ISSN :: 2454–1508 doi Prefix: 10.69655
IIFS Impact Factor: 4.5 IJIN Impact Factor: 8.5

CERTIFIED ISO 9001:2015 CERTIFIED

আত্মদীপ

আন্তর্জাতিক দ্বিমাসিক পিয়ার-রিভিউড গবেষণামূলক পত্রিকা

পর্ব-২, সংখ্যা-৪, মার্চ ২০২৬

সম্পাদক: ড. বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য
সহ-সম্পাদক: আজিজুল সেখ

আত্মদীপ

আন্তর্জাতিক দ্বিমাসিক পিয়ার-রিভিউড গবেষণামূলক পত্রিকা

পর্ব-২, সংখ্যা-৪, মার্চ ২০২৬

সম্পাদক:

ড. বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য

সহ-সম্পাদক:

আজিজুল সেখ

UTTAR SURI
Inheriting the spirit, inspiring the future

Uttarsuri | ISO 9001:2015 Certified Publisher
Website: **https://www.uttarsuri.com**
+919101232388 **admin@uttarsuri.com**

ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5(IJIN)
Volume-II, Issue-IV, March, 2026

Published by:
Dr. Bishwajit Bhattacharjee
Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: https://www.atmadeep.in/
Article Submission Link: https://www.uttarsuri.com/uttarsuri
Email: editor@atmadeep.in

Editor-in-Chief
Dr. Bishwajit Bhattacharjee

Associate Editor
Azizul Sekh

Type Setting:
Amrika Das Purkayastha
Soumili Dhar

Printed at:
Scholar Publications
Sribhumi, Assam, India, 788710

Cover Page:
Bishwajit Bhattacharjee

Price: Rs. 800.00

© Uttarsuri

The views and contents of this Journal are solely of the authors. This Journal is being sold on the condition and understanding that its contents are merely for information and reference and that neither the author nor the publishers, Printers or Sellers of this Journal are engaged in rendering legal, accounting or other professional service.

The publishers believe that the contents of this Journal do not violate any existing copyright/intellectual property of others in any manner whatsoever. However, in the event the author has been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action.

Atmadeep, is a Bi-monthly electronic & Print journal of open Access Category. The Readers do not need to pay/register themselves to read and download the articles in the journal. However, it is only for scholarly/academic purpose that is non-commercial. Users while using excerpts from Atmadeep, must cite the author, content and the journal by including the link of the content. Individuals/ Companies/ Organizations intending to use contents from Atmadeep, for commercial purpose must contact the Editor-in-Chief.

Editorial Board

Advisor



Dr. Tapadhir Bhattacharjee
Former Vice-Chancellor, Assam University, Silchar, Assam
President, Uttarsuri, Sribhumi, Assam
Mo: +919435566494



Dr. Nirmal Kumar Sarkar
Former Associate Professor, Karimganj College, Sribhumi, Assam
Vice-President, Uttarsuri, Sribhumi, Assam
Mo: +919435375599

Editor-in-Chief



Dr. Bishwajit Bhattacharjee
Associate Professor, Karimganj College
Sribhumi, Assam, 788710
Mo: +919435750458, +917002548380
Email: bishwajit@karimganjcollege.ac.in

Associate Editor



Azizul Sekh
Research Scholar, Dept. of Bengali, Tripura University, Tripura
Mo: +919126261414
Email: azizul.bengali@tripurauniv.ac.in

Editorial Board Member:



Dr. Debasish Bhattacharjee
Professor & Head, Dept. of Bengali
Assam University, Silchar
Email: debashish.bhattacharya@aus.ac.in



Dr. Rupasree Debnath
Assistant Professor, Department of Bengali
Gauhati University, Assam, India
Email: rupasree@gauhati.ac.in



Dr. Malay Deb
Assistant Professor, Dept. of Bengali
Tripura University, Tripura, India
Email: malaydeb@tripurauniv.ac.in



Dr. Madhumita Sengupta
Asst. Professor, Dept. of Bengali
Arya Vidyapeeth College, Guwahati, Assam, India
Email: madhumita.sengupta@avcollege.ac.in



Dr. Debjani Bhowmick (Chakraborty)
Associate Professor, Dept. of Bengali,
Sripat Singh College, Murshidabad, West Bengal, India
Email: dbhowmick@sripatsinghcollege.edu.in



Romana Papri
Lecturer, Department of Pali and Buddhist Studies
University of Dhaka, Bangladesh
Email: romanapapri@du.ac.bd



Dr. Rajarshi Chakrabarty
Assistant Professor, Dept. of History
University of Burdwan, West Bengal, India
Email: rchakrabarty@hist.buruniv.ac.in



Dr. Mumit Al Rashid
Associate Professor and chairman
Department of Persian Language and Literature
University of Dhaka, Bangladesh
Email: mumitarashid@du.ac.bd



Dr. Barnali Bhowmick Ghosh
Associate Professor and HOD
Department of Bengali
Bir Bikram Memorial College, Agartala, Tripura

দ্বিতীয় পর্ব, প্রথম সংখ্যা, সূচিপত্র

কথাসাহিত্য

১। **সোমেন চন্দের নির্বাচিত গল্পে সাম্যবাদী ভাবধারার কথাবিশ্বে মানবজীবনের রেখাচিত্র**
ড. সম্প্রিয়া চ্যাটার্জী, ১-৭

২। **বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্যের 'ইয়ারুইঙ্গম' উপন্যাসে অন্ত্যজশ্রেণির সংগ্রাম**
ড. যতন সাহা, ৮-১৬

৩। **সাধারণ জীবন থেকে সাহিত্য-সৃজন: নবনীতা দেবসেনের নির্বাচিত ছোটগল্পের প্রেক্ষিত**
সরলা মাণ্ডি, ১৭-২৩

৪। **বিমল লামার 'নুন চা' উপন্যাস: লোকজ উপাদানের অন্বেষণ**
ড. বিকাশ নার্জিনারী, ২৪-২৯

৫। **নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোট গল্পে নিম্নবর্গীয় চেতনা: এক বিশ্লেষণী পাঠ**
রাজর্ষি মোহান্ত, ৩০-৩৭

৬। **রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে প্রতিবাদী নারী: এক বিশ্লেষণী পাঠ**
অপরাজিতা ভট্টাচার্য, ৩৮-৪৬

৭। **বিভূতিভূষণের 'চাঁদের পাহাড়': ভূগোলের চোখে**
সৌম্য ঘোষ, ৪৭-৫৩

৮। **শরদিন্দুর ব্যোমকেশ কাহিনিগুলোর অন্তর্বর্তী সমাজচেতনা**
রাহুল দে, ৫৪-৬৪

৯। **মুহূর্তে বদলে যায় নারীর জীবন: মহাশ্বেতা দেবীর 'প্রতি চুয়ান্ন মিনিটে' উপন্যাস**
অনসূয়া কুণ্ডু, ৬৫-৭১

১০। **সময়ের শিকল, নারীর আর্তনাদ: রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প**
সুপ্রিতা নাথ, ৭২-৭৮

১১। **শিবরাম চক্রবর্তীর রচনায় নারী চরিত্রের অবলোকন**
সুস্মিতা সাহা, ৭৯-৮৪

১২। **'সেই পাখি' উপন্যাসের কাহিনি ও শিল্পরূপ: লেখক সন্তোষকুমার ঘোষের দৃষ্টিভঙ্গির একটি বিশেষ পর্যালোচনা**
অশোককুমার রায়, ৮৫-৯২

১৩। **পঞ্চাশের মন্বন্তর কালে বাংলাদেশের নারীদের অবস্থা ও বাংলা উপন্যাসে তার প্রতিফলন**
সুজন সাহা, ৯৩-৯৭

নাট্যভাবনা

১৪। **চন্দন সেনের নির্বাচিত নাটকে প্রতিবাদী নারী চরিত্র**
জয়ন্তী রাজোয়াড়, ৯৮-১০২

কবিতা

১৫। **নারী চেতনার আলোকে মহাকালের নারী: প্রসঙ্গ মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতা**
ড. রেজাউল ইসলাম, ১০৩-১১০

১৬। **'কৃত্তিবাসে'র আলোয় শঙ্খ ঘোষ: দেশ-কাল-সমাজ ও মানুষের সংবেদনশীল বয়ান**
শিরিন আক্তার, ১১১-১১৮

১৭। **বাংলা কাব্যগীতির ধারায় অতুলপ্রসাদ সেনের গজল**
মো: আফতাব উদ্দিন, ১১৯-১২৭

১৮। **স্থানীয় ইতিহাস চর্চায় কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী**
সুমিত পাল, রঞ্জনা ব্যানার্জি ও সমীররঞ্জন অধিকারী, ১২৮-১৩৭

১৯। **মধ্যযুগের মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর রচনায় প্রকৃতির স্বরূপ ও রূপবৈচিত্র্য**
হুমায়ুন কবির, ১৩৮-১৪৩

দর্শন ভাবনা

২০। **উপনিষদে বিশ্বসংস্কৃতি ভাবনা: একটি সমীক্ষা**
ড. স্বপন মাল, ১৪৪-১৫৪

২১। **স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত দর্শন এবং পাশ্চাত্যে এর প্রভাব: একটি বিশ্লেষণ**
ড. আনন্দ ঘোষ, ১৫৫-১৬০

২২। **জীবন জিজ্ঞাসা: ভারতীয় দর্শনের আলোকে একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ**
ড. মৈত্রী গোস্বামী, ১৬১-১৬৬

২৩। **দুঃখ ও দুঃখ মুক্তির উপায়: ধম্মপদের আলোকে একটি সমীক্ষা**
টোটন হাজরা, ১৬৭-১৭২

লোকসাহিত্য

২৪। **শ্রী অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তীর আলাপনে ছড়া ও আঞ্চলিক শব্দ**
অলোক চন্দ, ১৭৩-১৮৩

২৫। **বিখ্যাত কিছু ধাঁধা: একটি বিশ্বব্যাপী অন্বেষণের প্রয়াস**
অসিত মন্ডল, ১৮৪-১৮৯

২৬। **'ঠাকুরমার ঝুলি' (১৯০৭): রূপকথা ও শাশ্বত, আখ্যান কৌশলের আধুনিক বুনন**
সমরজিৎ শর্মা, ১৯০-১৯৫

বিবিধ

২৭। **প্রসঙ্গ কলকাতা ৭১: চলচ্চিত্র ভাষার নবনিরীক্ষা**
ড. মোস্তাক আলি, ১৯৬-২০৩

২৮। **বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের আধুনিকতার রূপায়ন**
মো: কয়েছ আহমেদ ও ড. কৃষ্ণা ভদ্র, ২০৪-২১৭

২৯। **সাদা-কালোর বাইরে: নন-বাইনারি পরিচয়ের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক অনুসন্ধান**
বসুন্ধরা গাঙ্গুলি, ২১৮-২২৪

৩০। **বাড়ি থেকে পালিয়ে: স্রষ্টার দ্বন্দ্ব, সৃষ্টির দ্বন্দ্ব**
অগ্নিভ সান্যাল, ২২৫-২৩০

৩১। **ভেষজ চিকিৎসায় পশ্চিম মেদিনীপুরের একটি গ্রাম কর্ণগড়ের একটি সমীক্ষা**
অনন্যা মুখার্জী, ২৩১-২৩৭

৩২। **ভারতবর্ষে রাজনৈতিক জনমত গঠনে সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারদের ভূমিকা**
শুভেন্দু বোস, ২৩৮-২৪৮

৩৩। **কাব্যসৌন্দর্যের আলোকে ঈশোপনিষদ**
মন্দিরা ডাঙ্গর, ২৪৯-২৫৫

৩৪। **সত্যজিৎ রায়ের গল্প: ভৌতিক ভাবনার রূপায়ণ**
সুরজিৎ সাহা, ২৫৬-২৬২

দ্বিতীয় পর্ব, দ্বিতীয় সংখ্যা, সূচিপত্র

কথাসাহিত্য

১। **সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'অর্ধেক আকাশ': বর্তমান সমাজে নারীর অবস্থান**
মহাদেব মণ্ডল ও লক্ষ্মীশ্রী ঠাকুর, ২৬৩-২৬৮

২। **কল্লোল লাহিড়ীর 'ইন্দুবালা ভাতের হোটেল': নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার আখ্যান**
ড. আনিসুর রহমান, ২৬৯-২৭৪

৩। **নির্বাচিত বাংলা ছোটোগল্প: দেশভাগ ও মানুষের স্বপ্নভঙ্গের আখ্যান**
ড. আজিমুদ্দিন মণ্ডল, ২৭৫-২৮০

৪। **নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'গল্পমালা'-র নির্বাচিত গল্পে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ: একটি গবেষণামূলক অধ্যয়ন**
দীপশিখা দাস ও ড. মিতা চক্রবর্তী, ২৮১-২৮৯

৫। **ছোটগল্পকার জগদীশ গুপ্তের 'চন্দ্র-সূর্য যতোদিন' গল্পে নারীর করুণ জীবনালেখ্য: একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা**
প্রিয়তমা মজুমদার, ২৯০-২৯৫

৬। **স্বর্ণকুমারী দেবীর সামাজিক উপন্যাস 'ত্রয়ী': গঠনশৈলী, পাশ্চাত্যপ্রভাব ও সংগীতপ্রয়োগ**
পম্পি দে, ২৯৬-৩০২

৭। **সুবোধকুমার চক্রবর্তীর 'রম্যাণি বীক্ষ্য'- এ দক্ষিণভারতের প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্য প্রসঙ্গ: একটি পর্যালোচনা**
জয়িতা সুর, ৩০৩-৩০৯

৮। **সন্তোষকুমার ঘোষের ছোটগল্পে সমাজ-দর্শন ভাবনা**
অরূপ কুমার পাল, ৩১০-৩১৬

৯। **বন্ধুত্বের নিরন্তর বন্ধন: রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ**
সন্দীপ ঘোষ, ৩১৭-৩২২

১০। **গল্পের মোড়কে অন্ত্যজশ্রেণির বাস্তব সংগ্রামের আখ্যান: প্রসঙ্গ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'কয়লাকুঠির দেশ'**
অনুরাধা দাস, ৩২৩-৩২৮

১১। **উনিশ শতকের প্রেক্ষিতে নারীর জীবনযাত্রা: প্রসঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কঙ্কাবতী'**
সুনন্দা ঘোষ, ৩২৯-৩৩৫

নাট্যভাবনা

১২। **শেখর দেবরায়ের মনসাকথা নাটক: নির্মাণ-বিনির্মাণ**
ড. প্রশান্ত দাস, ৩৩৬-৩৪১

কবিতা

১৩। **নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতায় 'কবিতার' প্রসঙ্গ**
মিহির মজুমদার ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য, ৩৪২-৩৪৯

দর্শন ভাবনা

১৪। **জীবনের যাপন ও জড়বাদী ভাবনা: চার্বাক দর্শনের আলোকে একটি সমীক্ষা**
ড. মৈত্রী গোস্বামী, ৩৫০-৩৫৫

১৫। **শিক্ষা ভাবনায় দর্শন: একটি নৈতিক ও চিন্তাগত অন্বেষণ**
কাজী মাহফুজা হক, ৩৫৬-৩৬২

১৬। **মানবিক মূল্যবোধ এবং বিশ্বসংস্কৃতি রক্ষার্থে সংস্কৃত-ভাষা: একটি সমীক্ষণ**
অভিজিৎ পণ্ডিত, ৩৬৩-৩৬৮

১৭। **হিন্দু ও ইসলামের ধর্মীয় শাস্ত্রে নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির দর্শন**
সান্তনা রানী সামন্ত ও আশাদুজ্জামান খান, ৩৬৯-৩৮২

লোকসাহিত্য

১৮। **লোকভাষ্যে বাংলার গ্রামীণ সমাজ ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন**
ড. মোঃ রাজিবুল ইসলাম, ৩৮৩-৩৯৩

১৯। **গোপভূমের ঐতিহ্যে আল্পনা গ্রাম লবন্ধার**
রুদ্রনীল চোংদার, ৩৯৪-৪০১

২০। **জাওয়া-করম উৎসব: সামাজিক ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্য**
রঞ্জিত কুমার মাহাত, ৪০২-৪১১

বিবিধ

২১। ***যদুবংশ*: বিভ্রান্ত সময়ের যাপিত যৌবন**
ড. প্রীতম চক্রবর্ত্তী, ৪১২-৪২৪

২২। **পাতা থেকে পর্দায়: বাংলা সিনেমায় নারী চরিত্রের বিবর্তন**
ড. সোমা ব্যানার্জি ও অমৃতা চক্রবর্তী, ৪২৫-৪৩০

২৩। **সাবেকি ভূরাজনীতি: ভূরাজনীতির সাবেকি চিন্তাবিদ এবং তাদের তত্ত্বের বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা**
সৌমেন মণ্ডল, ৪৩১-৪৪১

২৪। **জ্ঞান সাধনা, ইসলামী শিক্ষা বিস্তার ও প্রচার-প্রসারে উবায়দুল হক (রহ.)- এর ভূমিকা**
মোঃ কামাল উদ্দিন, ৪৪২-৪৪৯

২৫। **ব্রাত্য বসুর 'রুদ্ধসংগীত': প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী বয়ান**
রবিউল সেখ, ৪৫০-৪৫৭

২৬। **ঔপনিবেশিক ও পরবর্তী ঔপনিবেশিক যুগে পুরুলিয়ার ইতিহাসে কুষ্ঠ ব্যাধি ও জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা: প্রসঙ্গ দ্য লেপ্রসি মিশন হাসপাতাল**
স্বাগতা রায়, ৪৫৮-৪৬৬

২৭। **প্রসঙ্গ ধর্ম: যক্ষ-যুধিষ্ঠির সংলাপের আলোকে একটি সমীক্ষা**
পার্থসারথি অধিকারী, ৪৬৭-৪৭২

২৮। **সত্যজিৎ রায়ের কলমে বহির্জাগতিক প্রাণীর রূপায়ণ: একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন**
সুরজিৎ সাহা, ৪৭৩-৪৭৮

দ্বিতীয় পর্ব, তৃতীয় সংখ্যা, সূচিপত্র

কথাসাহিত্য

১। **আশাকাঙ্ক্ষী মানুষের অন্তর্লোক উদ্ঘাটনে বনফুলের প্রথম উপন্যাস 'তৃণখণ্ড'**
ড. বরুণ কুমার সাহা, ৪৭৯-৪৮৬

২। **নতুন ভোরের সন্ধানে বাজিকরের পথ চলা: প্রসঙ্গ 'রহু চণ্ডালের হাড়'**
ড. অর্পিতা রায় মৌলিক, ৪৮৭-৪৯৪

৩। **জয়া মিত্রের ছোটগল্প: নারী জীবনের বহুমাত্রিকতা**
সুজিত মণ্ডল, ৪৯৫-৫০১

৪। **ব্যাঘ্র প্রকল্প ও অরণ্যভূমিপুত্রদের জীবনকথা: অরণ্য ও শিকারকেন্দ্রিক বাংলা কথাসাহিত্য অবলম্বনে একটি পর্যালোচনা**
পূজা ভুঁঞে, ৫০২-৫১০

৫। **অনিতা অগ্নিহোত্রীর নির্বাচিত ছোটগল্পে নারী: অন্য আলোকে**
মঞ্জুশ্রী মুর্মু, ৫১১-৫১৭

৬। **সেলিনা হোসেনের 'চার যুবকের বিলাপ' গল্পে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী অবক্ষয়িত সমাজের অপরাধপ্রবণতা ও মাতৃত্ববোধের উত্তরণ**
মোবারক হোসেন, ৫১৮-৫২৪

৭। **বনফুলের ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত জীবন ও বেকারত্বের সংকট: একটি বিশ্লেষণ**
সেখ সাকলিনউদ্দিন, ৫২৫-৫৩২

নাট্যভাবনা

৮। **স্বদেশিকতার আলোয় অমৃতলাল বসুর 'সাবাস বাঙালী'**
নগেন মুর্মু, ৫৩৩-৫৪০

দর্শন ভাবনা

৯। **ব্রহ্মবিহার চতুষ্টয় বৌদ্ধ নৈতিক দর্শনের আলোকে এর তাৎপর্য ও আধুনিক প্রাসঙ্গিকতা**
ড. সঞ্জয় পাল, ৫৪১-৫৪৮

১০। **ব্রহ্মবিহারভাবনা: এক অভিনব ভাবনা**
তনুজা খাতুন, ৫৪৯-৫৫৬

১১। **সকল বিজ্ঞানের রাণী ও জননী হিসেবে দর্শন: একটি সমীক্ষণ**
খোকন সেখ, ৫৫৭-৫৬৩

১২। **অরবিন্দের দর্শন চিন্তার আলোকে মানবোত্তরণ: একটি সমীক্ষা**
জয়দেব হাজরা, ৫৬৪-৫৬৯

১৩। **প্রসঙ্গ নৈতিক আদর্শ ও মুল্যবোধ: প্রেক্ষাপট ভারতীয় নীতিদর্শন**
পারমিতা রায়, ৫৭০-৫৭৬

১৪। **সাক্ষীপ্রতীতি দ্বারা অজ্ঞানের সিদ্ধি: মাধ্ব এবং অদ্বৈতমত বিচার**
রাহুল ভৌমিক, ৫৭৭-৫৮৪

১৫। **সাংখ্যদর্শনে কল্যাণতত্ত্ব**
দিব্যা চৌধুরী, ৫৮৫-৫৯১

লোকসংস্কৃতি

১৬। **উত্তর ত্রিপুরার বিবাহকেন্দ্রীক লোকাচার: বাঙালি হিন্দুসমাজ**
রাজু নাথ, ৫৯২-৫৯৮

বিবিধ

১৭। **ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের সূত্রপাত: ভাসানীর "সাপ্তাহিক হক কথা"-র আলোকে**
তাপস দাস ও বিমল সরকার, ৫৯৯-৬১২

১৮। **চিকিৎসা নৈতিকতার সংকট প্রেক্ষিত বাংলাদেশ**
কাজী মাহফুজা হক, ৬১৩-৬২৩

১৯। **নারী মনস্তত্ত্বের আলোকে 'মেয়েলি সংলাপ'**
ড. পৌলোমী রায়, ৬২৪-৬৩৬

২০। **কর্তব্য, ন্যায় ও সংহতি: বাংলাদেশে অধিকার-আন্দোলনে ব্যক্তির নৈতিক অংশগ্রহণের দার্শনিক ভিত্তি**
কাজী মাহফুজা হক, ৬৩৭-৬৪৬

২১। **বাংলার ঘর-গৃহস্থালি ও চাকর-বাকর: দাসবৃত্তির ইতিহাস ও পরিণতি বিষয়ক একটি তথ্যগত সংক্ষিপ্ত আলোচনা**
তুলিকা বণিক, ৬৪৭-৬৫৫

২২। **ছন্দশিল্পী রবীন্দ্রনাথের ছন্দ চিন্তা এবং বাংলা ছন্দে তাঁর অবদান**
সুমন মোদক, ৬৫৬-৬৬৩

২৩। **'বাঙ্গলার কথা' ও 'বাঙালি পেট্রিয়টিজম্': ব্যক্তিত্ব ও ব্যবধান: একটি তুলনামূলক আলোচনা**
রাহুল মণ্ডল, ৬৬৪-৬৭২

২৪। **স্বাধীন ভারতের শিখ পরিচিতির আন্দোলন: পাঞ্জাবি সুবা আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা**
শুক্লা মণ্ডল, ৬৭৩-৬৮০

২৫। **উন্নয়ন ও স্থানচ্যুতি: একটি পর্যালোচনা**
রাজেশ মন্ডল, ৬৮১-৬৮৯

২৬। **সমরেশ বসুর 'গঙ্গা': ধীবর সংস্কৃতির আলোকে**
প্রিয়া দে, ৬৯০-৬৯৬

২৭। **সন্দর্ভ নির্মাণের বিভিন্ন অঙ্গ নির্মাণ এবং গবেষণার ভাষা ও ভাষা বয়নের কৌশল: একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন**
ড. বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, ৬৯৭-৭০৯

দ্বিতীয় পর্ব, চতুর্থ সংখ্যা
সূচিপত্র

১। **মধুসূদন দত্তের সাহিত্যের ভাষাবয়ন**
সঞ্জিৎ মণ্ডল, ৭১০-৭২০

২। **উপন্যাসের ঊর্মিতে, মনস্তত্ত্বের গহনে শ্যেনদৃষ্টি**
বর্ণালী ভৌমিক (ঘোষ), ৭২১-৭৪২

৩। **দীনেশচন্দ্র সেনের রাখালকথা: কোথা গেলে প্রেম পাই?**
ড. পারমিতা ব্যানার্জী মণ্ডল ও ড. সিদ্ধেশ্বর ব্যানার্জী, ৭৪৩-৭৫১

৪। **মনোজ মিত্রের সামাজিক নাটক**
ড. সুপ্রিয়া দাস ও ড. অরুপা চক্রবর্তী, ৭৫২-৭৫৮

৫। **স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে নারী শিক্ষার বিকাশ: অগ্রগতি, সমস্যা ও কর্মসূচীসমূহ**
ড. কৌশিক ভক্ত, ৭৫৯-৭৬৭

৬। **বাংলাদেশের নির্বাচিত নাটকে নারী চরিত্রে প্রান্তিকতার উপস্থাপন**
ড. আইরিন পারভিন, ৭৬৮-৭৭৮

৭। **আধুনিক গণতন্ত্রের সংকট ও রবীন্দ্রনাথ**
ড. অমিত কুমার দাস, ৭৭৯-৭৮৫

৮। **গ্রন্থ সম্পাদনায় সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা ও কৃতিত্ব পর্যালোচনা**
ড. মুন্সী মহম্মদ সাইফুল আহমেদ, ৭৮৬-৭৯৭

৯। **নীলকমল ব্রহ্মের গল্পে জনজাতীয় উপাদান ও আবেগের প্রতিফলন**
ড. রাজীব কুমার সাহা, ৭৯৮-৮০৪

১০। **শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কিশোর উপন্যাস: যতটা ভৌতিক, ততটাই মানবিক**
ড. অন্তরা চৌধুরি, ৮০৫-৮১১

১১। **সত্যের পক্ষে না ক্ষমতার? বাংলা সংবাদপত্রে নৈতিক দ্বন্দ্ব ও দর্শনের প্রতিফলন**
বিনন্দ সরেন, ৮১২-৮১৮

১২। **নাগরিকত্বের ধারণা: তাত্ত্বিক ভিত্তি ও সমকালীন বাস্তবতা**
বিজয় দাস, ৮১৯-৮২৯

১৩। **সমাজবাস্তবতার নিরিখে নির্বাচিত অসমীয়া গল্পকার ও গল্প: একটি বিশ্লেষণাত্মক পাঠ**
ড. টিটন রুদ্র পাল, ৮৩০-৮৩৯

১৪। **সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে নারী স্বাতন্ত্রতা: প্রফুল্ল রায়ের 'অদ্বিতীয়া' উপন্যাসের নিরিখে**
কেয়া দাস চক্রবর্তী, ৮৪০-৮৪৬

১৫। **গণেশ দের 'অতি সাধারণ এক কাহিনি': একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন**
বাপ্পন দেবনাথ, ৮৪৭-৮৫২

১৬। **শরৎচন্দ্রের 'পল্লী-সমাজ' উপন্যাসে জ্যাঠাইমা: কাহিনি বিন্যাসে এক প্রভাবশালী চরিত্রের মূল্যায়ন**
নিরঞ্জন মণ্ডল, ৮৫৩-৮৫৯

১৭। **পূর্ব মেদিনীপুরে লোকসংগীত চর্চার ধারা: পটুয়া গান**
ড. অনুরূপা হাজরা, ৮৬০-৮৬৮

১৮। **বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থটির আলোকে ধর্ম বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা**
সুদীপ পাল, ৮৬৯-৮৭৫

১৯। **বৈদিক সংস্কৃতি ও নৈতিকতা: একটি দর্শনগত পর্যালোচনা**
অরিন্দম গাঙ্গুলী, ৮৭৬-৮৮২

২০। **রবীন্দ্রনাথের পরিচয়-বিশ্বে জোনা গেল: এক মার্কিন লেখিকার অজানা তথ্য**
ড. শ্যামল কুমার মণ্ডল, ৮৮৩-৮৯০

২১। **উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর শিশুসাহিত্যে পুরাণ প্রসঙ্গ: নির্বাচিত পাঠ**
পৃথ্বীশ মজুমদার, ৮৯১-৮৯৭

২২। **কৌটিল্যর অর্থশাস্ত্রে কৃষি অনুশীলন: বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও আধুনিক প্রাসঙ্গিকতা**
মলয় ঘোষ, ৮৯৮-৯০৪

২৩। **আধুনিক ভারত গঠনে স্বামী বিবেকানন্দের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি: একটি পর্যালোচনা**
আব্দুল আলিম শেখ, ৯০৫-৯১১

২৪। **বেগম রোকেয়া: নারীশিক্ষা, সমাজসংস্কার ও সংগ্রামের ইতিহাস**
নওয়াজ শরিফ, ৯১২-৯২২

২৫। **নারীহৃদয়ের জটিল সমীকরণ: বাদল সরকারের নাটক**
ড. পাপিয়া সামন্ত, ৯২৩-৯২৯

২৬। **বিদ্যাসাগরের দর্শনচিন্তা: যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ ও সামাজিক ন্যায়ের এক সমন্বিত দার্শনিক বিশ্লেষণ**
জয়দীপ সাম, ৯৩০-৯৩৬

২৭। **ভগবদ্গীতার নিষ্কাম কর্ম এবং ইমানুয়েল কান্টের 'কর্তব্যের জন্য কর্তব্য'— এই দুইয়ের তুলনামূলক অধ্যয়ন**
প্রিয়াঙ্কা পাল, ৯৩৭-৯৪৫

২৮। **যুক্তির বৈধতা বিচারে সত্যসারণী নির্ণয় পদ্ধতির সীমা এবং অবরোহী প্রমাণ পদ্ধতির সূচনা**
রাগাই হেমব্রম, ৯৪৬-৯৫৫

২৯। **মার্ক্সীয়তত্ত্বের বীক্ষণে: মনোজ মিত্রের 'নরক গুলজার'**
সত্য দাস, ৯৫৬-৯৬৪

৩০। **'বাতাসে লাশের গন্ধ' অবলম্বনে রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহের কবিতার কথা**
শ্রেয়সী রায়, ৯৬৫-৯৭৪

৩১। **প্রেমেন্দ্র মিত্রের নির্বাচিত গল্পে প্রান্তিকতা: একটি অন্বেষণ**
রিয়া সাহা, ৯৭৫-৯৮১

৩২। **ন্যায়-বৈশেষিক গুণতত্ত্বে রূপরসাদি, পৃথক্ত্ব ও পরত্বাপরত্ব: পদার্থতত্ত্বনিরূপণ-কেন্দ্রিক বিশ্লেষণ**
সুদীপ্ত মণ্ডল, ৯৮২-৯৯১

৩৩। **স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে নারী: একটি সমীক্ষা**
সাজনা খাতুন, ৯৯২-৯৯৯

৩৪। **ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গিতে: বাস্তুকেন্দ্রিকতাবাদ**
সৌরভ মহান্ত, ১০০০-১০০৭

৩৫। **ধর্ম–সাধনা পদ্ধতি: এক অনন্য পরিক্রমা**
সুমন্ত রবিদাস, ১০০৮-১০১৫

৩৬। **ঔপনিবেশিক বাংলায় শ্রমিক চেতনার মুখপাত্র: বিশের দশকের 'সংহতি' পত্রিকার একটি বিশেষ পাঠ**
মস্তাফিজুর আলম, ১০১৬-১০২৩

৩৭। **মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার আলোকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প**
জ্যোতিস্মিতা চক্রবর্ত্তী, ১০২৪-১০৩১

৩৮। **বাদল সরকারের নাট্যসংলাপ ও কাব্যিক প্রকাশ**
সাহেব দাঁ, ১০৩২-১০৪২

৩৯। **কজিটোর মৃত্যু: লাঁকানীয় মনোবিশ্লেষণ ও বিষয়-গঠনে চিহ্নকের একাধিপত্য**
ড. মোঃ নাজমুল হাসান, ১০৪৩-১০৫৪

৪০। **'উইঙ্কল টুইঙ্কল'- ফাঁপা মানুষের উৎসসন্ধান**
ড. সুদেষ্ণা মৈত্র, ১০৫৫-১০৬২

৪১। **পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা**
ভবেশ চন্দ্র মুর্ম্মু, ১০৬৩-১০৭০

৪২। **মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও গ্রামসির সাংস্কৃতিক আধিপত্য: রাজনৈতিক দর্শনের একটি সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ**
প্রিয়াঙ্কা সাধুখাঁ, ১০৭১-১০৭৮

৪৩। **ফেরারি ফৌজ, স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অন্য অধ্যায় ও নিম্নবর্গের অবস্থান**
প্রতাপ বিশ্বাস, ১০৭৯-১০৮৫

৪৪। **রবীন্দ্রনাথের দর্শনচিন্তায় মানুষের ধারনা**
দেবাশিস বিশ্বাস, ১০৮৬-১০৯২

৪৫। **একবিংশ শতাব্দীতে ভারত–শ্রীলঙ্কা সম্পর্ক: ভূরাজনৈতিক ও কৌশলগত সমন্বয়ের একটি বিশ্লেষণ**
নৌরিন সিদ্দিকী, ১০৯৩-১১০৬

৪৬। **প্রযত্ন নীতিবিদ্যার আলোকে মহাত্মা গান্ধীর নারীচিন্তার দার্শনিক বিশ্লেষণ**
প্রিয়াঙ্কা সাধুখাঁ, ১১০৭-১১১৬

৪৭। **ঋত্বিক ঘটকের নাটক 'জ্বলন্ত': সামাজিক অবক্ষয়ের মর্মস্পর্শী ছবি**
সৌমিক মুখার্জী, ১১১৭-১১২৩

৪৮। **বিধবাদের ব্রত পালন: বাঙালি সমাজে ধর্ম, লিঙ্গ ও সামাজিক শাসন**
অমরেন্দ্র প্রধান, ১১২৪-১১৩০

৪৯। **দেবমহিমা প্রচার নাকি নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার চিরন্তন প্রচেষ্টা: প্রসঙ্গত মঙ্গলকাব্যের পটভূমি**
বিউটি রুদ্র, ১১৩১-১১৩৭

৫০। **দুয়ারে সরকার কর্মসূচি এবং প্রান্তিক স্তরের কল্যাণমূলক সুশাসনের প্রাতিষ্ঠানিক রূপায়ন: পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান–১ ব্লকের একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা**
সূর্য কান্ত দত্ত, প্রসেনজিৎ রায়, গবেষক ও উদয় মুর্মু, ১১৩৮-১১৪৮

৫১। **ভাষা আন্দোলনের রক্তস্মৃতি থেকে বিশ্বায়নের যুগ**
নিলুফা ইয়াসমিন, ১১৪৯-১১৫৭

৫২। **বাংলাভাষার প্রথম সার্থক কল্পবিজ্ঞানকাহিনি: একটি পর্যালোচনা**
অমৃতেন্দু রায়, ১১৫৮-১১৬৪

৫৩। **শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য-আন্দোলনের ধারায় গল্পকার বলরাম বসাক**
রাজেশ কর্মকার, ১১৬৫-১১৭১

৫৪। **তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি': ভিন্ন আলোকে**
সায়ন মণ্ডল, ১১৭২-১১৭৮

৫৫। **সুরথনাথ থেকে কালকূটের যাত্রাপথ**
সুমন্ত দাস, ১১৭৯-১১৮৪

৫৬। **যৌনতা, নারীদেহ, 'স্ল্যাং': লিঙ্গ হিংসা ও ক্ষমতার রাজনীতি**
সাবনূর সনম কামিনী, ১১৮৫-১১৯৪

৫৭। **নিম্নবিত্তীয় জীবন ভাবনার আলোকে সমরেশ মজুমদারের গল্প**
অনন্ত বর্মন, ১১৯৫-১২০১

৫৮। **সমকামী ও রূপান্তরকামী আত্মপরিচয়ের নির্মাণ: স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'হলদে গোলাপ' উপন্যাসের আলোকে**
তুলিকা মণ্ডল, ১২০২-১২১০

৫৯। **পাশ্চাত্য হিতবাদ ও ভারতীয় আধ্যাত্মিকতায় নৈতিক আদর্শ বিবেকানন্দের প্রতিক্রিয়া**
অভিজিৎ গরাই, ১২১১-১২১৭

৬০। **ক্ষেত্র সমীক্ষা ভিত্তিক রাঢ় বাংলায় হিন্দু-মুসলিম যৌথ ধর্মীয় উপাসনা ও মানত প্রথার দৃষ্টান্ত**
মুন্সী মহ: সাহেবুর রহিম, ১২১৮-১২২৫

৬১। **একুশ শতকের জন্মলগ্ন থেকে বাংলা চলচ্চিত্রে বাংলা কবিতারা**
মৌপিয়া মুখার্জী, ১১২৬-১২৪৩

৬২। **একবিংশ শতকের বাংলা কবিতার স্বরূপ**
কনক মণ্ডল, ১২৪৪-১২৫৫

৬৩। **পাতঞ্জল যোগ দর্শনে চিত্তবৃত্তি নিরোধ: একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ**
নাড়ুগোপাল প্রসাইত, ১২৫৬-১২৬৪

৬৪। **রবীন্দ্র সাহিত্যেবাউল দর্শনের প্রভাব**
সন্দীপ কুমারপতি, ১২৬৫-১২৭১

৬৫। **সুদক্ষিণা সেনের 'জীবনস্মৃতি': আধুনিক ভারতের সমাজ ইতিহাসের এক নারী কণ্ঠ**
সৈকত পাত্র, ১২৭২-১২৮২

৬৬। **ব্রাহ্মসমাজে মতাদর্শিক দ্বন্দ্ব ও ধর্মীয় রূপান্তর: রাজনারায়ণ বসু ও কেশব চন্দ্র সেনের চিন্তা ও কর্মের আলোকে একটি সমালোচনামূলক ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ**
প্রতীক দুয়ারী, ১২৮৩-১৩০০

৬৭। **ঈশ্বরসৃষ্ট কাল ও মানবচেতনার কাল: মধ্যযুগীয় দার্শনিক সেন্ট অগাস্টাইনের সময়তত্ত্বের দ্বৈত ব্যাখ্যা**
সুব্রত ক্ষেত্রী, ১৩০১-১৩০৮

৬৮। **বিস্মৃতপ্রায় জনপদ দেবীগঞ্জের ব্রাহ্ম সমাজ ও শিক্ষা সংস্কৃতির ধারা: একটি পর্যালোচনা**
ড. রাহুল কুমার দেব, ১৩০৯-১৩১৮

৬৯। **সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ: বাংলার সঙ্গে বর্হির্বিশ্বের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের অগ্রদূত**
ড. মোঃ নওয়াজ শরিফ ও মহ. সেখ মারুফ আজম, ১৩১৯-১৩২৫

৭০। **কালিদাসের রচনায় নারী মনস্তত্ত্ব**
শিপ্রা পাল, ১৩২৬-১৩৩২

৭১। **বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্যের চর্চার কয়েকটি দিক: একুশ শতকের মূল্যায়ন**
সৌম্য ঘোষ, ১৩৩৩-১৩৩৯

৭২। **ভ্রমণে সংস্কৃতি: সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যাম-দেশ'**
বর্ণালী দত্ত, ১৩৪০-১৩৪৫

৭৩। **রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ভাবনা ও দেশপ্রেমের স্বরূপ**
সায়ন সরকার, ১৩৪৬-১৩৫৪

৭৪। **ন্যায় দর্শনে অনুমিতি জ্ঞানের করণ: ব্যাপ্তিজ্ঞান না পরামর্শ— একটি সমীক্ষা**
সৌরভ মণ্ডল, ১৩৫৫-১৩৬২

৭৫। **শরৎ সাহিত্যে নিম্নবর্গীয় শ্রেণির ভাষা-সংলাপ**
কিরণ মণ্ডল, ১৩৬৩-১৩৭৯

৭৬। **উত্তর-ঔপনিবেশিক মেদিনীপুর জেলা: কৃষি অর্থনীতি এবং কৃষি কাঠামো (১৯৪৭-১৯৫৫)**
রাজকুমার মন্ডল, ১৩৮০-১৩৮৯

৭৭। **নৈতিকতায় মনস্তত্ত্বের ভূমিকা**
রত্না সরকার, ১৩৯০-১৪০০

৭৮। **অভাব পদার্থ সম্বন্ধে ন্যায়-বৈশেষিক ও মীমাংসকদের অভিমত: একটি তুলনামূলক আলোচনা**
টিংকু মণ্ডল, ১৪০১-১৪০৯

৭৯। **'শালগিরার ডাকে' উপন্যাসে দিকুদের আশ্রয়দাতা সাঁওতালরা: আদিবাসী ও অ-আদিবাসী মেলবন্ধন**
শিবরাম হাঁসদা, ১৪১০-১৪১৬

৮০। **মতি নন্দীর 'শবাগার': সত্তরের উত্তাপদগ্ধ আবর্তে অবক্ষয়ী মন ও হিমশীতল মৃত্যুভয়ের ঊর্ধ্বগামী পারদ**
মহেন্দ্র নাথ পাল, ১৪১৭-১৪২৬

৮১। **মনসামঙ্গল কাব্যে নারীর সামাজিক অবস্থান**
পুনম মুখার্জী, ১৪২৭-১৪৩৪

৮২। **শিবাজীকালীন মারাঠা জাতির আমোদ-প্রমোদ ও অবসর যাপনের ইতিকথা: রাজব্যবহারকোশের আলোকে একটি বীক্ষণ**
শ্রাবন্তী কাঞ্জিলাল, ১৪৩৫-১৪৪২

৮৩। **প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাপ: অন্তর্মনের কালোরজ্জু**
রাখী মিস্ত্রী, ১৪৪৩-১৪৪৮

৮৪। **পশ্চিমবঙ্গে রেশনিং ব্যবস্থার আর্থ-সামাজিক ইতিহাস ও রূপান্তর পর্যালোচনা**
সেখ সুজাউদ্দিন, ১৪৪৯-১৪৫৮

৮৫। **উৎপলকুমার বসুর কবিতা: পরাবাস্তববাদের আধারে আত্মসমীক্ষণ-প্রয়াস**
ড. সৌরভ মজুমদার, ১৪৫৯-১৪৬৮

৮৬। **রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের 'গোত্রহীন': প্রতিবাদে, প্রতিরোধে**
ড. সুভাষ মণ্ডল, ১৪৬৯-১৪৭৬

৮৭। **মহাশ্বেতা দেবীর নির্বাচিত ছোটোগল্প: নারীর অস্তিত্ব রক্ষার সংকট ও সংগ্রাম**
সোমনাথ চ্যাটার্জী, ১৪৭৭-১৪৮৮

৮৮। **স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা দলিত সাহিত্য: একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক পাঠ**
রাজা তালুকদার, ১৪৮৯-১৫০১

৮৯। **শ্রমিক ইতিহাস চর্চায় ঔপনিবেশিক বাংলার কবি-সাহিত্যিকদের চিন্তা-চেতনা: প্রসঙ্গ বাংলার নাবিক**
ড. আজহারুল মিদ্দা, ১৫০২-১৫০৮

৯০। **প্রতিবাদী ভাবধারায় সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতার পাঠ বিশ্লেষণ**
জুলিয়েট দীপা বিশ্বাস, ১৫০৯-১৫১৭

৯১। **লালন ফকিরের গানে সুফি প্রভাব: একটি আলোচনা**
মৌমিতা পাল, ১৫১৮-১৫২৮

৯২। **ভারতীয় দর্শনে বিবর্তন ও প্রকাশ: সাংখ্য, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং শ্রী অরবিন্দের তুলনামূলক অধ্যয়ন**
সম্পা দত্ত, ১৫২৯-১৫৩৫

৯৩। **পিণ্ডারিদের উত্থান ও বিকাশ ব্রিটিশপূর্ব ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট**
পুলক সরকার, ১৫৩৬-১৫৪৪

৯৪। **১৯৭১ পরবর্তী করিমপুরের উদ্বাস্তু কলোনির একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা**
সৌভিক মন্ডল ও রমা প্রামানিক, ১৫৪৫-১৫৫৫

৯৫। **শৈলী চিন্তার আলোকে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কিশোর উপন্যাস: 'পাতাল ঘর'**
ড. সবিতা বিশ্বাস, ১৫৫৬-১৫৭৩

৯৬। **যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'বাঙলার ডাকাত': অন্তরঙ্গ অবলোকন**
শাশ্বতী সেনগুপ্ত, ১৫৭৪-১৫৮০

৯৭। **শোলাশিল্প: একটি ঐতিহ্যবাহী আঙ্গিক**
আশিস হালদার ও সুজয়কুমার মণ্ডল, ১৫৮১-১৫৮৯

৯৮। **ভারতে মধ্যযুগে ভক্তি আন্দোলনে নারীদের অবদান**
বীথি দাস, ১৫৯০-১৬০১

৯৯। **জৈন নীতিতত্ত্বের প্রেক্ষিতে জীব ও অজীব তত্ত্ব: একটি পর্যালোচনা**
ঝুমা মন্ডল, ১৬০২-১৬০৮

১০০। **সাঁওতাল সমাজে রাজনৈতিক সংস্কৃতির বহুরূপতা: পুরুলিয়া জেলার প্রেক্ষাপটে ঐতিহ্য ও রূপান্তর**
রূপসিং টুডু, ১৬০৯-১৬১৫

১০১। **টুসু: কৃষি উৎসব ও ধনলক্ষীর লোকায়ত স্বরূপ**
রঞ্জিত কুমার মাহাত, ১৬১৬-১৬৩৩

১০২। **ফিরে চাও ধর্মরাজ' ও মহাভারতের আলোচনায় ভীম চরিত্রের পর্যালোচনা**
রীনা বিশ্বাস, ১৬৩৪-১৬৪৩

১০৩। **বিশ শতকে প্রচলিত অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে শিক্ষিত মহিলাদের কণ্ঠস্বর: 'ভারত-মহিলা' পত্রিকায়**
অনন্যা সামন্ত, ১৬৪৪-১৬৫১

১০৪। **পথের আহ্বান ও মায়ার বাঁধন: বিভূতিভূষণের দৃষ্টিতে জীবন ও মৃত্যু**
ড. নয়ন সরকার, ১৬৫২-১৬৫৮

১০৫। **স্মৃতি-সত্তা ও সময়ের দর্পণ: ওড়িয়া ছোটগল্পের পঞ্চরত্ন**
হায়দার সেখ, ১৬৫৯-১৬৬৫

১০৬। **ঔপনিবেশিক ভারতে ঠগীদের অপরাধ: উইলিয়াম হেনরি স্লিম্যানের বিবরণ ও অপরাধ-তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ**
কুন্দন চক্রবর্তী, ১৬৬৬-১৬৭৯

১০৭। **অজ্ঞানতা থেকে আত্মপরিচয়: দলিত ও নারী চেতনার জাগরণে ফুলের দর্শন**
সংযুক্তা পান, ১৬৮০-১৬৮৭

১০৮। **পরেশ মন্ডলের কবিতায় রঙ: বৈচিত্র্যের সন্ধানে**
চৈতালি ঘোষ, ১৬৮৮-১৬৯৫

১০৯। **প্রমথনাথ বিশীর আত্মচেতনায় রবীন্দ্রনাথ : জীবন সাধনা ও অর্চনার একটি রূপ**
মৃণালকান্তি মুর্মু, ১৬৯৬-১৭০৩

১১০। **আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'দীপ জ্বেলে যাই': অভিনয়ের আড়ালে এক নারীর ভালোবাসা ও আত্মত্যাগের গল্প**
রাধা গোবিন্দ নসিপুরী, ১৭০৪-১৭১০

১১১। **পশ্চিমবঙ্গের প্রথম শ্রেণির শিক্ষা ব্যবস্থায় 'সহজপাঠ প্রথম ভাগ'কে কেন্দ্রে রেখে 'আমার বই' নির্মাণ কৌশল: পর্যবেক্ষণ ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ**
সেখ সামিম আলি, ১৭১১-১৭২৩

১১২। **এখনো যারা (ব্রাত্যজন) নাগরিকত্ব সংকটে: প্রসঙ্গ ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল**
বিমল সরকার, ১৭২৪-১৭৩১

১১৩। **মাহাত্মা গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কৃপা হত্যা**
কিয়া মুর্মু, ১৭৩২-১৭৩৮

১১৪। **কিন্নর রায়ের 'অন্ধকারের ছবি': সংখ্যালঘু মনস্তত্ত্ব ও অস্তিত্বের সংকট**
সোনালী কুণ্ডু, ১৭৩৯-১৭৪৬

১১৫। **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বর্ধমান: শিক্ষা, সমাজ-সংস্কার ও মানব সেবামূলক কর্মকাণ্ডের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ**
ড. সোমনাথ মিশ্র, ১৭৪৭-১৭৫৪

১১৬। **খল চরিত্রের স্বরূপ ও ক্ষমতার রাজনীতি: সিংহাসনের ক্ষয়রোগ**
সন্দীপ ঘোষ, ১৭৫৫-১৭৬১

১১৭। **ভারতীয় জীবনাদর্শে অহিংসা**
ফারহানা আখতার, ১৭৬২-১৭৭০

১১৮। **স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থান প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য নক্ষত্র চলচ্চিত্র পরিচালক অপর্ণা সেন**
শুভেন্দু বোস, ১৭৭১-১৭৮৮

১১৯। **আয়ুর্বেদে শল্যচিকিৎসা: একটি ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ**
স্নিগ্ধা চ্যাটার্জী, ১৭৮৯-১৭৯৬

১২০। **রাণী চন্দের স্মৃতিকথায় ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ**
সায়ন্তন নন্দী, ১৭৯৭-১৮০৫

১২১। **সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ছোটোগল্পে প্রান্তিক শ্রেণির মধ্যবিত্তে উত্তরণ**
ড. প্রিয়াঙ্কা প্রধান, ১৮০৬-১৮১১

১২২। **গান্ধীর নন্দনতত্ত্ব: একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ**
শুভঙ্কর পোদ্দার, ১৮১২-১৮১৯

১২৩। **রামায়ণের আধ্যাত্মিক ধারণা: ঐশ্বরিক নীতি ও মানবিক মূল্যবোধের মেলবন্ধন**
সুফল মণ্ডল ও ড. সুজয়কুমার মণ্ডল, ১৮২০-১৮২৭

১২৪। **বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতা ও রেল: উত্তর ঔপনিবেশিক প্রেক্ষিত**
সঙ্গীতা চ্যাটার্জী, ১৮২৮-১৮৩৪

১২৫। **ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে সমবায়: প্রমাণতাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ**
পূর্ণিমা গুছাইত, ১৮৩৫-১৮৪৮

১২৬। **শূন্যতা ও মধ্যমা প্রতিপদ: বৌদ্ধ দর্শনের পারমার্থিক বিবর্তনে আচার্য নাগার্জুনের অবদান**
আব্দুল সামাদ সেখ, ১৮৪৯-১৮৫৫

১২৭। **সাবয়ব বস্তুর প্রত্যক্ষযোগ্যতা বিচার: ন্যায় মতের আলোকে একটি পর্যালোচনা**
ভাস্কর পাল, ১৮৫৬-১৮৬৪

১২৮। **আলুচাষে কীটনাশক-নির্ভরতা, জৈব কৃষির সম্ভাবনা, সরকারি নীতি ও স্বাস্থ্য-সংকট: হুগলি জেলার প্রেক্ষিত**
ড. মৌ সাউ, ১৮৬৫-১৮৭২

১২৯। **বাক্যার্থবোধের স্বরূপ: ন্যায় ও বৈশেষিক মতের একটি পর্যালোচনা**
রাহুল মান্না, ১৮৭৩-১৮৮৬

১৩০। **উত্তরাধুনিকতা: লিওটার্ড ও ফুকোর অভিমত অনুসারে সমসাময়িক জ্ঞানের স্বরূপ বিষয়ক আলোচনা**
আবৃতা নিয়োগী, ১৮৮৭-১৮৯৫

১৩১। **রবীন্দ্র কাব্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা': একটি বিশ্লেষণ**
ড. শতাব্দী ভৌমিক, ১৮৯৬-১৯০৩

১৩২। **'জিজ্ঞাসা': বিজ্ঞান-দর্শন-সাহিত্যের ত্রিবেণী সঙ্গম**
দেবী মন্ডল, ১৯০৪-১৯১৩

১৩৩। **সনৃজীদা খাতুনের স্মৃতিকথায় শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গ**
সুপর্ণা মণ্ডল, ১৯১৪-১৯২০

১৩৪। **আবুল বাশারের 'তেলেগ দাসরি': লোকায়ত মরমীবাদ, প্রাচ্য পুরাণ ও মানবিক আধ্যাত্মিকতার তাত্ত্বিক অনুসন্ধান**
নাসিরুদ্দিন হোসেন, ১৯২১-১৯২৭

১৩৫। **বাংলা সাহিত্যে বাহা উৎসব ও আদিবাসী জীবনদর্শনে প্রকৃতি চেতনা: একটি সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যতাত্ত্বিক পাঠ**
প্রতিমা হেম্ব্রম মান্ডি, ১৯২৮-১৯৩৮

১৩৬। **চন্দ্রাবতীর রামায়ণ: প্রথাগত রামকথার প্রতিস্পর্ধী আখ্যান**
আদিত্য চক্রবর্তী, ১৯৩৯-১৯৪৬

১৩৭। **রামমোহন: নারী ক্ষমতায়নের পথিকৃত**
ড. ব্রততী চক্রবর্তী, ১৯৪৭-১৯৫৩

১৩৮। **শ্রী রামকৃষ্ণের বহুত্ববাদী ধর্মদর্শন: যত মত তত পথ নীতির সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা**
চণ্ডী চরণ লেট, ১৯৫৪-১৯৬২

১৩৯। **পরিবেশ নীতিবিদ্যা ও গভীর বাস্তবাদ: প্রকৃতির অন্তর্নিহিত মূল্যের এক দার্শনিক পর্যালোচনা**
রীনা পাল, ১৯৬৩-১৯৬৯

১৪০। **জাতীয় অর্থনীতিতে ইপিজেড- এর অবদান: চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা**
মেহজাবীন ইলাহী, ১৯৭০-১৯৭৮

১৪১। **গণতন্ত্র, গণমাধ্যম ও সুশাসনের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ: বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে একটি পর্যালোচনা**
মো. হাবিবুর রহমান, মেহজাবীন ইলাহী, মোঃ কামাল উদ্দিন ও লুবনা আক্তার, ১৯৭৯-১৯৯৪

১৪২। **শিলচরের নর্মাল স্কুলের রামায়ণ পুথি সংগ্রহ: একটি পর্যবেক্ষণ**
মানচিত্র পাল, ১৯৯৫-২০০৪

১৪৩। **নারীমুক্তি আন্দোলন: ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর সমাজসংস্কারক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে (১৮০১-১৯০০)**
ড. অন্তরা চৌধুরী, ২০০৫-২০১২

১৪৪। **নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময় ও সমাজ**
দীপঙ্কর সরকার, ২০১৩-২০২১

১৪৫। **সেলিনা হোসেনের 'নীল ময়ূরের যৌবন' উপন্যাসের ডোম্বি: প্রেমে, প্রতিবাদে ও প্রতিরোধে**
সুকন্যা পাঁজা, ২০২২-২০৩৩

Guidelines, Review Process & Publication Ethics, Page No: 2034
Publication Charge, Page No: 2036

সম্পাদকীয়

বাংলা গবেষণা পত্রিকা হিসেবে আত্মদীপ বর্তমানে একটি সম্মানজনক স্থান অধিকার করেছে, যার একমাত্র কৃতিত্ব লেখক, রিভিউয়ার এবং সম্পাদকমণ্ডলীর। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আত্মদীপ গবেষণা পত্রিকা হিসেবে দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করেছে, যা আমাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের এবং গর্বের। এই পথের সহযাত্রী হিসেবে যারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, আপনাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। বহু বিষয় গত সংখ্যাগুলিতে সংযোজিত হয়েছে যা বাংলা সাহিত্যের গবেষণাকে একটি নতুনা মাত্রা এনে দিয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। আত্মদীপের এই পর্বের নির্বাচিত লেখাগুলোকে কথাসাহিত্য, নাট্যভাবনা, দর্শন, লোকসংস্কৃতি, বিবিধ ইত্যাদি নানারকম ভাগে সাজিয়ে তোলার প্রয়াস করা হয়েছে। যারা বাংলা ভাষায় লিখছেন, গবেষণা করছেন তাদের ভাবনাগুলোকে প্রবন্ধের আকারে প্রকাশ করার একটি ক্ষেত্র তৈরি করে দেওয়াই এই পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য।

আত্মদীপ পত্রিকা শুধু সাহিত্যকেন্দ্রিক নয়, বাংলা ভাষায়, যে কোন বিষয় নিয়ে লেখা গবেষণামূলক পত্রিকা। পত্রিকাটি অনলাইন এবং প্রিন্ট দুভাবেই প্রকাশিত হওয়ায় গবেষক এবং লেখকদের অনেকটা সাহায্য হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। প্রতিটি প্রবন্ধে DOI (Digital Object Identifier) সংযুক্ত হওয়ায় প্রবন্ধগুলি আন্তর্জাতিক আর্কাইভ এবং যে কোনো গবেষককে প্রবন্ধের রেফারেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই সাহায্য হবে। তাছাড়া প্রতিটি প্রবন্ধ আন্তর্জাতিক আর্কাইভে (https://archive.org/) সংরক্ষিত রয়েছে। আত্মদীপ জার্নালের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনের ইন্ডেক্সিং রয়েছে এবং International Journal Indexing (www.ijindexing.com) এর দ্বারা প্রদত্ত Impact Factor ৮.৫।

আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি বাংলা ভাষায় এটি একটি অন্যতম জার্নাল যা সম্পূর্ণ গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে লেখা প্রকাশিত হয়ে থাকে। যে কোনো প্রবন্ধ জমা দেওয়ার পর সেটিতে AI কিংবা Plagiarism আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার চেষ্টা করা হয় এবং তারপর রিভিউ এর জন্য পাঠানো হয়। রিভিউতে তা গ্রহণযোগ্য কিংবা রিভিউ রিপোর্ট অনুযায়ী প্রবন্ধ উপস্থাপিত হলেই তা প্রকাশ করা হয়।

ভারত এবং বাংলাদেশ থেকে যারা এই সংখ্যায় লেখা দিয়েছেন এবং পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলী, যারা আমাদের আহ্বানে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, সবার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আত্মদীপের পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশিত হবে ৩১শে মে, ২০২৬।

ড. বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য
মুখ্য সম্পাদক
এবং সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
করিমগঞ্জ মহাবিদ্যালয়, শ্রীভূমি, অসম।

আজিজুল সেখ
সহ-সম্পাদক
গবেষক, বাংলা বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরা।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 710-720
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.283

মধুসূদন দত্তের সাহিত্যের ভাষাবয়ন

সঞ্জিৎ মণ্ডল, *অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 18.03.2026; Accepted: 19.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Madhusudan Dutta was a milestone in the history of Bengali literature and also a pioneer of many genres in Bengali literature. He was a successful playwright who wrote both historical tragedies and farces. He wrote in many poetic forms, including narrative, epic, epistle, didactic poems and lyrical poetry demonstrating his versatility. Madhusudan Dutta also experimented with meter. Inspired by the western blank verse, he introduced 'Amitrakkhor Chhando' in Bengali poetry along with sonnet, payar and lachari. Madhsudan wrote and translated works into English. He assimilated and imbibed different styles of western literature and presented them in the traditional way in bengali. He was a true polyglot. Payar was one of the main strengths of his poetry. He also experimented with words in many ways. Madhusudan Dutta was enlightened by the Bengal Renaissance of the 19th century, and his characters also reflect influences from that period. He had to develop the dialogues for the characters of his plays considering the vast variety of their personalities, social class, moral stands, choice of words and dictions. Therefore, it was necessary for him to articulate his language with precision. He carefully selected each word to ensure that the dialogue suited the spirit and emotion of the character and genre. This essay will elaborate the linguistic features of his writings mentioned above.

Keywords: Madhusudan Dutta, Literature, Genre, Linguistics, Persona

ভাষা ভাবের প্রকাশ মাধ্যম। ভাব, বিষয় নির্মাণ করতে হয়, কখনো তা নির্মিত হয়। বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করেই বাংলা সাহিত্য, বাঙালি জাতি, সংস্কৃতি গঠিত হয়। সুদূর নবম-দশম শতাব্দীতে বাংলা ভাষার জন্ম, কিন্তু তার নির্মাণপর্ব চলেছে দীর্ঘকাল। আবার নবম-দশম শতাব্দীতে আমরা যে বাংলা ভাষা পেয়েছি, অনেক বাঁক বদলের মধ্য দিয়ে তা বর্তমানে এসে পৌঁছেছে। সময়, রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম, ব্যক্তিত্ব সেই বাঁক বদলের নিয়ামক। বাংলা তথা ভারত সংস্কৃতির মৌল বিশেষত্ব তার গ্রহণ উন্মুখ মানসিকতা। সেই গ্রহণের ফলেই বাংলা ভাষা সাহিত্যের আদলটি গড়ে ওঠে। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের সূত্রপাত। এই শাসনকার্য ও ধর্ম প্রচারের সূত্রেই বাংলা ভাষা, বাংলা গদ্য অনুবাদের পরিচর্যা ও অনুশীলনের সূচনা হয়। উনিশ শতকের সূচনায় একদিকে বাংলা ভাষা, সংস্কৃত ভাষায় রচিত সাহিত্যের নবনির্মাণ, পুনর্নির্মাণ চলে। অন্যদিকে ইংরেজি ভাষার, সাহিত্যের প্রতিও অনুরাগ জন্মে। পাশ্চাত্যের ভাষা, সাহিত্যের

প্রতি, সাহিত্য পাঠের প্রতি প্রবল আগ্রহ সূচিত হয় বাঙালিদের মধ্যে। বিশেষ করে যারা পাশ্চাত্য ভাষা আয়ত্ব করেছিলেন। আমাদের যা কিছু ঐতিহ্য সেগুলি এবং পাশ্চাত্যের সাহিত্যের বিষয়, আঙ্গিক, প্রকরণ, শ্রেণি আত্মীকরণ করে বাংলা ভাষা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে প্রয়াসী হলেন। বাংলা ভাষা, বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যের যে একটি গৌরবময় অধ্যায় আছে তা সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার দায়ও অনেকে অনুভব করলেন। এরকমই একজন প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব মধুসূদন দত্ত।

বাংলা গদ্যের সূচনা হয়েছে। গদ্যের ভাষায় প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে, হয়েছেও। কিছু নকশা জাতীয় রচনা গদ্যে লেখা হয়েছে। বিভিন্ন চরিত্রের মুখের ভাষা তখনও সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে না। যাত্রা থেকে নাটকে রূপান্তর পর্ব চলেছে অথচ তা সম্পূর্ণ নয়। খণ্ডকবিতা লেখা হয়েছে, আখ্যানকাব্য, মহাকাব্যের আদর্শ রূপ তখনও গঠিত হয়নি। কাব্যের অসংখ্য রূপ আছে। সেই বৈচিত্র্য আসছে না, বাংলা ছন্দের বিবর্তন থমকে আছে, ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ হচ্ছে, কিন্তু বাংলা থেকে ইংরেজিতে সেভাবে আসছে না— এরকম এক সময়ে ধূমকেতুর মতোই আবির্ভূত হলেন মধুসূদন দত্ত। বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষার আশ্রয়ে সাহিত্য রচনা করলেন। ধর্ম, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি সমস্ত দিক থেকেই উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে তাঁর সাহিত্য অভিনবত্বের দাবি রাখে। কত নতুন মানুষ, পুরনো মানুষ, পুরনো অথচ নতুন ভাবে নির্মিত মানুষের সাক্ষাৎ এই সময় পর্বে। তাদের চলন বলন সংস্কৃতি আলাদা। তাদের কথোপকথনের ভাষা আলাদা। এই ভাষার স্বাতন্ত্র্যকে সাহিত্যে রূপদান প্রয়োজন। আবার প্রতিটি সংরূপের সাহিত্যের শ্রেণির জন্য পৃথক ভাষাবয়ন প্রয়োজন। মধুসূদন ঐতিহাসিক ট্রাজিক নাটক লিখলেন, লিখলেন পৌরাণিক নাটক, প্রহসন, সামাজিক নাটক। নাটকের শ্রেণি আলাদা, প্রেক্ষিত আলাদা, পাত্র-পাত্রীও আলাদা। তাই ভাষাও পাল্টেছে প্রতি ক্ষেত্রে। আখ্যানকাব্য, সাহিত্যিক মহাকাব্য, পত্রকাব্য, সনেট, ওড্ জাতীয় রচনা, নীতিগর্ভ কবিতা লিখেছেন— তারও চরিত্র, পরিবেশনরীতি পৃথক। তাই চরিত্রানুযায়ী, প্রেক্ষিত অনুযায়ী ভাষার প্রয়োগ হয়েছে। বলা যেতে পারে বাংলা সাহিত্যের নতুন বিষয়-প্রকরণের জন্য মধুসূদনকে ভাষা নির্মাণ করতে হয়েছে।

মধুসূদনের স্বপ্ন ছিল ইংরেজি ভাষা সাহিত্যে তাঁর নিজস্ব ভুবন প্রতিষ্ঠা করা। তার প্রয়াসও ছিল। কিন্তু বাংলা ভাষা সাহিত্যের যে অমৃত ভাণ্ডার আছে তা খনন করে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার দায়ও অন্তরে অনুভব করেন। তাই ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ভাষাতেও সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন। মধুসূদন দত্ত বহু ভাষাবিদ। পিতা রাজনারায়ণ দত্তের কাছে ফারসি ভাষা শিখেছেন। বিশপ কলেজের সাধারণ বিভাগের ছাত্র হিসাবে তিনি গ্রিক, লাতিন, হিব্রু ভাষা শেখার সুযোগ লাভ করেন। কুমারস্বামীর কাছে শিখেছেন সংস্কৃত ভাষা। গৌরদাস বসাককে লেখা এক চিঠিতে তাঁর ভাষা যাপনের চিত্র তুলে ধরেছেন—

> "Here is my routine. 6 to 8 Hebrew, 8-12 school, 12-2 Greek, 2-5 Telugu and Sanskrit, 5-7 Latin, 7-10 English. Am I not preparing for the great object of embellishing the tongue of my father's?"[১]

তাঁর প্রাত্যহিক দিন যাপনে সকাল থেকে রাত্রি হিব্রু, গ্রিক, তেলুগু, সংস্কৃত, লাতিন, ইংরেজি ভাষার অনুশীলন চলে। অথচ তাঁর মাতৃভাষা, পিতৃভাষা অবহেলিত। বহুভাষা চর্চার সুযোগ হয়েছিল বলেই তাঁর সাহিত্য, সাহিত্যের ভাষায় বৈচিত্র এলো। বিভিন্ন ভাষায় রচিত সাহিত্য, সাহিত্যের আঙ্গিক, দর্শন আত্তীকরণ করেই বাংলা ভাষার নতুন আদল নির্মাণ করলেন। হিন্দু কলেজ, কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ, বিশপস কলেজ, তাঁর বন্ধুবর্গ, খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ, মনেপ্রাণে ইংরেজ হওয়ার আকুতি, দাম্পত্য, বিলেত যাত্রা— তাঁর সাহিত্য রচনায় বৈচিত্র এনেছে। সাহিত্যের ভাষা চয়নে ব্যক্তিগত জীবনের ছাপ প্রত্যক্ষ করি।

আমরা পূর্বেই বলেছি, মধুসূদন বাংলা সাহিত্যের মাইলফলক। তাঁর হাতেই বাংলা সাহিত্যের নতুন সংরূপ, নতুন শ্রেণির সূচনা হয়েছিল। প্রতিটি সংরূপ, শ্রেণির জন্য তাকে পৃথক চরিত্র সৃজন করতে হয়েছে। চরিত্রানুযায়ী ভাষা নির্মাণ করতে হয়েছে। নতুন ভাব এসেছে। সেই ভাব রূপায়ণে ভাষাকেও সেইভাবে প্রতিষ্ঠা দিতে হয়েছে। পাশ্চাত্যের ফার্স এর অনুসরণে বাংলা প্রহসনের জন্ম। মধুসূদন দুটি প্রহসন রচনা করলেন— 'একেই কি বলে সভ্যতা?' (১৮৬০) এবং 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০)। 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসনে সমকালে যে নব্যবঙ্গীয় যুবক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটল তাদের জন্য পৃথক ভাষাবয়ন প্রয়োজন ছিল। এই যুবক সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি, তাদের চাওয়া পাওয়া, আচরণ ভাষারূপ দেওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বারবিলাসিনীর ভাষা, সারজনের ভাষা, জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার সদস্যদের ভাষা, গৃহস্থ বধূদের ভাষা, বয়োজ্যেষ্ঠ সংস্কারপন্থী মানুষের ভাষা আলাদা। সেই চরিত্রানুসারী ভাষাই নির্মাণ করলের মধুসূদন। নবকুমার, কালীনাথ, মহেশ, বলাই, চৈতন, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত। তাদের ভাষা সংলাপে তাই ইংরেজি শব্দ অনায়াসেই স্থান পেয়েছে।

"নব । সভাটা দেখছি এবলিশ কত্যে হলো।"[২]

"কালী । যখন আমাদের সাবস্ক্রিপশন লিস্ট অতি পুওর ছিল।"[৩]

"মহেশ । হিয়র, হিয়র, আমি এ মোসন্ সেকেন্ড করি।"[৪]

"বলাই । হা, হা, হা এতে দেখছি কারো অবজেকশন নাই, একবার নেম্ কন্ ব্রাভো!"[৫]

সম্বোধনের ভাষা পাল্টে গেল ('হিয়র হিয়র, জেন্টলম্যান')।

এই সময়ে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) নাটক প্রকাশিত হচ্ছে। দুই নাটকেই সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জীবন্ত ভাষা রূপ পাচ্ছে। 'নীলদর্পণ'-এর নীলকর সাহেবের ভাষা আর 'একেই কি বলে সভ্যতা?'-এর ইংরেজ সার্জনের ভাষার কোন পার্থক্য নেই। চৌকিদার ও লেঠেল বাহিনীর ভাষাও এক। ক্ষেত্রমণি, পদী ময়রানীর ভাষার সঙ্গে বারবিলাসিনীদের ভাষার খুব একটা পার্থক্য নেই।

বারবিলাসিনীর ভাষা: "আমি তেমন বান্দা নই, বাবা, এই বয়সে কত শত বেটার নাকের জলে চক্ষের জলে করে ছেড়েচি। আজ মুড়ো খেঙ্গরা দে বিষ ঝাড়বো।"[৬]

ইংরেজ সারজন: "হাল্লো! চওকিডার! এক আডমি ওঢার ডৌরকে গিয়া নেই? আলবট্ গিয়া, হাম ডেকা। টোম জলদি ডওড়কে যাও, উস্টরফ ডেকো, যাও - যাও- জলডি যাও। ইউ সুওর।"[৭] (দ>ড, ধ>ঢ, ট>ত, ধ্বনি পরিবর্তন ঘটেছে। বাংলা হিন্দি ইংরেজি সমন্বয়ে এ ভাষা গঠিত।)

চৌকিদার: "নেই ছাব, হামতো কুছ নাহি দেখা।"[৮] (চৌকিদার হিন্দি ভাষার আশ্রয়ে তার ভাব প্রকাশ করে)

বাবাজি সন্ন্যাসী চরিত্র। তাই তার ভাষা আলাদা। তাতে আধ্যাত্মিকতা, ধার্মিকতা আছে। বারবিলাসিনী, মাতালের সংস্পর্শে তার ধর্ম, পবিত্রতা নষ্ট হতে যাচ্ছে। তার ভীরুসুলভ মানসিকতার প্রকাশ সংলাপের ভাষায়— "এ গলিতে কি কোন ভদ্রলোক বসতি করে গা?"[৯] কিংবা, "রাধে কৃষ্ণ! আঃ বাঁচলেম, আজ কি কুলগ্নেই বাড়ি থেকে বের্য়েছিলেম।"[১০] নববাবু, কালীনাথসহ বঙ্গীয় নব্যযুবকদের ভাষায় অশ্লীলতা আছে। তাই অশালীন অমার্জিত শব্দ তারা ব্যবহার করে থাকেন। জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার সভ্যদের কথোপকথনে সভার একটা চিত্র আমাদের সম্মুখে দৃশ্যায়িত হয়। নবজাগরণের আলোকে আলোকিত হয়ে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রিফরমেশনের দায়িত্ব নিলেন। কিছু গদ্য প্রবন্ধে এবং বাস্তব জীবনেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। মধুসূদন দত্ত সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজ শোধনের দায়ভার গ্রহণ করলেন। এই প্রহসনে জ্ঞানতরঙ্গিণী সভায় সভ্যগণের প্রতি নববাবুর দীর্ঘ ভাষণ রয়েছে। ভাষণধর্মী বাক্যের ফর্ম নির্মাণ করতে হল মধুসূদনকে। যথা—

> "নব: জেন্টালম্যান তোমাদের মেয়েদের এজুকেট কর- তাদের স্বাধীনতা দেও- জাতভেদ তফাৎ কর- আর বিধবাদের বিবাহ দেও— তাহলে এবং কেবল তাহলেই আমাদের প্রিয় ভারতভূমি ইংল্যান্ড প্রভৃতি সভ্য দেশের টক্কর দিতে পারবে— নচেৎ নয়।"[১১]

সম্ভাষণসূচক বাক্য এল, উপদেশ, অনুরোধমূলক, উদ্দীপনামূলক ভাষণকলা অন্তর্ভুক্ত হলো। অসংখ্য 'ড্যাশ' চিহ্ন আনলেন অনেকগুলি বিষয়কে ভাষণের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য।

ড্যানিয়েল জোনস ধ্বনিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রথম IPA তথা আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা প্রবর্তন করেন। আমরা কোন শব্দকে যেভাবে উচ্চারণ করি IPA তে সেভাবেই লেখা হয়। তারপর সেগুলোকে আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালায় লিপ্যন্তর করা হয়। অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় পূর্বে মধুসূদন উচ্চারণ অনুসারী বানান লিখলেন। তিনি ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করেছেন। তার প্রোনানসিয়েশন কেমন হবে সেই অনুযায়ী বানান লিখেছেন। এই অভিনব প্রয়াস তাঁর ভাষাতত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্য।

যথা: "আমাদের প্লেজর নষ্ট কত্যে এলো?"/ বোয়ে গেল..." [১২]

প্রোবিজন জমাতে কসুর করে?/ কর্তা তোমার গাড়ী দরোজায় দেখলেই..."[১৩]

"ও এট করার কি আছে ?"[১৪]

"এখন সত্তি কি বলবে বল দেখি?"[১৫]

"কি আপোদ,"[১৬]

নতুন বিষয়, সংস্কৃতি আমদানি হচ্ছে বাংলা ভাষায়। স্বভাবতই নতুন শব্দ পাঠকের কাছে অপরিচিত। তাই মধুসূদন অপরিচিত শব্দের সঙ্গে পাঠককে পরিচয় করাচ্ছেন। বাক্য সংলাপে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শব্দের অর্থ করে দিচ্ছেন। 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসন থেকে একটি নমুনা—

"চৈতন: তুমি কেমন সাকী হে?

বলাই: সাকী আবার কি?

চৈতন: যে মদ দেয় পারসিতে তাকে সাকী বলে।"[১৭]

এ যেন অন্যতর অভিধানবিজ্ঞান। সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই জাতীয় দৃষ্টান্ত আমরা পরবর্তীতে দেখেছি। পাশ্চাত্যের প্রভাবে আধুনিক যুগে একটি অন্যতম আলোচ্য বিষয় ওমেন এমপাওয়ারমেন্ট। মানবীবিদ্যাচর্চা তথা ওমেন স্টাডিজ প্রতিটি বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানেই আছে। পুরুষের সম অধিকার, শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, বুদ্ধিতে সমান পারদর্শিতা পাশ্চাত্য দেশ ও পাশ্চাত্যের মনীষীদের দ্বারাই বেশি কার্যকরী হয়েছিল প্রথমে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর যেমন সমাজের নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন, মধুসূদন তাঁর সাহিত্যকে আশ্রয় করে নারীর কণ্ঠকে প্রতিষ্ঠা দিলেন। সাহিত্যের নামকরণেই তার প্রমাণ নিহিত আছে। শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারী, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, রিজিয়া, রত্নাবলী এই নামের অন্তরালে পুরাণ, ইতিহাসের সেই নারী ব্যক্তিত্বের উদ্বোধন ঘটেছে মধুসূদনের হাতে। নবজাগরণের ধারায় স্নাত হয়ে তাঁরা তাঁদের প্রাপ্য অধিকার আদায় করতে চেয়েছেন। চরিত্র রূপায়ণে তাই নারীর পৃথক ভাষা বয়ন করতে হয়েছে। এই ভাষায় একটি প্রতিস্পর্ধিতার ভাব এল, প্রতিবাদ এল, নস্যাৎ করার মাধ্যমে নিজের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার আদল এলো। 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসনে হরকামিনীর সংলাপে এই প্রতিবাদী সংলাপ পেলাম—

> "হর। তা ভাই দেখ দেখি, এমন স্বামী থাকলেই বা কি আর না থাকলিই বা কি। ঠাকুর-ঝি! তোকে বলতে কী ভাই, এসব দেখে শুনে আমার ইচ্ছে করে গলায় দড়ি দে মরি। (দীর্ঘ নিশ্বাস) ছি। ছি। ছি! (চিন্তা করিয়া) বেহায়ারা আবার বলে কি, যে আমরা সায়েবদের মতন

সভ্য হয়েচি। হা আমার পোড়া কপাল। মদ মাস খ্যেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয়? একেই কি বলে সভ্যতা?"[১৮]

নারী তার মতামত প্রকাশ করছে, অসংখ্য প্রশ্ন করছে। সভ্যতা, সমাজ সম্পর্কে তার নিজস্ব অভিমত প্রকাশ করছে। সাহিত্যে তা নতুনই বটে। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে কোনো ঐতিহাসিক চরিত্র নয়, মদনিকার কণ্ঠে মধুসূদন প্রতিবাদের ভাষা দিয়েছেন। নারীর ক্ষমতায়নের অন্যতম নিদর্শন এই নাটক। এই ক্ষমতায়নের ভাষা মধুসূদন নির্মাণ করলেন।

"মদনিকা। যারা স্ত্রীলোককে অবোধ বল্যে ঘৃণা করে, তারা এটা ভাবে না যে, স্ত্রী লোকের শক্তিকুলে জন্ম।... এজন্মে কাকেও মেয়েমানুষ বলে অবহেলা কোরো না।"[১৯]

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রমীলার উক্তিতেও এই কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হতে দেখি— "রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী, —/ আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?"[২০]

বাংলা সাহিত্যে পত্রকাব্য ছিল না। মধুসূদন দত্ত ইতালীয় কবি ওভিদের 'হিরোইডস' বা 'এপিস্টল অব হিরোইনস' পত্রকাব্যের আদলটি বাংলা সাহিত্যে উপহার দিলেন। পত্রকাব্যের পৃথক এক বয়ান আছে, পৃথক এক ভাষাবৈশিষ্ট্য আছে। আর পত্রপ্রেরক যদি একজন প্রসিদ্ধা নারী হন এবং পত্রপ্রাপক যদি হন কোনো রাজা বা মহারথী, তাহলে তার ভাষাবয়ানও পালটে যাবে। মধুসূদনের হাতেই সেই পত্রকাব্যের ভাষা নির্মিত হল। পত্রে সম্বোধন থাকে, সম্ভাষণ বা সম্বোধনের ভাষা এল— "বন-নিবাসিনী দাসী নমে রাজপদে/ রাজেন্দ্র!"[২১] [দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা] "কি বলিয়া সম্বোধিবে, হে সুধাংশুনিধি,/ তোমারে অভাগী তারা?"[২২] [সোমের প্রতি তারা] "শুনি নিত্য ঋষিমুখে, হৃষিকেশ তুমি,/ যাদবেন্দ্র,"[২৩] [দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী]। কখনও কখনও সম্বোধন পাল্টে যায় পত্রপ্রেরকের মানসিক অবস্থান ও পত্রপ্রাপকের সঙ্গে সম্পর্কের নিরিখে। সেখানে বিনয় নয়, অন্তরের ক্রোধ, যন্ত্রণা স্পষ্ট হয়েছে পত্রের প্রথম থেকেই। 'দশরথের প্রতি কেকয়ী' কিংবা 'নীলধ্বজের প্রতি জনা' পত্রে এ ধরনের শব্দ-শরনিক্ষেপ লক্ষ করি— "এ কি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে"[২৪] কিংবা "বাজিছে রাজতোরণে রণবাদ্য আজি,/ হ্রেষে অশ্ব; গর্জে গজ; উড়িছে আকাশে/ রাজকেতু; মুহূর্মুহূঃ হুঙ্কারিছে মাতি/ রণমদে রাজসৈন্য; কিন্তু কোন্ হেতু?"[২৫] রাগে, অভিমানে, যন্ত্রণায় সরাসরি প্রশ্ন। আর এ দুটি পত্রিকায় অসংখ্য প্রশ্নবাক্য এসেছে। কেকয়ী তাঁর স্বামী দশরথের কাছে, জনা তাঁর স্বামী নীলধ্বজের কাছে অসংখ্য প্রশ্নের মাধ্যমে জেনে নিতে চান এই আনন্দ উৎসব আয়োজনের কারণ কী। স্বামীর বিরুদ্ধে তাঁর স্ত্রী প্রশ্ন রাখবেন, প্রশ্নবাণে জর্জরিত করবেন— এ ভাবনা তো সাহিত্যে নতুন। সাহিত্যের ভাষায় তা নতুনরূপে প্রতিষ্ঠা পেল—

"কেন বা উড়িছে ধ্বজা প্রতি গৃহচূড়ে?
কেন পদাতিক, হয়, গজ, রথ, রথী
বাহিরিছে রণবেশে? কেন বা বাজিছে
রণবাদ্য? কেন আজ পুরনারী-ব্রজ
মুহূর্মুহূ হুলাহুলি দিতেছে চৌদিকে?
কেন বা নাচিছে নট, গাইছে গায়কী?"[২৬]

শুধু প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা চিহ্নই নয়, প্রশ্নবাচক শব্দের বারবার ব্যবহারে জিজ্ঞাসার তীব্রতাকে প্রকাশ করা হয়েছে।

স্ট্রীম অব কনশাসনেস বা চেতনাপ্রবাহরীতি আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যে লক্ষ করেছি। মধুসূদন চেতনাপ্রবাহরীতির বাক্য সৃজন করলেন। বিশেষ করে 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র 'সোমের প্রতি তারা', 'দুষ্মন্তের

প্রতি শকুন্তলা' কিংবা 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র চতুর্থ সর্গ 'অশোকবন'-এ এই রীতির সাক্ষ্য পাই। আবার 'লক্ষণের প্রতি শূর্পনখা' পত্রিকায় চেতনাকে সঞ্চারিত করে দেওয়া হয়েছে বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে। সেজন্য ভবিষ্যবাচক ক্রিয়াপদের সাক্ষাৎ পাই।

"সম পাত্র মানি তোমা, পরম আদরে
অর্পিবেন শুভক্ষণে রক্ষঃ-কুল-পতি
দাসীরে কমলপদে। কিনিয়া, নৃমণি,
অযোধ্যা-সদৃশ রাজ্য শতেক যৌতুকে,
হবে রাজা; দাসী-ভাবে সেবিবে এ দাসী!"[২৭]

আবার চেতনা বর্তমান থেকে অতীতে সঞ্চারিত হবার অনুষঙ্গও আছে। সেক্ষেত্রে পত্রপ্রেরক, পত্রপ্রাপককে অতীত স্মৃতি স্মরণ করাতে চান। এটাও পত্রপ্রাপকের কাছ থেকে সম্মতি আদায়ের একটা কৌশল। সেক্ষেত্রে ক্রিয়াপদ হয় অতীত কালের। যথা:

"যে দিন প্রথমে তুমি এ শান্ত আশ্রমে
প্রবেশিলা, নিশাকান্ত, সহসা ফুটিল
নবকুমুদিনীসম এ পরাণ মম
উল্লাসে, ভাসিলা যেন আনন্দ সলিলে!"[২৮]

এক্ষেত্রে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। অমিত্রাক্ষর ছন্দের একটি প্রধান বিশেষত্ব— ভাব এক পংক্তি থেকে পরবর্তী পংক্তিতে প্রবাহিত হয়। চেতনাপ্রবাহরীতির বাক্যেও ভাব বর্তমান থেকে অতীতে বা বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে প্রবাহিত হয়ে যায়।

মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা কাব্য'কে সামনে রেখেই একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে— সম্মতি আদায়ের শিল্পকলা। কীভাবে প্রেমিক পুরুষ, স্বামীর কাছ থেকে সম্মতি আদায় করে নিতে হয় তার একটি আদল বাংলা সাহিত্যে আনয়ন করলেন। কখনও অনুনয়, কখনও প্রতিবাদের মাধ্যমে, কখনও ভয় দেখিয়ে বা ব্ল্যাকমেইল বা অপপ্রচারের ভয় দেখিয়ে, সমাজ-অনুশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে নারী তাঁর সম্মতি আদায় করতে চেয়েছে। এই সম্মতি আদায়ের জন্য ভাষা নির্মাণ করতে হল মধুসূদনকে। পৃথক এক কথনশৈলীই নির্মিত হল তাঁর হাতে। কখনও অনুনয়, কখনও প্রতিবাদের মাধ্যমে, কখনও অপপ্রচারের ভয় দেখিয়ে (পরম অধর্মাচারী রঘুকুলপতি), অসময়ে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে, গৃহত্যাগ করার ভয় দেখিয়ে, সমাজ-অনুশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে, অসংখ্য প্রশ্নবাণে জর্জতিত করে, শুধু ব্যক্তি নয়, একটি পরিবার, বংশকে আক্রমণ করে নারী, পুরুষের কাছ থেকে সম্মতি আদায় করতে চেয়েছেন।

তাই মধুসূদনকে নির্মাণ করতে হল আত্মনিবেদন-আত্মসমর্পণের ভাষা, বিনয়ের ভাষা, ত্যাগের ভাষা, সংযম-ধৈর্যের ভাষা, আত্মসমীক্ষণের ভাষা, অপপ্রচারের ভাষা, হুমকির ভাষা, নিন্দার ভাষা, পৌরুষ জাগ্রত করার ভাষা, চেতনাপ্রবাহরীতির ভাষা, মনস্তত্ত্বের ভাষা, সর্বোপরি পত্রের ভাষা, নারীর ভাষা, পুরুষেরও ভাষাবয়ন।

আত্মসমর্পণের ভাষা— 'জীবন মরণ মম আজি তব হাতে!'[২৯] [সোমের প্রতি তারা] 'যথা যাও যাব; করিব যা কর;— / বিকাইব কায় মনঃ তব রাঙা পায়ে!'[৩০] 'দয়ার সাগর তুমি। কর দয়া মোরে, প্রেম-ভিখারিণী আমি তোমার চরণে!'[৩১] [লক্ষণের প্রতি শূর্পনখা]

বিনয়ের ভাষা— "কেমনে মনের কথা কহিব চরণে,/ অবলা কুলের বালা আমি, যদুমণি?"[৩২] [দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী]

ত্যাগের ভাষা— "আরম্ভি সত্বরে/ সে তপঃ, আহার নিদ্রা ত্যজি একাসনে!"[৩৩] [সোমের প্রতি তারা]। "এ বেশ ভূষণ ত্যজি, উদাসীনী বেশে/ সাজি, পূজি, উদাসীন, পাদ-পদ্ম তব!"[৩৪] [লক্ষণের প্রতি শূর্পনখা]

সংযম-ধৈর্যের ভাষা— "জীবনের আশা, হায়, কে ত্যজে সহজে!"[৩৫] [দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা]

আত্মসমীক্ষার ভাষা— "না পড়ি ঢলিয়া আর নিতম্বের ভারে!/ নহে গুরু উরু-দ্বয়, বর্তুল কদলী-/ সদৃশ! সে কটি, হায়, কর-পদ্মে ধরি/ যাহায়,"[৩৬] [দশরথের প্রতি কেকয়ী]

অপপ্রচারের ভাষা— "যেখানে যাব, কহিব সেখানে/ পরম অধর্মাচারী রঘু-কুল-পতি!"[৩৭]

হুমকির ভাষা— "কেমনে এ অপমান সব ধৈর্য ধরি?/ ছাড়িব এ পোড়া প্রাণ জাহ্নবীর জলে;"[৩৮] [নীলধ্বজের প্রতি জনা]

নিন্দার ভাষা— "হায়, ভোজবালা কুন্তী— কে না জানে তারে,/ স্বৈরিণী? তনয় তার জারজ অর্জুনে/ (কি লজ্জা,) কি গুণে তুমি পূজ, রাজরথি,/ নরনারায়ণ-জ্ঞানে?"[৩৯] [নীলধ্বজের প্রতি জনা]

পৌরুষ জাগ্রত করার ভাষা— "সাজিছ কি, নররাজ, যুঝিতে সদলে—/ প্রবীর পুত্রের মৃত্যু প্রতিবিধিৎসিতে,—/ নিবাইতে এ শোকাগ্নি ফাল্গুনির লোহে?/ এই তো সাজে তোমারে, ক্ষত্রমণি তুমি।"[৪০] [নীলধ্বজের প্রতি জনা]

চেতনাপ্রবাহরীতির ভাষা— "ভাবিয়া দেখ, পড়ে যদি মনে,/ নরেন্দ্র; যথায় বসি, প্রেমকুতূহলে,/ লিখিল কমলদলে গীতিকা অভাগী;—/ যথায় সহসা তুমি প্রবেশি, জুড়ালে/ বিষম বিরহজ্বালা!"[৪১] [দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা]

মনস্তত্ত্বের ভাষা— "কি লজ্জা! কেমনে তুই, রে পোড়া লেখনি,/ লিখিলি এ পাপ কথা"[৪২] [সোমের প্রতি তারা] পুরুষের ভাষা নারীর বয়ানে বিবৃত হয়েছে কখনও কখনও।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'চোখের বালি' উপন্যাসে 'আঁতের কথা'কে সাহিত্যের পাতায় স্থান দিলেন। তার বহু পূর্বে মধুসূদন তাঁর সাহিত্যের চরিত্রের বয়ানে অন্তরের কথাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। মধুসূদনের প্রথমা স্ত্রীর প্রতি তিনি অবিচার করেছেন যথেষ্টই— এই আত্মসমালোচনা তাঁর কণ্ঠেই উচ্চারিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে তাঁর প্রথমা স্ত্রী যদি চিঠি বা পত্র লিখতেন তার বয়ান কেমন হবে— সে উদ্দেশ্যেই 'বীরাঙ্গনা কাব্য' লেখা। সেক্ষেত্রে প্রতিটি নারীর অন্তর মনস্তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত পত্রের ভাষায়। পত্র বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কাছের মানুষদের উদ্দেশেই লেখা হয়। তাতে নিজেকে অনেক বেশি উন্মোচন করা যায়। তাতে ব্যক্তি মধুসূদনকেও যেন পাই আমরা। 'সোমের প্রতি তারা' পত্রিকায় তারা যখন বলেন— 'নিজ রাজ্য ত্যজি,/ ভ্রমে কি বিদেশে রাজা, রাজকাজ ভুলি?/ সদর্পে কন্দর্প নামে মীনধ্বজ রথী,/ পঞ্চ খর শর তূণে, পুষ্পধনুঃ হাতে,/ আক্রমিছে পরাক্রমি অসহায় পুরী—/ কে তারে রক্ষিবে, সখে, তুমি না রক্ষিলে?'[৪৩] তখন তারার কথনে মধুসূদন পরাধীন ভারতবর্ষ তথা নিজের দেশের কথাই ব্যক্ত করলেন। এই সেই আত্মকথনরীতি যা গীতিকবিতা তথা আত্মগত কবিতার মূল বিশেষত্ব, তারও পদধ্বনি শুনতে পেলাম। মধুসূদন আত্মগত কবিতা বা গীতিকবিতার জন্য ভাষা নির্মাণ করলেন। বক্তব্য পরিবেশিত হলো উত্তম পুরুষের জবানীতে। যা ছিল চরিত্রের সংলাপ, কথক লেখক তা নিজেই পরিবেশন করলেন। পুরুষ, ক্রিয়ারূপ পাল্টে গেল এই বয়ানে। 'গীতিকবিতা' শ্রেণির দুটি কবিতা রচনা করলেন— 'আত্মবিলাপ' এবং 'বঙ্গভূমির প্রতি'। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র অন্তর্গত 'বঙ্গভাষা'সহ অনেক কবিতাতেই এই আত্মকথন পেয়েছি। যথা:

"আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়,
তাই ভাবি মনে?
জীবন-প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে যায়,
ফিরাব কেমনে?"[৪৪] [আত্মবিলাপ]
"রেখো, মা, দাসেরে মনে এ মিনতি করি পদে।"[৪৫] [বঙ্গভূমির প্রতি]

এই ভাষায় আত্মসমীক্ষণ এলো, আত্ম-সমালোচনা এলো, অন্তর মনস্তত্ত্ব এলো, ব্যক্তি-মানুষ মধুসূদন ধরা দিলেন।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ শিশুদের নীতিশিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে গদ্যে আখ্যান রচনা করেছেন। গোপাল-রাখাল থেকে নানারচনার সাক্ষাৎ পাই। মধুসূদন লিখলেন পদ্যে, নামকরণ করলেন 'নীতিগর্ভ কাব্য'। সেখানে দুজন করে চরিত্র এলো। যথা— 'ময়ূর ও গৌরী', 'কাক ও শৃগালী', 'রসাল ও স্বর্ণলতিকা', 'অশ্ব ও কুরঙ্গ', 'গদা ও সদা' ইত্যাদি। এই কাব্যে প্রতিটিতে একটি কাহিনি বা প্লট আছে। চরিত্রদ্বয় সেই গল্প-কাহিনি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের সংলাপ আছে, তা পদ্যে রচিত। এছাড়া কোনও কোনও রচনায় কাহিনি কথক আছেন। যেমন— 'গদা সদা নামে/ কোন এক গ্রামে/ ছিল দুই জন। / দূর দেশে যাইতে হইল; /দুজনে চলিল।'[৪৬] এই বয়ান অনেকটাই গদ্যের কাছাকাছি। এই নীতিগর্ভ কাব্যের জন্য পৃথক ভাষাবয়ন করলেন। যদিও এই রচনাগুলি ছোটদের জন্য। তাই গল্পরস সংযোজন করলেন। 'বাল্যরচনা' শ্রেণির 'বর্ষাকাল ও হিমঋতু' নামে দুটি কবিতা লেখেন। 'গান' শিরোনামে তাল, রাগসহ দুটি রচনা— 'প্রস্তাবনা', 'উপসংহার'। আসলে কবিতার ফর্ম নিয়ে নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। কাব্য-কবিতা কতটা ভারবহনক্ষম হয়ে উঠতে পারে বিষয়ের তারই নিরন্তর অনুসন্ধান চলেছে।

বাংলা ভাষায় সনেট ছিল না। মধুসূদন ইতালীয় সাহিত্য থেকে সনেটের রূপকল্প বাংলায় আনয়ন করলেন। নিজস্ব ঘরানায় নামকরণ করলেন 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'। সনেট পয়ারের এবং মহাপয়ারের মাত্রাবিন্যাসে রচিত হয়। মধুসূদন পয়ারের মাত্রাবিন্যাসকেই আশ্রয় করলেন। এই কাব্যের '৩' সংখ্যক সনেট 'বঙ্গভাষা'য় কবি লিখলেন— "হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;"[৪৭] তা সত্ত্বেও পরদেশ থেকে ভিক্ষাবৃত্তি করে সংগ্রহ করে এনেছেন নতুন বিষয়, নতুন ভাষা, নতুন শব্দ, নতুন ছন্দ, নতুন আঙ্গিক। সনেটের জন্য নতুন করে শিল্পবিন্যাস নির্মাণ করতে হল কবিকে। আর সনেটে গভীর ভাব বা বিষয় স্থান পায়। তাই গভীর ভাব, বিষয় অনুযায়ী শব্দচয়ন করতে হল কবিকে। বাংলা ভাষা, শব্দকে আশ্রয় করেই সনেটের রূপকল্প নির্মাণ করলেন।

চৌদ্দ অক্ষরযুক্ত চরণের জন্য তাঁকে শব্দ নির্বাচন করতে হয়েছে। কখনও মাত্রা সংখ্যার সমতার জন্য শব্দকে নতুনভাবে নির্মাণ করতে হয়েছে। কখনও প্রচলিত রূপ থেকে অপরিচিত শব্দরূপে নিয়ে গেছেন— রথ>স্যন্দন, ছন্দ মেলানোর জন্য 'ভীষণ' অর্থে 'ভীম', ক্রিয়ারূপ পরিবর্তন করছেন— 'বাস করে' অর্থে 'বাসে'। এরকম অসংখ্য শব্দ তাঁকে নতুনভাবে ব্যবহার করতে হয়েছে। তাঁকে সচেতন থাকতে হয়েছে মিলবিন্যাস ও মাত্রাসমতা রক্ষায়, উপযুক্ত ভাব প্রকাশে। শব্দকে ভাঙতে হয়েছে, গড়তে হয়েছে, রূপগত পরিবর্তন করতে হয়েছে।

'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য', 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'বীরাঙ্গনা কাব্য' অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত নয়, এর শ্রেণিও পৃথক। শ্রেণিগতভাবে এটি পাশ্চাত্যের ওড জাতীয় রচনা। গ্রন্থপরিচয় অংশে উল্লিখিত— "শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিষয়ে শ্রীমতি রাধিকার প্রেম প্রসঙ্গে অনেকে অনেক প্রকার

কাব্যরচনা করিয়া গিয়াছেন কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ নূতন ছন্দ ও সুমধুর নবভাব পরিপূরিত কবিতা এ পর্যন্ত কেহই রচনা করেন নাই বোধ হয়।"[৪৮] এরজন্য পয়ার ত্রিপদী, লাচাড়ী ছন্দের আশ্রয় নিলেন। নতুন করে মিলবিন্যাস রচনা করতে হল। "তিনি যে মিত্রাক্ষর কবিতা রচনায় কীরূপ পারদর্শী তা প্রমাণ করার লোভ সংবরণ করতে পারলেন না। মিলের পদ্ধতি যে কত বিচিত্র ও জটিল হতে পারে, কবি তা দেখিয়ে দেবার জন্য কোমর বেঁধে নামলেন।"[৪৯]

যেমন— 'বংশী ধ্বনি' '৩' সংখ্যক স্তবক বারোটি পঙক্তিতে বিন্যস্ত। তার তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম, দ্বাদশ পঙক্তির অন্তমিল আছে—রাধিকার মন—রতন—এখন—চরণ। আবার চতুর্থের সঙ্গে পঞ্চমের মিল—করি—হরি, সপ্তমের সঙ্গে অষ্টমের—স্বজনি—ধ্বনি, দশমের সঙ্গে একাদশের – কুল - কূল। অর্থাৎ মিলবিন্যাস নিয়ে নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন, ছন্দ নিয়েও। '৩' সংখ্যক কবিতা 'যমুনা তটে'। প্রতিটি পাঁচ পঙক্তির স্তবক, কবিতা। তার মিলবিন্যাস আবার আলাদা। প্রত্যেক শিরোনামাঙ্কিত কবিতার মিলবিন্যাসের স্বাতন্ত্র্য আছে। কবিতার গঠনও আলাদা রকমের। অসংখ্য নারীবাচক শব্দ আছে। আখ্যানকাব্য, মহাকাব্যের জন্যও বিষয়ানুসারী ভাষা নির্মাণ করেছেন, চরিত্রের অবস্থান অনুযায়ী ভাষা নির্মাণ করেছেন।

'মায়াকানন' বাদ দিলে দুটি পৌরাণিক নাটক, দুটি প্রহসন, একটি ঐতিহাসিক নাটক বা ঐতিহাসিক ট্রাজেডি। পৌরাণিক নাটকে পুরাণাশ্রয়ী শব্দই ব্যবহার করলেন। তাতে তৎসম শব্দ, ভাবগাম্ভীর্যসূচক শব্দই ব্যবহৃত হল। 'পদ্মাবতী' নাটকে কাব্যছন্দ অমিত্রাক্ষরের সার্থক প্রয়োগ ঘটালেন। দুটি নাটকেই চরিত্রের অবস্থান অনুযায়ী ভাষা ব্যবহৃত হল। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক চরিত্র সৃজন করলেন। রাজা ভীমসিংহ, রানি অহল্যা, রাজকুমারী কৃষ্ণার ভাষার আদল আর কাল্পনিক চরিত্র ধনদাস—মদনিকা—বিলাসবতীর ভাষার আদল আলাদা। নাটকটি যেহেতু ট্রাজেডি নাটক, তাই চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। এসেছে দীর্ঘ স্বগত সংলাপ। কৃষ্ণকুমারী ও বলেন্দ্রসিংহের ক্ষেত্রে এ জাতীয় দীর্ঘ সংলাপ পেয়েছি। নাটকের পঞ্চম অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে এ জাতীয় দীর্ঘ সংলাপ পাবো। দ্বিবাচনিকতার নিদর্শন পাই কোনো কোনো চরিত্রের সংলাপে। কখনও প্রকাশ্য সংলাপ, কখনও স্বগত সংলাপের আশ্রয় নিচ্ছেন চরিত্র। স্বগত সংলাপে চরিত্রের মনের আসল অভিসন্ধি, প্রবণতা ধরা পড়ে। আর প্রকাশ্য সংলাপে আমি কীভাবে সম্বোধন করলে, কীভাবে বললে স্বার্থ চরিতার্থ হবে সেই প্রসঙ্গ স্থান পায়। যাদের অন্তর ও বাইরের সত্তা পৃথক তাদের ক্ষেত্রেই এই দুই ধরনের সংলাপ ব্যবহৃত হয়। ধনদাসের সংলাপ থেকে উদ্ধৃতিযোগ্য—

"ধন। (স্বগত) আঃ, এ মাগী তো ভারী জ্বালাতে আরম্ভ কল্যে হে? (প্রকাশ্যে) এ অঙ্গুরীটি মহারাজ আমাকে রাখতে দিয়েছেন।"[৫০]

"ধন। (স্বগত) এ মেয়েমানুষটিকে আর কিছু বলা ভাল হয় না; এ যে সব কথা জানে, তা মহারাজ শুনলে আর নিস্তার থাকবে না। (প্রকাশ্যে) আমি ত ভাই, তোমার হিত বৈ অহিত কখন করি নাই; তুমি আমার উপর এ বৃথা রাগ কর কেন?"[৫১]

দুই সংলাপে সম্বোধনের ভাষা আলাদা, চরিত্র সম্পর্কে ধারণা আলাদা হয়ে যায়। যিনি সংলাপ বলছেন তার চরিত্রের দ্বৈততাও প্রকাশিত।

এই নাট্যসংলাপের ভাষার অপর একটি দিক লক্ষণীয়। নাট্যকার অনুষঙ্গ এনেছেন। কোনো একটি ভাব বা বিষয় বা অনুভূতি প্রকাশে প্রথাগত সংলাপ ব্যবহার না করে প্রবাদের মত অনুষঙ্গ এনেছেন। তাতে নাট্যকারের বস্তুবিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞানের পরিধির পরিচয় পাওয়া যায়। উদয়পুরের রাজা জগৎসিংহ এবং রাজসহচর ধনদাসের মধ্যে কথোপকথন তুলে আনা যেতে পারে। ধনদাস রাজার উদ্দেশে বলেছেন যে, এই নিকুঞ্জ বনের সকল ফুলেই আপনার একবার করে মধু পান করা হয়ে গেছে। বাকি রয়েছে শুধু ভেরেণ্ডা,

ধুতুরা প্রভৃতি কতক কদর্য ফুল। প্রত্যুত্তরে রাজা বলেছেন— 'সাগর কি বারিশূন্য হল না কি?' ধনদাসের উত্তর— "এমন অগস্ত্য অবিশ্রান্ত শুষতে লাগলে, সাগরে কি আর বারি থাকে?"[৫২]

নারী আসক্তির অনুষঙ্গে অগস্ত্য মুনির সমুদ্র শোষণের অনুষঙ্গ আনা হলো। একে প্রবাদ, ভিন্ন ধরনের উপমা, রূপক অনেক নামেই অভিহিত করা যায়। এরকম অসংখ্য অনুষঙ্গ আছে। পুরাণ থেকে, প্রকৃতিজগৎ থেকে, সমাজ, বিশ্ব থেকে অভিজ্ঞতালব্ধ অনুষঙ্গ স্থান পেয়েছে। তপস্বিনীর মতো চরিত্র অঙ্কন করেছেন নাট্যকার। যিনি দীর্ঘকাল ভারত পরিক্রমা করে জ্ঞানার্জ্জন করেছেন। তার মধ্যে একটা শুভ, মঙ্গল চেতনা আছে, তার ভাষা নির্মাণ করতে হয়েছে মধুসূদনকে। একটিও অমঙ্গলের, অশুভ ভাবের শব্দ নেই। পুরাণ থেকে দৃষ্টান্ত এনে আশ্বস্ত করার শব্দচয়ন করেছেন নাট্যকার। যেমন— জগৎ সিংহের প্রতি কৃষ্ণার আকৃষ্ট হবার ঘটনাকে তিনি বর্ণনা করেছেন এইভাবে— "ঐ যে সূর্যমুখী ফুলটি দেখছেন, ওটি ফুটলেই সূর্যদেবের পানে চেয়ে থাকে; কিন্তু কেন যে চায়, তা কেউ বলতে পারে না।"[৫৩] বা "দময়ন্তী সতী কি রাজা নলকে আপন চর্মচক্ষে দেখে তাঁর প্রতি অনুরাগিণী হয়েছিলেন?"[৫৪] প্রহসনের পৃথক ভাষা নির্মাণ করতে হল মধুসূদনকে। প্রহসনে টাইপ চরিত্র থাকে। এক-একটা শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে এক একটা চরিত্র। একটি চরিত্রের ভাষা সমাজের একটি শ্রেণির ভাষা। তাই কর্তামশায়ের ভাষা, নব্য-বঙ্গীয় যুবকের ভাষা, চৌকিদারের ভাষা, বারবিলাসিনীর ভাষা, অন্ত:পুরের নারীর ভাষা, সারজনের ভাষা পৃথক হয়ে যায়। জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার সদস্যদের উদ্দেশে ভাষণের ভাষা নির্মাণ করতে হয়। নারীর প্রতিস্পর্ধিতার ভাষাও নাট্যকারকে নির্মাণ করতে হয়েছে। এই প্রহসনেও অসংখ্য প্রবাদ আছে, প্রবাদকে ভাঙছেন তিনি। প্রবাদের শব্দগুলি বাক্য ব্যবহার করে তাকে বিস্তারিত করেছেন, 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনেও চরিত্রানুসারী সংলাপ ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্ববঙ্গের যশোর, রাজশাহী জেলার আঞ্চলিক ভাষা সংলাপে ব্যবহৃত হয়েছে। হানিফ ও ফতেমার সংলাপের ভাষায় আরবি, ফার্সি শব্দ, ভক্তপ্রসাদবাবুর সংলাপে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। 'হেকটর-বধ' নামক গদ্য আখ্যান রচনা করেছেন, অনুবাদ করেছেন, ইংরেজিতে কবিতা, চিঠি লিখেছেন— প্রত্যেক সংরূপের জন্য তাকে পৃথক ভাষা চয়ন করতে হয়েছে। নতুন সাহিত্য প্রকরণ, সাহিত্যের নতুন শ্রেণি আনলেন। তাই চরিত্র সৃজন করতে হয়েছে প্রতিমুহূর্তে। আর প্রতি চরিত্রের জন্য পৃথক ভাষা বয়ন করতে হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১। মধুসূদন রচনাবলী। সাহিত্য সংসদ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ১৬।
২। তদেব, পৃ. ২৩৯।
৩। তদেব, পৃ. ২৩৯।
৪। তদেব, পৃ. ২৪৬।
৫। তদেব, পৃ. ২৪৬।
৬। তদেব, পৃ. ২৪২।
৭। তদেব, পৃ. ২৪৩।
৮। তদেব, পৃ. ২৪৩।
৯। তদেব, পৃ. ২৪২।
১০। তদেব, পৃ. ২৪২।
১১। তদেব, পৃ. ২৪৮।
১২। তদেব, পৃ. ২৩৯।
১৩। তদেব, পৃ. ২৪০।
১৪। তদেব, পৃ. ২৪৬।

১৫। তদেব, পৃ. ২৪০।
১৬।তদেব, পৃ. ২৪৯।
১৭। তদেব, পৃ. ২৪৭।
১৮। তদেব, পৃ. ২৫১।
১৯। তদেব, পৃ. ৩৩০।
২০। তদেব, পৃ. ৫৬।
২১। তদেব, পৃ. ১৩৩।
২২। তদেব, পৃ. ১৩৫।
২৩। তদেব, পৃ. ১৩৮।
২৪। তদেব, পৃ. ১৪০।
২৫। তদেব, পৃ. ১৫৫।
২৬। তদেব, পৃ. ১৪০।
২৭। তদেব, পৃ. ১৪৪।
২৮। তদেব, পৃ. ১৩৬।
২৯। তদেব, পৃ. ১৩৭।
৩০। তদেব, পৃ. ১৩১।
৩১। তদেব, পৃ. ১৪৪।
৩২। তদেব, পৃ. ১৩৮।
৩৩। তদেব, পৃ. ১৩৭।
৩৪। তদেব, পৃ. ১৪৩।
৩৫। তদেব, পৃ. ১৩৫।
৩৬। তদেব, পৃ. ১৪১।
৩৭। তদেব, পৃ. ১৪১।
৩৮। তদেব, পৃ. ১৫৭।
৩৯। তদেব, পৃ. ১৫৫।
৪০। তদেব, পৃ. ১৫৫।
৪১। তদেব, পৃ. ১৩৪।
৪২। তদেব, পৃ. ১৩৫।
৪৩। তদেব, পৃ. ১৩৬।
৪৪। তদেব, পৃ. ১৮৬।
৪৫। তদেব, পৃ. ১৮৬।
৪৬। তদেব, পৃ. ১৯০।
৪৭। তদেব, পৃ. ১৫৯।
৪৮। তদেব, পৃ. ৩৫।
৪৯। তদেব, পৃ. ৩৬।
৫০। তদেব, পৃ. ৩০২।
৫১। তদেব, পৃ. ৩০৩।
৫২। তদেব, পৃ. ২৯৭।
৫৩। তদেব, পৃ. ৩১৭।
৫৪। তদেব, পৃ. ৩১৭।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 721- 742
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.284

উপন্যাসের ঊর্মিতে, মনস্তত্ত্বের গহনে শ্যেনদৃষ্টি

বর্ণালী ভৌমিক (ঘোষ), *সহযোগী অধ্যাপিকা এবং বাংলা বিভাগীয় প্রধান, বীর বিক্রম মেমোরিয়াল কলেজ, ত্রিপুরা, ভারত*

Received: 12.03.2026; Accepted: 14.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This paper offers a comprehensive critical analysis of *Putul Nacher Itikatha* by Manik Bandopadhyay, focusing on its thematic, structural, and philosophical dimensions. It examines the significance of the novel's title as a metaphor for human existence, where individuals appear as puppets controlled by complex social relations rather than supernatural determinism. The study highlights the interplay between nature, environment, and human psychology, emphasizing how biological impulses and socio-economic conditions shape character behavior. The language of the novel—marked by a blend of *sadhu* and *cholito* forms—is analyzed as a powerful narrative tool that enhances realism and emotional depth. Furthermore, the paper explores the influence of Freudian psychoanalysis in depicting suppressed desires, particularly through the characters of Shashi and Kusum. The conflict between tradition and modernity is examined through the father-son relationship between Gopal and Shashi, reflecting broader tensions within middle-class society. By comparing Manik's vision with Sarat Chandra Chattopadhyay's *Pallisamaj*, the study underscores differing approaches to rural life and human suffering. Ultimately, the novel emerges as a profound exploration of determinism, human agency, and existential crisis in modern Bengali literature.

Keywords: Determinism and Human Agency, Psychoanalytic Criticism, Rural Society and Modernity, Language and Narrative Technique, Existential Crisis

সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত দুমকা শহরে ১৯০৮ সালে ১৯শে মে, মঙ্গলবার (১৩১৫ বঙ্গাব্দের ৬-ই জ্যৈষ্ঠ) জন্মগ্রহণ করেন প্রবাদপ্রতিম কথাশিল্পী প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলাদেশের ঢাকার অন্তর্গত, বিক্রমপুরের মালপদিয়া গ্রামে ছিল তাঁর পিতৃনিবাস। পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সেটেলমেন্ট বিভাগের কানুনগো ও সাব-ডেপুটি কালেক্টর এবং মাতা নীরদা দেবীর নৈকট্যে- তত্ত্বাবধানে বাল্যশিক্ষা লাভ করার পর বিক্ষিপ্তভাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষা-জীবনের সূচনা হয়; প্রধানত— দুষ্কা, আড়া, সাসারাম, মেদিনীপুর জেলার বেশ কিছু অংশ, কুমিল্লার অন্তর্গত ব্রাহ্মণ বেড়িয়া, বারাসাত, কলকাতা, ময়মনসিংহের টাঙ্গাইলে ছাত্রজীবন অতিবাহিত। অতঃপর মেদিনীপুর থেকে ১৯২৬ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়া ও পরবর্তীকালে বাঁকুড়ার ওয়েলিয়ান মিশন কলেজ থেকে ১৯২৮ সালে আই.এস-সি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ

হয়ে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে গণিত শাস্ত্রে সাম্মানিক সহ বি.এস.সি ক্লাসে প্রবেশ। এর মধ্যে ১৯২৪ সালে ২৮ শে মে, ছাত্রাবস্থায় টাঙ্গাইলে লেখকের মাতৃবিয়োগ ঘটে।

সহপাঠীদের সঙ্গে বাজি ধরেই তাঁর সাহিত্যজীবনের সূত্রপাত। প্রথম গল্প 'অতসীমামী' ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর (১৩৩৫ বঙ্গাব্দের পৌষ) সংখ্যায়, 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তবে এর পূর্বে ষোল বছর বয়স থেকেই তিনি কবিতা লিখেছেন। তাই সাহিত্যচর্চা তাঁর রক্ত মজ্জায় অন্বিত। এরপর ঐ একই পত্রিকায় ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের আষাঢ় ও ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশ পায় 'নেকি' ও 'ব্যথার পুজা'; এই সাল থেকেই 'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসটির জন্ম হয়, অর্থাৎ শিক্ষাজীবনের সূর্য অস্তমিত হয় ও সাহিত্য- সূর্যের উদয় ঘটে। 'বঙ্গশ্রী পত্রিকায়' ১৯৩৪ সালে 'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসটি, 'একটি দিন' শিরোনামে বড়োগল্প রূপে প্রকাশ ঘটলে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিভা, ধারাবাহিক রচনার মধ্যে দিয়ে বিকশিত হয় ও পাঠকসমক্ষে সমালোচিত হতে শুরু করে। 'পদ্মানদীর মাঝি'-ও তিনি 'পূর্বাশা' পত্রিকায় ধারাবাহিক রচনার মধ্যে দিয়ে সর্বপ্রথম রূপ দিয়েছিলেন। তবে, পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হওয়ার দরুণ উপন্যাসটির প্রকাশও অসমাপ্ত থাকে। এরপর 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায়, ১৩৪১ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যা থেকে 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু হয়। একজন ব্যক্তিত্বপূর্ণ খাঁটি গ্রন্থকারের আবির্ভাব ঘটে এই সময় থেকেই। 'অতসীমামী' পরিমার্জিত প্রথম গল্পগ্রন্থ রূপে এবং 'জননী' উপন্যাস রূপে প্রকাশিত হয় এই সময়েই। ১৯৩৬ সালেই তাঁর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 'পদ্মানদীর মাঝি,' 'পুতুল নাচের ইতিকথা,' 'জীবনের জটিলতা।' ১৯৩৭ সালে তাঁর দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'প্রাগৈতিহাসিক'-এর মুক্তি ঘটে। এই সালেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন 'বঙ্গশ্রী' নামক মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার সহ-সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হয়ে। দক্ষিণ কলকাতার টালিগঞ্জের দিগম্বরী তলায় পৈতৃক বাড়িতে থেকে তিনি অতঃপর সাহিত্য সাধনায় জীবন শুরু করেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈবাহিক জীবনের সূচনা ঘটে ১৯৩৮ সালের ১১ই মে (১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ২৮-শে বৈশাখ)। এই সময় তিনি বিক্রমপুরের সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয়া কন্যা শ্রীযুক্তা কমলাদেবী-কে বিবাহ করেন। এই সময়পর্বেই তাঁর 'অমৃতসা পুত্রাঃ' উপন্যাসটি ও 'মিহি ও মোটা' গল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ১৯৩৯ সালের পয়লা জানুয়ারী তিনি 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার সহ-সহকারী সম্পাদকের পদ থেকে ইস্তফা দেন। এই বছরই ভ্রাতা সুবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় 'উদয়াচল প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস' নামক ছাপাখানা ও প্রকাশনালয় (প্রেস) স্থাপন করেন এবং ১৯৪০ সালে নিজস্ব প্রেস থেকেই প্রকাশ করেন গল্পগ্রন্থ 'বৌ'। 'পরিচয়' পত্রিকার মাধ্যমে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ধারাবাহিক উপন্যাসরূপে 'অহিংসা'-র প্রকাশ করেন। এই সময়ই তাঁর 'সরীসৃপ' গল্পগ্রন্থের প্রকাশ ঘটে। তাঁর লেখা 'শহরতলি' উপন্যাসের হাত ধরেই শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকার, শারদ সংখ্যায় একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস প্রকাশের রীতির সূচনা ঘটে। ১৯৪০ সালে 'শহরতলি'-র প্রথম পর্ব গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায় এবং ঠিক তার পূর্ব বছর 'পরিচয়' পত্রিকায় কার্তিক সংখ্যায় তিনি প্রথম স্বতন্ত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৯৪১ সালে তাঁর তিনটি উপন্যাস— 'শহরতলি দ্বিতীয় পর্ব', 'অহিংসা' ও 'ধরাবাঁধা জীবন' গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়। তবে মানিকের সঙ্গে শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকার যোগ নিবিড়। এই পত্রিকাতেই ১৯৪২ সালে দুটি অসাধারণ উপন্যাস 'শহরবাসের ইতিকথা' ও 'চতুষ্কোণ' প্রকাশিত হয়। ১৯৪৩ সালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তৎকালীন ভারত সরকারের 'National *War* Front' এর 'Bengal Branch এ Publicity Assistant'-এর পদে যোগদান করেন এবং 'All India Radio'-র কলকাতা কেন্দ্র থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংক্রান্ত তথ্যাবলী, বৈচিত্র্যময় বেতার অনুষ্ঠানে যুক্ত থাকেন। এই সময়ই তাঁর 'সমুদ্রের স্বাদ' গল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। শারদীয়ার 'যুগান্তর' পত্রিকায় 'প্রতিবিম্ব' উপন্যাসটি প্রকাশ পেলে তাঁর মনন-চিন্তা-চেতনা আপামর পাঠক সমক্ষে প্রকাশ পায়।

কথাসাহিত্যিক মানিকের জীবনে কমিউনিজম্ চিন্তা-চেতনা গভীর ভাবে প্রথোত। ১৯৫৫ সালে তিনি স্বয়ং 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী-লেখক ও শিল্পী সংঘের' দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতি মন্ডলের সদস্যরূপে নির্বাচিত হন এবং প্রগতিশীল লেখক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকে, সক্রিয়ভাবে একাধিক উপন্যাস-ছোট গল্পে তৎকালীন মধ্যবিত্ত সমাজ ও তার অর্থনৈতিক সংকট, অস্তিত্বের বিপন্নতাবোধ ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার বাস্তব রূপায়ণ ঘটান। প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী সম্মেলনের সাধারণ অধিবেশনে সভাপতি পদ অলংকৃত করাকালীন, তাঁর গল্প সংকলন 'ভেজাল' প্রকাশিত হয়। ১৯৪৪ সালে এবং ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত হয় উপন্যাস 'দর্পণ' ও গল্পগ্রন্থ 'হলুদ পোড়া'। ১৯৪৬-১৯৫০ সাল পর্যন্ত সময়পর্বটি লেখকজীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে এসেছে। কারণ, এ সময়ই পরপর অসামান্য রচনাগ্রন্থ প্রকাশিত হয— ১৯৪৬ সালে 'শহরবাসের ইতিকথা' (উপন্যাস), 'ভিটেমাটি' (নাটক), 'আজকাল পরশুর গল্প' (গল্পগ্রন্থ), 'চিন্তামণি' (উপন্যাস) 'পরিস্থিতি' (গল্পগ্রন্থ); ১৯৪৭ সালে— 'চিহ্ন' (উপন্যাস), 'আদায়ের ইতিহাস' (উপন্যাস), 'খতিয়ান' (গল্পগ্রন্থ); ১৯৪৮ সালে— 'ছোটবড়ো', 'মাটির মানুষ', ১৯৪৯ সালে 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' (গল্পগ্রন্থ); ১৯৫০ সালে— 'জীয়ন্ত' (উপন্যাস), 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প'।

১৯৪৯ সাল থেকেই লেখকের সাহিত্য জীবন গোধূলির আলোর স্পর্শ পায়। কারণ, এই সময়েই তিনি পৈতৃক ভিটে ত্যাগ করে বরানগরে, গোপাললাল ঠাকুর রোড এর ভাড়াবাড়িতে উঠে আসেন। এ সময় থেকেই বিশেষত ১৯৫১ সাল নাগাদ, চরম দারিদ্রতা ও অসুস্থতা তাঁর জীবনকে গ্রাস করেছিল, তবু তিনি সাহিত্য সাধনা থেকে বিরত থাকেন নি। কারণ, ১৯৫১ সালে প্রকাশিত হয় চারটি উপন্যাস— 'পেকনশা', 'সোনার চেয়ে দামি', 'স্বাধীনতার স্বাদ', 'ছন্দপতন', ১৯৫২ সালে বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত হয় মানিক গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয়ভাগ, ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হয় উপন্যাস— 'নাগপাশ', 'আরোগ্য', 'চালচলন', 'তেইশ বছর আগে পরে' এবং গল্পগ্রন্থ— 'ফেরিওলা', 'লাজুকতা', ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয় 'হরফ' (উপন্যাস), 'শুভাশুভ' (উপন্যাস)। এই সময় তিনি অত্যাধিক অসুস্থ হয়ে পড়ায় দারিদ্রতা চরমে ওঠে ও লেখকমন ক্রমশই সঞ্জীবনী জীবনসুধা হারিয়ে ফেলে নেতিবাচক ভাব মানসিকতার অধিকারী হয়ে পড়েন। আত্মদ্বন্দ্বে লেখকমন বিদীর্ণ, আত্মকষ্টে রূদ্ধ, আত্মরক্ষায় বিপন্ন হয়ে পড়ে তাঁর মানসিকতা, অবশেষে একান্তই ইচ্ছার বিরুদ্ধতায় তিনি চিকিৎসার জন্য ভর্তি হন ইসলামিয়া হাসপাতালে। তবে আত্মপ্রত্যয়ে বলিষ্ঠ লেখক অল্পদিন পরেই স্থায়ী চিকিৎসার বিরুদ্ধে গিয়ে নিজবাসস্থানে ফিরে আসেন, শেষে তাঁকে লুম্বিনি পার্ক মানসিক চিকিৎসালয়ে প্রায় দু-মাস চিকিৎসাধীনে রাখা হয়। এই সালেও অদম্য মানসিক জোরের কাছে হার মানেনি লেখনী প্রতিভা, প্রকাশিত হয় উপন্যাস 'পরাধীন প্রেম (১৯৫৫)। পরের বছর 'হলুদ নদী সবুজ বন' (উপন্যাস) প্রকাশের পর লেখক নতুনভাবে ভাবায় পাঠককে। তবে ১৯৫৬ সাল থেকে তিনি বাসিলারি ডিসেন্ট্রির আক্রমণে অসুস্থ হয়ে পরেন। এই সময়ই তাঁর জীবনের শেষ গল্প সংকলন 'স্ব-নির্বাচিত গল্প' ও উপন্যাস 'মাশুল' প্রকাশিত হয়। ১৯৫৬ সালের ৩-রা ডিসেম্বর (১৩৬৭ বঙ্গাব্দের ১৭-ই অগ্রহায়ণ) সোমবার নীলরতন সরকার হাসপাতালে প্রবাদ প্রতিম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে– সমাপ্ত হয় সাহিত্যরচনার ইতিকথা।

ক

যে কোন সাহিত্যসৃষ্টিতে নামকরণের সার্থকতা অবশ্য আলোচ্য বিষয়; কারণ, নামকরণের মধ্যেই স্রষ্টার ভাবনা- মননবোধ, সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। তাই সাহিত্যের ক্ষেত্রে নামকরণ নির্দেশাত্মক নয়, গুণাত্মক, কোন কোন ভারতীয় দর্শন একথাও বলে যে, যেখানে নাম ও নাম্নী অভিন্ন, সেখানেই নামকরণ তাৎপর্যপূর্ণ ও সার্থক। বস্তুত সাহিত্যজগতে এই অভিন্নতার আলোকেই নামকরণ দ্যুতিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

সাহিত্যে নামকরণের ক্ষেত্রে প্রধাণতঃ দুটি রীতি অবলম্বন করা হয়। প্রথমটি নামপ্রধান নামকরণ ও দ্বিতীয়টি ভাবপ্রধান নামকরণ বা ব্যঞ্জনাধর্মী নামকরণ। কাহিনি প্রধান সাহিত্যে, কাহিনির কেন্দ্র অবস্থিত চরিত্র, ঘটনা, স্থান যখন শিরোনামে প্রাধান্য পায়, তখন তাকে নামপ্রধান নামকরণ বলি। যেমন— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুন্ডলা', 'রজনী', ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কঙ্কাবতী', রমেশচন্দ্র দত্তের 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত', 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা', যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর 'কালাচাদ', 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'যোগাযোগ', 'নৌকাডুবি', 'গোরা' ইত্যাদি। কাহিনীর মূল ভাবকে কেন্দ্র করে যখন কোনো সাহিত্যের শিরোনাম স্থির করা হয় অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিষয়ভাবনার ব্যঞ্জিতরূপ শিরোনামে স্থান পায়, তখন তাকে বলা হয় ব্যঞ্জনাধর্মী নামকরণ। যেমন— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিষবৃক্ষ', রমেশচন্দ্র দত্তের 'সংসার', প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'জীবনের মূল্য', 'মনের মানুষ', শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পরিণীতা', 'চরিত্রহীন', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঘরে বাইরে', 'চার অধ্যায়', 'শেষের কবিতা' ইত্যাদি। আলোচ্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যয়ের অন্যতম উপন্যাস 'পুতুল নাচের ইতিকথা' (গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে, উপন্যাসটি ১৩৪১ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যা থেকে ১৩৪২ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ পর্যন্ত 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় মোট বারোটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।) ভাবধর্মী বা ব্যঞ্জনাধর্মী নামকরণের অন্তর্গত; যদিও জীবনবোধের একটি দিক হল নিয়তিবাদ, তবু বলা যায় উক্ত উপন্যাসটির নামকরণ সম্পূর্ণ-ই মানব সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত।

পুতুলনাচ আমাদের দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ একটি লোকশিল্প। নির্বাক পুতুলগুলিকে মঞ্চের উপরে অদৃশ্য এক মানুষের হাত আড়ালে থেকে নাচায়; আর 'ইতিকথা' শব্দটি দুটি পৃথক শব্দের সংযোজনে সৃষ্টি। 'ইতি' অর্থাৎ 'সমাপ্ত' বা 'অবসান' এবং 'কথা' অর্থে 'কাহিনি'-কেই বোঝান হয়। 'পুতুলনাচের ইতিকথা' কি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই শ্রেণীর নামকরণ, যা নিয়ন্ত্রিত মানবজীবনের অবসানজনিত কাহিনিকে ইঙ্গিতায়িত করেছে? মানুষের জীবন যেন পুতুলের নাচ, আমাদের জীবনরঙ্গমঞ্চেও আমরা একেকজন পুতুল মাত্র, যেন কোন অদৃশ্য শক্তির দুর্বোধ্য ইঙ্গি তে সমস্ত কর্ম সমাধা করে চলেছি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসে এই তত্ত্বকেই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন কয়েকবার পুতুলের অনুসঙ্গকে উপন্যাসটির নানা পর্যায়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করে। উপন্যাসের শেষে কুসুমের বাবা অনন্তের বিষন্ন উক্তিতে এই পুতুলনাচের রূপক ধর্ম ব্যঞ্জনায়- অনুভবে প্রকাশ ঘটেছে: 'সংসারে মানুষ চায় এক হয় আর, চিরকাল এমনি দেখে আসছি ডাক্তারবাবু। পুতুল বইতো নই আমরা, একজন আড়ালে বসে খেলাচ্ছেন।' অর্থাৎ মানুষ পুতুল, আর একজন আড়ালে বসে সংসারমঞ্চে মানুষরূপী এই পুতুলগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এই ভাবনা নিঃসন্দেহে শিরোনামের গূঢ়ার্থকে প্রকাশ করছে।

উপন্যাসের প্রারম্ভে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত সুকৌশলে পুতুলের প্রসঙ্গ আনলেন। হারু ঘোষের মৃতদেহ গ্রামে প্রবেশ করছে, গ্রামীণ নিশুতি রাত্রে কর্দমাক্ত পথে চলেছে হারুর মৃতদেহ। পথের ধারে বকুলগাছের গোড়ায় বসে শশী বিশ্রাম নিচ্ছে, তখন তার দৃষ্টিগোচর হয় ন্যাকড়া-জড়ানো একটা পুতুল ঝরা-পাতার উপর পড়ে আছে। শ্রীনাথের মেয়ের পুতুল এটি। এই পুতুলটাকে দেখে শশী মনে করে, ভোরবেলায় বকুলতলায় ঝাড় দিতে এসে সেনদিদি পুতুলটাকে দেবতার ঈঙ্গিত মনে করে নিয়ে যাবে আর মেয়েটি না পাওয়ার হতাশায় কাঁদবে। এই ঈঙ্গি তময়তার টানাপোড়েন আর আশা-নিরাশা, হাসি-কান্নার ঈঙ্গিত ও হারানোর বৈপরীত্যের সমন্বয়েই উপন্যাসটির সূচনা হয়েছে।

সমগ্র উপন্যাস জুড়েই এই পুতুল প্রসঙ্গ বারংবার এসেছে। যাত্রাদলের সঙ্গে কুমুদ শশীর গ্রামে এলে, শশী বোনের প্রসঙ্গে কুমুদকে বলে, "আমার খাটের তলাটা হল ওর খেলার ঘর। তাকিয়ে দেখ, পুতুলেরা সার

সার ঘুমোচ্ছে। এবার ঘুম ভাঙবে খুকির আসবার সময় হল।" তাছাড়া শশী যখন বোনকে জিজ্ঞাসা করে যে, সে বড় হয়ে কী করবে। তার জবাবে সিন্ধু বলে: " 'পুতুল খেলব' এবং এই একটিমাত্র জবাবে ক্ষণেকের জন্য শশীর মন যেন একেবারে হালকা হইয়া যায়।" এর অব্যবহিত সময়েই যে শশীর মন ভারাক্রান্ত ছিল, পরমুহূর্তের সব কিছুকেই তার মনে হয়, পুতুল খেলার মতই পরিনামহীন লঘু ও নিরর্থক। এরই বিপরীতে দেখা যায়, মতি কলকাতায় কুমুদের সঙ্গে জমিয়ে বসেছে, তখন মতির মনে হয়েছে পুতুলের মত সাজানো সংসার, জয়া বালিকাবধূ মতিকে নেড়েচেড়ে দেখছে, আর সেই মুহূর্তেই কুমুদ বলে: "স্পীড একটু কমাও জয়া, ভড়কে যাবে। পুতুল তো নয়।" এদিকে শীতলবাবুর দুর্লভের মেলায় পুতুল নাচের আসর বসানোর প্রসঙ্গ উপন্যাসে এসেছে এবং উপন্যাসের অন্ত্যে শশী স্থির করেছে গ্রাম ছেড়ে দেবে। সব বুঝিয়ে দেয় অন্য জাক্তারকে কিন্তু গোপাল সেনদিদির ছেলেকে নিয়ে চলে যায়, শশী-বাধা পড়ে গ্রামে। সে পুতুলের মতো অচেতনভাবে ঘুমায়। যদিও সে জীবন সম্পর্কে সচেতন। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসিকের মন্তব্য এক্ষেত্রে প্রনিধানযোগ্য: "জীবন সম্পর্কে যে অমন তীব্রভাবে সচেতন, সে হইয়া থাকে পুতুলের মত চেতনাহীন।"

পুতুলের প্রসঙ্গ উপন্যাসে ঘুরে-ফিরে আসলেও আমাদের মনে বারংবার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনবোধ— দর্শন সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন উদয় হয়। মানিক কি সত্যিই মনে করেন মানুষ পুতুল? সে কি এরকম ভবিতব্য তাড়িত নিয়তির দ্বারা ভাগ্যাহত? আমরা ভুলে যাই না যে, মানিক ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র। তাই বিজ্ঞান-মনস্ক মনের অধিকারী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কখনও ভাবতে পারেন না, মানুষ পুতুলের মতো সূতোর টানে নাচে কিংবা এক অদৃশ্য বা অলৌকিক শক্তির দ্বারা মানুষ চালিত। বকুলতলায় পুতুলদেখে শশী যে চিন্তা করেছিল তা সেনদিদির প্রতি শ্রদ্ধা-ভালোবাসা থেকে। এতে কোন অলৌকিক ভাবনা প্রশ্রয় পায়নি, সেনদিদি যেটা ভাবতে পারে, তাই শশী পূর্বরাত্রে ভেবেছে। এ এক জীবন সম্পর্কে সহানুভূতিশীল বিচার। এখানে অলৌকিকতা বা নিয়তির প্রভাব নেই। স্বাভাবিক ভাবনায় যা মনে আসতে পারে তাই শশী ভেবেছে। এমনকি কুমুদের সঙ্গে শশীর আলাপে নিয়তির কথা নেই। শশীর খুকির 'ঘুম ভাঙবে' এই মন্তব্যই প্রমাণ করে যে, মানুষ পুতুল নয়। কারণ, মানুষের ঘুম ভাঙে, পুতুলের নয়। কুমুদ, জয়ার কাছে মতিকে মানুষ হিসেবেই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে। মানুষ পুতুলের মত জড়বস্তু নয়। শশী একবার মন্তব্য করেছে: "তাকে একবার হাতে পেলে দেখে নিতাম।" 'তাকে' বলতে অদৃশ্য শক্তিকে বুঝিয়েছে। এই মন্তব্যের অদৃশ্য শক্তিকে অগ্রাহ্য করার ইঙ্গিত আছে। আসলে অলৌকিকত্বের যাবতীয় আয়োজন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই ভেঙে দিয়েছেন।

কিন্তু কেন তবে পুতুলের কথা বারংবার এ উপন্যাসে এসেছে ? মানুষ এ সংসার রঙ্গমঞ্চে পুতুলের মতো নাচে, ভাঙ্গে। তবে, পুতুল কে, আর পুতুল নাচিয়ে-ই বা কে? আসলে মানুষ-ই পুতুল। সে আপাদমস্তক সামাজিক। যে নৈরাশ্যতা মানুষকে ঘিরে ফেলেছে তার জন্য মানুষ-ই দায়ী। মানুষ নিজেই নিজেকে নিঃস্ফল ব্যর্থ করেছে। শশীর স্বপ্ন উপন্যাসের শেষে সফল হল না। সে নিজেই নিজেকে ব্যর্থ করেছে। গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে একটু একটু করে শশী জড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু তাকে ব্যর্থ করেছে তার পরিবেশ। তার পিতা গোপাল, সেই জীবন ছেড়ে চলে যায় অতৃপ্ত পিতৃত্বের বাসনায়। শশী ও গোপাল পরস্পর পরস্পরকে ব্যর্থ করে। কুসুমের প্রেমকে শশী ব্যর্থ করে আর শশীর জীবনকে শেষে কুসুম ব্যর্থ করে। উপন্যাসের সূচনাতে হারু ঘোষের পরিণতিতে মনে হয়, মানুষ নিয়তিতাড়িত, কিন্তু বজ্রপাত প্রকৃতির নিয়ম, নিয়তির এতে হাত নেই কোন। যেমন— মাধ্যাকর্ষণ এই মহাবিশ্বের পৃথিবীর মধ্যে থাকা একটি নিয়ম। সুতরাং উপন্যাসের সমস্ত চেষ্টায় যে ব্যর্থতা এসেছে, তাতে মানুষই দায়ী। আমরা নিজেরাই পরস্পরের সঙ্গে ভোজবাড়িও ম্যাজিক করে চলেছি। যে মানুষ বুদ্ধিতে-অর্থে-যশে সামান্যতম উপরে, সে অন্যকে ম্যাজিক বা ভোজবাজি দেখিয়ে অভিভূত করে দিতে চায়। মানব সমাজটাও ম্যাজিশিয়ানের মতো। পরস্পরকে সম্মোহিত ও দখল করতে চায়। তাই পুতুল বলতে

'মানুষ' আর তাই তার নড়াচড়াও অসংখ্য সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ। একজন নাচলে অন্যজনও নাচে বা নাচতে বাধ্য হয়। এতে হাসি-কান্না সব কিছুই বিফল হয়ে যায়। তবু মানুষ জেনেও এখেলা খেলে। পুতুলও নয়, নাচও নয়, মানিকের লক্ষ্য পুতুল নাচ। বলা বাহুল্য, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই লক্ষ্য পূরণে সিদ্ধ হয়েছেন, সুতরাং সবদিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণে বলা যায়, 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসটির নামকরণ যথাযথ গভীর অর্থবহ ও ব্যঞ্জনাধর্মী হয়ে উঠেছে নিয়তি নিয়ন্ত্রণের জন্য নয়, মানব সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের সুবাদেই।

খ

প্রকৃতির সঙ্গে মানবাত্মার চিরন্তন সম্পর্ক বর্তমান, তাই আদিকাল থেকে মানব ও প্রকৃতির সুনিপুণ সাহচর্যে উদ্ভাসিত হয়েছে সৃষ্টির অন্তগূঢ় রহস্য। প্রকৃতি প্রেমিক সাহিত্যস্রষ্টার কলমে কিংবা দার্শনিক গণের স্থিতধী প্রজ্ঞায় তাই যুগে যুগে সুন্দরী প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের উন্মাদনা চিরন্তন হয়েছে। William Wordsworth প্রকৃতিকে শিক্ষকরূপে গ্রহণ করার কথাই বলেছিলেন; কারণ, প্রকৃতির অনুমেয় উষ্ণতার সান্নিধ্যেই মানুষের চিন্তা-চেতনা-মননের বিকাশ ঘটে। আর দার্শনিক-মনোবিজ্ঞানী হিপোলাইট ধারণা করেছেন যে, মনকে আধ্যাত্মিক রহস্যময়তার মোড়কে বাঁধা বলে ধরা যায় না বরং মানতে হয় ইন্দ্রিয়ানুভূতির প্রভাব মনের উপর ক্রিয়াশীল। টেইলে ধারণা করেন যে, এই মহাবিশ্ব বস্তুত: একটি Great Mechanism. মানুষ, মানুষের নৈতিক জীবন এবং কর্মকান্ডসমূহ এসব কিছুই বোঝা যেতে পারে কার্য-কারণ সম্বন্ধসূত্রে। এখানে অলৌকিকতা বা অতিপ্রাকৃততার স্থান নেই। জীববিজ্ঞানী— দার্শনিক ডারউইন মনে করেন, মানুষ নিয়তির কাছে অসহায়। ব্যক্তি চরিত্রসমূহ Helpless products of Heredity and environ ment. জড় বিশ্বের ফাঁদে সে বন্দী। রক্তমাংসের দেহের কামনা, আকাঙ্ক্ষা ও তার জড়বিধান মানুষের জীবনে একমাত্র নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এর কালজয়ী শ্রেষ্ঠ পুতুল নাচের 'ইতিকথা' উপন্যাসে প্রকৃতি-জৈবিকতার সম্পর্ককে এই দৃষ্টিকোণ থেকে সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরতে পেরেছেন।

কথাসাহিত্যের প্রতিটি রচনা সাধারণ অর্থে ভূমিনির্ভর। কেমবমাত্র অবস্থানগত কারণে পটভূমির ভূমিকা ঔপন্যাসিককে তুলে ধরতে হয়। ফলতঃ পটভূমি ও তার জীবনধারা, নিসর্গ অনিবার্যভাবে উপন্যাসের চরিত্রগুলির ওপর ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এই কারণেই মানবজীবন ও প্রকৃতি একে অপরের পরিপূরক হয়ে ওঠে। আলোচ্য উপন্যাসে প্রকৃতির অমোঘ প্রভাব মানুষের জৈবিক বাসনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। উপন্যাসটির প্রতিটি চরিত্র-ঘটনা ও ঘটনার পারম্পর্যতা এক অদৃশ্য অন্ধনিয়তির পাশে বদ্ধ হয়ে ভাগ্য-নিয়ামক হয়ে উঠেছে, যেন রহস্যের অপার বিস্ময় শক্তি মানুষের কর্মের সঙ্গে সর্বদা যুঝে চলেছে। শশী, কুসুম, গোপাল, যাদব পন্ডিত, সেনদিদি, হারুঘোষ— এদের কারুর ইচ্ছাই শেষ পর্যন্ত পূর্ণ হয়নি। প্রত্যেকেই অপূর্ণ ইচ্ছের যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়েছে। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে মানুষের নিয়তিকে এভাবেই ফুটিয়ে তুলেছেন।

উপন্যাসটির স্থানিক পটভূমি গাওদিয়া গ্রামের জীবনযাত্রা পদ্ধতির মধ্যেই আবর্তিত। ঔপন্যাসিক, তাঁর জীবনদর্শনের আলোয় এই গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে দিয়ে এই উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। যদিও সম্পূর্ণভাবে গ্রামের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস এখানে নেই। ছোট ছোট চিত্ররচনার মধ্যে দিয়ে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক তুলে ধরা হয়েছে। প্রাকৃতিক বর্ণনার মধ্যেই জীবনের জৈবিকতার রসায়ন পরিপুষ্ট।

উপন্যাসের সূচনায় দেখা যায়, প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে হারু ঘোষের মৃত্যু ঘটেছে। তার মানসিক ইচ্ছার পরিপূর্ণতা ঘটে না। ঔপন্যাসিক বিবরণ দিয়েছেন এইভাবে: "খালের ধারে প্রকান্ড বটগাছটার গুঁড়িতে ঠেস দিয়া হারু ঘোষ দাঁড়াইয়া ছিল ... শতাব্দীর পুরাতন তরুটির মূক অবচেতনার সঙ্গে একান্ন বছরের আত্মময়তায়

গড়িয়া তোলা বিস্ময় জগৎটি তাহার চোখের পলকে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।" উপন্যাসের সূচনা এই নৈব্যক্তিক অসহায় মৃত্যুদৃশ্য দিয়ে অর্থাৎ প্রকৃতির অমোঘ নিয়তিই যেন রচিত হয়েছে উপন্যাস প্রারম্ভে। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের অন্যতম সুর মৃত্যুচেতনা এক্ষেত্রে ধ্বনিত। মৃত্যুচেতনাকে বাদ দিয়ে জীবনচেতনা পূর্ণতা পায় না। এই উপন্যাসের অন্তিমে সেই জীবনচেতনার বাণী-ই উন্মোচিত হয়েছে প্রকৃতির-ই সাহচর্যে: "তালবনে শশী আর কখনো যায় না। মাটির টিলাটির উপর সূর্যাস্ত দেখিবার শখ এ জীবনে আর একবারও শশীর আসিবে না।" অর্থাৎ প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে এই উপন্যাসের সূচনা ও অন্ত্য গ্রন্থিত। গ্রামের বিবরণ দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক প্রকৃতির প্রেক্ষাপটেই বর্ণনা টেনেছেন: "স্থানটিতে ওজনের ঝাঁঝালো সামুদ্রিক গন্ধ ক্রমে মিলাইয়া আসিল। অদূরের ঝোপটির ভিতর হইতে কেয়ার সুমিষ্ট গন্ধ ছড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। সবুজ রঙের সরু লিকলিকে একটা সাপ একটি কেয়াকে পাকে পাকে জড়াইয়া ধরিয়া আচ্ছন্ন হইয়া ছিল।" এর সঙ্গে হারুর মৃত্যু উপন্যাসের অন্তর্বিরোধকেই যেন ফুটিয়ে তোলে। একই সঙ্গে এই অংশে মৃত্যু ও জীবনের অন্বেষণ ঔপন্যাসিক ফুটিয়ে তুলেছেন সরীসৃপ, শেয়াল এসবও প্রাকৃতিক নিয়মে চলেছে।

মানুষের জীবনবৃত্তে আনন্দ দুঃখ, সুখ-যন্ত্রণা অনেক সময় প্রকৃতির প্রেক্ষাপটেও ঘটে থাকে। কখনও প্রকৃতি মানুষের জীবনে খুশীর স্বপ্ন আনে; আবার কখনো বিষণ্ণতার সুর অনুরনিত করে। এই উপন্যাসেও ঋতু পর্যায়ের বৈচিত্র্য তুলে ধরা হয়েছে। এই বৈচিত্র্যতা দেখা গেছে শশীর ডাক্তারী উপলব্ধির মধ্য দিয়ে এবং উপন্যাসের বর্ণনামূলক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে। অথচ তা জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েই পরিবেশিত হয়েছে। বস্তুত: উপন্যাসটির কালক্রম এক বর্ষা থেকে পরবর্তী বর্ষা ঋতুতেই শেষ হয়েছে। আর ঋতুচক্রের ধ্রুবপদটিতে বিভিন্নভাবে উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে ঘটনার ঘনঘটা। শশীর দৃষ্টিতে প্রকৃতির নির্মোহভাবকে তুলে ধরা হয়েছে এভাবে: "এই সুদূর পল্লীতে হয়তো সে বসন্ত কখনো আসিবে না। যাহার কোকিল পিয়ানো, সুবাস এসেন্স, দখিনা ফ্যানের বাতাস। তবু শশীর মনকে কে বাঁধিয়া রাখিবে? ... আজ শশী কামিনী ঝোপের পাশে ক্যাম্প চেয়ারে বসিয়া বাঁশ ঝাড়ের পাতা কাঁপানো ডোবার গন্ধভরা ঝিরঝিরে বাতাসে উন্মনা হোক....." তালপুকুরের বর্ণনার মধ্য দিয়েও হৃদয়স্পর্শী প্রকৃতির বর্ণনা দিয়েছেন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। চরিত্রের ছোটখাটো মানসিকতা (অর্থাৎ Mood) গুলিকে এই তালপুকুরের বর্ণনার সাথে সাথে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যেমন বিরোধ আছে, তেমনি বন্ধুত্বও আছে। পুতুলের মতো প্রকৃতিও এক্ষেত্রে প্রতীকি অর্থে গৃহীত হয়েছে: "সর্বাঙ্গের শুভ্রতায় তালগাছের রহস্যময় ছায়া মাখিয়া মাখিয়া তালপুকুরের গভীর কালো জলে হাস সাঁতার দেয়, তাদের গায়ে ঠেকিয়া লাল ও সাদা শাপলাগুলি জলে ডুবিয়া ভাসিয়া ওঠে।" মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্ণনার চিত্রকল্পের রূপ ফুটে ওঠে চতুর্দিকের ভরন্ত কলমীশাকের ফুলে, যেগুলি বাতাসের স্পর্শে অতীব সুন্দর রূপ পায়: "আকাশে ভাসে উজ্জ্বল সাদা মেঘ আর বন্য কপোতের ঝাঁক। শালিক পাখি উড়িবার সময় হঠাৎ শিস্ দেয়, অল্প দূরে পাখির পাঠশালা বসে। বাতাসে থাকে কত ফুল, কত মাটি, কত ডোবার মেশানো গন্ধ।" মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসে মতি-কুমুদের রোমান্টিক উপাখ্যানটিও প্রকৃতির সান্নিধ্যে স্থাপন করেছেন। কবি-কল্পনার আশ্রয়ে রোমান্টিক বর্ণনা যথেষ্ট মনোরম হয়েছে। আবার মতি ও কুমুদের চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে প্রকৃতি। শশী ও কুসুমের পারস্পরিক সম্পর্ক, আকর্ষণ-বিকর্ষণের ক্ষেত্রে, সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের নৈরাশ্য-পীড়িত বিদায়ের সাক্ষী-হিসেবে তালপুকুরের নিসর্গ প্রকৃতি–ই স্থান পেয়েছে।

সমগ্র উপন্যাসে, এভাবে টুকরো টুকরো জীবন সম্পর্কিত জৈবিক বাসনা সম্পর্কিত প্রকৃতি-চেতনা এসে ভিড় করেছে অবয়বে। যেমন মনের অস্থিরতায় এবং শশীর কাছ থেকে কোনরকম সাড়া না পাওয়ায় কুসুম গোলাপের চারা মাড়িয়ে দিয়েছে। আবার কখনো কুসুম, শশীকে বলেছে: "এমনি চাঁদনি রাতে আপনার সঙ্গে

কোথাও চলে যেতে সাধ হয় ছোটোবাবু।"— অর্থাৎ এই উপন্যাসের প্রকৃতি চিত্রণে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবন ও জৈবিকতার সঙ্গে প্রকৃতির অন্বয় ঘটিয়েছেন। প্রকৃতি এখানে মানবজীবনের বিশেষ করে অবচেতন বেশ কিছু ভাবকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে।

গ

মানুষের ভাববিনিময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ- সংবেদনশীল, আত্মিক মাধ্যম হল ভাষা। তাই স্রষ্টার কাছে সাহিত্যের ভাষা হল সেই মাধ্যম, যার তরী ধরে উপলব্ধির মোহনায় সহজেই পৌঁছানো যায়। উপন্যাসের ভাষা তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য পূরণের মাধ্যম রূপে ভাষা তাই হয়ে উঠেছে আলোচ্য বিষয়। বিচিত্রধর্মী উপন্যাস রচনার সময় ভাবভঙ্গি ও পটভূমির বিভিন্নতা অক্ষুন্ন রাখতে তাই উপন্যাসিকগণ ভাষার উপরেই নির্ভর করেন। তাই প্রয়োজনের ভাষা হয় দৃঢ়-অন্বয় বন্ধনে সম্পৃক্ত, বর্ণনার ভাষা হয় কোমল-পেলব আর সৃষ্ট চরিত্রের ভাষা অনুভূতিবেদ্য রূপ পায়।

উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে পূর্ব-পরিকল্পিত নিটোল মুক্তঝরা প্লট বা কাহিনি যেমন ঘটনার দিক দিয়ে গঠন শৈলীর ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ, তেমনি দুরান্বয়ের আকাঙ্ক্ষাকেও ফলপ্রসূ করে তুলতে পারে একমাত্র ভাষা। উপন্যাসে তাই ভাষার ব্যবহার একাধিক ধরণের হয়ে থাকে। ভাষা যেখানে উপন্যাসের চরিত্রসৃষ্টির সহায়ক, বা পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যম, সেখানেও ভাষার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়ে থাকে। কল্লোলশ্রেষ্ঠ মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাসক্তি কেবলমাত্র বিষয়বস্তুর মধ্যে সীমায়িত নয়; তাঁর বর্ণনারীতির মধ্যেও বাস্তবতায় প্রখর রূপ লাভ করেছে। 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসটি গাওদিয়া গ্রামজীবনের রাস্তব- পল্লী পরিবেশের সংকীর্ণ চৌহদ্দির মলিন, প্রাত্যহিক জীবনচর্চার প্রণালীর অল্পশিক্ষিত, অশিক্ষিত মানুষের জীবন-ভাবনায় আলোড়িত। শিক্ষিত শশী ডাক্তারের স্বপ্ন, সংঘাত, শেষে কীভাবে নৈব্যক্তিকতার স্তরে পৌঁছেছে— ঔপন্যাসিক যেন তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন বারংবার। মানুষের ছকে বাঁধা জীবনের ইতিকথার ইতিবৃত্ত এ উপন্যাসে দ্বন্দ্ব–সংঘাতের মধ্যে দিয়ে রূপ পেয়েছে। এই সচেতন প্রখর মননবোধ থেকে জন্মলাভ করা উপন্যাসটির ভাষারীতি যে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ হবে- তাতে কোন দ্বিমত নেই।

'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসটিতে দুই ধরণের ভাষাকে ব্যবহার করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমতঃ ওপন্যাসিকের নিজস্ব ভাষা এবং দ্বিতীয়ত: চরিত্রের মুখের সংলাপকে ঘিরে তৈরী হয়েছে যে ভাষা সাধারণ বর্ণনার ক্ষেত্রে তাই। নিসর্গ অঙ্কনের মাধ্যমরূপে, একাধিক চরিত্রের বর্ণনার ক্ষেত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজস্ব ভাষাকে ব্যবহার করেছেন। উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে 'সবুজপত্র' পত্রিকায় প্রমথ চৌধুরী চলিত রীতিকে প্রকাশ করেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে সেই রীতিকে অনুবর্তন করেছিলেন, এঁদেরই সুযোগ্য উত্তরসূরী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর উপন্যাসে সাধু ও চলিত ভাষার সংমিশ্রণে এক অদ্ভুত সাবলীল স্বচ্ছন্দ্য ভাষা সৃষ্টি করলেন 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসটিতে, যেখানে শিথিলতার সঙ্গে স্বচ্ছন্দ্যতার সমন্বয় ঘটে গেছে। উপন্যাসের সূচনায়ই তার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট: চন্ডীর মা মাঝে মাঝে দুপুরবেলা এদিকে কাঠ কুড়াইতে আসে। কিংবা "যামিনী কবিরাজের চেলা সপ্তাহে একদিন গুল্মলতা কুড়াইয়া লইয়া যায়।" এই বর্ণনার মধ্যে ভাষার কাঠামোগত রূপটি হয়েছে সাধু আবার সাধুর সাথে মেলবন্ধন ঘটেছে চলিত রীতিরও। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন লেখেন: "দু আঙ্গুলে একটি একটি মুড়ি মুখে দিবার সময় ছেলেকে তাহার কী সুন্দর দেখায়।" তখনও এই সাধু ও চলিত রীতি ভাষায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কেননা, সাধু শব্দ 'দুই'-এর চলিত রূপ 'দু'-এর সঙ্গে 'একটি একটি' সাধুরূপের মিশ্রণ ঘটে যায় মাত্র একটি বাক্যে। আবার বিবৃতিমূলক বর্ণনায় ঔপন্যাসিক স্বয়ং চলিত ও সাধুভাষা রীতির ব্যবহার করেছেন: "সকলে একদিন দুইদিন সহ্য করে, হাসিমুখে উঠিয়া বসিয়া হাই তুলিয়া বলাবলি করে: শশীর হয়েছে কী? এবার বাপু ওর একটা বিয়ে দেওয়া দরকার।"

এই ধরণের সাধু ও চলিত ভাষার সংমিশ্রণ উপন্যাসের একাধিক স্থানে রয়েছে।

উপন্যাসটির মধ্যে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় এমনভাবে সাধু ও চলিত রীতির সংমিশ্রণে ভাষারীতি গঠন করেছেন, তাতে বাক্যের স্বচ্ছন্দ্যতা কোন স্থানে বাঁধাপ্রাপ্ত হয়নি। প্রতিটি লাইনে কর্তা-কর্ম-ক্রিয়ার একটি নির্দিষ্ট সজ্জা বা বিন্যাস রয়েছে ভাষার অন্বয়বন্ধনে: "একটি অনাবশ্যক ব্যস্ততার সঙ্গে শশী ঘুরিয়া বেড়ায়- ওষুধের সঙ্গে দিয়েছে আশ্বাস।" এই বাক্যে ক্রিয়াপদটিকে মাঝখানে অবস্থান করিয়েছেন ঔপন্যাসিক। আবার ঔপন্যাসিক যখন লেখেন: "বাসুদেবের বাড়ি কম দূর নয়, শ্রীনাথের দোকান ছাড়াইয়া রজনী সরকারের পাকা দালানের পাশা দিয়া বামুনপাড়া পর্যন্ত গড়ানো সাপের মতো আঁকাবাকা পথের মাঝখান হইতে দক্ষিণ দিকে ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়া পায়ে চলা যে সংকীর্ণ রাস্তাটুকু পোয়াটেক গিয়া মাঠের মধ্যে হারাইয়া গিয়াছে, তার শেষাশেষি।"— তখন অসমাপিকা ক্রিয়া গিয়া' পরপর দুবার ব্যবহৃত হয়েছে জটিলবাক্য ব্যবহারের মাঝখানে। কখনও আবার তিনি অভিধানিক শব্দকেও পরিবর্তন করেছেন। যেমন আছ 'শব্দের অর্থ অতীতের সেই দিনটি'-কেই নির্দেশ করছে। 'খাপছাড়া', 'হারামজাদীর কান্ড দেখছ', '২৩ বছরের বাজা মেয়ে' ইত্যাদি অমার্জিত শব্দও অবলীলায় রূপ পেয়েছে এ উপন্যাসে। অর্থাৎ সংস্কৃত গন্ধী সাধুভাষা, তৎসম, চলিত, অশিষ্ট শব্দ সমন্বয়েই 'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসটি রূপ পেয়েছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনীতে ভাষা কখনো হয়েছে উদ্দেশ্যমূলকের হাতিয়ার। অর্থাৎ উপন্যাসের মূল বক্তব্যকে সফল করতে ভাষা ঔপন্যাসিকের শিল্পবোধের সহায়ক: "শনে ছাওয়া চাঁচের বেড়ায় গ্রামেরই চিরন্তন নিজস্ব নীড়।" এক্ষেত্রে 'নীড়' শব্দটি হয়েছে Focal Point. জন্মনাড়ীর সঙ্গে সংযুক্ত ও তার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সন্ত্রাস বেদনাটি কাজ করেছে বলেই 'নীড়' হয়েছে শান্তির আশ্রয় স্থল। ঔপন্যাসিক তাই পরম মমতায় 'নীড়' শব্দটিকে একান্ত নিজস্ব, চিরন্তন ভাবনার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। শব্দটি ব্যঞ্জিত হয়েছে অতিযত্নে এ উপন্যাস অবয়বে: "সে তো ডাক্তার, আহত ও রুগের সঙ্গে তার সারাদিনের কারবার, দিন ভরিয়া তাহার শুধু মাটি ছোঁয়া বাস্তবতা,- শ্রান্ত মনে সন্ধ্যার জনহীন মন্দিরে বাসার মতো বুড়োবুড়ির এই নীড়ে সে শান্তি বোধ করে," "শশীর নীড় প্রেম সীমাহীন।" 'খাপছাড়া' শব্দটিও বারংবার ব্যবহৃত হয়েছে বাক্যে সংকীর্ণ জীবনের বিচ্ছিন্নতা বোঝাতেই। এ উপন্যাসের ভাষা মানিকের হাতে পড়ে কখনও শ্রুতিমধুর- পেলব রূপও ধারণ করেছে: "ডুরে শাড়ীটি পড়ে চুলটি বেঁধে বউটি সেজে বসেছিলাম।" হৃদয়মোত্থিত করা এ ভাষায় উপন্যাসিকের নস্ট্রালজিয়া ধরা পড়ে যায়।

সমগ্র উপন্যাসে বিষয়বস্তুর বর্ণনায়, গ্রাম ও গ্রাম পরিবেশের খন্ড চিত্র অঙ্কনে, চরিত্রে উক্তি- প্রত্যুক্তিতে ভাষা যেন প্রাণ সঞ্চার করে; সুন্দর, জটিল অথচ সাবলীল, মননবেদ্য হৃদয়স্পর্শী এ ভাষার মধ্যেই ফুটে উঠেছে নিরপেক্ষ ছন্দময় জীবনবিলাস। আটপৌরে অথচ ধ্বনিতরঙ্গময় এভাষা "ভাঙ্গা লণ্ঠনের রাঙা আলোতে মতির রং যেন মিশিয়া গিয়াছে," যেন অনায়াসেই পাঠকমনে স্থান পায়।

ঘ

বাংলা উপন্যাসে আধুনিক জটিল জীবনজিজ্ঞাসার বহমান ধারায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা' (১৯৩৬-এ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত) তরঙ্গপ্রপাত সৃষ্টি করেছিল— একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে। ব্যক্তি জীবনের যন্ত্রণা-সংকট, জীবন মৃত্যুর দোলাচলে গড়ে ওঠা গভীর দার্শনিকবোধ, অনিঃশেষ জিজ্ঞাসা যেন মুক্তি পেয়েছিল এ উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে। অবশ্য ঔপন্যাসিক শশী চরিত্রের দর্শনেই তাঁর নিজস্ব জীবনবোধের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। এই জীবনবোধের অন্যতম দিক নিয়তিবাদ, যা অদৃষ্টে থেকে মানবজীবনের চালিকাশক্তিরূপে নিয়োজিত রয়েছে। মানুষের সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টার উৎসে রয়েছে তার নিয়তি বা অদৃষ্ট; তাকে

অতিক্রম করা যায় না। গ্রীক নিয়তিবাদে দেখা গেছে ভাগ্যেরই নির্মম পরিহাস আর পরবর্তীকালে মানুষ জেনেছে, কর্মবৃত্তির সত্যপ্রচেষ্টাই নিয়তি থেকে রক্ষা করতে পারে। অর্থাৎ মানুষ নিজেই অদৃষ্ট কর্মফল দ্বারাই রচনা করে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিজ্ঞানমনস্ক শিল্পভাবনায় কখনই সনাতন ধর্ম-সংস্কারের অদৃষ্টবাদ স্থান পায়নি। ভাগ্যের নির্মম হস্তে ক্রীড়নক মানব, মানবসংসারকে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখেছেন পুতুল রূপে তাঁর 'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসে। তাই উপন্যাসের নামকরণের ক্ষেত্রেও ব্যঞ্জিত হয়েছে নিয়তিবাদের ধারণা। উপন্যাসটিতে নিয়তি যেমন মৃত্যুর বীভৎস করুণ দৃশ্যকে ব্যঞ্জিত করেছে, তেমনি শশীর ব্যক্তিগত জীবনে পরাজয়ের গ্লানিবোধকেও সূচিত করেছে। শশীর মনে জীবন সংক্রান্ত রহস্যবোধের প্রথম সূচনা হয়েছে একটি অপঘাতে মৃত্যুকে আশ্রয় করে: "খালের ধারে প্রকান্ড বটগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া হারু ঘোষ দাঁড়াইয়া ছিল। আকাশের দেবতা সেইখানে তাহার দিকে চাহিয়া কটাক্ষ করিলেন।" অর্থাৎ সূচনায় হারু ঘোষের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে 'আকাশের দেবতা'-র অলক্ষ্য হাতে মানুষের অসহায়-নিরূপায় মৃত্যুর ছবির সাহায্যে পাঠকচিত্তে এক গূঢ় জীবনরহস্যের আভাস আনলেন। হারু ঘোষের নিরূপায় অসহায় মৃত্যু যেন গাওদিয়া গ্রামের 'ইতিকথা'র প্রবেশদ্বার হয়ে রইল। এই মৃত্যু অভিজ্ঞতায়ই সঙ্গী হল শশী। শশী শহরে বড় হওয়া ও স্বপ্ন দেখা চিকিৎসক বলেই মৃত্যুর নিষ্ঠুর গ্রাস থেকে জীবনকে ছিনিয়া আনার মন্ত্রে দীক্ষিত, সে ডাক্তার হয়েও এক্ষেত্রে জীবনকে রক্ষা করতে পারেনি। নিয়তির হাতে ক্রীড়নক শশী শুধুমাত্র শববাহকের সঙ্গী হয়েছে।

উপন্যাসের সূচনাতে মৃত্যুর অমোঘ রহস্য নিয়ে শশী গ্রাম জীবনে প্রবেশ করে, পল্লীর জীবনচিত্র অভিজ্ঞতার বিচিত্র ভান্ডারে পূর্ণ করেছে। তাই শশীর দৃষ্টি দর্পণে নানা রহস্যরূপ উদ্ভাসিত হয়েছে। সেইসব জীবন রহস্যচেতনার অন্যতম মুখ্য উপকরণ-মৃত্যু ও ব্যাধি। শুধু একটি মৃত্যু নয়, মানুষের চূড়ান্ত অসহায়তা, তার সমস্ত কর্মপ্রয়াসের চরম নিষ্ফলতা ও নিরর্থকতার মধ্যেই নিয়তির নীরব হাতছানি শশী লক্ষ্য করেছে বারংবার। বাসুদেব বাঁড়ুয্যের বালক- পুত্র, বৃদ্ধ যাবদপন্ডিত ও তাঁর স্ত্রী এবং যামিনী কবিরাজের স্ত্রী সেনাদিদির মৃত্যু- সবই একাধারে জীবনের অন্তহীন রহস্য ও মানুষের ব্যর্থতাবোধের নিরূপায় যন্ত্রনাকেই প্রকাশ করেছে। বজ্রাহত হারু ঘোষকে বাঁচানোর কোন সুযোগই পায়নি শশী ডাক্তার অথচ বাসুদেবের পুত্র ও সেনদিদিকে মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচানোর জন্য যথাসাধ্য সংগ্রাম করেছে শশী; শেষ পর্যন্ত তাদের মৃত্যুই নিশ্চিত হয়েছে, শুধুমাত্র শশীর মনে নিয়তির অনুভব হয়েছে মাত্র: "শশীও ভাবিতে পারে নাই, এ যাত্রা সে রক্ষা পাইবে না। ডাক্তার মানুষ সে, সেও যেন ভালো করিয়া বুঝিতে পারিল না। ..... শশী জানে এরকম হয়, মানুষের দেহের মধ্যে আজও এমন কিছু ঘটিয়া চলে এ যুগের ধন্বন্তরিরও যা থাকে জ্ঞানবুদ্ধির অগোচরে।" বলা বাহুল্য, এই 'জ্ঞানবুদ্ধির অগোচরে'-ই রহস্যময় নিয়তির অবস্থান- একথা শশী নিশ্চিতরূপে বুঝতে পেরেছে।

শশী ডাক্তারের দৃষ্টিকোণে অপর একটি মৃত্যু রহস্যময় তাৎপর্যতা নিয়ে এসেছ; তা হল যাদব পন্ডিত ও তার সহধর্মিনীর মৃত্যু। এটি কোনো সাধারণ মৃত্যু নয়। গাওদিয়া গ্রামের প্রতিটি মানুষ জেনেছে এটি 'সিদ্ধপুরুষ' পন্ডিত মশায়ের 'ইচ্ছামৃত্যু'। কিন্তু চিকিৎসক শশী বুঝতে পেরেছে, এই মৃত্যুটি যাদব পন্ডিতের কোন অলৌকিক লীলা নয়, এর নেপথ্যে রয়েছে করুণ আত্মপ্রবঞ্চনা, অর্থাৎ নিরূপায় আত্মহত্যা। শশী বেশ ভালো ভাবেই বুঝতে পেরেছে: "আপিমের ক্রিয়ায় যাদবের চামড়া ঢাকিয়া চটচটে ঘাম। বিন্দুর মতো ছোট হইয়া আসা চোখের তারকা আর মুখে ফেনা উঠিবার কথা," তাই এই মর্মান্তিক ঘটনায় তার স্বীয় ভূমিকার অসহায়তা ও অর্থহীনতাও তার নিজের কাছে বড়ো নির্মমভাবে স্পষ্টে হয়ে উঠেছে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মানুষটিকে বাঁচিয়ে তোলার সংগ্রামী ভূমিকা চিকিৎসক শশীর মনে বারংবার উদয় হওয়ার ফলে, শশীর নিজেকে বড় অসহায় লেগেছে। লেখক নিপুণ কৌশলে এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন, যেখানে সব জেনে শুনেও শশীর ভূমিকা কেবল নিরূপায়

দর্শকের মতই হয়েছে। শশীর দৃষ্টির সামনেই দুটি প্রাণের শিখা ধীরে দীরে নিভে গেছে আর সেই সঙ্গে শশীর মনে প্রতিকূল নিষ্ঠুর এই জাগতিক পরিবেশে মানুষের কর্মপ্রয়াসের অর্থহীনতার চেতনা জেগে উঠেছে, যা প্রকারান্তরে নিয়তিবাদকেই সমর্থন করেছে।

'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসের সূচনায় মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই নিয়তিবাদ সূচিত হয়েছে। এছাড়া, নেতিবাচক জীবনভঙ্গীর পরিচয়ের মধ্যে দিয়েও শশীর নিয়তিবাদকে সূচিত করেছেন ঔপন্যাসিক। চিকিৎসক শশী যেন সংশয়ে যন্ত্রনাবিদ্ধ এক অসুখী আত্মজিজ্ঞাসু সত্তা, যার ভাবনা-অনুভূতি পারিপার্শ্বিক দুশ্ছেদ্য জালে আবদ্ধ। তাই শশী বারংবার বাঁধা পেয়েছে তার স্বপ্নকে চরিতার্থ করতে গিয়ে, ফলে শেষ পর্যন্ত গ্রামীন জীবনের শিকড় ছেড়ে দূর আকাশে ডানা মেলতে গিয়েও বাঁধা পড়ে গেছে গাওদিয়ার জীবনচর্চায়। শশীর মনের এই আধুনিক যুগ দীনতা বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে দুই ব্যক্তির সংস্পর্শে-তাদের সঙ্গে শশীর পারস্পরিক ব্যক্তিগত গূঢ় সম্পর্কের মাধ্যমে। একজন শশীর পিতা গোপাল এবং অন্যজন কুসুম। উপন্যাসে শশীর সঙ্গে গোপালের সম্পর্ক সর্বদাই বিরোধ-সংঘাতের-এক মহাজন পিতার সঙ্গে আধুনিক প্রগতিশীল জীবনভাবনার অনুসারী পুত্রের। ওপরদিকে শশীর জটিলতম সত্তার উন্মোচন হয়েছে কুসুমের সঙ্গে তার সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে। উপন্যাসে কুসুমের প্রণয় ব্যাকুলতাকে সাড়া দেয়নি শশী। শশীর শিক্ষা-সংস্কার-মনোভাব-ব্যক্তিত্বের মর্যাদাবোধ তাকে বাঁধা দিয়েছে। অর্থাৎ শশীর ব্যক্তিসত্তার আত্মিক মৃত্যু ঘটেছে এক অমোঘ নিয়তির হাতে।

নিয়তিবাদের অপর তাৎপর্যতা ধরা পড়েছে জীবনের পরাজয়ে। যাদব পন্ডিত ও সেনদিদিকে বাঁচাতে না পারা, বিন্ধুর জীবন পরিণাম, পিতা গোপালের সঙ্গে নেতিবাচক সম্পর্ক, গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়ে স্বপ্নপূরণের ব্যর্থতা ও সর্বোপরি কুসুমের অপ্রত্যাশিত চলে যাওয়া— সমস্ত ঘটনাই পরিনামী ব্যর্থতা বহন করেছে শশীর জীবনে, ফলে তার জীবনও বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। অর্থাৎ আনিকেত, বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ শশী জীবনের এক ব্যর্থতার মুহূর্তে উপলব্ধি করেছে: "একটা অদৃশ্য শক্তি যেন অহরহ তার বিরুদ্ধে কান্না করিতেছে।" এই দুর্বার শক্তির ইঙ্গিত ঔপন্যাসিক দিলেও স্পষ্টতা দেননি; বলা বাহুল্য-এটি-ই শশীর অমোঘ নিয়তি।

শুধুমাত্র কয়েকটি আকস্মিক ঘটনা বা শশীর ব্যক্তিগত জীবনবীক্ষাই নয়, উপন্যাসটির নামকরণেও নিয়তিবাদকেই প্রাধান্য দেন ঔপন্যাসিক। মানুষের জীবন যেন পুতুলের নাচ আর সংসার রঙ্গমঞ্চ। এক দুর্বোধ্য-অদৃশ্য নিয়তির (শক্তির) ইঙ্গিতেই আমাদের সমস্তরকম কর্ম সাধিত হচ্ছে। অর্থাৎ উপন্যাসটির নামকরণের চিত্রকল্পটিও পুতুলনাচেরই পটভূমি। তাই উপন্যাসে শশীর সমস্ত ধারনাই পরিনামহীন লঘু ও নিরর্থক- এই অদৃষ্টের হাতে মানুষ ক্রীড়ানক, ধারণাটিই নিয়তিবাদের মূলকথা। তাই সমস্ত ঘটনা চরিত্র ও সর্বোপরি নামকরণেও ব্যঞ্জিত হয়েছে অদৃষ্টের অদৃশ্য ক্রীড়ানৈপুণ্য। এখানেই উপন্যাসের নিয়তিবাদের উপর মানুষের কর্ম-স্বপ্নের প্রতিষ্ঠা।

ঙ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিংশ শতকের তিরিশের দশকে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব থেকেই উপন্যাস গল্প রচনা শুরু করেছিলেন। এ সময়ের পূর্বে ইউরোপে ফ্রয়েড, এড্‌লার, ইয়ুও প্রমুখের গবেষণায় ব্যক্তির মনোলোকের রসও উদঘাটিত হতে থাকে। ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে 'সাইকোএ্যানালাইসিস' (Psycho-analysis) নামক গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশের ফলে মানুষের মন সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার পরিবর্তন ঘটে। মানুষের মনের গহনে আবিস্কৃত হল ত্রয়ীস্তর- Ego, Id ও super Ego. ফ্রয়েড দেখালেন, ব্যক্তির সব অভিজ্ঞতা অবচেতনে (Sub-conscious) জমা হয়ে থাকে, তাদের মধ্যে কতগুলি বেদনাদায়ক বা কষ্ট-যন্ত্রণা উদ্রেককারী বলে এবং তা যৌনকামনার সঙ্গে জড়িত বলে একটি শক্তি তাদের চেপে থাকে। চেতন মনস্তরে (Conscious) উঠতে পারে না। এ শক্তির নাম অবদমন (Repression), দীর্ঘদিন অবদমনের ক্রিয়া চললে নানাবিধ মানসিক জটের (Complex) সৃষ্টি

হয়। কখনও কখনও হিসটিরিয়া, নিউরোসিস প্রভৃতি মানসিক রোগের মধ্যে তা আত্মপ্রকাশ করে। ফ্রয়েডের মতে, অবদমিত যৌন কামনা স্বপ্নের মধ্যে প্রতীকের রূপ নিয়ে দেখা দেয়। আপাত দৃষ্টিতে সেই চিত্রকল্প অর্থহীন হলেও তা অবচেতনের ভাষা।

বাংলা উপন্যাসে ব্যক্তিচরিত্রের মনস্তত্ত্বের আরোপ তিরিশের দশক থেকেই লক্ষ্য করা যায়। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় যার পথিকৃৎ। ফ্রায়েড পন্থী মনোবিকলন ও মনবিকারতথ্য, তাঁর প্রথম পর্যায়ের উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য' (১৯৩৫) 'পুতুল নাচের ইতিকথা' (১৯৩৬), 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬)-এ গভীর প্রভাব ফেলেছে। এই উপন্যাসগুলিতে ফ্রায়ডের যৌন মনস্তত্ত্ব দেখা দিয়েছে। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন উপন্যাস রচনায় হাত দিয়েছেন, ঠিক তার পূর্বেই 'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে উপন্যাস এক নতুন পথ নিয়েছে, যার প্রধান লক্ষ্যই হল নরনারীর প্রেম, যৌনজীবনচিত্র ও সমস্যাকে তুলে ধরা। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধ স্যানাল, শৈলজানন্দ প্রমুখের উপন্যাসে নর-নারীর সেই দেহজ প্রেম ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এক নতুন পথ অন্বেষণ করে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও, তাঁর কালজয়ী উপন্যাস আলোচ্য 'পুতুল নাচের উপকথা' য়, ব্যক্তির মনোলোককে উদ্ঘাটন করে, তার কামনা-বাসনা দগ্ধ নির্যাসকেই সূক্ষ্ম ভাবরসে জারিত করে পাঠকবর্গকে উপহার দিয়েছেন।

'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপকথার সূচনা প্রকৃতির রুদ্ররোষে হারুঘোষের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। তার মৃত্যু উপন্যাসের নায়ক শশীকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। মৃত্যু এক একজনকে এক একভাবে বিচলিত করে। আত্মীয় কিংবা পরের মৃত্যুতে 'মরমানবের' জন্য শোক করে, শশী তাদের মতন নয়। তবু মৃত্যুর সান্নিধ্য যে শশীকে ব্যাথিত করে, উপন্যাসিক তা জানাতে ভোলেন নি। শশীর চরিত্রের দুটি সুস্পষ্ট ভাগের পরিচয় পাই। একদিকে তার মধ্যে কল্পনা, ভাবাবেগ ও রসোবোধের অভাব নেই, অন্যদিকে সাধারন সাংসারিক বুদ্ধি ও ধনসম্ভোগের প্রতি তার মমতা যথেষ্ট। এ হেন শশীর সঙ্গে পরানের বউ কুসুমের একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সম্পর্কের গোড়াতেই কুসুমের চলনে-বলনে-আচরণে ফ্রয়েডীয় যৌন মনস্তত্ত্ব নিঃসন্দেহে কাজ করেছে। মতিকে পরীক্ষা করে ডাক্তার শশী চলে গেলে বেগুনক্ষেতে দাঁড়িয়ে কুসুম হাসে। চাঁদ উঠলে কিংবা চাঁদ ওঠার আভাস দেখলে কুসুম যেন শুনতে পায়: "ভিনদেশী পুরুষ দেখি চাঁদের মতন/ লাজরক্ত হইয়া কন্যার পরথম্ যৌবন।" বাংলা কথাসাহিত্যে সধবা রমনীর প্রণয় ব্যাকুল চিত্র পূর্বে আসেনি— এমন বলা যাবে না; কিন্তু পাশ্চাত্যের সাইকোএ্যানালিসিস্টদের দৃষ্টিকোণ থেকে এমনভাবে চরিত্র সৃজন আমরা কুসুমের আগে দেখিনি।

প্রতিমামুখি মতির জন্য নয়, কুসুমের জন্য শশীর মনে নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। পরানের কথা শুনতে শুনতে শশী আশা করে, ঘরের ভিতর থেকে হয়ত দু'চোখে গাঢ় স্তিমিত ছায়া সঞ্চার করে হঠাৎ কুসুম বের হয়ে আসবে, আসলে উপন্যাসের কাহিনীকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাইরের জগৎ থেকে মনোজগতে নিয়ে আসার পরিকল্পনা করেছিলেন আর সে কাজে শক্তি সঞ্চার করেছে সেনদিদি, যামিনী কবিরাজ, বিন্দু প্রমুখ। মতির মনে অবদমিত ভালোবাসা থেকে মতি ভাবছিল যে, বড়লোকের বাড়িতে শশীর মত স্বামীর সঙ্গে তার বিয়ে হোক, তাই সে স্বপ্ন দেখে: "মস্ত একটি ঘরের এক কোনে সে বসিয়া আছে। সর্বাঙ্গে তার ঝলমলে গহনা, পরনে ঝকঝকে শাড়ি।" কুসুম, শশীর কথা বলে মতিকে যেমন উত্তেজিত করে তোলে, তেমনি মতির প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে তাকে আঘাত করতেও ছাড়ে না: "এত বড় ধেড়ি মেয়ে তুই, লজ্জা নেই তোর পেটে ভাত জোটে না। ..... ছোট বাবু ? তুলনায় তুই ছোটলোক ছাড়া কি?" এই চেতন-অবচেতন মনের দ্বন্দ্বই ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের মূল কথা, যে দ্বন্দ্ব শশী কুসমের মধ্যে যেমন বিদ্যমান, তেমনি পার্শ্ব চরিত্রগুলিকেও তা স্পর্শ করেছে।

কুসুমের মধ্যে এক ধরনের পাগলামি আছে, পাগলামির জন্যই তার প্রতি শশী আকৃষ্ট হয়। বাগানে শশীর সাধের গোলাপ চারাটি কুসুম দু'পায় মাড়িয়ে মাটিতে পুঁতে দিলেও শশী ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে না বরং কুসুমের মধ্যে

আবিষ্কার করে এক বালিকসুলভ সরলতা ও নির্বুদ্ধিতা। আবার মতির জন্য শশীর মনে বাৎসল্য মেশানো এক আশ্চর্য মমতা আছে। এই মমতার জন্যই মতির সঙ্গে কুমুদের বিয়ের কথা শুনে শশীর রাতে ঘুম হয় না। কুসুমকে সে বলে: "আমি যদি মতিকে বিয়ে করি?" এখানেই সমগ্র উপন্যাসটির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষন Climax এর পর্যায় পৌঁছে গেছে। এ এমন এক প্রশ্নচিহ্ন যার ফলে কুসুম আরও বেশী শশীর ঘনিষ্ট হয়ে যায়— সম্ভবত নারীর অহংকার-ই এর মূলে থাকে। ফ্রায়োডীয় মনস্তত্ত্বে প্রেম বলতে দেহজ কামনা বাসনা জর্জরিত, প্রবৃত্তিজাত প্রেমই বোঝায়। দেহাধীন প্রেম-ই সেখানে মূল কথা। দেহাতীত প্রেমের অস্তিত্বকে ফ্রয়েড স্বীকার করেন নি। 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসে সুক্ষ্মভাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই ফ্রয়েডীয়তত্ত্বকে সুচারুরূপে প্রয়োগ করেছেন। কুসুম একদিন শশীকে বলে— "এমনি চাঁদনী রাতে আপনার সঙ্গে কোথাও চলে যেতে সাধ হয় ছোটবাবু।" শশী কুসুমের এই ভাবনাকে মেনে নিতে পারেন না। আসলে, শশী নারীর মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে খুব বেশী ওয়াকিবহাল নন। উপযুক্ত পরিবেশে নির্জনে একাকী শশীকে পেয়ে— "কুসুম নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আপনার কাছে দাঁড়ালে আমার শরীর এমন করে কেন ছোটবাবু?" তখন কুসুমের শরীর কথা বলতে চায়। কিন্তু বিপরীত দিক থেকে সাড়া না পেয়ে কুসুম হয়ত হতাশ হয়। অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ হয়। শশী কুসুমের এই তীব্র কামনার আগুনের তাপকে বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করে— "শরীর, তোমার মন নাই কুসুম?" এখানে শশীর মনের গহন কোনের আবেগ এক স্থায়ী রূপ নেয়, কিন্তু বিস্ময়কর ভাষার সাহায্যে ঔপন্যাসিক এখানে এক হিমশীতল পরিবেশের সৃষ্টি করেছে।

কুসুম তার শরীর-যৌবন-কামনা-বাসনা নিয়ে শশীকে আহ্বান করেছিল। শশী সেই আহ্বানের তাগিদ অনুভব করেনি বলেই সাড়া দেয়নি। ফলে অতৃপ্তির বেদনায়, অপ্রাপ্তির হতাশায় কুসুমের মনের উত্তাপ নষ্ট হয়ে যায়। তার জীবনে প্রাণের চাঞ্চল্য, কামনা-উন্মাদনার অপমৃত্যু ঘটে। তাই শশী কুসুমের হাত ধরে টানাটানি করলে কুসুম নিরাসক্ত ভাবে বলে— "কাকে ডাকছেন ছোটবাবু, কে যাবে আপনার সঙ্গে? কুসুম কি বেঁচে আছে? সে মরে গেছে।" এখানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ফ্রয়েডের মনোবিকলন তত্ত্বকে, ক্ষতের বেদনার মতন ছড়িয়ে দেবার ক্ষমতা দেখিয়েছেন। এই তত্ত্বকে সাহিত্যের রসদ করে তুলতে বলা যায় তিনিই শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক। অদ্ভুত নিরাসক্তভাবে তিনি এই উপন্যাসে মানুষের কাম-পিপাসার জান্তবমূর্তি অঙ্কন করলেন। তিনি দেখালেন, মানবমন যুক্তির দাসত্ব করে, না বরং অন্তবস্থিত যৌন চেতনার, অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণের অধীন। তবে অবৈধ প্রেমের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করার সচেতন প্রচেষ্টা তিনি করেন নি, তার রহস্য উন্মোচনের প্রতি-ই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন।

চ

সাধারণ ভাবে যে মূল কাহিনি ও শাখাকাহিনির সংমিশ্রনে একটি উপন্যাস কলেবর গঠিত হতে দেখা যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর পুতুল নাচের ইতিকথা (১৯৩৬) তার ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। কারণ, এখানে মূল আখ্যান বলে কোনো আখ্যান নেই, কেবলমাত্র বেশ কিছু শাখা উপ্যাখ্যান অভিনব ও স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে উপন্যাস কলেবরে স্থান পেয়েছে। উপন্যাসটির মূল কাহিনি না থাকলেও শশী নামে মূল চরিত্রটির চলমান জীবনপথে ও ব্যক্তিমনের ভাবনার বিভিন্ন স্তরে কুসুম নামক একটি নারী চরিত্র আত্মপ্রকাশ করেছে। তাই উপন্যাসটিতে শশী কুসুম সম্পর্কটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে।

উপন্যাসটিতে শশী চরিত্রের প্রতি ঔপন্যাসিকের গভীর মনোযোগ লক্ষ করা যায় বলে, শশীর স্বভাবের বিশেষ বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনার সূত্রেই কুসুম চরিত্রটিকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ মমতা দিয়ে এঁকেছেন। আর এই শশীর প্রতি কুসুমের প্রেমও শেষপর্যন্ত বিচ্ছেদ পরিণতির মধ্যে দিয়ে রচিত হয়েছে। কুসুমের পেলব ও

অনুভূতিশীল মনকে শশী বুঝে উঠতে পারে নি। কেননা, স্ববিরোধের মধ্যেই কুসুমের স্বাতন্ত্র্যতা, কল্পনা আর বাস্তবের সংঘাতে কুসুম বদলে যায়, আর এই কুসুমও যখন শশীকে বলে— "চিরদিন কি আর একরকম যায়। মানুষ কি লোহার গড়া, যে চিরকাল সে একরকম থাকবে, বদলাবে না?" তখন জীবনের প্রবাহমানতায় কুসুমের মনস্তত্ব ধরা পড়ে। তারপর, গাওদিয়া ছেড়ে স্বামী পরানকে নিয়ে কুসুম চলে যায়! অথচ এই কুসুমই একদিন শশীকে নিয়ে ঘর করার স্বপ্ন দেখত— "এমনই চাঁদনীরাতে আপনার সঙ্গে কোথাও চলে যেতে সাধ হয় ছোটবাবু।" কিংবা এমন ছিল যে— "স্পষ্ট করে ডাকা দূরে থাক, ইশারা করে ডাকলে ছুটে যেতাম।" আর সেই কুসুমই আজকে অনেক পরিবর্তনশীল। শশীর সঙ্গে কুসুমের যে সম্পর্ক একদা গাওদিয়া গ্রামে থাকাকালীন রচিত হয়েছিল, সেই কুসুমই যেন আজ হারিয়ে গেছে আর কুসুমের এই অমোঘ ট্র্যাজেডি উপলব্ধি করেই, এই বেঁচে মরে থাকার মতো ভাবনা শশীকে এক নতুন উপলব্ধির জগতে এনে দেয়।

উপন্যাসে কুসুমের ব্যক্তিসত্তার ইচ্ছা অনিচ্ছা, রাগ-ক্ষোভ-প্রেম-বেদনার অকপট আত্ম বিশ্লেষণ, প্রেমকে জীবনের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে যথার্থরূপে অঙ্কন করাই ছিল ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য; তাই তো কুসুম তার আবেগ-ইচ্ছা, যন্ত্রণা ও তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়েই শশীর সামনে বারংবার এসে দাঁড়িয়ে আরও স্পষ্ট করে, সে শশীকে তার ইচ্ছা ঘোষনা করে বলতে পেরেছে— "আপনার কাছে দাঁড়ালে আমার শরীর এমন করে কেন ছোটবাবু?" কুসুম তার সততা নিয়েই শশীর সঙ্গে দেহনির্ভর প্রেম কে স্বীকার করে নিয়েছে। তাই সে তার পরিবেশ, প্রকৃতি ও জীবনধারার সঙ্গে অঙ্গীভূত যন্ত্রণাময় শরীরী প্রেমকেই স্বীকার করেছে। বদলে পেয়েছে শশীর ঔদাসীন্য— "তুমিও রইলে, আমিও রইলাম।"— এই গতানুগতিক মনোভাব বছরের পর বছর ধরে কুসুমের প্রেমকে নিঃশেষ করে দিয়েছে, আর তাই কুসুম যখন শশীকে বলেছে যে, রক্তিম- জ্বলন্ত উত্তপ্ত পিন্ড (অবশ্যই লোহার) যেমন পরিবেশ-পরিস্থিতি ও দীর্ঘদিনের অবহেলায় শীতল হয়ে যায়। তেমনি শশীর প্রতি ও কুসুমের সম্পর্ক আজ ঝরে গেছে, তাই তো শশী অনুভব করেছে— "কুসুমকে আর কোনোদিন যে ভালোবাসতেই পারবে না, কষ্টে শশী ছট্‌ফট্ করে। ফুটিয়া ঝরিয়া গিয়াছে, কুসুম মরিয়া গিয়াছে, তারই চোখের সামনে, তারই অনমনস্ক মনের প্রান্তে।"

কুসুমের সঙ্গে শশীর এমন সম্পর্ক সৃষ্টি করেছেন ঔপন্যাসিক, যেখানে শশীর মনের আকাশে নীড়-প্রেম-সীমাহীন কল্পনার নারী হয়ে ধরা দেয়নি কুসুম, ধরা দিতে চায়ও নি। কেবল গাউদিয়ার মৃত্তিকা ঘনিষ্ঠ বাস্তবের ভূমিতেই সৃষ্ট এক স্বতন্ত্র্য চরিত্র, প্রেমপ্রতিমা কুসুম, তাই তার প্রতি শশী যখন মুগ্ধ হয়ে, কুসুমের অফুরন্ত জীবন শক্তিতে আকর্ষিত হয়ে ক্রমে ক্রমে গাউদিয়ার মাটিতে এক ভিন্ন আকর্ষণ রয়ে গেছে, তখন শশী কিন্তু নিজের চারিদিকে শিক্ষা সভ্যতার মোড়কটি সযত্নে বজায় রেখেছে। তাই সেই মোড়কে ফাটল ধরিয়ে পরিপূর্ণ আশ্রয় দেওয়ার সাহস, জীবনশক্তি ও সুতীব্র কামনা- রক্তিম প্রেম নিয়ে কুসুম শশীর জীবনে প্রবেশ করে, পরকীয়া প্রেমভাবনায় এক নতুন মাত্রা সৃষ্টি করেছে।

শশী ক্রমশই যখন কুসুমের সঙ্গে ঘনিষ্ট হয়ে পড়েছে, বুদ্ধিমতি কুসুমের নিখুঁত মনটার সন্ধান পেয়েছে, তখন শশীর কাছে নিজের ভালোবাসার অধিকার কায়েমি করার জন্যই অকপটে কুসুম স্বীকার করেছে, শশীর সাথে চাঁদনী রাতে হারিয়ে যাওয়ার ইপ্সিত মনোবাসনাটি। তাই আকারে, ইঙ্গিতে-ইশারায় রহস্যময়ী কুসুম, শশীকে ভালোবাসার টানে ভাসাতে চেয়েছে দীর্ঘ নয় বছর ধরে আর তাই শিক্ষিত শশী রোমান্টিক কল্পনা দিয়ে তখনও স্বপ্ন দেখেছে— "একদিন কেয়ারী করা ফুল বাগানের মাঝখানে বসানো লাল টাইলে ছাওয়া বাংলোয় শশী-খাঁচার মধ্যে কেনারি পাখির নাচ দেখিবে, দামী ব্লাউজে ঢাকা বুকখানা শশীর বুকের কাছে স্পন্দিত হইবে আলো-গান- হাসি- আনন্দ-আভিজাত্য কিসের অভাব তখন থাকিবে শশীর?" কুসুম-শশীর এই আভিজাত্য ঘেরা স্বপ্নটি নষ্ট করে দিয়ে বারংবার শশীকে বাস্তব মাটির, সজীব প্রেমে ভাসাতে চেয়েছে, শশীর কামনাকে মাতাল

করে দিয়েছে বলে শশী, কুসুমকে প্রশ্ন করেছে— "তোমার মন নাই কুসুম?" রহস্যময়ী শরীরী-প্রেমিকা কুসুম উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বারংবার শশীর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে সজীব কামনা নিয়ে আর তাই ভালোবাসার তীব্রতায় কুসুম অবৈধ অসামাজিক প্রেমের শর্ত ভুলে বারংবার ছুটে গেছে শশীর উষ্ণতা পেতে। তাই গ্রামের প্রান্তে তালবনে প্রেমের স্বর্গ রচনা করেছে অথচ শশী, কুসুমের মতো অসংকোচ- ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারে নি। নাগরিক জীবন থেকে অর্জিত রোমান্টিকতা, শিক্ষা, আভিজাত্য ও পরস্ত্রী, বিশেষত বন্ধু পরাণের প্রতি আনুগত্য ও মধ্যবিত্ত সংস্কারের বশবর্তী হয়ে। তাই একদিন শশী- কুসুমের সম্পর্ক ম্লান হয়ে গেছে, শশীর কাছে সংসারের সবাই 'পুতুল' মনে হয়েছে, কুসুমের তপ্ত কাঞ্চন, দীপ্ত প্রেম অনাদারে-অবহেলায় ফিকে হয়ে গেছে। ফলে, হঠাৎ-ই শশী উপলব্ধি করেছে, কুসুম তার জীবনে অনিবার্য হয়ে উঠেছে। কুসুমের চলে যাওয়ার মুহূর্তে তাই অসীম আকুলতায় সে শশীকে জানিয়েছে— "কাকে ডাকছেন ছোটবাবু, কে যাবে আপনার সঙ্গে? কুসুম কি বেঁচে আছে? সে মরে গেছে।" তাই শশী-কুসুমের সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত ইচ্ছা-অনিচ্ছায় আবদ্ধ না হয়ে বেঁচে রয়েছে। অনন্তর মেয়ে, পরানের বউ কুসুম সজীব প্রেম- ভলোবাসায় একদিন শশীকে ভাবিয়েছে কিন্তু জৈব-প্রেম শেষপর্যন্ত দুনির্বার বাসনায় পরিণত না হয়ে বিরহের কাজল দিঘির কমল হয়েই রয়েছে।

জৈব প্রেমে উজ্জ্বল প্রাণবন্ত হয়েও, কুসুম-শশীর সম্পর্ক অসার্থক হয়ে গেল আর তাই চিরকালের মত গাউদিয়া গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়াকে শ্রেয় মনে করে কুসুম, ভিনদেশী পুরুষের প্রতি লজ্জাতুর প্রেমকে উপবাসী রেখে চলে গেছে। শশী-কুসুমের সম্পর্ক তাই উপন্যাসে ভিন্ন স্বাদ এনে দিয়েছে।

ছ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চোখের বালি', 'চতুরঙ্গ' ইত্যাদি উপন্যাসের পর থেকে বাংলা উপন্যাসের নির্মাণ কৌশলগত দিক থেকে এক অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল, যেখানে কোনো নিরলস ঘটনা-বর্ণনার থেকে বিভিন্ন চরিত্রের জটিল মনস্তত্ত্বের ঘাত-প্রতিঘাত-এ গড়ে ওঠা আখ্যান বস্তুটিতে ঔপন্যাসিকের চিন্তা-চেতনার পাশাপাশি বিচিত্র প্রক্রিয়াও রূপ পেয়েছিল। এই কৌশলটি বিংশ শতাব্দীর তিনের দশকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দর রপ্ত করেছিলেন, তাঁর 'পুতুল নাচের ইতিকথা' ঔপন্যাসটিতে শশী-গোপাল অর্থাৎপুত্র ও পিতার মধ্যে সংঘাতকে উপলব্ধি করেই পাঠকমহল তা বুঝতে পারে।

উপন্যাসের গোপাল ও শশীর মধ্যে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক বর্তমান। এদের দুজনের মধ্যেই রয়েছে পরস্পর বিপরীত সত্তা। গোপালের মধ্যে রয়েছে নিজ গ্রামের মধ্যে আর্থিক ও সামাজিক দিক থেকে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার প্রবল বাসনা। পাশাপাশি রয়েছে পুত্রের প্রতি গভীর মমতাবোধ। পক্ষান্তরে, শশীর মধ্যে রয়েছে নিজ গ্রামের প্রতি ভালোবাসা এবং গ্রামীণ সমাজ- জীবনের সঙ্গে নিজের ব্যক্তি জীবনকে মিলিয়ে দেওয়ার আগ্রহ; এছাড়া উন্নত, শিক্ষিত, রুচিশীল ব্যক্তিমনের আলোকে গড়ে ওঠা একটি স্বপ্নের জগতে নিজেকে মেলে ধরার আকাঙ্ক্ষা। আসলে, তাদের উক্ত বিপরীতমুখি সত্তাগুলি গড়ে ওঠার প্রেক্ষিতে রয়েছে তাদের সামাজিক অবস্থানের, গোপাল হলেন আধুনিক সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় গড়ে ওঠা, গ্রামীণ পরিবেশে লালিত হওয়া প্রকৃত জোতদারের প্রতিনিধি। ফলে, তার মধ্যে যেমন রয়েছে গ্রাম্য স্থূল রুচি, তেমনি জোতদার সুলভ প্রবল সামাজিক প্রতাপ ও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখবার হীন প্রচেষ্ঠা। এর জন্য সে মহাজনী বা নারী-পাচার জাতীয় যে কোনো হীন ব্যবসাকে অবলম্বন করতে পারে অনায়াসে। আবার গৃহকর্তা হওয়ার দরুন তার মধ্যে রয়েছে প্রকট সাংসারিক কর্তৃত্ব, বৈষয়িক বুদ্ধি ও অপার পুত্রস্নেহ, এ রকম চারিত্রিক গুণসম্পন্ন গোপালের সংস্পর্শে বড় হয়েছে শশী! কিন্তু নিজের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই হোক বা সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্যই হোক, শশীকে গোপাল শহরে পাঠায় ডাক্তারি পড়বার জন্য। ফলে শহরের রুচি- শিক্ষা-সংস্কৃতির সংস্পর্শে এবং

কুমুদের মত ব্যক্তির সান্নিধ্যে গ্রাম্য শশী পরিণত হয়েছে পাশ্চাত্য শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ চিকিৎসকরুপে। তার চরিত্রে দেখা দিয়েছে খানা ডোবা, অশিক্ষা- কুরুচিতে পরিপূর্ণ গ্রাম্য জীবনের প্রতি বিক্ষোভ; গড়ে উঠেছে Intellectual Romance-এর পিপাসা, বৃহত্তর জীবনে নিজেকে মেলে ধরার বাসনা, এখান থেকে শশী-ও গোপালের মধ্যে সম্পর্ক চির ধরেছে, রচিত হয়েছে দুস্তর মানসিক ব্যবধান এবং চেতনার দ্বন্দ্ব। ঔপন্যাসিকের উপলব্ধিতে— "তর্ক ও মতান্তর, আদেশ ও অবাধ্যতার বিরোধ।"

উপন্যাসের তৃতীয় পরিচ্ছেদ থেকেই এই বিরোধ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শশী তার ডাক্তারি কর্তব্য পালনের জন্য অস্বচ্ছল শ্রদ্ধাভাজন, বসন্তরোগী সেনদিদিকে চিকিৎসা করেন। অন্য রোগীর 'কল' ছেড়ে নিঃস্বার্থভাবে সেনদিদিকে চিকিৎসা না করার জন্য শশীর উপর যে চাপ সৃষ্টি করে, তা মারাত্মক। এর প্রেক্ষিতে শুধু গোপালের আর্থিক লোভ-ই নয়, পুত্রের উপর নিজের কর্তৃত্বও বজায় রাখার বাসনা ছিল প্রবল; কিন্তু আধুনিক শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ, স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী শশী, পিতার এই নিষেধাজ্ঞা মেনে নিতে পারে নি। ফলে, গোপাল ক্ষুদ্ধ হয়ে ওঠে। পিতা পুত্রের বাক্যালাপ বন্ধ হয়ে যায়। আবার কথা বন্ধ হলেও শশীকে গোপালের ডাকতে ইচ্ছা করে কিংবা যামিনী, শশীকে নিন্দা করলে গোপাল সহ্য করতে পারে না। অর্থ্যাৎ শশীর প্রতি গোপালের অপার পুত্রস্নেহাতুর হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায় এই সকল ক্ষেত্রে।

বিন্দুকে কেন্দ্র করে পিতা-পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় সংঘাত সৃষ্টি হয়। বৈষয়িক কূটকৌশলী গোপাল ধনী ব্যবসায়ী নন্দর সঙ্গে বিন্দুর বিয়ে দেয়। শশী, নন্দের ঘেরাটোপে বিন্দুকে দেখতে পারে না, তাই বিন্দুকে মুক্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে গ্রামে ফিরিয়ে আনে। এ ঘটনায় গোপাল ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, কিন্তু এখানেও গোপালের পুত্রস্নেহের পরিচয় পাওয়া যায়— "ছেলের সঙ্গে এরকম মতান্তর গোপালের বাৎসল্যের জগতে মন্বন্তরের সমান বড় কষ্ট হয়।" পিতাপুত্রের তৃতীয় সংঘাত শুরু হয় যাদবের হাসপাতাল গড়ার টাকাকে কেন্দ্র করে। অর্থলোভী, গোপাল ঐ দায়িত্ব নিজের হাতে নিতে চেয়েছে। আদর্শবান শশী এই টাকাকে পিতার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ঝগড়া পর্যন্ত করেছে। এই ভাবে পিতাপুত্রের সংঘাত একদিকে যেমন উপন্যাসের কাহিনীকে মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে, তেমনি গতি সঞ্চার করে পিতাপুত্রের জটিল সম্পর্ককে পাঠকসমক্ষে এনে দিয়েছে।

সেনদিদি বৃদ্ধ বয়সে সন্তান প্রসব করলে, উৎকট হয়ে পড়ে গোপালের গ্রাম্যরুচি, যে রুচির বিকার থেকে শশী নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য কুসুমের কামনাকে শেষপর্যন্ত উপেক্ষা করেছে, সেই রুচির বিকার গোপালের মধ্যে স্পষ্ট হওয়ায়, তার মনে দেখা দিয়েছে গোপালের প্রতি প্রবল ঘৃনা। এ কারণেই মরণাপন্ন সেনদিদির সন্তান প্রসবকালে শশী প্রথম দিকে ঘরে বসে থেকেছে, এখানে তার চিকিৎসকের কর্তব্য কিছুটা উপেক্ষিত, সেনদিদির জন্য গোপালের ব্যাকুলতার মধ্যে উৎকট নির্লজ্জতা দেখে শশী মনে মনে পিতাকে ধিক্কার জানিয়েছে। এমন কি সেনদিদির সন্তানকে তার সামনে আনলে ক্ষোভে ও ঘৃণায় খাবার ছেড়ে উঠে গেছে। পাশাপাশি পুত্রের কাছে নিজের ব্যাভিচার, অসংসম স্পষ্ট হওয়ায় গোপালের মধ্যে পুত্রের কাছে যে নিদারুণ সংকোচ দেখা দিয়েছে, তা পুত্রের প্রতি তার ভালোবাসাকেই স্পষ্ট করেছে। গোপালের এখানে স্পষ্টতর পুত্রের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছেন। এমন কি সংকুচিত হৃদয়ে পুত্রের শারীরিক খোঁজ খবর নিয়েছেন। এদিকে পিতার অর্থনৈতিক আচরণে জর্জরিত শশীর মনের গহনে লালিত বৃহত্তর জীবনের প্রতি মোহটিকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। সে গ্রাম ছাড়ার স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে আর শশীর এই সিদ্ধান্তে গোপালের মনে সৃষ্টি হয়েছে মরুভূমি তুল্য এক শূন্যতা, রিক্ততা, পুত্রের কাছে থাকার জন্য, তাকে কাছে পাওয়ার জন্য গুরুদেবের শরণাপন্ন হয়। শশীর পরিবর্তিত ডাক্তার অমূল্যকে বিদায় দিতে চায়। এমন কি অবৈধ সন্তানটিকে কুন্দর সঙ্গে পাঠিয়ে শশীকে গ্রামে আটকে রাখতে চায়, কিন্তু তাতেও সফল না হলে, অবশেষে নিজেই গ্রাম থেকে বিদায় নেয়। বিদায় কালে পিতাপুত্রের এত দিনের সংঘাত যেন এক অপার্থিব মহিমায় দূর হয়ে যায়, ফিরে আসে পিতাপুত্রে স্নেহ-

ভালোবাসার সম্পর্কটি— "গোপালকে শশী প্রণাম করিল। সকালবেলায় স্বচ্ছ আলোয় দুজনার মুখ দেখিয়া মনে হইল না কোনদিন সামান্য বিষয়ে মতান্তর ছিল। জীবনে গতি দুজনের বিপরীতধর্মী।"— এভাবে প্রীতি পূর্ণ পরিবেশে গোপালের বিদায়ের মধ্যে দিয়ে তাদের দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্বমুখর সম্পর্কটির অবসান ঘটল।

উপন্যাসের প্রায় সর্ব অংশে, বিক্ষিপ্ত পরিসরে এই দ্বন্দ্বমুখর উপখ্যানটির মধ্যে দিয়ে পাঠক অনুভব করেছে, সমকালের সংকীর্ণতা ও প্রগতিশীলতায় গড়া মধ্যবিত্ত সমাজের বাস্তবরূপ, সেখানে শশীর মত প্রগতিশীল ব্যক্তি কিংবা গোপালের মত সংকীর্ণ বৈষয়িক পুরুষ- কেউই নিজের মনের মতন করে, ঋজুগতিতে জীবনপথকে গড়তে পারে না বা চলতে পারে না, পারস্পরিক আঘাতে একে অপরের চলার পথে হয়ে ওঠে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। শশী যেমন স্বপ্নের জগতে নিজের শেষপর্যন্ত গোপালের জন্যই মেলে ধরতে পারে নি– একথা নিশ্চিত। তবে একথাও সঠিক যে, সামাজিক কারনে দ্বন্দ্ব যতই পিতাপুত্রের মধ্যে মানসিক সংঘাত ঘটাক না কেন, রক্তের টান বা স্নেহের টান কিন্তু চিরন্তন বা শাশ্বত! এই রক্তের টানই একটি সূক্ষ্ম অথচ গভীর সংযোগের সেতু নির্মাণ করেছে পিতাপুত্রের মধ্যে গোপালের মধ্যে যে স্পষ্ট পুত্রস্নেহ এবং বিক্ষুব্ধ শশীর যে গভীর পিতৃভক্তি উপন্যাসের শেষপর্যায়ে লভ্য হয়ে উঠলো, তাতে চিরন্তন পিতা-পুত্রের জাগতিক সম্পর্কটিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। অথ্যাৎ এই সত্যটিকেই উপলব্ধি করায় যে, স্নেহের কাছে সবকিছুই পরাস্ত হয়।

জ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালজয়ী উপন্যাস 'পুতুল নাচের ইতিকথা'-য় (১৯৩৬) শশী নামক মূল চরিত্রের চলমান জীবনপথে এবং ব্যক্তিভাবনার বিভিন্ন স্তর উন্মোচনের মধ্যে দিয়ে, আখ্যান কে একটি নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে নিয়ে গেছেন লেখক; যেখানে শশীর জীবনপটে একাধিক চরিত্র- ঘটনা, কার্যকারণ সম্পর্ক সুত্রে নিবদ্ধ হয়ে উপন্যাসটিকে অভিনবত্ব ও স্বাতন্ত্র্যতা দান করেছে। মতি-কুমুদ এরকমই দুই চরিত্র, যাদের সম্পর্কের টানাপোড়েনের ইতিকথা, তাদের চরিত্র বিশ্লেষণ, একাধিক দৃষ্টিকোণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসে স্থাপন করেছেন পরিবেশ সৃজনের ক্ষেত্রে, আবার মূল চরিত্র- কাহিনির জীবনপট থেকে যথাসময়ে বিদায় দিয়েও পাঠকের আকর্ষণকে দৃঢ়বদ্ধ করেছেন। তাই উপন্যাস অবয়বে মতি- কুমুদ সম্পর্কটি তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে।

কুমুদ ছিল শশীর কলকাতার কলেজ জীবনের বন্ধু, নাগরিক সভ্যতার প্রতিভূ; তার খাম খেয়ালী- স্বভাব, চরিত্রের উদ্দামতা, শেলী-বায়রন- হুইটম্যানের রোমান্টিক পিপাসা, ব্যক্তিত্বের চটুলতা, শশীকে শুধু অভিভূত-ই করেনি, সেই সঙ্গে তার মানসিকতারও মননের মধ্যে জাগিয়েছিল Intellectual রোমান্সের বাসনাও, পক্ষান্তরে, গাওদিয়ে গ্রামের সরল-সহজ বালিকা মতির প্রতি ছিল শশীর স্নেহমিশ্রিত ভালোবাসা ও গভীর মমতা, হারুঘোষের বাড়ির সঙ্গে শশীর ঘনিষ্ঠতার অন্যতম কারণও হয়ত বা মতি; শশীর মনকে প্রভাবিত করা, এই দুই নরনারীর (কুমুদ- মতি) সাক্ষাৎ ঘটল উপন্যাসের চতুর্থ পরিচ্ছেদে।

প্রথমে পূজা উপলক্ষে যাত্রা করতে আসা কুমুদ মনকে হালকা করতে শশীর বাড়ি থেকে হারু ঘোষের বাড়ির পিছনে তালপুকুরের ধারে হাজির হলে, হঠাৎ সাপের কামড় খেয়ে সে চিৎকার করে ওঠে আতঙ্কে; চিৎকার শুনে ছুটে আসে মতি, ঘটল তাদের প্রত্যক্ষে পরিচয়। যদিও এই, পরিচয়ে পারস্পরিক কোন আকর্ষণ-ই ব্যক্ত হয় নি, কিন্তু এখান থেকেই সম্পর্ক সৃষ্টির একটা ক্ষেত্র তৈরি হয়ে গেছিল। তাই দেখা যায়, যাত্রার আসরে নবপরিচিত কুমুদকে প্রবীর বেশে দেখে মতি কেমন বিস্ময় মুগ্ধ হয়ে যায়। রাজপুত্র প্রবীরের প্রেমাভিনয় দেখে মতির বিস্ময়মুগ্ধ মনে দেখা দেয় চঞ্চলতা আর এই অবস্থায় কুমুদ যখন মতির মনের গহনে অচিরেই স্থান করে দেন, তখন অবচেতনেই মতি কুমুদকে ভালোবেসে ফেলে। তাই কুমুদ যখন পরিহাস করে বলে— "যেন তোর সঙ্গেই করছে,— না?" তখন— "মতির বুকের ভিতর শিরশির করে"— বোঝা যায় রাজপুতবেশী

কুমুদের প্রতি মতির মনে একটা প্রচ্ছন্ন অনুরাগ গড়ে উঠেছে।

পরের দিন এই সুপ্ত অনুরাগ স্পষ্ট হওয়ার মতন পরিবেশ গড়ে ওঠে, মতি তালপুকুরের ধারে হারানো মাকড়ি খুঁজতে এলে। এখানে তাদের দ্বিতীয় সাক্ষাৎ— "উভয় পক্ষই কৃতার্থ হইয়া গেল।" মতি মাকড়ির পরিবর্তে পেল কুমুদকে। কুমুদও মতির প্রতি অনুভব করল গভীর অনুরাগ। যে অনুরাগ বশতঃ তিনি মতিতে মাকড়ি কিনে দিতে চায় আবার— "মতির মনে হয় মাকড়ি কেনার আগে প্রবীর তাহাকেই কিনিয়া ফেলিয়াছে।" মাকড়ি কিনে দেওয়াকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে পুনরায় সাক্ষাৎ ঘটেছে। এখানেই নির্জন দুপুরে তালপুকুরের ধারে, রোমান্টিক পরিবেশে তাদের ভালোবাসা আরও নিবিড় হয়েছে, এখানে আমরা দেখতে পাই মতির ভালোবাসাকে উপভোগ করার জন্য ব্যাকুল কুমুদকে, তাই সে মতির কাজে জানতে চায়— "আমি মরে গেলে তুমি কি করতে?" আর এই উত্তরে মতি যখন বলে— "কি জানি কি করতাম।" কিংবা "দুর! মরার কথা বলতে নেই।"— তখন আমরা মতির আদর্শ প্রেমিকা হৃদয়ের লজ্জা ও ভালোবাসার দ্বৈত প্রকাশটিকে অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করি, এর পর কুমুদ চলে যাওয়ার দেখা গেছে মতি বিচ্ছেদ যন্ত্রনায় কাতর হয়েছে। তাই সে বারংবার শশীর কাছে খবর চায়। এমনকি তাকে দেখবার জন্য কলকাতা পর্যন্ত হাজির হয়।

কুমুদও মতিকে ছেড়ে বেশি দিন থাকতে পারে না। ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে আমরা দেখি। কুমুদ পুনরায় গাওদিয়ায় হাজির হয়েছে। তার বিরহ ব্যাকুল চেহারায় ঘটেছে আমূল পরিবর্তন— "এবার সে যে বহুদিন আগেকার মত কবি ও ভাবক হইয়া উঠিয়াছে..... কি যেন সে ভাব। কী এক রসালো ভাবনা। চোখের দৃষ্টি তাহার হইয়া আসে উৎসুক এবং একান্ত বেমানানভাবে সেই সঙ্গে মুখে ফুটিয়া থাকে গভীর সন্তোষ।" কুমুদের চেহারায় এই আমূল পরিবর্তনের বাস্তব কারণ সকলের সামনে উদঘাটিল হলে ঘটেছে মতি-কুমুদের বিবাহ। পরিণতিতে লাভ করেছে তাদের প্রেম এরপর উপন্যাসের দশম ও একাদশ পব জুড়ে তাদের দাম্পত্য জীবন পর্ব ব্যক্ত হয়েছে।

মনের মতন স্বামী পেয়ে মতির হৃদয়ে দেখা দিয়েছে উৎফুল্লতা। সে উৎফুল্ল মনে পূর্ব পরিচিত কলকাতাকে দেখে অবাক হওয়ার ভান করে স্বামীকে খুশী করে। স্বামীর ভালোবাসায় আপ্লুত হয়ে যায়। তার শারীরিক সান্নিধ্যে তৃপ্তি লাভ করে, আবার কখনও জয়া- কুমুদের হৃদ্যতা উপলব্ধি করে ইর্ষান্বিত হয়। এক কথায় এই পর্বে তার সারাৎসার উপলব্ধি হল— "আমি ওর কতজন্মের বউ জানো?" অন্যদিকে, কুমুদ নিজের সৃষ্টিছাড়া জীবনপ্রবাহের সঙ্গে মতির জীবনস্রোতকে মিশিয়ে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে সার্থকভাবে সম্পূর্ণ করতে পেরেছিল। মতি তার মনের মতন করে পড়ে উঠেছে। তাই দেখা গেছে, উপন্যাসের শেষে মতি কূট- কৌশলে সকলকে ফাঁকি দিয়ে ট্রেনের কামরায় কুমুদের সঙ্গে অনিশ্চিত জীবনকে পাথেয় করে নেয় এবং শেষে গাওদিয়া গ্রামের তালপুকুরের ধার থেকে হাওড়া স্টেশনের রেল কামরা পর্যন্ত একটি সংক্ষিপ্ত উপখ্যানের "ইতি" ঘটে।

বলা বাহুল্য, উপন্যাসটি নিঃসন্দেহে উপভোগ্য, কিন্তু পাঠকমনে কৌতুহল জাগে, উপন্যাসে এই কাহিনির সার্থকতা সম্পর্কে। আসলে, উপন্যাসটি আপাত বিচ্ছিন্ন মনে হলেও আমর গভীর পর্যবেক্ষণ জনিত উপলব্ধির নিরিখে দেখতে পাই, উপন্যাসে মূল প্রতিপাদ্য শশীর ব্যক্তিভাবনার সঙ্গে কাহিনিটি বিচ্ছিন্ন নয়। অথ্যাৎ শশীর intellectual রোমান্স পিপাসা, যে কুমুদকে ও তার উপলব্ধিকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল, সেই কুমুদকেই যখন তিনি গাওদিয়া গ্রামে এসে যাত্রা করতে ও মতির মতন গেঁয়ো মেয়েকে বিবাহ করতে দেখে, তখনতার রোমান্টিক ভাবনা কিঞ্চিত আঘাত প্রাপ্ত হয়; মনে হয়, সেই রোমান্স, পিপাসা— "চায়ের ধোঁয়ার মত, জলীয় বাষ্প ছাড়া আর কিছু নয়।" এই ভাবনা থেকেই শশীর গ্রাম-মমত্বটি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে— বলা যায়। আবার কুসুমের মতো না হলেও মতির প্রতি শশীর একটা প্রচ্ছন্ন ভালোবাসার একটা সুপ্ত কামনা ছিল, কুসুমের ঈর্ষা এই সত্যতা প্রমাণ করে, তাই বলা যায়, শশী-মতি কুমুদ মিলে উপন্যাসের একটি জটিল ত্রিকোণ প্রেম সম্পর্ক সৃষ্টির প্রেক্ষিতে উক্ত উপন্যাসটি স্পষ্ট ভূমিকা নিয়েছে। পরিশেষে বলা যায়, উপন্যাসটি প্রতিটি চরিত্রের

জীবন-ব্যর্থতার উপলব্ধিতে ভরপুর, সেক্ষেত্রে মতি-কুমুদ এর সার্থক প্রেমকাহিনিটি জীবনের ইতিবাচক দিকটি প্রকাশে গৌরবান্বিত হয়ে উঠেছে। সুতরাং সবদিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণে মতি-কুমুদ সম্পর্কের ইতিকথাটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্প কুশলতার পরিচায়ক।

ঝ

কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (জন্ম ১৮৭৬ এর ১৫ই সেপ্টম্বর- ১৯৩৮ এর ১৬ ই জানুয়ারী) সাহিত্যপথের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮ এর ১৯শে মে জন্ম- ১৯৫৬ এর ৩রা ডিসেম্বর) এর সাহিত্য ভাবনায়, শরৎচন্দ্রের চিন্তা-চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গী দুলর্ভ-প্রভাবমুক্ত। সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট পথে হাঁটেন নি, এক পৃথক দৃষ্টিকোণে সমকালীনতা, মধ্যবিত্তের অস্তিত্বের সংকট মানিকের সাহিত্যে বারংবার উঠে এসেছে। পক্ষান্তরে, অন্তরের অনুভূতিতে স্পর্শ করে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে রূপ পেয়েছে অধঃপতিত, অসহায়, লাঞ্চিত মানুষের দল এবং অন্তঃপুরের নারীরা— 'মেজদিদি', 'অরক্ষণীয়া', 'বিরাজ বৌ', 'চরিত্রহীন', 'দত্তা', 'দেনাপাওনা', ইত্যাদি ছোটগল্প উপন্যাসে তার প্রমাণ মেলে; যেখানে তথাকথিত কায়েমি স্বার্থ বিরোধিতা দেখান হয়েছে সমাজের- ব্যক্তিমনের মূল্যবোধের বিপরীতে। মানবদরদি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্প উপন্যাসে নিপীড়িত নরনারীর প্রতি লেখকের মমত্ববোধ সহানুভূতিশীলতা অত্যন্ত স্পষ্ট। বিপরীতে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রগতি লেখকসংঘ ও আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন, তাই আত্মসচেতনবিদ, বিজ্ঞানের ছাত্র মানিক কখনই লালিত সৌন্দর্যবোধ ও মন্ত্রমুগ্ধ সৌন্দর্যের আরাধনা করেন নি তার সাহিত্যে; উপরন্তু জীবন যুদ্ধে ইতিবাচক দিকের পাশাপাশি নেতিবাচক মূল্যবোধ, বাস্তবতাবোধ, যুক্তিবাদী ভাবাবেগ তাঁর সাহিত্য সম্ভার কে সম্পৃক্ত করেছেন, 'কল্লোল' পত্রিকার মাধ্যমে প্রগতিশীল জীবন চেতনায় স্নাত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রগতিশীল সাহিত্যে তাই ধরা পড়েছে সমাজের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ, মার্কসবাদ, মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড, ইয়ং, এড্‌গার প্রমুখের মনোবিকলন তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ- যা থেকে জন্ম নিয়েছে মানুষ- জীবনের প্রতি অদম্য ভালোবাসা, এই ভালোবাসাই আবার দরদী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের সাহিত্য ভান্ডারের প্রাণ। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে থেকে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সমাজের দুঃখ-দুর্দশা, অর্থনৈতিক সামাজিক মূল্যবোধের ভাঙ্গনে, তথা সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অবক্ষয়-ই যেন ভালোবাসার মোড়কে শরৎসাহিত্যে উঠে এসেছে। তাই কোথায় যেন উভয় কথাশিল্পীর মননবোধ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে; চরিত্রভাবনায় ঐক্যতা সূচিত হয়েছে অজান্তেই।

স্রষ্টার ব্যক্তিগত জীবন যেমন সাহিত্য সৃষ্টির সহায়ক, তেমনি পারিপার্শ্বিক সমাজ ও সাহিত্যে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে— একথা অনস্বীকার্য, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উভয় শিল্পীর জীবনবেদ-দর্শন, ভিন্ন, তাই ভিন্ন চিন্তাধারায় 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের নায়ক রমেশ এবং 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র শশী আবর্তিত; তবু তুল্য-মূল্য বিচার বিশ্লেষণে উভয় চরিত্রই যেন পল্লীসমাজ জীবনের হীন বেড়াজালে নিজেদের আবদ্ধ করে, গ্রামের বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষকে ন্যায়ধর্ম ও মনুষ্যত্বের পথ দেখাতে চেয়েছে। সমাজে বহুদিনের লালিত, পুঞ্জিভূত ঈর্ষা- সঙ্কীর্ণতা-স্বার্থ পরতার মাঝে প্রাণরসের চেতনা নিয়ে এসেছে। যদিও উভয়েই শেষপর্যন্ত নারীমনের উষ্ণ রিক্ত ভালোবাসায় পরিপূর্ণ হতে পারে নি, বেদনা বিক্ষোভের অরুণরাগে উভয়ের নিঃসীম ভালোবাসা স্বপ্ন বাস্তবতার আঘাতে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে, ব্যর্থ হয়ে গেছে গ্রামীন জীবনে আদর্শ প্রতিষ্ঠার ইতিকথা, তবুও জীবন অন্বেষণের পথ বেয়ে রমেশ- শশীর স্বপ্ন সার্থক বলা চলে।

'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের নায়ক রমেশ, পেশায় শিক্ষক, জ্ঞান-প্রজ্ঞার আলোকে কুঁয়াপুর গ্রামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে প্রবেশ করেছে উপন্যাসের সূচনায়। আদর্শকে হাতিয়ার করে ন্যায়ের ও সত্যের পথে পল্লীসমাজের নীচতা-দীনতা দূর করতে এসেছে, 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসের নায়ক শশী, পেশায়

ডাক্তার, সংস্কার পূর্ণ গাওদিয়া গ্রামকে ভালোবাসার-আত্মমমতায় বেঁধে ফেলে অচিরেই গ্রামের অতি সাধারণ মানুষগুলিকে আপন করে নিয়ে লড়াই করেছে নিজের মনের সঙ্গে, পিতার ভাবনার সঙ্গে, অর্থাৎ উভয় চরিত্র-ই— রমেশ ও শশী গ্রামীণ সমাজের মঙ্গলকামনার মধ্যে দিয়ে যাত্রা সুচনা করেছে। এদের মধ্যে রমেশ অন্যায়-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে কারাবরণ করলেও সমাজ সংস্কারে নিরুৎসাহ মনোভাব কখনই পোষণ করেনি, উপরন্তু বিচিত্র অবিজ্ঞতা লব্ধ রমেশের মন আরও দঢ়প্রত্যয়ী হয়েছে কুঁয়াপুর গ্রামে উন্নতি প্রতিষ্ঠায় পক্ষান্তরে, শশী চরিত্রটির মূল আদর্শ-ভাবনা-চিন্তা- চেতনা উপন্যাসের সূচনায় কখনই গাওদিয়া। গ্রামকেন্দ্রিক ছিল না। দীর্ঘদিন বসবাসের পর ও একাধিক মানুষের সান্নিধ্যে আসার পর শশীর মনোলোকে গ্রাম সম্পর্কিত ভাবনা চিন্তা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। সাধারণ মধ্যবিত্তের দ্বন্দ্ব জটিল মানসিকতার প্রতিভূ শশী চরিত্রটি; তাই স্বপ্ন ও বাস্তবের দ্বন্দ্ব সর্বদাই সমান্তরালে তার মনোলোকে ক্রিয়াশীল, গাওদিয়ার মানুষজনের প্রতি অদম্য টান-ই পরাজয়ের গ্লানি-ই শেষ পর্যন্ত তাকে এই গ্রামে চিকিৎসক রূপে থেকে যেতে সাহায্য করেছে। তাই আপাতভাবে উভয় চরিত্রের ভাবনা-চিন্তা পৃথক হলেও, নীতিজ্ঞান ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার দিক দিয়ে, বিপন্ন মানুষগুলির পাশে দাঁড়িয়ে, তাদের জন্য ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনটাকে উৎসর্গ করতে কখনই পিছপা হয়নি উভয়ই— এখানে দুটি চরিত্রের মধ্যে নিঃসন্দেহে সাদৃশ্য রয়েছে।

কুঁয়াপুর ও গাওদিয়া পৃথক গ্রাম হলেও, উভয়গ্রামেরই জীবন বেদ অভিন্ন। 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে রমেশের দৃষ্টিকোণে কুঁয়াপুর ও 'পুতুল নাচের ইতিকথা'-য় শশীর দৃষ্টিতে গাওদিয়ার প্রকৃতি, অর্থনৈতিক বিপন্নতা, নিরন্ন-অসহায় মানুষগুলির দৈন্যতা বড়ই স্পষ্ট-অভিন্ন। রমেশ পিতৃশ্রাদ্ধের দিন গ্রাম্য সমজপতিদের কুসংস্কার বদ্ধ হীন স্বার্থান্বেষী মনোভাবের পরিচয় পেয়ে, গ্রামের বিষাক্ত সংকীর্ণতাকে অচিরেই চিনে ফেলেছে। পরশ্রীকাতরতা ও ধর্মীয় বেড়াজালে ঘেরা গ্রামে বড় হয়ে উঠেছে হতভাগ্য মানুষগুলির বিবর্ণ ইতিকথা। রমেশের উপলব্ধিতে ধরা পড়েছে জাতিভেদ ও সামন্ততন্ত্রের গোষ্ঠীকেন্দ্রিক নীচ মনোভাব। তবু ও এই জরাজীর্ণতার মধ্যে থেকেও রমেশ তার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। গ্রামেরই বেনীঘোষাল, ধর্মদাস, গোবিন্দ গাঙ্গুলী, দীনু ভট্টাচার্য, বাঁড়ুয্যে মশাই প্রমুখের কাছ থেকে ভর্ৎসনা, নিরুৎসাহ, নিমর্মতা পেয়েছে! তবুও অশিক্ষায় পরিপূর্ণ গ্রামকে জ্ঞানের আলোকে প্রজ্জ্বলিত করতে চেয়েছে। বিদ্যায়তনের জন্য তার অন্তরের অনুরাগে কল্যাণবোধ, জাতিধর্ম নির্বিশেষে মনুষ্যত্ববোধের প্রতিষ্ঠা, থেমে থাকেনি। পক্ষান্তরে, আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন নিয়ে গ্রামে প্রবেশের মুহূর্তেই হারুঘোষের, প্রকৃতির রোষে মৃত্যু যেন শশীর মনোলোকে প্রশ্নচিহ্ন জাগিয়ে তুলেছে। পিতা গোপালের পিতৃসত্তা সম্পর্কে বিরোধ জন্মেছে। তাই পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে, নিজের আদর্শকে কর্তব্যকে অবহেলা করতে পারেনি। সেনদিদির চিকিৎসা করতে গিয়ে যমের সঙ্গে নিয়ত সংগ্রাম করেছে, যামিনী ও পিতার সঙ্গে ও এ নিয়ে বিরোধ জন্মেছে, তবু গাউদিয়া গ্রামের বিপন্ন মানুষগুলিকে রোগমুক্ত করতে চিরজীবনের মতন গ্রামেই থেকে গেছে শশী। প্রবল আত্মমর্যাদা বোধ ও আত্মসমালোচনায় প্রখর চরিত্রটি। রমেশের মতই কুসংস্কারের বিপরীতে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠায় তৎপর।

রমেশ ও শশী উভয়েই পরাজিত মানবাত্মা; রমেশ, বাল্যজীবনের সাথী ও বিধবা রমার কাছ থেকেও পরিণত ভালোবাসার পরিবর্তে নিষ্ঠুরতাই পেয়েছে, রমার কায়েমী স্বার্থপর মনোভাব তাকে অন্তরে বিদ্ধ করেছে, অথচ হিন্দু সমাজাদর্শ থেকে রমেশ বিচ্যুত হয়নি। জটিল ও দুরধিগম্য সম্পর্ক যেন ফল্গু স্রোতের মতই রমা রমেশের সম্পর্কের মধ্যে রয়ে গেছে। রমা, রমেশকে ভালোবেসে কখনই সামাজিক ও বৈষায়িক জটিলতা থেকে উর্দ্ধে উঠতে পারে নি, বিবেক-অন্তর্দ্বন্দ্ব-সন্দেহ-অনুযোগ এ উপন্যাসে যেন রমার প্রাণসত্তার প্রতিবিম্ব। রমার অন্তরের দ্বিবিধ সত্তা বর্তমান। একদিকে জমিদার গৃহে অজন্ম প্রতিপালিত কন্যা-ভগিনী, অপর দিকে শাশ্বত নারী হৃদয়ের আবেগমথিত সত্তা। একদিকে বৈষয়িক স্বার্থপর মনোভাব, ভ্রাতার প্রতি দ্বায়িত্ববোধ; অপরদিকে

রমেশের সত্যাদর্শ, কল্যাণবোধের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা। এই দ্বিবিধ মনোলোকের আলোড়নে আবার রমেশের অন্তর দ্বিধাবিভক্ত। একদিকে পল্লীগ্রামের নিষ্ঠুর-নীচ সমাজের সঙ্গে প্রতিনিয়ত আন্দোলনে রমেশ ন্যায় প্রতিষ্ঠার তৎপর; অপরদিকে রমার আপাত মনোভাব রমেশকে ভাবিয়ে তুলেছে। অথচ এই রমাই, রমেশকে তারকেশ্বরের একটি দিনে যত্ন করে খাইয়াছে। দীপশিখা, নিষিদ্ধ ও সমাজগর্হিত ভেবে একাকী হৃদয়মধ্যে লালিত করেছে আজীবন। পক্ষান্তরে, 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসে শশীর নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গী হয়েছে হারুঘোষের পুত্রবধু, বাল্যবন্ধু পরাণের স্ত্রী-কুসুম এবং হারু ঘোষের অসুস্থ কন্যা মতি, কল্পনা পিপাসু শশীর একদা মনে হত— "একদিন কেয়ারী করা ফুলবাগানে মাঝখানে বসানো লাল টাইলে ছাওয়া বাংলোয় শশী খাঁচার মধ্যে কেনারি পাখির নাচ দেখিবে।" এবং তার স্ত্রী আভিজাত্যের মোড়কে আবৃত হয়ে— "দামী ব্লাউজে ঢাকা বুকখানা শশীর বুকের কাছে স্পন্দিত হইবে," অর্থাৎ গ্রামে আসার পূর্বে বা আসার ঠিক পরই শশী অবচেতনে স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষাকে তীব্রভাবে লালিত করেছে, কুসুম জৈবিক প্রবণতায় ও অনাবৃত প্রেমের প্রকাশ নিয়ে শশীর প্রতি আকর্ষিত হয়েছে, অথচ সমাজের সংস্কার, নীতিবোধ, শিক্ষাকে ছাপিয়ে প্রথম দিকে শশী কুসুমের দেহনির্ভর প্রেমকে প্রশ্রয় দেয়নি, তাকে সান্নিধ্যে পেয়েও দূরে সরিয়ে মহান হওয়ার বাসনা করেছে। অথচ যখন পরবর্তী ক্ষেত্রে শশী একাকী নিঃসঙ্গ হয়েছে, কুসুমের উষ্ণ সাহচার্য পেতে উন্মুখ, তখনই কুসুম, শশীর থেকে দূরে সরে গেছে। আবার, মতির চোখ দিয়েই যেন গাউদিয়া গ্রাম প্রকৃতিকে শশী ভালোবেসেছে এবং শশীর-ই মধ্যস্থতায়, তার কলকাতার বন্ধু কুমুদের সঙ্গে মতির বিবাহের ব্যবস্থা ও হয়েছে। তবে কুসুমের নারী হৃদয়ের ভালোবাসাকে শশী উপেক্ষা করতে যেমন পারেনি, তেমনি শশীর অপারগতায় কুসুম শশীর জীবনকে শূন্য-রিক্ত করে দিয়ে চলে গেছে।

রমেশ ও শশীর জীবনের পরিণতি ও সামঞ্জস্য পূর্ণ— উভয়ের জীবনের ট্র্যাজিডি মর্মান্তিক। উপন্যাসের পরিণতিতে, রমা, রমেশকে গ্রাম্য ত্যাগ করে, আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে অন্যত্র যাওয়ার জন্য মিনতি করেছে। ভাগ্য বিড়ম্বিতা রমার জীবনে রমেশের ভালোবাসা, শ্রদ্ধার সঙ্গে গোপনে লালিত হয়েছে। তার বৈধব্যজীবনে কাঙ্ক্ষিত রমেশ চিরকালই ট্র্যাজেডির নায়করূপে রয়ে গেছে। তাই গ্রামের সমস্ত অপযশ নিন্দা মাথায় নিয়ে, দুর্ভাগ্যকে সঙ্গী করে ভালোবাসার প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য রমা দূর তীর্থস্থানে যাত্রা করেছে, আর রমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধানুরাগে রঞ্জিত রমেশের স্বপ্ন চূর্ণ হয়ে গেছে। রমেশ সীমাবদ্ধ গ্রামের সংস্কার-শোষণ-অর্থনৈতিক বিপন্নতা-দূর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে, শেষ পর্যন্ত নিজের জীবনে ট্র্যাজেডি নিয়ে এসেছে। পক্ষান্তরে, 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসে দেখা যায়, শশী ক্রমশই অন্তর্দ্বন্দ্বে ও পিতা গোপালের ভাবনার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করতে ট্র্যাজেডির পথে এগিয়ে গেছে, সম্পর্কের দ্বন্দ্ব বারংবার শশীর স্বপ্নকে আঘাত করে বাস্তবের রূঢ়ভূমিতে নিয়ে এসেছে। একদিকে মতি-কুমুদের বোহিমিয়ান জীবনতৃষ্ণা, বিন্দুর উৎশৃঙ্খল জীবনোপভোগ শশীর মানসিকতাকে সাহসী করে তোলার প্রাক্কালেই কুসুম গাউদিয়া ছেড়ে চলে যাওয়ার নিশ্চত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। শশীর হৃদয়ের প্রেমকে উজ্জীবিত করে, শশীকে নিঃসঙ্গ, রিক্ত-শূন্য ট্র্যাজেডির নায়কে পরিণত করে, গাউদিয়া গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। অপরদিকে, চিকিৎসক শশী সেনদিদিকে, পুত্র প্রসবকালে বাঁচাতে না পেরে, নিজের চিকিৎসক সত্তার কাছেই পরাজিত হয়েছে। পিতা গোপালের সঙ্গে বৃত্তীয় দ্বন্দ্বে পাঁক খাওয়া শশী, মধ্যবিত্তের আত্মগ্লানি, দ্বিধা দ্বন্দ্বময় মনোভাব থেকে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। গাউদিয়া গ্রামেই বাঁধা পড়ে নিঃসঙ্গ, একাকী শশী জীবনের সম্পর্কের হিসেব কষতে বসেছে; গোপাল সেনদিদির পুত্রকে নিয়ে চিরকালের জন্য, সংসার ছেড়ে গাউদিয়া ছেড়ে চলে গেছে, শশীর ভরপুর-নিটোল, কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন গুলিকে ভেঙ্গে দিয়ে, তাই— "মাটির টিলাটির ওপর উঠিয়া সূর্যাস্ত দেখিবার শখে এ জীবনে আর একবারও শশীর আসিবে না।" শশীর স্বপ্নময় সত্তা, এখানেই রমেশের ন্যায়-আদর্শের সত্তার সঙ্গে মিলে-মিশে একাকার হয়ে উভয়কে ট্র্যাজেডির

প্রতীকে রূপায়িত করেছে।

গ্রন্থপঞ্জি:

১। রায়চৌধুরী, গোপীকানাথ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়: জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি। প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা।

২। ভট্টাচার্য, মালিনী। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একটি জীবনী। বহুস্বর প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ২০২১, ISBN: 978-81-94255-92-5.

৩। মজুমদার, সমরেশ। পুতুল নাচের ইতিকথা উপন্যাসের মৌলিক নির্মান। রত্নাবলী, কলকাতা-৭০০০...

৪। মন্ডল, স্বস্তি। শশীর স্বপ্ন বাস্তব: পুতুলনাচের ইতিকথা। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, পরিবেশক বামা পুস্তকালয়, কলকাতা-৭০০০৭৩।

৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা। পুনর্মুদ্রণ—২০০৬-২০০৭, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা- ৭০০০৭৩।

৬। মিত্র, সরোজ মোহন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুতুল নাচের ইতিকথা। প্রজ্ঞা বিকাশ প্রকাশনী, কলকাতা-৭০০০০৯।

৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক। পুতুল নাচের ইতিকথা। ভূমিকা: রজত কুমার সুর, ফাল্গুন-১৪২৯, মোহাম্মদ সালাউদ্দিন, সালাউদ্দিন বইঘর প্রকাশনা, ঢাকা-১১০০, ISBN: 978-984-89350-2-9.

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 743-751
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.285

দীনেশচন্দ্র সেনের রাখালকথা: কোথা গেলে প্রেম পাই?

ড. পারমিতা ব্যানার্জী মণ্ডল, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

ড. সিদ্ধেশ্বর ব্যানার্জী, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চিত্তরঞ্জন কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 15.02.2026; Accepted: 07.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Dineshchandra Sen had taken the opportunity to present the Lord Krishna with His two prominent identities – Lover Krishna & Ruler Krishna in his two fictional writings 'Muktachuri' and 'Rakhaler Rajgi'. In 'Muktachuri', Krishna is the God of Love; He has come to spread the spirit of love in the world. On the other hand, in 'Rakhaler Rajgi', Krishna is the ideal king, who has not forgotten the power and necessity of love for living. Dineshchandra is biased on the identity of Krishna, as the ideal Lover. So, after being the King, Krishna, in 'Rakhaler Rajgi', preferred the Bamboo Flute inspite of Sword or Crown. Without any hesitation, Krishna can speak to Brinda Duti, not to be afraid from Him; till now the leg-dust of Radha is more precious than the royal crown. Now-a-days, the spirit of love is decreasing and the spirit of power is increasing incredibly. This is not a good sign for our civilization. Keeping it in mind, Dineshchandra Sen, wished that the spirit of Lover Krishna should be more valuable to us. Love only can produce more and more 'Mukta' (The Pearl), by which the society will be more livable. Simultaneously, spirit of showing power should be abolished, so that relations become more precious day by day. The idea of Dineshchandra, we think very important and should be practised with great care.

Keywords: Dineshchandra Sen, Muktachuri, Rakhaler Rajgi, Politics, Past and Present, Power and Love

বর্তমান কালে ভারতের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা মনে হয় অতি রাজনীতির সংকট। রাজনীতির সর্বভুক মানসিকতায় যেন লুপ্ত হতে বসেছে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় জীবন। অথচ ভারতের অতীত ঐতিহ্য ছিল সম্পূর্ণত ভিন্ন। পৌরাণিক কাহিনি-মতে, কংসের অত্যাচারে যখন অতিষ্ঠ মানুষ তখন মর্ত্যে আবির্ভূত হন নররূপী নারায়ণ। কিন্তু শুধু কংসকে হত্যা করে তিনি সুশাসন প্রতিষ্ঠাই করেননি, তার আগে বিস্তার ঘটিয়েছেন প্রেমলীলার। ঐশ্বর্যলীলাতেও তাঁর সেই প্রেমলীলা নতুন মোড় নিয়েছে। সেই জনজীবনসংলগ্ন কাহিনিকে খুবই জনবোধ্য ভাষায় দীনেশচন্দ্র রূপদান করেছেন 'মুক্তাচুরি' ও 'রাখালের রাজগি' রচনায়। বর্তমানকালে আমরা দেখছি 'রাজগি' বা রাজ-পদের লড়াই। কিন্তু সেই রাখাল কোথায় যে প্রেমের বাতাবরণে মানবের মুক্তির পথ দেখাবে– এই প্রশ্নের সাপেক্ষেই আমাদের বর্তমান প্রবন্ধ প্রয়াস।

দুই...

দীনেশচন্দ্র সেন বাংলা সাহিত্যে মূলত পরিচিত ইতিহাস আলোচক, লোক-সংগ্রাহক ও সম্পাদক রূপে। সুকুমার সেন, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব চৌধুরী প্রমুখ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকারের গ্রন্থে মূলত এই তিনটি পরিচয়ই আমরা পেয়ে থাকি। এর বাইরে তাঁর যে আরও একটি বিশেষ পরিচয় আছে সেদিকে খুব একটা আলোচনা চোখে পড়ে না। তিনি বাংলার জনপ্রিয় কীর্তনগান অবলম্বন করে কৃষ্ণকথাকে খুবই সরল, সাবলীল ভাষায় প্রায় লোকসাহিত্যের রূপদান করেছেন। তাঁর কথায়–

> "কীর্ত্তনের পদাবলী থেকে সংগ্রহ করা ভাবগুলি নিয়ে আমি যে বইগুলি লিখেছি, তাদের সম্বন্ধে মৌলিকতার দাবী আমি করি না।"[১]

তিনি বিনয়ের সঙ্গে একথা বলেছেন। কিন্তু, আমাদের পাঠ অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি, কী ভাষায়, কী ভাবে, কী দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর সেই সৃজনকর্ম এক স্বতন্ত্র সাহিত্যিক আবেদনে পরিপূর্ণ। আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে তুলে ধরতে পারি শ্রী প্রমথনাথ তর্কভূষণের অভিমত:

> "আমার বিবেচনায় রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের এই প্রকার আখ্যান দ্বারা আমাদের সাহিত্যের একটী নূতন ধারা প্রদর্শিত হইয়াছে– এই ধারায় বঙ্গ-সাহিত্য প্রাচীন নির্ম্মল রসসৃষ্টি দ্বারা এক নূতন আনন্দের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইবে, ইহাই আমার বিশ্বাস। এই আখ্যান পাঠ করিলে প্রাচীন বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রতি নব্য শিক্ষিত-সমাজের সগৌরব দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে এবং তাহার ফলে বঙ্গসাহিত্যে যে অস্বাভাবিক বৈদেশিক ভাব-বাহুল্য ঘটনাচক্রে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা দেশের মঙ্গলের জন্য অনেক পরিমাণে অপসারিত হইবে।"[২]

দীনেশচন্দ্র সেনের সেই সাহিত্যসাধনার অমূল্য দুই রত্নফল 'মুক্তাচুরি' ও 'রাখালের রাজগি'। এই দুটি রচনা বর্তমান কালের নিরিখেও খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের আলোচনায় সেই তাৎপর্যের দিকগুলি তুলে ধরার প্রচেষ্টা থাকবে।

'মুক্তাচুরি' গ্রন্থের 'অবতরণিকা' অংশে দীনেশচন্দ্র আক্ষেপ করেছেন যে, একসময় শিক্ষিত সম্প্রদায় কীর্তন গানকে খুবই অবহেলা করতেন। সেই অবহেলা যে কি ভয়ানক ছিল তার একটি দৃষ্টান্ত–

> "এ দেশের কোন বিশিষ্ট সমাজ খোলের উপর এতটা বিরক্ত ছিল যে তাঁদের প্রার্থনা-মন্দিরের আঙ্গিনায় কেউ খোল আন্‌তে পারবেন না, দলিলপত্রে এইরূপ একটি সর্ত্ত লিখে রেজেষ্টারী করেছিলেন।"[৩]

তিনি রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন এইজন্য যে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম কীর্তনের অনুরাগী হয়ে এই বিষয়ে বিশিষ্ট সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগের সূত্রেই দীনেশচন্দ্র সেকালের বিখ্যাত কথক ক্ষেত্রনাথ চূড়ামণির কথকতা, শিবু কীর্তনিয়ার কীর্তনগান শোনার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তাছাড়া ছোটবেলা থেকেই তিনি কীর্তনের রসে অবগাহন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর উক্তিটি স্মরণযোগ্য–

> "আমি শিশুকাল থেকে অনেক কীর্ত্তনীয়ার গান শুনেছি। ধূলট উপলক্ষে নবদ্বীপে গিয়ে বঙ্গের কীর্ত্তনীয়াদের মধ্যে যাঁরা চূড়া, তাঁদের রস-নির্ঝরের বিন্দু আস্বাদন করে এসেছি।"[৪]

তাঁর মতে বাংলাদেশের (অখণ্ড) মসলিন, নব্যন্যায়, ফজলী আম আর কীর্তন– এই চারটি জিনিস হল স্বতন্ত্র সম্পদ তথা গৌরব এবং সর্বপ্রধান গৌরব হল কীর্তন। বাঙালির মনে-প্রাণে যে কীর্তন জড়িত হয়ে আছে

তাকে কোনোভাবেই হেলাফেলা করা উচিত নয় বলে তিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উদ্দেশ্যেও এক পরামর্শ বা উপদেশ দিয়েছেন। 'কানু ছাড়া গীত নাই' যে বাংলাদেশে সেখানে জন্মে, সেই জল-মাটি-হাওয়া আত্মস্থ করে বড়ো হয়ে তার সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গের প্রতি তিনি শ্রদ্ধা ও ভক্তি জ্ঞাপন করেই সাহিত্য-সাধনায় মনোনিবেশ করেছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে আলোকিত হয়েও তিনি ভুলে যাননি মাটির গন্ধ, দেশীয় সংস্কৃতি, দেশীয় লোকাচার। সেই দিক থেকে বাংলার বর্তমান কালের 'নামে বাঙালি' মানুষের কাছে এই রচনাগুলির আবেদন যথেষ্ট।

তিন...

'মুক্তাচুরি' রচনার আখ্যানভাগ অতি সামান্যই। কৃষ্ণের সখা সুদামের ইচ্ছে জাগে সে গোরুগুলিকে মুক্তার মালা দিয়ে সাজাবে। কৃষ্ণ একটি মুক্তা পেলে হাজার হাজার মুক্তা ফলাতে পারে। কিন্তু সেই একটি মুক্তা কোথায় পাওয়া যায়? সখা বসুদাম মুক্তার ব্যাপারে তার অভিজ্ঞতার কথা জানায়। তার মায়ের মুক্তার কানের দুলের একটাতে হাত দেওয়ায় তার মা ক্ষুব্ধ হয়; জানায় সেগুলি খুব দামী জিনিস। দামী জিনিস, স্বভাবতই তা পাওয়া খুব মুশকিল। সখা শ্রীদাম একটা উপায় বাতলায়। রাজার মেয়ে রাধার কাছে সহজেই মুক্তা পাওয়া যেতে পারে। কৃষ্ণ চাইলে সে কি আর একটা মুক্তা দেবে না? কৃষ্ণের অনুমতিক্রমে সুদাম একটি মুক্তা আনতে গেল রাধার কাছে। কিন্তু রাধা এই সুযোগে কৃষ্ণকে কাছে পেতে গিয়ে রাখাল বলে গালিগালাজ ও রাখালদের বোধবুদ্ধি প্রসঙ্গে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে বসল। ফলত কৃষ্ণ মায়ের কাছ থেকে আদর-অভিমানের জোরে মুক্তা আদায় করল, হাজারে হাজারে মুক্তা ফলিয়ে গোরুদের মুক্তার মালা দিয়ে সাজানোর ব্যবস্থা করল। রাধাকে জব্দ করার জন্য গেল না কুঞ্জে। বিরহী রাধা সখী মারফত সব জানতে পারল। ক্রমে রাধার গোপন অভিসার কিন্তু ব্যর্থতা, দুর্দশা, কৃষ্ণের রাধা-অদর্শনজনিত কাতরতা, কৃষ্ণের মানভাঙানো ও মিলন।

এই কাহিনির উৎস সম্পর্কে লেখক জানিয়েছেন, 'রাধাতন্ত্র'–এর কথা। সেখান থেকেই তিনি কৃষ্ণের সাত সখা ও রাধার সাত সখীর নাম সংগ্রহ করেছেন:

- ❖ কৃষ্ণের সখা– বসুদাম, সুদাম, শ্রীদাম, অংশুমান, মধুকণ্ঠ, মন্দার ও মধুমঙ্গল।
- ❖ রাধার সখী– ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, ইন্দুরেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবী।

এই বন্ধু-পরিবৃত গ্রামজীবনের কথা পড়তে পড়তে আমরা হারিয়ে যাই যেন এক স্বপ্নকল্প জগতে। অথচ এই জগত বেশিদিন যে হারিয়েছে তা নয়। ব্রিটিশ উপনিবেশে থাকাকালীন ভারত থেকে, বাংলা থেকে গ্রামজীবনের এই সামন্বয়িক চেহারা প্রায় অবলুপ্ত হয়ে গেছে। স্বাধীনতা-উত্তর বর্তমান বিশ্বায়নের পণ্যসর্বস্ব বেচাকেনার জগতে অবস্থা আরও ভয়ানক। কে কার হৃদয়ের খবর রাখে? বর্তমানকালে মান ভাঙানোর সময় কোথায়?

চার...

'মুক্তাচুরি'-তে বৃন্দাবনলীলা বা মধুরলীলা। আর 'রাখালের রাজগি' কৃষ্ণের ঐশ্বর্যলীলার কাহিনি। দীনেশচন্দ্র লিখেছেন:

> "'রাজগি' কি? এই প্রশ্ন অনেকের মুখে আমায় শুনতে হয়েছে। পূর্ব্ববঙ্গে ও হিন্দুস্থানে এ কথাটি খুবই প্রচলিত, ইহার অর্থ রাজ-পদ। 'রাখালের রাজগি' অর্থ রাখালের রাজ-পদ। কেউ কেউ প্রশ্ন কল্লেন, 'রাখালের রাজ-পদ' লিখ্‌লেন না কেন? উত্তরে এই বল্‌ব, বাঙ্গালা

ভাষাটার দোর-জানেলা কষে বেঁধে ফেলা উচিত নয়। পূর্ব্ববঙ্গে যদি কোন শব্দ-সম্পদ থাকে –তা কি আট্‌কে রাখতে হবে? সাহিত্যের আসরে তা স্থান পাবে না?"[৫]

দীনেশচন্দ্রের আজীবনের সাধনা তো তাই-ই ছিল; লোকসাহিত্যকে, লোকভাষাকে, লোকবিশ্বাসকে, লোকসংস্কৃতিকে মর্যাদা প্রদান করা। তাই 'রাখালের রাজগি' রচনায় আমরা যে কৃষ্ণকে পাই সেই কৃষ্ণ স্বর্গের নয়, ধূলি-ধূসরিত পৃথিবীর রাখাল বালক। সে হাতের কাছের রাখাল একদিন মথুরার রাজা হল। ছেড়ে চলে গেল মধুরলীলার বৃন্দাবন। সেই দুঃখে-বিরহে মা যশোদা, পিতা নন্দ, কৃষ্ণের সখা ও রাধার সখীরা, সর্বোপরি রাধা অস্থির হতে থাকে। কৃষ্ণ, তাদের কানু কি আর ফিরে আসবে না বৃন্দাবনে ? সবার দূতী হয়ে বৃন্দা গেল মথুরায় কৃষ্ণকে ফিরিয়ে আনতে। সেখানে গিয়ে সে প্রত্যক্ষ করল রাজকীয় ঐশ্বর্য। সমস্ত বাধা পেরিয়ে যখন সে পৌঁছল কৃষ্ণের কাছে তখন কৃষ্ণের আনন্দ যেন বিশ্বপ্লাবী হয়ে উঠল। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ সেই মুহূর্তে কৃষ্ণের উক্তি–

"তুমি আমায় দেখে ভয় পেও না। এই দেখ রাজদণ্ড, কত হীরার গাঁথুনী; যমদণ্ডের ন্যায় লোকে এ দেখে ভয় পায়। কিন্তু আমার বাঁশীটি বৃন্দাবনে ফেলে এসেছি। যে হাতে বাঁশী ছিল, সে হাতে কি এই রাজদণ্ড সাজে! আমার ময়ূর পাখা নেই, এই রাজমুকুটে কি আমার সে সাধ মিটবে! সেই যে রাধার পায়ের ধুলো যার শিরোভূষণ, সে ময়ূরপুচ্ছের মূল্য কি এই রাজমুকুটের?"[৬]

বৈষ্ণব দর্শনমতে রাধা, ভক্তের প্রতীক; কৃষ্ণ ভগবান। ভক্ত যেমন ভগবানের পায়ে নিজেকে সঁপে দিতে চান তেমনই ভগবানও ভক্তের সঙ্গে মিলনের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষায় উচাটন হয়ে থাকেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-এ কৃষ্ণের মুখে শোনা যায়–

"ঐশ্বর্য জ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য শিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত।।
আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন।।
আমারে ত যে যে ভক্ত ভজে যেইভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে।।

... ...

মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এইভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধভক্তি।।
আপনারে বড় মানে – আমারে সম হীন।
সর্বভাবে আমি হই তাহার অধীন।।"[৭]

ধর্মতত্ত্বের কথা যাই-ই হোক, আমরা যদি একে গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখি, তাহলেও রসাস্বাদনে কোন অসুবিধা হয় না। যিনি দেশের সাধারণ মানুষের ইচ্ছাকে ফলবতী করার জন্য রাজদণ্ড হাতে নেন, তিনি তো সাধারণ মানুষের জীবন-পরিবেশ থেকেই উঠে আসেন। তিনি কখনই ভুলতে পারেন না জীবনের মধুরলীলার সেইসব পর্যায়, সেইসব সম্পর্কগুলিকে। কিন্তু বর্তমান কালের দুর্ভাগ্য! অতি-রাজনীতিকতা দেশের দণ্ডধারীদের রাজমুকুটলোভী করে তুলছে, তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন 'ময়ূরপুচ্ছের মূল্য', তাঁরা 'বৃন্দা'-র মতো দূতীদের সাদরে অভ্যর্থনা করেন কি? রাখাল কৃষ্ণ সম্পর্কে মামা অসুর কংসকে হত্যা করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু বর্তমানকালে স্বজনপোষণের রাজনীতি চলছে, নীতির কোন বালাই নেই। তাই দিকে দিকে

হিংস্র নরখাদকদের নখদন্তের শিকার হচ্ছে নারী, শিশু ও অসহায় মানুষ। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতিকে বিকিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। এর মূলে রয়েছে মনে হয় ধর্মহীন জীবনচর্যার অনিবার্যতা। একারণেই হয়তো বিংশ শতাব্দীর কবিকে লিখতে হয়–

"নাই ভগবান, নাইকো ধর্ম, যাদের শিক্ষামূলে,
ছিন্নমস্তা শিক্ষা সে শুধু শয়তানি ইস্কুলে।"[৮]

বর্তমান রাজনীতির প্রেক্ষাপটে 'রাখালের রাজগি'-কে পড়তে চাওয়ার একটা মদত লেখকের কাছ থেকেই আমরা পেয়েছি। লেখক এই গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন, মহারাজা শ্রীযুক্ত স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়কে। উৎসর্গপত্রে লেখেন–

"শ্রদ্ধাস্পদেষু,

কোন দিন যিনি ব্রজের রাখালী ক'রতেন, বাঁশীর সুরে মন ভোলাতেন, তিনি পরে মথুরায় গিয়ে একচ্ছত্র রাজা হোয়েছিলেন। আমরা তাঁর মথুরার স্বর্ণসিংহাসনের রেণু দেখে মুগ্ধ হই নি। বৃন্দাবনে যে তাঁর চরণরেণু পড়ে আছে, তাই তিলক ক'রে গৌরব ক'রে থাকি। তিনি মথুরায় রাজদণ্ড দিয়ে দুষ্টকে শাসন ক'রতেন, আশ্রিতকে রক্ষা ক'রতেন, কিন্তু তাঁর মনটা পড়েছিল, যমুনার তীরে মাধবীকুঞ্জের তলায়। সেখান থেকে তিনি তাঁকে কে কি রকম ভালবাসে, তা দেখ্‌বার জন্য দুটি চোখ পথের দিকে ফেলে রাখ্‌তেন।

মহারাজ, আপনি রাজত্ব লাভ করেছেন, কিন্তু এক সময়ে আপনিও সাধারণের একজন ছিলেন এবং সকলের সঙ্গে মিশে তাদের বন্ধুত্বের অভিমান ক'রতেন। আপনি ঐশ্বর্যের রাজতক্তায় ব'সে সেই প্রীতির ক্ষেত্র ভোলেন নি। আপনার সুকুমার ভাবগুলি ধনরত্নের নীচে চাপা পড়েনি, বরং আরও বিকাশ পেয়েছে। রাজশক্তির পাশ কাটিয়ে আপনি হৃদয়কে বড় রেখেছেন; - মাধুর্য্যকে ঐশ্বর্য্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর প্রতিপন্ন ক'রেছেন। এই কারণে

"রাখালের রাজগি"

আপনার কর-কমলে সবহুমানে অর্পণ কর্‌লাম।"[৯]

এই পত্রে লেখক কৃষ্ণকে সমকালের প্রেক্ষাপটেও প্রাসঙ্গিক করে তুলেছেন। সেই সাহসেই আমরা বর্তমান কালের নিরিখে পাঠের সাহস দেখিয়েছি। বর্তমানকালে ঐশ্বর্যের দাপট চরম আকার ধারণ করছে। শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য জনসাধারণকে নানান ছলনায় ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা-চরিত্র করে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের মনে হয় শাসকদের হৃদয়ের 'সুকুমার ভাবগুলি ধনরত্নের নীচে চাপা' পড়ে গেছে। এখন দরকার সেই বাঁশীটিকে খুঁজে বের করা, খুঁজে বের করা সেই প্রেমপাগল রাখালটিকে।

পাঁচ...

এখন আমরা একবিংশ শতাব্দীর মানুষ। শিক্ষিত, ভদ্র, সভ্য। আমরা জানি ভাষা মানুষে মানুষে যোগাযোগের মাধ্যম। জানি, স্থানভেদে একই ভাষার বিভিন্ন রূপ, ব্যবহারিক আদব-কায়দা। তবু, আমরা কেউ কেউ প্রধান শহর বা রাজধানীতে বাস করার দৌলতে শিক্ষার বড়াই করি। হেয় জ্ঞান করি আঞ্চলিক ভাষায় কাউকে কথা বলতে শুনলে, বা শত প্রতিরোধ সত্ত্বেও কারও মুখ থেকে আঞ্চলিক ভাষার শব্দ ব্যবহৃত হলে। কিন্তু দীনেশচন্দ্র সেন আজ থেকে প্রায় শতাধিক বছর আগে গ্রামবাংলার মুখের ভাষাকে যে কতটা গুরুত্ব দিয়েছিলেন তা বোঝা যায় 'মুক্তাচুরি' ও 'রাখালের রাজগি' পাঠ করলে। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই গ্রাম-এলাকার বাংলা-ভাষী মানুষের একেবারে মুখের ভাষাভঙ্গিটি ধরা পড়বে–

১. "ওরই পরামর্শে তো রাই সব কাজ ক'রে থাকে! ওই সখীটাই রাইএর মাথাটা বিগ্‌ড়ে দিয়েছে।"[১০]

২. "রাখালেরা আমোদ কচ্ছে? সে কিসের আমোদ? সে আমোদে নাকি কানু উঠে-পড়ে লেগেছে? আমায় ছেড়ে তার কিসের আমোদ? আমি রাগ করেছি শুন্‌লে ত কেঁদে ভাসিয়ে দেবার কথা! - সে কি ক'রে আমোদ কর্ত্তে পারে? অসম্ভব।"[১১]

৩. "রঙ্গদেবী বললেন, 'এই যে গোবর্দ্ধন-গিরি, শিলা-তল বড় নির্জন স্থান; মথুরা যাবার চার দিন আগে এইখানে দুপুরবেলা রাইকে পেয়ে কত সুখী যে হোয়েছিলেন তা আর কি বলব। রাই এই পীত-বাস পরে মনে হয় তোমার বর্ণ দিয়ে আমার গা ঢেকে ফেলেছি, - তোমার নামে সাধা বাঁশী, তাই এক দণ্ড আমি হাতছাড়া করতে পারি না। দিন রাত তোমার পায়ের ধূলি পাবার গরবে আমার মাথার চূড়া হেলে থাকে।'

এই বলে কত আদরে রাধার পা ছুঁতে গেলেন। 'কি কর' বলে রাই পা সরিয়ে নিচ্ছেন, - আর কানু বল্‌ছেন – 'ঐ পা ছুঁলে মনে হয় যেন আমি জীবন পাচ্ছি।'

সেই মানুষ কি হয়ে গেল।"[১২]

৪. "রাইয়ের অবস্থা কি বল্‌বো। যেদিন আমি আস্‌ব, তার আগের দিন দেখি, রাই শুয়ে আছে, ওঠ্‌বার বল নেই, দিন রাত মুখে 'কানু' 'কানু' 'কানু' । ক্ষীণ কণ্ঠে আমায় বল্লে, - 'দূতি তার দোষ নেই, আমার ভাগ্যের দোষ। এ কি কেউ বিশ্বাস করবে? দূতি, আমি নদীর মোহনায় এসে তৃষ্ণায় ম'রে গেলেম! শ্রাবণ মাসের মেঘ আমায় এক ফোঁটা জল দিলে না, কে বিশ্বাস করবে? দূতি, চন্দন গাছ আমাকে দেখে সুগন্ধি লুকিয়ে রাখ্‌ল; কানুকে ভালবেসে আমার এই হবে তা কে জান্‌তো? এ আমার ভাগ্যের দোষ।'"[১৩]

এই চারটি উদাহরণে (১) রাগ প্রকাশের ভাষা, (২) মান-অভিমানের ভাষা, (৩) বর্ণনা ও তির্যকতার ভাষা, (৪) বেদনাবিধুর আক্ষেপের ভাষা– আঞ্চলিক ভাষায় প্রতিটি ভাবের যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য তা খুব অনায়াস দক্ষতায় সার্থক শিল্পরূপ দান করেছেন দীনেশচন্দ্র। তাঁর প্রবন্ধের ভাষার সঙ্গে এই ভাষার পার্থক্য যে কতখানি সেটিও কম আশ্চর্যের নয়। উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরা যাক, 'বঙ্গে ভক্তি' থেকে কয়েকটি ছত্র –

> "বঙ্গদেশের মত এমন পুষ্পাভরণালঙ্কৃতা, কুন্দ-কুটজ-চম্পক-অনুরঞ্জিত দেশ কোথায়? প্রেম-কণ্ঠে এদেশীয়ের মত কে গাইতে পারে? নবরসের সেতারে এ দেশের মত কে এত মধুর ঝঙ্কার দিতে পারে? বীণাধ্বনি এত মধুর কোথায়? বঙ্গভাষার ন্যায় ললিত পদবিন্যাস কোন্ ভাষায়? বীরের ভ্রূকুটি দ্রুমের উচ্চতা, কৃষ্ণমেঘোপম নগের শৃঙ্গ – না দেখিলে, প্রশংসা করিবে না, তুমি যদি এরূপ অঙ্গীকার করিয়া থাক, তবে বঙ্গদেশের শোভা ধারণা করা তোমার অদৃষ্টে নাই, তুমি বিদায় হও।"[১৪]

সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, সাধারণের উদ্দেশ্যে লিখিত আলোচ্য দুটি গ্রন্থে তিনি বিশেষ ভাষাভঙ্গি ব্যবহার করেছেন। যে ভাষায় মানুষ কথা বলে, ভাব প্রকাশ করে সেই ভাষার প্রতি, সেই ভঙ্গির প্রতি ভক্তি দেখানো হয়েছে। আজকের দিনেও এই ব্যাপারটি শিক্ষণীয়।

ছয়...

গ্রাম ও শহরজীবনের পার্থক্যটিও উপলব্ধ হয় এই দুটি রচনায়। গ্রামজীবনের ছেলেপিলেদের আনন্দের বহিঃপ্রকাশ যে কি বিচিত্র হতে পারে তার জীবন্ত বর্ণনা পাওয়া যায় *'মুক্তাচুরি'*-তে:

> "রাখালদের ভারি স্ফূর্ত্তি হোল। কেউ বাছুরের লেজ ধরে দৌড়তে লাগ্‌ল; কেউ একটা ডুরে কম্বল মুড়ি দিয়ে বাঘের মত থাবা পেতে ব'সে গরুকে ভয় দেখাতে লাগ্‌ল; কেউ বেঙ্গের সঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুট্‌ল; কেউ বা উড়ন্ত পাখীর ছায়ার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে যেতে লাগ্‌ল;

> কেউ বা কোকিলের ডাক ডাক্‌তে ডাক্‌তে চল্ল; কেউ দাঁত বার করে বানরগুলোকে ভেঙ্গ্‌চাতে লাগ্‌ল; কয়েকজন মিলে গেড়ু খেলতে সুরু করে দিল; কেউ শিবঠাকুর সেজে শিঙ্গায় ফুঁ দিলে; কেউ বা বালুর উপর পাখীর পদচিহ্ন ধোরে ধোরে যেতে লাগ্‌ল; কেউ বা চোখ বুজে অন্ধ সেজে হাতড়াতে হাতড়াতে চল্ল; কেউ বা এক-ঠেঙ্গো সেজে লাফাতে লাফাতে চল্ল; কেউ বা সাদা উড়ুনী দিয়ে গা ঢেকে যমুনার পারে বকদের মধ্যে গিয়ে বক হয়ে বসে রইল।"[১৫]

বছর ত্রিশ-চল্লিশ আগেও গ্রামজীবনে এরকম দৃশ্যগুলি অভাবনীয় ছিল না। কিন্তু বিশ্বায়নের যুগে, বিজ্ঞাপনসর্বস্বতার যুগে, কৃত্রিম চটকদারিতার যুগে গ্রামগুলির মৌলিক চরিত্র অনেক বদলে গেছে, দিনে দিনে আরও যাচ্ছে। আর বদলে যাওয়ার এই গতিকে সবচেয়ে বেশি ত্বরান্বিত করছে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা। রাজনীতির অতিরিক্ত দখলদারিতে শিক্ষাব্যবস্থায় ঘনঘন পরীক্ষামূলকতার চাপে শিশু-কিশোররা পরিণত হচ্ছে গিনিপিগে। তাদের শৈশব-কৈশোর হয়ে যাচ্ছে ধূসর পাতায় আবদ্ধ। দিলখোলা আনন্দের জগতই যাচ্ছে হারিয়ে। তাই এখনকার অনেকের কাছেই কৃষ্ণের সখাদের ঐ আচরণগুলি অদ্ভুত মনে হতে পারে। কিন্তু তার মধ্যে যে সরলতা, প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা, পশুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব – আর এসবের মধ্যেই রয়েছে মানবিকতার পাঠ, তা ভুললে চলবে না।

বৃন্দার চোখে *'রাখালের রাজগি'*-তে শহরজীবনের নেতিবাচক দিকগুলি উঠে এসেছে।

> "এ ত বৃন্দাবন নয়,- এ যে মথুরা। এখানে বড় বড় অট্টালিকা, - একটা ফুল বা লতাও ত পাওয়া যাচ্ছে না। নগরের বুক পাষাণে চাপা। এখানে প্রভাতে পদ্ম ফুটে ওঠে না। বড় বড় বাড়ীর আড়াল থেকে সূর্য্যোদয় দেখা যায় না। পাখী কলরব করে না। শেষ রাত্রে 'দয়েল', 'চোখ গেল' ডেকে ওঠে না; রাত্রি যে পুহিয়ে যায় – তা বুঝব কি করে? ... কই রাখালদের বাঁশীর সুর কই? মায়েরা ছেলেদের চোখে কাজল পরান্ কই? কপালে অলকা তিলকা এঁকে দেন কই? বউএরা কলসী নিয়ে নুপুর বাজিয়ে জল আন্‌তে যান কই? পুকুরের জলে পদ্মের মত সুন্দর মুখ ফুটে ওঠে কই? কোমল হাতের চুড়ি-বালায় লেগে বাসনের ঠুন্ ঠুন্ শব্দ ঘাটে ঘাটে ভ্রমরের মতো গুঞ্জন করে কই? মেঠো সুরে আকাশ কাঁপিয়ে চাষী হাল বায় কই?"[১৬]

বৃন্দার চোখে দেখা এই গ্রামীণ বৈশিষ্ট্যগুলি আজকের গ্রামগুলিতে আদৌ খুঁজে পাওয়া যাবে কি? এর সম্ভাব্য উত্তর– অনেকাংশেই হয়তো 'না'। শুধু তাই-ই নয় গ্রামের মানুষ বেনিয়ান-সভ্যতার সংস্পর্শে এসে অনেক বদলে গেছে। এক বৃদ্ধ যেমন বৃন্দাকে দেখেই চিনতে পেরেছিল গ্রামের মেয়ে হিসেবে, আজকের গ্রামের ছেলেমেয়েদের সেইভাবে চেনা প্রায় অসম্ভব। আজকের গ্রামের ছেলেমেয়েদের রাস্তা বলে দিয়ে অত সহজে কেউ টাকা চাইবার সুযোগ পাবে না। আসলে বর্তমান কালে শহর কি গ্রাম সব জায়গা থেকেই হারিয়ে যাচ্ছে সরলতা। 'অক্রুর'-রা অতি-সচেতন, অতি-বাস্তববাদী করে তুলছেন ছেলেমেয়েদের। ফলত আজকের দিনে যেন না আছে রাখাল, না আছে বাঁশী, না আছে রাধা-বোলে-বাঁধা বাঁশীর সুর। আজ আর কেউ মুক্তাও দিতে চায় না, মুক্তা ফলাতেও জানে না। জানে শুধু শাসন করতে, 'রাজগি' পাওয়ার কৌশল আঁটতে। দীনেশচন্দ্র কি এর আগাম আভাস পেয়েছিলেন? কৃষ্ণের মুখে সেইজন্যে কি শুনতে পাই–

> "কংসের ধ্বংসের পর থেকে জগৎ জুড়ে প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্যের পূজা হোচ্ছে। বাঁশীর সুর বধির জগতের কানে এখন পৌঁছাবে না; তাই বাঁশী এ যুগে আর বাজ্‌বে না।"[১৭]

কিন্তু হতাশার কালো অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের উচিত কর্তব্য নয়। তাই কৃষ্ণকে এও বলতে শুনি–

> "... তোমরা বাঁশী শুনেছ, তোমরা সে সুর ভুলবে না; তোমরা দুঃখের মর্ম্ম বুঝেছ, তোমরা আমায় ভুলবে না। আমি তোমাদের পদাঙ্ক দেখে দেখে এ যুগ কাটিয়ে দেবো। তোমরা আমার বাঁশী শোনবার জন্য কান একাগ্র করে থেকো।
>
> এর পরের যুগে রাধা আর আমি এক হোয়ে যাব।"[১৮]

কৃষ্ণ কথা রেখেছিলেন - বৈষ্ণববিশ্বাসে। তাই কৃষ্ণ রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণ-চৈতন্য প্রেমের বন্যায় সব পাপ-অপশাসন-অন্যায় ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়েছিলেন। আজ আমরা একবিংশ শতাব্দীর মানুষ সেই বাঁশীর জন্য কান পেতে আছি। আমরা কি মুক্তা পাবো না? আমরা কি 'রাজগি'-র মোহ থেকে বেরিয়ে আসা কালের রাখালের দেখা পাবো না? যে আশা বুকে নিয়ে কালোত্তরের কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লেখেন:

"আমি হব না ভাই নববঙ্গে
নবযুগের চালক,
আমি জ্বালাব না আঁধার দেশে
সুসভ্যতার আলোক।
যদি ননীছানার গাঁয়ে
কোথাও অশোক-নীপের ছায়ে
আমি কোনো জন্মে পারি হতে
ব্রজের গোপবালক
তবে চাই না হতে নববঙ্গে
নবযুগের চালক।"[১৯]

সেই ভাবের ঘোরেই যেন দীনেশচন্দ্র সেন স্বদেশীয় সংস্কৃতির মর্মমূলে পৌঁছাতে চেয়েছেন 'রাখালের রাজগি' ও 'মুক্তাচুরি' রচনার মাধ্যমে। কালের অবক্ষয় প্রত্যক্ষ করে, হাড়ে হাড়ে অনুভব করেই ঐশ্বর্যরূপের পরিবর্তে চিরন্তন প্রেমের দেবতা কৃষ্ণের রাগানুগা কথাকে তিনি আধুনিক সমাজের ঝাঁ-চকচকে আলোচনাসভায় অধিকতর গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন নিজস্ব ব্যক্তিত্বের রসে জারিত করে, দেশীয় ভাষা ও ভঙ্গিসহযোগে। সেক্ষেত্রে, শহুরে চটকদারি ও উপরচালাকিসর্বস্ব বাহাদুরির কাছে এতটুকু দ্বিধা ও কুণ্ঠা তিনি অনুভব করেননি।

তথ্যসূত্র:

১. সেন, দীনেশচন্দ্র। মুক্তা চুরি। শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র দাস গুপ্ত, গুপ্ত এন্ড কোং, ৪৯, রসারোড ভবানীপুর, কলকাতা, চৈত্র, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ, অবতরণিকা।
২. সেন, দীনেশচন্দ্র। রাখালের রাজগি। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র দাস গুপ্ত, গুপ্ত এন্ড কোং, ৪৯, রসারোড ভবানীপুর, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ, পরিশিষ্ট অংশ, পৃ. ১২।
৩. সেন, দীনেশচন্দ্র। মুক্তা চুরি। প্রাগুক্ত, অবতরণিকা।
৪. তদেব।
৫. সেন, দীনেশচন্দ্র। রাখালের রাজগি। প্রাগুক্ত, অবতরণিকা।
৬. তদেব, পৃ. ৬৭।

৭. গোস্বামী, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। পঞ্চম সংস্করণ, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, ২০১০, পৃ. ৫১-৫২।

৮.http://www.milansagar.com/kobi/jatindramohan_bagchi/kobi-jatindramohanbagchi_kobita4.html

৯. সেন, দীনেশচন্দ্র। রাখালের রাজগি। প্রাগুক্ত, উৎসর্গপত্র।

১০. সেন, দীনেশচন্দ্র। মুক্তা চুরি। প্রাগুক্ত, অবতরণিকা, পৃ. ২৭।

১১. তদেব, পৃ. ২৯।

১২. সেন, দীনেশচন্দ্র। রাখালের রাজগি। প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

১৩. তদেব, পৃ. ৭০।

১৪. সেন, দীনেশচন্দ্র। রেখা। শ্রী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১ নং কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি, 'বঙ্গে ভক্তি' প্রবন্ধ, ১৩০১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪২।

১৫. সেন, দীনেশচন্দ্র। মুক্তা চুরি। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৮।

১৬. সেন, দীনেশচন্দ্র। রাখালের রাজগি। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

১৭. তদেব, পৃ. ৭৬।

১৮. তদেব, পৃ. ৭৬-৭৭।

১৯. https://www.tagoreweb.in/Verses/khanika-42/jonmantor-514#google_vignette

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 752- 758
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.286

মনোজ মিত্রের সামাজিক নাটক

ড. সুপ্রিয়া দাস, *সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রামঠাকুর মহাবিদ্যালয়, ত্রিপুরা, ভারত*
ড. অরুপা চক্রবর্তী, *পি জি ফ্যাকাল্টি, বাংলা বিভাগ, মহারাজা বীর বিক্রম মহাবিদ্যালয়, ত্রিপুরা, ভারত*

Received: 06.03.2026; Accepted: 14.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In the field of modern Bengali drama, Manoj Mitra's contribution deserves special recognition. He has also achieved distinction in writing social dramas. His play Chak Bhanga Madhu is a notable social drama. In this play, he presents a realistic picture of the exploitation carried out by the landlord and moneylender classes in rural society, as well as the helpless suffering of poor common people. Aghor Ghosh symbolizes the oppressive class in the drama, who mercilessly exploits the villagers through the power of wealth and authority. On the other hand, Martala and her daughter Badami represent the oppressed section of society. Hunger, poverty, and humiliation devastate their lives.

Keywords: Poverty, Humanism, Moral Responsibility, Rural Social Structure, Socio-economic Context, Rebellion and Revenge, Mass Struggle, Social Injustice, Forgiveness and Resistance

বাংলা নাট্য-সাহিত্যে একজন প্রখ্যাত নাট্যকার হলেন শ্রী মনোজ মিত্র। নাট্য-জগতে শ্রী মনোজ মিত্রের নাম নাট্যকার, অভিনেতা ও পরিচালক এই ত্রিবিধ মাত্রার গুণে অন্বিত। তৎসত্ত্বেও এই তিনটির মধ্যে নাট্যকার মনোজ মিত্রের অবদান সর্বাধিক, একথা তর্কাতীত। পাঠকের সঙ্গে নাটকের, বিশেষ করে বাংলা নাটকের দূরত্বটা কখনো কখনো বড় অসহনীয় ঠেকে। নাটক যেন বন্দী হয়ে আছে থিয়েটারে, নাটক যেন হয়ে আছে গৃহবন্দী। তার ভালো-মন্দ বিচার চলে কেবলই মঞ্চনিরিখে। নাটকের গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান মেলে প্রযোজক-পরিচালক-নটনাটক দর্শকদের তরফ থেকে।

বাংলা নাটক আর একালের পাঠকদের মাঝখানের ভাঙা সেতুর পুনর্নির্মাণের কাজটি করেছেন নাট্যকার মনোজ মিত্র। সমগ্র নাট্যজীবনে মনোজ মিত্র চেষ্টা করেছেন মানুষের মন থেকে মুছে যাওয়া মূল্যবোধের রক্ষণ ও তার লালনের। নাটকের বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীকরণের অন্যতম একটি শ্রেণী হল 'সামাজিক নাটক'। নাটক যেহেতু মানুষের জীবনের কথা বলে এবং মানুষমাত্রেই সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ, সেহেতু বৃহত্তর অর্থে যে কোনো নাটকই সামাজিক নাটক। বিশিষ্ট সমালোচক কুন্তল চট্টোপাধ্যায় সামাজিক নাটকের সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে:

> "সামাজিক নাটক বলতে আমরা বুঝি কোনো একটি যুগ বা সময়ের সামাজিক সমস্যা ও সঙ্কট নিয়ে লেখা নাটক। সমাজের অন্তর্গত শক্তি সমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব কিংবা সমাজের সঙ্গে ব্যক্তি-মানুষের দ্বন্দ্ব এ জাতীয় নাটকের উপজীব্য।"[১]

নাট্যকারের সমকালের সামাজিক সমস্যা সামাজিক নাটকে গুরুত্ব পেয়ে থাকে। বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতিতে ব্যক্তিচরিত্রের সমস্যাও সামাজিক নাটকে চিত্রিত থাকতে পারে। এই শ্রেণীর নাটকে নাট্যকার কখনো সমস্যা সমাধানের পথের ইঙ্গিত দেন, কখনো বা সমাধানের পথ খোঁজার দায়িত্ব অর্পণ করেন পাঠক-দর্শকদের ওপর। নাটকের ভরকেন্দ্রে একটি বিশেষ সামাজিক সমস্যা থাকলে তাকে বলা হয় সামাজিক সমস্যামূলক নাটক। পাশ্চাত্য সমালোচনা সাহিত্যে এই শ্রেণীর নাটককে বলা হয়েছে Problem Play, ব্রিটিশ কবি তথা নাট্যকার Marjorie Boulton এই শ্রেণীর নাটক সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন:

> "It is usually somewhat tragic in tone in that it naturally deals with painful human dilemmas; it is the kind of play that, by implication, asks a definite question and eithersupplies an answer or leaves it to us to find one."[২]

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে পাশ্চাত্য নাট্যসাহিত্যে এই ধরনের নাটকের আবির্ভাব ঘটে। বার্নার্ড শ-এর 'Mrs. Warner's Profession', 'Major Barbara', গোর্কির 'The Lower Depths', গলসওয়ার্দি-এর 'Justice' এবং ইবসেনের 'Pillars of Society' ইত্যাদি নাটক এই শ্রেণীর নাটকের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

নাটক রচনা এবং অভিনয় সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে নাট্যকার মনোজ মিত্র বলেছেন যে, তিনি মানসিক ও জাগতিক সত্যের ভিত্তিতে অভিনয় নামক সর্বজনপ্রিয় এবং আশ্চর্য রহস্যময় শিল্পকলার বাস্তবতার সন্ধান করেছেন। তিনি অনুসন্ধান করে পেতে চেয়েছেন অভিনয়ের এবং নাটক রচনার ঠিক-বেঠিক, ভালো-মন্দ-সুন্দরের হদিশ। এই অনুসন্ধানের তীব্র আকর্ষণেই হয়তো নাট্যকার মনোজ মিত্রের এই উক্তি:

> "সাত-আট বছর বয়সেই মোটামুটি ধরে ফেলেছিলাম, লেখাপড়া হচ্ছে না। তার জন্যে দুঃখ ছিল না। মোটামুটি ঠিক করে রেখেছিলাম বড় হয়ে কী হব। জেলে হয়ে মাছ ধরব। তাঁতি হয়ে তাঁত চালাব। স্যাকরা হয়ে গয়না গড়ব। কুমোর হয়ে মাটর হাঁড়ি গড়ব। রাখাল হয়ে গোরু চালাব। ফকির হয়েও গাজনপীরের গান গাইতে পারি।"[৩]

মনোজ মিত্রের মতে, অভিনয়কলা বিষয়ে চিরকালই লোকের কৌতুহল। আজ তরুণ প্রজন্মের কাছে অভিনয় একটি চিত্তাকর্ষক পেশাও বটে। এই কথা মাথায় রেখেই তিনি নাটক ও অভিনয়ের জগতে নিজেকে সমর্পিত করেছেন। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় যুক্ত থাকার সময় ছাত্রছাত্রীরা মনোজ মিত্রকে মন-নির্ভর আন্তরিক অভিনয় বিষয়ে জানতে চাইলে এবং নাটক রচনার বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা জানতে চাইলে তিনি বলেন:

> "আমার প্রথম নাটক ('মৃত্যুর চোখে জল', ১৯৫৯) রচনার সময়কাল তথা জীবনের প্রথম অভিনয়ের দিনটি ছিল সত্যিই ভয়ঙ্কর।"[৪]

নাটক রচনার ক্ষেত্রে মানবমনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ বা মনোসমীক্ষণ নাট্যকার মনোজ মিত্রের ছিল না। তিনি শুধুমাত্র চেয়েছিলেন মানসিক এবং জাগতিক সত্যের ভিত্তিতে অভিনয় নামক শিল্পটিকে বুঝে নিতে। তাঁর মতে, নাটক রচনা তথা অভিনয়ের জন্যে দরকার মনকে জানার নয়, মনকে বোঝার। তিনি নাটক বলতে কেবলমাত্র অভিনয়কেই রেখেছেন; থিয়েটার, সিনেমা, যাত্রা- সব মাধ্যমেরই অভিনয়।

নাট্যকারের কথায়, আমাদের কৃষিনির্ভর ভূখন্ডের লোকনাট্যগুলোর দিকে তাকালে বোঝা যাবে যে, নাট্যের জন্মবৃদ্ধি ঘটেছে মৃত্তিকার গুণগান গেয়ে, শস্য-ফসল-বনসম্পদের বন্দনার মধ্যে দিয়ে। নাটকের চরিত্রের সঙ্গে একীভূত হওয়ার এই যে প্রয়াস, তজ্জনিত উন্মাদনা এবং পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন- এর মূলে আছে বোধ হয় বহির্বিশ্বের শিল্পীদের মৃত্তিকার প্রতি আসক্তি। এদেশের শিল্পীদের গহিন অন্তর্লোকে এবং নিজ্ঞান মানসলোকে সক্রিয় আছে এক আদিম ভৌমটান। মনোজ মিত্রের কথায়, ভূমির চেতনা নাট্যকারের প্রতিভাকে নানা আভরণে বিভূষিত করে। তাঁকে দেয় উপলব্ধির গাঢ়তা, অনুভূতির সূক্ষ্মতা, তন্ময়তা, আবেগ-প্রক্ষোভের অগ্নিময়তা, কল্পনার গতিশীলতা, মায়ামমতা, সহানুভূতিশীলতা- এইরকম আরও অনেক কিছুর সঙ্গে জীবন-জীবিকার স্বপক্ষে ইতিবাচকতা। বুদ্ধি দিয়ে কাটাছেঁড়া না করে, শিল্পী ভাবাবেগে চরিত্রটাকে কাছে টেনে নেয়, হয়ে উঠতে চায় তার মতো।

মৃত্তিকার টান নাটক রচনার ক্ষেত্রে নাট্যকার মনোজ মিত্রকে দিয়েছে প্রগাঢ় আসক্তি, প্রবলতার কল্পনাশক্তি। তাই তিনি কখনও ক্লান্ত বা অধৈর্য হননি, এবং হবেন না- এটাই হল মূল কথা। আর যেহেতু গাছের দুটো কদম ফুল বা দুট জ্যোৎস্নারাত্রি কোনোদিন একরকম হলেও দুটি মানুষ কখনও একরকম হবে না- তাই মানসনির্ভর থিয়েটার এবং নাট্যকারের রচনাও কখনো পুনরাবৃত্তির দোষে দুষ্ট হবে না, পুরনোও হবে না, ফুরোবেও না।

মনোজ মিত্রের নাট্যসৃজন পটভূমি:

'সুন্দরম' নাট্যসংস্থার জন্য ১৯৫৯ সালে মনোজ মিত্র যখন তাঁর 'মৃত্যুর চোখে জল' প্রথম নাটকটি লিখলেন, গণনাট্যের পথ বেয়ে নবনাট্যের আবির্ভাবের পরও তখন কেটে গেছে অনেকটা সময়কাল। নাট্যজগতে তখন দুই প্রবল ব্যক্তিত্বের টানাপোড়েন- শম্ভু মিত্র এবং উৎপল দত্ত। এঁদের একজনের কাজে অনুভূতির প্রাধান্য, অপরজনের কাজে বক্তব্যের। এই দুই ধারাকে নিজের নাটকে মেলালেন নাট্যকার মনোজ মিত্র। তাঁর নাটক রচনার আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটিকে চমৎকারভাবে চিহ্নিত করেছেন কুমার রায় মহাশয়। সমাজ-রাজনীতির নিপুণ পর্যবেক্ষণ এবং উপস্থাপন আছে মনোজ মিত্রের নাটকে। বিশেষ সামাজিক অবস্থায় পতিত মানুষের সমস্যা এবং সেই সমস্যা থেকে উত্তরণের ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি, তবে তা কোন রাজনৈতিক তত্ত্বের অনুগামী হয়ে নয়। কারণ মনোজ গণনাট্য সংঘ বা অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের সাংস্কৃতিক সংগঠনের উত্তরাধিকার দাবী করেন নি কখনো। বরং তিনি এসব থেকে নিজেকে অসম্পৃক্ত রাখতে চেয়েছেন।

স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে যে স্বপ্ন মানুষ দেখেছিল তা তখন ক্রমশ ভেঙে যাচ্ছে। আধুনিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠছে নিঃসঙ্গতাবোধ, আশ্রয়হীনতার সমস্যা। নিজের কালের সেই সমস্যা মনোজ মিত্রের নাটকে বিষয় হিসেবে গৃহীত হয়েছে। ক্রমাগত প্রতিবাদ আর শত্রু সংহার করতে গিয়ে বাংলা নাটক যখন রূপের দিক থেকে ক্রমশ দীন হয়ে পড়ছে, তখন তিনি বাংলা নাটকে নিয়ে এলেন 'আলো ছায়ায় ঘেরা গভীর গোপন মানুষ, অন্তর্লোকের বাসিন্দা মানুষ'-কে। তাঁর প্রায় প্রত্যেক নাটকেরই কেন্দ্রে আছে একজন অসহায় গড় মানুষ।

সে মানুষ কখনো পরিবার, কখনো সমাজ, কখনো বা রাজনীতি দ্বারা নির্যাতিত। সহজ ইচ্ছাপূরণ নয়, নাট্যক শর্ত মেনেই মনোজ মিত্র দেখিয়েছেন সেই মানুষের ঘুরে দাঁড়ানো। এই ঘুরে দাঁড়ানোর মধ্যে কোনো রাজনৈতিক তত্ত্ব নেই, আরোপিত আদর্শবাদ নেই- আছে মানুষের জন্য মানুষের আন্তরিক ভালোবাসা আর সহমর্মিতা। কোনো বক্তব্য চাপিয়ে দেওয়া নয়, পাঠক-দর্শকের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা নয়, এ যেন শুধু

নিজের অভিজ্ঞতাকে সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া। বিশিষ্ট সমালোচক শৈবাল মিত্র মনোজ মিত্রের নাটকের মূল সুরটিকে চিহ্নিত করেছেন যে; দেশ, কাল, ইতিহাস, সমাজ, ব্যক্তির সঙ্কট, অসহায়তায় তিনি অবিরত আলোড়িত, ব্যথিত হয়েছেন। জীবন কেন এত দুঃখময়, মানবিক সম্পর্কগুলো কেন ভেঙ্গে পড়ছে, কোথায় চলেছে মানবসভ্যতা, অস্তিত্বে বিজড়িত এই মৌলিক প্রশ্নগুলি বাঙালি দর্শক ও পাঠকদের তিনি ভুলতে দেন নি। সমগ্র নাট্যজীবনে মনোজ মিত্র চেষ্টা করেছেন ভেঙে যাওয়া মূল্যবোধের রক্ষণ ও লালনের।

মানুষের ক্ষুধা, অস্তিত্বের সঙ্গট, লোভ, বেঁচে থাকার প্রবল বাসনা, স্বার্থপরতা, সহমর্মিতা নিয়েই মনোজ মিত্রের নাটক। নিজের কালের সামাজিক-রাজনৈতিক অভিশাপ ও ব্যভিচারের নির্মোহ ব্যবচ্ছেদ করেছেন তিনি। কিন্তু সে ব্যবচ্ছেদ করেছেন কৌতুকের আশ্রয়ে, আর সে কৌতুক অনেক সময়ই চোখের জলের কাছাকাছি। আর এই কৌতুকের উপাদান রয়েছে নাট্যকারের নিজেরই চরিত্রে। দীনবন্ধু মিত্রের নাটক সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্গিমচন্দ্রে দেশীয় ব্যঙ্গপ্রণালীকে দুভাগে ভাগ করে বলেছিলেন- 'রসিক লাঠিয়ালের মোটা লাঠির বাড়ি' এবং 'ডাক্তারের সরু লানসেটের সূক্ষ্ম আঘাত'। আর একালের সমালোচক এবং পাঠকরা মনোজ মিত্রের নাটকে এই দুইয়ের উপস্থিতিই লক্ষ্য করে থাকেন।

আধুনিক যুগে সামাজিক নাট্যকারকে কেবল সামাজিক উপকরণ সম্পর্কে অভিজ্ঞ হলেই চলবে না, মানবচরিত্র সম্পর্কে সূক্ষ্ম অন্তদৃষ্টির অধিকারীও হতে হয়:

> "ব্যাপক সামাজিক অভিজ্ঞতার উপর মানব-চরিত্রের জটিল রহস্য সম্পর্কে সুগভীর অন্তসৃষ্টি ও ব্যক্তিচরিত্র সম্পর্কে আন্তরিক সহানুভূতি না থাকিলে সামাজিক নাটক রচনায় কেহ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন না।"[৫]

এই জাতীয় নাট্যকারদের মধ্যে অন্যতম একজন হলেন নাট্যকার মনোজ মিত্র। তাঁর সামাজিক নাটক বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতিতে ব্যক্তি-মানুষের সুখ-দুঃখ, লড়াই-যন্ত্রণা, আশা-আনন্দের প্রতিফলন। বৃহত্তর অর্থে মনোজ মিত্রের সব নাটকই সামাজিক। তাঁর সামাজিক নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- 'চাক ভাঙা মধু' (১৯৬৯), 'সাজানো বাগান' (১৯৭৬-৭৭), 'রাজদর্শন' (১৯৮১), 'নৈশভোজা' (১৯৮৪-৮৫) ইত্যাদি।

সমকালীন সাধারণ শোষিত মানুষের জীবনযন্ত্রণা, সংগ্রাম, অস্তিত্বসঙ্কট, বাদ-প্রতিবাদের চিত্র মনোজ মিত্রের নানা নাটকের বিষয় হয়ে উঠেছিল। পাশাপাশি নাটকের চরিত্ররাও জীবন্ত হয়ে উঠেছিল তাদের সংলাপের মাধ্যমে। মনোজ মিত্রের এমনই এক সামাজিক নাটক 'চাক ভাঙা মধু' (১৯৬৯)। এই নাটকে শোষক-শোষিতের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, সমাজভাবনা, গণসংগ্রামকে তুলে ধরা হয়েছে। সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ও শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস মনোজ মিত্রের 'চাক ভাঙা মধু' নাটকের মূল উপজীব্য বিষয়। মাতলা, জটা, শঙ্কর, অঘোর ঘোষ, ফুকনা, দাক্ষায়ণী এবং বাদামী- চরিত্রের সন্নিবেশে সম্পূর্ণ নাটকের কলেবর নির্মিত হয়েছে।

'চাক ভাঙা মধু'-তে অঘোর ঘোষ হল শোষক মহাজন। সে গ্রামের জমিদার এবং নিম্নশ্রেণীর মানুষদের উপর শাসন ও শোষণ করে অর্থের পাহাড় গড়ে তুলেছে। সাধারণ মানুষের রক্ত চুষে তিনি ক্রমশ বিত্তশালী হয়ে উঠেছেন। তার শাসনে ও শোষণে প্রজারা জর্জরিত ও দিশেহারা। গ্রামের মানুষেরা সকলেই তার প্রতি ক্ষিপ্ত।

বিংশ শতাব্দীর ছয়ের এবং সাতের দশকে বাংলার সমাজব্যবস্থার বিশৃঙ্খলার চূড়ান্ত নিদর্শন আলোচ্য নাটকে নাট্যকার মনোজ মিত্র দক্ষতার সাথে তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তিনি এই নাটকের প্রতিটি চরিত্রের নির্মাণ করেছেন। এই চরিত্রগুলির মধ্যে দুটি অন্যতম চরিত্র হল এক দরিদ্র ওঝা

মাতলা এবং তার একমাত্র মেয়ে বাদামী। মাতলার চেহারায় ও বেশভূষায় দারিদ্র্যের ছাপ স্পষ্ট ধরা পড়ে। ঢ্যাঙা, খড়ি-ওড়া বুকপিঠ এবং অর্ধনগ্ন, চুপসানো পেট, রুক্ষ ঝাঁকড়া চুল এবং ভাঙাচোরা মুখ নিয়ে মাতলা মাঝারি আকারের কলসি মাথায় করে বাড়ি ফেরে। তার কোমরে জড়ানো জালবোনা থলি ও হাতে একটা ছোট সড়কি। বাদামী ভাবে মাতলা হয়তো খাবারের সন্ধানে গিয়েছিল। কিন্তু মাওলা কোনো খাবার না নিয়ে বাড়িতে আসায় ক্ষুধার্ত বাদামী প্রচন্ড আক্ষেপকরে। বাদামী বিবাহিতা, গর্ভবর্তী ও স্বামী পরিত্যক্তা। অন্যদিকে সে মাতলার সংসারে একটা বোঝা। ক্ষুধার্ত বাদামী তার পিতা মাতলার আনা কলসি দেখে আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করলে মাতলা তাকে জানায়। "মধু, মধুরে বাদাম! হাঁ, হাঁ মধু, মৌ। জিবে ঠ্যাকাবি তো জিবখানা এমনি (হাত কাঁপায়) করতি লাগবে পুরো সাতদিন।"[৬]

একথা শুনে ক্ষুধার্ত বাদামী মধু খাওয়ার জন্য লালায়িত হয়। বাদামী আশা করে কলসির মুখ খোলে। আর কলসির মুখ খুলতেই বাদামী দেখতে পায় তার মধ্যে রয়েছে এক বিষধর গোখরো সাপ। মাতলার কাকা জটা নিমেষে কলসির মুখ চেপে ধরে। আর বাদামী তীব্র আক্রোশে ফেটে পড়ে ক্ষুধার যন্ত্রণায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জটার স্ত্রী একটানা সাতদিন না খেতে পেয়ে শেষে গঙ্গার জলে আত্মহত্যা করেছিল।

নাট্যকার মনোজ মিত্র এই নাটকে তৎকালীন বিশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থাকে খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। ভয়ানক দারিদ্র্যতা কিভাবে সাধারণ মানুষের জীবনকে গ্রাস করেছিল, সাধারণ মানুষের জীবন এবং পরিস্থিতি কত করুণ ছিল, তা আলোচ্য নাটকে সুপ্রকাশিত হয়েছে। অভাবের তাড়নায় মাতলা বাদামীর আসন্ন সন্তানকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই মেরে ফেলতে চায়। ক্ষুধায় কাতর বাদামী সাপটিকে পুড়িয়ে খেতেও ইচ্ছুক। কিন্তু মাতলা তখন বলে। "না। ওটারে আমি পোষ মানাব। হা পোষ। বিষ দাঁত ছোটাবো না। গায়ে পা চাপায়ে উয়ার আমি জাজ বাড়াব।"[৭]

সমকালীন সমাজব্যবস্থা তথা জোতদার ও জমিদারদের শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে এখানে তীব্র রাগ-ক্ষোভ-বিদ্বেষ প্রকাশিত হয়েছে। শ্রেণীশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে মাতলার ক্ষোভের তীর প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে তৎকালীন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে এই নাটকে উঠে এসেছে। মহাজন অঘোর ঘোষ ভিটে-মাটি বন্ধক রেখে টাকা ধার দেয়। অঘোর ঘোষ মাতলার সর্বস্ব গ্রাস করেছে। তাই এবারে সে প্রতিশোধ নিতে চায়। মাতলা জমিদার অঘোর ঘোষ সম্পর্কে বলে, সে এসে লাল খাতা বের করে সুদ চাইবে, আর না দিতে পারলে: "পেছনে দুই লাথি মেরে ধারে কাছে যা পাবে সব ফর্সা করে নে যাবে।"[৮] তাই সুদ দেবার ভয়ে মাতলা, জটা এরা সকলে পালিয়ে বেড়ায় এবং জমিদার থেকে বদলা নিতে চায়।

একসময় একটা 'কালাচ' সাপ এসে অঘোর ঘোষকে ছোবল মারে। অঘোর ঘোষ যদি মারা যায় তাহলে গ্রামের হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের মানুষ আনন্দিত হবে। কারণ প্রত্যেকেই তার শাসন ও শোষণে ক্ষুব্ধ। তাই অঘোর ঘোষের মৃত্যু হলে সকলেরই মুক্তি মিলবে। সকলের মতো মাতলাও চায়না অঘোর ঘোষ বাঁচুক। কিন্তু নাটকের অন্যতম প্রতিবাদী তথা দরদী চরিত্র মাতলার মেয়ে বাদামী। সে তার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয় না। মাতলা অঘোর ঘোষকে বাড়াতে না চাইলেও বাদামী দৃপ্ত কণ্ঠে বলে ওঠে। "বাপ! এটা মানুষ মরে যায়, আর তোমরা নাচতি লেগেছ। জানো না, ওঝার কানে খবর গেলি ছুটে যেতে হয় রুগীর ঠীয়।"[৯] অন্যদিকে অঘোর ঘোষকে বাঁচাতে উদগ্রীব তার আশ্রিতা বিধবা বোন দাক্ষায়ণী ঠাকরুণ এবং ছেলে শঙ্কর। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে মাতলা এবং জটা দাক্ষায়ণীর কাছ থেকে টাকা আদায় করতে চায়। এহেন পরিস্থিতির বর্ণনা সেই সময়ের সমাজ ব্যবস্থার পরিচায়ক। কিন্তু নাট্যকার মনোজ মিত্র তাঁর এই 'চাক ভাঙা মধু' নাটকে বাদামী চরিত্রকে বিশিষ্টতা দান করেছেন। বা দামী একজন মানুষ হিসেবে এবং তার নৈতিক

দায়িত্ব পালনের দিক থেকে অঘোর ঘোষকে বাঁচাতে চেয়েছে। তাই সে শঙ্করকে বলে অঘোর ঘোষকে তাদের বাড়িতে নিয়ে আসতে। বাদামী মাতলা ও জটার কার্যকলাপে বিরক্ত হয়ে কঠোরভাবে বলে উঠে: "ভেবেছ কী, তোমরা ছাড়া আর কেউ নেই তারে বাঁচানোর? ভেবেছ কি তোমরা, জানিনে ঝাড়ন? চিনিনে ওষুধ?"[১০] চাষী ফুকনা এবং গ্রামের হিন্দু-মুসলমান সবাই অঘোর ঘোষের পরিপন্থী। কিন্তু মানবতাবাদী বাদামীর নৈতিকতায় গ্রামবাসীদের মনও পরিবর্তিত হয় এবং শেষে মাতলাও অঘোর ঘোষকে ঝাড়াতে রাজী হয় এবং সে বলে: "রুগীর আবার জাত দ্যাখে নাকি বদ্যি? সরল! সরল না তো কি জটিল! ঝাড়াব!"[১১]

তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর মানুষ বলে একপ্রকার অহংকার ছিল অঘোর ঘোষদের। দাক্ষায়ণী শেষে নতিস্বীকার করে বলে: "শেষ পর্যন্ত তোদের দোরে এসেই দাঁড়াতে হল রে।"[১২]

মনোজ মিত্রের 'চাক ভাঙা মধু' নাটকের শেষ অংশেই হল মূল আকর্ষণ। মাতলা যখন অঘোর ঘোষকে ঝাড়াতে শুরু করে তখন বাদামী অনুভব করে চতুর্দিকে যেন প্রাণ লাফাতে আরম্ভ করেছে। মাতলার মন্ত্রের শক্তিতে হাত-পা ছেড়ে আছড়ে হামাগুড়ি দিয়ে অঘোর ঘোষ চিৎকার করে বলে ওঠে:

> "আমি কখনো জ্ঞান হারাই নি! যতো চেঁচাই, ডাক বেরোয় না। (দাক্ষাকে) অত জোরে বাঁধলি কেন? এত হাত-পা আছড়াই, বুঝিসনি কেন?"[১৩]

দাম্ভিক, অত্যাচারী অঘোর ঘোষ দেনার দায়ে মাতলার উপর দুর্বিষহ অত্যাচার করা সত্ত্বেও বাদামী এবং মাতলা অঘোর ঘোষকে ক্ষমার চোখে দেখেছে এবং তার প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছে। মনোজ মিত্রের চরিত্র সৃষ্টির কৃতিত্ব এখানেই। কিন্তু অঘোর ঘোষের চরিত্রের একটুকু বদল হয়নি। পুনরায় গর্জে উঠে সে লোভের থাবা বসায় বাদামীর দিকে। কামাতুর হয়ে সে বাদামীকে নিজের ঘরে নিয়ে যেতে চায়। আর দাক্ষায়ণীকে সে হেনস্থা আর অপমান করে। মনোজ মিত্রের লেখনীতে নাটকে এহেন সমাজের কুৎসিত চেহারা প্রকট হয়ে ওঠে। অঘোর ঘোষের এই অকৃতজ্ঞতা এবং দম্ভের প্রতিশোধ নিতে বাদামী সমাজের শোষিত, বঞ্চিত, অত্যাচারিত শ্রেণীর প্রতীক ও প্রতিনিধিরূপে শাসক ও অত্যাচারী জমিদার অঘোর ঘোষকে কচ্ছপ ধরার সড়কি দিয়ে হত্যা করে। বাদামীর এই প্রতিশোধ বা প্রতিবাদ কেবলমাত্র অঘোর ঘোষের বিরুদ্ধে নয়, সমাজের নিম্নশ্রেণীর সাধারণ মানুষদের উপর সমাজের উচ্চশ্রেণীর অত্যাচারী মানুষদের বিরুদ্ধে। এই জমিদার শ্রেণীই শাসনের নামে শোষণ, বঞ্চনা ও অত্যাচারের মাধ্যমে বাদামী, মাতলা, জটাদের মতো সহজ-সরল মানুষদের যুগ যুগ ধরে পদদলিত করে রাখে। নাট্যকার মনোজ মিত্র তাঁর এই 'চাক ভাঙা মধু' নাটকে তৎকালীন সমাজব্যবস্থার ও আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির বাস্তব চিত্র খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে, মনোজ মিত্রের নাটকগুলোর মধ্যে তাঁর দরদী মনের চিত্র ফুটে উঠেছে। অসহায়, দুর্বল, প্রান্তিক মানুষের জন্য তাঁর দরদ এবং সহানুভূতি প্রায় প্রতিটি নাটকেই লভ্য। তাঁর নায়কেরা প্রায় সকলেই জীবনের নিম্নস্তরের মানুষ, তারা সমাজের বিশিষ্ট কেউ নয়- তাঁদের জন্যই মনোজ মিত্রের দরদ এবং সহানুভূতি। তাই মনোজ মিত্রের নাটকের প্রতি রসবোধ এবং সাধারণ মানুষের প্রতি দরদের দিকটিকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন মনোজ মিত্রের বন্ধু শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায়:

> "তার রসবোধ তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনার মধ্যেও খুঁজে পায় মজার এবং উপভোগের অফুরন্ত উপাদান। যে কোনও মানুষের মধ্যে, যে কোনও ঘটনার মধ্যে, যে কোনও অভিজ্ঞতার মধ্যে এত যে রঙ্গের সম্ভাবনা ছিল, মনোজের সঙ্গে না থাকলে তা বোধ হয় ধরাই পড়ত না। কিন্তু শুধুমাত্র রঙ্গ নয়, খুব কাছের থেকে দেখলে ধরা পড়বে, মানুষের জন্য গভীর মমতা ও ভালবাসায় ভরে আছে মনোজের ভেতরটা।"[১৪]

তথ্যসূত্র:

১. চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল। সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ। রত্নাবলী, কলকাতা, পঞ্চম পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ: ভাদ্র-১৪২১, পৃ. ১৫১।

২. Ibsen, Henric. The Types of Drama: Problem Play-The Anatomy of Drama. Kalyani Publishers, New Delhi, June-1999, Page No. 149-150.

৩. মিত্র, মনোজ ও মিত্র, অমর। ভাসিয়ে দিয়েছি কপোতাক্ষের জলে। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি-২০১১।

৪. মিত্র, মনোজ। মনের কথা নাট্যকথা। আজকাল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: মাঘ-১৪১৩।

৫. ভট্টাচার্য, শ্রীআশুতোষ। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)। এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ-১৯৬১।

৬. মিত্র, মনোজ। শ্রেষ্ঠ নাটক একাদশ। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: বৈশাখ-১৪২৬।

৭. তদেব, পৃ. ৩৩৪।

৮. তদেব, পৃ. ৩৩৪।

৯. তদেব, পৃ. ৩৩৬-৩৩৭।

১০. তদেব, পৃ. ৩৪১।

১১. তদেব, পৃ. ৩৪১।

১২. তদেব, পৃ. ৩৪১।

১৩. তদেব, পৃ. ৩৭১।

১৪. মুখোপাধ্যায়, অশোক। মতান্তরকে শ্রদ্ধা করে, মনান্তর ঘটতে দেয় না। আজকাল, কলকাতা, আগস্ট-১৯৯২।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 759-767
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.287

স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে নারী শিক্ষার বিকাশ: অগ্রগতি, সমস্যা ও কর্মসূচীসমূহ

ড. কৌশিক ভক্ত, *সহকারী অধ্যাপক, শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 07.03.2026; Accepted: 10.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The role of women is so important in the social, political, cultural and economic development of a country. The role of education is so crucial in the empowerment, prosperity, development and welfare of the women. In the past, due to social, cultural customs, economic constraints and institutional flaws the scope of women education was limited. In the post-independence period of India constitutional provisions were introduced, special importance was imposed on the recommendations of different committees, commissions and national education policies. Later, Operational Blackboard, Sarva Shiksha Abhiyan, Mid-Day Meal scheme, Right to Education act, etc. helped in expanding primary education, increasing enrolment ratio and eliminating gender discrimination. The objectives of the study are to know about the development of women education in post-independence period of India, to explore the problems of women education in post-independent India and to know about the different strategies undertaken to promote women education. It is a qualitative study. The data has been collected from various secondary sources like books, articles, journals and websites. In this study, different recommendations of various commissions, committees, educational policies are discussed. Furthermore, some important barriers of women education like lack of proper infrastructure, lack of implementation of policies, social inequality, patriarchy are also highlighted. The study also informs various policies like Beti Bachao and Beti Padhao, Udaan, Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya etc. for the development of women education in the post-independent period of India.

Keywords: Women Education, Post-independent India, Education Commission, National Education Policy, Problems of Women Education and Strategies to promote Women Education

আধুনিক ভারতবর্ষের অগ্রগতির বিভিন্ন সূচকগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান হল নারী শিক্ষার অগ্রগতি। নারীরা প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত হলে তাঁরা যথাযত স্বাধীনতা ভোগ করেন, তাঁদের মধ্যে আত্তবিশ্বাস, সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং তাঁরা সমাজ গঠনে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেন। স্বামী বিবেকানন্দ নারী শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বলেছিলেন-

> "একটি পরিবার বা একটি দেশের উন্নতির কোন আশা করা যায় না, যেখানে নারীরা শিক্ষিত নয় এবং অসহায় জীবন যাপন করে।"[১]

ভারতবর্ষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারী শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বৈদিক যুগে নারী শিক্ষার বিশেষ অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। এই যুগে নারীরা পুরুষদের মতো উপনয়ন অনুষ্ঠানে যোগদান ও বেদ পাঠ করার অধিকার ভোগ করতেন। বৌদ্ধ যুগের প্রাথমিক পর্যায়ে নারী শিক্ষা কিছুটা অবহেলিত হলেও পরে নারীদের ভিক্ষুনি সংঘে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু ইসলামীও শাসনকালে নারী শিক্ষার অবনতি ঘটে। ভারতের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে নারী শিক্ষার প্রসার ব্যাপকভাবে অবহেলিত হয়। মিশনারিদের প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে মেয়েদের শিক্ষার অগ্রগতি শুরু হয়।[২] ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের পর জাতীয় উন্নয়ন তথা নিরক্ষরতা দূরীকরণ, লিঙ্গগত সমতা বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন -এর জন্য নারী শিক্ষাকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। শিশুদের সামগ্রিক বিকাশ অনেকাংশে নারী শিক্ষার উপর নির্ভর করে। নারীরা প্রতিটি পরিবার তথা সমাজের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচিত হন। তাই বলা হয়- একজন ভালো মা শত শত স্কুল শিক্ষকের সমান। ১৯৫১ সালে ভারতে নারী শিক্ষার হার ছিল ৮.৮৬%যা ২০২১ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৭০.৩%-এ।[৩]

অঞ্জু (২০০০) তাঁর গবেষণায় উল্লেখ করেন যে বৈদিক যুগের শুরুতে নারীদের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থান সন্তোষজনক ছিল, তবে পরবর্তী সময়ে তার ক্রমশ অবনতি ঘটে।[৪]

ভাট (২০১৫) দেখিয়েছেন যে ভারতে নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম এবং জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষিত নারীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[৫]

সাহু (২০১৬) তাঁর গবেষণায় লক্ষ্য করেন যে উচ্চশিক্ষার তুলনায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের শিক্ষার অবস্থা দুর্বল এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিকাঠামোগত সমস্যা এর প্রধান কারণ।[৬]

পরিমল মণ্ডল (২০২১) বলেন, প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত নারীরা শিক্ষাক্ষেত্রে অবহেলিত এবং বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় মেয়েরা এখনও সমান সুযোগ থেকে বঞ্চিত।[৭]

মীর আদিল হোসেন ও পি. কে. স্বরূপা (২০২৪) তাঁদের গবেষণায় উল্লেখ করেছেন যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক রীতিনীতি, অর্থনৈতিক দুর্বলতা ও লিঙ্গ বৈষম্যের কারণে ভারতে বিশেষত গ্রামীণ ও প্রান্তিক অঞ্চলে মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ সীমিত।[৮]

স্বাধীনতার পর ভারতে নারী শিক্ষায় অগ্রগতি হলেও সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নানা প্রতিবন্ধকতা এখনও বিদ্যমান। নারী শিক্ষা জাতীয় উন্নয়ন ও নারী ক্ষমতায়নের জন্য অপরিহার্য। তাই স্বাধীনোত্তর ভারতের নারী শিক্ষার অগ্রগতি ও সমস্যাগুলি বিশ্লেষণ করা জরুরি, যাতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়।

গবেষণার পদ্ধতি:

গবেষণার উদ্দেশ্য সমূহ

গবেষণার উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরুপ-

১. স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে নারী শিক্ষার বিকাশ সম্বন্ধে জানা।

২. স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে নারী শিক্ষার সমস্যাগুলির উপর আলোকপাত করা।

৩. স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতের নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে জানা।

গবেষণার নকশা-

এটি একটি গুণগত গবেষণা এবং মূলত বর্ণনামূলক।

নারী শিক্ষার বিকাশ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য বিভিন্ন গৌণ উৎস যেমন- বই, জার্নাল, প্রতিবেদন, ওয়েবসাইট ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে।

তথ্য বিশ্লেষণ:

১ম উদ্দেশ্য- স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে নারী শিক্ষার বিকাশ সম্বন্ধে জানা।

ভারতবর্ষের তৎকালীন নেতৃত্ব মনে করেন নারী শিক্ষার উন্নতি ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নের জন্য স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ভারত সরকার বিভিন্ন সংবিধানিক ধারার প্রচলন, কমিশন ও কমিটি নিয়োগ করে। এগুলির সুপারিশগুলি আলোচনা করলে নারী শিক্ষার বিকাশ সম্বন্ধে জানা সম্ভব।

- **ভারতীয় সংবিধানের ৪৫ নম্বর ধারা:** এই ধারায় ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সকল শিশুদের অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। ভারতের নারী শিক্ষার অগ্রগতির ইতিহাসে এটি অন্যতম যুগান্তকারী বিষয়।
- **বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন (১৯৪৮-৪৯):** দেশ স্বাধীন হওয়ার পর উচ্চশিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের সভাপতিত্বে এই শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশন নারী শিক্ষা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সুপারিশ করে- উচ্চশিক্ষায় নারী ও পুরুষের সমান অধিকার, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা করা, পাঠ্যক্রমে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান বিষয়টির অন্তর্ভুক্তির উপর জোর দেয়।[৯] গ্রামীণ ও দূরবর্তী এলাকার ছাত্রীদের জন্য হোস্টেলের ব্যবস্থা করা, চিকিৎসা, বিজ্ঞান পাঠে ও সামাজিক কাজে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়ার কথা বলা হয়।
- **মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫২-৫৩):** ড. লক্ষণ স্বামী মুদালিয়র-এর সভাপতিত্বে দেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার সংস্কার সাধন করার জন্য এই কমিশন গঠন করা হয়। নারী শিক্ষা সম্বন্ধে এই কমিশনের সুপারিশগুলি হল - মেয়েদের শিক্ষার জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করা, মেয়েদের উপযোগী বিষয় সমূহ পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা। এছাড়া ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল, বৃত্তি ও অন্যান্য সহায়ক ব্যবস্থার সম্প্রসারণ-এর উপর জোর দেওয়া হয়।[১০] মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষিকা নিয়োগের সুপারিশও করা হয়। এছাড়া সমাজে নারী শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়।
- **জাতীয় নারী শিক্ষা কমিটি (১৯৫৮):** শ্রীমতি দুর্গাবাঈ দেশমুখের নেতৃত্বে এই কমিটি গঠিত হয়। নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য এই কমিটির যে সুপারিশগুলি করে তা হল - নারী শিক্ষার সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা। নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য কেন্দ্রীয় স্তরে একটি জাতীয় পর্ষদ এবং রাজ্যস্তরে অনুরূপ একটি পর্ষদ গঠন করা। যেসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোন শিক্ষিকা নেই, সেখানে কমপক্ষে একজন গুরু মা নিয়োগ করার ওপর জোর দেওয়া হয়। মাধ্যমিক স্তরের ছেলে-মেয়েদের জন্য পৃথক পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।
- **হংস মেহেতা কমিটি (১৯৬১):** পূর্ববর্তী কমিটির সুপারিশ গুলির ভিত্তিতে নারী শিক্ষার অগ্রগতি আশাপ্রদ ছিল না। তাই ১৯৬১ সালে শ্রীমতি হংস মেহেতার নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সুপারিশে বলা হয়- মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের জন্য পৃথক পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা করা, মেয়েদের উপযোগী বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করা, বিজ্ঞান পাঠে মেয়েদের উৎসাহিত করার কথা বলা।[১১] শিক্ষাগত পেশায় মেয়েদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথাও বলা হয়।
- **ভক্তবৎসলম কমিটি (১৯৬৩):** মাদ্রাজের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ভক্তবৎসলম-এর নেতৃত্বে এই কমিটি গঠিত হয়। নারী শিক্ষা সম্পর্কিত এই কমিটির সুপারিশগুলি হল- নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগকে গুরুত্ব দেওয়া। মেয়েদের জন্য তাদের বাসস্থানের পাঁচ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে অন্তত একটি করে মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করার কথা বলা হয়। ছাত্রী ও শিক্ষিকাদের

থাকার জন্য হোস্টেলের ব্যবস্থা করার সুপারিশ করা হয়। দরিদ্র মেয়েদের বিনামূল্যে বই ও পোশাক দেওয়ার ব্যবস্থা করার ওপর জোর দেওয়া হয়।[১২]

- **ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬):** ড. ডি. এস. কোঠারির নেতৃত্বে ভারতীয় শিক্ষা কমিশন বা কোঠারি কমিশন গঠিত হয়। নারী শিক্ষার অগ্রগতি বিষয়ে এই কমিটির সুপারিশ গুলি হল - শিক্ষাক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়। মেয়েদের শিক্ষা দানের জন্য পৃথক বিদ্যালয় ও হোস্টেলের ব্যবস্থা করার ওপর জোর দেওয়া হয়। মেয়েদের জন্য পাঠ্যক্রমে চারুকলা, সঙ্গীত ও গার্হস্থ্য বিজ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার স্তরে নারী শিক্ষার প্রসার ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হয়।[১৩]
- **জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৬৮):** সামাজিক ন্যায়বিচার ও সামাজিক পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করার জন্য এই শিক্ষানীতি নারী শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে।এই শিক্ষা নীতিতে শিক্ষা ক্ষেত্রে লিঙ্গগত বৈষম্য হ্রাস করার উপর জোর দেওয়া হয়। মেয়েদের শিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্য হোস্টেলের ব্যবস্থা করা ও বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করার সুপারিশ করা হয়।[১৪] সমাজে নারী শিক্ষার অগ্রগতির জন্য বিভিন্ন স্তরে সচেতনতা বৃদ্ধির উপর এই শিক্ষা নীতিতে গুরুত্ব আরোপ করা হয়।
- **জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৮৬):** এই শিক্ষা নীতিতে নারী শিক্ষার উন্নয়নের জন্য যে কয়েকটি সুপারিশ করা হয়েছিল তা হল- মেয়েরা যাতে তাদের পুরো শিক্ষাকাল বিদ্যালয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে সে ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। সমাজের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নারীদের শিক্ষার পাঠ্যক্রম প্রণয়নের উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়। 'নারী শিক্ষা' (Women's Studies) কে পৃথক বিষয় হিসাবে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়। মেয়েদের জন্য তাদের উপযোগী বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করার উপর জোর দেওয়া হয়। এদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করার কথাও বলা হয়। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে যাতে কোনো রকম বিভেদ করা না হয় সে ব্যাপারেও এই শিক্ষা নীতি সুপারিশ করে।
- **জাতীয় সাক্ষরতা মিশন (১৯৮৮):** এই কর্মসূচিতে গ্রামের, উপজাতি ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল পরিবারের মেয়েদের সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়। মেয়েদের জন্য তাদের বাড়ির কাছে সাক্ষরতা শিবিরের ব্যবস্থা করার ওপর জোর দেওয়া হয়। গৃহবধূ ও অন্যান্য কাজের সাথে যুক্ত মহিলাদের শিক্ষাদানের সময়সূচী নমনীয় করার কথা বলা হয়। এই কর্মসূচির অংশস্বরূপ 'সম্পূর্ণ সাক্ষরতা অভিযান' গ্রহণ করা হয়, যেখানে শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। এই অভিযানে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষক সকলেই ছিলেন মহিলা,যা তাঁদের আত্মবিশ্বাস ও নেতৃত্বদানের ক্ষমতাবৃদ্ধি করেছিল। মেয়েদের শিক্ষা দানের মাধ্যমে তাদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য তাদের ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথাও বলা হয়।
- **মহিলা সমাখ্যা কর্মসূচি (১৯৮৮):** ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল মূলত গ্রামীণ ও পিছিয়ে পরা নারীদের ক্ষমতায়ন ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা। নারী শিক্ষার মাধ্যমে সমাজে বিদ্যমান লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য দূর করে সমতা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। নারী শিক্ষা বিষয়ে সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে নারীদের স্বনির্ভর ও আত্মবিশ্বাসী করে তোলা।[১৫]
- **প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশন (১৯৯২):** জাতীয় শিক্ষানীতি, ১৯৮৬-এর বাস্তবায়নের জন্য প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশন কর্মসূচি গৃহীত হয়েছিল। এতে সামাজিক পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে নারী শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। মেয়েদের স্কুলে ভর্তি, নিয়মিত উপস্থিতি ও স্কুলের নির্দিষ্ট শিক্ষাকাল পর্যন্ত

পড়াশোনা চালিয়ে যাবার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল। বয়স্ক শিক্ষা ও অপ্রথাগত শিক্ষার মাধ্যমে নারী শিক্ষার প্রসারের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। মেয়েদের জন্য বিনামূল্যে বই, পোশাক সহ হোস্টেলের সুবিধা ও বিভিন্ন ধরনের বৃত্তির ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছিল। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা নিয়োগ ও তাঁদের প্রশিক্ষণ দানের কথাও বলা হয়েছিল।

- **জাতীয় জনসংখ্যা নীতি (২০০০):** ভারত সরকার প্রণীত এই নীতিতে নারী শিক্ষাকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্যগত উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। নারী শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে জনসংখ্যার স্থিতিশীলতার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে মেয়েদের প্রাথমিক, মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে স্বাস্থ্য,পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, মাতৃ মৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস করার উপর জোর দেওয়া হয়।[১৬]
- **সর্বশিক্ষা অভিযান (২০০১):** এই কর্মসূচির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল নারী শিক্ষার প্রসার ঘটানো। এজন্য গ্রাম ও প্রত্যন্ত এলাকায় নতুন নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা, মেয়েদের জন্য বাড়ির কাছে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা, বিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ভর্তি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাগত সমতা আনা, মেয়েদের স্কুল ছুট রোধে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছিল। তপশিলি জাতি, উপজাতি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ও প্রতিবন্ধী মেয়েদের শিক্ষার জন্য এই অভিযানে বিশেষ সহায়তা প্রদান করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।
- **জাতীয় শিক্ষানীতি (২০২০):** এই শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত মেয়েদের জন্য সমান সুযোগ দানের কথা বলা হয়েছিল। এছাড়া মেয়েদের স্কুলে ভর্তি, উপস্থিতি বাড়ানো, স্কুল-ছুট কমানো, জীবনমুখী দক্ষতা বৃদ্ধিকারী কর্মসংস্থান সংক্রান্ত শিক্ষা প্রদানের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিজ্ঞান, প্রযুক্তিগত শিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও সর্বোপরি মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে তাদের আত্মবিশ্বাস ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছিল।[১৭]

২য় উদ্দেশ্য- স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে নারী শিক্ষার সমস্যাগুলির উপর আলোকপাত করা।

সংবিধানে পুরুষ-নারীদের সমান অধিকার আইনগতভাবে স্বীকৃত হলেও স্বাধীনতার প্রায় সাত দশক পরেও নারী শিক্ষার অবস্থা কাঙ্খিত জায়গায় পৌঁছাতে পারেনি। এর গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতাগুলি হল-

(ক) সামাজিক প্রতিবন্ধকতা- নারী ও পুরুষ সমাজের দুই প্রধান স্তম্ভ। সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারী শিক্ষার প্রতিবন্ধকতাগুলি নিম্নরূপ-

(i) রক্ষণশীলতা: ভারতীয় রক্ষণশীল, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা মেয়েদের বাড়ির বাইরে বেরিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে। সমাজের একাংশের এই ধরনের চিন্তাভাবনা নারী শিক্ষার প্রসারের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।[১৮]

(ii) বাল্যবিবাহ: বিশেষত গ্রামাঞ্চলে একটি বড় অংশের মেয়েদের ১৮ বছরের আগে বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের পর এই সমস্ত মেয়েরা পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারেনা, তাই ভারতীয় সমাজে বাল্যবিবাহ নারীশিক্ষার অগ্রগতির পথে অন্যতম একটি বাধা হিসাবে কাজ করে।

(iii) **অভিভাবকদের নিরক্ষরতা:** সাধারণত অভিভাবকরা যদি নিরক্ষর হন তাহলে তাঁরা তাঁদের মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ যত্নবান হন না। ফলে অভিভাবকদের বিশেষত মায়েদের নিরক্ষরতা মেয়েদের শিক্ষার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

(iv) **সচেতনার অভাব:** পরিবারের অভিভাবক সহ বয়স্ক মানুষদের একাংশের মধ্যে মেয়েদের শিক্ষা নিয়ে সচেতনতার অভাব রয়েছে। ছেলে সন্তানের শিক্ষার ব্যাপারে তাঁরা যতটা যত্নবান হন, মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁরা অবহেলা দেখান। এই সচেতনার অভাবই নারী শিক্ষার অন্যতম প্রতিবন্ধকতা।

(খ) মনোবৈজ্ঞানিক প্রতিবন্ধকতা-

(i) **অভিভাবকদের মানসিকতা:** মেয়েদের শিক্ষা অনেকাংশে নির্ভর করে অভিভাবকদের পড়াশোনার প্রতি মনোভাব ও মানসিকতা থেকে। অভিভাবকদের আর্থিক অবস্থা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা যাই হোক না কেন অভিভাবকরা যদি মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে না চান তাহলে নারী শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

(ii) **অবহেলা:** পুরুষতান্ত্রিক সমাজে অনেক ক্ষেত্রে মনে করা হয় মেয়েরা বৌদ্ধিক কাজে পারদর্শী নয়। পরিবারে কন্যা সন্তান অপেক্ষা পুত্র সন্তানকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই ধরনের অবহেলা নারী শিক্ষার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

(গ) ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা-

(i) **অপব্যাখ্যান:** কিছু সুবিধাভোগী মানুষ ধর্মের অপব্যাখ্যান দিয়ে নারীদের শৃঙ্খলিত করে চলেছে। ফলস্বরূপ মেয়েরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। এর ফলে মেয়েদের মধ্যে অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কারগ্রস্থ হওয়ার প্রবণতা বাড়ছে ।

(ii) **প্রাচীন প্রথা:** মধ্যযুগের সমাজে নারীর অবস্থানের অবনতি হতে থাকে। পরবর্তী সময়ে বাল্যবিবাহ, সতীদাহ প্রথা ইত্যাদির প্রভাবে নারীদের অবস্থার অবনতি হয়। ফলস্বরূপ মেয়েরা শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে থাকে।

(ঘ) অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা-

(i) **দরিদ্রতা:** দরিদ্রতার কারণে অভিভাবকরা অনেক সময় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে চান না। অনেক ক্ষেত্রেই কন্যা সন্তানকে বাড়িতে রেখে গৃহ কর্মের সাথে যুক্ত করেন বা অন্যান্য কোন কাজের সাথে যুক্ত করে দেন।

(ii) **অপুষ্টি:** ভারতীয় সমাজে বিশেষত গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের মধ্যে অপুষ্টি জনিত সমস্যা দেখা যায়। দরিদ্রতাসহ অন্যান্য কারণে মেয়েদের মধ্যে অপুষ্টি দেখা যায়। এই পরিস্থিতিতে ধারাবাহিকভাবে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।[১৯]

(iii) **শিশুশ্রমিক:** সরকারি আইনের চোখকে ফাঁকি দিয়ে মেয়েদের কারখানায়, কৃষিকাজে, ইঁট ভাটায় শিশু শ্রমিক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এই শিশু শ্রমের প্রবণতা মেয়েদের তাদের পড়াশোনা থেকে দূরে ঠেলে দেয়।

(ঙ) শিক্ষাগত প্রতিবন্ধকতা-

(i) **মেয়েদের স্কুলের অভাব:** অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবকরা তাঁদের মেয়েদের বিশেষভাবে বালিকা বিদ্যালয়ে পাঠাতে চান। কিন্তু প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল, যা নারী শিক্ষার পথে বাধা হয়ে উঠেছে।

(ii) হোস্টেলের অভাব: মূলত গ্রামাঞ্চল বা দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে মেয়েরা বাড়ির কাছাকাছি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ার সুযোগ পায় না, এক্ষেত্রে স্কুলে মেয়েদের হোস্টেল থাকা খুব দরকার। মেয়েদের হোস্টেলের অভাব নারী শিক্ষার অন্যতম একটি প্রতিবন্ধকতা।

(iii) অপচয় ও অনুন্নয়ন: সংবিধানে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলা হলেও সমাজের একাংশ এখনো বিদ্যালয়মুখি হয়নি। যারা বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে তাদের মধ্যে অনেকে দরিদ্রতা, বাড়ি ও স্কুলের মধ্যে ব্যাপক দূরত্ব, অল্প বয়সে বিবাহ ইত্যাদি কারণে নির্দিষ্ট পাঠ শেষ না করেই বিদ্যালয় ত্যাগ করছে। আবার কিছু সংখ্যক মেয়েরা একই শ্রেণীতে বছরের পর বছর থেকে যাচ্ছে, এই অপচয় ও অনুন্নয়ন নারী শিক্ষার প্রসারের অন্যতম বাধা।[২০]

(iv) পরিকাঠামোর অভাব: মেয়েরা শিক্ষা গ্রহণের জন্য যে সমস্ত সহশিক্ষা মূলক প্রতিষ্ঠান বা বালিকা বিদ্যালয়ে যায়, সেখানে উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে। পৃথক কমনরুম, পৃথক পরিষ্কার শৌচালয়, যথাযথ শ্রেণীকক্ষ, পরিশুদ্ধ পানীয় জল, উপযুক্ত লাইব্রেরী, পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার অভাব, পর্যাপ্ত মিড্ ডে মিলের অব্যবস্থা ইত্যাদি কারণে মেয়েরা স্কুলে যেতে স্বচ্ছন্দ বোধ করে না, তাদের শিক্ষা গ্রহণের পথে এই ধরনের পরিকাঠামোর অভাব বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

৩য় উদ্দেশ্য: স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে জানা।

শিক্ষা শুধুমাত্র নারী ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করে না বরং এটি তাঁদের অর্থনৈতিক ভাবে শক্তিশালী হতে শেখায়। ভারতে নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য সরকারিভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-

- **কস্তুরবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় (২০০৪):** সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল এবং বিদ্যালয় ছুট মেয়েদের শিক্ষার জন্য ভারত সরকার এই কর্মসূচি গ্রহণ করে।
- **মাধ্যমিক স্তরের মেয়েদের জন্য জাতীয় উৎসাহ প্রকল্প (২০০৮):** কেন্দ্রীয় সরকার গৃহীত এই প্রকল্পের মাধ্যমে মাধ্যমিক স্তরের মেয়েদের বিদ্যালয়-ছুট দূর করে তাদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখার বাবস্থা করা হয়। এজন্য প্রতিটি যোগ্য ছাত্রীদের নামে ৩০০০ টাকা স্থায়ী আমানত করা হয়।
- **বেটি বাঁচাও ও বেটি পড়াও (২০১৫):** ভারত সরকার গৃহীত এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হল- লিঙ্গগত বৈষম্য দূর করা ও বিদ্যালয় স্তরে মেয়েদের ভর্তির হার বৃদ্ধি করা।
- **উড়ান (২০১৫):** ভারত সরকারের এই শিক্ষা সহায়তা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল সংখ্যালঘু ও অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল পরিবারের মেয়েদের শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়ন করা।
- **বৃত্তি সমূহ :** মূলত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন নারী শিক্ষার অগ্রগতির জন্য দুধরনের বৃত্তির ব্যবস্থা করেছে-

➢ স্বামী বিবেকানন্দ সিঙ্গেল গার্লস চাইল্ড স্কলারশিপ ফর রিসার্চ ইন সোশ্যাল সাইন্সেস
➢ পোস্ট গ্রাজুয়েট ইন্দিরা গান্ধী স্কলারশিপ ফর সিঙ্গেল গার্ল চাইল্ড
➢ পোস্ট-ডক্টরাল ফেলোশিপ টু ওমেন ক্যান্ডিডেটস

পশ্চিমবঙ্গ সরকার নারী শিক্ষার অগ্রগতির জন্য বেশ কিছু প্রকল্প গ্রহণ করে। সেগুলি হল-

- **কন্যাশ্রী প্রকল্প (২০১৩):** মেয়েদের শিক্ষালয়ে ধরে রাখা, আর্থিকভাবে ক্ষমতায়ন করা ও বাল্যবিবাহ বন্ধ করার জন্য এই প্রকল্পটি চালু হয়। এই প্রকল্পে অষ্টম-দ্বাদশ শ্রেণীর যোগ্য ছাত্রীদের জন্য বাৎসরিক ও এককালীন অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়।
- **সবুজ সাথী প্রকল্প (২০১৫):** স্কুলগামী মেয়েদের ক্ষমতা বৃদ্ধি, নিয়মিত স্কুলে যেতে উৎসাহিত করা ও উচ্চশিক্ষায় বিদ্যালয়-ছুট দূর করার জন্য বিনামূল্যে সাইকেল বিতরণের লক্ষ্যে এই প্রকল্পটি গৃহীত হয়।

সর্বোপরি, নারী শিক্ষার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্নস্তরে ওয়ার্কশপ ও সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে। মেয়েদের দক্ষতা ও স্বনির্ভরতা বৃদ্ধির জন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থ্যা করা হচ্ছে।

উপসংহার:

মূলত সামাজিক পশ্চাৎপরতার কারণে অতীতে ভারতবর্ষে নারী শিক্ষার অগ্রগতির ধারা ছিল ধীর প্রকৃতির। পরবর্তী সময়ে সাংবিধানিক বিধান,সরকারি নীতি ও বিভিন্ন কমিটি, কমিশনের সুপারিশে নারী শিক্ষা ধীরে ধীরে প্রসারিত হতে থাকে। বর্তমানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন, খেলাধুলা, প্রশাসন, রাজনীতি সমস্ত ক্ষেত্রেই মেয়েরা পুরুষদের মত সমান অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

যদিও গ্রামের মানুষদের মধ্যে নারী শিক্ষার ব্যাপারে ধীরে ধীরে সচেতনতা বাড়ছে, আরো বেশি সংখ্যক মেয়েরা উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণ করছে, তবুও প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে দরিদ্রতা, কুসংস্কার, লিঙ্গগত বৈষম্য, নিরাপত্তার অভাব, পিতৃতান্ত্রিক মনোভাব প্রভৃতি নারী শিক্ষার পথে বাধা হয়ে রয়েছে। ভারত সরকার ও বিভিন্ন রাজ্য সরকার নারী শিক্ষার অগ্রগতির জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণ করেছে কিন্তু সেগুলিকে কার্যকরী ভাবে তৃণমূল স্তরে বাস্তবায়িত করা সম্পূর্ণভাবে সম্ভব হয়নি।

সর্বোপরি, নারী শিক্ষার প্রকৃত উন্নতির জন্য সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন ও বৃহত্তর সচেতনতার প্রয়োজন। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, প্রশাসন সকলকেই সদর্থক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষত মায়েদের নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য সচেতন করা বিশেষ প্রয়োজন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু যথার্থই বলেছেন,

> "একজন পুরুষকে শিক্ষিত করলে একজন ব্যক্তিকেই শিক্ষিত করা হয়, কিন্তু একজন নারীকে শিক্ষিত করলে একটি সম্পূর্ণ পরিবারকে শিক্ষিত করা হয়। নারী ক্ষমতায়ন মানেই ভারত মাতার ক্ষমতায়ন।"[২১]

তথ্যসূত্র:

১. রহমান, মুর্শিদা। স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শনে নারীমুক্তি এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। কলা অনুষদ পত্রিকা, ১৩ (১৮), ২০২৩,পৃ. ২৩৩-২৪৪।

২. Chakraborty, Prosenjit & Varma, Vandana. Evaluation of Women's Education During Pre and Post Independence in India. *Elementary Education Online* 20(5), 2023: pp. 8482–8488. https://ilkogretim-online.org/index.php/pub/article/view/3936.

৩. Government of India. NSO data (2019–21). Female literacy rate in India. 2022.

৪. Anju. *Indian Concept of Women Education*. As cited in "Women Education in India: Issues and Challenges," *International Journal of Creative Research Thoughts* (IJCRT), vol. 9, no. 1, 2021.

৫. Bhat, Rouf. Role of Education in the Empowerment of Women in India. Journal of Education and Practice, 6(10), 2015, pp. 188-191.

৬. Sahoo, Sanjukta. Girls' Education in India: Status and Challenges. International Journal of Research in Economics and Social Sciences, 6 (9), 2016, pp. 130–141.

৭. Mandal, Parimal. A Study on the Development of Women Education in India in the Light of Government Initiatives. International Journal of Creative Research Thoughts, 9(1), 2021, pp. 2721-2735.

৮. Mir, Aadil & Swaroopa. Women Education in India: Issues and Challenges. *International Journal of Educational Knowledge and Social Sciences* 3(5), 2024, pp. 210–218.

৯. ভক্তা, ভক্তি ভূষণ ও ভক্তা, চন্দন। ভারতীয় শিক্ষার রূপরেখা। অ আ ক খ প্রকাশনী, পূর্ব মেদিনীপুর, ২০০১, পৃ. ৪৪৬।

১০. তদেব, পৃ. ৪৪৬।

১১. তদেব, পৃ. ৪৪৭-৪৪৮।

১২. মন্ডল, অজিত ও বাগ, অনুপ। ভারতবর্ষে নারীশিক্ষা। আহেলি পাবলিশার্স, কোলকাতা, ২০২২, পৃ. ১১৪-১১৭।

১৩. তদেব, পৃ. ১০৩-১০৫।

১৪. তদেব, পৃ. ৮৮-৯০।

১৫. Mahila Samakhya: A National Review. Ravi Matthai Centre for Educational Innovation, Indian Institute of Management Ahmedabad, 2014.

১৬. Government of India. National Population Policy 2000. Reprint. New Delhi: Ministry of Health and Family Welfare, Department of Family Welfare, 2002.

১৭. Government of India, Ministry of Human Resource Development. National Education Policy 2020. Government of India, 2020, https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/nep/2020/BENGALI.pdf.

১৮. Sing, Bapan, Acharjee, Koushik & Jana, Koushik. Development and Obstacles of Women Education in Independent India. Journal of Emerging Technologies and Innovative Research, 2020, 7(5), pp.1186-1193, www.jetir.org

১৯. Mishra, V. K. and Retherford, R. D. Women's Education Can Improve Child Nutrition in India. National Family Health Survey (NFHS), no. 15. Mumbai: International Institute for Population Sciences, 2000. ISSN 1083-8678.

২০. ইসলাম, নুরুল। ভারতীয় শিক্ষা-ইতিহাসের রূপরেখা। শ্রীধর প্রকাশনী, কোলকাতা,২০১৮, পৃ. ১৭২

২১. Shetty, Sowjanya and Hans. V. B. Role of Education in Women Empowerment and Development: Issues and Impact. September 26, 2015. SSRN. https://ssrn.com/abstract =266589

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 768-778
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.288

বাংলাদেশের নির্বাচিত নাটকে নারী চরিত্রে প্রান্তিকতার উপস্থাপন

ড. আইরিন পারভিন, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজা বীরেন্দ্র চন্দ্র কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 12.03.2026; Accepted: 13.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The representation of female characters in Bangladeshi drama is often closely associated with marginality. This paper analyzes the position of women in Bangladeshi dramatic literature, their marginalization within socio-political contexts, and the perspectives of playwrights. Historically, from the colonial period to the post-independence era, women have been portrayed as victims of a patriarchal society, a condition reflected through war, poverty, gender discrimination, and cultural conflict. Through illustrative analyses of plays by Syed Shamsul Haq, Selim Al Deen, and others, the study demonstrates that female marginality is not merely a symbol of subjugation but also of resistance. These representations mirror gender-based inequalities in society and stimulate movements for women's emancipation. The discussion explores women's marginality from both literary and sociological perspectives, making it significant for cultural studies in Bangladesh.

Keywords: Women's Representation, Marginality, Bangladeshi Drama, Patriarchy, Feminism, Selim Al Deen, Syed Shamsul Haq, Gender Inequality, Resistance, Cultural Conflict

বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে নারীর উপস্থাপন একটি জটিল এবং বহুমুখী বিষয়। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত, নাটকে নারী চরিত্রগুলি সমাজের লিঙ্গভিত্তিক গতিশীলতা, অর্থনৈতিক অসমতা এবং সাংস্কৃতিক চাপের প্রতিফলন ঘটিয়েছে। প্রান্তিকতা (marginality) এখানে একটি কেন্দ্রীয় থিম, যা নারীকে সমাজের প্রান্তে ঠেলে দেয় এবং তাদের অস্তিত্বের সংকটকে তুলে ধরে। এই আলোচনাপত্রে আমরা বাংলাদেশের নাটকে নারীর প্রান্তিকতার উপস্থাপনকে বিশ্লেষণ করব, যা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের দ্বারা সৃষ্ট বৈষম্য, যুদ্ধের প্রভাব এবং নারীমুক্তির আন্দোলনের সাথে জড়িত।

বাংলাদেশের নাট্য ইতিহাস উপনিবেশকালীন যুগ থেকে শুরু করে স্বাধীনতা-উত্তর যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকে নারীকে জাতীয়তাবাদী প্রতীক হিসেবে দেখা যায়, যেখানে তারা ঐতিহ্যবাহী ভূমিকায় থেকেও প্রতিরোধ দেখায়। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে, বিশেষ করে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের পর, নাট্যকাররা নারীর প্রান্তিকতাকে যুদ্ধের আঘাত, ধর্ষণ এবং সামাজিক অবহেলার মাধ্যমে চিত্রিত করেছেন। এই উপস্থাপনা কেবল নারীর দুর্দশা দেখায় না, বরং তাদের শক্তি এবং প্রতিরোধকেও তুলে ধরে।

এই আলোচনার উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের নির্বাচিত কিছু নাটকে নারীর প্রান্তিকতার বিভিন্ন মাত্রা অনুসন্ধান করা। এখানে সাহিত্য পর্যালোচনা, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং নির্দিষ্ট নাটকের বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই বিষয়কে গভীরভাবে আলোচনা করব। এটি নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজের লিঙ্গভিত্তিক অসমতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে এবং ভবিষ্যতের নাট্যসাহিত্যের জন্য দিকনির্দেশনা দেবে।

সাহিত্য পর্যালোচনা:

বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে নারীর উপস্থাপন এবং প্রান্তিকতার বিষয়টি বিভিন্ন গবেষণা এবং সমালোচনামূলক কাজের মাধ্যমে অনুসন্ধান করা হয়েছে। এই পর্যালোচনায় আমরা বাংলা নাটকের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে শুরু করে সমসাময়িক নাটক পর্যন্ত নারী চরিত্রের বিবর্তন, তাদের প্রান্তিক অবস্থান এবং সামাজিক-রাজনৈতিক প্রভাবগুলোকে বিশ্লেষণ করব। বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে নারীকে প্রায়শই পিতৃতান্ত্রিক সমাজের শিকার হিসেবে চিত্রিত করা হয়, যা উপনিবেশকালীন যুগ থেকে স্বাধীনতা-উত্তর যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই উপস্থাপনা কেবল নারীর দুর্দশা দেখায় না, বরং তাদের প্রতিরোধ এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার গল্পও তুলে ধরে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নাট্যসাহিত্যে নারীর অবস্থান নিয়ে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় যে, নারী চরিত্রগুলো প্রধানত ঐতিহ্যবাহী ভূমিকায় সীমাবদ্ধ ছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকে নারীকে জাতীয়তাবাদী প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যেখানে তারা ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার মধ্যে প্রান্তিক অবস্থানে থাকে। এই যুগে নাটকে নারীকে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রান্তিকতার শিকার হিসেবে দেখানো হয়েছে, যা 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের মতো কাজে প্রতিফলিত। 'শত বছরের বাংলা নাটকে নারীর অবস্থান' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঊনবিংশ থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত নারী চরিত্রের মধ্যে সামাজিক পরিবর্তন প্রতিফলিত হয়েছে, যা নারীর চেতনা এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সাথে জড়িত। দীনবন্ধু মিত্রের নাটকে নিম্নবর্গীয় নারীর মাতৃত্বকে একধরনের প্রতিরোধের মাধ্যম হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা সমাজের পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর বিরুদ্ধে নারীর লড়াইকে তুলে ধরে। নারীকে পরিবারিক বন্ধন এবং মাতৃত্বের মাধ্যমে প্রান্তিকতা থেকে মুক্তির পথ দেখানো হয়েছে, যা সামাজিক অসমতার একটি সমালোচনা।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে নারীর প্রান্তিকতা আরও জটিল রূপ নেয়, বিশেষ করে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের প্রভাবে। সেলিম আল দীনের নাটকে নারী চরিত্রের পারিবারিক, সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনায় দেখা যায় যে, তাঁর নাটকে নারীকে প্রান্তিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। সেলিম আল দীনের নাটক দেশজ সংস্কৃতি থেকে অনুপ্রাণিত, যেখানে নারী যুদ্ধের শিকার এবং সামাজিক অবহেলার প্রতীক। তাঁর নাটকে নারীর মনস্তাত্ত্বিক গভীরতা বিশ্লেষিত হয়েছে, যা প্রান্তিকতার মাত্রা। যেমন পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ, পুরুষের অধীনতা এবং সামাজিক বঞ্চনা তুলে ধরে। উদাহরণস্বরূপ, তাঁর নাটকে নারীকে নিম্নবিত্তের প্রান্তিক জীবনের অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে, যেখানে তারা পুরুষের নিয়ন্ত্রণাধীন থেকেও প্রতিরোধ সত্তাকে তুলে ধরে।

সৈয়দ শামসুল হকের নাটকে নারীর উপস্থাপন আরও ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক মাত্রা নেয়। তাঁর 'নারীগণ' নাটকে নবাব মহলে বন্দি নারীদের উপলব্ধি এবং জীবন-বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে, যা প্রান্তিকতার একটি ঐতিহাসিক চিত্র। এই নাটকে নারীকে অধীনতার প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়েছে, কিন্তু তাদের প্রতিরোধও উঠে আসে নাটকের বিষয়ে। নবাব সিরাজউদ্দৌলার হত্যার পর অন্তঃপুরে বন্দি নারীদের জীবন চিত্রিত হয়েছে, যা উপনিবেশের প্রকৃতি এবং যুদ্ধের পরিণতিকে তুলে ধরে। এখানে নারীকে লুণ্ঠিত এবং ধর্ষিত

হিসেবে দেখানো হয়েছে, যা প্রান্তিকতার একটি গভীর মাত্রা। সৈয়দ শামসুল হকের নাটক উপনিবেশকালীন যুগের নারীদের মর্যাদা, ইচ্ছার স্বাধীনতা এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণকে অনুসন্ধান করে।

আধুনিক বাংলাদেশের নাটক এবং মিডিয়ায় নারীর উপস্থাপন নিয়ে গবেষণায় দেখা যায় যে, টেলিভিশন নাটকে নারী চরিত্রের বিবর্তন ঘটেছে। 'বাংলাদেশের টেলিভিশন নাটকে নারীর পরিবেশনা' নামক গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, নাটকে নারীকে বাস্তবজীবনের সাথে সংযুক্ত করে উপস্থাপন করা উচিত। এখানে নারী চরিত্র নির্মাণে পিতৃতান্ত্রিক প্রভাব লক্ষণীয়, যা নারীকে গৃহবধূ, যৌনকর্মী বা উচ্চাকাঙ্ক্ষী অভিনেত্রী হিসেবে দেখায়। আব্দুল্লাহ আল-মামুনের 'কোকিলারা' নাটকে যৌন-রাজনীতি এবং নিম্নবর্গীয় নারীর চিত্রায়ন দেখানো হয়েছে, যা নারীর প্রান্তিকতাকে পিতৃতান্ত্রিক অত্যাচারের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে। এই নাটকে নারীকে পুরুষের অধীনতার শিকার হিসেবে দেখানো হয়েছে, যেখানে তাদের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বও প্রতিফলিত কোকিলার উক্তিতে-

> "...তদ্দিনে আমার বোঝা সারা, এই দুনিয়াটা আল্লায় বানাইছে কেবল পুরুষ গো লিগা। এইহানে মাইয়া মানুষের বাঁচনের পথ নাই। এই দুনিয়া পুরুষের বাচ্চার ফুর্তির জায়গা। দেশেও হেগো ফুর্তি। বিদেশেও। তাই ঠিক করলাম, বাঁচুম না। এই দুনিয়ায় বাঁইচ্যা থাকলে আমার জিন্দিগিতে আরও পুরুষ আসব। আমারে বেশ্যা বানাইয়া ছাইরা দিব। তারথন ভাল মইরা খোদার কাছে গিয়া বিচার চাই।"[১]

প্রান্তিকতার থিম নিয়ে গবেষণায় দেখা যায় বাংলাদেশের সাহিত্যে নারীকে প্রবাসীত্ব, যুদ্ধ এবং সামাজিক অসমতার মাধ্যমে চিত্রিত করা হয়েছে। মনিকা আলীর 'ব্রিক লেন' এবং তাহমিমা আনামের উপন্যাসে প্রবাসী নারীর প্রান্তিকতা দেখানো হয়েছে, যা নাট্যসাহিত্যেও অনুরূপ। এখানে নারীকে 'অদরিং' এবং পরিচয় গঠনের মাধ্যমে প্রান্তিক করা হয়েছে, যেখানে মাইগ্রেশনের প্রভাবও নারীর জীবনকে পরিবর্তন করে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর প্রান্তিকতা নিয়ে আলোচনায় দেখা যায় যে, তারা প্রতীকী উপস্থিতিতে সীমাবদ্ধ, যা নাটকে প্রতিফলিত। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র এবং টিভিতে নারীর উপস্থাপন নিয়ে বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, নারীকে স্টিরিওটাইপিক্যালভাবে দেখানো হয়, যা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রতিফলন। এই আলোচনায় তাই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মিডিয়ায় নারীকে virago, subordinate বা house maker হিসেবে দেখানো হয়, যা সামাজিক মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যে নারী চরিত্রের উপস্থাপনও প্রাসঙ্গিক, যেখানে নারীকে স্বাধীনচেতা এবং প্রগতিশীল হিসেবে দেখানো হয়েছে। তাঁর গল্প এবং নাটকে নারীর বঞ্চনা, প্রতিবাদ এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা তুলে ধরা হয়েছে, যা অ-বিভক্ত ও বিভক্ত বাংলাদেশের নাট্যকারদের প্রভাবিত করেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় নারীকে ছকভাঙারূপে দেখানো হয়েছে, যেমন 'পদ্মানদীর মাঝি'র কপিলা, যা নাট্যসাহিত্যে প্রান্তিক নারীর চিত্রায়নে অনন্য।

এছাড়া, বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর মার্জিনালাইজেশন নিয়ে ভাবনায় দেখা যায় যে, তারা সিম্বলিক পার্টিসিপেশনে সীমাবদ্ধ। বাংলাদেশের নাটকে নারীর প্রান্তিকতা একটি চলমান থিম, যা সাহিত্যিক এবং সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়নের জন্য উর্বর ক্ষেত্র।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে নারীর উপস্থাপন এবং প্রান্তিকতার বিষয়টি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ছাড়া সম্পূর্ণরূপে বোঝা সম্ভব না। এই প্রেক্ষাপট উপনিবেশকালীন যুগ থেকে শুরু করে স্বাধীনতা-উত্তর যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত, যেখানে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনগুলো নারী চরিত্রের চিত্রায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় নারীর প্রান্তিকতা পিতৃতান্ত্রিক সমাজ এবং উপনিবেশবাদের দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর যুগে, বিশেষ করে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের পর, নারীর প্রান্তিকতা যুদ্ধের আঘাত, ধর্ষণ এবং সামাজিক পুনর্বাসনের সাথে জড়িত। এই অংশে আমরা এই ঐতিহাসিক বিবর্তনকে মনে করব, যা বাংলাদেশের নাট্যকারদের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করেছে।

উপনিবেশকালীন যুগ (ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দী):

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় নারীর প্রান্তিকতা একটি গভীর সামাজিক সমস্যা ছিল, যা উপনিবেশবাদ এবং পিতৃতান্ত্রিক সমাজের দ্বারা তীব্রতর হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনকালে, বাংলার শহুরে অভিজাত শ্রেণী নারীর শিক্ষা এবং স্বাধীনতা নিয়ে সূক্ষ্ম মতভেদ দেখিয়েছে, কিন্তু সাধারণত নারীকে ঘরোয়া ভূমিকায় সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। সুমন্ত ব্যানার্জির গবেষণায় দেখা যায় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে নারীর জনপ্রিয় সংস্কৃতি (যেমন যাত্রা, পাঁচালী, কবিগান) প্রান্তিকীকরণের শিকার হয়েছে। ব্রিটিশ শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোক নারীর এই সাংস্কৃতিক অংশগ্রহণকে অশ্লীল এবং অশিক্ষিত বলে মনে করতেন, যা নারীকে সামাজিক প্রান্তে ঠেলে দিয়েছে। ক্যাপ্টেন এন. অগাস্টাস উইলার্ডের মতো ব্রিটিশ লেখকরা নারীর অজ্ঞতা এবং লাইসেন্সিয়াস গানের প্রতি আকর্ষণকে সমালোচনা করেছেন, যা ব্রিটিশ শিক্ষা এবং মূল্যবোধের মাধ্যমে নারীকে 'উদ্ধার' করার প্রচেষ্টাকে তুলে ধরে।

এই যুগে বাংলা নাট্যসাহিত্যের উত্থান ঘটে, যেখানে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, দীনবন্ধু মিত্র এবং গিরীশচন্দ্র ঘোষের মতো নাট্যকাররা নারী চরিত্রকে জাতীয়তাবাদী প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে নারীকে নিম্নবর্গীয় শোষণের শিকার হিসেবে দেখানো হয়েছে, যা উপনিবেশবাদী অত্যাচারের প্রতিফলন। নারীকে মাতৃত্ব এবং পরিবারের মাধ্যমে প্রতিরোধের প্রতীক হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে, কিন্তু তাদের স্বাধীনতা সীমিত। এই উপস্থাপনা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যেখানে নারীকে ঘরোয়া এবং নৈতিক ভূমিকায় রাখা হয়েছে। উপনিবেশকালে নারীর শিক্ষা এবং স্বাধীনতার প্রশ্ন উঠলেও, এটি প্রধানত অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, যা নিম্নবর্গীয় নারীকে আরও প্রান্তিক করে তুলেছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাথে নারীর উপস্থাপন পরিবর্তিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকে নারীকে স্বাধীনচেতা এবং প্রগতিশীল হিসেবে দেখানো হয়েছে, যেমন 'চিরকুমার সভা' বা 'রক্তকরবী'। কিন্তু এখানেও নারীর প্রান্তিকতা সামাজিক নিয়মের দ্বারা নির্ধারিত, যা পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর বিরুদ্ধে লড়াইকে তুলে ধরে। ১৯৪৭-এর বিভাজনের পর, পূর্ব পাকিস্তানে নাট্য আন্দোলন শুরু হয়, যেখানে নারীকে ভাষা আন্দোলন এবং সাংস্কৃতিক সংঘর্ষের প্রেক্ষাপটে চিত্রিত করা হয়।

বিভাজন-উত্তর এবং পূর্ব পাকিস্তান যুগ (১৯৪৭-১৯৭১):

১৯৪৭-এর বিভাজনের পর, পূর্ব বাংলায় (পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান) নাট্যসাহিত্য একটি নতুন মাত্রা নেয়। এই যুগে নারীর প্রান্তিকতা ভাষাগত, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক দমনের সাথে জড়িত। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য ছিল, কিন্তু নাটকে তাদেরকে প্রধানত পুরুষের সহায়ক ভূমিকায় দেখানো হয়েছে। মুনীর চৌধুরী এবং সৈয়দ শামসুল হকের মতো নাট্যকাররা নারীকে সামাজিক সংঘর্ষের শিকার হিসেবে চিত্রিত করেছেন। সৈয়দ শামসুল হকের নাটকে নারীর প্রান্তিকতা ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে মিলিত, যেমন 'নারীগণ' নাটকে নবাব মহলে বন্দি নারীদের জীবন। এখানে নারীকে লুণ্ঠিত এবং অধীনতার প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়েছে, যা পাকিস্তানি শাসনের প্রতিফলন।

এই যুগে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সীমিত ছিল। ফারজানা রাহমানের গবেষণায় দেখা যায় যে, নারীর রাজনৈতিক বর্জন ঐতিহাসিকভাবে ব্যক্তিগত এবং কাঠামোগত কারণে ঘটেছে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীকে

ঘরোয়া ভূমিকায় রাখতে চায়, যা নাটকে প্রতিফলিত। ১৯৬০-এর দশকে গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন শুরু হয়, যেখানে নাটক সামাজিক সমস্যা তুলে ধরে। সেলিম আল দীনের প্রভাবিত নাটক দেশজ সংস্কৃতি থেকে নেয়া, যেখানে নারী প্রান্তিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। নারীকে যুদ্ধ এবং অর্থনৈতিক অসমতার শিকার হিসেবে দেখানো হয়েছে।

স্বাধীনতা-উত্তর যুগ (১৯৭১-আধুনিক কাল):

১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন আনে। যুদ্ধে নারীর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ছিল— তারা যোদ্ধা, নার্স এবং শিকার হিসেবে অংশগ্রহণ করেছে। কিন্তু যুদ্ধ-উত্তর সমাজে নারীকে প্রান্তিকীকরণ করা হয়েছে, বিশেষ করে ধর্ষিত নারীদের সামাজিক অবহেলা। বাংলাদেশে নারীবাদের বিবর্তন উপনিবেশবিরোধী প্রতিরোধ এবং মুক্তিযুদ্ধ দ্বারা গঠিত, যা নাটকে প্রতিফলিত। সেলিম আল দীনের নাটকে নারীকে যুদ্ধের পরবর্তী সংকটে চিত্রিত করা হয়েছে, যেখানে তাদের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব উঠে আসে।

১৯৭২ সালে সংসদে নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন প্রবর্তন করা হয়, যা নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বাড়িয়েছে, কিন্তু এটি প্রতীকী। সৈয়দা লাসনা কবিরের গবেষণায় দেখা যায় যে, নারীর সার্বভৌম প্রতিনিধিত্ব সীমিত, যা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রভাবে। এই প্রেক্ষাপট নাটকে নারীর প্রান্তিকতাকে তুলে ধরে, যেমন আব্দুল্লাহ আল-মামুনের নাটকে যৌন-রাজনীতি এবং নিম্নবর্গীয় নারীর চিত্রায়ন। ১৯৮০-এর দশকে টেলিভিশন নাটকের উত্থান ঘটে, যেখানে নারীকে স্টিরিওটাইপিকাল ভাবে দেখানো হয়— গৃহবধূ, অধীনস্ত বা যৌনতার প্রতীক। এই উপস্থাপনা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রতিফলন।

আধুনিক যুগে, বাংলাদেশের নাটকে নারীর উপস্থাপন আরও বৈচিত্র্যময়। প্রবাসীত্ব, যৌনহয়রানি এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতার থিম উঠে আসে। কিন্তু প্রান্তিকতা এখনও উপস্থিত, যা রাজনৈতিক এবং সামাজিক অসমতার সাথে জড়িত। বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর প্রান্তিকতা দেখা যায় যে, তারা প্রতীকী অংশগ্রহণে সীমাবদ্ধ, যা নাটকে প্রতিফলিত। উদাহরণস্বরূপ, সমসাময়িক নাটকে নারীকে সোশ্যাল মিডিয়ায় অপব্যবহারের শিকার হিসেবে দেখানো হয়, যা ঐতিহাসিক পিতৃতন্ত্রের ধারাবাহিকতা। এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট দেখায় যে, বাংলাদেশের নাটকে নারীর প্রান্তিকতা সমাজের আয়না। উপনিবেশকাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত, নারীকে অধীনতা, প্রতিরোধ এবং মুক্তির মধ্যে চিত্রিত করা হয়েছে, যা লিঙ্গবৈষম্যের সমালোচনা করে। ভবিষ্যতে নাট্যসাহিত্যে নারীর আরও সমতামূলক উপস্থাপন দরকার, যা সমাজের পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করবে।

নির্বাচিত কিছু নাটকের বিশ্লেষণ:

বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে নারী ও প্রান্তিকতার উপস্থাপনকে গভীরভাবে বোঝার জন্য প্রধান নাটকগুলির বিশ্লেষণ অপরিহার্য। এই অংশে আমরা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটকের উদাহরণস্বরূপ বিশ্লেষণ করব, যেমন সৈয়দ শামসুল হকের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' এবং 'নুরুলদীনের সারাজীবন', সেলিম আল দীনের 'কিত্তনখোলা' এবং 'চাকা', এবং আব্দুল্লাহ আল-মামুনের 'কোকিলারা'। এই নাটকগুলিতে নারী চরিত্রগুলি পিতৃতান্ত্রিক সমাজ, যুদ্ধের আঘাত, অর্থনৈতিক অসমতা এবং সাংস্কৃতিক সংঘর্ষের মধ্যে প্রান্তিক অবস্থানে চিত্রিত হয়েছে। এই উপস্থাপনা কেবল নারীর দুর্দশা দেখায় না, বরং তাদের প্রতিরোধ এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার গল্পও তুলে ধরে। বিশ্লেষণে আমরা দেখব যে এই নাটকগুলি উপনিবেশোত্তর প্রেক্ষাপটে নারীর প্রান্তিকতাকে কীভাবে প্রতিফলিত করে।

সৈয়দ শামসুল হকের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়':

সৈয়দ শামসুল হকের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' (১৯৭৬) নাটকটি মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত একটি কাব্যনাট্য, যা বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে একটি মাইলফলক। এই নাটকে নারী চরিত্রগুলি যুদ্ধের শিকার হিসেবে প্রান্তিকীকৃত, কিন্তু তাদের মধ্যে প্রতিরোধের শক্তি লক্ষণীয়। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র 'মা' বা নারীগুলি যুদ্ধের ধ্বংসলীলা, ধর্ষণ এবং সামাজিক অবহেলার মুখোমুখি হয়। উদাহরণস্বরূপ, নাটকে একটি নারী চরিত্র যুদ্ধের পর তার সন্তানকে হারিয়ে প্রান্তিক জীবন যাপন করে, যা সমাজের পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর দ্বারা তীব্রতর হয়।

"মেয়ে। সন্তান না দেখে যদি, কে আছে দেখার?

.....

--মনে আছে? —গতকাইল সন্ধ্যার সময়?
তখন পুকুর থিকা ফিরা আসছে হাঁস,
নিজে হাতে ঘরে নিছি, খিল দিছি, শিয়াল খাটাস
য্যান নাগাল না পায়। নমাজের শেষে আম্মাজান

.....

পাকঘরের দুয়ারে। দেখি, আপনে, পটের লাহান।
'কি লাগবে? কি দিমু বা'জান?-
তার না দিয়া উত্তর
'তর মা-য়ে কই? বইলা ঘরের ভিতর
গিয়া কইলেন, পাকঘর থিকা শোনা যায়,
'মেয়েটারে মেলেটারি চায়।
কইলেন,' এতে কোনো দোষ নাই,
রাজী করছি সে হইবো আমার জামাই।'
কইলেন, কলমা পড়ায়া দিমু রীতিমতো বিয়া
না হয় দেশের ছেলে না-ই হইল, দেশ ধুইয়া
পানি খামু ? দেইখা নিও এই যুদ্ধ শেষ হইলে পর
সোনায় মুড়ায়া দিবে তোমার এ ঘর।"[২]

নাট্যকার এখানে নারীকে জাতীয়তাবাদী প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন, যেখানে তারা যুদ্ধের শিকার হলেও জাতির মুক্তির জন্য ত্যাগ স্বীকার করে। এই উপস্থাপনা উপনিবেশোত্তর প্রতিরোধের একটি উদাহরণ, যেখানে নারীকে অধীনতার প্রতীক থেকে প্রতিরোধের প্রতিনিধি হিসেবে দেখানো হয়েছে। নাটকের ভাষা কাব্যময়, যা নারীর মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বকে গভীর করে। প্রান্তিকতা এখানে শারীরিক এবং মানসিক উভয় মাত্রায় প্রকাশিত—যুদ্ধের পর নারীকে সমাজে পুনর্বাসন না করা, যা লিঙ্গবৈষম্যের সমালোচনা। এই নাটক বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদকে চ্যালেঞ্জ করে, যেখানে নারী প্রান্তিকতা জাতির ইতিহাসের অংশ।

সৈয়দ শামসুল হকের 'নুরুলদীনের সারাজীবন':

নাট্যকারের আরেকটি উল্লেখযোগ্য নাটক 'নুরুলদীনের সারাজীবন' (১৯৯৪), যা একজন সাধারণ মানুষের জীবনকাহিনী দিয়ে সমাজের প্রান্তিকতাকে তুলে ধরে। এখানে নারী চরিত্রগুলি পারিবারিক এবং সামাজিক প্রান্তে অবস্থিত। নুরুলদীনের স্ত্রী বা নারীগুলি অর্থনৈতিক দারিদ্র্য, পুরুষের অধীনতা এবং সামাজিক চাপের শিকার। নাটকে নারীকে মাতৃত্ব এবং পরিবারের রক্ষক হিসেবে দেখানো হয়েছে, কিন্তু তাদের স্বাধীনতা সীমিত। উদাহরণস্বরূপ, নুরুলদীনের জীবনের সংকটে নারী চরিত্রগুলি প্রান্তিকীকৃত হয়, যেখানে তারা সমাজের নিয়মের

দ্বারা বন্দি। এই নাটক উপনিবেশোত্তর বাংলাদেশের সামাজিক বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করে, যেখানে নারীকে গ্রামীণ জীবনের মার্জিনাল ফিগার হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে, লিসবেথ এর উক্তিতে,

> "তাহলে মহিলা নয়, রমণী? সংগিনী?
> নর্ম সহচরী?
> প্রকাশ্যে বা গোপনে সে প্রনয়িণী ছাড়া কিছু নয়?
> ভালো। এ বিষয়ে পরে কথা হবে।
> সময় সংকীর্ণ আর কোম্পানীর এমনই দুর্ভাগ্য
> যে আপনাদেরই হাতে আপাতত এ মুহূর্তে,
> রংগপুরে কোম্পানীর অস্তিত্ব মর্যাদা সব নির্ভর করছে।"[৩]

প্রান্তিকতা এখানে অর্থনৈতিক এবং লিঙ্গভিত্তিক— নারীকে পুরুষের অধীনস্ত হিসেবে দেখানো হয়, কিন্তু তাদের মধ্যে প্রতিরোধের সম্ভাবনা উঠে আসে। নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গি নারীবাদী, যা সমাজের লিঙ্গবৈষম্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

সেলিম আল দীনের 'কিত্তনখোলা':

সেলিম আল দীনের 'কিত্তনখোলা' (১৯৯৫) নাটকটি গ্রাম থিয়েটার আন্দোলনের অংশ, যা দেশজ সংস্কৃতি এবং প্রান্তিক মানুষের জীবন থেকে অনুপ্রাণিত। এই নাটকে নারী চরিত্রগুলি গ্রামীণ বাংলার প্রান্তিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, যেখানে তারা অর্থনৈতিক শোষণ এবং সামাজিক বঞ্চনার শিকার। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র 'বেদেনী' বা নারীগুলি যাত্রা দলের সদস্য, যা সমাজের মার্জিনে অবস্থিত।নাট্যকার এখানে নারীকে উপনিবেশোত্তর প্রতিরোধের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন, যেখানে তারা ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির মাধ্যমে আধুনিকতার বিরুদ্ধে লড়াই করে। প্রান্তিকতায় এখানে সাংস্কৃতিক— নারীকে গ্রামীণ ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে দেখানো হয়, কিন্তু শহুরে আধুনিকতার দ্বারা অবহেলিত। নাটকের ভাষা এবং ফর্ম দেশজ, যা নারীর মনস্তাত্ত্বিক গভীরতাকে তুলে ধরে। এই উপস্থাপনা বাংলাদেশের থিয়েটারকে ডেকোলোনাইজ করে, যেখানে নারী প্রান্তিকতা থেকে প্রতিরোধের উৎস।

সেলিম আল দীনের 'চাকা':

সেলিম আল দীনের 'চাকা' (হুইল) নাটকটি উপনিবেশোত্তর চ্যালেঞ্জের একটি উদাহরণ, যা পশ্চিমা প্রতিনিধিত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দেখায়। এখানে নারী চরিত্রগুলি প্রান্তিক জীবনের অংশ, যেখানে তারা অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সংঘর্ষের মুখোমুখি। নাটকের ফর্ম এবং কনটেন্ট দেশজ, যা নারীকে মার্জিনাল ফিগার হিসেবে চিত্রিত করে। প্রান্তিকতা এখানে হেজেমনির বিরুদ্ধে— নারীকে সাবালটার্ন হিসেবে দেখানো হয়, কিন্তু তাদের প্রতিরোধ লক্ষণীয়।

আব্দুল্লাহ আল-মামুনের 'কোকিলারা':

আবদুল্লাহ আল-মামুনের 'কোকিলারা' (১৯৮৯) নাটকে যৌন-রাজনীতি এবং নিম্নবর্গীয় নারীর চিত্রায়ন দেখানো হয়েছে। নারী চরিত্রগুলি প্রান্তিক, যেখানে তারা পিতৃতান্ত্রিক অত্যাচারের শিকার। নাটকে নারীকে অধীনস্ত হিসেবে দেখানো হয়, কিন্তু সংলাপের মধ্যে তাদের দ্বন্দ্ব উঠে আসে। এই নাটকের বিশ্লেষণ দেখায় যে বাংলাদেশের নাটকে নারীর প্রান্তিকতা একটি কেন্দ্রীয় থিম, যা সমাজের লিঙ্গবৈষম্যকে প্রতিফলিত করে এবং নারীমুক্তির আহ্বান জানায়।

প্রান্তিকতার থিমস:

বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে নারীর প্রান্তিকতা বিভিন্ন থিমের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, যা সমাজের লিঙ্গভিত্তিক অসমতা, ঐতিহাসিক ঘটনা এবং সাংস্কৃতিক সংঘর্ষকে প্রতিফলিত করে। প্রান্তিকতা (marginality) এখানে নারীকে সমাজের কেন্দ্র থেকে দূরে ঠেলে দেয়, যা পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো, যুদ্ধের আঘাত, অর্থনৈতিক বৈষম্য, অভিবাসন এবং 'অদরিং' (othering) এর মতো থিমগুলির মধ্যে উঠে আসে। এই থিমগুলি নারীকে শুধু শিকার হিসেবে নয়, প্রতিরোধের প্রতীক হিসেবেও চিত্রিত করে। বাংলাদেশী নাট্যকাররা, যেমন সেলিম আল দীন, সৈয়দ শামসুল হক এবং আব্দুল্লাহ আল-মামুন, এই থিমগুলিকে তাদের নাটকে ব্যবহার করে সমাজের সমালোচনা করেছেন,নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে লিঙ্গবৈষম্যকে অনুসন্ধান করে।

পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ এবং 'অদরিং':

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীর প্রান্তিকতার মূল থিম। বাংলাদেশী নাটকে নারীকে 'অদর' (other) হিসেবে চিত্রিত করা হয়, যা সিমোন দ্য বোভোয়ারের ধারণার সাথে মিলে যায়। এখানে নারীকে পুরুষের অধীনস্ত বা 'পর' হিসেবে দেখানো হয়, যা তাদের স্বাধীনতা কেড়ে নেয়। উদাহরণস্বরূপ, সৈয়দ শামসুল হকের নাটকে নারী পিতৃতান্ত্রিক চাপের শিকার, যেখানে তারা পরিবারিক নিয়মের দ্বারা বন্দি। এই থিম ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সংস্কৃতিতে নারীর জনপ্রিয় সংস্কৃতির প্রান্তিকীকরণ থেকে উদ্ভূত, যেখানে নারীকে অশ্লীল বা নিম্নশ্রেণীর সাথে যুক্ত করা হতো। আধুনিক নাটকে, যেমন আল-মামুনের 'কোকিলারা', নারীকে যৌন-রাজনীতির শিকার হিসেবে দেখানো হয়, যা পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তাদের প্রান্তে ঠেলে দেয়। এই থিম নারীকে 'যৌন বস্তু' বা 'অপ্রয়োজনীয় সত্তা' হিসেবে চিত্রিত করে, যা পিতা বা স্বামীর মালিকানায় সীমাবদ্ধ। বাংলাদেশী নাটকে এই 'অদরিং' নারীর পরিচয় গঠনকে প্রভাবিত করে, যা তাদেরকে সমাজের কেন্দ্র থেকে দূর করে রাখে।

যুদ্ধ এবং সহিংসতার প্রভাব:

যুদ্ধ এবং সহিংসতা নারীর প্রান্তিকতার আরেকটি কেন্দ্রীয় থিম। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে নারীকে ধর্ষণ এবং অবহেলার শিকার হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে, যা যুদ্ধ-উত্তর সমাজে তাদের প্রান্তিক করে। সেলিম আল দীনের নাটকে নারী যুদ্ধের পরবর্তী সংকটে প্রান্তিক, যেখানে তারা সামাজিক পুনর্বাসনের অভাবে ভুগে। এই থিম নারীবাদী আন্দোলনের সাথে জড়িত, যা নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা এবং ইসলামীকরণের বিরুদ্ধে লড়াই করে। বাংলাদেশী নাটকে যুদ্ধ নারীকে 'শিকার' থেকে 'প্রতিরোধী' হিসেবে রূপান্তরিত করে, কিন্তু সমাজের অবহেলা তাদের প্রান্তিক রাখে। উদাহরণস্বরূপ, সৈয়দ শামসুল হকের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' নাটকে নারী যুদ্ধের ধ্বংসলীলায় প্রান্তিক, যা জাতির মুক্তির জন্য তাদের ত্যাগকে তুলে ধরে। এই থিম সমাজের লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, যা নারীকে শারীরিক এবং মানসিকভাবে প্রান্তে ঠেলে দেয়।

অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বৈষম্য:

অর্থনৈতিক বৈষম্য নারীর প্রান্তিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ থিম। বাংলাদেশী নাটকে নিম্নবর্গীয় নারীকে অর্থনৈতিক শোষণের শিকার হিসেবে দেখানো হয়, যা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের দ্বারা তীব্রতর। সেলিম আল দীনের 'কিত্তনখোলা' নাটকে গ্রামীণ নারীকে প্রান্তিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে চিত্রিত করা হয়, যেখানে তারা দারিদ্র্য এবং শোষণের মুখোমুখি। এই থিম বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর প্রান্তিকতাকে প্রতিফলিত করে, যেখানে তারা প্রতীকী অংশগ্রহণে সীমাবদ্ধ। সামাজিক বৈষম্য নারীকে পরিবারিক এবং সমাজীয় চাপের শিকার করে, যা তাদের স্বাধীনতা কেড়ে নেয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নারীর জনপ্রিয় সংস্কৃতিকে প্রান্তিক করা হয়েছে,

যা আধুনিক নাটকে অব্যাহত। এই থিম নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অভাবকে তুলে ধরে, যা তাদেরকে সমাজের মার্জিনে রাখে।

অভিবাসন এবং পরিচয় গঠন:

অভিবাসন নারীর প্রান্তিকতার আরেকটি থিম, যা 'অদরিং' এবং পরিচয় গঠনের সাথে জড়িত। বাংলাদেশী নাটকে প্রবাসী নারীকে সাংস্কৃতিক সংঘর্ষের শিকার হিসেবে দেখানো হয়, যেমন মনিকা আলীর 'ব্রিক লেন' এর প্রভাবিত নাটকে। এখানে নারীকে ডায়াস্পোরায় প্রান্তিক করা হয়, যা তাদের পরিচয়কে পরিবর্তিত করে। এই থিম ব্রিটিশ এবং বাংলাদেশের নারী লেখকদের সাধারণ অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরে, যা প্রান্তিকতার বিরুদ্ধে লড়াই করে। ডায়াস্পোরিক নারী সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিরোধ দেখায়, যা নাটকে প্রতিফলিত। এই থিম নারীর হাইব্রিড পরিচয়কে অনুসন্ধান করে, যা প্রান্তিকতা থেকে মুক্তির পথ দেখায়।

প্রতিরোধ এবং এজেন্সি:

প্রান্তিকতার মধ্যে প্রতিরোধের থিম উঠে আসে, যা নারীকে শিকার থেকে প্রতিরোধী হিসেবে রূপান্তরিত করে। বাংলাদেশী নাটকে নারী সোশ্যাল মিডিয়া বা সমাজীয় আন্দোলনের মাধ্যমে পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে লড়াই করে। এই থিম নারীবাদী আন্দোলনের সাথে জড়িত, যা সহিংসতা এবং মার্জিনালাইজেশনের বিরুদ্ধে। সেলিম আল দীনের নাটকে নারী দেশজ সংস্কৃতির মাধ্যমে প্রতিরোধ দেখায়, যা তাদের এজেন্সিকে তুলে ধরে। আধুনিক নাটকে হিজড়া সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তি প্রান্তিকতার বিরুদ্ধে লড়াই করে। এই থিম নারীকে 'ভিকটিম' থেকে 'ডিফায়েন্ট' হিসেবে চিত্রিত করে, যা পোস্টডিজিটাল বাংলাদেশে সম্মানের ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে।

প্রান্তিকতার এই থিমগুলি বাংলাদেশের নাটকে নারীর জটিল অবস্থানকে তুলে ধরে। এগুলি সমাজের অসমতাকে সমালোচনা করে এবং নারীমুক্তির আহ্বান জানায়। ভবিষ্যতে নাট্যসাহিত্যে এই থিমগুলিকে আরও গভীরভাবে অনুসন্ধান করা দরকার, যা লিঙ্গ সমতাকে প্রচার করবে।

উপসংহার:

বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে নারী ও প্রান্তিকতার উপস্থাপন একটি জটিল এবং গভীর বিষয়, যা সমাজের লিঙ্গভিত্তিক অসমতা, ঐতিহাসিক ঘটনা এবং সাংস্কৃতিক সংঘর্ষকে প্রতিফলিত করে। উপনিবেশকাল থেকে স্বাধীনতা-উত্তর যুগ পর্যন্ত, নাট্যকাররা নারীকে প্রান্তিক অবস্থানে চিত্রিত করেছেন, যা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের দ্বারা সৃষ্ট বৈষম্যের প্রতীক। সৈয়দ শামসুল হক, সেলিম আল দীন এবং অন্যান্য নাট্যকারদের কাজে নারী শুধু শিকার নয়, বরং প্রতিরোধের প্রতিনিধি। এই উপস্থাপনা সমাজের আয়না হিসেবে কাজ করে, যা নারীমুক্তির আন্দোলনকে উস্কে দেয়। আলোচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল নারীর প্রান্তিকতাকে সাহিত্যিক এবং সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনুসন্ধান করা, যেখানে বাংলাদেশী নাটক লিঙ্গবৈষম্যেরও সমালোচনা করে।

সাহিত্য পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে, ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত নারী চরিত্রের বিবর্তন ঘটেছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকে নারী জাতীয়তাবাদী প্রতীক, কিন্তু প্রান্তিকতা ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার মধ্যে। স্বাধীনতা-উত্তর যুগে, মুক্তিযুদ্ধের প্রভাবে নারীকে ধর্ষণ এবং অবহেলার শিকার হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। সেলিম আল দীনের নাটকে নারী গ্রামীণ প্রান্তিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, যা দেশজ সংস্কৃতির মাধ্যমে প্রতিরোধ দেখায়। এই পর্যালোচনা দেখিয়েছে যে, নাটক নারীর মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক গভীরতাকে তুলে ধরে, যা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে একটি সমালোচনা।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে, উপনিবেশকালে নারীকে অশিক্ষিত এবং অশ্লীল হিসেবে প্রান্তিক করা হয়েছে, যা ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবে। বিভাজন-উত্তর যুগে ভাষা আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধ নারীর প্রান্তিকতাকে যুদ্ধ এবং রাজনৈতিক দমনের সাথে জড়িয়েছে। আধুনিক যুগে, টেলিভিশন নাটকে নারীকে স্টিরিওটাইপিকাল ভাবে দেখানো হয়, কিন্তু প্রতিরোধের থিম উঠে আসে। এই প্রেক্ষাপট দেখিয়েছে যে, নাটক সমাজের পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে, যা নারীর অবস্থানকে প্রভাবিত করে।

প্রধান নাটকের বিশ্লেষণে, 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' নাটকে নারী যুদ্ধের শিকার, কিন্তু জাতির মুক্তির প্রতীক। 'কিত্তনখোলা'য় নারী গ্রামীণ শোষণের মুখোমুখি, যা সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ দেখায়। 'কোকিলারা'য় যৌন-রাজনীতি নারীকে প্রান্তিক করে, কিন্তু তাদের দ্বন্দ্ব উঠে আসে। এই বিশ্লেষণ দেখিয়েছে যে, নাট্যকাররা নারীকে অধীনতা থেকে মুক্তির পথ দেখান।

প্রান্তিকতার থিমসে, পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ, যুদ্ধ, অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং অভিবাসন নারীর প্রান্তিকতাকে গঠন করে। 'অদরিং' নারীকে 'পর' হিসেবে চিত্রিত করে, যা পরিচয় গঠনকে প্রভাবিত করে। প্রতিরোধের থিম নারীকে এজেন্সি দেয়, যা নারীবাদী আন্দোলনের সাথে জড়িত। এই থিমগুলি দেখিয়েছে যে, প্রান্তিকতা শুধু অধীনতা নয়, বরং মুক্তির উৎস।

বাংলাদেশের কিছু নাটক নারীর প্রান্তিকতাকে তুলে ধরে সমাজের লিঙ্গবৈষম্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। এটি নারীবাদী আন্দোলনকে শক্তিশালী করে, যা উপনিবেশবিরোধী প্রতিরোধ এবং মুক্তিযুদ্ধ থেকে উদ্ভূত। সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে, এই উপস্থাপনা নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে, যা ভবিষ্যতের লেখকদের অনুপ্রাণিত করে। সমাজতাত্ত্বিকভাবে, এটি লিঙ্গ সমতার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে, যা রাজনীতি এবং শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে সাহায্য করে। বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক প্রান্তিকতা দেখিয়েছে যে, তারা প্রতীকী উপস্থিতিতে সীমাবদ্ধ, যা নাটকে প্রতিফলিত। এই আলোচনা সমাজের পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করতে পারে, যা নারীকে কেন্দ্রে আনবে।

ভবিষ্যতের গবেষণার জন্য এই বিষয়ে কয়েকটি আবেদন করা যায়। প্রথমত, আধুনিক টেলিভিশন এবং ডিজিটাল নাটকে নারীর উপস্থাপন নিয়ে আরও বিস্তারিত অধ্যয়ন দরকার, যা সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাব অন্তর্ভুক্ত করবে। দ্বিতীয়ত, তুলনামূলক গবেষণা— বাংলাদেশী নাটক এবং দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের নাটকের মধ্যে নারীর প্রান্তিকতার তুলনা। তৃতীয়ত, নারী নাট্যকারদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসন্ধান, যা পুরুষকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকল্প দেবে। চতুর্থত, কুয়ার এবং ট্রান্সজেন্ডার চরিত্রের প্রান্তিকতা নিয়ে গবেষণা, যা লিঙ্গবৈচিত্র্যকে অন্তর্ভুক্ত করবে। এই গবেষণাগুলি নাট্যসাহিত্যকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করবে।

শেষকথায়, বাংলাদেশের নাটকে নারীর প্রান্তিকতা একটি শক্তিশালী থিম, যা সমাজের অসমতাকে উন্মোচন করে। এটি নারীকে অধীনতা থেকে মুক্তির আহ্বান জানায়, যা একটি সমতামূলক সমাজ গঠনে সাহায্য করে। নাট্যকাররা এই উপস্থাপনার মাধ্যমে সমাজকে চ্যালেঞ্জ করে, যা ভবিষ্যতের প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে। নারীর প্রান্তিকতা শুধু সাহিত্যিক নয়, বরং সামাজিক বিপ্লবের একটি অংশ। এই আলোচনা আশা করে যে, ভবিষ্যতে নাটকে নারীকে আরও কেন্দ্রীয় এবং শক্তিশালী হিসেবে দেখা যাবে, যা লিঙ্গ সমতার পথ প্রশস্ত করবে।

তথ্যসূত্র:

১. আল, আবদুল্লাহ। মামুন। নির্বাচিত নাটক, সম্পাদনা রামেন্দু মজুমদার, নালন্দা, বাংলাবাজার, কা-১১০০, ফেব্রুয়ারী ২০১১, পৃ. ৩০০-৩০১।

২. হক, সৈয়দ শামসুল। কাব্যনাট্য সংগ্রহ, বিদ্যা প্রকাশ, বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০, ফেব্রুয়ারি ২০০৫, পৃ. ৪২-৪৩।

৩. হক, সৈয়দ শামসুল। কাব্যনাট্য সংগ্রহ। বিদ্যা প্রকাশ, বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০, ফেব্রুয়ারি ২০০৫, পৃ. ৯০।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. ইকবাল, শহীদ। বাংলাদেশের নাটকের রূপরেখা। খালপার লাইব্রেরি, ঢাকা, ২০১৮।

২. আউয়াল, সাজেদুল। বাংলা নাটকে নারী-পুরুষ ও সমাজ। রকমারি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৫।

৩. কায়সার, শান্তনু। বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যদ্বন্দ্বের ইতিহাস। থিয়েটারওয়ালা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭।

৪. সেন, সুকুমার। বাংলায় নারীদের ভাষা। কালী ও কলম প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০০।

৫. চৌধুরী, কবীর। বাংলা নাটকের ইতিহাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, ঢাকা, ২০১১।

৬. মিশু, এম। ভাষা-আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক: পাঠ-পর্যালোচনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, ঢাকা, ২০২৪।

৭. খোন্দকার, শাহিদা ইসলাম। আনমনা প্রিয়দর্শিনী। ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অফ গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, ঢাকা, ২০১১।

৮. দে, সুজিত। দীনবন্ধু মিত্রের নাটকে নিম্নবর্গীয় নারীর মাতৃত্ব। জেটিআইআর প্রকাশনী, কলকাতা, ২০২৫।

৯. চৌধুরী, মুনীর। বাংলা সহপাঠ। ই-বুকবৌ, ঢাকা, ২০১১।

১০. দাস, সুমন্ত। বাংল মাহিত্যে নাটকের ধারা। আর্কাইভ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৫।

১১. রশীদ, মামুনুর। বাঙালির জাতীয় নাট্যাঙ্গিক: সেলিম আল দীন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, ঢাকা, ২০১০।

১২. শাহনাজ, আফরিন। রবীন্দ্রসাহিত্যে নারী চরিত্র। ভয়েস অফ আমেরিকা বাংলা, ঢাকা, ২০২৩।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 779-785
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.289

আধুনিক গণতন্ত্রের সংকট ও রবীন্দ্রনাথ

ড. অমিত কুমার দাস, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মহিষাদল রাজ কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 03.03.2026; Accepted: 07.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Today, the crisis of democracy has become evident all over the world. Even after following certain administrative methods in modern democracy, public opinion is not being properly reflected at the ballot box. Market economy or capitalist economy and state-terror have become the main obstacles to proper reflection of public opinion. However, direct democracy was prevalent in ancient Greece, in the small city-states of Rome, among the Teutonic tribes of the first century AD, and in the ancient cantons of Switzerland. These were non-party democracies. In that case, the will of the majority was accepted as the will of the general public. The ancient 'GAN' or 'Association' of India were examples of direct democracy. Rabindranath planned his 'Swadeshi Samaj' from a somewhat similar place of thought. Rabindranath's plan for 'Swadeshi Samaj' was an inevitable result of the fact that in subjugated India, political independence was not so active and outside state initiative and control. His 'Swadeshi Samaj' was an almost autonomous organization outside state terror or control—where the majority could be reflected. In contrast to helpless surrender to market economy or capitalism, Rabindranath's social reform or economic thought was an alternative attempt to search for a democratic or humane face of development.

Keywords: Crisis of Democracy, 'GAN' or 'Association', Direct Democracy, 'Swadesi Samaj', Capitalist Economy, Economic Thought of Rabindranath

সমাজকর্মী ও চিন্তাবিদ রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের বিপক্ষে ছিলেন না। তাঁর পল্লীউন্নয়ন কর্মযজ্ঞের অন্যতম লক্ষ্যই ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন। কিন্তু সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রকে অস্বীকার না করলেও অত বেশি গুরুত্ব দিতে রাজি ছিলেন না, যে কারণে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে স্বতন্ত্র গ্রাম-সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুদৃঢ়ীকরণ চেয়েছিলেন। এর মধ্যে কেউ কেউ ইউটোপিয়ান চিন্তাধারার নিদর্শন খুঁজে পান। সে আসলে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির ইতিহাস চেতনার অপরিপক্কতার ফসল। সারা বিশ্বে গণতান্ত্রিকতার বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আর আজকের দিনে গণতন্ত্রের সংকটকে স্মরণ করলে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা স্পষ্ট হয়ে পড়ে।

পৃথিবীর সামাজিক ইতিহাসে গণতন্ত্র কিন্তু খুবই প্রাচীন একটি সিস্টেম বা মতবাদ। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বা Direct Democracy প্রাচীন গ্রীসে, রোমের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর রাষ্ট্রে, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর টিউটন উপজাতিদের

মধ্যে, সুইটজারল্যান্ডের প্রাচীন ক্যান্টনগুলিতে প্রচলিত ছিল। এগুলি ছিল দলহীন গণতন্ত্র। সংখ্যাগুরুর ইচ্ছাই সেক্ষেত্রে সাধারণের ইচ্ছা বলে গৃহীত হোত।

ভারতে খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী থেকে খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত যে রিপাবলিক বা সাধারণতন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায় সেগুলি 'গণ' বা 'সংঘ' নামে পরিচিত ছিল। এদের আসলে বলা যায় ক্ষত্রিয় কূলের স্বয়ংশাসিত অভিজাত সাধারণতন্ত্র। ক্ষত্রিয় জাতির সভ্যরাই ছিল এর প্রভু। ভারতের প্রাচীন 'গণ' গুলি ছিল প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের নিদর্শন। এদের কিছু ছিল একক সংঘ, কিছু ছিল মিলিত সংঘ। গৌতম বুদ্ধের সময়ে খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম ও পঞ্চম শতাব্দীতে বৈশালীর লিচ্ছবিরা এবং কুশীনগরে মল্লরা ছিল সর্বাগ্রগণ্য। মৌর্যরা ছিল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গণ। লিচ্ছবি ও মল্লরাজের আদর্শ বৌদ্ধসংঘের সংগঠনকে প্রভাবিত করেছিল। তাই প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের ভাবনা ভারতে অপরিচিত নয়।

প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র (Representative Democracy) বা অপ্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের ধারণা গড়ে ওঠে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে। এতে গণ কেবল ভোটে অংশগ্রহণ করতে পারে কিন্তু আইন প্রণয়ণ বা শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলন্ডে এ জাতীয় গণতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে। স্বৈরতান্ত্রিক রাজশক্তিগুলির বিরুদ্ধে সমাজের বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের বিদ্রোহের মধ্য দিয়েই আধুনিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটে। এরপর বুর্জোয়া বা পুঁজিবাদী সমাজের সমালোচনার মধ্য দিয়ে মার্কস গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতাকে প্রকট করে তোলেন। ফলে শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যস্থতায় শ্রেণীবৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠাই গণতন্ত্রের লক্ষ্য হয়। আধুনিক কালে গণতন্ত্র যে একটি রাষ্ট্রকেন্দ্রিক ধারণা সে বিষয়ে মার্কসীয় বা অমার্কসীয় রাষ্ট্রতাত্ত্বিকেরা একমত। আমাদের দেশে ১৯৪৯-এ সংবিধান রচনার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় গণতন্ত্রের সূচনা। কিন্তু ভারতীয় সংবিধানটি গড়ে ওঠে Government Of India Act 1935 অনুসারে— যেটি আসলে বৃটিশদের রচনা। সেই হিসেবে আমাদের দেশের সংবিধান ইউরোপীয় রাষ্ট্রচিন্তার ফসল।

আমাদের দেশের সামাজিক কাঠামো, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইউরোপের গণতান্ত্রিক চেতনার জন্ম হয় বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলন, শিল্পবিপ্লব, নগরায়ণ ও একাধিক রাজনৈতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। গণতন্ত্র বিকাশের এই প্রাথমিক শর্তগুলি আমাদের দেশে অনুপস্থিত। গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনা সেখানে রাষ্ট্রব্যবস্থার উপরিকাঠামো হয়ে থাকেনি। ব্রিটেন ও ইউরোপের কিছু দেশে তাই রাজতন্ত্র বজায় থাকলেও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোন বিঘ্ন ঘটেনি। রাজতন্ত্র সেখানে গণতন্ত্রের অধীন। কিন্তু আমাদের দেশে রাজতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যেই সিংহাসনের অধিকারকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাদখলের লড়াই বা পারিবারিক অন্তর্দ্বন্দ্ব বহমান থেকেছে, রাজশক্তির পরিবর্তন ঘটেছে। ঊনবিংশ শতাব্দী অবধি এই ছিল ভারতবর্ষের ইতিহাস।

সমাজের উপরতলার এই বিরোধের জটিল বিশৃঙ্খল প্রকাশ কিন্তু ভারতের বৃহৎ গ্রামীণ কৃষিনির্ভর সমাজের মধ্যে কোনো আলোড়ন সৃষ্টি করেনি। ফলে এদেশের সাধারণ নিরক্ষর মানুষ গণতন্ত্র সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠার কোন অবকাশ পায়নি। উনিশ শতকে এদেশে বাংলায় রেনেসাঁর সৃষ্টি হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে রেনেসাঁ-প্রসূত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বোধ, মানবিকতাবোধ সেখানকার দেশগুলির শিল্প সংস্কৃতি, সাহিত্য দর্শনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে যেমন চেতনাসংস্কারের কাজ করেছিল এদেশের ক্ষেত্রে তেমনটা ঘটেনি। বাংলার নগরকেন্দ্রিক রেনেসাঁ এদেশের পল্লী অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয়নি। ফলে ভারতের গণতন্ত্র ইউরোপের গণতন্ত্রের মতো নিজস্ব চেষ্টায় কোনো হয়ে ওঠা ব্যাপার নয়— বাইরে থেকে আরোপিত।

তাছাড়া দলতন্ত্র আমাদের দেশের মতো ইউরোপীয় গণতন্ত্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সেখানকার দলগুলি একই সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় আদর্শকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠায় তাদের মধ্যেকার যে দ্বন্দ্ব

তাকে বলা চলে 'Non-Antagonistic'। কোন গুণগত পরিবর্তনের কথা তারা ভাবতে পারে না। সেখানে দলপ্রথা পদে পদে শ্রেণিবৈষম্য, জাতপাতের বৈষম্য, ভাষা তথা সাংস্কৃতিক বৈষম্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, গণতন্ত্রে সংকটকে ঘনিয়ে তোলে না।

কিন্তু ভারতে এর বিপরীত ছবিটি দেখা যায়। তার সঙ্গে রয়েছে আঞ্চলিক স্বার্থের প্রশ্ন, অঙ্গরাজ্যগুলোর নিজস্ব স্বার্থের প্রশ্ন, শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণ-বিকেন্দ্রীকরণের প্রশ্ন। এই বৈষম্য ও বিরোধ এদেশের গণতন্ত্রকে, তার রাষ্ট্রিক কাঠামোকে ভঙ্গুর করে তুলছে। আসলে এই বিরোধ আর বৈষম্যকে ভিত্তি করেই এদেশের রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু সেটা গণতন্ত্রের পক্ষে চরম সংকট বয়ে আনে। ভারতের দলপ্রথার চরিত্রলক্ষণই ভারতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠের মত যেখানে নিয়ন্ত্রক শক্তি সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠই সত্য— এটা মেনে নিতে হয়। যে দেশে অশিক্ষার হার বিপুল, সে দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকার কখনই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন, বণিক সমিতি ইত্যাদি সংস্থার নেতাদের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়। জীবনের সকল বিভাগের সত্য-মিথ্যা নির্ধারণের জন্য, নিজেদের সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে জনসাধারণের সম্মতি অর্জনের জন্য এরা যে পন্থা অবলম্বন করে তা হল অযৌক্তিক প্রচারকার্য— যা স্বার্থবাহী, আদর্শবাহী নয়। তাই এদেশে তথাকথিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষ বিপর্যস্ত ও বিভ্রান্ত। যাঁরা গণতন্ত্রকে একটি ভাবাদর্শ বা জীবনপন্থা বলে ভাবেন, তাঁদের কাছে গণতন্ত্র একটি সর্বব্যাপী জীবনদর্শন। জীবনের রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক সবকিছুই এর নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই গণতন্ত্রকে রক্ষা করার কয়েকটি পূর্বশর্ত আমাদের মানতে হবে। শিক্ষিত সামাজিক দায়িত্ববোধ সম্পন্ন সামাজিক মানুষ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতা, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, সেই সাথে পরমতসহিষ্ণুতা হল পূর্বশর্তগুলির অন্যতম।

রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অপেক্ষা এইসকল পূর্বশর্তগুলির পূরণের ব্যাপারেই অধিক জোর দিয়েছিলেন। কেননা তা না হলে গণতন্ত্রের সাফল্য অধরা থেকে যায়, সংকট ঘনীভূত হয়ে ওঠে। বৃটিশ শাসিত পরাধীন ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় গণতন্ত্রের ত্রুটি বা সংকট রবীন্দ্রনাথের কাছে যে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তা তাঁর রচনাগুলিই সাক্ষ্য দেয়। বিটিশ শাসনতন্ত্রের কাঠামোটি যে আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে বেমানান তা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে জানিয়েছেন। সে কারণে বিকল্প এক গণতন্ত্রের খোঁজ তাঁকে করতে হয়েছে। এই কারণে রবীন্দ্রনাথ গণতন্ত্রের স্বপক্ষে ছিলেন না এমন কথাও কোন কোন সমালোচক বলে থাকেন।

১৩০৮-এ রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শনে'র পাতায় নেশন তত্ত্বের বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি সমাজপ্রধান সভ্যতার গুণগান রচনা করেছিলেন। কিন্তু এখন ইংরেজ স্বার্থপরতার সংঘাতে দেশীয় স্বার্থপরতা অর্থাৎ নেশন বা 'পলিটিক্যাল স্বার্থবদ্ধ জনসম্প্রদায়'-এর উদ্ভব অনিবার্য জেনে দেশের মানুষকে সাবধান করতে চেয়েছেন। 'সমূহ' গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে 'দেশের কথা' প্রবন্ধে জানিয়েছেন— 'যাহা হউক আমাদিগকে নেশন বাঁধিতে হইবে— কিন্তু বিলাতের নকলে নহে। আমাদের জাতির মধ্যে যে নিত্য পদার্থটি আছে, তাহাকেই সর্বতোভাবে রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে— আমাদের চিত্তকে আমাদের প্রতিভাকে মুক্ত করিতে হইবে; আমাদের সমাজকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও বলশালী করিতে হইবে।'

রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হবার কারণ ব্যাখ্যা করে অশোক সেন তাঁর 'রাজনীতির পাঠক্রমে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে জানিয়েছেন, 'নেশন', 'ন্যাশনাল' নিয়ে ইংরেজি শিক্ষিত ভদ্রলোকের তখন প্রবল উৎসাহ। আন্দোলনেও তাঁরাই তৎপর। দেশজোড়া বিরাট জনসংখ্যার তুলনায় তারা নেহাত ছোটো এক অংশ, নিজেদের অবস্থার সঙ্গে অনেকের বিরাট ব্যবধান। দাবিদাওয়ার পরিসরও নিজেদের স্বার্থে সীমাবদ্ধ। তাই 'নেশন' কথাটির

সঙ্গে কোনো সর্বহিতের সম্ভাবনাকে, সার্বজনিক ধ্যানধারণার তাৎপর্যকে মেলাতে পারছেন না রবীন্দ্রনাথ। এমনও ভেবেছেন তিনি, যে 'জাতীয়' শব্দটির প্রয়োজনে নানা ভাষা, নানা ধর্ম, আরো সব ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়ের বাস্তব মুছে ফেলবার আশঙ্কা আছে, তার সঙ্গে কোনো শক্তিশালী অংশে যদৃচ্ছ আধিপত্যের অভিলাষ জুড়তে পারে। ইংরেজ সাম্রাজ্যের ভারতব্যাপী বিস্তার তৈরি করেছে এক সার্বভৌম রাষ্ট্রশক্তির ঐক্য। সেখানে অজস্র পার্থক্যের মধ্যে কোনো সজীব সামঞ্জস্যের পরিচয় নেই। সারা দেশে সে অভিজ্ঞতার ক্ষয়ক্ষতি কত বিপুল ও ব্যাপক তার জানাশোনাও সমানে বাড়ছে। স্বদেশের এই মর্মান্তিক বাস্তবকে বাদ দিয়ে 'নেশন' শব্দটিতে সাড়া পান না রবীন্দ্রনাথ। জাতীয়তার নামে শিক্ষিত ভদ্রজনের সুযোগ-সুবিধার জন্য আন্দোলন বড়ো তুচ্ছ মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে জানিয়েছেন— "ইংরেজিতে যাহাকে স্টেট বলে, আমাদের দেশে আধুনিক ভাষায় তাহাকে বলে সরকার। এই সরকার প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজশক্তি আকারে ছিল। কিন্তু বিলাতের স্টেটের সঙ্গে আমাদের রাজশক্তির প্রভেদ আছে। বিলাত, দেশের সমস্ত কল্যাণকর্মের ভার স্টেটের হাতে সমর্পণ করিয়াছে— ভারতবর্ষ তাহা আংশিকভাবে মাত্র করিয়াছিল।" আমাদের দেশে যুদ্ধবিগ্রহ রাজ্যরক্ষা এবং বিচারকার্য রাজা করলেও বিদ্যাদান থেকে শুরু করে জলদান পর্যন্ত সকল কাজের দায়িত্ব ছিল ব্যক্তির উপর। ফলে এসকল কাজ এমনভাবে সমাজ সম্পন্ন করেছে যে নতুন নতুন শতাব্দীতে নতুন নতুন রাজার শাসন আমাদের দেশের উপর দিয়ে বয়ে গেলেও আমাদের ধর্ম নষ্ট করে পশুতে পরিণত করতে পারেনি, সমাজ নষ্ট করে আমাদের লক্ষ্মীছাড়া করতে পারেনি। পূর্বোক্ত প্রবন্ধে তাই তিনি লিখেছেন— "রাজায় রাজায় লড়াইয়ে অন্ত নাই— কিন্তু আমাদের মর্মরায়মান বেণুকুঞ্জে, আমাদের আম-কাঁঠালের বনচ্ছায়ায় দেবায়তন উঠিতেছে, অতিথিশালা স্থাপিত হইতেছে, পুষ্করিণী-খনন চলিতেছে, গুরুমহাশয় শুভংকরী কষাইতেছেন, টোলে শাস্ত্র-অধ্যাপনা বন্ধ নাই, চণ্ডীমণ্ডপে রামায়ণপাঠ হইতেছে এবং কীর্তনের আরাবে পল্লীর প্রাঙ্গণ মুখরিত। সমাজ বাহিরের সাহায্যের অপেক্ষা রাখে নাই এবং বাহিরের উপদ্রবে শ্রীভ্রষ্ট হয় নাই।"

এই কারণে আমাদের দেশের সমাজ বা জনসাধারণ রাজার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নয়— যার বিপরীতটা পাশ্চাত্য দেশের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। এদেশে সমাজের কাজ সমাজের প্রত্যেকের উপর আশ্চর্যরূপে বিচিত্রভাগে ভাগ করে দেওয়া আছে। তাই পাশ্চাত্য দেশে রাজশক্তি বিপর্যস্ত হলে যেমন সমস্ত দেশের বিপর্যয় নেমে আসে আমাদের দেশে তেমনটা ঘটে না। ভারতবর্ষের রাজশক্তি তাই যুগে যুগে বহিঃশক্তির প্রভাবে বিপর্যস্ত হলেও পল্লীগুলিতে সমাজ তার আপন গতিতে বহমান থেকেছে। আমাদের দেশে সমাজ নিরপেক্ষ একটি স্বাধীন সত্তাকে বহন করে চলে। সে নিতান্ত নিষ্কর্মা হয়ে সকল দায়িত্ব স্টেটের হাতে তুলে দিয়ে বসে নেই।

রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ' প্রকাশিত হবার পর 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় কৃষ্ণকুমার মিত্র এর বিরূপ সমালোচনা করে এটিকে 'আকাশ কুসুম রচনা' বলে উল্লেখ করেন। 'নব্যভারত' পত্রিকায় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এর মধ্যে অধিক কাব্যিকতার প্রকাশ দেখে এটিকে 'একটি সামাজিক কবিতা' বলে ব্যঙ্গ করেন। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় বলাইচাঁদ গোস্বামীও প্রবন্ধটির সমালোচনা করে বেশকিছু প্রশ্ন উত্থাপন করেন— যার প্রত্যুত্তর দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ 'আত্মশক্তি' গ্রন্থের 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে। এগুলি আসলে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধ সমালোচনামাত্র। কিন্তু রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধটিকে 'সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রথম খসড়া' হিসেবে নির্দেশ করেন। জানান—

> "আজকাল আমরা গ্রামসংস্কার বা পল্লীসংগঠনের কথা শুনি, তাহার সূত্রপাত যে এইখানেই, সেকথা অনেকেরই জানা নাই। রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ' সম্বন্ধে কর্মপদ্ধতি কিয়ৎপরিমাণে হিন্দু মেলার আদর্শে অনুপ্রাণিত। তাঁহার শৈশবে হিন্দুমেলার যে আদর্শ গুণেন্দ্রনাথ-

> জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখ যুবকেরা সে যুগে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহাই রবীন্দ্রনাথ প্রৌঢ়কালে দেশের সমক্ষে প্রকাশ করিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ লিখিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, নিজ জমিদারিতে পর্যন্ত ইহার পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। দেশের কাজ সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত খসড়া তালিকা এই সময়ে মুদ্রিত হয়।"[১]

পরাধীন দেশে সরকারের সাহায্য ছাড়াই স্বায়ত্ত্বশাসিত গ্রাম-পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশ তথা পল্লীকে আত্মশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি একজন হিন্দু ও একজন মুসলমানের অধিনায়কত্বে একটি কর্তৃসভা স্থাপনের কথা বলেছেন। এই কর্তৃসভা পল্লী উন্নয়ন, শিক্ষাব্যবস্থা ও বেকারসমস্যা সমাধানের কাজে আত্মনিয়োগ করবে এবং সকলেরই বাধ্যতামূলক সহযোগিতা দাবি করতে পারবে। হিন্দু ও মুসলমানকে, শহরবাসী ও পল্লীবাসীকে এই কাজের ক্ষেত্রে এনে একত্রে সম্মিলিত করতে হবে।

এই ব্যবস্থা রুশ শাসনাধীন জর্জিয়া, আর্মেনিয়া প্রভৃতি দেশেও প্রচলিত আছে। শাসকের উপেক্ষা ও নিষ্ঠুর উদাসীনতার বিকল্প হিসেবে স্বায়ত্তশাসিত গ্রামপরিকল্পনার কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন—

> "জর্জীয়গণ, আর্মানিগণ প্রবল জাতি নহে—ইহারা যে-সকল কাজ প্রতিকূল অবস্থাতেও নিজে করিতেছে আমরা কি সেই-সকল কাজেরই জন্য দরবার করিতে দৌড়াই না? কৃষিতত্ত্বপারদর্শীদের লইয়া আমরা কি আমাদের দেশের কৃষির উন্নতিতে প্রবৃত্ত হইতে পারিতাম না? আমাদের ডাক্তার লইয়া আমাদের দেশের স্বাস্থ্যবিধান-চেষ্টা কি আমাদের পক্ষে অসম্ভব? আমাদের পল্লীর শিক্ষাভার কি আমরা গ্রহণ করিতে পারি না? যাহাতে মামলা-মকদ্দমায় লোকের চরিত্র ও সম্বল নষ্ট না হইয়া সহজ বিচারপ্রণালীতে সালিস-নিষ্পত্তি দেশে চলে তাহার ব্যবস্থা করা কি আমাদের সাধ্যাতীত? সমস্তই সম্ভব হয়, যদি আমাদের এই-সকল স্বদেশী চেষ্টাকে যথার্থভাবে প্রয়োগ করিবার জন্য একটা দল বাঁধিতে পারি।"[২]

কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আত্মশক্তির সাধনা সমষ্টিগত কর্মকাণ্ড দাবি করে। তাই ব্যক্তি-মানুষের নিজস্ব পরিসর বা অটোনমির আদর্শ 'স্বদেশী সমাজ' তত্ত্বে গুরুত্ব পায়নি। সেখানে যে 'এক' এর কথা বলা হয়েছে, তা 'বহু'র সমন্বয়ে নির্মিত একক, ব্যক্তি-একক নয়। এই 'এক' চরিত্র সম্পন্ন (composite), অখণ্ড (monolithic), নয়। তার বিভিন্ন খণ্ডের মধ্যে বন্ধন যান্ত্রিক নয়, আইন ও প্রশাসনের গিঁট তাদের বেঁধে রাখেনি। অ্যারিস্টটলের 'পোলিস্' (polis) এর মতো স্বদেশী সমাজ বিভিন্ন পেশা এবং নানা ধরণের ভূমিকার সমন্বয়ে গঠিত সমাজ। তার 'খণ্ড' গুলির মধ্যে আদান-প্রদান আছে, দ্বন্দ্ব নেই; বোঝাপড়া আছে, কাড়াকাড়ি নেই। অন্যভাবে বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজ লক-হেগেল-মার্কস-গ্রামস্চি বর্ণিত ও বিশ্লেষিত সিভিল সোসাইটি নয়। এই সমাজ রাষ্ট্রের ভিত্তি নয়। রাষ্ট্রের সঙ্গে এর কোন দ্বন্দ্বও নেই। 'স্বদেশীসমাজ'কে রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় 'সম্মতি' (consent) বা বলপ্রয়োগের বৈধতা উৎপাদনের ক্ষেত্রও বলা যায় না। স্বদেশী সমাজ রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করে না এবং রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। তাদের অবস্থান সমান্তরালতা ঊর্ধ্বতন-অধস্তন সম্পর্কের দ্বারা নির্ধারিত অবস্থান নয়।

স্বদেশের কর্মভার যদি স্বদেশীয়রা গ্রহণ করে তাহলে গবর্মেণ্টের অফিস এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে নিঃশেষে গ্রাস করতে পারে না। আবেদনের দ্বারা সরকারের চাকরি অপেক্ষা পৌরুষের দ্বারা স্বদেশের কর্মক্ষেত্র বিস্তারের উপর রবীন্দ্রনাথ তাই অধিক জোর দিতে চেয়েছিলেন। এই কর্মক্ষেত্রে যে কর্মসংস্থান ঘটার সম্ভাবনা তৈরি হয় তা দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে যেমন পরিপুষ্ট করে তেমনি দেশাত্মবোধ বা জাতীয়তাবোধের ভিতকেও শক্ত ভিত্তি দান করে থাকে। সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে পল্লীগুলিতে কীভাবে একটি সুলভ সহজ

বিচারব্যবস্থাও গড়ে তোলা যায় রুশীয় গভর্মেন্টের অধীনস্থ বল্গীক প্রদেশের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন তাঁর 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' প্রবন্ধে।

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, রবীন্দ্রনাথ সেই অর্থে বৃটিশ-ভারতের সংবিধান প্রসূত প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র বা রাষ্ট্রীয় গণতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন না। আজকের দিনে সারা বিশ্ব জুড়ে গণতন্ত্রের যে বিপুল সংকট, তার যে ব্যর্থতা রবীন্দ্রনাথের এই না-সমর্থনেরই ফলপরিণাম।

যদি বিচার করা হয় ভারতে এই মুহূর্তে গণতন্ত্র রয়েছে কাদের? প্রশ্নটা আর একটু সহজ করে নেওয়া যাক। কোন কোন শ্রেণিগুলি নিজ নিজ স্বার্থে রাষ্ট্রীয় সহায়তায় তাদের কার্যকলাপ চালাতে পারে? এই যেমন অধিক মুনাফার লক্ষ্যে গাড়ি কারখানার জন্য টাটার দরকার ছিল সিঙ্গুরের জমি ও সহকারি সহায়তা। আর কৃষক চেয়েছিল তাদের বহুফসল জমির অধিকার বজায় রাখতে। অনেকে হিসাব করে দেখিয়েছিলেন যে সিঙ্গুরে জমির চরিত্র বদল হয়ে কারখানা গড়ে ওঠাটা অর্থনীতির পক্ষেও ক্ষতিকর। কিন্তু রাষ্ট্র কাকে সাহায্য করেছিল?

একইভাবে বলা যায় যে, ভারতে বড় বাঁধ যে পরিমাণে গড়ে উঠেছে তার সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে বন্যা প্লাবিত অঞ্চলের পরিমাণ। কিন্তু তাতে কি নর্মদার উপর বাঁধ আটকানো গেছে? একইভাবে উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড় সহ গোটা মধ্য ভারতেই প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠনে কর্পোরেট পুঁজিকে সহায়তা দিতে রাষ্ট্র জনগণের কোন অধিকারকেই মান্যতা দিতে প্রস্তুত নয়। এই সমস্ত ঘটনাবলীর উপর নজর রেখে বিশেষ কোন বিশেষজ্ঞের সাহায্য ছাড়াই বলা যায় ভারতে গণতন্ত্র রয়েছে সেইসব বিদেশী কর্পোরেট সংস্থার যারা নিয়মিত শোষণের পাশাপাশি দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে উচ্ছেদ করে জল-জঙ্গল-জমির উপর দখল নিতে চাইছে, কোটি কোটি মানুষের জীবিকা বিপন্ন করে খুচরো ব্যবসার দখল নিতে চাইছে, গণতন্ত্র রয়েছে সেসব দেশীয় বৃহৎ পুঁজিপতিদের যারা সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সেবা করার মাধ্যমেই নিজেদের পুষ্ট করে।

আর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বা বলপ্রয়োগ গণতন্ত্রকে আজ ঠিক কতটা বিপন্ন করে তুলেছে? ভোটবাক্সে 'গণ'-এর মতামত প্রতিফলিত হবার আগেই সাধারণ মানুষ যে হিংসা, হানাহানি, রক্তপাত, হুমকি, পাল্টা-হুমকি, খুন, ধর্ষণের ঘৃণ্য দলীয় রাজনীতির শিকার হয় তারপরেও কোন সাহসে বা ভরসায় তারা ভোটকেন্দ্র অবধি নিজের পরিবারের লোকজনকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বা নিজে এগিয়ে যাবে? ফলে ছাপ্পা, ভোট-লুঠ দেশে দেশে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে উঠেছে বললে খুব বেশি ভুল বলা হয় না। এই বিপন্নতাকে আরো ঘনীভূত করে তুলেছে নিষ্ক্রিয় প্রশাসনের নিঃশব্দ মদত, ভোটযজ্ঞে স্বার্থপুষ্ট অসাধু কর্পোরেট সংস্থাগুলির অর্থের নিভৃত যোগান।

এ কারণেই রবীন্দ্রনাথ পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের চাইতে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন— যা প্রাচীন গ্রীস বা ভারতে পূর্বে বর্তমান ছিল। চেয়েছিলেন এদেশের বৃটিশ প্রশাসনিক খোল-নলচেটাকেই আমূল পালটে দেশীয় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা দানের জন্য। তাঁর গ্রাম-সমাজ বা 'স্বদেশী সমাজ' পরিকল্পনা সে দিকেরই ইঙ্গিত দেয়। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে সকল মানুষের বিচিত্র অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে সে গণতন্ত্রের স্বতন্ত্র এক রূপ। স্বায়ত্তশাসিত গ্রাম-পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথ যে সকল কথা বলেন তার মধ্যে এর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি আছে। সেখানে সকল 'গণ'ই সমান মর্যাদা পায়, সকলেই প্রশাসন বা নীতি নির্ধারণে অংশ গ্রহণ করতে পারে। নিজেদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক অবস্থার উজ্জীবন ঘটিয়ে স্বাবলম্বী ও গণতন্ত্র সচেতন হয়ে উঠতে পারে। সেই গ্রাম-সমাজ রাষ্ট্রের বিরোধী প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে না আবার রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিতও হয় না। রাষ্ট্রের সমান্তরালে গণতান্ত্রিকতার দ্বার উন্মুক্ত রাখে। পুঁজিশাসিত বিশ্বায়নের স্রোত সেখানে উন্নয়নের মানবিক মুখকে বিসর্জন দিতে পারে না।

এ জাতীয় গ্রাম-সমাজ পরিকল্পনাকে কেউ কেউ বিশ্বায়িত বাজার অর্থনীতির দ্বার রোধ করে দাঁড়িয়ে থাকা এক 'সর্বনাশা কল্পনা' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কেউ কেউ একে 'Utopian' বলে নির্দেশ করতে চেয়েছেন। কিন্তু আজকের দিনে সংস্কারমূলক অর্থনীতিতেও শুনি রবীন্দ্রনাথের এ জাতীয় অর্থনৈতিক চিন্তার স্বতন্ত্র প্রাসঙ্গিকতাকে। বাজারের বিপরীতে পরিকল্পিত অর্থনীতি গড়া 'সর্বনাশা কল্পনা' হ'তেই বাধ্য— এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই। কাজটা কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়; 'সর্বনাশা কল্পনা' নয় এটি। আস্থা রাখতে হবে মানুষের উদ্ভাবনী ক্ষমতার ওপর। যে উদ্ভাবনী ক্ষমতার সাহায্যে মানুষ এমন একটা সমাজ গড়তে পারবে যেখানে বাণিজ্য চক্রের মার নেই, নিয়োগহীনতার সমস্যা নেই এবং সামাজিক উৎপাদনের বন্টনে অসাম্য নেই। 'মান্থলি রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে এই ধরণের কথা বলেছিলেন আইনস্টাইন, যাঁর মেধার মান নিয়ে আজও কোনো প্রশ্ন নেই।

কথাটা সঙ্গত কথা। উদ্ভাবনী ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে মানুষ এরকম একটা সমাজ গড়বে এই প্রত্যাশা ইদানীং ক্রমবর্ধমান। কেননা বিশ্বায়িত বাজার অর্থনীতি ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছে ব্যক্তিমানুষের বিপন্নতা। প্রত্যাশা যত বাড়বে, এ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার তাগিদও তত বাড়বে। সমাজ এরকমই, এরকম সমাজ নিয়েই তুষ্ট থাকতে হবে। 'spontaneous developed order'-এর কাছে নতজানু হয়ে বাজার মৌলবাদীদের হাতে ভাগ্য সঁপে দিতে হবে— দেশে দেশে ক্রমশ বাড়ছে এই চিন্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। গড়ে উঠছে বিশ্বজুড়ে অসংখ্য সামাজিক সংগঠন। একবিংশ শতকে সমাজতন্ত্র এখন রীতিমত চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে সর্বত্র। সোভিয়েতের পতনের সাথে সাথে মতবাদ হিসেবে সমাজতন্ত্রবাদকে কবরে পাঠানো যায়নি। এটাকে গুরুত্ব দেবার কোনো দরকার নেই— উন্নাসিক বাজার-মৌলবাদীরা এরকম ভাবলেও বিশ্বায়িত বাজার অর্থনীতির ন্যায্যতা রক্ষার সমস্যা যে বাড়ছে, লিবারেল মতবাদের বাজারপন্থীরা এটা বিলক্ষণ বুঝেছেন। সেইজন্যই তাঁরা রলস্-এর 'সামাজিক ন্যায়'-এর তত্ত্ব আর বাজার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের কেইনসীয় তত্ত্ব ফিরিয়ে এনে বিশ্বায়িত বাজার অর্থনীতিতে একটা মানবিক মুখ প্রোথিত করার চেষ্টা করছেন এতটা গুরুত্ব দিয়ে। আর সেখানেই রবীন্দ্রনাথ দিনে দিনে বড্ড বেশি রকমের প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছেন।

তথ্যসূত্র:

১। মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার। রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড। বিশ্বভারতী, ১৪০৬, পৃ. ১৪৭।
২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। অবস্থা ও ব্যবস্থা। আত্মশক্তি। রবীন্দ্ররচনাবলী, ২য় খণ্ড। বিশ্বভারতী, ১৪০৬, পৃ. ৬৭৯-৬৮০।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 786-797
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.290

গ্রন্থ সম্পাদনায় সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা ও কৃতিত্ব পর্যালোচনা

ড. মুন্সী মহম্মদ সাইফুল আহমেদ, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, অসম, ভারত*

Received: 04.02.2026; Accepted: 07.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The identity of fiction writer Sadhan Chattopadhyay is universally recognized in the world of Bengali literature. He will be considered a timeless and universal literary figure for his novels such as 'Gahin Gang', 'Jaltimir', 'Matir Antenna', 'Shesh Rater Sheyal', 'Panihata', and short stories like 'Steel-er Chanchu', 'Mehogany', 'Manshakheko Ghora', 'Maharaja Dirghajibi Hon' etc. However, in addition to short stories and novels, he has written more than 300 essays; and has also done important work in editing of journals and books. In this research article, we will discuss Sadhan Chattopadhyay's role and distinctiveness in book editing. This research article examines the importance of his role not only in the creative writing of stories and novels but also in the broader scope of literary and cultural practice. Sadhan Chattopadhyay's organizational and editorial role in the context of international literature like that of Maxim Gorky, the partition of India, Bangladeshi literature, the Naxalite movement, short stories of 2000s and Bengali literary practice in Northeast India has been discussed in an analytical manner.

Keywords: Editororial Work, Little Magazine, Bangladesh, North-East India, Academic Knowledge, Cultural Editing, Organizational Achievements

বাংলা সাহিত্যের চর্চায় সম্পাদনার ইতিহাস দীর্ঘ এবং ফলবতী— ঈশ্বর গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে সাগরময় ঘোষ— তালিকা প্রস্তুত করলে বেশ কিছু আদর্শ ও মহান সম্পাদকের নাম চলে আসবে এবং এঁদের একটা বড় অংশই সৃষ্টিশীল রচনার সঙ্গেও যুক্ত এবং পরিচিত। সম্পাদনা-কর্মটি সাহিত্যচর্চা, সাহিত্যের সমালোচনা এবং সর্বোপরি ক্রিটিক্যাল নলেজের পরিবেশন করে থাকে। আর এইসব কাজে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন কথাশিল্পী সাধন চট্টোপাধ্যায়ও। লিটল ম্যাগাজিনের মতোই কয়েকটি কালজয়ী এবং ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থও সম্পাদনা করেছেন তিনি। সত্তরের দশকের খাদ্য আন্দোলন থেকে সাম্প্রতিক কোভিড পরবর্তী বাস্তবতা ভিন্নতর আঙ্গিকে[১] গল্প-উপন্যাসে রূপদান করেছেন যেমন তিনি; সম্পাদনার ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ, আসাম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গের লিটল ম্যাগাজিনের লেখকদের নিয়ে 'অসীমান্তিক' গল্প সংকলন, ত্রিপুরার গল্পও সংকলন, ম্যাক্সিম গর্কির ছোটগল্প, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শূন্য দশকের গল্প বা দেশভাগের গল্প— বিষয়ের দিকে নজর রাখলেই বোঝা যায়, দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সাহিত্যিক ও

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অনুসন্ধান ও চর্চায় সাধন চট্টোপাধ্যায় সচেতন এবং সক্রিয়। আমরা বর্তমান গবেষণা নিবন্ধে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থ সম্পাদনার ভূমিকা ও গুরুত্ব অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করব এবং সাহিত্য চর্চার সঙ্গে সৃজনশীল বিদ্যায়তনিক কাজে তাঁর কৃতিত্ব বিচার করব।

সম্পাদনা কর্মের মূল্যায়ন দেশ-কাল ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের প্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। সমালোচক উইলিয়ামস্ তাঁর 'what is an Editor?' নামক প্রবন্ধে একজন সচেতন সম্পাদকের প্রসঙ্গে যা বলেছেন, আমরা সাধন চট্টোপাধ্যায়ের জন্য সেই কথা ধার করতে পারি—

> "An editor is so many things to so many people that this rhetorically questioning heading is virtually impossible to answer in any concise form."[২]

আবার, বই সম্পাদনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলেছেন, যা এখানে স্মরণ করা যায়—

> "আমার ইংরেজি sadhana ছাপবার সময় তার কাজ দেখেছি, এতে যে সতর্কতা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন তা যে-সে লোকের দ্বারা সম্ভব নয়, এইজন্যে এ কাজের গৌরব আছে। তাকে প্রভূত পরিশ্রম করতে হয় জানি, কিন্তু এই পরিশ্রমের দ্বারা যে ফল পাওয়া যায় তা লেখক ও প্রকাশকের পক্ষে বহু মূল্যবান। আমার গ্রন্থ সম্পাদন কাজে আঙ্গিক ও ভাবের দিক থেকে এই রকম শ্রদ্ধাপূর্ণ সহায়তা পাব এই আমার আশা ছিল এবং আছে।"[৩]

রবীন্দ্রনাথ-কথিত আঙ্গিক ও ভাবের তাৎপর্য বর্তমান সময়ে গ্রন্থসংস্কৃতির বিবর্তনেও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে সমালোচক সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় বলেছেন—

> "লেখক ও সম্পাদক উভয়পক্ষেই একটা সম্ভ্রম ও সম্পর্ক ছাড়া কোনো বই-ই যথার্থরূপে হয়ে উঠতে পারে না। এই সম্পর্কের বিন্যাসে উভয়েরই লক্ষবিন্দু কিন্তু পাঠকই, কারণ তার কাছে পৌছানোর তাগিদেই তো বই প্রকাশকের উদ্যোগ। অর্থাৎ পড়তে গিয়ে পাঠ্যবিষয়ের পাঠে যাতে পাঠক কোথাও কোনো বাধা বা অস্বস্তিবোধ না করেন তা দক্ষতার সঙ্গে নিশ্চিত করাই সম্পাদকের প্রধান কাজ।"[৪]

আমরা দেখব, সম্পাদকের 'দায়' ও 'দায়িত্ব'র বৌদ্ধিক দিকগুলির চর্চা সাধন চট্টোপাধ্যায়ের মতো কথাসাহিত্যিক নিপুণ দক্ষতায় আয়ত্ব করেছেন। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনা-কর্মের মনন তাঁর জীবন জুড়েই আছে। একইসঙ্গে বলা যায় তিনি সাহিত্যের একজন বিরল সংগঠকও।

আমরা এই নিবন্ধে কথাসাহিত্যিক সাধন চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনা কর্মের সামগ্রিক বিচারে তাঁর সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে কর্মকুশলতার সার্থকতা বিচার করব। কারণ, 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন সাহিত্যের তিনটি দিকের কথা— জ্ঞান মার্গ, কর্ম মার্গ এবং সৃষ্টি মার্গ। এই প্রসঙ্গে স্বপন চক্রবর্তী বলেছেন—

> "অনেকে আছেন যারা সাহিত্য সম্পর্কে তত্ত্বায়ন করেন, অনেক কিছু জানেন, ভাবেন, অনেক সন্দর্ভ রচনা করেন, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন জ্ঞান মার্গ। অনেকে আছেন যারা পত্রিকা, বই প্রকাশ করেন, সম্পাদনা করেন, টীকা-ভাষ্য রচনা করেন, সাহিত্য-সম্মেলন, সাহিত্য-পরিষদ ইত্যাদি গঠন করেন— এটি একটি কর্মের দিক। সাহিত্যের জগতে এর একটি বিশেষ অবদান আছে, অন্তত রবীন্দ্রনাথের সময় তো বিশেষভাবেই ছিল। এবং তৃতীয় মার্গটি হল সৃষ্টির মার্গ।...সাহিত্যিকরাই যখন পত্রিকা-সম্পাদনার কাজে এগিয়ে আসছেন; সৃষ্টির পথ ঢুকে যাচ্ছে কর্মের পথে। সে পথের পাথেয় অবশ্যই সময়োপযোগী জ্ঞানের চর্চা।"[৫]

সাহিত্যিক যখন সম্পাদনার কাজে অগ্রসর হন, তাঁর মধ্যে যে 'সময়োপযোগী জ্ঞানের চর্চা'র প্রবণতা থাকে এবং সামগ্রিকভাবে তা যখন 'বিশেষ অবদান' বলে গৃহীত হয় বলে সমালোচক পণ্ডিত স্বপন চক্রবর্তীর বক্তব্য; তখন সাধন চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনা-কর্মের দিকে অধিক সচেতন অভিনিবেশ দাবি করে। গ্রন্থ সম্পাদনায় সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা ও পরিচয় যথাক্রমে আলোচনা করা হল।

এক- 'ম্যাক্সিম গোর্কির শ্রেষ্ঠ গল্প':

'ম্যাক্সিম গোর্কির শ্রেষ্ঠ গল্প' গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন সাধন চট্টোপাধ্যায়। গল্পগুলির অনুবাদক সমর ঘোষ। তিনি মূল থেকে নয়, ইংরেজি অনুবাদ থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। 'নব সাহিত্য প্রকাশনী' (১২৮/১ এ রাজা রামমোহন সরণী, কলকাতা-৯) থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমানে প্রকাশনীটা বন্ধ হয়ে গেছে। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১০ই অক্টোবর, ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে। প্রচ্ছদ করেছিলেন সমরেশ মুখোপাধ্যায়। মূল্য ছিল পনেরো টাকা। এই সংকলনে গর্কির যে গল্পগুলি স্থান পেয়েছে, সেগুলি হল—'জীর্ণ-বিকল', 'মানুষের জন্ম', 'কমরেড', 'কবি', 'আমরা ছাব্বিশজন ও একটি মেয়ে', 'কলুষা', 'পাঠক', 'প্রথম প্রেম', 'মুক্তি-সংগীত'।

সত্তর দশকের বাংলা কথাকারদের কাছে রুশ বিপ্লবোত্তর বাস্তবতা বিশেষত সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সাহিত্যচর্চার প্রসঙ্গে গর্কির প্রাসঙ্গিকতার কথা আমাদের অজানা নয়, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সাহিত্যচর্চায় আজও ততোধিক প্রাসঙ্গিক। আর সেই চাহিদা খানিকটা মিটিয়েছে এই সংকলনটি, বলাই বাহুল্য। সেদিক থেকেও এর একটা ঐতিহাসিক তাৎপর্য থকেই যায়। এই সংকলন এবং সামগ্রিক ভাবে গর্কি সম্পর্কে সম্পাদক সাধন চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—

> "১৮৯২ খৃষ্টাব্দে নিঝনি-নভোগর্দের শ্রমিক আলেক্সি পেশকভ যখন ম্যাক্সিম গোর্কির ছদ্মনামে প্রথম গল্প লেখেন, তাঁর বয়স মাত্র চব্বিশ। ইতিমধ্যেই বিচিত্র জীবন ও জীবিকার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর পাঠশালায় যে রুক্ষ, তিক্ত ও সুগভীর অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছিলেন, বিশ্বের খুব কম লেখকের ভাগ্যেই তা ঘটে।"[৬]

সম্পাদক সাধন চট্টোপাধ্যায় এই সংকলনের গল্পও বাছাই প্রসঙ্গে বলেছেন—

> "...এ সংকলনে গল্প বাছাইয়ের যে ধারা অনুসৃত হয়েছে তা হল গোর্কির প্রথম পর্বের সাহিত্য অর্থাৎ সরল মানবতাবাদের কিছু গল্প এবং দ্বিতীয় পর্বের উল্লেখযোগ্য কিছু গল্প যেখানে গোর্কির শ্রেণী-মানবতার পথ ধরে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার দিকে চিন্তা ও মননকে প্রসারিত করেছেন।"[৭]

দুই- 'প্রতিবেশী রাজ্য ত্রিপুরার গল্প ও গল্পকার':

সাধন চট্টোপাধ্যায় ও শ্যামল ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'প্রতিবেশী রাজ্য ত্রিপুরার গল্প ও গল্পকার' নামক গ্রন্থটি ৯ জানুয়ারি, ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে (লিটল ম্যাগাজিন মেলা, বাংলা আকাডেমি) 'উবুদশ প্রকাশনী' থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। শ্যামল ভট্টাচার্য নিজে ত্রিপুরার একজন গুরুত্বপূর্ণ গল্পকার। সংকলনটিতে ত্রিপুরার সতেরো জন গল্পকারদের একটি করে অর্থাৎ ১৭টি গল্পও সংকলিত হয়েছে এবং সঙ্গে রয়েছে রমাপ্রসাদ দত্তের মূল্যবান রচনা— 'ত্রিপুরার গল্পচর্চার ইতিহাস'।

'ঈশান কোণে ভিন্ন স্বর' নামক মুখবন্ধে সম্পাদক সাধন চট্টোপাধ্যায় ত্রিপুরার গল্পের ইতিহাসের সূত্র ধরে আপামর বাঙালি পাঠকের সামনে কয়েকটি অজানা তথ্য উত্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন—

> "মনে রাখতে হবে— দেশভাগের আগে ত্রিপুরা ছিল রাজন্যশাসনের অধীন। তাই সমগ্র ত্রিপুরায় বর্তমানে বাংলা ও ককবরক ভাষা, বাঙালি ও উপজাতীয় সংস্কৃতি একই বৃন্তের দু'টি ফুল। ত্রিপুরার গল্পে অসীমান্তিক চরিত্র নিয়েও এই স্বাতন্ত্র্য অর্জন রাতারাতি ঘটেনি। ছোট্ট পথ পরিক্রমা করতে হয়েছে। তথ্যে জানতে পারি ১৯৫৮-এর আগে পর্যন্ত ত্রিপুরার লেখকদের নিজস্ব কোনো গল্পগ্রন্থ ছিল না। রাজসভাকেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চা থেকে বেরিয়ে সাধারণের মধ্যে গল্পচর্চার প্রচেষ্টা প্রথম সূচিত হয় ত্রৈমাসিক 'রবি' পত্রিকার মধ্য দিয়ে ১৯২৪ সালে। তবে এসব নিছক ইতিহাসের জন্য। বাংলা গল্পের চর্চা প্রকৃতপক্ষে শুরু দেশভাগের পর, যখন আগরতলায় সৃষ্টি হয় 'সাহিত্য বাসর'। সেই থেকে সাতের দশক পর্যন্ত যে তরঙ্গ লক্ষ করা যায়— তা হলো নিটোল গল্প, একমাত্রিকতা এবং 'কল্লোল', 'উত্তর-কল্লোল'-এর প্রভাব। বিমল চৌধুরী, কালিপদ চক্রবর্তী, ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য, সন্তোষ রায়— এই সংকলনের কিছু লেখক ঐ ধারার অগ্রগন্য।"[৮]

আমরা জানি ত্রিপুরার গল্প যাঁদের হাতে নতুন রূপ পেয়েছে তা মূলত নতুন প্রজন্ম। দুলাল ঘোষ, দেবব্রত দেব, দীপক দেব, শ্যামল ভট্টাচার্য, মাধুরী লোধ, মীনাক্ষী সেন প্রমুখের রচনা ত্রিপুরা বা বলা চলে উত্ত-পূর্বাঞ্চলের বাংলা গল্পকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। এই গ্রন্থের সম্পাদক সাধন চট্টোপাধ্যায় 'উবুদশ'-এর প্রকাশক গৌতম চৌধুরীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছেন— "পশ্চিমবাংলা, বাংলাদেশ ও উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রায় ২৫ কোটি বাঙালি পাঠকের কাছে অসীমান্তিক চেতনায় ত্রিপুরার গল্পের এই স্বতন্ত্র পরিচয় করিয়ে দিয়ে আঞ্চলিক সাহিত্যের ভবিষ্যসম্ভাবনার দরজা খুলে দিলেন।" এই সংকলনে যাঁদের গল্পও স্থান পেয়েছে তাঁরা হলেন— কালিপদ চক্রবর্তী (গঙ্গাধরের উপাখ্যান), সন্তোষ রায় (খোলস), দুলাল ঘোষ (ইতিহাসের উই), মানিক চক্রবর্তী (একদা অন্ধকারে এবং নন্দলালের পৈতে), দীপক দেব (নয়নতারা), মানস দেববর্মন (জীবন), দেবব্রত দেব (বিষকরবী কথা), কিশোররঞ্জন দে (না), অনুপ ভট্টাচার্য (কামড়), বিমল চৌধুরী (সোয়াদ), মীনাক্ষী সেন (মুখ), মাধুরী লোধ (ঝরঝরিয়ার ছোটগল্প), সদানন্দ সিংহ (শুঁয়োপোকা), কার্তিক লাহিড়ী (ধর্ষণ সম্পর্কিত অশ্লীল সাক্ষাৎকার), ভীষ্মদেব চট্টাচার্য (বংশীর ভাতার), ও শ্যামল ভট্টাচার্য (রে আদমী)।

ত্রিপুরায় ১৯২৪-এ 'কিশোর সাহিত্য সমাজ'-এর প্রচেষ্টায় আগরতলায় 'রবি' পত্রিকার প্রকাশ ত্রিপুরার সাহিত্যের ইতিহাসে একাধিক গুরুত্ব চিহ্নিত হয়। 'রবি' পত্রিকা ছ'বছর চলেছিল। চরিত্র ছিল ত্রৈমাসিক। এই ছ'বছরে কেবলমাত্র ত্রিপুরার একজন গল্পকারের গল্পই প্রকাশিত হয়েছিল। (সূত্র; রমাপ্রসাদ দত্ত, 'ত্রিপুরার গল্পচর্চার ইতিহাস, এই সংকলন, পৃ-১৬২) সেটি হল— অজিতবন্ধু দেববর্মার 'দায়মুক্ত'। ('রবি', ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৩০) এটিকেই ত্রিপুরার সাহিত্যে প্রথম ছোটগল্প বলা যায়। এরপর ত্রিপুরার লিটল ম্যাগাজিন 'পুবালী', 'ত্রিপুরা', 'নবজাগরণ', 'চিনিহা' প্রভৃতি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরার গল্প নানা শাখা-প্রশাখায় বিস্তারিত হয়েছিল। সাধন চট্টোপাধ্যায় ও শ্যামল ভট্টাচার্যের নির্বাচনে এই অর্বাচীন ত্রিপুরার বাংলা গল্পের সামগ্রিক ও ধারাবাহিক পরিচয় যেমন পাওয়া যায়, একইরকম ভাবে, প্রতিবেশী অঙ্গরাজ্যের ভৌগোলিক পরিবেশ, ভাষা-সমাজ-সংস্কৃতির জটিল বৈচিত্র ও সাহিত্যের গুণগত বদলের তাপ-ছাপ-চিহ্ন বাঙালি পাঠকের সামনে হাজির করেছেন।

তিন- 'অসীমান্তিক':

বাংলাদেশের ২৪ জন গল্পকারের ২৪টি গল্প, পশ্চিমবঙ্গের ১৯ জন গল্পকারের ১৯টি গল্প এবং উত্তরপূর্ব ভারতের ১৬ জন গল্পকারের ১৬টি গল্প, অর্থাৎ ৫৯টি গল্প নিয়ে 'অসীমান্তিক' গল্প সংকলন জানুয়ারি, ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে

আগরতলার 'অক্ষর প্রকাশনী' থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থটির শিরোনামে বিশেষভাবে জানানো হয়েছে, 'বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গ উত্তরপূর্ব ভারত তিন ধারার এক উৎস'। ৫০৩ পৃষ্ঠার সংকলন গ্রন্থটির প্রধান সম্পাদক হলেন হাসান আজিজুল হক, সম্পাদনায় আরও তিনজন যুক্ত ছিলেন। তাঁরা হলেন— সাধন চট্টোপাধ্যায়, হারুন হাবীব এবং দুলাল ঘোষ। গ্রন্থটির উৎসর্গও বেশ আকর্ষণীয়। উৎসর্গ পৃষ্ঠায় লেখা আছে 'রবীন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতন থেকে শিলাইদহ, শিলঙ পাহাড় থেকে আগরতলা যার পরিব্রজ্যা'। এখানে পশ্চিমবঙ্গের অংশটি সাধন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদনা করেছিলেন। তবে আলাদা করে তিনি কোনও ভূমিকা বা সম্পাদকীয় লেখেননি। 'প্রধান সম্পাদকের কথা' নামে হাসান আজিজুল হক ভূমিকা লিখেছেন। সেখানে এই সংকলনে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা নিয়ে সেখানে কয়েকটি অভিযোগ তুলেছেন হাসান আজিজুল হক। তিনি বলেছেন বলেছেন—

> "বাংলা সাহিত্যের তিন ভূ-খণ্ডের জন্য তিনজন সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছেন। নিজ নিজ অংশের গল্প গ্রহণ বর্জন তাঁরা স্বাধীনভাবেই করেছেন। এখানে তাদের নির্বাচনই চূড়ান্ত। এটা খুবই স্বাভাবিক যে আলাদা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গিতে সম্পাদকগণ গল্প নির্বাচন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের সম্পাদক সেরা বাংলা গল্প বাছাইয়ের চেষ্টা করেননি। বাংলা সাহিত্যের চিরায়ত লেখকদের লেখা গল্প নেননি, এমনকি স্বাধীনতা পরবর্তীকালের অনেক বিখ্যাত লেখকের গল্পও গ্রহণ করেননি। ঐতিহ্যসমৃদ্ধ বাংলা গল্প বর্তমানে যেখানে পৌছেছে, তারই নমুনা তুলে ধরেছেন তিনি নতুন গল্পকারদের লেখা নিয়ে। ভাষায় ভঙ্গিতে বর্তমান গল্পের চেহারাটা তিনি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন, কিন্তু বাংলাদেশ পর্বের সম্পাদক তা করেননি।"[৯]

এই সংকলনে বাংলাদেশের আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, শওকত ওসমান, আবু ইসহাক, সেলিনা হোসেন, রসীদ হায়দার, বিপ্রদাস বড়ুয়া, মনি হায়দার, আলাউদ্দিন আল আজাদ মঞ্জু সরকার, মণীশ রায় প্রমুখের গল্পও স্থান পেয়েছে, যেখানে বাংলাদেশের ছোটগল্পের সামগ্রিক বিবর্তনের ধারাপথটিকে মূর্ত করেছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের ক্ষেত্রে বলা যায়, এই পর্বের সাধন চট্টোপাধ্যায়ের সমসাময়িক অর্থাৎ গত শতাব্দীর সাতের দশকের গল্পকাররাই স্থান পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন— অভিজিৎ সেন, অমর মিত্র, কিন্নর রায়, নলিনী বেরা, ভগীরথ মিশ্র, রামকুমার মুখোপাধ্যায়, রবিশংকর বল, সোহারাব হোসেন, স্বপ্নময় চক্রবর্তী প্রমুখেরা এবং স্বয়ং সাধন চট্টোপাধ্যায়ের গল্প। উত্তরপূর্ব ভারতের গল্পকারদের মধ্যে অন্যতম হলেন, মলয়কান্তি দে, দুলাল ঘোষ, অরিজিৎ চৌধুরী, দীপক দেব, শ্যামল ভট্টাচার্য, অলক দাশগুপ্ত, দেবব্রত দেব প্রমুখেরা। এই গল্পও সংকলন বাংলা ভাষা-সাহিত্যের সীমান্ত উপেক্ষা করে ব্যাপকতা আর বাস্তবতার সেতু রচনা করেছে বলা যায়।

চার- 'শূন্য দশকের ছোটোগল্প':

'শূন্য দশকের ছোটোগল্প'— অভিযান পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত এই গ্রন্থটি সাধন চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয়। ৩০৩ পৃষ্ঠার এই সংকলনটিতে পাঁচজন মহিলা কথাকার সহ সর্বোমোট ৩৩টি ছোটগল্প স্থান পেয়েছে।

গ্রন্থটিতে যাঁদের ছোটগল্প সংকলিত হয়েছে, তাঁরা হলেন— অনিন্দিতা গোস্বামী (প্রত্যাবর্তন), অর্ণব রায় (মেজোবাবু আসবেন), অরণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় (চেনা ফুলের ছাপ), অরুণ সিরাজ (উট নয়, উটের গ্রীবার গল্প), অরুনাভ বিশ্বাস (অ্যাপয়েন্টমেন্ট), অশোক তাঁতী (ফুলেরা যেভাবে ফোটে), চন্দন চক্রবর্তী (দুখিরামের ঝোলা), তমাল বন্দ্যোপাধ্যায় (সংক্রমণ), তন্বী হালদার (বিভাজন), দেবাশিস সরকার (লিখিও উহা ফিরিৎ চাহো কি না),

ধনঞ্জয় ঘোষাল (রাঙামাটি), পার্থজিৎ ভক্ত (ব্যান্ডমাস্টার), প্লাবন দাশ (অপু), বিকাশকান্তি মিদ্যা (বদল বৃত্তান্ত), বিনোদ ঘোষাল (জাতক কাহিনি), বিশ্বজিৎ মণ্ডল (জিব্রাইলের ডানা), মারুফ হোসেন (সরীসৃপের আপস প্রবণতা), মুক্তি হক (বন্দের মাঠ), রোহণ কুদ্দুস (নতুন কবিতার কবি), শতদল দেব (সময়ের সমুদ্রের পারে), শামিম আহমেদ (কবর), শীর্ষেন্দু দত্ত (ছায়ামন), শুভদীপ মৈত্র (রাস্তা কোথাও যায় না), শ্রীকান্ত অধিকারী (নষ্টামি), সজল ঘোষ (শহরের পাখি), সম্বিৎ চক্রবর্তী (আমি এবং আমরা), সাদিক হোসেন (করিম আলির রোশেনারা), সায়ন্তনী নাগ (ওরা দুজন), সুবীর বোস (মেঘ কালো), সুব্রত নাগ (শত্রুব্যূহ), সৈকত মুখোপাধ্যায় (বামন বিষাদময়ী কথা), সৌতি মিত্র (শবভাষ) ও স্বাতী গুহ (বাতাসি)। গ্রন্থটির সম্পাদনার উদ্দেশ্যে সাধন চট্টোপাধ্যায় প্রাঞ্জল ভাষায় জানিয়েছেন—

> "নতুন পরিস্থিতির মুখোমুখি, যারা বাংলা ছোটগল্প লিখতে এসেছেন, সৃষ্টির কাজে কীভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করছেন, উপকরণ-প্রকরণের সম্পর্ক কীভাবে দেখছেন, সকল আঞ্চলিক ভাষা যখন পৃথিবীময় একটি ভাষার বাণিজ্যিক ডিপার্টমেন্টের দাপটে দুয়োরানি, অবহেলার অতলে অভিভাবকহীন, যখন নয়া সংস্কৃতির আমোদাগারে বোধ-বুদ্ধি-চিন্তার প্রবেশে কাঁচি চলছে, বাংলা গল্প যখন প্রচারের দরজায় ঠা ঠা রোদ্দুরে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, এমন অভিনব বিধিব্যবস্থায় শূন্য দশকের লেখকরা কীভাবে কতদূর প্রতিকূল পরিবেশে দাঁড় বাইছেন—সরেজমিনে ক্ষেত্রগবেষণার প্রয়োজনবোধ করছি আমরা। তাই, 'অভিযান পাবলিশার্স'-এর কর্ণধার মারুফের প্রস্তাবে সাড়া দিলাম। সব যুগেই কাষ্ঠ আহরণের কিছু ব্যক্তি মজুত থাকেই।"[১০]

এই গ্রন্থ সংকলন ও সম্পাদনার উদ্দেশ্য একবিংশ শতাব্দীর শূন্য দশকে বাংলা আখ্যানের সামগ্রিক ডিসকোর্সটি অনুসন্ধান করা। একইসঙ্গে কেন্দ্রের দিকে সম্পূর্ণ ফোকাস না করে বৃত্তের সীমানায় গল্পবীজের অনুসন্ধান। তাই, সম্পাদকের নিরীক্ষা আমাদের চমকিত করে, যখন তিনি বলেন—

> "কলকাতা-কেন্দ্রিক সাহিত্য ঐতিহ্যের জড়তা ভেঙে যে পরিকাঠামোতে তা সম্ভব, আমাদের নেই। তবু বলছি, এ সংকলনের অধিকাংশ লেখক-লেখিকা রাজধানীর বাইরের। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান, দুই চব্বিশ পরগণার লিটল ম্যাগাজিনের নিয়মিত পাঠক্রিয়ায়, আহ্বান জানিয়ে গল্প সংগ্রহ করেছি।"[১১]

সম্পাদক গ্রন্থটি সম্পাদনার ক্ষেত্রে দুটি যুক্তির অবতারণা করেছেন ভূমিকাতে। প্রথমত. তিনি মনে করেছেন এই সংকলনের অন্তত চার-পাঁচজন লেখক ভবিষ্যৎ বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম প্রধান লেখক হয়ে উঠবেন। দ্বিতীয়ত. সমকালীন সাহিত্য-সংস্কৃতির সার্বজনীন সমস্যা, সংকট ও দ্বন্দ্বমুখরতার বৈশ্বিক বাতাবরণের ঐতিহাসিক ভূমিকা ও নিদর্শন হয়ে থাকবে এই সংকলনটি।

পাঁচ- 'প্রসঙ্গ: মতি নন্দী':

প্রমা প্রকাশনী থেকে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত 'প্রসঙ্গ: মতি নন্দী' নামক অমূল্য গ্রন্থটি সাধন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদনা করেছিলেন। যার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি বইমেলায়। মাত্র তিন বছরের মধ্যে সংস্করণ ও মুদ্রণ, গ্রন্থটির বিক্রি এবং বাজারের চাহিদাকেই প্রমাণ করে। উল্লেখ্য, সম্পাদক গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন— 'বাংলার ক্রীড়া সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে'। 'মতি নন্দী: দু চার কথা' নামক দু-পৃষ্ঠার প্রস্তাবনায় সম্পাদক গ্রন্থটির নির্মাণের কৈফিয়ৎ দিয়েছেন। ১৩৬ পৃষ্ঠার এই সংকলনটিতে ২৬টি প্রবন্ধ, সাক্ষাৎকার, মতি নন্দীর প্রামাণ্য জীবনপঞ্জি এবং গ্রন্থপঞ্জি রয়েছে সংকলনটিতে।

নতুন প্রজন্মের বাঙালি পাঠকের কাছে মতি নন্দী—ক্রীড়া সাংবাদিক এবং 'কোণি', 'স্ট্রাইকার', 'ব্যাটের রাজা বলের উজির' বা 'দ্বাদশ ব্যক্তি'-র রচয়িতা হিসেবেই কেবলমাত্র পরিচিত থেকে গেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন, সাহিত্য, সাংবাদিকতা, উপন্যাস, ছোটগল্প— সামগ্রিক পর্যালোচনা দুই মলাটে পরিবেশনা করেছেন সাধন চট্টোপাধ্যায়। মুখবন্ধ রচনায় সম্পাদক পাঠকদের সঙ্গে মতি নন্দীর পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন এইভাবে—

> "মতি নন্দীই ক্রীড়া-সাংবাদিকতাকে সাহিত্যের পরিবেশনে নতুন একটি ভুবন রূপান্তরিত করেছিলেন। বলতে গেলে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। নতুন ধরণের গদ্যই চালু করে দিয়েছিলেন। ভাষার ওপর ছিল মতি নন্দীর অসম্ভব দক্ষতা। ক্রীড়া সাংবাদিকতায় মতি নন্দী পুরনো যুগ অর্থাৎ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শঙ্করীপ্রসাদ বসু বা বেরী সর্বাধিকারীদের অস্তাচলে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এতে নতুন বাঙালি প্রজন্ম যে মতি নন্দীকে পেল, তাঁর প্রথম পরিচয়টিও সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মতি নন্দী প্রকৃত অর্থেই নাগরিকমনস্ক লেখক। যে-কলকাতা আজ রিয়েল-এস্টেট ব্যবসায় হারিয়ে গেছে, বিশেষত উত্তর কলকাতাকে খুঁজে নিতে গেলে, ইতিহাস গ্রন্থের চাইতেও জীবন্ত প্রয়োজন মতি নন্দীর গল্প-উপন্যাস পাঠ।"[১২]

এখানে উল্লেখ করতেই হয় যে, সাহিত্যিক মতি নন্দী বেঁচে থাকতেই 'প্রমা' পত্রিকা তাঁকে নিয়ে একটা বিশেষ সংখ্যা করেছিল। এই সংকলনটি তারই নির্বাচিত রূপ। এই সংকলনে যারা লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন— সন্তোষকুমার ঘোষ, অজয় বসু, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, আবুল বাশার, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ, পুর্ণেন্দু পত্রী, অশোক মুখোপাধ্যায়, রূপক সাহা, গৌতম হালদার, রামকুমার মুখোপাধ্যায়, কিন্নর রায়, স্বপ্নময় চক্রবর্তী প্রমুখেরা।

ছয়- 'দেশভাগের গল্প : রক্ত বেদনা ও স্মৃতির আলেখ্য':

এপ্রিল, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে 'গাঙচিল প্রকাশনী' থেকে প্রকাশিত 'দেশভাগের গল্প: রক্ত বেদনা ও স্মৃতির আলেখ্য' গ্রন্থটি সংকলন ও সম্পাদনা করেন সাধন চট্টোপাধ্যায়। ৩৯০ পৃষ্ঠার এই সংকলনটিতে মাত্র ২৮টি গল্প বেছে নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে দেশভাগ ও দাঙ্গা নিয়ে বাংলায় বেশ কয়েকটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। এই সংকলনে সাধন চট্টোপাধ্যায় মনোযোগ দিয়েছেন সেই সব লেখকদের অন্তর্ভুক্ত করতে যারা উপেক্ষিত থেকে গেছেন নানা কারণে।

এই সংকলনে সম্পাদক যাঁদের বেছে নিয়েছেন তাঁরা হলেন— রমেশচন্দ্র সেন (পথের কাঁটা), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (আচার্য কৃপালনী কলোনি), মনোজ বসু (এপার-ওপার), সতীনাথ ভাদুড়ী (গণনায়ক), নরেন্দ্রনাথ মিত্র (কাঠগোলাপ), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (একটি তুলসীগাছের কাহিনি), সত্যপ্রিয় ঘোষ (নদীর ভর্ৎসনা), দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (জটায়ু), অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (বাতাসী), প্রফুল্ল রায় (রাজা যায় রাজা আসে), জ্যোৎস্নাময় ঘোষ (অক্ষক্রীড়ার ক্যাবিনেট মিশন ও ভাঙা বাংলার বুলা), আশিস সান্যাল (জন্মভূমি), হাসান আজিজুল হক (পরবাসী), যতীন বালা (ভাঙা সেতুর দুই মুখ), সমীর রক্ষিত (বেলা অবেলা), জীবন সরকার (ভিটেমাটি), শৈলেন সরকার (স্বদেশযাত্রা), দেবীপ্রসাদ সিংহ (বডার), কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর (অন্য ইহুদি), অধীর বিশ্বাস (ছবি), অনিল ঘোষ (মাটি), নকুল মল্লিক (অব্যক্ত), সোহারাব হোসেন (এপার বর্ডার ওপার বর্ডার), গৌতম আলী (ঠিকানা), অহনা বিশ্বাস (ভাগের মা), অমিত মুখোপাধ্যায় (বাংলা আমার), নীহারুল ইসলাম (অথ সীমান্ত কথা) ও তৃষ্ণা বসাক (নদীর স্বদেশ)।

'দেশভাগের গল্প' সংকলনটিতে সম্পাদক সাধন চট্টোপাধ্যায় 'নতুন যুগের ভোরে' শিরোনামে দীর্ঘ বারো পৃষ্ঠার মুখবন্ধ রচনায় এই সংকলনের পটভূমি, প্রয়োজনীয়তা, ঐতিহাসিকতা প্রভৃতি প্রসঙ্গগুলি চিহ্নিত

করেছেন। দেশভাগ বাঙালি জীবনে যে সর্বাত্মক অভিঘাত এনেছিল যা, দেশভাগের ছয় দশক পরে মনস্তাত্ত্বিক স্তরে আজও বিদ্যমান, তা ছোটগল্পের পরিসর ও আধারে সংকলিত করেছেন সাধন চট্টোপাধ্যায়। তিনি দেখিয়েছেন, পশ্চিমের দেশভাগ সাতচল্লিশ থেকে পাঁচের দশকের মাঝামাঝিই শেষ হয়ে গিয়েছিল। সাদাত হুসেন মান্টো, রাজিন্দর সিং বেদী, ভীষ্ম সাহানি, ইসমত চুগতাই, কিষান চন্দর, ইন্তিয়াজ হুসেন— দেশভাগ নিয়ে তাঁদের সাহিত্যে আমাদের অনুভব-সত্তাকে প্লাবিত করে। মুখবন্ধে সম্পাদক বলেছেন—

> "সত্যিই দেশভাগ A process of continuous erosion of human values. বর্তমানে পরমাণ ও গুণমানে আমরা যদি বাংলা ভাষার পার্টিশন সাহিত্যকে বৃহত্তর ব্যপ্তিতে বিচার করি, দেখব শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, বাংলাদেশ ও উত্তর-পূর্ব সীমান্তের অভিবাসী বাঙালি লেখকরা কত স্পর্শকাতরতায় দেশভাগের মর্মবেদনাকে তুলে আনছেন। আর সংকীর্ণ চোখে বাংলা ভাষা বলতে, নিছক কলকাতাকেন্দ্রিক কিছু সৃষ্টিকে যদি বুঝি, বৃহত্তর পটভূমি ভুলে যাই, সে বিচার ভিন্ন ও খণ্ডিত হতে বাধ্য।"[১৩]

এই সংকলনের গল্পগুলিতে মুসলিম, বর্ণ-হিন্দুর সঙ্গে দলিত মানুষের জীবনে ভিন্নমাত্রায় দেশভাগের অভিজ্ঞতাকে তুলে আনতে সম্পাদক সচেষ্ট ছিলেন। প্রবীণতম লেখকের সঙ্গে নবীনতর লেখকের বয়সের ব্যবধান পঁচাত্তর বছর। তিন প্রজন্মের কথাকারদের সৃষ্টিতে সংকলনটি সমৃদ্ধ। এখানে সীমান্তবর্তী অঞ্চলের কথাকার— সোহারাব হোসেন, নীহারুল ইসলামের গল্প অন্য মাত্রা দান করেছে। একইভাবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দেবীপ্রসাদ সিংহ, বাংলাদেশের প্রতিনিধিস্থানীয় লেখক হাসান আজিজুল হক, আবার অহনা বিশ্বাস ও তৃষ্ণা বসাকের মতো নারী গল্পকারের রচনায় বহুমুখী তাৎপর্য, দেশভাগের গল্পের নতুন নতুন ভাষ্য ইতিহাসের ভিন্নতর ডিসকোর্সে পরিণত হয়েছে বলা চলে। আর এসবের নেপথ্যে সম্পাদক সাধন চট্টোপাধ্যায় ইতিহাসচর্চার সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক বীক্ষার নিখুঁত গ্রন্থনা করেছেন। যা কেবল 'রক্ত বেদনা ও স্মৃতির আলেখ্য' হয়েই শেষ হয়ে যায় না, দেশভাগের ঐতিহাসিক ও মানবিক দলিলের আধুনিক ভাষ্য রচনা করে চিন্তনের সম্পাদনা করতে থাকে।

সাত- 'নকশালবাড়ির গল্প':

'নকশালবাড়ির গল্প' গ্রন্থটি সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন সাধন চট্টোপাধ্যায়। ৩৫৬ পৃষ্ঠার গ্রন্থটি 'গাঙচিল প্রকাশনী' থেকে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি অর্থাৎ কলকাতা বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির প্রসঙ্গে ব্লার্বে বলা হয়েছে— "অর্ধশত বছর আগে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্র, রাজনীতি ও সমাজকে ঘিরে নকশাল আন্দোলনের নামে যে-কম্পন ঘণীভূত হয়েছিল, পাঁচ দশক জুড়ে নানা কম্পাঙ্কের তরঙ্গ আজও তা স্বপ্ন, সাহস, রক্ত ও দমনপীড়নের অক্ষরে বাহিত।"

এই সংকলনটি বত্রিশজন লেখকের গল্প নিয়ে সংকলিত। চব্বিশ জন প্রয়াত, আটজনের কলম আজও সজীব। অতীতে এঁদের অনেকেই রাষ্ট্রশক্তির নির্যাতনে জেল খেটেছিলেন, দু-দুজন খুন হয়েছেন কারাগারের অভ্যন্তরে— তিমিরবরণ সিংহ ও মুরারি মুখোপাধ্যায়। সংকলনটিতে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের নিজের গল্প 'রক্তিম বসন্ত' গ্রন্থটিকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে। এই লেককদের যে সকলেই এই আন্দোলন সমর্থন করেছিলেন এমনও নয়। তবে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের ইতিহাস-সচেতনতা অবশ্যই কাজ করেছিল। সাধন চট্টোপাধ্যায় এই সংকলনের জন্য বেছে নিয়েছেন যে সব গল্পকারদের তাঁরা হলেন— গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (এর নাম সমাজদেহ), মহাশ্বেতা দেবী (বিছন), মিহির আচার্য (কলকাতা, কলকাতা), অসীম রায় (অনি), ব্রজেন মজুমদার (খোদহাটির ডাক), মিহির সেন (আলোয় শুধু), অজিত মুখোপাধ্যায় (কলকাতা: ১৯৭০), মানবেন্দ্র পাল (অভিনয়), নির্মল চট্টোপাধ্যায় (পিপাসা), জ্যোৎস্নাময় ঘোষ (সরীসৃপ), প্রলয় সেন (তপু চলে যাচ্ছে), তপোবিজয় ঘোষ (একটি মস্তানি গল্পের

ভূমিকা), রবি সেন (ঘড়ি কী বলে), সমরেশ দাশগুপ্ত (জলপোকা), মণি মুখোপাধ্যায় (গণতন্ত্র এবং গোপাল কাহার), শচীন বিশ্বাস (জীবনযাপন), শৈবাল মিত্র (সংগ্রামপুর যাত্রা), শঙ্কর বসু (কপিলের মুকুলযাত্রা), সিদ্ধার্থ সাহা (ছোটবকুলপুরের পরের কথা), চন্দন ঘোষ (গল্প নয়, গল্পের মতো), নবারুণ ভট্টাচার্য (কাকতাড়ুয়া), জয়ন্ত জোয়ারদার (জয় পরাজয়), স্বপ্নময় চক্রবর্তী (আরুয়ালের হাত), স্বপন সেন (সাদা রুমাল), মুরারি মুখোপাধ্যায় (সূর্যের উত্তাপে তীরধনুক), তিমিরবরণ সিংহ (সূর্যসেনা), শৈলেন সরকার (ভালোবাসার চিঠী—মণিকে), সব্যসাচী সেন (বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ ও তাহার পর), সাত্যকি হালদার (অলয়) এবং অনিল ঘোষ (দুঃসময়ের মুখোমুখি) প্রমুখেরা।

সংকলনটির উৎসর্গ-পৃষ্ঠায় লেখা আছে— 'আত্মত্যাগ করেছিলেন যারা'। সংকলনটির ভূমিকা— 'প্রসঙ্গত কিছু'তে সম্পাদক সাধন চট্টোপাধ্যায় নকশাল আন্দোলন এবং তার প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা সাহিত্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলেছেন। তার মধ্যে দু'টি প্রসঙ্গ প্রণিধানযোগ্য—

১) "পৃথিবীর আর কোনও দেশে একটি আঞ্চলিক নাম এমনভাবে সংগ্রাম-প্রতিরোধের প্রতীকী হয়ে গান, কবিতা, গল্প-উপন্যাস কিংবা অভিবচন, তাত্ত্বিক তর্ক, সাংবাদিকতায় জীবন্ত থাকতে পারে জানা ছিল না।"[১৪]

২) "ভারতের স্বীকৃত বাইশটি ভাষার মধ্যে একটিও এমন নেই, যেখানে 'নকশাল' শব্দটির অভিঘাত অনুপস্থিত, গান, নাটক, সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রীয় আলোচনায় উঠে আসে না।"[১৫]

উপসংহার:

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে, পত্রিকার মতোই গ্রন্থ-সংকলন এবং সম্পাদনায় সাধন চট্টোপাধ্যায় তার স্বাধীন গল্প-উপন্যাস রচনা ব্যতীত দীর্ঘদিন পরিশ্রম করেছেন। পত্র-পত্রিকার সম্পাদক, খ্যাত-অখ্যাত লেখক, শহর-প্রান্তিক, উত্তর-পূর্বাঞ্চল এমনকি বাংলাদেশের সামগ্রিক গবেষক-লেখকদের সার্বিক অনুসন্ধান ও সর্বোপরি বিষয়ভিত্তিক সম্পাদনায় বঙ্গীয় পাঠক ও প্রকাশকের আগ্রহের সবদিক সাবলীল ও বিচক্ষণতায় বজায় রেখেছেন। 'অসীমান্তিক' 'প্রতিবেশী রাজ্য ত্রিপুরার গল্প ও গল্পকার' ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, উত্তর পূর্ব ভারতের গল্প সংকলন করেছিলেন, নাম— 'এক আকাশ তিন পৃথিবী'। বাংলা ভাষায় লিখিত গল্পের ভৌগোলিক সীমারেখা এবং সীমান্ত ব্যবধান দূর করে সংস্কৃতির সেতুবন্ধনে তিনি সদা সচেষ্ট। এছাড়া তাঁর সমকালীন এবং নবীন কথাসাহিত্যিক এবং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের কখনও সৃজনশীল কখনও গবেষণা-গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করেছেন অসংখ্য। যেমন উল্লেখ করা যায়, 'প্রজ্ঞা বিকাশ প্রকাশনী' থেকে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত অধ্যাপক সনৎকুমার নস্কর গ্রন্থিত এবং সম্পাদিত 'সোমেন চন্দের গল্প: নিজস্ব পাঠের আয়নায়' গ্রন্থে সাধন চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘ ছয় পৃষ্ঠার ভূমিকা লিখেছেন যা, প্রথম বাংলা শহীদ লেখকের সাহিত্যিক মূল্যায়ন ও চর্চার মুখবন্ধ রচনা বলা যায়; এছাড়াও কথাকার সোহারাব হোসেনের প্রথম গ্রন্থ এবং প্রথম গল্পও গ্রন্থ, ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে 'দিবারাত্রির কাব্য' প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত— 'দোজখের ফেরেস্তা'-তে বা সুকান্তি দত্তের প্রথম উপন্যাস ২০০১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'যুধান কথা'র ভূমিকাও লিখেছেন সাধন চট্টোপাধ্যায়।

এইভাবে একদিকে তিনি বাংলা গ্রন্থ-সংস্কৃতির নির্মাণ ও চর্চার ধারায় অবদান রেখেছেন এবং নূন্যতম হলেও সেই ঐতিহ্যে নতুন তাৎপর্য দান করেছেন। আবার অপরদিকে নবীন-প্রবীণ লেখক-গবেষকদের গতানুগতিকতার পরিবর্তে সৃজনশীল সৃষ্টিকর্মের দিশা। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের পরিচয় মূলত কথাসাহিত্যিক হিসেবে। তবে ছ'শ-র বেশি ছোটগল্প, পঁচিশটি উপন্যাস এবং শ'তিনেক প্রবন্ধ ও সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গেই আলোচ্য গুরুত্বপূর্ণ সম্পাদনাগুলি তার সাহিত্যপ্রেম, সৃজনীশক্তি, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ ও

অনুসন্ধিৎসা প্রমাণ করে। মতি নন্দী, উত্তর-পূর্বাঞ্চল বিশেষত ত্রিপুরার ছোটগল্প, দেশভাগের গল্প, নকশালবাড়ির গল্পচর্চা ও শূন্য দশকের গল্পচর্চায় তাঁর অবদান প্রবাদপ্রতিম এবং ঐতিহাসিক তা বলাই বাহুল্য।

উপরোক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়াও, সম্প্রতি সাধন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদনার কাজ করছেন 'বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভিন্নধারার গল্প' ও রবীন্দ্রনাথের নির্বাচিত ছোটগল্প' নিয়ে। বাংলা একাডেমিক জগতে যেমন, সাহিত্যিক মহলেও সাধন চট্টোপাধ্যায়ের এই সম্পাদনাকর্মগুলি স্বীকৃত। প্রখ্যাত সাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী 'সাধনদা, আমাদের প্রতিনিধি' নামক রচনায় সাধন চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদক ও সাংগঠনিক ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন—

> "সত্তর-আশির লেখকদের কাছে তিনি অভিভাবকপ্রতিম। সাধনদার সঙ্গে বাংলাদেশে আমরা যে সমবেত ভ্রমণ করেছি, সেখানে সাধনদাকে প্রায়শই আমাদের মুখপাত্র বলে মেনে নিয়েছি। অন্যত্রও করে থাকি। সাধনদা এই দায়িত্বটা খুব ভালভাবেই পালন করেন। সাধনদা আর একটা বড় কাজ করেন, বা করতে চেষ্টা করেন— সেটা হ'ল— ত্রিপুরা, আসাম পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশে মিলিত বাংলা সাহিত্যের সম্মেলন ঘটানো। কয়েকটি সংকলন সম্পাদনা ছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এই ব্যাপারে সোচ্চার হতে দেখেছি সাধনদাকে।"[১৬]

এখানে সমসাময়িক কথাকার স্বপ্নময় চক্রবর্তীর বক্তব্যে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের সাংগঠনিক গুণ, সংকলন ও সম্পাদনার তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা স্বীকৃত হয়েছে। আমরা জানি তিনি আদ্যন্ত লিটল ম্যাগাজিনের কর্মীও। এ প্রসঙ্গে স্বপ্নময় চক্রবর্তী বলেন—

> "সাধন চট্টোপাধ্যায় সর্ব অর্থেই ছোট কাগজ—লিটল ম্যাগাজিনের লেখক। লিটল ম্যাগাজিনের লেখক হিসেবে তাকে নিয়ে গর্ববোধ করতেই পারে বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে স্বাধীন এই প্রকাশমাধ্যমগুলি। আর সাধন চট্টোপাধ্যায়ও লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে গর্ববোধ করেন যে তাঁর সঙ্গে নানা আলাপে বুঝেছি।...কথাসাহিত্য উৎসবের সময় দূর মফস্বলের শক্তিমান তরুণদের খোঁজ দেন সাধন চট্টোপাধ্যায়। আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ আর পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষার লেখকদের নিয়ে তিনি সম্পাদনা করেছেন অসীমান্তিক নামের একটি আশ্চর্য গল্পগ্রন্থ।...তাঁদের সকলকে একসূত্রে বেঁধে কলকাতা শহরের দাপট বোধহয় ভাঙতে চান সাধন।"[১৭]

সমকালীন আর একজন কথাকার কিন্নর রায়, সাধন চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে বলেছেন— 'তাঁকে কখনও দৈনিক পত্রিকার অফিসে সম্পাদকীয় দপ্তরে গিয়ে বসে থাকতে দেখিনি। তিনি দৈনিক পত্রিকা বা প্রাতিষ্ঠানিক সাপ্তাহিকের ধারাবাহিক 'কৃপাধন্য' লেখক নন'। কিন্নর রায়ের বক্তব্য থেকে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদকীয় আদর্শের দিকটা অনুধাবন করা যায় অবশ্য। অ-বাণিজ্যিক পত্র-পত্রিকা, লিটল ম্যাগাজিনেই তাঁর বিশ্বাস ও শক্তির আস্থা দেখা যায়। প্রথমাবধিই তাঁর এই ব্যক্তিত্বের পরিচয় সম্পর্কে সচেতন পাঠকও অবগত। তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা সত্তর দশক থেকে আজও কথাসাহিত্যের ধারাটিকে নানাভাবে পুষ্ট করেছে। কিন্নর রায় আরও বলেছেন—

> "নব্বইয়ের দশকে 'দিবারাত্রির কাব্য' পত্রিকাকে ঘিরে যে সাহিত্যের পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে, সেই আড্ডাতেও কফিহাউসের টেবিলে তিনি নিয়মিত হাজির, প্রতি মঙ্গলবার।...আজকের 'দিবারাত্রির কাব্য' যেটুকু যা চিহ্ন রেখেছে বাংলা সাহিত্যের মূল ধারায়, তার পেছনে সাধন চট্টোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় সহ আরও অনেকের অবদান যথেষ্ট। বিশেষ করে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যার প্রকাশ, যার অতিথি সম্পাদক ছিলেন সাধন চট্টোপাধ্যায়।

'দিবারাত্রির কাব্য'-কে একটি সম্পূর্ণ অন্যতর জায়গায় নিয়ে যায়। এই সংখ্যা প্রকাশ করার জন্যই 'দিবারাত্রির কাব্য' পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির লিটল ম্যাগাজিন পুরস্কার পায়।"[১৮]

সম্পাদিত গ্রন্থগুলি পাঠ করলেই বোঝা যায় সাহিত্যিক মূল্যায়নের একটা সুউচ্চ, সৃজনশীল, মননধর্মী মানদণ্ড তাঁর আছে। বিশেষত সমস্ত ধরণের প্রাতিষ্ঠানিকতার বাইরে থেকে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের সংকলন ও সম্পাদনা নিয়ে এই পর্যালোচনার শেষে একটি কথাই বলা যায়— সাধন চট্টোপাধ্যায় জাত-সম্পাদক নন, কিন্তু তিনি একজন আদর্শ সম্পাদক। সমালোচক স্বপন চক্রবর্তীর বক্তব্য— "সাহিত্যিকরাই যখন পত্রিকা-সম্পাদনার কাজে এগিয়ে আসছেন; সৃষ্টির পথ ঢুকে যাচ্ছে কর্মের পথে। সে পথের পাথেয় অবশ্যই সময়োপযোগী জ্ঞানের চর্চা"[১৯]— একথা সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে অক্ষরে অক্ষরে যে সত্য তা স্বীকার করতেই হবে। বর্তমান আলোচনার প্রস্তাবনা কেবল এডিটর হিসেবে তাঁর ভূমিকা অনুসন্ধানে সীমাবদ্ধ নয়; বরং আমরা জানলাম, একজন প্রকৃত জ্ঞানতাপস, বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত ভূগোলের সামঞ্জস্যকারী, প্রকৃত গবেষকের সাধনা এবং "সাংস্কৃতিক সম্পাদনায়"[২০] সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক ভূমিকা অন্বেষণ-ই একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই নিশ্চিতভাবে এ কথা বলা যায় যে, সম্পাদক সাধন চট্টোপাধ্যায় চিরায়ত সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি ইতিহাসচর্চার সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক বীক্ষার নিখুঁত গ্রন্থনা করেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. মুন্সী, মহম্মদ সাইফুল আহমেদ। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে কভিডের ছবি ও প্রতিচ্ছবি। www.researchgate.net/publication/392197856_Images_and_reflections_of_Covid_in_Sadhan_Chattpadhyay's_short_stories_sadhana_cattopadhyayera_chotagalpe_kobhidera_chabi_o_praticchabi

২. Willimas, Alan D. 1993, *What is an Editor?* 'Editors on editing: what writers need to know about what editors do', ed. Gerald Gross, New York, Grove press, p. 4.

৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। মন্তব্য। কোমল গান্ধার। তৃতীয় সংখ্যা, ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ১১।

৪. মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীব। বই-সম্পাদনা প্রসঙ্গে দু-চার কথা। পরিচয়। সম্পাদক অভ্র বসু, ২য় সংখ্যা, ৮৭ বর্ষ, ২০১৯, কলকাতা, পৃ. ৯৮।

৫. চক্রবর্তী, স্বপন। সাহিত্য-সমালোচনা কোন পথে। সাহিত্যসমালোচনা প্রসঙ্গে, চার্বাক বক্তৃতামালা ৪। চার্বাক, ২০১৪, কলকাতা, পৃ. ৭-৮।

৬. চট্টোপাধ্যায়, সাধন। সম্পাদকের কথা। ম্যাক্সিম গোর্কির শ্রেষ্ঠ গল্প। সম্পাদক সাধন চট্টোপাধ্যায়, নব সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮২, কলকাতা, পৃ. ৫।

৭. তদেব, পৃ. ৬।

৮. চট্টোপাধ্যায়, সাধন। ঈশান কোণে ভিন্ন স্বর। প্রতিবেশী রাজ্য ত্রিপুরার গল্প ও গল্পকার। সাধন চট্টোপাধ্যায় ও শ্যামল ভট্টাচার্য সম্পাদিত, উবুদশ, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ-অনুল্লিখিত।

৯. হক, হাসান আজিজুল। প্রধান সম্পাদকের কথা। অসীমান্তিক। অক্ষর, ১৯৯৮, আগরতলা, পৃ-অনুল্লিখিত।

১০. চট্টোপাধ্যায়, সাধন। শূন্য দশকের ছোটগল্প: অপরম্পরার সন্ধানে। শূন্য দশকের ছোটগল্প। সম্পাদক সাধন চট্টোপাধ্যায়, অভিযান পাবলিশার্স, ২০১৪, কলকাতা, পৃ. ৮।

১১. তদেব, পৃ. ৮।

১২. চট্টোপাধ্যায়, সাধন। মতি নন্দী: দু চার কথা। প্রসঙ্গ: মতি নন্দী। সম্পাদক সাধন চট্টোপাধ্যায়, প্রমা প্রকাশনী, ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ৫।

১৩. চট্টোপাধ্যায়, সাধন। নূতন যুগের ভোরে। দেশভাগের গল্প: রক্ত বেদনা ও স্মৃতির আলেখ্য। সংকলন ও সম্পাদনা সাধন চট্টোপাধ্যায়, গাঙচিল, ২০১৬, কলকাতা, পৃ. ১৪।

১৪. চট্টোপাধ্যায়, সাধন। প্রসঙ্গত কিছু। নকশালবাড়ির গল্প। সম্পাদনা সাধন চট্টোপাধ্যায়, গাঙচিল, ২০১৯, কলকাতা, পৃ. ৮।

১৫. তদেব, পৃ. ৮।

১৬. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়। সাধনদা, আমাদের প্রতিনিধি। নীললোহিত, সাধন চট্টোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা। সম্পাদক বাসব দাশগুপ্ত, ২০০২, কলকাতা, পৃ. ৮২।

১৭. তদেব, পৃ. ৮৭-৮৮।

১৮. রায়, কিন্নর। তদেব, পৃ. ১০১।

১৯. চক্রবর্তী, স্বপন। সাহিত্য-সমালোচনা কোন পথে। সাহিত্যসমালোচনা প্রসঙ্গে, চার্বাক বক্তৃতামালা ৪। চার্বাক, ২০১৪, কলকাতা, পৃ. ৮।

২০. মুন্সী, মহম্মদ সাইফুল আহমেদ। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য: ক্ষমতা সম্পর্কের সুতোয় নিম্নবর্গ। www.researchgate.net/publication/392171055_Sadhan_Chattapadhyay's_Fiction_Subalterns_in_the_Thread_of_Power_Relations_sadhana_cattopadhyayera_kathasahitya_ksamata_samparkera_sutoya_nimnabarga

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 798-804
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.291

নীলকমল ব্রহ্মের গল্পে জনজাতীয় উপাদান ও আবেগের প্রতিফলন

ড. রাজীব কুমার সাহা, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কোকরাঝার বিশ্ববিদ্যালয়, কোকরাঝার, অসম, ভারত*

Received: 13.03.2026; Accepted: 14.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Neelkamal Brahma is one of the pioneer writers of Bodo language and Bodo literature. Just as Bengali spoken language literature was liberated from inertia at the hands of Rabindra-Sharath-Bibhuti, be it in language or in thought, similarly, Neelkamal Brahma has paved the way for simplicity in Bodo language and literature through Bodo short stories.

No one can present simple language and content to the reader better than Neelkamal Brahma. Despite that, it can be said that the pen of this storyteller contains Bodo national thoughts, the words of the hearts of ordinary Bodo people, the needs of the hardworking Bodo people, hopes and aspirations, happiness and sorrow, laughter and tears, etc. The tribal originality, elements and emotions of the Bodo nation and culture naturally emerge in his stories. Along with this, national struggles and conflicts also find a place in his stories as documents of the time. In this article, we have taken Neelkamal Brahma's two books, Silinghar and Sakhandra, as the main texts.

Keywords: Values, struggle, national thought, originality

নীলকমল ব্রহ্ম (১৯৪৪-১৯৯৮) বড়ো ভাষা তথা বড়ো কথা-সাহিত্যের একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র। বাংলা কথা সাহিত্য যেভাবে রবীন্দ্র-শরৎ-বিভূতি প্রভৃতির হাতে জড়তা থেকে মুক্তি লাভ করে তা ভাষাই হোক অথবা ভাবই হোক, তেমনি বড়ো ছোটগল্পের মাধ্যমে নীলকমল ব্রহ্ম বড়ো ভাষা তথা সাহিত্যের সরলতার পথকে প্রশস্ত করে দিয়েছেন।

সহজ-সরল ভাব-ভাষা ও বিষয়বস্তুকে কীভাবে উপস্থাপন করে পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া যায় তা নীলকমল ব্রহ্মের চাইতে আর কারও পক্ষে সম্ভব হবে না। তার পরও বলা যায় এই গল্পকারের কলমে স্থান পেয়েছে বড়ো জাতীয় ভাবনা, সাধারণ বড়ো মানুষের হৃদয়ের কথা, খেটে খাওয়া বড়ো মানুষদের চাহিদা, আশা-আকাঙ্খা, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ইত্যাদি।

গল্পগুলির গঠনশৈলীও আধুনিক ধাচের। লেখক খুবই সুকৌশলে গল্পের প্লটকে সাজিয়ে তোলেন। সূচনা থেকেই গল্পগুলি আশ্চর্যরকম ভাবে কৌতুহলী পরিবেশ রচনা করে দেয় এবং শেষে অপ্রত্যাশিত চমক গল্পগুলিকে নতুন মাত্রা প্রদান করে। এই বইয়ের প্রত্যেকটি গল্পই যেন চক চক করে তার সমস্ত কিছুকে নিয়ে।

তাই পাঠক কখনই পাঠ থেকে উঠে যেতে চায় না। এধরণের গুণ একজন বাক সংযমী, উপযুক্ত এবং ঋদ্ধ পণ্ডিতের মধ্যেই থাকা সম্ভব। আমাদের আলোচ্য বিষটি নিয়ে আলোচনার জন্য আমরা গল্পকারের সিলিংখার (১৯৮৪) ও সাখন্দ্রা (১৯৮৭) নামক বই দুটির গল্পগুলিকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

স্বল্প কালের জন্য জীবিত এই লেখক বড়ো সাহিত্যে যে অবদান রেখে গেছেন তার তুলনা হয় না। প্রথমে জনজাতি শব্দটির সঙ্গে পরিচয় হওয়া যাক। খুব সহজ ভাষায় বললে বলা যায় জনজাতি অর্থাৎ একই স্থানে বা একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক অঞ্চলে আদিকাল থেকে বসবাস করা গোষ্ঠীকেই জনজাতি বলে। এই জনজাতীয় সম্প্রদায়ের থাকে নিজস্ব সংস্কৃতি-কৃষ্টি ও রীতি নীতি। বহুকাল থেকে এই সংস্কার সংস্কৃতি ও রীতি নীতির ধারক ও বাহক নিয়ে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের জাতি এগিয়ে চলে। হিমালয়ের তরাই অঞ্চল ও অসমের ব্রহ্মপূত্র উপত্যক্কার উত্তর অংশের তিবেটো-বার্মা সম্প্রদায়ের বৃহত্তর জনগোষ্টী হল বড়ো সম্প্রদায়। মাহাভারত কাল থেকেই যাদের অস্তিত্ব ও অবস্থিতি বিদ্যমান। সেই বড়ো সম্প্রদায়ের রয়েছে ঋদ্ধ সংস্কৃতি ও সাহিত্য তা আমরা সকলেই জ্ঞাত।

নীলকমল ব্রহ্মের ছোটগল্পগুলিতে বড়ো জাতির উপাদান প্রতিফলিত হয়েছে। তবে উপাদান মানে কোন ধরণের উপাদান আমারা তাঁরই কিছু গল্প অবলম্বনে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব। ট্রাইব্যাল বা জনজাতির সংস্কৃতি মধ্যে নিহিত থাকে প্রাকৃতিক উপাদান। মাটি, জল, জঙ্গলই এই উপাদানের মধ্যে পড়ে। নীলকমল ব্রহ্মের গল্পগুলি সহজ সরল ভাবভঙ্গিমা নিয়ে গঠিত আবার সহজ সরল হলেও সেখানে এই জনজাতীয় আবেগ ও উপাদান উপেক্ষিত হয়নি। তাই আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা তাঁর সিলিংখার গ্রন্থের কয়েকটি গল্পকে বেছে নিয়েছি— আবো দুরমাও (দুরমাও দিদি), না বাথোন (মাছের চাটনি), হাওয়াসিনি বার (শীতল হাওয়া), বুলি (বলি), নেসৌন (চিহ্ন) ইত্যাদি।

(ক)

সিলিংখার গল্প গ্রন্থের অন্যতম একটি গল্প হল 'আবো দুরমাও' অর্থাৎ দুরমাও দিদি, এই গল্পে রয়েছে তিন বছর পূর্বেকার এক স্মৃতি বিজরিত দুঃখের কাহিনি। বৈশাগু (বহাগ বিহু, পহেলা বৈশাখ, ইত্যাদি) বড়ো জাতীয় জীবনের পরম্পরার অবিচ্ছেদ্য অংগ। বৈশাগু মানে নতুন বছরের আগমন, এই আগমন নিয়ে আসে উৎসব, আনন্দ, উত্তেজনা ইত্যাদি। কিন্তু সকলের জীবনে আনন্দ আসলেও দুরমাও দিদির জীবনের অন্ধকার কিন্তু ঘোঁচে না। কারণ ড্রাইভার স্বামী একসময় তাকে ছেড়ে চলে গেলে তার জীবনে নেমে আসে অন্ধকার, তাই এই বারের বৈসাগু তার কাছে "সুনিসো দেগ্লায়নি বৈশাগুয়া।"[১] তিনটি শিশুকে প্রতিপালন করার জন্য বেছে নেন মদ বিক্রী করার মতো পেশা। এছাড়া দিদির সংসারের খাওয়া-দাওয়ার খরচ মদের টাকা থেকেই আসে। নিজেকে বাদ দিয়ে দুরমাও দিদির সংসারে আরও তিনটি পেট রয়েছে। দুটি মেয়ে ও একটি ছেলে রয়েছে। তিনজনেই প্রইমারী স্কুলে পড়ে। তবে তার আক্ষেপ আছে। আক্ষেপ তার জীবনকে নিয়ে। এমন জীবন সে কখনই চায়নি। সমাজের কাছে সে নিজেকে দোষী বলে অনুভব করে। তবে তার চেয়ে দোষী আবার সমাজের বড়মাপের মানুষরাই, কেননা—

> "আবো দুরমাও নাথায় জৌ ফানগ্রা জানাংনায়নি থাখায় মাহারিনি গেদের-গৌরাফৌরখোসৌ দায়নিগিরি সানো। বুঙো—'বিসৌর বৈথালী হোন্নানৈ বুঙো, সমাজনি অনাগারি বুঙো, আংনি ফিসাফৌরনি মোদোমাও মুজুদলায়ো, নথায় গাওসোরনো হোরনি আন্দোআও আংনি জৌ লোফৈয়ো, আংনি নোআওনো জৌ দঙ না গৈয়া বেনি উদিস লাফৈয়ো'।"[২]

কারণ যারা তাকে সমাজ বিরূদ্ধ কাজ করা বলে ভাবে তারাই রাতের অন্ধকারে তার কাছে মদ খেতে আসে, তার ঘরে মদ আছে কি না তার খবর নিতে আসে।

এই গল্প থেকে যে উপাদান গুলি পাওয়া যায়—

(১) এই গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে বড়ো জাতির নারী সমাজের স্বাবলম্বীতার পরিচয়। দুরমাও দিদি কারও কাছে হাত পাতেনি। উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করেছে। হতে পারে তা সমাজের চোখে নীচু কাজ। কিন্তু দুরমাও দিদি তাও নিষ্ঠা ভাবেই পালন করেছে একমাত্র নিজের সন্তানদের লালন পালন করার স্বার্থে। এখানেই তিনি মহান।

(২) 'আবো দুরমাও' গল্পে খুবই নিঁখুত ভাবে গল্পকার সমাজে দু'মুখো চরিত্রকে প্রতিফলিত করেছেন। একজন সত্যিকারের গল্পকারের বা লেখকের যা করণীয় তিনি তাই করেছেন। এখানেও তিনি কখনও দ্বিধাবোধ করেননি, যা তাঁকে একজন ঋদ্ধ সাহিত্যিকে পরিণত করে।

আবার বৈশাগুতে পাহাড় বেয়ে ওঠা ও তারপর বাউখুংগ্রী পাহাড়ের কাছে নিজের মনোষ্কামনা পুরণের প্রার্থনা করা একটি আদি পরম্পরা। এ ধরনের পরম্পরা অন্য কোন জাতির মধ্যে এখনও রয়েছে কিনা জানা যায় না। এর থেকেই প্রমাণ হয় বড়ো জাতির মধ্যে প্রকৃতির প্রত্যেকটি উপাদান কীভাবে বিদ্যমান। জনজাতীয় উপাদান সংস্কার সংস্কৃতি ও পরম্পরায় যেমন রয়েছে তেমনি আবার রয়েছে খান পানের মধ্যেও। তাই 'অফ্রি গোসাইও' পরম শ্রদ্ধায় গ্রহণের প্রসঙ্গ রয়েছে গল্পের মধ্যে। এই 'অফ্রি গোসাই' (পারম্পরিক পদ্ধতিতে মদ তৈরী করার পর যে চাউলের গাদ থেকে যায় তাকেই বড়ো ভাষায় অফ্রি গোসাই বলে)-এর প্রতি যে শ্রদ্ধা নিবেদন তা জনজাতীয় পরম্পরায় রয়েছে।

নীলকমল ব্রহ্ম বাস্তবতাকে অস্বীকার করেননি। জীবন ও বাস্তবতাকে অপূর্ব ভাবে সংস্কার ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করে পরিবেশন করেছেন। তাই দুরমাও দিদি সমাজের চোখে নীচু কাজ করলেও জীবন সংগ্রামের কাছে সে একজন পাকা যোদ্ধা যা বড়ো জাতির নারী সাবলম্বীতার প্রতীক স্বরূপ।

(খ)

'না বাথোন' মানে মাছের চাটনি। এই গল্পে রয়েছে জনজাতীয় সংস্কার ও সংস্কৃতির প্রতিফলন। কাহিনীটা তো দেখা যায় খেতে সামান্য জলে ধানের চারা বোনার সময় জলকেলি রত অবস্থায় হুংগা লাঠি দিয়ে ভেদা ও চ্যাং মাছকে বাড়ি দিয়ে মেরে ফেলে। এতে বৌদি ভীষণ রাগ করে বলে-

> "আইয়ো আইয়ো ... ফাপীয়া..." 'মালায় রংজানায়খৌলায় মা নাংজাবায়নানৈ বুথার নাংগৌ জাখোসৈ! ফাপীসোহাই বি...!'[৩]

জলকেলি রত মাছ দুটিকে মেরে সে পাপ করেছে। সে দুটি মাছের ভর্তা চাটনি বানিয়ে গরম ভাতের সঙ্গে খাবার সময় অম্বাই (ভাইয়ের শালী) সেটা খাওয়ার বায়না ধরলে হুংগা বর্ণনা করে--

> "বাথ্রায়া বেনো, না থোতায়া নাস্রাই নিসলা-গৌরি-থেংগোনা জায়যৌং মোনো বেজৌংনো বস্রাইজায়গ্রাখায় বেখো থোতাজাম্বী বুঙো। বেখায়নো বেবাদি না খো নোংসৌর জায়োব্লা নোং -সৌরবো জায়যৌং মোনো বিজোংনো বস্রাইজানো হাগো।..."[৪]

অর্থাৎ ভেদা মাছ, চ্যাং, চিংড়ি, গড়ে যাকে পায় তাকেই মিথ্যে মায়ার জ্বলে ফেলে ঠকায়; যাকে 'থোতা জাম্বি' (ভেদা বোকা) বলে। সেজন্য যদি তোমরা এমন মাছ খাও তাহলে তোমরাও মায়ার জালে পড়তে পারো।

এ ধরনের জনজাতীয় উপাদানের নানা রকম প্রতিচ্ছবি মেলে নীলকমল ব্রহ্মের গল্পে। যেখানে ছোট ছোট সংস্কার পরম্পরা প্রভৃতি হয়ে ওঠে জীবনযাপনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বড়ো জাতিকে এই সংস্কারের সঙ্গেই দেখতে হবে।

(গ)

'বুলি', 'নেরসৌন' গল্প দুটির মধ্যে রয়েছে এই বিশাল জনজাতির আবেগের প্রতিফলন। নিজেদের সত্তা ও স্বকীয়তাকে কেউ ভুলতে চায় না। বড়ো জাতি তাকে বাঁচিয়ে রাখতেই এক দীর্ঘ সংগ্রাম করে এসেছে। সেই সংগ্রামের মধ্যে রয়েছে জাতীয় আবেগ, অনুভূতি। 'বুলি' অর্থাৎ 'বলি' মানে যাকে কোন উদ্দেশ্যে সামনে পরিকল্পিত ভাবে রাখা হয় এবং যার উপর দিয়ে বিপদ গড়িয়ে যায় তাকেই বলির পাত্র বলে। গল্পকার এই গল্পে ১৬ নভেম্বর অর্থাৎ বড়ো সাহিত্যের পবিত্র দিন বলে বিবেচিত সেই দিনকে নিয়ে প্লটটি সাজিয়েছেন। (বড়ো থুনলাই সান)

গল্পে দেখা যায়—

'তিনদিন আগে থেকেই খোরোমদাওএর মন উৎফুল্লিত হয়ে আছে। সে স্কুলের ষোল নভেম্বরের পালন কমিটির সেক্রেটারী। সমস্ত প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়েছে। খোরোমদাওএর কিন্তু এখন পর্যন্ত প্রতিযোগিতার লিখন লেখা শেষ হয়নি।

অনেক রাত পর্যন্ত খোরোমদাও লিখনটি লিখেছে। লিখতে লিখতেই কেরোসিনের তেল শেষ হয়েছে। ষোল নভেম্বরের নানা প্রকার কাজে খোরোমদাও জড়িত থাকার কারণে বাড়ির কোন কাজই করতে পারছিল না। রেশনের কন্ট্রোল থেকে রেশন আনতেও যেতে পারেনি। এই কারণে দিনে বিধবা মায়ের থেকে গালিও খেয়েছে।

পরের দিন সকালে তার মা তাকে রেশন কার্ড ও একটি ঝুলি দিয়ে কন্ট্রোলে পাঠিয়ে দেয়। সেই সময় খোরোমদাও রাতে যে লেখাটি শেষ করতে পারেনি সেটি শেষ করার জন্য মুখ না ধুয়েই মনোযোগ দিয়ে লিখতে বসেছিল। সময় বেশি ছিল না। আটটা বাজলেই স্কুলে যেতে হবে। আটটা থেকেই ষোল নভেম্বরের অনুষ্ঠান শুরু হবে।

রেশন আনতে না গেলেও ক্ষুধার্ত থাকতে হবে। চাউল, কেরোসিন, সরষের তেল কিছুই নেই। একদিকে ষোল নভেম্বরের আয়োজনের সম্পাদক হওয়ায় স্কুলে সকলের থেকে আগে না পৌঁছালেও দায়। খোরোমদাও কী করবে কী না করবে ভেবে পাচ্ছে না। সে লেখাটিকেও লিখে শেষ করতে পারেনি।

পরে খোরোমদাও একটি সিদ্ধান্তে আসে। আটটার সময় স্কুল কম্পাউণ্ডে পতাকা উত্তোলন করবে। রেশনের কন্ট্রোলও আটটার সময় খোলে। রেশনের দোকানে লাইন দিয়ে রেশন পাওয়া পর্যন্ত থাকলে পতাকা উত্তোলনের সময় চলে যাবে। খোরোমদাও ভেবেছে যে— পতাকা উত্তোলনের সময় হাজির হয়ে রেশন নিতে যাবে। রেশন বাড়িতে রেখে স্কুলের ষোল নভেম্বরের অনুষ্ঠানে যাবে।

স্নান সেরে ষোল নভেম্বরের দিন পরার জন্য তিনদিন আগেই ধুয়ে রাখা প্যন্ট-শার্ট পরে খোরোমদাও স্কুলের জন্য বেরিয়ে আসে। হাতে ছিল রেশন আনার জন্য একটি ঝোলা।

খোরোমদাও স্কুলের কাছে পৌঁছেই ছিল। সেই সময় স্কুলের দিক থেকে কারও চিৎকার করার আওয়াজ কানে ভেসে আসে। কীসের হট্টগোল? কী হয়েছে? জানার জন্য খোরোমদাও একটু দ্রুত হেটে স্কুলের দিকে যেতেই দেখে তাদের স্কুলেরই কিছু অবোড়ো ছাত্র বোড়ো ছাত্রদের পতাকা ওঠাতে বাধা দেয়। এক সময় পতাকাটিকে অবড়ো (=হারসা, ধীরেশ্বর বরোনার্জির বরো-ইংলিশ-অসমীয়া অভিধান, নিলিমা প্রকাশনী, বরমা, আসাম) ছাত্ররা ছিনিয়ে মাটিতে পা দিয়ে নষ্ট করেছিল ও কিছু সময় পর যে যেভাবে পেরেছে এদিক-সেদিক দিয়ে পালিয়েছে।

কী হয়েছে সে খবর নেওয়ার পূর্বেই খোরোমদাও পতাকা কাড়াকাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে। পতাকাকে সে ভিড়ের মাঝখানে উঠাতে গিয়েছিল। কিন্তু সেই সময় সে কারও চিৎকারের আওয়াজ শুনতে পেরেছিল—'C.R.P....C.R.P'।

চিৎকার শোনার সঙ্গে সঙ্গে পতাকা নিয়ে জান-প্রাণ লাগিয়ে অন্য দিকে পালাচ্ছিল। কিন্তু সে বেশি দূর পর্যন্ত চলতে পারেনি। পালানোর সময়েই সে রাইফেলের আওয়াজ শুনতে পায়—'গুরুম...গুরুম...!'

খোরোমদাও স্কুলের বারান্দার কাছে সম্পূর্ণ রূপে উপুর হয়ে পরে যায়। তার বুকের বাঁ দিক থেকে লাল গরম রক্ত বের হচ্ছিল। হাতের পতাকা ও ঝোলাটি হাতেই ছিল তবুও শক্ত করে সে হাতে ধরে রেখেছিল।' (উৎস-মূল গল্পের আনুবাদ অংশ, নীলকমল ব্রহ্মের 'সিলিংখার', বাংলা অনুবাদ, ড.রাজীব কুমার সাহা, এন. এল. পাব্লিশার, গুয়াহাটি, অসম)

এই আবেগঘন দিনটিকে কেন্দ্র করে দানা বাধে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি। শেষে সেই দুর্ভাগ্যজনক অপ্রীতিকর পরিবেশে সিআরপির গুলিতে প্রাণ দিতে হয় খোরমদাওকে । সিআরপির গুলি বুকে নিয়ে সে ঢলে পড়ে মাটিতে কিন্তু হাত থেকে পতাকাটি পরে যায়নি। সেটি সে শক্ত করেই ধরে রেখেছিল। কারণ প্রাণ চলে গেলেও নিজের জাতি ও সাহিত্যের মানস্বরূপ পতাকাটিতে সে কখনোই পদদলিত হতে দিতে চায়নি।

আবার 'নের্সৌন' (চিহ্ন) গল্পের প্লটে ৫০০০ হাজার বছর পরের একটি কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে দেখা যায় কোকরাঝার বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্থ্রোপোলজি বিভাগের এক প্রফেসর বিদেশ থেকে এমন একটি মেশিন নিয়ে আসেন যার সাহায্যে কঙ্কাল বা হাড় দিয়ে ২২ শতকের বডোল্যান্ড নামে একটি রাজ্যের একজন পুরুষ ও মহিলার ছবিও তৈরি হয়। শুধু তাই নয় তাদের সঙ্গে তাদের সময়ের প্রচলিত ভাষায় কথা বলে বড়ো জাতির সংগ্রাম ও সমৃদ্ধতার কথা জানতে পারে। একটি সুইচ টিপতেই কীভাবে হাড়ের থেকে সকল তথ্য ও ইতিহাস লাভ কার সম্ভব তা সেখানে জমায়েত হওয়া ছাত্ররা আশ্চর্যের সঙ্গে দেখছিল। শুধু তাই নয় একটি সম্ভাবনাময় জাতি কীভাবে নিজেদের ভুল অপরিপক্ক রাজনৈতিক দূরদর্শিতার জন্য ধ্বংস হয়ে যায় এই কাল্পনিক গল্পটি তার উদাহরণ।

আসলে লেখক নিজে বড়ো হয়ে বড়ো জাতির আবেগকে নিজের গল্পের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। গল্পে যেভাবে প্রতীকিভাবে রাজনৈতিক দলের নেতার চারিত্রিক দুর্বলতার কারণে আধঃপতনে ছবি তুলে ধরেছেন তা নিছক প্লটের তাগিদে তৈরী করা হয়নি, বরং জাতীয় আবেগ ও জাতীয় জীবনকে আয়না দেখানোর জন্যই করেছেন-

> "টুয়েন্টিয়েথ আরো টুয়েন্টি ফার্স্ট সেন্চুরীআও বে ইণ্ডিয়ান পেনেনসুলায়াও গোবাং রাইজো, হাদর দংসোগারোমোন। বডোল্যান্ডনি থাখায় টুয়েন্টিয়েথ সেন্চুরীআওনো সোমাওসারনায়নি খৌরাং জৌং জারিমিনআও মোনো। জানোবৌ হাগৌ, বে রাইজোআও বড়ো এবা বড়ো মুংনি মনসে হারি থায়োমোন।" [৫]

(বিংশ ও একবিংশ সেন্চুরীতে এই ইন্ডিয়ান পেনিনসুলায় বহু রাজ্য ও দেশ ছিল। বডোল্যান্ডের জন্য বিংশ শতকের আন্দোলনের খবর ইতিহাসে পাওয়া যায়। সম্ভবত, সেই রাজ্যে বড়ো ও বড়ো নামের একটি জনজাতির বসবাস ছিল।)

ফিললোজির প্রফেসরের মুখ থেকে বের হওয়া এই আক্ষেপবাণী ও রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসরের উক্তির মধ্যে লেখকের প্রত্যাশিত আবেগই প্রতিফলিত হয়েছে।

গল্পটির পটভূমি কল্পনার ওপর ভিত্তি করে গঠিত। কিন্তু কল্পনা হলেও এই গল্প আমাদের মনের কৌতূহলকে জাগিয়ে তোলে ও পাশাপাশি 'বড়োল্যান্ড রাজ্য' গঠনের যে স্বপ্ন বড়ো জাতির জনমানসের মধ্যে বিদ্যমান তা আমাদের ভাবিয়ে তোলে। এই আবেগঘন প্লট আসলে নিছক কোন কাহিনি নয়, এখানে ফুটে ওঠে তাদের জাতীয় সত্তা ও সাংস্কৃতিক উপাদান গুলির রক্ষণাবেক্ষণের প্রসঙ্গ। তাই গল্পকার এই প্লটের মাধ্যমে বড়ো জনজাতীয় সত্তাকে রক্ষার আহ্বানই করেছেন।

একই আহ্বানের সুর ধ্বনিত হয়েছে গল্পকারের **সাখন্দ্রা** গল্প সংগ্রহের অন্তর্গত **বুথুয়া থুংগ্রী (ভোঁতা তরোয়াল)** গল্পে।[৬] যেখানে সাগর নামক এক শিক্ষিত যুবক পড়াশোনার পর চাকরি নাপেয়ে একসময় পাহাড়মুখী হয়ে যায় ভুটানের দিকে। সেখানেই সে খুঁজে পায় পরম শান্তি, প্রকৃতির কোলে সে নিজের আদিম জাতীয় সত্তার আত্মার সন্ধান লাভ করে, সাংগ্রিলার অলৌকিক এক গাছের শেকড় খেয়েই তার পঁচিশ বছর কেটে যায়। কিন্তু যখন সে সভূমিতে ফিরে আসে তখন সেই জাতির ভোল বদল দেখে সে আঁতকে ওঠে, আক্ষেপ হয় তার-

> "বড়োফ্রা গুবুনফৌরজৌং বিগুর খুজাগাসিনৌ দং। রাজখান্তিনি গোহোনি ফলানফ্রা বড়োফৌরনি সিমাং-হাবিলাসখৌ ফৈমাল খালামনো বড়োফৌরনি রৈখানি থাওসি ট্রাইবেল বেল্ট আরো ব্লকফ্রাও গুবুনারিফৌরখৌ গির্জাও গির্জাও সোফৈদং। বেনি জাউনাও বড়োফ্রা—জাম্বা-লল্লা বোথিসে ওংখাম, খাউখ্লাবসে সি গরদসে দৈনি থাখায় হালায়-হাফায় জানানৈ মিংমাং-সিলাফৌথার দৈয়াং-রেংমায়াও জালায়-জাখায় জাহৈনাংদং।"[৭]

(বড়োরা অন্যদের দিয়ে চামড়া ওঠাচ্ছিল। রাজনৈতিক ক্ষমতার শিকারীরা বড়োদের স্বপ্ন-আশাকে ভঙ্গ করার জন্য বড়োদের রক্ষা-কবচ ট্রাইবেল বেল্ট ও ব্লকগুলিতে অন্যদের জমা করে এসেছে। সেই কারণে বড়োরা—বুর্বক বড়োরা এক সময়ের খাবার, একটুকরো কাপড়, একটু জলের জন্য হাহাকার করে মিংমাং-সিলাপাথার নদী-রেংমায় জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করেছে।)

শুধু তাই নয়-

> "বিগুর খুখাংনানৈ থুবব্লা হাখাউনায় সমাও জৌং মৈনি গোর্বোখোয়াও মৈ ফিসা গগ্লৈ মাসে মোনদং। ওব্লা আং সান্দোং: আথিখালনি রাজখান্থিনি দৈদেনগিরিফৌরনি ইনায় হাবিলাসনি খাজা জানানৈ বেসেবাংদি ইউন জোলেইফ্রা বিথোরাইয়াওনো লহায়লাংদং! জেরৈথিংবো গুন জানায় বড়ো হারিনি ইউন জোলেইনি ইউনখো লাথিখোনি বেহেরাও গোব্রাইহোহৈনো থাখায় গোহোখাংখুয়া, রাংখাংখুয়া, গাওজোং গাও, মোখাঙাও, হাব্রু সারফাউলায়গ্রা দুগামারা মাখাসে দৈদেনগিরিফ্রা বেসেবাংদি ফাও ফান্দায়গাসিনো দং।"[৮]

(চামড়া বের করার পর মাঝে কাটার সময় আমরা একটি হরিণের বাচ্চা পেয়েছিলাম। তখন আমি ভাবলাম- আজকালকার রাজনীতিক নেতাদের অনৈতিক আকাংক্ষার খাদ্যবস্তু হয়ে কতো ভবিষ্যতের প্রজন্ম কলিতেই শুকিয়ে গেছে! চারিদিকে সুনাম হওয়া বড়ো জাতির ভবিষ্যত প্রজন্মের ভবিষ্যতকে শূন্যতার খাদে ফেলে দেওয়ার জন্য ক্ষমতাখোর, টাকাখোর, নিজেরাই নিজেদের গায়ে কাদা মাখিয়ে প্রবঞ্চক কিছু নেতা কত কুকর্ম করে যাচ্ছে।)

তাই তাঁর মনে হয়েছে-

> "দা ওয়ে ইন হুইচ ইউ লিভ—নৌংসৌর দা যেরৈ থাংনানৈ দঙ বে আদব-হুদাখৌ নাগারাব্লা, গারনো নাজায়াব্লা ববেবা মনসে সমাও বড়ো হারিয়া জারিমিনজৌংনো বাওগারজাগৌন।"[৯]

লেখকের আবেগই যেন আক্ষেপের সুরে সাগরের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে- নিজের শরীরের থেকেও প্রিয় বড়ো জাতি আজ ফসিলের ওপরই যেন দাঁড়িয়ে আছে।

সুতরাং শেষে বলা যায় নীলকমল ব্রহ্ম একজন প্রকৃত বাস্তব সচেতন লেখক। যুগ ও সময়ের ঘটনা পরিঘটনাকে যেভাবে তিনি নিজের সাহিত্যকর্মের মাঝে তুলে ধরেছেন তেমনি আবার জনজাতীয় উপাদান ও আবেগগুলিকেও যথাযথ ভাবে নিজের গল্পের প্লটের মধ্যে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন, এখানেই তিনি স্বতন্ত্র। স্বজাতির আবেগ আকাঙ্খাকে একজন দক্ষ লেখকের মতো উপলব্ধি করে তাকে লিপিবদ্ধ করা শ্লাঘনীয় ব্যপার তাতে সন্দেহ নেই।

তথ্যসূত্র:

১। নীলকমল ব্রহ্ম, **সিলিংখার**, ওয়ার্ডস এন ওয়ার্ডস, ২০১৭, কোকরাঝার, পৃ. ২৭।
২। তদেব, পৃ. ২৯।
৩। তদেব, পৃ. ৩৯।
৪। তদেব, পৃ. ৪১।
৫। তদেব, পৃ. ৭০।
৬। নীলকমল ব্রহ্ম, **সাখন্দ্রা**, ওয়ার্ডস এন ওয়ার্ডস, ২০১৭, কোকরাঝার, পৃ. ১৪।
৭। তদেব, পৃ. ১২।
৮। তদেব, পৃ. ১২।
৯। তদেব, পৃ. ১৪।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 805- 811
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.292

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কিশোর উপন্যাস: যতটা ভৌতিক, ততটাই মানবিক

ড. অন্তরা চৌধুরি, *সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, ভাগলপুর ন্যাশনাল কলেজ, বিহার, ভারত*

Received: 15.03.2026; Accepted: 17.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Who asks whether ghosts exist or not? Some believe they do exist, while others think it is all strange imagination. Whether ghosts exist or not, ghost stories certainly continue to thrive. However, in the stories and novels of the eminent writer Shirshendu Mukhopadhyay, ghosts appear in a completely different form. Here, ghosts are not terrifying. They do not kill anyone, nor do they frighten people. Rather, they seem like very helpful friends. They are far more humane than they are supernatural. Perhaps this is why these ghosts have secured a permanent place in the minds of young readers.

Novels such as *Gosain Baganer Bhoot*, *Pagla Saheber Kabor*, and *Nrisimha Rahasya* have transcended their time to become timeless classics. There was a time when children would secretly read books written for adults. Shirshendu seems to have reversed that habit—now adults secretly read the stories and novels he wrote for children. This essay attempts an analytical discussion of some of his most memorable novels.

Keywords: Shirshendu, ghosts, Gosain Bagan, haunted clock, science fiction

ঠিক দুক্কুর বেলা যখন ভূতে মারে ঢেলা...।

ছোটবেলা থেকে সেই যে কথাটা শুনে ভূতের ভয়টা নিজের অস্থিমজ্জায় ঢুকে গিয়েছিল- হাঁউ মাউ খাঁউ মানুষের গন্ধ পাঁউ। এই কথাটা শুনলেই মনে হত ভূত এসেই ঘাড় মটকে দেবে। ভূতকে চোখে না দেখলেও তার ভয়টা কিন্তু মনের কোণে বাসা বেঁধেই থাকে। ভূত মানেই গা ছমছমে ব্যাপার। ভূত মানেই হানাবাড়ি, ছায়া, নিশীথের ডাক। আবার বিভিন্ন প্রকারের ভূতদের উপদ্রব। যেমন- পেত্নী, শাঁকচুন্নী, ব্রহ্মদত্তি, স্কন্ধকাটা, আলেয়া, নিশি, মামদো, ডাইনি, গেছো, মেছো।

কিন্তু ভূত কাদেরকে বলে? ভূতের কি নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা আছে? ট্রাডিশনাল বিশ্বাস আর গল্পকথা অনুযায়ী ভূত হল মৃত মানুষের আত্মা, কখনও পশুপাখিদেরও; যার দৃশ্যত বা অন্য কোনওভাবে জীবন্ত বিশ্বে অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে। এই আত্মার যত্রতত্র অবাধ বিচরণে কোনও বাধা নেই। মানুষ যা করতে পারে না, ভূত তাই করতে পারে। অর্থাৎ অসাধ্য সাধন। অশরীরী হয়ে যেদিকে খুশি হাজির হয়ে যাবে। যার ওপর চাইবে তার ওপরই ভর করতে পারে। তাই ভূত নিয়ে মানুষের ফ্যান্টাসি ক্রমশঃ শিল্প সাহিত্যকেও প্রভাবিত করেছে। ভূত-সাহিত্য নিয়ে মানুষের আগ্রহ চিরকালের। হয়তো চারিদিকে নগরোন্নয়নের ধাক্কায় ফাঁকা মাঠ, বেলগাছ, হানাবাড়ি

অন্ধকার নির্জন পথঘাট ক্রমশ উধাও হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সাহিত্যে সেরকম উচ্ছেদের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। সেখানে ভূতেরা বহাল তবিয়তে বসবাস করছে।

কিন্তু এইসব ভূতেদের চরিত্র কেমন? ভূত কি নিজে কখনও কাউকে ভয় পায়? পায় বইকি। আচ্ছা ভূত যদি বাঁদরের গায়ের গন্ধকে ভয় পায়, তাহলে তার ভূতামি নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ থাকতে পারে। আবার ভূত যদি মুশকিল আসান হয় তাহলে ব্যাপারটা কেমন হবে! আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের মত একটা দৈত্য এসে যদি বলে, 'হুকুম মেরি আকা'।

কিংবা গুপী গাইন বাঘা বাইনের মত ভূতের রাজার যদি বর পাওয়া যেত, তাহলে ইচ্ছে মত খাওয়া আর ঘোরা যেত। মনের মধ্যে এরকম বাসনা থাকাটা দোষের কিছু নয়। আসলে রসেবশে বাঙালি একটু খেতে পেলে আর ঘুরতে পেলে আর কিছু চায় না।

বাস্তবে না হলেও কল্পনায় সেই সাধ পূরণ করেছেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। তাঁর সৃষ্ট মুষ্টিকয়েক কিশোর উপন্যাসে ভূতেদের চরিত্র নিয়ে আলোচনা আমাদের প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। তবে শুধু চরিত্র নয়, আপাত হালকা চালে লেখা সেই উপন্যাসে সমাজকেও তিনি দেখিয়েছেন বেশ মুন্সিয়ানার সঙ্গে। তবে ভূত হোক বা কল্পবিজ্ঞান-এই ধারার লেখনীর সূত্রপাত কোথায়। একটু ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইংরেজিতে শিশুদের জন্য সাহিত্য লেখা শুরু হয়। যেমন বানিয়ানের 'পিলগ্রিম প্রগ্রেস', ডিফোর 'রবিনসন ক্রুশো', সুইফটের 'গালিভার ট্রাভেলস্' ইত্যাদি। ১৯৫০ এর পর থেকে শিশু সাহিত্যের রমরমা বাজার তৈরি হল বিদেশে। তৈরি হল নানা বয়সের উপযোগী গল্পের বই। ছেলেদের বই, মেয়েদের বই। কেউ কেউ হয়ে উঠলেন বিপুলভাবে জনপ্রিয়।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা তাই। তফাৎ শুধু কালের। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটবেলার লেখালেখি নিয়ে বলেছিলেন, তখন ছেলেদের এবং বড়দের বইয়ের মধ্যে বিশেষ কিছু পার্থক্য ছিল না। তাতে খুব বেশি কিছু ক্ষতিও হয়নি। এখনকার দিনে শিশুদের জন্য সাহিত্যরসে প্রচুরত জল মিশিয়ে যে সকল ছেলে ভুলানো বই লেখা হয় তাতে শিশুকে নিতান্তই শিশু বলে মনে করা হয়। তাদেরকে মানুষ বলে গণ্য করা হয় না।

উনিশ শতকের প্রারম্ভে বাংলা শিশু সাহিত্যের জন্ম হয়েছিল। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'খুকুমণির ছড়া' থেকে শুরু করে অবনীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সমকালে শিশু কিশোর সাহিত্য লেখা শুরু করেন। এই পর্যায়ের অন্যতম শিশু সাহিত্যিক ছিলেন হেমেন্দ্রকুমার রায়। তিনি প্রথম বাংলা শিশুসাহিত্যে রহস্য রোমাঞ্চ ধারাটি যুক্ত করেন। তবে তাঁর কাহিনিতে রহস্য রোমাঞ্চ সৃষ্টির চেষ্টা যতটা গুরুত্ব পেয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তবতা ততটাই অবহেলিত ছিল।

এই অভাব পূরণ করলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশ ও বিদেশের নৈসর্গিক সৌন্দর্য, দুর্গমতা ও ভীষণতাকে গবেষক সুলভ নিষ্ঠায় প্রত্যক্ষদর্শীর অনুভবের মত জীবন্ত করে তুলেছিলেন তিনি। ছোটদের জন্য লেখা লীলা মজুমদারের গল্পগুলিতে জীবন সম্পর্কে ইতিবাচক দিকের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁর সৃষ্ট ভূতও মানুষের হিতৈষী প্রতিবেশী হয়ে উঠেছে।

সাধারণত শৈশব ও তারুণ্যের মধ্যবর্তী সময়কেই কৈশোর বলে। আর যেসব সাহিত্যকর্ম সমাজ প্রার্থিত বিধিনিষেধের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে অপ্রাপ্তবয়স্ক পাঠকের উদ্দেশ্যে রচিত হয় তাকেই শিশু সাহিত্য বলে। অবশ্য এই জাতীয় শাখার শ্রেণীভেদও আছে। এর কিছু অংশের পাঠক চার-পাঁচ বছরের আর কিছু দশ-বারো থেকে তেরো চোদ্দ বছরের শিশুরা। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় কিশোরের চোখ দিয়ে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত মেশানো এক অদ্ভুত রসের জগৎ তৈরি করেছেন যে জগতে শিশুরাই স্বাভাবিক, বয়স্ক মাত্রই বাতিকগ্রস্ত। শীর্ষেন্দুর এই

উপন্যাসগুলি শিশুদের কল্পনা উদ্বোধক ও ব্যক্তির বিকাশে সহায়ক। শিশুদের মনোজগৎ তিনি খুব ভালোভাবেই চেনেন। তাই এ ধরনের রচনায় কিশোর মনোজগৎ অপূর্ব শৈল্পিকতায় ভাস্বর হয়ে ওঠে।

অদ্ভুত বলতে বোঝায় যা ভূত নয় আবার বাস্তবও নয়। ভূতের গল্পের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য থাকে তা এই উপন্যাসগুলোতে নেই। আবার বাস্তব উপন্যাসের বিশেষত্বও নেই। দুইয়ের মিশ্রণে গড়ে উঠেছে একটা বিস্তৃত গল্প-যা পড়তে পড়তে আমাদের একবারও মনে হয় না যে লেখক এমন কিছু আলোচনা করেছেন যা অসঙ্গত। কারণ সেটা আমাদের কাছে খুব সঙ্গত বলেই মনে হয়। উপন্যাস হল সেটাই যেখানে লেখকের একটা সামগ্রিক জীবন দর্শন থাকবে। চরিত্রের মাধ্যমে একটা বিরাট জীবনসত্যে পৌঁছে দেবে। শীর্ষেন্দুর এই উপন্যাসগুলো কি সত্যই আমাদের বিরাট জীবন দর্শনে পৌঁছে দিতে পারে? ক্ষণিক আর চিরকালীন আবেদনের এখানেই পার্থক্য হয়ে যায়। শীর্ষেন্দুর 'মানবজমিন', 'যাও পাখি', 'পার্থিব' আমাদের কাছে চিরকালীন। কিন্তু অদ্ভুতুড়ে সিরিজের গল্পগুলো আমাদের যে একটা অদ্ভুত আনন্দ দেয় সেই আনন্দের অনুরণন ক্ষণিকের। ভূত আছে কি নেই-এই বিতর্কের ধার ধারেন না লেখক। লোকবিশ্বাসে স্থিত ও জাত ভূত-পেত্নিরা আছে-এই স্বতঃসিদ্ধ প্রস্তাব মেনে নিয়েই তিনি লিখতে বসেন। ভূতেরা তাঁর লেখায় মানুষের মতো স্বাভাবিক চরিত্র এবং যথেষ্ট সামাজিকও। মানুষের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই কোনও শত্রুতার সম্পর্ক নেই তাদের। তারা মানুষের সংসার ছেড়ে গিয়েও মানুষের সঙ্গেই মিলেমিশে থাকে। শীর্ষেন্দুর সৃষ্ট ভূতেরা সংসারের মায়ায় জড়িয়ে থাকে। তাদের অধিকাংশই যথেষ্ট বিবেচক। এমনকী বেশ দয়ায় মায়ায় ভরা মন তাদের। বিশেষ করে জীবিত উত্তর প্রজন্মের প্রতি তাদের যথেষ্ট স্নেহ-প্রীতি এবং কর্তব্য বোধ আছে। এই ভাবেই গড়ে ওঠে আখ্যানের বুনোট। এই উপন্যাসগুলি মিলনান্তক সামাজিক কমেডি ধরনের লেখা। বালক ও কিশোরদের জন্য লেখা গল্প উপন্যাসের এই ঘরানা আমরা আগেও দেখেছি। কিন্তু শীর্ষেন্দু বড়দের জন্য লেখা উপন্যাসেও এই পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। সার্থক-এই অর্থে, এখানে বয়স্ক পাঠকেরা ভূত আছে কিনা- এই প্রশ্ন নিয়ে আদৌ ভাবাতুর নন। ভূতেদের তাঁরা মানুষের মতোই স্বাভাবিক চরিত্র বলে মেনে নেন। তাতে উপন্যাসের রস আস্বাদনে কোথাও এতটুকু বিঘ্ন হয় না। আপাত লঘুতার আবরণে এই লেখাগুলোতে ধরা থাকে জীবনের বর্ণ-বৈচিত্র্যময় রূপ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা মধুর অন্তিম পরিণতির দ্যোতক হলেও বিষাদ গভীর অনুভবও সেখানে স্থান পায়। হৃদয় ও মননের গভীরতা এই জাতীয় লেখাতে স্থান পায়।

শীর্ষেন্দুর সৃষ্ট ভূতগুলো ভীষণ অদ্ভুত ধরনের। তারা পরোপকারী। রামকে মোটেই তারা ভয় পায় না। কখনও রাম নাম শুনে তারা আঁতকে ওঠে, আবার কখনও কোনও রামকেই তারা কেয়ার করে না। ভূত আবার বেখেয়ালে নিজেই রাম কবিরাজের নাম উচ্চারণ করে বসে। কোন ভূত আবার বাঁদরের গায়ের গন্ধকে ভয় পায়। পুরো ব্যাপারটাই ভারি গোলমেলে। সবথেকে মজার ব্যাপার হল, গল্প বলতে বলতে ভূত আছে-এই ব্যাপারটা নিঃশব্দে শিশুদের মনের মধ্যে তিনি ঢুকিয়ে দিয়েছেন, আবার সেই ভূতকে যে ভয় পাবার কোনও কারণ নেই, সেই বোধটাও তিনি পরোক্ষভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন। অধিকাংশ ভূত পূর্বপুরুষরূপে আবির্ভূত হয়েছে। বংশধর বিপদে পড়লে ভূত হয়ে এসে তাকে সাহায্য করেছে। বিভিন্ন ধরনের ভূতের সংগ্রহশালা তাঁর ভূতের উপন্যাসগুলি। ভূতটাই ভীষণ অদ্ভুত যা ভাবিয়ে তোলে। কিছু কিছু উপন্যাসে ভৌতিক পরিসমাপ্তি আছে।

'গোঁসাইবাগানের ভূত' উপন্যাসেও অদ্ভুত এবং ভূতুড়ের সমাহার আছে চমৎকার। বুরুণ অঙ্কে তেরো পেয়ে ফেল করেছে। তাই মনের দুঃখে গোঁসাই ডাকাতের বাগানে ঢোকে। সেখানে নিধিরাম ভূতের সঙ্গে দেখা করে। সে জলের ওপর হেঁটে, হাত লম্বা করে মগডাল থেকে চালতা পেড়ে, মুন্ডু খুলে পরিষ্কার করে, ডান হাত দিয়ে বাঁ হাত খুলে তলোয়ারের মত ঘোরালেও বুরুণ ভয় পায় না। আসলে মানুষ যখন প্রচণ্ড কষ্ট পায় তখন কোনও অতিলৌকিক ঘটনাকেই সে ভয় পায় না। এতে নিধিরাম ঘাবড়ে যায়, ভয় পায় গোঁসাইবাবা তাকে

নীচের পোস্টে নামিয়ে দেবে। ভীত নিধিরাম ভূত বুরুণকে সন্তুষ্ট করার জন্য তার যাবতীয় কঠিন অঙ্ক নিমেষে করে দেয়, ভাল ইংরেজি লিখে দেয়, ক্রিকেটে কৃতিত্ব এনে দেয়, স্পোর্টসে পুরস্কার পেতে সাহায্য করে। ফলে নিধিরাম ভূত হয়ে যায় নিধিদা। দাদুর বন্ধুদের চিত্রও চমৎকার। প্রসঙ্গত তারা তোলে বদমাশ হাবুর কথা যে জেলে আছে। হাবুর অতীত আসে বিস্তৃতভাবে। অরস্কান্ত-র মনে হয় 'হাবু মানুষ নয়'। মানুষ ও ভূতের পারস্পরিকতা। একে অন্যের আচরণে ঢুকে পড়া শীর্ষেন্দুর এ ধরনের লেখার বৈশিষ্ট্য।

নিধিরাম একসময় বুরুণকে ছেড়ে যেতে চায়, 'নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখো এবার'। এভাবেই হাসি ঠাট্টার মধ্য দিয়ে জীবনের চিরন্তন সত্য এবং নীতিশিক্ষা নিঃশব্দে রক্তে মিশে যায়। এই উপন্যাসে বিজ্ঞান, রূপকথার আবহ, অ্যাডভেঞ্চার, ভূত ও মানুষ, অদ্ভুত ও বাস্তব চমৎকার মিশে গেছে। হাবুর ভালো হওয়া দেখান লেখক। শুভবোধ ও মঙ্গলবোধে লেখকের আস্থা জীবন সম্পর্কে একটা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেয়।

'নৃসিংহ রহস্য' পড়তে পড়তে মনে হয়, শীর্ষেন্দুর এই ধরনের গল্পগুলোতে একটা কমন ব্যাপার আছে। যেমন, একটা জঙ্গল ঘেরা মফঃস্বল, একান্নবর্তী পরিবার, একজন ঠাকুমা ভূত। একটা লোক গল্পের শুরুতেই নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। শেষে তাকে পাওয়া যায়। থাকে একটা জাঁদরেল দারোগা। আর বেশিরভাগ গল্পেই থাকে কবিরাজ, ছিঁচকে চোর ইত্যাদি। এই উপন্যাসে গয়েশবাবু খুন হয়েছে-এই খবর পাওয়া যায় রাতে। দেখা যায় যেটাকে ডেডবডি বলে মনে হয়েছিল, সেটা একটা গোড়াকাটা কলাগাছ। মুন্ডুর মতো জায়গাটা মৌচাক। অনেক গল্পের মতো দাবা খেলা আছে এখানে। দারোগার মতে থানায় ইনফরমেশন না দিয়ে নিরুদ্দেশ হওয়া চলবে না। গয়েশবাবু একজন শিকারী। গভীর রাতে তিনি নাকি পিঁপড়েদের কথাবার্তা শুনতে পান। এই উপন্যাসে ভৌতিক আবহ তৈরির একটা নিষ্ফল প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

'ভুতুড়ে ঘড়ি' উপন্যাস শুরু হয় দাদুর ঘড়ি হারানোর মধ্য দিয়ে। তিনশো বাইশটা ঘড়ি হারিয়ে যিনি বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন। হারানবাবুর বড় ছেলে কলকাতা থেকে তার বাবাকে একটা নতুন ধাঁচের ঘড়ি এনে দেয়। সেই ঘড়ি থেকে নানারকম ভৌতিক উপদ্রব তৈরি হয়। রাত্রে সেই ঘড়ি থেকে কথা শোনা যায়, গান হয়। কিন্তু ভাষা বিচিত্র। শীর্ষেন্দুর এই ইলিউশন ব্যাপারটা চমৎকার। কারণ রেডিওতে নানা ভাষার কথা ও গান হয় সারা রাত্রি। হারান ঘড়িটা ঠিক করতে দেয় তান্ত্রিক জটাইকে। জটাইয়ের মতে এই ঘড়ির মালিকের আত্মা ঘুরঘুর করছে ঘড়ির কাছে। শব্দ সব ভৌতিক। জটাই ঘড়িটা শোধন করে ভূতমুক্ত করে দিতে চায়। এদিকে মেজো ছেলে ফটো তুলেছিল ঘড়িপরা ঘুমন্ত বাবার। কিন্তু ছবি ওয়াশ করার পর দেখা গেল ছবিতে হারান নেই, শুধু ঘড়িটা আছে। সে সময় থেকে বাড়ির সব ঘড়িগুলো উল্টোদিকে চলতে থাকে। তান্ত্রিকের পোষা ভূত বাঞ্ছারাম। তান্ত্রিকের ঝগড়ার নিত্য সঙ্গী বৈষ্ণব নিত্য দাস। ঘড়ি থেকে যেসব শব্দ ওঠে তার মধ্যে আছে, রামরাহা, ঘ্রাচঘ্রাচ প্রভৃতি। ঘড়িটা থেকে হারাণদাদু ও ঠাকুমা মৃদু ও ভারি শব্দ শুনতে পায় যা 'একটু শুনলেই নেশা লেগে যায়। বুকটা ঠান্ডা হয়ে আসে।' এরপর গর্ডনের তৈরি যন্ত্রমানবের কথা, ভূতের হার চুরি চলন্ত ট্রেন থেকে প্রভৃতি আছে।

উপন্যাসের শেষে জটাই জানায়- 'ভূতের স্বভাবই ওই। যখনই কিছু ছাড়তে হয় তখনই রেগেমেগে ভাঙচুর করে যায়। তোমার ঘড়িটার ভূত হে। যেই তাড়িয়েছি, অমনি সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেছে। তেজ ছিল খুব ব্যাটার।' ভূতের রহস্যময় প্রেক্ষাপটে কল্পবিজ্ঞানের এই উপন্যাস বেশ উপভোগ্য।

'গৌরের কবচ' উপন্যাসে অলৌকিকতা বিস্তর। 'কবচ' এখানে হয়ে উঠেছে যাবতীয় শক্তিমত্তা ও অপরাজয়ের প্রতীক। গরিব বাড়ির মা-বাপ মরা ছেলে গৌর বকুনি খায়, ঘরের কাজ করে, বৌদির ভাই-মাউ আর খাউ আসার পর তার ওপর অত্যাচার বাড়ে। আর আছে ফকির সাহেব ও তার আরশি, যাতে জমা আছে

হাজার কয়েক ভূত। বয়স তার আড়াইশ। ভয় তাড়ানোর তেল চায় গৌর ওর কাছে। আর কবিরাজ মশায়ের বয়সও একশ অতিক্রান্ত। খাউ আর মাউয়ের ঘর থেকে নিশুতি রাতে বেরিয়ে আসে ঢ্যাঙামতো একটা লোক। দাদার নির্দেশে সে রাতে খেয়ে পায় না। তাকে জেগে থেকে চোর পাহারা দিতে হয়। চোর গোবিন্দ তার প্রতি দরদী, রাতে তার জন্য রুটি তরকারি নিয়ে আসে। কবচটা সে হারানোয় সবাই বকাবকি করে। কবচটা যোগেশ্বরের-যিনি ছিলেন নানা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। এই কবচ শরীরে থাকলে অসাধ্য সাধন করা যায়। এক সময় গোবিন্দর সাহায্যে ছুঁচোর গর্ত থেকে কবচটা পাওয়া যায়। এরপর রয়েছে আরও বিভিন্ন ঘটনা। শীর্ষেন্দুর এই উপন্যাসগুলোর বৈশিষ্ট্য-নিরীহ সরল এক ছেলের নিগ্রহ এবং শেষ পর্যন্ত বিপদ থেকে মুক্তি। এই উপন্যাসটিও এলোমেলো ছোট গল্পে ছুটে যায়নি। নানা উত্তেজক দৃশ্য পর্যায়ের মধ্য দিয়ে শেষের দিকে গেছে। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের রক্ষা-এটাও অধিকাংশ গল্পের মতো এখানেও দেখা যায়। ভাষা বর্ণনা একেবারে গল্পের উপযোগী। চরিত্র চিত্রণ বিশেষতঃ ফকির বাবা অত্যন্ত জীবন্ত।

'পাগলা সাহেবের কবর' উপন্যাসের গবেট ছাত্র হরিবন্ধু 'গোঁসাই বাগানের ভূত' উপন্যাসের বুরুণের মতোই, দু'জনের বাবাই ডাক্তার। হেডমাস্টার পর পর দু'বছর ফেল করা হরিবন্ধুকে টি সি দিতে চান। গগনবাবুর পেশেন্ট দুখীরামবাবুর বাড়ি সাঁওতাল পরগণায়। পাশেই খুব নাম করা বেঙ্গলি স্কুল। হরিকে শেষ পর্যন্ত মোতিগঞ্জেই পাঠানো সাব্যস্ত হল। স্বভাবতই হরির মন খারাপ। কিন্তু সে নিরুপায়। ক্লাসে প্রথম দিনেই ছেলেরা তাকে হেনস্থা করল। কিন্তু বন্ধুত্ব হল গোপালের সঙ্গে সে জানায় কুসুমগঞ্জ বাড়িতে ভীষণ ভূতের ভয়। জানা যায় এখানে আছে এক পাগলা সাহেব। হরির পরিচয় হল পটল দাস চোরের সঙ্গে। পটল ভোজবাজির মত অদৃশ্য হতে পারে। সে জানে অনেক কিছু (হস্ত লাঘব, মুখবন্ধন, বায়ু নিয়ন্ত্রণ, কুম্ভকা)। গোপাল তাকে চিঠি দিয়ে কুসুমগঞ্জে যেতে বারণ করেছিল। ওখানেই রাজর্ষিরা গোপালকে মেরে অজ্ঞান করে দেয়। এ গল্পে অন্য গল্পের মতই মানুষ ভূত হয়ে যায়, ভূত মানুষ হয়ে বন্ধুত্ব করতে আসে।

এরপর আসে পাগলা সাহেবের মিস্টিরিয়াস কবর। হরি একদিন আবিষ্কার করল তার থাকার ঘরের ছবির আড়ালে একটা সুড়ঙ্গ। সে অগ্রসর হয়। সেখানে সে পটলকে মার দিয়ে ফেলে যাওয়া দেখতে পায়। হরি আক্রান্ত হয়। পটল বন্দি দু'জনের হাতে, আর একজন গেছে হরিকে আনতে। পটল তার ওষুধের শিশি শুকিয়ে একটা লোককে কাবু করে। হরির সাহায্যে তাকে একটা ঝোপের মধ্যে রাখে। আর পাওয়া যায় সাদা একটা ঘোড়ার বিদ্যুচ্চমকে ছুটে যাওয়া। হেডমাস্টার হরিকে স্কুলে নিজের ঘরে ডেকে একটা সাংকেতিক ছড়ার ব্যাখ্যা করতে বলেন। হেডমাস্টার বলেন লোকের বিশ্বাস পাগলা সাহেবের কবরের তলায় যে জায়গা সেখানে শ্বাস নিলেই রাজা হওয়া যাবে। পাগলা সাহেব হরিকে দু-দুবার বাঁচান। হরি যে পাগলা সাহেবের কবর দেখেছে তা শুনে ঝিকু, টুবলু অবাক হয়ে যায়। পটল আতঙ্কিত, পাছে একারণে কোন বিপদ ঘটে। হরি বন্দি হয়। যারা বন্দি করে তারা পাগলা সাহেবকে চায়। ঝুমরী ও দুটো বাচ্চা মেয়ে বন্দি হয় ওদের হাতে। ঝিকু সর্দারও বন্দি। ঝিকুরা নাকি বাপ-ব্যাটায় পাগলা সাহেব সেজে সাদা ঘোড়ায় চেপে লোককে বোকা বানাত। পাগলা সাহেব এসে হরিকে মুক্ত করে। হরি এবার পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়। এই উপন্যাসে ম্যাসেজ-এর মোড়কে দুটো নীতিশিক্ষা আছে। তা হল-ভালো লোককে এমনকি ঘোর পাপীরাও খাতির করে।

ভূতের গল্পের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য। সেখানে এক বা একাধিক অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন অশরীরী, যারা প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা তান্ত্রিত নয়, যারা একটি স্থান, কিছু মানুষকে তাদের অস্তিত্বে আতঙ্কিত করে থাকে। মৌখিক থেকে লিখিত ভৌতিক গল্পের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। শীর্ষেন্দুর পূর্বসুরী হিসেবে ত্রৈলোক্যনাথের কয়েকটি ভূতের গল্প ('ভূতের বাড়ি', 'কেন এত নিদয় হইলে') প্রভৃতি মনে পড়ে। এঁরা দু'জন ভূতকে মানুষের কাছে এনে দিয়েছেন। ভূত সমাজে মানব চরিত্রের এমনকি জাত বিভাগের ব্যাপারও এনেছেন। এই দুই লেখকের

গল্পই আতঙ্কবিস্তারী নয়, আনন্দবিস্তারী। একটা নীতিবোধের সুর ও স্বর আছে। ফ্যান্সি ও ফ্যান্টাসি রচনায় সমকালীনদের মধ্যে শীর্ষেন্দু অতুলনীয়। সেক্ষেত্রে তাঁর উদ্ভাবন ক্ষমতা অতীব প্রশংসনীয়। সেক্ষেত্রে মজা রচনায় তাঁর কৃতিত্ব যথেষ্ট। তা চরিত্রের নামকরণে স্পষ্ট। যেমন-বুড়ি ঝি কিরমিরিয়া, গোরুর নাম হ্যারিকেন, বাচ্চা ছেলে ভূতুম, কাদামামা, ঘুসুরাম, হনুমান, ঘটোৎকচ, কবি সদানন্দ, মহলানবিশ, দারোগা বজ্রাঙ্গ।

আবার এই উপন্যাসগুলোতে শীর্ষেন্দুর চোখ দিয়ে এক অতি সাধারণ সমাজের কথা ধরা পড়েছে। সমাজের মনন ফুটে উঠেছে এই গল্পগুলিতে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের কথা উঠে এসেছে। সমাজে বদমাইশ লোক যেমন আছে, তেমনি আছে ঠগবাজ, অসৎ লোকও। শীর্ষেন্দু যেহেতু হাসির গল্প লিখেছেন সেহেতু চরিত্রগুলোকে হাস্যরসের মোড়কে তৈরি করেছেন। খলনায়ককে পুরোপুরি খলনায়ক না বানিয়ে তার মধ্যে একটা হাস্যরসের মোড়ক ঢুকিয়ে দেন। খারাপ চরিত্রগুলিও সহানুভূতির সঙ্গে প্রদর্শিত হয়। চরিত্রগুলির মধ্যে কমন গ্রামের কাপালিক যারা মন্ত্র টন্ত্রের দ্বারা দেখায় যে ভূত পুষেছি বা বাঘ পুষেছি। কাপালিক হয়তো ঘটনাচক্রের দ্বারা কিছু দেখে নিয়েছে কিন্তু সে বলে যে তাকে নাকি ভূতে খবর দিয়েছে। দারোগাগুলি সাধারণতঃ পেটমোটা, নাদুস নুদুস, কাজের কিছু নেই। সমাজের পুলিশগুলো যেমন সেরকম। কিন্তু লোকের কলাটা মুলোটা নেবার ধান্দা। উপঢৌকন পেতে ভালোবাসে। বিনা পয়সায় পেলে খুবই খুশি হয়।

বেশিরভাগ গল্পেই বিচিত্রপ্রকার চোর আছে। বুদ্ধিমান চোর, ছিঁচকে চোর এবং চোরের প্রতি সহানুভূতি আছে। গ্রামের পরিবেশ, ঝোপঝাড়, পোড়ো বাড়ি, সিয়াকুল, জলা শহরের ব্যাকগ্রাউন্ড নেই। 'বনি' গল্পে বিদেশের পটভূমি আছে, বাকি সব গল্পে বাংলা গ্রামের পরিবেশ যেখানে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর ছোটবেলা কাটিয়েছেন।

এই গল্পগুলোতে অবক্ষয়িত জমিদারতন্ত্র বা রাজতন্ত্রকে দেখানো হয়েছে। জমিদারের জমিদারত্ব নেই। লেঠেলদের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষাগত দিক থেকে প্রচুর উপমা পাওয়া যায়। যেমন-বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা, অমাবস্যার চাঁদ প্রভৃতি। জ্যোতিষী আছে। তার সঙ্গে সাধারণ মানুষের চরিত্রও দেখা যায়। চাষী, কাজের লোক, মাস্টারমশায়, পুরোহিত প্রভৃতি সমাজের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ উঠে এসেছে।

শীর্ষেন্দু এই ধরনের গল্প উপন্যাসকে বলতে চান অদ্ভুতুড়ে। এর মধ্যে কোনও নারী চরিত্রের বড় ভূমিকা নেই। সমসাময়িক দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজচিত্র নেই। এ এক মফঃস্বলের উদ্ভিদ পরিবৃত অঞ্চল যেখানে চিরন্তন সমস্যা আছে। ঝরঝরে ভাষায় হালকা মেজাজে তিনি গল্পগুলো লিখেছেন। সমাজের বিভিন্ন সৎ ও অসৎ চরিত্রগুলোকে নিয়ে তিনি মজা করেছেন। পুলিশও তাঁর গল্পে সৎ ও অসৎ কিছুই নয়। তাদেরকে নিয়ে মজা করাটাই আসল উদ্দেশ্য। এখানে সাহিত্যের আধুনিক দর্শন না খোঁজাটাই স্বাভাবিক। এই গল্পগুলো বাচ্চাদের কল্পনার জগৎকে কিছুটা প্রসারিত করে। কিছুটা বাস্তব কিছুটা অবাস্তব মিলিয়েই এই জগৎ। বাচ্ছা এবং বড়দের কাছে এই উপন্যাসগুলো এত আকর্ষণের কারণ হল, এই উপন্যাসগুলো পড়তে পড়তে হারিয়ে যাওয়া যায় সব পেয়েছির দেশে। ভূত সম্পর্কে পুরোনো সংস্কার ভেঙে দেবার চেষ্টা আছে, তেমনি সততারও পরাভব নেই। গল্পের কিশোর চরিত্র অনেক সময় পড়াশোনায় অপটু; কিন্তু দায়িত্ববোধ, সাহসিকতায়, আত্মত্যাগে, মিত্রতা রচনায়, রোমাঞ্চকর অভিযানে হয়ে ওঠে প্রশংসনীয়। হয়তো এই ধরনের রচনার জনপ্রিয়তার এটি একটি কারণ। শিশুদের মনোজগৎ তিনি অত্যন্ত ভালোভাবেই বোঝেন। তাই এই ধরনের রচনায় কিশোর মনোজগৎ অপূর্ব শৈল্পিকতায় ভাস্বর হয়ে ওঠে।

ভূতের ভয় পাওয়া দিয়েই এই লেখার শুরু হয়েছিল। আমাদের হাল ফ্যাশনের বাড়ি ঘরে এখন অ্যান্টিক কালেকশন ঠাকুমা দিদিমার সাদা কালো ছবির স্থান নেই। কাজেই ওই ছবির মধ্যে থেকে তাঁদের জীবিত হয়ে সতর্ক করার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম-

'এই ভূতেদের নিয়ে তোরা কী সব মশকরা শুরু করেছিস বলতো? তেনাদের খেপিয়ে তুল্লে অছেরেদ্দা করলে আর রক্ষে থাকবেনি কো...।'

গ্রন্থপঞ্জি:

আকর গ্রন্থ:

১. মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু। কিশোর উপন্যাস সমগ্র। ভলিয়াম ১, আনন্দ পাবিলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৯, চতুর্থ মুদ্রণ আগস্ট, ২০১১।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. দত্ত, বীরেন্দ্র। বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ দ্বিতীয় খণ্ড। পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুন-আগস্ট, ১৯৮৫, পঞ্চম সংস্করণ, এপ্রিল ২০০৪।

২. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার। কালের পুত্তলিকাঃ বাংলা ছোটগল্পের একশ। বিশ বছর/১৮৯১-২০১০, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ১৯১২, পুনর্মুদ্রণ অক্টোবর ২০১৬।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 812-818
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.293

সত্যের পক্ষে না ক্ষমতার? বাংলা সংবাদপত্রে নৈতিক দ্বন্দ্ব ও দর্শনের প্রতিফলন

বিনন্দ সরেন, *সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, নগর কলেজ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 26.02.2026; Accepted: 07.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This research paper analyses the historical development of Bengali newspapers and the contemporary conflict between truth and power from philosophical and ethical perspectives. Is the idealistic foundation of newspapers committed to truth, or has it become an instrument of power's oppression and suppression? This question forms the central axis of the analysis. The paper highlights the truth-oriented stance of Bengali journalism in the context of 19th-century nationalist and intellectual periodicals, while simultaneously examining the structure of 21st-century corporate-controlled and politically influenced media. Drawing on Foucault's concept of the relationship between knowledge and power, Habermas's theory of the public sphere, and Gandhi's notion of ethical journalism, it evaluates the role of newspapers. The study demonstrates how newspapers function on one hand as a medium of free expression, and on the other hand as a vehicle for propagating the discourse of power. This research aims to contribute to a renewed examination of the interrelationship between journalistic ethics, narrative construction, and philosophical inquiry in the context of newspapers.

Keywords: Bengali journalism, truth and power, ethical conflict, philosophy, freedom of expression

সাংবাদিকতা একদিকে সত্য অনুসন্ধানের দায়িত্ব পালন করে, অন্যদিকে সমাজে মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করে। তবে প্রশ্ন থেকে যায়, এই দায়িত্ব পালন সবসময় ন্যায়ের পক্ষে, না কি কখনও তা ক্ষমতার স্বার্থে সত্যকে আড়াল করে? বিশেষ করে বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাসে এই দ্বন্দ্ব প্রকটভাবে উপস্থিত। একদা সত্য, মানবতা ও মুক্তির কণ্ঠস্বর হিসেবে সংবাদপত্র জাতীয় চেতনার ধারক হয়েছিল, আজ তা প্রায়শই ক্ষমতার হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। এই গবেষণাপত্রে আমরা এই দ্বন্দ্বের গভীরে প্রবেশের চেষ্টা করব সংবাদপত্র সত্যের পক্ষে দাঁড়ায়, না কি ক্ষমতার চাপের কাছে নত হয়?

উনিশ শতকের বাংলা সংবাদপত্র যেমন সামাচার দর্পণ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা অথবা অমৃতবাজার পত্রিকা উপনিবেশের বিপক্ষে বিবেকের ভাষা ছিল। সেই সময়ের সম্পাদকগণ ছিলেন সমাজসংস্কারক, দার্শনিক ও চিন্তাবিদ। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে কর্পোরেট স্বার্থ, রাজনৈতিক প্রভাব ও প্রযুক্তি-নির্ভরতা সংবাদপত্রকে ভিন্ন এক বাস্তবতায় দাঁড় করিয়েছে। সংবাদ আজ তথ্য নয়, পণ্য। সাংবাদিকতা আজ আদর্শ নয়, পেশাগত চতুরতা।

এই পটভূমিতে বাংলা সাংবাদিকতার নৈতিক চেতনা ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি কতটা জীবিত, তা বিশ্লেষণের প্রয়োজন।

এই গবেষণাপত্রে মিশেল ফুকোর 'জ্ঞান ও ক্ষমতা' তত্ত্ব, হ্যাবারমাসের 'জনপরিসর' ধারণা এবং গান্ধীর নৈতিক সাংবাদিকতার আদর্শ ব্যবহার করে বাংলা সংবাদপত্রে সত্য ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব। আলোচনায় থাকবে পত্রিকার ভাষা, বয়ান নির্মাণ, নৈতিক দায়বদ্ধতা এবং পাঠক-সম্পাদক-রাষ্ট্রের ত্রিমুখী সম্পর্ক। পাশাপাশি, সেকালের আদর্শিক সাংবাদিকতার সঙ্গে একালের মিডিয়া বাস্তবতার তুলনামূলক পর্যালোচনা।

এই গবেষণার লক্ষ্য হচ্ছে, সাংবাদিকতা ও দর্শনের সংযোগ-রেখা উন্মোচন করা, যেখানে সংবাদপত্র কেবল তথ্যদাতা নয়, বরং একটি নৈতিক ও দার্শনিক অনুশীলনের ক্ষেত্র। সত্যের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করা কি আজও সম্ভব? নাকি আমরা এমন এক যুগে প্রবেশ করেছি যেখানে সংবাদ কেবল ক্ষমতার প্রতিচ্ছবি? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর অনুসন্ধান করাই এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

বাংলা সংবাদপত্রের উত্থান ও নৈতিক ভিত্তি:

বাংলা সংবাদপত্রের সূচনা শুধু সংবাদ পরিবেশনের প্রয়োজনে নয়, বরং সমাজচেতনা, শিক্ষা, সংস্কার ও জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যেই সংঘটিত হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে যখন ঔপনিবেশিক শাসন ভারতীয় সমাজে গভীর প্রভাব ফেলছে, তখন সংবাদপত্র হয়ে ওঠে প্রতিরোধ ও প্রগতির ভাষা। এর মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে এক বুদ্ধিবৃত্তিক পরিসর, যা সমাজে সত্য, যুক্তি, ন্যায় ও নৈতিকতার আলোচনাকে প্রাধান্য দিতে শুরু করে। ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ মে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত "সমাচার দর্পণ" বাংলা ভাষার প্রথম নিয়মিত সংবাদপত্র হিসেবে ইতিহাসে স্বীকৃত।[১] এই পত্রিকাটি খ্রিস্টান মিশনারি উদ্যোগের অংশ হলেও, তাতে সামাজিক ও নৈতিক বিষয় গুরুত্ব পেয়েছিল। সতীদাহ, কুসংস্কার, সামাজিক অনাচার প্রভৃতি বিষয়ে ধারাবাহিক সংবাদ ও প্রবন্ধ প্রকাশ করে জনমত নির্মাণেও ভূমিকা রাখে।[২] এরপর, রাজা রামমোহন রায় সম্পাদিত 'সংবাদ কৌমুদী' সমাজ সংস্কারের দার্শনিক প্ল্যাটফর্ম হয়ে ওঠে। ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকাটি সমাজসংস্কার, ধর্মীয় পুনর্ব্যাখ্যা এবং যুক্তিনির্ভর জনপরিসর গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।[৩] বাল্যবিবাহ, সতীদাহ, কুসংস্কার, নারীর অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে মতপ্রকাশ শুরু হয়। রামমোহনের মত সংবেদনশীল সমাজচিন্তকেরা পত্রিকাকে দেখতেন ন্যায়ের এক বিকল্প ভাষা হিসেবে। এটি শুধু তথ্য পরিবেশন'ই করত না, বরং সমাজকে চিন্তার অভিমুখে প্রেরিত করত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সংবাদপত্রগুলো ছিল নৈতিক অবস্থান নির্ভর। এগুলি সত্য, যুক্তি ও সমাজকল্যাণকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করত। পত্রিকার সম্পাদকগণ ছিলেন দার্শনিক, সমাজ সংস্কারক ও মানবতাবাদী চিন্তক। এ প্রসঙ্গে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়, যাঁরা যুক্তিবাদ, মানবাধিকার ও ধর্ম-নিরপেক্ষতা, নারীশিক্ষা, বিধবা বিবাহ, মানবতাবাদ প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। আকাশবাণী, হিতবাদিনী পত্রিকা, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, প্রভৃতি পত্রিকাগুলো শিক্ষিত সমাজ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করত। পত্রিকাগুলোর সম্পাদকীয় ছিল গভীর বিশ্লেষণসমৃদ্ধ, যুক্তিনির্ভর ও নৈতিক প্রশ্নে সুসংবদ্ধ। সংবাদপত্রগুলি হয়ে উঠেছিল একধরনের 'নৈতিক প্রতিষ্ঠান'। ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সংবাদপত্র জাতীয়তাবাদের প্রধান হাতিয়ার হয়ে ওঠে। অমৃতবাজার, যুগান্তর, বসুমতী, সন্ধ্যা ইত্যাদি পত্রিকাগুলি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রধান কণ্ঠস্বর হয়ে দাঁড়ায়। এই পত্রিকাগুলিতে কেবল রাজনীতি নয়, নৈতিক ও দার্শনিক অবস্থানেরও প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, অরবিন্দ ঘোষের

'বন্দে মাতরম' পত্রিকাটি যদিও বিপ্লবী চেতনার পক্ষে ছিল, তা নৈরাজ্যবাদকে সমর্থন করেনি। বরং, ঔপনিবেশিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধকে নৈতিক ন্যায় (moral justice) হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে।[৪]

প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় সমাজে 'সত্য' ও 'ধর্ম' ছিল সামাজিক অনুশাসনের ভিত্তি। সংবাদপত্র সেই ধারা অনুসরণ করে 'বুদ্ধিজীবী জনপরিসর' গঠন করে। হ্যাবারমাসের ভাষায় বলতে গেলে, বাংলা সংবাদপত্র হয়ে উঠেছিল এমন এক জনপরিসর যেখানে যুক্তি, নৈতিকতা ও আলোচনার জায়গা সৃষ্টি হয়। এই সময় পত্রিকা শুধুমাত্র তথ্য নয়, 'মত' ও 'মানবিক মূল্যবোধ' তুলে ধরতে শুরু করে।[৫]

সত্য ও ক্ষমতার দর্শন:

সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা কেবল তথ্য পরিবেশনের মাধ্যম নয়, বরং একটি জ্ঞান-নির্মাণ ও বয়ান-নিয়ন্ত্রণকারী কাঠামো। এই কাঠামোর মধ্যেই গড়ে ওঠে সত্য ও ক্ষমতার এক জটিল সম্পর্ক, যার দর্শনচর্চা না করলে সাংবাদিকতার গভীর তাৎপর্য উপলব্ধি সম্ভব নয়। এই অধ্যায়ে মিশেল ফুকো, হ্যাবারমাস, গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবনার আলোকে সংবাদপত্রে 'সত্য' এবং 'ক্ষমতা' ধারণাগুলোর তাত্ত্বিক পর্যালোচনা করা হবে।
ফরাসি দার্শনিক মিশেল ফুকো (Michel Foucault) তাঁর রচনায় বলেছেন,

> "Each society has its regime of truth, its 'general politics' of truth: that is, the types of discourse which it accepts and makes function as true."[৬]

প্রত্যেক সমাজেরই একটি 'সত্যের ব্যবস্থা' ও 'সাধারণ রাজনীতি' থাকে, যা নির্ধারণ করে কোন কোন বক্তব্যকে 'সত্য' হিসেবে গ্রহণ ও কার্যকর করা হবে। জ্ঞান ও ক্ষমতা একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাঁর মতে, 'সত্য' কেবল একটি নিরপেক্ষ বাস্তব নয়, বরং একটি 'উৎপাদনশীল কাঠামো', যা রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান ও ক্ষমতাবান শ্রেণির দ্বারা নির্মিত ও নিয়ন্ত্রিত। Power/Knowledge হল যেই 'জ্ঞান' প্রচারিত হয়, তা আসলে ক্ষমতার দ্বারা গৃহীত, পরিচালিত ও পুনরুৎপাদিত হয়। Discourse হল সংবাদপত্রে ব্যবহৃত এমন ভাষা ও বক্তব্য, যা একটি নির্দিষ্ট ধাঁচে নির্মিত হয় এবং ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে। কোনো ব্যক্তি যদি ডিসকোর্স গ্রহণ করে, সেই ডিসকোর্সের মধ্যে থাকার ফলে সে ঐ ডিসকোর্স অনুসারে পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ করে থাকে। কেউ কোনো ডিসকোর্সের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলে, সে ঐ ডিসকোর্সের বাইরে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে না, ফলে সে ঐ ডিসকোর্সের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখায়। যখন কেউ কোনো ডিসকোর্স গ্রহণ করে, তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেই ডিসকোর্স অনুযায়ী নিজের অবস্থান ঠিক করে নেয় এবং চিন্তা-ভাবনা করে, অনুভব করে এবং ব্যবহার করে। সংবাদপত্র কখনো জনগণের ওপর নজরদারির মাধ্যমও হয়ে উঠতে পারে। বাংলা সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেও দেখা যায় পাঠকের সামনে যে 'সত্য' উপস্থাপিত হয়, তা অনেক সময় রাজনৈতিক, কর্পোরেট বা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন।

জার্মান দার্শনিক জার্গেন হ্যাবারমাস তাঁর The Structural Transformation of the Public Sphere গ্রন্থে সাংবাদিকতাকে এক গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিসর হিসেবে দেখান। তিনি বলেন,

> "The public sphere mediates between society and state, in which the public organizes itself as the bearer of public opinion."[৭]

গণ পরিসর হলো সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে এক সেতুবন্ধন, যেখানে জনগণ নিজেকে 'জনমতের ধারক' হিসেবে সংগঠিত করে। যেখানে নাগরিকরা যৌক্তিক বিতর্কের মাধ্যমে মতপ্রকাশ করে এবং সামাজিক মতামত গঠন করে। সংলাপ হবে মুক্ত, সমানাধিকারভিত্তিক ও নিপীড়নমুক্ত। কিন্তু হ্যাবারমাস নিজেই পরবর্তী সময়ে বলেন যে, গণমাধ্যম এখন আর মুক্ত নয়। রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থে বিকৃত সংবাদ পরিবেশন করা হয়, ফলে

সংবাদপত্র আর গণতান্ত্রিক পরিসর বজায় রাখতে পারে না। বাংলা সংবাদপত্রের বর্তমান বাস্তবতাও হ্যাবারমাসীয় সংকটকে প্রতিফলিত করে, যেখানে মতপ্রকাশ অধিকার থাকলেও তা সবসময় ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ায় না।

মহাত্মা গান্ধী সংবাদপত্রকে একটি নৈতিক দায়িত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখতেন। তাঁর মতে, সাংবাদিকতার মূল লক্ষ্য হচ্ছে সমাজকে সত্য, ন্যায় ও আত্মশুদ্ধির দিকে পরিচালিত করা। সত্যের প্রতি অবিচল আনুগত্য, আহিংসা ও সংবাদপত্র হবে বিবেকের কণ্ঠস্বর, সংবাদ নয় তথ্য পরিবেশন নয় বরং নৈতিকভাবে সমাজ গঠনের অংশীদার।[৮] গান্ধীর মতে, সংবাদপত্রের কাজ হলো—

> "to understand the popular feeling and give expression to it; to arouse among the people certain desirable sentiments; and to fearlessly expose popular defects."[৯]

এখানে সংবাদপত্রকে তিনি জনমতের প্রতিফলন ও সংশোধনের মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করেন। সত্য প্রকাশ কেবল তথ্যগত নির্ভুলতা নয়, এটি নৈতিক সত্যের অন্বেষণ।

রবীন্দ্রনাথ সাংবাদিকতাকে তথ্যের বাহক নয়, বরং 'আত্মার ভাষা' হিসেবে দেখতেন। তাঁর দৃষ্টিতে সাংবাদিকতা হবে এমন এক মাধ্যম, যা সত্যের গভীরে প্রবেশ করে মানুষের বিবেককে জাগ্রত করে। রবীন্দ্রনাথের মতে, সত্য কেবল তথ্যগত নির্ভুলতা নয়; তার মধ্যে নৈতিকতা, করুণা ও মানবিক সহমর্মিতা থাকা আবশ্যক।[১০] সত্য মানে কেবল তথ্য নয়, তার মধ্যে নৈতিকতা ও করুণা থাকতে হবে, সংকীর্ণতার বাইরে বিশ্বমানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করতে হবে। সংবাদপত্র যখন ক্ষমতার ভাষ্য প্রচারে লিপ্ত হয়, তখন রবীন্দ্রীয় সাংবাদিকতার নৈতিক স্তম্ভ ভেঙে পড়ে।

একালের বাংলা সংবাদপত্রে সত্যের সংকট:

সাংবাদিকতা, যা একসময় গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত ছিল, আজ তা নানা মতাদর্শিক ও আর্থ-রাজনৈতিক স্বার্থের দোলাচলে ন্যুব্জ। বিশেষত বাংলা সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে দেখা যায়, সত্য বলার দায় প্রায়শই ক্ষমতার চাপ, পুঁজির খেলা ও রাজনৈতিক আনুগত্যের কাছে হার মানে। এই অধ্যায়ে একালের বাংলা সংবাদপত্রে মতাদর্শের প্রভাব ও সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিকতার সংকট বিশ্লেষণ করা হবে।

মতাদর্শ (Ideology) কেবল রাজনৈতিক অবস্থান নয়, এটি একটি দৃষ্টিভঙ্গি, যার মাধ্যমে আমরা বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করি। সংবাদপত্র, এই মতাদর্শকে প্রচার ও প্রতিষ্ঠার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে ওঠে। ফলে সত্যকে উপস্থাপন করার ধরনও মতাদর্শ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোনও পত্রিকা যখন একটি রাজনৈতিক দলের অপকর্মকে আড়াল করে, অথচ বিরোধীদলের সমালোচনায় সরব হয়, সেখানে মতাদর্শ সত্যকে ছাঁকনি দিয়ে চালিয়ে দেয়। ধর্মীয়, জাতিগত বা ভাষাগত পক্ষপাতও সংবাদপত্রের মতাদর্শিক অবস্থানকে প্রতিফলিত করে। বাংলা সংবাদপত্রগুলোর একটি বড় অংশ বর্তমানে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত-ফলে নিরপেক্ষ সাংবাদিকতা প্রায় অনুপস্থিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও সতর্ক করেছিলেন যে, সংবাদপত্র যখন ক্ষমতার প্রচারযন্ত্রে পরিণত হয়, তখন তার নৈতিক ভিত্তি ভেঙে পড়ে।[১১]

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অন্তরায়:

বাংলা সংবাদপত্রের আর্থিক কাঠামো ক্রমশ কর্পোরেট বিজ্ঞাপন ও সরকার নির্ভর হয়ে পড়ছে। এর ফলে সাংবাদিকতা স্বাধীনতার বদলে বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের দাসত্বে পরিণত হয়েছে। প্রধান সংকট হল বড় কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন হারানোর ভয়ে সংবাদপত্র অনেক সত্য গোপন রাখে। সরকারি নীতির

বিপক্ষে গেলে সংবাদপত্রকে কালো তালিকাভুক্ত করার ভয় থেকেই যায়। সাংবাদিকেরা নিজেরাই অনেক সময় আত্মনিয়ন্ত্রণে চলে যান- যাতে 'উপরের নির্দেশ' না আসে। এতে সংবাদপত্র এক ধরনের 'মেইনস্ট্রিম নীরবতা'তে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, যেখানে সত্য বলার চেয়ে নিরপদ থাকা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। 'পেইড নিউজ' বা অর্থের বিনিময়ে সংবাদ পরিবেশন বর্তমানে বাংলা পত্রিকাতেও ক্রমবর্ধমান। পাশাপাশি সামাজিক মাধ্যমে ভুয়া তথ্য, গুজব ও রাজনৈতিক ট্রোলিং সাংবাদিকতাকে দুর্বল করে তুলেছে। সংবাদপত্র তার নিজস্ব তথ্য যাচাই না করে সামাজিক মাধ্যমনির্ভর হয়ে পড়ে। জনগণের বিশ্বাস কমে যায়, সাংবাদিকতাকে আর 'সত্যের মুখপত্র' হিসেবে দেখা হয় না।

একালের সাংবাদিকতা অনেক সময় 'সত্য'-কে বিক্রি করে দেয়। সাংবাদিকতা পেশার চেয়ে পণ্য হয়ে দাঁড়ায়- যেখানে পাঠক নয়, বরং ক্লায়েন্টই মুখ্য। তিনটি প্রধান লক্ষণ হল- অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার অবক্ষয়, জনস্বার্থ নয় 'সংসদীয় স্বার্থ'কে প্রাধান্য দেওয়া ও নৈতিক দায়বদ্ধতার অভাব। এমন বাস্তবতায়, 'সত্য' আর উপলব্ধির বিষয় নয় বরং নির্ধারিত একটি বয়ান, যা নির্দিষ্ট গোষ্ঠী দ্বারা নির্মিত। তবে, সম্পূর্ণ চিত্র হতাশাজনক নয়। এখনো কিছু বাংলা সংবাদপত্র ও অনলাইন প্ল্যাটফর্ম অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা, দায়বদ্ধ প্রতিবেদন এবং জনস্বার্থে সত্য প্রকাশের সাহস দেখায়। কিছু প্রগতিশীল অনলাইন নিউজ পোর্টাল সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরব হচ্ছে। পরিবেশ, শ্রমিক অধিকার ও নারী নিপীড়নের মতো বিষয়েও কিছু নির্ভীক প্রতিবেদন তৈরি হচ্ছে। এটি প্রমাণ করে যে সাংবাদিকতা এখনো জীবিত, যদিও তা লড়াইরত।

সাংবাদিকতার ভবিষ্যৎ: নৈতিকতা, দর্শন ও পাঠকের ভূমিকা

সাংবাদিকতা শুধুমাত্র খবর পরিবেশনের পেশা নয়, এটি একটি নৈতিক ও দার্শনিক অনুশীলন যেখানে সত্য, ন্যায় ও জনগণের দায়িত্ববোধ নিরবচ্ছিন্নভাবে যুক্ত। বর্তমান সময়ে সংবাদমাধ্যম যেভাবে প্রযুক্তি, কর্পোরেটিকরণ ও রাজনৈতিক বলয়ের চাপে অবস্থান করছে, তাতে প্রশ্ন ওঠে- এই পেশার ভবিষ্যৎ কী? সত্য প্রকাশ কি আরও সংকুচিত হবে, নাকি পাঠকের সক্রিয় অংশগ্রহণ একে নতুন পথ দেখাবে?

এই অধ্যায়ে আমরা সাংবাদিকতার ভবিষ্যৎকে তিনটি মূল দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করব- নৈতিক চ্যালেঞ্জ ও তার উত্তরণ, সাংবাদিকতার দর্শনচিন্তার নতুন দিগন্ত, এবং পাঠকের ভূমিকার বিবর্তন।

ভবিষ্যতের সংবাদজগতে নৈতিকতার যে বড় চ্যালেঞ্জগুলো থাকবে, সেগুলির মধ্যে প্রধান হল:

ক. কর্পোরেট মালিকানার প্রভাব: কর্পোরেট মালিকানার কারণে সম্পাদকীয় স্বাধীনতা বিপন্ন হয়। বাংলা সংবাদপত্রেও বহু প্রতিষ্ঠান স্পনসর, বিজ্ঞাপনদাতার স্বার্থ রক্ষায় সংবাদ বিকৃত করে। ভবিষ্যতে এই চাপ আরও বাড়তে পারে।

সম্ভাব্য উত্তরণ: পাঠক-ভিত্তিক মডেল (সাবস্ক্রিপশন, পাবলিক ফান্ডিং), অলাভজনক সংবাদপত্র গঠন, স্বতন্ত্র সাংবাদিকতার অনুপ্রেরণা।

খ. ভুয়ো সংবাদ ও মিথ্যা বয়ান: ডিজিটাল যুগে ভুয়ো খবর, হাফ-ট্রুথ, এবং deepfake প্রযুক্তি সত্যের সংজ্ঞাকে অস্পষ্ট করে দিচ্ছে।

সম্ভাব্য উত্তরণ: ফ্যাক্ট-চেকিং প্রতিষ্ঠান (যেমন AltNews)। সাংবাদিকদের তথ্য যাচাইয়ের নৈতিক প্রশিক্ষণ, পাঠকের মিডিয়া-সচেতনতা বৃদ্ধি ভবিষ্যতের সাংবাদিকতা কেবল তথ্য পরিবেশক নয়, একটি সচেতন নাগরিক দর্শনের বাহক হবে- এমন আশা করা যায়। এখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উঠে আসে:

ক. সংবাদপত্রের দার্শনিক ভূমিকা: সাংবাদিকতা একটি নৈতিক দায়িত্ব (কান্টীয় চিন্তায়), সংবাদপত্র ক্ষমতার তত্ত্ব (ফুকো অনুসারে) দ্বারা প্রভাবিত এবং গঠনমূলক, প্রতিক্রিয়াশীল গণতন্ত্রের হাতিয়ার (হাবার্মাসের পাবলিক স্পিয়ার তত্ত্ব)।

খ. বিকল্প ও জনমুখী সাংবাদিকতা: ভবিষ্যতের বাংলা সাংবাদিকতায় দরকার গবেষণামূলক এবং জনসচেতনতা-নির্ভর ধারার বিস্তার। "লোকায়ত সাংবাদিকতা"- যা গ্রাম, দলিত, আদিবাসী ও প্রান্তিক মানুষের ভাষা ও দৃষ্টিকোণ তুলে আনে। সংবাদপত্র কেবল 'ঘটনার কাহিনি' নয়, বরং একটি 'দর্শনচর্চা- যেখানে সমাজের নৈতিক বোধ ও সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ফুটে ওঠে। ভবিষ্যতের সাংবাদিকতায় পাঠকের ভূমিকা কেবল 'সংবাদগ্রহীতা' হিসাবে নয়, বরং সহ-স্রষ্টা হিসাবেও বিবেচ্য। পাঠক'ই সংবাদপত্রের নৈতিক দিক রক্ষায় মূল নিয়ামক হয়ে উঠতে পারেন। পাঠকের ভূমিকার বিবর্তন করতে হবে যেমন - শেয়ার, রিভিউ, মন্তব্য, প্রতিবাদ ইত্যাদি মাধ্যমে সংবাদকে প্রশ্ন ও বিশ্লেষণ করা, স্বাধীন মিডিয়া উদ্যোগে অংশগ্রহণ (donation, voluntary reporting, citizen journalism)। তাই সংবাদপত্র যদি একটি নৈতিক সম্পর্ক হয়, তবে পাঠক তার বিবেক।

উপসংহার:

বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এটি কেবল তথ্য পরিবেশনের মাধ্যম নয়, বরং এক প্রকার নৈতিক এবং দার্শনিক অনুশীলনের ক্ষেত্রও বটে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সংবাদপত্র যেমন উপনিবেশবাদ ও সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে সত্যের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল, তেমনি একবিংশ শতাব্দীর সাংবাদিকতা বারংবার প্রতিষ্ঠানগত বাধা, কর্পোরেট চাহিদা এবং রাজনৈতিক প্রভাবের সঙ্গে আপোষ করতে বাধ্য হয়েছে। এই পরিবর্তন সংবাদপত্রের স্বরূপকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে- তা কি সত্যের পক্ষে দাঁড়ানো একটি নৈতিক বলিষ্ঠতা, নাকি ক্ষমতার স্বার্থে পরিচালিত একটি প্রাতিষ্ঠানিক যন্ত্র?

গবেষণায় দেখা গেছে, সংবাদপত্রের অন্তঃস্থলে একটি মৌলিক দ্বন্দ্ব বিরাজমান- সত্যপ্রিয়তা বনাম প্রতিষ্ঠান-নির্ভরতা। এই দ্বন্দ্ব সাংবাদিকতার নৈতিক ভিত্তিকে প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দেয়। অনেক ক্ষেত্রে সংবাদপত্র সত্য প্রচারের মাধ্যমে জনমত গঠন করে, আবার অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বা কর্পোরেট চাপে সত্য গোপন রাখে। এখানে ফুকোর "power/knowledge" তত্ত্ব এবং হ্যাবারমাসের "public sphere" ধারণা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যার সরঞ্জাম হিসেবে কাজ করে। তবে শুধু সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যম নয়, পাঠক সমাজেরও একটি সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। পাঠকের নৈতিক চেতনা, প্রশ্ন করার প্রবণতা ও তথ্য যাচাইয়ের আগ্রহ- এই সবই সংবাদপত্রকে সৎ থাকতে সহায়তা করতে পারে। তাই সাংবাদিকতার ভবিষ্যৎ কেবল সাংবাদিকের নীতিশীলতার ওপর নির্ভর করে না, বরং তা নির্ধারিত হয় একটি জাগ্রত, নৈতিক ও দার্শনিকভাবে সচেতন পাঠকসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণে।

অতএব, সারকথা হলো সাংবাদিকতা এক ধরনের নৈতিক দর্শনচর্চা, যেখানে সত্যের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং ক্ষমতার প্রতি সমালোচনামূলক মনোভাব বজায় রাখা জরুরি। সংবাদপত্র যদি এই দ্বন্দ্বে সত্যের পক্ষে অবস্থান নিতে পারে, তবেই তা গণতন্ত্রের এক শক্তিশালী স্তম্ভ হিসেবে কাজ করতে সক্ষম হবে।

তথ্যসূত্র:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ। বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাস। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৬৯, পৃ. ১২-১৫।
২. সেন, সুকুমার। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, খণ্ড ৩। আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮২, পৃ. ৪৫-৪৮।
৩. সেন, সুকুমার। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, খণ্ড ৩। আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮২, পৃ. ৫৮-৬১।

৪. Sarkar, Sumit. Modern India, 1885-1947. Macmillan, 1983, pp. 94-97.
৫. Habermas, Jürgen. The Structural Transformation of the Public Sphere. Translated by Thomas Burger, MIT Press, 1989, pp. 27-56.
৬. Foucault, Michel. Truth and Power. Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977, edited by Colin Gordon, Pantheon Books, 1980, p. 131.
৭. Habermas, Jürgen. The Structural Transformation of the Public Sphere. Trans. Thomas Burger. Cambridge, MA: MIT Press, 1989, p. 102.
৮. Nanda, B. R. Mahatma Gandhi: A Biography. Oxford University Press, 1958, pp. 180-185.
৯. Gandhi, M.K. The Function of Journalism. Young India, 2 July 1925. Collected Works of Mahatma Gandhi, vol. 27, Publications Division, Government of India, 1999, p. 214.
১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। সত্য ও বাস্তব। রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড ১২। বিশ্বভারতী, ১৯৮৯, পৃ. ৪৫-৪৮।
১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। রাজনীতি ও নৈতিকতা। রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড ১৪। বিশ্বভারতী, ১৯৮৯, পৃ. ৮০-৮৪।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 819- 829
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.294

নাগরিকত্বের ধারণা: তাত্ত্বিক ভিত্তি ও সমকালীন বাস্তবতা

বিজয় দাস, *সহকারী অধ্যাপক, আজীবন শিক্ষা ও সম্প্রসারণ বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 19.02.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Citizenship is one of the most fundamental concepts in political theory. Citizenship has been understood as a formal status that grants individuals certain rights while also imposing duties and responsibilities toward the political community. However, over time the concept has evolved significantly, reflecting broader transformations in political thought, state formation and social organization. This study examines the concept of citizenship from both theoretical and contemporary perspectives, highlighting its historical evolution, core principles, and present-day challenges. The theoretical foundations of citizenship can be traced back to classical political thought.In modern political theory, political thinkers are involved to develop the idea of citizenship by linking it with civil, political, and social rights. In contemporary society, the concept of citizenship has become more complex due to the influence of globalization, migration, multiculturalism, and the growing importance of human rights. Traditional notions of citizenship tied strictly to the nation-state are increasingly challenged by new forms of belonging and identity. Issues such as dual citizenship, transnational migration, statelessness, and the emergence of regional or global citizenship have reshaped debates surrounding the meaning and scope of citizenship. Furthermore, political and social developments in various countries have highlighted tensions between inclusion and exclusion in the practice of citizenship. The purpose of this study is to analyze the theoretical foundations of citizenship and examine how these ideas interact with contemporary realities. By exploring both classical theories and present-day developments, the study seeks to provide a comprehensive understanding of citizenship as a dynamic and evolving concept. The discussion also emphasizes the importance of citizenship in promoting democratic participation, social equality, and collective responsibility within political communities. The study concludes that citizenship is no longer merely a legal status but a multidimensional concept encompassing rights, duties, participation, identity, and social belonging.

Keywords: Citizenship, Cosmopolitan, Global Citizen, Globalization, Political Communities

নাগরিকত্ব ধারণা আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক ধারণা, যা ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ককে নির্ধারণ করে। নাগরিকত্বের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি একটি রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং সেই

রাষ্ট্রের অধীনে বিভিন্ন অধিকার ভোগ করার পাশাপাশি কিছু দায়িত্বও পালন করে। প্রাচীন নগররাষ্ট্রে নাগরিকত্ব মূলত রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সঙ্গে যুক্ত ছিল, কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রে এটি আইনি অধিকার, সামাজিক সুরক্ষা এবং সমতার ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে নাগরিকত্বের ধারণা আরও বিস্তৃত ও জটিল হয়ে উঠেছে। বিশ্বায়ন, অভিবাসন, মানবাধিকার এবং বহুসাংস্কৃতিক সমাজের বিকাশ নাগরিকত্বের প্রচলিত ধারণাকে নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করেছে।

এই আলোচনার মূল উদ্দেশ্য হলো নাগরিকত্বের তাত্ত্বিক ভিত্তি এবং তার সমকালীন বাস্তবতাকে বিশ্লেষণ করা। নাগরিকত্বের ধারণা কীভাবে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বিকশিত হয়েছে এবং বর্তমান বিশ্বে এর কী ধরনের পরিবর্তন ও চ্যালেঞ্জ দেখা যাচ্ছে, তা বোঝার চেষ্টা করা এই গবেষণার প্রধান লক্ষ্য। সমকালীন বিশ্বে নাগরিকত্বের প্রশ্ন নতুনভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে, বিশেষ করে অভিবাসন, নাগরিক অধিকার, সংখ্যালঘু সুরক্ষা এবং বৈশ্বিক নাগরিকত্বের আলোচনার প্রেক্ষাপটে। তাই নাগরিকত্বের ধারণা ও এর বাস্তব প্রয়োগ নিয়ে বিশ্লেষণ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার ক্ষেত্র।

নাগরিকত্বের ধারণার সূত্রপাত ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট:

নাগরিকত্বের ধারণা ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে বিকশিত হয়েছে এবং তা বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত। সাধারণভাবে নাগরিক তত্ত্বের বিকাশকে চারটি গুরুত্বপূর্ণ কালপর্বে ভাগ করে বিশ্লেষণ করা যায়।

প্রথমত, প্রাচীন গ্রীক বা রোমান যুগে নাগরিকত্বের ধারণার সূচনা ঘটে। গ্রীক নগররাষ্ট্রে নাগরিকত্ব মূলত রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সঙ্গে যুক্ত ছিল যা এরিস্টটলের Civic Republicanism (নাগরিকত্বভিত্তিক প্রজাতান্ত্রিক) এর মূল ধারণা হিসেবে পরিচিত (Aristotle, 1984)। রোমান সাম্রাজ্যে নাগরিকত্ব আইনি মর্যাদা ও অধিকার লাভের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে ওঠে (Heater, 2004)।

দ্বিতীয়ত, মধ্যযুগে রাজতান্ত্রিক কর্তৃত্ব ও সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কারণে নাগরিকের স্বাধীনতা সীমিত ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে বাণিজ্যিক নগর ও সামাজিক পরিবর্তনের ফলে নাগরিক অধিকারের ধারণা বিকশিত হতে শুরু করে (Turner, 1993)।

তৃতীয়ত, ফরাসি বিপ্লব (1789) ও আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ (1776) নাগরিকত্বের আধুনিক ধারণাকে শক্তিশালী করে। এই ঘটনাগুলি নাগরিকদের সমতা, অধিকার এবং গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করে (Held, 2006)।

চতুর্থত, উনবিংশ শতাব্দীর উদারনীতিবাদ থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত নাগরিকত্বের ধারণা আরও বিস্তৃত হয়। উদারনৈতিক চিন্তায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার গুরুত্ব পায়, আর বিংশ শতাব্দীতে গোষ্ঠীগত অধিকার, পরিচয়ভিত্তিক রাজনীতি এবং সামাজিক নাগরিকত্বের ধারণা গুরুত্ব লাভ করে (Marshall, 1950; Kymlicka, 1995)।

সুতরাং, নাগরিকত্বের ধারণা রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, অধিকার ও সামাজিক স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে ক্রমাগত বিকশিত হয়েছে।

নাগরিকত্বের অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(ক) নাগরিকত্বের অর্থ ও সংজ্ঞা: প্রাচীন গ্রিসে রাষ্ট্র কার্য অংশগ্রহণকারী ও কর্ণ প্রদানকারী জনগণকে বলা হয় নাগরিক। নাগরিক বলতে একটি রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের পূর্ণ ও সমান সদস্যপদ বোঝায়। নিমাই চন্দ্র ভট্টাচার্য ও শ্যামল কুমার চক্রবর্তী এদের মতে রাষ্ট্রের জনসমষ্টি নাগরিক নয়, রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট আইন দ্বারা যাদের

নাগরিকত্ব দান করা হয় তারা নাগরিক। তারা মনে করেন নাগরিকত্ব একটি দায়িত্ব ও অধিকারের সমষ্টি যা কোনো রাষ্ট্রে নাগরিক কতটুকু স্বাধীনতা ভোগ করবে সেই রাষ্ট্রের আইনের উপর নির্ভর শীল। অধ্যাপক শিবনাথ চক্রবর্তী নাগরিকত্বকে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, যে ব্যক্তি কোনো রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে সেই রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে এবং স্থায়িভাবে সেখানে বসবাস করে, তাকে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক বলা হয়। অধ্যাপক লাস্কি নাগরিকতার সংজ্ঞা নির্ধারণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, নাগরিকতার সারমর্ম হইল— সাধারণের হিতার্থে ব্যক্তির শিক্ষা-লব্ধ মার্জিত বুদ্ধির প্রয়োগ। নাগরিকত্ব বলতে সাধারণত রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির একটি আইনগত ও রাজনৈতিক সম্পর্ককে বোঝায়। নাগরিক সেই ব্যক্তি, যিনি একটি রাজনৈতিক সমাজের পূর্ণ সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন এবং রাষ্ট্রের অধিকার ও সুযোগ ভোগ করেন। নাগরিকরা রাষ্ট্রের পূর্ণ সদস্য, কিন্তু বিদেশীরা সেই পূর্ণ অধিকার ভোগ করে না। নাগরিকত্বের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো অধিকার ও কর্তব্যের পারস্পরিক সম্পর্ক। Encyclopaedia of Social Sciences-এ বলা হয়েছে "Citizens enjoy a certain reciprocity of rights against, and duties toward the community." অর্থাৎ নাগরিকরা যেমন রাষ্ট্রের কাছ থেকে অধিকার লাভ করে, তেমনি সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি কিছু দায়িত্বও পালন করে। আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে নাগরিকত্বকে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে একটি আইনি সম্পর্ক হিসেবে দেখা হয়। নাগরিক হল সেই ব্যক্তি, যিনি কোনো রাষ্ট্রের আইনি সদস্য এবং রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার ভোগ করেন। নাগরিকরা ভোটাধিকার, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত বিভিন্ন অধিকার লাভ করে (Marshall, 1950)। অন্যদিকে বিদেশী হল সেই ব্যক্তি, যিনি অন্য কোনো রাষ্ট্রের নাগরিক কিন্তু সাময়িকভাবে অন্য দেশে বসবাস বা অবস্থান করেন। অন্যদিকে প্রজা (Subject) ধারণাটি প্রধানত রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। প্রজা রাষ্ট্রের শাসকের অধীনস্থ হলেও তাদের রাজনৈতিক অধিকার সীমিত থাকে। মধ্যযুগীয় রাজতন্ত্রে জনগণকে প্রজা হিসেবে বিবেচনা করা হতো, যেখানে তারা শাসকের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করত (Held, 2006)।আধুনিক নাগরিকত্বের আলোচনায় ব্রিটিশ সমাজবিজ্ঞানী টি. এইচ. মার্শাল (T. H. Marshall) গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তাঁর মতে নাগরিকত্ব হলো এমন একটি মর্যাদা, যা একটি সম্প্রদায়ের পূর্ণ সদস্যদের প্রদান করা হয় এবং যার অধিকারী সকলেই অধিকার ও কর্তব্যের ক্ষেত্রে সমান। মার্শাল নাগরিকত্বকে তিনটি মৌলিক অধিকারের সমষ্টি হিসেবে ব্যাখ্যা করেন নাগরিক অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার এবং সামাজিক অধিকার।

(খ) নাগরিকতার বৈশিষ্ট্য: নাগরিকত্ব হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও আইনি ধারণা, যা ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ককে নির্ধারণ করে।

প্রথমত, নাগরিকত্ব ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করে। একজন ব্যক্তি যখন কোনো রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে, তখন সে সেই রাষ্ট্রের অধিকার ভোগ করার পাশাপাশি নির্দিষ্ট দায়িত্বও পালন করে।

দ্বিতীয়ত, নাগরিকত্বকে সাধারণত আইনগত পদমর্যাদা (legal status) হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ নাগরিকত্বের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি রাষ্ট্রের আইনি সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি পায় এবং সংবিধান ও আইনের দ্বারা নির্ধারিত অধিকার লাভ করে।

তৃতীয়ত, নাগরিকত্বের মধ্যে সমমর্যাদার ধারণা নিহিত থাকে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং তাদের মৌলিক অধিকার সমভাবে স্বীকৃত হয়।

চতুর্থত, ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে অধিকার ও দায়িত্ব নির্দিষ্ট আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। নাগরিকদের যেমন ভোটাধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ইত্যাদি অধিকার থাকে, তেমনি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য, আইন মেনে চলা এবং সামাজিক দায়িত্ব পালন করা তাদের কর্তব্য।

এইভাবে নাগরিকত্ব ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সম্পর্ককে সুসংহত করে এবং গণতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি গঠন করে।নাগরিক অধিকার ব্যক্তির স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, রাজনৈতিক অধিকার শাসন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয় এবং সামাজিক অধিকার শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও সামাজিক সুরক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করে।

নাগরিকত্বের তাত্ত্বিক ভিত্তি:

নাগরিকত্বের ধারণা বিভিন্ন রাজনৈতিক চিন্তাবিদের লেখায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল নাগরিকত্বকে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। তাঁর মতে, নাগরিক হল সেই ব্যক্তি যে রাষ্ট্রের বিচার ও শাসন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। অর্থাৎ নাগরিকত্ব শুধু আইনি মর্যাদা নয়, বরং রাজনৈতিক কার্যকলাপে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ। রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানী টি. এইচ. মার্শাল নাগরিকত্ব সম্পর্কে বলেন যে নাগরিকত্ব এমন একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা যা সমাজের পূর্ণ সদস্যদের প্রদান করা হয়। এর মাধ্যমে ব্যক্তি রাষ্ট্রে বিভিন্ন অধিকার, সুযোগ ও দায়িত্ব লাভ করে এবং সমাজের সক্রিয় অংশ হিসেবে স্বীকৃতি পায়। নাগরিক অধিকার ব্যক্তির স্বাধীনতা নিশ্চিত করে, রাজনৈতিক অধিকার রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয় এবং সামাজিক অধিকার নাগরিকদের কল্যাণ ও সমতা নিশ্চিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

(ক) নাগরিকত্বের ধারণায় উপর বিভিন্ন চিন্তাবিদের দৃষ্টিভঙ্গি: নাগরিকত্ব আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তায় একটি ওগুরুত্বপূর্ণ ধারণা, যা বিভিন্ন রাজনৈতিক চিন্তাবিদ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। হ্যারল্ড লাস্কি (Harold Laski) নাগরিকত্বের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে নাগরিকত্ব হলো জনগণের কল্যাণের জন্য নিজ নিজ সুচিন্তিত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করার ক্ষমতা। ল্যস্কির মতে একজন প্রকৃত নাগরিক সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে সচেতনভাবে অংশগ্রহণ করে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করে। একইভাবে টি. এইচ. গ্রীন (T. H. Green) মনে করেন যে সমাজের সদস্যরা যদি সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন না হয়, তবে অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। অর্থাৎ নাগরিকদের মধ্যে সামাজিক দায়িত্ববোধ ও সাধারণ কল্যাণের চেতনা থাকতে হবে, তবেই প্রকৃত নাগরিকত্বের বিকাশ ঘটে। অন্যদিকে ডেভিড মিলার (David Miller) নাগরিকত্বকে রাজনৈতিক সমাজের সদস্যপদের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। তাঁর মতে নাগরিকরা কেবল রাষ্ট্রের সদস্যই নয়; তারা নিজেদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অধিকার রক্ষার জন্য সরকার গঠন করে এবং সেই সরকারের প্রতি আনুগত্য ও সমর্থন প্রকাশ করে (Miller)। এছাড়াও জন লক (John Locke) নাগরিকত্বের ধারণাকে ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বাধীনতার সঙ্গে যুক্ত করেছেন। তাঁর মতে রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব হলো নাগরিকদের জীবন, স্বাধীনতা এবং সম্পত্তির অধিকার রক্ষা করা. সুতরাং এই চিন্তাবিদদের মতামত থেকে বোঝা যায় যে নাগরিকত্ব কেবল রাষ্ট্রের সদস্যপদ নয়; এটি অধিকার, দায়িত্ব, অংশগ্রহণ এবং সামাজিক কল্যাণের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত।

(খ) নাগরিকত্ব সাথে অন্য ধারণার সম্পর্ক:

নাগরিকত্ব ও রাষ্ট্র: নাগরিকত্বের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ যা ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে একটি আইনগত ও রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। রাষ্ট্রের সংবিধান ও আইন নাগরিকদের অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারণ করে এবং নাগরিকরা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। নাগরিকত্বের মাধ্যমে ব্যক্তি রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি পায় এবং রাষ্ট্র তাকে বিভিন্ন অধিকার প্রদান করে, একই সঙ্গে কিছু কর্তব্যও পালন করতে হয়।

নাগরিকত্ব ও জাতি: নাগরিকত্বর মাধ্যমে একজন ব্যক্তি কোনো রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং নির্দিষ্ট অধিকার ও কর্তব্য ভোগ করে। অন্যদিকে জাতি সাধারণত ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সাধারণ চেতনার ভিত্তিতে গঠিত একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়। একটি জাতি যখন একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে, তখন তাকে জাতি–রাষ্ট্র (Nation-State) বলা হয়। এই ক্ষেত্রে নাগরিকত্ব জাতীয় পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। তবে সবসময় নাগরিকত্ব ও জাতি একই নয়। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের মতো বহুজাতিক ও বহুসাংস্কৃতিক রাষ্ট্রে বিভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মের মানুষ একই নাগরিকত্বের অধিকারী।

নাগরিকত্ব ও ধর্ম: আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকত্ব ধর্মের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় না। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থায় সকল নাগরিক ধর্ম নির্বিশেষে সমান মর্যাদা ও অধিকার লাভ করে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং তাদের মৌলিক অধিকার সমভাবে স্বীকৃত। কিন্তু তা সত্ত্বেও ধর্মের ভিত্তিতে অনেক সময় নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে ভারতবর্ষে ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব প্রদান করা হচ্ছে।

নাগরিকত্ব ও সমতা: নাগরিকত্বের মূল ভিত্তির মধ্যে সমতার ধারণা নিহিত থাকে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং তাদের মৌলিক অধিকার সমভাবে স্বীকৃত। অর্থাৎ নাগরিকত্বের মাধ্যমে ব্যক্তি রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে সমান মর্যাদা লাভ করে এবং আইন ও সংবিধানের অধীনে সমান সুযোগ ভোগ করে। নাগরিকদের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠিত না হলে প্রকৃত নাগরিকত্ব কার্যকর হতে পারে না।

নাগরিকত্ব, অধিকার কর্তব্য: নাগরিকত্বের সঙ্গে অধিকার ও কর্তব্য উভয়ই সম্পর্কিত। নাগরিকরা যেমন ভোটাধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং আইনি সুরক্ষার অধিকার ভোগ করে, তেমনি আইন মান্য করা, কর প্রদান এবং সমাজের কল্যাণে কাজ করা তাদের কর্তব্য। এই অধিকার ও কর্তব্যের সমন্বয়ের মাধ্যমেই নাগরিকত্ব একটি সুস্থ ও কার্যকর গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সুনাগরিকতা ও গণতন্ত্র: গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সফলতা অনেকাংশে নাগরিকদের সচেতনতা, দায়িত্ববোধ এবং নৈতিকতার উপর নির্ভর করে। এই প্রসঙ্গে জে. এস. মিল (J. S. Mill) উল্লেখ করেছেন যে গণতন্ত্রের কার্যকারিতা তখনই নিশ্চিত হয়, যখন নাগরিকরা সচেতন, দায়িত্বশীল এবং রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ হয়। নাগরিকরা যদি রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সম্মান করে, তবে গণতন্ত্র শক্তিশালী হয়। এছাড়া ও লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce) সুনাগরিকের গুণাবলী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে একজন সুনাগরিকের মধ্যে বিচক্ষণতা, আত্মসংযম এবং বিবেকবোধ থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(গ) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নাগরিকতা মূল দিক:

নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য: একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকরা বিভিন্ন ধরনের অধিকার ভোগ করে, যেমন— মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, ভোটাধিকার, আইনের দৃষ্টিতে সমতা এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। এই অধিকারগুলো নাগরিকদের ব্যক্তিগত মর্যাদা রক্ষা করে এবং রাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়। টি. এইচ. মার্শাল নাগরিকত্বকে নাগরিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের সমষ্টি হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন (Marshall, 1950)। অন্যদিকে নাগরিকদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যও রয়েছে। আইন মান্য করা, কর প্রদান করা, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা এবং সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা নাগরিকের প্রধান কর্তব্য।

নাগরিকের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ: সরকার সংবিধান ও আইনের মাধ্যমে নাগরিকদের আচরণ ও কার্যক্রমের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। এই নিয়ন্ত্রণের মূল উদ্দেশ্য হলো সমাজে শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। সরকার বিভিন্ন আইন ও নীতির মাধ্যমে নাগরিকদের কিছু কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ করে, যেমন অপরাধ প্রতিরোধ, জননিরাপত্তা রক্ষা এবং সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা।

রাষ্ট্র পরিচালনায় নাগরিকের ভূমিকা: গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ রাষ্ট্র পরিচালনার মূল ভিত্তি হলো জনগণের অংশগ্রহণ। নাগরিকরা ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিনিধিদের নির্বাচন করে এবং এর মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। এই কারণে গণতন্ত্রকে "জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য এবং জনগণের শাসন" হিসেবে বর্ণনা করা হয়।

নাগরিকত্ব অর্জন ও বিলোপ:

(ক) নাগরিকত্ব অর্জনের পদ্ধতি: প্রত্যেক দেশের নিজস্ব আইন, নীতি ও মানদণ্ড রয়েছে যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তিকে নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সাধারণত নাগরিকত্ব জন্মের মাধ্যমে অর্জিত হয়, তবে অনেক ক্ষেত্রে আবেদন বা আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়।

জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব (Jus Sanguinis): জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব বা Jus Sanguinis অর্থ "রক্তের অধিকার" নীতিতে যদি কোনো ব্যক্তির পিতা বা মাতা কোনো রাষ্ট্রের নাগরিক হন, তবে সেই ব্যক্তিও সেই রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়ার অধিকার পেতে পারে। নাগরিকত্ব এখানে জন্মগত পরিচয় ও পারিবারিক ধারাবাহিকতার সাথে গভীরভাবে যুক্ত। এই ধরনের নাগরিকত্ব ইউরোপের জাতি-রাষ্ট্র ধারণার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। যেমন জার্মানি, ইতালি এবং আয়ারল্যান্ড–এ পিতামাতার নাগরিকত্বের ভিত্তিতে সন্তান নাগরিকত্ব লাভ করতে পারে, এমনকি সে বিদেশে জন্মগ্রহণ করলেও।

জন্মস্থান সূত্রে নাগরিকত্ব (Jus Soli): জন্মস্থান সূত্রে নাগরিকত্ব বা Jus Soli অর্থ "ভূমির অধিকার" নীতিতে কোনো ব্যক্তি যে দেশে জন্মগ্রহণ করে, সেই দেশের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি পেতে পারে। এই ধারণার উৎপত্তি ইংল্যান্ডে এবং পরবর্তীতে এটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিস্তার লাভ করে।এই বক্তব্যের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, কোনো রাষ্ট্রের ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তি জন্মের মাধ্যমেই সেই রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আমেরিকার অনেক দেশে এই নীতি প্রচলিত। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা–তে জন্মগ্রহণকারী অধিকাংশ শিশু স্বয়ংক্রিয়ভাবে নাগরিকত্ব লাভ করে।

বিবাহসূত্রে নাগরিকত্ব (Jus Matrimonii): অনেক রাষ্ট্রে নাগরিককে বিবাহ করার মাধ্যমে বিদেশী ব্যক্তি নাগরিকত্ব লাভের সুযোগ পায়। এই নীতিকে Jus Matrimonii বলা হয়। বিবাহের মাধ্যমে বিদেশি ব্যক্তির নাগরিকত্ব পাওয়ার প্রক্রিয়া অনেক সময় সহজ করা হয়। যেমন যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ভারত এবং জার্মানি–তে বিদেশী ব্যক্তি যদি নাগরিককে বিবাহ করে এবং কিছু সময় সেখানে বসবাস করে, তবে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারে।

রাষ্ট্র প্রদত্ত নাগরিকত্ব বা স্বাভাবিকীকরণ (Naturalization): কোনো বিদেশী ব্যক্তি যদি একটি দেশে আইনানুগভাবে প্রবেশ করে এবং দীর্ঘ সময় সেখানে বসবাস করে, তবে রাষ্ট্র তাকে নাগরিকত্ব প্রদান করতে পারে। এই ক্ষেত্রে সাধারণত নাগরিকত্ব প্রদানের আগে কিছু নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করতে হয়। শর্ত পূরণ করার মাধ্যমে একজন বিদেশি ব্যক্তি ধীরে ধীরে সেই দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক সম্প্রদায়ের পূর্ণ সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতে Citizenship Act, 1955 অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় বসবাসের পর বিদেশী ব্যক্তি নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারে।

বিনিয়োগের মাধ্যমে নাগরিকত্ব (Citizenship by Investment): কিছু রাষ্ট্রে বিনিয়োগের মাধ্যমে নাগরিকত্ব পাওয়ার সুযোগ রয়েছে, যাকে Economic Citizenship বলা হয়। এই ক্ষেত্রে ধনী ব্যক্তিরা সম্পত্তি ক্রয়, ব্যবসায় বিনিয়োগ বা সরকারকে অর্থ প্রদান করে নাগরিকত্ব অর্জন করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মাল্টা, সেন্ট কিটস ও নেভিস এবং সাইপ্রাস–এ বিনিয়োগের মাধ্যমে নাগরিকত্ব পাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

(খ) নাগরিকত্ব বিলোপ: নাগরিকত্ব বিলোপ বলতে বোঝায় কোনো ব্যক্তি তার নাগরিকত্বের আইনি মর্যাদা হারানো। এটি সাধারণত তিনটি প্রধান উপায়ে ঘটে— স্বেচ্ছায় ত্যাগ (Renunciation), আইনগত সমাপ্তি (Termination) এবং সরকার কর্তৃক বাতিল (Deprivation)। স্বেচ্ছায় ত্যাগের ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজ ইচ্ছায় অন্য দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে নিজের নাগরিকত্ব ত্যাগ করতে পারে। আইনগত সমাপ্তি ঘটে যখন কোনো ব্যক্তি বিদেশি নাগরিকত্ব গ্রহণ করলে তার পূর্বের নাগরিকত্ব স্বয়ংক্রিয়ভাবে শেষ হয়ে যায়। অপরদিকে, রাষ্ট্র যদি মনে করে যে কোনো ব্যক্তি প্রতারণা, অসত্য তথ্য প্রদান বা রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের মাধ্যমে নাগরিকত্ব অর্জন করেছে, তবে সরকার তার নাগরিকত্ব বাতিল করতে পারে। তবে আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নাগরিকত্ব বিলোপের ক্ষেত্রে মানবাধিকার ও ন্যায়বিচারের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি একজন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রহীন (stateless) করে তুলতে পারে। তাই আন্তর্জাতিক আইনে নাগরিকত্ব বিলোপের ক্ষেত্রে সতর্কতা ও সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে।

সমকালীন বাস্তবতার প্রেক্ষিতে নাগরিকত্বের ধারণা:

সমকালীন বিশ্বে নাগরিকত্বের ধারণা আরও বিস্তৃত হয়েছে। গণতন্ত্রের প্রসারের ফলে নাগরিকদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং অধিকার সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ নাগরিকত্ব শুধু রাষ্ট্রের সদস্য হওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি সামাজিক ন্যায়, মানবাধিকার এবং সমতার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। বিশ্বায়নের যুগে নাগরিকত্বের ধারণা নতুন সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে। অভিবাসন, বহুসাংস্কৃতিক সমাজ এবং বৈশ্বিক নাগরিকত্বের ধারণা নাগরিকত্বের প্রচলিত সীমাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে (Kymlicka, 1995)। একই সঙ্গে ডিজিটাল প্রযুক্তির বিকাশ নাগরিকদের নতুন ধরনের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করেছে, যা "ডিজিটাল নাগরিকত্ব" ধারণাকে গুরুত্ব দিয়েছে। বিশ্বায়ন, আন্তর্জাতিক অভিবাসন, বহুসাংস্কৃতিক সমাজ এবং মানবাধিকার আন্দোলনের ফলে নাগরিকত্বের প্রচলিত ধারণা নতুন সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে। অনেক দেশে এখন দ্বৈত নাগরিকত্ব, আঞ্চলিক নাগরিকত্ব (যেমন ইউরোপীয় ইউনিয়নের নাগরিকত্ব) এবং গ্লোবাল নাগরিকত্বের মতো নতুন ধারণা গুরুত্ব পাচ্ছে (Heater, 2004)। এছাড়া বর্তমান সময়ে নাগরিকত্বের সঙ্গে সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, লিঙ্গসমতা এবং সংখ্যালঘু অধিকারের বিষয়গুলোও যুক্ত হয়েছে। ফলে নাগরিকত্ব আর শুধু আইনি মর্যাদা নয়; এটি সামাজিক ন্যায়, সমতা এবং গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

(ক) বিশ্ব নাগরিকত্ব: গ্লোবাল সিটিজেনশিপ বা বিশ্ব নাগরিকত্ব এমন একটি ধারণা যেখানে একজন ব্যক্তি নিজেকে কেবল একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে নয়, বরং সমগ্র বিশ্বের নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করে। এই ধারণা মানবতা, সমতা, মানবাধিকার এবং বৈশ্বিক দায়িত্ববোধের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। গ্লোবাল সিটিজেনশিপের মূল বক্তব্য হলো পৃথিবীর মানুষ একে অপরের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্কিত এবং বৈশ্বিক সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য সকলের সম্মিলিত দায়িত্ব রয়েছে।

গ্লোবাল সিটিজেনশিপের ধারণার সূত্রপাত প্রাচীন গ্রিক দর্শনে খুঁজে পাওয়া যায়। গ্রিক দার্শনিক Diogenes নিজেকে "Cosmopolitan" বা বিশ্বের নাগরিক বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে মানুষের পরিচয় কেবল একটি নগররাষ্ট্র বা দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সমগ্র মানবসমাজের

সঙ্গে যুক্ত (Heater, 2004)। আধুনিক যুগে বিশ্বায়ন (Globalization), প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বৃদ্ধির ফলে গ্লোবাল সিটিজেনশিপ ধারণা নতুন মাত্রা লাভ করেছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, যোগাযোগ প্রযুক্তি, পরিবহন ব্যবস্থা এবং তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশের কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়েছে। ফলে জলবায়ু পরিবর্তন, মানবাধিকার, পরিবেশ সংরক্ষণ, দারিদ্র্য এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার মতো সমস্যাগুলো কেবল একটি রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; এগুলো বৈশ্বিক সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়।

সমসাময়িক রাজনৈতিক ও নৈতিক চিন্তায় Martha Nussbaum গ্লোবাল নাগরিকত্বের ধারণাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি মনে করেন যে শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে এমনভাবে গড়ে তোলা উচিত যাতে তারা নিজেকে কেবল জাতীয় নাগরিক হিসেবে নয়, বরং বিশ্ব নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করে এবং সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে কাজ করে (Nussbaum, 1997)। একইভাবে ডেভিড হেল্ড (David Held) বৈশ্বিক গণতন্ত্র (Global Democracy) এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে গ্লোবাল নাগরিকত্বের ধারণাকে শক্তিশালী করার কথা উল্লেখ করেছেন (Held, 2010)। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে গ্লোবাল সিটিজেনশিপ ধারণা কিছু সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন। বর্তমান আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় নাগরিকত্ব মূলত রাষ্ট্রভিত্তিক একটি আইনগত মর্যাদা। একজন ব্যক্তি সাধারণত একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে অধিকার ও সুরক্ষা লাভ করে। ফলে গ্লোবাল নাগরিকত্ব এখনও আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত নয়; এটি মূলত একটি নৈতিক ও আদর্শিক ধারণা।

(খ) সমকালীন বিশ্বে নাগরিকত্বের প্রধান সমস্যা: সমকালীন বিশ্বে নাগরিকত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামাজিক ধারণা হলেও বিভিন্ন দেশে এটি নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। বিশ্বায়ন, অভিবাসন, জাতিগত বৈষম্য এবং রাজনৈতিক মেরুকরণের কারণে নাগরিকত্বের প্রচলিত ধারণা নতুন প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়েছে।

ভারতের প্রেক্ষাপটে নাগরিকত্বের প্রশ্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। বিশেষত নাগরিকত্ব আইন এবং এর সংশোধনকে কেন্দ্র করে নাগরিকত্বের অন্তর্ভুক্তি ও বর্জনের প্রশ্ন সামনে এসেছে। ভারতের সংবিধান নাগরিকদের সমান অধিকার প্রদান করলেও বাস্তবে অনেক সময় জাতি, ধর্ম বা অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে নাগরিকত্বের পূর্ণ সুবিধা সকলের কাছে পৌঁছায় না (Basu, 2024)। উদাহরণস্বরূপ, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (CAA) নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক দেখা যায়, যা নাগরিকত্বের ধর্মভিত্তিক প্রশ্নকে সামনে নিয়ে আসে। ভারতের প্রেক্ষাপটে নাগরিকত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমকালীন সমস্যা হলো নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (CAA), ২০১৯। এই আইনের মাধ্যমে পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে আগত হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পারসি ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী অভিবাসীদের জন্য নাগরিকত্ব পাওয়ার পথ সহজ করা হয়েছে। তবে মুসলিম সম্প্রদায়কে এই আইনের বাইরে রাখায় অনেক সমালোচনা ও বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। সমালোচকদের মতে এটি ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমতার নীতির সঙ্গে সংঘাত তৈরি করতে পারে (Basu, 2024)। ফলে ভারতে নাগরিকত্ব প্রশ্নটি রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU) ক্ষেত্রে নাগরিকত্ব একটি নতুন মাত্রা পেয়েছে। এখানে জাতীয় নাগরিকত্বের পাশাপাশি ইউরোপীয় নাগরিকত্বের ধারণা রয়েছে, যা সদস্য রাষ্ট্রগুলোর নাগরিকদের অন্য সদস্য দেশে বসবাস ও কাজ করার অধিকার দেয়। তবে অভিবাসন ও শরণার্থী সংকটের কারণে অনেক দেশে নাগরিকত্ব ও সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে (Heater, 2004)। ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU) ক্ষেত্রে নাগরিকত্ব একটি বিশেষ রূপ ধারণ করেছে। ১৯৯২ সালের Maastricht Treaty-এর মাধ্যমে ইউরোপীয় নাগরিকত্বের ধারণা চালু হয়, যার ফলে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর নাগরিকরা অন্য সদস্য দেশে বসবাস, কাজ এবং চলাচলের

অধিকার পায়। তবে অভিবাসন সংকট, শরণার্থী সমস্যা এবং Brexit-এর মতো ঘটনাগুলো EU নাগরিকত্বের সীমা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন বিতর্ক সৃষ্টি করেছে (Heater, 2004)।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে নাগরিকত্ব ও অভিবাসন সমস্যা সমকালীন রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশেষ করে অবৈধ অভিবাসন এবং সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিতর্ক চলছে। অনেক সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন অবৈধভাবে প্রবেশ করা অভিবাসীদের গ্রেফতার (arrest) করে এবং আইন অনুযায়ী তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠায়, যাকে deportation বলা হয়। বিশেষত যুক্তরাষ্ট্র–মেক্সিকো সীমান্তে এই ধরনের ঘটনা বেশি দেখা যায়। সমালোচকদের মতে, এই নীতি মানবাধিকার ও অভিবাসীদের সুরক্ষার প্রশ্ন উত্থাপন করে (Aleinikoff & Klusmeyer, 2001)।

মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশে নাগরিকত্ব একটি সীমিত ধারণা হিসেবে বিদ্যমান। এখানে বিপুল সংখ্যক বিদেশি শ্রমিক বহু বছর ধরে বসবাস ও কাজ করলেও তারা সহজে নাগরিকত্ব লাভ করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, সৌদি আরব, কাতার বা সংযুক্ত আরব আমিরাতে লক্ষ লক্ষ অভিবাসী শ্রমিক কাজ করে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই নাগরিকত্বের অধিকার পায় না। ফলে তারা রাজনৈতিক অধিকার ও সামাজিক সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকে (Heater, 2004)।

ইসরায়েলের নাগরিকত্ব নীতিতে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। ১৯৫০ সালের Law of Return অনুযায়ী বিশ্বের যেকোনো স্থানে বসবাসকারী ইহুদি জনগোষ্ঠী ইসরায়েলে এসে নাগরিকত্ব লাভ করার অধিকার রাখে। এই আইনের মাধ্যমে ইসরায়েল মূলত ইহুদি জাতির জন্য একটি জাতীয় আবাসভূমি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তবে সমালোচকদের মতে, এই নীতি কখনও কখনও অ-ইহুদি জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে নাগরিকত্ব ও সমতার প্রশ্ন নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করে (Shapira, 2012)।

মিয়ানমারে নাগরিকত্বের একটি বড় সমস্যা হলো রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠীর নাগরিকত্ব সংকট। ১৯৮২ সালের মিয়ানমার নাগরিকত্ব আইন (Myanmar Citizenship Law) অনুযায়ী রোহিঙ্গাদের দেশের স্বীকৃত জাতিগোষ্ঠীর তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। ফলে তারা নাগরিকত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে এবং অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রহীন (stateless) হিসেবে বিবেচিত হয়। এর ফলে রোহিঙ্গারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চলাচল এবং রাজনৈতিক অধিকারের মতো মৌলিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকে। এই পরিস্থিতির কারণে বহু রোহিঙ্গা মিয়ানমার ছেড়ে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। আন্তর্জাতিক মহলে এই ঘটনাকে মানবাধিকার সংকট হিসেবে দেখা হয় (Human Rights Watch, 2020)।

উপসংহার:

নাগরিকত্বের ধারণা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত ও বিকশিত হয়েছে। প্রাচীন রাজনৈতিক চিন্তা থেকে শুরু করে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পর্যন্ত নাগরিকত্ব ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাত্ত্বিকভাবে নাগরিকত্ব অধিকার, দায়িত্ব এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠলেও সমকালীন বাস্তবতায় এটি সামাজিক ন্যায়, মানবাধিকার এবং অন্তর্ভুক্তির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। তাই একটি কার্যকর গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তুলতে নাগরিকত্বের ধারণা ও চর্চা উভয়ই অত্যন্ত। উইল কিমলিকা (Will Kymlicka), এর মতে "রাজনৈতিক চিন্তাবিদদের মধ্যে নাগরিকত্বের ধারণাটি একসময় গুরুত্ব হারিয়েছিল। নাগরিকত্ব আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ ধারণা, যা ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে আইনগত, রাজনৈতিক এবং সামাজিক সম্পর্ককে নির্ধারণ করে। তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে নাগরিকত্বের ধারণা প্রাচীন গ্রিক ও রোমান যুগ থেকেই বিকশিত হয়েছে। এরিস্টটল নাগরিকত্বকে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সঙ্গে

যুক্ত করেছিলেন, আর আধুনিক যুগে টি. এইচ. মার্শাল নাগরিকত্বকে নাগরিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের সমষ্টি হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন (Marshall, 1950)। এই তাত্ত্বিক আলোচনাগুলো নাগরিকত্বকে একটি বহুমাত্রিক ধারণা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে, যেখানে অধিকার, কর্তব্য এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তবে সমকালীন বিশ্বে নাগরিকত্বের ধারণা নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছে। বিশ্বায়ন, আন্তর্জাতিক অভিবাসন, বহুসাংস্কৃতিক সমাজ এবং মানবাধিকারের প্রশ্ন নাগরিকত্বের প্রচলিত ধারণাকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের ক্ষেত্রে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (CAA) নাগরিকত্বের অন্তর্ভুক্তি ও সমতার প্রশ্ন নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নে আঞ্চলিক নাগরিকত্বের ধারণা নতুন মাত্রা যোগ করেছে, আবার যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন ও deportation সমস্যা নাগরিকত্বের জটিলতা তুলে ধরেছে। একইভাবে মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব সংকট এবং ইসরায়েলের Law of Return-এর মতো নীতি নাগরিকত্বের প্রশ্নকে আন্তর্জাতিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছে।

এই প্রেক্ষাপটে নাগরিকত্ব আর শুধু একটি আইনি মর্যাদা নয়; এটি সামাজিক ন্যায়, সমতা, মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। তাই সমকালীন বিশ্বে নাগরিকত্বের ধারণাকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানবিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। একটি গণতান্ত্রিক ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্য নাগরিকদের সচেতন অংশগ্রহণ, অধিকার ও কর্তব্যের ভারসাম্য এবং সামাজিক সমতার নীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্যসূত্র:

১. ভট্টাচার্য, এন. সি., ও চক্রবর্তী, এস। (১৯৬১)। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান (তৃতীয় সংস্করণ)। ভারত।

২. চক্রবর্তী, শিবনাথ। (১৯৬৪)। রাষ্ট্রতত্ত্ব (Political Theory)। কলকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড।

৩. চক্রবর্তী, সত্যসাধন, ও প্রামাণিক, নির্মল কুমার। (১৯৬৫)। রাষ্ট্রবিজ্ঞান। কলকাতা: গ্রন্থি প্রকাশনী।

৪. Aleinikoff, T. A., & Klusmeyer, D. (2001). Citizenship policies for an age of migration. Carnegie Endowment for International Peace.

৫. Aristotle. (1984). The politics (B. Jowett, Trans.). Oxford University Press.

৬. Bellamy, R. (2008). Citizenship: A very short introduction. Oxford University Press.

৭. Brubaker, R. (1992). Citizenship and nationhood in France and Germany. Harvard University Press.

৮. Cheesman, N. (2017). How in Myanmar "national races" came to surpass citizenship and exclude Rohingya. Journal of Contemporary Asia, 47(3), 461–483.

৯. Government of India. (1955). The Citizenship Act, 1955. Government of India.

১০. Hall, S., & Held, D. (1989). Citizens and citizenship. In S. Hall & M. Jacques (Eds.), New times: The changing face of politics in the 1990s (pp. 173–188). Lawrence & Wishart.

১১. Heater, D. (2004). A brief history of citizenship. Edinburgh University Press.

১২. Heater, D. (2013). What is citizenship? John Wiley & Sons.

১৩. Held, D. (2000). Citizenship and autonomy. In Political theory and the modern state. Polity Press.

১৪. Held, D. (2006). Models of democracy (3rd ed.). Polity Press.

১৫. Held, D. (2010). Cosmopolitanism: Ideals and realities. Polity Press.

১৬. Isin, E. F., & Nyers, P. (2014). Introduction: Globalizing citizenship studies. In Routledge handbook of global citizenship studies (pp. 1–12). Routledge.

১৭. Jayal, N. G. (2014). Indian citizenship: A century of disagreement. In Routledge handbook of global citizenship studies. Routledge.

১৮. Kymlicka, W. (1995). Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights. Oxford University Press.

১৯. Locke, J. (1988). Two treatises of government. Cambridge University Press. (Original work published 1690).

২০. Mahajan, G. (2002). The multicultural path: Issues of diversity and discrimination in democracy. Sage Publications.

২১. Marshall, T. H. (1950). Citizenship and social class. Cambridge University Press.

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 830-839
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.295

সমাজবাস্তবতার নিরিখে নির্বাচিত অসমীয়া গল্পকার ও গল্প: একটি বিশ্লেষণাত্মক পাঠ

ড. টিটন রুদ্র পাল, *সহকারী অধ্যাপক, বিভাগীয় প্রধান, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় সরকারি আদর্শ মহাবিদ্যালয়, অসম, ভারত*

Received: 25.03.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Although folktale-based narratives had been prevalent in Assam since ancient times, the true development of the Assamese short story began in the second decade of the twentieth century. From this period onward, Assamese short stories moved beyond mere narrative tradition and emerged in entirely new forms. In the early phase, as in other Indian literatures, literary activities in Assam developed around contemporary journals and periodicals. Most Assamese writers of that time began their literary careers by writing short stories in these publications.

In their stories, along with the depiction of various psychological conflicts within individuals, writers also portrayed contemporary social issues such as political instability, communal tensions, livelihood crises, frustration, and the struggle for survival with a strong sense of realism. The primary aim of this article is to present an outline of such contemporary social realities as reflected in Assamese short stories.

Considering the limitations of scope, this discussion remains concise. As a result, it has not been possible to include all Assamese short story writers in this article; instead, only selected writers and their works have been discussed. At the same time, Bengali translations of Assamese stories have been used as the primary source for this study. In this regard, the book titled *"Asamiya Galpa Sankalan"*, edited by Nirmalprabha Bordoloi and translated into Bengali by Sujit Chowdhury, has been used as the main source material for this research article. The present discussion follows a descriptive analytical method.

Keywords: Assamese writers, Assamese short story, reflect, social realities

সাহিত্যের অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন শাখাটির নাম হল ছোটোগল্প। আধুনিককালে ভারতীয় ছোটোগল্প বিশেষত বাংলা, অসমীয়া এবং হিন্দি সাহিত্যের গল্প পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবেই বিকাশ লাভ করেছিল। ধীরে ধীরে সে প্রভাব কাটিয়ে উঠে ভারতীয় গল্প সাহিত্য এক বিশেষ মাত্রা লাভ করেছে। আর এক্ষেত্রে অসমীয়া সাহিত্যের ছোটোগল্পও ব্যতিক্রম নয়। ঊনিশ শতকের শেষ দিকে বাংলায় রবীন্দ্রনাথ, হিন্দিতে কিশোরীলাল গোস্বামী এবং প্রেমচাঁদের হাত ধরেই এই দুই ভাষার ছোটোগল্পের যাত্রারম্ভ হয় নানা পত্র-পত্রিকাকে অবলম্বন করে। অসমীয়া ছোটোগল্পের জন্ম এবং বিকাশও সমকালীন অসমীয়া পত্র-পত্রিকাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। ১৮৯২ সালে 'জোনাকী' পত্রিকার চতুর্থ ভাগের চতুর্থ সংখ্যায় লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার 'সেঁউতী' গল্প প্রকাশের মধ্যদিয়ে অসমীয়া গল্প রচনার যাত্রা শুরু হয়। যদিও এর বহু আগে থেকেই আসামে লোককাহিনির আকারে

নানা গল্পের ধারা প্রচলিত ছিল। কিন্তু প্রকৃত অর্থে ছোটোগল্পের বিকাশ শুরু হয় বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে। এই সময় থেকেই অসমীয়া ছোটোগল্প শুধুমাত্র কাহিনি বর্ণনার পরম্পরা ছেড়ে সম্পূর্ণ নতুন ভঙ্গিতে প্রকাশ লাভ করে।

প্রথম দিকে ভারতের অন্যান্য ভাষার সাহিত্যের মতোই আসামের সাহিত্যচর্চাও সমকালীন নানা পত্র-পত্রিকাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। তাই অসমীয়া গল্প আলোচনার পূর্বে সমকালীন পত্র-পত্রিকার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন। অসমীয়া সাহিত্যের অগ্রগতিতে যে তিনটি পত্রিকার অবদান সবচেয়ে বেশি বলে উল্লেখ করা হয় সেগুলি হল, 'জোনাকী', 'আবাহন'এবং 'রামধেনু'। এইসব পত্র-পত্রিকায় তৎকালীন প্রায় সব অসমীয়া সাহিত্যিকরাই সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে হাতে খড়ি দিয়েছিলেন। সাহিত্যিক লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া, শরৎ চন্দ্র গোস্বামী, সূর্যকুমার ভূঁইয়া, দণ্ডীনাথ কলিতা, লক্ষ্মীধর শর্মা, রমা দাশ, সৈয়দ আব্দুল মালিক, নগেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী, ত্রৈলোক্য নাথ গোস্বামী, হেম বরুয়া, হলীরাম ডেকা, নকুল চন্দ্র ভূঁইয়া, মহীচন্দ্র বরা, বীণা বরুয়া, দীননাথ শর্মা, উমা শর্মা, সুপ্রভা গোস্বামী, প্রেম নারায়ণ দত্ত, মুনীন বরকটকী, বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য, মহিম বরা, যোগেশ দাস, সৌরভ কুমার সলিহার, হোমেন বরগোহাঞি, নগেন শইকীয়া, শীলভদ্র, মামণি রয়সম গোস্বামী, অপূর্ব শর্মা, প্রণবজ্যোতি ডেকা, হরেকৃষ্ণ ডেকা, ফণীন্দ্র কুমার দেবচৌধুরী, দেবব্রত দাস, অরূপা পটংগীয়া কলিতা, মনোজ কুমার গোস্বামী, বিপুল খাটনিয়া, ভূপেন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য, জ্যোতিষ শিকদার, অরুণ গোস্বামী, মদন শর্মা, মৌসুমী কন্দলি, প্রশান্ত কুমার দাস, বিতোপন বরবরা, অনামিকা বরা, চন্দনা পাঠক, অপু ভরদ্বাজ, সোমনাথ বরাই, মৃণাল কলিতা, সপোনজ্যোতি বরঠাকুর, মণিকুন্তলা ভট্টাচার্য, গীতালি বরা, মণিকা দেবী, রশ্মিরেখা ভূঞা, সুরঞ্জনা শর্মা, বন্তি শেনচোবা, মৃত্যুঞ্জয় মহন্ত, অরূপ কুমার নাথ, সঞ্জীব পল ডেকা, সিদ্ধার্থ শঙ্কর বেজবরুয়া, প্রার্থনা শইকীয়া, মনালিসা শইকিয়া, অতনু ভট্টাচার্য প্রমুখ গল্পকার গল্প রচনা করে অসমীয়া গল্প সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের গল্পে মানুষের মনের বিভিন্ন দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পাশাপাশি নানা রাজনৈতিক অস্থিরতা, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, জীবিকা-সমস্যা, হতাশা, টিকে থাকার লড়াই ইত্যাদি সামাজিক সমস্যার কথাও বাস্তবতার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। অসমীয়াগল্পে প্রতিফলিত এইসব সমকালীন সমাজ চিত্রের একটি রূপরেখা তুলে ধরাই আলোচ্য নিবন্ধের মূল লক্ষ্য। পরিসর বিস্তারের কথা মাথায় রেখে আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনায় ব্রতী হয়েছি। ফলে অসমীয়া সাহিত্যের সব গল্পকারদের গল্প এই নিবন্ধে তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। নির্বাচিত কয়েকজন গল্পকার ও তাঁদের গল্পই আলোচ্য নিবন্ধে স্থান দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে আমরা অসমীয়া গল্পের বাংলা অনুবাদকেই এই নিবন্ধ রচনার প্রাথমিক উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছি। এক্ষেত্রে নির্মলপ্রভা বরদলৈ সম্পাদিত এবং সুজিৎ চৌধুরীকৃত বাংলায় অনুদিত "অসমীয়া গল্প সঙ্কলন" শীর্ষক গ্রন্থ এই গবেষণা নিবন্ধের প্রাথমিক উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। বক্ষ্যমাণ আলোচনায় সাধারণ বর্ণনাধর্মী বিশ্লেষণ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে।

সাহিত্য দেশ, কাল ও সমাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। ফলে বহু বিচিত্র সামাজিক পরিস্থিতি, রাজনৈতিক কার্যকলাপ, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, স্বাধীনতালাভ ও স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের নানা সমস্যা ও ঘটনা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো অনেক গল্পেরই মূল বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। আমাদের চারপাশের প্রতিনিয়ত ঘটে চলা নানা সামাজিক ঘটনাসমূহ বহু গল্প রচনার মূল প্রেরণা হিসাবে লেখকদের মনের ভিতরে কাজ করে যায়। আর এই চিরপরিচিত সমাজের নানা ঘটনা তথা সমস্যার কথা নিয়ে গল্প রচনা করেছেন আসামের অনেক গল্পকার। আসামের স্বনামধন্য লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়াই অসমীয়া সাহিত্যে ছোটোগল্পের প্রথম রূপকার হিসাবে প্রসিদ্ধ।[১] তাঁর জন্ম ১৪ই অক্টোবর ১৮৬৪ সালে আসামের শিবসাগর অঞ্চলে, মৃত্যু ১৯৩৮ সালের ২৬ মার্চ। তিনি শিবসাগর থেকে বিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক

ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তীকালে সাহিত্যসেবায় ব্রতী হন। তাঁর সাহিত্য সাধনার দিকে লক্ষ করে অনেকেই তাঁকে অসমীয়া সাহিত্যের রোমান্টিক ভাবধারার প্রথম পথপ্রদর্শক হিসাবে চিহ্নিত করে থাকেন। তিনি 'জোনাকি' ও 'বাহী' নামক সাহিত্য পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। আসামের জাতীয় সংগীত হিসাবে পরিচিত 'অ মোর আপনার দেশ' সংগীতটি তাঁর সুদক্ষ লেখনীর নিদর্শন। তাঁর চরিত্র গ্রন্থরাজির মধ্যে 'জোনবিবি', 'সুরভি', 'কদমকলী', 'পদুম কুঁয়রী', 'বরবরুয়ার কাকতর টোপলা', 'বরবরুয়ার ওভতনি', 'বরবরুয়ার ভাবর বুরবুরানি', 'কামর কৃতিত্ব লাভের সঙ্কেত', 'লিটিকাই', 'পাচনি', 'সাধুকথার কুফি', 'জয়মতী কুঁয়রী', 'চক্রধ্বজ সিংহ', 'চেলিমার', 'কাকা দেউতা নাতিলরা', 'ভাঙ্গীয়া দীননাথ', 'বেজবরুয়ার জীবনচরিত', 'শঙ্করদেব', 'ভগবৎ কথা', 'তত্ত্বকথা', 'শ্রীকৃষ্ণকথা', 'মোর জীবনের সোয়রঁণ' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও তিনি একাধারে কবিতা,ছোটোগল্প, উপন্যাস, নাটক, রঙ্গ-ব্যঙ্গমূলক প্রবন্ধ রচনা করে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। হাস্যরসের অসাধারণ কিছু প্রবন্ধ রচনা করে তিনি জনসাধারণের কাছে 'রসরাজ' নামে খ্যাত হন। তবে ছোটোগল্প রচনায় তাঁর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় সবচেয়ে বেশি। তাঁকে অসমীয়া গল্প সাহিত্যের ভগীরথও বলা হয়। লেখক লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া অসমীয়া ছোটোগল্প সাহিত্যে যে নতুন ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসেন তা আজও শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত। তাঁর গল্পের কাহিনি বয়নে অবলীলাক্রমেই চলে আসে আমাদের আশেপাশের সামাজিক নানা প্রতিচ্ছবি। তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য গল্পের নাম হল 'জলকন্যা'। আলোচ্য গল্পটি পরিসরে ছোটো হলেও এর কাহিনি বয়নে নিহিত আছে আমাদের সমাজের গভীর এবং নির্মম সত্য কথাটি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের অনেক ক্ষেত্রেই যে অবদমিত করে রাখা হয়, অন্তঃপুরের চারদেওয়ালের মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ করে রাখা হয় সে কথাই এই গল্পে উঠে এসেছে। আলোচ্য গল্পে আমরা দেখি প্রকৃতিপ্রেমী বাঁধনহারা নাম নাজানা মেয়েটি যখন বুঝতে পারে যে তাকে বিয়ে দেওয়া হবে, তখন থেকেই সে যেন জড়সড় হয়ে পড়ে। কারণ সে ছিল বনের সেই পাখিটির মতো বাঁধন ছাড়া, একেবারেই মুক্ত।বিবাহের প্রতি তার মনে একপ্রকার ভীতি কাজ করে। কারণ সে হয়তো আশেপাশের সামাজিক পরিবেশে দেখতে পেয়েছে যে বিয়ের পর মেয়েদের অপ্রত্যাশিতগৃহবন্দি জীবন। সমাজে প্রচলিত এই অসম ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করারও তার সাধ্য নেই। তাই একপ্রকার অসহায়ের মতোই আত্মসমর্পণ স্বরূপ আলোচ্য গল্পের শেষে সে তার ভাবী বরকে বলে,

"আমি ময়না পাখী, খাঁচায় ঢুকিয়ে রাখবে, নিয়ে চলো।"[২]

আসলে মানবসভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে আদিম যুগে কোনো পরিবার ছিল না। মানুষের তখন প্রধান লক্ষ্য ছিল খাদ্য সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করা। আর এক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষ উভয়ে মিলে মিশেই খাদ্য সংগ্রহ করতো। ফলে সেখানে নারী এবং পুরুষের মধ্যে কেউ আলাদা করে বিশেষ মূল্য পেতো না। পুরুষের সঙ্গে নারীরা খাদ্য সংগ্রহের পাশাপাশি সন্তানও প্রতিপালন করতো। ফলে তখন নারীদের কাজ এবং দায়দায়িত্ব অনেকটাই বেশি ছিল।কিন্তু ধীরে ধীরে পরিবারের উদ্ভব হল। আর এই পরিবার থেকেই পিতৃতন্ত্রের উদ্ভব হয়। তখন থেকেই নারীদের গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়া হয়। নারীরা হয়ে পড়ল পুরুষের অধীনস্থ। বর্তমান সময়ের তুলনায় আদিম সমাজে নারীদের স্থান যে উপরে ছিল এপ্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমালোচক বলেছেন,

> "আদিম মানব সমাজে কোন পরিবার ছিল না। অরণ্যবাসী মানুষ অরণ্য সম্পদের উপর নির্ভর করে জীবনযাপন করতো। পুরুষ শিকার করতো আর নারীরা আহরণ করতো ফলমূল। নারীদের অপর কাজ সন্তান ধারণ ও সন্তান জন্মদান ও প্রতিপালন। তাই নারীরা ছিল একদিকে প্রতিপালিকা অন্যদিকে জীবনদাত্রী। তাই আদিম সমাজে নারীর স্থান ছিল উচ্চে।"[৩]

কিন্তু ধীরে ধীরে সমাজে নারীদের উপর নানা বিধি-নিষেধ আরোপ করে তাদের গণ্ডিবদ্ধ করে রাখা হল। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে অনেকক্ষেত্রে নারীদের যেভাবে পদদলিত করা হয় সে দিকটিকেই লেখক আলোচ্য গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন।

অসমীয়া ছোটোগল্পের জগতে একটি সুপরিচিত নাম হল সাহিত্যিক লক্ষ্মীধর শর্মা। ১৮৯৮ সালে আসামের তেজপুরের ভীর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ছোটোবেলা থেকেই তিনি ছিলেন মেধাবী। শিক্ষাজীবন শেষ করে তিনি জনসেবার পাশাপাশি সাহিত্য সেবায় মনোনিবেশ করেছিলেন। কিছু কবিতার পাশাপাশি তাঁর সাহিত্য নিদর্শনগুলির নাম হল, 'ব্যর্থতার দান', 'অনাগতের অভিশাপ', 'নির্মলা', 'দেশের কথা', 'নিষ্ঠা আরু জীবনস্মৃতি' ইত্যাদি গ্রন্থ। এই সাহিত্যসেবীর অকালপ্রয়াণ ঘটে ১৯৩৪ সালে। মুক্তিযুদ্ধের বিপ্লবী বীর লক্ষীধর শর্মা অহিংস মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে জনসাধারণের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁর রচিত অনেক গল্পে আমাদের চারপাশের মানুষের নানা দুঃখ, দুর্দশার কথা উঠে এসেছে। এধরনের বিষয় নিয়ে রচিত তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য গল্পের নাম হল 'সিরাজ'। এই গল্পে আমাদের সমাজের কয়েকটি দিক লক্ষ করা যায়। গল্পের অন্যতম চরিত্র সাবিত্রির মাজীবনের প্রথম দিকে তাঁর ভাইদের অনেক সেবা যত্ন করেছিল। কিন্তু সাবিত্রির বাবার মৃত্যুর পর তারা তাঁকে সাহায্য করেনি, বরং তাঁকে দেখে তারা একপ্রকার এড়িয়ে চলেছে। আসলে আমাদের সমাজে এখনো কোথাও কোথাও কন্যা সন্তানকে পরিবারের বোঝা হিসাবেই গণ্য করা হয়। আর এই মানসিকতারই বাস্তব দৃষ্টান্ত আলোচ্য গল্পে লক্ষ করা যায় এইভাবে,

> "সাবিত্রীর মা ভেবেছিল সুখের দিনে নিজের ভাইদের সে যত্নআত্যি করেছে, দুঃখের দিনে আজ তারা তাকে বুকে তুলে নেবে। কিন্তু বাস্তবে বিপরীতটাই ঘটল। গাঁয়ের সবাই তাঁকে দেখলেই সরে সরে থাকে।"[৪]

আসলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে কন্যা সন্তানকে অনেক ক্ষেত্রেই অবাঞ্ছিত অতিথি হিসেবে ধরা হয়। তাই কন্যা সন্তানের জন্ম অনেক মা-বাবার কাছেই আকস্মিক দুঃসংবাদ ছাড়া আর কিছু নয়। মানুষের মধ্যে এরূপ ধারণার জন্ম দিয়ে গেছে কিছু ধর্মীয় গ্রন্থ। ধর্মই সমাজকে প্রাচীনকাল থেকে কন্যা সম্পর্কে কতগুলি হীন মূল্যবোধ দ্বারা বীতস্পৃহ করে রেখেছে। আর পুত্রকে করেছে মানুষের কাছে পরম কাম্য। পুত্র কামনায় আমাদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ অথর্ব সংহিতায় বলা হয়েছে,

> "হে নারী, তুমি পুত্র সন্তান উৎপন্ন কর, সে উৎপন্ন পুত্রের পরও পুত্র উৎপন্ন কর। এরূপ অবিচ্ছেদে জাত পুত্রদের তুমি মাতা হও।"[৫]

কন্যার তুলনায় পুত্র সন্তান এতই কাঙ্ক্ষিত যে কোনো স্ত্রী যদি শুধু কন্যা সন্তান জন্ম দেয় তাহলে সেই অপরাধে তাকে ত্যাগ করা যায় এবং পুত্রের জন্য পুরুষ দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে। আর এর নির্দেশ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উল্লেখ আছে এইভাবে,

> "স্ত্রী যদি কেবল কন্যাই প্রসব করে, তবে স্বামী দ্বাদশ বৎসর প্রতীক্ষা ক'রে (পুত্র প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা ক'রে) দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারবে।"[৬]

আর ধর্ম গ্রন্থে উল্লিখিত এধরনের নানা নির্দেশ পরবর্তীকালে আমাদের সমাজের মানুষের মনে খারাপ প্রভাব ফেলেছে। কারণ কন্যা সন্তানের প্রতি অনাদরের বহু চিত্র প্রতিনিয়ত আমাদের সমাজে লক্ষ করা যায়। আলোচ্য গল্পে তারই প্রতিফলিত চিত্র দেখা যায়। তাছাড়া আমাদের সমাজে দুষ্ট ক্ষতের মতো বিরাজ করা জাতিভেদ প্রথার কথাও আলোচ্য গল্পে উঠে এসেছে। আলোচ্য গল্পের মুখ্য চরিত্র কন্দর্প তাদের বাড়িতে আশ্রিতা সাবিত্রীকে ভালোবেসে জীবন সঙ্গী করতে চেয়েছিল। কিন্তু কন্দর্পের মা বাবা সে সম্পর্ক মেনে নিতে নারাজ। কারণ তাঁদের মতে সাবিত্রীর মায়ের বংশ পরিচয় তথাকথিত নীচু স্তরের, তাছাড়া তারা কন্দর্পদের

বাড়িতে আশ্রিতা মাত্র। তাদের তথাকথিত সমাজের বংশ মর্যাদা দূরের থাক নিজেদের থাকার জায়গা পর্যন্ত নেই। তাই তাঁদের পরিবারের সঙ্গে সাবিত্রীদের মেলবন্ধন সম্ভব নয়। তাইতো কন্দর্পের বাবা বলেন, "ছোটলোকের সঙ্গে সংশ্রব রাখাটাই ভুল হয়েছিল।"[৭] শুধু তাই নয় গল্পের অগ্রগতিতে আমরা দেখতে পাই সমাজে নিন্দার ভয়ে সাবিত্রীর গর্ভের সন্তানকে বিষ পানে হত্যার চেষ্টাও করা হয়। কিন্তু সাবিত্রী সে যাত্রায় সেখান থেকে পালিয়ে প্রাণে বাঁচে। আশ্রয় পায় সমাজসেবী মুসলমান সিরাজের ঘরে। সেখানে সাবিত্রী এক কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়ে প্রাণ ত্যাগ করে। সিরাজ আদর করে তার নাম রাখলেন নূর। কিন্তু যেহেতু সে একজন হিন্দুর সন্তান তাই তার অন্য নাম রাখলেন সীতা। ঘটনাক্রমে পরবর্তীতে কন্দর্প তার সন্তান সীতার সঙ্গে পরিচয় ঘটে। ধীরে ধীরে কন্দর্পের তত্ত্বাবধানে সীতা বড়ো হয়ে পড়াশুনা সম্পূর্ণ করে। অবশেষে তার বিবাহের সম্বন্ধ আসে সমাজের তথাকথিত উঁচু শ্রেণির পাত্র ও তার ভালোবাসার মানুষ অনিলের। কিন্তু অনিল যখন জানল সীতার জন্ম হয়েছে গরীবের ঘরে এবং মুসলমানের ঘরে প্রতিপালিত হয়েছে তখন সে বেঁকে বসে। তার কথা থেকে বুঝা যায় এই বেঁকে বসার একটি কারণ হল জাতপাতের ভেদাভেদ। আর অন্য কারণ হল সীতা একজন পিতৃ পরিচয়হীনা কন্যা। আলোচ্য গল্পে এই দিকগুলি উঠে এসেছে অনিলের মুখদিয়ে এইভাবে,

> "যে মেয়ের জন্ম চাকরানীর গর্ভে, আর সে মানুষ হয়েছে মুসলমানের ঘরে, আমার ইচ্ছা থাকলেও তেমন মেয়েকে আমার মা-বাবা কোনোদিনই ঘরে তুলবেন না।"[৮]

সমাজের রক্ত চক্ষুর ভয়ে কীভাবে একটি সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় তা এই গল্পে বাস্তবতার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। এই গল্প সম্পর্কে সমালোচক বিরিঞ্চি কুমার বরুয়া তাঁর বিখ্যাত 'অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন,

> "'সিরাজে'-এ পাই—সীতা ও অনিলের মধ্যে যে প্রেমের ফুল ধীরে ধীরে ফুটে উঠেছিল, তা হঠাৎ ঝরে পড়ল, কারণ অনিল সমাজের চোখ রাঙানির ভয়ে ভীত। সমাজ-পতিরা খবর জোগাড় করেন যে সীতা বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর কন্যা নয়।"[৯]

নারীর বিড়ম্বনাময় জীবন-চিত্র অঙ্কিত হয়েছে লেখক ত্রৈলোক্য নাথ গোস্বামীর কিছু ছোটোগল্পে। আসামের এই স্বনামধন্য গল্পকারের জন্ম ১৯০৩ সালে আসামের নলবাড়িতে। পেশায় তিনি ছিলেন অধ্যক্ষ। আজীবন তিনি সাহিত্য সাধনায় ব্রতী ছিলেন। একাধারে তিনি বহু গল্প ও উপন্যাস লিখে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর ছোটোগল্প সংকলনগুলির নাম হল, 'অরুণা', 'মরীচিকা', 'শিল্পীর জন্ম'। তাঁর উল্লেখযোগ্য একটি ব্যঙ্গমূলক উপন্যাসের নাম হল 'জীয়া মানুহ্'। তাঁর রচিত আলোচনামূলক গ্রন্থের নাম হল, 'সাহিত্য আলোচনা' এবং 'আধুনিক গল্প সাহিত্য'। দ্বিতীয় গ্রন্থটির জন্য সাহিত্য আকাদেমির দ্বারা তিনি পুরস্কৃত হন। ৮২ বছর বয়সে এই সাহিত্যিকের মৃত্যু ঘটে ১লা ডিসেম্বর ১৯৮৮ সালে। তাঁর উল্লেখযোগ্য একটি গল্পের নাম হল 'পতিত এবং পতিতা'।

আলোচ্য গল্পে নারীর বিড়ম্বনাময় জীবন-চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। গল্প বর্ণনায় আমরা দেখি খাউন্দদের বাড়িতে একজন বিধবা মহিলা থাকেন। অকালে স্বামী মারা যাওয়াই বাড়ির সকলে তাঁকে নানাভাবে গঞ্জনা দিতে থাকে। শাশুড়ি ভাবে এই বিধবা নারী পাপীয়সী। তাঁর পাপের ফলেই বাড়ির মেঝো ছেলের মৃত্যু হয়েছে। শুধু তাই নয় এই বাড়িতে যা কিছুই অমঙ্গল ঘটে সব দোষ এসে পড়ে এই অসহায় বিধবার উপর। শাশুড়ি কথায় কথায় তাঁকে তিরস্কার করে বলেন, "পাপীয়সী এসেই মেজ ছেলেটিকে খেয়েছিস। আর কি যে করবে, কে জানে।"[১০] প্রতিনিয়ত এইভাবে তিরস্কার শুনতে শুনতে তাঁর জীবনটাই যেন দুর্বিষহ হয়ে উঠে। তাইতো তিনি জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে বলেন,

> "বাড়ির সবাইর আমি চক্ষুশূল। দিনরাত আমার ভাগ্যে শুধু গালাগালিই জোটে। আমার বেঁচে থাকার দরকার নেই। সংসার আমার কাছে বিষ হয়ে উঠেছে।"[১১]

আসলে আমাদের সমাজের কিছু বদ্ধমূল ধারণা আছে যে কোনো মঙ্গল কাজে বিধবাদের ডাকতে নেই। বিধবাদের উপস্থিতিই যেন একপ্রকার অমঙ্গলকর। আর এই ধারনার বশবর্তী হয়ে অনেক পরিবারই তাদের উপরনানাভাবে উৎপীড়ন এবং শোষণ করতে থাকে। আমাদের সমাজে এধরনের দৃশ্য প্রতিনিয়তই কোথাও না কোথাও দেখতে পাওয়া যায়। বিধবাদের নানাভাবে অত্যাচারের ফলে তাদের জীবন যে দুঃখ-কষ্টে ভরে উঠেতারই বাস্তব চিত্র গল্পকার এই গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন।

হেমেন বরগোহাঞি অসমীয়া সাহিত্য জগতে এক সুপ্রসিদ্ধ নাম। ১৯৩২ সালের ৭ই ডিসেম্বর আসামের লক্ষ্মীমপুরে তাঁর জন্ম। ছোটোবেলা থেকেই তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে কটন কলেজ থেকে তিনি স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর পেশা ছিল শিক্ষকতা আর নেশা ছিল সাহিত্যচর্চা। আসাম সিভিল সার্ভিসেও তিনি তেরো বছর কর্মরত ছিলেন। পাশাপাশি প্রথমে 'শান্তিদূত' পত্রিকার সহ-সম্পাদক এবং পরবর্তীতে সাপ্তাহিক 'নীলাচল' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। এই পত্র-পত্রিকার হাত ধরেই তিনি সাহিত্য জগতে পদার্পণ করেন। তিনি একাধারে যশস্বী কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক ও সমালোচক ছিলেন। পাঁচটি গল্পসংকলন, তিনটি উপন্যাস, দুটি প্রবন্ধ গ্রন্থ তাঁর সাহিত্য নিদর্শন, যার দ্বারা তাঁর সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। 'অসম সাহিত্য সভা'-এর দ্বারা প্রকাশিত 'কুড়ি শতিকার অসমীয়া সাহিত্য' নামক গ্রন্থটি তিনি সম্পাদনা করেছেন। ১৯৭৮ সালে তাঁর রচিত উপন্যাস 'পিতা পুত্র'-এর জন্য তিনি সাহিত্য একাডেমী পুরস্কারে ভূষিত হন। এই বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি করোনা রোগে আক্রান্ত হয়ে সম্প্রতি(১২ই মে ২০২১) মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য গল্পের নাম হল 'পর্দা'।

আলোচ্য গল্পে আমাদের সমাজের নির্মম সত্যটি বর্ণিত হয়েছে। সমাজে যারা দেহোপজীবিনী থাকে তাদের সম্পর্কে আমাদের অনেকের মনেই বিরূপ ভাবনা কাজ করে। তাদের নানা ক্ষেত্রে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। অথচ একবারও আমরা ভাবিনা যে তাদের জীবিকার এই পথ বেছে নেবার কারণ কী? কিংবা তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে ইচ্ছা করেকিনা তা জানার চেষ্টা পর্যন্ত করা হয়না। আমাদের চোখে তারা এক প্রকার সমাজের অচ্ছুৎ।আবার এমনও দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে কোনো স্বহৃদয়বান মানুষ যদি তাদের মধ্যে কাউকে ভালোবেসে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে চায় তাহলেও বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় আমাদের কঠোর সমাজব্যবস্থা। ঠিক এধরনেরই কাহিনি নিয়ে রচিত এই 'পর্দা' গল্পটি। আলোচ্য গল্পে আমরা দেখি পেরেরার বর্ণিত কাহিনিতে যে বারাঙ্গনার কথা বর্ণিত আছে তার নাম রানী। রানীকে ভালোবেসে অশোক তাকে নিয়ে সংসার করতে চেয়েছিল।কিন্তু সমাজের লোকলজ্জার ভয়ে সে তাকে নিজের বাড়িতে তুলতে রাজি হয়নি। তার মনের সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বপ্রকাশ পায় আলোচ্য গল্পে এইভাবে,

> "রানীর প্রেমে পড়ে অশোক প্রথমে তাকে জীবনসঙ্গিনীইকরতে চেয়েছিল। কিন্তু সরকারি পদমর্যাদা, সামাজিক সম্মান আর সহজাত সংস্কার – এগুলোর চাপে শেষ পর্যন্ততা আর হয়ে ওঠে নি।"[১২]

এইভাবে সামাজিক অনুশাসনের দ্বারা জর্জরিত ও সঙ্কুচিত হতে হতে আলোচ্য গল্পের রানীর মতো আমাদের সমাজের বহু নারীর জীবনই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। সমাজের এই নির্মম সত্যটি আলোচ্য গল্পের গল্পকার অতি সাধারণ অথচ গভীরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রকৃতপক্ষে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নানা সামাজিক অনুশাসনে সবচেয়ে বেশি অত্যাচার আর বঞ্চনার শিকার হয় নারীরা। অথচ মাতা রূপে, কন্যা রূপে, জায়া রূপে, বধূ রূপে স্নেহ মায়া-মমতা এবং কর্তব্যনিষ্ঠা ও আন্তরিকতা দিয়ে পারিবারিক সুখ-সুবিধা, শান্তি-শৃঙ্খলা

বিধানের গুরুদায়িত্ব পালন করে থাকে নারী। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজে অতি প্রাচীনকাল থেকেই নারীকে নানা অনুশাসন এবং উপদেশ দিয়ে তাকে গণ্ডিবদ্ধ করে বঞ্চনা করা হয়েছে। মহাভারতে দেবী পার্বতীর মুখ দিয়ে স্ত্রী-ধর্ম কথিত হয়েছে এইভাবে,

> "যিনি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া গৃহমার্জন, গৃহ গোময়লেপন, স্বামীর সহিত মিলিত হইয়া হোমানুষ্ঠান, বলিপ্রদান এবং দেবতা, অতিথি ও ভৃত্যগণকে আহার প্রদান করিয়া থাকেন, পরিবারবর্গ ভোজন করিলে পর যিনি ভোজনে প্রবৃত্ত হয়েন, যাহার দ্বারা লোকসকল সন্তুষ্ট ও পরিতুষ্ট হয় এবং যিনি শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের সন্তোষসাধন, পিতামাতার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করেন, তাহার অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম লাভ হয়।"[১৩]

অর্থাৎ গৃহকর্মে নিপুণা এবং সকলের প্রতি সেবা শুশ্রূষা করার মতো নারীই সকলের কাম্য। আবার মানবশাস্ত্রাকার মনু বলেছেন,

> "শীলরহিত, পরদাররত, বিদ্যাদি গুণবর্জিত হইলেও পতিকে উপেক্ষা না করিয়া সাধ্বী স্ত্রী সর্বদা দেবতার ন্যায় তাহার সেবা করিবেন।"[১৪]

অর্থাৎ স্বামী যতই অযোগ্য হোক না কেন স্ত্রী স্বামীকে দেবতার মতো ভক্তি করবে। এইরকম নানা উপদেশ, নির্দেশ অনুশাসন দ্বারা সংসার যাত্রা নির্বাহের ক্ষেত্রে নারীকে স্বেচ্ছাচারী স্বামীর এক প্রকার দাসী রূপে প্রতিপন্ন করেছে শাস্ত্র। আবার স্ত্রী যাতে স্বামীর একান্ত অনুগত থাকে সেই উদ্দেশ্যে নারীকে নানাভাবে ভীতি প্রদর্শনও করেছে শাস্ত্র। এ প্রসঙ্গে স্কন্দ পুরাণে উল্লেখ আছে,

> "যে নারী স্বামীকৃত ভৎসনা রোষপরবশ হইয়া তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করে, সে পরজন্মে গ্রাম্য-কুক্কুরী ও বন্য শৃগালী হয়।"[১৫]

কিন্তু শাস্ত্রের এইসব ভীতি নির্দেশ পূর্বে নারীদের দমন করে রাখলেও আধুনিক চিন্তা-চেতনায় জাগ্রত নারীরা বর্তমানে তা মানতে নারাজ। তাদের সঙ্গে যে নানা অত্যাচার আর বঞ্চনা ঘটছে প্রতিনিয়ত, তার বিরুদ্ধে কিছু কিছু প্রতিবাদ এবং লড়াইয়ে সামিল হতেও দেখা যায় আধুনিক নারীদের। তারা পূর্বের সব অন্যায় আরোপিত গণ্ডিবদ্ধ জীবন-শৃঙ্খল ছিন্ন করে বেড়িয়ে আসতে চেষ্টা করছে। আধুনিক নারীর এই ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সাহিত্যেও প্রতিফলিত হয়েছে বাস্তবসম্মতভাবে। অসমীয়া সাহিত্যিক লক্ষ্মীনাথ ফুকন তাঁর 'বিহু সম্মিলন' গল্পে আধুনিক নারীদের এইসব নানা বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। আলোচ্য গল্পের অন্যতম চরিত্র বিচিত্রময়ী শুধু গার্হস্থ্য জীবনেই নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রাখেননি, তিনি সভানেত্রী হিসাবে নানা সভায় জনসাধারণের সামনে ভাষণ দিয়ে থাকেন। প্রয়োজনে তিনি নানা রাজনৈতিক ছলচাতুরী করতেও পিছপা হন না। তিনি নেতৃত্ব দিয়ে গ্রামের সকলের মন জয় করার চেষ্টা করেন। গ্রামে বিহু সম্মিলনের সমস্ত দায়-দায়িত্ব নিজে সামলানোর পাশাপাশি পারিবারিক দায়িত্বও সমানভাবে পালন করেন তিনি। আসলে যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গ্রাম্য সমাজেও যে আধুনিক চিন্তা-চেতনার দোলা লাগে তারই বাস্তবসম্মত বর্ণনা আলোচ্য গল্পে পরিস্ফুট হয়েছে।

সাহিত্যিক লক্ষ্মীনন্দন বরা অসমীয়া সাহিত্যজগতের এক উজ্জ্বল নাম। ১৯৩২ সালে আসামের নগাঁওঅঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। করোনা মহামারীর করালগ্রাসে সদ্যপ্রয়াত(৩রা জুন ২০২১) হন তিনি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় এম.এস.সি পাশ করে তিনি অসমের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন। তাঁর নয়টি উপন্যাস ও এগারোটি গল্প সংকলন রয়েছে। এছাড়াও তাঁর একটি নাটক এবং দুটি প্রবন্ধ গ্রন্থ রয়েছে যা

তাঁর লেখনীশৈলীর দক্ষতার পরিচয় বহন করে। তাঁর সামাজিক প্রেক্ষাপটে লেখা একটি উল্লেখযোগ্য গল্পের নাম হল 'গুরু পর্ব'।

আলোচ্য গল্পে পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক চাপে মানুষের মূল্যবোধ যে অবক্ষয় হচ্ছে সেই দিকটিকেই তুলেধরার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি বিশেষের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একটি আচরণমূলক ধারণা হল মূল্যবোধ। মূল্যবোধ মানব আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। আর এই মূল্যবোধগুলিই সমাজের জীবনপ্রবাহের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। এই মূল্যবোধ সম্পর্কে বিশিষ্ট সমালোচক বলেছেন,

> "নিকটবর্ত্তী স্থূল সুখের চেয়ে দূরবর্ত্তী সূক্ষ্ম সুখকে, আরামের চেয়ে সৌন্দর্য্যকে, লাভজনক যন্ত্রবিদ্যাকে শ্রেষ্ঠ জানা এবং তাদের জন্য প্রতীক্ষা ও ক্ষতি স্বীকার করতে শেখা-এ-সবই মূল্যবোধের লক্ষণ; আর এ সকলের অভাবই মূল্যবোধের অভাব।"[১৬]

যুগ যুগ ধরে এই মূল্যবোধের দ্বারাই সমাজকাঠামো পরিচালিত হয়ে আসছে। সামন্ততন্ত্রের অধীনস্থ প্রাচীন এবং মধ্য যুগ সমস্তটাই ধর্মীয় মূল্যবোধের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। মোটকথা এই ধর্মীয় মূল্যবোধই ছিল প্রাচীন এবং মধ্যযুগের সমস্ত কিছুর নিয়ামক শক্তি।[৩] এরপর ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যে গণতান্ত্রিক সমাজকাঠামোর যাত্রা শুরু হয়েছিল তারই ভিত্তিস্বরূপ সমাজমননে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মানবতাবাদী মূল্যবোধ। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং তার অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবে সমগ্র বিশ্বে যে মহামন্দা, বিশৃঙ্খলা চলছিল তার প্রভাব থেকে ভারতবর্ষও রেহায় পায়নি। ভারতবর্ষেও তখন আশাভঙ্গের বেদনা এবং স্বপ্নভঙ্গের বিষণ্ণতা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ফলে মানুষের স্থির চিন্তার জগৎ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে প্রচলিত মূল্যবোধে ফাটল দেখা দিল। আর এর জন্য প্রধানভাবে দায়ী ছিল অবক্ষয়িত যুগের অব্যবহিত পরবর্তীতে মানুষের অসংযত জীবন-যাপন, সীমাহীন লোভ, আত্মসর্বস্ব ও আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব, অসৎ প্রবৃত্তি, অনৈতিক কাজকর্ম। একইসঙ্গে ধীরে ধীরে মানুষের মন থেকে নৈতিকতা, মানবিকতা এবং মনুষ্যত্ববোধের মত চিরন্তন লালিত সামাজিক মূল্যবোধগুলি হারিয়ে যায়। সমকালীন প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বিশিষ্ট সমালোচক জানিয়েছেন,

> "লড়াইয়ের ফলে ইউরোপের যে দুরবস্থা ও মানুষের চিন্তাজগতে যতটা পরিবর্তন এসেছে, আমাদের দেশে তার চেয়ে অনেক কম হলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর তুলনায় আমাদের দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যের পরিমাণ ও মনের ভাবধারার গতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। ..... বর্তমানে বাংলাদেশে জীবন সংগ্রামে যে কঠোর প্রতিযোগিতা চলেছে, তাকে মুখের গ্রাস নিয়ে কাড়াকাড়ি বললে অত্যুক্তি হয় না।দারিদ্র্যের তাণ্ডব নৃত্যের নিষ্ঠুর পদাঘাতে কোথায় উড়ে যাচ্ছে ধর্ম, সমাজ, স্বাস্থ্য আনন্দ, প্রাণ, আয়ু, ইহকাল পরকাল--সব।"[১৭]

আর এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব এ যুগেও লক্ষ করা যায়। ভারতীয় সমাজব্যবস্থাকে উপলব্ধি করলে বুঝতে পারা যায় যে এমন অনেক আদর্শ বা মূল্যবোধ রয়েছে যা দীর্ঘদিন ধরে আমরা কোনো না কোনো ক্ষেত্রে অনুসরণ করে আসছি। বিশেষত ত্যাগ, দান, নিষ্ঠা, সত্য, অহিংসা ইত্যাদি ভারতীয় সমাজব্যবস্থার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আর এগুলির অব্যবহারই যে আমাদের সামাজিক মূল্যবোধ অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সামাজিক মূল্যবোধ অবক্ষয়ের বাস্তবসম্মত চিত্র আলোচ্য গল্পে লক্ষ করা যায়। এই গল্পে দেখা যায় গল্প কথক সরুমণিকে গ্রামে আয়োজিত নাটকের সূত্রধারের ভূমিকা পালন করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। তখন তার বাবা পারিশ্রমিক দিয়ে একজন গুরুকে রাখলেন তাকে সমস্ত গানের রাগ শেখানোর জন্য। কিন্তু গুরুদেবের পারিবারিক অবস্থা খুবই অসচ্ছল ছিল। তিনি সরুমণিকে যেসব গানের রাগকম সময়েই শেখাতে পারতেন তা শেখালেন অনেকটা সময় ব্যয় করে। এমনকি তিনি বিশেষ কিছু গানের নিয়ম

রেখে দেন পরবর্তীতে শেখাবেন এটা ভেবে। এর প্রধান কারণ তিনি জানতেন যে তাড়াতাড়ি গানের সব নিয়ম শিখিয়ে দিলে তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে। তখন তারা আর তাঁকে ডাকবে না। ফলে গান শিখিয়ে যে পারিশ্রমিক পেয়ে তিনি সংসার চালাতেন সে আয়ের পথ তাঁর বন্ধ হয়ে যাবে। অর্থনৈতিক চাপে পড়ে তিনি এ পথ বেছে নিলেও গল্পের শেষে আত্মধ্বংসনে দগ্ধ হয়ে সে কথা স্বীকার করে নিয়ে তাদের কাছে বলেন,

> "এই ছেলেটিকে যে শিখিয়েছি, তাতে বিস্তর ফাঁকি থেকে গেছে। প্রথম মাসেই তাকে আরো ভাল ভাল জিনিস শিখিয়ে দিতে পারতাম, কিন্তু শেষে আমার বিষয় জর্জর পাপী মন বাদ সাধল। ... বাড়িতে ছোট ছেলেমেয়েগুলির কি অবস্থা। শ্রাবণ মাসের পর ঘরে ধান একমুঠিও থাকে না। ... এই সময় আপনার অনুরোধে ছেলেটিকে শেখাতে গেলাম। ... তাতে কিছু সুরাহা হল। তখন একটা কথা মনে হতেই আমার মন পিশাচ হয়ে গেল। ... অনটনের দিনগুলির কথা ভেবে আমার মন যেন কি রকম হয়ে গিয়েছিল।"[১৮]

আসলে অর্থনৈতিক অভাব-অনটন কীভাবে মানুষের জীবনে নৈতিক অবনতি ঘটায় এই গল্পটি তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। একজন শিক্ষকের নৈতিক ও প্রধানদায়িত্ব হল তার ছাত্র-ছাত্রীদের নির্ভুল ও যথাযথ শিক্ষাদান করা। আর এই গুরুদায়িত্ব যখন কোনো শিক্ষক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র অর্থের অভাবে সঠিকভাবে পালন করতে পারে না তখনই দেখা দেয় সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়। আর এই মূল্যবোধ অবক্ষয়েরদিকটি আলোচ্য গল্পে বাস্তবসম্মতভাবে পরিস্ফুট হয়েছে।

আমাদের সমাজের এই সব নানা দিক অসমীয়া গল্পকারগণ তাঁদের গল্পে শিল্পরূপ দান করেছেন। কারণ সাহিত্যিকের সমাজ বহির্ভূত কোন সত্তা নেই, তিনি তাঁর স্ব-কালের সামাজিক নানা পরিবর্তন ও বিবর্তনের ফসলেই পরিপুষ্ট হয়ে থাকেন। আর এর ফলে তাঁর সৃষ্টিতে সমকালের দিকচিহ্নের বিভিন্ন স্তরগুলি কোনো না কোনো ভাবে ফুটে উঠবেই, আর এটাই স্বাভাবিক। সমাজের পারিপার্শ্বিক যে নানা বিবর্তন ঘটে চলছে তার চিত্র সাহিত্যিক কখনো জ্ঞাতসারে আবার কখনো অজ্ঞাতসারে তাঁর রচনায় তুলে ধরেন। আর আসামের গল্পকারগণও সমকালের সামাজিক প্রেক্ষাপটকে তাঁদের গল্পগুলিতে বাস্তবতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। তাঁদের গল্পে আসামের গ্রাম-পাহাড়ের সমাজ চিত্রের পাশাপাশি শহরের সামাজিক অবস্থারও চিত্র উঠে এসেছে। সমাজে ঘটমান জাতিবিদ্বেষ, হিংসাত্মক কার্যকলাপ, রাজনীতির নানা কুটিল চক্রান্ত, সবলের দ্বারা দুর্বলের উপর অত্যাচার, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ইত্যাদি নানা সমস্যার কথা তাঁদের লেখায় ফুটে উঠেছে। একইসঙ্গে আমাদের সমাজে নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থানের চিত্রও তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। সামাজিক নানা বিধি-নিষেধের কারণে কিংবা নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণের কারণে অনেক ক্ষেত্রেই নারীর জীবনে যে বিড়ম্বনার সৃষ্টি হয়, সে সব দিকও লেখকগণ আসামের সামাজিক প্রেক্ষাপটের নিরিখে বিশ্বাসযোগ্য করে গল্পগুলিতে উপস্থাপন করেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. বরুয়া, বিরিঞ্চিকুমার। 'অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাস', দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১৪, সাহিত্য অকাদেমি, পৃষ্ঠা. ১৯৯।
২. বরদলৈ, নির্মলপ্রভা (সম্পা.)। 'অসমীয়া গল্প সঙ্কলন', প্রথম প্রকাশ, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নয়াদিল্লি, পৃষ্ঠা. ৩।
৩. দে, বিদ্যুৎবিকাশ। 'উনিশ শতকের নারীসমাজ ও বিদ্যাসাগর', ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃষ্ঠা. ২০।
৪. বরদলৈ, নির্মলপ্রভা। সম্পাদনা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৫ ।

৫. বিহারী গোস্বামী, বিজন। অনুদিত ও সম্পাদিত, 'অথর্ববেদ সংহিতা', ৩/৫/২, ১৯৭৮ সাল, পৃষ্ঠা. ৯৮।

৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু। অনুদিত ও সম্পাদিত, 'কৌটিলীয়াম্ অর্থশাস্ত্রম' (প্রথম খণ্ড), ৩/২/৭, ২০০২ সাল, পৃষ্ঠা. ৫০৫।

৭. বরদলৈ, নির্মলপ্রভা। সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৮।

৮. তদেব, পৃষ্ঠা. ১৬।

৯. বরুয়া, বিরিঞ্চিকুমার। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ২০৩।

১০. বরদলৈ, নির্মলপ্রভা। সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৩৭।

১১. তদেব, পৃষ্ঠা. ৩৯।

১২. তদেব, পৃষ্ঠা. ১২১।

১৩. তর্করত্ন, পঞ্চানন। অনুদিত ও সম্পাদিত, 'মনুসংহিতা', ৫/১৫০, ১৯৯৩ সাল, পৃষ্ঠা. ৮৮।

১৪. তদেব, পৃষ্ঠা. ১৫১।

১৫. তর্করত্ন, পঞ্চানন। সম্পাদিত, 'স্কন্দ পুরাণ' (কাশী খণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়) ৩৬নং শ্লোক, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা. ২০৭১।

১৬. ইসলাম চৌধুরী, সিরাজুল। 'সংস্কৃতি-কথা', জুলাই ২০১৬, পৃষ্ঠা. ৩৭।

১৭. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার। 'কালের পুত্তলিকা' (বাংলা ছোটগল্পের একশ' দশ বছর ১৮৯১-২০০০), অক্টোবর ২০১৬, পৃষ্ঠা. ১৭৯।

১৮. বরদলৈ, নির্মলপ্রভা (সম্পা.)। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ২৫১।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 840-846
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.296

সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে নারী স্বাতন্ত্রতা: প্রফুল্ল রায়ের 'অদ্বিতীয়া' উপন্যাসের নিরিখে

কেয়া দাস চক্রবর্তী, *সহকারী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, রাম ঠাকুর কলেজ, পশ্চিম ত্রিপুরা, ভারত*

Received: 01.03.2026; Accepted: 07.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

One of the famous fiction writers of contemporary Bengali literature is Prafulla Roy. He came to India with the pain of partition in the year of 1947. Refugee problem, civic life issues were the main subjects of his novels and stories. Most of the studies have been done mainly on these two topics. However, in his various novels, protesting female characters are featured. Among them, I will try to highlight in this research paper the uniqueness of Nirupama's character in the novel 'Adwitiya'.

Keywords: Fiction, contemporary, partition, refugee, civic life, protesting, featured, uniqueness

"নারী হচ্ছে টি-ব্যাগের মত,
গরমজলে দেয়ার আগে তুমি বুঝতে পারবে না সে কতটা শক্তিশালী"

– এলিয়ানর রুজভেল্ট

নারী– এক অত্যন্ত জটিল এবং বহুমাত্রিক অধ্যায় হিসেবে যুগে যুগে বিবেচিত হয়ে এসেছে। এই মানবসত্তার ভেতরে লুকিয়ে আছে নানা রূপ; তিনি কখনও প্রবল স্নেহপরায়ণ, শান্ত এবং স্নিগ্ধতায় মুখর, ঠিক যেন এক স্নিগ্ধ নদীর মতো যার পবিত্র স্পর্শে সমগ্র জীবন গভীরভাবে আলোড়িত হয়ে ওঠে। আবার এই নারীই পরিস্থিতির প্রয়োজনে হয়ে ওঠেন তীব্র প্রতিবাদী, সমস্ত রকম অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা এক রুদ্ররোষের হুঙ্কার, আবার কখনও তিনি হয়ে ওঠেন নিছকই এক সরলতার পূর্ণ প্রতিমা। এর পাশাপাশি নারীর চরিত্রের আরেক দিক হলো তিনি আবার কখনো ছলনাময়ীও বটে। অর্থাৎ, এক কথায় বলতে গেলে নারীচরিত্র চরম বৈচিত্র্যতায় ভরপুর।

এই অসীম বৈচিত্রের আস্বাদন পেতে এবং এর গভীরতা উপলব্ধি করতে সময়ের ব্যবধানে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে বহু স্বনামধন্য সাহিত্যিক 'নারী' নামক এই প্রবল জটিল অধ্যায়ের নিবিড় অধ্যয়ন করেছেন। এই সমস্ত সাহিত্যিকরা তাঁদের সৃষ্ট নারীদের দৃষ্টান্ত অন্য কোনো কল্পজগত থেকে নয়, বরং আমাদের এই বাস্তব সমাজ থেকেই প্রতিনিয়ত আহরণ করেছেন। এক্ষেত্রে বাংলা কথাসাহিত্য এবং তার ঐতিহ্যও এই সাধারণ নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম নয়।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, বাংলার প্রথম সার্থক উপন্যাসিক সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কালজয়ী সৃষ্টি যেমন 'দুর্গেশ নন্দিনী', 'আনন্দ মঠ', 'রজনী' প্রভৃতি উপন্যাসে তিনি অত্যন্ত সুনিপুণভাবে নারীর চরিত্রের এই বিশাল বৈচিত্র্যতা পাঠকদের সামনে দেখিয়েছেন। এরপর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টিতে আমরা দেখতে পাই এক নতুন যুগের উন্মেষ; তাঁর অমর নারী চরিত্রদের মধ্যে 'যোগাযোগ' উপন্যাসের কুমুদিনী, 'চোখের বালি'র বিনোদিনী, কিংবা 'ঘরে বাইরে'র বিমলা প্রভৃতি চরিত্রগুলি স্ব স্ব ক্ষেত্রে এবং নিজেদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে এক কথায় স্বাতন্ত্র্যময়ী। মহিলাদের দ্বারা রচিত সাহিত্যের ক্ষেত্রে, প্রখ্যাত মহিলা উপন্যাসিক দের মধ্যে আশাপূর্ণা দেবীর বিখ্যাত 'ত্রয়ী' উপন্যাসের যে সকল নারী চরিত্ররা রয়েছেন, তারা তৎকালীন সমাজের প্রচলিত এবং কঠিন বেড়াজালকে ভেঙে ফেলার এক চূড়ান্ত দুঃসাহসিকতা দেখাতে সম্পূর্ণ রূপে সক্ষম হয়েছে। এছাড়াও বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে থাকা বহু বিখ্যাত উপন্যাসেই এই 'নারী' চরিত্রের এক অনবদ্য স্বাতন্ত্র্যতার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর বারবার পাওয়া যায়।

পরবর্তীকালে সমসাময়িক উপন্যাস সাহিত্যের দিকে নজর দিলে দেখা যায়, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রমুখ স্বনামধন্য সাহিত্যকদের উপন্যাসের নারীরা পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি আধুনিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। এই আধুনিকা নারীরা সমাজের বুকে চেপে বসা সামাজিক ও পারিবারিক গোঁড়ামি, নানা ধরনের অযৌক্তিক বিধিনিষেধ, অবজ্ঞা এবং যুগ যুগ ধরে চলে আসা লাঞ্ছনার কঠিন প্রাচীরকে নিজেদের বলিষ্ঠ পদাঘাতে চূর্ণ করে দিয়ে নিজেদের স্বাতন্ত্রতার এই এক নীরব প্রতিযোগিতায় অন্যান্যদের তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে।

তবে, এই সমসাময়িক কালের উপন্যাসিকদের মধ্যে যাঁর রচনায় অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে স্বাতন্ত্র্যময়ী, বিশেষ করে সমাজের চোখে চোখ রাখা প্রতিবাদী নারীদের কথা প্রবলভাবে উঠে আসছে, তিনি হলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রফুল্ল রায়। তাঁর রচিত সাহিত্যের দিকে তাকালে আমরা বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের সন্ধান পাই, যে সকল উপন্যাসে এই প্রতিবাদী নারী সত্তার এক অভাবনীয় প্রকাশ ঘটেছে। এই বিশিষ্ট উপন্যাসগুলি নিচে ক্রমানুসারে তালিকাভুক্ত করা হল:

- 'অদ্বিতীয়া', যা প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রসাদ' পত্রিকার পূজা সংখ্যায়, ১৯৮৭ সালে।
- 'ইস্পাতের ফলা', যেটি 'শারদীয় নবকল্লোল' পত্রিকায় ১৯৯০ সালে আত্মপ্রকাশ করে।
- 'অদিতির উপাখ্যান', যা প্রকাশ পায় এপ্রিল, ১৯৯২ সালে।
- 'শিখর পেরিয়ে', বর্তমান পত্রিকার শারদ সংখ্যা, ২০০৪-এ প্রকাশিত একটি রচনা।
- 'আবার বাতাস বয়', যা কলকাতা বইমেলা, ২০০৭ সালে পাঠকদের সামনে আসে।
- 'অস্ত্র', নামক উপন্যাসটি 'পাঁচটি প্রিয় উপন্যাস' সংকলনে জানুয়ারি ২০১১ সালে স্থান পায়।
- 'প্রতিধ্বনি', শারদীয়া প্রসাদ পত্রিকায় ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত হয়।
- 'পা রাখার জায়গা', যা 'নবকল্লোল' পত্রিকার সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যায় এপ্রিল ২০০৯ সালে প্রকাশিত।
- 'জলবিন্দু', এই উপন্যাসটি 'পাঁচটি বাছাই করা উপন্যাস' গ্রন্থে বইমেলা ২০১১-তে স্থান পায়।
- 'তটিনী তরঙ্গে', প্রকাশিত হয় 'প্রিয় অপ্রিয়' সংকলনে, ১৯৮৯ সালে।
- 'আকাশের সীমা নেই', এটিও 'পাঁচটি প্রিয় উপন্যাস' সংকলনে জানুয়ারি ২০১১ সালে প্রকাশিত হয়।

এছাড়াও এমন আরও অনেক সৃষ্টি তাঁর রচনা সম্ভারে রয়েছে।

লেখক প্রফুল্ল রায়ের ব্যক্তিগত জীবনের দিকে আলোকপাত করলে জানা যায়, অধুনা বাংলাদেশে তাঁর জন্ম হওয়া সত্ত্বেও, কেবলমাত্র জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে এবং পরিস্থিতির চাপে পড়ে পঞ্চাশের দশকে তিনি এদেশে চলে আসতে বাধ্য হন। নিজের প্রিয় জন্মভূমি থেকে নিজের শিকড় উপড়ে ফেলে এই সুবিশাল

ভারতবর্ষে নতুন করে শিকড় জমাতে তাঁকে সে যুগে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে এবং প্রচুর লড়াইয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই সুবিশাল ভারতের বিভিন্ন স্থানে তিনি দীর্ঘকাল ধরে পরিভ্রমণ করেছেন, যার প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতিতে অত্যন্ত বিচিত্র জীবিকা এবং নানা ধরনের জীবনধারার এক জ্বলন্ত সাক্ষী তিনি নিজেই। আর নিজের জীবনের এই বহুমূল্য অভিজ্ঞতাকে সুনিপুণভাবে কাজে লাগিয়েই তিনি সমগ্র বাংলা সাহিত্য জগতে একের পর এক বিখ্যাত উপন্যাস এবং বিভিন্ন স্বাদের অসংখ্য ছোট গল্প তাঁর অগণিত পাঠককুলকে পরম যত্নে উপহার দিয়েছেন।

তাঁর এই বিস্তীর্ণ সাহিত্য রচনার মূল বিষয়বস্তু হিসেবে বারবার উঠে এসেছে তৎকালীন যুগের জ্বলন্ত সমস্যা যেমন উদ্বাস্তু সমস্যা, সমাজের অবহেলিত নিম্নবর্গের জীবনের করুণ আর্তনাদ, এবং আধুনিক নাগরিক জীবনের নানা জটিলতা। তবে, এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে যে বিশেষ বিষয়টি আমার নিজের আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু, তা হল তাঁর সৃষ্ট উপন্যাসের এই নারীদের এক অভাবনীয় স্বাতন্ত্র্যতার দিকটি। পূর্বে উল্লেখিত বিষয়গুলি নিয়ে, বিশেষত তাঁর রচনায় প্রতিফলিত উদ্বাস্তু সমস্যা এবং নিম্নবর্গ চেতনা নিয়ে সাহিত্য মহলে ইতিপূর্বেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এবং গবেষণা হয়েছে। এই বিষয়ে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গবেষণার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে:

(১) 'প্রতিধ্বনি গবেষণা পত্রিকা' (Volume-VIII, Issue-III, January 2020, Page no- 34-44)-এ প্রকাশিত আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, কাছাড়, আসাম-এর বাংলা বিভাগের গবেষক মধুসূদন সরকারের একটি প্রবন্ধের কথা বলা যেতে পারে। প্রবন্ধটির নাম *'প্রফুল্ল রায়ের ছোট গল্প- দেশ ভাগ: একটি বিশ্লেষণ পাঠ'*। এখানে উক্ত প্রাবন্ধিক প্রফুল্ল রায়ের মোট ১৭টি ছোটগল্পে কীভাবে নির্মম দেশভাগের যন্ত্রণা এবং ভয়াবহ উদ্বাস্তু সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে, তা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে দেখিয়েছেন।

(২) ত্রিপুরা সরকার দ্বারা প্রকাশিত সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা 'গোমতী'-এর ৩৩ তম বর্ষ, বইমেলা ১৪১৫ সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ স্থান পায়। *'আকাশের নিচে মানুষ পটভূমি গারুদিয়া'* শিরোনামে ড: মৈত্রেয়ী দত্ত এই প্রবন্ধটি লিখেছেন, যেখানে তিনি ছোটোনাগপুরের গারুদিয়া মৌজাকে কেন্দ্র করে রচিত কাহিনিতে জমির মালিক রঘুসিং এবং ভূমিদাস ধর্মা ও কুশীদের কঠিন জীবন যন্ত্রণার দিকটি নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন।

(৩) '*প্রফুল্ল রায়ের উপন্যাস- সময়-সমাজ-সঙ্কট'* (করুণা প্রকাশনী, ১৮/এ, টেমার লেন, কলকাতা- ৭০০০০৯) নামক গ্রন্থের লেখিকা ড. অমৃতা সাহা উক্ত গ্রন্থটিতে তৎকালীন সমাজ এবং সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে ওঠা নানান সংকটের এক গভীর দৃষ্টিকোণ থেকে প্রফুল্ল রায়ের উপন্যাসগুলিকে সবিস্তারে বিশ্লেষণ করেছেন। এই একই গ্রন্থেই প্রফুল্ল রায়ের উপন্যাসে 'বহুমাত্রিক নারী চরিত্র' নামক একটি অধ্যায়ে ড. সাহা লেখকের বিভিন্ন উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলি সম্পর্কে সামান্য কিছু আলোচনা করেছেন।

উপরিউক্ত প্রাসঙ্গিক আলোচনার পর, আমার বর্তমান গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি হল প্রফুল্ল রায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'অদ্বিতীয়া' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র নিরুপমার চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্যতার এক নিবিড় এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ। উল্লেখ্য যে, এই উপন্যাসটি ২০১১ সালের কলকাতা বইমেলায় 'পাঁচটি বাছাই উপন্যাস' সংকলনে স্থান পেয়েছিল। সাহিত্যের আঙিনায় এই বিশেষ চরিত্রটি নিয়ে আরও গভীর গবেষণার যথেষ্ট অবকাশ আজও বিদ্যমান রয়েছে। 'অদ্বিতীয়া' উপন্যাসটি রচনার মূল প্রেরণা সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে প্রখ্যাত লেখক প্রফুল্ল রায় নিজেই তাঁর লেখনীতে উল্লেখ করেছেন, "এই উপন্যাসের যিনি মূল চরিত্র তাকে আমি দেখিনি আমার এক বন্ধুর কাছে তার কথা শুনেছিলাম। এমন বিরল প্রতিবাদী মানুষ আজকের এই নোংরা, কদর্য পরিবেশে সম্ভবত খুব কমই পাওয়া যাবে। এই শ্রেণীটি প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে" (প্রফুল্ল রায় রচনা সমগ্র-৬, দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০১২, পৃঃ ১০-১১)। সমাজ থেকে প্রায় লুপ্ত হয়ে যাওয়া এই তীব্র প্রতিবাদী নারী

চরিত্রটিকে লেখক তাঁর অসামান্য কলমের আঁচড়ে এবং অভাবনীয় দক্ষতার সঙ্গে গড়ে তুলেছেন, যা আজও অগণিত পাঠককুলকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে চলেছে।

নিরুপমা চরিত্রটির এই অনন্য চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্যতাকে পাঠকদের সামনে আরও স্পষ্টভাবে তুলে ধরার জন্য উপন্যাসে বর্ণিত তাঁর চরিত্রের কয়েকটি বিশেষ দিকের উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করা যেতে পারে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি হল নিম্নরূপ:

(ক) বিলাসবহুল জীবনের প্রতি চরম নির্লিপ্ততা।
(খ) নারী শিক্ষা ও স্বাবলম্বনের প্রতি অটুট বিশ্বাস।
(গ) প্রতিকূল পরিস্থিতিতে স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা।
(ঘ) স্বাধীনতা সংগ্রামী পিতার মহান আদর্শের গ্রহণ।
(ঙ) সমাজের অন্য মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ ও পরোপকারিতার ভাবনা।
(চ) যেকোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক আপসহীন অবিরাম সংগ্রাম।
(ছ) পাহাড় প্রমাণ চারিত্রিক দৃঢ়তা।

উপন্যাসের একেবারে শুরুতেই লেখক অত্যন্ত নিপুণভাবে যে বিলাসবহুল 'বসুম্যানসন'-এর ঐশ্বর্যমণ্ডিত বর্ণনা দিয়েছেন, সেই বিপুল বিলাসিতা এবং আড়ম্বরের প্রতি নিরুপমা চরিত্রটি একেবারেই নির্লিপ্ত ও উদাসীন। তাঁর স্বামী প্রমথেশ এবং দুই পুত্র রণেন ও দীপক, যারা পেশায় প্রোমোটারি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত, তাদের এই কোটি টাকার ব্যবসার প্রতিও তাঁর বিন্দুমাত্র কোনো আগ্রহ বা মোহ নেই। যদিও সমাজের অন্যান্য সাধারণ চার-পাঁচটা মধ্যবিত্ত মহিলার মতো তাঁকে প্রতিদিনের ক্লান্তিকর ঘরকন্না সামলাতে হয় না, কিন্তু তবুও এত বড় এবং বিলাসবহুল একটি বাড়িতে তিনি যেন নেহাতই একটা নিষ্প্রয়োজনীয় বস্তুর মতো তিনতলার একটা নির্জন ঘরে একাকী পড়ে থাকেন। সেই বাড়ির কোনো বিষয়েই তাঁর নিজস্ব অভিমত বা মতামত কেউই বিন্দুমাত্র গ্রহণ করেন না। তাঁর দুই আধুনিক পুত্রবধূ যেখানে সারাদিন চূড়ান্ত আরাম ও আয়েশে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করতে সদা ব্যস্ত থাকেন, সেখানে নিরুপমার অত্যন্ত সাধারণ সাজপোশাক কোনোভাবেই 'বসুম্যানসন'-এর মতো একটি অভিজাত ও ধনী বাড়ির উপযুক্ত বলে মনে হয় না। দৈনন্দিন আহার গ্রহণের ক্ষেত্রেও তিনি অত্যন্ত সরল এবং সাধারণ; সামান্য হালকা খাবার গ্রহণ এবং প্রতিদিন নিয়ম করে ব্যায়াম চর্চা করা তাঁর রোজকার বাঁধা রুটিনের অবিচ্ছেদ্য অন্তর্ভুক্ত বিষয়। বাড়িতে যাতায়াতের জন্য আরামদায়ক এবং দামি একাধিক গাড়ি সর্বক্ষণ মজুত থাকা সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত সাধারণ মানুষের মতো সাধারণ মিনিবাস বা অটোতে যাতায়াত করতেই সবচেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে থাকেন। তাঁর এই অনাড়ম্বর জীবনযাপন এবং সারল্যের জন্য তাঁর নিজের স্বামী এবং ছেলেরাই তাঁকে চূড়ান্ত তাচ্ছিল্য করে 'টিপিক্যাল মিডল ক্লাস মেন্টালিটি'-র মানুষ বলে বিদ্রুপ করতেও কোনোদিন ছাড়ে না।

নিরুপমা একজন উচ্চ শিক্ষিতা নারী, আর ঠিক সেই কারণেই স্বামীর উপার্জিত অজস্র পয়সায় আরামে ও বিলাসে দিন যাপন করার থেকে নিজের অর্জিত শিক্ষাকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে জীবনে সম্পূর্ণ স্বনির্ভর হওয়ার প্রতি তিনি অনেক বেশি আগ্রহী এবং যত্নবান। এই অদম্য ইচ্ছাশক্তির কারণেই ষাটোর্ধ্ব বয়সে পৌঁছেও নিরুপমা বিকাশভারতী মিশন স্কুলে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমিস্ট্রেসের পদে চাকরি করে চলেছেন। শারীরিক অসুস্থতা বা বিশেষ কোনো প্রয়োজন ছাড়া তিনি বিনা কারণে কখনোই স্কুলে যাওয়া কামাই করেন না। প্রতিদিন ভিড় বাসে বা অটোতে চেপে, আবার কিছুটা পথ পায়ে হেঁটে তিনি ঠিক সময়মতো তাঁর কর্মস্থলে পৌঁছে যান। তাঁর এই শিক্ষকতার চাকরি একদিকে যেমন তাঁকে কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রদান করেছে,

ঠিক তেমনি অন্যদিকে শিক্ষকতার মতো এক মহান ও কল্যাণকর কাজে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত রেখে তিনি নিজের এক বিরল চারিত্রিক স্বাতন্ত্রতার উজ্জ্বল পরিচয় দিয়েছেন।

স্বামী এবং দুই ছেলেদের নীতিহীন ব্যবসা সম্পর্কে তাঁর মনে মোটামুটি একটা স্পষ্ট ধারণা রয়েছে; তিনি ভালো করেই জানেন যে শুধুমাত্র নিজেদের হীন স্বার্থসিদ্ধির জন্য তারা সবটুকু সম্ভব নীচে অনায়াসে নামতে পারে। এ নির্মম সত্য কথাও তাঁর বিন্দুমাত্র অজানা নয়। তবে, নিজের দুই বিপথগামী পুত্র সম্পর্কে তাঁর মনে চরম উদাসীনতা থাকলেও তাঁর একমাত্র আদরের কন্যা সুনেত্রার প্রতি তাঁর হৃদয়ে যথেষ্ট এবং গভীর অপত্য স্নেহ সর্বদা বিরাজমান রয়েছে। আর ঠিক সেই কারণেই, স্বামী প্রমথেশের দ্বারা নির্ধারিত অত্যন্ত ধূর্ত ও লম্পট পাত্র বীরেশের হাত থেকে নিজের নিরীহ কন্যাকে চিরতরে রক্ষা করার জন্য তিনি গোটা পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়ে একাই অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেন মেয়েকে হস্টেলে পাঠানোর জন্য। স্বামী বা ছেলেদের কোনো রকম ভয় বা তীব্র পারিবারিক অশান্তির তোয়াক্কা না করেই গৃহীত তাঁর এই দৃঢ় সিদ্ধান্ত মেয়ে সুনেত্রাকেও নিজের পায়ে মজবুতভাবে দাঁড়ানোর জন্য গভীরভাবে উদ্দীপিত করে তোলে। মায়ের এই অভাবনীয় দৃঢ়তা ও সাহস দেখে সুনেত্রাকে অবাক হয়ে বলতে শোনা যায়, "তোমার মধ্যে এতটা সাহস ছিল ভাবতে পারিনি"।

নিরুপমা নিজে দৃঢ়ভাবে মনে করেন, "মেয়ে যতই শিক্ষিত হোক চাকরি বাকরি করে নিজের পায়ে দাঁড়াক, বিবাহিত জীবনের নিরাপত্তা অত্যন্ত জরুরি"। আর তাই শেষ পর্যন্ত সুনেত্রার নিজের পছন্দ করা একজন শিক্ষিত এবং মার্জিত পাত্র মনোজিতকেই তিনি মেয়ের জন্য সুপাত্র হিসেবে নির্ধারণ করে নেন। বস্তুতপক্ষে, একজন দায়িত্বশীল মায়ের তাঁর সন্তানের সার্বিক কল্যাণার্থে গৃহীত এই সাহসী সিদ্ধান্ত চরিত্রটির এক অভাবনীয় স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাতন্ত্র্যতার সুস্পষ্ট পরিচয় বহন করে।

নিরুপমার এই যে অদম্য মানসিক জোর এবং মেরুদণ্ড সোজা করে চলার ক্ষমতা, তার মূল উৎস লুকিয়ে রয়েছে তাঁর পারিবারিক শিক্ষায়। স্বাধীনতা সংগ্রামী পিতা অতুলপ্রসাদ ছিলেন নিরুপমার জীবনের একমাত্র এবং পরম আইডল। ছোটবেলা থেকেই তিনি তাঁর সেই অন্যায়ের সঙ্গে সর্বদা আপসহীন এবং পরম আদর্শবাদী পিতাকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন, যিনি কখনোই কারোর কাছে বা কোনও কিছুর প্রলোভনের বিনিময়েই নিজের মাথা নত করেননি বা হার মানেননি। পিতার সেই পবিত্র এবং বজ্রকঠিন আদর্শ নিরুপমার রক্তের শিরায় শিরায় প্রতিনিয়ত প্রবাহমান। তিনি স্বভাবগতভাবে এমন মানুষ নন যিনি বিনা কারণে গায়ে পড়ে ঝগড়া বা বিবাদ সৃষ্টি করবেন। কিন্তু যখনই প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন যে কোনও চরম প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং সেই গৃহীত সিদ্ধান্তকে যে কোনো মূল্যে বাস্তবে ফলপ্রসূ করার মতো অসীম সাহসিকতা এই নিরুপমা চরিত্রটির স্বাতন্ত্রতার অন্যতম একটি প্রধান দিক।

উপন্যাসের কাহিনিতে এমন একটি বিশেষ এবং অভাবনীয় ঘটনা ঘটে, যে ঘটনাটি নিরুপমা চরিত্রটির চারিত্রিক সমীকরণকে সাধারণ মানুষের স্তর থেকে তুলে একেবারে এক অনন্য উচ্চপর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে। ঘটনাটি হল, একদিন এক মাঝবয়সি অবাঙালি মহিলা এবং তার সাথে থাকা আর এক তরুণীর সঙ্গে নিরুপমার নিজের দুই পুত্র ও স্বামীর এক প্রবল বচসা শুরু হয়, এবং সেই বচসা শেষ পর্যন্ত গড়ায় এক চূড়ান্ত মারামারিতে। এই জঘন্য দ্বন্দ্বে উভয় পক্ষই কমবেশি আঘাতপ্রাপ্ত হয় বটে, তবে তার নিজের দুই ছেলের পাশবিক আক্রমণের দ্বারা ওই অসহায় তরুণীটি বিশেষভাবে আহত হয়ে পড়ে। এরপর অত্যন্ত নির্মমভাবে বাড়ির দারোয়ান ওই মহিলা এবং তরুণীকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। এই গোটা অমানবিক দৃশ্যটাই নিরুপমা নিজের তিনতলার নির্জন বারান্দা থেকে নীরবে দেখছিলেন।

তবে এই ঘটনার পর এক চূড়ান্ত আশ্চর্যের বিষয় পরিলক্ষিত হয়; নিজের ঔরসজাত পুত্রদের আঘাত তাঁকে একজন মা হিসেবে যতটা না বিচলিত বা চিন্তিত করেছিল, তার থেকে অনেক বেশি ওই সম্পূর্ণ অপরিচিত তরুণীটির প্রতি হওয়া অন্যায়ের জন্য তাঁর প্রাণ ভেতর থেকে ডুকরে কাঁদতে থাকে। তিনি মনে মনে এই বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিলেন যে, তাঁর ছেলেরা বিনা কারণেই তরুণীটিকে আঘাত করেনি। এর পাশাপাশি ওই নিরীহ অবাঙালি পরিবারের কতটা চরম ক্ষতিই না করল তাঁর নিজের স্বামী ও পুত্ররা, এই গভীর অপরাধবোধ এবং দুশ্চিন্তায় তিনি সারা রাত দু'চোখের পাতা এক করে ঘুমোতে পারেননি। সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং ভিন্ন ভাষাভাষী একটি তরুণীর জন্য অন্তরের এই যে গভীর আত্মিক স্পর্শ এবং প্রবল সহানুভূতি, এটি নিরুপমা চরিত্রটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং মানবিক গুণ হিসেবে পাঠকের সামনে ধরা দেয়।

পরের দিন সকালে অন্তরের এই তীব্র প্রাণের তাগিদেই এবং অপরাধবোধের তাড়নায় তিনি সেই মাঝবয়সী মহিলা এবং তাঁর মেয়ের খোঁজখবর নিয়ে তাদের কাছে ছুটে যান। জানা যায় সেই মহিলার নাম রেবেকা এবং তাঁর আহত কন্যার নাম এলিজাবেথ ওরফে লিজা। তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিরুপমা যে আচরণ করেন তা এক কথায় অভাবনীয়। নিজের স্বামী ও পুত্রদের এই জঘন্য কর্মকাণ্ডে যে তাঁর বিন্দুমাত্র কোনো সমর্থন নেই এবং তাদের প্রতি তাঁর লজ্জা ও ঘৃণার কোনো লেশ মাত্র নেই, তা তাঁর স্পষ্ট বক্তব্যে প্রকাশ পায়। তিনি অকপটে বলেন, "বিশ্বাস করবে কি না জানি না সারা রাত আমি ঘুমোতে পারিনি তোমাদের জন্য তো খুব কষ্ট হচ্ছিলই, আমার স্বামী আর ছেলেরা এতটা নীচে নেমে গেছে ভাবতেও ঘেন্নায় মরে যেতে ইচ্ছা করছিল"।

সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি শুধু যে নিজের পরিবারের প্রতি চরম ঘৃণাই প্রকাশ করেছিলেন এমনটা নয়, বরং তিনি একপ্রকার প্রকাশ্য জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন নিজের পরিবারের বিরুদ্ধেই। তিনি নিজে থেকেই লিজাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন তাঁর স্বামী ও ছেলেদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে ডাইরি করার জন্য। শুধু তাই নয়, আইনের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তিনি নিজেই যে নিজের পরিবারের বিরুদ্ধে প্রধান সাক্ষী দেবেন, এই কঠিন প্রতিশ্রুতিও তিনি অবলীলায় তাদের দিয়েছিলেন। নিরুপমার মতো একজন সম্ভ্রান্ত বাড়ির গৃহবধূর এমন অবিশ্বাস্য সাহস ও উন্নত মানসিকতার পরিচয় পেয়ে রেবেকাকে চরম বিস্ময়ের সঙ্গে বলতে শোনা যায়- "আপনার মতো মানুষ আমি আগে আর দেখিনি"।

রেবেকাদের মহামূল্যবান প্রপার্টি বা সম্পত্তি অসৎ উপায়ে গ্রাস করার যে চক্রান্ত চলছিল, তা থেকে তাদের রক্ষা করতে নিরুপমা প্রথমে 'অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান'-এর কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেখান থেকে তিনি কোনোরকম সাহায্য পাননি। কিন্তু তাতে তিনি বিন্দুমাত্র দমে যাননি, বরং নিজেই একাকী নিজের প্রবল ক্ষমতাশালী স্বামী, দুই পুত্র ও বীরেশের মতো ভয়ঙ্কর অপশক্তির বিরুদ্ধে এক অভেদ্য ঢাল হয়ে রুখে দাঁড়ান।

উপন্যাসের একেবারে শেষ লগ্নে নিরুপমা যখন নিজের এই তথাকথিত বিলাসবহুল কিন্তু নীতিহীন বাড়ি চিরতরে ছেড়ে যাওয়ার এক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন, তখন এক গভীর অন্তর্দহনের সৃষ্টি হয়। বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার মুহূর্তে পেছন থেকে "স্বামী ও ছেলেদের কণ্ঠস্বর ভেসে এল... নিরুপমার বুকের ভেতরটা দুমড়ে মুচড়ে যেতে লাগলো, তবু তিনি ফিরে তাকালেন না, থামলেন না"। আবেগের এই প্রবল ঝড়ের মুখে দাঁড়িয়েও নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকার এই যে অভাবনীয় দৃঢ়তা, তা তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অন্যতম এবং শ্রেষ্ঠ একটি দিক। আজীবন লালিত আদর্শ তাঁর কাছে সর্বাগ্রে এবং জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ, তাই কোনো ধরনের অন্যায়ের সঙ্গে তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আপস করতে রাজি নন।

তাঁর কাছে নীতি এতটাই বড় যে, আপনজনও যদি অন্যায়কারী বা অপরাধী হয়, তবে তা তিনি কোনো ভাবেই একজন স্নেহময়ী মা বা স্ত্রী হিসেবে মেনে নেবেন না। আজীবন যে মহান আদর্শের দ্বারা তিনি তিল তিল করে লালিত হয়েছেন, সেই আদর্শই তাঁর কাছে রক্তের বা সমাজের সমস্ত সম্পর্কের থেকে অনেক বেশি বড় এবং পবিত্র। মানব মনের অন্তরের চিরকালীন নারী সুলভ বা মাতৃত্ব সুলভ অনুভূতির উপর ছাই চাপা দেওয়া যে কোনো সাধারণ নারীর কাছে প্রায় এক অসাধ্য সাধন করার সমান, আর এই উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে নিরুপমা তাঁর অবিচল মানসিকতা দিয়ে সে অসাধ্যকেই পরম সাহসিকতার সঙ্গে সাধন করলেন।

আসলে উপন্যাসের সমস্ত ঘটনা ও চরিত্র নিরুপমাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। আকার আকৃতির দিক থেকে উপন্যাসটি অনেকটাই সংক্ষিপ্ত। উপন্যাসটিতে জটিলতা, সম্পর্কের টানপোড়ান, চরিত্রের আধিক্য কোনও কিছুই ঘটাননি লেখক। তাঁর সমস্ত ভাবনা জুড়ে ছিল এই একটি মাত্র চরিত্র। লেখকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও চরিত্র সৃষ্টির দক্ষতায় নিরুপমা স্বাতন্ত্র্যময়ী আধুনিক নারীর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১। রায়, প্রফুল্ল। প্রফুল্ল রায় রচনা সমগ্র। ভাগ-৬, দে'জ পাবলিশিং; এপ্রিল, ২০১২ (প্রথম প্রকাশ), কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ. ১০-১১।

২। তদেব, পৃ. ৩৮৯।

৩। তদেব, পৃ. ৩৫০।

৪। তদেব, পৃ. ৩৬২।

৫। তদেব, পৃ. ৩৬৯।

৬। তদেব, পৃ. ৩৯৪।

গ্রন্থপঞ্জি:

আকর গ্রন্থ:

১। রায়, প্রফুল্ল। প্রফুল্ল রায় রচনাসমগ্র। ভাগ-৬, দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল, ২০১২ (প্রথম প্রকাশ), কলকাতা-৭০০০৭৩।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। সাহা, অমৃতা। প্রফুল্ল রায়ের উপন্যাস, সময়-সমাজ-সঙ্কট। করুণা প্রকাশনী, ১৮/এ টেমারলেন, কলকাতা–৭০০০০৯।

২। গোমতী। ত্রিপুরা সরকার প্রকাশিত সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা, ৩৩ তম বর্ষ, বইমেলা, পৃ. ৬৭-৭০।

৩। 'প্রতিধ্বনি' গবেষণা পত্রিকা, Volume- VIII, Issue- III, January 2020, Page no. 34-44.

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 847- 852
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.297

গণেশ দের ‘অতি সাধারণ এক কাহিনি’: একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন

বাপ্পন দেবনাথ, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, আর্য্য বিদ্যাপীঠ মহাবিদ্যালয় (স্বায়ত্বশাসিত), অসম, ভারত*

Received: 25.03.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Among the few storywriters who enriched the Bengali Literature of the North-East in the 20th century, Ganesh Dey is a renowned writer. Where the Bengali literature of the North-East has a label called 'Deshbhag' in the mind of the reader; Ganesh Dey has given the reader a taste of a different story. However, Ganesh Dey's works have been discussed a little less in Bengali Literature. Although there is currently a lot of discussion among researchers or readers. Ganesh Dey was born on 8th May, 1941 in Lakshmipur village of Silchar city and died on 18th September, 2013. His literary life is thirty years. However, he limited his literary life only to writing 'Column'. Ganesh Dey has written six novels, forty-eight stories, more than a thousand Columns and several romantic Compositions and a few Poems.

Our proposed topic of discussion is “Ganesh Dey’s ‘Ati Sadharan Ek Kahini’: An Analytical Study”. The story begins with a conversation between the author and a rickshaw puller. And in their conversation, another aspect of the masked nature of 20th century urban life emerges. Our main discussion will attempt to highlight those aspects.

Keywords: Uttarpurba, Deshbhag, Romantic, Column, Rickshaw Puller, Urban life

> “চোখের সামনে কোন ঘটনা ঘটতে দেখলে আমার মনে হয় এটা তো অন্যরকম পরিণতি পেতে পারত যা আমাদের কাম্য প্রার্থিত তখনই গল্প লেখার প্রেরণা পাই ... আমি গল্পের জন্য গল্প লিখি না চাবুক আর তুলিকে এক করে আমি গল্প লিখে জীবনের জন্য।”[১]

কথাগুলো গণেশ দে কেন গল্প লিখি?’ বলে একটি রচনায় তিনি একজন পাঠকের প্রশ্নের উত্তরে লিখেছিলেন।

বাংলা সাহিত্য তথা উত্তর-পূর্বের বাংলা সাহিত্যের একজন অন্যতম সাহিত্যিক গণেশ দে। তবে অসম তথা বাংলা সাহিত্যে গণেশ দে-র রচনা একটু কম আলোচিত হয়েছে।উত্তর পূর্বাঞ্চলের বাংলা সাহিত্য মানে পাঠকের মনে যেখানে ‘দেশভাগ’ নামক একটি তকমা গেঁথে গেছে; সেখানে দাঁড়িয়ে গণেশ দে এক অন্যরকম গল্প উপন্যাসের স্বাদ দিয়েছেন পাঠককে।

গণেশ দে-র জন্ম ১৯৪১ সালের ৮ই মে শিলচর শহরের লক্ষ্মীপুর গ্রামে এবং মৃত্যু ২০১৩ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর। তাঁর সাহিত্যিক জীবন ত্রিশ বছরের। তবে এরপরও তিনি তাঁর সাহিত্যিক জীবন শুধুমাত্র 'কলাম' লেখার মধ্যেই সীমিত রেখেছেন। এই সীমিত সময়ে গণেশ দে ছয়টি উপন্যাস, আটচল্লিশটি গল্প, হাজারেরও বেশি কলাম এবং বেশ কয়েকটি রম্যরচনা ও কবিতা রচনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাহিত্যের একটি বিশেষ স্থান আছে। উত্তর-পূর্বের বিশেষ করে অসমের কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিকরা উনিশ শতক থেকেই সাহিত্য রচনা করে আসছেন। একসময় এই অঞ্চলের সাহিত্যিকদের লেখা ছিল সাময়িকপত্র নির্ভর, কিন্তু প্রকাশনার অভাবে অনেক রচনা শুধুমাত্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে। 'নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্প উত্তর-পূর্ব' গ্রন্থের সম্পাদকীয় অংশে জানানো হয়েছে যে,

> "বাংলা সাহিত্যের কেন্দ্রের স্পটলাইটের আলো অবশ্য এত দূর পরিধিতে কখনই পৌঁছায় না। এ নিয়ে আক্ষেপের কিছু নেই। ইনার ইন্ডিয়ান বেঙ্গলি ডায়াসপোরার কোথায়ই-বা পৌঁছায় সেই আলো? মনে হয়, আলোর এই বিপ্রতীপ অবস্থান উত্তর-পূর্বের কথাকারদের মনে তেমন কোনো সংকট সৃষ্টি করতে পারেনি। বরং তাঁদের হয়তো স্বস্তিই দিয়েছে এজন্য যে তাঁদের সামনে ইঁদুর দৌড়ের কোনো অনিবার্য ট্র্যাক অপেক্ষা করে নেই। তাঁদের সামনে ঝুলে নেই ঘড়ি ধরে সাহিত্য উৎপাদনের পরোয়ানা। মূলত ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকা নির্ভর, অপেশাদার এ অঞ্চলের কথাকারদের যাবতীয় সৃজনকর্মই অন্তরতাগিদজাত বললে ভুল বলা হবে না।"[২]

কিন্তু বর্তমান সময়ে প্রকাশনার সমস্যাগুলো কিছুটা কমতে দেখা যায়। এবং তাঁর কৃতিত্ব দিতে হয় এই অঞ্চলের প্রকাশকদের। বাংলা সাহিত্যের বৃহৎ পরিসরে গণেশ দের নাম তুলনামূলকভাবে কম আলোচিত হলেও বিশ শতকের শেষের দিকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের তিনি বেশ জনপ্রিয় একজন লেখক ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে তিনি প্রথম কবি হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করলেও পরবর্তীকালে তিনি উপন্যাস, কলাম, রম্যরচনাকার হিসেবেই বেশ পরিচিত ছিলেন।আমরা জানি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাহিত্যের একটি বড় বৈশিষ্ট্য 'দেশভাগের সাহিত্য' বা আমরা বলতে পারি দেশভাগকেন্দ্রিক রচনার জন্যই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিশেষ করে অসমের বাংলা সাহিত্য আজ সারা দেশে পরিচিত। কিন্তু গণেশ দে-র সমগ্র সাহিত্যের দু-একটি রচনা বাদ দিলে প্রায় সব রচনাতেই আমরা উক্ত প্রচলিত ধারার পরিবর্তে সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে এক জীবনবোধের কথা বা মানুষের মনের ভাবনার কথা দেখতে পাই।

এখানে উল্লেখ্য ভারতবর্ষ বা অসমের রাজনীতিতে যে পালাবদল বা দেশভাগের মতো বড় ঘটনা ঘটেছে, তার ছাপ গণেশ দের উপন্যাস বা গল্পে তেমন উঠে আসেনি। আর হয়তো এই জন্যই বর্তমান সময়ের অনেক পাঠক ও গবেষকের কাছে গণেশ দের নামটি অনালোচিত হয়ে আছে। আবার অন্যভাবেও বলা যায় যে 'দেশভাগ' বিষয়টি যখন অসমের সাহিত্যিকদের মূল বিষয় তখন সেই সময়ে এক অন্য স্বাদের রচনা লিখে পাঠকদের মন জয় করেছিলেন গণেশ দে।

আমাদের প্রস্তাবিত আলোচনার বিষয় গণেশ দের 'অতি সাধারণ এক কাহিনি': একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন'। 'অতি সাধারণ এক কাহিনি' গল্পে লেখক গল্পকথক।গল্পে লেখক ও এক রিকশাওয়ালার কথোপকথনের মধ্য দিয়ে সমাজের নানা রূপ আমাদের সামনে উঠে এসেছে। গল্পে যেমন উঠে এসেছে সরল মনের মানুষদের কথা, তেমনি উঠে এসেছে মদ্যপান সমাজের কথা। আবার কীভাবে উচ্চশ্রেণির মানুষের অর্থবলের কাছে নিরুপায় রিকশাওয়ালা নিজের প্রেমকে সামনে দেখেও কিছু বলতে পারে না– সেই ছবিও ধরা পড়ে।

গল্পটি লেখকের সাহিত্য-জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ের হওয়ায় গল্পের কাঠামোয় কিছুটা দুর্বলতা থাকলে লেখকের অভিজ্ঞতায় তা একটি অসাধারন গল্পের রূপ নেয়। গল্পটি যদি আমরা আলোচনা করি দেখেতে পাই, কালাচাঁদ যার ভালো নাম চন্দ্রশেখর, যে একজন রিক্সাওয়ালা এবং গল্পকথক যার ভালো নাম মনোময়, তিনি অবশ্য কোনো অফিসের বড়বাবু। তবে তারা একসঙ্গে মদ খায়। একদিন রাতে তারা খুব মদ পান করে এবং সেদিনই কালাচাঁদ তার অন্তরের সমস্ত ব্যাথা মনোময়ের কাছে উগড়ে দেয়। চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী ওরফে কালাচাঁদ আসলে মূর্খ অশিক্ষিত রিক্সাওয়ালা নয়, সে হল ক্লাস নাইন পাস এক দরিদ্র পরিবারের সন্তান যে উঁচু তালার মানুষদের চক্রান্তের শিকার হয়ে সর্বশ্রান্ত হয়ে শহরে আসে জীবিকার তাগিদে, সেই সঙ্গে অনেকটা স্বপ্ন নিয়ে তার ভালোবাসার মানুষের সাথে সংসার করার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু তার সেই স্বপ্ন সমাজের কলুষিতায় বাস্তবে রূপ নিতে পারেনি, কেননা সে চন্দ্রশেখর থেকে হয়ে ওঠে রিক্সাওয়ালা কালাচাঁদ। রিক্সাওয়ালা কালাচাঁদ হয়ে ওঠার পেছনে কাকতালীয়ভাবে মনোময়কেই যেন কিছুটা দায়ী করা হয়, কেননা চন্দ্রশেখর শহরে এসে বিভিন্ন অফিসে দরখাস্ত দেয়, সেই সঙ্গে অফিসের বড়বাবু মনোময়ের কাছেও পিয়নের চাকরির জন্য দরখাস্ত দেয়; কিন্তু তা মঞ্জুর হয় না।

আমরা জানি জীবিকা মানুষের জীবনকে টিকিয়ে বা বাঁচিয়ে রাখে। তাই সব জীবিকাই নিজস্ব গুনে বিদ্যমান কোন জীবিকাই ছোট নয়। তবুও যোগ্যতা সম্বন্ধে জীবিকা অর্জন সবারই প্রাপ্য। চন্দ্রশেখর যেহেতু নাইন পাস করেছিল, তাই সে পিওনের চাকরির দরখাস্ত করেছিল। আমাদের সমাজ ব্যবস্থা একটা মানুষের জীবিকার উপর ভিত্তি করে মূলত তার ব্যক্তিত্ব বিচার করে। লেখকের ভাসায়- "গতকাল পর্যন্ত পেলে রিকশা ছেড়ে ভদ্রজীবনে প্রবেশ করতাম।"[৩] অর্থাৎ যদি সে রিক্সাওয়ালা না হয়ে পিওন হত, তবে ভদ্রসমাজে স্থান পেত। আজ রিকশাচালক বলে 'So Called' ভদ্র সমাজে জায়গা পায়নি। এখানে গল্পকার ভদ্র সমাজের পথিক হিসেবে মনোময় চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। গল্পকালের ভাষায়- "জীবনসন্ধানী তাই সর্বস্তরের লোকের আড্ডাতেই ওর যাওয়া আসা আছে।এই রিক্সাওয়ালাদের সাথেও ওর বেশ মেলামেশা ওটা অবশ্য গভীর রাতে।"[৪] অর্থাৎ দিনের আলোতে মিশলে সমাজের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে, তাই সে গভীর রাতে মেলামেশা করে সেই সঙ্গে রাতে নিজের বড় চাকরির পরিচয়টাও তাকে আড়াল রাখতে হয়। তাইতো আজও মদ পান করা ভদ্র সমাজে 'ফ্যাশন' আর সমাজের নিম্নস্তরে সেটাই হয়ে ওঠে 'মাতলামি'। উঁচু তালা লোকদের কাছে একটি পিয়নের চাকরি হয়তো সামান্য, কিন্তু নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের কাছে এই সামান্য চাকরি আকাশের চাঁদ পাওয়ার সমান। তাদের কাছে শুধু এটা চাকরি নয়, হাজারও রঙিন স্বপ্ন। সেই স্বপ্নটা একদিন চন্দ্রশেখর দেখেছিল–

> "গতকাল পর্যন্ত পেলে রিকশা ছেড়ে ভদ্র জীবনে প্রবেশ করতাম। গোঁফ-দাড়ি ফেলে কালাচাঁদ আবার চন্দ্রশেখর হতাম। চামিলিকে আনিয়ে নিতাম। একখানা সংসার ছোট্ট, বুঝলে লেখকবাবু ছোট্ট সংসার করতাম।"[৫]

চামেলি কালাচাঁদের মনের মানুষ। যাকে সে কথা দিয়ে এসেছিল, চাকরি পেয়ে শহরে নিয়ে এসে দুজনে বিয়ে করবে আর ভালোবাসা দিয়ে ছোট্ট সংসার করবে। চামিলিও কেঁদে কেঁদে বলেছিল— "সারারাত না-ঘুমানো ফোলা চোখ জলে ভরে বলেছিল তাড়াতাড়ি তাকে নিয়ে আসতে।"[৬] কিন্তু এই অপেক্ষারত মেয়েটি অপেক্ষায় করে গেল, তার ভালোবাসার মানুষটিকে আর ফিরে পেল না।

এখানে গল্পকার অতি-নিম্নবিত্ত পরিবারের ব্যর্থ প্রেমের কাহিনিটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। দুটি সহজ সরল মানুষের নিষ্পাপ প্রেম শুধুমাত্র চাকরি না পাওয়ায় তরুণ শূন্যে হারিয়ে গেল। যখন কালাচাঁদ সবকিছু হারিয়ে একা হয়ে পড়েছিল; ঠিক তখনই চামেলির জন্যই শহরে এসেছিল, টাকা রোজগার করে তাকে বিয়ে করবে

বলে। তাই তার বাঁচার একমাত্র উৎস চামেলিকে যখন সে ফিরে পেল না, তার বাঁচার ইচ্ছেটাই চলে গেল। বছরের পর বছর কত মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে আসে জীবিকা অর্জনের আশায়, না জানি কত স্বপ্ন ভেঙে যায় এভাবে সকলের অগোচরে। দূর থেকে তো সমুদ্রে কেউ কত সুন্দর মনে হয়। কিন্তু জলে নামলে বোঝা যায় সমুদ্রের ঢেউ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কতটা কষ্টকর। শহরটা ও ঠিক এই সমুদ্রের মতো, এখানেও গ্রামের সহজ সরল মানুষদের টিকে থাকা ঠিক ঢেউয়ের মতোই কষ্টকর। শহরের সভ্য সমাজে টিকে থাকাটাই বড় 'চ্যালেঞ্জ।'

চন্দ্রশেখর হাত ধরে চামেলিকে শহরে আসতে না পারলেও, সে আসে কোন এক ধনী বাবুর হাত ধরে। ঘটনাচক্রে কালাচাঁদের রিকশাতেই চামিলিকে অন্য পুরুষের সাথে ঘনিষ্ট হতে দেখেছিল, তখন কালাচাঁদ তা সহ্য করতে পারছিল না, আর তাই তার জমানো সব টাকা দিয়ে বিলাতি মদ খেয়ে মাতলামি করেছিল। এবং নিজের দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা সব মনোময়কে বলতে গিয়েই মনোময় বুঝতে পারে চামিলের সঙ্গে সেই অন্য পুরুষটি আর কেউ নয়, স্বয়ং সে। লেখকের ভাষায়- "...কী যেন বলেছিল মেয়েটি ভীরু কাঁপা কাঁপা স্বরে... চামিলিই তো!"[৭] চামেলিকে আসলে শহরে 'আমদানি' করা হয়েছিল অর্থাৎ মেয়েটিকে বিক্রি করে দেওয়া হয়। আর কাকতালীয়ভাবে ট্যাকসো অফিসের বড়বাবু মনোময় চড়া দামে মেয়েটিকে কিনে নিয়েছিল। "চড়া দামে মাসি ওর জন্য মনোময়কেই মাত্র ঠিক করেছে।"[৮] এখানে গল্পকার সমাজের এক করুণ নগ্ন রূপকে তুলে ধরেছেন। যেই ভদ্র সমাজ নারীদের মা দুর্গা, দেবী সরস্বতী রূপে পূজা করে, সেই সমাজেরই এক শ্রেণীর মানুষ মেয়েদের অন্য রূপে বিক্রি করে দিল। তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থান বোঝাতেই লেখক মেয়েটিকে 'আমদানি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

স্বাভাবিক ভাবে যখন মনোময় বুঝতে পারে যে, এই মেয়েটি আসলে কালাচাঁদের চামেলি আর তার অফিসেই পিয়নের দরখাস্তটি রিজেক্ট করায় আজ চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী কালাচাঁদে পরিবর্তিত হয়েছে। মনোময় ভীষণভাবে অনুতপ্ত হয় এবং কালাচাঁদকে বলে, "...আচ্ছা তুই যদি চাকরিটা পাস, তবে তুই কি করবি?"[৯] উত্তরে কালাচাঁদ জানায় চামেলির জন্যই তার এই লড়াই; আর সেই যদি অন্য পুরুষের হয়ে যায়, তাহলে তার আর চাকরি দিয়ে ভদ্র সমাজে জায়গা করার কোন ইচ্ছা নেই। এ যেন এক ব্যর্থ প্রেমের কাহিনি যা টাকার কাছে হেরে যায়। যদিও তাদের চাহিদা ছিল খুবই সামান্য, তবুও নিষ্পাপ ভালোবাসা ধন-সম্পত্তির কাছে হার মানল।

অনুতপ্ত মনোময় পরিশেষে সিদ্ধান্ত নিল যে চন্দ্রশেখর চক্রবর্তীর 'রিজেক্ট' দরখাস্তটি বের করে তার একটা 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার' দেবে আর তার চামেলিকেও ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু এখন প্রশ্ন হল চামেলিকে ফিরে পেলেও এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের একজন হয়ে চন্দ্রশেখর কি মেয়েটির সতীত্বকে দূরে ঠেলে তার অতিকাঙ্ক্ষিত ভালোবাসার নারীকে ঠিক আগের মতোই আঁকড়ে ধরে সারা জীবন বাঁচতে চাইবে? ...এই প্রশ্নের উত্তর পাঠকদের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিয়ে গল্পকার তাই নিয়তিকেই বেছে নেন। আর এই নিয়তের অভিশাপে কালাচাঁদের আচমকা গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয়।

এদিকে গ্রামের সেই সহজ-সরল মেয়েটির রঙিন স্বপ্নকে বাস্তববায়িত করার উদ্দেশ্যে মনোময় চামিলিকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। "...তারিখটা ঠিক করে ফেলি?"[১০] আমরা অনুমান করতেই পারি যে গল্পকার গণেশ দে নারীদের যথেষ্ট সম্মান করতেন আর তাই চামেলির মতো 'আমদানি করা' মেয়েটিকেও তিনি সম্মানের আসনে বসিয়েছেন। কেননা তিনি বুঝেছিলেন বিনা স্বার্থে মেয়েটি এই নগ্ন কলুষিত সমাজের বেড়াজালে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছিল। হয়তো উপযুক্ত সমাজ কাঠামো পেলে কোনদিনই কোনো মেয়ে পণ্য

হিসেবে ব্যবহৃত হতো না। এই গল্পে লেখক তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার সব নীতিকেই কুঠারাঘাত করেছেন। আর এখানেই গল্পকার গণেশ দে একটি 'অতি সাধারণ একটি গল্প'-কেও তিনি অসাধারণ করে তুলেছেন।

গণেশ দে-র অনেক গল্পেই উঠে এসেছে বিশ শতকের শেষের দিকের সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক জীবন। কোন কোন গল্পে উঠে এসেছে লেখকের নিজস্ব জীবনের অভিজ্ঞতার কথা। গণেশ দের সমসাময়িক লেখকরা যেসময় দেশভাগ, দাঙ্গা, নাগরিকত্ব প্রমাণ ইত্যাদি বিষয়কে রচনার কেন্দ্র করে গল্প উপন্যাস লিখেছিলেন, তখন গণেশ দে ছিলেন সেসকল লেখকদের থেকে ছিলেন স্বতন্ত্র। হয়তো তাঁর খুব কম লেখাতেই দেশভাগের কথা উঠে এসেছে কিন্তু তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য ছিল পাঠককে রসবোধ দেওয়া, আর সেটা তাঁর রচনা পাঠ করলেই বোঝা যায়। এখানে আমরা এটাও বলতে পারি যে, লেখকের সমকালীন সময়ে প্রকাশনার কাজ যদি আজকের মতো হত তাহলে অন্যান্য লেখকদের মতো তিনিও আজ বহু চর্চিত একজন লেখক উয়ে উঠতেন। তবে এও ঠিক বর্তমান সময়ে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সমস্ত কিছু প্রকাশ করার তাগিদা অনেক প্রকাশনা দেখাচ্ছে।ফলে আগন্তুক দিনে গণেশ দে-র সাহিত্য শুধু অসম নয় ভারতবর্ষের প্রতিজন পাঠকের কাছে পৌঁছে যাবে।

পরিশেষে গণেশ দের 'কেন গল্প লিখি' রম্য রচনা থেকে কয়েকটি কথা উল্লেখ করে আমাদের এই আলোচনা সমাপ্ত করব। তিনি লিখেছেন,

"কেন গল্প লিখি? এমন একটা বেয়ারা প্রশ্নের সামনে কোনদিন দাঁড়াতে হবে জানলে হয়তো গল্পই লিখতাম না। এই প্রশ্নটার দুটো অর্থ করে নেওয়া যায়। সোজা অর্থটা হলো আমার গল্প লেখার কারণগুলি কি অর্থাৎ আমার গল্পগুলো সত্যিই ভালো গল্প হয় সুতরাং এই গল্প লেখার প্রেরণা আনন্দ উৎসব ইত্যাদি জানতে ইচ্ছে করে। আরেকটা অর্থ হতে পারে ওহে বাপু গনেশ দে, তুমি যে গল্প নামে উদ্ভট কি সব লেখ ওগুলোর তো কোন উদ্দেশ্য বিধেও খুঁজে মেলেনা তবুও বাপু তুমি কেন গল্প লেখ। ...যারা পেশাদার লেখক তারা তো স্রেফ চাল ডাল তেল নুন অসাধ্য টাকার জন্য লেখেন কিন্তু আমি কেন লিখি? আমাদের বরাক উপত্যকায় তো গল্প লিখে টাকা পাওয়া যায় না গল্প লিখে এখানে হয়না কিছুই তবু তো লিখি। কেন লিখি এই প্রশ্নটা আমাকে যতদিন কেউ করেননি ততদিন এর উত্তর নিয়ে মাথা ঘামায়নি। একবার ভেবেছিলাম প্রশ্নটা নিয়ে কোন পণ্ডিত ব্যক্তির গোচনাস্ত হই গিয়ে বলি ও পন্ডিতমশাই বলে দিন না আমি কেন গল্প লিখি কিন্তু ভেবে দেখেছি তারপর তা যা ঘটতে পারে তার কোনটাই আমার পক্ষে সুখ কর বা আহ্লাদপ্রদ হবার কথা নয়। তাই হাত দেই নিজের ছোট ঝুলিকে শতাব্দি আগে এই শহর শিলচরেই আমার গল্প লেখার হাতে খড়ি। তখন শিলচরের আনকোরা বিশ্লেষণ কোভিদ শহর অতন্দ্র শতাব্দী লুব্ধ কবিসংবাদ প্রকৃতির কবিতা পত্রিকা পত্রিকা মৌচাকে ঝাকে ঝাকে কবি মৌমাছির গুন গুন কবি বন্ধুদের পদ্মচাঁপা গোলাপ গন্ধরাজের মধু আহরণের সাথে আমিও গুলো কবি হয়ে ঘেটু আকন্দ ধুতুরা প্রভৃতি উচা ফুলের মধু আহরণে ব্যস্ত। ফুলকপি কথাটা আমি মন্দ অর্থে ব্যবহার করছি না ভুল থাকে যার সেই তো হল।যাইহোক কবিতা অথবা পদ্মের সেই জগা ঝম্পক কীর্তনের তীরে হঠাৎ মনে হল কবিতা তো হচ্ছে প্রচুর কিন্তু গল্প কই সোমবার নামক কাগজটায় শঙ্কর গুপ্ত আর মহিউদ্দিন এই দুজন মাঝে মাঝে গল্প লিখতেন ঝোঁকের মাথায় প্রকাশ করলাম শনিবার বিকেল নামের একটি গল্প পত্রিকা। এই পত্রিকা স্লোগান দিলাম কাছাড়ে ধানের চেয়ে কবিতার ফলন বেশি এবার কিছু গল্প চাই গল্প লিখুন দু-চারটে গল্প এবং বেশ কিছু না গল্প এল কিন্তু জমলো না তিন ইস্যুতে গল্প পত্রিকার কর্মক আবার কিন্তু আমার গল্প লেখা শুরু হয়ে গেল অসুবিধা রয়ে গেল প্রকাশের স্থানীয় পত্রিকা গুলোর পূজা সংখ্যায় গল্পকারদের ভরসা এরপর অবশ্য আকাশবাণী হয়েছে সাহিত্যের আসর বসেছে তাতে অন্তত গোটা গল্প প্রচারিত হয়েছে আমার। এই তথ্য

থেকে যে তথ্যটা পাওয়া গেল তা হচ্ছে মূলত আমি গল্প লেখা শুরু করি বরাক উপত্যকার ছোট গল্পের ধারাকে পুষ্ঠ করার চেষ্টায়।

চোখের সামনে কোন ঘটনা ঘটতে দেখলে আমার মনে হয় এটা তো অন্যরকম পরিণতি পেতে পারত যা আমাদের কাম্য প্রার্থিত তখনই গল্প লেখার প্রেরণা পাই নানা ঘটনার সমষ্টি এই জীবন যা হতে চায় সেই ব্যাকুলতার পেছন পেছন আমার গল্প লেখার তীর্থ যাত্রা। এছাড়া রয়েছে দৃষ্টিকোণের বিভিন্নতা ইচ্ছে করে আমার দৃষ্টি করে দেখা জীবনটা অন্যকে দেখায় আর সেই তাকে দিয়ে কলমে ভারত গড়তে হয় গল্পের কালি।

বর্তমান মধ্যবিত্ত জীবন যেন এক মোটামুটি সুদৃশ্য কাঠের আসবাব ঘুনে ধরেছে তার সর্বাঙ্গে অদৃশ্য গুণ প্রকার রাত-দিন কাঠ কাটার নির্দয় শব্দ আমাকে আহত করে অশ্লীল করে বাজার ব্যাগ বয়ে চলা নূর পদক্ষেপে চা দোকানের দশ বছরের শিশু শ্রমিকের সমিতির মলিন চোখে সেকেন্ড হ্যান্ড পোশাকে ফিটফাট সেজে থাকা বেকার যুবকটির কৃত্রিম চালচলনে যে জীবন আঁকুপাঁকু করে তাকে সবার সামনে মিলে ধরার তাগিদেই আমি গল্প লিখি।

সর্বোপরি আমি গল্পের জন্য গল্প লিখি না চাবুক আর তুলিকে এক করে আমি গল্প লিখে জীবনের জন্য।"[১১]

তথ্যসূত্র:

১) দে, গণেশ। 'গল্পসমগ্র', যাপনকথা। শোণিতপুর, অসম, প্রথম প্রকাশ– মার্চ ২০১৯, পৃ. ২২।
২) চক্রবর্তী, মিতা। ভারতীয়, সৌমেন ও কর, দীপংকর। 'নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্প উত্তর-পূর্ব' (সম্পাদক)। ভি কি পাবলিশার্স, গুয়াহাটি, প্রথম প্রকাশ ২০১৬, পৃ. ২২।
৩) দে, গণেশ 'গল্পসমগ্র', যাপনকথা। শোণিতপুর, অসম, প্রথম প্রকাশ– মার্চ ২০১৯, পৃ. ৩০।
৪) তদেব, পৃ. ৩০।
৫) তদেব, পৃ. ৩০।
৬) তদেব, পৃ. ৩০।
৭) তদেব, পৃ. ৩১।
৮) তদেব, পৃ. ৩১।
৯) তদেব, পৃ. ৩০।
১০) তদেব, পৃ. ৩০।
১১) তদেব, পৃ. ২১।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 853- 859
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.298

শরৎচন্দ্রের ‘পল্লী-সমাজ’ উপন্যাসে জ্যাঠাইমা: কাহিনি বিন্যাসে এক প্রভাবশালী চরিত্রের মূল্যায়ন

নিরঞ্জন মণ্ডল, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সাঁকরাইল অনিল বিশ্বাস স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 22.03.2026; Accepted: 24.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In the novel ‘Pallisamaj’ a vivid and realistic reflection of rural life and its social crises is prominently observed. Various forms of social conflict, tension, superstition, and class-based divisions within the rural community are clearly depicted. Alongside highlighting the problems inherent in the social structure, the novel also explores the possibilities of social reconstruction, where women play a significant representative role. The objective of this research paper is to analyze the representative position of women in ‘Pallisamaj’ and to examine how their roles are reflected in the process of social reconstruction. The novel demonstrates that women in rural society are not confined merely to the domestic sphere; rather, they serve as important bearers of social values, morality, and human compassion. The empathy, self-sacrifice, moral strength, and social awareness of women function as powerful forces in resolving social crises. Furthermore, through the portrayal of female characters, the novelist illustrates that the presence and active participation of women are essential for bringing about social change. At times, they emerge as voices of protest, while at other times they act as supportive forces in promoting social reform and education. Thus, women are not merely passive members of society but emerge as crucial representatives in the process of social reconstruction. This research aims to discuss the role, social position, and representative significance of women in ‘Pallisamaj’. Through this analysis, it becomes evident that women play a profoundly important and relevant role in resolving social crises and in building a humane and progressive society.

Keywords: Social Conflict, Superstition, Social Crisis, Social Reform, Women's Representation

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘পল্লী-সমাজ’ উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যে গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার এক বাস্তবসম্মত প্রতিচিত্র। যেখানে সমাজের নানা সংকট, দ্বন্দ্ব ও পরিবর্তনের সম্ভাবনা গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এই উপন্যাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল নারীর অবস্থান ও ভূমিকা, যা কেবল পারিবারিক পরিসরে সীমাবদ্ধ নয়, বরং বৃহত্তর সমাজ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রেও তা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মধ্যে

আবদ্ধ থেকেও নারীরা কীভাবে নৈতিকতা, সহমর্মিতা ও মানবিক মূল্যবোধের ধারক হিসেবে সমাজকে নতুন দিশা দেখাতে সক্ষম 'পল্লী-সমাজ'-এ তারই সুস্পষ্ট প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসে নারীরা একদিকে যেমন সামাজিক কুসংস্কার, অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের শিকার, অন্যদিকে তেমনি তারা এই প্রতিকূলতার মধ্যেই মানবিকতা ও ন্যায়বোধের শক্ত ভিত্তি রচনা করেছে। জ্যাঠাইমার মতো চরিত্রের মাধ্যমে লেখক দেখিয়েছেন, কীভাবে একজন নারী তার প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা সমাজের সংকীর্ণতা ভেঙে একটি বৃহত্তর মানবিক চেতনার বিকাশ ঘটাতে পারেন। তার বক্তব্যে প্রতিফলিত হয় যে, সমাজের সমস্যাগুলির মূলে রয়েছে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য ও অজ্ঞতা এবং এই উপলব্ধি সমাজ পুনর্গঠনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া, নারীদের এই প্রতিনিধিত্বমূলক অবস্থান কেবল ব্যক্তি বা পারিবারিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং তা সমাজের নৈতিক কাঠামোকে পুনর্গঠিত করার এক অন্তর্নিহিত শক্তিতে পরিণত হয়। তারা সরাসরি ক্ষমতার অধিকারী না হলেও, তাদের চিন্তা, মূল্যবোধ ও সহানুভূতির মাধ্যমে সমাজের গতিপথকে প্রভাবিত করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে 'পল্লী-সমাজ' উপন্যাসে নারীর উপস্থিতি এক ধরনের নৈতিক নেতৃত্বের প্রতীক, যা সমাজ পরিবর্তনের এক অনিবার্য উপাদান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। অতএব, 'পল্লী-সমাজ' উপন্যাসের নিরিখে নারীদের প্রতিনিধিত্বমূলক অবস্থান বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয় যে, সমাজ পুনর্গঠনের প্রক্রিয়ায় তাদের ভূমিকা নীরব হলেও অত্যন্ত গভীর ও প্রভাবশালী। এই প্রবন্ধে সেই ভূমিকার বহুমাত্রিক দিকগুলি বিশ্লেষণ করার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে।

এই আলোচনার মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে উপন্যাসের বিভিন্ন প্রসঙ্গ উল্লেখ করে কীভাবে বিশ্বেশ্বরী দেবী একজন সমাজ পুনর্গঠনের কান্ডারী হয়ে উঠেছেন। একটা সুন্দর ও সুস্থ সমাজ গড়ে তোলার জন্য তিনি কীভাবে রমেশকে তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন আবার রমাকেও তিনি জমিদারির প্রশাসনিক জটিলতা থেকে একটি সুন্দর জীবনের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। আসলে বিশ্বেশ্বরী দেবী সকলের অন্ধকার দূর করার প্রচেষ্টার ত্রুটি রাখেননি। উপন্যাসের বিভিন্ন প্রসঙ্গের আলোকে উপলব্ধি করতে পারা জায় যে বিশ্বেশ্বরী দেবী কীভাবে এক অনন্য সমাজসংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি কেবল তাত্ত্বিকভাবে নয়, বাস্তব কর্মধারার মধ্য দিয়েই সমাজ পুনর্গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। একটি সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি রমেশকে ধীরে ধীরে আদর্শ ও মানবিক মূল্যবোধে গড়ে তুলেছেন। একই সঙ্গে রমাকেও তিনি জমিদারির জটিল প্রশাসনিক পরিসর থেকে সরিয়ে এনে এক স্বচ্ছ ও শান্তিপূর্ণ জীবনের পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করেছেন। মূলত, বিশ্বেশ্বরী দেবীর চরিত্রে এক আলোকবর্তিকার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া গিয়েছে— যিনি নিজের প্রজ্ঞা, সহমর্মিতা ও দৃঢ় মানসিকতার মাধ্যমে চারপাশের অন্ধকার দূর করার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তাঁর এই নিরবচ্ছিন্ন সাধনাই তাঁকে সমাজ পুনর্গঠনের এক প্রকৃত কান্ডারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পল্লী গ্রামের দুই জমিদার পরিবারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে 'পল্লী-সমাজ' উপন্যাসের প্লট নির্মাণ করেছেন। দুই পরিবারের জমিদারি রক্ষার লড়াইকে কেন্দ্র করে তৎকালীন পল্লী সমাজের সমাজ ব্যবস্থা পরিচালিত হয়েছে। যেখানে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে চেনা যায় বিশ্বেশ্বরী দেবীর সামাজিক জ্ঞানের আলোর মাধ্যমে। উপন্যাসের চরিত্র গোবিন্দ গাঙ্গুলী, ধর্মদাস, বেনী ঘোষাল এদের প্রত্যেকের চরিত্রের অন্ধকার দিকটি বিশেষভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। তৎকালীন সময়ের একজন গৃহবধূ কীভাবে সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা পালন করতে পারেন তা বিশ্বেশ্বরী চরিত্রটির নির্মাণের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক পাঠকের কাছে উপস্থাপন করেছেন। সমাজের মূল সমস্যা সমাধানের মধ্য দিয়ে এক নতুন

সমাজ গড়ে তোলার কথা আমরা জানতে পারি। শত বাঁধার মধ্য দিয়েও জ্যাঠাইমা নিজের লক্ষ্যে সর্বদা অবিচল থেকেছেন। নিজের সন্তান অর্থাৎ বেণী ঘোষালের কুকর্মে তিনি লজ্জিত ও দুঃখিত হলেও সন্তানের প্রতি স্নেহ কখনও কমে যায়নি। তবে তিনি যখন বুঝতে পেরেছেন যে নিজের সন্তানের পরিবর্তন হওয়া একেবারেই অসম্ভব তখন তিনি সংসারকে পরিত্যাগ করার মাধ্যমে সন্তানকে পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এভাবেই জগত সংসারকে আর এক নতুন সংকটের মুখোমুখি করে জ্যাঠাইমা এই শিক্ষাই দেওয়ার চেষ্টা করেছেন যে, সংসারের পক্ষে যা কিছু মন্দ তা পরিত্যাগ করাই সংসারের জন্য মঙ্গল। তা যতই অনেক আপন হোক তবুও আমাদের বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষার জন্যই তা পরিত্যাগ করতে হবে। এভাবেই অন্দরমহলের এক নারীকে বৃহত্তর সমাজ গঠনের কারিগর হিসেবে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গড়ে তুলেছেন। সামাজিক নিয়মে এই সমাধান চিরন্তন নয়, কালের নিয়মে সব সময়ই সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর দুষ্ট চক্রান্তকারী মানুষেরা গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আবারও সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচারের খাড়া নামিয়ে আনবে আর তখনই প্রয়োজন হবে শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজের এই বলিষ্ঠ নারীদের। যাঁরা অন্তরে থেকেও বাহিরকে পরিষ্কারভাবে দেখতে পান। যখনই সমাজের উপর কালো মেঘের ছায়া পড়েছে তাঁরা বুঝতে পারেন তখনই নিজেদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের মধ্য দিয়েই সমাজকে পুনর্গঠনের কাজ শুরু করে দেন। তাইতো জ্যাঠাইমা রমেশ কে বলেছিল, রমেশ তাঁকে ডাকেনি, তিনি নিজেই এসেছেন। অর্থাৎ ভালো কাজ করবার জন্যে অন্যের আহ্বানের প্রয়োজন হয় না, নিজের উদ্যোগেই মানুষ এগিয়ে আসে। সমাজের সকল মুখোশধারীদের মুখোশ টেনে খুলে দেয় সাধারণ মানুষ আর তখন দেখতে পায় সেই মানুষগুলির প্রকৃত চেহারা। তাইতো বিশ্বেশ্বরী অর্থাৎ রমেশের জ্যাঠাইমা রমেশকে সমাজের শিক্ষা প্রসারের জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করার কথা বলেছেন। আমরা এইরকম আরও অনেক ঘটনা যা উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে তা অনুসন্ধান করে বোঝার চেষ্টা করেছি প্রকৃতপক্ষে এই উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলি কীভাবে সমাজকে আরও একটু এগিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিজেদের ঘাড়ে তুলে নিয়েছে।

জ্যাঠাইমার কথার মাধ্যমে গ্রামীণ সমাজের প্রকৃত চিত্র ফুটে ওঠে। তিনি রমেশকে বোঝাতে চান যে গ্রামের মানুষদের আচরণ যতই সংকীর্ণ বা স্বার্থপর মনে হোক, তার মূল কারণ তাদের দারিদ্র্য, অশিক্ষা এবং দুর্বলতা। এই বক্তব্যে নারীর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত স্পষ্ট। জ্যাঠাইমা এখানে একজন সমাজসংস্কারকের ভূমিকা পালন করেছেন, তিনি সমস্যাকে দোষারোপ না করে তার কারণ বিশ্লেষণ করছেন। নারীর এই সহানুভূতিশীল মনোভাব সমাজ পুনর্গঠনের জন্য অপরিহার্য। রমেশ প্রথমে গ্রামবাসীদের প্রতি ক্ষুব্ধ হলেও, জ্যাঠাইমার কথায় তার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ, নারী এখানে পরিবর্তনের প্রেরণা। সমাজের অশিক্ষা ও সংকীর্ণতা দূর করতে হলে ঘৃণা নয়, বরং সহানুভূতি ও বোঝাপড়া দরকার, এই শিক্ষা জ্যাঠাইমার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে বোঝা যায়, নারীরা শুধু পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তারা সমাজের নৈতিক দিশারী হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। রমার সততা ও নৈতিকতার প্রতি সমাজের বিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে। গোপাল সরকারের কথায় বোঝা যায়, রমা একজন নারী হয়েও সম্পত্তির ন্যায্য বণ্টনের ক্ষেত্রে এক নির্ভরযোগ্য চরিত্র। সে অন্যায়ভাবে কারও সম্পত্তি আত্মসাৎ করবে না, এই বিশ্বাস সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে নারীর প্রতিনিধিত্ব শুধু গৃহস্থলির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও বিস্তৃত। রমা ন্যায়পরায়ণতার প্রতীক। সমাজ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এই ধরনের নৈতিক নেতৃত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সমাজের ভিত শক্ত হয় তখনই যখন সেখানে বিশ্বাস ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অংশে ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন যে নারী শুধু আবেগপ্রবণ সত্তা নয়, বরং তারা ন্যায়বিচারের রক্ষকও হতে পারে।

রমার চরিত্র সমাজে এক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছে, যেখানে নারী সততা ও নৈতিকতার মাধ্যমে সমাজকে সুসংগঠিত করতে পারে। মানবজীবনের মূল্যবোধকে সম্পত্তির চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জ্যাঠাইমা এখানে রমাকে সতর্ক করছেন, বিষয়-সম্পত্তির জন্য যেন রমেশের মতো মানুষের জীবন ও আদর্শ নষ্ট না হয়। এটি নারীর দূরদর্শিতা ও মূল্যবোধের প্রতিফলন। সমাজ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এই চিন্তাধারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, যখন মানুষ সম্পত্তি ও স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়, তখন সমাজে দ্বন্দ্ব ও অবক্ষয় সৃষ্টি হয়। জ্যাঠাইমা সেই প্রবণতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। এই অংশে নারী চরিত্রটি সমাজের নৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করছে। তিনি শুধু পরিবার নয়, বৃহত্তর সমাজের কল্যাণের কথা ভাবছেন। তাঁর এই মানবিক ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সহায়ক। ফলে বোঝা যায়, নারীরা সমাজে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অপরিহার্য শক্তি। রমেশের মানসিক পরিবর্তন প্রকাশ পেয়েছে, যা জ্যাঠাইমার শিক্ষার ফল। তিনি বুঝতে পারেন যে গ্রামবাসীদের উপর রাগ করা অর্থহীন, কারণ তাদের সংকীর্ণতা আসলে অজ্ঞতা ও শিক্ষার অভাবের ফল। এখানে নারীর প্রভাব পরোক্ষভাবে কাজ করছে। জ্যাঠাইমার চিন্তাধারা রমেশকে আত্মবিশ্লেষণে সাহায্য করেছে। ফলে সে সমাজকে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে শিখেছে। এই উপলব্ধি সমাজ পুনর্গঠনের মূল ভিত্তি। কারণ, পরিবর্তন শুরু হয় নিজের চিন্তাভাবনা থেকে। নারীর প্রেরণায় এই আত্মজ্ঞান সম্ভব হয়েছে। তাই বলা যায়, নারী এখানে সমাজ পরিবর্তনের প্রাথমিক শক্তি হিসেবে কাজ করছে। উপন্যাসের একটি কেন্দ্রীয় দর্শন। এখানে 'আলো' বলতে বোঝানো হয়েছে শিক্ষা, জ্ঞান ও সচেতনতা। জ্যাঠাইমা বিশ্বাস করেন, অন্ধকার দূর করার একমাত্র উপায় হল জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেওয়া। নারীর এই দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত প্রগতিশীল। তিনি কোনো কঠোর শাসন বা দমননীতি নয়, বরং শিক্ষার মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের কথা বলেছেন। সমাজ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এই চিন্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, শিক্ষা মানুষকে সচেতন করে, তার বিচারবুদ্ধি উন্নত করে। জ্যাঠাইমা এখানে একজন আলোকপ্রদর্শক। তার এই আহ্বান নারীর নেতৃত্বের এক উজ্জ্বল উদাহরণ। পল্লীসমাজের অবক্ষয়ের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। রমেশ উপলব্ধি করে যে, একসময়ের আদর্শ গ্রামীণ সমাজ এখন মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছে। এই উপলব্ধির পেছনে জ্যাঠাইমার শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নারী এখানে সমাজের পতনের কারণ বুঝতে সাহায্য করেছে এবং পুনর্গঠনের পথ দেখিয়েছে। এই অংশে সমাজের ভণ্ডামি ও সংকীর্ণতার সমালোচনা করা হয়েছে। নারী চরিত্রের মাধ্যমে লেখক দেখিয়েছেন যে, সমাজকে পুনরুজ্জীবিত করতে হলে তার অন্তর্গত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা জরুরী। জ্যাঠাইমার দৃঢ়তা ও নেতৃত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি রমেশকে পালিয়ে যেতে নিষেধ করেন এবং তাকে সমাজসেবার কাজে অবিচল থাকতে উৎসাহিত করেন। নারীর এই দৃঢ়তা সমাজ পুনর্গঠনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, পরিবর্তনের পথে বাধা আসবেই। সেই বাধা অতিক্রম করার জন্য প্রয়োজন ধৈর্য ও স্থিরতা, যা জ্যাঠাইমার মধ্যে বিদ্যমান। তিনি এখানে একজন পথপ্রদর্শক ও প্রেরণাদাত্রী। তার এই ভূমিকা প্রমাণ করে যে, নারীরা সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম। এই উক্তিতে কঠোর বাস্তবতার প্রতিফলন দেখা যায়। জ্যাঠাইমা বোঝাতে চান যে, কিছু পরিবর্তন শুধুমাত্র কোমল পদ্ধতিতে সম্ভব নয়, কখনও কখনও কঠোর অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। এখানে নারী চরিত্রটি বাস্তববাদী। তিনি শুধু আদর্শবাদী নন, বরং বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে জানেন। সমাজ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সব সমস্যার সমাধান একরকম নয়। কখনও কঠোরতা, কখনও সহানুভূতি, উভয়ের সমন্বয় প্রয়োজন। জ্যাঠাইমা সেই ভারসাম্য রক্ষা করছেন। এই অংশে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গঠনের দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে। রমা তার সন্তানের দায়িত্ব রমেশের হাতে তুলে দিয়ে তার আদর্শে মানুষ করার আহ্বান জানিয়েছে। এখানে নারীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি শুধু বর্তমান নয়, ভবিষ্যৎ সমাজ নির্মাণের

কথাও ভাবছেন। সমাজ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে শিক্ষা ও আদর্শের গুরুত্ব এই অংশে স্পষ্ট। নারী এখানে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নির্মাতা হিসেবে উপস্থিত। রমার কথায় বোঝা যায় যে, রমেশের প্রচেষ্টা সফল হবে এবং সমাজে পরিবর্তন আসবেই। নারী এখানে আশার প্রতীক। তিনি পরিবর্তনের প্রতি বিশ্বাস রাখেন এবং অন্যদেরও সেই বিশ্বাস জাগিয়ে তোলেন। সমাজ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এই ইতিবাচক মনোভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, আশা ছাড়া কোনো পরিবর্তন সম্ভব নয়। রমার এই বিশ্বাস সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শক্তি জোগায়। রমেশের আত্মবোধের সূচনা দেখা যায়। সে উপলব্ধি করে যে, যদি সে গ্রাম ছেড়ে চলে যায়, তবে সমাজের সমস্যাগুলোর কোনো সমাধান হবে না। জ্যাঠাইমার কথার প্রভাবেই তার এই উপলব্ধি জন্মায়। এখানে নারী চরিত্রটি সমাজ পরিবর্তনের অনিবার্যতার কথা তুলে ধরে। এই বক্তব্যে বোঝা যায়, সমাজের দায়িত্ব থেকে পালিয়ে গেলে সমস্যার সমাধান হয় না। বরং সমস্যার মধ্যেই থেকে কাজ করতে হয়। জ্যাঠাইমা রমেশকে সেই শিক্ষাই দিয়েছেন। ফলে নারী এখানে সমাজের স্থায়ী শক্তি, যিনি মানুষকে দায়িত্ববান করে তোলেন। সমাজ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এই ধারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, পরিবর্তন আনতে হলে সমাজের ভেতরেই কাজ করতে হয়। নারীর এই দৃষ্টিভঙ্গি সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অন্যতম ভিত্তি। জ্যাঠাইমার আত্মসমালোচনার দিকটি ফুটে ওঠে। তিনি মনে করেন, রমেশের জেল হওয়ার পেছনে তার নিজেরও কিছু দায় আছে। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি এটাও উপলব্ধি করেন যে, এই শাস্তি রমেশের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল। এখানে নারীর গভীর আত্মজ্ঞান ও বাস্তববোধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি নিজের ভুল স্বীকার করতে জানেন, আবার বৃহত্তর কল্যাণের দিকটিও বিবেচনা করেন। সমাজ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এই মানসিকতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ভুল স্বীকার না করলে কোনো উন্নতি সম্ভব নয়। জ্যাঠাইমার এই দৃষ্টিভঙ্গি দেখিয়েছে যে, নারী সমাজের নৈতিক বিচারক হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। জ্যাঠাইমার আশাবাদী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বিশ্বাস করেন যে, রমেশ তার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সত্য উপলব্ধি করবে এবং আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসবে। এখানে নারী চরিত্রটি দূরদর্শী। তিনি জানেন যে, জীবনের কষ্ট ও অভিজ্ঞতা মানুষকে পরিপক্ক করে তোলে। তাই তিনি এই ঘটনাকে নেতিবাচক হিসেবে না দেখে ইতিবাচকভাবে মূল্যায়ন করে ছেন। সমাজ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এই আশাবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, পরিবর্তনের পথে ব্যর্থতা বা কষ্ট আসবেই। কিন্তু সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এগিয়ে যাওয়াই প্রকৃত উন্নতির পথ। নারী এখানে সেই দৃষ্টিভঙ্গির বাহক। রমার ন্যায়বোধ ও প্রশ্ন করার সাহস প্রকাশ পেয়েছে। সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলে এবং রমেশের শাস্তিকে ন্যায্য বলে মেনে নিতে পারে না। এখানে নারী চরিত্রটি প্রতিবাদী রূপে উপস্থিত। সে শুধু নিয়ম মেনে চলা নয়, বরং ন্যায়-অন্যায় বিচার করতে চায়। এই মনোভাব সমাজ পরিবর্তনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সমাজ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে প্রশ্ন তোলা একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। কারণ, প্রশ্ন ছাড়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে ওঠে না। রমার এই অবস্থান প্রমাণ করে যে, নারী সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারে। ভবিষ্যতের এক ইতিবাচক চিত্র আঁকা হয়েছে। জ্যাঠাইমা বিশ্বাস করেন যে, রমেশ ফিরে এসে দেখবে সমাজ তার জন্য প্রস্তুত, মানুষ তাকে চিনেছে এবং ভালোবেসেছে। এখানে নারী চরিত্রটি আশার প্রতীক। তিনি সমাজের পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে সামনে নিয়ে আসেন। সমাজ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এই আশাবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, পরিবর্তনের জন্য মানুষের মধ্যে বিশ্বাস জাগানো প্রয়োজন। জ্যাঠাইমা সেই বিশ্বাস সৃষ্টি করেছেন। গ্রামীণ সমাজের বিচারব্যবস্থা ও কর্তৃত্বের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে। রমেশের প্রতি সমাজের আস্থা এখানে স্পষ্ট। এখানে বোঝা যায়, একজন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সমাজ কীভাবে গ্রহণ করে। নারীর প্রেরণায় রমেশ যে আদর্শে গড়ে উঠেছে, তার ফলস্বরূপ সমাজ তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে। সমাজ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এই বিশ্বাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কারণ, নেতৃত্বের প্রতি আস্থা না থাকলে কোনো পরিবর্তন সম্ভব নয়। রমার মাতৃত্ববোধ ও আদর্শবোধ প্রকাশ পেয়েছে। সে তার সন্তানকে এমনভাবে গড়ে তুলতে চায়, যাতে সে রমেশের মতো নিঃস্বার্থ ও আদর্শবান হয়। এখানে নারী ভবিষ্যৎ সমাজ নির্মাণের প্রধান কারিগর। তিনি শুধু সন্তানের লালন-পালনই করেন না, বরং তাকে আদর্শে গড়ে তোলেন। সমাজ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এই ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ভবিষ্যৎ প্রজন্মই সমাজের ধারক ও বাহক। নারীর এই দায়িত্ব সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। বংশগত আদর্শ ও মূল্যবোধের কথা বলা হয়েছে। রমা বিশ্বাস করে যে, তার সন্তানের মধ্যে পূর্বপুরুষদের ত্যাগের গুণ বিদ্যমান। এখানে নারী চরিত্রটি মূল্যবোধের ধারক হিসেবে উপস্থিত। তিনি বিশ্বাস করেন যে, সঠিক শিক্ষার মাধ্যমে এই গুণাবলি বিকশিত করা সম্ভব। সমাজ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এই ধারণা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সমাজের উন্নতির জন্য ত্যাগ ও আদর্শ অপরিহার্য। সমাজের ভুল ও তার সংশোধনের প্রক্রিয়া তুলে ধরা হয়েছে। রমা স্বীকার করেছে যে, তারা নিজেদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে রমেশকে কষ্ট দিয়েছে। এখানে নারীর আত্মসমালোচনার ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি নিজের ভুল বুঝতে এবং তা সংশোধন করতে প্রস্তুত। সমাজ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এই মনোভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ভুল স্বীকার না করলে উন্নতি সম্ভব নয়। রমেশের পূর্ণ রূপান্তরের কথা বলা হয়েছে। সে আর বাইরের কেউ নয়, বরং সমাজেরই একজন অংশ হয়ে উঠেছে। এখানে নারী চরিত্রটি এই পরিবর্তনের স্বীকৃতি দিচ্ছে। রমার কথায় বোঝা যায় যে, রমেশ এখন সত্যিকারের সমাজসেবক। সমাজ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এই অন্তর্ভুক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সমাজের ভেতর থেকেই পরিবর্তন আনতে হয়।

'পল্লী-সমাজ' উপন্যাসের আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, সমাজ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা কেবল সহায়ক নয়, বরং নেতৃত্বমূলক ও দিকনির্দেশনামূলক। গ্রামীণ জীবনের নানা সংকট, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কার ও সামাজিক বৈষম্যের মধ্যে নারী চরিত্রগুলি মানবিকতা, সহমর্মিতা এবং বাস্তববোধের মাধ্যমে সমাজকে নতুন পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সচেষ্ট হয়েছে। উপন্যাসের নারী চরিত্ররা প্রথাগত গণ্ডি অতিক্রম করে সমাজের অন্তর্গত সমস্যাগুলিকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছে এবং তার সমাধানের পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছে। বিশেষত জ্যাঠাইমার মতো চরিত্রের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন, নারীর দৃষ্টিভঙ্গি কতটা সংবেদনশীল ও বাস্তবসম্মত হতে পারে। তিনি কেবল ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রেই নয়, সমগ্র গ্রামীণ সমাজের সমস্যার মূল কারণ দারিদ্র্য ও অশিক্ষা চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন। এই উপলব্ধিই সমাজ পুনর্গঠনের প্রথম ধাপ। নারীরা এখানে প্রতিবাদী না হয়েও পরিবর্তনের শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে, তাদের ধৈর্য, সহিষ্ণুতা এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সহায়ক হয়েছে। এছাড়া, নারী চরিত্রগুলির মধ্যে যে নৈতিক দৃঢ়তা ও মূল্যবোধের চেতনা লক্ষ্য করা যায়, তা সমাজের ভাঙন রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তারা সম্পর্ক রক্ষা, পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক সংহতি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। ফলে বোঝা যাচ্ছে যে, সমাজের পুনর্গঠন কেবল বাহ্যিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সম্ভব নয়, এর জন্য প্রয়োজন অভ্যন্তরীণ মানসিক ও নৈতিক রূপান্তর, যা নারীর মাধ্যমে কার্যকরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। সার্বিকভাবে বলা যায়, 'পল্লী-সমাজ' উপন্যাসে নারীরা নিছক গৃহবন্দী চরিত্র নয়, বরং তারা সমাজের পরিবর্তনের অন্যতম চালিকাশক্তি। তাদের চিন্তা, মূল্যবোধ ও মানবিকতা গ্রামীণ সমাজকে একটি সুস্থ, সচেতন ও সমন্বিত রূপ দেওয়ার পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে নারীদের প্রতিনিধিত্বমূলক অবস্থান সমাজ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য ও অনস্বীকার্য।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১। গুপ্ত, ক্ষেত্র। বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)। গ্রন্থনিলয়, ১৯৯৫, কলকাতা।

২। চক্রবর্তী, সুমিতা। উপন্যাসের বর্ণমালা (তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ)। পুস্তক বিপণি, ২০১৬, কলকাতা।

৩। চট্টোপাধ্যায়, শরৎ চন্দ্র। পল্লী-সমাজ (অষ্টম মুদ্রণ)। ইণ্ডিয়ান অ্যাসসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ, ১৩৫২, কলকাতা।

৪। চট্টোপাধ্যায়, হীরেন। উপন্যাসের রূপরীতি (পুনর্মুদ্রণ)। দে'জ পাবলিশিং, ২০২১, কলকাতা।

৫। দত্ত, বীরেন্দ্র। বাংলা কথাসাহিত্যের একাল। পুস্তক বিপণি, ১৯৯৮, কলকাতা।

৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর (ষষ্ঠ সংস্করণ)। দে'জ পাবলিশিং, ২০১২, কলকাতা।

৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ। বাংলা উপন্যাস: দ্বান্দ্বিক দর্পণ। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাদেমি, ১৯৯৬, কলকাতা।

৮। ভট্টাচার্য, দেবীপদ। উপন্যাসের কথা (দ্বিতীয় সংস্করণ)। দে'জ পাবলিশিং, ২০১৮, কলকাতা।

৯। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার। কালের প্রতিমা বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর বছর: ১৯২৩-১৯৯৭ (ষষ্ঠ সংস্করণ)। দে'জ পাবলিশিং, ২০১৯, কলকাতা।

১০। রায়, অলোক। সাহিত্যকোষ: কথাসাহিত্য (পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ)। সাহিত্যলোক, ২০১০, কলকাতা।

১১। রায়, গোপিকা নাথ। বাংলা কথাসাহিত্য: প্রকৃতি ও প্রবণতা। পুস্তক বিপণি, ১৯৯১, কলকাতা।

১২। রায়, দেবেশ। উপন্যাস নিয়ে (চতুর্থ সংস্করণ)। দে'জ পাবলিশিং, ২০১৯, কলকাতা।

১৩। রায়, দেবেশ। উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে। দে'জ পাবলিশিং, ২০০৬, কলকাতা।

১৪। রায়, সত্যেন্দ্রনাথ। বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা (পুনর্মুদ্রণ)। দে'জ পাবলিশিং, ২০১৫, কলকাতা।

১৫। সেনমজুমদার, জহর। উপন্যাসের ঘরবাড়ি (দ্বিতীয় প্রকাশ)। পুস্তক বিপণি, ২০২৩, কলকাতা।

১৬। শিকদার, অশ্রুকুমার। আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস (চতুর্থ সংস্করণ)। অরুণা প্রকাশনী, ২০০৮, কলকাতা।

১৭। সামন্ত, সুবল সম্পাদনা। বাংলা উপন্যাস: বীক্ষা ও অন্বীক্ষা (দ্বিতীয় সংস্করণ)। এবং মুশায়েরা, ২০১১, কলকাতা।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 860- 868
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.299

পূর্ব মেদিনীপুরে লোকসংগীত চর্চার ধারা: পটুয়া গান

ড. অনুরূপা হাজরা, *রাজ্য সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, বিভাগীয় প্রধান, সংগীত বিভাগ, খেজুরী কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 15.03.2026; Accepted: 17.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Folk songs express the emotions of the human mind in simple and straightforward language through music. When the life stories of common people are presented in such plain and rustic melodies, they become deeply appealing. Folk music is a form of expression in which the joys and sorrows of a simple, unadorned lifestyle are conveyed through songs. Because of its uncomplicated language, folk songs easily find a place in people's hearts. The richness of melody and the charm of rhythm and cadence give folk music its aesthetic beauty. Many people also earn their livelihood through this tradition, which is why folk music has gained popularity as a means of sustenance.

Patuya Gaan is one such genre of folk music that portrays various aspects of society with the help of scroll paintings (patachitra). In this tradition, song, poetry, and visual art blend seamlessly into one. In the district of Purba Medinipur, this form of folk music holds a significant place. It has a close relationship with visual art, as Patuya or scroll painters create long narrative paintings on cloth or paper and present the sequential stories through songs. For this reason, it is often referred to as Pata Gaan as well.

Patuya artists travel from place to place, creating scroll paintings with colors and brushes, and performing poetic songs to entertain people while earning their livelihood. These songs generally revolve around religious, mythological, social, and contemporary themes. Stories from the Ramayana and Mahabharata, Manasamangal, Chandimangal, various folk tales, as well as themes of education, health, and natural disasters, often become the subject matter of these performances. As the song progresses, the scroll is gradually unfolded, allowing the audience to follow the narrative visually.

In various villages of Purba Medinipur, especially during rural fairs, festivals, and social gatherings, Patuya Gaan is performed. It is not only a medium of entertainment but also an important tool for education and social awareness. The artists of the Patuya community have preserved this art form across generations. As an integral part of the folk culture of Purba Medinipur, Patuya Gaan represents a unique folk art where music, painting, and storytelling come together to create a distinctive cultural expression.

Keywords: Folk Music, Patuya Gaan, Patachitra, Cultural Heritage, Purba Medinipur

পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম বৈচিত্র্যপূর্ণ জেলা হল মেদিনীপুর। ১৯৭১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী আয়তন ও জনবহুলতায় পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম জেলা এটি। বিহার ও উড়িষ্যা রাজ্যের দুই প্রান্তকে ছুঁয়ে রয়েছে এই সীমারেখা। এই জেলার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে রয়েছে অরণ্যাকীর্ণ লাল মাটির রুক্ষতা এবং দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে বঙ্গোপসাগরের বিস্তীর্ণ বালুকাময় তটভূমি উর্বর সমতল ভূমি ও ছোট বড় কয়েকটি নদীর শাখা উপশাখায় পরিব্যপ্ত অর্থাৎ একদিকে সুজলা সুফলা নদীমাতৃক বঙ্গের পল্লী অধ্যুষিত শস্য শ্যামলা ভূখণ্ড এবং অন্যদিকে নিবিড় অরণ্যানি ঘেরা লাল মাটি। এই দ্বিবিধ প্রাকৃতিক পরিবেশের জনজীবন, শিল্প সংস্কৃতিও তাই স্বাভাবিকভাবে দ্বিধা বিভক্ত। ২০০৩ সালে এই বৃহত্তম জেলাটি দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়- পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুর। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা হলদিয়া, তমলুক, কাঁথি ও এগরা এই চারটি ভাগ নিয়ে গঠিত। সংগীত চর্চার ক্ষেত্রে এই দুই জেলারই ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের অবদান রয়েছে। এখানে একদিকে ধ্রুপদী উচ্চাঙ্গ সংগীতের চর্চা যেমন হয়েছে তেমনি লোকসংগীতের অনুশীলনও হয়েছে।

শিল্প ও স্থাপত্যের মতো সংগীতও ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ। এটি একটি কলা বিদ্যা। সারা ভারতে সংগীত চর্চার সাথে সাথে পূর্ব মেদিনীপুরেও সংগীতের বিকাশ ঘটে। এই জেলার নানা স্থানে শাস্ত্রীয় সংগীত চর্চার বিভিন্ন কেন্দ্র (তমলুক, মহিষাদল কাঁথি প্রভৃতি) যেমন গড়ে উঠেছিল তেমনি লোকসঙ্গীতের বিশেষ সমাদরও ছিল। অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার লোকসংগীত প্রধানত উৎসবের অঙ্গ হিসেবে বিভিন্ন পালা পার্বণে গাওয়া হত। এই জেলার পশ্চিমাঞ্চলে বর্ণ হিন্দুদের সংস্কৃতির পাশাপাশি উপজাতি ও আদিবাসীদের পূজা পরম অনুষ্ঠানে লোকগীতির প্রচলন তাদের সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। এই উৎসব অনুষ্ঠান হতো সাধারণ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই। সহজ-সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপনের সঙ্গে আনন্দ, দুঃখের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এই লোক উৎসবের মধ্য দিয়ে। আর এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ হল লোকসংগীত।

লোকসংগীত:

আঞ্চলিক সাহিত্য, সংগীত সমাজের দর্পণ স্বরূপ। বিশেষতঃ সংগীতের মধ্য দিয়ে সমাজ জীবনের ছায়া প্রতিভাত হয়। স্বভাবতই লোকসংগীত হল আঞ্চলিক সম্পদ। বিচিত্র পরিবেশে শ্রমজীবী মানুষের কণ্ঠে এই গান শোনা যায়। একে উচ্চতর সংগীতের সঙ্গে কোনোভাবেই তুলনা করা যায় না। সহজ কথা ও সরল সুরে, নৈসর্গিক নির্ভরতাপূর্ণ আঞ্চলিক ভাষা ও সুরে লোকগান রচয়িতা মনের আবেগে গেয়ে ওঠেন এবং সেই গান যুগ পরম্পরায় মুখে মুখে চলতে থাকে। প্রাকৃতিক উপমা, দৈনন্দিন বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠে এই গানে। পল্লী অঞ্চলের বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষজন এবং তাদের পারিপার্শ্বিকতা লোকগানে খুব সহজে জায়গা করে নেয়।

লোকগানের ভাষা সহজ সরল হওয়ায় এবং সুরের ঐশ্বর্য ও তাল ছন্দের মনোহারিত্ব লোকগানকে নান্দনিকতা দান করেছে। যা মানুষের হৃদয়ের গান ও প্রাণের গানে পরিণত হয়েছে। জাত পাতের সংকীর্ণ বিচার আচার দূরীকরণে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় লোকগানের ভূমিকা উল্লেখ্য। আচার অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে, কর্মসঙ্গীত রূপে, আদিবাসী সংগীত, অবসর বিনোদনের সংগীত ইত্যাদি রূপে লোকসংগীত যেমন প্রচলিত তেমনি জীবিকাশ্রয়ী সংগীত হিসাবেও লোকসংগীত প্রযুক্ত হয়। যার মধ্যে পটুয়া গান অন্যতম। তবে এই গান ছাড়াও বাউল, কাঠি নাচ, টুসু, ঝুমুর প্রভৃতি লোকসংগীত মেদিনীপুরে বিশেষভাবে প্রচলন ছিল। আলোচ্য লেখনীতে পটুয়া ও পটুয়া গান সম্পর্কে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।



পটচিত্র, উইকিপেডিয়া

পট ও পটুয়া গান:

পট হল অন্যতম একটি লোকশিল্প। এই পট শব্দটি সংস্কৃত পট্ট বা পাটজাত শব্দ থেকে এসেছে বলে মনে করা হয়। পট্টের অর্থ কাপড়ের ফালি। এই পট্টের উপর আঁকা চিত্রই হল পটচিত্র। পট বিভিন্ন ধরনের হয়- দেওয়াল চিত্রন, পুঁথির পাটাচিত্র এক ধরনের পট, দেব দেবীর মাহাত্ম্য অঙ্কন আরেক ধরনের পট। যাঁরা এই পট দেখিয়ে গান গেয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন তাদের বলা হয় পটুয়া। এরা পটীদার বা চিত্রকর নামেও পরিচিত। পটের গানের প্রধান উপাদান হল পটচিত্র শিল্পকলা। এর মধ্যে রয়েছে চিত্র ও সংগীতের আশ্চর্য সহমর্মিতা। পটুয়ারা একাধারে ছিলেন কবি, গীতিকার ও সুরকার। তাদের সুরের টানে পটের চিত্রকে জীবন্ত করে ফুটিয়ে তুলেছেন এবং গেয়েছেন জীবনের গান। যা পটুয়া গান নামে পরিচিত। চিত্র দেখানোর সাথে সাথে চিত্রকরগণ গান গেয়ে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করেন। এই সকল গানে কোন তাল নেই। পদান্ত মিল যুক্ত বাক্য একটা সাদামাঠা একঘেয়ে সুরে আবৃত্তি করা হয়। পটুয়াগণ যে পট আঁকেন সেই পট সাধারণতঃ দুই প্রকার হয়। এক শ্রেণী চিত্র সম্বলিত ছোট ছোট পট আঁকেন যা 'টোকো' পট নামে পরিচিত। আর অন্য শ্রেণি বহু চিত্র সমন্বিত পরপর ছবি এঁকে পট তৈরি করেন যেগুলি 'দীঘল পট' নামে পরিচিত। এই পট আট দশ হাত থেকে শুরু করে কুড়ি পঁচিশ হাত পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। এই দীঘল পট অবলম্বন করে পটুয়ারা গান রচনা করেন এবং অর্থ উপার্জন করেন।

পটুয়া গানে চিত্রের হুবহু বর্ণনা থাকে না। কাহিনির দিক থেকে দেখতে গেলে চিত্রগুলি বিচ্ছিন্ন মনে হয়। তবে এক চিত্র থেকে অন্য চিত্রের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের সময় যে ফাঁক থাকে সেগুলি গান দিয়ে পূর্ণ করেন পটুয়াগণ। এইভাবে গান ও চিত্র একে অপরের পরিপূরক হয়ে ওঠে।

ঐতিহাসিক পটভূমি:

লোকশিক্ষার অন্যতম বাহক এই পট ও পটুয়া সঙ্গীত। অনুমান করা হয় এই পটচিত্র প্রদর্শনী ভারতবর্ষে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক অর্থাৎ বুদ্ধদেবের সময় থেকে প্রচলিত ছিল।[১] বিভিন্ন ভারতীয় সাহিত্যে পটচিত্রের উল্লেখ রয়েছে। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' ও 'মালবিকাগ্নিমিত্রম' (খ্রী: চতুর্থ শতক), বানভট্টের 'হর্ষচরিত' (খ্রী: ৭ম শতক), ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' (খ্রী: ৭ম-৮ম শতক), বিশাখ দত্তের 'মুদ্রারাক্ষস' (খ্রী: ৫ম শতক), 'হরিবংশ' (খ্রী: ২য় শতক) প্রভৃতি গ্রন্থ গুলি লক্ষ্য করলে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।[২] *(a,b)* বানভট্টের 'হর্ষচরিত' ও বিশাখ দত্তের 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকে যম পট প্রদর্শনের বিস্তৃত চিত্র দেখা যায়। মানুষ মারা গেলে তার পারলৌকিক পট দেখিয়ে বিভিন্ন বিবরণ প্রদান করা হয় এই যম পটের সাহায্যে। বৌদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে 'সারত্থপকামিনী' (খ্রী: ৫ম শতক), 'সংযুক্তনিকায়: খন্দসংযুক্ত' (খ্রী: পূ: ৬ষ্ঠ শতক) এবং জাতক গ্রন্থের মধ্যেও পটের বর্ণনা পাওয়া যায়।[৩]

প্রথমদিকে রামায়ণ-মহাভারত এবং অন্যান্য পৌরাণিক ও বৌদ্ধ কাহিনী অবলম্বন করে সম্ভবতঃ পট আঁকা হত। পরবর্তীকালে বাংলাদেশে লৌকিক দেব দেবীর কাহিনী অবলম্বনে পট আঁকা শুরু হয়। পটচিত্র গুলি

বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এর বিষয়গুলি পাঁচটি ভাগে বিভক্ত, যেমন- পৌরাণিক, প্রকৃতি ও স্থির চিত্র, ঐতিহাসিক বিষয় সম্বলিত, দৈনন্দিন জীবনচিত্র ও ব্যঙ্গচিত্র। পৌরাণিক চিত্রসমূহে মহাযোগী শিব, নটরাজ শিব, কৃষ্ণ কর্তৃক বকাসুর বধ, বামন কর্তৃক বালিবধ, ব্রহ্মা, শিব পার্বতী, নারায়ণের কুর্মাবতার, স্তন্যপানরত কৃষ্ণ, শিশু কৃষ্ণ কোলে যশোদা, হনুমানের বুকে রাম সীতা, সতী দেহ কণ্ঠে মহাদেব, কমলে কামিনী, জগন্নাথ ও কালি রূপ প্রভৃতি বিষয়গুলি চিত্রিত হয়েছে। প্রকৃতি ও স্থির চিত্রে বিভিন্ন প্রাণী ও পশু পাখি স্থান পেয়েছে। যেমন- গলদা চিংড়ি, জোড়া মাছ, সবুজ টিয়া, শেয়াল প্রভৃতি। ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গৌর নিতাই, ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ, ব্রিটিশ সৈন্যের কুচকাওয়াজ ইত্যাদি বিষয় রয়েছে। দৈনন্দিন জীবন চিত্রের মধ্যে রয়েছে খেমটা নাচ, প্রসাধন, সেতারবাদিকা, সঙ্গীতজ্ঞ, কেশবিন্যাসরত বালিকা, দর্পণ হাতে নারী, বাবুকে হুকা দান, খুনের বিচার, তারকেশ্বরের নারী প্রভৃতি চিত্র। এছাড়া ব্যঙ্গচিত্রের বিষয় ছিল বাবু, সূরা ও সাকী, বৈষ্ণব ও বেশ্যার প্রেমালাপ, পদতলে প্রনয়ী, নারীর পদতলে পড়ে বাবু ইত্যাদি।[৪] এই সকল পটের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল অশিক্ষিত সমাজের মানুষকে চিত্রের মাধ্যমে শিক্ষিত করে তোলা। তাছাড়া সামাজিক অসংলগ্নতাও এই গানের মধ্য দিয়ে ধিক্কৃত হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা ছিল সামাজিক অসঙ্গতিগুলিকে শুধরানোর চেষ্টা করা। এক কথায় পটুয়াগণ নীতি শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের উন্নতি সাধনের কাজে লিপ্ত ছিলেন।

বাংলায় পটচিত্রের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ:

বাংলায় প্রাচীনকাল থেকে পটুয়াগানের প্রচলন ছিল। বাংলাদেশে প্রাক্-আর্য যুগ থেকে সংগীত সহযোগে পট প্রদর্শনের রীতি চলে আসছে। বৌদ্ধ যুগে যমপটের বিশেষ প্রচলন ছিল। তৎকালে তিব্বত, জাভা, বোর্ণিও প্রভৃতি স্থানে পটচিত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। বাংলাদেশে মুসলমান বিজয়ের প্রাক্কালে ইসলামী ধর্ম প্রচারকদের আগমন ঘটে এবং তাদের হাত ধরে বাঙালী জনসাধারণের মধ্যে ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তৎকালীন দেশীয় প্রচার পদ্ধতির প্রচলিত মাধ্যম হিসেবে 'পটচিত্র প্রদর্শন কলা' প্রদর্শিত হতো। তাঁরাই প্রথম এদেশে মুসলমানী পটের প্রচলন করেন।

বাংলায় নব্য বৈষ্ণব ধর্মের পথপ্রদর্শক ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। তিনি তুর্কি আফগান যুগে হিন্দু বর্ণের নিম্ন বর্ণ ও অন্তজ্য শ্রেণীর মধ্যে ভক্তি আন্দোলনের জোয়ার এনেছিলেন। সেই জোয়ারে সিক্ত হয়েছিল বাংলার চিত্রকলা। এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের লোকপ্রিয়তা বিশেষভাবে ধরা দিয়েছিল পট চিত্র শিল্পের মধ্যে। চৈতন্য জীবন কথা, কৃষ্ণলীলা বিষয়ক দৃশ্যাবলী সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছিল পটুয়াদের হাত ধরে। এছাড়াও সাঁওতাল জন্মকথা ও কাহিনী বিষয়ক 'কোরিয়াক কথা', মুসলিম মহাত্মা ও গাজী পীরদের বীরত্ব ও অলৌকিক ক্রিয়া কলাপ, পুরাণ, মহাকাব্য প্রকৃতি বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এই পটুয়া গানের পূর্ণ বিকাশ দেখতে পাওয়া যায় কালীঘাটের পটে। তবে এখানেও ধর্মীয় বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে। পট চিত্রে কালি, দুর্গা, শিব-পার্বতী, গনেশ, কার্তিক, লক্ষ্মী-সরস্বতী, যশোদা-কৃষ্ণ, জগদ্ধাত্রী, রাধা-কৃষ্ণ, হনুমান, চৈতন্য, ষড়ভূজা প্রভৃতি দেবদেবীর বিষয় বর্ণিত হয়েছে।



কালীঘাটের পট, উইকিপিডিয়া

শৈলীগত বিচারে ও অবস্থান ভেদে এই পটুয়াকে চার ভাগে ভাগ করা যায়।

১) সাঁওতাল উপজাতির জন্মকথা ও কাহিনী বিষয়ক চক্ষুর্দান পট- যা পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে দেখা যায়।

২) যমপট- যা বাংলার হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

৩) গাজী পট- এটি পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলায় প্রচলিত গীত এবং

৪) হিন্দু পুরাণ, মহাকাব্য, কৃষ্ণলীলা ও চৈতন্য লীলা বিষয়ক পট- মেদিনীপুর, বর্ধমান, নদীয়া, বীরভূম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় প্রচলিত গীত।[৫]

সুতরাং বলা যায় পটুয়াদের উপস্থিতি পশ্চিমবঙ্গের নানাস্থানে। যেমন উত্তর-পশ্চিম বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা প্রভৃতি। এর মধ্যে মেদিনীপুরের পটের বিষয়বস্তুতে ও পটুয়া জীবন বোধে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। মেদিনীপুরের পটুয়াগণ হিন্দু ও মুসলমান দ্বৈত সত্তাকে বজায় রেখেছেন। তাই অনুমান করা যায়, মেদিনীপুর তথা পূর্ব মেদিনীপুর ছিল পটুয়া সংগীতের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। এই অঞ্চলের পটুয়াগণ ধর্মীয়, সামাজিক ও সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে পট রচনা করেন ও সেই অনুযায়ী গান রচনা করে গাইতেন। বিভিন্ন কাহিনীর মধ্যে বেহুলার কাহিনী বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। ১৯৪২ এর আন্দোলনের সময় সাহেব পট বা ইংরেজ পট মেদিনীপুরের গ্রামে গ্রামে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

পূর্ব মেদিনীপুরের পটুয়া সমাজ:

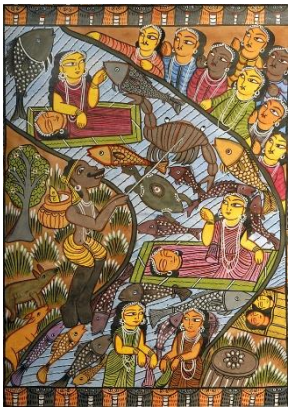
বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় পূর্ব মেদিনীপুরে পটুয়াগণ অধিক মাত্রায় বসতি স্থাপন করেছিলেন। সুতাহাটা থানার চৈতন্যপুর, আকুবপুর, কেশবপুর, খেজুরি থানার দেউলপোতা, দাসপুর থানার বাসুদেবপুর ও নাড়াজোল, নন্দীগ্রাম থানার নানাকারচক, কুমিরমারা, কুলাপাড়া, সুন্দি, মহিষাদল থানার ঠেকুয়াচক, পিংলা থানার মালিগ্রাম ও নয়াগ্রাম, তমলুক থানার সিরুই, পাঁশকুড়া থানার কেশবপুর প্রভৃতি এলাকার পটুয়াগণ বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছিলেন। মেদিনীপুরের পটুয়াগণ ছিলেন কালীঘাটের পটুয়া সমাজের পূর্বপুরুষ। এই পটুয়া ঘরানার মধ্যে অন্যতম হলো 'ত্রিবেনী সমাজ গোষ্ঠী' বা 'স্কুল' - এর অন্তর্গত তমলুক কালীঘাট পট। মোটা কাগজ জুড়ে জুড়ে লম্বা করে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত ছবি এঁকে গান করেন এই পটুয়াগণ। মূলত রামায়ণ-মহাভারত ও অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের কাহিনি এই পটে ফুটে উঠত। এর অঙ্কন পদ্ধতিতে অভিনবত্বের ছোঁয়া রয়েছে। নানা ধরনের গাছ গাছালির ফল, ফুল, পাতা থেকে রস সংগ্রহ করে তুলির টানে তুলোর সাহায্যে পট তৈরি করতেন।



নয়াগ্রাম পটচিত্র, উইকিপিডিয়া

মহিষাদল থানার ঠেকুয়াচকে দু-ধরনের পটের নিদর্শন পাওয়া যায়। এছাড়া এখানে আমদাবাদে প্রচলিত পটের মত পটও দেখা যায়। বিভিন্ন ধরনের পট এই গ্রামে লক্ষ্য করা যায়। চিত্রকরদের মধ্যে কালিপদ, সুরেন, বসন্ত, ভূষণ ও গুণধর নামক চিত্রকরগণ ছিলেন দক্ষিণী ধারার বাহক। এছাড়া অজিত, অমর, জহর প্রমূখ

চিত্রকরদের আঁকা চিত্র অতুলনীয়। চীন বা জাপানি শিল্পীদের মত অতি হালকা রঙের জমির উপর সূক্ষ্ম ও সামান্য তুলির টানে তারা বাংলায় পট তৈরি করতেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের মিউজিয়ামে এর নিদর্শন রয়েছে। ঠেকুয়া ঘরানার উৎকৃষ্ট পট হলো 'বেহুলা পট'। পিংলা থানার নয়াগ্রাম ও মালিগ্রাম ঘরানার চিত্রকরগণ ঠেকুয়া ঘরানাকে অনুসরণ করেছে। নাড়াজোল ঘরানার পটশিল্পে যেমন বিরাট পটভূমি ও জমজমাট রঙের উজ্জ্বলতা আছে। সেখানে ঠেকুয়া ঘরানা বা পিংলা ঘরানার পটশিল্পে রয়েছে হালকা ভাঙা রঙের ফুরফুরে হাওয়া। হালকা নীল রঙের নদীর জলে কালো কালো টানের নৌকা গুলি লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে বাতাসের টানে। প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে মঙ্গলকাব্যের কাহিনি ফুটে উঠেছে। অন্যদিকে আমদাবাদ ঘরানার বীরেন চিত্রকরের পটে উজ্জ্বল নীল রঙের উপর সাদা বুটিকের কাজ, ঘন লাল রঙের উপর সাদা অলংকরণ প্রভৃতি লক্ষ্যনীয়।



বেহুলা পট, উইকিপিডিয়া

১৯৪৫ সালে তৎকালীন অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ একটি ইংরেজি নিবন্ধে মেদিনীপুরের পটের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে জানিয়েছেন যে এই জেলার জড়ানো পটগুলিতে বিস্তৃত অলংকরণ সহ এক একটি ফলক ভিড়ে পরিপূর্ণ। এই জড়ানো ফলকের প্রথম ফলকে দেবদেবীর প্রতিকৃতি স্পষ্ট ভাবে চিত্রিত হয়েছে। এখানকার কৃষ্ণলীলা পটগুলিতে দেব-দেবীর মুখ তিন চতুর্থাংশ দেখা যায়। তবে আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য হলো Shad এর ব্যবহার, যেগুলি বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে ঘোড়া, হাতি ও গরুর চিত্রগুলিতে। মেদিনীপুরের পটশিল্পের সঙ্গে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মিল পাওয়া যায়। পাঁশকুড়া, কেশবপুর, চৈতন্যপুর, আকুবপুর, তমলুক প্রভৃতি অঞ্চলের পটুয়াগণ এই বিষয়ে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। প্রধানতঃ প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বা তমলুকে এর ব্যাপক প্রচলন ছিল। তমলুকের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং উড়িষ্যার সঙ্গে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক মিলনক্ষেত্র রচিত হয়েছিল বলে এই অঞ্চলে সম্ভবত পটুয়া গানের প্রথম উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল।

মেদিনীপুরের পটের বিষয়বস্তু:

লোকসঙ্গীতের অন্যান্য বিষয়ের মত পটুয়া গানের বিষয়বস্তু বৈচিত্র্য পরিপূর্ণ। বিষয়ভাবনা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ পট শৈলীর উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। পটুয়াগণ হিন্দু-মুসলমান ও খ্রিস্টীয় পট এঁকে ভারতের মাটিতে এক নতুন ধর্ম সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত রচনা করেছেন। মেদিনীপুরের পটুয়াদের মধ্যে ছয়টি শ্রেণী রয়েছে- বসনতরী, সাতকড়ি, আটপড়া বা আটকুড়ি, চৌপলকাটা, কাটাকাটা এবং বেজো।[৬]

মেদিনীপুরের পটুয়াদের রচনাশৈলীর অলংকরণ ও সূক্ষ্ম কর্ম বিষয় নৈপুণ্যের গাঁথা। কৃষ্ণলীলা, বেহুলা লখিন্দরের কাহিনি, রামায়ণ মহাভারতের কাহিনি, চৈতন্যদেবের গৃহত্যাগের ঘটনা, চাঁদ সদাগরের কাহিনি,

ইংরেজ বিরোধী সংগ্রাম প্রভৃতি উল্লেখ্য। কৃষ্ণ বিষয়ক পটগুলির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যের রূপ প্রকাশ পায় না। সেখানে সাত্ত্বিক মাধুর্য রূপেরও প্রকাশ নেই। নিতান্ত লৌকিক রূপটি তাদের গানে ফুটে ওঠেছে। উদাহরণস্বরূপ-

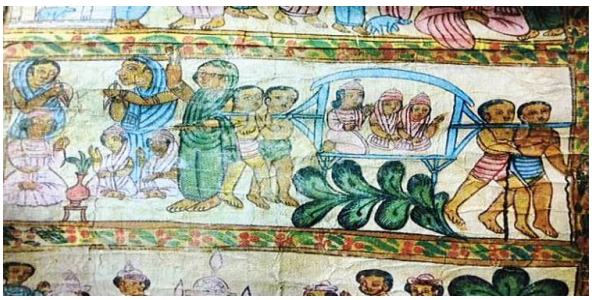
"কানিয়া কদম্বমূলে নাগরিয়া থানা,
বনফুল গাঁথিয়ে কৃষ্ণের গলে বনমালা।
হাত বাঁকা পা'য় বাঁকা বাঁকা মাজাখানি,
চরণের নূপুর বাঁকা চুড়ায় টানুনি।।'"[৭]

রামায়ণের কাহিনি অবলম্বনে রচিত পটুয়া গান হলো রামলীলা। সিন্ধু মুনি বধের বর্ণনা সম্বলিত একটি রচনা হল-

"রজ রাজার পুত্র নামে দশরথ
সভা করে বসে আছেন যত প্রজাগণ।"[৮]

তমলুকের ও পাঁশকুড়া থানার পটীদারগণ কেউ কেউ কুখ্যাত ডাকাত মনোহর ফাঁসুড়ের পট দেখিয়ে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করতেন। এই কাহিনী অবলম্বন করে অনেক প্রাচীন পল্লী কবিও কাব্য রচনা করেছেন। কুঞ্জ বিহারী দাস ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। বৈষ্ণবচক অঞ্চলে প্রাপ্ত মনোহর ফাঁসুড়ের একটি পট মেদিনীপুর সংগ্রহশালায় রয়েছে। গানটির কয়েকটি লাইন লক্ষ্য করলেই পটুয়াদের কবিত্ব শক্তির সাথে সাথে সনাতন ভাবধারা অনুভব করা যায় -

"একদিন সত্যপীর মনেতে ভাবিয়া।
সিন্ধু রাজার দেশে আমি পূজা নিব গিয়া।।
সিন্ধু রাজার দেশে গিয়া আশীষ করিব।
কিছুদিন পরে তার সন্তান ভেজিব।।"[৯]



মনোহর ফাঁসুড়ে পট, "পটুয়াজ অ্যান্ড পট আর্ট ইন বেঙ্গল" গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত

মেদিনীপুরের পট রচনায় রাজনৈতিক প্রভাব:

মেদিনীপুর থেকে প্রাপ্ত জড়ানো পট তথা scroll painting উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল চন্ডীমঙ্গল চিত্র। এখানে দেবী দুর্গার দশ হাতে ও মুখে ছায়া বৃত্তের ব্যবহার করা হয়েছে। রাজনৈতিক পটভূমির পরিবর্তনের সাথে সাথে এই পট রচনার ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ঝড় উঠে। একে একে স্বাধীনতা পট, সাহেব পট, স্টিমার পট, সিনেমা পট, পরিবার পরিকল্পনা পট, ডাক্তারবাবু খুন পট, বিদ্যাসাগর পট, মাইলোর গান পট ইত্যাদি বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এমনকি উপজাতি বিদ্রোহে যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন তাঁদের নিয়ে ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান' গাওয়ার কাহিনি রচিত হয়েছিল।

ত্রয়োদশ শতকে সুলতানি আমলে মুসলিম সুলতানদের মন জয় করার জন্য পটুয়াগণ মুসলিম সন্তদের অলৌকিক ক্ষমতা ও মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য গাজীর পট, মহম্মদ মঙ্গল ইত্যাদি পট রচনা শুরু করেছিলেন।

এছাড়া পটুয়াদের রচনায় সাধারণ মানুষের অত্যাচারিত হওয়ার বিভিন্ন ছবি ধরা দিয়েছিল। ১৯৪৭ সালের দাঙ্গা ও দেশভাগের পরের বিভিন্ন ঘটনা ফুটে উঠেছে পটুয়া গানে। ১৯৪২ সালে সরকারিভাবে 'সাহেব পট' দেখানো নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও নীল বিদ্রোহ, চুয়াড় বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ প্রভৃতির কাহিনি অবলম্বন করে মেদিনীপুরের পটুয়াগন পট রচনা করেছিলেন। চুয়ার বিদ্রোহ সম্পর্কে রচিত একটি পটুয়া গানের উদাহরণ হল-

"এই মাটির চুয়ার গোঁয়ার বীর,
তারা ধরিল টাঙ্গি ধনুক তীর।
রক্ত দিয়েছিল বুক পেতে তারা,
মানেনি ইংরাজের নতুন ধারা।।"[১০]

১৯৪২ সালের আন্দোলনের সময় পটুয়াদের রচিত সাহেব পটের গান নিয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ায় গানের ভাষার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। কারণ চিত্রিত সাহেব পটে এমন অনেক ছবি দেখতে পাওয়া যায় যা গানের সাথে মেলে না। অনুমান করা হয় ডাকাতের পট যা নিছকই ডাকাতির বিষয়ে রচিত, সেগুলি পরবর্তীকালে চুয়াড় বিদ্রোহের নায়ক যুগল কিশোরের কাহিনীর সঙ্গে মিশে গেছে। সাহেব পটের বিষয়বস্তুর মধ্যে ছিল ইংরেজের অত্যাচারের কাহিনি। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের কালেও মেদিনীপুরে পটুয়া গান রচিত হয়েছিল যা তাদের রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় বহন করে।



দিল্লি দাঙ্গা ও গাজী পট, উইকিপিডিয়া

উপসংহার:

যদিও পটুয়া গান বর্তমানে গ্রামবাংলায় প্রচারিত বিলীয়মান লোকসংস্কৃতির একটি অধ্যায়ে পরিণত হয়েছে। তবে ভারতের বিভিন্ন স্থানে এর বিশেষ প্রসার ঘটেছে। মুম্বাই, আমেদাবাদ, হায়দ্রাবাদ, কেরালা, কানপুর, গুজরাট, দিল্লি, পাটনা, পুনে, গয়া প্রভৃতি স্থানে পটশিল্প ছড়িয়ে পড়েছে। এমনকি বিদেশের মাটিতেও এই শিল্প জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। যেমন- মন্টু চিত্রকর ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত ছাড়াও অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়ায় তাঁর পটচিত্র প্রদর্শন করেছেন। প্রবীণ পটুয়া গুরুপদ চিত্রকর অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পট আঁকা ও পটের গান গেয়ে বাঙালির মন জয় করে নিয়েছেন। তিনি ২০০৪ সালে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন। ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, স্পেন ও ইতালিতে তিনি 'কলাশ্রী' পুরস্কার পেয়েছেন। আনোয়ার চিত্রকর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এবং দিল্লির পর্যটন কেন্দ্র থেকে পুরস্কৃত হয়েছেন। তিনি ২০০৬ সালে জাতীয় পুরস্কারও পেয়েছেন। ফলতঃ বলা যায় পট শিল্প আজ জাতীয় স্তরে প্রসারিত। বাঙালির একটি ঐতিহ্য হল এই পটুয়া গান। তাই পট গীতিকে জাতীয় সাহিত্যের একটি বিশেষ অঙ্গ বলা যায়। বর্তমানে পটচিত্র নিয়ে বিভিন্ন workshop, exhibition করা

হয়। বর্তমানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, করোনা পরিস্থিতি প্রভৃতি সাম্প্রতিক বিষয়ের প্রতিফলন দেখা যায় পটুয়া গানে। শিক্ষা ক্ষেত্রেও পটশিল্পের বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা শুরু হয়েছে।

মেদিনীপুর জেলার কিছু কিছু স্থানে এখনো পটুয়া গানের প্রচলন আছে। পূর্ব মেদিনীপুরের চন্ডিপুরের নিকট হাঁসচড়া অঞ্চলে গোলাপ পটুয়া বর্তমানে বিভিন্ন স্থানে পটচিত্র দেখিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। পটুয়াগন যখন বাড়ি বাড়ি ঘুরে কোন বিশেষ পট দেখান, তখন গানের মধ্যে পটের বিষয়বস্তু সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন। সাধারণ গ্রামবাসী শুনে তৃপ্ত হতেন। বিশেষতঃ মহিলা ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা এতোটাই মুগ্ধ হতেন যে বারবার দেখানোর অনুরোধ করতেন এবং অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দিতেন। অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে পটুয়ারা সুরেলা গানের মাধ্যমে কাহিনির বিবরণ দিতেন। আর অলক্ষ্যে লোকশিক্ষার কাজ করে যেতেন। সংগীতকে পরিপূর্ণতা দান করে তার বক্তব্যের বাণী, সুরের বিন্যাস এবং উভয়ের মধ্যে গড়ে ওঠা রূপকল্প বা Image। পটুয়া সংগীতের মধ্যে এই শিল্পরূপ ফুটে উঠেছে। জীবন ও জীবিকার উদ্দেশ্যে এই গান রচিত হলেও এর নান্দনিকতার বিষয়টিও অস্বীকার করা যায় না। পরিবর্তিত অর্থ সামাজিক পরিবেশে পটশিল্প ও পটুয়াগান যদিও অবলুপ্তির পথে তথাপি নতুন উদ্যোগ ও যুগোপযোগী সৃষ্টিকর্মে এই পটশিল্প চর্চা সংগীত চর্চার ক্ষেত্রে আরো বিস্তৃতি লাভ করতে পারলে প্রাচীন এই শিল্পকলা নতুনভাবে প্রতিভাত হবে।

তথ্যসূত্র:

১. ইন্ডিয়ান ফোকলোর, ভলিউম ওয়ান, নং- ওয়ান, কলকাতা, ১৯৫৬, পৃ. ৬০।

২. পটুয়া সংগীত গুরুসদয় দত্ত, Folk Art and Crafts of Bengal, The collected papers, Kolkata 1990. ভূমিকা, পৃ. ১৬-১৮।

a. লোকায়ত বাংলা সুনীল চক্রবর্তী, কল্যাণী প্রকাশন, ৩ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রীট, কলকাতা ১৯৬৯, লোকচিত্রকলা অধ্যায়, পৃ. ৪।

b. ইন্ডিয়ান ফোকলোর, ভলিউম ওয়ান, নং- টু, কলকাতা, ১৯৫৬, পৃ. ৮৫।

৩. লোকায়ত বাংলা সুনীল চক্রবর্তী, কল্যাণী প্রকাশন, ৩ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রীট, কলকাতা ১৯৬৯, লোকচিত্রকলা অধ্যায়, পৃ. ৪।

৪. পট- পটুয়া, পট গীতি; বারিদ বরুণ ঘোষ, বিশ্ববিদ্যা পরিচয়, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ১৫ - ১৬।

৫. মেদিনীপুর: ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন (৩য় খন্ড), সম্পাদনা প্রণব রায়, সাহিত্য লোক, কলকাতা, ২০০২ পৃ. ২১৩।

৬. তদেব, পৃ. ২১৬।

৭. বঙ্গীয় লোকসংগীত রত্নাকর (৩য় খন্ড), ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ লোক সংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, কলকাতা, ১৩৬৭, পৃ. ১০৪২।

৮. বঙ্গীয় লোকসংগীত রত্নাকর (৩য় খন্ড), ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ লোক সংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, কলকাতা, ১৩৬৭, পৃ. ১০৪৪।

৯. তদেব, পৃ. ১০৪৮।

১০. ঝাড়গ্রামের পটুয়া গান; বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গের লোকজীবনে লোকসংস্কৃতি, কলকাতা, ১৩৯৭, পৃ. ৩২।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 869-875
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.300

বঙ্কিমচন্দ্রের ‘ধর্মতত্ত্ব’ গ্রন্থটির আলোকে ধর্ম বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

সুদীপ পাল, *রাজ্য সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, দর্শন বিভাগ, কুলটি কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 01.03.2026; Accepted: 23.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

We generally know that the word '*Dharma*' is derived from the root '*Dhri*' and the suffix '*Mana*', which means to hold. Therefore, it can be said that what holds is *Dharma*. Bankim Chandra refers to the Religion of Humanity as Dharma. In his book '*Dharmattva*', he has recognized four faculties of man, namely: one, physical faculty, two, knowledge-seeking faculty, three, practical faculty, and four, mental-pleasing faculty. The practice, development, and fulfillment of these faculties is humanity. According to him, the proper practice and mutual harmony of all these faculties is true humanity and this is human religion. And the true human religion depends on this practice. He means humanity or human religion by '*Dharma*'. For him, '*Dharma*' does not mean any superstition, mythology, or blind faith, but for him, '*Dharma*' is the practice of a moral sense and a form of human welfare. The present article will mainly present a brief review of religion in the light of Bankim Chandra's book '*Dharmattava*'.

Keywords: Faculty, Practice, Inspiration, Fulfillment, and Harmony

বঙ্কিমচন্দ্রের *‘ধর্মতত্ত্ব’* গ্রন্থে আমরা এক গুরু-শিষ্য পরম্পরা দেখতে পাই, যেখানে গুরু প্রশ্ন করছেন শিষ্য তার উত্তর দিচ্ছেন, আবার কোথাও শিষ্য প্রশ্ন করছেন গুরু তার উত্তর দিচ্ছেন, এইভাবে একটা পরম্পরা আমরা লক্ষ্য করি। এই গুরু-শিষ্য পরম্পরার মধ্যে দিয়ে তিনি সকল মানব সমাজকে তাঁর অনুশীলনতত্ত্ব বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। বর্তমান এই প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের *‘ধর্মতত্ত্ব’* গ্রন্থটির আলোকে ‘ধর্ম’ বিষয়ক একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা।

বঙ্কিমচন্দ্র *‘ধর্মতত্ত্ব’* গ্রন্থে বলেছেন অনুশীলনই ধর্ম।[১] অনুশীলন বলতে বোঝায় নিয়মিত চর্চা, অভ্যাস ও আত্মশিক্ষা। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, সত্যবাদিতা একদিনে অর্জিত হয় না, দয়া ও ন্যায়বোধ হঠাৎ জন্মায় না এবং আত্মসংযম একবারের প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ হয় না। এসব গুণ ধীরে ধীরে নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। শুধু ঈশ্বরে বিশ্বাস অথবা শুধু পূজা-পার্বণ করলেই ধর্ম হয় না আবার শুধু ধর্মগ্রন্থ পড়লেই ধর্ম সম্পূর্ণ হয় না। জীবনে সত্য, প্রেম, ন্যায় ও দয়া প্রভৃতির চর্চা করাই হল প্রকৃত ধর্ম। ধর্ম মানে জীবনের নৈতিক গুণাবলির বাস্তব প্রয়োগ। তাঁর মতে, ধর্ম কেবল বিশ্বাস, আচার বা তত্ত্ব নয় বরং ধারাবাহিক নৈতিক চর্চা। ধর্ম হল

১. *বঙ্কিম রচনাবলী,* যোগেশ চন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ৫২৯।

জীবনের প্রতিদিনের সৎ অনুশীলন। আর এই নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমেই মানুষ তার পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করে। তিনি মনে করেন, মানুষ মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করলেই পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করতে পারে না। মানুষের মধ্যে পশুত্ব, স্বার্থপরতা প্রভৃতি প্রবৃত্তিগুলি থাকে। কিন্তু যখন সে সত্যকে গ্রহণ করে, ন্যায় পালন করে, দয়া ও প্রেম চর্চা করে এবং আত্মসংযম অবলম্বন করে তখনই তার প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়। আর এই প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশই হল মানবতা।

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন অনুশীলনের ফল সুখ। তাঁর মতে যদি অনুশীলন ধর্ম্ম হয় এবং অনুশীলনের ফল সুখ হয় তাহলে ধর্ম্মের ফলও সুখ। ধর্ম্মের ফল ইহকালে সুখ, আর যদি পরকালে থাকে তাহলে পরকালেও সুখ। ধর্ম্ম সুখের একমাত্র উপায়।[২]

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর *'ধর্মতত্ত্ব'* গ্রন্থের ক্রোড়পত্র 'ক'-এ ধর্মের ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ উল্লেখ করেছেন। ধর্মের এই ছয়টি ভিন্নার্থ হল, প্রথমত, 'Religion' অর্থে, যেমন- হিন্দুধর্ম, ইসলাম ধর্ম ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, 'Morality' অর্থে, যেমন- ধর্মশাস্ত্র, ধর্ম্মসূত্র ইত্যাদি। তৃতীয়ত, 'Virtue' অর্থে, যেমন, সৎ আচরণ। চতুর্থত, রিলিজিয়ন বা নীতি অনুমোদিত অর্থে, যেমন- দান পরম ধর্ম, অহিংসা পরম ধর্ম ইত্যাদি। পঞ্চমত, গুণ অর্থে, যেমন- মুখ্য গুণ, গৌণ গুণ। এবং ষষ্ঠত, আচার অর্থে, যেমন- দেশধর্ম, জাতিধর্ম ইত্যাদি। বঙ্কিমচন্দ্র এই ছয়টি অর্থের মধ্যে একটা সমস্যা লক্ষ্য করেছেন। ধর্ম কখনো রিলিজিয়নের প্রতি, কখনো নীতির প্রতি, কখনো অভ্যস্ত ধর্মাত্মতার প্রতি, আবার কখনো পুণ্যকর্ম্মের প্রতি প্রযুক্ত হওয়াতে নীতির প্রকৃতি রিলিজিয়নে, রিলিজিয়নের প্রকৃতি নীতিতে, অভ্যস্ত গুণের লক্ষণ কর্মে, কর্মের লক্ষণ অভ্যাসে ন্যস্ত। ফলে রিলিজিয়ন–উপধর্মসংকুল, নীতি–ভ্রান্ত, অভ্যাস–কঠিন, এবং পুণ্য–দুঃখজনক হয়ে পড়েছে।[৩] তাই তিনি ধর্মের নতুন করে ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

ধর্ম সম্পর্কে আমাদের যে অজ্ঞতা রয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর *'ধর্মতত্ত্ব'* গ্রন্থে সেই অজ্ঞতা দূর করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, ধর্ম কেবল আচার বা উপাসনা নয়; মানুষকে মনুষ্যত্বের পর্যায়ে পৌঁছানোয় হল ধর্ম। বঙ্কিমচন্দ্র আসলে 'ধর্ম' এই ধারণাটিকে এক বিশুদ্ধ অর্থে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। *'ধর্মতত্ত্ব'* গ্রন্থে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, সমাজে ধর্ম, নীতি, অভ্যাস ও পুণ্যকর্ম এই চারটি পৃথক ধারণাকে একে অপরের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলার ফলে গভীর দার্শনিক ও সামাজিক বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। ধর্ম কখনো কেবল সম্প্রদায়গত বিশ্বাস ও আচার হিসেবে, কখনো নৈতিক বিধি হিসেবে, কখনো চরিত্রগত অভ্যাস হিসেবে আবার কখনো বিচ্ছিন্ন পুণ্যকর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র প্রকৃতি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। এর ফলে ধর্ম তার মানবোন্নতিকর সারবত্তা হারিয়ে উপধর্ম ও আচারবহুল রূপ ধারণ করেছে। নীতি যুক্তিনিষ্ঠ নৈতিকতা না হয়ে কুসংস্কারনির্ভর নিয়মে পরিণত হয়েছে। অভ্যাস স্বতঃস্ফূর্ত চরিত্রগঠনের বদলে কঠোর যান্ত্রিক আচরণে নেমে এসেছে এবং পুণ্যকর্ম আনন্দময় মানবকল্যাণের পরিবর্তে ভয় ও বাধ্যবাধকতার বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, হিন্দুধর্ম ও হিন্দু নীতিবোধের আধুনিক অবনতি এবং শিক্ষিত সমাজের অনাস্থার একটি প্রধান কারণ হল এই ধারণাগত বিশৃঙ্খলা। তাই তিনি ধর্মকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করেন মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি ও মানবত্বের বিকাশের প্রক্রিয়া হিসেবে, যেখানে নীতি, কর্ম ও অভ্যাস সবই সুসংগতভাবে মানবকল্যাণের লক্ষ্যে যুক্ত থাকবে।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "ধর্ম শব্দের যৌগিক অর্থ অনেকটা Religion শব্দের অনুরূপ। ধর্ম = ধৃ + মন্ (ধ্রিয়তি লোকো অনেন, ধরতি লোকং বা)। এই জন্য আমি ধর্মকে Religion শব্দের প্রকৃত প্রতিশব্দ বলিয়া

---

২. তদেব, পৃষ্ঠা ৫৩০।

৩. *বঙ্কিম রচনাবলী,* যোগেশ চন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ৬০৭-৬০৮।

নির্দেশ করিয়াছি"।[৪] এই Religion বা ধর্ম শব্দটি সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করার জন্য তিনি বিভিন্ন পাশ্চাত্য দার্শনিকের মতামত উল্লেখ করেছেন, তাঁর মধ্যে দার্শনিক সিলির মতটিকেই বিশেষ ভাবে সমর্থন করেছেন। ধর্ম সম্পর্কে দার্শনিক সিলির মতটি হল "The Substance of Religion is Culture।"[৫] তিনি 'Religion' বা 'ধর্ম' শব্দটিকে কেবল শুষ্ক, আচারসর্বস্ব উপাসনা পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহার না করে মনুষ্যত্ব বা মানববৃত্তির উৎকর্ষ অর্থেই ব্যবহার করেছেন।

তিনি গ্রন্থের শুরুতেই দেখিয়েছেন যে, সকল মানুষ সুখের অনুসন্ধানী। মানুষ মনে করে ধার্মিক ব্যক্তি কখনও সুখী হতে পারে না। কিন্তু তিনি দেখিয়েছেন যে ধার্মিক হওয়া ও সুখী হওয়ার মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। এই কথা বোঝানোর জন্য তিনি আমাদেরকে তাঁর রচিত *'ধর্মতত্ত্ব'* গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে দুঃখ ও সুখ কি তা বিভিন্ন উপমার মাধ্যমে বুঝিয়েছেন। তাঁর রচিত *'ধর্মতত্ত্ব'* গ্রন্থের শুরুতেই তিনি বলেছেন বাচস্পতি মহাশয় ধার্ম্মিক ব্যক্তি কিন্তু তার থেকে দুঃখী কেউ নেই। যখন সে দুঃখী তখন সে ধার্ম্মিক নয়। বাচস্পতি মহাশয় যথার্থ দুঃখী নন তিনি নিজের দোষে অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের ত্রুটির কারণেই দুঃখ পাচ্ছেন।[৬] বঙ্কিমচন্দ্র *'ধর্মতত্ত্ব'* গ্রন্থে এক সর্বজনীন বৃত্তির অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছেন।

তিনি *'ধর্মতত্ত্ব'* গ্রন্থে ধর্মের মূল লক্ষ্য হিসেবে মানববৃত্তির সম্যক বিকাশের কথা বলেছেন। মানুষের মধ্যে জ্ঞান, প্রেম, কর্মশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি এই বিভিন্ন বৃত্তি আছে। ধর্মের কাজ হল এই বৃত্তিগুলিকে সুষম ও সঠিক পথে পরিচালনা করা। যে সাধনা মানুষের অন্তরের শক্তিকে উন্নত করে এবং তাকে সত্য, মঙ্গল ও কল্যাণের পথে নিয়ে যায় সেটাই প্রকৃত ধর্ম। সুতরাং ধর্ম কেবল বিশ্বাস নয়, এটি একটি নৈতিক-আধ্যাত্মিক অনুশীলন।

তিনি বলেছেন অনুশীলনতত্ত্বকে বুঝতে গেলে আগে সুখ ও মুক্তি কী তা বোঝা দরকার তবেই অনুশীলনতত্ত্বকে বোঝা যাবে।[৭] তাই বর্তমান এই প্রবন্ধে প্রথমে সুখের আলোচনা করে তারপর মুক্তির আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। সুখ কী তা বোঝাতে গিয়ে *'ধর্মতত্ত্ব'* গ্রন্থে তিনি বলেছেন, বৃত্তির অনুশীলনই সুখ। যদি বৃত্তির অনুশীলনই সুখ হয় তাহলে সেই সুখের উপাদান কি হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি তিন প্রকার সুখের উপাদানের কথা বলেছেন যথাঃ প্রথমত, শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকলের অনুশীলন তজ্জনিত স্ফূর্তি ও পরিণতি। দ্বিতীয়ত, সেই সকলের পরস্পর সামঞ্জস্য। তৃতীয়ত, তাদৃশ্য অবস্থায় সেই সকলের পরিতৃপ্তি।[৮] এইগুলি হল সুখের উপাদান। এইভাবে তিনি সুখকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। বৃত্তিগুলির স্ফূর্তি ও সামঞ্জস্য বিধানের উপায় হিসাবে তিনি অনুশীলনের কথা বলেছেন।

এরপর তিনি মোক্ষের কথা আলোচনা করেছেন। *'ধর্মতত্ত্ব'* গ্রন্থে মুক্তি বা মোক্ষ শব্দটি সমার্থক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, "অনুশীলনের সম্পূর্ণতায় মোক্ষ"।[৯] তিনি মোক্ষ প্রসঙ্গে *'ধর্মতত্ত্ব'* গ্রন্থে আরও বলেছেন যে,

> "....তাঁহার সামীপ্য, সালোক্য, সারূপ্য, সাযুজ্য কামনা করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা ক্রমে ঈশ্বরের নিকট হইব। আর্য্য ঋষিরা বিশ্বাস করিতেন যে, তাহা হইলে আমরা ক্রমে

৪. *দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র,* হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃষ্ঠা ৬২ থেকে উদ্ধৃত।

৫. *বঙ্কিম রচনাবলী,* যোগেশ চন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ৫৩১।

৬. তদেব, পৃষ্ঠা ৫২৯।

৭. তদেব, পৃষ্ঠা ৫২৬-৫২৭।

৮. *বঙ্কিম রচনাবলী,* যোগেশ চন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ৫২৯।

৯. *দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র,* হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃষ্ঠা ১০৯ থেকে উদ্ধৃত।

> সারূপ্য ও সাযুজ্য প্রাপ্ত হইব, ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইব, ঈশ্বরেই লীন হইব। ইহাকেই মোক্ষ বলে। মোক্ষ আর কিছুই নয়, ঐশ্বরিক আদর্শ-নীত ঈশ্বরানুকৃত স্বভাবপ্রাপ্তি। তাহা পাইলেই সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া গেল, এবং সকল সুখের অধিকারী হওয়া গেল।"[১০]

এছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্র *'ধর্মতত্ত্ব'* গ্রন্থে মুক্তি প্রসঙ্গে আরও বলেছেন,

> "কিন্তু যে মুক্ত, অর্থাৎ সংযতাত্মা, বিশুদ্ধচিত্ত, তাহার মনের সুখের সীমা নাই। যে মুক্ত সে-ই ইহজীবনে সুখী। এই জন্য তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, সুখের উপায় ধর্ম। মুক্ত ব্যক্তির সকল বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া সামঞ্জস্যযুক্ত হইয়াছে বলিয়া সে মুক্ত। যাহার বৃত্তিসকল স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত নহে, সে অজ্ঞান, অসামর্থ্য, বা চিত্তমালিন্যবশত মুক্ত হইতে পারে না।"[১১]

তিনি আরও বলেছেন, মুক্তি পূর্ণ মনুষ্যত্ব। অন্যত্র তাঁর নিজের উক্তি হল "ঈশ্বরে ভক্তিই পূর্ণ মনুষ্যত্ব এবং অনুশীলনের একমাত্র উদ্দেশ্য এই ভক্তি।"[১২] সুতরাং তাঁর মতে ঈশ্বর ভিন্ন ধর্ম নেই ও অনুশীলনও নেই।

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন, মানুষের সকল বৃত্তিগুলির অনুশীলনের দ্বারা সম্যক্ স্ফুর্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যই ধর্মের লক্ষ্য। তাঁর মতে, তিনিই আদর্শ মানুষ যার সকল বৃত্তি সম্যক্ স্ফুর্তি, পরিণতি ও পরস্পর সামঞ্জস্য। আর এই অবস্থাই হল প্রকৃত মনুষ্যত্ব। এটিই হল মোক্ষ।[১৩]

বঙ্কিমচন্দ্র *'ধর্মতত্ত্ব'* গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে ধর্ম কি তা বোঝাতে গিয়ে 'মানুষের ধর্ম' কথাটি ব্যবহার করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর *'ধর্মতত্ত্ব'* গ্রন্থের ক্রোড়পত্র 'ক'-এ ধর্মের যে ছয়টি ভিন্নার্থ উল্লেখ করেছেন তারমধ্যে ধর্মের পঞ্চম যে অর্থটি সেই অর্থেই তিনি এখানে ধর্ম বলতে মানুষের ধর্মকে বুঝিয়েছেন। তিনি ধর্ম বলতে মানুষের গুণের কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। যে গুণটি মানুষের মধ্যে থাকলে মানুষ মানুষ হয়ে ওঠে আর যা না থাকলে মানুষকে মানুষ বলে গণ্য করা যায় না। সেইজন্য মনুষ্যত্বকেই মানুষের ধর্ম বলা হয়েছে। যেমন চৌম্বকের ধর্ম লৌহকর্ষণ, অগ্নির ধর্ম দাহকতা ঠিক তেমনি মানুষের ধর্ম মনুষ্যত্ব। মানুষের ধর্ম কি? শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলির বিহিত অনুশীলনই মানুষের ধর্ম। এটিই হল মনুষ্যত্ব।[১৪] সেই মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র *'ধর্মতত্ত্ব'* গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে বলেছেন, "যে অবস্থায় মনুষ্যের সর্বাঙ্গীন পরিণতি সম্পূর্ণ হয় সেই অবস্থাকেই মনুষ্যত্ব বলা হয়।"[১৫]

মানুষের অন্তরে কতকগুলি শক্তি আছে। বঙ্কিমচন্দ্র *'ধর্মতত্ত্ব'* গ্রন্থে এই শক্তিগুলিকে 'বৃত্তি' বলে উল্লেখ করেছেন। এই 'বৃত্তি' শব্দটি আবার বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর *'ধর্মতত্ত্ব'* গ্রন্থে 'বৃত্তি' বলতে ইংরেজি 'Faculty' শব্দটিকেই নির্দেশ করেছেন। তিনি দুই ধরনের বৃত্তির কথা বলেছেন যথা- শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি। মানসিক বৃত্তিগুলি আবার তিন প্রকার যথাঃ জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি, কার্যকারিণী বৃত্তি ও চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি। যে বৃত্তিগুলি জ্ঞান অর্জন করে তাকে জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি বলা হয়, আর যে বৃত্তগুলি কর্মে প্রবৃত্ত হয় তাকে কার্য্যকারিণী বৃত্তি বলা হয়, আর যে বৃত্তিগুলি জ্ঞান উপার্জন করে না আবার কার্যে প্রবৃত্ত হয় না শুধুমাত্র আনন্দ দেয় তাকে চিত্তরঞ্জনী বৃত্তি বলা হয়। অর্থাৎ বলা যেতে পারে তিনি মানুষের

---

১০. *বঙ্কিম রচনাবলী,* যোগেশ চন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ৫৩৪।

১১. তদেব, পৃষ্ঠা ৫৭৫।

১২. *দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র,* হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃষ্ঠা ১১০ থেকে উদ্ধৃত।

১৩. তদেব, পৃষ্ঠা ১১৫ থেকে উদ্ধৃত।

১৪. *দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র,* হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃষ্ঠা ৬৩।

১৫. *বঙ্কিম রচনাবলী,* যোগেশ চন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ৫৩১।

বৃত্তিগুলিকে মোট চারটি ভাগে ভাগ করেছেন যথাঃ এক, শারীরিক বৃত্তি, দুই, জ্ঞানার্জনীয় বৃত্তি, তিন, কার্য্যকারিণী বৃত্তি, চার, চিত্তরঞ্জনী বৃত্তি। এই বৃত্তিগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতাই হল মনুষ্যত্ব।[১৬] তাঁর মতে এই সকল বৃত্তিগুলির যথার্থ অনুশীলন ও পারস্পরিক সামঞ্জস্যই হল প্রকৃত মনুষ্যত্ব আর এটাই হল মানবধর্ম। আর এই অনুশীলনের ওপরেই প্রকৃত মানবধর্ম নির্ভর করে।

এই বৃত্তিগুলির পারস্পরিক সামঞ্জস্য হল অনুশীলনের সীমা। আর এই বৃত্তিগুলির পারস্পরিক সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুশীলনের ফল হল সুখ। যখন এই সমস্ত বৃত্তিগুলির অনুশীলন করা হয় তখন সকলেই ঈশ্বরমুখী হয়। এই অবস্থাকে ভক্তি বলা হয়।[১৭] ভক্তির পরেই প্রীতি কারণ তাঁর মতে বৃত্তিগুলির মধ্যে ভক্তি ও প্রীতি এই দুটি বৃত্তি সর্বশ্রেষ্ট। তিনি প্রীতিকে চার ভাগে ভাগ করেছেন যথাঃ প্রথমত, আত্মপ্রীতি, দ্বিতীয়ত, স্বজনপ্রীতি, তৃতীয়ত, স্বদেশপ্রীতি এবং চতুর্থত, পশুপ্রীতি। তিনি বলেন সকল ধর্মের উপর স্বদেশপ্রীতি। ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন, এইজন্য সর্বভূতে প্রীতি ভক্তির অন্তর্গত। সর্বভূতের প্রতি প্রীতিই হল ভক্তি, ধর্ম ও মনুষ্যত্ব।[১৮]

তাঁর ধর্মচিন্তা কেবল আচারনির্ভর নয় বরং এক নৈতিক ও মানবিক আদর্শ। তাঁর মতে, "ঈশ্বরে ভক্তি ও মনুষ্যে প্রীতি ইহাই ধর্মের সার, অনুশীলনের মুখ্য উদ্দেশ্য, সুখের মূলীভূত এবং মনুষ্যত্বের চরম।"[১৯] এই বক্তব্যটির অর্থ বিশ্লেষণ করলে যা পায় তা হল তিনি ঈশ্বর বলতে কেবল ঈশ্বরের পূজা-অর্চনাকেই বোঝাননি। তাঁর মতে ঈশ্বর হলেন সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের প্রতীক। তিনি ঈশ্বরে ভক্তি বলতে আসলে যা বোঝাতে চেয়েছেন তা হল জীবনের সর্বক্ষেত্রে নৈতিক আদর্শকে গ্রহণ করা। এই ভক্তি মানুষকে স্বার্থপরতা, হিংসা ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে এক উচ্চতর চেতনায় উন্নীত করে। সুতরাং ঈশ্বরে ভক্তি হল আত্মার উৎকর্ষের পথ। তিনি মনে করেন যদি ঈশ্বরপ্রেম মানুষের প্রতি প্রেমে প্রকাশ না পায় তবে তা প্রকৃত ভক্তি নয়। মানবপ্রেম অর্থাৎ সহানুভূতি, দয়া, পরোপকার ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রভৃতি হল ধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ। মানুষের সেবা ও মঙ্গল চিন্তাই ঈশ্বরভক্তির বাস্তব রূপ। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, ঈশ্বরে ভক্তি ও মানবপ্রেম এই দুইয়ের সমন্বয়ই হল ধর্মের সার। তিনি অনুশীলন বলতে চরিত্রগঠন ও আত্মশুদ্ধির ধারাবাহিক চর্চাকেই বুঝিয়েছেন। এই অনুশীলনের মুখ্য উদ্দেশ্য হল এমন এক মানসিক অবস্থায় পৌঁছানো যেখানে মানুষ ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও মানুষের প্রতি প্রেমময় হয়ে ওঠে। তাঁর মতে, প্রকৃত ধর্ম কোনো সংকীর্ণ আচার নয়। ধর্ম হল নৈতিকতা ও মানবতার আদর্শ। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি মানুষকে আত্মিকভাবে উন্নত করে এবং মানুষের প্রতি প্রেম তাকে সামাজিকভাবে পরিপূর্ণ করে। এই দুইয়ের সমন্বয়েই সত্য ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মনুষ্যত্ব তার চূড়ান্ত সার্থকতা লাভ করে। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন, প্রকৃত সুখ বস্তুগত ভোগে নয়; আত্মিক শান্তি ও মানবকল্যাণে নিহিত। ঈশ্বরভক্তি মানুষকে অন্তরের প্রশান্তি দেয় এবং মানবপ্রেম সমাজে সম্প্রীতি স্থাপন করে। এই দুইয়ের সমন্বয়েই মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। তাই তিনি একে "মনুষ্যত্বের চরম" বলে অভিহিত করেছেন।

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, দুঃখ থেকে সুখে যাওয়ার জন্য এক সেতুর প্রয়োজন সেই সেতুটি হল ধর্ম। এখানে ধর্ম মানে কোনো বিশেষ উপাসনা পদ্ধতি নয়, বরং 'ধৃ' ধাতু থেকে আসা সেই সত্তা যা ধারণ করলে সমাজ ও জগত খণ্ড-বিখণ্ড হওয়া থেকে রক্ষা পায়। বঙ্কিমচন্দ্র *'ধর্মতত্ত্ব'* গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে সেই সেতুবন্ধনের কাজটিই করার চেষ্টা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র *'ধর্মতত্ত্ব'* গ্রন্থে 'ধর্ম' সম্পর্কে এক নতুন ও সহজ সরল

---

১৬. তদেব, পৃষ্ঠা ৫৩৫।

১৭. *বঙ্কিম রচনাবলী,* যোগেশ চন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ৫৫৯।

১৮. *দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র,* হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃষ্ঠা ৭৫।

১৯. তদেব, পৃষ্ঠা ৭৫ থেকে উদ্ধৃত।

ব্যাখ্যা আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর মতে, মানুষের মধ্যে যে নৈতিক গুণাবলী রয়েছে যেমন- সত্য, ন্যায়, প্রেম, দয়া, আত্মসংযোগ ও কর্তব্যবোধ প্রভৃতির বিকাশই হল প্রকৃত ধর্ম। এই গুণগুলির সমন্বয়ই হল মানবতার প্রকৃত রূপ। আমরা সকলেই দুঃখের হাত থেকে পরিত্রান পেতে চাই। এই দুঃখের হাত থেকে পরিত্রান চাওয়া মানে হল আমি সুখে থাকতে চাই বা সুখ পেতে চাই। তাই দুঃখ হল মানুষের চিরস্থায়ী সমস্যা আর সুখ হল মানুষের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা। তাই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এই সমস্যার সমাধান ও আকাঙ্ক্ষার একমাত্র পথ হল ধর্ম। একমাত্র ধর্মই পারে মানুষকে দুঃখের হাত থেকে পরিত্রান দিতে। ধর্মই হল সুখের একমাত্র উপায়।[২০] বঙ্কিমচন্দ্র তিন প্রকার সুখের কথা বলেছেন যথাঃ প্রথমত, স্থায়ী সুখ, দ্বিতীয়ত, ক্ষনিক কিন্তু পরিমাণে দুঃখশূন্য এবং তৃতীয়ত, ক্ষনিক কিন্তু পরিমাণে দুঃখের কারণ। শেষোক্ত সুখ সুখই নয়, দুঃখের প্রথম অবস্থা মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্র যখন ধর্মকে সুখের উপায় বলেছেন তখন সুখ শব্দের দ্বারা স্থায়ী বা পরিমাণে দুঃখশূন্য সুখকেই নির্দেশ করেছেন। তাঁর প্রচারিত অনুশীলন ধর্মের উদ্দেশ্য ঐরূপ সুখ। অর্থাৎ যেরূপ অনুশীলনে স্থায়ী সুখ বা দুঃখশূন্য সুখ জন্মে তাই বিহিত। এইরূপ সুখই ধর্মের কষ্টিপাথর। অন্যত্র তিনি বলেছেন সুখের উপায় ধর্ম আর মনুষ্যত্বেই সুখ, সুতরাং সুখই সেই কষ্টিপাথর।[২১] তিনি *'ধর্মতত্ত্ব'* গ্রন্থে ধর্ম বলতে কোন অন্ধবিশ্বাস বা কুসংস্কারকে বোঝাননি। তিনি ধর্ম বলতে অনুশীলনকে বুঝিয়েছেন আর এই অনুশীলনের ওপরেই প্রকৃত মানবধর্ম নির্ভর করে। তাই 'ধর্ম' বলতে তিনি মানবতা বা মানবধর্মকেই বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। তিনি মানবাতকে দুটি দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করেছেন। প্রথমতঃ, ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি চরিত্রগঠন, আত্মনিয়ন্ত্রন ও নৈতিক শুদ্ধির কথা বলেছেন আর দ্বিতীয়তঃ, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি অপরের মঙ্গলচিন্তা, সমাজকল্যাণ ও পরোপকারের কথা বলেছেন। আর এই দু-য়ের সমন্বয়েই মানবতার পূর্ণতা অর্জিত হয়। তাঁর মতে মনুষ্যত্বের উন্নতিই হল মানবতা। ধর্ম মনুষ্যত্বকে উন্নত করে। এখানে মনুষ্যত্ব মানেই মানবতা অর্থাৎ মানুষের ভেতরে যে নৈতিক গুণগুলি রয়েছে যেমন সত্যনিষ্টা, ন্যায়বোধ, দয়া, প্রেম, কর্তব্যবোধ এবং আত্মসংযম প্রভৃতি এই গুণগুলির চর্চা ও বিকাশই হল প্রকৃত মানবতা।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. বাগল, যোগেশচন্দ্র। বঙ্কিম রচনাবলী (সম্পাদিত)। সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৪৩০।
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ। দাস, শ্রীসজনীকান্ত। বঙ্কিমচন্দ্র (সম্পাদিত)। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৪৯।
৩. মুখোপাধ্যায়, শ্রীশ্যামাপ্রসাদ। বঙ্কিম-পরিচয় (সম্পাদিত)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৩৮।
৪. সমাজপতি, সুরেশকুমার। বঙ্কিম-প্রসঙ্গ। নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮২।
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ। দাস, শ্রীসজনীকান্ত। বিবিধ প্রবন্ধ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৬৬।
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ। দাস, শ্রীসজনীকান্ত। ধর্ম্মতত্ত্ব। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৮৮৮।

২০. *বঙ্কিম রচনাবলী,* যোগেশ চন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ৫৩০।

২১. *দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র,* হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃষ্ঠা ৬৯ থেকে উদ্ধৃত।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. বসু, শ্রীলেখা। বঙ্কিম-চর্চা। (২০০৮), কলকাতা: গ্রন্থমিত্র।
২. দত্ত, ভবতোষ। চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র। (১৯৬১), কলকাতা: জিজ্ঞাসা।
৩. দত্ত, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ। দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র। (১৩৪৭), কলকাতা: শ্রী ভারতী প্রেস।
৪. দাশগুপ্ত, রবীন্দ্রকুমার। প্রবন্ধ সংগ্রহ। (২০১০), কলকাতা: এবং মুশায়েরা।
৫. দাশগুপ্ত, রবীন্দ্রকুমার। বিবিধ প্রবন্ধ। (২০০৭), কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
৬. দে, নাড়ুগোপাল। উনিশ শতকের বাংলা রেনেসাঁস ও বঙ্কিমচন্দ্র। (২০১০), কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।
৭. মজুমদার, মোহিতলাল। বঙ্কিম-বরণ। (১৩৫৬), হাওড়া: বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়।
৮. পোদ্দার, অরবিন্দ। বঙ্কিম মানস। (১৩৫৮), কলকাতা: ইন্ডিয়ানা লিমিটেড।
৯. সেনগুপ্ত, শ্রীসুবধচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র। (১৩৪৫), কলকাতা: এস, সি সরকার এন্ড সনস লিমিটেড।
১০. সিংহ, শ্রীবিমলচন্দ্র। বঙ্কিম-প্রতিভা। (১৩৪৫), কলকাতা: রঞ্জন পাবলিশিং হাইস।
১১. তেওয়ারি, রামবহাল। বঙ্কিম বীক্ষা। (১৯৯৩), কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 876-882
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.301

বৈদিক সংস্কৃতি ও নৈতিকতা: একটি দর্শনগত পর্যালোচনা

অরিন্দম গাঙ্গুলী, *রাজ্য সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, ওন্দা থানা মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 16.03.2026; Accepted: 26.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Abstract

The importance of ethics and values in human society is immense. Man is a social being, and the origin and development of ethics and values are due to the need for that sociality. In India, ancient and complete traditional patterns of ethics and values can be seen in the thinking of society. There are signs of it since the dawn of Indian history, but its prevalence can be seen from Vedic society. The traditional patterns of ethics that can be seen in Vedic culture are observed in the present Indian society. The main source of information for understanding Vedic culture is Vedic literature. Vedic literature is mainly divided into four categories – Samhita, Brahmana, Aranyaka and Upanishads. According to recent chronology, the possible time range of Vedic literature is from 1500 BC to 600 BC, almost a thousand years. The central idea in the ethics of Rigveda is the concept of ritual 'Rta'. The main idea of which is a unique thought that unites discipline and morality. Along with this, the concept of religion, karma, is prevalent. Which speaks of the complete development of the individual and society. The concept of *Purushaartha* has taken place as the main goal of individual life. In the social field, the sense of world brotherhood, community thinking has taken place. In educational thought, attention has been paid to the development of character and personality rather than the improvement of worldly life. The central thought of the Upanishads is the thought of searching for truth. A prayer is mentioned in the search for knowledge of 'truth', the highest truth and complete knowledge. The thought of the relationship between nature and man has taken place, the five elements of creation and life, the five elements are mentioned. The idea of harmonious development of nature and man has been given. In the current globalized society, in the context of its decline and degradation, it has special significance in the overall development of man and society. An attempt has been made to highlight that aspect in this article.

Keywords: Vedic culture, literature, social life, morality.

ভারত ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল বৈদিক যুগ। বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তার ভথ্যসূত্র সম্পর্কে জানা বিশেষ প্রয়োজন। বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতির যে চিত্র পন্ডিত ও ঐতিহাসিকরা তুলে ধরেছেন তা মূলত সাহিত্যগত তথ্যের উপর নির্ভর করে। প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যের সীমাবদ্ধতাই এর একমাত্র কারণ। আকার ও বৈচিত্রে ব্যাপক এই বৈদিক সাহিত্যের সময়কাল নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

সাম্প্রতিক কালনির্দেশ অনুযায়ী বৈদিক সাহিত্য সম্ভার এর সম্ভাব্য কাল সীমা খ্রিস্টপূর্বাব্দ ১৫০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ প্রায় সহস্র বছর ব্যাপী।[১]

বৈদিক সাহিত্য:

বেদ শব্দের মানে হল পবিত্র ও পরম জ্ঞান। ইন্দো-ইউরোপীয় তথা পৃথিবীর সর্ব প্রাচীন সাহিত্য হল বেদ। তবে এটি একটি শুধুমাত্র বিশেষ গ্রন্থ নয়, আকার ও বৈচিত্র্যে ব্যাপক এই সাহিত্য প্রায় শতাধিক সমষ্টি। বৈদিক সাহিত্য কে মূলত চারটি অংশে বিভক্ত করা হয়- ১) সংহিতা ২) ব্রাহ্মণ ৩) আরণ্যক ৪) উপনিষদ। এই ব্যাপক ও বৈচিত্র্যময় বৈদিক সাহিত্যের অনেক গ্রন্থ আজ বিলুপ্ত। তবে আজও যা বেঁচে আছে তা সুবিশাল। এখানে তার প্রাথমিক ধারণা উল্লেখ করা যাক। সংহিতা: সংহিতা মূলত চারটি ক) ঋগ্বেদ সংহিতা, খ) সামবেদ সংহিতা, গ) যজুর্বেদ সংহিতা, ঘ) অথর্ববেদ সংহিতা।

ক) ঋগ্বেদ সংহিতা: আধুনিক পণ্ডিতদের মতে ঋক শব্দের অর্থ হল 'song of praise'। ঋগ্বেদ মানে 'The Veda of the knowledge of the songs of the praise'। ঋকবেদ এর পাঁচটি শাখার নাম পাওয়া যায়- শাকল, বাষকল, আশ্বলায়ন, সংজ্ঞায়ন এবং মণ্ডুক। শুধুমাত্র শাকল শাখাটি বর্তমান। এতে দশটি মন্ডল। ১০২৮ টি সুক্ত। ১০,৪৬২ টি স্তবক। ঋকবেদ পদ্য ছন্দে সংকলিত পৃথিবীর প্রাচীনতম সংকলন। তবে এর রচয়িতা কোন একজন ব্যক্তি নয় বা কোন একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার রচনাও নয়। ঋগ্বেদ সংহিতার প্রধান বিষয়বস্তু হল দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রশস্তি- অন্ন, ধন, গবাদি পশু, সন্তান ও নিরাপত্তা কামনা।

খ) সামবেদ সংহিতা: তিনটি শাখা বর্তমান যথা- কৌথুম, রাণায়নীয় এবং জৈমিনীয়। মোট ১৫৪৯ টি স্তবক। সংহিতা টির প্রধানত দুটি ভাগ আর্চিক ও উত্তর আর্চিক। উদ্‌গাতা প্রথমে আর্চিক ভাগের সাহায্যে সুরগুলি আত্ম করবেন- আর্চিক অংশ যেন মনে রাখবার জন্য গানের প্রথম স্তবক গুলি সংকলন বিশেষ। তার পর উত্তর আর্চিক ভাগের সাহায্যে তিনি বৈদিক স্তৌএগুলি সুর করে গাইবেন। সামবেদ সংহিতা প্রধান বিষয়বস্তু হল গান।

গ) যজুর্বেদ সংহিতা: প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত- কৃষ্ণ যজুর্বেদ ও শুক্ল যজুর্বেদ। বর্তমান পাঁচটি শাখার নাম পাওয়া যায় কৃষ্ণ যজুর্বেদ এর চারটি শাখা যথা কাঠক সংহিতা, কঠ সংহিতা, মৈত্রায়নী সংহিতা, তৈত্তিরীয় সংহিতা এবং শুক্ল যজুর্বেদের মাত্র একটি শাখা যার নাম বাজসেনীয় সংহিতা। বৈদিক সাহিত্যে যে সব যজ্ঞ এর পরিচয় পাওয়া যায় যথা অশ্বমেধ, পুরুষমেধ, রাজসূয়, ইত্যাদির জন্য মন্ত্র উচ্চারণ করার বিধি ছিল যজুর্বেদ সংহিতায়।

ঘ) অর্থর্ববেদ সংহিতাটি আধুনিক পণ্ডিতেরা অথর্ববেদকে যাদুমন্ত্রের বেদ আখ্যা দিয়েছেন। অথর্ব বেদে মোট ৭৩১টি সুক্ত প্রায় ৬০০০ স্তবক এবং কুড়িটি অধ্যায় আছে।

ব্রাহ্মণ: ব্রাহ্মণগুলি হল যাগ-যজ্ঞ মূলক ক্রিয়াকান্ডের এক জটিল ও বিশাল সাহিত্য। উপরের তালিকাতে এদের নামগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। আরণ্যক ও উপনিষদ এগুলো তুলনামূলক পরবর্তী সময়ের রচনা। এখানেই সর্বপ্রথম সুস্পষ্ট ও সচেতন দার্শনিক চিন্তা ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় যা পরবর্তী কালে ভারতীয় দর্শনকে সমৃদ্ধ করেছে।

বৈদিক সমাজ - সংস্কৃতি ও নৈতিকতা:

ভারত ইতিহাসের বৈদিক যুগ সময়ের ব্যবধানে প্রায় সহস্র বছর ব্যাপী বিস্তৃত। মোটামুটি পনেরশো থেকে ছয়শত খ্রিস্টপূর্বাব্দ সময়কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সমগ্র বৈদিক যুগকে পণ্ডিতেরা প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন যথা ঋকবেদের যুগ ও পরবর্তী বেদের যুগ। স্বভাবতই এই বিস্তৃত সময়কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ বৈদিক

যুগের সমাজ অর্থনীতি সংস্কৃতি ও ভাবধারা এক ধরণের ছিল না সময়ের সাথে তা ছিল পরিবর্তনশীল এবং এ প্রসঙ্গে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। বৈদিক সমাজ ছিল মূলত কৃষি ও পশুপালনের উপর নির্ভরশীল এক গ্রামকেন্দ্রিক সমাজ। গ্রাম জীবন ছিল বৈদিক সংস্কৃতি প্রধান দিক। বৈদিক সমাজ জীবন ছিল বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত যথা জন, বিশ, গণ, গ্রাম, কুল । বৃহত্তর একক ছিল জন এবং ক্ষুদ্র একক হল কুল। কুল বা পরিবার ছিল সমাজের মূল ভিত্তি। যৌথ একান্নবর্তী পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ছিল। পরিবারের প্রধান ব্যক্তিকে গৃহপতি বা কুলপতি বলা হত। পিতা, মাতা, পিতামহ, ভগ্নি, ভাই ও অন্যান্য পরিজন নিয়ে পরিবার গঠিত হত। পরিবারের ব্যক্তিদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকত। বৈদিক আর্যগোষ্ঠীর বিশ্ববীক্ষায় দৈব হস্তক্ষেপ ছিল স্বাভাবিক ও অনিবার্য। কেননা তখন দৈনন্দিন জগতে দেবতা, দানব, পিশাচ, প্রেত, নাগ ও পশু বিরাজ জ্বরত। প্রত্নকথাগুলিতে তখন এই বিশ্বাস পরিস্ফুট হয়েছে যে, সৃষ্টিতে কোনো নীতিহীন বিশৃঙ্খলা নেই; বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়মে শাসিত। বিশ্বজগতের অন্তর্লীন সাম্যবোধ বিপর্যস্ত করার জন্য কিছু কিছু শক্তি সক্রিয়; বিধ্বস্ত ঐক্যবোধকে পুনর্বিন্যস্ত করার অনিবার্য আবশ্যিক প্রেরণা থেকে প্রাশুরু প্রত্নকথাগুলির জন্ম হয়েছে। সৃষ্টির মূলগত ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দেবতারা মানুষের ওপর অর্পণ করেছিলেন ব'লেই মানব জীবন একটি কেন্দ্রীভূত বিশ্ববোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই আধ্যাত্মবাদী প্রণতা থেকেই এক মহৎ নীতিবোধের জন্ম হয়েছিল; তাই অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক মানসিকতাই তৎকালীন সমাজে একমাত্র স্বীকৃত দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে উঠল এবং প্রত্যেক তাৎপর্যপূর্ণ মানবিক কার্যই হয়ে উঠল ধর্মাচরণের অঙ্গ। যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রত্যেক অনুপুঙ্খ প্রত্ন-পৌরাণিক তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে নীতিবোধের বিচিত্রগামী অভিব্যক্তিতে নতুন একটি মাত্রা যোগ করল। ঋগ্বেদের নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে বিশদ তথ্য পাওয়া যায় সেই সমস্ত সূক্তে যেখানে দেবতা এবং মানুষকে ধৈর্য, দান, ঋজুতা, দয়া, অতিথিপরায়ণতা ও সহযোগিতা জাতীয় গুণাবলীর জন্য প্রশংসা করা হয়েছে। অগ্নি, বরুণ, ইন্দ্র কিংবা অশ্বীদের মতো দেবতারা পূর্বোক্ত গুণগুলির জন্যই মহৎ; বিরুদ্ধ পরিবেশের সঙ্গে জীবনকে সার্থকভাবে সমন্বিত করার প্রেরণা তাঁরা দিয়েছেন; সেই সঙ্গে বিপদ, ক্ষুধা, ব্যাধি, অন্ধকার ও মৃত্যুর কবল থেকে জীবনকে মুক্ত করার যথার্থ পথও তাঁরা নির্দেশ করেছেন। বিশেষত আলোর জন্য নিরন্তর তৃষ্ণা ঋগ্বেদে বারেবারে ব্যক্ত হয়েছে। কেননা বৈদিক আর্যদের নিকট এই আলো একই সঙ্গে জ্ঞান, উপলব্ধি, আনন্দ ও জীবনের প্রতীক। ঋগ্বেদের বিখ্যাত প্রার্থনা-'উদয় সূর্যকে যেন আমরা চিরদিন দেখতে পাই'। ঋগ্বেদের নীতিবোধের মূল প্রেরণাই এই যে, জীবন অমূল্য এবং মূলত কল্যাণময়, মধুর ও উপভোগ্য ব'লেই এই আশ্চর্য রহস্যময় জীবনকে যতদিন পর্যন্ত সম্ভব, উপভোগ করাই বাঞ্ছনীয়।

বৈদিক সাহিত্যে যৌথ জীবন ও সমষ্টি চিন্তাভাবনার ইঙ্গিত স্পষ্ট যা নৈতিক দিক থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ। বৈদিক সাহিত্য থেকে এ ধরনের কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হল।

> "তোমরা একত্র মিলিত হও, এক কণ্ঠে ঘোষণা কর, একত্র মত বিনিময় কর; যে রূপ অতীতের দেবতাগণ সচেতনভাবে একত্র বসিয়া তাহাদের ভাগ গ্রহণ করিতেন।"[২]

'মন্ত্র সমান হউক, সমিতি সমান হউক, মন সমান হউক, বিচার এক রূপ হউক। তোমাদের সহিত একই মন্ত্রে আমি মন্ত্রনা করি, তোমাদের সহিত একই হবি দ্বারা আমি হোম করি।' অন্য একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে যে,

> "তোমাদের প্রচেষ্টা সমান হউক, হৃদয় গুলি এক হউক, মন এক হউক- যাহাতে তোমাদের ঐক্য স্থাপিত হয়।।"[৩]

ঋকবেদে সমষ্টি কামনা উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে দু-একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন- 'হে ব্রাহ্মণস্পতি তুমি ইহার নিয়ামক। তুমি সুপ্ত কে জান এবং তনয় দান কর; দেবতারা যাহাদিগকে রক্ষা করেন

তাহারা সমস্তই মঙ্গলময়। আমরা বীর পুত্র সমূহের জন্য এই সভায় তোমায় বিশেষ করিয়া বলিতেছি।' একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে,

> "হে ব্রাহ্মণস্পতি তুমি আমাদিগের উপদ্রবকারী শত্রুকে হিংসা কর, তাহারা যেন কদাপি আমাদের প্রাপ্ত না হয়; হে ব্রাহ্মণস্পতি তুমি আমাদের রক্ষা করো।"[৪]

এছাড়াও বলা হয়েছে যে,

> "হে দ্যাবা- পৃথিবী, তোমরা দুইজন দেবতাদিগের আনন্দদায়ক অন্ন লাভ করিবার জন্য আমাদের দিকে অন্ন ও ধন সমূহ জয় করিয়া দাও।।"[৫]

পণ্ডিতেরা উল্লেখ করেছেন প্রাচীন বৈদিক সমাজে মানুষের যে চিন্তা চেতনা প্রতিফলন দেখা যায় তা ছিল পার্থিব সম্পদের কামনা। এই কামনা একান্তই পার্থিব অন্নের কামনা পশুর কামনা ধনের কামনা বল বীর্যের কামনা সন্তানের কামনা নিরাপত্তা কামনা। আধুনিক অর্থে পরিণত আধ্যাত্বিক চিন্তা ভাবনা বিকাশ দেখা যায় না যে ব্রহ্ম চিন্তা বা মোক্ষলাভ আধ্যাত্বিক চিন্তার মূল তার উল্লেখ নেই।[৬] ঋকবেদে দেবতার স্তুতির পেছনে রয়েছে প্রাকৃতিক শক্তিকে জয় করবার বাসনা বা পার্থিব সম্পদের কামনা। প্রকৃতির সুন্দর ও বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে প্রাচীন বৈদিক মানুষের হৃদয় যে ভাবের জন্ম হতো তা থেকেই তাদের মধ্যে নানা দেবতার কল্পনা গড়ে উঠেছিল। দৈনন্দিন জীবনে বৈদিক মানুষেরা বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে যেমন সূর্য অগ্নি পৃথিবী জল বাতাস উপাসনা করত।[৭] বৈদিক দেবতাদের মানবীয় রূপ এর চেষ্টা করা হয়েছে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে - হে ইন্দ্র তুমি যুদ্ধের নেতা তুমি নরগণের সহিত প্রধান প্রধান যুদ্ধে শত্রু সংহারে সমর্থ। ইন্দ্রের মানব নেতৃত্বে উল্লেখ রয়েছে।[৮] ঋকবেদে এও উল্লেখ রয়েছে যে, মানবের মধ্যে ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ মানব তার আবাস গৃহ মানুষের মতোই এমনকি তিনি মানুষের মতই কথা বলতে আমাদের নিকট আসেন এবং আমাদের ধন দান করেন। বৈদিক যজ্ঞে রয়েছে জাদু বিশ্বাসের প্রভাব যা প্রাক আধ্যাত্মবাদী চেতনার প্রতিফলন তার মূল উদ্দেশ্য প্রকৃতিকে আয়ত্তে আনা এবং যত অস্ফুট ও অচেতন ভাবেই হোক না কেন তার অন্তর্নিহিত বিশ্বাস প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম জাদুর ক্ষেত্রে ঈশ্বরের পরিকল্পনা নেই প্রকৃতির উপকৃত শক্তিশালী দেবতাদের কোন কর্তৃত্ব স্বীকৃত নয়, স্বীকৃত নয় লোকোত্তর পরিকল্পনা।[৯] বৈদিক সংস্কৃতির নৈতিক চিন্তাভাবনায় কেন্দ্রীয় স্থানে অবস্থান করছে 'ঋত' সংক্রান্ত ধারণা। ঋকবেদের প্রাচীন পর্যায় প্রকৃত দার্শনিক চেতনার কোন আভাস যদি সত্যিই স্বীকৃত হয় তাহলে তার মূল সূত্র এই 'ঋত'-র মধ্যে সন্ধান করতে হবে। ভিনটারনিতস এর মতে- ঋত মানে 'order of the universe' বিশ্বের নিয়মানুবর্তিতা। ম্যাকডোনাল্ড কিথ এর মতে- 'ঋত' মানে বিশ্বের নিয়মানুবর্তিতা এবং নৈতিক নিয়মানুবর্তিতা উভয়ই। সুতরাং ঋত মূলে কোন এক অমোঘ নিয়মে চেতনায় অনুমিত হয় এবং সে নিয়ম সর্বব্যাপী প্রাকৃতিক নিয়ম যজ্ঞের নিয়ম মানবীয় সম্পর্কের নিয়ম তথা নৈতিক জীবনের নিয়ম। ঋত-র প্রভাবে বৈদিক মানুষেরা কতখানি প্রভাবিত হয়েছিল তার দু একটা বিষয় বলা যেতে পারে। ঋত-র প্রভাবেই প্রভাতে ঊষার উদয় ঋত অনুসারেই পিতৃগণ আকাশে সূর্যকে স্থাপন করেছিলেন। সূর্যের জ্যোতি ঋত-র মুখ আর গ্রহণের অন্ধকার ব্রত বা নিয়মের বিপরীত। সংবৎসর ঋত-র দ্বাদশ অল যুক্ত রথ চক্র। শ্বেত অপাক গাভীর গাঢ় রক্তিমাভ দুধের মূলেও ঋত পরিচালিত গাভীর ঋত। অরণি ঘর্ষণের ফলে জল ও ঔষধি অন্তর্গত গুপ্ত যে আগুন মানুষের জন্য উন্মথিত হয় তাও ঋত-র শিখা। নদীর স্রোত ঋত-র নিয়ম অনুসারে।[১০] ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাভাবনা যে আধ্যাত্মবাদ বিকাশ লাভ করেছিল তার সূচনা বৈদিক সংস্কৃতি থেকেই বিশেষ করে উপনিষদ গুলিতে আধ্যাত্মবাদ চিন্তাভাবনা পরিণত রূপ গ্রহণ করেছিল। উপনিষদের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল তার নৈতিক আদর্শের স্বাতন্ত্র্য। এই সর্ব ব্রহ্মবাদী একাত্মবোধ হতেই উপনিষদের নৈতিক আদর্শের জন্য। মানুষের জীবনের একটি মূল সমস্যা হল স্বার্থ ও পরার্থে দ্বন্দ্ব। উপনিষদ বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে এর সমাধান

খুঁজেছে। উপনিষদ বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে হৃদয়বৃত্তির পরিবর্ধন চেয়েছে এবং হৃদয়বৃত্তির প্রচারের ভিত্তিতে স্বার্থ ও পরার্থে দ্বন্দ্বের মীমাংসা করেছে। মানুষের হৃদয়বৃত্তির শ্রেষ্ঠ বিকাশ স্নেহ প্রীতি এবং ভালোবাসার বিস্তারে এই পথেই মানুষের স্বার্থ পরিশোধিত হতে পারে।[১১] ইশ উপনিষদ বলে মানুষ ভোগ করুক কিন্তু এমন সংযমের সহিত করুক যাতে অন্যের স্বার্থের হানি না হয়, তার কারণ অন্যের স্বার্থের হানি নিজের স্বার্থের হানির শামিল হবে আমাদের সকলকে পরিব্যপ্ত করে তা একই সত্তা বিরাজমান। উপদেশ দেওয়া হয়েছে সবকিছুই ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদিত তাই তাকে সহিত ভোগ করা উচিত।[১২] উপনিষদে যে নৈতিক মূল্যবোধ প্রচারিত হয়েছে তা মোটামুটি ভাবে বিশ্বাস বা ক্রিয়াকর্মের চেয়ে জ্ঞান ও উপলব্ধির পথেই মুক্তির.. কথা বেশি বলা হয়েছে। যে নৈতিক মূল্যবোধের কথা তাদের ভিতর দেখতে পায় তা একান্ত বাস্তবসম্মত ভালো-মন্দ সব আপেক্ষিক তাদের ব্যবধান ঘুচে যায় সব ব্রহ্মের পটভূমিতে।"[১৩] ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে যে ধর্মপথে তিনটি শাখা ত্যাগ অধ্যায়ন ও দানশীলতা এদের প্রথম দ্বিতীয় হল কঠোর আত্মসংযম এবং গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য পালন। তৃতীয় এইসব পথ অবলম্বন করে না পুণ্যবানদের জগতে প্রবেশ করতে পারে কেবলমাত্র ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিতার মাধ্যমে। এ বিষয়ে খুব উচ্চমানের নৈতিকতার প্রতিফলন দেখা যায় জবালার পুত্র সত্যকাম এর গুরু দীক্ষা কাহিনীটির মধ্যে।[১৪]

বৈদিক যুগের শেষে অর্থাৎ প্রান্তীয় বৈদিক যুগে বেদকে কেন্দ্র করেই আর-একধরনের শিক্ষাব্যবস্থা জন্মলাভ করে, যা ইতিহাসে প্রান্তীয় বৈদিক শিক্ষা' বা ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা নামে পরিচিত। মূলত এই শিক্ষা-ব্যবস্থা হল আদি বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থার উন্নত রূপ। এই যুগের শিক্ষার সঙ্গে জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। গুরুগৃহে বসবাসকালে গুরুর সান্নিধ্যে থেকে শিক্ষার্থীরা আত্মসংযম ও আত্মশৃঙ্খলার দীক্ষায় দীক্ষিত হত। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য যুগে জাতিভেদ বা বর্ণভেদ প্রথা প্রকট হয়ে ওঠায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের শিক্ষার অধিকার থাকলেও শূদ্ররা শিক্ষার অধিকার থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত হয়ে পড়ে। তাই বলা হয় ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থা, আদি বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থার মতো গণতান্ত্রিক ছিল না। এই শিক্ষা ক্রমে অগণতান্ত্রিক হয়ে পড়ে। এই যুগে শিক্ষায় বাস্তব জগতের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলা হয় 'জীবনের জন্যও শিক্ষা, শুধু মুক্তি লাভের জন্য শিক্ষা নয়'।

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার পাঠ্যক্রম ছিল পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যার সমন্বয়। ব্রহ্মবিদ্যা বা অধ্যাত্মবিদ্যাই পরাবিদ্যা, আর যাবতীয় বিজ্ঞান, শিল্প, কলা ইত্যাদি অপরাবিদ্যা। উপনিষদের ঋষি বলেছেন, 'অবিদ্যয়া মৃত্যুংতীর্জা বিদ্যয়াহমৃতমতে' অবিদ্যা অর্থাৎ কলা, বিজ্ঞান, শিল্পবিদ্যার অনুশীলন জগতে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন। অন্যদিকে ব্রহ্মবিদ্যা বা পরাবিদ্যার প্রয়োজন অমৃতত্ব বা চরম শান্তি লাভের জন্য। শুধুমাত্র লৌকিক বিদ্যা বা কেবলমাত্র অধ্যাত্মবিদ্যা নিয়ে চললে মানুষের কল্যাণ হয় না। উপনিষদে বলা হয়েছে- 'অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যাং উপাসতে তত ভূয় এব তে উ বিদ্যায়াং রতাঃ।' অর্থাৎ, যারা কেবলমাত্র বিজ্ঞান, শিল্পকলা প্রভৃতি লৌকিক বিদ্যার অনুশীলন করে, তারা একসঙ্গে অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকে। কিন্তু যারা কেবল ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন করে, তারা তার চেয়েও অধিকতর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়।

এই যুগে পাঠ্যক্রম ছিল বর্ণভিত্তিক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। কেননা বিভিন্ন বর্ণের জন্য বৃত্তি অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের পাঠ্যক্রম এই সময় প্রচলিত ছিল। এই সময় ব্রাহ্মণরাই কেবলমাত্র বেদ পাঠের অধিকারী ছিল। অন্যদিকে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের বেদ পাঠের কোনো অধিকার ছিল না।

১. ব্রাহ্মণদের শিক্ষার পাঠ্যক্রম: ব্রাহ্মণদের শিক্ষার পাঠ্যক্রম ছিল অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। ব্রাহ্মণদের শিক্ষার পাঠ্যক্রমে যে সমস্ত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেগুলি হল- বেদ, সাহিত্য, দর্শন, শ্রুতি শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ ইত্যাদি। এ ছাড়া তর্কশাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ, গাথা, সর্পবিদ্যা, অসুরবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা (রাষ্ট্রনীতি), নক্ষত্রবিদ্যা, দেবতাবিদ্যা (নাচ, গান, বাজনা, প্রলেপ তৈরি) ইত্যাদি বিষয়গুলিও

শিক্ষার্থীদের অধ্যয়ন করতে হত। তা ছাড়া ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য ও অধ্যাপনার জন্য ব্রাহ্মণদের সংহিতা, আরণ্যক, উপনিষদ ইত্যাদি বিষয়গুলি বিশদভাবে অধ্যয়ন করতে হত।

২. ক্ষত্রিয়দের শিক্ষার পাঠ্যক্রম: এই যুগে ক্ষত্রিয়দের বেদ পাঠের কোনো অধিকার ছিল না। তাই তাদের পাঠ্যক্রমে বেদপাঠের কোনো স্থানও ছিল না। ক্ষত্রিয়দের প্রধান কাজই ছিল রাজকার্য পরিচালনা করা। এই জন্য তাদের শিক্ষার পাঠ্যক্রমে অস্ত্রবিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যা, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, অর্থনীতি, দণ্ডনীতি, পঞ্চতন্ত্র । বৈদিক সংস্কৃতির মানুষজন নৈতিক শিক্ষার উপর জোর দিয়েছিলেন। শিক্ষাকে জ্ঞান এর আলো বলে গণ্য করতেন, যেখানে জীবনের সমস্ত দিকের সার্বিক বিকাশ হবে। বৈদিক সমাজে শিক্ষা ছিল এমন যেখানে মানুষের পার্থিব চাহিদা পূরণেই শেষ কথা নয় পাশাপাশি আধ্যাত্মিক চেতনাকে জাগ্রত করা ও নৈতিক রীতিনীতির বিকাশ ঘটানো।[১৫] বৈদিক শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রথমত- চরিত্রের বিকাশ, দ্বিতীয়ত-ব্যক্তিত্বের বিকাশ, তৃতীয়ত- সমাজ সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানো। এ প্রসঙ্গে D. R. Altekar মত-

> "The objectives of education in Vedic period where worship of God, a feeling for religion fulfilment of public and civic duties, an increase in social efficiency, protection and propagation of national culture."[১৬]

এ বিষয়ে পন্ডিত R. K. Mukherjee মনে করেন-

> "Inculcation of civic and social duties, promotion of social efficiency and the preservation and spread of national culture were the chief aims of ancient Indian education."[১৭]

বৈদিক সমাজেও পরিবেশ সচেতনতা পরিচয় পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্যে পরিবেশ প্রকৃতি সংক্রান্ত নৈতিক মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।[১৮] ঋকবেদের দশম মন্ডল এর নবম সুক্ত জলের উদ্দেশ্য উৎসর্গ করা হয়েছে। ঋকবেদের একটি সুক্ততে উল্লেখ রয়েছে যে-

> "The sky is like father the earth like mother and the space their son. The universe consistent of the three is like a family and any kind of damage done to anyone of the three throws the universe out of balance."[১৯]

ঋকবেদের অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে যে-

> "Thousands and hundreds of years if you want to enjoy the fruit and happiness of live then take up systematic planting of trees".[২০]

প্রকৃতি ও তার তাৎপর্য সম্পর্কে যজুর্বেদ-তে উল্লেখ করা হয়েছে যে-

> "No person suit kill animal It helpful to all."[২১]

অথর্ববেদের পৃথিবী সুক্ত-তে বলা হয়েছে, *Mata Bumih putroham Prithivyah* অর্থাৎ earth is my mother, I am her son. যা প্রকৃতি সুরক্ষার প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।[২২]

বিশ্বের দার্শনিক চিন্তাভাবনা সংক্রান্ত যে নৈতিকতার প্রতিফলন পাওয়া যায় ভারতীয় সমাজে তার পরিপূর্ণ সূত্রপাত বৈদিক যুগ থেকে। বৈদিক সমাজের যে নৈতিকতার প্রতিফলন দেখা যায় তা মূলভারতীয় সমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত। নীতি নৈতিকতার এই ভাবনা বৈদিক পরবর্তী ভারতীয় সমাজকে যথেষ্ট ভাবে প্রভাবিত করেছে যা আজও তার নিদর্শন দেখা যায়। বৈদিক সংস্কৃতির নৈতিক চিন্তাভাবনা সমাজের সর্ব স্তরে বিস্তার করেছিল। এই নৈতিকতা পার্থিব ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে সমাজকে বিকশিত করেছে যা সমাজ ও ব্যক্তির বিকাশের সঙ্গে

সম্পৃক্ত। বর্তমান বিশ্বায়িত পরিবেশে যেখানে নীতি নৈতিকতার চূড়ান্ত অবক্ষয়, সমাজ ও ব্যক্তির সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে এর তাৎপর্য রয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১) চক্রবর্তী, রণবীর, ভারত ইতিহাসের আদি পর্ব, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা, ২০১৮, পৃষ্ঠা- ৮৬।

২) ঋকবেদ, ২০। ১৯১।।

৩) ঋকবেদ, ২০। ১৯৩।।

৪) ঋকবেদ, ১। ১৮। ৫।।

৫) ঋকবেদ, ১। ১৮। ৩।।

৬) ঋকবেদ, ৯। ৭। ৯।।

৭) চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, ভারতীয় দর্শন, এন বি এ, কলকাতা, ২০১২, পৃষ্ঠা-৭৮।

৮) ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ, ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাপট, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ৫২।

৯) চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, ঐ, পৃষ্ঠা- ৭৯।

১০) চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, ঐ, পৃষ্ঠা- ৭৯।

১১) বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরণময়, উপনিষদের দর্শন, পুনশ্চ, কলকাতা, ১৯৯৮।

১২) ঈশ উপনিষদ, পৃষ্ঠা- ৮।

১৩) ছান্দোগ্য উপনিষদ, পৃষ্ঠা- ২৩।

১৪) Basam, A.L., The wonder that was India, Rupa, Kolkata, P. 256.

১৫) Saran, P, concept of Vedic education and importance of moral education, New Delhi, India.

১৬) Dr. Altekar, Education in Ancient India, New Delhi, 1965.

১৭) Mukherjee, R. K., Hindu civilization, Longman Green and Co., London, 1976.

১৮) Renugadevi, R., Environmental Ethics in the Hindu Vedas and Puranas in India.

১৯) David Ds, Tamil temple myths, Princeton University press, New Jersey, 1989.

২০) Rig- Veda, 10.32.

২১) Yajurveda, 13.37.

২২) Atharvaveda, 8.20.

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 883-890
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.302

রবীন্দ্রনাথের পরিচয়-বিশ্বে জোনা গেল: এক মার্কিন লেখিকার অজানা তথ্য

ড. শ্যামল কুমার মণ্ডল, *রাজ্য সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, গলসী মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 21.03.2026; Accepted: 24.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Overall, five times Rabindranath Tagore had visited Amarica:1912-13, 1916-17, 1920-21, 1929 and 1930. His maiden visitation was an allied journey with his son Rathindranath Tagore and daughtet-in-law Pratima Devi. The second one, i.e. in 1916, proved to be an odyssey. Tagore's personal acquaintance with Zona Gale (1874-1938) in the house of Harriet Moodie stood out to be a less acclaimed, yet an important chapter in Tagore's life story. Zona Gale, a prominent American feminist writer and a Pulitzer Prize winner, already came across some of the renderings of *The Gitanjali*, and it certainly made her curious and respectful for this Asian stalwart. Importantly, this visitation was brought to light for the first time by Amalendu Bagchi in a well-known Bengali journal *Desh*. However, in the biographies of Tagore, this is almost unsung. This paper/essay thus attempts to focus on Tagore's encounter with Gale as a significant landmark in both the persons' life. It also seeks to put forward the liberal minded Gale's noble character and feministic views. For Tagore, he not only drew interest in her as mere a Pulitzer Prize winner, but also for her deep diving perspective on humanity and civilization. It may be seen a cultural encounter between two different epoch-making personalities, how often alike they think, alike they work. With a brief introduction to their life, this paper also will bring to attention the efficacy of their meetings, conversations etcetera. And under this light, it will also be an important addition to Rabindra scholarship.

Keywords: Rabindra Scholarship, Rabindrik Impression, Liason, Zona Gale, Feminism

রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার আমেরিকা সফরে বিশেষভাবে পরিচিত হন বিখ্যাত মার্কিন লেখিকা পুলিৎজার পুরস্কার প্রাপক জোনা গেল (১৮৭৪-১৯৩৮)-এর সঙ্গে। তবে পরিচয়টি সরাসরি হয়নি। আর এক বিখ্যাত লেখিকা হ্যারিয়েট মুডির মধ্য দিয়ে কবির ও জোনা গেলের সাক্ষাৎ হয়। তার আগে জানা প্রয়োজন জোনা গেল সম্পর্কে। আমেরিকার উইসকনসিন রাজ্যের পোর্টেজ শহরে ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে ২৬শে আগস্ট জোনা গেল জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি চার্লস ও এলিজা গেল-এর একমাত্র কন্যা। ১৮৯৫ সালে উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন। পরবর্তীকালে তিনি সাংবাদিক হিসেবে 'ইভনিং উইসকনসিন' পত্রিকায় যোগদান করেন। ১৮৯৯ সালে ওই একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। এছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি সম্মানজনক ডিগ্রি লাভ করেন। উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি পান। ১৯২৩ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রিজেন্ট' সদস্য ছিলেন (প্রথম মহিলা সদস্য)। ৪৪ বছর বয়সে তিনি বিবাহ করেন উইলিয়াম ব্রিস-কে। উইলিয়ামের দ্বিতীয় বিবাহ এটি। এই বিবাহের সময় উইলিয়ামের

একটি দত্তক কন্যা ছিল, নাম জুলিয়েট। ৫৩ বছর বয়সে জোনা তিন বছরের মেয়ে লেসলিনকে দত্তক নেন। ১৯৩৮ সালের ১৭ই ডিসেম্বর শিকাগোর একটি চিকিৎসালয়ে জোনা পরলোকগমন করেন।

ছোটবেলা থেকেই তিনি ডায়েরি লিখতে ভালবাসতেন। মাত্র বারো বছর বয়সে 'আ হোয়াইট ডাভ' গল্প লেখেন। যদিও এই গল্পটি একটি পত্রিকায় পাঠিয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে ফেরত আসে। তবুও তিনি হাল ছাড়েননি। ১৯০৬ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'রোমান্স আইল্যান্ড'। ১৯০৮ সালে প্রকাশিত হয় 'ফ্রেন্ডশিপ ভিলেজ' নামে একটি গল্প সংকলন। ১৯০৯ সালে নিউইয়র্কের 'ইভনিং ওয়ার্ল্ড'[১] পত্রিকায় পুনরায় সাংবাদিক হিসেবে যোগদান করেন। সেখানে বসবাসের সময় বিখ্যাত কবি রিজলি টরেন্স-এর সাথে প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। এই প্রেম মাত্র দু'বছর স্থায়ী হলেও জোনার জীবনে ও মননে দারুণভাবে রেখাপাত করে। ১৯১০ সালে একটি প্রতিযোগিতায় সেরা ছোটগল্পকার হিসেবে ২০০০ ডলার পুরস্কার জেতেন। তাঁর লেখা একটি বিখ্যাত উপন্যাস 'মিস লুলু বেট' প্রকাশিত হয় ১৯২০ সালে। তিনি ওই উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন ১৯২১-এ এবং এই বছরই তিনি আমেরিকার সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার পুলিৎজার লাভ করেন। মহিলা নাট্যকার হিসেবে প্রথম তিনি এই পুরস্কার পান। জোনার লেখা উপন্যাসের সংখ্যা ১৩, ছোটগল্প সংকলন ৯টি। এছাড়াও তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ ও একটি প্রবন্ধ গ্রন্থ আছে। লিখেছেন সাতটি নাটক ও একটি জীবনচরিত। যেমন 'বার্থ', 'ফেন্ট পারফিউম' এবং 'পাপা লা ফ্লুর' (তিনটিই উপন্যাস), 'ফ্রেন্ডশিপ ভিলেজ', 'ব্রাইডাল পন্ড' (ছোটগল্প সংকলন) এবং নাটক 'মিস লুলু বেট' জনপ্রিয়তা লাভ করে।

জোনা গেল সাহিত্যচর্চা ছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের সাথেও জড়িত ছিলেন। যেমন মহিলা ভোটাধিকার, মৃত্যুদণ্ড বিরোধিতা, বিশ্বশান্তি, বৃদ্ধাশ্রম নির্মাণ প্রভৃতি। তাঁর লেখায় মহিলাদের সমান অধিকারের অভাবজনিত নৈরাশ্যের কথা সুন্দরভাবে তিনি তুলে ধরেছেন। জোনা গেল সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে আর একটি নাম এসে যায়, তিনি হলেন হ্যারিয়েট মুডি। এডমণ্ড স্টেডম্যান ছিলেন নিউইয়র্কের একজন সুপরিচিত সাহিত্যপ্রেমী। তাঁর বাড়িতে প্রতি রবিবার একটি সাহিত্যসভা বসত। এটি ১৯০২ সালের কথা। সেই সময় জোনা ছিলেন এডমণ্ডের সেক্রেটারি। এডমণ্ডের সাহিত্য সভায় অনেক কবি ও সাহিত্যিক আসতেন। যেমন কবি ভন উইলিয়ম মুডি (হ্যারিয়েট মুডির স্বামী), রিজলি টরেন্স, হ্যারিয়েট মনরো, রিচার্ড লে গ্যালিয়েন প্রমুখ। এই সাহিত্যসভাতেই জোনার সাথে পরিচয় হয় রিজলি টরেন্সের। পরিচয়ের গভীরতা রূপ নেয় প্রণয়ে। ১৯০৪ এর এপ্রিলে তাঁরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবেন ঠিক হয়। এমন সময় রিজলি টরেন্স এক বন্ধু মারফত সংবাদ পান যে জোনার সঙ্গে রিচার্ড লে গ্যালিয়েনের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক রয়েছে এবং তারা একে অপরের সাথে প্রায়শই দেখাও করেন। জোনার এই ঘনিষ্ঠতার কথা শুনে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন রিজলি কেননা জোনা রিজলিকে এই পরিচয়ের গভীরতা সম্পর্কে কিছুই জানায়নি। জোনা রিজলিকে বলেন, তিনি রিচার্ডের গুণমুগ্ধ হলেও তাঁদের মধ্যে কোন প্রণয় সম্পর্ক ছিল না। একসময় পত্রিকা দপ্তরে কাজ করতে করতে তিনি একঘেঁয়েমি ও একাকীত্বে ভুগতেন এবং সেই একাকীত্ব কাটাতে তিনি মাঝে মধ্যে তিনি রিচার্ডের সাথে দেখা করতেন। এই সাক্ষাৎগুলি ছিল নেহাৎই সৌজন্য ও বন্ধুত্বমূলক। জোনার এই বক্তব্য মানতে পারেন নি রিজলি। ফলে তাঁদের মধ্যে ঘটে যায় বিচ্ছেদ। এই বিচ্ছেদ বেদনা জোনা আজীবন ভুলতে পারেন নি। এরপর তিনি চলে আসেন তাঁর পোর্টেজের বাড়িতে এবং বাকি জীবন নিজের বাড়িতেই কাটিয়ে দেন। এই বিচ্ছেদের ১০ বছর পর রিজলি অলিভিয়া হাওয়ার্ড ডানবার-কে বিবাহ করেন।

[১] একটি বিখ্যাত দৈনিক সংবাদপত্র যা নিউইয়র্ক সিটি থেকে প্রকাশিত হত। ১৮৮৭-১৯৩৮ পর্যন্ত ছিল এই পত্রিকাটির আয়ুষ্কাল।

জোনা আঠারো বছর পরে ১৯২২ সালে পোর্টেজের জনৈক ব্যবসায়ী পূর্বপরিচিত উইলিয়ম ব্রিস-এর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯০২ থেকে শুরু করে জোনা রিজলিকে ১৫০টি চিঠি লেখেন, যার মধ্যে বেশ কিছু চিঠি ১৯০৪ সালে লেখা। তবে চিঠিগুলো শুধুমাত্র প্রেমপত্র নয়, সেখানে আলোচিত হয়েছে সাহিত্যদর্শন, শিল্পকলা ইত্যাদি। ১৯২৪ সালের একটি চিঠিতে জোনা রিজলিকে লিখেছেন, 'আশা করি আমরা পরের জন্মে আবার প্রেমিক প্রেমিকা হয়ে জন্ম নেব'। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হ্যারিয়েট মুডির পরিচয় হয় হ্যারিয়েট মনরোর মধ্যস্থতায়। হ্যারিয়েট মনরো ছিলেন 'পোয়েট্রি'[২] পত্রিকার সম্পাদিকা। এই পত্রিকায় ১৯১২-এর ডিসেম্বর সংখ্যায় গীতাঞ্জলির কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়। আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের কবিতার এটিই প্রথম প্রকাশন। রবীন্দ্রনাথ মনরোকে এই পত্রিকার ডিসেম্বর সংখ্যাটি পাঠাতে অনুরোধ করে একটি চিঠি লেখেন। রবীন্দ্রনাথ আরবানা শহরে আছেন জেনে মনরো কবিকে শিকাগো আসতে অনুরোধ করেন। অপরদিকে কবি-পরিবারের বাসস্থানের সন্ধানে তিনি বিশেষ বন্ধু হ্যারিয়েট মুডিকে অনুরোধ জানান কবিকে তাঁর বাড়িতে আশ্রয় দেবার জন্য। মুডি তাতে সম্মতি দেন। রথীন্দ্রনাথ তাঁর 'On the Edges of Time' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি যখন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার আয়োজন করতে আসেন তখন মুডির সাথে তাঁর পরিচয় হয় এবং মুডি অত্যন্ত সহৃদয়ভাবে তাঁদের অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ করেন। পরবর্তীকালে এই পরিচয় চিরকালীন বন্ধুত্বে রূপান্তরিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মুডির যখন পরিচয় হয় তখন তিনি ক্রিশ্চিয়ান সাইন্স প্রচারিত অতীন্দ্রিয়বাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব, দার্শনিক মতবাদ ও কবিতা মুডিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। কবির প্রভাব তাঁর জীবনে এক অদ্ভুত প্রশান্তি এনে দেয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জোনার সাক্ষাৎকারের বিষয়টিতে আজ পর্যন্ত কেউই সেভাবে আলোকপাত করেননি; এমনকি রবীন্দ্র-জীবনীকারের লেখাতেও সম্ভবত পাওয়া যায় না। এই দুই স্রষ্টার পরিচয়ের সূত্রধর হলেন হ্যারিয়েট মুডি। খুব কম বয়স থেকেই জোনা অতীন্দ্রিয়বাদের দ্বারা প্রাণিত হন। এলভিন আন্ডারহিলের লেখা 'মিস্টিসিজম' বইটি পড়ে জোনা ভগবদগীতা সম্পর্কে জানতে পারেন ও বইটি পড়েও ফেলেন। রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক মনোভাব মুডির মনের বিচলিতভাব দূর করে সঠিকভাবে আধ্যাত্মিকতা অনুধাবন করতে সাহায্য করেছিল। রিজলির সঙ্গে মুডির পরিচয় বহুদিনের। ১৯১৩ সালের রবীন্দ্রনাথ যখন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে যান, তখন রেজলি নিউইয়র্ক থেকে ওই দলে যোগ দেন। জোনার সাথে রিজলির বিচ্ছেদ ও পরবর্তীকালে জোনা যে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন তা নিশ্চয়ই মুডি জানতেন। ফলে বহুদিনের পরিচিত ভগ্নহৃদয়বান্ধবী জোনার জীবনের রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়ে শান্তি আনার প্রয়াস করেছিলেন মুডি। জোনাকে উপহার দেওয়া রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা এই সাক্ষাৎকারের সাক্ষী বলা যেতে পারে। কবিতাটি হল -

To miss Zona Gale

I lived on the shady side of the road,
And watched my neighbours' gardens
across the way revelling in the sunshine.
I went with hunger in my heart

[২] ইংরেজি ভাষায় সবচেয়ে জনপ্রিয় ও অনুপ্রেরণামূলক সাহিত্যিক পত্রিকা। শিকাগো শহর থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হত। এই পত্রিকায় তৎকালীন সময়ে বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিকরা লিখতেন। যেমন – এজরা পাউণ্ড, উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস, টি.এস.এলিয়ট প্রমুখ।

The more they gave me from their careless abundance
The more I become aware of my beggar's bowl
Till one morning I awoke from my sleep
at the sudden opening on my door.
and you came and asked for alms
In despair I broke the lid of my chest open–
and was startled into finding my own wealth.
Rabindranath Tagore
Dec. 31, 1916

কবিতাটির সঙ্গে 'কৃপণ' কবিতার সাদৃশ্য আছে। ১৯১৬ সালে মুডির বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের সাথে জোনার সাক্ষাৎ হয়। এই আলাপচারিতা জোনাকে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর বিভিন্ন লেখাতেও রবীন্দ্রনাথের পরোক্ষ প্রভাব স্পষ্ট। জোনার জীবনী লেখেন দু'জন মানুষ অগাস্ট ডারলেথ এবং জন হোমস। এঁদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে জোনার লেখায় আধ্যাত্মিকতা ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং একটা সময় তা অতিমাত্রায় চলে যায়। জন মনে করতেন জোনার রচনা মূলত তিন ভাগে বিভক্ত- এক, ভাবপ্রবণ দুই, বাস্তবতা তিন, অতীন্দ্রিয় বা চতুর্থ মাত্রা (Fourth Dimension) ভয়ঙ্করভাবে গ্রাস করে ফেলে। জোনা মনে করতেন তারামণ্ডলের ওপারে চেতনার আবাস তাকে ভগবান বা মহাজাগতিক ব্যক্তি যেভাবেই ভাবা হোক না কেন। পরবর্তীকালে তাঁর সমস্ত বইতে তিনি লিখতেন জীবন বলতে আমাদের যা বিশ্বাস এটি তার থেকেও বেশি কিছু। জোনার নিজস্ব কিছু সংগ্রহ রয়েছে পোর্টেজের ঐতিহাসিক সংগ্রহশালায়। তার মধ্যে আছে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির অনুবাদ, Nationalism, Reminiscences ইত্যাদি বইগুলি ছিল। বইগুলি তিনি কোন বন্ধু মারফত আনাতেন। গীতাঞ্জলি বইটি পাঠানোর তারিখ ১৯১৪, ২৪শে মে। ফলে অনুমান করা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের সাথে সাক্ষাতের আগেই তিনি গীতাঞ্জলি পড়ে ফেলেছিলেন। 'যুদ্ধ নয় শান্তি চাই'- এই মনোভাবে আজীবন তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি নিজেও যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন সেই সূত্রে উইসকনসিন এর টুমা শহরের ফ্রাঙ্ক মিলারের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। ফ্রাঙ্ক ক্যালিফোর্নিয়ার রিভারসাইড শহরে 'মিশন ইন' নামে একটি সুন্দর পান্থনিবাস করেছিলেন। এই পান্থনিবাসে দেশে-বিদেশের অনেক বিখ্যাত মানুষেরা আসতেন। যেমন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্ট, হেনরি ফোর্ড, জাপানের রাজপুত্র কায়া প্রমুখ অনেকেই থেকেছেন এই পান্থনিবাসে। জোনার লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা আছে, কবিতাটি হল-

We live in this world when we love it
Let the dead have the immortality of fame,
But the living the immortality of love.

I have seen the as the half-awakened child
sees his mother in the dusk of the dawn
And then smiles and sleeps again.

I shall die again and again to know that
life is inexhaustible.

While I was passing with the crowd in the road
I saw the smile from the balcony and I sang and forget all noise
Love is life in its fullness like the cup with its wine.
They light their own lamps and sing their own words
in their temples. But the birds sing thy name
in thine own morning light - for thy name is Joy.

জোনা উল্লেখ করেছেন এই কবিতাটি পান্থনিবাসে বসেই লেখা। রবীন্দ্রনাথের লেখা দুটি কবিতার মধ্যে জোনাকে লেখা কবিতাটি পরবর্তীকালে প্রকাশিত কবির 'Lovers Gift and Crossing' (১৯১৮) কাব্যগ্রন্থের Crossing বিভাগের মুদ্রিত ৪৭ সংখ্যক কবিতাটি। প্রথমে রবীন্দ্রনাথ জোনাকে লিখেছেন পরবর্তীকালে পাঠ পরিমার্জন করে কাব্যগ্রন্থে যুক্ত করেন। রবীন্দ্রনাথের অভিনব দার্শনিক প্রত্যয় ও প্রজ্ঞা জোনাকে মুগ্ধ করে। সম্ভবত এই কারণেই তিনি রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আসার প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং অচিরেই তা ফলপ্রসূ হয়। রবীন্দ্রনাথের যুদ্ধবিরোধী মনোভাব ও আধ্যাত্মিকতার সরল ব্যাখ্যা জোনাকে প্রচণ্ডভাবে মোহিত করে। জোনার জীবন, চিন্তা, ভাবনা অনুধ্যানের বিরাট রূপান্তর ঘটে যায় রবীন্দ্র-সহচর্যে। ম্যাডিসন, উইসকনসিন-এর একটি রেডিও অনুষ্ঠানে জোনা গেল-এর জীবনী নিয়ে আলোচনার সময় ফোর্ট অ্যাটকিনসন-এর শিক্ষিকা ন্যান্সি ব্রিটস্প্রেশার উল্লেখ করেন জোনা গেল-এর সাথে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়েছিল। এই সম্প্রচার শুনেই অমলেন্দু বাগচী মহাশয় ব্যক্তিগতভাবে ব্রিটস্প্রেশার মহাশয়ার সঙ্গে কথা বলে রবীন্দ্রনাথের সাথে জোনার সাক্ষাৎকারের বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হন। এর আগে কোন রবীন্দ্র গবেষক বা জীবনীকারের কাছে উক্ত বিষয়টি অজ্ঞাত ছিল। অবশেষে বলা যায়, রবীন্দ্র পরিচয়-বিশ্বে অনেক বিদেশিনীর ভিড়, সেই ভিড়ে জোনা গেল-কে রবীন্দ্র-অনুরাগী হিসাবে সহজেই চিহ্নিত করা যায়।


'She Loved Small Town Life . . .'

Death Claims Zona Gale Breese, Wisconsin Writer, Civic Leader

Home Given to Portage League

ZONA GALE

vs Index
oday:

Friendship Village
(An Excerpt)
By ZONA GALE

On The Inside:
'Little TVA' Looms in Nebraska
Dairy Group Starts Advertising Drive
Medical Profession Blamed for Syphilis
U. W. Perfects New Vitamin D Machine

সহায়ক গ্রন্থ:

1. Chakrabarty, Dipesh: Friendships in the Shadow of Empire: Tagore's Reception in Chicago, circa 1913–1932. Modern Asian Studies, SEPTEMBER 2014, Vol. 48, No. 5 (SEPTEMBER 2014), pp. 1161-1187. Cambridge University Press.
2. Derleth, August– Still Small Voice: The Biography of Zona Gale, New York, D-Appleton Century Company (1940)
3. Dunbar, Olivia Howard – A House in Chicago, Chicago: University of Chicago Press (1940)
4. Hay, Stephen N. "Rabindranath Tagore in America." *American Quarterly*, vol. 14, no. 3, 1962, pp. 439–63. *JSTOR*, https://doi.org/10.2307/2710456. Accessed 21 Mar. 2026.
5. Hay, Stephen N. *An Artist in Life: A Commentary on the Life and Works of Rabindranath Tagore.; Passage to America: The Reception of Rabindranath Tagore in the United*by

Niharranjan Ray and Sujit Mukherjee. *The Journal of Asian Studies*, vol. 29, no. 4, 1970, pp. 972–74. *JSTOR*, https://doi.org/10.2307/2943151. Accessed 21 Mar. 2026.

6. Hurwitz, Harold M. "Ezra Pound and Rabindranath Tagore." *American Literature*, vol. 36, no. 1, 1964, pp. 53–63. *JSTOR*, https://doi.org/10.2307/2923500. Accessed 21 Mar. 2026.
7. Hurwitz, Harold M. "Yeats and Tagore." *Comparative Literature*, vol. 16, no. 1, 1964, pp. 55–64. *JSTOR*, https://doi.org/10.2307/1769883. Accessed 21 Mar. 2026.
8. Lahiri, Madhumita. "The Global Anglophone: Rabindranath Tagore's Gitanjali." *Imperfect Solidarities: Tagore, Gandhi, Du Bois, and the Global Anglophone*, Northwestern University Press, 2021, pp. 21–64. *JSTOR*, https://doi.org/10.2307/j.ctv17z84jm.7. Accessed 21 Mar. 2026.
9. Mohua, Mafruha. "'A Miserable Attenuation': T. S. Eliot, Rabindranath Tagore and Irving Babbitt." *The Edinburgh Companion to Modernism, Myth and Religion*, edited by Suzanne Hobson and Andrew Radford, Edinburgh University Press, 2023, pp. 441–56. *JSTOR*, http://www.jstor.org/stable/10.3366/j.ctv32vqkks.32. Accessed 21 Mar. 2026.
10. Quayum, Mohammad A. "Imagining 'One World': Rabindranath Tagore's Critique of Nationalism." *Interdisciplinary Literary Studies*, vol. 7, no. 2, 2006, pp. 33–52. *JSTOR*, http://www.jstor.org/stable/41209941. Accessed 21 Mar. 2026.
11. Saha, Poulomi. "Singing Bengal into a Nation: Tagore the Colonial Cosmopolitan?" *Journal of Modern Literature*, vol. 36, no. 2, 2013, pp. 1–24. *JSTOR*, https://doi.org/10.2979/jmodelite.36.2.1. Accessed 21 Mar. 2026.
12. SIRCAR, KALYAN. "A Neo-Orientalist Appropriation of Tagore." *India International Centre Quarterly*, vol. 24, no. 4, 1997, pp. 44–56. *JSTOR*, http://www.jstor.org/stable/23002293. Accessed 21 Mar. 2026.
13. Tagore, Rathindranath– On the Edges of Time, Connecticut: Greenhouse Pressmn (1978)
14. Williams, Louise Blakeney. "Overcoming the 'Contagion of Mimicry': The Cosmopolitan Nationalism and Modernist History of Rabindranath Tagore and W. B. Yeats." *The American Historical Review*, vol. 112, no. 1, 2007, pp. 69–100. *JSTOR*, http://www.jstor.org/stable/4136007. Accessed 21 Mar. 2026.
15. পাল, প্রশান্তকুমার – রবিজীবনী, প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৩।
    দ্বিতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯০।
    তৃতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৯৪।
    চতুর্থ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৫।
    পঞ্চম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯০।
    ষষ্ঠ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৩।
    সপ্তম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৭।
    অষ্টম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০১।
    নবম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৩।
16. মুখোপাধ্যায়, বিমলকুমার – সাহিত্যবিবেক,দে'জ,১৯৮৯।
17. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার – রবীন্দ্রজীবনী ১-৪, বিশ্বভারতী, ১৪০১,১৪০৬,১৪০৬,১৪০১।
18. মজুমদার, নেপাল – জাতীয়তা আন্তর্জাতিকতা ও রবীন্দ্রনাথ, প্রথম খণ্ড, দে'জ ১৯৯৫।
19. সরকার, কল্যাণকুমার – রবীন্দ্রমননে মার্কসীয় দর্শন, বর্ণালী, ১৯৮৭।

পত্রিকা:

১. কোরক সাহিত্য পত্রিকা– অন্য রবীন্দ্রনাথ – প্রাক্ শারদ/১৪১৭ – সম্পাদনা – ভৌমিক, তাপস।

২. কোরক– ভারতে ও বহির্ভারতে রবীন্দ্রনাথ – শারদ/১৪১৭ – সম্পাদনা – ভৌমিক, তাপস।

৩. কোরক– রবীন্দ্রনাথ ও বিভিন্ন ভারতীয় ব্যক্তিত্ব – জানুয়ারি/২০১১, সম্পাদনা – ভৌমিক, তাপস।

৪. দেশ– (১৯৯১–২০১০ পর্যন্ত রবীন্দ্র বিষয়ক সংখ্যাগুলি)

৫. দেশ - জানুয়ারি ১৯৯১, এপ্রিল ১৯৯২, এপ্রিল ১৯৯৩, ডিসেম্বর ১৯৯৪, ২৭ মে ২০০০, ১৭ মার্চ ২০০৪, নভেম্বর ২০০৯ – এপ্রিল ২০১০ ইত্যাদি প্রায় সমস্ত সংখ্যা।

৬. দেশ, শারদীয় – ১৪০৪, ১৪০৭, ১৪০৮, ১৪০৯, ১৪১৫ ইত্যাদি।

৭. নীললোহিত – রবীন্দ্রসংখ্যা/২০০৯ – ২০১০, সম্পাদনা – চট্টোপাধ্যায়, সাধন ।

৮. পশ্চিমবঙ্গ – রবীন্দ্রস্মরণ সংখ্যা /১৩৯৪, ১৩৯৮, ১৪০১, ১৪০২, ১৪০৩, ১৪০৪, ১৪০৬, ১৪০৭, ১৪০৮, ১৪০৯, ২০০৪, ২০০৬, ২০০৮, সার্ধশতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা/ ২০১০, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত।

ইংরেজি গ্রন্থ :

1. Basu, Manjula (ed.) – Centenary Volume of L. K. Elmhirst (1873-1993), Tagore Research Institute, 1994
2. Bhattacharya, Sabyasachi, ed. - The Mahatma and the Poet: Letters and Debates between Gandhi and Tagore, 1915-1941. New Delhi: National Book Trust, 1997.
3. Chakrabarti, M. - Tagore and education for social change. New Delhi: Gian Publishing House, 1993
4. Chakrabarti, B. - Concepts of community information service in the West and in India. In S.K. Sen and others (Eds.), Politics culture and society: Collection of essays in memory of S M Ganguly, Kolkata: New Age, 2005
5. Das, C. M. - The philosophy of Rabindranath Tagore: His social, political, religious and educational views. New Delhi: Deep and Deep, 1996
6. Dasgupta, Uma – Santiniketan and Sriniketan, Visva-Bharati, 1998
7. Dutta, Krishna, Andrew Robinson (eds.), Selected Letters of Rabindranath Tagore, New Delhi: Cambridge University Press, 26 june, 1997
8. Kathleen O'Connell, Rabindranath Tagore: The Poet as Educator, Kolkata: Visva-Bharati, 2002
9. Roy, N.- Tagore's thought on rural reconstruction and role of village development societies. New Delhi, Abhijeet Publishers, 2008
10. Ray, Mohit.K (Edited) - Studies on Rabindranath Tagore, New Delhi, Atlantic, Latest Edition, 1 January 2004
11. Thompson, E. P., Alien Homage: Edward Thompson and Rabindranath Tagore, Delhi: Oxford University Press, 1993
12. Fraser, Bashabi (ed) – Tagore-Geddes Correspondence, Visva-Bharati, 2004
13. Siksha-Satra – The Platinum Jubliee Celebrations of Siksha-Satra, Vol.1. Visva-Bharati, 1998
14. Tagore by Fireside; Maitraye Devi,Translated and adapted by the author from her Bangla work Mungpu-te Rabindranath; Rupa & Co.; New Delhi; 2002
15. Weber, Jacques – Les Relations entre la France et l'Inde de 1673 a nos jours. 2001, Paris.

e–Source:

1. www.tagoreweb.in
2. www.bichitra.jdvu.ac.in
3. www.tagorecentreiccr.org
4. www.tagoresociety.in
5. www.rabindrasangeet.org
6. https://www.ijhsss.com
7. https://bn.m.wikisource.org
8. www.newsnviewsbd.com
9. www.abasar.net
10. https://blog.bdnews24.com
11. www.sahityaangan.com
12. https://rabindra-rachanabali.nltr.org
13. https://m.dailyinqilab.com
14. https://bn.m.wikipedia.org

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 891-897
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.303

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর শিশুসাহিত্যে পুরাণ প্রসঙ্গ: নির্বাচিত পাঠ

পৃথ্বীশ মজুমদার, *রাজ্য সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 25.03.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Various stories from the Puranas have been prevalent for a long time. These are not merely tales that glorify gods and goddesses, but they also impart moral lessons and true knowledge to the entire human race. However, at the beginning of the nineteenth century, Hinduism began to face attacks from various directions. Especially in that situation, there was a strong need to rewrite the Puranas—an essential part of Indian tradition—in a way that would revive a sense of heritage among the people of India.

At the same time, it is also a social responsibility to sow the seeds of growth in young minds by awakening their consciousness. With this determination, Upendrakishor Roy Chowdhury, during that turbulent and rebellious period of the nineteenth century, composed stories from Indian traditional Puranas suitable for shaping the future of young minds. His objective was to provide true education to children and to introduce young readers to Indian heritage. He presented some of the stories from Indian traditional Puranas in the form of short, child-friendly narratives. Some such Puranic stories have been included in his work "upendrakishor samagra." In the present project, a discussion has been made on selected stories from among the twenty-six tales in his collection of mythological narratives.

At the beginning of the discussion, the story titled "indra howar sukh" has been analyzed. Taken from the "udyoga Parva" of the Mahabharata, the discussion highlights how the story was reconstructed to make it suitable for young readers. From this story, young readers learn that arrogance born of power ultimately leads to destruction. Similarly, from the story "ganesher bibaha," taken from the Shiva Purana, one learns that labor without wisdom is futile—that working with intelligence leads to proper and positive results. The next story is taken from the "Devi mahatmyam." From the story of "mahishasur," one learns that evil forces are inevitably destroyed and good ultimately triumphs. The subsequent story, "shumbha and sishumbha," also taken from the "Devi mahatmyam," teaches that arrogance and pride ultimately bring about destruction.

In this way, he reshaped the complex and heavy narratives of the original Puranas into forms suitable for young readers, awakening in them both an appreciation for the greatness of the Puranas and a sense of righteous wisdom.

Keywords: Puranic Stories, Moral Education, Children's Literature, Indian Heritage, Upendrakishor Roy Chowdhury

ঐতিহ্য বলতে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের থেকে যা অর্জন করি তা বোঝায়। ভারত অনেক ভিন্ন সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের একটি দেশ। আমাদের দেশে বিপুল সংখ্যক ধর্মীয় গোষ্ঠীর বসবাসের কারণে ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বৈচিত্র্যময়। সেই ঐতিহ্যকে ধরে রাখা আমাদের কর্তব্য। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি এবং সম্মান জানানোর বিষয়টি জাগানোর দায়িত্ব প্রবীণদের নিতে হবে। আমাদের মহান উত্তরাধিকার বজায় রাখতে হলে এটি শুরু থেকেই করা উচিত। নবীন প্রজন্মের মধ্যে ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি ভালোবাসা জাগিয়ে তোলা বড়দের দায়িত্ব। আমাদের ভারতীয় সাহিত্যে যেমন বৈচিত্র্যময় সভ্যতার প্রতিনিধিত্ব করে। অন্যান্য ধরণের ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে আমাদের আছে বৈদিক সাহিত্য, মহাকাব্য, সংস্কৃত সাহিত্য ইত্যাদি রয়েছে। তেমনই ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হল পুরাণ। পুরাণ বিশেষ কোন দেবতার মাহাত্ম্য প্রচার মূলক রচনা। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের একটি ধারা, যা ভারতে উল্লেখযোগ্য ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব যার মধ্যে দিয়ে বহমান। পুরাণগুলি হল ভারতীয় সংস্কৃতির মৌলিক গ্রন্থ। পুরাণ আমাদের ধর্মের মেরুদন্ড, যা ভারতের আধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরে।

আধ্যাত্মিক পটভূমিতে লিখিত হলেও পুরাণ কথার মধ্যে রয়েছে নীতিবোধ- যা অপরাপর ভারতীয় জ্ঞান-পরম্পরারই প্রকাশক। সাহিত্যের ক্ষেত্রে পরম্পরা বিষয়টি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। নতুনের মধ্যে পুরাতনের স্বভাব ধর্মের সম্পূর্ণ প্রকাশ না হলেও নির্মাণের মধ্যে ভাবগত ঋণ বিশেষভাবে কার্যকরী হয়ে থাকে। স্বভাবতই এই সমস্ত পুরাণ গুলি পরবর্তী সময়ে সাহিত্যের নানা রীতির মধ্যে অনুসৃত হয়েছে; নির্মিত হয়েছে তার নব নব বয়ান। সহজ কথায় এই নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করায় হল পুনর্নির্মাণ। পুরাণের নানান কাহিনি গুলি যত পুনর্নির্মিত হয়েছে ততই সেই কাহিনি গুলি নতুন ভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচারিত হয়েছে, সেই সঙ্গে ভালো মন্দের বিষয় জনগণের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। সকলের মধ্যে বিশেষ বোধ জাগ্রত করায় ছিল পুরাণ গুলি রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য। খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দে রচিত 'ছান্দোগ্য উপনিষদ' এ পুরাণের একটি প্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায়। লোকমতে, মহাভারত রচয়িতা ব্যাসদেব পুরাণ সমূহের সংকলন করেন। ঐতিহ্যগত ভাবে, পুরাণের সংখ্যা আঠারোটি। পুরাণে সৃষ্টি থেকে প্রলয় পর্যন্ত ব্রহ্মান্ডের ইতিহাস, ঋষি, উপদেবতাগণের বংশ বৃত্তান্ত, হিন্দু সৃষ্টিতত্ত্ব ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। এই পুরাণ গুলিতে পৌরাণিক কাহিনি, সৃষ্টির গল্প, দেবতাদের লীলা মাহাত্ম্য ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। তবে প্রাচীনকালের পুরাণের কাহিনিগুলি আধুনিককালে নানান সাহিত্যিকদের রচনায় পুনর্নির্মিত হয়েছে। উনিশ শতকে পদার্পণ করেও এই পুরাণের কাহিনি গুলি নানান ভাবে রচিত হয়েছে। যার মধ্যে দিয়ে আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের শিকড়টি আরও দৃঢ় হয়েছে। তাই উনিশ শতকে এসেও সেই ঐতিহ্যের শিকড়ের সন্ধানে নানান ভাবে পুরাণের কাহিনি গুলি নিয়ে লেখা হয়েছে। উনিশ শতক পরিবর্তনের যুগ এবং সেই পরিবর্তন এসেছে সারা শতক জুড়ে যুগপৎ ভাঙা গড়ার খেলার মধ্যে দিয়ে।

উনিশ শতকের সূচনাকাল বঙ্গদেশের জাতীয় জীবনে নতুন যুগের সূচনা করেছিল। নানান বিতর্ক থাকলেও ভাবগত ক্ষেত্রে নবজাগরণের সুচনাকাল বলে সকলেই এই সময়পর্বকে স্বীকার করেছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষাচর্চার কাঠামোকে অনুসরণ করেই নতুনাভাবে দেশীয় ভাষায় শিক্ষাচর্চা; মূলত শিশুশিক্ষার সূচনা উনিশ শতকেরই অবদান। কিন্তু এতদসত্ত্বেও নানা বিষয়ে দ্বান্দিকতা উনিশ শতকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ধর্মীয় স্তরে যার প্রকাশ নানাভাবে বাঙালী জাতিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ফলে নানান দিক থেকে হিন্দুধর্মের উপর আক্রমণ হতে লাগলো। প্রচলিত হিন্দুধর্মের ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলেন খ্রিস্টান মিশনারিগণ। উদ্দেশ্য ছিল এই হিন্দু ধর্মকে সমূলে উৎপাটিত করা। কিন্তু হিন্দু

ধর্মের শিকড় এতই শক্ত ছিল যে, আঘাতে তার মূল উৎপাটিত হয়নি। সেই সঙ্গে উনিশ শতক সমাজ সংস্কারের যুগ- জাতীয়তাবাদী চেতনার যুগও বটে। মধুসূদন দত্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা উনিশ শতকের সেই লক্ষণ স্পষ্ট। উনিশ শতকের আন্দোলনের মধ্যে, উত্তাল সামাজিক পরিস্থিতিতে সকল মানুষের মধ্যে শুভবুদ্ধি জাগ্রত করা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই সেই পরিস্থিতির মধ্যে বেড়ে ওঠা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে ভারতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা দেওয়া ছিল তখনকার সাহিত্যিকদের উদ্দেশ্য। কারণ আজ যারা ছোট, আগামী দিনে তারাই বড় হয়ে দেশ সমাজের হাল ধরবে। তবে ছোটদের জন্য কিছু লেখা মস্ত ঝক্কির কাজ, কারণ বড়রা সব বোঝে, তাই তাদের জন্য সব লেখা যায়, কিন্তু ছোটদের বোঝার ক্ষমতা কম, তাই তাদের উপযোগী করে হাস্যরসের মিশ্রণে অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে দিয়ে সেই সঙ্গে ভৌতিক গল্প সমূহ রচনা করায় শ্রেয়। এই শিশু সাহিত্যের জনক বলা হত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীকে। তিনি বিভিন্ন পুরাণের গল্প রচনা করেছিলেন এবং সেগুলিকে তিনি শিশুদের উপযোগী করে রচনা করেছিলেন। সেই সময় আমরা তাঁর পাশাপাশি আরো কিছু সাহিত্যকদের লক্ষ্ করি, যাঁরা শিশুদের জন্য লিখেছেন। যেমন - "বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদে এলো বান। / শিব ঠাকুরের বিয়ে হল, তিন কন্যে দান।।" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিশুদের জন্য লেখা এই ছড়া খুবই প্রচলিত। এখানেও পুরাণের শিব ঠাকুরের প্রসঙ্গ এসেছে। তবে এই ছড়াগুলিতে পুরাণের শিবের কথা এলেও তা ভারি অর্থ বর্জন করে শিশু পাঠকদের উপযোগী হয়ে উঠেছে। ছড়া সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-

> "ছড়াগুলিই শিশু-সাহিত্য, তাহারা মানব মনে আপনি জন্মিয়াছে। ছড়াগুলি ভারহীনতা, অর্থবন্ধন শূন্যতা এবং বৈচিত্র্য বশতই চিরকাল ধরিয়া শিশুদের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে- শিশু- মনোবিজ্ঞানের কোন সূত্র ধরিয়া রচিত হয় নাই।"[১]

উপেন্দ্রকিশোর এবং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সমসাময়িক। সেই সময় রবীন্দ্রনাথও লিখেছিলেন 'ছেলেভুলানো ছড়া'। পাশাপাশি উপেন্দ্রকিশোরও ছোটদের জন্য লিখিতে ভালোবাসতেন। তবে এই লেখালেখির জগতে তিনি কিভাবে এলেন তা বলে নেওয়া যাক।

বর্ণপরিচয়ের পূর্বেই খেলার পাশাপাশি ঘুমপাড়ানি গান, ছড়া ও রূপকথার মাধ্যমে সাহিত্যের সঙ্গে মানব শিশুর প্রথম পরিচয়। আধুনিক সাহিত্য পাঠক রূপে প্রাপ্ত বয়স্কদের পাশাপাশি শিশুদের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এই সূত্রেই 'শিশুসাহিত্য' এই কথাটির উদ্ভব।প্রায়ই দেখা যায়, যে সব গ্রন্থ শিশুদের জন্য রচিত হয়নি, সেসবের মধ্যে কিছু গ্রন্থ অনায়াসেই শিশু পাঠককে আকৃষ্ট করে। রামায়ণ, মহাভারত এছাড়াও পুরাণ কেন্দ্রিক নানান দেব - দেবীর গল্প ইত্যাদি যেকোনো সাহিত্য কর্ম সম্পর্কে এ কথা সত্য। বাংলা শিশুসাহিত্যের জন্ম নিশ্চিত ভাবেই লোকসাহিত্যের সীমায়- রূপকথা, উপকথা, পুরাণ জাতীয় গল্প এছাড়াও নানাবিধ ছড়ার জগতে। উনিশ শতকের পূর্বে বাংলা শিশুসাহিত্যের কোন গ্রন্থই বিশেষভাবে শিশুদের উদ্দেশ্যে রচিত হয়নি। রাজেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী ১৮৯৯ সালে প্রকাশিত যোগীন্দ্রনাথ সরকার সংকলিত 'খুকুমনির ছড়া' গ্রন্থের ভূমিকায় প্রথম 'শিশু সাহিত্য' শব্দটি ব্যবহার করেন।১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বাংলা সাময়িক পত্র 'দিগদর্শন' প্রকাশের সাথে সাথে বাংলা শিশু সাহিত্যের গোড়াপত্তন হল। এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষা বিস্তার। শিশু কিংবা কিশোরের শব্দ ভান্ডার বয়স্কদের তুলনায় সংক্ষিপ্ত। উনিশ শতকের শেষদিকের একজন প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক ছিলেন শিক্ষাবিদ যোগীন্দ্রনাথ সরকার। " অ- অজগর আসছে তেড়ে / আ- আমটি খাব পেড়ে।" উচ্চারণ করে এখনও পর্যন্ত বাঙালি শিশুর বর্ণপরিচয় হয়ে থাকে। শিশুপাঠ্য রচনায় তিনিই প্রথম চলতি বাংলা ব্যবহার করেন। শিশুসাহিত্য রচনায় তেমনি জনপ্রিয় একজন হলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। তাঁর জন্ম ১৮৬৩ সালের ১১ মে ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার মসূয়া গ্রামে। তাঁর

পিতা শ্যামসুন্দর রায়চৌধুরী, মাতা জয়তারা রায়চৌধুরী। ১৯১৩ সালে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সম্পাদনায় বিখ্যাত 'সন্দেশ' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হতে শুরু হয়। এই পত্রিকাটি বাংলা শিশুসাহিত্যে স্বর্ণযুগের সূচনা করে। 'সন্দেশ' স্রষ্টা উপেন্দ্রকিশোরের গ্রন্থ সংখ্যা সাতটি। সেগুলি হল- সেকালের কথা, ছেলেদের রামায়ণ, ছেলেদের মহাভারত, মহাভারতের গল্প, টুনটুনির বই, ছোটদের রামায়ণ, গুপী গাইন বাঘা বাইন, এছাড়াও প্রচুর বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা, পুরাণের গল্প ইত্যাদি তাঁর গ্রন্থাবলীতে সংকলিত হয়েছে। উপেন্দ্রকিশোর লোককথা বা রূপকথার আঙ্গিকে প্রাচীন মহাকাব্যগুলির কাহিনি পরিবেশন করেছিলেন। তাঁর অসংখ্য শিশুপাঠ্য রচনার প্রায় সবগুলিই সাধু ভাষায় রচিত। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে সংলাপে চলিত গদ্য ব্যবহৃত হয়েছে। পুরাণ কথাকে উপেন্দ্রকিশোর প্রায় লোককথার ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন। তিনি মনে করেছিলেন সমকালীন নানান বিষয় জানার পাশাপাশি গুটি গুটি পায়ে বেড়ে ওঠা শিশুদের পুরাণের নানান বিষয় জানা অত্যন্ত জরুরি।

ভারতের জ্ঞান ভান্ডারে যেসব প্রাচীন গ্রন্থ আছে, পুরাণ গ্রন্থ সেগুলোর মধ্যে এক অমূল্য রত্ন বিশেষ। পুরাণ আমাদের ভারতের ঐতিহ্য। উপেন্দ্রকিশোর সেই ঐতিহ্যকে দেশের কচিকাঁচাদের ভালোভাবে জানানোর উদ্দেশ্যে পুরাণের সেই ভারি ভারি কাহিনি গুলিকে ছোট ছোট গল্পাকারে নানান ছবি সহকারে শিশুদের উপযোগী করে তিনি উপহার দিয়েছিলেন শিশুদের। আমরা কমবেশি প্রায় সকলেই জানি, বিদ্যালয়ে থাকতেই তিনি আঁকিয়ে হিসেবে বেশ জনপ্রিয় ছিলেন। তাই শিশুদের জন্য লেখার পাশাপাশি সেইসব লেখার জন্য বিভিন্ন ছবিও তিনি নিজেই আঁকতেন। আমাদের ভারতীয় ঐতিহ্য পুরাণের কিছু কিছু কাহিনিকে তিনি শিশু উপযোগী ছোট ছোট গল্পাকারে পরিবেশন করেছিলেন। তাঁর 'উপেন্দ্রকিশোর সমগ্র' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে সেইরকমই কিছু পুরাণের গল্প। উপেন্দ্রকিশোর সহজ ভাষায় শিশুদের সেই সমস্ত গল্পগুলির মধ্যে দিয়ে শিক্ষাদানের চেষ্টা করছিলেন। সর্বোপরি পুরাণের এই ঐতিহ্যবাহী কাহিনি গুলিকে শিশুদের বোধগম্য করে পরিবেশন করার জন্য সেগুলোকে পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর রচিত 'পুরাণের গল্প' ছাব্বিশটি পৌরাণিক কাহিনির সংকলন। বর্তমান প্রকল্পে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পৌরাণিক কাহিনি সংকলনের ছাব্বিশটি গল্পের মধ্যে নির্বাচিত কয়েকটি গল্পের আলোচনা করা হয়েছে।

'ইন্দ্র হওয়ার সুখ' শিরোনামাঙ্কিত কাহিনিতে দম্ভ ও দর্পের পরাজয়ের ছবি সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। মূল মহাভারতের 'উদযোগ পর্ব' এর এই আখ্যানে আমরা দেখতে পায় নহুষ নামক একজন রাজা প্রথমে ধর্মপথের অনুসারী ছিলেন। এই প্রজাপালনে রত, সুবিনয় রাজাকে ইন্দ্র পদে মনোনীত করেন মহর্ষিরা। কিন্তু ক্ষমা পাওয়ার কিছু পরেই তার চরিত্রে পরিবর্তন দেখা যায়। ইন্দ্রত্ব প্রাপ্তির পর সেই রাজা দাবি করেন- "ইন্দ্রমহিষী আমার সেবা করেননা কেন? উনি সত্বর আমার গৃহে আসুন"।[২] তখন ব্যথিতা শচী দেবগুরু বৃহস্পতির কাছে আশ্রয় নেন এবং পরে ইন্দ্রের পরামর্শে নহুষকে জানান - দেবরাজ যদি তার একটি ইচ্ছা পূরণ করেন, তবে তিনি সর্বদা তার বশগামিনী হবেন। তিনি বলেন - "..... আমার ইচ্ছা, মহাত্মা ঋষিগণ আপনার শিবিকা বহন করুন।"[৩] এই কথা শুনে নহুষ ঋষিদের অভিসম্পাতে বিনষ্ট হন। আর উপেন্দ্রকিশোর তাঁর পুরাণের গল্পে নহুষের এই ইন্দ্রপরায়ণ ছবি বাদ দিয়ে তিনি যে চিত্র তুলে ধরেছেন তাতে আমারা দেখতে পায় ক্ষমতায় মত্ত এক রাজাকে। তিনি শিশুদের জন্য এটি রচনা করেছেন বলেই হয়ত শচী প্রসঙ্গ বাদ পড়েছে উপেন্দ্রকিশোরের রচনায়। কিন্তু তিনি এর মধ্যে দিয়ে তাঁর শিশু পাঠকদের খুব সহজেই বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন যে, ক্ষমতার দম্ভ আসলে বিনাশই ডেকে আনে।

'গনেশের বিবাহ' শিরোনামাঙ্কিত কাহিনিটিতে আমরা দেখি, কার্তিক আর গনেশ যখন বড়ো হলেন তখন একটা কথা নিয়ে দুজনের মধ্যে তর্ক উপস্থিত হল যে, কে আগে বিবাহ করবে? তাঁদের এই তর্ক শুনে

শিব এবং পার্বতী দুজনেই বড়ই ভাবনায় পড়লেন। তখন শেষে অনেক ভেবে শিব স্থির করলেন কার্তিক এবং গনেশের মাধ্যমে আগে এই পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে ফিরে আসতে পারবে, তাঁর বিবাহই আগে দেওয়া হবে। একথা শোনা মাত্রই কার্তিক পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে বাহির হলেন। কিন্তু গনেশের তো ভুঁড়ি - তা নিয়ে তিনি ছোটাছুটি করে তাড়াতাড়ি ফিরবেন কি করে- এই চিন্তায় পড়লেন তিনি। মনে মনে এক চমৎকার যুক্তি স্থির করলেন যে, তিনি শিব এবং পার্বতী অর্থাৎ তাঁর পিতা মাতার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করবেন। এবং তিনি করলেনও তাই। তারপর জোরহাতে তাঁদেরকে বললেন- "এখন তবে আমার বিবাহ দিন।" [৪] তখন শিব বললেন কার্তিকের আগে যদি গনেশ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে ফিরে আসতে পারে, তবে তাঁর বিবাহ আগে দেওয়া হবে। তখন গনেশ জানান তিনি সাতবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছেন। বেদে আর শাস্ত্রে আছে পিতা মাতাকে প্রদক্ষিণ করলে তাতে পৃথিবী প্রদক্ষিণের ফল পাওয়া যায়। একথা শুনে শিব বললেন - তাইতো এ তো একদম ঠিক কথা। তখনই গনেশের বিবাহের আয়োজন করা হল। 'শিবপুরাণ' এর অন্তর্গত এই আখ্যানটিকে উপেন্দ্রকিশোর শিশুদের উপযোগী করে রচনা করেছেন। আসলে তিনি এর মধ্যে দিয়ে শিশু পাঠকদের খুব সহজেই বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন যে, বুদ্ধিহীন পরিশ্রম বৃথা, অর্থ্যাৎ বুদ্ধি দিয়ে কোন কাজ করলে অবশ্যই তার সঠিক এবং ভালো ফল লাভ ঘটে।

উনিশ শতকের সূচনাকালে নানাদিক থেকে হিন্দুধর্মের উপর আক্রমণ হতে লাগলো। প্রচলিত হিন্দুধর্মের ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন খ্রিস্টান মিশনারিগণ। ব্রিটিশ বিজয়ের ফলে ভারতের সভ্যতা পাশ্চাত্য সভ্যতার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। তাদের মতে হিন্দু ধর্মই ছিল অধঃপতিত - যার মূল পর্যন্ত পঁচে গেছে এবং যা সংস্কারেরও অযোগ্য। প্রকৃতপক্ষেই শিশুরা যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে, যে পরিবেশের মধ্যে দিয়ে বড়ো হয়ে ওঠে, সেই সময়ই উপেন্দ্রকিশোর শিশুদের মধ্যে হিন্দু ধর্মের ঐতিহ্য পুরাণকে নব জাগরিত করার জন্য পুরাণের গল্পগুলি রচনা করলেন। উনিশ যে সময় চারিদিকে উত্তাল, ভয়াবহ পরিস্থিতি, দাঙ্গা, বিদ্রোহ, শুভ অশুভের লড়াই বেঁধেছিল, সেই রাজনৈতিক ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে তিনি শুভবোধ জাগরিণের এই পুরাণ গল্পগুলি লিখেছিলেন - যা শুধুমাত্র শিশুদের নয়, সেই সঙ্গে আপামর ভারতবাসীর মধ্যে নতুন করে শুভ বোধ জাগ্রত করতে সহায়তা করেছিল। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী বিরচিত তেমনি একটি কাহিনি 'মহিষাসুর'। প্রত্যেকটি বাঙালিই এই চরিত্রটির সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু সেই চরিত্রটিকেই উপেন্দ্রকিশোর পুনরায় তাঁর লেখনীতে তুলে ধরেছেন। এই কাহিনিতে অশুভ শক্তির বিনাশ এবং শুভ শক্তির জয়গান গীত হয়েছে। পূরানের বহু প্রচলিত এই কাহিনি অনুযায়ী এক ভয়ঙ্কর অসুর ছিল - সে মহিষ সেজে বেড়াত, তাই তাকে মহিষাসুর বলা হত। দেবতারা কিছুতেই তার সাথে যুদ্ধে জিততে পারতেন না। এমনকি এই মহিষাসুর দেবতাদের, স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করেছিল। এরপর সমস্ত দেবতা ব্রহ্মার স্মরণাপন্ন হন এবং শিব ও বিষ্ণুর, সেই সঙ্গে সকল দেবতাদের শরীর থেকে তেজ বের হল। সকল দেবতার অস্ত্র, বস্ত্র, বর্ম, অলংকারের দ্বারা সুসজ্জিত হয়ে সেই দেবী গেলেন মহিষাসুরের সাথে যুদ্ধ করতে। শেষ পর্যন্ত মহিষাসুর বধ হয়েছিল দেবী দুর্গার হাতে। বহু প্রচলিত হিন্দুধর্মের এই কাহিনিকে তিনি পুনর্নির্মাণ করেছিলেন মূলত শুভ শক্তিকে জাগ্রত করতে। তবে তার পাশাপাশি তা শিশুদের উপযোগীও হয়ে উঠেছে। শিশুদের কাছে অ্যাকশন জাতীয় গল্প হোক বা অন্যান্য রচনা, অ্যাকশন তাদের বেশ আনন্দ দেয়। এবং এই কাহিনিতে আমরা দেখি দেবী দুর্গা এবং মহিষাসুরের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ - যা একাধারে যেমন শিশুদের মনে অশুভ শক্তির বিনাশ এবং শুভ শক্তির জয়গানকে ফুটিয়ে তুলেছে, তার পাশাপাশি এই কাহিনি শিশুকে যথেষ্ট আনন্দ দান করেছে। তাই এই কাহিনি অনেকবেশি শিশুপযোগী হয়ে উঠেছে।

উপেন্দ্রকিশোর যে সময়ে বসে এই পুরাণের গল্পগুলি লিখেছিলেন, তার কিছুকাল আগেও সমাজে এক ভয়ানক পরিস্থিতি ছিল, দাঙ্গা, লুটপাট ইত্যাদি লেগেই ছিল। সেই পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে বেড়ে ওঠা শিশুদের মনে তা গভীর ভাবে প্রভাব বিস্তার করত। কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্যের আধার এই পুরাণের গল্পগুলি সেই সমস্ত বেড়ে ওঠা শিশুদের মন থেকে এই সমস্ত দাঙ্গা, বিদ্রোহের ক্লেশকে দূর করে তাদের মধ্যে শুভ বুদ্ধি জাগ্রত করতে সহায়তা করেছিল। উনিশ শতকের সূচনাকাল থেকে হিন্দু ধর্মের উপর যেভাবে নানাদিক থেকে আক্রমণ আসতে শুরু করেছিল, উপেন্দ্রকিশোরের রচনাতে সেই হিন্দু ধর্মের ঐতিহ্য পুরাণ স্থান পেয়ে মূলত ভারতীয় ঐতিহ্যের জয়কেই সূচিত করেছে।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী বিরচিত 'পুরাণের গল্প' এর অন্তর্গত 'শুম্ভ - নিশুম্ভ' শিরোনামাঙ্কিত কাহিনিতে ঔদ্ধত্য ও অহংকারের পরাজয়ের ছবি সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। শুম্ভ ও নিশুম্ভ হল দুইজন হিন্দু পৌরাণিক চরিত্র। শাক্ত ধর্মগ্রন্থ 'দেবী মাহাত্ম্যম্' অনুযায়ী এরা অসুর ভ্রাতৃদ্বয়। এই গ্রন্থে বর্ণিত দেবী দুর্গা সংক্রান্ত তৃতীয় ও সর্বশেষ কাহিনিটি হল শুম্ভ নিশুম্ভ বধের কাহিনি। গ্রন্থের উত্তর চরিত্র বা তৃতীয় খন্ডে বিধৃত পঞ্চম থেকে একাদশ অধ্যায়ে এই কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। শুম্ভ নিশুম্ভ নামে দুই অসুর ভ্রাতা স্বর্গ ও দেবতাদের যজ্ঞভাগ অধিকার করে নিলে দেবগন হিমালয়ে গিয়ে বৈষ্ণব শক্তি মহাদেবীকে স্তব করতে লাগলেন। এমন সময় সেই স্থানে পার্বতী গঙ্গা স্নানে উপস্থিত হলে আদ্যাদেবী ইন্দ্রাদি দেবতার স্তবে প্রবুদ্ধা হয়ে তাঁর দেহকোষে থেকে নির্গত হলেন। এই দেবী কৌশিকী নামে অখ্যাত হলেন এবং শুম্ভ নিশুম্ভ বধের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। এদিকে অসুর দ্বয়ের চর চন্ড ও মুন্ড তাঁকে দেখতে পেয়ে নিজ প্রভু দ্বয়কে তাদের কথায় বললেন - এমন সুন্দরী স্ত্রীলোক তাদের ভোগ্য হবার যোগ্য। এরপর শুম্ভ নিশুম্ভ মহাসুর সুগ্রীবকে দৌত্যকর্মে নিযুক্ত করে দেবীর নিকট কুপ্রস্তাব প্রেরণ করে, এবং দেবীও তা শুনে মৃদু হেসে বিনীত স্বরে বলেন - এই বিশ্বে শুম্ভ নিশুম্ভের মতো বীর আর কেউ নেই। তবে দেবী পূর্বে অল্পবুদ্ধিবশতঃ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, যে দেবীকে যুদ্ধে পরাভূত করতে পারবে, কেবলমাত্র তাকেই দেবী বিবাহ করবেন। এখন তিনি তো প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করতে পারবেন না। এরপর শুম্ভ নিশুম্ভের সাথে দেবীর যুদ্ধ হয়। আর শেষ পর্যন্ত দেবীর কাছে তারা পরাজিত হয়। দেবী দুর্গা নিশুম্ভকে বধ করেন এবং যুদ্ধান্তে দেবী শুম্ভকে শূলে গ্রথিত করে বধ করেন। দেবতারা পুণরায় স্বর্গের অধিকার ফিরে পান।

তবে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী তাঁর পুরাণের গল্পে দেবীর প্রতিজ্ঞায় বিষয়টিকে বাদ দিয়েছেন। সেই স্থানে দেবী বলছেন - তার ছেলেমানুষী খেয়াল হয়েছে যে, যে তাঁকে যুদ্ধে হারাতে পারবে না, সে দেবীকে বিবাহ করতে পারবে না। 'দেবী মাহাত্ম্যম্' এ দেবী প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। এই প্রতিজ্ঞা বলতে বোঝায় আগে থেকেই কিছু সংকল্প বা অঙ্গীকার করা। কিন্তু উপেন্দ্রকিশোর যেহেতু শিশু পাঠকদের জন্য এই কাহিনি রচনা করেছেন তাই তাঁর কাহিনিতে দেবীর হঠাৎ করেই খেয়াল হয়েছে যে, যুদ্ধে তাঁকে হারাতে না পারলে তিনি বিবাহ করবেন না। আসলে শিশুরাও তো এমনি হয়ে থাকে। কোনো কিছু আগে থেকেই ভেবেচিন্তে তারা করেনা। তাদের যা খেয়াল হয় হঠাৎ করে, সেই কাজই তারা করে ফেলে। সুতরাং, এই কাহিনিতে উপেন্দ্রকিশোরও যেন দেবীকে শিশুদের মতোই তাদের উপযোগী করেই নির্মাণ করেছেন। তাই দেবীরও হঠাৎ খেয়াল হয়েছে। এর পাশাপাশি কবি তাঁর শিশু পাঠকদের বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন যে, ঔদ্ধত্য ও অহংকার আসলে বিনাশই ডেকে আনে। তাই এই কাহিনির শেষেও লক্ষ্য করা গেল শুম্ভ ও নিশুম্ভ হল ঔদ্ধত্য ও অহংকারের প্রতীক, যাঁরা দেবীর বিনয় ও প্রজ্ঞার নিকট পরাস্ত হল।

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসকে বুঝতে পুরাণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি উপাদান। ভারতীয় ঐতিহ্য- সংস্কৃতির ইতিহাস এই পুরাণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। উনিশ শতকের শেষের দিকে দাঁড়িয়ে

উপেন্দ্রকিশোর যে পুরাণকে ফিরে দেখেন, তা মানবিকতার জয়পতাকাকেই তুলে ধরতে চায়। আমাদের মনে রাখা দরকার যে, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর মূল পাঠক শিশুরা। সমাজের নানান নিয়ম রীতি রাজনীতির জটিলতায় তাদের মন তখনও পঙ্কিল হয়ে ওঠেনি। একদিকে তাদের মধ্যে ছিল অজানাকে জানার ইচ্ছা, অচেনাকে চেনার আকাঙ্ক্ষা। পুরাণের এই সমস্ত কাহিনি কম বেশি আমারা সকলেই জানি। তবে উপেন্দ্রকিশোর এই পুরাণের কাহিনিকে ছোট ছোট গল্পাকারে বীর, কখনো হাস্যরসের মধ্যে দিয়ে তাঁর শিশু পাঠকদের জন্য পুনর্নির্মাণ করে তাদের এক প্রাঞ্জল পাঠ্য উপহার দিয়েছেন। তাঁর রচিত গল্পগুলির মূল কাহিনি পুরাণ নির্ভর হলেও উপেন্দ্রকিশোরের নিজস্ব সাবলীল গল্প বলার ধরণটি কাহিনি গুলিকে সরল ও সরস করে তুলেছে। উপেন্দ্রকন্যা পুণ্যলতা চক্রবর্তী তাঁর ছোটবেলার স্মৃতি রোমন্থনে বলেছেন-

> "ছোট ছেলেমেয়েদের বাবা বড় ভালোবাসতেন। শিশুদের সঙ্গে শিশুর মতোই আনন্দে তিনি হাসি- খেলা- নাচ- গানে মেতে উঠতেন। ছোটদের ভালোবাসতেন, তাদের মন বুঝতেন বলেই বুঝি এমন সুন্দর সহজ মিস্টি হত তাঁর লেখা।"[৫]

এভাবেই দেখা যায়, সম্পাদক উপেন্দ্রকিশোরের পাশাপাশি শিশু সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোরও তাঁর গভীর মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন তাঁর এই সকল রচনায়। তাই তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা স্বল্প পরিমাণের হলেও সেগুলি অমর হয়ে একাধারে আনন্দ এবং শুভবোধ সঞ্চার করে চলেছে।

ভারতীয় জ্ঞান ভান্ডারের প্রাচীন গ্রন্থ পুরাণ গ্রন্থ গুলির কাহিনি গুলিকে শিশু সাহিত্যকার উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী তাঁর রচিত 'পুরাণের গল্প' এর ছাব্বিশটি গল্পের মধ্যে নির্বাচিত চারটি গল্পে 'ইন্দ্র হওয়ার সুখ', 'গনেশের বিবাহ', 'মহিষাসুর', 'শুম্ভ নিশুম্ভ' তে কিভাবে নতুন করে শিশুদের উপযোগী পাঠ্য হিসেবে পুনর্নির্মাণ করেছেন। এবং এই পুনর্নির্মাণের ফলে এই বিষয়গুলি নতুন দেখতে পেলাম যে, মূল মহাভারতের 'উদযোগ পর্ব' এর নহুষের ইন্দ্র পরায়ণতাকে উপেন্দ্রকিশোর তাঁর 'ইন্দ্র হওয়ার সুখ' শিরোনামাঙ্কিত গল্পে বাদ দিয়ে সেখানে তিনি তাকে করে তুলেছেন ক্ষমতায় মত্ত এক রাজা। আর শিশুপাঠ্য বলে শচী প্রসঙ্গও বাদ পড়েছে। 'শিবপুরাণ' থেকে নেওয়া 'গনেশের বিবাহ' এই গল্পটিতে তিনি নিছক একটি পুরাণের গল্পের বদলে এর পুনর্নির্মাণ করে এটাই শিক্ষা দিতে চেয়েছেন যে, বুদ্ধিহীন পরিশ্রম বৃথা। 'দেবী মাহাত্ম্যম্' থেকে গৃহীত 'মহিষাসুর' কাহিনিটিকেও প্রচলিত মহিষাসুরমর্দিনীর কাহিনি থেকে কিছুটা বদলে, এর ভাষাকে শিশুদের উপযোগী করে অ্যাকশন, হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন এবং এক্ষেত্রেও শিশু পাঠকদের শিক্ষা দিয়েছেন।

তথ্যসূত্র:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। লোকসাহিত্য। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা ১৩৪৫।

২. ভট্টাচার্য্য, শ্রীমদ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ। মহর্ষি শ্রী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীতম, মহাভারতম্। উদযোগ পর্ব, প্রথম খণ্ড।

৩. ভট্টাচার্য্য, শ্রীমদ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ। মহর্ষি শ্রী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীতম, মহাভারতম্। উদযোগ পর্ব, প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত।

৪. তর্করত্ন, পঞ্চানন (সম্পা.)। শ্রী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীতম, শিবপুরাণম্। কলকাতা, ১৩১৪, পৃ. ১৪০।

৫. চক্রবর্তী, পুণ্যলতা। ছেলেবেলার দিনগুলি। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৭, পৃ. ৮৫।

৬. রায়চৌধুরী, উপেন্দ্রকিশোর। উপেন্দ্রকিশোর সমগ্র। দেজ পাবলিশিং, কলকাতা।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 898-904
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.304

কৌটিল্যর অর্থশাস্ত্রে কৃষি অনুশীলন: বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও আধুনিক প্রাসঙ্গিকতা

মলয় ঘোষ, *রাজ্য সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক-১, সংস্কৃত বিভাগ, বলাগড় বিজয়কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 25.03.2026; Accepted: 28.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The Arthashastra of Kautilya is not only a treatise on Indian political thought and diplomacy but also a significant documentation of advanced agricultural science. This study analyses Kautilya's scientific observations on agriculture during the Maurya period and presents a comparative perspective with modern agricultural practices.

The role of the Sitadhyaksha as the administrative head of agriculture highlights systematic approaches to seed preservation, irrigation management, and diversified farming. Detailed strategies regarding rainfall measurement, seasonal planning, soil-based crop selection, and harvesting techniques reflect a rational and scientific agricultural framework.

Practices such as seed purification and the use of organic fertilizers indicate early principles of sustainable agriculture. In the context of contemporary challenges such as climate change, soil degradation, and food scarcity, Kautilya's agricultural vision remains highly relevant. Above all, he recognised an economic framework similar to the modern-day performance-based incentive system for workers. Thus, the agricultural system described in the Arthashastra may be regarded as a well-structured foundation of modern agricultural science.

Keywords: Kautilya, Arthashastra, Sitadhyaksha, Irrigation Management, Sustainable Agriculture, Mauryan Economy

প্রাচীন ভারতের মূল্যবান জ্ঞানভাণ্ডারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হল অর্থশাস্ত্র। এর প্রণেতা প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও রাষ্ট্রচিন্তক কৌটিল্য, যিনি মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তকে মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে তাঁর প্রধান উপদেষ্টা ও মন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত। এই গ্রন্থে রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসন, পররাষ্ট্রনীতি, কর আদায় এবং সামাজিক কাঠামোর পাশাপাশি আয় উপার্জনের বিভিন্ন উপায়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রাচীন ভারতে কৃষি ছিল মানুষের জীবিকার প্রধান উৎস এবং রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল ভিত্তি। সেই কারণে কৌটিল্য কৃষিকে কেবলমাত্র উৎপাদনমূলক কার্যকলাপ হিসেবে দেখেননি, বরং একে একটি সুসংগঠিত ও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র-এর পনেরোটি অধিকরণের মধ্যে দ্বিতীয় অধিকরণের অন্তর্গত চব্বিশতম অধ্যায়ে ভারতীয় কৃষির বিশদ বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে কৃষি-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়, যেমন— কৃষি প্রশাসন, জমির গুণাগুণ নির্ণয়, বীজ নির্বাচন, সেচ ব্যবস্থা, ঋতুভিত্তিক চাষাবাদ, সার প্রয়োগ এবং ফসল সংরক্ষণ প্রভৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে। উপরিউক্ত নির্দেশনাগুলির বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে কৌটিল্য-এর কৃষি-ভাবনা আধুনিক কৃষিবিজ্ঞানের সঙ্গে অনেকাংশে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বর্তমান বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তন, খাদ্য সংকট, কর্মসংস্থানের অভাব এবং মাটির উর্বরতা হ্রাসের মতো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার প্রেক্ষাপটে প্রাচীন কৃষিবিজ্ঞান পুনর্মূল্যায়ন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই প্রবন্ধে অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত কৃষি বিষয়ক ধারণাগুলিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করা হবে এবং আধুনিক কৃষিবিজ্ঞানের সঙ্গে তার তুলনামূলক আলোচনা উপস্থাপন করা হবে।

সীতাধ্যক্ষ: কৃষিকর্মের প্রশাসক:

কৃষিকাজের ক্ষেত্রে সুদক্ষ প্রশাসকের গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত। এই প্রসঙ্গে অর্থশাস্ত্র-এ উল্লিখিত 'সীতাধ্যক্ষ' প্রাচীন ভারতের কৃষি প্রশাসনের এক গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী ছিলেন। তাঁর ওপরই রাষ্ট্রের কৃষি ব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খল ও পরিকল্পিতভাবে পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। 'সীতা' বলতে লাঙ্গলের দ্বারা কর্ষিত জমির ওপর উৎপন্ন রেখা বোঝায় এবং 'অধ্যক্ষ' শব্দের অর্থ তত্ত্বাবধায়ক; ফলে সীতাধ্যক্ষ ছিলেন রাজকীয় কৃষিজমির প্রধান তত্ত্বাবধায়ক।

তিনি জমির প্রকৃতি নির্ধারণ, উপযুক্ত ফসল নির্বাচন, বীজ সংরক্ষণ, সেচব্যবস্থা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব পালন করতেন। এই সমস্ত কার্যাবলী বর্তমান সময়ের কৃষি আধিকারিক বা কৃষিবিজ্ঞানীদের দায়িত্বের সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্যপূর্ণ বলে আমার মনে হয়।

সীতাধ্যক্ষের ক্ষেত্রে বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে 'সীতাধ্যক্ষঃ কৃষিতন্ত্র- শুল্ব- বৃক্ষায়ুর্বেদজ্ঞস্তজ্ঞজসখো বা...'।[১] অর্থাৎ সীতাধ্যক্ষকে কৃষিতন্ত্র, শুল্বতন্ত্র এবং বৃক্ষায়ুর্বেদশাস্ত্র জ্ঞান লাভ করে কৃষি কাজের প্রয়োজনীয় বীজ যথা সময়ে সংগ্রহ করবেন। এই জ্ঞান না থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে তিনি অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ গ্রহণ করেও কৃষিকাজ পরিচালনা করতেন। এর থেকে বোঝা যায় কৌটিল্যের সময়ে যোগ্যতাকে দক্ষ প্রশাসক নিয়োগের মাপকাঠি ছিলো। এছাড়া শ্রমিক ও কর্মচারী যেমন দাস ও কর্মকরদের মাধ্যমে চাষাবাদ ও বপনকার্য সম্পন্ন করানোও তাঁর অন্যতম দায়িত্ব ছিল। মনুসংহিতায় দাসের প্রকারভেদ সম্পর্কে বলা হয়েছে-

"ধ্বজাহৃতো ভক্তদাসো গৃহজঃ ক্রীতদত্রিমৌ।
পৈতৃকো দণ্ডদাসশ্চ সপ্তৈতে দাসযোনয়ঃ।।"[২]

আর কর্মকার হল বেতনভুক্ত শ্রমিক। সব দিক পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে কৃষি ব্যবস্থা কেবল অভিজ্ঞতানির্ভর ছিল না, বরং তা সুসংগঠিত ও বৈজ্ঞানিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে আমার মনে হয়। এই ধারণা বর্তমান কৃষি ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট তাৎপর্য বহন করে।

বৃষ্টিপাতের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি:

প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান ভারতবাসীদের কাছে কৃষিকাজ শুধুমাত্র কর্মক্ষেত্র হিসেবে নয়, সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ হিসেবেও খ্যাত। আবার কৃষিকাজ একটি স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত কাজও বটে। একজন কৃষক তার

অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে কৃষি কর্ম করে থাকেন। তবে এই কৃষিকাজ করার জন্য আমাদের প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল থাকতে হয়। এই প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

কৌটিল্য তার অর্থশাস্ত্রে বলেছেন, কৃষি কর্মের সাফল্য অনেকাংশে বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল। কৃষি কাজের ক্ষেত্রে বৃষ্টিপাত কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তার পরিচয় পাওয়া যায় ঋকবেদের পর্জন্য সূক্তে। সেখানে বলা হয়েছে-

প্র বাতা বান্তি পতয়ন্তি বিদ্যুত উদোষধীর্জায়ন্তে পিন্বতে স্বঃ।
ইরা বিশ্বেভ্যোভুবনায় জায়তে যৎপর্জন্যঃ পৃথিবীবং রেতসাবতি॥[৩]

অর্থাৎ, বায়ু প্রবাহিত হয়, বিদ্যুৎ চমকায়, ওষধিরা (উদ্ভিদকুল) অঙ্কুরিত হয় এবং আকাশ থেকে বৃষ্টিধারা বর্ষিত হয়। যখন পর্জন্য দেব পৃথিবীকে তাঁর বৃষ্টির দ্বারা (বীজশক্তি) সিক্ত করেন, তখন সমস্ত জগতের জন্য অন্ন উৎপন্ন হয়।

এমনকি ইতিহাসবিদ দামোদর ধর্মানন্দ কৌশম্বির মতে, প্রাচীন ভারতীয় কৃষি মূলত মৌসুমী বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল ছিল।

অর্থশাস্ত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায়, যেখানে বর্ষার উপর নির্ভর করে কৃষিকাজ করা হতো সেই কৃষিজমিকে দুটো শ্রেণীতে ভাগ করা হয়- একটি হলো জাঙ্গল অর্থাৎ মরুপ্রায় দেশ এবং অপরটি হলো অনূপ অর্থাৎ জলপ্রায় প্রদেশ। মরুপ্রায় প্রদেশে যেমন ১৬ দ্রোণ অর্থাৎ ৩২ ইঞ্চি জল জমা হলে তবেই সেই জল শস্য উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত হত। আবার জলপ্রায় প্রদেশে ২৪ দ্রোণ পরিমাণ জল জমা হলে ফলন সম্ভব হতো। এছাড়াও অস্মক ও অবন্তি প্রদেশেও ১৩.৫ ও ২৩ দ্রোণ বৃষ্টি ফলনে সম্ভব পর ছিল। কৌটিল্যের মতে হিমালয় ও পশ্চিমে কোঙ্কন অঞ্চলে সব ঋতুতে জল পাওয়া যেত ফলে সেখানে ফসল উৎপাদনে স্বতন্ত্রতা ছিল।

এছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের তারতম্যের ভিত্তিতে জমির শ্রেণীবিভাজন ও সেই অনুযায়ী চাষাবাদ করা হতো। যেখানে বৃষ্টিপাত কম সেখানে জল সেচের ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষি কাজ করতো। এটি আধুনিক কৃষিতে 'বৃষ্টির জল সংরক্ষণ', 'জল ব্যবস্থাপনা' এর ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে কৃষি পরিকল্পনা পরিবর্তিত হতো। যেমন বর্ষা, হেমন্ত ও গ্রীষ্মকাল ভেদে চাষাবাদের পরিকল্পনা করা হতো এবং অর্থনীতিবিদদের থেকে মতামত অনুসরণ করা হত। কিন্তু আধুনিক যুগে আবহাওয়া দপ্তরের আনুকূল্যে ফসল চাষের ব্যবস্থা অনেক সুবিধাজনক, তবুও প্রাচীনকালে গণনা ও ঋতুভিত্তিক প্রস্তুতি ছিল অনেক বেশি।

তবে এইসব বৈজ্ঞানিক ধারা গুলি সময়ের বিজ্ঞানের সাথে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কৌটিল্য মনে করতেন, বৃষ্টি হল কৃষির মূল ভিত্তি। এই বৃষ্টিপাতের উপর ভিত্তি করেই তিনি মৌসুমী চাষের কথা বলেছেন। এই ধারণা বর্তমানকালে মৌসুমী চাষাবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন তিনি বলেছেন- শ্রাবণ থেকে কার্তিক মাসের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টি ভালো হয় বলে ভালো পরিমাণে ফসল সম্ভব হয়। আবার মেঘ যদি একটানা সপ্তাহ ধরে ভারী বর্ষণ করে তাহলে চাষের পক্ষে খুবই কার্যকরী হয়। আবার বর্ষার মাঝে রৌদ্র উঠলে কৃষি কাজের হাসোলো ভালো হয় বলে কৌটিল্য মনে করেন। অতএব বলা যায় কৌটিল্যের বৃষ্টি নির্ভর চাষাবাদের পরিকল্পনা আজও প্রাসঙ্গিক ও স্থায়িত্ব কৃষিপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সেচব্যবস্থা ও জলকর:

একটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান সূচক হল কৃষিকাজ। আর এই কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য অর্থ অপরিহার্য। সেই জন্য প্রাচীন কালে কৃষি ব্যবস্থায় জলকর প্রদানের প্রথা ছিল। এই জলকর প্রদানের মাধ্যমে কৃষির সুস্থায়ী উন্নয়ন সম্ভব হয়েছিল। একটি রাষ্ট্রের রাজা যেহেতু ভূমি ও জল উভয়ের স্বামী, সেহেতু ভূমিকারের মত জলকর রাজাকে দিতে হতো। এ বিষয়ে শ্রীমূলা টীকায় বলা হয়েছে-

"রাজা ভূমেঃ পতি দৃষ্টঃ শাস্ত্রজ্ঞৈরুদকস্য চ।
তাভ্যামন্যত্তু যদ্ দ্রব্যং তত্র স্বাম্যং কুটুম্বিনাম্।।"[৪]

অর্থশাস্ত্রে জলকর ব্যবস্থা ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কৃষকরা নিজেদের দৈহিক পরিশ্রমে বা কলসের দ্বারা জল তুলে নিয়ে কৃষি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতেন, তাহলে উৎপন্ন শস্যের একের পাঁচ ভাগ জলকর দিতে হতো। এছাড়াও যেসমস্ত কৃষকরা খাল নালী কেটে শ্বেত-সুবিধা গ্রহণ করত তাদেরকেও নির্দিষ্ট হারে কর দিতে হতো। এই কর রাষ্ট্রের আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস ছিল। আধুনিক সময়ে সেচ ব্যবস্থা জন্য বিভিন্ন ধরনের জলকর প্রচলিত আছে। সরকার এই অর্থ নিয়ে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বাঁধনির্মাণ তথা কৃষিকাজের সুস্থায়ী উন্নয়নের জন্য কাজ করেন, যা প্রাচীন ব্যবস্থার আধুনিক রূপ।

জ্যোতির্বিজ্ঞান ও কৃষি পরিকল্পনা:

কৃষিকাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সঠিক সময় নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, অর্থশাস্ত্র-এ কৌটিল্য কৃষিতে বৃষ্টিপাতের গুরুত্ব বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন সময়ে বৃষ্টির তারতম্যের ফলে কৃষিকাজও ভিন্নভাবে প্রভাবিত হত। কৌটিল্যের মতে, সূর্য ও গ্রহের গতিবিধি এবং প্রাকৃতিক লক্ষণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস করা সম্ভব, যা কৃষি পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত সীতাধ্যক্ষ এই বৃষ্টিপাতের উপর ভিত্তি করে মৃত্তিকা নির্বাচন করতেন এবং উপযুক্ত সময়ে বীজ বপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। এর ফলে ভালো ফলন নিশ্চিত করা যেত এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেত। এই কৃষি ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। একজন দক্ষ কৃষি প্রশাসকের জন্য শুধুমাত্র জমি নির্বাচনই নয়, বরং ঋতুচক্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কেও জ্ঞান থাকা প্রয়োজন ছিল, যাতে তিনি যথাযথ সময়ে কৃষিকাজ পরিচালনা করতে পারেন।

বর্তমান যুগেও এই ধারণার প্রাসঙ্গিকতা লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক কৃষিবিজ্ঞানে আবহাওয়া পূর্বাভাস, বৃষ্টিপাতের পরিমাপ এবং ঋতুভিত্তিক ফসল পরিকল্পনার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রাচীনকালে যেমন সূর্য ও গ্রহের অবস্থান দেখে কৃষিকাজের সময় নির্ধারণ করা হত, আজও উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে একই কাজ আরও নির্ভুলভাবে করা হয়।

তৎকালীন সময়ে বিভিন্ন শস্য, শাকসবজি, ফলমূল ও অন্যান্য উদ্ভিদের চাষ জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ধারণার সাথে সামঞ্জস্য রেখে করা হত। যদিও আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই সব ধারণার কিছু অংশ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়, তবুও এগুলি মানুষের দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার ফল। এই প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে, প্রাচীন ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থার সাথে জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটি গভীর সম্পর্ক ছিল, যা কৃষির সুষ্ঠু বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

ভূমি বিভাজন ও ফসল নির্বাচন:

কৃষি কাজের জন্য শুধুমাত্র জলসেচ এবং বৃষ্টিপাত অপরিহার্যতা নয়, উপযুক্ত ভূমি ও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কৌটিল্য মনে করেন সব ধরনের জমি সব চাষের ক্ষেত্রে উপযুক্ত নয়। তার জন্য ফসল অনুযায়ী ভিন্ন জমি

নির্বাচন করতে হয়। অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে- শসা কুমড়ো জাতীয় চাষ নদী বা সরোবরের তীরে, পিপ্পলী আঙ্গুর ও আখের মত ফসলের উপযোগী নদীর অববাহিকায়, শাক ও মূলের জন্য কূপপার্শ্বস্থ জমে ছিল উপযুক্ত স্থান।

এছাড়াও সবজি চাষ ভালো হতো তড়াগের ধারে। সুগন্ধি উদ্ভিদ ও ঔষধি গাছের জন্য আলাদা জমির ব্যবস্থাও ছিল। এর থেকে বোঝা যায় সেই সময় বহুমুখী চাষ পদ্ধতি খুব জনপ্রিয় ছিল। কৌটিল্য এই বহুমুখী চাষের কথার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন প্রকার জমির প্রকৃতি বিবেচনা করে উপযুক্ত ফসল চাষের দিকনির্দেশ করেছেন। আধুনিক কালে কৃষিবিজ্ঞানে ভূমির প্রকৃতি অনুযায়ী ভূমি বিভাজন ও ফসল নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে, যা বর্তমানে 'Land Classification ', 'Soil Management' নামে পরিচিত লাভ করেছে। আধুনিক কৃষি বিজ্ঞানীরা ও কৃষকরা মাটির গঠন ও প্রকৃতি বিবেচনা করে ফসল নির্বাচন করেন, যা কৌটিল্যের চিন্তাধারার এক আধুনিক প্রতিফলন।

বীজসংস্কার ও জৈবসার প্রয়োগ:

কৃষিকাজে দ্বারা উৎপন্ন উন্নতমানের ফসল অনেকাংশে নির্ভর করে উন্নতমানের বীজ প্রস্তুত ও সঠিক জৈব সার প্রয়োগের মাধ্যমে। কৃষি কাজের অন্যান্য ধাপের মতো বীজ সংস্করণ ও বপনের উপযোগী করে তোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কৌটিল্য এই বিষয়ের উপর অনেক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তার মতে, বীজ নির্বাচন ও সংস্কার অপরিহার্য। সীতাধ্যক্ষের দায়িত্ব হল বিচ বপন করার আগে সেটিকে নির্বাচন করা, তারপর বীজকে সংরক্ষণ করা, সংরক্ষিত বীজকে পোকামাকড়ের হাত থেকে রক্ষা করে সঠিকভাবে বপন করা।

অর্থশাস্ত্রে কৌটিল্য বলেছেন, বপনের আগে ধান্যবীজকে সাত দিন রাত রোদ ও শিশিরে রাখতে হবে, যাতে ভালো অঙ্কুরোদগম হয়। অনুরূপভাবে মুগ মাষের বীজকে তিন থেকে পাঁচ দিন রাখতে হবে। অতএব কৌটিল্য মনে করেন ভালো অঙ্কুরোদগম উন্নত কৃষি ব্যবস্থার জন্য অপরিহার্য। আবার এমন কিছু উদ্ভিদ আছে যেমন আমের বীজ লাগানোর পর গর্তে খরকুটো জ্বালাতে হয় এবং ফুল ধারণ করলে গোবর সার দিতে হয়। এর থেকে বোঝা যায় এই ধরনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যা বীজের ফলন বৃদ্ধি করতে অপরিহার্য। এছাড়াও দেখা যায় কার্পাস বীজের স্যারের সাথে সাপের চামড়া পুড়িয়ে ধোঁয়া দিলে কৃষি ক্ষেত্রে সাপের অত্যাচার বন্ধ হয়। এটাও একটি কৌটিল্যের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়। কৌটিল্য এটাও বলেছেন যে,সব ধরনের বীজ বোনার জন্য জলে সোনা ডুবিয়ে তাতে ভিজিয়ে বোনা উচিত।

পরিশেষে আরো বলা হয় যায়, প্রাচীন থেকে বর্তমান কৃষিকাজ একটি পবিত্র ও শুভ কার্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কৌটিল্যে অর্থশাস্ত্রে দেখা যায়, বীজ বপনের পূর্বে নির্দিষ্ট একটি শুভ দিন নির্বাচন করা হতো এবং নির্দিষ্ট আচার অনুষ্ঠান পালনের রীতিনীতি ও প্রচলিত ছিল। সেখানে একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে-

"প্রজাপতয়ে কাশ্যপায় দেবায় চ নমঃ সদা।
সীতা মে ঋধ্যতাং দেবী বীজেষু চ ধনেষু চ।।"[৫]

অর্থাৎ 'প্রজাপতি, কাশ্যপ (সূর্য পুত্র) ও পর্জন্যদেব কে সর্বদা নমস্কার জানাই।'

এইসব দিক থেকে বলা যায়, আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা এই ধারণা গুলি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বীজ বপন, সংরক্ষণ ও রক্ষা করা এইসব রীতিনীতি প্রাচীন পদ্ধতির উন্নত রূপ বলা যায় এছাড়া জৈব সারের প্রয়োগ বর্তমানকালে অনেকাংশেই বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে জৈব কৃষি বিশেষভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে। অতএব বলা যায় কৌটিল্যের বীজ ও জৈব সারের প্রয়োগের ধারণা আধুনিক কৃষিবিজ্ঞানের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত।

কৃষি ব্যবস্থায় শ্রমিক কল্যাণ ও বেতননীতি:

কথায় আছে শ্রমিক খুশি থাকলে উৎপাদন ভালো হয়- এই নীতি কে সুপরিকল্পিতভাবে রূপ দিয়েছেন প্রায় কয়েক হাজার বছর আগে মহামতি কৌটিল্য। বর্তমান যুগে আমরা যে ন্যূনতম মজুরির কথা বলি, তা কৌটিল্য অনেক আগেই প্রবর্তন করেছিলেন। যাদের শ্রম ছাড়া উৎপাদন সম্ভব নয় সেই শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য তিনি বেতন কাঠামো চালু করেছিলেন। কৌটিল্যে অর্থশাস্ত্রে দেখা যায় সীতাধ্যক্ষ রাখাল, ক্রীতদাস ও অন্যান্য কর্মচারীদের ভোজনসহ প্রতিমাসে ১.২৫ পন করে বেতনের ব্যবস্থা করেছিলেন। বলাবাহুল্য তিনি দক্ষতা ভিত্তিক বেতনের পক্ষপাতী ছিলেন, তা বর্তমান কর্পোরেট যুগে 'পারফরম্যান্স বেসড ইনসেনটিভ' ব্যবস্থার আদি রূপ। এছাড়াও শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ ও তপস্বীদের দেব কার্যের জন্য পতিত ফল ও মূল সংগ্রহের অনুমতি দিয়েছিলেন, যা সামাজিক ন্যায়বোধের অনন্য উদাহরণ। এছাড়াও কৌটিল্য ইচ্ছামতো গাছ থেকে ফুল ও ফল তোলার পক্ষপাতী ছিলেন না, যেটা তার পরিবেশ সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি চেয়েছিলেন সমাজের দরিদ্র মানুষেরা অনাহারে জীবনযাপন না থাকেন, সেই জন্য তিনি জমিতে পড়ে থাকা অবাঞ্ছিত ধান ও যব সংগ্রহ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। এটি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে মানবিক মূল্যবোধের দৃষ্টান্ত। একটি রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য হল, শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি প্রদান করা ও খাদ্য ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা। যেটি কৌটিল্য হাজার হাজার বছর আগে ভেবেছিলেন। অতএব বলতেই পারি, আধুনিক সমাজে শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা ও মানববোধ জাগ্রত করতে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এখন ও প্রাসঙ্গিক।

কৃষি: রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান সূচক:

প্রাচীন ভারতের কূটনীতিবিদ ও ও অর্থনীতিবিদ কৌটিল্য তার বিখ্যাত অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে কৃষিকে একটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মেরুদন্ড বলেছেন। তবে কৃষিকে প্রাধান্য দেওয়ার ধারাটি আরো প্রাচীন। ঋকবেদের অক্ষসূক্তে বলা হয়েছে– "অক্ষৈর্মা দীব্যঃ কৃষিমিৎ কৃষস্ব।"[৬] অর্থাৎ জুয়া খেলো না, কৃষি কর্ম করো- এই অমোঘ বাণীটি অতীতে ভারতীয় অর্থনৈতিক চিন্তাধারায় উৎপাদনশীলতার বীজ বপন করেছিল। কৌটিল্য এই বৈদিক উক্তিকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় রূপ দেন এবং মনে করেন একটি রাষ্ট্র শক্তিশালী ও সমৃদ্ধশালী হওয়ার পেছনে একটি অন্যতম মাধ্যম কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন। বর্তমান যুগেও একটি রাষ্ট্রের পক্ষে বিশেষত ভারতবর্ষের মতো উন্নয়নশীল দেশের পক্ষেও কৌটিল্যের এই চিন্তা ধারা সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

অর্থশাস্ত্রে কৌটিল্য কৃষিকে এক উৎপাদনশীল কার্যকলাপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি মনে করেন কৃষির মাধ্যমে শুধুমাত্র খাদ্য সমস্যা নয়, একটি রাষ্ট্রের রাজস্ব বৃদ্ধি পায়। এছাড়া বিভিন্ন ঋতুভিত্তিক বিভিন্ন ফসল চাষের মাধ্যমে সারা বছর উৎপাদন ক্রমবর্ধমান। ফলস্বরূপ কৃষকদের স্থায়ী অর্থ উপার্জন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি হয়।

এছাড়াও কৃষি একটি রাষ্ট্রের জিডিপি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। কারণ কৃষিকাজ এর ফলে উদ্বৃত্ত পণ্য বাজারজাত করে পরোক্ষে মুনাফা অর্জন হয়। একটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো বৃদ্ধি সম্পর্কে কৌটিল্য সদা সচেতন ছিলেন সে বিষয়ে আমরা তার রচনাতে প্রমাণ পাই। বর্তমানে যে সব গ্রামীন কাঠামো উন্নয়নের কথা বলা হয়, কৌটিল্য কয়েক হাজার বছর আগে তা অনুধাবন করেছিলেন। তিনি পতিত জমিকে চাষযোগ্য করতে এবং উন্নত সেচ ব্যবস্থার দ্বিতীয় দৃষ্টিপাত করেন। যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে। ফলস্বরূপ এটা বলা যায় যে, কৃষি শুধু জীবিকা নয়, বরং রাষ্ট্রের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান সূচক বলা যায়।

উপসংহার:

প্রাচীন ভারতীয় কৃষিচিন্তায় রাষ্ট্রচিন্তক কৌটিল্যের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন। কৌটিল্য কৃষিকে একটি উৎপাদনশীল অর্থনৈতিক কার্যকলাপ হিসেবে চিহ্নিত করেছে তা নয়, বরং সুসংগঠিত প্রাকৃতিক নির্ভর ব্যবস্থা হিসেবে উপস্থাপন করেছে। তিনি তাঁর সুচিন্তিত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা জল, মৃত্তিকা, সার, কৃষকশ্রেণী ও জীব বৈচিত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক গভীরভাবে উপলব্ধি করে সুস্থায়ী কৃষি উন্নয়নের ওপর জোর দিয়েছেন।

কৌটিল্যের মতে সুস্থায়ী কৃষি উন্নয়ন সঠিক প্রাকৃতিক উপাদানের ব্যবহারের মাধ্যমেই সম্ভবপর হয়। তাই তিনি উন্নত জলসেচ ব্যবস্থা, বৃষ্টিপাতের তারতম্যের ভিত্তিতে মৌসুমী ফল চাষ, সঠিক জৈবসার ব্যবহার ও বীজ সংরক্ষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে স্থায়ী কৃষি উন্নয়নে প্রয়োগ করেছেন। আধুনিকযুগে যেখানে কীটনাশক সারের প্রয়োগ, ভূগর্ভস্থ জলের অপচয়, একফসলি কৃষি যা পরিবেশকে ভারসাম্য নষ্ট করছে, সেখানে কৌটিল্যের প্রাকৃতিক ও পরিবেশ বান্ধব কিসের ব্যবহার নতুন ভাবে কৃষিকাজে মুকুটের মতো বিরাজ করেছে। তাই একথা বলা যায়, কৌটিল্যের সময় ভারত ছিল স্বনির্ভর ও সমৃদ্ধ কৃষিভিত্তিক দেশ। তবে পরিশেষে কথা বলতে পারি যে, আধুনিক যুগে দাঁড়িয়ে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত কৃষি পরিকল্পনা একটি সুস্থায়ী কৃষি উন্নয়নের জীবন্ত দলিল স্বরূপ।

তথ্যসূত্র:

১. বন্দোপাধ্যায়, মানবেন্দু। কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্। প্রথম খণ্ড, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ২০১০, পৃষ্ঠা ৪১৫।

২.বন্দোপাধ্যায়, মানবেন্দু। মনুসংহিতা। সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ১৪২৭, পৃষ্ঠা ৮৮৭।

৩. শর্মা, উমা শঙ্কর (ঋষি)। ঋকসূক্তনিকরঃ। চৌখাম্বা পাবলিশার্স, বারানসী,২০১৯, পৃষ্ঠা ১৫৭।

৪. বন্দোপাধ্যায়, মানবেন্দু। কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্। প্রথম খণ্ড, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ২০১০, পৃষ্ঠা ৪২১।

৫. তদেব, পৃষ্ঠা ৪২৩।

৬. বন্দোপাধ্যায়, উদয়চন্দ্র। বেদ সংকলন। সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা,২০০৬, পৃষ্ঠা ২০৩।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. বন্দোপাধ্যায়, মানবেন্দু ।কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্। প্রথম খণ্ড (২০১০), কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার।

২. সিকদার, সুকুমার। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র (২০০৮), কলকাতা, অনুষ্টুপ।

৩. বসু, অনিল চন্দ্র। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (২০০৯), কলকাতা, সংস্কৃত বুক ডিপো।

৪. দত্ত, চৈতালি। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র (২০১৭), কলকাতা, ঋদ্ধি প্রকাশ।

৫. Kosambi. D.D, An Introduction to the study of Indian History (1956), Bombay, Popular Book Depot.

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 905-911
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.305

আধুনিক ভারত গঠনে স্বামী বিবেকানন্দের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি: একটি পর্যালোচনা

আব্দুল আলিম শেখ, *রাজ্য সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, দর্শন বিভাগ, ডোমকল কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 25.03.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Swami Vivekananda was not merely a spiritual leader; he was one of the foremost social revolutionaries of modern India. His life philosophy reflects a successful synthesis of the rationalism of the Brahmo Samaj, the syncretism of Sri Ramakrishna, and the liberal humanism of Buddhism. Transcending the boundaries of traditional spirituality, he established himself as a modern and scientifically-minded social reformer. Vivekananda's ideal of 'Man-making education' prioritized character building over the colonial system's clerk-producing education, and his perspectives on women's empowerment and the abolition of the caste system were remarkably revolutionary. Furthermore, his active inspiration behind industrialization and the expansion of advanced scientific research—most notably his influence on Jamsetji Tata's research projects and the promotion of indigenous technical industries—added a new dimension to India's progressive journey. By introducing the concept of 'serving living beings as Shiva' (*Shib-gyane Jiv-seba*), he integrated spirituality with *Karma Yoga*, regarding the service of the distressed as the ultimate religion. In today's individualistic and fragmented society, his eternal philosophy serves as an indispensable guide for fostering human unity and solidarity. This discourse provides a profound analysis of Vivekananda's multifaceted progressive thoughts and their practical applications in the context of the contemporary world, highlighting his call for women's self-reliance and his stinging critique of untouchability as a 'demonic trait.'

Keywords: Patriotism, Progressiveness, Caste system, Industrialization, Scientific temper, Education

বর্তমান বিশ্বের ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিচ্ছিন্নতা ও স্বার্থপরতার আবহে স্বামী বিবেকানন্দের শাশ্বত জীবনদর্শন এক অপরিহার্য দিকদর্শন হিসেবে প্রতিভাত হয়। ব্রাহ্মসমাজের যুক্তিমনস্কতা, শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক সান্নিধ্য এবং বৌদ্ধধর্মের উদার মানবিকতার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা তাঁর এই কালজয়ী ব্যক্তিত্ব ১৮৯৩ সালের শিকাগো বিশ্বমঞ্চে ভারতীয় ঐতিহ্যের এক অনন্য গৌরবময় অধ্যায় সূচনা করেছিল। মূলত, স্থবিরতায় আচ্ছন্ন এক জাতিকে প্রাচীনত্বের জড়তা থেকে মুক্ত করে আধুনিক প্রগতির পথে চালিত করার যে গুরুদায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছিলেন, তা-ই তাঁর প্রগতিশীল চিন্তা ও বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতার মূল ভিত্তি।

স্বামী বিবেকানন্দ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত বহুত্বের মধ্যেই নিহিত রয়েছে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের মূল সুর। তাঁর এই দর্শনের মূলে সম্ভবত শ্রীরামকৃষ্ণের সেই কালজয়ী বাণী— 'যত মত তত পথ' চিরকাল এক গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। উপনিষদ তাঁর সামনে সমন্বয় ও ঐক্যের যে সুগভীর জগত উন্মোচিত করেছিল, তা স্বামীজীর মানসপটে স্থায়ী রেখাপাত করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রায় সমসাময়িক বিবেকানন্দও মানবিক ঐক্যের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। কবির ভাষায় যা প্রতিফলিত হয়েছে— 'একের অনলে বহুর আহুতি দিয়া বিভেদ ভুলিয়া জাগিয়া উঠিল একই বিরাট হিয়া।'[i] তিনি উপনিষদের 'চরৈবেতি' (এগিয়ে চলো) মন্ত্রে পরম আস্থা জ্ঞাপন করতেন। স্বামীজীর মতে, সচল থাকাই জীবনের ধর্ম, আর স্থবিরতা বা নিশ্চলতা হলো মৃত্যুরই নামান্তর। তিনি বিশ্বাস করতেন, কেবল বাগাড়ম্বর নয়, বরং নিরন্তর কর্মতৎপরতার মাধ্যমেই একজন প্রকৃত মানুষকে চেনা সম্ভব।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষকে কেবল একটি ভৌগোলিক ভূখণ্ড নয়, বরং জীবন্ত মাতৃজ্ঞানে পূজা করতেন। এই পুণ্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করে তিনি অকৃত্রিম গর্ব অনুভব করতেন। তৎকালীন পরাধীন ভারতবর্ষের লাঞ্ছনা ও চরম দুর্দশা প্রত্যক্ষ করে তাঁর সংবেদনশীল হৃদয় গভীরভাবে ব্যথিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল। দেশের এই অবক্ষয়ের মূলে তিনি মূলত জনসাধারণের অশিক্ষা এবং জীবনবিমুখ কুশিক্ষাকেই প্রধানত দায়ী করেছিলেন। বিবেকানন্দের স্বপ্ন ছিল একটি অখণ্ড ভারত গঠন করা, যা গড়ে উঠবে বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ বিভেদহীন এক উদার ভাবনার আলোকে। তাঁর কাছে জাতীয়তাবোধ ছিল অত্যন্ত পবিত্র এক চেতনা; যেখানে ব্যষ্টির 'আমিত্ববোধ' যখন সমষ্টির 'আমরাবোধ'-এ উত্তীর্ণ হয়, তখনই প্রকৃত জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। জাতিগঠনের পথে তিনি জাতিভেদ প্রথাকে একটি অন্যতম প্রধান অন্তরায় বলে চিহ্নিত করেছিলেন এবং ধর্মীয় মেরুকরণের সংকীর্ণতাকে তীব্রভাবে নিন্দা জানাতেন। যদিও তিনি ভারতকে সনাতন ধর্মের চারণভূমি বলে মনে করতেন, তবে তিনি সর্বদাই সেই ধর্মের উদার ও সর্বজনীন রূপটিকেই দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছেন। সামাজিক জাগরণ ও রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠনের প্রধান সোপান হিসেবে স্বামীজী শিক্ষাকে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করেছিলেন। তাঁর দর্শনে শিক্ষা কেবল বাহ্যিক কোনো তথ্য আহরণ নয়, বরং মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তার জাগরণ। শিক্ষার কালজয়ী সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, "Education is the manifestation of the perfection already in man."[ii] তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, প্রকৃত শিক্ষাই পারে একজন মানুষকে পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্বে এবং পরিশেষে দেবত্বে উন্নীত করতে। স্বামীজীর এই শিক্ষাভাবনা ছিল তদানীন্তন কেরানি তৈরির ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তিনি কেবল ডিগ্রি অর্জন কিংবা পরীক্ষার বৈতরণী পার হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমের নির্বাচিত অংশ মুখস্থ করাকে প্রকৃত শিক্ষা বলে মানতেন না। বাল্যকাল থেকেই কেবল নম্বর অর্জনের এই যান্ত্রিক প্রতিযোগিতাকে তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে সমালোচনা করতেন। তাঁর ভাষায়, "মাথার মধ্যে একগাদা আজে-বাজে জিনিস ঠেসে রেখে কি ফল? আমি শুধু পাস করবার জন্য কলেজের পড়া পড়ি। ডিগ্রি দরকার, অন্ন জুটবে না।"[iii] বিবেকানন্দের লক্ষ্য ছিল এমন এক 'মানুষ গড়ার শিক্ষা' (Man-making education), যা ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস ও চরিত্র গঠনে সহায়তা করবে। এই ক্ষেত্রে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো তিনিও চেয়েছিলেন প্রাচ্যের মহান আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য ও পাশ্চাত্যের আধুনিক বিজ্ঞানমনস্কতার এক সার্থক মেলবন্ধন ঘটাতে। স্বামীজী মনে করতেন, জ্ঞান অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক দৃঢ়তা থাকা একান্ত আবশ্যক। তাই কেবল পুঁথিগত বিদ্যায় মগ্ন না থেকে বলিষ্ঠ চারিত্রিক গঠন ও শারীরিক সক্ষমতার ওপর জোর দিয়ে তিনি তরুণ সমাজকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, 'গীতা পাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলা শ্রেয়'। তাঁর এই প্রগতিশীল শিক্ষাভাবনা ছিল অত্যন্ত গণতান্ত্রিক ও জনমুখী। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, শিক্ষার আলো সমাজের প্রতিটি স্তরে, বিশেষ করে দরিদ্র ও অবহেলিত মানুষের

দোরগোড়ায় পৌঁছানো উচিত। এ প্রসঙ্গে তাঁর সেই বিশ্ববিখ্যাত উক্তিটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক: "... পর্বত মহম্মদের নিকট না যাওয়াতে মহম্মদই পর্বতের নিকট গিয়েছিলেন। সেইরূপ দরিদ্র সকল যদি শিক্ষালয়ে আসিতে না পারে, তবে তাহাদের নিকট শিক্ষক পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।"[iv] মূলত, আপামর জনসাধারণের মধ্যে আত্মমর্যাদা ও স্বনির্ভরতার বোধ জাগিয়ে তোলাই ছিল তাঁর বৈপ্লবিক শিক্ষা দর্শনের মূল ভিত্তি। শিক্ষার এই উদার ও সর্বজনীন প্রসারের সমান্তরালে স্বামীজী সমকালীন সমাজে নারীর শোচনীয় অবস্থা পরিবর্তনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীতে নারীসমাজের অবস্থান ছিল অত্যন্ত করুণ, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণের মানুষের তুলনায় অধিক লাঞ্ছিত। সে যুগে নারীরা শিক্ষার অধিকার থেকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত ছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার ভাষ্য অনুযায়ী, বিবেকানন্দ মনে করতেন তাঁর আদর্শ ও সঙ্ঘের অন্যতম প্রধান ব্রত হলো নারীজাতি ও অবহেলিত জনসাধারণের উন্নতি সাধন। তিনি বিশ্বাস করতেন, নারীকে শিক্ষার সুযোগ দিলে তারা নিজেরাই নিজেদের ভবিষ্যতের সমস্যাবলি মীমাংসা করতে সমর্থ হবে। বিবেকানন্দ নারীর মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রগতিশীল চিন্তার বিকাশ ঘটাতে চাইতেন; তবে এর পাশাপাশি তিনি স্বামী ও শ্বশুরগৃহের প্রতি নিষ্ঠা এবং ঐতিহ্যানুসারী গুণাবলিকেও আদর্শ পত্নীর বৈশিষ্ট্য হিসেবে মূল্যায়ন করতেন। তিনি বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে যেমন সচেতন ছিলেন, তেমনই পরিণত বয়সে বিবাহ এবং জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারীর স্বাধীনতার বিষয়টিও তাঁর লেখনীতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। বিবেকানন্দের এই সংস্কারধর্মী ভাবনা কেবল নারী শিক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তিনি হিন্দুধর্মকে এক সংকীর্ণতামুক্ত বিশ্বজনীন রূপ দিতে চেয়েছিলেন। তিনি তথাকথিত 'ছুৎমার্গ' ও আচারসর্বস্ব হিন্দুয়ানি পরিহার করে ধর্মের এক উদার ও মানবিক রূপের জয়গান গেয়েছেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা একটি পত্রে তাঁর এই আপসহীন মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। দক্ষিণেশ্বরের উৎসবে তথাকথিত অস্পৃশ্য বা বারবনিতাদের অংশগ্রহণে সমাজের তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষেরা আপত্তি তুললে তিনি বজ্রকণ্ঠে বলেছিলেন, "বেশ্যারা যদি দক্ষিণেশ্বরের মহাতীর্থে যাইতে না পায় তো কোথায় যাইবে? পাপীদের জন্য প্রভুর বিশেষ প্রকাশ, পুণ্যবানের জন্য তত নহে।"[v] তিনি তীর্থস্থান ও উপাসনা ক্ষেত্রকে জাতিভেদ, লিঙ্গভেদ ও ধনভেদের ঊর্ধ্বে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। ধর্মপ্রাণতার নামে যারা সাধারণ মানুষ বা দরিদ্রদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করে, তাদের মানসিকতাকে তিনি 'রাক্ষসীভাব' বলে অভিহিত করেছেন এবং প্রগতিবাদী কণ্ঠে জানিয়েছেন যে, সমাজের এই ছদ্মবেশী 'ভদ্রলোক'দের সংখ্যা হ্রাস পাওয়াই মঙ্গলকর। প্রকৃতপক্ষে, তিনি ছিলেন এক মহান মানবতাবাদী ব্যক্তিত্ব, যাঁর কাছে ধর্মের চেয়ে মানুষের মর্যাদাই ছিল মুখ্য।

ব্যক্তির মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য স্বামীজী শারীরিক সক্ষমতাকে অপরিহার্য মনে করতেন, আর এখানেই উঠে আসে তাঁর খাদ্যাভ্যাস সংক্রান্ত বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি। ভারতীয় উপমহাদেশে ধর্মের সঙ্গে খাদ্যাভ্যাসের যে নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে, তা তিনি অস্বীকার করেননি; তবে ধর্মের কঠোর অনুশাসনের পরিবর্তে তিনি শরীর ও মনের প্রয়োজনকে অধিক অগ্রাধিকার দিয়েছেন। জাতির দুর্বলতা দূর করতে তিনি আমিষ খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। তাঁর শিষ্যকে দেওয়া নির্দেশে পাওয়া যায়, "(মাছমাংস) খুব খাবি বাবা। তাতে যা পাপ হবে তা আমার।"[vi] বিবেকানন্দ লক্ষ্য করেছিলেন যে, আমিষভোজী অন্যান্য জাতিসমূহ স্বাস্থ্যের দিক থেকে অনেক বেশি বলিষ্ঠ, যা তাদের জীবনসংগ্রামে সফল হতে সাহায্য করে; বিপরীতে দুর্বল শরীর নিয়ে কোনো বড় কাজ সম্পাদন করা অসম্ভব। বৌদ্ধ বা বৈষ্ণব ধর্মের 'অহিংসা' তত্ত্বে তাঁর অশ্রদ্ধা ছিল না, কিন্তু এই নীতিকে কারোর ওপর বলপূর্বক চাপিয়ে দেওয়ার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি শ্রুতি ও মনুস্মৃতির উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, বৈদিক যুগেও আমিষ আহারের প্রচলন ছিল। উদাহরণস্বরূপ তিনি দেখিয়েছেন, মাছ-মাংস ও পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাসের কারণে পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় পূর্ববঙ্গের মানুষ অধিক সুস্বাস্থ্যের অধিকারী।

এইভাবে তিনি ধর্ম ও সমাজসংস্কারের প্রতিটি স্তরেই এক বিজ্ঞাননিষ্ঠ ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন।

শারীরিক ও মানসিক দৃঢ়তার এই আবশ্যিকতাকে স্বামীজী আরও বৃহৎ পরিসরে প্রসারিত করেছিলেন জাতির বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ভাবনায়। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, কোনো জাতির প্রাণশক্তির বিকাশ মূলত নির্ভর করে সেই জাতির বিজ্ঞানমনস্কতার ওপর। তিনি বাঙালি জাতিকে একটি আধুনিক ও বিজ্ঞাননিষ্ঠ জাতি হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন। সমকালীন বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় ভারতের পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ হিসেবে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন অন্যান্য জাতিসমূহ কীভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করে ভারতীয় বাজার দখল করে নিয়েছে, যার ফলে দেশীয় শিল্প ধ্বংসের মুখে পতিত হয়েছিল। এই সংকট থেকে উত্তরণের পথ নির্দেশ করে তিনি বজ্রকণ্ঠে বলেছিলেন— "প্রতিযোগিতা-রূপ ভয়ঙ্কর মন্ত্রই সবকিছু করিয়া ফেলিবে। যদি বাঁচিয়া থাকিতে চাও তো নিজেকে যুগোপযোগী করিয়া তুলিবার চেষ্টা কর। আমরা যদি আদৌ বাঁচিয়া থাকিতে চাই, তাহা হইলে আমাদিগকে বিজ্ঞাননিষ্ঠ জাতিতে পরিণত হতে হইবে।"[vii] বিজ্ঞানের এই প্রায়োগিক প্রসারে স্বামীজীর দূরদর্শী ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। ১৮৯৮ সালে জামসেদজী টাটা যখন উচ্চমানের বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার সপক্ষে ত্রিশ লক্ষ টাকা দান করেছিলেন, তার নেপথ্যে বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণা ও সক্রিয় অবদান ছিল, যার প্রমাণ পাওয়া যায় স্বয়ং টাটার লেখা পত্রে। স্বামীজী এই মহতী উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করে একে 'সময়োচিত ও সুদূরপ্রসারী' বলে বর্ণনা করেছিলেন এবং সমগ্র জাতিকে ক্ষুদ্র স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে এই পরিকল্পনা সফল করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। বিজ্ঞানের এই আধুনিক ভাবনার সঙ্গেই যুক্ত ছিল তাঁর শিল্পায়নের স্বপ্ন। তিনি ভারতে এক মহান শিল্পবিপ্লব চেয়েছিলেন এবং শিল্প যে আধুনিক যুগের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি, সে বিষয়ে তাঁর কোনো সংশয় ছিল না। তিনি গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেন যে তৎকালীন ভারতে শিল্পের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়; তাঁর ভাষায়— "ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ এখনও পায়ের উপর দাঁড়ায়নি। বিশেষ দুর্দশা হয়েছে শিল্পের।"[viii] তবে এই শিল্পায়ন তিনি চেয়েছিলেন দেশীয় সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে। কারিগরি জ্ঞান ও বিজ্ঞানের শিক্ষা বিদেশ থেকে গ্রহণ করলেও নিজের শাশ্বত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বিসর্জন দেওয়ার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। তাই তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন— "...নূতন শিখতে হবে, করতে হবে, কিন্তু তা বলে কি পুরানোগুলো জলে ভাসিয়ে দিয়ে নাকি?"[ix]

বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেছিলেন যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানই হবে ভারতের সার্বিক কল্যাণের চাবিকাঠি। তিনি জাপান ও আমেরিকার শিল্পোন্নয়ন থেকে শিক্ষা নেওয়ার জন্য দেশবাসীকে বারবার তাগিদ দিয়েছেন। তিনি শিল্পপতিদের দেশীয় শিল্পস্থাপনে উৎসাহ দিতেন এবং জামসেদজী টাটাকে বিদেশী পণ্যের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে স্বদেশে দেশলাই কারখানা স্থাপনের পরামর্শ দিয়েছিলেন। কারিগরি শিক্ষা ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারের পাশাপাশি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতের উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা তাঁর চেতনায় সদা জাগ্রত ছিল। তিনি জানতেন যে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও জনশক্তি এদেশেই বিদ্যমান, যা বাণিজ্যিকভাবে দেশটিকে বিশ্বদরবারে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসাতে পারে, যেমনটি জাপান করে দেখিয়েছিল। ভারতের উজ্জ্বল বাণিজ্যিক ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি গর্বভরে বলেছিলেন— "মানবজাতির বর্তমান অবস্থার জন্য যতগুলি কারণ প্রাচীনকাল থেকে কাজ করেছে, তার মধ্যে বোধ হয় ভারতের বাণিজ্য সর্বপ্রধান। অনাদিকাল হতে, উর্বরতায় আর বাণিজ্য শিল্পে ভারতের মতো দেশ কি আর আছে?"[x]

বৈষয়িক ও সামাজিক উন্নতির লক্ষ্যকে সফল করতে স্বামীজী ভারতবর্ষের পুণ্যভূমিতে এক অভিনব 'সেবাধর্মের' প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি জীবের প্রতি সাধারণ দয়া বা করুণা প্রদর্শনের পরিবর্তে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' করার আদর্শকে প্রাধান্য দিতেন, যা তাঁর এই দর্শনকে অন্যান্য প্রথাগত ধর্মমতের চেয়ে পৃথক এক অনন্য

উচ্চতায় আসীন করেছে। এই সেবার অভিনব দার্শনিক ভিত্তিটি নিহিত ছিল পরমগুরু শ্রীরামকৃষ্ণের সেই অমোঘ উপলব্ধির মধ্যে; যেখানে তিনি সাধারণ 'জীবে দয়া'র ধারণাটি প্রত্যাখ্যান করে আর্তের মধ্যে শিবের অস্তিত্ব অনুভব করতে এবং তাঁদের সেবা করতে বলেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের এই ব্যাখ্যা বিবেকানন্দের মনে এক 'অদ্ভুত আলোক' সঞ্চার করেছিল, যা তাঁর সমগ্র জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপন্থাকে আমূল পরিবর্তিত করে দেয়। সেবাধর্মের এই মহান ধারণাকে বাস্তবে রূপদান করতে বিবেকানন্দ 'কর্মযোগ' বা সক্রিয়তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। জগতের যন্ত্রণাকাতর অবস্থায় মানুষের নিষ্ক্রিয়তাকে তিনি ধিক্কার জানাতেন। তাই তাঁর উদাত্ত আহ্বান ছিল— "হে মহাপ্রাণ, ওঠো, জাগো, জগৎ যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতেছে, তোমার কি নিদ্রা সাজে?... কাজ শুরু করিলে কার্যপ্রণালী আপনি গড়িয়া ওঠে। আমি শুধু বলি জাগো জাগো।"[xi] বিবেকানন্দের কাছে কর্মবিমুখতা ছিল মৃত্যুরই নামান্তর; তাই তিনি মানুষের অন্তর্নিহিত ব্রহ্মশক্তিকে জাগ্রত করে বিশ্বমানবের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করার কথা বলতেন। আচার্য শঙ্করাচার্যের মায়া-দর্শনের বিপরীতে দাঁড়িয়ে তিনি এই জগতকে একতরফাভাবে 'মিথ্যা' বলে এড়িয়ে যাননি, বরং জগতের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করে এর প্রায়োগিক দিকের ওপর সমধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, ক্ষুদ্র সংসারী কীটের মতো তুচ্ছ জীবন অতিবাহিত করার চেয়ে সত্য প্রচারের কর্মক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া অনেক বেশি সার্থক ও গৌরবের।

যদিও স্বামীজী ছিলেন মূলত আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ, তবুও জাগতিক ও বৈষয়িক বিষয়ে তাঁর প্রগতিশীল চিন্তা আজও আমাদের বিস্মিত ও অনুপ্রাণিত করে। তিনি সমাজে সর্বদা 'রজঃ গুণের' অধিকারী তেজস্বী মানুষের সন্ধান করতেন, যাঁদের সক্রিয়তা ও সুশৃঙ্খল কর্মতৎপরতার মাধ্যমে বিশ্বের চেহারাই বদলে দেওয়া সম্ভব। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, সত্য, ধর্ম ও পবিত্রতা অবিনশ্বর; তাই শত প্রতিকূলতা বা দীর্ঘ সময় আবর্জনার স্তূপে ঢাকা থাকলেও সত্যের জয় অনিবার্য। আদর্শ জাতি ও চরিত্র গঠনের জন্য তিনি 'রাশি রাশি বাজে চেলার' পরিবর্তে মুষ্টিমেয় কিছু 'খাঁটি মানুষের' ওপর আস্থা রাখতেন, যাঁরা ত্যাগের মহিমায় দেশ ও দশের সেবা করতে সক্ষম হবেন। স্বামীজীর অকুতোভয় প্রগতিশীল মানসিকতা কেবল আধ্যাত্মিক বা সামাজিক সংস্কারেই সীমাবদ্ধ ছিল না; তৎকালীন জটিল রাজনৈতিক ও ধর্মীয় টানাপোড়েনের আবহে ধর্মের নামে প্রচলিত বিভিন্ন সংকীর্ণ অনাচারের বিরুদ্ধেও তিনি ছিলেন বজ্রকঠিন। তিনি সম্যক অবগত ছিলেন যে, যুগসঞ্চিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো কতটা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে, তবুও তিনি সত্য প্রকাশে ছিলেন আপসহীন। গোরক্ষিণী সভার প্রতিনিধিদের সাথে তাঁর সংলাপটি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছিলেন যে, যে সংগঠন মানুষের প্রতি ন্যূনতম সহানুভূতি প্রদর্শন করে না এবং যেখানে নিজের ভাই অনশনে মৃত্যুবরণ করলেও তাকে একমুষ্টি অন্ন না দিয়ে পশুপক্ষী রক্ষার নামে রাশি রাশি সম্পদ ব্যয় করা হয়, সেই সভার প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই। ধর্মের দোহাই দিয়ে বা কর্মফলের অজুহাতে মানুষের দুর্দশাকে অবজ্ঞা করার যে মানসিকতা তৎকালীন সমাজে বিদ্যমান ছিল, স্বামীজী তাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিলেন। তিনি মনে করতেন, কর্মফলের দোহাই দিয়ে যদি মানুষের সেবা থেকে বিরত থাকতে হয়, তবে জগতে কোনো শুভ প্রচেষ্টাই সার্থক হবে না। এমনকি গোরক্ষক বাহিনীর গোঁড়ামিকে বিদ্ধ করতে তিনি যে তির্যক রসিকতা করেছিলেন, তা তাঁর অসীম সাহসিকতারই পরিচয় দেয়; যখন তিনি সহাস্যে বলেছিলেন যে, গরু সত্যিই 'মা' বলেই হয়তো এমন সব অদ্ভুত 'কৃতী সন্তান' প্রসব করেছেন। এই নির্ভীক সত্যভাষণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তাঁর স্বপ্নের ভারতবর্ষ গড়ার পথে তিনি কোনো প্রকার ধর্মীয় মেরুকরণ বা ভণ্ডামিকে প্রশ্রয় দিতে রাজি ছিলেন না।

সমাজ ও রাজনীতির বৈপ্লবিক রূপান্তরের পাশাপাশি সমসাময়িক ভারতীয় সমাজের বৃহত্তর প্রেক্ষিতে ভাষার গুরুত্বকেও স্বামীজী অত্যন্ত প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করেছিলেন। সাহিত্য ও দর্শনের অঙ্গনে তিনি ছিলেন

এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, যাঁর চিন্তা সমকালীন মননশীলতাকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল। সেই সময় বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি নিয়ে একটি তাত্ত্বিক বিতর্ক অত্যন্ত প্রবল ছিল—ভবিষ্যতে বাংলা ভাষা তার গাম্ভীর্যপূর্ণ 'সাধু' রূপেই সচল থাকবে, নাকি 'চলিত' রীতির লোকমুখী রূপটিকে গ্রহণ করবে। এই বিতর্কেও বিবেকানন্দ তাঁর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও যুক্তিগ্রাহ্য অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন এবং অত্যন্ত জোরালোভাবে চলিত রীতির পক্ষাবলম্বন করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত অন্যতম প্রধান মুখপত্র 'উদ্বোধন'-এর ভাষা হিসেবে তিনি সচেতনভাবেই চলিত বাংলাকে বেছে নিয়েছিলেন। পত্রিকাটি বাংলা ভাষায় প্রগতিশীল চিন্তা প্রকাশের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। স্বামীজী অনেক আগেই অনুধাবন করেছিলেন যে, সাধারণ মানুষের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে হলে এবং সাহিত্যকে প্রাণবন্ত রাখতে হলে চলিত ভাষাই হবে অনাগত ভবিষ্যতের একমাত্র কার্যকর পথ। ভাষার এই আধুনীকরণ তাঁর সামগ্রিক প্রগতিশীল ভাবনারই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল, যা উচ্চবিত্তের ড্রয়িংরুম থেকে জ্ঞানকে সাধারণ মানুষের আঙিনায় পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করেছিল।

স্বামীজীর প্রগতিশীল দর্শনের এই ধারায় আধ্যাত্মিকতা কেবল ব্যক্তিগত মোক্ষলাভের পথ নয়, বরং ত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বৃহত্তর সমাজের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করার এক মহান সোপান। তিনি মনে করতেন, নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করে সমষ্টির হিতে কাজ করাই হলো সকল ধর্মের সারশিক্ষা। তাঁর দর্শনে কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান—এই তিনটি পথই ছিল আত্মজ্ঞান লাভের অমোঘ উপায়, যা সমকালীন বাঙালি জাতির চারিত্রিক পরিচিতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। স্বামীজীর আধ্যাত্মিকতা ছিল আক্ষরিক অর্থেই উদার ও সর্বজনীন। তিনি প্রায়শই একটি প্রবাদ উদ্ধৃত করে সতর্ক করতেন যে, "কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মানো ভালো, কিন্তু উহার গণ্ডির মধ্যে মৃত্যু অতি ভয়ঙ্কর।"[xii] অর্থাৎ, তিনি চেয়েছিলেন মানুষের হৃদয় হবে প্রশস্ত এবং মস্তিষ্ক হবে যুক্তিনির্ভর ও উদারনীতিতে পূর্ণ। যে কোনো ধর্মের ইতিবাচক দিককে গ্রহণ করার সামর্থ্য অর্জন করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য এবং ব্যক্তিকে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ গোঁড়ামির শিকলে আবদ্ধ রাখা ছিল তাঁর কাছে তীব্র নিন্দনীয় এক দাসত্ব। এই সুগভীর আধ্যাত্মিক চেতনার সমান্তরালে বিবেকানন্দের মননে এক আধুনিক পরিবেশ সচেতনতাও প্রবহমান ছিল। আপাদমস্তক আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাস করতেন যে, রোগব্যাধির মূল উৎস হলো জীবাণু, যা মূলত নোংরা, পচা ও অপরিষ্কার স্থান থেকে জন্ম নেয়। পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব বোঝাতে তিনি তাত্ত্বিক আলোচনার চেয়ে প্রায়োগিক কাজে অধিক বিশ্বাসী ছিলেন এবং সেই কারণে কখনো কখনো নিজেই ঝাঁটা নিয়ে মঠ পরিষ্কারের কাজে নেমে পড়তেন। তাঁর এই কাজে কেউ বিস্ময় বা আপত্তি প্রকাশ করলে তিনি অত্যন্ত সহজভাবে বুঝিয়ে দিতেন যে, পরিবেশ অপরিচ্ছন্ন থাকলে মঠের সকলকেই অসুখ ও শারীরিক অসুস্থতার সম্মুখীন হতে হবে। আধ্যাত্মিক শুদ্ধির সঙ্গে পরিবেশগত এই বৈজ্ঞানিক সচেতনতার সমন্বয় স্বামীজীর প্রগতিশীল আধুনিক মননকেই অনন্য করে তোলে।

পরিশেষে বলা যায়, স্বামী বিবেকানন্দের প্রগতিশীল চিন্তাধারা কেবল ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের এক উজ্জ্বল ফসল ছিল না, বরং তা ছিল অনাগত আধুনিক ভারতবর্ষের এক অমোঘ দিকদর্শন। তিনি ধর্মকে মঠ ও মন্দিরের সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে মুক্ত করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে—বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য এবং সামাজিক সমতায় প্রয়োগ করেছিলেন। প্রাচ্যের সুগভীর আধ্যাত্মিকতা এবং পাশ্চাত্যের আধুনিক বিজ্ঞাননিষ্ঠার যে সার্থক সংশ্লেষ তিনি ঘটিয়েছিলেন, তা আজও বিশ্বমানবের মুক্তি ও অগ্রগতির প্রধান চাবিকাঠি। বিবেকানন্দের 'ব্যবহারিক বেদান্ত' আমাদের শিখিয়েছে যে, বনের বেদান্তকে ঘরে আনা এবং মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের সন্ধান করা। তাঁর 'মানুষ গড়ার শিক্ষা' এবং 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' কেবল দার্শনিক তত্ত্ব নয়, বরং একবিংশ শতাব্দীর নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় রোধে এক শক্তিশালী রক্ষাকবচ। বর্তমান বিশ্বায়িত পৃথিবীতে যখন জাতিগত

বিদ্বেষ এবং ধর্মীয় মেরুকরণ চরম আকার ধারণ করেছে, তখন বিবেকানন্দের সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ এবং অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি শান্তি ও সহাবস্থানের একমাত্র পথ। উপসংহারে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, বিবেকানন্দ ধর্মকে আধুনিকীকরণের মাধ্যমে যে প্রগতিশীল সমাজ কাঠামোর স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা বাস্তবায়িত করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে একটি সমৃদ্ধ, আত্মনির্ভরশীল ও মানবিক ভারতের প্রকৃত ভবিষ্যৎ। তাঁর জীবনদর্শন ও কর্মপন্থা আজও সমকালীন ভারতবর্ষের বৃহত্তর প্রেক্ষিতে ধ্রুবতারার ন্যায় প্রাসঙ্গিক এবং অবিনশ্বর।

তথ্যসূত্র:

[i] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩১৭)। গীতাঞ্জলি (কবিতা: 'ভারত-তীর্থ')। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

[ii] চক্রবর্তী, বরুণকুমার (২০১৫)। বিচিত্র ভাবনার গদ্য (বিবেকানন্দের শিক্ষা ভাবনা)। দে বুক স্টোর। (পৃ. ৬১)

[iii] বসু, শঙ্করীপ্রসাদ (২০১৪)। স্বামী বিবেকানন্দ নতুন তথ্য নতুন আলো। আনন্দ প্রকাশনী। (পৃ. ২)

[iv] চক্রবর্তী, বরুণকুমার (২০১৫)। বিচিত্র ভাবনার গদ্য (বিবেকানন্দের শিক্ষা ভাবনা)। দে বুক স্টোর। (পৃ. ৬৩)

[v] বসু, কাঞ্চন (সম্পা.)। বিবেকানন্দ সমগ্র (২য় খণ্ড)। রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন। (পৃ. ২৭৪)

[vi] চক্রবর্তী, শ্রীশরচ্চন্দ্র (১৯৬০)। স্বামি-শিস্য-সংবাদ। উদ্বোধন কার্যালয়। (পৃ. ১৬১)

[vii] স্বামী বিবেকানন্দ (২০০১)। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৬ষ্ঠ খণ্ড)। উদ্বোধন কার্যালয়। (পৃ. ১৩৮)

[viii] বসু, শঙ্করীপ্রসাদ (২০১৩)। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ (৫ম খণ্ড)। মণ্ডল বুক হাউস। (পৃ. ২৪০-২৪১)

[ix] বার্ক, মেরী লুইজ (২০০০)। পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দ (১ম ও ২য় খণ্ড)। উদ্বোধন কার্যালয়। (পৃ. ২১০)

[x] স্বামী বিবেকানন্দ (২০১২)। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৬ষ্ঠ খণ্ড)। উদ্বোধন কার্যালয়। (পৃ. ৮২)

[xi] বসু, শঙ্করীপ্রসাদ (২০১৪)। স্বামী বিবেকানন্দ নতুন তথ্য নতুন আলো। আনন্দ প্রকাশনী। (পৃ. ৩২৪)

[xii] চক্রবর্তী, শ্রীশরচ্চন্দ্র (১৯৬০)। স্বামি-শিস্য-সংবাদ। উদ্বোধন কার্যালয়। (পৃ. ২৩৬)

গ্রন্থপঞ্জি:

১. চক্রবর্তী, শ্রীশরচ্চন্দ্র। (১৯৬০)। স্বামি-শিস্য-সংবাদ। উদ্বোধন কার্যালয়।

২. নিবেদিতা, ভগিনী। (১৯৭৫)। স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি (স্বা. মাধবানন্দ, অনু.)। উদ্বোধন কার্যালয়।

৩. বসু, শঙ্করীপ্রসাদ। (২০১৩)। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ। মণ্ডল বুক হাউস।

৪. বসু, শঙ্করীপ্রসাদ। (২০১৪)। স্বামী বিবেকানন্দ নতুন তথ্য নতুন আলো। আনন্দ প্রকাশনী।

৫. বার্ক, এম. এল। (১৯৯২)। পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দ (১ম খণ্ড)। উদ্বোধন কার্যালয়।

৬. স্বামী, বিবেকানন্দ। (১৩৬৯)। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা। উদ্বোধন কার্যালয়।

৭. স্বামী, বিবেকানন্দ। (১৩৯৬)। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী সঞ্চয়ন। উদ্বোধন কার্যালয়।

৮. মিত্র, মধু। (২০১৫)। ভারত নির্মাণ ও স্বামী বিবেকানন্দ। আর্ট পাবলিশিং।

৯. হ্যামল্যান্ড, এরিক। (২০১১)। স্মৃতির আলোয় বিবেকানন্দ। উদ্বোধন কার্যালয়।

১০. শ্রী সারদা মঠ। (২০১৭)। নিবোধত, ৩১ (১), ৭৬।

১১. উদ্বোধন কার্যালয়। (২০১৯)। উদ্বোধন, ১২১ (৩), ০৯।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 912-922
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.306

বেগম রোকেয়া: নারীশিক্ষা, সমাজসংস্কার ও সংগ্রামের ইতিহাস

নওয়াজ শরিফ, *রাজ্য সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক-১, শ্রীকৃষ্ণ কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 22.03.2026; Accepted: 28.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This article discusses in detail Begum Rokeya Sakhawat Hossain's contribution to the spread of Muslim women's education and various aspects of her life of struggle. She realized that lack of education was the main cause of women's degradation, degradation and social backwardness. Therefore, she dedicated herself to the movement to spread women's education with the aim of awakening self-awareness, self-esteem and sense of rights in the female community. The 'Sakhawat Memorial Girls' School' he founded emerged as an important educational institution for Muslim girls in Kolkata, which included subjects such as Bengali, English, Urdu, home management, and health care, in addition to religious education.

The article also highlights that Begum Rokeya had to struggle against various social obstacles, prejudices, conservative mindsets, and religious bigotry in the path of expanding women's education. Although some sections of society viewed his initiative negatively, he moved forward with determination and courage. Despite the school's financial crisis, lack of qualified teachers, and social obstacles, she sustained the institution through his personal finances and tireless work and gradually took it forward on the path of progress. Special importance has also been given to her philosophy of education, where she did not only want to produce women with degrees,

Therefore, it can be said that Begum Rokeya's relentless efforts, sacrifice and foresight opened a new horizon in the expansion of women's education in the Muslim society of Bengal. Her contribution is established as a unique and memorable chapter in the history of women's awakening.

Keywords: Women's education, women's awakening, social reform, veiling, social change

দূরদৃষ্টিসম্পূর্ণ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন অচিরে উপলব্ধি করেছিলেন যে, শিক্ষার অভাব নারীজাতির অবনতি ও অধঃপতনের মূল কারণ। তিনি অনুধাবন করেন শিক্ষাই নারী মনের সচেতনতা ও আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত ঘটাবে। ফলে নারী জাতি সমাজে নিজ অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হবে এবং নারী তার কর্তব্যকর্মে এগিয়ে যাবে। তাই মুসলিম নারী জাতির অগ্রগতির জন্য শিক্ষা বিস্তার করার আন্দোলনে ব্রতী হয়ে উঠেন। নারী শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল'। এটিকে ধরা হয় কলকাতার বুকে প্রথম মুসলিম বালিকা বিদ্যালয়। যেখানে উর্দু শিক্ষার পাশাপাশি অন্যান্য (ইংরেজি, বাংলা) ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হতো।[১] বেগম রোকেয়ার মতে,

> "শিক্ষার' অর্থ কোনো সম্প্রদায় বা জাতি বিশেষের 'অন্ধ অনুকরণ' নহে। ঈশ্বর যে স্বাভাবিক জ্ঞান ও ক্ষমতা দিয়েছেন সেই ক্ষমতাকে অনুশীলনের মাধ্যমে বৃদ্ধি করায় শিক্ষা। ঐ গুনের সৎ ব্যবহার করা কর্তব্য এবং অপব্যবহার দোষ।"[২]

শিক্ষা প্রসঙ্গে আরও মন্তব্য করেন- ঈশ্বর আমাদের হস্ত, পদ, মন, শিক্ষাচিন্তা দিয়েছেন। যদি আমরা অনুশীলনের দ্বারা হস্তপদ সবল করি এবং হস্তের মাধ্যমে সৎ কাজ করি, চক্ষুর দ্বারা মনযোগ সহকারে দর্শন করি, কর্ণের দ্বারা মনযোগ পূর্বক শ্রবন করি এবং চিন্তা শক্তির দ্বারা আরো সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করতে শিখি তাহাই প্রকৃতি শিক্ষা।[৩]

মুসলিম নারীদের এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন যাতে তারা উচ্চ আদর্শের সুকন্যা, সুগৃহিনী, সুমাতা হতে পারে। এই প্রসঙ্গে বেগম রোকেয়ার মন্তব্য নিম্নরূপ-

> "Our girls should not only obtain university degrees, but must be ideal daughter, wife and mother or one may say obtain daughters loving sister dutiful wife and instructive."[৪]

এই আদর্শকে কার্যকারী করার জন্য বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের শিক্ষা পদ্ধতিও সেই রকম করেন। স্কুলে কোরান পাঠ থেকে শুরু করে ইংরেজি, পার্সি, উর্দু, হোম নার্সিং, ফাস্ট এড, রন্ধন, সেলাই ইত্যাদি বিষয়ে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হতো।[৫] বেগম রোকেয়ার প্রতিষ্ঠিত স্কুল সম্বন্ধে 'The Mussalman' পত্রিকায় বলা হয়েছে-

> "Aim of the school preparation for future citizenship & Motherhood through an all-round physical, mental & normal training."[৬]

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ভারতীয় উপমহাদেশে মহিলাদের কোনো স্কুল স্থাপিত হয়নি। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় শতকে 'ফিমেল জুভিনাইল সোসাইটি'তে ১৮১৯ সালে একটি স্কুল স্থাপিত হয়। ধীরে ধীরে বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে স্ত্রীশিক্ষা, পুস্তক প্রকাশ, স্কুল খুলতে আরম্ভ করে।[৭] কিন্তু বিশেষ করে হিন্দু সমাজের উচ্চ বর্ণের নারীদের জন্য। কিন্তু অতি দুঃখজনক ব্যাপার এবং এই কথাটা সত্য যে তা হল, বাঙালি মুসলিম সমাজে তখন স্ত্রীশিক্ষা প্রজোনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হয়নি। সামাজিক কুপ্রথা, কুরীতিনীতি, কুসংস্কার, অবরোধ প্রথা ছিন্ন করে মুসলিম নারীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য এগিয়ে আসেন বেগম রোকেয়া এবং একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন তা আমি আগেই বলেছি।

সমকালীন বাংলার পত্র পত্রিকায় প্রতিফলিত বাঙালি মুসলিম জনমত থেকে অনুমেয়। বিংশ শতকের প্রথম দশক থেকেই বাংলার মুসলিম সমাজ ক্রমশ স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের প্রজোনীয়তা উপলব্ধি করেন।[৮] বেগম রোকেয়া কর্তৃক বাঙালি মুসলিম নারীশিক্ষা বিস্তার আন্দোলনের পূর্ব হতে বাঙালি মুসলিম সমাজের অতিপ্রয়োজনীয় নারী শিক্ষা প্রচেষ্টা চলছিল। কিন্তু তা সীমিত পর্যায়ে থেকে যায় এবং ব্যাপক রূপ নিতে ব্যর্থ হয়। বেগম রোকেয়াই দেশ ব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করতে সামর্থ্য হয়। এবং নিজ সমাজে স্ত্রী শিক্ষার জন্য শক্তিশালী জনমত গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল।

বাঙালি মুসলিম সমাজে নারীদের স্কুল প্রতিষ্ঠিতা এবং স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে বেগম রোকেয়া প্রথম উদ্যক্তা নয় এই কথা সত্য, তবে তার সবচেয়ে বড় কৃতত্ব হল এই যে, শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে যে নারী মুক্তি ও নারী প্রগতি চেয়েছিলেন সেই মানসিক মুক্তি বা প্রগতির প্রবাহ তার প্রচেষ্টাতে এবং ক্রমশ তার ব্যাপকতায় প্রকাশ পায়।

মুসলিম নারীদের শিক্ষাদান কল্পে প্রতিষ্ঠিত হল 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল'। কিন্তু স্কুল স্থাপনের অতি অল্পদিনের মধ্যেই স্কুলের উপর অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা নেমে এল। স্কুলের জন্য নির্দিষ্ট ১০ হাজার টাকা প্রথমে একটি বেসরকারি ব্যাংক এ রাখা হয়েছিল। কিন্তু বারমা ব্যাংক ফেল করার পর উক্ত ১০ হাজার টাকা নষ্ট হয়ে যায়। ব্যাংক ফেল হবার পর সহ কর্মীরা হতাশায় ভেঙে পড়ে। সেই সময়কার সেক্রেটারি জনাব সৈয়দ আহাম্মদ আলি, বেগম রোকেয়াকে বলেন,

> "পরাজয় অবশেষে আসিল। কিন্তু একেবারে অপ্রত্যাশিত বিপদের মধ্যে দিয়া আসিল, এটাই দুঃখের।"[৯]

কিন্তু বেগম রোকেয়া এই পরাজয় মেনে নেননি। স্কুলের জন্য নির্দিষ্ট টাকা ছাড়াও রোকেয়ার ব্যাক্তিগত তহবিল থেকে প্রায় ৩০ হাজার টাকা স্কুলের জন্য দান করেন। পরিচালিকা হিসাবে তাঁর–একটি নির্দিষ্ট মাসহারা ছিল। সে মাসহারা কোন দিন নেননি।[১০] তার অসীম স্বার্থত্যাগের জন্য 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস' স্কুল টিকে ছিল, তা নাহলে সূচনা লগ্নে তার বিনাশ হয়ে যেত।

বেগম রোকেয়া স্কুলের কাজ শুরু করে দিলেন। কিন্তু স্কুলের নিয়ম-কানুন, বিধি ব্যবস্থা সম্পর্কে তার কোন জ্ঞান ছিলনা তবুও তিনি নিরুৎসাহ হয়ে যান নি। কঠিন পণ ও উৎসাহ নিয়ে নিজ পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য বেগম রোকেয়া নিজের সময় ও উদ্যম শক্তি নিবেদিত করলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি কলকাতার ইংরেজি, বাঙালি, খৃস্টান, নেপালি প্রভৃতি অভিজ্ঞ ও কর্মদক্ষ মহিলাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে লাগলেন। ক্রমে জ্ঞানপিপাসু বেগম রোকেয়া মিসেস পি. কে. রায় প্রভৃতি শিক্ষাবিদদের সংস্পর্শে আসার ফলে কলকাতার বিখ্যাত বালিকা বিদ্যালয় গুলিতে আসা যাওয়া শুরু করলেন। এইসময় দিনের পর দিন অন্যান্য ছাত্রীদের মতো প্রতিদিন স্কুল আসা যাওয়া শুরু করলেন এবং স্কুল পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা সঞ্চার করলেন।[১১] স্কুলের প্রতি বছর বার্ষিক রিপোর্টে মুসলিম মহিলার শিক্ষায়াত্রী উপযুক্ত ট্রেনিং এর ব্যবস্থার জন্য আবেদন করা হয়েছে। ১৯১৯ সালের শেষ ভাগে একটি মুসলিম মহিলা ট্রেনিং স্কুল স্থাপন করেন।[১২]

বাংলা, ইংরেজি, উর্দু প্রভৃতি বিষয়ে তার অগাধ জ্ঞান ছিল। বিদ্যা বুদ্ধি ও জ্ঞান বিচারে তিনি বিশ্ব বিদ্যালয়ে উচ্চ ডিগ্রীধারীর চেয়েও অধিক জ্ঞানী ছিলেন। তবুও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী নন বলে, বিদ্যালয়ের অনেক কাজে তিনি বাধা পেতেন। তিনি অনেক সময় অভিমানী সুরে বলেছেন,

> "আমি তো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ-মারা নই। গাধার খাটুনি আমি খাটি! আধুনিককালে উপাধিধারনীদের দেখিয়ে কর্তৃপক্ষ স্কুলের ভালোমন্দ বিচার করেন।" [১৩]

মুসলিম নারী শিক্ষা বিস্তারের মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বেগম রোকেয়া স্কুলের কাজের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। কিন্তু কুসংস্কার আচ্ছন্ন মুসলিম সমাজ তার এ শুভ কাজকে বিন্যস্ত করার উদ্দেশ্য নানাবিধ ষড়যন্ত্র শুরু করে। ধনী শরিফ সম্প্রদায় ও কাঠ মোল্লারা এই ব্যাপারে তার সম্বন্ধে বাজে কথা বলতেও দ্বিধাবোধ করেনি। তাঁর নামে এমন অপবাদ দেওয়া হয়েছিল যে,

> "যুবতি বিধবা স্কুল স্থাপন করিয়া নিজের রুপ-যৌবনের বিজ্ঞাপন করিতেছে।"[১৪]

তীব্র ভাষায় তিনি এর জবাব দিয়েছিলেন,

> "যে সকল মোল্লারা স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে ফতোয়া দেয় তারা হল ছদ্মবেশী শয়তান।"[১৫]

স্কুলের প্রতিষ্ঠা কাল থেকে জীবনের শেষকাল পর্যন্ত বেগম রোকেয়া স্কুল পরিচালনার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন এবং সেই কাজের তীব্র অপমান, গঞ্জনা প্রভৃতি সহ্য করেছেন। তার প্রতি সমালোচনার কথা আলোচনা করতে গিয়ে ১৯২৯ সালে তিনি বলেছিলেন,

> "আঠারো বছর ধরিয়া গরিব স্কুলটির অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য কেবল সংগ্রাম করতে হয়েছে। দেশের বড়ো লোক – যাদের নামুচ্চারন করিতে রসনা গৌরব বোধ করে, তাহারও প্রাণ পনে শত্রুতা সাধন করিয়াছে।স্কুলের বিরুদ্ধে কতো দিকে কত প্রকার ষড়যন্ত্র চলিতেছে তাহা একমাত্র আল্লাহ জানেন। আর কিছু কিছু দিন সেবিকাও সময় সময় শুনিতে পাই। একমাত্র ধর্ম আমাদেরকে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। স্কুলটি এত বঞ্চনা, এত সিকা বৃষ্টি এত অত্যাচার সহ্য করেও টিকিয়া আছে তাহাই যথেষ্ট।"[১৬]

স্কুলের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য বেগম রোকেয়া সমস্ত বাধা বিপত্তিকে উপেক্ষা করে অবিচলিত ভাবে এগিয়ে চলিতেছেন। স্কুলের কাজে হাত দিয়ে কখনও নিরুৎসাহিত হয়ে যায়নি। কারণ সত্য প্রিয় হোক বা অপ্রিয় হোক, সাধারনের গৃহত হোক বা প্রচলিত মতের বিরোধী হোক সত্যকে বুঝব ও সত্যকে গ্রহন করিব। সত্যকে গ্রহন করে চুপ থাকেনি, তিনি সত্যকে প্রচার করেছেন- দেশের প্রতিটি হতভাগা নারীকে তাঁর মূলমন্ত্রে টেনে নেওয়া ছিল তাঁর আদর্শ। জীবনের শেষ পর্যন্ত কোন প্রকার বাধা বিপত্তি তাঁর আদর্শ থেকে নিজেকে বিচ্যুত করেন নি।[১৭]

স্কুলের ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কলকাতার সকল মুসলিম বাড়িতে যেতেন, মেয়েদের স্কুলে পাঠাবার জন্য অভিভাবকদের অনুরোধ করিতেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিতেন যে, প্রত্যেক মেয়ের শিক্ষার যাবতীয় দায়িত্ব তিনি নিবেন। পড়ার জন্য কোন খরচ দিতে হবেনা ও যাতায়াত এর জন্যও কোন খরচ দিতে হবেনা, এই রূপ সুবিধা প্রদানের মধ্যে দিয়ে তিনি ছাত্রী সংগ্রহ করেছেন।[১৮] এই প্রসঙ্গে সামসুন নাহার বলেন,

> "যিনি লেখা পড়া শিখিয়েছেন তিনি মনে করিয়াছেন- 'আমি বেগম রোকেয়াকে ধন্য করিলাম'। আর নানা ছল-ছুতায়, স্কুলের কতৃপক্ষের পান হাতে চুন খসিবার অপরাধে মেয়েদের পড়া বন্ধ করে দিয়েছে – তিনি মনে করেছেন বেগম রোকেয়াকে বড় শাস্তি দিলাম।"[১৯]

সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলটিকে একটি প্রথম শ্রেণীর আদর্শ বালিকা বিদ্যলয় রূপে গঠন করাই ছিল রোকেয়ার মূল লক্ষ্য। স্কুলের ছাত্রীদের তিনি আপন সন্তানের মতো দেখতেন এবং পড়াশুনা ব্যাতিত অন্যান্য সুযোগ সুবিধার দিকেও তাঁর লক্ষ্য ছিল। তিনি ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বিনা ব্যায়ে ঔষুধ দেবার জন্য পুরুষ ডাক্তার নিযুক্ত করেন। আপত্তি উঠিল- 'মিসেস হোসেন মেয়েদের পর্দা নষ্ট না করিয়া' ছাড়িল না।[২০]

অবশেষে তিনি মিসেস কহেন নামে এক মহিলা ডাক্তার নিযুক্ত করেন। তাকে নিযুক্ত করার পর আর এক সমস্যার সম্মুখীন হলেন। মিস কহেন 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের' ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে, কোনো ছাত্রীকে উপযুক্ত ডাক্তার দেখাবার উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর সুপারিশ অনুসারে বেগম রোকেয়া তাদের অভিভাবকে চিঠি লিখেন ডাক্তার দেখাবার জন্য।

বেগম রোকেয়া কোন সময় পর্দা পছন্দ করতেন না। তবুও স্কুলের স্বার্থের তিনি কঠোর অবরোধের মধ্যে দিয়ে কাটিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

> "পর্দা মানে অবরোধ নয় আমি যে অনিচ্ছাকৃতভাবে অবরোধবাসিনী হয়েছি তাঁর কারণ অনেক। আমার স্কুলটা আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় ছিল। একে বাঁচিয়ে রাখার জন্য অনিচ্ছায় নিয়ম-কানুন মানিয়াছি ও পালন করিয়াছি। আমি বাড়ি বাড়ি ক্যানভাস করে স্কুলের জন্য ছাত্রী আনতে যায়, কিন্তু অভিভাবকরা আগেই আমাকে জিজ্ঞাসা করেন পর্দা পালন করা? এতটুকু ছোটো মেয়ের বেলাও এই প্রশ্ন! এই এখন বুঝুন আমি কি পরিস্থিত মধ্যে দিয়ে স্কুল চালাচ্ছি, আর ব্যক্তিগত ভাবে অবস্থাটাই বা কি রূপ? স্কুলের জন্য সব অত্যাচার ও অবিচার মেনে চলেছি।"[২১]

স্কুলের কাজে সবচেয়ে বেশি সহায়ক ছিল The Mussalman পত্রিকা।স্কুলের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে পত্রিকাটি বিভিন্ন সমায়ে উন্নতি-অবনতি, অভাব-অনটন, বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মধ্যে দিয়ে স্কুলের কাজে রোকেয়াকে সাহায্য করেছিল। স্কুলের স্বার্থে জনগনের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ও সরকার এর দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে পত্রিকাটি সম্পাদকীয় কলমে মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করেছেন। এই পত্রিকাটির কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে তিনি বলেন,

> "It gratifying to note how 'The Mussalman' was able to secure such agood friend for our poor school."[২২]

স্কুলের উন্নতির দিকে তাকিয়ে সুদীর্ঘকাল তিনি অনেক অত্যাচার- অনাচার নীরবে সহ্য করেছিলেন। কিন্তু জীবনের শেষপ্রান্তে সমাজের কষাঘাতের তিক্ততাই বিষিয়ে তুলে, তাঁর নিম্নে বক্তব্য থেকে সহজে অনুমেয়,

> "এই স্কুলটা না থাকলে আমার তিলমাত্র ক্ষতি নাই, তবে এই স্কুলের কেন উন্নতি চাই?- চাই, নিজের সুখ্যাতি বাড়ানোর জন্য নয়, চাই স্বামীর স্মৃতি রক্ষার জন্য নয়, চাই বাঙালি মুসলিম নারীদের কল্যানের জন্য। 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল' শব্দ দুটি জন্য যদি স্কুলের অকল্যান হয়, তবে সাইন বোর্ড থেকেও ঐ শব্দ দুটি মুছে ফেলা যাক। অবশ্য মুসলিম সমাজ টিকে থাকলে বা গোল্লায় গেলে আমার কোন ক্ষতি বা বৃদ্ধি নাই। কারণ আমার কোন বংশধর নাই যে তাদের ভাবী অবস্থা দেখে আশঙ্কিত হতে হবে কিংবা তাদের অবস্থা দেখে আমি দুশ্চিন্তা ভুগবো। সুতরাং আপানারা বুঝতে পারছেন যে, এই স্কুলটি নিয়ে আমার কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ নাই। যাদের বংশধর আছে তাদের ভবিষ্যৎ আছে, তারা যদি সমাজটা রক্ষা করতে চান, তবে মাতৃস্থানীয় এই বালিকা বিদ্যালয়টিকে আদর্শ বিদ্যালয় রূপে গঠিত করো।"[২৩]

তবে প্রথম জীবনে সংগ্রামের ইতিহাসের মুষ্টিমেয় মাহানুভাব ব্যক্তির আসা ও উৎসাহের অভয় বানী নিঃসন্দেহে বেগম রোকেয়ার মহান উদ্দেশ্যে, সাধারন শক্তি-সাহস ও ত্যাগ-সাধনার পথে প্রেরণা জাগিয়ে ছিল। ১৯১৬ সালে ১৬ই সেপ্টেম্বর দেশনেত্রী সরোজিনী নাইডু২৪ বেগম রোকেয়ার মহৎ সাধনার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছিলেন। বেগম রোকেয়ার নারী শিক্ষা বিস্তারের কর্মসূচীকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি একখানি পত্র লিখেন,

> "আজ একাত্ম ভাবে রোগশয্যায় শুইয়া এই চিঠিখানা আপনাকে লিখিলাম। কয়েক বৎসর হইতে দেখছি, আপনি কি দুঃসাহসের কাজ করে চলেছেন। মুসলিম বালিকাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য আপনি যে কাজ হাতে নিয়েছেন এবং তাঁর সাফাল্যের জন্য দীর্ঘকাল ব্যাপী যে ত্যাগ সাধনা করে আসছেন, তা বাস্তবিক বিস্ময়কর। আপনার প্রতি আমার আন্তরিক সহানুভূতি এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার জন্য চিঠিটা লিখলাম।"[২৪]

"গত বছর আমি যখন কলকাতা গিয়েছিলম, তখন আপনার স্কুল তো আপনার সাথে সাক্ষাতের সুযোগের সন্ধানে ছিলাম। কিন্তু আমার পিতার শেষ কাজের ব্যস্ততায় মানসিক অশান্তিয় ছিলাম, এই জন্য সুযোগ করতে পারলাম না।

আজ সাময়িক পত্রে (Indian Ladies Magazine) আপনার স্কুলের বার্ষিক রিপোর্ট পড়ছিলাম। আপনার এই ভগ্নি দূর হতে বারবার আপনার আদর্শকে ও আপনার কর্মময় জীবনকে কি রূপ শ্রদ্ধার চোখে দেখে তাহাকে, তা জানবার জন্যই চিঠি। মুসলিম নারীদের জন্য আপনি যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, বিধাতা করুক আপনার জয়যুক্ত হোক। আহা! দেশের কেন্দ্রে কেন্দ্রে আপনার স্কুলের মতো এই শ্রেণীর স্কুল কি

দারুণ প্রয়োজন। এই সকল স্কুল চালনায় শুধু কি সরকারি সাহায্য দরকার? দেশের উন্নতির জন্য যে সব শিক্ষিত হৃদয়ে নারীর জন্য প্রাণ কাঁদে, তাদের সাধনা ও যত্নের প্রয়োজনই সবচেয়ে বেশি। যখনই আমার ভাগ্নি, কি হিন্দু কি মুসলিম, এইরূপ দেশ সেবার কাজে অগ্রসর হন, তখনি গৌরবে আমার বুক ফুলে উঠে। আপনি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা নিবেন।"[২৫]

ভারতের এক প্রান্তে থেকে অন্য প্রান্তে,- মুম্বাই হতে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত ভূখণ্ড হতে কিঞ্চিত এক একটি মহাপ্রান মানুসে দানের হস্ত একাত্ম অপ্রত্যাশিত ভাবে বেগম রোকেয়াকে সাহায্য দানের জন্য প্রসারিত হয়েছে।[২৬] সুদূর রেঙ্গুন থেকেও অর্থের সাহায্য পেয়েছেন সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল। একবার এক নববিবাহিতা তরুণ তরুণী তাদের বিয়ের সমস্ত যৌতুক স্কুলের কাজে দান করে দেন।[২৭]

বেগম রোকেয়ার আন্তরিক সাহায্য ও প্রচেষ্টার ফলে অনেক বাধা বিপত্তি দিয়ে অল্পদিনের মধ্যে স্কুলটি উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বিশেষতঃ ছাত্রীদের যাতায়াতের গাড়ির অভাব উল্লেখযোগ্য উন্নতিতে বাধা প্রাপ্ত হয়। অবশেষ কিছু কিছু অনুদান পাওয়া গেল। ছাত্রীদের যাতায়াতের জন্য প্রথম অনুদান করে একটি ঘোড়া, এক জৈনিক ব্যাবসায়ী এই অনুদান করেছিল। সরকার থেকে এই বাবদ মাত্র ২৫ টাকা সাহায্য পাওয়া যায়। এর ফলে ছাত্রীর সংখ্যা বাড়তে লাগে।

পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, স্কুলের যাবতীয় কাজ করে ছাত্রীদের পড়াশোনার প্রতিও তাকে খেয়াল রাখতে হতো। ১৯১৫ সালে ৮ই সেপ্টেম্বার বেগম রোকেয়া তাঁর চাচাতো বোন(বেগম মারিয়ম রাশীদকে) কে লিখেছিলেন,

> ".....। চিঠি না লিখবার এক মাত্র কারণ সময়ের অভাব। বুঝতে পার এখন খোদার ফজলে ৫টি ক্লাস, ৭০টি ছোটো–বড় মেয়ে, দুখানা গাড়ি, দুখানা ঘোড়া, কোচম্যান ইত্যাদি সব দিকে আমাকে দৃষ্টি রাখতে হয়। রোজ সকাল বেলায় সইসেরা ঠিক মতো ঘোড়া মলে কিনা তাও আমাকে দেখতে হয়। ভাগ্নিরে! এই যে হাড় ভাঙ্গা গাধার খাটুনি- ইহার বিনিময় কি জানিস? বিনিময় হচ্ছে 'ভাড় লিপকে হাত কালা' অর্থাৎ উনুন লেপন করিলে উনুন তো বেশ পরিস্কার হয়, কিন্তু যে লেপন করে তাহার হাত কালিতে কালো হয়ে যায়। আমার হাড় ভাঙ্গা খাটুনির পরিবর্তে সমাজ আমার ভুলভ্রান্তি ধরতে বদ্ধপরিকর ।"[২৮]

ছাত্রীদের স্কুলে যাবার সুবিধার জন্য ১৯১৫ এর শুরুতে মোটর বাসের ব্যবস্থা করা হয় এবং সে বছরে জুন মাসে আর একটি বাসেরও বন্দোবস্ত করা হয়। বাসের পশ্চাৎ দ্বারে উপর সামান্য একটু জাল এবং সম্মুখে এর উপরে একটু জাল ছিল। এই তিন ইঞ্চি চাওড়া ও দের ফুট লম্বা জাল না থাকলে এটিকে সম্পূর্ণ 'এয়ার টাইট' বলা যেত। স্কুলের এক জৈনিক শিক্ষার্থী বাস দেখে বলেছিলেন

> "মোটর ভয়ানক অন্ধকার.... না বাবা! আমি কখনও মরতে যাবনা।"[২৯]

পর্দা রক্ষার জন্য ছাত্রীর অভিভাবকদের অনুরোধেই এই ব্যাবস্থা করতে হয়েছিল। কারণ তারা অন্যথায় মেয়ে স্কুলে পাঠাতে নারাজ ছিল।

স্কুলের মোটর বাস দেখে রোকেয়ার বন্ধু মিসেস মুখার্জি মন্তব্য করে বলেছিলেন যে,-

> "আপনাদের মোটর বাস তো খুব সুন্দর হয়েছে। প্রথমে রাস্তায় বাস দেখে মনে করেছিলাম যে একটি বড় আলমারি যাচ্ছে কি না – চারিদিকে একেবারে বন্ধ – তাই দেখে বড় আলমারি বলে ভ্রম হয়েছিল। আমার ভাইপো এসে বলে "ও পিসীমা! দেখো, সে Moving Black Hole (চলন্ত অন্ধকুপ) যাচ্ছে"। তাই তো তার ভিতরে মেয়েরা বসে কি করে?"[৩০]

প্রথম দিকে গাড়িতে মেয়েরা প্রচন্ড অসুস্থ হয়ে যায়। কেহ কেহ বমি করে। আর ছোটো মেয়েরা অন্ধকারের ভয় পেয়ে চিৎকার করতে শুরু করে। বাধ্য হয়ে বেগম রোকেয়াকে এই ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করতে হয়। দ্বিতীয় দিন ছাত্রী আনার জন্য মোটর পাঠাবার সময় মোটের দ্বারে খড় খড়ি কাটা নামিয়ে দিয়ে একটি রঙিন কাপরের পর্দা ঝুলিয়ে দেয়। তথাপি ছাত্রীরা স্কুলে আসিলে দেখা যায় দু-তিন জন অসুস্থ হয়ে পড়েছে দুই চার জন বমি করছে এবং কয়েক জনের মাথা ধরেছে ইত্যাদি। ছুটির সময় ছাত্রীদের বাড়ি পৌঁছে দেবার সময় খড় খাটি নামিয়ে একটি পর্দা দেওয়া হয়। এর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় আরও নানা সমালোচনা। এই ব্যাপারে উর্দু পত্রিকাগুলি কঠোর ভাষায় তিরস্কার করে,-

> "মিসেস আর. এস. হোসেন পর্দা উঠাবার জন্য কতো কি না করল। মুসলিম নারীদের পাশ্চাতের নারীদের মতো করায় ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য। এই রকম কাজ আমরা মানব না।"[৩১]

ছাত্রীদের অভিভাবকরাও বেগম রোকেয়াকে অপমান করতে সঙ্কোচবোধ করেনি। তৃতীয় দিন সন্ধার পর চারখানা ঠিকানা সহিত ডাকের চিঠি পাইলাম। ইংরেজি লেখক স্বাক্ষর করিয়াছেন,-"Brother-in-islam", বাকি তিন খানা উর্দু ছিল, দুই খানা বেনামি আর চতুর্থ খানায় পাঁচ জনের সাক্ষর ছিল। সকল পত্রের বিষয় ছিল একক সকলেই দায় করিয়া আমাদের স্কুলের কল্যাণ কামনায় লিখেছিলেন যে মোটরের দুই পাশে যে পর্দা দেয়া আছে তা বাতাসে উড়িয়া বেপর্দা করে। যদি আগামীকাল পর্যন্ত কোন ভালো ব্যাবস্থা না করা যায়, তবে তাহারা ততধিক দায় করে " আসরের জাদীদ" প্রভৃতি উর্দু দৈনিক পত্রিকায় স্কুলের কুৎসা রচনা করিবে এবং দেখিয়া লইবে এই রকম বে পর্দা গাড়ীতে কি করে মেয়ে আসে।[৩২]

তবুও বেগম রোকেয়া ধীরে ধীরে স্থির ভাবে নিজ গন্তগ্য পথে এগিয়ে যেতে থাকেন। ধীরে ধীরে ছাত্রী বৃদ্ধি হতে থাকে। যানবাহন সমস্যা, প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব, এমন কি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষিকার অভাব নানাবিধ সমস্যা থাকা সত্ত্বেও রোকেয়ার ঐকান্তিক সাধনা, পরিশ্রম ও অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে এক বছরের মধ্যে উন্নতি লাভ করে। ১৯১৭ সালে ১৫ই মার্চ স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান স্কুলের উন্নতি লক্ষ্য করে প্রেসিডেন্সি এবং বর্ধমান অঞ্চলের স্কুল প্রদর্শিকা মিস এস. বোস তাঁর ভাষণে বলেন।

> "…..it (sakhawat memorial girl's school) was started in a very small house at waliullaah lane with only 8 girls on the roll. When I first visited it, it could hardly be called a school, but now I am glad to notice the gradual development and rapid progress it had made in the course of only six years."[৩৩]

শুরুতে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল উর্দু ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার প্রচলন ছিল। তবে সেই সময় বাংলা বিষয়ের একটি ক্লাস চালু ছিল।[৩৪] বেগম রোকেয়ার একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি স্কুলে বাংলা বিভাগ চালু করতে পারছিলেন না বাংলা পুস্তকের অভাব, বাংলার শিক্ষাথীর অভাব এবং সর্বপরি ছাত্রীর অভাব এর প্রধান কারণ। কলকাতার পর্দাশীল বাঙালি মুসলিমরা বিনা টাকাতেও মেয়েদের পড়ানোর পক্ষপাতি ছিল না। তবুও বেগম রোকেয়া স্কুলে বাঙালি ভাষা চালু করার জন্য অদ্যম প্রচেষ্টা করে গেছেন। ১৯১৭ সালে অল্প ছাত্রী নিয়ে বাংলা বিভাগ চালু হল। সেই সময় উর্দু এর পাশাপাশি ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে বাংলা ক্লাস করত। এই কারনে বাংলাকে ভালো ভাবে শিক্ষা দেবার জন্য একজন ভালো শিক্ষিকার সন্ধান করছিল, যদিও সে সময় একজন নিযুক্ত ছিল। ধীরে ধীরে মুসলিম নারীদের মধ্যে বাংলা শিক্ষার প্রজোনীয়তা দেখা দিল এবং তাদের মধ্যে সচেতনতা বোধ জাগ্রত হল। জনগণের তরফ থেকেও সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলে বাংলা শিক্ষা জন্য অনুরোধ করা হল এবং তা পরবর্তী কালে সফল হল।

বিদ্যা শিক্ষা ছাড়া অন্যান্য বিষয়েও সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের মেয়েদের পারদর্শীকতা লক্ষ করা যায়। আদর্শ নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্য 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' এর ছাত্রীদের পরোপকার প্রবৃতিকে বিকাশিত করার জন্য "মহাযুদ্ধ সাহায্য তহবিল," "পূর্ব- বাংলা- বার্তা- দুর্গ সাহায্য তহবিল" এ সবে সাহায্য করতে তাদের উৎসাহিত করা হয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতীয় সৈনিকদের জন্য ও লেডি কারমাইকেলের যুদ্ধ তহবিলে মেয়েরা সেলাইএর কাজ করে দিয়েছেন।[৩৫]

স্কুল নিজে অর্থে প্রতিষ্ঠা করলেও তিনি সাধারন শিক্ষার্থীর মতই স্কুলের নিয়ম কানুন বিধি ব্যবস্থা মেনে চলতেন। তার চাচাতো বোন মেরিকে লিখা চিঠি লেখা অংশ বিশেষ থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

> "...আমি, আল্লাহ চাহে এবার তোমার সঙ্গে নিশ্চয় বোম্বে যাইব। কিন্তু বোন! তুমি যদি এ মাসে আরম্ভে যদি চাও তবে পারিবনা। কারণ আমার স্কুল জুন মাসে বন্ধ হইবে। তুমি যদি ১৫ বা ১৫ এর পরে যাও তবে আমার যাওয়া হইবে আমাকে বিধি মতো দরখাস্ত করিতে হইবে।"[৩৬]

এখান থেকে বোঝা যায় যে, স্কুলের সর্বময় কর্তা হয়েও নিয়ম কানুন না আইনের বাইরে কখনও যাইনি, নিজের সুবিধা ও আত্মীয়তার মায়াও তাকে আদর্শচ্যুত করতে পারেনি। তিনি স্কুলটিকে টিকিয়ে রাখার জন্য কঠোর ত্যাগ শিকার করেন। এই সম্পর্কে ১৯৩২ সালে ১৪ই জানুয়ারি The Mussalman পত্রিকাই বলা হয়েছে–

> "It is due to the self-sacrificing on the part of mrs. Hossain to the cause of the school that it has gradually been raised from the status of a primary school to that of high school and that it has had a useful carer of twenty-one long years."[৩৭]

নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যে স্কুলটি একটি আদর্শ স্কুলে উন্নতি লাভ করে এই সম্পর্কে সমসাময়িক পত্রিকায় The Mussalam মন্তব্য করেন-

> "The school has survived twenty-one years of hard work, difficulties, struggles, endurance and patience with slow but sure success."[৩৮]

মুসলিম বালিকাদের শিক্ষা দানে স্কুলটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। এই সম্পর্কে ৮ এ মার্চ ১৯৩২ সালে The Mussalam পত্রিকায় এক সম্পাদকীয় কলমে বলা হয়ঃ

> "The school is doing most beautiful work for the Muslim community."[৩৯]

বেগম রোকেয়া তার জীবনের দুই দশকেরও বেশি সময় কাল বাঙালি মুসলিম নারী সমাজে শিক্ষা বিস্তারের জন্য উৎসর্গ করে ছিলেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে, শিক্ষা অর্জন নিপীড়িতা অত্যাচারিত নারী সমাজের এক মাত্র পথ। তার কঠোর প্রচেষ্টা বাধা সৃষ্টি করে ছিল অজ্ঞ মোল্লা সম্প্রদায় ও রক্ষণশীল ব্যক্তিরা। এই প্রসঙ্গে অবরোধ বাসিনী গ্রন্থে নিবেদনে তিনি লিখেছিলেন-

> ".....জীবনের ২৫ বছর ধরিয়া সমাজ সেবা করিয়া কঠোর মোল্লাদের অভিসম্পদ কুরাইতেছি।"[৪০]

বিংশ শতাব্দীর প্রথম শতকের শেষ দিকে বেগম রোকেয়া মুসলিম নারী শিক্ষা বিস্তারের ব্রতী হন এবং আমৃত্যু বিরতিহীন ভাবে নারী শিক্ষার জন্য সংগ্রাম করে গিয়েছেন। তার এই কঠোর সাধনার ফল তার জীবদ্দাসায় দেখা গিয়েছিল। সেই সময় কলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক জন মহিলা গ্রাজুয়েট করেছিলেন এবং মিসস ফজিলাতুন্নেসা নামে এক মহিলা, সরকারী বৃত্তি লাভ করে উচ্চ শিক্ষার জন্য ইংল্যান্ড গমন করেছিলেন। ১৯২৮

সালে লিখিত তার এক প্রবন্ধে মুসলিম সমাজে নারী শিক্ষা বিস্তারে বিরামহীন প্রচেষ্টার সফলতার নির্দশনের কথা নিজেই পরোক্ষ ভাবে স্বীকার করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন-

> "এখন মুসলিম সমাজ বুঝেছেন স্ত্রীশিক্ষা ব্যাতিত এই অধঃপতিত সমাজের উন্নতির আশা নেই। তাই তাহারা আর শুধু ভাতৃ সমাজ লয়িয়াই ব্যাস্ত নই। চারিদিকে দিকে স্ত্রী শিক্ষার আলোচনা হচ্ছে ও জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন হচ্ছে।"[৪১]

তথ্যসূত্র:

১. রহমান, এম. আবদুর। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলিম বিরাঙ্গনা। (দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা ১৯৮৭), পৃ. ৪২।

২. সাখাওয়াত হোসেন, রোকেয়া। স্ত্রীজাতির অবনতির। মতিচূর, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৮-২৯।

৩. তদেব, পৃ, ২৯।

৪. Hossain, R.S. 'Educational Ideals for the modern Indian girls. The Mussalman. Vol.XXV. T.W.Edition Vol.VII, March 5, 1931. No.26, p. 7.

৫. এম. ফাতেমা খানম, সপ্তর্ষ, সেলিনা চৌধিরি কর্তৃক প্রকাশিত (ঢাকা, ১৯৬৪) পৃ.১।

৬. The Mussalman, Vol, XXVI, T.W. Edition. Vol.VII, june 11, 1932. no. 66, p. 3.

৭. বাগল, শ্রীযোগেশচন্দ্র। বাংলার স্ত্রীশিক্ষা ১৮০০-১৮৫৬ (কলকাতা, ১৩৫৭), পৃ. ৩।

৮. আনিসুজ্জামান, মুসলিম বাংলার সমসাময়িক পত্রিকা ১৮৩১-১৯৩০, ভূমিকা, পৃ. ৩৭।

৯. মাহমুদ, শামসুন নাহার। রোকেয়া জীবনী। কলকাতা, বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ১৯৩৭, পৃ. ৪১

১০. মাহমুদ, মোশফেকা। পাত্রে রোকেয়া পরিচয়। পৃ. ৪।

১১. মাহমুদ, শামসুন নাহার। রোকেয়া জীবনী। কলকাতা, বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ১৯৩৭, পৃ. ৪৩, ৪৪।

১২. মাহমুদ, শামসুন নাহার। রোকেয়া জীবনী। কলকাতা, বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ১৯৩৭, পৃ. ৪১।

১৩. তদেব,পৃ. ৪৪।

১৪. তদেব, পৃ.৫৩।

১৫. সাখাওয়াত হোসেন, রোকেয়া। রোকেয়া-রচনাবলী। আবদুল কাদির সম্পাদিত। ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩. পৃ. ৫৩৯

১৬. মাহমুদ, শামসুন নাহার। রোকেয়া জীবনী। কলকাতা, বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ১৯৩৭. পৃ. ৫৩, ৫৪।

১৭. তদেব, পৃ. ৯৬।

১৮. সাখাওয়াত হোসেন, রোকেয়া। রোকেয়া-রচনাবলী। আবদুল কাদির সম্পাদিত। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩ পৃ. ৫৩৯

১৯. মাহমুদ, শামসুন নাহার। রোকেয়া জীবনী। কলকাতা, বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ১৯৩৭, পৃ. ৫৮।

২০. সাখাওয়াত হোসেন, রোকেয়া। রোকেয়া-রচনাবলী। আবদুল কাদির সম্পাদিত। ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩ পৃ। ২৯১।

২১. সাখাওয়াত হোসেন, রোকেয়া। রোকেয়া-রচনাবলী। আবদুল কাদির সম্পাদিত। ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩ পৃ. ৫৩৬

২২. The Mussalman, Vol, XXIII, April 26, 1929, No.16, p. 10

২৩. মিসেস আর. এস. হোসেন, 'ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলিম', মাসিক স্পোহাম্মদী, ৪র্থ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮, পৃ. ৬০৯। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল'- ম্যানেজিং

কমিটির এক অধিবেশনে (৮ মার্চ ১৯৩১) বেগম রোকেয়ার বক্তব্য সেক্রেটারি সাহেব কর্তৃক পাঠিত হয়। এবং পরবর্তীতে 'ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলিম' শিরোনামে বক্তব্যটি প্রবন্ধাকারে মাসিক স্পোহাম্মদী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

২৪. সরোজিনী নাইডু (১৮৭৯-১৯৪৯) ছিলেন একাধারে কবি, রাজনীতিক ও বাগ্মী। তাঁর আদি নিবাস ব্রাহ্মগাঁ, ঢাকা। তিনি মাত্র ১২ বছর বয়সে প্রবেশিকা পরিক্ষায় উত্তীন হন। পরবর্তীতে তিনি ইংল্যান্ডের কিংস কলেজ ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গাট্রন কলেজে পড়াশুনা করেন। অল্প বয়স থেকেই কবিতা রচনা করতেন। ইংরেজ কবিতা রচনার জন্য তিনি 'প্রাচ্যের নাইটিঙ্গেল' নামে সুপরিচিত ছিলেন। ১৯১৫ সালে তিনি সক্রিয় ভাবে রাজনীতিতে যোগদান করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি উত্তরপ্রদেশে রাজ্যপাল হন দ্রষ্টব্য, সংসদ বাঙালী চরিতাবিধান, পৃ. ৫৪৯।

২৫. মাহমুদ, শামসুন নাহার। রোকেয়া জীবনী। কলকাতা: বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ১৯৩৭ পৃ. ৫-৬।

২৬. তদেব, পৃ. ৪৮।

২৭. তদেব, পৃ. ৫০ ।

২৮. মাহমুদ, মোশফেকা। রোকেয়ার-জীবনী। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৫৮। পৃ. ৫

২৯. হোসেন, মিসেস আর. এস.। 'অবরোধ-বাসিনী', মাসিক স্পোহাম্মদী, ৩য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৩৭, পৃ.৮৩২ ।

৩০. সাখাওয়াত হোসেন, রোকেয়া। রোকেয়া-রচনাবলী। আবদুল কাদির সম্পাদিত। ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩. পৃ ৫১১।

৩১. মাহমুদ, শামসুন নাহার। রোকেয়া জীবনী। কলকাতা: বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ১৯৩৭। পৃ. ৪৪।

৩২. 'রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। 'অবরোধ-বাসিনী', মাসিক মোহাম্মদী, ৩য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৩৭, পৃ. ৮৩৩।

৩৩. দ্য মুসলমান (The Mussalman), বর্ষ ১১, সংখ্যা ১৭, ২৩ মার্চ ১৯১৭, পৃ. ৫।

৩৪. দ্য মুসলমান (The Mussalman), বর্ষ ১১, সংখ্যা ১৭, ২৩ মার্চ ১৯১৭, পৃ. ৫।

৩৫. মাহমুদ, মোশফেকা। রোকেয়ার-জীবনী। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৫৮। পৃ. ৪৮।

৩৬. . তদেব, পৃ. ৮ ।

৩৭. দ্য মুসলমান (The Mussalman), টি. ডব্লিউ. এডিশন, বর্ষ ২৬, সংখ্যা ৬, ১৪ জানুয়ারি ১৯৩২, পৃ. ৪।

৩৮. দ্য মুসলমান (The Mussalman), টি. ডব্লিউ. এডিশন, বর্ষ ২৬, সংখ্যা ৩১, ১৭ মার্চ ১৯৩২, পৃ. ২।

৩৯. দ্য মুসলমান (The Mussalman), টি. ডব্লিউ. এডিশন, বর্ষ ২৬, সংখ্যা ২৭, ৮ মার্চ ১৯৩২, পৃ. ৬।

৪০. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। 'অবরোধ-বাসিনী', মাসিক মোহাম্মদী, ৩য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৩৭, পৃ. পৃ. ৪৭১।

৪১. সাখাওয়াত হোসেন, রোকেয়া। রোকেয়া-রচনাবলী। আবদুল কাদির সম্পাদিত। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩. পৃ. ১৬০-২৬১।

সহায়ক গ্রন্থ:

English Books:

1. Ahmed, Rafiuddi. The Bengal Musslims 1871-1906: A Quest Identity. Delhi: Oxford University press, 1981.

2. Gopal, Ram. Indian Muslims: A Political History 1858-1947. Bomby: Asia Publishing House, 1959.
3. Gupta, Atul Chandra(ed.). Studies in the Bengal Renaissance. Jadavpur: National council of Education, 1958
4. Usha, Chakraborty. Condition Of Bengali Women Around The 2nd half of the 19th Century. Calcutta: Published by the author, 1963.

বাংলা বই:

১. আলম, মোহাম্মদ শামসুল, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনঃ জীবন ও সাহিত্য, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯।
২. আহমদ, আবুয যোহা নূর, মুসলিম জগতের মহীয়সী নারী, ঢাকা, মোহাম্মদ ফারুক হোসেন ও মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯২৬।
৩. আহমদ, ওয়াকিল, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা- চেতনার ধারা, (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩।
৪. ইসলাম, মস্তফা নূরুল, সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত ১৯০১-১৯৩০, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭।
৫. উদ্দিন, মজির, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মহিলা, , ঢাকা, দিদার পাবলিশিং হাউস, ১৩৭৪।
৬. ওদুদ, কাজী আবদুল, বাংলার জাগরণ, কোলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৬৩।
৭. খুরশিদ, গোলাম, রাসসুন্দরী থেকে রকেয়াঃ নারী প্রগতির একশো বছর, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৬।
৮. দেবী, কৈলাস বাসিনী, হিন্দুমহিলাগণের হীনাবস্থা, কোলকাতা গুপ্তপ্রেস, ১৮৬৩।
৯. দাশগুপ্ত, কমলা, স্বাধীনতা- সংগ্রামে বাংলার নারী, কোলকাতা, বসুধারা প্রকাশনী, ১৩৭০।
১০. বেগম, মালেকা, নারীমুক্তি আন্দোলন, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।

বেগম রোকেয়া রচিত গ্রন্থাবলী

১. মতিচূর, প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশক, কোলকাতা, গুরুদাস ..... এন্ড সন্স, ১৩১২। ও পুনমুদ্রন, কোলকাতা, গুরুদাস..... কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩১৪।
২. Sultana's Dream, Kolkata, Cotton Press, 1908.
৩. মতিচূর, দ্বিতীয় খণ্ড, কোলকাতা, গ্রন্থাকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩২৮।
৪. পদ্মরাগ, কোলকাতা, গ্রন্থাকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯২৬।
৫. অবরোধবাসিনী, কোলকাতা, মোহাম্মদী বুক এজেন্সী, ১৯২৮।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 923-929
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.307

নারীহৃদয়ের জটিল সমীকরণ: বাদল সরকারের নাটক

ড. পাপিয়া সামন্ত, *অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 25.03.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

After the World War II, modern Bengali theatre began to move along a new path. It shifted from the confined stage of proscenium theatre to open-air, free stages under the influence of the people's theatre movement and new theatrical forms. In this context, during the 1960s and 1970s, playwright Badal Sircar emerged on the Bengali stage, introducing an absurdist, existential theatrical trend. Using the purposelessness of life as his central theme, he created a number of significant plays that came to be known as absurd theatre.

In the course of his dramatic career, Badal Sircar produced several notable and popular plays, where themes of frustration, exhaustion, conflict, sorrow, and alienation from life repeatedly surface. Alongside these, he vividly portrayed the intense conflicts within human life, especially the inner struggles of the female psyche. In particular, in plays like Jodi Aar Ekbar and Pagla Ghora, his depiction of the conflict-ridden female mind is truly remarkable. Although women may not always occupy the central role in these plays, almost all characters and events revolve around women. Through diverse emotional and psychological states, a series of vivid images emerge, giving form to the complex and often unknowable world of the female heart.

In "*Jodi Aar Ekbar*", the playwright primarily portrays the meaninglessness of life. Especially when the female mind is in a state of indecision, it becomes incapable of making the right choices. Enchanted by illusions, it wanders aimlessly, chasing mirages without direction. In reality, the female heart repeatedly ignores harsh realities and seeks refuge in the realm of imagination. However, even upon reaching that imagined world, it fails to find peace, becoming increasingly restless and suffocated, ultimately longing to return to its former life. On the other hand, in "*Pagla Ghora*", the playwright presents a profound philosophy of life. He suggests that "perhaps only by witnessing death can one truly understand life," and emphasizes that "it is never better to die than to live" and that "as long as one life, everything remains possible." Through this, the play presents the conflicts, despair, fatigue, and sorrow of the female psyche. At the center of the play is the dead body of a woman, around which revolve four other female identities. Each expresses their own pain, conflict, frustration, and suffering. These varied female forms appear as different manifestations of a single feminine essence in the lives of different men. Although the playwright presents life through the lens of death, he skillfully gives language to the unexpressed pain of the female heart.

Keywords: Second World War, Third Theatre, Female Psychology, Conflict and Crisis

যে পাশ্চাত্য ধারার আভরণ পরিধান করে বাংলায় নাট্যশিল্পের আগমন ঘটে, সেই নাট্যশিল্প কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে নিজেকে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে থাকে। বিশেষত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী সময় থেকে বাংলা নাটকের স্রোত একেবারে ভিন্ন খাতে বইতে শুরু করে। বাংলা নাটক প্রসেনিয়াম থিয়েটারের বদ্ধ মঞ্চ থেকে আত্মপ্রকাশ করে গণনাট্য-নবনাট্যের মুক্তপ্রাঙ্গণে। এরই সূত্র ধরে ষাট-সত্তরের দশকের দিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারার নাটক নিয়ে উপস্থিত হয় নাট্যকার বাদল সরকার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিভীষিকার সঙ্গে দাঙ্গা, দেশভাগ ও পরিশেষে স্বাধীনতা প্রাপ্তি সমকালীন সামজিক-রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে মানব জীবনকে চূড়ান্তভাবে পীড়িত করে। বিশেষত সমকালীন সময় জুড়ে মানবমনে জন্ম নেয় দ্বন্দ্ব-হতাশা-বিষাদ-অনিশ্চয়তা। এমনই সময়পর্বে বাংলা রঙ্গমঞ্চে বিকল্প থিয়েটার তথা থার্ড থিয়েটারের ডালি নিয়ে আবির্ভাব ঘটে বাদল সরকারের।

পাশ্চাত্য ভাবধারায় সুপুষ্ট এই নাট্যকার মানবজীবনের ক্লেশ-গ্লানি-রিক্ততাকে আভূষণ করে প্রবর্তন করেন বাস্তববিমুখ শূন্যতাবাদী ভিন্ন এক নাট্যধারা। যেখানে উঠে আসে মানুষের একঘেয়েমি জীবনযন্ত্রণা। আসলে আধুনিক যুগের নাট্যকার বাদল সরকার ছিলেন জীবনের প্রতি সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণকারী। ফলত তাঁর নাটকে অনায়াসে উপস্থিত হয়েছে জটিলতাসমৃদ্ধ মানবজীবন। নাট্যকার তাঁর নাটকগুলিতে দেখিয়েছেন কীভাবে মানব জীবন জটিলতার আবর্তে ঘুরপাক খেতে খেতে একেবারে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর পথকে উন্মুক্ত করে। নাট্যকার বাদল সরকার রচিত নাটকগুলির মূল কেন্দ্রে অবস্থান করছে অনিশ্চয়তায় ভরপুর হতাশাগ্রস্ত মানবমন। এই মানবমনের বিশেষত নারীমনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত হয়ে উঠেছে নাট্যকারের নাটকের প্রধান হাতিয়ার।

মানবমন কিংবা নারীমন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে আমাদের জেনে নিতে হবে প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের মনঃবিশ্লেষণমূলক তত্ত্ব। সিগমুণ্ড ফ্রয়েডেই প্রথম আঙুল তোলেন মানব হৃদয়ের জটিল রহস্যময় গোপনতম প্রদেশগুলির দিকে। যেখানে উন্মোচিত হয় চেতন, অবচেতন ও অচেতন মন। বিজ্ঞানী ফ্রয়েডই প্রথম সন্ধান দেন মানুষের চেতন মনের সমস্ত কর্মকাণ্ডের নেপথ্যে মূল চালিকাশক্তি হল অবচেতন মন। বলা চলে, মানব মনের নিয়ামক শক্তি হল অবচেতন মন। আর এই অবচেতন মনের ক্ষেত্র হয় অত্যন্ত বিশৃঙ্খল। ফ্রয়েড আবার অন্যদিকে মানবমনকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন, মানবমন তিনটি উপাদানের সমাহারে গঠিত- ইড, ইগো, সুপারইগো। ইড বা অদ্‌স মানুষের মধ্যে অবস্থিত স্বার্থান্বেষী অনৈতিক চিন্তা, যা প্রতিমুহূর্তে মনকে ভোগ তথা আত্মতুষ্টির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। অপরদিকে সুপারইগো মানবমনকে নৈতিক দিকে উপস্থাপিত করে। ঠিক ভুল বিচার-বিশ্লেষণ করে নির্দেশিকা তৈরি করে দেয়। আর ইড ও সুপারইগোর মধ্যবর্তী সংযোগরক্ষাকারী উপাদান হল ইগো। এটি মানবমনের তিনটি স্তরেই বিরাজ করে। তবে বাস্তবসম্মত চিন্তার মাধ্যমে কার্য সম্পাদনে সহায়তা করে ইগো। বলা যায়, বাস্তব নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ইড-জাত ইচ্ছাসমূহকে সামাজিক ন্যায়সঙ্গতার সঙ্গে পূরণের প্রচেষ্টা করে ইগো।

কিন্তু এই মনস্তত্ত্বের কথা বললে নারী-পুরুষ উভয়েরই কথা আসে। আর পুরুষ ও নারীর মনস্তত্ত্বের মধ্যে রয়েছে বিস্তর ফারাক। কারণ উভয়ের মনস্তাত্ত্বিক জগত গঠিত হয় প্রকৃতিগত স্বভাববৈশিষ্ট্য এবং সামাজিক মর্যাদার ওপর ভিত্তি করে। পুরুষের মনস্তত্ত্ব যেমন তার প্রকৃতিগত সত্তার ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে, তেমনি নারী মনস্তত্ত্বের প্রকৃতি গড়ে ওঠে তার সত্তার ওপর নির্ভর করে। যেখানে তার স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যে স্থান লাভ করে প্রেম, সংযম, সহিষ্ণুতা, মাতৃত্ব। প্রথমদিকে নারী পুরুষের অবস্থান সমপর্যায়ে থাকলেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কঠোর বিধি ব্যবস্থায় নারী হয়ে ওঠে পেছন সারির যাত্রী, ঘৃণা-অবহেলার পাত্র। আর তখনই নারীর মনে উদয় হয় দ্বন্দ্ব-বিষাদ-হতাশা। কাঠিন্যতায় ভরা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নানা সামাজিক সংস্কারে পদপৃষ্ট হয় নারীর ভাব-কল্পনা। ফলত অধরা থেকে যায় নারী মনের সমস্ত স্বপ্ন-আশা-ভাব-কল্পনা। নারী তার অবচেতন

মনে সৃজন করে চলে তার কল্পনার জগত। যেখান থেকে কেউ তাকে সরাতে পারে না। যদিও এই অবচেতন মনে থাকা ভাব-কল্পনার প্রভাব পড়ে নিজের জীবনে, সাথে পারিপার্শ্বিক জীবনে। ফলত বহির্জগত ও অন্তর্জগতের মধ্যে শুরু হয় তীব্র দ্বন্দ্ব-সংঘাত। বহির্জগতে নারী হয়ে ওঠে রহস্যময়, বৈচিত্র্যময়। নারী হৃদয়ের অতল গভীরে থাকা ভাব-কল্পনা থেকে যায় ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। মনের ভেতর তিল তিল করে গড়ে ওঠা স্বপ্ন থেকে যায় অধরা। তাইতো বিশ্বের তাবড় তাবড় সাহিত্যিকগণ পর্যন্ত স্বীকার করেছেন সুগভীর নারী হৃদয়ের রহস্যকথাকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেই বলেছেন-নারীর মনের কারখানা-যেখানে নারীর হাসিকান্না, পাওয়া না পাওয়া, কামনা-বাসনা, ঈর্ষা-দ্বেষ প্রভৃতি অন্তর্গূঢ় রহস্যের ইতিহাস চাপা পড়ে আছে।

আর এই নারীমনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত অত্যন্ত স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে বাদল সরকারের নাটকগুলিতে। বিশেষত 'যদি আর একবার' (১৯৬৬) ও 'পাগলা ঘোড়া' (১৯৬৭) নাটকে নারী হৃদয়ের দ্বন্দ্ব-সংঘাত উঠে এসেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে। মাত্র দুটি অঙ্কে সমন্বিত 'যদি আর একবার' নাটকের মূলে রয়েছে জীবনের প্রতি অর্থহীনতা তথা মূল্যহীনতা। নাটকটি ১৯৬৬ সালে রচিত হলেও প্রথম অভিনয় হয় বহুরূপী কর্তৃক অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এ (২৬ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬)। হালকা মেজাজের এই নাটকে খুব সন্তর্পণে প্রবেশ ঘটিয়েছেন মানসিক দ্বন্দ্বকে। আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সমাজ হয়ে উঠেছিল নিরাশার যুগ। যেখানে প্রাধান্য পেতে থাকে কেবল দ্বন্দ্ব-হতাশা-যন্ত্রণা-বিষাদ। নাট্যকার এই নাটকে নারীর হৃদয়ের বিচিত্র গতিকে অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। নাটকটিতে রয়েছে তিনজন নারী চরিত্র- বনলতা রায়, যে অবিবাহিতা, চাকুরীজীবী, স্বাধীনচেতা মনোভাবের অধিকারী। দ্বিতীয়জন করুণা, যে সরকারী উচ্চপদস্থ অফিসার ধনীব্যক্তি রতিকান্ত সান্যালের স্ত্রী। তৃতীয়জন অতসী, যে লেখক সঞ্জয় ঘোষের স্ত্রী। এই তিননারীর হৃদয় ভাবনা তথা মনোগত বাসনা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই তিন নারীর অবচেতনে থাকা কামনা-বাসনার বিচিত্র স্তরের মধ্য দিয়েই নাটকের কাহিনি ক্রম বিবর্তিত হয়েছে।

নাটকের শুরুতেই দেখা যায়, এই তিন নারী নিজের নিজের পরিবারের সঙ্গে বঙ্গ উপসাগরের কূলে ভ্রমণে এসেছে। প্রত্যেকেই বিশ্রামের জন্য আশ্রয় নিয়েছে উপসাগরের কূলে অবস্থিত সত্যসিন্ধু শেঠের সুন্দর মনোরম হোটেলে। আর এই হোটেলই এই নাটকের কাহিনিস্থল। এখানেই পরিচিত হয় একে অন্যের সঙ্গে। সেই পরিচয় সূত্রেই উঠে আসে প্রত্যেকের অন্তর্জগতের বিচিত্র মনোবাসনা। বিশেষত তিন নারী চরিত্রের নিজ নিজ অবস্থান সম্পর্কে তিনজনেরই মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত আমাদের ভাবনায় ফেলে দেয়। কোন নারীই তার নিজ অবস্থানে সুখী নয়, সে চায় বিপরীত অবস্থানে থাকা অন্যের স্থানটি অধিকার করতে। কারণ তার কাছে অন্যের স্থান অনেক বেশি সুখকর, অনেক বেশি শান্তিদায়ক। এ যেন 'নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস, ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস'। যেমন বনলতা চায় করুণার স্থান অধিকার করতে, অপরদিকে করুণার বাসনা সে বনলতার ন্যায় স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে। স্বামীর অধীনে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে নারাজ করুণা। স্বামী রতিকান্তর বিপুল অর্থের প্রাচুর্যে দমবন্ধ হয়ে আসে তার। সে চায় বনলতার ন্যায় মুক্ত স্বাধীন জীবন। নিজে চাকরি করে, নিজের রোজগারে, স্বাধীনভাবে জীবন উপভোগ করতে চায় করুণার মন। তাই সে বনলতাকে বলে ওঠে-

> "...আমি শুধু চাই
> যেটুকু বিদ্যে আছে সম্বল করে
> কোনো এক নিরুদ্বেগ সাদাসিধে
> চাকরির স্বাধীনতা। বিবাহিত জীবনের দাসত্বের অপমান থেকে
> মুক্তি চাই শুধু। যে মেয়ের ঐটুকু আছে,

তাকে আমি হিংসে করি, তোমাকেও হিংসে করি
এই কারণেই।"[১]

যে বিবাহিত জীবন করুণার কাছে দাসত্ব হয়ে উঠেছে, তার স্বাধীনতাটুকু কেড়ে নিচ্ছে, তার কণ্ঠরোধ করছে, সেই বিবাহিত জীবনের স্বাদ গ্রহণ করতে আগ্রাসী মিস্ বনলতা সেন। কারণ বনলতার নিকট একাকীত্ব হয়ে উঠেছে একঘেয়েমি, অসহ্যকর। বিবাহিত জীবন, সংসার জীবন তার কাছে ঈশ্বরের দান। তাই সে করুণার ন্যায় জীবনের প্রত্যাশা করে বলে ওঠে-

"স্বাধীনতা দেখো, হিংসে করো, একা থাকা কাকে বলে কিছুই জানো না, যা পেয়েছো জীবনের দান, তার জন্য ধন্যবাদ দিও বিধাতাকে।"[২]

জীবনে পাওয়া-না পাওয়ার অতৃপ্ত বেদনায় নারীমন হতাশা ও ক্লান্তি বোধ করে। দুই প্রকৃতির নারীর মনে সুখ নেই। উভয়ের মধ্যে থাকা বিপরীত জীবনভাবনা তাদের ক্লান্তি, হতাশাগ্রস্থ করে তোলে। একদিকে একাকী নারী সংসারের বন্ধনে বাঁধা পড়তে চায়, অপরদিকে সংসারে থাকা নারী সংসারের দাসত্ব থেকে মুক্তি চায়।

নাটকের অপর এক নারী চরিত্রকে পাই- অতসী। যেখানে সে পিতার ঐশ্বর্যকে পায়ে ঠেলে নিজের ভালোবাসাকে তথা সঞ্জয়কে বরণ করে নিয়েছিল, একসাথে পথ চলার শপথ গ্রহণ করেছিল, সেই অতসী অর্থহীনতার কারণে সঞ্জয়ের কাছ থেকে মুক্তি লাভের জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। কারণ বিবাহের পর অর্থহীনতার কারণে জীবনের সমস্ত শখ-আহ্লাদ তার কাছে অধরা। তাই অতসীর মনে হয়-

"সব স্বপ্ন। সব মিথ্যে আশা। জীবনের প্রথমেই গোলমাল হয়ে গেছে সব, ফেরবার উপায় তো নেই।"[৩]

আসলে অর্থহীনতা অতসীকে দাঁড় করিয়েছে বাস্তবের রূঢ় কঠিন বাস্তবের মাটিতে। অর্থহীনতার কারণে তার কাছে সঞ্জয়ের শিল্পীসত্তা হয়ে উঠেছে মিথ্যে, অর্থহীন। নিতান্তই বুজরুকি। তাই বনলতার মুখে শিল্পীসত্তার প্রশংসা শুনে ক্ষোভের সঙ্গে বলে ওঠে-

ঝাঁটা মারি কালচারের মুখে! চাল নেই, চুলো নেই, কালচার ধুয়ে খাবো! (১/২)[৪]

শিল্পী সঞ্জয়কে বরণ করা তাঁর জীবনের সবচেয়ে ভুল সিদ্ধান্ত। তাই সে বনলতাকে জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে উপদেশ প্রদান করে জানায়-

বনলতা, যদি বিয়ে করো, কালচার ছেড়ে ভাই কারবারি ধরো। (১/২)[৫]

যে শিল্প, যে সৃষ্টিকার্য তাদের অন্ন যোগান দিতে পারে না, যে শিল্প তাদের দিনের পর দিন স্টার্ভেশনে রাখে, সেই শিল্প অতসীর কাছে হাস্যকর, মিথ্যে। যা অতসীর খেদোক্তিতে সুস্পষ্ট বিদ্যমান-

"লিখে ক'টা টাকা আসে ভাই পোড়া বাংলাদেশে?
.....
টাকা সব নয় জানি। কিন্তু যদি ভদ্রভাবে চলাটাও
শক্ত হয়, যদি ফেস্ করো স্টার্ভেশন- মানে উপবাস..." (১/২)[৬]

প্রত্যেকের এই অতৃপ্তিবোধ তাদের অন্য সুখকর জীবনের হাতছানি দেয়। একাকী স্বাধীন বনলতাও হাঁপিয়ে ওঠে তার একঘেয়েমি জীবনযাপনে। করুণার স্থান লাভে আশাবাদী বনলতা তোলে যোগ্যতার প্রশ্নচিহ্ন। যোগ্যতার মাপকাঠিতে বনলতা নিজেকে বসায় শীর্ষস্থানে।

"একজন পেয়েও বোঝে না কতখানি পেলো, যা পেয়েছে পায়ে ঠেলে নষ্ট করে! অথচ হয় তো অন্য কেউ অপেক্ষায় মরে। হয় তো পাবার কথা তারই যোগ্যতার কথা যদি ওঠে।"[৭]

তবে 'বুড়ঢা জিন'-এর আশির্বাদ নাটকের সকল চরিত্রকে উপনীত করে নিজ নিজ কল্পনার জগতে। যেখানে নাটকের সবাই নিজস্ব জীবন থেকে এক ভিন্ন জীবনের প্রান্তে উপস্থিত হয়। তাদের অবচেতন মনে থাকা কল্পনার জগতে তারা উপস্থিত হয়। কিন্তু এই জীবন তাদের প্রত্যেককে ক্লান্ত করে। বনলতা, করুণা, অতসীর অবচেতন মনে যে জীবন, যে চাহিদা, আশা-আকাঙ্ক্ষা লুকিয়ে ছিল, বুড়ঢা জিনের ম্যাজিকে তা পূরণ হলেও সেখানে প্রত্যেকেই পূর্ব জীবন ফিরে পেতে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। কেউই চায় না এমন আকাঙ্ক্ষিত জীবন। রুচি, শিক্ষা, বৈদগ্ধের ভারাক্রান্তে অতসী ক্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। নতুন জীবনের সীমাহীন বিলাসিতার প্রাচুর্যে দমবন্ধ হয়ে আসে অতসীর। অপরদিকে বনলতা ও করুণাও হাঁপিয়ে ওঠে নতুন জীবনে। রতিকান্তের প্রেমলীলা বনলতার কাছে হয়ে ওঠে একঘেয়েমি, অসহ্যকর। আবার করুণার কাছে একাকীত্ব হয়ে দাঁড়ায় বিষময়। তাই অতসী বলে ওঠে- "ওঃ কী ভুল করেছি'।[৮]

আসলে নাট্যকার দেখিয়েছেন মানুষের অবচেতনে মনে থাকা গোপন আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি ঘটলেও সেখানে জীবনের সকল সুখ খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং ইচ্ছামতো জীবন পাওয়ার চাইতে, জীবন থেকে পাওয়া জীবনটাকে মেনে নিলেই সর্বসুখ।

অপর নাটক 'পাগলা ঘোড়া'-তেও একই রকমভাবে উঠে এসেছে নারী মনের তীব্র দ্বন্দ্ব-সংঘাত। উক্ত নাটকটিও সর্বপ্রথম অভিনীত হয় বহুরূপী কর্তৃক অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এ ১৯৭১ সালে ২৮শে ফেব্রুয়ারি। মাত্র দুটি অঙ্কের মধ্যেই নাটকের পরিসমাপ্তি টেনেছেন। সমগ্র নাটকে প্রধান চরিত্র হিসেবে না এলেও কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে 'মেয়েটা'-র উপস্থিতি নাটকটিকে চমৎকারিত্ব এনে দিয়েছে। এই নাটকের ঘটনাস্থল শ্মশান। যেখানে পুড়ছে একটি মেয়ে তথা 'মেয়েটা'। নাট্যকার এখানে 'মেয়েটা' বলেই সম্বোধন করেছেন। নির্দিষ্ট কোন নাম দেননি। তবে এই মেয়েটাই কখনো মালতী, কখনো মিলি, কখনোবা লছমী বা লক্ষ্মী। নাটকে প্রধান চারটি পুরুষ শশী-কার্তিক-হিমাদ্রি-সাতকড়ি আবর্তিত হয়েছে মেয়েটিকে কেন্দ্র করেই। আবার এই 'মেয়েটা'-ই ভিন্ন ভিন্ন নারী রূপে উপস্থিত হয়েছে। এক মেয়ের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন নারী চরিত্রের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে নাটক হয়ে উঠেছে তীব্র সংঘাতপূর্ণ।

নাট্যকার উক্ত নাটকে শ্মশানের পটভূমিতে জীবনের অনুসন্ধান করেছেন। নাটকের শুরুতেই আমরা দেখি, চারজন শ্মশানযাত্রী একটি অল্পবয়সী মেয়ের শবদাহ শ্মশানে নিয়ে এসেছে দাহ করতে। আর এই দাহকার্য চলাকালীন চার ব্যক্তির আলাপচারীতার মধ্য দিয়ে উঠে আসে সমাজে নারীর অসাহায়তা ও দুর্ভাগ্যের চিত্র। নাট্যকার মৃত মেয়েটার অস্তিত্ব জুড়ে উপস্থাপন করেছেন আরো তিনটি নারী চরিত্র। তীব্র জীবন যন্ত্রণায় লালিত মেয়েটার অবয়বের মধ্যে ফুটে ওঠে অত্যাচারিত তিনটি নারীর অবয়ব- মালতী, মিলি, লছমী। যে মালতী ভালোবেসেছিল শশীকে, সেই মালতীকে বিয়ে করতে উদ্যত হয় মদ্যপ, লম্পট শশীর ভাই প্রদীপ। শুধুমাত্র সমাজ ও মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বে শশী হৃদয় দিয়ে ভালবাসলেও মালতীকে গ্রহণ করতে পারে না। মালতীর কাতর অনুনয়, প্রেম কোনোকিছুই টলাতে পারেনা শশীকে। শশীর সামাজিক অবমাননার ভীতি মালতীকে টেনে নিয়ে যায় মৃত্যুর দিকে। মালতীর সেই অতৃপ্ত সত্তা 'মেয়েটা'-র মধ্য দিয়ে বলে ওঠে-

> "তোমার জিত। তোমার নিজের উপর জিত। পেরেছো তুমি। ভেসে যাওনি, খুঁটি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছো। নিজের কাছে হেরে যাওনি তুমি।"[৯]

শুধুমাত্র সামাজিকতার কারণে শশী তার প্রেমের হত্যা করে। যে হত্যার প্রতিফল মালতীর মৃত্যু। নারীর হৃদয়ের গোপনে থাকা সুগভীর ভালোবাসাকে পিষে ফেলে শশী। যেখানে নারীর ভালোবাসার কাছে সমাজ হয়ে ওঠে অনেক বড়। মালতীর এই অন্তর্বেদনা জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ করে 'মেয়েটার' মধ্যে।

অপরদিকে আবার মেয়েটার অস্তিত্বে জাগ্রত হয় মিলি। যে মিলি উচ্চবিত্ত সমাজের মেয়ে। অসামান্য ধনী সুন্দরী মিলি সাধারণ নিম্ন-মধ্যবিত্ত স্কুল টিচার হিমাদ্রিকে ভালোবাসলেও হিমাদ্রি তার সেই শুদ্ধতম ভালোবাসার সঠিক মর্যাদা দেয়নি। অন্যদিকে হিমাদ্রির প্রতি মিলির অকুণ্ঠ ভালোবাসা ও আত্মসমর্পণে মিলি নিজের অস্তিত্ব ভুলে যায়। উভয়ের মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতে অবশেষে দুজনের পথ আলাদা হয়ে যায়। আসলে নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজের গণ্ডীতে আবদ্ধ হিমাদ্রী কিছুতেই তার জীবনের সীমাকে অতিক্রম করতে পারে না। হিমাদ্রীর কাছে নিজেকে উৎসর্গ করলেও মিলির ভালোবাসাকে বরণ করে নেওয়ার সাহস বা শক্তি কোনোটাই নেয় হিমাদ্রীর। এখানে নাট্যকার অসাধারণ ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন সামাজিক বৈষম্যকে। যে বৈষম্যের শিকার মিলি-হিমাদ্রী। যেখানে মিলি সমাজের বৈষম্যকে তোয়াক্কা না করে হিমাদ্রীর জগতকে আপন করে নিতে চেয়েছে, সেখানে হিমাদ্রী নিম্ন-মধ্যবিত্ত সুলভ ভীরুতায় বারবার পিছু হটেছে-

> "হিমাদ্রী: তোমার আমার জগতের এতো তফাৎ যে- মিলি: জগতের তফাৎ। জগতের তফাৎ। তোমার কাছে তোমার জগতটাই সব। আমি কিছু না। আমাকে তোমার কোনো দরকার নেই। (দ্বিতীয় অঙ্ক)[১০]

মিলি তার সর্বস্ব অর্পণ করে দিতে চায়। কিন্তু সামাজিক বৈষম্যের সংস্কারে বশবর্তী হিমাদ্রী নিজের জীবনের সঙ্গে মিলির জীবনকে মেলাতে পারে না। শেষ পর্যন্ত হিমাদ্রী মিলির ভালোবাসাকে উপেক্ষা করে মিলির বাবার দেওয়া চাকরিতে ইস্তাফা দেয়। নিজেকে বহুদূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। যেখানে মিলি তাকে কোনদিন খুঁজে পাবে না। হিমাদ্রীর কঠোর সিদ্ধান্ত মিলিতে ভেতর থেকে ভেঙে দেয়। তীব্র যন্ত্রণায় এক বুক হতাশা নিয়ে বলে ওঠে-

> "আমার জগৎ নেই আর। তোমার জগতে ষোলো আনা ঢুকতে পারিনি। কিন্তু আমারটা খুইয়েছি। কিন্তু তাতে তোমার কিছু আসে যায় না।"[১১]

শুধুমাত্র নিজের ভালোবাসার এই অপমান সহ্য করতে না পেরে মিলি বেছে আত্মহত্যার পথ।

উক্ত নাটকে আরও একটি নারী চরিত্রকে আমরা লক্ষ করি আমরা। যে কুলিকামিন লছমী। ঠিকাদার সাতুর জীবনে বহু মেয়ের আগমন ঘটে। তেমনিভাবেই একদিন লছমীও এসেছিল সাতুর জীবনে। ঠিকাদার সাতুর কাছে নারী শুধুমাত্র ভোগ্যপণ্য। কারণ বিবাহিত জীবন নিয়ে সাতুর উক্তি সত্যিই অবাক করে দেয়। তার কাছে বিবাহ শুধুমাত্র নারীদেহ ভোগ করার অধিকার পত্র। আসলে যার জীবনে প্রতিনিয়ত বহু নারীর আগমন ঘটে, তার কাছে বিবাহ শব্দটাই ব্যঙ্গজনক। আর এমনই বোহেমিয়ান চিত্তের অধিকারী সাতুর জীবনে আসে লছ্মী। যে লছ্মী মরিয়া হয়ে উঠেছিল সাতুর সঙ্গে ভালোবাসার ঘর বাঁধার জন্য, যে লছ্মী বাঁচতে চেয়েছিল সাতুকে আঁকড়ে ধরে, যে লছ্মী সাতুকে স্থান দিয়ে ছিল স্বামীর থেকেও উচ্চাসনে, সেই লছ্মীকে ও তার ভালোবাসাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে সাতু। আসলে মিলির ন্যায় লছ্মী নিজেকে অর্পণ করে দেয় সাতুর পদতলে। তাইতো ছেড়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ এলে লছ্মী বলে ওঠে-

> "তোমাকে ছেড়ে যাবো- মরলে"[১২]

তবে লছ্মীর শত কাতর অনুনয় বিনয় সত্ত্বেও লছমীকে দূরে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে সে। প্রতাখ্যাত লছ্মীর সেই তীব্র মর্মযন্ত্রণা সাতু দেখতে পায় মেয়েটার মধ্যে। ঘৃণাভরে তাড়িয়ে দিলেও লছমীর প্রেম-ভালোবাসার স্মৃতি সাতুকে কুরে কুরে খায়। কিন্তু লছমীর এই শুদ্ধতম ভালোবাসা সাতু উপলব্ধি করে তার মৃত্যুতে। তাই সাতুর উপলব্ধি -

> "মরণ দেখলেই বোধ হয় জীবন দেখা সম্ভব"[১৩]

এভাবেই নাট্যকার নাটকে ভিন্ন ভিন্ন নারী চরিত্রের মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে একটি নারীর মধ্যে তুলে ধরেছেন। যেখানে নাট্যকারের অভিনব দক্ষতার পরিচয় মেলে। আবার কম্পাউণ্ডার কার্তিক ও তার গল্পের মেয়ের যে

কাহিনি সেখানেও উঠেছে দ্বন্দ্ব-সংঘাত। কার্তিকের কম্পাউণ্ডারে আসা মেয়েটি জীবন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে বিষ চায়। জীবন তার কাছে হয়ে উঠেছে অসহ্য। মনের গহীনতায় বেঁচে থাকার তীব্র ইচ্ছা থাকলেও জীবন যন্ত্রণার কাছে পরাজিত মেয়েটি বলে ওঠে-

> "বেঁচে – কী হয়? মানুষ বাঁচতে চায় কেন? কী পায়?"[১৪]

তীব্র হতাশায় বলে ওঠে-

> "সত্যি বলছি- যন্ত্রণা আমি চাই। যন্ত্রণাও হয় না বলে- আপনার কাছে- বিষ চাইতে এসেছিলাম। আমি মরতে চাই না। আমি বাঁচতে চাই- যন্ত্রণা চাই।"[১৫]

তথাপি মৃত্যুকে বরণ করে নেয় মেয়েটি। মেয়েটি শুধুমাত্র জীবন যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল, কিন্তু তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তাই তো কার্তিক বলে ওঠে-

> "বেঁচে থাকলে সবই সম্ভব।"[১৬]

আসলে এই নাটকে প্রত্যেকের গল্প আলাদা হয়েও শেষে এক হয়ে যায়। এই তিন নারীর হৃদয় দ্বন্দ্ব সব শেষে মৃত্যুতেই সমাপ্ত হয়। অথচ এই নারীদের মনে ছিল বেঁচে থাকার তীব্র বাসনা। নারীমনের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব শুধু সে সময়কার সমাজে নয়, বর্তমান সমাজেও প্রতিনিয়ত কোনো না কোনো নারী ভিতরে ভিতরে দগ্ধ হয়ে চলেছে। যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ের ভার সহন করতে না পেরে জীবন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। তথাপি নাট্যকার নাটকের শেষ মুহূর্তে এসে জীবনের জয়গান গেয়েছেন। তাই তো নাট্যকার বলেছেন- "মরণ দেখলেই বোধ হয় জীবন দেখা সম্ভব।/ বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ভালো হয় না কখনো।"[১৭] এভাবেই নাট্যকার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবনকে উপস্থাপিত করলেও নারী হৃদয়ের অব্যক্ত যন্ত্রণা-ব্যথা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত সুনিপুণ রূপ পেয়েছে এই দুই নাটকে।

তথ্যসূত্র:

১) সরকার, বাদল। বাদল সরকার নাটক সমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড)। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৪১৭, পঞ্চম মুদ্রণ, জৈষ্ঠ্য ১৪৩০, পৃ. ২০৩।
২) তদেব, পৃ. ২০২।
৩) তদেব, পৃ. ২০৪।
৪) তদেব, পৃ. ২০১।
৫) তদেব, পৃ. ২০১।
৬) তদেব, পৃ. ২০১।
৭) তদেব, পৃ. ২০১।
৮) তদেব, পৃ. ২১৩।
৯) তদেব, পৃ. ৩৮৮।
১০) তদেব, পৃ. ৪২২।
১১) তদেব, পৃ. ৪২৩।
১২) তদেব, পৃ. ৪২৩।
১৩) তদেব, পৃ. ৪১১।
১৪) তদেব, পৃ. ৪৩৪।
১৫) তদেব, পৃ. ৪৩৫।
১৬) তদেব, পৃ. ৪৩৮।
১৭) তদেব, পৃ. ৪৩৮।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 930-936
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.308

বিদ্যাসাগরের দর্শনচিন্তা: যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ ও সামাজিক ন্যায়ের এক সমন্বিত দার্শনিক বিশ্লেষণ

জয়দীপ সাম, *অতিথি শিক্ষক, দাশরথি হাজরা মেমোরিয়াল কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 13.03.2026; Accepted: 18.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In the Bengal Renaissance of the nineteenth century, Ishwar Chandra Vidyasagar emerged as a thinker who constructed a distinctive philosophical position through social reform, the expansion of education, and moral courage. Although he was not a philosopher in the conventional academic sense, his writings, social movements, and critical engagement with scriptures reveal a coherent humanistic and rationalist philosophy. This article analyzes Vidyasagar's philosophical thought through the lenses of humanism, moral philosophy, social justice, critique of religion, and applied ethics. It also presents a comparative discussion of his ideas with the reformism of Raja Rammohan Roy and modern moral philosophy.

Keywords: Humanism, Rationalism, Applied Ethics, Social Justice, Renaissance

ঊনবিংশ শতাব্দী ছিল ভারতীয় সমাজজীবনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের যুগ। ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা, নতুন চিন্তাধারা এবং আধুনিক বৌদ্ধিক আন্দোলনের সংস্পর্শে এসে ভারতীয় সমাজে এক নতুন চেতনার উদ্ভব ঘটে, যা সাধারণত বাংলা নবজাগরণ নামে পরিচিত। এই নবজাগরণ কেবল সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তা সমাজসংস্কার, শিক্ষা, ধর্মীয় চিন্তা এবং নৈতিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই বৌদ্ধিক ও সামাজিক পরিবর্তনের যুগে যেসব মনীষী আধুনিকতার পথকে সুদৃঢ় করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগর কেবল একজন শিক্ষাবিদ বা সমাজসংস্কারকই নন; তিনি ছিলেন একজন গভীর মানবতাবাদী চিন্তাবিদ, যাঁর চিন্তার মূল ভিত্তি ছিল যুক্তি, মানবমর্যাদা এবং সামাজিক ন্যায়বোধ। তাঁর জীবন ও কর্ম বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তিনি সমাজের প্রচলিত কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস এবং অন্যায় প্রথার বিরুদ্ধে যুক্তি ও নৈতিকতার শক্তিকে কাজে লাগিয়েছিলেন। বিশেষত বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন, নারীশিক্ষা বিস্তার এবং শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা বাংলার সমাজজীবনে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করে।

বিদ্যাসাগরের দর্শনচিন্তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, তা কেবল তাত্ত্বিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ নয়; বরং বাস্তব সামাজিক সমস্যার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। তিনি বিশ্বাস করতেন যে দর্শনের প্রকৃত উদ্দেশ্য মানুষের জীবনকে

উন্নত করা এবং সমাজে ন্যায় ও মানবিকতার প্রতিষ্ঠা করা। তাই তাঁর চিন্তায় যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ এবং সামাজিক ন্যায়— এই তিনটি উপাদান একত্রে মিলিত হয়ে একটি সমন্বিত দার্শনিক অবস্থান তৈরি করেছে।

এছাড়াও বিদ্যাসাগরের চিন্তায় ঐতিহ্য ও আধুনিকতার এক সৃজনশীল সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। তিনি একদিকে ভারতীয় শাস্ত্র ও সংস্কৃতির গভীর জ্ঞানকে ধারণ করেছিলেন, অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার যুক্তিবাদী মনোভাবকে গ্রহণ করেছিলেন। এর ফলে তিনি সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে এমন এক মধ্যপন্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হন, যেখানে ঐতিহ্যের মূল্য অস্বীকার না করেও তার সমালোচনামূলক পুনর্মূল্যায়ন সম্ভব হয়।

এই প্রবন্ধে বিদ্যাসাগরের দর্শনচিন্তাকে বিশেষভাবে তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে— যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ এবং সামাজিক ন্যায়। এই তিনটি উপাদানের আলোকে তাঁর চিন্তা ও কর্মকে বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয় যে বিদ্যাসাগর কেবল একজন সমাজসংস্কারক নন; বরং তিনি আধুনিক ভারতীয় সমাজচিন্তার এক গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক ভিত্তি নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর দর্শনচিন্তা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক, কারণ তা আমাদের শেখায় যে যুক্তি, মানবিকতা এবং ন্যায়বোধের সমন্বয়ের মাধ্যমেই একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠন সম্ভব।

বিদ্যাসাগরের মানবতাবাদ: দর্শনের ভিত্তি

(ক) মানুষই সর্বোচ্চ মূল্য: নৈতিকতার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে মানবসত্তা

ঊনবিংশ শতকের বঙ্গসমাজে প্রচলিত ধর্মীয় ও সামাজিক প্রথাগুলির অধিকাংশই ছিল শাস্ত্রনির্ভর, অথচ মানবকল্যাণবিমুখ। এই প্রেক্ষাপটে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে নৈতিক অবস্থান গ্রহণ করেন, তার মৌলিক ভিত্তি ছিল— মানুষই সর্বোচ্চ মূল্য (man as the supreme value)। তাঁর দৃষ্টিতে সমাজ, শাস্ত্র, প্রথা কিংবা ধর্ম— এসবের মূল্য তখনই, যখন তা মানবজীবনের মর্যাদা, স্বাধীনতা ও কল্যাণকে সুরক্ষিত করে। বিদ্যাসাগরের এই অবস্থান এক ধরনের মানবকেন্দ্রিক নৈতিক বাস্তববাদ (anthropocentric ethical realism)। তিনি বিমূর্ত আধ্যাত্মিক তত্ত্বের পরিবর্তে বাস্তব মানবদুঃখকে নৈতিক বিচার-বিবেচনার মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করেন। বিধবা-বিবাহ প্রশ্নে তাঁর যুক্তি ছিল— একজন নারীর সারাজীবনের সামাজিক বঞ্চনা, দারিদ্র্য, মানসিক নিপীড়ন এবং অস্তিত্বগত অপমান কোনোভাবেই ধর্মের নামে ন্যায়সঙ্গত হতে পারে না। অর্থাৎ, তিনি প্রথাকে মানুষের উপরে স্থান দেননি; বরং মানুষকে প্রথার বিচারক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন।এখানে লক্ষণীয় যে, বিদ্যাসাগরের মানবতাবাদ কেবল আবেগনির্ভর সহানুভূতি নয়; বরং যুক্তিনির্ভর নৈতিক অবস্থান। তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রসমূহ বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেয়েছেন যে, মানবকল্যাণবিরোধী ব্যাখ্যাগুলি প্রকৃত শাস্ত্রসম্মত নয়। এর ফলে তাঁর মানবতাবাদ ধর্মবিরোধী নয়, বরং ধর্মের নৈতিক পুনর্ব্যাখ্যা। এই দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক নৈতিক দর্শনের কয়েকটি ধারার সঙ্গে তুলনীয়। যেমন, উপযোগবাদে মানবকল্যাণ সর্বোচ্চ মানদণ্ড; আবার কান্টীয় নীতিশাস্ত্রে মানুষকে 'উদ্দেশ্য' (end in itself) হিসেবে গণ্য করা হয়। বিদ্যাসাগর সরাসরি এসব পাশ্চাত্য তত্ত্ব অনুসরণ না করলেও তাঁর চিন্তায় মানুষের মর্যাদাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার যে প্রবণতা দেখা যায়, তা এক সার্বজনীন নৈতিক মানবতাবাদের পরিচায়ক।অতএব, বিদ্যাসাগরের মানবতাবাদের প্রথম ও প্রধান ভিত্তি হলো— মানুষ কোনো প্রথার অনুগত বস্তু নয়; বরং নৈতিক বিবেচনার কেন্দ্র। সমাজের মূল্য মানুষের জন্য।

(খ) করুণা ও নৈতিক দায়িত্ব: সহমর্মিতা থেকে নৈতিক কর্মে উত্তরণ:

বিদ্যাসাগরের মানবতাবাদের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো করুণা (compassion) এবং তা থেকে উদ্ভূত নৈতিক দায়িত্ববোধ। তাঁর ব্যক্তিজীবন ও কর্মজীবনের বহু ঘটনায় দেখা যায় যে, দুঃখী ও নিপীড়িত মানুষের প্রতি গভীর সহমর্মিতা তাঁকে সক্রিয় সামাজিক উদ্যোগে উদ্বুদ্ধ করেছে। কিন্তু তাঁর করুণা নিছক আবেগপ্রবণতা

নয়। এটি যুক্তিনিষ্ঠ এবং নৈতিকভাবে সংহত। তিনি মনে করতেন, অন্যের দুঃখ উপলব্ধি করা মানেই নৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয় থাকা নয়; বরং তা দায়িত্বের সূচনা। এই অর্থে তাঁর মানবতাবাদ এক ধরনের সক্রিয় নৈতিকতা (active ethics)। বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তিনি কেবল দুঃখ প্রকাশ করেননি; বরং আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান চেয়েছেন। ১৮৫৬ সালের Widow Remarriage Act প্রবর্তনে তাঁর ভূমিকা দেখায় যে, তিনি ব্যক্তিগত সহানুভূতিকে সামাজিক ন্যায়ে রূপান্তর করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, বিদ্যাসাগরের করুণা ছিল নৈতিক কর্মের প্রেরণা। তিনি করুণাকে দুর্বলতা হিসেবে দেখেননি; বরং এক নৈতিক শক্তি হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে করুণা মানে অন্যের অবস্থানকে নিজের বিবেকের অংশ করে নেওয়া।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক দিক লক্ষণীয়— বিদ্যাসাগরের নৈতিক দায়িত্ববোধ ব্যক্তিসীমায় সীমাবদ্ধ নয়; তা সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক। অর্থাৎ, ব্যক্তি যদি অন্যায় প্রথা বজায় রাখে, তবে সে নৈতিকভাবে দায়ী। আবার রাষ্ট্র যদি মানবকল্যাণবিরোধী আইন বহাল রাখে, তবে সেটিও নৈতিক বিচারে প্রশ্নবিদ্ধ।অতএব, বিদ্যাসাগরের মানবতাবাদে করুণা এক মৌলিক আবেগ হলেও তা যুক্তি ও নৈতিক দায়িত্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সহমর্মিতা থেকে কর্মে উত্তরণ— এই রূপান্তরই তাঁর দর্শনের প্রাণশক্তি।

বিদ্যাসাগরের দর্শনচিন্তায় যুক্তিবাদ:

ভারতীয় নবজাগরণের প্রেক্ষাপটে যুক্তিবাদ ছিল সমাজসংস্কারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। এই যুক্তিনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গিকে বাংলার সমাজজীবনে সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁর চিন্তা ও কর্মের মধ্যে এমন এক বৌদ্ধিক মনোভাব লক্ষ্য করা যায়, যেখানে অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার এবং অযৌক্তিক সামাজিক প্রথার পরিবর্তে যুক্তি ও বিবেককে প্রধান মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁর দর্শনচিন্তায় যুক্তিবাদ বলতে বোঝায়— যে কোনো সামাজিক প্রথা, ধর্মীয় বিধান বা প্রচলিত ধারণাকে অন্ধভাবে মেনে না নিয়ে যুক্তি ও মানবকল্যাণের আলোকে বিচার করা। বিদ্যাসাগরের মতে, সমাজে প্রচলিত অনেক প্রথা কেবল দীর্ঘদিন ধরে চলে আসার কারণে সত্য বা ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করা হয়। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন যে ঐতিহ্য বা প্রথার প্রাচীনতা কোনো কিছুকে নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য করে তোলে না। বরং মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা এবং যুক্তিবোধের মাধ্যমে প্রতিটি সামাজিক বিধানকে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। এই কারণে তিনি সামাজিক সমস্যাগুলিকে আবেগ বা অন্ধ বিশ্বাসের ভিত্তিতে নয়, যুক্তির ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন।

বিধবা-বিবাহ প্রসঙ্গে তাঁর অবস্থান বিদ্যাসাগরের যুক্তিবাদী মনোভাবের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। সে সময় সমাজে প্রচলিত ধারণা ছিল যে হিন্দু ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী বিধবা-বিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কিন্তু বিদ্যাসাগর যুক্তি ও শাস্ত্রসম্মত বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখান যে এই ধারণা একপাক্ষিক এবং গোঁড়া ব্যাখ্যার ফল। তিনি সংস্কৃত ধর্মশাস্ত্রের বিভিন্ন অংশ বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে বিধবা-বিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ নয় এবং সমাজের কল্যাণের স্বার্থে এর অনুমোদন থাকা উচিত। এর মাধ্যমে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণ সামাজিক সংস্কারের শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারে।

বিদ্যাসাগরের যুক্তিবাদ কেবল শাস্ত্রসমালোচনায় সীমাবদ্ধ ছিল না; তা শিক্ষা, ভাষা এবং সামাজিক চিন্তার ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হয়েছিল। তিনি বাংলা গদ্যকে সহজ ও যুক্তিসংগত রূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন, যাতে সাধারণ মানুষ জ্ঞান ও শিক্ষার সুযোগ লাভ করতে পারে। তাঁর রচিত পাঠ্যপুস্তকগুলোতে জটিল অলঙ্কারপূর্ণ ভাষার পরিবর্তে সরল, স্পষ্ট এবং যুক্তিনিষ্ঠ ভাষার ব্যবহার দেখা যায়। এর মাধ্যমে তিনি শিক্ষাকে অধিকতর গণমুখী ও বোধগম্য করে তুলতে চেয়েছিলেন।

অতএব, বিদ্যাসাগরের দর্শনচিন্তায় যুক্তিবাদ একটি মৌলিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। তাঁর মতে, যুক্তি মানুষের মুক্তির পথ উন্মুক্ত করে এবং সমাজকে কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস থেকে মুক্ত করতে সাহায্য করে। এই যুক্তিনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমেই তিনি মানবতাবাদ এবং সামাজিক ন্যায়ের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। ফলে বিদ্যাসাগরের যুক্তিবাদ কেবল বৌদ্ধিক মনোভাব নয়; এটি ছিল এক সামাজিক ও নৈতিক পরিবর্তনের শক্তিশালী মাধ্যম।

নারী মুক্তির দার্শনিক প্রকল্প:

(ক) শিক্ষা ও মানবমুক্তি: জ্ঞানের মাধ্যমে সামাজিক রূপান্তর

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নারীশিক্ষাকে কেবল একটি সামাজিক সংস্কারমূলক উদ্যোগ হিসেবে দেখেননি; বরং এক গভীর দার্শনিক মুক্তির প্রকল্প হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। তাঁর মতে, শিক্ষা মানুষের অন্তর্নিহিত বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক সম্ভাবনাকে বিকশিত করে। যে সমাজ নারীর শিক্ষাকে অস্বীকার করে, সে সমাজ ইচ্ছাকৃতভাবে তার অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখে।

ঊনবিংশ শতকের বঙ্গসমাজে নারীর অবস্থান ছিল গৃহকেন্দ্রিক ও নির্ভরশীল। বিদ্যাসাগর উপলব্ধি করেন যে, এই নির্ভরতার মূল কারণ অশিক্ষা। ফলে নারী কেবল অর্থনৈতিকভাবে নয়, নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকেও পরাধীন হয়ে পড়ে। তাঁর নারীশিক্ষা-আন্দোলন তাই এক ধরনের জ্ঞানভিত্তিক মুক্তির আন্দোলন—যেখানে জ্ঞানকে ক্ষমতায়নের (empowerment) প্রধান উপায় হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

এখানে শিক্ষাকে তিনি নিছক সাক্ষরতা হিসেবে দেখেননি; বরং তা নৈতিক চেতনার বিকাশের মাধ্যম। শিক্ষিত নারী কুসংস্কার ও অন্যায় প্রথার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলতে সক্ষম হন। অর্থাৎ, শিক্ষা সামাজিক কাঠামোর সমালোচনামূলক উপলব্ধির সুযোগ সৃষ্টি করে।

এই প্রেক্ষিতে বিদ্যাসাগরের অবস্থানকে এক ধরনের আলোকায়ন-চিন্তার (Enlightenment ideal) সঙ্গে তুলনা করা যায়, যেখানে যুক্তিবোধ ও জ্ঞানকে মুক্তির পথ হিসেবে ধরা হয়। তবে তাঁর বিশেষত্ব এই যে, তিনি এই আদর্শকে বাংলার বাস্তব সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ করেছেন।

(খ) জ্ঞান ও নৈতিক স্বায়ত্তশাসন: ব্যক্তিসত্তার বিকাশ

নারীশিক্ষা প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-এর চিন্তায় একটি গভীর দার্শনিক দিক প্রতিফলিত হয়, যা হলো জ্ঞান ও নৈতিক স্বায়ত্তশাসনের পারস্পরিক সম্পর্ক। বিদ্যাসাগরের মতে শিক্ষা কেবল জ্ঞানার্জনের একটি প্রক্রিয়া নয়; বরং এটি মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক এবং সামাজিক চেতনার বিকাশের প্রধান মাধ্যম। শিক্ষা মানুষের মধ্যে এমন এক সচেতনতা সৃষ্টি করে, যার ফলে ব্যক্তি নিজের জীবন, সমাজ এবং নৈতিক কর্তব্য সম্পর্কে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে সক্ষম হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা ব্যক্তির স্বতন্ত্র সত্তা বা ব্যক্তিসত্তার বিকাশে মৌলিক ভূমিকা পালন করে।

ঊনবিংশ শতকের বঙ্গসমাজে নারীদের সামাজিক অবস্থান ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। অধিকাংশ নারী শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল এবং সমাজের প্রচলিত নিয়ম ও প্রথার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে জীবনযাপন করত। ফলে তারা নিজের মতামত প্রকাশ বা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সুযোগ খুব কমই পেত। বিদ্যাসাগর উপলব্ধি করেছিলেন যে এই পরিস্থিতির মূল কারণ হলো অশিক্ষা এবং সামাজিক অচেতনতা। তাই তিনি মনে করতেন যে নারীদের প্রকৃত মুক্তি তখনই সম্ভব, যখন তারা শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান ও সচেতনতা অর্জন করবে। বিদ্যাসাগরের মতে জ্ঞান মানুষের মধ্যে আত্মসচেতনতা এবং আত্মসম্মানবোধ সৃষ্টি করে। শিক্ষিত ব্যক্তি কেবল বাহ্যিক নিয়মের অনুসারী হয়ে থাকে না; বরং নিজের বিবেক ও যুক্তিবোধের সাহায্যে নৈতিক সত্যকে উপলব্ধি

করার ক্ষমতা অর্জন করে। এই অবস্থাকে নৈতিক স্বায়ত্তশাসন বলা যায়। অর্থাৎ ব্যক্তি তখন অন্যের নির্দেশ বা সামাজিক চাপের উপর নির্ভর না করে নিজের বিবেক ও যুক্তির আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।এই প্রেক্ষাপটে বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা-চিন্তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষিত নারী কেবল পরিবার বা সমাজের নিষ্ক্রিয় সদস্য হয়ে থাকবে না; বরং তিনি যুক্তিবাদী ও সচেতন নাগরিক হিসেবে সমাজের উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারবেন। শিক্ষা নারীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে, তাদের চিন্তাশক্তি বিকশিত করে এবং সামাজিক অন্যায় ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস জোগায়।

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো— বিদ্যাসাগরের মতে শিক্ষা ব্যক্তিকে নৈতিক দায়িত্ববোধের দিক থেকেও পরিণত করে। শিক্ষিত ব্যক্তি কেবল নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা করে না; বরং সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের বিষয়েও সচেতন হয়। ফলে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে ব্যক্তি শুধু নিজের ব্যক্তিসত্তাকে বিকশিত করে না, বরং সমাজের প্রতি নিজের নৈতিক দায়িত্বও উপলব্ধি করতে শেখে।

এইভাবে বিদ্যাসাগরের চিন্তায় জ্ঞান, নৈতিক স্বায়ত্তশাসন এবং ব্যক্তিসত্তার বিকাশ একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তিকে জাগ্রত করে, নৈতিক বিচারবোধকে উন্নত করে এবং ব্যক্তিকে স্বাধীন ও মর্যাদাসম্পন্ন সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করে। তাই বলা যায়, বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা-চিন্তা কেবল সামাজিক সংস্কারের একটি কর্মসূচি নয়; বরং এটি মানুষের আত্মমুক্তি ও ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ বিকাশের একটি দার্শনিক প্রকল্প।

বাংলা নবজাগরণে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা:

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক ও বৌদ্ধিক ইতিহাসে বাংলা নবজাগরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই নবজাগরণের মাধ্যমে সমাজে নতুন চিন্তা, যুক্তিবাদী মনোভাব এবং মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে। এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বাংলা নবজাগরণের মূল লক্ষ্য ছিল সমাজের কুসংস্কার দূর করা, শিক্ষার প্রসার ঘটানো এবং মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা। বিদ্যাসাগর তাঁর চিন্তা ও কর্মের মাধ্যমে এই লক্ষ্যকে বাস্তব রূপ দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি মনে করতেন সমাজের প্রকৃত উন্নতি তখনই সম্ভব যখন মানুষ যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবে এবং মানবিক মূল্যবোধকে গুরুত্ব দেবে। নবজাগরণের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল শিক্ষা সংস্কার। তিনি বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষা মানুষের চিন্তাভাবনাকে মুক্ত করে এবং সমাজে যুক্তিবাদী মনোভাব গড়ে তোলে। এই কারণে তিনি বাংলা ভাষায় সহজ ও বোধগম্য পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন এবং সাধারণ মানুষের শিক্ষার প্রসারের জন্য কাজ করেন। তাঁর রচিত বর্ণপরিচয় বাংলা ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়। শিক্ষা ব্যবস্থাকে সহজ ও গণমুখী করার মাধ্যমে তিনি নবজাগরণের বৌদ্ধিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করেছিলেন। সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল বিধবা বিবাহ আন্দোলন। সেই সময়ে বিধবাদের জীবন অত্যন্ত করুণ ছিল এবং তাদের পুনরায় বিবাহ করার সুযোগ সমাজে ছিল না। বিদ্যাসাগর এই অন্যায় প্রথার বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ করেন। তিনি শাস্ত্রের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিয়ে প্রমাণ করেন যে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ নয়। তাঁর প্রচেষ্টার ফলে ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন প্রবর্তিত হয়। এই আন্দোলন বাংলা নবজাগরণের মানবতাবাদী ও প্রগতিশীল চেতনার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। বিদ্যাসাগরের মানবতাবাদী চিন্তাধারাও নবজাগরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি মানুষের দুঃখকষ্টকে গভীরভাবে অনুভব করতেন এবং সমাজে সহমর্মিতা ও মানবিকতার আদর্শ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। দরিদ্র ও অসহায় মানুষের প্রতি তাঁর সহানুভূতি এবং সাহায্যের মনোভাব তাঁকে একজন সত্যিকারের মানবতাবাদী চিন্তকে পরিণত করেছিল।

আধুনিক সমাজে বিদ্যাসাগরের চিন্তার প্রাসঙ্গিকতা:

ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজসংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন— যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ এবং সামাজিক ন্যায়— তা আজকের আধুনিক সমাজেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। সমাজ ও প্রযুক্তির অনেক পরিবর্তন ঘটলেও মানবিক মূল্যবোধ, সামাজিক সমতা এবং শিক্ষার গুরুত্ব আজও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক সমাজে তাঁর চিন্তার প্রাসঙ্গিকতা কয়েকটি দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যায়।

(ক) মানবিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের বিকাশ

বর্তমান সময়ে শিক্ষার মূল লক্ষ্য অনেক ক্ষেত্রেই কর্মসংস্থান বা অর্থনৈতিক সাফল্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। কিন্তু বিদ্যাসাগর মনে করতেন শিক্ষা কেবল জ্ঞানার্জনের জন্য নয়, বরং মানুষের নৈতিক ও মানবিক বিকাশের জন্য অপরিহার্য। তিনি শিক্ষাকে মানবিকতা, সহানুভূতি এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার সাথে যুক্ত করেছিলেন। আজকের সমাজে যখন সহিংসতা, অসহিষ্ণুতা এবং নৈতিক অবক্ষয়ের সমস্যা দেখা যায়, তখন বিদ্যাসাগরের মানবিক শিক্ষার ধারণা নতুন গুরুত্ব লাভ করে। শিক্ষাব্যবস্থায় মানবিক মূল্যবোধ, সামাজিক দায়িত্ব এবং সহমর্মিতার চর্চা বৃদ্ধি করা হলে একটি সুস্থ ও সহানুভূতিশীল সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।

(খ) নারীসমতা ও নারীমুক্তির ক্ষেত্রে গুরুত্ব

নারীশিক্ষা ও নারীর সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে নারী ও পুরুষ উভয়ের সমান অধিকার থাকা উচিত। ঊনবিংশ শতকে বিধবা বিবাহ প্রচলন এবং নারীশিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে তিনি নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করেছিলেন। আধুনিক যুগে নারীসমতার ধারণা আরও বিস্তৃত হয়েছে— নারীর শিক্ষা, কর্মসংস্থান, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং সামাজিক স্বাধীনতা আজ গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। তবুও বিশ্বের অনেক সমাজে নারীরা এখনও বৈষম্যের শিকার। এই প্রেক্ষাপটে বিদ্যাসাগরের নারীসমতার আদর্শ আধুনিক সমাজকে ন্যায়ভিত্তিক ও সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্য অনুপ্রাণিত করে।

(গ) যুক্তিবাদী চিন্তা ও কুসংস্কারমুক্ত সমাজ

বিদ্যাসাগরের চিন্তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল যুক্তিবাদ। তিনি সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার ও অযৌক্তিক প্রথার বিরুদ্ধে যুক্তির মাধ্যমে প্রতিবাদ করেছিলেন।

বর্তমান যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি সত্ত্বেও সমাজে এখনও অনেক ধরনের কুসংস্কার, গোঁড়ামি এবং ধর্মীয় সংকীর্ণতা বিদ্যমান। এই পরিস্থিতিতে বিদ্যাসাগরের যুক্তিবাদী চিন্তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। সমাজে যুক্তিবাদী মনোভাব এবং সমালোচনামূলক চিন্তার বিকাশ ঘটালে মানুষ অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে সত্য ও মানবকল্যাণের পথে অগ্রসর হতে পারে।

(ঘ) সামাজিক ন্যায় ও মানবাধিকারের ধারণা

বিদ্যাসাগরের চিন্তায় সামাজিক ন্যায়বোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে সমাজের প্রতিটি মানুষের সমান মর্যাদা ও অধিকার থাকা উচিত। সমাজে দুর্বল ও নিপীড়িত মানুষের প্রতি সহানুভূতি এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি কাজ করেছিলেন। আধুনিক সমাজে মানবাধিকার, সামাজিক সমতা এবং ন্যায়বিচারের প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতিগত, ধর্মীয় বা লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য দূর করার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের মানবতাবাদী দর্শন একটি শক্তিশালী নৈতিক ভিত্তি প্রদান করে।

(ঙ) সামাজিক সংস্কার ও গণচেতনার বিকাশ

বিদ্যাসাগর শুধু চিন্তাবিদ ছিলেন না; তিনি তাঁর চিন্তাকে বাস্তব সমাজে প্রয়োগ করেছিলেন। সমাজে পরিবর্তন আনতে হলে কেবল তত্ত্ব নয়, বাস্তব কর্মপ্রয়াসও প্রয়োজন— এই সত্য তিনি তাঁর জীবন ও কর্মের মাধ্যমে প্রমাণ করেছিলেন।

আধুনিক সমাজেও নানা ধরনের সামাজিক সমস্যা বিদ্যমান— দারিদ্র্য, বৈষম্য, শিক্ষার অসমতা, নারী নির্যাতন ইত্যাদি। এসব সমস্যার সমাধানের জন্য বিদ্যাসাগরের মতো মানবিক ও যুক্তিবাদী নেতৃত্ব অত্যন্ত প্রয়োজন।

(চ) ধর্মনিরপেক্ষ ও সহনশীল সমাজ গঠনে ভূমিকা

বিদ্যাসাগরের চিন্তার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল তাঁর উদার ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি ধর্মীয় সংকীর্ণতার পরিবর্তে মানবকল্যাণকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। আজকের বহুত্ববাদী সমাজে বিভিন্ন ধর্ম, সংস্কৃতি ও মতাদর্শের মানুষ একসাথে বসবাস করে। এই পরিস্থিতিতে সহনশীলতা, পারস্পরিক সম্মান এবং মানবিকতার আদর্শ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যাসাগরের উদার মানবতাবাদ আধুনিক সমাজে এই মূল্যবোধগুলোকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে।

উপসংহার:

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-এর দর্শনচিন্তা আমাদের শেখায়— দর্শন কেবল তত্ত্বচর্চা নয়; তা নৈতিক সাহস ও সামাজিক দায়িত্বের সমন্বয়। তাঁর যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ ও সামাজিক ন্যায়চেতনা আজও সমান প্রাসঙ্গিক। বাংলা নবজাগরণের প্রেক্ষাপটে তিনি কেবল একজন সমাজসংস্কারক নন; বরং এক প্রয়োগমূলক নৈতিক দার্শনিক।

গ্রন্থপঞ্জি:

1. Kopf, David. The Brahmo Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind. Princeton UP, 1979.
2. Sen, Amiya P. Ishwar Chandra Vidyasagar and His Elusive Milestones. Rupa Publications, 2013.
3. Sen, Amiya P. Vidyasagar Reconsidered. Modern Asian Studies, vol. 38, no. 2, 2004, pp. 405–421.
4. Datta, Kalikinkar. Ishwar Chandra Vidyasagar: His Life and Work. Firma KLM, 1966.
5. Raychaudhuri, Tapan. Europe Reconsidered: Perceptions of the West in Nineteenth-Century Bengal. Oxford UP, 1988.
6. Roy, Raja Rammohun. The English Works of Raja Rammohun Roy. Edited by Jogendra Chunder Ghose, Panini Office, 1906.
7. Vidyasagar, Ishwar Chandra. Bidhaba Bibaha. Calcutta, 1855.
8. Vidyasagar, Ishwar Chandra. Bahubivaha. Calcutta, 1871.
9. Vidyasagar, Ishwar Chandra. Barnaparichay. Calcutta, 1855.
10. Bhattacharya, Sabitri. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০১।
11. Bandyopadhyay, Asit Kumar. বাংলা নবজাগরণ ও বিদ্যাসাগর। দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৫।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 937- 945
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.309

ভগবদ্গীতার নিষ্কাম কর্ম এবং ইমানুয়েল কান্টের 'কর্তব্যের জন্য কর্তব্য'— এই দুইয়ের তুলনামূলক অধ্যয়ন

প্রিয়াঙ্কা পাল, *অতিথি অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ, ময়নাগুড়ি কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 13.03.2026; Accepted: 14.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The idea of selfless action in the Bhagavad Gita and Immanuel Kant's moral philosophy is compared philosophically in this essay, with special attention to the connection between Niskāma Karma and Kant's "duty for duty's sake" theory. Both faiths, in my opinion, provide deep ethical frameworks that stress acting morally without regard to one's own benefit or the effects on others. The Bhagavad Gita, which is credited to Vyasa, presents the idea of Niskāma Karma, which exhorts people to carry out their responsibilities with devotion to the divine order and without regard for the results of their deeds. On the other hand, Kant's deontological ethics, which he outlined in his groundbreaking work Groundwork of the Metaphysics of Morals, contends that moral worth is found in behaving out of obligation under the guidance of rational moral law as opposed to motivation or anticipated results. The conceptual underpinnings, parallels, and discrepancies between these two ethical viewpoints are examined in this paper. Although moral purpose and the inherent worth of responsibility are emphasized in both frameworks, they originate from different metaphysical and cultural settings. While Kant bases moral obligation on cognitive autonomy and the universal concept of the categorical imperative, the Bhagavad Gita places ethical behaviour within a spiritual worldview where selfless duty leads to liberation and harmony with cosmic order. By examining these convergences and divergences, the paper highlights how Eastern and Western ethical traditions offer complementary insights into the nature of moral responsibility and selfless action. In the end, the paper makes the case that a comparison between Kantian duty and Niskāma Karma enhances modern ethical discussion and offers a more profound philosophical explanation of moral behaviour driven by principle rather than self-interest.

Keywords: Niskāma Karma, Duty for Duty's Sake, Bhagavad Gita, Immanuel Kant, Moral Duty, Deontological Ethics

নৈতিক দর্শনের ইতিহাসে কর্তব্য, নৈতিকতা এবং কর্মের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত প্রশ্ন মানবচিন্তার অন্যতম মৌলিক সমস্যা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দার্শনিক ঐতিহ্যেই এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে গভীর আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষত ভারতীয় দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ ধর্মগ্রন্থ **ভগবদ্গীতা** এবং পাশ্চাত্যের আধুনিক নৈতিক দর্শনের অন্যতম প্রধান চিন্তাবিদ ইমানুয়েল কান্ট, উভয়ের চিন্তায় কর্তব্য ও কর্মের নৈতিক তাৎপর্য বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। ভগবদ্গীতার *নিষ্কাম কর্ম* (Niskāma Karma) ধারণা এবং কান্টের *duty for duty's sake* নীতি এই

দুই ভিন্ন সাংস্কৃতিক ধারার মধ্যেও এক গভীর নৈতিক সাদৃশ্যের দিক নির্দেশ করে। এই গবেষণাপত্রে আমি মূলত এই দুই নৈতিক ধারণার তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাদের দার্শনিক তাৎপর্য অনুধাবনের চেষ্টা করেছি। ভারতীয় দর্শনের প্রেক্ষাপটে ভগবদ্গীতা কেবল ধর্মীয় গ্রন্থ নয়, বরং একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক-দার্শনিক গ্রন্থ। এখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে কর্মতত্ত্ব শিক্ষা দেন তার কেন্দ্রবিন্দু হল *নিষ্কাম কর্ম* - অর্থাৎ ফলের আসক্তি ত্যাগ করে কর্তব্য পালন করা। গীতার বিখ্যাত শ্লোকে বলা হয়েছে—

> "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
> মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি॥"

অর্থাৎ, মানুষের অধিকার কেবল কর্মে, কখনোই তার ফলে নয়; কর্মফল যেন কর্মের উদ্দেশ্য না হয় এবং অকর্মের প্রতিও যেন আসক্তি জন্মায় না (Bhagavad Gītā, 2.47)।

এই শ্লোকটি গীতার নৈতিক দর্শনের কেন্দ্রীয় ভিত্তি, যেখানে কর্মের মূল্য ফলের উপর নয় বরং কর্তব্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। অনেক ব্যাখ্যাকার যেমন স্বামী গম্ভীরানন্দ উল্লেখ করেছেন যে গীতার এই শিক্ষা কর্মের মধ্যেই আত্মশুদ্ধি ও মুক্তির পথ নির্দেশ করে (Gambhirananda, 2008, p. 124)। অর্থাৎ কর্ম তখনই নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে মূল্যবান হয়ে ওঠে যখন তা ব্যক্তিগত লাভ বা আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত হয়ে কেবল কর্তব্যবোধের দ্বারা পরিচালিত হয়।

অন্যদিকে পাশ্চাত্য নৈতিক দর্শনে ইমানুয়েল কান্ট কর্তব্যকে নৈতিকতার একমাত্র ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Groundwork of the Metaphysics of Morals*-এ তিনি বলেন যে নৈতিকতার প্রকৃত মূল্য কর্মের ফল বা উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে না, বরং সেই নীতির উপর নির্ভর করে যার দ্বারা কর্মটি পরিচালিত হয়। কান্টের ভাষায়,

> "An action done from duty has its moral worth… not in the purpose to be attained by it, but in the maxim according to which it is decided upon." (Kant, 1785/1998, p. 14)

এই বক্তব্যের মাধ্যমে কান্ট স্পষ্টভাবে বলেন যে কোনো কর্মের নৈতিক মূল্য তার ফলাফলের মধ্যে নয়, বরং সেই নৈতিক নীতিতে নিহিত যার ভিত্তিতে কর্মটি সম্পাদিত হয়। তিনি আরও বলেন,

> "An action, to have moral worth, must be done from duty" (Kant, 1785/1998, p. 13)

অর্থাৎ সত্যিকারের নৈতিকতা তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় যখন ব্যক্তি কেবল কর্তব্যের প্রতি শ্রদ্ধা থেকেই কর্ম সম্পাদন করে, কোনো ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা বা স্বার্থের কারণে নয়।

এখানেই ভগবদ্গীতার *নিষ্কাম কর্ম* এবং কান্টের কর্তব্যনীতির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। উভয় দার্শনিক ধারাই কর্মের ফলকে নৈতিকতার মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে না; বরং কর্তব্য বা নৈতিক বিধির প্রতি আনুগত্যকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়। তবে একই সঙ্গে তাদের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্যও রয়েছে। গীতার নিষ্কাম কর্ম ধারণা মূলত আধ্যাত্মিক মুক্তি ও যোগদর্শনের সাথে যুক্ত, যেখানে কর্ম ঈশ্বরার্পণের মাধ্যমে আত্মোন্নতির পথ হয়ে ওঠে। অপরদিকে কান্টের নৈতিকতা সম্পূর্ণভাবে যুক্তিনির্ভর এবং *categorical imperative*-এর মাধ্যমে সার্বজনীন নৈতিক বিধির ধারণা প্রতিষ্ঠা করে। এই প্রেক্ষাপটে ভগবদ্গীতার নিষ্কাম কর্ম এবং কান্টের কর্তব্যনীতি উভয়ই নৈতিক দর্শনের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। একদিকে এগুলো মানবকর্মের নৈতিক ভিত্তি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে, অন্যদিকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক ঐতিহ্যের মধ্যে একটি বৌদ্ধিক সংলাপের ক্ষেত্রও সৃষ্টি করে। এই গবেষণায় আমি মূলত এই দুই

নৈতিক ধারণার মৌলিক নীতিসমূহ বিশ্লেষণ করে তাদের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেছি, যাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নৈতিক দর্শনের পারস্পরিক সম্পর্ক আরও স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায়।

ভগবদ্গীতায় নিষ্কাম কর্মের ধারণা:

ভগবদ্গীতা ভারতীয় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দর্শনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, যেখানে মানবজীবনের কর্তব্য, নৈতিকতা এবং মুক্তির পথ সম্পর্কে গভীর আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থের অন্যতম মৌলিক তত্ত্ব হল নিষ্কাম কর্ম (Niskāma Karma); অর্থাৎ ফলের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করে কর্তব্য পালন করা। গীতার এই ধারণা কেবল ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক উপদেশ নয়; বরং এটি এক গভীর নৈতিক দর্শন, যা মানুষের কর্মজীবনকে স্বার্থহীনতা ও কর্তব্যবোধের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। আমার মতে, ভগবদ্গীতার নিষ্কাম কর্মের ধারণা মানুষের নৈতিক আচরণকে এক উচ্চতর আদর্শে উন্নীত করে, যেখানে কর্মের মূল্য ব্যক্তিগত লাভে নয় বরং কর্তব্যের নিঃস্বার্থ সাধনায় নিহিত। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কর্মের প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন,

> "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
> মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোऽস্ত্বকর্মণি॥"

অর্থাৎ মানুষের অধিকার কেবল কর্মে, কখনোই তার ফলে নয়; কর্মফল যেন কর্মের উদ্দেশ্য না হয় এবং অকর্মের প্রতিও যেন আসক্তি জন্মায় না (Bhagavad Gītā, 2.47) ।

এই শ্লোকের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ কর্মযোগের মৌলিক নীতি স্থাপন করেছেন। এখানে কর্মের মূল্য ফলের উপর নির্ভর করে না; বরং কর্মের নৈতিকতা নির্ভর করে সেই মানসিক অবস্থার উপর, যার দ্বারা কর্ম সম্পাদিত হয়। অর্থাৎ মানুষকে তার কর্তব্য পালন করতে হবে, কিন্তু ফলের আকাঙ্ক্ষা বা ব্যক্তিগত লাভের প্রতি আসক্ত হওয়া উচিত নয়। অনেক দার্শনিক মনে করেন যে এই শিক্ষাই গীতার কর্মযোগ দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু।

ভারতীয় দার্শনিক ও ব্যাখ্যাকার **সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন** গীতার কর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে নিষ্কাম কর্ম মানুষের আত্মিক বিকাশের অন্যতম প্রধান পথ। তাঁর মতে,

> "The Gita asks us to work without attachment to the fruits of action" (Radhakrishnan, 1948, p. 156)

এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে গীতার মূল উদ্দেশ্য মানুষকে কর্মবিমুখ করা নয়, বরং তাকে স্বার্থহীন কর্মের মাধ্যমে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে পরিচালিত করা। একইভাবে স্বামী গম্ভীরানন্দ গীতার ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন যে ফলের প্রতি আসক্তি মানুষের মনকে অস্থির করে তোলে এবং তাকে বন্ধনের দিকে নিয়ে যায়। তিনি বলেন,

> "Your right is for action alone, never for the results" (Gambhirananda, 2008, p. 124)

তাঁর মতে, যখন মানুষ ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে কর্তব্য পালন করে, তখন তার মন স্থির ও সমবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই অবস্থাই প্রকৃত যোগের সূচনা।

নিষ্কাম কর্মের ধারণা আরও স্পষ্ট হয় গীতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শ্লোকে, যেখানে বলা হয়েছে,

> "যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
> সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥" (Bhagavad Gītā, 2.48)।

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দেন যে সফলতা বা ব্যর্থতার প্রতি সমভাব রেখে কর্তব্য পালন করাই প্রকৃত যোগ। অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মের মূল লক্ষ্য হল মানসিক সমতা এবং আধ্যাত্মিক মুক্তি। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে কর্ম তখনই সত্যিকার অর্থে নৈতিক হয়ে ওঠে যখন তা ব্যক্তিগত লাভ বা ক্ষতির হিসাব থেকে মুক্ত হয়ে সম্পাদিত হয়। এখানে লক্ষ্যণীয় যে ভগবদ্গীতার নিষ্কাম কর্ম ধারণা কোনো নিষ্ক্রিয়তার শিক্ষা দেয় না; বরং

এটি সক্রিয় ও দায়িত্বশীল জীবনযাপনের উপর জোর দেয়। গীতায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে ফলের প্রতি আসক্তি যেমন অনুচিত, তেমনি কর্মত্যাগও অনুচিত। বরং মানুষের কর্তব্য হল নিজ নিজ ধর্ম বা সামাজিক দায়িত্ব পালন করা এবং সেই কর্মকে ঈশ্বরের প্রতি নিবেদন করা। এইভাবেই কর্ম মানবজীবনের বন্ধন নয়, বরং মুক্তির পথ হয়ে ওঠে। সুতরাং বলা যায় যে ভগবদ্গীতায় নিষ্কাম কর্মের ধারণা এক গভীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শকে প্রতিফলিত করে। এখানে কর্মের প্রকৃত মূল্য নির্ধারিত হয় কর্মের ফল দ্বারা নয়, বরং কর্মের অন্তর্নিহিত কর্তব্যবোধ এবং নিঃস্বার্থ মানসিকতার দ্বারা। আমার দৃষ্টিতে, এই নীতি মানবজীবনের নৈতিক ভিত্তিকে দৃঢ় করে এবং ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের কল্যাণ সাধনে একটি সর্বজনীন নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।

কান্টের নৈতিক দর্শনে কর্তব্যের ধারণা:

পাশ্চাত্য নৈতিক দর্শনের ইতিহাসে ইমানুয়েল কান্ট (Immanuel Kant) এমন এক দার্শনিক যিনি নৈতিকতার ভিত্তি হিসেবে কর্তব্যকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে নৈতিকতার প্রকৃত ভিত্তি কোনো ফল, অনুভূতি বা ব্যক্তিগত স্বার্থ নয়; বরং মানুষের যুক্তিবোধ দ্বারা নির্ধারিত নৈতিক বিধি বা *moral law*-এর প্রতি শ্রদ্ধা থেকেই নৈতিক কর্মের জন্ম হয়। আমার দৃষ্টিতে, কান্টের নৈতিক দর্শন মানবকর্মের মূল্য নির্ধারণে একটি মৌলিক নীতি প্রতিষ্ঠা করে, যে নৈতিকতা তখনই সত্যিকার অর্থে প্রতিষ্ঠিত হয় যখন মানুষ কেবল কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য পালন করে। কান্ট তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Groundwork of the Metaphysics of Morals*-এ নৈতিকতার ভিত্তি হিসেবে "সু-ইচ্ছা" (*good will*)-কে সর্বোচ্চ নৈতিক মূল্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা নিঃশর্তভাবে ভালো, একমাত্র "good will" ছাড়া। এই good will তখনই প্রকাশিত হয় যখন মানুষ কেবল কর্তব্যবোধ থেকে কাজ করে। এই প্রসঙ্গে কান্ট স্পষ্টভাবে বলেন,

> "An action, to have moral worth, must be done from duty" (Kant, 1785/1998, p. 13)

এই বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চান যে কোনো কাজ যদি কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থ, আবেগ বা আকাঙ্ক্ষার দ্বারা পরিচালিত হয়, তবে তা নৈতিক মূল্য লাভ করতে পারে না। নৈতিকতার প্রকৃত ভিত্তি হল সেই মানসিক নীতি বা *maxim* যার দ্বারা কর্ম পরিচালিত হয়। তাই কান্ট বলেন,

> "An action done from duty has its moral worth… not in the purpose to be attained by it, but in the maxim according to which it is decided upon" (Kant, 1785/1998, p. 14)

এই উক্তি থেকে স্পষ্ট যে কান্টের মতে কোনো কর্মের নৈতিক মূল্য তার ফলাফলের উপর নির্ভর করে না; বরং নির্ভর করে সেই নৈতিক নীতির উপর যার দ্বারা কর্মটি সম্পাদিত হয়। অর্থাৎ কোনো কাজ যদি কেবল লাভ, সুখ বা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য করা হয়, তবে তা নৈতিকতার প্রকৃত মানদণ্ড পূরণ করে না। কান্ট নৈতিক কর্মের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য নির্দেশ করেন— "*acting according to duty*" এবং "*acting from duty*"। অনেক সময় মানুষ এমন কাজ করে যা কর্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কিন্তু সেই কাজের পেছনে প্রকৃত উদ্দেশ্য থাকে ব্যক্তিগত স্বার্থ বা আবেগ। এই ধরনের কর্ম নৈতিকতার প্রকৃত মূল্য বহন করে না। কান্ট একটি উদাহরণ দিয়ে বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি অন্যকে সাহায্য করে কেবল সহানুভূতি বা ব্যক্তিগত আনন্দের কারণে, তবে সেই কাজ প্রশংসনীয় হলেও তা প্রকৃত নৈতিক মূল্য বহন করে না; কারণ তা কর্তব্যবোধ থেকে সম্পাদিত হয়নি ।

এই কারণেই কান্ট কর্তব্যের ধারণাকে নৈতিকতার কেন্দ্রীয় নীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মতে, কর্তব্য হল "নৈতিক বিধির প্রতি শ্রদ্ধা থেকে কাজ করার অপরিহার্যতা"। তিনি বলেন,

> "Duty is the necessity of acting from respect for the law" (Kant, 1785/1998, p. 15)

এখানে "law" বলতে কোনো সামাজিক বা রাজনৈতিক আইন নয়; বরং যুক্তি দ্বারা নির্ধারিত সার্বজনীন নৈতিক বিধিকে বোঝানো হয়েছে। এই নৈতিক বিধিই পরবর্তীতে কান্টের বিখ্যাত *categorical imperative* ধারণায় প্রকাশিত হয়। কান্ট বলেন, আমাদের এমনভাবে কাজ করা উচিত যাতে আমাদের কর্মনীতি এমন একটি সর্বজনীন বিধি হয়ে উঠতে পারে যা সকল যুক্তিসম্পন্ন সত্তার জন্য প্রযোজ্য। অর্থাৎ নৈতিকতা তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় যখন কোনো কর্মনীতি সর্বজনীনভাবে প্রয়োগযোগ্য হয়। এইভাবে দেখা যায় যে কান্টের নৈতিক দর্শনে কর্তব্যের ধারণা সম্পূর্ণভাবে যুক্তিনির্ভর এবং সার্বজনীন নৈতিক বিধির উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে কর্মের ফলাফল বা ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কোনো ভূমিকা নেই; বরং নৈতিকতার মূল ভিত্তি হল নৈতিক বিধির প্রতি শ্রদ্ধা এবং সেই বিধি অনুসারে কর্ম সম্পাদন করা। আমার মতে, কান্টের এই নৈতিক তত্ত্ব মানবনৈতিকতার এক উচ্চতর আদর্শকে প্রতিফলিত করে, যেখানে ব্যক্তিগত স্বার্থের পরিবর্তে সার্বজনীন নৈতিক নীতির প্রতি আনুগত্যই নৈতিকতার প্রকৃত মানদণ্ড হয়ে ওঠে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে কান্টের কর্তব্যনীতি মানবকর্মকে এক গভীর নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে এবং নৈতিকতার একটি সর্বজনীন ও যুক্তিনির্ভর ব্যাখ্যা প্রদান করে। এই কারণেই আধুনিক নৈতিক দর্শনে কান্টের কর্তব্যতত্ত্ব একটি মৌলিক ও প্রভাবশালী দার্শনিক ধারণা হিসেবে বিবেচিত হয়, যা পরবর্তীকালে বিভিন্ন নৈতিক আলোচনার ভিত্তি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

নিষ্কাম কর্ম ও কর্তব্যনীতির মধ্যে সাদৃশ্য:

ভগবদ্গীতার নিষ্কাম কর্ম তত্ত্ব এবং ইমানুয়েল কান্টের কর্তব্যনীতি নৈতিক দর্শনের ইতিহাসে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দুই গুরুত্বপূর্ণ ধারাকে প্রতিনিধিত্ব করে। ভিন্ন সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত হলেও এই দুই তত্ত্বের মধ্যে কিছু মৌলিক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। আমার দৃষ্টিতে, এই সাদৃশ্যের প্রধান ভিত্তি হল— উভয় দর্শনই নৈতিক কর্মের মূল্য নির্ধারণে ফল বা পরিণামের পরিবর্তে কর্তব্যবোধকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে কর্মতত্ত্ব শিক্ষা দেন তার মূল লক্ষ্য হল কর্মফলের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করে কর্তব্য পালন করা। গীতায় বলা হয়েছে, "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" (Bhagavad Gītā, 2.47)। এই শ্লোকের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে মানুষের অধিকার কেবল কর্মে, কিন্তু তার ফলে নয়। অর্থাৎ মানুষের কর্তব্য হল নিজের নির্ধারিত কর্ম সম্পাদন করা, কিন্তু সেই কর্মের ফল লাভের প্রতি আসক্ত হওয়া উচিত নয়। এই ধারণাই গীতার নিষ্কাম কর্ম তত্ত্বের মূল ভিত্তি। গীতার এই নৈতিক অবস্থানকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনেক গবেষক উল্লেখ করেছেন যে গীতার কর্মযোগ মূলত স্বার্থহীন কর্তব্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত (Radhakrishnan, 1948, p. 156)।

অন্যদিকে কান্টের নৈতিক দর্শনেও একই ধরনের একটি ধারণা দেখা যায়। কান্টের মতে কোনো কর্ম তখনই প্রকৃত নৈতিক মূল্য লাভ করে যখন তা কেবল কর্তব্যবোধ থেকে সম্পাদিত হয়। তাঁর বিখ্যাত বক্তব্য, "An action, to have moral worth, must be done from duty" (Kant, 1785/1998, p. 13)। এখানে কান্ট স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে কোনো কাজ যদি ব্যক্তিগত স্বার্থ, আবেগ বা সুখ লাভের উদ্দেশ্যে করা হয়, তবে তা প্রকৃত নৈতিক মূল্য বহন করে না। নৈতিকতার প্রকৃত ভিত্তি হল কর্তব্যের প্রতি শ্রদ্ধা। এই কারণে তিনি আরও বলেন,

> "An action done from duty has its moral worth… not in the purpose to be attained by it" (Kant, 1785/1998, p. 14)

এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে কান্টের নৈতিক দর্শনে কর্মের মূল্য তার ফলাফলের উপর নির্ভর করে না; বরং নির্ভর করে সেই নৈতিক নীতির উপর যার দ্বারা কর্মটি সম্পাদিত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি গীতার নিষ্কাম কর্ম ধারণার সঙ্গে উল্লেখযোগ্যভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ।

অনেক দার্শনিক এই দুই নৈতিক তত্ত্বের মধ্যে এই মিলকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, কিছু তুলনামূলক গবেষণায় বলা হয়েছে যে গীতার নিষ্কাম কর্ম এবং কান্টের কর্তব্যনীতি উভয়ই "duty for duty's sake" ধারণাকে সমর্থন করে এবং উভয় ক্ষেত্রেই কর্মকে ফলের আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত রাখার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ উভয় দর্শনই মানুষের নৈতিক আচরণকে স্বার্থহীন কর্তব্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এছাড়া উভয় দর্শনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশ্য হল যে তারা উভয়েই নৈতিকতার ক্ষেত্রে আবেগ বা ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার প্রভাবকে সীমিত করতে চায়। গীতায় বলা হয়েছে যে আসক্তি, কামনা ও স্বার্থপরতা মানুষের মনকে অস্থির করে এবং তাকে নৈতিক পথ থেকে বিচ্যুত করে। একইভাবে কান্ট মনে করেন যে নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আবেগ নয়, বরং যুক্তি এবং নৈতিক বিধিই প্রধান নিয়ামক হওয়া উচিত। এই কারণে কান্টের নৈতিক দর্শন সম্পূর্ণভাবে যুক্তিনির্ভর এবং সার্বজনীন নৈতিক বিধির উপর প্রতিষ্ঠিত। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মিল হল যে উভয় দর্শনই নৈতিক কর্মকে ব্যক্তিগত লাভের পরিবর্তে বৃহত্তর মানবকল্যাণের সঙ্গে যুক্ত করে। গীতায় নিষ্কাম কর্মের লক্ষ্য হল *লোকসঙ্গ্রহ*— অর্থাৎ সমাজের কল্যাণ ও স্থিতি রক্ষা করা। একইভাবে কান্টের নৈতিক দর্শনে "kingdom of ends" ধারণার মাধ্যমে এমন একটি নৈতিক সমাজের কল্পনা করা হয়েছে যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যকে উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচনা করবে এবং কখনোই কেবল মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করবে না। এই দৃষ্টিভঙ্গি মানবমর্যাদা ও নৈতিক সমতার ধারণাকে শক্তিশালী করে। সুতরাং বলা যায় যে ভগবদ্গীতার নিষ্কাম কর্ম এবং কান্টের কর্তব্যনীতি ভিন্ন সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক প্রেক্ষাপটে বিকশিত হলেও তাদের মধ্যে একটি মৌলিক নৈতিক সাদৃশ্য বিদ্যমান। উভয় দর্শনই নৈতিক কর্মের মূল্য নির্ধারণে ফলের পরিবর্তে কর্তব্যবোধকে প্রধান ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং মানুষের নৈতিক জীবনকে স্বার্থহীনতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও নৈতিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছে। আমার মতে, এই সাদৃশ্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নৈতিক দর্শনের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধিক সংলাপের ক্ষেত্র সৃষ্টি করে, যা নৈতিক দর্শনের সার্বজনীনতা উপলব্ধিতে বিশেষ সহায়ক।

নিষ্কাম কর্ম ও কান্টীয় কর্তব্যনীতির মধ্যে পার্থক্য:

ভগবদ্গীতার নিষ্কাম কর্ম তত্ত্ব এবং ইমানুয়েল কান্টের কর্তব্যনীতি নৈতিক দর্শনের ইতিহাসে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক আদর্শ হলেও তাদের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখা গেছে যে উভয় তত্ত্বই কর্মের ফলের পরিবর্তে কর্তব্যবোধকে গুরুত্ব দেয়। তবে গভীর বিশ্লেষণে বোঝা যায় যে এই দুই দর্শনের নৈতিক ভিত্তি, উদ্দেশ্য এবং দার্শনিক কাঠামোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভিন্নতা রয়েছে। আমার দৃষ্টিতে, নিষ্কাম কর্ম ও কান্টীয় কর্তব্যনীতির পার্থক্য প্রধানত তিনটি ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়— নৈতিকতার ভিত্তি, কর্মের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য এবং নৈতিক বিধির প্রকৃতি। প্রথমত, নিষ্কাম কর্ম ও কান্টীয় কর্তব্যনীতির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হল নৈতিকতার ভিত্তি। ভগবদ্গীতার নিষ্কাম কর্ম মূলত আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠিত। এখানে কর্মের উদ্দেশ্য কেবল নৈতিক কর্তব্য পালন নয়, বরং আত্মশুদ্ধি ও মুক্তি (*মোক্ষ*) অর্জন করা। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দেন যে কর্মফলের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কর্ম সম্পাদন করতে হবে—

"मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य" (Bhagavad Gītā, 3.30)

অর্থাৎ, সকল কর্ম ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সমর্পণ কর (Radhakrishnan, 1948, p. 173)। এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে গীতার নিষ্কাম কর্ম ধারণা ঈশ্বরবাদী এবং আধ্যাত্মিক মুক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। অন্যদিকে কান্টের নৈতিক দর্শন সম্পূর্ণভাবে যুক্তিনির্ভর এবং ধর্মীয় ভিত্তির উপর নির্ভরশীল নয়। কান্টের মতে নৈতিকতার প্রকৃত উৎস হল মানুষের যুক্তি (*reason*) এবং সেই যুক্তি দ্বারা নির্ধারিত সার্বজনীন নৈতিক বিধি। তিনি বলেন, "Duty is the necessity of acting from respect for the law" (Kant, 1785/1998, p. 13) । অর্থাৎ নৈতিক কর্ম তখনই সত্যিকার অর্থে মূল্যবান হয় যখন তা নৈতিক বিধির প্রতি শ্রদ্ধা থেকে সম্পাদিত হয়। এখানে ঈশ্বর বা আধ্যাত্মিক মুক্তির ধারণা নৈতিকতার প্রধান ভিত্তি নয়; বরং যুক্তি দ্বারা নির্ধারিত নৈতিক আইনই প্রধান।

দ্বিতীয়ত, এই দুই তত্ত্বের মধ্যে কর্মের চূড়ান্ত উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। ভগবদ্গীতার নিষ্কাম কর্মের উদ্দেশ্য হল আধ্যাত্মিক মুক্তি এবং মানসিক সমতা অর্জন। গীতায় বলা হয়েছে, "যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি... সমত্বং যোগ উচ্যতে" (Bhagavad Gītā, 2.48)। এখানে কর্মযোগের লক্ষ্য হল সফলতা ও ব্যর্থতার প্রতি সমভাব বজায় রেখে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করা। শ্রী অরবিন্দ এই প্রসঙ্গে বলেন যে গীতার কর্মযোগ মানুষের কর্মকে "a means of spiritual realization" হিসেবে বিবেচনা করে (Aurobindo, 1997, p. 87)। অর্থাৎ কর্ম এখানে মুক্তির পথে একটি আধ্যাত্মিক অনুশীলন। কিন্তু কান্টের নৈতিক দর্শনে কর্মের লক্ষ্য আধ্যাত্মিক মুক্তি নয়; বরং নৈতিক বিধির প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে একটি সার্বজনীন নৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর বিখ্যাত নীতি অনুযায়ী, "I ought never to act except in such a way that I could also will that my maxim should become a universal law" (Kant, 1785/1998, p. 31)। এই নীতিকে তিনি *categorical imperative* নামে অভিহিত করেন। অর্থাৎ কোনো কর্ম তখনই নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য যখন সেই কর্মনীতি সকল মানুষের জন্য সার্বজনীন বিধি হিসেবে প্রযোজ্য হতে পারে।

তৃতীয়ত, নিষ্কাম কর্ম ও কান্টীয় কর্তব্যনীতির মধ্যে নৈতিক বিধির প্রকৃতিতেও পার্থক্য রয়েছে। গীতায় নৈতিকতা ব্যক্তির *স্বধর্ম* বা সামাজিক-নৈতিক দায়িত্বের সঙ্গে যুক্ত। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি তার সামাজিক অবস্থান, কর্তব্য এবং ধর্ম অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করবে। এই কারণে গীতার নৈতিকতা অনেকাংশে প্রসঙ্গনির্ভর ও ধর্মীয় দায়িত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত। অপরদিকে কান্টের নৈতিকতা সম্পূর্ণভাবে সার্বজনীন এবং প্রসঙ্গনিরপেক্ষ। তাঁর মতে নৈতিক বিধি এমন হতে হবে যা সকল যুক্তিসম্পন্ন সত্তার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। এজন্য কান্ট নৈতিকতার ভিত্তিকে ব্যক্তিগত বা সামাজিক অবস্থানের উপর নির্ভরশীল না করে যুক্তির সার্বজনীন নীতির উপর প্রতিষ্ঠা করেছেন। সুতরাং বলা যায় যে ভগবদ্গীতার নিষ্কাম কর্ম এবং কান্টীয় কর্তব্যনীতি উভয়ই নৈতিক কর্মে কর্তব্যবোধকে গুরুত্ব দিলেও তাদের মৌলিক দার্শনিক ভিত্তি ভিন্ন। নিষ্কাম কর্ম মূলত আধ্যাত্মিক মুক্তি ও ঈশ্বরার্পণের ধারণার সঙ্গে যুক্ত, যেখানে কর্ম আত্মোন্নতির পথ হিসেবে বিবেচিত। অন্যদিকে কান্টের কর্তব্যনীতি সম্পূর্ণভাবে যুক্তিনির্ভর এবং সার্বজনীন নৈতিক বিধির উপর প্রতিষ্ঠিত। আমার মতে, এই পার্থক্যই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নৈতিক দর্শনের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করে এবং তুলনামূলক নৈতিক দর্শনের আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।

সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা:

বর্তমান বিশ্বে নৈতিক সংকট, সামাজিক বৈষম্য, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা এবং ভোগবাদী মানসিকতার বৃদ্ধি মানবসমাজের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে ভগবদ্গীতার নিষ্কাম কর্ম তত্ত্ব এবং ইমানুয়েল কান্টের কর্তব্যনীতি নতুনভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আমার দৃষ্টিতে, এই দুই নৈতিক ধারণা কেবল ঐতিহাসিক বা দার্শনিক আলোচনা নয়; বরং সমকালীন সমাজে নৈতিক দায়িত্ববোধ,

সামাজিক ন্যায় এবং মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দিশা প্রদান করতে পারে। প্রথমত, আধুনিক সমাজে ব্যক্তিস্বার্থ ও ভোগবাদী প্রবণতার ফলে নৈতিক মূল্যবোধ অনেক ক্ষেত্রে দুর্বল হয়ে পড়ছে। এই পরিস্থিতিতে গীতার নিষ্কাম কর্ম তত্ত্ব মানুষের মধ্যে স্বার্থহীন কর্তব্যবোধের গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়। গীতায় বলা হয়েছে, "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" (Bhagavad Gītā, 2.47)। অর্থাৎ মানুষের অধিকার কেবল কর্মে, কিন্তু তার ফলে নয়। এই শিক্ষার মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে ব্যক্তিগত লাভের পরিবর্তে কর্তব্যনিষ্ঠ কর্মই মানবজীবনের প্রকৃত আদর্শ। ভারতীয় দার্শনিক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে গীতার কর্মতত্ত্ব মানুষের কর্মকে "detachment from the fruits of action"-এর মাধ্যমে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে পরিচালিত করে (Radhakrishnan, 1948, p. 156)। বর্তমান সমাজে যখন কর্মের মূল্য অনেক সময় কেবল ব্যক্তিগত লাভের দ্বারা নির্ধারিত হয়, তখন গীতার এই শিক্ষা মানবিক নৈতিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।

দ্বিতীয়ত, আধুনিক নৈতিক আলোচনায় কান্টের কর্তব্যনীতি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে, বিশেষত মানবাধিকার, ন্যায়বিচার এবং সামাজিক দায়িত্বের প্রশ্নে। কান্টের মতে কোনো কর্ম তখনই নৈতিক মূল্য লাভ করে যখন তা কেবল কর্তব্যবোধ থেকে সম্পাদিত হয়। তিনি বলেন,

> "An action done from duty has its moral worth… not in the purpose to be attained by it, but in the maxim according to which it is decided upon" (Kant, 1785/1998, p. 14)

এই বক্তব্যে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে নৈতিকতার ভিত্তি কর্মের ফল নয়, বরং সেই নৈতিক নীতি যার দ্বারা কর্ম পরিচালিত হয়। সমকালীন মানবাধিকার দর্শন ও নৈতিক আইনের আলোচনায় এই ধারণা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি মানুষের মর্যাদা এবং নৈতিক স্বাধীনতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে। তৃতীয়ত, বর্তমান বিশ্বে নৈতিক নেতৃত্ব এবং সামাজিক দায়িত্বের প্রশ্নে এই দুই দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। গীতার নিষ্কাম কর্ম তত্ত্ব অনুযায়ী নেতার কর্তব্য হল ব্যক্তিগত লাভের কথা চিন্তা না করে সমাজের কল্যাণে কাজ করা। গীতায় *লোকসঙ্গ্রহ* ধারণার মাধ্যমে বলা হয়েছে যে সমাজের স্থিতি ও কল্যাণ রক্ষার জন্য দায়িত্বশীল কর্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একইভাবে কান্টের নৈতিক দর্শনে "categorical imperative"-এর ধারণা মানবমর্যাদা এবং নৈতিক সমতার ভিত্তিতে একটি ন্যায়সঙ্গত সমাজ গঠনের নির্দেশ দেয়। কান্টের মতে, মানুষের এমনভাবে কাজ করা উচিত যাতে তার কর্মনীতি একটি সার্বজনীন নৈতিক বিধি হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে (Kant, 1785/1998, p. 31)।

চতুর্থত, সমকালীন পেশাগত নৈতিকতা; যেমন চিকিৎসা, শিক্ষা, প্রশাসন এবং ব্যবসায়িক নীতিশাস্ত্র— ক্ষেত্রেও এই দুই দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। আধুনিক পেশাগত জীবনে নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনেক সময় ব্যক্তিগত লাভ, ক্ষমতা বা প্রতিযোগিতার দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই পরিস্থিতিতে নিষ্কাম কর্মের স্বার্থহীনতা এবং কান্টের কর্তব্যনীতির নৈতিক বাধ্যবাধকতা পেশাগত নৈতিকতার একটি শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করতে পারে। অতএব বলা যায় যে ভগবদ্গীতার নিষ্কাম কর্ম এবং কান্টের কর্তব্যনীতি কেবল ঐতিহাসিক দার্শনিক ধারণা নয়; বরং সমকালীন নৈতিক সংকটের প্রেক্ষাপটে তাদের গভীর তাৎপর্য রয়েছে। আমার মতে, এই দুই নৈতিক তত্ত্ব মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে নৈতিক দায়িত্ববোধ, স্বার্থহীনতা এবং সার্বজনীন মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দিশা প্রদান করতে সক্ষম। এই কারণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই দুই মহান নৈতিক দর্শনের তুলনামূলক অধ্যয়ন বর্তমান যুগেও বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক এবং তা নৈতিক দর্শনের একটি সমন্বিত ও সার্বজনীন উপলব্ধি গঠনে সহায়ক।

উপসংহার:

ভগবদ্গীতার নিষ্কাম কর্ম তত্ত্ব এবং ইমানুয়েল কান্টের কর্তব্যনীতি নৈতিক দর্শনের ইতিহাসে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী ধারণা, যা ভিন্ন সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক প্রেক্ষাপটে বিকশিত হলেও মানবনৈতিকতার মৌলিক প্রশ্নগুলোর প্রতি গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। এই গবেষণায় আমি মূলত এই দুই নৈতিক তত্ত্বের তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাদের মৌলিক সাদৃশ্য, পার্থক্য এবং সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা অনুধাবনের চেষ্টা করেছি। ভগবদ্গীতার নিষ্কাম কর্ম তত্ত্ব মানুষের কর্মজীবনকে স্বার্থহীনতা, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং আধ্যাত্মিক চেতনার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এখানে কর্মের মূল উদ্দেশ্য কেবল বাহ্যিক সাফল্য অর্জন নয়; বরং কর্মফলের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করে আত্মিক উন্নতি ও মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়া। গীতার এই দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে এক ধরনের নৈতিক সংযম ও মানসিক সমতার শিক্ষা দেয়। অন্যদিকে কান্টের কর্তব্যনীতি সম্পূর্ণভাবে যুক্তিনির্ভর এবং সার্বজনীন নৈতিক বিধির উপর প্রতিষ্ঠিত। কান্টের মতে কোনো কর্ম তখনই প্রকৃত নৈতিক মূল্য লাভ করে যখন তা কেবল কর্তব্যবোধ থেকে সম্পাদিত হয় এবং সেই কর্মনীতি এমন হতে পারে যা সকল মানুষের জন্য একটি সার্বজনীন নৈতিক বিধি হিসেবে গ্রহণযোগ্য। এই দুই তত্ত্বের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য হল যে উভয়ই কর্মের ফল বা ব্যক্তিগত স্বার্থের পরিবর্তে কর্তব্যবোধকে নৈতিকতার প্রধান ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে। তবে তাদের মৌলিক পার্থক্যও স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। গীতার নিষ্কাম কর্ম তত্ত্ব মূলত আধ্যাত্মিক মুক্তি ও ঈশ্বরার্পণের ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত, যেখানে কর্ম আত্মোন্নতির একটি পথ হিসেবে বিবেচিত। অপরদিকে কান্টের কর্তব্যনীতি সম্পূর্ণভাবে যুক্তি এবং সার্বজনীন নৈতিক বিধির উপর প্রতিষ্ঠিত, যেখানে নৈতিকতার ভিত্তি ধর্মীয় বিশ্বাস নয় বরং মানবীয় যুক্তি। আমার দৃষ্টিতে, ভগবদ্গীতার নিষ্কাম কর্ম এবং কান্টের কর্তব্যনীতি উভয়ই মানবনৈতিকতার একটি উচ্চতর আদর্শকে প্রতিফলিত করে। এই দুই দর্শনের তুলনামূলক অধ্যয়ন আমাদেরকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নৈতিক চিন্তার মধ্যে একটি গভীর বৌদ্ধিক সংলাপের সম্ভাবনা উপলব্ধি করতে সহায়তা করে। বর্তমান যুগে যখন নৈতিক মূল্যবোধ বিভিন্ন সংকটের সম্মুখীন, তখন এই দুই মহান দার্শনিক ঐতিহ্যের শিক্ষাগুলো মানবসমাজে নৈতিক দায়িত্ববোধ, স্বার্থহীনতা এবং সার্বজনীন মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি:

1. Agrawal, M. M., & Mishra, S. K. (2013). *Gita and Kant: An Ethical Study*. Varanasi: Chaukhamba Surbharati Prakashan.
2. Aurobindo, S. (1997). *Essays on the Gita*. Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram.
3. Bhagavad Gītā. (2017). *The Bhagavad Gita* (Chapter 2, Verse 47).
4. Gambhirananda, S. (Trans.). (2008). *Bhagavad Gita with the commentary of Shankaracharya*. Advaita Ashrama.
5. Kant, I. (1998). *Groundwork of the Metaphysics of Morals* (M. Gregor, Trans.). Cambridge University Press. (Original work published 1785).
6. Kant, I. (1785/2002). Fundamental Principles of the Metaphysic of Morals (T. K. Abbott, Trans.). Prometheus Books.
7. Paton, H. J. (1964). *The categorical imperative: A study in Kant's moral philosophy*. University of Pennsylvania Press.
8. Radhakrishnan, S. (1948). *The Bhagavadgita*. London: George Allen & Unwin.
9. Russell, B. (2004). *History of Western Philosophy*. Routledge.
10. Tilak, B. G. (2000). *Srimad Bhagavad Gita Rahasya*. Pune: Tilak Brothers.
11. Wood, A. (2014). *Kantian ethics*. Cambridge University Press.

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 946-955
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.310

যুক্তির বৈধতা বিচারে সত্যসারণী নির্ণয় পদ্ধতির সীমা এবং অবরোহী প্রমাণ পদ্ধতির সূচনা

রাগাই হেমব্রম, *রিসোর্স পার্সন, দর্শন বিভাগ (সাঁওতালি মাধ্যম, অল-চিকি লিপি), সাধু রামচাঁদ মুর্মু বিশ্ববিদ্যালয়, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 19.03.2026; Accepted: 26.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

According to copi an argument is any group of propositions of which one is claimed to follow from the others which are regarded as providing support or grounds for the truth of the one. Validity is the characteristic of an argument. In Logic, the validity of an argument refers to the validity of its form or structure. If an argument is valid, it ensures that the conclusion follows necessarily from the premises. For example

If Rimi Comes then I will go.
Rimi has come.
Therefore, I will go.

The form of this argument is- If p then q
p
Therefore, q

This argument form is valid because here the conclusion 'q' follows necessarily from the premises 'if p then q' and 'p'. So the above argument is valid. In logic, if the form of an argument is valid, then all argument of that form are valid.

There are two main methods for determine the validity of an argument, one is the Decision procedure and another is Proof procedure. The method by which we can decide the validity or invalidity of an argument is called Decision procedure. e.g Truth table, Venn Diagram, Resolution all of these methods are Decision procedure. And the method by which we definitively prove whether an argument is valid or invalid is called Proof procedure. The method of deduction is one kind of proof procedure.

Although the validity of an argument can be decide and proven through many kinds of method. The study highlights the limitations of the truth table method in decide the validity of an argument. As well as the introduction of the method of deduction.

Keywords: argument, decision procedure, proof procedure, truth table, deduction method

যুক্তি বলতে বোঝায় এমন বচনের সমষ্টি যা একটি বচন অপর এক বা একাধিক বচন থেকে অনুসৃত হয়। প্রত্যেক যুক্তির দুটি অবয়ব থাকে। সেগুলি হল আশ্রয় বাক্য বা হেতুবাক্য এবং সিদ্ধান্ত। কোন বচন বা বচন সমষ্টি থেকে যে বচনটি নিঃসৃত হয় তাকে সিদ্ধান্ত বলে। আর সিদ্ধান্তটি যে বচন বা বচন সমষ্টি থেকে নিঃসৃত হয় সেই বচন বা বচন সমষ্টিকে আশ্রয়বাক্য বা হেতুবাক্য বলে। যেমন-

(১) যদি বরফ পড়ে তবে ঠান্ডা বাড়বে
(২) বরফ পড়েছে
(৩) ∴ ঠান্ডা বাড়বে

এখানে ৩ নং বচনটি ১ এবং ২ নং বচন থেকে নিঃসৃত হয়েছে তাই ৩ নং বচনটি হল সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্তটি যেহেতু ১ ও ২ নং বচন থেকে নিঃসৃত হয়েছে তাই ১ ও ২ নং বচন হল আশ্রয়বাক্য বা হেতুবাক্য।

বৈধতা হল যুক্তির এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কেবল যুক্তিকেই আমরা বৈধ অথবা অবৈধ বলতে পারি। এখানে যুক্তির বৈধতা বলতে যুক্তির আকারগত বৈধতার কথায় বলা হয়। অর্থাৎ যুক্তির আকার বৈধ হলেই যুক্তিটি বৈধ হয়। কোন যুক্তির আকারকে বৈধ বলার অর্থ হল ওই যুক্তি আকারটির সমস্ত নিবেশন দৃষ্টান্ত অর্থাৎ ওই আকারের যেকোনো যুক্তি বা সকল যুক্তি যে বৈধ সে কথা বলা হয়। কোন একটি যুক্তি বৈধ হবে যখন এমন দেখা যাবে না যে হেতুবাক্য সত্য এবং সিদ্ধান্ত মিথ্যা। আর যদি হেতুবাক্য সত্য এবং সিদ্ধান্ত মিথ্যা হয় তাহলে যুক্তিটি অবৈধ হবে। উপরে উল্লেখিত যুক্তির আকার হবে নিম্নরূপ-

$$p \supset q$$
$$p$$
$$\therefore q$$

এখানে হেতুবাক্য '$p \supset q$' ও 'p' যদি সত্য হয় তাহলে সিদ্ধান্ত 'q' সত্য হবে। অর্থাৎ হেতুবাক্য গুলি থেকে সিদ্ধান্তটি অনিবার্য ভাবে নিঃসৃত হয়। তাই উক্ত যুক্তির আকারটি বৈধ। সুতরাং উপরে উল্লেখিত যুক্তিটিও বৈধ। এখানে আর একটি কথা উল্লেখ প্রয়োজন, শুধুমাত্র উল্লেখিত যুক্তিটিই বৈধ নয়, এই আকারের যতগুলি যুক্তি হবে সবকটি যুক্তিই বৈধ হবে। একটি যুক্তির আকার থেকে যেসব যুক্তি পাওয়া যায় তাকে ঐ যুক্তি আকারের নিবেশন দৃষ্টান্ত বলা হয়। যেমন-

$$p \supset q$$
$$p$$
$$\therefore q$$

এই যুক্তি আকার থেকে নিম্নলিখিত যুক্তিও পাওয়া যাবে-

যদি বৃষ্টি পড়ে তবে মাটি ভিজবে
বৃষ্টি পড়ছে
সুতরাং, মাটি ভিজছে

সুতরাং এই যুক্তটি হল উপরে উল্লেখিত যুক্তি আকারের নিবেশন দৃষ্টান্ত।

যুক্তির বৈধতা বিচারের জন্য মূলত দুটি পদ্ধতি রয়েছে, সেগুলি হল- নির্ণয় পদ্ধতি (Decision procedure) এবং প্রমাণ পদ্ধতি (proof procedure)। যে পদ্ধতির সাহায্যে একটি যুক্তি বৈধ কি অবৈধ তা নির্ণয় করা হয় তাকে নির্ণয় পদ্ধতি বলা হয়। সত্যসারণী (Truth table), ভেনচিত্র (Venn diagram), লঘুকরণ (Resolution) এগুলি সবই যুক্তির বৈধতা বিচারের নির্ণয় পদ্ধতি। নির্ণয় পদ্ধতির সাহায্যে সুনির্দিষ্ট ভাবে বোঝা যায় একটি যুক্তি বৈধ অথবা অবৈধ। অপরদিকে যে পদ্ধতির সাহায্যে একটি যুক্তির বৈধতা প্রমাণ

করে দেখানো হয় তাকে যুক্তির বৈধতা বিচারের প্রমাণ পদ্ধতি বলা হয়। অবরোহন পদ্ধতি (Deduction Method) একটি প্রমাণ পদ্ধতি।

সত্যসারণী পদ্ধতির সীমা:

যুক্তির বৈধতা বিচারের নির্ণয় পদ্ধতি গুলির মধ্যে অন্যতম হল সত্যসারণী পদ্ধতি। এই পদ্ধতির সাহায্যে একটি যুক্তি বৈধ কি অবৈধ তা সহজেই নির্ণয় করা যায়। সত্যসারণী হল এমন এক বিন্যাস যেখানে কোন যৌগিক বচনের সকল অঙ্গ বচনের সকল সম্ভাব্য সত্যমূল্য দেখানো হয়। যেমন 'p⊃q' এই বচনাকারের অন্তর্গত অঙ্গ বচন দুটি p এবং q। একটি বচনের সত্যমূল্য (সত্য, মিথ্যা) দুটি হলে, দুটি বচনের চারটি সম্ভাব্য সত্যমূল্য হয়। সুতরাং দুটি বচন দিয়ে গঠিত যৌগিক বচনের সত্যসারণীতে চারটি সারি থাকবে। যেমন 'p⊃q' যৌগিক বচনের অঙ্গ বচন p ও q এর সম্ভাব্য সত্যমূল্য হবে –

p	q
T	T
T	F
F	T
F	F

একই রকম ভাবে সত্যসারণীর সাহায্যে যুক্তি আকারের বৈধতা নির্ণয়ের জন্য যুক্তির অন্তর্গত বচনের সকল অঙ্গ বচন গুলির সম্ভাব্য সত্যমূল্য বের করা হয়। তারপর হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তের সত্যমূল্য নির্ণয় করা হয়। সত্যসারণী গঠন করে যদি দেখা যায় অন্ততপক্ষে কোন একটি সারিতে হেতুবাক্য গুলি সত্য এবং সিদ্ধান্ত মিথ্যা, তাহলে যুক্তিটি অবৈধ হয়। আর যদি কোন সারিতে এরকম না দেখা যায় অর্থাৎ হেতুবাক্য সত্য এবং সিদ্ধান্ত মিথ্যা এরকম দেখা না যায়, তাহলে যুক্তিটি বৈধ হয়। উক্ত বিষয়টিকে দুটি উদাহরণের সাহায্যে বোঝা যাক।

প্রথম উদাহরণ:

রবীন্দ্রনাথ হয় কবি অথবা দার্শনিক
রবীন্দ্রনাথ নয় কবি
∴ রবীন্দ্রনাথ হয় দার্শনিক

যুক্তিটির আকার হল–

p ν q
~ p
∴ q

উক্ত যুক্তির যৌগিক বচন গুলির মোট অঙ্গ বচন রয়েছে দুটি p এবং q। তাহলে সত্যসারণীতে মোট সারি হবে চারটি। নিম্নে অঙ্গ বচন, হেতুবাক্য এবং সিদ্ধান্তের সম্ভাব্য সত্যমূল্য নির্ণয় করা হল –

p	q	p ν q	~ p	q
T	T	T	F	T
T	F	T	F	F

F	T	T	T	T
F	F	F	T	F

উপরিক্ত সত্যসারণীতে প্রথম দুটি স্তম্ভতে রয়েছে অঙ্গ বচন এবং তৃতীয় ও চতুর্থ স্তম্ভে রয়েছে হেতুবাক্য এবং শেষ স্তম্ভে রয়েছে সিদ্ধান্ত। এই সত্যসারণীতে দেখা যাচ্ছে যে এমন কোন সারি নেই যেখানে হেতুবাক্য গুলি সত্য এবং সিদ্ধান্ত মিথ্যা। সুতরাং যুক্তিটি বৈধ।

দ্বিতীয় উদাহরণ:

যদি রিমা আসে তাহলে আমি যাব
রিমা আসেনি
∴ আমি যাব না

যুক্তিটির বিশেষ আকার হল–

$$p \supset q$$
$$\sim p$$
$$\therefore \sim q$$

উক্ত যুক্তির যৌগিক বচন গুলির অঙ্গ বচন রয়েছে দুটি p এবং q। তাহলে তাহলে এখানেও সত্যসারণীতে মোট সারি হবে চারটি। নিম্ন অঙ্গ বচন, হেতুবাক্য এবং সিদ্ধান্তের সম্ভাব্য সত্যমূল্য নির্ণয় করা হল।

p	q	$p \supset q$	$\sim p$	$\sim q$
T	T	T	F	F
T	F	F	F	T
F	T	**T**	**T**	**F**
F	F	T	T	T

উক্ত সত্যসারণীতে প্রথম দুটি স্তম্ভ হল অঙ্গ বচনের সম্ভাব্য সত্যমূল্য। তৃতীয় এবং চতুর্থ স্তম্ভ হল হেতুবাক্যের সত্যমূল্য এবং শেষ স্তম্ভ হল সিদ্ধান্তের সত্যমূল্য। এই সত্যসারণীর তৃতীয় সারিতে দেখা যাচ্ছে হেতুবাক্য গুলি সত্য এবং সিদ্ধান্ত মিথ্যা। তাই উক্ত যুক্তিটি অবৈধ।

উপরিক্ত আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম যে সত্যসারণী নির্ণয় পদ্ধতির সাহায্যে সহজেই যুক্তির বৈধতা নির্ণয় করা যায়। আমরা জানি সত্যসারণীতে একটি অঙ্গ বচনের জন্য সত্যমূল্য দুটি (T, F)। তেমনি দুটি হলে $2\times2=4$ টি, তিনটি হলে $2\times2\times2=8$ টি হয়। এরকম করে যদি যুক্তির অঙ্গ বচনের সংখ্যা বেড়ে যায় তাহলে সত্যমূল্যের সারির সংখ্যাও বেড়ে যাবে, ফলে বৈধতা নির্ণয় করা জটিল হয়ে যাবে। বলা যায় সত্যসারণী পদ্ধতি বৈধতা নির্ণয়ের জন্য অত্যন্ত সহজ ও সরল হলেও অপেক্ষাকৃত ছোট ও সরল বচন দ্বারা গঠিত কোন যুক্তির ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব। দীর্ঘ ও জটিল বচন দ্বারা গঠিত যুক্তির ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি সার্থক ভাবে প্রয়োগ করা যায় না। কারণ এরূপ ক্ষেত্রে সত্যসারণীটি একটি বিশাল আকার ধারণ করে। যেমন–

$$A \supset (B \supset D)$$
$$\sim C \supset (D \supset G)$$

$A \supset G$

$\sim C$

$\therefore B \supset G$

এই যুক্তটিতে মোট পাঁচটি অঙ্গ বচন আছে। তাই সত্যসারণী পদ্ধতির সাহায্যে এই যুক্তির বৈধতা বিচার করতে হলে মোট 32 টি সারির প্রয়োজন হবে। যা দেখানো খুব জটিল। তাই বলা যায় যুক্তিবিজ্ঞানে বৈধতা বিচারের জন্য সত্যসারণী নির্ণয় পদ্ধতির কোন সীমা উল্লেখ না থাকলেও সব ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির সাহায্যে বৈধতা বিচার করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ সত্যসারণী পদ্ধতি এক সময় সীমায়িত হয়ে পড়ে।

অবরোহী পদ্ধতি (Method of deduction):

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম যে সত্যসারণী পদ্ধতির সাহায্যে দীর্ঘ, জটিল বচন দ্বারা গঠিত যুক্তির বৈধতা বিচার করা সম্ভব নয়। যুক্তিবিজ্ঞানে এরকম দীর্ঘ, জটিল বচন দ্বারা গঠিত যুক্তির বৈধতা বিচারের জন্য আরেকটি পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। এই পদ্ধতিকে বলা হয় অবরোহী পদ্ধতি বা যুক্তির আকারগত বৈধতা প্রমাণের পদ্ধতি (Formal proof of validity)। এই পদ্ধতির সাহায্যে প্রাথমিক বৈধ যুক্তিকে (Elementary Valid Argument) একের পর এক প্রয়োগ করে আশ্রয়বাক্য থেকে প্রদত্ত সিদ্ধান্তটি নিষ্কাশন করা হয়। এই প্রাথমিক বৈধ যুক্তিকেই অনুমানের সূত্র বা বিধি (Rule of Inference) বলা হয়। এই প্রাথমিক বৈধ যুক্তি আকারের বৈধতা সত্যসারণী পদ্ধতির সাহায্যে সহজেই নির্ণয় করা যায়। নিম্নে প্রাথমিক বৈধ যুক্তি বা অনুমানের সূত্র গুলি উল্লেখ করা হল

Modus Ponens (M.P)

$p \supset q$

p

$\therefore q$

Modus Tollens (M.T)

$p \supset q$

$\sim q$

$\therefore \sim p$

Hypothetical Syllogism (H.S)

$p \supset q$

$q \supset r$

$\therefore p \supset r$

Distinctive Syllogism (D.S)

$p \vee q$

$\sim p$

$\therefore q$

Addition (Add.)

p

$\therefore p \vee q$

Constractive Dilemma (C.D)

$(p \supset q) . (r \supset s)$

$p \vee r$

$\therefore q \vee s$

Absorption (Abs.)

$p \supset q$

$\therefore p \supset (p . q)$

Simplification (Simp.)

$p . q$

$\therefore p$

Conjunction (Conj.)

p

q

$\therefore p . q$

উক্ত বৈধ যুক্তির (elementary valid argument) বৈধতা সত্যসারণী পদ্ধতির সাহায্যে সহজেই নির্ণয় করা যায়। নিম্নে প্রতিটি যুক্তির বৈধতা নির্ণয় করা হল–

Modus Ponens (M.P)

p	q	p ⊃ q	p	q
T	T	T	T	T
T	F	F	T	F
F	T	T	F	T
F	F	T	F	F

Modus Tollens (M.T)

p	q	p ⊃ q	~ q	~ p
T	T	T	F	F
T	F	F	T	F
F	T	T	F	T
F	F	T	T	T

Hypothetical Syllogism (H.S)

p	q	r	p ⊃ q	q ⊃ r	p ⊃ r
T	T	T	T	T	T
T	T	F	T	F	F
T	F	T	F	T	T
T	F	F	F	T	F
F	T	T	T	T	T
F	T	F	T	F	T
F	F	T	T	T	T
F	F	F	T	T	T

Distinctive Syllogism (D.S)

p	q	p ν q	~ p	q
T	T	T	F	T
T	F	T	F	F
F	T	T	T	T
F	F	F	T	F

Constractive Dilemma (C.D)

p	q	r	s	p ⊃ q	r ⊃ s	(p ⊃ q) . (r ⊃ s)	p ∨ r	q ∨ s
T	T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	T	F	T	F	F	T	T
T	T	F	T	T	T	T	T	T
T	T	F	F	T	T	T	T	T
T	F	T	T	F	T	F	T	T
T	F	T	F	F	F	F	T	F
T	F	F	T	F	T	F	T	T
T	F	F	F	F	T	F	T	F
F	T	T	T	T	T	T	T	T
F	T	T	F	T	F	F	T	T
F	T	F	T	T	T	T	F	T
F	T	F	F	T	T	T	F	T
F	F	T	T	T	T	T	T	T
F	F	T	F	T	F	F	T	F
F	F	F	T	T	T	T	F	T
F	F	F	F	T	T	T	F	F

Absorption (Abs.)

p	q	p . q	p ⊃ q	p ⊃ (p . q)
T	T	T	T	T
T	F	F	F	F
F	T	F	T	T
F	F	F	T	T

Simplification (Simp.)

p	q	p . q	p
T	T	T	T
T	F	F	T
F	T	F	F
F	F	F	F

Conjunction (Conj.)

p	q	p . q
T	T	T
T	F	F

F	T	F
F	F	F

Addition (Add.)

p	q	p ν q
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

উপরে উল্লেখিত সকল যুক্তির সত্যসারণীতে এমন কোন সারি নেই যেখান হেতুবাক্য গুলি সত্য এবং সিদ্ধান্ত মিথ্যা। তাই উপরের প্রতিটি যুক্তিই বৈধ।

যে যুক্তি গুলির বৈধতা সত্যসারণী পদ্ধতির সাহায্যে নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছিল না সেই যুক্তি গুলির বৈধতা উপরে উল্লেখিত নয়টি অনুমানের সূত্র প্রয়োগ সহজেই প্রমাণ করা যায়। যেমন–

$A \supset B$

$B \supset C$

$C \supset D$

$\sim D$

$A \nu N$

$\therefore N$

উক্ত যুক্তিতে মোট ৫ টি অঙ্গ বচন রয়েছে। তাই এই যুক্তির বৈধতা সত্যসারণী পদ্ধতির সাহায্যে নির্ণয় করতে গেলে মোট ৩২ টি সত্যমূল্যের সারি প্রয়োজন, যা দেখানো সম্ভব নয়। কিন্তু এই একই যুক্তিতে যদি অনুমানের সূত্র প্রয়োগ করা হয় তাহলে হেতুবাক্য গুলি থেকে সহজেই প্রদত্ত সিদ্ধান্তটি প্রমাণ করা যায়। নিম্নে তা দেখানো হল–

1. $A \supset B$
2. $B \supset C$
3. $C \supset D$
4. $\sim D$
5. $A \nu N \quad / \therefore N$
6. $A \supset C$ (1, 2, H.S)
7. $A \supset D$ (6, 3, H.S)
8. $\sim A$ (7, 4, M.T.)
9. N (5, 8, D.S)

প্রদত্ত যুক্তির 1 ও 2 নং আশ্রয়বাক্য থেকে H.S অনুমান বিধি প্রয়োগ করে 6 নং এ $A \supset C$ কে সিদ্ধান্ত রূপে পাই। আবার এটিকে পরবর্তী যুক্তির আশ্রয়বাক্যরূপে গ্রহণ করে মূল যুক্তির 3 নং আশ্রয়বাক্যর সাথে H.S অনূমান বিধি প্রয়োগ করে 7 নং এ $A \supset D$ সিদ্ধান্ত পাই। একই রকম ভাবে এটিকে আশ্রয়বাক্যরূপে গ্রহণ

করে 4 নং আশ্রয়বাক্যর সাথে M.T অনুমান বিধি প্রয়োগ করে 8 নং এ $\sim A$ সিদ্ধান্ত পাই। এবং শেষে 5 ও 8 নং আশ্রয়বাক্য থেকে D.S অনুমান বিধি প্রয়োগ করে যুক্তিতে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত N কে প্রমাণ করা হল।

আবার এমন অনেক বৈধ সত্যাপেক্ষ যুক্তি আছে যেগুলির বৈধতা এই নয়টি অনুমানের বিধি প্রয়োগ করে প্রমাণ করা যায় না। যেমন–

$A \supset B$
$C \supset \sim B$
$\therefore A \supset \sim C$

এই রকম যুক্তির বৈধতা প্রমাণের জন্য আরো কতকগুলি সূত্রের প্রয়োজন। এই সূত্র গুলিকে বলা হয় রূপান্তরের সূত্র বা সমমানের সূত্র (Rule of Replacement)। এই সূত্র অনুযায়ী কোন সত্যাপেক্ষ যৌগিক বচনের অন্তর্গত কোন একটি অঙ্গ বচনের পরিবর্তে অন্য একটি বচনকে ব্যবহার করা যায়, যার সত্যমূল্য ঐ অঙ্গ বচনের সমমানের বা অভিন্ন। তাই মূল বচনের সত্যমূল্য পরিবর্তন হয় না। যেমন – আমরা p এর পরিবর্তে $\sim \sim p$ ব্যবহার করতে পারি। কারণ p ও $\sim \sim p$ এর সত্যমূল্য সমমানের। এটিও একটি রূপান্তরের সূত্র। নিম্ন রূপান্তরের সূত্র গুলি উল্লেখ করা হল –

De Morgan's Theorem (De M)

i. $\sim (p \,.\, q) \equiv (\sim p \vee \sim q)$
ii. $\sim (p \vee q) \equiv (\sim p \,.\, \sim q)$

Commutation (Com.)

i. $(p \vee q) \equiv (q \vee p)$
ii. $(p \,.\, q) \equiv (q \,.\, p)$

Association (Assoc.)

i. $[p \vee (q \vee r)] \equiv [(p \vee q) \vee r]$
ii. $[p \,.\, (q \,.\, r)] \equiv [(p \,.\, q) \,.\, r]$

Distribution (Dist.)

i. $[p \,.\, (q \vee r)] \equiv [(p \,.\, q) \vee (p \,.\, r)]$
ii. $[p \,.\, (q \vee r)] \equiv [(p \,.\, q) \vee (p \,.\, r)]$

Double negation (D.N.)

$p \equiv \sim\sim p$

Transposition (Trans.)

$(p \supset q) \equiv (\sim q \supset \sim p)$

Material implication (Impl.)

$(p \supset q) \equiv (\sim p \vee q)$

Material equivalence (Equiv.)

i. $(p \equiv q) \equiv [(p \supset q) \,.\, (q \supset p)]$
ii. $(p \equiv q) \equiv [(p \,.\, q) \vee (\sim p \,.\, \sim q)]$

Expiration (Exp.)

$[(p \,.\, q) \supset r] \equiv [p \supset (q \supset r)]$

Tautology (Taut.)

i. $p \equiv (p \vee p)$

ii. $p \equiv (p \cdot p)$

যে সত্যাপেক্ষ যুক্তির বৈধতা অনুমান বিধির সাহায্যে প্রমাণ করা যাচ্ছিল না সেটি উক্ত রূপান্তরের নিয়ম প্রয়োগ করে সহজেই প্রমাণ করা যায়। নিম্নে দেখানো হল–

1. $A \supset B$
2. $C \supset \sim B \quad / \therefore A \supset \sim C$
3. $\sim \sim B \supset \sim C$ 2, Trans.
4. $B \supset \sim C$ 3, D.N
5. $A \supset \sim C$ 1, 4 H.S

এখানে 2 নং হেতুবাক্য থেকে Trans. রূপান্তরের সূত্র প্রয়োগ করে 3 নং পাওয়া গেল এবং 3 নং এ D.N প্রয়োগ করে 4 নং পাওয়া গেল এবং শেষে 1 ও 4 নং এ H.S সূত্র প্রয়োগ করে প্রদত্ত সিদ্ধান্তটি প্রমাণ করা হল।

উপরিক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল যুক্তির বৈধতা বিচারের জন্য অনেক গুলো পদ্ধতি রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সত্যসারণী পদ্ধতি, ভেনচিত্র, লঘুকরণ, সত্যশাখী ইত্যাদি। সত্যসারণী পদ্ধতি হল একটি নির্ণয় পদ্ধতি। এই পদ্ধতির সাহায্যে যুক্তির বৈধতা নির্ণয় করা গেলেও, যে যুক্তির অন্তর্গত বচন গুলি দীর্ঘ ও জটিল সেগুলির বৈধতা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তার জন্য নতুন একটি পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়েছে। সেটি হল অবরোহী পদ্ধতি বা যুক্তির আকারগত বৈধতার প্রমাণ পদ্ধতি। এই পদ্ধতির সাহায্যে নয়টি অনুমানের বিধি প্রয়োগ করে যুক্তির বৈধতা প্রমাণ করা হয়। অনুমানের বিধিও যুক্তির বৈধতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়। তার জন্য আরো কতকগুলি সূত্রের প্রয়োজন, তাকে রূপান্তরের সূত্র বা সমমানের সূত্র বলা হয়। এক কথায় বলা যায় যুক্তির বৈধতা প্রমাণের জন্য মোট ১৯ টি সূত্রের উল্লেখ করা হয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থ:

1. Copi, Irving M & Cohen, Carl. Introduction to Logic. Prentice, Hall of India Private Limited, 9th edition, 2001, New Delhi.
2. দাস, রমাপ্রসাদ। সাংকেতিক যুক্তিবিজ্ঞান, প্রথম খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০১৯, কলকাতা।
3. পান্ডে, দুলাল চন্দ্র ও মুখোপাধ্যায়, ফাল্গুনী। পাশ্চাত্য যুক্তিবিজ্ঞানের ভূমিকা: প্রচলিত ও সাংকেতিক, বিজয়া পাবলিশিং হাউস, পঞ্চম সংস্করণ, ২০২০, কলকাতা।
4. চক্রবর্তী, শুক্লা। তর্ক বিজ্ঞান। প্রগতিশীল প্রকাশক, পুনর্মুদ্রণ ২০১৭, কলকাতা।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 956-964
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.311

মার্ক্সীয়তত্ত্বের বীক্ষণে: মনোজ মিত্রের ‘নরক গুলজার’

সত্য দাস, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 13.03.2026; Accepted: 16.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In Marxist philosophy, art and literature serve as the superstructure built upon an economic base. Although playwright Manoj Mitra was not a formal Marxist, his work Narak Guljar deeply aligns with these principles by championing the oppressed against systemic exploitation. The play reflects the simplified class conflict of the modern bourgeois era, dividing society into two primary groups:

The Bourgeoisie: Represented by the landlord Ghorui and factory owner Batul Biswas. They own the means of production and maintain power by exploiting the labor and dreams of the working class.

The Proletariat: Represented by Manik, Phullara, and their children. Lacking their own means of production, they must sell their labor to survive, caught between the crushing pressures of rural and urban life.

A pivotal character, Sadhak Guibaba, functions as a tool for the capitalist regime, mirroring the religious-political manipulation seen in Tagore’s Raktakarabi. Despite the grim reality where the youth and vitality of the poor are ‘simmered away,’ the play ends on a note of revolutionary hope.

Rather than surrendering to the bourgeois representatives, the protagonists choose to fight. By leaving the ‘heaven’ of the elite and entering a new world of struggle, they embody the classic Marxist sentiment: they have nothing to lose but their chains. Their journey is not just one of survival, but a definitive fight for liberation and the restoration of human dignity.

Keywords: Bourgeoisie, Proletariat, Power, Exploitation, Consciousness, Struggle

ক

মনোজ মিত্র বাংলা নাট্যজগতে একটি বিশিষ্ট নাম। পূর্ব-বাংলার সাতক্ষীরা জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে পথচলা শুরু করে তাঁর কলকাতায় আসা। তারপর দক্ষতায় প্রতিভায় লেখনীতে অভিনয়ে অধ্যাপনায় এই অলরাউন্ডার মানুষটি আপামর বাঙালির মন জয় করেন। বাংলার এই কিংবদন্তি অভিনেতা ও নাট্যকার, তার নিজের হাতে বাংলা থিয়েটারের খোলনলচে বদলে প্রায় ছয় দশক ধরে বাংলা থিয়েটার জগতে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। ছিলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য বিভাগের অধ্যাপক। শেষদিকে দীর্ঘদিন ধরেই তিনি অসুস্থ ছিলেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় মৃত্যুর ভুয়ো খবর রটেছে বারবার। অবশেষে ১২ নভেম্বর ২০২৪, হেমন্তের সকালে সেই খবর সত্যি হয়, শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এই বর্ষীয়ান অভিনেতা। তবে বাঞ্ছারাম চলে গেলেও তাঁর সাজানো বাগান পাঠক এখনও সযত্নে আগলে রেখেছে। তাঁর ‘সাজানো বাগান’, ‘নরক গুলজার’, ‘চাকভাঙা

মধু', 'শিবের অসাধ্যি', 'অশ্বত্থামা', 'নেকড়ে', 'মেষ ও রাক্ষস', 'রাজদর্শন', 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা', 'নৈশ ভোজ', 'কিনু কাহারের থেটার', 'শোভাযাত্রা', 'পুঁটি রামায়ণ' ইত্যাদি নাটকে তিনি স্বতন্ত্র নাট্যশৈলী, চরিত্র নির্মাণ এবং থিয়েটারের নিজস্ব ধারা তৈরির মাধ্যমে বাংলা নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। মনোজ মিত্র তাঁর নাটকে সমসাময়িক সমাজের সমস্যা, নানা অসঙ্গতি, ব্যক্তি-মানুষের মনস্তত্ত্ব, শোষণ ও ব্যক্তির সংকটকে যেমন কৌতুক ও গভীর জীবনবোধের মিশেলে তুলে ধরেছেন, তেমনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নাট্যরীতির মিশ্রণে তিনি এক নতুন ধারা তৈরি করেন, যেখানে পুরাণ ও লোককথার রূপক ব্যবহার দেখা যায়।

শুধু 'নরক গুলজার' নয়, তাঁর অন্যান্য অনেক নাটকে শোষিত মানুষদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখা যায়। শোষিত মানুষরা যখন সংঘবদ্ধভাবে লড়াইয়ে নামে তখন শোষক শ্রেণি পালাতে বাধ্য হয়। 'চাকভাঙা মধু' নাটকে জমিদার অঘোর ঘোষের বিরুদ্ধে বাদামীসহ সমস্ত গ্রামের জাগরণ সেই শ্রেণিসংগ্রামকেই স্পষ্ট করে। মনোজ মিত্র তাঁর 'নেকড়ে' নাটকেও শাসক-শোষিতের সংগ্রামে শোষিতের পাশে দাঁড়িয়েছেন। 'রাজদর্শন', 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা' নাটকে অর্থনৈতিক বৈষম্য, সামাজিক, রাজনৈতিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। মনোজ মিত্র কমিউনিস্ট পার্টির বা গণনাট্যের সদস্য ছিলেন না ঠিকই তবুও গণনাট্যগুলির সঙ্গে তাঁর 'শিবের অসাধ্যি' 'নেকড়ে', 'মেষ ও রাক্ষস', 'নৈশ ভোজ' অথবা 'চাকভাঙা মধু'-র খুব একটা পার্থক্য নেই। তবে আমাদের বক্ষ্যমাণ নিবন্ধের বিষয় যেহেতু 'মার্ক্সীয়তত্ত্বের বীক্ষণে: মনোজ মিত্রের 'নরক গুলজার', তাই আমরা এখন কেবল 'নরক গুলজার'-কেই পর্যালোচনার কেন্দ্রে রাখবো।

খ

বাংলা নাট্যসাহিত্যে মার্ক্সীয় তত্ত্বের প্রয়োগ ও উদাহরণ:

আলোচনার শুরুতেই আমরা বুঝে নেবো মার্ক্সীয় সাহিত্য বলতে আমরা কী বুঝি? আমরা জানি, কার্লমার্ক্স ও ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস, ইতিহাস, দর্শন ও অর্থনীতির জগতে যতটা গুরুত্বের সঙ্গে স্বীকৃত, নন্দনতত্ত্বের জগতে ততটা অবশ্যই নয়। তবে মার্ক্স ও এঙ্গেলস দুজনেই ছিলেন সাহিত্যরসিক- এ গল্পটা অনেকেই জানেন না। মার্ক্স শুধু যৌবনে কবিতা লেখেননি, হাইনে, গ্যেটে, শেক্সপীয়র, বালজাক— প্রত্যেকের সাহিত্যের সঙ্গে ছিল তাঁর নিগূঢ় যোগাযোগ। তবে তাঁরা সাহিত্যকর্মকে অন্যান্য সৃজন প্রক্রিয়া থেকে পৃথক করে ভাবেননি। ফলে সাহিত্য বিচারের জন্য কোনো সরলরেখ পথের নির্দেশও দেননি। সুতরাং সেক্ষেত্রে কোন ধরনের সাহিত্য বিচার পদ্ধতিকে মার্ক্সীয় বলে গণ্য করা যাবে তা তর্কাতীত নয়। ১৮৯০ এর ২১/২২ সেপ্টেম্বর তারিখে যোসেফ ব্লকের কাছে লেখা একটি চিঠিতে এঙ্গেলস জানিয়েছেন- অর্থনৈতিক দিকটির উপর অতিরিক্ত গুরুত্বদানের যে ত্রুটি তরুণদের লেখায় দেখা যাচ্ছে তার জন্য তিনি এবং কার্লমার্ক্স দায়ী।[১] এঙ্গেলসের এই চিঠি থেকে যা বোঝা যায় তা হল অর্থনৈতিক অবস্থা ও সাহিত্যকর্মের মধ্যে তাৎক্ষণিক সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রবণতা এঙ্গেলসের দ্বারা সমর্থিত নয়। অর্থাৎ মার্ক্স পন্থায় সাহিত্য বিচার মানে কোনো দেশের সাহিত্যের জন্মকালীন সবকিছু বাদ দিয়ে সে দেশের অর্থনীতিকে সাহিত্যের একমাত্র জন্মকারণ রূপে গণ্য করা নয়। শিল্প হল মার্ক্স-এঙ্গেলসের মতে সমাজ চৈতন্যের অন্যতম রূপ। সমাজ চৈতন্যের অন্যান্য প্রকাশ অর্থাৎ ধর্ম, দর্শন, অর্থনীতি সবই সাহিত্যের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কসূত্রে আবদ্ধ। মার্ক্সীয় দর্শনে অর্থনীতি হল 'ভিত' এবং শিল্প সাহিত্য হল সেই ভিতের উপরে গড়ে ওঠা 'অধিসৌধ'। কিন্তু অনেকসময় ভুলে যাই আমরা এ কথা। আমদের পন্ডিতসমাজ অনেকসময়ই মার্ক্স ও তাদের উত্তরসূরিদের নানা মন্তব্যকে অপব্যাখ্যা করে এক মেধাহীন তাত্ত্বিক আলোচনায় মেতে ওঠে। ১৯০৫ সালে ১৩ই নভেম্বর তারিখে 'নোভায়া ঝিজন' পত্রিকায় ১২শ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'পার্টি অর্গানাইজেশন অ্যান্ড পার্টি লিটরেচর' প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে লেনিনের বক্তব্যকে বিকৃত করা হয়েছে। আর এই বিভ্রান্তির জন্য মোটেই লেনিন দায়ী নয়। আসলে মার্ক্সবাদের স্রস্টা-প্রবক্তা-ব্যাখ্যাকারদের গ্রন্থ-প্রবন্ধ-ভাষণ পাঠ

করার একটা মার্ক্সীয় পদ্ধতি আছে। আমরা কি মনে রাখি সে কথা? 'পার্টি লিটরেচর' কথাটার বাংলা তর্জমা করতে গিয়ে আমরা লিখি 'পার্টি সাহিত্য', কিন্তু য়ুরোপীয় ভাষায় 'লিটরেচর' আর আমাদের 'সাহিত্য' কি সবসময় এক? লিটরেচর শব্দটার একটা অর্থ 'সাহিত্য', তবে শব্দটির আরেকটি মানে জ্ঞানচর্চার কোনো একটা বিষয়ে যেসব গ্রন্থ, পুস্তিকা পাওয়া যায় সেগুলো- যেমন প্রেসার কুকার কিনলে তার সঙ্গে ব্যবহার প্রণালী এবং গুণাগুণ সম্বন্ধে ছোট পুস্তিকা থাকে, সেটা ঐ বস্তুর লিটরেচর। অনেক ওষুধের মোড়কেও 'লিটরেচর' থাকে।[২] পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি, লক্ষ্য, কার্যক্রম, সংগঠন বিষয়ে যেসব পুস্তিকা প্রকাশিত হয় সেগুলিকে পার্টি লিটরেচর বলে। লেনিনের প্রবন্ধটি পার্টির নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে, কোনো সাহিত্য সম্বন্ধে নয়- এটা কি আমরা আজও বুঝে উঠতে পেরেছি? যাইহোক, সাহিত্যের বিচারে মার্কস-পন্থা কী, সেই বিষয়ে ড. বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, 'সাহিত্য-বিচার তত্ত্ব ও প্রয়োগ' গ্রন্থে কিছু সূত্র উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:

১. সাহিত্যিক যে ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিতে সাহিত্য রচনা করেছেন তার পরিচয় জানা প্রয়োজন।
২. সাহিত্যে রাজনীতি নানারূপে প্রকাশিত হয়। রাজনীতি-সচেতন এ-কালের মানুষের সাহিত্য থেকে তাই রাজনীতিকে বিযুক্ত করা হয় না।
৩. সাহিত্যকে আগে সাহিত্যরূপে সার্থক হতে হবে। সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের সম্ভাব্য সমাধান কোনো সাহিত্যিকই পাঠকের হাতে তুলে দেন না।
৪. সু-সমালোচক শিক্ষকের মতো লেখকের সমাজ বিষয়ে দৃষ্টিহীনতা ও শৈল্পিক দুর্বলতার ক্ষেত্রগুলি দেখিয়ে দেবেন।
৫. ফর্ম এবং কনটেন্ট-এর আপেক্ষিক গুরুত্বে কনটেন্ট-এর বিচার অগ্রাধিকার পেলেও ফর্ম-কে উপেক্ষা অনুচিত।
৬. মার্কসীয় সাহিত্য সমালোচনা হবে একইসঙ্গে বৈজ্ঞানিক এবং শৈল্পিক কর্মকাণ্ড।[৩]

মূল নাটকে আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে এই প্রসঙ্গে অন্যান্য নাটককারদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন। আমরা দেখেছি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উত্তরকালে বিজন ভট্টাচার্য, সলিল সেন, ঋত্বিক ঘটক, তুলসি লাহিড়ী, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নাট্যকারগণ নতুন জীবনবোধ দিয়ে একটি গণচেতনার ধারা তৈরি করেছিলেন। যদিও এর আগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় অনেকেই সাম্রাজ্যবিরোধী নাটক লিখেছিলেন, তবে তাতে রাজনীতি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক ছিল না। এখানেই উৎপল দত্ত ব্যতিক্রম। তাঁর কাছে নাটক শখের ছিল না, তিনি মনে করতেন নাটক মানে সংগ্রামের হাতিয়ার। গণনাট্য সংঘে যোগদান শুধু নয়, তিনি সমাজের শোষিত, নিপীড়িত গণমানুষের অধিকারকে তাঁর নাট্যসাধনার কেন্দ্রীভূত বিষয় করেছিলেন। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ অর্থাৎ মার্ক্সীয় ডায়ালেকটিস-এ বিশ্বাসী উৎপল দত্তের নাটকে গণমানুষই নায়ক, তারাই নাটকের নিয়ন্ত্রক। শ্রেণিসংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লিখেছিলেন, টিনের তলোয়ার, লৌহ মানব, ফেরারী ফৌজ, কল্লোল, তিতুমীর, ব্যারিকেড ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। যাইহোক মার্ক্স-এঙ্গেলস এবং তাদের উত্তরসূরীরা সাহিত্য সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, তার উপর ভিত্তি করে একালের শ্রেষ্ঠ নাটককার মনোজ মিত্রের 'নরক গুলজার' নাটকটিকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

গ

মনোজ মিত্রের 'নরক গুলজার'–এর কথাবস্তু:

বিংশ শতাব্দীর সত্তর দশকের মধ্যলগ্নে পাঠক সমাজ উপহার পেলো 'নরক গুলজার'। সালটা ১৯৭৪। মনোজ মিত্রের সাহিত্যিক জীবনের এক ঐতিহাসিকক্ষণ। যদিও জন্মলগ্নেই নাটকটির কিছু অপূর্ণতা শিল্পীর চোখ এড়ায়নি। আসলে তিনি নাটকটিকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন মহাকালের দরবারে; ছুঁতে চেয়েছিলেন শিল্পের

উত্তুঙ্গ শিখর। আর তাই তাঁর সেই সুপ্ত অভিলাষ চরিতার্থতার জন্যই নাটকটিকে আরো পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করেন ১৯৭৬ সালে। আর 'নরক গুলজার' নাটকটি হয়ে ওঠে সর্বহারাদের মহাকাব্য। তাঁর লেখা এ যাবৎ প্রায় ৮০ টির নাটকের মিছিলে এই নাটকটিকেই দেখেছি, মুষ্টিবদ্ধ শাণিত হাতে দৃপ্ত পদচারণায় হেঁটে যাচ্ছে পাঠক-দর্শকের হৃদয়ের অলিগলি পেরিয়ে, ভাবিকালের সেই 'সহৃদয় সামাজিক'-এর হৃদয়ের দিকে লক্ষ্য করে। তবে এই জনপ্রিয় শক্তিশালী নাটকটি প্রথম মুদ্রণের আলো দেখেছিল ১৯৭৭-এ। মুদ্রণের মধ্য দিয়ে ভদ্রবেশে বের হলে ক্রিটিকের দল কিন্তু ধেয়ে আসেনি বরং এদেশে আপামর নাট্যমোদি বাঙালির কাছে অভিনন্দিত হয়েছে নাটকটি। নতুন নতুন ইন্টারপ্রিটেশন নতুন করে মাপতে চেয়েছে তার গভীরতা। যারাই নাটকটির নিবিড় পাঠে মগ্ন হয়েছেন, তারাই নাটকটির বহুমুখী সম্ভবনা আর তার স্বপ্ন- প্রতিবাদ-প্রতিরোধ সংশ্লেষে হয়েছেন অভিভূত। বারবার, বহুবার।

মূল নাটকের উপর স্পটলাইট ফেললে দেখা যায়, মঞ্চের তিন ভাগ— স্বর্গ, নরক, মর্ত্য। এই ত্রিলোক নিয়েই নাটককারের কারবার। আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে এ কোনো রূপকথার গল্প বা পৌরাণিক আখ্যান। কিন্তু নাটকটির সঙ্গে এক নিবিড় পাঠে লগ্ন হলেই দেখা যায়— এ আসলে আমাদেরই ছবি। মনোজবাবু অত্যন্ত সুকৌশলে আমাদের সমাজের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন 'নরক গুলজার'-এর আয়নায়। হ্যাঁ, 'নরক গুলজার' আমাদের বাড়ির কাছের আরশি নগর, আর সেই আরশিতেই ফুটে উঠেছে— ঐ সর্বহারাদের গ্লানি, যন্ত্রণা, তাদের সুখ-দুঃখের বারোমাস্যা। তাই একবার স্বর্গ, একবার নরক ও মর্ত্য করে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরকে এক ফ্রেমে বেঁধে নাটককার এক প্রবহমান নিরবচ্ছিন্নতা গড়ে তুলেছে।

'নরক গুলজার' নাটকটি দুইটি অঙ্কে নির্মিত। প্রথম অঙ্কে- ৪টি দৃশ্য ও দ্বিতীয় অঙ্কে- ৬টি দৃশ্য অর্থাৎ দুইটি অঙ্কে মোট ১০টি দৃশ্যের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এক অখন্ড কথাবিশ্ব। কখনো স্বর্গ, কখনো মর্ত্য বা নরকের মধ্য দিয়ে চলেছে নাটককারের নান্দনিক যাতায়াত।

নাটকের শুরুতেই দেখি ঘোড়ুইমশাই মানিকের বাড়িতে এসে তাঁকে চোরের বদনাম দেয় এবং বলে সাড়ে সাতশো টাকা ফেলতে নতুবা ভিটেমাটি নিঃশর্তে লিখে দিতে। অথচ তাদের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে জানা যায় এই মানিকদের মতো অসহায় মানুষদের শোষণ করেই এই ঘোড়ুইদের যত জারিজুরি। দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যায় স্বর্গে দেবতাদের বিলাসের চিত্র। এরপর নরকপুরীতে ডেঞ্জারাস ওয়েস্টবেঙ্গলের সেল, যেখানে খুনি, ডাকাত, সুদখোর মহাজনদের সহাবস্থান। তাদের সকলের দাবী পুনর্জন্ম দিতে হবে। এইভাবে সত্তর দশকের সামজিক- রাজনৈতিক অবক্ষয়কে কৌতুক ও রূপকের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে ক্ষমতালোভী শাসক এবং শোষকদের আঁতাত এবং শ্রমজীবী মানুষদের অসহায়ত্ব চিত্রিত হয়েছে।

ঘ

'নরক গুলজার'-এ মার্ক্সীয় তত্ত্বের প্রয়োগ:

সেদিন জন্মমুখে কান্না নিয়ে ভাসান ভেলায় ভাসতে ভাসতে কাঁটাতারের বেড়া গলে ভারতের বেলাভূমিতে আছড়ে পড়েছিল আজকের নাটককার— বাংলা নাট্যজগতের কিংবদন্তী সম্রাট মনোজ মিত্র। সমসাময়িক দেশ-কাল-সমাজ, অনন্ত জিজ্ঞাসা আর তার থেকে উঠে আসা নানা প্রশ্ন তাঁকে দীর্ণ করেছে। তাঁর বিশ্বাস কোথাও স্থাপিত হতে না হতেই, কোনো মহৎ প্রত্যাশার কেন্দ্রে কেলাসিত হয়ে উঠতে না উঠতেই খান খান হয়ে ভেঙ্গে গেছে। তবু তিনি স্বপ্ন দেখা থামাননি। তাঁর স্বপ্নের নায়কদের হাতে তুলে দিয়েছেন লড়াইয়ের যাদুদন্ড। 'নরক গুলজার' এর মানিক-ফুল্লরারা কিন্তু বুর্জোয়া সমাজের সমাজের প্রতিনিধি ঘোড়ুই বা বাঁটুলের কাছে শেষপর্যন্ত

নতি স্বীকার করেনি। স্বর্গ হতে বিদায় নিয়ে নতুন পৃথিবীতে লড়াইয়ের জন্য তৈরী হয়েছে। তাদের তো শৃঙ্খল ছাড়া হারানোর কিছু নেই। আর তাদের এই লড়াই শৃঙ্খল মোচনের লড়াই।

নাটকের সূত্রপাতেই মঞ্চে প্রবেশ করে ধনতান্ত্রিক কাঠামোর এজেন্ট ঘোড়ুইমশাই। হাতে খেরো বাঁধানো হিসাবের খাতা দেখে তাঁকে পাঠকের চিনতে কোন কষ্ট হয়না। মানিকের বাড়ি প্রবেশ করে উচ্চকণ্ঠে সে জানাতে থাকে তার বাড়ি থেকে চুরি যাওয়া এক বিশাল ফর্দ। তার কথা শুনে পাঠক-দর্শক যখন মানিককে তার এই কৃতকর্মের জন্য চোরের স্ট্যাম্প মারতে যাবে, ঠিক তখনই মানিকের সপাটে চড় পাঠকের গালে। মানিক জানায় বাপের টিপ সই নকল করে তাদের সাত পুরুষের ভিটে মাটি আত্মসাৎ করেছে ঘোড়ুইমশাই। এ যেন অন্য এক 'উপেন'। মানিক বলে, তার বাপ বলে গেছে—

> "হুই তেঁতুল গাছটা তানার বাপের ছেলো...ধম্মত এবং নেয্যত! তো আপনি নিজের জমির সীমানা লাফে লাফে বাড়াতি বাড়াতি গাছটারে নিজের অর্ন্তভুক্ত করে ফেললেন।"[৪]

পাঠক আঁচ করে এক শোষণের পরম্পরাগত ইতিহাস। মার্ক্স যথার্থই বলেছিলেন-

> "The production of commodities, their circulation, and that more developed form of their circulation called commerce, these form the historical ground work form which it rises."[৫]

এই অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে ঘোড়ুইরা সম্পদের পাহাড় গড়ে। আর এই শোষণের রথচক্র অব্যাহত রাখতে নেয় পুলিশ-প্রশাসনের শরণ। আর বুর্জোয়াদের তৈরি সমাজ ব্যবস্থায় প্রশাসন তাদের হাতের ক্রীড়নক। তাই সেই পুলিশকে ঢাল করেই ঘোড়ুই মানিককে বলে সাড়ে সাতশো টাকা ফেলতে নতুবা ভিটেমাটি নিঃশর্তে লিখে দিতে।

তারপর দ্বিতীয় দৃশ্যে জেগে ওঠে স্বর্গ। এ যেন বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কোনো দেশনেতা-মন্ত্রিদের প্রতিচ্ছবি। যারা সর্বহারা বঞ্চিতদের বিশ্বাসের বৃন্তের উপর ভর করেই টিকে আছে কিন্তু সেইসব মানুষদের নিয়ে ভাববার সময় কোথায় যে সময় নষ্ট করবে! বরং তারা দুগ্ধফেননিভ শয্যায় বিলাসস্রোতে গা ভাসায়। এ যেন "বিষের জ্বালায় বিশ্ব পুড়ে স্বর্গ তারা মেটান তৃষা।"[৬] একেই মনোজ ব্যঙ্গ করে নারদের মুখে গানে বসিয়েছে-

> "ভগবানের ছানাপোনা দেবতা আছেন নানাজনা
> আয়েসে ফূর্তি করে ফ্যাট গ্যাদার করেছেন...
> অকাজের গোঁসাই তারা কাজের বেলা না।"[৭]

এইভাবে নাটককার নাটকের পরতে পরতে কৌতুকের ভাঁজে ভাঁজে রেখে দিয়েছেন জীবনের নানা চেনা ছবি, নানা গ্লানি। নরকপুরীতে সবচেয়ে ডেঞ্জারাস নাকি ওয়েস্টবেঙ্গলের সেল, সেখানে খুনি আছে, ডাকাত আছে, আছে সুদখোর মহাজন। তাদের দীর্ঘদিনের দাবী পুনর্জন্ম দিতে হবে। নশো স্মারকলিপি পড়েছে জমা। এরই মধ্যে চিত্রগুপ্ত ব্রহ্মাকে স্মরণ করিয়ে দেয় বঙ্গশ্রী বাঁটুল বিশ্বাসের মৃত্যুদিনে যমের সেখানে উপস্থিত হবার কথা। কে এই বঙ্গশ্রী বাঁটুল? ইনি একজন বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিনিধি। তার 'দশখানা বাড়ি, দশখানা গাড়ি, দশটা বড়ো বড়ো কলকারখানার মালিক।'— তার এই প্রভূত সম্পত্তি ঐই মেহনতি মানুষদের রক্তের-ঘামের বিনিময়েই গড়ে উঠেছে। এহেন পুঁজিপতি শ্রেণির মানুষদের মারার জন্য ব্রহ্মার কাছে ভৎর্সিত হলে সে জানায় তার আরেক ভি-আই-পি মারার কথা-

> "হাতিবাঁধা বিষ্টুপুরের জোতদার বামনদাস ঘোড়ুই। ব্যাটা টাকার কুমীর! তবু গরিবের ভিটে মাটি গ্রাস করবে বলে মানিকচাঁদ নামে ব্যাটা চাষার পশ্চাদ্ধাবন করেছিল।"[৮]

তারপর যম ওটাকে নরকে টেনে নেয়। কিন্তু রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় আসীন সরকার বেছে বেছে এই বুর্জোয়াদের মারাকে ভালো চোখে দেখে না। কেননা বুর্জোয়াদের পুঁজির উপরেই চলেছে রাষ্ট্রব্যবস্থা। বুর্জোয়া ও রাষ্ট্রের রয়েছে গোপন আঁতাত। চিত্রগুপ্তও সে কথাই বলেছে—

> "মর্ত্যের লোকেরাও সন্দেহ করছে ওরা আপনারই লোক। তাই ওদের অত্যাচার যত বাড়ছে, লোকজন ততোই আপনার উপর ক্ষেপছে।"[৯]

এখানে 'ওদের' বলতে সর্বহারার রক্তচুষে ধনী হওয়া মুনাফালোভীরা আর 'লোকজন' বলতে সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর সবচেয়ে নীচে বাসকারী মেহনতী মানুষদের কথা বলা হয়েছে।

এর মধ্যে মঞ্চে প্রবেশ করতে দেখি সাধক গুঁইবাবাকে। এরাও সর্বহারা মানুষগুলোর জীবনরস শুষে বেতের মতো লিকলিকে না করে ওদের রেহাই দেয়না। আসলে বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থায় এরাও একটা শোষণ যন্ত্র। যদি মুদ্রার এক পিঠে থাকে জোতদার ঘোড়ুই, কারখানার মালিক বাঁটুল, তবে অন্য পিঠে আছে সাধক গুঁইবাবারা। এই সাধক সোনার থান ইঁটে সাধনা করেন। তার সহকারী পান্নালালের কাছ থেকে জানা যায়— ওয়েস্টবেঙ্গলে সাড়ে তিন কোটি, আমেরিকায় আরো পাঁচকোটি ভক্ত তার। তাঁর দানপাত্রে টাকা পড়তো, সোনা পড়তো, বাড়ির দলিলও পড়তো।

এরপর দেখি 'নরক গুলজার' এর নরককে সরগরম রাখার ক্ষেত্রে যার অন্যতম কৃতিত্ব - সেই মস্তান নেংটিকে। ওয়াগন ব্রেকার। মাত্র বাইশ বছর বয়সে তিন হাজার চোদ্দখানা মাল বোঝাই ওয়াগন ভেঙেছে। এইরকমই একদিন ওয়াগন ভাঙার দিনে প্রভাতি সংঘ আর নবারুণ সংঘের সংঘাতের মধ্যে দুই দলের মধ্যে যখন টপাটপ ছোটোখোকা টপকাটপকি চলছে। সেই চরম সংঘাতের চরম মুহূর্তে আপগাড়ির চাকা চলে যায় তার হৃদয়ের উপর দিয়ে। বলি হয় তরুণ প্রাণ-যুবশক্তি। এই বুর্জোয়া নির্মিত সমাজ ব্যবস্থায় তাদের আধিপত্য কায়েম রাখতে এমন অনেক নেংটিকে তারা ভাড়া করে থাকে। এদের কাঁধে ভর দিয়েই বাঁটুল বিশ্বাসরা 'বঙ্গশ্রী' উপাধি পায়। বাঁটুল রূপী নারদের মুখ দিয়ে সেই সত্যই প্রকাশিত—

> "দ্য গ্রেট মাস লীডার। মস্তান, পুলিশ, জোতদার, ব্লাক মার্কেটিয়ার আমার ডান হাত, বাঁ হাত...ওদের আটকে ইয়ার্কি করছো তোমরা। ওদেরই কাঁধে ভর দিয়ে আমি এতদূর উঠেছি।"[১০]

এইভাবে সমাজের নগ্ন বাস্তবতার রূপকে নান্দনিক ভাবে ফুটিয়ে তোলেন নাটককার।

নাটকের প্রথম অঙ্কের শেষ দৃশ্যে দেখা মেলে নাটকের নায়িকার। লকলকে বেতের মতো বেদেনী মেয়ে ফুল্লরা। বালুর চরে ছুটে বেড়াতো, সড়কি চালিয়ে চিতের মাথা ফাটাতো, রাতের বেলায় দল বেঁধে ঢোলে ঘা দিতো। এই বনের পাখিকেই মানিক সংসার বাঁধার স্বপ্ন দেখায়। জোতদারের ভয়ে গ্রাম থেকে পালানো মানিক শহরে পথের ধারে ঝুপড়ির ভিতর সংসার বেঁধেছে। সর্বহারাদের সংসার। খিদের জ্বালায় শিশু কাঁদছে, ঘরে পয়সা নেই, মাথার উপর ছাদ নেই। এমন অবস্থায় প্রেমের বাহুডোরও লোহার শিকল হয়। বুর্জোয়া শ্রেণি পরিবার প্রথা থেকে ভাবালু ঘোমটাটাকে ছিঁড়ে ফেলে, পারিবারিক সম্বন্ধকে পরিণত করে আর্থিক সম্পর্কে। ফুল্লরা ও মানিকের কথোপকথন তুলে ধরলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে—

> "ফুল্লরা।। ঘর ঠিক করেছিস?
> মানিক।। ঘর! কুথায় ঘর?
> ফুল্লরা।। বললি যে কোন মেথরের ধাওড়ায়-ট্যাংরায় না কমনে...।
> মানিক।। ত্রিশ টাকা ভাড়া চায়, তিনশো টাকা আগাম। তিনশোটা পয়সা নেই...।[১১]

এরপর তাদের কথামালা থেকে জানা যায় মালিক যে ঠেলার দাম কেটে নেয় তা আসলে মানিকের মজুরি দিয়ে কেনা নিজের ঠেলা। তার কথায়- "আমার ঠেলা আমি ভাঙলাম, ও শালারা আমারই মজুরি কাটবে?"[১২] এইভাবেই মেহনতি মানুষদের রক্ত-ঘাম-স্বপ্ন নিংড়ে বেঁচে থাকে বুর্জোয়ারা আর তারা কলুর বলদের মত খেটে যায় বেগার, সারা যাপন জুড়ে। মানিকদের মতো সর্বহারাদের একদিকে গাঁয়ের ঠেলা অন্যদিকে শহরের ঠেলা– মাঝখানে সেদ্ধ হতে থাকে তাদের জীবন-যৌবন।

এই হল গল্প। যদিও গল্পটি সবাই জানে। গল্পটি আজকের নয়। শিল্পবিপ্লব উত্তরকাল থেকে এ গল্প আমাদের চেনা, গ্রাম-গঞ্জ-শহর-বস্তিতে সব জায়গায় দেখতে পাই। গল্পের চরিত্ররা মাঝে মাঝে তাদের রূপকথার মায়া ছেড়ে ঘুরে বেড়ায় চোখের সামনে নির্লজ্জভাবে।

মনোজ মিত্র মার্ক্সবাদী ছিলেন কিনা জানা নেই। অন্তত তাঁর স্মৃতিকথা 'গল্পনা' বা অন্যান্য লেখা পত্রে কোথাও প্রত্যক্ষ ভাবে তিনি মার্ক্সবাদের পক্ষে জোরালোভাবে কোনো সওয়াল করেননি অর্থাৎ অনুমান করা যায় তিনি তথাকথিত মার্ক্সিস্ট ছিলেন না। কিন্ত তাঁর স্মৃতিকথার সেই দুগ্গি বউকেই দেখি—

> "ও মাঝি, মাঝি গো খান দুই গোলপাতা দাওনা, ঝুপরিখানা ছাইবো গো, ওই দেখো ছাউনি খসে পড়ছে।"[১৩]

এইভাবে তিনি বারেবারে তুলে ধরেন নিপীড়িত মানুষগুলোর যন্ত্রণা। বোঝা যায় তাঁর কমিটমেন্ট ছিল মানবতার পক্ষে; শোষণের বিরুদ্ধে। তাই তিনি এই নাটকেও যে শোষিত মানুষদের পাশে দাঁড়াবেন- এতে অবাক হবার কিছু নেই।

আমাদের এই বুর্জোয়া যুগের বিশেষত্ব: শ্রেণিবিরোধ এতে সরল হয়ে এসেছে। গোটা সমাজ ভাগ হয়ে পড়েছে দুইটি বিরাট শ্রেণিতে— বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত। বুর্জোয়া মানে বলতে চাইছি, আধুনিক পুঁজিপতি শ্রেণি, যারা সামাজিক উৎপাদনের উপকরণগুলির মালিক এবং মজুরি শ্রমের নিয়োগকর্তা। প্রলেতারিয়েত হল আজকের মজুরি-শ্রমিকেরা, নিজেদের কোনো উৎপাদন উপকরণ না থাকার দরুন যারা বেঁচে থাকার জন্য শ্রমশক্তি বেঁচতে বাধ্য হয়। এই শ্রেণিতত্ত্বের ধারণা নিয়ে 'নরক গুলজার'এ ও দেখি স্পষ্ট দুটি শ্রেণি–

১। অন্ধকারবৃত্তে মানিক-ফুল্লরা, তাদের সন্তান- যারা দিনবদলের স্বপ্ন দেখে;

২। আলোকিত বৃত্তে জোতদার ঘোড়ুই এবং কারখানার মালিক বাঁটুল বিশ্বাস, সাধক গুঁইবাবা।

এই সাধক গুঁইবাবা অনেকটা 'রক্তকরবী'র গোঁসাই চরিত্রের মতো। যিনি ধনতন্ত্র শাসনতন্ত্রের কায়েমী স্বার্থসাধনের অস্ত্র স্বরূপ। অধর্মকে শাস্ত্রের বচনের আড়ালে ধর্ম বলে চালানোই গুঁইবাবাদের কাজ। গুঁইবাবা–পান্নালালদের সাধনার নমুনার একটি ঝলক:

> "হামার কেস ভেরী ভেরী আর্জেন্ট। লাখ লাখ রূপেয়ার বেবিফুড হামার গুদামে পচছে।"[১৪]

এইভাবে বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থায় শোষণের ষোলকলা পূর্ণ হয়।

মনোজবাবু সুকৌশলে নাটকটিতে ব্যঙ্গের মধ্যে শ্লেষের মশলা মিশিয়ে উপস্থাপন করেছেন। ঘোড়ুইবাবুরা কেবল মর্ত্যের শোষণে তৃপ্ত নন, মরণের ওপারেও তাদের সুদের কল চলে, এ যন্ত্রে জং পড়েনা। তাই সে নরকে গিয়ে বলে—

> "গলায় ফাঁসি দিয়ে তোর দলিল আদায় করব। চোদ্দশ টাকা পাই।"[১৫]

শুধু এখানেই শেষ নয়। বিধাতা পুর্নজন্ম দিলেও মানিক যখন আর পৃথিবীতে যেতে চায় না, তখন ঘোড়ুইের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে সেই সত্য-

> "না যাবি তো আমার দুহাজার মেটাবে কে? চাষবাস করবে কে? লাঙল ঠেলবে কে? আমরা সেখানে গিয়ে খ্যাঁচাকল ল্যাটামাছ চুষবো।"[১৬]

প্রতিযুগে শাসকশ্রেণির ভাবধারণাই কর্তৃত্বশালী ভাবধারণা। বৈষয়িক উৎপাদনের উপকরণে যে শ্রেণির আয়ত্তি থাকে সেটাই একই সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করে মানসিক উৎপাদনের উপায় উপকরণ।[১৭] সেরকমটাই মনে হয় গঙ্গার পারে মনভোলানো সজ্জায় স্বামীর মৃত্যুর পরই ফুল্লরাকে গান গাইতে দেখে। সবাই তো নীলকণ্ঠ হতে পারেনা। অব্যক্ত বেদনা তাই গান হয়ে ঝরে পড়ে কিন্তু যখনই বাবু টাকা ছড়ায়, ফুল্লরা ধীরলয়ের বিষাদ ছেড়ে দ্রুতলয়ে গায়-

> "বাবু পান খাওয়াবে
> ও বাবু গাল রাঙাবে।"[১৮]

ঙ

মানুষ জীবনে যা পায়না, স্বপ্নে তা পায়। মনোজ মিত্র 'নরক গুলজার'কে কৌতুকের আধারে প্রেজেন্ট করেছেন বলেই সর্বহারা শ্রেণির নতুন করে মর্ত্যে গিয়ে লড়াইয়ের স্বপ্ন তাই অস্বাভাবিক ঠেকেনা। নারদ তাই ব্রহ্মার চাল বাঞ্চাল করে সবাইকে পুনর্জন্ম দেয়, বলে-

> "মর্ত্যে আসল বাঁটুল ঘোড়ুই সব ছাড়া রয়েছে, তোমার ছেলেকে গিলে খাবে বলে। শেষ লড়াইটা, ওখানেই হবে। যাও...।"[১৯]

এইভাবে সর্বহারাদের লড়াইয়ের স্বপ্ন দিয়েই শেষ হয় নাটক। সর্বহারাদের যখন পালাতে পালাতে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যায়, তখন তো ঘুরে দাঁড়াতেই হয়। উদাসীন ঈশ্বর কেঁপে ওঠে তাদের পদাতিক পদক্ষেপে। মানিক বলে—

> "পলাতি পলাতি এসে ঠেকেছি মরণের পারে। এর ওধারে তো আর যাওয়া যায়না! ঐ শেকল রইলো! ওটা এবার হয় তুমি আমারে পরাবে, নয় আমি তোমারে। এসো, চলে এসো!"[২০]

মনোজবাবু তথাকথিত মার্ক্সবাদী না হলেও মানবতার প্রতি 'কমিটমেন্ট' থেকেই তিনি শোষিত মানুষদের পক্ষ অবলম্বন করেন। তিনি নাটকের শেষে স্বপ্ন দেখান— নির্যাতিত মানুষরাই মনুষ্যত্বের দাবীতে আগামীর ইতিহাস রচনা করবে। শাশ্বত রাত্রির বুকে ঘটবে অনন্ত সূর্যোদয়।

তথ্যসূত্র:

১। মুখোপাধ্যায়, বিমলকুমার। সাহিত্য বিচার, মার্ক্সীয় সাহিত্যতত্ত্ব। দেজ সংস্করণ, জানুয়ারি-২০০৫, পৃ. ৮১।
২। ভট্টাচার্য, জ্যোতি। মার্ক্সবাদী পার্টি, সাহিত্য ও সাহিত্যিক। অগ্রণী বুক ক্লাব, বইমেলা- ১৯৯৬, পৃ. ৩৩।
৩। মুখোপাধ্যায়, বিমলকুমার। সাহিত্য-বিচার তত্ত্ব ও প্রয়োগ। চতুর্থ সংস্করণ, জুলাই ২০১৫, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, পৃ. ৪৪।
৪। মিত্র, মনোজ। নরক গুলজার। কলাভৃৎ পাবলিশার্স, মে, ২০০৮, পৃ. ৭।
৫। মুখোপাধ্যায়, বিমলকুমার। সাহিত্য-বিচার তত্ত্ব ও প্রয়োগ। চতুর্থ সংস্করণ, জুলাই ২০১৫, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, পৃ. ৫০।
৬। ইসলাম, নজরুল। পথের দিশা, সঞ্চিতা। ডি. এম. লাইব্রেরি, অক্টোবর ১৯২৮, পৃ. ১১২।
৭। মিত্র, মনোজ। নরক গুলজার। কলাভৃৎ পাবলিশার্স, মে, ২০০৮, পৃ. ৯।
৮। তদেব, পৃ. ১৩।

১০। তদেব, পৃ. ১৩।
১১। তদেব, পৃ. ২৬।
১২। তদেব, পৃ. ২৭।
১৩। মিত্র, মনোজ। গল্পনা। দে'জ পাবলিশিং, জানু- ২০১৫, পৃ. ৭৩।
১৪। মিত্র, মনোজ। নরক গুলজার। কলাভৃৎ পাবলিশার্স, মে, ২০০৮, পৃ. ৪০।
১৫। তদেব, পৃ. ২০।
১৬। তদেব, পৃ. ৪৫।
১৭। মার্ক্স এঙ্গেলস নির্বাচিত রচনাবলী, প্রথম খন্ড। প্রগতি প্রকাশন, মস্কো ১৯৭৯, পৃ. ৫৮।
১৮। মিত্র, মনোজ। নরক গুলজার। কলাভৃৎ পাবলিশার্স, মে, ২০০৮, পৃ. ৪৩।
১৯। তদেব, পৃ. ৫৩।
২০। তদেব, পৃ. ৫২।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 965-974
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.312

‘বাতাসে লাশের গন্ধ’ অবলম্বনে রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহের কবিতার কথা

শ্রেয়সী রায়, *গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 23.02.2026; Accepted: 07.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Are the poetry of Bangladesh and Bengali poetry synonymous? For a literary enthusiast from West Bengal, this question is complex, multidimensional, and layered. From the Partition of India in 1947, through the historic Language Movement of 21st February 1952, to the birth of the new nation-state called Bangladesh in 1971, the political, social, and surrounding realities of East Bengal underwent repeated transformations. This history differs in many significant ways from that of India and West Bengal. Such distinct socio-historical developments have shaped the literature— especially the poetry— of East Bengal and later Bangladesh with unique thematic concerns and expressive modes.

Rudra Muhammad Shahidullah was one of the leading poets of 1980s Bangladesh. Like many other poets and writers of his time, his works embodied and nurtured the multidimensional definitions of a newly formed nation and national identity. His first poetry collection, *Upadruta Upakul* includes one of his most popular and well-known poems: ‘Batashe Lasher Gondho’. Through a close critical reading of this poem, the present study explores Rudra’s poetic universe. At the same time, it brings into focus the broader landscape of Bangladeshi poetry. Furthermore, it attempts to demonstrate how Rudra’s poems remain urgent and relevant—from his own time to the present—in the socio-political environment and realities of Bangladesh. In essence, the discussion aims to reflect upon three interrelated perspectives: the poetry of East Bengal and Bangladesh, the nationalism shaped by the Language Movement, and the poetic consciousness of Rudra Muhammad Shahidullah.

Keywords: Rudra Mohammad Shahidullah’s works, ‘Batashe Lasher Gondho’, 1952 Bengali language movement (*Ekusher andolon*), *Ekushe February*-inspired literary tradition, post-1947 poetry in East-Pakistan, Post-Independence Bangladeshi Poetry, Nationalism in Rudra’s works, Language and cultural identity in Rudra’s works

।। ১ ।।

‘বাংলাদেশের কবিতা’ কী? এই সংজ্ঞায়ন কখন এবং কীভাবে আলাদা হয়ে গেল ‘বাংলা কবিতা’-র বৃহত্তর পরিধি থেকে? দু’মলাটের কোনো কবিতা সংকলন থেকে যদি সরিয়ে ফেলা যায় নাম-ধাম, পরিচয়পত্র, তাহলে বাংলা কবিতার তন্নিষ্ঠ পাঠক কি তাকে চিনে নিতে পারেন পৃথক কোনো দেশ-কালের উৎসজ হিসেবে? এর জবাবের মুখ একাধিক। ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক; ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক। স্বাধীনতা আর দেশভাগ যে বিচ্ছিন্নতা তৈরি করে দিল ৪৭-এর অগাস্টে, তা কেবল মানচিত্রগত দেশ নয়, মনোদেশ আর

ভাষাদেশেও নতুন শিল্প-সংস্কৃতির অভিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত করল। অবশ্যই অটুট রইল অখণ্ড বাংলার সাহিত্যচর্চার দীর্ঘ ঐতিহ্য আর উত্তরাধিকারও। কিন্তু নবগঠিত রাষ্ট্রের জাতিসত্তা; তার অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম, আবেগ— সর্বোপরি, ভাষার স্বাধিকার-রক্ষার জন্য একুশে (১৯৫২) তার শ্রদ্ধেয় সংগ্রাম আর শপথ— এই ভূখণ্ডের নিজস্ব লেখালেখিতে আর নতুন লেখকদের মধ্যে পৃথক চেতনা আর প্রকাশভঙ্গির স্পষ্ট ছাপ তৈরি করে দিল। পাশাপাশি কবিতার শৈলী নির্মাণেও কিছু কিছু ভিন্নতা পাওয়া গেল, বিশেষত পূর্ববঙ্গীয় বিভিন্ন জেলার আঞ্চলিক শব্দাবলির প্রয়োগে (ঔপভাষিক বিচ্যুতি বা dialectal deviation)।

পূর্ব-বাংলার (তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান) প্রথম স্বতন্ত্র কাব্যসংকলন 'নতুন কবিতা' প্রকাশিত হয় ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের মার্চে (চৈত্র, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ), ঢাকা থেকে। সম্পাদনা করেন দুই তরুণ কবি আশরাফ সিদ্দিকী ও আবদুর রশীদ খান। পুব বাংলার বেশ কয়েকজন তরুণ কবির রচনা এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।[১] এর মুখবন্ধে বলা হয়েছিল— "'কাব্য-মালঞ্চ' যেখানে শেষ সেখান থেকেই আমাদের শুরু।" ['কাব্য-মালঞ্চ' ১৯৪৫-এ প্রকাশিত কিছু মুসলমান কবির রচনা-সংকলন।] এই 'নতুন কবিতা'-কেই বলা যেতে পারে 'বাংলাদেশের কবিতা'-র দিশারী। এই সংকলনে উপস্থিত মোট ১৩ জন কবির অধিকাংশই পরবর্তীকালে 'বাংলাদেশের কবিতা'-র অগ্রদূত হিসাবে পরিগণিত হয়েছিলেন।

মধ্য-পঞ্চাশ ও ষাটের দশক পূর্ববঙ্গের কবিতার পক্ষে অত্যন্ত উর্বর কাল-পর্ব। ভাষা-আন্দোলনের ফলশ্রুতি আবেগে, উত্তেজনায়, ক্রোধে, প্রতিরোধে সে-দেশের কবিতার গোলাঘর তখন ভরে তুলেছে অজস্র ফসলের দানে। অথচ ৭৩ থেকে ৭৫— এই পর্বের কবিতায় প্রকট হয়েছে অবক্ষয়ের ছবি। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত নতুন দেশ ও জাতি তখন দিশাহীন। যে আলোকোজ্জ্বল স্বপ্নদিনের ছবিকে সামনে রেখে চলেছিল দু'-দশক ব্যাপী সংগ্রাম— মুক্তিযুদ্ধ; তার বাস্তব পরিণতিটি হলো রক্ত-পঙ্কিল, অন্ধকার; স্বার্থ ও ঈর্ষার কলুষে মলিন। কবিরা দেশ ও সমাজের সেইসব ভাঙা স্বপ্নের বেদনাকে, ব্যর্থতা আর গ্লানিকে, হতাশা ও পাপের ছবিকে বারবার ফিরিয়ে এনেছেন কবিতায়। বিশেষত, ১৫ই অগাস্ট ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার পর দেশের রাজনৈতিক মানচিত্রের পাশাপাশি কবিতার শারীরচিত্রেও দেখা দিয়েছিল বাঁকবদলের দিকচিহ্ন। এই পর্বের তরুণ কবিরা ভাষা-বিজয় আর স্বাধীনতা লাভের প্রাক্তন গৌরবকে অন্তঃস্থ করেও বর্তমানের সংশয় আর সংঘাতে তাড়িত হয়েছেন বারংবার।

১৯৫৬ সালের ১৬-ই অক্টোবর বরিশালে জন্ম কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহের। পিতৃসূত্রে তাঁর স্থায়ী নিবাস অবশ্য ছিল বাগেরহাট জেলার মংলা থানার অন্তর্গত সাহেবের মেঠ গ্রামে। বাবা শেখ ওয়ালীউল্লাহ ছিলেন মংলা ডক লেবার হাসপাতালের চিকিৎসক। মা শিরিয়া বেগম। দশ ভাইবোনের মধ্যে রুদ্র সর্বজ্যেষ্ঠ। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার ওয়েস্ট এণ্ড হাইস্কুল থেকে বিজ্ঞান শাখায় প্রথম বিভাগে এসএসসি (দশম শ্রেণির চূড়ান্ত পরীক্ষা) পাশ করার পর ঢাকা কলেজে কবি ভর্তি হন মানবিক (হিউম্যানিটিজ) শাখায়। ১৯৭৫-এ সেখান থেকেই দ্বিতীয় বিভাগে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন এবং বাংলা বিভাগে বিএ (অনার্স)-তে ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯৮০-তে অনার্স এবং ১৯৮৩-তে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন রুদ্র। ঢাকা কলেজে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই সাহিত্য এবং রাজনীতি— এই দু'য়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ঘটে, এবং দুই-ই এরপর ছিল তাঁর ৩৪ বছরের স্বল্পায়ু জীবনের আমৃত্যু সহচর। ছাত্রজীবন থেকেই একের পর এক রাজনৈতিক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন রুদ্র; এই পর্বেই পর পর প্রকাশিত হয়েছে তাঁর দু'টি কাব্যগ্রন্থ : ১৯৭৯-তে 'উপদ্রুত উপকূল' ও ১৯৮১-তে 'ফিরে চাই স্বর্নগ্রাম' (কবির ব্যবহৃত বানান)। দু'টি কাব্যগ্রন্থই বিপুল সমাদর ও পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করে, এমনকি একাধিক পুরস্কারে ভূষিত হয়ে তাঁকে কবিখ্যাতিতে এনে দিয়েছিল অসন্দিগ্ধ প্রতিষ্ঠা। তাঁর আজীবনের দুই কবিতামুখ— প্রেম-অপ্রেমের দ্যুতিময় শিল্পিত রচনা; এবং

কিছুটা উচ্চগ্রামে বাঁধা বিবৃতিধর্মী মঞ্চসফল কবিতা— তাঁর কলমে নিশ্চিত ভাবে ধরা দিয়েছিল এই দু'টি প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকেই। কাব্যগ্রন্থ-দু'টির অভিধাতেই ('উপদ্রুত' উপকূলবাসীর প্রতি সমমর্মিতা এবং হৃত 'স্বর্ণগ্রাম' ফিরে পাবার আর্তি) বিধৃত হয়েছে তাঁর অনস্বীকার্য রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক সচেতনতার প্রতিচ্ছবি।

।। ২।।

বাঙালি আর মুসলমান— অতিপরিচিত এই শরৎচন্দ্রীয় বিভ্রান্তিটিকে বাদ দিলেও হিন্দু বাঙালি আর মুসলমান বাঙালির মধ্যেকার আমরা-ওরা বিভাজন চিরকালই আকাশচুম্বী। সেই দূরত্ব থেকে বৈষম্য— আর তারপর কূটনৈতিক দ্বৈধ। অতএব দ্বিজাতিতত্ত্বের ধাক্কায় গঙ্গা থেকে যখন আলাদা হয়ে গেল পদ্মা, তখন পদ্মাকে ঘিরে বয়ে চলা জীবনের সাহিত্যে আর সংস্কৃতিতেও স্পষ্ট হতে শুরু করল পার্থক্যের ছাপ। তবু ৪৬ – ৪৭-এ জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্ব সার্বিকভাবে বাংলা ও বাঙালির পক্ষে যতখানি বেদনার; যতখানি ক্ষয়, ক্ষতি আর ক্ষতের সংবাহক— ৫১ থেকে ৭১-এ মুজিবুর রহমানের দ্বিজাতিতত্ত্ব, আর তৎপ্রসূত সংগ্রাম দুই বাংলার বাঙালির পক্ষেই ততখানি-ই গৌরবের। দেশের নামে, জাতির নামে, ধর্মের নামে পৃথিবী জুড়ে ক্রমাগত হয়ে চলা রক্তপাতের সুদীর্ঘ ইতিহাসের মাঝে ভাষার জন্য রক্তক্ষয় সেই প্রথম। ১৯৫২-র ২১শে ফেব্রুয়ারি। মাতৃভাষার অধিকারের দাবিতে শুরু হওয়া সেই লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই বিভাজিত বঙ্গভূমি অর্জন করেছিল জাতীয়তার পৃথক অভিজ্ঞান, স্বকীয়তার নতুন সংজ্ঞা— যার ফলশ্রুতিতে ৭১-এর ডিসেম্বরে অবশেষে গড়ে উঠল নতুন দেশ, পৃথক মাতৃভূমি। স্বভাবতই 'একুশ' তাই নবসৃষ্ট জাতির অচ্ছেদ্য আবেগ, উজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্যের সূচক। এবং অনিবার্যভাবেই এই একুশের সঙ্গে এরপর ক্রমশ যুক্ত হতে থেকেছে আরও অনেক অনেক মাত্রিকতা। 'একুশ' হয়ে উঠেছে যাবতীয় প্রতিরোধের প্রতীক, দৃপ্ত স্বাজাত্যাভিমানের দ্যোতক। পূর্ব পাকিস্তানের জন্ম মুহূর্তেই কিন্তু উপ্ত হয়েছিল এই সংগ্রামটির বীজ। যে ধর্মকেন্দ্রিক দ্বিজাতিতত্ত্বকে ঘিরে বাংলার বিভাজন, তাই-ই হয়ে দাঁড়িয়েছিল পরবর্তী ভাষা দ্বৈরথটির মূল। বাংলাদেশের নতুন কবিতাধারার অন্যতম পুরোধা, 'দুঃখিনী বর্ণমালা'-র মরমী পরিপালক কবি শামসুর রহমান তাঁর স্মৃতিচারণায় যেমন বলছেন—

> "পাকিস্তান আমলে বাংলা ভাষার উপর উৎপীড়ন হয়েছে নানাভাবে। পাকিস্তানি শাসকদের অপশাসনের অত্যাচার শুধু এদেশের বাসিন্দাদেরই ভোগ করতে হয় নি, বাংলাভাষাকেও নিপীড়নের কাণ্ড-কারখানা দেখতে হয়েছে। ... ছেলেবেলায় একটি সুবোধ্য কবিতা মুখস্থ করেছিলাম। কবিতাটির প্রথম দু'টি পঙক্তি হল—
>
> 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি
> সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।'
>
> দুঃখের বিষয়, এ-কথা বলতে আমি বাধ্য হচ্ছি এই পঙক্তি দু'টিকে পাকিস্তান আমলে বদল করা হয়েছিল এভাবে—
>
> 'ফজরে উঠিয়া আমি দিলে দিলে বলি
> সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।'
>
> কোনো কবির লেখা পালটে দেয়ার অধিকার বিশিষ্ট পণ্ডিতেরও নেই। 'দিলে দিলে বলি' কোন্ কিসিমের বাংলা? এ ধরনের বেয়াদবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গেও হয়েছে। তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতা 'চল চল চল'। এই কবিতার একটি পঙক্তি এরকম 'নব নবীনের গাহিয়া গান, সজীব করিব মহাশ্মশান'। পাঠ্যবইয়ে কোনো এক পণ্ডিতপ্রবর কবির পঙক্তিটি থেকে 'মহাশ্মশান' শব্দটি উড়িয়ে দিয়ে তার পরিবর্তে অবলীলায় বসিয়ে দিয়েছেন 'গোরস্তান' শব্দটি। 'গোরস্তান' আমাদের কোনো

অপরিচিত শব্দ নয়। কিন্তু কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার কোনো শব্দ বদলের অধিকার তাকে কে দিল? এ ধরনের হটকারিতা বরদাশত করা মুশকিল।"[২]

ভাষার ওপর এই স্বৈরাচারী নিয়ন্ত্রণ পূর্ব-বাংলার সত্তাকে পীড়িত করে তুলেছিল। সুতরাং প্রতিরোধের রক্ত ঝরল একুশে, ঢাকার রাজপথে। সেই রক্তের সেচনে আরও উর্বর হলো স্পর্ধার জমি, স্বাতন্ত্র্যের অভিজ্ঞান। ৫১ – ৫২-র ভাষা আন্দোলন ক্রমশই বহুমাত্রিকতায় ভর দিয়ে এসে পৌঁছল ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে। কবিরা লিখলেন—

"স্টেনগানের প্রতিটি ঝলকে বাজাল উজ্জ্বল সুর
শৈশবের বল ছুঁড়লো গ্রেনেডে, অকম্পিত সঙ্গিন
বিঁধলো শত্রু দেহ। আমার নিজের ভাই
বড় বেশি ভালো সে বাসতো স্বাধীনতা
জননীর নিষেধ মানে নি, পিতার অবাধ্য হয়েছিল
পতাকার রক্তিম সাহস তাকে ডাক দিলো
স্বদেশের ছবি-রক্তে, ঝাঁপ দিলো স্বদেশের নামে।"[৩]

৭০ – ৭১-এ এসে বোঝা গেল ভাষাকে ঘিরে জন্ম নেওয়া স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দীপনাটি এবার প্রাণিত করেছে স্বাধীনতার সামগ্রিক লড়াইকে। ১৯৭০-এর গণভোটে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করল। কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রসঙ্গে সমঝোতা করল না ইয়াহিয়া সরকার। ৭১-এর ৭ই মার্চ মুজিবুর রেসকোর্সের ময়দানে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ২৫শে মার্চ শুরু হয় সেনা অভিযান ও গণহত্যা। ন' মাস ধরে চলে মুক্তিযুদ্ধ। অবশেষে বহু অশ্রু, রক্ত, শ্রম আর প্রাণের মূল্যে ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর এল স্বাধীনতা। পূর্ব-পাকিস্তান এবারে হলো বাংলাদেশ।

"এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়
এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়।"[৪]

তৃতীয় বিশ্বের উপনিবেশিক হীনমন্যতাবোধ আর আত্মকারুণ্যের মাঝে ৫১ থেকে ৭১; এক দুঃসাহসী অভ্যুত্থান। 'এপার বাংলা'-র মনস্বী ছাত্রসমাজের নিভৃত রক্তেও 'ওপার বাংলা'-র সেই সংগ্রাম সেদিন জাগিয়ে তুলেছিল চাঞ্চল্যের দোল। শঙ্খ ঘোষের স্মৃতিচারণে যেমন—

"আমরা তখন এম. এ. ক্লাসের ছাত্র। আর সেইসঙ্গে দেশচ্যুতও বটে। পুব বাংলা নিয়ে নিভৃত একটা গর্ববোধ আমাদের ছিল। ...

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের যে পত্রিকা বেরোত একসময়ে, সেই 'একতা'র ১৯৫২-৫৩ সালের সংখ্যাটি সম্পাদনার দায়িত্ব ছিল আমাদের কজনের ওপর। পিছন ফিরে তাকিয়ে আজ মনে পড়ছে, সে-পত্রিকায় এই ভাষা-আন্দোলন নিয়ে দু-দু'টো লেখা ছাপাবার ব্যবস্থা করেছিলাম আমরা। একটি ছিল সংস্কৃতি প্রসঙ্গে প্রতিবেদন, আর অন্য-একটি ছিল নিজের অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া দীর্ঘ এক ইতিহাস। ওপার-বাংলা থেকে সদ্য-আসা আমাদের এক বন্ধু সেখানে দেখিয়েছিলেন কীভাবে কয়েকবছর ধরে একেবারে শেষ ধাপে এসে পৌঁচেছে ওই আন্দোলন, কীভাবে লাল কালিতে মোটা মোটা হরফে লেখা প্রকাণ্ড পোস্টার জ্বলজ্বল করছে ঢাকা স্টেশনের গায়ে; "ঢাকা, তুমি জাগো। তোমার সমস্ত বীরত্ব আর মর্যাদা নিয়ে তুমি জাগো। বঞ্চনা আর লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে, স্পর্ধা আর বর্বরতার বিপক্ষে তুমি মাথা তোলো—"।"[৫]

বিশ শতক জুড়ে বাংলাদেশের কবিতা তথা সাহিত্যচর্চায় সর্বত্রই মুক্তিযুদ্ধের এমনই সংরক্ত উপস্থিতি।

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহের কাব্যগ্রন্থের প্রথম প্রকাশ যদিও যুদ্ধের উত্তরকালে, তবু নবগঠিত দেশের সদ্যতন সংগ্রাম, মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তসিঞ্চিত স্বাধীনতার অপব্যবহার, যুদ্ধোত্তর অপরাধ ও অপপ্রশাসন তাঁর কবিতার আবেগকে ছুঁয়ে থেকেছে নিরন্তর।

।। ৩।।

"তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা,
তোমাকে পাওয়ার জন্যে
আর কতবার ভাসতে হবে রক্ত গঙ্গায়?
আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন?"[৬]

১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের সমসময়ে রুদ্র মুহম্মদ ছিলেন নবম শ্রেণির ছাত্র (জন্ম: ১৬ই অক্টোবর, ১৯৫৬)। যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য তাঁর কিশোর মন যখন অস্থির, তখন তাঁকে আটকেছিলেন তাঁর মা। তাঁর বাবাকে ধরে নিয়ে যায় পাক সেনারা। আর প্রথম সন্তান রুদ্র বাবার মতো ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন জলাঞ্জলি দিয়ে এই অন্তঃশীল বারুদ আর অশ্রুকে সঙ্গী করে হাতে তুলে নিলেন কবির কলম। ১৯৭৪ থেকে এরপর তিনি করেছেন একাধিক কবিতাপত্রের সম্পাদনা[৭]। লিখেছেন অজস্র কবিতা, গান, গল্প, কবিতা বিষয়ক প্রস্তাবনা ইত্যাদি। ১৯৭৯-এ প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উপদ্রুত উপকূল'। এরপর ৩৪ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনে একের পর এক প্রকাশিত হয়েছে ৭টি কাব্যগ্রন্থ এবং মরণোত্তর আরও একটি কাব্যগ্রন্থ। তবে প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকেই চিনে নেওয়া গিয়েছিল প্রেমে আর দ্রোহে আমৃত্যু আবিষ্ট এক কবির নিজস্ব লিখনভঙ্গিটিকে।

"প্রাপ্য পাইনি করাল দুপুরে,
নির্মম ক্লেদে মাথা রেখে রাত কেটেছে প্রহর বেলা —
এই খেলা আর কতোকাল আর কতোটা জীবন!
কিছুটাতো চাই— হোক ভুল, হোক মিথ্যে প্রবোধ,
অভিলাষী মন চন্দ্রে না-পাক জোস্নায় পাক সামান্য ঠাঁই,
কিছুটাতো চাই, কিছুটাতো চাই।"[৮]

এই অসম্ভব সম্মোহী অভিমানময় উচ্চারণ যাঁর, তাঁরই কাব্যধর্মের আরেক মাত্রার পরিচয়ও মিলবে এই একই কাব্যগ্রন্থে। সেখানে প্রেমের প্রসন্ন দক্ষিণ মুখ নয়, বরং দ্রোহেই কবি 'রুদ্র'। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, 'রুদ্র' কবির পিতৃদত্ত নাম নয়; স্বয়ং-নির্বাচিত সহনাম। হিন্দু-গন্ধী এই নামটি নিয়ে কিছু বন্ধুবান্ধব বা পত্রিকা-সম্পাদক আপত্তি জানালেও এই নামেই সম্বোধিত ও পরিচিত হতে পছন্দ করতেন কবি।

'আজো আমি বাতাসে লাশের গন্ধ পাই,
আজো আমি মাটিতে মৃত্যুর নগ্ন নৃত্য দেখি,
ধর্ষিতার কাতর চিৎকার শুনি আজো আমি তন্দ্রার ভিতরে—
এ-দেশ কি ভুলে গেছে সেই দুঃস্বপ্নের রাত, সেই রক্তাক্ত সময়?'[৯]

কবিতার শেষে রচনার স্থান ও কালের এন্ট্রিতে কবি লিখেছেন: '০৩.১২.৭৭, সিদ্ধেশ্বরী ঢাকা'। এ সময়ে রুদ্র থাকতেন ঢাকার ২১ সিদ্ধেশ্বরী লেনে, বন্ধু বদরুল হুদা সেলিমের বাড়িতে। এরপর ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে (ফাল্গুন, ১৩৮৫) কবি আহমদ ছফার উদ্যোগে ও তাঁরই প্রকাশনা 'বুক সোসাইটি' থেকে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উপদ্রুত উপকূল' প্রকাশিত হলে তাতে সংকলিত হয় কবিতাটি। 'বাতাসে লাশের গন্ধ' এ বইয়ের জনপ্রিয়তম রচনাগুলির একটি। সমালোচক লিখেছেন;

"প্রথম গ্রন্থেই রুদ্র সচেতন পাঠকের দৃষ্টি কেড়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলো। এই গ্রন্থভুক্ত কবিতাগুলোর মধ্যে সবচে' বেশি জনপ্রিয় হয়েছিলো 'বাতাসে লাশের গন্ধ' কবিতাটি। এটি সে 'সমকাল' পত্রিকার জন্য অনিরুদ্ধ হয়ে লিখেছিলো। এই কবিতার কয়েকটি পংক্তি 'জাতির পতাকা আজ খামচে ধরেছে সেই পুরনো শকুন' কিংবা 'ধর্ষিতা বোনের শাড়ি ওই আমার রক্তাক্ত জাতির পতাকা'— প্রবল আলোড়ন তুলেছিলো পাঠকসমাজে।"[১০]

বইটির জন্যে কবি ১৯৮০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদ প্রবর্তিত 'মুনীর চৌধুরী সাহিত্য পুরস্কার' লাভ করেন।

গ্রন্থান্তর্গত তৃতীয় কবিতা 'বাতাসে লাশের গন্ধ'। ৭৫ – ৭৬ পর্ববর্তী বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা, গুপ্তহত্যা, রক্তপাত, জরুরি অবস্থা— এই কবিতার শিকড় সেইসব প্রগাঢ় অন্ধকার আর গভীর হতাশায়। ১৯৭৫-এর ১৫ই অগাস্ট বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও তৎকালীন রাষ্ট্রপতি মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে অতর্কিত সামরিক আক্রমণে হত্যা করা হয়। রাজনৈতিক ও সামরিক চূড়ান্ত অব্যবস্থায়, দারিদ্র্যে, নিরাপত্তাহীনতায় ক্লিন্ন রক্তস্রোতের বীভৎসায় সদ্যস্বাধীন দেশ তখন পর্যুদস্ত। এই কি এত রক্তমূল্যে ক্রীত স্বাধীনতার দান? কিংবা এ স্বাধীনতা আসলে এক মহাবৃক্ষ— প্রাচীন, মৃতপ্রায়— অবহেলার রৌদ্রে-জলে একা থেকে থেকে নীরস, বিশুষ্ক হয়েছে তার ন্যুব্জ দেহ। অতীত কীর্তির দীর্ঘ ছায়ায় এখন কেবল ঘনিয়ে আসছে মৃত্যুর অমোঘ নিশান—

"ঝাঁকড়া চুল এক অন্ধ বাউলের মতো
গাছটি দাঁড়িয়ে আছে
অনেক-অনেক দিন ধ'রে
গহন রাতের মত নিঃসঙ্গ, একাকী।
পাঁচিলের গায়ে তার কীর্তিমান ছায়া
দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে কেবলই,
অনন্ত ক্ষুধায় ন্যুব্জ বিশীর্ণ শরীর,
হাড় চিনচিনে বোধের বিস্তার
কেবল তাকেই ডাকে
বাঁধানো গোরের মত!"[১১]

স্বাধীন দেশের ভ্রষ্ট রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতিকে কবিতার স্বরে সরাসরি তুলে এনেছেন যেসব কবি, রুদ্র মুহম্মদ তাঁদের অন্যতম। কবির রাজনৈতিক সংলগ্নতাও ছিল যথেষ্ট। তাঁর জীবনীকাররা জানাচ্ছেন '৭৫-এর পরের প্রায় সমস্ত গণ-আন্দোলনে, স্বৈরাচার-বিরোধী সংগ্রামে, মিছিলে, সংস্কার উদ্যোগে রুদ্র সর্বদাই থাকতেন অগ্রণী। মুক্তিযুদ্ধের সক্রিয় সদস্য না হওয়ার সত্ত্বেও মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তবুদ্ধির প্রতি আজীবন বিশ্বস্ত ও অনুরক্ত থেকেছেন কবি। কবিতাকেও তাই নিয়ে যেতে চেয়েছেন মুক্ত জনমনের কাছাকাছি। সচেতনভাবেই 'কবিতার পাঠক' আর 'সাধারণ পাঠক'-এর মধ্যেকার দূরত্বকে মুছে ফেলে কবিতাকে করতে চেয়েছেন সার্বজনিক বার্তাবহনের হাতিয়ার। তাই অনেক সময়েই তাঁর কবিতা হয়েছে শ্রোতৃপ্রিয়, কিছু উচ্চকিত ও সহজে মনোরঞ্জক। তবুও কবিতার শৈল্পিক অঙ্গীকারকেও অস্বীকার করেননি কবি। বিশেষত 'কবিতা' আর 'অ-কবিতা' বিষয়ে এসব তথাকথিত মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও কবি ছিলেন; তাঁর আজীবনের স্বভাববশতই; বেপরোয়া— ইচ্ছেখুশির তরুণ তুর্কি।

'আজো আমি বাতাসে লাশের গন্ধ পাই/ আজো আমি মাটিতে মৃত্যুর নগ্ননৃত্য দেখি'। যুদ্ধ শেষ, তবু যুদ্ধাপরাধের কোনো শেষ নেই। শেষ নেই রক্তের, শেষ নেই মৃত্যুর। 'উপদ্রুত উপকূল'-এর উৎসর্গপত্রে তাঁর আটকোটি উপদ্রুত উপকূলবাসী প্রতিবেশীর হয়ে কবি লিখলেন—

'থামাও, থামাও এই মর্মঘাতী করুন বিনাশ
এই ঘোর অপচয় রোধ করো হত্যার প্লাবন'

নির্বাক দিন, নিস্তব্ধ রাত... সুখ-তন্দ্রার ঘোর বারবার ছিঁড়ে যায় ধর্ষিতার কাতর-করুণ চিৎকারে। মিথ্যা সুখের বুদবুদে ক্ষণিক আচ্ছন্ন হয়ে দেশ আর দেশবাসী কেমন করে ভুলে গেল দুঃস্বপ্নের সেইসব রাত! কেমন করে ভুলে গেল রক্তাক্ত ইতিহাসের দীক্ষা!

পরবর্তী ছত্রে আবারও পুনরাবৃত্ত হয়েছে এই আর্তি— 'বাতাসে লাশের গন্ধ ভাসে/ মাটিতে লেগে আছে রক্তের দাগ'। স্বপ্ন দেখেছিল যারা একদিন নতুন ভোরের, তাদের সংবেদী হৃদয়ও আজ জীর্ণ, ক্লিন্ন, ঘৃণিত যাপনের ভিতর বিকৃত হয়ে গেছে। তাদের জন্যও আজ কেবল জমা হয়ে আছে আঁধার— 'নিষিদ্ধ আঁধার'। 'আঁধার' শব্দের কালিমাকে আরও নিবিড়, আরও নিরালোক করে দেয় এই 'নিষিদ্ধ' বিশেষণটির উপস্থিতি। সময়ের অসুখ মনুষ্যত্বের শেষ অঙ্কুরটিকেও বিনষ্ট করেছে। আলোর আশায় বুক বেঁধেছিল যারা একদিন, আজ তারাই আলোহীন খাঁচার জীবনকে নির্বিবাদে ভালোবেসে জেগে থাকে রাত্রির গুহায়। নবগঠিত দেশের সেসব চালক, রাজনীতিক আর ভণ্ড বুদ্ধিজীবীদের প্রতি বিতৃষ্ণায় তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে রুদ্রর কলম—

"সেলফে বন্দি রবীন্দ্রনাথ, ড্রয়িংরুমে ঝুলে থাকা ধানশীষ
আহা বাংলাদেশ তুমি ঝুলে আছো— আমার সোনার বাংলা
কতিপয় হিজড়া-পন্ডিত আর মূর্খ নেতাদের ডিনার টেবিলে
মুখ থুবড়ে প'ড়ে আছে বিষন্ন বাংলাদেশ উচ্ছিষ্ট হাড়ের মতো।"[১২]

'সোনার বাংলা' আজ স্বার্থগৃধ্নু লোভীদের ভুক্তাবশেষ; ডিনার টেবিলের 'উচ্ছিষ্ট হাড়'। লজ্জিত, খণ্ডিত স্বাধীনতা যেন এক মহতী প্রয়াসের ব্যর্থতম উৎসৃজন।

'এ যেন নষ্ট জন্মের লজ্জায় আড়ষ্ট কুমারী জননী,
স্বাধীনতা— একি তবে নষ্ট জন্ম?
একি তবে পিতাহীন জননীর লজ্জার ফসল?'

কুমারী মাতার আড়ষ্টতা, তদুপরি নষ্ট গর্ভের লজ্জা— এই দুই মিলে যায় যে প্রচণ্ড ব্যর্থ বেদনার বোধে, একাত্তরের রক্তাক্ত স্বাধীনতা যেন তেমনি নিঃসীম হতাশার মুখে দাঁড় করিয়ে দিল দেশবাসীকে।

'জাতির পতাকা আজ খামচে ধরেছে সেই পুরনো শকুন'। জনপ্রিয় এই কবিতার জনপ্রিয়তম পংক্তি এটি। জীবনানন্দের সময় থেকেই আধুনিক কবিতায় 'শকুন' ইমেজের ব্যবহার প্রচুর। বিভিন্ন কবির মনোভূমি ও জীবনবোধ অনুসারে একই বস্তু বা প্রাণীর ইমেজ বিভিন্ন অর্থমাত্রা পেয়ে যায় পৃথক পৃথক কবিতায়। তবুও স্বাভাবিকভাবেই শকুন শিকারি পাখি, মারক শক্তির প্রতিভূ। ধ্বস্ত মুমূর্ষু প্রাণিকুলের প্রতি তার শ্যেন দৃষ্টি। অতর্কিত মৃত্যুর মতো বিরাট কালো ডানায় অবশিষ্ট আলোটুকুকে মুছে ফেলে নির্মম চঞ্চুর আঘাতে ক্ষয়িষ্ণু প্রাণকে খুঁটে তুলে নেবে সে। আর 'পুরনো শকুন'? নিষ্ঠুর ভয়াবহতার সে আরও কঠিন অনুষঙ্গ; ইতিহাসের পুনরাবৃত্ত পাপ-মূর্তি। স্বার্থ আর প্রবঞ্চনার, লোভ আর বীভৎসার এই উপমাটিও তো প্রাচীন। স্বার্থ আর শ্বাসরোধী সংকীর্ণতা নিয়ে দেশে-দেশে, কালে-কালে পুনরাবর্তিত হচ্ছে এই 'পুরনো শকুন'-এর শিকার-বৃত্তি। জাতির পতাকা সে খামচে ধরে বারবার তার পুরনো নখে।

'বাতাসে লাশের গন্ধ—
নিয়ন আলোয় তবু নর্তকীর দেহে দোলে মাংসের তুফান!
মাটিতে রক্তের দাগ—
চালের গুদামে তবু জমা হয় অনাহারী মানুষের হাড়।'

একদিকে দারিদ্র্য আর অনাহার, অপরদিকে রক্তশোষকের অনাচার— এই দুই বিপরীত মেরুর উল্লেখ যথারীতি স্পষ্ট করে তোলে মুনাফা আর বিলাসের উত্তুঙ্গ ন্যারেটিভটিকে। 'নিয়ন আলো'য় নর্তকীর দেহে 'মাংসের তুফান'! এই শব্দবন্ধ নারী-মেদকে করে তুলেছে আরও একান্ত ভাবে বস্তুময়, একান্ত মননশূন্য।[১৩]

এই ভীষণ অন্ধকার আর শূন্যতার ভেতর অতন্দ্র জেগে থাকেন যাঁরা, তাঁরা শিউরে ওঠেন অতীত ইতিহাস থেকে ভেসে আসা ধর্ষিতার চিৎকারে। পুকুরে পানার মতো ভেসে থাকা মানুষের পচা লাশ, আর মুণ্ডহীন বালিকার কুকুরে খাওয়া বীভৎস শরীর রাষ্ট্রের যাবতীয় সংগোপন-চেষ্টা ভেদ করে ভেসে ওঠে তাঁদের 'চোখের ভিতরে', জ্যোতির্ময় অন্তশ্চক্ষে।

কোনো কোনো পশুপাখি, সরীসৃপ— শেয়াল, কুকুর, শকুন বারবার কবিতায় ফিরে আসে মৃত্যুর নৃশংসতা আর শোষণের প্রতীকমূর্তি হয়ে। কুকুরে আর শকুনে কুরে খেয়েছে যে সমস্ত শহীদের দেহ, প্রিয়জনের অপমৃত্যুতে শূন্য হয়ে গেছে যে নরনারীর জীবন, তারা যে প্রত্যেক স্বাধীন নাগরিকের ভাগ্যহত ভাই, দুর্ভাগিনী মা, প্রিয়তম পিতা! অতএব এই স্বাধীনতা সমস্ত স্বজন হারিয়ে পাওয়া একমাত্র স্বজন, সমস্ত প্রিয় মানুষের রক্তে কেনা অমূল্য ফসল। অথচ অমূল্য সেই ফসল নষ্ট করছে আজ পঙ্গপালের ঝাঁক।

'ধর্ষিতা বোনের শাড়ি ওই আমার রক্তাক্ত জাতির পতাকা!'

জাতির নবলব্ধ পতাকার লাল উদয়ার্ক যেন এক মুহূর্তে ঢেকে যায় অসহায়ের রক্তে, অশ্রু-লবণাক্ত অভিশাপে। 'ঘাতক' কবিতায় শঙ্খ ঘোষ লিখেছিলেন—

"কে ওকে মেরেছে? সে কথার কোনো উত্তর নেই আজ
এ-মুখে ও-মুখে তাকিয়ে এখন চুপ করে থাকা শ্রেয়।"[১৪]

প্রায় সমসময়ে দাঁড়িয়ে দুঃসাহসী 'ভাষা-কিষান', বেপরোয়া রুদ্র কিন্তু লিখলেন—

"সমতার নামে ক্ষমতাকে কোরে রপ্ত,
আমি জানি কারা জীবনে ছড়ায় পুঁজ, পোকা, বিষ তপ্ত—
জানি আমাদের কারা ধুতুরার ফুলে অন্ধ করেছে অবেলায়,
ছুঁড়ে দিয়ে গেছে নষ্ট নগ্ন বেদনায়।"[১৫]

কবি নন, তিনি শব্দ-শ্রমিক। ভুল বোধ আর ভুল চেতনার ওপর শব্দের লাল হাতুড়ি ঠোকার দায়ভার মোহাচ্ছন্ন, মূঢ় দেশে আজীবন বহন করতে হয় শব্দ-শ্রমিক কবিদের আর কলম-পেষা-মজুর সাহিত্যিকদের।

নেই বোধি, নেই স্থিতি। করতলে বিশ্বাসের শেষতম কোমল রেখাটিতেও ফুটে উঠছে দূষিত ক্ষরণ। সেদিন। আজ। এবং আগামীদিনেও। দেশের সাম্প্রতিকতম রাজনৈতিক পরিস্থিতি আর আর্থসামাজিক অবক্ষয় আজ আবারও প্রকট করে তুলেছে সেই রক্ত-পুঁজ, সেই দ্বেষ-বিষ। প্রতিবেশী আকাশের নীল আবার ছেয়ে গেছে পুরনো শকুনের কালো ডানায়। রুদ্রের ভাষ্য সেখানে আজও প্রাসঙ্গিক।

তবুও;

"তবুতো কোনোদিন একদিন বৈশাখি রাতে জীবন এসে বলেছিলো:
হাড়ের খুলির মাটি কোনো এক বর্ষার পর ঠিকই পাললিক হবে,
খরার মাঠের বুকে দেখো ঠিক মেলে দেবে ফসলের সোনালি পালক॥"[১৬]

স্বদেশ আসলে তো এক ক্রম-নির্মীয়মাণ স্বপ্নভূমি। আর জীবনেরই অপর নাম প্রত্যাশা। অতঃপর, প্রত্যাশার প্রত্যয়ে বুক বেঁধে যথার্থ 'স্বদেশ'-ভূমির সন্ধানে অনন্ত পথ হাঁটেন; হাঁটতে থাকেন 'উপদ্রুত উপকূল'বাসী, স্বপ্নদর্শী এক প্রেমিক কবি...

উল্লেখপঞ্জি ও প্রাসঙ্গিক টীকা:

(১) স্বাধীনতা পূর্ববর্তী পূর্ববঙ্গ কখনো জন্মসূত্রে, কখনো বা কর্মসূত্রে বাংলার বহু দিকপাল কবিকেই লালন করেছে, যাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কিংবা জীবনানন্দের মত মহীরুহ-সদৃশ নামকেও আমরা উপস্থিত দেখব। কিন্তু সম্যক কারণেই (কলকাতা-কেন্দ্রিক এপার-বাংলাই যেহেতু তাঁদের রচনাসমূহের প্রকৃত ধাত্রী) ঠিক 'বাংলাদেশের কবি ও কবিতা'র একান্ত পৃথক ঘরানাটির মধ্যে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না।

(২) রায়, গৌতম (সম্পা.)। 'শামসুর রহমান গদ্য সংগ্রহ'। পুনশ্চ, প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর ২০০৫, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ১৭৩।

(৩) কবির, হুমায়ুন। "আমার ভাই", 'বাংলাদেশের কবিতা' (দাউদ হায়দার সম্পা.)। এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় সংস্করণ: আষাঢ় ১৪২৩, জুলাই ২০১৬, কলকাতা ৭০০০০৩, পৃ. ২৩১।

(৪) হাফিজ, হেলাল। "নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়", 'বাংলাদেশের কবিতা'। তদেব, পৃ. ২৬৬।

(৫) ঘোষ, শঙ্খ। 'একুশে ফেব্রুয়ারি' (দেবাশিস সেনগুপ্ত সম্পা.)। প্রথম বাণীশিল্প সংস্করণ: ফেব্রুয়ারি ২০০৬, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ৮৫

(৬) রহমান, শামসুর। "তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা", 'বন্দি শিবির থেকে'। বিভাস, প্রথম বিভাস সংস্করণ: মার্চ ২০১৬, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০, পৃ. ১০।

(৭) ছাত্রবয়সে, ১৯৭৩-এ 'নক্ষত্রবীথি' থেকে শুরু করে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪-এ 'অনামিকার অন্য চোখ এবং চুয়াত্তোরের প্রসব যন্ত্রণা' [কবির ব্যবহৃত বানান], ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫-এ 'অশ্লীল জোৎস্নায়', মার্চ ১৯৮০-তে 'Poiema'— ইত্যাদি বেশ কয়েকটি কবিতাপত্রের একক অথবা সহ-সম্পাদনা করেছেন রুদ্র। সাহিত্য সাময়িকীর সচরাচরের নিয়মানুযায়ী অবশ্য এরা প্রত্যেকেই অত্যন্ত স্বল্পায়ু।

(৮) শহিদুল্লাহ, রুদ্র মুহম্মদ। "অভিমানের খেয়া", 'উপদ্রুত উপকূল'। বুকস্ ফেয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০, পৃ. ১১।

(৯) শহিদুল্লাহ, রুদ্র মুহম্মদ। "বাতাসে লাশের গন্ধ", তদেব, পৃ. ১৪।

(১০) চৌধুরী, কামাল। 'রুদ্র: অমলিন স্মৃতি'। সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ৫ জুলাই ১৯৯১, প্রাপ্ত: বাগচী, তপন, 'রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ' (জীবনী গ্রন্থমালা), বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: জুন ১৯৯৮, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৫, ঢাকা ১০০০, পৃ. ৩০।

(১১) হাফিজ, দিলারা। "এই স্বাধীনতা", 'বিভাব'। আন্তর্জাতিক কবিতা সংখ্যা (সম্পা. সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ও আরতি সেনগুপ্ত), ৮৬-৮৭ সংখ্যা, এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০০০।

(১২) শহিদুল্লাহ, রুদ্র মুহম্মদ। "ক্লান্ত ইতিহাস", 'রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর রচনাসমগ্র' প্রথম খণ্ড। (সম্পা. অসীম সাহা), বিদ্যাপ্রকাশ, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, বাংলাবাজার ঢাকা, পৃ. ৬১।

(১৩) ১৯৭৪-এর ফেব্রুয়ারিতে 'অনামিকার অন্য চোখ এবং চুয়াত্তোরের প্রসব যন্ত্রণা' কবিতাপত্র সম্পাদনার সময়ে 'একুশ তুই আর আসিস না' নামে এক সম্পাদকীয় লেখেন রুদ্র। মহীয়সী স্বাধীনতা, মহান

একুশ যেন কয়েকটি মাত্র বছরের পেরিয়েই পরিণত হয়েছে হেলাফেলার ছেলেখেলায়, বাজারের নর্তকীতে। রুদ্র লেখেন—

'ক্যানো আসবি, কার কাছে আসবি? তোর বুকের গরোম রক্তের স্পর্শে একদিন নিষিদ্ধ বিক্ষোভ হোয়েছি। অপ্রতিরোধ্য ব্যারিকেড গোড়েছি। কৃষ্ণচূড়ার বিক্ষুব্ধ লাল ছুঁড়ে দিয়েছি তোর সুনীল করতলে। কিন্তু আজ তোর খোঁপায় রজনীগন্ধা অথবা স্মিত হাসি ভালো লাগে না আর। আমরা তোর অন্তর্বাসে হাত দিয়েছি। কী কোরবো বল, কিছুই পাই নি যে আমরা! মেনড্রাক্স আজ একমাত্র সংগী— সম্বল একবুক জারজ স্মৃতির বিষ। তোর মর্যাদা দেবার মতো কিছুই নেই।

আর আসিস নে হতভাগী। সত্যি বোলছি এবার এলে নিশ্চয়ই তুই সতীত্ব হারাবি।'

[বানান কবির নিজস্ব। বাংলায় উচ্চারণানুগ বানান ব্যবহারের নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি।]

দুঃসময়ের পাশবিক ক্ষুধাদৃষ্টির সামনে একুশ এবং বঙ্গরমণীর অধোগতি সমজাতীয়।

(১৪) ঘোষ, শঙ্খ। "ঘাতক", 'শবের উপরে শামিয়ানা'। অনুষ্টুপ, প্রকাশ: ডিসেম্বর ১৯৯৬ কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ৪০।

(১৫) শহিদুল্লাহ, রুদ্র মুহম্মদ। "শব্দ-শ্রমিক", 'রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর রচনাসমগ্র' প্রথম খণ্ড। (সম্পা. অসীম সাহা), বিদ্যাপ্রকাশ, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, বাংলাবাজার ঢাকা, পৃ. ২৬

(১৬) শহিদুল্লাহ, রুদ্র মুহম্মদ। "মাংশভুক পাখি", তদেব, পৃ. ২৮।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 975-981
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.313

প্রেমেন্দ্র মিত্রের নির্বাচিত গল্পে প্রান্তিকতা: একটি অন্বেষণ

রিয়া সাহা, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 28.02.2026; Accepted: 09.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Marginality refers to the class outside the mainstream of society—those who have no economic power, no social power, and minimal ties with the state or power structures. Literarily, the image of marginality means a life full of crisis, where deprivation, hunger, despair, oppression, and the struggle for survival continue. In the first half of the 20th century, rural society in Bengal and the urban middle and lower classes faced social changes. Poverty among the lower classes took extreme forms due to industrialization, urbanization, economic recession, and the Great Depression. This social reality is reflected in the pens of writers. Premendra Mitra was one of those writers who combined humanity with reality. In his stories, we hear the pitiful cries of marginalized people, but at the same time we see the power of hope and resistance.

Premendra Mitra is a shining star in the history of Bengali short stories. He was a poet, novelist, screenwriter and short story writer all at once. In the thirties of the 20th century, when a new modernity was beginning in Bengali literature with the help of the Kallol era, Premendra Mitra's writings opened up new horizons of social reality. His stories depict the marginalized people of the city, the uprooted reality of life, poverty, despair, and at the same time the hidden dreams and indomitable vitality of the human heart. Premendra Mitra's short stories are not just stories, they are a mirror of sociology, where the life struggle of poor people, economic inequality, social oppression, and the tension between people are reflected. In his stories, these marginalized people are not just side characters, but they become the main subject of the story. Especially in 'Pistol', 'Samane Charai', 'Sangkranti' and 'Ponaghat Periye'—we see the intense reality of life and a subtle analysis of the mentality of marginalized people.

The realistic writer Premendra Mitra has depicted the lives of the lower-class people in his stories. Speaking of whom, Sarat Chandra says – 'Those who only give in the world and get nothing, those who are deprived, those who are weak, oppressed, those who are human beings but whose tears are never counted…' The characters of these marginalized, neglected people are presented with specific feelings in his stories.

Keywords: Marginal, Middle class, Oppression, Vitality, Social reality, Urbanization

অন্ত্যজ বা প্রান্তিক শব্দের আভিধানিক অর্থ 'নীচজাতি' হলেও ব্যাপক অর্থে নিম্নবৃত্তধারী বঞ্চিত, সর্বহারা মানুষদের বোঝানো হয়ে থাকে। অর্থনৈতিক কিংবা সামাজিক দিক দিয়ে যেভাবেই প্রান্তিক মানুষদের চিহ্নিত

করা হোক না কেন চূরান্ত পর্যায়ে দেখা যায় এরা দীর্ঘ সময় ধরে নানাভাবে বঞ্চিত হয়ে এসেছে। তথাকথিত উচ্চবর্গের মানুষের কাছে এরা চিরদিনই উপেক্ষার পাত্র। উত্তর-ঔপনিবেশিক সময়ে 'নিম্নবর্গ' ধারণা বহুচর্চিত একটি বিষয় হলেও বাংলা কথাসাহিত্যে নিম্নজীবী মানুষের কথা বিশ শতক থেকেই লক্ষ করা যায়, বিশেষ করে কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকদের রচনায়। বাংলা সাহিত্যের সেরকমই একজন প্রথিতযশা লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), যাঁর সৃষ্টিশীল কাজের মধ্য দিয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরের চিত্র ফুটে উঠেছে। তাঁর সাহিত্যকর্মে একদিকে যেমন শহুরে মধ্যবিত্ত জীবনের চালচিত্র ফুটে উঠেছে, তেমনই বারবার উঠে এসেছে সমাজের প্রান্তিক ও নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনসংগ্রামের বাস্তব চিত্র। তাঁর গল্পে এই প্রান্তিক মানুষরা কেবল পার্শ্বচরিত্র নয়, বরং তারাই হয়ে উঠেছে গল্পের মূল উপজীব্য। তাদের দৈনন্দিন দুঃখ, বঞ্চনা, হতাশা এবং আত্মমর্যাদার লড়াই গভীর মমত্ববোধের সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প 'পিস্তল' হল সমাজের প্রান্তিক ও দুস্থ মানুষের জীবনের এক বাস্তব প্রতিচ্ছবি। এই গল্পে একটি জংশন স্টেশনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা একদল পথশিশু, যুবক-যুবতী এবং তাদের নিত্যদিনের জীবন সং6গ্রাম বর্ণিত হয়েছে। যুদ্ধের বাজারে স্টেশনের চেহারা যেমন বদলে গিয়েছে, তেমনি বদলে গিয়েছে মানুষের জীবনও। যুদ্ধের বাজারে এই স্টেশন হঠাৎই মিলিটারি কনট্রাক্টরের মতো ফুলে ফেঁপে ওঠে। একদিকে যেমন যুদ্ধের সরঞ্জাম বোঝাই মালগাড়ি চলাচল করে, তেমনি দেশি-বিদেশি সৈন্যদের আনাগোনাও বেড়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে, মানুষের জীবনের মান ক্রমশ নিচে নামতে থাকে। দুর্ভিক্ষ আর খাদ্যাভাবে আশেপাশের গ্রামগুলো থেকে আসা মানুষজনের ভিড়ে স্টেশন ভরে যায়।

> "পেটের জ্বালা নিবোতেই সারা দিনরাত চোখ দুটো জ্বেলে রেখে সজাগ থাকতে হয়। বড় কঠিন লড়াই। আশপাশের সমস্ত গাঁ ভেঙে মেয়ে-মদ্দ বাচ্চা-বুড়ো এসে স্টেশনে ভিড় করেছে- কোথাও এক দানা চাল নেই.... তাদের হাহাকারে স্টেশনে কান পাতা যায় না।"[১]

ট্রেনগুলোর ছাদে, দরজায়, জানালায় মানুষ ঝুলতে ঝুলতে চালের খোঁজে দূরদূরান্তে যায়, কিন্তু অনেকেই পথে দুর্ঘটনার শিকার হয়।

গল্পের প্রধান চরিত্রগুলি হল নিধে, শ্যামা, বিনি, এবং আরও অন্যান্য ছেলেমেয়েরা, যাদের জীবনের একমাত্র আশ্রয় এই স্টেশন। তারা ভিখারি না হলেও সুযোগ পেলে চুরি করে, কিন্তু তারা নিজেদের চোর বলতে নারাজ। তারা নিজেদেরকে লোহা-লক্কড় ইঞ্জিন-মালগাড়ির এক নতুন জগতের বেদে বলে মনে করে। তাদের জীবন যেন "সময়ের অসীম স্রোতে প্রতি মুহূর্তের ঢেউয়ের উপরে তারা কোনোরকমে ভেসে থাকে,"[২] যেখানে সামনে বা পেছনের কোন হিসেব নেই। তাদের জীবনযাত্রা এতটাই অনিশ্চিত যে, যেকোনো মুহূর্তে কেউ হারিয়ে যেতে পারে, যেমনটা ঘটেছে বিনির ক্ষেত্রে। মালগাড়ির নিচে কাটা পড়ে বিনির মৃত্যু হয় এবং তার ছড়িয়ে পড়া চালের দানাগুলো অন্যরা কুড়িয়ে নেয়, যা তাদের জীবন সংগ্রামের নির্মম বাস্তবতাকে তুলে ধরে। গল্পের দুটি প্রধান চরিত্র হল নিধে এবং শ্যামা। নিধে হল সেই 'বেদে' দলের একজন, যে ইংরেজ ও মার্কিনের মধ্যে পার্থক্য বোঝে এবং প্রয়োজন মতো তাদের কাছে থেকে খাবার ও পয়সা আদায় করতে পারে। সে অন্যদের থেকে অনেক বেশি চালাক ও সতর্ক, যেন 'খরগোশের মতো সতর্ক-ইঁদুরের মতো চালাক'। তার চরিত্রের মধ্যে এক ধরনের চাপা ক্ষোভ ও বিদ্রোহ দেখা যায়, বিশেষ করে লালমোহনের বিরুদ্ধে।

অন্যদিকে, শ্যামা চরিত্রটি আরও গভীর। রোগা-কালো এবং 'হাড্ডিসার কাঠির মতো চেহারা' হলেও তার 'হাড়েরও একটা শ্রী ছিল'। সে অন্যদের থেকে আলাদা ছিল, কারণ তার মধ্যে এক ধরনের আত্মসম্মানবোধ ছিল। সে তার ছেঁড়া কাপড় এমনভাবে পরত যাতে গেরো ও তালি চোখে না পড়ে। সবচেয়ে অদ্ভুত ছিল তার চোখ, যা সাপের মতো জ্বলজ্বলে ছিল। শ্যামা যেন এই প্রান্তিক সমাজে টিকে থাকার জন্য এক লড়াইয়ের প্রতীক। সে পয়সা না পেলে সহজে হার মানত না। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে সেও লালমোহনের শিকার

হয় এবং জীবন যুদ্ধে ক্রমশ নেতিয়ে পড়ে, যেমনটা গল্পকার লিখেছেন- "কালসাপ এখনো একেবারে মরে যায়নি, সবে খোলস ছেড়ে এসে শুধু নেতিয়ে পড়েছে।"[৩]

গল্পে লালমোহন চরিত্রটি ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রতীক। সে একজন সাধারণ আড়কাঠি থেকে ফতেচাঁদ সিন্ধির গুদামের প্রধান কর্মকর্তা হয়ে ওঠে। তার হাতে এখন হাজার হাজার কুলির জীবন-মরণ। তার এই ক্ষমতার অপব্যবহারের শিকার হয় সমাজের অসহায় মানুষেরা, বিশেষ করে মেয়েরা। সে 'ভিখিরি মেয়েদের সঙ্গে দুটো ফষ্টিনষ্টি করবার' জন্য ঘুরে বেড়াত এবং তার সুনাম কারও অজানা ছিল না। নিধে ও তার দলবলের কর্মকাণ্ডে লালমোহনের জাতক্রোধ ছিল, কারণ তারা তার অপকর্মের মুখোশ খুলে দিত। তার হাতে ছকার মতো সরল ছেলেকে চুরি আর মারধোরের শিকার হতে হয়।

গল্পের শেষ দৃশ্যে নিধে শ্যামাকে একটি পিস্তল দেয়, যা গল্পের নামকে সার্থক করে তোলে। এই পিস্তল কেবল একটি বস্তু নয়, এটি হল অসহায় মানুষের ক্ষোভ, ক্রোধ, এবং প্রতিবাদের প্রতীক। শ্যামা যখন এটি হাতে নিয়ে চমকে ওঠে, তখন তা যেন তার আত্মরক্ষার এক নতুন আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে তোলে। গল্পটি শেষ হয় এক করুণ দৃশ্যে— শ্যামা রাস্তার ধারে বসে বুক চেপে ধরে কাশছে, তার আঁচলে একদিকে চালের পুঁটুলি আর অন্যদিকে নিধের দেওয়া সেই পিস্তল। এই চাল তাদের বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য, আর পিস্তলটি তাদের প্রতিবাদের নীরব প্রতীক। সব মিলিয়ে, 'পিস্তল' গল্পটি প্রেমেন্দ্র মিত্রের এক অসাধারণ সৃষ্টি, যা প্রান্তিক মানুষের জীবন, তাদের সংগ্রাম, আশা, হতাশা এবং প্রতিরোধের এক মর্মস্পর্শী চিত্রকে তুলে ধরে। গল্পটি যুদ্ধের বাজারে সমাজের করুণ অবস্থাকে তুলে ধরেছে, যেখানে মানুষ শুধু বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করে এবং ক্ষমতাবানদের হাতে নিপীড়িত হয়।

'সামনে চড়াই' গল্পটি শুধু একটি কাহিনি নয়, এটি এক গভীর আদর্শের প্রতিচ্ছবি যা জীবনের কঠিন বাস্তবতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। এই গল্পে মহিমদা নামের এক বিপ্লবী চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক দেখিয়েছেন যে প্রকৃত সংগ্রাম শুধু রাজনৈতিক মুক্তি নয়, বরং সমাজের প্রান্তিক ও শোষিত মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য নিরন্তর চেষ্টা করা। গল্পের শুরুতেই আমরা মহিমদার সঙ্গে গল্পের কথক লোকেশের আকস্মিক পুর্নমিলন দেখি। এক সময়ের বিপ্লবী মহিমদাকে এখন দেখা যায় এক চালের কলের ম্যানেজার হিসেবে, যা তার পূর্ব পরিচয়ের সঙ্গে সম্পূর্ণ বেমানান। তার পুরোনো পরিচয় ছিল এক দুঃসাহসী দেশপ্রেমিক, যার নাম শুনলে অদ্ভুত শিহরণ জাগত। পুলিশও তার মাথার দাম ১০ হাজার টাকা ধার্য করেছিল। কিন্তু, সেই জীবনকে পেছনে ফেলে তিনি এখন এক সাধারণ, সাদাসিধে মানুষ। তার স্ত্রী বোবা এবং তাদের সংসার অত্যন্ত দরিদ্র। এই পরিবর্তন দেখে কথকের মনে প্রশ্ন জাগে, কেন একজন বিপ্লবী এমন সাধারণ জীবনে নিজেকে আবদ্ধ করেছেন?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই মহিমদা তার জীবনের নতুন দর্শনের কথা বলেন। একসময় তিনি বিশ্বাস করতেন, বিপ্লবের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করতে পারলে সব সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু, তিনি এখন বুঝতে পেরেছেন, সত্যিকারের লড়াই কেবল রাষ্ট্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে নয়, বরং দারিদ্র্য, অশিক্ষা এবং আত্মসম্মান হারানোর বিরুদ্ধে। তিনি বলেন যে, গরিব মানুষরা "নির্লজ্জভাবে পায়ে লুটিয়ে পড়ে ভিক্ষে করে বড় লোককে অমানুষ করে তোলে,"[৪] এবং এতে তাদের আত্মসম্মান নষ্ট হয়। মহিমদা বিশ্বাস করেন, এমন মানুষদের খুঁজে বের করতে হবে, যাদের মধ্যে এখনও আত্মসম্মানের বীজ বেঁচে আছে। সেই বীজকে আবার নতুন করে পাথুরে জমিতে রোপণ করতে হবে। এই নতুন আদর্শে, মহিমদা এখন চালের কলের ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেন, কারণ এটি তাকে প্রান্তিক মানুষের কাছাকাছি থাকার সুযোগ করে দেয়। তিনি কঠোরভাবে চাষীদেরকে সাহায্য চাইতে নিরুৎসাহিত করেন এবং তাদের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য অনুপ্রাণিত করেন। গল্পের শেষে,

মহিমদার এই নতুন সংগ্রামকে এক 'নতুন করে ছক পাল্টানো' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যেখানে তিনি নিজে বড়ের চাল না চললেও সেইসব ছোট ছোট 'বড়ে'দের অর্থাৎ সাধারণ মানুষের শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে চান। এভাবে, 'সামনে চড়াই' গল্পটি বিপ্লবের এক নতুন সংজ্ঞা দেয়। এটি দেখায় যে, সত্যিকারের বিপ্লব শুধু বড় বড় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি মানুষের আত্মসম্মান ফিরিয়ে আনার এবং তাদের জীবনের মান উন্নয়নের এক নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস। গল্পটির শিরোনাম 'সামনে চড়াই' প্রতীকী অর্থ বহন করে— রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জনের পর সামনে যে কঠিন পথ পড়ে আছে, তা হল সমাজের সবচেয়ে দুর্বল মানুষকে উপরে তোলার সংগ্রাম। মহিমদার চরিত্রটি সেই সংগ্রামেরই প্রতীক।

প্রেমেন্দ্র মিত্র বাংলা সাহিত্যের এক প্রবাদপ্রতিম শিল্পী, যিনি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জীবনকে নিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন। তাঁর ছোটগল্পগুলিতে সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন, লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত প্রান্তিক মানুষের জীবন অত্যন্ত সংবেদনশীলতার সাথে ফুটে উঠেছে। এই মানুষগুলি শুধু দারিদ্র্যের শিকার নয়, বরং সামাজিক অবহেলা, ঘৃণা ও অপমানেরও শিকার। 'সংক্রান্তি' গল্পটি এই ধরনের চরিত্রের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, যেখানে অখিল নামক এক যুবকের জীবন, তার অসহায়তা এবং সমাজের নিষ্ঠুরতা এক মর্মস্পর্শী রূপ লাভ করেছে। গল্পের প্রধান চরিত্র অখিল যেন এক চলমান লাঞ্ছনার প্রতিচ্ছবি। সে শুধুমাত্র অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল নয়, বরং তার সামাজিক সম্মানও তলানিতে ঠেকেছে। মেসের ভাড়া বাকি থাকায় এবং তার নিত্যদিনের অসহায়তার কারণে সে বুড়ো হাঁপানি রোগীর (পূর্ণবাবু) কাছে প্রতিনিয়ত অপমানিত হয়। বুড়ো তাকে 'বেহায়া লোক' বলে গালি দেয়, তার জ্বরকে মিথ্যা আখ্যা দেয়, এবং তার সামান্য ভাতের থালা নিয়েও কটাক্ষ করতে ছাড়ে না। অখিলের এই অসম্মান শুধু বুড়োর কাছেই সীমাবদ্ধ নয়। মেসের ঝি, যার নিত্যদিনের কলহ তার কানে আসে, এবং মেসের ঠাকুরও তাকে ছোটলোক বলে সম্বোধন করে। ঠাকুর তার ধমকে ভ্রূক্ষেপ না করে তাকে কাজের সময় গোলমাল করতে বারণ করে, এবং তার সঙ্গে ঝগড়া করে তাকে আরও অপমানিত করে। এই সমস্ত ঘটনা অখিলকে আরও কোণঠাসা করে তোলে, এবং সে নিরুপায় ক্রোধে ফুঁসতে থাকে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র অখিলের মাধ্যমে প্রান্তিক মানুষের মানসিক যন্ত্রণাকে অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। অখিলের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অপমান, বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার স্মৃতি তাকে তাড়া করে বেড়ায়। শৈশবে তার মামাতো বোনের বিয়ের সময় বরপক্ষীয়দের সামনে বলা একটি সত্য কথা, যা তাকে সূঁচের মতো বিঁধেছিল। তা তার মনে গভীর ক্ষত তৈরি করে রেখেছে। এই ধরনের ছোট ছোট, তুচ্ছ অপমানগুলি তার মনে জমা হয়ে এক নিষ্ফল অভিমান ও সংসারের প্রতি বীতরাগ তৈরি করেছে। একসময় এক তরুণীর এক ঝলক স্নিগ্ধ ও নিষ্পাপ চাহনি তাকে জীবনের প্রতি নতুন করে আশাবাদী করে তোলে। সে তখন লিখেছিল,

> "আমায় অনেক দুঃখ দিলে দেবতা, অনেক লাঞ্ছনা, অনেক বঞ্চনার বেদনা; কিন্তু এইটুকুর জন্যে আজ তোমায় প্রণাম করছি।"[৫]

কিন্তু সেই স্নিগ্ধতাও মুহূর্তেই মিলিয়ে যায়, যখন তরুণীর বর্ষীয়সী মা তাকে 'ছোটলোক' বলে গালি দেয় এবং মেসের লোকজনের কাছে তার সম্মানহানির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই ঘটনা অখিলকে এতটাই ভেঙে দেয় যে সে লজ্জায়, ঘৃণায় ও ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মেস থেকে পালিয়ে যায়।

গল্পে আরও অনেক প্রান্তিক চরিত্রের উল্লেখ আছে যারা অখিলের মতোই অসহায়তার শিকার। পাওনাদার দর্জি, যার পাওনা মাত্র দশ আনা পয়সা, সেও অখিলকে তাড়া করে এবং প্রকাশ্যে অপমান করে। অখিলের বন্ধু, যার কাছে সে কুড়ি টাকা ধার করেছিল, সেও তাকে নীরব অবজ্ঞায় উপেক্ষা করে চলে যায়। এমনকি যখন অখিল তার কাছে একটি টাকা ভিক্ষা করে, তখন সে তাকে ভর্ৎসনা করে। এই প্রতিটি চরিত্র যেন সমাজের সেই দিকটিকে তুলে ধরে যেখানে মানবিকতা শুধু অর্থ ও প্রতিপত্তির ওপর নির্ভরশীল। জীবনের শেষ

মুহূর্তেও, যখন অখিল আফিম খেয়ে জীবন শেষ করার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন তার বন্ধু, মেসের সহকর্মী, এমনকি পথচারী মজুররাও তাকে সাহায্য করতে অস্বীকার করে। সমাজের এই নির্মম দিকটিই প্রেমেন্দ্র মিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। অখিল যখন জীবন ও মৃত্যুর মাঝে দাঁড়িয়েছিল, তখন তার ছবির চিঠি তাকে বাঁচতে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু আফিমের প্রভাবে তার শরীর শিথিল হয়ে আসছিল এবং সে জ্ঞান হারাতে শুরু করে। তার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, কারণ সমাজের কেউ তার ডাকে সাড়া দেয় না। এই গল্পে, লেখক প্রান্তিক মানুষের অসহায়তা ও একাকিত্বকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যে তা পাঠকের মনে গভীর দাগ ফেলে যায়।

'সংক্রান্তি' গল্পে প্রেমেন্দ্র মিত্র অখিল নামক এক প্রান্তিক চরিত্রের মাধ্যমে সমাজের নির্মম দিকটি তুলে ধরেছেন। এই গল্পে দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা, অপমান এবং মানুষের অসহযোগিতার এক ভয়াবহ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, যা সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষের জীবনকে প্রতিবিম্বিত করে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখনী এই প্রান্তিক মানুষের প্রতি এক গভীর সংবেদনশীলতার পরিচয় দেয়, এবং তাদের যন্ত্রণার ভাষাহীন আর্তনাদকে এক শক্তিশালী রূপ দেয়।

'পোনাঘাট পেরিয়ে' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বলাই, যে সমাজের চোখে একজন ব্যর্থ, ভবঘুরে এবং নেশাগ্রস্ত মানুষ। কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্র তাকে কেবল এই পরিচয়ে সীমাবদ্ধ রাখেননি। গল্প যত এগোয়, ততই তার চরিত্রের গভীরতা উন্মোচিত হয়। সে একজন ঘরজামাই, যার কোনও কাজ নেই। শাশুড়ি তাকে 'বকাটে' এবং 'ভীমরতি' ধরা জামাই হিসেবে দেখেন। স্ত্রী চপলাও তাকে ঘৃণা করে, কারণ সে একজন ভবঘুরে এবং নেশাখোর। সমাজের চোখে সে একজন অপদার্থ, যে চাকরি হারিয়েছে একই রাস্তার নম্বরগুলো একটু অদল-বদল করার মতো সামান্য ভুলের জন্য। কিন্তু বলাইয়ের নির্বিকার মুখ, তার তাচ্ছিল্যভরা হাসি এবং প্রখর আত্মমর্যাদা তাকে এক ভিন্ন মাত্রায় স্থাপন করে। সে জানে সমাজের চোখে তার কোনো মূল্য নেই, তাই সে প্রচলিত সমাজের নিয়ম-কানুন বা মর্যাদার তোয়াক্কা করে না। যখন তার শাশুড়ি তাকে তিরস্কার করে, তখন সে হাসে এবং রসিকতা করে। বলাইয়ের চরিত্রটি কেবল তার ব্যক্তিগত জীবন দিয়ে গঠিত নয়। তার চারপাশে থাকা মানুষগুলোও প্রান্তিক সমাজেরই অংশ। গরুর গাড়ির চালক মেহরারু, ওসমান, জীয়ুৎ— এরা সবাই কঠোর পরিশ্রমী, কিন্তু সমাজের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন। নদীর দুর্দশার কথা বলতে গিয়ে লেখক দেখান, কিভাবে এক সময়ের খরস্রোতা নদী এখন 'হাঁটু পর্যন্ত জল' ধারণ করে, যা এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক দুর্দশারই প্রতীক। বলাইয়ের কথায় সেই হতাশা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন সে বলে, "শহরে কি আর টাকা আছে রে বাপু, যে লোকে বাড়ি করবে?"[৬] তার এই উক্তি কেবল তার নিজস্ব হতাশা নয়, বরং তা সমগ্র অঞ্চলের অর্থনৈতিক মন্দার প্রতিফলন। তার রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিশ্লেষণও গভীরতা প্রকাশ করে, যেমন "ঐ কাগজ দিয়ে ভুলিয়ে সব টাকা বিলেতে চালান করে দিচ্ছে, তা জানিস?"[৭] এটি প্রমাণ করে যে সমাজের নিম্নস্তর থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও তার দৃষ্টি দেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার ওপর রয়েছে।

গল্পে খোঁড়াবাবুর চরিত্রটি শোষক শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে। সে সমাজের সেই অংশ, যারা সাধারণ মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নিজেদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বাড়ায়। বলাইয়ের সঙ্গে তার বিরোধ কেবল ব্যক্তিগত নয়, বরং তা সমাজের দুই বিপরীত শ্রেণির সংঘাত। খোঁড়াবাবু যখন বলাইকে 'বেপরোয়া ঘাড়ধাক্কা' দেয়, তখন তা কেবল এক ব্যক্তির ওপর আরেক ব্যক্তির ক্ষমতা প্রদর্শন নয়, বরং তা প্রান্তিক মানুষের প্রতি শোষক শ্রেণির চরম অবজ্ঞার প্রকাশ। বলাইয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার পদ্ধতিটি প্রতীকী। সে সরাসরি মারামারি বা বাগ্‌বিতণ্ডায় না গিয়ে খোঁড়াবাবুর নতুন খড়ের গোলায় আগুন দেয়। এই আগুন কেবল একটি গোলা ধ্বংস করে না, বরং তা প্রান্তিক মানুষের চাপা রাগ, হতাশা এবং বিদ্যমান ব্যবস্থার প্রতি তাদের প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে ওঠে।

বলাই বলে, "দেখলি সেলাম? নেশাখোর মানুষ-আমাদের রাগ করতে নেই, তবে আমাদের সেলাম এমনি!"[৮] এই উক্তিটি বলাইয়ের নিজস্ব দর্শনকে তুলে ধরে— প্রচলিত সমাজের প্রতি তার ঘৃণা এবং প্রতিবাদ।

প্রেমেন্দ্র মিত্র এই গল্পের মাধ্যমে দেখাতে চেয়েছেন যে তথাকথিত 'অপদার্থ' বা 'অপরাধী' মানুষরাও সমাজের নির্মমতার শিকার। তাদের আচার-আচরণ বা অপরাধের পেছনে লুকিয়ে থাকে গভীর হতাশা এবং এক ধরনের অব্যক্ত প্রতিবাদ। বলাইয়ের গল্প কেবল একজন নেশাখোরের গল্প নয়, বরং এটি প্রান্তিক মানুষের আত্ম-মর্যাদা রক্ষার এক নীরব লড়াইয়ের প্রতিচ্ছবি। প্রেমেন্দ্র মিত্র এই গল্পে তাদের কণ্ঠস্বর দিয়েছেন, তাদের দুঃখ-যন্ত্রণা ও প্রতিরোধকে সম্মান জানিয়েছেন, যা বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। তিনি দেখিয়েছেন, সমাজের প্রান্তিক মানুষের জীবনেও থাকে জটিলতা, আবেগ, এবং প্রতিরোধের আগুন, যা প্রচলিত সাহিত্যকে নতুন মাত্রা দেয়।

প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর গল্পে প্রান্তিক মানুষের জীবনকে কেবল তুলে ধরেননি, বরং তাদের প্রতি এক গভীর সহানুভূতি ও মর্যাদা প্রদর্শন করেছেন। বলাইয়ের মতো চরিত্রগুলোকে তিনি তাদের ব্যর্থতা বা অপরাধ দিয়ে বিচার করেননি, বরং তাদের ভেতরের মানবিকতা ও আত্ম-মর্যাদার লড়াইকে তুলে ধরেছেন। 'পোনাঘাট পেরিয়ে' গল্পে বলাইয়ের খোঁড়াবাবুর গোলায় আগুন দেওয়াটি কেবল একটি প্রতিশোধ নয়, বরং সমাজের শোষক শ্রেণির প্রতি প্রান্তিক মানুষের চাপা রাগ ও প্রতিরোধের প্রতীকী বিস্ফোরণ। বলাইয়ের এই কাজটি প্রমাণ করে যে সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত মানুষটিও তার আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য প্রতিবাদ করতে পারে, যদিও সেই প্রতিবাদ হয়তো সহিংস বা বেপরোয়া।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাহিত্য এই বার্তা দেয় যে, তথাকথিত 'প্রান্তিক' মানুষরাও সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাদের গল্প, দুঃখ, ও প্রতিরোধকে বাদ দিয়ে সমাজের সম্পূর্ণ চিত্র আঁকা সম্ভব নয়। তাই তার নির্বাচিত ছোটগল্পগুলো কেবল সাহিত্যিক মানদণ্ডেই উত্তীর্ণ নয়, বরং সমাজের অবহেলিত মানুষের জীবনচিত্র হিসেবেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি দেখিয়েছেন, সমাজের প্রান্তিক মানুষের জীবনেও থাকে জটিলতা, আবেগ, এবং প্রতিরোধের আগুন, যা প্রচলিত সাহিত্যকে নতুন মাত্রা দেয়।

তথ্যসূত্র:

১। মিত্র, প্রেমেন্দ্র। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প ১ম খণ্ড। দে'জ পাবলিশিং, মে ২০১৫, বৈশাখ ১৪২২, পৃ. ৬০৪।
২। তদেব, পৃ. ৬০২।
৩। তদেব, পৃ. ৬০৬।
৪। মিত্র, প্রেমেন্দ্র। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প ২ম খণ্ড। দে'জ পাবলিশিং, মে ২০১৫, বৈশাখ ১৪২২, পৃ. ১৮।
৫। মিত্র, প্রেমেন্দ্র। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প ১ম খণ্ড। দে'জ পাবলিশিং, মে ২০১৫, বৈশাখ ১৪২২, পৃ. ১৬৭।
৬। তদেব, পৃ. ২১৩।
৭। তদেব, পৃ. ২১৩।
৮। তদেব, পৃ. ২১৮।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। মিত্র, প্রেমেন্দ্র। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প ১ম খণ্ড। দে'জ পাবলিশিং, মে ২০১৫, বৈশাখ ১৪২২।

২। মিত্র, প্রেমেন্দ্র। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প ২ম খণ্ড। দে'জ পাবলিশিং, মে ২০১৫, বৈশাখ ১৪২২।

৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিন্দিতা। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প মননে ও সৃজনে। পুস্তক বিপণি, ২০০৫।

৪। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার। কালের পুত্তলিকা। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ আশ্বিন ১৪২৩, অক্টোবর ২০১৬।

৫। সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার। কল্লোল যুগ। এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, মাঘ, ১৪২৬।

৬। ঘোষ, বিনয়। মেট্রোপলিটন মন: মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ। প্রথম দীপ সংস্করণ: প্রাইভেট লিমিটেড, জুন ২০২০।

৭। ভট্টাচার্য, তপোধীর। নারী চেতনা মননে ও সাহিত্যে। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০২২।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 982-991
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.314

ন্যায়-বৈশেষিক গুণতত্ত্বে রূপরসাদি, পৃথক্ত্ব ও পরত্বাপরত্ব: *পদার্থতত্ত্বনিরূপণ*-কেন্দ্রিক বিশ্লেষণ

সুদীপ্ত মণ্ডল, *গবেষক, সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 28.02.2026; Accepted: 07.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The sovereign of imagination and the crown jewel of logic, Raghunatha Shiromani, in his immortal work *Padārthatattvanirūpaṇa*, analyzed and established the doctrine of categories (padārthatattva) with the brilliance of an independent philosophical genius. A close and profound study of the text reveals that, among the various ontological doctrines formulated by the ancient philosophers of the Nyāya and Vaiśeṣika systems through extensive inquiry, Raghunatha accepted only those views that satisfied the rigorous standards of his subtle intellect and irrefutable logic. Conversely, those traditional conclusions that appeared to him logically weak or philosophically untenable were boldly refuted, even if they had long been upheld within the established tradition. In their place, he firmly articulated and defended his own independent, coherent, and carefully reasoned positions. *Padārthatattvanirūpaṇa* stands as a jewel among Raghunatha's works. The treatise is systematically structured and firmly grounded upon the harmonious integration of valid means of knowledge (pramāṇa) and logical reasoning (tarka). Shiromani was a philosopher of mature intellect who possessed unwavering confidence in his own intellectual and analytical powers. In this work, his innovative imagination, penetrating analytical capacity, and distinctive philosophical originality often expressed in contrast to earlier authorities reach their fullest expression. His fresh perspective infused the Navya-Nyāya community with renewed vigor and creative enthusiasm. The renowned logicians of Nabadwip, inspired by his example, devoted themselves to the subtle formulation and systematic recording of ever-new theories and arguments. In the present research paper, a sincere attempt has been made to offer a concise yet focused discussion, in the light of *Padārthatattvanirūpaṇa*, of certain qualities (guṇa) such as colour and taste (rūpa, rasa, etc.), as well as separateness/distinctness (pṛthaktva), remoteness (paratva), and nearness/ proximity (aparatva).

Keywords: Colour, Taste, Separateness, Remoteness, Nearness, Nyāya–Vaiśeṣika, *Padārthatattvanirūpaṇa*

তার্কিক শিরোমণি শ্রীরঘুনাথ তাঁর *পদার্থতত্ত্বনিরূপণ* গ্রন্থে স্বতন্ত্ররূপে পদার্থের বিবেচন করেছেন। এই গ্রন্থটি ন্যায়বৈশেষিক প্রস্থানের অন্তর্গত হলেও কেবলমাত্র প্রাচীন ন্যায়বৈশেষিকসম্মত পদার্থসমূহই এটিতে পর্যালোচিত হয়নি। কিছু বিশেষ স্থলে ন্যায়বৈশেষিক মতবিরুদ্ধ এবং মীমাংসকদের অনুমত পদার্থ স্বীকার করতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেননি। রঘুনাথ বৈশেষিক দর্শনের সপ্তপদার্থবাদের পরীক্ষা এবং ন্যায়শাস্ত্রের কতিপয়স্থলের সমীক্ষা

সূত্ররূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন। গ্রন্থের বিষয়সমূহ শিরোমণির স্বাধীন দার্শনিক চিন্তার মূর্ত বিকাশরূপে অভিহিত করা যেতে পারে। এই গ্রন্থেই পূর্বাচার্যদের মতের বিপরীতে তাঁর অভিনব কল্পনা, বিশ্লেষণক্ষমতা ও দার্শনিক স্বাতন্ত্র্যের চূড়ান্ত প্রকাশ লক্ষিত হয়। তাঁর এই নবদৃষ্টিভঙ্গি নব্যন্যায়সমাজে এক নব উদ্যম ও সৃজনোচ্ছ্বাসের সঞ্চার করেছিল; নবদ্বীপের প্রখ্যাত নৈয়ায়িকগণ তাঁর অনুকরণে নিত্যনতুন তত্ত্ব ও তর্কের সূক্ষ্ম উদ্ভাবন ও লিপিবদ্ধকরণে আত্মনিয়োগ করেন।

মহর্ষি কণাদ তাঁর *বৈশেষিকসূত্রে* বলেছেন—

> "রূপরসগন্ধস্পর্শাঃ সংখ্যাঃ পরিমাণানি পৃথক্ত্বং সংযোগবিভাগৌ পরত্বাপরত্বে বুদ্ধয়ঃ সুখদুঃখে ইচ্ছাদ্বেষৌ প্রযত্নাশ্চ গুণাঃ।"[১]

অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ এবং প্রযত্ন— গুণ পদার্থের অন্তর্গত। গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম, অধর্ম এবং শব্দ— এই গুণগুলি সূত্রে স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হয়নি; কিন্তু পরে এগুলোকেও গুণের মধ্যে গ্রহণ করা হবে। সেজন্য শ্রীশঙ্করমিশ্র কৃত *উপস্কার*-টীকায় বলা হয়েছে—

> "চকারেণ গুরুত্বদ্রবত্বস্নেহসংস্কারধর্মাধর্মশব্দান্ সমুচ্চিনোতি তে হি প্রসিদ্ধগুণভাবা এবেতি কণ্ঠতো নোক্তাঃ।"[২]

বৈশেষিকমতে রূপ সাত প্রকার— শুক্ল, নীল, পীত, রক্ত, হরিত, কপিশ ও চিত্র। এই সাতপ্রকারই রূপ স্বীকৃত হলেও এইরূপগুলির অনেক অবান্তর ভেদ আছে। ন্যায়বৈশেষিকাচার্য্যগণ নীলরূপ ও কৃষ্ণরূপকে অভিন্ন মনে করেন। রসশাস্ত্রে নীল ও শ্যাম ভিন্নভাবে স্বীকৃত হয়েছে। বীভৎসরসকে নীল ও শৃঙ্গাররসকে শ্যাম বলা হয়েছে। কবিবৃন্দও ঐ দুটিকে অর্থাৎ নীল ও শ্যামকে ভিন্ন বলেই বর্ণনা করেন। অন্ধকারকে বা তেজের অভাবে প্রতীয়মান রূপকে নীল বা কৃষ্ণ বলা হয়েছে। নীলরূপ ও কৃষ্ণরূপকে অভিন্ন বললেও তাদের তারতম্য অনস্বীকার্য। স্থূলভাবে রূপকে সাতপ্রকার বলা হয়েছে। আবার এই রূপগুলোকে উদ্ভূত ও অনুদ্ভূত— এই ভেদে প্রত্যেকটিকে দ্বিবিধ বলা হয়েছে। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকেই বোঝা যায়, যে যে গুণ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ হয়, সেই সেই ইন্দ্রিয়ই অবশ্যই ঐ গুণগুলোর আশ্রয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, চক্ষুরিন্দ্রিয় থেকে রূপের প্রত্যক্ষ জন্মায়; তাই তৈজস ইন্দ্রিয় চক্ষু রূপের আশ্রয়। একইভাবে পার্থিবেন্দ্রিয় ঘ্রাণের মাধ্যমে গন্ধ গ্রহণ করা হয়; সুতরাং ঘ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধের গ্রাহক ইন্দ্রিয় এবং সেটিই গন্ধের আশ্রয়। আরও বলা হয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পার্থিবত্বনিবন্ধন তার রূপবত্তার কারণেই নির্ধারিত। তদ্রূপ ঘ্রাণেন্দ্রিয়, চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গের মহৎ পরিমাণও অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। রূপবিশিষ্ট ঘট ইত্যাদির যেমন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় তেমনি ঘ্রাণেন্দ্রিয়, চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলোরও কি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত নয়? এর উত্তরে প্রাচীন ন্যায়বৈশেষিকসম্প্রদায় বলেন, রূপমাত্র চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের কারণ নয়। বরং উদ্ভূতরূপ বা উদ্ভূত রূপবিশিষ্ট দ্রব্যই লৌকিক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয়। প্রাণেন্দ্রিয় বা চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গে লৌকিক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের উপযোগী উদ্ভূতরূপ না থাকায়, সেগুলোর চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ সম্ভব নয়। নীল, পীত প্রভৃতি রূপে যে উদ্ভূতত্ব বা অনুদ্ভূতত্ব ধর্ম ধরা হয়, তার প্রকৃত স্বরূপ কী? এগুলো কি রূপত্বের ব্যাপ্য কোনও জাতিবিশেষ, না কি উপাধিবিশেষ? এই দুই কল্পনার মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ উদ্ভূতত্ব ও অনুদ্ভূতত্বকে জাতিবিশেষ বলা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আচার্য উদয়ন ছয় প্রকার জাতিবাধকের কথা বলেছেন; তার মধ্যে সাঙ্কর্য একটি প্রধান জাতি-বাধক। কোনও ধর্ম যদি অন্য একটি ধর্মের দ্বারা সঙ্কীর্ণ হয়, তবে সেই সঙ্কীর্ণ ধর্মকে আর জাতি বলা যায় না। উদ্ভূতত্ব ও অনুদ্ভূতত্বও নীলত্ব, পীতত্ব প্রভৃতি জাতির দ্বারা সঙ্কীর্ণ; অতএব এদের কোনওটিই জাতি হতে পারে না। কেউ যদি বলেন সকল নীল, পীতাদি রূপে অনুগত যে উদ্ভূতত্ব, তা সাঙ্কর্যদোষের কারণে জাতি না হলেও, সকল রূপগত একটি সাধারণ জাতি

স্বীকার না করে শুক্লত্ব, নীলত্ব প্রভৃতি জাতির ব্যাপ্য নানা উদ্ভূতত্ব ধরা যেতে পারে তবুও এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, যদি শুক্লত্বাদির ব্যাপ্য বহু উদ্ভূতত্বকে জাতি হিসেবে মানা হয়, তবে সেই উদ্ভূতত্বজাতিকে সামনে রেখে উদ্ভূত রূপের সঙ্গে দ্রব্যের লৌকিক প্রত্যক্ষের কার্য-কারণভাব স্থাপন করা যাবে না। কার্য-কারণভাব তখনই সিদ্ধ হয়, যখন কারণে কার্যের অন্বয় ও ব্যতিরেকগ্রহ থাকে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, কোনও বিশেষ উদ্ভূত রূপ অনুপস্থিত থাকলেও অন্য উদ্ভূত রূপ থেকে সেই দ্রব্যের লৌকিক প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়। অতএব কোনও নির্দিষ্ট উদ্ভূতরূপ না থাকলেও যদি দ্রব্যের লৌকিক প্রত্যক্ষরূপ কার্য ঘটে, তবে কারণের ব্যতিরেক সত্ত্বেও কার্যোৎপত্তি ঘটে এতে ব্যতিরেকব্যভিচার জন্মায়। আর এই ব্যতিরেকব্যভিচারের জ্ঞান কার্যকারণভাবগ্রহের প্রতিবন্ধক। তাই এমন উদ্ভূতত্বজাতি মানলে কোনও নির্দিষ্ট উদ্ভূতরূপের কারণতা প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। এই সমস্যার সমাধানের জন্য প্রাচীন সম্প্রদায় বলেন— নীলত্ব, পীতত্ব প্রভৃতির ব্যাপ্য যে নানা অনুদ্ভূতত্ব জাতি, তা স্বীকার করতে হবে। আর যে অনুদ্ভূতত্বজাতি ধরা হয়, তার অভাবসমষ্টিকেই উদ্ভূতত্ব হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এর ফলে অনুদ্ভূতত্বের অভাবসমষ্টিরূপ যে উদ্ভূতত্ব, তাকে সামনে রেখে শুক্ল, নীল, পীত প্রভৃতি উদ্ভূত-রূপবিশিষ্ট দ্রব্যের লৌকিক প্রত্যক্ষের কারণ নির্ধারণ করলে পূর্বে আশঙ্কিত কোনও দোষ আর থাকে না। এইভাবে উদ্ভূত ও অনুদ্ভূত রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদি স্বীকার করলে লৌকিক বিষয়তার ক্ষেত্রে রূপের প্রত্যক্ষে উদ্ভূত রূপের কারণতা এবং স্পর্শের প্রত্যক্ষে উদ্ভূত স্পর্শের কারণতা প্রভৃতি যথাযথভাবে স্থাপন করা সম্ভব হয়। কিন্তু রঘুনাথ অনুদ্ভূত রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি মানতে চান না। *পদার্থতত্ত্বনিরূপণ* গ্রন্থে রঘুনাথ বলেছেন—

> "রূপাদীনাং চ নেন্দ্রিয়গ্রহণাযোগ্যত্বম্। বায়বাদৌ রূপং নাস্তীতি সার্বলৌকিকপ্রত্যয়াত্। অন্যথা অতীন্দ্রিয়-প্রতিযোগিত্বেন পিশাচাত্যন্তাভাবস্যেব তৎসামাণ্যাভাবস্যাপ্রত্যক্ষতাপত্তিঃ। অতীন্দ্রিয়ানন্তস্পর্শকোটিকল্পনা-মপেক্ষ্য লাঘবাৎ মূর্ত্তত্বেনৈব দ্রব্যসমবায়িকারণত্বম্। মূর্ত্তত্বং তু স্পন্দসমবায়িকারণতাবচ্ছেদকো জাতিবিশেষঃ। ভূতত্বমপি তদেব। সমবেতেন্দ্রিয়গ্রাহ্যগুণববৃত্তিদ্রব্যত্বব্যাপ্যজাতিমত্ত্বং তদিত্যপি কেচিত্। অন্ত্যাবয়বিনিরাসস্তু আবয়োঃ সমানঃ।"[৩]

রঘুনাথের বক্তব্য হল— চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অতীত, অর্থাৎ যা চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গের দ্বারা লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না, এমন অযোগ্য রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শের অস্তিত্ব প্রমাণসিদ্ধ নয়। বরং যদি অতীন্দ্রিয় রূপ, রস ইত্যাদি স্বীকার করা হয়, তাহলে যেমন পিশাচ প্রভৃতির অভাব অতীন্দ্রিয় প্রতিযোগী হওয়ায় লৌকিক প্রত্যক্ষের অযোগ্য, তেমনি বায়ু প্রভৃতিতেও রূপসামান্যাভাব লৌকিক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হতে পারবে না। কারণ, অভাবনিষ্ঠ লৌকিক বিষয়তার ক্ষেত্রে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের জন্য স্বপ্রতিযোগিতাকত্বসম্বন্ধে যোগ্য প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগীসামান্যই কারণ। এই কার্যকারণভাবের ভিত্তিতে রূপসামান্যভাবের চক্ষুরিন্দ্রিয়জন্য লৌকিক প্রত্যক্ষ হওয়া সম্ভব নয়; কারণ রূপসামান্যের অন্তর্ভুক্ত অতীন্দ্রিয় রূপও সেখানে প্রতিযোগী হয়ে দাঁড়ায়। *পদার্থতত্ত্বনিরূপণ* গ্রন্থের উপর শ্রীবিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন রচিত টীকায় বলা হয়েছে—

> "ননু বহিরিন্দ্রিয়স্য গ্রাহ্যজাতীয়বিশেষগুণবত্ত্বনিয়মাচ্চক্ষুরাদেরতীন্দ্রিয়ং রূপং স্যাত্। ন স্যাত্ অপ্রয়োজকত্বাৎ। বায়বাদাবিতি। আদিনা জলাদিসংগ্রহঃ। রূপং নাস্তীত্যুপলক্ষণং জলে গন্ধো নাস্তীতি বোধ্যম্। অন্যথা রূপাদেরতীন্দ্রিয়ত্বে। নন্বতীন্দ্রিয়প্রতিযোগিকত্বেঽপি পিশাচাদিভেদবত্তস্যৈন্দ্রিয়কত্বমস্তু ফলানুরোধিত্বাৎ কল্পনায়াঃ। যোগ্যানুপলব্ধেরগ্রে নিরাকরিষ্যমাণত্বাৎ ইতি চেত্, সত্যম্। যদি বায়বাদৌ রূপাদ্যভাবশশক্যনির্ণয়ঃ স্যাৎ, তদেব তু নাস্তি। চক্ষুরাদিবদনুদ্ভূতরূপস্যাপি তত্র সম্ভবাত্। বায়বাদৌ নীরূপত্বপ্রত্যয়ো ভ্রান্ত এব স্যাত্। তত্র সাধকাভাব ইতি চেত্, প্রকৃতেঽপি দীয়তাং দৃষ্টিঃ। দ্রব্যত্বাদেরিব তেজস্ত্বাদেরপ্যকিঞ্চিৎকরত্বাৎ।"[৪]

প্রাচীন মতে রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতি কখনও প্রত্যক্ষযোগ্য, কখনও প্রত্যক্ষের অযোগ্য বলে স্বীকৃত হয়েছে। অর্থাৎ উদ্ভূতরূপ, উদ্ভূতরস, উদ্ভূতগন্ধ এবং উদ্ভূতস্পর্শ লৌকিক প্রত্যক্ষগোচর; কিন্তু অনুদ্ভূত রূপ, অনুদ্ভূত রস, অনুদ্ভূত গন্ধ ও অনুদ্ভূত স্পর্শ— চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সন্নিকৃষ্ট থাকিলেও প্রত্যক্ষযোগ্য হয় না। এই প্রাচীন মতসিদ্ধ অনূদ্ভূত রূপ, রস প্রভৃতি খণ্ডনের উদ্দেশ্যে রঘুনাথ বলছেন যে চক্ষুঃ, রসনা ও ঘ্রাণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের অযোগ্য রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতি স্বীকৃত নয়; অতএব অনূদ্ভূত রূপ, রস প্রভৃতি স্বীকারযোগ্য নয়। নবীন মতে সমবেত দ্রব্যের প্রতি মূর্তত্বে অবয়ব দ্রব্যের যে সমবায়িকারণতা স্বীকৃত, উক্ত সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক মূর্তত্ব পদার্থটি কী? যদি 'অবচ্ছিন্ন পরিমাণবত্ত্ব' মূর্তত্বের স্বরূপরূপে গ্রহণ করা হয়, তবে অনন্ত পরিমাণকেও পূর্বোক্ত সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক স্বীকার করতে হয়। তা হলে বিনিগমনাবিরহপ্রযুক্ত স্পর্শবত্বে দ্রব্যগত সমবায়িকারণতা কল্পনা করে অতীন্দ্রিয় স্পর্শসমূহকেও তদ্রূপ সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক বলা যাবে না কেন— এই প্রশ্ন দেখা দেয়। এই প্রশ্নের সমাধানার্থে রঘুনাথ বলেন— 'মূর্তত্ব' স্পন্দের সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক জাতিবিশেষ। অর্থাৎ 'মূর্তত্ব' অবচ্ছিন্ন পরিমাণবত্ত্ব নয়; বরং এটি এক জাতি বিশেষ। উক্ত মূর্তত্ব জাতি স্পন্দ-সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকত্বরূপ হেতু দ্বারা সিদ্ধ। ভূতত্ব ও মূর্তত্ব অভিন্ন; অর্থাৎ মূর্তত্ব অপেক্ষা ভূতত্ব অতিরিক্ত কোনো পদার্থ নয়। মতান্তর প্রদর্শনের জন্য রঘুনাথ আরও বলেন— সমবেত ইন্দ্রিয়বর্গ দ্বারা গৃহীত যে গুণসমূহ (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি), তাদৃশ গুণবৃত্তিযুক্ত যে দ্রব্যত্বব্যাপ্য জাতিবিশেষ, তাকেই মূর্তত্ব বলা উচিত— এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ভূত ও মূর্ত্তপদের তদ্রূপ উপাধিরূপ শক্যতাবচ্ছেদক (প্রবৃত্তিনিমিত্ত) কল্পনা করলে অনাবশ্যক গৌরব স্বীকার করতে হয়। অতএব উক্ত উপাধি কল্পনা না করে ভূতপদার্থকেই মূর্ত্ত পদার্থগত একটি জাতি স্বীকার করাই সমীচীন— ইহাই রঘুনাথের বক্তব্য। এই জন্য রঘুনাথের সিদ্ধান্ত— কোনও অতীন্দ্রিয় রূপ, রস, স্পর্শ বা গন্ধ কল্পনা করা যায় না। যদি তা কল্পনা করা হয়, তবে "বায়ৌ রূপং নাস্তি"— এই সর্বানুভবসিদ্ধ প্রতীতিরই অপলাপ ঘটে। এখানে আপত্তি তোলা যেতে পারে— রঘুনাথ যদি অতীন্দ্রিয় অনুদ্ভূত রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ স্বীকার না করেন, তাহলে সমস্যা দেখা দেয়। কারণ চক্ষুঃস্বরূপ যে অবয়বী দ্রব্য, তার অন্তর্গত স্পর্শের ক্ষেত্রে অবয়বগত অনুদ্ভূত স্পর্শকে কারণ হিসেবে ধরা যাবে না। আবার গগন প্রভৃতি স্পর্শশূন্য দ্রব্যে দ্রব্যারম্ভকত্ব নিবারণের জন্য, জন্য-দ্রব্যের প্রতি স্পর্শবৎ দ্রব্যত্বে সমবায়ী কারণতা মানতে হবে। ফলে যদি অনুদ্ভূত স্পর্শ স্বীকার না করা হয়, তাহলে অবয়বী চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রে চক্ষুর অবয়বকে সমবায়িকারণ বলা সম্ভব হবে না। সুতরাং উক্ত কার্যকারণভাব রক্ষার জন্য অনুদ্ভূত, অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় স্পর্শ স্বীকার করা বাধ্যতামূলক বলে মনে হতে পারে। এই আশঙ্কার জবাবে রঘুনাথ বলেন— এভাবে কার্যকারণভাব বজায় রাখতে গেলে অসংখ্য অতীন্দ্রিয় স্পর্শব্যক্তি স্বীকার করতে হয়, যা মহাগৌরবের কারণ হবে। তাই লাঘবের দিক বিবেচনা করে জন্যদ্রব্যের প্রতি মূর্তত্ব ধর্মে অবয়ব দ্রব্যের কারণতা কল্পনা করাই যুক্তিযুক্ত। অতএব অতীন্দ্রিয় অনুদ্ভূত রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। এখন রঘুনাথের এই সিদ্ধান্ত নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। কেউ কেউ বলেন, মূর্তত্ব ধর্ম হল পরিচ্ছিন্ন পরিমাণের আশ্রয়ত্ব; আবার কারও মতে এটি ক্রিয়াশ্রয়ত্ব। যদি এমন ধরা হয়, তবে পরিমাণ বা ক্রিয়ার ভেদ অনুসারে অবয়বদ্রব্যের কারণতা কল্পনা করতে গেলে কার্যকারণভাবের ভিন্নতা ধরতে হবে— ফলে কল্পনাগৌরব এড়ানো যাবে না। এর উত্তরে রঘুনাথের বক্তব্য— মূর্তত্ব পরিচ্ছিন্নপরিমাণবত্ত্ব বা ক্রিয়াশ্রয়ত্ব নয়; বরং এটি একটি জাতিবিশেষ। অতএব অবয়বী দ্রব্যমাত্রের ক্ষেত্রে মূর্তত্বরূপ জাতিবিশেষে অবয়বদ্রব্যের কারণতা স্থাপন করতে হবে। ফলে এখানে কোনও প্রকার গৌরবের আশঙ্কা থাকে না। *পদার্থতত্ত্বনিরূপণ* গ্রন্থের উপর শ্রীরঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার বিরচিত টীকায় বলা হয়েছে—

"অন্যথা চাক্ষুষাদিকং প্রতি চাক্ষুষবিষয়ান্যত্বাদিনা প্রতিবন্ধকত্বাদেব নীরূপাদীনাং চাক্ষুষবারণোপপত্তৌ রূপাদিমহত্ত্বাদিহেতুতাবিলয়প্রসঙ্গাৎ। অন্যত্র চ বহুতরকারণতাবিলয়প্রসঙ্গাদিতি চেত্, ন। অনায়ত্যাঘটত্বাদিনা বিশিষ্য প্রতিবন্ধকতায়াঃ স্বীকারাত্। অথবা জন্যদ্রব্যত্বাবচ্ছিন্নং প্রতি বিজাতীয়ৈকত্ববত্তেনৈব হেতুত্বমভ্যুপেয়তে। অন্ত্যাবয়বিনামেকত্বে তাদৃশবৈজাত্যানভ্যুপগমাদেব ন তত্র দ্রব্যোৎপাদাপত্তিরিতি। প্রাগভাববিরহেণ ন দ্রব্যোৎপাদ ইত্যন্যে। বস্তুতস্তু বিজাতীয়সংযোগরূপাসমবায়ি-কারণবিরহাদেব ন তত্র দ্রব্যোৎপাদ ইতি সমীচীনম্।"[৫]

রঘুনাথ আকাশ ও মন পদার্থ খণ্ডন করায় ভূতত্ব ও মূর্তত্ব— উভয়ই কেবল পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ুতে বর্তমান; ফলে এরা সমনিয়ত হয়েছে। এই কারণেই তিনি ভূতত্ব ও মূর্তত্বকে অভিন্ন জাতি বলেছেন। সমনিয়ত হওয়ায় এখানে সাঙ্কর্যদোষের আশঙ্কাও দূর হয়।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি চতুর্বিংশতি গুণের মধ্যে পৃথক্ত্ব একটি স্বতন্ত্র গুণ। পৃথক্ত্ব সামান্য গুণ, সকল দ্রব্যেই থাকে। 'ইদম্ অস্মাৎ পৃথক্'— এই দ্রব্যটি এই দ্রব্য হতে পৃথক্ এরূপ ব্যবহারের অসাধারণ কারণকে পৃথক্ত্ব বলা হয়। পৃথক্ত্ব দুই প্রকার— একপৃথক্ত্ব ও দ্বিপৃথক্ত্ব আদি। নিত্যদ্রব্যে স্থিত একপৃথক্ত্ব নিত্য। অনিত্য দ্রব্যে স্থিত একপৃথক্ত্ব অনিত্য। দ্বিপৃথক্ত্ব আদি সকল পৃথক্ত্বই অনিত্য। পৃথক্ত্বগুণের বোধ বা ব্যবহার ঘটতে গেলে পৃথক্ত্ববোধক পদের পূর্বে অবধিত্ববোধক পঞ্চমী-বিভক্ত্যন্ত পদ আবশ্যক। যেমন 'ইদমস্মাৎ পৃথক্' এরূপ ব্যবহারে দ্রব্যবিশেষগত পৃথক্ত্বের বোধ হয়। এই কারণে পৃথক্-ব্যবহারের অসাধারণ কারণত্বকেই পৃথক্ত্বের লক্ষণ বলা হয়। একত্ব, দ্বিত্ব সংখ্যার ন্যায় একপৃথক্ত্ব, দ্বিপৃথক্ত্ব প্রভৃতিও প্রাচীনসম্মত। প্রাচীনগণ আরও বলেন— পৃথক্ত্ব অন্যোন্যাভাব নয়। কারণ 'ইদমস্মাৎ পৃথক্' ও 'ইদমিদং ন ভবতি'— এই দুই প্রতীতির বৈলক্ষণ্য আছে; অতএব পৃথক্ত্ব ও অন্যোন্যাভাব অভিন্ন নয়। যদি উভয়কে সমার্থক ধরা হয়, তবে 'ইদমস্মাৎ পৃথক্' স্থলে যেরূপ অবধিত্ববোধক পঞ্চমীবিভক্তি প্রয়োজন, নঞ্-প্রয়োগস্থলেও ('ইদমস্মাদ্ ন') সেরূপ পঞ্চমীবিভক্তির আপত্তি উপস্থিত হবে। অতএব পৃথক্ত্ব অন্যোন্যাভাব নয়; বরং চতুর্বিংশতি গুণের অন্তর্গত স্বতন্ত্র গুণ। এই প্রাচীনসম্মত পৃথক্ত্বগুণ খণ্ডন করতে রঘুনাথ বলেন— পৃথক্ত্ব গুণান্তর নয়। *পদার্থতত্ত্বনিরূপণ* গ্রন্থে রঘুনাথ বলেছেন—

> "পৃথক্ত্বমপি ন গুণান্তরম্। অন্যোঽন্যাভাবাদেব পৃথক্ত্বব্যবহারোপপত্তেঃ। পৃথক্ত্বপ্রতীতিস্তু ন সাবধিকত্বাবলম্বনা, মানাভাবাত্। ঘটাৎ পটঃ পৃথক্ ইতরোঽন্যো ভিন্নোঽর্থান্তরমিত্যাদৌ চ তত্তচ্ছব্দবিশেষপ্রয়োগে পঞ্চম্যানুশাসনিকী।"[৬]

'ঘট পট হতে পৃথক্'— এই প্রতীতিতে ঘটাংশে যে পৃথক্ত্ব বিশেষণরূপে প্রতীয়মান, তা প্রমাণসিদ্ধ নয়; অতএব গুণবিশেষ বলে মান্য নয়। এখন প্রশ্ন— 'পৃথক্ত্ব' কোন পদার্থের অন্তর্গত? রঘুনাথের উত্তর— পৃথক্ত্ব অন্যোন্যাভাবেই অন্তর্ভুক্ত। অতএব পৃথক্-ব্যবহার অন্যোন্যাভাব হতেই উপপন্ন। আবার আশঙ্কা হতে পারে— পৃথক্ত্বে সাবধিত্ব থাকায় ইহা অভাব নয়; অতএব পৃথক্ত্বে অন্যোন্যাভাবত্বের অভাব প্রমাণিত। রঘুনাথ বলেন— পৃথক্ত্ব-ব্যবহারের জন্য সাবধিত্ব অপরিহার্য— এমন প্রমাণ নেই। *পদার্থতত্ত্বনিরূপণ* গ্রন্থের উপর শ্রীবিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন রচিত টীকায় বলা হয়েছে—

> "ন গুণান্তরমিতি। 'ঘটাদ্ পটঃ পৃথগিতি' প্রতীতৌ পটাংশে প্রকারীভূতঃ পটত্বাতিরিক্তো ধর্মঃ, 'পটো ন ঘট' ইত্যত্র প্রকারীভূততাদৃশধর্মাতিরিক্তো ন বেতি বিপ্রতিপত্তিঃ। নন্বন্যোঽন্যাভাবস্য ন সাবধিত্বম্ অপি তু সপ্রতিযোগিকত্বম্। পৃথক্ত্বস্য তু বৈপরীত্যম্, তৎকথং তয়োরভেদ ইত্যত আহ— পৃথক্ত্বপ্রতীতিব্যবহার ইতি।"[৭]

প্রাচীন ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতে, যে প্রতীতি পৃথক ব্যবহারের উপযোগী, সেখানে অবধিত্ববোধক পঞ্চমীবিভক্তিযুক্ত পদের একটি নিয়মিত প্রত্যাশা থাকে। তাই তাঁরা মনে করেন, অন্যোন্যাভাব দিয়ে পৃথকত্বের ব্যবহার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু রঘুনাথ এই সিদ্ধান্ত মানেন না। তাঁর মতে, পৃথক্ত্বের প্রতীতি বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বত্র পঞ্চমীবিভক্তিযুক্ত পদের অবধিত্বের প্রত্যাশা থাকবে— এ কথা ঠিক নয়। যেমন— 'ঘটাৎ পটঃ পৃথক্'— এখানে পঞ্চমী-বিভক্তির ব্যবহার আছে। কিন্তু 'ঘটাদিতরঃ পটঃ', 'ঘটাদন্যঃ পটঃ', 'ঘটাদ্ভিন্নঃ পটঃ', 'ঘটাদর্থান্তরঃ পটঃ'— এই সকল ক্ষেত্রেও অন্ত, অন্য, ভিন্ন, অর্থান্তর প্রভৃতি অন্যোন্যাভাববোধক শব্দের সঙ্গে পঞ্চমী-বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। অতএব যেখানে 'অন্য', 'ভিন্ন' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়, সেখানে যেমন অন্যোন্যাভাববিশিষ্ট অর্থই বোঝানো হয়, তেমনি 'ঘটাৎ পটঃ পৃথক্'— এই ব্যবহারে 'পৃথক্' শব্দটিও অন্যোন্যাভাববিশিষ্ট অর্থই নির্দেশ করে। *পদার্থতত্ত্বনিরূপণ* গ্রন্থের উপর শ্রীরঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার বিরচিত টীকায় বলা হয়েছে—

> "পৃথক্ত্বস্য গুণত্বং নিরাকরোতি — পৃথক্ত্বমপীত্যাদি। 'ঘটাৎ পটঃ পৃথগি'তি প্রতীতিপ্রকারোঽপি গুণপদবাচ্যো নেত্যর্থঃ। প্রমাণাভাবাদিতি ভাবঃ। যত্তু ন গুণান্তরমিত্যস্য গুণত্বজাত্যভাববদিত্যর্থ ইতি, তন্ন। গুণত্বে জাতিত্বস্যাগ্রে নিরাকর্তব্যতয়া তথা ব্যাখ্যাতুমশক্যত্বাৎ। ননু পৃথগ্ব্যবহারবিষয়স্য অন্যত্র কুত্রাপ্যন্তর্ভাবা-সম্ভবেনান্যথানুপপত্ত্যা গুণপদবাচ্যতাভ্যুপগম আবশ্যক ইত্যত আহ — অন্যোন্যেতি।"[৮]

পরত্ব ও অপরত্ব— এই দুটি গুণ ন্যায়বৈশেষিক মতে স্বীকৃত। পরত্ব, অপরত্ব এই দুটি গুণ পরস্পরসাপেক্ষ। শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননভট্টাচার্য *ভাষাপরিচ্ছেদে* বলেছেন —

> "পরত্বঞ্চাপরত্বঞ্চ দ্বিবিধং পরিকীর্তিতম্।
> দৈশিকং কালিকঞ্চাপি, মূর্ত এব তু দৈশিকম্॥
> পরত্বং, মূর্তসংযোগভূয়স্ত্বজ্ঞানতো ভবেৎ।
> অপরত্বং তদল্পত্ববুদ্ধিতঃ স্যাদিতীরিতম্॥
> তয়োরসমবায়ী তু দিক্‌সংযোগস্তদাশ্রয়ে।
> দিবাকর পরিস্পন্দভূয়স্ত্বজ্ঞানতো ভবেৎ॥
> পরত্বমপরত্বন্তু তদীয়াল্পত্ববুদ্ধিতঃ।
> অত্র ত্বসমবায়ী স্যাৎ সংযোগঃ কালপিণ্ডয়োঃ॥"[৯]

অর্থাৎ দৈশিক পরত্ব ও অপরত্ব কেবল মূর্ত দ্রব্যেই অবস্থিত। বিভু দ্রব্যে দিক্‌সংযোগরূপ অসমবায়িকারণত্ব উপপন্ন না হওয়ায় 'পরত্ব' ও 'অপরত্ব' মূর্ত দ্রব্যেরই গুণরূপে স্বীকৃত। মূর্ত দ্রব্যের অধিক সংযোগের আনন্তর্যজ্ঞান থেকে দৈশিক পরত্বের উদ্ভব ঘটে এবং স্বল্পতর মূর্তদ্রব্যসংযোগান্তরিত্বের জ্ঞান থেকে অপরত্বের উৎপত্তি হয়। কারিকার 'মূর্তসংযোগভূয়স্ত্বজ্ঞানতঃ' ও 'তদল্পত্ববুদ্ধিতঃ'— এই দুই পদ দ্বারা যথাক্রমে 'পরত্ব' ও 'অপরত্ব' এর উৎপত্তির এই প্রক্রিয়াই ব্যাখ্যাত হয়েছে। পরত্ব ও অপরত্ব সংক্রান্ত শাব্দবোধে অবধিত্ব নিরূপণের উদ্দেশ্যে পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ আবশ্যক বলে বিবেচিত হয়। কোনো নির্দিষ্ট স্থানকে অবধি করে একই অভিমুখে অবস্থিত দুই বস্তুর মধ্যে এই পদ্ধতিতেই দৈশিক পরত্ব ও অপরত্ব নিরূপিত হয়ে থাকে। লৌকিক ভাষায় 'দূরবর্তী', 'নিকটবর্তী' প্রভৃতি শব্দপ্রয়োগের ভিত্তি এই দৈশিক পরত্ব ও অপরত্ব। দৈশিক পরত্বাপরত্বের অসমবায়ী কারণ হল— যে মূর্ত দ্রব্যে পরত্ব বা অপরত্ব অধিষ্ঠিত, তার সঙ্গে দিক্ বা দেশের সংযোগ; কারিকায় বলা হয়েছে— 'অসমবায়ী তু দিক্-সংযোগস্তদাশ্রয়ে'। 'দিবাকরপরিস্পন্দভূয়স্ত্বজ্ঞানতো ভবেৎ' বিশ্বনাথের এই কারিকায় কালিক পরত্ব ও অপরত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে। কোনো বস্তুর ক্ষেত্রে যত পরিমাণ সূর্যপরিস্পন্দ

নিরূপিত হয়েছে, তার তুলনায় অধিক সূর্যপরিস্পন্দ যে বস্তুর ক্ষেত্রে প্রতিপন্ন হয়, সেই বস্তু পর অর্থাৎ প্রচলিত ভাষায় জ্যেষ্ঠ; এবং যে বস্তুর ক্ষেত্রে স্বল্পতর সূর্যপরিস্পন্দ গৃহীত হয়, সেই বস্তু অপর অর্থাৎ কনিষ্ঠ। কালিক পরত্ব ও অপরত্ব কার্য দ্রব্যেই উৎপন্ন হয়। দৈশিক ও কালিক পরত্বাপরত্বের বিনাশ অপেক্ষাবুদ্ধির লোপের সঙ্গে সম্পৃক্ত। পরত্বের প্রতীতি অপরত্বের প্রতীতি না হলে হয় না এবং অপরত্বের প্রতীতি পরত্বের প্রতীতি না হলে হয় না। এই দুটি গুণ পৃথিবী জল, তেজ, বায়ু ও মনে থাকে। অন্য দ্রব্যে থাকে না। পরস্পরসাপেক্ষ হওয়ায় এই দুটি গুণের লক্ষণ পৃথক্ পৃথক্ভাবে বলা সম্ভব নয়। পরত্ব ও অপরত্বের উৎপত্তিতে দিক্ কারণ হয়ে বলে এই পরত্ব, অপরত্বকে দিকৃত বা দৈশিক বলা হয়। অপরত্বের উৎপত্তির কারণ সন্নিকর্ষ এবং পরত্বের উৎপত্তির কারণ সন্নিকর্ষ যথাক্রমে অল্পতরসংযুক্তসংযোগ ও বহুতরসংযুক্তসংযোগ। *দীধিতি*কার এই গুণদ্বয়কে স্বীকার করেন না। *পদার্থতত্ত্বনিরূপণ* গ্রন্থে শিরোমণি মহাশয় বলেছেন—

> "পরত্বাপরত্বে অপি ন গুণান্তরে। বিপ্রকৃষ্টত্বসন্নিকৃষ্টত্বাভ্যাং জ্যেষ্ঠত্বকনিষ্ঠত্বাভ্যাং চ তথাবিধব্যবহারোপপত্তেঃ। অত্রাদ্যে তৃতীয়মপেক্ষতে। অন্ত্যে তু পরস্পরাশ্রয়মিতি বিবেকঃ।"[১০]

দীধিতি-কার বলেন— পরত্ব ও অপরত্ব আলাদা কোনও গুণ নয়। বরং বিপ্রকৃষ্টত্ব, অর্থাৎ বহুতর সংযুক্তসংযোগ পরত্ব এবং সন্নিকৃষ্টত্ব অর্থাৎ অল্পতর সংযুক্তসংযোগই অপরত্ব। ফলে দৈশিক পরত্ব বা অপরত্ব সংযোগ থেকে ভিন্ন কোনও স্বতন্ত্র গুণ নয়। তেমনি জ্যেষ্ঠত্ব বা কনিষ্ঠত্বও স্বতন্ত্র গুণ নয়। 'চৈত্র হতে মৈত্র জ্যেষ্ঠ'— এখানে চৈত্রের পূর্বকালীন উৎপন্নত্বই জ্যেষ্ঠত্ব এবং মৈত্রের উত্তরকালীন উৎপন্নত্বই কনিষ্ঠত্ব। এই জ্যেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্বকেই কালিক পরত্ব ও অপরত্বের প্রতীতির বিষয় হিসেবে বুঝতে হবে— এটাই রঘুনাথের সিদ্ধান্ত।

প্রাচীন মতে কালিক ও দৈশিক ভেদে এরা দ্বিবিধ। যেমন— 'চৈত্র অপেক্ষা মৈত্র জ্যেষ্ঠ' এবং 'মৈত্র অপেক্ষা চৈত্র কনিষ্ঠ'— এই ধরনের প্রতীতিতে যে জ্যেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্ব প্রকাশ পায়, ন্যায়বৈশেষিক মতে সেই জ্যেষ্ঠত্বই কালিক পরত্ব এবং কনিষ্ঠত্বই কালিক অপরত্ব। আবার— 'বঙ্গদেশ হতে পাটলিপুত্র অপেক্ষা প্রয়াগ দূরবর্তী' এবং 'বঙ্গদেশ হতে প্রয়াগ অপেক্ষা পাটলিপুত্র নিকটবর্তী'— এই প্রতীতিতে যে দূরত্ব ও নৈকট্য দেখা যায়, প্রাচীন মতে তা যথাক্রমে দৈশিক পরত্ব ও দৈশিক অপরত্ব। কালিক পরত্ব ও অপরত্বের ক্ষেত্রে একটি অসমবায়িকারণ অপরিহার্য; এবং সেই অসমবায়িকারণ সংযোগ ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। একই যুক্তিতে দৈশিক পরত্ব ও অপরত্বের ক্ষেত্রেও দিক্-পিণ্ড-সংযোগকেই অসমবায়িকারণ বলতে হবে। *পদার্থতত্ত্বনিরূপণ* গ্রন্থের উপর শ্রীবিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন রচিত টীকায় বলা হয়েছে—

> "গুণান্তরে ইতি। পরত্বাদিবুদ্ধের্বিপ্রকৃষ্টত্বাদিভিন্নবিষয়সত্ত্বে মানাভাবাত্। বিপ্রকৃষ্টত্বসন্নিকৃষ্টত্বে সংযুক্তসংযোগভূয়স্ত্বাল্পীয়স্ত্বে জ্যেষ্ঠত্বকনিষ্ঠত্বে পূর্বকালীনজন্মত্বাপরকালীনজন্মত্বে। তদুক্তং পূর্বোৎপন্নং পরত্বং পশ্চাদুৎপন্নত্বমপরত্বমিতি। অচেতনে ঘটাদৌ জ্যেষ্ঠত্বাদিব্যবহারাভাবে প্রাণিত্বেন তদ্বিশেষণীয়ম্।"[১১]

কালিক পরত্ব ও অপরত্বের নিমিত্তকারণ হল সৌরক্রিয়ার ভূয়স্ত্ব-জ্ঞান ও অল্পীয়স্ত্ব-জ্ঞান। তেমনি দৈশিক পরত্ব ও অপরত্বের নিমিত্তকারণ হল বহুতর মূর্তসংযোগ-জ্ঞান ও অল্পতর মূর্তসংযোগ-জ্ঞান। *পদার্থতত্ত্বনিরূপণ* গ্রন্থের উপর শ্রীরঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার বিরচিত টীকায় বলা হয়েছে—

> "বিপ্রকৃষ্টেত্যাদি। বিপ্রকৃষ্টত্বসন্নিকৃষ্টত্বাভ্যাং বহুতরসংযুক্তসংযোগাল্পতরসংযুক্তসংযোগাভ্যামিত্যর্থঃ। তথা চ বিপ্রকৃষ্টত্বসন্নিকৃষ্টত্বয়োঃ পরাপরবুদ্ধিপ্রকারতয়া দৈশিকপরত্বাপরত্বে সংযোগাতিরিক্তগুণরূপে ন সিদ্ধ্যত ইতি ভাবঃ। জ্যেষ্ঠত্বকনিষ্ঠত্বাভ্যাম্। তৎপ্রাগভাবাধিকরণক্ষণবৃত্তিত্বরূপজ্যেষ্ঠত্বতদুৎপত্তিক্ষণধ্বংসাধিকরণ-

ক্ষণোৎপত্তিকত্বরূপকনিষ্ঠত্বাভ্যাম্। তথা চ জ্যেষ্ঠত্বকনিষ্ঠত্বয়োঃ পরাপরবুদ্ধিপ্রকারতয়া ন কালিকপরত্বে গুণরূপে সিদ্ধ্যত ইতি ভাবঃ।"[১২]

এভাবেই স্বীয় যুক্তিবলে শিরোমণি মহাশয় তাঁর *পদার্থতত্ত্বনিরূপণ* গ্রন্থে রূপরসাদি, পৃথক্ত্ব, পরত্ব এবং অপরত্বকে গুণপদার্থরূপে অস্বীকার করেছেন।

সংকেতসূচি:

কা. — *কারিকাবলী*
প. ত. নি. — *পদার্থতত্ত্বনিরূপণ*
পৃ. — পৃষ্ঠাসংখ্যা
বৈ. দ. — *বৈশেষিকদর্শন*
বৈ. সূ. — *বৈশেষিকসূত্র*
সম্পা. — সম্পাদক

উল্লেখপঞ্জি:

১. বৈ. সূ.- ১/১/৬।
২. বৈ. দ., সম্পা. অমিত ভট্টাচার্য, পৃ. ১১।
৩. প. ত. নি., সম্পা. পা. তি.গু. যতিরাজসম্পৎকুমারাচার্য, পৃ. ৪১।
৪. তদেব, পৃ. ৪১।
৫. তদেব, পৃ. ৫০।
৬. তদেব, পৃ. ৫১।
৭. তদেব, পৃ. ৫১।
৮. তদেব, পৃ. ৫১।
৯. কা.– ১২১- ১২৪।
১০. প. ত. নি., প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।
১১. তদেব, পৃ. ৬০।
১২. তদেব, পৃ. ৬০।

Bibliography:

1. Annaṁbhaṭṭa. *Tarkasaṁgrahaḥ* (With *Dīpikā* Commentary). Ed. Niranjanswarup Brahmachari. Kolkata: Sanskrit Book Depot, 2013 (Rpt., 2005 1st Pub.).
2. Bhaṭṭācārya, Śrīmohana & Dīneśacandra Bhaṭṭācārya. *Bhāratīya Darśana Koṣa.* Kolkata: Sanskrit Collage, 1958.
3. Chatterji, Kshitish. *Technical Terms and Technique of Sanskrit Grammar.* Kolkata: Calcutta University Press, 1964.
4. Dāsgupta, Surendranāth. *A History of Indian Philosophy.* Vol-I. Delhi: Motilal Banarasidass, 1988.
5. Gautam. *Nyāyadarśana*. Vol- I. Ed. Phanibhusan Tarkabagish. Kolkata: West Bengal State Book Board, 2018 (6th ed., 1981 1st ed.).
6. *Ibid*. Vol- II. Ed. Phanibhusan Tarkabagish. Kolkata: West Bengal State Book Board, 2015 (3rd ed., 1984 1st ed.).
7. *Ibid*. Vol- III. Ed. Phanibhusan Tarkabagish. Kolkata: West Bengal State Book Board, 2017 (3rd ed., 1982 1st ed.).

8. *Ibid*. Vol- IV. Ed. Phanibhusan Tarkabagish. Kolkata: West Bengal State Book Board, 2015 (2nd ed., 1988 1st ed.).
9. Guha, Dinesh Chandra. *Navya Nyaya System of Logic* (Some Basic Theories & Techniques). Varanasi: Bharatiya Vidya Prakashan, 1968.
10. Jhalakīkaraḥ, Bhimācāryaḥ. *Nyāyakośaḥ.* Poona: The Bhandarkar Oriental Research Institute, 1928 (3rd ed.).
11. Kaṇāda. *Vaiśeṣika Darśana*. Ed. Amit Bhattacharyya. Kolkata: Sanskrit Book Dipo, 2012 (1st ed.).
12. Keśavamiśra. *Tarkabhāṣā*. Vol- I. Ed. Gangadhar Kar. Kolkata: Jadavpur University Press, 2013 (2nd ed., 2008 1st ed.).
13. Kumārila Bhaṭṭa. *Ślokavārttika.* Ed. Swami Dvarikadasa Sastri. Varanasi: Tara Publications, 1978. (1st ed.).
14. Mahāpātra, Biṣṇupada. *Nyāya-pāribhaṣika-śabdāvalī.* New Delhi: Manyata Prakashan. 2010 (1st ed.).
15. Pāṇini. *Aṣṭadhyāyī*. Ed. Tapan sankar Bhattacharyya. Kolkata: Sanskrit Book Depot, 2017 (3rd ed., 2004 1st ed.).
16. Praśastapādācārya. *Praśastapādabhāṣyam.* Vol-I. Ed. Brahmachari Medhachaitanya. Kolkata: Sanskrit Book Depot, 2017 (1st Pub.).
17. Raghunātha Śiromaṇi. *Padārthatattvanirūpaṇa* (With the Commentaries Padārthatattvāvaloka of Śrī Viśvanātha Pañcānana Bhaṭṭācāya & *Ṭīkā* of Śrīraghudeva Nyāyālaṅkārā). Ed. P.T.G.Y Sampathkumarachar-yulu. Tirupati: Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, 2010.
18. *Ibid*. Ed. Madhusudan Bhattacharya Nyayacharya. Kolkata: Sanskrit College, 1976.
19. *Ibid*. (With the Commentaries of Raghudeva and Ramabhadra Sarbbhauma). Ed. Pandit Vindhyeswari Prasada Dvivedin. Benaras: J. Lazabus & Co Publishers, 2010.
20. *Ibid.* Ed. Karl H. Potter. Cambridge: Harvard University Press, 1957.
21. Śaṅkaramiśra. *Vaiśeṣikasūtropaskāraḥ*. Ed. Narayan Mishra. Varanasi: The Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1969.
22. Śivādityamiśra. *Saptapadārthī*. Ed. Tapan Sankar Bhattacharyya. Kolkata: Sanskrit Book Depot., 2012 (1st ed.).
23. Tarkālaṁkāra, Jagadīśa. *Śabdaśaktiprakāśikā* (With *Kṛṣṇakāntī*, *Prabodhinī* Commentaries). Ed. Dhundhiraj Sastri. Varanasi: Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1973.
24. *Ibid*. Vol- I. Ed. Madhusudhan Bhattacharya Nyayacarya. Kolkata: Sanskrit Collage, 1980.
25. *Ibid*. Vol- II. Ed. Madhusudhan Bhattacharya Nyayacarya. Kolkata: Sanskrit Collage, 1981.
26. *Ibid*. Vol- III. Ed. Madhusudhan Bhattacharya Nyayacarya. Kolkata: Sanskrit Collage, 1985.
27. Tarkavāgīś(a), Phaṇibhūṣaṇ(a). *Nyāya Paricaya*. Kolkata: West Bengal State Book Board, 2006 (3rd Rpt., 1978 1st Print).
28. Udayana. *Ātmatattvaviveka* (With the Commentaries of *Nārāyanī*, *Dīdhiti* & *Bauddhādhikāra* Vivṛti). Ed. Dhundhiraj Sastri. Varanasi: Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1940.
29. Uddyotakara. *Nyāyavārttikam.* Ed. Vindhyeshwari Prasad Tribedi. Varanasi: The Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1913.
30. Vācaspatimiśra. *Nyāyavārtikatātparyaṭīkā*. Ed. Rajeshwara Sastri. Benares: The Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1925.
31. Vallabhācārya. *Nyāyalīlāvatī* (With the Commentaries of Vardhamānopādhyāya's *Prakāśa*, Śaṅkara Miśra's *Kaṇṭhābharaṇa* and Bhagīratha Ṭhākura's *Vibṛti*). Ed.

Harihara Shastri. Varanasi: Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1991 (2nd ed.).
32. Varadarāja. *Tārkikarakṣā* (With *Niṣkaṇṭaka* Commentary by Mallināthasūri). Ed. Vindhyeshwari Prasad Tribedi. Varanasi: 1903.
33. Vātsyāyana. *Nyāyabhāṣyam* (With *Prasannapadā* Commentary by Sudarśanacārya Śāstrī). Ed. Swami Dwarikadas Sastri. Varanasi: Bauddha Bharati, 1998.
34. Vidyabhusana, Satis Chandra. *A History of Indian Logic.* Delhi: Motilal Banarasidass, 1978.
35. Viśvanātha Nyāyapañcānan(a). *Bhāṣāparicchedaḥ.* Ed. C. Sankara Rama Sastry. Madras: Sri Balamanora Press, 1923.

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 992-999
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.315

স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে নারী: একটি সমীক্ষা

সাজনা খাতুন, *ছাত্রী, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 05.03.2026; Accepted: 22.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

According to Swami Vivekananda, female power (Shakti) is the focal point of all energy. This power is what the world needs most right now, whether in this country or abroad. This is only the beginning; in time, this feminine force will take on a majestic form across the entire world. In Swamiji's eyes, even a woman in prostitution was an embodiment of the Divine Mother (Mahamaya).

The core mantra of all his teachings was Atman-Tattva, or the awakening of the inherent divinity within humanity. He believed that both men and women have an equal right to attain this self-knowledge. He questioned: "If a man can become a knower of Brahman (Brahmagyani), why can't a woman?" He believed if even one woman attains such spiritual enlightenment, her brilliance will awaken thousands of others, leading to the welfare of the country and society.

Keywords: Shakti(power), Atman-Tattva (Self-knowledge), Equality, Mahamaya (Divine mother)

স্বামী বিবেকানন্দের নারীভাবনা ছিল বাস্তববাদী ও প্রগতিশীল। তিনি বলেন-"ভারতে মাতাই নারী-চরিত্রের সর্বোচ্চ আদর্শ।"[১] এই আদর্শকে সামনে রেখে ভারতীয় নারীকে জগৎমাতা রূপে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন বিবেকানন্দ। এটিই তাঁর নারীশিক্ষা পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। স্বামীজির মতে, নারীশিক্ষাই নারী-বন্ধন মুক্তির কারণ হবে। এই বন্ধন কেবল আধ্যাত্মিক নয়; বরং মানসিক, পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক বহুবিধ বন্ধনও বটে। নারীকে কেবলমাত্র পুঁথিগত শিক্ষায় সমৃদ্ধ না করে, তার নিজের অন্তঃসত্তার আলোকিত অস্তিত্বকে লোকচক্ষুর সামনে আনতে চেয়েছেন বিবেকানন্দ- যেখানে নারীর শিক্ষা, সক্ষমতা, স্বাধীনতা ও স্বমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে- যা নিঃসন্দেহে এক বৈপ্লবিক চিন্তা-চেতনা।

বিবেকানন্দ বলেন- "জগতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই।"[২] নারীজাতির অভ্যুদয় অর্থাৎ প্রকৃত শিক্ষার ওপরেই নির্ভর করছে কোনও দেশের উন্নতি ও সর্বপ্রকার সমস্যার সমাধান। তাঁর মতে, ধর্ম বা শাশ্বত সনাতন আধ্যাত্মভিত্তিক ভারতীয় সংস্কৃতি থাকবে সেই অভ্যুদয়ের কেন্দ্রেবিন্দুতে। নারী জাতির অবস্থানের যে চিত্র আমরা বিবেকানন্দের দর্শনে পাই, তা আমি এই নিবন্ধে ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ করে তুলে ধরছি -

নারী সচেতনতা প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের অভিমত:

সাধনপথের অন্তরায় বিবেচনা করে সন্ন্যাসিবৃন্দ চিরকাল নারীজাতিকে অবহেলা করে এসেছেন। যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিবেকানন্দ সেই অবহেলিত নারীজাতির কথা ভেবেছেন। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন,

> "... এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে।... সেজন্যই আমার স্ত্রী মঠ স্থাপনের জন্য প্রথম উদ্যোগ।"[৩]

প্রকৃতপক্ষে যদি নারী এবং পুরুষ উভয়েরই জীবন সমভাবে উন্নত না হয়, তবে দেশের বা জগতের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভব নয়। একটা শিশু বস্তুতঃ তার মায়ের কোলেই বেড়ে ওঠে এবং মায়ের কাছেই প্রথম শিক্ষা পেয়ে থাকে। সুতরাং মা শিক্ষিত না হলে শিশু শিখবে কীভাবে – সে প্রশ্ন থেকে যায়।

তিনি পুরুষ ও নারী উভয়কে সমমর্যাদা দিতে চেয়েছেন। তাই তিনি বলেন,

> "আমরা স্ত্রীলোক্কে নীচ, অধম, মহা হেয়, অপবিত্র বলি। তার ফল- আমরা পশু, দাস, উদ্যমহীন, দরিদ্র।"[৪]

তৎকালীন সময় আমাদের দেশের নারীরা কতটা করুন অবস্থাতে ছিল, তাদের কি নজরে দেখা হত, তা উক্ত বর্ননায় খুবই স্পষ্ট। সেসময় নারীদেরকে বিভিন্ন রকম আচার অনুষ্ঠানে যেতে বাধা প্রদান করা হত, আচার অনুষ্ঠানের নামে ঘরে অবরুদ্ধ করে রাখা হত, পতি বিয়োগ নারীকে তার মৃত স্বামীর চিতায় নিক্ষেপ করা হত- নারীদের প্রতি এসকল মর্মান্তিক ঘটনা বিবেকানন্দের কোমল মনে বেদনার সৃষ্টি করে। সম্ভবত, তিনি ব্রত নেন নারী জাতিকে এই পাশবিক সমাজের কবল থেকে উদ্ধার এবং নারীজাতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠা কর্মে। তাই তো তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলেন- "আমি পুরুষদের যা বলে থাকি, নারীদেরও ঠিক তা-ই বলব...।"[৫] বিবেকানন্দ আসলে নারী-পুরুষের কোনো বিভেদ করতে চাননি; নারীজাতিকে বসাতে চেয়েছেন পুরুষজাতির সমান মর্যাদাসম্পন্ন আসনে। একইভাবে বিবেকানন্দ ব্যবহারিক জগতের মতো আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রেও পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি। তাঁর নিজের ভাষায়- "আত্মাতে কি লিঙ্গভেদ আছে নাকি? দূরকর মেয়ে আর মদ্দ, সব আত্মা।" [৬]

বিবেকানন্দের বাণীতেই নারীর পূর্ণ স্বাধীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। আধ্যাত্মিকতা জাগরণের মাধ্যমেই জগতের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ বা পূর্ণ স্বাধীনতা তথা মুক্তি লাভ সম্ভব। আধ্যাত্মিকতার পূর্ণতা লাভ করাই হবে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য কেবল পুরুষের নয়; নারীরও। কেননা আত্মাতে নারী-পুরুষ বলে কিছু হয়না। আত্মা যে দেহ ধারন করে আমরা তাকে সেই আত্মা বলে সম্মোধন করি মাত্র; এর বেশি কিছু না। মূলতঃ স্ত্রী আত্মা বা পুরুষ আত্মা ভেদ করা যেমন অর্থহীন, তেমনি উদ্ভট-অবাঞ্ছিত।

শিক্ষা বিষয়ে বিবেকানন্দের অভিমত:

শিক্ষা সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন–

> "কেবল শিক্ষকের মুখে উপদেশ শুনে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। শিক্ষকের ব্যক্তিগত জীবনের সংস্পর্শে না আসলে প্রকৃত শিক্ষা লাভ হয় না...ছাত্রের সম্মুখে থাকা চায় উচ্চতম শিক্ষকতার জীবন্ত আদর্শ।"[৭]

অর্থাৎ তিনি বিশ্বাস করতেন, শিক্ষার যাদুকরী শক্তি আছে এবং শিক্ষাই একমাত্র সব সমস্যার সমাধানে সক্ষম; কিন্তু সে শিক্ষা শুধু পাঠ্য পুস্তকের বা আক্ষরিক নয়। যে শিক্ষায় চরিত্রগঠন হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ ঘটে, নিজের সিধান্ত নিজে নির্ধারণ করা যায়, আত্মজ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়, তাকেই তিনি প্রকৃত শিক্ষা বলতেন। অন্যভাবে বলা যায়- মানবের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশ সাধনই হল শিক্ষা। এছাড়াও তিনি

বিশ্বাস করতেন, যে শিক্ষা জীবনে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখায়, অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হয় না, সে-ই হল শিক্ষা।

স্বামী বিবেকানন্দ মানবকল্যানের জন্য শিক্ষার কোন বিকল্প নেই বলে মনে করতেন। কিন্তু তিনি শিক্ষা বলতে তৎকালীন পারম্পরিক শিক্ষাকে বোঝাননি, বরং তিনি এমন শিক্ষার কথা বলেছেন যা মানুষ দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করতে পারে। অর্থাৎ, শিক্ষা হবে ব্যবহারিক ও যে শিক্ষার দ্বারা মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশ ঘটবে। বিবেকানন্দের ভাষায়– "শিক্ষা হচ্ছে, মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম থেকেই বিদ্যমান, তারই প্রকাশ।"

নারী শিক্ষা বিষয়ে বিবেকানন্দের অভিমত:

যে সময় মানুষ নারী শিক্ষার উপর গুরুত্বই দিতেন না, সেই সময়ে তিনি নারীদের শিক্ষার প্রতি সচেতন হন। সে কারনেই তিনি বলেন-

> "নারীগণকে এমন যোগ্যতা অর্জন করাইতে হইবে, তাহারা যাহাতে নিজেদের সমস্যা নিজেদের ভাবে মীমাংসা করিয়া লইতে পারে।"[৮]

নারীরা শুধুমাত্র সংসারিক কাজ কর্মে লিপ্ত থাকবে– এই ধারণাটি তখনকার দিনে জনমানসে বদ্ধ ছিল। নারী শিক্ষার এই অবস্থা দেখে তিনি হতবাক হতেন। ভারতবর্ষ একসময় নারীশিক্ষার জন্য প্রগতিমূলক পদ্ধতি প্রচলন করেছিল। যে বৈদিক ভারতে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও বুদ্ধিজীবী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, সেই ভারতেই নারীশিক্ষার ওপর কোনো গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছিল না। অথচ শিক্ষার সমূহ সংস্কার খুবই জরুরী। তাই তিনি বলেন, "তোমাদের মেয়েদের শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দাও। তারপর তারাই বলবে, কোন জাতীয় সংস্কার তাদের পক্ষে দরকার।"[৯]

কিন্তু পরবর্তীকালে যখন পাশ্চাত্যে অনেক প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী নারীশিক্ষা সম্পর্কে নতুন করে ভাবনা-চিন্তা করতে শুরু করেন, তাদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শহরে ভ্রমণ করেন এবং তিনি পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে নারী শিক্ষার উন্নতির ও নারীদের প্রগ্রতি দেখে মুগ্ধতা প্রকাশ করেন। পাশাপাশি ভারতীয় নারীদের প্রতি আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন যে, "আর জগতের অন্যান্য দেশের মেয়েদের মতো আমাদের মেয়েরাও এ যোগ্যতা-লাভে সমর্থ।" [১০] বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন যে, নারীকে সুশিক্ষিত না করলে দেশের সার্বিক উন্নতি সম্ভব নয়। যেহেতু একজন শিশুর শিক্ষা তার মায়ের সান্নিধ্যেই সম্পন্ন হয়, তাই তার মা যদি শিক্ষিত না হয়, তাহলে শিশুরা শিক্ষিত হবে কী করে? সেজন্যই তিনি লিখেছেন– "আমাদের দেশের মেয়েরা বিদ্যাবুদ্ধি অর্জন করুক, এ আমি খুবই চাই...।"[১১] স্বামীজি মনে করতেন, পুরুষ যদি ব্রহ্মজ্ঞ হতে পারে, তাহলে মেয়েরা হতে পারবে না কেন? তিনি মেয়েদের জন্য পাঠশালা খুলে তাদের মানুষ করতে বলেছেন। স্বয়ং তিনি নারীশিক্ষা বিকাশের জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। সেই পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, নারীদের আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশের জন্য মঠ গড়ে তুলতে হবে এবং মঠের সঙ্গে থাকবে নারীশিক্ষার জন্য বিশেষ বিদ্যালয়। নারীশিক্ষার পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত হবে ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ব্যকরণ, রান্না, সেলাইসহ মাতৃত্বের দায়িত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন পাঠ এবং সাংসারিক কাজকর্ম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়। নারীদের এই সমস্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানে সহায়তা করবেন ব্রহ্মচারিণীরা। বিবেকানন্দ মনে করতেন, জাতি গঠনের জন্য সুশিক্ষিতা ও সুমাতা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। সেজন্য তিনি বলেন, "তোমাদের মেয়েদের উন্নতি করিতে পারো? তবে আশা আছে। নতুবা পশুজন্ম ঘুচিবে না।"[১২]

বিবেকানন্দ নারীশিক্ষার জন্য যে পরিকল্পনা করেছিলেন তার ভিত্তি ছিল সনাতন ধর্ম, নৈতিকতা, আজীবন ব্রত পালনের মতো ঐকান্তিত নিষ্ঠা। তাঁর কাছে আদর্শ হল- সীতা চরিত্র- যিনি অগ্নির মতো পবিত্র ও ভাস্বয়। তিনি বলেন–

> "সম্ভবতঃ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নারীদের অপেক্ষা হিন্দুনারীগণ বেশি ধর্মশীলা ও আধ্যাত্মিকভাবসম্পন্না। যদি আমরা চরিত্রের ঐ সকল সদগুন রক্ষা করিতে পারি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নারীদের বুদ্ধিবৃত্তির পুষ্টিসাধন করিতে পারি, তাহা হইলে ভবিষৎ হিন্দুনারী জগতের আদর্শস্থানীয়া হইবেন।"[১৩]

স্বামীজি ভারতীয় নারীকে জগৎমাতা রূপে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন এবং এটিই তাঁর নারীশিক্ষা পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। তাঁর মতে, শিক্ষাই নারীর বন্ধনে মুক্তির কারণ হবে। তিনি মনে করতেন, নারীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠবে ভবিষ্যৎ সমাজ। আদর্শ জননী ছাড়া আদর্শ সন্তান লাভ সম্ভব নয়। সেজন্য স্বামীজি বলেন,

> "ধর্মকে Centre (কেন্দ্র) করে রেখে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার করতে হবে। ধর্ম ভিন্ন অন্য শিক্ষাটা Secondary (গৌণ) হবে। ধর্মশিক্ষা, চরিত্রগঠন...নতুবা তার কাজে গলদ বেরোবেই।"[১৪]

এভাবে আদর্শ সন্তান হবে দেশের আদর্শ নাগরিক। তিনি মনে করেন, হৃদয়ের অন্তঃস্থিত পূর্ণতাকে পরিস্ফুট করাই হলো নারী শিক্ষার শেষ কথা। এই Man Making Mission -এ আগে মানুষ হতে হবে, তারপর নারী। দেশের কল্যাণের জন্য, প্রয়োজন বীর্যবান, তেজস্বী, বিশ্বাসী, চরিত্রবান, দায়িত্ববান মানুষের। তাঁরা জাতিপ্রথা, কলঙ্ক, সামাজিক অন্যায়, বৈষম্যেয় বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে; সৃষ্টি করবে আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ। নারীকে হতে হবে নির্ভীক, সাবলম্বী; তাহলে তাঁর নারীত্ব, চরিত্র, শালীনতা, নম্রতা, ধৈর্য, কোমলতা ও চিন্তার স্বাধীনতার বিকাশ ঘটবে। স্বামীজি মনে করতেন নারীদের শিক্ষা দিলে তারাই প্রয়োজনীয় সংস্কারের কথা বলবেন। যদিও সমস্যার শেষ নেয়। তাই তিনি বলেন,

> "(নারীদের) অনেক সমস্যা আছে– সমস্যাগুলিও বড় গুরুতর। কিন্তু এমন একটিও সমস্যা নেই, 'শিক্ষা'– এই মন্ত্রবলে যার সমাধান না হতে পারে।"[১৫]

সেজন্য তিনি ব্রহ্মচারিনী তৈরি করতে চেয়েছিলেন Mass Education -এ সাহায্যে। তাছাড়া শিক্ষিতা বিধবা রমনীরাও এই দায়িত্ব নিতে পারবে। সে উদ্দেশ্য সাধনে বিবেকানন্দের মানসকন্যা মিস মার্গারেট নোবেল একআদর্শ শিক্ষিকার ভূমিকায় নারীশিক্ষায় কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। স্বামীজির ইচ্ছা ছিল ছোটো বেলা থেকে মেয়েদেরকে সাহসী, সাবলম্বী ও শিক্ষিত করে গড়ে তোলা হবে। প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে তারা ত্যাগী হয়ে সমাজের উন্নতিকল্পে ঝাঁপিয়ে পড়বে অথবা পতি নির্বাচন করে সংসারে প্রবেশ করবে। ফলে একদিকে যেমন তাঁরা সমাজকল্যাণে নিবেদিতা হয়ে উঠবে, অন্যদিকে হয়ে উঠবে বীর প্রসবিনী।

নারী শিক্ষা বিস্তারে বিবেকানন্দের বিবিধ পদক্ষেপ:

বিবেকানন্দ বলেন-

> "এদেশে পুরুষ-মেয়েতে এতটা তফাৎ কেন যে করেছে, তা বোঝা কঠিন। বেদান্তশাস্ত্রে তো বলেছে, একই চিৎসত্তা সর্বভূতে বিরাজ করছেন। তোরা মেয়েদের নিন্দাই করিস, কিন্তু তাদের উন্নতির জন্য কি করেছিস বল দেখি?"[১৬]

তিনি বিশ্বাস করতেন, নারী-পুরুষের জীবনের চরম লক্ষ্য হল পরম সত্য লাভ করা এবং সমস্ত রকম বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করা। এহেন সত্যকে সামনে রেখে তিনি কতকগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন- সেগুলি নিম্নে আলোচনা করা গেল:

(ক) নারী মঠ:

বিবেকানন্দ বলেন,

> "…. মেয়েদের জন্য গ্রামে গ্রামে পাঠশালা খুলে তাদের মানুষ করতে বলি। মেয়েরা মানুষ হলে তবে তো কালে তাদের সন্তান সন্ততির দ্বারা দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে– বিদ্যা, জ্ঞান, শক্তি, ভক্তি দেশে জেগে উঠবে।"[১৭]

এজন্য তিনি বেলুড় মঠের বিপরীতে একটি নারী মঠের পরিকল্পনা করেন, যেখানে একটি বালিকা বিদ্যালয় থাকার কথা তিনি বলেন। মঠের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব শুধুমাত্র মহিলাদের ওপর ন্যস্ত হবে। পুরুষের মঠে যেমন কেন্দ্রস্থলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অবস্থান, রমণীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত মঠে তেমনই কেন্দ্রস্থলে থাকবেন শ্রী মা সারদামণি দেবী। তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ব্রহ্মচারিণী ওই মঠে সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করবেন ও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ শিক্ষায় নিজেকে শিক্ষিত করতে পারবেন।

স্বামীজী নারী শিক্ষাকে দুটি বিষয়ে ভাগ করেছেন– আধ্যাত্মিক শিক্ষা এবং ব্যবহারিক শিক্ষা।

(খ) আধ্যাত্মিক শিক্ষা:

স্বামীজি বিশ্বাস করতেন যে, ভারতীয় নারীরা আধ্যাত্মিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে। তাই ধর্মকে কেন্দ্র করে নারী শিক্ষার বিস্তার করতে হবে, যেখানে ধর্মনিরপেক্ষ অন্য সমস্ত শিক্ষাই গৌণ। ধর্ম শিক্ষা, চরিত্র গঠন, শিশু পালন প্রভৃতির দিকে জোর দিতে হবে। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে স্বামীজী চেয়েছিলেন, তাঁর মঠে নারীরা সন্ন্যাসী জীবন পালন করবে। তাদের নিয়মিতভাবে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অনুশীলন করানো হবে এবং সংশ্লিষ্ট শাস্ত্র, সংগীত, সংস্কৃত, ব্যকরণ ইত্যাদি পড়ানো হবে। আধ্যাত্মিক শিক্ষা শেষে যদি কেউ মনে করেন যে তারা মঠে থেকে কাজ করবে, তাহলে তারা করতে পারেন।

এখন প্রশ্ন হল নারীরা মঠে কি কাজ করবেন? তারা মঠে কি কি কাজ করবেন সেই ব্যাপারে স্বামীজি একটি রূপরেখা তৈরি করেন। স্বামীজি মনে করেন, মঠে থাকার সিদ্ধান্ত নেবেন এসব ব্রহ্মচারিণীরাই; পরবর্তীকালে শিক্ষয়িত্রী এবং ধর্মপ্রচারক হবেন তারাই। এসব শিক্ষয়িত্রী কী কী কাজ করবে, স্বামীজী তারও একটা রূপরেখা নির্ধারণ করেছিলেন। তিনি বলতেন এইসব ধর্ম প্রচারিকারা শহর এবং গ্রামে যাবেন। বিভিন্ন জায়গায় নারী শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করবে। সমাজের প্রান্তিক শ্রেণির নারীদের মধ্যে শিক্ষা প্রচারে ব্রতিনী হবেন। তারা দেশের প্রকৃত নারীশিক্ষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবেন।

(গ) দৈনন্দিন ব্যবহারিক শিক্ষা:

আধ্যাত্মিক শিক্ষার পাশাপাশি বিবেকানন্দ নারীদেরকে দৈনন্দিন কাজে লাগবে- এমন অনেক ব্যবহারিক শিক্ষার কথা বলেন। যেমন সেলাই, রান্না করা, ও সংসারী কাজকর্মের শিক্ষা প্রভৃতি। এই আকাক্ষা নিয়ে তিনি বলেন-

> "আমার জীবনে এই একমাত্র আকাক্ষা যে, … পুরুষ হউক আর নারীই হউক– নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য রচনা করিবে।"[১৮]

যারফলে নারীরা স্বনির্ভরশীল হয়ে উঠবে এবং সে তার নিজের বন্দোবস্ত নিজেই করতে পারবে। এরফলে পুরুষ ও নারীর মধ্যে ভেদাভেদ অনেকটাই কমবে বলে স্বামীজী মনে করতেন। সর্বোপরি, স্বামীজী নারীশিক্ষা বলতে কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যার কথা বলেননি, বরং আধ্যাত্মিক ও সার্বিক বিকাশের কথা বলেন।

(ঘ) বৃত্তিগত ও কারিগরি শিক্ষা:

বিবেকানন্দ ছিলেন চরম বাস্তববাদী। পরিব্রাজক বিবেকানন্দ সারা ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভারতবাসীর অর্থনৈতিক দুরবস্থার মূল কারনই হল দরিদ্রতা। তাঁর কাছে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে

প্রাথমিক শর্ত হলো দরিদ্রতার অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করা। স্বামীজি মনে করতেন, দারিদ্র্যের মূল কারণই হলো শিক্ষার অভাব। তাই তিনি সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বৃত্তিগত ও কারিগরি শিক্ষার প্রসারের উপর জোর দেন।

বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে, দেশের যেখানে মূলধনের অভাব এবং শ্রমের প্রাচুর্য দেখা যায়, সেখানে শ্রম শক্তিকে কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে সুশিক্ষিত করে তোলার দরকার। তিনি আরো মনে করতেন, দেশবাসীর সঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার পরিচিত দরকার। তাঁর মতে, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই হল মানুষকে জীবন সংগ্রামের যোগ্য করে তোলা। তার জন্য চাই জীবনমুখী শিক্ষা। সেজন্য তিনি বলতেন, "মেয়েরা প্রত্যেকেই এমন কিছু শিখুক, যাতে প্রয়োজন হলে তাদের জীবিকা তারা অর্জন করতে পারে।"[১৯]

মোটকথা, কর্মে পটু করে তোলা বা দক্ষতা সৃষ্টি হবে শিক্ষার উদ্দেশ্য। সেই জন্য দরকার বৃত্তিমুখী শিক্ষা। হাতে কলমে কাজ না করলে, শ্রমের প্রতি মর্যাদা সম্বন্ধে অবহিত না হলে, কেউ জীবন সংগ্রামের যোগ্য হবে না। তিনি মনে করেন একাজে নারী-পুরুষ উভয়কেই একযোগে এগিয়ে আসতে হবে, তা নাহলে দেশ বা জাতির সার্বিক কল্যান সম্ভব নয়। এজন্যই তিনি বলেন, "ভারত ও ভারতীয় ধর্মে বিশ্বাস কর, তেজস্বিণী হও, আশায় বুক বাঁধো...।"[২০] এবার্তা ছিল ভারতীয় নারীদের প্রতি মুক্তির বার্তা। নারীশিক্ষা ও স্বাধীনতার অধিকারের বার্তা। নারীর আত্মপ্রকাশের বার্তা। তিনি বলতে চেয়েছেন, নারীকে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল সবই শিখতে হবে। দাসত্বের কবল থেকে নারীজাতির উদ্ধারের জন্য নারীকে ধর্মশাস্ত্র, সাহিত্য, সংস্কৃত ব্যাকরণ, ইংরেজি, বাংলা যেমন শিখতে হবে, তেমনি শিখতে হবে রন্ধনবিদ্যা, সূচিশিল্প, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, সন্তান পরিচর্যাবিদ্যা প্রভতি। নারীদের শিখতে হবে সনাতনী ধর্মের আধ্যাত্মিকতার দৈনন্দিন অনুশীলন। বিবেকানন্দের ভাষায়– "...সব বিষয়ে (নারীদের) চোখ ফুটিয়ে দিতে হবে।"[২১]

স্বামীজী বিশ্বাস করতেন অতীতে যেসকল মহীয়সী নারী জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, আগামীদিনের ভারতীয় নারীরা তাদের মহত্ত্ব দিয়ে পূর্ববর্তীদের কীর্তিকে অতিক্রম করে যাবে। আগামীদিনের নারীর মধ্যে থাকবে দৃঢ় সংকল্প ও স্নেহময়ী কোমল মন। তারাই হবে পবিত্রতা, শক্তি ও স্বাধীনতার আদর্শ প্রতীক। আধ্যাত্মিক পূর্ণতা লাভই হবে তাদের জীবনের একমাত্র উদেশ্য। একসময় তাদের গর্ভে জন্ম নেবে সুসন্তান। স্বামীজীর মতে- "তাঁকে (নারীকে) অবলম্বন করে আবার সব গার্গী, মৈত্রয়ী জগতে জন্মাবে।"[২২] এবং পরবর্তীতে সেই সকল শিশুরাই হয়ে উঠবে দেশের সভ্য নাগরিক ও বীর-সন্যাসী। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র পরিচালনায় মূলে থাকবে নারীর এক অভূতপূর্ব প্রভাব। তার ফলে থাকবে না নারী-পুরুষের দ্বন্দ্ব। বসস্তুতঃ স্বামীজী নারীদের এমন এক উন্নতমানের জীবন) ব্যবস্থার সমাধান দিয়েছেন- যা কেবল সংসার প্রতিপালন, কর্ম ব্যবস্থা, পুরুষ সম অধিকার আদায় নয়; বরং প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা দৃঢ় প্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে নিজের ভাগ্য নিজে নিজেই নির্ধারন করার মনোবল ও স্বাধীনতা– যার কেন্দ্রস্থল হল আধ্যাত্মিকতা। এই আধ্যাত্মিকতার পথ বিকশিত হলেই নারী পূর্ণ স্বাধীনতা উপলব্ধি করতে পারবে; আর তখনই সে নিজের সব কর্মশক্তি ও ভালবাসা উৎসর্গ করতে পারবে মানবসেবায়। আর এখানেই বিবেকানন্দের নারী দর্শনের সার্থকতা। নারী আদর্শের প্রেক্ষিতে এই জগতে 'ভারত আবার শ্রেষ্ঠ আসন লবে'।

বিবেকানন্দের দর্শনে নারী শিক্ষার অবদান পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, নারী পুরুষের মধ্যে যে বৈষম্য আবহমান কাল ধরে এ পর্যন্ত চলে আসছে তা তিনি মানতে রাজি ছিলেন না। তিনি বরাবরই তাঁর দর্শনে নারী-পুরুষের এক রূপতা ও সামঞ্জস্যতা আনার চেষ্টা যেমন করেছেন, তেমনি তার বাস্তবায়নেরও সর্বাধিক প্রচেষ্টা চালানোর প্রয়াস করেছেন; যা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে খুবই প্রাসঙ্গিক। আমাদের সমাজ ব্যবস্থার চিরাচরিত প্রথায় দেখা যায় যে, রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন গৃহকর্তারা নারীদের এই বলে হেয় প্রতিপন্ন করেন যে- 'ও তুই

মেয়ে, তুই তো নারী, তুই আর কি পড়াশোনা করবি! তোর দ্বারা কি বা হবে; বরং তুই বিয়ে করে ঘর-সংসার সামলা' ইত্যাদি। আসলে এখনো বেশির ভাগ মানুষ মেয়েদেরকে একটা অপদার্থ বা অকর্মণ্য বলে পরিগণিত করেন। অথচ যদি ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায় তাহলে এমন অনেক নারীর সন্ধান পাওয়া যাবে- যারা রাষ্ট্রপরিচালক থেকে শুরু করে মহাকাশবিজ্ঞানীর শিরোপাও অর্জন করেছেন বা করছেন। নারীদের ভিতরেও যে সামর্থ্য বা দক্ষতা বা সম্ভাবনা রয়েছে- এই কথাটা অনেকেই মানতে চায় না। কিন্তু আজকের আধুনিক যুগে নারীরা প্রমাণ করে দিচ্ছেন যে, তাদের মধ্যেও অনন্ত সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু, এই রক্ষণশীল মনোভাব নারীদের সকল সম্ভবনাকে গলাটিপে হত্যা করে আসছে বহু কাল থেকে। তাই স্বামী বিবেকানন্দ সোচ্চার হয়েছিলেন নারী শিক্ষার উন্নতি সাধন প্রকল্প নিয়ে। ব্যবহারিক থেকে আধ্যাত্মিক কোথাও বৈষম্য থাকতে পারে না নারী-পুরুষের- এ কথা স্বামীজি পদে পদে আমাদেরকে বলেছেন। বরং, এক্ষেত্রে সাধনার পথে দেশের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধনায় নারীকেই দিয়েছেন স্বামীজি এক সর্বোচ্চ স্থান। অথচ নারীরা অবহেলিত ও উপেক্ষিত সমগ্র বিশ্ব জুড়ে; শুধু তাই নয় বরং ভোগাকাঙ্খা ও উন্মত্ততার ভয়াবহতা আজও অব্যাহত। কাব্য, সাহিত্য, শিল্প, পারিবারিক, সামাজিক, এমন কি আধ্যাত্মিক সকল ক্ষেত্রই সেই কালো ছায়া আজও বিরাজমান। নারীকে করা হয়েছে পণ্য ও বিনোদনের একমাত্র সামগ্রী। পুরুষের চোখে শ্রদ্ধেয়া হয়ে ওঠার পরিবর্তে তাকে সর্বাধিক আকর্ষণীয় হওয়ার প্রতিযোগিতায় নামানো হয়েছে। অথচ আমরা জানি, নারীদের যথাসম্মান না দিয়ে কোন জাতিই উন্নতি সাধন করতে পারেনা। এই বৈষম্য দূর করে নারীদের যথাযথ সম্মান ও আত্মপরিচিতির মধ্য দিয়ে স্বামীজি দেশ ও জাতির সর্বাধিক এবং সর্বাঙ্গ উন্নতি সাধন করতে চেয়েছিলেন। সুতরাং, নারীদের সম্ভ্রম, আত্মপরিচয় ও স্বাধীনতার পুনঃস্থাপনে স্বামী বিবেকানন্দের নারী বিষয়ক আলোচনা বা দার্শনিক পর্যালোচনা আজকের দিনে বড়ই প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র:

১. নিত্যমুক্তানন্দ স্বামী (প্রকাশক)। দেববাণী, স্বামীজীর বাণী ও রচনা, চতুর্থ খণ্ড। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ-১৩৮২, পুনর্মুদ্রণ- April-2022, পৃ. ১৭৭।

২. লোকেশ্বরানন্দ স্বামী। চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা, পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩০১-৩০২।

৩. বিবেকানন্দ, স্বামী। আমার ভারত অমর ভারত। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা, প্রকাশক - স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। পুনর্মুদ্রণ নভেম্বর-১৯৮৮, পৃ. ৫৮।

৪. নিত্যমুক্তানন্দ, স্বামী। পত্রাবলী, স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ - ১৩৮৩, পুনর্মুদ্রণ- October- 2021, পৃ. ৩০৫।

৫. বিবেকানন্দ, স্বামী। আমার ভারত অমর ভারত। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬।

৬. তদেব, পৃ. ৫৭।

৭. সেন, পৃথ্বীরাজ। স্বামী বিবেকানন্দ জীবন ও দর্শন। অক্ষর বিন্যাস– শৈব্যা বুকস এন্ড লেজার, কলকাতা, প্রকাশক – সাহা অঈশি, তৃতীয় সংস্করণ - january 2015, , পৃ. ৪২৭-৪২৮ ।

৮. নিত্যমুক্তানন্দ স্বামী। স্বামীজীর বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ-১৩৮০, পুনর্মুদ্রণ- April-2022, পৃ. ৩১১।

৯. বিবেকানন্দ, স্বামী। আমার ভারত অমর ভারত। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৯।

১০ নিত্যমুক্তানন্দ স্বামী। স্বামীজীর বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১১।

১১. বিবেকানন্দ, স্বামী। আমার ভারত অমর ভারত। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।
১২. নিত্যমুক্তানন্দ, স্বামী। পত্রাবলী, স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫।
১৩. নিত্যমুক্তানন্দ স্বামী (প্রকাশক)। প্রাচ্য নারী, স্বামীজীর বাণী ও রচনা, প্রথম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করন-১৩৮১, পুনর্মুদ্রণ- May- 2022, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, পৃ. ৩০।
১৪. লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী (সম্পা.)। চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা, পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-২৯৪।
১৫. বিবেকানন্দ, স্বামী। আমার ভারত অমর ভারত। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।
১৬. তদেব, পৃ. ৫৭ ।
১৭. তদেব, পৃ. ৫৮।
১৮. নিত্যমুক্তানন্দ, স্বামী। পত্রাবলী, স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩০৭ ।
১৯. বিবেকানন্দ, স্বামী। আমার ভারত অমর ভারত। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।
২০. লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী (সম্পা.)। চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪।
২১. বিবেকানন্দ, স্বামী। আমার ভারত অমর ভারত। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।
২২. লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী (সম্পা.)। চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1000-1007
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.316

ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গিতে: বাস্তুকেন্দ্রিকতাবাদ

সৌরভ মহান্ত, *স্বাধীন গবেষক, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 05.03.2026; Accepted: 10.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Although environmental reflections have been discussed since antiquity, they took on a new dimension in the mid-20th century. Centered on the significance of nature and the environment, a vital branch of contemporary applied ethics emerged, known as 'Environmental Ethics.' This discipline refers to the branch of ethics that examines the reciprocal interaction between humans and nature. It analyzes moral principles based on human conduct toward the environment and the resulting consequences. The scope of environmental ethics is vast, encompassing humans, animals, vegetation, water, soil, air, and the entire Earth. Furthermore, its scope has now expanded beyond Earth into the solar system, bringing outer space within its ethical domain. A pivotal aspect of this field is Ecocentrism. Ecocentrism refers to that theory within environmental ethics which recognizes the moral value not just of humans or sentient beings, but of the entire inanimate world, species, and ecosystems.

Ecocentrism brings us to the realization that the entire natural world is an indivisible and all-encompassing system. Traditional Anthropocentric perspectives focus solely on the glorification of human existence. In contrast, Ecocentrism rejects the narrow outlook of anthropocentrism and advocates for a holistic perspective. Various doctrines have emerged in the West centered on the claim of the ecosystem's intrinsic value. The leading ethical philosophers associated with these claims include Aldo Leopold, Arne Naess, and others. Additionally, Holmes Rolston III holds a highly significant place in contemporary environmental thought. However, long before the Western perspective, the imprint of eccentric thinking was evident in India. Among the environmental concepts known from the Vedic era in India, the most notable is the environmental philosophy found in the 'Bhumi Sukta' of the Atharva Veda.

Keywords: Environmental Ethics, Earth, Ecocentrism, Anthropocentric, intrinsic value, Bhumi Sukta, Atharva Veda

বাস্তুকেন্দ্রিকতাবাদের আলোকে 'ভূমির' পর্যালোচনা:

সাবেকি নীতিবিদ্যায় নীতি-নৈতিকতার পরিধি কেবলমাত্র মানুষের মধ্যেই সীমিত ছিল। কিন্তু বিগত কয়েক শতাব্দীর ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে দেখতে পায়, নৈতিকতার পরিধি ব্যাপক থেকে ব্যাপকতার আকার ধারণ করেছে। ফলে আজকের দিনে ভূপৃষ্ঠের শক্ত আবরণ থেকে শুরু করে মহাকাশেও তার আওতায় অন্তর্গত। বাস্তুতন্ত্রের ক্ষুদ্র প্রাণী থেকে শুরু করে বৃক্ষ, লতা-গুল্ম তারাও আজ নৈতিকতার আওতায় অন্তর্ভুক্ত। এই সমস্ত

উপাদানগুলির মধ্যে অন্যতম একটি উপাদান হলো 'ভূমি'। 'ভূমির' অধিকারকে প্রাধান্য দেওয়া ও নীতি-নৈতিকতার আওতায় অন্তর্ভুক্ত করার কথা প্রথম শোনা যায় পাশ্চাত্যের পরিবেশতাত্ত্বিক আলডো লিওপোল্ড এর মুখ থেকে। লিওপোল্ড তাই তার মতবাদকে 'ভূমি-নীতিতত্ত্ব' নামে অভিহিত করেছিলেন।

পাশ্চাত্যের মানবকেন্দ্রীকতাবাদী চিন্তা ভাবনাকে পরিহার করে আলডো লিওপোল্ড সমগ্রতাবাদী ধ্যানধারণার কথা তুলে ধরেন। 'ভূমি' বলতে কেবলমাত্র পৃথিবী পৃষ্ঠের শক্ত আবরণকে বোঝাননি। তিনি নৈতিকতার পরিধিকে এমনভাবে বিস্তৃত করেছেন যেখানে মাটি, জল, গাছপালা, পশুপাখি এবং বায়ুমণ্ডল সবই তার আওতায় অন্তর্ভুক্ত। লিওপোল্ড ভূমি-নীতিতত্ত্বে কেবলমাত্র মানুষের স্বার্থের কথা ভাবেনা, সেখানে সামগ্রিকভাবে 'ভূমির' স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়। এ প্রসঙ্গে লিওপোল্ড বলেন 'ভূমি' কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় যাকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা যাবে। বিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে ভূমি নীতিতত্ত্ব সম্পর্কে যে সমস্ত বিধি-নিষেধের কথা পাওয়া যায় তাতে 'ভুমি' কে কেবল ব্যবহারের উপাদান হিসেবে ভাবা নীতি-নৈতিকতা বিরোধী বলে গণ্য হতো। এ প্রসঙ্গে লিওপোল্ড বলেন,

> "The land ethics simply in enlarges the boundaries of the community to include soils, waters, plants, and animals, or collectively: the land."[১]

লিওপোল্ড যে ভূমি- নীতিতত্ত্বের কথা বলেছেন সেখানে ভূমির উপাদান গুলির বেঁচে থাকার অধিকার কে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং শুধুমাত্র প্রয়োজনের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত না হয়ে, তাদের স্বকীয় ভাবে বেঁচে থাকার অধিকার কে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।লিওপোল্ড তাই মানুষকে কেবলমাত্র ভূমির মালিক হিসেবে না দেখে ভূমির এক সাধারণ সদস্য রূপে দেখার কথা বলেছেন এবং ভূমির অন্তর্গত সকল সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব জাগিয়ে তোলা ও ভূমির সকল সদস্যদের মধ্যে একটা আন্তঃসম্পর্ক গড়ে তোলার কথা বলেছেন। সাবেকি নীতিবিদ্যা যেখানে মানুষের স্বার্থের কথায় ভেবে এসেছে এবং মানুষকে কেন্দ্রে রেখেই যাবতীয় চিন্তা ভাবনার পরিবর্তন ঘটিয়েছে সেখানে, ভূমি নীতিতত্ত্ব আমাদের সমগ্র বাস্তুব্যবস্থাকে প্রাধান্য দিয়েছে। লিওপোল্ডের ভূমি-নীতিতত্ত্ব ঘোষণা করে এমন কোন নীতিতত্ত্বের কথা পাওয়া যায় না, যেখানে ভূমি এবং তার উপর অবস্থিত উপাদানগুলির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে সুদৃঢ় করার কথা বলে।

লিওপোল্ড ভূমি-নীতিতত্ত্বে মানুষকে প্রাণমন্ডলের অপরাপর সদস্যের মতোই সমমর্যাদা সম্পন্ন সদস্য হিসেবে বিচার করার কথা বলেন। আর ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা অনেক ঐতিহাসিক ঘটনাকে তুলে ধরে, যেখানে ভূমিকে কেবলমাত্র মানুষেরা সচেতন সত্তা হিসেবে না দেখে, মানুষ ও ভূমির টানাপোড়নের বিষয় হিসেবে দেখেছেন। উদাহরণসহ আমেরিকার বিভিন্ন ঘটনাকে লিওপোল্ড মানুষের সঙ্গে জমির সম্পর্কের ফলাফল হিসেবে বিচার করেছেন।

আর ঐতিহাসিক ঘটনাকে আমরা তখনই বাস্তুতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচনা করতে পারব যদি তা ভূমির প্রকৃত ধারণা এবং জল, মাটি, উদ্ভিদ, মানুষ সমস্ত কিছুকে নিয়ে এক অখন্ড সমাজ ব্যবস্থার কথা তুলে ধরা যায়। যাকে বাস্তবিজ্ঞানের ভাষায় মিথোজীবিতা বলে অভিহিত করা হয়। লিওপোল্ড মন্তব্য করে বলেন,

> "In short, a land ethic changes the role of homo sapiens from conqueror of the land community to plain member and citizen of it. It implies respect for his fellow members and also respect for the community as such."[২]

সংরক্ষণ বলতে মানুষের সঙ্গে ভূমি এক সামঞ্জস্যপূর্ণ সহাবস্থানকে বোঝানো হয়। নানা প্রচার অভিযান চালানো সত্বেও সংরক্ষণের গতি আজও ধীর। তাই সংরক্ষণের বিষয়ে শুধুমাত্র মতবাদ প্রতিষ্ঠা করে ক্ষান্ত হলে চলবে না, বাস্তবে তাকে রূপদান করার কথাও ভাবতে হবে। তাই বর্তমানে সংরক্ষণ সংক্রান্ত আরো উন্নত চিন্তাভাবনা

ও শিক্ষার প্রয়োজন। লিওপোল্ড মনে করেন এ চিন্তা-চেতনার বিষয় কি হবে এবং তা নিয়েও ভাবনাচিন্তা প্রয়োজন। সাধারণভাবে সংরক্ষণ সংক্রান্ত চেতনা বলতে যে বিষয়গুলিকে নির্দেশ করা হয় তা হলো: আইন কানুন মেনে চলো, ঠিকভাবে নির্বাচনে ভোট দাও, কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হও এবং যে ধরনের সংরক্ষণ ভূমির ক্ষেত্রে মঙ্গলজনক, সেরকম কর্ম সম্পাদন কর। লিওপোল্ড মনে করেন এই সাধারণ চিন্তা ভাবনার দ্বারা কোনো গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য সাধন করা যাবে না। এছাড়াও এই চিন্তা চেতনার মধ্যে ভালো-মন্দের কোনো স্থান নেই, কর্তব্যবোধের কোন কথা বলা হয় না, মূল্যবোধ সংক্রান্ত চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন আনার কথা বলা হয় না। এখানে কেবলমাত্র সংকীর্ণ আত্মসাথের কথায় তুলে ধরা হয় এবং তার দ্বারা কখনোই আমরা বেশি দূর পৌঁছাতে পারবো না।

আর তাকে সম্পূর্ণ পরিহার করা না গেলে ভূমি-নীতিতত্ত্বে পৌঁছানো কখনো সম্ভব নয়। লিওপোল্ড মনে করেছেন ভূমি সংক্রান্ত শিক্ষার অভাব যদি মানুষের মধ্যে থেকে যায় তাহলে পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তা বড় কোন কর্মসিদ্ধ করতে পারবে না। নানা বিষয়ে শিক্ষা প্রসারে গুরুত্ব পাওয়া সত্ত্বেও আমরা এখনো বুঝতে পারিনি বৃষ্টির জলকে কিভাবে কাজে লাগানো যায়, কৃষিকাজের বৈচিত্র ও সৌন্দর্যকে কিভাবে সংরক্ষণ করা যায়। তাই ভূমি সংক্রান্ত আমাদের সংকীর্ণ চিন্তাভাবনা যে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক স্বার্থের উত্তরণ ঘটাতে সাহায্য করে, তা যে ঠিক নয় তা উপলব্ধি করতে হলে আমাদের বিবেককে জাগ্রত করতে হবে এবং বিবেকবোধ ছাড়া কখনো কর্তব্য সম্পন্ন করা যায় না। তাই সমাজবদ্ধ মানুষকে মানবকেন্দ্রীকতাবাদী গন্ডিকে কাটিয়ে উঠে ভূমিতে পৌঁছে দেওয়াই লিওপোল্ডের মূল উদ্দেশ্য ও কর্তব্য। লিওপোল্ড মনে করেন সংরক্ষণ সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণা দর্শনে ও ধর্মে এখনো পর্যন্ত পরিপূর্ণরূপ লাভ করতে সমর্থ হয়নি। তাই সংরক্ষণ ব্যাপক ভাবে প্রসারিত হতে অসমর্থ হয়েছে। তাই তিনি উক্তি করে বলেন,

> "No important change in ethics was accomplished without an internal change in our intellectual emphasis loyalties, affections, and convictions. The proof that conservation has not yet touched these foundations of conduct lies in the fact that philosophy and religion have not yet heard of it. in our attempt to make conservation easy, we have made it trivial."[৩]

লিওপোল্ড মনে করেন ভূমি-নীতিতত্ত্বকে বুঝতে গেলে 'ভূমিকে' জৈব পদ্ধতির অঙ্গ হিসাবে দেখতে হবে। এছাড়া যাকে আমরা দেখি, ভালোবাসি, বিশ্বাস করি, অনুভব করি, এবং যার প্রতি আমাদের বিশ্বাস নিহিত আছে, এবং তার সাথে আমারা এক নৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি।

মানবকেন্দ্রিকতাবাদী সংকীর্ণ চিন্তাভাবনার গন্ডি পেরিয়ে আমাদের ভূমিকে নিছক ভূপৃষ্ঠের শক্ত আবরণ রূপে বা মৃত্তিকা রূপে বিবেচনা করলে চলবে না, তাকে জীবমণ্ডলের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে দেখতে হবে এবং তার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। লিওপোল্ড সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে ভূমির এক সাধারণ চিত্র রচনা করেছেন। এবং সমগ্র বাস্তুতন্ত্রকে বোঝানোর জন্য লিওপোল্ড একটি ভূমি পিরামিড কল্পনা করেছেন। লিওপোল্ড এই পিরামিডকে ভূমির প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন এবং তা কিছু আকার ইঙ্গিত এর মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। এই পিরামিডের একেবারে নিচের অংশে আছে মৃত্তিকা এবং একটি গাছ মৃত্তিকার উপর নির্ভর করে থাকে, তাই বলা যায় গাছপালা স্তরটি পুরোপুরি মৃত্তিকা নির্ভর। আবার এই গাছপালার উপর নির্ভর করে কীট-পতঙ্গ নানা পশুপাখি অবস্থান করে, তাই কীটপতঙ্গের স্তরটিকে বৃক্ষ নির্ভর বলা যায়। কারণ পাখি এবং তীক্ষ্ণদন্ত বিশিষ্ট প্রাণীরা পোকামাকড়ের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। এইভাবেই পিরামিডের উপরের দিকের স্তরগুলিতে সর্ববৃহৎ তথা উন্নত প্রাণী প্রজাতি অবস্থান করে। আর সর্ববৃহৎ মাংসাসী স্তন্যপায়ী প্রাণীরা পিরামিডের সর্বোচ্চ

স্তরে অবস্থান করে এবং প্রতিটি স্তর খাদ্যের জন্য অন্যান্য কাজের জন্য নিচে স্তরের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। নিচ থেকে যতই উপরের দিকে যাওয়া যাবে ততই স্তর গুলির মধ্যে সংখ্যাগত প্রাচুর্য ক্রমশ হ্রাস পাবে। এছাড়াও এই পিরামিডের সর্বোচ্চ স্তর থেকে নিম্ন স্তরের দিকে এগোতে থাকলে সংখ্যাগত প্রাচুর্যও লক্ষ্য করা যায়। জীব বিজ্ঞানের পরিভাষায় খাদ্য ও অন্যান্য ব্যাপারে প্রতিটি স্তরের যে পরম্পরা বা তাকে খাদ্যশৃঙ্খল বলা হয়। মানুষ এবং অন্যান্য সমস্ত প্রজাতি এই খাদ্যশৃঙ্খলের বিভিন্ন স্তরে অবস্থান করে। এই শৃঙ্খলের যে পিরামিড তা এতই জটিল যে আমরা অনেক সময় তার মধ্যে বিশৃঙ্খলা লক্ষ্য করি। কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেখলে বোঝা যায় এই শৃঙ্খলা এক উচ্চ মানের পরিপূর্ণ অবয়ব। এখানে কোন প্রাণ প্রজাতির টিকে থাকা বিভিন্ন অংশের সহযোগিতা এবং প্রতিযোগিতার উপর নির্ভর করে। কিন্তু যদি এই খাদ্যশৃঙ্খলের মধ্যে কোথাও কোন ছেদ ঘটে তাহলে অন্যান্য অংশগুলি এই ছেদকে সহজে পূরণ করার চেষ্টা করে। আর বিবর্তন প্রক্রিয়া যেহেতু নিজস্ব সৃষ্ট এক প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া এবং যা দীর্ঘ সময় ধরে অতিবাহিত হয়ে থাকে। তাই এই প্রক্রিয়ার দ্বারা যে পরিবর্তন ঘটে থাকে তা ধীর গতি সম্পন্ন। অপরদিকে মনুষ্য সৃষ্ট পরিবর্তন তা অতি দ্রুততার সঙ্গে ঘটে থাকে এবং তার পরিধিও ব্যাপক। বিবর্তনের ধারাকে পিছনে ফেলে মানুষ উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে প্রকৃতিতে অতিরিক্তমাত্রায় পরিবর্তন ঘটিয়ে তুলেছে যা আমাদের কল্পনারও অতীত। তবে কৃষিবিজ্ঞানে যেসব নতুন আবিষ্কার ঘটেছে তা এই পরিবর্তনকে বিচিত্র দিকে নিয়ে গেছে।

ভূমি নীতিতত্ত্ব বাস্তুতান্ত্রিক বিবেকের কথা বলে যেখানে ভূমির স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি মানুষের এক ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা কথাও প্রতিফলিত হয় নিজেকে পুনরুদ্ধার করার যে শক্তি ভূমির মধ্যে আছে তাকে ভূমি স্বাস্থ্য বলা যায়। আর সংরক্ষণের লক্ষ্য হবে জমির স্বাস্থ্য কে ভালোভাবে বোঝা এবং তাকে রক্ষা করা ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়া। তবে তা বাস্তব প্রয়োগ খুবই সমস্যা জনক। বিশেষ করে সংরক্ষণ বাদিরা এই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ পোষণ করে সমস্যাকে আরো জটিল করে তুলেছে। কিছু দল সংরক্ষণ বাদি ভূমিকে কেবলমাত্র মৃত্তিকা হিসেবেই দেখে এবং একে পণ্য উৎপাদনের একজন যন্ত্র হিসেবে বিচার করে। অপরদিকে আরেক দল ভূমি নীতি-তাত্ত্বিক ভূমিকে এই অখণ্ড প্রাণমন্ডলের এর এক সত্তা হিসেবে বিচার করে এবং যার কার্যকারিতা বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে বিচার করে। তারা প্রাণ মন্ডল এর দায়িত্ব ও ভারসাম্য নিয়ে গভীরভাবে চিন্তিত।

লিওপোল্ড মনে করেন ভূমির প্রতি ভালোবাসা শ্রদ্ধা ও মূল্যবোধ জাগ্রত না হলে ভূমি সঙ্গে নৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তবে মূল্য বলতে তাকে বল অর্থনৈতিক মূল্যের কথা বুঝলে চলবে না তা দার্শনিক মূল্যের দিক থেকে বুঝতে হবে। বাস্তুবিজ্ঞানের দিক থেকে ভূমির মূল্যকে উপলব্ধি করতে হবে ভূমির বাস্তুতাত্ত্বিক গুরুত্বকে বোঝার জন্য বাস্তুতত্ত্বের জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। তাই লিওপোল্ড বলেন, এক অখন্ড বাস্তুতান্ত্রিক দিক থেকেই ভূমিকে বিচার করতে হবে। ভূমি নীতিতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গিতে তাই বলা হয়

> "A thing is right when it tends to preserve the integrity,stability,and beauty of the biotic community. it is wrong when it tends otherwise."[৪]

পরিশেষে লিওপোল্ড যেসব আশা মানব সত্তার উপর রেখে গেছেন তা হল: কেবলমাত্র আর্থিক লেনদেনের দিক থেকে ভূমিকে ব্যবহার করার ভাবনা আমাদের বন্ধ করতে হবে এবং ভূমিকে নৈতিক, নান্দনিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে দেখতে হবে। ভূমিকে সামাজিক বিবর্তনের এক অঙ্গ হিসেবে দেখতে হবে। তাই ভূমিনীতি একই সঙ্গে বৌদ্ধিক ও আবেগ নির্ভর এক পদ্ধতি প্রকরণ।

অর্ণে নেস বলেন, গভীর বাস্তবাদ শুধুমাত্র একটি পরিবেশ নীতিতত্ব নয়, তা এক সম্পূর্ণ আন্দোলন, যাকে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা করেছেন নেস এবং তার সহযোগিরা। তাই তিনি প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশের প্রায় ১৩ বছর পর অর্থাৎ ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে 'The Deep Ecological Movement: Some Philosophical

Aspects' নামক একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। এই প্রবন্ধে গভীর বাস্তবাদের নীতিগুলিকে একটি প্ল্যাটফর্ম আকারে রূপদান করেন যা 'ডিপ ইকোলজি প্লাটফর্ম' এর নীতিগুচ্ছ নামে পরিচিত। এখানে নেস মোট আটটি নীতি সূত্রের প্রস্তাব করেছে।[৫] সেগুলি হলো:

১. পৃথিবীতে মানুষ এবং মানুষ ছাড়া অন্য সকল প্রাণীর সুখ ও সমৃদ্ধি স্বত:মূল্যবান। আর মনুষ্যতর প্রাণীর যে মূল্য মানুষের কাছে বিদ্যমান, তা থেকে স্বতন্ত্র এই স্বত:মূল্যগুলি।

২. প্রাণের এই প্রাচুর্য ও বৈচিত্র তা স্বত:মূল্যের প্রকাশকে আরো ত্বরান্বিত করে এবং এই প্রাচুর্য ও বৈচিত্র নিজেরাও স্বত:মূল্যবান।

৩. মানুষের মৌলিক প্রয়োজন ছাড়া প্রাচুর্য ও বৈচিত্র কে হ্রাস করার কোন অধিকার মানুষের নেই।

৪. জীবনের গুণগত মানের সঙ্গে জনসংখ্যার এক গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই মনুষ্যতরপ্রাণীর স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য জনসংখ্যার বিষয়টিকে নজর দিতে হবে।

৫. বর্তমানে মনুষ্যত্বের জগতের উপর মানুষের মাত্রা ছাড়া হস্তক্ষেপ পরিস্থিতিকে আরো খারাপের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

৬. প্রথাগত নিয়ম নীতির পরিবর্তন করতে হবে। এবং তা আমাদের অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত ও আদর্শগত মৌলিক চিন্তা কাঠামোর পরিবর্তন সূচনা করবে। ফলে পরিস্থিতি বর্তমানে থেকে গভীরভাবে স্বতন্ত্র হবে।

৭. মতাদর্শ গত পরিবর্তন স্বাগতমূল্যবান জীবনের গুণগতমানকে বুঝতে সাহায্য করবে এবং প্রথাগত ভোগবাদী জীবনের ধ্যান-ধারণাকে পাল্টে দেবে।

৮. যারা উপরিউক্ত নীতিগুলিকে প্রাধান্য দেবেন এবং তাতে সহমত পোষণ করবেন তাদের উপর একটা নৈতিক দায় বর্তাবে যে তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আবশ্যিক পরিবর্তন গুলি বাস্তবায়নের চেষ্টা করবে।

অথর্ববেদে ভূমিসূক্তে 'ভূমির' বৈচিত্রতা ও প্রাচুর্যতা:

আর্যদের প্রাচীনতম গ্রন্থ হল বেদ। এটি কোন ধর্মগ্রন্থ নয়, তা সকল বিদ্যার ভান্ডার স্বরূপ। আর বেদের অপর নাম ত্রয়ী। কারণ ঋকবেদ, সামবেদ ও যজুর্বেদ এই তিনটি বেদকে একত্রে ত্রয়ী বিদ্যা বলা হয়। কিন্তু অর্থববেদকে ত্রয়ীর অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। তবে কেউ কেউ কঠোরভাবে কে ত্রয়ীর অন্তর্ভুক্ত না বলে ত্রয়ীবিদ্যার পরিধিষ্ট বলেও মনে করেন। অর্থববেদের প্রবর্তক রূপে আমরা ঋষি অথর্বা, অঙ্গীরা এবং ভৃগু এই তিনজন ঋষির নাম পাওয়া যায়। অথর্ববেদ মানুষের পার্থিব কামনা-বাসনা এবং চাওয়া-পাওয়াকে চরিতার্থ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ভারতীয় বৈদিক শাস্ত্রে যে চারটি বেদের কথা পাওয়া যায় তার মধ্যে অথববেদ পরিবেশ সচেতনতা সম্পর্কে সর্বাধিক ভূমিকা পালন করে। তবে ঋগ্বেদ, সামবেদ এবং যজুর্বেদে ঋষিদের যে পরিবেশ ভাবনা নিহিত ছিল অথর্ববেদে তার আরো সুস্পষ্ট প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। অথর্ববেদের দ্বাদশ কান্ডের শৌণক সংহিতার প্রথম সুক্ত হলো ভূমিসূত্র। এটি পৃথিবী সুক্ত নামে পরিচিত। এখানে মোট ৬৩ টি মন্ত্র রয়েছে এবং বেশিরভাগ মন্ত্রই পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ে আলোচিত। ভূমিসুক্তের দেবতা হলো ভূমি বা পৃথিবী। ঋষি অথর্বা ভূমিমাতার অতুল বৈভবে মুগ্ধ হয়ে ভূমির প্রতি বন্দনা এই সূত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয়। তাই অথর্বা পৃথিবী বন্দনার পূর্বেই বলেন, "সত্যং বৃহদৃতমুগ্রং দীক্ষা তপো ব্রহ্ম যজ্ঞঃ পৃথিবীং ধআরয়ন্তই।"[৬] অর্থাৎ মহান সত্য, তেজশ্রী ঋত, দীক্ষা, তপস্যা, জ্ঞান ও যজ্ঞ এরা সকলে পৃথিবীকে ধারণ করে আছে। একটু গভীরভাবে ভাবলে বোঝা যায় এই মৌলিক নীতিগুলো আজও পৃথিবীকে তথা বিশ্বজগতকে চালনা করছে। অথর্ববেদে পৃথিবীসুক্তে পৃথিবীকে জননীরূপে গণ্য করা হয়। আমরা হলাম পৃথিবীর সন্তান। আর মাতা সন্তানের সম্পর্ক পৃথিবীতে সব থেকে গভীরতম সম্পর্ক। ঋষি অথর্বা মাতৃরূপা পৃথিবীর কাছে সন্তান হিসেবে আশ্রয় চাইতে গিয়ে বলেন-

> "হে পৃথিবী যা তোমার মধ্যভাগ, যা তোমার নিম্নভাগ, যা তোমার তৈজস দ্রব্য পূর্ণ রূপ, সেইসব শরীর দিয়ে তুমি আমাকে ধারণ কর, আমাকে পবিত্র কর, ভূমিই মাতা, আমি পৃথিবীর সন্তান, পিতা পর্জন্য, তিনি আমাদের পূর্ণ করুন।"[৭]

অথর্বা বলেন পৃথিবীর কোলেই আমার জন্ম,তার কোলেই আমাদের আশ্রয়। পৃথিবীর কত বিচিত্র রূপ। কোথাও উন্নত পাহাড় পর্বত, কোথাও সমতল, কোথাও গভীর সমুদ্র, কোথাও বা বিস্তৃত অরণ্য, পৃথিবী শস্যে, ফলে, ফুলে, ফসলে আমাদেরকে পুষ্ট দান করে। পৃথিবী সমস্ত ভাবেই আমাদেরকে লালন-পালন করে। তাই অথর্ববেদে ভূমি বলতে কেবলমাত্র ভূপৃষ্ঠের উপর অবস্থিত শক্ত আবরণকে বোঝায় না। ভূমি বলতে বাস্তুতন্ত্রে অবস্থিত সমস্ত উপাদান অর্থাৎ এক টুকরো নুড়ি, কাকর, বালিকণা থেকে শুরু করে বায়ুমন্ডলে অবস্থিত প্রত্যেকটা বিষয়বস্তু ভূমির আওতায় অন্তর্ভুক্ত।

গিরি অরণ্য ঘেরা চঞ্চলা অথচ ধূর্বা পৃথিবীর বিভিন্ন রূপ তুলে ধরেছেন। কবি অথর্বা এই পৃথিবীতে কোথাও উচ্চ পর্বতমালা, কোথাও আবার চিরো তুষারবৃত,কোথাও গভীর অরণ্য। তাই ঋষির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে

> "হে পৃথিবী! তোমার পাহাড়সমূহ বরফাচ্ছাদিত পর্বতরাজি, অরণ্য আমার কাছে সুখকর হোক। পিঙ্গলবর্না, কৃষ্ণা, রক্তবর্ণা, বহুরূপা, ইন্দ্ররক্ষিতা, ধ্রুবরূপে প্রতিষ্ঠিতা এই পৃথিবীতে আমি যেন অপরাজিত, অনাহত, অক্ষতরূপে অধিষ্ঠিত হই।"[৮]

এই পৃথিবীতে সোনা, রুপ ইত্যাদি কত মূল্যবান সম্পদের সম্ভার। এইসব মূল্যবান সম্পদ জোগানোর জন্য ঋষিকবি পৃথিবীকে প্রণাম জানিয়েছেন-

> "শিলা ভূমিরশ্মা পাংসু সা ভূমিঃ সংধৃতা ধৃতা। তস্যৈ হিরণ্যবক্ষসে পৃথিব্যা অকরং নমঃ"।।[৯]

অর্থাৎ, এই পৃথিবী মৃত্তিকা, প্রস্তর ও ধূলিকণা দিয়ে গঠিত পৃথিবীর গভীরে এসবের রূপান্তর থেকে নানা খনিজ মূল্যবান ধাতু ও স্বর্ণের উদ্ভব হয়েছে এসব মূল্যবান সম্পদ যোগানোর জন্য আমরা পৃথিবীকে প্রণাম জানাই।

এছাড়াও জল হল পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। জল আমাদের জীবনে জীবন দায়ী অমৃত স্বরূপ- "জীবলা জীবধন্যাঃ প্রতিষ্ঠাঃ।"[১০] শরীরের সমস্ত দোষের বিনাশক হলো জল। তাই অথববেদের ঋষিরা উপলব্ধি করেছেন জলের মধ্যে অমৃত ও ভেষজ উভয় বিদ্যমান। তা জলের মহিমা, অথর্ববেদ এ গভীরভাবে লক্ষ্য করা যায়।

পরিবেশের আর এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো মেঘ ও বৃষ্টি। আর যা জলের প্রধান উৎস। বৃষ্টি গাছপালা লতা-গুল্ম প্রভৃতিকে সজাগ করে রাখেন, তাই মেঘের গুরুত্ব খুবই। মেঘের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে গিয়ে অথর্ববেদে বলা হয়েছে- "পর্জন্যঃ পিতা স উ নঃ পিপতু।"[১১]

অথর্ববেদে জলের পর ঋষি অথর্বা তেজ বা অগ্নির গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। কারণ পৃথিবীতে প্রাণের ধারাকে বজায় রাখতে তেজ বা অগ্নির ভূমিকা অপরিহার্য। ঋষি অথর্বা তেজ বা অগ্নির বন্দনা করেছেন। বায়ু ছাড়া আমাদের পক্ষে এক মুহূর্তে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। অথর্ববেদে আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়-

> "প্রাণমাহুর্মাতরিশ্বানং বাঁচো হ প্রান উচ্যতে।
> প্রাণে হ ভঊতং ভব্যং চ প্রাণে সবং প্রতিষ্ঠিতম।"[১৩]

অর্থাৎ বায়ু প্রাণস্বরূপ। বায়ুরূপ প্রাণে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকালের উৎস জগৎ উভয় অবস্থান করে। এছাড়াও গাছ কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে এবং মানুষ অক্সিজেন উপনির্ভর করে বেঁচে থাকে, তা পুরোপুরি সম্ভব হয় বায়ুর জন্য।

পৃথিবীতে প্রাণপ্রবাহ ধরে রাখতে সূর্যের ভূমিকা অপরিসীম। কারণ সূর্য হল সকল শক্তির উৎস। আর এই সূর্যালোকের উপস্থিতিতেই বৃক্ষ খাদ্য প্রস্তুত করে। সূর্য সমস্ত কিছুর আশ্রয় স্বরূপ। এছাড়াও সূর্যের আলোকে জগতের সমস্ত অন্ধকার দূর হয়ে যায়। সূর্য জগতে প্রদীপ স্বরূপ- "রুচিরসি রোচোহসি।"[১২] অর্থাৎ 'হে সূর্য তুমি দীপ্তিমান, তুমি জগতের প্রদীপস্বরূপ'।

ভূমিসুক্তে কৃষিকাজের গুরুত্ব কেউ প্রাধান্য দেওয়া হয়। কারণ কৃষি ব্যবস্থার উপর বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য অনেকাংশে নির্ভর করে। এবং ভূমিসুক্তে বলা হয় চাষীরা লাঙল দিয়ে জমি কর্ষণ করবে এবং তাতে ধান, গম, যব ইত্যাদি ফসল উৎপাদন করবে। সেখানে আরো বলা হয়- হে কৃষকগণ, লাঙ্গলগুলিকে যুগের সাথে যুক্ত কর। যুগগুলি বলীবর্দের কাঁধে প্রসারিত কর। অঙ্কুর উৎপত্তির যোগ্য ব্রীহি, যব ইত্যাদি বীজ কর্ষিত ভূমিতে বপন কর। ধান,যব ইত্যাদি গাছ ফলভারযুক্ত হোক। তাই ঋষিকবি ভূমিমাতার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা প্রার্থনা করে বলেন- "মা যে মর্ম বিমৃগ্ধরি মা তে হৃদয়মপির্ষম।"[১৩]

অথর্ববেদে বৃক্ষ-লতা-গুল্মের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ এই বৃক্ষ-লতা-গুল্ম গুলির বেশিরভাগ ঔষধি গুনসম্পন্ন। তাদের দ্বারা ঔষধ তৈরি করা হয়। এবং এই ঔষধ গ্রহণ করে শরীরের রোগ ব্যাধি থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তাই বৃক্ষ-লতা-গুল্ম গুলির বেশিরভাগটাই যেহেতু ভেষজস্বরুপ তাই তার গুরুত্ব অপরিসীম। সেখানে অর্জুন গাছের কান্ড, যবের তুষ ও তিলের মঞ্জরী দ্বারা ক্ষেত্রিয় রোগ থেকে আরোগ্য কামনা করা হয়। বর্তমানে যেভাবে মানুষ যথেচ্ছ হারে বৃক্ষ ছেদন করছে এবং বৃক্ষরোপণ বিষয়ে মানুষের সচেতনতার বড় অভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাই অর্থব বেদের ঋষিরা বৃক্ষরোপণের প্রয়োজন অনুভব করে বলেন- "যৎ তে ভূমে বিখনামি ক্ষিপ্রং তদপি রওহতউ।"[১৪] অর্থাৎ তোমার ভূমিতে যে গাছটি কাটা হল সেটি পুনরায় জাত হোক। এর থেকে বোঝা যায় কতখানি পরিবেশ সচেতনতা অথর্ব বেদে লক্ষ্য বিদ্যমান।

পরিশেষে বলা যায় অথর্ববেদে পরিবেশ সচেতনতা সংক্রান্ত যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হলো তা থেকে একথা স্পষ্ট, অথর্ববেদে গভীর পরিবেশ ভাবনার ছাপ লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও চার হাজার বছর পূর্বে অথর্ববেদে পরিবেশ সচেতনতা সংক্রান্ত চিন্তাভাবনার যে সাক্ষ্য লক্ষ্য করা যায়, তার দ্বারা একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় পাশ্চাত্যের বহু পূর্বেই সেখানে পরিবেশ সচেতনতার কথা বিদ্যমান ছিল। ভূমিসূক্তে পৃথিবীর সকল পদার্থ যেমন, উদ্ভিদজগত, প্রাণীজগৎ, এছাড়া বাস্তুতন্ত্রের সকল প্রজাতির একত্র সমাবেশ অথর্ববেদে জীববৈচিত্র সংরক্ষণের এক জ্বলন্ত প্রমাণ। বৃক্ষরোপণ, জল, আগুণ, বায়ু, প্রাণী ইত্যাদির বন্দনা যেভাবে অর্থববেদে করা হয় তাতে বোঝা যায় বাস্তুতন্ত্রের প্রত্যেকটি উপাদানই স্বতোঃমূল্যবান। আর বাস্তুতন্ত্রের নিজস্ব মূল্য বিদ্যমান একথা আধুনিক যুগের পাশ্চাত্য নীতিদার্শনিক অর্নে নেস তাঁর গভীর বাস্তবাদী ধ্যান-ধারণায় প্রথম যোষনা করেন।

তথ্যসূত্র:

১. লিওপোল্ড, অলডো। দ্য ল্যান্ড এথিক। প্রেনটিস হল, ১৯৯৩, পৃ. ৯৬।
২. তদেব, পৃ. ৯৭।
৩. তদেব, পৃ. ১০০।
৪. তদেব, পৃ. ১০৮।
৫. অথর্ব বেদ, ১২/১/১।
৬. তদেব, ১২/১/১২।
৭. তদেব, ১২/১/১১।

৮. তদেব, ১২/১/২৬।
৯. তদেব, ১২/১/৩/৫।
১০. তদেব, ১২/১/১/১২।
১১. তদেব, ১২/২/৫/৫।
১২. তদেব, ১৭/১/৩/১।
১৩. তদেব, ১২/১/৩৫।
১৪. তদেব, ১২/১/৩৫।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. লিওপোল্ড, অলডো। দ্য ল্যান্ড এথিক। এনভায়রনমেন্টাল ফিলোসফি: ফ্রম অ্যানিম্যাল রাইটস্ টু রাডিকেল ইকোলজি (মাইকেল ই. সিমারম্যান প্রমুখ সম্পাদিত), প্রেনটিস্ হল: ইঙ্গেল ক্লিফস্, ১৯৯৩।
২. কালিকট, জে.বি। দ্য ল্যান্ড এথিক। এ কম্পোনিয়ান টু এনভায়রনমেন্টাল ফিলোসফি (ডেল জেমিসন সম্পাদিত), ব্লাকওয়েল: ২০০৩।
৩. নেস, অর্নে। ইকোলজি, কমিউনিটি অ্যান্ড লাইফস্টাইল। আউটলাইন অফ ম্যান অ্যান ইকোসফি (ডেভিড রোথেনবাগ), কেমব্রিজ য়ুনিভার্সিটি প্রেস: কেমব্রিজ, ২০০২।
৪. কালিকট, জে. বি। কম্পোনিয়ান টু এ স্যান্ড কাউন্টি অ্যালম্যানাক। ইন্টারপ্রিটেটিভ অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল এসে, ইউনিভার্সিটি অফ উইসকনসিন প্রেস: 1987।
৫. নেস, অর্নে। দ্য শ্যালো অ্যান্ড দ্য ডিপ, লং-রেঞ্জ ইকোলজি মুভমেন্টস: এ সামারি। ইনকোয়ারি: ১৯৭৩।
৬. গুহ, রামচন্দ্র। এনভায়রনমেন্টালিজম। এ গ্লোবাল হিস্ট্রি, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস: নিউ দিল্লি, ২০০০
৭. গুহ, রামচন্দ্র। র‍্যাডিক্যাল আমেরিক্যান্ এনভায়রনমেন্টালিজম্ অ্যান্ড ওয়াইল্ডারনেস প্রিজার্ভেশন, ডায়ালগস্। অর্নে নেস অ্যান্ড দ্য প্রোগ্রেস অফ্ ইকোফিলোসফি, উইলি ব্লাকওয়েল: ১৯৮৯।
৮. পাল, কুমার সন্তোষ। ফলিত নীতিশাস্ত্র। লেভান্ত বুকস্: কলকাতা, ২০১২।
৯. চক্রবর্তী, নারায়ণ নির্মাল্য। পরিবেশ ও নীতিবিদ্যা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ: কলকাতা, ২০১৯।
১০. গোস্বামী, বিজনবিহারী। অথর্ববেদ। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা: ১৯৭৮।
১১. বিশ্ববন্ধু সম্পাদিত। অথর্ববেদ (সায়নভাষ্যসহ)। বিশ্ববন্ধু বৈদিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট: হোশিয়ারপুর, ১৯৬০।
১২. আচার্য্য, ধ্রুব। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে পরিবেশ ভাবনা। সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার: কলকাতা, ২০১৭।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1008-1015
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.317

ধর্ম–সাধনা পদ্ধতি: এক অনন্য পরিক্রমা

সুমন্ত রবিদাস, *স্বাধীন গবেষক, কুমারগ্রাম, দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 07.03.2026; Accepted: 10.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

If we look at the literary stream that has been flowing since the Charyapada, the earliest example of Bengali literature, to the very modern times, we will see that there is a deep similarity between all the religions and their methods of practice that are mentioned during this period. If we compare the practices that have been mentioned in all those religions, that is, the path that has been given to attain the attainable object, it will be seen that all religions have spoken of the same path. As many religious views and sects as there have been from the Charyapada to the modern times, the path that all the sects and religious views have given to attain the attainable object, that is, God or Moksha, is basically the same. Starting from the simple Buddhist practice, to the Nath, Vaishnava, Baul, Sufi and Shakta practices, it has been said to purify the mind by freeing it from the illusion of the worldly world, that is, by emptying it of desires and desires, in order to attain the attainable object. At the same time, the same thing has been said as a way to attain the attainable object in the literature written in the modern times. If we look at the literary genre that has developed from the Charya period to the modern era, we will see that in this unique cycle, only the practice of the body is mentioned. That is, it is said that the attainable object can be achieved through the body and that God resides within the body. The path that the ascetics have shown at different times to attain the attainable object is basically the same and all the practices are mentioned there under the guidance of the Guru. That is, a significant role of the Guru in the practice can be seen in all areas.

Keywords: Charjapada, Buddhis, nath sahitya, Vaishnava, sufi, shakta, baoul

বৌদ্ধ সাধন ভাজন সংক্রান্ত চর্যাপদ থেকে শুরু করে নাথ সাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য, শাক্ত সাহিত্য, বাউল গান এবং সুফি সাহিত্য পর্যন্ত লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এগুলিতে একই ধরনের সাধন-ভাজন সংক্রান্ত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এগুলির সাধনপদ্ধতি মোটামুটি এক এবং একই কথা বলা হয়েছে। কীভাবে বা কোন পথে ঈশ্বর লাভ করা যায়, যা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাপদ থেকে শুরু করে সুফিবাদ পর্যন্ত একই পথের কথা বলা হয়েছে। আবার এই সাহিত্য গুলিতে প্রায় গুরুবাদী সাধন পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে।

এক্ষেত্রে আমাদের আলোচ্য বিষয়, কিভাবে এই বিভিন্ন সাহিত্য ধারার মধ্যে একই পথ বা মার্গ এর কথা বলা হয়েছে, তা তুলে ধরাই মূল লক্ষ্য। এই সাধনা গুলির মধ্যে একটা ঐক্য রয়েছে, কিভাবে সাধ্য বস্তুকে লাভ করা যায় তার যে পথের কথা বলা হয়েছে উপরিউক্ত সাহিত্য গুলিতে, সেই পথগুলি মোটামুটি একই। তবে বিভিন্ন রূপকের সাহায্যে তা ব্যক্ত করেছেন বিভিন্ন সাহিত্য বিভিন্নভাবে। তবে আবার কোনো কোনো

রূপক এর মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাবে। যেমন চর্যাপদে 'ইড়া-পিঙ্গলা'র কথা আছে, আবার তা শক্ত, নাথ সাহিত্যেও আছে। এইরকম কিছু রূপক আছে এবং কিছু গানও আছে, যাদের মূল অর্থ একই। তবে আমাদের সেগুলো শুধু আলোচ্য বিষয় নয়, আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় কিভাবে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাতে সাধ্য বস্তু লাভের জন্য একই পথের কথা বলা হয়েছে।

সাধ্য বস্তুকে (ঈশ্বরকে) কিভাবে পাওয়া যাবে? তার কথা চর্যাপদ থেকে শুরু করে মধ্যযুগের অন্যান্য সাহিত্যের শাখাতেও একই রকম পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। চর্যাপদে যেমন 'কায়া' সাধনার কথা বলা হয়েছে, তেমনি নাথসাহিত্যেও 'কায়াসাধন' পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। যদিও নাথ সাহিত্য ও চর্যাপদ এর সময়কাল কাছাকাছি, আবার একই ব্যক্তি চর্যাপদ রচনা করেছেন এবং নাথ সাহিত্যের পদও রচনা করেছেন। যেমন কাহ্নপাদের (কানফার) পদের কথা চর্যাতেও পাওয়া যাচ্ছে আবার নাথ সাহিত্যেও পাওয়া যাচ্ছে। তিনি চর্যাতে সবথেকে বেশি সংখ্যক পদ রচনা করেছেন (১৩টি); আবার নাথ সাহিত্যে দেখা যায় নিরঞ্জনের কান থেকে কানফার জন্ম হয়ে দেবীর অভিশাপে 'ডাহুক' রাজ্যে চলে যায় শাস্তি ভোগের জন্য- 'তুরিতে গমনে যাঅ ডাহুক চলিয়া।' তবে এই কাহ্নপাদ বা কানফা একই ব্যক্তি কিনা বিতর্ক আছে। কিন্তু সাধন পদ্ধতিগত এবং ভাষাগত মিল আছে। যেমন চর্যার '১' নং পদটিতে আছে–

"কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল।।
দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভনই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ।।"[১]

এখানে যেমন 'কাআ'(কায়া) রূপ দেহের পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে যেমন পাঁচটি ডাল বলা হয়েছে এবং সেই ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যেমন কায়া সাধনার কথা বলা হয়েছে তেমনি নাথ সাহিত্যেও 'কায়া' সাধনার কথা আছে–

"অচেতন রৈলা গুরু কিছু নয় ভাল,
কায়া সাধিয়া গুরু জিন জম কাল।"[২]

আবার গোর্খনাথ যখন গুরুকে মায়া থেকে মুক্ত হবার আহ্বান জানায়—

"অনন্ত সিধাএ শুনি ঘোষিব কুনাম।।
জ্ঞান এড়ি পাইলা গুরু ভুল কদলীত।
আগে মিঠা লাগে গুরু আছে হএ তিত।।
কামেতে পীড়িত হইআ সভ হল্য দোষ।জীবন তরীতে এবে হল্য কসাকস।।"[৩]

মীননাথ যখন প্রকৃত সত্যকে ভুলে অন্ধ মায়ায় মুগ্ধ হয়ে ছিলেন তখন গোর্খনাথ গুরু মীননাথের চেতনা ফিরিয়ে আনার উপদেশ দিয়েছেন এবং কায়া সাধনার দ্বারা গুরুকে এই মায়া থেকে মুক্তির কথা বলেছেন। এখানে লৌকিক মায়া থেকে মুক্তি এবং জীবনের চরম লক্ষ্য মোক্ষ তথা মুক্তি লাভের কথা বলা হয়েছে। চর্যাপদ এবং নাথ উভয় সাধনায় এই মোক্ষ লাভের পথ নির্দেশ করা হয়েছে, তার সঙ্গে গুরু-শিষ্য পরম্পরাও উভয় সাধনায় লক্ষ্য করা যায়—

যেমন চার্যার '৬' নং পদে আছে-

"কাহেরে ঘিনি মেলি অচ্ছহ কীস।...
তিন ন চ্ছুপই হরিণা পিবই ন পাণী।
হরিণা হরিণির নিলঅ ণ জাণী।।
হরিণী বোলঅ সুণ হরিণা তো।

এ বন চ্ছাড়ী হোহ ভান্তো।।
তরঙ্গতে হরিণার খুর ন দীসঅ।"[৪]

এই পদে 'হরিণ' অর্থাৎ জীবাত্মা আর 'হরিণী' অর্থাৎ পরমাত্মার মিলনের কথা বলা হয়েছে। জীবাত্মা হরিণ মায়ায় পরে সেটাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছিল অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার অংশ হয়েও পরমাত্মাকে ভুলে মায়ার জগতকেই সত্য বলে মনে করে নিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হরিণটির মুক্তি ঘটল এবং শেষে হরিণটির এমন অবস্থা হল যে, মায়ার জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে জগতের সব কিছুকে এমন কি খাদ্য- পানীয়কেও বর্জন করল। আর তখনই পরমাত্মার আহ্বানে তার মুক্তি ঘটল। আবার '২৮' নম্বর পদে আছে দেহের মধ্যে উচ্চতম শৃঙ্গের নৈরাত্মার অবস্থান যা বাউল সাধকেরাও মনে করেন দেহের মধ্যে ঈশ্বরের অবস্থানকে। তাই তারা দেহ সাধনার কথা বলেন–

"আমার মনের মানুষ যে রে,
আমি কোথায় পাব তারে,
হারায়ে সেই মানুষে দেশবিদেশে
বেড়াই ঘুরে ঘুরে।।"[৫]

এখানে 'মনের মানুষের' সাধনার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ঈশ্বরের সাধনার কথা বলা হয়েছে। দেহের মধ্যেই যে পরম ঈশ্বরের বাস, তা আমরা মায়ায় পড়ে না বুঝেই মন্দির-মসজিদে অর্থাৎ দূরতম স্থানে অর্থাৎ দেশ-বিদেশে মনের মানুষ তথা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে খুঁজে চলি আজীবন। দেহের উচ্চতম শৃঙ্গ দেহের উচ্চতম শৃঙ্গে সবরীরূপী ঈশ্বর তথা মনের মানুষের যে পরম অবস্থান, তা আমরা ভুলে যাই। দেহের মধ্যে যে ঈশ্বরের অবস্থান বাউলেরা স্বীকার করে নিয়েছে; আবার সুফিরাও একই কথায় বলেছে। কিন্তু এই ঈশ্বরকে আমরা চিনতে পারি না, বিভিন্ন সাজসজ্জায় আবৃত থাকার কারণে। তাই '২৮' নং চরর্যায় আছে–

"উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী।।....
নানাতরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী।
একেলী শবরী এ বন হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী।।"[৬]

এই নৈরাত্মা রূপি অর্থাৎ ঈশ্বর ময়ূরপুচ্ছ অর্থাৎ ভাববিকল্পাদি, কর্ণকুণ্ডল অর্থাৎ জ্ঞানমুদ্রা আবৃত থাকায় আমরা তাকে চিনতে পারি না। তেমনি নাথ সাহিত্যে (গোর্খবিজয়ে) দেখা যায় মীননাথ যখন মায়ায় পড়ে সত্যটাকে চিনতে পারছেন না তখন গোর্খনাথ গুরুকে উদ্ধারের জন্য বলেছিলেন–

"কদলীত আসিয়া পাইলা উপভোগ,
কামিনীর কোল পাইয়া পাসরিলা যোগ।
আপনি হইলা ভুলা না চিনিলা পিছে,
গুরুর বচন তুমি সব কৈলা মিছে।"[৭]

এখানে মীননাথ মায়ায় পড়ে গুরুর সব বচন ভুলে গেছে এবং মায়াকেই সত্য বলে মেনে নিয়েছে। কিন্তু গোর্খনাথ শেষ পর্যন্ত মীননাথের পুত্র বিন্দুনাথকে মেরে ফেলে আবার বাঁচিয়ে দিয়েছে এবং শেষে সকলকে বাদুড়ে পরিণত করেছে। এভাবে গুরুকে সত্য দর্শন করিয়েছে যে, জগতের সবকিছুই মিথ্যা, একমাত্র ঈশ্বরই সত্য। এই সত্য দর্শনের পর মীননাথ আবার স্বধর্মে বা কর্মে ফিরে আসে। নিজের কি করনীয় তা সে বুঝতে পারে। আবার মুক্তি কিভাবে আসে তা বলতে গিয়ে চর্যায় বলা হয়েছে–

"নাদ ন বিন্দু ন রবি না সসিমন্ডল।
চিঅরাঅ সহাবে মুকুল।।
উজ্জুরে উজ্জু ছাড়ি মা লেহুরে বঙ্ক,
নিঅহি বোহি মা জাহুরে লাঙ্ক।।"[৮]

এই একই কথা '৫' নং চর্যাতেও আছে–

"সাঙ্কমত চড়িলে দাহিণ বাম মা হোহী।
নিয়ড্ডী বোহী দূর মা জাহী।"[৯]

অর্থাৎ সাধ্য বস্তুকে পেতে হলে ডান-বাঁম বা বাঁকা পথে যাওয়া উচিত নয়, সব সময় সোজা পথে অর্থাৎ সমস্ত রকম লোভ- লালসা, কামনা-বাসনা, মায়া-মোহ ত্যাগ করে ঈশ্বরের সাধনা করা উচিত। সাধন পথে যেতে যেতে কখনো কামাসক্ত হওয়া যাবে না বা ডান-বামে চলা যাবে না অর্থাৎ চিত্তকে সব সময় শূন্য রাখতে হবে। কখনো ইড়া ও পিঙ্গলা দ্বারা অর্থাৎ লোকজ্ঞান ও লোকভাস দ্বারা যেন সেই পথ অবরুদ্ধ না হয়। তাই গোর্খনাথ গুরু মীননাথকে বলেছে–

"বেঙ্কানালে সাধ গুরু না করিহ হেলা।
ইঙ্গলা পিঙ্গলা দুই বশ করা ভালা।।[১০]

বাউলেও আছে নাথ সাহিত্যের মত চারি চন্দ্রের কথা। লালনের একটি গানে আছে-

"চেয়ে দেখ না রে মন দিব্য নজরে।
চারি চাঁদ দিচ্ছে ঝলক মণিকোটার ঘরে।
হলে সেই চাঁদের সাধন অধরা চাঁদ পায় দরশন,
পায় রে চাঁদেতে চাঁদের আসন রেখেচে ফিকিরে।।"[১১]

এখানেও সেই চার চাঁদের কথা বলেছেন লালন। এই চার চাঁদের সাধনা করলে অধরা চাঁদ পাওয়া যায়। অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ত্যাগ করে অধরা চাঁদের অর্থাৎ মনের মানুষের বা ঈশ্বরের সাধনা করলে তাকে পাওয়া যায়। কিন্তু তার জন্য আগে মায়া মুক্ত হতে হবে। অর্থাৎ চোখের সামনে দৃশ্যমান জগতের মায়াকে দূরীভূত করতে হবে এবং মনের সেই দিব্য নজরকে জাগাতে হবে, তবেই সাধ্যবস্তুকে পাওয়া যাবে। এই একই কথা বৈষ্ণব সাধনায়ও রয়েছে। তারা 'রাধা-কৃষ্ণ' রূপকের মাধ্যমে তার কথা বলেছে। রাধা অর্থাৎ 'জীবাত্মা' কৃষ্ণ অর্থাৎ 'পরমাত্মার' অংশ হয়েও প্রকৃত স্বরূপ ভুলে এই মায়ার জগতে পড়ে আছি আমরা সকলে। সকল জীবকে রাধা বলে অভিহিত করেছে বৈষ্ণব সাধকরা। রাধাকে যেমন দেখা গিয়েছিল যে, শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রী (লক্ষী) হয়েও নিজের সব ভুলে গিয়ে আইহনের ঘরনীতে পরিণত হয়েছে, কৃষ্ণকে সে তখন আর চিনতে পারছে না। কিন্তু মাঝেমধ্যে বাঁশির শব্দে তার মন বিচলিত হচ্ছে। ঠিক তেমনি কৃষ্ণের বাঁশির শব্দ আমাদের কানে এসে পৌঁছায় না, যারা সিদ্ধ যোগী তারাই মাত্র তারা আভাস পায়। রাধার মতো আমরাও মায়ায় পড়ে নিজের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে ভুলে গিয়েছি এবং মায়ার জগত- সংসারকেই সত্য বলে মেনে নিয়েছি। একমাত্র সিদ্ধ সাধকেরাই সেই বৃন্দাবনে কৃষ্ণের বাঁশির আওয়াজ শুনতে পায়, কিন্তু তাদের কাছেও তা ধরাছোঁয়ার বাইরে। শুধুমাত্র মনকে মাঝেমধ্যে বিচলিত করে। শেষপর্যন্ত যেমন রাধার মায়া কেটে গিয়েছিল এবং নিজেকে ও কৃষ্ণকে চিনতে পেরেছিল, সেই জন্যই বৈষ্ণব সাহিত্যে এই 'রাধা' ও 'কৃষ্ণ' রূপকে সাধনতত্ত্বের কথা বলা হয়েছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মূল তত্ত্ব হল 'অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব' এই তত্ত্বের উপরই এই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। এই তত্ত্বে বলা হয়, জগতের সব কিছু ব্রহ্ম থেকে সৃষ্টি। অর্থাৎ এই জীবজগৎও ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বা কৃষ্ণ থেকে সৃষ্টি। সুতরাং সমস্ত কিছুই কৃষ্ণের অংশ। সেই জন্য ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে কিছু ভেদ বা বৈসাদৃশ্য এবং কিছু

অভেদ বা মিল আছে। যেমন মাতা-পিতার সঙ্গে সন্তানের ভেদাভেদ আছে, তেমনি কৃষ্ণ ও জীব অর্থাৎ ভক্ত ও ভগবানের মধ্যেও ভেদাভেদ আছে। কিন্তু আমরা মায়ায় পড়ে তা যাই, যেমন রাধা মায়ায় পড়ে প্রকৃত স্বরূপ ভুলে গিয়েছিল। তেমনি আমাদের দেহের স্বরূপকে জানতে হবে আর তার জন্য প্রয়োজন মায়া অপসারণ করা। এইজন্য চর্যাপদ, বাউল, নাথ সাহিত্য, শাক্ত, সুফি প্রভৃতি সাধনায় দেহ সাধনা, মায়া মুক্তির কথা বলা হয়েছে। জীবজগৎ যে কৃষ্ণের অংশ তা বোঝাতে 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন-

"অনন্ত স্ফটিক যৈছে এক সূর্যভাসে।
তৈছে জীব গোবিন্দের অংশ প্রকাশে।।"[১২]

দেহের মধ্যে যে ঈশ্বরের অবস্থান এবং দেহ সাধনার দ্বারাই যে জীবের সাধ্য বস্তু লাভ সম্ভব, সেকথা শাক্ত সাহিত্যেও আছে। রামপ্রসাদ সেন এর একটি পদে আছে-

"ডুব দে রে মন কালী বলে।
হৃদিরত্নাকরের অগাধ জলে।।
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দুচার ডুবে ধন না পেলে।
তুমি দম-সামর্থে এক ডুবে যাও, কুলকুণ্ডলিনীর কূলে।।"[১৩]

এখানেও সেই দেহের মধ্যে 'রত্নাকরের' অবস্থানকেই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ দেহের মধ্যে ঈশ্বরের অবস্থানকে বোঝানো হয়েছে এবং দেহের মধ্যে সেই রত্ন আরোহন করা অর্থাৎ ঈশ্বর লাভের কথাই এখানে বলা হয়েছে। আবার শক্ত সাহিত্যেও সেই মায়াবাদ এর কথা এসেছে রামপ্রসাদের একটি পদে-

"কেবল আশার আসা, ভবের আসা, আসা মাত্র হলো
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে ভ্রমর ভুলে রলো।।
মা নিম খাওয়ালে চিনি বলে, কথাই করে ছলো।
ওমা! মিঠার লোভে, তিত মুখে সারা দিনটা গেলো।।"[১৪]

এই পদেও আছে মায়ার কথা, যে কথা চর্যাপদ থেকে শুরু করে বাউল, সুফি বিভিন্ন সাধনায় আছে। এই পদে পদকর্তা মায়ের (ঈশ্বরের) কাছে অনুযোগ জানিয়েছে, এই মায়া থেকে উদ্ধার করার জন্য। এই মায়া মুক্তি এবং সাধ্য লাভের কথা বৈষ্ণব সাহিত্যে বা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে সাধ্য-সাধন তত্ত্বে বলা হয়েছে। রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব গোদাবরীর তীরে এই তত্ত্ব আলোচনা করেছিলেন। এখানেই উঠে এসেছিল জ্ঞানশূন্য ভক্তির কথা। অর্থাৎ জ্ঞানশূন্য ভক্তি দ্বারাই যে ঈশ্বর লাভ করা যায় তার কথা, যে কথা আমরা চর্যাপদ, নাথ, শাক্ত, সুফি, বাউল সমস্ত সাধনাতেই পাই। সেই ভক্তির কথা চৈতন্যদেবও বলেছেন রায় রামানন্দকে—

"জ্ঞানে প্রয়াস মুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সম্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাং।
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যৈ প্রায়শোহজিতজিতোহপ্যসি তৈ স্ত্রিলোক্যাং।।"[১৫]

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত(শ্রীমৎভাগবত))

এখানেও সেই জ্ঞান মার্গের পথ ছেড়ে ভগবানের উদ্দেশ্যে উপাসনার কথা বলা হয়েছে। আবার রামানন্দ মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সঙ্গে আলোচনার সময় 'প্রেমভক্তি' যে সর্বসাধ্যসার তাও বলেছেন। আর এই প্রেমভক্তি কি রকম হওয়া চাই, তা বলতে গিয়ে 'কান্তা প্রেম সর্বসাধ্যসার'। অর্থাৎ প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে যেমন প্রেম ভক্তি থাকে, সেরকম ভক্তির দ্বারাই ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। এর উদাহরণ হিসাবে 'রাধার' কথা রামানন্দ বলেছেন। অর্থাৎ

কৃষ্ণ বা ভগবানকেই সবকিছু ধরে জাগতিক বাধা বন্ধন অতিক্রম করে কৃষ্ণের সাধনা করতে হবে, ঠিক যেমনটা আমরা চর্যাপদ, নাথ, শাক্ত, সুফি, বাউল প্রভৃতি সাধনায় দেখেছিলাম।

আবার সুফিবাদেরও অভীষ্ট হচ্ছে ঈশ্বরে লীন হয়ে যাওয়া, যা কিছুটা সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মের মতো ঈশ্বরকেই সর্বোস্ব মেনে তার কাছেই আত্মসমর্পণ করা, বাউলে যা 'মনের মানুষের' সন্ধান, চর্যাপদে কায়াসাধন, নাথ সাহিত্যেও কায়াসাধন। সুফিবাদে ঈশ্বরের সঙ্গে লীন হয়ে যাওয়া অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা একাত্ম হওয়ার ক্ষেত্রে কয়েকটি স্তরের কথা বলা হয়েছে। ঈশ্বরের নৈকট্য লাভে ইসলামী শাস্ত্রে সাধন পথের চারটি স্তর অতিক্রম করতে হয়-শরিয়ত, তরিকত, হকিকত ও মারিফত। পাঞ্জু শাহ তাই বলেন-

"আল্লাহতালা চার রাহা করিয়াছে তায়।
শরীয়ত তরিকত জানিবা ত্বরায়।।
হকিকত মারুফত এই চারি হয়।
চারি রাহে দুই ভেদ জানিবা নিশ্চয়।।"[১৬]

এই চারটি স্তরের মধ্যে মারিফত ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের সর্বোচ্চ স্তর। এই স্তরে তর্ক-যৌক্তিকভাবে পরিহার করা হয়। ঠিক একই কথা সহজিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যেও বলা হয়েছে যুক্তি-তর্কহীন ঈশ্বরের প্রতি প্রেম নিবেদনের কথা। এই তর্ক-যুক্তি পরিহার করেই ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। সুফি যখন ফানা থেকে বাকায় পৌঁছান তখন তার বিভ্রম কেটে যায়। সাধক সার্বিক মিলনের স্তরে একাত্ম হয়ে যান। সুফিবাদেও বলা হয়েছে নিজেকে জানার দ্বারাই ঈশ্বরকে জানা যায়। এ কথা চর্যাপদ, নাথ সাহিত্যে, শাক্ত, বৈষ্ণব, বাউলেও আছে। চর্যাপদ, নাথ সাহিত্যে এবং বাউলে সেই দেহ সাধনার কথা বলা হয়েছে। আবার সুফিবাদেও পীর বা গুরু শিষ্যকে পথ দেখান, যেমন চর্যাপদ, নাথ, বৈষ্ণব, ও বাউলে গুরু-শিষ্য পরম্পরা আছে, তেমনি সুফিবাদেও আছে।

চর্যাপদ, নাথ সাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য, শাক্ত সাহিত্য, বাউল, ও সুফিবাদ প্রভৃতির যদি এভাবে তুলনামূলক আলোচনা করা হয় তবে দেখা যাবে উভয়ের মধ্যেই সাদৃশ্য বর্তমান। উভয় সাহিত্য- সাধনার ধারাতেই সাধ্য বস্তু লাভের জন্য একই রকম পথের কথা বলা হয়েছে। চর্যাপদে যেমন দেহ সাধনার কথা আছে, তেমনি নাথ সাহিত্যেও আছে। বৈষ্ণব সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণকে লাভের কথা বলা হয়েছে জ্ঞানশূন্য ভক্তির দ্বারা অর্থাৎ সাধকের মনে জগতের কোনো রকম জ্ঞান থাকবে না। নিঃস্বার্থভাবে ভগবানের চরণে প্রেম নিবেদন করা। শ্রী চৈতন্যদেবের শেষ অবস্থা যেমন হয়েছিল দীব্যউন্মাদ, কোনোরকম জাগতিক জ্ঞান ছিল না। ঠিক যেমন চার্যার '৬' নং পদে হরিণ ও হরিণীর রূপক এর মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। হরিণের যেমন শেষ অবস্থা হয়েছিল, জাগতিক মায়া কেটে গিয়েছিল, খাদ্য-পানীয় সবকিছু ত্যাগ করেছিল। এক চরম উন্মাদের মতন অবস্থা হরিণেরও হয়েছিল, তার পরেই হরিণ মোক্ষলাভ করেছিল। নাথ সাহিত্যেও গোর্খনাথ কর্তৃক মীননাথের মায়া মুক্তি ঘটানো হয়েছে। শাক্ত সাহিত্য, বাউল, সুফিবাদ প্রভৃতিতেও মায়া মুক্তির কথা বলা হয়েছে। আবার এইসব সাহিত্যে দেহ সাধনার দ্বারা যে সাধ্য বস্তু লাভ করা যায় তাও বলা হয়েছে।

শুধু এইসব সাহিত্যেই নয়, মায়ায় পড়ার কথা ও মায়া মুক্তির কথা আধুনিক যুগের রচিত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যেও আছে-

"এই ঠাঁই মনেরে সংযত কর, সিদ্ধি লাভ হবে।
হয়্যে উপবিষ্ট
হও উপদিষ্ট,
সেই ধন পা'বে যা'র তুল্য নাই ভবে।।"[১৭]

আবার এখানেও সংসার রূপ গভীর অরণ্যের কথা বলা হয়েছে। আর এই অরণ্যে মায়া রূপে সাপ, ডাকিনী, বাঘ বাঘ প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে। এই গভীর অরণ্য রূপ সংসারকে পার করলেই (কাব্যে যাকে পর্বত শিখর বলা হয়েছে) সেখানে উপনীত হলেই পরম কাম্য বস্তু পাওয়া যাবে। কিন্তু এই বন পার করা সহজ নয়, সেখানে নানান হিংস্র জন্তুর বাস। বাঘ, সাপ প্রভৃতি ভয়ঙ্কর জন্তুর দ্বারা আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা অর্থাৎ এই গহীন ভব সংসার পার করতে গেলে লোভ, মায়ায় পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই মায়া থেকে মুক্ত হওয়াও কঠিন। চর্যাপদে যা সাঁকোর রূপকের মাধ্যমে বলা হয়েছে যে, ডান-বাঁমে গেলেই বিপদ, এখানেও ঠিক তাই হিংস্র জন্তুর দ্বারা আক্রান্তের সম্ভাবনা। অর্থাৎ সংসারে চলতে গেলে ডানে-বাঁমে বা লোভ-লালসার দ্বারা আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা। কিন্তু আমাদের উচিত লোভ-লালসা মুক্ত হয়েই সোজা পথে চলা।

এই লোভ-লালসা বা মায়া-মোহ থেকে মুক্ত হওয়ার কথা চর্যাপদ থেকে শুরু করে বাউল, সুফি সমস্ত সাহিত্যেই বা ধর্মীয় আদেশে তথা সাক্ষাতেই পাওয়া যায়। কিন্তু চর্যাপদে সাধ্য বস্তু রূপে যেমন মোক্ষলাভের কথা বলা আছে, তেমনি বৈষ্ণব বা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম বা সাহিত্যে ঈশ্বর লাভের কথা বলা আছে। তেমনি নাথ সাহিত্য বা সাধনায় অমরত্ব লাভ, সুফিতে মনের মানুষ বা ঈশ্বর লাভের কথা বলা হয়েছে। এভাবে দেখলে দেখা যাবে সাধ্যবস্তুর কিছুটা পার্থক্য থাকলেও সাধ্যবস্তু লাভের যে পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে তা মূলত একই। লৌকিক জগতের মায়া মুক্ত হয়েই যে সাধ্য বস্তু লাভের পথে অগ্রসর হওয়া যায়, সেই কথা সকল সাহিত্য-সাধনাতেই আছে। এই মায়ার জন্য আমরা আমাদের প্রকৃত স্বরূপটাকে চিনতে পারি না। আমরা আমাদের উদ্দেশ্য- লক্ষ্য সম্পর্কেও ভুলে যাই এবং এই জাগতিক মায়াকেই সত্য বলে মেনে নেই। এই মায়া মুক্তির কথা, সাধ্যকে লাভ করার পদ্ধতির কথা চর্যাপদ, নাথ সাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য, বাউল, সুফি, শাক্ত সাহিত্য মধ্যযুগের এই সাহিত্য ছাড়াও আধুনিক যুগের সাহিত্যেও আছে, যেমন- 'স্বপ্নপ্রয়াণে'ও সেই রকম কথা বলা হয়েছে। এইসব সাহিত্যেই মায়া মুক্তির উপদেশ দেওয়া আছে। এইসব সাহিত্যে যে সাধনার কথা বলা হয়েছে সে গুলির মধ্যে তুলনা করলে সাদৃশ্যই চোখে পড়ে। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন সহজে বৌদ্ধদের সাধনা থেকে শুরু করে একেবারে আধুনিক সময় পর্যন্ত এক পরিক্রমায় দেখি, তবে বিভিন্ন সাহিত্য ধারাতেই আমরা সাধ্য বস্তুকে লাভ করার যে পদ্ধতির উল্লেখ পাই তার মধ্যে আছে এক গভীর সাদৃশ্য।

তথ্যসূত্র:

১. দাশ, নির্মল। চর্যাগীতি পরিক্রমা। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭০০ ০৭৩, অগ্রহায়ণ, ১৪২৫, পৃ. ১১৭।
২. মন্ডল, পঞ্চানন। এম্-এ (সম্পাদিত), গোর্খ -বিজয়। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ২, কলকাতা, অগ্রহায়ন, ১৩৫৬, পৃ. ৯৫।
৩. লালা, আদিত্যকুমার। বাংলার নাথধর্ম ও নাথসাহিত্য। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০ ০৭৩, মাঘ, ১৪২৬, পৃ. ৫০।
৪. চৌধুরী, মিহির। কামিল্যা, নির্বাচিত চর্যাপদ। শিলালিপি পাবলিশার্স, কলকাতা -৭০০ ০০৯, আগস্ট, ২০১৮, পৃ. ৪৯-৫০।
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত। তৃতীয় খন্ড: দ্বিতীয় পর্ব, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা- ৭০০ ০৭৩, ২০১৯- ২০২০, পৃ. ৩৫৯।
৬. চৌধুরী, মিহির। কামিল্যা, নির্বাচিত চর্যাপদ। শিলালিপি পাবলিশার্স, কলকাতা- ৭০০ ০০৯, আগস্ট, ২০১৮, পৃ. ৭২।

৭. মন্ডল, পঞ্চানন। এম্-এ (সম্পাদিত), গোর্খ-বিজয়। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ২, কলকাতা, অগ্রহায়ন, ১৩৫৬, পৃ. ৮০।
৮. দাশ, নির্মল। চর্যাগীতি পরিক্রমা। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭০০ ০৭৩, অগ্রহায়ণ, ১৪২৫, পৃ. ১৯৮।
৯. চৌধুরী, মিহির। কামিল্যা, নির্বাচিত চর্যাপদ। শিলালিপি পাবলিশার্স, কলকাতা -৭০০ ০০৯, আগস্ট, ২০১৮, পৃ. ৪৭।
১০. মন্ডল, পঞ্চানন। এম্-এ (সম্পাদিত), গোর্খ -বিজয়। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ২, কলকাতা, অগ্রহায়ন, ১৩৫৬, পৃ. ৯২।
১১. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত। তৃতীয় খন্ড: দ্বিতীয় পর্ব, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা- ৭০০ ০৭৩, ২০১৯- ২০২০, পৃ. ৩৮৮।
১২. কৃষ্ণদাস। শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত। আনন্দ পাবলিশার্স, সুকুমার সেন, তারাপদ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কলকাতা -৭০০ ০০৯, ফাল্গুন, ১৪২৬, পৃ. ৭।
১৩. রায়, শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত)। শাক্ত পদাবলী (চয়ন)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০, পৃ. ১৭৬।
১৪. তদেব, পৃ. ১০৯।
১৫. কৃষ্ণদাস। শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত। আনন্দ পাবলিশার্স, সুকুমার সেন, তারাপদ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত)। কলকাতা -৭০০ ০০৯, ফাল্গুন, ১৪২৬, পৃ. ১৭৭।
১৬. ওয়াহাব, আব্দুল। বাংলার বাউল। সুফি সাধনা ও সংগীত, রত্নাবলী পাবলিশার্স, কলকাতা- ৭০০ ০০৯, প্রথম প্রকাশ, মে, ১৯৯৯, পৃ. ৮৪।
১৭. লালা, আদিত্যকুমার (সম্পাদনা)। স্বপ্ন-প্রয়াণ, মননে-অনুভবে। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭০০ ০৭৩, পৃ. ২৩৩।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. দাশ, নির্মল। চর্যাগীতি পরিক্রমা। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭০০ ০৭৩, অগ্রহায়ণ, ১৪২৫।
২. মন্ডল, পঞ্চানন এম্-এ (সম্পাদিত)। গোর্খ -বিজয়। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ২, কলকাতা, অগ্রহায়ন, ১৩৫৬।
৩. লালা, আদিত্যকুমার। বাংলার নাথধর্ম ও নাথসাহিত্য। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা -৭০০ ০৭৩, মাঘ, ১৪২৬।
৪. কামিল্যা, চৌধুরী, মিহির। নির্বাচিত চর্যাপদ। শিলালিপি পাবলিশার্স, কলকাতা -৭০০ ০০৯, আগস্ট, ২০১৮।
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত। তৃতীয় খন্ড: দ্বিতীয় পর্ব, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা- ৭০০ ০৭৩, ২০১৯-২০২০।
৬. কৃষ্ণদাস। শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত। আনন্দ পাবলিশার্স, সুকুমার সেন, তারাপদ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কলকাতা- ৭০০ ০০৯, ফাল্গুন, ১৪২৬।
৭. রায়, শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত)। শাক্ত পদাবলী (চয়ন)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০।
৮. ওয়াহাব, আব্দুল। বাংলার বাউল, সুফি সাধনা ও সংগীত। রত্নাবলী পাবলিশার্স, কলকাতা- ৭০০ ০০৯, প্রথম প্রকাশ, মে, ১৯৯৯।
৯. লালা, আদিত্যকুমার (সম্পাদনা)। স্বপ্ন-প্রয়াণ, মননে-অনুভবে। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭০০ ০৭৩

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1016-1023
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.318

ঔপনিবেশিক বাংলায় শ্রমিক চেতনার মুখপাত্র: বিশের দশকের ‘সংহতি’ পত্রিকার একটি বিশেষ পাঠ

মস্তাফিজুর আলম, *স্বাধীন গবেষক, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 07.03.2026; Accepted: 10.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The 1920s stand as a landmark era in the social, political, and economic history of Bengal. Inspired by the post-World War I global economic depression, inflation, and the success of the 1917 Russian Revolution, an unprecedented awakening emerged among the working class in India's industrial belts. In particular, there was a pressing need to give a structured political form to the spontaneous grievances of workers in Kolkata and its adjacent jute mill areas. During this critical juncture, a significant section of the educated, socially conscious middle-class intelligentsia directly involved themselves in the labor movement. Their primary objective was to sensitize the neglected laborers and employees regarding their legitimate rights and to build a robust trade union or labor organization to secure those rights.

The contemporary periodicals served as one of the primary instruments of this organizational endeavor. In the early 1920s, specifically between 1921 and 1924, several labor-friendly magazines were published from Kolkata, among which 'Sanghati', are particularly noteworthy. These periodicals did not merely disseminate news; they provided theoretical and practical direction to foster a distinct 'Labor Consciousness' among the working class. How these magazines determined the course of the labor movement amidst the political turmoil of that time, and specifically how 'Sanghati' conveyed the messages of 'Class Collaboration' and 'Labor Liberation' to the common people, is the central theme of this essay. This research is primarily based on the editorial comments and archival records of the original 1920s periodicals, presented here as a documented testament to the struggle of the working class in Bengal.

Keywords: Labor Movement, Sanghati Magazine, Trade Union, Class Collaboration, The Twenties (1920s), Santosh Kumari Devi, Industrial Politics, Nationalism, Periodicals, Economic Depression, Press Employees' Association, Labor Consciousness, Hunger Strike of Political Prisoners, Labor Laws, Cooperative Movement, Bureaucratic Interference

‘সংহতি’ পত্রিকার আবির্ভাব ও সাংগঠনিক ভিত্তি:

ঔপনিবেশিক বাংলায় ১৯২০-এর দশকের সূচনা পর্বটি ছিল নানাবিধ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক টানাপোড়েনে কণ্টকিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী অর্থনৈতিক মন্দা এবং মুদ্রাস্ফীতির করাল গ্রাসে বাংলার শ্রমজীবী মানুষের জীবন যখন ওষ্ঠাগত, ঠিক সেই সময় ১৩৩০ বঙ্গাব্দের (১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ) বৈশাখ মাসে ‘সংহতি’ পত্রিকার জন্ম

হয়। এই পত্রিকার আবির্ভাব কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না; বরং এটি ছিল তৎকালীন ক্রমবর্ধমান ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের এক সুপরিকল্পিত বুদ্ধিবৃত্তিক বহিঃপ্রকাশ। পত্রিকাটির প্রকাশনার মূল চালিকাশক্তি ছিল 'প্রেস কর্মচারী সমিতি'। মূলত মুদ্রণ শিল্পের সাথে যুক্ত শ্রমিক ও কর্মচারীদের অধিকার রক্ষার তাগিদ থেকেই একটি নিজস্ব মুখপত্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল, যার সফল রূপায়ন ছিল এই 'সংহতি'।

পত্রিকাটির সম্পাদনার গুরুভার গ্রহণ করেছিলেন জ্ঞানাঞ্জন পাল এবং মুরলীধর বসু। তবে এর নেপথ্যে প্রধান সাংগঠনিক কারিগর হিসেবে কাজ করেছিলেন জিতেন্দ্র নাথ গুপ্ত। এই ব্যক্তিবর্গ কেবল সাংবাদিক ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন তৎকালীন সমাজ-চেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি, যাঁরা বিশ্বাস করতেন যে শ্রমিকদের মুক্তির পথ প্রশস্ত করতে হলে তাঁদের হাতে কলম তুলে দিতে হবে। 'সংহতি'র সাংগঠনিক ভিত্তিটি ছিল অত্যন্ত মজুত, কারণ এটি সরাসরি একটি শ্রমিক সংগঠনের আদর্শকে ধারণ করত। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, অবহেলিত ও শোষিত শ্রমিক শ্রেণিকে তাঁদের ন্যায্য অধিকার সম্পর্কে সচেতন করাই এর প্রধান লক্ষ্য।

এই পত্রিকাটির সাংগঠনিক কাঠামোর অন্যতম বিশেষত্ব ছিল এর শিক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গি। পরিচালকরা মনে করতেন, কেবল রাজপথে আন্দোলন করলেই শ্রমিকদের মুক্তি আসবে না; তাঁদের মধ্যে লেবার কনশাসনেস (শ্রমিক চেতনা) জাগ্রত করা অপরিহার্য। এই চেতনার উন্মেষ ঘটানোর জন্য 'সংহতি' তার পাতায় নিয়মিতভাবে শিল্প আইন (Labour Laws) এবং বিভিন্ন আইনি সুরক্ষা নিয়ে আলোচনা করত। তৎকালীন ব্রিটিশ আমলের জটিল শ্রম আইনগুলো সাধারণ শ্রমিকদের বোধগম্য করে তোলার ক্ষেত্রে এই পত্রিকার ভূমিকা ছিল অতুলনীয়।

সাংগঠনিক কার্যক্রমে 'সংহতি' কেবল একটি সংবাদপত্রের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ না থেকে শ্রমিকদের জন্য একটি আদর্শিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করত। পত্রিকাটির মাধ্যমে সমবায় আন্দোলনের (Cooperative Movement) গুরুত্ব ব্যাপকভাবে প্রচার করা হতো। উদ্যোক্তারা বিশ্বাস করতেন, শ্রমিকরা যদি সমবায়ের ভিত্তিতে নিজেদের অর্থনৈতিক ভিত্তি শক্তিশালী করতে পারে, তবে মালিক পক্ষের শোষণ থেকে রক্ষা পাওয়া সহজ হবে। এই সমবায়মুখী চিন্তা ও সাংগঠনিক দৃঢ়তা 'সংহতি'কে তৎকালীন অন্যান্য সাময়িকী থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদা প্রদান করেছিল।

'সংহতি'র সাংগঠনিক আদর্শের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল এর শ্রেণি সমন্বয় (Class Collaboration) নীতি। তখনকার দিনে যখন রুশ বিপ্লবের প্রভাবে শ্রেণি সংগ্রামের ধারণা তীব্র হচ্ছিল, 'সংহতি'র পরিচালক গোষ্ঠী তখন বুদ্ধিজীবী সমাজের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে একটি সৌভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্কের স্বপ্ন দেখতেন। তাঁরা মনে করতেন, আন্দোলনের চরমপন্থা অবলম্বন না করে আলোচনার মাধ্যমে ও নিজেদের দাবি সুসংহতভাবে পেশ করার মাধ্যমেই প্রকৃত পরিবর্তন সম্ভব। এই সাংগঠনিক দর্শনটি আচার্য ব্রজেন্দ্র নাথ শীল ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো মনীষীদের আশীর্বচনে আরও পুষ্ট হয়েছিল।

এই ধারায় 'সংহতি' তার সাংগঠনিক কাঠামোকে এমনভাবে বিন্যস্ত করেছিল যেখানে শ্রমিকরা কেবল পাঠক ছিলেন না, বরং ছিলেন আন্দোলনের সক্রিয় অংশীদার। এই সাংগঠনিক দৃঢ়তাই বিশের দশকের উত্তাল দিনগুলোতে পত্রিকাটিকে বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম প্রধান দিশারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে।

তাত্ত্বিক অবস্থান: শ্রেণি সমন্বয় ও বুদ্ধিজীবী সমাজের প্রভাব

বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি কেবল রাজপথের লড়াইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এর পেছনে কাজ করেছিল এক গভীর তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দর্শন। 'সংহতি' পত্রিকার

তাত্ত্বিক ভিত্তির দিকে তাকালে দেখা যায়, এটি তৎকালীন বৈশ্বিক রুশ বিপ্লবোত্তর 'শ্রেণি সংগ্রাম' (Class Struggle)-এর উগ্র ধারণার পরিবর্তে এক বিশেষ ধরনের 'শ্রেণি সমন্বয়' (Class Collaboration)-এর আদর্শ দ্বারা পরিচালিত ছিল। তৎকালীন সমাজ-চেতন মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণি, যাঁরা শ্রমিক আন্দোলনের গোড়ার যুগে দিকনির্দেশক হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁদের রাজনৈতিক ও সামাজিক দর্শনের প্রতিফলন এই পত্রিকার পাতায় পাতায় লক্ষ্য করা যায়।

পত্রিকাটির আদর্শিক অবস্থান বুঝতে হলে এর প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত আচার্য ব্রজেন্দ্র নাথ শীল-এর আশীর্বাণীটি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছিলেন যে, ধনী ও শ্রমিকের মধ্যে কেবল বিরোধ বৃদ্ধি করা কোনো সংবাদপত্রের লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। তাঁর মতে, সমাজের এই দুই অপরিহার্য অঙ্গের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মেলবন্ধন ঘটানোই হওয়া উচিত 'সংহতি'র মূল ব্রত। এই 'শ্রেণি সমন্বয়' মতবাদটি তৎকালীন বাংলার উদারপন্থী বুদ্ধিজীবী মহলে অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, মালিক পক্ষকে শত্রু হিসেবে না দেখে বরং তাঁদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা সম্ভব।

এই তাত্ত্বিক ভাবনার সমান্তরালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর চিন্তাধারাও 'সংহতি'র আদর্শকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে দেওয়া তাঁর বাণীতে রাজনৈতিক উত্তেজনার চেয়ে 'আত্মশক্তির' ওপর বেশি জোর দিয়েছিলেন। তিনি শ্রমিকদের এই সত্যটি অনুভব করতে বলেছিলেন যে, সমাজের যন্ত্র-সভ্যতায় তাঁদের অপরিহার্যতা ঠিক কতখানি। রবীন্দ্রনাথের মতে, শ্রমিকরা যদি নিজেরাই নিজেদের শ্রমের মূল্য ও সামাজিক মর্যাদা বুঝতে পারে, তবেই তাঁরা শোষণের হাত থেকে মুক্তি পাবে। মালিকের বদান্যতা নয়, বরং শ্রমিকের নিজস্ব ব্যক্তিত্বের উদ্বোধনই ছিল তাঁর দর্শনের মূল কথা। এই বুদ্ধিবৃত্তিক প্রভাবের কারণেই 'সংহতি' পত্রিকা সরাসরি কোনো রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি না করে একটি স্বতন্ত্র নৈতিক অবস্থান বজায় রাখার চেষ্টা করত।

তবে এই 'শ্রেণি সমন্বয়'-এর তত্ত্ব কেবল ভাববাদী আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। এর একটি প্রয়োগিক দিকও ছিল। পত্রিকাটি বারবার প্রচার করত যে, পুঁজি ও শ্রমের বিরোধ মেটাতে হলে শ্রমিকদের শিক্ষিত ও সচেতন হতে হবে। মালিকরা যখন শ্রমিকদের অবহেলিত রেখে কেবল মুনাফা অর্জন করে, তখন পত্রিকাটি সেই শোষণের বিরুদ্ধে কলম ধরলেও সমাধানের পথ হিসেবে 'সন্ধি' বা 'সমন্বয়'-এর পথটিকেই শ্রেয় মনে করত। এই দর্শনের মূলে ছিল একটি সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থা বজায় রাখার আকাঙ্ক্ষা, যেখানে ধর্মঘট বা সংঘাত হবে শেষ অস্ত্র, প্রথম নয়।

গবেষণার নিরিখে দেখা যায়, তৎকালীন ভারতের চটকল বা শিল্পাঞ্চলগুলোতে যেখানে ইউরোপীয় মালিকদের শাসন চলত, সেখানে এই 'শ্রেণি সমন্বয়' তত্ত্বটি কতটা কার্যকর ছিল তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। কিন্তু 'সংহতি'র পরিচালক গোষ্ঠী দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, শ্রমিকদের হাতে কেবল মার্কসবাদী বিপ্লবের ধ্বজা তুলে দিলে তাঁদের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাঁদের জন্য প্রয়োজন লেবার কনশাসনেস (শ্রমিক চেতনা) এবং আইনি লড়াইয়ের জ্ঞান। এই তাত্ত্বিক কাঠামোর ওপর ভিত্তি করেই পত্রিকাটি 'শিল্প আইন' এবং শ্রমিকদের 'ন্যায্য দাবি-দাওয়া' নিয়ে সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করত।

পত্রিকাটির তাত্ত্বিক অবস্থানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ ছিল সমবায় আন্দোলন (Cooperative Movement)। তাঁরা মনে করতেন, পুঁজিবাদের বিপরীতে শ্রমিকদের একমাত্র রক্ষাকবচ হলো নিজেদের মধ্যে সংহতি স্থাপন করে সমবায়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জন করা। অর্থাৎ, তাঁরা মালিকপক্ষের ওপর

চিরস্থায়ী নির্ভরশীলতা কাটাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা সংঘাতের পথে নয়, বরং গঠনমূলক বিকল্প গড়ে তোলার পথে। এই বিশেষ দর্শনটিই 'সংহতি'কে সমসাময়িক অন্যান্য বৈপ্লবিক বামপন্থী পত্রিকা থেকে আলাদা একটি তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছিল।

তাত্ত্বিক সারসংক্ষেপ করতে গিয়ে দেখা যায়, বিশের দশকের এই সাময়িকীটি একটি মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছিল। একদিকে যেমন চটকল মালিকদের অমানবিক শোষণের চিত্র তারা তুলে ধরত, অন্যদিকে দেশীয় বুদ্ধিজীবী সমাজের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে একটি সংঘাতহীন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখত। রুশ বিপ্লবের সেই উত্তাল সময়ে বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে শ্রেণি সমন্বয়ের এই ডাক তৎকালীন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও শ্রমিকদের মধ্যে এক সেতুবন্ধন তৈরির বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টা ছিল বললে ভুল হবে না।

শ্রমিক সংবাদ: সমসাময়িক আন্দোলনের জীবন্ত দলিল

'সংহতি' পত্রিকার ঐতিহাসিক গুরুত্ব কেবল এর তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এর প্রতিটি সংখ্যা ছিল তৎকালীন বাংলার শিল্পাঞ্চল ও শ্রমিক জীবনের এক জীবন্ত দলিল। পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যায় 'আলোচনা' বা 'শ্রমিক সংবাদ' নামক বিশেষ বিভাগে সমসাময়িক ধর্মঘট, শ্রমিক সভা এবং চটকলগুলোর অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির যে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়, তা তৎকালীন শ্রমিক আন্দোলনের মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তোলে। এই সংবাদগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পত্রিকাটি কেবল তাত্ত্বিক দিকনির্দেশনা দিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি, বরং প্রতিটি ছোট-বড় আন্দোলনকে তারা জনসমক্ষে নিয়ে আসার দায়িত্ব পালন করত।

১৯২৩ সালের মে মাসে (১০ই বৈশাখ, ১৩৩০) 'সংহতি' পত্রিকায় একটি বিশেষ সংবাদ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রকাশিত হয়। এটি ছিল হুগলি জেলে কারারুদ্ধ রাজনৈতিক বন্দীদের ওপর জেল কর্তৃপক্ষের অমানবিক নির্যাতনের প্রতিবাদ। বিশেষ করে কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং তাঁর সহযোদ্ধাদের দীর্ঘ অনশন ধর্মঘটের সংবাদটি পত্রিকাটি এমনভাবে প্রচার করেছিল যা সাধারণ শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। রাজবন্দীদের এই নৈতিক লড়াইয়ের সাথে শ্রমিকদের স্বার্থকে একীভূত করে দেখা ছিল পত্রিকাটির একটি সাহসী পদক্ষেপ।

শিল্পাঞ্চলভিত্তিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে 'সংহতি'র দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত প্রখর। জামশেদপুরের টাটা কোম্পানির শ্রমিকদের আন্দোলনের খবর এর পাতায় নিয়মিত স্থান পেত। টাটা কোম্পানির কর্তৃপক্ষ যখন শ্রমিকদের সভা-সমাবেশ করার মৌলিক অধিকারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে এবং দমনমূলক আচরণ শুরু করে, তখন পত্রিকাটি এর তীব্র প্রতিবাদ জানায়। একইসাথে, ১৯২৩ সালের এপ্রিল মাসে সান্তাহারে অনুষ্ঠিত 'ই. বি. রেল ভারতীয় কর্মচারী সভা'-র দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয়। এই অধিবেশনে রেল শ্রমিকদের কাজের সময় নির্ধারণ এবং ভারতীয় ও ইউরোপীয় কর্মচারীদের মধ্যে বিদ্যমান বেতন বৈষম্য দূর করার যে দাবি তোলা হয়েছিল, 'সংহতি' তাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে সম্পাদকীয় স্তম্ভ সাজিয়েছিল।

চটকল শ্রমিকদের আন্দোলনের ক্ষেত্রেও পত্রিকাটির ভূমিকা ছিল অত্যন্ত সক্রিয়। তথ্য অনুযায়ী, ১৯২৩ সালের মে ও জুন মাসের সংখ্যাগুলোতে চটকল শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন অস্থিরতার খবর পাওয়া যায়। বিশেষ করে ভাটপাড়ার নিকটবর্তী 'গৌরীপুর চটকল', 'রিলায়েন্স' এবং 'নদীয়া চটকল'-এর শ্রমিক ধর্মঘটের কারণ ও ফলাফল নিয়ে পত্রিকাটি বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ তুলে ধরেছিল। নদীয়া চটকলের ক্ষেত্রে দেখা যায়, একজন ইউরোপীয় কর্মচারীর দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে প্রায় তিন হাজার শ্রমিক কাজ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। পত্রিকাটি এই সংবাদ

প্রকাশের মাধ্যমে প্রমাণ করেছিল যে, শ্রমিকদের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার লড়াই মজুরি বৃদ্ধির লড়াইয়ের মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

পত্রিকাটির সংবাদ পরিবেশনার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল এর বিশ্লেষণধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি। কেবল ধর্মঘটের খবর ছাপিয়েই তারা দায়িত্ব শেষ করত না, বরং সেই ধর্মঘট কেন ব্যর্থ হলো বা কেন সফল হলো, তা নিয়েও আলোচনা করত। নদীয়া চটকলের শ্রমিকদের একতা ও সাফল্যের প্রশংসা করে পত্রিকাটি লিখেছিল যে, শ্রমিকরা যদি নিজেদের 'সংহত শক্তি' বা সংগঠনের ওপর ভরসা রাখে, তবেই তারা কর্তৃপক্ষের অন্যায় আচরণের যোগ্য জবাব দিতে পারবে। এই সংবাদগুলো পরিবেশনের মূল উদ্দেশ্যই ছিল বিভিন্ন প্রান্তের বিচ্ছিন্ন শ্রমিক আন্দোলনগুলোর মধ্যে একটি সংহতি স্থাপন করা এবং তাদের মধ্যে একটি অভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনার উন্মেষ ঘটানো।

এছাড়াও, সমসাময়িক শিল্প-অর্থনীতির জটিল বিষয়গুলোকেও সাধারণ শ্রমিকের বোধগম্য করে তোলার চেষ্টা 'সংহতি'র পাতায় লক্ষ্য করা যায়। মজুরি নির্ধারণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বা শ্রম আইনের মারপ্যাঁচ নিয়ে পত্রিকাটির আলোচনা বিভাগ ছিল তথ্যের খনি। তারা বারবার শ্রমিকদের মনে করিয়ে দিত যে, উৎপাদিত দ্রব্যের ওপর শ্রমিকের কোনো আইনি অধিকার না থাকলেও, সেই দ্রব্য উৎপাদনের প্রধান চালিকাশক্তি হলো শ্রমিকের শ্রম। এই বোধটি তৈরির জন্য তারা দেশি-বিদেশি বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলনের উদাহরণও নিয়মিত ব্যবহার করত।

তৎকালীন বঙ্গীয় আইন সভায় শ্রমিক প্রতিনিধি নির্বাচনের বিতর্কিত বিষয়টিও 'সংহতি'র সংবাদ ও আলোচনা বিভাগে উঠে এসেছিল। তৎকালীন সরকার মনোনীত প্রতিনিধি কে. সি. রায় চৌধুরীর ভূমিকার সমালোচনা করে পত্রিকাটি দাবি করেছিল যে, শ্রমিকদের প্রতিনিধি নির্বাচনের পূর্ণ অধিকার কেবল শ্রমিকদেরই থাকা উচিত। আমলাতান্ত্রিক কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়াই শ্রমিকরা যাতে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে প্রতিনিধি পাঠাতে পারে, সেই লক্ষ্যে জনমত গঠনে পত্রিকাটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। এই সংবাদগুলো পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, 'সংহতি' কেবল একটি তথ্য সরবরাহকারী কাগজ ছিল না, বরং এটি ছিল ঔপনিবেশিক বাংলায় শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের এক অদম্য কণ্ঠস্বর।

এইভাবে 'সংহতি' তার সংবাদ ও আলোচনা বিভাগের মাধ্যমে সমসাময়িক ভারতবর্ষের বিশেষ করে বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের প্রতিটি স্পন্দনকে ধরে রেখেছিল। টাটা কোম্পানির ব্যারিকেড থেকে শুরু করে হুগলি জেলের অনশন কিংবা চটকলের সাইরেন— সবই এই পত্রিকার পাতায় এক সুসংহত ইতিহাসের রূপ নিয়েছিল যা তৎকালীন শ্রমজীবী মানুষের লড়াইকে এক নতুন মাত্রা প্রদান করে।

শ্রমিক অধিকার ও আইন সভার প্রতিনিধিত্ব: 'সংহতি'র রাজনৈতিক অবস্থান

ঔপনিবেশিক বাংলায় শ্রমিকদের কেবল কারখানার ভেতরে শোষিত হতে হতো না, বরং প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক স্তরেও তাঁদের কণ্ঠস্বরকে অবদমিত করে রাখার এক সুসংগঠিত সরকারি প্রচেষ্টা জারি ছিল। 'সংহতি' পত্রিকা এই প্রশাসনিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণ করেছিল। তৎকালীন বঙ্গীয় আইন সভায় শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি ছিল অত্যন্ত বিতর্কিত। এই বিতর্কের কেন্দ্রে ছিল শ্রমিক প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে সরকারি বা আমলাতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ (Bureaucratic Interference)।

তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার আইন সভায় শ্রমিক প্রতিনিধি হিসেবে যাদের মনোনীত করত, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকৃত শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা না করে সরকারের তাঁবেদারি করতেই ব্যস্ত থাকতেন। 'সংহতি' এই প্রথার তীব্র বিরোধিতা করে এক অটল নীতি ঘোষণা করেছিল। তাদের মূল দাবি ছিল— শ্রমিকদের প্রতিনিধি

শ্রমিকরাই সরাসরি নির্বাচন করবে এবং এই নির্বাচনি স্বাধীনতার ওপর সরকার কোনোভাবেই হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। এই দাবিটি ছিল তৎকালীন সময়ের নিরিখে অত্যন্ত প্রগতিশীল। পত্রিকাটির মতে, আমলাদের দ্বারা মনোনীত প্রতিনিধি কখনোই শ্রমিকদের প্রকৃত দুঃখ-দুর্দশার কথা আইন সভায় তুলে ধরতে পারবেন না। এই রাজনৈতিক চেতনা থেকেই পত্রিকাটি প্রতিটি কারখানায় এবং শিল্পাঞ্চলে শক্তিশালী শ্রমিক সমিতি গড়ে তোলার ডাক দিয়েছিল।

এই প্রসঙ্গের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল তৎকালীন শ্রমিক নেতা কে. সি. রায় চৌধুরীর নাম। নথিতে দেখা যায়, 'সংহতি'র পরিচালক গোষ্ঠী কে. সি. রায় চৌধুরীর রাজনৈতিক ভূমিকার ঘোর বিরোধী ছিলেন। যদিও তিনি সরকার কর্তৃক মনোনীত শ্রমিক সদস্য হিসেবে আইন সভায় প্রতিনিধিত্ব করতেন, কিন্তু 'সংহতি'র দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন শ্রমিকদের স্বার্থ বিরোধী এক সুবিধাবাদী নেতা। কে. সি. রায় চৌধুরীর পুনর্নির্বাচনের বিরোধিতা করতে গিয়েই পত্রিকাটির পক্ষ থেকে বারবার দাবি করা হয়েছিল যে, মনোনয়ন নয়, বরং ভোটাধিকারের মাধ্যমেই প্রকৃত প্রতিনিধি বাছাই করতে হবে। এই বিরোধটি কেবল ব্যক্তিগত ছিল না, বরং এটি ছিল দুটি ভিন্ন ধারার রাজনৈতিক দর্শনের সংঘাত। একদিকে ছিল সরকার ঘেঁষা আপসকামী রাজনীতি, অন্যদিকে ছিল 'সংহতি'র প্রচারিত শ্রমিকদের গণতান্ত্রিক অধিকারের লড়াই।

পত্রিকাটির রাজনৈতিক দর্শনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ ছিল শ্রমিকদের আত্মমর্যাদাবোধ। তারা মনে করত, শ্রমিকদের মুক্তি কোনো 'বিখ্যাত ব্যক্তি' বা বাহিরের কোনো নেতার বদান্যতায় আসবে না। তৎকালীন সময়ে কোনো শ্রমিক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হলেই কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তিকে তার সভাপতি করার যে এক চিরাচরিত প্রথা চালু ছিল, 'সংহতি' তার তীব্র প্রতিবাদ জানায়। তাদের স্পষ্ট বক্তব্য ছিল— শ্রমিক সমিতি কেবল শ্রমিকদের দ্বারাই পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। বাইরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ কেবল পরামর্শদাতার ভূমিকা পালন করতে পারেন, কিন্তু সংগঠনের চাবিকাঠি থাকতে হবে সাধারণ শ্রমিকের হাতেই। এই চিন্তাটি ছিল মূলত শ্রমিকদের স্বনির্ভরতা ও লেবার কনশাসনেস (শ্রমিক চেতনা) তৈরির প্রথম ধাপ।

শ্রমিকদের এই রাজনৈতিক সচেতনতাকে শক্তিশালী করতে 'সংহতি' তার পাতায় নিয়মিতভাবে শিল্প আইন (Labour Laws) সংক্রান্ত জটিল বিষয়গুলো সহজ সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করত। আইন সভায় কোন বিল পাশ হচ্ছে, সেটি শ্রমিকের স্বার্থে নাকি মালিকের সুবিধার্থে— এই বিশ্লেষণগুলো পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশ করত। তারা বিশ্বাস করত যে, শ্রমিকরা যদি আইনি ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন না হয়, তবে তাদের লড়াই কেবল মজুরি বৃদ্ধির গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ থেকে যাবে। অথচ তাদের লড়াই হওয়া উচিত একটি শোষণমুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে।

প্রবন্ধগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পরিচালক মণ্ডলীর মূল নীতি 'শ্রেণি সমন্বয়' হলেও অনেক সময় তারা সেই নীতির ঊর্ধ্বে উঠে মালিকপক্ষের দমননীতির তীব্র সমালোচনা করতেন। বিশেষ করে যখন কোনো ইউরোপীয় কর্মচারী ভারতীয় শ্রমিকের সাথে দুর্ব্যবহার করতেন, তখন পত্রিকাটির জাতীয়তাবাদী চেতনা শ্রমিক স্বার্থের সাথে একীভূত হয়ে যেত। তারা ঘোষণা করত যে, শ্রমিকের একমাত্র হাতিয়ার হলো তার 'সংহত শক্তি', যা সে সমিতি বা সমবায়ের মাধ্যমে সংগ্রামের কাজে প্রয়োগ করতে পারে।

এইভাবে 'সংহতি' পত্রিকা কেবল একটি তথ্য সরবরাহকারী কাগজ হিসেবে নয়, বরং শ্রমিকদের রাজনৈতিক দাবি-দাওয়া ও অধিকার রক্ষার এক অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। আইন সভায় আমলাতান্ত্রিক মনোনয়ন প্রথার বিরোধিতা এবং শ্রমিকদের গণতান্ত্রিক প্রতিনিধি নির্বাচনের সপক্ষে তাদের নিরবচ্ছিন্ন প্রচার বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। শ্রমিকদের

প্রতি এই অঙ্গীকারই পত্রিকাটিকে তৎকালীন সময়ের অন্যান্য সাময়িকীর চেয়ে স্বতন্ত্র এক রাজনৈতিক গুরুত্ব প্রদান করে।

উপসংহার:

বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে বাংলার উত্তাল রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে 'সংহতি' পত্রিকা কেবল একটি গতানুগতিক শ্রমিক মুখপত্র হিসেবে নয়, বরং এক বহুমাত্রিক দর্পণ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। যদিও এর প্রধান লক্ষ্য ছিল অবহেলিত শ্রমিক ও কর্মচারী শ্রেণিকে তাঁদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা, কিন্তু পত্রিকাটির বিষয়বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এটি বৃহত্তর জাতীয় জীবনের নানা স্পন্দনকে ধারণ করত। পত্রিকাটির পাতায় শ্রমিক আন্দোলনের সংবাদের সমান্তরালে সমকালীন জাতীয় রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রকাশিত হতো। বিশেষ করে, হুগলি জেলে রাজবন্দীদের ওপর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের দমননীতি এবং কবি কাজী নজরুল ইসলামের ঐতিহাসিক অনশন ধর্মঘটের খবর যেভাবে এই পত্রিকায় স্থান পেয়েছিল, তা প্রমাণ করে যে 'সংহতি' শ্রমিক স্বার্থকে তৎকালীন জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই গণ্য করত।

শ্রমিকদের দৈনন্দিন লড়াইয়ের খবরের পাশাপাশি এই পত্রিকায় এক গভীর বুদ্ধিবৃত্তিক ও তাত্ত্বিক চর্চার ধারাও বহমান ছিল। পত্রিকাটির সম্পাদকীয় নীতি ও বিষয়বস্তুতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আচার্য ব্রজেন্দ্র নাথ শীলের আশীর্বাণী ও দর্শনের যে প্রতিফলন আমরা দেখি, তা ছিল মূলত এক ধরনের উচ্চতর সামাজিক চেতনা সৃষ্টির প্রয়াস। কেবল ধর্মঘট বা মজুরি বৃদ্ধির লড়াই নয়, বরং শ্রমিকদের রুচি ও মেধার বিকাশের জন্য সাহিত্য ও প্রবন্ধের নিয়মিত চর্চা ছিল এই সাময়িকীর এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। শ্রমিকরা যাতে কেবল যান্ত্রিক উৎপাদক না হয়ে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ ও সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই 'সংহতি' তার পাতায় সমবায় আন্দোলনের গুরুত্ব, স্বাস্থ্যবিধি এবং বিশ্ব অর্থনীতির জটিল বিষয়গুলোকে অতি সাধারণ ভাষায় ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব নিয়েছিল।

পরিশেষে বলা যায় যে, 'সংহতি'র তাত্ত্বিক কাঠামোতে 'শ্রেণি সমন্বয়'-এর আধিক্য থাকলেও এবং অনেক ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক ও সুবিধাবাদী শ্রমিক নেতাদের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বলয়ে সীমাবদ্ধ থাকলেও, পত্রিকাটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। এটি প্রমাণ করেছিল যে, শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলন কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; এটি সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির এক সম্মিলিত রূপ। শ্রমিকদের নিজস্ব আত্মশক্তি ও সংগঠনের ওপর নির্ভর করার যে আহ্বান পত্রিকাটি ১৯২৩ সালে জানিয়েছিল, তা আজ শতবর্ষ পরেও আধুনিক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ইতিহাসের এক আকর দলিল হয়ে রয়ে গেছে। বিশের দশকের সেই স্বল্পস্থায়ী কিন্তু আলোকোজ্জ্বল পথচলা বাংলার শ্রমজীবী মানুষের চেতনার ইতিহাসে 'সংহতি'কে এক কালজয়ী মর্যাদা প্রদান করেছে।

তথ্যসূত্র:

১. পাল, জ্ঞানাঞ্জন ও বসু, মুরলীধর (সম্পা.)। সংহতি (১৩৩০ বঙ্গাব্দ/১৯২৩ খ্রি.), প্রথম বর্ষ, সংখ্যা ১-১২। পিরিওডিক্যালস বিভাগ, জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ১, ৩-৫, ৯-১১।

২. সরকার, মুকুন্দলাল (সম্পা.)। কর্মী (১৩২৮ বঙ্গাব্দ/১৯২১ খ্রি.), প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের বিভিন্ন সংখ্যা। 'এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন'-এর মুখপত্র, পৃষ্ঠা: ৪-৬।

৩. দেবী, সন্তোষ কুমারী (সম্পা.)। শ্রমিক (১৯২৪), প্রথম বর্ষের সংরক্ষিত সংখ্যাসমূহ। কলকাতা, পৃষ্ঠা: ২, ১২।

৪. চট্টোপাধ্যায়, গৌতম (সম্পাদনা)। সংহতি, লাঙল, গণবাণী। কলকাতা: কে.পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৯২, পৃষ্ঠা: ১৩-২৮ (এই গ্রন্থটি আপনার গবেষণার প্রধান আকর)।

৫. চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জু। শ্রমিকনেত্রী সন্তোষকুমারী ও তৎকালীন বাংলা। কলকাতা: মনীষা গ্রন্থালয়, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা: ৪৫-৫৮।

৬. রায়, সুপ্রকাশ। ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও শ্রমিক আন্দোলন। কলকাতা: ডিএনবি পাবলিশিং, সংস্করণ ১৯৭২, পৃষ্ঠা: ৩৮০-৩৯৫।

৭. সরকার, সুমিত। আধুনিক ভারত (১৮৮৫-১৯৪৭)। দিল্লি: ম্যাকমিলান পাবলিশার্স, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা: ২০৫-২১৮।

৮. মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয়। বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস। কলকাতা: ওরিয়েন্ট লংম্যান, পৃষ্ঠা: ৯২-১০৫।

৯. চট্টোপাধ্যায়, সুরঞ্জন এবং দাশগুপ্ত, রতন। সাময়িক পত্রে শ্রমিক আন্দোলন (১৯২০-১৯৩০), পৃষ্ঠা: ১-১৫, (আর্কাইভালসংকলন)।

১০. জাতীয় গ্রন্থাগার (কলকাতা) সংরক্ষিত— রিপোর্ট অন নেটিভ নিউজপেপারস (বেঙ্গল), ১৯২১-১৯২৪ সময়কাল। ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো নথিপত্র। (সংগ্রহ নং: ৪২/বি)।

১১. সেন, সুকোমল। Working Class of India: History of Emergence and Movement, 1830-1970। কলকাতা: কে.পি. বাগচী, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা: ১৫৪-১৬৮।

১২. গোস্বামী, ওমকার। Industry, Trade, and Peasant Capitalism: Agriculture and the Jute Capacity of Bengal, 1900-1947। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯১, পৃষ্ঠা: ১১০-১২৫। (চটকল ধর্মঘটের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণের জন্য)।

১৩. দস্তীদার, সলিল। ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ধারা। কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, পৃষ্ঠা: ৭৪-৮৮।

১৪. 'প্রেস কর্মচারী সমিতি'-র বার্ষিক প্রতিবেদন ও সংরক্ষিত কার্যবিবরণী (১৯২১-১৯২৩), কলকাতা, (অধিবেশন রিপোর্ট: ৩)।

১৫. আচার্য ব্রজেন্দ্র নাথ শীল এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সংহতি' পত্রিকায় প্রকাশিত আশীর্বচন ও মূল প্রবন্ধের সংকলন, সংহতি, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৩০; পৃষ্ঠা: ৩-৫।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1024-1031
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.319

মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার আলোকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প

জ্যোতিস্মিতা চক্রবর্ত্তী, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 19.03.2026; Accepted: 22.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract:

Values may be understood as the patterns of behaviour, conduct, and personality traits characteristic of people in a particular era. They are intrinsically linked with the humane consciousness of individuals. We know that animals cannot transcend their physical limitations, but human beings seek to move beyond such boundaries and attain a higher dimension beyond mere physical existence—this higher dimension is what we call values. In the post-Second World War period, the negative impact on the socio-economic sphere led, in many cases, to the erosion and suppression of individual values. In literary works where human life is shaped and stirred by socio-economic contexts, the emergence, transformation, evolution, and crisis of individual values are vividly portrayed. The diverse representations of values are also evident in modern Bengali short stories. For analytical convenience, the discussion of values in Sunil Gangopadhyay's short stories is divided into three stages: the evolution of individual values, the revelation of individual values, and the crisis of individual values. The crisis of values may further be understood in terms of conflicts arising from socio-economic conditions and interpersonal tensions, conflicts between the individual and the surrounding environment, and inner conflicts between the individual's inner self and the external world. In this article we see that Sunil Gangopadhyay, in his short stories, portrays both the moral decay of the upper-class society and the ethical framework of the middle class. At the same time, he highlights the crisis of values while also suggesting the possibility of overcoming it. Through themes of modern disillusionment, meaninglessness, and the erosion of values, he presents—through a contemporary lens—the looming crisis of a dark and uncertain future.

Keywords: Values, Crisis, Conflict, Individual, Consciousness, Transformation

বিশ শতক হল রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অস্থির এক সময়। দেশভাগের যন্ত্রণা, খণ্ডিত স্বাধীনতা, উদ্বাস্তু সমস্যা, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি প্রতি মুহূর্তে জীবনের প্রতি স্বপ্নগুলোকে চুরমার করে দিয়েছে। পাঁচের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে ষাটের দশকে যাঁরা পাঠকমননে স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অমলেন্দু চক্রবর্তী, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, মতী নন্দী, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, দিবেন্দ্যু পালিত প্রমুখ। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের এই সময়ের একজন জনপ্রিয় লেখক। তিনি প্রথম জীবনে কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও, পরবর্তীতে একাধারে যেমন জনপ্রিয়

ঔপন্যাসিক, ভ্রমণ সাহিত্যিক তেমনি একজন গল্পকারও। তাঁর জন্ম ১৯৩৪ সালের ৭ ই সেপ্টেম্বর, বাংলাদেশের ফরিদপুরে। দেশভাগের কাছাকাছি সময় থেকে উত্তর কলকাতায় তাঁর বসবাস শুরু। তাঁর ছোটোবেলায় বই পড়ার অভ্যেস তৈরি হয় মায়ের থেকে। মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান সুনীল বিদ্যালয় জীবনের শেষপ্রান্ত থেকে টিউশনি পড়ানো শুরু করেন। ১৯৫৩ সালে রমাপদ চৌধুরী সম্পাদিত 'ইদানিং' পত্রিকায় তাঁর 'বাঘ' গল্পটি প্রকাশিত হয়। এরপর তিনি প্রায় ৩০০ টিরও বেশি গল্প লিখেছেন। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক জীবনের ওঠাপড়ার মধ্য দিয়ে ব্যক্তির মূল্যবোধের রূপান্তর, সংকট এবং নতুন মূল্যবোধের উদ্ভাসন কীভাবে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে প্রতিফলিত হয়েছে তা এই প্রবন্ধে আলোচনা করব।

'মূল্যবোধ' বলতে কোনো একযুগের মানুষের নিজেদের আচার-আচরণ, ব্যক্তিত্বকে বলা যেতে পারে। মানুষের মানবিক সত্তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত তার মূল্যবোধ বা মূল্যচেতনা। 'value' কথাটির উৎস ল্যাটিন শব্দ 'valuere' থেকে, যার অর্থ 'to be strong, to be worthy'। আমরা জানি পশুরা দৈহিক সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে পারে না। কিন্তু মানুষ এই গণ্ডি পেরিয়ে শারীরিক যথার্থতার উপরে উঠে এক অন্য মাত্রা পেতে চায়, যা হল মূল্যবোধ।

> "মূল্যবোধ শ্বাশত বা চিরন্তন নয়। আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে ও প্রয়োজনে মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়। সেই আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে মূল্যবোধেরও পরিবর্তন ঘটে। বাস্তবের সেই পরিবর্তনগুলি শিল্পের মধ্যেও প্রতিবিম্বিত হয়।"[১]

মূল্যবোধ প্রতিটি একক মানব সত্তার নিজস্ব অন্তর্নিহিত চেতনা। অ্যারিস্টটল যে ব্যক্তিক মূল্যবোধের কথা বলেছিলেন, দীর্ঘদিন পর স্যাঁত্রেও আধুনিককালে 'Existential Situation' এর মধ্যেও সেই 'Individual Value' র কথা বলেছেন। ব্যক্তির মূল্যবোধ বৃহত্তর ক্ষেত্রে সামাজিক মূল্যবোধে সঞ্চারিত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে আর্থ-সামাজিক স্তরে যে নেতিবাচক প্রভাব পরে, তাতে ব্যক্তির মূল্যবোধ পদদলিত হয়েছিল অনেক ক্ষেত্রেই। যে সাহিত্যশিল্পে আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে মানুষের জীবন আলোড়িত হয়েছে, সেখানে ব্যক্তির মূল্যবোধের আবির্ভাব, পরিবর্তন, রুপান্তর ও সঙ্কটের চিত্র ফুটে উঠেছে।

> "ব্যক্তির উপর সামাজিক চাপ যত বাড়তে লাগল সামাজিক মূল্যবোধ ততই ব্যক্তির জীবনে অনাবশ্যকভাবে ভারী হয়ে উঠল। ব্যক্তি মানুষের আকাঙ্ক্ষা এবং অভিজ্ঞতার থেকে মূল্যবোধের উদ্ভব।"[২]

আধুনিক বাংলা ছোটোগল্পেও মূল্যবোধের এই বিবিধ চিত্র দৃশ্যমান। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে মূল্যবোধ প্রসঙ্গটিকে আলোচনার সুবিধার্থে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে।

ক. ব্যক্তির মূল্যবোধের উত্তরণ
খ. ব্যক্তির মূল্যবোধের উদ্ভাসন
গ. ব্যক্তির মূল্যবোধের সংকট

আবার মূল্যবোধের সংকটকেও তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন:

১. আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ব্যক্তি বনাম ব্যক্তির অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে মূল্যবোধের সংকট।
২. প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে ব্যক্তির সংঘাতে উৎপন্ন হওয়া মূল্যবোধের সংকট।
৩. আত্মদ্বন্দ্ব অর্থাৎ ব্যক্তির অন্তর জগতের সঙ্গে বহির্জগতের দ্বন্দ্ব, তা থেকে উদ্ভুত মূল্যবোধের সংকট।

ক. ব্যক্তির মূল্যবোধের উত্তরণ:

ব্যক্তির জীবনে কোনো ঘটনা কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তির সহচর্য, ব্যক্তির পূর্বতন চরিত্রে একটি নতুন মাত্রা সংযোজিত করে। ফলে একজন আপাত সাধারণ ব্যক্তির মূল্যবোধ উন্নীত হয় একটি নতুন স্তরে। মূল্যবোধ রূপান্তরের এই ঘটনাটি দেখা যায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বেশ কিছু ছোটোগল্পে। যেমন: 'বিজনের বেঁচে থাকার উদ্দ্যেশ্য' গল্পে তথাকথিত উচ্চবিত্ত প্রশান্তনয়ন যিনি আত্মকেন্দ্রিক, অভিমানী একজন পুরুষ চরিত্র। বিজনকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেললেও তিনি প্রথমে তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। যদিও গল্পের পরবর্তীতে গিয়ে আমরা জানতে পারি, ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়ার ঘটনাটি তিনি ভালোই মনে করতে পেরেছিলেন, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ রূপে অস্বীকার করে মিথ্যে বলেন।

> "-আমি; কাল দুপুরে? অ্যাবসলিউটলি ননসেন্স। আমি কাল দুপুরে কারুকে কোনও ধাক্কা দিইনি, তা আমার মনে থাকত।"[৩]

গল্পের শেষভাগে আমরা এই দাম্ভিক, আত্মকেন্দ্রিক প্রশান্তনয়নের এক সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র দেখি। যেখানে সে নিজের দোষ স্বীকার করে এবং খানিক অনুতপ্তও বটে। সুতরাং, এই গল্পে প্রশান্তনয়ন চরিত্রটির মূল্যবোধের এক সার্বিক উত্তরণ ঘটেছে, যা অন্য একটি ব্যক্তির বাহ্যিক ব্যবহার দ্বারা অনুপ্রাণিত।

'ব্যর্থ প্রেমিক' গল্পে দেখা যায়, প্রধান চরিত্র মনিময় বারবার বিবাহিত প্রেমিকার ফ্ল্যাটে যায়। সেখানে সে অবাঞ্ছিত এবং অবহেলিত। অতিথি হিসেবে কোনো রকম সমাদরই তার জোটে না। মুখ বুজে এই অপমান সহ্য করার তার একটিমাত্র কারণ, সে জানতে চায় কেন অনীতা যোগাযোগ বন্ধ করেছিল। কোন দোষে তাকে বিয়ে করতে চায়নি অনীতা- এ প্রশ্ন যেন তাকে সারাক্ষণ তাড়া করে বেড়াত। তবে মনিময়ের মধ্যে মূল্যবোধ অবশ্যই ছিল। সে কারণেই সে অনিতার কোনো ক্ষতি করতে চায় না, এমনকি অনীতার সংসার ভাঙতেও চায় না। এরপর অনীতা জানায়, সে মনিময়ের পরিবারে নিজেকে অযোগ্য বলে মনে করে পিছিয়ে আসে, কারণ কুলাটা মেয়েকে মনিময়ের মা নাও সম্মতি দিতে পারে। অনীতা বুঝতে পেরেছিল, এতে তাদের যৌথ পরিবারের আনন্দময় পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাবে। দীর্ঘ কয়েক বছর পর একথা জানতে পেরে-

> "মনিময় স্তব্ধ হয়ে রইল। তার শরীরটা কাঁপছে। সে হঠাৎ বুঝতে পেরেছে। অনীতা তার চেয়েও অনেক বড়।"[৪]

অনীতার এই পদক্ষেপে দীর্ঘদিনের মর্মাহত, বঞ্চিত এবং হতাশ মনিময় একক সিদ্ধান্ত নিয়ে সম্পর্ক ভেঙে ফেলা অনীতাকে নিজের থেকে এক উচ্চতর ব্যক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করতে পিছুপা হয় না। এখানেই ঘটে তার মূল্যবোধের উত্তরণ।

'প্রথম মিথ্যে' গল্পে চন্দ্রা পল্লবকে বিনা অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে, যা আমুল পরিবর্তন ঘটায় পল্লবের জীবনে। যদিও এসব আবেগ বিন্দুমাত্র ছোঁয় না তার মনকে। তবে জীবনের পরবর্তীকালে এই ঘটনা তার মনে দাগ কাটে। সে প্রকৃতির কাছে ক্ষমা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে মূল্যবোধের উত্তরণ ঘটায়-

> "চন্দ্রার শরীর কাঁপছে, ঠোঁট কাঁপছে। সে হাত জোড় করে কদমগাছের উদ্দেশ্যে ফিসফিস করে বললো, ছেলেমানুষ ছিলাম, বুদ্ধিশুদ্ধি হয় নি, একদিন তোমার ফুলকে যোগ্য মর্যাদা দিই নি, সেজন্য ক্ষমা চাইছি, ক্ষমা করো, ক্ষমা করো!"[৫]

খ. ব্যক্তির মূল্যবোধের উদ্ভাসন:

মূল্যবোধের উদ্ভাসন মেঘলা আকাশে বিদ্যুৎ চমকের মতো। সম্পূর্ণ মূল্যবোধের রূপান্তর যেখানে ব্যক্তিকে মননে ও বিচারে তার আগের স্থান থেকে উন্নীত করে, মূল্যবোধের উদ্ভাসন সেক্ষেত্রে এক নতুন ধারা তৈরি

করে। 'বিশ্বাসঘাতক' গল্পে দানু একজন ডাকাত ও নারীর সম্মান হরণকারী। মেয়েদের দেখলে তার কাজ ফেলে ভোগ করবার কামনা জন্মায়। এমনকি সে তার নিজের দাদার রক্ষিতা পারুলের মুখ বেঁধে রেখে অত্যাচার করতেও পিছপা হয়নি। এই ঘটনা থেকে স্পষ্ট যে, দানুর মনে স্ত্রীলোকের প্রতি বিন্দুমাত্র সম্মানের কোনো জায়গা নেই। কিন্তু সেই দানুই গল্পের পরবর্তী অংশে পারুলের প্রলোভনে সাড়া দেয় না। গল্পের শেষভাগে আমরা জানতে পারি, দানু এক অতি সাধারণ চাকচিক্যহীন মেয়ের প্রতি দায়বদ্ধ হয়েছে। যার প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার পর সে আর অন্য নারীর স্পর্শ পর্যন্ত গ্রহণ করছে না।

> "অমন মেয়ে ঢের ঢেড় গড়াগড়ি যাচ্ছে! ওই তো দুটো রোগা হাত আর এইটুকুনি মাথা – তবু ওর জন্যই আমার মাথা ঠিক নেই, মাথায় ভূত চেপেছে আমার! শালা, এত মেয়েছেলে ঘাঁটলুম! শেষকালে এখন আমাকে ফ্যাক্টরিতে চাকরি নিতে হবে, ওফ! কিন্তু পারি না যে, ওর রাগ দেখলে এমন ভয় পাই...রোজ বেরুবার সময় বলে, যা কথা দিয়েচো মনে থাকে যেন-"[৬]

ডাকাত-ধর্ষক দানু পারুলকে ছোঁয় না, সে বেড়িয়ে যায় সমস্ত ঋণ শোধ করে, শুধুমাত্র একটি মেয়েকে কথা দিয়েছে বলে। শূন্য মূল্যবোধের বাহক দানুর মনে উদ্ভাসিত হয় সম্পর্কের সন্মান প্রদানের মূল্যবোধ।

'মা' গল্পে দেখা যায় দীপ যখন বাড়ি ফেরার জন্য আকুল হয়, তখন তার সহকর্মী লিন্ডা ঠিক বুঝে উঠতে পারেনা তার ভাবনার গভীরতা। সে ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করে দীপের দেশে ফেরার কারণ সম্পর্কে। আসলে তার কাছে শুধুমাত্র নিজের মা কে দেখার জন্য মার্কিন-মুলুকের লোভনীয় চাকুরী ছেড়ে দেওয়াটা খুব আশ্চর্যজনক। যদিও দীপের মুখে তার মা সম্পর্কে যাবতীয় বৃত্তান্ত শোনার পর লিন্ডার মনে একটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। সেদিন দীপের মুখে তার মায়ের কথা শুনে লিন্ডা বাড়িতে গিয়ে খুব কেঁদেছিল। তার চেতনাকে পরিবর্তন করে দীপের এই মার্তৃভক্তি-

> "-সেদিন তুমি তোমার মায়ের কথা বললে! আমি জানি, ইন্ডিয়া গরিব দেশ! এখানে তুমি ভাল চাকরি করতে, দেশে গিয়ে এরকম আরামে থাকতে পারবে না। তোমার অনেক কষ্ট হবে। তবু তুমি সব ছেড়ে চলে যাচ্ছো তোমার মায়ের জন্য। তোমার মায়ের কাছে থাকবে বলে। এটা আমার চেতনাকে কাঁপিয়ে দিয়েছে!"[৭]

লিন্ডার এই পরিবর্তন মূল্যবোধের এক উদ্ভাসনই বলা চলে, যা অপর একটি ব্যক্তির ভাবধারা থেকে অনুপ্রানিত।

'মূল্যবোধ' গল্পে রজত একজন মদ্যপ, নারী শরীরে আসক্ত, মূল্যবোধহীন পুরুষ। সে মানুষকে মানুষ হিসেবে ভাবে না। সে মনে করে টাকা দিলে পৃথিবীতে সবকিছু কেনা যায়, এমনকি মানুষের মান-ইজ্জতও। টাকার চেয়ে বেশি মুল্যের যে মানুষের জীবন, মন, মূল্যবোধ- তা সে ভাবতেই পারে না। এই নিম্ন মানসিকতার মানুষ রজত একরাতে মদ্যপ অবস্থায় যখন কোনো এক নিম্নবিত্ত পরিবারের সেবায় জেগে ওঠে, মানুষগুলোর দারিদ্র্য ও প্রান্তিকতা দেখে তার মনেও এক মূল্যবোধের উদ্ভাসন ঘটে। যার কারণে সে টাকা-পয়সা ভর্তি থলে জেনে বুঝে ফেলে আসে খাটিয়ার নিচে। এখান থেকে তার মূল্যবোধের উদ্ভাসনের পরিচয় পাওয়া যায়।

গ. ব্যক্তির মূল্যবোধের সংকট:

বাংলা কথাসাহিত্যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আবির্ভাব পঞ্চাশের দশকের এমন একটা সময়ে, যখন রাজনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক দিক থেকে সামগ্রিকভাবে দেশের পটপরিবর্তন শুরু করেছে, ভাঙন ধরতে শুরু

করেছে। অর্থনৈতিক সংকটের জন্য চারিদিকে হতাশা, অবক্ষয় দেখা যায়। সর্বস্ব হারিয়ে যে একদল বিপন্ন মানুষ জীবন সংগ্রামের সম্মুখীন, তাদের মূল্যচেতনা দ্বিধান্বিত হয়ে পরে। এই সময়কে বিষয়বস্তু হিসেবে ব্যবহার করে বেশ কিছু গল্প তিনি রচনা করেছেন, যেখানে মূল্যবোধের সংকটের ছবি ফুটে উঠেছে।

১. আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ব্যক্তি বনাম ব্যক্তির অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে মূল্যবোধের সংকট:

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বাংলা সমাজে অর্থনৈতিক বিপর্যয়, ব্যক্তিস্বাধীনতার হরণ, শোষণ ও নিপীড়ন মানুষের মূল্যবোধকে অনেক বড়ো আঘাতের সম্মুখীন করে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের অনেক ছোটোগল্পে ব্যক্তি বনাম ব্যক্তির এই অন্তর্দ্বন্দ্ব স্পষ্ট। 'যা চলছে' গল্পে শ্রীপতি রায় একজন পুরোদস্তুর ব্যবসায়ী মানুষ। সাধারণত অর্থনৈতিক উপায়ে যারা পয়সা উপার্জন করে, সরকারি অধিকারিকদের হাতে রাখাটা তাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজন। তাই মাঝে মধ্যে যখন পুলিশের দারোগা বা বি.ডি.ও গ্রামে আসে তখন তারা শ্রীপতি রায়ের বাড়িতেই ওঠে। এমত অবস্থায় শুধুমাত্র বাবুদের আবদারের ও বায়নার খরচ কমানোর উদ্দেশ্যে সে নিজের বিবাহিত স্ত্রীকে পরপুরুষের হাতে তুলে দিতেও পিছুপা হয়না। কেননা অর্থপিপাসু শ্রীপতি রায়ের কাছে বিবাহবন্ধন অপেক্ষা অর্থ সঞ্চয় বেশি গুরুত্বপূর্ণ। উচ্চপদস্থ সরকারি অধিকারিকদের স্খলিত চরিত্র এক্ষেত্রে শ্রীপতি রায়ের মতো ব্যবসায়ীর মুল্যবোধকে হত্যা করেছে।

'অনুসূয়ার প্রেম' গল্পে অভিজিৎ সেন অনুসূয়ার থেকে তার প্রত্যাশিত প্রেম না পেয়ে এক উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপন করে, যার মাশুল দিতে হয় অন্য মানুষদেরও। পার্টিতে মদ্যপ অবস্থায় একজন মহিলাকে অপমান করতেরও পিছপা হয় না সে। মদ্যপ অবস্থায় নির্বিচারে গাড়ির স্টিয়ারিংয়ে বসে, ভাবে না তার এই হঠকারীতার মাশুল অন্যেরা কেন দেবে?

> "সেখানেই আকণ্ঠ মদ্যপান করে মধ্যরাত্রের পর একা গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। গৃহস্বামী অনেক অনুরোধ করেছিল সেখানেই থেকে যেতে। কিন্তু ওই যে অভিদার জেদ? তাতে কে আটকাতে পারে। মাথা উঁচু করে বলেছিলেন, আমি ঠিক আছি, আমার নেশা হয় নি।"[৮]

তাহলে দেখা গেল, এখানে মূল্যবোধের অবক্ষয় অপর একটি ব্যক্তির কর্মের দ্বারা প্রভাবিত।

'হারাধনের বৈঠকখানা' গল্পে পিতার প্রতি তার পুত্র ও পুত্রবধূর অবজ্ঞা মূল্যবোধের অবক্ষয়ের দৃশ্যটা আরও স্পষ্ট করে। যে বাবা তাকে বড়ো করেছে, তার প্রতি ছেলের অবহেলা স্পষ্ট। বাবা প্রয়োজনে টাকা চাইলে যে পুত্র তা দিতে অস্বীকার করে, তার নুন্যতম মূল্যবোধ নেই বললেই চলে। গল্পের পরবর্তী অংশে এই হারানো মূল্যবোধ আরও প্রগাড় হয়ে ওঠে যখন তারা বৃদ্ধ পিতাকে খাবার দিয়ে ডাকে না, এমনকি রাতে না খেলে খোঁজও রাখার প্রয়োজন মনে করে না।

২. প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে ব্যক্তির সংঘাতে উৎপন্ন হওয়া মূল্যবোধের সংকট:

প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি সবসময় গল্প ও তার চরিত্রের অনুকূলে বয় না। প্রতিকূলে প্রবাহী পরিপার্শ্ব থেকে উৎপন্ন হয় মূল্যবোধের সংকট।

'পোষা হাঁসের ডিম' গল্পে দেখা যায় বিত্তশালী আয়োজকদের বিরুদ্ধে জুরি সদস্যদের পরোক্ষ নিঃশব্দ আন্দোলন খাবার নষ্ট করার মধ্য দিয়ে।

> "বরুণ লক্ষ্য করেছে, প্রত্যেক জুরিই যতটা খেতে পারে তার চেয়ে অনেক বেশি খাবার নেয়। একটা অতবড় চিংড়িই খেয়ে শেষ করা যায় না, চায় দুটো চিংড়ি। বাকিটা নষ্ট করে। যেন প্রতিহিংসার বশে বেশি বেশি খরচ করিয়ে আনন্দ পাওয়া।"[৯]

ভারতবর্ষের মতো এক উন্নয়নশীল দেশে যেখানে সিংহভাগ মানুষ দরিদ্রসীমার নিচে অবস্থান করে, সেখানে অন্যদের অন্ন দান করা না হোক, যদি নিজের খাবারটুকুকে সন্মান জানানো হয়, নষ্ট না করে, তা এক উচ্চতর মূল্যবোধের পরিচয়। অথচ এই গল্পে আমরা তথাকথিত দর্শন-সর্বস্ব গণমাধ্যমগুলির ও তার মানুষজনের ক্রমহ্রাসমান মূল্যবোধের পরিচয় পাই। গল্পের পরবর্তী অংশে দেখি সময় ও চাহিদার সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে নারকেল গাছগুলিকে।

'বুড়োর দোকান' গল্পে সুট-টাই পরিহিত তিনজন বাবু শ্রেণির ছোকরা-র বর্ণনা পাই, যারা যথেষ্ট বিত্তশালী হলেও পতিতাপল্লীর পার্শ্ববর্তী এক সস্তা দেশি মদের ঠেকেই মদ্যপান করে। তারা জীবনে সফল হলেও কোনো এক অজানা কারণে পারিপার্শ্বিকের বশবর্তী হয়ে কুরুচিকর কার্যে লিপ্ত হয়।

> "তিনজনেরই বয়স তিরিশের এদিক ওদিক। বেশ ফূর্তিবাজ ধরনের। টাই-বাবুটি কোনো অফিসে বড় কাজ করে, অন্য দু'জনও এলেবেলে নয়। সার্থকতার পথ তাদের চরিত্রে এক ধরনের ব্যক্তিত্ব এনে দিয়েছে। তবু সার্থকতার প্রতি খানিকটা বিদ্রোহ দেখাতেই বোধহয় এরা এই বে-আইনি অতি সস্তার মদের দোকানটাতে আসে।"[১০]

'যে কোন মূল্যে' গল্পে পূর্ণ ভাগ্যবশত একটি বই পেয়ে যায় ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে। সেটা সে চুরি করে। তবে এরকম অনৈতিক কাজ সে আগে কখনো করেনি।

> "চট করে পাঞ্জাবিটা তুলে পেটের কাছে পাজামার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল বইটা। দিয়েই তার বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো এরকম কাজ সে কখনো করেনি।"[১১]

লীনার উপস্থিতিতে সুরঞ্জনের করা অপমান তার এই অনৈতিক কাজকে যুক্তিগতভাবে ঠিক প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে পূর্ণর মন। পূর্ণর একাকীত্ব, স্ত্রী বিয়োগ যে পারিপার্শ্বিক শূন্যতা তৈরি করে, তা তার মূল্যবোধের অবক্ষয়ের জন্য সরাসরি দায়ী। স্ত্রী বিয়োগের পরে তার নিজ বাসস্থানকে একটা হোটেলের ঘর ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। শুধু মূল্যবোধের সংকট নয়, এই অনৈতিক কাজ করে তার মনে এক অদ্ভুত প্রশান্তির উদ্রেক ঘটে যা কখনই সমর্থনযোগ্য নয়।

৩. আদ্বন্দ্ব অর্থাৎ অন্তর জগতের সঙ্গে বহির্জগতের দ্বন্দ্ব, তা থেকে উদ্দ্ভুত মূল্যবোধের সংকট:

'বাসনা' গল্পে জগদিন্দ্র নিজের কন্যাসম পুষ্পময়ীকে পুত্রবধূ করতে রাজি হননি, নিজের কামারিপুর বশবর্তী হয়ে।

> "এক কোমর জলে দাঁড়ানো সেই কন্যার ঝলমলে যৌবনের দিকে কয়েক পলক তাকিয়েই জগদিন্দ্র কামমোহিত হয়েছিলেন, তাঁর পৌরুষ দপ করে জ্বলে উঠেছিল, তা মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য।"[১২]

শুধুমাত্র নিজের রিপুর তাড়নায় দুটি মানুষকে এক হতে না দেওয়া এক চরম মূল্যবোধের অবক্ষয়ের পরিচয় দেয়।

'কে অপরাধী' গল্পে অমরনাথের নিজের ছেলের প্রতি বিনা কারণে সন্দেহ প্রকাশ, অবিশ্বাস জ্ঞাপন এবং পরবর্তীতে নিজের ভেতরে তৈরি হওয়া অন্তর্দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের সংকটের চিত্রাঙ্কন করে। কোর্টের শমন এলে প্রথমেই তার নেতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত হয়। তার ছেলের দেরি করে বাড়ি ফেরা তার মনে সন্দেহের উদ্রেক ঘটায়। তার সন্দেহ আরও প্রবল হয়ে ওঠে ছেলের গোপন ব্যবসায় জড়িয়ে পরার অলিক কল্পনায়। গল্পের শেষে জয়দীপের অপরাধ ভুল প্রমাণিত হলেও তার বাবার দ্বন্দ্ব কাটেনা। তাই জয়দীপকে তিনি জড়িয়ে ধরলেন ঠিকই, কিন্তু তাতে কোনো আন্তরিকতা ছিলনা।

'টেলিগ্রাম' গল্পে সুবিমল পিয়নের থেকে টেলিগ্রাম গ্রহণ করেও তা খুলে পড়তে পারে না। আর্থ-সামাজিক সংকটে লড়াই করতে করতে খড়কুটোর মতো পাওয়া চাকরিটা সে হারাতে চায় না। সম্ভাব্য পারিবারিক সংকট তার চাকরির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে ভেবে সে চিঠি পড়তে পারে না। পরিবারে নেমে আসা বিপর্যয়ের তুলনায় তার কর্মজীবনের নিশ্চয়তা বেশি জরুরি। বাড়ি থেকে আসা দুঃসংবাদের পূর্বাভাস পেয়েও সে শুধুমাত্র নিজের চাকরি নিয়ে ভাবে, একটা অন্তর্দ্বন্দ্বের শিকার হয় সে, যাতে তার মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে।

অর্থাৎ আমরা দেখতে পাই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ছোটোগল্পে উচ্চবিত্ত সমাজের মূল্যবোধের পচন যেমন দেখিয়েছেন আবার মূল্যবোধের নৈতিকতার আলোকে মধ্যবিত্ত সমাজকে দেখিয়েছেন, তেমনি মূল্যবোধের সংকট এবং সংকট থেকে উত্তরণের আশাও জাগিয়েছেন। আধুনিক জীবনের অবসাদ, অর্থহীনতা, মূল্যবোধের ক্ষয় ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বর্তমানের চোখ দিয়ে আসন্ন ভবিষ্যতের অন্ধকারময় সংকটের পরিস্থিতি তুলে ধরেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. লাহা, চিত্তরঞ্জন। ২০০৭। মূল্যবোধ ও আধুনিক বাংলা উপন্যাস। পুস্তক বিপণি: কলকাতা, পৃ. ১।
২. চক্রবর্তী, সাবিত্রী নন্দ। ২০১৯ (১ম সং)। আধুনিক বাংলা ছোটগল্প মূল্যবোধের সংকট। করুণা প্রকাশনী: কলকাতা, পৃ. ১২।
৩. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল। ২০২০ (৯ম মুদ্রণ)। গল্পসমগ্র (খণ্ড ১)। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ: কলকাতা, পৃ. ১৬৩
৪. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল। ২০২০ (৬ষ্ঠ মুদ্রণ)। গল্পসমগ্র (খণ্ড ২)। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ: কলকাতা, পৃ. ১৪৫।
৫. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল। ২০২০ (৩য় মুদ্রণ)। গল্পসমগ্র (খণ্ড ৪)। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ: কলকাতা, পৃ.৩১
৬. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল। ২০২০ (৯ম মুদ্রণ)। গল্পসমগ্র (খণ্ড ১)। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ: কলকাতা, পৃ. ২৩০-২৩১।
৭. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল। ২০২০ (৩য় মুদ্রণ)। গল্পসমগ্র (খণ্ড ৪)। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ: কলকাতা, পৃ. ১৭৭।
৮. তদেব। পৃ .২৯২।
৯. তদেব। পৃ. ১৫৩।
১০. তদেব। পৃ. ৩০৯।
১১. তদেব। পৃ. ৭৭।
১২. তদেব। পৃ. ১৯৭-১৯৮।

আকর গ্রন্থ:

১. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল। ২০২০ (৯ম মুদ্রণ)। গল্পসমগ্র(খণ্ড ১)। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ: কলকাতা।
২. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল। ২০২০ (৬ষ্ঠ মুদ্রণ)। গল্পসমগ্র(খণ্ড ২)। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ: কলকাতা।

৩. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল। ২০২০ (৩য় মুদ্রণ)। গল্পসমগ্র(খণ্ড ৪)। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ: কলকাতা।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ। ১৯৯৮। সাহিত্যে ছোটোগল্প। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ: কলকাতা।

২. গিরি, রত্নদ্যুতি। ২০০৯। ছোটগল্পের অন্তর-জগৎ। ক্রিয়েটিভ পাব্লিকেশন: কলকাতা।

৩. ঘোষ, ব্যাসদেব। ২০১৯। বাংলা ছোটগল্পে বৃত্তিজীবির সংকট (১৯৭০-২০০০)। অক্ষর প্রকাশনী: কলকাতা।

৪. চক্রবর্তী, সাবিত্রী নন্দ। ২০১৯। আধুনিক বাংলা ছোটগল্প মূল্যবোধের সংকট। করুণা প্রকাশনী: কলকাতা।

৫. চক্রবর্তী, সুমিতা। ২০২১। ছোটগল্পের বিশয়-আশয়। পুস্তক বিপণি: কলকাতা।

৬. চৌধুরী, ভূদেব। ২০০০। ছোটোগল্পের কথা। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি: কলকাতা।

৭. দাশ, শিশিরকুমার। ২০২২। বাংলা ছোটগল্প। দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা।

৮. পাল, শ্রাবনী (সম্পা.)। ২০০৮। বাংলা ছোটগল্প পর্যালোচনা বিশ শতক। পুস্তক বিপণি: কলকাতা।

৯. মিত্র, মঞ্জুভাস। ২০১৩। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর সাহিত্য। প্রতিভাস: কলকাতা।

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1032-1042
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.320

বাদল সরকারের নাট্যসংলাপ ও কাব্যিক প্রকাশ

সাহেব দাঁ, *গবেষক, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 09.03.2026; Accepted: 13.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Dialogue is one of the six essential elements of drama, often considered its very soul. It is through dialogue that a playwright's deepest hopes, desires, and emotions are channeled. A successful playwright employs dialogue with utmost precision, yet the style of usage varies across different eras and authors. In this context, Badal Sircar and his works hold a significant place. Emerging in the second half of the twentieth century, Sircar was not just a playwright, but also a director, actor, and producer. Through constant experimentation, he strove to offer something new to Bengali theatre, introducing the concepts of the Absurd and Third Theatre. His visionary approach added a distinct dimension to the landscape of Bengali drama.

Much like Mohit Chattopadhyay, Badal Sircar was initially drawn to poetry. While working as a town planner, he spent his leisure time writing numerous short poems for himself or in letters to his beloved wife. These were later published in a collection titled 'Nanamukh' (Anjali Basu, November 1988). Eventually, he felt that poetry alone could not fully express his inner self. Consequently, he moved toward playwriting, aiming to present himself more comprehensively to society. However, since poetry was his first love, its influence naturally persisted in his plays. In works like 'Evam Indrajit' (1963), 'Sara Rattir' (1963), 'Jodi Ar Ekbar' (1966), and 'Circus' (1969), poetic verses and sensibilities frequently surface in the characters' dialogues. In these four selected plays, characters turn to poetry for various reasons: sometimes to escape the monotony of life, sometimes to survive on false hope amidst loneliness, or perhaps seeking peace from the dissatisfactions of the present and future. In some instances, they bid a final farewell to poetry through the lens of shattered faith and extreme despair. Thus, by creating diverse situations and weaving poetic dialogues into his characters' voices, Badal Sircar showcased his masterful skill in dialogue construction and highlighted his profound poetic identity.

Keywords: Nandimukh, Prabaser Hijibiji, and Ebong Indrajit— monotony, Sararatir— loneliness, Jodi Ar Ekbar — unfulfillment, Circus— despair.

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা নাট্যসাহিত্যে বাঁক বদলকারী ব্যক্তিত্ব হলেন বাদল সরকার (১৯২৫-২০১১ খ্রি.)। ডাক নাম সুধীন্দ্র সরকার। তিনি ছাত্র হিসেবে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। ছেলেবেলায় পড়াশোনার পাশাপাশি দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষিরোদপ্রসাদ, গিরিশচন্দ্রের নাটক পড়ে শেষ করেছেন। বড়ো হয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স করে দেশ থেকে বিদেশ পৃথিবীর নানা প্রান্তে ঘুরেছেন। সেই সুবাদে শেকসপিয়র, সেরিডান, মলিয়ের, বার্নাড শ' প্রমুখের

নাটক পড়েন এবং থিয়েটারে তার অভিনয়ও দেখেন। এইভাবে ধীরে ধীরে নাটকের প্রতি বাদল সরকারের আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে থাকে। একজন টাউন প্ল্যানার হয়ে দিনে চাকরি করার পরেও অবসর সময়ে একের পর এক নাটক রচনায় হাত দেন। শুধু নাটক রচনাই নয়; পাশাপাশি অভিনয়, নির্দেশক, প্রযোজক হয়েও সমানভাবে খ্যাতি অর্জন করেন। যা জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত বহমান থেকেছে। মূলত তাঁর নাট্যকর্মকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা— প্রসেনিয়াম থিয়েটার এবং থার্ড থিয়েটার। এই দুই পর্বে রচিত নাটকগুলিতে নাট্যকার প্রথম দিকে সিচ্যুয়েশনাল কমেডি দিয়ে শুরু করলেও পরে পরে চক্রাকারে বয়ে চলা জীবনের গভীর অর্থের অনুসন্ধান করেন। অর্থাৎ সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে নাটকের বিষয়কে গুরুগম্ভীর করে তুলেছেন।

একটি নাটকে মোট ছয়টি উপাদান থাকে। তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি হলো সংলাপ। বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থে বলেছেন, "সংলাপঃ স্যাদ্ গভীরোক্তির্নানাভাব সমাশ্রয়ঃ"[১] অর্থাৎ নানাভাবের ব্যঞ্জনাপূর্ণ গভীরোক্তিই হলো সংলাপ। দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "বস্তুত বৃত্ত ও চরিত্র নাটকের অপরিহার্য উপাদান হলেও সংলাপবর্জিত নাটক অর্থহীন।"[২] এই বক্তব্য আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, নাটককে গতিশীল, পরিণামমুখী, চরিত্রকে প্রাণবন্ত, তাদের ভারসাম্য রক্ষা ইত্যাদি কার্যগুলি সুচারুভাবে চালনা করার জন্যই সংলাপের প্রয়োজন। এজন্য সংলাপকে সর্বদা হতে হবে সংক্ষিপ্ত, আবেগদীপ্ত, স্বাভাবিক, যথোপযুক্ত, প্রাণময়, গতিগর্ভ ইত্যাদি। একজন নাট্যকার তাঁর নাটকে উক্ত বিষয়গুলিকে মাথায় রেখেই তিনি নাটক রচনা করবেন। এতে নাটকটির মান যেমন উৎকৃষ্ট হবে, তেমনি নাট্যকারের সাফল্য আর দর্শকরাও আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারবে।

বাদল সরকার স্কুলে পড়াকালীন কয়েকটি ছোটো ছোটো নাটক ('স্লিপার্স অব সিণ্ডারেলা', 'পলাশীর যুদ্ধ' ইত্যাদি) রচনার চেষ্টা করেন। কিন্তু এগুলি প্রকাশ পায়নি। পরে অর্থাৎ ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে একটি ইংরেজি চলচ্চিত্রের অভিনয় দেখে তার থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে শুধুমাত্র চরিত্রগুলিকে নিয়ে 'সলিউশন এক্স' নামক নাটকটি রচনা করেন। নাটকটিতে আগাগোড়া কমেডির ছড়াছড়ি। কমেডি ছাড়াও সহজ-সরল-স্বাভাবিক ভাষা, ছোটো ছোটো সংলাপ লক্ষ করা যায়। এতে দর্শক এবং পাঠক বাদল সরকারের নামে বেশ জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে দেয়। একইভাবে 'বড়ো পিসীমা' (১৯৫৯ খ্রি.), 'রাম শ্যাম যদু' (১৯৬১ খ্রি.) নাটকগুলি রচনা করেন। কিন্তু 'সমাবৃত্ত' থেকে তার গতানুগতিক ধারা পরিবর্তন করার প্রয়াস করেন, যা 'এবং ইন্দ্রজিৎ' (১৯৬৩ খ্রি.) নাটকে গিয়ে পূর্ণতা মেলে। তাই 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকটিকে বাদল সরকারের নাট্যরচনার ইতিহাসে মাইলফলক হিসেবে ধরা হয়। নাটকটি রচনার জন্যই তিনি সমগ্র বাঙালি তথা ভারতবর্ষ থেকে বিদেশ পর্যন্ত সকলের কাছে নাট্যকার বাদল সরকার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। তাঁর এই জনপ্রিয় নাটকের বিশেষত্ব হলো চরিত্রদের মধ্যে অসামঞ্জস্য, উদ্ভট সংলাপ উচ্চারণ, সংলাপে উক্তি-প্রত্যুক্তির গরমিল এবং কাব্যিক সংলাপের প্রকাশ।

বাদল সরকারের জীবনে প্রথম ভালোলাগার জায়গা ছিল কবিতা। নিজের প্রিয়তমা পত্নীকে লেখা চিঠিতে কিংবা মনের অনুভবের ভাষাকে বহির্বিশ্বে প্রকাশ করতে কবিতাকারে ছোটো ছোটো চিরকুটে পাতার পর পাতা লিখে গেছেন তিনি। যা পরবর্তীকালে 'নান্দীমুখ' (অঞ্জলি বসু, নভেম্বর ১৯৮৮ খ্রি.) নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। যদিও এই গ্রন্থ পাঠকসমাজে কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। এছাড়াও, চিঠি ও ডায়রীর আকারে লেখা তাঁর আত্মজীবনী 'প্রবাসের হিজিবিজি'-তে কবিতার উল্লেখ রয়েছে। হঠাৎ করে কোনো এক সময়ে এসে তিনি উপলব্ধি করলেন, কবিতার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে কোথাও যেন একটা সংকোচবোধ হচ্ছে। এই দ্বিধা কাটানোর জন্যেই নাটক রচনায় হাত দেন। কিন্তু কবিতাকে দূরে সরালেও তাঁর কবিস্বভাব মন শরীরের শিরা-উপশিরার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে রয়েছে। অর্থাৎ নাট্যসত্তার সঙ্গে কবিসত্তা অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত রয়েছে বলা যায়।

বাদল সরকারের নাটকে নাট্যকারের কবিপ্রতিভা কীভাবে ফুটে উঠেছে, তা আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের প্রথমেই 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকের নাম উল্লেখ করতে হয়। প্রবাসকালে লেখা নাটকটির মধ্য দিয়ে নাট্যকার জীবনের একঘেয়েমি এবং অস্তিত্ববাদের উজ্জ্বল উপস্থিতির কথা তুলে ধরেছেন। এই একঘেয়েমি এবং অস্তিত্ববাদকে কাব্যিক সংলাপের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। এর পূর্বাভাস নাটকটির মুখবন্ধে নাট্যকার জানিয়েছেন, "নাটকটির রচনাকাল ১৯৬৩, কিন্তু আসলে কবিতায় আর ডায়েরীতে এটি রচিত হয়ে গিয়েছিলো লন্ডনে ১৯৫৭ থেকে ১৯৫৯ সালে। বস্তুত একটা ছাড়া সবকটি কবিতাই ঐ সময়ে লেখা।"[৩] এই মুখবন্ধ থেকে পাঠক হিসেবে আমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি যে, নাটকটির পরতে পরতে রয়েছে কবিতা দিয়ে মোড়া।

"এক—দুই—তিন
এক—দুই—তিন—দুই—এক—দুই—তিন
চার—পাঁচ—ছয়
চার—পাঁচ—ছয়—পাঁচ—চার—পাঁচ—ছয়
সাত—আট—নয়
সাত—আট—নয়—আট—সাত—আট—নয়"[৪]

নাটকে লেখক চরিত্রের এই কবিতা আবৃত্তি আমাদের কাছে দুর্বোধ্য বলে মনে হয়। কিন্তু মনুষ্যজীবন যে নিরন্তর একটা চক্রের মধ্য দিয়ে আবর্তন করছে, তার নিদারুণ ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন নাট্যকার। এরপর নাটকের কাহিনি এগোলেই স্পষ্ট হয়ে আসে কবিতাটি।

"লেখক: এক—দুই—তিন। অমল—বিমল—কমল। —এবং ইন্দ্রজিৎ। এবং মানসী। ঘর থেকে স্কুল। স্কুল থেকে কলেজ। কলেজ থেকে দুনিয়া। বড়ো হচ্ছে। আর ঘুরছে। ঘুরছে আর ঘুরছে আর ঘুরছে। এক—দুই—তিন—দুই—এক। অমল—বিমল—কমল। এবং ইন্দ্রজিৎ।"[৫]

মানব জীবনের এই চক্রাকার আবর্তন থেকে মুক্তির যে পথ রয়েছে তাই নাট্যকার নিরন্তর খুঁজে চলেছেন।

"লেখক: ইন্দ্রজিৎ ও মানসী। ঘুরতে ঘুরতে ওরা অনেক দূর চলে এসেছে। অনেক দূর? চলে এসেছে? না ঘুরছে? শুধু ঘুরছে? ওরা বিয়ে করতে পারে। তারপর? ঘুরবে। ওদের বিয়ে নাও হতে পারে। তাহলে? ঘুরবে.....
দিকে দিকে থাক ঐতিহাসিক পাথুরে নয়ন মেলা,
ছন্দবাঁধনে আবর্তনের চলুক অনাদি খেলা,
আলো আঁধারির চক্র ধাঁধায় কালের শোণিতধ্বনি
দিবারাত্রের খণ্ডচয়ণে গেঁথে যাক বন্ধনী,
অজানা দিশায় আগামী অতীত ভুলে যাক সন্ধান,
আমি তো বর্তমান।
কী হবে মিথ্যা সূক্ষ্ম হিসাবে পুরোনো সংখ্যা গুণে?
কী হবে স্বপ্নে ভবিষ্যতের তন্তু-আঁচল বুনে?
রাত্রিদিনের ছন্দে কখনো যাবে না তো কেটে তাল,
বৃথা কেন তবে মনের দেউলে ভরে তোলা জঞ্জাল?
হৃৎস্পন্দন সময়ের তালে বেঁধে নিতে যদি পারো
পরোয়া থাকে না কারো।

.....এক মুহূর্ত—আবর্তনকে অস্বীকার করো। পুরো অঙ্কটা অস্বীকার করো।.....
নির্বোধ মনে অবুঝ অঙ্কে তবু উত্তর খোঁজা,
তবু সংখ্যার চক্ররাশিতে ভারি করে তোলা বোঝা।
অনেক দিনের হিসাবে শূন্য—সে কথা জায় না মানা,
অল্পদিনের ক্ষুদ্র গণনে তাই তো গণ্ডী টানা।
প্রকৃতিপত্রে শিশু অক্ষরে জীবনের ভাষা তাই
এখনো তো লিখে যাই।"[৬]

এই আবর্তনের অঙ্ক ক্রমশ কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে চলেছে। কথাগুলি যেন হয়ে উঠেছে নাটকের মর্মবাণী।

"নাগরদোলার আবর্ত-ছাঁদে গড়া
আমি এলোমেলো আকাশে এনেছি নেশা
অজ্ঞ বাতাস চেতনার বিষে মেশা,
না জানা ছন্দে ভাঙাচোরা বোঝাপড়া!
এদের কথা আমাকে বলতে হবে! এদের নাটক আমাকে ভাষায় গাঁথতে হবে!
ভাষা তো প্রাচীন, ক্ষতবিক্ষত কথা,
আলো দিশাহারা শিথিল অপ্রকাশে,
সমাধি মৌন জড়তার নাগপাশে,
চিতাবহ্নিতে প্রদীপ্ত বাচালতা।"[৭]

এই মর্মবাণীতে বোঝা যায় আবর্তনের পথিক চরিত্রটি লেখকরূপে নাট্যকার নিজেই। এই সংলাপ কবিতা থেকে কাব্যভাষার রূপ নিয়েছে।

"ঘন্টা বাজছে। একটি পরমাণু খসে গেছে। আরেকটি পরমাণুকে ডাকছে। তিনটি পরমাণু ডাকছে। আরো রাশি রাশি পরমাণু মিলে মিশে তালগোল পাকিয়ে বিরাট এক পৃথিবী ঘুরছে আর ঘুরছে। আর একের পর এক সেকেন্ড মিনিট ঘন্টা ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে।..."[৮]

এই আবর্তনের মধ্যেই নাট্যকার অস্তিত্ববাদের ইঙ্গিত টেনে বলেছেন,

"আমি বিভক্ত, আমি অণুখণ্ডিত,
গুঁড়ো দিয়ে গাঁথা জটিল ঐক্যতান।
বুড়ো শতাব্দী আজো পেতে আছে কান,
চূর্ণ পৃথিবী এখনো অপরাজিত!"[৯]

মানবজীবনের আবর্তনের অঙ্কের হিসাব-নিকাশ করতে গিয়ে নাট্যকার একসময় বিরক্তি বোধ করেন। তাই নাট্যমঞ্চে অমল, বিমল, কমলের অনুপস্থিতিতে লেখক নিজের ভাবনা নিয়ে বসে থাকাকে অর্থহীন মনে করেছেন।

"আমি। বসে ভাবি। শুধু ভাবি।
শুধু ভাবি বসে আমি খণ্ডিত উপকথা,
অসম্ভাব্য বায়বীয় পূর্ণতা।
সমাপ্তি যদি মেশে বিলোপের গানে,
অর্ধচেতনা তবু কেন আনে
ঝংকৃত মুখরতা?

.....
জীবনের বীজ ধুলোতে কি মিশে আছে?
কী হবে কুড়িয়ে ছাঁকা ভবিষ্যকণা?
.....
বৃথা পরিকল্পনা।
আমি। বসে ভাবি। আজো ভাবি।
আজো কেন তবু ভাবি পুরো মানুষের কথা?
অংশ-চেতনা আজো কেন খোঁজে লিখনের অন্যথা?"[১০]

দীর্ঘ সময় ধরে মাসিমা লেখকের জন্য খাবার নিয়ে অপেক্ষা করছে। লেখকের অর্থহীন ভাবনায় মাসিমা যোগদান করলে তার উদ্ভট কথাবার্তা শুনে তাকে বিয়ে করার পরামর্শ দেয়। কিন্তু লেখক গতানুগতিক জীবনের পথে হাঁটতে রাজি নয়। তাই মাসিমা অন্য সকলের বিয়ের কথা বললে লেখক তার প্রতিবাদ করে জানায়,

"এই পেয়ে গেছি! সব্বাই করছে।
কেন তুমি হাঁচবে? কেন তুমি কাশবে?
দাঁত ক'টি মেলে ধরে কেন মধু হাসবে?
কেন তুমি দেবে তুড়ি, ওরা যদি তুলে হাই?
সব্বাই করে বলে, সব্বাই করে তাই!"[১১]

"কাব্যির নাম শুনে কেন তুমি পালাবে?
কেন রোজ রেডিওটা অতো জোরে চালাবে?
কেন তুমি ডালে দেবে আটখানা লঙ্কাই?
সব্বাই করে বলে সব্বাই করে তাই!"[১২]

আলোচ্য দু'টি কবিতার মধ্যে নাট্যকার বুঝিয়েছেন, অন্য সকলের মতো বিয়ে করে সাংসারিক জীবন পালন করা মানে চক্রাকারে জীবনকে ঘোরানো। এই লজিক অগ্রাহ্য করেন বলেই তিনি অন্যদের থেকে পৃথক। এইভাবে নাটকটিতে মাঝে মাঝে কাব্যিক সংলাপ দিয়ে সুন্দর চলতে থাকে। চরিত্রদের অর্থহীন জীবনে অর্থবহ কাব্যিক সংলাপ দিয়ে সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। পরের কবিতায় শোনা যায় তাদের অন্তরের মর্মবাণী। প্রায়ান্ধকার মঞ্চে আলো-আঁধারির পরিবেশে তাদের গম্ভীর কণ্ঠস্বর আবৃত্তি করে ওঠে—

"মৃত্তিকা সমুদ্রে শেষ। সমুদ্র দিগন্তে সীমাটানা।
সৌরমণ্ডলের চক্রে পৃথিবীর নগণ্য ঠিকানা
কোথায় হারিয়ে আছে।
অবিশ্রান্ত সময়ের কাছে
.....
ধরণীর অর্থহীন প্রাণ।
.....
অবশ্য মৃত্যুর ছন্দে খুঁজে ফেরা তালের বিচ্যুতি,
.....
এখনো লেখেনি মর্তে মানুষের স্বল্প ইতিহাস।"[১৩]

এরপর মানসী জানায়,

"তবু আমি কীটাণু-অধম
বেশরম।
প্রতিবেশী সান্ত্বনায় ভুলে থাকি বিরাট ধারণা
জটিল গণিত-তত্ত্ব সূক্ষ্ম আলোচনা।...."[১৪]

এইভাবে নাটক শেষের দিকে ক্রমশ এগোতে থাকে। অস্তিত্ববাদের বিষয়টি আরও জোরালো হয়ে দাঁড়ায়। ইন্দ্রজিৎ এবং মানসী শেষবারের মতো দেখা করবে তাদের ওই পুরোনো মাঠের ঝাঁকড়া-মাথা গাছের নিচে।

"ও মাঠে মাটিতে ঘাসে মেশা
অনেক পুরোনো নেশা
অনেক জরুরি আলোচনা,
.....
আজে বাজে দু'টো কথা রাখি,
দু'দণ্ড বসে থাকি
কাছাকাছি গোলাপী বাতাসে।"[১৫]

ইন্দ্রজিৎ নিজের অস্তিত্বের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। এতদিন ধরে যার কাছে সবকিছুর উত্তর ছিল, আজ সে যুক্তি–তর্ক–বিচারের ধার ধারে না। ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ঘুমোতে চায়। এই অর্থহীন মানুষের ক্লান্তিময় জীবনের কথা লেখক তুলে ধরে কবিতার লাইন জুড়ে।

"আমি ক্লান্ত। বৃথা প্রশ্ন থাক,
এখন ঘুমোতে দাও নিভন্ত নির্বাক
ছায়ার গভীরে।
কী হবে কথার রাশি দিয়ে?
কী হবে তর্কের বীজ বাতাসে ছড়িয়ে?
আমি ক্লান্ত যুক্তির জ্বালায়,
আমাকে ঘুমোতে দাও একা নিরালায়
ছায়ার গভীরে।...."[১৬]

ইন্দ্রজিতের ক্লান্তিময় একঘেয়ে জীবনে আরও এক মানসী আসে। তাকে স্বপ্ন দেখায়। জীবনের প্রতি বিশ্বাস রাখতে বলে। এই স্বপ্ন একদিন ফুরিয়ে গেলেই শক্ত জমি মিলবে। আসল জীবন শুরু হবে। কিন্তু ইন্দ্রজিৎ বিশ্বাস রাখতে না পেরে বলে,

"ভেসে থাকি আস্তিকের দৈন্য নিয়ে,
কুটোয় এলিয়ে রাখি জীবনের ভার,
মুছে গেছে অন্য পার কুয়াশার সাদা দীর্ঘশ্বাসে।
.....
জোলো সান্ত্বনার বুলি ছেড়ে দাও,
কেড়ে নাও বিশ্বাসের অন্ধ ঠুলী,
.....
ডুবো পাথরের ভিতে পাতালে সে পাতে রাজধানী।"[১৭]

মানসীর সংলাপ আমাদের মুক্তির কথা বললেও ইন্দ্রজিৎ কখনও তা মেনে নেয়নি। মানবজীবন অভিশপ্ত সিসিফাসের প্রেতাত্মার মতো। জীবনে বেঁচে থাকার জন্যে প্রথম দিন থেকে নিরর্থকভাবে শুধু ঠেলেই যেতে হয়। এই ঠেলার না আছে কোনো বর্তমান আর না আছে কোনো ভবিষ্যৎ। অর্থাৎ জীবনের তীর্থযাত্রায় কোনো তীর্থ নেই; আছে শুধুমাত্র যাত্রা। এই যাত্রাপথ ধরেই লেখক তার উদাত্ত কণ্ঠস্বরে নাটকের শেষে ঘোষণা করে—

"আজো তাই
এ পথের শেষ নাহি পাই।
ফুরালে এ পথ
পূর্ণ হবে সর্ব মনোরথ
.....
এ যাত্রায় তাই
উদ্দেশ হারালো আজ, অর্থ কিছু নাই।
.....
দিবসান্তে আজ যেন মন
নাহি ভোলে সেই দীক্ষা। তীর্থ নয়,
তীর্থপথ আমাদের—মনে যেন রয়।"[১৮]

সমগ্র নাটকটি অস্তিত্ববাদের উপর ভর করেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাই হয়তো নাট্যকার ঘন ঘন কবিতার সাহায্য নিয়েছেন। মনুষ্যজীবন তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্যে এবং অর্থহীন জীবনকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে আত্মবিশ্বাসের খুবই প্রয়োজন। আলোচ্য কবিতাগুলিই তার উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে যায়। নাট্যকার বাদল সরকার গদ্য ও কবিতার সংলাপের মিশ্রণ ঘটিয়ে 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। এতে তাঁর কাব্যিক প্রকাশ যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি দিগন্ত জুড়ে জনপ্রিয়তাও ছড়িয়ে পড়েছে।

'সারারাত্তির' (১৯৬৩ খ্রি.) নাটকে নাট্যকার বৃদ্ধ চরিত্রটি দিয়ে একটি আত্মানুসন্ধান চালিয়েছেন। এই অনুসন্ধান বাইরের সঙ্গে ভিতরের; যা সারারাত ধরে চলতে থাকে। এই অনুসন্ধান 'এবং ইন্দ্রজিৎ'-কেও ছাড়িয়ে যায়। তিনটি প্রতীকী চরিত্র (বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ) এবং ব্যঞ্জনা দিয়ে নাটকটিকে সাজানো হয়েছে। বৃদ্ধটি সারারাত ধরে জেগে থাকে। তাই তার চৈতন্যও চলাচল করতে থাকে। জাগ্রত এই চৈতন্য আমাদের জানা-অজানা, চেনা-অচেনা নানান প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়। তখনই 'এবং ইন্দ্রজিৎ'-র সব জিজ্ঞাসা 'সারারাত্তির'-এ গভীর ও গাঢ় হয়ে ওঠে। শুরু হয় বৃদ্ধের কবিতা—

"আমি জেগেছি। সারারাত্তির।
সারারাত্তির সারারাত্তির
সারারাত্তির জেগেছি দেখেছি
দুই চোখ মেলে জেগেছি দেখেছি
তন্দ্রাবিহীন দুই চোখ মেলে
সারারাত্তির জেগেছি দেখেছি জেনেছি।"[১৯]

সারারাত ধরে বৃদ্ধের জেগে থাকা এবং রাত্রে জেগে উঠে জানালার ধারে চিন্তা করা স্ত্রী চরিত্রের মধ্যে আমরা পুরাতন প্রেমের সম্পর্কের ইঙ্গিত পাই। স্ত্রী রাত্রে জেগে থাকার কারণ জানতে চাইলে বৃদ্ধ কবিতার মাধ্যমে জানিয়ে স্পষ্ট করে দেয়।

"সা—রা—রা—ত্তি—র

সারারাত্তির প্রহরে প্রহরে
দণ্ডে দণ্ডে পলে অনুপলে
কতো অর্বুদ অণু পরমাণু
তিলে তিলে মিশে একটি রাত্রি বেঁধেছে।
.....
কতো মুহূর্ত মুহূর্তমালা গেঁথেছে।
....."[২০]

বৃদ্ধ এখানে নিছক বৃদ্ধ নয়; অভিজ্ঞতার কারণে বৃদ্ধ। এই বৃদ্ধের মধ্যে পুরোনো রঞ্জনের প্রেম জাগ্রত রয়েছে। তার প্রেমিকা এসেছে বলেই বৃদ্ধের থেকে পুরোনো রঞ্জন বেরিয়ে এসেছে। যে প্রেমকে পাওয়ার জন্য রঞ্জন রাতের পর রাত জেগে স্বপ্ন দেখেছে, তা এখন হাতের নাগালে। রঞ্জনের এই স্বপ্ন আজ যেন স্বীকৃতি পেল।

"....
আমার দু'চোখে শান দিয়ে দিয়ে
খোলা দুই চোখে নির্মম শাণ রেখেছি।
স্বপ্নের ভয়ে সজাগ প্রহরী
সারারাত্তির ধারালো দু'চোখে জেগেছি।
.....
প্রতি বার বার নির্বোধ মনে
তোমাকে স্বপ্ন তোমাকে স্বপ্ন দেখেছি।"[২১]

স্ত্রী চরিত্রের কাছে রঞ্জন হলো মুক্তির পথ। এই জেগে থাকা রাত রঞ্জনের রাত। রাত পেরিয়ে সকাল হলেই রঞ্জন অদৃশ্য। স্ত্রী এই রাতকে ভুলতে চায় না। বৃদ্ধ কবিতার পঙক্তিতে জানায়—

"যা হবার হোক। সারারাত্তির
তবু তো দু'চোখ সারারাত্তির
মনের স্বপ্ন তবু তো দু'চোখ নেমেছে।
শেষ হয় হোক। তবু তো রাত্রি—
অসম্ভবের সম্ভাবনাকে জেনেছে।"[২২]

সমগ্র নাটকে বৃদ্ধ চরিত্রের আত্মানুসন্ধানের বিষয়টি বেশ চমকপ্রদ। প্রতি মুহূর্তে পাঠকমনে ভাবনার উদ্রেক ঘটায়। নাটকের নাম 'সারারাত্তির'। বিষয় হিসেবে সমগ্র একটি রাতের ঘটনা। ব্যবহৃত কবিতাগুলির প্রতি ছত্রে ছত্রে 'সারারাত্তির' কথাটি যুক্ত থাকায় আমরা কবিতার নামও 'সারারাত্তির' ভেবে নিতেই পারি। এবং নাটকে ব্যবহৃত স্তবকগুলিকে কবিতার অংশবিশেষ ধরে নিই। নাটকের ভিতর কাব্যিক সংলাপের ব্যবহারে নাট্যকারের অসীম দক্ষতার পরিচয় মেলে। আর দর্শক-পাঠক হিসেবে আমাদের চমক দেওয়ার পাশাপাশি আনন্দও এনে দিয়েছে। এখানেই নাট্যকারের সার্থকতা।

'যদি আর একবার' (১৯৬৬ খ্রি.) নাটকের প্রতিটি সংলাপেই কবিতার ছাঁচে ঢেলে নাট্যকর রচনা করেছেন। নাটকে উপস্থিত চরিত্রগুলি নিজেদের প্রয়োজনে পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা বলে নাটকের গতিকে সচল রাখতে সাহায্য করেছে। তাদের মুখে বসানো সংলাপগুলি গঠনগত দিক দিয়ে কাব্যিক রূপ নিয়েছে।

"হয় নি, হয় নি বিয়ে, করেছি আমিই!
হওয়া তো অন্যের হাতে, নিয়তির মত।

আমিই করেছি বিয়ে বেছে বেছে দেখে শুনে
প্রেমে পড়ে গেছি ধরে নিয়ে। এ আমারই ভুল।
যা তার মাশুল—এতোদিন আমিই দিয়েছি,
আরো দিতে হবে বহুদিন।"[২৩]

নাটকে দুটি অঙ্ক রয়েছে। প্রথম অঙ্কে জীবনের অতৃপ্তির হতাশা। দ্বিতীয় অঙ্কে জীবনে সবকিছু পেয়ে দম বন্ধ হয়ে আসার আশঙ্কায় পূর্বের অতৃপ্ত জীবনে ফিরে আসার জন্য হতাশা প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ মানুষ সর্বদা অশান্তির মধ্যে বাস করছে। এর সমাধান একটাই। পূর্বের অবস্থায় জোর করে টিকে থাকা। বুড়ঢা জিনের মতো বছরে একবার সমুদ্র থেকে উঠে এসে অতৃপ্ত মানুষের মনে তৃপ্তির ছোঁয়া এনে দেয়। মানুষ তার স্বর্গসুখ খুঁজে পায়। এই স্বপ্নময় পরিবেশে সত্যসিন্ধু কবিতা আবৃত্তি করে—

"……
রাতের মানুষ নালিশ তোমার স্তব্ধ হোক
রাতের সাগরে ডুবুক তোমার ব্যর্থ শোক।
ভুলের মাশুল দিও না আর
শুরু করে দেখো আর একবার
……"[২৪]

এই কবিতা আবৃত্তির পর প্রত্যেকটি চরিত্র যেন নিজেদের জীবন ফিরে পায়। সবকিছু ভুলে গিয়ে তারা নতুন জীবন শুরু করে। শুধুমাত্র একটি কবিতার মধ্য দিয়ে মানব জীবনের হতাশা, অতৃপ্তি সরে গিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারে। বলা যায়, বাদল সরকার তাঁর ডায়রীর কবিতা দিয়ে যেমন নাটককে সমৃদ্ধ করেছেন, তেমনি নিজের কবিকুশলতারও পরিচয় দিয়েছেন।

'সার্কাস' (১৯৬৯ খ্রি.) নাটকে স্বাধীনতার সময়কালে হিন্দু-মুসলিমদের দাঙ্গা লাগিয়ে অজয় এবং তার বন্ধুদের মধ্যে হতাশা তৈরি করেছে। এই পরিস্থিতিতে মানুষ কর্মহীন থাকায় তাদের সার্কাসে যোগদানের আহ্বান জানানো হয়। যারা যোগদান করবে, রাজনীতির যাঁতাকলে মাড়াই করে তাদের উপর শোষণ করা হবে। এমতাবস্থায় একজন ব্রতীন নামক যুবকের আগমন হয়। বন্ধু সরোজের মতে সে ভালো লেখালেখিও করে। ব্রতীন ভগবানের মতো তার প্রিয় মানুষকে বিশ্বাস করত। কিন্তু ঘটনাক্রমে সেই বিশ্বাস ভেঙে যায়। বিশ্বাসভঙ্গের সেই কবিতার নাম দিয়েছে 'চিরমানব'।

"জলন্ত-অঙ্গার-আত্মা ছদ্মভস্মমাখা
কুণ্ডলী ধোঁয়ায় ঢাকা রশ্মি-অঙ্গীকার
অমৃতের অধিকার নির্বিচারে দিয়েছো বিলিয়ে
কণ্ঠে বিষ নিয়ে।...."[২৫]

ব্রতীনের মধ্যে বিশ্বাসভঙ্গের কবিতা অর্থাৎ হতাশা যেমন দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি ভালোবাসার কবিতাও সমানভাবে রয়েছে।

"গলাটেপা নিঃঝুম এ ঘরে
ওপাশটা কোলাহলে আর্ত,
পাতা তো ঝরেই পড়ে, মুখ-বুজে ফুল খায় মার তো।
বসে-থাকা কড়ানীলে সাদা মেঘ কখন যে ভাসবে,
কবে তুমি আসবে?

.....
তবুও স্বপ্ন দেখি ফিরে এসে তুমি ভালোবাসবে,
কবে তুমি কবে কবে কবে তুমি আসবে?"[২৬]

শেষে ব্রতীনের ভালোবাসাই তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। যেন পুরো পৃথিবী ব্রতীনকে রিজেক্ট করেছে। ব্রতীন বলেছে—

"সমস্ত পৃথিবী হেসে উঠে বললো—
তোমাকে বুঝলাম না।
.....
তবু বুঝবে না,
তবু হেসে উঠবে
সমস্ত পৃথিবী!।....."[২৭]

এরপর ব্রতীনের মধ্যে হতাশা যে চরম আকার নিয়েছে তা আমরা পরবর্তী সংলাপে প্রমাণ পেয়েছি। সে তার ভালোবাসাকে চুলোয় যেতে বলেছে এবং কবিতাকেও সারাজীবনের জন্য ছুটি দিয়েছে। এই ঘটনা বাদল সরকারের মধ্যেও লক্ষ করা যায়। তিনিও একসময় ভালোবাসার জায়গা কবিতার প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে কবিতাকে চিরবিদায় জানিয়েছেন। প্রবেশ করেছেন নাটকে।

বাদল সরকারের কাব্যিক প্রকাশকে ফুটিয়ে তুলতে হলে 'এবং ইন্দ্রজিৎ' একাই যথেষ্ট। এই নাটকে নাট্যকার লেখক, ইন্দ্রজিৎ— চরিত্রের মধ্য দিয়ে বারবার কাব্যিকতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সেই প্রকাশে তাঁর নিজস্ব জীবনের অর্থহীনতা, একঘেয়েমি, অস্তিত্ববাদের কথা বলে দর্শককে নতুন কিছু উপহার দেওয়ার প্রয়াস করেছেন। পরবর্তী 'সারারাত্তির' নাটকে নিঃসঙ্গ, একাকীত্ব নাট্যকারকে ঘিরে ধরলে তিনি আত্মানুসন্ধান চালিয়ে মুক্তির পথ অন্বেষণ করেন। এই সময়ে কবিতার উপর ভর করে যে কাব্যিক ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন তা অভূতপূর্ব। 'যদি আর একববার' নাটকে নাট্যকারের অতৃপ্তির হতাশা এবং সবকিছু পাওয়ার পরেও হতাশা একইভাবে রয়ে যায়। শুধুমাত্র সত্যসিন্ধুর একটি কবিতায় সবকিছু ঠিক হয়ে যায়। নাট্যকারের এই কাব্যিক প্রকাশ নাটকে রিলিফ হিসেবেও কাজ করেছে। শেষে 'সার্কাস' নাটকে ব্রতীন চরিত্রের কাব্যিক প্রকাশের মাধ্যমে বিশ্বাসভঙ্গের হতাশা, প্রেম-ভালোবাসা ফুটে উঠেছে, যা আমরা বাদল সরকারের মধ্যেও লক্ষ করেছি।

পরিশেষে বলব, বাদল সরকার কবিতা লিখে খ্যাতি পাওয়ার জন্যে কবিতা রচনা করেননি। তাঁর কবিতার প্রতিটি চরণ আপন মনের মাধুরী মেশানো এলোমেলো কয়েকটি শব্দ দিয়ে তৈরি করা। এতে আছে শুধুই ভালোবাসা আর ভালোলাগা। তাঁর কবিতা নিয়ে কোনোদিন কাউকে কটাক্ষ করতে দেখিনি। কিন্তু তাঁকে আধুনিক কবিতায় ভয়ানক অবস্থার প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করতে দেখেছি 'কবিকাহিনী' নাটকে। এই উচ্চ সাহসিকতার জন্যই বাদল সরকার অনন্য।

তথ্যসূত্র:

১. মুখোপাধ্যায়, দুর্গাশঙ্কর। নাট্যতত্ত্ব-বিচার। করুণা প্রকাশনী, প্রথম করুণা সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ৮৮।
২. তদেব, পৃ. ৮৯।
৩. সরকার, বাদল। নাটক সমগ্র (১ম খণ্ড)। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, চতুর্থ মুদ্রণ, ফাল্গুন ১৪২৪, কলকাতা, পৃ. ২৬২।
৪. তদেব, পৃ. ২৭১।

৫. তদেব, পৃ ২৭৬।
৬. তদেব, পৃ. ২৮২।
৭. তদেব, পৃ. ২৮৫।
৮. তদেব, পৃ. ২৮৫।
৯. তদেব, পৃ. ২৮৫।
১০. তদেব, পৃ. ২৮৯-২৯০।
১১. তদেব, পৃ. ২৯১।
১২. তদেব, পৃ. ২৯১।
১৩. তদেব, পৃ. ২৯৫-২৯৬।
১৪. তদেব, পৃ. ২৯৬।
১৫. তদেব, পৃ. ২৯৮।
১৬. তদেব, পৃ. ৩০০।
১৭. তদেব, পৃ. ৩০৪।
১৮. তদেব, পৃ. ৩১১-৩১২।
১৯. তদেব, পৃ. ৩২২।
২০. তদেব, পৃ. ৩৩৪।
২১. তদেব, পৃ. ৩৫০।
২২. তদেব, পৃ. ৩৫৬।
২৩. সরকার, বাদল। নাটক সমগ্র (২য় খণ্ড)। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, চতুর্থ মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪২৭, কলকাতা, পৃ. ১৮৫।
২৪. তদেব, পৃ. ২০৭।
২৫. তদেব, পৃ. ৪৭৫।
২৬. তদেব, পৃ. ৪৭৭।
২৭. তদেব, পৃ. ৪৭৮।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1043- 1054
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.321

কজিটোর মৃত্যু: লাঁকানীয় মনোবিশ্লেষণ ও বিষয়-গঠনে চিহ্নকের একাধিপত্য

ড. মোঃ নাজমুল হাসান, *স্বাধীন গবেষক, শান্তিনিকেতন, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 09.03.2026; Accepted: 13.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The concept of *Cogito, ergo sum* formulated by René Descartes established one of the most influential foundations of modern Western philosophy. By grounding certainty in the thinking subject, the Cartesian Cogito introduced a model of subjectivity characterized by self-transparency, rational autonomy, and epistemic certainty. This conception of the subject subsequently shaped the intellectual framework of modern science, political liberalism, and humanism. However, twentieth-century theoretical developments, particularly within psychoanalysis and structural linguistics, began to challenge this unified and self-transparent notion of the subject.

This paper examines the theoretical displacement of the Cartesian Cogito through the psychoanalytic framework of Jacques Lacan. Building upon the discovery of the unconscious by Sigmund Freud, Lacan reformulates subjectivity through language and symbolic structures. His well-known proposition that "the unconscious is structured like a language" fundamentally destabilizes the Cartesian subject by demonstrating that thought and meaning are mediated through a pre-existing linguistic order. Within this framework, the subject is not the origin of meaning but an effect of the differential relations between signifiers. Through an analysis of Lacan's theories of the mirror stage, the symbolic order, and the primacy of the signifier, this article argues that the apparent unity of the Cartesian subject is a structural illusion. The subject emerges as divided, decentred, and constituted within the symbolic network of language and desire. Consequently, the "death of the Cogito" does not signify the disappearance of the subject but rather the transformation of subjectivity into a linguistically mediated and structurally fragmented phenomenon.

Keywords: Cogito, Subjectivity, Lacanian Psychoanalysis, Signifier, Unconscious, Mirror Stage, Symbolic Order

আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে "বিষয়" (subject) ধারণাটি কোনো স্বতঃসিদ্ধ বা চিরকালীন সত্য নয়; বরং এটি একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ও দার্শনিক নির্মাণ। এই নির্মাণের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে René Descartes–এর বিখ্যাত সূত্র *Cogito, ergo sum*— "আমি চিন্তা করি, অতএব আমি আছি।" Cogito কেবল একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত নয়; এটি আধুনিক subjectivity-র মৌলিক ভিত্তি স্থাপন করে। দেকার্তের আগে মধ্যযুগীয় দর্শনে বিষয় মূলত ঈশ্বর, বিশ্বব্যবস্থা এবং ঐতিহ্যের মধ্যে স্থাপিত ছিল। মানুষের জ্ঞান ও অস্তিত্বের নিশ্চয়তা আসত বাইরের উৎস থেকে— ঈশ্বর, প্রকৃতি বা ধর্মীয় কর্তৃত্ব থেকে। দেকার্ত এই কাঠামো উল্টে দেন। তিনি প্রথমবারের মতো জ্ঞান ও অস্তিত্বের ভিত্তিকে মানুষের নিজের চিন্তার মধ্যে স্থাপন করেন। Cogito-র মূল দাবি

হলো— সবকিছু সন্দেহযোগ্য হলেও, সন্দেহ করার ঘটনাটি নিজেই সন্দেহের বাইরে। কারণ সন্দেহ মানেই চিন্তা, আর চিন্তা মানেই একজন চিন্তাকারীর অস্তিত্ব। এইভাবে দেকার্ত এমন একটি বিষয় প্রতিষ্ঠা করেন, যে নিজেই নিজের অস্তিত্বের নিশ্চয়তা। এখানে বিষয় আর বাহ্যিক কর্তৃত্বের উপর নির্ভরশীল নয়। সে নিজেই নিজের ভিত্তি। এই আত্মভিত্তিক বিষয়ই আধুনিক দর্শনের সূচনা বিন্দু।

দেকার্তের *Meditations on First Philosophy*-এ Cogito কোনো আকস্মিক সিদ্ধান্ত নয়; এটি একটি দীর্ঘ পদ্ধতিগত সন্দেহের ফল। দেকার্ত প্রথমে ইন্দ্রিয়, বাহ্যিক জগৎ, এমনকি ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্যন্ত সন্দেহের আওতায় আনেন। কিন্তু এই সর্বব্যাপী সন্দেহের মধ্যেও একটি বিষয় অক্ষত থাকে— সন্দেহ করার ঘটনাটি নিজেই। সন্দেহ মানেই চিন্তা, আর চিন্তা মানেই চিন্তাকারীর অস্তিত্ব। এই যুক্তির কাঠামোতে Cogito একটি স্ব-প্রমাণমূলক সত্য। দেকার্তের মতে, আমি ভুল করতে পারি, বিভ্রান্ত হতে পারি, কিন্তু আমি যে চিন্তা করছি— এই সত্য অস্বীকার করা অসম্ভব। এখানে বিষয় নিজেকে সরাসরি অভিজ্ঞতা করে; এই অভিজ্ঞতার জন্য কোনো বাহ্যিক মধ্যস্থতার প্রয়োজন পড়ে না। এই অবস্থান থেকেই দেকার্ত subjectivity-কে ভাষা, ইতিহাস এবং সমাজের বাইরে স্থাপন করেন। Cogito কোনো সামাজিক নির্মাণ নয়, কোনো ভাষাগত উৎপাদ নয়। এটি চিন্তার একটি বিশুদ্ধ ঘটনা, যা নিজেই নিজের নিশ্চয়তা বহন করে। এই কারণেই Cogito আধুনিক দর্শনে একটি বিশেষ মর্যাদা পায়— এটি যেন সমস্ত আপেক্ষিকতার ঊর্ধ্বে অবস্থিত। কিন্তু এখানেই দেকার্তীয় দর্শনের একটি মৌলিক অনুমান নিহিত থাকে: বিষয় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে জানে। চিন্তা এখানে নিজেই নিজের কাছে স্বচ্ছ। এই আত্মস্বচ্ছতাকে দেকার্ত প্রশ্ন করেন না; বরং এটিকেই দর্শনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন। ফলত Cogito একটি নিরপেক্ষ আবিষ্কার নয়, বরং একটি গভীর মেটাফিজিক্যাল সিদ্ধান্ত— subjectivity মানে স্বচ্ছতা।

Cogito যে বিষয়ের ধারণা তৈরি করে, তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো আত্মস্বচ্ছতা। দেকার্তের মতে, যখন আমি চিন্তা করি, তখন আমি আমার চিন্তাকে সরাসরি জানি। চিন্তা এবং চিন্তার জ্ঞান এখানে আলাদা নয়। বিষয় নিজের কাছে সম্পূর্ণভাবে উপস্থিত। এই আত্মস্বচ্ছতা আধুনিক বিষয়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এখান থেকেই যুক্তি, বিজ্ঞান এবং নৈতিকতার ধারণা তৈরি হয়। যদি বিষয় নিজেকে জানতেই না পারে, তাহলে সে কীভাবে সত্য জানবে, সিদ্ধান্ত নেবে বা নৈতিকভাবে দায়ী হবে? ফলে Cogito এমন এক subject নির্মাণ করে, যে—

- নিজের চিন্তার সম্পূর্ণ অধিকারী
- নিজের কাছে নিজেই উপস্থিত
- নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত

এই ধারণা আধুনিক বিজ্ঞানের নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক, আধুনিক আইনের দায়বদ্ধ নাগরিক এবং আধুনিক নৈতিক ব্যক্তির ধারণার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। *Cogito, ergo sum*—"আমি চিন্তা করি, অতএব আমি আছি"— এই সূত্রটি কেবল একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত নয়; এটি এমন এক বিষয়ের (subject) ধারণা নির্মাণ করে, যে বিষয় নিজেই নিজের অস্তিত্বের ভিত্তি ও প্রমাণ। René Descartes-এর দর্শনে Cogito একটি মৌলিক আর্কিমিডীয় বিন্দু, যার উপর দাঁড়িয়ে পরবর্তী সমস্ত জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং সত্যের দাবি নির্মিত হয়। Cogito-র মাধ্যমে যে বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়, তার তিনটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, এই বিষয় আত্মস্বচ্ছ (transparent); সে নিজেকে জানে এবং এই জানার মধ্যে কোনো অন্ধকার অঞ্চল নেই। দ্বিতীয়ত, বিষয়টি ঐক্যবদ্ধ; চিন্তা ও অস্তিত্বের মধ্যে কোনো মৌলিক বিভাজন নেই।

Cogito-র আরেকটি মৌলিক দিক হলো বিষয়ের ঐক্য। দেকার্তের subject বিভক্ত নয়। চিন্তা, চেতনা এবং আত্মপরিচয়ের মধ্যে কোনো মৌলিক ফাঁক নেই। বিষয় একক, অবিভাজ্য এবং ধারাবাহিক। এই ঐক্য থেকেই আসে বিষয়ের সার্বভৌমত্ব। আধুনিক subject নিজেকে সিদ্ধান্তের উৎস হিসেবে কল্পনা করে। সে ভাবে— আমি চিন্তা করি, আমি সিদ্ধান্ত নিই, আমি কাজ করি। এখানে বিষয় ইতিহাস, ভাষা বা সমাজের দ্বারা গঠিত নয়; বরং সে নিজেই তার কর্মের কেন্দ্র। এই সার্বভৌম subject-এর ধারণা আধুনিক উদারনীতিক রাজনীতি, ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং অধিকার ধারণার ভিত্তি হয়ে ওঠে। Cogito কেবল একটি দার্শনিক যুক্তি নয়; এটি একটি মেটাফিজিক্যাল সিদ্ধান্ত। এটি ধরে নেয় যে—

- চিন্তা ভাষার আগের
- বিষয় চিন্তার উৎস
- আত্মপরিচয় একটি অভ্যন্তরীণ সত্য

এই অনুমানগুলোর উপর দাঁড়িয়ে আধুনিক দর্শন সত্য, জ্ঞান এবং বাস্তবতার তত্ত্ব নির্মাণ করে। ফলে Cogito ভেঙে পড়া মানে কেবল একটি তত্ত্বের পতন নয়; বরং আধুনিক subjectivity-র ভিত্তিতেই ফাটল সৃষ্টি হওয়া। এই কারণেই পরবর্তী দার্শনিক ধারাগুলো— মনোবিশ্লেষণ, কাঠামোবাদ, উত্তর-কাঠামোবাদ— Cogito-কে আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দুতে রাখে।

Cogito-র সবচেয়ে বড় দুর্বলতা বাহ্যিক আক্রমণে নয়, বরং তার নিজের কাঠামোর মধ্যেই নিহিত। প্রথমত, Cogito নিজেকে প্রমাণ করে নিজের মাধ্যমেই। "আমি চিন্তা করছি"— এই দাবির সত্যতা যাচাই করার জন্য Cogito আর কোনো মানদণ্ড হাজির করে না। এটি একটি বৃত্তাকার যুক্তি (circular reasoning), যেখানে প্রমাণ ও প্রমাণিত বিষয় একই। দ্বিতীয়ত, Cogito ধরে নেয় যে চিন্তা সম্পর্কে জানাটা নিজেই চিন্তার অংশ। কিন্তু এই জানাটা কীভাবে সম্ভব? আমি কীভাবে নিশ্চিত হব যে আমি যা জানছি, সেটাই আমার চিন্তার সম্পূর্ণ ক্ষেত্র? দেকার্ত এই প্রশ্নের উত্তর দেন না, কারণ তার কাছে এই প্রশ্ন ওঠারই কথা নয়। আত্মস্বচ্ছতা এখানে একটি পূর্বধারণা। এই পূর্বধারণার ফলে Cogito একটি আদর্শায়িত subject নির্মাণ করে— এমন এক বিষয়, যার কোনো অচেতন নেই, কোনো বিভাজন নেই, কোনো ভাষাগত সীমাবদ্ধতা নেই। বাস্তব মানব অভিজ্ঞতার সঙ্গে এই মডেলের সম্পর্ক ক্রমশ সমস্যাজনক হয়ে ওঠে।

এইখানেই পরবর্তী মনোবিশ্লেষণী হস্তক্ষেপের প্রয়োজন দেখা দেয়। Cogito যে subjectivity-র একটি নির্দিষ্ট মডেল চাপিয়ে দেয়, তা আর নিরপেক্ষ বা অবিকল্পনীয় থাকে না। Cogito হয়ে ওঠে একটি তাত্ত্বিক নির্মাণ, যা ঐতিহাসিক ও ধারণাগতভাবে প্রশ্নযোগ্য। এই অভ্যন্তরীণ ফাঁকগুলিই Cogito-কে পরবর্তী র‍্যাডিকাল সমালোচনার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়—বিশেষত ফ্রয়েড এবং লাঁকা-র হাতে।

তৃতীয়ত, এই বিষয় সার্বভৌম; তার চিন্তার উৎস সে নিজেই, এবং সেই চিন্তার উপর তার পূর্ণ অধিকার বর্তমান। এই Cogito-ভিত্তিক subjectivity আধুনিক দর্শনের সীমানা অতিক্রম করে আধুনিক বিজ্ঞান, রাজনৈতিক তত্ত্ব এবং মানবতাবাদী চিন্তায় প্রবেশ করে। যুক্তিবাদী নাগরিক, স্বাধীন নৈতিক এজেন্ট এবং আত্মনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি—এই ধারণাগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে Cogito-র উত্তরাধিকার বহন করে। ফলে Cogito-কে প্রশ্ন করা মানে কেবল দেকার্তকে প্রশ্ন করা নয়; বরং আধুনিক subjectivity-র ভিত্তিকেই প্রশ্নের মুখে ফেলা। বিশ শতকে মনোবিশ্লেষণ, ভাষাতত্ত্ব এবং কাঠামোবাদের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এই ভিত্তি আর অবিচল থাকে না। বিশেষত Jacques Lacan-এর তাত্ত্বিক প্রকল্প Cogito-কে কেবল সংশোধন করে না, বরং তাকে কাঠামোগতভাবে অকার্যকর প্রমাণ করে। এই প্রবন্ধের মূল যুক্তি হলো— লাঁকানীয় মনোবিশ্লেষণে

Cogito-র 'মৃত্যু' কোনো রূপক নয়; এটি একটি তাত্ত্বিক অনিবার্যতা, যা চিহ্নকের (signifier) আধিপত্যের মধ্য দিয়েই ঘটে।

দেকার্তীয় Cogito-র উপর প্রথম প্রকৃত তাত্ত্বিক আঘাত আসে মনোবিশ্লেষণের হাত ধরে। এই আঘাতের কেন্দ্রীয় নাম Sigmund Freud। ফ্রয়েডের কাজ আধুনিক subjectivity-র ধারণাকে আমূল নড়িয়ে দেয়, কারণ তিনি দেখান যে মানুষের মানসিক জীবন সম্পূর্ণভাবে সচেতন নয়। বরং সচেতন চিন্তার নিচে সক্রিয় থাকে একটি বিস্তৃত অচেতন ক্ষেত্র, যা ব্যক্তির ইচ্ছা, সিদ্ধান্ত এবং আচরণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ফ্রয়েডীয় অচেতন Cogito-কে সরাসরি অস্বীকার করে না; বরং তার সবচেয়ে মৌলিক অনুমানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। Cogito ধরে নেয় যে, চিন্তা মূলত সচেতন এবং বিষয় (Subject) নিজের চিন্তার বিষয়ে অবগত। কিন্তু Sigmund Freud দেখান যে, মানুষের মানসিক জীবনের একটি বড় অংশ এমন স্তরে কাজ করে, যা সচেতনতার বাইরে অবস্থিত। এখানে চিন্তা ঘটে, সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, ইচ্ছা গঠিত হয়— কিন্তু 'আমি' তা জানে না। এই আবিষ্কার Cogito-র আত্মস্বচ্ছতার ভিত্তিকে ভেঙে দেয়। যদি চিন্তা এমনভাবে ঘটে, যা বিষয়ের অজানা, তাহলে "আমি চিন্তা করি" বাক্যটি আর সর্বজনীন নিশ্চয়তা দিতে পারে না। চিন্তা আর বিষয়ের সম্পূর্ণ অধিকারে থাকে না।

ফ্রয়েডের বিশ্লেষণে স্বপ্ন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্বপ্ন এমন এক মানসিক উৎপাদন, যা গভীরভাবে অর্থপূর্ণ, কিন্তু সেই অর্থ স্বপ্নদ্রষ্টার কাছে সরাসরি উপস্থিত নয়। একইভাবে ফসকে যাওয়া কথা, ভুল কাজ, পুনরাবৃত্ত আচরণ— এসব প্রমাণ করে যে, বিষয় (Subject) প্রায়শই এমন কিছু বলে বা করে, যার প্রকৃত অর্থ সে নিজেই পুরোপুরি বোঝে না। এখানে Cogito-র ঐক্যবদ্ধ subject ভেঙে পড়ে। এই ভাঙন কেবল জ্ঞানতাত্ত্বিক নয়, ontological। বিষয় আর নিজের মানসিক জীবনের পূর্ণ কেন্দ্র নয়। তার ভিতরেই একটি "অপর" কাজ করে— অচেতন। ফলে, subjectivity আর একক নয়; এটি বিভক্ত। সচেতন 'আমি' এবং অচেতন মানসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে একটি অমোচনীয় ফাঁক তৈরি হয়। তবে এই বিন্দুতে ফ্রয়েড Cogito-কে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করেন না। বরং তিনি মনে করেন, মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে অচেতন বিষয়বস্তুকে ধীরে ধীরে সচেতন করা সম্ভব। অর্থাৎ, subject আহত হলেও পুরোপুরি বিলুপ্ত হয় না। বিশ্লেষণের শেষে একটি অধিকতর সচেতন, অধিকতর আত্মজ্ঞানসম্পন্ন বিষয় পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা ফ্রয়েড রেখে যান।

এই কারণেই ফ্রয়েডীয় অচেতনকে Cogito-র প্রথম সংকট বলা যায়, চূড়ান্ত মৃত্যু নয়। Cogito-র সার্বভৌমত্ব এখানে প্রশ্নের মুখে পড়ে, কিন্তু তার অস্তিত্ব পুরোপুরি বাতিল হয় না। বিষয় (Subject) আর সম্পূর্ণ স্বচ্ছ নয়, তবুও সে এখনো বিশ্লেষণের কেন্দ্র। দার্শনিক দিক থেকে এই সংকটের তাৎপর্য গভীর। ফ্রয়েড দেখান যে, আধুনিক subjectivity কোনো স্বতঃসিদ্ধ সত্য নয়; এটি একটি সমস্যাজনক নির্মাণ। বিষয় নিজের ইচ্ছা জানে না, নিজের কথার অর্থ পুরো বোঝে না, এবং নিজের সিদ্ধান্তের উৎস সম্পর্কে বিভ্রান্ত থাকে। এই উপলব্ধি Cogito-কে একটি ঐতিহাসিকভাবে সীমাবদ্ধ ধারণা হিসেবে উন্মোচিত করে। এইখানেই ফ্রয়েড আধুনিক দর্শনের গতিপথ পরিবর্তন করেন। তিনি দেখান যে, আত্মজ্ঞান আর কোনো স্বচ্ছ আয়নার মতো কাজ করে না। বিষয় নিজের কাছে নিজেই আংশিকভাবে অচেনা। এই অচেনা অংশই পরবর্তীতে লাঁকানীয় তত্ত্বে আরও র‍্যাডিকাল রূপ পায়, যেখানে Cogito-র জন্য রাখা শেষ আশাটুকুও বিলুপ্ত হয়ে যায়।

ফ্রয়েডের অচেতনের ধারণা Cogito-র আত্মস্বচ্ছতার দাবি সরাসরি প্রশ্নবিদ্ধ করে। যদি চিন্তার একটি বড় অংশ এমন স্তরে ঘটে, যা বিষয় নিজেই জানে না, তাহলে "আমি চিন্তা করি" এই বাক্যটি আর পূর্ণ অর্থ বহন করতে পারে না। এখানে 'আমি' আর চিন্তার সম্পূর্ণ মালিক নয়। স্বপ্ন, ভুলভ্রান্তি (parapraxis), ফসকে

যাওয়া কথা— এসব ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষণে প্রমাণ করে যে, বিষয় প্রায়শই এমন কিছু বলে বা করে, যার অর্থ সে নিজেই সম্পূর্ণ বোঝে না। ফ্রয়েড যদিও Cogito-র আত্মস্বচ্ছতাকে ভেঙে দেন, তবু তিনি এখনো এমন একটি ধারণা ধরে রাখেন যে, বিশ্লেষণের মাধ্যমে অচেতনের সত্যকে ধীরে ধীরে উন্মোচন করা সম্ভব। অর্থাৎ, বিষয় আহত হলেও পুরোপুরি বিলুপ্ত হয় না। বিশ্লেষণের শেষে যেন একটি অধিকতর সচেতন, অধিকতর সত্যবাদী বিষয় পুনরুদ্ধার করা যায়—এই প্রত্যাশা ফ্রয়েডের তত্ত্বে রয়ে যায়। এই কারণেই বলা যায়, ফ্রয়েড Cogito-কে দুর্বল করেন, কিন্তু হত্যা করেন না। Cogito-র ভিতরে একটি গভীর ফাটল তৈরি হয়, কিন্তু সেটি এখনো চূড়ান্ত ভাঙনে পরিণত হয়নি। এই ফাটলকে র‍্যাডিকাল বিচ্ছেদে রূপ দেন লাঁকা।

Jacques Lacan–এর প্রকল্পের মৌলিকত্ব এখানেই যে তিনি ফ্রয়েডীয় অচেতনকে ভাষাতাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে পুনর্বিন্যাস করেন। লাঁকা-র বিখ্যাত ঘোষণা— *the unconscious is structured like a language*—কেবল একটি রূপক নয়; এটি একটি মৌলিক তাত্ত্বিক অবস্থান। এই ঘোষণার মাধ্যমে লাঁকা অচেতনকে মনস্তাত্ত্বিক গভীরতা বা জৈবিক প্রবৃত্তির স্তর হিসেবে ভাবতে অস্বীকার করেন। তাঁর কাছে অচেতন এমন একটি ক্ষেত্র, যা চিহ্নক, বাক্যবিন্যাস, রূপক (metaphor) এবং স্থানান্তর (metonymy) দ্বারা সংগঠিত। স্বপ্নের কাজ, লক্ষণের গঠন, এমনকি উপসর্গের পুনরাবৃত্তি—সবই ভাষার নিয়ম মেনে চলে। এই ভাষাতাত্ত্বিক মোড় দেকার্তীয় Cogito-র জন্য বিধ্বংসী। কারণ Cogito ধরে নেয় যে, চিন্তা ভাষার আগের একটি বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতা। লাঁকা দেখান, চিন্তা ভাষার বাইরে ঘটে না। ভাষা কোনো বাহ্যিক মাধ্যম নয়, যা চিন্তার পরে আসে; বরং ভাষাই চিন্তার শর্ত। এইখানে subjectivity-র স্থানচ্যুতি ঘটে। বিষয় আর চিন্তার উৎস নয়; বরং সে ভাষার ভিতরে একটি অবস্থান মাত্র। বিষয় চিন্তা করে না, ভাষা ব্যবহার করে; বরং ভাষার মাধ্যমেই বিষয় হিসেবে উৎপাদিত হয়।

Sigmund Freud অচেতনকে আবিষ্কার করেছিলেন এমন একটি ক্ষেত্র হিসেবে, যেখানে দমন করা ইচ্ছা, স্মৃতি ও কামনা সক্রিয় থাকে। স্বপ্ন, ভুলভ্রান্তি ও নিউরোটিক লক্ষণের বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি দেখান যে, মানুষের মানসিক জীবন সম্পূর্ণভাবে সচেতন নয়। কিন্তু ফ্রয়েডের তত্ত্বে অচেতন এখনো অনেকাংশে একটি মনস্তাত্ত্বিক গভীরতা— একটি অভ্যন্তরীণ ভাণ্ডার— যেখান থেকে অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব। লাঁকা এই অবস্থানকে সীমাবদ্ধ মনে করেন। তাঁর মতে, অচেতনকে কেবল গভীর মানসিক স্তর হিসেবে ভাবলে আমরা একটি মৌলিক প্রশ্ন এড়িয়ে যাই: অচেতন কীভাবে অর্থ উৎপাদন করে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই লাঁকা ভাষাতত্ত্বের দিকে অগ্রসর হন এবং মনোবিশ্লেষণকে কাঠামোবাদের সঙ্গে যুক্ত করেন।

লাঁকা-র মতে 'ভাষা' বলতে দৈনন্দিন কথাবার্তার ভাষা বোঝানো হয় না। বরং এটি চিহ্নকের (signifier) একটি ব্যবস্থা, যেখানে অর্থ কোনো স্থির সারবস্তু নয়, বরং পার্থক্য ও সম্পর্কের মধ্য দিয়ে উৎপন্ন হয়। এই ধারণার উৎস Ferdinand de Saussure–এর ভাষাতত্ত্ব, যেখানে চিহ্নক (signifier) ও চিহ্নিতের (signified) সম্পর্ক স্বেচ্ছাচারী এবং অর্থ সর্বদা পার্থক্যের মাধ্যমে গঠিত। লাঁকা এই কাঠামোকে অচেতনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। তাঁর মতে, অচেতন কোনো বিশৃঙ্খল আবেগের ক্ষেত্র নয়; এটি একটি সুসংগঠিত signifying structure। স্বপ্ন, লক্ষণ বা ফসকে যাওয়া কথা ভাষার মতোই কাজ করে— একটি চিহ্নক অন্য চিহ্নকের দিকে ইঙ্গিত করে, কিন্তু কখনোই চূড়ান্ত অর্থে পৌঁছায় না।

লাঁকা ফ্রয়েডীয় স্বপ্ন-কার্যের দুটি প্রধান প্রক্রিয়া— condensation ও displacement—কে ভাষার দুটি মৌলিক অলঙ্কারিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে তুলনা করেন। condensation কাজ করে রূপকের (metaphor) মতো, যেখানে একাধিক অর্থ একটি চিহ্নকের মধ্যে সংকুচিত হয়। displacement কাজ করে স্থানান্তরের (metonymy) মতো, যেখানে অর্থ একটি চিহ্নক থেকে অন্য চিহ্নকে সরে যায়। এই তুলনা দেখায় যে অচেতন

কোনো পূর্ব-ভাষিক ক্ষেত্র নয়। বরং এটি ভাষার নিয়মেই সংগঠিত। অচেতন চিন্তা করে, কিন্তু সেই চিন্তা সচেতন 'আমি'-এর নিয়ন্ত্রণে থাকে না। এখানে অর্থ উৎপাদন একটি কাঠামোগত প্রক্রিয়া, বিষয়ের ইচ্ছার ফল নয়।

এই বিন্দুতেই লাঁকা-র তত্ত্ব দেকার্তীয় Cogito-র উপর চূড়ান্ত আঘাত হানে। Cogito ধরে নেয় যে, চিন্তা একটি সচেতন ও আত্ম উপস্থিত অভিজ্ঞতা— "আমি চিন্তা করি" মানেই আমি জানি যে আমি চিন্তা করছি। কিন্তু লাঁকা দেখান যে, চিন্তা ঘটে চিহ্নকের শৃঙ্খলে, যা বিষয়ের পূর্ববর্তী এবং বহিরাগত। বিষয় ভাষার মালিক নয়; বরং ভাষার মধ্যেই সে একটি অবস্থান গ্রহণ করে। এমনকি 'আমি' নিজেই একটি চিহ্নক, যার অর্থ প্রসঙ্গভেদে পরিবর্তিত হয়। ফলে "আমি চিন্তা করি" কোনো মৌলিক সত্য নয়; এটি ভাষার একটি নির্দিষ্ট বিন্যাসমাত্র। এই কারণে লাঁকা বলেন, বিষয় চিন্তা করে সেখানে, যেখানে সে নিজেকে উপস্থিত মনে করে না। চিন্তা ঘটে অচেতনে, ভাষার কাঠামোয়। আর যেখানে বিষয় নিজেকে উপস্থিত মনে করে— সেই স্থানে চিন্তা অনুপস্থিত।

"অচেতন ভাষার মতো গঠিত"— এই ধারণা আধুনিক subjectivity-র ধারণাকে আমূল রূপান্তরিত করে। বিষয় আর নিজের চিন্তার সার্বভৌম উৎস নয়; বরং ভাষার দ্বারা বিভক্ত একটি সত্তা। আত্মপরিচয় কোনো অভ্যন্তরীণ সার নয়, বরং চিহ্নকের মধ্যে একটি অস্থির অবস্থান। এই তত্ত্ব Cogito-কে একটি ঐতিহাসিকভাবে সীমাবদ্ধ নির্মাণ হিসেবে উন্মোচিত করে। দেকার্তীয় subject যে আত্মস্বচ্ছ ও ঐক্যবদ্ধ সত্তা হিসেবে কল্পিত হয়েছিল, লাঁকা দেখান যে বাস্তবে বিষয় সর্বদা বিভক্ত, অস্বচ্ছ এবং ভাষার দ্বারা শাসিত।

ভাষা, অর্থ এবং বিষয়ের সম্পর্ক নিয়ে আধুনিক দর্শনে দীর্ঘকাল ধরে একটি মৌলিক অনুমান কাজ করেছে: মানুষ প্রথমে চিন্তার মাধ্যমে অর্থ গঠন করে এবং ভাষা সেই অর্থ প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এই ধারণার পেছনে যে দার্শনিক কাঠামোটি সক্রিয়, তার কেন্দ্রে রয়েছে René Descartes–এর Cogito, যেখানে সচেতন চিন্তা এবং আত্মপরিচয় একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে ভাষাতত্ত্ব এবং মনোবিশ্লেষণের বিকাশ এই সম্পর্ককে নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করে। বিশেষত Jacques Lacan ভাষা ও অচেতনকে নতুনভাবে বিশ্লেষণ করে দেখান যে অর্থ কোনো সচেতন বিষয়ের দ্বারা সরাসরি নিয়ন্ত্রিত নয়। বরং ভাষার ভেতরে চিহ্নকের (signifier) কাঠামোগত সম্পর্ক অর্থ উৎপাদনের প্রধান শর্ত।

ভাষার কাঠামো বোঝার জন্য প্রথমে চিহ্নের দ্বৈত গঠন সম্পর্কে ধারণা প্রয়োজন। এই প্রবন্ধাংশে, ভাষার এই কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য কীভাবে আধুনিক subjectivity-র ধারণাকে পুনর্বিবেচনার দিকে নিয়ে যায় তা দেখবো। ভাষাবিদ Ferdinand de Saussure ভাষার মৌলিক একক হিসেবে 'চিহ্ন' (sign)–কে ব্যাখ্যা করেন দুটি উপাদানের সমন্বয়ে: চিহ্নক (signifier) এবং চিহ্নিত (signified)। চিহ্নক হলো শব্দের ধ্বনি বা লিখিত রূপ, আর চিহ্নিত হলো সেই শব্দের ধারণাগত অর্থ। উদাহরণস্বরূপ, 'গাছ' শব্দটির ধ্বনি বা লিখিত রূপ হলো চিহ্নক (signifier), আর আমাদের মনে যে গাছের ধারণাটি তৈরি হয় সেটি হলো চিহ্নিত (Signified)। তবে সসুর দেখান যে চিহ্নক ও চিহ্নিতের সম্পর্ক স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক নয়। 'গাছ' শব্দটির সঙ্গে বাস্তব গাছের কোনো স্বাভাবিক সম্পর্ক নেই; এটি একটি সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত সম্পর্ক। ভাষার ভেতরে অর্থ তৈরি হয় মূলত পার্থক্যের মাধ্যমে। একটি শব্দের অর্থ নির্ধারিত হয় অন্য শব্দের থেকে তার ভিন্নতার দ্বারা।

লাঁকা সসুরীয় ভাষাতত্ত্বকে মনোবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে একটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক রূপান্তর ঘটান। তাঁর মতে ভাষার মধ্যে চিহ্নিত কখনোই স্থির বা চূড়ান্ত নয়; বরং এটি সর্বদা চিহ্নকের অধীন। এই অবস্থানকে বোঝাতে লাঁকা বলেন যে, অর্থ সবসময় চিহ্নকের শৃঙ্খলের (signifying chain) মধ্যে গঠিত হয়। একটি

চিহ্নক অন্য একটি চিহ্নকের দিকে নির্দেশ করে, যা আবার অন্য চিহ্নকের সঙ্গে সম্পর্কিত। ফলে অর্থ একটি চলমান প্রক্রিয়া, কোনো স্থির সত্তা নয়। এখানে চিহ্নকের প্রাধান্য বলতে বোঝায় যে, ভাষার ভেতরে অর্থের চেয়ে চিহ্নকের কাঠামোগত সম্পর্কই বেশি মৌলিক। অর্থ কোনো পূর্বস্থিত ধারণা নয়; এটি ভাষার কাঠামোর মধ্যেই উৎপন্ন হয়। যেহেতু অর্থ চিহ্নকের সম্পর্কের উপর নির্ভর করে, তাই এটি স্থায়ী বা অপরিবর্তনীয় হতে পারে না। ভাষার প্রসঙ্গ পরিবর্তিত হলে অর্থও পরিবর্তিত হয়।

উদাহরণ হিসেবে 'স্বাধীনতা' শব্দটি বিবেচনা করা যেতে পারে। রাজনৈতিক আলোচনায় 'স্বাধীনতা' একটি রাষ্ট্রিক ধারণা নির্দেশ করতে পারে; আবার ব্যক্তিগত জীবনের আলোচনায় এটি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বোঝাতে পারে। একই চিহ্নক ভিন্ন প্রসঙ্গে ভিন্ন অর্থ ধারণ করে। এই উদাহরণ দেখায় যে, অর্থ কোনো নির্দিষ্ট স্থানে স্থির হয়ে থাকে না; বরং ভাষার ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে তা পরিবর্তিত হয়। লাঁকানীয় তত্ত্বে এই অবস্থাকেই অর্থের অস্থিরতা বলা হয়। অর্থের অস্থিরতা বোঝার জন্য একটি সাধারণ দৈনন্দিন উদাহরণ বিবেচনা করা যেতে পারে। ধরুন, কেউ বলে— "আমি ঠিক আছি।" এই বাক্যের আক্ষরিক অর্থ ইতিবাচক হলেও বাস্তব পরিস্থিতিতে এটি বিভিন্ন অর্থ ধারণ করতে পারে। কখনো এটি সত্যিকারের সন্তুষ্টি প্রকাশ করতে পারে, আবার কখনো এটি হতাশা বা অসন্তোষ লুকানোর একটি উপায় হতে পারে। এখানে দেখা যায় যে, একই চিহ্নক ভিন্ন সামাজিক বা মানসিক প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ তৈরি করতে পারে। অর্থাৎ ভাষার অর্থ নির্ভর করে চিহ্নকের অবস্থান ও সম্পর্কের উপর, কেবল শব্দের উপর নয়।

লাঁকা-র মতে মানুষের অচেতনও ভাষার মতো গঠিত। এই ধারণার ভিত্তি আসে Sigmund Freud-এর মনোবিশ্লেষণ থেকে, যেখানে স্বপ্ন, ভুল কথা বা অদ্ভুত আচরণের মাধ্যমে অচেতনের উপস্থিতি প্রকাশ পায়। লাঁকা যুক্তি দেন যে, এই অচেতন প্রকাশগুলোও ভাষার মতো একটি চিহ্নক কাঠামোর মধ্যে কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো ব্যক্তি ভুল করে এমন একটি শব্দ ব্যবহার করতে পারে, যা তার অচেতন ইচ্ছাকে প্রকাশ করে। এখানে অর্থ সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রিত নয়; বরং চিহ্নকের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে উৎপন্ন হয়।

চিহ্নকের প্রাধান্য এবং অর্থের অস্থিরতার ধারণা subjectivity-র উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। যদি অর্থ ভাষার কাঠামোর মধ্যে তৈরি হয়, তাহলে বিষয় নিজেও ভাষার বাইরে দাঁড়িয়ে অর্থকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। মানুষ নিজের পরিচয় নির্ধারণ করে ভাষার মাধ্যমে— যেমন "আমি ছাত্র", "আমি শিক্ষক", "আমি লেখক"। কিন্তু এই পরিচয়গুলোও ভাষার চিহ্নকের উপর নির্ভরশীল এবং প্রসঙ্গের সঙ্গে পরিবর্তিত হতে পারে। ফলে বিষয় একটি স্থির ও সম্পূর্ণ স্বচ্ছ সত্তা নয়; বরং ভাষার কাঠামোর মধ্যে গঠিত একটি অবস্থান।

লাঁকানীয় তত্ত্বে "চিহ্নকের একাধিপত্য" ধারণাটি বোঝায় যে, ভাষার কাঠামোর মধ্যে চিহ্নক এমন এক প্রাধান্য অর্জন করে, যার ফলে অর্থ এবং subjectivity উভয়ই চিহ্নকের দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই ধারণাটি মূলত Jacques Lacan-এর ভাষাতাত্ত্বিক পুনর্ব্যাখ্যার ফল, যেখানে ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়; বরং মানব মানসিক গঠন ও সামাজিক সম্পর্কের মৌলিক কাঠামো। লাঁকা-র মতে মানুষ ভাষা ব্যবহার করে না; বরং ভাষার কাঠামোর মধ্যেই মানুষ একটি অবস্থান গ্রহণ করে। অর্থাৎ ভাষা মানুষের একটি বাহ্যিক যন্ত্র নয়, বরং মানব subjectivity-এর গঠনমূলক শর্ত।

এই প্রেক্ষাপটে "চিহ্নকের একাধিপত্য" বলতে বোঝানো হয় যে, অর্থ বা ইচ্ছা কোনো স্বচ্ছ অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে আসে না; বরং চিহ্নকের শৃঙ্খলের মধ্য দিয়ে উৎপন্ন হয়। উদাহরণ হিসেবে সামাজিক পরিচয়ের প্রশ্নটি বিবেচনা করা যেতে পারে। একজন ব্যক্তি নিজেকে 'শিক্ষক', 'ছাত্র' বা 'নাগরিক' হিসেবে পরিচিত করে। এই পরিচয়গুলো বাস্তব কোনো সারবস্তু নয়; এগুলো ভাষাগত চিহ্নকের মাধ্যমে গঠিত সামাজিক অবস্থান।

একজন ব্যক্তি যখন নিজেকে 'শিক্ষক' বলে চিহ্নিত করেন, তখন তিনি একটি নির্দিষ্ট সামাজিক কাঠামোর মধ্যে নিজেকে স্থাপন করেন। এখানে লক্ষ্য করা যায়, যে চিহ্নকটি ব্যক্তির পরিচয় নির্ধারণ করছে, ব্যক্তি চিহ্নকের বাইরে দাঁড়িয়ে নিজের পরিচয় তৈরি করছে না; বরং চিহ্নকের কাঠামোর মধ্যেই তার পরিচয় অর্থবহ হয়ে উঠছে। লাঁকা এই অবস্থাকে "dictatorship of the signifier" বলে ব্যাখ্যা করেন। এখানে 'dictatorship' শব্দটি রাজনৈতিক অর্থে ব্যবহার করা হয়নি; বরং কাঠামোগত প্রাধান্য বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ ভাষার চিহ্নক এমনভাবে কাজ করে যে, ব্যক্তি তার বাইরে গিয়ে অর্থ বা পরিচয় নির্ধারণ করতে পারে না। এই ধারণাটি মনোবিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ। কোনো ব্যক্তি যখন বিশ্লেষণের সময় নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন, তখন তিনি নিজের জীবনের সত্যকে সরাসরি প্রকাশ করেন না; বরং চিহ্নকের মাধ্যমে একটি বর্ণনামূলক কাঠামো তৈরি করেন। বিশ্লেষকের কাজ হলো সেই চিহ্নকের সম্পর্কগুলো অনুসরণ করা এবং সেখানে লুকানো অচেতন ইচ্ছার ইঙ্গিত খুঁজে বের করা।

আধুনিক দর্শনে বিষয়কে (subject) সাধারণত একটি ঐক্যবদ্ধ এবং স্বচ্ছ সত্তা হিসেবে ভাবা হয়। বিশেষত, René Descartes-এর Cogito ধারণায় বিষয় নিজের চিন্তার মাধ্যমে নিজের অস্তিত্বকে নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু লাঁকানীয় তত্ত্বে বিষয়কে এমনভাবে ভাবা হয় না। লাঁকা-র মতে subject একটি বিভক্ত সত্তা (split subject)। এই বিভাজন তৈরি হয় ভাষা ও অচেতনের কাঠামোর কারণে। এই ধারণার মূল উৎস রয়েছে Sigmund Freud-এর মনোবিশ্লেষণে। ফ্রয়েড দেখিয়েছিলেন যে, মানুষের আচরণ ও চিন্তার অনেক অংশ অচেতন দ্বারা পরিচালিত হয়। লাঁকা এই ধারণাকে ভাষাতাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে পুনর্বিন্যাস করেন। লাঁকা-র মতে subject দুই স্তরে কাজ করে: সচেতন ও অচেতন স্তর। এই দুই স্তরের মধ্যে সম্পূর্ণ মিল নেই। মানুষ যা বলে এবং যা সত্যিকারভাবে চায়, তার মধ্যে প্রায়ই পার্থক্য দেখা যায়। একটি সাধারণ উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ধরুন কোনো ছাত্র বলে, "আমি পরীক্ষার জন্য খুবই প্রস্তুত।" কিন্তু বাস্তবে সে পরীক্ষার সময় ভয় এবং অনিশ্চয়তায় ভুগছে। তার কথার স্তর এবং মানসিক বাস্তবতার স্তর এক নয়। এখানে দেখা যায় যে, subject নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে একীভূত নয়। ভাষার মধ্যে যে "আমি" কথা বলছে, সেটি subject-এর একটি আংশিক রূপ মাত্র। লাঁকা এই অবস্থাকে ব্যাখ্যা করে বলেন যে, subject ভাষার মধ্যে একটি চিহ্নক হিসেবে উপস্থিত হয়। কিন্তু সেই চিহ্নক subject-এর সম্পূর্ণ বাস্তবতাকে ধারণ করতে পারে না। ফলে subject সর্বদা নিজের সঙ্গে একটি দূরত্ব বজায় রাখে। এই কারণেই লাঁকানীয় subject সবসময় অসম্পূর্ণ এবং বিভক্ত।

দেকার্তীয় দর্শনে "আমি চিন্তা করি, তাই আমি আছি"— এই বক্তব্যটি ধরে নেয় যে চিন্তা এবং অস্তিত্বের মধ্যে একটি সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। বিষয় নিজের চিন্তার মাধ্যমে নিজের অস্তিত্বকে নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু মনোবিশ্লেষণ এবং ভাষাতাত্ত্বিক তত্ত্ব এই ধারণাকে গভীরভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করে। বিশেষত লাঁকা দেখান যে চিন্তা কখনোই সম্পূর্ণ সচেতন বা স্বচ্ছ নয়। চিন্তার একটি বড় অংশ ভাষার কাঠামোর মধ্যে গঠিত এবং অচেতনের দ্বারা প্রভাবিত। এই অবস্থাকে বোঝাতে লাঁকা Cogito-কে উল্টে দেন। তিনি বলেন যে মানুষ "যেখানে চিন্তা করে, সেখানে সে সম্পূর্ণভাবে উপস্থিত নয়; এবং যেখানে সে উপস্থিত, সেখানে চিন্তা সম্পূর্ণভাবে তার নিয়ন্ত্রণে নয়।" এই বক্তব্যের দার্শনিক তাৎপর্য গভীর। এটি দেখায় যে, চিন্তা এবং অস্তিত্বের মধ্যে যে সরাসরি সম্পর্ক দেকার্তে কল্পনা করেছিলেন, বাস্তবে তা এতটা সরল নয়। একটি উদাহরণ বিবেচনা করা যেতে পারে। একজন ব্যক্তি কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় মনে করতে পারেন যে, তিনি সম্পূর্ণ যুক্তির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। কিন্তু পরে দেখা যায় যে, তার সিদ্ধান্ত আসলে কোনো গভীর আবেগ বা অচেতন ইচ্ছা দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এখানে দেখা যায় যে, চিন্তার সচেতন স্তর এবং মানসিক বাস্তবতার গভীর স্তরের

মধ্যে একটি ব্যবধান রয়েছে। এই ব্যবধানই লাঁকানীয় subject-এর মৌলিক বৈশিষ্ট্য। এইভাবে Cogito-ভিত্তিক subject থেকে Lacanian subject-এ রূপান্তর আধুনিক দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নির্দেশ করে। বিষয় আর স্বচ্ছ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা নয়; বরং ভাষা, অচেতন এবং সামাজিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে গঠিত একটি জটিল অবস্থান।

লাঁকানীয় subjectivity বোঝার ক্ষেত্রে *Mirror Stage* একটি মৌলিক ধারণা। Jacques Lacan এই ধারণাটি প্রথম উপস্থাপন করেন তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ *"The Mirror Stage as Formative of the Function"*-এ। এই তত্ত্বের মাধ্যমে লাঁকা দেখাতে চান যে, মানুষের আত্মপরিচয় বা 'আমি' (ego) কোনো স্বচ্ছ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা নয়; বরং এটি একটি ভ্রান্ত ঐক্যের (misrecognized unity) উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্য কথায়, বিষয় নিজেকে যে ঐক্যবদ্ধ সত্তা হিসেবে উপলব্ধি করে, তা আসলে একটি কল্পিত নির্মাণ (imaginary construction)। লাঁকা-র মতে, শিশুর বিকাশের প্রায় ছয় থেকে আঠারো মাস বয়সের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ মানসিক ঘটনা ঘটে। এই সময় শিশুটি যখন প্রথমবার আয়নায় নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে, তখন সে নিজের শরীরকে একটি সম্পূর্ণ ও ঐক্যবদ্ধ রূপে উপলব্ধি করতে শুরু করে। এই মুহূর্তে শিশুটি আনন্দ বা উত্তেজনা অনুভব করে, কারণ আয়নায় দেখা প্রতিচ্ছবিটি তাকে একটি সম্পূর্ণ, সুসংগঠিত এবং স্থিতিশীল শরীরের চিত্র প্রদান করে। কিন্তু বাস্তবে শিশুর শরীর তখনও মোটর দক্ষতার দিক থেকে অসম্পূর্ণ ও বিচ্ছিন্ন। সে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ফলে আয়নায় যে ঐক্যবদ্ধ চিত্রটি সে দেখে, তা তার বাস্তব শারীরিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে পুরোপুরি মেলে না। এই ব্যবধানই লাঁকা-র ভাষায় *méconnaissance* বা ভ্রান্ত স্বীকৃতি। অর্থাৎ শিশুটি যে প্রতিচ্ছবিকে নিজের বলে গ্রহণ করে, সেটি আসলে একটি বাহ্যিক চিত্র, যা তার প্রকৃত অভিজ্ঞতার সঙ্গে পুরোপুরি মেলে না। এখানেই 'আমি'-এর উৎপত্তি একটি মৌলিক ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

আয়নার স্তর মূলত লাঁকা-র Imaginary Order-এর অন্তর্গত। এই স্তরে বিষয় তার পরিচয় গঠন করে চিত্র, প্রতিফলন এবং সাদৃশ্যের মাধ্যমে। শিশুটি আয়নার প্রতিচ্ছবির সঙ্গে নিজেকে একীভূত করে এবং সেই চিত্রটিকে নিজের পরিচয়ের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু এই পরিচয় আসলে একটি বাহ্যিক প্রতিমূর্তির সঙ্গে আত্মসমীকরণ (identification with an external image)। ফলে 'আমি' কখনোই সম্পূর্ণভাবে নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত নয়; বরং এটি সর্বদা নিজের বাইরের কোনো চিত্রের উপর নির্ভরশীল। এই ধারণা আধুনিক দর্শনের একটি মৌলিক অনুমানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। উদাহরণস্বরূপ, René Descartes-এর দর্শনে 'Cogito' বা চিন্তাশীল সত্তাকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মস্বচ্ছ কেন্দ্র হিসেবে কল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু লাঁকা-র আয়নার স্তর তত্ত্ব দেখায় যে 'আমি' আসলে শুরু থেকেই একটি বিচ্ছিন্নতা ও বিভ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত কাঠামো।

আয়নার স্তরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এটি বিষয়কে একটি কৃত্রিম ঐক্যের অনুভূতি প্রদান করে। আয়নায় দেখা প্রতিচ্ছবি শিশুকে মনে করায় যে, সে একটি সুসংগঠিত ও সম্পূর্ণ সত্তা। কিন্তু এই ঐক্য বাস্তব নয়; এটি কেবল একটি কল্পিত প্রতিমূর্তি। এই কারণেই লাঁকা বিষয়কে মূলত বিভক্ত সত্তা (split subject) হিসেবে বিবেচনা করেন। একদিকে রয়েছে বিষয়টির বাস্তব অভিজ্ঞতা, যা বিচ্ছিন্ন ও অসম্পূর্ণ; অন্যদিকে রয়েছে আয়নায় দেখা ঐক্যবদ্ধ প্রতিচ্ছবি। বিষয়টি এই দুইয়ের মধ্যে একটি স্থায়ী উত্তেজনা বা দ্বন্দ্বের মধ্যে অবস্থান করে। এই দ্বন্দ্বই মানুষের আত্মপরিচয়ের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। ফলে বিষয় কখনোই নিজের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিলিত হতে পারে না। তার পরিচয় সর্বদা একটি বাহ্যিক প্রতিমূর্তির মাধ্যমে মধ্যস্থতাপ্রাপ্ত।

আয়নার স্তরের প্রভাব কেবল শিশুকালেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি পুরো সামাজিক জীবনে প্রতিফলিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, আধুনিক সমাজে মানুষ প্রায়ই নিজেদের পরিচয় নির্মাণ করে বাহ্যিক চিত্র বা প্রতীক-এর মাধ্যমে— যেমন সামাজিক মর্যাদা, পেশা, বা সামাজিক মাধ্যমে তৈরি করা ব্যক্তিগত প্রতিচ্ছবি। কেউ যদি নিজেকে "সফল মানুষ", "বুদ্ধিজীবী", বা "জনপ্রিয় ব্যক্তি" হিসেবে কল্পনা করে, তাহলে সেই পরিচয়ও অনেকাংশে একটি প্রতীকী প্রতিচ্ছবি, যা অন্যদের দৃষ্টির মাধ্যমে নির্মিত। এই প্রক্রিয়াটি আয়নার স্তরের কাঠামোর সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। অর্থাৎ ব্যক্তি নিজের পরিচয়কে উপলব্ধি করে এমন এক প্রতিমূর্তির মাধ্যমে, যা প্রকৃতপক্ষে বাহ্যিক এবং সামাজিকভাবে নির্মিত।

আয়নার স্তর তত্ত্ব আধুনিক দর্শন ও মানববিদ্যার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক পরিবর্তন সূচিত করে। এটি দেখায় যে, বিষয় কোনো স্থির ও স্বয়ংসম্পূর্ণ কেন্দ্র নয়; বরং এটি প্রতিফলন, ভাষা এবং সামাজিক সম্পর্কের মাধ্যমে গঠিত একটি অস্থির সত্তা। এই কারণে লাঁকা-র তত্ত্বে 'আমি'-এর ঐক্য একটি স্থায়ী সত্য নয়, বরং একটি ভ্রান্ত ভিত্তি, যার উপর বিষয় নিজের পরিচয় নির্মাণ করে। ফলে Cogito-র ধারণা, যা বিষয়কে একটি স্বচ্ছ ও স্বনির্ভর সত্তা হিসেবে কল্পনা করেছিল, লাঁকা-র বিশ্লেষণে মৌলিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে ওঠে।

এখানে লাঁকা দেখান যে, বিষয় তার নিজের সঙ্গে প্রথম সম্পর্ক স্থাপন করে একটি ভুল-চেনার (*méconnaissance*) মাধ্যমে। শিশুটি আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে এক ধরনের ঐক্য ও সম্পূর্ণতার অভিজ্ঞতা লাভ করে, যদিও বাস্তবে তার দেহগত ও মানসিক অভিজ্ঞতা তখনো ভাঙাচোরা ও অসমন্বিত। এই মুহূর্তটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এখানেই 'আমি' প্রথম গঠিত হয়—কিন্তু এই 'আমি' কোনো অভ্যন্তরীণ সত্য থেকে নয়, বরং একটি বাহ্যিক প্রতিচ্ছবি থেকে। বিষয় নিজেকে চিনে নেয় এমন কিছুর মাধ্যমে, যা সে নয়। ফলে subjectivity-র কেন্দ্রেই একটি বিভ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। দেকার্তীয় Cogito যেখানে ধরে নেয় যে, বিষয় নিজেকে সরাসরি অভিজ্ঞতা করে, Mirror Stage সেখানে দেখায় যে আত্মপরিচয়ের সূচনা ঘটে পরোক্ষতা ও ভ্রান্তির মধ্য দিয়ে। ঐক্য এখানে প্রাথমিক সত্য নয়; বরং একটি কল্পিত নির্মাণ। এই কল্পিত ঐক্যই পরবর্তীতে Imaginary order-এর ভিত্তি গড়ে তোলে। ফলে 'আমি' কোনো স্বচ্ছ সত্তা নয়, বরং একটি কল্পিত গঠন, যা শুরু থেকেই বিভাজিত। এই বিভাজন Cogito-র ঐক্যবাদী subject-এর ধারণাকে কাঠামোগতভাবে অকার্যকর করে তোলে।

এই প্রেক্ষিতে "dictatorship of the signifier" শব্দবন্ধটি তাত্ত্বিক অর্থে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এখানে dictatorship বলতে কোনো রাজনৈতিক দমন বোঝানো হচ্ছে না; বরং একটি কাঠামোগত আধিপত্য বোঝানো হচ্ছে। চিহ্নক এমন একটি ব্যবস্থা, যা বিষয়ের চিন্তা, ইচ্ছা এবং আত্মপরিচয়কে নির্ধারণ করে, কিন্তু বিষয়ের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। লাঁকা-র মতে, মানুষ ভাষা ব্যবহার করে না; ভাষাই মানুষকে ব্যবহার করে। বিষয় মনে করে সে কথা বলছে, কিন্তু বাস্তবে ভাষাই তার মাধ্যমে কথা বলে। এই কারণেই লাঁকা বলেন, ইচ্ছা সবসময় অপরের ইচ্ছা। বিষয় যা চায়, তা সে সরাসরি চায় না; ভাষার মধ্যস্থতায় চায়। এই কাঠামোতে বিষয় মৌলিকভাবে অ-সার্বভৌম। সে নিজের চিন্তা, নিজের ইচ্ছা, এমনকি নিজের 'আমি'-এরও পূর্ণ মালিক নয়। Cogito-র যে দাবি ছিল—"আমি চিন্তা করি, অতএব আমি আছি"— এই দাবি এখানে অর্থহীন হয়ে পড়ে। চিহ্নকের আধিপত্য Cogito-কে শুধু সংশোধন করে না; এটি Cogito-র সম্ভাবনাকেই বাতিল করে দেয়। এই কারণেই লাঁকানীয় তত্ত্বে Cogito-র মৃত্যু একটি আকস্মিক ঘটনা নয়, বরং একটি কাঠামোগত পরিণতি। পাশ্চাত্য দর্শনের মূল স্তম্ভ ছিল রেনে দেকার্তের 'কজিটো'— যেখানে ব্যক্তি নিজেকে তার চিন্তার কেন্দ্র মনে করত। কিন্তু জ্যাক লাঁকা এসে দেখালেন, এই 'আমি' বা 'Subject' আসলে কোনো স্বাধীন সত্তা নয়, বরং এটি ভাষার এক স্বৈরাচারী কাঠামোর আড়ালে বন্দি। একেই আমরা বলতে পারি "চিহ্নকের একাধিপত্য"।

দেকার্ত বলেছিলেন, "আমি চিন্তা করি, তাই আমি আছি"। লাঁকা একে উপহাস করে উল্টে দিলেন "আমি যেখানে নেই, সেখানেই আমি চিন্তা করি"। লাঁকা-র মতে, মানুষ যখন চিন্তা করে, সে আসলে নিজের তৈরি করা কোনো মৌলিক চিন্তা করে না; বরং সে এমন এক ভাষায় চিন্তা করে যা তাকে সমাজ বা সংস্কৃতি (the Other) শিখিয়ে দিয়েছে।লাঁকানীয় দর্শনে সাবজেক্ট বা ব্যক্তি হলো split Subject। এই চিহ্নের অর্থ হলো— ব্যক্তি জন্মগতভাবেই খণ্ডিত। এই খণ্ডন ঘটে যখন একটি শিশু প্রথম 'মা' বা 'বাবা' বা নিজের 'নাম' উচ্চারণ করতে শেখে। সেই মুহূর্তেই তার আদিম, অখণ্ড সত্তাটি মারা যায় এবং সে ভাষার ডিক্টেটরশিপে প্রবেশ করে। চিহ্নকের একাধিপত্য বোঝার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো এটি বোঝা যে— মানুষ ভাষার জন্ম দেয় না, বরং ভাষাই মানুষকে জন্ম দেয়। আপনি জন্মাবার আগেই আপনার জন্য একটি নাম রাখা হয়েছিল। আপনার জন্মের আগেই আপনার পরিবার এবং সমাজ একটি ভাষার কাঠামো তৈরি করে রেখেছে। আপনি বড় হয়ে যখন কথা বলতে শিখলেন, আপনি কেবল সেই তৈরি করা কাঠামোতে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন মাত্র। লাঁকা-র মতে, একটি চিহ্নক (Signifier) সবসময় অন্য একটি চিহ্নকের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। যেমন— 'দেশপ্রেম' শব্দটি শুনলে আপনার মনে যে আবেগ আসে, তা আপনার নিজের নয়। সমাজ ওই চিহ্নকের সাথে কিছু নির্দিষ্ট অর্থ জুড়ে দিয়েছে যা আপনি মানতে বাধ্য। এখানেই চিহ্নকের স্বৈরাচার স্পষ্ট।

চিহ্নকের এই একাধিপত্য কেবল আমাদের কথায় নয়, আমাদের কামনায় (Desire) পর্যন্ত বিস্তৃত। লাঁকা-র বিখ্যাত উক্তি: "Desire is the desire of the Other।" আমরা যা চাই— তা কি সত্যিই আমরা চাই? আমাদের অবচেতন এমনভাবে প্রোগ্রাম করা যে, আমরা তা-ই চাই যা সমাজ আমাদের চাইতে বলে। একটি ব্র্যান্ডের পোশাক বা একটি নির্দিষ্ট জীবনধারা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আসলে চিহ্নকের তৈরি করা একটি মরীচিকা। চিহ্নক এখানে ডিক্টেটর হিসেবে কাজ করে, কারণ সে ঠিক করে দেয় আমাদের সুখ এবং দুঃখের মানদণ্ড কী হবে।

লাঁকা দেখিয়েছেন, যারা এই চিহ্নকের ডিক্টেটরশিপ বা 'পিতার নাম' (*Nom-du-père*) মেনে নিতে পারে না, তারাই মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন বা সাইকোটিক হয়ে পড়ে। অর্থাৎ, সমাজে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার একমাত্র শর্ত হলো চিহ্নকের এই স্বৈরাচারকে মেনে নেওয়া। আমরা যদি ভাষার আইন না মানি, তবে আমরা আমাদের পরিচয় হারিয়ে ফেলব।

"Dictatorship of the signifier" এইখানে কোনো রেটোরিকাল অতিশযোক্তি নয়। এটি সেই কাঠামোগত বাস্তবতার নাম, যেখানে ভাষা বিষয়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। বিষয় এই আধিপত্যের বাইরে দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। এই কারণেই বলা যায়, লাঁকানীয় তত্ত্বে Cogito-র মৃত্যু কোনো আকস্মিক পতন নয়, বরং একটি তাত্ত্বিক অনিবার্যতা। আধুনিক দর্শনের যে ভিত্তি দেকার্ত স্থাপন করেছিলেন, লাঁকা সেই ভিত্তিকেই পুনর্বিবেচনার মুখে দাঁড় করান— এবং দেখান, বিষয় আর নিজের সার্বভৌম কেন্দ্র হতে পারে না। লাঁকানীয় কজিটো-সমালোচনা শুধু তাত্ত্বিক নয়; এটি রাজনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে গভীর প্রভাব ফেলে। স্বচ্ছ নাগরিক, স্থির পরিচয় এবং যুক্তিনির্ভর সিদ্ধান্তের ধারণা প্রশ্নবিদ্ধ হয়। পরিচয় এখানে নির্মিত, ভাষানির্ভর এবং ক্ষমতার দ্বারা প্রভাবিত।

লাঁকানীয় তত্ত্বে কজিটোর মৃত্যু কোনো নৈরাশ্যবাদী ঘোষণা নয়। বরং এটি বিষয়ের বাস্তব অবস্থানকে স্বীকার করার একটি প্রয়াস। বিষয় আর সর্বজ্ঞ বা সর্বনিয়ন্ত্রক নয়; সে বিভক্ত, ভাষানির্ভর এবং অচেতন দ্বারা প্রভাবিত। এই স্বীকৃতি আমাদের চিন্তাকে আরও দায়িত্বশীল এবং সমালোচনামুখর করে তোলে। কজিটোর মৃত্যু তাই দর্শনের সমাপ্তি নয়, বরং তার পুনর্গঠন। Cogito-র মৃত্যু কোনো নিছক দার্শনিক বিতর্কের ফল নয়; এটি

আধুনিক subjectivity-র গভীর রূপান্তরের সূচক। লাঁকানীয় তত্ত্ব দেখায় যে, বিষয় সার্বভৌম নয়, স্বচ্ছ নয়, এবং নিজেকে সম্পূর্ণভাবে জানতেও সক্ষম নয়। এই উপলব্ধির দার্শনিক তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। যদি বিষয় নিজেই বিভক্ত হয়, তাহলে সিদ্ধান্ত, ইচ্ছা এবং দায়বদ্ধতার ধারণাও আর সরল থাকে না।

Bibliography:

1. Althusser, Louis. *For Marx*. Translated by Ben Brewster, Verso, 2005. P. 233.
2. Butler, Judith. *Subjects of Desire: Hegelian Reflections in Twentieth-Century France*. Columbia University Press, 1987.
3. Derrida, Jacques. *Of Grammatology*. Translated by Gayatri Chakravorty Spivak, Johns Hopkins University Press, 1997. P. 158.
4. Descartes, René. *Meditations on First Philosophy*. Translated by Donald A. Cress, Hackett Publishing, 1998. P. 17.
5. Descartes, René. *Meditations on First Philosophy*. Translated by John Cottingham, Cambridge University Press, 1996.
6. Fink, Bruce. *The Lacanian Subject: Between Language and Jouissance*. Princeton University Press, 1995.
7. Freud, Sigmund. *Introductory Lectures on Psycho-Analysis*. W. W. Norton, 1989.
8. Freud, Sigmund. *The Interpretation of Dreams*. Translated by James Strachey, Basic Books, 2010. P. 112.
9. Lacan, Jacques. *Écrits*. Translated by Bruce Fink, W. W. Norton, 2006.
10. Lacan, Jacques. *Écrits: A Selection*. Translated by Alan Sheridan, W. W. Norton, 1977. P. 1-7.
11. Lacan, Jacques. *The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis*. Translated by Alan Sheridan, W. W. Norton, 1998.
12. Lacan, Jacques. *The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis*. Edited by Jacques-Alain Miller, translated by Alan Sheridan, W. W. Norton, 1978. Pp. 20-28.
13. Laplanche, Jean, and Jean-Bertrand Pontalis. *The Language of Psychoanalysis*. Translated by Donald Nicholson-Smith, W. W. Norton, 1973. P. 45.
14. Saussure, Ferdinand de. *Course in General Linguistics*. Translated by Wade Baskin, McGraw-Hill, 1966. Pp. 65-70.
15. Žižek, Slavoj. *Looking Awry: An Introduction to Jacques Lacan through Popular Culture*. MIT Press, 1991.

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No.1055-1062
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.322

‘উইঙ্কল টুইঙ্কল’- ফাঁপা মানুষের উৎসসন্ধান

ড. সুদেষ্ণা মৈত্র, *স্বাধীন গবেষক, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 11.03.2026; Accepted: 13.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

‘Winkle Twinkle’ (2002) of Bratya Basu is a political play highlighting the contemporary political ideals and differences. This dissertation aims at the crisis born of dreams and disillusionment of two main protagonists of the play. It also tries to find out the contemporaneity of the play after almost a quarter of a century. With his selfless values Sabyasachi dreams of an ideal society, Indra despite being the son of an ideal father joins the opposite political camp. This paper delves deep into the psyche of present generation to find how do they perceive such defection. ‘Winkle Twinkle’ is used to search the reason why living in a political backdrop today’s youth turns his face from politics. Hollow substanceless present generation owes its origin to the repeated shattering of dreams and this paper aims to highlight it.

Keywords: Political Disillusionment, Youth and Politics, Ideological Conflict, Contemporary Bengali Theatre, Dream and Crisis

“আমরা যেদিন আগুনের নদী থেকে
তুলে আনলাম মা’র ভেসে যাওয়া দেহ
সারা গা জ্বলছে বোন তোর মনে আছে
প্রতিবেশীদের চোখে ছিল সন্দেহ।”[১]

২৬ বছর পর নিজের বাড়ি ফিরে এসে সব্যসাচীও কি সেই মা’র ভেসে যাওয়া দেহের মুখোমুখি হয়নি? মুখোমুখি হয়নি হাজারও প্রশ্ন ও সন্দেহের? সময়ের চেয়ে এগিয়ে বাঁচা মানুষকে ঘিরে আমাদের উন্মাদনা, বিস্ময় এবং প্রশংসাধ্বনি বেজে ওঠে অনায়াসে। কিন্তু যে মানুষটি সময়ের চেয়ে ২৬ বছর পিছিয়ে পড়েছে, যে মানুষটি’র ঘুম ভাঙলো সবেমাত্র আর দেখলো তার চোখের সামনে বদলে গেছে পৃথিবী। সেই বদল শুধু বিশ্বায়নের বহির্ঘাত নয়, আঘাত লেগেছে অন্তরে। যে আঘাতে মনে পড়ে যায় নাটককার তুলসী লাহিড়ীর ‘ছেঁড়াতার’ নাটকের রহিমের সেই মর্মভেদী উক্তি- “আল্লা! মোর যন্তর বাজিলয় না। আল্লা! তার খালি ছিঁড়ি ছিঁড়ি গেল।” (তৃতীয় অঙ্ক/তৃতীয় দৃশ্য)। রহিমের এই দিলের রবাব যেভাবে ছিঁড়ে গেল, এই বদলে যাওয়া পৃথিবীতে হঠাৎ ঢুকে পড়া ডোডোপাখির মতো অতীত নিয়ে বিভোর, স্বপ্নগ্রস্ত সব্যসাচীও যতবার বাস্তবের মুখোমুখি হচ্ছেন, হৃদয়বীণা ছিঁড়ে যাচ্ছে বীভৎস শব্দ করে। নাটককার এবং নাট্যকার ব্রাত্য বসুর ‘উইঙ্কল টুইঙ্কল’ এক দীর্ঘ পরিচিত, প্রচারিত, বিতর্কিত অথচ সফল নাটক। বহু আলোচনা ও সমালোচনার দেবযানে চড়ে নাটকটি পার

হয়েছে প্রায় ২৫ বছর। এই একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে দাঁড়িয়ে তবু মনে হয় এই সময়কে ধরার ক্ষেত্রে ২০০২ সালে প্রকাশিত এই নাটকটি আরো একবার বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। অন্ততপক্ষে এই প্রজন্ম এবং তার পূর্ববর্তী প্রজন্মের রাজনৈতিক এই পালাবদলের ধান্দামুখর স্বভাব-চরিত্রকে বুঝে নিতে হলে নাটকটির দিকে ফিরে তাকানো প্রয়োজন। আমরা যারা স্বাধীনতা আন্দোলন দেখিনি, খাদ্য আন্দোলনের হাহাকার শুনিনি, চিন-পাকিস্তানের যুদ্ধে চিন্তিত হইনি, নকশাল আন্দোলনে বলি হওয়া ১০৮৪'র আর্তনাদে সামিল হইনি। যারা দেখিনি ১৯৯৯ সালে ক্ষমতায় এসে পাঁচ বছর শাসন করে যাওয়া বাজপেয়ী সরকারকে। যারা চিনতে পারিনি ক্ষমতাতন্ত্রের বিরুদ্ধে কথা বলে ২০০০ সালে ক্ষমতায় আসা পার্টি আসলে ক্ষমতাতন্ত্রের প্রতীক। যারা সুযোগ পাইনি বিশ্বায়নের থাবার প্রথম নখর পড়ে ফেলতে। আমরা যারা নেই-রাজ্যের বাসিন্দা। বর্তমান নৈরাজ্যের সূতিকাঘর নিয়ে ভাবার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা যাদের নেই। সেই আমরা, যারা অন্যের স্মৃতিকথা ধার করে বেঁচে থাকি। সামনে নেই কোনো আদর্শ-অবয়ব। পিছনে নেই কোনো লড়াইয়ের অদম্য ক্লান্তি। স্মৃতির যক্ষ সেজে আমরা যারা স্মৃতির শববাহক। একবিংশ শতাব্দী'র দ্বিতীয় দশকে হাতের মুঠোয় শূন্য ধরে বসে আছি। হাত খুললেও শূন্য। তাদের জানতে হবে এই স্বপ্নভাঙনের উপকথার জন্ম ঠিক কবে থেকে। সময় কখনো ধীর লয়ে কখনো দ্রুত লয়ে বহমান। তবু সে তার সমকালীনতার ছাপ ছেড়ে রেখে যায় প্রতিটি পাল্টে যাওয়া হাওয়ার সন্ধিক্ষণে। সময়ের এই লয়, ধ্বনি, ছন্দ একজন তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষকের মত ধরে রাখতে চেয়েছেন নাটককার ব্রাত্য বসু তাঁর এই নাটকে। যেন কোনো অদৃশ্য ক্যামেরাম্যান, যিনি সমসাময়িক রাজনীতির প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হেঁটে চলেছেন এবং ক্যামেরাবন্দি করছেন প্রতিটি স্খলন ও বিপর্যয়কে। সেইসব ফটোকপির কোলাজ দিয়েই স্পষ্ট রূপ পেয়েছে 'উইঙ্কল টুইঙ্কল'। প্রায় ২৫ বছর পরে এসেও ভারি অদ্ভুতভাবে সমসাময়িক হয়ে ওঠে সেই কোলাজ। মিলে যায় ২০০২ সালের এই নাটকের মুখ্য চরিত্রের সময়চ্যুতির সঙ্গে। নাটকে সব্যসাচীর বোধের কাছে তাঁর ঘুমিয়ে থাকা ২৬ বছরের কোনো স্মৃতি নেই। তাই, তাঁর চারপাশের এই পরিবর্তন তিনি ধরতে পারছেন না। আমাদেরও সময়চ্যুতি ঘটেছে অতীতের সঙ্গে। আমরা বহুদিন ধরে জেগে ঘুমিয়ে আছি। এই চ্যুতিময় সময়ের ইতিহাসের দলিল জানা না থাকলে বর্তমানের প্রতিটি দেখা ধোঁয়াশার মতো মনে হয়। এই সময়ে রাজনীতি থেকে আমরা গা বাঁচিয়ে চলতেই ভালোবাসি। শাসকপক্ষ, বিরোধীপক্ষ, কে কোন ইস্যু নিয়ে সরব, তার খবর ধামাচাপা পড়ে যায় অজস্র মিম, সারকাজম এবং মিমিক্রির বাড়বাড়ন্তে। এই জেনারেশন রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীকে বুড়ো আঙুল দেখায় এবং ধান্দাবাজির রাজনীতির বৃত্তে নিজের আখেরটুকু গুছিয়ে নেওয়ার পদ্ধতি খুঁজে ফেরে। আমাদের তাই জানতে হবে, এই সুবিধাবাদের সূত্রপাত কি এই সময়েই নাকি এর আঁতুড়ঘর অনেক আগেই রচিত হয়েছে? নিজের দেশ, নিজের রাজ্য, তাকে সুস্থ দেখার ইচ্ছে, সেই স্বপ্ন কেন আর দেখে না বর্তমান ও গত প্রজন্ম? ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার রাজনৈতিক চক্রান্তে কেন কোনো রাজনৈতিক দলই মানুষকে পাশে পাচ্ছে না? এই সমস্ত উত্তর খুঁজতেও প্রয়োজন পড়ে, ব্রাত্য বসুর 'উইঙ্কল টুইঙ্কল' নাটকটি। ১৮১৯ সালে লেখা 'রিপ ভ্যান উইঙ্কল' গল্পে রিপ ভ্যানের ঘুম ভেঙেছিল প্রায় কুড়ি বছর পরে। চোখ খুলে দেখে এক বিশাল বদল ঘটেছে তার চারপাশে। পৃথিবী তাকে ছেড়ে হেঁটে এসেছে অনেকটা পথ। আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলন দেখতে পায়নি ভ্যান। ১৯৭৬ সালে পুলিশের এনকাউন্টার থেকে বাঁচতে ছুটে চলা সব্যসাচী হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়। সাতের দশকের ঠিক যে সময়ে তিনি অদৃশ্য সেই সময়টি গেল থমকে। সব্যসাচী দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর বামপন্থী আদর্শবাদ নিয়ে। শ্রমিকের জন্য লড়াই, জনগণের জন্য স্বার্থত্যাগ, ন্যূনতম অধিকারের দাবি, সেইসব মোহময় বৃত্তে। এই থেমে যাওয়ার সঙ্গে অদ্ভুতভাবে মিল খুঁজে পাই আমার মায়ের নস্টালজিয়ার- "আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম", দীর্ঘদিন গণসঙ্গীতে গলা মেলানো মায়ের বামপন্থার আদর্শগত মোহভ্রান্তি সময়ের থেকে প্রায় ৩০ বছর পিছিয়ে রেখেছে তাঁকে। মায়ের আবেগ-

উচ্ছ্বাসে, মিছিল পথে এখনো হাঁটার শব্দ উঠে আসে থমকে যাওয়া ঘড়ির নির্দিষ্ট মুহূর্তের হাত ধরে। আমরা জানি, এরকম অসংখ্য মানুষ ছড়িয়ে রয়েছে আমাদেরই চারপাশে যারা আজও নস্টালজিয়ায় সব পেয়েছির দেশের স্বপ্নে বাঁচে। কারা এরা? কারা সব্যসাচী, রাজলক্ষ্মী? আরো কত অজস্র চোখ, যাদের জ্বলজ্বলে দৃষ্টি গেছে নিভে, জ্যোতি গেছে কমে। কিন্তু, একপাশ ফিরে আছে অতীতের স্বপ্নগুলোর দিকে আর বর্তমানকে করছে অস্বীকার। নাটকে অন্যতম উল্লেখযোগ্য চরিত্র সব্যসাচীর ছেলে ইন্দ্র যেন তাদেরকেই বলছে 'মৃত মানুষ মৃত সময় মৃত বিশ্বাস'। তারা যদি নিজের সময় পেরিয়ে অন্য সময়ে ফিরে আসে তবে তাদেরকে নিয়ে সেই অন্য সময়ের অস্বস্তি বাড়ে। তাদের সেই স্বপ্নগুলোর কাছেই ফিরে যেতে হবে। তাদের দেখা দিয়ে নয়। তাদের না দেখা দিয়ে বিশ্লেষণ করতে হবে কীভাবে স্বপ্নগুলোর অপমৃত্যু ঘটেছিল। সেই কবর খুঁড়তে এবং খবর খুঁজতে ফিরে পড়তে হয় 'উইঙ্কল টুইঙ্কল'। ১৯৭৬-এ অদৃশ্য হয়ে যাওয়া সব্যসাচীকে নাটককার ইচ্ছে করেই 'পজ' বোতাম টিপে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কারণ, যে ছেলেটি বা যে মেয়েটি অবিরত দৌড়চ্ছে পার্টির আদর্শকে বুকে নিয়ে। যারা জেল খাটছে। যৌথখামারের স্বপ্ন দেখছে। ক্ষমতাতন্ত্রকে, পুঁজিবাদকে ঘৃণা করছে। শ্রমিক-মজুর-কৃষক-সর্বহারার পাশে দাঁড়াচ্ছে, প্রতিনিধিত্ব করছে আর প্রতিমুহূর্তে রাষ্ট্রের চোখে ধুলো দিয়ে প্রাণ হাতে নিয়ে ছুটছে ছুটছে ছুটছে। তাকে দাঁড় করিয়ে রাখতে চাইলেন নাটককার। গুলির দাপটে মেরে ফেললেন না। পরিবর্তনের এই নৈরাজ্যের ঝাপটা দিয়ে আড়াই দশক অতিক্রম করে ধাক্কা দিতে চাইলেন সেই ছুটন্ত ছেলেটিকে। আজ যা ধ্রুবসত্য তা আগামীকাল বাস্তবিকই কতখানি ঠুনকো। আদর্শবাদ কীভাবে ভাঙতে ভাঙতে হয়ে উঠছে সুবিধাবাদ, ভোগবাদ এবং স্বার্থান্বেষী মনোভাবের দাবার চাল। সেইসব নৈতিক অবক্ষয় এবং রাজনৈতিক মূল্যবোধের দ্বিচারিতার মুখোশ টেনে খুলে ফেলতে চাইলেন লেখক। কাদের সামনে? অন্তত তাদের সামনে, যারা নির্ভেজালভাবে, নিঃস্বার্থভাবে দলকে সময় দিয়েছে। নবযুগ আনার স্বপ্নে বিভোর থেকেছে। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে চেয়ে থেকেছে পার্টির প্রতিটি সিদ্ধান্তের প্রতি। সেই সব্যসাচী ২৬ বছর পর নিজের বাড়ি ফিরে এসে দেখেন তারই সন্তান বিরোধী পার্টিতে যোগ দিয়েছে। কেন? উত্তরে তাঁর চোখের সামনে থেকে একের পর এক মিথ্যে স্বপ্নে রাঙানো পর্দা সরিয়ে দিচ্ছে তারই ছেলে ইন্দ্র-

"সব্যসাচী- না না। এখন জরুরি অবস্থা-

ইন্দ্র- না। এখন শীতল অবস্থা।

...

ইন্দ্র- আপনার সময়ের উল কাঁটাটা সোয়েটার বুনে পালটে দিয়েছে সব। ...আচ্ছা, বলুন তো এখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কে?

সব্যসাচী- সিদ্ধার্থশংকর রায়

ইন্দ্র- না। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য"[২]

এবং আইডিয়ালিস্ট বাবা'কে চিনিয়ে দিচ্ছে ইন্দ্র এই সময়ের দাবি'কে-

"সব্যসাচী- সময় কার, সময় কী সেটা কে ঠিক করবে?

ইন্দ্র- আমি ঠিক করবো। আমরা। আমাদের সময় যদি ফাঁপা হয়, আমরা যদি হলো হই, তা হলে সেই হলোনেসই ঠিক করবে সময় কার। শুনে রাখুন সব্যসাচী সেন আমি আমার সময়ে দাঁড়িয়ে ঠিক।— হতে পারে এই সময়ে কোনও মহৎ আদর্শ নেই, বড় মানুষ নেই। আর এই জন্যই আমরা কোনও টুপি খাই না, আদর্শের ট্যাবলেট গিলি না- আমরা আমাদের মতো করে আমাদের সময়ে সৎ।"[৩]

পড়তে পড়তে মনে হতে পারে, লেখক আজ, এই সময়ের কথা বলছেন। মনে হতে পারে একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে সবচেয়ে বড়ো ক্রাইসিস এবং সত্যদর্শন লেখা হয়ে গেছে ২০০২ সালেই। তখন প্রশ্ন করতে হয়, এই ২০২৬-এ আমরা ঠিক কোন সময়ের বাসিন্দা। মৃত সময় নাকি জ্যান্ত সময়ের?

নাটকে বাবা সব্যসাচী থমকে যাওয়া সময় পেরিয়ে বাড়ি আসছেন। এখন তাঁর বয়স প্রায় ২৯ বছর। বাড়ির ভিতরে অবস্থিত বর্তমান সময়ের প্রতিনিধি ইন্দ্রর বয়সও ২৯ বছর। বাবা ঠিক যে বয়সে তার অতীতে ঘুমিয়ে পড়েছেন, ছেলের বর্তমান বয়স সেই অতীতের আঁচড়, কামড় সামলে বিরোধীপক্ষ তৃণমূল-কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে। ইন্দ্র বাবা'র সেই স্বপ্নময় গোলকের ভিতর ঢুকে বাবাকে চিনিয়ে দিচ্ছে বিগত ২৬ বছরের বামপন্থার দ্বিচারিতা, বিশ্বাসভঙ্গের ইতিহাস। ইন্দ্র শিখে গেছে সুবিধাবাদী রাজনীতি, ইন্দ্রের দলকে বামপন্থীরা, লুম্পেন আদর্শহীন দল বলে ডাকে। বড্ড রাগ ইন্দ্রের চোখে মুখে। কারণ, আদর্শবাদী বাবার ছেলে ইন্দ্ররা চোখের সামনে দেখে ফেলেছে সেই সব গুন্ডাদের, যারা একসময় বামপন্থার বিরোধিতা করত। নকশালপন্থীদের খুন করত। তারাই এখন সিপিএম করছে। মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকার মন্ত্রণা পেয়ে হাজার চুরাশির দল কখনো মারা গেছে পুলিশের গুলিতে, কখনো গুন্ডার গুলিতে। আর সেইসব ক্যাডারদের আদর্শ গেলানো নেতারা ক্রমেই ভুলেছে মাটির সঙ্গে সম্পর্ক। মেহনতি মানুষের কান্নায় ভর করে উঠে আসা পার্টি শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্যের মোড়কে এলটিজমের হাওয়ায় মেতে ভুলে গেছে সর্বহারার অধিকারের দাবি দাওয়া মেটানোর প্রতিশ্রুতি। স্বজনপোষণ আর রুচিশীলতার অক্ষরবাহী পুঁজিবাদী শাসকসমাজ তাই চাকরি দেয় ইউনিয়ন সেক্রেটারির আত্মীয়কে। যদিও পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী সব্যসাচীর ছেলে ইন্দ্র'র রেজাল্ট তার চেয়ে অনেক ভালো ছিল। নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যেই নাটককার ইন্দ্রকে দিয়ে বলিয়ে নিচ্ছেন এক মোক্ষম সংলাপ- "রাজনীতি করলেই যে কিছু পাওয়া যায় সেটা একটা বাচ্চাও জানে।"[৪]

এই জানার উপরই দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের ছাত্রসমাজ। যে সংক্রমণের সূত্রপাত বহু যুগ আগে। সেই তরুণসমাজ আজ অনায়াসে পিস্তল চালানো শেখে। ইউনিভার্সিটির গেট ভাঙে। কলেজের ভিতর 'রেপ' হয় এবং হওয়ার পর থ্রেট হয়। এইসব ছন্নছাড়া, লোফার, লুম্পেনের রাজনৈতিক আবহ প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই অন্তরের হাল হাকিকত। অজস্র না পাওয়া আর বিশ্বাসভঙ্গের ইতিহাসে হয়তো একবিংশ শতাব্দী এমন ছাত্রসমাজের জন্ম দিয়েছে। স্বাধীনতা দিবসের দিন জন্ম হয়েছে সব্যসাচী সেনের। তারপর থেকেই স্বাধীনতাকে ঘিরে যে লোফালুফি আর অজস্র দ্বিচারিতা, তারই মাশুল গুণে চলে ইন্দ্রেরা-

ইন্দ্রঃ "ভুলের জন্ম কবে আর ঠিক থেকে হয়েছে। ভুল থেকেই তো ভুলের শুরু।" (পৃ. ২৪৯)

একবিংশ শতাব্দীতে মেধা সম্পন্ন ছাত্রের দল কেন রাজনীতি বেছে নিচ্ছে না? কেন তারা দিন বদলের স্বপ্ন দেখছে না? তার কারণ কি এই যে, তারা চোখের সামনে প্রতিমুহূর্তে রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের মুখের কথার পরিবর্তন ঘটতে দেখছে? দেখছে প্রতিঘন্টায় নেতাদের স্ট্যান্ড পয়েন্ট যাচ্ছে পাল্টে। এমনকী এই সময় দাঁড়িয়ে উইঙ্কল টুইঙ্কল'এর মত কোন নাটক, উপন্যাস বা গল্পের জন্ম হতে দেখা যাচ্ছে না। অথচ এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে সামাজিক সমস্যাগুলো ভয়াবহ। রাজনৈতিক অবক্ষয় খাদের কিনারে। ২০২১ সালের তথ্য বলছে প্রতিদিন গড়ে ২৫ জন কৃষক আত্মহত্যা করে। দেশে শিক্ষিত বেকারত্বের হার প্রায় ২৯ শতাংশ। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর বার্ষিক রিপোর্ট জানাচ্ছে, প্রতিদিন গড়ে ৮৬টি করে ধর্ষণের ঘটনার অভিযোগ দায়ের হয়। অথচ, চারপাশ এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে মুখ ফিরিয়ে। ফুল খেলবার দিন পেরিয়েছে কবেই, তবু অন্ধ কোকিলের মত সাহিত্য-ফ্যাশন-সংস্কৃতি-মূর্তি উন্মোচন আর নান্দনিকতার ফাঁপা আবর্তের ভিতর নিজেকে নিজে গিলে চলেছে আমাদের দেশের তরুণ শিক্ষিতসমাজ। একমাত্র নাটকই পারে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে, বলগাহীনভাবে,

তীক্ষ্ণভাবে সমসাময়িকতাকে তুলে ধরতে। প্রখ্যাত নাটককার, নাট্যকার দেবাশিস মজুমদার মিনার্ভা থিয়েটার আয়োজিত এক বক্তৃতায় রাজনীতিসচেতন থিয়েটারের অভাবের দিকে আঙুল তুলে আহ্বান জানিয়েছিলেন সেই সকল নাট্যস্রষ্টাকে, যারা একবিংশ শতাব্দীর সামাজিক অবক্ষয়গুলিকে তুলে ধরে রাষ্ট্রকে প্রশ্ন করবে, প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত করবে। ঠিক যেভাবে নাটককার ব্রাত্য বসু তাঁর নাটকের ভিতর দিয়ে অসংখ্য প্রশ্ন তুলে ধরেছেন পাঠকের সামনে। ২০০২ এর সাময়িক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে ইন্দ্র তার মাকে জানাচ্ছে, কীভাবে বিজেপির মত সাম্প্রদায়িক দলের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে ডানপন্থা, বামপন্থা প্রতিটি রাজনৈতিক দল, তাদের সুবিধা এবং স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য। ধরা পড়ে গেলে দোহাই দিয়েছে পরিবর্তিত পরিস্থিতির। এই হাত মেলানোর সংস্কৃতির ঘনঘন নিঃশ্বাসে আমরা এত বেশি অভ্যস্ত এখন যে, গুলিয়ে ফেলি কে কার আপনজন-

"ইন্দ্র- "হ্যাঁ, আমি তৃণমূল করি। পরিষ্কার শুনে নাও- ওখানে যদি আমার ধান্দা ঠিকঠাক না পোষায় তাহলে কাল দরকার পড়লে ওই বিজেপি করব। রামমন্দির চাইব, করসেবা করব, ময়দানে গিয়ে হাফ প্যান্ট পরে মার্চ করব।"[৫]

বর্তমানে সিপিএম এক শূন্য পাওয়া দল। মানুষের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা, এলিটিজমের সুবিধাবাদ, মাটির সঙ্গে সংযোগরক্ষায় ব্যর্থতা এই দলকে এমন অবস্থায় এনে ফেলেছে। এই দলই একদিন আশার আলো দেখিয়েছিল, মানুষই সব। মেহনতি মানুষের শক্ত হাত এবং প্রান্তিক মানুষের মৌলিক অধিকারের লড়াই, একমাত্র এই পথেই 'সুজলাং সুফলাং' পৃথিবী সকলের কাছে ভোগযোগ্য হয়ে উঠবে। সেই দল তার পদস্খলনের পর আর উঠে দাঁড়াতে পারছে না। কেন? এর উত্তর, স্তালিন সব্যসাচীকে জানিয়ে দিয়ে যায়। পার্টিকে তিনি পৌরাণিক চরিত্র আন্টিয়াসের সঙ্গে তুলনা করেন। মাটি যার ভাগ্য নির্ধারক। আন্টিয়াসকে মাটি থেকে উপড়ে ফেললে তার মৃত্যু যেমন অনিবার্য তেমনভাবেই, পার্টি যখনই মানুষ বা মাটি থেকে চোখ ফিরিয়ে নেবে, সেই পার্টিরও মৃত্যু নিশ্চিত-

স্তালিন- "যতদিন পার্টি মাটি অর্থাৎ জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখবে, ততদিনই তারা অপরাজেয় থাকে। কিন্তু যে মুহূর্তে তারা মাটি অর্থাৎ জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ হারাবে, সেই মুহূর্তে তাদের পতন হয়ে উঠবে আসন্ন তথা অনিবার্য।"[৬]

নাটকে 'রাজেন' চরিত্রটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক চরিত্র, যার সংলাপের ভিতর দিয়ে সব্যসাচী জানতে পারছে পার্টির পুঁজিবাদী মানসিকতা এবং সময়কালীন পরিবর্তনের ইতিহাস। রাজেনকে প্রয়োজন ছিল সব্যসাচীর। কারণ, একইসঙ্গে কাজ করে চলা সমবয়সী এই বন্ধু চাক্ষুষ করেছে চারপাশের রাজনীতির বদলে যাওয়াগুলো। সব্যসাচীর এই অপরিচিত চারপাশের ভিতর স্ত্রী রাজলক্ষ্মী এবং বন্ধু রাজেন যেন খড়কুটোর মতো দুই অবলম্বন ও আশ্রয়ের জায়গা। রাজেন ইতিহাসের ক্রমিক সূত্রবাহক। পরপর তথ্য মিলিয়ে ভুলচুক, হঠকারিতা আর অন্ধবিশ্বাসের ফলাফল হিসেব-নিকেশ করে দেখিয়ে দিচ্ছে, ধরিয়ে দিচ্ছে সব্যসাচীকে। ডিওয়াইএফআই সম্পাদক যখন হাওড়ার শিষমহলে রাজ্যসম্মেলনে বক্তৃতা রাখছেন পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে। চাকরি সংস্থানের লক্ষ্যে। সেই সৎ দাবিগুলির পতন ঘটছে ক্ষমতা বদলের পরপরই। পুঁজিবাদের হাত ধরে, আন্দোলনের বিরুদ্ধে, বন্ধের বিরুদ্ধে কথা বলতে দেখা যাচ্ছে গণতন্ত্রের সরকারকে। সমসাময়িকতা থেকে বিচ্ছিন্ন সব্যসাচীকে এইসব অন্ধকার ও অন্ধ স্কুলে বেজে ওঠা ঘন্টার ধ্বনি শোনানোর জন্যই এমন 'ব্ল্যাকআউট' জোনের সৃষ্টি করেছিলেন নাটককার। ২০২৬ এ দাঁড়িয়ে আমরা সেই সব আদর্শচ্যুতিরই পুনরাবৃত্তি দেখে চলেছি প্রতিটি শাসকশ্রেণীর স্বভাব দিয়ে। চাকরিহীন, শিক্ষিত বেকার যুবতী-যুবকের দল ফ্যাতাড়ুর মতো হয়ে উঠতে পারছে না। জীবিকার দিশা পেতে কুটিরশিল্প নির্মাণের নামে খাওয়ারের ঠেলাগাড়ি সামলায়, নয়তো রুচিহীন রিলে ফলোয়ার বাড়িয়ে উপার্জনের পথ করছে প্রশস্থ।

এই সময়ের বুকে যে শব্দটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত তা হল 'অরাজনৈতিক'। রাজনীতির থাবা সময়কে এতটাই ভয় দেখিয়েছে যে মানুষ কোনো পক্ষ নিতে পারছে না। নাটকে সব্যসাচীকে ক্রমাগত যেন অতীতমুখী বর্তমান বলে চলেছে 'পক্ষ নিন সব্যসাচী, পক্ষ নিন'। কোনো একটা পক্ষ না নিলে সমাজে টিকে থাকা যাবে না। এই পক্ষহীনতার কনফিউশন ধীরে ধীরে আজ হয়ে উঠেছে একপ্রকার সুবিধাবাদী রাজনীতি। সে কথা সব্যসাচীরা জানতে পারেনি, জানিয়ে দিয়েছে এই একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক। অরাজনৈতিক বুদ্ধিজীবীরা যেভাবে সমস্ত রকম কঠিন পরিস্থিতিতে নিরপেক্ষ থাকে। মৃত্যু উপত্যকাময় এই দেশে হাজার টুনিবাল্বের উদযাপনে বিভোর বুদ্ধিজীবীসমাজ সেই অতীত থেকে সুবিধাবাদী রাজনীতিতে মকশো করতে করতে বর্তমানে হয়ে উঠেছে আরো বেশি প্রখর। অন্যায়ের সময় মুখ ঢেকেছে এবং তারপর সেই অন্যায়কারীর আমন্ত্রণে মঞ্চ আলো করে বসেছে। নাটকের ভিতর ২৫ বছর আগের সব্যসাচী যখন বিড়বিড় করে বলে চলেছে 'উই আর স্টাভট ম্যান উই আর হলোম্যান', তখন একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে দাঁড়িয়ে নাটকের ইন্দ্রাণীর মতোই বর্তমান যুবসমাজ বোকা সেজে, হালফ্যাশন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল সেজে, চারপাশ সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে বেশ কাটিয়ে দিচ্ছে সময়। বুদ্ধিজীবীরা থাকছে সুবিধাবাদী নিরপেক্ষ-

> "One day/ the apolitical intellectuals/ of my country will be interrogated/ by the simplest of our people. /They will be asked what they did/ when their nation died out slowly."[৭]

অরাজনৈতিক বুদ্ধিজীবীদের আজ সত্যিই সাধারণ মানুষ এসে প্রশ্ন করে চলেছে, মাটি মানুষ দেশের দুরবস্থায় আপনাদের অ্যাবসার্ডিজম, শূন্যবাদ নিয়ে যুক্তি-তর্ক সংস্কৃতি বোধ ঠিক কোন কাজে লাগছে? এর উত্তর কিন্তু লেখক ব্রাত্য বলিয়ে নিচ্ছেন নাটকের মুখ্য চরিত্র সব্যসাচীর মুখ দিয়েই। সব্যসাচী বলছেন, এলিয়েনেশন সাধারণ মানুষেরও হয়। এ শুধু খেটে খাওয়া মজুর ও বুদ্ধিজীবীদের সম্পত্তি নয়। না পেতে পেতে, বিশ্বাসের চ্যুতি দেখতে দেখতে, চোখের সামনে আদর্শের ধরাচূড়া খসে পড়া সিস্টেমের সঙ্গে যুঝতে না পেরে, ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্নতাবোধ গ্রাস করে চলে সাধারণ মানুষকেও। আর সেই বীজ থেকেই জন্ম হয় ইন্দ্রদের, যাদের সিনড্রোম 'কনফিউশন'। কিছু বুঝতে না পারার ধাঁধা। এই সিন্ড্রোমে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত ২১ শতকের দ্বিতীয় দশক। এলিয়েনেশনে বিপর্যস্ত, বিপন্ন এই জেনারেশন। এর প্রতিমুহূর্তে পরিচয় পাওয়া যায় স্কুল কলেজের ক্লাসরুমে। ডিগ্রি নিতে আসা শয়ে শয়ে ছাত্রছাত্রীর চাহনির জগতে প্রবেশ করতে পারে না অধ্যাপকেরা। এই জেনারেশন জানে না আদৌ তার কোনো নিজস্ব জগৎ নির্মাণ হয়েছে কিনা। প্রতিটি চাহনি যেন বিপদসীমার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে। শিকড়হীন এক উদ্বাস্তু মনোযোগে সংক্রামিত ছাত্রসমাজ। সিলেবাসের যে কোনো মডিউলের যত তীব্র ব্যবচ্ছেদই হোক না কেন তাদের কাছে সেইসব তত্ত্ব অপ্রয়োজনীয়, অনাবশ্যক, অনিচ্ছার জন্ম দেয়। এমনকী এই হলোম্যানিজম আজ এতটাই ভয়াবহ যে এই সময়ের শিক্ষার্থীর ৮০ শতাংশ একথাও বুঝতে পারে না যে তারা আদৌ কিছু বুঝতে পারছে কিনা। এই প্রসঙ্গ থেকে ইন্দ্রের কাছে আবার ফিরে আসা যাক। সে তার বাবাকে জানাচ্ছে বাবা'র না চিনতে পারার সময় সম্পর্কে। এই সময় আসলে তথ্যের তোতাপাখি। পৃথিবীতে এখন নামহীন, পরিচয়হীন, প্রান্তিক মানুষের হ্যাভনট শ্রেণি নিয়ে কেউ ভাবে না। এই সমাজে এখন দুইধরনের মানুষের বসবাস। ইনফরমেশন হ্যাভস আর ইনফরমেশন হ্যাভনটস।

শুধুমাত্র রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা, পালাবদল বা দ্বিচারিতা ধরতে পারছেন না সব্যসাচী, এমন নয়। আর কী কী ধরতে পারছেন না সব্যসাচী? এই ২৬ বছরের সময়প্রবাহে এসে পড়েছে কম্পিউটার, ইন্টারনেট, টেলিফোন, স্যাটেলাইটের যোগাযোগ এবং বিশ্বায়নের বিপুল পণ্যের সম্ভার। পৃথিবী নামক ছোট্ট একটি গ্রামে হাট বসেছে শুক্রবারে। প্যাকেজিংয়ের চোখ ধাঁধানো মোড়কে বিভোর হয়ে থাকছে সমাজ। ভুলে যাচ্ছে খোঁজ নিতে যা আছে

তা টাটকা না বাসি? যা আছে, তা কি আদৌ নিত্যদিনের প্রয়োজনীয়? এই সর্বগ্রাসী বিশ্বায়নের থাবায় বেড়ে চলেছে শপিংমল, ফাটকাবাজি, বিজ্ঞাপন, প্রতারণা আর বিলুপ্ত হয়ে চলেছে শংকর মুদিদের দোকানপাট। এই ব্যবস্থার শুরু নয়ের দশক থেকেই-

> "বদ্রিলারের মতে, মার্ক্সীয় 'মোড অফ প্রোডাকশন'-এর ব্যাখ্যা এখানেই কনজিউমার সংস্কৃতিকে বোঝার পক্ষে অসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। কনজিউমারিজম আসলে কতকগুলো 'চিহ্ন'র চেইন সিস্টেম যা প্রত্যেক মুহূর্তে জনসমাজকে বিশ্লিষ্ট করেছে।... পণ্যের মোড়ক নির্ধারণ করে দিচ্ছে তার বাজার দর, পণ্যের অন্তর্বস্তু এখানে নিরর্থক।... 'হাইপাররিয়াল'-এর ব্যাখ্যায়, যেখানে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার বিজ্ঞাপনে হয়ে ওঠে একমাত্র 'সত্য'। বাস্তবের অপমৃত্যু ঘটে। এরই হাত ধরে উচ্চ এলিট সংস্কৃতি আর নিম্ন লোকসংস্কৃতির ভেদরেখা ক্রমাগত ঘুচে যেতে থাকে।"[৮]

২৫ বছর আগে লেখা এই নাটক কি শুধুই প্রশ্ন করতে শেখায়? একুশ শতকের দ্বিতীয় দশক কি ক্রমে আরো ঘনিষ্ঠভাবে হলোম্যানেই পরিণত হবে, এবং এই 'নেইবাদ'কেই সময়ের দাবি বলে গ্রহণ করে নেবে? যেখানে বিবেক ও অন্ধকারকে সমার্থক শব্দ বলে মনে হয় না? এই উত্তেজনা, অস্থিরতা ও নিরাশার ভিতর আমাদের ফেলে রেখে যেতে চাননি নাটককার। তাই, ইন্দ্র এসে সান্ত্বনা দিতে চায় সব্যসাচীকে। সব্যসাচী গেয়ে ওঠে শিকল ভাঙার গান। ইউটিউবে নাটকটি দেখতে দেখতে মনে হলো, ইন্দ্রও যেন সব্যসাচীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে ফেলছে, হয়তো ভুল করেই। হয়তো অবচেতনে এখনও সুস্থ পৃথিবীর, নিশ্চয়তায় ভরা প্রজন্মের স্বপ্ন দ্যাখে ইন্দ্ররা। এই অবচেতন যখন কণ্ঠে রূপ পায়, তখন আদর্শবাদী সব্যসাচীরাই যেন বলে ওঠে-

> "আমারও হাতে দেখো বৃদ্ধ বলিরেখা কপালে উঠেছে ভ্রূকুঞ্চন
> অতল গভীরে মৃত্যু বাসা বাঁধে পদধ্বনি তার আসন্ন
> আমারই ধ্বংসে তোমার উত্থান ভূমিতে পা রাখো হে সন্তান।
> কপালে চুমো খাব আবার জন্মাব তোমারই মাঝে আমি ভবিষ্যত"[৯]

অতএব সময়ের দাবি মেনে প্রখর ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার বয়ান রূপে 'উইঙ্কল টুইঙ্কল'-এর মতো নাটক আরো বহুবার লিখে যেতে হবে। লিখতে হবে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য। লিখতে হবে বর্তমান সমাজে সময়ের বদল, অবক্ষয়, ক্ষত এবং ক্ষতিগুলিকে চিনে নেওয়ার জন্য। এই দায়িত্ব প্রতিজনের উপর বর্তায়। তবে বলাই বাহুল্য, প্রতিজন এমন তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণী শক্তিসম্পন্ন দ্রষ্টা এবং স্রষ্টা নন। তথাকথিত অরাজনৈতিক এই প্রজন্মকে সমসাময়িক সামাজিক, পারিবারিক এবং মানসিক রাজনীতির তুখোর দাবার চালগুলি বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য প্রয়োজন একাধিক 'উইঙ্কল টুইঙ্কল'এর মতো নাটকের। আমরা তাই তাকিয়ে থাকি এই নাটকের স্রষ্টা ব্রাত্য বসুর দিকে। তিনি কী বলছেন?-

"প্রশ্ন; আর একটা 'উইঙ্কল টুইঙ্কল'এর কথা ভাবেন?
উত্তর- আমি তো উইঙ্কল টুইঙ্কল সিরিজ লিখব ভাবছি! আমার ইচ্ছা আছে।"[১০]

তথ্যসূত্র:

১। গোস্বামী, জয়। কবিতা সংগ্রহ উন্মাদের পাঠক্রম, সৎকার গাথা। পঞ্চম মুদ্রণ, ২০১৮, পৃ. ১১৭।
২। বসু, ব্রাত্য। নাটকসমগ্র, উইঙ্কল টুইঙ্কল। ২০১৭, আনন্দ প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ২৫৬।
৩। তদেব, পৃ.২৮০।
৪। তদেব, পৃ. ২৪৯।

৫। তদেব, পৃ. ২৫০।

৬। তদেব, পৃ. ২৭৭।

৭। Castillo, Otto Rene. Marxism and Art. Literature Marxist Internet Archive.

৮। সাহা, অর্ণব। ব্রাত্য-অবিকল্প নাট্যপুরুষ, সংকলন ও সম্পাদনা অর্ণব সাহা, রিক্ত, অষ্টাবক্র সময়ের রাজনীতি। উদার আকাশ প্রকাশনী, ২০২৫, কলকাতা, পৃ. ৮।

৯। বসু, ব্রাত্য। নাটকসমগ্র, মৃত্যু ঈশ্বর যৌনতা। আনন্দ প্রকাশনা, ২০১৭, কলকাতা, পৃ. ৩০০।

১০। মুখার্জি, প্রদীপ্ত। ব্রাত্য-অবিকল্প নাট্যপুরুষ। সংকলন ও সম্পাদনা অর্ণব সাহা, নানারূপে ব্রাত্য, উদার আকাশ প্রকাশনী, ২০২৫, কলকাতা, পৃ. ৩৫৮।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1063-1070
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.323

পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা

ভবেশ চন্দ্র মুর্ম্মু, *গবেষক, সাঁওতালি বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 09.03.2026; Accepted: 13.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The ancient or primitive inhabitants of the tribal people have a tradition of living together in an organized manner, keeping their language, culture and traditions alive, from that time to the present. This process of organizing or living together is different in different ethnic groups of the tribal people. The tribal people choose the places or places where they consider suitable for living; where there is abundance of water. There is flat land suitable for cultivation. There are delicious fruits and root forests to satisfy their hunger. There is no fear of any obstacle or danger to spend their lives. They choose such places. They live permanently in that place. If they do not face any obstacle or danger, they do not shift their residence. The tribal people belong to different castes or communities. They live by establishing different caste-based rural environments by identifying their own ethnic identity. The importance and contribution of the knowledge and epistemology of the tribal ancestors in creating this rural environment is immense. They have created or established village management systems or rules by creating each village. This is an incomparable contribution among the tribals. In this research paper, I have tried to present the theory of knowledge through research only on the village organization system of the tribals of West Bengal. Where what kind of customs, rules and management are there in the village organization system of the tribals of West Bengal? If any problem arises in the daily life of the tribals through that management, by what process do they solve that problem? What is the condition of this village organization system in the present generation and what kind of evidence is being reflected? The main aim and objective of this research paper is to explore and present the answers to such research questions.

Keywords: Identity of the tribal people of West Bengal, village structure, village organization system, village governance, nature of current village organization

আমার এই গবেষণার বিষয় ‘পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা’ দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছি। এ বিষয়ে আদিবাসী পূর্বপুরুষদের যে জ্ঞানতত্ত (Epistemoogy) প্রতিফলিত হয়েছে গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা সম্পর্কে; তা কিন্তু অতুলনীয়। আদিবাসীরা কিরকম স্থানে গ্রাম স্থাপন করেন এবং গ্রাম কিভাবে পরিচালনা করলে, ঐ গ্রামের মানুষজন তাদের যে সংস্কৃতি চেতনা গুলো রয়েছে; তা নিখুঁত ভাবে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হবে। এই যে জ্ঞানতত্ত আদিবাসী পূর্বপুরুষ তৈরী করে গেছেন, তা কিন্তু পুঁথিগত শিক্ষাহীন মেরুদন্ডে মহামূল্য জ্ঞান আবিষ্কার। জাতিসত্তাকে বাঁচিয়ে রাখার মহান এই কার্য ও কৌশল বেঁধে দিয়ে গেছেন। জাতিভিত্তিক মানুষকে

বেঁচে থাকতে হলে সংস্কৃতির আধারে যে নিয়মাবলী রয়েছে, তা মেনে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমি এখানে পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের মধ্যে নয়টা (৯) জাতি বা সম্প্রদায় এর গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থার বিভিন্ন জ্ঞান উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি। তথ্য সংগ্রহের কৌশল হিসাবে আদিবাসী সমাজ সম্পর্কে বিভিন্ন মূল্যবান গ্রন্থ থেকে জ্ঞান নেওয়া হয়েছে। সেই জ্ঞান ভান্ডার থেকে গ্রাম সংগঠন বিষয়ে বিভিন্ন মূল্যবান যে ব্যবস্থা গুলো রয়েছে তা বিশ্লেষণ করে, বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় মনে করে এই বিষয় গবেষণা করেছি।

পুরো বিশ্ব জুড়ে আদিবাসীরা তাদের অমুল্য সম্পদ ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রেখে বসবাস করে চলেছেন। বর্তমানে পুরো বিশ্বে উইকিপিডিয়া এর তথ্য অনুযায়ী ৪৭৬ মিলিয়ন আদিবাসী রয়েছেন। কারা এই আদিবাসী? আদিবাসী বলতে কাদেরকে বোঝায়? এ বিষয়ে ডঃ রিভার্স বলেছেন–

> "তারা সমাজের এমন একটি গোষ্ঠী যাদের জীবনে জটিলতা নেই, যারা এখনও একই ভাষা বলে মনের ভাব প্রকাশ করে, যাদের আকৃতি বা সংস্কৃতিগত সাদৃশ্য আছে, নিজেদের নিয়ম-কানুন রক্ষার জন্য যাদের পঞ্চায়েত আছে এবং প্রয়োজন হলে যারা গোষ্ঠী সচেতন মনোবৃত্তি নিয়ে যুদ্ধবিগ্রহ বা সংগ্রাম করে থাকে।"[১]

আবার এ বিষয়ে পিডিংটন এর উক্তি–

> "তারা এমন এক গোষ্ঠীর মানুষ যারা একই ভাষায় কথা বলে, একই অঞ্চলে বসবাস করে এবং যাদের সাংস্কৃতিক জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্য (Homogenity) বিদ্যমান।"[২]

অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার আদিবাসী সম্পর্কে বলেছেন–

> "আদিবাসী সমাজ হল কয়েকটি পরিবারের সমষ্টি অথবা এক গোষ্ঠীর পরিবার, যাদের নামের সমতা থাকে, সদস্যরা একটি নির্দিস্ট অঞ্চলে বসবাস করে, একই ভাষায় কথা বলে এবং একই রুপ বিবাহভিত্তিক ও পেশাভিত্তিক ধর্মীয় বাধা নিষেধ মেনে চলে এবং নিজেদের মধ্যে বাধ্যবাধকতা, সামঞ্জস্য ও আদান-প্রদান করে থাকে।"[৩]

এই মহান ব্যক্তিদের উক্তি দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, আদিবাসী বলতে তাদেরকে বলা হয় যদের ভাষা একই রকম, একেক রকম সংস্কৃতি মেনে চলে এবং একেকটা অঞ্চলে সহজ, সরল ভাবে জীবন যাপন করে থাকে। আদিবাসীরা নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক।

আদিবাসীরা নিজস্ব গ্রাম্য পরিবেশ গঠন করে বসবাস করে থাকেন। একত্রে একটা নির্দিষ্ট গ্রামে বসবাস করার উদ্দেশ্যে ঐ গ্রাম পরিচালনার জন্য কয়েকজন ব্যক্তির দায়িত্ব ও অবদান রয়েছে। যেটা গ্রাম সংগঠন নামে পরিচিত। আদিবাসীদের মধ্যে এই গ্রাম সংগঠন প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয়েছে, সেই আদিমকাল হতে পূর্বপুরুষের হাত ধরে। আমি এখানে পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের মধ্যে নয়টা (৯) জাতি বা সপ্রদায়ের গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে তাদের জ্ঞানকে তুলে ধরছি। সেই জাতি বা সম্প্রদায় গুলো হল– লোধা, খাড়িয়া, শবর, হো, বিরহড়, মুন্ডা, সাঁওতাল, মাহালি ও কোড়া। আমি প্রথমে লোধা সম্প্রদায়ের গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করছি। ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে বলেছেন–

> "লোধা শব্দটি সম্ভবতঃ সংস্কৃত 'লুব্ধক' শব্দ থেকে এসেছে। 'লুব্ধক' মানে ব্যাধ।"[৪]

এই উক্তির দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, লোধা সম্প্রদায় শিকার এর সাথে বিশেষ ভাবে যুক্ত। শিকারই তাদের পেশা। এই জাতির সংস্কৃতির আধারে নিজস্ব গ্রাম সংগঠন রয়েছে। যেটা পঞ্চায়েত ব্যবস্থা বলেও জানা যায়। এই ব্যবস্থাতে পঞ্চায়েত প্রধানকে 'মুখিয়া' বলা হয়। তিনি গ্রামের সর্বোচ্চ সসম্মানীয় পদাধিকারি ব্যক্তি। ঐ গ্রামের সকল সদস্যের দায়িত্ব এই 'মুখিয়া' এর উপর বিন্যস্ত থাকে। পুরো গ্রামকে তিনি পরিচালনা করেন।

ঘরে ঘরে বিবাদ বা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলে, তার সমাধান কিন্তু এই 'মুখিয়া' করে থাকেন। এছাড়াও গ্রাম পরিচালনাতে আর এক ব্যক্তির অবদান রয়েছে, তিনি হলেন বার্তাবাহক। গ্রামে কোন সমস্যা দেখা দিলে তিনিই বার্তা আদান প্রদান করেন। এই বার্তাবাহক 'ডাকুওয়া' নামে পরিচিত। এছাড়াও গ্রামে পুজো অর্চনা করার জন্য একজন পুরোহিত থাকেন। পুরোহিতকে বলা হয় 'দেহরি বা দিহরি'। এই 'দেহরি বা দিহরি' লোধা সম্প্রদায়েরি একজন হয়ে থাকেন। এই গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থাপনা একটা ছকের সাহায্যে দেখালাম–

ছক নং– ১

পদের নাম	পদাধিকারি নাম
১। গ্রাম প্রধান	মুখিয়া
২। বার্তাবাহক	ডাকুওয়া
৩। পুরোহিত	দেহরি বা দিহরি

'হো' আদিবাসী জাতি বা সম্প্রদায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে বা প্রান্তে বসবাস করেন। গ্রাম্য পরিবেশ গঠন করে গ্রাম পরিচালনার চিত্র কিন্তু এই হো সমাজেও বর্তমান। হো জাতির ক্ষেত্রেও এই গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থাতে কয়েকজন সসম্মান পদাধিকারি ব্যক্তির অবদান রয়েছে। তাদের হাতেই কিন্তু গ্রাম পরিচালনার পুরো দায়িত্ত থাকে। হো সম্প্রদায়ের গ্রাম প্রধানকে 'মুন্ডা' বলা হয়। গ্রামের যে কোন জটিল সমস্যা তিনিই বিচার করে সমাধান করে থাকেন। এছাড়াও সংস্কৃতির বিভিন্ন কার্যকলাপ তিনিই পরিচালনা করেন। এছাড়াও গ্রাম প্রধানের একজন সহায়ক থাকেন। তাকে 'ডাকুওয়া' বলা হয়। গ্রাম পরিচালনার বিভিন্ন কাজে তিনি 'মুন্ডা'কে সহযোগিতা করে থাকেন। এছাড়াও আর একজন ব্যক্তির অবদান রয়েছে, তিনি হলেন 'দিওরি'। অর্থাৎ তিনি গ্রামের পুজো ব্যপারে সক্রিয় থাকেন। প্রত্যেক পদাধিকারি ব্যক্তি সংস্কৃতির দর্পণে বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। হো সম্প্রদায় এর গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা একটা ছকের সাহায্যে দেখালাম–

ছক নং– ২

পদের নাম	পদাধিকারি নাম
১। গ্রাম প্রধান	মুন্ডা
২। গ্রাম প্রধান সহায়ক	ডাকুওয়া
৩। পুরোহিত	দিওরি

'বিরহড়' আদিবাসী সম্প্রদায় মুলত পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলাতেই বসতি লক্ষ্য করা যায়। এই সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও কিন্তু গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা রয়েছে। এই গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা কিন্তু বিরহড় সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে গোষ্ঠীপ্রধান ব্যবস্থা নামে পরিচিত। গোষ্ঠীপ্রধান ব্যবস্থা নামের কারণ হল একাধিক গোত্রের মানুষ বসবাস করেন বলে। এই গোষ্ঠীপ্রধান ব্যবস্থাতে গোষ্ঠীপ্রধান এর সর্বোচ্চ সসম্মান পদাধিকারি ব্যক্তি হলেন 'নায়া'। এই 'নায়া' এর উপরেই কিন্তু গ্রাম দেখাশোনার সকল দায়িত্ত দেওয়া থাকে। সামাজিক যে কোনো সমস্যা তিনিই বিচার এর মাধ্যমে সমাধান করে থাকেন। গ্রামের ভালো ও খারাপ দিক গুলো পর্যালোচনা করেন। 'নায়া'কে বিশেষ ভাবে সাহায্য করার জন্য একজন ব্যক্তি থাকেন। তিনি হলেন 'কোতওয়ার বা দিগুওয়ার'। এই 'কোতওয়ার বা দিগুওয়ার' গ্রামের বার্তাবাহক রূপেও কাজ করে থাকেন। গ্রামের পুজোর ব্যাপারে বাড়তি দায়িত্ত 'নায়া' এর উপরেই বিন্যস্ত থাকে। বিরহড়দের গ্রাম সংগঠন বা গোষ্ঠীপ্রধান ব্যবস্থার একটা চিত্র ছক এর মাধ্যমে দেখানো হল–

ছক নং– ৩

পদের নাম	**পদাধিকারি নাম**
১। গোষ্ঠীপ্রধান	নায়া
২। বার্তাবাহক	কোতওয়ার বা দিগুওয়ার
৩। পুরোহিত	নায়া (বাড়তি দায়িত্ব)

'মুন্ডা' আদিবাসী সম্প্রদায় পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বসবাস করে আছেন। এই 'মুন্ডা' সম্প্রদায়-এর ক্ষেত্রেও নিজস্ব গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা রয়েছে। সংস্কৃতির আধারে তাদেরও গ্রাম পরিচালনার রীতিনীতি রয়েছে। সামাজিক কার্যকলাপ সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করার জন্য এই গ্রাম সংগঠনের গুরুত্ব অপরিসীম। মুন্ডা গ্রাম পরিচালনার মূল দায়িত্বে যিনি থাকেন, তাকে বলা হয় 'মুন্ডা'। এই 'মুন্ডা' এর দ্বারাই গ্রামের সকল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যার সমাধান করে থাকেন। অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ সম্মান তিনি পেয়ে থাকেন। এছাড়াও একজন বার্তাবাহক থাকেন, যার নাম 'মাহাতো'। গ্রামে দ্বন্দ্ব, ঝগড়া ও বিবাদের মতো কোন সমস্যা দেখা দিলে; তিনি এই বার্তা ঘরে ঘরে প্রেরণ করেন বিচারের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের বিষয়ে। এছাড়াও গ্রামের পুজো ব্যাপারে একজন পুরোহিত থাকেন, যার নাম 'পাহান'। এই পাহান গ্রামের সমস্ত সামাজিক পুজো অর্চনার ভূমিকা পালন করে থাকেন। আবার মুন্ডা সমাজে অনেকগুলো গ্রাম নিয়ে একটা 'পাড়হা' গঠিত হয়। এই 'পাড়হা' এর একজন প্রধান থাকেন যার নাম 'পাড়হা রাজা'। 'পাড়হা রাজা' এর একজন সহায়ক থাকেন, যিনি হলেন 'দেওয়ান'। 'পাড়হা রাজা ও দেওয়ান' একি সঙ্গে সহযোগিতা দিয়ে গ্রামের সকল জটিল সমস্যা গুলো সমাধান করে থাকেন। মুন্ডা সম্প্রদায় এর গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা একটা ছকের সাহায্যে দেখালাম–

ছক নং– ৪

পদের নাম	**পদাধিকারি নাম**
১। মুন্ডা প্রধান	মুন্ডা
২। বার্তাবাহক	মাহাতো
৩। পুরোহিত	পাহান
৪। পাড়হা প্রধান	পাড়হা রাজা
৫। পাড়হা প্রধান	দেওয়ান

সাঁওতাল আদিবাসী সম্প্রদায় পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত আদবাসীদের তুলনায় বেশি ঘনবসতি লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক জেলাতেই সাঁওতাল সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রয়েছে। এদেরও সাংস্কৃতিক আধারে গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা রয়েছে। একটা গ্রামকে পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন পদ অনুযায়ী কার্যনির্বাহী ব্যক্তিবর্গরা রয়েছেন। এই গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা সাঁওতাল সম্প্রদায়ের কছে 'মাঝি ব্যবস্থা' বা 'আতো মড়ে হড়' (Majhi system) ব্যবস্থা নামে পরিচিত। তার উপরে যে ব্যবস্থা রয়েছে তা হল 'মাঝি পারগানা ব্যবস্থা। সংস্কৃতি অনুযায়ী প্রত্যেক গ্রামেই এই ব্যবস্থা রয়েছে। এই মাঝি ব্যবস্থাতে পাঁচ সদস্যের অবদান রয়েছে। যেটাকে তাদের ভাষায় 'আতো মড়ে হড়' নামে পরিচিত। এই ব্যবস্থাতে সর্বোচ্চ পদাধিকারী হলেন 'মাঝি'। 'মাঝি' এর হাতেই গ্রাম চালনার সকল দায়িত্ব বহাল থাকে। গ্রামে ঝগড়া, বিবাদ ও দ্বন্দ্বের মতো সমস্যা তৈরি হলে 'মাঝি' বিচার এর মাধ্যমে সমস্যা গুলোকে সমাধান করে থাকেন। সংস্কৃতির বিভিন্ন কার্যে 'মাঝি' এর অবদান

অপরিসীম। 'মাঝি' এর পরবর্তী সদস্য হলেন 'পারানিক'। পারানিক এর কার্য হল 'মাঝি' এর অনুপস্থিতিতে তার কার্য সম্পাদন করা। এক কথায় 'মাঝি' এর সহযোগী হলেন 'পারানিক'। পারানিক এর পরবর্তী সদস্য হলেন 'জগ-মাঝি'। এই জগ-মাঝি এর কার্য হল গ্রামের সকল যুবক ও যুবতিদের পাহারাদার। সংস্কৃতির নিয়মানুসারে যুবক, যুবতিদের জ্ঞান সচেতন মুলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করানো ও সামাজিক মূলক শিক্ষা-দীক্ষা প্রদান করা। জগ-মাঝি এর পরবর্তী সদস্য হলেন 'গডেত'। 'গডেত' এর কার্য হল বার্তা আদান প্রদান করা। প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে বিশেষ সামাজিক কার্য এর বার্তা দিয়ে থাকেন। 'গডেত' এর পরবর্তী সদস্য হলেন 'নায়কে'। যিনি সামাজিক পুজা অর্চনার কার্য করে থাকেন। এই পাঁচ বর্গের সদস্য গ্রামকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করেন। এছাড়াও সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সংস্কৃতিতে তিন বা ততোধিক গ্রাম নিয়ে একটা 'পীড়' গঠিত হয়। আবার অনেক গুলো 'পীড়'কে নিয়ে একটা 'তল্লাট' গঠিত হয়। তল্লাট এর উপরে 'মুলুক' গঠিত হয়। প্রত্যেক ভাগের একজন করে মূল দায়িত্বে থাকেন। তাদেরকে 'পারগানা' বলা হয়। পারগানা এর কার্য হল বিভিন্ন বিচার আচার সুষ্ঠ ভাবে সম্পাদন করা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ঐতিহ্য রক্ষা করা। সাঁওতাল সম্প্রদায় এর গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা একটা ছকের সাহায্যে দেখালাম–

ছক নং– ৫

পদের নাম	**পদাধিকারি নাম**
১। গ্রাম প্রধান	মাঝি
২। গ্রাম প্রধান সহায়ক	পারানিক
৩। যুবদের পাহারাদার	জগ-মাঝি
৪। বার্তাবাহক	গডেত
৫। পুরোহিত	নায়কে

'মাহালি' আদিবাসী সম্প্রদায় পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলা গুলোতেই বসবাস করেন। মূলত মেদিনীপুর ও জলপাইগুড়ি জেলাতে এদের বসবাস এর সংখ্যা সবথেকে বেশি। মাহালি সম্প্রদায় বেশির ভাগই সাঁওতাল গ্রামের আশেপাশে ও তাদের গ্রামেই বাড়ি ঘর তৈরি করে বসবাস করেন। স্যার এইচ, এইচ রিজলে বলেছেন– "মাহালিরা সাঁওতালদেরই এক বিচ্ছিন্ন শাখা।"[৫] তাই তাদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানান্তে সাঁওতাল সম্প্রাদায়ের ব্যবস্থাতেই সমাধান করে।

'কোড়া' আদিবাসী সম্প্রদায় পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই কম বেশি বসবাস করেন। তবে দার্জিলিং জেলাতে তাদের অস্তিত্ব বেশি পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। কোড়া সম্প্রাদায় অন্যান্য আদিবাসীদের মতোই তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি অনুযায়ী গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা রয়েছে। একটা গ্রাম পরিচালনায় নিজস্ব রীতিনীতি রয়েছে। গ্রাম পরিচালনায় গ্রাম প্রধানের দায়িত্বে যিনি থাকেন তাকে 'মাহাতো' বলা হয়। তাঁর হাতেই পুরো গ্রামের সকল ভালো-মন্দ বিন্যস্ত থাকে। এছাড়াও 'মাহাতো' সহকারী একজন থাকেন, যার নাম 'পারমানিক'। মাহাতোকে বিভিন্ন সামাজিক কার্যে সহায়তা করে থাকেন। এছাড়াও একজন বার্তাবাহক থাকেন। যিনি গ্রামের সামাজিক বিভিন্ন কার্যকলাপের বার্তা বাড়িতে বাড়িতে প্রেরণ করে থাকেন। তাকে 'গেড়াইত' বলা হয়। এছাড়াও গ্রামের সকল সামাজিক পুজা সম্পন্ন করার জন্য একজন পুরোহিত থাকেন, যার নাম 'পারমানিক'। এখানে পারমানিক দুইটা দায়িত্ব সামলান। এছাড়াও মাহাতো, পারমানিক, গেড়াইত এদের কার্যে বিশেষ ভাবে সহায়তা করার জন্য একজন থাকেন, যার নাম 'নেকি'। কোড়া সমাজে এই গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থার উপরে 'টোঠা পঞ্চায়েত' থাকে। গ্রাম পঞ্চায়েত এর কোন জটিল সামাজিক সমস্যা সমাধান

না হলে সেটিকে 'টোঠা পঞ্চায়েত'এ সমাধান করা হয়। এই টোঠা পঞ্চায়েত এ কিছু পদাধিকারি ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন। যিনি টোঠা পঞ্চায়েত এর প্রধান থাকেন, তিনি হলেন 'পাঁড়ে'। এছাড়া দেওয়ান এর কার্য যিনি করেন তাঁকে 'ছেড়িদার' বলা হয়। এছাড়াও একজন অঞ্চল তত্ত্বাবধায়ক থাকেন যার নাম 'এইন মড়ল'। এই ভাবে কোড়া সম্প্রদায় সমাজে গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা রয়েছে। তা একটা ছকের মাধ্যমে দেখান হল –

ছক নং –৬

পদের নাম	**পদাধিকারি নাম**
১। গ্রাম প্রধান	মাহাতো
২। গ্রাম প্রধান সহায়ক	পারমানিক
৩। বার্তাবাহক	গেড়াইত
৪। পুরোহিত	পারমানিক
৫। সকল সদস্যের সহায়ক	নেকি

'খাড়িয়া' আদিবাসী সম্প্রদায় পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও মেদিনীপুর জেলাতে বেশি পরিমানে বসবাস করেন। অন্যান্য জেলা গুলোতে সংখ্যার তুলনায় কম। এই খাড়িয়া সম্প্রদায়-ও বসবাস করার জন্য নিজস্ব গ্রাম স্থাপন করেন। সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আধারে এদেরও কিন্তু গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা রয়েছে। কিভাবে একটা গ্রামকে পরিচালনা করতে হয়, তা কিন্তু খাড়িয়া সম্প্রদায় এর পূর্বপুরুষেরা তৈরি করে দিয়ে গেছেন। খাড়িয়া সম্প্রদায় মুলত তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত। ১) পাহাড়িয়া খাড়িয়া, ২) দুধ খাড়িয়া ও ৩) ঢেলকি খাড়িয়া। নিজস্ব গ্রাম পরিচালনা করার জন্য পঞ্চায়েত ব্যবস্থা রয়েছে। এই ব্যবস্থার প্রধানকে 'দিহুরি' বলা হয়। এই 'দিহুরি'র হাতেই কিন্তু পুরো গ্রামের দেখা শোনার ভার থাকে। এছাড়াও সামাজিক পুজো ক্রিয়া কলাপের জন্য এই 'দিহুরি'ই পুরোহিতের কার্য করে থাকেন। এছাড়াও পঞ্চায়েত ব্যবস্থাতে দুটো ভাগ রয়েছে। ১) পাহরা পঞ্চায়েত, ২) কুতমার পঞ্চায়েত।

'শবর' আদিবাসী সম্প্রদায় পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম দিনাজপুর ও পুরুলিয়া জেলাতেই তাদের বেশি পরিমাণে বসবাস লক্ষ্য করা যায়। অন্যান্য জেলা গুলোতেও কম বেশি ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করেন। তাদেরও সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আধারে নিজস্ব গ্রাম পরিচালনার জন্য গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা রয়েছে। গ্রাম পরিচালনার প্রধানকে বলা হয় 'প্রধান'। গ্রামের সকল সমস্যা ও শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব এই প্রধানের উপরেই বিন্যস্ত থাকে। এছাড়াও একজন বার্তাবাহক থাকেন যার নাম 'গড়েত'। এছাড়া গ্রাম পরিচালনায় আর কোন সদস্যের সন্ধান পাওয়া যায় না।

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান প্রাপ্ত হল। এবার এই গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা সেকাল ও একাল এর একটা চিত্র তুলে ধরছি। সেকাল বলতে আমি এখানে ভারত স্বাধীনতা লাভের পূর্বের কথা বলতে চাইছি। কারণ ভারত স্বাধীনতা লাভের প্রক্কালে দেশীয় শাসন ব্যবস্থা জারি ছিল না। বৃটিশ শাসনের অধীনে ছিল। সেই সময়ে দেশীয় প্রত্যেকটা আদিবাসী সম্প্রদায় নিজস্ব জাতিসত্তা সুস্থ ও সবল ভাবে বাঁচতে এই রকম সাংস্কৃতিক রীতিনীতি নিয়মাবলী তৈরি করেছিলেন। এটা একটা জাতির ঐতিহ্য মেরুদন্ড। একক জাতি হিসাবে বেঁচে থাকা নিজস্ব সংস্কৃতি চেতনার দ্বারা জাতিসত্তার পরিচয় বাঁচিয়ে রাখা ইত্যাদি। আদিবাসীদের মধ্যে এই রকম সংগঠন জ্ঞান চেতনা সত্যিই এক বিস্ময়কর আবিস্কার। এখানে আদিবাসী পূর্ব পুরুষদের জ্ঞানতত্ত্ব বাহবা পাওয়ার যোগ্য। কারণ বেঁচে থাকার এই মহান রীতিনীতিগুলো আদিম কাল হতে আজও একই নিয়মে আবহমান। একালের প্রসঙ্গে আমি লক্ষ্য

করেছি যে, ভারত স্বাধীনতা লাভের পর দেশীয় শাসন ব্যবস্থা শুরু হলে, আদিবাসীদের মধ্যে এই শাসন ব্যবস্থা একটা প্রভাব ফেলে। দেখা যায় এই শাসন ব্যবস্থায় ধীরে ধীরে তাদের সৃষ্ট রীতিনীতি থেকে অল্প অল্প করে ছিটকে যাচ্ছে। তাদের সংস্কৃতির সৃষ্ট নিয়মাবলীকে একটু একটু করে অবহেলা করতে করতে হারিয়ে ফেলতে শুরু করেছে। আগের মতো এই গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের মধ্যে আর কিন্তু লক্ষ্য করা যায় না। একমাত্র সাঁওতাল জাতি বা সম্প্রদায় সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত তাদের সংস্কৃতি চেতনাগুলো আজও ধরে রেখেছেন। দেশীয় শাসন ব্যবস্থা তাদের সংস্কৃতির উপর প্রভাব ফেলতে পারেনি। কারণ তারা যে আদিবাসী। তাদের শাসন ব্যবস্থা অনেককাল আগেই তৈরি হয়ে আছে। এবং সেটা আজও বর্তমান। তারা দেশীয় শাসন ব্যবস্থাকে যেমন সম্মান করেন, তেমনি তাদের সংস্কৃতিকেও মর্যাদাপূর্ণ সম্মান করেন। পশ্চিমবঙ্গের বাকি আদিবাসী সম্প্রদায় নিজেদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ভুলে গিয়ে হারিয়ে গেছেন কোন এক অজ্ঞাত পরিচয়ে। আদিবাসীদের মতো করে বাঁচতে হলে তাদেরকে ফিরে আসতে হবে নিজেদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পথে। আদিবাসীদের ঐক্য ধরে রাখতে এই গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে ব্যবস্থার মাধ্যমে ঐ জাতি বা সম্প্রদায় একটা সুস্থ জীবন যাপন করতে সক্ষম। এই বিষয়টা বুঝতে হবে। নিজেদের সৃষ্ট সাংস্কৃতিক চেতনা গুলোকে সম্মান দিতে হবে। গুছিয়ে থাকার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজ করতে হবে। জাতিসত্তার পরিচয়কে অটুট রাখতে বিশেষ ঐক্যবদ্ধ ভাবে কার্য করে যেতে হবে। তবেই আদিবাসীদের গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা আগের মতোই জীবিত হয়ে থাকবে।

মূল্যায়ন:

আমার এই বিষয় ‘পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা’ সম্পর্কে বিশেষ আলোচনার দ্বারা সকল জ্ঞান উপস্থাপিত করলাম। বর্তমানে আদিবাসীদের গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা যে করুণ দৃষ্টান্ত লক্ষিত হচ্ছে, তা আগের মতো সচল রাখতে হলে তাদেরকেই বেশি করে ভাবতে হবে। যে সংস্কৃতির মহামূল্য সম্পদ এই গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থার দ্বারা প্রত্যেক আদিবাসী সম্প্রদায় এককালিন সুন্দর ভাবে বেচেঁ থাকতে শিখিয়েছে। সামাজিক বিভিন্ন সমস্যাগুলো গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা দ্বারা সমাধান করতে শিখিয়েছে। গ্রামের মর্যাদা রক্ষার্থে এই গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা যে কতটা প্রয়োজন তা কিন্তু আদিবাসী পুর্ব পুরুষেরা তৈরি করে দিয়ে গেছেন। এই গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রায় একই রকম। প্রত্যেক গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থাতে গ্রাম প্রধান আছেন। তাকে সহায়তা করার জন্য একজন সহায়ক থাকছেন। সমস্যার বিভিন্ন খবরগুলো পৌছে দেওয়ার জন্য একজন বার্তাবাহক আছেন। গ্রামের যুবদের দেখাশোনার জন্য একজন ব্যক্তি থাকছেন। এছাড়াও গ্রামের পুজো ব্যাপারে একজন পুরোহিত থাকছেন। এই সম্মানীয় সদস্যগুলো ঐ গ্রামের ঐ সম্প্রদায়ের-ই হতে পারবে। অন্য গ্রামের থেকে নয়। এ একটা বিশেষ নিয়ম রয়েছে। এই গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের কাছে সেকাল ও একালের কথা ভেবে জীবিত রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে তাদেরকেই।

তথ্যসূত্র:

১. বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ। পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসি সমাজ (প্রথম খন্ড)। ষষ্ঠ প্রকাশ: অগাস্ট, ২০১৩, প্রকাশনায়: শ্রমতি রিংকি বাস্কে ১৮/১, শান্তিনগর রিজেন্ট পার্ক কলকাতা, ৭০০ ০৪০, পৃ. ০১।
২. তদেব, পৃ. ০১।

৩. তদেব, পৃ. ০১।
৪. তদেব, পৃ. ৩৯।
৫. তদেব, পৃ. ১৭০।

গ্রন্থপঞ্জি:

১। Risley, H, H. The tribes and castes of Bengal.
২। Dalton, E, T. Descriptive Ethnology of Bengal.

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1071-1078
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.324

মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও গ্রামসির সাংস্কৃতিক আধিপত্য: রাজনৈতিক দর্শনের একটি সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ

প্রিয়াঙ্কা সাধুখাঁ, *গবেষিকা, দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 12.03.2026; Accepted: 26.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Karl Marx, the nineteenth-century philosopher, profoundly transformed modern social and political thought through his theories of historical materialism and class struggle. His framework emphasized that economic structures fundamentally shape society's political, legal, and cultural institutions. However, the anticipated proletarian revolution in Western societies did not materialize in the twentieth century, prompting the Italian Marxist thinker Antonio Gramsci to reinterpret Marxist theory.

Gramsci argued that social power is maintained not only through economic dominance but also through cultural and ideological leadership. He introduced the concept of cultural hegemony, emphasizing the role of civil society, educational institutions, media, and intellectuals in shaping social consent and sustaining the authority of ruling classes. The paper examines Marx's historical materialism and then analyses Gramsci's theoretical innovations, including the distinction between political society and civil society, the organic intellectual, and the strategic concepts of War of Position and War of Manoeuvre.

Furthermore, the study situates Gramsci's thought in dialogue with Lenin, Althusser, and post-Marxist theorists, highlighting how he extends Marxist analysis beyond purely economic determinism. The findings demonstrate that Gramsci simultaneously preserves Marx's theoretical legacy and reconstructs it into a distinct political philosophy, offering a nuanced framework for understanding modern social, cultural, and ideological dynamics.

Keywords: Marxism, Gramsci, Historical Materialism, Cultural Hegemony, Civil Society

উনবিংশ শতকে কার্ল মার্কস সমাজ ও ইতিহাসের একটি মৌলিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন, যা আধুনিক সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শনের ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। তার মতে মানব সমাজের ইতিহাস মূলত শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস।[i] এই শ্রেণিসংগ্রামের মূল কারণ নিহিত রয়েছে উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে।

মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অনুসারে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও চিন্তাধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—

> "The mode of production of material life conditions the social, political and intellectual life process in general."[ii]

এই বক্তব্যের মাধ্যমে মার্কস বোঝাতে চেয়েছেন যে মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন মূলত তাদের বস্তুগত উৎপাদন ব্যবস্থার দ্বারা নির্ধারিত হয়।

উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোরও পরিবর্তন ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজে জমির উপর অভিজাত শ্রেণির নিয়ন্ত্রণ ছিল এবং রাজনৈতিক ক্ষমতাও সেই শ্রেণির হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল। কিন্তু শিল্প বিপ্লবের ফলে যখন পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, তখন অর্থনৈতিক ক্ষমতা শিল্পপতি ও বুর্জোয়া শ্রেণির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়।[iii]

এই প্রেক্ষাপটে অ্যান্তোনিও গ্রামসি মার্ক্সীয় তত্ত্বকে নতুনভাবে বিশ্লেষণ করে সমাজে সাংস্কৃতিক শক্তির গুরুত্ব তুলে ধরেন।

সাহিত্য পর্যালোচনা:

মার্কস এবং গ্রামসির দর্শন নিয়ে আধুনিক রাজনৈতিক দর্শন ও সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় ব্যাপক গবেষণা হয়েছে। বিভিন্ন দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাবিদ মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এবং গ্রামসির সাংস্কৃতিক আধিপত্য তত্ত্বের উপর বিশদ আলোচনা করেছেন।

মার্কস তার *A Contribution to the Critique of Political Economy* গ্রন্থে অর্থনৈতিক ভিত্তি এবং উপরিকাঠামোর সম্পর্কে বিশ্লেষণ করেছেন।[iv] এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা সমাজের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোকে প্রভাবিত করে (Marx 1859)। এই ধারণাই পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ তত্ত্বের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ্রামসি তার বিখ্যাত *Prison Notebooks*-এ মার্কসবাদকে নতুনভাবে বিশ্লেষণ করেন এবং সাংস্কৃতিক আধিপত্য ধারণা উপস্থাপন করেন।[v] তিনি দেখান যে সমাজে ক্ষমতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক এবং আদর্শগত শক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে (Gramsci 1971) । গ্রামসির মতে শাসক শ্রেণি কেবল অর্থনৈতিক শক্তির মাধ্যমে নয়, বরং সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেও সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে।

অ্যান্ড্রু হেওউড আধুনিক রাজনৈতিক মতাদর্শের আলোচনায় গ্রামসির চিন্তাকে মার্কসবাদী তত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রসারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। (Heywood 2017)[vi]

পরবর্তী মার্কসবাদী চিন্তাবিদ লুই আলথুসার রাষ্ট্রের আদর্শগত কাঠামো বিশ্লেষণ করতে গিয়ে Ideological State Apparatus ধারণা উপস্থাপন করেন, যা গ্রামসির চিন্তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।[vii] (Althusser 1971)

এছাড়া রজার সাইমন এবং স্টুয়ার্ট হল গ্রামসির সাংস্কৃতিক আধিপত্য ধারণাকে আধুনিক সাংস্কৃতিক অধ্যয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে বিশ্লেষণ করেছেন।

তাছাড়া আর্নেস্তো লাক্লাউ এবং শঁতাল মুফ তাদের Hegemony and Socialist Strategy গ্রন্থে গ্রামসির হেজিমনি ধারণাকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করে পোস্ট-মার্কসবাদী রাজনৈতিক তত্ত্বের বিকাশ ঘটান (Laclau & Mouffe 1985) ।

এই সকল আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে মার্কস ও গ্রামসির দর্শন আধুনিক রাজনৈতিক তত্ত্বে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং সমাজ ও ক্ষমতার সম্পর্কিত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এখনও প্রাসঙ্গিক।

মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ:

মার্কসের মতে সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি বা Base সমাজের উপরিকাঠামোকে প্রভাবিত করে। উৎপাদন শক্তি (forces of production) এবং উৎপাদন সম্পর্ক (relations of production) সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো গঠন করে (Marx 1859) ।

এই অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে গড়ে ওঠে সমাজের উপরিকাঠামো— যার মধ্যে রাষ্ট্র, আইন, ধর্ম, নৈতিকতা এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত।[viii] মার্কস মনে করেন যে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে সমাজের সামগ্রিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে।

পুঁজিবাদী সমাজে বুর্জোয়া শ্রেণি উৎপাদনের উপকরণের মালিক এবং প্রলেতারিয়েত শ্রেণি শ্রম বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। এই সম্পর্কের মধ্যেই শোষণ নিহিত রয়েছে। কারণ শ্রমিকদের শ্রম থেকে উৎপন্ন অতিরিক্ত মূল্য পুঁজিপতিরা দখল করে (Marx 1867) ।

মার্ক্সীয় তত্ত্ব থেকে গ্রামসির সাংস্কৃতিক আধিপত্য ধারণার বিকাশ:

মার্কসের দর্শনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হল সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি এবং উপরিকাঠামোর সম্পর্ক। মার্কসের মতে সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা কেবল অর্থনৈতিক সম্পর্ক নির্ধারণ করে না; বরং সমাজের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, আইন, নৈতিকতা এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

এই ধারণার ভিত্তিতেই গ্রামসি তার বিশ্লেষণ গড়ে তোলেন। তবে তিনি উপলব্ধি করেন যে সমাজে ক্ষমতার কাঠামো বোঝার ক্ষেত্রে কেবল অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ যথেষ্ট নয়। কারণ তিনি মনে করেন আধুনিক সমাজে শাসক শ্রেণি কেবল অর্থনৈতিক শক্তির মাধ্যমে নয়, বরং সাংস্কৃতিক প্রভাবের মাধ্যমেও ক্ষমতা বজায় রাখে।

তিনি লিখেছেন—

"The supremacy of a social group manifests itself in two ways, as domination and as intellectual and moral leadership."[ix] এই বক্তব্যের মাধ্যমে গ্রামসি বোঝাতে চেয়েছেন যে শাসক শ্রেণি একদিকে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে আধিপত্য বজায় রাখে এবং অন্যদিকে বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক নেতৃত্বের মাধ্যমে সমাজে প্রভাব বিস্তার করে।এইভাবে বাস্তবে শাসক শ্রেণি অনেক সময় জনগণের সম্মতি অর্জনের মাধ্যমে তাদের আধিপত্য বজায় রাখে।

এই প্রেক্ষাপটে গ্রামসি সাংস্কৃতিক আধিপত্য (Cultural Hegemony) ধারণা উপস্থাপন করেন। তার মতে শাসক শ্রেণি শিক্ষা ব্যবস্থা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সাহিত্য, গণমাধ্যম এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিজেদের মূল্যবোধকে সমাজের সাধারণ মূল্যবোধ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

ফলে শাসিত শ্রেণি অনেক সময় অজান্তেই সেই মূল্যবোধকে গ্রহণ করে এবং শাসক শ্রেণির আধিপত্যকে স্বাভাবিক বলে মনে করে। এই বিশ্লেষণ মার্কসবাদী তত্ত্বকে একটি নতুন মাত্রা প্রদান করে, কারণ এখানে সংস্কৃতি এবং আদর্শগত শক্তির গুরুত্ব বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

গ্রামসির স্বাতন্ত্র্য:

গ্রামসির দর্শনের স্বাতন্ত্র্য মূলত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণার মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

সিভিল সোসাইটি ও রাষ্ট্র সম্পর্কে গ্রামসির বিশ্লেষণ:

গ্রামসি রাষ্ট্রের কাঠামো বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য নির্দেশ করেন। তার মতে রাষ্ট্রকে দুইটি অংশে ভাগ করা যায়— Political Society এবং Civil Society।

Political Society– রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগমূলক দিককে নির্দেশ করে। যেমন—পুলিশ, সেনাবাহিনী এবং প্রশাসন। এগুলি প্রয়োজন হলে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে শাসন বজায় রাখে।

Civil Society– সমাজের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ করে, যেমন—শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় সংগঠন, পরিবার এবং গণমাধ্যম।

এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—

> "Civil society is the ensemble of organisms commonly called private."[x]

এর মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে শিক্ষা, ধর্ম, পরিবার এবং গণমাধ্যমের মতো সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি সমাজে মতাদর্শ গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ্রামসির মতে আধুনিক সমাজে Civil Society অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এখানেই সাংস্কৃতিক আধিপত্যের প্রক্রিয়া কার্যকর হয়।

অর্গানিক ইন্টেলেকচুয়াল:

গ্রামসির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল Organic Intellectual ধারণা। তার মতে প্রতিটি সামাজিক শ্রেণির নিজস্ব বুদ্ধিজীবী থাকে, যারা সেই শ্রেণির অভিজ্ঞতা এবং স্বার্থকে প্রকাশ করে।

তিনি লিখেছেন—

> "Every social group… creates together with itself organically one or more strata of intellectuals."[xi]

এই বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন যে সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কারণ তারা সমাজে নতুন রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টি করতে পারে এবং শাসিত শ্রেণিকে সংগঠিত করতে সাহায্য করতে পারে।

এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে গ্রামসি দেখিয়েছেন যে বুদ্ধিজীবীরা কেবল তাত্ত্বিক চিন্তার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

গ্রামসি ও লেনিন: বিপ্লবের কৌশলগত পার্থক্য:

লেনিন বিপ্লবকে মূলত একটি সরাসরি রাজনৈতিক সংগ্রাম হিসেবে দেখেছিলেন। তার মতে একটি সুসংগঠিত বিপ্লবী দল শ্রমিক শ্রেণিকে নেতৃত্ব দেবে এবং রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে । লেনিনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রকে দমন যন্ত্র হিসেবে দেখা যায় এবং শ্রমিক শ্রেণিকে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক স্বার্থ অনুযায়ী সংগঠিত করা অপরিহার্য।

কিন্তু গ্রামসি পশ্চিমা ইউরোপীয় সমাজের জন্য বিপ্লবের একটি বিকল্প কৌশল প্রস্তাব করেন। তার মতে, সেখানে সমাজকে কেবল রাজনৈতিক দমনশক্তির মাধ্যমে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। কারণ এখানে Civil Society (শিক্ষা, গণমাধ্যম, ধর্ম, পরিবার ইত্যাদি) অত্যন্ত শক্তিশালী।

গ্রামসি এই প্রেক্ষাপটে বিপ্লবের দুটি কৌশলগত ধারণা প্রবর্তন করেন:

War of Manoeuvre– এটি লেনিনের ধারার বিপ্লবের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। অর্থাৎ, সরাসরি রাজনৈতিক শক্তি ব্যবহার করে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করা।

War of Position– দীর্ঘমেয়াদি সাংস্কৃতিক ও আদর্শগত সংগ্রাম। এর মাধ্যমে সমাজে নতুন চেতনা এবং বিকল্প মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

গ্রামসির মতে পশ্চিমা সমাজে War of Position প্রয়োজনীয়, কারণ সামাজিক স্বীকৃতি এবং সাংস্কৃতিক সম্মতির ছাড়া সরাসরি রাজনৈতিক বিপ্লব কার্যকর হওয়া কঠিন। ফলে, Civil Society এবং সাংস্কৃতিক শক্তিকে একত্রীকরণ করে একটি বিকল্প চেতনা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

গ্রামসির Cultural Hegemony ধারণা লেনিনের সরাসরি রাজনৈতিক কৌশল থেকে একটি মূলত ভিন্ন দৃষ্টিকোণ প্রদান করে। লেনিন রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং অভ্যন্তরীণ দলীয় সংহতির ওপর জোর দেন। গ্রামসি বলেন— কেবল বলপ্রয়োগ নয়, মানসিক ও সাংস্কৃতিক রাজত্ব সমাজের স্থায়ী পরিবর্তন ঘটায়।

তিনি দেখান যে শাসক শ্রেণি জনগণের সম্মতি অর্জনের মাধ্যমে আধিপত্য বজায় রাখে। তাই একটি সফল বিপ্লবের জন্য শুধু রাজনৈতিক দলকে নয়, সিভিল সোসাইটিতে নতুন চেতনা ও মূল্যবোধ সৃষ্টিকারী বুদ্ধিজীবীদের (Organic Intellectuals) ব্যবহার করা আবশ্যক।

লেনিন এবং গ্রামসির এই তুলনা স্পষ্টভাবে বোঝায় যে— লেনিন বাস্তবায়ন-কেন্দ্রিক, গ্রামসি দীর্ঘমেয়াদী সাংস্কৃতিক-কেন্দ্রিক।

গ্রামসি ও আলথুসার:

Gramsci এবং Althusser উভয়ই মার্কসবাদকে শুধু অর্থনৈতিক ভিত্তি-উপরিকাঠামো তত্ত্বের বাইরে নিয়ে গিয়েছেন, তবে তারা দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিশ্লেষণের পদ্ধতিতে পার্থক্য রেখেছেন।

Gramsci-র Cultural Hegemony ধারণা দেখায় যে শাসক শ্রেণি কেবল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নয়, বরং সিভিল সোসাইটি, শিক্ষা, গণমাধ্যম এবং সংস্কৃতি-র মাধ্যমে সমাজের সম্মতি অর্জন করে। তিনি বলেন যে সমাজের স্থায়ী পরিবর্তনের জন্য War of Position, অর্থাৎ দীর্ঘমেয়াদি সাংস্কৃতিক ও আদর্শগত সংগ্রাম প্রয়োজন।

Althusser, অন্যদিকে, রাষ্ট্রের Ideological State Apparatuses (ISAs) ধারণা প্রবর্তন করেন। ISAs হল রাষ্ট্রের সেই অংশ যা সরাসরি বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নয়, বরং শিক্ষা, ধর্ম, পরিবার, গণমাধ্যম ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজে শ্রেণি-ভিত্তিক মানসিকতা ও আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে। Althusser দেখিয়েছেন যে অর্থনৈতিক ভিত্তি শুধু সমাজের কাঠামো তৈরি করে না, বরং মানসিক চেতনা ও সাংস্কৃতিক শ্রেণীবিন্যাস তৈরিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

Gramsci এবং Althusser-এর বিশ্লেষণ একে অপরের সাথে সম্পূরক। Gramsci ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে শাসক শ্রেণির আধিপত্য এবং স্বীকৃতি অর্জনের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করেন, যেখানে Althusser কাঠামোগত এবং আদর্শগত প্রক্রিয়ার উপর জোর দেন।

উদাহরণস্বরূপ, Gramsci বলেছিলেন যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একটি সাংস্কৃতিক যুদ্ধের ক্ষেত্র যেখানে শাসক শ্রেণি নিজেদের আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে। Althusser এই একই প্রক্রিয়াকে Ideological State Apparatus-এর মাধ্যমে বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করেন।

ফলে, আধুনিক সমাজে সাংস্কৃতিক আধিপত্য বোঝার জন্য Gramsci এবং Althusser-এর দর্শন একত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। Gramsci বলছেন কিভাবে সমাজের সচেতনতা এবং সম্মতি তৈরি হয়, আর Althusser দেখাচ্ছেন কিভাবে এই সচেতনতা প্রতিষ্ঠান এবং কাঠামোর মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে পুনর্নির্মাণ হয়।

এই তুলনা আমাদের শেখায় যে, সমাজের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক শক্তি একাধিক স্তরে কাজ করে। সরাসরি রাজনৈতিক শক্তি ব্যবহার (Lenin-style) কেবল একটি মাত্র স্তর, কিন্তু Gramsci ও Althusser-এর মত বিশ্লেষণ দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক পরিবর্তন এবং আদর্শগত স্থায়িত্ব বোঝার জন্য অপরিহার্য।

পোস্ট-মার্কসবাদে গ্রামসির প্রভাব:

বিংশ শতকের শেষার্ধে মার্কসবাদী তত্ত্বের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করতে গিয়ে post-Marxist thinkers নতুন ধারণা উপস্থাপন করেন। post-Marxism মূলত ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে সরাসরি অর্থনৈতিক নির্ধারিতর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার প্রবণতার সমালোচনা করে।

গ্রামসি, যদিও ক্লাসিক্যাল মার্কসবাদীর ধারায় পড়েন, তিনি একই সময়ে অর্থনৈতিক নির্ধারিতির সীমা স্বীকার করে নেন এবং সাংস্কৃতিক ও আদর্শগত শক্তি-কে সমাজ পরিবর্তনের জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে দেখান।

Post-Marxist thinkers যেমন Ernesto Laclau এবং Chantal Mouffe, গ্রামসির Cultural Hegemony ধারণাকে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করে দেখিয়েছেন যে আধুনিক সমাজে ক্ষমতা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক শ্রেণি ভিত্তিক নয়; বরং রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক চুক্তি ও বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে বজায় থাকে। তারা Gramsci-এর Civil Society এবং War of Position-এর বিশ্লেষণকে আধুনিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

গ্রামসি ও post-Marxism- দার্শনিকদের মধ্যে সাদৃশ্য হল এই যে, শ্রেণি-ভিত্তিক Reductionism-কে বাদ দিয়ে সমাজকে বহুস্তরবিশিষ্টভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেন। গ্রামসি দেখিয়েছেন যে শাসক শ্রেণি জনগণের স্বীকৃতি এবং সাংস্কৃতিক সম্মতি অর্জন করে আধিপত্য বজায় রাখে। post-Marxists এই দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও সম্প্রসারিত করে বলে যে আধুনিক সমাজে ক্ষমতা শুধুমাত্র শ্রেণি দ্বন্দ্ব নয়, বিভিন্ন সামাজিক চিহ্ন, চেতনা এবং রাজনৈতিক চুক্তির মাধ্যমে বজায় থাকে।

ফলে বলা যায়, গ্রামসি post-Marxism-এর তাত্ত্বিক পূর্বসূরি হিসেবে বিবেচিত হতে পারেন। তিনি দেখিয়েছেন যে Marx-এর অর্থনৈতিক কাঠামো এবং শ্রেণিসংগ্রাম তত্ত্ব তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রদান করলেও, আধুনিক সমাজ বিশ্লেষণে সাংস্কৃতিক, আদর্শগত ও রাজনৈতিক স্তরগুলোর সমন্বয় অপরিহার্য। Gramsci-এর Cultural Hegemony এবং Civil Society ধারণা post-Marxists-এর দৃষ্টিভঙ্গির মূল ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই বিশ্লেষণ আমাদের বোঝায় যে আধুনিক রাজনৈতিক দর্শন ও সমাজতত্ত্বে Gramsci-এর তত্ত্ব post-Marxism-এর ধারাকে প্রভাবিত করেছে এবং আজও সমাজ বিশ্লেষণে অপরিহার্য দিক নির্দেশনা প্রদান করে।

দার্শনিক তাৎপর্য:

মার্কস ও গ্রামসির দর্শন আধুনিক রাজনৈতিক দর্শনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক অবদান রাখে। প্রথমত, মার্কস সমাজ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কাঠামোর গুরুত্বকে সামনে নিয়ে আসেন এবং দেখান যে সামাজিক সম্পর্ক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি অর্থনৈতিক ভিত্তির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। এর ফলে সামাজিক বাস্তবতাকে বোঝার ক্ষেত্রে একটি নতুন পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে।

দ্বিতীয়ত, গ্রামসি মার্কসের তত্ত্বকে পুনর্ব্যাখ্যা করে দেখান যে ক্ষমতা কেবল অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক শক্তির মাধ্যমে নয়, বরং সাংস্কৃতিক ও আদর্শগত প্রভাবের মাধ্যমেও প্রতিষ্ঠিত হয়। তার সাংস্কৃতিক আধিপত্য ধারণা দেখায় যে সমাজে ক্ষমতার কাঠামো অনেক বেশি জটিল এবং বহুস্তরবিশিষ্ট।

তৃতীয়ত, গ্রামসির অর্গানিক ইন্টেলেকচুয়াল ধারণা সমাজে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক আলোচনার সূচনা করে। এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে সামাজিক পরিবর্তন কেবল অর্থনৈতিক শক্তির মাধ্যমে নয়, বরং চিন্তাধারা ও সাংস্কৃতিক সংগ্রামের মাধ্যমেও ঘটতে পারে।

এই কারণে মার্কস ও গ্রামসির চিন্তা আধুনিক রাজনৈতিক দর্শন, সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন এবং সমাজ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। এইভাবে তিনি দেখিয়েছেন যে সমাজে ক্ষমতার কাঠামো বুঝতে হলে সাংস্কৃতিক এবং আদর্শগত ক্ষেত্রকেও গুরুত্ব দিতে হবে।

এই কারণে অনেক দার্শনিক মনে করেন যে গ্রামসি Classical Marxism এবং Contemporary Cultural Theory-এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধন তৈরি করেছেন।

সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা:

আধুনিক বিশ্বে রাজনীতি, সংস্কৃতি এবং গণমাধ্যমের সম্পর্ক অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছে। বর্তমান সমাজে গণমাধ্যম, শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শ সমাজে প্রচারিত হয়।

এই প্রেক্ষাপটে গ্রামসির সাংস্কৃতিক আধিপত্য তত্ত্ব আধুনিক সমাজ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, গণমাধ্যমের মাধ্যমে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ধারণাকে জনপ্রিয় করে তোলা বা শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা—এসব ঘটনাকে গ্রামসির তত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

ফলে মার্কস ও গ্রামসির চিন্তা কেবল ঐতিহাসিক গুরুত্বই বহন করে না; বরং সমকালীন সমাজ ও রাজনীতির বিশ্লেষণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উপসংহার:

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে অ্যান্তোনিও গ্রামসি মার্ক্সীয় তত্ত্বকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করে একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দর্শন নির্মাণ করেছেন। Marx-এর ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এবং শ্রেণিসংগ্রামের তত্ত্ব অর্থনৈতিক কাঠামো এবং রাজনৈতিক শক্তির উপর গুরুত্ব প্রদান করলেও, Gramsci দেখিয়েছেন যে সমাজের ক্ষমতা শুধু অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক নয়, বরং সাংস্কৃতিক ও আদর্শগত স্তরে বিকাশ লাভ করে।

Gramsci-এর Cultural Hegemony-র ধারণা প্রমাণ করে যে শাসক শ্রেণি জনগণের সচেতন সম্মতি এবং সাংস্কৃতিক স্বীকৃতি অর্জনের মাধ্যমে আধিপত্য বজায় রাখে। Civil Society, Organic Intellectual, এবং War of Position-এর মত ধারণাগুলি বোঝায় যে দীর্ঘমেয়াদি সাংস্কৃতিক এবং আদর্শগত সংগ্রাম ছাড়া আধুনিক সমাজে বড় ধরনের সামাজিক পরিবর্তন সম্ভব নয়।

লেনিনের সরাসরি রাজনৈতিক কৌশল (War of Manoeuvre) এবং Gramsci-এর সাংস্কৃতিক-কেন্দ্রিক কৌশল (War of Position)-এর তুলনা আমাদের বোঝায় যে আধুনিক সমাজে বিপ্লব বা সামাজিক পরিবর্তন কেবল রাজনৈতিক দল বা রাষ্ট্রক্ষমতার উপর নির্ভরশীল নয়। দীর্ঘমেয়াদি সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রস্তুতি অপরিহার্য।

Althusser-এর Ideological State Apparatus ধারণা এবং post-Marxist thinkers-এর Gramsci-এর Cultural Hegemony-এর প্রসঙ্গ দেখায় যে আধুনিক সমাজে শক্তি এবং ক্ষমতা বহুস্তরবিশিষ্ট, যেখানে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং আদর্শগত স্তর একে অপরের সঙ্গে আন্তঃসংযুক্ত।

ফলে বলা যায়, Gramsci একদিকে Marx-এর তাত্ত্বিক উত্তরাধিকার বহন করেছেন, অন্যদিকে তিনি Marxism কে post-Marxist প্রেক্ষাপটে পুনর্গঠন করে সমাজ বিশ্লেষণের জন্য একটি স্বতন্ত্র কাঠামো প্রদান করেছেন। আধুনিক রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব এবং সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণে Gramsci-এর চিন্তা আজও অপরিহার্য এবং প্রাসঙ্গিক।

Gramsci-এর তত্ত্ব থেকে আমরা শিখতে পারি যে সামাজিক পরিবর্তন, রাজনৈতিক শক্তি এবং সাংস্কৃতিক আধিপত্যের মধ্যে সম্পর্ক বোঝা ছাড়া সমাজ বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ। ফলে, আধুনিক রাজনৈতিক দর্শন, সমাজতত্ত্ব এবং সাংস্কৃতিক গবেষণায় Gramsci-এর তত্ত্ব একটি মৌলিক

Footnote:

[i] Karl Marx, *A Contribution to the Critique of Political Economy.* (Moscow: Progress Publishers, 1859).
[ii] Ibid, p. 20.
[iii] Karl Marx, *Capital: A Critique of Political Economy,* Vol. I (London: Penguin Classics, 1867).
[iv] Karl Marx, *A Contribution to the Critique of Political Economy.* (Moscow: Progress Publishers, 1859).
[v] Antonio Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks,* (New York: International Publishers,1971).
[vi] Andrew Heywood, *Political Ideologies: An Introduction,* 6th ed. (London: Palgrave Mllan,2017).
[vii] Louis Althusser, "*Ideology and Ideological State Apparatuses",* in *Lenin and Philosophy and Other Essays* (New York: Monthly Review Press,1971).
[viii] Karl Marx, *Capital: A Critical of Political Economy,* Vol.1 (London: Penguin Classics, 1867).
[ix] Antonio Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks,* (New York: International Publishers,1971).
[x] Ibid, p. 12.
[xi] Ibid, p. 5.

Bibliography:

1. Marx, Karl and Friedrich Engels. *The Communist Manifesto*. 1848.
2. Marx, Karl. *A Contribution to the Critique of Political Economy.* 1859.
3. Marx, Karl. *Capital.* Vol. I. 1867.
4. Lenin, Vladimir. *State and Revolution.*
5. Gramsci, Antonio. *Selections from the Prison Notebooks.*
6. Forgacs, David, ed. *The Antonio Gramsci Reader.*
7. Althusser, Louis. *Ideology and Ideological State Apparatuses.*
8. Heywood, Andrew. *Political Ideologies.*
9. Simon, Roger. *Gramsci's Political Thought.*
10. Hall, Stuart. *Cultural Studies and the Legacy of Gramsci.*
11. Bottomore, Tom. *A Dictionary of Marxist Thought.*

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1079-1085
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.325

ফেরারি ফৌজ, স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অন্য অধ্যায় ও নিম্নবর্গের অবস্থান

প্রতাপ বিশ্বাস, *স্বাধীন গবেষক, আদর্শপল্লী, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 12.03.2026; Accepted: 13.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The people situated at the lower strata of the social pyramid, who have long been identified as timid and cowardly, lacking independent thought and consciousness, and sustained by the leftovers of society, are reimagined by Utpal Dutt in his play with a different identity. He places in their voices a new language of protest. Instead of marching in the traditional procession of silence, they transform history and establish themselves as counterparts to the upper classes. *"Ferari Fauj"* narrates the story of such a marginal community, who, under British-ruled India, succeeded in shedding the stigma of cowardice. They became capable of standing upright with dignity and voicing resistance. Those individuals who usually dissolve into the crowd without any distinct identity are presented in the play with a unique and powerful dimension.

Keywords: Lower Class, Capitalism, Subaltern, Rebellion, Cowardice

সমাজ বিজ্ঞানের পরিসর ছাড়িয়ে আমরা যদি জীব বিজ্ঞানের দিকে নজর ঘোরাই, সেখানে খাদ্য পিরামিড বলে একটি তত্ত্ব কাজ করে। জীবের মধ্যে যে খাদ্য খাদক সম্পর্ক সেখানে খাদ্য শ্রেণির অবস্থান সব সময়ই তলদেশে। সংখ্যাগত দিক থেকে তাদের পরিমাণ বেশি হলেও চিরকালই তারা খাদ্য, খাদক শ্রেণির ভরণ পোষণের দায়টা তাদের উপরেই চাপে। এবং সেই দায় মেটাতেই তাদের যুগের পর যুগ ছুটে চলা।

ঠিক তেমনই সমাজবিজ্ঞান চর্চাতেও দেখা যায়, আমাদের সমাজে চিরকালই একদল মানুষ থাকে, যারা ঠিক মানুষ নয় অথবা যাদের মানুষ হয়ে ওঠা হয়নি। তারাই সমাজের বাহন; চিরকালই সমাজের উচ্ছিষ্টে তারা লালিত পালিত। দিন শেষে তাদের প্রাপ্য শুধুই বঞ্চনা। কারণ অসম পুঁজিবাদের বণ্টনে তাদের জন্ম। যুগ যুগ ধরে সমাজ সভ্যতার দীপ মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তারা, নিজে জ্বলে আলো বিতরণ করে চলেছে। প্রাবন্ধিকের মতানুযায়ী, আমাদের দেশ ভারতবর্ষের দুটি ভাগ-

> "একদল ভারতবাসী থাকেন ইন্ডিয়া-য়, আরেকদল ভারতবর্ষ-এ। এই দ্বিতীয় দলের সংখ্যা ভারী..... সমাজ বিজ্ঞানের পরিভাষা ব্যবহার করলে উচ্চবর্গের ভারত এবং নিম্নবর্গের ভারত।"[১]

এখন প্রশ্ন হল নিম্নবর্গ কি? বা কারা? সমাজ তত্ত্বের আলোচনায় 'নিম্নবর্গ' ধারণাটি এসেছে মূলত মার্কস চর্চার সূত্র ধরে। ইতালির বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা আন্তেনিও গ্রামসি তাঁর বিখ্যাত 'কারাগারের নোটবই' (A Prisonar's Note Book, ১৯২৯ থেকে ১৯৩৫ সালে রচিত) গ্রন্থে মার্কস-এর ভাবনাকে মুসোলিনির প্রহরা

এড়িয়ে 'প্রলেতারিয়েত' শ্রেণি অর্থে 'সাবলটার্ন' শব্দটি সুকৌশলে প্রয়োগ করেছিলেন। কিন্তু ব্যাপকার্থে এই প্রতিশব্দটি ইতালির পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মেহনতি মানুষকেই বোঝায়। মার্কসীয় তত্ত্বের দুটি পরিচিত পরিভাষা 'পুঁজিমালিক' বা 'বুর্জোয়া' এবং 'প্রলেতারিয়েত' গ্রামসির আলোচনায় ভিন্ন দুটি পরিভাষা দ্বারা প্রযুক্ত হল। গ্রামসির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পরিচিতি লাভ করল 'প্রাক্সিসের দর্শন' হিসেবে। 'বুর্জোয়া' পরিভাষাটি গৃহীত হল 'হেজেমনিক' ও 'প্রলেতারিয়েত' পরিভাষার পরিবর্তে ব্যবহৃত হল 'সাবলটার্ন' প্রতিশব্দ। ইতালীয় শব্দ 'সুবলতের্নো' থেকে গ্রামসি নির্বাচন করেছেন 'সাবলটার্ন' শব্দ। সেক্ষেত্রে মূলত শ্রমিকশ্রেণিকে ইঙ্গিতপূর্ণ করে তোলে শব্দটি। তবে 'নিম্নবর্গ' ইংরেজি 'সাবলটার্ন' (subaltern) শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ। ইংরেজিতে সাবলটার্ন শব্দটি সামরিক বাহিনী তথা সামরিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। সাধারণত ক্যাপ্টেনের অধস্তন অফিসারদেরই সাবলটার্ন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আভিধানিক অর্থ এই রকম– "Under the control or influence of someone or something that is more powerful"[২]; অর্থাৎ সাবলটার্ন মানে অধস্তন, নীচে যার অবস্থান। আবার অ্যারিস্টটলের মতানুযায়ী "সাবলটার্ন হচ্ছে এমন কোন বচন যা সব সময় অন্য বচনের অধীন– যা বিশিষ্ট, মূর্ত, সার্বিক নয়।"[৩] অধীন অর্থাৎ পুঁজিবাদী অসম বণ্টনে কতৃত্ব, ক্ষমতা, আধিপত্যের অধীন। এবং এই অধীনতার কবলে পড়েই একদল ক্রমশ নীচে নেমে আসে। এই নীচে থাকা মানুষেরাই নিম্নবর্গ। সমাজ স্তরের সর্বক্ষেত্রেই এরা পরিত্যক্ত।

সুতরাং ব্যপকার্থে সামাজিক ক্ষমতা বিন্যাসের ধারায় শ্রেণিবিভক্ত সমাজে যারা প্রভুত্ব বিস্তার করে, তার বিপরীতে অবস্থানকারী শ্রেণীই সাবলটার্ন বা নিম্নবর্গ। এই মানদণ্ডের বিভাজনে শ্রমিক শ্রেণি, গরিব চাষি, মজুর সবাই নিম্নবর্গ। নিম্নবর্গের ইতিহাস বলে, "ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষে যারা প্রভুশক্তির অধিকারী ছিল।"[৪]– তারাই উচ্চবর্গ। এই বিভাজন মেনে উচ্চবর্গ বহির্ভূতদের বলা হয় নিম্নবর্গ। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে 'ক্ষমতা' শব্দের মাপকাঠিতে বিভাজিত হয় উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গ। 'সাবলটার্ন' প্রসঙ্গে গ্রামসি শ্রেণিবিভক্ত সমাজে ক্ষমতাবিন্যাসের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা তুলে ধরেছেন। সামাজিক ক্ষমতা বিন্যাসের ধারায় এক শ্রেণি বরাবর শাসন বিস্তার করে। প্রভুত্বশক্তির অধিকারী হয়ে তারা আধিপত্য কায়েম করে রাখে অন্য শ্রেণির উপর। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে এই প্রভুত্ব বিস্তারকারী শ্রেণির বিপরীতে অবস্থানকারী শ্রেণিই প্রতিপন্ন হয় 'সাবলটার্ন' বা 'নিম্নবর্গ' হিসেবে। নিম্নবর্গ ধারণার সহজ সরলীকরণ হল প্রভুত্ব-অধীনতার সম্পর্ক। প্রভুত্ব-অধীনতার সম্পর্ক চিরকালীন বিরোধিতার সম্পর্ক। গ্রামসি হেজেমনিক শ্রেণির প্রভাব-প্রতাপকে চিহ্নিত করেছেন সাবলটার্ন শ্রেণির অভাব-অস্তিত্বের কারণ হিসেবে।

সমাজবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে নিম্নবর্গ আজ একটি প্রধান আলোচনার বিষয় হওয়ায়, উচ্চবর্গের রাজনীতি ও ভাবাদর্শের মধ্যে নিম্নবর্গের অবস্থান ঠিক কোথায় তা স্পষ্ট করে দেখার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিম্নবর্গের মানুষেরা উপস্থাপিত হয় ভীরু, উচ্চবর্গের অনুগত প্রাণী হিসেবে। উচ্চবর্গ তখনই নিম্নবর্গকে প্রতিপক্ষ হিসেবে মান্যতা দেয় যখন তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

> "একমাত্র প্রকাশ্য রাজনৈতিক বিরোধ, বিশেষ করে বিদ্রোহের সময়েই শাসকগোষ্ঠী তাকে সক্রিয় প্রতিপক্ষ হিসেবে গ্রাহ্য করে।"[৫]

ইতিহাসের কর্তব্য সত্যকে উপস্থাপিত করা। কিন্তু তা সর্বক্ষেত্রে সম্ভব হয় না, কারণ ইতিহাসের স্পন্দন নিয়ন্ত্রিত হয় উচ্চবর্গের অঙ্গুলিহেলনে।

বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গের মানুষের প্রবেশ অনেক আগে থেকেই। যদিও বিশ শতকের শেষ দিকে এদেশে সাবলটার্ন সম্পর্কিত চর্চা শুরু হয়েছিল, কিন্তু প্রাগাধুনিক সাহিত্যে অনেক আগে থেকেই শ্রেণি বিভাজন, বৈষম্য, নিম্নবর্গের প্রতি অবমাননার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ থেকে শুরু করে

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মঙ্গলকাব্য, রামায়ণ, মহাভারত সব ক্ষেত্রেই নিম্নবর্গের কথা উঠে এসেছে। পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, শরৎসাহিত্য সবস্থানেই নিম্নবর্গের বিচরণ লক্ষণীয়। বাংলা সাহিত্যে বিষয় ভাবনায় তথা দৃষ্টিভঙ্গি স্থাপনে বাঁকবদল ঘটে কল্লোল সাহিত্যিকদের হাত ধরে। প্রান্তজন নিয়ে বাংলা সাহিত্যে সরাসরি কলম ধরেছেন কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকেরা। রবীন্দ্র সাহিত্যের বিরুদ্ধে দুর্দমনীয় বিদ্রোহ ঘোষণাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য। রবীন্দ্র সাহিত্যের ধারা থেকে সরে এসে স্বকীয়তার পথ নির্মাণে কল্লোল গোষ্ঠির লেখকরা নেমে দাঁড়ালেন শ্রমিক- মজুর- বস্তিবাসী- ফুটপাতবাসী সমাজের অবহেলিত নানাশ্রেণির পতিত ও অপাংক্তেয় মানুষের বিচিত্র জীবনযন্ত্রণার গলিপথে।

রবীন্দ্র প্রভাব থেকে দূরে সরে এসে তাঁরা সর্বহারা মানুষের জীবন দর্শন নির্মাণে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিরা সমাজের প্রতিষ্ঠিত জীবন থেকে সরে এসে দৃষ্টি রেখেছেন মানুষের অন্ধকারময় জীবনে। কয়লাকুঠির পরিচয়দানে বাংলা সাহিত্যে ভিন্ন অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য দিয়েছেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। দীর্ঘদিন যাবৎ রানীগঞ্জের কয়লাখনি অঞ্চলের মানুষের সংস্পর্শ লাভ করায় সেখানকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সাঁওতাল, বাউরি, হাড়ি, ডোম, কুলি, কামিন অধিগ্রহণ করেছে তাঁর সাহিত্যের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড। তাঁর 'কয়লাকুঠি', 'মা' গল্পগুলি কয়লাকুঠির অধিবাসীদের নিখুঁত জীবননির্বেদ উপস্থাপিত করেছে।

বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গের জীবন চিত্রের রূপ নির্মাণে তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকাও অনস্বীকার্য। রাঢ় বাংলার লোকায়ত জীবন, সমাজ-সংস্কৃতি, তাদের জীবনচেতনার স্বরূপ চিত্রিতমণ্ডিত হয়েছে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে। অখ্যাতজনের কথাকার তারাশঙ্করের সাহিত্যে পটুয়া, বেদিয়া, বাজীকর, সাপুড়ে, ঠ্যাঙারে, বাউল, বোষ্টমী– প্রভৃতি নানাশ্রেণির অকিঞ্চিৎকর মানুষের মজলিস। পিলসুজের নীচে অন্ধকারে তলিয়ে যাওয়া জনপদ ডোম, বাউরি, বাগদি, কাহার, বেদে, সাঁওতাল প্রভৃতি অপজাত শ্রেণি তারাশঙ্করের লেখনীর আলোকবৃত্তে দীপ্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর সাহিত্য প্রান্তিক মানুষের জীবনাচরণ, বৃত্তি, প্রবৃত্তি নিবিড় চেতনার পরিচয়ে সমৃদ্ধ। ছোটোজাত কাহার জনগোষ্ঠীর জীবনের উপকথা উচ্চারিত হয়েছে 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে। 'কালিন্দী', 'কবি', 'সন্দীপন পাঠশালা', 'চৈতালি ঘূর্ণি', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'মন্বন্তর', 'ঝড় ও ঝরাপাতা' প্রভৃতি উপন্যাসের মর্মমূলে প্রোথিত প্রান্তিক মানুষের ঘনিষ্ঠতা। ডোম সমাজের বলিষ্ঠ অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে 'কবি' উপন্যাসে। জাতপাতবিষয়ক সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার সংস্কারে চরম আঘাত হেনেছে 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাস। গণজীবনের স্পষ্ট প্রকাশক রূপে উত্থিত হয়েছে 'গণদেবতা' উপন্যাস। পদ্মার জনজীবনকে কেন্দ্রমুখ করে সাহিত্য রচনায় বলিষ্ঠ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। পদ্মার তীরবর্তী জেলেপাড়ার জীবনাচরণ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষিত হয়েছে 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে। ভদ্র জীবনের কৃত্রিমতা ও যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে গ্রামজীবনের নির্বিত্ত শোষিত মানুষের অবিন্যস্ত জীবন-যাপন, কাম-প্রণয়, স্বার্থ-সংকীর্ণতা চিত্রিত হয়েছে উপন্যাসে। কেতুপুর গ্রামের পটভূমিতে বেড়ে ওঠা চরিত্র সকল- কুবের, গণেশ, ধনঞ্জয়, মালা, যুগল, রাসু, যুগী, গোপী ও অন্যান্যদের জীবনযাত্রা বিন্যস্ত হয়েছে দারিদ্র্যের প্রবল সংঘর্ষে।

সাম্প্রতিককালে এ ধারায় রয়েছেন অভিজিৎ সেন, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনী বেরা প্রমুখ। বিশ শতকের প্রথম দশকে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যেতে থাকে অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক মূল্যবোধ ইত্যাদি। উৎপল দত্তের বেড়ে ওঠা এই কালখণ্ডে। তার মানুষ সংক্রান্ত চেতনা শ্রেণি সমাজের বাস্তবতাকেই তুলে ধরে। সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদী মানুষ সম্পর্কে তার গভীর জীবন বোধ তার নাটক গুলিকে সফলতা দান করেছে। তাঁর নাটক নিছক অবসর বিনোদনের মাধ্যম নয়, ঘুন ধরা বিকলাঙ্গ সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। তা একাধারে অস্ত্র, যে অস্ত্র 'টিনের তলোয়ার' নয়, তা 'রাইফেল'। উৎপল দত্তের নাটক গুলির মধ্যে আবার পাওয়া যায় শ্রেণি চেতনা, ইতিহাস চেতনা। যে শ্রেণি চেতনার উল্লেখ পাওয়া যায় তাঁর 'ফেরারি ফৌজ' নাটকে।

নিম্নবর্গীয় চেতনার নিজস্বতা স্বীকরণের পাশাপাশি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাদের ভূমিকার বিশিষ্টতা বিষয়েও মনোনিবেশ করা হয়েছে এক্ষেত্রে।

নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকগণ নিম্নবর্গের নিজস্ব কণ্ঠস্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাদের মতে, ইতিহাস থেকে নিম্নবর্গের যে কণ্ঠস্বর উঠে আসে সেটি তার স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকারী স্বর নয়, তা অন্যের নির্মাণ। "ইতিহাসের দলিলে যে-কণ্ঠস্বরই শুনি না কেন, তা নিম্নবর্গের কথা নয়, অন্যের নির্মাণ।"[৬] কিন্তু উৎপল দত্ত সেখানই এক বিপরীত মুখী চিন্তাধারার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়েছেন। 'ফেরারি ফৌজ' নাটকে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ভাবে সমাজের প্রান্তিক জনগণের প্রভাব না থাকলেও তাদের অস্তিত্ব কিন্তু রয়ে গেছে প্রতিটি ক্ষেত্রেই। ভুবন ডাঙার কৃষক সম্প্রদায় স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতা মাস্টারদা সূর্য সেনকে তাদের হৃদয়ে স্থান দিয়েছে দেবতা রূপে। সূর্য সেন তাদের কাছে কোনও ব্যক্তিবিশেষ নয়, সূর্য সেন এক আবেগ, সমাজের বুকে এসে লাগা এক ঢেউয়ের ধাক্কা। তাইতো সূর্য সেনকে যদি পুলিশ ধরে ফাঁসি দেয়, সে কথায় এক কৃষকের উক্তি, "দিউক। এক সূর্য স্যান যাউক, তার স্থানে আইব আর একজন। তারপর আর এক।"[৭] অর্থাৎ সূর্য সেন ভুবন ডাঙার সাধারণ মানুষদের কাছে এক না শেষ হওয়া মুক্তির সুখ। যে সুখের শেষ কোনও একজনকে ফাঁসি দিয়ে শেষ করা যায় না। তাইতো সূর্য সেন হোক, বা তার শিষ্য শান্তি রায়, তারা এই সর্বহারা মানুষদের কাছে দেবতার স্বরূপ, এক না শেষ হওয়া গল্প তথা তাদের মনের বিশ্বাস।

নাটকে তথাকথিত এই নিম্নবর্গীয় সম্প্রদায়ের ইংরেজ বিরোধী প্রত্যক্ষ সংগ্রামের রূপটি উঠে না এলেও, পরোক্ষ ভাবে তারাও কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামী। ভারত মাতার শৃঙ্খল মোচনে যারাই সামিল তারাই তো স্বাধীনতা সংগ্রামী। তাইতো চণ্ডী গ্রামের সাধন ডোম তার ঘরে শান্তি রায়কে লুকিয়ে রাখার সময়ে একবারও ভাবেনি তার পরিণামের কথা। যার ফলও তাকে ভুগতে হয়েছে অবসম্ভাবি রূপেই, তার ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু কোনও ভাবেই কি তাদের মনে থেকে স্বাধীনতার বীজকে উপড়ে ফেলা সম্ভব হয়েছে? কখনোই না, কারণ সূর্য সেনদের চোখের যে আগুন, সেই আগুন প্রভাবিত করেছে তাদেরকে, সেই আগুন সঞ্চারিত হয়েছে তাদের মধ্যেও। কারণ শান্তি রায়, সূর্য সেনরা তাদের কাছে শুধুমাত্র স্বাধীনতা সংগ্রামী নয়, তারা তাদের কাছে এক আবেগ, মুক্তির আরেক নাম। তারা তাদের কাছে কারাবালার প্রান্তরের হাসান হোসেনের সমান। তাইতো শিবু মণ্ডলের একরত্তি ছেলেটিও পুলিশের সামনে চীৎকার করে ওঠে, "বন্দেমাতরম্! ইনক্লাব বিন্দাবর! ইনক্লাব বিন্দাবর!"[৮]

শুধুমাত্র এই কৃষক সম্প্রদায়রা নয়, পিছিয়ে নেই স্টিমার ঘাটের মাঝি মাল্লা, শ্রমিক সম্প্রদায়ও। পলাতক সংগ্রামীদের স্টীমারে পাচার করতে তারাই একমাত্র সহায়, এবং সে কাজে যে তারা পিছুপা নয় তা প্রমাণিত হয়েছে সিরাজুলের কথাতেই, "মাল্লাগো আর কইতে হইব না। শ্রমিক সম্প্রদায়ের দলে টানা দেখলাম অত্যন্ত সহজ।"[৯] সিরাজুলের কথাতেই প্রমাণিত যে তথাকথিত মেরুদণ্ডহীন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের থেকে এইসব অশিক্ষিত, তথা সমাজের প্রান্তিক সম্প্রদায়ই সেদিন স্বাধীনতার গুরুত্বকে বেশি অনুধাবন করতে পেরেছিল। তারাই চেয়েছিল স্বাধীনতার আস্বাদ গ্রহণ করতে। তাইতো এই পর্যায়ে এসে নাটকের তথাকথিত শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়, যারা কিনা স্বাধীনতার ব্রতকে মনে প্রাণে আপন করে নিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপ দিয়েছে তাদের চোখেও সূর্য সেন আর এই সর্বহারা সম্প্রদায় এক আসনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, "সেই কন্ডিশনে গায়ের নিতাই বাগদী ও সূর্য স্যানে কোনো ডিফারেন্স থাকে না।"[১০]

নিম্নবর্গের ইতিহাস আমাদেরকে আর একটি বিষয় সম্পর্কে অবহিত করে, তা হল সমাজে নারীর অবস্থান। নিম্নবর্গের ইতিহাস বলে, "পুরুষশাসিত সমাজে সব নারীই এক অর্থে নিম্নবর্গ।"[১১] কাজেই নিম্নবর্গের ইতিহাসের প্রকৃত নির্মাণ করতে হলে সমাজে নারীর অধীনতার বিষয়টিও গবেষণার বিষয়। বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে

অদ্যবধি আমাদের সমাজে নারী শুধুই অবহেলার পাত্র। নারী শৈশবে তার পিতা, যৌবনে স্বামী, বার্ধক্যে সন্তানের অধীন। তার নিজস্ব সত্তা, নিজস্ব চিন্তা চেতনা গড়ে ওঠার সুযোগ কোনটাই এই পুরুষশাসিত সমাজে স্বীকৃত হয়নি, হয়না। নারী শিক্ষা, নারী স্বাধীনতা সমস্ত বিষয়েই পুরুষ সমাজ তাদেরকে নিজের গণ্ডির মধ্যেই আটকে রেখেছে চিরকাল। সে সমাজ উচ্চবর্গের হোক বা নিম্নবর্গের, নারী সেখানে চিরকালই অধীনস্থ। সন্তান উৎপাদন, সংসার প্রতিপালন এই তাদের মূল প্রতিপাদ্য। 'প্রান্তজন' ধারণার তাত্ত্বিক কক্ষপথে নারীর অবস্থান, অস্তিত্ব অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে অতি সহজে। নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিকগণ অকপটে স্বীকার করেছেন নারীর বিপর্যয়কে। উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গ উভয় সমাজশৃঙ্খলায় নারীর অবস্থান অসহায়, অধীনস্থ।

নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকদের কাছে উচ্চবর্গের সমাজে নারীর অধীনতার পাশাপাশি নিম্নবর্গের সমাজে মেয়েদের অধীনতার বিষয়টিও সমানভাবে আলোচ্য বিষয়। কারণ বর্গভেদে পুরুষশাসিত সমাজের গাঠনিক চেহারাই মেয়েদের অধীনস্থ অবস্থানের ধারাটিকে অব্যাহত রেখেছে যুগান্তরব্যাপী। মেয়েদের সম্পর্কে সামাজিক ধ্যান-ধারণা, মানসিকতার প্রতিফলন কখনোই সরল-সমানুপাতিক নয়। সুপ্রাচীনকাল থেকেই অবরোধ-অবদমনের চিত্র প্রতিফলিত সমাজব্যবস্থায়। পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থা-বিন্যাসই সামাজিক গড়নকে মেয়েদের জন্য অবনত রেখেছে। চাপিয়ে দেওয়ার শাসন-রাজনীতি প্রতিফলিত হয়েছে পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে। আমাদের ভারতবর্ষীয় সমাজব্যবস্থায় এর চূড়ান্ত প্রতিরূপ পাওয়া যায় মনুসংহিতার কাল থেকেই। মানসিক দৃষ্টিপ্রক্ষেপেই চূড়ান্ত অবমাননার পরিচয় রেখেছে মনুশাস্ত্র। একটি মেয়ে, একটি সাপ, একটি বেজি, একটি বাজপাখিকে সমতুল্য হিসেবে বিচার করা হয়েছে। প্রান্তবর্গীয় সমাজ-কাঠামোও এই সনাতনী চিন্তাধারা, ব্যবস্থা থেকে পৃথক হতে পারেনি। প্রতিটি প্রান্তিক গোষ্ঠী নিজেদের মতো সংস্কার-শৃঙ্খলার কাঠামো তৈরি করেছে বটে; কিন্তু মেয়েদের সম্পর্কে গঠনমূলক ধ্যানধারণা, মানসিকতার প্রকাশ ঘটেনি বিশেষ। বরং শ্রেণি, জাতি, সম্প্রদায়ের বিষয়গুলো নারীর অধীনতাকে তরান্বিত করেছে বেশিমাত্রায়।

ফলে অবদমন, অবমাননার ফলশ্রুতিই অনিবার্য পরিণতি হিসেবে পর্যবসিত হয়েছে মেয়েদের নিয়তি-অদৃষ্টে। প্রাত্যহিক জীবনযাপনের পর্যালোচনায় লিঙ্গগত বৈষম্যই প্রতিফলিত হয়েছে চূড়ান্তরূপে। আসলে, মেয়েদের প্রতি অবমাননার ক্ষেত্রে বর্গভেদ অভিন্ন সত্তায় ধরা পড়লেও প্রান্তিক সমাজে পুরুষ-শাসনের কঠোর অনুশাসনে গভীরতর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে মেয়েরা। নারীবাদের কোনও একক সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। মূলত পশ্চিম ইউরোপের বুর্জোয়া শ্রেণির অবস্থানের মধ্যে নারীবাদের সূত্র লুকিয়ে আছে। বুর্জোয়া শ্রেণি যে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার উপর দাঁড়িয়ে ছিল, সেই ব্যবস্থার শ্রম বিভাজন ছিল লিঙ্গভিত্তিক। পুরুষের কাজ ছিল বাইরের জগতের উৎপাদনমুখী ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত, আর নারী ছিল অন্দরমহলে। সন্তানপালন ও পরিচর্যার মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনযাপনই ছিল তার কাজ । বুর্জোয়া উৎপাদন ব্যবস্থায় তাই নারীর ভূমিকা ছিল গৌণ। এই সমাজব্যবস্থা উদ্ভবের প্রায় দেড়শ বছর পরে ১৯৪৯ সালে ফরাসি দার্শনিক 'সিমোন দ্য বোভোয়া' নারীর সামাজিক অবস্থানকে second sex (দ্বিতীয় লিঙ্গ) বলে অভিহিত করলেন প্রতিবাদের স্বরে।

কিন্তু এর কিছু ব্যতিক্রমী দিক নিয়েই উঠে এসেছে 'ফেরারি ফৌজ'। যে সমাজ নারীদেরকে চিরকালই পিছিয়ে রাখতে চায়, বলা ভালো যে রাখতে অভ্যস্ত, স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সেই সমাজেই নারী উঠে এসেছে তার বিদ্রোহিণী রূপ নিয়ে। অন্দরমহলে থেকে শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদন বা সংসার ধর্ম পালনই নয়, নারী উঠে এসেছে এক অন্য মাত্রা নিয়ে। নাট্যকার তাদের প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন অন্য রূপে। সেই কারণেই হয়তো উৎপল দত্ত তাঁর নাটকটি উৎসর্গ করলেন পরাধীন ভারতের অগ্নিকন্যা কল্পনা দত্তকে। হ্যাঁ এটা ঠিকই পরাধীন ভারতে প্রীতিলতা বা কল্পনা দত্তদের মত এ-নাটকের নারী চরিত্ররা সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়নি, কিন্তু এও ঠিক যে তারা সেখানে পিছিয়েও নেই। যে নারী বিপ্লবিদের সহায়তা করতে পারে, বা যে নারী নিজের সন্তানকে

স্বাধীনতা আন্দোলনে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে পারে, নিজের সম্মান বিসর্জন দিতে পারে সে কখনোই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়।

অশোকের পিতা শিক্ষিত রুচিসম্মত হওয়া সত্ত্বেও পড়াশুনা ছেড়ে নিজের ছেলের স্বাধীনতা সংগ্রামী হওয়া যেখানে মেনে নিতে পারছেন না, সেখানে বঙ্গবাসী কিন্তু অবলীলায় নিজের ছেলের পাশে দাঁড়িয়ে তার কর্মকাণ্ডকে সমর্থন জানিয়েছেন, দেশের জন্য নিজের ছেলেকে উৎসর্গ করেছেন। সমর্থন জানিয়েছেন ছেলের দলের আইন শৃঙ্খলাকে। তাইতো যেখানে যোগেন ছেলের চিন্তায় ব্যকুল, বঙ্গবাসী সেখানে দাঁড়িয়ে বলতে পেরেছেন, "যে দেশের স্বাধীনতা নেই, সে-দেশ জ্ঞান দিয়ে কি করবে?"[১২] অর্থাৎ পরাধীনতার যন্ত্রণাটা সামান্য গৃহবধূ হয়েও বঙ্গবাসী অনুধাবন করতে পেরেছেন। চেয়েছেন সেই শৃঙ্খল মোচন করতে, তাইতো আজ অবগুণ্ঠন ত্যাগ করে তাদের বেরিয়ে আসা। পিছিয়ে নেই অশোকের স্ত্রীও, নিজের স্বামীর চিন্তায় ব্যকুল হলেও তাকে মনের মধ্যে দমিয়ে স্বামীর আদর্শ, স্বামীর কর্মকে নীরব সমর্থন জানিয়েছে সে। পুলিশের অত্যাচারের মুখেও সে মুখ খোলেনি। ধর্ষিতা হয়েছে এই বর্বরদের দ্বারা, কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজের স্বামীর আদর্শকে ত্যাগ করেনি। বরং অশোকের রাজসাক্ষী হওয়ার ঘটনায় তারা নিজের সন্তান তথা স্বামীর বিরুদ্ধেই খড়্গহস্ত হয়েছে, সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে চেয়েছে তার সাথে। অর্থাৎ তাদের কাছে অশোকের চেয়ে তার আদর্শ, দেশের প্রতি ভালবাসাই বড়। সন্তান সেখানে নগণ্য, দেশ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

সমাজের অতি প্রাচীন পেশায় নিযুক্ত রাধাও পিছিয়ে নেই, নিজের বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করে নিজের ঘরে সে আশ্রয় দিয়েছে বিপ্লবীদের। একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর চেয়ে তার অবদান কিছু কম নয়। এই মহান কাজে ব্রতী হতে পেরে সে নিজেকে ধন্য মনে করেছে। সমাজের পাঁকে অবস্থান করেও সে নিজেকে এই পবিত্র কাজে উৎসর্গ করতে পেরেছে। তাই যখন স্বাধীনতা সংগ্রামী শান্তি রায় বলেন, "দেশমাতৃকা আমার কাছে একটা নিছক কল্পনা নয়। তার মুখ ঠিক-ঠিক ঐ রাধার মতন সে দেখতে।"[১৩] তখন তার এই কথাকে কোনোমতেই অত্যুক্তি বলে মনে হয়না। ভারত মাতার শৃঙ্খল মোচনের কাজে তার যে বীর সন্তানদের প্রত্যক্ষ অবদান রয়েছে, সেখানে ঘরের এই গৃহবধূদের যেমন অবদান রয়েছে, ঠিক তেমনই অবদান রয়েছে এই রাধাদেরও। দেশ তো সবাইকে নিয়েই।

সমাজের ভিড়ে মিশে যাওয়া এই মানুষদের আলাদা করে কোনও আইডেন্টিটি থাকে না, থাকেনা কোনও মূল্য, তাদের পরিচয় শুধুই ক্রাউড হিসেবে, নাটকেও তাদের অবস্থান হয়েছে জনতা হিসেবেই। উচ্চবর্গ তখনই এদেরকে মান্যতা দেয় যখন এরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। 'ফেরারি ফৌজ' নাটকে সেই বিদ্রোহের রূপ নিয়ে, স্বাধীন হওয়ার মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে এসেছে তারা। ভীরু তথা উচ্চবর্গের অনুগত, এই তকমা ছেড়ে বেরিয়ে এসে সহযোদ্ধা হিসেবে নিজেদেরকে উপস্থিত করেছে নাটকে। এবং বলাবাহুল্য নাট্যকার তাদের মুখে প্রতিবাদের এক অন্য ভাষা ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। কাজেই কখনও প্রত্যক্ষ কখনও বা অপ্রত্যক্ষ, যেভাবেই হোক না কেন নাটকে তাদের অবদান অনস্বীকার্য।

উল্লেখপঞ্জি:

১। মাঝি, বিপ্লব (সম্পা.) সন্ধান। নিম্নবর্গ সংখ্যা। কলকাতা, দিয়া পাবলিকেশন, ২০১৩, পৃ. ১২৩।
২। মজুমদার সেন, জহর। নিম্নবর্গের বিশ্বায়ন। কলকাতা, পুস্তক বিপণি, জুলাই ২০০৭, পৃ. ১১।
৩। তদেব, পৃ. ১১।
৪। ভদ্র, গৌতম এবং চট্টোপাধ্যায়, পার্থ। নিম্নবর্গের ইতিহাস। কলকাতা, আনন্দ, ১৯৯৮, পৃ. ৩২।
৫। ভদ্র, গৌতম এবং চট্টোপাধ্যায়, পার্থ। নিম্নবর্গের ইতিহাস। কলকাতা, আনন্দ, ১৯৯৮, পৃ. ৮।

৬। ভদ্র, গৌতম এবং চট্টোপাধ্যায়, পার্থ। নিম্নবর্গের ইতিহাস। কলকাতা, আনন্দ, ১৯৯৮, পৃ. ১৭।
৭। দত্ত, উৎপল। ফেরারি ফৌজ। কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৪০৮, পৃ. ১৩।
৮। দত্ত, উৎপল। ফেরারি ফৌজ। কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৪০৮, পৃ. ২০।
৯। দত্ত, উৎপল। ফেরারি ফৌজ। কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৪০৮, পৃ. ২৫।
১০। দত্ত, উৎপল। ফেরারি ফৌজ। কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৪০৮, পৃ. ৫৩।
১১। ভদ্র, গৌতম এবং চট্টোপাধ্যায় পার্থ। নিম্নবর্গের ইতিহাস। কলকাতা, আনন্দ, ১৯৯৮, পৃ. ২০।
১২। দত্ত, উৎপল। ফেরারি ফৌজ। কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৪০৮, পৃ. ৩২।
১৩। দত্ত, উৎপল। ফেরারি ফৌজ। কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৪০৮, পৃ. ৮১।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1086-1092
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.326

রবীন্দ্রনাথের দর্শনচিন্তায় মানুষের ধারনা

দেবাশিস বিশ্বাস, *গবেষক, মানবিক বিজ্ঞান, অর্থনীতি, কলা ও গ্রামীণ প্রযুক্তি বিভাগ (দর্শন), ভারতীয় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ধারওয়াড়, কর্ণাটক, ভারত*

Received: 12.03.2026; Accepted: 13.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In the latter half of the nineteenth century and the early twentieth century, several Indian thinkers engaged in philosophy outside the boundaries of traditional Indian schools of thought. Among them, one of the greatest was Rabindranath Tagore. Though celebrated across the world as the "Poet Laureate of Bengal," Tagore's poems, essays, and songs reveal a deep and original vision of life and the universe with remarkable philosophical depth. His famous Hibbert Lectures were later collected and published as '*The Religion of Man*'. The title itself makes us wonder—if it's not The Religion of God, does that mean Tagore was an atheist? However, what becomes clear through '*The Religion of Man*' is that the central focus of Tagore's philosophy is the human being. Naturally, this raises questions: What is the true nature of a human being? What role do humans play in this world? Was Tagore speaking about a particular community or a specific period of history? And while exploring these questions, did he turn to Advaita Vedanta for guidance? So then, what does this Religion of Man actually mean? Why did Tagore feel the need to search for a new kind of religion centred on humanity? And how does it differ from the many established religions we already know? My research paper will make a sincere attempt to explore these questions, even if only in brief.

Keywords: Religion, Humanism, Surplus in man, Advaita Vedanta, Idea of God

সাধারণত কোন দার্শনিক তাঁর চিন্তাধারা কোনো বিশেষ তত্ত্বের আকারে প্রকাশ করে থাকেন এবং সেই তত্ত্বের বাক্যগুলি যুক্তির আকারে সাজানো থাকে। দার্শনিকের কাছে যৌক্তিকতার বিষয়টি প্রাধান্য পায়। কিন্তু কবি দার্শনিকের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাব লক্ষ্যণীয়। কবি-দার্শনিকের চিন্তাধারা মূলত তাঁর কল্পনার প্রকাশ। তারা বহু সময়ই কোন অনুভূতির মাধ্যমে তাঁর দার্শনিক তত্ত্বকে সাজানোর চেষ্টা করেন। তাই সেক্ষেত্রে তাঁর মূল বক্তব্য বুঝতে গেলে প্রয়োজন হয় অন্তর্দৃষ্টির অনুশীলন। রবীন্দ্র দর্শনেও পাই এমনি গভীর অন্তর্দৃষ্টি।

শুধু তাই নয়, আমরা জানি যে, দর্শনের অর্থ 'দৃষ্টি'। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই 'দর্শন' শব্দটিকে আক্ষরিক অর্থেই গ্রহণ করেছেন। তিনি 'দর্শন' বলতে বুঝিয়েছেন, কল্পনাপ্রসূত দৃষ্টি, যার মাধ্যমে আমরা অনুভব করি অকৃত্রিম সত্যকে। আবার অন্যদিকে দৃষ্টির পাশাপাশি চলে আসে দ্রষ্টার প্রসঙ্গ, কেননা দৃষ্টি মানে কোনো না কোনো ব্যক্তির দৃষ্টি। তাই ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে দৃষ্টি অথবা দর্শন কোনটাই সম্ভব নয়। এভাবেই রবীন্দ্রনাথ গুরুত্ব দিয়েছেন ব্যক্তি এবং ঐ ব্যক্তির অনুভূতির উপর। তাঁর মতে ব্যক্তির থেকে বিচ্ছিন্ন করে সত্যের আলোচনা করা

অসম্ভব। তাই তাঁর দর্শন ব্যক্তিকেন্দ্রিক দর্শন। তাঁর কাছে এই ব্যক্তি হলো মানব। তাঁর দর্শন হল মানবতাবাদী দর্শন।

কেউ কেউ মনে করেন, যে বেদ ও উপনিষদের প্রাচীন আদর্শ কবির মনে গাঁথা, কিন্তু তবুও সেই আদর্শের দ্বারা সম্পূর্ণরুপে কবি কখনোই প্রভাবিত হননি। তাঁর মতে উপনিষদ ও বেদান্তে যা বলা হয়েছে, তাঁর সঙ্গে মানুষের সাধারণ জীবনধারার কোন যোগ নেই। তাই তিনি স্বাভাবিকভাবেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন বৈষ্ণবভক্তি মার্গের প্রতি, যা তাঁর সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়েছে।

সেখানে ভক্তিগীতের মাধ্যমে ভক্ত ও ভগবানের প্রেম মানবপ্রেমেই সমন্বিত হয়েছে। সেই ভাবধারা রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

তাছাড়াও উপনিষদের ব্রহ্ম এবং বৈষ্ণবধর্মের ঈশ্বর এই দুইয়ের মধ্যে যে সাদৃশ্য, তা দেখতে পেয়েছেন ভগবতগীতায়। সেখানে নিরাকার ব্রহ্ম ও সাকার ঈশ্বরের ভেদ মুছে যায়। তিনি একদিকে অদ্বৈতবাদী, অন্যদিকে ঈশ্বরের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট। তাই বলা যেতে পারে যে, তাঁর মানবতাবাদী দর্শন আস্তিকতা ও অদ্বৈতবাদী- এই উভয়ের মধ্যেই বিচরণ করে। একদিকে তিনি যেমন মিলিয়েছেন কাব্য ও দর্শনকে, অন্যদিকে মানবতা ও আধ্যাত্মিকতাকে। তাই তিনি মানুষের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা করেছেন সেই পরম সত্তাকে। তাই তিনি অদ্বৈতবাদী হয়েও তিনি বাস্তব-বিমুখ নন। তাকে সেই অর্থে বলা যেতে পারে মূর্ত অদ্বৈতবাদী বা Concrete Monist. তিনি বহুত্বের বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গেই স্বীকার করেছেন এই মানবের বিশ্বকে।

রবীন্দ্রনাথের কাছে ব্রহ্ম যতটা সৎ ও সত্য, আমাদের এই মানব-বিশ্ব, এই বহুত্বের জগতও ততটাই সত্য। ঈশ্বর এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন বটে কিন্তু মানুষ নিজের ক্ষমতায় ও প্রতিভায় তাকে বাসযোগ্য করে তুলেছে। তাই এই বিশ্ব হলো মানুষের বিশ্ব। তিনি বলেছেন,

> "পথ চলছিল একটানা বাইরের দিকে, তাঁর নিজের মধ্যে নিজের অর্থ ছিল না। পৌঁছল এসে ঘরে, সেখানে অর্থ পাওয়া গেল, আরম্ভ হল ভিতরের লীলা। মানুষ এসে পৌছল সৃষ্টির ব্যাপারে, কর্মবিধির পরিবর্তন ঘটলো, অন্তরের দিকে রইল তাঁর ধারা।"[১]

দার্শনিক দিক থেকে এটি গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের আবির্ভাবপূর্বে শুধুই বস্তু জাগতিক ক্রিয়াকলাপ চলছিল। সেখানে শুধুই বস্তুর জড় স্বভাবের প্রসারণ অথবা অভিব্যক্তি চলছিল। কিন্তু মানুষের উদ্ভবের পরই সমস্ত সৃষ্টি প্রক্রিয়া অন্তর্মুখী হল, অভিব্যাক্তির ঝোঁক পড়ল মানবমনের দিকে।

কাজেই, মানুষের আবির্ভাব প্রকৃতির অভিব্যক্তি প্রক্রিয়ার আমূল পথ পরিবর্তন করেছে, তাকে শুধুই বহির্মুখী না করে, অন্তর্মুখী করেছেন, রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় মানুষের আরও একটি কারনে গুরুত্ব রয়েছে, সেটি হল তিনি জাগতিক অস্তিত্বের ক্ষেত্রেও মানুষের প্রাধান্য কে স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-

> "আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ
> চুনি উঠল রাঙা হয়ে, আমি চোখ মেললুম আকাশে-
> জ্বলে উঠলো আলো
> পুবে পশ্চিমে।
> গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর'
> সুন্দর হল যে।"[২]

কাছেই জগৎ এর অস্তিত্ব নির্ভর করছে মানুষের চেতনার উপর। তিনি একথা বলেছেন যা ঘটে তা সবসময় সত্য নয়, মানুষ যা রচনা করে তাই সত্য। আইনস্টাইনের সঙ্গে এক কথোপকথনে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, যা

সত্য তা কখনই নৈর্ব্যক্তিক ও মনুষ্য নিরপেক্ষ নয়। এই বিশ্বজগতে এমন কিছুই নেই যা ব্যাক্তি মানুষের সীমানার বাইরে। কারন মানুষই হল সবকিছুর কেন্দ্রে। এর থেকে একথা স্পষ্ট যে রাবীন্দ্রিক ভাবনায় মানুষের একটি দার্শনিক ভূমিকা রয়েছে। মানুষই তাঁর দর্শনের কেন্দ্রীয় প্রত্যয়।

এখন আমাদের জানা প্রয়োজন মানুষের স্বরূপটি কেমন? রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে, ভাষণে মানুষের স্বরূপের দুটি দিকের কথা বলেছেন। 'শান্তিনিকেতন' ভাষণবলীর 'দ্বিধা' নামক ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "দুইকে নিয়ে মানুষের কারবার। যে প্রকৃতির, আবার সে প্রকৃতির উপরের। এক দিকে সে কায়া দিয়ে বেষ্টিত, আর এক দিকে সে কায়ার চেয়ে অনেক বেশি।" আবার, 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধমালায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "মানুষ আছে তাঁর দুই ভাবকে নিয়ে, একটা তাঁর জীবভাব, আর একটা বিশ্বভাব।"[৪] "দ্বিধা" ভাষণে রবীন্দ্রনাথ মানুষের মধ্যেকার এই দ্বন্ধের কথা বলেছেন- "মানুষকে একই সঙ্গে দুটি ক্ষেত্রে বিচরণ করতে হয়। সেই দুটির মধ্যে এমন বৈপরীত্য আছে যে, তারই সামঞ্জস্য সংঘটনের দুরহ সাধনায় মানুষকে চিরজীবন নিযুক্ত থাকতে হয়।" মনুষ্যত্বের মধ্যে এই যে প্রকাণ্ড দ্বন্ধ রয়েছে তাকে তিনি বলছেন, প্রকৃতি এবং আত্মার দ্বন্ধ। একদিকে স্বার্থ অন্যদিকে পরমার্থ, একদিকে বন্ধন অন্যদিকে মুক্তি, একদিকে সীমা অপরদিকে অসীম অনন্ত। মানবসত্তার এই দুটি দিককে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন, কখনো বলেছেন 'আত্মা' ও 'অহং' (যেমন 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধমালার দ্বিতীয় প্রবন্ধে); আবার কখনো তিনি মানুষের এই দুটি দিককে 'বড় আমি' আর 'ছোট আমি' বলেছেন (যেমন 'আত্মপরিচয়')। এই দুই দিকই মানুষের স্বরূপেরই অংশ।

এখন মানুষের মধ্যে যে দিকটি প্রাণীকূলের অনুকরণে গড়ে ওঠে তাকে মানুষের সসীম স্বরূপ বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ এই স্বরূপটিকে 'জীবভাব' নামেও চিহ্নিত করেছেন। মানুষ তাঁর জীবভাবে নিজের উপস্থিতিকে আঁকড়ে বাঁচতে চায়, এই স্বরূপে সে তাঁর জীবনধারনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদিকে কেন্দ্র করেই জীবন নির্বাহ করে। অর্থাৎ, যে স্বভাবে মানুষ শুধুই জীবরূপে বাঁচতে চায় তাই হল মানুষের সসীম স্বরূপ। এখানে প্রধান লক্ষ্য হল সেই সমস্ত কিছু যা সাধারন মানুষের কাম্য; অর্থাৎ অর্থ, বিত্ত, যশ, খ্যাতি প্রভৃতি। এই দিকটি সর্বদা তাঁর জৈববৃত্তির চরিতার্থতা চায়। এই দিকটিতে মানুষ যা যা তাঁর বৃত্তি আছে, সব নিয়োজিত করে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য উন্নতি সাধন ও সাফল্য লাভের জন্য।

কিন্তু মানুষ সর্বদা নিজেকে এই বিষয়ের জগতে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখতে চায় না। তখনই প্রকাশিত হয় মানুষের অপর একটি দিক। সে তখন আরও উচ্চতর জগতে বাস করতে চায়। তাঁর মতে যখনই তাঁর দৈহিক সসীমতার উর্ধে উঠে মহত্তর কোন কিছু করতে উদ্দত হয়, তাঁর ক্ষুদ্র স্বার্থপরতাকে বিসর্জন দিয়ে পরার্থপর ও মানবিক কাজে যুক্ত হয়, তখনই তাঁর মধ্যে অসীম স্বরূপের উন্মোচন ঘটে। এই অসীম স্বরূপ আসলে মানুষের মধ্যেকার বিশ্বমানব। তাই রবীন্দ্রনাথ 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধে বলেছেন, "মানুষের মধ্যে সেই জীব পেরিয়ে গেছে যে সত্তা সে আছে আদর্শকে নিয়ে এই আদর্শ অন্নের মত নয়, বস্ত্রের মতো নয়, এই আদর্শ এক আন্তরিক আহ্বান, এই আদর্শ একটা নিজ নির্দেশ। কোন দিকে নির্দেশ- যে দিকে সে বিচ্ছিন্ন নয়, যেদিকে তাঁর পূর্ণতা, যে দিকে ব্যাক্তিগত সীমাকে সে ছাড়িয়ে চলেছে, সে দিকে বিশ্বমানব।"

মানুষের প্রবল প্রাণশক্তি সমস্ত প্রতিকূলতাকে সরিয়ে অসীমের দিকে ধাবিত হয়। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, মানুষের অসীম স্বরূপের অন্তঃস্থিত এই জীবনীশক্তির দ্বারাই মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

> "The Power that lies behind is neither physical nor mental, it belongs to the inward self where man is united with this God." [৫]

রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন মানুষের অন্তঃস্থিত এই অসীম প্রকৃতি তাকে অমরতার স্বপ্ন দেখায়। মৃত্যু হল মানুষের সসীম অস্তিত্বের একটি ভ্রমমাত্র। মানুষ তাঁর অসীম প্রকৃতির দ্বারা মৃত্যু নামক ভ্রমকে অগ্রাহ্য করে অমরত্বের প্রতি অগ্রসর হয়।

মানুষের অসীম স্বরূপের প্রধান লক্ষ্য হল ত্যাগ ও তপস্যা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে রবীন্দ্রনাথ 'মানুষ' বলতে কখনই কোন বিশেষ দেশের, কালের, যুগের গোষ্ঠীর বা সম্প্রদায়ের কথা বলেন নি। তিনি মনে করেন যে মানুষের বর্তমান পরিচয় তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। তাঁর একটা উন্নততর ও বৃহত্তর পরিচয় আছে, যে পরিচয় তাকে বিষয়-সর্বস্বতার মধ্যে বেঁধে রাখে না তখন মানুষ জীবাত্মা থেকে উত্তীর্ণ হয় পরমাত্মার। ভারতীয় দর্শনে যেমন বলা হয় যে অসংখ্য জীবাত্মার মধ্যেই এক পরমাত্মা বিরাজ করেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনই মনে করেন যে প্রত্যেক ব্যাক্তি মানবের মধ্যে নিহিত আছে সর্বজনীন সর্বকালীন মানব।

এই অসীম দিকটিকে রবীন্দ্রনাথ 'মানুষের মধ্যে স্মিত সামান্য', 'মানুষের মধ্যে উদ্ধৃত', 'মানুষের মধ্যে দেবত্ব' এরকম নানা নামে উল্লেখ করেছেন। মানুষের অসীম দিকটিকে সুনির্দিষ্ট ভাষায় প্রকাশ করা দুরহ। তাই রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন জীবনের নানা ধরনের অভিজ্ঞতা যার মধ্যে দিয়ে মানুষের উদ্ধৃত দিকটির উন্মোচন ঘটে। মানুষ যখন ব্যাক্তিগত স্বার্থ ও জড় প্রথাগত অভ্যাস কাটিয়ে তাঁর বৃহৎ, সৃজনশীল মানুষ হয়ে ওঠাই মানবজীবনের লক্ষ্য। মানুষ যখন বাহ্য প্রকৃতির ভোগবিলাস থেকে মন সরিয়ে নিজের অন্তরের মধ্যে একাত্ম হয়ে সর্বজনীন, সর্বকালীন মানবকে উপলব্ধি করে, তখনই সে পূর্ণতা অর্জন করে। কাজেই মানব-সত্যের পূর্ণতার উপলব্ধির জন্য মানুষের মধ্যে যে বৃহৎমানুষ বা সর্বজনীন, সর্বকালীন মানব আছে তার জ্ঞান প্রয়োজন। মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত এই অন্য মানুষকে যাকে বাউলেরা 'মনের মানুষ' বলে তাকেই রবীন্দ্রনাথ 'মানুষের মধ্যে উদ্বৃত্ত' বলেছেন। মানুষের মধ্যে সৌন্দর্যবোধ, তাঁর আত্মপ্রকাশের বাসনা, শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি নান্দনিক বোধ, বিজ্ঞান,দর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে যে উৎকর্ষের প্রকাশ ঘটে তা প্রমান করে মানুষের অন্তরে এক উদ্বৃত্ত সত্তার বাস। এই উদ্বৃত্ত সত্তাই যেন জীবজগতে 'বাড়তির ভোগ'। জড় প্রকৃতির মধ্যে মানুষের এই দিকটি কুলায় না।

রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে অথর্ববেদ'কে অনুসরণ করে বলেছেন,

> "স্বতং সত্যং তপো রাষ্ট্রং শ্রমো ধর্মশ্চ কর্ম চ
> ভূতং ভবিষ্যদুচ্ছিস্তে বীর্যং লক্ষ্মীবর্লং বলে।"[৬]

রবীন্দ্রনাথ এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলেছেন- স্বত সত্য তপস্যা রাষ্ট্র-শ্রম, ধর্ম-কর্ম, ভূত-ভবিষ্যৎ, বীর্য-সম্পদ-বল সমস্ত মানুষের উদ্বৃত্তে অবস্থিত। এই সকল মানব গুণ যোগে জীবধর্ম সীমার অতিরিক্ত যে সত্তা তা কখোনই অমানব নয়। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে যে 'মানবব্রহ্ম'। আমাদের ঋতে, সত্যে, তপস্যায়, কর্মে সেই মানব ব্রহ্মরুপী উদ্বৃত্ত সত্তাকে অনুভব করি।

রবীন্দ্রনাথ 'The Religion of man' শীর্ষক বক্তৃতায় প্রকৃতির বিবর্তনের প্রেক্ষিতে মানুষের উদ্বৃত্ত ধারনাটি ব্যক্ত করেছেন।

তিনি বলেছেন, মানুষ স্বাধীন অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করল নিজের দেহভঙ্গিমার পরিবর্তন ঘটিয়ে। অভিব্যক্তি ধারার ব্যাতিক্রম ঘটিয়ে মানুষ জন্তুর চতুষ্পদী ভঙ্গিমার পরিবর্তে দু-পায়ের উপর ভর করে ঋজু হয়ে মানুষ উঠে দাঁড়ালো। এই দু-পায়ে দাঁড়ানো মানুষের স্বভাবগত, যা অন্যান্য চতুষ্পদী প্রাণীদের থেকে মানুষকে পৃথক করেছে। রবীন্দ্রনাথ আরও মনে করেন, যে চতুষ্পদী প্রাণীদের দৃষ্টি সাধারণত; নীচের দিকে হওয়ায় তাদের দৃষ্টিপাত হয় খণ্ড খণ্ড বস্তুর দিকে। এই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষই তাদের একমাত্র অবলম্বন, যার সঙ্গে কখনো বা যুক্ত

হয় কারো কারো ঘ্রানশক্তি বা শ্রবণশক্তি। কিন্তু মানুষের দৃষ্টি সর্বদা অগ্রে প্রসারিত রাখে, তাই সে শুধু খণ্ড খণ্ড বস্তুকে দেখে না, সেই বিভিন্ন বস্তুর মধ্যেকার একটা সম্বন্ধ ও ঐক্য কে উপলব্ধি করে। এই ভাবে মানবদৃষ্টি দেখতে পায় এক অখণ্ড সত্তাকে, যার কেন্দ্র স্থলে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। রবীন্দ্রনাথ একেই বলেছেন, 'মুক্ত দৃষ্টি'। পাশাপাশি তিনি একথাও বলেছেন, মানুষ তাঁর ঋজুমুক্ত দেহে চৈতন্যের অধিকারী হয়ে এমন একটা বিরাট জগতের পরিচয় পেয়েছে যেখানে সে কেবলমাত্র খাদ্য বস্ত্রের চাহিদায় নিমগ্ন থাকেনি।

পুরু ত্বক, বড়ো বড়ো নখ, দাঁত, শুঁড়, ডানার মতো অঙ্গভার থেকে মুক্ত হয়ে লাভ করেছে এক উন্মুক্ত কল্পনাশক্তি যা মানুষকে প্রদান করেছে মননশীল ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা।

সমস্ত দৈহিক সীমাবদ্ধতাকে ছাপিয়ে নিজের অন্তঃস্থলের অনন্ত সত্তাকে প্রকাশের তাগিদ দেখিয়েছে। ভারত, চীন, পারস্য বা গ্রীসের মতো বিভিন্ন দেশে মানুষের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করার বাসনা বারংবার দৃষ্ট হয়েছে, এবং এটি সম্ভব হয়েছে মানবজীবনের উদ্বৃত্ত স্বরূপ জীবন শক্তির জন্য। মানুষ মরণশীল জীব হয়েও নিজেকে অমৃতের অধিকারী করতে চায়। সে সাহিত্য রচনা করে একজন শিল্পী হয়ে উঠে। কারণ সে বিশ্বাস করে তাঁর ব্যাক্তিগত দৈহিক পরিচয় তার আসল পরিচয় নয়। তার প্রকৃত পরিচয় একজন বিশ্বজনীন সৃষ্টিশীল মানব হিসাবে যার মধ্যে নিজেকে সকলের সঙ্গে যুক্ত করার তীব্র আকুলতা রয়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, যদি আমরা রোম সভ্যতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন গুলি দেখি, সেগুলি কেবলমাত্র রোমের তৎকালীন অধিবাসীদের জন্য নয়। সর্বকালের সর্বদেশের মানুষের কাছে সেগুলি সমানভাবে গ্রহণযোগ্য ও উৎকৃষ্ট নিদর্শন রূপে সমাদৃত হয়ে চলেছে। তাই এই রোম সভ্যতার উৎকৃষ্ট নিদর্শনগুলিকে মানুষের উদ্বৃত্ত সত্তার পরিচায়ক হিসেবে গণ্য করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন জীবজগতে মানুষের চৈতন্যশক্তি, কল্পনাশক্তি ও সৃষ্টিশীলতা তাকে জীবজগত থেকে স্বতন্ত্র্য নিয়ে তৃপ্ত থাকেনি।

'আমি কে' এই আত্মজিজ্ঞাসার সদুত্তর দেওয়ার ব্যাকুল বাসনায় মানুষ নানাভাবে সচেষ্ট হয়েছিল। তাই পশু জগতের সুখ কখনো মানুষকে তৃপ্ত করতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে কবি 'বড়ো আমি' এবং 'ছোট আমি' এর প্রসঙ্গে এনেছেন। 'ছোট আমি' একটি অহংকারের আবরণে নিজেকে আবৃত করে রাখে। সে হল আত্মকেন্দ্রিক এবং আত্মগরিময় অন্ধ। কিন্তু 'বড় আমি' সত্যতার পথে অনুসন্ধিৎসু। তাই এই 'বড়ো আমি' মানুষের ও সমগ্র জাতির ভবিষ্যৎ রচনা করতে পারে। মানুষের প্রগতি সর্বদা ভবিষ্যৎ অমুখী। মানুষ চায় তার 'বড়ো আমি' কে প্রকাশ করতে। তাই সে প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে মনুষ্যত্বকে বাঁচিয়ে রাখতে। আর সেই কারণেই মানুষের মধ্যে রয়েছে দ্বৈত অধিকার- মৃত্যুর অধিকার ও অমৃতের অধিকার। ব্যক্তি মানুষের মৃত্যু হয়, কিন্তু রবীন্দ্রমনন যাকে 'মানুষ' বলে অভিহিত করেছে, তার মৃত্যু নেই। সে মানব, তাই সে অমর। আর এখানেই সার্থক রবীন্দ্রধারনায় 'মানুষ'।

রবীন্দ্রনাথ মানুষের মধ্যে উদ্বৃত্তের পরিচয় দিতে গিয়ে মানুষের ধর্মচেতনার ইতিহাসটিকেও অনুধাবন করেছেন। তিনি ধর্ম বলতে মহাজাজতিক, বিমূর্ত বা অলৌকিককে বোঝায়নি। তাঁর কাছে ধর্ম কোন আচার অনুষ্ঠান নয়, তাঁর মতে ধর্ম হচ্ছে মানুষের স্বভাব। এই স্বভাবটি হল মনুষ্যত্ব। আর মনুষ্যত্ব হল মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি। তিনি বলেছেন,

> "স্বার্থ আমাদের যে সব প্রয়াসের দিকে ঠেলে নিয়ে যায় তাঁর মূল প্রেরণা দেখি জীব প্রকৃতিতে; যা আমাদের ত্যাগের দিকে তপস্যার দিকে নিয়ে যায় তাকেই বলি 'মনুষ্যত্ব' আর এই মনুষ্যত্বই হল মানুষের ধর্ম।"[৬]

আসলে রবীন্দ্রনাথের কাছে মানুষের ধর্ম হল মনুষ্যত্বের সাধনা, যা দেশ, কাল বা কোন ধর্মের গণ্ডিতে থেমে থাকেনি। এই সাধনার জন্য মনুষ্যের মধ্যে মনুষ্যত্বের যে আদর্শ ব্রহ্ম তারই মধ্যে অভিব্যক্ত। এই মানবব্রহ্ম কোনো এক বিমূর্ত কল্পনা বা আইডিয়া নয়, অথবা উপনিষদের শুদ্ধ চৈতন্যময় সত্তামাত্র নয়। মানুষের মধ্যে যে মহান গুনাবলি নিহিত আছে। যার স্বল্পতম বিকাশে মানুষ নিজেকে 'মানুষে'র পর্যায় তুলে আনে, যেখানে পশু থেকে মানুষ পৃথক হয়ে যায়- সেই গুণাবলির শ্রেষ্ঠ বিকাশ যে আদর্শের মধ্যে- মানবব্রহ্ম সেই মূর্ত মানবসাপেক্ষ আদর্শেরই প্রতীক। মানুষ ছাড়া এই আদর্শের কল্পনা করা যায় না। এই পরমসত্যকে তিনি বারবার বলেছেন।[৭]

রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন আমার ভগবান মানুষের যা শ্রেষ্ঠ তাই নিয়ে। তিনি মানুষের স্বর্গেই বাস করেন।[৮] একথার অর্থ হল দেবতা বা ভগবান নয়, মানুষরূপী ভগবান মুখ্য হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ যাকে 'জীবনদেবতা' বলেছেন। তা কোন মন্দিরের দেবতা নয়। কোন ধর্মেই এই দেবতাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই দেবতার অবস্থান মানুষের মধ্যে।

তিনি বলেছেন,

> "...in order to know himself truly, Man in his religion cultivates the vision of a Being who exceeds him in truth and with whom also he has kinship."[১০]

তথ্যসূত্র:

১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। মানুষের ধর্ম্ম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৩ সাল।

২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। আমি। শ্যামলী কাব্যগ্রন্থ, ১৯৩৬ সাল।

৩। রবীন্দ্র রচনাবলী (দ্বাদশ খণ্ড)। শতবার্ষিকী সংস্কার, পৃ. ৩৫২।

৪। তদেব, পৃ. ৫৬৯।

৫। Tagore, Rabindranath. Sadhana (the realization of life). 1954.

৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মানুষের ধর্ম্ম। https://www.tagoreweb.in/Essays/manusher-dharma-116/manusher-dhormo-2370/3 প্রবেশের তারিখ: ৮, জানুয়ারি ২০২৬।

৭। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। মানুষের ধর্ম্ম, ভূমিকা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৩ সাল, পৃ. ৫।

৮। মতিলাল, বিমলকৃষ্ণ। দেশ। সাহিত্যসংখ্যা, ১৯৩৮, পৃ. ৫৮।

৯। রায়, সত্যেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগৎ। পৃ. ১৩৯।

১০। Tagore, Rabindranath. The Religion of Man. 1922. Chapter III – "The Surplus in Man," page 63.

গ্রন্থপঞ্জি:

১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। মানুষের ধর্ম্ম, ভূমিকা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম সংস্করণ, ১৯৩৩।

২। Tagore, Rabindranath, The Religion of Man First Published 1922,

৩। Tagore, Rabindranath, Sadhana (the realization of life), First Published, 1954

৪। বন্দ্যপাধ্যায়, হিরণ্ময়। উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ। নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা-৯, প্রথম সংস্করন, ১ জানুয়ারি ১৯৫৯।

৫। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্ররচনাবলী ১২খণ্ড। বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, ১৪২৩ সন।

৬। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। দি রিলিজিয়ান অফ ম্যান। অনুবাদ সেনগুপ্ত শংকর, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, এপ্রিল ২০২১।

৭। পাল, সন্দীপ। রবীন্দ্রনাথের দর্শন চিন্তা। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা-১২০৫, প্রথম সংস্করন, জুন ২০২১।

৮। ভট্টাচার্য, সেবন্তী। আধুনিক ভারতীয় দর্শন। এবং মুশায়েরা, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করন, জানুয়ারি ২০২২।

৯। চক্রবর্তী, নির্মাল্য নারায়ন। বিংশশতাব্দী ভারতীয় দর্শন চর্চা। ঘোষ পৃথা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা-৯১, প্রথম সংস্করন, জানুয়ারি, ২০২০।

১০। বন্দোপাধ্যায়, সৈকত। বিংশশতাব্দীর ভারতীয় দর্শন। নবোদয় পাবলিকেশনস, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করন ২০২৩-২০২৪।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1093-1106
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.327

একবিংশ শতাব্দীতে ভারত–শ্রীলঙ্কা সম্পর্ক: ভূরাজনৈতিক ও কৌশলগত সমন্বয়ের একটি বিশ্লেষণ

নৌরিন সিদ্দিকী, *গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 13.03.2026; Accepted: 13.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The bilateral relationship between India and Sri Lanka is one of the oldest and most layered partnerships in South Asia, rooted in shared civilizational memory, Buddhist heritage, and geographic contiguity across the Palk Strait. This paper undertakes a systematic examination of how this relationship has evolved in the twenty-first century, focusing on political, economic, cultural, and geopolitical dimensions. Drawing on primary diplomatic records and secondary scholarly sources, the study analyses the transformative impact of India's 'Neighbourhood First' policy, which re-energised bilateral engagement particularly under the Modi administration. The 2022 Sri Lankan economic collapse— the worst in the island's post-independence history— served as a critical test of Indian strategic commitment, and India's rapid humanitarian intervention, totalling approximately USD 4 billion in credit lines, food, fuel and medicine, substantially reinforced its image as a reliable partner. The article also investigates how the India–Sri Lanka Free Trade Agreement (ISFTA, 2000) reshaped bilateral commerce, with Sri Lankan exports to India rising by over 342% within two years of implementation, and explores the prospects and political obstacles surrounding the proposed Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Cultural diplomacy— encompassing Buddhist relic exchanges, direct air connectivity, yoga diplomacy and academic institution-building— constitutes a central but often under-examined dimension of this relationship. Against this backdrop, the article pays close attention to the geopolitical anxieties generated by China's Belt and Road Initiative investments in Sri Lanka, particularly the 2017 Hambantota Port lease, and situates India's hedging strategy— including its participation in the Quadrilateral Security Dialogue— within the broader contest for influence in the Indian Ocean Region. The paper concludes that the India–Sri Lanka relationship, despite periodic turbulence, retains strong structural foundations, and that its future trajectory will depend on sustained diplomatic creativity, equitable economic partnerships, and transparent multilateral cooperation.

Keywords: India–Sri Lanka Relations, Neighbourhood First Policy, Belt and Road Initiative, String of Pearls, Indian Ocean Geopolitics, ISFTA, CEPA, Hambantota Port, Cultural Diplomacy, BIMSTEC

দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনৈতিক মানচিত্রে ভারত ও শ্রীলঙ্কার সম্পর্ক এমন একটি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, যা বিশ্লেষণের জন্য কেবল কূটনৈতিক ইতিহাস পাঠ করলে চলে না— এর নিচে রয়েছে সহস্র বছরের সভ্যতাগত আদান-প্রদান, বৌদ্ধ ধর্মের যাত্রাপথ, তামিল সমুদ্রপারের বণিকদের স্মৃতি এবং ঔপনিবেশিক যুগের গ্রন্থি। পাল্ক প্রণালীর মাত্র কয়েক ডজন কিলোমিটার দূরত্ব ভৌগোলিকভাবে দুই দেশকে পরস্পরের কাছে এনেছে, কিন্তু এই নৈকট্য যে সম্পর্ককে সহজ করেনি— ইতিহাস সেটার সাক্ষী। তামিল প্রশ্ন, জেলে বিরোধ, ভারতীয় শান্তিরক্ষী বাহিনীর তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং সময়ে সময়ে পরস্পরবিরোধী কৌশলগত স্বার্থ— এসব সত্ত্বেও এই সম্পর্ক টিকে আছে, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে গভীর হয়েছে।

একবিংশ শতাব্দীতে এই সম্পর্কের চরিত্র বদলেছে কয়েকটি কারণে। প্রথমত, শ্রীলঙ্কার দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের সমাপ্তি (২০০৯) দুই দেশকে নতুন সম্পর্কের পরিসর দিয়েছে যেখানে অভ্যন্তরীণ সংঘাতের প্রত্যক্ষ ছায়া আর নেই। দ্বিতীয়ত, চীনের ভারত মহাসাগরীয় অগ্রযাত্রা একটি তৃতীয় চলক হিসেবে এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে জটিল মাত্রা যোগ করেছে। তৃতীয়ত, ভারতের নিজস্ব অর্থনৈতিক শক্তিবৃদ্ধি এবং 'নেইবারহুড ফার্স্ট' নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ শ্রীলঙ্কার প্রতি ভারতের নীতিকে আরও সুসংহত করেছে। এই তিনটি পরিবর্তন একসঙ্গে বিশ্লেষণ না করলে আজকের ভারত–শ্রীলঙ্কা সম্পর্ক বোঝা যাবে না।

এই গবেষণাপত্রটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও কৌশলগত— এই চারটি স্তরে ভারত–শ্রীলঙ্কা সম্পর্ক বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে। গবেষণার পদ্ধতি হিসেবে মূলত গুণগত বিশ্লেষণ ব্যবহার করা হয়েছে, যেখানে প্রাথমিক উৎস হিসেবে সরকারি নথি ও কূটনৈতিক বিবৃতি এবং মাধ্যমিক উৎস হিসেবে একাডেমিক গ্রন্থ ও জার্নাল নিবন্ধ ব্যবহার করা হয়েছে। সময়সীমার দিক থেকে প্রধানত ২০০০ থেকে ২০২৪ সালের ঘটনাপ্রবাহ আলোচনার কেন্দ্রে রাখা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য:

যেকোনো গবেষণার আগে উদ্দেশ্য নির্ধারণ জরুরি— কারণ উদ্দেশ্যই ঠিক করে দেয় কোন প্রশ্নগুলো অগ্রাধিকার পাবে। এই গবেষণার ক্ষেত্রে নিচের প্রশ্নগুলো কেন্দ্রীয়:

- শীতল যুদ্ধ-পরবর্তী পর্যায় থেকে শুরু করে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ভারত ও শ্রীলঙ্কার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি কেমন ছিল? বিভিন্ন সরকারের নীতিগত অবস্থানভেদে এই সম্পর্ক কতটা বদলেছে?
- ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক যোগসূত্র দুই দেশের সম্পর্কে কতটা কার্যকর বাফার হিসেবে কাজ করে — বিশেষত রাজনৈতিক সংকটের মুহূর্তে?
- ভারত–শ্রীলঙ্কা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি এবং প্রস্তাবিত সিইপিএ দুই দেশের অর্থনৈতিক আন্তঃনির্ভরতা কতটা বদলেছে এবং এর সীমাবদ্ধতা কোথায়?
- শ্রীলঙ্কায় চীনের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ও কৌশলগত উপস্থিতি ভারত–শ্রীলঙ্কা সম্পর্কের স্থিতিশীলতার জন্য কতটা চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে?

সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review):

ভারত–শ্রীলঙ্কা সম্পর্ক বিষয়ক গবেষণাসাহিত্য বিশাল ও বহুস্তরীয়। এই সম্পর্কের বিভিন্ন দিক বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। নিচে প্রাসঙ্গিক গ্রন্থসমূহের সমালোচনামূলক পর্যালোচনা করা হলো।

এল. আর. রেড্ডির 'শ্রীলঙ্কা: পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট' (২০০৩) গ্রন্থটি শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরে। তিনি দেখিয়েছেন যে ১৯৪৮ সালে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তির পরপরই

সিংহলি ও তামিল জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল, সেটা আসলে ঔপনিবেশিক আমলে তৈরি হওয়া কাঠামোগত বৈষম্যেরই প্রতিফলন। এলটিটিই-র উত্থান এবং দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ এই গ্রন্থের একটি মূল্যবান অংশ। তবে ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিশ্লেষণে গ্রন্থটি তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত (রেডিড, ২০০৩)।

এ. এস. ভাসিনের 'ইন্ডিয়া ইন শ্রী লঙ্কা: বিটউইন দ্য লায়ন অ্যান্ড দ্য টাইগার্স' (২০০৪) ভারত–শ্রীলঙ্কা কূটনৈতিক সম্পর্কের সবচেয়ে বিস্তারিত ঐতিহাসিক বিবরণীগুলির একটি। ইন্দো-শ্রীলঙ্কা শান্তি চুক্তি (১৯৮৭) থেকে ভারতীয় শান্তিরক্ষী বাহিনীর বিপর্যয়কর অভিজ্ঞতা— ভাসিন এই পুরো ঘটনাপ্রবাহের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক গতিবিদ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মূল যুক্তি হলো, ভারতের শ্রীলঙ্কানীতি প্রায়ই তামিলনাড়ুর ঘরোয়া রাজনৈতিক চাপের সামনে কৌশলগত সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলেছে— যা দীর্ঘমেয়াদে দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে (ভাসিন, ২০০৪)।

এস. এস. উপাধ্যায়ের 'ইন্ডিয়া অ্যান্ড শ্রী লঙ্কা: ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল রিলেশনস' (২০০৭) অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা তুলে ধরে। তিনি বিশেষভাবে দেখিয়েছেন যে জাতিগত সংকটের কারণে ভারত থেকে অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রবাহ কীভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে এবং শান্তি প্রক্রিয়ার অগ্রগতির সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কের প্রসার কীভাবে সংযুক্ত (উপাধ্যায়, ২০০৭)।

সিরা গ্যাঙ্গুলির সম্পাদিত সাউথ এশিয়ান ইনসিকিউরিটি অ্যান্ড দ্য গ্রেট পাওয়ার্স (১৯৮৬) যদিও কিছুটা পুরোনো, তবুও দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তাচিন্তার তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মাণে এটি অপরিহার্য। গ্যাঙ্গুলি দেখান যে এই অঞ্চলের দেশগুলো কীভাবে বাইরের শক্তির হস্তক্ষেপ ও নিজেদের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতার মধ্যে কৌশলগত সিদ্ধান্ত নেয়— এই কাঠামো আজও শ্রীলঙ্কার বিশ্লেষণে প্রাসঙ্গিক (গ্যাঙ্গুলি, ১৯৮৬)।

সি. রাজা মোহানের সমুদ্র মন্থন: সিনো-ইন্ডিয়ান রাইভালরি ইন দ্য ইন্দো-প্যাসিফিক (২০১২) ভারত মহাসাগরে চীন-ভারত প্রতিযোগিতার কাঠামো তুলে ধরার ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক গ্রন্থ। শ্রীলঙ্কাকে তিনি এই বৃহত্তর প্রতিযোগিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিসর হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বিশেষত হাম্বানটোটা বন্দর প্রকল্প শুরু হওয়ার সময়কাল থেকে তাঁর পর্যবেক্ষণগুলো দূরদর্শী বলে প্রমাণিত হয়েছে (রাজা মোহান, ২০১২)।

জয়াদেবা উয়াঙ্গোদার 'শ্রীলঙ্কা ইন ক্রাইসিস: প্লুরালিজম অ্যান্ড পলিটিক্স' (২০১১) শ্রীলঙ্কার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কাঠামোর সংকটকে ভেতর থেকে দেখেছে। একজন শ্রীলঙ্কান লেখক হিসেবে তিনি যে দৃষ্টিকোণ এনেছেন, সেটা বাইরের পর্যবেক্ষকদের থেকে ভিন্ন এবং মূল্যবান। তিনি দেখিয়েছেন যে শ্রীলঙ্কার রাজনীতিতে জাতীয়তাবাদী আবেগ কীভাবে পররাষ্ট্রনীতির সিদ্ধান্তগুলোকে প্রভাবিত করে (উয়াঙ্গোদা, ২০১১)। নিরা উইক্রামাসিংহের 'শ্রীলঙ্কা ইন দ্য মডার্ন এজ : অ্যা হিস্ট্রি অব কন্টেস্টেড আইডেন্টিটিজ' (২০০৬) শ্রীলঙ্কার পরিচয় রাজনীতির ইতিহাস বিশ্লেষণ করেছে। সিংহলি বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদের উত্থান ও তামিল সংখ্যালঘুদের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্কের যে টানাপোড়েন— উইক্রামাসিংহে তার ঐতিহাসিক শিকড় খুঁজেছেন। এই গ্রন্থটি ভারতের তামিল স্বার্থ সংরক্ষণের নীতি বোঝার জন্য অপরিহার্য পটভূমি দেয় (উইক্রামাসিংহে, ২০০৬)।

হার্শ ভি. পান্তের 'ইন্ডিয়ান ফরেন পলিসি: অ্যান ওভারভিউ' (২০১৬) ভারতের পররাষ্ট্রনীতির সামগ্রিক প্রবণতা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে যে ভারত কৌশলগতভাবে প্রতিক্রিয়াশীল (reactive)— অর্থাৎ দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার চেয়ে ঘটনার প্রেক্ষিতে সাড়া দেওয়ার প্রবণতা বেশি। শ্রীলঙ্কা নীতির ক্ষেত্রেও এই প্যাটার্ন দেখা

যায়— ২০২২ সালের সংকটে ভারতের দ্রুত সাড়া এর ব্যতিক্রম হলেও ব্যাপক কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গির ঘাটতি থেকেই যায় (পান্ত, ২০১৬)।

ম্যালোন, রাজা মোহান ও রাঘবনের অক্সফোর্ড হ্যান্ডবুক অব ইন্ডিয়ান ফরেন পলিসি (২০১৫) এই বিষয়ের সবচেয়ে বিস্তারিত রেফারেন্স গ্রন্থগুলির একটি। বিভিন্ন লেখকের অবদানে তৈরি এই গ্রন্থটি ভারতের পররাষ্ট্রনীতির প্রতিটি মাত্রা— অর্থনীতি, নিরাপত্তা, সংস্কৃতি, পারমাণবিক কৌশল— একসঙ্গে বিশ্লেষণ করে (ম্যালোন, মোহান ও রাঘবন, ২০১৫)।

শান্তানু রায় চৌধুরীর 'দ্য চায়না ফ্যাক্টর' (২০২২) দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের সম্প্রসারণমূলক কৌশল বিশ্লেষণের একটি সাম্প্রতিক ও প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ। শ্রীলঙ্কা অধ্যায়টি বিশেষভাবে বিআরআই-র প্রভাব ও শ্রীলঙ্কার কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের সংকোচন তুলে ধরে (রায় চৌধুরি, ২০২২)।

গবেষণায় বিদ্যমান ঘাটতি (Research Gap):

উপরের পর্যালোচনা থেকে স্পষ্ট যে বিদ্যমান সাহিত্য ভারত–শ্রীলঙ্কা সম্পর্কের কিছু নির্দিষ্ট দিক ভালোভাবে বিশ্লেষণ করেছে, কিন্তু কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফাঁক রয়ে গেছে। সাংস্কৃতিক কূটনীতির ভূমিকা— বিশেষত বৌদ্ধ রেলিক বিনিময়, যোগ দিবস, সরাসরি বিমান পরিষেবা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-বিনিময়ের মাধ্যমে যে নরম শক্তি (soft power) তৈরি হচ্ছে— সেটা যথেষ্ট মনোযোগ পায়নি। অধিকাংশ গবেষণা নিরাপত্তা ও অর্থনীতির দিকে মনোযোগ দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, ২০২২ সালের শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক সংকট এবং তাতে ভারতের মানবিক ও কূটনৈতিক ভূমিকার একটি সমন্বিত বিশ্লেষণ এখনও প্রয়োজন। এই ঘটনাটি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের একটি 'স্ট্রেস টেস্ট' হিসেবে কাজ করেছে, কিন্তু এটি নিয়ে এখনও পর্যাপ্ত বিশ্লেষণমূলক সাহিত্য তৈরি হয়নি। তৃতীয়ত, মৎস্যজীবী বিরোধের দীর্ঘস্থায়িত্বের কারণ ও সম্ভাব্য সমাধানের পথ নিয়ে গভীর গবেষণার অভাব রয়েছে।

রাজনৈতিক সম্পর্ক:

একবিংশ শতাব্দীতে ভারত–শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক সম্পর্কের গতিপথ বোঝার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মাথায় রাখতে হয়: শ্রীলঙ্কার প্রতিটি সরকার, চাই তা সিংহলি জাতীয়তাবাদী হোক বা উদারপন্থী, একটা না একটা কারণে ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা চেয়েছে। কারণটা সহজ— শ্রীলঙ্কার ভৌগোলিক বাস্তবতা তাকে ভারত থেকে দূরে সরে যাওয়ার সুযোগ দেয় না।

নরেন্দ্র মোদি ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার দিনই সার্কভুক্ত দেশগুলোর নেতাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন— এটি প্রতীকী হলেও কূটনৈতিক বার্তাটি স্পষ্ট ছিল। প্রতিবেশীরা অগ্রাধিকার। তাঁর সরকার 'নেইবারহুড ফার্স্ট' নীতিকে কেবল বক্তৃতার বিষয় না রেখে কার্যক্রমে রূপ দিয়েছে— এবং শ্রীলঙ্কা সেই নীতির অন্যতম প্রধান সুবিধাভোগী হয়েছে।

২০১৯ সালের ইস্টার সানডে বোমা হামলার ঘটনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এপ্রিল ২০১৯-এ কলম্বো ও অন্যান্য স্থানে সিরিজ বিস্ফোরণে ২৬৯ জনের প্রাণহানি হয়। এই মর্মান্তিক ঘটনার মাত্র কয়েক সপ্তাহ পর মোদি পুনর্নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথম বিদেশ সফর হিসেবে শ্রীলঙ্কাকে বেছে নেন। বিষয়টি কূটনৈতিক হিসাবের বাইরেও একটি মানবিক বার্তা বহন করেছিল— যা শ্রীলঙ্কার জনমানসে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে (দ্য ইকোনমিক টাইমস, ২০১৯)।

প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষ ২০১৯ সালে নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে প্রশ্ন উঠেছিল— তিনি কি চীনের দিকে বেশি ঝুঁকবেন? তাঁর পরিবারের সঙ্গে চীনা বিনিয়োগের সম্পর্ক সুবিদিত। কিন্তু ভারতের

পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্করের দ্রুত কলম্বো সফর এবং ৪০০ মিলিয়ন ডলারের কারেন্সি সোয়াপ চুক্তি এই আশঙ্কার বিপরীতে একটি বলিষ্ঠ কূটনৈতিক সংকেত পাঠিয়েছিল। গোতাবায়া নিজেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে শ্রীলঙ্কার মাটি ভারতের নিরাপত্তার বিরুদ্ধে কোনো কাজে ব্যবহৃত হবে না (রেভি, ২০২০)।

২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে মহিন্দা রাজাপক্ষ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নয়াদিল্লি সফরে এলে দুই দেশের সম্পর্কের একটি সূক্ষ্ম কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্ত তৈরি হয়। মোদি সেই বৈঠকে শ্রীলঙ্কার তামিল জনগোষ্ঠীর অধিকার এবং ১৩তম সংশোধনী বাস্তবায়নের বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গটি নিয়মিতভাবে আলোচনায় আনা ভারতের জন্য রাজনৈতিকভাবে অপরিহার্য— কারণ তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক মতামত এড়িয়ে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার শ্রীলঙ্কার সঙ্গে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করতে পারে না।

২০২১ সালের ইন্টিগ্রেটেড কান্ট্রি স্ট্র্যাটেজি (আইসিএস) প্রকাশ ছিল একটি কাঠামোবদ্ধ সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রচেষ্টা। এই নথিতে রাজনৈতিক সংলাপ, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ, প্রতিরক্ষা সহযোগিতা এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তা— এই চারটি অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হয়েছিল (ম্যালেম্পটি, ২০২১)। এটি কেবল একটি কূটনৈতিক দলিল নয়— এটি প্রমাণ করে যে দুই দেশ সম্পর্কটিকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে আনতে সচেষ্ট।

২০২২ সালের অর্থনৈতিক সংকট শ্রীলঙ্কার আধুনিক ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ। মোট বৈদেশিক ঋণ ৪১.৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছিল, বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভ তলানিতে নেমে গিয়েছিল, এবং পেট্রোলের লাইনে মানুষ অজ্ঞান হয়ে পড়ছিল। এই পরিস্থিতিতে ভারত সবার আগে সাড়া দেয়। জ্বালানি, খাদ্য ও ওষুধ সরবরাহে ভারতের মোট সহায়তা ছিল প্রায় চার বিলিয়ন ডলারের সমতুল্য। এই সংকটে চীন তুলনামূলক নিষ্ক্রিয় ছিল— যা শ্রীলঙ্কার জনমানসে একটি স্থায়ী ছাপ ফেলে গেছে (মিশ্র, ২০২২)।

মৎস্যজীবী বিরোধ এই সম্পর্কের একটি পুরোনো ক্ষত। পাল্ক প্রণালীতে শ্রীলঙ্কার জলসীমায় ভারতীয় ট্রলারের অনুপ্রবেশ এবং শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনীর গ্রেপ্তার অভিযান— এই চক্র বারবার ঘুরে আসে। ২০১৬ সালে যৌথ কর্মদল গঠিত হলেও সমস্যার মূলে কোনো পরিবর্তন আসেনি। তামিলনাড়ুর জেলেদের পেশাগত স্বার্থ এবং শ্রীলঙ্কার তামিল জেলেদের জীবিকার প্রশ্ন— এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় করতে না পারলে সমস্যাটির সমাধান কঠিনই থাকবে (ডেকান হেরাল্ড নিউজ, ২০২২)।

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে গত দুই দশকে সম্পর্ক উল্লেখযোগ্যভাবে গভীর হয়েছে। মিত্র শক্তি (স্থলবাহিনী মহড়া), করমোরান্ট স্ট্রাইক (বিশেষ বাহিনী মহড়া) ও এসএলআইএনইএক্স (নৌ মহড়া) — এই তিনটি নিয়মিত যৌথ মহড়া দুই দেশের সামরিক সমন্বয় ও আস্থা গড়ে তুলেছে। ২০২২ সালের সংকটে মিশন সাগার উদ্যোগের আওতায় ভারতীয় নৌবাহিনী সরাসরি ত্রাণ পাঠিয়েছে — এটি শুধু মানবিক নয়, কৌশলগতভাবেও তাৎপর্যপূর্ণ (প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ২০২২-২০২৩)।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক:

ভারত ও শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক সম্পর্কের আধুনিক অধ্যায় শুরু হয় মূলত ২০০০ সালে আইএসএফটিএ কার্যকর হওয়ার পর থেকে। তার আগে দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক অনেকটাই সীমিত ছিল — শ্রীলঙ্কা ভারত থেকে পণ্য আমদানি করত, কিন্তু রপ্তানির অংশীদারিত্ব ছিল নগণ্য। আইএসএফটিএ সেই ভারসাম্যটাকে কিছুটা বদলে দিয়েছে (যৌথ সমীক্ষা দল, ২০০৩)।

চুক্তির সরাসরি প্রভাব পরিসংখ্যানে স্পষ্ট। ২০০০ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে ভারতের শ্রীলঙ্কায় রপ্তানি ১১৩ শতাংশ বাড়লেও শ্রীলঙ্কার ভারতের দিকে রপ্তানি বেড়েছে ৩৪২ শতাংশ— অর্থাৎ ছোট অর্থনীতিটি

আপেক্ষিকভাবে বেশি সুবিধা পেয়েছে (শর্মা, এ.বি., ২০০৪)। ১৯৯৯ সালে শ্রীলঙ্কা মাত্র ৫০৫ ধরনের পণ্য ভারতে রপ্তানি করত, ২০১২ সালে সেই সংখ্যা দাঁড়ায় ২,১০০-এ। এই বৈচিত্র্যায়ন শুধু পরিমাণগত নয়, গুণগতভাবেও উল্লেখযোগ্য।

তবে চুক্তিটির সমস্যাও ছিল। রুলস অব অরিজিন নিয়ে বিরোধ, ভারতীয় পক্ষের অশুল্ক বাধা এবং বাণিজ্য ঘাটতির প্রশ্ন শ্রীলঙ্কার ব্যবসায়ী মহলে বারবার অসন্তোষ তৈরি করেছে। ভারত থেকে আমদানি ২০০০ সালে ৬০০ মিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ২০১২ সালে ৩.৬৪ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, কিন্তু শ্রীলঙ্কার রপ্তানি সেই তুলনায় অনেক পিছিয়ে (কেলেগামা, ২০১৪)।

২০২১ সাল ছিল দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের একটি রেকর্ড বছর। মহামারি-পরবর্তী পুনরুদ্ধারের জোয়ারে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ ৫.৪৫ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছায়— যা ২০২০ সালের ৩.৬ বিলিয়ন ডলারের তুলনায় প্রায় ৪৮ শতাংশ বৃদ্ধি। কিন্তু এর পরের বছরই শ্রীলঙ্কার অর্থনীতি ধসে পড়ে এবং আমদানির উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয় (ভারত–শ্রীলঙ্কা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, ২০২৪)।

(ক) মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (আইএসএফটিএ):

আইএসএফটিএ-র কাঠামোটি নেগেটিভ লিস্ট পদ্ধতিতে তৈরি— অর্থাৎ তালিকায় থাকা পণ্যগুলো ছাড়া বাকি সব পণ্যে শুল্ক ছাড় পাওয়া যাবে। শ্রীলঙ্কাকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়েছিল— তার নেগেটিভ লিস্ট ভারতের চেয়ে দীর্ঘ এবং শুল্ক কমানোর জন্য বেশি সময় দেওয়া হয়েছিল। রুলস অব অরিজিন বিধি অনুযায়ী শুল্ক ছাড় পেতে পণ্যের কমপক্ষে ৩৫% মূল্য সংযোজন রপ্তানিকারক দেশে হতে হবে (গুণারুওয়ান ও ডি আলউইস, ২০১২)।

বাস্তবে চুক্তিটির সবচেয়ে বড় সুবিধা পেয়েছে শ্রীলঙ্কার চা, বস্ত্র ও পোশাক শিল্প। ভারতীয় বাজারে এই পণ্যগুলোর শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার শ্রীলঙ্কার রপ্তানি খাতকে নতুন প্রাণ দিয়েছে। তবে ভারতের কিছু শিল্পমহল, বিশেষত বস্ত্র খাত, এই চুক্তির বিরুদ্ধে লবিং করেছে— ফলে চুক্তির পরিপূর্ণ বাস্তবায়নে বারবার বাধা এসেছে।

(খ) ব্যাপক অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (CEPA):

আইএসএফটিএ-র পরের ধাপ হিসেবে সিইপিএ পণ্য বাণিজ্যের বাইরে পরিষেবা ও বিনিয়োগ খাতেও সহযোগিতার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়েছিল। ২০০৮ সালের সার্ক সম্মেলনে এটি স্বাক্ষরিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শ্রীলঙ্কার ব্যবসায়ী সংগঠন এবং জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলগুলো— বিশেষত পরিষেবা খাতে ভারতীয় শ্রমিকদের প্রবেশের আশঙ্কায়— তীব্র বিরোধিতা করে। ফলে চুক্তিটি আটকে যায় (দ্য মেল, ২০০৯)।

সিইপিএ-র কাঠামোতে শ্রীলঙ্কার নেগেটিভ লিস্টে ১,১৮০টি পণ্য রাখার সুযোগ ছিল — ভারতের তালিকায় ছিল মাত্র ৪১৯টি। এই অসামঞ্জস্য প্রমাণ করে যে ভারত ছোট অর্থনীতির সুরক্ষার জন্য কিছুটা ছাড় দিতে রাজি ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তির অভাব এই প্রক্রিয়াটিকে বারবার থামিয়ে দিয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই চুক্তি পুনরুজ্জীবিত করার আলোচনা আবার শুরু হয়েছে, কিন্তু এখনও কোনো সুনির্দিষ্ট অগ্রগতি হয়নি (কেলেগামা, ২০১৪)।

সাংস্কৃতিক সম্পর্ক:

ভারত–শ্রীলঙ্কার সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বোঝার জন্য ইতিহাসের অনেক পেছনে যেতে হয়। অশোকের পুত্র মহিন্দ ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রা যে বৌদ্ধধর্মের বীজ শ্রীলঙ্কায় বপন করেছিলেন, সেই বীজ থেকে আজকের শ্রীলঙ্কার

সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অনেকটুকু তৈরি হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের ত্রিপিটক পালি ভাষায় শ্রীলঙ্কায় সংরক্ষিত হয়েছে— এবং সেই পালি ভাষার শিকড় ভারতের মাটিতে। এই সভ্যতাগত সংযোগ কোনো চুক্তিতে লেখা থাকে না, কিন্তু এটি দুই দেশের মধ্যে একটি অদৃশ্য কিন্তু শক্তিশালী সেতু।

আধুনিক সাংস্কৃতিক কূটনীতির আনুষ্ঠানিক ভিত্তি স্থাপিত হয় ২৯ নভেম্বর ১৯৭৭ সালে, যখন নয়াদিল্লিতে কালচারাল কো-অপারেশন এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে নিয়মিত বিনিময়ের একটি কাঠামো তৈরি করে (হাই কমিশন অব ইন্ডিয়া)। এর দুই দশক পর, ডিসেম্বর ১৯৯৮ সালে ইন্ডিয়া–শ্রীলঙ্কা ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়, যার লক্ষ্য ছিল সরকারি কাঠামোর বাইরে নাগরিক সমাজ ও তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলা।

২০১০ সালে নয়াদিল্লিতে সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি স্থাপন একটি দূরদর্শী পদক্ষেপ ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীলঙ্কাসহ সার্কভুক্ত দেশগুলোর শিক্ষার্থীরা ভারতে এসে পড়াশোনার সুযোগ পাচ্ছেন। একটি অঞ্চলের ভবিষ্যৎ নির্মাণে শিক্ষা-বিনিময় যে কতটা কার্যকর হতে পারে, তার একটি বাস্তব প্রমাণ এই বিশ্ববিদ্যালয় (রিসার্চগেট, ইন্দো-শ্রী লঙ্কা বাইল্যাটেরাল রিলেশনস)।

বৌদ্ধ ধর্মীয় বিনিময় এই সাংস্কৃতিক সম্পর্কের সবচেয়ে গভীর এবং আবেগঘন অংশ। ২০১২ সালে গৌতম বুদ্ধের বোধিলাভের ২৬০০তম বার্ষিকী (সম্বুদ্ধত্ব জয়ন্তী) উপলক্ষে পবিত্র কপিলাবস্তু রেলিকস শ্রীলঙ্কায় আগস্ট–সেপ্টেম্বর মাসে প্রদর্শিত হয়। লক্ষ লক্ষ শ্রীলঙ্কান ভক্ত এই পবিত্র অবশেষের দর্শনে এসেছিলেন— সংখ্যাটি প্রমাণ করে যে ধর্মীয় কূটনীতির রাজনৈতিক কূটনীতির চেয়ে কম শক্তি নেই (হাই কমিশন অব ইন্ডিয়া, ২০১২)।

একই বছর নয়াদিল্লিতে বুদ্ধিস্ট ইন্টারন্যাশনাল পারফর্মিং আর্টস ফেস্টিভাল অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ২০১৩ সালে ক্যান্ডির শ্রী দালাদা মালিগাওয়া-র আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ জাদুঘরে ইন্ডিয়ান গ্যালারি উদ্বোধন হয়, যেখানে ভারত থেকে শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধধর্মের যাত্রাকে দৃশ্যমান করা হয়েছে। ২০১৪ সালে অনাগারিকা ধর্মপালের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী যৌথভাবে উদযাপন করা হয়েছিল (হাই কমিশন অব ইন্ডিয়া)।

আধুনিক সাংস্কৃতিক কূটনীতিতে যোগ দিবস একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ২১ জুন ২০১৫ সালে কলম্বোর গ্যালে ফেস গ্রিনে প্রথম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালিত হয়, এতে প্রায় দুই হাজার মানুষ অংশ নেয়। ২০১৬ সালে মহাবিহার দেবী পার্কে এবং পরে ইন্ডিপেন্ডেন্স স্কোয়ারে এই অনুষ্ঠান আরও বড় আকারে হয়, যেখানে রাষ্ট্রপতি মৈত্রিপালা সিরিসেনা স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন (হাই কমিশন অব ইন্ডিয়া)।

সরাসরি বিমান পরিষেবা সাংস্কৃতিক বিনিময়ের একটি বাস্তব সেতু। ১২ মে ২০১৭ সালে প্রধানমন্ত্রী মোদির কলম্বো সফরকালে বারাণসী–কলম্বো সরাসরি ফ্লাইট চালুর ঘোষণা হয় এবং ৪ আগস্ট ২০১৭ থেকে এই রুটে বিমান চলাচল শুরু হয়। বারাণসী ও কলম্বোর সংযোগ কেবল পর্যটকদের জন্য নয়— এটি তীর্থযাত্রার একটি প্রাচীন পথ আধুনিক পরিবহনে পুনরুজ্জীবিত করেছে (হাই কমিশন অব ইন্ডিয়া)।

২০১৮ সালে ভারতীয় বিমানবাহিনীর সি-১৭ বিমানে করে শ্রীলঙ্কার সশস্ত্র বাহিনীর প্রায় ১৬০ জন সদস্য ও তাদের পরিজনকে বোধ গয়া তীর্থযাত্রায় নিয়ে যাওয়া হয়। একই বছর ২৯ এপ্রিল থেকে ২ মে পর্যন্ত বেসাক উৎসব উপলক্ষে সারনাথ থেকে পবিত্র রেলিকস শ্রীলঙ্কায় আনা হয় (হাই কমিশন অব ইন্ডিয়া)। এই ধরনের আয়োজন সরকার থেকে সরকারের সম্পর্কের বাইরে মানুষ থেকে মানুষের সম্পর্ক গড়ে তোলে— যা দীর্ঘমেয়াদে অনেক বেশি টেকসই।

২০১৯ সালে মহাত্মা গান্ধীর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রীলঙ্কায় 'বৈষ্ণব জনা তো' নামের সাংস্কৃতিক ভিডিও প্রকল্প চালু হয়। বিশেষ ডাকটিকিট প্রকাশ ও সাংবাদিক সম্পথ বান্দারার লেখা একটি বই প্রকাশ পায়। একই বছর ১৭ অক্টোবর জাফনা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর উদ্বোধনের পর ১১ নভেম্বর থেকে চেন্নাই–জাফনা সরাসরি বিমান পরিষেবা চালু হয়। এটি দক্ষিণ ভারত ও উত্তর শ্রীলঙ্কার মধ্যে— দুটি তামিল অধ্যুষিত অঞ্চলের মধ্যে— একটি সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ তৈরি করেছে (হাই কমিশন অব ইন্ডিয়া)।

অক্টোবর ২০২১-এ ভাপ পয়া দিবস উপলক্ষে কলম্বো–কুশিনগর ফ্লাইট চালু হয়। এই যাত্রায় ওয়াস্কাদুওয়া থেকে কপিলাবস্তু বুদ্ধ রেলিকস ভারতে নিয়ে আসা হয় এবং কুশিনগর, সারনাথসহ বিভিন্ন শহরে প্রদর্শনীর আয়োজন হয় (হাই কমিশন অব ইন্ডিয়া)। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেও সম্পর্ক বিস্তৃত হচ্ছে। ইন্ডিয়ান কালচারাল সেন্টার, কলম্বো-তে সংগীত, নৃত্য, হিন্দি ও যোগ শেখানো হচ্ছে। ইউনিভার্সিটি অব কলম্বোয় সেন্টার ফর কন্টেম্পোরারি ইন্ডিয়ান স্টাডিজ এবং আইসিসিআর-এর মাধ্যমে কেলানিয়া ও সাবারাগামুওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দি চেয়ার স্থাপন করা হয়েছে। শ্রীলঙ্কার প্রায় ত্রিশটি বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল ও পিরিভেনায় বিভিন্ন কর্মসূচি চলছে (হাই কমিশন অব ইন্ডিয়া, ২০২২)।

মান্নারের থিরুকিতিশ্বরম মন্দির পুনর্নির্মাণ, কলম্বো পাবলিক লাইব্রেরিতে ভারত-কোষ স্থাপন এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্ডিয়া কর্নার প্রতিষ্ঠা— এই উদ্যোগগুলো দেখায় যে সাংস্কৃতিক কূটনীতি কেবল বড় অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ নেই, এটি প্রতিদিনের জীবনেও প্রবেশ করছে।

ভূরাজনৈতিক গুরুত্ব:

ভারত মহাসাগরে শ্রীলঙ্কার অবস্থান বোঝার জন্য একটি সহজ উপায় হলো মানচিত্র দেখা। শ্রীলঙ্কা আন্তর্জাতিক শিপিং লেনের ঠিক মাঝখানে বসে আছে— পশ্চিমে পারস্য উপসাগর, পূর্বে মালাক্কা প্রণালী। পৃথিবীর মোট তেল বাণিজ্যের প্রায় ৭০ শতাংশ এই অঞ্চলের সমুদ্রপথ দিয়ে যায়। ভারতের নিজের ৯৫ শতাংশ বাণিজ্য এবং ৮০ শতাংশ অপরিশোধিত তেল সমুদ্রপথে আসে— ফলে ভারত মহাসাগরের নিরাপত্তা ভারতের অর্থনীতির নিরাপত্তার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত (পাওয়েল, ২০১১)।

এই ভূগোলের কারণেই ত্রিনকোমালি বন্দর ঐতিহাসিকভাবে এতটা আলোচিত। ব্রিটিশরা এই বন্দরকে 'প্রাকৃতিক বন্দরের রাজা' বলত। স্বাধীনতার পর থেকেই বিভিন্ন শক্তি এই বন্দরে ঘাঁটি স্থাপনের চেষ্টা করেছে। ভারত এই বিষয়ে সবসময় সতর্ক থেকেছে— ত্রিনকোমালিতে বিদেশি সামরিক উপস্থিতি ভারতের নিরাপত্তার জন্য সরাসরি হুমকি হতে পারে (কান্দাউডাহেওয়া, ২০১৬)।

২০০৮ সালে জলদস্যু দমনের নামে চীনা নৌবাহিনীর জাহাজ এডেন উপসাগরে মোতায়েন হওয়ার পর থেকে ভারত মহাসাগর অঞ্চলে নতুন শক্তি-সমীকরণ শুরু হয়েছে। প্রথমদিকে ভারত এটাকে বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার প্রচেষ্টা হিসেবে দেখেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে চীনা নৌ-উপস্থিতির বিস্তার এবং শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান ও মালদ্বীপে বন্দর বিনিয়োগের সম্মিলিত চিত্র ভারতীয় কৌশলবিদদের উদ্বিগ্ন করেছে (হেনরি, ২০১৬)।

ভারতের ১৯৯১ সালের অর্থনৈতিক সংস্কারের পর থেকে সমুদ্রপথে বাণিজ্য বহুগুণ বেড়েছে। সি লেইনস অব কমিউনিকেশন (এসএলওসি) রক্ষা করা তখন থেকেই ভারতীয় নৌনীতির কেন্দ্রীয় বিষয়। ২০০৪ ও ২০০৭ সালের নৌনীতি নথিতে চীনের নৌশক্তিবৃদ্ধির বিষয়টি সরাসরি উল্লেখ করা হয়েছে এবং ভারতীয় নৌবাহিনীকে সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপযোগী করে তোলার কথা বলা হয়েছে (বর্মা, ২০১৫)।

আঞ্চলিক সহযোগিতা:

দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের পাশাপাশি ভারত ও শ্রীলঙ্কা বেশ কয়েকটি বহুপাক্ষিক মঞ্চে একসঙ্গে কাজ করছে। সার্ক, বিমসটেক ও আইওআরএ— এই তিনটি সংগঠন দুই দেশের আঞ্চলিক কূটনীতির গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র।

(ক) সার্ক (SAARC):

সার্ক প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৫ সালে ঢাকায়। প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিল বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা। ২০০৫ সালে আফগানিস্তান অষ্টম সদস্য হিসেবে যোগ দেয় (রেড্ডি, সি.আর., ২০২০)। ভারতের ভূমিতে তিনটি সার্ক শীর্ষ সম্মেলন হয়েছে।

সার্কের সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা হলো ভারত–পাকিস্তান উত্তেজনা। এই দ্বিপাক্ষিক বৈরিতা সমগ্র সংগঠনকে কার্যত অকার্যকর করে রেখেছে। ২০১৬ সালে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকা সার্ক সম্মেলন ভারত বয়কট করার পর শ্রীলঙ্কাও পিছিয়ে যায়— এটি ভারত–শ্রীলঙ্কার কূটনৈতিক সমন্বয়ের একটি প্রমাণ (ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস কলম্বো, ২০১৬)। ২০১৮ সালে শ্রীলঙ্কা সার্কের প্রথম দেশ হিসেবে ন্যাশনাল নলেজ নেটওয়ার্কে যুক্ত হয়েছে — প্রযুক্তি খাতে সহযোগিতার একটি বাস্তব পদক্ষেপ।

(খ) বিমসটেক (BIMSTEC):

১৯৯৭ সালে ব্যাংককে প্রতিষ্ঠিত বিমসটেক দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সংযোগের একটি নতুন মঞ্চ তৈরি করেছে (সেনারত্নে, ২০২০)। সার্কে পাকিস্তান ও চীনের প্রভাব নিয়ে ভারতের উদ্বেগ বিমসটেককে আরও বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। ভারত এই মঞ্চকে তার 'লুক ইস্ট' এবং পরবর্তীতে 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে ব্যবহার করছে (রাও, ২০২০)। শ্রীলঙ্কা বিমসটেকের প্রযুক্তি ও সন্ত্রাস দমন খাতের নেতৃত্ব দেয়— এই দায়িত্বপালনে দেশটির সক্রিয়তা আঞ্চলিক মঞ্চে তার গুরুত্ব তুলে ধরে।

(গ) আইওআরএ (IORA):

ভারত মহাসাগর উপকূলীয় দেশগুলোর সংগঠন আইওআরএ-তে বর্তমানে ২১ সদস্য রাষ্ট্র রয়েছে। ভারত ২০১১ সালে এর চেয়ারম্যান হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, মৎস্য ব্যবস্থাপনা, পর্যটন ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ে সহযোগিতার ছয়টি অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে (দেব ও দত্ত, ২০২৩)। শ্রীলঙ্কা সিঙ্গাপুর ও দুবাইয়ের মতো একটি আঞ্চলিক বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়— আইওআরএ তার সেই লক্ষ্যের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম (ওয়াইদ্যাতিলকে, ২০১৭)। ভারতের সাগর নীতি— সিকিউরিটি অ্যান্ড গ্রোথ ফর অল ইন দ্য রিজিওন— আইওআরএকে আঞ্চলিক নিরাপত্তা সহযোগিতার একটি কার্যকর মঞ্চ হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছে (খান, ২০২৩)।

স্ট্রিং অব পার্লস কৌশল ও ভারতের উদ্বেগ:

'স্ট্রিং অব পার্লস' একটি বিতর্কিত ধারণা। মার্কিন থিংক ট্যাংক বুজ অ্যালেন হ্যামিলটনের তৈরি এই তত্ত্ব অনুযায়ী, চীন ভারত মহাসাগর উপকূলে একের পর এক বন্দর ও অবকাঠামো নির্মাণ করে ভবিষ্যতে সামরিক উপস্থিতির জন্য জমি প্রস্তুত করছে। কেউ এই তত্ত্বকে অতিরঞ্জিত বলে মনে করেন, কেউ একে একটি বাস্তব কৌশলগত পরিকল্পনার প্রতিফলন হিসেবে দেখেন (পেহরসন, ২০০৬; ঘোষ, ২০২০)।

পাকিস্তানের গওয়াদর, বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, মিয়ানমারের সিটওয়ে এবং শ্রীলঙ্কার হাম্বানটোটা— এই বন্দরগুলোকে একসঙ্গে দেখলে ভারত মহাসাগর ঘিরে চীনের উপস্থিতির একটি চিত্র ফুটে ওঠে। ভারতের

সামরিক বিশ্লেষকরা এই চিত্রকে 'কৌশলগত ঘেরাও'-র বিপদ হিসেবে দেখছেন। তবে চীন বলছে এগুলো সবই বাণিজ্যিক প্রকল্প— সামরিক উদ্দেশ্য নেই (পল, ২০১৯)।

চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের আওতায় দক্ষিণ এশিয়ায় বিনিয়োগ এসেছে বটে, কিন্তু এর সঙ্গে ঋণনির্ভরতার একটি প্রশ্নও এসেছে। শ্রীলঙ্কার হাম্বানটোটা বন্দর ঋণ পরিশোধে ব্যর্থতার পর ৯৯ বছরের জন্য চীনের হাতে চলে যাওয়া— এই একটি ঘটনা 'ডেট ট্র্যাপ ডিপ্লোম্যাসি' শব্দবন্ধটিকে সারা বিশ্বে পরিচিত করে দিয়েছে (সিং, এ., ২০১৮; হ্যাং ঙা ও থুওং, ২০২১)।

ভারত এই পরিস্থিতিতে সরাসরি সংঘাতের পথ বেছে নেয়নি। বরং 'হেজিং' কৌশল অনুসরণ করেছে— অর্থাৎ একদিকে চীনের সঙ্গে কিছুটা সম্পর্ক বজায় রাখছে, অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে কোয়াডের মাধ্যমে নিরাপত্তা সহযোগিতা গভীর করছে। এই কৌশলের একটি সীমাবদ্ধতা হলো এটি দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে যথেষ্ট স্পষ্ট বার্তা দিতে পারে না (পান্ত, ২০১৪)।

হাম্বানটোটা বন্দর: কৌশলগত প্রশ্ন:

হাম্বানটোটা বন্দরের গল্পটি একই সঙ্গে উন্নয়ন অর্থনীতি, ভূরাজনীতি এবং দেশীয় রাজনীতির এক জটিল মিশ্রণ। দক্ষিণ শ্রীলঙ্কার এই বন্দর আন্তর্জাতিক শিপিং রুট থেকে মাত্র ৬ নটিক্যাল মাইল দূরে অবস্থিত— যা বৈশ্বিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এটিকে কৌশলগতভাবে অত্যন্ত মূল্যবান করে তোলে (মানহাস, ২০২০)।

বন্দরটি নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল মাহিন্দা রাজাপক্ষার আমলে, মূলত তাঁর নিজের নির্বাচনী এলাকার উন্নয়ন হিসেবে। চীনা ঋণে নির্মিত এই বন্দরটি প্রথম থেকেই পর্যাপ্ত বাণিজ্যিক ব্যবহার পায়নি। ঋণের বোঝা বাড়তে থাকলে ২০১৭ সালে শ্রীলঙ্কা সরকার চায়না মার্চেন্টস পোর্ট হোল্ডিংসের কাছে বন্দরের ৫৮% শেয়ার ও ৯৯ বছরের পরিচালনা অধিকার হস্তান্তর করে। মোট লেনদেনের মূল্য ছিল প্রায় ১.১২ বিলিয়ন ডলার (সিং, এ., ২০১৮)।

শ্রীলঙ্কা সরকার আশ্বাস দিয়েছিল যে বন্দরটি বেসামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে। ২০১৪ সালে একটি চীনা সাবমেরিনকে কলম্বো বন্দরে নোঙর করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ ওঠে। পরবর্তীতে শ্রীলঙ্কা এই ধরনের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছে। কিন্তু ভারতের উদ্বেগ রয়ে গেছে— কারণ বাণিজ্যিক অবকাঠামো সামরিক কাজে রূপান্তরিত হওয়ার উদাহরণ ইতিহাসে আছে (শাব্বির, বশির ও সালিম, ২০১৯)। একটি বাস্তবতাও এখানে স্বীকার করতে হবে: শ্রীলঙ্কার কাছে বিকল্প ছিল সীমিত। যে মাত্রায় তার অবকাঠামো উন্নয়নের প্রয়োজন ছিল, সেই অর্থায়ন পশ্চিমা বিশ্ব বা ভারত দিতে পারেনি। ২০২২ সালের সংকটের পর থেকে এই হিসাব বদলাচ্ছে— ভারত আরও বেশি উন্নয়ন অংশীদার হতে এগিয়ে আসছে। কিন্তু এটি দেরি করে নেওয়া পদক্ষেপ কিনা, সেই প্রশ্ন থেকে যায়।

উপসংহার:

ভারত ও শ্রীলঙ্কার সম্পর্ককে সহজ ভাষায় কোনো একটি বিশেষণে বর্ণনা করা যায় না। এটি বন্ধুত্বপূর্ণ— কিন্তু উষ্ণতা সবসময় থাকে না। এটি কৌশলগতভাবে প্রয়োজনীয়— কিন্তু কৌশল সবসময় স্পষ্ট নয়। এটি ঐতিহাসিকভাবে গভীর— কিন্তু ইতিহাস সবসময় পথ দেখায় না। এই জটিলতাকে স্বীকার করেই বিশ্লেষণ করতে হবে।

একবিংশ শতাব্দীতে এই সম্পর্কের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো চীনের উপস্থিতি। শ্রীলঙ্কার পক্ষে চীনকে সম্পূর্ণ এড়ানো সম্ভব নয়— না অর্থনৈতিকভাবে, না কূটনৈতিকভাবে। একইভাবে ভারতকে এড়ানোও সম্ভব নয়— ভৌগোলিক বাস্তবতা তা মেনে নেয় না। তাই শ্রীলঙ্কার সামনে একটিই পথ: দুই দেশের মধ্যে ভারসাম্য

রক্ষা করে নিজের স্বার্থ আদায় করা। ভারতের কাজ হলো এই ভারসাম্যকে নিজের দিকে কাত করার জন্য যথেষ্ট আকর্ষণীয় অংশীদার হয়ে উঠতে থাকা।

তামিল সমস্যার স্থায়ী সমাধান, মৎস্যজীবী বিরোধের অবসান এবং সিইপিএ বাস্তবায়ন— এই তিনটি বিষয় সম্পর্কের গুণগত পরিবর্তন আনতে পারে। এর বাইরে, ২০২২ সালের অভিজ্ঞতা থেকে একটি শিক্ষা হলো: সংকটের মুহূর্তে কে পাশে দাঁড়ায়, তা মানুষ মনে রাখে। ভারত সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েছে।

ভবিষ্যতের দিকে তাকালে বলা যায়, ভারত–শ্রীলঙ্কা সম্পর্কের সম্ভাবনা তার সংকটের চেয়ে বেশি। সাংস্কৃতিক ঘনিষ্ঠতা, ভৌগোলিক নৈকট্য, ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক পারস্পরিকতা এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তায় মিলিত স্বার্থ— এই চারটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে এই সম্পর্ক আরও এগিয়ে যেতে পারে। প্রয়োজন কেবল সদিচ্ছা, ধৈর্য এবং পরস্পরের সীমাবদ্ধতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা।

গ্রন্থপঞ্জি:

- বরুয়া, ডি. এম। (২০২০)। ইন্ডিয়া ইন দ্য ইন্দো-প্যাসিফিক: নিউ দিল্লিস থিয়েটার অব অপরচুনিটি। কার্নেগি এনডাউমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিস।
- ভাসিন, এ. এস। (২০০৪)। ইন্ডিয়া ইন শ্রী লঙ্কা: বিটউইন দ্য লায়ন অ্যান্ড দ্য টাইগার্স। ল্যান্সার পাবলিশার্স।
- ভট্টাচার্য, জে। (২০১৮, জানুয়ারি)। এসএএআরসি ভার্সাস বিমসটেক: দ্য সার্চ ফর দ্য আইডিয়াল প্ল্যাটফর্ম ফর রিজিওনাল কোঅপারেশন। অবজার্ভার রিসার্চ ফাউন্ডেশন।
- চাহাল, এইচ। (২০১৭)। শ্রী লঙ্কা: থ্রি ইয়ার্স অব দ্য মোদি গভর্নমেন্ট। ইনস্টিটিউট অব পিস অ্যান্ড কনফ্লিক্ট স্টাডিজ (পিপি, ৫৫-৫৬)।
- ডি মেল, ডি। (২০০৯)। ইন্দো-লঙ্কা ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্টস: পারফরম্যান্স অ্যান্ড প্রসপেক্টস (পি. ২৭)। ইনস্টিটিউট অব পলিসি স্টাডিজ অব শ্রী লঙ্কা।
- ডেব, এস., অ্যান্ড দত্তা, এ। (২০২৩)। ইন্ডিয়াস রোল ইন ক্যাপাবিলিটি ডেভেলপমেন্ট মেজার্স ফর মেরিটাইম সিকিউরিটি ইন দ্য ইন্ডিয়ান ওশান আন্ডার সাগার। জার্নাল অব টেরিটোরিয়াল অ্যান্ড মেরিটাইম স্টাডিজ, ১০(২), ৫২।
- ডেকান, হেরাল্ড নিউজ। (২০২২, জানুয়ারি)। ফিশিং টার্নস ইনটু অ্যা ডিপ্লোম্যাটিক ইস্যু বিটউইন ইন্ডিয়া, শ্রী লঙ্কা। ডেকান হেরাল্ড।
- দিক্ষিৎ, জে. এন। (২০০১)। ইন্ডিয়াস ফরেন পলিসি অ্যান্ড ইটস নেইবার্স। জ্ঞান পাবলিশিং হাউস।
- ঘোষ, এস। (২০২০)। চায়নাস স্ট্রিং অব পার্ল স্ট্র্যাটেজি: অ্যা থ্রেট টু ইন্ডিয়াস সিকিউরিটি। জার্নাল অব ক্রিটিক্যাল রিভিউস, ৭(৯), ১০২০১।
- গুণারুওয়ান, টি. এল.। অ্যান্ড ডি আলউইস, কে. এ. আই. (২০১২)। ইন্দো-শ্রী লঙ্কা ফ্রি ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্ট: অ্যা ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রেইজাল অব দ্য ইনফ্লুয়েন্স অন ট্রেড বিটউইন দ্য টু কান্ট্রিজ (পিপি. ৭-৮)।
- হ্যাং ঙা, এল. টি., অ্যান্ড থুওং, এন. এল. টি। (২০২১)। ইন্ডিয়া-চায়না কম্পিটিশন ইন সাউথ এশিয়া আন্ডার প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। দ্য জার্নাল অব ইন্ডিয়ান অ্যান্ড এশিয়ান স্টাডিজ, ২(১), ১৬।

- হেনরি, সি। (২০১৬)। শিফটিং কারেন্টস: চায়নাস রাইজ ইন দ্য ইন্ডিয়ান ওশান রিজিওন অ্যান্ড ইন্ডিয়াস পলিসি রেসপন্স। ইন্দো-প্যাসিফিক স্টাডিজ সেন্টার।
- হাসান, পি। (২০২১, নভেম্বর ২৪)। শ্রী লঙ্কা ক্যান প্লে সিগনিফিক্যান্ট রোল ইন রিভাইভিং এসএএআরসি। ইউরেশিয়া রিভিউ।
- ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস কলম্বো। (২০১৬, ডিসেম্বর ২৩)। ইন্ডিয়া-শ্রী লঙ্কা টাইজ ইম্প্রুভড ইন ২০১৬, কনসার্ন ওভার চায়না রিমেইনস। দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস।
- ইন্ডিয়া-শ্রী লঙ্কা বাইল্যাটেরাল রিলেশনস স্ট্রেংদেনড। (২০২৪)। এসপিস ল্যান্ড ফোর্সেস। রিট্রিভড ফ্রম https://www.spslandforces.com
- জয়েন্ট স্টাডি গ্রুপ। (২০০৩, অক্টোবর)। ইন্ডিয়া-শ্রী লঙ্কা কম্প্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ অ্যাগ্রিমেন্ট জয়েন্ট স্টাডি গ্রুপ রিপোর্ট (পি. ৮১)। ইনস্টিটিউট অব পলিসি স্টাডিজ অব শ্রী লঙ্কা।
- জেইন, আর। (২০২৩)। ইন্ডিয়া অ্যান্ড এসএএআরসি: অ্যান অ্যানালিসিস (পিপি. ১, ৬২)। ইন্ডিয়ান জার্নাল অব এশিয়ান অ্যাফেয়ার্স।
- কান্দাউডাহেওয়া, টি। (২০১৬)। শ্রী লঙ্কাস মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইন দ্য চেঞ্জিং ইন্ডিয়ান ওশান। লক্ষ্মণ কাদিরগামার ইনস্টিটিউট।
- কেলেগামা, এস। (২০১৪)। দ্য ইন্ডিয়া-শ্রী লঙ্কা ফ্রি ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্ট অ্যান্ড দ্য প্রোপোজড কম্প্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ অ্যাগ্রিমেন্ট: অ্যা ক্লোজার লুক (পিপি. ৪-৫, ১১)। রিজিওনাল ইন্টিগ্রেশন ইন সাউথ এশিয়া।
- খান, টি. এ। (২০২৩)। লিমিটেড হার্ড ব্যালান্সিং: এক্সপ্লেইনিং ইন্ডিয়াস কাউন্টার রেসপন্স টু চাইনিজ এনসার্কেলমেন্ট (পিপি. ৯৫-৯৭, ১০৫)। জার্নাল অব ইন্দো-প্যাসিফিক অ্যাফেয়ার্স।
- খান্না, ভি. এন। (১৯৯৭)। ফরেন পলিসি অব ইন্ডিয়া। বিকাশ পাবলিশিং হাউস।
- গুইতে, এল। (২০২০)। ইন্ডিয়াস মেরিটাইম রিলেশনস উইথ শ্রী লঙ্কা ইন দ্য ইন্ডিয়ান ওশান (পিপি. ১১৫-১১৬)। এমজেডইউজেএইচএসএস, ভিআই (২)।
- ম্যালেম্পটি, এস। (২০২১)। শ্রী লঙ্কাস ইন্টিগ্রেটেড কান্ট্রি স্ট্র্যাটেজি (আইসিএস) ফর এনহ্যান্সিং ইন্ডিয়া-শ্রী লঙ্কা রিলেশনস: মেইন গোলস অ্যান্ড ফিউচার প্রসপেক্টস। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স।
- ম্যালোন, ডি. এম., মোহান, সি. আর., অ্যান্ড রাঘবন, এস. (এডস.)। (২০১৫)। দ্য অক্সফোর্ড হ্যান্ডবুক অব ইন্ডিয়ান ফরেন পলিসি। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস। মানহাস, এন. এস। (২০২০)। চায়নাস পলিসি অব 'স্ট্রিং অব পার্লস'। ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট, ৫(৩), ২৫।
- মজুমদার, এ। (এন.ডি.) ইন্ডিয়ান ফরেন পলিসি ইন ট্রানজিশন: রিলেশনস উইথ সাউথ এশিয়া। রাউটলেজ।
- মিনিস্ট্রি অব ডিফেন্স, গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া. (২০২০). অ্যানুয়াল রিপোর্ট ২০১৯-২০২০. এমওডি।
- মিনিস্ট্রি অব ডিফেন্স, গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া. (২০২২). অ্যানুয়াল রিপোর্ট ২০২০-২০২২. এমওডি।
- মিনিস্ট্রি অব ডিফেন্স, গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া. (২০২৩). অ্যানুয়াল রিপোর্ট ২০২২-২০২৩. এমওডি।
- মিশ্র, এস. (২০২২). শ্রী লঙ্কা ইন ডায়ার স্ট্রেইটস: হোয়াট ইট মিনস ফর ইন্ডিয়া-শ্রী লঙ্কা রিলেশনস. কালিঙ্গা ইনস্টিটিউট অব ইন্দো-প্যাসিফিক স্টাডিজ।

- মিনিস্ট্রি অব এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স, গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া. (২০২২, জুলাই). ইন্ডিয়া-শ্রী লঙ্কা জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ অন ফিশারিজ. এমইএ।
- পান্ত, এইচ. ভি. (২০১৪). সিনো-ইন্ডিয়ান মেরিটাইম অ্যাম্বিশনস কোলাইড ইন দ্য ইন্ডিয়ান ওশান. জার্নাল অব এশিয়ান সিকিউরিটি অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স, ১(২), ১৮৭-২০২।
- পান্ত, এইচ. ভি. (২০১৬). ইন্ডিয়ান ফরেন পলিসি: অ্যান ওভারভিউ. ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটি প্রেস।
- পল, টি. ভি. (২০১৯). হোয়েন ব্যালান্স অব পাওয়ার মিটস গ্লোবালাইজেশন: চায়না, ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য স্মল স্টেটস অব সাউথ এশিয়া. পলিটিক্স, ৩৯(১), ৫০-৬৩।
- পেহরসন, সি. জে. (২০০৬). স্ট্রিং অব পার্লস: মিটিং দ্য চ্যালেঞ্জ অব চায়নাস রাইজিং পাওয়ার অ্যাক্রস দ্য এশিয়ান লিটোরাল (পি. ৩). স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ ইনস্টিটিউট।
- পাওয়েল, এল. (২০১১, ডিসেম্বর ৬). সিকিউরিটি অব গ্লোবাল অয়েল ফ্লোস: রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট ফর ইন্ডিয়া (পার্ট থ্রি). অবজার্ভার রিসার্চ ফাউন্ডেশন।
- পিটিআই. (২০২২). ইন্ডিয়া অ্যাবস্টেইনস ফ্রম ইউএনএইচআরসি ভোট অন শ্রী লঙ্কা রেজোলিউশন. প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া।
- রাজাগোপালন, আর. পি. (১৯৯১, ডিসেম্বর ২১). এসএএআরসি সামিটস সিন্স ১৯৮৫: অ্যা প্রোফাইল. ইনস্টিটিউট অব পিস অ্যান্ড কনফ্লিক্ট স্টাডিজ।
- রাও, এস. এস. (২০২০). ইন্ডিয়াস প্যারাডাইম শিফট ফ্রম এসএএআরসি টু বিমসটেক (পিপি. ৫৫-৫৬). ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স: দ্য জার্নাল অব ইন্টারন্যাশনাল ইস্যুস, ২৪(১). কাপুর সূর্য ফাউন্ডেশন।
- রেড্ডি, সি. আর. (২০২০). ইন্ডিয়াস রোল ইন দ্য এসএএআরসি (পিপি. ১০৭, ১০৯-১১১). জার্নাল অব ইমার্জিং টেকনোলজিস অ্যান্ড ইনোভেটিভ রিসার্চ (জেইটিআইআর), ৭(১১)।
- রেড্ডি, এল. আর. (২০০৩). শ্রী লঙ্কা: পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট. এপিএইচ পাবলিশিং।
- রেভি, ভি. (২০২০). শ্রী লঙ্কা, ইন্ডিয়া অ্যান্ড চেঞ্জিং পলিটিক্যাল ডায়নামিক্স. অবজার্ভার রিসার্চ ফাউন্ডেশন।
- রয় চৌধুরি, এস. (২০২২). দ্য চায়না ফ্যাক্টর: বেইজিংস এক্সপ্যান্ডিং এনগেজমেন্ট ইন শ্রী লঙ্কা, মালদিভস, বাংলাদেশ, অ্যান্ড মিয়ানমার. রাউটলেজ।
- সেনারত্নে, বি. (২০২০). শ্রী লঙ্কা অ্যান্ড বিমসটেক: পাস্ট, প্রেজেন্ট অ্যান্ড প্রসপেক্টস ফর দ্য ফিউচার (পিপি. ৭৭-৭৮). ন্যাশনাল সিকিউরিটি, থ্রি(ওয়ান)।
- শাব্বির, এম. ও., বশির, আর., অ্যান্ড সালিম, এস. (২০১৯). জিও-স্ট্র্যাটেজিক ইম্পর্ট্যান্স অব ইন্ডিয়ান ওশান: ক্ল্যাশ অব ইন্টারেস্টস বিটউইন চায়না অ্যান্ড ইন্ডিয়া. জার্নাল অব ইন্ডিয়ান স্টাডিজ, ৫(১), ৪৭-৬০।
- শর্মা, এ. বি. (২০০৪, সেপ্টেম্বর ৩০). এফটিএ পুশেস আপ ইন্ডিয়া, লঙ্কা ট্রেড বাই ১২৮%. বাইল্যাটেরালস. অর্গ।
- শর্মা, এস. কে. (এন.ডি.). চেঞ্জিং পলিটিক্যাল ডায়নামিক্স ইন শ্রী লঙ্কা: ইম্প্লিকেশনস ফর ইন্ডিয়া-শ্রী লঙ্কা রিলেশনস. অবজার্ভার রিসার্চ ফাউন্ডেশন।
- সিকরি, আর. (২০০৯). চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজি: রিথিংকিং ইন্ডিয়াস ফরেন পলিসি. সেজ পাবলিকেশনস।

- সিং, এ. (২০১৮, জুলাই ২৬). চায়নাস স্ট্র্যাটেজিক অ্যাম্বিশনস সিন ইন দ্য হাম্বানটোটা পোর্ট ইন শ্রী লঙ্কা. হিন্দুস্তান টাইমস।
- সিং, আর. (২০২১). ইস্ট কন্টেইনার টার্মিনাল কন্ট্রোভার্সি অ্যান্ড ইন্ডিয়া-শ্রী লঙ্কা-জাপান ট্রাইল্যাটেরাল. অবজার্ভার রিসার্চ ফাউন্ডেশন।
- দ্য ইকোনমিক টাইমস. (২০১৯, জুন). মোদি ভিজিটস শ্রী লঙ্কা আফটার ইস্টার সানডে অ্যাটাকস. দ্য ইকোনমিক টাইমস।
- উপাধ্যায়, এস. এস. (২০০৭). ইন্ডিয়া অ্যান্ড শ্রী লঙ্কা: ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল রিলেশনস. কল্পাজ পাবলিকেশনস।
- বর্মা, এন. (২০১৫). ইন্ডিয়াস নিডস অ্যান্ড নেভাল ক্যাপাবিলিটিজ: অ্যা সিম্বায়োটিক রিলেশনশিপ. জার্নাল অব এশিয়ান সিকিউরিটি অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স, ২(১), ৫২-৭৪।
- ওয়াইদ্যাতিলকে, বি. (২০১৭, নভেম্বর). মেইনটেইনিং মোমেন্টাম: শ্রী লঙ্কাস স্ট্র্যাটেজি ইন দ্য ইন্ডিয়ান ওশান।
- রিম অ্যাসোসিয়েশন (পি. ১). লক্ষ্মণ কাদিরগামার ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ।
- ইউয়ানঝে, কিউ. (২০২০). চায়না-শ্রী লঙ্কা মিলিটারি অ্যান্ড সিকিউরিটি কোঅপারেশন. চায়না-সাউথ এশিয়া স্টাডিজ সেন্টার।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1107- 1116
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.328

প্রযত্ন নীতিবিদ্যার আলোকে মহাত্মা গান্ধীর নারীচিন্তার দার্শনিক বিশ্লেষণ

প্রিয়াঙ্কা সাধুখাঁ, *গবেষিকা, দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 13.03.2026; Accepted: 16.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Care ethics has emerged as an important perspective in contemporary moral philosophy, emphasizing empathy, relationships, and moral responsibility as the basis of ethical life. Developed primarily by feminist thinkers such as Carol Gilligan and Nel Noddings, care ethics challenges the dominance of abstract and rule-based moral theories. In the context of Indian philosophical thought, Mahatma Gandhi's views on women have often been interpreted in contradictory ways. Gandhi is sometimes regarded as a thinker who held conservative or even critical views regarding women, as he occasionally pointed out certain limitations in women's social roles and responsibilities. However, such an interpretation does not fully capture the complexity of his thought. This paper argues that although Gandhi criticized certain social conditions and limitations associated with women, he was not fundamentally anti-women. On the contrary, Gandhi frequently emphasized qualities such as compassion, self-sacrifice, patience, and moral strength as distinctive virtues of women, and he incorporated many of these values into his own ethical and political philosophy. By examining Gandhiji's views on women through the framework of care ethics, this paper attempts to demonstrate that his emphasis on non-violence, service, and moral responsibility shows significant affinity with the principles of care ethics. At the same time, the paper critically evaluates the strengths and limitations of Gandhi's perspective within the broader context of contemporary feminist ethical discourse.

Keywords: Care Ethics, Gandhian Philosophy, Feminist Ethics, Women's Liberation, Non-violence, Moral Responsibility

নৈতিক দর্শনের ইতিহাসে দীর্ঘদিন ধরে নৈতিকতার ভিত্তি হিসেবে যুক্তি, কর্তব্য এবং সর্বজনীন নৈতিক নীতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কান্টীয় নীতিবিদ্যা এবং উপযোগবাদী নীতিবিদ্যা এই ধরনের নৈতিক তত্ত্বের প্রধান উদাহরণ। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে নারীবাদী চিন্তাবিদরা এই ধরনের নৈতিক তত্ত্বের সীমাবদ্ধতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁদের মতে, প্রচলিত নৈতিক তত্ত্বগুলো মানবিক সম্পর্ক, আবেগ এবং যত্নের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয় গুলো নিয়ে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে না।[i]

এই প্রেক্ষাপটে ক্যারোল গিলিগান এবং নেল নডিংস প্রযত্ন নীতিবিদ্যার ধারণা বিকাশ করেন। প্রযত্ন নীতিবিদ্যা নৈতিকতার ভিত্তি হিসেবে সম্পর্ক, সহমর্মিতা এবং যত্নকে গুরুত্ব দেয়। প্রযত্ন নীতিবিদ্যার উদ্যোক্তারা মনে করেন যে নৈতিকতা কেবলমাত্র বিমূর্ত নীতির বিষয় নয়; বরং তা মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং দায়িত্ববোধের মধ্য দিয়ে গঠিত হয়।

ভারতীয় নৈতিক ও রাজনৈতিক চিন্তায় মহাত্মা গান্ধীর স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গান্ধী নারীকে কেবল সামাজিক জীবনের অংশ হিসেবে নয়, বরং নৈতিক শক্তির প্রতীক হিসেবে দেখেছিলেন। তাঁর মতে নারীর মধ্যে সহমর্মিতা, সহনশীলতা এবং আত্মত্যাগের যে বিশেষ ক্ষমতা আছে, সেই ক্ষমতার মধ্যেই সামাজিক নৈতিক পরিবর্তন ঘটানোর সক্ষমতার বীজ নিহিত রয়েছে।[ii] তিনি বলেন—

> "To call woman the weaker sex is a libel; it is man's injustice to woman. If by strength is meant moral power, then woman is immeasurably man's superior."[iii]

এই উক্তির মাধ্যমেই গান্ধী নারীর নৈতিক শক্তি এবং সহমর্মিতার ক্ষমতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর মতে নারীর মধ্যে যে সহনশীলতা, প্রেম এবং আত্মত্যাগের গুণ বিদ্যমান তা সমাজে নৈতিক পরিবর্তন আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবশ্যই পালন করে।

এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হলো প্রযত্ন নীতিবিদ্যার আলোকে গান্ধীজির নারীচিন্তার একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করে তার সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা মূল্যায়ন করা।

নারীবাদী নীতিবিদ্যা ও প্রযত্ন নীতিবিদ্যার ধারণা:

সমসাময়িক নৈতিক দর্শনের আলোচনায় নারীবাদী নীতিবিদ্যা (Feminist Ethics) একটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক ধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নারীবাদী নীতিবিদ্যা মূলত সেই সকল নৈতিক তত্ত্বের সমালোচনা করে, যেগুলি দীর্ঘদিন ধরে পুরুষকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতা ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। নারীবাদী চিন্তাবিদদের মতে, প্রচলিত নীতিবিদ্যায় যুক্তি, নিরপেক্ষতা এবং সার্বজনীন নিয়মকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ার ফলে মানবিক সম্পর্ক, আবেগ, সহমর্মিতা এবং যত্নের মতো গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক গুণগুলি অবহেলিত হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটেই নারীবাদী নীতিবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসেবে প্রযত্ন নীতিবিদ্যার উদ্ভব ঘটে।

প্রযত্ন নীতিবিদ্যা (Care Ethics) হল নারীবাদী চিন্তাবিদদের দ্বারা বিকশিত এক গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক তত্ত্ব। এই নীতিবিদ্যায় নৈতিকতার ভিত্তি হিসেবে সামাজিক সম্পর্ক, পারস্পরিক নির্ভরতা, দায়বদ্ধতা এবং সহানুভূতিশীলতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পুরুষতান্ত্রিক সাবেকি নীতিবিদ্যার বিপরীতে নারীবাদীদের দ্বারা গড়ে ওঠা এই নীতিবিদ্যা প্রচলিত নিয়মনীতি ও বিমূর্ত নৈতিক মানদণ্ডের বাইরে গিয়ে প্রত্যেকটি ঘটনাকে তার বিশেষ পরিস্থিতি ও চাহিদার ভিত্তিতে বিচার করার কথা বলে।

পরিণামবাদ কিংবা কর্তব্যবাদী নীতিতত্ত্ব যেখানে সাধারণীকৃত মানদণ্ডের উপর নির্ভর করে এবং নিরপেক্ষতাকে নৈতিকতার প্রধান মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করে, সেখানে প্রযত্ন নীতিবিদ্যা ব্যক্তিগত সম্পর্কের উষ্ণতা, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং ব্যক্তিবিশেষের চাহিদার উপর অধিক গুরুত্ব দেয়। এই নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি মূলত আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক এবং পারস্পরিক নির্ভরতার বাস্তবতাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, যেখানে যত্ন, দরদ, সহানুভূতি এবং মহানুভবতাকে গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক গুণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

প্রযত্ন নীতিবিদ্যার প্রবক্তাদের মতে, নারীরা সাধারণত বিমূর্ত নীতি বা তত্ত্বের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করার পরিবর্তে বাস্তব পরিস্থিতি এবং জীবন্ত সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে নৈতিক সমস্যাগুলির সমাধানের প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করে। এই প্রসঙ্গে ক্যারোল গিলিগান তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *In a Different Voice*-এ দেখিয়েছেন যে নারীরা নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সম্পর্ক এবং যত্নকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়।[iv] তাঁর মতে প্রচলিত নৈতিক তত্ত্বগুলো মূলত পুরুষকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

পুরুষতান্ত্রিক সাবেকি নীতিবিদ্যায় পুরুষালি বিচারধারাকেই আদর্শ নৈতিক বিচারধারা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। অপরদিকে নারীরা যেহেতু প্রধানত পারিবারিক ও গৃহস্থালীর ক্ষেত্রে— যেমন রান্নাবান্না, অতিথি

আপ্যায়ন, শিশু, রোগী ও বৃদ্ধদের পরিচর্যা ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত থাকে— তাই এই কাজগুলিকে তুলনামূলকভাবে গুরুত্বহীন বলে মনে করা হয়েছে। ফলে পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতি নির্ভরশীলতা, দায়িত্ববোধ, আবেগ এবং সহানুভূতিশীলতা প্রভৃতি গুণকে 'মেয়েলি বলে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে।

কিন্তু প্রযত্ন নীতিবিদ্যা এই ধারণার বিরোধিতা করে। এই তত্ত্বের মতে যত্ন করা, সমঝোতা, আত্মত্যাগ, দায়বদ্ধতা, সহানুভূতিশীলতা এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতা কেবলমাত্র নারীর গুণ নয়; বরং এগুলি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের নৈতিক গুণ হওয়া উচিত। এই গুণগুলির গুরুত্ব কেবল ব্যক্তিগত পরিসরেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিসরেও এর বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে।

প্রযত্ন নীতিবিদ্যা মনে করে যে সব নৈতিক সমস্যাকে একই নিয়মনীতির আওতায় এনে বিচার করা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ পরিস্থিতি ও মানবিক সম্পর্কের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে সমস্যার বিচার করা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো ব্যক্তি তার অসুস্থ স্ত্রীকে সুস্থ করার জন্য আর্থিক অসামর্থ্যের কারণে কোনো ঔষধের দোকান থেকে ঔষধ চুরি করে আনেন, তাহলে সেই ঘটনাটিকে কেবলমাত্র আইনগত দৃষ্টিতে 'চুরি' হিসেবে বিচার করলে সমস্যার প্রকৃত মানবিক প্রেক্ষাপটটি অদৃশ্য থেকে যায়। কিন্তু প্রযত্ন নীতিবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে সেই ব্যক্তির পরিস্থিতি, তার দায়িত্ববোধ এবং সম্পর্কের প্রতি তার অঙ্গীকার— এসব বিষয়ও বিবেচনার আওতাভুক্ত হয়। ফলে নৈতিক বিচার আরও মানবিক ও বাস্তবভিত্তিক হয়ে ওঠে।
এই প্রসঙ্গে জোয়ান ট্রোনটো তাঁর *An Ethic of Care* প্রবন্ধে প্রযত্নের চারটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন।[v]
প্রথমত, Attentiveness (মনোযোগিত্ব)— যার প্রতি যত্ন নেওয়া হচ্ছে তার বিশেষ চাহিদার প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেওয়া। অন্যের প্রয়োজনের প্রতি এই সংবেদনশীলতা না থাকলে সমাজে সহিংসতা ও নিষ্ঠুরতার পরিবেশ তৈরি হতে পারে।
দ্বিতীয়ত, Responsibility (দায়িত্ববোধ)— অন্যের প্রয়োজনের প্রতি দায়িত্বশীলভাবে সাড়া দেওয়া। এই দায়িত্ব কেবল প্রতিষ্ঠিত নিয়মের বাধ্যবাধকতা থেকে নয়, বরং মানবিক সহমর্মিতা ও নৈতিক দায়িত্ববোধ থেকেও উদ্ভূত হতে পারে।
তৃতীয়ত, Competence (সামর্থ্য)— শুধু দায়িত্ব অনুভব করাই যথেষ্ট নয়; সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার সক্ষমতাও থাকতে হবে।
চতুর্থত, Responsiveness (প্রতিদেয়তা বা প্রতিক্রিয়াশীলতা)— যিনি প্রযত্ন গ্রহণ করছেন, তিনিও প্রযত্নদাতার প্রতি সংবেদনশীল হবেন এবং সেই সম্পর্কের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া গড়ে উঠবে।

এই চারটি উপাদান থেকে বোঝা যায় যে প্রযত্ন নীতিবিদ্যা মানবিক সম্পর্ক, পারস্পরিক নির্ভরতা এবং দায়িত্ববোধের উপর ভিত্তি করে নৈতিকতার একটি বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদান করে।

এছাড়াও প্রযত্ন নীতিবিদ্যার আলোচনায় নেল নডিংসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রযত্ন নীতিবিদ্যার ধারণাকে আরও সুসংগঠিত করেন। তাঁর মতে নৈতিকতার মূল ভিত্তি হলো *caring relationship*। একজন ব্যক্তি তখনই নৈতিকভাবে দায়িত্বশীল হয়ে ওঠে যখন সে অন্যের প্রয়োজন ও অনুভূতির প্রতি সংবেদনশীল হয়।[vi]

সারসংক্ষেপে বলা যায়, প্রযত্ন নীতিবিদ্যার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

১. নৈতিকতার ভিত্তি হিসেবে সম্পর্কের গুরুত্ব
২. সহমর্মিতা ও আবেগের ভূমিকা

৩. যত্ন ও দায়িত্ববোধ
৪. পরিস্থিতিনির্ভর নৈতিক বিচার

এই দৃষ্টিভঙ্গি নৈতিকতাকে কেবল নিয়ম বা কর্তব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তাকে আরও মানবিক, বাস্তবসম্মত এবং সম্পর্কভিত্তিক করে তোলে।

গান্ধীজির নারীচিন্তা:

ভারতীয় সমাজচিন্তায় মহাত্মা গান্ধীর নারীসম্পর্কিত ভাবনা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। তাঁর মতে কোনো দেশের প্রকৃত সম্পদ হল মানুষ, এবং সেই মানবসমাজের অর্ধাংশ হল নারী। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কারের কারণে নারীরা সমাজে অবমাননা ও দাসত্বের শিকার হয়েছে। এই বাস্তবতা উপলব্ধি করেই গান্ধীজি নারীকে সামাজিক দাসত্ব থেকে মুক্ত করে প্রকৃত মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি নারীকে সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক শক্তি হিসেবে বিবেচনা করেন এবং মনে করেন যে সহনশীলতা, প্রেম, আত্মত্যাগ এবং সহমর্মিতার মতো গুণাবলি নারীর মধ্যে বিশেষভাবে বিকশিত হয়, যা সমাজে নৈতিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম।

গান্ধীজি প্রথমেই সেইসব ধর্মশাস্ত্রের সমালোচনা করেন যেখানে নারীর মর্যাদাকে অবমাননা করা হয়েছে। ভারতবর্ষে ধর্ম মানুষের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলেও তিনি অন্ধভাবে ধর্মীয় শাস্ত্রকে গ্রহণ করার পক্ষে ছিলেন না। তিনি মনুস্মৃতির কিছু উক্তিকে 'তথাকথিত' বলে উল্লেখ করেন এবং মনে করেন যে নারীর প্রতি অবমাননাকর বহু শ্লোক পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। কারণ একই শাস্ত্রের মধ্যেই আবার বলা হয়েছে—"যেখানে নারী পূজিতা, সেখানে দেবতাও প্রসন্ন হন।" তাই গান্ধীর মতে ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা; যে কোনো শাস্ত্রীয় উক্তি যদি মানবিক ন্যায় ও নৈতিকতার পরিপন্থী হয় তবে তাকে বর্জন করা উচিত।

ধর্মশাস্ত্রের সমালোচনার পাশাপাশি তিনি সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন কুপ্রথার বিরুদ্ধেও সোচ্চার হন। বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, বাধ্যতামূলক বৈধব্য, দেবদাসী প্রথা, পর্দা প্রথা এবং নারীর আর্থিক পরাধীনতার মতো সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে তিনি কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেন। তাঁর মতে নারীকে পুরুষের অধীনস্থ বা ভোগের বস্তু হিসেবে দেখার মানসিকতা সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের লক্ষণ। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন যে নারী পুরুষের দাসী নয়, বরং তার সহযোগী ও সহকর্মী।

বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে গান্ধীজির অবস্থান ছিল অত্যন্ত কঠোর। তিনি মনে করতেন যে কন্যা কোনো পিতার সম্পত্তি নয় যে তাকে ইচ্ছামতো দান করা যাবে। পিতা সন্তানের রক্ষক মাত্র, মালিক নয়। অল্পবয়স্কা মেয়েদের বিবাহকে তিনি নৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করতেন এবং একে অনেকাংশে পুরুষের ভোগকেন্দ্রিক মানসিকতার ফল হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে বিবাহ একটি পবিত্র সামাজিক বন্ধন, যেখানে নারী ও পুরুষ উভয়ের সমান মর্যাদা ও অধিকার থাকা উচিত এবং উভয়েরই নিজের জীবনসঙ্গী নির্বাচন করার স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন।

পণপ্রথার বিরুদ্ধেও গান্ধীজি কঠোর সমালোচনা করেন। তাঁর মতে বিবাহ কোনো বেচাকেনার সম্পর্ক নয়; বরং এটি একটি পবিত্র সামাজিক প্রতিষ্ঠান। পণ গ্রহণকে তিনি "নিষ্ঠুর সামাজিক প্রথা" এবং "আত্মবিক্রয়"-এর সমতুল্য বলে আখ্যায়িত করেন। তাঁর মতে যে পুরুষ বিবাহের শর্ত হিসেবে পণ গ্রহণ করে সে কেবল নারীর মর্যাদাকেই অপমান করে না, বরং নিজের শিক্ষাকেও অবমানিত করে।

নারীর সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন। তাঁর মতে সম্পত্তির পূর্ণ অধিকার পুরুষকে সামাজিক ক্ষমতা প্রদান করে এবং সেই ক্ষমতার অপব্যবহার থেকেই নারীর উপর অত্যাচারের জন্ম হয়। তাই নারীদেরও পিতৃসম্পত্তির ভোগ ও অধিকার থাকা প্রয়োজন বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

বিধবা নারীর অবস্থান সম্পর্কেও গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বিধবা বিবাহকে কোনো পাপ বলে মনে করেননি এবং বলেছেন যে যদি বিধবা বিবাহ পাপ হয় তবে বিপত্নীক পুরুষের পুনর্বিবাহও একইভাবে পাপ হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধেও তিনি অবস্থান গ্রহণ করেন এবং মনে করেন স্বামীর মৃত্যুর পর আত্মাহুতি দেওয়ার মধ্যে প্রকৃত সতীত্ব নেই; বরং সংযমপূর্ণ জীবনযাপনই প্রকৃত নৈতিকতার পরিচায়ক।

নারীমুক্তির জন্য গান্ধীজি নারীশিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর মতে নিরক্ষরতার অজুহাতে নারীদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কোনো নৈতিক ভিত্তি নেই। শিক্ষা নারীদের আত্মসচেতন করে তুলবে এবং তাদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে বিকশিত করতে সাহায্য করবে। তবে তিনি এমন শিক্ষা ব্যবস্থার বিরোধিতা করেন যা কেবল নারীদের আদর্শ স্ত্রী বা মাতা হওয়ার জন্য প্রস্তুত করে। তাঁর মতে নারীশিক্ষা এমন হওয়া উচিত যা তাদের ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ঘটাবে এবং সমাজজীবনে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ দেবে।

নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকেও তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন। তাঁর মতে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা ছাড়া প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়। এই কারণেই তিনি চরকা আন্দোলনের মাধ্যমে নারীদের উৎপাদনমূলক কাজে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে চরকা কেবল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নয়, বরং আত্মনির্ভরতা ও মর্যাদাবোধের প্রতীক।

গান্ধীজি নারীর রাজনৈতিক অধিকারের বিষয়েও সচেতন ছিলেন। তিনি মনে করতেন রাজনৈতিক স্বাধীনতা তখনই অর্থবহ হবে যখন নারীরাও স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারবে এবং রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। এই কারণে তিনি নারীদের ভোটাধিকারের পক্ষেও মত প্রকাশ করেন।

সার্বিকভাবে বলা যায়, গান্ধীজি নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মতে নারীরা স্বভাবতই অহিংসার আদর্শের সঙ্গে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সহমর্মিতা, আত্মত্যাগ ও সেবার মতো গুণাবলি সমাজে নৈতিক পরিবর্তনের শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে। যদিও তাঁর চিন্তায় মাতৃত্ব ও আত্মত্যাগের ধারণা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে, তবুও তিনি নারীর মর্যাদা, স্বাধীনতা এবং নৈতিক শক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

প্রযত্ন নীতিবিদ্যার আলোকে গান্ধীজির নারীচিন্তার বিশ্লেষণ:

প্রযত্ন নীতিবিদ্যার আলোকে গান্ধীজির নারীচিন্তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তাঁর চিন্তায় বহু উপাদান এই নীতিবিদ্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যপূর্ণ। প্রযত্ন নীতিবিদ্যা যেমন সহমর্মিতা, যত্ন, দায়িত্ববোধ, আত্মত্যাগ ও পারস্পরিক নির্ভরতার উপর নৈতিকতার ভিত্তি স্থাপন করে, গান্ধীজিও তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শনে এই গুণগুলির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

গান্ধীজির অহিংসামূলক আন্দোলনের মধ্যেই এই প্রযত্নমূলক নৈতিকতার প্রভাব সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। তিনি সশস্ত্র সংগ্রামের পরিবর্তে অহিংসাকে জীবনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মতে সমাজে নৈতিক পরিবর্তন আনতে হলে সেবা, যত্ন, সহানুভূতি, সততা, আত্মসংযম, দায়িত্বশীলতা ও আত্মত্যাগের মতো গুণগুলির বিকাশ অপরিহার্য। এই গুণগুলি সমাজে শান্তি ও সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং মানবিক সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে তোলে।

এই প্রেক্ষাপটে গান্ধীজি মনে করতেন যে স্বাধীনতা আন্দোলনের সাফল্যের জন্য এমন মানুষদের প্রয়োজন যারা এই নৈতিক গুণগুলির অধিকারী। তাঁর মতে অহিংস সংগ্রাম কেবল বাহুবলের উপর নির্ভর করে না; বরং এটি নৈতিক শক্তি, আত্মসংযম এবং আত্মত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই তিনি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকেই এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন।

গান্ধীজি বিশেষভাবে নারীদের এই আন্দোলনে অংশগ্রহণের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর মতে নারীদের মধ্যে সহনশীলতা, ধৈর্য, সহানুভূতি এবং আত্মত্যাগের যে স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে তা অহিংস সংগ্রামের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মনে করতেন পুরুষেরা অনেক সময় সামাজিক সংস্কার ও ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষার কারণে হিংসাত্মক মনোভাব দ্বারা প্রভাবিত হয়, কিন্তু নারীরা তাদের সহৃদয়তা ও ধৈর্যের দ্বারা অহিংস আন্দোলনের শক্তিকে সুদৃঢ় করতে পারে। এই কারণেই তিনি বলেছিলেন— "ভারতবর্ষের মুক্তি ভারতবর্ষের ত্যাগ ও জাগৃতির উপর নির্ভর করে।"

এছাড়াও তিনি নারীদের গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছিলেন— "আমার ভবিষ্যৎ সেনাদলে পুরুষ অপেক্ষা নারীর বিপুল সংখ্যাধিক্য দেখতে আমি ইচ্ছা করি... পুরুষের হিংসাবৃত্তিকে আমি অত্যন্ত ভয় করি।" এই বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে অহিংস সংগ্রামের ক্ষেত্রে নারীদের নৈতিক শক্তি বিশেষভাবে কার্যকর। তাঁর মতে পুরুষরা বাহুশক্তিতে এগিয়ে থাকলেও আত্মত্যাগের শক্তিতে নারীরা অধিক বলীয়সী। তিনি বলেন— "আমি বিশ্বাস করি, পুরুষ যেমন পশুশক্তি প্রণোদিত সাহসে নারী হইতে শ্রেষ্ঠ, নারীও সকল সময় আত্মত্যাগের শক্তিতে পুরুষের চেয়ে অধিক বলীয়সী।"

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে স্পষ্ট হয় যে গান্ধীজি তথাকথিত "নারীসুলভ" গুণগুলিকে হেয় করে দেখেননি; বরং তিনি মনে করেছিলেন এই গুণগুলি মানবজাতির আদর্শ গুণ হওয়া উচিত। তাঁর মতে সহমর্মিতা, সেবা, ধৈর্য ও আত্মত্যাগ কেবল নারীর বৈশিষ্ট্য নয়; বরং এগুলি মানবিক নৈতিকতার মৌলিক উপাদান।

প্রযত্ন নীতিবিদ্যার সঙ্গে গান্ধীজির চিন্তার এই সাদৃশ্য আরও স্পষ্ট হয় তাঁর 'সেবা' ধারণায়। প্রযত্ন নীতিবিদ্যা যেমন নৈতিকতার ভিত্তি হিসেবে caring relationship-এর উপর গুরুত্ব দেয়, গান্ধীজিও সমাজে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সেবার আদর্শকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর মতে অন্যের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করা মানবজীবনের অন্যতম নৈতিক কর্তব্য।

তবে গান্ধীজির নারীচিন্তার কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। অনেক সমালোচকের মতে তিনি কখনো কখনো নারীর ভূমিকা মাতৃত্ব, সেবা এবং আত্মত্যাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেখেছেন। আধুনিক নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এই দৃষ্টিভঙ্গি সমালোচিত হয়েছে, কারণ এতে নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং স্বতন্ত্র সত্তার প্রশ্নটি সবসময় সমান গুরুত্ব পায় না।

তবুও সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে গান্ধীজির নারীচিন্তায় প্রযত্ন নীতিবিদ্যার সঙ্গে গভীর সাদৃশ্য বিদ্যমান। তিনি সহমর্মিতা, যত্ন, সেবা, আত্মত্যাগ এবং অহিংসার মতো মূল্যবোধকে মানবসমাজের নৈতিক ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন এবং এই গুণগুলির মাধ্যমে নারীকে সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

দার্শনিক মূল্যায়ন:

প্রযত্ন নীতিবিদ্যা নৈতিকতাকে কেবল নিয়ম বা কর্তব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে না; বরং মানবিক সম্পর্ক, সহমর্মিতা এবং পারস্পরিক দায়িত্ববোধের ভিত্তিতে নৈতিকতার একটি বিকল্প ব্যাখ্যা প্রদান করে। এই নীতিবিদ্যার মূল লক্ষ্য হল নৈতিকতাকে বাস্তব জীবনের সম্পর্কের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা এবং যত্ন, সহানুভূতি,

দায়িত্ববোধ ও পারস্পরিক নির্ভরতার গুরুত্বকে তুলে ধরা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে নৈতিক জীবনকে আরও মানবিক এবং বাস্তবসম্মত রূপে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়।

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে গান্ধীর নারীচিন্তা প্রযত্ন নীতিবিদ্যার সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ তৈরি করে। তাঁর অহিংসা, প্রেম, সহমর্মিতা এবং সেবার ধারণা মূলত মানবিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। গান্ধীজি মনে করতেন যে সত্য ও অহিংসার আদর্শ অনুসরণ করার জন্য মানুষের মধ্যে সহমর্মিতা, আত্মসংযম এবং অপরের কল্যাণের প্রতি দায়িত্ববোধ থাকা আবশ্যক। এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রযত্ন নীতিবিদ্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, কারণ এখানেও নৈতিকতার ভিত্তি হিসেবে caring relationship এবং পারস্পরিক নির্ভরতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

তবে একই সঙ্গে এটাও বলা যায় যে গান্ধীর নারীচিন্তা সম্পূর্ণরূপে আধুনিক নারীবাদী নীতিবিদ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আধুনিক feminist ethics সাধারণত নারীর স্বাধীনতা, সমতা এবং স্বায়ত্তশাসনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে গান্ধীর চিন্তার কিছু সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমত, গান্ধীজি প্রায়ই নারীর নৈতিক শক্তিকে তার মাতৃত্ব, সেবা এবং আত্মত্যাগের গুণাবলীর সঙ্গে যুক্ত করেছেন। তিনি মনে করতেন নারীরা স্বভাবতই সহনশীল, সহৃদয় এবং আত্মত্যাগে সক্ষম। যদিও এই ধারণা নারীর নৈতিক মর্যাদাকে স্বীকৃতি দেয়, কিন্তু আধুনিক নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটি সমস্যাজনক বলে বিবেচিত হতে পারে। কারণ এতে নারীর পরিচয় অনেক সময় একটি নির্দিষ্ট সামাজিক ভূমিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং নারীর স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তার প্রশ্নটি সবার অবলোকনেই থেকে যায়।

দ্বিতীয়ত, আধুনিক feminist ethics নারীর স্বায়ত্তশাসন বা autonomy-কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। অর্থাৎ নারীরা নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত নিজে নেওয়ার অধিকার রাখে এবং সামাজিক বা সাংস্কৃতিক প্রত্যাশার দ্বারা সেই স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত নয়। কিন্তু গান্ধীর চিন্তায় অনেক ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা সমাজের নৈতিক উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ফলে নারীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতার চেয়ে তার সামাজিক বা নৈতিক ভূমিকার উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হয়।

তৃতীয়ত, আধুনিক নারীবাদী নীতিবিদ্যায় লিঙ্গসমতার প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। feminist ethics পুরুষ ও নারীর সমান সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেয়। যদিও গান্ধীজি নারীর অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং নারীদের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিলেন, তবুও তাঁর চিন্তায় অনেক সময় নারীর নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি নারীর ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দিলেও, এটি কখনও কখনও নারীর উপর অতিরিক্ত নৈতিক প্রত্যাশা আরোপ করতে পারে।

এই কারণেই বলা যায় যে গান্ধীর নারীচিন্তা এবং আধুনিক feminist ethics-এর মধ্যে একদিকে যেমন কিছু সাদৃশ্য রয়েছে, অন্যদিকে তেমনি কিছু মৌলিক পার্থক্যও বিদ্যমান। গান্ধীজি প্রযত্ন, সহমর্মিতা এবং অহিংসার মতো মূল্যবোধকে নৈতিকতার কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করেছিলেন, যা প্রযত্ন নীতিবিদ্যার সঙ্গে গভীরভাবে সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু আধুনিক নারীবাদী নীতিবিদ্যা এই মূল্যবোধগুলির পাশাপাশি নারীর স্বাধীনতা, সমতা এবং স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নকেও সমান গুরুত্ব দেয়।

সুতরাং বলা যায় যে গান্ধীর নারীচিন্তা প্রযত্ন নীতিবিদ্যার সঙ্গে আংশিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও তা সম্পূর্ণরূপে আধুনিক feminist ethics-এর সঙ্গে মিলে যায় না। বরং এই দুই চিন্তাধারার মধ্যে একটি

সমালোচনামূলক আলোচনা সম্ভব, যা নৈতিক দর্শনের ক্ষেত্রকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারে এবং নারী, নৈতিকতা ও সমাজ সম্পর্কে একটি অধিকতর সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সহায়তা করতে পারে।

সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা:

বর্তমান সমাজে নারী-পুরুষ সমতার প্রশ্নটি বিশ্বব্যাপী আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদিও আধুনিক যুগে নারীরা শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং বিভিন্ন পেশাগত ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে, তবুও সামাজিক বাস্তবতায় এখনও নানা ধরনের বৈষম্য এবং সহিংসতার ঘটনা লক্ষ্য করা যায়। কন্যাভ্রূণ হত্যা, পণপ্রথা, পারিবারিক সহিংসতা, কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য এবং নারীর প্রতি সামাজিক অবমাননার মতো সমস্যাগুলি আজও বিভিন্ন সমাজে বিদ্যমান। এই প্রেক্ষাপটে মহাত্মা গান্ধীর নারীচিন্তা এবং প্রযত্ন নীতিবিদ্যার ধারণা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

প্রথমত, সমকালীন সমাজে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা। ভারতের ক্ষেত্রে National Crime Records Bureau (NCRB)-এর প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক নারী পারিবারিক সহিংসতা, পণজনিত নির্যাতন এবং যৌন সহিংসতার শিকার হন।[vii] এই পরিস্থিতিতে গান্ধীর অহিংসা এবং সহমর্মিতার নৈতিক আদর্শ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প নৈতিক পথ নির্দেশ করতে পারে। তাঁর মতে সমাজে স্থায়ী পরিবর্তন আনতে হলে সহিংসতার পরিবর্তে সহমর্মিতা, সহিষ্ণুতা এবং মানবিক দায়িত্ববোধের বিকাশ অপরিহার্য। এই দৃষ্টিভঙ্গি আজকের সমাজে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে নৈতিক সচেতনতা গড়ে তুলতে সহায়ক হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, সমকালীন বিশ্বে নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। United Nations Women-এর বিভিন্ন প্রতিবেদনে দেখা যায় যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে নারীরা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করলেও এখনও বহু দেশে তারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার।[viii] এই প্রেক্ষাপটে গান্ধীর নারীশিক্ষা, আত্মনির্ভরতা এবং সামাজিক অংশগ্রহণের উপর জোর আজও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তিনি মনে করতেন যে নারীর প্রকৃত মুক্তি তখনই সম্ভব যখন তারা শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মাধ্যমে আত্মনির্ভর হয়ে উঠবে এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।

তৃতীয়ত, সমসাময়িক নারীবাদী আলোচনায় "care economy" একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে। অর্থনীতিবিদ বিনা আগরওয়াল দেখিয়েছেন যে সমাজে যত্ন ও পরিচর্যার কাজ— যেমন শিশু, বৃদ্ধ বা অসুস্থ ব্যক্তির যত্ন নেওয়া— প্রধানত নারীরাই সম্পাদন করে থাকেন, কিন্তু এই কাজগুলির যথাযথ সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন করা হয় না।[ix] এই ধারণা প্রযত্ন নীতিবিদ্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, কারণ এই নীতিবিদ্যা মানবিক সম্পর্ক, যত্ন এবং পারস্পরিক দায়িত্ববোধকে নৈতিকতার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করে। গান্ধীর 'সেবা এবং 'সহমর্মিতা- ভিত্তিক নৈতিকতা এই আলোচনার সঙ্গে একটি তাৎপর্যপূর্ণ সংযোগ তৈরি করে।

এইসব আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে গান্ধীর নারীচিন্তা এবং প্রযত্ন নীতিবিদ্যার ধারণা কেবল ঐতিহাসিক বা দার্শনিক আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা সমকালীন সমাজের নৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলির বিশ্লেষণেও গুরুত্বপূর্ণ দিশা প্রদান করতে পারে। নারী-পুরুষ সমতা, মানবিক সম্পর্ক এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই চিন্তাধারাগুলি আজও গভীর প্রাসঙ্গিকতা বহন করে।

উপসংহার:

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে মহাত্মা গান্ধীর নারীচিন্তা ভারতীয় সমাজচিন্তা এবং নৈতিক দর্শনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান। তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে দীর্ঘদিন ধরে সামাজিক প্রথা, ধর্মীয় কুসংস্কার এবং পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার কারণে নারীরা সমাজে অবমাননা ও দাসত্বের শিকার হয়েছে। এই বাস্তবতার প্রতি সচেতন হয়েই তিনি নারীদের পশুত্বরূপ দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে তাদের প্রকৃত মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মতে দেশের প্রকৃত স্বাধীনতা তখনই অর্থবহ হবে যখন নারী-পুরুষ উভয়েই সমান মর্যাদা ও অধিকার ভোগ করতে পারবে।

এই কারণেই স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তিনি নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁর আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলন, খিলাফৎ আন্দোলন এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনে বিপুল সংখ্যক নারী অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং সমাজের অন্তর্জগতের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে জাতীয় জীবনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। গান্ধীজির নেতৃত্বেই ১৯২৫ সালে সরোজিনী নাইডু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পদে আসীন হন, যা ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসে নারী অংশগ্রহণের এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

গান্ধীজির নারীচিন্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তিনি তথাকথিত "নারীসুলভ" বলে বিবেচিত গুণাবলিকে হেয় করে দেখেননি। বরং তিনি মনে করতেন সহমর্মিতা, সেবা, আত্মত্যাগ, ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতার মতো গুণাবলি মানবসমাজের নৈতিক উন্নতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রযত্ন নীতিবিদ্যার সঙ্গে গভীরভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ, কারণ প্রযত্ন নীতিবিদ্যাও নৈতিকতার ভিত্তি হিসেবে মানবিক সম্পর্ক, যত্ন এবং পারস্পরিক দায়িত্ববোধের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। গান্ধীর অহিংসা, প্রেম এবং সেবার ধারণা এই মানবিক মূল্যবোধের উপরই প্রতিষ্ঠিত। তাঁর মতে সমাজে ন্যায়, শান্তি এবং মানবিকতার পরিবেশ গড়ে তুলতে এই গুণাবলির বিকাশ অপরিহার্য।

তবে আধুনিক নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে গান্ধীর নারীচিন্তার কিছু সীমাবদ্ধতাও লক্ষ্য করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে তিনি নারীর নৈতিক শক্তিকে মাতৃত্ব, সেবা এবং আত্মত্যাগের গুণাবলির সঙ্গে যুক্ত করেছেন, যা কখনও কখনও নারীর স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা এবং স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নকে আংশিকভাবে আড়াল করে দিতে পারে। আধুনিক feminist ethics নারীর স্বাধীনতা, সমতা এবং স্বায়ত্তশাসনের উপর অধিক গুরুত্ব দেয়। তবুও এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও গান্ধীর নারীচিন্তা নারী-মুক্তি এবং নৈতিক দর্শনের আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশ করে। এই প্রসঙ্গে গান্ধীর একটি উক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

> "Woman is the companion of man, gifted with equal mental capacities. She has the right to participate in the minutest details of the activities of man."[x]

এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় যে গান্ধী নারীকে সমাজের সমান অংশীদার হিসেবে দেখেছিলেন এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক জীবনে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণকে সমর্থন করেছিলেন। আজকের সমাজে যখন একদিকে নারীরা রাষ্ট্রপরিচালনা থেকে শুরু করে শিক্ষা, বিজ্ঞান, অর্থনীতি এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, অন্যদিকে এখনও অনেক স্থানে কন্যাসন্তান অবহেলা, পণপ্রথা এবং নারী নির্যাতনের মতো সমস্যা বিদ্যমান— এই প্রেক্ষাপটে গান্ধীর নারীচিন্তা নতুনভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

সুতরাং বলা যায় যে প্রযত্ন নীতিবিদ্যার আলোকে গান্ধীর নারীচিন্তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তাঁর নৈতিক দর্শন মানবিক সম্পর্ক, সহমর্মিতা এবং দায়িত্ববোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। যদিও আধুনিক নারীবাদী নীতিবিদ্যার

সঙ্গে তাঁর চিন্তার সম্পূর্ণ মিল নেই, তবুও এই দুই চিন্তাধারার মধ্যে একটি সৃজনশীল সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব। এই সৃজনশীল সম্পর্কের মাধ্যমে নৈতিক দর্শন, নারীবাদ এবং সামাজিক ন্যায়ের প্রশ্নকে আরও গভীরভাবে অনুধাবন করা সম্ভব এবং সমকালীন সমাজে নারী-পুরুষ সমতার আদর্শ প্রতিষ্ঠায় তা গুরুত্বপূর্ণ দিশা প্রদান করতে পারে।

---

[i] Alison Jaggar, *Feminist Ethics,* Oxford University Press.
[ii] Raghavan Iyer, *The Moral and Political Thought of Mahatma Gandhi.*
[iii] M.K. Gandhi, *Young India*, 1921.
[iv] Carol Gilligan, *In a Different Voice,* Harvard University Press, 1982
[v] Joan Tronto, An Ethics of Care, Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care (New York: Routledge, 1993).
[vi] Nel Noddlings, *Caring: A Feminine Approach to Ethics and Moral Education*, 1984.
[vii] Government of India**, National Crime Records Bureau**, *Crime in India Report 2022* (New Delhi: Ministry of Home Affairs, 2023)
[viii] **UN Women,** *Progress on the Sustainable Development Goals: Gender Equality Snapshot 2023* (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, 2023)
[ix] Bina Agarwal, "Gender Equality and Women's Empowerment," *World Development Report* (Washinton D.C.: World Bank, 2012).
[x] M.K. Gandhi*, Harijan*, 1931.

গ্রন্থপঞ্জি:

১. গান্ধী, মহাত্মা করমচাঁদ। নারী ও সমাজ ভাবনা। নবজীবন পাবলিশিং হাউস, ১৯৬২, আহমেদাবাদ, পৃ. ২৫।

২. তদেব, পৃ. ৩২।

৩. গান্ধী, মহাত্মা করমচাঁদ। *Young India* (নির্বাচিত রচনা) । নবজীবন ট্রাস্ট, ১৯২৫, আহমেদাবাদ, পৃ. ৫৪।

৪. গিলিগান, ক্যারোল। In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮২, কেমব্রিজ, পৃ. ৪১।

৫. নডিংস, নেল। Caring: A Feminine Approach to Ethics and Moral Education। ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস, ১৯৮৪, বার্কলে, পৃ. ১৭।

৬. ট্রোনটো, জোয়ান। Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care। রাউটলেজ, ১৯৯৩, নিউইয়র্ক, পৃ. ১২৭।

৭. আগরওয়াল, বিনা। Gender Equality and Women's Empowerment। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক পাবলিকেশন, ২০১২, ওয়াশিংটন ডিসি, পৃ. ৬৫।

৮. ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো। Crime in India Report। ভারত সরকার, ২০২২, নয়া দিল্লি, পৃ. ১০৪।

৯. ইউনাইটেড নেশন্স উইমেন। Progress on the Sustainable Development Goals: Gender Equality Report। ইউনাইটেড নেশন্স পাবলিকেশন, ২০২৩, নিউইয়র্ক, পৃ. ২৯।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1117-1123
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.329

ঋত্বিক ঘটকের নাটক ‘জ্বলন্ত’: সামাজিক অবক্ষয়ের মর্মস্পর্শী ছবি

সৌমিক মুখার্জী, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী, উত্তরপ্রদেশ, ভারত*

Received: 14.03.2026; Accepted: 16.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

‘Jwalanta’ is the final play written by Ritwik Kumar Ghatak. The central theme of this drama revolves around a teenage girl from a destitute family who falls victim to the miscreants of society and is raped. Subsequently, she is murdered by being set on fire. The play vividly depicts various anti-social activities—including the smuggling of stolen goods, the looting of railway wagons, and the brutalization of women. The central protagonist of the play is Bishnupriya, while the characters involved in these illicit activities are Raja, Rana, and Feku. Through this work, the playwright endeavors to expose the moral decay plaguing society. He illustrates how women have been subjected to oppression across different historical eras; in this context, he invokes the stories of Sita, Draupadi, and Shakuntala through the medium of song. The playwright highlights the inherent conflict between ancient Indian civilization and modern urban society. He refrains from situating the play within any specific historical timeframe; rather, his primary objective is to underscore the existential crisis confronting society. The erosion of human values takes center stage in this drama. He demonstrates that such anarchy was rampant throughout the entirety of Bengal, leaving the ordinary, destitute masses with no means of escape or survival—they inevitably fall victim to this relentless oppression. At the play's conclusion, following Bishnupriya's death, the playwright addresses the audience directly, asserting that the people must rise in revolt. Only through a collective uprising can a remedy to this situation be found. United public resistance remains the sole solution to this crisis; otherwise, society will plunge even deeper into darkness, and beasts like Raja, Rana, and Feku will continue to snuff out the vibrant young lives of countless girls like Bishnupriya.

Keywords: Ritwik Kumar Ghatak, Playwriter, Social crisis, ancient Indian civilization, oppression, collective uprising

ঋত্বিক ঘটকের সাহিত্যকর্ম হোক কিংবা চলচ্চিত্র নির্মাণ— সবক্ষেত্রেই এক তীব্র তাড়ণা আমরা দেখতে পাই। এক ধরণের অস্বস্তি তাঁর মধ্যে সবসময় কাজ করে গেছে। সেই অস্বস্তির মূলে ছিল দেশভাগ। দুই বাংলার মধ্যে কাঁটাতারের বিভাজনকে তিনি কোনোদিন মেনে নিতে পারেননি। দেশভাগের ফলে উদ্ভূত সমস্যাগুলি সমাজকে প্রতিনিয়ত ক্ষত-বিক্ষত করে গিয়েছে। এই সমস্যাগুলির বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার হয়েছেন ঋত্বিক ঘটক। তাঁর রচনাকর্মের মধ্যে দিয়ে তিনি নিজের প্রতিবাদ চালিয়ে গিয়েছেন। সেই প্রতিবাদের ফলস্বরূপ হলো ‘জ্বলন্ত’ নাটক। তিনি মৃত্যুর ঠিক এক বছর পূর্বে ১৯৭৫ সালে এই নাটকটি রচনা করেছেন। তাঁরই নির্দেশনায়

এবং সঙ্গীত পরিচালনায় ওই বছর ২৪ অগাস্ট নাটকটি অভিনীত হয় আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসে। নাটকটি লেখার আগে তিনি ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশনের কাছে 'সেই বিষ্ণুপ্রিয়া' নামে একটি প্রস্তাবিত ছবির সংক্ষিপ্তসার জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু দীর্ঘদিন কোনো উত্তর না পাওয়ায় সেই কাহিনিকে নাট্যরূপ প্রদান করে রচনা করেন 'জ্বলন্ত' নাটক। এই নাটকের প্রসঙ্গে সংহিতা ঘটক যিনি ঋত্বিক ঘটকের কন্যা এবং প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তিনি নাটকটিতে বিষ্ণুপ্রিয়ার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তিনি এক স্মৃতিচারণায় বলেন,

> "১৯৭৪ সালে ঋত্বিক ঘটক একটি নাটক লিখেছিলেন 'জ্বলন্ত'— একটি সত্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখা। পশ্চিমবঙ্গে তখন বিভিন্ন ঘটনা ঘটছে। খবরের কাগজে সব সত্য ঘটনা ছাপা হয় না। এই খবরটিও অন্যভাবে বেরিয়েছিল। উনি নিজের উদ্যোগে আসল ঘটনা জেনে লিখেছিলেন এই নাটক।"[১]

এই নাটকে সামাজিক অবক্ষয়ের যে ছবি ফুটে উঠেছে সেদিকে আলোকপাত করার পূর্বে নাটকটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে জেনে নেওয়া আমাদের দরকার।

এক

দেশভাগের নিদারুণ ফলাফলের দরুণ পূর্ববাংলা থেকে এক ছিন্নমূল পরিবার— এক প্রাজ্ঞ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ, যিনি প্রাচীন ভারতীয় পুরাণ এবং শাস্ত্র সম্পর্কে বিদগ্ধ তিনি অসহায় অবস্থায় তাঁর পরিবারকে নিয়ে উপস্থিত হন। এই নাটকে একদিকে প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সভ্যতা অন্যদিকে নবনির্মিত সভ্যতা। এই নবনির্মিত সভ্যতার যূপকাষ্ঠে পড়ে ধর্ষিতা হয় বিষ্ণুপ্রিয়া চরিত্রটি। ধর্ষিতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে আগুনে নিক্ষেপ করার মধ্য দিয়েই ঋত্বিক ঘটক দেখাতে চেয়েছিলেন প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ধংসের ছবি। এই নাটকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো সমাজ, বিপন্ন সভ্যতা এবং মানুষের মূল্যবোধের সংকট।

নাটকে চরিত্র সংখ্যা চোদ্দ। তারাচরণ, শচীদেবী, বিষ্ণুপ্রিয়া, সুশোভন, দুর্গাচরণ, ন্যায়রত্ন, রঘুদেব সার্বভৌম, উৎপল, বিদ্যাভূষণ, কণিকা, রাজা, রাণা, ফেকু, দারোগা, রাইচরণ, সেপাই এবং পুলিশের বড়কর্তা। পুলিশের বড়কর্তা চরিত্রটির নাটকে কোনো শারীরিক উপস্থিতি নেই। যে মূল্যবোধের সংকট নাটকের মূল বিষয় তার সূচনা আমরা প্রথম দৃশ্য থেকেই দেখতে পাই। পরবর্তীতে নাট্যকার এই সংকটের ছবিকে আরো দৃঢ়তর করেছেন। নাটকের শুরুতে দেখা যায় নাট্যকার উল্লেখ করছেন,

> "যবনিকা যখন উঠছে পেছনে থাকবে কালো পর্দা। হঠাৎ কতগুলো আলো জ্বলে উঠবে। ওপরের থেকে নেমে আসবে একটি পোস্টার। তাতে লেখা: নাটক ভাঙাই এই নাটকের কাজ।"[২]

নাট্যকার নাট্য নির্দেশনার মধ্যে দিয়ে দর্শকের যেন ধাক্কা মারতে চেষ্টা করেন। কালো পর্দা দিয়ে সমাজের মধ্যেকার কালো, অন্ধকারময় পরিস্থিতিকে যেন দেখাতে চেয়েছেন। অন্যদিকে তীব্র আলোর মাধ্যমে দর্শকের চোখের আরাম ভঙ্গ করতে চেয়েছেন। 'নাটক ভাঙাই এই নাটকের কাজ' এর মধ্যে দিয়ে বার্তা দিতে চেয়েছেন যে প্রচলিত নাট্যগুণ সম্পন্ন এই নাটক নয়। এখানে দর্শকদের বিচার, বিবেচনায় বারংবার আঘাত করা হবে। আরো একটি বিষয় উল্লেখ্য, নাটকের শুরুতে গানের উল্লেখ রয়েছে। ঋত্বিক ঘটক দর্শকদের বোধকে নাড়া দেওয়ার জন্যই গানটি উপস্থাপন করেন। "শচীমাতা গো, আমি চারযুগে হই জনমদুখিনী।/ সত্যযুগে ছিলাম সীতা, ত্রেতাতে দ্রৌপদী/ দ্বাপরে ছিলাম শকুন্তলা, কলিতে এই বিষ্ণুপ্রিয়া।/ মাগো আমি চারযুগে হই জনমদুখিনী।"[৩] অর্থাৎ চারযুগে (সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি) চার নারীর আত্ম-যন্ত্রণার কথা কবুল করে কলির বিষ্ণুপ্রিয়াকে হাজির করতে চান বিশ শতকের সত্তরের দশকে। এরপর দেখা যায় নাটকের প্রথম দৃশ্যে দারোগা রাইচরণ আসলে একজন ভণ্ড ব্যক্তি। সে আই.জি-এর ভাইপো সেজে রাজা-রাণা-ফেকুর মতো মানুষদের

অসামাজিক কাজে মদত দিতে থাকে। তারাচরণ এবং সুশোভনের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে উপস্থাপন করেন নাট্যকার তৎকালীন সামাজিক অবক্ষয়ের ছবিটি।

> "তারাচরণ: বাংলাদেশে মারাত্মক চোরাচালান, রাহাজানি, ছিনতাই। সব থেকে বড়ো সমস্যা নারী। এই নারীদের সম্ভ্রমের কোনো মূল্যই নেই তাদের কাছে। আমার মেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া— শুধু আমারটা কেন, সকল মেয়েরই এক অবস্থা।"[৪]

দ্বিতীয় দৃশ্যে আমরা পরিচিত হই রাইচরণ এবং রাজা-ফেকু-রাণার কাজের সঙ্গে। রাতের অন্ধকারে মালগাড়ি থেকে মাল নামায় রাজার দল। BSF এবং CRP-এর লোকদের সঙ্গে ঝামেলা বাঁধলে দারোগা রাইচরণ মধ্যস্থতা করতে এগিয়ে আসে। BSF এবং CRP-এর লোকেরা টাকার ভাগ পেয়ে মনের আনন্দে সেখান থেকে প্রস্থান করে। রাজাদের দল পরবর্তীতে বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়ে আসা মালের ডেলিভারি নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। রাজার দল শুধু ওয়াগন ব্রেকিং, চোরাচালান বা মালপাচার করেই ক্ষান্ত হয় না। রঘুদেব সার্বভৌমের মেয়ে সুষমাকে জোর করে ধরে নিয়ে যায়। এই কাজের পরোক্ষ মদত থাকে রাইচরণের। তারা রঘুদেবকে শাসায় এই বলে, "রাজা- এক নম্বর, গাঁ ছাড়বেন না। ছাড়বার চেষ্টাটি করলে আপনার হালত টাইট হওয়ার সম্ভাবনা।..."[৫]

তৃতীয় দৃশ্যে দেখা যায় তাদের নজর পড়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার ওপর। কিন্তু তারাচরণের আকস্মিক আগমনে বিষ্ণুপ্রিয়া সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। শেষদৃশ্যে পৌঁছে নাটককার একের পর এক অনেকগুলি ঘটনা হাজির করেছেন। মঞ্চে চরিত্রগুলি ক্রমানুসারে প্রবেশ করেছে। প্রথমেই দেখা যায় রাজা-রাণা-ফেকুকে, যারা তাদের মাল পাচারের কাজ নিয়ে মত্ত। এরপর মঞ্চে প্রবেশ করে কণিকা ও বিষ্ণুপ্রিয়া। এই দুই কিশোরী নিজেদের কিশোর প্রেম নিয়ে ব্যস্ত। তারপর দুর্গাচরণ, রঘুদেব, উৎপল আসে। তারাও নিজেদের আলোচনায় মত্ত থাকে। শেষে দেখা যায় বিষ্ণুপ্রিয়া রাজাদের দলের হাতে ধরা পড়ে। রাজাদের দল বিষ্ণুপ্রিয়াকে ধর্ষণ করে। ধর্ষণের পর বিষ্ণুপ্রিয়ার গায়ে আগুন লাগিয়ে দেয়। তারা পালিয়ে যায়। নাটকের শেষ দৃশ্যে দেখা যায় সুশোভন বিষ্ণুপ্রিয়ার মাথা কোলের ওপর নিয়ে দর্শকদের উদ্দেশে প্রশ্ন করছে,

> "আর কতদিন, আর কতকাল দেশের মানুষ এইসব সহ্য করবে? এ আর সয় না। আপনারা যাঁরা নাটক দেখতে এসেছেন, বাড়ি গিয়ে ভাত খেয়ে শুয়ে পড়বেন, কাল আবার অফিসকাছারি করবেন। কিন্তু এ অত্যাচার চলতেই থাকবে। এর কি কোনো রাস্তা নেই? দুর্নীতি দমন করার কি কোনো পথ নেই? আপনারা ভাবুন।"[৬]

নাটককার সমকালীন সমাজব্যবস্থার নগ্নরূপকে উপস্থাপন করতে চেষ্টা করেছেন। নিজের দেশের মধ্যেকার মানুষদের মধ্যে এরকম মনোবৃত্তি পাঠকমনকে নিঃসন্দেহে বিস্মিত করে। নাটকে দেখা যায় সুষমা নামক এক চরিত্র সে রাজা-রাণা-ফেকুদের অত্যাচারে উন্মাদ হয়ে যায়। এই ঘটনাটি শচীদেবীকে প্রতিবাদী করে তোলে। কিন্তু সেও নিজের মেয়েকে দুষ্কৃতীদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেননি।

দুই

'জ্বলন্ত' নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে নাট্যকারের দুটি বক্তব্যকে আমরা উপস্থাপন করবো।

এক, তিনি বলেছেন,

> "ভারতবর্ষ এমন একটা দেশ যেখানে বারবার বিষ্ণুপ্রিয়া invaded হয়েছে। বাইরের বিভিন্ন রাজশক্তির আক্রমণে ভারত-মা ধর্ষিতা। বিষ্ণুপ্রিয়া আমার সেই সামান্য মেয়ে যে represent করেছে সেই ভারতবর্ষকে।"[৭]

দুই,

> "'জ্বলন্ত' নাটকের সমাজবিরোধী প্রসঙ্গে একবার তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল কেন তিনি তিনমূর্তিকে নাটকে আনলেন? দুই বা চার নয় কেন? তিনি বলেছিলেন, "দিল্লিতে যে তিনমূর্তি... যে ছাপ (লাগানো আছে সেটা বুঝতে পারছ না, সত্যমেব জয়তে?"[৮]

নাটকে বিষ্ণুপ্রিয়ার পরিণতি আমাদের সমাজে নতুন কোনো ছবি নয়। যুগ যুগ ধরে আমাদের সমাজে নারীরা অবহেলিত, নিষ্পেষিত হয়ে আসছে। নারীর যন্ত্রণা দিয়েই শুরু করেছেন নাটকের। পরবর্তীতে দেখিয়েছেন সামাজিক দুর্নীতির ছবি। রাজা, রাণা, ফেকুরা রেলের ওয়াগান ভাঙার মতো অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়েছে। টাকা রোজগারই তাদের মূল উদ্দেশ্য। আসলে নাট্যকার যে সময়ে রচনা করেছেন নাটকটি সেই সময় অর্থাৎ সত্তরের দশক ছিল টালমাটাল সময়ের। বাংলার বুকে তখন নকশাল আন্দোলন চলছে। সরকারি আদেশের অজুহাতে প্রশাসন প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে যুবকদের। অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও সমাজে তখন ঠিক ছিল না। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীতে দেশে বেকারত্ব যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি কালোবাজারির উদ্ভব হয়। রাজা, রাণা, ফেকুরা আসলে সেই সমাজব্যবস্থারই ফল। তাদের মধ্যে কেবল ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সফল করতে নিজের মানবিক মূল্যবোধের বিসর্জন দিতেও পেছপা হয় না। সেই কারণেই জীবন নষ্ট করেছে তারা সুষমার, বিষ্ণুপ্রিয়ার। নারীকে ভোগ্যপণ্য হিসাবে তারা ব্যবহার করেছে।

নাটকে আরেক শ্রেণির মানুষদের দেখতে পাওয়া যায়। দুর্গাচরণ ন্যায়রত্ন, রঘুদেব সার্বভৌম এবং উৎপল বিদ্যাভূষণ। এরা যেন বাংলার প্রচলিত প্রবাদ ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর সার্থক উদাহরণ। নিজের চারপাশের পরিস্থিতি না দেখে বাইরের দেশে কী হচ্ছে সেই নিয়ে বেশি আগ্রহী। নিজদের আশেপাশে যে সামাজিক অবক্ষয় সেটা নিয়ে তারা চিন্তিত নয়। বিশ্ব রাজনীতিতে কী চলছে সেটা নিয়ে ভাবতে তারা আগ্রহী।

> "দুর্গাচরণ: ভিয়েতনাম মিটেও মিটছে না দাদু, মার্কিনি ঠান্ডা চাঁদ, কোথায় আচো? কামবোডিয়ায় লন নলের কী হাল হবে ভেবে দেকেচো? কী হে রঘুদেব সার্বভৌম, কী বৎস উৎপল বিদ্যাভূষণ, কিছু বলবে তো?"[৯]

দেখা যাচ্ছে এরা ভিয়েতনাম, আমেরিকা নিয়ে বেশি চিন্তিত। পরবর্তীতে নাটকে দেখা যায় সুষমা যে রঘুদেব সার্বভৌমের কন্যা সে ধর্ষিতা এবং উন্মাদ হয়ে যাওয়ার পরেও রঘুদেবের মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখা যায় না। সে একইভাবে বন্ধুদের সঙ্গে বিশ্বরাজনীতি নিয়ে আলোচনায় মত্ত থাকে।

দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যায় রাজা রেল ওয়াগান থেকে মাল চুরির পাশাপাশি টিকিট ব্ল্যাক করবার মতো কাজের সঙ্গেও লিপ্ত রয়েছে—

> "রাজা: টিকিট বেলাকের ব্যবস্থা আগের মতো করে রাখবি, ভুলবিনে যেন। এ মোকায় সাতের টিকিট সত্তরে না ঝেড়েছি তো আমার নামে কুকুর পুষিস।"[১০]

'জ্বলন্ত' নাটকে বিষ্ণুপ্রিয়া যেন দেশমাতার প্রতিমূর্তি স্বরূপ। বিষ্ণুপ্রিয়ার পরিণতি যেন দেশমাতার অপমৃত্যু। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য নাটককার তাঁর নাটকের ঘটনার কোনো সময় নির্দেশ করেননি। পূর্ববাংলা থেকে আগত একটি পরিবারের জীবনে দেশভাগ যে দুর্দশা ঘনিয়ে তুলেছে সে ঘটনাই নাটককার তাঁর নাটকে দেখিয়েছেন। দেশভাগ সে ভারতবর্ষ হোক, জার্মানি হোক বা অন্য দেশ, তার প্রতিক্রিয়া যে সর্বত্র সমান নাটককারের এই বিশ্বাসই হয়তো-বা এখানে প্রতিফলিত। দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য এবং নগর সভ্যতার অমানবিক আস্ফালন— এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব এই নাটকে উঠে এসেছে। নগর সভ্যতার বলি হয়েছে সুষমা, বিষ্ণুপ্রিয়ার মতো নারীরা। তারা যুগে যুগে এভাবেই লাঞ্ছিত হয়েছে। আর ধর্ষকদের মধ্যে দিয়ে সমাজবিরোধী কার্যকলাপকে দেখাতে চেয়েছেন। তাদের

জন্যই সমাজে অবক্ষয় নেমে আসে। তারা শোষণ করে নারীদের। তাদের হাতে পড়েই প্রাণ হারায় অসহায় নারীরা। তারা এভাবেই কালিমালিপ্ত করে দেশমাতাকে। রাজা, রাণা, ফেকু এই তিন চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নাটককার তাঁর সমকালীন ক্ষোভকে প্রকাশ করেছেন। তিনি তুলে ধরেছেন অ-সামাজিক শিক্ষিত সম্প্রদায়কে। সামাজিক অনাচার তাদের বিচলিত করে না, কিন্তু সে অনাচার এক সাধারণ বাঙালি মাকে ক্ষোভে বিদ্রোহী করে তোলে। দুষ্টের দমনকারী প্রশাসকের ভক্ষকরূপ উঠে এসেছে নাটকের মধ্যে।

এই নাটকে আর একটি প্রায়োগিক দিকের কথা উল্লেখ করা আবশ্যিক। সামাজিক দুর্দশার ছবি তুলে ধরতে গিয়ে নাটককার এক অভিনব প্রয়োগ কৌশল ব্যবহার করেছেন। সেটি সবুজ মাকড়সার মৃত্যুর নৃত্য বা গ্রিন ট্যারানটুলা। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে পুরুষ মাকড়সাকে স্ত্রী মাকড়সারা সম্ভোগ করে। তারপর তাকে ঘিরে স্ত্রী মাকড়সাগুলোর নৃত্য শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত পুরুষ মাকড়সাকে তারা খেয়ে ফেলে। নাটকে রাইচরণ-দারোগার কাছ থেকে সব রকম সুবিধা আদায় করেছিল রাজার দল। শেষদৃশ্যে দারোগাকে ঘিরে তারা নাচতে থাকে, যেন খেতে আসে। ওদের নাচের ছন্দে দারোগাও নাচতে বাধ্য হয়।

সামাজিক অবক্ষয়ের ছবি নাটকের প্রতিটি দৃশ্যের মধ্যেই খুব স্পষ্ট। এমন একটা সময়কে দেখিয়েছেন নাট্যকার যেখানে মানবিক মূল্যবোধ যেমন হারিয়ে গেছে তেমনি অসামাজিক কার্যকলাপ তার চরম সীমায় পৌঁছে গেছে। যাদের কাছে ক্ষমতা রয়েছে তারা শাসন করছে ক্ষমতাহীনদের ওপর। আর সব চাইতে বড় কথা ক্ষমতাহীনদের পালিয়ে যাবার কোনো উপায় নেই। কারণ সমগ্র দেশ জুড়েই এইরূপ অবস্থা। তাই নাটকের শুরুতে তারাচরণের সংলাপের মধ্য দিয়েই স্পষ্ট করে দিয়েছেন নাটককার। তারাচরণদের কোথাও পালিয়ে যাবার জায়গা নেই। তারা চরম অপমান, লাঞ্ছনা সহ্য করেও থেকে যায় তাদের ভিটে মাটি আঁকড়ে। এই চরম সংকট শুধু তারাচরণের নয়। তার মতো হাজার হাজার পরিবারের। স্বাধীনতার বেশ কিছু বছর কেটে যাওয়ার পরেও পরিস্থিতির কিছু পরিবর্তন হয়নি। এমনকি আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সংবাদ মাধ্যমে প্রতিদিন আমরা দেখতে পাই নারীদের ওপর অত্যাচারের কথা। প্রাচীন যুগে যা অবস্থা ছিল বর্তমানে একই আছে। নাটকের শেষে তাই ঋত্বিক ঘটক ফ্লাই কার্ডের মাধ্যমে দেখিয়েছেন,

> "মানুষকে বাঁচতে হলে খেপতে হবে। খ্যাপো ভাইবোনেরা, সব খ্যাপো। খেপে তুলকালাম করো। নইলে কিছুটি হবার নয়।"[১১]

সামাজিক অবক্ষয়ের থেকে মুক্তির উপায় একটাই। সবাইকে একত্রিত হয়ে লড়াই করতে হবে। ওই গ্রামে যদি সুষমার ওপর হওয়া অত্যাচারের প্রতিবাদ করতো কেউ তাহলে বিষ্ণুপ্রিয়াকে মরতে হত না। কিন্তু সবাই চুপ করেছিল। সেটা রাজাদের ভয়েই হোক কিংবা তাদের অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া জীবনের জন্যেই হোক। নাটককার এখানেই আঘাত হানতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন যে খেপে উঠতে, অস্থির হয়ে উঠতে। তবেই প্রতিবাদের ঢেউ উঠবে। জঙ্গলের যে আইনের কথা নাটকে বলা হয়েছে সেটার বিরুদ্ধেই এই প্রতিবাদের স্বর জাগাতে চেয়েছেন নাটককার।

ঋত্বিক ঘটক তাঁর নাটক 'জ্বলন্ত'-তে প্রাচীন সভ্যতার অবক্ষয়ের সঙ্গে আধুনিক সভ্যতার অবক্ষয়ের দিকটির মধ্যে নাটকীয় দ্বন্দ্ব উপস্থাপন করেছেন। তিনি নাটকের সূচনাতেই যে গানের অবতাড়না করেছেন তার মধ্যে দিয়েই নিজের ভাবনাকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। সেখানে সীতা, দ্রৌপদী, শকুন্তলার উল্লেখ করেছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই সমাজের কাছে লাঞ্ছিত হয়েছেন। সীতাকে সতীত্ব পরীক্ষার জন্য অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছিল। অন্যদিকে দ্রৌপদীর ভরা রাজসভায় বস্ত্রহরণ হয়েছিল। শকুন্তলাকে তাঁর জীবনে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। পরবর্তীতে এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিষ্ণুপ্রিয়াকেও একইভাবে অত্যচার সহ্য করতে হয়েছে। এই নারীদের মধ্যে আপাত সময়ের পার্থক্য থাকলেও তাদের অবস্থানের কোনো পার্থক্য ছিল না। তারা সকলেই

নিপীড়িত। নাটকে বিষ্ণুপ্রিয়া চরিত্রের নামকরণের মধ্যে দিয়ে নাটককার যেন তাঁর নিয়তি রচনা করে দিয়েছিলেন। তাই নাটকে আমরা দেখি তাকে ধর্ষণ করছে রাজাদের দল। পরবর্তীতে তাকে হত্যা করে রাজাদের দল। এও যেন এক আধুনিকা সীতা, যার শেষ পরিণতি আগুনের লেলিহান শিখায়। আসলে নাটকের মূল বক্তব্য এটাই, যতদিন এই অরাজকতা থাকবে তার বলি হবে সমাজের অসহায় নারীরা। শুধু নারী বলেই নয় যারা সমাজের নীচু তলার মানুষ, সহায় সম্বলহীন তারাও একইভাবে নির্যাতিত হবে। শত আপমান, বঞ্চনা সহ্য করেও তাদের থেকে যেতে হবে নিজের ভিটে মাটি আঁকড়ে। এ এক অন্য ধরণের অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম।

ঋত্বিক ঘটক মূলত চলচ্চিত্রকার হলেও তার জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে মানুষ। মানুষই তাঁর রচনার প্রথম ও শেষ কথা। তাই সাহিত্যের সংরূপ পরিবর্তন করে তিনি কখনও গল্পে আবার কখনও নাটক রচনা করেছেন। কিন্তু মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হননি। এই নাটকেও আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই মানুষের কথা। তাদের দুঃখ, দুর্দশার কথা প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর কাছে মাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ হয়নি, তাঁর কাছে বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে। এই নাটক শেষে তাই ইতিবাচক সমাধান দর্শকদের দেখিয়েছেন। বলেছেন খেপে উঠতে। এই খেপে ওঠা আসলে প্রতিবাদ। জীবন অতিবাহিত করার দুটো উপায় থাকে। এক, যা হচ্ছে সেটা হতে দিতে হবে। চুপচাপ মেনে নিতে হবে। আর দুই, সেটাকে দায়িত্ব নিয়ে পরিবর্তন করতে হবে। ঋত্বিক ঘটক সেই দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষের মধ্যে পড়ে। তাই তিনি দায়িত্ব নিয়েছিলেন। নিছক প্রেমের কিংবা সামাজিক ঘরোয়া নাটক তাঁর রচনার বিষয়বস্তু হয়নি। তিনি নিজেকে নিমজ্জিত করেছেন প্রতিবাদের আবর্তে। সমাজব্যবস্থার প্রতি তীব্র ক্ষোভ নাটকে প্রতিফলিতে হয়েছে। সমাজের কোনো সুষম প্রতিচিত্র রচনার প্রয়াস নয়, সামাজিক সমস্যা ও তার থেকে উত্তরণের প্রয়াস নাটকের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। খবরের কাগজের একটি ছোট সংবাদ থেকে তিনি কাহিনী গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সেটিকে বৃহৎ এক পরিসরে স্থান দিয়েছেন তিনি। সেখান থেকে সমাজ পরিবর্তনের ডাক দিয়েছেন তিনি। শুধুই অবক্ষয়ের দিকটি দেখানো তাঁর লক্ষ্য ছিল না। সেদিক থেকে তিনি একজন সার্থক শিল্পী। ঋত্বিক ঘটক ব্যক্তিজীবনে গণনাট্যের সদস্য ছিলেন। তিনি বিজন ভট্টাচার্যসহ অন্যান্য গণনাট্যের কর্মীদের সঙ্গে সরাসরি কাজ করেছেন। তাই তিনি গণনাট্যের যে মূল বৈশিষ্ট্য শুধু সমস্যা দেখানো নয়, সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ স্পষ্ট করে দেওয়া, সেটাও নাটকের মধ্যে দেখা যায়। তিনি সবাইকে খেপে উঠতে বলেছেন। একত্রিত হতে বলেছেন। এই সমাধানসূত্র প্রসঙ্গ তাঁর নাট্যকৃতীকে দর্শায়। ঋত্বিক ঘটক একজন মানূষের শিল্পী। তাই শিল্পের জন্য শিল্প করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি মানুষের জন্য শিল্প করতে চেয়েছেন। তাঁর 'জ্বালা' থেকে 'জ্বলন্ত' সব নাটকেই এই কথাই উচ্চারিত হয়েছে। 'জ্বলন্ত' নাটক হয়তো নাট্যগুণ সম্পন্ন বিখ্যাত নাটক হিসাবে পরিচিত হতে পারেনি। কিন্তু এই নাটক যে নাটক ভাঙার নাটক সেটা ঋত্বিক ঘটক বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি যে ব্রেশট দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন সেটার বিভিন্ন উদাহরণ পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের আলোচনার মূলে ছিল এই নাটকের মধ্যে দিয়ে কীভাবে তিনি সামাজিক অবক্ষয়ের দিকটি তুলে ধরতে পেরেছেন। আমরা আলোচনার মধ্যে দিয়ে দেখতে পেলাম তিনি সেই দিক থেকে সার্থকতা লাভ করেছেন। এই নাটকের বিষয়বস্তুর দিকে নজর দিলেই দেখা যায় যে অরাজকতাকে বিষয় করেই তিনি রচনা করেছেন নাটকটি। সেখানে মানুষদের দুঃখ, কষ্টের কথাই প্রধানত উঠে এসেছে। চোরাকারবারি, ঘুষখোর, ধর্ষক ইত্যাদি অসামাজিক কার্যকলাপ কীভাবে সমাজে পচন ধরিয়ে দিয়ে সুস্থ সুন্দর পৃথিবীকে নষ্ট করে দিচ্ছে সেটাই দেখাতে চেয়েছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া নাটকের এক সংলাপে বলে, "... আকাশ কী সুন্দর! মাঠ নদী কী সুন্দর! মানুষ কী সুন্দর! সব সুন্দর, না মা!"[১২] নিষ্পাপ এই কিশোরী যে সবকিছু সুন্দর দেখছিল তাকেই বেছে নিতে হল আত্মহত্যার পথ। এই সুন্দর পৃথিবী থেকে তাকে চলে যেতে হয়। এই ক্ষোভটাই নাটকের মেরুদণ্ড। ঋত্বিক ঘটক এভাবেই স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন সমগ্র নাটক জুড়ে।

তথ্যসূত্র:

১. চ্যাটার্জী, কুমার সৌমিত্র সম্পাদনা। নাট্যকথা বিশেষ সংখ্যা থিয়েটারে ঋত্বিক ঘটক। মার্চ ২০০৪, পৃ. ১৫১।
২. চক্রবর্তী, রথীন সম্পাদনা। ঋত্বিক ঘটকের নাটকসংগ্রহ। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, ২০০৮, কলকাতা, পৃ. ৩৯৯।
৩. তদেব, পৃ. ৩৯৯।
৪. তদেব, পৃ. ৪০০।
৫. তদেব, পৃ. ৪০৯।
৬. তদেব, পৃ. ৪২২।
৭. কুমার চ্যাটার্জী, সৌমিত্র সম্পাদনা। নাট্যকথা বিশেষ সংখ্যা থিয়েটারে ঋত্বিক ঘটক। মার্চ ২০০৪, পৃ. ১৭৭।
৮. তদেব, পৃ. ১৬৮।
৯. চক্রবর্তী, রথীন সম্পাদনা। ঋত্বিক ঘটকের নাটকসংগ্রহ। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, ২০০৮, কলকাতা, পৃ. ৪০৩।
১০. তদেব, পৃ. ৪০৭।
১১. তদেব, পৃ. ৪২২।
১২. তদেব, পৃ. ৩৯৯।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১. মুখোপাধ্যায়, পার্থ সম্পাদনা। ঋত্বিককুমার ঘটক কথাবার্তা সংগ্রহ। প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৯।
২. ঘটক, সুরমা। ঋত্বিক। অনুষ্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা, জুন ২০২৩।

সহায়ক গবেষণা:

১. চক্রবর্তী, নিবেদিতা। ঋত্বিক কুমার ঘটক ও তাঁর নাট্যচর্চা। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1124-1130
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.330

বিধবাদের ব্রত পালন: বাঙালি সমাজে ধর্ম, লিঙ্গ ও সামাজিক শাসন

অমরেন্দ্র প্রধান, *গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, মেদিনীপুর কলেজ রিসার্চ সেন্টার, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 14.03.2026; Accepted: 16.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This paper discusses the ritual of *brata* (religious vows) among the Hindu widows in Bengali society and how it fits into the larger category of gendered, religious, and socially regulated practices in the Bengali society. *Brata* has been a significant mode of religious observance mostly among women in the cultural life of Bengali. But these rituals were not equally experienced. Whereas married women undertook vows in pursuit of household prosperity, marital well-being and family stability, widows were frequently subjected to more severe types of ritual discipline. Widow centered vows like *Ekadashi*, *Ambubachi*, and other related practices, controlled the daily life and social status of widowed women who were required to live under the influence of prolonged starvation, dietary restraints, ritual silence and deprivation of bodily pleasures. Based on the analysis of autobiographical accounts, literary sources, and historical debates, this paper will claim that these rituals functioned not just as a way of religious devotion but also as a means of cementing patriarchal rules. Meanwhile, to most widows the practices offered a system of spiritual sense and ethical respect under circumstances of social marginalization. The analysis of these overlapping dimensions demonstrates how the traditions of widow-centred brata help understand the multifactorial connection between the field of religious practice, gendered disciplines, and social authority in the cultural history of Bengal.

Keywords: Brata Rituals, Widowhood in Bengal, Patriarchal Social Control, Religious Asceticism, Gender and Ritual Practices, Bengali Folk Culture

'ব্রত' শব্দটি 'বৃ' ধাতুর সঙ্গে 'অত্' প্রত্যয় যোগে সম্পন্ন হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে- "কিছু কামনা করে যে অনুষ্ঠান সমাজে চলে তাকেই বলি ব্রত।"[১] ড. শীলা বসাক বলেছেন- "সাধারণত কিছু কামনা করে দেবতার কাছে বিশেষ প্রার্থনা জানিয়ে কোন বিশেষ আচরণ পালন বা অনুষ্ঠান করা কিংবা পার্থিব কল্যাণ কামনায় দশে মিলে যে সামাজিক নিয়ম বা অনুষ্ঠান পালন করা হয় তাকেই ব্রত বলা হয়"।[২] আবার সংসদ বাংলা অভিধানে বলা হয়েছে ব্রত হল- "পুণ্য লাভ ইষ্টলাভ পাপক্ষয় প্রভৃতির জন্য অনুষ্ঠান ধর্মকার্য, ধর্মানুষ্ঠান; তপস্যা; সংযম"।[৩] অর্থাৎ ব্রত হল- মানুষের কামনা ও সেই কামনা পূরণের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত আচরণ সমষ্টি। বাঙালি সমাজে ব্রতপ্রথার উৎপত্তি কেবল শাস্ত্রীয় ধর্মাচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর শিকড় আরো প্রাচীন লোকাচার ও মানব সমাজের আদিম অভিজ্ঞতার মধ্যে নিহিত।

বাংলার সামাজিক ইতিহাসে বিধবাদের অবস্থান ছিল সর্বদাই প্রান্তিক ও পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ও ধর্মীয় অনুশাসন বিধবাদের জীবনকে আবদ্ধ করেছিল কঠোর সংযম ও বিধি-নিষেধের বেড়াজালে। উনিশ শতকের জনগণনা অনুযায়ী বাংলায় বিধবাদের সংখ্যা ছিল সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাধিক, কিছু কিছু ক্ষেত্রে মোট নারীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ।[৪] এই বিপুল সংখ্যক বিধবাদের উপস্থিতি পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ দ্বারা সৃষ্ট শাস্ত্রীয় বিধান, ব্রত ও সংযমমূলক অনুশীলনকে কেবল ব্যক্তিগত ধর্মাচারণ নয়, বরং একটি ব্যাপক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় পরিণত করেছিল। এই প্রেক্ষাপটে ব্রত পালন ছিল এমন এক অনুশীলন যার মাধ্যমে বিধবাদের দৈহিক আচরণ, খাদ্যাভ্যাস ও নৈতিক পরিচয় নির্ধারণ করা হতো।

ব্রতের গঠন ও প্রকৃতির ভিত্তিতে এগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় যথা শাস্ত্রীয় ব্রত ও অশাস্ত্রীয় ব্রত। শাস্ত্র, পুরাণ এবং ব্রাহ্মণ্য আচার পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত ব্রত গুলিকে শাস্ত্রীয় ব্রত বলা হয়। এগুলিতে মন্ত্রপাঠ, সংকল্প, ঘটস্থাপন, ব্রাহ্মণকে দান ইত্যাদি নিয়মাবলী অনুসরণ করা হয়। এই ব্রতগুলির কাঠামো তুলনামূলকভাবে সুনির্দিষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত।[৫] আবার অশাস্ত্রীয় ব্রতগুলির মধ্যে নারী ব্রতকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় যথা- কুমারী ব্রত, সধবা ব্রত ও বিধবা ব্রত। কুমারী ব্রতগুলি মূলত অল্প বয়সী মেয়েদের দ্বারা পালিত হয় এবং এগুলি অপেক্ষাকৃত সহজ ও লৌকিক প্রকৃতির। এখানে মন্ত্র বা পুরোহিতের ভূমিকা প্রায় অনুপস্থিত, তার চেয়ে আলপনা, প্রতীকি ক্রিয়া এবং ছড়ার মাধ্যমে কামনা প্রকাশ বেশি লক্ষ্য করা যায়। এই ব্রতগুলিকে বাংলার লোকসংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[৬] সধবা ব্রতগুলি শাস্ত্রীয় ও লৌকিক উপাদানের মিশ্রণ, এগুলি বিবাহিত নারীদের দ্বারা পালিত হয়। গৃহস্থলীর মঙ্গল, সন্তানের কল্যাণ এবং পারিবারিক সমৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত এই ব্রতগুলিতে শাস্ত্রীয় আচার থাকলেও তা অনেকক্ষেত্রে সহজীকৃত ও রূপান্তরিত।[৭] স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবারা যে ব্রতগুলি পালন করে থাকেন তাকে বিধবা ব্রত বলা হয়। মূলত পাপ মুক্তি, পূর্ণ অর্জন, নরকবাস থেকে মুক্তি ও বিষ্ণুলোক প্রাপ্তির আশায় বিধবারা এই ব্রতগুলি পালন করতেন। তুলনামূলক ভাবে বিধবাদের ব্রতগুলি ছিল খুব কঠিন। বহু ক্ষেত্রেই বিধবারা সমাজের লাল চোখ এড়াতে এই কঠিন ব্রতগুলি পালন করতে বাধ্য হতেন। হিন্দুমতী দেবী তার বৈধব্য জীবনের একটি ঘটনা উল্লেখ করেছিলেন- অল্প বয়সে বিধবা হওয়ার পর বাপের বাড়িতে এসে ডুরে কাপড় গয়নাগাটি পরে খোঁপা বেঁধে বেড়াতেন, চুলে সোনার চিরুনি-ফুলকাটা সবই দিতেন। এই দেখে তাদের পাড়ার ঘোষেদের মেয়ে এসে ব্যঙ্গ করে বলেছিল-

"তোর ভাতার মরেছচে। ১২/১৪ বছরের ধাড়ি হলি, একাদশী করবি কবে?
মা তো খুব সোহাগিনী সাজিয়ে রেখেছে। সিঁদুর পরবে কবে লো?"[৮]

সাধারণত নারী ব্রত কে নারীদের ধর্মীয় আচার হিসেবে দেখা হলেও, সব ব্রত সকল নারীর জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য ছিল না। এই নারী ব্রত প্রথাগুলির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হল সাধারণ ব্রত এবং বিধবা কেন্দ্রিক ব্রত। সাধারণ ব্রত প্রধানত বিবাহিত নারীদের দ্বারা পালিত হতো এবং এগুলির উদ্দেশ্য ছিল স্বামীর মঙ্গল, সন্তানের কল্যাণ এবং গৃহস্থলীর সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা। যেমন - লক্ষী ব্রত, সাবিত্রী ব্রত, শীতলা ব্রত বা বিভিন্ন পৌষ-পার্বণ কেন্দ্রিক ব্রত। এই ব্রতগুলিতে খাদ্য প্রস্তুতি, পূজা ও ভোগ নিবেদনের আচারগুলি গৃহস্থালি জীবনের সঙ্গে তাদের একটি ইতিবাচক ও ধারাবাহিক সম্পর্ক বজায় রাখতে সহায়তা করে। অন্যদিকে বিধবা কেন্দ্রিক ব্রত মূলত সংযম, বর্জন এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের উপর ভিত্তি করে গঠিত। একাদশী, অম্বুবাচী, মাঘব্রত, মৌনী অমাবস্যা প্রভৃতি ব্রতের ক্ষেত্রে উপবাস, স্বল্প আহার, নীরবতা এবং দৈহিক সুখ পরিত্যাগ করার মাধ্যমে বিধবাদের শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এখানে 'মঙ্গল' বা 'সমৃদ্ধি'র পরিবর্তে 'পবিত্রতা' ও 'সংযম' প্রধান মূল্যবোধ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

এইসকল পার্থক্য কেবল আচরণগত নয়, বরং তা গভীরভাবে লিঙ্গ ও সামাজিক অবস্থানের সঙ্গে যুক্ত। বিবাহিত নারীদের ক্ষেত্রে এই ব্রতগুলি গৃহস্থলীর মঙ্গল সাধনের উপায়, কিন্তু বিধবাদের ক্ষেত্রে ব্রত সামাজিক সীমাবদ্ধতা ও নৈতিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম। ফলে এই ব্রতপ্রথা দুই ভিন্ন সামাজিক অবস্থানে দুই ভিন্ন অর্থ ধারণ করে।[৯] এইভাবে বিধবা কেন্দ্রিক ব্রত ও সাধারণ ব্রতের পার্থক্য বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয় যে ব্রতপ্রথা কোনো একরৈখিক ধর্মীয় আচার নয়, বরং এটি সামাজিক স্তরবিন্যাস, লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকা এবং ক্ষমতার সম্পর্ককে প্রতিফলিত করে। হিন্দু ধর্মীয় পরিমণ্ডলে ব্রত বলতে বোঝায় নির্দিষ্ট নিয়মাবলী মেনে উপবাস, সংযম ও আচার পালনের মাধ্যমে ধর্মীয় পুণ্য অর্জনের প্রক্রিয়া। মনুস্মৃতি ও অন্যান্য স্মৃতি শাস্ত্রে নারীদের জন্য বিভিন্ন ব্রতের উল্লেখ থাকলেও বিধবাদের জন্য সংযোগের মাত্রা ছিল তুলনামূলক ভাবে কঠোর। যা স্বামীর মৃত্যুর পর নারীর কামনা, ভোগ ও সামাজিক অংশগ্রহণ সীমিত করার নৈতিক যুক্তি হিসাবে এই ব্রতকে বৈধতা দেওয়া হয়েছিল।[১০] শাস্ত্রীয় নির্দেশগুলি লক্ষ্য করলে বিধবাদের জীবনকে বৈরাগ্যমুখী করে তোলার প্রবণতা দেখা যায়, যদিও বাস্তবে এই বৈরাগ্য পুরুষের সন্ন্যাসের মতো ছিল না, পরিবর্তে এটি ছিল গৃহস্থ সমাজের ভেতরেই আরোপিত এক আমৃত্যু ব্রহ্মচর্যের ব্রত।

বিধবাদের ব্রত পালনের ক্ষেত্রে খাদ্য সংযম ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও কঠোরতম অনুশীলন। দিনে একবেলা আহার, নির্দিষ্ট তিথিতে নির্জলা উপবাস, নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ এবং লবণ, তেল, মসলা বর্জনের মতো বিধিনিষেধ বিধবাদের শরীরকে নিয়ন্ত্রণের প্রধান উপায় হয়ে উঠেছিল।[১১] খাদ্য এখানে কেবল পুষ্টির প্রশ্ন ছিলনা, এটি ছিল পবিত্রতার প্রতীক। কম আহার মানেই কম কামনা, এই ধারণা সমাজের অন্তরে গভীর ভাবে প্রথিত ছিল। এই খাদ্যবিধি বিধবাদের ক্রমাগত স্মরণ করিয়ে দিত তাদের সামাজিক অবস্থান ও সমাজ দ্বারা নির্ধারিত নৈতিক সীমানা।[১২] দৈহিক দুর্বলতা, রোগ ও অপুষ্টি ছিল এই সংযমের স্বাভাবিক পরিণতি এবং সেগুলিকে ধর্মীয় পুণ্য অর্জনের পেছনে কৃচ্ছ্রসাধন বলে ঘোষণা করা হতো। বাল্যবিধবা হিন্দুমতী দেবী তার পালনীয় ব্রত সম্পর্কে বলেছেন-

> "একাদশী, অম্বুবাচী, দশুমী, দোয়াদশী, পরাণ, বামুন খাওয়ানো- হাজার রকম উপোস তিরেস সবই থাকত ফি-মাসে। ঠাকুর মশাই ঘন্টা বাজাতে বাজাতে এসে মোক্ষদাকে হাঁক পেড়ে উপোসের কতা শুনিয়ে টাকা নিয়ে যেতেন। একাদশীর আগের দিন দশুমীতে ভাত খাওয়া চলত না, দোয়াদশীতে বামুন খাইয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে তবে চিনির পানা খাওয়া যেত।"[১৩]

ব্রত পালনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিক ভাবে যুক্ত ছিল পোশাক ও শয্যার উপর বিধিনিষেধ। সাদা অনাড়ম্বর পোশাক, অলংকার বর্জন এবং কঠিন শয্যায় শয়ন এই সকল বিধিনিষেধের মধ্যে বিধবাদের শরীরকে সামাজিক ভাবে উপস্থাপিত করা হত এক 'সংযত' ও 'নিষ্কাম' সত্তা হিসেবে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ এই যে কঠিন সংযম তা স্বেচ্ছায় গৃহীত সন্ন্যাসের মতো ছিল না, এটি ছিল সামাজিক প্রত্যাশা দ্বারা আরোপিত এক আমৃত্যু স্থায়ী ব্রহ্মচর্যের ব্রত। বিধবাদের জীবনে কিছু নির্দিষ্ট ব্রতগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, এর মধ্যে একাদশী ব্রত হল সবচেয়ে কঠিন ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বৈষ্ণব প্রভাবিত বাংলা সমাজে একাদশী ব্রত পালন ছিল বাধ্যতামূল। প্রতি বাংলা মাসের দুই একাদশী তিথিতে এই ব্রত পালন করতে হত। একাদশী ব্রতকথা অনুযায়ী এই তিথিতে নির্জলা উপবাস করলে পূর্বপুরুষের আত্মা তৃপ্ত হয় এবং ব্রতীর মোক্ষ লাভ হয়। অমৃতলাল বসু তার 'অমৃত-মদিরা' গ্রন্থে 'বালবিধবা' কবিতায় তুলে ধরেছেন তার মা ছাব্বিশ বছর বয়সে বিধবা হন এবং সেই মাসেই কিছুদিন বাদে তার কলেরা রোগ হয়, এই অবস্থায় সদ্য বিধবার জৈষ্ঠ মাসের গরমের মধ্যে নির্জলা একাদশী ব্রত পালনের বর্ণনা তিনি দিয়েছেন-

"পুরাণের কোন্ দেবী এত শক্তি ধরে।
জ্যেষ্ঠমাসে একাদশী জল বিনা করে।।
সমস্ত শরীরসুখ হেঁসে বলিদান।
লজ্জায় পালায় কাম ফেলে ফুলবান।।
.....
নগরে নিদাঘ জ্যৈষ্ঠ দিবা দ্বিপ্রহর।
বিসুচিকা-তৃষ্ণা তাতে কত ভয়ঙ্কর।।
শক্তি বুঝিবারে বুঝি সদ্যোবিধবার।
সেইদিন একাদশী পড়েছে আবার।।
মা আমার ছটপট্ করেন মাটাতে।
বাটীর সকল বুক লাগিল ফাটিত।।
.....
উড়িল ব্যবস্থাপত্র বাতাসে উঠানে।
কাকীমা জলের ফোঁটা দেন মার কানে।।
আমি কেঁদে বলি পাপ আমারে চাপাও।
মা আমার এক-ঢোঁক জল তুমি খাও।।
.....
পাথরে রাখিয়া জল উদরে বসায়।
জননী জীবন পান ঈশরকৃপায়।।
"বড়ই নৃশংস এই কসাই-আচার।
তলায় থিতোনো কাদা বর্ব্বর প্রথার"।।"[১৪]

এই কবিতার মাধ্যমে কবি একাদশী ব্রতের কঠিন নির্মমতাকে তুলে ধরেছেন। বিধবাদের অবশ্য পালনীয় এই একাদশী ব্রতকে সমালোচনা করে কবি যথার্থই একে বর্বর প্রথা বলে উল্লেখ করেছেন। একাদশী ব্রতের করুণ পরিণতির একটি ঘটনা, অধ্যাপিকা সুমিতা মিত্র তার মায়ের কাছ থেকে শুনে ছিলেন- এক চোদ্দ বছরের গর্ভবতী মেয়ে বিধবা হয়ে বাপের বাড়ি চলে আসেন। বাপের বাড়ির পুকুরে বারোমাস স্নান করলেও একাদশীর দিন তাকে কিছুতেই পুকুরে যেতে দেওয়া হতনা, বাড়িতে জল তুলে তাকে স্নান সারতে হত। বাড়ির লোকের ভয় ছিল যদি মেয়ে পুকুরে স্নান করতে গিয়ে গোপনে জল খেয়ে ব্রতভঙ্গ করে তবে তার নরকবাস হবে। মেয়ের স্নানের সময় বাড়ির ঝিকে দিয়ে নজর রাখা হত। অদৃষ্টের করুন পরিহাসে গ্রীষ্মের একাদশীর রাত্রিতেই তার প্রসববেদনা ওঠে, আর তখন সে একটু জলের জন্য ছটফট করতে থাকে। বারবার জল চাইলেও আগামী জন্মে মেয়ের বৈধব্য হবে এই আশঙ্কা করে মা জল দিতে পারেননি। দ্বাদশীর সকালে মেয়েটি একটি মৃত পুত্র-সন্তান প্রসব করে।[১৫]

এই সকল ঘটনাগুলি প্রমাণ করে এই সকল ব্রতপ্রথার ফলে বিধবাদের কি করুন পরিণতির সম্মুখীন হতে হত। নরকবাস, পরজন্মের বৈধব্যের ভয় ও মৃত স্বামীর আত্মার শান্তির জন্য কৃচ্ছসসাধন। সামাজপতিরা আশ্বাস দেয় যে তার কষ্টের মধ্যেই স্বামীর পরলৌকিক মঙ্গল নিহিত ও এই দিন অন্ন গ্রহণ করলে তা 'পাপ' ভক্ষণের সমান হবে। এই সকল ধর্মীয় ভয়ই বিধবাদের নির্জলা উপবাস করতে বাধ্য করত। এটি ছিল মূলত বিধবাদের শরীরকে শোষণ করার একটি প্রক্রিয়া।

বাঙালি হিন্দু শাক্ত ধর্মে বিশ্বাসী বিধবাদের কাছে অম্বুবাচী ব্রত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আষাঢ় মাসের সপ্তম দিনে সূর্য যখন মৈথুন রাশিতে প্রবেশ করে তখন থেকেই এই ব্রত শুরু হয় যা পরপর তিন দিন ধরে চলে। প্রত্যেক বছর আষাঢ়ের সাত তারিখ অম্বুবাচী শুরু হয় তাই প্রবাদ আছে- "সাতই আষাঢ় অম্বুবাচী, নেই কোনো তার পাঁজি পুঁথি।"[১৬] লোকের বিশ্বাস যে অম্বুবাচীর তিন দিন বসুমতি রাজস্বলা হন বলে সেই দিনগুলিতে তিনি অশুচি থাকেন। বিধবা নারীরা এই সময় উপবাস করেন, সজ্জা ছেড়ে মাটিতে পা দেন না। ব্রতীরা এই সময় তিন দিন উনুন জ্বালেন না এবং কোন রান্না করা খাবার খাননা, তারা কাঁচা খাবার অর্থাৎ আম, সাবু, কাঁচা দুধ, শুকনো ফল ইত্যাদি খান। এই তিন দিন অতিক্রান্ত হলে চতুর্থ দিনে ধরিত্রী শুদ্ধ হলে ব্রত সাঙ্গ করে স্নান সেরে স্বাভাবিক আহারে ফিরে আসা যায় এবং প্রত্যেকটি বাড়ি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করা হয়, বাড়ির সমস্ত জামা-কাপড়ও ধোয়া হয় অর্থাৎ সবকিছুকেই পুনরায় শুচি করা হয়।[১৭]

অম্বুবাচীকে পৃথিবীর ঋতুকাল হিসেবে দেখা হয়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ঋতুস্রাবকে 'অশুচি' বা 'অপবিত্র' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিধবাদের যেহেতু আমৃত্যু ব্রহ্মচর্যের ব্রত পালন করতে হয় তাই তাদের শরীরকে 'নিষ্কাম' ও 'নিষ্ক্রিয়' করে রাখতে উর্বরতার থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে এই কঠিন ব্রত পালন করতে হয়।[১৮] অম্বুবাচী উৎসবের মূল সুরটি উর্বরতা ও প্রকৃতির বন্দনা হলেও এই ব্রত পালনের পেছনে বিধবাদের ওপর কৃচ্ছসাধনের ভার চাপিয়ে দেওয়া হয়, যা আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক বিচারে স্পষ্টতই একটি লিঙ্গ বৈষম্যের উদাহরণ।

মাঘ মাসে 'মাঘ স্নান' ও মৌনী অমাবস্যার ব্রত পালন বিধবাদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই দুই ক্ষেত্রেই সংযম, উপবাস ও নীরবতা (মৌনতা পালন) গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত মৌনী অমাবস্যার দিনে গঙ্গা অথবা যেকোন পবিত্র নদীতে স্নান করে সারাদিন মৌন থাকা ও স্বল্প আহার গ্রহণ করতে হয়। শুধু মৌন নয় অন্তরের কামনা ও বাসনার শব্দকে বন্ধ করে অন্তরে বাহিরে মৌন থাকা। বিধবাদের ক্ষেত্রে এই ব্রত তাদের সামাজিক নীরবতার প্রতীক, যেখানে ধর্মীয় নীরবতা ও সামাজিক নীরবতা একে অপরের সঙ্গে মিশে যায়।

এই সকল ব্রতগুলির পাশাপাশি বিধবারা সধবাদের সঙ্গে বেশকিছু যৌথ ব্রত পালন করতেন। যেমন মঙ্গল চন্ডী, নাগ পঞ্চমী, তালনবমী, হরির চরণ, জন্মাষ্টমী, শিব চতুর্দশী, ভৈমী একাদশী, মনসা, বিপত্তারিণী প্রভৃতি।[১৯] বিধবাদের ব্রত পালন কেবল বিচ্ছিন্ন ধর্মীয় আচার নয়, এটি তারচেয়ে অনেক বৃহৎ এক সামাজিক কাঠামো। উনবিংশ শতকের ব্রাহ্মণ্য ভদ্রলোক সমাজে ব্রহ্মচর্য বা আজীবন সংযমকে বিধবার 'আদর্শ জীবন' হিসেবে চিত্রায়ীত করা হয়েছে, যেখানে ব্রত, উপবাস ও দৈহিক নিয়ন্ত্রণের আদর্শকে দৈনন্দিন জীবনে বাস্তবায়ীত করা হয়েছে।[২০]

ঔপনিবেশিক আধুনিক শিক্ষার ফলে বাংলায় সমাজ সংস্কার আন্দোলনের পরিমণ্ডল তৈরি হতে থাকে। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর মত ব্যক্তিরা এবং নব্যবঙ্গ ও ব্রহ্ম সমাজের মতো সংগঠনগুলি বিধবাদের দুরাবস্থা নিয়ে সমালোচনা শুরু করেন। তাঁরা শাস্ত্র, যুক্তি ও মানবিকতার সমন্বয়ে বিধবা বিবাহ ও সামাজিক সংস্কারের পক্ষে সওয়াল করেন, তবে বিধবাদের কঠোর ব্রত পালনের প্রশ্নটি প্রায়শই তাদের কাছে গৌণ থেকে যায়।[২১] রাজা রামমোহন রায়ের প্রয়াসে সতীদাহ প্রথা রদ হওয়ার ফলে জীবিত বিধবাদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। কৌলিন্য প্রথা, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি প্রথার ফলে সমাজে তাদের উপস্থিতি ক্রমশ দৃশ্যমান হয় এবং এই একই সঙ্গে তাদের উপর উপবাস, নিরামিষ আহার গ্রহণ, ব্রত পালন প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ মূলক আচার আরো কঠোরভাবে আরোপ করা হয় যাতে সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় থাকে। সমাজপতিদের ভয় ছিল বিধবারা যদি এই ব্রত পালন ও কঠিন ত্যাগের জীবন না গ্রহণ করেন তাহলে সম্পত্তির ওপর তাদের দাবি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই তাদের সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখতে তাদের সংসার ত্যাগী ব্রতী

হিসেবে তুলে ধরা হত।[২২] এটিও ছিল ব্রত প্রচারের পেছনে একটি প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে বিধবা বিবাহ আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে বিদ্যাসাগর বিধবাদের উপর আরোপিত কঠিন শাস্ত্রীয় কৃচ্ছসাধনের ধারণার ওপর প্রথম বড় আঘাত হানেন। বিদ্যাসাগর যুক্তি ও শাস্ত্র ব্যাখ্যার মাধ্যমে দেখিয়েছিলেন যে জোরপূর্বক সংযম আরোপ মানবিকতার পরিপন্থী। এই সময় স্ত্রী শিক্ষার বিস্তারের ফলে অন্দরমহলের ভেতরে থাকা বিধবারা ব্রতপ্রথার পৌরাণিক বয়ানের বাইরে বেরিয়ে এসে যুক্তিবাদী চিন্তা এবং আধুনিক শিক্ষার দিকে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এর ফলে কঠিন ব্রত পালনের বাধ্যবাধকতা কিছুটা প্রশ্নের মুখে পড়ে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে নারী শিক্ষার প্রসার, নগরায়, আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান ও পুষ্টিবিজ্ঞানের প্রভাবে সচেতনতা বৃদ্ধি হতে থাকে বিধবাদের একবেলা আহার নিয়মিত নির্জলা উপবাস বিভিন্ন ব্রত পালনের সময় অন্ন বর্জন প্রভৃতি বিধান দীর্ঘকাল টিকে থাকলেও ক্রমে শহুরে বিধবারা প্রচলিত কঠিন ব্রত পালনের বেড়াজালকে নিরবে অতিক্রম করতে থাকেন- মাছ খাওয়া পুনরাম্ভ, উপবাস শিথিল করা ইত্যাদির মাধ্যমে।[২৩] ক্রমে কঠিন ব্রত পালনকারীর সংখ্যা শহরাঞ্চলে ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে এবং গ্রামীণ জীবনে এটি একটি 'লোকজ সংস্কৃতি' হিসেবে টিকে রয়েছে। নাগরিক আধুনিকতার প্রসারের সাথে সাথে একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে অনু-পরিবারের প্রসার ঘটতে থাকে। যার ফলে বিধবাদের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কাঠামো ক্রমশ শিথিল হতে থাকে। পরিবার ভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ কমে যাওয়ায় ব্রত পালনের বাধ্যবাধকতা ও আংশিকভাবে কমতে থাকে।

উচ্চবর্ণের হিন্দু বিধবাদের মধ্যে এই ব্রত পালনের কঠোরতা যতটা ছিল নিম্ন বর্ণের বিধবাদের মধ্যে তা তুলনামূলক ভাবে শিথিল ছিল। উনবিংশ শতকের শেষভাগে সংস্কৃতায়নের ফলে বহু নিম্ন ও মধ্যবর্তী জাতি উচ্চবর্ণীয় বিধবাদের সংযমের আদর্শ গ্রহণ করতে শুরু করে। ফলে ব্রতপ্রথা শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণ্য আচার থেকে বিস্তার ঘটে সামাজিক নিয়মে পরিণত হয়।[২৪] অনেক ক্ষেত্রে পরিবার নিজেদের সমাজে উঁচুতে তুলতে নিজেদের বাড়ির বিধবাদের ওপর শাস্ত্রীয় কঠোরতা বৃদ্ধি করতে শুরু করে ফলে বিধবাদের কঠিন তপসামুলক জীবনধারা পরিবারের নৈতিক মানদন্ড ও সামাজিক মর্যাদাকে সমাজের প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে পরিণত হয়ে উঠেছিল।[২৫]

স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবাদের সর্বক্ষণের একাকীত্ব, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার প্রেক্ষিতে নিয়মিত ব্রত পালন, উপবাস ও পূজা-অর্চনা তাদের জীবনের নতুন অর্থ ও লক্ষ স্থির করে দেয় এবং তাদের এক আধ্যাত্মিক আশ্রয় প্রদান করে। তাই সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই ব্রতপ্রথা ও ধর্মীয় আচারগুলি পালনের মাধ্যমে নিজেকে ঈশ্বরের চরণে সোপে দিয়ে এক ধরনের মানসিক শান্তি ও সুরক্ষাবোধ লাভ করত।[২৬] এই আত্মত্যাগ ও ঈশ্বরসেবা তাদের মনের মধ্যে পবিত্রতা বোধ গড়ে তোলে, যা তাদের কাছে আত্মগৌরব ও আত্মপরিচিতির একমাত্র পথে পরিণত হয়। তার নিজের কষ্টকে ঈশ্বরের সেবা বলে মনেকরে আত্মনিপীড়নের মধ্যেই আনন্দ খোঁজার চেষ্টা করতেন। এটি পিতৃতন্ত্রের এক বিশেষ জয়, যেখানে শোষিত নিজেই শোষণের দড়িকে ধর্ম মনে করে গলায় পরে নিতেন।

বাঙালি নারী ইতিহাসের একটি দীর্ঘ যন্ত্রণাময় অধ্যায় হল এই বিধবা কেন্দ্রিক ব্রতপ্রথাগুলি। যার ছত্রে ছত্রে রয়েছে বিধবাদের জীবনানুভূতি, ধর্মীয় আচার ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের এক জটিল সাংস্কৃতিক ইতিহাস। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিধবা ব্রতগুলিকে দেখলে এক অদ্ভুত দ্বিচারিতা লক্ষ্য করা যায়, যেখানে একদিকে এটি একটি শোষণের হাতিয়ার, আবার অপরদিকে এটি বহু বিধবাদের কাছে চরম একাকীত্ব ও অনিশ্চয়তার মাঝে বেঁচে থাকার একমাত্র আধ্যাত্মিক আশ্রয় ও মানসিক নিরাপত্তা বোধের উৎস। তাই এটি পিতৃতন্ত্রের এমন এক সুক্ষ্ম জয়, যেখানে শোষিত নিজেই তার উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া শৃঙ্খলকে ধর্মের পবিত্র প্রলেপ দিয়ে সাদরে বরণ করে নিয়েছে। ব্রত কেবলমাত্র শাস্ত্রীয় বিধান নয়, এটি একটি সামাজিক

ব্যবস্থা যা সময়ের সাথে সাথে বিবর্তিত হয়ে আজও সমাজের মধ্যে পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্যের পদচিহ্ন বহন করে চলেছে। এই কারণে বিধবাদের ব্রতপ্রথার বিশ্লেষণ বাংলার সামাজিক ইতিহাস, লিঙ্গ, সমাজতত্ত্ব ও লোকসংস্কৃতির অন্তর্নিহিত গতিশীলতা বোঝার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্যসূত্র:

[১] ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। বাংলার ব্রত। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ, বিশ্বভারতী, পৃ. ৫।

[২] বসাক, শীলা। বাংলার ব্রতপার্বণ। পুস্তক বিপণি, ১৯৯৮, কলকাতা, পৃ. ২।

[৩] বিশ্বাস, শৈলেন্দ্র (সংকলক)। সংসদ বাংলা অভিধান। সাহিত্য সংসদ, ১৯৫৭, কলকাতা, পৃ. ৬৫১।

[৪] Chakrabarti, Aisika. Widowhood in Colonial Bengal 1850-1930. PhD diss., University of Calcutta, 2004, pp. 8-12.

[৫] বসাক, শীলা। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

[৬] ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫-৬।

[৭] বসাক, শীলা। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।

[৮] দত্ত, কল্যানী। পিঞ্জরে বসিয়া। স্ত্রী, ১৯৯৬, কলকাতা, পৃ. ১৩।

[৯] Sarkar, Tanika. Hindu wife, Hindu nation: community, religion, and cultural nationalism. Permanent Black, 2001, pp. 41-43.

[১০] Mani, Lata. Contentious Traditions: The Debate on Sati in Colonial India. University of California Press, 1998, pp. 51-53.

[১১] Chatterjee, Ananya. The Bengali Widow's Kitchen: Looking Back at an Obscure Legacy. New Literaria- An International Journal of Interdisciplinary Studies in Humanities, Vol. 4, No. 1, January-February 2023, pp. 32.

[১২] Banerji, Chitrita. The Hour of the Goddess: Memories of Women, Food, and Ritual in Bengal. Penguin Books, 2006, pp. 95-104.

[১৩] দত্ত, কল্যানী। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

[১৪] বসু, অমৃতলাল। অমৃত-মদিরা। বেঙ্গল মেডিক্যাল্ লাইব্রেবী, ১৩১০ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ. ১০৯-১১৭।

[১৫] দত্ত, কল্যানী। প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৩।

[১৬] চট্টোপাধ্যায়, ত্রিদিবকুমার। বাংলার প্রবাদ। পত্র ভারতী, ২০০০, কলকাতা, পৃ: ১৫৩।

[১৭] বসাক, শীলা। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯।

[১৮] Sarkar, Tanika. op. cit., pp. 52-55.

[১৯] বসাক, শীলা। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।

[২০] Chakrabarti, Aisika. op. cit., pp. 224-230.

[২১] Zafar, Manmay. Social Reform in Colonial Bengal: Revisiting Vidyasagar. Philosophy and Progress, V0l. LV-LVI, January-December, 2014, pp. 110-111.

[২২] Chakravarti, Uma. Gender, Caste and Labour: Ideological and Material Structure of Widowhood. Economic and Political Weekly, Vol. 30, no. 36, 9 September 1995, pp. 2248-2249.

[২৩] Banerji, Chitrita. op. cit., pp. 101-102.

[২৪] Chakrabarti, Aisika. op. cit., pp. 11-13

[২৫] Sarkar, Tanika. A Prehistory of Rights: The Age of Consent Debate in Colonial Bengal. Feminist Studies, Vol. 26, no. 3, 2000, pp. 617-620.

[২৬] Chakrabarti, Aisika. op. cit., pp. 224-230

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1131-1137
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.331

দেবমহিমা প্রচার নাকি নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার চিরন্তন প্রচেষ্টা: প্রসঙ্গত মঙ্গলকাব্যের পটভূমি

বিউটি রুদ্র, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 14.03.2026; Accepted: 22.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This paper explores the representation of women's self-assertion in Bengali Mangal-Kavya within a predominantly patriarchal social framework. While these medieval texts are often interpreted as narratives glorifying deities, a deeper reading reveals the persistent struggle of female characters for identity, dignity, and recognition. Through an analysis of texts such as *Manasamangal*, *Chandimangal*, *Dharmamangal*, and *Annadamangal*, the study highlights how figures like Manasa, Behula, Chandi, and others embody resistance against social, familial, and religious constraints. These women challenge established norms, assert autonomy, and negotiate power within restrictive structures. The paper situates these narratives within the socio-political context of medieval Bengal, marked by religious transitions and social stratification. It argues that beneath the veneer of divine glorification lies a discourse of gendered agency and empowerment. Thus, Mangal-Kavya becomes a significant literary site for understanding early expressions of women's selfhood and resistance in Bengali literature.

Keywords: Mangal-Kavya, Women's Agency, Patriarchy, Medieval Bengal, Self-Assertion

জন্মলগ্ন থেকেই জীবের অস্তিত্ব রক্ষার এক নিরন্তর প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। কখনো খাদ্য বস্ত্র বাসস্থানের জন্য সংগ্রাম আবার কখনোবা সমাজের বুকে নিজেকে প্রতিষ্ঠা দিতে সম্মুখীন হতে হয় এক দুর্বিষহ লড়াইয়ের। এই প্রচেষ্টা আজকের আধুনিক যুগের ফসল নয়, মধ্যযুগের কাব্যাকাশে খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে জন্ম নেওয়া মঙ্গলকাব্যগুলির আঁতের কথা। সাধারণভাবে দেখলে দেখা যায় মঙ্গলকাব্যগুলিতে ধ্বনিত হয়েছে দেবতার জয়গান। কিন্তু এই সকল কাহিনির অতলগহ্বরে ডুব দিলে দেখা যায় সেখানে রয়েছে তৎকালীন সমাজের কথা, রয়েছে চরিত্রগুলির আত্মপ্রতিষ্ঠার চিরন্তন দাবি।

বাংলা সাহিত্যের জগতে যখন আবির্ভাব ঘটে মঙ্গলকাব্যের, তৎকালীন সমাজের দিকে তাকালেই দেখা যাবে এক রাজনৈতিক উত্থান পতনের ইতিহাস। এই সময়ে ঔপনিবেশিক ইসলামিক শক্তির সাম্রাজ্য বিস্তারের অন্যতম হাতিয়ার হয়ে ওঠে ধর্মীয় আগ্রাসন। জরাসন্ধের দেহসন্ধির দুর্বল অংশে ভীমের আঘাত হানার মতো বৈষম্যদীর্ণ বাঙালি জাতির শিথিল হয়ে আসা সামাজিক ঐক্যের গ্রন্থিতে আঘাত হেনেছিল দুর্বার বৈদেশিক শক্তি। এই শৈথিল্য একদিনে আসেনি। এর পিছনে আছে বহু প্রাচীন দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপট। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান, বৈদিক আর্য ধর্মের সঙ্গে সামাজিক সংঘাতের ফলশ্রুতি। উন্নাসিক আর্য সংস্কৃতির চোখে এদেশে বসবাসকারী মানুষদের অবস্থান ছিল অশ্রদ্ধাজনক। ফলত দীনেশচন্দ্র সেন কথিত 'বৃহৎবঙ্গ'-এর সুবিশাল

ভূখণ্ডের মধ্যে আর্য ও অনার্যের মিলন সম্ভব হয়নি। দেখা যায় বর্ণ বিভাজন। এইরকম এক সামাজিক প্রেক্ষিতের হাত ধরে পাল বংশ থেকে সেন বংশের রাজত্বকালে রাজাদের নানা পালা বদল ঘটলেও সমাজে বর্ণবৈষম্য ছিল চূড়ান্ত। এইরূপ বর্ণবৈষম্যের করালগ্রাসে জর্জরিত সমাজে যখন ইখতিয়ার উদ্দিন মহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি বাংলা আক্রমণ করেন, তখন খুব সহজেই তিনি পরাজিত করেন তৎকালীন বাংলার মসনদের অধিপতি লক্ষ্মণ সেনকে। এই পরাজয়ের নেপথ্য ভূমিতে ছিল উচ্চবর্ণের সঙ্গে নিম্ন বর্ণের সংযোগহীনতা। যার ফলে এক রাজা গিয়ে অন্য রাজার আগমন ঘটলে সাধারণ মানুষের কিছু যায় আসতো না। এছাড়াও রাজা লক্ষ্মণ সেন ছিলেন আরাম প্রিয় বিলাসী মনোভাবাপন্ন। তুর্কি আক্রমণকে প্রতিহত করবার মতো পূর্ব প্রস্তুতি ছিল না তৎকালীন শাসকের। অন্যদিকে সাধারণ মানুষের হাতে ছিল না অর্থ। তুর্কি আক্রমণের প্রভাব তাই সাধারণ মানুষের থেকে বেশি পড়েছিল তখনকার ধনকুবেরদের রাজধানী তথা মন্দিরগুলিতে। এই মন্দিরের অধিপতি ব্রাহ্মণদের উপর চলতে থাকে অকথ্য অত্যাচার। একটানা এই ভাঙা ভাঙা আর ভাঙার হাত থেকে নিস্তার পেতে সাধারণ মানুষ চেয়েছিল শক্তিশালী আশ্রয়। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে পাল যুগ থেকে পূজিত হয়ে আসা শিব আর মানুষকে দিতে পারছেন না সেই নিরাপদ আশ্রয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাই লিখেছেন,

> "বস্তুত সংসারিক সুখ-দুঃখ বিপৎসম্পদের দ্বারা নিজের ইষ্ট দেবতার বিচার করিতে গেলে, সেই অনিশ্চয়তার কালে শিবের পূজা টিকিতে পারেনা।"[১]

একইভাবে আশ্রয় দিতে অক্ষম মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ। ফলত সেই ঝড়-ঝঞ্ঝাকালে বিপর্যস্ত পরিবেশে আশ্রয় দিতে আবির্ভাব ঘটেছিল শক্তির। ক্ষমতা যার কোনো সীমায় ধরা যায় না, ইচ্ছা-অনিচ্ছা যার কোনো নিয়ন্ত্রণ মানে না। যা সহজেই মানুষকে সর্বোচ্চ চূড়ায় ওঠাতে পারে আবার তেমনি সহজেই ডোবাতে পারে অন্ধকারের অতল গহবরে। এমন এক শক্তির স্বরূপ মানুষের মনে স্থান পেয়েছিল যা তাদেরকে সেই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম। আর তখনই আশ্রয়দাত্রী হয়ে ধরা দিয়েছিলেন মনসা, চণ্ডী, অন্নদা প্রমুখরা। মঙ্গলকাব্যের পটভূমিকায় নারীদের আশ্রয়দাত্রী রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এই ছবি পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বুকে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবিকেই যেন ঘোষণা করে যায়। একবিংশের পাঠক মনে প্রশ্ন জাগে মঙ্গলকাব্যগুলির কাহিনি কি শুধুই দেব মহিমা প্রচার নাকি এর অন্তরালে লুকিয়ে আছে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সেই চিরন্তন প্রচেষ্টা?

মধ্যযুগের রচিত হওয়া মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে অন্যতম হল 'মনসামঙ্গল'। এই কাব্যের নামকরণ থেকে শুরু করে কাহিনির পরতে পরতে লেখকের লেখনি এক অযোনিসম্ভূতা নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামকেই তুলে ধরেছে। সে বিপ্রদাসের লেখনী হোক বা বিজয়গুপ্ত কিংবা কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের প্রেয়সী কলমই হোক। তুর্কি আক্রমণের প্রেক্ষাপটে এক অযোনিসম্ভূতা নারীর আশ্রয়দাত্রী হয়ে ওঠার কাহিনির অন্তরালে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের নারীর দুর্বার লড়াই যেন 'মনসামঙ্গল কাব্য'-কে নব জন্ম দিয়েছে। তিনি শিবের মননজাত কন্যা। যাঁর জন্মলগ্নে হয়নি কোনো শঙ্খধ্বনি। জন্ম থেকেই পিতা শিব তাঁর কন্যাকে চেনেন না। তাই মনসা যখন মহাদেবের সামনে উপস্থিত হন তখন "দেখিয়া লোভিত হর চাহে কাম-চীতে।"[২] পিতার কাছেও সন্তানের এই নিরাপত্তাহীনতা। আত্মসম্মান রক্ষার্থে যে সন্তানকে তাঁর পিতার কাছে নিজের পরিচয় দিতে হয়, সেই সন্তান বড়ো অসহায়। এই অসহায়তা তাঁর প্রতিষ্ঠা পাওয়ার স্বপ্নকে ভেঙে দিতে পারেনি বরং নিজেকে প্রতিষ্ঠা দিতেই মনসা হয়ে উঠেছেন অপ্রতিরোধ্য। তাই পিতাকে জানিয়েছেন "তব সঙ্গে চলে যাব যথা নিজে ঘর।"[৩] তখন দেবী চণ্ডীর কোপকে স্মরণ করে শিব তাঁকে নিজের ঘরে নিয়ে যান পুষ্পের মধ্যে লুকিয়ে। এমনভাবে গৃহপ্রবেশ তাঁর অন্তর্দহনের জ্বালাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। সেখানে গিয়েও মেলেনি তাঁর আশ্রয়। বিতাড়িত হন চণ্ডীর দ্বারা। অবশেষে ঠাঁই মেলে সিজুয়া পর্বতে। এমনকি মা চণ্ডীর কোপদৃষ্টিতে স্বামী সুখ থেকেও হন তিনি বঞ্চিত। পিতৃ, মাতৃ, স্বামী পরিত্যক্তা এক নারীর লড়াই শুরু হয় এখান থেকেই। দেব সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য শিব উপাসক

চাঁদ বনিকের পুজো পেতে শুরু হয় তাঁর অক্লান্ত সংগ্রাম। তবে সেখানেও মেলেনি তাঁর যথার্থ সম্মান। চাঁদের কাছ থেকে পুজো পেতে তিনি নিরন্তর চেষ্টা করে যান। মহাজ্ঞান হরণ, গুয়াবাড়ি ধ্বংস, ধন্বন্তরি বধ, ছয় পুত্রের প্রাণ হরণ, সপ্তডিঙা ডুবি, চাঁদের শুভাকাঙ্ক্ষীদের বিনাশ, মর্ত্যে অনিরুদ্ধ, ঊষার লখিন্দর ও বেহুলা রূপে জন্মগ্রহণ সবই তাঁর প্রচেষ্টার জ্বলন্ত উদাহরণ। এতো প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনার ফল হিসাবে অবশেষে-

"অনেক প্রকারের স্তুতি করে চাঁদো রাজা
নানা বিধি প্রকারে করয়ে পদ্মা-পূজা।"[৪]

মনসা প্রতিষ্ঠা পান দেব সমাজে। এক নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই আর প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর যে আন্তরিক ইচ্ছা এবং শেষ অবদি তাঁর স্বপ্নপূরণ- এ কোনো দেবমাহাত্ম্যমূলক কাহিনি নয়, এই কাহিনি এক সাধারন নারীর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার দুর্নিবার লড়ায়ের কথাকেই তুলে ধরে, যা আজও নারীদের মধ্যে বর্তমান। আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য, নিজের অধিকারের যথাযথ মর্যাদা আদায়ের জন্য মনসার যে লড়াই তা তো বর্তমান সমাজে ঘরে বাইরে সামলানো কোনো নারীর থেকে কম নয়। শুধু মনসাই নন, চণ্ডী, নেতো, বেহুলা, সনকা সকলই আপন আপন চেষ্টায় আত্মপ্রতিষ্ঠার সোপানে নিজেদের জয়গান ঘোষনা করেছেন। চণ্ডীর তাঁর স্বামীর প্রতি সন্দেহ জাগলে সেই সন্দেহ নিরসনের জন্য যে পদক্ষেপ নিয়েছেন, তা এক আধুনিক নারীরই লক্ষণ। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে স্বামী যেখানে ইহকাল-পরকাল, সেখানে চণ্ডীর এই স্বতন্ত্র মনোভাব তাঁর আত্মমর্যাদা ও নিজ অধিকারের দাবিকেই প্রতিষ্ঠা করে। অন্যদিকে নেতো মনসারই মতো এক অযোনিসম্ভূতা নারী। শিবের চোখের জলে যাঁর জন্ম। এই নেতো শুধু বাঙালি পরিবারের অসহায় বোনের নির্ভরশীলা দিদি নন, একজন তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন নারী। যিনি নিজের বোনকে প্রতিষ্ঠা দিতে তাঁর পাশে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি ছিলেন জ্যোতিষ শাস্ত্রে পারদর্শী–

"শুনিয়া পদ্মার বাণী করে লৈল খড়িখানি
গনে নেতা এ তিন সংসার।"[৫]

মনসার প্রতিষ্ঠার জন্য নেতো তাঁকে পরামর্শ দিয়েছেন বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে। নেতো হয়ে উঠেছেন একজন যথার্থ পরামর্শদাত্রী। তাঁর প্রদর্শিত পথে চলেই মনসা পেয়েছেন প্রতিষ্ঠা। এক অযোনিসম্ভূতা নারী হয়ে নেতোর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সমাজের বুকে এই বার্তাই ঘোষণা করে যে নারী অসহায় বা অবলা নন। তিনি নারী, তাই তিনি সমগ্র বাধা অতিক্রম করে নিজেকে মেলে ধরতে পারেন। অন্যদিকে সনকা ও বেহুলা আধুনিক নারী থেকে কোনো অংশে কম নয়। সনকা শুধু চাঁদ সওদাগরের গৃহকত্রী নন, তাঁর পুত্রদের মা নন, সর্বোপরি তিনি একজন নারী। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ তখন। চাঁদ বণিক সেই সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তি। তা সত্ত্বেও চাঁদকে পুত্রহন্তা হিসাবে সনকা তাঁর দিকে নিক্ষিপ্ত করেছেন গঞ্জনার শ্লেষমালা– "সর্বনাশ হৈল রাজা তোর দম্ভদোষে।"[৬] আবার লক্ষিন্দর যখন সর্পদংশনে মারা যান, তখনও সনকা চাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান দৃঢ় কণ্ঠে–

"বিধির করম-ফলে সেই স্বামী মরে মিলে
অবুদ্ধিইয়া চাঁদো নৃপবর।"[৭]

এই সনকা মধ্যযুগের পতি স্বর্গ পতি ধর্ম বাতাবরণের বেড়াজাল ভেঙে স্বামীর কর্মের প্রতিবাদ করতে জানেন। আবার নিজের সম্মান রক্ষার্থে নিজেরই চারিদিকে রচনা করেছেন এক সুরক্ষার চক্রব্যূহ। তাঁর পাঁচ মাস গর্ভাবস্থায় চাঁদ যখন বাণিজ্যে যেতে চান, তখন সনকা বলেন–

"লোক ধর্ম্মচারে পাছে হয় অপমান
তবে পত্র দেহ রাজা সভা বিদ্যমান।"[৮]

নারীত্বের অহংকারকে কলঙ্ক মুক্ত রাখতে সনকার এই পদক্ষেপ তাঁর ব্যক্তিস্বতন্ত্রেরই পরিচয় দেয়। অন্যদিকে বেহুলা নারী স্বতন্ত্রের মূর্তিময় প্রতীক। যিনি সমাজের নিয়ম নীতিকে পিছনে ফেলে মৃত স্বামীকে নিয়ে স্বর্গযাত্রা করে তাঁর প্রাণ ফিরিয়ে আনতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ– "জীয়াইয়া প্রভুরে আসিব পুনর্বার।"[৯] যাত্রাপথে সকল বাধাকে অতিক্রম করে ফিরিয়ে আনেন স্বামীর প্রাণ। পুজো দিতে বাধ্য করেন চাঁদকে-

"বেহুলার বাক্য শুনি বলিল রাজন
পূজিব পরম ভক্তি মনসা চরণ।"[১০]

এই বেহুলা নিজের মতকে প্রতিষ্ঠা দিতে সদা প্রতিজ্ঞ। ইনি কোনো মধ্যযুগীয় নারী নন, মধ্যযুগের আবহাওয়ায় লালিত আধুনিক নারীর নব সংস্করণ। সমগ্র 'মনসামঙ্গল' কাহিনিতে ডুব দিলেই দেখা যাবে তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে রয়েছে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবি। দেব কথার মাহাত্ম্য ছেড়ে যুগ যুগ ধরে চলতে থাকা নারীর লড়াইয়ের গোপন কথার ঘনযামিনী হয়ে উঠেছে 'মনসামঙ্গল'এর কাহিনি।

'মনসামঙ্গল' কাব্যের পাশাপাশি মঙ্গলকাব্যের ধারা পথে 'চণ্ডীমঙ্গল' এক বিশেষ সময়ের সাহিত্য ফসল। এখানে দেবী চণ্ডী দেবাদিদেবের ঘরণী তবুও মর্ত্যে পুজো প্রচারের জন্য নানা সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে তাঁকে। যা বর্ণিত আছে 'আখেটিক খণ্ড' ও 'বণিক খণ্ড' নামক 'চণ্ডীমঙ্গল' এর দুই খণ্ডে। 'আখেটিক খণ্ড'-এ দেখা যায় দেবী চণ্ডী তাঁর পুজো প্রচারের জন্য যে পরিকল্পনা করেন তাতে নীলাম্বর ধর্মকেতুর পুত্র কালকেতু রূপে এবং তাঁর পত্নী ছায়া ফুল্লরা রূপে মর্ত্যে অবতীর্ণ হন। কালকেতুর হাত থেকে বন্য পশুদের রক্ষার্থে চণ্ডী সুবর্ণ গোধিকার ছদ্মবেশ নেন। ব্যাধ কালকেতু তাঁকে শিকার করে ঘরে নিয়ে গেলে সেই স্বর্ণগোধিকা ফুল্লরার সামনে অপূর্ব রমনীর রূপে উপস্থিত হন। তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে উত্তর মেলে– "আনিল তোমার স্বামী বান্ধি নিজগুনে।"[১১] জীবনে শত অভাব অনটনেও যে ফুল্লরা স্বামীর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনেননি, সতীন ঘরে এসেছে ভেবে নারীত্বের অপমানের জ্বালায় স্বামীর দিকে ছুঁড়ে দিয়েছেন গঞ্জনা বাণ–

"পিপিড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে।
কাহার সোলস্যা কন্যা আনিআছ ঘরে।।"[১২]

মধ্যযুগের বাতাবরণে ফুল্লরার এহেন প্রতিবাদ নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবিকেই তুলে ধরেছে। অপরদিকে 'বণিক খণ্ড'-এ ধনপতি বণিকের দুই স্ত্রী- লহনা ও খুল্লনা। লহনা খুল্লনার সতীন বলে তাঁর বিনাশ ঘটানোর জন্য তিনি বদ্ধ পরিকর। অপরদিকে খুল্লনার ত্যাগ, দুঃখ-দহন বাস্তব বলে মনে হয়। এই দুইজন দুই ভিন্নধর্মী নারী। এই নারীরা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বহু পত্নিক বণিক রাজার ঘরণী। নারী স্বতন্ত্রতার প্রকৃত মহিমায় তাঁদের মহিমান্বিত করা যায় কিনা এ নিয়ে পাঠক মনে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। তবুও খুল্লনার বুদ্ধিমত্তা, সন্তানকে পরামর্শ দেওয়া, দেবী চণ্ডীর কাছে বর চাওয়ার মধ্য দিয়ে মাঝে মাঝে তাঁর মধ্যে ব্যক্তিস্বতন্ত্রের প্রদীপ জ্বলে উঠলেও তিনি মনসা, বেহুলা, চণ্ডী, সনকা বা ফুল্লরার মতো আলো দান করতে পারেননি। অন্যদিকে দুর্বলা অনেক বেশি নিজের মতকে প্রতিষ্ঠা দিতে, নিজের চাওয়া-পাওয়াকে সত্য করে তুলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাই দুই সতীনের ঘরে কলহ সৃষ্টি করেন তিনি। কারণটাও স্পষ্ট–

"লহনা খুল্লনা যদি থাকে এক মেলি
পাটী করি মরিব দুজনে দিব গালি।।"[১৩]

দুর্বলা হয়ে উঠেছেন লহনার পরামর্শদাত্রী। লহনার সাধভক্ষণ, শ্রীমন্তের জন্ম, শিক্ষা আরম্ভ সবেতেই লহনার ছায়াসঙ্গী তিনি। তিনি চতুরা, পরশ্রীকাতর, আবার মমতা ও কর্মদক্ষতাও তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তৎকালীন

সমাজে ভাগ্যবিড়ম্বিত দুর্বলার অপরের বাড়িতে নিজের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাঁর যে কৌশল গ্রহণ, তা তাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবিকে অনেকখানি মহিমা দান করেছে। আপন মনের মাধুরী মিশে তিনি রচনা করেছেন আপনার জগৎ। সমগ্র 'চণ্ডীমঙ্গল'-এ দেবী চণ্ডী থেকে শুরু করে ফুল্লরা, খুল্লনা, দুর্বলা প্রতিটি নারী চরিত্রই আজীবন সংগ্রাম করেছেন নিজের কথাটাকে নিজের মতো করে বলবার জন্য। নিজের নারীত্বের সম্মান রক্ষার্থে, আত্মমর্যাদার প্রতিষ্ঠাতে, কখনো ধনাত্মক কখনোবা ঋণাত্মক পথে পাড়ি দিয়েছেন এই নারীরা। দেখতে চেয়েছেন নিজের ক্ষমতাকে পরখ করে। এই কষ্টিপাথরের যাচাই শুরু হয়েছে সেই মধ্যযুগের পটভূমিতে, যা আজও চলছে।

'মনসামঙ্গল' বা 'চণ্ডীমঙ্গল'-এর মতো 'ধর্মমঙ্গল' কোনো নারী দেবতার পুজো প্রচারের কাহিনি নয় বরং এই কাব্যটি এক পুরুষ দেবতার মর্ত্যে পুজো প্রবর্তনের অমর গাথা। এই গাথার অন্তরালে যে সকল নারী চরিত্র স্থান পেয়েছেন তাঁরা কি তাঁদের আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবিকে প্রতিষ্ঠা দিতে সক্ষম হয়েছেন নাকি মেনে নেওয়া আর মানিয়ে নেওয়ার অতল সমুদ্রের অভিযাত্রী হয়েই থেকে গেছেন? ধর্ম ঠাকুরের পুজো প্রবর্তনের জন্য দেব নর্তকী জাম্ববতীকে স্বর্গভ্রষ্ট করে মর্ত্যে পাঠানো হয়। এক পুরুষ দেবতার পুজো প্রচারের ভার পড়ে এক নারীর উপর। পিতৃতান্ত্রিক বাতাবরণে এ নারীর ক্ষমতায়নেরই জয়গান। জাম্ববতী মর্ত্যে ধারণ করেন রঞ্জাবতী নাম। তাঁর ভাই মহামদ বা মাহুদার অমতেই গৌড়েশ্বর তাঁর বিবাহ দেন ঢেকুরের অধিপতি কর্ণসেনের সাথে। মাহুদার দ্বারা তাঁর স্বামী অপমানিত হলে রঞ্জাবতীর প্রতিজ্ঞা: এমন ভাইকে আর তিনি স্থান দেবেন না মনে। স্বামীর অপমানে নারীর এ এক তীব্র প্রতিরোধ। কিন্তু রঞ্জাবতী নিঃসন্তান। সামুল্যা কথিত হরিশচন্দ্র ও মদনার কাহিনি শ্রবণ করেন তিনি। এই উপকাহিনির নায়িকা মদনাও একজন ব্যক্তিত্বময়ী নারী। যিনি তাঁর নিজের কথার মর্যাদা রাখতে বুকে পাথর চাপা দিয়ে তাঁর সাত রাজার ধন এক মানিক লুইধরকে নিজের হাতে কেটে রান্না করে নিবেদন করেন ধর্মঠাকুরকে। এই উপকাহিনি শ্রবণ করে রঞ্জাবতীর পুজো করেন ধর্মের। জন্ম নেন লাউসেন। ঘটনা এগোলে লাউসেনের সঙ্গে পরিচয় হয় কালু ডোম ও তাঁর স্ত্রী লখাই-এর। এই লখাই মাহুদ্দা ময়নাগড় আক্রমণ করলে যুদ্ধ করেন এবং বীরাঙ্গনার মতো প্রাণ ত্যাগ করেন। এক নারীর পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই পথ চলা নারীর স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠা হওয়ার দাবিকেই সিদ্ধ করে।

'ধর্মমঙ্গল' এক পুরুষ দেবতার পুজো প্রচারের কাহিনি। তাই একবিংশের একজন পাঠিকা হয়ে যখন নারীর চোখ দিয়ে 'ধর্মমঙ্গল' পাঠ করি তখন মনে হয় এটা শুধুই একটা কাহিনিকে ফিরে দেখা নয়, এই কাহিনির রি-ভিজনিজম। নারীর চোখ দিয়ে নবরূপে দেখতে চাওয়ার একটা আকাঙ্ক্ষা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ছবিটা নারীর অন্তরে যেন জন্মসূত্রেই গেঁথে যায়। তাই যখন সেই সমাজের দিকটাকে লঙ্ঘন করে নারীর দৃষ্টিতে 'ধর্মমঙ্গল'কে দেখি, তখন মনের মধ্যে সঞ্চার ঘটে নানান প্রশ্নের। ধর্মের পুজো প্রচারের জন্য যে জাম্ববতী রঞ্জাবতী হয়ে মর্ত্যে এসেছিলেন তাঁর জন্ম বর্ণনা থেকে বড়ো হয়ে ওঠা কয়েকটি চরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ কেন? কাব্যটিতে তার বর্ণনা এসেছে এভাবে –

> "রম্ভা এসে তার গর্ভে লভিল জনম।।
> দিবস গণনা ক্রমে নয় মাস গেল।
> পূর্ণ হতে দশমাস প্রসব হইল।।"[১৪]

কেন ষষ্ঠী পুজো, অন্নপ্রাশনের পর তাঁর ষোড়শী হয়ে ওঠা? কাব্যটি তা ফুটে উঠেছে এভাবে-

> "বাড়ে রঞ্জা বিগ্রহেতে বাপের সদনে।
> শুক্লপক্ষে শশধর সম দিনে দিনে।।

কায়কান্তি কমনীয় কামধনু ভুরু।
রামরম্ভা হব অতি সুগঠন উরু।।"[১৫]

যেখানে লাউসেনের জন্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা রয়েছে। তাঁর মহিমা প্রচারের জন্য 'বাঘেরজন্মপালা', 'বাঘবধপালা' দুটি স্বতন্ত্র পালার আবির্ভাব ঘটেছে, সেখানে রঞ্জাবতীর জীবন বর্ণনা কয়েকটি পঙক্তির অন্তরেই আত্মগোপন করেছে। এই সময়পর্বে অন্ত্যজ শ্রেণির মেয়েরা অনেক বেশি পরিশ্রমী ছিলেন পুরুষদের থেকে। লখাই ও কালু ডোমের কাহিনিতে নারী অনেক বেশি অগ্রবর্তী। যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল লখাই। নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার আঙ্গিক থেকে সব মিলিয়ে দেখলে 'ধর্মমঙ্গল'-এর এক নতুন পাঠ তৈরি হয়, যেখানে সমাজ ব্যবস্থার ক্রমান্বয়িক পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যবাদ আজও রয়ে গেছে।

গুরুত্বপূর্ণ মঙ্গলকাব্যের আঙিনায় ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের 'অন্নদামঙ্গল'এর আধিপত্য চোখে পড়ে। যিনি অন্ন দান করেন, তিনিই অন্নদা। সামাজিক প্রতিষ্ঠা আছে তাঁর। কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক সমাজে দেবী অন্নদার প্রতিষ্ঠার কাহিনি নয়, স্ত্রী উমার অন্নদা হয়ে ওঠার মধ্যে এক ব্যক্তিত্বময়ী নারীসত্তার প্রতিফলন 'অন্নদামঙ্গল'কে নবরূপ দান করেছে। শিব-জায়া সতী দক্ষরাজের কন্যা। পিতার অসম্মতিতে কন্যা বিবাহ বিবাহ করায় বঞ্চিত হন দক্ষযজ্ঞের নিমন্ত্রণ থেকে। তবুও পিতার গৃহে যাত্রা করলে সতীকে শুনতে হয় স্বামী নিন্দা। পতি নিন্দা সতীর আত্মমর্যাদায় আঘাত হানলে তিনি আত্মহননের সংকল্প করেন এবং পিতাকে বলেন–

"যে মুখে পামর নিন্দিলে শঙ্কর
সে মুখ হবে ছাগল।"[১৬]

দেহত্যাগ করেন সতী। জন্ম নেন গিরিরাজের ঘরে গৌরী রূপে। শিবের সাথে হয় বিবাহ। কিন্তু কামলোলুপ, অকর্মণ্য স্বামীর জন্য সংসারের চিন্তায় তাঁর দিন আর অতিবাহিত হয় না। সংসারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনি। শিব তাঁকে সংসারের দুর্দশার জন্য গঞ্জনা দিলে তা তাঁর আত্মসম্মানে আঘাত হানে। তখন স্বামীর দিকে নিক্ষেপ করেন তিক্ত কথার রংমশাল–

"অলক্ষণা সুলক্ষণা যে হই সে হই।
মোর আসিবার পূর্ব্ব কালি ধন কই।।"[১৭]

এই একই সাংসারিক চিত্রের দেখা মেলে 'শিবায়ন কাব্য'-তে। সংসার নির্বাহের ক্ষেত্রে শিবের দায়িত্বহীনতা গৌরীকে ক্রোধান্বিত করে তোলে। শুধু 'অন্নদামঙ্গল কাব্য' নয়, 'শিবায়ন কাব্য'-তেও দেখি সেই ছবি–

"শিবা বলে সেই যে সম্পদ দিয়াছিলে।
মনে কর মহাপ্রভু কতকাল খাল্যে।।
গৃহস্থের গৃহ চলে গৃহিনীর গুনে।
ফেল্যা দিয়া পুরুষ পাসরে সে কি জানে।।"[১৮]

পতি পত্নীর এই কলহ উভয় কাব্যেই বর্তমান। সংসারের দুর্দশার জন্য একদিকে যেমন স্বামীকে গঞ্জনা করেছেন তেমনি অপরদিকে আবার অন্নপূর্ণা রূপ ধারণ করে মিটিয়েছেন স্বামীর জঠোর-জ্বালা। বর্তমান সমাজ-সংসারে নারীদের এই অন্নদাত্রী রূপ বিদ্যমান। নারী-পুরুষদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন সংসারের ভার। সমান ছন্দে নির্বাহ করেছেন ঘরে-বাইরের দায়িত্ব। সীমা থেকে অসীমে ছড়িয়ে দিয়েছেন নিজের স্বপ্নকে। মধ্যযুগের কোলে জন্ম নেওয়া অন্নদা নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিকে যে পর্যায়ে উন্নীত করেছেন, উত্তরাধিকার সূত্রে আজকের আধুনিক নারীরাই তার ধারক ও বাহক।

প্রবন্ধ পরিশেষে তাই বলাই যায়, আজ আধুনিক নারীরা যে সর্বসমক্ষে নিজের মতকে প্রতিষ্ঠা দিতে প্রস্তুত, নিজের স্বপ্নের উড়ানকে অসীমের সীমাহীনতায় পৌঁছে দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ; সেই স্বপ্নের বীজ বপন হয়েছিল মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের মহাকাশে। এখানে মনসা, নেতো, সনকা, চণ্ডী, ফুল্লরা, লহনা, দুর্বলা, রঞ্জাবতী, লখাই ডোম, অন্নদা তাঁদের আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবিকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের হৃদয় বিদীর্ণ করে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন অসাধারণ মেধা শক্তি ও পরিশ্রমী মনোভাবের উপর নির্ভর করে। কিন্তু সময়টা তখন ছিল অস্থির। শাসকের পালাবদলে বাংলার সামাজিক তথা রাজনৈতিক পরিমণ্ডল বিপর্যস্ত। তাই সেই সময়ের কথাকে সরাসরি না বলে লেখকরা ব্যবহার করলেন ধর্মকে মুখোশ হিসাবে। যাকে বাহ্যিকভাবে দেখলে মনে হয় এই কাহিনিগুলি দেব মাহাত্ম্য ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু এর গভীরে প্রবেশ করলে বোঝা যাবে তৎকালীন সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে দেব মাহাত্ম্যের মোড়কে মুড়ে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার কথাকেই যেন ঘোষনা করে চলেছে উদাত্ত কণ্ঠে।

তথ্যসূত্র:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। সাহিত্য প্রবন্ধ সংকলন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। বিশ্বভারতী, পৃ. ১৫।
২. সেন, সুকুমার (সম্পা.)। বিপ্রদাসের মনসাবিজয়। এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, খণ্ডিত, পৃ. ১৫।
৩. তদেব, পৃ. ১৫।
৪. তদেব, পৃ. ২৩০।
৫. তদেব, পৃ. ৫৮।
৬. তদেব, পৃ. ১৩২।
৭. তদেব, পৃ. ২১১।
৮. তদেব, পৃ. ১৪০।
৯. তদেব, পৃ. ২০৫।
১০. তদেব, পৃ. ২২৯।
১১. সেন, সুকুমার (সম্পা.)। কবিকঙ্কন মুকুন্দ– বিরোচিত: চণ্ডীমঙ্গল। সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ১৩৬২, পৃ. ৬০।
১২. তদেব, পৃ. ৬২।
১৩. তদেব, পৃ. ১৩১।
১৪. দত্ত, বিজিত কুমার ও দত্ত, সুনন্দা (সম্পা.)। মানিকরাম গাঙ্গুলী (বিরচিত): ধর্মমঙ্গল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
কলকাতা, ১৯৬০, পৃ. ৩২।
১৫. তদেব, পৃ. ৩৩।
১৬. মজুমদার, ভবেশ। ভারতচন্দ্র ও অন্নদামঙ্গল। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১৩২।
১৭. তদেব, পৃ. ১৬৯।
১৮. মন্ডল, দয়াময় (সম্পা.)। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিব-সঙ্কীর্তন বা শিবায়ন। প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা ,২০১৭, পৃ. ১৬৭।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1138-1148
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.332

দুয়ারে সরকার কর্মসূচি এবং প্রান্তিক স্তরের কল্যাণমূলক সুশাসনের প্রাতিষ্ঠানিক রূপায়ন: পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান–১ ব্লকের একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা

সূর্য কান্ত দত্ত, *গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*
প্রসেনজিৎ রায়, *গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*
উদয় মুর্মু, *গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 14.03.2026; Accepted: 16.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Ensuring citizen-centric services and inclusive development for marginalised communities remains a major challenge in modern governance. In this context, the 'Duare Sarkar' programme of the government of West Bengal is an important administrative innovation. The main objectives of the 'Duare Sarkar' programme are to provide government services at the doorstep of the citizen and to build an institutional framework for welfare governance. The study analysed the effectiveness of the 'Duare Sarkar' programme, administrative impact and increased access to welfare services to marginalised community based on a field survey conducted in Bardhaman-I block of Purba Bardhaman district in West Bengal. The main objectives of the study are to assess the administrative structure and implementation process of the programme, to assess the change in access to social security scheme among marginalised sections, and to analyze the effectiveness of the fundamental principles of 'good governance', such as transparency, accountability and inclusive governance. The data was collected through interviews with beneficiaries, local administration officials and programme implementation stakeholders, observations and analysis of government documents. The result of the research indicates that the 'Duare Sarkar' programme has significantly accelerated the decentralisation of administrative services at the municipalities, block and gram panchayat levels and has relatively simplified the application and approval process for social security scheme. Access to government services has increased, especially among women, scheduled castes, scheduled tribes and economically weaker sections. At the same time, there are signs of reductions in travel and administrative costs, as well as greater transparency in the application process. The research indicates that the 'Duare Darkar' program holds an innovative governance model of welfare good governance at the grassroots level. And it can be considered as an effective policy example of decentralisation of administration and delivery of citizen-centric services.

Keywords: Duare Sarkar, good governance, administrative decentralization, citizen-centric administration, social security

সমসাময়িক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সুশাসন (Good Governance) ধারণাটি প্রশাসনিক দক্ষতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং নাগরিক অংশগ্রহণের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। বিশ্বব্যাংকের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, সুশাসন এমন একটি প্রশাসনিক কাঠামো, যার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদ দক্ষ ও জবাবদিহিতাপূর্ণভাবে পরিচালিত হয় এবং নাগরিকদের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হয় (World Bank, 1992, p. 1)। একইভাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP) সুশাসনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে অংশগ্রহণ, অন্তর্ভুক্তি, কার্যকারিতা এবং আইনের শাসনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে (UNDP, 1997)। তবে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে প্রশাসনিক কাঠামোর জটিলতা, তথ্যের অভাব এবং দাপ্তরিক বিলম্বের কারণে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ প্রায়ই সরকারি কল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। বিশেষত গ্রামীণ অঞ্চলে প্রশাসনিক দপ্তরের দূরত্ব, প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা এবং মধ্যস্থতাকারীর উপর নির্ভরশীলতা এই সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলে। এই প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচি চালু করে, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল নাগরিকদের দোরগোড়ায় সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া এবং সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পসমূহে আবেদন ও অনুমোদন প্রক্রিয়াকে সহজতর করা (Government of West Bengal, 2020)। ক্যাম্পভিত্তিক এই প্রশাসনিক মডেলের মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন ব্লক, গ্রাম পঞ্চায়েত এবং শহুরে ওয়ার্ড স্তরে অস্থায়ী প্রশাসনিক শিবির আয়োজন করা হয়, যেখানে নাগরিকরা একই স্থানে বিভিন্ন প্রকল্পে আবেদন করতে পারেন। এই কর্মসূচির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল **Single-Window Service Delivery System**, যার মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ, নথি যাচাই, ডিজিটাল ডেটা এন্ট্রি এবং প্রাথমিক অনুমোদন প্রক্রিয়া একই প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে সম্পন্ন করা হয় (Government of West Bengal, 2021)। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী, কন্যাশ্রী, কৃষকবন্ধু, জাতিগত শংসাপত্র এবং ঐক্যশ্রীর মতো বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প এই কর্মসূচির আওতায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

তাত্ত্বিকভাবে এই উদ্যোগটি নিউ পাবলিক ম্যানেজমেন্ট (NPM) এবং নাগরিক কেন্দ্রিক শাসন (Citizen Centric Governance) তত্ত্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। নিউ পাবলিক ম্যানেজমেন্ট তত্ত্ব প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি, ফলাফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনা এবং পরিষেবা বিকেন্দ্রীকরণের উপর গুরুত্ব প্রদান করে (Hood, 1991)। অন্যদিকে Osborne এবং Gaebler (1992) প্রশাসনকে একটি উদ্যোক্তামূলক এবং নাগরিক কেন্দ্রিক কাঠামো হিসেবে পুনর্গঠনের উপর জোর দেন, যেখানে সরকারের মূল লক্ষ্য নাগরিকের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিষেবা প্রদান করা। এই গবেষণাটি পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান–১ ব্লককে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়েছে। পূর্ব বর্ধমান প্রধানত কৃষিনির্ভর জেলা, যেখানে গ্রামীণ জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের উপর নির্ভরশীল (Government of India, 2011)। বর্ধমান–১ ব্লকে গ্রামীণ ও আধা-শহুরে জনসংখ্যার সহাবস্থান প্রশাসনিক পরিষেবা প্রাপ্তির বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণের জন্য একটি উপযোগী ক্ষেত্র তৈরি করে। এই প্রেক্ষাপটে বর্তমান গবেষণাটি বিশ্লেষণ করতে চায় যে 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচি কীভাবে প্রান্তিক স্তরে কল্যাণমূলক সুশাসনের প্রাতিষ্ঠানিক রূপায়নে অবদান রেখেছে এবং প্রশাসনিক পরিষেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় কী ধরনের কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

তাত্ত্বিক কাঠামো:

এই গবেষণার তাত্ত্বিক ভিত্তি মূলত চারটি গুরুত্বপূর্ণ শাসন তত্ত্বের উপর নির্মিত— সুশাসন (Good Governance), নিউ পাবলিক ম্যানেজমেন্ট (New Public Management), নাগরিক-কেন্দ্রিক শাসন (Citizen-Centric Governance) এবং বিকেন্দ্রীকরণ তত্ত্ব (Decentralization Theory)। এই তাত্ত্বিক কাঠামো ব্যবহার করে গবেষণাটি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'দুয়ারে সরকার'

কর্মসূচি কীভাবে প্রশাসনিক পরিষেবা প্রদান ব্যবস্থাকে প্রান্তিক স্তরে পুনর্গঠন করে কল্যাণমূলক সুশাসনের একটি কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক মডেল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সুশাসনের ধারণা আন্তর্জাতিক উন্নয়ন আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে ১৯৯০-এর দশকে। বিশ্বব্যাংকের বিশ্লেষণে সুশাসনকে এমন একটি প্রশাসনিক কাঠামো হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যেখানে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন এবং কার্যকর প্রশাসনিক সক্ষমতা নিশ্চিত করা হয় (World Bank, 1992, p. 1)। পরবর্তীকালে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP) সুশাসনের ধারণাকে আরও বিস্তৃত করে নাগরিক অংশগ্রহণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি এবং দক্ষ সেবা প্রদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করে (UNDP, 1997, p. 3)। এই তাত্ত্বিক কাঠামো অনুসারে প্রশাসনের মূল উদ্দেশ্য কেবল নীতি বাস্তবায়ন নয়; বরং নাগরিকদের বাস্তব চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সেবা প্রদান নিশ্চিত করা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচি নাগরিকদের দোরগোড়ায় প্রশাসনিক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে এই সুশাসনের নীতিগুলিকে বাস্তব রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছে। বিশেষ করে গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য এই কর্মসূচি প্রশাসনিক সেবার প্রাপ্তিকে আরও সহজলভ্য করেছে। এছাড়া নিউ পাবলিক ম্যানেজমেন্ট (NPM) তত্ত্ব আধুনিক প্রশাসনিক সংস্কারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী সরকারি প্রশাসনকে আরও দক্ষ, ফলাফলমুখী এবং নাগরিকবান্ধব করতে বেসরকারি ব্যবস্থাপনার নীতিগুলির কিছু উপাদান গ্রহণ করা প্রয়োজন (Hood, 1991)। NPM প্রশাসনিক প্রক্রিয়াকে সরলীকরণ, সেবা প্রদানের গতি বৃদ্ধি এবং নীতির বাস্তব ফলাফল মূল্যায়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়। 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচি এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কারণ এটি প্রশাসনিক সেবাকে কেন্দ্রীয় অফিস নির্ভরতা থেকে বের করে সরাসরি স্থানীয় স্তরে পৌঁছে দিয়েছে। ব্লক ও গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যায়ে ক্যাম্প আয়োজনের মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে আবেদন গ্রহণ এবং পরিষেবা বিতরণের প্রক্রিয়া সহজতর করা হয়েছে, যা প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ (Government of West Bengal, 2021). নাগরিক-কেন্দ্রিক শাসনের ধারণা আধুনিক প্রশাসনিক তত্ত্বে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা যোগ করে। Osborne এবং Gaebler (1992) তাদের বিশ্লেষণে যুক্তি দিয়েছেন যে আধুনিক রাষ্ট্রকে কেবল নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নয়, বরং একটি উদ্যোক্তামূলক ও সেবামুখী সংগঠন হিসেবে কাজ করতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে নাগরিকদেরকে প্রশাসনিক ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং সেবাগুলিকে তাদের প্রয়োজন ও প্রত্যাশার ভিত্তিতে পুনর্গঠন করা হয়। 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচি এই নাগরিক-কেন্দ্রিক প্রশাসনিক ধারণার একটি বাস্তব উদাহরণ হিসেবে দেখা যায়, কারণ এটি প্রশাসনিক পরিষেবাকে নাগরিকদের কাছে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে সেবা প্রদানের কাঠামোকে পুনর্বিন্যাস করেছে। এর ফলে বিশেষত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী— যাদের প্রশাসনিক দপ্তরে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে আর্থিক ও সামাজিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে— তাদের জন্য সরকারি পরিষেবা গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে বিকেন্দ্রীকরণ তত্ত্ব স্থানীয় শাসনের কার্যকারিতা এবং জনগণের অংশগ্রহণকে গুরুত্ব দেয়। Ostrom (1990) তার প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন যে স্থানীয় স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি পেলে প্রশাসনিক কার্যকারিতা এবং নীতি বাস্তবায়নের সফলতা বাড়ে। Pierre এবং Peters (2000)-এর মতে, বিকেন্দ্রীকরণ প্রশাসনিক ক্ষমতাকে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের কাছে হস্তান্তরের মাধ্যমে নাগরিকদের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ককে আরও ঘনিষ্ঠ করে তোলে। এই তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচিকে একটি বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসনিক উদ্যোগ হিসেবে দেখা যায়, যেখানে ব্লক প্রশাসন, গ্রাম পঞ্চায়েত এবং স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিষেবা প্রদান করা হয়।

পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান-১ ব্লকে পরিচালিত ক্ষেত্র সমীক্ষা এই গবেষণার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেছে যে 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে প্রশাসনিক আচরণ, সেবা প্রদানের প্রক্রিয়া এবং নাগরিক-প্রশাসন সম্পর্কের ক্ষেত্রে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে। বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলিতে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির মাধ্যমে এই কর্মসূচি কল্যাণমূলক সুশাসনের একটি কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠনে কতটা ভূমিকা পালন করেছে তা এই গবেষণার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়।

সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review):

সুশাসন ধারণাটি আধুনিক প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক গবেষণায় একটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক কাঠামো হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বব্যাংকের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, সুশাসন মূলত সেই প্রশাসনিক প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে যার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদ দক্ষ, স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিতাপূর্ণভাবে পরিচালিত হয় (World Bank, 1992)। UNDP-এর মতে সুশাসনের মূল উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে অংশগ্রহণমূলক প্রশাসন, আইনের শাসন, কার্যকারিতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন (UNDP, 1997)।

তবে উন্নয়নশীল সমাজে প্রশাসনিক কাঠামোর জটিলতা এবং তথ্যের ঘাটতি প্রায়ই নাগরিকদের সরকারি পরিষেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। Pierre এবং Peters (2000) দেখিয়েছেন যে প্রান্তিক স্তরের প্রশাসনে স্বচ্ছ তথ্যপ্রবাহ, স্থানীয় অংশগ্রহণ এবং বিকেন্দ্রীকৃত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সুশাসনের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

নিউ পাবলিক ম্যানেজমেন্ট তত্ত্ব প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সেবার বিকেন্দ্রীকরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। Hood (1991) উল্লেখ করেন যে আধুনিক প্রশাসনে ফলাফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনা, পরিষেবা সরলীকরণ এবং নাগরিক-কেন্দ্রিকতা প্রশাসনিক সংস্কারের মূল উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। Osborne এবং Gaebler (1992) তাদের বিখ্যাত গ্রন্থ *Reinventing Government*-এ দেখিয়েছেন যে সরকারকে একটি উদ্যোক্তামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করতে হবে, যেখানে নাগরিকের প্রয়োজন ও প্রত্যাশাকে প্রশাসনিক নীতি নির্ধারণের কেন্দ্রে রাখা হয়।

এই তাত্ত্বিক কাঠামোর আলোকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচিকে একটি আউটরিচ-ভিত্তিক প্রশাসনিক উদ্যোগ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। ক্যাম্পভিত্তিক পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে এটি প্রশাসনিক দূরত্ব কমিয়ে নাগরিকদের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার একটি বিকল্প মডেল তৈরি করেছে। সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী এই কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় ২৭টি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল (Government of West Bengal, 2021)। বিভিন্ন গবেষণা প্রবন্ধে এই কর্মসূচিকে প্রশাসনিক উদ্ভাবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। Chakrabarti (2022) তার বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন যে ক্যাম্পভিত্তিক পরিষেবা প্রদান গ্রামীণ অঞ্চলে প্রশাসনিক পরিষেবা গ্রহণের সময় ও ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়েছে। তবে তিনি প্রযুক্তিগত অবকাঠামোর সীমাবদ্ধতা, ইন্টারনেট সংযোগের সমস্যা এবং মানবসম্পদের ঘাটতির মতো চ্যালেঞ্জের কথাও উল্লেখ করেছেন।

পূর্ব বর্ধমান জেলার প্রেক্ষাপটে এই কর্মসূচির প্রভাব বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ জেলার একটি বড় অংশের জনসংখ্যা বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের উপর নির্ভরশীল (Government of India, 2011)। স্থানীয় প্রশাসনিক কাঠামোর সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ক্ষেত্রসমীক্ষা-ভিত্তিক বিশ্লেষণ নির্দেশ করে যে 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে সরকারি পরিষেবার প্রবেশাধিকার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives of the Study):

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ হলো—

১. 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচির প্রশাসনিক কাঠামো ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করা।
২. প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে সরকারি কল্যাণমূলক পরিষেবার প্রবেশাধিকারের পরিবর্তন মূল্যায়ন করা।
৩. স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং অন্তর্ভুক্তিকরণের মতো সুশাসনের উপাদানসমূহ কতটা কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে তা নির্ণয় করা।
৪. কর্মসূচির বাস্তবায়নে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতাগুলি চিহ্নিত করা।

গবেষণা প্রশ্ন (Research Questions):

১. দুয়ারে সরকার কর্মসূচি কীভাবে প্রশাসনিক পরিষেবা প্রদানের বিকেন্দ্রীকরণকে প্রভাবিত করেছে?
২. এই কর্মসূচি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের প্রবেশাধিকার কতটা বৃদ্ধি করেছে?
৩. সুশাসনের নীতিগত উপাদানসমূহ— যেমন স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং অন্তর্ভুক্তি— কর্মসূচির মাধ্যমে কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে?

গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology):

এই গবেষণাটি মূলত একটি ক্ষেত্রসমীক্ষাভিত্তিক (field-based) বিশ্লেষণ, যার উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচির মাধ্যমে প্রান্তিক স্তরে কল্যাণমূলক সুশাসনের প্রাতিষ্ঠানিক রূপায়ন কতটা কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে তা অনুধাবন করা। গবেষণাটি পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান–১ ব্লককে গবেষণা ক্ষেত্র হিসেবে নির্বাচন করে পরিচালিত হয়েছে, যেখানে গ্রামীণ ও আধা-শহুরে সামাজিক কাঠামোর উপস্থিতি প্রশাসনিক পরিষেবা প্রাপ্তির বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণের একটি উপযোগী ক্ষেত্র তৈরি করে। গবেষণায় প্রধানত মিশ্র পদ্ধতি (mixed-method approach) অনুসরণ করা হয়েছে, যেখানে গুণগত (qualitative) বিশ্লেষণকে প্রধান ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হলেও প্রাথমিক তথ্যের পরিসংখ্যানগত ব্যাখ্যার জন্য বর্ণনামূলক পরিসংখ্যান (descriptive statistics) ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রাথমিক (primary) এবং গৌণ (secondary) উভয় ধরনের উৎস ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে দুয়ারে সরকার ক্যাম্পের উপভোক্তা, স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের সঙ্গে আধা-গঠিত সাক্ষাৎকার (semi-structured interviews), পর্যবেক্ষণ (participant observation) এবং নির্বাচিত উপকারভোগীদের প্রশ্নমালাভিত্তিক সমীক্ষার মাধ্যমে। নমুনা নির্বাচন পদ্ধতিতে উদ্দেশ্যমূলক নমুনা (purposive sampling) অনুসরণ করা হয়েছে, যাতে নারী, তফসিলি জাতি (SC), তফসিলি জনজাতি (ST) এবং অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা যায়। অন্যদিকে গৌণ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে সরকারি প্রতিবেদন, নীতিগত নথি, জেলা প্রশাসনের প্রকাশিত তথ্য, এবং প্রাসঙ্গিক একাডেমিক গবেষণা নিবন্ধের বিশ্লেষণের মাধ্যমে। সংগৃহীত তথ্যসমূহকে থিম্যাটিক অ্যানালাইসিস (thematic analysis) পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যাতে প্রশাসনিক কাঠামো, পরিষেবা প্রাপ্তির প্রবেশাধিকার, এবং সুশাসনের উপাদান— যেমন স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রশাসন— এর বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে একটি সমন্বিত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা সম্ভব হয়। এই পদ্ধতিগত কাঠামো গবেষণাটিকে প্রান্তিক স্তরের প্রশাসনিক বাস্তবতা এবং নাগরিক অভিজ্ঞতার মধ্যে একটি প্রমাণভিত্তিক (evidence-based) সংযোগ স্থাপন করতে সহায়তা করেছে, যা 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচির প্রশাসনিক প্রভাব মূল্যায়নে একটি নির্ভরযোগ্য বিশ্লেষণাত্মক ভিত্তি প্রদান করে।

ক্ষেত্রসমীক্ষার ফলাফল ও উপাত্ত বিশ্লেষণ (Field Findings and Data Analysis):

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচি মূলত নাগরিকদের দোরগোড়ায় প্রশাসনিক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার একটি উদ্ভাবনী প্রশাসনিক উদ্যোগ। এই কর্মসূচির বাস্তব প্রভাব মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান ১ -এ পরিচালিত ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে সংগৃহীত উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মোট ১২০ জন উত্তরদাতার উপর ভিত্তি করে সংগৃহীত তথ্য থেকে প্রশাসনিক পরিষেবা প্রাপ্তি, সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের প্রবেশাধিকার এবং নাগরিকদের অভিজ্ঞতার বিভিন্ন মাত্রা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

দুয়ারে সরকার কর্মসূচি সম্পর্কে সচেতনতার মাত্রা:

ক্ষেত্রসমীক্ষার ফলাফল থেকে দেখা যায় যে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ উত্তরদাতা দুয়ারে সরকার কর্মসূচি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। সচেতনতার প্রধান উৎস ছিল গ্রাম পঞ্চায়েত, স্থানীয় প্রশাসন, প্রচার কার্যক্রম এবং সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে তথ্যপ্রবাহ।

কর্মসূচি সম্পর্কে সচেতনতা:

সচেতনতার অবস্থা	উত্তরদাতা	শতাংশ
সচেতন	১০২	৮৫%
আংশিক সচেতন	১২	১০%
সচেতন নন	৬	৫%
মোট	১২০	**১০০%**

এই তথ্য নির্দেশ করে যে দুয়ারে সরকার কর্মসূচির প্রচার এবং প্রশাসনিক আউটরিচ কার্যক্রম স্থানীয় স্তরে যথেষ্ট কার্যকর হয়েছে। বিশেষত গ্রামীণ অঞ্চলে ক্যাম্পভিত্তিক প্রচারণা এবং স্থানীয় প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকা নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে অংশগ্রহণ:

ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে জানা যায় যে উত্তরদাতাদের একটি বড় অংশ দুয়ারে সরকার ক্যাম্পের মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে আবেদন করেছেন। এর মধ্যে নারীদের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হলো লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্প।

দুয়ারে সরকার ক্যাম্পের মাধ্যমে আবেদনকৃত প্রকল্প:

প্রকল্পের নাম	উত্তরদাতা	শতাংশ
লক্ষ্মীর ভাণ্ডার	৪০	৩৩.৩%
স্বাস্থ্যসাথী	২৬	২১.৭%
কৃষকবন্ধু	১৮	১৫%
জাতিগত শংসাপত্র	১৬	১৩.৩%
অন্যান্য	২০	১৬.৭%
মোট	**১২০**	**১০০%**

এই তথ্য থেকে স্পষ্ট হয় যে নারীকেন্দ্রিক এবং সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলির প্রতি মানুষের আগ্রহ তুলনামূলকভাবে বেশি। বিশেষ করে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প গ্রামীণ পরিবারের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রশাসনিক পরিষেবা প্রাপ্তির অভিজ্ঞতা:

ক্ষেত্রসমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের কাছে দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে পরিষেবা গ্রহণের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। অধিকাংশ উত্তরদাতা প্রশাসনিক পরিষেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ইতিবাচক অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন।

পরিষেবা প্রাপ্তির অভিজ্ঞতা:

অভিজ্ঞতার ধরন	উত্তরদাতা	শতাংশ
অত্যন্ত সন্তোষজনক	৪৮	৪০%
সন্তোষজনক	৪৬	৩৮.৩%
মাঝারি	১৮	১৫%
অসন্তোষজনক	৮	৬.৭%
মোট	**১২০**	**১০০%**

এই ফলাফল নির্দেশ করে যে ক্যাম্পভিত্তিক প্রশাসনিক পরিষেবা নাগরিকদের জন্য তুলনামূলকভাবে সহজ এবং গ্রহণযোগ্য হয়েছে। অনেক উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন যে প্রশাসনিক দপ্তরে বারবার যাতায়াতের প্রয়োজন না হওয়ায় সময় ও অর্থ উভয়ই সাশ্রয় হয়েছে।

প্রশাসনিক প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির প্রভাব:

ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে দুয়ারে সরকার কর্মসূচি প্রশাসনিক পরিষেবার প্রবেশাধিকার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে। বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে সরকারি প্রকল্পে অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রশাসনিক পরিষেবার প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি

মতামত	উত্তরদাতা	শতাংশ
উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে	৭২	৬০%
কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে	৩২	২৬.৭%
উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি	১২	১০%
মতামত নেই	৪	৩.৩%
মোট	**১২০**	**১০০%**

এই তথ্য থেকে বোঝা যায় যে দুয়ারে সরকার কর্মসূচি প্রশাসনিক পরিষেবা বিকেন্দ্রীকরণে একটি কার্যকর উদ্যোগ হিসেবে কাজ করছে। ব্লক ও গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে ক্যাম্প আয়োজনের ফলে নাগরিকদের জন্য প্রশাসনিক পরিষেবা গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

কর্মসূচির সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ:

যদিও অধিকাংশ উত্তরদাতা কর্মসূচির ইতিবাচক প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন, তবুও ক্ষেত্রসমীক্ষায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতার বিষয়ও উঠে এসেছে।

প্রধান চ্যালেঞ্জ:

সমস্যা	উত্তরদাতা	শতাংশ
প্রযুক্তিগত সমস্যা	৩৪	২৮.৩%
দীর্ঘ অপেক্ষার সময়	২৬	২১.৭%
তথ্যের ঘাটতি	২২	১৮%
নথিপত্র সংক্রান্ত জটিলতা	২০	১৬.৭%
অন্যান্য	১৮	১৫%
মোট	১২০	**১০০%**

প্রযুক্তিগত অবকাঠামোর সীমাবদ্ধতা এবং ইন্টারনেট সংযোগের সমস্যা ক্যাম্প পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এছাড়া কিছু ক্ষেত্রে আবেদন প্রক্রিয়ায় নথিপত্র যাচাইয়ের বিলম্বও লক্ষ্য করা গেছে।

বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা:

ক্ষেত্রসমীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে দুয়ারে সরকার কর্মসূচি প্রশাসনিক পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটিয়েছে। প্রশাসনিক দপ্তর-কেন্দ্রিক পরিষেবা ব্যবস্থাকে নাগরিকদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার ফলে প্রশাসনিক দূরত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। বিশেষ করে নারী, তফসিলি জাতি এবং নিম্ন-আয়ের পেশাজীবীদের মধ্যে সরকারি কল্যাণমূলক প্রকল্পের প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্তিমূলক চরিত্র আরও শক্তিশালী হয়েছে। তবে প্রযুক্তিগত অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রশাসনিক সমন্বয় বৃদ্ধি এবং তথ্যপ্রবাহ আরও কার্যকর করার মাধ্যমে কর্মসূচির কার্যকারিতা ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি করা সম্ভব।

বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা (Analytical Discussion):

পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান–১ ব্লকে পরিচালিত ক্ষেত্রসমীক্ষার উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচি প্রান্তিক স্তরে প্রশাসনিক পরিষেবা প্রদানের কাঠামোয় একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর ঘটিয়েছে। ঐতিহ্যগতভাবে ভারতে সরকারি কল্যাণমূলক পরিষেবাগুলি দীর্ঘদিন ধরে দপ্তর-কেন্দ্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে এসেছে, যার ফলে গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে বাস্তবিক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছে। প্রশাসনিক দপ্তরের ভৌগোলিক দূরত্ব, তথ্যের সীমাবদ্ধতা, দাপ্তরিক জটিলতা এবং মধ্যস্থতাকারীর উপর নির্ভরশীলতা প্রায়ই নাগরিকদের জন্য কল্যাণমূলক পরিষেবা গ্রহণকে কঠিন করে তোলে। এই প্রেক্ষাপটে 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচি প্রশাসনিক পরিষেবা প্রদানের একটি বিকল্প কাঠামো তৈরি করেছে, যা নাগরিক-কেন্দ্রিক প্রশাসনিক সংস্কারের একটি বাস্তব উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ক্ষেত্রসমীক্ষার তথ্য থেকে দেখা যায় যে উত্তরদাতাদের প্রায় ৮৫ শতাংশ এই কর্মসূচি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। এটি নির্দেশ করে যে কর্মসূচিটির প্রচার ও প্রশাসনিক আউটরিচ কার্যক্রম স্থানীয় স্তরে যথেষ্ট কার্যকর হয়েছে। বিশেষত গ্রাম পঞ্চায়েত, স্থানীয় প্রশাসন এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক যোগাযোগের মাধ্যমে তথ্যপ্রবাহ নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রশাসনিক গবেষণায় দেখা যায় যে তথ্যপ্রবাহের কার্যকারিতা সুশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত, কারণ নাগরিকরা যখন সরকারি পরিষেবা সম্পর্কে অবগত হন, তখন তারা প্রশাসনিক কাঠামোর সঙ্গে আরও

সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হতে পারেন। গবেষণার ফলাফল আরও নির্দেশ করে যে 'দুয়ারে সরকার' ক্যাম্পের মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে নাগরিকদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষত লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী এবং কৃষকবন্ধু প্রকল্পে আবেদনকারীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। এই প্রবণতা নির্দেশ করে যে কর্মসূচিটি গ্রামীণ পরিবারগুলির সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা জোরদার করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। নারী-কেন্দ্রিক প্রকল্পগুলির প্রতি অধিক আগ্রহ গ্রামীণ অর্থনীতিতে নারীর ভূমিকা এবং সামাজিক সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরে। উন্নয়নমূলক প্রশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল, কারণ অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রশাসনিক পরিষেবা প্রাপ্তির অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেও অধিকাংশ উত্তরদাতা ইতিবাচক মতামত প্রকাশ করেছেন। প্রায় ৭৮ শতাংশ উত্তরদাতা পরিষেবা গ্রহণের অভিজ্ঞতাকে 'অত্যন্ত সন্তোষজনক' বা 'সন্তোষজনক' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এই ফলাফল নির্দেশ করে যে ক্যাম্পভিত্তিক প্রশাসনিক পরিষেবা নাগরিকদের জন্য তুলনামূলকভাবে সহজ এবং গ্রহণযোগ্য হয়েছে। প্রশাসনিক দপ্তরে বারবার যাতায়াতের প্রয়োজন না হওয়ায় সময় ও অর্থ উভয়ই সাশ্রয় হয়েছে, যা বিশেষত নিম্ন আয়ের গ্রামীণ পরিবারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা। নিউ পাবলিক ম্যানেজমেন্ট তত্ত্ব অনুযায়ী প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পরিষেবা প্রদানের গতি উন্নয়ন আধুনিক প্রশাসনিক সংস্কারের অন্যতম লক্ষ্য। এই দৃষ্টিকোণ থেকে 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচি প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির একটি বাস্তব উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ক্ষেত্রসমীক্ষার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল হলো প্রশাসনিক পরিষেবার প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির বিষয়টি। প্রায় ৬০ শতাংশ উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন যে এই কর্মসূচির ফলে প্রশাসনিক পরিষেবার প্রবেশাধিকার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্লক ও গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে ক্যাম্প আয়োজনের মাধ্যমে প্রশাসনিক পরিষেবা স্থানীয় স্তরে পৌঁছে দেওয়ার ফলে নাগরিকদের জন্য সরকারি প্রকল্পে অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিকেন্দ্রীকরণ তত্ত্ব অনুযায়ী প্রশাসনিক ক্ষমতা যখন স্থানীয় স্তরে বিকেন্দ্রীকৃত হয়, তখন নীতি বাস্তবায়নের কার্যকারিতা এবং নাগরিক অংশগ্রহণ উভয়ই বৃদ্ধি পায়। এই তাত্ত্বিক কাঠামোর আলোকে 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচিকে একটি কার্যকর বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসনিক উদ্যোগ হিসেবে দেখা যায়।

উপসংহার (Conclusion):

এই গবেষণার বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচি প্রান্তিক স্তরে কল্যাণমূলক প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবনী মডেল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান–১ ব্লকে পরিচালিত ক্ষেত্রসমীক্ষা নির্দেশ করে যে এই কর্মসূচি প্রশাসনিক পরিষেবা প্রদান ব্যবস্থাকে নাগরিক-কেন্দ্রিক কাঠামোর দিকে পুনর্গঠন করতে সক্ষম হয়েছে। গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা যায় যে কর্মসূচিটি প্রশাসনিক পরিষেবার বিকেন্দ্রীকরণকে ত্বরান্বিত করেছে এবং গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি করেছে। বিশেষত নারী, তফসিলি জাতি এবং অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল জনগোষ্ঠীর জন্য এই উদ্যোগ প্রশাসনিক পরিষেবা গ্রহণকে তুলনামূলকভাবে সহজ ও দ্রুততর করেছে। ক্যাম্পভিত্তিক প্রশাসনিক মডেল নাগরিকদের প্রশাসনিক দপ্তরে বারবার যাতায়াতের প্রয়োজন কমিয়ে সময় ও অর্থ সাশ্রয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তবে প্রযুক্তিগত অবকাঠামোর সীমাবদ্ধতা, ডিজিটাল বিভাজন এবং প্রশাসনিক সমন্বয়ের ঘাটতির মতো কিছু চ্যালেঞ্জ এখনও কর্মসূচির কার্যকারিতাকে আংশিকভাবে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। এই সীমাবদ্ধতাগুলি দূর করা গেলে 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচি ভবিষ্যতে আরও কার্যকর প্রশাসনিক মডেল হিসেবে বিকশিত হতে পারে।

তবে গবেষণায় 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচির কিছু সীমাবদ্ধতাও চিহ্নিত হয়েছে। প্রযুক্তিগত অবকাঠামোর সীমাবদ্ধতা, ইন্টারনেট সংযোগের সমস্যা এবং দীর্ঘ অপেক্ষার সময় ক্যাম্প পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হিসেবে উঠে এসেছে। বিশেষত গ্রামীণ অঞ্চলে ডিজিটাল অবকাঠামোর ঘাটতি অনেক সময় আবেদন প্রক্রিয়ার গতি কমিয়ে দেয়। এছাড়া কিছু ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংগ্রহ করতে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করতে হয়েছে। এই সীমাবদ্ধতাগুলি নির্দেশ করে যে প্রশাসনিক উদ্ভাবনের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রযুক্তিগত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বিভাগীয় সমন্বয় বৃদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচি প্রান্তিক স্তরে প্রশাসনিক পরিষেবা প্রদান ব্যবস্থাকে নাগরিক-কেন্দ্রিক কাঠামোর দিকে রূপান্তরিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রশাসনিক পরিষেবাকে নাগরিকদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে এটি প্রশাসনিক দূরত্ব কমিয়েছে এবং সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলির প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি করেছে। এই কর্মসূচি সুশাসনের মৌলিক নীতি যেমন- স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রশাসন বাস্তবায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

সুতরাং সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচি কেবল একটি কল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন উদ্যোগ নয়; বরং এটি প্রান্তিক স্তরে নাগরিক-কেন্দ্রিক প্রশাসনিক সংস্কারের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ, যা সুশাসনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করতে সহায়ক হতে পারে।

নীতিগত সুপারিশ (Policy Recommendations): গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সুপারিশ উপস্থাপন করা যেতে পারে—

- **ডিজিটাল অবকাঠামো উন্নয়ন:** গ্রামীণ অঞ্চলে ইন্টারনেট সংযোগ ও প্রযুক্তিগত অবকাঠামো উন্নয়ন করা প্রয়োজন, যাতে ক্যাম্প পরিচালনার সময় তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত সমস্যা কমে।
- **প্রশাসনিক সমন্বয় বৃদ্ধি:** বিভিন্ন সরকারি বিভাগের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করলে পরিষেবা প্রদানের গতি আরও উন্নত করা সম্ভব হবে।
- **তথ্যপ্রবাহ ও সচেতনতা বৃদ্ধি:** গ্রাম পঞ্চায়েত ও স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে সচেতনতা কর্মসূচি আরও জোরদার করা প্রয়োজন, যাতে নাগরিকরা বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প সম্পর্কে অবগত হতে পারেন।
- **ক্যাম্প ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি:** দীর্ঘ অপেক্ষার সময় কমানোর জন্য ক্যাম্প ব্যবস্থাপনায় অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগ এবং ডিজিটাল টোকেন ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে।
- **প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ সহায়তা:** তফসিলি জাতি, জনজাতি এবং প্রবীণ নাগরিকদের জন্য ক্যাম্পে বিশেষ সহায়ক ডেস্ক চালু করা হলে পরিষেবা গ্রহণ আরও সহজ হবে।

তথ্যসূত্র:

1. Chakrabarti, A. (2022). Administrative outreach and welfare delivery: Assessing the impact of the Duare Sarkar programme in West Bengal. *Indian Journal of Public Administration, 68*(4), 645–662. https://doi.org/10.1177/00195561221112345
2. Government of India. (2011). *Census of India 2011: District census handbook – Bardhaman*. Office of the Registrar General & Census Commissioner.
3. Government of West Bengal. (2020). *Duare Sarkar: Government outreach programme guidelines*. Department of Personnel and Administrative Reforms. Government of West Bengal.
4. Government of West Bengal. (2021). *Duare Sarkar scheme implementation report 2021*. Department of Planning and Statistics, Government of West Bengal.

5. Hood, C. (1991). A public management for all seasons? *Public Administration, 69*(1), 3–19. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x
6. Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. Addison-Wesley. pp. 19, 45, 167.
7. Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press. pp. 171-185.
8. Pierre, J., & Peters, B. G. (2000). *Governance, politics and the state*. Macmillan Press. pp. 43-44.
9. Sen, A., & Dreze, J. (2013). *An uncertain glory: India and its contradictions*. Princeton University Press. pp. 45–46
10. United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance for sustainable human development*. UNDP Policy Document.
11. World Bank. (1992). *Governance and development*. World Bank Publications.
12. World Bank. (2017). *World development report 2017: Governance and the law*. World Bank.
13. Bardhan, P. (2002). Decentralization of governance and development. *Journal of Economic Perspectives, 16*(4), 185–205. https://doi.org/10.1257/089533002320951037
14. Grindle, M. S. (2004). Good enough governance: Poverty reduction and reform in developing countries. *Governance, 17*(4), 525–548. https://doi.org/10.1111/j.0952-1895.2004.00256.x
15. Leftwich, A. (1993). Governance, democracy and development in the Third World. *Third World Quarterly, 14*(3), 605–624. https://doi.org/10.1080/01436599308420345

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1149-1157
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.333

ভাষা আন্দোলনের রক্তস্মৃতি থেকে বিশ্বায়নের যুগ

নিলুফা ইয়াসমিন, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 22.03.2026; Accepted: 28.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This paper analyzes language as the fundamental basis of human identity and national consciousness. The Language Movement of 1952 demonstrates that the right to language is both a political and a human rights issue, which later laid the foundation for the spirit of the Liberation War. In the era of the global village or globalization, the dominance of English and the influence of technology are creating challenges for mother tongues, leading to the erosion of linguistic diversity and cultural memory. However, language preservation is possible through mother tongue–based education, development of digital content, and social awareness. Protecting the mother tongue means safeguarding identity and cultural plurality.

Keywords: Language, Mother Tongue, Identity, Protest, Globalization, Technology

কিছুদিন আগেই আমরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করেছি। ফেব্রুয়ারির সেই স্মৃতিময় দিনটি অতিক্রম করে এখন মার্চের অন্তরায় দাঁড়িয়েও ভাষা সম্পর্কে নতুন করে ভাবনার প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই দিনটি কেবল একটি আনুষ্ঠানিক স্মরণ- এর উৎসব নয়, এটি ভাষার জন্য আত্মত্যাগ, সংগ্রাম এবং আত্মপরিচয়ের গভীর বোধকে পুনরুজ্জীবিত করার এক গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ। ভাষার জন্য মানুষের এই আত্মত্যাগ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে ভাষা যোগাযোগের মাধ্যম তো বটেই সঙ্গে এটি মানুষের অস্তিত্ব, সংস্কৃতি এবং আত্মপরিচয়ের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্তও বটে।

বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর যুগে, যখন কম্পিউটার, স্মার্টফোন ও বিভিন্ন ডিজিটাল মাধ্যমের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত আমরা ভাষা ব্যবহার করছি, তখন ভাষার অবস্থান ও তার পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতনভাবে চিন্তা করা আরও জরুরি হয়ে উঠছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, ই-মেইল, অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থা, ব্লগ এবং বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ভাষার ব্যবহারে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। মানুষ এখন দ্রুত, সংক্ষিপ্ত এবং তাৎক্ষণিক যোগাযোগে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে, যার ফলে ভাষার প্রচলিত রীতি ও শৈলীতে পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে।

প্রযুক্তির হাত ধরে মানুষের যোগাযোগের ক্ষেত্র যেমন বহুগুণে বিস্তৃত হয়েছে, তেমনি ভাষার রূপ, গঠন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এসেছে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। একদিকে ডিজিটাল মাধ্যম মাতৃভাষাকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরার সুযোগ করে দিচ্ছে, অন্যদিকে একই সঙ্গে এটি একটি শক্তিশালী বৈশ্বিক ভাষার প্রভাবকেও বিস্তার করছে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে মাতৃভাষার স্বাভাবিক শব্দচয়ন, ব্যাকরণ ও প্রকাশভঙ্গি পরিবর্তিত বা প্রভাবিত

হচ্ছে। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের ভাষা ব্যবহারে যে মিশ্র ভাষার প্রবণতা দেখা যায়, তা ভবিষ্যতে ভাষার স্বকীয়তার উপর কী প্রভাব ফেলবে, সেটিও ভাবনার বিষয়।

এই বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সামনে আসে— প্রযুক্তি ও বিশ্বায়নের প্রভাব মাতৃভাষাকে কতখানি সমৃদ্ধ করছে এবং কতখানি তাকে সংকুচিত করে ফেলছে। একদিকে প্রযুক্তি ভাষার বিস্তার, সংরক্ষণ এবং সহজলভ্যতার পথ খুলে দিয়েছে; অন্যদিকে এর ফলে ভাষার সরলীকরণ, বিকৃতি কিংবা প্রভাবাধীন হয়ে পড়ার আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে। ফলে এই পরিবর্তনকে একপাক্ষিকভাবে বিচার করা যায় না; বরং এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক—উভয় দিকই সমানভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

এই কারণেই ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য স্মরণ করে বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে মাতৃভাষার অবস্থান, তার সম্ভাবনা এবং সংকট নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা জরুরি হয়ে পড়েছে। ভাষার প্রতি এই সচেতনতা ও দায়বদ্ধতার বোধ থেকেই বর্তমান আলোচনার সূত্রপাত। এই গবেষণায় ভাষার ঐতিহাসিক গুরুত্ব, প্রযুক্তির প্রভাব এবং বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে মাতৃভাষার অবস্থানকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হবে, যাতে ভাষার ভবিষ্যৎ নিয়ে একটি সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে।

ভাষা মানুষের আত্মপরিচয়ের অবশ্যই একটি প্রধান ভিত্তি। তাই ভাষার মধ্যেই একটি জাতির ইতিহাস, সংস্কৃতি, অভিজ্ঞতা, বেদনা ও স্বপ্নের গভীরতম স্মৃতি সঞ্চিত থাকে। ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে না, এটি একটি সমাজের চিন্তাধারা, সাংস্কৃতিক অভ্যাস এবং মানসিকতার নির্মাণক্ষেত্রও বটে। ভাষার ভেতর দিয়ে একটি জনগোষ্ঠীর আত্মপরিচয় গড়ে ওঠে এবং সেই ভাষার মাধ্যমেই তারা নিজেদের অতীতকে ধারণ করে ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হয়। সেই কারণেই ভাষাকে একটি জাতির অস্তিত্বের অন্যতম মৌলিক উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট মনীষী আহমদ শরীফ তাঁর 'স্বদেশ, স্বভাষা ও স্বাজাত্য' প্রবন্ধে লিখছেন,

> "...তাই তাঁরা স্বধর্ম ত্যাগ করলেও আঁকড়ে ধরে ছিলেন স্বভাষা। তাঁরা জানতেন, ভাষা ও সাহিত্য শুধু মহৎ প্রেরণায় সহায়কই নয়, জীবনানুভূতির ভিত্তি বা জীবনরসের উৎসও।"[১]

এই উক্তির মধ্যে ভাষার অস্তিত্বগত গুরুত্ব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। ভাষা মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতাকে ধারণ করে এবং সেই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই একটি সমাজ তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য নির্মাণ করে। ফলে ভাষার ওপর আঘাত মানে একটি জাতির আত্মপরিচয়ের ওপর আঘাত। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, বহু সময় ভাষার প্রশ্ন রাজনৈতিক সংঘাত, সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ এবং জাতীয় চেতনার উন্মেষের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। ভাষা কেবল মানুষের ভাবপ্রকাশের বাহন নয়; এটি তার চিন্তা-চেতনা, মূল্যবোধ এবং জীবনদৃষ্টিরও নির্মাতা। একটি জাতি তার ভাষার মধ্য দিয়েই পৃথিবীকে উপলব্ধি করে, নিজের অস্তিত্বকে সংজ্ঞায়িত করে এবং ভবিষ্যতের স্বপ্ন নির্মাণ করে। তাই ভাষা মানুষের মানসিক স্বাধীনতার ভিত্তি রচনা করে— এটি চিন্তার মুক্তি এবং আত্মপ্রকাশের প্রধান মাধ্যম।

যখন কোনো শাসকগোষ্ঠী বা ক্ষমতাশালী শক্তি একটি জনগোষ্ঠীর ভাষাকে দমন করার চেষ্টা করে, তখন সেই প্রচেষ্টা কেবল ভাষাগত নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; এর অন্তরালে কাজ করে সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার গভীর আকাঙ্ক্ষা। ভাষাকে নিয়ন্ত্রণ মানে মানুষের চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করা, তার ইতিহাসকে বিকৃত করা এবং তার সাংস্কৃতিক স্মৃতিকে মুছে দেওয়ার চেষ্টা করা। ফলে ভাষার ওপর আঘাত আসলে একটি জাতির

আত্মপরিচয়ের ওপরই আঘাত হানে। এই কারণেই ভাষার প্রশ্ন বহু সময় রাজনৈতিক সংগ্রামের রূপ ধারণ করে এবং তা মানুষের আত্মমর্যাদা, স্বাধীনতা ও অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে পরিণত হয়।

বিশ্ব ইতিহাসে ভাষা-নির্ভর আন্দোলনের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেখানে মানুষ নিজের মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার জন্য জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং এটি প্রতিরোধের শক্তি, প্রতিবাদের ভাষা এবং স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভাষা মানুষের সম্মিলিত চেতনাকে সংগঠিত করে, তাকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহস জোগায়।

বাঙালির ইতিহাসে ২১ ফেব্রুয়ারি একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিন। এটি কেবল একটি স্মরণদিবস নয়; এটি আত্মত্যাগ, প্রতিবাদ এবং সাংস্কৃতিক আত্মমর্যাদার এক অনন্য প্রতীক। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন দেখিয়েছিল, ভাষার অধিকার কোনো সামান্য দাবি নয়— এটি মানুষের মৌলিক মানবিক অধিকারের অন্যতম ভিত্তি। মাতৃভাষার প্রতি এই গভীর ভালোবাসা ও দায়বদ্ধতা বাঙালিকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

ভাষা আন্দোলনের শহিদরা প্রমাণ করে গেছেন যে ভাষা মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাদের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে—ভাষা কেবল সাংস্কৃতিক পরিচয়ের বাহক নয়, এটি রাজনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদার সঙ্গেও গভীরভাবে সম্পর্কিত। ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা মানে নিজের পরিচয়, ইতিহাস ও সম্মান রক্ষা করা। তাই ২১ ফেব্রুয়ারি আমাদের কাছে কেবল অতীতের একটি ঘটনা নয়; এটি বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য একটি প্রেরণা, যা আমাদের শেখায়— নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির মর্যাদা রক্ষা করা মানেই নিজের অস্তিত্বকে সম্মান জানানো।

কবি শঙ্খ ঘোষ লিখছেন,

> "শুধু দূরদর্শনে নয়, একেবারে উপায়হীন না হলে জীবনের সর্বত্র আমরা বাংলার ব্যবহার করব, এই জেদটাই এখন প্রতিবাদের মূল ভর হওয়া উচিত।"[২]

এই বক্তব্যের মধ্যে ভাষার প্রতি এক গভীর সাংস্কৃতিক দায়বদ্ধতা প্রকাশ পেয়েছে। ভাষার ব্যবহার এখানে দৈনন্দিন প্রয়োজনের একটি সাধারণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়নি; এটি একটি সচেতন সাংস্কৃতিক অবস্থান। ভাষার চর্চা মানুষের আত্মপরিচয় রক্ষার একটি শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে— এই উপলব্ধিই এই বক্তব্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে মাতৃভাষার সংকট নিয়ে আলোচনা করতে গেলে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস এক নতুন তাৎপর্য লাভ করে। এই ইতিহাস আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে ভাষার মর্যাদা রক্ষার সংগ্রাম কেবল অতীতের কোনো অধ্যায় নয়; বরং এটি বর্তমান ও ভবিষ্যতের সাংস্কৃতিক বাস্তবতার সঙ্গেও গভীরভাবে যুক্ত। আজকের দিনে প্রযুক্তি, গণমাধ্যম এবং বিশ্বব্যাপী যোগাযোগব্যবস্থার দ্রুত প্রসারের ফলে একদিকে যেমন ভাষার বিনিময় সহজ হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি প্রভাবশালী ভাষার আধিপত্যও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে অনেক ছোট ভাষা ও উপভাষা বিলুপ্তির মুখে পড়ছে, আর বৃহত্তর ভাষাগুলোর চাপে মাতৃভাষার স্বাতন্ত্র্য ও শুদ্ধতা ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস আমাদের শেখায় যে ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এটি একটি জাতির আত্মপরিচয়, সংস্কৃতি এবং মানসিক স্বাধীনতার ভিত্তি।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজনের পর পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়, যার দুটি অংশ ছিল— পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ব পাকিস্তান। এই দুটি অঞ্চলের মধ্যে ভৌগোলিক দূরত্ব ছিল প্রায় দেড় হাজার মাইল, যা প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগকে দুর্বল করে তুলেছিল। কিন্তু ভৌগোলিক দূরত্বের চেয়েও বড় ছিল ভাষা, সংস্কৃতি এবং

ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার পার্থক্য। পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ মানুষ বাংলা ভাষাভাষী এবং তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছিল বাংলাভিত্তিক; অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির ধারক ছিল। এই বৈষম্য শুরু থেকেই এক গভীর অসামঞ্জস্যের জন্ম দেয়, যা পরবর্তীকালে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংঘাতের রূপ নেয়।

এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৪৮ সালে ঢাকায় এসে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন যে উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এই ঘোষণা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ভাষাগত অধিকারের প্রতি সরাসরি অস্বীকৃতি। বাস্তবে এটি কেবল একটি ভাষানীতি ছিল না; বরং এটি ছিল সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার একটি সুপরিকল্পিত প্রয়াস। এর মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জনগোষ্ঠীর ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে প্রান্তিক করে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছিল।

এই ঘোষণার বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ, বুদ্ধিজীবী এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ভাষার অধিকার রক্ষার দাবিতে ধীরে ধীরে আন্দোলন গড়ে ওঠে, যা পরবর্তীতে এক বৃহত্তর জাতীয় চেতনার ভিত্তি নির্মাণ করে। ভাষা আন্দোলন তাই কেবল ভাষাগত অধিকারের দাবি নয়; এটি ছিল আত্মপরিচয়, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের জন্য এক ঐতিহাসিক সংগ্রাম।

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে এই ইতিহাসের গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। কারণ আজও আমরা দেখতে পাই, শক্তিশালী ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাবের কারণে অনেক জাতি তাদের নিজস্ব ভাষা ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছে। তাই ভাষা আন্দোলনের শিক্ষা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়— মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা করা মানে কেবল একটি ভাষাকে সংরক্ষণ করা নয়, বরং একটি জাতির অস্তিত্ব, আত্মপরিচয় এবং সাংস্কৃতিক স্বাধিকারকে রক্ষা করা।

এই প্রসঙ্গে মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন-

> "সেই কতকাল আগে, ১৯৫২ সালে, যখন সেকালের পূর্ব পাকিস্তানে কোথাও- কিছু- নেই হঠাৎ উর্দু রাজভাষার সর্বাত্মক দাপটের মুখোমুখি হয়ে বাংলাভাষার স্বাধিকাররক্ষার চ্যালেঞ্জ - যাকে সংক্ষেপে বলা হয় ভাষা-আন্দোলন, তা-ই বিস্ফোরিত হল, তখন পশ্চিমবাংলায় আমরা আচমকা একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে কেমন-যেন বিচলিত, হতচকিত হয়ে পড়লুম।"[৩]

এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায় যে ভাষা আন্দোলনের অভিঘাত পূর্ব পাকিস্তানের সীমানা অতিক্রম করে সমগ্র বাঙালি সমাজে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। ভাষা এখানে একটি সাংস্কৃতিক বন্ধন হিসেবে কাজ করেছে, যা ভৌগোলিক সীমারেখাকেও অতিক্রম করে মানুষের মধ্যে এক ধরনের ঐক্যের অনুভূতি সৃষ্টি করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে ছাত্রসমাজ ও বুদ্ধিজীবীরা দ্রুত সংগঠিত হতে শুরু করেন। ১৯৪৮ সাল থেকেই ছাত্ররা ভাষার অধিকারের দাবিতে বিভিন্ন সভা, সমাবেশ ও প্রতিবাদ কর্মসূচি আয়োজন করতে থাকে। ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগঠিত রূপ দেখা যায় তামদ্দুন মজলিস এবং ছাত্রলীগের উদ্যোগে গঠিত রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে। এই সংগঠন বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে একটি ব্যাপক গণআন্দোলনের সূচনা করে।

আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পরিস্থিতি আরও উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে। ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা জারি থাকা সত্ত্বেও ছাত্ররা প্রতিবাদ মিছিল বের করে। সেই মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে শহিদ হন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউর প্রমুখ। এই ঘটনাটি কেবল একটি রাজনৈতিক ঘটনা

হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকে না, এটি হয়ে ওঠে একটি জাতির আত্মমর্যাদার সংগ্রামের প্রতীক। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় সুফিয়া কামালের 'মিছিল'কবিতার সেই বিখ্যাত পংক্তি- "রমনা ঝিলের বুকে রক্ত- শতদল হেরে নেত্র মেলে /এত রক্ত কারা দিল ঢেলে।"[৪] এই রক্তস্নাত ইতিহাস বাঙালির সাংস্কৃতিক চেতনাকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। ভাষার প্রশ্ন একটি বৃহত্তর জাতীয় আন্দোলনের ভিত্তি হয়ে ওঠে। ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রেষ্ঠ সম্মান হবে যদি আমরা প্রযুক্তির সকল শাখায় বাংলাকে সমৃদ্ধ করতে পারি। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বাংলা কম্পিউটিং ও ডাটাবেস তৈরি এখন সময়ের দাবি।

এই আত্মদান ভাষা আন্দোলনকে গণআন্দোলনে রূপান্তরিত করে এবং ভাষার প্রশ্নকে জাতীয় অস্তিত্বের প্রশ্নে উন্নীত করে। ভাষা আন্দোলনের পর পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থান ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে এই জাতীয়তাবাদের প্রভাব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। পরবর্তীকালে ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধানে বাংলা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করে। এটি দীর্ঘ সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। অনেক গবেষকের মতে ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই পরবর্তী রাজনৈতিক আন্দোলনের বীজ রোপিত হয়। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের আদর্শিক ভিত্তির সঙ্গে ভাষা আন্দোলনের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ ভাষা আন্দোলন একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাসেরও সূচনা পর্ব হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

ভাষা আন্দোলনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আসে যখন ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। ২০০০ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী দিবসটি পালিত হচ্ছে। এই স্বীকৃতি ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্যকে বিশ্বদরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং ভাষাগত বৈচিত্র্য রক্ষার প্রশ্নকে আন্তর্জাতিক আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে।

বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় সাত হাজার ভাষা প্রচলিত রয়েছে। ভাষাবিদদের মতে প্রতি কয়েক সপ্তাহে একটি করে ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কেবল স্মৃতিচারণের দিন হিসেবে বিবেচিত হয় না, এটি ভাষাগত বহুত্ব রক্ষার একটি বৈশ্বিক আহ্বান।

আমরা দেখছি, বিশ্বায়নের ফলে অর্থনীতি, প্রযুক্তি, শিক্ষা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তনের প্রভাব ভাষার ক্ষেত্রেও পড়েছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, উচ্চশিক্ষা, গবেষণা এবং প্রযুক্তির প্রধান ভাষা হিসেবে ইংরেজির প্রভাব ক্রমশ বিস্তৃত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে লেখক স্বপ্নময় চক্রবর্তী তাঁর 'ভাষা দুর্বল হলে জাতিসত্তা দুর্বল হয়' প্রবন্ধে লিখছেন,

> "বিয়ে–টিয়ের ভোজে দেখবেন একটা মেনুকার্ড দেয়া হয়, তাতে ইংরেজি লেখা Radha Ballavi, Chnolar Daal ইত্যাদি। এমনি কি pappad! কলকাতার উচ্চারণ, এখনো কোলকাতা হয়ে গেছে। যেহেতু ইংরেজিতে হালে kolkata লেখা হয়। কলকাতার ক' এ এতটা ওকার পড়ত না।"[৫]

এই উদাহরণগুলো ভাষা ব্যবহারের অচেতন পরিবর্তনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সমাজের বিভিন্ন স্তরে ভাষার ব্যবহারে ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটে চলেছে।

এ কারণে অনেক দেশেই মাতৃভাষার পরিবর্তে বিদেশি ভাষায় শিক্ষার প্রচলন বাড়ছে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ইংরেজি শিক্ষাকে উন্নত কর্মসংস্থানের চাবিকাঠি হিসেবে দেখা হয়। এর ফলে মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষার গুরুত্ব অনেক সময় কমে যায়। অথচ শিক্ষাবিদদের মতে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাতৃভাষায় শিক্ষা শিশুর বোধগম্যতা, সৃজনশীলতা এবং মানসিক বিকাশকে সমৃদ্ধ করে।

ভাষাবিদদের মতে শক্তিশালী ভাষার আধিপত্যে ছোট ও আদিবাসী ভাষাগুলো বিলুপ্তির দিকে ঝুঁকে পড়ছে। ভাষারবিলোপের সঙ্গে হারিয়ে যায় একটি জনগোষ্ঠীর লোকজ জ্ঞান, মৌখিক ইতিহাস, আঞ্চলিক সাহিত্য, লোকসংগীত এবং প্রবাদ-প্রবচনের বিশাল ভাণ্ডার। প্রখ্যাত লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'দৃশ্যপটে বাংলা: প্রয়োজনে চাই ভাষা- পুলিশ' প্রবন্ধে লিখছেন,

> "ভারতে যে কোন শহরে গেলে চতুর্দিকে তাকিয়ে বোঝা যায়, সেখানকার প্রধান ভাষা কী। একমাত্র কলকাতায়ই তার ব্যতিক্রম। কলকাতা দৃশ্যপট থেকে বাংলা ভাষা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে।"[৬]

এই পর্যবেক্ষণ নগর সংস্কৃতির মধ্যে ভাষার সংকুচিত উপস্থিতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত বহন করে।

বিশ্বায়নের ফলে গণমাধ্যম, বিজ্ঞাপন, কর্পোরেট সংস্কৃতি এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ভাষায় যে দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে, তা আমাদের ভাষাজীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় নির্দেশ করে। বাংলা ও ইংরেজির মিশ্রণে গড়ে ওঠা নতুন কথ্য ভাষা— যাকে অনেকেই 'বাংলিশ' নামে অভিহিত করেন— বর্তমানে শহুরে ও তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই পরিবর্তনকে একদিকে ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তন হিসেবে দেখা যায়, কারণ ভাষা কখনো স্থির নয়; সময়, সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভাষাও পরিবর্তিত হয়। কিন্তু অন্যদিকে, এই পরিবর্তন যখন মাতৃভাষার নিজস্ব স্বর, ব্যাকরণগত স্বাতন্ত্র্য এবং সাংস্কৃতিক গভীরতাকে ক্ষুণ্ন করতে শুরু করে, তখন তা নিঃসন্দেহে উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

বিশেষত গণমাধ্যমের প্রভাব এখানে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। টেলিভিশন, ওয়েব সিরিজ, ইউটিউব কনটেন্ট বা বিজ্ঞাপনের ভাষা আজ আর নিছক তথ্যপ্রদানের মাধ্যম নয়; বরং তা একটি নির্দিষ্ট জীবনধারা ও মানসিকতার নির্মাতা। বিজ্ঞাপনের ভাষায় ইংরেজি শব্দের আকর্ষণীয় ব্যবহার, কর্পোরেট দুনিয়ার 'প্রেজেন্টেশন কালচার', কিংবা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত বার্তা আদান-প্রদানের প্রবণতা—সব মিলিয়ে ভাষার একটি নতুন রূপ গড়ে উঠছে, যা অনেক সময় প্রমিত বাংলার ব্যাকরণ ও শুদ্ধতার সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে। ফলে, একদিকে যেমন ভাষা সহজ ও গতিশীল হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনই তার শুদ্ধতা ও সৌন্দর্য ক্ষীণ হয়ে পড়ার আশঙ্কাও তৈরি হচ্ছে।

মনোবিজ্ঞানীদের মতে, শিশুর চিন্তার প্রাথমিক বিকাশ মাতৃভাষার মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। শিশুর প্রথম আবেগ, প্রথম কল্পনা এবং প্রথম অনুভূতি মাতৃভাষার ভেতর দিয়েই প্রকাশিত হয়। এই কারণে মাতৃভাষা শুধু একটি ভাষাগত মাধ্যম নয়, বরং এটি ব্যক্তিত্বের ভিত্তি নির্মাণের প্রধান উপাদান। যখন একটি শিশু তার নিজস্ব ভাষার পরিবর্তে ক্রমাগত একটি মিশ্র বা বিদেশি ভাষার প্রভাবে বেড়ে ওঠে, তখন তার চিন্তার স্বাভাবিক বিকাশে একধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। এর ফলে ভাষাগত দক্ষতার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক পরিচয়ও দুর্বল হয়ে পড়তে পারে।

এছাড়া, পরিবার ও শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষার ব্যবহার কমে যাওয়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে দেখা দিচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, অভিভাবকেরা শিশুদের ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতে গিয়ে ঘরোয়া পরিবেশে বাংলার ব্যবহার কমিয়ে দিচ্ছেন। এর ফলে শিশুরা ধীরে ধীরে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, লোকঐতিহ্য এবং ভাষার সঙ্গে সংযোগ হারাতে থাকে। এই বিচ্ছিন্নতা কেবল ভাষাগত নয়, এটি এক ধরনের মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা, যা ভবিষ্যতে একটি জাতির সাংস্কৃতিক ঐক্যকেও ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর যুগে স্মার্টফোন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং ডিজিটাল বিনোদনের বিস্তার মানুষের ভাষা ব্যবহারের ধরণে এক বিপ্লব এনেছে। ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম প্রভৃতি মাধ্যমে মানুষ

দ্রুত, সংক্ষিপ্ত এবং অনেক সময় ধ্বনিগতভাবে বিকৃত ভাষা ব্যবহার করছে। যেমন— বাংলা শব্দ ইংরেজি হরফে লেখা, বা ইংরেজি শব্দ বাংলার ব্যাকরণে ব্যবহার করা— এই প্রবণতাগুলি ভাষার একটি নতুন রূপ সৃষ্টি করছে। এই রূপটি যদিও সহজবোধ্য ও দ্রুত যোগাযোগের জন্য কার্যকর, তবে এটি দীর্ঘমেয়াদে ভাষার শুদ্ধ রূপকে দুর্বল করে দিতে পারে।

সংগীত ও বিনোদন জগতেও এই পরিবর্তনের প্রভাব স্পষ্ট। কলারটিউন বা অনলাইন প্ল্যাটফর্মে বিদেশি শিল্পীদের গান ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এমনকি বাংলা গানেও ইংরেজি র‍্যাপ, হিন্দি শব্দ বা পাশ্চাত্য সুরের প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই ধারা একদিকে যেমন সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ ও বৈচিত্র্যের পরিচায়ক, অন্যদিকে তেমনই এটি বাংলা গানের নিজস্ব সুর ও ভাষার ঐতিহ্যকে আড়াল করে দেওয়ার ঝুঁকিও বহন করে।

বিশ্বায়নের ফলে পশ্চিমা ও হিন্দি সংস্কৃতির প্রভাব তরুণ প্রজন্মের ওপর বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, বিনোদন— সব ক্ষেত্রেই এই প্রভাবের ছাপ রয়েছে, এবং ভাষাও এর ব্যতিক্রম নয়। তরুণদের মধ্যে 'কুল' বা আধুনিক দেখানোর প্রবণতায় অনেক সময় শুদ্ধ বাংলার পরিবর্তে মিশ্র ভাষার ব্যবহার বাড়ছে। এর ফলে ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম না থেকে একটি সামাজিক মর্যাদা বা পরিচয়ের প্রতীক হয়ে উঠছে, যেখানে ইংরেজি ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেকে 'উন্নত' বা 'আধুনিক' হিসেবে তুলে ধরার প্রবণতা দেখা যায়।

তবে এই পরিবর্তনকে সম্পূর্ণ নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা উচিত নয়। ভাষার বিবর্তন একটি স্বাভাবিক ও অনিবার্য প্রক্রিয়া, এবং নতুন শব্দ, নতুন রীতি ভাষাকে সমৃদ্ধও করতে পারে। কিন্তু প্রয়োজন হলো একটি ভারসাম্য রক্ষা করা—যেখানে আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার পাশাপাশি মাতৃভাষার স্বাতন্ত্র্য, শুদ্ধতা ও সাংস্কৃতিক গভীরতাকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলার যথাযথ চর্চা, পরিবারে মাতৃভাষার ব্যবহার বৃদ্ধি এবং গণমাধ্যমে শুদ্ধ ভাষার প্রয়োগ— এই বিষয়গুলির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা অত্যন্ত জরুরি। অতএব, বিশ্বায়নের এই যুগে ভাষার পরিবর্তনকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়, কিন্তু সচেতনতার মাধ্যমে আমরা এই পরিবর্তনকে একটি ইতিবাচক পথে পরিচালিত করতে পারি। মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা বজায় রেখে, তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেই আধুনিকতার সঙ্গে সহাবস্থান সম্ভব। ভাষা কেবল শব্দের সমষ্টি নয়; এটি আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের সংস্কৃতি এবং আমাদের আত্মপরিচয়ের গভীরতম প্রতিফলন। তাই ভাষার এই পরিবর্তনের ধারায় আমাদের দায়িত্ব হলো— নিজস্ব শিকড়কে অক্ষুণ্ণ রেখে, নতুনের সঙ্গে সংলাপ স্থাপন করা। তবুও ইতিহাস আমাদের আশাবাদী হতে শেখায়। ভাষার জন্য মানুষ আত্মত্যাগ করেছে এবং সেই আত্মত্যাগ একটি জাতির সাংস্কৃতিক শক্তিকে সুসংহত করেছে। তাই ভাষা কেবল যোগাযোগের উপকরণ হিসেবেই সীমাবদ্ধ থাকে না; এটি মানুষের মর্যাদা ও আত্মপরিচয়ের সঙ্গেও যুক্ত। মাতৃভাষাভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা, স্থানীয় ভাষায় ডিজিটাল কনটেন্ট নির্মাণ, বিলুপ্তপ্রায় ভাষার শব্দভাণ্ডার সংরক্ষণ এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রসার—এই সব উদ্যোগ ভাষা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রযুক্তিকে মাতৃভাষার সহায়ক শক্তি হিসেবে ব্যবহার করা গেলে ভাষার চর্চা আরও বিস্তৃত হবে।

২১ ফেব্রুয়ারির ইতিহাস আমাদের একটি গভীর শিক্ষা দেয়। ভাষা কেবল শব্দের সমষ্টি নয়; এটি মানুষের স্মৃতি, সংস্কৃতি, অনুভূতি এবং অস্তিত্বের ধারক। ভাষার মধ্যেই একটি জাতির আত্মপরিচয় নির্মিত হয় এবং সেই ভাষার মাধ্যমেই মানুষ তার অতীতকে ধারণ করে ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হয়। ভাষা আন্দোলনের শহিদেরা যে আত্মত্যাগ করেছিলেন তা কোনো একটি দিনের প্রতিবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সেই আত্মত্যাগ আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে সাংস্কৃতিক মর্যাদা রক্ষার জন্য মানুষের সংগ্রাম কখনও নিষ্ফল হয় না। ভাষার প্রশ্নে যে সচেতনতা সেই সময় গড়ে উঠেছিল তা পরবর্তীকালে একটি জাতির স্বাধীনতার আন্দোলনকে শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করে।

বিশ্বায়নের যুগে ভাষার প্রশ্ন নতুন মাত্রা লাভ করেছে। প্রযুক্তি, অর্থনীতি এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগের প্রসারের ফলে একটি বিশ্বভাষার প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বাস্তবতা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে একাধিক ভাষা জানা মানুষের জ্ঞান ও সুযোগের পরিসরকে বিস্তৃত করে। তবে একই সঙ্গে মাতৃভাষার মর্যাদা ও চর্চা রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মাতৃভাষা মানুষের চিন্তার প্রথম ভিত্তি। মাতৃভাষার মাধ্যমে মানুষ তার সমাজ, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। যদি মাতৃভাষার ব্যবহার কমে যায়, তাহলে সেই সমাজের সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতাও দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। এই কারণে ভাষা সংরক্ষণের প্রশ্নকে কেবল আবেগের বিষয় হিসেবে দেখা যথেষ্ট নয়; এটিকে একটি সাংস্কৃতিক নীতি এবং শিক্ষাগত দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করা প্রয়োজন। পরিবারে শিশুদের মাতৃভাষায় কথা বলার অভ্যাস তৈরি করা, বিদ্যালয়ে মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির মাধ্যমে ভাষার চর্চা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি।

ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রেষ্ঠ সম্মান হবে যদি আমরা প্রযুক্তির সকল শাখায় বাংলাকে সমৃদ্ধ করতে পারি। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বাংলা কম্পিউটিং ও ডাটাবেস তৈরি এখন সময়ের দাবি। ডিজিটাল যুগে ভাষা সংরক্ষণের নতুন সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে। অনলাইন শিক্ষা, ই-বুক, ডিজিটাল আর্কাইভ, ভাষাভিত্তিক সফটওয়্যার এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সাহায্যে মাতৃভাষাকে নতুন প্রজন্মের কাছে আরও সহজভাবে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। যদি এই প্রযুক্তিকে সচেতনভাবে ব্যবহার করা যায়, তাহলে মাতৃভাষার চর্চা আরও বিস্তৃত হতে পারে। প্রযুক্তিতে বাংলার অবস্থান ইন্টারনেট ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) যুগে যদি বাংলার প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ত্বরান্বিত না হয়, তবে জ্ঞান- বিজ্ঞানের ভাষা হিসেবে বাংলা পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকিতে থাকবে। যদিও বর্তমানে ইউনিকোড আসার পর বাংলা টাইপিং সহজ হয়েছে তবুও গবেষণাপত্র ও উচ্চশিক্ষায় বাংলার ব্যবহার এখনো সীমিত। ভাষা একটি জীবন্ত সত্তা। মানুষের ব্যবহার, সৃজনশীলতা এবং সাংস্কৃতিক চর্চার মধ্য দিয়ে ভাষা ক্রমাগত বিকশিত হয়। তাই ভাষাকে সংরক্ষণ করার অর্থ এটিকে স্থবির করে রাখা নয়; বরং তার স্বাভাবিক বিকাশের পথকে সুসংহত করা। ২১ ফেব্রুয়ারির স্মৃতি আমাদের এই দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়। ভাষার মর্যাদা রক্ষা করা মানে একটি জাতির আত্মপরিচয়কে সম্মান করা। মাতৃভাষা বেঁচে থাকলে সংস্কৃতি বেঁচে থাকবে, আর সংস্কৃতি বেঁচে থাকলে মানবসভ্যতার বহুত্বও অটুট থাকবে।

১৯৫২ সালের রক্ত স্মৃতি আজ কেবল ক্যালেন্ডারের পাতায় সীমাবদ্ধ নয়। এটি একটি জীবন্ত দর্শন। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু হওয়া যে পথযাত্রা, তা আজ বিশ্বায়নের মহাসড়কে এসে দাঁড়িয়েছে। আমাদের গর্বের এই উত্তরাধিকারকে টেকসই করতে হলে প্রয়োজন শুদ্ধ ভাষা চর্চা, প্রযুক্তিতে বাংলার সমৃদ্ধি এবং তরুণ প্রজন্মের মনে একুশের চেতনার সঠিক প্রতিফলন। এই কারণেই বিশ্বায়নের প্রবল স্রোতের মধ্যেও মাতৃভাষাকে শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে এবং প্রযুক্তির ব্যবহারে সমান মর্যাদা দেওয়া প্রয়োজন। ভাষার চর্চা যত বিস্তৃত হবে, ততই একটি সমাজ তার সৃজনশীল শক্তিকে বিকশিত করতে পারবে। ভাষা মানুষের আত্মার ঠিকানা। সেই ঠিকানাকে সযত্নে রক্ষা করা কেবল একটি সাংস্কৃতিক দায়িত্ব নয়; এটি মানবিক কর্তব্যও। রক্তে কেনা এই বর্ণমালা যেন বিশ্বায়নের ঝরে বিলীন না হয়ে বরং বিশ্ব দরবারে আরো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে- এটাই হোক আজকের শপথ। আগামী প্রজন্মের হাতে সমৃদ্ধ ভাষা ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকার তুলে দেওয়াই আমাদের সম্মিলিত দায়িত্ব।

তথ্যসূত্র:

১. খাতুন, তাহমিনা, দে প্রবীর, সম্পাদনা। মায়ের ভাষা। শর্মিলা কুণ্ডু ও স্বপনকুমার ঘোষ এন. ই. পাবলিশার্স। ২০১৬, পৃ. ২৫।

২. সেনগুপ্ত, দেবাশীষ, সম্পাদনা। একুশে ফেব্রুয়ারি। ২০০৬, পৃ. ৮৭।

৩. তদেব, পৃ. ৪৮।
৪. খাতুন, তাহমিনা, দে প্রবীর, সম্পাদনা। মায়ের ভাষা। শর্মিলা কুণ্ডু ও স্বপনকুমার ঘোষ এন. ই. পাবলিশার্স। ২০১৬, পৃ. ১৯৬।
৫. তদেব, পৃ. ৫২।
৬. তদেব, পৃ. ১৬৩।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1158-1164
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.334

বাংলাভাষার প্রথম সার্থক কল্পবিজ্ঞানকাহিনি: একটি পর্যালোচনা

অমৃতেন্দু রায়, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 16.03.2026; Accepted: 17.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The establishment of Hindu School and Hindu College in 1817, followed by Calcutta Medical College in 1835 and the University of Calcutta in 1857, paved the way for the Bengali Renaissance to flourish through scientific temperament and rationalism. Following the 1818 publication of Mary Shelley's 'Frankenstein; or, The Modern Prometheus', world literature grew increasingly interested in science fiction, with that novel being recognized as the pioneer of the genre in the modern era. Similarly, when the question arises as to which is the first science fiction story written by a Bengali in the Bengali language, one encounters diverging opinions. Confusion persists over whether the title belongs to Jagadish Chandra Bose's 'NiruddesherKahini' published in 1896; Hemlal Dutta's 'Rahasya' published in the magazine 'Vigyan-Darpan' in 1882; or Jagadananda Roy's 'Shukra-Bhraman'. This essay attempts to resolve these contradictions and establish the historical truth in detail.

Keyword: Science Fiction, Bengali Language, Bengali Literature, Science, Scientific Technolog

১৮০০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও শ্রীরামপুর মিশনকে যেভাবে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের আধুনিক যুগের সূচনাকাল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, সেইভাবে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু-স্কুল এবং হিন্দু-কলেজের স্থাপনাকেও আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বাঙালি চেতনার নবজাগরণের উন্মেষ পর্বের সূত্রপাত হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। ক্রমে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের স্থাপনা ও ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পরে বাঙালির নবজাগরণ বিজ্ঞান-চেতনা এবং যুক্তিবাদ দ্বারা পরিপূর্ণ বিকাশের পথে সমৃদ্ধ হয়। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে মেরী শেলি (Mary Shelley) রচিত 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন ওর দা মর্ডান প্রমেথিউস' (FRANKENSTEIN or THE MODERN PROMETHEUS) উপন্যাস প্রকাশের পর বিশ্বসাহিত্যে কল্পবিজ্ঞান রচনা সম্পর্কে একটি আগ্রহের জায়গা তৈরি হয়, অনেকেই এই উপন্যাসকে আধুনিক যুগের কল্পবিজ্ঞান শাখার অগ্রদূত হিসাবে মান্য করে থাকেন। অনুরূপে বাঙালি রচিত বাংলাসাহিত্যের প্রথম বাংলা কল্পবিজ্ঞানকাহিনি কোনটি? সেই প্রশ্ন উত্থাপিত হলে বেশ কিছু বিভ্রান্তির সম্মুখীন হতে হয়। অনেকেই মনে করেন ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে 'কুন্তলীন পুরস্কার' নামক গল্পসংগ্রহে প্রকাশিত জগদীশচন্দ্র বসুর 'নিরুদ্দেশের কাহিনী' রচনাটি প্রথম বাংলা কল্পবিজ্ঞানকাহিনি। আবার কারোর মতে, ১৮৮২

খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'বিজ্ঞান দর্পণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হেমলাল দত্তের 'রহস্য' রচনাটি এই শিরোপার প্রকৃত দাবিদার। অনেকে আবার জগদানন্দ রায়ের 'শুক্র-ভ্রমণ' রচনাটিকে প্রথম বাংলা কল্পবিজ্ঞান রচনা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী। আলোচ্য প্রবন্ধে এই বিস্তারিত আলোচনা এবং যুক্তির মাধ্যমে এই বিভ্রান্তি দূর করে প্রকৃত সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হবে।

প্রথম কল্পবিজ্ঞান রচনা কি? সে বিষয়ে আলোচনার পূর্বে, কোন জাতীয় রচনাকে কল্পবিজ্ঞান আখ্যা দেওয়া হয় সেই বিষয়ে সামান্য আলোকপাত প্রয়োজনীয়। অধ্যাপক হীরেন চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'সাহিত্য প্রকরণ' গ্রন্থে ছোটোগল্পের শ্রেণিবিভাগ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে জানিয়েছেন, বিষয় অনুসারে শ্রেণিবিভাগ করতে হলে দুটি বিভাগ হয়। প্রথমত, ব্যক্তির নিজের সমস্যার বিশ্লেষণ এবং দ্বিতীয়ত, ব্যক্তি ও সমাজের সমস্যার বিশ্লেষণ। তবে এই দুটি ভাগ ছাড়াও আরও অনেক ধরণের ছোটোগল্প লেখা হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে তিনি শ্রীশচন্দ্র দাশের লেখা 'সাহিত্য-সন্দর্শন' গ্রন্থের কথা বলেছেন যেখানে তিনি ছোটোগল্পকে ১৫ টি ভাগে বিভক্ত করেছেন, তার মধ্যে নয় নম্বর ভাগে তিনি বিজ্ঞাননির্ভর এক শ্রেণির ছোটোগল্পের কথা বলেছেন—

> "নয়।। বিজ্ঞাননির্ভর: এই জাতীয় গল্পকে ইংরেজিতে বলে সায়েন্স-ফিকশন। বিজ্ঞানের কোনও প্রতিষ্ঠিত সত্যকে অবলম্বন করে সুস্থ কল্পনার দ্বারা এরকম গল্প লেখা হয়। উদ্ভট গল্পেও মাঝে মাঝে বিজ্ঞান থাকে বটে, কিন্তু বিজ্ঞানের প্রতি কোনোরকম আনুগত্য সেসব গল্পে থাকে না। এইচ. জি. ওয়েলস ও জুলে ভার্নের গল্প এই জাতীয় গল্পের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এ যুগের লেখকদের মধ্যে আইজ্যাক অ্যাসিমভ এবং আর্থার সি ক্লার্কের নাম করা যেতে পারে। বাংলায় বিজ্ঞাননির্ভর গল্প খুব কম, যা আছে তার মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদার গল্প উল্লেখযোগ্য। ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য শুধু বিজ্ঞাননির্ভর গল্পই রচনা করেছেন।"[১]

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও কল্পবিজ্ঞান লেখক অনীশ দেব তাঁর সম্পাদিত 'সেরা কল্পবিজ্ঞান' গ্রন্থের ভূমিকা অংশে এই বিষয়ে বলেছেন—

> "কল্পবিজ্ঞানের প্রকৃত সংজ্ঞা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্কের শেষ নেই। তবে দেখা গেছে, প্রায় সবক'টি সংজ্ঞার মূল চাবিকাঠি একই। কল্পবিজ্ঞান কাহিনিতে বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিশেষ নিয়ন্ত্রণী ভূমিকা থাকবে। থাকবে অজানা সম্ভাব্য জগতের কথা, প্রাণীর কথা, আর আগামী দিনের কথা। তবে এত সত্ত্বেও কল্পবিজ্ঞানের বহুমুখী বিচিত্র জগৎকে সংজ্ঞার বাঁধনে বাঁধা সম্ভব নয়।"[২]

অর্থাৎ, কল্পবিজ্ঞান কাহিনির মধ্যে বিজ্ঞানের একটি বিশেষ ভূমিকা থাকবে যা সেই কাহিনির গতিকে নিয়ন্ত্রিত হবে। এই বিজ্ঞানের প্রসঙ্গটি যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন গল্পে তার উপস্থিতি অবশ্যক, এই প্রসঙ্গ ব্যতীত কোনও রচনা কল্পবিজ্ঞান কাহিনির তকমা লাভ করতে পারে না।

আলোচ্য বিষয়ে প্রথম যে রচনাটির প্রসঙ্গ আসবে সেটি হল, হিন্দু কলেজের (অধুনা প্রেসিডেন্সী) ছাত্র কৈলাস চন্দ্রের ইংরেজি ভাষায় লেখা— 'আ জার্নাল অব ফর্টি-এইট আওয়ারস অব দ্য ইয়ার নাইন্টিন ফর্টি ফাইভ' (A Journal of Forty-Eight Hours of the Year 1945)। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ৬ই জুন 'ক্যালকাটা লিটারারি গেজেট' (Calcutta Literary Gazette) পত্রিকায় প্রকাশিত এই কাহিনিতে দেখা যায়— তৎকালীন ইংরেজ বড়লাট লর্ড ফেল বুচারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভুবনমোহন নামক এক ছাত্রের

নেতৃত্বে, ইংরেজ সৈন্যদের সঙ্গে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, পঁচিশজন ব্রিটিশ সেনা ও ছয়জন ভারতীয়ের মৃত্যুর পরে সেনাবাহিনী পরাজয় স্বীকার করে।

এই কাহিনিতে Probable future বা সম্ভাব্য ভবিষ্যতের ছবি প্রকাশ পেয়েছে, এই বিকল্প ভবিষ্যৎ ধারাটি কল্পবিজ্ঞানের একটি শাখারূপে স্বীকৃত। ফলে, এই যুক্তি অনুসারে প্রথম বাঙালি কল্পবিজ্ঞান রচয়িতার শিরোপাটি কৈলাস চন্দ্র দত্তের প্রাপ্য। এর প্রায় এক দশক পরে ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে মে, 'স্যাটারডে ইভিনিং হরকরা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় একই পরিবারের সদস্য শশীচন্দ্র দত্তের রচনা 'দ্য রিপাবলিক অব ওড়িশা: আ পেজ ফ্রম দি অ্যানালস অব দ্য টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি' (THE REPUBLIC OF ORISSA; A PAGE FROM THE ANNALS OF THE TWENTIETH CENTURY)। এই গল্পে দেখা গেছে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে ওড়িশা রাজ্যের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের সংঘর্ষ ঘটে, এই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সেনাবাহিনী পরাজিত হলে সেরাজ্যে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে এবং স্বাধীন ওড়িশা প্রজাতন্ত্রের সূচনা হয়। নবজাগরণের চেতনায় বিকশিত দুই বাঙালি যুবকের ইংরেজি ভাষায় এই সুদূর ভবিষ্যৎ কাহিনি রচনার প্রচেষ্টাকে কুর্নিশ না জানিয়ে উপায় নেই। তবে এই দুইটি কাহিনিকে বাঙালি রচিত প্রথম কল্পবিজ্ঞান রচনা আখ্যা না দেওয়াই শ্রেয়। কারণ ভবিষ্যতের কথা বলা হলেও এই গল্পদুটির মধ্যে সামাজিক ও ঐতিহাসিক আবেদন অধিকমাত্রায় উপস্থিত, বিজ্ঞানের কোনও প্রসঙ্গ এতে নেই। এই প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক ভূদেব মুখোপাধ্যায় রচিত ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' উপন্যাসের কথাও উল্লেখযোগ্য। যেখানে লেখক মুঘল রাজকন্যা জাহানারার সঙ্গে মারাঠি রাজা শিবাজীর প্রেমকাহিনি বর্ণনা করেছেন। পরিচিত ইতিহাসে ঘটনাকে ভিন্নভাবে নতুন করে উপস্থাপনা করার বিষয়টিকে Alternate History বা বিকল্প ইতিহাস বলা হলেও এটি কল্পবিজ্ঞানের একটি উপশাখা রূপে পরিচিত। পরবর্তীকালে ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'এডুকেশন গেজেট' (Education Gazette) পত্রিকায় 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' নামক একটি ধারাবাহিক রচনা প্রকাশ করেন। যেখানে বিকল্প ইতিহাসের বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে লক্ষিত হয়েছে। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে, সে গ্রন্থের ভূমিকা অংশে তিনি বর্ণনা করেছেন যে, পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের ফলাফল যদি অন্যরকম হত তাহলে কি হত এই ভাবতে ভাবতে তিনি ঘুমিয়ে পড়লে তা নিয়ে তিনি অনেক স্বপ্ন দেখেন, পরে সেই স্বপ্নগুলিকে একত্রিত করে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন। আলোচ্য চারটি রচনাগুলিকে কল্পবিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য প্রারম্ভিক প্রচেষ্টারূপে স্বীকৃতি দেওয়া গেলেও, এদের মধ্যে বিজ্ঞানের কোনও সরাসরি সম্পর্ক বা কোনও রকমের বৈজ্ঞানিক আবেদন লক্ষ করা যায় না। ফলে লেখাগুলি কল্পবিজ্ঞান রচনা হিসাবে স্বীকৃতি লাভের যোগ্য নয়।

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ছাড়াও উন্নততর প্রযুক্তির সঙ্গেও ক্রমশ পরিচিত হয়ে ওঠে। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা ও ডায়মন্ড হারবারের মধ্যে প্রথম টেলিগ্রাম চালু হয়, ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে হাওড়া থেকে হুগলি অবধি প্রথম ট্রেন চালু হয়, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথম গ্যাসের আলো এবং ১৮৭৯ নাগাদ প্রথম বিদ্যুতের সংযোগ স্থাপিত হয়। প্রযুক্তির এহেন অভূতপূর্ব উন্নতি সমাজকে যেমন প্রভাবিত করেছিল তেমনই সাহিত্যে তার প্রতিফলন লক্ষিত হয়েছিল। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে 'বিজ্ঞান-দর্পণ' পত্রিকায় দুই কিস্তিতে প্রকাশিত হেমলাল দত্তের 'রহস্য' গল্পের মধ্যে এই উন্নত প্রযুক্তির একটি ছবিই দেখতে পাওয়া যায়। এই গল্পে দেখা যায়— প্রধান চরিত্র নগেন্দ্র বিলেতে গিয়ে তার এক বন্ধু হার্ভির বাড়িতে আমন্ত্রিত হয়। সেই বাড়িতে গিয়ে নগেন্দ্র স্বয়ংক্রিয় ডোরবেল, বার্গার অ্যালার্ম, কোট থেকে ধুলো ঝাড়ার স্বয়ংক্রিয় মেশিনসহ আরও অনেক যন্ত্রের সম্মুখীন হয় এবং বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা লাভ করে। কল্পবিজ্ঞান গবেষক ও লেখক সিদ্ধার্থ ঘোষ এই রচনাটিকে প্রথম বাংলা কল্পবিজ্ঞান হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

> "১২৮৯ বঙ্গাব্দে (১৮৮২-তে) 'শ্রী যোগেন্দ্র-নাথ সাধু কর্তৃক জোড়াসাঁকো ৫নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি হইতে প্রকাশিত ও 'সচিত্র বিজ্ঞান দর্পণ' পত্রিকায় দুই কিস্তিতে মুদ্রিত হেমলাল দত্ত রচিত 'রহস্য' গল্পটি শুধু প্রাচীনত্বেই নয়, বিষয়গৌরবে ও লিপিকুশলতায় একাধারে বাংলা এস.এপথ-এর প্রথম প্রতিনিধিত্বমূলক নিদর্শন। 'একদা বিজ্ঞান আমাকে অজ্ঞান বাঙালি পাইয়া কিরূপ দুর্গতি করিয়াছিল তাহা বলিতেছি, শুনিয়া আপনাকে কাঁদিতে হইবে।'– প্রথম পরিচ্ছেদে লন্ডন প্রবাসী নগেন্দ্রের এই উক্তি সত্ত্বেও এটি হাস্যরসাত্মক কাহিনী। শিল্প-বিপ্লবের প্রাথমিক উন্মাদনা কমে আসার পর জীবনযাত্রার অতিযান্ত্রিকীকরণের উৎপাত নিয়ে হিথ রোবিনসনের উদ্ভট কলকব্জার বিচিত্র দৃশ্য জগতেরই যেন সাহিত্যিক প্রতিচ্ছবি এই গল্পটি। গ্যালভানিক ব্যাটারি ও বহু যন্ত্রকৌশল সমৃদ্ধ সাহেব বন্ধু 'হার্বি'-র স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় ভরপুর বাড়িতে এক দিনের অতিথি এই বঙ্গ-সন্তানের ভুল করে পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধাকে তার শয্যাসঙ্গী হিসাবে আমন্ত্রণ এবং বহু বিঘ্ন পার হয়ে অব্যাহতি লাভের এই সরস ও উপভোগ্য কাহিনীর মধ্যে নিহিত কটাক্ষ অসতর্ক পাঠকের পক্ষেও লক্ষ না ক'রে উপায় নেই।"[৩]

সমগ্র গল্পটির মধ্যে বিজ্ঞানের বদলে প্রবল হাস্যরসের আবেদনই অধিক লক্ষিত হয়ে থাকে। পূর্বে উল্লেখিত কল্পবিজ্ঞানের সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞাটিকে সামনে রেখে রচনাটিকে বিচার করলে দেখা যায়, এই কাহিনিতে বিজ্ঞান ও উন্নত যন্ত্রের প্রভূত বর্ণনা থাকলেও ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির কল্পনা এতে অনুপস্থিত। কারণ এই গল্পে যে সকল যন্ত্রের উল্লেখ আছে তৎকালীন যুগে সেগুলির আবিষ্কার হয়ে গেছে এবং বিদেশে তখন সেগুলির যথেষ্ট প্রচলন ছিল। প্রখ্যাত সাহিত্যিক অনীশ দেব তাঁর 'ইউ এফ ও' প্রবন্ধে এই কাহিনি সম্পর্কে বলেছেন—

> "রহস্য গল্পটি পড়ার পর সিদ্ধার্থের সঙ্গে একমত হওয়া মুশকিল...গল্পটি যে কোনভাবেই কল্পবিজ্ঞানের শ্রেণিতে পড়তে পারে না, তার আরও একটা কারণ হল, গল্পের যাবতীয় যন্ত্রপাতি কোনোটাই কাল্পনিক বা ফিউচারিস্টিক নয়। ঠিক একই কারণে চার্লি চ্যাপলিনের মর্ডান টাইমস সিনেমাটি সায়েন্স ফিকশন সিনেমার শ্রেণিতে পড়ে না। বহু গল্প-উপন্যাসে প্রমাণিত এবং প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানকে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু সেগুলি কল্পবিজ্ঞান নয়"[৪]

ফলে 'রহস্য' রচনাটি গুরুত্বপূর্ণ হলেও এটি যথার্থ কল্পবিজ্ঞান নয়। এবার আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর রচনা 'নিরুদ্দেশের কাহিনী' প্রসঙ্গে এলে জানা যায়, এই রচনাটি কুন্তলীন প্রতিযোগিতায়[1] প্রথম স্থান অর্জন করে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে 'কুন্তলীন পুরস্কার' নামক গল্পসংগ্রহে প্রকাশিত হয়েছিল। লেখক 'নিরুদ্দেশের কাহিনী' শিরোনামের সঙ্গে সাব-টাইটেল যুক্ত করেছিলেন 'বৈজ্ঞানিক-রহস্য'-এই দুটি শব্দ। সায়েন্সের সঙ্গে ফিকশন অথবা ফ্যান্টাসিকে যুক্ত করে সায়েন্স ফিকশন (Science Fiction) অথবা সায়েন্স ফ্যান্টাসি (Science Fantasy) এই শব্দবন্ধগুলির ইংরেজি ভাষায় আবির্ভাবের বহু পূর্বেই তিনি সচেতনভাবে বাংলাকে এই পরিভাষা উপহার দিয়েছেন। কাহিনিটি দুটি অংশে বিভাজিত, প্রথম অংশে দেখা যায়— কলকাতায় একটি প্রবল ঘূর্ণি ঝড়ের পূর্বাভাস থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত কোনও এক অজানা কারণে সেটি হয় না, ভুল সতর্কতা প্রকাশ করার জন্য সরকারী আবহাওয়া দফতরকে প্রবল জনরোষের সম্মুখীন হতে হয়। দ্বিতীয় অংশে কথক

[1] কুন্তলীন প্রতিযোগিতা- বাঙালি শিল্পপতি হেমেন্দ্রমোহন বসু ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে নিজের 'কুন্তলীন' কেশতেল এবং এসেন্স 'দেলখোস'এই দুটি দ্রব্য প্রচারের জন্য একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন, শর্ত ছিল গল্পের সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রেখে এমনভাবে এই দুই দ্রব্যের মধ্যে কোন একটির প্রসঙ্গ নিয়ে আসতে হবে যাতে তা যেন বিজ্ঞাপন বলে মনে না হয়।

জানান যে— তিনি ডাক্তারের নির্দেশে চিকিৎসার কারণে জাহাজে করে ২৮ তারিখ লঙ্কার দিকে যাত্রা করেছিলেন, ১ তারিখ মাঝ সমুদ্রে জাহাজের সবাই প্রচণ্ড ঝড়ের মুখোমুখি হলে তিনি এক শিশি কুন্তল-কেশরী নামক গন্ধতেল সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন, তারপর সেই তেলের পৃষ্ঠটানের[2] (Surface Tension) প্রভাবে সমুদ্রের ঢেউ কমে যায় আর সব যাত্রী আসন্ন সাইক্লোনের কবল থেকে রক্ষা পায়। ঘটনাটি এইরূপ—

> "বৈজ্ঞানিক কাগজে ঢেউয়ের উপর তৈলের প্রভাব সম্প্রতি পড়িয়াছিলাম। তৈল যে চঞ্চল জলরাশিকে মসৃণ করে এ বিষয়ে অনেক ঘটনা মনে হইল...অমনি আমার ব্যাগ হইতে তৈলের শিশি খুলিয়া অতি কষ্টে ডেকের উপর উঠিলাম। জাহাজ তখন টলমল করিতেছিল। উপরে উঠিয়া দেখি, সাক্ষাৎ কৃতান্তসম পর্বতপ্রমাণ ফেনিল এক মহা ঊর্মি জাহাজ গ্রাস করিবার জন্য আসিতেছে। আমি 'জীব আশা পরিহরি' সমুদ্র লক্ষ্য করিয়া 'কুন্তল-কেশরী' বাণ নিক্ষেপ করিলাম। ছিপি খুলিয়া শিশি সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। মুহূর্তমধ্যে তৈল সমুদ্রে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ইন্দ্রজালের প্রভাবের ন্যায় মুহূর্তমধ্যে সমুদ্র প্রশান্ত মূর্তি ধারণ করিল। কমনীয় তৈল স্পর্শে বায়ুমণ্ডল পর্যন্ত শান্ত হইল। ক্ষণপরেই সূর্য দেখা দিল। এইরূপে আমরা নিশ্চিত মরণ হইতে উদ্ধার পাই ...কত সহস্র প্রাণী যে এই সামান্য এক বোতল তৈলের প্রভাবে অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে?"[৫]

নিদারুণ হাস্যরসের সঙ্গে বিজ্ঞানের মিলন ঘটিয়ে সৃষ্টি করা জগদীশচন্দ্র বসুর এই কল্প-কাহিনিটি তাঁর প্রথম এবং শেষ ছোটগল্প। এক শিশি তেল ঢেলে একটি সামুদ্রিক ঝড়কে থামানো সম্ভব কিনা তা প্রশ্নসাপেক্ষ বিষয় হলেও কল্পবিজ্ঞানের সংজ্ঞাটিকে সামনে রেখে, কাহিনির নিয়ন্ত্রক হিসাবে বিজ্ঞানের ভূমিকাটি লক্ষ করলেই রচনাটিকে কল্পবিজ্ঞান আখ্যা দেওয়া যায়। প্রায় পঁচিশ বছর পরে লেখক 'অব্যক্ত' (১৯২১) নামক সংকলনগ্রন্থে এই কাহিনিটির খানিক পরিমার্জনা করে 'পলাতক তুফান' নাম দিয়ে পুনরায় প্রকাশ করেন। অনীশ দেব এই গল্পটিকে প্রথম বাংলা কল্পবিজ্ঞান রচনার মর্যাদা দিয়েছেন—

> "বিজ্ঞানের নিয়ন্ত্রণী ভূমিকার এই মৌলিক শর্তটি প্রয়োগ করে বাংলাভাষায় কল্পবিজ্ঞানের সূচনা ১৮৯৬ সালে, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর কলমে। কুন্তলীন পুরস্কার প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে তাঁর 'নিরুদ্দেশের কাহিনী' গল্পটি।"[৬]

এবার জগদানন্দ রায়ের 'শুক্র-ভ্রমণ' কাহিনি প্রসঙ্গে জানা যায়, ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের 'প্রাকৃতিকী' গ্রন্থে এই রচনাটি প্রথমবার প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই গ্রন্থের নিবেদন অংশে তিনি জানিয়েছেন যে—

> "নানা মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত আমার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলী হইতে কতকগুলিকে লইয়া 'প্রাকৃতিকী' রচিত হইল; ইহাতে কয়েকটি অপ্রকাশিত নূতন প্রবন্ধও স্থান পাইয়াছে। 'শুক্রভ্রমণ' প্রভৃতি দুই তিনটি প্রবন্ধ প্রায় বাইশ বৎসর পুর্ব্বের রছনা; তখন সাহিত্যচর্চা আরম্ভ করিয়াছি মাত্র।"[৭]

লেখকের বক্তব্য অনুসারে বাইশ বছর আগে, অর্থাৎ ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তিনি এই কাহিনিটি রচনা করেছেন এবং তা সেই সময়ের কোনও একটি পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছিল। কিন্তু কবে এবং কোথায় প্রকাশ পেয়েছিল সেই সম্পর্কে তিনি কোনও তথ্য প্রদান করেন নি। পরবর্তী সময়ে কোনও গবেষকও সেই

---

[2] **পৃষ্ঠটান** –একটি কাঁচদণ্ড জলে ডুবিয়ে তুলে আনলে দেখা যায় কিছু জল দণ্ডের গায়ে লেগে আছে, কারণ জলের ফোঁটার পৃষ্ঠতলে বল ক্রিয়া করে যা তরলের একটি বিশেষ ধর্ম, একেই পৃষ্ঠটান বলে।

তথ্য উদ্ধার করতে পারেন নি, উপরন্তু কাহিনিতে শুক্রগ্রহ ও তার বাসিন্দাদের বর্ণনা থাকার কারণে অনেকেরই ধারণা হয় এটি প্রখ্যাত সাহিত্যিক এইচ. জি. ওয়েলসের (H.G. Wells) ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'ওয়ার অব দ্যা ওয়ার্ল্ডস' (War of The Worlds) রচনাটি থেকে অনুপ্রাণিত। এহেন অবস্থায় আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর 'নিরুদ্দেশের কাহিনী'-কেই প্রথম বাংলা কল্পবিজ্ঞান রচনা আখ্যা দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত ছিল। কিন্তু কিছু বছর আগে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে জানা যায় যে, তাঁর এই গল্পটি 'ভারতী' পত্রিকায় প্রথমবার প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর বাংলার কল্পবিজ্ঞান প্রকাশনা সংস্থা কল্পবিশ্ব নিজস্ব উদ্যোগে জার্মানির হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রিপোসিটারি থেকে ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'ভারতী' পত্রিকার উনিশতম বর্ষের দুটি সংখ্যা উদ্ধার করে, যেখানে এই গল্পটির প্রকাশের প্রমাণ পাওয়া গেছে।

'শুক্র-ভ্রমণ'-এর কাহিনিটি হল—গল্পের কথক ও তাঁর বন্ধু শুক্র গ্রহের বিষয়ে কথা বলতে বলতে আচমকা সেখানে হাজির হয়ে যান, তারপর তাদের সঙ্গে সেখানকার অধিবাসীদের দেখা হয়, শুক্রের অন্ধকার অংশে কিছুদিন কাটানোর পর তারা গ্রহের আলোকময় অঞ্চলের দিকে যাত্রা করেন। পথে মানুষের মতো দেখতে জীবদের কাছে তারা জানতে পারেন আলোকিত শুক্রের বাসিন্দারা পৃথিবীর থেকে বহুগুণে উন্নত। শেষে কথকের ঘুম ভেঙে যায় এবং তিনি আবিষ্কার করেন সবটাই একটা স্বপ্ন ছিল। জগদানন্দ শান্তিনিকেতনের বিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন এবং তাঁর রচিত 'পপুলার সায়েন্স' গ্রন্থমালা বেশ বিখ্যাত ছিল। ফলে কাহিনিটি স্বপ্ন-দর্শন হলেও একজন বিজ্ঞান সচেতন মানুষ হিসাবে লেখক শুক্র গ্রহের পরিবেশের বর্ণনা, সেখানকার অধিবাসী জীবদের দৈহিক গঠন ইত্যাদির যুক্তিসঙ্গত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। জগদানন্দের বর্ণনা অনুসারে— সেখানকার বাসিন্দাদের দেহ ঘন কালো লোমে আবৃত ছিল, তাদের মাথাটি দেহের তুলনায় বড় ছিল, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি ছিল দীর্ঘ নখযুক্ত এবং তারা ছিল সম্পূর্ণ নগ্ন । এছাড়াও গ্রহের আকাশের বর্ণনা, অন্ধকার অংশের বাসিন্দাদের আফ্রিকার মতো বনমানুষজাতীয় জীব আর আলোকিত অংশের অধিবাসীদের পাশ্চাত্যের ন্যায় উন্নত প্রজাতি হিসাবে উপস্থাপন করা, গ্রহের বাসস্থান এবং খাদ্যের বিকল্প উপাদান সংগ্রহ প্রভৃতি বিষয়গুলিকে লক্ষ করলে এই রচনাটিকে নিঃসন্দেহে কল্পবিজ্ঞান রচনার শ্রেণিভুক্ত করা যায়।

অতঃপর যাবতীয় তথ্য বিশ্লেষণ করে এই সিধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, জগদীশচন্দ্র বসুর 'নিরুদ্দেশের কাহিনী'-কে অনীশ দেবসহ বহু গবেষক ও লেখক বাংলাভাষায় রচিত প্রথম কল্পবিজ্ঞান কাহিনির মর্যাদা দিলেও সাম্প্রতিককালে প্রাপ্ত প্রমাণের নিরিখে দেখা যাচ্ছে 'শুক্র-ভ্রমণ' আলোচ্য গল্পের একবছর আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। উভয় কাহিনিকে গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সংজ্ঞা অনুসারে কল্পবিজ্ঞান রচনা হিসাবে 'নিরুদ্দেশের কাহিনী'-এর চেয়ে 'শুক্র-ভ্রমণ' কোনও অংশেই কম নয় বরং কিছু ক্ষেত্রে তা আরও এগিয়ে আছে। কাজেই বাংলার প্রথম কল্পবিজ্ঞান রচনা হিসাবে 'শুক্র-ভ্রমণ' এবং প্রথম লেখক হিসাবে জগদানন্দ রায়কে গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত বলে বোধ হয়।

তথ্যসূত্র:

১) চট্টোপাধ্যায়, হীরেন। সাহিত্য প্রকরণ। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, সেপ্টেম্বর ২০১২, কলকাতা, পৃ. ২৬৭।
২) দেব, অনীশ, সম্পাদনা। সেরা কল্পবিজ্ঞান, কল্পবিজ্ঞান প্রসঙ্গে। আনন্দ পাবলিশার্স, ১ আগস্ট, ১৯৯১, কলকাতা।

৩) ঘোষ, সিদ্ধার্থ। "সায়েন্স ফিকশন একটি পরিভাষার জন্ম।" কল্পবিশ্ব, https://kalpabiswa.com/article/সায়েন্স-ফিকশন-সিদ্ধার্থ-ঘোষ। প্রবেশের তারিখ ৩ মার্চ, ২০২৬।

৪) চট্টোপাধ্যায়, অনিন্দ্য, সম্পাদনা। ইউএফও, প্রতিদিন রোববার, প্রতিদিন প্রকাশনী, ১৯ অক্টোবর, ২০১৪, কলকাতা, পৃ. ৩৬।

৫) দেব, অনীশ, সম্পাদনা। সেরা কল্পবিজ্ঞান, কল্পবিজ্ঞান প্রসঙ্গে। আনন্দ পাবলিশার্স, ১ আগস্ট, ১৯৯১, কলকাতা, পৃ. ১৫।

৬) তদেব, কল্পবিজ্ঞান প্রসঙ্গে।

৭) বাগ, সন্তু ও ঘোষ, দীপ সম্পাদনা। কল্পবিজ্ঞান প্রবন্ধ সংগ্রহ। কল্পবিশ্ব পাবলিকেশন, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০২৩, কলকাতা, পৃ.৭০।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1165-1171
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.335

শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য-আন্দোলনের ধারায় গল্পকার বলরাম বসাক

রাজেশ কর্মকার, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, অসম, ভারত*

Received: 15.03.2026; Accepted: 18.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The short story is one of the newest forms of Bengali literature. Since its early stage of development, it has undergone various changes with the passage of time. These changes have sometimes occurred in terms of theme and subject matter and sometimes in terms of form and narrative technique. Among the factors that accelerated these transformations, literary movements played an important role. If we examine the history of Bengali literature, we can see that different literary movements emerged at different times and influenced the course of literature. In this context, one of the most significant literary movements is the Shastrabirodhi movement. It was mainly a short story–centered literary movement. In 1962, several writers such as Ramanath Ray, Shekhar Basu, Subrata Sengupta, Kalyan Sen, Ashis Ghosh and later Balaram Basak, Amal Chand and Sunil Jana initiated this movement around the magazine Ei Doshok.

The main objective of this movement was to break away from the conventional literary tradition and introduce a new approach to short story writing. Instead of giving importance to the traditional plot or storyline, the movement emphasized the writer's ideas, thoughts and inner experiences. One of the notable writers associated with this movement was Balaram Basak. However, he was not involved in the movement from the beginning; he joined later through the sixth issue of the magazine Ei Doshok, which served as the mouthpiece of the movement. In this magazine he wrote a total of eleven short stories. The present paper will mainly focus on those stories. It will also attempt to examine their literary value and significance in the context of the Shastrabirodhi movement and evaluate their relevance in contemporary literary discussion.

Keywords: Shastrabirodhi movement, Ei Doshok, Short Story, Structure, Literary Value

সাহিত্য আন্দোলন যেকোনো সাহিত্যের ইতিহাসে খুবই গুরত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। কারন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় এই সাহিত্য আন্দোলনের ফলে সাহিত্যের গতিমুখ, প্রকৃতি, গঠন সমস্ত কিছু বদলে যায়। এমনকি প্রচলিত সাহিত্যধারা ভেঙ্গে একটা নতুন সাহিত্যধারার সৃষ্টি হয়। তাই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনের সুরে তাল মিলিয়ে সংগঠিত হয়েছে এই সাহিত্য আন্দোলনগুলি। ইউরোপীয় সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম এই সাহিত্য আন্দোলনের সূচনা হয়। পরবর্তীকালে ক্রমে বাংলা সাহিত্যে এই আন্দোলনের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। সেইরকমই বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে বাংলা সাহিত্যে সংগঠিত হওয়া একটি গুরত্বপূর্ণ সাহিত্য আন্দোলন হল 'শাস্ত্রবিরোধী' আন্দোলন। শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন ছিল মূলত একটা গল্প আন্দোলন। ষাটের দশকে সেইসময় কিছু লেখকের

আবির্ভাব হয়েছিল, যাঁরা গল্প রচনার ক্ষেত্রে একটা নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করতে চেয়েছিল। বস্তুতপক্ষে তাঁরা গল্প রচনার জন্য প্রচলিত ধ্যান ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে নতুন ধারা অবলম্বন করেছিল। যা পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যে শাস্ত্রবিরোধী গল্প আন্দোলন হিসেবে পরিচিতি পায়।

শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের সুর তৈরি হয় 'বিদিশা' নামক পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। পরবর্তীকালে শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের মুখপত্র হিসেবে 'এই দশক' পত্রিকা আবির্ভাব ঘটে। ১৯৬২ সালে রমানাথ রায়ের নেতৃত্বে কিছু তরুণ লেখকগণ এপ্রিল মাসে 'এই দশক' পত্রিকার প্রথম বুলেটিন প্রকাশ করেন। তবে এই বুলেটিন প্রকাশের সময় এই দলে কিছু কবিও ছিলেন। তাই এই বুলেটিনগুলোতে প্রকাশিত হয়েছিল গল্প, কবিতা এবং অনেক সমালোচনামূলক লেখা। এছাড়াও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? এই চিন্তা ভাবনা উল্লেখ্য ওই বুলেটিনে প্রকাশিত হয়েছিল। তবে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত রমানাথ রায়ের নেতৃত্বে 'এই দশক' পত্রিকার ৯টি বুলেটিন সংখ্যা প্রকাশ হওয়ার পরে, এই সংখ্যার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থাকা কবিরা আলাদাভাবে ১৯৬৫ সালে 'শ্রুতি' নামক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় মূলত কবিতা ও কবিতা বিষয়ক অন্যান্য লেখালেখি প্রকাশিত হতো। অন্যদিকে ১৯৬৬ সালে কিছু গল্পকার মিলে 'এই দশক' পত্রিকা নতুন ভাবে প্রকাশ করেন।

১৯৬৬ সাল থেকে প্রথম কয়েক বছর 'এই দশক' পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু শেষের দিকে এই পত্রিকার প্রকাশ ক্রমশ অনিয়মিত হয়ে পড়ে। ১৯৮১ সাল পর্যন্ত 'এই দশক' পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। ১৬ বছরে মোট ২৪টি সংখ্যা বের হয়েছিল। 'এই দশক' পত্রিকার প্রথম সংকলনে মোট পাঁচজন লেখকের পাঁচটি গল্প প্রকাশিত হয়। যেমন- ক) সুব্রত সেনগুপ্ত– 'চারিদিকে', খ) রমানাথ রায়- 'বলার আছে', গ) শেখর বসু– 'অন্ধকার থেকে', ঘ) কল্যাণ সেন- 'সমুদ্র', ঙ) আশিস ঘোষ– 'আহ্বানে'। এছাড়াও 'এই দশক' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকীয় লেখা বের হয়েছিল 'শাস্ত্রবিরোধী ছোটগল্প' শিরোনামে। এই শিরোনামেই শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য উল্লেখ ছিল যে—

> "সময় হয়েছে যা কিছু পুরনো তাকে বর্জন করবার, সময় হয়েছে যা কিছু নতুন তার জন্য প্রস্তুত হবার। আলমারি থেকে সব বই নামিয়ে ফেলো। আমাদের জন্য এবার একে একে তাকগুলো খালি করে দাও। তথাকথিত মহৎ উপন্যাস এবং গল্পগুলোকে তাড়াতাড়ি ট্যাঙ্কে পুরে ফেলো। ওগুলো আর দরকার নেই। ওগুলো এখন আবেদনহীন এবং বিরক্তিকর।মনে রেখো আর্তোর সেই বিখ্যাত উক্তি: Masterpieces of the past are good for the past, not good for us."[১]

এই দশক পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদে 'শাস্ত্রবিরোধী' ছোটগল্পের স্বরূপ প্রকাশক চারটি সংকল্প[২] বাক্যের উল্লেখ পাওয়া যায়—

১) গল্পে আমরা আমাদের কথাই বলব।
২) আমরা এখন বাস্তবতায় ক্লান্ত।
৩) অতীতের মহৎ সৃষ্টি অতীতের কাছে মহৎ আমাদের কাছে নয়।
৪) গল্পে এখন যারা কাহিনি খুঁজবে তাদের গুলি করা হবে।

প্রচ্ছদে সংকলিত চারটি বাক্যের প্রথম বাক্য দুটি 'এই দশকের' লেখকদের রচনা। তৃতীয় বাক্যটি পূর্ব উল্লিখিত সম্পাদকীয় নিবন্ধে ব্যবহৃত আর্তোর ইংরেজি উদ্ধৃতির বাংলা অনুবাদ। আর চতুর্থটি নেওয়া হয়েছে মার্ক টোয়েনের লেখা 'The adventures of Huckleberry Finn' গ্রন্থ থেকে। সেই গ্রন্থে বলা ছিল—

> "এই কাহিনীর ভেতর থেকে কেউ যদি কোনও উদ্দেশ্য টেনে বার করার চেষ্টা, তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হবে; গল্প থেকে কেউ যদি নীতিগর্ভ কিছু খুঁজে বার করার চেষ্টা করে, তাকে নির্বাসনে পাঠানো হবে; আর রচনাটির মধ্যে কেউ যদি চক্রান্ত খোঁজার চেষ্টা করে তাকে গুলি করা হবে।"[৩]

অর্থাৎ শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনকারীদের মূল কথা হল গল্পের মধ্যে কাহিনি বা প্লট খুঁজলে হবে না, গল্প হবে লেখকের মনের বহিঃপ্রকাশ। যেখানে থাকবে না কোনো নিটোল কাহিনি, নিটোল ঘটনা, থাকবে শুধু লেখকের স্বাধীনতা ও অবাধ চিন্তার প্রকাশ।

শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের যেসমস্ত লেখকগন ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম একজন হলেন বলরাম বসাক। শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের মুখপত্র 'এই দশক' পত্রিকার যে ২৪ টি সংখ্যা বের হয়েছিল তার মধ্যে ষষ্ঠ সংখ্যা থেকে বলরাম বসাক এই শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ষষ্ঠ সংখ্যা থেকে ১৭ সংখ্যা পর্যন্ত বলরাম বসাক 'এই দশক' পত্রিকায় মোট ১১টি গল্প রচনা করেন। বলরাম বসাক ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসের ১০ তারিখে বাংলাদেশের ঢাকা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ব্যক্তিগতভাবে শৈশব জীবন তাঁর মোটেই ভালো ছিল না। সেই সময়ে বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ছিল বিশৃঙ্খলাময়। আর এই বিশৃঙ্খলাতার শিকার হন তিনি। ১৯৪৬ সালে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল, সেই দাঙ্গার প্রভাবে বাংলাদেশের বহু মানুষ বাংলাদেশ ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন। এছাড়াও, ১৯৪৭ সালে দেশভাগ হলে দেশভাগের পরিপ্রেক্ষিতে অনেককে তদানীন্তন এদেশে চলে আসতে হয়। এই 'দেশভাগ-দাঙ্গা-উদ্বাস্তু' সমস্যা তাদের পারিবারিক জীবনে প্রভাব ফেললেও, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল গান্ধীজির মৃত্যু। দেশভাগের মতো সময়ে সমাজের অবস্থা ছিল একেবারে শোচনীয়, ঠিক এই মুহূর্তে গান্ধীজির মৃত্যু যেন ওই অবস্থাকে আরও কঠিন থেকে কঠিনতর করে তোলে। লেখক বলরাম বসাক ঠিক এই সময়ে দাদুর সঙ্গে গিয়েছিলেন নারায়ণগঞ্জে। তবে নারায়ণগঞ্জ থেকে তাঁদের আর পুনরায় ঢাকা শহরে ফেরা হয়নি। তাঁরা যেদিন নারায়ণগঞ্জ আসেন তার পরেরদিনই গান্ধীজির মৃত্যু ঘটে। গান্ধীজির মৃত্যুর ফলে সমগ্র বাংলাদেশের রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে যায়। ফলত তাঁরা পুনরায় ঢাকাতে ফিরে না যেতে পেরে উদ্বাস্তু হয়ে কলকাতা শহরের উপকণ্ঠে এসে ভিড় জমায়। আর এর ফলেই পরবর্তীকালে তাঁরা এই কলকাতা শহরে বসবাস করতে শুরু করে।

বলরাম বসাকের শিক্ষা জীবন বাংলাদেশে শুরু হলেও কলকাতাতে এসে তার একটা ভিত্তি স্থাপিত হয়। কলকাতাতেই তিনি স্কুলে ভর্তি হন এবং এর পরবর্তীকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. কম পাস করেন। শিক্ষাজীবনের পর বলরাম বসাকের কর্মজীবন শুরু হয় খুব স্বাভাবিকভাবে শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে সান্ধ্য বিভাগে এমএ কম পড়তে পড়তেই দেশপ্রাণ স্কুলের অবৈতনিক শিক্ষকতা শুরু করেন ১৯৬৩ সাল থেকে। ১৯৬৬ সাল থেকে সব বেতনে শিক্ষকতা শুরু করেন। এর পরবর্তীকালে ১৯৭৭ এর মাঝামাঝি ঠাকুর পুকুরের বিবেকানন্দ কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। ওখান থেকেই ২০০৩ এ মার্চ মাসে অবসর গ্রহণ করেন।

বলরাম বসাকের সাহিত্যচর্চার আবির্ভাব মূলত স্কুলে পড়াশোনার সময় থেকে। তিনি মূলত স্কুল ম্যাগাজিনে ছড়া লিখতেন। পরে তিনি কলেজে ওঠার সময় কলেজ ম্যাগাজিনে প্রথম গল্প লেখেন। আর এই গল্প লেখার পর সকলের কাছে প্রশংসনীয় হয়ে উঠলে পরবর্তীকালে গল্প রচনায় মনোনিবেশ করেন। তবে প্রথম দিকে তিনি প্রচলিত ধারায় গল্প লিখেছেন। প্রথাগত গল্পচর্চার বাইরে তিনি নতুন ধরনের গল্প লেখা শুরু করেন বিমল করের 'ছোটগল্প নূতন রীতি' আন্দোলনকে দেখে। তাই এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

> "একদিন শ্রীবিমল করের সম্পাদনায় 'ছোটগল্প নতুন রীতি' আর তার আন্দোলন দূর থেকে লক্ষ্য করলাম। একটু ভাবিতও হলাম। ভাবতে ভাবতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার আসরে নেমে গেছি। নতুন ধরনের গল্প লিখতে শুরু করেছি। একদিন শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্যিক বন্ধুরা আমাকে ডাকল তাদের কাছে। কিন্তু আমি আমার ভাবনাচিন্তা নিয়েই তাদের সঙ্গে ছিলাম।"[৪]

অর্থাৎ এইভাবে বলরাম বসাক নতুন ধরনের গল্পলেখক ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনকার হিসেবে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করেন।

আলোচনার প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বলরাম বসাক শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের মুখপত্র 'এই দশক' পত্রিকায় মোট এগারোটি গল্প লিখেছেন। তাঁর 'এই দশক' পত্রিকায় লেখা প্রথম গল্প হল 'নিষেধ'। নিষেধ গল্পটি এই দশক পত্রিকার ষষ্ঠ সংখ্যায় বের হয়। গল্পটির মধ্যে কোনো সম্পূর্ণ নিটোল কাহিনি নেই। ক্ষুদ্র কাহিনির উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, আবার গল্পটির মধ্যে কোন চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ সেই অর্থে লক্ষ করা যায় না। সম্পূর্ণ গল্পটি কথকের উত্তম পুরুষের বয়ানে লেখা। গল্পের নামকরণ নিষেধ থেকে বোঝা যায় যে কোনো বাধা বা নিষেধের কথা বলা হয়েছে। গল্পের কথক ছোটো থেকেই গাছ-পালা, পশু-পাখি এদের অনায়াসে দেখে এসেছে। তবে ছোটো থেকে অনেক কিছু ঘটনার ক্ষেত্রে কথকের মা কথককে বাধা প্রদান করেছে। যেমন— মিথ্যা কথা না বলা, দুপুরে ছাদে ঘুড়ি ওড়ানো, আবার খারাপ বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা না করা। তবে কোনো কিছুর দিকে তাকানোর ক্ষেত্রে তার মা কোনদিন তাকে বারণ করেনি। তাই অবলীলাক্রমে সে সব কিছুর দিকে তাকিয়েছে। তবে একদিন সে একটা মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। কারণ সাবলীলভাবে তাকিয়ে থাকা তার জীবনের অভ্যাস। আর এই দৃষ্টি সমাজের চোখে অপরাধমূলক, তাই তার সামনেই নেমে আসে আক্রমণ—

> "একটা মস্ত বড় হাত, বেশ বড় রোমশ—। একটা যুবকের হাত আমার কলার চেপে ধরল। ওর গায়ে বেশ জোর। কারণ আমার জামাটা ছিঁড়েছ।"[৫]

গল্প কথকের উপর নেমে আসা আঘাত কোথাও যেন তার অবাধ দৃষ্টির উপর প্রশ্ন তোলে। তাকে ভাবতে বাধ্য করে যে তাকানোর ক্ষেত্রেও অনেক নিষেধ আছে। পরবর্তীকালে কথক আবার অনুভব করে কারো পশ্চাদে দৃষ্টি বিচরণ করলে কোন সমস্যা হচ্ছে না। কারণ পশ্চাতে কারো চোখ থাকে না। কিন্তু একটা সময়ের পর কোথাও যেন তার কাল্পনিক জগতে একটা অস্বস্তির সৃষ্টি হয়। সে বুঝতে পারছে যে পশ্চাতেও তাকানো উচিত নয়, কারণ সেখানেও সে নিষেধের মাত্রা অনুভব করছে। অর্থাৎ এইভাবে কাল্পনিক জীবনের সঙ্গে বাস্তবিক জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে গল্পের অন্তিম মুহূর্ত পর্যবসিত হয়।

'নিষেধ' গল্পটি শুধুমাত্র কথক তথা আমির অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনার বহিঃপ্রকাশ। তাছাড়া—

> "বস্তুপৃথিবীর মূর্ত বাস্তব সমস্যা এই গল্পে লেখক এর অবলম্বন নয়, বস্তুপৃথিবী লেখকের মনে যে বাস্তবতার জন্ম দিয়েছে তারই আবেগময় প্রকাশ 'নিষেধ'।"[৬]

বলরাম বসাক এই গল্পে বেশ কিছু বাক্যকে এমন ভাবে ব্যবহার করেছে যার মধ্যে দিয়ে একটা প্রবাহমানতা সৃষ্টি হয়েছে। তিনি কোথাও যেন প্রচলিত ভাবনাগুলোকে এমনভাবে গল্পে ব্যবহার করেছেন তা নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করেছে। তাই এই গল্প চিরাচরিত পাঠের অভ্যাসের বসে রস আস্বাদন করা যায় না, একটা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ এর মধ্য দিয়ে গল্পের রসাস্বাদন লাভ করতে হয়।

বলরাম বসাকের শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন পর্যায়ের যে গল্পটি খুব জনপ্রিয়তা পেয়েছিল সেটি হল 'কার্পেট'। 'কার্পেট' গল্পটি 'এই দশক' পত্রিকায় অষ্টম সংকলনে বের হয়। বলরাম বসাক গল্প রচনার ক্ষেত্রে তিনি শব্দ

ও আঙ্গিক কে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই তিনি শব্দ দিয়ে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। আর এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্যতম ফসল হলো 'কার্পেট' গল্পটি। নিম্নে গল্পটির একটি অংশ তুলে ধরা হল —

"ফুল পাতা ফুল পাতা পাতাপাতা ফুলফুল পাতা
ফুল পাতা পাতা ফুলফুল পাতা ফুল ফুল
পাতা পাতা পাতা ফুল পাতা পাতা ফুল
ফুল ফুল ফুল পাতা ফুল বেড়া
লতাপাতাপাতা পাতাফুল পাতা ফুলপাতা পাতাপাতা বেড়া
পাতা পাতা পাতা পাতা পাতা পাতা লাল পাতা পাতা
পাতাপাতাপা ফুল হাত পাতা
ফুল ফুল লাল
গালঠোঁটনাক বেড়।"[৭]

অর্থাৎ বলরাম বসাক তিনি বেশ কিছু শব্দকে পরপর সাজিয়ে একটা গল্পের রূপ দিতে চেয়েছেন। তবে এই গল্পেও কোনো নিটোল কাহিনি বা চরিত্রের বিকাশ পরিলক্ষিত হয় না। আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে থাকা কিছু শব্দকে সংগ্রহ করে তিনি একটা গল্পের রূপ দিয়েছেন। তবে এই গল্পের গঠন নিয়ে অনেক সমালোচনামূলক প্রশ্ন ওঠে। অনেকে বলতে চাই এটা গল্প নয়, একটি কবিতা। তবে শাস্ত্রবিরোধী গল্পের লেখকরা আগেই বলেন যে তারা গল্প বা কবিতার মধ্যে কোন পার্থক্য খোঁজেন না। প্রয়োজনে কবিতাও গল্প হয়ে ওঠে গল্পও কবিতা হয়ে ওঠে।

তাছাড়া গল্পটিকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখা যায় যে গল্পকার প্রকৃতির অনুষঙ্গ যেমন— ফুল, পাতা, ঘর, বাড়ি এই শব্দগুলি বারবার ব্যবহার করেছেন। তার পাশাপাশি বদ্ধ দেওয়াল ঘড়ি ইত্যাদি শব্দগুলি ও ব্যবহার করেছেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন আমাদের ব্যস্ততাময় জীবন। বর্তমান সময়ে এই ব্যস্ততা আমাদের জীবনকে একঘেয়ে করে তোলে, সেইরকম ভাবেই ওই একই শব্দ বারবার ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের একঘেয়ে জীবনের দিককেই ইঙ্গিত করেছেন। এছাড়া লেখক প্রকৃতির অনুসঙ্গ ও প্রকৃতির রং ব্যাপকভাবে গল্পের মধ্যে দিয়ে ব্যবহার করেছেন। তবে তিনি গল্পে এই রং ব্যবহারের প্রসঙ্গে জানিয়েছেন— রং হলো একটা বক্তব্য। লেখায় নানান রকম বক্তব্য থাকে, লেখায় নানান রকম রং প্রকাশ পায়। রং একটি আঙ্গিকের বক্তব্য রেখেছে, শিল্প করার জন্যই ওই আঙ্গিক এবং ঐ রং। অর্থাৎ লেখক এই রঙের মাধ্যমে বিভিন্ন বক্তব্যকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। তাই তাঁর গল্পে রং একটি প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।

বলরাম বসাকের দ্বাদশ সংকলনে প্রকাশিত একটি গল্প হল 'ডিম'। 'ডিম' গল্পটি ভিন্নভাবে ভিন্ন ধরনের দৃষ্টিকোণের মধ্যে দিয়ে গল্পকার উপস্থাপন করেছেন। এই গল্পেও আমরা সেই অর্থে কোন নিটোল কাহিনি বা পরিণত চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করি না। ডিমের হিসেব মেলানো নিয়ে গল্পে একটা সংখ্যাচক্রের সৃষ্টি হয়েছে। তবে লেখক হিসেবের সূত্র ধরে এই যে চক্র সৃষ্টি করছেন সেটা শুধুমাত্র নেহাত একটি সংখ্যাচক্র নয়।—

"২৫টা ডিম।— ১৩ থেকে ২৫ গেলে— ২৫ থেকে ১৩ গেলে— ১৩ আর ২৫। ২৫ থেকে ১৩ গেলে থাকে ১২৩৪...— ২৫ থেকে ১৩ গেলে থাকে ২৬ না ১২ না ১০ উহুঁ ১১ ১২ তা হলে।"[৮]

লেখক কোথায় যেন গল্পের মধ্যে সংখ্যাতত্ত্বের আলোকে আমাদের জীবনের কথাকে ব্যক্ত করেছেন। আমরা তো বর্তমান সময়ে একটা সংখ্যার মতো। আমাদের জীবনের চাওয়া–পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা এই সমস্ত হিসেবের নিরিখে কোথাও যেন আমরা একটা গণ্ডির মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। যেখানে একটা চক্রের মত আমরা প্রতিনিয়ত ঘুরছি, আমাদের বিশ্রাম নেই। যান্ত্রিক সভ্যতা আমাদের জীবনকে আরও যেন এক ঘূর্ণনচক্রের

ভিতর নিয়ে যাচ্ছে। লেখক এই প্রতীকের, ব্যঞ্জনার মাধ্যমে আমাদের জীবনের কথাকেই 'ডিম' গল্পের মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। আবার এই গল্পের আঙ্গিকের দিকটাও যদি দেখা যায়, সেখানে দেখা যায় এক ভিন্নরকম দৃষ্টিভঙ্গি। এই গল্পে লেখক একই শব্দ পরপর ব্যবহার করেছেন, আবার কয়েকটা সংখ্যাকে পরপর বসিয়ে একটা বাক্য নির্মাণ করেছেন। প্রত্যেক বাক্যের মাঝে কিছুটা জায়গা ফাঁকা রেখেছেন। অর্থাৎ কোথাও যেন লেখক পাঠককে নিজের চিন্তা ভাবনার জায়গা দিয়েছেন। আর এই সমস্ত দিকগুলি তাঁর গল্প ও গল্পের আঙ্গিকের ক্ষেত্রে একটা নতুনত্ব দান করেছেন।

বলরাম বসাকের লেখা আরেকটি গল্প হল 'গগল্‌স'। 'গগল্‌স' গল্পটি 'এই দশক' পত্রিকার সপ্তম সংকলনে বের হয়। আলোচ্য গল্পটিতে লেখক আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অন্যতম ইন্দ্রিয় চোখ সম্পর্কে উত্তম পুরুষের বয়ানে কিছু কথা বলেছেন। তবে সেখানে কথাগুলি নিটোল কাহিনির পরিবর্তে খুবই বিক্ষিপ্তভাবে উঠে এসেছে। তিনি গল্পের সূচনাতেই আয়নার সামনে নিজের চোখকে পর্যবেক্ষণ করছেন। আর এই পর্যবেক্ষণের সূত্রে তিনি কোথাও যেন বলতে চেয়েছেন চোখের ভিতরে চোখ এবং তার ভিতরে তারা ও তারার ভিতরে বিন্দু, বিন্দুর ভিতরে আবার চোখ, এইভাবে একটা চক্র সৃষ্টি করেছেন। যেমন—

> "টা কাছে নিয়ে এলাম। তাতে চোখ দুটো চোখের কাছে এল। চোখ দুটোর ভেতর একটা করে কটা রঙের মণি এবং মণির মাঝখানে একটা করে কালো বিন্দু। প্রত্যেক কালো বিন্দুতে মুখের একটা করে ছায়া। প্রত্যেক ছায়াই একজোড়া চোখ। প্রত্যেক চোখে কটা রঙের মণি। মণির মাঝখানে একটা করে কালো বিন্দু। প্রত্যেক বিন্দুতে আবার মুখের ছায়া। ছায়ায় আবার একজোড়া চোখ। চোখের মণি। মণিতে বিন্দু। বিন্দুতে।"[৯]

লেখক বলরাম বসাক চোখের এই চক্রের মাধ্যমে আগের গল্পের মতো একটা বৃত্ত বা গণ্ডিকে বোঝাতে চেয়েছেন। নাগরিক সমাজে মানুষের জীবন ঠিক কোথাও এই একই বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ। কারণ আমাদের জীবনের চাওয়া-পাওয়া, আশা-আখাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ এই সমস্ত কিছুর মধ্যে প্রতিনিয়ত জীবন ঘুরপাক খাচ্ছে। আর এই জীবনকে যদি আমরা দেখি তাহলে সব মানুষই প্রায় একই বৃত্তের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে।

লেখক এই গল্পে আরো একটি প্রসঙ্গের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি গগল্‌স এর কথা বলেছেন অনেকবার। সাধারণত গগল্‌স হচ্ছে চোখকে নিরাপত্তা দানকারী বস্তু। আর এই গগল্‌স বিভিন্ন রকমের হতে পারে। তাই লেখক কোথায় যেন এই গগল্‌সকে চাইছে। তবে এই চাওয়ার মধ্যে তিনি একটা দ্বন্দ্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি মানুষের জীবনের এক ভীষণ সত্যকে গগল্‌স এর মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। আমরা খালি চোখে যা দেখি চোখে চশমা লাগিয়ে সেই রকম দেখি না। অর্থাৎ আমাদের দেখার মধ্যে একটা পার্থক্য তৈরি হয়। বর্তমানে মানুষ কোথাও যেন খালি চোখে বাস্তবকে দেখতে অভ্যস্ত নয়। তারা গগল্‌স এর মাধ্যমে সমস্ত কিছুকে দেখতে চাই। তাই লেখক গল্পে এইসব মানুষকে ইঙ্গিত করেই এ গগল্‌স এর প্রয়োজনের প্রসঙ্গটি তুলে ধরেছেন। তাছাড়া এই গল্পের সামগ্রিক আলোচনা প্রসঙ্গে ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

> "স্যুররিয়ালিস্ট বা পরাবাস্তববাদীদের মতো বলরামের অবচেতন থেকে উঠে আসে এই গল্পের কাহিনি, হয়তো বা শৃঙ্খলাহীন উদ্ভট কল্পনা। আবার মনে হতে পারে এ গল্পের বর্ণনা কোন স্বপ্ন জগতের ঘুম আর জাগরণের মাঝে দাঁড়িয়ে লেখক বলে চলেছেন অনবরত এবং যা বলেছেন, যেমনভাবে বলেছেন শেষ পর্যন্ত তাই গল্প হয়ে উঠেছে।"[১০]

উপরিউক্ত গল্পগুলি ছাড়াও বলরাম বসাক 'এই দশক' পত্রিকায় 'কফি হাউস: Caution Speed Breaker Ahead', 'পদ্মফুল', 'চুনকালি', 'আমি' প্রভৃতি গল্পগুলি রচনা করেন। 'কফি হাউস: Caution Speed Breaker' গল্পে লেখক কথোপকথনের সূত্রে বিভিন্ন রকমের প্রসঙ্গের কথা বলেছেন। এককথায় বলতে গেলে বিচ্ছিন্নভাবে

বিভিন্ন রকমের উদ্ভট চিন্তা-ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। 'পদ্মফুল' গল্পে লেখক নারীজীবনের দুঃখময় কথাকে বর্ণনা করেছেন ও 'চুনকালি' গল্পে ছেলেকে একটা মায়ের ভাবনা এবং বন্ধুত্ব সম্পর্কের বিচিত্র রূপ ফুটে উঠেছে।

শাস্ত্রবিরোধী গল্পকার হিসেবে বলরাম বসাকের গল্পগুলি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তবে বলরাম বসাক শেষ পর্যন্ত 'এই দশক' পত্রিকায় লেখালেখি করেননি। তাই অনেকে বলেন, বলরাম বসাক শাস্ত্রবিরধী আন্দোলন থেকে দূরে সরে গেছেন। কিন্তু বাস্তবে তা নয়, লেখক এই বিষয়ে নিজেই জানিয়েছেন—

> "বন্ধু লেখক অতীন্দ্রিয় পাঠক এবং আরও কেউ কেউ কোথাও লিখেছেন যে আমি শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য আন্দোলন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছি। কথাটা ঠিক নয়। আমি কখনও শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়াইনি। শুধুমাত্র 'এই দশক' গোষ্ঠীর সদস্যপদ ছেড়ে দিয়েছিলাম এবং 'এই দশক' গোষ্ঠীর শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য আন্দোলনের যেকোনো কর্মসূচি থেকে নিজেকে বিযুক্ত করেছিলাম মাত্র।"[১১]

বলরাম বসাক শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন থেকে সরে যায়নি তার প্রমাণ হিসেবে 'গল্পসভা' (১৯৭১) ও 'মুক্ত গল্পসভা' (১৯৭৭) সংগঠনের নেতৃত্ব দানের মাধ্যমে বোঝা যায়। বলরাম বসাক শাস্ত্রবিরোধী গল্পকার হিসেবে গল্প লিখলেও এই গল্পগুলি সব শ্রেণির পাঠকের কাছে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেননি। কারণ প্রথমত গল্পগুলি ছিল প্রথাবিরোধী, এছাড়া গল্পগুলিতে কোনো নিটোল কাহিনি ছিল না। তাই সেইসময় বেশিরভাগ পাঠক এই গল্পগুলি গ্রহণ করেনি। তবে তাঁদের লেখা এই গল্পগুলির প্রভাব কিছুটা হলেও বাংলা সাহিত্যে পড়েছিল। তাই তাঁদের আদর্শকে কেন্দ্র করে এখন অনেক লেখক প্লটহীন গল্প লেখার চেষ্টা করেন।

গ্রন্থপঞ্জি:

১। বসু, শেখর সম্পাদনা। শাস্ত্রবিরোধী গল্প। এবং মুশায়েরা, প্রথম সংস্করণ- জানুয়ারি ২০১০, কলকাতা, পৃ. ১২।
২। বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌম্যব্রত সম্পাদনা। শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন। গাঙচিল, প্রথম সংস্করণ- ২০১৮ জানুয়ারি, কলকাতা, পৃ. ১৯।
৩। বসু, শেখর সম্পাদনা। শাস্ত্রবিরোধী গল্প। এবং মুশায়েরা, প্রথম সংস্করণ- জানুয়ারি ২০১০, কলকাতা, পৃ. ১২।
৪। সামন্ত, সুবল সম্পদনা। বংলা গল্প ও গল্পকার। ৩য় খন্ড, এবং মুশায়েরা, সংস্করণ- জানুয়ারি ২০২০, কলকাতা, পৃ. ৭৩।
৫। বসাক, বলরাম। কার্পেট। অব্যয়, প্রথম সংস্করণ- অগ্রহায়ণ ১৩৬৭, কলকাতা, পৃ. ২৭।
৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌম্যব্রত সম্পাদনা। শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন। গাঙচিল, প্রথম সংস্করণ- ২০১৮ জানুয়ারি, কলকাতা, পৃ. ৪২২।
৭। বসাক, বলরাম। কার্পেট। অব্যয়, প্রথম সংস্করণ- অগ্রহায়ণ ১৩৬৭, কলকাতা, পৃ. ৩৯।
৮। তদেব, পৃ. ৫৪।
৯। বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌম্যব্রত সম্পাদনা। শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন। গাঙচিল, প্রথম সংস্করণ- ২০১৮ জানুয়ারি, কলকাতা, পৃ. ২৮৫।
১০। তদেব, পৃ. ৪২৩।
১১। সামন্ত, সুবল সম্পদনা। বংলা গল্প ও গল্পকার। ৩য় খন্ড, এবং মুশায়েরা, সংস্করণ- জানুয়ারি ২০২০, কলকাতা, পৃ. ৭৪।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1172-1178
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.336

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কবি’: ভিন্ন আলোকে

সায়ন মণ্ডল, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 15.03.2026; Accepted: 21.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Tarashankar Bandyopadhyay is a renowned figure in Bengali literature. In his fictional works, modernity and tradition coexist in a parallel and often complementary manner. His narratives frequently foreground regionality, elements of folk culture, and the lives and experiences of people from the Rarh region of Bengal. These features are present, to varying degrees, in the novel under discussion as well.

However, the present essay moves beyond these commonly discussed aspects and seeks to explore a particular current within Bengali fiction—namely, the artist-biographical (or artist-novel) tradition. It attempts to examine the nature of the artist's life and the ways in which Tarashankar Bandyopadhyay portrays the life, struggles, and sensibility of the artist within the narrative. The essay also considers how the shadow of the artist Tarashankar Bandyopadhyay himself may be reflected in the novel's central protagonist, and how elements of the author's own creative consciousness resonate through the character. Through this perspective, the study aims to situate the novel within the broader discourse of artist-centered narratives in Bengali fiction.

Keywords: Literary Theory, Fiction, Artist-Biographical Novel, Fictional, Informative, Folk Culture, Tradition

সময় ও সময় স্রোতের ঘটনাবলি সমাজের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যে ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। বিশ শতকের প্রথম কয়েকটি দশকের রাজনৈতিক, সামাজিক ঘটনাবলি বাংলা সাহিত্যে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। বঙ্গভঙ্গ, অসহযোগ আন্দোলন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু, বামপন্থী রাজনীতির উত্থান, দাঙ্গা, ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে মহাত্মা গান্ধীর অভ্যুদয়, তাঁর রাজনৈতিক দর্শন ও চেতনার প্রতিষ্ঠা, প্রয়োগ প্রভৃতি সমগ্র ভারত তথা বাংলার সামাজিক চেতনাকে নতুন ধারায় বইয়ে নিয়ে চলেছিল। সমাজ ও রাজনীতির একটা গভীর প্রভাব সাহিত্যে পড়ে, উক্ত প্রভাবগুলির পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যে এইসময় পাশ্চাত্য দর্শন, চেতনা, শিক্ষার প্রভাব পড়েছিল। এই নতুন স্রোতের প্রভাবেই বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা হয় ‘কল্লোল’ যুগের। দীনেশরঞ্জন দাশ, গোকুলচন্দ্র নাগ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, যুবনাশ্ব প্রভৃতি সাহিত্যিকেরা ছিলেন এই যুগের পুরোধা ব্যক্তিত্ব। এই বিশেষ যুগ বাংলা সাহিত্যে নতুন রীতির পরিবর্তন ঘটাল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যের কথা আলোচনা করি, প্রথমেই একটি শব্দবন্ধ উঠে আসে ‘তিন বন্দ্যোপাধ্যায়’, যথাক্রমে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়,

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই তিন কথাসাহিত্যিকের প্রতিষ্ঠা, প্রকাশ কল্লোল যুগের হাত ধরেই। অথচ, নিজেদের সাহিত্যগুণে এই তিনজন কথাসাহিত্যিকই একটি বিশেষ রীতির মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ করেননি, নিজ নিজ রীতির প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। সে-জন্যই আমরা সাহিত্য আলোচনায় তাঁদের মোটা দাগে চিহ্নিত করার জন্য এক একটি শিরোপা দিয়ে থাকি, যেমন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাধারণত বলা হয়ে থাকে রাঢ়বঙ্গের কথাকার। প্রসঙ্গত আমাদের মনে রাখা উচিত সাহিত্যে মোটা দাগে বলা কথাগুলি শুধু চিহ্নিতকরণের জন্যই, উক্ত কথাকারদের সাহিত্য বৈশিষ্ট্যকে বিশেষ গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ করা যায় না। যাইহোক আলোচ্য প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় কল্লোল যুগের অন্যতম কথাকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর 'কবি' নামাঙ্কিত উপন্যাসটি।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যজীবনের শুরু কবিতা ও ছড়াচর্চার মাধ্যমেই, সেকথা আমরা তাঁর 'আমার সাহিত্য জীবন' রচনাতেই পাই। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যে প্রথম জীবনে কংগ্রেসী রাজনীতি ও স্বদেশ মুক্তির আন্দোলনে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন সেকথাও উক্ত রচনাতেই আছে। তাঁর রাজনৈতিক জীবন থেকে সাহিত্যজীবনে প্রবেশ সম্পর্কে তিনি জানাচ্ছেন—

> "আমার সাহিত্য জীবনের শুরু কোনখান থেকে করব সে নিয়ে আমার মনে কোনও অস্পষ্টতা নেই। এই শুরুটি জীবনে অত্যন্ত স্পষ্ট প্রত্যক্ষভাবেই ঘটেছিল। ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে যে দিন জেলখানা থেকে বের হলাম সেই দিনই মনে মনে এ সংকল্প করেছিলাম। ...এবং তখন জেলখানায় রাজনীতি-সর্বস্ব মানুষের চেহারা দেখে ভবিষ্যৎ ভাবনায় শঙ্কিত হয়েছি; চিত্ত ভারাক্রান্ত হয়ে তখন রাজনীতির দিকে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ হয়েছে।"[১]

অর্থাৎ, ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাস থেকে তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে সরে আসছেন, কিন্তু তিনি আজীবন থেকেছেন রাজনীতি ও সমাজ সচেতন, তাঁর রচিত উপন্যাস, ছোটগল্প, রিপোর্টাজধর্মী লেখা 'গ্রামের চিঠি' তার সাক্ষ্য বহন করে। এই প্রবন্ধের আলোচ্য উপন্যাস 'কবি'-তেও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন বহু রয়েছে। আঞ্চলিকতা— রাঢ়ের প্রকৃতি, সমাজ, মানুষ, লোকজ উপাদান— কবিগান, ঝুমুর গান প্রভৃতি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে সামনে রেখে এই উপন্যাসের বিচার সম্ভব। কিন্তু এসব বাদেও এই উপন্যাসটিকে একটি ভিন্ন আলোকে আলোচনা করা যেতে পারে। জার্মান ভাষায় একটি শব্দ আছে বিলডুংসরোমান (Bildungsroman) অর্থাৎ আত্মজীবনীমূলক রচনা, এই জঁরের একটি উপবিভাগ ক্যুনসটলাররোমান (Künstlerroman) অর্থাৎ শিল্পীজীবনী মূলক উপন্যাস।[২] পাশ্চাত্য সাহিত্যে এই ধরনের রচনার উদাহরণ— James Joyce রচিত A Portrait of the artist as a Young Man, Thomas Mann রচিত Dr Faustus, Romain Rolland রচিত John Christopher ইত্যাদি। এই ধরনের রচনার বা উক্ত উপন্যাসগুলির যা বৈশিষ্ট্য সেটি বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে কতখানি প্রযোজ্য সেই বিষয়ে প্রশ্নচিহ্ন হয়ে উঠতে পারে। তবে শিল্পীজীবনীমূলক উপন্যাস যে বাংলা সাহিত্যে বিরল নয় এবং তার নিজের একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেটা নিয়ে দ্বিরুক্তি নেই। বর্তমান প্রবন্ধে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি' উপন্যাসটিকে এই বিশেষ জঁর আলোকে দেখার চেষ্টা করব।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেক উপন্যাসের বীজতলা তাঁর ছোটগল্পের জগৎ। 'কবি' উপন্যাসটি এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়, 'প্রবাসী' পত্রিকার ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায় একই শিরোনামে একটি ছোটগল্প প্রকাশিত হয়, উপন্যাসের প্রারম্ভের কাহিনি অংশই গল্পের কাহিনি, যদিও গল্পের শেষ সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রসঙ্গত, গল্পের প্রোটাগনিস্ট ও উপন্যাসের প্রোটাগনিস্ট এক হলেও গল্পে তার শিল্পী সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেনি, ছোটগল্পের সংক্ষিপ্ত পরিসরে সেটা বোধহয় সম্ভবও নয়। যাইহোক আমরা এবার উপন্যাসের কাহিনির একটা সরল সংক্ষেপ আলোচনা করতে পারি। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যান্য উপন্যাসের মতোই এই উপন্যাসের

কাহিনির পটভূমিও রাঢ়বঙ্গ। রাঢ়বঙ্গের বর্ণাশ্রমের নিম্নস্তরের অন্তর্ভুক্ত ডোম জাতির ঘরে জন্ম এই কাহিনির প্রোটাগনিস্ট নিতাইয়ের। তার পিতামহ ঠ্যাঙাড়ে, বাপ সিঁধেল চোর, মাতামহ ও মামা দুজনেই নামকরা ডাকাত। কাহিনির শুরুতেই জানা যায় তার মামা 'বীরবংশী অথবা গৌর ডোম' বছরখানেক পূর্বেই কালাপানির সাজা কেটে ফিরেছে। এহেন বংশে, পরিবেশে নিতাই সম্পূর্ণ বিপরীত। ডাকাতি, ঠ্যাঙাড়ে বৃত্তি দূর অস্ত, চৌর্যবৃত্তিরও বিরোধী নিতাই। এমনকি এসবের জন্য ঘর, জীবিকা ছাড়তেও দ্বিধা করেনি সে। ছোটবেলা থেকে পড়াশোনার প্রতি প্রবল আগ্রহ তার, নৈশ স্কুলে যতদিন সম্ভব পড়াশোনা করেছে, যেখানে পড়ার সামগ্রী পেয়েছে সংগ্রহ করেছে, এমনকি পড়ে পাওয়া ছাপার অক্ষরের কাগজও উৎসাহের সঙ্গে যত্নে রেখেছে নিজের সংগ্রহে। গ্রামে গ্রামে কবিগানের আসরে ঘুরেছে, অশ্লীল কবিগানের থেকে তার পছন্দ তারণ মণ্ডলের সুষ্ঠু, অশ্লীলতা বর্জিত কবিগান, তাকেই সেই দ্রোণাচার্য মেনেছে মনে মনে। নিতাইয়ের ইচ্ছে সে বড় কবিয়াল হবে একদিন। কবির জগতে প্রবেশের সুযোগও একদিন হঠাৎ করে চলে আসে তার সামনে এবং নিজগুণে সেই সুযোগের সম্পূর্ণরূপে সদ্ব্যবহার করে সে। নিজের কবিসত্তাকে উন্মোচিত করে জনসমক্ষে। আসরের মূল কবিয়াল থেকে পৃষ্ঠপোষক বাবুরা সকলেই উচ্চকিত প্রশংসায় ভরিয়ে দেয় তাকে। বন্ধু রাজন থেকে ভবিষ্যতের অনুপ্রেরণাদাত্রী ঠাকুরঝি সকলেই বিস্মিত হয় তার এই শৈল্পিক প্রতিভায়। নিতাইয়ের স্বপ্নের গন্তব্যের যাত্রা শুরু হয়। পূর্বেই নিতাই নিজেকে পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডল থেকে বিচ্যুত করেছিল শিল্পসাধনার জন্য, সেই প্রক্রিয়া আরও ত্বরান্বিত হয় এই ঘটনার পর। এরপর আমরা দেখি ধীরে ধীরে বহু বাঁধাবিঘ্ন অতিক্রম করে নিতাইয়ের শিল্পী হয়ে ওঠার যাত্রা। সে কুলিগিরির কাজে ইস্তফা দেয়, তার জীবনে ঠাকুরঝির অস্তিত্ব দেখা দেয় ভিন্ন মাত্রায়, এসবের মধ্যেই তার জীবনে শুরু হয় বসন কাণ্ড। কবির লড়াইয়ে দোয়ারকি হিসাবে ডাকা পাওয়া, কৃচ্ছ্রসাধানায় জীবন অতিবাহিত করা, ঠাকুরঝির সঙ্গে প্রণয় সম্পর্ক গড়ে ওঠার মধ্যে দিয়েই তার জীবনে শুরু হয় বসন অধ্যায়ের। গ্রামে আসে ঝুমুর দল, সেই ঝুমুর দলের প্রধান নৃত্যশিল্পী বসন ওরফে বসন্ত। এই নৃত্য পটিয়সী নারী একধারে যেমন ঝুমুর দলের বড় মানের শিল্পী, আরেকদিকে তার রূপের আলোর নীচে অন্ধকারের মতো দেহ ব্যবসার জীবন রয়েছে। এই বসন্তের সঙ্গেই নিতাইয়ের গড়ে ওঠে প্রণয়ের সম্পর্ক। উৎসবের শেষে ঝুমুর দল বিদায় নেয়, নিতাই-ঠাকুরঝি সম্পর্কে ভাঙন ঘটে যায়। সে-সময়েই ঝুমুর দলের ডাকে অথবা বসন্তের আকর্ষণে গ্রাম, বন্ধু রাজন, ঠাকুরঝিকে পিছনে ফেলে নিতাই পাড়ি দেয় ভিন্ন এক যাত্রায়। সেটা যদিও তার শিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পরই। নিতাইয়ের জীবনে বসন্ত অধ্যায় প্রণয়, সম্পর্কের টানাপোড়েন, সামাজিক অন্ধকার, ঝুমুর দলের লোকজ সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে সম্পূর্ণ কবিয়াল হয়ে ওঠার পর্ব। জীবন তার কাছে নতুন নতুন আঙ্গিকে ধরা দিলেও শিল্প সাধনা থেমে থাকে না। বরং শিল্পের শ্লীলতা, অশ্লীলতাকে সে নিজগুণে প্রয়োজনমতো পৃথক করে রূপ দিতে পারে। এরপর বসন্তের অকাল মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে শেষ হয় নিতাইয়ের জীবনের এই অধ্যায়ও। বসন্তের মৃত্যু নিতাইকে কিছুটা বিবাগী করে তোলে, ঝুমুর দল ছেড়ে সে কাশীর উদ্দেশে যাত্রা করে। কিন্তু নিতাইয়ের সংক্ষিপ্ত কাশীবাস তার বিরহ ক্ষতের উপরে প্রলেপ লাগাতে পারে না, নিজের দেশের স্মৃতি বারংবার তার মনে জেগে ওঠে, সে উপলব্ধি করে এই বিদেশবাস, এই বৈরাগ্যের দেশ তার জন্য নয়, নিজের দেশের প্রকৃতি, ভাষা আসল, সে অভাব কোনওভাবেই পূরণ করা যাবে না। নিতাই আবার ফিরে আসে নিজের দেশে, নিজের মানুষের কাছে, নিজের ধুলোমাটিতে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কলমে যখন বাংলা উপন্যাসের জন্ম হয় তার পূর্বেই বাংলাভাষায় উপন্যাস শিল্প নিয়ে অল্পবিস্তর পরীক্ষানিরীক্ষা হয়ে গেছে। তারপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির কলমে বাংলা উপন্যাস বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পেয়েছে প্রত্যেক যুগের বৈশিষ্ট্য নিয়ে এবং স্রষ্টার ছায়া নিয়ে। বর্তমান সময়েও সেই ধারা চলে আসছে ক্রমাগত। শুরুতেই উল্লেখ করেছিলাম তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যখন

কথাসাহিত্যের জগতে প্রবেশ করেছেন তখন বাংলা সাহিত্যে এক নতুন যুগের সূচনা হয়ে গেছে, সেই যুগের বৈশিষ্ট্য ছিল সাহিত্যে বাস্তবতার প্রাবাল্য, চরিত্রের মনের বিশ্লেষণের মতো বিভিন্ন বিষয়, এমনকি কথন প্রণালীতেও বিশিষ্টতা লক্ষ করা যায়। একজন ঔপন্যাসিক যখন উপন্যাস লেখেন তখন উপন্যাসের কাহিনি ও চরিত্রে ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যের ছায়া দেখা যায়। 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী' উপন্যাসের মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশ্বাসের একটি ছবি ধরা পড়ে। 'শিবনাথ' চরিত্রটি যেন তাঁরই সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনায় পুষ্ট। ঠিক এই সূত্র ধরেই আমরা যদি 'কবি' উপন্যাসের নিতাই চরিত্রের আলোচনা করি তবে দেখব তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পীসত্তার গভীর ছায়া পড়েছে এই চরিত্রে। একজন শিল্পী যখন আরেকজন কাল্পনিক শিল্পীর জীবন কাহিনি লিখছেন তখন এই ধরনের ছায়াপাত অবশ্যম্ভাবী। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে রাঢ়বঙ্গের মানুষ, চিরটাকাল সেখানেই কাটিয়েছেন, সেখানকার সমাজ, প্রকৃতি, লোকজ উপাদান তাঁর নখদর্পণে। ঠিক এই পটভূমিতেই এইসব উপাদানের মধ্যেই রয়েছেন উপন্যাসের প্রোটাগনিস্ট নিতাই কবিয়াল, তার শিল্পীসত্তার জন্যও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বেছে নিচ্ছেন রাঢ়ের বহুল জনপ্রিয় একটি শিল্প মাধ্যমকে। কবিগান বাংলার লোকশিল্পের অন্তর্গত একটি শিল্প মাধ্যম, এই মাধ্যম যেমন বাংলার গ্রামীণ খেটে খাওয়া বর্ণাশ্রমের নীচের সারির মানুষের কাছের, তেমনই এই মাধ্যমটির মধ্যে ধরা আছে দেশীয় ঐতিহ্য। এই সূত্রে এই বাংলার বিশিষ্ট কবিয়াল বিজয় সরকারের একটি গানের কথা উল্লেখ করলে বোধহয় বিষয়টি স্পষ্ট হয়— "বাদল বাউল মেতেছে তার প্রাণের গান গেয়ে,/ ধানের খেতে নাচিছে এক দুলালী মেয়ে/ সবুজ ভরা যৌবন অঙ্গে/ কবে মিলিবে সোনালি রঙ্গে"।[৩] এই গানের পঙ্‌ক্তি থেকেই বোঝা যায় কবিয়ালরা বঙ্গদেশকে কোন অবস্থান থেকে চেনেন এবং কীভাবে সেই দেখা ছড়িয়ে দেন। লোকজ সংস্কৃতি, দেশীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বোধহয় এই কারণেই নিতাই কবিয়ালের জন্য এই শিল্প মাধ্যম বেছে নেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ণাশ্রম প্রথা মানতেন কিনা জানা নেই। কিন্তু তিনি নিজের সমাজ ও শ্রেণির কলুষতা, অন্ধকার দিকগুলোকে সৃষ্টিকর্মের মধ্যে দিয়ে দেখিয়ে গেছেন এবং সমালোচনাও করেছেন। অপরদিকে নিতাই কবিয়াল নিজেকে সমাজচ্যুত করেছিল শুধু সৃষ্টিশীলতার পথে নিজেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য নয়; বরং সে নিজের সমাজের অপরাধপ্রবণতার দিকগুলিকে মানতে পারেনি বলেই। নিতাই কবিয়াল যদি নিজেকে জাতিগত উদ্ধারের প্রক্রিয়াতে নিয়ে যেত তবে পরবর্তীকালে বারংবার নিজের জাতের কথা স্বীকার করত না। বরং বিপ্রপদ-র অপমানের জবাবে তার মধ্যে কিছুটা জাত্যাভিমানও বিচ্ছুরিত হতে দেখা যায়। এর মূল কারণ হিসাবে বলা যায় সে কখনও নিজের শিকড়কে অস্বীকার করেনি। এই দিকটিও কিন্তু তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে তুলনীয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষয়িষ্ণু জমিদার, ব্রাহ্মণ প্রভৃতির সমালোচনা করেছেন, কিন্তু নিজের শিকড় অস্বীকার করেননি, অহংকারও করেননি। পূর্বে উল্লেখ করেছিলাম তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যজীবন শুরু হয়েছিল কবিতার মাধ্যমে এবং সেই প্রক্রিয়া তাঁর ক্ষেত্রে খুব একটা সুখকর হয়নি। এই উপন্যাসের প্রত্যেকটি গান তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের রচিত, তিনি কোনও জায়গা থেকে ধার করেননি। সুতরাং, এই উপন্যাস রচনার মাধ্যমে নিজের এক অপূর্ণ সাধ পূরণ করবার প্রচেষ্টা করেননি বলে আমরা মেনে নেব? এছাড়া ঔপন্যাসিকের নিজের একটি বক্তব্য উল্লেখ করা প্রয়োজন—

> "সাহিত্যকে অবলম্বন করেই কোনোক্রমে দিন যাপন করে চলেছি। মধ্যে মধ্যে ভাবি কেন লিখি? প্রতিষ্ঠার লোভ? সম্মানের লোভ? সম্মানের মোহ? কিন্তু সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করতে পারি না। এর মধ্যে আরও কিছু পেয়েছি। আনন্দ তো বটেই। আনন্দ কিন্তু প্রতিষ্ঠাতেও আছে,

> সম্মানেও আছে। আনন্দের অতিরিক্তও কিছু পেয়েছি। এর ফলে পেয়েছি দুঃখ শোককে সহ্য করবার শক্তি।"[৪]

উপন্যাসের কাহিনি ভালভাবে অনুধাবন করলে দেখা যাবে নিতাই কবিয়ালের শিল্প সাধনার যাত্রা এভাবেই পরিণতিতে পৌঁছেছে। মিলিয়ে দেখতে গেলে শিল্পীর সৃষ্ট শিল্পীর সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ না হলেও বিশেষ কিছু সামঞ্জস্য ধরা পড়বেই।

প্রবন্ধের শুরুর দিকে দুটি জার্মান শব্দের কথা উল্লেখ করেছিলাম, একটি 'বিলডুংসরোমান' (Bildungsroman), অপরটি 'ক্যুনসটলাররোমান' (Künstlerroman)। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও নিতাই কবিয়ালের জীবনের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে প্রথম শব্দটি বা ওই ধারার সঙ্গে বর্তমান উপন্যাসের সংযোগ কিছুটা বোঝানো গেল। এবার আসা যাক দ্বিতীয় শব্দ বা ধারার কাছে, অর্থাৎ শিল্পী জীবনীমূলক আখ্যানের ক্ষেত্রে। আমরা জানি শিল্পী মাত্রই তিনি সাধারণ মানুষের থেকে তিনি আলাদা হবেন, সেটা শুধু সৃষ্টি করছেন বলে নয়, বরং সৃষ্টির পিছনে যে বিশেষ কর্মকাণ্ড রয়েছে তার জন্য। অথচ, একজন শিল্পী ও একজন সাধারণ মানুষ একই সমাজের অন্তর্গত, কেউ জন্মাবার পরেই শিল্পী হয়ে ওঠেন না। এই সৃষ্টিশীল মন বা শিল্পী মনকে চিহ্নিত করার জন্য কয়েকটি বিষয়কে আমরা লক্ষ করতে পারি। প্রথমত, খুব অল্প বয়স থেকেই জানার ও জ্ঞানের প্রতি তার বিশেষ আগ্রহ। দ্বিতীয়ত, যা জানছি, যা দেখছি তার সঙ্গে কল্পনা শক্তি মিশিয়ে নতুনভাবে সৃষ্টি করার প্রবণতা। তৃতীয়ত, ধীরে ধীরে নিজেকে সমাজ ও সাধারণ থেকে বিচ্যুত করে ফেলা (Isolate)। চতুর্থত, সংবেদনশীলতা। পঞ্চমত, জীবনের দুঃখ, দারিদ্র্য, যন্ত্রণাকে সৃষ্টির অনুঘটক হিসাবে কাজে লাগানো। ষষ্ঠত, সৃষ্টিশীলতার পথে একাগ্র থাকা। এছাড়া, সততা, শিল্পের সঙ্গে অশ্লীলতা না মিশিয়ে তাকে শাশ্বত রাখার প্রবণতা প্রভৃত। বস্তুত, কোনও সৃষ্টিশীল মানুষ এই মাপকাঠি মেনেই যে সৃষ্টিশীল হবেন এই দাবি করা যায় না। কিন্তু আলোচনার স্বার্থে এই স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা আমরা ধরতে পারি। এবার দেখা যেতে পারি নিতাই কবিয়ালের জীবন নির্মাণে এই বিষয়গুলি কতটা ব্যবহার করেছেন ঔপন্যাসিক।

উপন্যাস কাহিনির প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে নিতাই জাতিতে ডোম ও তার পূর্বপুরুষ সকলেই চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি কর্মের সঙ্গে। আরেকটু বিশদে বললে তাদের পুরো সমাজটাই। এহেন সমাজ ও পরিবারের নিতাইয়ের প্রথম থেকেই জানার প্রতি আগ্রহ ও বিশেষ যত্ন। যেখানে আঁধার নামলে তার সমাজের অধিকাংশ নিঃশব্দ পদসঞ্চরণে জীবিকার উদ্দেশ্যে বের হয়, সেখানে নিতাইচরণ রোজ সন্ধ্যায় বইয়ের দপ্তর বগলে নাইট স্কুলে যায়। নিতাইয়ের সঙ্গে ডোমপাড়ার অনেক ছেলেই এই নৈশ স্কুলে ভর্তি হলেও পরবর্তীতে পালিয়ে যায়, নিতাই শুধু থেকে যায় এবং পরীক্ষাতে ফার্স্টও হয়। নাইট স্কুলে চার দফায় পুরস্কৃত হওয়ার পরও নিতাই দুই বছর পাঠশালায় ভর্তি হয়। ঔপন্যাসিক বলছেন—

> "ততদিনে তাহার বিদ্যানুরাগ আর এক পথে শাখা বিস্তার করিয়াছে। এ দেশে কবিগানের পাল্লার সে মস্ত ভক্ত হইয়া উঠিয়াছে।... নিতাইয়ের আসক্তি অন্যরূপ। পুরাণ-কাহিনী, কবিতার ছন্দমিল এবং উপস্থিত বুদ্ধির চমক দেওয়া কৌতুকও তাহার ভাল লাগে।"[৫]

অর্থাৎ, বোঝা যায় নিতাইয়ের এই বিদ্যানুরাগ শুধু পুরস্কারপ্রাপ্তি, উপহার পাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সে জানতে চাইছে, শিখতে চাইছে। শুধু এটুকুই নয় পরবর্তীতে কাহিনিতে আমরা বারংবার দেখি নিতাইয়ের এই বিদ্যানুরাগ, নিতাই যখন যা ছাপার অক্ষরে পেয়েছে পরম ভক্তিতে সংগ্রহ করেছে। এমনকি যখন সে ঝুমুর দলের কবিয়াল তখন ঝুমুর দলের কর্ত্রীর মুখ থেকে শুনেছে গল্প এবং কলকাতা থেকে ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদামঙ্গল, দাশু রায়ের পাঁচালী আনিয়েছে, প্রিয়তমা বসন্তের কাছে আগ্রহ ভরে শিখতে চেয়েছে বৈষ্ণব পদাবলি। কাহিনির শুরুতে আমরা যে নিতাইয়ের বিদ্যানুরাগ দেখি তার শেষ পর্যন্ত একইরকম থাকে। তবে

নিতাই যে শুধু শিখছে এমন নয়, যা শিখেছে তার সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে সৃষ্টি করেছে, সে মহাদেবের দলের সঙ্গে প্রথম কবির লড়াইয়ে হোক, কিংবা 'ঠাকুরঝি'কে 'রাজা' কালো বলার কারণে মুখে মুখে গান বানানো হোক, অথবা রাজার ছেলেকে 'যোবরাজ' অভিধায় ভূষিত করার জন্যই হোক।

কাহিনিতে নিতাইয়ের সমাজচ্যুত হওয়ার বিষয়টিও রয়েছে ভীষণ স্পষ্টভাবে। নিতাই যখন যে পরিবেশে থেকেছে নিজের চারিপাশে যেন একটা অদৃশ্য দেওয়াল রেখেছে, যেখানে প্রবেশের অধিকার গুটিকয়েক মানুষের। প্রথমত, শুধু শিল্পসাধনার জন্যই নিতাই নিজেকে সমাজ থেকে বিচ্যুত করে। তারপর সমাজ থেকে নিজেকে আলাদা করে যখন বন্ধু রাজার সাহয্যে স্টেশনের কাছে আসে এবং একটি ঘর বেছে নিয়ে নিজেকে যেন কিছুটা বিচ্ছিন্ন রাখে। স্টেশনের কাছে নিতাইয়ের বসবাসের ঘরটি ঔপন্যাসিকের বর্ণনা অনুযায়ী যদি পাঠক যদি কল্পনা করে নেন, তবে বুঝতে পারবেন ঐ ঘরটির আশেপাশে আছে রাজার বাসস্থান ও বণিক মাতুলের দোকান। সে দুটিও নিতান্ত এক চৌহদ্দিতে নয়। ঝুমুর দলের সঙ্গে থাকবার সময়েও সে নিজেকে আলগোছে রেখেছে দলটির সঙ্গে, প্রিয়তমা বসন্তের জন্য দলের সঙ্গে থেকে গেলেও দলের সবার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেলেনি, বরং দল থেকেও সবাইকে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে। ঝুমুর দলের প্রধানকর্ত্রী মাসি নিতাই সম্পর্কে তাই উপলব্ধি করে—

> "এই লোকটি তাহার আনুগত্য কোনদিন স্বীকার করে নাই এবং আজও সে যে তাহাকে লঙ্ঘন করিল তাহারও মধ্যে রূঢ় কিছু নাই, উদ্ধত কিছু নাই, অস্বাভাবিকও কিছু নাই। নিতাই কোনমতেই তাহার কোন অপমান করে নাই।"[৬]

নিতাইয়ের জীবনে দুঃখ, যন্ত্রণা বারংবার এসেছে এবং সেসব যন্ত্রণা তার শিল্পী হওয়ার পথে অন্তরায় না হয়ে পাথেয় হয়েছে বলা চলে। কবিগানে এঁটোপাতার অপবাদ, বিপ্রপদ-র 'কপিবর' বলার মতো অপমান, বিদ্যানুরাগের জন্য নিজের সমাজের থেকে পাওয়া পণ্ডিত বিদ্রুপ, কবিগানের আসরে সম্মান পেলেও মামার হাতে প্রহৃত হওয়া, বহুবার বহুরকমভাবে অপমানিত হতে হয়েছে নিতাইকে। সাধারণ মানুষের জীবনে যে অপমান আসে না এমন নয়, কিন্তু নিতাই অপমানে দগ্ধ হয়েছে, জারিত হয়েছে, নিজেকে প্রস্তুত করেছে যোগ্য জবাব দেবার জন্য। তবে নিতাইয়ের সবথেকে বড় যন্ত্রণাময় অধ্যায় সম্ভবত দুটি, একটি ঠাকুরঝির অমিলন ভালবাসা হারানো। দ্বিতীয়ত, প্রিয়তমা বসন্তের মৃত্যু। নিতাইয়ের কবি জীবনের প্রথম অংশে ঠাকুরঝি একাধারে ভক্ত, অনুপ্রেরণাদাত্রী ও ভালবাসার মানুষ। নিতাই সমাজ, সংসার ভুলে কোন ক্ষণে ঠাকুরঝিকে ভালবেসে ফেলে, অথচ এই ভালবাসা পরিণতি পাবার আগেই ঝরে যায়। নিতাই একরকম এই দুঃখে নিজের গ্রাম ছাড়ে। দ্বিতীয়ত, ঠাকুরঝি অধ্যায় শেষ হবার আগেই নিতাইয়ের জীবনে আসে বসন্ত, বসন্তের সঙ্গে ধীরে ধীরে এক গভীর প্রণয়ের সৃষ্টি হয়। বসন্তের গুপ্ত কাশরোগ, তার জীবিকা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থেকেও বসন্তকে নিজের করে নেয় নিতাই, গাঁটছড়া বাঁধে তার সঙ্গে। যেন সবকিছু জেনেই যন্ত্রণার সঙ্গে আলিঙ্গন করে নিতাই। বসন্তের মৃত্যু নিতাইয়ের জীবনে গভীর যন্ত্রণা হয়ে নেমে আসে, একরকম বৈরাগ্যে নিয়ে যায় তাকে। যদিও নিতাই নিজের সৃষ্টিশীল সত্তা অথবা নিয়তির কারণেই ফিরে আসে পুরানো গ্রামে, যেখানে তার জন্য অপেক্ষা করছিল আরেক যন্ত্রণার সংবাদ— ঠাকুরঝির মৃত্যু। আমরা যদি বাস্তবের শিল্পীদের জীবন কাহিনির দিকে ফিরে তাকায়, দেশ থেকে বিদেশ, সবরকম ও সমস্ত শিল্পীদের জীবনে ট্রমা, দুঃখ, যন্ত্রণা একটি সাধারণ গুণনীয়ক। সে অন্ধ সঙ্গীতশিল্পী মোৎজার্ট হোক বা চিত্রশিল্পী ভিনসেন্ট ভ্যান গগ অথবা আমাদের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশ, মির্জা গালিব। এই সারণী শেষ হবার নয়, পৃথিবীব্যাপী শিল্পীদের জীবনে দুঃখ, বেদনা, যন্ত্রণা যেন অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, শিল্প সৃষ্টিতে অনুঘটক। ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্ট নিতাই কবিয়াল এই বিষয় থেকে ছাড় পাবে কি করে?

কবিয়াল নিতাইয়ের জীবন ঘটনাবহুল, কাহিনিতে নিতাইয়ের নিস্তরঙ্গ জীবনের কথা ঔপন্যাসিক বিশেষ বলেননি। জীবনের বহু ওঠাপড়ার মধ্যে দিয়ে নিতাই এগিয়েছে, অপমান, লাঞ্ছনা, প্রিয়জন হারানোর যন্ত্রণা, দারিদ্র্য। কিন্তু নিতাই একজন কবি হওয়ার লক্ষ্যে অবিচল থেকে শেষ পর্যন্ত, তার শিল্প সাধনায় সে একাগ্র। হয়তো ঝুমুর দলে এসে পেট চালানোর জন্য অথবা দলের সামগ্রিক দাবিতে সে মদ্যপান করে উগ্র রূপ ধরেছে, কবিগানের সভায় অশ্লীল হয়েছে কিন্তু নিজস্ব সাধনা চালিয়ে গেছে সমান্তরালে।

অধ্যাপক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য[৭] ও অধ্যাপক অশ্রুকুমার সিকদার[৮]-এর মতো বিদ্বজনেরা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' দ্বৈত উপন্যাসের অপুকে কেন্দ্র করে বিলডুংসরোমান (Bildungsroman) ও ক্যুনসটলাররোমান (Künstlerroman) তত্ত্বের বঙ্গীয় রূপের কথা উল্লেখ করেছেন। সেইদিক থেকে দেখতে গেলে ওই দ্বৈত উপন্যাসের মতো তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি' মহাকাব্যিক নয় এবং বিস্তারিতও নয়। ওই দ্বৈত উপন্যাসে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অপুকে যেমন শৈশব থেকে গড়ে তোলেন, বিভিন্ন উপকাহিনিতে চারপাশ ভরে রাখেন এই উপন্যাসে তেমনটা নেই। কিন্তু একজন শিল্পীর জীবন গড়ে তোলার যথেষ্ট রসদ রয়েছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপুর পাঁচালী বাংলা কথাসাহিত্যে এক রকম বিরল একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের নিজস্ব কবিজীবনী বা সৃষ্টিশীল জীবনীমূলক উপন্যাসের অভাব নেই, বুদ্ধদেব বসুর 'মৌলিনাথ', মহাশ্বেতা দেবী রচিত 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু' প্রভৃতি উপন্যাস রয়েছে। এই উপন্যাসগুলির আখ্যানের প্রবণতা অন্য কিছু হলেও এই উপন্যাসগুলির মধ্যে শিল্পীজীবন গড়ার প্রবণতা বিদ্যমান। তেমনই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি' উপন্যাসকে আঞ্চলিকতা, লোকজ উপাদান সমৃদ্ধ উপন্যাসের বাইরে গিয়ে ভিন্ন আলোকেও দেখা যেতে পারে।

তথ্যসূত্র:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর। আমার সাহিত্য জীবন। বেঙ্গল পাবলিশার্স, শ্রাবণ ১৩৬০, পৃ. ১০।
২. ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ। বিভূতিভূষণ ও কথাসাহিত্যে বাস্তববাদ। চিরায়ত প্রকাশন, ভাদ্র ১৪২০, পৃ. ৫৫।
৩. হক, মৃদুল ও দত্ত, সঞ্চিতা (সম্পাঃ)। পড়শি। 'বিজয় সরকার সংখ্যা'। দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, শরৎ ১৪২৯, পৃ. ৬৭।
৪. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ ও বিশ্বাস, প্রণব (সম্পাঃ)। কেন লিখি। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৌষ ১৪০৬, পৃ. ১৫-১৬।
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর। কবি। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, বৈশাখ ১৪২৯, পৃ. ১৬।
৬. তদেব, পৃ. ১৪২
৭. ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ, বিভূতিভূষণ ও কথাসাহিত্যে বাস্তববাদ। চিরায়ত প্রকাশন, ভাদ্র ১৪২০, পৃ. ৫৫-৬৭।
৮. সিকদার, অশ্রুকুমার। আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস। অরুণা প্রকাশনী, শ্রাবণ ১৩৯৫, পৃ. ৯৫-১১০।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1179-1184
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.337

সুরথনাথ থেকে কালকূটের যাত্রাপথ

সুমন্ত দাস, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 15.03.2026; Accepted: 17.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Samaresh Basu transform his real name to pseudonymous which represents a complex negotiation between realism, political expressionism and creative rejuvenation. Basu famously adopted pseudonym 'Kalkut' to explore theme distinct from his realist social fiction. Under this pseudonym Samaresh Basu various philosophical narratives and introspective works moves beyond strict social realism ontology. Further basu's narrative voice exponentially shifts from extreme political to the existential or living crisis which demonstrates how the pen name allowed Samaresh Basu to reconstruct his literary identity at large. Thus, this article tries to highlight how the literary identity of Samaresh Basu has exponentially shifted as well as ornamentally enriched efficacy of pseudonym as 'Kalkut' has been engraved to his original names or pseudonym. Besides by adopting multiple pen names or pseudonyms Samaresh Basu effectively creates parallel narrative selves which portray distinct dimension of Bengali society. i.e. it's long political struggle, spiritual quest and sexual subjectivity.

Keywords: Surathnath, Samaresh, Pseudonym, Kalkut, Vote Mirror

বাংলা সাহিত্যের ধারা বহতা নদীর মতো সুদূরপ্রসারী। এই বহতা নদীর প্রাণ-প্রবাহধারাকে ত্বরান্বিত করেছেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন সুরথনাথ বসু ওরফে সমরেশ বসু (১১.১২.১৯২৪–১২.০৩.১৯৮৮)। একেবারে রূপকথার নায়ক বলতে যা বোঝায় সমরেশ বসু তাই। স্কুল পালানো, এক সংসার ত্যাগ করে গৌরী দেবীকে সঙ্গী করে আরেক সংসারের কর্তা হওয়া, লেখক জীবন শুরু করা,– শুধু লেখার মধ্যে ডুবে থাকার জন্য কখনো ডিম ফেরি তো কখনো বন্দুক কারখানায় কাজ করে দারিদ্রের সঙ্গে হরদম লড়াই, জীবনবোধের দর্শন, সাহিত্যজ্ঞান ও ব্যক্তিত্ব তাঁকে এককালীন থেকে চিরকালীনের নায়করূপে প্রতিপন্ন করে চলেছে আজও প্রতিনিয়ত। ব্রত চক্রবর্তীর সমরেশ স্মৃতিচারণা (অন্তরীপ, তৃতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, পৃষ্ঠা, সাত–দশ) অন্তত তারই সাক্ষ্য দেয়– পাঞ্জাবি ড্রাইভার আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন, "খোকাবাবু, উস আদমী কোনো ফিল্ম স্টার আছে?" আবার একই কথা আমরা সম্প্রতি দেশ বইসংখ্যা (প্রথম প্রকাশ ১৭ জানুয়ারি ২০২৪) ২০২৪ এ অনিতা অগ্নিহোত্রীর লেখা 'অমৃতের উত্তরাধিকার' প্রবন্ধের শুরুতেও লক্ষ করি। সমরেশ বসুর নায়কোচিত এই ক্যারিশ্মাটিক ব্যক্তিত্বের পেছনে রয়েছে এক গভীর সাধনা– সুরথনাথ থেকে সমরেশ, সমরেশ থেকে কালকূট ও পরবর্তীতে কালকূট থেকে ভ্রমর এবং বাংলা সাহিত্যের এক ডাকে চেনার মতো প্রতিষ্ঠা পাওয়ার সাধনা।

ছদ্মবেশ ধারণের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল আত্ম ব্যতীত অন্যদের তথা পাঠক, দর্শক ইত্যাদি শ্রেণিবর্গের কাছে নিজেকে গোপন করে নিজের উদ্দেশ্য সাধন। ম্যাজিশিয়ান থেকে শুরু করে লেখক, অভিনেতা, থিয়েটারকর্মী, বহুরূপী প্রভৃতি বহু ভিন্ন পেশার মানুষেরা নানান সময় নানান দরকারে অদরকারে ছদ্মবেশ ধারণ করে থাকেন। বহুরূপী কিম্বা নাট্যকারদের ছদ্মবেশ ধারণ তাদের শিল্প প্রকাশের একটি প্রকৌশল অথবা রুজি-রুটি কামানোর পথ। কিন্তু লেখকদের ছদ্মবেশ ধারণের ক্ষেত্রে মুখ্য হয় তাদের গোপন অভিসন্ধি; প্রধানত সমাজের হীনকর অথবা বিকৃতকর ব্যবস্থার বিপক্ষে বিদ্রোহের সুর প্রতিধ্বনিত হয়। এই বিদ্রোহের সুরে চটে যায় সরকার; রাষ্ট্র। তারা নিজেদের দোষ, ত্রুটি ইত্যাদির সমালোচনা শুনে নিজেদের শুধরে নেওয়ার পরিবর্তে চড়াও হয় উক্ত বিদ্রোহের তথা বিদ্রোহীর উপর। অবশ্য বাংলা সাহিত্যিকেরা প্রথমদিকে কোনরূপ রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক মত বিরোধিতা বা আইনী জটিলতাকে এড়িয়ে চলার জন্য ছদ্মনামের ব্যবহার করতেন– এমনটা নয়। নেহাতই শিল্পীরা যেভাবে মঞ্চনাম ব্যবহার করে থাকেন তারই অনুকরণে লেখকেরা ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। হুতোম প্যাঁচা, কমলাকান্ত সহ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম দিককার ছদ্মনামধারী লেখকদের ক্ষেত্রে অন্তত তাই মনে হয়। তবে সময় গড়ায়, সমাজ সচেতনতামুখী হয়। শাসকের শোষক হওয়াকে মেনে নিতে পারে না সংবেদনশীল সাহিত্যিকেরা। তারা মুঠো ভরে তলোয়ারের বদলে আঙুলের সাহায্যে তুলে নেয় কলম; চুরমার হয়ে যায় শাসকের মুখোশ, বেরিয়ে আসে রক্ত রঙের মুখ। কলমের আঁচড় নড়িয়ে দেয় শাসকের গদি, আর এই গদি হারানোর ভয় থেকে শাসক দমন করতে চায় সাহিত্যিকদের। এ থেকেই গা বাঁচিয়ে স্বপ্নসমাজ গড়তে লেখকেরা ছদ্মনামের আশ্রয় নেন। 'গাহে অচিন পাখি' রচনায় সমরেশ বসু ছদ্মনাম ব্যবহারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিজেই বলেছেন, "...ছদ্মনামের প্রয়োজন হয়, নামের আড়াল থেকে নিজেকে ব্যক্ত করা।"[১] কথাসাহিত্যের আঙিনায় বিখ্যাত সমরেশ বসুর পিতৃদত্ত নাম সুরথনাথ বসু। বন্ধু দেবশঙ্কর মুখোপাধ্যায় তার নাম বদলে দেন,– সমরেশ বসু। অর্থাৎ সুরথনাথ থেকে সমরেশ ছদ্মনাম নয় আবার সমরেশ থেকে কালকূট ছদ্মনামের এক যাত্রাপথ। নাম বদলের পরেও ছদ্মনাম কেন নিতে হল সমরেশ বসুকে, এ নিয়ে আলোচনার অবকাশ থেকেই যায় আবার ছদ্মনামের যথার্থতা ছাদ্মিকে কতটা প্রকট করে তোলে তার বিশ্লেষণও অনুসন্ধিৎসু অধুনা গবেষকদের গবেষণার বিষয়। এখন প্রশ্ন হল, 'সমরেশ' নামটি এল কোথা থেকে? এ নিয়ে প্রশ্নের প্রেক্ষিতে সমরেশ বসু নিজেই তাঁর স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন, নরেশ সেনগুপ্তের কোনো গল্পের চরিত্রের নাম থেকে তাঁর নাম সমরেশ হয়েছিল। সুরথনাথের মূর্তিই পরবর্তীতে প্রতিমায় সমরেশ এবং কালকূট রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলা সাহিত্যে।

ছদ্মনামের প্রাসঙ্গিকতা তার উদ্দেশ্যকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে। অনেকক্ষেত্রে ছদ্মনাম গ্রহণের উদ্দেশ্য প্রথমদিকে যতটা জোরালো থাকে পরবর্তীতে আর তার ততখানি গুরুত্ব নজরে আসে না। সেক্ষেত্রে ছদ্মনাম তার আবেদনক্ষমতা হারায়। কিন্তু সমরেশ বসুর ক্ষেত্রে তাঁর ছদ্মনামের প্রকৃত অর্থের উপলব্ধি প্রথমেই হয়নি, হয়েছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। সমরেশ বসু ছদ্মনামে একটিমাত্র রাজনৈতিক লেখা লিখেছেন, 'ভোটদর্পণ'। আর তারপরেই তিনি জেনেছেন "বস্তুতপক্ষে কালকূট ভ্রমণবিলাসী নন— ভ্রমণ তার কাছে উপলক্ষ মাত্র।"[২] আসলে কালকূট একটা যাত্রাপথ। যে পথে একের পর এক নতুন নতুন মানুষের সংস্পর্শে এসে সমরেশ বসু কালকূট হয়ে উঠছেন অদম্য ইচ্ছাশক্তি আর তাঁর নিজের লেখনীর মন্ত্রবলে। দিনের বেলা লুকিয়ে পোস্টার লিখে সেগুলো রাতের আঁধারে দেওয়ালে সাঁটা, কিম্বা শ্রমিকদের জমায়েতে বক্তৃতা দেওয়া সবই নিঃস্বার্থ ভাবে করেছেন তিনি। পার্টি অন্তঃপ্রাণ সমরেশ জেলও খেটেছেন। পড়াশুনার জন্য সময় তেমন পেতেন না। তবু লেখক হওয়ার তীব্র ইচ্ছেশক্তি তাঁকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে নিখাদ লেখক তৈরি করেছে। সমরেশ বসু জানাচ্ছেন,– "প্রায় চৌদ্দ ঘন্টা পর বাড়ি ফিরে, ক্লান্ত শরীরের লিখতে বসাটা প্রায় অসম্ভব মনে হলেও, ভিতরের উন্মাদনা কোন ক্লান্তিকেই মেনে

নিতো না।"[৩] এই 'ভিতরের উন্মাদনা'টাই জীবনকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে খাঁটি সাহিত্যিক রূপে গড়ে তুলতে পেরেছিল সমরেশ বসুকে। তিনি নিজে যা হতে চেয়েছিলেন, তা হতে পেরেছিলেন একমাত্র নিজের অদম্য জেদ ও স্ত্রী গৌরী দেবীর সহায়তায়। একটি জীবনের বড় হয়ে ওঠার পেছনে তার পারিপার্শ্বিক বহু মানুষের অবদান থাকে, এক্ষেত্রেও তা ই হয়েছে। ঢাকার মুন্সীগঞ্জ মহকুমার রাজানগর গ্রামের সুরথনাথ বসু হয়ে ওঠেন বাংলা সাহিত্যের এক প্রবাদপ্রতিম নাম, কালকূট।

২

মোহিনীমোহন বসু ও শৈবলিনী বসুর জীবিত চার সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠ সন্তান হলেন সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮)। ১৯২৪ সালের ১১ ডিসেম্বর মোহিনীমোহনের মাতুলালয়ে রাজনগরে ঢেঁকিতে পাড় দেওয়ার সময় শৈবলিনী বসু জন্ম দেন সমরেশের। তড়িঘড়ি জন্ম নেওয়াতে সমরেশ বসুর ডাকনাম হয় তড়বৈরা। সমরেশ বসুকে ১৯২৮ এ গিরীশ মাস্টারের স্কুলে ভর্তি করা হয়। পরবর্তীতে তিনি গণ্ডারিয়া ঢাকাতে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। শ্রী বসু পড়াশোনায় তেমন মেধাবী না হলেও ছবি আঁকা ও গান গাওয়াতে একজন কৃতি ছাত্র ছিলেন। পিতা মন্মথনাথ বসু লোকচিত্র আঁকতেন; তাঁর কাছ থেকে শিখেছেন ছবি আঁকা। এছাড়াও ভক্তি ও তন্ত্রের প্রভাবের মূলেও ছিলেন পিতা। আর মা শৈবলিনী দেবীর কাছে ব্রতকথা ও পাঁচালীর শিক্ষা পেয়েছিলেন তিনি। এছাড়া সমরেশ বসু অসাধারণ বাঁশি বাজাতেও পারতেন। টিকিট কালেকটর হামিদের বাড়িতে গানের আড্ডায় গান ভেজেছেন, বাঁশিতে জুগিয়েছেন অপূর্ব প্রাণ প্রবাহ ধারা। অর্থাৎ, সংস্কৃতিমনস্ক বাঙালির যা যা বৈশিষ্ট্য থাকে তার সবকটিই ছেলেবেলা থেকে সমরেশ পেয়েছিলেন পিতা-মাতা ও পারিপার্শ্বিকদের কাছ থেকে। প্রতিভা আসলে সবসময় জন্মগতই হয় এমনটা না, প্রতিভা কখনো কখনো কঠোর অনুশীলন ও একাগ্র মনে অধ্যাবসায়ের ফলেও সুতীক্ষ্ণ ও উপযোগিতা অনুযায়ী প্রখরতা লাভ করে। যার ফলে সমাজে বিছুরিত হয় সফলতার নতুন পথের সন্ধানে উজ্জ্বল আলোকরশ্মি।

ছেটোবেলা থেকেই সমরেশ ছিলেন দুরন্ত। অষ্টম শ্রেণির রেজাল্ট বেরোনোর দুদিন আগে কলকাতায় মাসতুতো ভাইয়ের বিয়েতে যাওয়ার জন্য সমরেশ বসু একটি কাগজে কতকগুলো সংখ্যা বসিয়ে এনে বাড়িতে জানিয়েছিলেন, তিনি পাশ করেছেন। কিন্তু বিয়ে বাড়ি সেরে ফেরার পর আর রেজাল্ট আনতে যাননি। কাজেই তাঁর দাদাকে যেতে হল স্কুলে। সমরেশ বসু ততক্ষণে বেপাত্তা। দুষ্টুমির দৌরাত্ম্য সমরেশের বাল্যকালকে বেড়া দিয়ে রেখেছে। তাঁর দুরন্তপনাকে আয়ত্তে আনতে না পেরে পিতা মোহিনীমোহন বসু বড় পুত্র মন্মথনাথ বসুর কাছে ১৯৩৮ এ নৈহাটিতে পাঠালেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মন্মথনাথ বসু ছোট ভাই সমরেশের চাইতে কুড়ি বছরের বড় এবং তিনি ততদিনে ভারতীয় রেলের একজন চাকুরিজীবী কর্মচারী। নৈহাটিতে এসেও কমেনি সমরেশের দুরন্তপনা। তবে সেসময় তাঁর গুণের মধ্যে অন্যতম ছিল থিয়েটারে অভিনয় ও গানবাজনা করা। সতেরো বছর বয়সে ভালোবেসে বিয়ে করে বসলেন বন্ধু দেবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের দিদি তথা যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা গৌরী দেবীকে। এ বিষয়ে যে কথা মনে রাখার তা হল, গৌরী দেবী পূর্ব থেকেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন অন্যত্র; কিন্তু সেখানে স্বামীর সঙ্গে ঠিক মতো মধুর সম্পর্ক গড়ে না ওঠায়, শ্বশুরবাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ফিরে এসেছিলেন বাপের বাড়িতে। তারপর ভাইয়ের বন্ধু সমরেশের সঙ্গে সম্পর্কে জড়ান এবং সমাজের কারোর তোয়াক্কা না করে বিয়ে করেন দুজনে। এ বিয়ে মেনে নেয়নি পুরানো সংস্কারমনস্ক দুপক্ষের কোনো পরিবারই। কাজেই দারিদ্রতা এবং দায়িত্বের চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে একইসঙ্গে লড়াইয়ের ময়দানে নামতে হয় নব বিবাহিত দম্পতিকে। দারিদ্রতার কঙ্কাল ঢাকতে ডিম বিক্রি করতে শুরু করলেন সমরেশ বসু। তাতেও যখন পেটের খোরাক মিটছে না তখন ঢাকেশ্বরী কটন মিলে লেবারের চাকরি করতে শুরু করলেন তিনি।

কখনো আধপেটা খেয়ে তো কখনো অনাহারে কেটেছে স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই। বন্ধু এবং গবেষক সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সমরেশ বসুর এই কষ্টের সঙ্গে লড়াই প্রসঙ্গে এক ডকুমেন্টারিতে জানাচ্ছেন,–

> "তিনি দৈনিক এক টাকা সতেরো পয়সা রোজে ইছাপুর মেটাল ফ্যাক্টরিতে ট্রেসারের কাজ শুরু করেন। এখানেই সত্যভূষণ দাশগুপ্ত ওরফে সত্য মাস্টারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সত্য মাস্টার ই তাঁকে কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা 'জনযুদ্ধ' দিয়েছিলেন।"[৪]

অর্থাৎ পেটের রসদ জোগাড় করাই দায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল সমরেশের। এ অবস্থায় মনের রসদের টান পড়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তবু হৃদয় জুড়ে সাহিত্য সাধক হওয়ার বাসনাকে জিইয়ে রেখেছিলেন মনের গোপনে। আর গোপন এই বাসনায় স্ত্রী গৌরী দেবী তাঁকে সাধ্য মতো সাহায্য করে গিয়েছিলেন। লেখাকেই জীবিকা করুক স্বামী এজন্য সংসারে অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করতে গৌরী দেবী গান শেখাতে শুরু করেছিলেন।

ঠিক এমনই এক সময়ে 'পরিচয়' পত্রিকায় ১৯৪৬ এর শারদীয় সংখ্যায় 'আদাব' এর হাত ধরে স্বপ্নের প্রথম নাগাল পেলেন সমরেশ। প্রথম ছোটোগল্পের খ্যাতি ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করছিল ততদিনে সাহিত্যিক মহলে। এছাড়াও নৈহাটি আতপুরের চটকল শ্রমিকদের জীবনকে অত্যন্ত কাছ থেকে দেখেছিলেন তিনি। আতপুরের তরফদার পাড়ায় থাকাকালীন চটকলের মিস্ত্রি ও নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষদের সংস্পর্শে এসেছিলেন সমরেশ। দিন আনে দিন খায় এমন খেটে খাওয়া মানুষদের খুব কাছ থেকে লক্ষ করেছেন তিনি। তিনি নিজেও অবশ্য সে দলেরই একজন গুরুত্বপূর্ণ মুখ। বন্ধনভীরু সমরেশ পারিবারিক, সামাজিক অনুশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ছুটে গেছেন সেই সব মানুষদের কাছে, যারা সমাজে অবহেলিত, অপাংক্তেয়– সভ্যতার আলো যাদের ধারে কাছেও পৌঁছায়নি। এমন সময় দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৪৮ এর ২৬ মার্চ সরকারিভাবে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী ঘোষিত হয়। আর তাতেই সমরেশ বসু বেকায়দায় পড়লেন তাতে। কমিউনিস্ট পার্টির খুব কাছের লোক হওয়ার অপরাধে কলকাতার মেস বাড়ি থেকে ১৯৪৯ এ গ্রেফতার হলেন তিনি। নয় মাস জেল খাটার পর ফিরে এলেন, কেননা ১৯৫০ এর ২৭ ফেব্রুয়ারি কলিকাতা হাইকোর্ট কমিউনিস্ট পার্টিকে আইনসম্মত বলে আদেশ জারি করে। আর এরপর থেকেই শুরু হয় সমরেশের নতুন ইনিংস,– কালকূট। তবে কালকূটের ছদ্মবেশটিকে বুঝতে গেলে আমাদের তাঁর পূর্ব কালকূট পর্বটিকে আরেক পশলা জেনে নিতে হবে।

৩

নৈহাটির মহেন্দ্র স্কুলের নথি অনুযায়ী ৬.২.১৯৩৯ এ সুরথনাথ নামে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হন সমরেশ। প্রথাবদ্ধ পড়াশোনায় সমরেশ বসু উদাসীন ছিলেন; আর সেকারণেই অষ্টম শ্রেণির Examination Result Register এ Not promoted লেখাটি আজও বর্তমান। দাদা মন্মথনাথ সমরেশ সম্পর্কে বলেছিলেন "অনিচ্ছুক মেধাবী পড়ুয়া।"[৫] ছেলে পড়াশোনায় লবডঙ্কা প্রমাণিত হলে অভিভাবকেরাও হতাশগ্রস্ত হন। আর্ট স্কুলে ভর্তি হতে চেয়েছিলেন সমরেশ কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। মাত্র ষোলো বছর বয়সেই সিগারেটের প্রবল নেশা তাকে জড়িয়ে ধরে। অদৃষ্ট প্রদত্ত বেকারত্বকে স্বীকার না করে হাতে লেখা পত্রিকা "বাণী" প্রকাশ করেন। শুরু হয় সমরেশের লড়াকু জীবন। এই পত্রিকা চালাতে গিয়ে সমরেশ বসুকে লিখতে হয় অনেক গল্প। সেই গল্পগুলো যে 'খুবই পাকামী' তাও পরবর্তীতে স্বীকার করেছেন সমরেশ বসু। বড় বড় লেখা পড়ে সেই গল্পগুলো দাঁড় করাতেন বলেও স্বীকার করেছেন তিনি। দারিদ্রের ঘুণপোকা কুরে কুরে শেষ করতে চায় সমরেশের জীবনকে। এ অবস্থায় আতপুরে চটকলের আবদুল মিস্ত্রির বাড়িতে আশ্রয় নিতে হয় তাঁকে।

থিয়েটারে গান বাজনা ও অভিনয়ে উৎসাহী সমরেশ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন এই সময়ে। দাদা মন্মথনাথ বসুর আর্থিক সংকট এবং চিকিৎসার উদাসীনতার দরুন সমরেশ মৃত্যুর দিকে ক্রমশ অগ্রসর হন। এই সময়েই বন্ধু দেবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের বড় দিদি গৌরী দেবীর (যিনি বিবাহিত এবং স্বামী বিচ্ছিন্না হয়ে বাপের বাড়িতেই

থাকতেন) সেবা, যত্ন এবং আর্থিক সাহায্যের দ্বারা সুস্থ হয়ে উঠলেন। গৌরী দেবী নিজের গহনা বিক্রি করে দেবশঙ্করের সঙ্গে ছোট বোনের শ্বশুরবাড়ি উত্তরপ্রদেশের গাজীপুরে সমরেশকে পাঠিয়ে দিলেন স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য। জল হাওয়ার গুণ ও গৌরী দেবীর নিঃস্বার্থ প্রেম সহচর হয় সমরেশের। অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সমরেশ এবং গৌরী দেবীর প্রেম সম্পর্কে বলেন, "এই প্রেমই তাঁর জীবনের চাকা ঘুরিয়ে দিল।"[৬]

ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রাককালে কমিউনিস্ট পার্টির নেতা সত্যপ্রসন্ন দাশগুপ্তের সঙ্গে পরিচয় হয় সমরেশ বসুর। তাঁর কাছ থেকে তিনি পেলেন 'জনযুদ্ধ' এর মন্ত্রশক্তি, উদ্বুদ্ধ হলেন মার্ক্সবাদী চিন্তাধারায়। শ্রী বসু নিজমুখে স্বীকার করেছেন, "সত্যমাস্টার আমার প্রথম রাজনৈতিক গুরু।"[৭] ফার্মবয়ের চাকরির সুবাদে সংসার স্বচ্ছল হতে শুরু করেছিল সবে, এমন সময় হঠাৎই সমরেশ বসুকে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জন্য খোয়াতে হল চাকরি। দিকভ্রান্ত অবস্থা আবার শুরু হয়, তবে তা বেশিদিন স্থায়ী হয় না। ১৯৪২ এর ডিসেম্বর মাসে সমরেশ দৈনিক এক টাকা চার আনায় ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরিতে 'ইন্সপেক্টর অব স্মল আর্মস' বিভাগে কাজ পান। স্বস্তি মেলে কিছুটা। ফিরে যেতে পারেন নিজের স্বপ্নের কাছাকাছি। নতুন করে আবার এক হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। 'বাণী'র চাইতে এই পত্রিকার নতুনত্ব হিসেবে কমিউনিজমের প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মতাদর্শ কোনদিনই সমরেশের পরিবারকে প্রভাবিত করেনি। সমরেশের মেসোমশাই বগলাপ্রসন্ন গুহ টেররিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং পরবর্তীতে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। পার্টি ভাগ হবার পর সি.পি.আই.এম এ এসেছিলেন এবং আমৃত্যু এই পার্টির সদস্য ছিলেন। এসময়ে 'উদয়ন লাইব্রেরী' নামে একটি পাঠাগার গড়ে তুলে সমরেশ বসু তাঁর সাহিত্য সাধনাকে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে যান। তাঁর ছিল অসম্ভব রকমের বই পড়ার ক্ষুধা। বই পড়ার দৌলতেই মার্ক্সবাদী সাহিত্য ধারার সঙ্গে তাঁর যোগ আরো নিবিড়তা লাভ করে। মার্ক্সবাদে দীক্ষিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সমরেশ বসুর অন্যতম প্রিয় লেখক। মানব মনের মধ্যে যে আঁধার চেতনার বোধে ধরা দেয় কিন্তু প্রকাশের আলোয় তেমন ধরা দেয় না; সেই সব চেতনাকে ফুটিয়ে তুলতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন সমরেশ বসু। বাস্তব জীবনের পরিস্থিতির সঙ্গে জীবনের চাওয়া পূরণ হয় না অভাব ও বিভিন্ন দায়-দায়িত্বের মারপ্যাঁচে। কিন্তু সমরেশ বসু এ বিষয়ে ভাগ্যবান; কেন না মার্কসবাদী ও প্রগতিশীল সাহিত্যচর্চা তাঁর জীবনের রসদ পূরণে অনেকটা সমর্থ হয়। সত্যপ্রসন্ন দাশগুপ্তের অনুমতিক্রমে ১৯৪৪-৪৫ এ পান কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ। এর ঠিক পরের বছরই অর্থাৎ ১৯৪৬ এর শারদীয়া 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'আদাব' ছোটগল্পটি। উপযুক্ত তথ্য প্রমাণের অভাবে এই গল্পটিকেই সমরেশ বসুর রচিত প্রথম ছোটগল্প ধরে নেওয়া হয়। অন্যথায় তার প্রথম ছোটগল্প 'শের সর্দার' 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় 'আদাব' এর পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল বলে অনেক সমালোচক মনে করেন।[৭] 'আদাব' গল্পটি তথাকথিত পূর্বতন ছোটগল্পগুলি থেকে অন্যমাত্রার। ১৯৪৬ সালের রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে লেখা এই ছোটগল্পটি শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠেছে বিশুদ্ধ মানবতার গল্প। 'আদাব' গল্পটির জনপ্রিয়তা এতটাই ছিল যে দ্বিতীয় গল্পটি তার পূর্বতন গল্পের সুনাম বজায় রাখতে পারবেন না বলে ভেবেছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এজন্য 'ঈশানী' গল্পটিকে পত্রিকায় ছাপার জন্য মনোনীত না করে অন্য আরেকটি গল্প পাঠাতে অনুরোধ করেন এবং 'নতুন খোকা' গল্পটিকে মনোনীত করেন।

অর্থাৎ সমরেশ বসুর সাহিত্যে পদার্পণ বৃহৎ এক ধুমকেতুর আগমনের সমতুল্য। দেশভাগ এবং তার পরবর্তীতে বাংলার সমাজজীবনে নেমে আসে এক অসহ্যকর অবক্ষয়ের সময়। আর এই ঘন তিমিরাচ্ছন্ন দাঙ্গা-দেশভাগ-উদবাস্তু মানুষদের হাহাকারে ভরা পরিস্থিতিতে বাংলা ছোটগল্প খুঁজে পায় তার এক নবীন সাধককে। আগাগোড়া কমিউনিজমের মন্ত্রে দীক্ষিত সমরেশ বসু কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হলে গ্রেফতার হবার পরও হতাশ হননি। বরং জ্বলে উঠেছেন ফিনিক্স পাখির মতো। নয় মাস জেলে থাকা অবস্থায় লিখলেন 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাস

(প্রথম প্রকাশ ১৯৫১), 'লেবার অফিসার' নামে একটি নাটক এবং 'ডাক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'অকালবৃষ্টি' নামে একটি ছোটগল্প। 'উত্তরঙ্গ' প্রকাশের পর কবি বিষ্ণু দে একটি চিঠিতে সমরেশ বসুকে জানিয়েছিলেন, "আরো লিখুন, গঙ্গার ধারের যে কথা আপনি লিখেছেন, আপনাকে দেখতে চাই তার সাগরসঙ্গমে।"[৮] কাজেই ছদ্মনাম পূর্ববর্তী সময়েও সমরেশের গ্রহণযোগ্যতা কিংবা প্রকাশক্ষমতা যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। সমরেশ বসু জেলে থাকাকালীন তাঁর সংসারে তীব্র টান পড়ে। স্ত্রী গৌরী দেবী ততদিনে চার সন্তানের মা। সন্তানদের মুখে খাবার দেওয়ার দায়িত্ব তাঁর কাঁধে এসে পড়ে। মরুভূমিতে মরীচিকা খুঁজে বেড়ানোর মতো অবস্থার সম্মুখীন হন তিনি। গান শেখানোর পুরানো কাজ দিয়ে আর চলে না সংসার। ভাবতে হয় নতুন পথ। কিন্তু পেটের জ্বালা মেটানোর জন্য টাকা রোজগারের কোনো পথ না পেয়ে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে নিরুপায় গৌরী দেবী অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন করেছিলেন। ডাঃ বি. সি. রায় সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মাসোহারার মাধ্যমে সরকারি সাহায্যের ব্যবস্থা করে দেন গৌরী দেবীকে। তৎকালীন সময়ে ভারতবর্ষের বুকে সৌজন্যমূলক রাজনীতির এ এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত দেখা গিয়েছিল।

৪

একের পর এক উপন্যাস যখন নাম করছে তখনই তিনি ছদ্মনামের আশ্রয় নিলেন, নিজের পরিচয় গোপন রেখে নিজের কথাটি বিশ্বের কাছে প্রকাশের উদ্দেশ্যে। কমিউনিস্ট মতবাদী 'প্রবাহ' পত্রিকায় ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের সংখ্যায় 'ভোটদর্পণ' নামে একটি পর্যালোচনা মূলক ফিচার লিখলেন। শুরু হল সমরেশ বসুর কালকূট পর্ব। চটকল এলাকায় সাধারণ নির্বাচনে কি হয় কি হয়! এরকম এক উত্তাল পরিবেশে রাজনৈতিক দলগুলোর দ্বারা পরিচালিত বাঙালি-অবাঙালির মধ্যে দাঙ্গার বিরোধিতা লেখাটির উপজীব্য। বোঝাই যায় সমরেশ বসুর রাজনৈতিক অবস্থান থেকে লেখাটির সূত্রপাত এবং ছদ্মনামের প্রয়োজনও স্পষ্ট। বাম রাজনীতির ব্যক্তিত্বদের এমন ছদ্মবেশ শাসনকর্তাদের কোপ এড়াতে সে সময়ে প্রয়োজন ছিল। তবে সমরেশ যে উদ্দেশ্য নিয়ে কালকূট ছদ্মনাম গ্রহণ করেছেন বলে 'গাহে অচিন পাখি'তে জানাচ্ছেন তার তাৎপর্যের বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত 'ভোটদর্পণ' এ নেই। কালকূট জীবনতীর্থের তীর্থযাত্রী। তাঁর ভ্রমণ ইতিহাস-পূরাণকে জানার জন্য নয়, মানুষকে জানার জন্য। এজন্যই 'আদাব' থেকে 'দেখি নাই ফিরে'র মধ্যিখানে সুরথনাথের কালকূট যাত্রাটি সমরেশের জীবনের পরশমণি।

তথ্যসূত্র:

১. কালকূট। কালকূট রচনা সমগ্র, প্রথম খণ্ড। মৌসুমী প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৩৯।

২. কালকূট। কালকূট রচনা সমগ্র, প্রথম খণ্ড। মৌসুমী প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ১।

৩. দত্ত, বীরেন্দ্র। প্রসঙ্গ: বাংলা উপন্যাস। ওয়েস্টবেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬০, পৃ. ৬৯৭।

৪. Dutta, Rajesh. Samaresh Basu: A Documentry by Raja sen. https://youtu.be/g09IYSTzs6o?si=AHVmYEWh8vuTC96p প্রকাশের তারিখ: ১২ মার্চ ২০২০।

৫. চৌধুরী, সত্যজিৎ ও অন্যান্য। সমরেশ বসু: স্মরণ ও সমীক্ষণ, জীবনপঞ্জী। কলকাতা, ১৯৯১-৯২, পৃ. ৫৬৮।

৬. মিত্র, মনোতোষ। জীবনশিল্পী সমরেশ বসু। কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭, পৃ. ১১।

৭. বসু, নিতাই। সমরেশ বসুর একান্ত সাক্ষাৎকার। মৌসুমী প্রকাশনী, কলকাতা ১৯৮৯, পৃ. ১২-১৩।

৮. ঘোষ, সাগরময় সম্পাদনা। দেশ। ৫৫ বর্ষ, ২৯ সংখ্যা, ১৪ মে ১৯৮৮, কলকাতা, পৃ. ৩২।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1185-1194
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.338

যৌনতা, নারীদেহ, 'স্ল্যাং': লিঙ্গ হিংসা ও ক্ষমতার রাজনীতি

সাবনূর সনম কামিনী, *গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 15.03.2026; Accepted: 17.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Patriarchal authority has long been embedded within language, functioning as a subtle yet powerful mechanism for the subordination of women. One of the most pervasive forms of linguistic violence is the use of derogatory slang terms directed at women, such as which, prostitute, immoral woman, adulteress, and similar expressions. Sexuality and slang are deeply interconnected, as a large proportion of slang terms carry sexual connotations and are socially categorized as "taboo" or "obscene," often falling under various forms of social censorship.Despite this, the use of such expressions is widespread in everyday social interactions—across spaces such as offices, streets, schools, colleges, trains, and buses—where slang is employed in anger, humor, ridicule, or verbal aggression. In the Bengali linguistic context, many commonly used slang expressions revolve around the female body, women's sexuality, psychological attributes, competence, and social status. Consequently, these linguistic practices contribute to the normalization of sexual violence and the objectification of women within society, reducing women to mere bodies or sexual objects rather than recognizing them as full human subjects.

This paper seeks to examine how slang operates as a cultural and linguistic instrument that sustains patriarchal power structures. It further investigates how sexually charged, body-referencing expressions embedded within patriarchal discourse generate and reinforce gender-based violence, thereby functioning as subtle mechanisms of power and social control.The study adopts an empirical research methodology. Primary data were collected through informal interviews with individuals from diverse occupational backgrounds, including students, farmers, laborers, rickshaw-van pullers, housewives, and domestic workers. A total of 45 participants (25 men and 20 women) from Basirhat Block II of North 24 Parganas district, West Bengal, aged between 18 and 65 years, were interviewed between January and June 2025. The participants represented varied educational and socio-economic backgrounds. Secondary data were gathered from books, journals, newspapers, magazines, and relevant online sources.

Keywords: Slang; Female Body; Gender Violence; Power Politics; Patriarchy

স্ল্যাং: শ্লীল বনাম অশ্লীল

সমাজে আবহমান পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতার যে আধিপত্য,ভাষা খোদ সেই আধিপত্যের জমিনকে পোক্ত করতে থাকে তার নির্মিত ভাষার মাধ্যমে। এই ভাষার এক বিশেষ রূপ হলো স্ল্যাং। আমাদের মধ্যেকার রাগ-ক্ষোভ, উত্তেজনা বহিঃপ্রকাশের অন্যতম মাধ্যম স্ল্যাং, আবার বন্ধুবান্ধবের আড্ডায় মজার ছলে উচ্চারিত হয় বিভিন্ন প্রকার স্ল্যাং, যাকে গোদা বাংলায় আমরা গালি বা খিস্তি, অশ্লীল শব্দ, ইতর ভাষা বা ইতর শব্দ, অপভাষা বা অপশব্দ, অকথ্য শব্দ, অপাঙক্তেয় শব্দ ইত্যাদি বলে থাকি।স্ল্যাং-এর এই বাংলা পরিভাষাগুলি নানা দিক থেকে অসম্পূর্ণ, তো সেগুলি যথাযথভাবে স্ল্যাং শব্দটির তাৎপর্য বহন করতে পারে না।তাই স্ল্যাং-এর বাংলা পরিভাষা হিসাবে 'স্ল্যাং' শব্দটিই রাখা যথাযথ।প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক সুকুমার সেন মহাশয় তাঁর 'ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে বলেছেন, 'যে শব্দ বা পদ ভদ্র লোকের কথ্যভাষায় ও লেখ্য ভাষায় প্রয়োগ হয় না এবং যাহার উৎপত্তি কোন ব্যক্তি বিশেষের অথবা দল বিশেষের হীন ব্যবহার হইতে, তাহাই ইতর শব্দ বা স্ল্যাং'।[1] তবে আমরা দেখবো যে সমস্ত বিষয়ে কোন না কোন সামাজিক ট্যাবু বা নিষেধাজ্ঞা কাজ করে (যেমন- যৌনতা) সে সমস্ত বিষয়ে স্ল্যাং-এর প্রাধান্য। এজন্য অধিকাংশ স্ল্যাং-এর কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে যৌনতাকেন্দ্রিক শব্দ।তবে প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য বা সাহিত্যে যৌনতা নিয়ে উদার আলোচনা দেখতে পাওয়া গেলেও ভিক্টোরিয়ান যুগে যৌনতা নিয়ে শ্লীল-অশ্লীলের জটিল আবর্তে ভদ্র সমাজে যৌনতা হয়ে ওঠে নিষিদ্ধ অশালীন, অশ্লীল (vulgar) বিষয় এবং ভদ্র রুচি বিরোধী।তাই এই সময় থেকে স্ল্যাং একটি অশ্লীল বিষয় হিসেবে সামাজিক সেন্সরশিপ-এর আওতায় চলে এলো, এজন্য ভদ্র সমাজে যত্রতত্র স্ল্যাং-এর অবাধ ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ হলো।তবে যারা শ্রমজীবী মানুষ কায়িক পরিশ্রম করেন, তারা যৌনতাসূচক স্ল্যাং-কে ব্যবহার করেন শ্রমের কষ্টকে লাঘব করার প্রয়োজনে। তাই গ্রাম্য সমাজে এই জাতীয় শব্দের প্রয়োগের বিধি-নিষেধের বাধ্যবাধকতা তুলনামূলক কম।তবে স্ল্যাং-এর সাথে ঐ তথাকথিত 'অশ্লীলতা', 'অশালীনতা' সবসময় সম্পর্কিত নয়।প্রকৃতপক্ষে এটা নির্ভর করে শব্দটাকে কীভাবে, কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে তার উপর।আমরা দেখবো যে 'অশ্লীল' শব্দ প্রয়োগভেদে স্ল্যাং হিসেবে গণ্য নাও হতে পারে, আবার 'শ্লীল' শব্দ ব্যবহারের মারপ্যাঁচে স্ল্যাং হিসেবে গণ্য হতে পারে। যেমন—যখন একজন চাষী তার স্ত্রীকে বলছেন, 'ওরে মাগী ভাত খোল রে, মাঠ থেকে আইছি', তখন কিন্তু 'মাগী' শব্দটি নেহাত স্বাভাবিক সম্বোধন হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু যখন একজন ভদ্র সমাজের তথাকথিত শিক্ষিত ছাত্র তার ক্লাসের সহপাঠিনীকে উদ্দেশ্য করে বলছে: 'এক্কেবারে আনারকলি, টুসকি মাল, কচি মাল', তখন কিন্তু এটি আক্ষরিক অর্থেই স্ল্যাং, যেখানে এই যৌনগন্ধী বাচনিক মন্তব্যের মাধ্যমে নারী শরীরকে ধর্ষকামী দৃষ্টিতে লেহন করা হচ্ছে।তো বোঝাই যাচ্ছে যে— অশ্লীলতা ও স্ল্যাং সবসময় একই মুদ্রার উভয় পিঠ একথা ভিক্টোরিয়ান শালীনতার ধারণার একটি নির্মিত মিথ।তবে স্ল্যাং মূলত সংস্কৃতি-নির্ভর এবং সবসময় "contextualized"।সেজন্য এই স্ল্যাং-এর প্রকার ও ধরণ সমাজ, স্থান ও সময়ভেদে ভিন্নতর হয়। কারণ—'এক দেশের বুলি আরেক দেশের গালি'। যেমন— প্রত্যন্ত গ্রাম্য অঞ্চলের মানুষেরা আঞ্চলিক কথ্য ভাষায় 'মাগি' শব্দটি সাধারণ অর্থেই অবলীলায় ব্যবহার করেন কিন্তু এই শব্দগুলো ভদ্র সমাজে গালি বা ইতর শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আবার যুগের পরিবর্তনের সাথে সমাজ পরিবর্তিত হয় এবং সাথে সাথে স্ল্যাং-ও বদলায়। যেমন রামকৃষ্ণ কথামৃতে, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে 'মাগ', 'মাগি' এই শব্দগুলি সাধারণভাবে মেয়ে অর্থে ব্যবহৃত হতো।কিন্তু মাগি শব্দটি আজ একটি অশ্লীল এবং যৌনগন্ধী স্ল্যাং হিসেবেই গৃহীত। ভাষাবিদ ডেল হাইমস-এর 'এথনোগ্রাফি অফ কমিউনিকেশন' তত্ত্ব অনুযায়ী, ভাষার ব্যবহার বোঝার জন্য শুধু শব্দের অর্থ নয়, বরং কে, কাকে, কোথায়, কেন এবং কীভাবে বলছে, তা বিশ্লেষণ করা জরুরি।[2] তাঁর SPEAKING মডেল

আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে একই শব্দ ভিন্ন প্রসঙ্গে ভিন্ন অর্থ বহন করতে পারে—যা 'মাগী' শব্দের গ্রামীণ সম্বোধন ও শহুরে স্ল্যাং-এর মধ্যে পার্থক্য বুঝতে সাহায্য করে।

ফরাসি দার্শনিক মিশেল ফুকো-র ক্ষমতা-জ্ঞান-ভাষার সম্পর্ক বিষয়ক তত্ত্ব থেকে আমরা দেখতে পাই যে ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এটি ক্ষমতা প্রয়োগের একটি হাতিয়ার।[3] ফুকো-র মতে, যে কোনো সমাজে 'ডিসকোর্স' তৈরি করে একটি নির্দিষ্ট জ্ঞান ও সত্যের ধারণা, যা সেই সমাজের ক্ষমতাকাঠামোকে বৈধতা দেয়। আমাদের প্রেক্ষাপটে, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীদেহ ও যৌনতা নিয়ে এক ধরনের 'ডিসকোর্স' তৈরি করেছে, যার একটি অংশ এই স্ল্যাং-গুলি। এই ডিসকোর্সের মাধ্যমেই নারীকে একটি নির্দিষ্ট কাঠামোতে বন্দি করে রাখা হয়। অন্যদিকে, ফরাসি সমাজতাত্ত্বিক পিয়ের বর্দিয়ুর 'প্রতীকী সহিংসতা' (symbolic violence) তত্ত্ব অনুযায়ী, শাসকগোষ্ঠী (এক্ষেত্রে পুরুষতন্ত্র) এমন একটি প্রতীকী কাঠামো তৈরি করে যা শাসিতগোষ্ঠী (এক্ষেত্রে নারী) নিজেরাও স্বাভাবিক বলে মেনে নেয় এবং এই সহিংসতা চিহ্নিতও করতে পারে না।[4] এই স্ল্যাং-গুলির মাধ্যমে নারীর উপর যে ভাষাগত ও মানসিক আঘাত করা হয়, তা নারী নিজেও অনেক সময় স্বাভাবিক বলে মেনে নেন, কারণ এটি তাঁর কাছে শৈশব থেকে দেখা সামাজিক রীতি। সাক্ষাৎকারপ্রাপ্ত ৪৫ বছরের এক গৃহবধূ জানালেন "ছোটোবেলা থেকেই শুনে আসছি বাবা মাকে খানকি- মাগি বলে গাল দিতো, যখন তাদের মধ্যে ঝগড়া হতো,আমার স্বামীও রেগে গেলে আমাকে গাল দেয়,তাতে কি হয়েছে, এটা খুব স্বাভাবিক, আমরা শুনে অভ্যস্ত"। বর্দিয়ুরের তত্ত্বের সত্যতা প্রমাণিত হয় এই উক্তিতে। এই তত্ত্বদ্বয়ের আলোকে আমরা স্ল্যাং-কে পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতা কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। তবে কোন স্ল্যাং কতোটা শ্লীল বা অশ্লীল তার যথার্থতা বিচার করা আজকের আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয় নয়। বরং ভিক্টোরিয়ান শালীনতাবোধ নির্মিত শ্লীল-অশ্লীলের গণ্ডি টপকে আমরা দেখবো যে আমাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নির্মিত যৌনগন্ধী স্ল্যাং কিভাবে যৌন বিদ্বেষ সৃষ্টি করে নারীকে 'মৌখিক অপমান' (verbal insult) করার মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে যুগ যুগান্তর ধরে। গালাগালের চরিত্র সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় পবিত্র সরকার যথার্থই জানিয়েছেন 'গালাগালের প্রথম শর্ত হবে এই যে তা যথার্থ ক্রোধ ও বিদ্বেষ থেকে উৎসারিত হবে, নিছক বিরক্তি বা ধৈর্যহীনতা থেকে উঠে আসবে না। তা আঘাত করার জন্য উচ্চারিত হবে'।[5]

নারী 'চিকনা মাল': অতীত ঐতিহ্যের অনুরণন:

বাংলা স্ল্যাং-এ মেয়েদের নিয়ে নানা রকম শব্দের যে প্রাচুর্য তাতে মেয়েদের মাল বা উপভোগের জিনিস হিসেবে দেখার প্রবণতাই বেশি। আসলে নারীকে ভোগ্যদ্রব্য হিসেবে দেখার একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আমাদের চেতনা-অবচেতনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে লালিত, কিন্তু নানা সামাজিক এবং নৈতিক প্রতিবন্ধকতার জন্য নারীকে ভোগ করার যৌনাকাঙ্ক্ষা যখন অবদমিত হতে থাকে, ঠিক তখনই নারীর দেহকে কেন্দ্র করে নানান যৌনগন্ধী স্ল্যাং উচ্চারণ পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ধর্ষকামীতাকে তৃপ্ত করে। তাই স্ল্যাং-এর একটা বড় অংশেই নারীর প্রতি অসম্মান, অশ্রদ্ধা ও লালসা দেখা যায়, যেটা আসলে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থান ও অপমানের অতীত ঐতিহ্যের একটি বহমান ধারা, যেখানে মনে করা হয় নারী মানব সত্ত্বা নয়, নারী একটি যৌনসত্ত্বা।ভারতবর্ষীয় সভ্যতার উষালগ্ন থেকে নারীকে আমরা কেবলই ভোগ্য এবং পণ্য হিসেবে ব্যবহার করেছি। বৈদিক যুগেই রোপিত হয়েছিল নারী লাঞ্ছনার বিষবৃক্ষটি। অর্থাৎ প্রায় তিনহাজার বছর পূর্ব থেকেই ভারতবর্ষ নারীকে দেখছে ভোগ্য পণ্য হিসাবেই। খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম শতকেই তৈত্তিরীয় সংহিতাতে উচ্চারিত হয়েছে 'তস্মাদু হ স্ত্রীয় ভোগমেব হারয়ন্তে'। পরবর্তীকালে গৌতম ধর্মসূত্রেও পশু, ভূমি ইত্যাদির সঙ্গে নারীকেও ভোগ্য হিসেবে দেখানো হয়েছে- 'পশু ভূমিস্ত্রীনামনতিভোগঃ'।[6] পৌরাণিক বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে বলা হয়েছে – কন্যা অভিশাপ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৬/৩/৭/১৩), তাই সন্তান সম্ভবা নারীর একটি অবশ্য করণীয় অনুষ্ঠান হলো পুংসবন, যেন গর্ভের সন্তানটি

পুত্র হয়। নারী মিথ্যাচারিণী, দুর্ভাগ্যস্বরূপিনী, সুরা বা দ্যূতক্রীড়ার মত একটি ব্যসনমাত্র (মৈত্রায়ণী সংহিতা ১/১০/১১, ৩/৬/৩)। সর্বগুণান্বিত শ্রেষ্ঠ নারীও তাই অন্যতম পুরুষের চেয়ে হীন (তৈত্তীরীয় সংহিতা ৬/৫/৮/২)। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে স্ত্রী স্বামীর পরে খাবে। কারণ ভুক্তেবাচ্ছিষ্টং বধ্বৈ দদাৎ, খেয়ে এটোটা স্ত্রীকে দেবে (গৃহ্যসূত্র ১/৪/১১)... বাড়ির কুকুর, বেড়াল এবং স্ত্রী একই জাতের জীব বলে এঁটো দিয়েই তাদের প্রতিপালন করা হয়। আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে (১/৯/২৩/৪৫) বলা হয়েছে কালো পাখি, শকুনি, নেউল ছুঁচো ও কুকুর হত্যা করলে যে প্রায়শ্চিত্ত, নারী হত্যা ও শূদ্র হত্যার সেই একই প্রায়শ্চিত্ত, অর্থাৎ মাত্র একদিনের কৃচ্ছসাধন।[7] আমাদের সভ্যতার প্রাচীন নানা ধর্মগ্রন্থে এই সকল বিধি-নিষেধ নারীকে ভোগ্য হিসেবে চিহ্নিত করে এসেছে। তার ফলস্বরূপ পিতৃতান্ত্রিক সমাজের চেতনা-অবচেতনে নারীদেহ সূচক যৌনতাকেন্দ্রিক স্ল্যাং-এর মাধ্যমে নারীকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এখন ছাত্র যুবক থেকে শুরু প্রৌঢ়দের কাছে সুন্দরী যুবতীর সমার্থক হল 'মাল', 'চিকনা মাল', 'ডাঁসা মাল', 'ডবকা মাল', 'জালি মাল', 'কাঁচা মাল' ইত্যাদি। 'মাল' কথার অর্থ পণ্যদ্রব্য। যেহেতু অন্য অনেক পণ্যের মতো নারীও বিনিময়যোগ্য তাই তার সমার্থক হয়ে দাঁড়ায় 'মাল'। তসলিমা নাসরিন লিখছেন—'মাল একটি আরবি শব্দ যার অর্থ পণ্যদ্রব্য। মুসলিম হাদীস শরীফে লেখা—"দুনিয়ার সব কিছু ভোগের সামগ্রী আর দুনিয়ার সর্বোত্তম সামগ্রী হচ্ছে মেয়েমানুষ।" বিনিময় পণ্য হিসেবে, মূল্যবান দাসী হিসাবে, দামী সামগ্রী হিসেবে সমাজে নারীর অবস্থান বলেই নারীকে 'মাল' বলে ডাকতে কারো দ্বিধা নেই। ওরা ডাকে কারণ ধর্ম ওদের ইন্ধন জোগাচ্ছে, সমাজ ও রাষ্ট্র ওদের আস্কারা দিচ্ছে।[8] হিন্দু সংস্কৃতি এবং শাস্ত্রের মত ইসলাম শাস্ত্র নারীকে ভোগ্যপণ্যের চোখে দেখেছে। —'তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতঃপর তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করিবে (সূরা বাকারা ২২৩ আয়াত)... সূরা নিসার ৩৪ আয়াতে আছে— পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ তাহাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন এবং পুরুষ তাহাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। ...স্ত্রীদের মধ্যে যাহাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাহাদিগকে সদুপদেশ দাও, তারপর তাহাদের শয্যা বর্জন কর এবং তাহাদিগকে প্রহার কর।[9] বোঝাই যাচ্ছে ধর্মের চোখেও নারী মানুষ নয়, তাই নারীদের উপর শারীরিক নির্যাতনের পাশাপাশি গাল-খিস্তি প্রয়োগ করে, ভাষা সন্ত্রাসের মধ্যে দিয়ে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীর উপর মনস্তাত্ত্বিক নিপীড়ন চালায়।

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে নারী যে অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের সঙ্গে বিবেচিত হতো তার প্রমাণ সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, মহাভারতে দেখা যায় ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে জুয়া খেলায় পন রাখলেন, ...বিনা প্রতিবাদে সভার মধ্যে দ্রৌপদীর উপর ঘটা যৌনহেনস্থা দেখে গেলেন। রামায়ণে আমরা দেখেছি শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে উদ্ধার করলেও তার সতীত্বের পরীক্ষা করছেন। আবার শাস্ত্রে বলা হচ্ছে নারী নরকের দ্বার, নারী অপবিত্র, যজ্ঞকালে শূদ্র, কুকুর ও নারী দর্শন নিষিদ্ধ, নারী দুর্ভাগ্যস্বরূপিনী ইত্যাদি, অর্থাৎ প্রাচীন কাল থেকে আজ অবধি সভ্যতার অগ্রগতি ঘটলেও নারী মনুষ্য গোত্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি।আমাদের সমাজের নারী দৃষ্টির এহেন ঐতিহ্যের উত্তরসূরী হিসেবে আমরা যখন নারীর প্রতি ঘৃণা, অবজ্ঞা ও লালসাপূর্ণ কটুক্তি করি, স্ল্যাং ব্যবহার করি তখন কোথাও একটা ঐতিহ্যের অনুরণন ঘটে, তাই নয় কি? দ্রৌপদীদের বস্ত্রহরণের রেওয়াজ বর্তমানেও সমানভাবে অব্যহত। সুযোগ পেলেই 'সুযোগের অভাবে চরিত্রবান পুরুষরা' উক্ত কর্মে পিছুপা হন না। আর যখন সুযোগ অধরা অথচ প্রবৃত্তি ষোল আনা তখন দুধের স্বাদ ঘোলে মিটানোর মত বেরিয়ে আসে কচি মাল, নি-মাই (স্তনহীন নারী), চমচম, টুসকি মাল, ফুলটুসি, জিবে গজা, চুলবুলি, আনারকলি, ছিনাল মাগী, ব্লু হট, চাবুক-মাল, প্রভৃতি যৌনগন্ধী স্ল্যাং। এই স্ল্যাং গুলির মাধ্যমে নারীর প্রতি গোটা সমাজের লোলুপ ধর্ষকামী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়ে পড়ে। 'শিক্ষিত ভদ্র সমাজের' ছাত্র যুবদের এইসব শব্দ এবং ভাষা আমাদের অতীত ঐতিহ্যের অনুসারী। ডক্টর সত্যজিৎ গোস্বামী যথার্থই বলেছেন 'অকথ্য শব্দাবলীর একটি বড় অংশ নারীর প্রতি

অসম্মান ও লালসা চিহ্নিত। পথে ঘাটে বাসে ট্রেনে চলতে গিয়ে প্রায় বিকৃত মানসিকতার সশব্দ উচ্চারণ আপনাকে শুনতে হবে। এইসব অশ্লীল অকথ্য শব্দের ফুলঝুরি শুনতে শুনতে তথাকথিত মার্জিত রুচি মানুষের ভ্রু ও মন যতই সংকুচিত হোক, যুবসমাজের চূড়ান্ত অবক্ষয়ের প্রতি প্রবল ঘৃণার অগ্নিস্রোত যতই বয়ে যাক না কেন বুকের তলায়, তবু মনে রাখতে হবে এই প্রবল বিকার সাম্প্রতিকও নয়, আমাদের সামগ্রিক সামাজিক ইতিহাস থেকে আদৌ বিচ্ছিন্ন নয়'।[১০]

শুধু ভারতীয় উপমহাদেশ নয়, বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তেও নারীদেহকেন্দ্রিক স্ল্যাং-এর প্রচলন দেখা যায়। ইংরেজি ভাষায় 'bitch', 'whore', 'slut' শব্দগুলি ঠিক একইভাবে নারীর যৌনাচার ও চরিত্রকে আক্রমণ করতে ব্যবহৃত হয়।[11] স্প্যানিশ 'puta', ফরাসি ভাষায় 'salope' শব্দগুলির ব্যবহারও একই পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার পরিচয় বহন করে।[12] অর্থাৎ, নারীদেহ ও যৌনতাকে কেন্দ্র করে স্ল্যাং-এর এই প্রয়োগ শুধু বাঙালি সমাজের নয়, এটি বিশ্বব্যাপী পিতৃতন্ত্রের একটি সাধারণ কৌশল। নারীবাদী ভাষাতাত্ত্বিক ডেল স্পেন্ডার তাঁর 'ম্যান মেড ল্যাঙ্গুয়েজ' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে ভাষা পুরুষের দ্বারা নির্মিত এবং তা পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গিই প্রতিফলিত করে।[13] ভাষায় নারীর অভিজ্ঞতার জন্য শব্দের অভাব আছে এবং নারীদের বোঝাতে ব্যবহৃত শব্দগুলি অধিকাংশ সময় নেতিবাচক বা যৌনাঙ্গীভূত—যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'বেশ্যা', 'ছিনাল'-এর পুরুষবাচক শব্দের অনুপস্থিতি।

স্ল্যাং: আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু নারীর দেহ, যৌনতা:

সমাজে বৈষম্য টিকিয়ে রাখার অন্যতম বড় হাতিয়ার হলো ভাষা। শব্দ নির্বাচন ও ভাষার ব্যবহারের সঙ্গে মিশে থাকে ক্ষমতায় টিকে থাকার রাজনীতি। একটি সমাজে নারীর অবস্থান অনেকটাই প্রতিফলিত তাঁর প্রতি ভাষায় ব্যবহারে। গালিগুলোকে উদারভাবে আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতির অংশ হিসেবে দেখানোর ফলে বৈধতা পায় গালির মাধ্যমে নারীর প্রতি শোষণ, নির্যাতন আর অপমান। আমাদের সমাজে প্রচলিত গালিগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যৌনগন্ধী এবং নারীকে অসম্মান করার প্রবণতায় দূষিত। সেই সঙ্গে শারীরিক নির্যাতনের পাশাপাশি নারীকে যে নানা ধরণের মানসিক নিগ্রহের (psychological violence) শিকার হতে হয়, তার একটি বড় অংশ হয় নেতিবাচক নানা স্ল্যাং-এর মাধ্যমে, যেগুলো দিয়ে নারীর কর্মদক্ষতা বা যোগ্যতা খাটো করা হয়। যেমন—মুখরা (যে নারী খোঁচা দিয়ে বেশি কথা বলে), ঝগড়াটে (যে ঝগড়া করে, কিন্তু কোন আগ্রাসী পুরুষের জন্য এই শব্দ ব্যবহার হয় না), মাল (আকর্ষণীয় নারী), বন্ধ্যা/বাজা (সন্তান নেই যার), পোড়ামুখী (খারাপ ভাগ্য যার), ডাইনী, খানকী বা বেশ্যা, ছিনাল, কুটনি, অসতী, নটী, ব্যাভিচারিণী, কুলটা, পতিতা, ভ্রষ্টা, নষ্ট মেয়ে ইত্যাদি ইত্যাদি। একটু লক্ষ করলেই দেখা যায়, বাংলা ভাষায় এইসব স্ত্রীবাচক স্ল্যাং-এর পুরুষবাচক কোনো শব্দ নেই। সাধারণত শরীর বিক্রি করা মেয়েদের উপাধি হয়েছে বেশ্যা শব্দটি। তবে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নির্মিত লক্ষণরেখা অতিক্রম করে রাতে বাইরে ঘোরাফেরা করে, পুরুষতান্ত্রিক অবদমনকে মেনে না নিয়ে নিজের স্বাধীনতায় বাঁচতে চায় সেই সমস্ত অবাধ্য মেয়েদেরও বেশ্যা বলার চল আছে। আবার সতীত্ব নামক যৌন পবিত্রতা কেবল নারীরই রক্ষা করতে হবে। পুরুষের জন্য সতীত্বের সমার্থক শব্দ আজ অবধি কোনো অভিধানে ওঠেনি। বসিরহাটের ৩২ বছরের ইটভাটা- শ্রমিক রমেশ মন্ডল সরল সুরে জানালেন: "ঘরের বউ প্রেম করলে সে ছিনাল, বেশ্যা হয়ে যায়"। কিন্তু তাঁর স্ত্রী মিতা দেবীর মত ভিন্ন: "উনি আমাকে বাজা মাগী বলে গালি দেন, অন্য জায়গায় প্রেমের সম্পর্ক করে, তখন উনি সাধু পুরুষ। বাচ্চা না হওয়া আমার একার অপরাধ নাকি?"(ব্যাক্তিগত সাক্ষাৎকার)

তো দেখা যাচ্ছে বাংলা ভাষায় প্রচলিত গালির অধিকাংশই নারীর শরীর, মনস্তত্ত্ব, কর্মদক্ষতা, সামাজিক অবস্থান কিংবা তাঁর যৌনতাকে কটাক্ষ করে আবর্তিত। আসলে গালির সঙ্গে জড়িত আছে ক্ষমতার রাজনীতি। নিজের স্বাধীন অস্তিত্ব নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ানো একজন নারীকে দমিয়ে রাখতে হলে সবচেয়ে ধারালো অস্ত্র

তার চরিত্রে আঘাত করে গালি দেওয়া। কোনোভাবে তাকে চরিত্রহীন বলতে পারলেই হলো। প্রমাণ করারও দরকার হবে না, নারী মানসিকভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়বে। নারীকে আক্রমণ করার জন্য প্রচলিত কিছু ভাষিক বর্বরতার দৃষ্টান্ত দেখা যাক— 'বেশ্যা মাগী', 'পতিতা', 'খানকি', 'আঁটকুড়ো', 'বাঁজা মাগী', 'আগুনখাকি', 'কুটনী মাগী', 'ঢ্যামনা মাগী', 'দজ্জাল মাগী', 'এজমালি মাগী', 'গতরখাকি', 'ঢলঢলে মাগী', 'দুলকি মাগি', 'বাচাল মাগী', 'হুমদো মাগী', 'সাত ভাতারী সাবিত্রী', 'বাজারী মাগী', 'কাউরা মাগী', 'বারো ভাতারী' প্রভৃতি। বাংলা প্রবাদে আমরা শুনতে পাই: "ঢ্যামনা মাগীর ঢ্যামনা মন, পরপুরুষকে করে আপনজন।"[14]

প্রচলিত গালিগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নারীর যৌন অঙ্গ কিংবা তাঁর যৌনতাকে ঘিরে বলা গালিতে ফুটে ওঠে পুরুষের ধর্ষকামী চেতনা এবং বিকৃত কামবাসনা। পুরুষের এই ধর্ষকামী মানসিকতা দ্বারা প্রভাবিত হন নারীও। একই সমাজে বেড়ে ওঠা নারীও স্বগোত্রের প্রতি অবমাননাকর এই শব্দগুলোকেই প্রয়োগ করেন অবলীলায়। বাংলা ভাষার গবেষক সুকুমার সেন তার 'বাংলায় নারীর ভাষা' প্রবন্ধে কিছু শব্দের কথা উল্লেখ করেছেন—যা থেকে পুরুষ ও নারীর সামাজিক অবস্থান স্পষ্ট হয়, যেমন— 'অনাছিষ্টি', লক্ষ্মীছাড়া, 'আঁটকুড়ো', 'আড়ি', 'আদিখ্যেতা', 'কুটনী', 'খোঁটা', 'গাদী', 'গুমর', 'গা', 'ছিরি', 'ঠমক', 'ঢঙ', 'দেমাক', 'ন্যাকা', 'পোয়াতি', 'বিয়েন', 'কুট্টি', 'মিনসে', 'রাঁড়', 'রাঁড়ী', 'সেয়ানা', 'সোমত্ত', 'সোহাগ', 'সই' ইত্যাদি।[15]

আমরা জানি যে সামাজিক অর্থ নির্মাণে 'মেয়েলি' শব্দটি দিয়ে মেয়েদের আবেগী, যুক্তিহীন, কোমল, অবলা, 'নরম', 'লজ্জাবতী' প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য দিয়ে চিহ্নিত করা হয়, অপরদিকে পুরুষালি শব্দটি দিয়ে পৌরুষ, শক্তি, ক্ষমতার দম্ভ প্রকাশিত হয়। এখানেই নিহিত ভাষার রাজনীতি। তাই আমরা যখন দেখি কোনো ছেলে পৌরুষের ছক ভেঙ্গে কোমল আচরণ করছে, সাজতে চাইছে, তখনই তাঁর স্বভাবকে 'মেয়েলি' স্বভাব বলে বা 'মেয়েলোক', 'মেয়েছেলে', 'হাফ-লেডিজ' ইত্যাদি বলে কুৎসিতভাবে অপমান করা হয়। এর পাশাপাশি যেসব পুরুষ স্ত্রীর কথামতো চলে, তাদের উপহাস করে বলা হয় 'স্ত্রৈণ'। এই শব্দটি প্রয়োগ হয় পুরুষের জন্য নেতিবাচক, অসম্মানজনক, অগৌরবজনক হিসেবে। আবার অপরদিকে মেয়েরা যদি কোড অব কন্ডাক্টের লক্ষণরেখা অতিক্রম করে রাতে বাইরে চলাফেরা করে, প্রশ্নহীন আনুগত্যের বাইরে এসে তর্ক করে, জোরে হাঁটে, ক্রিকেট খেলে, গাছে ওঠে, সোজা কথায় পুরুষতান্ত্রিকতাকে অস্বীকার করে তখন তার স্বভাবকে 'মদ্দা স্বভাব', 'দস্যি মেয়ে' ইত্যাদি বলে আক্রমণ করা হয়।

আসলে স্ল্যাং-এর মাধ্যমে কীভাবে নারীকে অবদমন, হেয় প্রতিপন্ন, তুচ্ছ, খাটো, নিন্দা বা অপমান করা যায় তার জন্যই পুরুষ তৈরি করে নিয়েছে আলাদা স্ল্যাং পরিভাষা, যার মাধ্যমে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীর প্রতি চালায় ভাষিক নিপীড়ন। সভ্যতার এতোটা অগ্রগতি হলো, নারীরা ঘরের চারদেয়ালের বাইরে বেরিয়ে এসে রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান সর্বত্র নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখছেন, কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক ভাষাসন্ত্রাসের মুখে আজো নারীদের ক্ষতবিক্ষত হতে হয়। আমরা দেখেছি বিধানসভা থেকে শুরু করে লোকসভায় পর্যন্ত নির্বাচিত নারী জনপ্রতিনিধিকে তাদের বেশভূষার জন্য পুরুষ প্রতিনিধির কটাক্ষ বাক্যবাণে বিদ্ধ হতে হয়। বর্তমানে আমাদের রাজ্য রাজনীতির দিকে চোখ রাখলে দেখতে পাচ্ছি অকথা-কুকথার কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি চলছে অবিরত, তার উপরে রাজনীতির রাঘববোয়ালদের মুখে অকথ্য স্ল্যাং-এর মাধ্যমে মা-বোনকে তুলে হুমকি থ্রেটের কালচার যৌন বিদ্বেষকে কতোখানি প্রশ্রয় দিচ্ছে ভাবলে শিহরিত হতে হয়। এই যৌন বিদ্বেষী মন্তব্য ক্ষমতার প্রশ্রয়ে থাকার জন্য ধর্ষণের রমরমা বাড়ছে, যৌন হিংসার ঘটনা বাড়ছে।

জুডিথ বাটলারের 'পারফরমেটিভিটি' তত্ত্ব অনুযায়ী, লিঙ্গ পরিচয় কোনো স্থির সত্তা নয়; এটি বারংবার ভাষা ও আচরণের মাধ্যমে 'সম্পাদিত' হয়।[16] বাংলা স্ল্যাং-এ নারীদেহ সূচক শব্দগুলির পুনঃপুন প্রয়োগ আসলে নারীর একটি নির্দিষ্ট লিঙ্গ পরিচিতি নির্মাণ করে—যে পরিচিতিতে নারী কেবল একটি যৌনসত্ত্বা, ভোগের

বস্তু।যখন কোনো ছাত্র দল বন্ধুদের মধ্যে 'চিকনা মাল' বলে একটি মেয়েকে আখ্যায়িত করে, তখন তারা কেবল একটি শব্দ ব্যবহার করছে না, তারা নারীর দেহ ও অস্তিত্ব সম্পর্কে একটি বিশেষ 'সত্য' বারবার রচনা করছে, যা পরিণামে নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করে। এই ভাষিক পারফরমেন্স দিনের পর দিন চলতে থাকলে তা একটি 'স্বাভাবিক' ও 'প্রাকৃতিক' সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ছাত্র সমাজ ও যৌন ইঙ্গিতবাহী স্ল্যাং: যৌন হিংসার আঁতুড়ঘর:

বর্তমান দিনে ছাত্র সমাজের মধ্যে আড্ডা ইয়ার্কির ছলে যে স্ল্যাং গুলি প্রয়োগ করা হয় তার বেশিরভাগটাই নারী অঙ্গ মূলত যৌনাঙ্গের প্রতি লালসা-জ্ঞাপক শব্দ। বিকৃত কাম মানসিকতাই স্ল্যাং-এর অনেকটা অংশ জুড়ে আছে, তাই নারীর স্তন, নিতম্ব, যৌনাঙ্গগুলিই স্ল্যাং-এর কেন্দ্রবিন্দু। ছেলেরা মেয়েদের নিয়ে যেসব মজা করে সেগুলো ভীষণ রকম সেক্সিস্ট হিউমর হয়ে থাকে, যেমন কলেজের হালকা গড়নের মেয়েটিকে নামকরণ করা হয় 'নি-মাই' আর একটু ভারী গড়নের মেয়েটিকে ডাকা হয় 'লাউ' নামে। এই ধরনের যৌন রসিকতা যৌন বিদ্বেষকে প্রশ্রয় দেয়, যৌন অপরাধকে প্রত্যক্ষ ইন্ধন জোগায়, তাই নয় কি? সামাজিক ধর্ষণ ইচ্ছার প্রকাশ দেখা যায় আজকের দিনের ছাত্র-যুবদের 'ব' সূচক পুরুষাঙ্গ শব্দের আধিক্যের মধ্যে। শব্দটির এতই আধিক্য যে অনেকের কাছে এটি মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়ে গেছে। 'মাদারচোদ', 'বানচোদ', 'রেন্ডির বাচ্চা', 'খানকির ছেলে' এই সমস্ত স্ল্যাং গুলির আকছার বাচনিক প্রয়োগ দেখা যায় ছাত্র সমাজে, এগুলোর মাধ্যমে আসলে তাদের যৌন বিকার মানসিকতার ব্যাপকতর বহিঃপ্রকাশ ঘটে। একাদশ শ্রেণীর এক ছাত্র (১৮) স্বীকার করলো—"বন্ধুদের সাথে আড্ডার সময় ক্লাসের বিভিন্ন সহপাঠিনীদের উদ্দেশ্য করে নানারকম ঠাট্টা -ইয়ার্কি করি, যেমন একটু স্থূল সহপাঠিনীকে লাউ বলে ডাকি, সুন্দরী সহপাঠিনী কে আনারকলি বলি, এগুলো নিছক মজা করে বলি"!

ছাত্র সমাজের এই মানসিক বিকারকে প্রশ্রয় দিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমগুলির প্রত্যক্ষ ভূমিকা আছে। আজকের দিনে হলিউড, বলিউড, টলিউড সর্বত্র সিনেমায় হিংসা, খুন, ধর্ষণ ইত্যাদির রমরমা। বিজ্ঞাপনী প্রচারে নারীদেহকে ভোগ্যপণ্য হিসেবে, যৌন বস্তু (sexual object) হিসেবে উপস্থাপনের প্রবণতা লাগামছাড়া হয়ে উঠেছে, আবার ফ্যাশন শো, সুন্দরী প্রতিযোগিতার নামে দেখানো হয় আসলে নারীর শরীরের নানান খাজ ও ভাঁজগুলি। নারীর 'sexy' রূপে দেখার বাসনা এতই উগ্র যে এখন যে কোনো সিনেমাতে 'আইটেম ড্যান্স' অতি আবশ্যক রাখতে হয়। স্ল্যাং-এর পরিভাষায় নতুন সংযোজন হলো আরেকটি অসম্মানজনক শব্দ 'আইটেম গার্ল'। দর্শকের এই চাহিদার মধ্যে ধরা পরে আমাদের সামাজিক গণমনস্তত্ত্বের ছবি। লরা মুলভির 'মেল গেজ' তত্ত্ব অনুযায়ী, সিনেমা ও গণমাধ্যমের চিত্রায়ণে নারী সবসময় পুরুষের দৃষ্টির 'বস্তু' হিসেবে উপস্থাপিত হন; পুরুষ হল 'বীক্ষক' আর নারী হল 'দর্শনীয় বস্তু'।[17] স্ল্যাং-এর মাধ্যমেও নারীকে পুরুষের এই 'ভাষিক দৃষ্টির' বস্তু বানানো হয়—'চিকনা মাল', 'টাইট মাল', 'আইটেম গার্ল' প্রভৃতি পরিভাষা আসলে নারীদেহকে পুরুষের লালসার 'গেজ'-এর সামনে উপস্থাপন করে।ছাত্র সমাজে নারীদের ইভটিজিং করা খুবই সাধারণ ঘটনা বলে ধরা হয়,ছাত্র সমাজ মনে করে আড্ডা ইয়ার্কির ছলে একটু আধটু ইভটিজিং তো করাই যেতে পারে, এটা ছাত্র বয়সের ধর্ম। তো এই ইভটিজিং নামে নারীকে 'উত্ত্যক্ত' করার এবং বিরক্ত করার পারিভাষিক শব্দ পর্যন্ত তৈরি হয়েছে ছাত্র সমাজে। খাদ্যদ্রব্য, ফল, বাদ্যযন্ত্র, অস্ত্র, এই সব বিষয়কে বিকৃত অর্থে ব্যবহার করা হয় নারীকে ভাষিক নিপীড়ন করার জন্য। যেমন— 'রসে ভরা কমলা', 'টাইট মাল', 'কচি ডাব', 'এটম বোম', 'মিষ্টি তেঁতুল', 'তানপুরা', 'গাড়ির চেসিস', 'ডবল ডেকার', 'গোলাপ জাম', 'কোম্পানির মাল', 'মাগির গ্যারেজ বড়', 'কালনাগিনী', 'কাশবন', 'কচি মাল', 'ইন্ডিয়া গেট', 'জাম্বুরা', 'গোলাপি আপেল', 'দুধের ট্যাঙ্কার' ইত্যাদি। আবার যৌন ইশারাযুক্ত স্ল্যাং ভদ্র সমাজে তেমন চল না থাকলেও এমন কিছু শব্দ আছে যা আপাতভাবে অশ্লীল বলে মনে না হলেও ইঙ্গিত কিন্তু পরিষ্কার থাকে, ছাত্র সমাজে এগুলোর প্রচলন বেশি। যেমন—ওল্টানো কড়াই (সুদৃশ

নিতম্ব), খাল (বহু ব্যবহৃত যোনি), বালিশ ওয়ালি (বৃহৎ স্তন যুক্ত মহিলা), লোডেড মাল (গর্ভবতী মহিলা)। আবার '... মেরে দেবো', 'লাগাবো', 'খেলা হবে' এগুলো ইশারা ইঙ্গিতে বলার মাধ্যমে ছাত্রসমাজের মধ্যেকার সুপ্ত ধর্ষণেচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। উপরোক্ত শব্দগুলো যেগুলো যৌনতা, কামুকতা ও নোংরামিতে ভরপুর সেগুলো নারীর দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাথে সাদৃশ্য করে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে ছাত্রসমাজের একাংশ তাদের মধ্যেকার বিকৃত যৌনকামনাকে তৃপ্ত করার হয়তো প্রয়াস চালায়।

দেখা যাবে বাংলা স্ল্যাং-এ মেয়েদের নিয়ে নানা রকমের শব্দের প্রাচুর্য, সেখানে নারীকে দেখা হচ্ছে যৌনবস্তু হিসাবে। আমরা শুধু 'মেয়ে' শব্দের যত রকম প্রতিশব্দ বাংলা স্ল্যাং-এ আছে তার যদি একটা তালিকা করি তাহলে তার বিস্ময়কর পরিভাষা ধরা পড়বে— 'আগুন, আনারকলি, কমলি খরশি, খাপচু, গুড গুডস, গুড়িয়া, গোলাপ জাম, চামকি, চাম্পি, চিকনা, চিজ, চিড়িয়া, চুটকি, চুলবুলি, চাঁদনী, ছাম, ছেমড়ি, জি টু, ঝিল্লি, টিশু, তুবড়ি, দুগ্গি, নল, পাটি, পানসি, পিস, ফানটুস, ফোর ফরটি, ভাতি, মাল, মিছরি, রঙ্গিলা, লগদা ইত্যাদি'।[18]

বলাবাহুল্য এই জাতীয় শব্দ ব্যবহারের মধ্যে প্রতিফলিত হয় পুরুষের প্রচ্ছন্ন ধর্ষণকামিতা, যেখানে মেয়েদের উপভোগের বস্তু হিসাবে 'যৌন বস্তু' (sexual object) হিসেবে দেখার প্রবণতাটাই বড়। নারী সম্পর্কে এই অশ্রদ্ধার বোধ, অসম্মানের রীতি শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে বাঙালি পুরুষের স্ল্যাং-এ পাওয়া যায়। সমাজের উচ্চমহলে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নারী সম্পর্কিত ধারণায় হয়তো সামান্য কিছু পরিবর্তন হয়ে থাকতে পারে কিন্তু স্ল্যাং-এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে তার কোন বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। বিশেষত তরুণ প্রজন্ম বা ছাত্র সমাজে এ বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। নারীকে যৌনসত্ত্বা হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য কিছু পরিভাষা তৈরি হয়েছে ছাত্র সমাজে, যেগুলো প্রতিনিয়ত খুব স্বাভাবিকভাবে আকছার ব্যবহৃত হয়।

স্তন: আতা, আনারদানা, আপেল, আমসি, উই ঢিবি, গ্যানা, চুঁচি, নিমকি, নিমাই, পিরামিড, ফজলি আম, বাতাবি, বুটকি, বেগুন, বেগুন পোড়া, মাই, মেশিন, ম্যানা, লুচি, সিঙ্গারা, হেডলাইট।

যোনি: গাঁড়, গুদ, গুহা, চুত, চেরাপুঞ্জি, চ্যাট, ফুটো, মন্দির, মাং, স্বর্গ, স্বর্গদ্বার, হোল।

পশ্চাদ্দেশ: কত দিবি কত নিবি, কি দিবি কি নিবি, ডবল ডেকার, ডেকচি, তবলা, তানপুরা, তুই থাক আমি যাই, দুলকি, দোলন।

নাভি: খিড়কি, টুনি, পেটি।[19]

আসলে, ভদ্র সমাজের শিক্ষিত তরুণ প্রজন্মের মধ্যে নারীর প্রতি মানবিক সম্মানবোধের ধারণা গড়ে ওঠে নি, নারীকে কেবল যৌনযন্ত্র হিসেবে চেনে, তাই শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ, যৌননির্যাতনের ঘটনা উত্তরোত্তর মহামারির আকার নেবে, তাতে আশ্চর্য হওয়ার অবকাশ থাকবে না, কারণ এই সমাজ তরুণ প্রজন্মের এই ধর্ষকামী মানসিকতাকে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে।

উপসংহার: রমণী সুন্দর হয় 'মনুষ্যত্ব' রক্ষণে:

ভিক্টোরিয়া যুগের শালীনতাবোধকে আজও আমরা সর্বাংশে বাদ দিতে পারিনি। ফলে সমাজে যৌনতা নিয়ে এখনো ট্যাবু রয়েই গেছে। মজার ব্যাপার হলো জনসংখ্যার নিরিখে পৃথিবীর প্রথম স্থান দখল করা সত্ত্বেও ভারতীয় সমাজে যৌনতা সম্পর্কিত মুক্ত আলোচনায় এখনও এতো প্রবলতম নিষিদ্ধ, রাখঢাক, গুড়গুড় ব্যাপার রয়ে গেছে যে, যৌনতাকে নোংরা, অশ্লীল বিষয় রূপে বিবেচনা করে স্ল্যাং প্রয়োগের মাধ্যমে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের কুশীলবরা তাদের ভিতরকার অতৃপ্ত ধর্ষকামীতাকে তৃপ্ত করে থাকে। আর যেহেতু প্রাচীনকাল থেকেই 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা' থেকে মনুর অন্য সব বিধানে নারীকে কেবলমাত্র ভোগ্যা, ব্যবহার্য শরীর হিসাবে দেখা হয়েছে, সেই প্রাচীন ধারা অনুসারে নারী বর্তমানেও সমাজের চোখে শরীরসর্বস্ব প্রোডাকশন মেশিন, যৌনসত্ত্বা;

আকর্ষণীয় স্তন, যোনি, উরু, নাভি এগুলোর মধ্যেই নারীর পরিচিতি সীমাবদ্ধ। সমাজের চোখে নারী তাই কেবলই মেয়েমানুষ, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ মানুষ নয়। আমরা দেখবো যে পুরুষ শব্দের সমার্থক হিসেবে মানুষ কিংবা মনুষ্য শব্দ আছে অভিধানে কিন্তু নারী শব্দের সমার্থক হিসাবে তা নেই। এইভাবে আমাদের সংস্কৃতিতে ভাষাগত লিঙ্গ রাজনীতি ডালপালা মেলে আছে। নারী যেহেতু মানুষ নয়, শরীর, তাই নারীর শরীরকে স্ল্যাং-এর মাধ্যমে রগরগে উপস্থাপন করা হয় আকছার। আর স্ল্যাং-কে নিম্নশ্রেণীর মুখের ভাষা হিসেবে ধরা হলেও বাস্তব অন্য কথা বলে। আসলে ভিক্টোরিয়ান শালীনতাবোধের মুখোশ পরে থাকলেও ভদ্র সমাজের তথাকথিত শিক্ষিত রুচিশীল সংস্কৃতিমনস্ক মানুষের মুখোশের আড়ালে ঘাপটি মেরে থাকে এক বিকৃতকাম মানসিকতা, সুযোগ পেলেই মুখোশের আড়াল থেকে গলগল করে নির্গত হয় নারীদেহ সূচক যৌনগন্ধী স্ল্যাং-এর ফুলঝুরি।এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজে অদ্ভুত দ্বিচারিতা দেখা যায়। এই সমাজ একহাতে নারীকে মাতৃজ্ঞানে, দেবী জ্ঞানে পূজা করে, আবার পিতৃতান্ত্রিক লক্ষণরেখা ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে চাইছে যে নারী, তছনছ করে দিতে চাইছে স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণের ছক, তাকে 'বেশ্যা মাগী' বলে গালি দেয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুললেই তাকে 'ডাইনি' বলে পুড়িয়ে মারে। প্রশ্নহীন আনুগত্যের বাইরে যেতে চাইলে তাকে 'ছিনাল' বলে তার জিভ কেটে দেয়, 'অসতী খানকি' বলে জীবন্ত কবর দেয়। আবার ছাত্র সমাজের ইভটিজিং-এর পরিভাষাগুলো সমাজ উদারচিত্তে প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে সমাজে ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি ও যৌন হিংসার ঘটনা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।এইভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আধিপত্যবাদ বজায় রাখার জন্য নারীদেহকে নিয়ে তৈরি হয়েছে ভাষাগত লিঙ্গ রাজনীতি। বেশ্যা, অসতীর পুংবাচক শব্দ অভিধানে কি কখনও লেখা হবে? শরীরের ঊর্ধ্বে, যৌনযন্ত্রের ঊর্ধ্বে গিয়ে কবে এই সমাজ নারীদের মানুষ হিসাবে দেখতে শিখবে? এইসব প্রশ্নের উত্তরের জন্য কি আরো কয়েক শতাব্দী অপেক্ষা করতে হবে?

তথ্যসূত্র:

১. সেন, সুকুমার। ভাষার ইতিবৃত্ত। ইস্টার্ন পাবলিকেশন, ১৯৮৩, কলকাতা, পৃ. ১২।

২. হাইমস, ডেল। ফাউন্ডেশনস ইন সোশিওলিঙ্গুইস্টিকস: অ্যান এথনোগ্রাফিক অ্যাপ্রোচ। ইউনিভার্সিটি অফ পেনসিলভানিয়া প্রেস, ১৯৭৪, ফিলাডেলফিয়া, পৃ. ৫৩-৬২।

৩. ফুকো, মিশেল। দ্য আর্কিওলজি অব নলেজ অ্যান্ড দ্য ডিসকোর্স অন ল্যাঙ্গুয়েজ। এ. এম. শেরিডান স্মিথ অনূদিত, প্যানথিয়ন বুকস, ১৯৭২, নিউ ইয়র্ক, পৃ. ২১৫-২১৭।

৪. বর্দিয়ু, পিয়ের এবং জঁ-ক্লদ পাসেরোঁ। রিপ্রোডাকশন ইন এডুকেশন, সোসাইটি অ্যান্ড কালচার। রিচার্ড নাইস অনূদিত, সেজ পাবলিকেশনস, ১৯৯০, লন্ডন, পৃ. ৪-৬।

৫. সরকার, পবিত্র। লোকভাষা-লোকসংস্কৃতি। চিরায়ত প্রকাশন, ২০০৩, কলকাতা, পৃ. ১০৩।

৬. গোস্বামী, সত্রাজিৎ। বাংলা অকথ্যভাষা ও শব্দকোষ। জয় দুর্গা লাইব্রেরী, ২০০০, কলকাতা, পৃ. ৯৯।

৭. নাসরিন, তসলিমা। নির্বাচিত কলাম। আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৪, কলকাতা, পৃ. ২৩।

৮. তদেব ,পৃ. ১৭।

৯.তদেব, পৃ. ৬৮।

১০. গোস্বামী, সত্রাজিৎ। বাংলা অকথ্যভাষা ও শব্দকোষ। জয় দুর্গা লাইব্রেরী, ২০০০, কলকাতা, পৃ. ৯৯।

১১. ক্যামেরন, ডেবোরা। ফেমিনিজম অ্যান্ড লিঙ্গুইস্টিক থিওরি। প্যালগ্রেভ ম্যাকমিলান, ১৯৯২, লন্ডন, পৃ. ১০২-১০৫।

১২. মোলিনার, রোজিও। 'ওমেন অ্যান্ড স্ল্যাং ইন স্প্যানিশ: আ কালচার্যাল পারস্পেকটিভ', জার্নাল অফ জেন্ডার স্টাডিজ ২৫, নং ৩ (২০১৬): ২৭৬-২৮৯।

১৩. স্পেন্ডার, ডেল। ম্যান মেড ল্যাঙ্গুয়েজ। রাউটলেজ অ্যান্ড কিগান পল, ১৯৮০, লন্ডন, পৃ. ১৫-২২।

১৪. বসাক, সুনন্দা। বাংলার প্রবাদ। আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৭, কলকাতা, পৃ. ১৩১।

১৫. সেন, সুকুমার। 'বাংলায় নারীর ভাষা', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৩৩, নং ২ (১৯২৭): ৪৫-৬২।

১৬. বাটলার, জুডিথ। জেন্ডার ট্রাবল: ফেমিনিজম অ্যান্ড দ্য সাবভার্সন অফ আইডেনটিটি। রাউটলেজ, ১৯৯০, নিউ ইয়র্ক, পৃ. ৩৪-৩৬।

১৭. মুলভি, লরা। 'ভিজ্যুয়াল প্লেজার অ্যান্ড ন্যারেটিভ সিনেমা', স্ক্রিন ১৬, নং ৩ (১৯৭৫): ৬-১৮।

১৮. বসু, অভ্র। বাংলা স্ল্যাং সমীক্ষা ও অভিধান। প্যাপিরাস, ২০০৬, কলকাতা, পৃ. ১৮৩।

১৯.তদেব, পৃ. ১৮৪।

(প্রবন্ধে উল্লিখিত বিভিন্ন ধরণের "স্ল্যাং", সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ ব্যবহার করে থাকেন। যদিও যেগুলো ভদ্রসমাজে বা একাডেমিক পরিসরে ব্যবহৃত হয় না। তবে প্রবন্ধের মূল বক্তব্যকে 'জাস্টিফাই' করার উদ্দেশ্যে নারীদেহ সূচক কিছু 'নিষিদ্ধ', 'অশালীন' স্ল্যাং প্রবন্ধে উল্লেখ করতে হলো ইচ্ছাকৃতভাবে।)

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1195- 1201
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.339

নিম্নবিত্তীয় জীবন ভাবনার আলোকে সমরেশ মজুমদারের গল্প

অনন্ত বর্মন, *গবেষক, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, অসম, ভারত*

Received: 15.03.2026; Accepted: 17.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Samaresh Majumdar is an established wiriter of the 1970s. Although born in North Bengal, he resided in Kolkata due to professional oligations. Consequently, he witnessed – on one hand – the lives of the lower classes in Kolkata, and on the other – the lives neglected, deprived, and impoverished people of North Bengal, as well as the various indigenous communities such as the Lepchas and Madeshias. He has portrayed the anguish and struggles of these lower-class people observed firsthand in various stories throughout his oeuvre. Furthermore, his stories highlight the economic hardships faced by immigrants in North Bengal, as well as the financial struggles of the lower classes who depend on the region's tea gardens, rivers, and forests for their livelihood. For instance, in the story 'Janani', just as Bindu unhesitatingly plunges into the river to grasp a floating tree trunk, her husband shows no hesitation in stripping clothes from a corpse. In the story 'Char, Shahar ebong Ekti Bekub' day laborers, domestic maids, rickshaw pullers, and hand – cart pullers – unable to find shelter for the night in Jalpaiguri city – find their soler refuge on the riverbank. Conversely, in the story 'jathor' he depicts the abject Poverty of day laborers living on the banks of the Teesta River. In 'Yuddha Kshetrey Ekjan' the marginalized farmar of North Bengal rise up in revolt against the exploitation and deprivation inflicted by landlords and feudal estate owners. In the story 'Octopus', he illustrates how certain selfish and avaricious individuals in society prey upon the lower classes to secure their own interests, intimately pushing the poor toward the brink of death. Finally, in 'Jiyono Machh', he articulates the suffering and hardships in the tea gardens. In essence, Samaresh Majumdar did not merely recount the tribulation of the lower classes; he also illuminated the paths of hope and resilience that enable them to survive.

Keywords: Lower class, farmers, day laborers, rivers, workers

বাংলা সাহিত্যে নিম্নবিত্তের চর্চার ইতিহাস প্রাচীন যুগের চর্যাপদ থেকে শুরু করে আধুনিক সাহিত্যেও তা প্রবাহমান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের সার্থক ছোটগল্পকার হলেও তিনি তাঁর গল্পে শুধু সমাজের মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্তের সমস্যার কথাই তুলে ধরেছেন। নিম্নবিত্ত মানুষের কথা তুলে ধরলেও সমাজের অবহেলিত, বিত্তহীন, শ্রমজীবী, কৃষক, বস্তিবাসী মানুষেরা তাঁর গল্পে নির্বাসিত। এই আবহে আবির্ভাব ঘটে কল্লোল লেখক গোষ্ঠীর। সমরেশ মজুমদার তাঁর 'গীতবিতান ছুঁয়ে বলছি' গ্রন্থে বলেছেন-

> "কল্লোল এর লেখকেরা গোকুল নাগের নেতৃত্বে সেই তথাকথিত শুদ্ধতার বেড়া ভেঙে নীচের তলার মানুষদের ওপরে তোলার চেষ্টা করলেন।"[১]

কল্লোল লেখক গোষ্ঠীর সব লেখাই যে নিম্নবিত্তের তা নয়। কিছু কিছু গল্প আছে যা আমাদের মনের গ্রন্থিগুলিকে নাড়া দেয়, যেমন– অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'দুইবার রাজা', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সংসার সীমান্তে', শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'কয়লাকুঠি' ইত্যাদি গল্পে নিম্নবিত্ত মানুষের দৈনন্দিন সমস্যা এবং নীচের তলার মানুষদের ওপরে তোলার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। এই সময়ের পরর্বতী কয়েক দশক পরে আবির্ভাব ঘটে বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের। তিনিও তাঁর বিভিন্ন গল্পে নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন যন্ত্রণার কথা ব্যক্ত করেছেন। যদিও নিম্নবর্গ ও নিম্নবিত্ত বিষয়টি এক নয়। আমাদের প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় সমাজে অর্থনৈতিক দিক থেকে নিম্ন পেশায় নিযুক্ত অবহেলিত, নিপীড়িত, দরিদ্র মানুষের জীবন নিয়ে সীমাবদ্ধ। সমরেশ মজুমদারের জন্ম উত্তরবঙ্গে হলেও কর্মসূত্রে কলকাতায় ছিলেন। ফলে তিনি তাঁর বিভিন্ন গল্পে উত্তরবঙ্গের নিম্নবিত্ত মানুষের 'খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান'-এর জন্য সংগ্রাম ব্যক্ত করেছেন। এছাড়াও উত্তরবঙ্গের অভিবাসীদের জীবন, চা-বাগানের মদেশিয়া শ্রমিকদের জীবন, নদী ও জঙ্গলের উপর নির্ভর করা নিম্নবিত্ত মানুষের অর্থনৈতিক টানাপোড়েন লেখক বিভিন্ন গল্পে উপস্থাপন করেছেন। যেমন– 'জিয়োনো মাছ', 'জননী', 'যুদ্ধ ক্ষেত্রে এক জন', অক্টোপাস', 'দায়' ইত্যাদি গল্পে তিনি চা-বাগানের মদেশিয়া শ্রমিক থেকে শুরু করে তিস্তা নদীর চরে বিত্তহীন মানুষদের এবং দিনমজুরদের জীবন যন্ত্রণার পরিচয় দিয়েছেন।

সমরেশ মজুমদারের শৈশব কেটেছে ডুয়ার্সের চা-বাগানে। এবং স্কুল জীবন কেটেছে জলপাইগুড়ির তিস্তা নদীর পাশে হাকিম পাড়ায়। ফলে উত্তরবঙ্গের নিম্নবিত্তের কৃষক, চা-বাগানের মদেশিয়া শ্রমিক, তিস্তা নদীর চরে বসবাসকারী মানুষ এবং জঙ্গলের উপর নির্ভর করা মানুষের জীবন সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করেছেন। সেই প্রত্যক্ষ দেখা নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন সংগ্রামের কাহিনি তিনি বিভিন্ন গল্পে উপস্থাপন করেছ। উত্তরবঙ্গে জঙ্গলকেন্দ্রিক সংস্কৃতির একটি অন্যতম দিক হল পশু শিকার। সমাজের এক শ্রেণি লোভী মানুষ সরকারের থেকে হাতির বাচ্চা শিকারের ইজারা নিয়ে কিছু দরিদ্র মানুষের উপর ভর করে হাতি শিকার করে। আর কিছু নিম্নবিত্ত মানুষ খাবার ও অর্থের বিনিময়ে নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে সেই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আবার কখনও কখনও হাতির পদপৃষ্ঠে প্রাণও দেয়। এই রকম একটি অসাধারণ গল্প হল 'অক্টোপাস'। এই গল্পে অভিরাম সরকারের কাছে বাচ্চা হাতি ধরার ইজারা নেয়। অভিরাম ভুটানের দুটো দরিদ্র মানুষের উপর ভর করে হাতি ধরে। লোক দুটোকে এই কাজে সাহায্য করত হীরামন আর হীরামতী নামে দুটো পোষা হাতি। এই মানুষদের সম্পর্কে অভিরামের ভাবনা–

> "খাবার তাদের কাছে স্বর্গের চেয়ে বেশি লোভনীয়। সেই খাবারের লোভ দেখিয়ে ওদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় সে।"[২]

খাবার ও কিছু অর্থের বিনিময়ে অভিরাম লোক দুটোকে বন্যযন্ত্র তৈরি করে। যতদিন হাতি ধরা না পরে ততদিন তাদের নুন, আলুসেদ্ধ ভাত খেতে হয়। মাছ, ডিম, পেঁয়াজ, রসুন খাওয়া নিষেধ। এমনকি মদ, বিড়ি, খৈনী খাওয়া কিংবা স্ত্রীসঙ্গ করাও যাবে না। শরীরে কাদা মেখে দিন-রাত পোষা হাতি দুটোর সঙ্গে থাকতে থাকতে তাদের চামড়ায় হাতির গন্ধ চলে আসে। লোক দুটোর মধ্যে একজনের নাম মইনু অন্য জন পঁচিশ বছরের যুবক। তাদের শরীর থেকে যেমন হাতির গন্ধ বের হয় তেমনি হাতির ডাকও নকল করতে হয়। কিন্তু পঁচিশ বছরের যুবকটি জঙ্গলে লেপচা জনগোষ্ঠীর এক দোকানির যুবতী মেয়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে হাতি ধরতে যায়। সেদিনেই বুনো হাতির দলনেত্রী পঁচিশ বছরের যুবকের গায়ে যৌবনের গন্ধ টের পেয়ে যুবককে মাটিতে পিসে মেরে ফেলে। আসলে সমরেশ মজুমদার এই গল্পের মধ্যদিয়ে দেখিয়েছেন সমাজের কিছু স্বার্থপর লোভী নর পিসাচদের। যারা সমাজের নিম্নবিত্ত মানুষের উপর ভর করে নিজেরটা গুছিয়ে নেয় এবং তাদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। তাঁর গল্পগুলি না পড়লে বোঝা যায় না।

উত্তরবঙ্গ কৃষি প্রধান অঞ্চল। এই অঞ্চলের অধিকাংশ কৃষক ছিলেন নিম্নবিত্তের অধিকারী। এক সময় এই অঞ্চলের জমিদার-জোতদারদের দ্বারা নিম্নবিত্তের কৃষকরা বহুদিন ধরে শোষিত হয়েছে। জমিদার-জোতদাররা শুধু বীজ ধান আর সার দিয়ে জমির তিনভাগের দুইভাগ ফসল ঘরে তুলে নিতেন। উত্তরবঙ্গের কৃষকরা জমিদার-জোতদারদের শোষন বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে আন্দোলন করেন। যা নকশাল আন্দোলন নামে পরিচিত। নকশাল আন্দোলনের পরবর্তী সময়ও প্রান্তিক কৃষকরা জমিদার-জোতদারদের দ্বারা শোষিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সমরেশ মজুমদারের একটি উল্লেখযোগ্য গল্প হল 'যুদ্ধক্ষেত্রে একজন'। এই গল্পে ময়নাগুড়ির জোড়খালির জমিদার-জোতদার হরিশ রায় কৃষকদের ফলানো ফসল থেকে তিনভাগের দুইভাগ ফসল ঘরে তুলে নিতেন। জোড়খালির দরিদ্র কৃষকরা প্রতিবাদ করার সাহস পায়নি। এক মাত্র শিবু প্রতিবাদ করে বলে– "লাঙল যার জমি তার।"[৩] কারণ কৃষকরা কঠোর পরিশ্রম করে ফসল ফলায় আর জমিদার হরিশ রায় শুধু বীজ ধান ও সার দিয়ে তিনভাগের দুইভাগ ফসল নিয়ে নেয়। এদিকে কৃষকরা সারা বছর খেতে পায় না। বছরের শেষে জমিদারের কাছে হাত পাততে হয়। বউ, ছেলে-মেয়েদের জন্য ভালো পোশাক কেনার সাহস পায় না। তাই শিবু জমিদার হরিশ রায়ের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে দুনিয়ার খেতে না পাওয়া মানুষদের এক হতে বলে। জমিদার হরিশ রায় ষড়যন্ত্র করে গাছ চুরির অপরাধে শিবুকে জেলে পাঠায়। সেই সময় দেশে ইমার্জেন্সি ঘোষণা হওয়ায় রাষ্ট্রদ্রোহী কয়েদিদের মিসা ঘোষণা করে মুক্তি দেওয়া হয়। সেই রাষ্ট্রদ্রোহিতায় শিবুও মিসার আওতায় পড়ে মুক্তি পায়। শিবু জেলেই গণ মুক্তিকামী বিপ্লবীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। লেখকের ভাবনা–

> "যারা এতদিন শোষিত ছিল তারা আজ মাথা তুলছে। শোষিত কে? না যারা রক্ত দিয়ে পরিশ্রম করে। শোষক কে? না যারা সেই পরিশ্রমের ফসল পায়ে পা দিয়ে ঘরে তোলে। তার মানে হরিশ রায় শোষক, আর বড় বড় ব্যবসাদার শোষক। এই সরকার যে তাকে মিসা করেছে সেও শোষক।"[৪]

উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক কৃষকরা জমিদার-জোতদারদের শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গর্জে ওঠে। সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চায় সাধারণ কৃষক। এখানে লেখকের কমিউনিস্ট ভাবাপন্নের কথা ভাবা যেতে পারে।

লেখক সমরেশ মজুমদার চার বছর বয়সে প্রথম তিস্তা নদী দেখেন। তিনি শৈশবে ঠাকুরদার সঙ্গে গয়েরকাটার চা-বাগান ছেড়ে জলপাইগুড়ির তিস্তা নদীর পাশে হাকিম পাড়ায় চলে আসেন। আর সেখানেই গোটা স্কুল জীবন কাটান। ফলে তিস্তা নদীর চর তাঁর প্রিয় জায়গা হয়ে ওঠে। এই চরে এসে বন্ধুদের সঙ্গে কত আড্ডা দিয়েছেন। একা একা বসে কত বই পড়েছেন। বন্যায় তিস্তা যখন ভয়ংকর রূপ ধারণ করে তখন চরের মানুষসহ ঘর-বাড়িগুলো খড়কুটোর মতো ভেসে নিয়ে যায়। আবার কখনও ভেসে আসা গাছেরগুঁড়ি ধরতে নদীর চরের মেয়েরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। লেখক ১৯৬৮ সালের বন্যায় দেখেছেন কীভাবে জলপাইগুড়ি শহরকে গ্রাস করেছিল। সমরেশ মজুমদার তাঁর 'গীতবিতান ছুঁয়ে' গ্রন্থে জানিয়েছেন–

> "জল ভেঙে ভেঙে যখন তিস্তা ব্রিজে উঠে এলাম ব্রিজ অটুট আছে। কিন্তু জলপাইগুড়ি শহরের দিকে যে বাঁধ ছিল তা ভেঙে উড়ে গেছে। নিচে তিস্তার ঢেউগুলো ফুঁসছে। পাহাড়ের কোনও লেক বৃষ্টির জলের চাপ সহ্য করতে না পেরে ভেঙে গিয়ে নিচে নেমে এসেছিল তীব্র গতিতে। বাঁধ উড়িয়ে দিয়েছিল এক লহমায় হড়পা বান কথাটা তখনও চালু হয়নি। কিন্তু সেই বিপুল জলরাশি নিমেষে শহরটাকে তছনছ করে দিয়েছিল মধ্যরাত্রে।"[৫]

সেই ভেসে আসা জলে কত মৃত মানুষের লাশ ছড়িয়ে পড়ে ছিল। কিছু মানুষ সেই মৃত মানুষের কাপড়ের লোভ সামলাতে না পেরে খুলে নিয়েছে। আসলে তিস্তা নদীর চরে বসবাসকারী মানুষরা নদীর সঙ্গে লড়াই করে

বেঁচে থাকে। তাই তিস্তার হাত থেকে বাঁচতে তিস্তাবুড়ি নামে পূজা করে। নদীর চরে বসবাসকারী মানুষের কাছে তিস্তা কখনও দেবতা আবার কখনও আত্মীয় হয়ে ওঠে। তিস্তা নদীর চরে বসবাসকারী মানুষের জীবন সংগ্রামের কথা সমরেশ মজুমদার বিভিন্ন গল্পে উপস্থাপন করেছেন। 'জননী' গল্পে তিস্তা নদীর চরে বসবাসকারী মানুষের কাছে নদী জননী হয়ে ওঠে। এই গল্পে বিন্দু নদীর মাঝখান দিয়ে ভেসে আসা একটা কাঠেরগুঁড়ি দেখে বুড়িতিস্তাকে মানত করে– "পাঁচ পয়সার বাতাসা মা, ও মাগো বুড়ি, মানত রইল, ঠেলে দাও এদিকে, ঠেলে দাও।"[৬] তিস্তার বন্যায় যেমন নিমিষেই ঘর-বাড়ি ভাসিয়ে নিয়ে যায় তেমনি বন্যায় গাছেরগুঁড়ি ধরার জন্য আবার মানতও করে। আসলে নদীর চরে বসবাসকারী মানুষরা নদীর সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকার তীব্র আকাঙ্ক্ষা আমরা বিন্দুর মধ্য দিয়ে লক্ষ করি। বিন্দু এই গাছেরগুঁড়ি ধরতে পারলে যেমন তার জ্বালানির অভাব মিটবে তেমনি বিক্রি করলে কুড়ি টাকা পাবে। এই কুড়ি টাকা সে কোনও মতে হাতছাড়া করতে চায় না। বিন্দু মস্ত বড় গাছেরগুঁড়িটাকে ধরতে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। গাছেরগুঁড়িটাকে চরে টেনে এনে দেখে সঙ্গে দুটো লাশও ভেসে এসেছে। লাশ দুটোকে দেখে তার বর-বউ মনে হয়। বিন্দু মড়া দুটোকে কাশ ফুলের জঙ্গলে টেনে এনে বাড়িতে গিয়ে স্বামীকে ডেকে বলে–

> "হেই উঠ উঠ উঠ না কেনে, আঃ মরণ আমার। একবার নদীর ধারে চল কেন, বিরাট গাছ ধরেছি। এক কুড়ি টাকার গাছ। আর জোড়া বরবউ! মড়া।"[৭]

বিন্দু একটা দা নিয়ে স্বামীর সঙ্গে নদীর দিকে দৌড়ে এসে গাছেরগুঁড়িটাকে দেখতে না পেয়ে তার মাথা ঘুরে যায়। জলের স্রোতে গুঁড়িটা ভেসে গেছে। বিন্দুর স্বামী মড়া দুটোর চারদিকে ঘুরে পুরুষটার জামা কাপড় খুলে নেয়। বউটার পড়নে নতুন শাড়ি দেখে লোভ সামলাতে না পেরে টান মেরে বিন্দুকে বলে– "নে ধর, নতুন শাড়ি। হাই বাপ, মা কালীর মতো দেখায় যে তোরে। নে-নে পরে নে ক্যানে।"[৮] বিন্দু নতুন শাড়ি পেয়ে গাছের গুঁড়িটার দুঃখ ভুলে যায়। আসলে তিস্তার বন্যা উত্তরবঙ্গের মানুষের জীবন সংগ্রাম, তাদের বেঁচে থাকার তীব্র আকাঙ্ক্ষা লেখক বিন্দু ও তার স্বামীর মধ্যদিয়ে প্রকাশ করেছেন। কতটা অভাবে পরলে মানুষ মৃত মানুষের কাপড় খুলে নিতে বাধ্য হয় বিন্দুর স্বামী ও বিন্দু তার পরিচায়ক।

অন্যদিকে তিস্তার ভয়ংকর বন্যার ছোবল জলপাইগুড়ি শহরকে ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছে। সেই সময় বাঁধ দিয়ে নদীর কোমর ভেঙে দেয়। ফলে নদীতে চর সৃষ্টি হয়। নদী এতটাই দুর্বল হয়ে যায় যে, নিজের সৃষ্টি করা চরও ডিঙাতে পারে না। সেই চরই হয়ে ওঠে আশ্রয়হীনদের আশ্রয়স্থল। জলপাইগুড়ি শহরের দিনমজুর, ঠিকেঝি, রিক্সাওয়ালা, ঠেলাওয়ালাদের জীবনে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানে চরম সংকট দেখা দেয়। অন্ন-বস্ত্র মিললেও তাদের বাসস্থান মেলেনি। শেষে তিস্তা নদীর চরেই তাদের আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে। এদের জীবন নিয়ে সমরেশ মজুমদারের একটি গল্প হল 'চর, শহর এবং একটি বেকুব'। এই গল্পে জলপাইগুড়ি শহরে এক ভিনদেশী দিনমজুর সারাদিন কাজ করে রাতে শহরের ফুটপাতে ঝুপড়িতে থাকে। শহরের নগরপালের করা নির্দেশ– "শুধু দিন মজুরি করে যাও, তা বেশ, কিন্তু রাত্তির বেলায় ফুটপাতে থাকা যাবে না।"[৯] এক দিকে নগরপালের শাসানি অন্যদিকে পুলিশের লাঠির ঘা খেয়ে তিনদিন হাজতে থেকে মুক্তি পায়। ভিনদেশী দিনমজুর সারাদিন কাজ করতে পারবে কিন্তু ফুটপাতে থাকতে পারবে না। তাদের ভাড়া বাড়িতে থাকতে নির্দেশ দেয়। একজন দিনমজুরের পক্ষে ভাড়া বাড়িতে থাকার সামর্থ্য নেই। তাছাড়া তাদের কে ভাড়া দেবে? শেষ পর্যন্ত ভিনদেশী দিনমজুর তিস্তা নদীর চরে বাঁশের দরমা দিয়ে ঘর তৈরি করে মাথা গোজার জায়গা করে নেয়। এই খবর শহরের ফুটপাতে থাকা আশ্রয়হীনদের কানে পৌঁছে যায়। ফলে চরে ধীরে ধীরে ঠিকে ঝি, রিক্সাওয়ালা, ঠেলাওয়ালাসহ মোট পনেরো ঘর বাসিন্দা হয়ে যায়। এদিকে শহরে চুরি চামারি বেড়ে যাওয়ায় চরে পুলিশ এসে তাদেরকে শাসিয়ে যায়–

> "এই চরে লোক বাড়ার পর থেকে শহরে চুরিচামারি বেড়ে গেছে। লোকে বলছে চরের লোকই রাতে শহরে চুরি করতে যায়। এটা বেআইনি বসতি অতএব উঠে যাও তোমরা। আমি কোনও কথা শুনতে চাই না।"[১০]

নির্জন নদীর চরেও নিম্নবিত্ত মানুষদের শান্তিতে থাকার অধিকার নেই। প্রতি মুহূর্তে ভয় এই বুঝি তাদের ঘর ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। অন্যদিকে থানার দারগাবাবুর শাসানি। নদীর চরে প্রথমে আসে ভিনদেশী দিনমজুর, দ্বিতীয় ঘর গাজাখোর ও তার স্ত্রী ঠিকেঝি, রিক্সাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা মিলে একটা সুন্দর পাড়া তৈরি হয়। লেখক সমরেশ মজুমদার হত দরিদ্র মানুষের মনেও প্রেমের জোয়ার বয়ে আনেন ভিনদেশী দিনমজুর ও ঠিকেঝির বোনের মধ্য দিয়ে। তারা দু'জনে সংসার পাতে। কিছু দিনের মধ্যে দিনমজুর তার বউয়ের পেটে বাচ্চা আসার খবর শুনে আনন্দে পুলকিত হয়। দিনমজুরের বউ বলে–

> "হেসো না। এখন তোয়াজ করবে কি দিয়ে। ক'টা টাকা কামাও। আমার এখন ঝাল মাংস খেতে ইচ্ছে করছে, খাওয়াও দেখি।"[১১]

কিন্তু দিনমজুর লোকটি সারাদিন দিনমজুরি করে বড়জোর দু'বেলা আলুসেদ্ধ ভাত জোটাতে পারে। কিন্তু তিনি বউয়ের ভালো মন্দ খাওয়ার স্বাদ মেটাবেন কীভাবে? তাই তার বউ শহরের বাড়িতে বাসন মাজার কাজ করতে যায়। সেই বাড়ির বাবুদের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে আসে ইলিশ মাছ। এই ব্যাপারটি দিনমজুর লোকটি সহ্য করতে পারে না। কারণ সে দরিদ্র হতে পারে কিন্তু ভিখারি নয়। দিনমজুর লোকটি তার বউকে শহরে বাসন মাজার কাজ করতে নিষেধ করে বলে– "ফের যদি শহরে ঢুকিস তাহলে গলা টিপে মারব। সেদ্ধভাতে সুখ হবে কি না বল।"[১২] কারণ এই শহরের মানুষেই একদিন তাকে মাথা গোজার ঠাই দেয়নি। বর্ষায় সাত দিন অনবরত বৃষ্টির ফলে নদী ফুলে-ফেঁপে ওঠে জলপাইগুড়ি শহরকে হ্রদে পরিনত করে। ফলে গোটা জলপাইগুড়ি শহরের মানুষ বাঁধে এসে জরো হয়। চরের মানুষ নৌকায় করে পালিয়ে আসে বাঁধের পারে। কিন্তু দিনমজুর লোকটি তার বউকে নিয়ে চর ছেড়ে পালিয়ে আসেনি। আসলে সমরেশ মজুমদার নদীর চরে বসবাসকারী দিনমজুরদের সংকটময় পরিস্থিতির বর্ণনা করেছেন।

'জঠর' গল্পে সমরেশ মজুমদার নদীর চরে বসবাসকারী দিন আনা দিন খাওয়া মানুষের চরম দারিদ্রতার পরিচয় দিয়েছেন। গল্পে পৌঢ় ও পৌঢ়ার দশটি সন্তানকে দু'বেলা ভাতও দিতে পারে না। মুড়ি খেয়ে আধপেটা থেকে দিন অতিবাহিত করে। পৌঢ়র প্রতিদিন কাজ জোটে না। যেদিন কাজ জোটে সেদিন চরে উনুন জ্বলে। যেদিন কাজ জোটে না সেদিন চরে উনুনও জ্বলে না। পৌঢ়ার শরীরে জ্বর থাকায় কয়েকদিন কাজে যেতে পারেনি। পৌঢ় তার বোবা ছেলেকে নিয়ে ভবানীর মাঠে কাজের খোঁজে আসে। আর সেখানে গাছতলায় দিনমজুরা শীর্ণ শরীর নিয়ে কাজের খোঁজে বসে আছে। তাদের বুকের খাঁচার হারগুলো গোনা যায়। সিল্কের পাঞ্জাবি পড়া এক লোক কাজের লোক খুঁজতে ভবানীর মাঠে আসে। তার জঙ্গলে মুরগী ও ছাগল ছানাদের দেখাশোনা করার জন্য একজন কাজের লোকের প্রয়োজন। লোকটি পৌঢ়র ছেলেকে কাজ দিতে চায়। কারণ পৌঢ়কে কাজে নিলে একসের চালের ভাত খাওয়াতে হবে। পৌঢ় ও পৌঢ়া বাধ্য হয়ে বোবা ছেলেকে পাঠায় দু'বেলা ভাত ও পনেরো টাকার আশায়। পৌঢ়া তার ছেলেকে মুড়ি বাতাসা খাইয়ে সাজিয়ে জঙ্গলে মুরগি ও ছাগলছানা পাহারা দেওয়ার জন্য পাঠিয়ে দেয়। বিদায় মুহূর্তে বাবা-মাসহ নয়টি কন্যা সন্তান ভাবছে ছেলেটি ভাতের প্রাসাদে যাচ্ছে। কেউ বলে দাদা ডিম আনবে, কেউ বলে দাদা দুধ আনবে। তাদের কত আশা, কত দিন তারা দুধ ডিম খায়নি। লোকটি ছেলেটিকে তার জঙ্গলে এনে বলে–

> "এই হল আমার জায়গা। সব দেখে নে। ছাগল দেখবি, মুরগী দেখবি। কারও যদি অযত্ন হয় তো পেটে পা ঢুকিয়ে দেব শালা। পনের টাকা দিতে হবে, কাজ যদি সেরকম না হয় লাথি মেরে তাড়িয়ে দেব।"[১৩]

লোকটির শরীরে জ্বর তাই সে রাতে ভাত খাবে না বলে ছেলেটিকেও না খেয়ে পাহারা দিতে হয়। ছেলেটি তিনদিন ধরে ভাত খায়নি।

> "দু'মুঠো মুড়ি ছাড়া সে কিছুই খায়নি। তার মা বাড়ি বাড়ি বাসন মেজে ভাত নিয়ে আসত থালা বেঁধে। বাপ কাজ পেলে চরে উনুন জ্বলত। তারা দশ ভাই-বোন সেই ভাত পেটে পুরে রাত্রে ঘুমত। তিনদিন মা কাজে যায়নি, বাবাও কাজ পায়নি। তাই ভাতও নেই পেটে।"[১৪]

আসলে সমরেশ মজুমদার এই গল্পের মধ্যদিয়ে সমাজের নিম্নবিত্ত মানুষের করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন।

উত্তরবঙ্গের চা-বাগানের মদেশিয়া শ্রমিকদের নিম্নবিত্তীয় জীবন যন্ত্রণার পরিচয় পাওয়া যায় 'জিয়ানো মাছ' গল্পে। এই গল্পে বংশী চা-ফ্যাক্টরিতে কাজ করে। মেয়েরা ফ্যাক্টরি থেকে চা চুরি করলে কেউ ধরতে পারে না। কিন্তু বংশী যেদিন চুরি করে সেদিনেই ধরা পরে যায়। ফলে তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে। আসলে বংশীকে লোভ দেখায় সোনিরাম মুদি– "ওরে বংশী, শুনলাম গুদামে কাজ করিস, নিয়ে আয় চা মুঠি কতক দশ টাকা কিলো দেব।"[১৫] এই লোভে পড়ে বংশীর চাকরি চলে যায়। ঐ টাকা দিয়ে হয়তো কয়েকটি হাড়িয়ার বোতল কিনতে পারত। কিন্তু শেষে চাকরি মেলে চা-বাগানের হাসপাতালে। চা-বাগানের মদেশিয়া শ্রমিকদের মাংসের অভাব মেটাত জঙ্গলের পাখি। বংশী সিরিনের বউকে জঙ্গল থেকে তিনটি চিড়িয়া মেরে দিয়ে মাংস খাওয়ার স্বাদ মেটাত। 'বড় পাপ হে' গল্পে নামবিহীন নায়কের নিম্নবিত্তীয় জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পের নায়ক নোনা রায়ের খুটিমারী জঙ্গলের পাশে কলাবাগান পাহারা দেয় বছরে একশো টাকার বিনিময়ে। নোনা রায় ধান কেটে নিয়ে যায় কিন্তু একমুঠি ধানও দিয়ে যায় না। সমাজের কিছু মানুষ তাদের শোষণ করে এবং এক ঘরে করে রাখে। নোনা রায় সেই সমাজের প্রতিনিধি। ফলে গল্পের নায়ককে আংরাভাসা নদী থেকে মাছ এবং জঙ্গলের পাখি খেয়ে বেঁচে থাকতে হয়। 'দায়' গল্পে লেখক জয়দেব চরিত্রের মধ্যদিয়ে অর্থনৈতিক টানাপোড়েন দেখিয়েছেন। জয়দেবের মা গোলাপবালার ইচ্ছা ছিল গঙ্গায় শরীর রাখার। হাউলি গ্রামের একমাত্র শ্রীধর ঘোষের বাবার কালীঘাটের শ্মশানে যাওয়ার ভাগ্য হয়েছিল। কিন্তু গোলাপবালা মানুষের বাড়িতে বাসন মাজার কাজ করে সেই ইচ্ছা মেটাবে কীভাবে? একদিন ভোরে বাসন মাজার কাজে যাওয়ার সময় গোলাপবালাকে চৌধুরীবাবুর লরি চাপা দিয়ে হাওয়া হয়ে যায়। স্থানীয় ডাক্তারের নির্দেশে কলকাতার বেলেঘাটা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও জয়দেব তার মাকে বাঁচাতে পারেনি। হাউলি থানা থেকে কোন অ্যাকসিডেন্টের খবর না আসায় মাডার্রের সন্দেহে জয়দেবকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। ফলে গোলাপবালাকে ন'দিন লাশকাটা ঘরে শুয়ে থাকতে হয়। কলকাতা আসার পর জয়দেবের মনে হয় চারিদিকে শুধু শকুনের মেলা, সবাই যেন হা করে আছে। জয়দেব বলে– "না, আমার টাকা অত সস্তা নয়। গরিব মানুষ দেখেও তোমাদের মায়া হয় না।"[১৬] জয়দেবের পকেটে যা টাকা ছিল তা হাসপাতালের বাবুকে, মর্গে, তার মাকে শ্মশানে নিয়ে যেতে গাড়ির ড্রাইভারকে দিতেই শেষ হয়ে যায়। শ্মশানে দাহ করার জন্য কোন টাকা নেই। কিন্তু শ্মশান কর্মীরা টাকা ছাড়া তার মাকে দাহ করবে না। জয়দেব শেষে বাধ্য হয়ে তার হাতের রুপার তাবিজ এবং গালিগালাজ, কিল ঘুষির পরিবর্তে তার মায়ের দাহকার্য করে।

সমরেশ মজুমদার সত্তর দশকের পরবর্তী সময়ের একজন সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক ছিলেন। তিনি তাঁর গল্পে শুধু নিম্নবিত্ত মানুষের কথাই বলেননি, তাদের বেঁচে থাকার আশা ও ভরসার পথও দেখিয়েছেন। তাঁর গল্পে সমাজের প্রান্তিক কৃষক, দিনমজুর, শ্রমিক ও বৃত্তিহীন মানুষের খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের জন্য লড়াইয়ের পরিচয়

পাওয়া যায়। তিস্তা নদীর চরে বসবাসকারী মানুষদের একদিকে অর্থনৈতিক টানাপোড়েন অন্যদিকে নদীর সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকার তীব্র আকাঙ্ক্ষা লক্ষ করা যায়। আসলে তিনি মানুষকে নিয়ে লিখতে ভালোবাসতেন। ফলে মানুষের জীবন যন্ত্রণার কথাই তাঁর গল্পে বার বার ওঠে এসেছে।

তথ্যসূত্র:

১. মজুমদার, সমরেশ। গীতবিতান ছুঁয়ে বলছি। সাহিত্যম্, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৬৭।
২. মজুমদার, সমরেশ। গল্প সমগ্র ১। পত্রভারতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ৩৬৬।
৩. মজুমদার, সমরেশ। গল্প সমগ্র ২। পত্রভারতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, পৃ. ২২৭।
৪. মজুমদার, সমরেশ। গল্প সমগ্র ২। পত্রভারতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, পৃ. ২৩৬।
৫. মজুমদার, সমরেশ। গীতবিতান ছুঁয়ে বলছি ২। সাহিত্যম্, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ২৪০।
৬. মজুমদার, সমরেশ। গল্প সমগ্র ১। পত্রভারতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২২, পৃ. ৯৩।
৭. তদেব, পৃ. ৯৫।
৮. তদেব, পৃ. ৯৬।
৯. মজুমদার, সমরেশ। গল্প সমগ্র ২। পত্রভারতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, পৃ. ২৪৭।
১০. তদেব, পৃ. ৪৮।
১১. তদেব, পৃ. ৫৪।
১২. তদেব, পৃ. ২৫৫।
১৩. মজুমদার, সমরেশ। গল্প সমগ্র ২। পত্রভারতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, পৃ. ৩১০।
১৪. তদেব, পৃ. ৩১১।
১৫. মজুমদার, সমরেশ। গল্প সমগ্র ১। পত্রভারতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২২, পৃ. ৩৩৭।
১৬. মজুমদার, সমরেশ। গল্প সমগ্র ২। পত্রভারতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, পৃ. ৬২।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1202-1210
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.340

সমকামী ও রূপান্তরকামী আত্মপরিচয়ের নির্মাণ: স্বপ্নময় চক্রবর্তীর *'হলদে গোলাপ'* উপন্যাসের আলোকে

তুলিকা মণ্ডল, *ছাত্রী, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 15.03.2026; Accepted: 17.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This paper examines the representation of homosexual and transgender identities in Bengali literature through a critical reading of Swapnamoy Chakraborty's novel 'Holde Golap'. Although Bengali literature has historically reflected diverse social realities such as class conflict, caste divisions, and gender inequality, issues of sexual orientation and gender identity have largely remained marginalised. In most literary works, homosexual and transgender characters appear only as peripheral figures or symbolic curiosities, leaving their struggles for identity, social acceptance, and dignity underrepresented. In this context, '*Holde Golap*' emerges as a significant literary intervention that foregrounds the lived experiences of queer individuals within the Bengali cultural sphere.

The study employs a qualitative textual analysis of the novel, drawing upon theoretical frameworks from Michel Foucault's discourse on sexuality, Judith Butler's concept of gender performativity, and Peter Berger and Thomas Luckmann's theory of the social construction of reality. Through these perspectives, the paper explores how social norms construct and regulate ideas of "normality," often marginalising non-heteronormative identities. The analysis focuses on four central characters—Manabi Bandyopadhyay, Parimal/Pari, Ivy, and Dulal/Dulali—whose narratives collectively reveal the complexities of self-identification, social exclusion, and resistance within a heteronormative society.

The paper argues that '*Holde Golap*' not only portrays the personal struggles of queer individuals but also challenges the dominant cultural assumptions surrounding gender and sexuality. By presenting these experiences with empathy and realism, the novel transforms marginalised voices into subjects of serious literary and academic discourse. Ultimately, this study highlights the importance of '*Holde Golap*' as a cultural text that expands the scope of Bengali literary criticism and contributes to broader discussions on gender diversity, identity formation, and social inclusion.

Keywords: Swapnamoy Chakraborty, Holde Golap, homosexual, transgender, social norms

বাংলা সাহিত্যের সুদীর্ঘ ইতিহাসে সামাজিক বাস্তবতার বহুমুখী প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। শ্রেণি সংগ্রাম, জাতিগত বিভাজন, লিঙ্গীয় অসমতা কিংবা ধর্মীয় পরিচয়ের সংকট— সাহিত্যের আলোচনায় এই বিষয়গুলো

দীর্ঘকাল ধরে প্রাধান্য পেয়েছে। তবে এই বিস্তৃত পরিমণ্ডলের মধ্যেও যৌন অভিমুখিতা এবং লিঙ্গ পরিচয়ের প্রশ্নটি এক প্রকার অদৃশ্য বা উপেক্ষিতই থেকেছে। বিশেষত, সমকামী ও রূপান্তরকামী মানুষের জীবন-বাস্তবতা মূলধারার সাহিত্যে হয় অনুপস্থিত ছিল, নতুবা কেবল পার্শ্বচরিত্রের কৌতূহল বা রহস্যের আবরণে উপস্থাপিত হয়েছে। ফলে তাঁদের অস্তিত্বের সংকট, আত্মপরিচয় নির্মাণের জটিলতা এবং সামাজিক সংগ্রামের প্রকৃত রূপটি যথাযথ সাহিত্যিক মর্যাদা পায়নি। এই শূন্যতার প্রেক্ষাপটে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর উপন্যাস '*হলদে গোলাপ*' বাংলা সাহিত্যে এক ব্যতিক্রমী ও যুগান্তকারী সংযোজন।

'হলদে গোলাপ' কেবল একটি কাহিনিনির্ভর সাহিত্যকর্ম নয়; বরং এটি সমকামী ও রূপান্তরকামী মানুষের আত্মপরিচয়, সামাজিক স্বীকৃতি এবং অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের একটি সাহিত্যিক দলিল। উপন্যাসটিতে লেখক এমন এক সামাজিক বাস্তবতাকে সামনে নিয়ে আসেন, যা দীর্ঘদিন ধরে সমাজের প্রচলিত নৈতিকতা ও মূল্যবোধের কাঠামোর মধ্যে অবদমিত ছিল। সমাজে 'স্বাভাবিকতা' নামে যে ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা আসলে একটি সামাজিক নির্মাণ। এই নির্মিত কাঠামোর মধ্যে নির্দিষ্ট লিঙ্গপরিচয় এবং বিষমকামী যৌন আচরণকেই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়, আর এর বাইরে থাকা পরিচয়গুলিকে প্রায়শই 'অস্বাভাবিক' বা 'বিকৃত' বলে চিহ্নিত করা হয়। এই অর্থে '*হলদে গোলাপ*' সমাজে প্রতিষ্ঠিত এই 'স্বাভাবিকতা'র ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এবং প্রান্তিক মানুষের অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যিক আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসে।[১]

যৌনতা এবং লিঙ্গপরিচয় নিয়ে আধুনিক তাত্ত্বিক আলোচনায় দেখা যায় যে এই ধারণাগুলি স্থির বা অপরিবর্তনীয় নয়; বরং সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নির্মিত। মিশেল ফুকো তাঁর '*The History of Sexuality*' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে যৌনতা কেবল ব্যক্তিগত আচরণ নয়; বরং এটি ক্ষমতা, জ্ঞান এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের জটিল সম্পর্কের মধ্য দিয়ে গঠিত একটি ঐতিহাসিক নির্মাণ। সমাজ ও রাষ্ট্র যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট নৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করে এবং সেই কাঠামোর বাইরে থাকা পরিচয়গুলিকে বিচ্যুতি হিসেবে চিহ্নিত করে। ফলে যৌনতার প্রশ্ন কেবল ব্যক্তিগত নয়; এটি একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নও বটে।[২]

এই তাত্ত্বিক আলোচনাকে আরও বিস্তৃত করেছেন জুডিথ বাটলার, যিনি তাঁর '*Gender Trouble*' গ্রন্থে লিঙ্গপরিচয়কে একটি স্থির সত্তা হিসেবে না দেখে বরং সামাজিকভাবে নির্মিত ও পুনরাবৃত্ত আচরণের ফল হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। বাটলারের মতে লিঙ্গ একটি 'পারফরমেটিভ' প্রক্রিয়া— অর্থাৎ সমাজে স্বীকৃত আচরণ ও ভূমিকার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে লিঙ্গ পরিচয় গঠিত হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বোঝা যায় যে সমাজে প্রচলিত পুরুষ ও নারীর ধারণা কোনো প্রাকৃতিক বা অপরিবর্তনীয় সত্য নয়; বরং এটি একটি সাংস্কৃতিক নির্মাণ।[৩] এই তাত্ত্বিক কাঠামো সমকামী ও রূপান্তরকামী মানুষের অভিজ্ঞতা বোঝার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

মানব যৌনতার বহুমাত্রিকতা নিয়ে মনোবিজ্ঞানেও উল্লেখযোগ্য আলোচনা হয়েছে। সিগমুন্ড ফ্রয়েড মানবমনের গঠন বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখিয়েছিলেন যে মানুষের যৌন আকাঙ্ক্ষা বহুমুখী এবং তার মধ্যে বিভিন্ন সম্ভাবনা বিদ্যমান।[৪] পরবর্তীকালে আলফ্রেড কিনসের গবেষণা মানব যৌনতাকে একটি ধারাবাহিক স্পেকট্রাম হিসেবে ব্যাখ্যা করে, যেখানে সমকামিতা এবং বিষমকামিতা কঠোর দ্বৈত বিভাজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এই গবেষণা মানব যৌনতার বৈচিত্র্য সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।[৫]

ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেও লিঙ্গ ও যৌনতার এই বহুমাত্রিকতার উপস্থিতি সম্পূর্ণ অচেনা নয়। পুরাণ ও মহাকাব্যের বিভিন্ন আখ্যান এই বিষয়টির সাক্ষ্য বহন করে। বিষ্ণুর মোহিনী অবতার, '*মহাভারত*'-এ শিখণ্ডীর

চরিত্র কিংবা অর্জুনের বৃহন্নলা রূপ— এই সব আখ্যান লিঙ্গপরিচয়ের পরিবর্তনশীলতা এবং পরিচয়ের বহুমাত্রিকতার ধারণাকে প্রতিফলিত করে। কিন্তু সামাজিক ও ধর্মীয় কাঠামোর পরিবর্তনের ফলে আধুনিক সমাজে এই বৈচিত্র্য ক্রমশ প্রান্তিক হয়ে পড়ে এবং সমকামী ও রূপান্তরকামী মানুষের পরিচয় প্রায়শই সামাজিকভাবে অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে থাকে।

আধুনিক যুগে সমকামিতা ও রূপান্তরকামিতা নিয়ে সামাজিক ও আইনি বিতর্কের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের গবেষণা প্রমাণ করে যে সমকামিতা কোনো মানসিক ব্যাধি নয়। ১৯৭৩ সালে আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশন তাদের '*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders'* থেকে সমকামিতাকে মানসিক রোগের তালিকা থেকে বাদ দেয়। পরবর্তীকালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও একই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[৬] ভারতীয় প্রেক্ষাপটেও দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর ২০১৮ সালে সুপ্রিম কোর্ট ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারাকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করে, যা সমকামী মানুষের সাংবিধানিক অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়।[৭] তবুও সামাজিক বাস্তবতায় সমকামী ও রূপান্তরকামী মানুষের প্রতি বৈষম্য ও পূর্বধারণা এখনও বহুলাংশে বিদ্যমান। এই বৃহত্তর সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটেই স্বপ্নময় চক্রবর্তীর '*হলদে গোলাপ'* উপন্যাসকে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। উপন্যাসটি প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ঋতুপর্ণ ঘোষ সম্পাদিত *রোববার* পত্রিকায়। লেখক নিজেই উল্লেখ করেছেন যে আকাশবাণীর একটি যৌনশিক্ষা বিষয়ক অনুষ্ঠানে প্রাপ্ত একটি চিঠি থেকেই এই উপন্যাসের মূল বীজ রোপিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে বিভিন্ন মানুষের অভিজ্ঞতা, সাক্ষাৎকার এবং সামাজিক বাস্তবতার অনুসন্ধানের মাধ্যমে উপন্যাসটির কাহিনি নির্মিত হয়েছে। ফলে এটি কেবল একটি কল্পনানির্ভর সাহিত্যকর্ম নয়; বরং বাস্তব সামাজিক অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে নির্মিত একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক দলিল।[৮]

এই গবেষণাপত্রের উদ্দেশ্য হল '*হলদে গোলাপ*' উপন্যাসের আলোকে সমকামী ও রূপান্তরকামী মানুষের আত্মপরিচয় নির্মাণের প্রক্রিয়া, সামাজিক প্রতিরোধ এবং সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন বিশ্লেষণ করা। উপন্যাসের চারটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র— মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিমল/পরি, আইভি এবং দুলাল/দুলালী— এই আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে। তাদের জীবনসংগ্রাম, সামাজিক অভিজ্ঞতা এবং আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধান বিশ্লেষণের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে যে কীভাবে এই উপন্যাসটি একটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বরকে সাহিত্যিক পরিসরে প্রতিষ্ঠা করেছে।

সমাজবিজ্ঞানী পিটার বার্জার এবং টমাস লাকম্যান তাঁদের '*The Social Construction of Reality*' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে সমাজ একটি নির্দিষ্ট বাস্তবতা নির্মাণ করে, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে হয়। কিন্তু এই নির্মিত বাস্তবতার বাইরে থাকা পরিচয় ও অভিজ্ঞতাগুলি প্রায়ই সামাজিকভাবে অগ্রহণযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়।[৯] '*হলদে গোলাপ*' এই নির্মিত বাস্তবতার সীমাবদ্ধতাকে উন্মোচিত করে এবং প্রান্তিক মানুষের অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যিক আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসে।

এই গবেষণার তাৎপর্য এখানেই যে এটি বাংলা সাহিত্যে সমকামী ও রূপান্তরকামী মানুষের প্রতিনিধিত্বকে একটি তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণধর্মী কাঠামোর মধ্যে বিবেচনা করার সুযোগ প্রদান করে। একই সঙ্গে এটি দেখায় যে সাহিত্য কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়; বরং এটি সামাজিক বাস্তবতাকে পুনর্বিবেচনা করার একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক পরিসর। সেই অর্থে '*হলদে গোলাপ*' বাংলা সাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক, যা প্রান্তিক মানুষের অভিজ্ঞতাকে মানবিক ও সমালোচনামূলক দৃষ্টিতে উপস্থাপন করেছে।

পূর্ববর্তী গবেষণা (Literature Review):

সমকামিতা ও লিঙ্গ বৈচিত্র্যের প্রশ্ন বিশ্বসাহিত্যে দীর্ঘদিন ধরে আলোচিত হলেও বাংলা সাহিত্যে এই বিষয়টি তুলনামূলকভাবে দেরিতে গুরুত্ব লাভ করেছে। পাশ্চাত্য সাহিত্যে সমলিঙ্গ প্রেম, লিঙ্গপরিচয়ের পরিবর্তনশীলতা এবং যৌনতার বহুমাত্রিকতা নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। প্রাচীন গ্রিক সাহিত্য থেকেই সমকামী সম্পর্কের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্লেটোর '*Symposium*' গ্রন্থে সমলিঙ্গ প্রেমকে একটি দার্শনিক ও নৈতিক আলোচনার বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।[১০] একইভাবে গ্রিক কবি স্যাফোর কবিতায় নারী-নারী প্রেমের আবেগময় প্রকাশ দেখা যায়।[১১] আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যে অস্কার ওয়াইল্ড, জেমস বল্ডউইন, ভার্জিনিয়া উলফ প্রমুখ লেখকদের রচনায় সমকামিতা ও লিঙ্গ পরিচয়ের প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে।

সমসাময়িক সাহিত্যসমালোচনায় 'Queer Theory' এই আলোচনাকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেছে। ইভ কোসফস্কি সেজউইক এবং জুডিথ বাটলারের মতো তাত্ত্বিকরা যৌনতা ও লিঙ্গ পরিচয়কে একটি সামাজিক নির্মাণ হিসেবে বিশ্লেষণ করেছেন। জুডিথ বাটলার তাঁর '*Gender Trouble*' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে লিঙ্গ কোনো স্থির পরিচয় নয়; বরং এটি সামাজিক আচরণের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে গঠিত একটি পারফরমেটিভ প্রক্রিয়া। এই তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি সমকামী ও রূপান্তরকামী মানুষের অভিজ্ঞতাকে বোঝার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতীয় প্রেক্ষাপটে সমকামিতা ও লিঙ্গ বৈচিত্র্যের আলোচনা সাম্প্রতিক সময়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। রুথ ভানিতা এবং সালিম কিদওয়াই সম্পাদিত '*Same-Sex Love in India*' গ্রন্থে ভারতীয় সাহিত্য, লোককথা ও ঐতিহাসিক দলিলের আলোকে সমলিঙ্গ প্রেমের বিভিন্ন উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। এই গবেষণা দেখায় যে ভারতীয় সংস্কৃতিতে সমলিঙ্গ প্রেম সম্পূর্ণ অচেনা বিষয় নয়; বরং ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে এর উপস্থিতি ছিল।[১২]

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সমকামিতা ও লিঙ্গ বৈচিত্র্যের প্রশ্ন তুলনামূলকভাবে কম আলোচিত হয়েছে। কিছু লেখকের রচনায় এই বিষয়ের আভাস দেখা গেলেও তা সাধারণত মূল কাহিনির কেন্দ্রে স্থান পায়নি। জগদীশ গুপ্ত[১৩], কমলকুমার মজুমদার[১৪] বা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের[১৫] কিছু লেখায় লিঙ্গ ও যৌনতার ভিন্ন অভিজ্ঞতার ইঙ্গিত পাওয়া যায় । তবে এই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে আলোচনার কেন্দ্রে আসে মূলত সমকালীন বাংলা সাহিত্যে। এই প্রেক্ষাপটে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর '*হলদে গোলাপ*' উপন্যাস বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। এখানে সমকামী ও রূপান্তরকামী মানুষের জীবনসংগ্রাম কেবল একটি উপকাহিনি নয়; বরং পুরো কাহিনির কেন্দ্রীয় বিষয়। উপন্যাসটি সমকামী ও রূপান্তরকামী মানুষের সামাজিক বাস্তবতা, পারিবারিক দ্বন্দ্ব এবং আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধানকে মানবিক দৃষ্টিতে উপস্থাপন করেছে। ফলে এটি বাংলা সাহিত্যে যৌনতা ও লিঙ্গ বৈচিত্র্যের আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

তবে এখনো পর্যন্ত '*হলদে গোলাপ*' উপন্যাসকে কেন্দ্র করে তাত্ত্বিক কাঠামোর ভিত্তিতে বিস্তৃত গবেষণা তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে। ফলে এই উপন্যাসের আলোকে সমকামী ও রূপান্তরকামী মানুষের আত্মপরিচয় নির্মাণ এবং সামাজিক প্রতিরোধের প্রশ্ন বিশ্লেষণ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

গবেষণার পদ্ধতি ও বিশ্লেষণাত্মক কাঠামো:

এই গবেষণাপত্রটি মূলত একটি গুণগত (qualitative) সাহিত্যবিশ্লেষণমূলক গবেষণা। এখানে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর '*হলদে গোলাপ*' উপন্যাসকে প্রধান পাঠ্য হিসেবে গ্রহণ করে তার বিষয়বস্তু, চরিত্র নির্মাণ এবং

সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণায় মূলত পাঠ-সমালোচনার (textual analysis) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে উপন্যাসের কাহিনি, চরিত্র এবং বর্ণনাভঙ্গির মধ্য দিয়ে সমকামী ও রূপান্তরকামী মানুষের আত্মপরিচয় নির্মাণের প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এই গবেষণায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক কাঠামো ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমত, মিশেল ফুকোর যৌনতা-বিষয়ক তত্ত্ব এই আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। ফুকো তাঁর *The History of Sexuality* গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে যৌনতা কেবল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নয়; বরং এটি ক্ষমতা ও জ্ঞানের সম্পর্কের মাধ্যমে সামাজিকভাবে নিয়ন্ত্রিত। এই তত্ত্বের আলোকে দেখা যায় যে সমাজ একটি নির্দিষ্ট যৌন আচরণকে স্বাভাবিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে এবং এর বাইরে থাকা পরিচয়গুলিকে বিচ্যুতি হিসেবে চিহ্নিত করে।[১৬]

দ্বিতীয়ত, জুডিথ বাটলারের "Gender Performativity" তত্ত্ব এই গবেষণার বিশ্লেষণাত্মক কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বাটলারের মতে লিঙ্গ একটি স্থির সত্তা নয়; বরং সামাজিক আচরণ ও সাংস্কৃতিক প্রত্যাশার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে নির্মিত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে উপন্যাসের চরিত্রগুলির লিঙ্গ পরিচয়ের নির্মাণ ও পরিবর্তনের প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করা হয়েছে।[১৭]

তৃতীয়ত, পিটার বার্জার এবং টমাস লাকম্যানের 'সামাজিক বাস্তবতার নির্মাণ' তত্ত্ব এই আলোচনাকে একটি সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি প্রদান করে। তাঁদের মতে সমাজ একটি নির্দিষ্ট বাস্তবতা নির্মাণ করে, যা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক বলে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নির্মিত বাস্তবতার বাইরে থাকা পরিচয়গুলি প্রায়ই সামাজিকভাবে অগ্রহণযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়। এই তত্ত্বের আলোকে উপন্যাসে সমকামী ও রূপান্তরকামী চরিত্রগুলির সামাজিক অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।[১৮]

গবেষণার বিশ্লেষণাত্মক অংশে উপন্যাসের চারটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র— মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিমল/পরি, আইভি এবং দুলাল/দুলালী—কে কেন্দ্রে রেখে আলোচনা করা হয়েছে। তাদের জীবনসংগ্রাম, পারিবারিক সম্পর্ক, সামাজিক অভিজ্ঞতা এবং আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধান বিশ্লেষণের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে যে কীভাবে এই উপন্যাসটি সমকামী ও রূপান্তরকামী মানুষের অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যিক পরিসরে উপস্থাপন করেছে।

এই পদ্ধতিগত কাঠামোর মাধ্যমে গবেষণাটি দেখাতে চায় যে '*হলদে গোলাপ*' কেবল একটি সাহিত্যকর্ম নয়; বরং এটি একটি সামাজিক দলিল, যা সমকালীন সমাজে যৌনতা, লিঙ্গ পরিচয় এবং সামাজিক স্বীকৃতির প্রশ্নকে নতুনভাবে ভাবার সুযোগ সৃষ্টি করে।

চরিত্র বিশ্লেষণ: আত্মপরিচয় ও সামাজিক প্রতিরোধের বহুমাত্রিক রূপ:

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর '*হলদে গোলাপ*' উপন্যাসে সমকামী ও রূপান্তরকামী মানুষের জীবনসংগ্রাম প্রধানত কয়েকটি চরিত্রের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। এই চরিত্রগুলি কেবল ব্যক্তিগত গল্পের ধারক নয়; বরং তারা বৃহত্তর সামাজিক বাস্তবতার প্রতিনিধিত্ব করে। তাদের জীবনকাহিনির মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সমাজে প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ ও যৌনতার নিয়মের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের সংঘাত কীভাবে একজন মানুষের অস্তিত্বকে প্রভাবিত করে। উপন্যাসের চারটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র— মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিমল/পরি, আইভি এবং দুলাল/দুলালী— এই আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে।

(ক) মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়: রূপান্তরের মাধ্যমে আত্মপ্রতিষ্ঠা

মানবী বন্দ্যোপাধ্যায় চরিত্রটি উপন্যাসে রূপান্তরকামী মানুষের আত্মপরিচয় নির্মাণ এবং সামাজিক স্বীকৃতির সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। জন্মসূত্রে পুরুষদেহে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর মানসিক সত্তা ধীরে ধীরে নারীত্বের দিকে বিকশিত হয়। এই অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে গভীর সংকট সৃষ্টি করে। সমাজের

প্রচলিত লিঙ্গবিভাজন— যেখানে মানুষকে কেবল 'পুরুষ' বা 'নারী' এই দুই শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেখা হয়— তার অভিজ্ঞতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

জুডিথ বাটলারের "Gender Performativity" তত্ত্বের আলোকে মানবীর চরিত্রটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে লিঙ্গ পরিচয় কোনো স্থির জৈবিক সত্য নয়; বরং এটি সামাজিক আচরণ ও সাংস্কৃতিক প্রত্যাশার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে গঠিত। মানবীর জীবন এই ধারণাকে প্রতিফলিত করে। সোমনাথ থেকে মানবী হয়ে ওঠার যাত্রা কেবল একটি ব্যক্তিগত রূপান্তর নয়; এটি সমাজে প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ ধারণার বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধও বটে।[১৯]

একই সঙ্গে মানবীর শিক্ষাগত সাফল্য এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা এই বিষয়টিও নির্দেশ করে যে রূপান্তরকামী মানুষ কেবল প্রান্তিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; তারা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। এই চরিত্রটি তাই প্রান্তিকতার সীমা অতিক্রম করে আত্মপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকেও তুলে ধরে।

(খ) পরিমল থেকে পরি: আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধান

পরিমল চরিত্রটি উপন্যাসের অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র এবং আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধানের প্রশ্নে সবচেয়ে জটিল অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যায়। শৈশব থেকেই তার মধ্যে নারীত্বের প্রতি আকর্ষণ ছিল। কিন্তু সমাজের প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী এই অনুভূতি গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে সে এক ধরনের মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে বেড়ে ওঠে।

পরিমলের অভিজ্ঞতা মিশেল ফুকোর যৌনতা-তত্ত্বের আলোকে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ফুকো দেখিয়েছেন যে সমাজ যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট নৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করে। এই কাঠামোর বাইরে থাকা যৌন পরিচয়কে বিচ্যুতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পরিমলের জীবন এই সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অভিজ্ঞতাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।[২০]

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিমল নিজের পরিচয় সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং অবশেষে 'পরি' হয়ে ওঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই রূপান্তর কেবল বাহ্যিক পরিবর্তন নয়; বরং এটি নিজের সত্তাকে স্বীকৃতি দেওয়ার একটি প্রক্রিয়া। এই চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক দেখিয়েছেন যে আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধান প্রায়শই সামাজিক প্রতিরোধের মধ্য দিয়েই সম্ভব হয়।

(গ) আইভি: নারী সমকামিতার স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতা

আইভি চরিত্রটি উপন্যাসে নারী সমকামিতার অভিজ্ঞতাকে সামনে নিয়ে আসে। বাংলা সাহিত্য ও সমাজে নারী সমকামিতার আলোচনা তুলনামূলকভাবে আরও কম হয়েছে। ফলে আইভি চরিত্রটি এই অভাব পূরণের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

আইভির জীবন দেখায় যে নারী সমকামিতাও সমাজে একই ধরনের অবজ্ঞা ও পূর্বধারণার সম্মুখীন হয়। সমাজে নারীর জন্য নির্ধারিত আচরণ ও ভূমিকার সঙ্গে তার ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব একটি গভীর সংকট সৃষ্টি করে। তবে আইভির চরিত্রের মধ্য দিয়ে দেখা যায় যে নারী সমকামিতা কেবল যৌন আকর্ষণের প্রশ্ন নয়; বরং এটি আবেগ, সম্পর্ক এবং আত্মপরিচয়ের জটিল অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত।

এই চরিত্রটি queer theory–এর আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি দেখায় যে লিঙ্গ ও যৌন পরিচয়ের প্রশ্ন কেবল পুরুষকেন্দ্রিক নয়; বরং নারীর অভিজ্ঞতাও এই আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।[২১]

(ঘ) দুলাল থেকে দুলালী: প্রান্তিক সম্প্রদায়ের সামাজিক বাস্তবতা

দুলাল চরিত্রটি উপন্যাসে হিজড়া সম্প্রদায়ের সামাজিক বাস্তবতাকে তুলে ধরে। পরিবারের মধ্যে নিজের পরিচয় স্বীকৃতি না পাওয়ার ফলে সে সমাজের প্রান্তিক এক সম্প্রদায়ের মধ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এই অভিজ্ঞতা দেখায় যে পরিবার ও সমাজের বর্জন কীভাবে একজন মানুষকে বিকল্প সামাজিক কাঠামোর দিকে ঠেলে দেয়। দুলাল থেকে দুলালী হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াটি কেবল ব্যক্তিগত রূপান্তর নয়; বরং এটি সামাজিক বর্জনের প্রতিক্রিয়াও। সমাজ যখন একটি নির্দিষ্ট পরিচয়কে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে, তখন মানুষ নতুন সামাজিক পরিচয়ের সন্ধান করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দুলাল চরিত্রটি প্রান্তিক সম্প্রদায়ের সম্মিলিত অভিজ্ঞতার প্রতিনিধিত্ব করে।

ফুকোর ক্ষমতা ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের তত্ত্ব এখানে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।[২২] সমাজ যে যৌন ও লিঙ্গ আচরণকে স্বাভাবিক বলে প্রতিষ্ঠা করে, তার বাইরে থাকা মানুষদের প্রায়শই প্রান্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজেদের অস্তিত্ব গড়ে তুলতে হয়।

(ঙ) সমষ্টিগত তাৎপর্য

উপন্যাসের এই চারটি চরিত্রের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সমকামী ও রূপান্তরকামী মানুষের জীবনসংগ্রাম কেবল ব্যক্তিগত নয়; বরং এটি গভীরভাবে সামাজিক। তাদের আত্মপরিচয় নির্মাণের প্রক্রিয়া সমাজের প্রচলিত লিঙ্গ ও যৌনতার ধারণার সঙ্গে ক্রমাগত সংঘাতে লিপ্ত।

এই চরিত্রগুলি দেখায় যে লিঙ্গ ও যৌন পরিচয় কোনো স্থির বা অপরিবর্তনীয় বাস্তবতা নয়; বরং এটি একটি চলমান সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া। ফলে '*হলদে গোলাপ'* উপন্যাসটি কেবল কয়েকটি ব্যক্তিগত জীবনের গল্প নয়; বরং এটি সমাজে প্রতিষ্ঠিত 'স্বাভাবিকতা'র ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার একটি সাহিত্যিক প্রচেষ্টা।

বৃহত্তর প্রাসঙ্গিকতা ও গবেষণার তাৎপর্য:

'হলদে গোলাপ' শুধু একটি উপন্যাস নয়, এটি একটি যুগান্তকারী সাহিত্যকর্ম, যা বাংলা সাহিত্যের মূলধারায় সমকামী ও রূপান্তরকামী জনগোষ্ঠীর জীবনবাস্তবতাকে একটি গবেষণার মর্যাদা দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

এই গবেষণাপত্রটি দেখানোর চেষ্টা করেছে যে, কীভাবে 'হলদে গোলাপ' একটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিত্বের ধারাকে পাল্টে দিয়েছে। মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃথিকা ইয়াসমিন (প্রথম রূপান্তরকামী পুলিশ অফিসার), জয়িতা মণ্ডল (প্রথম রূপান্তরকামী বিচারক), সত্যাশ্রী সার্মিল (প্রথম রূপান্তরকামী উকিল)-দের মতো ব্যক্তিত্বরা যখন সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করছেন, তখন সাহিত্যে তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য 'হলদে গোলাপ'-এর মতো উপন্যাস এক অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে।

পথ সাহিত্য পত্রিকায় শতদ্রু মজুমদার মন্তব্য করেছেন, "মনন ও জিজ্ঞাসার নতুন পথ অন্বেষণে কেউ কেউ উপন্যাস লিখেছেন। মানবিক নানান প্রশ্নে উপন্যাস লিখেছেন অনেকেই, এই ধারার সাম্প্রতিক সংযোজন স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'হলদে গোলাপ' উপন্যাস।"[২৩] অমর মিত্র, গৌতম চক্রবর্তীর মতো বিশিষ্টজন এই উপন্যাসের গুরুত্ব স্বীকার করেছেন[২৪]। আনন্দবাজার পত্রিকায় গৌতম চক্রবর্তী লিখেছেন, "হলুদ গোলাপ ফুলে স্বপ্নময় আনন্দ— সুঘ্রাণ"— এই উপন্যাসের সৌরভ সমগ্র বাংলা সাহিত্যে ছড়িয়ে পড়েছে[২৫]।

ভবিষ্যতে এই বিষয়ে গবেষণার বিস্তৃত পরিধি রয়েছে। বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য উপন্যাস, গল্প বা কবিতায় সমকামী-রূপান্তরকামী প্রতিনিধিত্বের তুলনামূলক বিশ্লেষণ, এই বিষয় নিয়ে সৃষ্ট চলচ্চিত্র ও জনপ্রিয় সংস্কৃতির প্রভাব, অথবা সমাজকর্ম ও আইনের ক্ষেত্রে এই উপন্যাসের প্রভাব— এগুলি গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে

পারে। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে এলজিবিটি সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের এই ধারার তুলনামূলক আলোচনাও সম্ভাবনার পথ খুলে দেয়। মাইকেল ফুকোর 'দ্যা হিস্টোরি অফ সেক্সুয়ালিটি' তত্ত্বের আলোকে এই উপন্যাসের বিশ্লেষণ ভবিষ্যতে আরও গভীর গবেষণার সুযোগ তৈরি করবে।[২৬]

উপসংহার:

হলদে গোলাপের সৌরভ:

সবশেষে বলা যায়, স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'হলদে গোলাপ' বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য সম্পদ। এটি প্রমাণ করে যে, সাহিত্য শুধু বিনোদনের বস্তু নয়, এটি সমাজের বিবেককে জাগ্রত করার একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এই উপন্যাসটি সমকামী ও রূপান্তরকামী মানুষদের শিকড় সন্ধানের এক আন্তরিক প্রয়াস। তাদের জীবনযুদ্ধকে আমরা যেমন এখানে চিনতে পারি, তেমনই উপলব্ধি করতে পারি তাদের স্বাভাবিকতা ও স্বীকৃতির তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

বাংলা সাহিত্যের দুর্গেশনন্দিনী, গোরা, চরিত্রহীন, আরণ্যক, কবি, পুতুল নাচের ইতিকথা, জাগরী, তিতাস একটি নদীর নাম, নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে, সেইসময় প্রভৃতি বিচিত্রময় উপন্যাসের মালায় 'হলদে গোলাপ' এক ভিন্ন বর্ণের ও গন্ধের ফুল হিসেবে যুক্ত হয়েছে। বর্ণভেদে গোলাপ বিভিন্নতা থাকলেও সেগুলি যেমন গোলাপ, তেমনি নারী-পুরুষের মতো সমকামী ও রূপান্তরকামী মানুষেরাও মানবসন্তান। গোলাপের রঙ ভিন্ন হলেও তার সৌরভ ও সৌন্দর্য যেমন অনন্য, তেমনি এই মানুষগুলির জীবনযুদ্ধ, তাদের ভালোবাসা, তাদের স্বপ্ন— সবই সমান মূল্যবান ও শ্রদ্ধেয়। যেমন লেখক নিজেই তাঁর একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "ওটাই ছিল বীজ, তারপর নিজের আগ্রহ বিভিন্ন জনের সাথে যোগাযোগ, বিভিন্ন পত্রিকা ঘাঁটা, উপন্যাসের প্লট তৈরি।" সেই বীজ আজ 'হলদে গোলাপ' রূপে প্রস্ফুটিত হয়ে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে এক অনন্য সুবাস ছড়িয়ে চলেছে— একটি সুবাস যা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, ভালোবাসার কোনো লিঙ্গ হয় না, অধিকারের কোনো ছোট-বড় হয় না, আর স্বপ্ন দেখার অধিকার সবারই সমান।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়। (২০১৭)। *হলদে গোলাপ*। দে'জ পাবলিশিং।

২. ফুকো, মিশেল। (১৯৭৬)। *দ্য হিস্ট্রি অফ সেক্সুয়ালিটি: ভলিউম ১*। প্যানথিয়ন বুকস।

৩. বাটলার, জুডিথ। (১৯৯০)। *জেন্ডার ট্রাবল: ফেমিনিজম অ্যান্ড দ্য সাবভারশন অফ আইডেন্টিটি*। রাউটলেজ।

৪. ফ্রয়েড, সিগমুন্ড। (১৯০৫)। *থ্রি এসেস অন দ্য থিওরি অফ সেক্সুয়ালিটি*। হোগার্থ প্রেস।

৫. কিনসে, আলফ্রেড। (১৯৪৮)। *সেক্সুয়াল বিহেভিয়ার ইন দ্য হিউম্যান মেল*। ডব্লিউ. বি. সন্ডার্স।

৬. আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশন। (১৯৭৩)। *ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্যাল ম্যানুয়াল অব মেন্টাল ডিসঅর্ডার্স (DSM-II, সংশোধিত সংস্করণ)*। ওয়াশিংটন, ডিসি:

৭. সুপ্রিম কোর্ট অব ইন্ডিয়া। (২০১৮)। *Navtej Singh Johar vs. Union of India*, রায়: ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩৭৭ অসাংবিধানিক ঘোষণা। নয়াদিল্লি: সুপ্রিম কোর্ট অব ইন্ডিয়া।

৮. ঘোষ, ঋতুপর্ণ (সম্পা.)। (২০১০)। *রোববার* (আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবারের সাহিত্যপত্রিকা), যেখানে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর *হলদে গোলাপ* ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

৯. বার্জার, পিটার এল., এবং লাকম্যান, টমাস। (১৯৬৬)। *দ্য সোশ্যাল কনস্ট্রাকশন অফ রিয়ালিটি*। অ্যাঙ্কর বুকস।

১০. প্লেটো। (২০০১)। *সিম্পোজিয়াম*। অনুবাদ: আলেকজান্ডার নেহামাস ও পল উডরাফ। ইন্ডিয়ানাপোলিস: হ্যাকেট পাবলিশিং।

১১. স্যাফো। (২০০২)। *স্যাফো: এ নিউ ট্রান্সলেশন*। অনুবাদ: মেরি বার্নার্ড। বার্কলে: ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস।

১২. ভানিতা, রুথ ও সালিম কিদওয়াই (সম্পা.)। (২০০০)। *Same-Sex Love in India: Readings from Literature and History*। নিউ দিল্লি: পেঙ্গুইন বুকস।

১৩. গুপ্ত, জগদীশ। (১৯৩০)। *অরূপের রাস*। জগদীশ গুপ্তের গল্পসমগ্র। কলকাতা: বিভিন্ন সংস্করণে প্রকাশিত।

১৪. মজুমদার, কমলকুমার। (১৯৫৭)। *মল্লিকাবাহার*। কমলকুমার মজুমদারের গল্পসমগ্র। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর। (১৯৪৬)। *হাঁসুলি বাঁকের উপকথা*। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ।

১৬. ফুকো, মিশেল। (১৯৭৬)। *দ্য হিস্ট্রি অফ সেক্সুয়ালিটি: ভলিউম ১*। প্যানথিয়ন বুকস।

১৭. বাটলার, জুডিথ। (১৯৯০)। *জেন্ডার ট্রাবল: ফেমিনিজম অ্যান্ড দ্য সাবভারশন অফ আইডেন্টিটি*। রাউটলেজ।

১৮. বার্জার, পিটার এল., এবং লাকম্যান, টমাস। (১৯৬৬)। *দ্য সোশ্যাল কনস্ট্রাকশন অফ রিয়ালিটি*। অ্যাঙ্কর বুকস।

১৯. বাটলার, জুডিথ। (১৯৯০)। *জেন্ডার ট্রাবল: ফেমিনিজম অ্যান্ড দ্য সাবভারশন অফ আইডেন্টিটি*। রাউটলেজ।

২০. ফুকো, মিশেল। (১৯৭৬)। *দ্য হিস্ট্রি অফ সেক্সুয়ালিটি: ভলিউম ১*। প্যানথিয়ন বুকস।

২১. বাটলার, জুডিথ। (১৯৯০)। *জেন্ডার ট্রাবল: ফেমিনিজম অ্যান্ড দ্য সাবভারশন অফ আইডেন্টিটি*। রাউটলেজ।

২২. ফুকো, মিশেল। (১৯৭৬)। *দ্য হিস্ট্রি অফ সেক্সুয়ালিটি: ভলিউম ১*। প্যানথিয়ন বুকস।

২৩. মজুমদার, শতদ্রু। (২০১৮)। "মালার একটি ফুল: হলদে গোলাপ।" *পথ সাহিত্য পত্রিকা*, জুলাই সংখ্যা।

২৪. মিত্র, অমর। (২০১৮)। "হলদে গোলাপ।" *পথ সাহিত্য পত্রিকা*, জুলাই সংখ্যা।

২৫. চক্রবর্তী, গৌতম। (২০১৫)। "হলুদ গোলাপ ফুলে স্বপ্নময় আনন্দ—সুঘ্রাণ।" *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ১৫ এপ্রিল।

২৬. ফুকো, মিশেল। (১৯৭৬)। *দ্য হিস্ট্রি অফ সেক্সুয়ালিটি: ভলিউম ১*। প্যানথিয়ন বুকস।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1211-1217
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.341

পাশ্চাত্য হিতবাদ ও ভারতীয় আধ্যাত্মিকতায় নৈতিক আদর্শ বিবেকানন্দের প্রতিক্রিয়া

অভিজিৎ গরাই, *গবেষক, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 16.03.2026; Accepted: 17.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

To Bengalee, to Indian - even to outsiders, Vivekananda is known as a seer, humanist, and social activist. He is not usually recognised as a philosopher, but rather as 'Swamiji'. However, his writings and lectures are filled with deep philosophical insights. One example of a philosophical argumentative analysis appears in his critique of the supporters of the principle of Utility. The advocates of Utilitarianism, such as Jeremy Bentham and John Stuart Mill, have urged us to abandon belief in supernatural entities, which they regard as mysterious, and to lead an altruistic moral life. By adopting the principle of 'the greatest good for the greatest number,' the claim that one can effectively explain sacrifices and altruism inclination. Swamiji respectfully disagrees with the utilitarians at this point. He argues that ethics cannot be developed without a conviction in the existence of the supernatural or a belief in its infinity. He presented numerous arguments side by side to expose the moral emptiness of the Western 'Hitavada' principle. This paper is a humble attempt to reflect on Swamiji's observations.

Keywords: Supernatural, Utilitarianism, 'Hitavada', infinity

বঙ্গমানসে বিবেকানন্দের পরিচয় স্বামীজী হিসেবে। সমাজসেবী, সন্ন্যাসী ও ভারতপ্রেমী হিসেবে তার পরিচয় যতখানি দার্শনিক হিসেবে তার পরিচয় ততখানি নয়। এই কারনেই অনেকেই রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ প্রমুখকে দার্শনিক বলে মেনে নিতে চান না। কিন্তু তার বানী-রচনা ও অভিভাষণ গুলির ছত্রে ছত্রে যে গভীর দর্শন ও মননবোধ সম্পৃক্ত রয়েছে গুণীজন মাত্রই তা জানেন। তবে সরাসরি ভাবে দার্শনিক বিচার তার যে সমস্ত রচনায় পরিলক্ষিত হয় তার মধ্যে একটি হল হিতবাদ বা 'Utility' তত্ত্ব সম্বন্ধে তার প্রতিক্রিয়া। 'Utility' তত্ত্ব দর্শনের ছাত্রের কাছে পরিচিত উপযোগিতাবাদ হিসেবে। প্রয়োজনবাদ হিসেবেও একে কখনো কখনো চিহ্নিত করা হয়। এই উপযোগিতাবাদ বা প্রয়োজনবাদ স্বামীজীর রচনাই 'হিতবাদ' নাম পেয়েছে, এই হিতবাদ যে ভারতীয়ও হিতবাদী ঐতিহ্যের সঙ্গে মানানসই নয় সে কথা অনেকেই বলেছেন। কিন্তু ঠিক কেন সন্তোষজনক দার্শনিক বা নৈতিক মতবাদ হিসেবে গ্রাহ্য নয়। স্বামীজীকে অনুসরণ করে তার ব্যাখ্যা দেওয়া এই উপস্থাপনের অভিমুখ হবে।

হিতবাদ সম্বন্ধে স্বামীজীর বিরূপ মনোভাবের পরিচয় দেওয়ার পূর্বে পাশ্চাত্য হিতবাদের একটা পরিচয় দেওয়া দরকার। সুখ লাভের চেষ্টা মানুষের জন্মগত। অন্যান্য প্রাণীর মত সেইও একটি প্রাণী, স্বাভাবিক ভাবেই আত্মসুখ নিশ্চিত করা তার জীবনে অন্যতম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। নিজের জৈব চাহিদাগুলির পরিপূরণ তার

চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে তার প্রতিটি আচরণের ক্ষেত্রে কিন্তু অন্য পশুর সঙ্গে মানুষের তফাৎ রয়েছে। জৈব প্রবৃত্তি মানব সত্তার সবটুকু নয়। একটি পশুর সমস্ত আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় তার সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা। কিন্তু, মানুষ বিচারশীল প্রাণী। সহজাত প্রবৃত্তির দাস সে হতে পারে না। কৃত কর্মের অনুশোচনা যেমন তাকে ভাবিত করে তেমনি ভাবি কর্মের দুর্ভাবনা তাকে পীড়িত করে। বিচারশীল এবং মননশীল প্রাণী হিসেবে তার কী করা কর্তব্য, সে প্রশ্ন তার মনে ভিড় করে। এই সম্বন্ধে প্রচলিত নীতি তত্ত্বগুলি পরস্পর বিরোধী সমাধান নিয়ে তার কাছে উপস্থিত হয়। একদিকে সুখবাদ বলে, সুখলিপ্সা দ্বারাই তার চালিত হওয়া উচিত অন্যদিকে কর্তব্যবাদ বলে, ক্ষুদ্র সুখের ইচ্ছাই নয়, বিচারশীল প্রাণী হিসেবে কর্তব্যবোধের দ্বারা চালিত হওয়াই মানুষের আদর্শ। এখন এই আত্মপ্রীতির দ্বারা চালিত হয়ে নিজে ইন্দ্রিয়ের দাবী গুলিকে সম্পূর্ণ করার দিকে মানুষ যদি নিয়োজিত হয় তাহলেও কিন্তু সে সুখই হয় না কারণ সে একটা সমাজে বাস করে, সমাজের অন্যদের ভাবনাও ভাবিত করে তাকে। স্বার্থপরের মত নিজের কথাটুকু ভেবে তার কাজ শেষ হতে পারে না। তাই বিচারশীল প্রাণী হিসেবে কি করা উচিত সে প্রশ্ন তাকে তাড়িত করে। এই সম্মন্ধে কর্তব্যবাদীরা একটি ভিন্ন সমাধান নিয়ে তার কাছে উপস্থিত হয়। একদিকে আত্মস্বার্থ অন্যদিকে পরস্বার্থ উভয়ইকে রক্ষা করা একটি তৃতীয় পথপ্রস্ত নিয়ে হাজির হন 'Utility' তত্ত্বের প্রবর্তকরা। তারা দাবী করেন, আত্মসুখের কামনার সঙ্গে পরহিতের ঘটনাকে এমনভাবে সংবদ্ধ করা যায় যেখানে নিজের সুখ কামনা করেও একজন ব্যক্তি পরহিতের ইপ্সা করতে পারে। মানুষের উচিত বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা চালিত হওয়া। প্রাণীবৃত্তি তার নিম্নতর বৃত্তি, বুদ্ধি বৃত্তি তার উচ্চতর বৃত্তি। নিম্নতর বৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত বা শাসিত করে উচ্চতর বৃত্তির আলোয় পথ চলায় মানুষের কর্তব্য। এই কঠোর কর্তব্যবাদী তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। রক্ত মাংসের মানুষ হয়ে সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হওয়া তার কাছে সমস্যার হয়ে দাঁড়ায়। একদিকে স্বার্থপর সুখবাদ অন্যদিকে শুষ্ক কর্তব্যবাদ। এই দুইয়ের দাবীর টানাপোড়েনে সে বিভ্রান্ত হয়। এই পরিস্থিতিতেই ইউরোপে তৃতীয় একটি নৈতিক মতের আবির্ভাব ঘটেছে সেটি হল উপযোগবাদ।

ইংরাজী 'Utility' বা উপযোগ শব্দ থেকে 'Utilitarianism' বা উপযোগবাদ কথাটির উৎপত্তি। উপযোগের ভিত্তিতে কোনো কাজ বা নীতির যথাযথতা নির্ধারণ করে এই মতবাদ। যে কাজের উপযোগ সর্বাধিক, যা সর্বাধিকের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করে-সেই কাজই করণীয় বা উচিত-বলে এই মতবাদ রায় দেয়। ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে বেন্থাম ও জন স্টুয়ার্ট মিলের রচনাকে অবলম্বন করে এই ভাবধারা ইউরোপীয় চিন্তাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। শুধু ইউরোপ কেন ইংরাজি উপনিবেশ ভারতবর্ষের ইংরেজী শিক্ষিতদের মানসে এই মতবাদ গভীরভাবে দাগ কাটে। চিরাচরিতভাবে হিতবাদীর ঐতিহ্য উত্তরসূরী ভারতীয়রাও ভাবতে শুরু করেন, কোন কাজ হিতকর বা মঙ্গলসাধক আর কোন কাজ অহিতকর বা অনুচিত তা নির্ধারণের মাপকাঠি ঐ কাজের দ্বারা উপযোগ বা কল্যাণের পরিমাণ। অধিকাংশ উপযোগবাদীর কাজে এই কল্যাণ আসলে সুখ বা ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি (Pleasure)। উপযোগবাদীদের পরসুখবাদীও বলা হয়; যদিও ব্যতিক্রমী কিছু উপযোগবাদীর কাছে এই উপযোগ সুখ মাত্র নয়। এই প্রসঙ্গে বেন্থামের অভিমত উল্লেখের দাবী রাখে-

> "By utility is meant that property in any object, whereby it tends to produce benefit, advantage, pleasure, good, or happiness."[১]

[১] Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1789) Oxford, ch. I, p.2

ঠিক যে পরিমানে একটি কাজ সুখপ্রবণ তো যে সেই পরিমানে যথোচিত স্মরণ করিয়ে দিয়ে মিলও বলেছেন,

> "Actions are right in proportion as they tend to promote happiness, wrong as they tend to produce the reverse of happiness. By happiness are intended pleasure and the absence of pain."[২]

অর্থাৎ কিনা কল্যাণ (good) এর অন্তরালে সর্বাধিক সংখ্যকে সর্বাধিক পরিমানে সুখই তাদের কাছে কাম্য। এর জন্য উপযোগবাদীদের পরসুখবাদী বলে অভিহিত করা হয়; যদিও উপযোগকে সুখের সঙ্গে এক করে ফেলতে রাজি নন। এমন কিছু ব্যতিক্রমি উপযোগবাদীও রয়েছেন। তবে উপযোগ সুখ হোক বা না হোক "Greatest good of the greatest number" হল নির্বিশেষে সকল উপযোগবাদীর সাধারণ নীতি।

এই পর্যন্ত পাশ্চাত্য হিতবাদীদের নীতিদর্শনের একটা পরিচয় পাওয়া গেল। এও জানা গেল যে নৈতিক মানদণ্ড গ্রহণ করলে শুধুমাত্র বিচারবুদ্ধির দ্বারাই নৈতিকতার ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে, কোনো অলৌকিক সত্ত্বা বা কোনো অলৌকিক শক্তির অনুমোদন স্বীকার করার প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু এখানে প্রশ্ন ওঠে যে একজন ব্যক্তি কী কারণে নিজের ভালো বা কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে অন্যদের কল্যাণের কথা বিবেচনা করবে? অর্থাৎ কোন ব্যক্তি স্বরূপত আত্মসুখবাদী বা অহংবাদী, অহংবাদী এক ব্যাক্তি কীভাবে পরবাদীতে রূপান্তরিত হবে? এই বিষয়ে বেন্থাম ও মিলের ব্যাখ্যা ভিন্ন ভিন্ন। বেন্থামের মতানুসারে, মানুষ যদিও স্বভাবত আত্মসুখ কামনা করে তথাপি সে পরবাদী হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু কীভাবে হবে? এর মূল বা কারণ হিসেবে তিনি চার প্রকার নিয়ন্ত্রনের কথা বলেছেন- ১. প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ ২. সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ৩. ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ ও ৪. রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ।

মানুষ যেহেতু সমাজে বাস করে তাই বাকি মানুষদের সাথে সম্বন্ধ নির্মাণ করেই তাকে থাকতে হয় এবং সমাজের দাবিও তাকে মেনে চলতে হয়, যাকে বেন্থাম সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলে গণ্য করেন। আবার মানুষ প্রকৃতির অপর নির্ভরশীল তাই তাকে প্রকৃতির দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হতে হয়, যেমন প্রকৃতির বিপদ আপদ মোকাবিলা করতে গেলে তাকে অন্যের সাহায্য যেমন নিতে হয় ঠিক তেমনি অন্যের সাহায্যে হাতও বাড়াতে হয়, যা প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রানাধীন। আবার ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ এই মত প্রকাশ করে যে, অন্যের জন্য কিছু করা উচিৎ। আবার রাষ্ট্র স্বার্থপর মানুষকে শাস্তি দেয় ও নিয়ন্ত্রণ করে যাকে বেন্থাম প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। এই চতুর্বিধ নিয়ন্ত্রণ থাকার কারণেই মানুষ আত্মবাদী থেকে পরবাদী হতে শেখে। মিল অবশ্য এই বাহ্যনিয়ন্ত্রণগুলিকে পরার্থপ্রবৃত্তির প্রণোদন বলে দাবী করেন নি, কারন শুধুমাত্র নিজের সুখের কারণে মানুষ পরের ভাবনায় ভাবিত হবে এটা মানুষের মর্যাদার পক্ষে হানীকার বলে তিনি বিশ্বাস করতেন, একটি সুখী শূকর হওয়ার চেয়ে অসুখী মানুষ হওয়া গর্বের বলে মনে হতো।[৩] তাই বাহ্য নিয়ন্ত্রণ মানার সাথে সাথে আন্তর নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করার পক্ষপাতী।[৪]

কিন্তু এই হিতবাদ বিবেকানন্দের বিচারে কোনো নৈতিক মতবাদ হিসেবে গণ্য হতে পারে না, কারণ এই মতবাদ আমাদের অলৌকিক বিশ্বাস পরিত্যাগ করতে বলে অথচ কোনো একটি আদর্শে বিশ্বাস স্থাপন ছাড়া নৈতিক আচরণ সম্ভব হয় কি? স্বামীজীর মতে, "অহংকারের পূর্ণ বিনাশই নীতিশাস্ত্রের আদর্শ।"[৫] অহংকার

---

[২] J.S. Mill, Utilitarinism (1863) ch.II, P. 9-10.

[৩] J.S. Mill, Utilitarinism (1863) ch.II, P.14.

[৪] Ibid, Ch. III, P. 40-41.

[৫] স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১২৪।

বলতে তিনি অহংবোধকে বুঝিয়েছেন অর্থাৎ স্বার্থবোধ। যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ স্বার্থবোধ ত্যাগ করতে পারছে ততক্ষন পর্যন্ত সে নৈতিক আচরণ করতে পারে না। নীতি শাস্ত্রের মূল মন্ত্রই হল- "নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু।"[৬] এখন এই নৈতিক আত্মত্যাগ বা স্বার্থবিলোপ মানুষ করবে কেন? বিবেকানন্দের মতে, কোন অতিচেতন বা কোন আদর্শকে সামনে না রেখে মানুষ আত্মত্যাগেকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না, সহজ কথায় মানুষের যদি কোন অলৌকিক সত্ত্বায় বিশ্বাস না থাকে তাহলে কি কারনে বা কি উদ্দেশ্যে সে অন্যের জন্য ভাবিত হবে? এই প্রসঙ্গে, বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে অনন্তকে পাওয়ার মহতিবাসনা ছাড়া অহংবোধের নাশ হয় না, আত্মত্যাগের প্রবৃত্তি জন্মে না। সুতরাং নীতিশাস্ত্র এবং নৈতিক কর্মের মূলে রয়েছে আদর্শে বিশ্বাস, অতিচেতনের অনুভূতি। এই প্রত্যয় ব্যক্ত করতে গিয়ে স্বামীজি বলেন,

> "অলৌকিক অনুমোদন অথবা আমি যাহাকে অতিচেতন অনুভূতি বলিতে পছন্দ করি,তাহা ব্যতীত কোন নীতিশাস্ত্র গড়িয়া উঠিতে পারে না। অনন্তের অভিমুখে অভিযান ব্যতীত কোন আদর্শই দাঁড়াইতে পারে না।"[৭]

একই প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে তার লন্ডনের বক্তৃতায়-

> "Without the struggle towards the Infinite there can be no ideal."[৮]

অর্থাৎ অনন্তের অভিমুখের অভিযান ছাড়া কোনো আদর্শ দাঁড়াতে পারে না। অথচ ঐ অনন্তের অভিমুখে অভিযানকেই ত্যাগ করতে বলেন হিতবাদিরা। কারণ তাদের বিচারে ঐ প্রচেষ্টা অসাধ্য ও অযৌক্তিক। অথচ তারাই আবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নীতি অনুসরণ ও সমাজ কল্যাণে আত্ম নিয়োগে করতে বলেন। এখানে বিবেকানন্দের প্রশ্ন, আমরা সমাজ কল্যানে আত্মনিয়োগ করব কেন? অর্থাৎ পরকল্যানে আত্মনিয়োগে প্রণোদন কী হবে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য-

> "হিত করা তো গৌণ ব্যাপার। আমাদের একটি আদর্শ থাকা আবশ্যক। নীতিশাস্ত্র তো লক্ষ্য নয়, উহা উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র। লক্ষ্যই যদি না থাকে, তবে আমরা নীতিপরায়ণ হইব কেন?"[৯]

এখানে কেউ প্রতিবাদ করে কান্টের আদর্শের কথা বলতে পারেন, কর্তব্যবোধের যে কঠোর আদর্শ কান্ট প্রচার করেন তার উৎস মূল হল প্রজ্ঞা বা বিশুদ্ধ বুদ্ধি (pure reason) এবং সদিচ্ছা (Good will)। বিশুদ্ধ বুদ্ধির পথে যিনি চালিত হন বিবেকের নির্দেশে তিনি অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করেন তুচ্ছ হৃদয়া বৃত্তির কোনো আবেদন তার কাছে থাকে না। তাই ঈশ্বরের ভক্তি অলৌকিক বিশ্বাস নৈতিকতার আবশ্যিক পূর্বাঙ্গ এমনটা বলা যাবে কীভাবে? এই রকম আশঙ্কার উত্তরে বলা যায়, কর্তব্যর জন্য কর্তব্য ও সদিচ্ছা মহান আদর্শের কথা কান্ট বললেও নৈতিকতার তিনটি পূর্বাঙ্গকে (postulates) তিনি স্বীকার করেন; যার মধ্যে আত্মার অমরতা ও ইচ্ছার স্বাধীনতার পাশাপাশি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। আবার খ্রিস্ট প্রভৃতি সাবেকি ধর্ম গুলি মনে করে যে, সকলেই ঈশ্বরের সন্তান অতএব আমাদের সকলকেই ভ্রাতা ভগ্নী হিসেবে গ্রহণ করা

---

[৬] তদেব. পৃ. ১২৪।

[৭] তদেব. পৃ. ১২৪।

[৮] Swami Vivekananda, The Complete Works of Swami Vivekananda, Volume II – Jnana-Yoga (The Necessity of Religion), 14th Edition, Advaita Ashrama. P.63.

[৯] স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১২৪-১২৫।

কর্তব্য। অতএব কোন একটি আদর্শকে সামনে না রেখে বা কোনো অতিলৌকিক সত্ত্বার ওপর বিশ্বাস না রেখে নৈতিক কর্মের কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া যায় এমন দাবী করা কঠিন।

শুধু বৌদ্ধিক নৈতিকতার আদর্শ প্রচার করে বলে নয়, পাশ্চাত্য হিতবাদ বিবেকানন্দের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি নানা কারনে। তার প্রথম অভিযোগ, কোনো মানুষের হিত বা সুখই যদি লক্ষ্য হয় তাহলে সে স্বভাবতই আত্মহিতে ব্রতি হবে সে পরহিতে ব্রতি হবে কেন? যে ব্যাক্তি স্বভাবতই সুখ কামনা করে, সে পরসুখ বিধান করতে যাবে কেন? সে পরের জন্য আত্মত্যাগ করবে কেন? কেনই বা নিজেকে দুঃখী করবে? কেন সে নিজেকে সুখী করবে না? এই হিতবাদের বিরুদ্ধে এই সকল প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন বিবেকানন্দ। তাঁর জিজ্ঞাসা,

> "Why should I do good to other men, and not injure them? If happiness is the goal of mankind, why should I not make myself happy and others unhappy? What prevents me?"[10]

এখানে বাহ্য নিয়ন্ত্রণ ও আন্তর নিয়ন্ত্রনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে পারেন Utility পন্থীরা। কিন্তু সমাজ, প্রকৃতি, রাষ্ট্র, ধর্মের চাপ আত্মবাদীকে পরবাদী করে এই যুক্তি ধোপে টেকে না, কারণ পরিস্থিতির চাপে যে পরের কথা ভাবতে বাধ্য হয়, সুযোগ পেলেই সে স্বার্থের সিদ্ধির পথে যাবে একথা ঠিক যে মিল এখানে আন্তর নিয়ন্ত্রনের কথাও বলেছেন। কিন্তু এই আন্তর নিয়ন্ত্রনের নিয়ন্ত্রক কী হবে? কোন বাধ্যতা অন্তরের দিক থেকে মানুষকে পর ভাবনায় ভাবিত করবে, বিচিত্র বহুকে অসীম অনন্ত একের মধ্যে বিধৃত করতে না পারলে– একের দিক থেকে বহুকে দেখতে না পারলে- অন্তরের তাগিদ আসবে কোথা থেকে? হিতবাদিরা সর্বাধিক কল্যানের কথা বলেন, কিন্তু কোনটা কল্যাণ বা হিত এবং কীসের বিচারে তা কল্যানের তা না জেনে তার সর্বাধিকীকরণ সম্ভব কী? মোট কথা কোনো আদর্শকে পূর্বস্বীকার্য হিসেবে মেনে না নিয়ে শুভত্ব বা কল্যাণের ধারনা গড়ে উঠতে পারে না; সে ক্ষেত্রে কল্যানের সর্বাধিকীকরণের প্রয়াস সুদূর পরাহত হয়।

স্বামীজির আরও দাবী, হিতবাদিরা যে মানদণ্ডে শুভের ব্যখ্যা দিতে চান তা আসলে প্রয়োজনের মানদণ্ড, উপযোগের মানদণ্ড, যার নিরিখে সর্বকালের নৈতিক নিয়ম গড়ে উঠতে পারে না। পুনরায় তিনি এই কথাও বলেন, যা কিছু বর্তমান প্রয়োজন পূরণে সহায়ক, আগামীতে তা নাও থাকতে পারে। তাছাড়া প্রয়োজনের কোন চিরায়ত মাপকাঠি নেই। এক সময় যে সমস্ত বিষয় আমাদের প্রয়োজন সাধক বলে মনে হত এখন তাদের অনেক কিছুই হয় বিনষ্ট কিম্বা আর প্রয়োজনের বলে বিবেচিত হয় না। পরিচ্ছদের ধরনে আমূল পরিবর্তনের দিকে নজর রাখলে ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়। একটি বিষয় গোষ্ঠী বিশেষের কাছে কাঙ্ক্ষিত ও সুখকর বলে মনে হলেও ও অন্য ব্যাক্তির কাছে সেটি দুঃখের বলে গণ্য হতে দেখা যায় অর্থাৎ রুচি পছন্দভেদে সুখ ও দুঃখবোধ ভিন্ন ভিন্ন হয়। আমরা যাকে সমাজ বলছি তা সাময়িক, স্বামীজির কথায়,

> "বহুযুগ পূর্বে সমাজের অস্তিত্ব ছিল না, খুব সম্ভব বহুযুগ পরেও থাকিবে না। খুব সম্ভব উচ্চতর ক্রমবিকাশের দিকে অগ্রসর হইবার পথে এই সমাজ-ব্যবস্থা আমাদের অন্যতম সোপান। শুধু সমাজ-ব্যবস্থা হইতে গৃহীত কোন বিধিই চিরন্তন হইতে পারে না এবং সমগ্র মানব-প্রকৃতির পক্ষে পর্যাপ্ত হইতে পারে না।"[১১]

---

[১০] Swami Vivekananda, The Complete Works of Swami Vivekananda, Volume II – Jnana-Yoga (The Necessity of Religion), 14th Edition, Advaita Ashrama.p. 63-64.

[১১] স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১২৫।

এখানে বলা দরকার সুখবাদীরা যখন "the greatest good of the greatest number" এর কথা বলেন তখন 'good' বা কল্যাণের ধারনা বলতে তারা বর্তমানের সুখবোধকেই প্রাধান্য দেন। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ে মানুষের মধ্যেও সুখ লাভ করার নানাবিধ পর্যায় রয়েছে। একদল আছেন যারা স্থূল সুখভোগ করেই তৃপ্তি অনুভব করেন আবার অনেক উচ্চতর মানসিকতার মানুষ আছেন যারা ত্যাগে বা সর্বজনের সুখে আনন্দ লাভ করেন। মানসিক তৃপ্তি, ইন্দ্রিয় সুখ এক নয়। প্রসঙ্গত বলা দরকার, যাকে মোক্ষ বা মুক্তি বলা হয়, তাও একধরণের উচ্চতর সুখই। সুখ আসলে মুক্তির একটি উচ্চতর অবস্থা মাত্র। জীবের ক্রম ভেদে সুখবোধের যে পরিবর্তন তা সর্বজনবিদিত। বিষয়টিকে সহজবোধ্য করতে গিয়ে স্বামীজি, মনুষ্যেতর প্রাণীর খাদ্য গ্রহণের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। একটি কুকুর বা শৃগালের দিকে তাকালে মনে হয় জগতের সমস্ত সুখ খাদ্য গ্রহণের মধ্যেই নিহিত, কিন্তু উচ্চতর প্রাণীর ক্ষেত্রে বা মানুষের ক্ষেত্রে খাদ্য গ্রহণ বা রসনার সাধটায় তার কাছে শ্রেষ্ঠ সুখ নয়। বিশেষত যারা চেতনার উচ্চক্রমে উন্নীত হতে পেরেছেন তা তাদের সুখবোধ ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিকে অতিক্রম করে যায়।

কাজেই, নীতিতত্ত্ব হিসাবে হিতবাদের দুর্বলতা স্পষ্টতা সত্ত্বেও এর মধ্যে যে লোকহিতের মহৎ আদর্শ ব্যক্ত হয়েছে তা যেই হিতবাদী মহৎ ব্যক্তির চিন্তার ফসল সে কথা অস্বীকার করেন নি বিবেকানন্দ। তবে কিনা ঐ লোকহিতের প্রেরণাটি স্বামীজির মতে, আধ্যাত্মিক তা ধর্ম থেকেই উৎসারিত। এই বিষয়ে তাঁর মন্তব্য দিয়েই এই নিবন্ধ শেষ করা যাক-

> "কেবল হিতবাদ অবলম্বন করিলেই মানুষ খুব সৎ ও নীতিপরায়ণ হইতে পারে, ইহা আমি অস্বীকার করি না। এ জগতে এমন বহু মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা হিতবাদ অনুসরণ করিয়াও সম্পূর্ণ নির্দোষ, নীতিপরায়ন এবং সরল ছিলেন। কিন্তু যে-সকল মহামানব বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের স্রষ্টা, যাঁহারা জগতে যেন চৌম্বকশক্তিরাশি সঞ্চারিত করেন, যাঁহাদের শক্তি শত সহস্র ব্যক্তির উপর কাজ করে, যাঁহাদের জীবন আধ্যাত্মিক অগ্নি প্রজ্বলিত করে, এরূপ মহাপুরুষদের মধ্যে আমরা সর্বদা অধ্যাত্মশক্তির প্রেরনা দেখিতে পাই। তাঁহাদের প্রেরণা-শক্তি ধর্ম হইতে আসিয়াছে। যে অনন্ত শক্তিতে মানুষের জন্মগত অধিকার, যাহা তাহার প্রকৃতিগত, তাহা উপলব্ধি করিবার জন্য ধর্ম সর্বাপেক্ষা বেশী প্রেরণা দেয়। চরিত্র-গঠনে, সৎ ও মহৎ কার্য-সম্পাদনে, নিজের ও অপরের জীবনে শান্তিস্থাপনে ধর্মই সর্বোচ্চ প্রেরণাশক্তি।"[১২]

[১২] তদেব. পৃ. ১২৮।

গ্রন্থপঞ্জি:

১। Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Oxford, 1789.

২। J.S. Mill, Utilitarinism, London: Parker, Son, and Bourn, 1863.

৩। Sinha Jadunath, A Manual of Ethics, New Central Book Agency (P) Ltd, 1978.

৪। Frankena, William K, Ethics, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1963.

৫। OLiver A. Johnson, Rightness and Goodness,Martinus Nijhoff, The Hague.1959.

৬। চক্রবর্তী, সোমনাথ, কথায় কর্মে এথিকস, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা।

৭। Chatterjee, P.Bhushan , Published by the Authors, Kolkata, 1966.

৮। স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা, তৃতীয় খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৬৭ সন।

৯। Swami Vivekananda, The Complete Works of Swami Vivekananda, Volume II, Edition 14th, Advaita Ashrama, 1958.

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1218-1225
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.342

ক্ষেত্র সমীক্ষা ভিত্তিক রাঢ় বাংলায় হিন্দু-মুসলিম যৌথ ধর্মীয় উপাসনা ও মানত প্রথার দৃষ্টান্ত

মুন্সী মহ: সাহেবুর রহিম, *গবেষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 16.03.2026; Accepted: 17.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In the socio-religious and cultural history of Rarh Bengal, the practice of joint Hindu–Muslim worship and vow-making (manat) constitute a significant feature. Through the interaction of Sufism and the worship of regional folk deities, a syncretic culture developed in Bengal in which pirs and local deities often became interchangeable. Deities and pirs such as Fatema Bibi, Bonbibi, Olabibi, Satyapir, Gorachand Pir, Barakhan Gazi, Manasa, and Olaichandi are worshipped by both Hindu and Muslim communities. As a result, the presence of Muslims in Hindu temples and the participation of Hindus in Muslim shrines have become a traditional social reality in various parts of Rarh Bengal.

Field studies reveal numerous examples of such shared religious practices across the districts of Hooghly, Birbhum, Murshidabad, Bankura, and Bardhaman. For instance, in Jamgram of Hooghly, it is customary during the Durga Puja of the Nandi family to serve food to a Muslim fakir and to offer *shirni* at a pir's shrine. At the Bishalakshmi temple in Kalachhara, both Hindus and Muslims perform vows. In Khajutipara village of Birbhum, Muslims offer fruits and milk during the worship of Dharmaraj Thakur, and the consecrated food is shared by all. In Bhandarkata village of Mohammad Bazar, Kali Puja is organized by the Muslim community.

Similar practices are observed in Murshidabad, Bankura, and Bardhaman districts, where Muslim households host Hindu deities or actively participate in the maintenance of Hindu temples. Examples include the shrine of Dinadayal at Nawpara in Bardhaman, the Panchanan Thakur shrine at Yabgram, the worship of Dharmapir or Dharmaraj at Sabajpur, and the Jagannath Pir shrine at Ketugram. In all these places, both communities equally participate in vows, rituals, and festivals.

This field study indicates that in the rural society of Rarh Bengal, mutual coexistence, shared beliefs, and regional traditions have played a more significant role than religious divisions. Thus, the practices of joint worship and vow-making stand as a remarkable historical testimony to the pluralistic culture and communal harmony of Rarh Bengal.

Keywords: Sufi, Pir, Fateha, Astana, Hajat, Atan, Shirni, Kafir, Manat, Fakir, Than, Dargah

রাঢ় বাংলায় লৌকিক পির ও লৌকিক দেবদেবী সমার্থক হয়ে আছে। ঐতিহাসিক ও গাজীপির ছাড়াও ফাতেমা বিবি, বনবিবি[১], ওলাবিবি[২], ওলাইচণ্ডী, মনসা, বড়খাঁ গাজী, পির গোরাচাঁদ ও সত্যনারায়ণ বা সত্যপির, মানিকপির[৩] খজখেজের[৪] প্রভৃতি লৌকিক পির বা লৌকিক দেবদেবী হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মাবলম্বী দ্বারা পূজা ও হাজত পান। বাংলায় সুফিবাদ ও লৌকিক দেবদেবীদের মিশ্রণে এক ধরনের মিশ্র ধর্মীয় সমাজ সংস্কৃতি

গড়ে ওঠে। যার ফল আজও বাংলা তথা রাঢ় বাংলায় রয়েছে। যার ফলস্বরূপ হিন্দু পুজোয় মুসলিমদের অংশগ্রহণ এবং মুসলিম পিরের থানে হিন্দুদের আগমন ঘটে। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় হিন্দু বাড়িতে যেমন মুসলমানদের পিরের থান রয়েছে, আবার মুসলিমদের বাড়িতে হিন্দু লৌকিক দেবদেবীর থান রয়েছে। এগুলি সবই মিশ্র সংস্কৃতির ফল। এ প্রসঙ্গে ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে থানগুলি যে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ তা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

হুগলি জেলার পান্ডুয়ার কাছে অবস্থিত জামগ্রাম। এখানে রয়েছে নন্দী পরিবারের শ্রী শ্রী লক্ষ্মীজনার্দন ঠাকুরের মন্দির, ঠাকুরদালান ও রাসমঞ্চ।[৫] এগুলি সবই স্থাপিত হয়েছে উনিশ শতকে। এই নন্দী বাড়ির দুর্গাপুজো ও লক্ষ্মীপুজোর আলাদা একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। শোনা যায় এই পরিবারের দশ পুরুষ পূর্বে জামগ্রামে হাপুরজি নামক এক সুফি ফকিরের আশীর্বাদে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। তারপর থেকে প্রতি বছর এই পরিবারের পুজোয় কিছু নিয়ম চালু হয়। যেমন দুর্গাপুজোর নবমী তিথিতে প্রথমে দুজন মুসলিম ফকিরকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে হবে। এই ফকিরের অন্ন গ্রহণের পরই বাকী ভক্তগণ ও পরিবারের সদস্যরা নবমীর প্রসাদ গ্রহণ করবে। পাশাপাশি লক্ষ্মীপুজোর পরের দিন নন্দী বাড়ি থেকে ভোরবেলায় শোভাযাত্রা বের হয়। প্রথমে এই শোভাযাত্রা আসে হাপুরজি পিরের মাজারে। মাজারে শিরনি হিসাবে বাতাসা ফল গুড় চিড়ে দিয়ে ভোগ দেওয়া হয়। পিরের বাতাসা সহ ভোগ বড়-ছোট নর-নারী সকলেই আনন্দে ভাগ করে নেন।[৬] এইভাবে জামগ্রামে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সম্পর্ক দৃঢ় হয়েছে। ফকিরকে নেমন্তন্ন করে খাওয়ানো বা পিরের দরগায় শিরনি বিতরণ করে পুজোর সমাপ্তি- কোনো ক্ষেত্রেই হিন্দু ধর্ম উচ্ছন্নে যায়নি বা মুসলিম ধর্মের কেউ কাফের, বিধর্মী হয়ে যায়নি, বরং সম্প্রীতি বজায় এই ঐতিহ্য আজও চালু রয়েছে।

হুগলি জেলার চন্ডীতলা থানার অন্তর্গত কলাছড়া পল্লীর বিশালাক্ষী মন্দির[৭], মন্দিরের ফলকটি ১৬৬৭ খ্রিস্টাব্দে খোদিত, সম্ভবত সাড়ে তিনশো বছরের প্রাচীন। দেবীর মূর্তি চতুর্ভুজা, ত্রিনেত্রা, পদতলে শায়িত শিব, এবং শিবের পাশে নীলবর্ণ মহাকাল বা কালভৈরব উপবিষ্ট। শাস্ত্রীয় নিয়ম মেনে নিত্য পূজা হয়। বাৎসরিক পূজা হয়, সেই সঙ্গে মেলা বসে ও পাঁচালী গান হয়। পাঁচালী গানে হিন্দু-মুসলিম সকলে অংশ নেন। মানসিকের জন্য হিন্দুরা পাঁঠা মুরগি বাতাসা, মুসলমানরা মুরগি পোড়ামাটির লাল কালো ঘোড়া নিবেদন করেন। গ্রামবাসীদের মতে, দেবী অত্যন্ত জাগ্রত। ভক্তিভরে পূজা করলে রোগমুক্তি, মহামারী প্রতিরোধ, দুর্যোগ নিবারণ হয়। বহু ভক্ত রোগমুক্তি পাওয়ার দাবি করেছেন, মুসলিম মানতকারী সামী হোসেন সুস্থ হওয়ার অভিজ্ঞতার কথা জানান। সুতরাং বিশালাক্ষী দেবী আঞ্চলিক লৌকিক উপাসনার প্রতীক, যিনি পরে শাস্ত্রীয় দেবতা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। তিনি আর্য অনার্য, ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক সংস্কৃতির মিশ্রণে গঠিত। কলাছড়া অঞ্চলে তাঁর মন্দির শুধুমাত্র ধর্মীয় স্থান নয়, বরং হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিরও কেন্দ্র[৮]।

হুগলির বটেশ্বর মন্দিরে এবং তারকেশ্বর মন্দিরে ওই অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় আসেন, পূজা দেন ও মানত করেন[৯]।

বীরভূম জেলার নানুর থানার খাজুটিপাড়া গ্রামে নিম গাছের নীচে ধর্মরাজ ঠাকুরের আটন আছে। নিয়মিত ধূপ দেওয়া হয়। গ্রামটিতে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ই বসবাস করেন। বৈশাখী পূর্ণিমায় মুসলিমগণ দেবতার উদ্দেশ্যে ফল ও দুধ ইত্যাদি দিয়ে যান। হিন্দুগণ তা সাদরে গ্রহণ করেন। তারপর ভোগ রান্না হলে তা হিন্দু-মুসলিম সকলেই আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেন। তাদের বিশ্বাস স্নান করে এসে মুক্তমনে দেবতার ভোগ গ্রহণ করলে দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।[১০]

বীরভূম জেলার মহম্মদ বাজার থানার ভাঁড়কাটা গ্রামে কালীপূজা হয়। গ্রামটিতে বেশিরভাগ বসবাসকারী মুসলিম। কালীপূজার উদ্যোগ মুসলিমরাই করেন। এই কালী পূজা উপলক্ষে সেখানে প্রতিবছর একটি মেলা বসে। মেলা প্রায় ৬/৭ দিন ধরে চলে। মেলাতে বসে কবি গানের আসর। দেবীকে সমগ্র গ্রাম পরিক্রমা করানো হয়, যার দায়িত্বে থাকেন মুসলমানগণ। তাঁরা দেবীকে নিয়ে গিয়ে হিন্দু-মুসলিম প্রায় সব বাড়ির সামনে নামান। বাড়ি থেকে লোকজন বের হয়ে দেবীকে দর্শন করেন। কেউ মানসিক করে থাকলে তা সেইসময় শোধ করে দেন। আবার কেউ কেউ সেই দিন কোন নতুন আশা নিয়ে দেবীর কাছে মানত ও করেন। বাড়িতে বাড়িতে জ্বলে দীপাবলির আলো।[১১]

মুর্শিদাবাদ জেলার পাঁচথুপি বড়ুয়া থানার মুনুটিয়া গ্রামের 'জটাধারী তলা' হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির এক অনন্য নিদর্শন। মুসলিম পাড়ায় অবস্থিত শিবমন্দিরটি স্থানীয় মুসলমানদের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ হয়। এখানে শিব ও পঞ্চ নাগের মূর্তি পূজিত হয়। প্রতি বছর চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহে গাজন উৎসব তিনদিন ধরে উদযাপন হয়, যার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে মন্দির চত্বর। উৎসবকালে মেলা বসে এবং বৃহস্পতি ও শনিবারে সবচেয়ে বেশি ভক্তের সমাগম ঘটে। অনেক মুসলিম মহিলা এখানে মানত করে উপকার লাভ করেছেন বলে জানান।[১২] জটাধারী তলার এই উৎসব ও পূজাচর্চা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় সহাবস্থান, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও মিলনের এক বাস্তব উদাহরণ হিসেবে গ্রামীণ বাংলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দিকটি তুলে ধরে।

মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙা থানার নওপুকুরিয়া গ্রামে মা ডুমনির আটন আছে। ঐ ডুমনির আটনটি প্রায় পাঁচশত বছরের পুরাতন বলে জানা যায়। মা ডুমনী ওই গ্রামের এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামের জাগ্রত দেবী বলে খ্যাত। মৃত্যু বৎসা দোষ খন্ডন, বন্ধ্যা নারীর সন্তান কামনা, দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি ইত্যাদির জন্য ওই অঞ্চলের হিন্দু-মুসলিম সকলেই দেবীর কাছে মানত করেন। কলকাতা, মালদহ, রাজশাহী, বীরভূম, বর্ধমান, হাওড়া, হুগলি প্রভৃতি দূর-দূরান্ত স্থান থেকেও বহু ভক্ত দেবীর নিকট আসেন। এই দেবীর বিশেষ বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠিত হয় বৈশাখ মাসের শনি ও মঙ্গলবারে। সেদিন দেবীর উদ্দেশ্যে চিড়ে ও দই দিয়ে প্রসাদ তৈরি হয় এবং দুপুরে পায়েস ও খিচুড়ি রান্না হয়। হিন্দু-মুসলিম সকলেই সেদিন রান্নাতে সাহায্য করেন এবং মহানন্দে সকলেই ভোজন করেন। মন্দিরের সেবায়েতকে[১৩] এর ইতিহাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন-লিখিত কোনো ইতিহাস জানা নেই। তারা বংশ পরম্পরায় এই দেবতার আরাধনা করে আসছে। দেবতার বহু মুসলমান ভক্ত আছে। এইভাবে ওই অঞ্চলে উঠেছে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রতীর মিলন ক্ষেত্র।

মুর্শিদাবাদ জেলার শক্তিপুর থানার, বেলডাঙ্গা-২ ব্লকের কাটাইকোনা গ্রামের বসির সেখের বাড়িতে হিন্দু দেবদেবী আটন আছে। আটনটিতে প্রতীক হিসাবে ঘরের কোণে একটি লোহার গফুরের বাহন আছে। কেউ কেউ সেটিকে নারায়ণের ঢেঁকির বাহনও বলে থাকেন। প্রতীকটি চার পা যুক্ত অনেকটা ঘোড়ার মতো দেখতে। আটনটির পুরোপুরি দেখাশোনা করেন তিনার স্ত্রী। ওই আটনের বাহক হিসাবে একশত এক জন হিন্দু দেবদেবীর তিনি আরাধনা করেন। তবে সবচেয়ে প্রাধান্য দেন দেবী মনসা ও শিবকে। তিনি প্রত্যেকদিন সকাল-সন্ধ্যা দুবেলা আটনের জায়গা পরিষ্কার করে ধুপ ধুনা দেন তারপর ভোগ নিবেদন হিসাবে যে কোন এক প্রকার মিষ্টি, জবাফুল ও বিভিন্ন রকমের ফল রাখেন। তাছাড়া প্রত্যেকদিন নিয়ম করে সেখানে গরুর কাঁচা দুধ ঢালা হয়। ঐ থানে প্রত্যেকদিন অনেক হিন্দু-মুসলিমের আগমন ঘটে। বছরের একটি বিশিষ্ট দিনে মহিলা বাড়িতে নিজের পয়সায় এক বিরাট অনুষ্ঠান করেন। সেই অনুষ্ঠানে দেবতার উদ্দেশ্যে ভোগ রান্না করা হয়। সেদিন হিন্দু-মুসলিম সকলেই মহানন্দে সেই ভোগ গ্রহণ করেন। তাছাড়া মহিলাটি সপ্তাহে একদিন করে পাঁচ রকম ফল দিয়ে দেবতার প্রসাদ করেন যা হিন্দু-মুসলিম সকলেই ভক্ষণ করেন।[১৪]

বাঁকুড়ার ইন্দাস ব্লকের বিউর গ্রামের গাজন উৎসব ধর্মীয় সম্প্রীতির এক অনন্য দৃষ্টান্ত। প্রায় ৩০০ বছর ধরে চলে আসা এই উৎসব অক্ষয় তৃতীয়া থেকে শুরু হয়ে বুদ্ধপূর্ণিমায় শেষ হয়। যদিও স্থানীয় সেন, সরকার এবং রায় পরিবার গাজনের আয়োজন করে, এটি আশপাশের অন্তত ১০টি গ্রামের সম্মিলিত উৎসব। এই গাজনের অন্যতম প্রধান অংশ হল বুদ্ধপূর্ণিমার হোম, যার জন্য কমপক্ষে এক সের ঘি প্রয়োজন হয়। বিশেষ বিষয় হলো, এই ঘি সরবরাহের দায়িত্ব প্রথাগতভাবে গ্রামের মল্লিকপাড়ার এক মুসলিম পরিবারের। ঐতিহ্য অনুসারে, ওই পরিবার থেকে ঘি না এলে সিদ্ধেশ্বরের হোম সম্পন্ন হয় না। শুধু তাই নয়, হিন্দু সন্ন্যাসীরা মুসলিম পরিবারগুলির পাঠানো ফল ও মিষ্টি খেয়ে উপবাস ভাঙেন। গ্রামের আনিসুর রহমান, যাঁর পরিবার প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই ঘি প্রস্তুত ও সরবরাহ করে আসছে, বলেন— "আমরা কে হিন্দু বা কে মুসলিম এভাবে ভাবি না। এটা আমাদের সকলের উৎসব।" এই দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য দেখায় যে ধর্ম কেবল বিশ্বাস নয়, সামাজিক ঐক্যেরও বাহক হতে পারে। বিউর গ্রাম সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল নিদর্শন হয়ে আজও একই নিয়মে তার সংস্কৃতি বহন করে চলেছে।[১৫]

কোতুলপুর থানার মাধবগঞ্জে এক অজানা পিরস্থান রয়েছে। সেই পিরস্থানের পাশেই রয়েছে গঙ্গাধর শিবের মন্দির। শিবের গাজন অক্ষয় তৃতীয়ায় শুরু হয়ে বুদ্ধ পূর্ণিমায় শেষ হয়। এখানে শিবের গাজন হওয়ার পূর্বে পিরের উরস পালিত হয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো শিবের গাজনে ভোগদেয় পার্শ্ববর্তী ধুলাডাঙ্গার হাজারি পদবিধারী মুসলমান পরিবার।[১৬]

বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী থানার নওপাড়া গ্রামে আনসার আলী মণ্ডলের বাড়িতে দীনদয়ালের আটন রয়েছে, যা বহু প্রজন্ম ধরে হিন্দু-মুসলমান ভক্তদের মিলনস্থল হয়ে আছে।[১৭] আনসার মণ্ডল জানান, তাঁর দাদু ছিলেন অগ্রদ্বীপের চরণপালের প্রথম শিষ্য এবং সেই পরম্পরা আজও বহমান। এই দীনদয়ালকে হিন্দুরা শিবের শক্তি রূপে পূজা করেন, আর মুসলমানরা ফকিরের দরবেশ রূপে উপাসনা করেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ভক্তরা এখানে সন্ধ্যা দেয়, মানসিক করে এবং সন্তান কামনা বা পারিবারিক মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করে। প্রতি বছর পৌষ মাসের ৫ তারিখে এখানে মহোৎসব হয়, যেখানে দুই সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রিত হন। যদিও মুসলিম উপাসকের তুলনায় হিন্দু ভক্তদের সংখ্যা বেশি, তবে এই স্থান সর্বজনীন আস্থার প্রতীক হিসেবে টিকে আছে। নওপাড়ার বিশেষ দীনদয়াল শুধু ধর্মীয় উপাসনার কেন্দ্র নয়, বরং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে।[১৮]

বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার যবগ্রামে অবস্থিত আমিনুল হক মোল্লার বাড়িতে পঞ্চানন ঠাকুরের (পাঁচু ঠাকুর) আটন রয়েছে, যা হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের একতা ও আস্থার প্রতীক। পাঁচু ঠাকুর বাংলার বিভিন্ন জেলায় ভিন্ন উপায়ে পূজিত হন, বিশেষ করে শিশুদের খিঁচুনি ও ধনুষ্টংকার নিরাময়ের দেবতা হিসেবে। ঠাকুরের থানে একটি মাটির ঢিপির চারপাশে অসংখ্য লাল-কালো পোড়ামাটির ঘোড়া ছড়িয়ে আছে, যা মানতের নিদর্শন হিসেবে মানুষ রেখে যায়। এছাড়া, সেখানে ছয়টি সাদা রঙের ঘোড়াও রয়েছে। প্রতিদিন বহু ভক্ত, হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে, ঠাকুরের পবিত্র জল গ্রহণ করতে আসেন, যা শুভ কাজের পূর্বে ব্যবহার করা হয় এবং শিশুদের রোগমুক্তির আশায় তাদের চোখ-মুখ ধোয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। মাঘ মাসের ১৭-১৮ তারিখে এখানে বড় উৎসব হয়, যেখানে বহু ভক্ত সমবেত হন। ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে সম্প্রীতির এক মহামিলন কেন্দ্র হিসেবে যবগ্রামের এই পঞ্চানন ঠাকুরের আটন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৯]

বর্ধমান জেলার ভাতার থানার এরুয়া গ্রামে, মবু শেখের বাড়িতে ধর্মরাজ ঠাকুরের আটন রয়েছে। এই ধর্মরাজ ঠাকুরকে 'পঞ্চানন' নামেও ডাকা হয়। অতীতে তিনি তিন সের চাল ও দুধ দিয়ে পূজিত হতেন এবং বৈশাখী পূর্ণিমায় মহাগাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হতো। এই গাজনে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলে অংশ নিতেন এবং একে অপরকে সহযোগিতা করতেন। বর্তমানে গাজন বন্ধ হয়ে গেলেও, অনেক হিন্দু ভক্ত এখনও এখানে পূজা দিতে আসেন, এবং মুসলমানরাও তাঁদের সহায়তা করেন। তাই অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাঁকুড়ার মন্দির গ্রন্থে বলেছেন–

> "অতি নিম্নবর্ণের আদিবাসী থেকে অতি উচ্চ বর্ণের হিন্দু ছাড়াও, কোন কোন স্থানে মুসলমান সম্প্রদায় অবধি ধর্মরাজের পূজা করে থাকেন।"[২০]

ঠাকুরটি এখন বাড়ির একটি ঘরের কোণে, বানের আড়ালে রাখা আছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর থানার সাবাজপুর গ্রামে এক মুসলিম পরিবারের বাড়িতে ধর্মরাজ ঠাকুরের (স্থানীয়ভাবে 'ধর্ম পির') আটন রয়েছে। এই ধর্মরাজ ঠাকুরের কোনো মূর্তি নেই, তবে বাড়ির উঠানের এক কোণে লাল ও কালো পোড়ামাটির ঘোড়া রাখা আছে, যা দেবতার প্রতীক হিসেবে পূজিত হয়। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে ভক্তরা দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি এবং নানা সমস্যার সমাধানের জন্য এখানে মানত করেন। ধর্মরাজ পূজা সাধারণত বুদ্ধ পূর্ণিমার দিনে অনুষ্ঠিত হয়, তবে তার আগে থেকেই ভক্তরা উপবাস করেন। হিন্দু ভক্তরা বেলপাতা ও ফুল দিয়ে পূজা করেন, আর মুসলিম ভক্তরা 'ধর্মপির'র নামে শিরনি ও বাতাসা দিয়ে মানসিক পালন করেন। এই ধর্মরাজ বা ধর্মপির পূজায় দুই সম্প্রদায়ের মানুষের একাত্মতা স্পষ্ট, যেখানে একসঙ্গে উপবাস, পূজা এবং ভক্তি প্রকাশ করা হয়। এটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন, যেখানে ধর্ম-বর্ণের ব্যবধান ভুলে মানুষ একসঙ্গে প্রার্থনা করেন।[২১]

কাটোয়া থানার শ্রীবাটি গ্রাম, যেখানে হিন্দুদের সংখ্যা বেশি, এবং সংলগ্ন নতুনগ্রাম, যেখানে মুসলিমদের আধিক্য রয়েছে— এই দুই গ্রাম প্রাকৃতিক শস্য-শ্যামল পরিবেশে অবস্থিত। শ্রীবাটি গ্রামে একটি প্রাচীন কালো পাথরের শিবলিঙ্গ আছে, যা হিন্দুরা শিবের প্রতীক বলে মানেন, আর মুসলিমরা একে বুড়োরাজ বা বুড়োপির হিসেবে পূজা করেন। চৈত্র মাসের নির্দিষ্ট একদিন শিবকে পালকিতে করে গঙ্গাস্নানে নিয়ে যাওয়া হয়, শিবভক্ত জল সন্ন্যাসীদের সাথে। নতুনগ্রামের মুসলিম সম্প্রদায় এই উৎসবের অংশ হিসেবে একটি খামারবাড়ি পরিষ্কার করে রাখেন, যেখানে পালকি বিশ্রাম নেয়। পালকি এলে নতুনগ্রামের মুসলিম মেয়েরা অর্ঘ্য হিসেবে ফল, দুধ ও মিঠাই নিবেদন করেন এবং তাঁদের মানত শোধ করেন। এরপর শিবকে ঘিরে মেলা বসে, যার প্রধান দায়িত্ব পালন করেন মুসলমানরা। মেলায় শিবকে উদ্দেশ্য করে ভোগ রান্না করা হয় (যাতে বাতাসা, দুধ ও আতপ চাল থাকে), যা হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সবাই গ্রহণ করেন। যদিও শিবের পালকি সেখানে বেশিক্ষণ থাকে না, তবু সেই সময়ের মধ্যেই স্থানটি ধর্মীয় সহাবস্থান ও সম্প্রীতির এক মহাতীর্থ হয়ে ওঠে।[২২]

পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত জামালপুর গ্রামে অবস্থিত বুড়োরাজ ঠাকুরের মন্দির হিন্দু-মুসলিম মিলনের এক অনন্য প্রতীক। বুড়োরাজকে স্থানীয় লৌকিক দেবতা হিসেবে পূজা করা হয়। গবেষকদের মতে, শিব ও ধর্মরাজের মিলিত প্রভাবেই এই দেবতার উদ্ভব হয়েছে। হিন্দুরা তাঁকে বুড়োরাজ নামে ডাকেন, আর মুসলমানরা তাঁকে জামালউদ্দিন পির বলে সম্মান করেন। জামালপুরের কাছাকাছি নিমদহ গ্রামে একটি মুসলিম পরিবার থেকে বুড়োরাজের পুজোর জন্য বাঁশের নতুন মই তৈরি করা হয়। এই মইতে সাজানো অর্ঘ্য প্রথমে জামালউদ্দিন পিরের কাছে নিবেদন করা হয়, তারপর অন্য ভক্তরা তাঁদের অর্ঘ্য দেন। বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় এবং মানত করার জন্য মানুষ এখানে আসেন। ভক্তদের বিশ্বাস, এই দরবারে মানত করলে বোবা কথা বলতে পারে, অন্ধ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়, দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময় হয় এবং নিঃসন্তানরা সন্তান লাভ করেন। বৈশাখী

পূর্ণিমায় এখানে বুড়োরাজের গাজন অনুষ্ঠিত হয়,[২৩] যেখানে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলে অংশগ্রহণ করেন। গাজনের সময় বিশাল মেলা বসে, যা বর্ধমান, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, উত্তর ২৪ পরগনা থেকে ব্যবসায়ীদের আকর্ষণ করে। মেলা বৈশাখী পূর্ণিমা থেকে শুরু হয়ে দু'দিন ধরে চলে। এই কাহিনী ধর্মীয় সহাবস্থান ও সামাজিক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, যেখানে বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রে এক দেবতাকে শ্রদ্ধা জানায় এবং তাঁর কাছে মানত করেন।

এই বুড়োরাজ-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মন্তেশ্বর ব্লকের পিপলন মৌজার ইচু ভাগড়া গ্রামে এক সমন্বয়ী পূজার দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায়। প্রধানত এই স্থানে মুসলিম হিন্দু পাশাপাশি বসবাস করে। এখানে মুসলিম বসতির পাশে একটি শ্রী শ্রী বুড়োরাজ জিউ নামক একটি মন্দির আছে। এই মন্দিরে পূজারী পিপলন গ্রামের ব্রাহ্মণ হলেও পুজো করার পূর্বে মুসলিমরা ফলমূল দিয়ে পুজোর বন্দোবস্ত করেন। মুসলমানদের দেওয়া অর্ঘ্যে পুজো সম্পূর্ণ হওয়ার পর হিন্দুরা পুজো দেন। শুধু তাই নয় এই পুজোর সময় আশেপাশের হিন্দু মুসলিম বাড়িতে চুলো জ্বালানো নিষেধ। পুজো সম্পন্ন হওয়ার পর তারা রান্না করে খাওয়া দাওয়া করেন। তাদের বিশ্বাস এইকাজে বুড়োরাজ খুশি হন। কোন শুভ কাজ শুরু করা, বিবাহের বন্দোবস্ত করা প্রভৃতি কাজে বুড়োরাজকে তারা স্মরণ করে। পুজো নিত্যদিন হলেও প্রধান পুজো হয় মাঘ পূর্ণিমা ও বুদ্ধ পূর্ণিমার দিনে অর্থাৎ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাস নাগাদ।[২৪]

বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত কুন্দা গ্রামে অবস্থিত কুন্দাক্ষী দেবী ধর্মীয় সহাবস্থানের একটি চমৎকার উদাহরণ। মনে করা হয়, সেন আমলে যখন বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়, তখনই এই মন্দিরটিরও নির্মাণ হয়। স্থানীয় কিংবদন্তি অনুসারে, কুন্দাক্ষী দেবীকে মনসার রূপ হিসেবে পূজা করা হয়। গ্রামে আলাদাভাবে মনসার পূজা না করে কুন্দাক্ষীকেই মনসা দেবীর প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করা হয়। এই দেবীর পূজার সাথে একটি অনন্য হিন্দু-মুসলিম মিলন সংস্কৃতির সম্পর্ক রয়েছে। আগে গ্রামের একটি বিশেষ মুসলিম পরিবার থেকে দেবীর পূজার জন্য অর্ঘ্য ও একটি ছাগল দেওয়া হতো। এই অর্ঘ্য আসার পর পুরোহিত সেই মুসলিম ব্যক্তির কপালে চন্দনের ফোঁটা লাগিয়ে তাকে সম্মান জানাতেন, তারপর পূজা শুরু হতো। নাগ পঞ্চমীতে বিশেষভাবে দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়, এবং ভক্তরা বিশ্বাস করেন যে কুন্দাক্ষী দেবী অত্যন্ত জাগ্রত। বিপদ-আপদে কিংবা শুভ কাজের আগে গ্রামবাসীরা তাঁর কাছে মানত করেন। এই ঘটনাগুলো ধর্মীয় সম্প্রীতির উজ্জ্বল উদাহরণ, যা গ্রামবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ঐক্যের পরিচয় বহন করে।[২৫]

বর্ধমান জেলার সদর থানার অন্তর্গত কৃষ্ণপুর গ্রামের ধর্মীয় সম্প্রীতির একটি সুন্দর উদাহরণ তুলে ধরে। গ্রামটিতে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের বসবাস থাকলেও তাদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, গ্রামের মুসলিম পাড়ার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত শিবের আটন (একটি পাথরের শিবলিঙ্গ), যা মুসলমানরা সযত্নে রক্ষা করে। তারা নিশ্চিত করেন যে এটি কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। যদিও নিত্য পূজা হয় না, তবে বছরে একবার শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকেরাও সমানভাবে অংশ নেন এবং হিন্দুদের সহায়তা করেন। এই বিবরণটি ধর্মীয় সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল নিদর্শন হিসেবে উঠে আসে, যেখানে ভিন্ন ধর্মের মানুষ পরস্পরের সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং সৌভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রেখে বসবাস করেন।[২৬] সুতরাং হিন্দু বাড়িতে পিরের ধান মুসলিম বাড়িতে হিন্দু দেবদেবীর আটন থেকে প্রমাণিত হয় হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি অতীতেও ছিল আজও রয়েছে।

পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার অন্তর্গত কান্দরা গ্রামে দক্ষিণ পাড়ায় হিন্দু মুসলমান'র আর এক লৌকিক পিরের সন্ধান পাওয়া যায়। যার লোকনাম জগন্নাথ পির। এই পিরের মূর্তিতে হাত-পা কাটা বা ভাঙা, আরাধনা করেন মুসলমান পরিবার। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে এই পিরের পুজো দেন। গ্রাম রক্ষার দেবতা হিসাবে তিনি পূজিত হন। জগন্নাথ পির শুধু গ্রামরক্ষক দেবতা নন, তিনি শিশু রক্ষক দেবতা হিসাবে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে পূজিত।[২৭] বর্ধমান, হুগলি, বীরভূম প্রভৃতি জেলার অসংখ্য নবদম্পতিরা এই পিরসাহেবের কাছে আসেন। সন্তান পাবার জন্য মানত করেন। পিরের আস্তানায় হত্যে দিয়ে শিরনি প্রসাদ গ্রহণ করে। সন্তান হলে দম্পতিরা শিশুটিকে নিয়ে পিরের কাছে এসে মাথা কামিয়ে নেন এবং শিশুটির কেশগুচ্ছ জগন্নাথ পিরকে উৎসর্গ করেন। গ্রামের একটি ছোট্ট ঘরে কাঠের সিংহাসনে রয়েছে জগন্নাথ পির। গায়ে কাপড় জড়ানো, গলায় মুসলমানি তাবিজ। পাশে রয়েছে বড়ো বড়ো দুটি মাটির ঘোড়া ও নাড়ুগোপালের মূর্তি। আস্তানার পাশের ঘরে রয়েছে জাহের খাদিমের কবর। জগন্নাথ পিরের নিত্য পুজো হয় হিন্দু মুসলমান ধর্মের নিয়ম মেনে। শারদীয়া নবমী তিথিতে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে পিরপুকুর থেকে ঘট ভরে আনা হয়। সেই ঘট পেতে হয় পুজো। শিরনি হিসাবে দেওয়া হয় ফল-মূল মিষ্টান্ন। গ্রামবাসীরা ভক্তিভরে পুজো দেন। প্রতি বছর মাঘ মাসের ২৬ তারিখে পিরের বাৎসরিক উৎসব হয়। সকলকে খাওয়ানো হয় খিচুড়ি। এদিন শোনা যায় ফকিরি গান, কাওয়ালি, সত্যপিরের পালাগান প্রভৃতি। জগন্নাথ পিরের আস্তানায় যিনি খাদিমের দায়িত্ব পালন করেন তিনি হলেন টিটো, তার প্রকৃত নাম শাহ আলম। তাঁর মুখ থেকে জগন্নাথ পিরের ইতিহাস জানা যায়। বহু বছর আগে শাহ আলমের এক পূর্বপুরুষ ইশা বা মুসা অযোধ্যায় ভ্রমণ করার সময় একটি ধাতব জগন্নাথ মূর্তি কুড়িয়ে পান। তিনি যত্ন সহকারে বাড়িতে মূর্তিটাকে প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমানের বাড়িতে জগন্নাথের মূর্তি দেখে প্রতিবেশীরা নানা কথা শোনাতে লাগলেন। কারণ ইসলাম ধর্মে মূর্তিপুজো নিষিদ্ধ। প্রতিবেশীরা একদিন মূর্তিটাকে নিকটবর্তী এক পুকুরে ফেলে দেয়। ফেলে দেওয়ার কিছুদিন পর থেকে শুরু হয় দৈব-দুর্বিপাক। এইদিকে সুফি আদর্শে বিশ্বাসী ইশা বা মুসা জগন্নাথকে না পেয়ে খুব কষ্ট পান। দৈব-দুর্বিপাকে খুব ভয় পেয়ে যান প্রতিবেশীরা। তাঁরা ক্রমশ বুঝতে পারল- ঐ মূর্তি জলে ফেলে দেওয়ার জন্যই এমন অবস্থা তাদের। শেষে ডোবা থেকে যখন মূর্তিটি তোলা হল তখন প্রতিবেশীরা দেখলেন এ ধাতব মূর্তি নয়। হাত-পা ভাঙা কালো রঙের বিগ্রহ। অর্থাৎ ঠুঁটো জগন্নাথ। মাথায় সামান্য পাগড়ির মত। উচ্চতা দশ ইঞ্চি। পুনরায় জগন্নাথ পিরকে পুজোর জন্য প্রতিষ্ঠা করেন।[২৮] সেই থেকেই মুসলমানদের কাছে পরিচিত হলেন বুড়োরাজ বা বুড়োপির আর হিন্দুদের কাছে জগন্নাথ পির। নাম যায় হোক বর্তমান সময়ে এই জগন্নাথ পির লৌকিক পির হিসাবে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কাছে সম্প্রীতির বার্তা বহন করে আসছে।

তথ্যসূত্র:

১. Uddin, Sufi. Beyond National Borders and Religious Boundaries: Muslim and Hindu Veneration of Bonbibi. (Mathew N. Schmalz and Peter Gottschalk ed.) Engaging South Asian Religions: Boundaries, Appropriations, and Resistances, State University of New York Press, New York, 2011, pp. 61-82.

২. বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ। বাংলার লৌকিক দেবতা। কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, দেজ পাবলিশিং, এপ্রিল ১৯৭৮, পৃ. ১৯৩।

৩. ঠাকুর, স্বপনকুমার। রাঢ় কথা মননে সমীক্ষণে। নান্দনিক প্রকাশনী, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, এপ্রিল ২০১৭, পৃ. ৯৬-৯৭।

৪. L.S.S., O'Malley. Bengal District Gazetteers. Murshidabad, The Bengal Secretariat Book Dept., Calcutta, 1914, pp. 210-211.

৫. ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ। হুগলী জেলার পুরাকীর্তি। প্রত্নতত্ত্ব অধিকার, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, আগস্ট ১৯৯৩, পৃ. ৭৫।

৬. ভট্টাচার্য, চন্দ্রশেখর। মুসলমানের দুর্গাপুজো। জনস্বার্থ প্রকাশন, কলকাতা, বইমেলা ২০২৪, পৃ. ৪৭–৫০।
৭. ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ। হুগলী জেলার পুরাকীর্তি। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।
৮. নিজস্ব ক্ষেত্র সমীক্ষা, সহায়তা- বাবলু মন্ডল ও শিশির মন্ডল, কলাছরা পল্লি, চন্ডিতলা, হুগলি।
৯. ভট্টাচার্য, প্রদ্যোৎ। বঙ্গে সুফি প্রভাব ও সুফি তত্ত্বের ক্রমবিকাশ। রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০১৮, পৃ. ২১৭।
১০. নিজস্ব ক্ষেত্র সমীক্ষা, বালাইচাঁদ চক্রবর্তী ও উমেশ মালিক, খাজুটিপাড়া, নানুর, বীরভূম।
১১. (বীরভূমের মহম্মদ বাজারের ভাঁড়কাটা গ্রামে মুসলমানদের উদ্যোগে কালীপূজা),
https://www.anandabazar.com/amp/west-bengal/purulia-birbhum-bankuraতাং ৮/১১/২০১৫.
১২. নিজস্ব ক্ষেত্র সমীক্ষা, রাসু দাস ও কাসেম মল্লিক, বড়ুয়া, মুর্শিদাবাদ।
১৩. তথ্য দানে সহায়তা করেছেন সেবায়ত খোকন বিশ্বাস।
১৪. ক্ষেত্র সমীক্ষায় সাহায্য করেছেন বসির সেখ, মামনি হালদার ও অন্যান্য, মুনুটিয়া- নওপুকুরিয়া- কাটাইকোনা, বেলডাঙ্গা-২ ব্লক, মুর্শিদাবাদ।
১৫. নিজস্ব ক্ষেত্র সমীক্ষা, সহায়তা করেছেন কিলটন মল্লিক, দ্রষ্টব্য; Anandabazar Patrika, "মুসলিম পরিবারে তৈরি হওয়া ঘি ছাড়া 'অভুক্ত' থাকেন সিদ্ধেশ্বর", Purulia-Birbhum-Bankura বিভাগ, ৭ মে ২০২২।
১৬. Banerjee, Subhas Chandra. Folk Religion of Bengal. Firma KLM Pvt. Ltd., Calcutta, 1969, p Pp. 175–190.
১৭. নিজস্ব ক্ষেত্র সমীক্ষা, দ্রষ্টব্য
১৮. সেখ, মো: আফরুক। রাঢ় বাংলার লৌকিক দেবদেবী। পুস্তক বিপণী, জানুয়ারি ২০২১, কলকাতা, পৃ. ৪৬-৫০।
১৯. তদেব, পৃ. ৫৬–৬০।
২০. বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয়কুমার। বাঁকুড়ার মন্দির। সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৩৭১, পৃ. ৪৭।
২১. নিজস্ব ক্ষেত্র সমীক্ষা, সহায়তা করেছেন সৈয়দ আতাউর রহমান, বড়পলাশন, মেমারি, পূর্ব বর্ধমান।
২২. নিজস্ব ক্ষেত্র সমীক্ষা। সহায়তা করেছেন রিপন শেখ ও স্বপন কুমার ঠাকুর, শ্রীবাটি, কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান।
২৩. কামিল্যা, মিহির চৌধূরী। বর্ধমান জেলার লোকসংস্কৃতি। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, ১ ফেব্রু. ২০০৯, পৃ. ৭০।
২৪. ক্ষেত্র সমীক্ষায় সাহায্য করেছেন পূজারি কানাইলাল চক্রবর্তী ও নিতাইচাঁদ চক্রবর্তী, জোৎস্না খাতুন, রহিমা বেগম, ইচু ভাগড়া, মন্তেশ্বর, পূর্ব বর্ধমান।
২৫. তথ্যদানে সহায়তা করেছেন মোহাম্মদ আইয়ূব হোসেন, রাজুয়া, কাটোয়া, বর্ধমান।
২৬. সেখ, মো: আফরুক। রাঢ় বাংলার লৌকিক দেবদেবী। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭-৬৮।
২৭. নিজস্ব ক্ষেত্র সমীক্ষায় সংগ্রহ, দ্রষ্টব্য: সেখ, মো: আফরুক, রাঢ় বাংলার লৌকিক দেবদেবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮- ৬৯।
২৮. ঠাকুর, স্বপন কুমার: রাঢ় কথা মননে সমীক্ষণে, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1226-1243
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.343

একুশ শতকের জন্মলগ্ন থেকে বাংলা চলচ্চিত্রে বাংলা কবিতারা

মৌপিয়া মুখার্জী, *স্বাধীন গবেষক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 16.03.2026; Accepted: 18.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The topic of the essay is 'Bengali Poetries in Bengali Cinema since the birth of the 21st Century'. Generally, different types of songs are used to create the ambience of scenes in cinema. But the use of poetry to create the mood and sense of the background is really interesting! Here, words, verse, meter, and the significance are the determinants of the whole scene. It's not at all a 'common' thing to use poetry in Bengali cinema. But some directors have made use of Bengali poems for this purpose and created a magic indeed! Here, the most important factor is Imagery. Both in Cinema and Poetry, the focus of perception is the ability to think and feel, the magic of thought and language in poetry, and of sight and sound in film. Incessantly, there is poetry in film, film in poetry, or altogether with an indescribable feeling. Twenty-one Bengali films where Bengali poetries have been used in a stunning way, are discussed in this essay. When a camera is placed in place of a pen, poetry becomes a moving art. Symbols are created through a scene in a film. A scene of the film becomes a word of the poem, the 'sequence' is its foot, and the 'cut' is like various punctuation marks. The world is a collection of dynamic images. It is an endless film itself. As Shakespeare said, life is a moving stage. The language of any poem needs to have explanatory quality, image quality, and film quality. When the feeling of motion and mystical perception of poetry is combined with the atmosphere of the film, a mental relief is created. Sometimes movies become poetic, and poetry sometimes becomes cinematic also. In this essay, it is discussed how the poetries have been used in films, whether they have been treated properly or not, what the impact of those poems is, whether there is any limitation to use poetries in each type of film, and above all, the importance of making such poetic films is the primary outline of the essay.

Keywords: Poetry, Bengali, Cinema, Ambience, Imagery, Scene, Significance, Language, director, verse

সাধারণত চলচ্চিত্রের আবহে মিশে যায় গানের কথা ও সুর। কিন্তু, বেশ কিছু চলচ্চিত্রে দৃশ্যটির যাবতীয় না-বলা সবকিছুকে জাপটে ধরে কয়েকটা শব্দ...পরপর...কবিতার আলতো হাত আগলে রাখে সমস্ত অনুভূতি। দৃশ্যের আবহ নির্মাণ করে দেয় কয়েকটা শব্দ, ছন্দ। চলচ্চিত্রে একটি দৃশ্যের মাধ্যমেই প্রতীক নির্মিত হয়। চলচ্চিত্রের এক একটা দৃশ্য যেন হয়ে ওঠে কবিতার এক একটি শব্দ, সিনেমার 'সিকোয়েন্স' তার চরণ আর 'কাট' হল নানা যতিচিহ্ন। কখনও চলচ্চিত্র হয়ে ওঠে কবিতাময়, কবিতাও কখনও চলচ্চিত্রময়। কবির অভিপ্রায়ের ব্যাঞ্জনায় শব্দ যেন গতিশীল হল মুদ্রনযন্ত্রের কৌশলে। "সে মিলিয়ে যায়"-এই বাক্যটিকে যদি

বর্ণের ক্রমশ বড় থেকে ছোট মাপে লেখা যায় বিশেষ কৌশলে, সেটা দেখেও মনে হবে যেন 'সে' মিলিয়ে যাচ্ছে। নির্বাক যুগের কোনো কোনো চলচ্চিত্রকেও ভোলা যায় না। কিন্তু, ধ্বনি চলচ্চিত্রে প্রাণ আনে। ভারতীয় সিনেমার আচার্য, চলচ্চিত্রকার দেবকী কুমার বসু তাঁর 'অর্ঘ্য' ছবিটিতে (১৯৬১ সালে) রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের 'পূজারিণী', 'দুই বিঘা জমি', 'অভিসার' এবং 'পুরাতন ভৃত্য'- এই চারটি কবিতার চলচ্চিত্র রূপ দেন। বাংলা কবিতা থেকে অন্যান্য ভাষাতেও চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। যেমন- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দুই বিঘা জমি' কবিতা অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে বিমল রায় পরিচালিত হিন্দি চলচ্চিত্র 'দো বিঘা জমিন'। তবে সিনেমার বহু দৃশ্যেও আবহে জুড়ে দেওয়া হয় কবিতা। শব্দপ্রয়োগ, ভাষার কৌশল, অনুভবের প্রকাশভঙ্গি অসাধারণ দৃশ্যগত ইমেজ তৈরি করে। চলচ্চিত্র ও কবিতা, দুই ক্ষেত্রেই উপলব্ধির মূল জায়গা হল মনন-চেতন ও অনুভব করার ক্ষমতা। কবিতার ক্ষেত্রে ভাব ও ভাষার জাদু এবং চলচ্চিত্রে দৃশ্য ও শব্দের। অনবরত চলতে থাকে চলচ্চিত্রে কবিতা, কবিতায় চলচ্চিত্র কিংবা সবমিলিয়ে এক অবর্ণনীয় অনুভব। অনেকসময় বলা হয়, "দৃশ্যটা ঠিক কবিতার মতন!"... তবে কবিতা নিজেও নির্মাণ করে দৃশ্য, যা ঠিক জীবনের মতন!

একুশ শতকের জন্মলগ্ন থেকে কয়েকটি বাংলা চলচ্চিত্র ও বাংলা কবিতার মেলবন্ধন:

অসুখ (১৯৯৯):

ঋতুপর্ণ ঘোষের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি 'অসুখ'।

পরিচালক বলেছিলেন, 'অসুখ' সিনেমাটি তিনি তৈরি করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'হারিয়ে যাওয়া' কবিতাটি অবলম্বনে। প্রতারক প্রেমিক(অভিনয়ে-শিলাজিৎ মজুমদার), অসুস্থ মা ও বয়সভারে শ্রান্ত বাবা-এই তিনজনের মধ্যে দাঁড়িয়ে একটি একা মেয়ে কাঁধে অনেকখানি দায়িত্বভার নিয়ে কীভাবে সকলের চোখের আড়ালে হারিয়ে যায় ক্রমশ, তার অন্যতম নিদর্শন 'অসুখ'। মেয়েকে ডানার মতন নিবিড় যত্নে আগলে রাখতে চাওয়া বাবা বুঝতে পারেন, মেয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে রোজ রাতে ঘুমের ওষুধ খায়! এই দৃশ্যে আবহ নির্মাণ করল 'হারিয়ে যাওয়া' কবিতাটি-

"...নিবত যদি আলো, যদি হঠাৎ যেত থামি,
আকাশ ভরে উঠত কেঁদে,
'হারিয়ে গেছি আমি!'..."
(অপর্ণা সেনের কণ্ঠে)

- "কী হয়েছে বামী?"র উচ্চারণে যেন বাবা-মা মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। সেই মিলিত উদ্বেগ স্নেহশীল চারটে হাত বাড়িয়ে যেন বলছে, "মনে হল আকাশ-পানে চেয়ে/ আমার বামীর মতোই যেন অমনি কে এক মেয়ে।" প্রেমিকের চলে যাওয়ার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কান্নায় ভেঙে পড়া রুনুর হয়ে আবহ বলছে,

"ওগো মা,
রাজার দুলাল যাবে আজি মোর
ঘরের সমুখপথে,..."
('শুভক্ষণ', 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর')

রুনু জানে মনে মনে, "ফেলিতে নিমেষ দেখা হবে শেষ, যাবে সে সুদূরপুরে...", রুনু আর ফিরে পাবে না অনিরুদ্ধকে! অসহনীয় যৌবন ভেঙেচুরে মায়ের সঙ্গে শৈশবের সঞ্চয়িতাতেই ফিরে যেতে ইচ্ছে করে রুনুর। মা বলেন, "তোর হোরিখেলার ঐ জায়গাটা মনে আছে?"...মা-মেয়ে একসঙ্গে বলতে থাকে-

"ফাগুন মাসে দখিন হতে হাওয়া
বকুলবনে মাতাল হয়ে এল।

বোল ধরেছে আম্রবনে- বনে,
ভ্রমরগুলো কে কার কথা শোনে-..."
('হোরিখেলা', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

মা বলেন, "সঞ্চয়িতা পড়ে তোকে কত ঘুম পাড়িয়েছি ছোটবেলায়। তুই হঠাৎ ঘুমের ওষুধ ধরলি কেন রে!" আবহ জুড়ে বেজে ওঠে রবীন্দ্রনাথের 'খেলাভোলা' কবিতাটি।

"... খেলাভোলার দিন মা আমার আসে মাঝেমাঝে..."
(কণ্ঠে- দেবশ্রী রায়, অপর্ণা সেন)

চোখের লেন্সটা খুলে রাখার সময় রুনু কোনোমতে আটকে নেয় অশ্রু। যাবতীয় গৃহস্থালী সামলায় সে। অথচ, এ অবস্থায় তার মনে যা ধ্বনিত হওয়াই স্বাভাবিক অনবরত, তাই শোনা যায় আবহে, রবীন্দ্রনাথের 'অসম্ভব' কবিতাটি-

"...শুনিতে পেলেম সেতারে বাজিছে সুরের দান
অশ্রুজলের আভাসে জড়িত আমারি গান।
কবিরে ত্যজিয়া রেখেছ কবির এ গৌরব—
মন শুধু বলে, অসম্ভব এ অসম্ভব।।"

কবিতার সহায়তা ছাড়া হৃদয়ের অতলের এই অসীম যন্ত্রণাকে ছোঁয়ার সাধ্য অন্তত এই অ-সুখের জন্য আর কিছুর নেই!

পারমিতার একদিন (২০০০):

অপর্ণা সেন পরিচালিত এই সিনেমাটি পারমিতার (অভিনয়ে- ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত) একটি মিথ্যে বিবাহিত জীবনের তথাকথিত 'সংসার'এর কাহিনি। কিন্তু এই অজানা জীবনে পারমিতার একমাত্র নিশ্চিন্ত আশ্রয় তার শাশুড়ি-মা সনকা (অভিনয়ে-অপর্ণা সেন)। পারমিতা লুকিয়ে কবিতা লেখে, সনকা ধরে ফেলে। পারমিতাকে শোনাতে বলে কবিতাটা। প্রথমে একটু লজ্জা পায় পারমিতা। সনকা অভিমানী স্বরে প্রমাণ করতে চায় যে সে-ও একসময় কবিতা পড়ত! অভিমানী সনকা প্রবল উৎসাহে মুখস্থ বলতে শুরু করে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত 'দূরের পাল্লা' কবিতাটি-

"ছিপখান তিন-দাঁড় -
তিনজন মাল্লা
চৌপর দিন-ভোর
দেয় দূর-পাল্লা!..."

কবিতাটার ছন্দের গতিশীলতা ও অপর্ণা সেনের বলার ভঙ্গি দৃশ্যটিকে অন্য এক মাত্রা দান করে। সনকা যেন এই ছন্দের হাত ধরেই ফিরে যেতে থাকে তার শৈশবে। এরপর পারমিতা তার লেখা কবিতাটা সনকাকে শোনায়। কবিতাটার নাম 'আত্মজ' (সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায় রচিত)।

"দীর্ঘ, বড় দীর্ঘ ছিলো শীত,
রুক্ষ, বড়ো রুক্ষ ছিলো পথ-ও,
তবুও তোকে আনতে গিয়ে একা,
সয়েছি বুকে রক্তঝরা ক্ষত।..."

এই কবিতাটা পারমিতার সম্পূর্ণ জীবনচিত্র। তার একমাত্র ছেলে শারীরিকভাবে অস্বাভাবিক, হাঁটাচলা করতে পারে না, কথা বলতে পারে না। সেই ছোট্ট মনের অসহায়তা নিয়ে লড়াই পারমিতার একার। আবার কোথাও যেন কবিতাটা মানসিক ভারসাম্যহীন সকলের 'বোঝা' মেয়ের মা সনকারও!

এক যে আছে কন্যা (২০০১):

সুব্রত সেন পরিচালিত এই সিনেমাটি অঞ্জন-রূপার (অভিনয়ে- যথাক্রমে সব্যসাচী চক্রবর্তী ও দেবশ্রী রায়) দীর্ঘকালীন সম্পর্কের মাঝে আচমকা এসে পড়া মানসিক ভারসাম্যহীন রিয়ার (অভিনয়ে-কঙ্কনা সেন শর্মা) নানা কার্যকলাপের গল্প। রিয়াদের বাড়িতে ভাড়া থাকতে শুরু করে অঞ্জন। রিয়া আকৃষ্ট হয় তার প্রতি। রূপাকে অসহ্য মনে হতে থাকে রিয়ার। অঞ্জন-রূপার একান্ত আলাপের ঘনিষ্ঠতা তুলে ধরে অঞ্জনের বলা একটা কবিতা-

"আসলে কেউ বড় হয়না, বড়র মতো দেখায়,
নকলে আর আসলে তাকে বড়র মতো দেখায়,
গাছের কাছে গিয়ে দাঁড়াও, দেখবে কত ছোট..."
(শক্তি চট্টোপাধ্যায় রচিত কবিতা- 'বিরহে যদি দাঁড়িয়ে ওঠো')

রূপা ও অঞ্জনের ভালোবাসার বারবার বজ্রপাতে রূপাকে আশ্বস্ত করে অঞ্জন বলে যায়-

"আমার ভালোবাসার কোনো জন্ম হয়না
মৃত্যু হয়না-
কেননা আমি অন্যরকম ভালোবাসার হীরের গয়না
শরীরে নিয়ে জন্মেছিলাম..."
(সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা 'জন্ম হয়না, মৃত্যু হয়না')

শেষপর্যন্ত অঞ্জনের ভালোবাসার কোনো জন্ম-মৃত্যু ঘটেনি। রিয়াকে যেতে হয়েছে মানসিক হাসপাতালে। অঞ্জনের 'জন্ম-কবচ' রূপাকে সঙ্গে নিয়ে অঞ্জন চলে গেছে বিবাহিত জীবনের পথে।

তিতলি (২০০২):

ঋতুপর্ণ ঘোষ পরিচালিত 'তিতলি' সিনেমায় দেখি উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি অঞ্চলের চা-বাগান গৃহিণী ঊর্মির (ঊর্মিলা চ্যাটার্জী) (অভিনয়ে-অপর্ণা সেন) রোজনামচার মাঝে হঠাৎ একদিন মুখোমুখি হওয়া ফেলে আসা প্রেমিক রোহিত রায়ের। প্রায় কুড়ি বছর ধরে চা-বাগানের কুয়াশার কারাগারে বন্দি আছে ঊর্মি। না, 'বন্দি' বলা ভুল হবে! টি-এস্টেটের ম্যানেজারের স্ত্রী ঊর্মি সুখেই আছে!

বিবাহিত ঊর্মির থেকে রোহিতের বাধ্যতামূলক সরে যাওয়ার শীতঘুম ধরা পড়ে তাদের দুজনের কথোপকথনের কয়েকটি পঙতিতেই-

"আধেকলীন-হৃদয়ে দূরগামী
ব্যথার মাঝে ঘুমিয়ে পড়ি আমি
সহসা শুনি রাতের কড়ানাড়া"

কল্পনার অধরা স্বপ্নে তাদের একসঙ্গে বসবাসের জীবনকে কী অদ্ভুতভাবে পরিচালক মিলিয়ে দিলেন রবি ঠাকুরের 'এক গাঁয়ে' কবিতায়। ঊর্মির কণ্ঠে এই চরণগুলির উচ্চারণ যেন মেঘের স্তরে স্তরে এঁকে দিতে থাকে তাদেরই না হওয়া কিংবা হতে পারা এক জীবন!

"আমরা দুজন একটি গাঁয়ে থাকি,
সেই আমাদের একটিমাত্র সুখ।"

ভালো থেকো (২০০৩):

গৌতম হালদার পরিচালিত সিনেমা 'ভালো থেকো' একটা ভালো না থাকার গল্প। আনন্দীর (অভিনয়ে-বিদ্যা বালান) প্রেম নিবিড়ভাবে যুক্ত থাকতে চায় প্রকৃতির সঙ্গে। সেই যোগসূত্র আনন্দীর প্রেমিক বাবুয়ার (অভিনয়ে-জয় সেনগুপ্ত) ধরাছোঁয়ার বাইরে। সে কবিতা বোঝে না। সে বোঝে না কেন জন্মদিনে গাছ লাগানো হয় আনন্দীদের বাড়িতে। আনন্দীর বোন ঝিনুকের (অভিনয়ে-রিমঝিম গুপ্ত) প্রেমিক দীপ (অভিনয়ে-পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়) বুঝতে পারে গাছেদের কথা। দীপ টের পায় আনন্দীর সঙ্গে গাছেদের কতরকম কথা হয়। গাছ লাগাতে লাগাতে দীপ আনন্দীর অনুরোধে হঠাৎ বলে ওঠে একটা কবিতা,

"...বৃষ্টি নামলো যখন আমি উঠোন পানে একা,
দৌড়ে গিয়ে, ভেবেছিলাম তোমার পাব দেখা..."
(শক্তি চট্টোপাধ্যায় রচিত কবিতা 'যখন বৃষ্টি নামলো')

ঝিনুক একদিন দীপের সঙ্গে প্রতারণা করে চলে যায় অন্য একজনের কাছে। আর বাবুয়া বিলেতে পড়তে গিয়ে হঠাৎ একদিন চিঠি লিখে জানায় যে সে ওখানকার এক মেয়েকে বিয়ে করেছে। বিচ্ছিন্নতায়, যন্ত্রণায়, তীব্র আঘাতে জ্বলতে থাকে পড়ে থাকা দুটো কবিতা-আনন্দী ও দীপ। একদিন বাবুয়া ফিরে আসে দেশে। আনন্দীকে বলে, "আমি তোকে মুক্তি দিতে এলাম রে বুড়ি!"

আনন্দী এগিয়ে যায় সেই গাছটার দিকে, যে গাছের সঙ্গে জুড়ে আছে দীপের কবিতা, তার নিজের অনেকদিনের জমানো কান্না। আনন্দীর দাদা বৈপ্লবিক কাজে একদিন বেরিয়ে যায়, আর ফেরেনি। দাদার জন্য এই গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে অনেক কেঁদেছে সে, বাবুয়ার জন্যেও! সেই গাছটাকে জড়িয়ে ধরে আনন্দী। সমস্ত হাসি-কান্না-মান-অভিমান-কষ্টদের জড়িয়ে সে বলে-

"ভালো থেকো ফুল, মিষ্টি বকুল, ভালো থেকো।
ভালো থেকো ধান, ভাটিয়ালি গান, ভালো থেকো..."
(হুমায়ুন আজাদের কবিতা 'ভালো থেকো')

আলো (২০০৩):

তরুণ মজুমদার পরিচালিত 'আলো' সিনেমাটি নির্মিত হয়েছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'কিন্নরদল' গল্প অবলম্বনে। সিনেমার শুরুতে কলাকুশলীদের নামগুলি যখন দৃশ্যে ভেসে যায়, তখন অপূর্ব গ্রাম্য প্রাকৃতিক দৃশ্যকে অবলম্বন করে আবহে রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা জমি' কবিতাটির নির্বাচিত অংশপাঠ অপূর্ব অনুভূতি সৃষ্টি করে।

"নমোনমো নম, সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি!
গঙ্গার তীর, স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি।..."

দৃশ্যের পর দৃশ্য জুড়ে দেখা যায় গ্রাম্য কুটির, গোয়ালঘর, অবারিত মাঠ, দিঘীর জল, কলসি কাঁখে হেঁটে যাওয়া বঙ্গের বধূদের।

দোসর (২০০৬):

ঋতুপর্ণ ঘোষ পরিচালিত এই সিনেমায় দেখা যায় কাবেরী (অভিনয়ে-কঙ্কনা সেন শর্মা) জানে তার জীবনসঙ্গী কৌশিক গেছে অফিস ট্যুরে। আচমকা আসে টেলিফোন। অ্যাকসিডেন্ট! হাসপাতালে বেশ কয়েকদিন ভর্তি থেকে অবশেষে বাড়ি ফিরে আসে কৌশিক (অভিনয়ে-প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়)। কাবেরীর সামনে উন্মোচিত হয় অন্য এক রহস্যজাল। কৌশিকের সঙ্গে দুর্ঘটনার সঙ্গী হয়ে মৃত্যু হয়েছে মিতার (অভিনয়ে-চান্দ্রেয়ী ঘোষ)।

কাবেরী বোঝে, মিতার সঙ্গে এতকালের সাহচর্য কোনো অফিস ট্যুর নয়! কৌশিকের ফোনে একটা এস.এম.এস পায় কাবেরী, সম্ভবত মিতার পাঠানো।

"তোমার ঠোঁট আমার ঠোঁট ছুঁলো
যদিও এ প্রথমবার নয়,
চুম্বন তো আগেও বহুবার
এবার ঠোঁটে মিলেছে আশ্রয়..."

সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা এই 'চুম্বন' কবিতাটি এই সিনেমার প্রতিটি ঘটনাকে যেন উন্মুক্ত করে দেখিয়ে দেয় দর্শককে। কবিতাটির প্রথম কিছুটা কৌশিক-কাবেরীর ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে কাবেরীর কণ্ঠে। বাদবাকিটা মিতার কণ্ঠে আবহ হিসেবে।

"...আসলে তুমি দীর্ঘ শাল-মূলী
সবার মাথা ছাড়িয়ে তোর বর
তোমার ঠোঁট আমার ঠোঁট ছুঁলো
আর যা কিছু-
অকিঞ্চিৎকর।"

অদ্ভুতভাবেই, কবিতাটি কাবেরী ও মিতা-উভয় কণ্ঠ মিলে সমাপ্ত করেছে। বাস্তবেও তো কাবেরী ও মিতা উভয়ের কথাই এক! তারা মিলেমিশে যায়। দিনের শেষে তারা দুজনেই নারী এবং পুরুষতন্ত্রের শিকার। ক্ষমাশীল এই নারীদের মাঝে কৌশিকের মতন 'রাজপুত্রের জয়' হয় সম্পর্কের অন্ত্যঃমিলে। বাকি যা কিছু ভুলচুক, ওঠাপড়া সবটাই তো টিকে থাকার কাছে 'অকিঞ্চিৎকর'!

যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল (২০০৭):

জয় গোস্বামীর রচনা 'যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল' অবলম্বনে, অঞ্জন দাস পরিচালিত এই সিনেমায় রাধার ধরা দেওয়া হয়নি অরণির (অভিনয়ে-জয় সেনগুপ্ত) কবিতার পঙতিতে। রাধার (অভিনয়ে-ইন্দ্রানী হালদার) বিয়ে হয়ে যায় অন্যত্র। সেখানে রাধা 'বাধ্য গৃহবধূ' এবং 'স্বামীর ভোগ্যবস্তু' ছাড়া আর কিছুই নয়। একদিন বাড়িতে রাধা একা। মুষলধারে বৃষ্টি নামল বাইরে। মেঘের গর্জনে ছাদের একপাশে বসে রাধা পড়তে লাগল অরণির সেই কবিতাগুলো, অরণি নিজের হাতে লিখে একটা মেঘলা দিনে রাধাকে দিয়েছিল। প্রাকৃতিক মেঘাচ্ছন্নতা ও রাধার জীবনের বৃষ্টিধারায় সেই কবিতা অনায়াসেই রাধাকে নিয়ে গেল অরণির স্মৃতিপথে। কবিতাটা পড়তে পড়তে রাধা তখন বর্তমানের কেউ নয়, সে কেবল অরণির সেই 'মেঘবালিকা'!

"আমি যখন ছোট ছিলাম
খেলতে যেতাম মেঘের দলে
একদিন এক মেঘবালিকা
প্রশ্ন করল কৌতুহলে
'এই ছেলেটা নাম কি রে তোর?'
আমি বললাম, 'ফুসমন্তর!'..."
(জয় গোস্বামী রচিত 'মেঘবালিকার জন্য রূপকথা' কবিতা)

এই কবিতার আবহে দেখানো হয়েছে অরণিকে, রাধাকে...দুজনেই বৃষ্টিতে ভিজে একাকার, বিচ্ছিন্নভাবে! আকাশ কালো করে তারা ভিজছে...পুড়ছে দুটো ভগ্ন হৃদয়!

অরণির যখন বেশ নামডাক হয়েছে, একদিন এক পাঠককে কবি অরণি একটা পাতায় লিখে দিয়েছিল-

"অতল, তোমার সাক্ষাৎ পেয়ে চিনতে পারিনি বলে
হৃদি ভেসে গেল অলকানন্দা জলে..."
(জয় গোস্বামী রচিত– 'হৃদি ভেসে যায় অলকানন্দা জলে')

সেই পাঠক, সেই নারী কবির 'ডুবে মরা'কে জুড়ে নিয়েছিল নিজের নারীত্বের অতলতায়। অরণি তাকে আরও একটা কবিতা দিয়েছে, দু-লাইন পড়ে শোনায় সে, এলোমেলো।

মূল কবিতাটি-

"এতদিন জলে আছি। আজ দিন আগুনে কাটুক।..."
(জয় গোস্বামী রচিত কবিতা '২০শে নভেম্বর, সকাল')

অরণি তখন রীতিমতন এক কবি! তার কবিতাপাঠের সভা হয়- 'অরণির সঙ্গে এক সন্ধ্যা'। সেই কবিতায় অরণি পাঠ করে তার লেখা কবিতা-

"ফিরে এলাম সরল পথ অতিক্রম করে
যত এগোই লতার পরে লতা
পায়ের গোছ আঁকড়ে ধরে-ছাড়াতে গিয়ে দেখি
হীরেমানিক জ্বালানো জটিলতা।
...
হীরেমানিক-বোনের পাশে ভাই।"
(জয় গোস্বামী রচিত কবিতা 'রূপকথা')

এই কবিতায় হয়ত বা উঠে এসেছে অরণির প্রেম-বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ দিদির কথা!

জয় গোস্বামীর উপরিউক্ত কাব্যগ্রন্থেই 'শ্রাবণ' নামে একটি দু-পঙতির কবিতা আছে।

"ওই মেয়েটির কাছে
সন্ধ্যাতারা আছে।"

সেই পাঠকের বাড়ি রাত্রিবাসকালে কবি স্বপ্নে পেল সমুদ্রের তীরে পড়ে থাকা কাগজের নৌকায় লেখা একটা না হওয়া কবিতার চার-লাইন-

"চাঁদের গায়ে উল্কা পড়া গর্ত
চাঁদের গায়ে ধুলো হয়ে যাওয়া কোটি বছরের উল্কা
চাঁদের খুলিতে হাজার মাইল কাটা দাগ
চাঁদের মগজে শুকিয়ে বালি হয়ে যাওয়া সমুদ্র..."
(জয় গোস্বামী রচিত কবিতা 'চন্দ্রাহত')

কবি তখন সত্যিই চন্দ্রাহত, যদি ধরে নিই সেই পাঠক মেয়েটি চাঁদ। কবি যদি চাঁদ হয়, তবে তার গায়ে কলঙ্কের গর্ত হবে আজ রাতে। এতকাল সেই চাঁদের গায়ে লেগেছিল রাধার উল্কাপিন্ড! তার প্রেমের সমুদ্র এতদিনে অপেক্ষার প্রহর গুনতে গুনতে শুকিয়ে একেবারে বালি হয়ে মিশে গেছে অতলে!

প্রভু নষ্ট হয়ে যাই (২০০৭):

সিনেমাটি অগ্নিদেব চ্যাটার্জী পরিচালিত। সামগ্রিকভাবেই এটি আদতেই সম্পর্ক, মূল্যবোধ, সততা ও সত্যতার নষ্ট হয়ে যাওয়ার গল্প। পারস্পরিক সম্পর্ক, বিশ্বাস, ভরসা সমস্তটাই ধামাচাপা পড়ে যায় অত্যন্ত কদর্যতায়!

সিনেমার শুরুতে কলাকুশলীদের নাম প্রদর্শনের সময় শিলাজিৎ মজুমদারের কণ্ঠে আবহ নির্মাণ করেছে শক্তি চট্টোপাধ্যায় রচিত 'প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই' কবিতাটি

"বার বার নষ্ট হয়ে যাই
প্রভু, তুমি আমাকে পবিত্র
করো, যাতে লোকে খাঁচাটাই
কেনে..."

'নষ্ট' যা কিছুকে প্রকট করতে সমগ্র সিনেমাটি সাদা-কালো দৃশ্যে ভরপুর।

সব চরিত্র কাল্পনিক (২০০৯):

কাব্যের বুননেই চরিত্রগুলিকে সাজিয়ে তুলেছেন পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষ। চরিত্রগুলো কাল্পনিক কি না জানা নেই, তবে চরিত্রগুলি যদি কবিতার এক একটা চরণ হয়, তবে তারা একে অন্যের সঙ্গে মিলে গেছে এক অনবদ্য অন্ত্যমিলে। সিনেমার অনেকখানি অংশই সিনেমাটির নায়ক ইন্দ্রনীল মিত্রের (অভিনয়ে-প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়) কবিতা অবলম্বনে নির্মিত। ইন্দ্রনীল ও তার স্ত্রী রাধিকার (অভিনয়ে-বিপাশা বসু) জীবনের নানা মিলন-বিরহের কথা বলে যায় ইন্দ্রনীলের ঐ কবিতাগুলো। রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা ছাড়া বাকি কবিতাগুলির রচয়িতা জয় গোস্বামী। বোহেমিয়ান, বেখেয়ালী, ভুলোমনের এক পাগলাটে বিবাহিত কবি ইন্দ্রনীল মিত্র। ইন্দ্রনীলের চেয়ে রাধিকার অনেক বেশি ভরসাযোগ্য মনে হয় তার (রাধিকার) অফিসের সহকর্মী শেখরকে (অভিনয়ে-যীশু সেনগুপ্ত)। ইন্দ্রনীলের কল্পনা ও শেখরের বাস্তবতা- এই দুইয়ের মধ্যে রাধিকার টানাপোড়েন কবিতার মতন করে এঁকেছেন ঋতুপর্ণ। সিনেমার শুরুতে বিপাশা বসুর কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের 'আমাদের ছোট নদী' কবিতাটির ইংরেজি অনুবাদ শোনা যায় আবহে-

"Our little river twists and turns
In May its water needy prunes
Cows bathe across carts bail through
Banks are high and sloping too"
(ইংরেজি অনুবাদে- মধুছন্দা কার্লেকর)

রাধিকা নির্দ্বিধায় বলতে পারে, "I was too lazy to think something original..."

বিয়ের পর ট্রেনে করে জামশেদপুর থেকে কলকাতা আসার সময় একটা ছোট নদী দেখেছিল রাধিকা, তার বিবাহিত দিনগুলোর মতন।

দেশভাগের পর ঘরবাড়ি ওদেশে ফেলে চলে আসে নন্দর মা। তার নাম প্রিয়বালা দাস (অভিনয়ে-সোহাগ সেন)। ইন্দ্রনীলের মৃত্যুর পর সে রাধিকাকে জানায়, "আমার সঙ্গে গালগপ্প করত তো, তখন জিগাইসে, আমি কইসি"...যদিও, তার জীবনের কিছু কিছু অংশ ইন্দ্রনীল কল্পনা করে নিয়েছে তার কবিতায়। প্রিয়বালারা দুই বোন আলাদা হয়ে যায়নি। প্রিয়বালা বলে, "বানায় বানায় লিখসে!"...তবু, এ কবিতা শুনে নন্দর মা লুকিয়ে চোখের জল মোছে। এ কবিতা ইন্দ্রনীলের স্মরণসভায় পাঠ হতে শুনে রাধিকা চঞ্চল হয়ে পড়ে। পাঠ করেন জয় গোস্বামী নিজেই।

"সেই কোন দেশে আমরা যাচ্ছিলাম
কোন দেশ ছেড়ে আমরা যাচ্ছিলাম ...
ছোটবোন আর মা বাবা, গ্রামের লোক
তার পাশে আমি, দুলালী? না প্রিয়বালা?..." ('নন্দর মা')

স্মরণসভায় একজন আনলেন ইন্দ্রনীলের কবিতার প্রথমদিকের নায়িকা 'কাজরী'র (অভিনয়ে-পাওলি দাম) প্রসঙ্গ।

রাধিকা যেন নিজের বেশেই দেখতে পাচ্ছে কাজরীর ছায়া।

"এই তো আমার সঙ্গে কেঁদুলির মেলা
এই তো আমার সঙ্গে বাউলের ঘর
উড়ছে শীতের রাত লালন-এর গানে
কাজরীর সঙ্গে শুধু জ্বর।

...

জ্বর কি তোমার কোন পুরনো প্রেমিক?
ইস্কুল বয়েস থেকে সে এসে তোমার পাশে বসে?
যখন থাকি না আমি?
সে আমার হাত থেকে নিক, তবে অভিশাপ নিক

...

সে জ্বলুক, যেরকম কৃতকর্ম জ্বলে।"
('কাজরীর জ্বর) (পাঠ: পল্লব কীর্তনীয়া)

রাধিকার মনে পড়ে যায়, একবার বন্ধুদের সঙ্গে কেঁদুলির মেলায় গিয়েছিল ইন্দ্রনীল। রাধিকার তখন ধুম জ্বর! রাধিকা ভেবেছিল, ইন্দ্রনীল সে জ্বরের তোয়াক্কা করেনি। অথচ, সে এক আস্ত কবিতা! রাধিকার যে সত্তার নাম 'কাজরী', সে ধরা দেয়নি ইন্দ্রনীলের কাছে। অথচ ইন্দ্রনীল ভাবত, "কাজরী, উড়িয়ে আনব তোমায় এখানে..."! ক্রমশ শেখরের দিকে উড়ে যাওয়া রাধিকার 'কাজরী' হয়ে ওঠা হয়নি আর!

একবার হাঁসকুড়ি নদীর কাছে একটা জঙ্গলে বেড়াতে গিয়ে রাধিকা একটা কবিতা লিখেছিল। তারপর সেটি হারিয়ে যায় ফেরার রাস্তায়। এ কথা শুনে কবিতাটির জন্য কাতর কবি ইন্দ্রনীল বলেছিল, "অলকানন্দার জলে কবিতাটাকে একা রেখে চলে এলে? ও কীকরে পথ চিনে আসবে!"... 'হাঁসকুড়ি' নামটা পছন্দ হয়নি বলে ইন্দ্রনীল নদীটার নাম দেয়, 'অলকানন্দা'।

ইন্দ্রনীলের জীবদ্দশায় তার অতলতার সাক্ষাৎ পায়নি রাধিকা। অলকানন্দার জলে ভেসে গেছে তাদের ব্যর্থ দাম্পত্য। মৃত্যুর মতন চরম এক সত্যের সামনে রাধিকার আজ মনে হচ্ছে, "I wanted to leave you neel, but I didn't want you to leave me!"

রাধিকার দরকারি কাগজপত্র দিয়ে মৃত্যুর পরেও এসে এরোপ্লেন বানিয়ে উড়িয়ে দেয় ইন্দ্রনীল। রাধিকা দেখতে পায় এমন দৃশ্য। পরপর কিছু দৃশ্যে দেখি, রাধিকার কল্পিত কাজরী আর রাধিকা একে অন্যের সঙ্গে মিলেমিশে যাচ্ছে।

আবহে ভেসে আসছে ইন্দ্রনীলের কণ্ঠে তার কবিতা-

"আজ আর আমাদের ঘুম আসবে না, চলো
ছাদে দাঁড়াই
ছাদ কোথায় পাবো, আমাদের মাথার ওপর তো
আর দুজন ঘুমোচ্ছে!..."
('১৪ জুলাই', জয় গোস্বামী)

নন্দর মায়ের কাছ থেকে রাধিকা ইন্দ্রনীলের একটা কবিতার প্লট শুনে চমকে ওঠে। এ ভাবনা যে তার! বহুদিন আগে ইন্দ্রনীল একজনের বাড়িতে যায় একটা কাজে। বাড়িটার বাইরে ট্যাক্সিতে তার জন্য অপেক্ষা করছিল রাধিকা। সেইসময় সে রাস্তায় একটা পাগলকে দেখে ভয় পায়। তারপর একটা ভাবনা আসে তার মাথায়, ইংরেজিতে সে লিখে রেখেছিল ভাবনাটা। সেই অনুভব নিয়ে মৃত্যুর দুদিন আগে ইন্দ্রনীল একটা কবিতা লিখে গেছে।

"আমার সবচেয়ে ভয় হয় আমার ঘরের মানুষটাও যখন বলে এবার পাগল হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে যাব একদিন যদি সত্যিসত্যিই বেরিয়ে যায় মাথাগরম লোকটা..."

রাধিকা উদঘাটন করে, ইন্দ্রনীলকে সে ভালোবাসে। ভালোবাসে বলেই, তার 'পাগল' কবি কোথায় হারিয়ে যাবে, কীভাবে বাড়ি খুঁজে ফিরে আসবে আর ফিরতে না পারলে কোনো অভাগিনীর ঝুপড়িতে খসে পড়বে কি না, এসব তাকে ভাবায়!

প্রথমদিকের এক দৃশ্যে চলন্ত ট্রেনের কামরায় দেখেছিলাম সদ্য বিবাহিত রাধিকার উজ্জ্বল, রঙিন হাত। শেষ দৃশ্যে চলন্ত ট্রেনের জানালায় রাখা আছে রাধিকার অকাল বৈধব্য জড়িত একটা ক্লান্ত হাত। আবহে ভেসে আসছে রাধিকার কণ্ঠে বাংলা কবিতা।

"আমাদের ছোটো নদী চলে বাঁকে বাঁকে
বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে।..." (রবীন্দ্রনাথ)

ছোটদের জন্য লেখা রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতার কয়েকটা লাইনকে কি অপূর্ব ভঙ্গিমায় মানুষের সম্পর্ক-জীবন-মৃত্যুর মাঝের স্রোতধারা হিসেবে জুড়ে দিলেন পরিচালক! সিনেমার পোস্টার ও ডিভিডি'তে লেখা আছে,

"অর্ধেক লিখেছ মৃত্যু
বাকি অর্ধ সেতুর ওপারে।"
('মৃত্যুবিষয়ক', জয় গোস্বামী)। মৃত্যুতে জন্ম হয় জন্মকালীন অনেক অধরার।

অন্তহীন (২০০৯):

অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরী পরিচালিত 'অন্তহীন' আই.পি.এস অফিসার অভীক চৌধুরীর (অভিনয়ে-রাহুল বোস) অন্তহীন কল্পনার জগতের গল্প। চারপাশের তথাকথিত সম্পর্কগুলো দেখে দেখে সে বিধ্বস্ত। সে চায় একান্ত নিজস্ব একটা নীরবতা। সে 'অনলাইন ফ্রেন্ডশিপ' গড়ে তোলে সম্পূর্ণ অজানা একটি মেয়ের সঙ্গে। মেয়েটির নাম বৃন্দা (অভিনয়ে-রাধিকা আপ্তে)। অন্যদিকে পারো (অভিনয়ে- অপর্ণা সেন) ও রঞ্জন (অভিনয়ে- কল্যান রায়) স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন যুগল। তাঁরা প্রৌঢ়ত্ব ছুঁয়েছেন, অভিজ্ঞ। তাই নিছক এক আড্ডায় অভীককে রঞ্জন বলেন, "ইন্টারনেট লাভ গেমস্ একেবারে টিন-এজারদের!...তোর বয়সে এসব মানায় না!" ...অভীক বলে, "গেম নয় রঞ্জু'দা।...ইমোশানাল এসকেপ বলতে পারো!...অপেক্ষা!" ঠিক এসময় রঞ্জনের কণ্ঠে শুনি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'মানুষ' কবিতাটি।

"তার ঘর পুড়ে গেছে
অকাল অনলে,
তার মন ভেসে গেছে
প্রলয়ের জলে।
তবু এখনও সে মুখ
দেখে চমকায়,
এখনও সে মাটি পেলে

প্রতিমা বানায়।"

(সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত 'গণসংগীত সংগ্রহ' কাব্য সংকলন)

এক সদ্য প্রস্ফুটিত প্রেমিক সত্তার সামনে এই কবিতার পঙতিগুলি উচ্চারণ করছে এক বিচ্ছিন্ন, বিধ্বস্ত হৃদয়। সে হৃদয়ের মন ভেসে গেছে অশ্রুজলের অতলতায়, ঘর পুড়ে গেছে সম্পর্কের অকাল দহনে। তবু, কোনো নতুন প্রেমময় মুখ এখনও তাঁর মনে আশা জাগায় নতুন বন্ধনের প্রতিমা বানাতে!

কালবেলা (২০০৯):

গৌতম ঘোষ পরিচালিত সিনেমা 'কালবেলা' নির্মিত হয়েছে সমরেশ মজুমদারের 'কালবেলা' উপন্যাসটিকে ভিত্তি করে। নকশাল আমলের উত্তাল সময়ে কলেজ-ছাত্র অনিমেষের (অভিনয়ে-পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়) মেস-জীবনের যৌবনকাল তুলে ধরা হয়েছে দুটি কবিতার প্রয়োগে। দুটি কবিতাই শোনা যায় অনিমেষের মেস-বন্ধু ত্রিদিবের (অভিনয়ে-রুদ্রনীল ঘোষ) কণ্ঠে। এক রাতে মত্ত অবস্থায় মেসে ফিরতে ফিরতে ত্রিদিব বলতে থাকে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'সে বড়ো সুখের সময় নয়, সে বড়ো আনন্দের সময় নয়' কবিতাটি।

"পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করে, দেয়ালে দেয়াল, কার্নিশে কার্নিশ,
ফুটপাত বদল হয় মধ্যরাতে..."

ত্রিদিবের স্বপ্নে কেউ ঘুরপাক খায়। কবিতার মধ্যে দিয়ে তাকে ছুঁতে চায় ত্রিদিব, ভেঙে পড়ে নেশাগ্রস্ত কান্নায়! এই দৃশ্যে ত্রিদিবের কণ্ঠে শোনা যায় জীবনানন্দ দাশের 'জনান্তি' কবিতাটি

"তোমাকে দেখার মতো চোখ নেই- তবু,
গভীর বিস্ময়ে আমি টের পাই- তুমি
আজো এই পৃথিবীতে র'য়ে গেছ..."

কলেজ সহপাঠী মাধবীলতার প্রেমে পড়ে এক সকালে খানিক অন্যমনস্ক দেখায় বিপ্লবী অনিমেষকে। তাই অনিমেষের মনের ব্যাকুলতা বোঝাতে মজার ছলে ত্রিদিব বলে ওঠে,

"আকাশে তাকালাম
তোমার মুখ
চোখ বন্ধ করলাম
তোমার মুখ
বজ্রকে বধির করে তুমি আমায় ডাকছ।"

(সুভাষ মুখোপাধ্যায় রচিত কবিতা 'আমি আসছি')

অনিমেষের মনের অবস্থা তখন ঠিক তাই! তার এটুকু কথাতেই সেটা স্পষ্ট- "কবিরা কি মনের ডাক্তার হয়?"

ইতি মৃণালিনী (২০১০):

অপর্ণা সেন পরিচালিত এই সিনেমা দেখায় সারাজীবন একাধিক সম্পর্কে জর্জরিত, প্রতারিত মৃণালিনী (অভিনয়ে- অপর্ণা সেন ও কঙ্কনা সেন শর্মা) আত্মহত্যার রাতে চিঠিতে লিখে যাচ্ছে তার শেষ কিছু কথা। অভিনয় জীবনের সমস্ত হিসেব-নিকেশ পুরোপুরি না মিললেও, মৃণালিনীর কলম বারবার ফিরে যাচ্ছে তার প্রথম প্রেমের কাছে, যেখানে কোনো অভিনয় নেই! আজ ঘুমের ওষুধগুলো খাওয়ার ঠিক আগে, মৃত্যুর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে মৃণালিনী ছিঁড়ে ফেলতে চায় তার সমস্ত স্মৃতিপাতা (পুরোনো ছবি, উপহার...)। অতীত ঘেঁটে বেরিয়ে আসে তার প্রথম প্রেমিক অভিজিৎ-এর দেওয়া 'স্মৃতির শহর' (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় রচিত) বইটি। মৃণালিনী প্রবল আকর্ষণে ফিরে যায় কলেজ-জীবনের বন্ধুদের প্রাণবন্ত আড্ডার সেই সমস্বর কবিতা উচ্চারণে-

"আমাকে টান মারে রাত্রি-জাগা নদী
আমাকে টানে গূঢ় অন্ধকার..."

কবিতাটির শব্দ ও প্রকাশভঙ্গির উচ্ছ্বাস যেন যৌবনের উদ্দামতাকে প্রকাশ করে সিনেমায়। একইসঙ্গে, মৃত্যুর দরজায় দাঁড়ানো এক ক্লান্ত প্রাণকেও টান মারে তার রাত্রি-জাগা নদী, তার প্রথম সবকিছু। সেই টানেই সে পার্থিব খোলশ ছেড়ে রেখে চলে যেতে চাইলেও পারে না!

২২শে শ্রাবণ (২০১১):

সৃজিত মুখার্জী পরিচালিত এই সিনেমায় জটিলতা, রহস্য, আক্রোশ ইত্যাদির আবরণেও বারবার ফিরে এসেছে কবিতার ব্যবহার। 'নিবারণ' চরিত্রটির (অভিনয়ে গৌতম ঘোষ) পরতে পরতে জুড়ে আছে কবিতা। এই সিনেমার শেষ দৃশ্যে এক্স-ডিসিপি প্রবীর রয়চৌধুরী নিজে নিজেকে গুলি করে মৃত্যুবরণ করার আগের মুহূর্তে বলতে থাকা রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'র পঙক্তির ব্যবহার সত্যিই নজর কেড়েছে!

"কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও
তারি রথ নিত্যই উধাও... হে বন্ধু, বিদায়"

গয়নার বাক্স (২০১৩):

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় রচিত ছোট গল্প 'রাসমনির সোনাদানা' অবলম্বনে গয়নার বাক্স চলচ্চিত্রটি নির্মিত। এটি এক বাঙালি হিন্দু জমিদার পরিবারের অকাল- বিধবা রাসমণির অতৃপ্ত স্বপ্নের গল্প। সেই গল্প শুধু রাসমণির থাকে না, পরবর্তী প্রজন্মদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয় সেই স্বপ্নের নেশা। তথাকথিত সাংসারিক গন্ডির চৌকাঠ পার হয়ে সোমলতা ধরা দিতে যায় প্রেমিকের কাছে, যা রাসমণি পেরে ওঠেনি শেষমেশ, সোমলতাও না। একের পর এক প্রজন্মের ধামাচাপা দিতে থাকা বাসনার গল্পগুলো থেকে যায় কালের সত্য হয়ে, ধরা দেয় কবিতায়...

"সীমন্তিনী, তোমায় ডেকে পাইনি সাড়া
দুয়ার ঘিরে ছিল হাজার কাঁটার বেড়া...
একলা এলে পথ হারালে –
বনের পথে কেন আমায় পথ ভোলালে..."
('সোমলতাকে', শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়)

এপার-ওপার মিশে যায় কবিতা থেকে গানে, দুই বাংলার হয়ে কথা বলে অধরা মুহূর্তরা- "ওপারের মেয়ে সব কাজ ফেলে তাই কি এলে!"

চতুষ্কোণ (২০১৪):

সৃজিত মুখার্জী পরিচালিত এই সিনেমা সম্পর্কের অতি জটিল সমীকরণ ও এক প্রতিশোধের গল্প বলে। সিনেমার ভেতর বাস্তব ও সিনেমা মিলেমিশে জট পাকিয়ে যায় এবং শেষ পরিণতি জয়ব্রতর (অভিনয়ে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়) মৃত্যু। তবু, ধ্বংসের এই বিপুল আয়োজনেও জয়ব্রত তৃণাকে আচমকা মনে করিয়ে দেয় তার ফেলে আসা জীবন,

"ঠিক সময়ে অফিসে যায়?
ঠিক মতো খায় সকালবেলা?
টিফিনবাক্স সঙ্গে নেয় কি?
না ক্যান্টিনেই টিফিন করে?..." ('প্রাক্তন', জয় গোস্বামী)

কবিতা হয়ত এভাবেই তীব্র জটিল আবহতেও আনে প্রাণের স্পন্দন!

বেলাশেষে (২০১৫):

নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত সিনেমা 'বেলাশেষে'। এটি বিশ্বনাথ মজুমদার নামে এক বৃদ্ধের (অভিনয়ে-সৌমিত্র চ্যাটার্জী) দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের বিবাহিত জীবনের পর 'বিবাহিত' সম্পর্ক থেকে মুক্তির আকাঙ্খার গল্প। এই ইচ্ছে থেকেই পরিবর্তন ঘটে যায় একে একে অনেকগুলো সম্পর্কের। বাবা-মাকে বিচ্ছিন্ন হতে দেখে ছেলেমেয়েরা ফিরে তাকায় তাদের নিজের নিজের সম্পর্কের দিকে। এদের প্রত্যেকের ছেঁড়া ছেঁড়া সম্পর্কগুলোকে দু-লাইনেই স্পষ্ট করে দিয়েছে শঙ্খ ঘোষের 'সঙ্গিনী' কবিতা-

"হাতের উপর হাত রাখা খুব সহজ নয়
সারা জীবন বইতে পারা সহজ নয়"

পঙক্তিগুলি সিনেমায় শুনি মালশ্রীর (অভিনয়ে- ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত) কণ্ঠে, বিশ্বনাথ মজুমদারের মেজো মেয়ে। এই দুই পঙতি নিমেষেই বুঝিয়ে দেয় সম্পর্ক ও আজীবনের মধ্যেকার ব্যস্তানুপাতিক হিসেবের গল্প!

কাদম্বরী (২০১৫):

সুমন ঘোষ পরিচালিত এই সিনেমাটি রবিঠাকুরের বৌঠান কাদম্বরী দেবীর জীবনচিত্র। রবীন্দ্রনাথ (অভিনয়ে- পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়) ও কাদম্বরীর(অভিনয়ে-কঙ্কনা সেন শর্মা) একান্ত আলাপচারিতায় রবির কবিতা নিয়ে কথপোকথনে রবি পড়ে শোনায় তার লেখা নতুন কবিতা, তার নতুন বৌঠানকে।

"আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাতপাখির গান!
না জানি কেন রে এত দিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ।..."('নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ')

এই কবিতার মধ্যে এক উজ্জ্বলতা আছে, প্রাণ আছে। এই প্রাণ যেন সিনেমার এই দৃশ্যে আরো বেশি করে ফুটিয়ে তোলে যুবক কবি রবির প্রখরতা,ঔজ্জ্বল্য এবং সেই ঔজ্জ্বল্যের মাত্রা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয় তার নতুন বৌঠানের প্রশংসা ও সাহচর্য। রবি বলছে, "আমার যেন কীসের ঘোর লেগেছে বৌঠান, আমি জানি না কীসের ঘোর!"

প্রাক্তন (২০১৬):

নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত সিনেমা 'প্রাক্তন' একটি প্রাক্তন সম্পর্কের রেলগাড়িতে হঠাৎ দেখা হওয়ার গল্প। সুদীপা (অভিনয়ে-ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত) ও উজানের (অভিনয়ে-প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়) প্রেম হয়, পরিণতি বিয়ে। কিন্তু মানসিকতার বিস্তর ফারাকে সেই বিয়ের পরিণতি বিচ্ছেদ। রেলগাড়ির এক কামরায় সুদীপার পরিচয় হয় মালিনী ও তার মেয়ে পুতুলের সঙ্গে। মাঝে এক স্টেশনে ঐ কামরায় আসে পুতুলের বাবা। সুদীপার সঙ্গে দীর্ঘদিন পর সাক্ষাৎ হয় উজানের, পুতুলের বাবার। দীর্ঘ ট্রেনযাত্রায় একই কামরায় এই দুই প্রাক্তনের অন্তরের কথাগুলো ফুটিয়ে তুলতে আবহ নির্মাণ করেছে রবীন্দ্রনাথের 'হঠাৎ দেখা' কবিতাটি (কণ্ঠ: সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়)

রেলগাড়িটির পাশের কামরার সহযাত্রী এক বৃদ্ধ দম্পতি (অভিনয়ে- সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও সাবিত্রী চ্যাটার্জী)। তাঁরা বিচ্ছিন্ন 'প্রাক্তন' দম্পতির সামনে এক জলজ্যান্ত বৈপরীত্য। দীর্ঘ পথ তাঁরা দুজন পাড়ি দিয়েছেন একসঙ্গে, দিয়ে চলেছেন।

"রেলগাড়ির কামরায় হঠাৎ দেখা,
ভাবিনি সম্ভব হবে কোনোদিন।..."

সিনেমার শেষের দিকে আসে ট্রেন থেকে একে একে নামার পালা। সুদীপার ভারী স্যুটকেস তুলতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় উজান। কাছাকাছি আসে স্যুটকেসের ওপর রাখা দুটো হাত, যারা একে অন্যকে আঁকড়ে থাকতে চেয়েছিল সারাজীবন, পারেনি। এই দৃশ্যের আবহই তাদের কথোপকথন!

"... 'আমাদের গেছে যে দিন
একেবারেই কি গেছে,
কিছুই কি নেই বাকি?'
একটুকু রইলেম চুপ করে;
তারপর বললেম,
'রাতের সব তারাই আছে
দিনের আলোর গভীরে।..."

হঠাৎ দেখা (২০১৭):

রেশমি মিত্র ও সাহাদাত হোসেইন পরিচালিত এই সিনেমাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'হঠাৎ দেখা' কবিতাটি অবলম্বন করেই নির্মিত হয়েছে। মানসী (অভিনয়ে- দেবশ্রী রায়) ও অমিতের (অভিনয়ে- ইলিয়াস কাঞ্চন) দেখা হয়েছে হঠাৎ এক রেলগাড়ির কামরায়। পূর্ণিয়ার গ্রামজীবনে ছিল তাদের কৈশোরের প্রেম। তারা আবার মিলিত হয় এক রেলগাড়ির কামরায়, প্রৌঢ় বয়সে। একে অন্যকে চিনে নেয় ঠিক! খানিক চেনা দেওয়া, খানিক না দেওয়ার আবহ জুড়ে বেজে চলে-

"রেলগাড়ির কামরায় হঠাৎ দেখা,
ভাবিনি সম্ভব হবে কোনোদিন।..."

সবশেষে মানসী ট্রেন থেকে নেমে যায় তার সঙ্গীসাথীর সঙ্গে। একা সেই কামরায় থেকে যায় অমিত। আবহে বেজে ওঠে,

"সবাই নেমে গেল পরের স্টেশনে
আমি চললেম একা"

এই সিনেমা জুড়ে থাকে একটাই কবিতা, 'হঠাৎ দেখা'।

কেদারা (২০১৯):

ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত পরিচালিত 'কেদারা' সিনেমাটি নরসিংহ (অভিনয়ে-কৌশিক গাঙ্গুলি) নামক এক নিঃসঙ্গ, বিবাহ-বিচ্ছিন্ন, সম্পূর্ণ একা মানুষের কাহিনি। তাঁর অন্যতম নেশা ভেন্ট্রলোকুইজম। পিতৃপুরুষের ভিটেয় একটা অন্ধকার নিরালায় নিঃসঙ্গ জীবন অতিবাহিত করেন নরসিংহ। অনির্বাণ ভট্টাচার্যের কণ্ঠে এই সিনেমায় আবহ নির্মাণ করেছে শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "পাখিরা বুঝি মাইনে পায়" কবিতা-

"পাখিরা বুঝি মাইনে পায়?
মেঘেরা বুঝি অফিস যায় রোজ?
হাওয়ার বুঝি ব্যবসা আছে কোনো?
নদীরা বুঝি চুক্তি হলে, তবেই করে সমুদ্রের খোঁজ?..."

নরসিংহের মতন এমন একাকিত্বে মোড়ানো অসহায় মানুষ পাখির মতন, কেবল খড়কুটো আঁকড়ে বাঁচতে ভালোবাসে! তারা অন্য সাধারণ মানুষদের চাকুরে জীবনে অভ্যস্থ হতে পারে না। লিখিত চুক্তি ছাড়াও তারা বিবাহ-বিচ্ছিন্ন 'স্ত্রী'কে বারবার ফোন করে চেয়ে নেয় ঋর্ণার খোঁজ। মেঘ, সমুদ্র কিংবা একাকী নদীর যে ডাক, সেই হাতছানি দেওয়া আহ্বান শোনার ক্ষমতা থাকে কেবল এই নিঃসঙ্গ হৃদয়গুলোর!

গবেষণার ফলাফল:

অতএব, বিভিন্ন বাংলা চলচ্চিত্রে কবিতার ব্যবহার পর্যালোচনা করে কী বোঝা গেল? বাংলা চলচ্চিত্রে কবিতার ব্যবহার কেবল নান্দনিক অলংকার হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং তা প্রায়ই চরিত্রের অন্তর্লৌকিক মানসিক অবস্থার এক প্রকার ভাষ্য হয়ে ওঠে। অনেক সময় চলচ্চিত্রে এমন কিছু আবেগ, সংকট বা স্মৃতি জুড়ে থাকে, যা সরাসরি সংলাপের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় না। এই অবস্থায় কবিতার পঙ্‌ক্তি চরিত্রের মনের অপ্রকাশিত অংশকে প্রকাশের সুযোগ করে দেয়। গবেষণার দৃষ্টিতে দেখা যায় যে একুশ শতকের শুরুতে নির্মিত বহু বাংলা চলচ্চিত্রে কবিতার এই ব্যবহার একটি সচেতন ন্যারেটিভ কৌশল হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে।

চলচ্চিত্রে স্মৃতি ও নস্টালজিয়ার নির্মাণে কবিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। অনেক চলচ্চিত্রে অতীত স্মৃতি, হারিয়ে যাওয়া সম্পর্ক বা অসম্পূর্ণ প্রেমের প্রসঙ্গে কবিতা ব্যবহৃত হয়েছে। কবিতার ভাষা সাধারণত ইঙ্গিতপূর্ণ ও প্রতীকসমৃদ্ধ হওয়ায় তা স্মৃতির আবছায়া অনুভূতিকে খুব স্বাভাবিকভাবে ধারণ করতে পারে। ফলে যখন কোনো চরিত্র অতীতের দিকে ফিরে তাকায়, তখন একটি কবিতা সেই স্মৃতির আবহকে নির্মাণ করে, যে আবহের গভীরতা সাধারণ আলাপচারিতায় বা কথোপকথনে এভাবে ধরা যেত না। চলচ্চিত্রের দৃশ্যভাষা ও কবিতার প্রতীকী ভাষার মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত সাদৃশ্যও লক্ষ্য করা যায়। কবিতায় যেমন উপমা, রূপক বা চিত্রকল্পের মাধ্যমে অনুভূতির প্রকাশ ঘটে, তেমনি চলচ্চিত্রেও দৃশ্য, আলো, শব্দ এবং সম্পাদনার মাধ্যমে অর্থ নির্মিত হয়। ফলে কবিতা যখন চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত হয়, তখন দুটি শিল্পভাষা একে অপরকে যারপরনাই সমৃদ্ধ করে। এই সমন্বয়ের ফলে দৃশ্যের অর্থ কেবল দৃশ্যমানতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং তা শব্দের নন্দনতত্ত্বের মাধ্যমে বিস্তৃত হয়ে ওঠে।

নারী চরিত্রের অন্তর্জগৎ প্রকাশের ক্ষেত্রেও কবিতার ব্যবহার বিশেষভাবে কার্যকর হয়েছে। অনেক চলচ্চিত্রে নারী চরিত্রের নীরব যন্ত্রণা, আশা, আকাঙ্ক্ষা বা একাকিত্বকে প্রকাশ করার জন্য কবিতার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। কারণ কবিতা আবেগের সূক্ষ্ম স্তরকে প্রকাশ করতে সক্ষম। ফলে নারী চরিত্রের অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম বা মানসিক টানাপোড়েন দর্শকের কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

চলচ্চিত্র ও কবিতার অনেকসময় একটি আন্তঃপাঠিক (intertextual) সম্পর্কও তৈরি হয়। এর ফলে চলচ্চিত্রের অর্থের পরিধি বৃদ্ধি পায়। দর্শক একইসঙ্গে সাহিত্যিক স্মৃতি এবং দৃশ্যমান অভিজ্ঞতার সংযোগ ঘটিয়ে নতুন অর্থ অনুধাবন করতে পারে।

বাংলা সমাজে কবিতা পাঠ এবং কবিতার প্রতি আবেগ দীর্ঘকাল ধরে একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে বিদ্যমান। যখন চলচ্চিত্রে পরিচিত কবিদের রচনা ব্যবহৃত হয়, তখন তা কেবল একটি দৃশ্যের আবহ তৈরি করে না; বরং বৃহত্তর সাংস্কৃতিক স্মৃতির সঙ্গেও দর্শককে যুক্ত করে। এর ফলে চলচ্চিত্রটি একটি সাহিত্যিক ঐতিহ্যের ধারক হিসেবে কাজ করে। বেশ কিছু চলচ্চিত্র কবিতার বয়ানেই নির্মিত।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো চরিত্র নির্মাণে কবিতার ভূমিকা। কোনো চরিত্র যখন একটি নির্দিষ্ট কবিতা পাঠ করে বা তার সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক দেখা যায়, তখন সেই চরিত্রের মানসিক গঠন সম্পর্কে দর্শক একটি

ধারণা পায়। এর মাধ্যমে চরিত্রের সংবেদনশীলতা, চিন্তার ধারা কিংবা আবেগপ্রবণতা সহজেই প্রকাশিত হয়। ফলে কবিতা চরিত্রের অন্তর্লৌকিক জগৎ নির্মাণের একটি কার্যকর উপায় হয়ে ওঠে।

চলচ্চিত্রের বয়ানে কবিতা যুক্ত হওয়ার ফলে গল্প বলার কাঠামোতেও এক ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রচলিত কাহিনিনির্ভর চলচ্চিত্রে যেখানে ঘটনাপ্রবাহই মূল চালিকাশক্তি, সেখানে কবিতাময় চলচ্চিত্রে আবেগ ও পরিবেশ অনেক বেশি গুরুত্ব পায়। এই ধরনের চলচ্চিত্রে ঘটনাগুলোর মধ্যবর্তী নীরবতা, দৃশ্যান্তর বা চরিত্রের একাকিত্বের মুহূর্তগুলো বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। কবিতা এই মুহূর্তগুলিকে আরও অনেকখানি অর্থবহ করে তোলে।

সবশেষে বলা যায়, একুশ শতকের বাংলা চলচ্চিত্রে কবিতার ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ নান্দনিক কৌশল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটি চলচ্চিত্রের আবেগীয় গভীরতা বৃদ্ধি করে, চরিত্রের মানসিক জটিলতাকে উন্মোচিত করে এবং সাহিত্য ও সিনেমার মধ্যে এক সৃজনশীল সেতুবন্ধন গড়ে তোলে। এই প্রবণতা বাংলা চলচ্চিত্রকে একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিচয় প্রদান করেছে এবং ভবিষ্যত গবেষণার ক্ষেত্রেও নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেছে।

উপসংহার:

সকল বাংলা চলচ্চিত্রে কবিতার ব্যবহার হবে, এমন আশা করা অবশ্য ঠিক নয়। খুব কম চলচ্চিত্রে আবহ নির্মাণ করতে পারে কবিতা কিংবা কোনো চরিত্র পাঠ করে কোনো কবিতা। সিনেমার গল্প, চিত্রনাট্য, চরিত্রসৃষ্টি, উপস্থাপনা, টার্গেট অডিয়েন্স ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে সেখানে কবিতার ব্যবহার কতটা যথপোযুক্ত হবে। কিন্তু, এটুকু বলাই যায় যে বাংলা চলচ্চিত্রে কবিতাকেন্দ্রিক বা কবিতাকে সঙ্গী করে কাজ হয়েছে তুলনায় অনেক কম। অথচ, যেসব কাজ হয়েছে এতকাল, সেই দৃষ্টান্তদের দিকে ফিরে তাকালে বোঝা যায় যে সেখানে গানের ব্যবহার না থেকেও তার পরিবর্তে কবিতা কতখানি শ্রুতিমধুর হয়ে উঠছে। বহু ঐশ্বর্য ধুলোচাপা পড়ে থাকে কবেকার কোন ফেলে আসা কাব্যগ্রন্থে, বাড়ির পুরোনো ভাঙা আলমারিটায়...কখনও বা থাকেও না! সেসব শব্দকে যদি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে উপহার দেওয়া হয়, তাহলে দৃশ্য, শব্দ ও মুহূর্তরা আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জাগিয়ে তুলবে প্রাণস্পন্দন, প্রশান্তি, তৃপ্তিবোধ ও সম্মোহন!

তথ্যসূত্র:

ব্যবহৃত কবিতার উৎস-

১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। সঞ্চয়িতা। বিশ্বভারতী গ্রন্থণ বিভাগ, পৌষ, ১৩৩৮, পৃ. ৩৬।
২। তদেব, পৃ. ২৩৮।
৩। তদেব, পৃ. ৩৬০।
৪। তদেব, পৃ. ৪১৮।
৫। তদেব, পৃ. ৪৮৭।
৬। তদেব, পৃ. ৫৭২।
৭। তদেব, পৃ. ৭১৯।
৮। তদেব, পৃ. ৮১৭।
৯। দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ। "দূরের পাল্লা।" https://www.bangla-kobita.com/satyendranath/durer-palla/
১০। গঙ্গোপাধ্যায়, সুজাতা। "আত্মজ।"

http://amarpriyokobitarkhata.blogspot.com/2015/02/blog-post_12.html। প্রবেশের তারিখ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫।

১১। চট্টোপাধ্যায়, শক্তি। আসলে কেউ বড় হয় না। https://bengaliforum.com/%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%89-%E0%A6%AC%E0%A6%A1%E0%A6%BC%E0%A7%8B-%E0%A6%B9%E0%A6%AF%E0%A6%BC-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-a/ , Bengali Forum।

১২। গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল। জন্ম হয় না, মৃত্যু হয় না। https://www.kobitacocktail.com/%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE-%E0%A6%B9%E0%A7%9F-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81-%E0%A6%B9%E0%A7%9F-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-sunil-gangopadhyay/ । প্রবেশের তারিখঃ ১৪ মার্চ ২০২৩।

১৩। চট্টোপাধ্যায়, শক্তি। পদ্যসমগ্র। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৯, পৃ. ৯৭।

১৪। তদেব, পৃ. ১২৫।

১৫। আজাদ, হুমায়ুন। শুভেচ্ছা। http://kobitarakash.blogspot.com/2014/06/blog-post_19.html।

১৬। গঙ্গোপাধ্যায়, সুজাতা। চুম্বন। https://sahityabhalobese.blogspot.com/2017/07/blog-post_62.html। প্রবেশের তারিখঃ ১৯ জুলাই ২০১৭।

১৭। গোস্বামী, জয়। কবিতা সংগ্রহ ২। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৭, পৃ. ৫১।

১৮। তদেব, পৃ. ১৩৯।

১৯। তদেব, পৃ. ১৬১।

২০। তদেব, পৃ. ২৩৭।

২১। গোস্বামী, জয়। কবিতা সংগ্রহ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯০, পৃ. ১৮৫।

২২। তদেব, পৃ. ১৯৪।

২৩। চট্টোপাধ্যায়, শক্তি। প্রভু নষ্ট হয়ে যাই। https://www.bangla-kobita.com/shaktichattopadhyay/probhu-noshto-hoye-jai/

২৪। গোস্বামী, জয়। নন্দর মা। https://www.musixmatch.com/es/letras/Shafi-s/Nondor-Ma-%E0%A6%A8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE। প্রবেশের সালঃ ২০২২।

২৫। গোস্বামী, জয়। কাজরীর জ্বর। https://abahaman.wordpress.com/2014/05/02/%E0%A6%8F%E0%A6%87%E0%A6%A4%E0%A7%8B-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AE/। প্রবেশের তারিখঃ ২ মে ২০১৪।

২৬। গোস্বামী, জয়। কবিতা সংগ্রহ ২। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৭, পৃ. ২৭০।

২৭। তদেব, পৃ. ১৩৮।

২৮। তদেব, পৃ. ১৪৫।

২৯। গোস্বামী, জয়। কবিতা সংগ্রহ ৩। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০০, পৃ. ৩৭।

৩০। চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র। মানুষ। https://www.kobikolpolota.in/manush-kobita-birendra-chattopadhyay/।

৩১। চট্টোপাধ্যায়, শক্তি। সে বড়ো সুখের সময় নয়, সে বড়ো আনন্দের সময় নয়। https://www.kobitacocktail.com/%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%A1%E0%A6%BC%E0%A7%8B-%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%96%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%9F-%E0%A6%A8%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%A1%E0%A6%BC/।

৩২। দাশ, জীবনানন্দ। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা। ভারবি, ১৯৫৪, পৃ. ৯১।

৩৩। মুখোপাধ্যায়, সুভাষ। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা। দে'জ পাবলিশিং, ১৯৭৩, পৃ. ৪১।

৩৪। গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল। স্মৃতির শহর ০১। https://www.poetrystate.com/sunil-gangopadhyay/%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%ae%e0%a7%83%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a6%b9%e0%a6%b0-%e0%a7%a6%e0%a7%a7-%e0%a6%86%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%a8-%e0%a6%ae/। প্রবেশের সালঃ ২০১৯।

৩৫। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। শেষের কবিতা। আদ্রিশ পাবলিকেশন, ১৪২১, পৃ. ৯৪।

৩৬। মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু। সোমলতাকে। https://www.kobikolpolota.in/somlotake-kafer-tomake-valobaslam-bole-kobita/।

৩৭। ঘোষ, শঙ্খ। সঙ্গিনী। https://www.kobitacocktail.com/%E0%A6%B8%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%80-%E0%A6%B6%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%96-%E0%A6%98%E0%A7%8B%E0%A6%B7/। প্রবেশের তারিখঃ ১১ জুন ২০২৪।

৩৮। বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজাত। "পাখিরা বুঝি মাইনে পায়।" https://www.amarkobita4u.com/2020/12/pakhira-bujhi-maine-pay-lyrics-srijato.html।

৩৯। বসু, সুদেষ্ণা। তিনি ছিলেন ভারতীয় সিনেমার আচার্য, এক বৈষ্ণব চলচ্চিত্রকার। *আনন্দবাজার পত্রিকা*, https://www.anandabazar.com/patrika/a-special-article-about-film-director-debaki-kumae-bose-1.975996, প্রবেশের তারিখঃ ৬ এপ্রিল ২০১৯।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1244-1255
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.344

একবিংশ শতকের বাংলা কবিতার স্বরূপ

কনক মণ্ডল, *গবেষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 16.03.2026; Accepted: 19.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The natural tendency of humans is to bring something novel to the center of discussion. Here, the word 'novel' is particularly significant. Bengali poetry, since its inception (Charyapada), has been constantly evolving. If its trajectory had remained the same, the word 'novel' would have been redundant. However, the diverse treasure trove of Bengali poetry has not disappointed us; it has taken turns like the flow of a river, and repeatedly so. This turning point is what Rabindranath Tagore referred to as 'modern'. In the post-2001 contemporary Bengali poetry, it is not difficult to find originality. If we read the recent poems with a deeper understanding, we can see the novelty in many of them. Following the rule of change in Bengali poetry, there has been a clear transformation in the post-2001 contemporary Bengali poetry. And, it is undeniable that this change in the Bengali poetry scene is more vibrant and lively compared to previous times. In this article, we will attempt to understand how contemporary Bengali poetry is becoming 'new in form, new in spirit' with each passing moment. The new thoughts, distinct mentality, and above all, the all-encompassing experience of the 21st-century poets have gradually propelled them towards creating superior poetry. We will try to explore how the essence of 21st-century poetry is emerging through a few aspects.

Keywords: 21st century, poetry, modernity, imagery, globalization, reminiscence, daily life, mythological references, love, confession

কবিতা সম্পর্কিত আলোচনা-সমালোচনা শুধু আজকের নয়— সুদূর অতীত থেকেই এর ধারা বহমান। মনসামঙ্গলের কবি বিজয়গুপ্তও একটি সমালোচনাত্মক মন্তব্য করেছিলেন কবি কানাহরি দত্ত সম্পর্কে—

"কথার সঙ্গতি নাই নাহিক দুস্বর।
এক গাইতে এক গায় নাহি মিত্রাক্ষর॥"

ভারতচন্দ্র পরবর্তীকালে বলেছিলেন, 'যে হৌক সে হৌক কাব্য ভাষা রস লয়ে'। যাই হোক, প্লেটো অ্যারিস্টটল থেকে শুরু করে একালের সাহিত্য-সমালোচকরা কবিতাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে আসছেন। বলাবাহুল্য, এই যে দেখার দৃষ্টিকোণ, বোধের উপলব্ধি— এটি সবার একরকম হবে এমন কোনও মানে নেই। কিন্তু প্রায় সকলেই নিজের নিজের পর্যালোচনায় সঠিক একথা মেনে নিতে বিশেষ অসুবিধা হবার কথা নয়।

মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা হল অভিনব কোনও কিছুকে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসা। এখানে 'অভিনব' কথাটি সবিশেষ ভাবেই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা কবিতা তার জন্মলগ্ন (চর্যাপদ) থেকেই নিরন্তর চলমান।

তার এই গতি যদি একইরকম থাকত, তাহলে 'অভিনব' শব্দটি হত পরিহার্য্য। কিন্তু বৈচিত্র্যময়ী বাংলা কবিতা-ভাণ্ডার আমাদের নিরাশ করেনি সে বাঁক নিয়েছে নদীর স্রোতের মতোই। এবং বারেবারে। এই বাঁক ফেরাটাকেই তো রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'আধুনিক'। আসলে বাংলা কবিতার দিক পরিবর্তন বোঝা যায় তো এই অভিনবত্বের গুণেই। ফলে অনেক কবিতা নতুন ধারার সৃষ্টি হিসাবে যথেষ্ট নাড়া দেয় পাঠকচিত্তকে। সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদীকে। হয়তো সে কারণেই এখনও পর্যন্ত জীবনানন্দকে বলা হয় রবীন্দ্রোত্তর যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। T.S. Eliot স্বীকৃতি পেয়েছিলেন আধুনিক চেতনার কবি হিসাবে। কেননা, উল্লেখিত সবার মধ্যেই কাব্যচর্চার অভিনবত্বের সন্ধান মিলেছিল। কবির এই অভিনবত্বকে তাঁর অরিজিন্যালিটিও বললে অসংগত হবে না। 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সংগত একটি মন্তব্য করেছিলেন,

> "বড় সাহিত্যের একটা গুণ হচ্ছে অপূর্বতা, ওরিজিন্যালিটি। সাহিত্য যখন অক্লান্ত শক্তিমান থাকে তখন সে চিরন্তনকেই নূতন করে প্রকাশ করতে পারে। এই তাঁর কাজ। একেই বলে ওরিজিন্যালিটি।"[১]

২০০১ পরবর্তী সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার মধ্যেও এই অরিজিন্যালিটি খুঁজে পাওয়া শক্ত নয়। একটু গভীর মননের সাথে যদি আমরা সাম্প্রতিক কবিতাগুলি পাঠ করি, তাহলে বহু সাম্প্রতিক কবিতার মধ্যে অভিনবত্ব আমরা দেখতে পাব। সাম্প্রতিক বাংলা কবিতাকে অবহেলায় আমরা দূরে সরিয়ে রেখে আমরাই মূল্যবান কোনও কিছু থেকে যে বঞ্চিত হচ্ছি, এই বোধ আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করানোর সময় এসে গেছে।

বাংলা কবিতার কালান্তরের নিয়ম মেনেই ২০০১ পরবর্তী সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার মধ্যেও স্পষ্টভাবেই পরিবর্তন এসেছে। আর, বলতে দ্বিধা নেই যে, বাংলা কাব্যজগতে এই পরিবর্তন অন্যান্যবারের তুলনায় যেন আরও সজীব— অধিক প্রাণবন্ত।

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা প্রকৃতভাবেই যে 'নতুন রূপ, নতুন চেতনা'য় ক্ষণে ক্ষণে সাবলীল হচ্ছে, তা আমরা নীচে আলোচনা করে বোঝার চেষ্টা করব। একবিংশ শতকের কবিদের নব চিন্তা, স্বতন্ত্র মানসিকতা, সর্বোপরী সর্বভুক অভিজ্ঞতা তাদের ধীরে ধীরে উচ্চতর কাব্য রচনার দিকে এগিয়ে দিয়েছে। কয়েকটি বিষয়কে আলোচনা করে আমরা দেখার চেষ্টা করব কীভাবে একবিংশ শতকের কবিতার স্বরূপটি আমাদের কাছেও উঠে আসছে।

এক

চিত্রকল্প

'Image' বা 'চিত্রকল্প' একবিংশ শতকের কবিতায় কীভাবে নির্মিত সেই আলোচনায় আসার আগে জ্যোতি ভট্টাচার্য চিত্রকল্পের সংজ্ঞায় কী বলেছেন জেনে নেওয়া যাক—

> "কাব্যে ব্যবহৃত শব্দের দ্বারা যে কল্পনাশ্রয়ী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সূচিত হয়ে রূপবর্ণশব্দগন্ধস্পর্শ ও স্বাদ প্রভৃতি নানা সংবেদনের একটির বা একাধিকের স্মৃতি বহন করে এবং উদ্‌বোধ জাগায় সেই বস্তু চিত্রকল্প। চিত্রকল্পে চিত্রের আভাস থাকে। চিত্র সাধারণত দৃষ্টিগ্রাহ্য। কিন্তু এই সংজ্ঞায় 'চিত্র' শব্দটির অর্থ ব্যাপক— চিত্রকল্প দৃষ্টিগ্রাহ্য তো হতেই পারে, তা ছাড়া শ্রবণগ্রাহ্য, স্পর্শগ্রাহ্য, ঘ্রাণগ্রাহ্য সবই হতে পারে, এবং যেসব সংবেদন আপন শরীরের অভ্যন্তরে প্রখর অস্মিতা বোধ জাগায়, সে রকম সংবেদনও চিত্রকল্পের বস্তু হতে পারে।"[২]

কাব্যের ভাষা অনিবার্য রকমে ব্যঞ্জনাধর্মী। সৎ কবির প্রয়োগে কথাগুলি তাদের ব্যবহারজীর্ণ আভিধানিক অর্থের চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল ও গভীর দ্যোতনায় সমৃদ্ধ হয়, আর অর্থের সংবেদনশীল পাঠক মাত্রেই

জানেন যে সার্থক কাব্যের ভাষার এই ব্যঞ্জনাশক্তি সচরাচর কোনও না কোনও ইন্দ্রিয়নির্ভর অভিজ্ঞতার রূপ গ্রহণ করে। কবির আবেগ ও চিন্তা সমূর্ত হয় ধ্বনি-স্পর্শ-ঘ্রাণ-দৃশ্যে আবেদনে, অর্থাৎ যে ধ্বনিরূপ, দৃশ্যরূপ, ঘ্রাণরূপ ও স্পর্শরূপ ব্যঞ্জিত হয়েছে বাক্যের সমাবেশে তারই মধ্য দিয়ে কবির আবেগ ও চিন্তার সন্নিহিত হতে পারেন পাঠক। এই উপমা, রূপক প্রভৃতি পোয়েটিক ইমেজেই বাক্‌প্রতিমা।

একবিংশ শতকের গুরুত্বপূর্ণ কবি **অর্ঘ্য মণ্ডলের** কবিতায় অস্থির যুগসংকটের সঙ্গে সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার বহুরৈখিক চিত্রকল্প উঠে আসতে দেখছি। কিছু ব্যঙ্গ, কিছু অসহায়তা— সত্তার আকুতি নিয়ে ধরা দিচ্ছে তাঁর কবিতা। 'অগোছাল' (১৪১৫ বঙ্গাব্দ) কাব্যগ্রন্থের টানা গদ্যকবিতায় লিখছেন—

> "ওই তো সোমাঞ্জন কাকু ঘণ্টা নিয়ে বেরিয়ে আসছে... এই তো বইয়ের ব্যাগে যা ছিল সকলই খোয়া গেছে, আর শ্রেণি-শিক্ষকের মতো নামডাকার খাতা বন্ধ করে মেয়েরা আমাকে আজ পড়া ধরছে, ওইসব লাল-লাল দিদিমণি ভালোবাসবার কথা গ্যাসবেলুনের গায়ে পেস্ট করে ছড়িয়েছে আকাশে-আকাশে। ওইসব লাল-লাল দিদিমণি যেভাবে ঠ্যাং-ফাঁক করে দাঁড়িয়ে ফুচকা খাচ্ছে রাস্তায় রাস্তায়... রাস্তা থতমত খেয়ে ডেকে আনছে জাতীয় সড়ক, সড়কেরা হেসে উঠছে এই ঘটনায়, ওই তো গাছের গায়ে হেলান দিয়েছে অন্য গাছ..."[৩]

কবিতায় ব্যবহৃত চিত্রকল্পগুলির মধ্যে কবি আত্মসমালোচনার মধ্য দিয়ে ভালবাসা-বিশ্বাসের মিলনভূমিকে দেখাচ্ছেন। একবিংশ শতকের আরেক কবি **সব্যসাচী মজুমদার** 'মেঘ আর ভাতের কবিতা' (২০১২) কাব্যগ্রন্থে লিখছেন—

> "ততটা প্রাচীন তুমি অস্ত্র যত কাল...
> অসুখের চেয়ে ঘন এই ধানক্ষেতে
> ভিজেছ আদিম ভোর... ভিজেছ খবর...
> তবু কি বোঝোনি জিভ,
> জলের ছবিতে জল শুকিয়ে গেলেও আহা
> প্রেম থেকে যায়..."[৪]

'অসুখের চেয়ে ঘন এই ধানক্ষেতে'— কী অসম্ভব সাহসী চিত্রকল্প! ধানখেতের ঘনত্ব বোঝাতে কবি এখানে অসুখের প্রসঙ্গ এনেছেন। 'অসুখ'-এর বিস্তার আমাদের দেহের অভ্যন্তরীণে— অদৃশ্যত। আর ধানখেত দৃশ্যত। চিত্রকল্পের সঙ্গে পাঠককে একটা কল্পনাও এ ক্ষেত্রে করতে হচ্ছে। এই কল্পনা ও চিত্রই পাঠককে কবিতা পাঠ করার ক্ষেত্রে আকর্ষিত করে তুলছে। বুঝতে চাইবেন কবিতা অন্তর্নিহিত অর্থকে। একবিংশ শতকের কবি **বিবেকানন্দ মণ্ডল** তাঁর 'গোধূলি দহন' (২০২৩) কাব্যগ্রন্থে লিখছেন—

> "টর্চ হাতে পেলেই একটা মজার খেলা খেলতাম।
> ছোট ছিলাম তখন।
> টর্চের মুখ পাপড়ির মতো হাত দিয়ে চেপে ধরে
> আলোর সংজ্ঞা আটকাতে চাইতাম।
> কুসুম-লাল হয়ে উঠত হাত...
> এখন মুখের উপর হাসি টাঙিয়ে ব্যথা আটকাতে চাই
> অথচ প্রকৃত হাসি ফটাতে
> দাঁতের সঙ্গে ঠোঁটের সঠিক কৌণিক অবস্থান
> আনতে পারি না—ধরা পড়ে যাই!

তুমিও প্রেম আটকাতে চেয়ে উপেক্ষার দ্বারস্থ হও
কবিতাদেহে যেমন অপহ্নুতি অলঙ্কার...
এও এক আশ্চর্য খেলা!"[৫]

এই কবিতাটিতে ছেলেবেলার কথা স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে টর্চের মুখে হাত দিয়ে চেপে ধরার চিত্রকল্পের আশ্রয় নিচ্ছেন। এবং পরবর্তী জীবনে কবি যে ছেলেবেলার খেলাটির সঙ্গে হাসিটাও রেখে এসেছেন তা 'এখন মুখের উপর হাসি টাঙিয়ে ব্যথা আটকাতে চাই' পঙ্‌ক্তিতে স্পষ্ট। সমাজ ও সময় যে কবির মন থেকে আনন্দ ছিনিয়ে নিয়েছে তা পাঠক চিত্রকল্পটির কারণেই সহজে বুঝে উঠতে পারছে।

একবিংশ শতকের কবিতায় অসংখ্য কবিরা এমন চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন, যা পূর্ববর্তী শতকের কবিরা তাঁদের কবিতায় ব্যবহার করেননি। আর এখানেই ধীরে ধীরে একবিংশ শতকের কবিতা স্বতন্ত্র হতে শুরু করেছে।

দুই
বিশ্বায়নের প্রভাব

বিশ্বায়নের প্রভাব সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় বেশ গভীরভাবে পড়েছে। গ্লোবালাইজেশন-এর প্রধান উদ্দেশ্য হল, বিশ্বকে একই প্লাটফর্মে এনে দাঁড় করানো। ফলে বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার ইন্টারনেট, মোবাইল, গুগল, ফেসবুক, হোয়াটঅ্যাপ, টুইটার, ইউটিউব প্রভৃতি মাধ্যমে মুহূর্তে পৃথিবীর যে-কোনও মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ ও তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে। এইসব যোগাযোগ মাধ্যমগুলি বিশেষ করে একবিংশ শতকের কবিদের মনের মধ্যেই ফেলেছে প্রভাব। কবি **জয়দেব বাউরী**র একটি কাব্যগ্রন্থের নাম 'ট্যাগ' (২০২৩)। 'ট্যাগ' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির শিরোনাম যথাক্রমে এইরকম— 'অ্যাকাউন্ট', 'প্রাইভেসি', 'লগ ইন', 'লাইভে আসছি', 'টাইমলাইন', 'প্রোফাইল', 'স্টোরি', 'কমেন্ট', 'সেলফি', 'লাইক' ইত্যাদি। এই শব্দগুলি বহুল প্রচলিত হতে দেখি একবিংশ শতক। বিশ্বায়নের যুগে আমরা যেমন বিশ্বকে হাতের মুঠিতে পেয়েছি, তেমনই নষ্ট হয়েছে আমাদের প্রাইভেসি। 'প্রাইভেসি' শিরোনামের কবিতার "আমার নিঝুমে আর কান পাতা আছে!"[৬] পঙ্‌ক্তিতে কবি সেই ইঙ্গিতই দিয়েছেন। ইন্টারনেটের মাধ্যমে সকলের গোপনীয়তা সংগ্রহ করছে কোনও বড় কম্পানি। কবির ভাষায় 'শ্যেনদৃষ্টি' পেতে বসে আছে সেইসব সংগ্রাহকরা। আমরা স্বাধীন অথচ স্বাধীন নই। শঙ্খ ঘোষ 'আপাতত শান্তিকল্যাণ' কবিতায় লিখেছিলেন, 'পেটের আছে উঁচিয়ে আছো ছুরি/ কাজেই এখন স্বাধীনমতো ঘুরি।' ভাবছি আমরা মুক্ত, কিন্তু পায়ে বাঁধা আছে অদৃশ্য শিকল।

কবি **বঙ্কিম লেটে**র কবিতাতেও বিশ্বায়নের ছাপ লক্ষ করা যায়। 'মমি' কাব্যগ্রন্থের প্রবেশক কবিতাতে লিখছেন—

"আমি এই লাক্ষাগ্রহে তোমাকে হাতড়াই
হান্ড্রেড পারসেন্ট বার্ন নিয়ে রোজ নিদ্রা যাই"[৭]

'লাক্ষাগ্রহ' মহাভারত থেকে তুলে আনা শব্দ। দুর্যোধনের নির্দেশে পুরাচন তৈরি করেছিলেন লাক্ষাগ্রহ। যেখানে পাণ্ডবদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ কবি ভস্মের মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছেন তাঁর প্রিয়জনকে। তাকে না পেয়ে হান্ড্রেড পারসেন্ট বার্ন নিয়ে অর্থাৎ পুড়ে যাওয়া ত্বক নিয়ে কবি নিদ্রা যায়। 'হান্ড্রেড পারসেন্ট বার্ন' কথা কবি ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছেন বিশ্বায়নেরই ফলে। কবি জয়দেব বাউরী তাঁর সাম্প্রতিক একটি কবিতায় মানুষের জীবনকে সোশ্যাল মিডিয়ার ভাষা ট্যাগের সঙ্গে অপূর্ব বন্ধনে জড়িয়েছেন। এখানে কবির ভাবনার ব্যাপ্তি সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। বিশ্বায়নের একটি বড় মাধ্যম হল মিডিয়া। ফেসবুক, হোয়াটঅ্যাপের যুগে দেশের অতি গোপনীয় কথাও এখন আর সংগোপনে থাকতে পারে না। কাউকে আবার জনপ্রিয়তার

শিখরে পৌঁছে দিতে যেমন পারে, তেমন আবার মাটিতে ফেলতেও পারে এই মিডিয়া। বিশ্বায়নের ফলে একবিংশ শতকের কবিতার স্বরূপকে পালটে দিচ্ছে সন্তর্পণে।

তিন

স্মৃতিচারণা

একবিংশ শতকের কবিতায় স্মৃতিচারণার ব্যাপারটি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অনেক কবিই স্মৃতিমন্থনে বিভোর। মানুষ আনন্দ পেলে পূর্বস্মৃতি অনেক সময় মনে করে সেই আনন্দের মাত্রা আরও বাড়িয়ে তোলে। অন্যদিকে মানুষ যখন দুঃখ পায় তখন বর্তমানের বিষাদকে সাময়িক লাঘব করার জন্য স্মৃতিমন্থনে চলে যায়। মনে করার চেষ্টা করে পূর্বের কোনও মনরাঙানো মুহূর্ত। এবং পূর্ব-সোনালি দিনগুলোকেই স্মৃতিতে আনার চেষ্টা করে।

অসমের কবি **সুতপা চক্রবর্তী**র 'ভ্রমরযান' (২০২৪) কাব্যগ্রন্থের কিছু কবিতায় উঠে আসছে স্মৃতিচারণা।

> "ঠাকুমারে লইয়া দুনিয়া ঘুরি। ব্যাটা-ঘোড়ার গাড়ি লই। কমটি বান্ধিয়া গুয়া লই। চাল মুড়ি চিঁড়া খই। উড়তে উড়তে দিঘিতে যাই। সারা বছরের জল খাই। সাজি মাটি ঘষিয়া দেই। মাথার চুলে মারে খেই। আরও উড়ি দুইজনে। বনেবাদাড়ে মনে-মনে। চলো, চলো তৈয়ার হও। শাড়ি পরো, সিন্দুর পরো। ব্যাটা-ঘোড়ার গাড়ি আইছে। তোমার দেশের লোক আইছে। দুগ্‌গা দুগ্‌গা হর হর। দুগ্‌গা দুগ্‌গা হর হর। আলতা পরো, সিন্দুর পরো। তোমার দেশের লোক আইছে। ব্যাটা-ঘোড়ার গাড়ি আইছে। তোমার দেশের লোক আইছে। ভ্রমর, ভ্রমর গো, ঠাকুমার দেশের ঘোড়া আইছে। ঠাকুমার দেশের লোক আইছে।"[৮]

ঠাকুমার ছেড়ে আসা দেশের স্মৃতিকথা কবির মনে ফিরে ফিরে আসছে কবিতাটিতে। ফেলে জন্মভূমির স্মৃতি ঠাকুমাকে কাতর করে তোলে। কবির ইচ্ছা ঠাকুমাকে ঘোড়ার গাড়ি করে সেই জন্মভূমিতে পাঠাবে। দেশের লোক অর্থাৎ যেখানে সেই ব্যক্তি বেড়ে উঠেছেন। যে দেশের লোকটি এসেছে তার সঙ্গে কবি ঠাকুমাকে পাঠিয়ে দিতে চান শাড়ি ও সিন্দুর পরিয়ে। ফিরে আসুক ঠাকুমার পুরোনো দিন।

কবি **অমিত সাহা** স্মৃতিচারণা করেই লিখছেন—

> "একটি সরলরেলা
> কতখানি কষ্টে বৃত্ত হয়,
> তুমি কেন্দ্র-বিন্দু হয়ে
> সেকথা জানতে পারলে না!
> জানতে চাওনি
> ভাগ্যবলে হয়ে গেছ
> প্রেমিকার টিপ!
> যে কপালে আঁকা আছে
> ঘামেদের অনুবাদ,
> সে কপাল বুঝে গেছে
> প্রতিটি সকাল কেন পাগল-প্রধান!
> দুটি সরলরেখার কোল বেয়ে দুটি প্ল্যাটফর্ম,
> সবুজ বিষাদ আর
> পলাশ রঙের অভিমান..."[৯]

একটু কবিতাটির গভীরে গেলে বুঝতে পারব যে কবি তার প্রেমিকার স্মৃতিচারণা করছেন। প্রেমের পথ যদি সরলরেখা হয় তবে তার পরিণতি বাঁকা হতে হতে বৃত্ত হয়ে ওঠে। প্রেমিকার কপালের বৃত্তাকার টিপ মনে এলে কবির বোঝে এটাই তার পরিণতি। আর কবিহৃদয় পাগল হয়ে ওঠে প্রতিটি সকালে। 'পলাশ রঙের অভিমান' বলতে এখানে প্রেমিকার টিপের রঙকেই বুঝিয়েছে। একবিংশ শতকের কবি **বিবেকানন্দ মণ্ডল** 'খেলা' কবিতায় লিখছেন ছোটবেলার স্মৃতির কথা। ছেলেবেলার স্মৃতিতে কবির মিশে আছে একটি খেলার ছবি। যা তাকে আনন্দ দিত। বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সময় ও সমাজের চাপে সেই আনন্দ কবির জীবন থেকে বিস্মিত হতে থাকে। আগেই বলেছিলাম যে স্মৃতি দুটি কারণে আসে এক. আনন্দ থেকে; দুই. দুঃখ থেকে। এখানে বেদনাই কবিকে ছেলেবেলার স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। একবিংশ শতকের স্বরূপ এই স্মৃতিচারণা থেকেও পেয়ে থাকি।

চার

পুরাণ-প্রসঙ্গ

একবিংশ শতকের বাংলা কবিতায় পুরাণ প্রসঙ্গ উঠে আসতে দেখা যায় বেশ কয়েকজন কবির লেখায়। এর আগের শতকের কবিরাও পুরাণ প্রসঙ্গ এনেছেন ঠিকই, কিন্তু একংবিশ শতকের লেখরা তাদেরকে স্মরণে রেখেই অন্যরকমভাবে উপস্থাপন করছেন।

সাম্প্রতিক কবি **রুমা তপাদার**-এর 'বালিকাপুরাণ' (২০২৩) নামে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এই কাব্যগ্রন্থে প্রতিটি কবিতার বিষয় হিসেবে কবি পুরাণের নারীদেরকেই সামনে রেখেছেন। মিথ-পুরাণকে আত্মস্থ করে নিজের উপলব্ধির কথা তিনি লিখেছেন। কবিতা শিরোনামগুলিও রেখেছেন পুরাণের নারীদের নামকরণে। যেমন— 'দুর্গা', 'বিষ্ণুপ্রিয়া', 'শিখণ্ডী', 'মন্দোদরী', 'মেনকা', 'তুলসী', 'শূর্পনখা', 'দ্রৌপদী', 'বড়াই' প্রভৃতি। 'শকুন্তলা' নামক কবিতায় লিখছেন—

> "এসো মহারাজ, অপেক্ষা জন্মের
> যে যার পথের বাঁকে হারিয়ে যাবেই জেনো
> বাসর সংসার সব নতুন যা-কিছু আছে তারা
> ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়বে ঠিকঠাক সময়মতো
> এত দুঃখ এত কান্না এতটা যন্ত্রণা খেদ ক্লান্তি
> গলার সমস্ত শিরা টানটান দাঁড়িয়ে গেছে
> এখন কান্নায় শব্দ নেই জড়িয়ে পড়েছে ক্লান্ত স্বর
> বুকে কোনও নদী নেই হাড় মাংস নুনছাল সার
> আঙুলের দিকে নয় তাকাও চোখের দিকে
> এই অভিজ্ঞানে মনে কি পড়ে না বলো আমাকে তোমার?"[১০]

কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের শকুন্তলা চরিত্রের বেদনার কথা বাঙালি পাঠক সবাই জানেন। সেই চরিত্রের বেদনার কথা বর্ণনা করে কবি আসলে তার জীবনের না পাওয়া কোনও খেদের কথা কবিতায় তুলে ধরেছেন। তিনি বলছেন, শকুন্তলার সারা জীবনের দুঃখের কথা অভিজ্ঞান হয়ে আছে আমার চোখে; যে চোখের দিকে তাকালে প্রিয় মানুষটির জন্য আলাদা করে কোনও অভিজ্ঞান বস্তু বহন করে আনতে হবে না। এইভাবেই প্রতিটি কবিতা কবি রুমা তপাদার তাঁর কবিতায় আধুনিক ভাষায় তুলে ধরেছেন।

কবি **ফাল্গুনী ভট্টাচার্য** ও কবি **বিবেকানন্দ মণ্ডল** চর্যাপদ ও বৈষ্ণব পদাবলি নিয়ে যে কাজটি করেছেন তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। প্রথমে আসি ফাল্গুনী ভট্টাচার্যের 'আ লো ডোম্বী' (২০২১) কাব্যগ্রন্থ প্রসঙ্গে। তিনি চার্যাভাষা আয়ত্ত করে পুরো কাব্যগ্রন্থটিই রচনা করেছেন চর্যাপদের ভাষায়। একটি উদাহরণ তুলে দেওয়া হল—

"শ্রীশ্রীবজ্রযোগিন্যৈ নমঃ
রাগ: ভৈরবী
(ফাল্গুনীসহজসিদ্ধাবিরচিতম্।)
বিষয় কামনা দূর গেলঅ।
বাঢ়ল মহাসুহ আশ॥১
উপবীঅ ছিণ্ডিআঁ লেলি।
চণ্ডালি সমএ সহবাস॥২
নাচন্তি চণ্ডালি বউকখে।
আশ্রু বহই চউকখে॥৩
ভণই ফাল্গুনী কান্দএ।
নিমজিঅ সহজানন্দে॥৪"[১১]

কবি চর্যার ভাষাটুকু শুধু নিচ্ছেন। এবার নিজের ভণিতা যুক্ত করে বৌদ্ধদর্শনের কথা বলেছেন। কাব্যগ্রন্থের মধ্যে চর্যাভাষাতে লেখা কবিতাগুলির ভাবানুবাদও করে দিয়েছেন ছন্দে। যেভাবে 'মহাভারত' ও 'রামায়ণ' যুগে যুগে নতুন ব্যাখ্যা নিয়ে হাজির হয়, তেমনই কবি ফাল্গুনী ভট্টাচার্য চর্যাপদকে নতুনভাবে কাব্যের মাধ্যমে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করছেন।

কবি **বিবেকানন্দ মণ্ডল** এই কাজটিই করেছেন, তবে বৈষ্ণব পদাবলিকে স্মরণে রেখে। তিনি মূলত বিদ্যাপতির ব্রজবুলি ভাষাকে আধার করেছেন কাব্য রচনার ক্ষেত্রে। তাঁর কাব্যগ্রন্থটির নাম 'পদাবলীক্ষতপরিক্রমা' (২০২২)। 'পূর্বরাগ', 'রূপানুরাগ', 'অনুরাগ', 'মিলন', 'অভিসার', 'আক্ষেপানুরাগ', 'মাথুর', 'রাস', 'ভাবসম্মিলন', 'ভাবোল্লাস' পর্বগুলিকেই কাব্যের মধ্যে তুলে ধরেছেন ব্রজবুলি ভাষাতে। বিবেকানন্দ মণ্ডলও ফাল্গুনী ভট্টাচার্যের মতো কবিতাগুলিকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন নিখুঁত ছন্দে।

"আজু হাম কৈছে রজনী গোঙায়ব
বঁধু হে, তুয়া দরশন বিসরিতে নারি।
তোঁহারি ভাবনারাশি, অযুত কুলিশ আসি
উজলিল সকল আন্ধিয়ারি।...
(পূর্বরাগ)
আজি কেমনে রজনী কাটাইব?
তব দরশন-সুখ কেমনে ভুলিব?
অযুত কুলিশ সম তোমারই ভাবনারাশি
রাতের আঁধার মোর উজলিল আসি। ...
(অনুবাদ)"[১২]

একবিংশ শতকে এসে রাধার পূর্বরাগের চঞ্চলতাকে তুলে ধরতে কবি পদাবলিই ভাষাকে ব্যবহার করছেন। পুরাণপ্রসঙ্গ এভাবেই একবিংশ শতকের কবিতার স্বরূপকে আমাদের সামনে লিপিবন্ধ করছে।

পাঁচ

প্রেম প্রসঙ্গ

পৃথিবীর এক অবিনশ্বর অনুভূতির নাম প্রেম; এক স্বর্গীয় চেতনার উপলব্ধি প্রেম। আর প্রেমী? তিনি কে? তিনি, নারী বা পুরুষের অবয়বে— প্রেমের আধার। প্রেম অবিনশ্বর। প্রেমী অবিনাশ। বাংলা কাব্য-সাহিত্যে প্রেমের

কবিতা বলা যায় তার জন্মলগ্ন থেকেই শুরু হয়েছে। কাব্যালোচনা করলে দেখা যাবে বাংলা কাব্যে প্রেমের স্বরূপ তার ঐতিহ্যকে ধরে রেখেই বদলেছে প্রতিটি দশকে। বদল ঘটেছে একবিংশ শতকেও।

কবি **সুকৃতি সিকদার** তাঁর 'ভবঘুরে এক তৃণভোজী' (১৪১৭ বঙ্গাব্দ) কাব্যপুস্তিকায় লিখছেন—

"যতটাই সৎ আমি ততটাই ঘোর মিথ্যাবাদী
প্রেমের আকুতি জানে আমার আসল পরিচয়
একটার পর আরেকটা পাথর ফেলছি
কৃপণ জলের বালতিতে।
যেহেতু সবুজ পাতারাই আলোকের সাথে
সরাসরি কথা বলে, তাই
স্থির থাকলেও তারা আমাদের পথ প্রদর্শক।..."[১৩]

কবি জানেন প্রেমের গভীরতা। তিনি সৎ ও মিথ্যাবাদী বলে নিজেকে স্বীকার করে কৃপণ বালতিতে পাথর ফেলে যাচ্ছেন। কৃপণ বালতি একটা আধার। বলা যায় মনের আধার। সেই আধারের আয়তন যদি ক্ষুদ্র হয় তবে বৃহৎ প্রেমকে আশ্রয় দিতে সক্ষম হবে না। একবিংশ শতকের কবি সুকৃতি সিকদার বলছেন সবুজ পাতা যেমন আলোকের সঙ্গে কথা বলে, অর্থাৎ আলো ও পাতার যেরূপ সম্পর্ক, তেমনই হতে হবে মানব-মানবীর প্রেম।

কবি **রাখী সরদার** 'শস্য ভেজা চোখের দোহাই' (২০২১) কাব্যগ্রন্থে লিখছেন—

"বিরহী পাখিও জানে আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে
উড়ন্ত চুমুর শব্দে উনিশবতী বৃষ্টি নেমে আসে,
মাধবী টিলার ধারে মেঘ নৃত্যে অবুঝ চিকুর
এখন রাধিকা নামে মধুপুরে নেমেছে শ্রাবণ
ধরো যদি প্রিয় ঠোঁট ডুবে যায় ডাহুক বেলায়
দেহের ভণিতা ছেড়ে খুঁজে নিয়ো শুশুক খেলায়।"[১৪]

প্রেমে পূর্বরাগ, অভিসার, আক্ষেপানুরাগ, বিরহ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় স্তর। রাখী সরদারের উক্ত কবিতায় অভিসার চমৎকারভাবে উঠে এসেছে। অভিসার মিলনকে খুঁজতে থাকে। 'উনিশবতী বৃষ্টি' বলতে কবি উনিশ বৎসরের যুবতী নারীকেই বুঝিয়েছেন। শ্রাবণ প্রসঙ্গে বোঝা যায় এখানে বর্ষাভিসারের কথা বলতে চাচ্ছেন। শেষ দুটি পঙ্‌ক্তিতে কবি দুটি প্রাণীর কথা বলেছেন— এক. ডাহুক, দুই. শুশুক। 'ডাহুক বেলা' বলতে সন্ধ্যাকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর মিলন প্রসঙ্গে 'শুশুকের খেলা'র কথা বলছেন। 'শুশুক' একটি স্তন্যপায়ী জলজ প্রাণী। এই প্রাণীটি জলের মধ্যে নানান ভঙ্গিতে বিচরণ করে, যাকে কবি খেলার আখ্যা দিচ্ছেন। শুশুকের মতো প্রেমের খেলাতে মেতে উঠতে বলছেন। এই ধরনের প্রাণীর প্রসঙ্গ এনে প্রেমকে বর্ণনা করে একবিংশ শতকে আগের শতকের থেকে ক্রমশ আলাদা হচ্ছে বলে আমার মত।

কবি **রুমা তপাদারের** 'ধুলোমাটির সংলাপ' (২০২৪) কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি কবিতাই প্রেমের কবিতা। তিনি লিখছেন—

'চুল খুলিস না সর্বনাশী'
খরিশ সাপের বিষ ঢেলেছ হৃদয় জুড়ে
শরীরে শরীর দিয়ে তাই ছুঁয়ে দেখোনি আমাকে
পাছে বিষ লেগে যায় ঘোর মৃত্যু প্রত্যহ কান্নায়...

তার কত পরে দেখো বেঁচে আছি পেখম মেলেছি ধীরে ধীরে
এখন মেঘের কান্না: 'সোহাগ নাচত' ডেকে বলে কান্না-নাশিনী এক্ষুনি কাছে আয়"[১৫]

রুমা তপাদারের প্রেমের কবিতাতে 'আহ্বান' থাকে। যদিও আহ্বান না থাকলে প্রেমের ঘনত্ব থাকে না। 'খরিশ সাপের বিষ' আসলে তীব্র প্রেমের কথাই বলা হচ্ছে। অন্যপিঠের মানুষটি তাকে ছেড়ে গেলে কথক আবারও ধীরে ধীরে পেখম মেলেছে। চলে যাওয়া সেই মানুষটিকে দেখলে এখনও তার কাছে যেতে কথক প্রস্তুত। সে জানে আবার তাকে ছেড়ে চলে যাবে আমার কাঙ্ক্ষিত মানুষটি। যে কারণে শেষ পঙ্‌ক্তিতে তাকে ডাকছে 'কান্না-নিশিনী'-তে। এক তাকে পেয়ে এই রাত কান্নায় ভরে গেছে, আবার তার চলে যাওয়াতেও এই রাত 'কান্না-নিশিনী' হয়ে যাবে। আহ্বান ও তাকে পেয়ে আবার বিচ্ছেদ আবহমান। ফলে এই প্রেমের চিরন্তর সত্যকেও একবিংশ শতকের কবিতায় আমরা দেখতে পাচ্ছি।

ছয়

স্বীকারোক্তিমূলক কবিতা

আগের শতকেই স্বীকারোক্তিমূলক কবিতা আমাদের নজরে এলেও একবিংশ শতকের কবিতা স্বীকারোক্তিমূলক কবিতা লিখেছেন নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। এ সমস্ত কবিতায় কবি নিজে উত্তম পুরুষে তাঁর স্বীকারোক্তি পেশ করছেন। এই স্বীকারোক্তি ধরা পড়ছে কখনও তাঁর দুর্বলতা— কখনও-বা অন্য কোনও গোপনীয় বিষয়। এখানে কবি পুরোপুরি সত্যের মুখোমুখি এসে দাঁড়ান, ফলে কবির মনটা থাকে অনেক সরল।

কবি **অর্ঘ্য মণ্ডল** অকপটে স্বীকার করছেন তাঁর জীবন-যন্ত্রণার কথা। 'অগোছাল' (১৪১৫ বঙ্গাব্দ) কাব্যগ্রন্থের প্রবেশক কবিতায় লিখছেন—

"কাউকে দেখেছ আমার মতন হেসে
শরীরে মাখছে চাবুকাঘাতের গতি
অনেক দিনের অভিমান মুছে ফেলে
জীবনের ভাঁজে লুকিয়ে রাখছে নদী..."[১৬]

কবি স্বীকারোক্তি দিচ্ছেন, এই জীবন চাবুকাঘাতের মতো নির্মম বাস্তব। যে বাস্তবের সঙ্গে লড়াইয়ে তিনি প্রতিনিয়ত হেরে যাওয়া মানুষ। তবু তিনি অভিমান লাঞ্ছনা ঝেড়ে ফেলে নদীকে জীবনের ভাঁজে লুকিয়ে রেখেছেন। নদী অর্থাৎ জীবনমুখীনতার ইঙ্গিত দিচ্ছেন। 'হলুদ, তোমাকে' (২০০৩) কাব্যগ্রন্থের প্রবেশক কবিতাতেও দেখি এমনই দর্শন।

"অন্ধ বালক পথ ফুরোতে যেটুকু বেশি সময় নিচ্ছে
সেটাই আমার বসন্ত, যার মধ্যে ঢুকে
অরণ্যানল চুকুম দিয়ে
ঠান্ডা করে দিচ্ছ হিংসা, আর মণিদ্বীপ পরমততোষে
তোমার আমার মধ্যে দিয়ে উড়ে যাচ্ছে
ভ্রান্তিবিহীন শূন্য দিকে— চাওনি। তবু
এটাই তোমার জন্য
মহাকাল দিয়েছেন"[১৭]

যারা চোখে দেখতে সক্ষম তারা রাস্তা পেরোতে পারে দ্রুত, কিন্তু দৃষ্টিহীন মানুষের রাস্তা পেরোতে একটু সময় লাগে বেশি। কেউ কেউ হয়তো হাত ধরে পার করে দেয়। কবি বলছেন ওইটুকুই আমার বসন্ত। অর্থাৎ তাঁর

জীবনের আনন্দঘন মুহূর্ত খুব ক্ষীণ সময়ের জন্য আসে। সময়, সমাজ ও রাজনীতি কবিকে জীবনের অফুরন্ত বসন্তের সন্ধান না দিয়ে দাঁড় করিয়েছে কঠিন বাস্তবতার সামনে। যেখানে নেই কোনও মনোরম বাতাস।

কবি **রাখী সরদার** লিখছেন—

"আমার তো ডাকনাম ছিল না কিছুই কোনওদিন
অথচ প্রকাশ্যে তুমি, ডাক দিলে শোনো কুচিপুড়ি
মুহূর্তে ভিতর স্রোতে উন্মাতাল সহাগিনী নদী,
অবোধ লাবণ্য পাখি দুরু দুরু পালক ভেজায়

অভিমানে ছোঁয়াছুঁয়ি, কেঁপে ওঠে আড়ষ্ট আঙুল
তুমি বুঝি জাদু জানো! জমাট পাথরে ফোটে ফুল।"[১৮]

ডাকনাম বাঙালি সমাজে আদরের চিহ্নস্বরূপ। 'কুচিপুড়ি' ডাকনামে তাই কবির হৃদয় দুলে ওঠে। ভালবাসা সোহাগে মনের ভেতরের নদী উন্মাতাল হয়ে ওঠে। কবি বলেন, 'তুমি বুঝি জাদু জানো!'। এ যেন প্রেমের পূর্বরাগের কবির স্বীকারোক্তি।

কবি **অমিত সাহা** 'শূন্যতার আরও কাছে আসি' (২০১৮) লিখছেন—

"কর্মব্যস্ত একটা দিন যেমন টাটকা শোক ভুলিয়ে রাখতে পারে
ঠিক তেমনই অসীমের আভিজাত্যে মুগ্ধ হতে হতে
নিজেকে অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়। অহম্ মিলিয়ে যায়... "[১৯]

কবির কর্মব্যস্ত জীবন যেমন শোককে ভুলিয়ে রাখে, তেমনই অসীমের আভিজাত্য অর্থাৎ বিস্তৃতি দেখে নিজেকেই অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়। সকলেই ভাবে এই সমাজের জন্য আমি খুবই প্রয়োজনীয় অংশ। কিন্তু অনন্তের দিকে তাকালে, এ বিশ্বের দিকে তাকালে—বোঝা যাবে আসলে আমরা না থাকলেও পৃথিবীর বিন্দুমাত্র ক্ষতি হত না। তাই কবি বলছেন, 'অহম্ মিলিয়ে যায়...'। কবি এখানে জাগতিক সত্যের উপলব্ধির কথা তুলে ধরতে চাইছেন।

কবি **তমাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের** লেখাতে স্বীকারোক্তিমূলক কবিতা অনেক বেশি করে আমরা পাচ্ছি। 'যে জন রহস্য জানে' (২০২১) কাব্যগ্রন্থে তিনি লিখছেন—

"বাবা, বাবা, চুপ করো! আমি খুব একা হয়ে গেছি...
ধনুক আমার হাতে আজ আর মানাচ্ছে না, জানো?"[২০]

কবি নিসঙ্গ হয়ে আশ্রয় খুঁজেছে বাবার কাছে। কবির পিতা কবিকে শুধু নির্দেশ দিয়ে গেছেন একের পর এক, আর কবি তা পালন করতে করতে ক্লান্ত। তাই বলছে 'আমি খুব একা হয়ে গেছি...'। যে সন্তানকে যোদ্ধা হয়ে ওঠার কথা ছিল, যার জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার কথা ছিল— তার হাতে আজ ধনুক মানাচ্ছে না। কারণ, কবির বয়স হচ্ছে আর ভেতরে ভেতরে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন।

এইভাবে স্বীকারোক্তিমূলক কবিতার বহু উদাহরণ দেওয়া যায়। প্রতিটি কবিই তার কাব্যে কোনও না কোনওভাবে নিজের কথা বলেছেন। একবিংশ শতকের কবিদের মধ্যে এই প্রবণতা অনেক বেশি দেখতে পাচ্ছি আমরা। সেখানে নিজের অন্তরের কথা বলতে চাইছেন বাস্তবকে নিরীক্ষণ করে মননের সঙ্গে। আর আমাদের চোখে ধরা দিচ্ছে একবিংশ শতকের কবিতার অন্তরের স্বরূপটা।

বাংলা কবিতার কালান্তরের ইতিহাসে ষাটের দশক পঞ্চাশের দশকের মতো পুষ্টিকর ছিল না। এই দশকের তরুণ কবিদের যাত্রা শুরু হয়েছিল কয়েকটি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। এবং এই আন্দোলন সাহিত্যে খুব একটা ফলপ্রসু হয়েছিল বলে মনে হয় না। ট্রামভাড়া বৃদ্ধি আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলনে উত্তাল ছিল সারা দেশ। এই

আন্দোলনের প্রভাব পড়ল সমকালীন তরুণ কবি সমাজে— ফলে তাঁরাও বাংলা কাব্যে কয়েকটি আন্দোলন আনার চেষ্টা করেছিলেন। এই সময়ে 'হাংরি কাব্য আন্দোলন' ও 'শ্রুতি আন্দোলন' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাংলা কবিতার গতি এইভাবেই সত্তরের প্রস্তুতিপর্ব কাটিয়ে উন্মেষ আশি'তে এসে পৌঁছল। কবিতা নিয়ে নতুন ভাবনা-চিন্তা শুরু হল এই পর্বেতে এসে। একথা অত্যুক্তি নয় যে, কবিতার জন্য একবিংশ শতকের কবিরাও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। হয়তো তাঁদের এই Experiment সর্বদা সার্থক হয় না। কিন্তু সাম্প্রতিক কবিদের জ্ঞানের ভাণ্ডারটি বেশ সমৃদ্ধ বলেই আমার মনে হয়। পরিপুষ্ট তাঁদের চেতনার রাজ্যটিও।

চেতনার এই রাজ্যে সাম্প্রতিক কবিতাগুলি এক অভিনব আত্ম-উপলব্ধির জগতে প্রবেশ করে এক অদ্ভুত আনন্দরস প্রবাহিত করে। যে রসের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে ধরা পড়ে এই সময়ের কবিতার 'নতুন রূপ, নতুন চেতনা'। এই রূপ কামনার, বাসনার; এই চেতনা অবগাহনের, উত্তরণের। এই যাত্রা চলছে নিজস্ব চালে, আপন গতিতে।

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা চায় যুক্তির সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি পেতে, সে অবলীলায় চলে যেতে চায় প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে। বহুমাত্রিকতা তার জঠরে বহন করে সে হতে চায় এ যুগের 'নীলকণ্ঠ'। বিশ্বায়ণের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে নতুন নতুন শব্দজোট সৃষ্টি করে সাম্প্রতিক কবিতা। আবার ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা রাখতেও সে কুণ্ঠিত হয় না। এখানেই সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার বিশালতা। উদার হৃদয়ে সে ঠাঁই দিয়ে চলেছে নবাগত রূপ-চেতনা।

একবিংশ শতকের কবি যখন কবিতা লেখেন, তখন তাঁর মর্মের শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতম বিন্দুটি কবিতার মধ্যে রেখে দিতে চান। রেখে যেতে চান, এক আশ্চর্য সঞ্জীবনী শক্তি। যে শক্তির সুধা পান করবে বর্তমান ও ভবিষ্যত বিপুল পাঠককুল। কবি একরকম নিজেকে নিঃশেষ করে পাঠকের জন্য রেখে যান তাঁর সারা জীবনের একটি একটি করে গেঁথে তোলা মালার সমগ্রতা। এই সমগ্রতা নিয়েই সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার যাত্রা শুরু হয়েছে।

তার এই যাত্রা অভিনব, স্বতন্ত্র তার ভঙ্গি; চিত্তাকর্ষক তার প্রকাশভঙ্গিমা। বহু অভিজ্ঞত প্রজ্ঞা থেকে সাম্প্রতিক কবিরা তাঁদের কাব্যের পরিকাঠামোটি সৃষ্টি করেন একজন সার্থক স্রষ্টার মতো। তাতে যে সকলেই সফলতা পায়, এমন মত জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। তবে অনেকাংশেই যে তা চিত্তকে হরণ করছে, সে বিষয়ে সুচিবায়ুগ্রস্থ হওয়ার কারণ দেখি না।

'সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন জ্ঞানের বিষয় নয়, তা ভাবের বিষয়' কথাটি মেনে নিলে সাম্প্রতিক কবিতার অভিনব রীতিগুলিকে কোনওভাবেই নস্যাৎ করে দেবার উপায় থাকে না। কেননা, এটা সকলেই জানে যে, জ্ঞানের কথাকে প্রমাণ করতে হয়, আর ভাবের কথাকে সঞ্চার করে দিতে হয়। তার জন্য নানাপ্রকার আভাস-ইঙ্গিত, নানাপ্রকার ছলাকলার দরকার হয়। তাকে কেবল বুঝিয়ে বললেই হয় না, তাকে সৃষ্টি করে তুলতে হয়। সাম্প্রতিক বাংলা কবিতাগুলির নিবিড় পাঠে আমরা এর সত্যতা অনায়াসে পেয়ে যাই। একে শুধুমাত্র গ্রহণ করার শক্তি ও মানসিকতা থাকতে হবে।

একবিংশ শতকের বাংলা কবিতার মধ্যে অরিজিন্যালিটি খুঁজে পাওয়া শক্ত নয়। একটু গভীর মননের সাথে যদি আমরা সাম্প্রতিক কবিতাগুলি পাঠ করি, তাহলে বহু সাম্প্রতিক কবিতার মধ্যে অভিনবত্ব আমরা দেখতে পাব। আলোচিত অভিসন্দর্ভে আমরা দেখেওছি তাই। সাম্প্রতিক বাংলা কবিতাকে অবহেলায় আমরা দূরে সরিয়ে রেখে, নিজেরাই মূল্যবান কোনও কিছু থেকে যে বঞ্চিত হচ্ছি, এই বোধ আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ

করালে আমাদের তথা সাহিত্যের মঙ্গল হবে। একটা সত্য যেন আমরা না ভুলি যে, কবিতা আমাদের কাঁদায় না; কবিতার জন্ম আনন্দ দিতে, রস দিতে।

তথ্যসূত্র:

১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। সাহিত্যের পথে। 'সাহিত্যে নবত্ব'। বিশ্বভারতী, পৃ. ৮৬।
২। দাশগুপ্ত, ধীমান। সিনেমায় ইমেজ। কলকাতা: বাণীশিল্প, ২০০৪, পৃ. ২৬।
৩। মণ্ডল, অর্ঘ্য। অগোছাল। 'বাড়ি ফেরার কবিতা'। বনগাঁ: ফসিল। ১৪১৫ ব., পৃ. ৩২।
৪। মজুমদার, সব্যসাচী। মেঘ আর ভাতের কবিতা। 'আমন', ২০১২, পৃ. ১৪।
৫। মণ্ডল, বিবেকানন্দ। গোধূলি দহন। 'খেলা'। বনগাঁ: কবিতা আশ্রম প্রকাশন, ২০২৩, পৃ. ২০।
৬। বাউরী, জয়দেব। ট্যাগ। 'প্রাইভেসি'। বনগাঁ: কবিতা আশ্রম প্রকাশন, ২০২৩, পৃ. ১৪।
৭। লেট, বঙ্কিম। মমি। 'প্রবেশক কবিতা'। বনগাঁ: কবিতা আশ্রম প্রকাশন, ২০২৪, পৃ. ৯।
৮। চক্রবর্তী, সুতপা। ভ্রমরযান। 'ভ্রমরযান ৩৯'। গুয়াহাটি: বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি-সমাজ, ২০২৪, পৃ. ৪৫।
৯। সাহা, অমিত। একট মিলন দাবি। 'সরল কবিতা'। বনগাঁ: কবিতা আশ্রম প্রকাশন, ২০২০, পৃ. ১৫।
১০। তপাদার, রুমা। বালিকাপুরাণ। 'শকুন্তলা'। বনগাঁ: কবিতা আশ্রম প্রকাশন, ২০২৩, পৃ. ৪৫।
১১। ভট্টাচার্য, ফাল্গুনী। আ লো ডোম্বী। বনগাঁ: কবিতা আশ্রম প্রকাশন, ২০২১, পৃ. ৯।
১২। মণ্ডল, বিবেকানন্দ। পদাবলীক্ষতপরিক্রমা। 'পূর্বরাগ'। বনগাঁ: কবিতা আশ্রম প্রকাশন, ২০২২, পৃ. ১০।
১৩। সিকদার, সুকৃতি। ভবঘুরে এক তৃণভোজী। 'যাদুকর'। হুগলি: মন্থন প্রকাশনা, ১৪১৭ ব., পৃ. ৭।
১৪। সরদার, রাখী। শস্য ভেজা চোখের দোহাই। 'শস্য ভেজা চোখের দোহাই ৫'। বনগাঁ: কবিতা আশ্রম প্রকাশন, ২০২১, পৃ. ১৩।
১৫। রুমা তপাদার। ধুলোমাটির সংলাপ। 'ধুলোমাটির সংলাপ বারো'। বনগাঁ: কবিতা আশ্রম প্রকাশন, ২০২৪, পৃ. ২২।
১৬। মণ্ডল, অর্ঘ্য। অগোছাল। 'প্রবেশক কবিতা'। বনগাঁ: ফসিল, ১৪১৫ ব., পৃ. ৯।
১৭। অর্ঘ্য মণ্ডল। হলুদ, তোমাকে। 'প্রবেশক কবিতা'। বনগাঁ: ফসিল, ২০০৩, পৃ. ৯।
১৮। সরদার, রাখী। শস্য ভেজা চোখের দোহাই। 'শস্য ভেজা চোখের দোহাই ২০'। বনগাঁ: কবিতা আশ্রম প্রকাশন, ২০২১, পৃ. ২৮।
১৯। সাহা, অমিত। শূন্যতার আরও আছে আসি। 'অহম্ আবাম্ বয়ম্'। বনগাঁ: কবিতা আশ্রম প্রকাশন, ২০১৮, পৃ. ২৬।
২০। বন্দ্যোপাধ্যায়, তমাল। যে জন রহস্য জানে। 'যে জন রহস্য জানে'। বনগাঁ: কবিতা আশ্রম প্রকাশন, ২০২১, পৃ. ১১।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1256-1264
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.345

পাতঞ্জল যোগ দর্শনে চিত্তবৃত্তি নিরোধ: একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ

নাড়ুগোপাল প্রসাইত, *স্বাধীন গবেষক, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 16.02.2026; Accepted: 19.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Yoga philosophy is one of the six orthodox (Āstika) schools of Indian philosophy, whose theoretical foundation is laid out in the Yoga Sūtra of Patanjali. The central concept of this philosophical system is Citta-vṛtti-nirodha, which is regarded as the fundamental definition of Yoga. The present research paper aims to examine and interpret the concept of Citta-vṛtti-nirodha in Patanjali's philosophy from a philosophical perspective. In the Yoga Sūtra, Patanjali defines Yoga as: "Yogaś citta-vṛtti-nirodhaḥ," meaning "Yoga is the cessation of the modifications of the mind." Taking this definition as its point of departure, the study raises several important questions: What is Citta? What is meant by Citta-vṛtti? By what means can the cessation of these mental modifications be achieved? And what is the ultimate outcome of such cessation? The principal objective of this paper is to analyze Patanjali's definition of Yoga and to provide reasoned to these questions. In this context, the paper also examines the nature, interrelationship, and significance of three key concepts—Citta, Citta-vṛtti, and Citta-vṛtti-nirodha— as well as their implications for human consciousness. The study explains that Citta collectively refers to Manas (mind), Buddhi (intellect), and Ahaṅkāra (ego). The transformation of the mind in accordance with the forms of objects of knowledge is known as Citta-vṛtti (mental modifications). The regulation or cessation of these modifications is termed Citta-vṛtti-nirodha. Patanjali prescribes the discipline of Aṣṭāṅga Yoga— Yama, Niyama, Āsana, Prāṇāyāma, Pratyāhāra, Dhāraṇā, Dhyāna, and Samādhi— as the practical means for attaining this state. The study further analyzes how these eight stages gradually purify, discipline, and stabilize the mind, ultimately culminating in Samādhi or self-realization. In addition, the paper highlights the ethical, psychological, and spiritual significance of Citta-vṛtti-nirodha. The philosophical analysis thus demonstrates that, in Patanjali's system, the cessation of the modifications of the mind is not merely a technique of mental regulation but a fundamental path leading to human liberation and self-knowledge.

Keywords: Yoga Philosophy, Patanjali, Citta, Citta-vṛtti, Citta-vṛtti-nirodha, Aṣṭāṅga Yoga, Samādhi, Self-realization

সাধারণ মানুষের জীবন জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হেতু ভারতীয় দর্শনের আবির্ভাব। ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলি আস্তিক ও নাস্তিক ভেদে দ্বিবিধ। যে সকল দর্শন সম্প্রদায় বেদের প্রামাণ্যে বিশ্বাসী তারা আস্তিক বা বৈদিক নামে পরিচিত এবং যে সকল দর্শন সম্প্রদায়গুলি বেদের প্রামাণ্যে বিশ্বাসী নয় বা যারা বেদের নিন্দা করে, তারা নাস্তিক বা অবৈদিক নামে পরিচিত। এই আস্তিক ও নাস্তিক দর্শন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে আস্তিক দর্শন ছয়টি

হওয়ায়, এগুলি একত্রে বৈদিক ষড়দর্শন নামে প্রসিদ্ধ। এই বৈদিক ষড়দর্শনের অন্যতম হল 'যোগদর্শন'। সাংখ্য ও যোগ দর্শন সমানতন্ত্র। ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনে যোগ দর্শনের প্রভাব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। যোগ দর্শনের প্রাচীনতা প্রসঙ্গে বলা হয় বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, গীতা, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রে যোগের ও যোগানুষ্ঠানের উল্লেখ আছে। প্রাচীন ঐতিহ্য অনুযায়ী স্বয়ং হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা বা ঈশ্বর হলেন যোগের প্রথম উপদেষ্টা। অনেকের মতে 'হিরণ্যগর্ভ' বলতে 'কপিল ঋষিকে' বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ঋষি কপিলই হলেন সাংখ্য ও যোগের আদি বক্তা। তবে যাইহোক বাচস্পতি মিশ্র, বিজ্ঞানভিক্ষু উভয়ই যাজ্ঞবল্ক্যের উক্ত বচন অনুযায়ী 'হিরণ্যগর্ভকেই' যোগের আদি উপদেষ্টা বলে স্বীকার করেছেন। মহর্ষি পতঞ্জলি হলেন যোগদর্শনের সূত্রকার। অর্থাৎ তিনি স্বল্পাক্ষর যুক্ত ও বহু অর্থসূচক সূত্রের দ্বারা যোগ শাস্ত্রকে সুবিন্যস্তভাবে প্রকাশ করেছেন। মহর্ষি পতঞ্জলির নামানুযায়ী যোগদর্শন 'পাতঞ্জল দর্শন' নামেও প্রসিদ্ধ। যোগসূত্রের উপর রচিত ভাষ্যগ্রন্থ হল মহর্ষি ব্যাসদেব কর্তৃক রচিত 'যোগভাষ্য'। পতঞ্জলি কর্তৃক রচিত যোগসূত্রে মোট ১৯৫ টি সূত্র আছে। এই ১৯৫ টি সূত্র চারটি পাদ-এ বিভক্ত। এই চারটি পাদ হল– (ক) সমাধি পাদ, (খ) সাধন পাদ, (গ) বিভূতি পাদ ও (ঘ) কৈবল্য পাদ। প্রতিটি পাদ-এ নির্দিষ্ট সংখ্যক সূত্র রয়েছে, যথা- সমাধি পাদে ৫১ টি সূত্র, সাধন পাদে ৫৫ টি সূত্র, বিভূতি পাদে রয়েছে ৫৫ টি সূত্র এবং কৈবল্য পাদে রয়েছে ৩৪ টি সূত্র। এই চারটি পাদের আলোচ্য বিষয়ও ভিন্ন ভিন্ন, যথা- সমাধি পাদে যোগের লক্ষণ, প্রকারভেদ, প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, চিত্তবৃত্তি, প্রমাণ, ঈশ্বর ও চিত্তবৃত্তি নিরোধের উপায় প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে; এই সমাধি পাদ 'যোগপাদ' নামেও পরিচিত। সাধন পাদে যোগের ক্রিয়া ও তার ফল নিয়ে আলোচনা রয়েছে। বিভূতি পাদে যোগের দ্বারা লব্ধ অলৌকিক শক্তির বর্ণনা রয়েছে এবং কৈবল্য পাদে রয়েছে মোক্ষ বিষয়ক আলোচনা।

যোগের লক্ষণ প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়' বলেছেন– "যোগঃ কর্মসু কৌশলম্"। অর্থাৎ 'কোনো কাজে নৈপুণ্য অর্জনের নামই হল যোগ'।[১] যাজ্ঞবল্ক্য যোগের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন– "সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্মাপরমাত্মনোঃ"। অর্থাৎ পুরাণাদি শাস্ত্রে যোগ শব্দটি ব্যাপক অর্থে, অর্থাৎ সংযোগ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এই মতে 'জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগেই হল যোগ'; এই সংযোগ প্রযত্ন দ্বারা সিদ্ধ হয়।[২] ভোজবৃত্তিতে বলা হয়েছে– "পুং প্রকৃত্যাবিয়োগোঽপি যোগ ইত্যুদিতো যয়া"। অর্থাৎ পাতঞ্জল শাস্ত্রে প্রকৃতি ও পুরুষের বিয়োগ বা বিবেকজ্ঞানকে যোগ বলা হয়েছে।[৩] 'যোগ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে সংস্কৃত 'যুজ্' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় যোগে। যোগসূত্রের ভাষ্যকার ব্যাসদেব তাঁর 'যোগভাষ্য' গ্রন্থে 'যুজ্' ধাতুর অর্থ করেছেন– 'সমাধি' বা 'একাগ্রতা' এবং বলেছেন– "যোগঃ সমাধিঃ"। অর্থাৎ যোগ হল সমাধি বা একাগ্রতা।[৪] ভাষ্যকার কর্তৃক এই উক্তিটি মহর্ষি পতঞ্জলির লক্ষণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যোগভাষ্যের টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রও তাঁর 'তত্ত্ববৈশারদী' গ্রন্থে বলেছেন– 'সমাধি বা একাগ্রতাই হল যোগের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ'। সূত্রাকার মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁর যোগসূত্রের প্রথম পাদ তথা সমাধি পাদের দ্বিতীয় সূত্রে যোগের ব্যাখ্যায় বলেছেন– "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" অর্থাৎ 'যোগ হল চিত্তবৃত্তির নিরোধ'।[৫] স্বাভাবিক ভাবেই সূত্রকার কর্তৃক উল্লিখিত যোগের সংজ্ঞাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমাদের নিকট বেশ কিছু প্রশ্ন উদ্ভাসিত হয় যথা, চিত্ত কি? চিত্তবৃত্তি বলতে কি বোঝায় এবং কোন উপায়ে চিত্তবৃত্তির নিরোধ সম্ভব? চিত্তবৃত্তি নিরোধ হলেই বা কি হয়? মহর্ষি পতঞ্জলিকৃত যোগের লক্ষণটি বুঝতে হলে আমাদের সর্বাগ্রে উক্ত প্রশ্নগুলির অর্থ অনুধাবন করতে হবে। আমার এই গবেষণা পত্রের লক্ষ্য হল মহর্ষি পতঞ্জলি কর্তৃক প্রদত্ত যোগের সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ পূর্বক আলোচনা করা এবং উক্ত প্রশ্নগুলির যথাসম্ভব উত্তর প্রদান করা। এছাড়া চিত্ত, চিত্তবৃত্তি ও চিত্তবৃত্তি নিরোধ— এই তিনটি মৌলিক ধারণার পারস্পরিক সম্পর্ক, তাদের প্রকৃতি এবং মানবচেতনার উপর তাদের প্রভাব ইত্যাদি এই আলোচনার মূল বিষয় হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে, মন, বুদ্ধি ও অহংকার এই তিনটিকে একত্রে বলা হয় চিত্ত এবং চিত্তের

বিষয়ের আকারে আকারিত হওয়াকে বলা হয় চিত্তবৃত্তি। এই বৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ বা স্থগিত করাকেই বলা হয় চিত্তবৃত্তি নিরোধ। পতঞ্জলি চিত্তবৃত্তি নিরোধের সাধনের জন্য অষ্টাঙ্গ যোগের পথ নির্দেশ করেছেন— যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি। গবেষণায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে এই আটটি স্তর ধাপে ধাপে চিত্তকে শুদ্ধ ও স্থিতিশীল করে, যার চূড়ান্ত লক্ষ্য হল সমাধি বা আত্মসাক্ষাৎকার। এছাড়াও এই গবেষণায় চিত্তবৃত্তি নিরোধের নৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং আধ্যাত্মিক তাৎপর্যও আলোচনা করা হয়েছে। ফলত, এই দার্শনিক বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে পাতঞ্জল যোগ দর্শনে চিত্তবৃত্তি নিরোধ কেবল মানসিক নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি নয়, বরং মানবমুক্তি ও আত্মজ্ঞান লাভের একটি মৌলিক উপায়।

চিত্ত: মহর্ষি পতঞ্জলির মতে চিত্তবৃত্তি নিরোধই হল যোগ। কাজেই সূত্রকার কর্তৃক প্রদত্ত যোগের লক্ষণটিকে বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে যে প্রশ্নটি সর্বাগ্রে উঠে আসে, তাহল- চিত্ত কি? মহর্ষি পতঞ্জলি ও ভাষ্যকার ব্যাসদেব বহু স্থানে বুদ্ধি ও মনকে চিত্ত বলেছেন। সাংখ্য ও যোগ দর্শন হল সমানতন্ত্র। সাংখ্য দর্শনে মোট পঁচিশটি তত্ত্ব স্বীকৃত। সাংখ্য মতে পঁচিশটি তত্ত্বের মধ্যে পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুটি হল মূল তত্ত্ব। প্রকৃতির প্রথম বিকার হল 'মহৎ' বা 'বুদ্ধি'। 'বুদ্ধির' বিকার হল 'অহংকার' এবং 'অহংকারের' অন্যতম বিকার হল 'মন'। যোগদর্শনে এগুলিকেই, অর্থাৎ মন, বুদ্ধি ও অহংকার– এই তিনের অন্তঃকরণকে বলা হয় চিত্ত। প্রকৃতি থেকেই চিত্তের উৎপত্তি। ফলে প্রকৃতি অচেতন হওয়ায় চিত্তও অচেতন। প্রকৃতির তিনটি গুণ- সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ- এই তিনটি গুণ চিত্তেও থাকে। চিত্তে 'সত্ত্ব' গুণের আধিক্য থাকায়, চিত্ত অত্যন্ত স্বচ্ছ হয়। ফলে পুরুষের সান্নিধ্যবশত পুরুষের চৈতন্য চিত্তে প্রতিবিম্বিত হয়। যোগদর্শনে সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণের তারতম্য অনুযায়ী চিত্তের পাঁচটি ভূমি বা অবস্থা স্বীকার করা হয়েছে, সেগুলি হল– ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র, নিরুদ্ধ। ক্ষিপ্ত হল প্রথম চিত্তভূমি। এই অবস্থায় চিত্তে রজঃ ও তমো গুণের প্রভাব থাকে। ফলে চিত্ত অত্যন্ত অস্থির হয়। মূঢ় হল দ্বিতীয় চিত্তভূমি। এই অবস্থায় চিত্তে তমো গুণের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। ফলে চিত্ত প্রবল রাগ ও মোহের বশীভূত হয়ে পড়ে এবং চিত্তে নিষ্ক্রিয়তা, আলস্য, তন্দ্রা রাজত্ব করে। বিক্ষিপ্ত হল তৃতীয় চিত্তভূমি। এই অবস্থায় চিত্ত তমঃ গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হলেও, রজঃ গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে না। ফলে এই স্তরে সাময়িকভাবে চিত্ত কোনো বিষয়ে নিবিষ্ট হলেও তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। একাগ্র হল চতুর্থ চিত্তভূমি। এই অবস্থায় চিত্ত তমঃ ও রজঃ-এর প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়। এই অবস্থায় চিত্তে সত্ত্ব গুণের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটে। ফলে চিত্ত কোনো একটি বিশেষ বিষয়ে নিবিষ্ট থাকে। নিরুদ্ধ হল পঞ্চম চিত্তভূমি তথা চিত্তভূমির শেষ অবস্থা। এই অবস্থায় চিত্তের সকল প্রকার বৃত্তি নিরুদ্ধ হয়। এই স্তরে চিত্ত শান্ত ও সমাহিত হয়। এই চিত্তভূমিতে পুরুষ স্ব-স্বরূপে অবস্থান করে। চিত্তের এই পাঁচ প্রকার ভূমি বা অবস্থার মধ্যে মাত্র শেষ দুটি অবস্থা তথা একাগ্র ও নিরুদ্ধ অবস্থা যোগানুকূল।

চিত্তবৃত্তি: এখন প্রশ্ন হল 'চিত্তবৃত্তি' বলতে কি বোঝায়? 'চিত্তবৃত্তি'-এর অন্তর্গত 'বৃত্তি' শব্দের অর্থ হল 'পরিণাম'। কাজেই চিত্তবৃত্তি বলতে বোঝায়– 'চিত্তের পরিণাম'। এ প্রসঙ্গে ভাষ্যকার বলেছেন– "বিষয়সম্বন্ধাৎ চিত্তস্য পরিণাম-বিশেষা বৃত্তয়ঃ"। অর্থাৎ বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হওয়ার ফলে চিত্তের যে বিষয়াকারে পরিণতি, তাই হল চিত্তবৃত্তি।[৬] উদাহরণ স্বরূপ, গলিত ধাতু যে পাত্রে ঢালা হয়, ধাতু যেমন সেই পাত্রের আকার ধারণ করে, তেমনি চিত্তের সঙ্গে যখন কোনো বিষয়ের সংযোগ ঘটে তখন চিত্তও সেই বস্তুর আকার ধারণ করে। আর বিষয়ের সঙ্গে সংযোগের ফলে চিত্তের এইরূপ বিষয়ের আকার প্রাপ্তিই হল চিত্তবৃত্তি। চিত্তের এরূপ বৃত্তির মাধ্যমেই আত্মার বিষয়জ্ঞান হয়ে থাকে। পাতঞ্জল যোগ দর্শনে চিত্তবৃত্তির প্রকার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– "প্রমাণ-বিপর্য্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃত্তয়ঃ" অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি হল পাঁচ প্রকারের– প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি।[৭]

ভারতীয় দর্শনে যথার্থ জ্ঞানকে বলা হয় 'প্রমা' এবং যথার্থ জ্ঞান লাভের উপায় বা প্রণালীকে বলা হয় 'প্রমাণ'। যোগ মতে, অনধিগত সৎ বা যথাভূত বিষয়ের সত্তা নিশ্চয়ের নাম প্রমাণ। সাংখ্যদর্শনের ন্যায় যোগদর্শনেও তিনটি প্রমাণ স্বীকার করা হয়েছে। এপ্রসঙ্গে যোগসূত্রে বলা হয়েছে "প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি।" অর্থাৎ প্রমাণ তিনটি– প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম বা শব্দ।[৮] বিষয়ের সঙ্গে সন্নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞানই হল দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ। অনুমান হল লিঙ্গ লিঙ্গি পূর্বক জ্ঞান। আপ্তব্যক্তির বা যথার্থবক্তার বাক্য শুনে শ্রোতার চিত্তে যে বৃত্তি উৎপন্ন হয়, তাই হল আগম বা শব্দ। বিপর্যয় হল দ্বিতীয় প্রকার চিত্তবৃত্তি। মহর্ষি পতঞ্জলি বিপর্যয়ের লক্ষণে বলেছেন– "বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূমপ্রতিষ্ঠম্।" অর্থাৎ বিপর্যয় হল অতদ্রূপ অপ্রতিষ্ঠ মিথ্যা জ্ঞান।[৯] তৃতীয় প্রকার চিত্তবৃত্তি হল বিকল্প। বিকল্পের লক্ষণে পাতঞ্জল দর্শনে বলা হয়েছে– "শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ।" অর্থাৎ শব্দ জ্ঞানানুপাতী ও বস্তুশূন্য বা অবাস্তব পদার্থ বিষয়ক বৃত্তিকে বলা হয় বিকল্প।[১০] নিদ্রা হল চতুর্থ প্রকার চিত্তবৃত্তি। নিদ্রার লক্ষণে যোগসূত্রে বলা হয়েছে– "অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা।" অর্থাৎ অভাবের যে প্রত্যয় তাকে অবলম্বন করে যে বৃত্তি হয়, তাকেই বলা হয় নিদ্রা।[১১] স্মৃতি হল পঞ্চম তথা শেষ চিত্তবৃত্তি। যোগসূত্রে 'স্মৃতি'র লক্ষণে বলা হয়েছে– "অনুভূত বিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ।" অর্থাৎ অনুভূত বিষয়ের অনুরূপ আকারযুক্ত বৃত্তিকেই বলা হয় স্মৃতি।[১২] প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি– এই পাঁচ প্রকার চিত্তবৃত্তি আবার দ্বিবিধ– ক্লিষ্ট বৃত্তি ও অক্লিষ্ট বৃত্তি। ক্লেশদায়ক চিত্তবৃত্তি গুলি ক্লিষ্ট। রাগ, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি বৃত্তিগুলি ক্লেশের কারণ, তাই এগুলি ক্লিষ্ট চিত্তবৃত্তি। ক্লেশ নাশক চিত্তবৃত্তিগুলি অক্লিষ্ট। শ্রদ্ধা, ভক্তি, করুণা, বৈরাগ্য প্রভৃতি বৃত্তিগুলি ক্লেশনাশক, তাই এগুলি অক্লিবৃত্তি।

চিত্তবৃত্তি নিরোধ : যোগ হল চিত্তবৃত্তির নিরোধ। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন "তদা দ্রষ্টু স্বরূপেঽবস্থানম্"। অর্থাৎ সকল প্রকার চিত্তবৃত্তির নিরুদ্ধ অবস্থায় দ্রষ্টা পুরুষ যখন নিজ স্বরূপে অবস্থান করে তখন আত্মার স্বরূপ প্রকাশিত হয়।[১৩] এখন প্রশ্ন হচ্ছে চিত্তবৃত্তি নিরোধ কিভাবে সম্ভব? মহর্ষি পতঞ্জলি তার 'যোগসূত্র' গ্রন্থে চিত্তবৃত্তি নিরোধের দ্বিবিধ উপায়ের কথা বলেছেন– (ক) অভ্যাস (ঘ) বৈরাগ্য। অভ্যাসের লক্ষণে বলা হয়েছে– "তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ।" অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা যে যত্নের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়, তার অনুষ্ঠানে তৎপর হওয়ার নামই হল অভ্যাস।[১৪] অভ্যাসকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত, নিরন্তরতা পূর্বক, সৎকার পূর্বক এবং শ্রদ্ধা পূর্বক সেবন করলে চিত্ত দৃঢ় হয়। বৈরাগ্যের লক্ষণে বলা হয়েছে– "দৃষ্টানুশ্রবিক বিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্।" অর্থাৎ দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়ে তৃষ্ণা রহিত যোগীর মন, ইন্দ্রিয়তে পূর্ণ বর্শীকরণ হওয়াকে অপর বৈরাগ্য বলা হয়।[১৫] সেই বৈরাগ্যই সবচেয়ে উচ্চ বৈরাগ্য। জীবাত্মার সাক্ষাৎকার হয়ে গেলে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের প্রতি বিতৃষ্ণা হয়ে যায়, এই অবস্থাকে 'পরবৈরাগ্য' বলা হয়। এই অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হলে প্রথমে 'সম্প্রজ্ঞাত সমাধি' হয়। 'সম্প্রজ্ঞাত' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল 'সম্যক্' বা 'প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত'। এই অবস্থায় ধ্যেয় বস্তুকে সম্যকভাবে জানা যায় বলে এই সমাধিকে সম্প্রজ্ঞাত বলে। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি প্রসঙ্গে যোগসূত্রে বলা হয়েছে– "বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতারূপানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ।" অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি চার প্রকার– সবির্তক, সবিচার, সানন্দ ও সাস্মিত।[১৬] সাধারণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে সকল বিষয় গৃহীত হয়, যেমন– ঘট , পট, গো আদি- এইসব স্থূল বিষয় যখন শব্দবাচ্য রূপে সমাধি প্রজ্ঞার বিষয় হয় তখন তাকে বলে সবিতর্ক। এই স্থূল বিষয়ক সমাধি আয়ত্ত হলে, যোগীর বিচার বিশেষের দ্বারা তন্মাত্র আদি সূক্ষ্ম বিষয়ের সম্প্রজ্ঞান হলে, তাকে বলা হয় সবিচার। সানন্দ অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নতমানের। আমাদের শরীর হচ্ছে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়, চিত্ত ও প্রাণের অধিষ্ঠাতা। অভ্যাসের ফলে যখন ঐ সকল করণ আদির সাথে শরীরের বিশেষ এক সর্বব্যাপী সাত্ত্বিক সুখ অনুভূত হয়, তাকে বলে সানন্দ এবং সাস্মিত অবস্থায় হল সম্প্রজ্ঞাত সমাধির সর্বোচ্চ অবস্থা। 'আমি' এই বোধ মাত্রই সাস্মিত সমাধির বিষয়। এতদ্ সত্ত্বেও সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্তবৃত্তি নিরোধ অসম্পূর্ণ থাকে। সম্প্রজ্ঞাত সমাধির

দ্বারা যখন চিত্ত বিষয় চিন্তা থেকে মুক্ত হয় তখন উদয় ঘটে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির বর্ণনায় যোগসূত্রে বলা হয়েছে– "বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ"। অর্থাৎ পরবৈরাগ্যের অভ্যাসের দ্বারা সংস্কার শেষ স্বরূপ সমাধিকে বলা হয় অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি।[১৭] লক্ষ্যনস্থ 'বিরাম' বলতে বোঝায় 'সকল প্রকার চিত্তবৃত্তির নিরোধকে' এবং এই বিরাম লাভের উপায়ই হল বৈরাগ্য। অভ্যাসের ফলে বৈরাগ্য দৃঢ় হয় এবং চিত্তবৃত্তির পুনরায় উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। এই কারণেই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিকে নিরালম্ব ও নির্বীজ সমাধিও বলা হয়। অভ্যাস ও বৈরাগ্য ছাড়াও যোগ দর্শনে চিত্তবৃত্তি নিরোধের সাক্ষাৎ উপায় প্রসঙ্গে আটটি যোগাঙ্গের কথা বলা হয়েছে। সেগুলিকে অষ্টাঙ্গ যোগ বা যোগের অষ্টাঙ্গ বলা হয়।

চিত্তবৃত্তি নিরোধের উপায় : মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁর যোগসূত্রে চিত্তবৃত্তি নিরোধের উপায় স্বরূপ আটটি যোগাঙ্গের কথা বলেছেন,"যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি।" অর্থাৎ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি– এই আটটি একত্রে 'অষ্টাঙ্গযোগ' বা 'যোগের অষ্টাঙ্গ' নামে পরিচিত।[১৮]

যম: 'যম' হল 'অষ্টযোগাঙ্গের' প্রথম অঙ্গ। মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁর যোগসূত্রে 'যম' এর লক্ষণে বলেছেন– "অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ"। অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ এই পাঁচটি সাধনকে বলা হয় যম। ব্যক্তি যদি ইন্দ্রিয়াসক্ত, বিষয়ভোগী এবং ব্যক্তির চিত্ত যদি অসংযত হয় তবে সেই ব্যক্তির পক্ষে যোগ সাধনার দূর্গম পথ অতিক্রম করা সম্ভব হতে পারে না। তাই চিত্তবৃত্তি নিরোধ ঘটানোর জন্য সর্বাগ্রে 'যম' অনুশীলন করা দরকার।[১৯] যমের প্রথম সোপান হল অহিংসা। অহিংসা বলতে বোঝায় হিংসা করা থেকে বিরত থাকা। হিংসা শুধুমাত্র শারীরিক নয়, বরং মানসিক বা বাচিকও হতে পারে। তাই এখানে অহিংসা বলতে কায়মনোবাক্যে অন্যের ক্ষতিসাধন থেকে নিবৃত্ত থাকাকে বোঝায়। অর্থাৎ কায়িক বা শারীরিকভাবে, মানসিকভাবে বা মননে এবং বাচিকভাবে কারও ক্ষতি বা অনিষ্ট না ঘটানোই হল অহিংসা। এ প্রসঙ্গে ভাষ্যকার বলেছেন– "মা হিংস্যাৎ সর্বভূতানি"। অর্থাৎ সব কিছুর প্রতি সহিংস আচরণ থেকে বিরত থাকা।[২০] অহিংসাকে নির্মল করার জন্যই যমের অপরাপর সোপানগুলি প্রতিপাদিত হয়েছে। ভাষ্যকার ব্যাসদেব সত্য আদি কে অহিংসা সিদ্ধির হেতু বলেছেন। সত্য হল যথাযথ কথন ও চিন্তন। সত্য যদি অপ্রিয় হয়, সেক্ষেত্রে মৌন থাকা দরকার। অস্তেয় বলতে বোঝায় 'চৌর্যবৃত্তি পরিত্যাগ'। অর্থাৎ যা নিজের নয় এমন দ্রব্য বা পরদ্রব্য গ্রহণ করা হতে বিরত থাকা বা বিরত থাকার ইচ্ছাই হল অস্তেয়। এপ্রসঙ্গে ভাষ্যকার ব্যাসদেব বলেছেন– অশাস্ত্রপূর্বক বা অবৈধভাবে অপরের দ্রব্য গ্রহণ করা স্তেয় এবং এর বিপরীত আচরণই অস্তেয়। কাম আচরণ ও কাম চিন্তা থেকে বিরত থাকা, রমণীসম্ভোগ ত্যাগ ও বীর্য ধারণই হল ব্রহ্মচর্য। এপ্রসঙ্গে পাতঞ্জল যোগদর্শনে বলা হয়েছে– 'স্মরণ, কীর্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, গুহ্যভাষণ, সংকল্প, অধ্যবসায় ও ক্রিয়ানিষ্পত্তি-এই অষ্টাঙ্গ মৈথুন তথা অষ্ট অব্রহ্মচর্য বর্জনই হল ব্রহ্মচর্য'। দেহরক্ষা বা প্রাণধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় ছাড়া সকল প্রকার ভোগ বিলাসের আকাঙ্খা বর্জন করা ও অপরের দান অগ্রহণই হল অপরিগ্রহ। সূত্রকার তাঁর যোগসূত্র গ্রন্থে অপরিগ্রহ প্রসঙ্গে বলেছেন– "অপরিগ্রহস্থৈর্যে জন্মকথন্তাসম্বোধঃ"। অর্থাৎ শরীর ধারণের জন্য আবশ্যক দ্রব্য ভিন্ন সকল ভোগ্য বিষয় ত্যাগকেই সাধারণভাবে অপরিগ্রহ বলা হয়।[২১] এপ্রসঙ্গে ভাষ্যে বলা হয়েছে– বিষয় অর্জন, ক্ষয়, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার প্রতিটি ক্ষেত্রে উৎপন্ন দুঃখের অবশ্যম্ভাবী ফল হল হিংসা, যোগী এরূপ হিংসা জনক দুঃখের কথা জেনে প্রথমে ত্যাগ করেন ও পরে তা অগ্রহণ করেন।

নিয়ম: অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বিতীয় অঙ্গ হল 'নিয়ম'। নিয়মের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যোগসূত্রে বলা হয়েছে– "শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ"। অর্থাৎ শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধানকে বলা হয় নিয়ম।[২২] শৌচ শব্দের অর্থ হল 'শূচিতা' বা 'শুদ্ধি'। এই শৌচ বাহ্য ও আন্তর ভেদে দ্বিবিধ। ব্যাসদেব

তার যোগভাষ্য গ্রন্থে বলেছেন– "তত্রশৌচং মৃজ্জলাদিজনিতং মেধ্যাভ্যবহরণাদি চ বাহ্যম্"। অর্থাৎ জল আদি দ্বারা, পবিত্র আহার দ্বারা শরীরের শূচিতা রক্ষা করাকে বলে বাহ্য শৌচ এবং "আভ্যন্তরং চিত্তমলানামাক্ষালনম্।" অর্থাৎ মদ, মান, আসূয়াদি চিত্তমলের ক্ষালন ঘটানোই হল আভ্যন্তর শৌচ।[২৩] সন্তোষ বলতে বোঝায় অহেতুক আকাঙ্খাকে বর্জন করে যা পাওয়া যায়, তাতেই সন্তুষ্ট থাকা। ব্যাসদেব তাঁর যোগভাষ্য গ্রন্থে 'সন্তোষ' প্রসঙ্গে বলেছেন– "সন্তোষঃ সন্নিহিতসাধনাদধিকস্যানুপাদিৎসা।" অর্থাৎ সন্তোষ হল সন্নিহিত সাধনের মধ্যে প্রাণধারণের অধিক গ্রহণেচ্ছাশূন্যতা।[২৪] 'তপঃ' শব্দের অর্থ হল 'তপস্যা'। ব্যাসদেব তাঁর যোগভাষ্যে 'তপঃ' প্রসঙ্গে বলেছেন– "তপঃ দ্বন্দ্বসহনম্"। অর্থাৎ তপ হল দ্বন্দ্বসহন। এখানে 'দ্বন্দ্ব' বলতে বোঝানো হয়েছে– ক্ষুধা–পিপাসা, শীত-উষ্ণ, স্থিরাবস্থান-আসন, কাষ্ঠমৌন ও আকারমৌন– এই সকল বিরুদ্ধ অবস্থায় সমভাব উৎপন্ন।[২৫] এছাড়াও যোগসূত্রে কৃচ্ছসাধন চান্দ্রায়ণ আদি ব্রতগুলিকেও তপ বলা হয়েছে। স্বাধ্যায় বলতে বোঝায় 'অধ্যায়ন ও জপ'। এপ্রসঙ্গে ব্যাসদেব তাঁর 'যোগভাষ্য' গ্রন্থে বলেছেন– "স্বাধ্যায়ঃ মোক্ষশাস্ত্রণামধ্যয়নং প্রণবজপো বা।" অর্থাৎ স্বাধ্যায় হল মোক্ষশাস্ত্র অধ্যায়ন করা অথবা প্রণব জপ। এরফলে বিষয়চিন্তা ক্ষীন হয় এবং পরমার্থে রুচি ও জ্ঞান বাড়ে।[২৬] ঈশ্বর প্রণিধান হল মানস ক্রিয়াযোগ। ব্যাসদেব তাঁর যোগভাষ্য গ্রন্থে ঈশ্বরপ্রণিধান প্রসঙ্গে বলেছেন– "ঈশ্বরপ্রণিধানং তস্মিন্ পরমগুরৌ সর্বকর্মার্পণং" । অর্থাৎ ঈশ্বর প্রণিধান হল পরমগুরু ঈশ্বরে সর্বকর্ম সমর্পণ।[২৭]

আসন: আসন হল অষ্টাঙ্গযোগের তৃতীয় অঙ্গ। আসনের লক্ষণে সূত্রকার তাঁর 'যোগসূত্র'-এ বলেছেন– "স্থিরসুখমাসনম্"। অর্থাৎ স্থিরে ও সুখে উপবেশনই হল আসন।[২৮] আসনের দ্বারা সুস্থ ও নিরোগ দেহ লাভ করা যায়। আসন নানান প্রকারের হয়, যথা- পদ্মাসন, বীরাসন, ভদ্রাসন, স্বস্তিকাসন, সোপাশ্রয়াসন, পর্যঙ্কাসন আদি।

প্রাণায়াম: অষ্টাঙ্গযোগের চতুর্থ অঙ্গ হল প্রাণায়াম। প্রাণায়ামের লক্ষণ প্রসঙ্গে মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁর যোগসূত্র গ্রন্থে বলেছেন– "তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ।" অর্থাৎ শ্বাসগতি ও প্রশ্বাস-গতির বিচ্ছেদই হল প্রাণায়াম।[২৯] শ্বাসরূপ আভ্যন্তরিন গতি ও প্রশ্বাস রূপ বহির্গতির বিচ্ছেদই হল প্রাণায়াম। সূত্রকার প্রাণায়ামের প্রকার প্রসঙ্গে বলেছেন– "বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভ বৃত্তির্দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘসূক্ষ্মঃ।" অর্থাৎ প্রাণায়াম হল বাহ্যবৃত্তি, আভ্যন্তরবৃত্তি ও স্তম্ভবৃত্তি ভেদে তিন প্রকার। তবে দেশ কাল ও সংখ্যার দ্বারা পরিদৃষ্ট হলে এগুলি দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হতে পারে।[৩০]

প্রত্যাহার: প্রত্যাহার হল পঞ্চম যোগাঙ্গ। প্রত্যাহারের লক্ষণ প্রসঙ্গে যোগসূত্রে বলা হয়েছে –"স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ"। অর্থাৎ নিজ নিজ বিষয় থেকে অসংযুক্ত হওয়ার ফলে চিত্তের স্বরূপানুকার লাভকেই ইন্দ্রিয়সমূহের প্রত্যাহার বলা হয়।[৩১] অর্থাৎ প্রত্যাহার সাধনের উপায়গুলি হল – বাহ্য বিষয় থেকে লক্ষ্য অপসারণ, মানসভাব নিয়ে অবস্থান করা, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণের অভ্যাস ত্যাগ।

ধারণা: ধারণার লক্ষণে যোগসূত্রে বলা হয়েছে –"দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা।" অর্থাৎ চিত্তকে কোনো এক বিশেষ স্থানে ধরে রাখা বা অবদ্ধ করে রাখাই হল ধারণা।[৩২] ধারণার দুটি স্থান – বাহ্য ও আন্তরিক। বৃক্ষ, পর্বত আদি হল বাহ্য স্থান এবং নাভি, হৃদয়, নাসিকার অগ্রভাগ, মস্তক আদি হল ধারণার আন্তরিক স্থান। যোগমতে ধারণা দ্বিবিধ– তত্ত্বজ্ঞানময় ধারণা ও বৈষয়িক ধারণা।

ধ্যান: ধারণার পরবর্তী যোগাঙ্গ হল 'ধ্যান'। ধ্যানের লক্ষণে যোগসূত্রে বলা হয়েছে–"তত্র প্রত্যয়ৈকতানতাধ্যানম্"। অর্থাৎ ধারণায় প্রত্যয়ের বা জ্ঞানবৃত্তির একতানতাই হল ধ্যান। তৈলধারার মত যে প্রত্যয় প্রবাহ তাই ধ্যান।[৩৩]

সমাধি: সমাধি হল অষ্টযোগাঙ্গের সর্বশেষ তথা চরম স্তর। সমাধিই হল যোগীর অন্তিম লক্ষ্য। সমাধি হল ধ্যানের চরম উৎকর্ষ। এটি চিত্তস্থৈর্যের সর্বোত্তম অবস্থা; এর চেয়ে বেশি চিত্তস্থৈর্য সম্ভব নয়। সমাধির লক্ষণে যোগসূত্রে বলা হয়েছে– "তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ।" ধ্যান পরিপক্ক হয়ে যখন অর্থমাত্র নির্ভাস হয়, অর্থাৎ কেবলমাত্র ধ্যেয় বিষয়কেই প্রকাশ করে, ধ্যেয় বিষয়ের আবেশবশতঃ। ধ্যান স্বরূপশূন্যের মত হয়ে যায়– তাই সমাধি।[৩৪] এই স্থলে সমাধিকে দ্বিবিধ বলা হয়েছে– সম্প্রজ্ঞাত সমাধি ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার এই পাঁচটি হল যোগের বহিরঙ্গসাধন এবং ধারণা, ধ্যান ও সমাধি হল যোগের অন্তরঙ্গ সাধন। ধারণা, ধ্যান ও সমাধিকে আবার 'সংযম'ও বলা হয়। বিবেকজ্ঞান লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তি সর্বাগ্রে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার এই পাঁচটি বহিরঙ্গের অভ্যাসের দ্বারা স্থির চিত্তের অধিকারী হয়ে উঠলে, পরে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই অন্তরঙ্গগুলি সাধনের উপযুক্ত হয়ে ওঠে। এভাবে বিবেকজ্ঞান লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তি যম, নিয়ম আদি বহিরঙ্গগুলি ক্রমান্বয়ে অভ্যাসের পর ধারণা ও ধ্যান অভ্যাস করবে এবং তারপর ধ্যানের চরম উৎকর্ষ তথা অষ্টাঙ্গ যোগের সর্বশেষ স্তরে উন্নিত হবে। প্রথমে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ হয়ে পরে তা পরিপক্ক হয়ে পরবৈরাগ্য উৎপন্ন হয়ে ক্রমে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ হয় এবং সাধকের কৈবল প্রাপ্তি হয়।

উপসংহার:

মোক্ষলাভের অর্থাৎ দুঃখ থেকে চিরনিবৃত্তি লাভের নানান উপায় থাকলেও যোগদর্শন অনুযায়ী 'যোগ' হল শ্রেষ্ঠ উপায়। সাংখ্য ও যোগ দর্শন হল সমানতন্ত্র। সাংখ্য দর্শনের বিবেকজ্ঞান যোগ দর্শনের কৈবল্যের নামান্তর। যোগমতে কেবল বিচার দ্বারা বিবেকজ্ঞান লাভ সম্ভব নয়, তার জন্য প্রয়োজন চিত্তকে সংস্কারশূন্য ও শুদ্ধ করা। তবেই কৈবল্য লাভ সম্ভব হতে পারে। যোগ সূত্রকার মহর্ষি পতঞ্জলির মতে কৈবল্য প্রাপক যোগ হচ্ছে 'চিত্তবৃত্তির নিরোধ'। অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির নিরোধ হলেই কৈবল্যলাভ সম্ভব। যোগ মতে মন, বুদ্ধি ও অহংকার হল চিত্ত এবং চিত্তের বিষয়ের আকারে আকারিত হওয়া হচ্ছে চিত্তবৃত্তি। চিত্তবৃত্তি পাঁচটি– প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। চিত্ত এই পাঁচ প্রকার বৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই বৃত্তিগুলি স্বাভাবিক জ্ঞান প্রক্রিয়ার অংশ হলেও এগুলি যখন অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে বা বিকৃত রূপ ধারণ করে, তখন তা দুঃখ, মোহ ও অজ্ঞানের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে বিবেকজ্ঞান পিপাসু ব্যক্তিকে অভ্যাস ও বৈরাগ্য সমন্বিত ভাবে অনুশীলন করতে হবে। এর দ্বারা ধীরে ধীরে চিত্তের অস্থিরতা প্রশমিত হবে এবং চিত্ত একাগ্র ও শান্ত হবে। এছাড়াও এই গবেষণা পত্রে মহর্ষি পতঞ্জলি প্রস্তাবিত 'অষ্টাঙ্গযোগের' ধাপগুলির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে যে, কিভাবে বিবেকজ্ঞান লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তি যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই আটটি যোগাঙ্গের দ্বারা ধীরে ধীরে বাহ্যজগতের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করে সমাধি স্তরে উন্নীত হতে পারে। এই প্রক্রিয়া শুধুমাত্র মানসিক সংযম নয়; বরং নৈতিক শুদ্ধতা, শারীরিক স্থিতি ও আধ্যাত্মিক উন্নতির এক সুসংহত পথ নির্দেশ করে। এই গবেষণা পত্রের আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে, যোগ হল প্রায়োগিক। পাতঞ্জল দর্শনে 'চিত্তবৃত্তি নিরোধ' কেবলমাত্র একটি তাত্ত্বিক দার্শনিক ধারণা নয়; বরং এটি মানবমনের স্বরূপ ও তার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করে। বর্তমানে যোগের প্রচার-প্রসার ব্যাপক পরিমাণে হলেও; আমাদের মনে রাখতে হবে যে, যোগ কেবল শ্বাস-প্রশ্বাসের জটিল প্রক্রিয়া নয়, ব্যাপ্তি জ্ঞান ও চর্যার দিক থেকে অনেক গভীর, প্রসারিত ও গূঢ়। আধুনিক সমাজে যখন মানুষের জীবনে মানসিক চাপ, অশান্তি, সহিংসতা, নৈতিক অবনতি ক্রমাগত বেড়েই চলেছে, তখন পাতঞ্জল প্রদত্ত 'চিত্তবৃত্তি নিরোধ' মানব মনের ভারসাম্য ও শান্তি শৃঙ্খলা পুনরায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। অতএব, এই গবেষণাপত্রের আলোচনার ভিত্তিতে একথা স্পষ্ট হয় যে, চিত্তবৃত্তি নিরোধ পাতঞ্জল যোগদর্শনের মৌলিক লক্ষ্য এবং অষ্টাঙ্গযোগ

হল বিবেকজ্ঞান বা কৈবল্যলাভের একটি কার্যকর উপায়। এর দ্বারা ব্যক্তি তত্ত্ব বা সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে এবং দুঃখ থেকে চিরনিবৃত্তি লাভ করতে পারে ।

তথ্যসূত্র:

১. যোগঃ কর্মসু কৌশলম্। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২/৫০
২. সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্মাপরমাত্মনোঃ। যোগিযাজ্ঞবল্ক্যম্, ১/৪৩
৩. ভোজবৃত্তি (দ্রষ্টব্য: বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক কুমার (সম্পাদিত): যোগিযজ্ঞবল্ক্যম্ সানুবাদ· যোগশাস্ত্রম্, পৃ - ৩৮)
৪. যোগঃ সমাধিঃ। যোগভাষ্য, ১/১
৫. যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ। যোগসূত্র, ১/২
৬. বিষয়সম্বন্ধাৎ চিত্তস্য পরিণাম-বিশেষা বৃত্তয়ঃ। যোগভাষ্য, ১/৫
৭. প্রমাণ-বিপর্য্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃত্তয়ঃ। যোগসূত্র, ১/৬
৮. প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি। যোগসূত্র, ১/৭
৯. বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূমপ্রতিষ্ঠম্। যোগসূত্র, ১/৮
১০. শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ। যোগসূত্র, ১/৯
১১. অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা। যোগসূত্র, ১/১০
১২. অনুভূত বিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ। যোগসূত্র, ১/১১
১৩. তদা দ্রষ্টু স্বরূপেঽবস্থানম্। যোগসূত্র, ১/৩
১৪. তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ। যোগসূত্র, ১/১৩
১৫. দৃষ্টানুশ্রবিক বিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্। যোগসূত্র, ১/১৫
১৬. বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতারূপানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ। যোগসূত্র, ১/১৭
১৭. বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ। যোগসূত্র, ১/১৮
১৮. যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি। যোগসূত্র, ২/২৯
১৯. অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ। যোগসূত্র, ২/৩০
২০. তত্রাহিংসা সর্বথা সর্বদা সর্বভূতানামনভিদ্রোহঃ। যোগভাষ্য, ২/৩০
২১. অপরিগ্রহস্থৈর্যে জন্মকথন্তাসম্বোধঃ। যোগসূত্র, ২/৩৯
২২. শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ। যোগসূত্র, ২/৩২
২৩. তত্রশৌচং মৃজ্জলাদিজনিতং মেধ্যাভ্যবহরণাদি চ বাহ্যম্, আভ্যন্তরং চিত্তমলানামাক্ষালনম্ যোগভাষ্য, ২/৩২
২৪. সন্তোষঃ সন্নিহিতসাধনাদধিকস্যানুপাদিৎসা। যোগভাষ্য, ২/৩২
২৫. তপঃ দ্বন্দ্বসহনম্। যোগভাষ্য, ২/৩২
২৬. স্বাধ্যায়ঃ মোক্ষশাস্ত্রণামধ্যয়নং প্রণবজপো বা। যোগভাষ্য, ২/৩২
২৭. ঈশ্বরপ্রণিধানং তস্মিন্ পরমগুরৌ সর্বকর্মার্পণং। যোগভাষ্য, ২/৩২
২৮. স্থিরসুখমাসনম্। যোগসূত্র, ২/৪৬
২৯. তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ। যোগসূত্র, ২/৪৯
৩০. বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভ বৃত্তির্দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘসূক্ষ্মঃ। যোগসূত্র, ২/৫০
৩১. স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ। যোগসূত্র, ২/৫৪

৩২. দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা। যোগসূত্র, ৩/১

৩৩. তত্র প্রত্যয়ৈকতানতাধ্যানম্। যোগসূত্র, ৩/২

৩৪. তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ। যোগসূত্র, ৩/৩

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১. আরণ্য, শ্রীমৎ হরিহরানন্দ। পাতঞ্জল যোগদর্শন। কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৫।

২. ভট্টাচার্য, শ্রীদীনেশচন্দ্র। ষড়দর্শন: যোগ। কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৬।

৩. শর্মা, শ্রীপূর্ণচন্দ্র। পাতঞ্জল দর্শন। কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৫।

৪. দেবশর্মা, শ্রীকালীবর। পাতঞ্জলদর্শন। কলকাতা, শ্রীহীরালাল ঢোল দ্বারা প্রকাশিত, ১২৯১ বঙ্গাব্দ।

৫. ভট্টাচার্য, বিধুভূষণ। সাংখ্য দর্শনের বিবরণ। কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৭।

৬. মন্ডল, প্রদ্যেত কুমার। ভারতীয় দর্শন। কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০১৬।

৭. বাগচী, দীপক কুমার। ভারতীয় দর্শন। কলকাতা, প্রগতিশীল প্রকাশক, ২০১৫।

৮. গোস্বামী, শ্রী নারায়ণ চন্দ্র। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী। কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৬।

৯. চক্রবর্তী, সত্যজ্যোতি (বঙ্গানুবাদ)। সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ (সায়ন মাধবীয়), সাহিত্যশ্রী। কলকাতা, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪১৫ বঙ্গাব্দ।

১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, কনকপ্রভা। সংখ্য-পাতঞ্জল দর্শন। কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৯।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1265-1271
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.346

রবীন্দ্র সাহিত্যে বাউল দর্শনের প্রভাব

সন্দীপ কুমার পতি, *গবেষক, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 17.03.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The Baul tradition represents a distinctive spiritual stream within the cultural and philosophical heritage of Bengal. At its core lies the search for the *"Moner Manush"*—the inner or eternal being within the human self. Baul practitioners emphasize a human-centred mysticism that prioritizes personal spiritual experience over formal doctrines, scriptures, or ritual practices. The human body and inner consciousness are regarded as the primary locus of spiritual realization. Through disciplined practice, music, and reflective insight, the seeker attempts to discover the divine presence within oneself. In this sense, Baul philosophy promotes self-knowledge and spiritual freedom beyond caste distinctions, social hierarchies, and rigid religious identities.

The songs of the renowned Baul mystic Lalon Shah express this humanistic vision by questioning social divisions and emphasizing the unity of human existence. Baul thought also reflects influences from Sahajiya Vaishnavism and Sufism. The tradition significantly influenced Rabindranath Tagore, who helped introduce Baul ideas and songs to the wider intellectual world. Thus, Baul philosophy presents a unique vision of spirituality grounded in inner realization, love, and human unity.

Keywords: Baul Philosophy, Moner Manush, Lalon Shah, Rabindranath Tagore, Humanistic Mysticism, Spiritual Self-realization

রবীন্দ্র সাহিত্যে নানা ভাবনার এক সঙ্গম ক্ষেত্র। রবীন্দ্রনাথ যদিও দার্শনিক নয় বরং কবি বলে ভাবতেই তিনি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন তথাপি তাঁর কাব্য, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে নানাবিধ দর্শন ভাবনা। বিশেষত তার ধর্ম ভাবনা পুষ্ট হয়েছে নানা ভাবের স্রোতস্বিনী ধারার মধ্যে। ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ইসলাম ভাব যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে সহজিয়া বৈষ্ণব বাউল ভাব। বিশেষত তার জীবন যতই উত্তর পর্বে অগ্রসর হয়েছে ততই যেন অন্যসব ভাবকে ছাড়িয়ে সহজিয়া বৌদ্ধ, বৈষ্ণব ও বাউল ভাব প্রকট হয়ে উঠেছে তার রচনায়। দেহ-গেয় বোধ 'মনের মানুষের' ধারণা উপোচারিক ধর্মের প্রতি অনীহা সর্বত্রই বাউল দর্শনের গভীর প্রভাব লক্ষ্য করি আমরা। লালন ফকির থেকে গগন হরকরার ভাবনা রবীন্দ্র কবি মানুষকে কতখানি উজ্জীবিত করেছে তা প্রকট করে তোলার লক্ষ্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

বাউল উদাসীন সংসার মোহ মুক্ত। আবার বাউলকে আমরা সাধনাও বলতে পারি। যেকোনো ধর্মের মানুষ বাউলের সাধনা করতে পারে। বাউলের সাধকরা ঈশ্বর-পাগল। 'মনের মানুষ'- এর কথা বলেন বাউল সাধকরা। এই মনের মানুষ হলো মানুষের অন্তঃস্থিত মানুষ, মানব দেহেই তার আধার। এই মনের মানুষকে

উপলব্ধি করাই বাউল সাধনার প্রধান লক্ষ্য আর এই মানব দেহেই হলো সেই সাধনার প্রধান আশ্রয় ও আধার।বাউলরা বিশ্বাস করেন যে সঠিক ভাবে সাধনা করা গেলে এই দেহেই সেই মনের মানুষের সাথে মিলন ঘটবে। বাউল এর বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে এক বিশেষ গোষ্ঠী হল সাঁই দরবেশ।বিশিষ্ট বাউল সাধক সিরাজ শাহ ফকির এর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন বাউল জগতের এক অদ্বিতীয় রত্ন লালন। যিনি ছিলেন এক হিন্দু কায়স্থ পরিবারের সন্তান। 'লালন'শব্দেরঅর্থ প্রিয় শিষ্য।তিনি লালন শাহ ফকির নামে দশ হাজার শিষ্যের গুরু হিসেবে জীবন অতিবাহিত করেছেন। তার তিরোধানের বহু বছর পরও আজও তারঁ অজস্র গান বাংলা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে বর্তমান।

বাউলরা কোন ধর্ম কিংবা কোন ধর্মের সাথে জড়িত গ্রন্থকে মানেন না। তাদের কাছে ঈশ্বর, দেব-দেবী, আল্লাহ কোনটারই কোন মানে নেই। তবে তাদেরকে ঠিক নাস্তিকও বলা যায় না। বাউলরা বিশ্বাস করেন এক চিরন্তন সত্তায় যা মানুষের অন্তরে বাস করে। এই জায়গাতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে বাউলদের মিল পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের ওপর বাউল তথা লালনের দর্শন চিন্তার বিশেষ প্রভাব লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথের সূত্র ধরেই লালন ফকিরের বহু গান বিশ্বজুড়ে খ্যাতি লাভ করেছে। এমনকি রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সাহিত্যেও বাউল দর্শনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো তাঁর 'গোরা' উপন্যাসে বাউল সংগীত- "খাঁচার ভিতর অচিন পাখী"[১]-এর সংযোজন। বাউল সাধনার অন্তর্নিহিত মানব কেন্দ্রিক আধ্যাত্মিক যে সুর রবীন্দ্রনাথের চেতনায় গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছিল তা এর থেকেই বোঝা যায়।

অন্যান্য সাধনার মতোই বাউল সাধকদের সামনে এক বিশেষ লক্ষ্য বর্তমান। কিন্তু সেটা কোন পারলৌকিক মুক্তি কিংবা স্বর্গ লাভ নয়; বরং বিদ্যমান সমাজের বিভিন্ন কামনা-বাসনা, সুখ-দুঃখের বহু ঊর্ধ্বে সাধকদের নিজের দেহেরঅভ্যন্তরের সত্তার অনুসন্ধান। নিজের মধ্যে লুকিয়ে থাকা মনের মানুষের সন্ধানই হলো তাদের পরম লক্ষ্য। ঠিকএই কারণে বাউল সাধনার প্রধান লক্ষ্য হল ব্যক্তির আত্মানুসন্ধান।অতীন্দ্রিয় সত্তায় বাউলেরা বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেননি। এর কারণে নিজেদের দেহকেন্দ্রিক উপলব্ধির সাধনা করেন,ফলে কেবল বর্ণাশ্রম ও সামাজিক আচার-আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নয়, এর অন্তরে নিহিত ছিল মানুষের সামাজিক অবস্থান নির্ধারণকারী কাঠামোর বিরুদ্ধেও একটি মৌলিক প্রশ্ন। লালন ফকিরের বিভিন্ন গানের মাধ্যমে এটা প্রতিফলিত হয়েছে বারংবার– "কার বা আমি, কে বা আমার/প্রাপ্ত বস্তু ঠিক নাহি তার"[২]। এই পঙক্তিটিরমাধ্যমে তিনি সামাজিক বিভাজনের অসারতা তুলে ধরেছেন।

ইউরোপের নবজাগরণের সময়কালে মানুষ সচেতন সত্তা হিসেবে একটি নির্দিষ্ট মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তুলেছিল। ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার যখন উত্থান ঘটেতখন মানবতাবাদী চিন্তার উন্মেষ ঘটেছিল। যদিও সেটি সম্পূর্ণভাবে ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত ছিল না। বাউল ধর্মের মৌলিক ভিত্তি ছিল সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মে। বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনার ধারণাটি মূলত মানবীয় নারী পুরুষের মধ্যেকার পবিত্র প্রেমকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। এই প্রেমে রাধা-ভাবাপন্ন মানব সত্তা এবং কৃষ্ণের চিরন্তন প্রেমলীলার প্রতীকী পুনঃনির্মাণ হিসেবে ব্যাখ্যা হয়। অন্যদিকে বাউলদের কাছে তাদের অন্তর্নিহিত চিরন্তন পরমাত্মারূপই হলো আসল প্রেম। এই সত্তাকেই তারা 'মনের মানুষ' নামে অভিহিত করেছেন। সুফি দর্শনের ঈশ্বর অনুসন্ধানের সঙ্গে এই বাউলদের মনের মানুষের মিলনের যে গভীর আকুতি কিংবা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয় তার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বাউল সাধকলালন মানবের এই সত্ত্বাটিকে রতনের সঙ্গে তুলনা করেন এবং তাকে যতন করে রাখার উপদেশ দিয়েছেন। দেহ হল বর্তমান এবং মনের মানুষ এর উৎস, অবস্থান, সন্ধান, প্রাপ্তি মানবদেহের মধ্যেই লভ্য এবং তাকে দেহ সাধনার দ্বারাই লাভ করা যায়। অনেক মানুষ শুধু কেবলমাত্র বুদ্ধি বাধারণার মাধ্যমে মনের মানুষকে ব্যাখ্যা করতে চান, কিন্তু বাউল সেই

সীমা অতিক্রম করে যায়। যদি কোন মানুষ সঠিক সাধনার মাধ্যমে কামনা বাসনা সুখ-দুঃখের গণ্ডি অতিক্রম করে প্রেমকে পেতে পারে তখন সেই সাধক অন্তঃস্থিত ঈশ্বরীয় সত্তায় উপনীত হয় এবং সাধককের প্রকৃত সত্তাই তার একমাত্র সত্তা হয়ে ওঠে। এটা লালনের ভাষায় "মনের মানুষ খেলছে দ্বি দলে।/যেমন সৌদামিনী মেঘের কোলে।।/ও সে দল নিরূপণ হবে যখন/মানুষ ধরা যাবে তখন/জনম সফল হবে রূপ দেখিলে।।"[৩] এইভাবেই দেহকেন্দ্রিক সাধনার মাধ্যমে বাউলদের চেতনার আত্মগত স্তরের উত্তরণ ঘটে। ঠিক এভাবেই বাউলেরা নিজের ভেতরকার মনের মানুষের সন্ধান করতে গিয়ে আর একটা সত্তার অস্তিত্ব অনুভব করে যাকে তারা 'ভোলা মন' আখ্যা দেন। এই ধারণার সূত্রটির হাত ধরে 'ভোলা মন' শব্দবন্ধটাবাউল গানের এক অভিন্ন পরিচয়চিহ্ন হয়ে উঠেছে। এই বাউল সঙ্গীতের মধ্যে 'মন' ও 'মনের মানুষ'-এর মধ্যে একটা দ্বৈতভাব লক্ষ্য করা যায়। যদিও সাধকরা জানে এই ভাবাবেগ প্রকৃত ভাব নয় নিজের মধ্যে অধরা মানুষকে ধরাই একমাত্র সাধনা এবং তার জন্য এই দ্বৈতভাবকে সরিয়ে দেহ ও মনের মিলন ঘটানোই সাধকের সবথেকে চরম ও একমাত্র উদ্দেশ্য। যখন ব্যাক্তি, মন এবং দেহ এগুলিকে পৃথক বলে মনে হওয়া সত্তাগুলি একটি বিন্দুতে এসে মিলিত হয়, তখনই সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে এবং বাউলেরানিজের মধ্যে থাকা প্রকৃত স্বরূপের সন্ধান পান ও সাধকের সাথে এই মনের সম্পর্ক কখনও বা বিচ্ছেদ আবার কখনও বা সংযুক্তির মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে। এই পরিবর্তনীয় গতিশীল পথের মধ্যে দিয়েঅনুসন্ধান এগিয়ে চলে। কিন্তু বাউল সাধনার সবচেয়ে কঠিন কাজ হলো মনের মানুষের যে প্রাপ্তি সেই উপলব্ধিটিকে ধরে রাখা। এইভাবেই মনের মানুষের অনুসন্ধান বাউলের কাছে কোন সমাপ্তি নয় বরং বলা যেতে পারে সমগ্র জীবনব্যাপী এক অবিরাম অন্বেষণ। জীবন নিজেই সাধনার রূপ ধারণ করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন ও সাহিত্যে বিভিন্নভাবে বাউল ভাবধারার প্রতিফলন দেখা যায়। বাউলের 'মনের মানুষ' তত্ত্বের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতার' সাদৃশ্য সহজেই লক্ষণীয়। তাঁর বিভিন্ন গল্প, উপন্যাস, কবিতা, গান, প্রবন্ধ ইত্যাদির মধ্যে বারংবার বিভিন্নভাবে বাউলের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি এক কবিতায় লিখছেন- "তরুণ যৌবনের বাউল/সুর বেঁধে নিল আপন একতারাতে, /ডেকে বেড়ালো/নিরুদ্দেশে মনের মানুষকে অনির্দেশ্য বেদনার খ্যাপা সুরে।"[৪] ধীরে ধীরে এইভাবেই 'রবীন্দ্রবাউলে' তিনি রূপান্তরিত হয়েছিলেন। শিয়ালদহে কবি বিভিন্ন বৈষ্ণব, বৈষ্ণবী ও বাউলদের সংস্পর্শে আসেন। তাঁর সাথে বাউলের এক অন্তরঙ্গ পরিচিতি তৈরি হয়। এমনকি আজকের এই বাংলায় যে লালন সম্পর্কে এত উৎসুক তার জন্যও বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথই দায়ী। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'প্রবাসী' পত্রিকায় ও 'গোরা' উপন্যাসে প্রথম লালনের গানের উল্লেখ করেছিলেন। "খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়" - লালনের এই গানটি জীবনস্মৃতি গ্রন্থের 'গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। ১৯২৫ সালে ভারতীয় দর্শন মহাসভার অধিবেশনে 'The philosophy of our people' শীর্ষক সভাপতির ভাষণে 'অচিন পাখির' উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। এর পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত বক্তৃতায় লালনের বিভিন্ন গানের উল্লেখ করেন তিনি।

শিলাইদহের জমিদারি দেখাশোনার দায়িত্ব নেওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে লালন শাহের আধ্যাত্মিক গানের এক গভীর যোগসূত্র তৈরি হয়। লালনের সংগীতের সহজবোধ্য ভাষা অথচ উচ্চমার্গের দর্শন তাঁকে গভীরভাবে বিমোহিত করেছিল। মূলত শিলাইদহ যাপনের সেই দিনগুলোতেই তাঁর সৃজনশীল সত্তায় লালনের দর্শনের এক শক্তিশালী প্রভাব পড়ে। মজার বিষয় হলো, শিলাইদহ ডাকঘরের পিয়ন এবং বাউল কবি গগন হরকরাকে রবীন্দ্রনাথই প্রথম জনসমক্ষে নিয়ে আসেন। লালনের পর গগন হরকরার সৃষ্টিকর্মই তাঁকে সবচেয়ে বেশি উদ্বুদ্ধ করেছিল।

গগনের কালজয়ী গান— "আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে"[৫]— রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল। পরবর্তীকালে তাঁর হাত ধরেই প্রবাসী পত্রিকায় বিখ্যাত 'হারামণি' বিভাগের যাত্রা শুরু হয়, যেখানে বাউল গানের অমূল্য রত্নগুলো সংরক্ষিত হতে থাকে। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, কবির বাউল ভাবধারার বিকাশে লালন ফকির ও গগন হরকরার অবদান অনস্বীকার্য। গগন হরকরার সেই গানটির সুর ও বাণীর প্রভাব এতটাই গভীর ছিল যে, তা থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি 'আমার সোনার বাংলা'[৬] গানটি রচনা করেন।

'হারামণি'র মুখবন্ধে গগনের গানটি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে, গানের কথাগুলো সরল হলেও সুরের মূর্ছনায় তা এক অলৌকিক জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, উপনিষদের গূঢ় তত্ত্বগুলোই যেন গ্রামবাংলার বাউলদের মুখে 'মনের মানুষ' হিসেবে সহজভাবে ধরা দিয়েছে। উপনিষদের 'অন্তরতর যদয়মাত্মা' কথাটির সঙ্গে বাউলদের এই 'মনের মানুষ' খোঁজার যে বিস্ময়কর মিল, তা রবীন্দ্রনাথকে অভিভূত করত।[৭] প্রকৃতপক্ষে, শিলাইদহ ছিল বাউল-বৈষ্ণবদের এক মিলনমেলা, আর তাঁদের সাহচর্যেই কবির জীবনদর্শনে এক মরমি ও আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল। ফলে এটা বলা যেতেই পারে শিয়ালদহের বাউল সম্প্রদায়ের থেকে প্রেরণা পেয়ে তিনি রবীন্দ্র বাউলে রূপান্তরিত হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে বিভিন্ন পর্যায়ে বাউল ভাবের পরিচয় স্পষ্ট, সে তার শিল্পকর্মে হোক কিংবা পোশাক পরিচ্ছদে। সব বাউলদের মতো তিনিও বাইরের ধর্মকে অস্বীকার করে অন্তর ধর্মকেই আপন ধর্ম বলে মনে করতেন। নিজেকে জানার এই ধর্মই হলো বাউল ধর্ম। রবীন্দ্রনাথও বলেছিলেন "আমার ধর্ম কি, তা যে আজও আমি সম্পূর্ণ এবং সুস্পষ্ট করে জানি, এমন কথা বলে পারিনে -অনুশাসন আকারে তত্ত্ব আকারের কোন পুঁথিতে লেখা ধর্ম সে তো নয়।"[৮] বাউলের যে প্রধান বাণী মনের মানুষের অন্বেষণ রবীন্দ্রনাথ সেটিকেই নিজের জীবনে ধারণ করেছিলেন তার ধর্ম চিন্তায়। তিনি বলেছেন, "বিশ্ব দেবতা আছেন, তাঁর আসন লোকে লোকে, গ্রহ চন্দ্র তারায়।"[৯] ক্ষ্যাপা বাউলরা যেমন সারা জীবন ঘুরে ঘুরে নিজের মনের মানুষের সন্ধান করে রবীন্দ্রনাথও ঠিক যেন তার মনের মানুষের সন্ধান চালিয়ে গেছেন সারা জীবন ধরে। তাই তিনি নিজেকে সমর্পণ করতে গিয়ে বলেছেন "আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন/সকল মন্দিরের বাহিরে/আমার পূজা আর সমাপ্ত হল/দেবলোক থেকে/মানবলোকে,/আকাশে, জ্যোতির্ময় পুরুষে/আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে।"[১০]

রবীন্দ্রনাথের 'পটপুট' কবিতাটির - "কতদিন দেখেছি ওদের সাধককে/একলা প্রভাতের রৌদ্রে সেই পদ্মা নদীর ধারে,/...দেখেছি একতারা হাতে চলেছে গানের ধারা বেয়ে/মনের মানুষকে সন্ধান করবার/গভীর নির্জন পথে..."[১১] এই লাইনগুলি দেখলেই বোঝা যায় তাঁর দর্শন চিন্তায় বাউল ভাবধারার কতখানি প্রভাব ছিল। রবীন্দ্রনাথের নাটকের ক্ষেত্রে যদি আমরা লক্ষ্য করে দেখি তাহলে বুঝতে পারা যাবে যে বেশিরভাগ নাটকের প্রধান চরিত্র হিসেবে বাউল ধরনের একটি বিশেষ কোন চরিত্রকে অবলম্বন করে পরিণাম সুসজ্জিত করার একটা তাই প্রবণতা তাঁর মধ্যে ছিল। যেমন-'ফাল্গুনীর' সেই অন্ধ বাউলের কথা বলা যায়।

'শান্তিনিকেতন' ভ্রমণাবলীর অন্তর্গত 'ছোটো ও বড়ো' নামের একটি রচনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নিজের সত্যরূপটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যা যা বলেছেন, তার প্রধান বক্তব্য হলো মনের মানুষকে 'কোথায় পাওয়া যাবে?' তার সন্ধান করতেই যেমন বাউল সাধকরা জীবন কাটিয়ে দেন, তার জীবনেরও অন্বেষণ সেই সন্ধানে সমধর্মীয়। অন্যদিকে 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির প্রত্যেকটি পঙক্তি যেন তার জীবন দেবতার ধারণাকে গভীরতর দার্শনিক করে তুলেছিল।বাউল প্রেম এই মনের মানুষের প্রতি অনুরাগ সব মিলিয়ে তার বিভিন্ন

নাটকের প্রধান চরিত্র হয়ে উঠেছিল এক বাউল। ধনঞ্জয় বৈরাগী, দাদা ঠাকুর, অন্ধ বাউল...ইত্যাদি চরিত্রগুলি জীবনের সহজ সরল পথ, সামাজিক ক্রীড়া প্রতিক্রিয়া ত্যাগ করে মোক্ষের বার্তা বয়ে বেড়িয়েছে।

বাংলার এক অভিন্ন লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত বাউল গান দীর্ঘদিন যাবত সমাজে চলে এলেও শিক্ষিত সম্প্রদায় এর তেমন কোন সন্ধান জানতেন না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে সর্বপ্রথম এই গানগুলি শিক্ষিত জনসমাজের প্রচারিত হয়েছিল। তিনি এই গানগুলির কাব্য মূল্য বিচার করে তার নিজের অন্তরে প্রতিস্থাপন করেছিলেন। উপনিষদ ও বিভিন্ন সন্তদের বাণীর পাশেই তিনি স্থান দিয়েছিলেন নিরক্ষর বাউলের বাণী। তাঁর ধারণা ছিল বাউলরা কবীর-নানক প্রভৃতি সন্তদের মতোই মোক্ষের পথের সাধক ছিলেন। সন্ত ও বাউলদের মতবাদের মধ্যে অনেক মিল থাকলেও বাউল কিন্তু সন্তদের কাছ থেকে ধর্ম কিংবা মতবাদ গ্রহণ করেননি। এই সাধনাটি বিশেষভাবেই বাংলাদেশের নিজস্ব। 'বাউল গান' প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেছেন যে তার অন্তরে গভীর যুগ ছিল বাউল গানের সঙ্গে। তাঁর মতে অহং বিন্যাসের ফলে প্রকৃত প্রেম পাওয়া সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথ বাউল গানগুলির মধ্যে জটিলতাকে বাদ দিয়ে সহজভাবে কবিত্তময় গানগুলি নির্বাচন করে নিয়ে রস উপভোগ করেছেন। তার জন্যই ধর্মদর্শন ও সাহিত্যের বিচারে বৈষ্ণব বা শান্তদের তুলনায় বাউল গান রবীন্দ্রনাথকে বেশি পরিমাণ মুগ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল। তিনি বাউল নাম দিয়ে যে স্বদেশী গানগুলোর রচনা করেছিলেন তাদের বেশির ভাগটাই বাউল সুরে রচিত হলেও সবগুলি কিন্তু ছিল না। তবুও সবগুলোকেই বাউল নামে চিহ্নিত করেছিলেন তিনি কারণ তিনি দেখেছিলেন এই বাউল সম্প্রদায়ের সাধকরা জনসাধারণের দরজায় দরজায় ঘুরে গান উচ্চারণের মাধ্যমে তত্ত্বকথা ও ধর্ম ভাব পরিবেশন করেনএবং তাদের ভাবের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভাবের এক সুদৃঢ যোগ সূত্র দেখা যায়। তিনি লিখেছেন– "আমার মন, যখন জাগালি না রে, তোর মনের মানুষ এল দ্বারে"[১২]। রবীন্দ্রনাথের মনের মানুষের প্রতি যে মনের আকুতি ভাব তা প্রকাশ করে তিনি লিখছেন- "আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে,/তাই হেরি তাই সকল খানে।।"[১৩] আবার কখনো বাউলের তত্ত্বকথা কে অবলম্বন করে বিভিন্ন নতুনত্ব সৃষ্টি করার অনুপ্রেরণাও পেয়েছিলেন তিনি। "অচিন পাখি তুমি/মিলনের খাচায় থাক/নানা সাজের খাঁচা।/সেখানে বিরহ নিত্য থাকে পাখির পাখায়,/স্থকিত ওড়ার মধ্যে।"[১৪]

বাউল গান এবং রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের মধ্যে যে মিল দেখা যায় সেটা খানিকটা প্রভাবগত হলেও সম্পূর্ণরূপে নয়, বরং উভয়ের জীবনদর্শনের প্রতি যে ধারণা তাসুদৃঢ় ঐক্য ছিল। তাই ভারতীয় দার্শনিক সংঘের অধিবেশনে মানুষের ধর্ম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি এই ভাবটির প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেখিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন- "আপনারই পরমকে না দেখে মানুষ বাইরের দিকে সার্থকতা খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু মানুষের দেবতা মানুষের মনের মানুষ..."[১৫]।

পরিশেষে এটা বলা যেতেই পারে বৈষ্ণব পদাবলী তাঁকে যথাসাধ্য আকৃষ্ট করলেও তার মনে বিশেষ স্থান পায়নি। তার হৃদয়ে বাউল সাধনা ও বাণী যে কতখানি দাগ কেটেছিল তা আরো স্পষ্টভাবে ধরা পরে ১৩২২ সালে প্রবাসী পত্রিকায় তাঁর সম্পাদনায় বাউল গুরু লালন ফকিরের ১৯ টি গান প্রকাশিত হয়। তিনি বুঝেছিলেন যদি সবথেকে সহজ মুক্তির সাধনার পথ কিছু থেকে থাকে তাহলেসেটা হলবাউল সাধনার পথ।

তথ্যসূত্র:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। গোরা। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৬৯,বিশ্বভারতী, পৃ. ৭।
২. দাশ, ডক্টর শ্রী মতিলাল ও মহাপাত্র, শ্রী পীযূষকান্তিবিশ্বভারতী। লালন গীতিকা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮, কলিকাতা, পৃ. ২৮৬।
৩. দাশ, ডক্টর শ্রী মতিলাল ও মহাপাত্র, শ্রী পীযূষকান্তিবিশ্বভারতী। লালন গীতিকা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮, কলিকাতা, পৃ. ৫৫-৫৬।
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ।শেষ সপ্তক। রবীন্দ্ররচনাবলী (৩য় খণ্ড), বিশ্বভারতী প্রেস, ১৯৮৩, শান্তিনিকেতন, পৃ. ২১১।
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। আশীর্বাদ, উদ্দীন, মনসুর, মুহম্মদ, 'হারামণি' (২য় খণ্ড), ঢাকা, ১৩৭৮, পৃ. ৩।
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। আশীর্বাদ, উদ্দীন, মনসুর, মুহম্মদ, 'হারামণি' (২য় খণ্ড), ঢাকা, ১৩৭৮, পৃ. ৩।
৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। আশীর্বাদ, উদ্দীন, মনসুর, মুহম্মদ, 'হারামণি' (২য় খণ্ড), ঢাকা, ১৩৭৮, পৃ. ৩।
৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। আত্মপরিচয়, রবীন্দ্ররচনাবলী (খণ্ড ২৭), বিশ্বভারতী, ১৩৮১, পৃ. ২৩৫।
৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। আত্মপরিচয়, রবীন্দ্ররচনাবলী (খণ্ড ২৭), বিশ্বভারতী, ১৩৮১, পৃ. ২৪২।
১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'পত্রপুট' (পনেরো পরিচ্ছদ), রবীন্দ্ররচনাবলী (খণ্ড ২০), বিশ্বভারতী, ১৩৭৪, পৃ. ৪৮।
১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'পত্রপুট' (পনেরো পরিচ্ছদ), রবীন্দ্ররচনাবলী (খণ্ড ২০), বিশ্বভারতী, ১৩৭৪, পৃ. ৪২।
১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। গীতবিতান, বিশ্বভারতী, ১৯৩১, শান্তিনিকেতন, পৃ. ৫৫০।
১৩. রবীন্দ্রনাথ। গীতবিতান, বিশ্বভারতী, ১৯৩১, শান্তিনিকেতন, পৃ. ৫৪৯।
১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। শেষসপ্তক, রবীন্দ্ররচনাবলী (খণ্ড ১৮), বিশ্বভারতী, ১৩৭৪, শান্তিনিকেতন, পৃ. ১৬২।
১৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। মানুষের ধর্ম, রবীন্দ্ররচনাবলী (খণ্ড ২০), বিশ্বভারতী, ১৩৭৪, শান্তিনিকেতন, পৃ. ৩৯০।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. উদ্দীন, মনসুর। মুহম্মদ হারামণি (২য় খণ্ড)- 'আশীর্বাদ'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৭৮, ঢাকা।
২. কবিরাজ, শ্রী গোপীনাথ। ভারতীয় সাধনার ধারা। সংস্কৃত কলেজ,১৯৬৫, কলিকাতা।
৩. গুপ্ত, অমিত। বাংলার লোকজীবনে বাউল।সংবাদ,১৯৭৮, কলকাতা।
৪. চক্রবর্তী, সুধীর। ব্রাত্য লোকায়ত লালন। পুস্তক বিপণি,১৯৯২, কলকাতা।
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্ররচনাবলী (১-১৪ খণ্ড)। জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৩৬৮, কলিকাতা।
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্ররচনাবলী (খণ্ড ১৮)। ১৩৭৪, বিশ্বভারতী।
৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। গোরা। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়,১৯৬১, বিশ্বভারতী।
৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। মানুষের ধর্ম। বিশ্বভারতী, ১৩৩৯, শান্তিনিকেতন।
৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। গীতবিতান। বিশ্বভারতী, ১৯৩১, শান্তিনিকেতন।
১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ।সংগীত চিন্তা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ,১৩৯৯, কলিকাতা।
১১. দত্ত, ভাবতোষ।বাংলা গীতিকাব্যের আদিপর্ব। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ,১৩৯৮, কলকাতা।

১২. পাঠক, সুনীতিকুমার।বাউল খোঁজে মনের মানুষ। অর্পিতা প্রকাশনী,১৯৯৭, কলকাতা।
১৩. বসু, অরুনকুমার। রবি– বাউলের উৎসমুখে। রবীন্দ্র প্রসঙ্গ (রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রবন্ধ সংকলন), তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, ১৩৯৫, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
১৪. ভট্টাচার্য্য, উপেন্দ্রনাথ। বাংলার বাউল ও বাউলগান, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৩৭৮, কলিকাতা।
১৫. মিত্র, শ্রী সনৎকুমার। লালন ফকির, পুস্তক বিপণি, ১৩৮৬, কলিকাতা।
১৬. রায়, অভয়পদ। বাউল পদাবলী, ১৪০০ প্রকাশনী, বোলপুর, ১৪০১, বীরভূম।
১৭. রায়, শ্রী অমরেন্দ্রনাথ। শাক্ত পদাবলী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭১, কলিকাতা।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1272-1282
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.347

সুদক্ষিণা সেনের ‘জীবনস্মৃতি’: আধুনিক ভারতের সমাজ ইতিহাসের এক নারী কণ্ঠ

সৈকত পাত্র, *স্বাধীন গবেষক, আরামবাগ, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 18.03.2026; Accepted: 19.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

An autobiography is a work in which a person expresses the experiences, feelings, and thoughts of their life in their own words. Sudakshina Sen was an educated and cultured woman of the nineteenth century. In her autobiography ‘JivanSmriti’, she described not only her personal life but also the social system of her time.

She wrote about her family environment, social customs, religious beliefs, and various superstitions present in Hindu society during that period. Her writings clearly show the position of women, the limitations on their education, and the conservative attitude of society toward women. The influence of Brahmanical traditions and the ideas of social reform are also reflected in her work.

In this autobiography, Sudakshina Sen attempts to understand society and history from a woman’s perspective. she also highlighted the social changes of her time, the spread of education, and the awakening of women. She mentioned several important social reformers, such as Keshav Chandra Sen, Vijaykrishna Goswami, and Bidhan Roy, whose ideas help us understand the intellectual climate of that period.

‘JivanSmriti’ is not merely a personal life story; it is an important document for understanding nineteenth-century society and history. Through the autobiography of a woman, we can see a realistic picture of the social conditions of that time. In this article, based on Sudakshina Sen’s autobiography ‘JivanSmriti’, I have tried to explore the nature of nineteenth-century Indian society, the challenges faced by women, and the issues related to women’s awakening.

Keywords: Autobiography, Autogynography, Fasting Festivals (vrat utsav), Antahpur (inner quarters), Brahmo Movement, Paganism

আত্মজীবনী (Autobiography) হল একজন ব্যক্তির স্বরচিত আত্মকথা। নারীবাদী গবেষণার ক্ষেত্রে আত্মজীবনীর একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। নারী আত্মজীবনী কেন লেখা হয়? কারন আত্মজীবনীর মাধ্যমে মেয়েদের জীবনের ইতিহাস ধরা পড়ে। তার মূল কারণ হচ্ছে মেয়েদের জীবনচর্চা বা জীবনবোধ প্রচলিত ঐতিহাসিক তথ্যে সেভাবে ধরা পড়ে না। আত্মজীবনীমূলক লেখার বৈশিষ্ট্য হল- (১) ব্যক্তি জীবনের উন্মোচন অর্থাৎ ব্যক্তি জীবনকে তুলে ধরা এবং (২) যিনি লিখছেন তার ব্যক্তি সত্তার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার সামাজিক প্রেক্ষিতের একটি পরিচয় পাওয়া প্রয়োজন।

আত্মজীবনীমূলক লেখাতে বহির্জগতে ঘটে যাওয়া ঘটনার প্রতি একজন ব্যক্তি কিভাবে প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে সেটাও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজনীয়। মেয়েদের লেখা ও পুরুষের লেখা জীবনের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। মেয়েদের লেখার ভঙ্গি পুরুষের থেকে ভিন্ন হয়। প্রখ্যাত মার্কিন লেখিকা Domna C. Stanton রচিত *The Female Autobiography: Theory and Practice of Autobiography from the Tenth to the Twentieth Century* গ্রন্থে, মেয়েদের আত্মকথার জন্য তিনি তৈরি করেছেন একটি নতুন শব্দ- 'অটোবায়োগ্রাফি'-র বদলে 'অটোগাইনোগ্রাফি'।[১] কিন্তু কেন? এর পেছনে কতগুলি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় (১) ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি ঝোঁক এবং (২) বহির্জগতের তুলনায় পারিবারিক জীবনে বেশি আগ্রহ, (৩) কালানুক্রম না মেনে এলোমেলো লেখা।

Malavika Karlekar তাঁর *Voices from Within: Early Personal Narratives of Bengali Women* গ্রন্থে উনিশ শতকের বাঙালি মেয়েদের নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই সময় মেয়েরা যে ঘরের মধ্যে একটা ব্যক্তিগত পরিসর তৈরি করেছিলেন, তার প্রতিফলন ঘটেছিল আত্মজীবনীতে। ১৮৫০ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে কবিতা, উপন্যাস, আত্মজীবনী মিলিয়ে বাংলাদেশে মেয়েদের রচিত অন্তত ৪০০-এর বেশি সাহিত্যকর্ম ও তাদের সম্পাদিত ২১ টি পত্রিকার সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রথম যুগের শিক্ষিত বাঙালি মহিলা যারা আত্মজীবনী লিখেছেন রাসসুন্দরী দেবী (১৮০৯-১৮৯৯), সারদা সুন্দরী দেবী (১৮১৯-১৯০৭), কৈলাসবাসিনী মিত্র (১৮২৯-১৮৯৫), নিস্তারিণী দেবী (১৮৩৩-১৯১৬) এই চারজনকে বলা হয় মেয়েদের প্রথম প্রজন্ম। যাঁরা প্রথম আত্মজীবনী লিখেছেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের আত্মজীবনী লেখিকারা আধুনিক শিক্ষার সুযোগ লাভ করেছিলেন। এনারা হলেন জ্ঞানোদানন্দিনী দেবী (১৮৫০-১৯৪১), স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২), শরৎকুমারী চৌধুরানী (১৮৬-১৯২০), লীলাবতী মিত্র (১৮৬৪-১৯২৪), সারোদা মঞ্জুরী দত্ত (১৮৭২-১৯৫৪)।

বিংশ শতকে এসেও কিন্তু মেয়েরা লেখালেখি করেছেন যারা বিভিন্ন পেশা গ্রহন করেছিলেন ও যারা সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ নিয়েছিলেন। যেমন- মনিকুণ্ডলা সেনের 'সেদিনের কথা', পূন্যলতা সেনের 'ছেলেবেলার দিনগুলি', শান্তিসুধা ঘোষের 'জীবনের রঙ্গমঞ্চে', বীনা দাশের 'শৃঙ্খল ঝঙ্কার', রেবা রায়চৌধুরী 'জীবনের টানে শিল্পের টানে'। যারা জেলে গিয়েছিলেন তাঁরা জেল জীবনের কথা লিখেছেন- রানী চন্দ-র 'জেনানা ফাটক'।

১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত রাসসুন্দরী দেবীর 'আমার জীবন' হল প্রথম ভারতীয় নারীর আত্মজীবনী। এটি আমাদের উনবিংশ শতকের ভারতীয় সমাজের নারীদের অবস্থান সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করে, আর বিংশ শতকের নারীদের লেখা আত্মজীবনীর মধ্যে অন্যতম হল সুদক্ষিণা সেনের 'জীবনস্মৃতি' (১৯৩২)। সুদক্ষিণা সেন ছিলেন উনবিংশ শতকে একজন শিক্ষিত, সংস্কৃতিমনা, প্রগতিশীল বঙ্গনারী। এই আত্মজীবনীর মধ্যে দিয়ে সুদক্ষিণা সেন তার ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক প্রেক্ষাপট, ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণের সিদ্ধান্ত সহ তৎকালীন সমাজে একাধিক কুসংস্কার ও রক্ষণশীলতা কিভাবে বঙ্গদেশের সমাজকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করে রেখেছিল- এই বিষয়টি আমি সবিস্তারে পর্যালোচনা করার চেষ্টা করেছি।

উনবিংশ শতকের বঙ্গসমাজ ও সুদক্ষিণার জীবন:

অবিভক্ত বাংলাদেশের ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুরের সোহাগদল গ্রামে, ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে ২৬ ডিসেম্বর সুদক্ষিণা সেন জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন জগবন্ধু গঙ্গোপাধ্যায় আর মাতা ছিলেন নিত্যকালী

গঙ্গোপাধ্যায়। সুদক্ষিণারা তিন ভ্রাতা-ভগ্নী ছিল তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন গোবিন্দবন্ধু আর ভগ্নী ছিলেন বগলা সুন্দরী।

উনবিংশ শতকে বঙ্গীয় সমাজ ছিল রক্ষণশীল ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। নারীরা ছিল অবহেলিত ও অন্তঃপুরবাসিনী। সুদক্ষিণার পিতা জগবন্ধু গঙ্গোপাধ্যায়, বঙ্গদেশে ঘোর কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের থেকেও তার মধ্যে একটা যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী স্বাধীন চিন্তা চেতনার উন্মেষ ঘটে। শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধ করে তিনি বলেছিলেন, "কন্যাদের লেখাপড়া শিখাইও ও বড় করিয়া বিবাহ দাও।"[২] কিন্তু উনবিংশ শতকের গোঁড়া রক্ষণশীল ও অন্ধকারচ্ছন্ন বঙ্গসমাজ মেয়েদের পড়াশোনা নিয়ে গ্রামে হুলস্থুল বাঁধিয়ে দিল। কেউ কেউ অর্বাচীনের মতো বলতে লাগলো, মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বিধবা হইবে।

উনবিংশ শতক ছিল বাংলার ইতিহাসে এক সাংস্কৃতিক ও সামাজিক রূপান্তরের যুগ। শিক্ষার প্রসার, ব্রাহ্ম আন্দোলন, নারী শিক্ষার সূচনা, ধর্মীয় সংস্কার ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে এই সময় বাংলার নারীদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির ধারাও প্রবলভাবে বজায় ছিল। এই ধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল ব্রত ও ব্রতকথা। বাংলার গ্রামীণ নারীরা এই শতকে ধর্ম, সংসার, প্রকৃতি ও নারীত্বকে কেন্দ্র করে একাধিক ব্রত পালন করতেন। সুদক্ষিণাও বাল্যকালে প্রচলিত বিভিন্ন ব্রত- যেমন মাঘমন্ডল, যম-পুকুর, মঙ্গল চন্ডী ইত্যাদি পালন করতেন। মাঘ মন্ডল ব্রতে সম্পূর্ণ মাঘ মাস প্রতি দিবস অতি প্রত্যুষে উঠে পুস্করিনীর ধারে দাঁড়িয়ে মন্ত্র পড়তে হতো;

"উঠ উঠ, সূর্য্যঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়া,
না উঠিতে পারি মোরা হিয়ণের লাগিয়া...
যা,যা, নাইকানী, তুই আমার সই,
মাঘমন্ডলের ব্রত করতে ঘাট পাবো কই ?"[৩]

বাল্যকালে আরও একটি ব্রতর কথা তিনি উল্লেখ করেছেন তার নাম যম-পুকুর। এই ব্রতের উদ্দেশ্য যমরাজার মাকে তুষ্ট করা এবং পরলোকগত গুরুজনদের জলদান করা। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন যে, ঐ সকল ব্রতকর্মে তার আস্থা চলে গিয়েছিল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ব্রত আর করিবেন না। তিনি বলেন যে,

> "পৌত্তলিকতায় যখন আমার বিশ্বাস নেই নিরাকার ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের অঙ্কুর দয়াময় ঈশ্বরই যখন আমার শিশুমনে বপন করিয়াছেন তখন মিথ্যা অভিনয়ের প্রয়োজন কি!"[৪]

মেয়েদের সে সময়কার সামাজিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে, বালিকার এই ছোট বিদ্রোহ নেহাত ছোট নয়।

বাংলার সমাজ সংস্কার আন্দোলনের প্রধান স্থপতি ছিলেন রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সমাজে বাল্যবিবাহের ন্যায় কুপ্রথা বন্ধের জন্য তারা অপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। সুদক্ষিণার দাদার বয়স যখন মাত্র ১৫ বছর তখন তার কাকারা একটি বংশজের (অর্থাৎ অকুলীন) কন্যার সাথে দাদার বিবাহ দিয়ে দেন। ইতিপূর্বেই বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে এক বিশেষ আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল বিদ্যাসাগর মহাশয় তার 'বাল্যবিবাহের দোষ'[৫] নামক প্রবন্ধে; তিনি যুক্তি, শাস্ত্র, এবং বাস্তব সমাজচিত্রের আলোকে বাল্যবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। সেই সময় 'বাল্যবিবাহ' নামক একখানি সংবাদপত্র ঢাকা থেকে প্রকাশিত হতো। সেই সংবাদপত্রে সাধারণ জনগণকে বাল্যবিবাহ প্রসঙ্গে সচেতন করার জন্য বেশ কিছু প্রবাদ ও ছড়া প্রকাশিত হতো-

"অল্প বয়সে বিবাহ
সিংহ হয় বরাহ"-

ও

"অল্প বয়সে বিয়ে করা
কাঁচা বাঁশি ঘুণ ধরা"[৬]

সুদক্ষিণার দাদামহাশয় সেকালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হলেও তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অতি উদার। অনেক বিষয়ে তিনি দেশের প্রচলিত কুসংস্কার হইতে দূরে থাকতেন-

> "সে'কালে বিধবাদের নিজ্জলা একাদশী করিবার নিয়ম ছিল। এই কুসংস্কারটি লোকের মনে এত দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছিল যে, একাদশীর দিন কোন বিধবার মৃত্যু হইলেও একবিন্দু জল দ্বারা তাঁহার কণ্ঠ ভিজাইতে পারিতেন না। এমন কি একাদশীর দিনে মৃতা হতভাগিনী বিধবার চিতা ভস্মও ধুইবার নিয়ম ছিল না। এই নিদারুণ মূঢ়তার ফলে কত বিধবাকে যে শুষ্ককণ্ঠে মরিতে হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। হায়রে কুসংস্কার! পুরুষগণ স্ত্রীর মৃত্যুর পরে, এমনকি যাহা খুসি তাহাই করিতে পারিবে; কিন্তু হতভাগিনী বিধবা শুষ্ককণ্ঠে জল পাওয়া দূরে থাকুক, চিতাভস্মটুকু ধৌত করিলেও তাহার ধর্ম নষ্ট হইবে?"[৭]

সমাজ-সংস্কৃতি, ব্রাহ্ম আন্দোলন ও নারীর আত্মপরিচয়ের নির্মাণ:

এইরূপ উদার ধার্মিক প্রকৃতি পিতার কন্যা বলেই, সুদক্ষিণার মা ঘোর কুসংস্কারের আবরণ ভেদ করে ব্রাহ্ম ধর্মের আলোকে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। সুদক্ষিণার মা কয়েকজন ব্রাহ্ম বন্ধুর সাহায্যে ব্রাহ্মসমাজের 'তত্ত্ববোধনী'[৮] ও 'অবলাবান্ধব'[৯] নামক পত্রিকা পাঠ করে তাঁর হৃদয় বাহ্ম সমাজের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। ইতিহাসবিদ Geraldine Forbes তাঁর বই *Women in Modern India* উনিশ শতকের নারীজাগরণ ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের আলোচনা করতে গিয়ে 'অবলাবান্ধব' পত্রিকা-এর মতো সাময়িক পত্রিকার গুরুত্ব উল্লেখ করেছেন।[১০] হিন্দু সমাজে তৎকালীন বিভিন্ন কুসংস্কার পৌত্তলিকতার প্রতি তাঁর মনে বীতরাগ উপস্থিত হয়েছিল। হিন্দু সমাজ ছিল তাদের কাছে কারাগার স্বরূপ, তাই ব্রাহ্মসমাজে আসা সুদক্ষিণারা মায়ের কাছে, অন্ধকার কারাগার হইতে মুক্ত বাতাসে প্রাণ ভরে বাঁচার মতো একটা আশা।

উনবিংশ শতকে বাঙালি ভদ্র মহিলাদের দিন কাটতো অন্তঃপুরে। সেই সময় বাড়ির বাইরে মেয়েদের বের হওয়া বাঙালির সমাজে যথেষ্ট নিন্দনীয় বলে বিবেচিত হতো। উনবিংশ শতাব্দীতে অন্তঃপুরই ছিল মেয়েদের বিচক্ষণের সীমানা। সেই সময় কোন একটি উপলক্ষ নাহলে বাড়ি থেকে মেয়েদের বাইরে বেরোনো যেত না। এইজন্য সুদক্ষিণার মা গঙ্গাস্থানের অভিলাষে, এবং অন্তরে অন্তরে নিরাকার ব্রহ্মের আহ্বানে কলকাতা যাত্রার পথ বেছে নেয়।

অবশেষে গ্রামের একটা ছোট নৌকোতে নদীপথে কলকাতা যাত্রা স্থির হয় ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের, নভেম্বর মাসে। সুদক্ষিণা সহ তিন ভ্রাতা-ভগ্নি, দাদার স্ত্রী, তাঁর মা, সোনাদিদি এবং মাতুল কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় অভিভাবক স্বরূপ তাদের সঙ্গে যান। "যথাসময়ে, শুভক্ষণে বাড়িঘর, আত্মীয়-স্বজন এবং বিষয়পত্রের মায়া ছিন্ন করিয়া ভগবানের ডাকে নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া হইল। শিশুগুলিকে কিরূপে পালন করিবেন, অর্থ কোথা হইতে আসিবে- এ সকল ভাবনা মাতৃদেবীর মনে তখন কিছুই আসিল না।"[১১]

অবশেষে দীর্ঘ ৭ দিন নানা বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করে তাঁরা ব্রাহ্মসমাজের প্রাণকেন্দ্র কলকাতা শহরে এসে উপস্থিত হন। সন্ধ্যার সময় তাঁরা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম মন্দিরে যান। মন্দিরের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে দেখেন ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেন মহাশয় বেদীতে উপবিষ্ট। তাহার মুখমন্ডল হইতে জ্যোতি নির্গত হচ্ছে। অন্যদিকে

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয়ের সুমধুর সংগীত এবং অর্গান বাদনের দ্বারা সকলেই এক স্বর্গীয় অনুভূতি পায়। তিনি উপলব্ধি করেন,

> "হে ঈশ্বর সকল কুসংস্কারের জাল ছিন্ন করিয়া সকল মাটির কল্পিত পুতুল দেবতাগুলি চুরমার করিয়া ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া তোমার নিরাকার রূপে মুগ্ধ ও বিমোহিত করিতে তুমি কোথায় আনিলে? এ আনন্দ যে প্রাণে ধরে না! এ সুখ কোথায় রাখিব? হে দয়াময়! তোমাকে কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব জানি না।"[১২]

সুদক্ষিণা ও তাঁর পরিবার প্রতি রবিবার ব্রাহ্মসমাজে যেতেন সেখানে আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের উপাসনা ও উপদেশ শ্রবণ করতেন। ব্রাহ্ম সংগীত শুনতে ও গাইতে সুদক্ষিণা ও তার মা খুব ভালোবাসতেন। অভয়বাবু নামে এক ব্যক্তি এই নগর সংকীর্তনটি উচ্চস্বরে গাইতে শিখিয়েছিলেন।

> "আজি গাও গভীর স্বরে
> প্রেম ভরে নগরে-
> মধুর ব্রহ্মনাম,"[১৩]

শুধুমাত্র ধর্মীয় ব্রাহ্ম উপাসনা নয়, কলকাতায় এসে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা কিভাবে হবে সেটা সকলেরই ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সেই সময় ব্রাহ্ম ব্যক্তিগণ সিদ্ধান্ত নিলেন যে নবাগত মহিলাদের জন্য একটা স্কুল স্থাপন করতে হবে। তাই স্থির হয় লাখুটিয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত রাখাল চন্দ্র রায়ের বাড়িতে ক্লাস হবে। কয়েকজন বিদ্বান ব্যক্তি এক ঘন্টা করে স্কুলে পড়ানোর ভার গ্রহন করেন। এনাদের মধ্যে অন্যতম হলেন স্বর্গীয় রজনীনাথ রায়, দ্বারকনাথ গাঙ্গুলী, অম্বিকাচরণ সেন, শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দত্ত মহাশয়।

কলকাতায় এইসময় একটা ছাপাখানা ছিল এখান থেকে প্রখ্যাত ব্রাহ্ম আন্দোলনের নেতা কেশবচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় *The Indian Mirror*[১৪] পত্রিকা প্রকাশিত হতো। এই পত্রিকা থেকেই সমকালীন ভারতবর্ষের সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ধর্মীয় ব্যবস্থার (বিশেষ করে ব্রাহ্মসমাজের মতাদর্শ, কার্যকলাপ ও ধর্মীয় সংস্কারের) একটা প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে।

কলকাতার এই ভারতাশ্রমে প্রতিদিন দু'ই বেলা উপাসনা ও সন্ধ্যায় ধর্মালোচনা হতো। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রত্যাহ স্নানান্তে উপাসনা করতেন ভারতাশ্রমে আসতেন। তিনি হিন্দু ধর্মের পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন দিকগুলির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যুক্তি, নৈতিকতা এবং একেশ্বরবাদ এর উপর ভিত্তি করে উপদেশ প্রচার করতেন। কেশবচন্দ্র তাঁর এই উপাসনা পদ্ধতি সংকলন করে 'Brahmo Upasana' নামক একটা গ্রন্থ প্রকাশ করেন এতে প্রার্থনা, স্ত্রোত্র, উপদেশ এবং উপাসনার নির্দেশাবলি সংকলিত ছিল। সুদক্ষিণা তাঁর আত্মজীবনীতে দেখিয়েছেন একদিন ভারতাশ্রমে সমস্ত রাত্রি উপাসনা করা হয়। সন্ধ্যার সময় সকলে উপাসনায় বসলেন এবং পরের দিন প্রাতঃকালে সেই গভীর উপাসনার সমাপ্ত হয়। প্রত্যুষে প্রখ্যাত ব্রাহ্ম উপাসক ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয় সুমধুর কণ্ঠে গেয়ে ওঠেন-

> "এবে জাগ সকলে অমৃতের অধিকারী"[১৫]

১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের সুদক্ষিণা কলকাতার ব্রাহ্ম উপাসনা কেন্দ্র থেকে ঢাকায় আসেন। ব্রাহ্ম আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ঢাকাতে বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের অনুকরণে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেখানে সুদক্ষিণার মা, তার পুত্র, পুত্রবধূ ও ছোট কন্যা সহ সেখানে ব্রাহ্ম উপাসনা ও বসবাস করছিলেন। তিনি উল্লেখ করেছেন ঢাকায় তাদের সেই আশ্রমে জালাল মিঙা নামক একজন মুসলমান ভদ্রলোক ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। সুদক্ষিণা ও তার ভাই-বোনেরা তাকে 'মিঙামামা' ও তাঁর স্ত্রী প্যারী বিবিকে 'মিঙামামী'

বলে ডাকতেন। অর্থাৎ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কিভাবে ব্রাহ্ম আন্দোলন সমাজকে এক বন্ধনের সূত্রে আবদ্ধ করে তুলেছিল তা সুদক্ষিণা তার আত্মজীবনীর মধ্যে দেখাতে চেয়েছেন।

ঢাকার এই আশ্রমে থাকাকালীন সুদক্ষিণা সহ অন্যান্য নারীদের উপাসনার পাশাপাশি সকলের জন্য রান্না করতে হতো। তিনি দেখিয়েছেন,

> "আমরা রান্না করিতে করিতে পড়া শিখিতাম। বইগুলি একটি পিঁড়ির উপর রাখিয়া, ডাল কিম্বা ভাত চড়াইয়া দিয়া পড়া করিতাম। মধ্যে মধ্যে বইয়ের পাতাগুলি খুলিয়া রাখিয়া দিতাম। যে সময় বই হাতে লইয়া পড়িবার সুবিধা হইত না, অর্থাৎ হলুদ ইত্যাদি মাখাইতে হইত, সেই সময় খোলা পাতা দেখিয়া পড়া মুখস্ত করিতাম।"[১৬]

উনবিংশ শতকে বাংলাদেশের নারীদের অন্তঃপুর শিক্ষার যে চিত্র তা ফুটে উঠেছে তার এই মন্তব্য থেকে।

বিবাহ, পরিবার ও লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক কাঠামো:

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি সমাজ ছিল ধর্মাশ্রয়ী, পুরুষতান্ত্রিক ও সামাজিকভাবে রক্ষণশীল। এই সময় নারীদের বিয়ে হতো অত্যন্ত অল্প বয়সে তাদের পছন্দ-অপছন্দের মূল্য কিছুই ছিল না। বিবাহ নারীর জীবনে ছিল একমাত্র গন্তব্য। সেই সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কিছু নারী আত্মজীবনীকার, সমাজ সংস্কারক ও সাহিত্যিকগণ তাদের লেখনীর মাধ্যমে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। সুদক্ষিণা তার আত্মজীবনী 'জীবনস্মৃতি'-তে লিখেছেন,

> "আমি পড়াশোনা করিতে বড়ই ভালোবাসিতাম। স্কুলে মনোযোগ সহকারে পড়িতে আমি বড়ই আনন্দ পাইতাম কিন্তু ভাগ্যদেবতা আমার কপালে 'পড়াশোনা' বোধহয় লেখেন নাই।"[১৭]

বাংলার প্রথম আত্মজীবনী রচয়িতা রাসসুন্দরী দেবী লিখেছেন, তিনি যখন বারো বছর বয়সে বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর মনের অবস্থার বর্ণনা করেছেন,

> "যখন দুর্গোৎসবে কি শ্যামাপূজায় পাঁঠা বলি দিতে লইয়া যায়, সে সময়ে সেই পাঁঠা যেমন প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া হতজ্ঞান হইয়া মা মা বলিয়া ডাকিতে থাকে, আমার মনের ভাবও তখন ঠিক সেই প্রকার হইয়াছিল।"[১৮]

এই বক্তব্য থেকে উনবিংশ শতকে বাল্যবিবাহের নির্মম বাস্তবতা ও কন্যা সন্তানের প্রতি সমাজের অবজ্ঞা ও অবহেলার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ফুটে উঠেছে।

১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১ জুন সুদক্ষিণা ও অম্বিকাচরণ সেনের বিবাহ সম্পন্ন হয়। পরের দিন শ্বশুরালয়ে, দলে দলে লোক নববধূকে দেখতে আসে এবং তাদের কেউ কেউ বললেন, "ব্রাহ্ম সমাজের মেয়ে না জানি কেমন? অদ্ভুত কিছু হইবে বোধ হয়।"[১৯] সেই সময় গ্রাম বাংলার নিয়ম ছিল যে, বাড়ির নববধূ ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকে রাখবে কেউ তাকে দেখতে এলে মুখের ঘোমটা তুলে নববধূ মুখ দেখাবে, সেই সময় নববধূ চোখ বুঝে থাকবে। কিন্তু তারা দেখে এই শিক্ষিতা ব্রাহ্ম বধূর তো মুখ ঢাকা নেই, যে আসছে সেই তার মুখ দেখতে পাচ্ছে। এছাড়া বয়স্কা বধূ, ব্রাহ্মণ কন্যা, বৈদ্য বর, এই সমস্ত কিছুই গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের চোখে খুবই আশ্চর্যের বিষয় ছিল।

উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে কন্যা সন্তান এর কামনা প্রায় অনুপস্থিত ছিল। কিন্তু শিক্ষা বিস্তার, ধর্মীয়-সামাজিক সংস্কার, নারী চেতনার জাগরণ কন্যা সন্তানের প্রতি সমাজের মনোভাব পরিবর্তন করে তোলে। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে ১৩ ই অক্টোবর সুদক্ষিণার কন্যা সরযূবালার জন্ম হয় তিনি বলেছেন,

"আমার স্বামী কন্যাই চাহিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হওয়াতে তিনি অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং ভগবানকে ধন্যবাদ দিলেন।"[২০]

সুদক্ষিণা ও তার স্বামী দুজনেই ছিলেন শিক্ষিত ও যুক্তিবাদী মানুষ। তাই তারা তাঁদের কন্যাকে বাল্যকাল থেকেই পড়াশোনার পাশাপাশি গান, বাজনা, সেলাই, প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তাঁদের কন্যা সরযূবালাকে কলকাতার প্রথম মহিলা বিদ্যালয় 'বেথুন স্কুলে' ভর্তি করে দেন।

স্মৃতি, আত্মপরিচয় ও অন্তঃপুর জীবনের সীমানা অতিক্রম:

কিছুদিন পর ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে ৩০ শে জুলাই সরকার থেকে নির্দেশ আসে যে তার স্বামীকে কটকে জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে যেতে হবে। তখন কটকে রেলওয়ে ছিল না তাই যাতায়াত ছিল খুবই কষ্টসাধ্য। বাধ্য হয়ে তিনি স্ত্রী কন্যাকে কলকাতায় রেখে কটকে যাত্রা করেন। কলকাতায় কিছুদিন থাকার পর সুদক্ষিণা স্বামীর কাছে কটক যেতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। সেই সময় নারীরা বেশিরভাগ সময় যেহেতু অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকতো তাই সুদক্ষিণা তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "সমুদ্র কখনও দেখি নাই। কেবলমাত্র ভূগোল পুস্তকে সমুদ্র, পব্বতের বিষয়ে পড়িয়াছি। এতদ্ব্যতীত নূতন দেশ নূতন জিনিষ দেখিবার স্পৃহা আমার অত্যন্ত প্রবল।"[২১] কটক যাত্রাপথে স্টিমারে বসে, তিনি তার ফেলে আসা অতীতের স্মৃতির ক্যানভাসে একটি কবিতা লিখেছিলেন-

"কে তোরা দাঁড়ায়ে ঐ উচ্চ করি' শির,
অহঙ্কারে স্ফীত কেন সবার মূরতি?...
যাহাতে সাজিবে বৃক্ষ নয়নরঞ্জন; ছায়ায়
তাহার, জগতের সর্ব্বক্লান্তি হবে অপনিত।"[২২]

কটকে যাবার পর বিভিন্ন লৌকিক উৎসবের মধ্যে অন্যতম মেয়েদের উৎসবটি তাদের বাড়িতেই হতো। কটক এই উৎসবকে 'নারী উৎসব' বলা হতো। সেই নারী উৎসবের দিন পুরুষরাও নিমন্ত্রিত হতেন ও উপাসনায় যোগ দিতেন। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন যে, "সেই উৎসবের দিনটি যে কিরূপ আনন্দে কাটিত তাহা স্মরণ করিলে আজিও হৃদয় প্রফুল্ল হইয়া ওঠে।"[২৩]

জাতি-ধর্ম-বর্ণের বিভেদকে দূরে সরিয়ে দিয়ে তাদের প্রতিবেশী দুই এক ঘর খ্রিস্টানো সেই নারী উৎসবের আনন্দের শামিল হতেন উৎসব আরাম্ভের পূর্বেই সমস্ত রান্নার কাজ করে রাখা হতো সেই খ্রিস্টান মহিলারাও তাকে অনেক সাহায্য করতেন। সেই উৎসবের দিন সুদক্ষিণা একটি স্বরচিত গান গেয়েছিলেন-

"আজি সম্বৎসর পরে মিলিনু ভগিনী সকলে
পূজিব মায়ের পদ ভক্তিভরে প্রাণভরে...
প্রেমসুধা হাতে ল'য়ে মা ডাকেন কাতর হয়ে
খাওয়াইতে প্রেম-অন্ন ক্ষুধায় কাতর নারী-নরে।"[২৪]

সুদক্ষিণা স্বামী অম্বিকাচরণ সেনকে গভর্মেন্ট রাজশাহীতে বদলি করে দেন। রাজশাহীতে থাকার তার স্বামীর শারীরিক কিছু অসুস্থতা দেখা দেয় এবং স্বাস্থ্য সংকট ঘটে। হঠাৎ একদিন তার অসুস্থতার বিষয় জানিয়ে তিনি তার স্ত্রীকে একটি চিঠি লেখেন, আমি অবসর গ্রহণ করিয়া শীঘ্র কলিকাতা যাইতেছি, তোমাদের আসিবার প্রয়োজন নেই।

শারীরিক অসুস্থতার সত্বেও রাজশাহীতে তার স্বামীই ব্রাহ্মমন্দিরে আচার্যের কার্য সম্পাদনা করতেন। একদিন তার স্বামী সুদক্ষিণা কে নিয়ে ব্রাহ্মমন্দিরে গিয়েছিলেন। সেই সময় সুগায়ক ও কবি রজনীকান্ত সেন

মহাশয় গান করছিলেন। তার সুললিত কণ্ঠের অপূর্ব সংগীতে সেই দিন উপাসনা কিভাবে প্রাণবন্ত ও আবেগময় হয়ে উঠেছিল তা তিনি তার আত্মজীবনীতে সেই স্মৃতি তুলে ধরেছেন।

স্বামীর অবসর গ্রহণের পর তারা সকলে কলকাতায় আসেন। ইতিপূর্বেই, আমরা ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি সুদক্ষিণা ও তার স্বামীর যে অনুরাগ তা দেখেছি। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন এর প্রতি স্বামীর ভক্তি চিরদিন অটুট ছিল, তিনি তার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে কেশব চন্দ্র সেন এর নেতৃত্বাধীন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ যখন দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে, তখন তিনি কোন পক্ষেই যোগদান করেননি। বস্তুতঃ সাধারণ ব্রহ্মসমাজ (১৮৭৮) ও নববিধান ব্রহ্মসমাজ (১৮৮০) দুই ব্রাহ্মসমাজেরই প্রচারক ও বন্ধুদিগের তিনি সমভাবে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জ্ঞাপন করতেন।

ব্রাহ্মগণ কেবলমাত্র হিন্দু কুসংস্কারের বিরোধিতা, পৌত্তলিকতার বিরোধিতা ও উপাসনা- বক্তৃতা করেই ক্ষান্ত থাকতো না। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের একাধিক বিষয়কে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে আলোচনা হতো। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের লর্ড কার্জন হিন্দু-মুসলিম বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশকে দ্বিখন্ডিত করার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন তার স্বামী অম্বিকাচরণ সেন মহাশয় ও একাধিক ব্রাহ্ম নেতা এই বাংলা ভাগের বিরোধিতায় আন্দোলনে সামিল হয়।

সুদক্ষিনার স্বামীর শারীরিক অবস্থা ক্রমশ অবনতির দিকে এগোতে থাকে। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ৫ নভেম্বর তার স্বামী চিরদিনের জন্য নিদ্রিত হইলেন। স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর দুঃখ-কষ্ট এক গভীর মানবিক অভিজ্ঞতা— যা হৃদয়ের গভীরতম জায়গা থেকে অনুভব করা যায়। সেই গভীর অনুভবের কথাই তিনি আত্মজীবনীতে তুলে ধরেছেন,

> "হায়! স্বর্গ যাঁহাকে আকিঞ্চন করে, পৃথিবীর মানুষ কতদিন তাঁহাকে ধরিয়া রাখিবে? আমি সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। আমার সুখ-দুঃখ তাঁহার সহিত প্রস্থান করিল। আজ সেই সুদূরের পানে তাকাইয়া আছি, কবে তাঁহার সহিত পুনরায় মিলিত হইব, কবে আমার সকল দুঃখের প্রকৃত অবসান হইবে।"[২৫]

অন্তিম পর্ব, জীবন দর্শন ও তাৎপর্য:

একজন মানুষ যখন জীবনসন্ধিক্ষণে পৌঁছায়, তখন সে অতীতের পথচলার দিকে ফিরে তাকায়- সফলতা, ব্যর্থতা, আনন্দ, বেদনা, প্রাপ্তি আর অপূর্ণতার সংমিশ্রণে গঠিত একটি বর্ণিল ক্যানভাসের দিকে। জীবনের উপান্তে এসে সুদক্ষিণা সেন দেখতে পেয়েছেন, "কালের প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে কোথায় আসিনু হায়, সীমা অন্তরেখা নাহি যায় দেখা, সিন্ধুতে বিন্দু মিলায়।"[২৬] অর্থাৎ তিনি স্মৃতিচারণা করেছেন কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলাম আর কালের প্রবাহে ভাসতে ভাসতে কোথায় পৌঁছেছি। তার সেই প্রিয় জন্মভূমি সোহাগদল গ্রাম পদ্মাতীরে অবস্থিত। প্রকৃতিদেবী যেন সেখানে স্বয়ং বিরাজ করছেন। তার শোভা ও সৌন্দর্যের কথা তিনি বর্ণনা করিতে সক্ষম নন যারা পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন নাই অথবা যারা পল্লীগ্রামে কখনো বাস করেন নাই তারা সেই সৌন্দর্যের মর্ম কিছুতেই অনুভব করতে পারবেন না বলে তিনি মনে করেন। ফেলে আসা স্মৃতির কল্পনা চক্ষে তিনি দেখেন প্রবল স্রোতে পদ্মা নদীর জল বয়ে যাচ্ছে অসীমের পথে, মাঝিরা নদীর স্রোতে নৌকো নিয়ে ভাটিয়ালি গান করতে করতে নৌকোয় দাঁড় বাইছে। তাদের জীবনে ভয় নেই তারা যেন এই মত্ত প্রকৃতির সন্তান- তখন স্মৃতি তরঙ্গে সুদক্ষিণা নিজেকে হারিয়ে ফেলেন।

পল্লীগ্রামে বর্ষার সময়ই নৌকোযোগে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাতায়াতের সুবিধা হয় বলেই এই সময়ের জন্য অনেকেই অপেক্ষা করে থাকেন। বালিকা বধূরা তাদের শ্বশুরবাড়ির অভিভাবকদের অনুমতি নিয়ে বর্ষাকালে

ছোট নৌকো করে তাদের বাপের বাড়ি আসতো পিতা-মাতা এবং আত্মীয় স্বজনদের দেখতে ও কিছুদিনের জন্য মুক্ত বাতাসে নিজেকে হারিয়ে ফেলবার জন্য। "বালিকা সুলভ খেলাধুলা করা যাহাদের স্বভাব তাহারা শ্বশুরগৃহে অবরুদ্ধ হইয়া পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির ন্যায় ছটফট করিয়া থাকে।"[২৭] অতীতে ফেলে আসা এই সকল স্মৃতিমধুর ঘটনাগুলি জীবনের উপান্তে এসে তাঁর মানসচক্ষে ফুটে উঠেছে।

তারপরে বিষাদের সুরে তিনি মন্তব্য করেছেন,

> "শোকের আগুনে দগ্ধ করে কি ভগবান আমার পরলোকের উপযুক্ত করিলেন! উর্দ্ধলোকে আমার প্রিয়জনেরা ঘর সাজাইয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।... হে প্রেমসিন্ধু, তোমার একবিন্দু প্রেম যাহা তুমি দয়া করিয়া আমার প্রাণে দিয়াছ, আমি যেন সেই বিন্দুটুকু তোমার অনন্ত প্রেমের সিন্ধুতে ঢালিয়া দিতে পারি।"[২৮]

উনবিংশ শতকের বাংলায় নারী চিন্তা ও নারী মুক্তি বিষয়টি সাম্প্রতিককালে একটি বহুল চর্চিত বিষয় হয়ে উঠেছে। সুদক্ষিণা সেনের 'জীবনস্মৃতি'- নারী আত্মজীবনী হিসেবে শুধু একজন নারীর ব্যক্তিগত জীবনগাথা নয়, বরং তা একটি যুগের সমাজ-সংস্কৃতি, নারীর অবস্থান, এবং তার আত্মসংগ্রামের প্রামাণ্য দলিল। লেখিকা যে স্পষ্টতা ও সংবেদনশীলতায় নিজের কথা বলেছেন, তা নারীর অভিজ্ঞতাকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বাঁধা-ধরা রীতির মধ্যে থেকেও তাঁর আত্মপরিচয় নির্মাণের প্রচেষ্টা আমাদের অনুপ্রাণিত করে।

সুদক্ষিণা আত্মজীবনী 'জীবনস্মৃতি' শুধু তার মৌলিক জীবনের কাহিনী নয়, এ হলো সেই সময়কার প্রত্যেক নারী জাতির এক প্রতিবাদী চেতনা। প্রাচীন ভারতে বিশেষত বৈদিক যুগে যেখানে আমরা গার্গী, লোপামুদ্রা, অপালার ন্যায় বিদুষী শিক্ষিত নারীদের কথা জানতে পারি যারা সেই সময় সমাজে এক বিশেষ প্রভাব রেখেছিল। সেই নারীজাতিই পরবর্তীতে সামাজিক রক্ষণশীলতা, পুরুষতন্ত্রের আধিপত্য, পরাধীনতার শিকলে বাঁধা পড়ে। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে সেই নারীরা সামাজিক সমতার দাবিতে কখনো সচেতন বা অবচেতন ভাবে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে ওঠে। সুদক্ষিণার এই 'জীবনস্মৃতি' শুধুমাত্র জীবনের কিছু স্মৃতিমধুর ঘটনার বিবরণই নয়, তা একটা যুগের নারীদের প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর।

স্মৃতিকথা মাত্রেই ঐতিহাসিক দলিল, নারী আত্মজীবনী ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে একটি বিকল্প ও মূল্যবান উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। পুরুষ প্রধান ইতিহাসে যেখানে নারীর উপস্থিতি ছিল সীমিত এবং প্রান্তিক, সেখানে আত্মজীবনী নারীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও ধর্ম প্রভৃতির অনালোচিত দিকগুলোকে তুলে ধরেন। একজন নারী যখন নিজের জীবনকথা লিপিবদ্ধ করেন, তখন তা শুধু তাঁর আত্মপ্রকাশ নয়, বরং তাঁর সময়কালের ইতিহাসের একটি প্রতিচ্ছবিও হয়ে ওঠে, সুদক্ষিণা সেনের 'জীবনস্মৃতি' হল উনবিংশ ও বিংশ শতকের এইরূপ এক ঐতিহাসিক দলিল।

তথ্যসূত্র:

[১] Stanton, Domna C. The Female Autobiography: Theory and Practice of Autobiography from the Tenth to the Twentieth Century. University of Chicago Press, Chicago, 1987, p. 3

[২] সেন, সুদক্ষিণা। *জীবনস্মৃতি*। দে'জ পাবলিশিং এন্ড স্কুল অব উইমেন্স স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্বদ্যিালয়, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ২২।

[৩] তদেব, পৃ. ২৫।

[৪] তদেব, পৃ. ২৮।

[৫] ১৮৫০ সালে 'সর্ব্বশুভকরী' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় তাঁর ঐতিহাসিক প্রবন্ধ 'বাল্যবিবাহের দোষ' প্রকাশিত হয়।

[৬] তদেব, পৃ. ৪২।

[৭] তদেব, পৃ. ৪০।

[৮] তত্ত্ববোধিনী সভা–র উদ্যোগে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। পত্রিকাটি মূলত ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ প্রচার, সমাজসংস্কার ও শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়েছিল এবং উনিশ শতকের বঙ্গীয় নবজাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

[৯] 'অবলা বান্ধব' পত্রিকা উনিশ শতকের বাংলার একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাজসংস্কারমূলক সাময়িক পত্রিকা। এটি ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে সমাজসংস্কারক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়–এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নারীশিক্ষা, বিধবা-বিবাহ এবং নারীদের সামাজিক অধিকার সম্পর্কে জনমত গড়ে তোলে।

[১০] Geraldine Forbes, *Women in Modern India*, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, pp. 23–28.

[১১] সুদক্ষিণা সেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৬।

[১২] তদেব, পৃ. ৫২।

[১৩] তদেব, পৃ. ৫২।

[১৪] 'The Indian Mirror'- উনিশ শতকের বাংলার একটি গুরুত্বপূর্ণ ইংরেজি সাময়িক পত্রিকা। এটি প্রথমে ১৮৬১ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর–এর উদ্যোগে প্রকাশিত হয় এবং পরে কেশবচন্দ্র সেন এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে ব্রাহ্ম সমাজের ভাবধারা প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

[১৫] তদেব, পৃ. ৬১।

[১৬] তদেব, পৃ. ৭১।

[১৭] তদেব, পৃ. ৭২।

[১৮] রাসসুন্দরী দেবী, *আমার জীবন*, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা, পৃ. ২০।

[১৯] সেন, সুদক্ষিণা। *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৫।

[২০] তদেব, পৃ. ৭৮।

[২১] তদেব, পৃ. ৯৬।

[২২] তদেব, পৃ. ৯৭।

[২৩] তদেব, পৃ. ৯৯।

[২৪] তদেব, পৃ. ৯৯।

[২৫] তদেব, পৃ. ১১৫।

[২৬] তদেব, পৃ. ১২০।

[২৭] তদেব, পৃ. ১২০।

[২৮] তদেব, পৃ. ১২১।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. সেন, সুদক্ষিণা। জীবনস্মৃতি। দে'জ পাবলিশিং এন্ড স্কুল অব উইমেন্স স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্বদ্যিালয়, কলকাতা, ২০০২।

২. চন্দ, পুলক। নারী বিশ্ব। গাঙচিল, কলকাতা, ২০০২।

৩. চক্রবতী, সম্বুদ্ধ। অন্দরে অন্তরেঃ উনিশ শতকে বাঙালি ভদ্রমহিলা। স্ত্রী, কলকাতা, ১৯৯৬।

৪. গুপ্ত, সুপর্না (সম্পা.)। ইতিহাসে নারী: শিক্ষা। পঃবঃ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা, ২০০১।

৫. ঘোষ, বিজিত (সংকলন ও সম্পা.)। প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ, চতুর্থ খণ্ড। পুনশ্চ, কলকাতা, ২০০১।

৬. Karlekar, Malavika. *Voices from Within: Early Personal Narratives of Bengali Women*. Oxford University Press, New Delhi, 1991.

৭. Sarkar, Tanika. *Hindu Wife, Hindu Nation: Gender, Religion and the Prehistory of Indian Nationalism*. Permanent Black, New Delhi, 2001.

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1283- 1300
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.348

ব্রাহ্মসমাজে মতাদর্শিক দ্বন্দ্ব ও ধর্মীয় রূপান্তর: রাজনারায়ণ বসু ও কেশব চন্দ্র সেনের চিন্তা ও কর্মের আলোকে একটি সমালোচনামূলক ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ

প্রতীক দুয়ারী, *গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 18.03.2026; Accepted: 19.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The nineteenth century in Bengal witnessed significant religious and social transformations under this context, the Brahmo movement emerged as an important reformist initiative aimed at revitalizing Indian religious thought and society. Initiated by Raja Rammohan Roy and later institutionalized by Debendranath Tagore, the Brahmo Samaj sought to promote monotheism, rational spirituality, and social reform. However, the movement also experienced ideological tensions and internal debates regarding the nature of religion, tradition, and reform.

This paper critically examines these ideological conflicts and religious transformations within the Brahmo Samaj, focusing primarily on the contributions of Rajnarayan Basu and Keshab Chandra Sen. Rajnarayan Basu emphasized the continuity of Brahmo ideals with the philosophical foundations of the Upanishads and the broader Hindu cultural tradition. Through his writings, lectures, and reformist activities, he attempted to restore confidence in indigenous cultural heritage while advocating a rational and ethical form of religion.

In contrast, Keshab Chandra Sen introduced a more universalistic and progressive interpretation of Brahmoism, incorporating elements of global religious thought and advocating wider social reforms. These differing approaches generated important debates within the Brahmo Samaj regarding the relationship between tradition and modernity.

By analyzing the ideas and activities of these two influential thinkers, the study highlights how ideological disagreements contributed to the transformation of the Brahmo movement. It argues that the dynamic tension between cultural rootedness and universal reform played a crucial role in shaping the intellectual and religious history of nineteenth-century Bengal.

Keywords: Brahmo Samaj, Rajnarayan Basu, Keshab Chandra Sen, Religious Reform, Colonial Bengal, Ideological Conflict

ঊনবিংশ শতকের ভারতীয় সমাজজীবন ছিল এক গভীর পরিবর্তন ও দ্বন্দ্বের যুগ। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর পাশাপাশি বৌদ্ধিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনেও ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষা, বিজ্ঞানচেতনা এবং খ্রিস্টান মিশনারিদের কার্যকলাপ ভারতীয় সমাজের প্রচলিত বিশ্বাস ও ধর্মীয় অনুশীলনের সামনে এক নতুন প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল।[১] এই পরিস্থিতিতে একদিকে যেমন রক্ষণশীল সমাজ প্রচলিত ধর্মীয় আচারকে অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করছিল, অন্যদিকে নব্য শিক্ষিত

সমাজের একাংশ ভারতীয় ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যবস্থার পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন অনুভব করছিল। এই দ্বন্দ্বপূর্ণ পরিবেশেই উনিশ শতকের বাংলা সমাজে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের সূচনা ঘটে, যার মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২]

ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮২৮ সালে রাজা রামমোহন রায়ের উদ্যোগে। এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা, পৌত্তলিকতার বিরোধিতা এবং যুক্তিনির্ভর ধর্মচিন্তার প্রসার। পরবর্তীকালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজকে সংগঠিত রূপ দেন এবং উপনিষদীয় বেদান্ত দর্শনের ভিত্তিতে ব্রাহ্মধর্মকে একটি আধ্যাত্মিক ও নৈতিক আদর্শে উন্নীত করার চেষ্টা করেন।[৩] কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস কেবলমাত্র ধর্মীয় সংস্কারের ধারাবাহিকতা নয়; এর ভেতরে মতাদর্শিক দ্বন্দ্ব, মতভেদ এবং পরিবর্তনের ধারাও সমানভাবে সক্রিয় ছিল।

এই মতাদর্শিক দ্বন্দ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় দেখা যায় রাজনারায়ণ বসু ও কেশবচন্দ্র সেনের সময়ে। রাজনারায়ণ বসু ব্রাহ্মধর্মকে ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিক রূপ হিসেবে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন, অন্যদিকে কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মধর্মকে একটি আরও সার্বজনীন ও বিশ্বধর্মীয় আদর্শের দিকে পরিচালিত করতে চেয়েছিলেন। এই ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে মতভেদ ও বিতর্ক সৃষ্টি করে এবং পরবর্তীকালে সংগঠনের অভ্যন্তরীণ বিভাজনের পথ প্রশস্ত করে।[৪]

অতএব, ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস কেবল ধর্মীয় সংস্কারের ইতিহাস নয়; এটি উনিশ শতকের বাংলার বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ইতিহাসও বটে। এই প্রবন্ধে বিশেষভাবে রাজনারায়ণ বসু ও কেশবচন্দ্র সেনের চিন্তা ও কর্মের আলোকে ব্রাহ্মসমাজের অভ্যন্তরীণ মতাদর্শিক দ্বন্দ্ব ও ধর্মীয় রূপান্তরের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা হবে।

সাহিত্য পর্যালোচনা:

উনিশ শতকের বঙ্গীয় নবজাগরণ, ব্রাহ্মসমাজের বিকাশ এবং রাজনারায়ণ বসুর চিন্তাধারা নিয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও গবেষক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। এই গবেষণাগুলি মূলত ব্রাহ্ম আন্দোলনের ধর্মীয়, সামাজিক ও বৌদ্ধিক প্রভাব বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে।

প্রথমত, শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'রামধনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ' এ উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবর্তনের একটি বিস্তৃত চিত্র তুলে ধরেছেন। এই গ্রন্থে ব্রাহ্মসমাজের বিকাশ, ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের ধারা এবং রাজনারায়ণ বসুর কার্যকলাপ সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। বিশেষত ব্রাহ্মসমাজের অভ্যন্তরীণ মতভেদ ও কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে আদিব্রাহ্ম সমাজের মতপার্থক্যের বিষয়টি তিনি বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।[৫]

দ্বিতীয়ত, অমিয় কুমার সেন তাঁর 'The Tattvabodhini Sabha and the Bengal Renaissance' গ্রন্থে তত্ত্ববোধিনী সভা ও ব্রাহ্মসমাজের মাধ্যমে উনিশ শতকের বৌদ্ধিক নবজাগরণের বিকাশ বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে এই আন্দোলন পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ ও ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি নতুন ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারার জন্ম দেয়।[৬]

তৃতীয়ত, সুরেন্দ্রনাথ মুখার্জী তাঁর 'Social Implications of the Brahmo Movement' গ্রন্থে ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে শিক্ষা বিস্তার, নারী-উন্নয়ন, বিধবাবিবাহ এবং বিবাহসংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বিশেষত ব্রাহ্মবিবাহ আইন সংক্রান্ত বিতর্কের সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য তিনি বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।[৭]

এছাড়া ডেভিড কফ তাঁর 'The Brahmo Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind' গ্রন্থে ব্রাহ্মসমাজকে আধুনিক ভারতীয় চিন্তার বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে ব্রাহ্ম আন্দোলন আধুনিক শিক্ষা, ধর্মীয় উদারতা এবং যুক্তিবাদী চিন্তার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।[৮]

অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় রাজনারায়ণ বসুর লেখনী ও চিন্তাধারার উচ্চ প্রশংসা করেন। তাঁর মন্তব্য থেকে বোঝা যায় যে রাজনারায়ণ বসুর বক্তব্য সমকালীন বুদ্ধিজীবী সমাজে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।[৯]

উপরোক্ত গবেষণাগুলি ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস, ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন এবং বঙ্গীয় নবজাগরণের বৌদ্ধিক পটভূমি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করলেও, রাজনারায়ণ বসুর চিন্তাধারা ও ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের গভীর বিশ্লেষণ তুলনামূলকভাবে সীমিত। বিশেষত ব্রাহ্মসমাজের মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব, ব্রাহ্মবিবাহ আইন নিয়ে তাঁর অবস্থান এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনার একটি সমন্বিত গবেষণা এখনও পর্যাপ্তভাবে আলোচিত হয়নি। ফলে এই বিষয়টি নিয়ে আরও গভীর অনুসন্ধানের প্রয়োজন রয়েছে।

গবেষণার ফাঁক:

ব্রাহ্মসমাজ এবং উনিশ শতকের বঙ্গীয় নবজাগরণ নিয়ে বহু ঐতিহাসিক ও গবেষক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। বিশেষত শিবনাথ শাস্ত্রী, এস. এন মুখার্জী এবং ডেভিড কফ- এর গবেষণায় ব্রাহ্মসমাজের ধর্মীয় ও সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষিত হয়েছে। তবে এই গবেষণাগুলির অধিকাংশই ব্রাহ্মসমাজকে একটি সামগ্রিক ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলন হিসেবে আলোচনা করেছে; সেখানে রাজনারায়ণ বসুর ব্যক্তিগত চিন্তাধারা ও অবদানের উপর স্বতন্ত্র ও গভীর বিশ্লেষণ তুলনামূলকভাবে সীমিত।

প্রথমত, ব্রাহ্মসমাজের অভ্যন্তরীণ মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব— বিশেষত আদি ব্রাহ্মসমাজ ও কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বাধীন নবব্রাহ্ম ধারার মধ্যে যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছিল— তার বিশদ বিশ্লেষণে রাজনারায়ণ বসুর ভূমিকা পর্যাপ্তভাবে আলোচিত হয়নি।

দ্বিতীয়ত, ব্রাহ্মবিবাহ আইন (১৮৭২) প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বসুর সমালোচনা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক জাতীয়তাবাদী চিন্তার সঙ্গে কীভাবে সম্পর্কিত ছিল, সে বিষয়ে গবেষণা তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে।

তৃতীয়ত, মেদিনীপুরে তাঁর কর্মকাণ্ড— যেমন ব্রাহ্মসমাজের পুনরুজ্জীবন, ধর্মীয় বক্তৃতা, সামাজিক সংস্কারমূলক উদ্যোগ এবং স্থানীয় সমাজে ব্রাহ্ম আদর্শের বিস্তার— এই বিষয়গুলি প্রায়শই সামগ্রিক ব্রাহ্ম আন্দোলনের আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে; এগুলির স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক গুরুত্ব নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা এখনও অপর্যাপ্ত।

চতুর্থত, রাজনারায়ণ বসুর চিন্তাধারায় পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ, খ্রিষ্টীয় ও ইসলামিক একেশ্বরবাদ এবং ভারতীয় বেদান্তীয় দর্শনের যে সমন্বয় দেখা যায়, তার গভীর বৌদ্ধিক বিশ্লেষণও এখনও যথেষ্টভাবে সম্পন্ন হয়নি।
অতএব বলা যায়, ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে রাজনারায়ণ বসুর অবদান, তাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা এবং ব্রাহ্ম আন্দোলনের ভেতরে তাঁর ভূমিকার একটি সমন্বিত ও বিশ্লেষণধর্মী গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমান গবেষণা সেই শূন্যস্থান পূরণের একটি প্রচেষ্টা।

গবেষণার উদ্দেশ্য:

রাজনারায়ণ বসু উনিশ শতকের বঙ্গীয় নবজাগরণ ও ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের একজন গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাবিদ ও সমাজসংস্কারক। তাঁর চিন্তাধারা, কর্মকাণ্ড এবং ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্যগুলি নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ:

১. উনিশ শতকের বাংলায় ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিকাশ বিশ্লেষণ করা।
২. ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে রাজনারায়ণ বসুর সম্পর্ক এবং তাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা।
৩. ব্রাহ্মসমাজের অভ্যন্তরীণ মতাদর্শগত বিতর্ক ও বিভাজনের প্রেক্ষাপটে রাজনারায়ণ বসুর ভূমিকা বিশ্লেষণ করা।
৪. মেদিনীপুরে রাজনারায়ণ বসুর ধর্মীয় প্রচার, সামাজিক সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড এবং ব্রাহ্ম আদর্শ প্রচারের গুরুত্ব মূল্যায়ন করা।
৫. ব্রাহ্মবিবাহ আইন ও ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রশ্নে রাজনারায়ণ বসুর মতামত ও তার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা।
৬. উনিশ শতকের ভারতীয় সমাজে ধর্মীয় সংস্কার, জাতীয় চেতনা এবং সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে রাজনারায়ণ বসুর অবদান নিরূপণ করা।
৭. ব্রাহ্মসমাজের মাধ্যমে একেশ্বরবাদী ধর্মীয় চিন্তা ও সামাজিক সংস্কারের যে ধারা গড়ে ওঠে, তার সঙ্গে রাজনারায়ণ বসুর চিন্তাধারার সম্পর্ক নির্ধারণ করা।

গবেষণার মূখ্য প্রশ্নাবলী:

এই গবেষণার মূল লক্ষ্য হলো উনিশ শতকের বঙ্গীয় সমাজে ব্রাহ্মসমাজ ও রাজনারায়ণ বসুর ভূমিকা বিশ্লেষণ করা। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে নিম্নলিখিত মূখ্য প্রশ্নাবলী নির্ধারণ করা হয়েছে:

১. রাজনারায়ণ বসু কিভাবে ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ ও ধর্মীয় চিন্তাধারার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করেছিলেন, এবং তাঁর এই চিন্তাধারা কিভাবে প্রভাব ফেলেছে?
২. মেদিনীপুরে রাজনারায়ণ বসুর কার্যক্রম, বক্তৃতা ও রচনা কিভাবে ব্রাহ্মসমাজের পুনঃস্থাপনা ও সম্প্রসারণে অবদান রেখেছিল?
৩. ব্রাহ্মবিবাহ আইন এবং ব্রাহ্মধর্মের সম্পর্কিত বিতর্কে রাজনারায়ণ বসুর অভিমত ও কার্যক্রম কী ছিল, এবং তা সমাজে কেমন প্রভাব ফেলেছিল?
৪. রাজনারায়ণ বসুর ব্রাহ্মধর্ম সংক্রান্ত লিখিত রচনা ও বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি কিভাবে হিন্দুধর্মের সংস্কারমূলক ধারণা প্রচার করেছেন?
৫. ব্রাহ্মসমাজের ভেতরের মতবিরোধ ও কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বাধীন নবগোষ্ঠীর উদ্ভবের প্রেক্ষাপটে রাজনারায়ণ বসুর অবস্থান ও প্রতিক্রিয়া কী ছিল?
৬. রাজনারায়ণ বসুর চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে উনিশ শতকের ভারতীয় সমাজে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও জাতীয় পুনর্জাগরণের যে প্রভাব পড়েছে, তা কীভাবে পরিমাপ করা যায়?

গবেষণা পদ্ধতি:

এই গবেষণায় গুণগত ও ঐতিহাসিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। মূলত রাজনারায়ণ বসুর গ্রন্থ, বক্তৃতা, চিঠিপত্র ও ব্রাহ্মসমাজের নথি বিশ্লেষণ করে তাঁর চিন্তাধারা, কার্যক্রম এবং সামাজিক প্রভাব বোঝার চেষ্টা করা

হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে রাজনারায়ণ বসুর লেখা যেমন 'Defence of Brahmoism and the Brahmosamaj', 'ধর্মতত্ত্বদীপিকা', এবং মাধ্যমিক উৎস হিসেবে শিবনাথ শাস্ত্রী, এস.এন. মুখার্জী ও এ.কে. সেনের গবেষণামূলক সাহিত্য। এছাড়াও তুলনামূলক বিশ্লেষণ এবং নিরীক্ষণ ও ব্যাখ্যা প্রয়োগ করে ব্রাহ্মসমাজের দুটি গোষ্ঠীর ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থান ও হিন্দুধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সংক্ষেপে, গবেষণা পদ্ধতি প্রধানত প্রামাণ্য দলিল ও ঐতিহাসিক তথ্যের বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট:

সুপ্রাচীনকাল হতে আদ্যাবধি খ্রিস্টীয় বা ইসলামীয় ধাঁচের কেন্দ্রীভূত সুসংবদ্ধ ধর্মপ্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষে কখনও গড়ে ওঠেনি। ভারতবর্ষীয় মানুষের ধর্মাচরণকে পাশ্চাত্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে তাই অনেক সময় ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হতে পারে। ভারতীয়দের ধর্মাচরণের মূল তার সুদীর্ঘ প্রবহমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যেই প্রোথিত।[১০] অঞ্চল ও স্থানভেদে বিশ্বাস, উপাসনা ও ধর্মীয় যাপনের পদ্ধতিও ভিন্নতর রূপ ধারণ করেছে। যদিও কখনও এই সাংস্কৃতিক যাপন পদ্ধতির ক্রমাগত জটিলতর রূপের বিরুদ্ধে ভারতীয় সমাজের ভেতর থেকেই প্রতিবাদ ও সংস্কারের ধারা দেখা গেছে, তবে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেশজ উপাদানের মধ্য থেকেই সংস্কারমূলক রূপে আবির্ভূত হয়েছে। মূল কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন সাধারণত ঘটেনি; পরিবর্তন অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছিল বাহ্যিক।[১১]

উদাহরণস্বরূপ প্রায় ২৬০০ বছর পূর্বে উদ্ভূত বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মীয় আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই আন্দোলনগুলি প্রচলিত ধর্মীয় আচার ও সামাজিক প্রথার সমালোচনা করলেও মূলত ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার ভেতর থেকেই বিকশিত হয়েছিল।[১২] অনেক পণ্ডিতের মতে, এদের দর্শন উপনিষদীয় চিন্তার সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়; বরং বৃহত্তর ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্যেরই এক বিকল্প ব্যাখ্যা।[১৩]

এইভাবে হাজার হাজার বছর ধরে ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন উত্থান-পতন ঘটেছে, তবু এর মূল বৈশিষ্ট্য অপরিবর্তিত থেকেছে। বহিরাগত জাতি যেমন শক, হূণ, পল্লব ও কুষাণ প্রভৃতিও ক্রমে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্তিমূলক কাঠামোর মধ্যে আত্মসাৎ হয়ে যায়।[১৪] ফলে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি তার দীর্ঘ অন্তর্ভুক্তিমূলক চরিত্র বজায় রেখেই নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে।[১৫]

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ব্রিটিশরা যেমন ভারতীয়দের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য কেড়ে নিয়েছিল, তেমনি বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও তাদের উপনিবেশায়িত করার চেষ্টা করেছিল। ঔপনিবেশিক প্রশাসন ও পাশ্চাত্য লেখকরা বারবার ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সমালোচনা করে ভারতীয় সমাজের অধঃপতনের চিত্র তুলে ধরেছিল।[১৬] এই প্রেক্ষাপটে খ্রিস্টীয় মিশনারিদের ভারতবর্ষে ধর্মপ্রচারের সুযোগ দেওয়া হয় এবং তারা সক্রিয়ভাবে ধর্মান্তরকরণের প্রচেষ্টা চালাতে থাকে।[১৭] এই আগ্রাসী ধর্মপ্রচার ও সাংস্কৃতিক সমালোচনার মুখে ব্রাহ্ম আন্দোলন একপ্রকার প্রতিরোধী আদর্শ হিসেবে আবির্ভূত হয় এবং উনিশ শতকের অনেক শিক্ষিত হিন্দুকে খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়া থেকে বিরত রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[১৮]

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে হিন্দুসমাজে ক্রমবর্ধমান কুসংস্কার ও সামাজিক কুপ্রথা— যেমন বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সতীদাহ প্রথা, নারীশিক্ষার প্রতি অনীহা, জাতিভেদ ও বর্ণভেদ— ভারতীয় সমাজের আর্থসামাজিক অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করেছিল। একই সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও খ্রিস্টীয় ভাবধারার প্রভাবে নবশিক্ষিত বাঙালি সমাজের একাংশের মধ্যে নিজস্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে হীনম্মন্যতার অনুভূতি জন্ম নিতে শুরু করে। এই

পরিস্থিতিতে রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব ভারতে নবজাগরণের সূচনা ঘটায়। তিনি খ্রিস্টান মিশনারিদের সমালোচনা, ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর ধর্মবিরোধী মনোভাব এবং রক্ষণশীল হিন্দুদের পরিবর্তনবিমুখতার মধ্যবর্তী অবস্থান গ্রহণ করে দেশীয় ঐতিহ্যের সারমর্মের উপর ভিত্তি করে ধর্ম ও সমাজসংস্কারের পথ অনুসরণ করেন এবং ১৮২৮ সালে ব্রাহ্মসভা প্রতিষ্ঠা করেন। শ্যামল সেনগুপ্তের মতে, স্বদেশবাসীর সর্বাঙ্গীণ ধর্মীয় ও সামাজিক উন্নয়নই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য।[১৯]

শিবনাথ শাস্ত্রী মন্তব্য করেছেন যে, রামমোহনের কর্মধারা মূলত সংস্কারমূলক ছিল।[২০] বিভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্যের মূল তত্ত্ব বিশ্লেষণের মাধ্যমে রামমোহন উপলব্ধি করেছিলেন যে সকল ধর্মের মধ্যেই এক ও অদ্বিতীয় সত্যের উপাসনার ধারণা বিদ্যমান। তাঁর উদ্যোগেই ব্রাহ্মসমাজে দেশীয় উপাসনা-পদ্ধতির ব্যবহার শুরু হয় এবং সতীদাহ প্রথা রদসহ নানা সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে তিনি হিন্দুশাস্ত্রের যুক্তিনির্ভর ব্যাখ্যা ব্যবহার করেন। তিনি মনে করতেন যে দেশীয় ধর্মীয় সংস্কৃতির সবকিছুই অগ্রাহ্য করার মতো নয়; বরং পৌত্তলিকতা ও যুক্তিহীন আচারপ্রথাই মানুষের যুক্তিবাদী চিন্তাকে বাধাগ্রস্ত করে। তাই তিনি হিন্দুসমাজকে সরাসরি আক্রমণ না করে যুক্তি ও শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার মাধ্যমে কুসংস্কারের বিরোধিতা করেছিলেন।

অমলশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে, রামমোহনের ধর্মচিন্তায় ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক সাধনা ও সমবেত উপাসনা— এই দুই দিকের সমন্বয় ছিল। তাঁর মতে ব্যক্তিগত সাধনার ভিত্তি ছিল অদ্বৈতবাদ, আর সমবেত উপাসনার মূল লক্ষ্য ছিল মানবকল্যাণ ও নৈতিক উন্নতি।[২১] অতএব বলা যায় যে রামমোহনের ব্রাহ্ম ভাবনার মূল ভিত্তি ছিল প্রাচীন উপনিষদীয় দর্শন, যা আধুনিক যুক্তিবাদী ব্যাখ্যার মাধ্যমে নতুন রূপ লাভ করেছিল।

১৮৪৩ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। এর পূর্বে তিনি ১৮৪০ সালে কলকাতায় তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্টীয় মিশনারিদের সমালোচনার মুখে ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতির আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য ও গৌরবময় ইতিহাসকে নতুনভাবে উপস্থাপন করা।[২২] ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের পর দেবেন্দ্রনাথ বেদপাঠকে সকল বর্ণের মানুষের জন্য উন্মুক্ত করে দেন এবং ধর্মীয় জ্ঞানচর্চাকে আরও বিস্তৃত সামাজিক পরিসরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন।[২৩]

১৮৪৫ সালে তিনি এমন বিধান প্রবর্তন করেন যে যারা পৌত্তলিকতা বর্জন করে একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী, তারাই ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের অধিকার লাভ করবে। এর মাধ্যমে তিনি একদিকে হিন্দু আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার চেষ্টা করেন, অন্যদিকে পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী চিন্তার সঙ্গে তার এক প্রকার সমন্বয় সাধনের উদ্যোগ নেন।[২৪] দেবেন্দ্রনাথ মূলত ব্রাহ্ম আদর্শকে হিন্দুধর্ম থেকে সম্পূর্ণ পৃথক কোনো ধর্মরূপে কল্পনা করেননি। তাঁর মতে, হিন্দুধর্ম থেকে পৌত্তলিকতা ও বহু ঈশ্বরবাদ দূর করা গেলে তার প্রকৃত রূপই ব্রাহ্ম আদর্শ হিসেবে প্রতিভাত হয়। তিনি বেদান্ত দর্শনের উপর গভীর আস্থা রাখতেন; তবে রাজা রামমোহন রায়ের অদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যার পরিবর্তে তিনি বিশিষ্টাদ্বৈত ভাবধারার প্রতি অধিক ঝোঁক প্রদর্শন করেছিলেন।[২৫]

সমকালীন যুগে আবির্ভূত ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অন্যতম অগ্রদূত হিসেবে পরিচিত রাজনারায়ণ বসু এই একই ধারার চিন্তাবিদ ছিলেন। তিনি আজীবন ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের শুদ্ধ ও গৌরবময় দিকগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেন এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে নিজস্ব সংস্কৃতি সম্পর্কে দ্বিধা ও হীনম্মন্যতায় ভোগা নবশিক্ষিত যুবসমাজের মানসিক সংকট দূরীকরণে নিজেকে নিয়োজিত করেন।[২৬]

অতএব ব্রাহ্মসমাজে রাজনারায়ণ বসুর ভূমিকা, তাঁর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা এবং অন্যান্য ব্রাহ্ম নেতাদের সঙ্গে তাঁর মতাদর্শিক পার্থক্যের তুলনামূলক আলোচনা এই প্রবন্ধের মূল বিষয়। এই আলোচনায়

প্রবেশের পূর্বে ব্রাহ্মসমাজের সূচনাপর্বে সংশ্লিষ্ট প্রধান ব্যক্তিত্বদের ভাবধারা এবং ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন।

রাজনারায়ণ বসু: প্রারম্ভিক জীবন ও বৌদ্ধিক বিকাশ:

উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক, আধ্যাত্মিক, সাহিত্যিক ও বৌদ্ধিক ইতিহাসে রাজনারায়ধ একটি বিশিষ্ট নাম। তিনি ছিলেন উনিশ শতকের বঙ্গীয় নবজাগরণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাবিদ ও সমাজসংস্কারক। তাঁর পিতা নন্দকিশোর বসু ছিলেন রাজা রামমোহন রায়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও অনুগামী।[২৭] নন্দকিশোর বসুর প্রথম পুত্র রাজনারায়ণ বসুর জন্ম ১৮২৬ সালের ৭ সেপ্টেম্বর চব্বিশ পরগনার বোড়াল গ্রামে।[২৮]

প্রথানুসারে তাঁর বাল্যশিক্ষা শুরু হয় গ্রাম্য পাঠশালায়। সেখান থেকে প্রায় সাত বছর বয়সে তিনি কলকাতার একটি পাঠশালায় ভর্তি হন। পরবর্তীকালে তিনি বৌবাজারে শম্ভু মাস্টারের বিদ্যালয় এবং ডেভিড হেয়ার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন। অবশেষে তিনি ভর্তি হন তৎকালীন বিখ্যাত হিন্দু কলেজে, যা সেই সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল।[২৯]

হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালে তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন মধুসূদন দত্ত, প্যারীচরণ সরকার, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। এই পরিবেশ তাঁর মানসগঠনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁর মধ্যে সাহিত্য ও ইতিহাসচেতনার বিকাশ ঘটতে শুরু করে। বাংলা সাহিত্যের পাশাপাশি ইংরেজি সাহিত্যের প্রতিও তাঁর গভীর অনুরাগ জন্মেছিল।[৩০]

ফলে তিনি একদিকে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের মূল্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হন, অন্যদিকে পাশ্চাত্য চিন্তার নতুন ধারা ও বৌদ্ধিক প্রবণতাকেও সমালোচনামূলকভাবে মূল্যায়ন করতে পারেন। এই দ্বৈত অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে তাঁর চিন্তাধারা ও কর্মজীবনের অন্যতম ভিত্তি হয়ে ওঠে।

উনিশ শতকের বাংলার সমাজজীবনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল যে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত নবযুবকদের একাংশ পাশ্চাত্য জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিককে আধুনিকতার পরিচয় হিসেবে গ্রহণ করতে শুরু করেছিল। তাদের মধ্যে মদ্যপানকে আধুনিক সভ্যতার একটি অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে করার প্রবণতা দেখা যায় এবং একই সঙ্গে হিন্দুধর্মে নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত কিছু খাদ্যাভ্যাসের প্রতিও অকারণ আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়।[৩১] এই সামাজিক ও মানসিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে রাজনারায়ণ বসু পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব এবং প্রচলিত হিন্দুধর্মের নানা কুসংস্কার ও পঙ্কিলতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ১৮৪৬ সালে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

তবে তাঁর এই সিদ্ধান্ত কেবল ব্যক্তিগত বৌদ্ধিক উপলব্ধির ফল ছিল না; পারিবারিক পরিবেশও এর পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তাঁর পিতা নন্দকিশোর বসু বৈদান্তিক ধর্মমতের প্রতি গভীর বিশ্বাস পোষণ করতেন এবং সেই প্রভাব

রাজনারায়ণের মানসগঠনে কার্যকর হয়। এই প্রসঙ্গে তাঁর আত্মজীবনীতে একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি পাওয়া যায়:

> "কলেজ পরিত্যাগের পূর্বে আমি সংশয়বাদী ছিলাম; কিন্তু স্ত্রী ও পিতার মৃত্যু আমাকে প্রকৃতিস্থ করিল। পুনরায় ধর্মে আমার বিশ্বাস হইল; কিন্তু এবার আমার পৈতৃক তত্ত্ববোধিনী সভার প্রচারিত বৈদান্তিক ধর্মে বিশ্বাস হইল।"[৩২]

তবে তাঁর ব্রাহ্ম আদর্শ গ্রহণ কোনো প্রকার গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেওয়া ছিল না। তিনি ধর্মীয় বিশ্বাস ও যুক্তিহীন অনুকরণের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য উপলব্ধি করেছিলেন। তৎকালীন হিন্দুধর্মের পঙ্কিলতা, কুসংস্কার ও যুক্তিহীন আচারের বিরুদ্ধে তিনি সমালোচনামূলক অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর যুক্তিশীল মন এমন এক ধর্মচিন্তার সন্ধান করছিল যা নৈতিক, যুক্তিসংগত এবং হৃদয়গ্রাহী। যদিও তিনি সনাতন হিন্দুধর্মের মৌলিক

আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের বিরোধিতা করেননি; বরং তাঁর বিরোধিতা ছিল অন্ধ অনুকরণ ও গড্ডালিকা প্রবাহের বিরুদ্ধে।

রাজনারায়ণ বসু বিশ্বাস করতেন যে ধর্মবোধহীন শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা হতে পারে না। তাঁর বক্তৃতা ও প্রার্থনায় একটি যুক্তিনির্ভর, পরিশীলিত এবং উপনিষদীয় ব্রহ্মবাদী চিন্তার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। কর্মজীবনের সূচনায় তিনি ব্রাহ্মসমাজকেই তাঁর প্রথম কর্মক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।[৩৩]

তিনি পাশ্চাত্য যুক্তিবাদকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেননি; বরং অন্ধ অনুকরণের বিরোধিতা করেছিলেন। একই সঙ্গে তিনি স্বদেশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর আস্থা পোষণ করতেন এবং নবশিক্ষিত বাঙালি সমাজকে বারবার সেই ঐতিহ্যের মূল্য উপলব্ধি করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির এক ধরনের সমন্বয়ের আদর্শ গ্রহণ করেছিল বলেই তিনি এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন।[৩৪]

অতএব বলা যায় যে ব্রাহ্মসমাজে তাঁর যোগদান কোনো গড্ডালিকা প্রবাহের ফল ছিল না। একদিকে পাশ্চাত্যের মোহে অন্ধ হয়ে পড়া ইয়াং বেঙ্গল গোষ্ঠীর দেশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি অবজ্ঞা, অন্যদিকে খ্রিস্টান মিশনারিদের আগ্রাসী ধর্মপ্রচার এবং অপরদিকে রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের সংস্কারবিরোধী মনোভাব— এই দ্বিমুখী পরিস্থিতির মধ্যেই রাজনারায়ণ বসু দেশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মর্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজে রাজনারায়ণ বসুর যোগদান ও প্রাথমিক ভূমিকা:

রাজনারায়ণ বসু ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলেও আজীবন নিজেকে হিন্দু বলেই মনে করতেন। এই ক্ষেত্রে তিনি রাজা রামমোহন রায় এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবধারার অনুসারী ছিলেন। রাজনারায়ণ বসুর মতে ব্রাহ্ম আদর্শ কোনো নতুন ধর্ম নয়; বরং এটি ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এর মূল ভিত্তি ছিল বেদান্ত ও উপনিষদে নিহিত একেশ্বরবাদী ও আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা, যার সঙ্গে আধুনিক যুগোপযোগী যুক্তিবাদী ধারণার সমন্বয় ঘটেছিল। এই সমন্বয়ের মাধ্যমে তৎকালীন ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিকে কুসংস্কার ও পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত করে যুক্তিবাদী ও বিশ্বজনীন আদর্শের আলোকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে— এমন বিশ্বাস তিনি পোষণ করতেন।[৩৫]

এই কারণেই ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের পর তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে একটি পত্র লেখেন। সেই পত্রে তিনি প্রস্তাব দেন যে হিন্দুশাস্ত্র থেকে নির্বাচিত মূল তত্ত্বসমূহ সংগ্রহ করে একটি সংকলনগ্রন্থ প্রস্তুত করা উচিত। তাঁর মতে এই গ্রন্থের প্রথম অংশে বেদের নির্বাচিত অংশ, দ্বিতীয় অংশে স্মৃতিশাস্ত্রের অংশ এবং তৃতীয় অংশে ইতিহাস, পুরাণ ও তন্ত্র থেকে প্রাসঙ্গিক শ্লোকসমূহ সংকলিত হওয়া উচিত। এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুশাস্ত্রের বিশুদ্ধ ও অবিকৃত রূপ জনসমক্ষে উপস্থাপন করা, যাতে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি পুনরায় আস্থা সৃষ্টি হয়।[৩৬]

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হন এবং রাজনারায়ণের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনায় আগ্রহ প্রকাশ করেন। ক্রমে রাজনারায়ণ বসু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হয়ে ওঠেন এবং ব্রাহ্ম আদর্শ প্রচারের বিভিন্ন বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে আলোচনা ও পরামর্শ করতে থাকেন। ১৮৪৬ সালে দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে তত্ত্ববোধিনী সভায় অনুবাদক হিসেবে নিযুক্ত করেন।[৩৭]

প্রথমদিকে তাঁকে উপনিষদের ইংরেজি অনুবাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়। দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা প্রদান করতেন এবং রাজনারায়ণ সেগুলিকে ইংরেজিতে অনুবাদ করতেন। এইভাবে কঠোপনিষদ, কেনোপনিষদ, ঈশোপনিষদ, মুন্ডক উপনিষদ এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ইংরেজি অনুবাদ ক্রমান্বয়ে

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়।[৩৮] দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজনারায়ণের জ্ঞান ও ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় দক্ষতা দেখে গভীরভাবে মুগ্ধ হন এবং ক্রমে তিনি তাঁর অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহচর হয়ে ওঠেন।

এইভাবে নিজ প্রতিভা ও দক্ষতার মাধ্যমে ব্রাহ্মসমাজে রাজনারায়ণ বসুর ক্রমশ উত্থান ঘটে। দেবেন্দ্রনাথের নির্দেশে তিনি বিভিন্ন স্থানে ধর্ম ও সমাজসংস্কার বিষয়ক বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। তাঁর বক্তৃতা ব্রাহ্মসমাজের সদস্যদের মধ্যে বিশেষ সাড়া জাগিয়েছিল। যদিও প্রাথমিকভাবে অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর বক্তৃতাশৈলী সম্পর্কে খুব সন্তুষ্ট ছিলেন না এবং এ বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথের কাছে কয়েকবার অভিযোগও করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে রাজনারায়ণের বক্তৃতার গভীরতা উপলব্ধি করে তিনি তাঁর প্রশংসা করেন। ব্রাহ্মধর্মের লক্ষণ সম্পর্কিত রাজনারায়ণের একটি বক্তৃতা পড়ে অক্ষয়কুমার দত্ত মন্তব্য করেছিলেন— "আপনি মেদিনীপুর উজ্জ্বল করিয়া আছেন।"[৩৯]

১৮৪৬ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে রাজনারায়ণ বসু ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বর্ধমান অঞ্চলে গমন করেন। সেখানে তাঁদের ধর্মীয় বক্তৃতা ও আলোচনার মাধ্যমে ব্রাহ্ম আদর্শ প্রচারিত হতে থাকে। বর্ধমানের প্রভাবশালী জমিদার মাহাতাব চাঁদ বাহাদুর রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতায় গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে ব্রাহ্ম আদর্শ গ্রহণ করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই বর্ধমানে একটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।[৪০]

উক্ত সময়ে ব্রাহ্মধর্ম মূলত বৈদান্তিক ধর্মরূপেই পরিচিত ছিল এবং এর ধর্মতাত্ত্বিক ভিত্তি ছিল উপনিষদীয় একেশ্বরবাদ। তবে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতার মৃত্যুর পর ব্রাহ্মসমাজে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পর্কিত একটি জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কিছু বিশিষ্ট ব্রাহ্ম সদস্য, বিশেষত কৈলাস চন্দ্র দাস মত প্রকাশ করেন যে, দেবেন্দ্রনাথ যদি তাঁর পিতার শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে অপৌত্তলিক ব্রাহ্মপদ্ধতিতে সম্পন্ন না করেন, তবে তাঁরা ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করতে বাধ্য হবেন।[৪১]

এই পরিস্থিতিতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে প্রচলিত হিন্দু আচার অনুসারে পিণ্ডদান না করে কেবল দানোৎসর্গ করেন, যা সম্পূর্ণ ব্রাহ্ম প্রথা না হলেও আংশিকভাবে নতুন ধর্মীয় আদর্শের প্রতিফলন ঘটায়। তৎকালীন হিন্দুসমাজের সামাজিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে এটি একটি সাহসী পদক্ষেপ হিসেবেই বিবেচিত হয়। তবুও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মসমাজের অভ্যন্তরে মতভেদ ও আলোড়নের সৃষ্টি হয়।[৪২]

এই বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঠাকুর 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমালোচনা শুরু করেন। এর প্রতিক্রিয়ায় রাজনারায়ণ বসু দেবেন্দ্রনাথের সমর্থনে 'ইংলিশম্যান' এবং 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় একাধিক প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর লেখাগুলিতে দেবেন্দ্রনাথের ধর্মীয় অবস্থান ও ব্রাহ্ম আদর্শের যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়। এই ঘটনাগুলি ব্রাহ্মসমাজে রাজনারায়ণ বসুর বৌদ্ধিক সক্রিয়তা এবং তাঁর নেতৃত্বের সম্ভাবনাকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে।[৪৩]

ব্রাহ্মসমাজে বেদের ঐশী প্রামাণ্যতা নিয়ে বিতর্ক (১৮৪৮–১৮৫১):

এসময় (১৮৪৮–১৮৫০) বেদ ঈশ্বরের প্রত্যাদিষ্ট কিনা, এই বিষয়কে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মসমাজে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণ বসুসহ অনেক ব্রাহ্মনেতা প্রথমদিকে বেদকে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ বলে মনে করতেন। রাজনারায়ণ বসু কেন বেদকে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ বলে গ্রহণ করেছিলেন, তা তাঁর 'Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj' গ্রন্থে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে।[৪৪]

১৮৪৬ সালের অক্টোবর মাসে 'The Englishman' পত্রিকায় প্রকাশিত এক পত্রে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও উল্লেখ করেন যে ধর্মের নীতিসমূহ প্রকৃতি, মানববুদ্ধি ও মানবহৃদয়ের নির্দেশনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া উচিত।[৪৫]

অন্যদিকে খ্রিস্টান মিশনারি চিন্তাবিদ জন মুর মুলেনস তাঁর 'Essay on Vedantism, Brahmoism and Christianity' গ্রন্থে মন্তব্য করেন যে ব্রাহ্মরা বেদকে ঐশী সত্যের প্রকাশ হিসেবে মানলেও তারা মূলত প্রকৃতি থেকেই ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করে এবং বেদের শিক্ষাকে সেই প্রাকৃতিক সত্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলেই গ্রহণ করে।[৪৬] রাজনারায়ণ বসুও তাঁর 'Vedantic Doctrine Vindicated' প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে অনুপ্রেরণার উৎস থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান চিরন্তন সত্যের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তা মানববুদ্ধিকে সমৃদ্ধ করে।[৪৭] তবে বেদের সম্পূর্ণ অভ্রান্ততার প্রশ্নে ব্রাহ্মসমাজের অভ্যন্তরে মতভেদ দেখা দেয়। ব্রাহ্মনেতা অক্ষয়কুমার দত্ত এই মতের বিরোধিতা করেন এবং যুক্তির ভিত্তিতে বিষয়টি পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানান। দীর্ঘ আলোচনা ও গবেষণার পর ১৮৫১ সালের ২৩ জানুয়ারি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্মতিক্রমে বেদের অভ্রান্ততার ধারণা আনুষ্ঠানিকভাবে পরিত্যক্ত হয় এবং মানবের আত্মপ্রত্যয়, যুক্তি ও নৈতিক বোধকে ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এই পরিবর্তনের প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী মন্তব্য করেছেন যে ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের ধর্মীয় বিশ্বাসে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে এবং এই রূপান্তরে রাজনারায়ণ বসুরও ভূমিকা ছিল।[৪৮]

১৮৪৮ থেকে ১৮৫১ সালের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের ধর্মতাত্ত্বিক চিন্তায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে, যার কেন্দ্রে ছিল বেদের প্রামাণ্যতা নিয়ে বিতর্ক। প্রথমদিকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণ বসুসহ ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দ বেদকে ঈশ্বরপ্রদত্ত বা প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তবে তাঁদের এই গ্রহণ মূলত ঐতিহ্যগত ধর্মবিশ্বাসের উপর নয়, বরং বেদের নৈতিক শিক্ষা ও দার্শনিক যুক্তিসংগততার উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। ব্রাহ্মসমাজের নেতারা মনে করতেন যে বেদের উপদেশ যদি মানববুদ্ধি, নৈতিকতা এবং প্রকৃতির সত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তবে তাকে ধর্মীয় সত্যের উৎস হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

কিন্তু খ্রিস্টান মিশনারিদের সমালোচনা এবং যুক্তিবাদী ব্রাহ্ম চিন্তাবিদদের প্রশ্নের ফলে এই অবস্থান পুনর্বিবেচনার মুখে পড়ে। বিশেষত অক্ষয়কুমার দত্ত যুক্তির ভিত্তিতে বেদের অভ্রান্ততার ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেন। এর ফলে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে একটি বৌদ্ধিক অনুসন্ধানের সূচনা হয়, যেখানে ধর্মীয় সত্যের উৎস হিসেবে শাস্ত্রের পরিবর্তে যুক্তি, নৈতিক বোধ এবং ব্যক্তিগত আত্মপ্রত্যয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়। শেষপর্যন্ত এই বিতর্কের ফলস্বরূপ ব্রাহ্মসমাজ বেদের অভ্রান্ততার দাবি পরিত্যাগ করে এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে সার্বজনীন যুক্তিবাদ ও মানবিক নৈতিকতাকে প্রতিষ্ঠা করে। এই রূপান্তর ব্রাহ্মসমাজকে এক নতুন ধর্মদর্শনের দিকে পরিচালিত করে, যা আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের মধ্যে এক সৃজনশীল সমন্বয়ের প্রতিফলন।

মেদিনীপুরে রাজনারায়ণ বসুর কর্মজীবন ও ব্রাহ্মসমাজের প্রসার (১৮৫১–১৮৬৬):

১৮৫১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন এবং প্রায় পনেরো বছর সেখানে কর্মরত ছিলেন। এই সময়ে তিনি শিক্ষা, সমাজসংস্কার ও ধর্মীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।[৪৯] তাঁর উদ্যোগে ১৮৫২ সালে মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ পুনরুজ্জীবিত হয়, যা প্রথমে ১৮৪১ সালে শিবচন্দ্র দেব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কিন্তু পরবর্তীকালে প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল।[৫০]

রাজনারায়ণ বসু ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে একটি ধর্মালোচনা সভা ও সঙ্গতসভা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রভাবে স্থানীয় জমিদার নবীনচন্দ্র নাগ, অখিলচন্দ্র দত্ত এবং নীলকমল দে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন এবং মেদিনীপুর অঞ্চলে ব্রাহ্ম আদর্শের বিস্তার ঘটে।[৫১]

১৮৫৩ সালে তিনি 'ধর্মতত্ত্বদীপিকা' গ্রন্থ রচনা করেন, যেখানে ব্রাহ্মধর্মের তত্ত্বসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়। এই গ্রন্থে পশ্চিমী যুক্তিবাদ ও স্বদেশীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার এক সমন্বিত রূপ প্রকাশ পায়।[৫২] পরে তিনি 'ব্রহ্মসাধন' পুস্তিকা রচনা করেন, যার ভাবধারা আংশিকভাবে John Abercrombie-এর 'The Interior Life'

গ্রন্থ দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এই গ্রন্থ সম্পর্কে কেশবচন্দ্র সেন মন্তব্য করেছিলেন যে ব্রাহ্মধর্মের তত্ত্বকে ব্যক্তিগত জীবনে উপলব্ধি না করলে এমন রচনা সম্ভব নয়।[৫৩] মেদিনীপুরে অবস্থানকালে তিনি খ্রিস্টান মিশনারিদের সমালোচনার জবাবে ইংরেজি ভাষায় 'Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj' রচনা করেন, যা ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষামূলক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়।[৫৪] ১৮৬৩ সালে তিনি বঙ্গদেশের প্রথম সুরাপান নিবারণী সভা প্রতিষ্ঠা করেন, যার লক্ষ্য ছিল মদ্যপান রোধ ও সমাজের নৈতিক ও শারীরিক উন্নতি সাধন।[৫৫]

এইভাবে মেদিনীপুরে তাঁর কর্মজীবন কেবল শিক্ষা প্রশাসনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং ধর্মীয় পুনর্জাগরণ, সামাজিক সংস্কার এবং বৌদ্ধিক নেতৃত্বের মাধ্যমে তিনি ব্রাহ্মসমাজের আদর্শকে সুদূরপ্রসারী রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

মেদিনীপুরে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার ও সামাজিক সংস্কারে রাজনারায়ণ বসুর ভূমিকা:

মেদিনীপুরে অবস্থানকালে রাজনারায়ণ বসু ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যে উদ্দেশ্যমূলক বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন, সেগুলি পরে মুদ্রিত হয়ে সারাদেশে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে তাঁর মেদিনীপুরে প্রদত্ত উপদেশাবলী পাঠ করেই কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন এবং পরবর্তীকালে ব্রাহ্ম আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।[৫৬] মেদিনীপুরে প্রতিষ্ঠিত সুরাপান নিবারণী সভাও একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক উদ্যোগ ছিল। এই আন্দোলনের প্রভাবেই ১৮৬৪ সালে প্যারীচরন সরকার কলকাতায় একই আদর্শে একটি সুরাপান নিবারণী সভা প্রতিষ্ঠা করেন।[৫৭]

রাজনারায়ণ বসু কেবল ব্রাহ্মধর্ম প্রচারেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না; তিনি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনেও ব্রাহ্ম আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন। ব্রাহ্মনীতির প্রতি তাঁর এই অঙ্গীকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হল নিজের কন্যার বিবাহ ব্রাহ্মপদ্ধতিতে সম্পন্ন করা।[৫৮] এছাড়াও মেদিনীপুরে অবস্থানকালে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত বিধবাবিবাহ আন্দোলনের প্রসারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এবং এর মাধ্যমে এই সামাজিক সংস্কার আন্দোলন গ্রামীণ বাংলায় বিস্তার লাভ করে। প্রবল সামাজিক প্রতিরোধ সত্ত্বেও তিনি বিদ্যাসাগরের পাশে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করেন এবং বিদ্যাসাগরের পুত্র দুর্গানারায়ণ ও সহোদর মদনমোহনের বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করেন।[৫৯]

এইসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে রাজনারায়ণ বসু ব্রাহ্মধর্মের আদর্শকে কেবল ধর্মীয় তত্ত্বের পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং সমাজসংস্কার ও ব্যক্তিজীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন।

মেদিনীপুরে অবস্থানকালে রাজনারায়ণ বসু যে কার্যক্রম পরিচালনা করেছিলেন, তা ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় নির্দেশ করে। এই সময়ে তাঁর বক্তৃতা, রচনা এবং সামাজিক উদ্যোগ ব্রাহ্ম আন্দোলনকে কেবল শহরকেন্দ্রিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখেনি; বরং তা বাংলার জেলা ও গ্রামীণ সমাজেও বিস্তার লাভ করতে সহায়তা করে। মেদিনীপুরে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতাসমূহ মুদ্রিত হয়ে বিভিন্ন স্থানে প্রচারিত হওয়ার ফলে ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ সম্পর্কে শিক্ষিত সমাজে নতুন আগ্রহের সৃষ্টি হয়। এরই প্রভাবে কেশবচন্দ্র সেনের মতো নবীন চিন্তাবিদ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং পরবর্তীকালে আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।একইসঙ্গে রাজনারায়ণ বসু ধর্মীয় আদর্শকে সামাজিক সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। সুরাপান নিবারণ আন্দোলন, বিধবাবিবাহের প্রসারে সহায়তা এবং পারিবারিক জীবনে ব্রাহ্মনীতির অনুসরণ তাঁর সংস্কারবাদী মনোভাবের স্পষ্ট পরিচয় দেয়।

বিশেষভাবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের প্রতি তাঁর সমর্থন ব্রাহ্মসমাজের উদার ও প্রগতিশীল চরিত্রকে আরও সুদৃঢ় করে।

অতএব বলা যায়, মেদিনীপুর পর্বে রাজনারায়ণ বসুর কর্মকাণ্ড ব্রাহ্মসমাজকে কেবল একটি ধর্মীয় মতবাদ হিসেবে নয়, বরং একটি বিস্তৃত সামাজিক ও নৈতিক সংস্কার আন্দোলন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তাঁর এই উদ্যোগ উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণধর্মী চিন্তাধারার বিকাশেও বিশেষ অবদান রেখেছিল।

কানপুর পর্ব ও ব্রাহ্মসমাজে মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব:

১৮৬৬ সালে অসুস্থতার কারণে রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুর ত্যাগ করে উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন। কানপুরে অবস্থানকালে কানপুর ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসবে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। সেখানে তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে ব্রাহ্মধর্ম কোনো নতুন ধর্ম নয়; বরং এটি হিন্দুধর্মের প্রাচীন ও বিশুদ্ধ রূপের পুনরাবিষ্কার। তাঁর মতে, হিন্দুধর্মের উপর যে কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার আবরণ পড়েছিল, ব্রাহ্মধর্ম সেই আবরণ দূর করে ধর্মের মূল সত্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চায়।[৬০] এই মতবাদ থেকেই পরবর্তীকালে তাঁর সঙ্গে কেশবচন্দ্র সেনের মতবিরোধ তীব্র হয়ে ওঠে। কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে কিছু ব্রাহ্ম সদস্য আদি ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে অবতারবাদ ও ব্যক্তিপূজার প্রবণতা দেখা দিতে শুরু করে। এই পরিস্থিতি সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসু তাঁর স্মৃতিচারণে লিখেছেন—

> "সেদিন এমন এক দৃশ্য দেখিলাম যাহা আর ব্রাহ্মসমাজে পূর্বে কখনো দেখি নাই। উপাসনার পরে প্রত্যেক ব্রাহ্ম মজুমদার মহাশয়ের পা ধরিয়া কেহ বলিলেন— 'প্রভু আমাকে পরিত্রাণ করুন।' কেহ বলিলেন— 'আমার হয়ে দুটো কথা ঈশ্বরকে বলিবেন।' তাহার পর অপেক্ষাকৃত কম বয়সের ব্রাহ্ম আচার্যের পা ধরা হইল। ব্রাহ্মেরা আমার পা ধরিতে আইলে আমি এমন করিতে নাই, করিতে নাই বলিয়া পিছু হাটিতে লাগিলাম।"[৬১]

এই ঘটনা ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে নরপূজার প্রবণতার সূচক হিসেবে বিবেচিত হয়। এ প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে লিখেছেন—

> "এই ১৮৬৮ সালে ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে এক মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। নবভক্তির আবির্ভাবে ব্রাহ্মদিগের অন্তরে আশ্চর্য্য বিনয়ের আবির্ভাব হয়। তাহার ফলস্বরূপ তাহাদের অনেকে কেশবচন্দ্রের পদে ধরিয়া পদধূলি গ্রহণ, পাদপ্রক্ষালন, সবিনয়ে ক্রন্দন প্রভৃতি আরম্ভ করেন।"[৬২]

এই প্রবণতার বিরোধিতা করে রাজনারায়ণ বসু ১৮৬৯ সালে 'Brahmic Advice, Caution and Help' নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। সেখানে তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে ব্রাহ্মধর্মের মূল লক্ষ্য হল নিরাকার পরমব্রহ্মের উপাসনা প্রতিষ্ঠা করা এবং সকল প্রকার মূর্তিপূজা ও অবতারবাদ পরিহার করা।[৬৩]

পরবর্তীকালে ১৮৭২ সালে ব্রাহ্মবিবাহ আইন প্রণয়ন প্রসঙ্গেও মতভেদ তীব্র হয়ে ওঠে। কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্ম থেকে পৃথক ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণ বসু এর বিরোধিতা করেন। তাঁদের মতে ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মেরই একটি সংস্কারমূলক রূপ এবং সামাজিক সংস্কারের মাধ্যমে হিন্দু সমাজকে শুদ্ধ করা উচিত।[৬৪]

ব্রাহ্মবিবাহ আইন প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বসুর সমালোচনা:

ব্রাহ্মবিবাহ আইন নিয়ে বিতর্কের সময় রাজনারায়ণ বসু ব্রাহ্মসমাজের সদস্যদের উদ্দেশ্যে 'An Appeal to the Brahmos of India' শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্র রচনা করেন। এই পত্রে তিনি আইনটির বিরোধিতা করে যুক্তি দেন যে, প্রস্তাবিত ব্রাহ্মবিবাহ বিল ব্রাহ্মধর্মের ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য ও আচারব্যবস্থাকে অবমূল্যায়ন করছে। তাঁর মতে, আইনটি বিবাহকে রেজিস্ট্রারের সামনে সম্পাদিত একটি নাগরিক আনুষ্ঠানিকতার উপর নির্ভরশীল করে তুলছে, ফলে ব্রাহ্মীয় ধর্মীয় আচারকে গৌণ বা অপ্রয়োজনীয় বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন—

> "The bill in question imposes a new form of marriage in the presence of the registrar… What are Brahmic nuptial rites—nothing, and the form of marriage imposed by the legislature everything? Is not this a plain insult to our religion?"[৬৫]

রাজনারায়ণ বসুর মতে, এই বিল কার্যকর হলে প্রথমবারের মতো ঔপনিবেশিক সরকার কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আচার-অনুষ্ঠানে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করবে। তিনি সতর্ক করে দেন যে, ব্রাহ্মসমাজ যদি স্বেচ্ছায় তাদের ধর্মীয় অধিকারের উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ মেনে নেয়, তবে ভবিষ্যতে ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়ে বারবার সরকারি হস্তক্ষেপের পথ উন্মুক্ত হবে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন—

> "For the first time in the history of India the Government is going to interfere with the religion of a class of Her Majesty's Indian subjects… Better that our sons be deprived of their patrimonial inheritance than that we should part with our religious independence."[৬৬]

এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় যে রাজনারায়ণ বসু ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্মের সংস্কারমূলক রূপ হিসেবে দেখলেও তিনি ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রশ্নে অত্যন্ত দৃঢ় ছিলেন। তাঁর মতে, ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারমূলক আদর্শ বজায় রাখতে হলে রাষ্ট্রের আইনি কাঠামোর পরিবর্তে ধর্মীয় আচার ও নৈতিক নীতির উপরই অধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত। ফলে ব্রাহ্মবিবাহ আইনকে কেন্দ্র করে যে মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়, তা ব্রাহ্মসমাজের অভ্যন্তরীণ বিভাজনকে আরও প্রকট করে তোলে এবং পরবর্তীকালে আন্দোলনের গতিপথে গভীর প্রভাব ফেলে।

ব্রাহ্মবিবাহ আইন বিতর্ক ও রাজনারায়ণ বসুর জাতীয়তাবাদী অবস্থান:

ব্রাহ্মবিবাহ আইন প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বসু সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারতীয় সমাজে বিবাহ কেবল একটি আইনি চুক্তি নয়; বরং এটি গভীর আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় তাৎপর্যপূর্ণ একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। তাঁর মতে, ব্রাহ্মবিবাহকে কেবলমাত্র রেজিস্ট্রারের সামনে সম্পাদিত নাগরিক আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে বৈধতা দেওয়া হলে তার ধর্মীয় মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে। তদুপরি তিনি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিদেশি রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেন, কারণ এর ফলে ভারতীয় সমাজ ধীরে ধীরে ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে সাংস্কৃতিকভাবে উপনিবেশায়িত হয়ে পড়তে পারে। তিনি সতর্ক করে দেন যে যদি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পর্কও ব্রিটিশ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে ভারতীয় সমাজের স্বাতন্ত্র্য ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[৬৭]

রাজনারায়ণ বসুর এই যুক্তিনির্ভর ও জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ বক্তব্য সমসাময়িক সমাজে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। তাঁর লেখা প্রকাশিত হওয়ার পর বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় রাজনারায়ণ বসুর এই বক্তব্যের প্রশংসা করে লিখেছিলেন—

"রাজনারায়ণ বাবুর লেখনীর উপর পুষ্পচন্দন বৃষ্টি হউক। এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র গীত হউক; হিমালয় কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক; গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, নর্মদা, গোদাবরীতটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্মরিত হউক।"[৬৮] একইভাবে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে রাজনারায়ণ বসুর এই বক্তৃতা ছিল অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও জাতীয় চেতনায় সমৃদ্ধ—

"এই বক্তৃতা এত চিন্তাপূর্ণ, সুযুক্তিসঙ্গত ও জাতীয় ভাবপূর্ণ হইয়াছিল যে বক্তৃতা হইবামাত্র চারিদিকে ধন্য ধন্য রব উঠিয়া গেল।"[৬৯] অন্যদিকে সমসাময়িক সংবাদপত্র 'সোমপ্রকাশ'-এ দ্বারকানাথ বিদ্যা ভূষন মন্তব্য করেছিলেন—

"হিন্দুধর্ম নির্বাণোন্মুখ হইতেছিল, রাজনারায়ণবাবু তাহাকে রক্ষা করিলেন।"[৭০]

তবে এই বিতর্কের ফলশ্রুতিতে ব্রাহ্মসমাজের অভ্যন্তরীণ বিভাজন আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠী ক্রমশ হিন্দু সমাজ থেকে পৃথক ধর্মীয় পরিচয় প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হয়, অন্যদিকে আদি ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্বে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণ বসু হিন্দুধর্মের সংস্কার ও একেশ্বরবাদী ব্যাখ্যার মাধ্যমে তাকে নতুন রূপে প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হন। তবুও উভয় গোষ্ঠীর ধর্মীয় উপাসনা, আচার ও উৎসবের ভক্তিমূলক রূপে হিন্দু ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রভাব স্পষ্টভাবে বিদ্যমান ছিল।

বস্তুত, এই বিতর্ক থেকে স্পষ্ট হয় যে উনিশ শতকের ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনে ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ, খ্রিষ্টীয় ও ইসলামি একেশ্বরবাদী ধারণার প্রভাব গ্রহণ করলেও তারা ভারতীয় ঐতিহ্যের ভিত্তিতে একটি যুক্তিসম্মত ধর্মদর্শন নির্মাণের চেষ্টা করেছিল। ভারতীয় সংস্কৃতির দীর্ঘ ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এটি মূলত অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমন্বয়ধর্মী; বিভিন্ন ধর্মীয় ও দার্শনিক ধারাকে গ্রহণ করে বহুত্বের মধ্য দিয়ে এক বৃহত্তর সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে তোলাই এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। ফলে ধর্মীয় আগ্রাসনের পরিবর্তে সহাবস্থান ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিকশিত হয়েছে।

গবেষণার প্রধান অনুসিদ্ধান্ত:

১. রাজনারায়ণ বসু উনিশ শতকের ব্রাহ্ম আন্দোলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধিক ও সাংগঠনিক ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর চিন্তাধারা ব্রাহ্মধর্মকে যুক্তিবাদী, নৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করে।

২. মেদিনীপুরে তাঁর কর্মপর্ব ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। সেখানে তিনি ব্রাহ্মসমাজের পুনরুজ্জীবন, ধর্মীয় বক্তৃতা, গ্রন্থ রচনা এবং বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগের মাধ্যমে আন্দোলনকে নতুন গতি প্রদান করেন।

৩. তাঁর রচিত গ্রন্থ ও বক্তৃতাগুলি ব্রাহ্মধর্মের তাত্ত্বিক ভিত্তি সুসংহত করতে সহায়তা করে এবং শিক্ষিত সমাজে একেশ্বরবাদী ধর্মচিন্তার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৪. ব্রাহ্মসমাজের অভ্যন্তরে মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব বিশেষত কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে উদ্ভূত নতুন ধারার সঙ্গে তাঁর বিরোধ আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় নির্দেশ করে। রাজনারায়ণ বসু ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্মের সংস্কারমূলক রূপ হিসেবে দেখেছিলেন, যেখানে কেশবচন্দ্র সেন এটিকে পৃথক ধর্মীয় সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী ছিলেন।

৫. ব্রাহ্মবিবাহ আইন প্রসঙ্গে তাঁর বিরোধিতা ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রশ্নে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান নির্দেশ করে। তিনি মনে করতেন যে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ভারতীয় সমাজকে সাংস্কৃতিকভাবে উপনিবেশায়িত করার পথ প্রশস্ত করতে পারে।

৬. তাঁর যুক্তিপূর্ণ লেখনী ও বক্তৃতা সমসাময়িক সমাজে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ সমসাময়িক চিন্তাবিদ তাঁর বক্তব্যের উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন।

৭. ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও উভয় পক্ষই একেশ্বরবাদী ধর্মচিন্তা এবং ধর্মীয় সংস্কারের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিল, যা উনিশ শতকের বঙ্গীয় নবজাগরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

৮. সামগ্রিকভাবে দেখা যায় যে রাজনারায়ণ বসুর চিন্তা ও কর্মকাণ্ড ভারতীয় সমাজে ধর্মীয় সংস্কার, জাতীয় চেতনার বিকাশ এবং সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের পুনর্গঠনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিল।

উপসংহার:

উনিশ শতকের বঙ্গীয় নবজাগরণের প্রেক্ষাপটে রাজনারায়ণ বসুর চিন্তা ও কর্মধারা ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচনা করেছে। তিনি ব্রাহ্মধর্মকে কেবল একটি ধর্মীয় মতবাদ হিসেবে নয়, বরং একটি যুক্তিনির্ভর ও সংস্কারমূলক সামাজিক আন্দোলন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর রচনা, বক্তৃতা এবং সংগঠনিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ব্রাহ্মসমাজ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে নতুন ধর্মীয় ও নৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়। বিশেষত মেদিনীপুরে তাঁর কার্যকাল ব্রাহ্ম আন্দোলনের বিস্তারে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে, যেখানে ধর্মীয় প্রচার, সামাজিক সংস্কার এবং শিক্ষামূলক কার্যক্রম একসঙ্গে অগ্রসর হয়। রাজনারায়ণ বসুর ধর্মীয় চিন্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল হিন্দুধর্মের প্রাচীন আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে যুক্তিবাদী ব্যাখ্যার মাধ্যমে পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা। তিনি ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্মের সংস্কারিত রূপ হিসেবে দেখেছিলেন এবং এর মাধ্যমে পৌত্তলিকতা, কুসংস্কার ও অযৌক্তিক প্রথাকে পরিহার করে একেশ্বরবাদী ধর্মচেতনার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে ব্রাহ্মসমাজের অন্য একটি প্রভাবশালী ধারার নেতা কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে মতাদর্শগত দ্বন্দ্বে নিয়ে যায়। কেশবচন্দ্র সেন যেখানে ব্রাহ্মধর্মকে পৃথক ধর্মীয় সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী ছিলেন, সেখানে রাজনারায়ণ বসু এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দুধর্মের সংস্কার ও পুনর্ব্যাখ্যার মাধ্যমে সমাজের পরিবর্তন সাধনের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন।

ব্রাহ্মবিবাহ আইন নিয়ে বিতর্কে রাজনারায়ণ বসুর অবস্থান তাঁর ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে গভীর সচেতনতার পরিচয় দেয়। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ভারতীয় সমাজকে ধীরে ধীরে সাংস্কৃতিকভাবে উপনিবেশায়িত করে তুলতে পারে। এই কারণে তিনি ব্রাহ্মসমাজের সদস্যদের সতর্ক করে ধর্মীয় অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার আহ্বান জানান। তাঁর এই যুক্তিনির্ভর বক্তব্য সমসাময়িক বুদ্ধিজীবী সমাজে গভীর প্রভাব বিস্তার করে এবং শিক্ষিত সমাজে তাঁর মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। সমসাময়িক সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও চিন্তাবিদ শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর চিন্তাধারার প্রশংসা করেছিলেন, যা তাঁর বৌদ্ধিক প্রভাবের স্বীকৃতি বহন করে।

সর্বোপরি বলা যায়, রাজনারায়ণ বসুর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা উনিশ শতকের ভারতীয় সমাজে আধুনিকতার বিকাশের সঙ্গে ঐতিহ্যের সমন্বয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত। তিনি একদিকে পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদী মূল্যবোধকে গ্রহণ করেছিলেন, অন্যদিকে ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের ভিত্তিকে অক্ষুণ্ণ রেখে একটি নতুন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় নির্মাণের চেষ্টা করেছিলেন। এই কারণেই তাঁর চিন্তা ও কর্মকাণ্ড কেবল ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসেই নয়, সমগ্র বঙ্গীয় নবজাগরণের ধারায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হিসেবে বিবেচিত হয়।

তথ্যসূত্র:

১. Kopf, David. The Brahmo Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind. Princeton University Press, Princeton, 1979, pp. 3–10.
২. Sastri, Sivanath, History of the Brahmo Samaj, Sadharan Brahmo Samaj Press, Calcutta, 1911, pp. 45–52.
৩. Tagore, Rabindranath, The Religion of Man, George Allen & Unwin, London, 1931, pp. 23–25.
৪. Ghosh, Baridbaran, Rajnarayan Basu: A Study of His Life and Thought, Firma KLM, Calcutta, 1975, pp. 80–92.
৫. Shastri, Shibnath, Ramtanu Lahiri O Tatkalin Banga Samaj, New Age Publishers, Calcutta, 1904, pp. 210–220.
৬. Sen, Amiya Kumar, The Tattvabodhini Sabha and the Bengal Renaissance, Firma KLM, Calcutta, 1979, pp. 140–160.
৭. Mukherjee, S. N., Social Implications of the Brahmo Movement, Firma KLM, Calcutta, 1974, pp. 350–365.
৮. Kopf, David, The Brahmo Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind, Princeton University Press, Princeton, 1979, pp. 45–60.
৯. Chattopadhyay, Bankim Chandra, “Rajnarayan Babur Lekhani,” Bangadarshan, Chaitra 1279 B.S., p. 312.
১০. Radhakrishnan, Sarvepalli, Indian Philosophy, Vol. 1, George Allen & Unwin, London, 1923, pp. 22–28.
১১. Basham, A. L., The Wonder That Was India, Sidgwick & Jackson, London, 1954, pp. 9–15.
১২. Thapar, Romila, Early India: From the Origins to AD 1300, University of California Press, Berkeley, 2002, pp. 143–152.
১৩. Radhakrishnan, S., Indian Philosophy, Vol. 1, pp. 309–320.
১৪. Majumdar, R. C., Ancient India, Motilal Banarsidass, Delhi, 1977, pp. 215–220.
১৫. Nehru, Jawaharlal, The Discovery of India, Oxford University Press, New Delhi, 1946, pp. 48–55.
১৬. Said, Edward, Orientalism, Pantheon Books, New York, 1978, pp. 205–210.
১৭. Oddie, Geoffrey A., Missionaries, Rebellion and Proto-Nationalism, Curzon Press, Richmond, 1999, pp. 45–50.
১৮. Kopf, David, The Brahmo Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind, Princeton University Press, Princeton, 1979, pp. 31–38.
১৯. Sengupta, Shyamal, Raja Rammohan Roy and the Brahmo Movement, Firma KLM, Kolkata, 1983, pp. 54–60.
২০. Sastri, Sivanath, History of the Brahmo Samaj, Sadharan Brahmo Samaj Press, Calcutta, 1911, pp. 63–65.
২১. Bandyopadhyay, Amal Sankar, Rammohun Roy: A Study of His Religious Thought, Firma KLM, Calcutta, 1964, pp. 112–118.
২২. Kopf, David, The Brahmo Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind, Princeton University Press, Princeton, 1979, pp. 55–60.
২৩. Sastri, Sivanath, History of the Brahmo Samaj, Sadharan Brahmo Samaj Press, Calcutta, 1911, pp. 118–122.
২৪. Sen, Amiya P., Debendranath Tagore, Oxford University Press, New Delhi, 2010, pp. 73–80.
২৫. Sen, Amiya P., Debendranath Tagore, pp. 95–102.
২৬. Basu, Rajnarayan, Atmacharit, Bangiya Sahitya Parishad, Calcutta, 1909, pp. 45–50.
২৭. Basu, Rajnarayan, Atmacharit, pp. 3–5.

২৮. Sen, Amiya P., Hindu Revivalism in Bengal, 1872–1905, Oxford University Press, Delhi, 1993, p. 21.
২৯. Kopf, David, The Brahmo Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind, Princeton University Press, Princeton, 1979, pp. 140–145.
৩০. Sarkar, Sumit, A Critique of Colonial India, Papyrus, Calcutta, 1985, pp. 96–100.
৩১. Sarkar, Sumit, A Critique of Colonial India, pp. 87–92.
৩২. Basu, Rajnarayan, Atmacharit, Bangiya Sahitya Parishad, Calcutta, 1909, p. 32.
৩৩. Kopf, David, The Brahmo Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind, Princeton University Press, Princeton, 1979, pp. 142–148.
৩৪. Sen, Amiya P., Hindu Revivalism in Bengal, 1872–1905, Oxford University Press, Delhi, 1993, pp. 36–40.
৩৫. Basu, Rajnarayan, Atmacharit, pp. 60–65.
৩৬. Ghosh, Baridbaran, Rajnarayan Basu, Sahitya Samsad, Kolkata, 1962, pp. 32–34.
৩৭. Sastri, Sivanath, History of the Brahmo Samaj, Sadharan Brahmo Samaj Press, Calcutta, 1911, pp. 135–138.
৩৮. Kopf, David, The Brahmo Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind, Princeton University Press, Princeton, 1979, pp. 150–155.
৩৯. Ghosh, Baridbaran, Rajnarayan Basu, p. 37.
৪০. Ghosh, Baridbaran, Rajnarayan Basu, Sahitya Samsad, Kolkata, 1962, pp. 40–42.
৪১. Sastri, Sivanath, History of the Brahmo Samaj, Sadharan Brahmo Samaj Press, Calcutta, 1911, pp. 150–152.
৪২. Kopf, David, The Brahmo Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind, Princeton University Press, Princeton, 1979, pp. 158–160.
৪৩. Ghosh, Baridbaran, Rajnarayan Basu, pp. 44–45.
৪৪. Basu, Rajnarayan, Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj, Brahmo Samaj Press, Calcutta, 1860, pp. 12–15.
৪৫. Tagore, Debendranath, “Letter on the Principles of the Brahmo Religion,” The Englishman, Calcutta, October 1846.
৪৬. Mullens, John Muir, Essay on Vedantism, Brahmoism and Christianity, Bishop’s College Press, Calcutta, 1854, pp. 30–33.
৪৭. Basu, Rajnarayan, “Pedantic Doctrine Vindicated,” in Tracts on Brahmoism, Brahmo Samaj Press, Calcutta, 1865, pp. 41–44.
৪৮. Sastri, Sivanath, Ramtanu Lahiri O Tatkalin Bangasamaj, New Age Publishers, Calcutta, 1903, p. 212.
৪৯. Ghosh, Baridbaran, Rajnarayan Basu, Sahitya Samsad, Calcutta, 1962, pp. 58–59.
৫০. Sastri, Sivanath, Ramtanu Lahiri O Tatkalin Bangasamaj, New Age Publishers, Calcutta, 1903, p. 215.
৫১. Ghosh, Baridbaran, Rajnarayan Basu, pp. 60–61.
৫২. Basu, Rajnarayan, Dharmatattva Dipika, Brahmo Samaj Press, Calcutta, 1853, pp. 3–6.
৫৩. Sen, Keshab Chandra, Speeches and Writings of Keshab Chandra Sen, Brahmo Samaj Press, Calcutta, 1870, pp. 84–85.
৫৪. Basu, Rajnarayan, Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj, Brahmo Samaj Press, Calcutta, 1860, pp. 18–22.
৫৫. Kopf, David, The Brahmo Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind, Princeton University Press, Princeton, 1979, pp. 164–165.
৫৬. Sastri, Sivanath, Ramtanu Lahiri O Tatkalin Bangasamaj, New Age Publishers, Calcutta, 1903, pp. 218–219.
৫৭. Ghosh, Baridbaran, Rajnarayan Basu, Sahitya Samsad, Calcutta, 1962, pp. 72–73.
৫৮. Ghosh, Baridbaran, Rajnarayan Basu, p. 74.

৫৯. Vidyasagar, Ishwar Chandra, Bidhaba Bibaha, Sanskrit Press, Calcutta, 1855; see also Sastri, Sivanath, Ramtanu Lahiri O Tatkalin Bangasamaj, p. 220.
৬০. Sen, A. K., The Tattvabodhini Sabha and the Bengal Renaissance, Firma KLM, Calcutta, 1979, p. 154.
৬১. Basu, Rajnarayan, Atmacharit, Bangiya Sahitya Parishad, Calcutta, 1909, p. 92.
৬২. Shastri, Shibnath, Ramtanu Lahiri O Tatkalin Banga Samaj, New Age Publishers, Calcutta, 1904, p. 183.
৬৩. Basu, Rajnarayan, Brahmic Advice, Caution and Help, Calcutta, 1869, pp. 15–16.
৬৪. Mukherjee, S. N., Social Implications of the Brahmo Movement, Firma KLM, Calcutta, 1974, p. 360.
৬৫. Basu, Rajnarayan, An Appeal to the Brahmos of India, Brahmo Press, Calcutta, 1871, p. 5.
৬৬. Basu, Rajnarayan, An Appeal to the Brahmos of India, pp. 6–7.
৬৭. Basu, Rajnarayan, An Appeal to the Brahmos of India, Brahmo Press, Calcutta, 1871, pp. 6–8.
৬৮. Chattopadhyay, Bankim Chandra, “Rajnarayan Babur Lekhani,” Bangadarshan, Chaitra 1279 B.S., p. 312.
৬৯. Shastri, Shibnath, Ramtanu Lahiri O Tatkalin Banga Samaj, New Age Publishers, Calcutta, 1904, p. 215.
৭০. Vidyabhushan, Dwarkanath, “Brahmo Bibaha Bill,” Som Prakash, 1872, cited in Shastri, Shibnath, Ramtanu Lahiri O Tatkalin Banga Samaj, p. 215.

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1301- 1308
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.349

ঈশ্বরসৃষ্ট কাল ও মানবচেতনার কাল: মধ্যযুগীয় দার্শনিক সেন্ট অগাস্টাইনের সময়তত্ত্বের দ্বৈত ব্যাখ্যা

সুব্রত ক্ষেত্রী, *গবেষক, দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 17.03.2026; Accepted: 24.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The nature of time has long been one of the most fundamental questions in human thought. While our ordinary experience assumes time as self-evident, philosophical inquiry has critically examined its nature, existence, and structure. Medieval philosophers, Augustine offered a profound analysis of time in his works On Genesis (389) and Confessions (397), especially in Book XI. Augustine presents two complementary perspectives on time. In *On Genesis*, he developed a cosmological and objective account of time. According to this view, time is a creation of God and began simultaneously with the creation of the world. God is eternal, changeless, and exists outside time; therefore, asking what God was doing "before" creation is meaningless because time itself did not exist prior to creation.

In *Confessions* (Book XI), Augustine saws a psychological or subjective interpretation of time. He argues that time is closely related to human consciousness and is experienced through mental processes. The past is known through memory, the present through immediate perception, and the future through expectation. Thus, time is not simply an external reality but also a phenomenon experienced within the human mind. Augustine's analysis reveals a tension between these two perspectives—time as an objective creation of God and time as a subjective experience of human consciousness. By integrating cosmological and psychological approaches, Augustine provides a unique and influential framework for understanding the nature of time in medieval philosophy.

Keywords: Augustine, Time, Objective Time, Subjective Time, Human Consciousness

সময়ের প্রকৃতি মানবচিন্তার এক প্রাচীন ও মৌলিক প্রশ্ন। আমরা বস্তু ও ঘটনার মধ্যে 'আগে–পরে', 'একই সময়ে' ইত্যাদি কালিক সম্পর্কের মাধ্যমে সময়কে অনুভব ও পরিমাপ করি। ঘটনার ক্রমবিন্যাস থেকেই সময়ের ধারণা গঠিত হয়, যা সকল অভিজ্ঞতার এক সর্বব্যাপী বৈশিষ্ট্য বলে মনে হয়। সাধারণ মানুষ সময়কে স্বতঃসিদ্ধ ধরে নিলেও দার্শনিকরা তা বিনা বিচারে গ্রহণ করেননি; বরং সময়ের স্বরূপ, অস্তিত্ব ও সত্তা সম্পর্কে যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণ করেছেন। সাধারণ অভিজ্ঞতায় মনে হয়, সব ঘটনা কোনো না কোনো সময়ে ঘটে এবং সময় ছাড়া কোনো কিছুর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী কাল অনাদি–অনন্ত, সর্বব্যাপী এবং সব কিছুর আশ্রয়; সেকেন্ড, মিনিট, বছর ইত্যাদি কালের প্রকৃত অংশ নয়, বরং পরিমাপের উপায় মাত্র। আমরা ঘড়ি, ক্যালেন্ডার বা নিয়মিত ঘটনার মাধ্যমে সময় পরিমাপ করি। কিন্তু

দার্শনিক বিশ্লেষণে এই ধারণায় সমস্যা দেখা দেয়। কালকে অসীম ও পরম দ্রব্য বলা হলেও তা প্রত্যক্ষযোগ্য নয়। আবার কাল প্রগতিশীল এবং আমাদের চেতনা তাকে অতীত–বর্তমান–ভবিষ্যৎ এই তিন ভাগে বিভক্ত করে। এই তিনটি অংশ একসঙ্গে থাকতে পারে না; তাই কালকে একই সঙ্গে অসীম ও গতিশীল বলা যুক্তিসঙ্গত নয়। প্রকৃত অর্থে কেবল বর্তমানই বিদ্যমান— অতীত আর নেই, ভবিষ্যৎ এখনও আসেনি। তবে বর্তমানের নিজস্ব স্থায়িত্ব বা সত্তা কতখানি, সেটিই মূল দার্শনিক সমস্যা।

মধ্যযুগীয় দার্শনিক অগাস্টাইন তাঁর On Genesis (389) এবং Confessions(397) Book XI-এ কালের ধারণা আলোচনা করেছেন। On Genesis-এ তিনি বিশ্বতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে বলেন, ঈশ্বর চিরন্তন, কালিকহীন ও পরিবর্তনহীন; তিনি কোনো পূর্বস্থিত উপাদান ছাড়াই (ex nihilo) জগত সৃষ্টি করেছেন। উপাদানগুলো শাশ্বত নয়, তাই ঈশ্বরই জগতের একমাত্র স্রষ্টা। ঈশ্বর কালের মধ্যে নন; বরং কাল ও জগত একসঙ্গে সৃষ্ট হয়েছে— অর্থাৎ সময়ের সূচনা হয়েছে সৃষ্টির সঙ্গে। Confessions (Book XI)-এ তিনি মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখান যে সময় মূলত মানবচেতনার অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কিত। শাশ্বত মানে কালের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী হওয়া নয়, বরং কালের বাইরে অবস্থান করা; শাশ্বতে অতীত-ভবিষ্যৎ নেই, সবই এক চিরবর্তমান। ঈশ্বর জগত সৃষ্টির আগে কী করছিলেন— এ ধরনের প্রশ্নকে অগাস্টিন অযৌক্তিক বলেন, কারণ সৃষ্টি-পূর্বে কালই ছিল না। তাই 'সৃষ্টির আগে' কথাটিই অর্থহীন। ঈশ্বর পরিবর্তনহীন, আর জগত ও কাল পরিবর্তনশীল—এই ভেদই তাঁর তত্ত্বের মূল বক্তব্য। অগাস্টাইন কালের স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, "What then is time? If no one asks me, I know, if I want to explain it to a questioner, I do not know" (Augustine 2006, P. 242). "যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, কাল কি? আমি জানি কাল কি কিন্তু প্রশ্ন কারকের কাছে যদি ব্যাখ্যা করতে যাই তখন কাল কি তা আমি জানি না।"

সেন্ট অগাস্টাইন কালের বিষয়ে দুই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছেন। On Genesis-এ তিনি কালের বিষয়গত (objective) ব্যাখ্যা করেছেন, আর Confessions (Book XI)-এ কালের মনস্তাত্ত্বিক বা বিষয়ীগত (subjective) বিশ্লেষণ দিয়েছেন।

তিনি বলেন, মননির্ভরভাবে কালের তিনটি অংশ— অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ— বোঝা যায়। তবে বাস্তবে এদের অস্তিত্ব কীভাবে আছে, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি স্মৃতির গুরুত্ব তুলে ধরেন। অতীতকে আমরা স্মৃতির মাধ্যমে, বর্তমানকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় এবং ভবিষ্যৎকে প্রত্যাশার মাধ্যমে উপলব্ধি করি। তাই সময়ের ধারণা লাভে স্মৃতি একটি মৌলিক মানসিক প্রক্রিয়া হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অগাস্টাইন কালের বিষয়গত ও বিষয়ীগত যে দুটি অভিমত প্রদান করেছেন। সেই দুটি অভিমত অলোচনা করা হল:

১. কাল হল ঈশ্বরের সৃষ্ট (Time is creature of God)।

২. কাল হল মানুষের চেতনাশ্রীত (Time is a phenomenon of human consciousness)।

কালের এই দ্বিবিধ আলোচনা কালের স্বরূপ বিষয়ে সমস্যার উদ্ভব ঘটায়। সেন্ট অগাস্টাইন প্রথমে On Genesis-এ কালের বিশ্বতাত্ত্বিক (objective) ব্যাখ্যা দেন, তিনি বলেন— কাল ঈশ্বরসৃষ্ট এবং জগত সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই কালের সূচনা হয়েছে। অর্থাৎ ঈশ্বর যখন বিশ্ব সৃষ্টি করেন, তখন থেকেই সময়েরও আরম্ভ; তার আগে কোনো কাল ছিল না। এই অর্থেই তিনি কালকে ঈশ্বরের সৃষ্টির একটি অংশ হিসেবে দেখিয়েছেন (Augustine, p. 282)। পরে Confessions (Book XI)-এ তিনি একই বিষয়কে গভীরতরভাবে, মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেন। কারণ, কালকে আমরা সব কিছু বোঝার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করি; কিন্তু যদি

কালকেই আবার কাল দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চাই, তাহলে যুক্তিগত দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। তাই তিনি কালের প্রকৃতি বোঝাতে চেয়েছেন একদিকে সৃষ্টিতত্ত্বের মাধ্যমে, অন্যদিকে মানবচেতনার অভিজ্ঞতার আলোকে।
অগাস্টিন কালের প্রথম যে অভিমত দিয়েছেন সেখানে ঈশ্বরের সৃষ্ট, কালের তিনটি বৈশিষ্ট রয়েছে সেগুলি হল-

অগাস্টিন তাঁর প্রথম অভিমত, (On Genesis) বলেন, কাল ঈশ্বরসৃষ্ট; তাই তা চিরন্তন নয়।

দ্বিতীয় অভিমত, কাল বিষয়মূলক অর্থে মানুষের চেতনার ওপর নির্ভরশীল নয় এবং বস্তুর গতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হলেও তার সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিন্ন নয়।

তৃতীয় অভিমত, কাল বস্তুর গতির সাথে সম্বন্ধযুক্ত, কিন্তু পুরোপুরি এক ও অভিন্ন নয়। পরবর্তীতে Confessions-এ তিনি কালের বিষয়ীগত বা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেন। এখানে কালকে মানুষের চেতনাশ্রিত বলে দেখানো হয়েছে— অর্থাৎ সময় মানুষের মনের মধ্যেই উপলব্ধ হয়। যদিও তিনি উভয় দৃষ্টিভঙ্গিই স্বীকার করেছেন, Confessions-এ বিষয়ীগত ব্যাখ্যাকেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

'Time is creature of God' অর্থাৎ কাল হল ঈশ্বরের সৃষ্টি:

কালের বিষয়গত ব্যাখ্যায় (On Genesis) বলেন- 'Time is a creature of God' অর্থাৎ কাল হল ঈশ্বর সৃষ্ট অংশ। যে কাল মনুষ্য সৃষ্টির পূর্বে অস্থিত্বশীল রূপে ছিল। কাল মানুষের চেতনার উপর নির্ভরশীল নয়। মানব চেতনার অতিরিক্ত ভাবে বাস্তব জগতে কাল অস্তিত্বশীল। কাল হল স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। এই জগতে কোনো মানুষ না থাকলেও কাল তার কালিক নিয়মে অতিবাহিত হতে থাকবে। এটি কালের বিষয়গত দিক।

অগাস্টাইন তাঁর The Confessions বইয়ে বলেছেন 'সেখানে কি কোনো কাল রয়েছে, যে কাল তুমি সৃষ্টি করনি? যদি তুমি সর্ব কালের স্রষ্টা হও আর যদি কাল অস্তিত্বশীল হয় তাহলে সেই কাল তোমার দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। ফলে তোমার কাল সৃষ্টির পূর্বে কোনো কাল অতিবাহিত হতে পারে না'। কাল অস্তিত্বশীল কারণ ঈশ্বর সেই কাল সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর ছাড়া কোন কালের অস্তিত্ব হতে পারে না। কালকে তিনি ঈশ্বরসৃষ্ট বলে উল্লেখ করেন। তবে জগতের মতো আলাদা কোনো সত্তা হিসেবে নয়; বরং জগত সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই কালের সূচনা হয়েছে— এই অর্থে কাল সৃষ্ট। তাই কাল চিরন্তন নয়, এরও একটি শুরু আছে। Confessions-এ তিনি স্পষ্ট করেন যে কালের আগে কোনো কাল ছিল না। ফলে "জগত সৃষ্টির আগে ঈশ্বর কী করছিলেন?"— এই প্রশ্ন অর্থহীন, কারণ সৃষ্টি-পূর্বে সময়ের অস্তিত্বই ছিল না। অতএব, এটি একটি প্রকারগত ভ্রান্তি (category mistake)।

মানুষের অস্তিত্বের পুর্বে সৃষ্ট কালের সুত্রপাত হয়েছিল। সৃষ্ট কাল কে বিষয়গত এই অর্থে বলা হয়েছে যে, কাল মানুষের চেতনার উপর নির্ভরশীল নয়। On Genesis গ্রন্থে অগাস্টিন বলেছেন- 'এটা নিশ্চিত যে ঈশ্বর জগত নির্মান করেছিলেন, জগত নির্মানের সাথেই কালের সুত্রপাত হয়েছিল'। সময়ের একটা শুরু আছে। আর সেই শুরুটা হয়েছিল যখন ঈশ্বর এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন। যখন ঈশ্বর এই মহাবিশ্বকে নির্মান করেছিলেন তখন সেখানে কোনো মানুষের অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং মানুষের অস্তিত্বের পুর্বে কালের অস্তিত্ব ছিল। তিনি বলেছেন "কাল হল এমন যার সুত্রপাত হয়েছিল মহাবিশ্ব সৃষ্টির সূচনা থেকে আর মহাবিশ্বের সূচনা হয়েছিল কাল সৃষ্টির সুত্রপাত থেকে আর উভই সৃষ্টি হয়েছিল ঈশ্বর থেকে" (Augustine 2002, p.282)। অন্য ভাবে যদি বলা যায়, মানুষের অস্তিত্ব থেকে কালের অস্তিত্ব আলাদা। মানুষের অস্তিত্ব কালের অস্তিত্ব থেকে আলাদা কারণ মানুষের অস্তিত্বের পূর্বে কালের অস্থিত্ব ছিল। অগাস্টিন এর যুক্তি গুলিকে নিম্ন লিখিত পদ্ধতিতে বলা যেতে পারে-

১. ঈশ্বরই কালের স্রষ্টা।
২. কাল চিরন্তন বা শাশ্বত নয়।
৩. যখন ঈশ্বর শূন্য থেকে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন, তখনই কালের সূত্রপাত হয়েছিল।
৪. যখন তিনি মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন, সেখানে কোনো মানুষের অস্তিত্ব ছিল না, মহাবিশ্ব সৃষ্টির কিছুদিন পর মানুষের অস্তিত্ব হয়েছিল।
৫. সুতরাং কাল হল ঈশ্বরের সৃষ্টি যেটা মানুষের চেতনার পূর্বে অস্থিত্বশীল ছিল।
৬. অতএব মানুষের চেতনা থেকে কাল স্বতন্ত্র।

'Time, seen as a creature, began when the universe began'। অগাস্টিন Confessions-এ কালের বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতামূলক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি বলেন, যদিও কাল সৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত, তা কোনো অপার্থিব বা ভৌত বস্তুর গতির সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিন্ন নয়। কাল গতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হলেও তার সমান নয়। এমনকি যদি সব বস্তুর গতি থেমেও যায়, তবুও কালের প্রবাহ অব্যাহত থাকবে।
অগাস্টিনের যুক্তি গুলি এই ভাবে সাজানো যেতে পারে-

১. অপার্থিব জগতে যদি শুধূমাত্র একটি বস্তু গতিশীল থাকে তাহলে সেখানে কালের অস্তিত্ব থাকবে।
২. এটা বলা ঠিক হবে যে, সূর্যের গতিতে তাঁর নিজের পরিবর্তন হয়ে থাকে। একটি নির্দিষ্ট কালের মধ্যে সূর্যের গতির ফলে সূর্যকে কম এবং বেশি দূরত্বে দেখায়।
৩. সূর্য যদি স্থির থাকে তাহলেও কাল অতিবাহিত হবে।
৪. সুতরাং অপার্থিব বস্তুর গতিশীলতা কিন্তু কাল নয়।

উপরের যুক্তি গুলি থেকে এটা বোঝা যায় যে, অগাস্টিনের কাল সম্পর্কিত আলোচনা বাইবেল গ্রন্থ দ্বারা প্রভাবিত। অগাস্টিন বিশ্বতাত্ত্বিক যুক্তি আলোচনায় কালের বিষয়গত দিককে ব্যাখ্যা করেছেন। যেখানে বলা হয়েছে কাল হল ঈশ্বর সৃষ্ট। ফলে সেই কাল চিরন্তন বা শাশ্বত নয়। মানুষের অস্তিত্বের পূর্বে কালের অস্তিত্ব ছিল। কালের বিষয়গত দিক এই অর্থে বলা হচ্ছে যে কাল মানুষের চেতনা থেকে স্বতন্ত্র্য। যে কাল মানুষের চেতনার উপর নির্ভরশীল নয়। এমনকি যদি কোন চেতন সত্তার অস্তিত্ব নিরপেক্ষ ভাবেও কাল অতিবাহিত হবে।

'Time is a phenomenon of human consciousness' অর্থাৎ কাল হল মানুষের চেতনাশ্রীত:
অগাস্টাইন Confessions-এ কালের বিষয়ীগত বা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে, 'Time is a phenomenon of human consciousness'— অর্থাৎ কাল মানুষের চেতনাশ্রিত এবং মনের ওপর নির্ভরশীল। মননিরপেক্ষ বাস্তব জগতে কালের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই; বরং সময় মানবচেতনার সঙ্গে যুক্ত। তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ— এই তিন বিভাজনের বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁর মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করেছেন। অগাস্টাইন কালের যে তিনটি বিন্যাস সম্পর্কে দাবি করেছেন সেগুলি হল–

১. অতীত আর নেই, ইহা ছিল।
২. ভবিষ্যৎ এখনো হয় নি, ইহা হবে।
৩. বর্তমানটি আছে কিন্তু তা স্থায়ী নয়, কেননা যদি স্থায়িত্ব থাকে তাহলে সেটি চিরস্থায়ী হবে। আর যদি সেটি চিরস্থায়ী হয় তাহলে সেটি বর্তমান হবে না।
৪. সময় হিসাবে বর্তমানের অস্তিত্ব নির্ভর করছে তার চিরস্থায়ী প্রবাহিত হওয়ার উপর এবং চলে যাওয়ার উপর।
৫. সময় বা কালের সত্ত্বা নির্ভর করে তার অসত্ত্বার ওপর।

কালের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় বলেন, সময় সম্পূর্ণভাবে মানবমনের উপর নির্ভরশীল; মননিরপেক্ষভাবে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ— এই ত্রিবিধ কালের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। অতীত ছিল, ভবিষ্যৎ বর্তমান হয়ে অতীতে পরিণত হয়, আর বর্তমানের নিজস্ব কোনো স্থায়িত্ব নেই— এটি মাত্রাহীন এক ক্ষণমাত্র। তাই বর্তমান স্থায়ী হলে তা অতীত ও ভবিষ্যতে বিভাজ্য হয়ে যাবে; এই কারণে তিনি 'বর্তমানের স্থায়িত্ব অস্বীকার করেন'।

এ প্রসঙ্গে অগাস্টাইন প্রশ্ন তোলেন: অতীত যদি আর না থাকে, তবে কীভাবে তার অস্তিত্ব বলা যায়? ভবিষ্যৎ যদি এখনও না আসে, তবে তাকে কীভাবে বাস্তব বলা যায়? এবং যদি অতীত-ভবিষ্যতের বাস্তব অস্তিত্ব না থাকে, তবে আমরা তাদের কীভাবে পরিমাপ করি? এই প্রশ্নগুলির মাধ্যমে তিনি সময়ের বিষয়ীগত প্রকৃতি ব্যাখ্যা করেছেন। অগাস্টিন কালের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় স্মৃতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। তাঁর মতে, সময়ের অভিজ্ঞতা মূলত মনের মাধ্যমেই সম্ভব। অতীত আমাদের মনে থাকে স্মরণরূপে, ভবিষ্যৎ থাকে প্রত্যাশারূপে, আর বর্তমান প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে।

যেহেতু স্মৃতি একটি মানসিক প্রক্রিয়া এবং আমরা দৈনন্দিন জীবনে স্মৃতির উপর নির্ভরশীল, তাই অগাস্টাইন মনে করেন— কালের উপস্থিতি ও পরিমাপ মনের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। অতীত তখনই 'সৎ' বা অর্থপূর্ণ, যখন তা স্মৃতিরূপে আমাদের চেতনায় উপস্থিত থাকে। এই কারণেই তাঁর বিষয়ীগত তত্ত্বে স্মৃতি কালের ধারণা ব্যাখ্যার মূল উপাদান। অগাস্টাইন Book X এ বলেছেন 'আমি আমার স্মৃতিতে নিজের সাথে কথা বলতে পারি, আমার আমি কে স্মরন করতে পারি, কোথায় কখন কী করেছিলাম, তখন আমি কেমন মনের অবস্থায় ছিলাম, এগুলি আমি স্মরন করতে পারি, যেন সেগুলি আমার কাছে বর্তমানে উপস্থিত রয়েছে'। অগাস্টাইন- এর মতে, স্মৃতি হল অতীতের সঞ্চয়; অতীত সরাসরি বর্তমান নয়, বরং মনের প্রতিচ্ছবি হিসেবে উপস্থিত। তাই স্মৃতি ছাড়া অতীত সম্পর্কে কথা বলা যায় না। একইভাবে, ভবিষ্যৎও প্রত্যাশারূপে মনের মধ্যে বর্তমান থাকে(Augustine 2006, p.246-251)।

অতএব, সময় মানবচেতনার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। অগাস্টাইন বলেন— কালের তিনটি রূপই 'বর্তমানে' বিদ্যমান: অতীত থাকে স্মৃতি হিসেবে, বর্তমান থাকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হিসেবে, আর ভবিষ্যৎ থাকে প্রত্যাশা হিসেবে (Augustine2006, p. 246)। ফলে সময়ের বাস্তবতা মূলত মনের মধ্যেই নির্ধারিত। তাঁর মতে, কাল মানবচেতনার সাথে আপেক্ষিক। অতীত ও ভবিষ্যৎ কোনো মননিরপেক্ষ স্বাধীন বাস্তবতা নয়; এগুলি ব্যক্তির চেতনার ওপর নির্ভরশীল। যেমন, আমি পাঁচ বছর আগের ঘটনা স্মরণ করি— এটি আমার স্মৃতিতে বর্তমান; অন্যদিকে স্টিফেন তার নিজস্ব অতীত স্মরণ করে, যা আমার অতীত থেকে ভিন্ন। একইভাবে ভবিষ্যৎও ব্যক্তিভেদে প্রত্যাশারূপে আলাদা হয়। যাইহোক, 'অতীত ও ভবিষ্যতের, মানুষের চেতনা নিরপেক্ষ স্বাধীন ভাবে কোনো বাস্তবতা নেই। বর্তমানের বস্তু অতীতে ও বর্তমানের বস্তু ভবিষ্যতে- মনের বাইরে তাদের কোনো বাস্তবতা নেই'।

অতএব, অতীত থাকে স্মৃতিরূপে, ভবিষ্যৎ থাকে প্রত্যাশারূপে, এবং বর্তমান থাকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতারূপে—এই তিন রূপই কেবল মনের মধ্যে অবস্থিত; বাহ্যজগতে এদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। অগাস্টাইন কালের ব্যাখ্যায় দুটি দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছেন— বিষয়গত (objective) ও বিষয়ীগত/মনস্তাত্ত্বিক (subjective)। On Genesis-এ তিনি সৃষ্টিতত্ত্বের প্রেক্ষিতে কালের বিষয়গত দিক আলোচনা করেন; এখানে কাল ঈশ্বরসৃষ্ট এবং জগতের সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু কালিক প্রবাহ (temporal passage) বিষয়ে বিশদ আলোচনা নেই। পরবর্তীতে Confessions-এ তিনি অভিজ্ঞতার আলোকে কালের প্রবাহ বিশ্লেষণ করেন এবং উপলব্ধি করেন যে সময়ের ধারণা মানবচেতনার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। এখানে তিনি বলেন, কালের অস্তিত্ব মনের বাইরে স্বতন্ত্রভাবে নির্ধারণ করা যায় না; বরং অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ— সবই ব্যক্তিচেতনাকেন্দ্রিক

অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ধরা পড়ে। তাই তাঁর আলোচনায় বিষয়ীগত বা মনস্তাত্ত্বিক দিকটি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। দুটি গ্রন্থের মধ্যে কী কোনো স্ববিরোধীতা রয়েছে? অগাস্টাইন-এর দুই গ্রন্থ— On Genesis ও Confessions— এর মধ্যে প্রকৃত কোনো স্ববিরোধিতা নেই। প্রথম গ্রন্থে তিনি সৃষ্টিতত্ত্বের দৃষ্টিতে কালের বিষয়গত (objective) অস্তিত্ব নির্ধারণ করেছেন, আর দ্বিতীয় গ্রন্থে অভিজ্ঞতার আলোকে কালের বিষয়ীগত (subjective) বা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাই উভয় গ্রন্থের আলোচনার আভিমুখ ভিন্ন, পরস্পরবিরোধী নয়। কালের কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি দেখান, মনের উপর নির্ভর করেই সময়ের অতীত–বর্তমান–ভবিষ্যৎ বিন্যাস বোঝা যায়। তবে এই তিনটি অংশ স্বতন্ত্রভাবে স্থায়ী সত্তা নয়; বরং অতীত স্মৃতিতে, বর্তমান প্রত্যক্ষে, ভবিষ্যৎ প্রত্যাশায় বিদ্যমান। এই মানসিক উপস্থিতির মাধ্যমেই কালের অস্তিত্ব নিরূপিত হয়।

বর্তমান সমন্ধে বিবৃতি:

বর্তমানের স্থায়িত্ব কতক্ষণ? যদি বর্তমানের সর্বদা উপস্থিতি থাকে, তাহলে সেই উপস্থিতি কোথায় রয়েছে? বর্তমান যদি বিদ্যমান থাকে তাহলে সেই বর্তমানের বিদ্যমানতা কত দিন থাকবে? বর্তমান বছর কী তাহলে বর্তমান? বর্তমানে আমরা যে শতাব্দীতে বসবাস করছি, এটাই কি বর্তমান? না, কারণ শতাব্দীর যে প্রগতি সেই প্রগতির প্রায় শেষের দিকে থাকতে চলেছি। সেখানে কিছু কাল ইতিমধ্যে অতিবাহিত হয়ে গেছে। আর কিছু কাল বা সময় এখনো আমাদের সামনে উপস্থিত হয়নি, যেটা আমাদের কাছে ভবিষ্যৎ রূপে আসবে। বর্তমানের কোনো বিস্তৃতি নেই, এর কোনো স্থায়িত্ব থাকতে পারে না (The present Is extensionless -i.e, it has no duration at all)। অগাস্টাইন বলেন, যদি সময়কে বিভাজ্য ধরা হয়, তবে যে ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য এককটি থাকে সেটিই 'বর্তমান'। কিন্তু বর্তমানের কোনো স্থায়িত্ব নেই; কারণ তা যদি প্রসারিত হয়, তবে তা অতীত ও ভবিষ্যতে বিভক্ত হয়ে যাবে। তাই বর্তমান এক ক্ষণমাত্র, যা সঙ্গে সঙ্গে অতীতে পরিণত হয়। এ কারণেই তিনি প্রশ্ন করেন—যদি অতীত ও ভবিষ্যৎ সত্যিই অস্তিত্বশীল হয়, তবে তারা কোথায় অবস্থিত?
সমসাময়িক দর্শনে সময় সম্পর্কে তিনটি মত পাওয়া যায়—

১. বর্তমানবাদ (Presentism): কেবল বর্তমানই অস্তিত্বশীল।
২. Growing Block Theory: অতীত ও বর্তমান আছে, ভবিষ্যৎ এখনও নয়।
৩. শাশ্বতবাদ (Eternalism): অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমভাবে অস্তিত্বশীল।

অগাস্টাইনের বক্তব্যে শাশ্বতবাদীদের মত আংশিকভাবে সমর্থনযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়, যদিও তাঁর মূল বিশ্লেষণ মানবচেতনার প্রেক্ষিতেই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তিনি বলছেন প্রকৃতপক্ষে যদি ভবিষ্যৎ ও অতীত অস্তিত্বশীল হয়, তাদের অবস্থান কোথায় রয়েছে?। যদি অতীত আর ভবিষ্যৎ সৎ বা বাস্তবে থাকে, তাহলে তারা কোথায়? তিনি বলছেন তারা অস্তিত্বহীন অর্থাৎ তাদের অস্তিত্ব নেই।

অতীতের সম্বন্ধে ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিবৃতি:

আমরা যখন কোনো বস্তুকে প্রত্যক্ষ করি, তার প্রতিচ্ছবি আমাদের স্মৃতিতে সঞ্চিত হয়। কিন্তু অতীত সরাসরি প্রত্যক্ষযোগ্য নয়; তাই অতীত সম্পর্কে নিশ্চিত বা জোরালো দাবি করা কঠিন, কারণ সেটি বর্তমান অবস্থায় বিদ্যমান থাকে না। অতীতের ঘটনাগুলি যখন ঘটেছিল, তখন সেগুলি আত্মায় প্রতিচ্ছবি রূপে উপস্থিত হয়েছিল; বর্তমানে সেগুলি কেবল স্মৃতিরূপে টিকে আছে। ফলে অতীতের জ্ঞান মূলত স্মৃতিনির্ভর, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতানির্ভর নয়। ভবিষ্যৎ সরাসরি প্রত্যক্ষযোগ্য নয়; একমাত্র ঈশ্বরই প্রকৃত অর্থে ভবিষ্যৎকে প্রত্যক্ষ করতে পারেন। মানুষ যখন বলে 'আগামীকাল সূর্য উদিত হবে', তখন সে ভবিষ্যৎকে দেখছে না; বরং বর্তমানের কারণ ও লক্ষণের ভিত্তিতে অনুমান করছে।

অতএব, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কঠোর বা নিশ্চিত বক্তব্য দেওয়া যায় না, কারণ তা এখনও উপস্থিত হয়নি। আমরা বর্তমানে যা প্রত্যক্ষ করি— যেমন প্রভাতের আলো— তার ওপর নির্ভর করেই ভবিষ্যৎ ঘটনার পূর্বাভাস দিই। ফলে ভবিষ্যৎজ্ঞান মূলত বর্তমানের চিহ্ন ও কারণের ওপর নির্ভরশীল অনুমানমাত্র।

কাল কি গতি (Time is Motion)?

অগাস্টাইন প্রশ্ন তোলেন—কাল কি অপার্থিব বস্তুর (যেমন- সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র) গতির সমান? অনেকেই মনে করেন, এই আকাশীয় বস্তুর গতি দিয়েই আমরা সময় পরিমাপ করি। কিন্তু অগাস্টিন বলেন, বস্তুর গতি থেমে গেলেও সময় থেমে যায় না। বস্তুর চলন ও স্থিতি— উভয়ই কালের মধ্যেই সংঘটিত হয়, এবং আমরা সেই সময়-দূরত্ব পরিমাপ করি। অতএব, কাল বস্তুর গতির সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও তার সঙ্গে অভিন্ন নয়। এমনকি কোনো মানুষ না থাকলেও কাল তার নিজস্ব নিয়মে প্রবাহিত হবে। সেন্ট অগাস্টাইন-এর বিষয়গত দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, কাল ঈশ্বরসৃষ্ট এবং চিরন্তন নয়; মানুষের অস্তিত্বের পূর্বেই এর সূচনা হয়েছে। কাল মানুষের চেতনা থেকে স্বতন্ত্র— অর্থাৎ মানুষ না থাকলেও সময় তার নিজস্ব নিয়মে প্রবাহিত হবে। তবে সময়কে আমরা যেভাবে উপলব্ধি ও পরিমাপ করি, তা মনের মধ্যস্থ। আমরা অতীতকে স্মৃতির প্রতিচ্ছবি অনুসরণ করে জানি; বস্তু নিজে কথা বলে না, বরং আমাদের আত্মায় সংরক্ষিত ছাপের মাধ্যমেই আমরা তার বিবরণ দিই। সময় পরিমাপ করতে গিয়েও আমরা আসলে মনের ভেতরের এই প্রতিচ্ছবিগুলিকেই মাপি। উদাহরণস্বরূপ, কেউ যখন গান গাইতে প্রস্তুত হয়, পুরো গানটি আগে থেকেই তার মনে উপস্থিত থাকে; গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটি বর্তমান থেকে অতীতে সরে যায়। এই প্রক্রিয়াতেই কালের অভিজ্ঞতা গঠিত হয়। যাহোক,

- যে অংশটি সম্পন্ন হয়েছে তা স্মৃতিতে একটি ছাপ হিসাবে 'সম্পাদনা' করবে।
- আমাদের প্রত্যাশায় যে অংশটি আসছে সেটির 'অস্তিত্ব' এখনো সম্পন্ন হয়নি।
- ব্যক্তির মনোযোগ সর্বদা উপস্থিত থাকবে গানের সেই সময়কালবিহীন অংশের দিকে।

Book XI-এর একটি ব্যাখ্যায়, মরিসনের মতে, অগাস্টিন The Confessions গ্রন্থে "সময়কে মানুষের আত্মা বা চেতনার সঙ্গে সম্পর্কিত বলে মনে করেন। অর্থাৎ সময় মানুষের আত্মার সঙ্গে যুক্ত; তাই আত্মা বা মানবচেতনা ছাড়া সময়ের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না"। যদি মানুষ না থাকত, তবে সময়ও থাকত না, কারণ সময় উপলব্ধি করতে মানবচেতনার ভূমিকা অপরিহার্য। মরিসন আরও বলেন যে স্মৃতি (memory) সময় উপলব্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমরা মূলত স্মৃতির সাহায্যে সময়কে পরিমাপ করি। অগাস্টিন বলেন, আমরা অতীত ঘটনাগুলিকে সরাসরি পরিমাপ করি না; বরং আমাদের স্মৃতিতে যে চিহ্ন বা ধারণা রয়েগেছে, সেটাকেই পরিমাপ করি।

এ কারণে বলা যায়—

- অতীত আমাদের স্মৃতিতে থাকে,
- ভবিষ্যৎ আমাদের মনের প্রত্যাশায় থাকে,
- এবং বর্তমানও মানুষের চেতনার মধ্যে উপলব্ধ হয়।

পরিশেষে, অগাস্টাইন তাঁর On Genesis এবং Confessions গ্রন্থে সময়ের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এখানে সময়ের দুটি ধারণা উপস্থাপন করেন।

প্রথমত, On Genesis এবং Confessions-এ অগাস্টিন বলেন যে সময় ঈশ্বরের সৃষ্টি। এই অর্থে সময় মানুষের চেতনার উপর নির্ভরশীল নয়। অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টি হওয়ার আগেও সময়ের অস্তিত্ব ছিল। তাই এই দৃষ্টিভঙ্গিতে সময়কে objective (বস্তুনিষ্ঠ) বলা হয়।

দ্বিতীয়ত, Confessions-এ অগাস্টিন সময়ের একটি psychological বা subjective ধারণাও উপস্থাপন করেন। এখানে সময় মানুষের মন, স্মৃতি ও চেতনার সাথে সম্পর্কিত বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাঁর মতে, কাল মানুষের চেতনার উপর নির্ভরশীল; চেতনা না থাকলে কালেরও অস্তিত্ব থাকে না। মানুষের মনই অতীত–বর্তমান–ভবিষ্যৎ এই ত্রিধা বিন্যাসের প্রকাশক। আমরা যখন অতীতকে পরিমাপ করি, তখন আসলে স্মৃতিতে সংরক্ষিত অতীতকেই পরিমাপ করি। একইভাবে, ভবিষ্যৎ থাকে প্রত্যাশারূপে এবং বর্তমান থাকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতারূপে— সবই মনের মধ্যে অবস্থান করে। তবে কালের এই তিন বিভাজনের কোনটি প্রকৃত অর্থে অস্তিত্বশীল— এ প্রশ্নে দার্শনিক মহলে বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে, এবং এর যুক্তিসঙ্গত বিশ্লেষণের প্রয়োজন আজও রয়ে গেছে।

গ্রন্থপঞ্জি:

1. Aristotle. *A New Aristotle Reader*. Edited by J. L. Ackrill, Princeton University Press, 1987.
2. Augustine of Hippo. *The Confessions*. Edited by Michael P. Foley, Hackett Publishing Company, 2006.
3. Augustine of Hippo. *On Genesis*. Edited by John E. Rotelle, New City Press, 2002.
4. Akhlaghi, A.. *Time in Augustine's Thought*. M.A. Thesis, University of Tehran, 1995.
5. Aristotle. *Physics (Normal Hearing)*. Translated by Mehdi Farshad, Amir Kabir Publication, 1984.
6. Chadwick, Henry. *Augustine: A Very Short Introduction*. Oxford University Press, 2001.
7. Ilkhani, Mohammad. *The History of Medieval Philosophy and Renaissance*. Samt Publication, 2003.
8. Mojtahedi, Karim. *Philosophy in the Middle Ages*. Amir Kabir Publication, 2000.
9. Morison, John L.. "Augustine's Two Theories of Time." *New Scholasticism*, vol. 45, 1971, pp. 600–610.
10. *Nasr, Seyyed Hossein*. "*The Article of Sadr Shirazi.*" History of Philosophy in Islam, *1986.*
11. *Wiener, Charl.* Greek Wisdom. *Translated by Bozorg Naderzad, Scientific and Cultural Publication, 2004.*

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1309-1318
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.350

বিস্মৃতপ্রায় জনপদ দেবীগঞ্জের ব্রাহ্ম সমাজ ও শিক্ষা সংস্কৃতির ধারা: একটি পর্যালোচনা

ড. রাহুল কুমার দেব, *সহকারী শিক্ষক (ইতিহাস), বুড়াগঞ্জ কালকুট সিং উচ্চ বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 18.03.2026; Accepted: 19.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

If 'renaissance' signifies rebirth, the emergence of new values, and a fresh expression of creative power, then the awakening of Bengal in the 19th century can undoubtedly be termed a Renaissance. Raja Rammohan Roy can be considered the pioneer of this movement. The Brahmo Samaj, established under his leadership, arose from the new consciousness and reasoning characteristic of the renaissance. At the begining of the 19th century, traditional Hinduism had largely become ritualistic, leading to various distortions within it. Rammohan was troubled by the prevalent degradation of society, as well as the dogma and hypocrisy associated with Hinduism. In an effort to establish a universal religion rooted in the finest traditions of Hindu monotheism, he founded the 'Brahmo Samaj' or 'Brahmo Sabha' on August 20, 1828, in the home of Firingi Ramkamal Bose. In January 1830, a regular house of worship was founded, and its charter outlined the foundational ideas of the well-known Brahmo movement. When Maharishi Debendranath Tagore joined the Brahmo Samaj in 1838, the disorganized group was turned into a spiritual brotherhood. He established the 'Tattvabodhini Sabha,' a gathering place for the intellectual elite of modern-day Bengal. Debendranath organized formal initiation into Brahmoism in order to identify those who were truly interested in Brahmo Samaj and Brahmo ideal. A pledge was also drafted for initiation. This is how Brahmo Samaj became Brahmo religion. In 1857, Keshab Chandra Sen, who was well-versed in western education, joined Brahmo Samaj, and his inspiring oratory gave the Brahmo movement unprecedented strength. Under his leadership, the Brahmo Samaj grew into a real force in the country, and the way young people joined this religion in droves was never happened before. Keshab visited South Indian cities such as Madras, Poona, Bombay, and Calicut in 1864-65 to spread Brahmoism. He expanded the organization into new places. Keshab gathered a group of enthusiastic enargetic young people who, within a few days, began to outperform him in progressive thinking. Included among them were Shibnath Shastri, Durga Mohan Das, Dwarkanath Gangopadhyay, and Ananda Mohan Bose. The new Brahmos increasingly voiced their objections to Keshab's leadership, his mystical tendencies, and his alleged arbitrariness in running houses of worship. Furthermore, their disputes over the methods of female education and social reform also reached a peak. When Keshab Chandra, rejecting the Native Marriage Act of 1872 (Act III of 1872) that had been introduced among the Brahmos on his own initiative, married his minor daughter to

the King of Cooch Behar according to the old custom, a rupture became inevitable. A new organization, the Sadharan Brahmo Samaj, was established at a meeting convened at the Town Hall on 15 May 1878. A democratic constitution was formulated for this organization. On the other hand, Keshab revitalized the Bharatbarsiyo Brahmo Samaj by renaming it as 'Nababidhan' on 26 January 1880. With the inception of the Nababidhan, Keshab boldly stepped forward to overcome the limitations of narrow religious awareness, beautifully merging pagan traditions, Shakta-Vaishnavism, and mystical practices with the noble ideals and principles of Christianity and Islam. Although somewhat late, this movement spread to various areas of North Bengal, a peripheral region of Bengal, like the rest of India. The Brahmo movement began to flourish in North Bengal during the latter phase of its evolution. Remarkably, the final decade of the nineteenth century marked a vibrant transformation in the social fabric of the people of North Bengal. A variety of factors fueled this remarkable change. The interactions with western individuals and their vibrant culture, the dissemination of western education, the advancement of communication systems, and the introduction of a local autonomy framework were notable among the driving forces. Together, these elements significantly expedited the journey toward modernization in the remote regions of North Bengal. And with this, the Brahmo Samaj reform movement made its significant entrance during this period. In my research article, I have chosen to focus on the Brahmo Samaj movement of Debiganj. The principal objective of this article is to investigate and contemplate the endeavors of both the Sadharan and the Nababidhan Brahmo Samaj in Debiganj, an almost overlooked area in undivided North Bengal, from the latter part of the nineteenth century until the third decade of the twentieth century. Furthermore, this article will also examine the prevailing trends in education and culture within this region.

Keywords: Brahmoism, Education and culture, Local history, North Bengal, Regional development, Renaissance, Social reform

দেবী চৌধুরানীর স্মৃতি বিজড়িত দেবীগঞ্জ বর্তমান বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলার অন্যতম একটি উপজেলা।[১] তবে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পূর্বে দেবীগঞ্জ ছিল করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত জলপাইগুড়ি জেলার একটি বড় বন্দর। এছাড়া এটি উত্তর পূর্ব ভারতের অন্যতম দেশীয় রাজ্য কোচবিহারের মহারাজার বিস্তীর্ন জমিদারির অন্তর্গত চাকলাজাত এস্টেটের সদর দফতরও ছিল।[২] ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুর বোদা, পাটগ্রাম ও পূর্বভাগ চাকলার সদর কার্যালয় দেবীগঞ্জে স্থাপন করেন।[৩] ডোমর স্টেশন থেকে পাঁচ মাইল পশ্চিমে দেবীগঞ্জ অবস্থিত।[৪] ১৮৭৮ সালে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে দ্বিতীয় বিভাজনের পর দেবীগঞ্জে ব্রাহ্মসমাজের সূত্রপাত হয়েছিল। সাধারণপন্থী ব্রাহ্মদের প্রচেষ্টায় দেবীগঞ্জে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হলেও, ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তীকালে নববিধান ব্রাহ্মসমাজেরও এখানে প্রবেশ ঘটেছিল।

সাধারন ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্নের তত্ত্বাবধানে ও প্রচেষ্টায় দেবীগঞ্জে সর্বপ্রথম ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্মপ্রেমী শমসের আলী মিয়াঁ ও বাবু রাধাসুন্দর চক্রবর্তীর অর্থ সাহায্যে প্রথম উপাসনালয়টি নির্মিত হয়।[৫] যদিও এর সঠিক তারিখ জানা যায়নি। তবে যেহেতু রামকুমার বিদ্যারত্নের উদ্যোগে সমাজটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে সাধারন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে তিনি প্রচারকব্রত গ্রহণ করেছিলেন, তাই ধারণা করা হয় যে উক্ত সমাজটি ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তীকালে স্থাপিত। যাইহোক, দেবীগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজের এই ভবন খুবই ক্ষুদ্র হওয়ায়, ব্রাহ্ম সম্প্রদায় সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা সমাজের একটি নতুন গৃহ প্রস্তুত করবেন এবং সাধারন ব্রাহ্মসমাজে অংশভুক্ত হওয়ার প্রার্থনায় একটি আবেদনপত্র কলকাতায় প্রেরণ করবেন। গৃহ তৈরির জন্য তারা চাঁদা সংগ্রহ করাও শুরু করেন।[৬] এরপর

১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি সময়ে দেবীগঞ্জে একটি নতুন উপাসনা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন উত্তরবঙ্গে ধর্মপ্রচারে এসে হলদিবাড়ি ও রংপুরে উপাসনার কাজ করার পর তিনি জলপাইগুড়ির কাছে দেবীগঞ্জে এই নতুন উপাসনা সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।[৭] কিন্তু সমাজের নতুন ভবনের উদ্বোধন হল আরও এক মাস পর। বিশেষ করে সে বছর জ্যৈষ্ঠ মাসে এটি 'দেবীগঞ্জ প্রার্থনা সমাজ' নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্ভবত আবেদনকৃত সেই চিঠির জবাবে তারা এই সময়ে কলকাতার সাধারন ব্রাহ্মসমাজের একটি শাখা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। সাধারন ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে শিবনাথ শাস্ত্রী তার গ্রন্থে ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের নামের যে তালিকা দিয়েছেন তাতে ৩৯ নম্বর ক্রমিক সংখ্যায় Devigunj P.S (প্রার্থনা সমাজ) এর নাম রয়েছে এবং এর প্রতিষ্ঠার বছর ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৮] এইসময় তত্ত্বকৌমুদীতে লেখা হয়েছিল- "বিগত ১৫ই ও ১৬ই মে দেবীগঞ্জ প্রার্থনা সমাজ গৃহের প্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছে। উত্তরবাঙ্গলা ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্য বাবু কালীপ্রসন্ন বসু এবং শ্রীযুক্ত জালালউদ্দিন মিঞা উপাসনার কার্য্য সম্পাদন করেন। উপাসনা, প্রকাশ্য স্থানে প্রচার এবং সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতি দ্বারা ব্রাহ্মগণ অতিশয় উপকৃত হইয়াছেন এবং সাধারনের মধ্যেওআন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে।"[৯]

দেবীগঞ্জে যে কয়েকজন ব্রাহ্ম সদস্য বাস করত তারা সবাই ছিল দরিদ্র। প্রথমদিকে কলকাতার ব্রাহ্ম প্রচারক মন্ডলীর মনোযোগ দেবীগঞ্জের দিকে ছিল খুবই কম। তাই এখানকার স্থানীয় উপাসকমন্ডলীর আন্তরিকভাবে ইচ্ছা ছিলো যে, প্রচারক মহাশয়দের সময় সময় এখানে এসে উপদেশ প্রদান এবং এই জাতীয় যে কোনও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া উচিত। তাদের বক্তব্য ছিল দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি ভ্রমণের সময় যদি প্রচারকরা এখানে আসেন তবে তারা বিশেষভাবে উপকৃত হবে।[১০] আর এর পরেই দেখা গেল কাশীচন্দ্র ঘোষাল, গিরিশচন্দ্র কাঞ্জিলাল, রাম কুমার বিদ্যারত্ন প্রমুখ একাধিক ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক দেবীগঞ্জে আসেন। ধর্মপ্রচারের জন্য পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্নের দেবীগঞ্জে প্রচার যাত্রার বিস্তৃত বিবরণ ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকাতে পাওয়া যায়। এই বিবরণ থেকে জানা যায়, সেই বছরের ২১শে চৈত্র রবিবার পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন দেবীগঞ্জে ব্রাহ্ম ধর্মের কাজ সম্পন্ন করার পর তিনি সেদিন রাতে রেলপথে দার্জিলিং এর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। দেবীগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজে সকালে সুমধুর সঙ্গীত সহকারে উপাসনা শুরু হয়। উদ্বোধন, আরাধনা, ধ্যান এবং প্রার্থনা, উপাসনার চারটি অংশ গভীরভাবে অভিব্যক্তিপূর্ণ এবং আবেগপূর্ণ হয়েছিল। দেবীগঞ্জের বেশ কয়েকজন ব্রাহ্ম সদস্য তাদের অতীতের বিভিন্ন পাপের কথা স্মরণ করে অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়েছিলেন। উপাসনা পরবর্তী কর্মসূচিতে তিনি 'ঈশ্বরই আত্মার শান্তিদাতা' এই সম্বন্ধে একটি মর্মস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন। তারপর মৃদঙ্গ সহকারে সংকীর্তন হয়েছিল। দুপুরের খাবারের পরে যখন সবাই উপাসনাগৃহে একত্রিত হয়, তখন কিছু বিষয়ের উপর একটি প্রশ্নোত্তর পর্ব হয়। যেমন, বিবেকের স্বরূপ বর্ণনা, আদেশবাদ, পরকাল, আত্মার অমরত্ব, উপাসনার ফলাফল কী? এবং একটি ব্রাহ্ম উপাসকের কি ধরনের চরিত্র হওয়া উচিত? এই বিষয়ে আলোচনা হয়ে সভা ভঙ্গ হয়। সন্ধ্যার সময় উপাসনাও অতি সরল হয়েছিল। উপাসনার শেষে রামকুমার বিদ্যারত্ন 'ধর্মীয় জীবনই সুখের জীবন' এই সম্বন্ধে একটি সুন্দর বক্তৃতা দেন। সমাজ গৃহে জায়গা না হওয়ায় অনেকে বাইরে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুনেছিলেন। তাঁর গভীর থেকে গভীরতম আবেগের ধার্মিক উপাসনায় এবং জ্বলন্ত উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতায় এখানকার ব্রাহ্ম উপাসকরা অত্যন্ত খুশি হয়েছিল।[১১]

সাধারন ব্রাহ্মসমাজ ছাড়াও দেবীগঞ্জে নববিধান ব্রাহ্মসমাজেরও সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। এখানে নববিধান ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়েছিল মূলত কোচবিহার রাজবংশের একজন বংশধর কুমার গজেন্দ্র

নারায়ণের প্রচেষ্টায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই কুচবিহার রাজ্য ছিল নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। এখানকার মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের দুহিতা সুনীতি দেবীর সঙ্গেঁ।[১২] এই বিবাহ ব্রাহ্ম সমাজে বিভেদ আনলেও সেই রাজ্যের নববিধান ব্রাহ্ম আন্দোলনে গতি সঞ্চার করে। মহারাজা স্বয়ং কেশবচন্দ্রের মত মহাপুরুষের নিকট সান্নিধ্যে আসতে পেরেছিলেন। তার উন্নত জীবনধারা এবং উদার ধর্মভাব তরুণ মহারাজার মনে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল তার ফলে তিনি চিরকাল ব্রাহ্মধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতি উৎসাহী ছিলেন।[১৩] নৃপেন্দ্র নারায়ণকে অনুসরণ করে তাঁর জ্ঞাতি ভ্রাতা কুমার গজেন্দ্র নারায়ণও এই ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। নৃপেন্দ্র নারায়ণ অর্থানুকূল্য করেছেন, আর ধর্মের প্রচার করেছেন কুমার গজেন্দ্র নারায়ণ। কেশবের দ্বীতিয় কন্যা অর্থাৎ সুনীতিদেবীর বোন সাবিত্রীর সঙ্গেঁ তার বিয়ে হয় ব্রাহ্মধর্মের পদ্ধতি মেনেই।[১৪] সুনীতি দেবীর মতই কোচবিহার রাজ্যে সাবিত্রী দেবীর বিয়ে কুচবিহারের বর্নহিন্দু রক্ষনশীল গোষ্ঠীর পছন্দ ছিল না। দুটো প্রগতিশীল সংস্কারধর্মী ব্রাহ্ম মেয়ের এ রাজ্যে আগমন যে কুচবিহারে ব্রাহ্মসমাজের শক্তিকে কয়েকগুন বৃদ্ধি করবে, এ আশঙ্কা তাদের ছিল। তাই এই প্রস্তাবে কুচবিহারের অধিকাংশ লোক ও দেওয়ান অসম্মতি প্রকাশ করে ও গজেন্দ্র নারায়নকে বিয়ে করতে নিষেধ করে। কেশবচন্দ্রের দেওয়া সাহসে ও মহারাজের ইচ্ছায় তিনি এ বিয়ে করেন।[১৫] স্বভাবতই সাবিত্রী দেবীকে বিয়ের পূর্বে ধর্ম্ম, জাতি, কুল, আত্মীয়স্বজন সব ছেড়ে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহন করায় রাজ্যের লোকেরা প্রতক্ষ্যভাবে তার বিষম শত্রুতা ও হিংসা করতে লেগেছিলেন।[১৬] ১৮৮৬ খ্রীঃ নৃপেন্দ্রনারায়ন ও সুনীতি দেবীর উদ্দ্যোগে সমগ্র দক্ষিন পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সর্ববৃহৎ নববিধান ব্রাহ্ম মন্দিরটি কোচবিহারে স্থাপিত হয় এবং এর প্রথম সম্পাদক রূপে নির্বাচিত হন কুমার গজেন্দ্র নারায়ন।[১৭] সর্বোপরি তিনি ছিলেন কুচবিহারের রাজগন পরিবার থেকে আসা প্রথম সম্পাদক। নৃপেন্দ্রনারায়ন এবং তার অপত্যদের বাদ দিলে কুমার গজেন্দ্রনারায়নই ছিলেন রাজ্যের আগত ব্রাহ্মদের সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে একমাত্র যোগসুত্র। স্বভাবতই বহিরাগত ব্রাহ্ম কর্মচারী বা প্রচারকদের, এ রাজ্যে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে প্রচারের ক্ষেত্রে অনেকটাই তার ওপড় নির্ভর করতে হয়েছে। পারিবারিক বিদ্রুপ সহ্য করেও গজেন্দ্রনারায়ন কিন্তু তার ধর্মপ্রচার থেকে কখনই সরে আসেননি। তার উদ্দ্যেগেই কুচবিহারে সুরাপান নিবারনী সভা, কেশব আশ্রম, আর্যনারী সমাজ, ব্রাহ্মপল্লী, ব্রাহ্ম বোডিং, ব্রাহ্ম গ্রন্থাগার, প্রচারাশ্রম স্থাপনের ফলে নববিধান ব্রাহ্মসমাজ কুচবিহারে পায়ের নীচে মাটি খুজে পেয়েছিল।[১৮] স্বভাবতই বর্নহিন্দু গোষ্ঠীর ধর্মনৈতিক ও বৈষয়িক স্বার্থ উভয়েরই পরিপন্থী হয়ে দাড়িয়েছিল গজেন্দ্র নারায়নের এই কার্যকলাপ গুলো। প্রাদপ্রদীপের আলো থেকে তাকে সরিয়ে রেখে এ রাজ্যে ব্রাহ্ম আন্দলনকে স্থিমিত করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় রক্ষনশীল বর্ন হিন্দু পিউরিটান রাজ কর্মচারীদের মধ্যে। যখন কুচবিহারে Assistant Civil Judge এর কাজ নিয়ে আসেন, তখন যদি তিনি Civil Judge এর পদ প্রাপ্ত হয়ে কুচবিহার রাজ্যে বিশেষ ভাবে ব্রাহ্মধর্মের বিস্তার করেন ও রাজার প্রিয়পাত্র হন, সেই আশঙ্কায় ১৮৮৯ খ্রীঃ তাকে দূরবর্তী জায়গা জলপাইগুড়ির অন্তর্গত দেবীগঞ্জে মহারাজার চাকলাজাত এস্টেটের দায়িত্বভার সপে দেওয়া হয়।[১৯] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে চাকলাজাত সম্পত্তির সদর কার্যালয় দেবীগঞ্জে স্থাপনের পর এর ব্যবস্থাপনার জন্য নৃপেন্দ্র নারায়ণ একজন প্রধান ও একজন সহকারী ম্যানেজার নিযুক্ত করেছিলেন। তাদের বাহন ছিল হাতি ও পাল্কী। ম্যানেজারদের চালচলন ও জাকজমক ছিল রাজার মতো।[২০] গজেন্দ্র নারায়নকে এই সময় এই পদে নিয়োগ দেওয়া হয়।তবে দেবীগঞ্জে বদলি হয়ে এসেও তিনি কিন্তু নববিধান ব্রাহ্ম ধর্মের প্রচার থেকে সরে আসেননি। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি দেবীগঞ্জে চাকলাজাত এস্টেটের

সুপারিনটেনডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করবার পরই তাঁর প্রচেষ্টায় মূলত 'দেবীগঞ্জ নববিধান সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই বছরই আশ্বিন মাসের 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকাতে এ প্রসঙ্গে লেখা হয়েছিল-

> "বিগত শনিবার কোচবিহার মহারাজের জমীদারীর অন্তর্গত দেবীগঞ্জ নামক স্থানে একটি নববিধান সমাজের সুত্রপাত হইয়াছে। ভাই গৌরগোবিন্দ রায় হলদিবাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে উপাসনা করিয়াছেন। অনেকগুলি ভদ্রলোক উপাসনায় যোগদান করিয়াছিলেন।..... কুমার গজেন্দ্র নারায়ণ সাহেব এক্ষণ মেনেজারের পদে নিযুক্ত আছেন। তাঁহার উদ্যোগে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। তথায় একজন প্রচারক, অবস্থিতি করিয়া কিছু দিন কার্যা করিবার কথা হইয়াছে।"[২১]

দেবীগঞ্জে নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই নববিধানের প্রচারকরা ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারের কাজে দেবীগঞ্জে আসতে শুরু করেন। পরের মাসেই ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল দেবীগঞ্জে প্রচারে আসেন এবং সেখান থেকে হলদিবাড়ি, শিলিগুড়ি প্রভৃতি স্থানে ধর্মপ্রচার শেষ করে দার্জিলিং ভ্রমণ করেন। ১৯০২ সালের দিকে, অমরাগরী ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য আশুতোষ রায়, হরলাল রায় এবং কোচবিহার নববিধান ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ প্রচারক হিসাবে দেবীগঞ্জে উপস্থিত হয়েছিলেন। সন্ধ্যায় সংগীত, প্রার্থনা ও উপদেশ অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন উষা কীর্তন এবং বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সংগীত ও বক্তৃতা হয়েছিল।[২২] দেবীগঞ্জ নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের ব্রহ্ম উৎসব গুলোতেও একাধিক প্রচারকের আগমন হতো। কুমার গজেন্দ্র নারায়ণ অত্যন্ত উৎসাহের সাথে প্রচারকদের নিজের বাড়িতে রেখে তাদের আতিথেয়তা দেখাতেন এবং তাঁর যত্ন ও পরিশ্রমের ফলে ব্রাহ্মধর্মের প্রচার সংক্রান্ত অনেক বই বিক্রি হত।[২৩] দেবীগঞ্জে নববিধান প্রচারক ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন ও ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্তের এক বিস্তারিত প্রচার বিবরণ 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকার পাতায় পাওয়া যায়। জানা যায়, ১৮৯১ সালের আশ্বিনের ৫ তারিখ সোমবার নববিধানের এই দুই প্রচারক আমন্ত্রিত হয়ে ফুলবাড়ি থেকে দেবীগঞ্জে পৌঁছান। বক্তৃতা দেওয়া হবে বলে কুমার গজেন্দ্র নারায়ণ আগেই ঢোলের তালে ঘোষণা করেছিলেন। বিকেল ৫টায় একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে দু-তিনশো ভদ্র ও সাধারণ শ্রেণির হিন্দু-মুসলমান জড়ো হয়। প্রথমে ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন 'ইসলাম ধর্ম ও তার প্রকৃত রূপ' বিষয়ে বক্তৃতা দেন এবং তারপর ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্ত 'ধর্মের উদারতা' সমন্ধে বক্তৃতা করেন। পরের দিন ৬ই আশ্বিন মঙ্গলবার বিকেলে আবার সেই অনুষ্ঠানস্থলে, ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন 'ওহদানিয়াত কেয়া চিজ হ্যায়' (একত্ববাদ কী?) এই বিষয়ে উর্দুতে একটি বক্তৃতা পাঠ করেন। জৈনপুরে বসবাসকারী একজন আরবীয় ভাষাবিজ্ঞ মুসলিম হাফেজ (কোরআন মুখস্থকারী) শ্রোতা শ্রেণীর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর তিনি উর্দুতে 'একত্ববাদ' বিষয়ে তার নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেন। এরপর ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্ত বাংলা ভাষায় কিছু কথা বলেন। ৭ই আশ্বিন বিকালে করতোয়া নদীর বুকে একটি নৌকায় সংকীর্তন হয়। কুমার গজেন্দ্র নারায়ণের আহ্বানে সাড়া দিয়ে, সেই এলাকার কীর্তন বিশেষজ্ঞদের তিনটি দল বাদ্যযন্ত্র, যেমন খোল এবং করতাল সহকারে এসে জড়ো হয়েছিল। দলগুলো পালাক্রমে রাত ৮টা পর্যন্ত উৎসাহের সাথে সংকীর্তন নামক ভক্তিমূলক গান পরিবেশন করে। পরের দিন ৮ই আশ্বিন, ম্যানেজারের বাংলোতে বিশেষ উপাসনা ও ধর্মোপদেশ পরিচালিত হয় যেখানে ডাক্তারবাবু এবং জমিদারীর আমলারা সেই উপাসনায় অংশ নেন। ৯ তারিখ শুক্রবার সকালে প্রচারক ভাতৃদ্বয় হলদিবাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। দেবীগঞ্জে প্রাত্যাহিক, মধ্যাহ্নিক উপাসনায় কুমার সাহেব গজেন্দ্র নারায়ণ নিয়মিত যোগদান করেছেন। তিনি বিশেষ উৎসাহ ও আদর স্নেহের সাথে নিজ বাড়িতে স্থান দিয়ে প্রচারকদের আতিথেয়তা আপ্যায়ন করেছেন এবং তার যত্ন ও প্রচেষ্টায় প্রচার সংক্রান্ত অনেকগুলো বই বিক্রি হয়েছিল। আর তার জন্য ব্রাহ্মসমাজ তাঁর কাছে যথেষ্ট কৃতজ্ঞ ছিল।[২৪]

এই সময়কালে, কুমার গজেন্দ্র নারায়ণের উদ্যোগী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে দেবীগঞ্জে একাধিক জনহিতকর কাজ করা হয়েছিল। ডোমার স্টেশন থেকে আড়াই ক্রোশ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে দেবীগঞ্জে আসতে হতো। এই পথ দিয়ে পথিকদেরকে অনেক কষ্টে আসতে হতো। আশেপাশে কোন জলাশয় বা কূপ ছিল না। তাই কুমার গজেন্দ্র নারায়ণ এবং তার স্ত্রী কেশব চন্দ্রের কন্যা সাবিত্রী দেবী উভয়ে ভ্রমণকারীদের পানীয় জলের অভাব দূর করতে এবং তাদের তৃষ্ণা মেটাতে পানীয় জল বিতরণের জন্য একটি জায়গা অর্থাৎ 'জলসত্রের' ব্যাবস্থা করে দেন। পথিকদের জন্য গুড়, ছোলা ও পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকতো। প্রথমে পথিকরা সেই খাবার গ্রহণে দ্বিমত পোষণ করেন। তারা ভেবেছিল এর জন্য তাদের মূল্য দিতে হবে। শেষ পর্যন্ত চাকরেরা দু-চারজনকে জোর করে খাওয়াবার পর দলবেঁধে পথিক এসে তৃষ্ণার সময় জল পান করে তৃপ্ত হয়ে প্রচুর আশীর্বাদ করে চলে যেত।[২৫] স্থানীয় কীর্তন গায়কদের দলের মধ্যে ব্রাহ্মধর্মের প্রবেশ ঘটানোর উদ্দেশ্য নিয়ে কুমার গজেন্দ্র নারায়ণ দেবীগঞ্জে ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন উৎসবে একাধিক কীর্তনের দলকে আমন্ত্রণ জানাতেন। তিনি প্রত্যেক দলে এক একটি ব্রাহ্ম সঙ্গীত সম্বলিত বই বিতরণ করে তাদের উৎসাহিত করতেন। এমনকি তিনি একজন সংগীতে পারদর্শী নববিধানে বিশ্বাসী কর্মচারীকে প্রতি রবিবার তাদের ব্রাহ্মসংগীত শেখানোর জন্য নির্দেশ দেন।[২৬] গজেন্দ্র নারায়ণের ছেলে বিকাশেন্দ্র নারায়ণ এ প্রসঙ্গে তার একটি প্রবন্ধে বলেছেন-

> "When we were in Debigunj Chaklajat Estate my father used to collect people from villages and taught them Brahma sangit or religious songs. Soon they became good singers. We are little boys at that time and used to join the kirtan parties. Some of the Brahmo Bhajans were translated in their own colloquial language and sung. A song, I remember was – 'Ekje, manus ache, tare dakle katha koi` ie. there is a man who speaks if we call him etc."[২৭]

গজেন্দ্র নারায়ণ ১৮৮৯ থেকে ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দেবীগঞ্জে কোচবিহারের মহারাজার চাকলাজাত এস্টেটের সুপারিনটেনডেন্ট থাকাকালীন সেই এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে সুরা সেবনের কুফল সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারে সামিল হন। মাদক গ্রহণের কুফল সম্পর্কে ব্রাহ্ম প্রচারকদের বক্তৃতা শ্রোতাদের গভীরভাবে প্রভাবিত করতে থাকে।[28] স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনি দেবীগঞ্জের অনেক দরিদ্র অসহায় মানুষকে একটি বিশেষ সাহায্য হিসেবে চাকরির বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন।[২৯]

দেবীগঞ্জ অঞ্চল কুচবিহার রাজ্যের চাকলাজোতের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, এখানকার যে কোন কল্যাণমূলক প্রচেষ্টায় কোচবিহারের ব্রাহ্ম রাজ পরিবারের অবদান থাকত।[৩০] ব্রাহ্ম ধর্মের প্রভাবের ফলে মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ চিরকাল ধর্মকর্মে উৎসাহী ও অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভুতিশীল ছিলেন এবং প্রজাকল্যানকামী ও সংস্কৃতিমনস্ক শাষক হিসাবে নিজেকে তুলে ধরতে পেরেছিলেন। মহারাজা ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে দেবীগঞ্জে একটি 'দাতব্য চিকিৎসালয়' ও 'জগদ্বন্ধু ঠাকুরবাড়ি' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর দ্বারা স্থাপিত হয় 'মহারাজা স্মৃতিমন্দির' নামক নাট্যশালা ও পাবলিক লাইব্রেরি।[৩১] বারমাসে তের পার্বণের আমেজ লেগে থাকতো জমিদারি সদর কার্যালয়ে। ব্যবসাবাণিজ্য ও শিক্ষা সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল হিসাবে সেকালে এই অঞ্চলের নিজস্ব ধারা তৈরী হয়েছিল।[৩২] খুব সম্ভবতঃ কুচবিহার-রাজ আনুকূল্যেই দেবীগঞ্জে শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার লাভ ঘটে। পূর্বে প্রতিষ্ঠিত একটি বিদ্যালয় পরবর্তীকালে ১৮৮০/৮১ খ্রিস্টাব্দে মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। জলপাইগুড়ি জেলা বোর্ড থেকেও এই বিদ্যালয়ে যথারীতি সাহায্য প্রদান করা হত। এরপর ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে কুচবিহার রাজানুকূল্যেই ঐ মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে

রূপান্তরিত হয় এবং বিদ্যালয়ের নাম কুচবিহারের স্বনামধন্য শিক্ষানুরাগী মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের নামানুসারে চিহ্নিত হয় 'দেবীগঞ্জ নৃপেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল হাই স্কুল'। এই গৃহনির্মাণ বাবদ সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন কুচবিহার রাজ তহবিল, এবং এই বিদ্যালয়ের সমস্ত পৌনঃপুনিক ব্যয়ও ঐ দরবার থেকে বহন করা হত। ঐ বিদ্যালয় গৃহের গঠন প্রণালীও ছিল কুচবিহার জেক্সিস স্কুল ও ভিক্টোরিয়া কলেজের আদি গৃহগুলির অনুরূপ। এই বিদ্যালয়ই জলপাইগুড়ি জেলার দ্বিতীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় এবং এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার চার বছরের মধ্যেই একটি ছাত্র ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় এই জেলার মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে।[৩৩] পরবর্তীকালে ১৯২৭-২৮ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ কোচবিহার রাজ প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই বিদ্যালয়ের হিন্দু ছাত্রদের বসবাসের জন্য একটি হোস্টেল নির্মান করে দেওয়া হয়।[৩৪] গজেন্দ্র নারায়ণের মৃত্যুর পর তার স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁর স্ত্রী সাবিত্রী দেবীর উদ্যোগে প্রতি বছর তাঁর জন্মদিনে দেবীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন বালককে পদক প্রদান করা হতো।[৩৫] নৃপেন্দ্র নারায়ণ উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় সে যুগের একটি প্রথম শ্রেণীর বিদ্যালয় ছিল। শ্রী জে. এন তালুকদার, আই সি. এস. (পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন চীফ সেক্রেটারি), ডাঃ কাজী সামছুল আলম, এফ. আর. সি. এস, বিচারপতি আব্দুল খালেক, পাক আমলের ডেপুটি স্পীকার গমির উদ্দিন প্রধান, গোঠি এস্টেটের ইতিহাস ও বহু ধর্মীয় গ্রন্থ প্রণেতা আমির উদ্দিন প্রধান, মর্নিং নিউজের প্রাক্তন সম্পাদক আলহজ্ব মোঃ শামছুল হুদা এবং আরো অনেকেই এই বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন।[৩৬] এছাড়া এই দেবীগঞ্জেই জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে প্রথম বালিকাদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।[৩৭] ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে যখন কুমার গজেন্দ্র নারায়ণের পরিবার দেবীগঞ্জে অবস্থান করছিলেন, তখন মহারাণী সুনীতি দেবী সেখানে গিয়ে আট দিন ছিলেন।[38] সম্ভবত সে সময় সুনীতি দেবীর উদ্যোগী প্রচেষ্টায় দেবীগঞ্জে নারী শিক্ষার উন্নতির জন্য বালিকা বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে গণেশ চন্দ্র চক্রবর্তী 'কোচবিহার দর্পণ' পত্রিকায় এ প্রসঙ্গে লিখেছেন-

> "পুণ্যবতী মহারাণী স্বর্গীয়া সুনীতি দেবী, দেবীগঞ্জে শুভাগমন করিয়া স্ত্রী শিক্ষার অভাব দুরীকরনে অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সুনীতি-বালিকা বিদ্যালয় দেবীগঞ্জের মস্ত অভাব দুরীভূত করিয়া উন্নতিমুলক প্রতিষ্ঠানে পরিনত হইয়াছে।"[৩৯]

১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের জলপাইগুড়ি জেলা বোর্ডের একটি সম্মানিত মন্তব্য থেকে জানা যায় যে, জেলার মেয়েদের জন্য ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে যে দুটি বিদ্যালয়কে তারা অনুদান প্রদান করেছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল জলপাইগুড়ি শহরে এবং আরেকটি ছিল দেবীগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়টি ছিল জেলার মেয়েদের জন্য প্রথম প্রাথমিক বিদ্যালয়।[৪০]

কোনো কোনো নববিধানবাদী ছোট-বড় যেকোনো ঘটনাকে উপলক্ষ করে পারিবারিক উৎসব পালন করতেন। গজেন্দ্র নারায়ণের দেবীগঞ্জে থাকার সময়, তিনি তার ছেলের অন্নপ্রাশন এবং তার মেয়ের জন্মদিন উপলক্ষে ব্রাহ্ম রীতিতে একাধিক পারিবারিক উৎসব করেছিলেন। এরকম একটি উৎসব উপলক্ষ্যে স্থানীয় ব্রাহ্ম ভ্রাতারা সাহেবের বাড়িতে নামগান গেয়েছিলেন। বাড়িটি ফুল, পাতা, নিশান ইত্যাদি দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছিল। দুপুরে পারিবারিক উপাসনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং 70 থেকে 80 জন গরিব কাঙালিকে বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছিল। সবশেষে রাতে কুমার সাহেব স্থানীয় 'ব্রাহ্ম' সদস্যদের সাথে একত্রে প্রীতিভোজন করেন।[৪১] সন্দেহ নেই যে, এই ধরনের অনুষ্ঠান, ব্রাহ্ম ধর্মীয় আচার-আচরণ, রীতিনীতি, ক্রিয়াকর্মকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরে তিনি পরোক্ষভাবে ধর্ম প্রচারে অনেক সহায়তা করেছিলেন। দেবীগঞ্জে একাধিক ব্যক্তি ব্রাহ্মধর্ম সমর্থনে তাদের অনুকূল মতামত ও বিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন। যেমন দেবীগঞ্জের বাবু

মতিলাল বড়ুয়া কলকাতার লিলি কটেজ প্রাঙ্গণে ভাই উমানাথ গুপ্তকে গুরু হিসেবে গ্রহণ করে নববিধান ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন।[৪২]

সামগ্রিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্রাহ্মধর্মান্দোলন কেবল নিছক ধর্মসাধনার একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠীগত আন্দোলন ছিলোনা। সামাজিক জীবনও এই ধর্মসাধনার অঙ্গীভূত হয়েছিল। তাই সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে যেমন ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন করেন, তেমনি সমগ্র সমাজকে শক্তিশালী করার জন্য শিক্ষা-সংস্কৃতির সুফল নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়ে সকলকে সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতামুক্ত ও সাবলম্বী হতে প্রেরণা যুগিয়েছে। সে যুগে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেনি এমন ব্যক্তিও ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে লাভ করেছে উদার ধর্মনীতির শিক্ষা এবং ধর্মীয় সামাজিক সর্বপ্রকার কুপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য পেয়েছে বিশ্বস্ত সঙ্গী। আবার স্বদেশ ও স্বজাতি সম্পর্কে সচেতন মানুষ দেশভক্তি ও জাত্যভিমানের দীক্ষা পেয়েছে এবং স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছে। বহু যুবক পাশ্চাত্য শিক্ষাসংস্কৃতির ঘূর্ণাবর্তে উদ্ভ্রান্ত-যৌবনের উন্মাদনাকে প্রশমিত করেছে ব্রাহ্মদের মার্জিত রুচি ও চরিত্রের সংস্পর্শে এসে।[৪৩] উত্তরবঙ্গের এক বৃষ্মিতপ্রায় প্রান্তকেন্দ্রিক জনপদ দেবীগঞ্জেও ব্রাহ্ম আন্দোলনকারীরা বিভিন্ন সামাজিক সংস্কারের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তার সুফলগুলি বেশীরভাগই ভোগ করেছে উচ্চ সম্প্রদায়ের লোকেরা। নগরভিত্তিক আন্দোলন গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে ব্যর্থ হয়। ফলে দেবীগঞ্জের খুব অল্প সংখ্যক জনসাধারণই এই ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তাই ভবিষৎ প্রজন্মকে যদিও এই ধর্ম তার ছত্রছায়ায় বাধতে পারেনি তা সত্ত্বেও এর সামাজিক মূল্যকে কখনো অস্বীকার করা যায়না। ব্রাহ্মরাই জাতপাতের ইস্পাত কাঠিন্য ভাঙ্গার সাহস দেখিয়ে এবং অপর ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতি সহিষ্নুতা ও সৌহার্দ্যবোধের যে নির্দশন রেখেছিল তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েই পরবর্তী দশকগুলোতে দেবীগঞ্জের মত উত্তরবঙ্গের এই সমস্ত প্রান্তীয় জনপদে সামাজিক স্থিতি বিরাজ করেছিল, উৎকর্ষতা লাভ করেছে এখানকার শিক্ষা সংস্কৃতির ধারা।

তথ্যসূত্র:

[১] https://panchagarh.info/debiganj/

[২] ধর্ম্মতত্ত্ব, ভট্টাচার্য, রামসর্বস্ব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, কলকাতা: বিধান প্রেস, ১লা আশ্বিন ১৮১১ শক, পৃ.২০০

[৩] লতিফ, আব্দুল, প্রাচীন করতোয়া ও দেবীগঞ্জ: অখন্ড জলপাইগুড়ি জেলার কিছু কথা, কর, অরবিন্দ (সম্পা), 'কিরাতভূমি': জলপাইগুড়ি জেলার ১২৫ বর্ষ পুর্তি উপলক্ষে জলপাইগুড়ি জেলা সংকলন (১৮৬৯-১৯৯৪), জলপাইগুড়ি: চক্রবর্তী, প্রদীপ কুমার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৯৫, পৃ. ৪৮-৪৯

[৪] ধর্ম্মতত্ত্ব, দাস, বিশ্বনাথ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, কলকাতা: মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেস, ১৬ই আশ্বিন ১৮১৩ শক, পৃ.২১০

[৫] তত্ত্বকৌমুদী, ঘোষ, ভুবন মোহন কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, কলকাতা: সাধারন ব্রাহ্মসমাজ প্রেস, ১লা বৈশাখ ১৮০৩ শক, পৃ.২৬১

[৬] তদেব, পৃ.২৬১

[৭] তত্ত্বকৌমুদী, ঘোষ, ভুবন মোহন কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, প্রাগুক্ত, ১৬ই বৈশাখ ১৮০৩ শক, পৃ.২৭২

[৮] Sastri, Sivanath History of the Brahmo Samaj, Vol 2, Kolkata: published by Chatterjee, R. 1912, p.552

[৯] তত্ত্বকৌমুদী, ঘোষ, ভুবন মোহন কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, প্রাগুক্ত, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৮০৩ শক, পৃ.৩০০

[১০] তদেব, ১লা বৈশাখ ১৮০৩ শক, পৃ.২৬১

[১১] তদেব, পৃ.২৬১

[১২] Das, Bhuban Mohan (ed.) *Brahmo public opinion*, Kolkata: Brahmo Mission Press, April 4th, 1878, p.16

[১৩] দাশ, কমলেশ, সামন্ত রাজ্য কোচবিহারে ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলন, চট্টপাধ্যায়, গৌতম (সম্পা), ইতিহাস অনুসন্ধান (২য় খন্ড), কোলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ১৯৮৭, পৃ.২২৬

[১৪] নৃপেন্দ্র নারায়ণ ও গজেন্দ্র নারায়ণের একই প্রপিতামহ, তাঁর নাম মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণ। মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণের ছয় পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় ছিলেন মেঘেন্দ্র নারায়ণ। তার চার পুত্রের মধ্যে চতুর্থ হলেন ভবেন্দ্র নারায়ণ। তার জ্যৈষ্ঠ পুত্র কোচবিহারের প্রথম ব্যারিষ্টার ২৪ বছর বয়সি গজেন্দ্র নারায়ণের সঙ্গে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ই আগষ্ট কেশবচন্দ্র সেনের দ্বিতীয় মেয়ে সাবিত্রী দেবীর বিয়ে হয় কোলকাতায় ব্রাহ্মধর্মের পদ্ধতি মেনেই। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের কলেটের ব্রাহ্ম ইয়ার বুকে ১৮৮০– ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ব্রাহ্ম বিবাহের যে তালিকা রয়েছে তার ১২৯ নম্বর ক্রমিক সংখ্যায় এই বিবাহের উল্লেখ রয়েছে। দ্রষ্টব্য: Collect, Sophia Dobson (ed.), *The Brahmo Year Book for 1881, Brief Record of work and life in the Theistic Churches of India,* London and Edinburgh: Williams and Norgate, 1881, p.147

[১৫] দেবী, সাবিত্রী, স্বর্গীয় কুমার গজেন্দ্র নারায়ণ, কলকাতা: লক্ষীবিলাস প্রেস, ১৯২৮, পৃ.১১

[১৬] প্রাগুক্ত, পৃ.৩১,৫০,৫১

[১৭] "Brahmo Samaj building Finished'' in Annual Administrative Report of Cooch Behar State for the year of 1887-1888, Cooch Behar: Cooch Behar State Press, 1888, pp.29-36; Also see, Kopf, David, The Brahmo Samaj and the shaping of the modern Indian mind, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1979, p.329

[১৮] Narayan, Bikashendra, Brief Reminiscences of Late Kumar Gajendra Narayan, Sinha, Nirmal Chandra (ed.) *The World and the New Dispensation,* Autumn Souvenir, Kolkata: Bhartbarsiya Brahmo Samaj, Bhadrotsav 1959, pp.26-27

[১৯] দেবী, সাবিত্রী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩

[২০] লতিফ, আব্দুল, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৮-৪৯

[২১] ধর্ম্মতত্ত্ব, ভট্টাচার্য, রামসর্বস্ব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, প্রাগুক্ত, ১লা আশ্বিন ১৮১১ শক, পৃ.২০০

[২২] ধর্ম্মতত্ত্ব, নাথ, কে. পি দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, কলকাতা: মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেস, ১লা আষাঢ়, ১৯৫৯ সংবৎ, পৃ.১৩১

[২৩] ধর্ম্মতত্ত্ব, দাস, বিশ্বনাথ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, প্রাগুক্ত, ১৬ই আশ্বিন ১৮১৩ শক, পৃ.২১০

[২৪] প্রাগুক্ত, পৃ.২১০

[২৫] দেবী, সাবিত্রী, প্রাগুক্ত, পৃ.৪১

[২৬] ধর্ম্মতত্ত্ব, দাস, বিশ্বনাথ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, প্রাগুক্ত, ১৬ই আশ্বিন ১৮১৩ শক, পৃ.২১০

[২৭] Narayan, Bikashendra. *Op.cit.,* p.27

[২৮] মজুমদার, অরুপ জ্যোতি, উত্তরবঙ্গে অসমাপ্ত মাদক বিরোধী আন্দোলন, ব্রহ্মচারী, তপব্রত (সম্পা) ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৪৫ বর্ষ, সপ্তম- নবম সংখ্যা, কলকাতা: ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ মণ্ডলী, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪১৬ বঙ্গাব্দ, পৃ.১৫

[২৯] দেবী, সাবিত্রী, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৭

[৩০] পাকড়াশী, অমিয় কুমার, জলপাইগুড়ি জেলায় শিক্ষা বিস্তারের রূপরেখা, সান্যাল, চারুচন্দ্র ও অনান্য (সম্পা), জলপাইগুড়ি জেলা শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ (১৮৬৯- ১৯৬৮), জলপাইগুড়ি: জেলা শতবার্ষিকী উদযাপন কমিটি, ১৯৭০, পৃ.১৭১-১৭২

[৩১] লতিফ, আব্দুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮-৪৯

[৩২] প্রাগুক্ত, পৃ.৪৮-৪৯

[৩৩] পাকড়াশী, অমিয় কুমার, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭১-১৭২

[৩৪] *The Annual Administration Report of the General Administration and Criminal justice of the Cooch Behar State for the year 1927-28*, Cooch Behar: Cooch Behar State press, 1928, p.38

[৩৫] *The World and the New Dispensation*, Kolkata: Bharatbarsiya Brahmo Samaj, Septembar 17, 1925, p.7

[৩৬] লতিফ, আব্দুল, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৮-৪৯

[৩৭] পাকড়াশী, অমিয় কুমার, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭১-১৭২

[৩৮] দেবী, সাবিত্রী, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৫

[৩৯] চক্রবর্তী, গনেশ চন্দ্র, জন্ম তিথি স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি (দেবীগঞ্জ), ঘোষাল, শরৎচন্দ্র ও বিশ্বাস, জানকী বল্লভ (সম্পা), কোচবিহার দর্পণ, প্রথম বর্ষ, ১৭শ সংখ্যা, কোচবিহার: কোচবিহার স্টেট প্রেস, ১লা পৌষ, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, পৃ.২১৬

[৪০] দাশগুপ্ত, কল্যাণী নারীশিক্ষা ও নারী আন্দোলন, ঘোষ, তারাপদ (সম্পা) পশ্চিমবঙ্গ, ৩৪ বর্ষ, ৪৮, ৪৯, ৫০ সংখ্যা (জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা), কলকাতা: তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪০৮, পৃ.৩১৯

[৪১] ধর্ম্মতত্ত্ব, ঘোষ, জগবন্ধু কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, কলকাতা: মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেস, ১লা ভাদ্র, ১৮১৪ শক, পৃ. ১৭৬; এছাড়া দেবী, সাবিত্রী, প্রাগুক্ত, পৃ.৪০

[৪২] *The World and the New Dispensation,* Vol – XVI, No-34, Printed and Published by Nath, K.P Kolkata: Mangalganj Mission Press, September 16, 1906, p.402

[৪৩] চট্টোপাধ্যায়, অরুন কুমার, ঊনবিংশ শতাব্দীর সভা সমিতি ও বাংলা সাহিত্য, প্রথম এশিয়ান সংস্করণ, কলকাতা: এশিয়ান পাবলিকেশন, ২০১৪, পৃ.৫৩-৫৪

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1319-1325
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.351

সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ: বাংলার সঙ্গে বর্হিবিশ্বের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের অগ্রদূত

ড. মোঃ নওয়াজ শরিফ, *স্বাধীন গবেষক, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*
মহ. সেখ মারুফ আজম, *স্বাধীন গবেষক, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 19.03.2026; Accepted: 21.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Sultan Ghiyasuddin Azam Shah (1390-1411) was one of the most notable rulers of medieval Bengal, making important contributions to building strong connections between Bengal and the outside world. During his reign from the Ilyas Shahi dynasty, Bengal gained prominence on the international stage. Notably, his forward-thinking diplomacy and support for the arts and culture helped boost Bengal's global reputation. Moreover, showing his deep passion for culture and literature. On the other hand, Sultan Ghiyasuddin Azam Shah sent an envoy to the famous Persian poet Hafiz Shirazi, asking him to complete a verse of an unfinished poem. Additionally, guided by a strong religious sense of duty, he founded madrasas and hospices in Mecca (Makkah) and Medina (Madinah), while also providing financial aid to local residents. By rejuvenating historic cultural and trade links between Bengal and China, he promoted increased trade and diplomatic relations between the two nations. In Addition, during his era, the port of Chittagong became a key hub for international trade, a crucial point for pilgrims and merchants alike. These accomplishments strengthened Bengal's relationships worldwide, giving the region a respected universal standing. In this context, this research paper will explore how the Sultan Ghiyasuddin Azam Shah effectively enhanced Bengal's international relations through his diplomatic and cultural efforts.

Keywords: Bengal, Sultanate, Ghiyasuddin Azam Shah, Cultural Harmony, Political Diplomacy, International Relations.

মধ্যযুগের ভারতবর্ষে বাংলা এক গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ ছিল। ইহার পূর্বসীমা এসলামাবাদ অথার্ৎ চট্টগ্রাম ও পশ্চিম সীমা তিলিয়াগড্ডি (রাজমহলের নিকট), পূর্ব-পশ্চিমে দৈর্ঘ্য অনুমান চারশত ক্রোশ, বঙ্গের উত্তর প্রান্তে পর্বতরাজি বর্তমান ও দক্ষিণ প্রান্তে মান্দারেন। মান্দারেন বঙ্গ সুবার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত, উত্তর-দক্ষিণে প্রস্থ অনুমান দুইশত ক্রোশ।[১] উল্লেখযোগ্য যে, বঙ্গদেশে তুর্কি অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলেও এখানকার শাসকগণ প্রায়ই দিল্লির প্রাধান্য অস্বীকার করার চেষ্টা করতো। যদিও দিল্লির সুলতানি আমলে বঙ্গদেশ প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন ছিল বলা যায়।[২] ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় স্বাধীন সুলতানি আমলের শুরু। এই সালে সোনারগাঁওয়ের শাসনকর্তা বাহরাম খানের মৃত্যুর পর তাঁর সিলাহদার (বর্মরক্ষক) ফখরা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ্ উপাধি ধারণ করে সোনারগাঁওয়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ফখরউদ্দীনের স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়েই বাংলার স্বাধীন সুলতানির সূচনা। সুলতান সিকান্দার শাহের রাজত্বের পর ১৩৯৩ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর

পুত্র, গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ' উপাধি গ্রহণ করে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ তাঁহার পিতা ও পিতামহের মত দক্ষ নৃপতি ছিলেন। কিন্তু তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব যুদ্ধবিগ্রহে নয়। তিনি ১৩৯৩ থেকে ১৪১১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার সুলতান ছিলেন।[৩]

সেই সময় বাংলার সমস্ত স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে তাঁর মতো আকর্ষণীয় চরিত্র বোধ হয় আর কারো ছিলনা। তার জীবনে কোন কোন ঘটনা এতই বিচিত্র যে যেগুলি থেকে একে রূপকথার রাজপুত্রের সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করা হয়।[৪] সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ অত্যন্ত দক্ষ নৃপতি ছিলেন, ন্যায় বিচারক, সুশাসক, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, বিদ্বান ও কবিদের পৃষ্ঠপোষণ, সুফি-সাধকদের প্রতি ভক্তি, ইসলামী সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে মাদ্রাসা স্থাপন এবং চীন সম্রাটের সঙ্গে দূত বিনিময়ের জন্য তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন।[৫] এছাড়াও আজম শাহের আমলেই বঙ্গদেশ বহির্বিশ্বে পরিচিত লাভ করে। এই পরিচিতি ছিল সম্মানজনক, বিদেশে বঙ্গদেশের মর্যাদা এবং সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছিল। তুলনামূলকভাবে, বেশ কয়েকটি আরব, চীনা ও ভারতবর্ষের ইতিহাস গ্রন্থে আজম শাহের বিবরণ স্থান পায়।[৬] নিম্নলিখিতভাবে গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ সুলতানি যুগে বাংলাকে বিশ্ব দরবারে পরিচিতি ঘটান এবং তিনি বিভিন্ন দেশ ও রাজ্যের সঙ্গে দূত বিনিময় করেন।

পারস্যের কবি হাফিজের সঙ্গে সম্পর্ক:

সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ নিজে একজন বিদ্বান ছিলেন এবং বিদ্যার আদর করতেন। অন্যদিকে, তিনি ফার্সি ভাষায় কবিতা লিখতেন এবং প্রথমবারের মতো তিনি ইরানের বিখ্যাত কবি হাফেজকে বাংলাদেশে আগমনের নিমন্ত্রণ জানান। সমসাময়িক গ্রন্থ, রিয়াজ-উস-সলাতিনে একটি কাহিনী আছে তাও বেশ চমকপ্রদ। কথিত আছে যে একবার সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ কঠিন রোগে আক্রান্ত হন এবং তিনি জীবনের আশা ত্যাগ করেছিলেন। তাই তিনি মৃত্যুর পর তার লাশ ধোয়ার জন্য সরও, গুল ও লালা নাম্নী নামে তিনজন হারেমের মেয়েকে নির্বাচিত করেন। পরে সুলতান আরোগ্য লাভ করেন এবং মেয়ে তিনটিকে আগের চেয়েও বেশি অনুগ্রহ দেখাতে থাকেন। কিন্তু হারেমের অন্য মেয়েরা তাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে এবং লাশ ধেওয়ার কথা নিয়ে তাদের উপহাস করতে থাকে। পরবর্তীকালে, মেয়ে তিনটি একদিন সুলতানের নিকট সেই বিষয়ে অভিযোগ জানায়।[৭] তাদের অভিযোগ শ্রবণ করে ক্ষনকাল চিন্তা করেই তিনি মনে মনে ফার্সি ভাষায় একটি কবিতার প্রথম চরণ রচনা করে বলে ওঠেন; "সাকি হাদিস-ই-সার্ভ, গুল ও লালা মিরাওয়াদ"।[৮] কিন্তু সুলতান কবিতাটির দ্বিতীয় চরন আর রচনা করতে পারলেন না। এছাড়াও তাঁর সভার কোন কবিও পারলেন না। তখন সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ এই চরণটি লিখে একজন দূত মারফত ইরানের শিরাজ শহরে কবি হাফিজের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। হাফিজ সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় চরনটি রচনা করেছিলেন।[৯] তৎপর হাফিজ স্বরচিত কয়েকটি পদসহ সম্পূর্ণ কবিতাটি সুলতান গিয়াসউদ্দীনের নিকট প্রেরণ করিলেন। গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ কবিতাপ্রাপ্ত হইয়া প্রীতি লাভ পূর্বক হাফেজকে যথোপযুক্ত রূপে পুরস্কৃত করেছিলেন।

বিবৃত আছে 'হে হিন্দুস্থানের তুতি পক্ষীগন, ইহার মিষ্টতা আস্বাদন কর, পারস্য দেশ হইতে বঙ্গদেশে মিষ্টান্ন প্রেরিত হইতেছে। হাফেজ, তুমি গিয়াসউদ্দীনে আজম শাহের রাজসভায় কবিতা প্রেরণ করিতে বিরত থেকোনা। কারণ তোমার বিলাপধ্বনি তথায় পৌঁছিলে আশা পূর্ণ হইবে।

প্রথম চরণ: হে (প্রেম) সুধা-দায়িনি! গোর ও লালার প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় চরণ: এই প্রসঙ্গ প্রকৃতই তিনজন গোসানির জন্য উপস্থিত হইয়াছে।[১০]

অন্যদিকে, হাফিজের গজল সম্পর্কে 'আইনি-ই-আকবরী' তে উল্লেখ আছে-

> On Sikandar's death, his son was elected to succeed him and was proclaimed under the title of Ghiyasuddin. Khawajah Hafiz of Shiraz sent him an ode in which occurs the following verse: And now shall India's parroquets on sugar revel all, in this sweet Persian lyric that is borne to far Bengal.[১১]

রিয়াজ-উস-সলাতিন ও আইন-ই-আকবরীতে এই গজলটির কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, যেগুলিতে সম্পূর্ণ গজলটি (হাফিজের মৃত্যুর অল্প পরে তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু মুহাম্মদ গুল-অন্দম কর্তৃক সংকলিত) 'দিওয়ান-ই-হাফিজে' উল্লেখ পাওয়া যায়।[১২] যদিও তিনি গজলে সুলতানের নাম, তিন দাসীর নাম, বঙ্গদেশের নাম উল্লেখ করেছেন এবং এক বছরে যাত্রাপথ অতিক্রম করে বঙ্গদেশের যেতে না পারার জন্য (সম্ভবত বয়সের কারণে) গভীরভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।[১৩]

আরব দেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন:

সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ মক্কা ও মদিনা শরীফে বহু টাকা ব্যয়ে মাদ্রাসা স্থাপন করেন এবং এই দুই শহরে অধিবাসীদের মধ্যে বন্টন করার জন্য বহু অর্থ প্রেরণ করেন। যদিও সমসাময়িক কয়েকজন আরব দেশীয় এবং পাক-ভারতের ঐতিহাসিকদের লেখা বইয়ে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এই ইতিহাস গ্রন্থ গুলি হচ্ছে ইবন-ই-হজর -এর ইনবা-উল-গুমর, তকী-আল ফার্সির ইকদুথ-থামিন, কুতুব-উদ-দীন হানফীর তারীখ-ই-মক্কা এবং আল সখাভীর আল-জউ-উল-লামি।[১৪] উল্লেখ্য যে, খান জাহান নামে আজম শাহের একজন উজিরের অনুপ্রেরণায় মক্কা ও মদীনায় মাদ্রাসা স্থাপন ও সেখানকার অধিবাসীদের জন্য বহু উপহার পাঠান। এছাড়াও সুলতান নিজস্ব ভৃত্য হাবসী ইয়াকুতকে দিয়ে অর্থ ও উপহার সামগ্রী পাঠান।[১৫]

এই সময়ে মক্কায় আজম শাহের মাদ্রাসা বাব-ই-উম্মেহানি নির্মিত হয় এবং মদীনায় মাদ্রাসাটি হোসন-উল-আতিক নির্মিত হয়। উভয় মাদ্রাসাই বাঙ্গালি মাদ্রাসা বা গিয়াসীয়া মাদ্রাসা নামে পরিচিত হয়।[১৬] এ ছাড়াও মক্কায়-মাদ্রাসার নিকটে দুখণ্ড জমি এবং চারটি জলধারা কিনে মাদ্রাসাকে দান করা হয়। যদিও এই সম্পত্তির আয় থেকে মাদ্রাসার শিক্ষক, ছাত্র, কর্মচারী ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের জন্য ব্যয় করা হয়। মাদ্রাসা ভবনের সামনে অবস্থিত একটি বাড়িও পাঁচশত স্বর্ণ মুদ্রায় কিনে মাদ্রাসার জন্য ওয়াকফ করা হয়।[১৭] এত বেশি অর্থ পাঠানো হয়েছিল যে, মক্কা ও মদিনা শহরের প্রত্যেক লোকই তার কিছু অংশ পায়। এছাড়াও সুলতান আরাফাতে খাল খননের জন্যও ইয়াকুত মারফত অর্থ পাঠান। মাওলানা হাসান (মক্কার শরীফ) এই অর্থ গ্রহণ করেন এবং বলেন যে, আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করব। এই অর্থের পরিমাণ ছিল ত্রিশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা।[১৮]

চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন:

সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের আর এক গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্ব, ভারতের সঙ্গে চীনের প্রাচীন সাংস্কৃতিক যোগাযোগকে তিনি পুনর্জীবিত করেন। চীনের সম্রাটও বঙ্গদেশে সুলতান ও তার বেগমের জন্য উপঢৌকনসহ দূত পাঠান। এমনকি, চীন সম্রাট বঙ্গদেশের সুলতানকে বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী চীনে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেন। সেই অনুরোধ রক্ষার জন্য মহারত্ন ধর্মরাজ নামে এক বৌদ্ধ ভিক্ষু ১৪১০-১৪১১ খ্রিস্টাব্দে চীনদেশ পরিভ্রমণ করেন।[১৯] চীন দেশের বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থ থেকে সুলতান গিয়াস উদ্দিনের এই দূত প্রেরণের কথা জানা যায় যেমন- সি-য়ং-চাও-কুং-তিয়েন-লু, শু-য়ু-চৌ-ৎ, সেউ-লু এবং মিং রাজবংশের সরকারি ইতিহাসগ্রন্থ মিং-শে ইত্যাদি গ্রন্থে। শু-য়ু-চৌ-ৎ সেউ-লু নামক বইটিতে লেখা আছে য়াং-লো'র রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে (১৪০৫) বাংলার রাজা নগই-য়া-সসে-তিৎ চীনের রাজসভায় দূত পাঠান। য়ংলো'র রাজত্বের ষষ্ঠ বর্ষে (১৪০৮ খ্রিস্টাব্দে) ঐ

দেশের (বাংলার) রাজা আবার দূত পাঠালেন। এই দূত ভেটসমেত তাই-ৎ-সাং বন্দরে এসে পৌঁছালেন। (চীনের) সম্রাট তাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য পররাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রীকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন।[২০]

অন্যদিকে ১৪০৮ ও ১৪০৯ খ্রিস্টাব্দে চীনে প্রেরিত বাংলার রাজকীয় প্রতিনিধি দলের সদস্য সংখ্যা ছিল ২৩০, যেখানে সৈয়দ মোহাম্মদ নেতৃত্ব দেন। সদস্য-সংখ্যা থেকে প্রতীত হয় যে, এতে কূটনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়া বাণিজ্য স্বার্থও জড়িত ছিল।[২১] চীনা দূতদলের দোভাষী মা-হুয়ান এর য়িং-যাই-শেং-লান (য়ি-য়া-শ্যং-লান) গ্রন্থ থেকে চীন-বাংলার দূত বিনিময় জানা যায়।[২২] মা-হুয়ান সমুদ্রপথে সুমাত্রা দ্বীপ হয়ে নিকোবর থেকে কুড়ি দিনের যাত্রার পর ১৪০৬ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামে অবতরণ করেন। চট্টগ্রাম থেকে একটি ছোট জাহাজে করে নদীপথে সুনউঢ়কং (সোনারগাঁও) শহরে উপস্থিত হন। তাঁর মতে, সমুদ্রের মুখ থেকে সোনারগাঁও এর দূরত্ব কম বেশি ৫০ 'লি' (১৫০ মাইল) সোনারগাঁও থেকে মাহুয়েন উত্তর-পশ্চিম মুখে ২৫ টি আস্তানা অতিক্রম করে 'পাংকোলা'র (বাংলার) রাজধানীতে পৌঁছন। তিনি রাজধানীর নাম উল্লেখ করেননি। যদিও তখন বাংলার রাজধানী ছিল গৌড়।[২৩]

উল্লেখ্য যে, সুলতানি যুগে বাঙালিদের মধ্যে সততা ছিল এবং তারা ব্যবসায়ে অনেক টাকা খাটাত। নিজেদের ক্ষতি হলেও তারা মিথ্যা বলত না বা কাউকে ঠকাবার চেষ্টা করত না। পুনরায় চীনা বিবরণে বাংলার কৃষকদেরও বেশ প্রশংসা করা হয়, তারা সারা বৎসর চাষ করত, বীজ বপন করত, ক্ষেত নিড়াত, সেচের কাজ করত এবং কঠোর পরিশ্রম করে ফসল ফলাতো তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য।[২৪] এছাড়াও বঙ্গদেশে সুতি বস্ত্রের বিশেষ উল্লেখ রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ যে, বাংলার মসলিন শিল্প অবশ্যই বিদেশীদের আকর্ষণ করত, কারণ অন্য কোন দেশে এত সুক্ষ বস্ত্র পাওয়া যেত না।[২৫] তবে এখানে চা উৎপন্ন হত না, তাই এখানকার লোকেরা চা দ্বারা অতিথি আপ্যায়ন করিত না, চায়ের পরিবর্তে তাহারা পান দিয়া অতিথি আপ্যায়ন করিত।[২৬] অতএব চীনা বিবরণে তৎকালীন বাংলার একটি সুন্দর ও প্রাচুর্যে ভরা দেশের চিত্র পাওয়া যায়।

বহির্বিশ্বের সঙ্গে পরিচয়ে চট্টগ্রাম বন্দর:

সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের শাসনামলে চট্টগ্রাম বন্দর ধীরে ধীরে একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিবরণে এই সময়ের চট্টগ্রামের সমৃদ্ধ বাণিজ্যিক অবস্থার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। বিশেষ করে আরব ভৌগোলিকদের লেখনী থেকে জানা যায় যে, চট্টগ্রামের অন্তর্গত সন্দীপ তখন এক অত্যন্ত কর্মচঞ্চল ও সমৃদ্ধ বাণিজ্যিক বন্দর হিসেবে পরিচিত ছিল। এই সময়ে আরব বণিকদের অসংখ্য জাহাজ নিয়মিতভাবে চট্টগ্রাম বন্দরে আগমন করত এবং তারা স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে বাণিজ্য পরিচালনা করত। যদিও বাণিজ্যের প্রধান উপকরণ হিসেবে মসলাজাত দ্রব্য, বস্ত্র, মুক্তা ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রীর আদান-প্রদান হতো। ধীরে ধীরে এই বাণিজ্যিক যোগাযোগের ফলে আরব বণিকদের একটি স্থায়ী বসতি চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল, যা স্থানীয় সংস্কৃতি ও অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল। ফলস্বরূপ, সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের আমলে চট্টগ্রাম শুধু আঞ্চলিক নয়, বরং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নেটওয়ার্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[২৭]

একই সাথে গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ (১৩৯০-১৪১০) কূটনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ইনি স্থাপন করেছিলেন চীনের সঙ্গে। তাঁর আমলে শ্রীবৃদ্ধিসাধন ঘটেছিল চট্টগ্রাম বন্দরের। সুদূর প্রাচ্যের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে সাফল্য এসেছিল প্রভূত পরিমানে।[২৮] সুমাত্রা হইতে যাত্রা শুরু করে করিয়া চৈনিক প্রতিনিধি দল সমুদ্রপথে একবিংশতি দিবস পরে বাংলাদেশের চেহ-টি-গান (চাটগাঁ) বন্দরে পৌঁছায়।[২৯] মুজাফর শামস্ বলখী যখন শেষবার হজ্জ করতে মক্কায় যান, তখন চট্টগ্রাম বন্দর থেকে যাত্রা করেন। চট্টগ্রামে তিনি

মাসাধিকাল ছিলেন। চট্টগ্রাম থেকে বলখী সুলতান গিয়াস উদ্দিনকে একটি চিঠি লিখে চট্টগ্রামের কারকুনদের কাছে এক ফরমান পাঠাতে অনুরোধ জানান, যাতে তারা প্রথম জাহাজেই মক্কা যাত্রী দরবেশদের স্থান করে দেয়।[৩০] এ থেকে বঙ্গদেশের তীর্থযাত্রীরা চট্টগ্রাম বন্দরের সাহায্যে আরব যেতো তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

যাইহোক বাঙালিরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অত্যন্ত তৎপর ছিল। সে সময় বঙ্গদেশে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা তৈরি হতো, যার মধ্যে রৌপ্য মুদ্রাকে 'তঙ্কা' বলা হতো এবং এটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো।[৩১] অন্যদিকে রাজধানীর বহু ধনী ব্যক্তির নিজস্ব জাহাজ ছিল, যা তাদের সমুদ্রপথে বাণিজ্য পরিচালনায় সহায়তা করত। ফলে তারা সহজেই বাইরের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বহির্বাণিজ্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। চীনা পর্যটক মা-হুয়ান তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে উল্লেখ করেছেন যে, এদেশে সমুদ্রগামী নৌযান নির্মাণের প্রচলন ছিল। ধারণা করা হয়, চট্টগ্রাম এই নৌকা নির্মাণ শিল্পের একটি প্রধান কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল।[৩২] এছাড়াও চীনা বিবরণ থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, সোনারগাঁও ও চট্টগ্রাম বন্দরের উপর সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল, যা তাঁর শাসনক্ষমতা ও বাণিজ্যিক দক্ষতার পরিচয় বহন করে।[৩৩]

আরাকান রাজার সঙ্গে সম্পর্ক:

আরাকানের রাজা গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ-এর দরবারে সিংহাসনচ্যুত শাসক আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। আজম শাহ তাকে পুনরায় আরাকানের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই প্রচেষ্টা সফল হয়নি।[৩৪] পঞ্চদশ শতকে আরাকান ধীরে ধীরে একটি শক্তিশালী ও প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতার কেন্দ্রে পরিণত হয়। এই সময়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ক্ষমতার লড়াই তীব্র আকার ধারণ করে। এই প্রেক্ষাপটে রাজা রাজাথুর পুত্র নারামেখলা (১৩৯৭–১৪০১) তাঁর শাসনকালের প্রথম দিকেই প্রতিদ্বন্দ্বীদের চাপে পড়ে আরাকান ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তিনি নিরাপত্তার জন্য বাংলার রাজধানী গৌড়ে আশ্রয় নেন। গৌড়ে অবস্থানকালে তিনি বাংলার সুলতানের সহায়তা লাভের চেষ্টা করেন, যাতে পুনরায় নিজের রাজ্য পুনরুদ্ধার করা যায়।[৩৫]

উপসংহার:

উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারা যায় যে, সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ মধ্যযুগে বাংলার সমস্ত সুলতানদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। যিনি তৎকালীন সময় যেভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন তা তাঁর অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় বহন করে। পাশাপাশি প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন, সাহিত্যচর্চা, সুফি সাধকদের প্রতি শ্রদ্ধা, আরব দেশে মাদ্রাসা-সরাইখানা নির্মাণ, চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সহায়তা ও আরাকান রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাই ঐতিহাসিক সুখময় বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন, বাংলার সমস্ত স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে তাঁর মতো আকর্ষণীয় চরিত্র বোধ হয় আর ছিল না। সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের জীবনে কোন কোন ঘটনা এতই বিচিত্র যে সেগুলি থেকে একে রূপকথার রাজপুত্রের সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করা হয়।

একই সাথে তার শাসনামলে বাংলার রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি ন্যায়পরায়ণ ও উদার শাসক হিসেবে প্রজাদের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। বিশেষত পারস্যের কবি হাফেজের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ তাঁর সাহিত্যরুচি ও সংস্কৃতিপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। এছাড়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের মাধ্যমে বাংলাকে সমকালীন বিশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত করার ক্ষেত্রেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ফলে সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের শাসনকাল মধ্যযুগীয় বাংলার ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়।

তথ্যসূত্র:

১. সলীম, গোলাম হুসেন। রিয়াজ-উস-সলাতিন। অনু. শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত (স.), দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৭, পৃ.২৮।

২. চৌধুরী, তেসলিম। ভারতের ইতিহাস আদিমধ্য যুগ থেকে মধ্যযুগে উত্তরণ ৬০০-১৫৫৬। প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৫২২।

৩. আনিসুজ্জামান। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী)। দ্বিতীয় খন্ড,বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ৩-৭।

৪. মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুখময়। বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর: স্বাধীন সুলতানদের আমল (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রী:)। ভারতী বুক স্টল, কলকাতা, জুলাই ১৯৬০, পৃ. ৮২।

৫. করিম, আবদুল। বাংলার ইতিহাস সমাজ ও রাজনীতি। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০২২, পৃ. ২০৭।

৬. করিম, আবদুল। বাংলার ইতিহাস মুসলিম বিজয় থেকে সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত (১২০০-১৮৫৮ খ্রী:)। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০২১, পৃ. ৮০।

৭. করিম, আবদুল। প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০।

৮. খান, আবিদ আলী। গৌড় ও পান্ডুয়ার স্মৃতি। চৌধুরী শামসুর রহমান (স.) সোপান পাবলিশার, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৩৫।

৯. মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুখময়। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।

১০. সেলিম, গোলাম হুসেন। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।

১১. Allami, Abul Fazl. *The Ain-i Akbari.* vol. 2. (T.) Colonel H.S. Jarrett, The Asiatic Society, Kolkata, 2010, p. 161.

১২. মজুমদার, রমেশচন্দ্র। বাংলাদেশের ইতিহাস। দ্বিতীয় খন্ড, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ফাল্গুন ১৩৭৩, পৃ. ৪২।

১৩. আহমদ, ওয়াকিল। বাংলার মুসলমানের শিকড় ও আত্মপরিচয় (মধ্যযুগ)। বইপত্র, ঢাকা ২০২২, পৃ. ৮৯।

১৪. করিম, আবদুল। প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২।

১৫. তদেব, পৃ. ২১৩।

১৬. করিম, আবদুল। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।

১৭. করিম, আবদুল। প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩।

১৮. তদেব, পৃ. ২১৪।

১৯. চৌধুরী, তেসলিম। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৩।

২০. মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুখময়। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯।

২১. আহমদ, ওয়াকিল। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯।

২২. মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুখময়। প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬।

২৩. আহমদ, ওয়াকিল । বাংলার বিদেশী পর্যটক। গতিধারা, ঢাকা, মে ২০১৪, পৃ. ৩০ ।

২৪. করিম, আবদুল। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।

২৫. তদেব, পৃ. ৭৬।

২৬. রহিম, এম আবদুর, চৌধুরী, আবদুল মোমিন, মাহমুদ এ বি মহিউদ্দিন, এবং ইসলাম, সিরাজুল। বাংলাদেশের ইতিহাস। নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ১৯৭১, পৃ. ১৯০।

২৭. রহমান, মাহবুবুর। বাংলার সামাজিক সাংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক ইতিহাস। মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, সেপ্টেম্বর ২০১৩, ঢাকা, পৃ. ৫০।

২৮. রিজভী, এস. এ এ। অতীতের উজ্জ্বল ভারত। (অনু.) অংশুপতি দাশগুপ্ত, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা ২০১৫, পৃ. ১৩৪।

২৯. রহিম, এম. আবদুর চৌধুরী, আবদুল মোমিন, মাহমুদ এ বি মহিউদ্দিন, এবং ইসলাম, সিরাজুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯।

৩০. মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুখময়। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।

৩১. করিম, আবদুল। প্রাগুক্ত,পৃ. ৭৬।

৩২. আহমদ, ওয়াকিল। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

৩৩. করিম, আবদুল। প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০।

৩৪. চৌধুরী, তেসলিম। প্রাগুক্ত,পৃ. ৫৩৩।

৩৫. https/www.britinnica.com/biography/Narameikhla, 10.03.2023.

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1326-1332
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.352

কালিদাসের রচনায় নারী মনস্তত্ত্ব

শিপ্রা পাল, *গবেষক, সংস্কৃত বিভাগ, সিধো কানহু মুর্মু বিশ্ববিদ্যালয় পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 19.03.2026; Accepted: 21.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Kalidasa is universally regarded as one of the greatest poets and dramatists of Sanskrit literature. His works represent the highest achievement of classical Sanskrit poetry in terms of beauty, imagination, and philosophical depth. Because of his extraordinary poetic genius, Kalidasa is often described as the "ever-luminous star" in the vast sky of Sanskrit literary tradition. The exact period of Kalidasa remains uncertain, but many scholars believe that he flourished during the Gupta age, often called the golden age of Indian culture and literature. His literary creations display an extraordinary command over language, refined aesthetic sensibility, and deep understanding of human emotions and nature.

Kalidasa's major works include the celebrated plays Abhijnanasakuntalam, Malavikagnimitram, and Vikramorvasiyam. Among his poetic compositions, Raghuvamsa and Kumarasambhava are regarded as magnificent mahakavyas, while Meghaduta and Ritusamhara are lyrical masterpieces. These works demonstrate his unique ability to blend poetic imagination with natural beauty and human sentiment. One of the most remarkable features of Kalidasa's poetry is his vivid description of nature. In his works, nature is not merely a background but an active participant in human emotions. His descriptions of seasons, landscapes, clouds, rivers, and mountains are filled with sensitivity and artistic brilliance. Another significant aspect of his poetry is the delicate portrayal of love, devotion, separation, and longing, which makes his works deeply appealing to readers across ages.

Kalidasa also shows a profound understanding of Indian culture, mythology, and philosophical thought. His works harmoniously combine aesthetic beauty with moral and spiritual ideals. The influence of Kalidasa extends far beyond India; his play Abhijnanasakuntalam was translated into several European languages and greatly admired by Western scholars and poets.

Thus, Kalidasa stands as an immortal poet whose works continue to illuminate the literary world with timeless beauty and universal human values.

Keywords: Kalidasa, Sanskrit Literature, Classical Poetry, Abhijnanasakuntalam, Meghaduta, Raghuvamsa, Kumarasambhava, Nature in Poetry, Gupta Age, Sanskrit Drama

সংস্কৃতসাহিত্যের এক স্বনামধন্য ও কালজয়ী স্রষ্টা হলেন কালিদাস। সভ্যতার সেই আদিকাল থেকে ঋষিরা যে জীবন বাণীকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তাদের সাধনায়। যে সাধনায় জগৎ সৃষ্টির কথা ছিল, মানব অনুভূতির গল্প এবং জীবনের অন্তঃস্থলে বেড়ে ওঠা দার্শনিক অনুভূতির মোরখ ছিল। ঋষিদের সেই দার্শনিক অনুভূতিকে হৃদয় দিয়ে শোষণ আপন দর্শন ও সৃষ্টিশীলতায় যিনি বইয়ে দিয়েছিলেন তিনি কালিদাস। তার সূক্ষ্ম দার্শনিক অনুভূতি

কাব্যিক ব্যঞ্জনায় অভিব্যঞ্জিত- "সোহম্ আজন্মশুদ্ধানামাফলোদয়কর্মণাম্।[১] আবার একই অনুভূতি "তং সন্তু শ্রোতুমর্হন্তি সদসদ্ব্যক্তিহেতবঃ।"[২] উপমা প্রয়োগে তিনি সিদ্ধহস্ত। ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর সভার বর্ণনায় তিনি বলেন-

"সঞ্চারিণী দীপশিখেব রাত্রৌ যং যং ব্যতীয়ায় পতিম্বরা সা।
নরেন্দ্রমার্গাট্ট ইব প্রপেদে বিবর্ণভাবং স স ভূমিপালঃ।"[৩]

অর্থাৎ, রাত্রিকালে সঞ্চারিণী দীপশিখা রাজমার্গের পার্শ্বস্থ অতিক্রান্ত প্রাসাদগুলিকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করে উত্তরোত্তরবর্ত্তী প্রাসাদ ক্রমশঃ উজ্জ্বল করে তোলে তেমনি স্বয়ম্বরসভায় ইন্দুমতী যে যে ভূমিপালকে অতিক্রম করে চললেন তাদের মুখশশী ক্রমশঃ বিষাদে মলিন হতে লাগল এবং পুরোবর্ত্তী রাজগণের মুখমণ্ডল অনুরাগ লাভেরআশায় সমুজ্জ্বল হতে লাগল। বিশ্বকল্যাণের বাণী তাঁর রচনায় সর্বত্র প্রতিধ্বনিত। কালিদাসের চেতনায় কিভাবে নারী মনস্তত্ত্ব প্রতিফলিত হয়েছে তাই হল আমার বর্তমান গবেষণা পত্রের সারাংশ।

কালিদাসের কাব্যে নারীর প্রেম ও লজ্জার সমন্বয়: কালিদাসের কাব্যে নারীচরিত্র যেন সৌন্দর্য ও সংযমের এক অনুপম সম্মিলন। তাঁর নায়িকারা কেবল প্রেমাসক্ত নয়, তারা লজ্জাশীলা আবার কেবল লাজুক নয়, তাঁরা গভীর অনুরাগে উদ্ভাসিত। প্রেম (শৃঙ্গার) ও লজ্জা (লজ্জা-ভাব) এই দুই বিপরীত স্রোত তাঁর কাব্যে মিলিত হয়ে সৃষ্টি করেছে এক অপূর্ব নান্দনিক সুষমা শকুন্তলা আশ্রম বর্ধিত তাই স্বভাবতই লজ্জা তাঁর অকৃত্রিম আভরণ। "নিসর্গাদেব অপ্রগল্‌ভস্তপস্বিকন্যাজনঃ"[৪] শকুন্তলা চরিত্রে আমরা প্রেম ও লজ্জার সূক্ষ্ম মেলবন্ধন দেখি। তাঁর শৃঙ্গারলজ্জা এক অদ্ভুতভাবে ধ্বনিত হয়েছে–

"অভিমুখে ময়ি সংহৃতমীক্ষিতম্ হসিতমন্যনিমিত্তকৃতোদয়ম্।
বিনয়বারিতবৃত্তিরতস্তয়া ন বিবৃতো মদনো ন চ সংবৃতঃ।।"[৫]

কখনো সে কুশাঙ্কুরের দ্বারা চরণ ক্ষত হয়েছে এই ছলে কয়েক পা গিয়েই থেমে গেছে; গাছের ডালে নিজ বল্কল বসন আটকে না গেলেও ছাড়াবার অছিলাই রাজার দিকে চেয়েছে । এ যেন প্রেমের অন্য এক অভিব্যঞ্জনা- "নানাবিকারৈঃ সুব্যক্তঃ শৃঙ্গারাকৃতিসূচকৈঃ।[৬] দুষ্যন্তের প্রতি তাঁর আকর্ষণ স্পষ্ট, কিন্তু সে প্রেম কখনোই অশালীন উচ্চারণে প্রকাশ পায় না– "মিথঃ প্রস্থানে পুনঃ শালীনতায়াপি কামমাবিষ্কৃতো ভাবস্তত্রভবত্যাঃ।"[৭]

প্রিয়ংবদা ও অনসূয়ার সামনে তিনি লজ্জায় নিমীলিত নেত্রে নিজের হৃদয়ের কথা স্বীকার করেন। দুষ্যন্তকে দেখে তাঁর মনের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে কবি লিখেছেন– "তব ন জানে হৃদয়ং..."[৮] এখানে রয়েছে তাঁর নিবিড় মানসিক আন্দোলন আবার যখন দুষ্যন্ত বিদায় নেন, শকুন্তলার অন্তর ব্যাকুল, কিন্তু মুখে লজ্জার আবরণ। তাঁর প্রেম উচ্চকণ্ঠ নয়, নিঃশব্দ অন্তর্মুখী, অথচ গভীর। কুমারসম্ভবম্-এ পার্বতীর প্রেম আরও সংযত ও তপস্যাময়। শিবের প্রতি তাঁর অনুরাগ প্রকাশিত হয়েছে কঠোর সাধনায়, কিন্তু প্রত্যক্ষ মিলনের মুহূর্তে তাঁর লজ্জা কবিকে মুগ্ধ করেছে। শিবের সামনে পার্বতীর নম্র অবনত দৃষ্টি, লাজে রাঙ্গা গাল -এইসব চিত্র কাব্যে

---

[১] রঘুবংশম্ ১, ৫

[২] রঘুবংশম্ ১, ১০

[৩] রঘুবংশম্ ৬, ৬৭

[৪] অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, দ্বিতীয় অঙ্ক

[৫] অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ দ্বিতীয় অঙ্ক, ১১

[৬] অর্থদ্যোতনিকা, রাঘবভট্ট

[৭] রঘুবংশম্ ৬, ৮১

[৮] অভিজ্ঞানসশকুন্তলম্ ২, ১৩

শৃঙ্গার রসকে মাধুর্যমণ্ডিত করেছে। একস্থানে কবি বলেন- "সা বালা লজ্জানমিতা" এখানে "লজ্জানমিতা" শব্দেই নারীত্বের সৌন্দর্য ধরা পড়েছে। প্রেম আছে , কিন্তু আত্মসমর্পিত নয়; বরং লজ্জার আবরণে আবিষ্ট । রঘুবংশম্-এ ইন্দুমতী অজ-এর প্রতি আনুরাগ লজ্জাবশতঃ বাণী দ্বারা প্রকট না করলেও প্রেমের সাত্ত্বিকভাব শরীররূপী যষ্টি বিদীর্ণ করে প্রকটিত হয়েছে-

"সা যূনি তস্মিন্নভিলাষবন্ধং শশাক শালীনতায়া ন বক্তুম্।
রোমাঞ্চলক্ষেণ স গাত্রযষ্টি ভিত্বা নিরাকামদরালকেশ্যাঃ।"[৯]

বিক্রমোবর্শীয়ম্-এ উর্বশী স্বর্গীয় অপ্সরা; তবু পুরুরবার প্রতি তাঁর প্রেমে লজ্জার সূক্ষ্ম স্পর্শ রয়েছে। তিনি দেবলোকের নৃত্যশিল্পী, কিন্তু প্রেমে তিনি মানবী। পুরুরবার সামনে তাঁর আকুলতা প্রকাশ পেলেও, প্রথম সাক্ষাতে তিনি সঙ্কোচে নত হন। এই সঙ্কোচই তাঁর প্রেমকে মর্যাদা দিয়েছে।

মেঘদূতে প্রেয়সী সরাসরি উপস্থিত নন, কিন্তু যক্ষের স্মৃতিচিত্রে তাঁর লজ্জাশীলা রূপ ফুটে ওঠে। যক্ষ কল্পনা ক্রেন,প্রিয়ার চরণে অলকাবতীর ফুল, কিন্তু মুখে স্নিগ্ধ লাজ। এখানে প্রেম স্মৃতির মাধ্যমে উদ্ভাসিত, আর লজ্জা সেই স্মৃতিকে কোমলতা দিয়েছে। কালিদাসের কাব্যে নারী কেবল রূপময়ী নয়, রসসমৃদ্ধ। তাঁর নারীরা প্রেমে উজ্জ্বল, কিন্তু সেই প্রেম কখনো উচ্ছৃঙ্খল নয়। লজ্জা তাদের প্রেমকে পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য দিয়েছে। প্রেম যেখানে অন্তরের অগ্নি, লজ্জা সেখানে তার চন্দনলেপ; প্রেম যেখানে আকাঙ্খা, লজ্জা সেখানে সংযমের অলঙ্কার। এইভাবেই কালিদাস নারীর হৃদয়ে প্রেম ও লজ্জার যুগলবন্দী সৃষ্টি করে ভারতীয় কাব্যধারায় এক চিরন্তন আদর্শ স্থাপন করেছেন।

কালিদাসের কাব্যে বিরহবেদনা ও সংবেদনশীলতা: সংস্কৃতসাহিত্যের অমর কবি কালিদাস তাঁর কাব্যে প্রেম, প্রকৃতি ও মানবমনের সূক্ষতম অনুভূতিকে যে অপূর্ব শিল্পে রূপায়িত করেছেন, তার কেন্দ্রবিন্দুতে বারবার আবির্ভূত হয়েছে নারীচরিত্রের বিরহবেদনা ও সংবেদনশীলতা। তাঁর নায়িকারা কেবল প্রেমের অলংকার নন; তাঁরা প্রেমের অন্তর্লীন ব্যথা, প্রতীক্ষার দীর্ঘশ্বাস, স্মৃতির দহন আত্মসমর্পণের নির্মল দীপ্তির জীবন্ত প্রতিমা। মেঘদূতে নির্বাসিত যক্ষ তার প্রিয়ার কাছে মেঘকে দূত করে পাঠায়। এখানে নায়িকার সংলাপ নেই, তবু তাঁর বিরহবেদনাই কাব্যের প্রাণ। যক্ষ কল্পনা করে বলে "চক্ষুঃ খেদাৎ সলিলগুরুভিঃ...।"[১০] মেঘের আগমনে তার নয়নজল শান্ত হবে। এ উক্তিতে নারীর অশ্রু কেবল শোকের চিহ্ন নয়, তা প্রেমের নিবিড়তার প্রতীক। প্রেম যেমন গভীর, বিরহ ঠিক ততটাই গভীর। বিরহিণী প্রিয়া রাত্রির নীরবতায় চন্দ্রালোকে প্রিয়তমের স্মৃতি আঁকড়ে ধরে -এই চিত্রায়ণে কালিদাস প্রকৃতির সঙ্গে নারীর অন্তর্জগতকে ত্রকসূত্রে বেঁধেছেন। মেঘের গভীর গর্জন যেন তার হৃদয়ের আর্তনাদ, বিদ্যুৎ রেখা যেন ক্ষণিক আশার ঝলক।

অভিজ্ঞানশকুন্তলমে নাটকে শকুন্তলার প্রেম ও বিরহ ভারতীয় সাহিত্যের এক চিরন্তন অধ্যায়। রাজা দুষ্যন্তের বিস্মৃতির ফলে শকুন্তলার অন্তরে যে আঘাত জন্মায়, তা ব্যক্ত হয়েছে মৃদু অথচ তীব্র সংলাপে। শকুন্তলার প্রেম কখনও ম্লান হয় না; প্রিয়জনকে বিস্মৃত হওয়া তার ধর্ম নয়। প্রিয়ার জন্য তিনি সুদীর্ঘ বিরহব্রত ধারণ করেছেন। এখানে নারীর সংবেদনশীলতা আত্মমর্যাদার সঙ্গে যুক্ত। তিনি কেবল ব্যথিত নন, অপমানিতও। তাঁর বিরহ দুঃখময় হলেও মর্যাদাপূর্ণ। প্রকৃতির কোলেই বেড়ে ওঠা শকুন্তলার অশ্রু যেন আশ্রমের লতাপাতায়

[৯] রঘুবংশম্ ৬, ৮১

[১০] মেঘদুতম্ উত্তরমেঘ, ২৭

ঝরে পড়ে- কালিদাসের কলমে নারী ও প্রকৃতি একাকার। কুমারসম্ভবম্-এ পার্বতীর প্রেম এক তপস্যাময় বিরহ। শিবের প্রতি তাঁর একনিষ্ঠ প্রেম আত্মসংযমের কঠোর সাধনায় রূপ নেয়। "তপসা কিল বিশ্বস্য স্থিরতা"[১১]

অর্থাৎ, তপস্যাতেই বিশ্বের স্থিতি। উমার প্রেম তাই ব্যক্তিগত আকুলতা ছাড়িয়ে বিশ্বজনীন শক্তির প্রতীক। তাঁর বিরহ কেবল প্রিয়ালাভের বাসনা নয়; তা আত্মোন্নতির সোপান। সংবেদনশীলতা এখানে দুর্বলতা নয়, বরং আধ্যাত্মিক দৃঢ়তার প্রকাশ।

ঋতুসংহারে বিভিন্ন ঋতুর বর্ণনায় প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন ও বিরহের রূপ ফুটে উথেছে। বর্ষার দিনে প্রিয়ের অনুপস্থিতিতে নারীর হৃদয়ে ব্যাথার সুর ধ্বনিত হয়, আবার বসন্তে সে আশা উদ্দীপনায় ভরে ওঠে। কালিদাস বলেন –"প্রিয়বিরহকাতরাণাং হৃদয়ং ঋতুভিঃ..."[১২] অর্থাৎ প্রিয় বিরহে কাতর হৃদয় ঋতুচক্রে স্পর্শিত হয়।এখানে প্রকৃতি নারীর অন্তর্জগতের প্রতিচ্ছবি মেঘ, বায়ু, পুষ্প, চন্দ্র সবই তার অনুভূতির সহচর। বর্ষায় গম্ভীর মেঘরাশি ও সৌদামিনী নারীর হৃদয়ে প্রিয়বিরহের যন্ত্রণাকে আরও তীব্রতর করে তুলেছে। প্রোষিতভত্তৃকা নারীরা মালা, আভরণ ও অনুলেপন ত্যাগ করে প্রিয়ার জন্য উৎকণ্ঠিত।

কবিগুরু এ বিরহের মাঝে এক সার্বজনীন বিরহকে খুঁজে পেয়েছেন। তিনি বলেন- "প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অতলস্পর্শ বিরহ। আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাহি সে আপনার মানসসরোবরের অগম্য তীরে বাস করিতেছে; সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠানো যায়, সেখানে সশরীরে উপনীত হইবার কোনো পথ নাই"।[১৩] কালিদাসের কাব্যে নারীর বিরহবেদনা কখনও অশ্রুসজল,কখনও ধ্যানমগ্ন, কখনও আত্মমর্যাদায় দীপ্ত। তাঁর নায়িকারা নিছক প্রেমের অবলম্বন নন; তাঁরা অনুভূতির গভীরতম সুর। বিরহ তাঁদের কাছে ক্ষয় নয়, এক অন্তর্লীন জাগরণ। সংবেদনশীলতা তাঁদের দুর্বলতা নয়, বরং সৃষ্টিশীল শক্তি। এইভাবেই কালিদাস নারীর হৃদয়কে প্রকৃতির মহিমার সঙ্গে মিলিয়ে এক চিরন্তন কাব্যজগৎ নির্মাণ করেছেন, যেখানে বিরহ মানেই ব্যাথা নয়, তা প্রেমের পরিশুদ্ধ রূপ; আর নারী মানেই আকঙ্খা নয়, তিনি অনুভূতির অনন্ত আকাশ।

কালিদাসের কাব্যে নারীর ভাবনাত্মক সন্তুলন: সংস্কৃত সাহিত্যের দিগন্তে কালিদাস এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর কাব্যে নারী কেবল প্রেমের অলঙ্কার নন, তিনি অনুভূতির কেন্দ্র, নৈতিকতার দিশারী এবং জীবনের গভীর মানবিকতার প্রতিমূর্তি। নারীর চিত্তের যে সূক্ষ্ম কম্পন, যে দ্বন্দ্ব, যে সংযম ও সমর্পণের সমবায় কালিদাস তারই এক অনন্য রূপকার। তাঁর রচনায় নারীর ভাবনাত্মক সন্তুলন (emotional balance) এক বিশেষ নন্দনতাত্ত্বিক ও দার্শনিক তাৎপর্য বহন করে।

অভিজ্ঞানশকুন্তলম-এ শকুন্তলার চরিত্রে আমরা দেখি প্রেমের আবেগ ও লজ্জার সংযমের এক অপূর্ব সমন্বয়। দুষ্যন্তকে প্রথম দর্শনে তাঁর হৃদয়ে যে কম্পন জাগে, তা উচ্ছ্বাসে বহমান নয়; বরং তা অন্তর্মুখী, নিবৃত্ত, সংযত। কালিদাস বলেন- সে যেন আর-এক লতা, যার দোলনায় হৃদয়ের গোপন ভাষা ব্যক্ত হয়। শকুন্তলার প্রেম প্রকাশ্য নয়, তবু গভীর; স্পষ্ট নয়, তবু স্পর্শকাতর। তাঁর ভাবনায় আকুলতা আছে, কিন্তু তা কখনো অসংযত নয়। এ এক অন্তর্লীন আবেগ, যেখানে প্রেম ও মর্যাদা পাশাপাশি অবস্থান করে।

কুমারসম্ভব-এ পার্বতীর চরিত্র নারীর ভাবনাত্মক সন্তুলনের এক মহিমান্বিত দৃষ্টান্ত। তিনি একদিকে প্রেমাসক্তা, অন্যদিকে তপস্বিনী। শিবপ্রাপ্তির জন্য তাঁর কঠোর সাধনা কামনার অন্ধতা নয়; তা এক চেতনার

---

[১১] শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ ৩.১২.১৮

[১২] ঋতুসংহারম্ ৬, ২৫

[১৩] প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উত্তরণ। কালিদাস বলেন "তপঃ কিলেদং তদবাপ্তিসাধনম্।"[১৪] তপস্যার মাধ্যমেই শ্রেয়স লাভ হয়। পার্বতীর প্রেম দেহগত নয়, আত্মগত; কামনা নয়, ব্রত। তিনি আবেগে আবিষ্ট হলেও আত্মমর্যাদা বিসর্জন দেন না। এই সংযমই তাঁর ভাবনাত্মক ভারসাম্যকে মহত্ত্বে উন্নীত করেছে।

মেঘদূত-এ যক্ষপত্নীর চরিত্রে বিরহের যে রূপ ফুটে ওঠে, তা আর্তনাদময় নয়, বরং ধ্যানমগ্ন। স্বামীবিয়োগে তিনি ভেঙে পড়েন না; বরং স্মৃতির ভিতর দিয়ে বেঁচে থাকেন। কবি বলেন"প্রেক্ষিষ্যন্তে পথিকবনিতাঃ প্রত্যয়াদাশ্বসত্যঃ..."[১৫] প্রিয়ার হৃদয়ে সন্দেহ নয়, বিশ্বাসই প্রধান আশ্রয়। এখানে নারী বিরহিণী, কিন্তু অসহায় নন; তিনি অপেক্ষমাণ, কিন্তু ভগ্ন নন। তাঁর ভালোবাসা ধৈর্যের, তাঁর স্মৃতি আশার। এই ধৈর্যই নারীর ভাবনাত্মক শক্তির পরিচয় বহন করে।

রঘুবংশ-এ ইন্দুমতী বা অযোধ্যার রাণীদের চিত্রণে দাম্পত্য সম্পর্কের এক মর্যাদাপূর্ণ ভারসাম্য দেখা যায়। তাঁরা স্বামীর সহধর্মিণী—অধীন নয়, সহযাত্রী। এক স্থানে কবি ইঙ্গিত করেন- "গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ।"[১৬] গৃহিণী একই সঙ্গে পরামর্শদাত্রী ও সখী। এ উক্তির মধ্যেই নারীর ভাবনাত্মক অবস্থানের সংজ্ঞা নিহিত তিনি সংসারের অলঙ্কার নন, প্রজ্ঞার সহচরী। আবেগ ও প্রজ্ঞার এই যুগলবন্দিই কালিদাসীয় নারীচরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

রবীন্দ্রনাথ বলেন– "কালিদাস তাহার এই আশ্রমপালিতা উদ্ভিন্নযৌবনা শকুন্তলাকে সংশয়বিরহিত স্বভাবের পথে ছাড়িয়া দিয়াছেন, শেষ পর্যন্ত কোথাও বাধা দেন নাই। আবার অন্য দিকে তাহাকে অপ্রগল্‌ভা, দুঃখশীলা, নিয়মচারিণী, সতীধর্মের আদর্শরূপিণী করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।এক দিকে তরুলতাফলপুষ্পের ন্যায় সে আত্মবিস্মৃত স্বভাবধর্মের অনুগতা; আবার অন্যদিকে তাহার অন্তরতর নারীপ্রকৃতি সংযত, সহিষ্ণু, একাগ্রতপঃপরায়ণা, কল্যাণধর্মের শাসনে একান্ত নিয়ন্ত্রিতা। কালিদাস অপরূপ কৌশলে তার নায়িকাকে লীলা ও ধৈর্যের, স্বভাব ও নিয়মের, নদী ও সমুদ্রের ঠিক মোহনার উপর স্থাপিত করিয়া দেখাইয়াছেন"।"[১৭]

কালিদাসের কাব্যে নারী কখনো অতিরঞ্জিত রোমান্টিক প্রতিমা নন, আবার কেবল সহনশীলতার প্রতীকও নন। তিনি অনুভূতির গভীরতা, সংযমের দীপ্তি এবং আত্মমর্যাদার নীরব শক্তির সম্মিলন। প্রেমে লজ্জা, বিরহে ধৈর্য, তপস্যায় দৃঢ়তা, দাম্পত্যে সহমর্মিতা— এই চারটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়েই কালিদাস নির্মাণ করেছেন নারীর ভাবনাত্মক সন্তুলনের এক চিরন্তন রূপ। অতএব বলা যায়, কালিদাসের কাব্যে নারী কেবল নায়িকা নন, তিনি চেতনার সমতা, হৃদয়ের শুদ্ধতা এবং মানবিকতার সূক্ষ্ম সুষমার এক অনুপম রূপক।

কালিদাসের কাব্যে নারীর সৌন্দর্চেতনা: কালিদাসের কাব্যে নারীর সৌন্দর্যচেতনা কেবল বাহ্যিক রূপবর্ণনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; তা এক গভীর নান্দনিক ও আধ্যাত্মিক অনুভবের প্রকাশ। তাঁর কাব্যে নারী কখনো প্রকৃতির অনুরণন, কখনো প্রেমের প্রতিমা, কখনো আবার তপস্যার দীপ্ত আভা। রূপ, লজ্জা, কোমলতা, স্বাধিকারবোধ ও হৃদয়ের নিবেদন সব মিলিয়ে নারীমূর্তি তাঁর কাব্যে এক পরিপূর্ণ নন্দনসত্তা।

কালিদাস নারীর সৌন্দর্যকে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম করেছেন। কুমারসম্ভবে পার্বতীর রূপবর্ণনায় তিনি বলেন "মুখেন সা পদ্মসুগন্ধিনা নিশি প্রবেপমানাধরপত্রশোভিনা।"[১৮] এখানে মুখ পদ্মের সঙ্গে, অধর পত্রদলের সঙ্গে

---

[১৪] কুমারসম্ভবম্ ৫, ৬৪

[১৫] মেঘদূত পূর্বমেঘ, ৮

[১৬] রঘুবংশম্ ৮, ৬৭

[১৭] প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৮] কুমারসম্ভবম্ ৫, ২৭

তুলিত কিন্তু এই উপমা নিছক অলংকার নয়; প্রকৃতির সৌন্দর্য যেন নারীর অঙ্গে প্রতিফলিত। নারী ও প্রকৃতি পরস্পরের প্রতিবিম্ব। আবার ঋতুসংহার–এ ঋতুভেদে রমণীদের রূপবদল বর্ণনা করতে গিয়ে কবি দেখিয়েছেন, বসন্তের কুসুম যেমন প্রস্ফুটিত হয়, তেমনি নারীর হৃদয়ও প্রেমস্পর্শে প্রস্ফুটিত হয়। প্রকৃতি এখানে নারীর অন্তর্জগতের রূপক।

কালিদাসের নায়িকারা অশ্লীলতামুক্ত, মার্জিত ও লাজুক। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্–এ শকুন্তলার প্রথম আবির্ভাবে দুষ্যন্তের দৃষ্টিতে তিনি যেন অরণ্যের হরিণীর মতো। লজ্জা আর সঙ্কোচ ভরা তাঁর নয়ন। এই লজ্জা তার দুর্বলতা নয়, বরং সৌন্দর্যের অলংকার। লজ্জাই নারীর প্রকৃত শোভা। নারীর সৌন্দর্যচেতনা এক নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সঙ্গে যুক্ত। মেঘদূতে বিরহিণী যক্ষিণীর চিত্রণে কবি এক অনুপম মানসিক সৌন্দর্য তুলে ধরেছেন। যক্ষ মেঘকে বলে— "স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্যাশ্রমেষু।"[১৯] সেই প্রিয়ার হৃদয়ে বিরহের অগ্নি জ্বললেও, তার প্রেম অটল ও নিবেদিত। এখানে নারী কেবল প্রতীক্ষমাণ প্রিয়া নয়; তার অনুভব গভীর, ধৈর্য অনিঃশেষ। প্রেমে তার আত্মসমর্পণ যেমন আছে, তেমনি আত্মমর্যাদাও অটুট।

কুমারসম্ভবে পার্বতীর তপস্যা নারীর আধ্যাত্মিক শক্তির প্রতীক। তিনি কেবল শিবের পত্নী হবার আকাঙ্ক্ষায় তপস্বিনী নন; তিনি নিজের সত্তার পরিপূর্ণতার সন্ধানী। তপস্যার দ্বারা দেহ ক্ষীণ হলেও তার ধৈর্য নড়ে না। এই দৃঢ়তা নারীর অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচায়ক। সৌন্দর্য এখানে তপস্যার দীপ্তিতে আলোকিত। রবীন্দ্রনাথ বলেন "তিনি তপস্যা দ্বারা নিজের রূপকে অবন্ধ করিতে ইচ্ছা করিলেন। এখানে গৌরী তরুণার্ক-রক্তিম বসনে শরীর মণ্ডিত করিলেন না, কর্ণে চুতপল্লব এবং অলকে নবকর্ণিকার পরিলেন না; তিনি কঠোর মৌঞ্জীমেখলা-দ্বারা বল্কল বাঁধিলেন এবং ধ্যানাসনে বসিয়া দীর্ঘ অপাঙ্গে কালিমাপাত করিলেন"।[২০]

কালিদাসের কাব্যে শৃঙ্গাররসই প্রধান, কিন্তু তা কখনো কৃত্রিম নয়। নারীর রূপ বর্ণনায় তিনি চিত্রশিল্পীর সূক্ষ্মতা ও সংগীতজ্ঞের সুরলহরী মিশিয়েছেন। যেমন শকুন্তলার অকৃত্রিম রূপ বর্ণনায় তিনি বলেন "স্ত্রীরত্নসৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি সা মে।"[২১] নারীর মৃদু হাসি ও কোমল ভাষণ এই সামান্য ইঙ্গিতেই কবি পূর্ণ রূপমাধুর্য নির্মাণ করেন। তাঁর দৃষ্টিতে সৌন্দর্য কেবল দেহে নয়, আচরণে, বাক্যে ও অনুভবে। পার্বতী প্রিয়হৃদয়ে স্বীয় হৃদয়কে বিলীন করে দেওয়াকেই প্রকৃত সৌন্দর্য মনে করেন- "প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলা হি চারুতা"।[২২] সৌন্দর্য বাহ্যিক দেহাবরণে নয়; সৌন্দর্য অন্তরের দীপ্তিতে ও আচরণের শুদ্ধতায়। রবীন্দ্রনাথ বলেন "সৌন্দর্য যেখানে ইন্দ্রিয়কে ছাড়াইয়া ভাবের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করে সেখানে বাহ্যসৌন্দর্যের বিধান তাহাতে আর খাটে না। প্রেমের মন্ত্রবলে মন যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করে তাহাকে বাহ্য সৌন্দর্যের নিয়মে বিচার করাই চলে না।"

কালিদাসের কাব্যে নারীর সৌন্দর্যচেতনা বহুমাত্রিক— প্রকৃতির সহচরী, প্রেমের সাধিকা, লজ্জার অলংকারে শোভিতা, আবার তপস্যায় দীপ্ত আত্মমর্যাদাশীলা। তাঁর নায়িকারা কোনো একমাত্রিক প্রতিমা নন; তারা রস, রূপ, ধর্ম ও চেতনার সমন্বিত প্রতিরূপ। এইজন্যই কালিদাসের কাব্যে নারী কেবল দর্শনের বিষয় নয়, অনুভবের সঙ্গিনী রূপে মাধুর্য, মনে অনন্ত গভীরতা, আর সত্তায় এক চিরন্তন নন্দনের আলোকধারা।

---

[১৯] মেঘদূতম্ পূর্বমেঘ, ১

[২০] প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[২১] অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ ২, ৯

[২২] কুমারসম্ভবম্ ৫, ১

উপসংহার: আলোচনার শেষে বলতে পারি যে, কালিদাসের নারীর মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ অত্যন্ত দুরহ, তবুও বলা যায় কালিদাসের জীবন দর্শনে নারী এসেছে তার কাব্যের সঙ্গিনী রুপে, তার ভাবনার সহচরে নারী কখনো নায়িকা কখনো বা প্রতিবাদী কখনও বা স্বপ্নচারিনি। জীবন ও জগত সম্পর্কে সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও মার্মিক উপলব্ধি তাঁর রচনার পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে। তাঁর লেখনীর স্পর্শে সংস্কৃত সাহিত্য আলোকিত; আর সেই আলোকময় সাহিত্যগগনের কেন্দ্রমণ্ডলে আছে নারী। নারীর ভাবনা আর সূক্ষ্মতম অনুভূতি তাঁর কাব্যে প্রাণধারারূপে প্রতিষ্ঠিত। নারীর অন্তর্মনে সূক্ষ্ম কম্পন, অন্তর্লীণ আবেগ, প্রেম-বিরহ, হর্ষ-বিষাদ প্রত্যেক গহন অনুভূতির এক অনন্য রূপকার তিনি। তাঁর কাব্যে নারী বিধাতার অপ্রতিম সৃষ্টি স্ত্রীরত্নতুল্য। অন্তরের শুদ্ধতায়, আচরণের পবিত্রতায় ও চেতনার দীপ্তিতে তাঁরা সতত দেদীপ্যমান। নারীর প্রেম শাশ্বত আনন্দময়, বিরহ তপস্যাময় ও সৌন্দর্য কল্যাণময়। প্রেমের শুদ্ধতা আর পবিত্রতাবলে শকুন্তলার প্রেম স্বর্গীয় সুষমায় মহিমান্বিত। নারীর কোমলতা, ত্যাগশক্তি, আত্মমর্যাদা শাশ্বত মানবীয় মূল্যবোধকে জাগ্রত করে।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. আচার্য, রামণারায়ণ। কুমারসম্ভবম্। মুম্বাই: নির্ণয় সাগর প্রেস, ১৯৫৫।
২. চক্রবর্ত্তী, সত্যনারায়ণ। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৫৯।
৩. ত্রিপাঠী, শ্রীকৃষ্ণমণি। রঘুবংশম্। বারাণসী: চৌখাম্বা সুরভারতী প্রকাশন, ১৯০৩।
৪. পান্ডে, এস। মেঘদূতে নারী সংবেদনশীলতার চিত্রায়ন। দিল্লী: সাহিত্য একাডেমী, ২০১৫।
৫. ভট্টাচার্য, শ্রীমদ্ গুরুনাথ বিদ্যানিধি। রঘুবংশম্. কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৬।
৬. মিশ্র, শ্রী রামচন্দ্র। মালবিকাগ্নিমিত্রম্। বারাণসী: চৌখাম্বা সংস্কৃত সীরিজ অফিস, ১৯৯৩।
৭. মিশ্র, শ্রীরামচন্দ্র। বিক্রমোর্বশীয়ম্। বারাণসী: চৌখাম্বা সংস্কৃত সীরিজ অফিস, ১৯৫৩।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1333-1339
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.353

বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্যের চর্চার কয়েকটি দিক: একুশ শতকের মূল্যায়ন

সৌম্য ঘোষ, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 19.03.2026; Accepted: 21.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In the 2nd century, the two books "Bibhutibhushan: Kathasahitye Vastabvada" by Ramakrishna Bhattacharya and "Bibhutibhushan: Swabiradhi Sanbed" by ChandikaPrasad Ghoshal are of particular importance in the criticism of Bibhutibhushan's literature. Both critics have viewed Bibhutibhushan's literature in two different ways. Neither of them could create any separation between Bibhutibhushan as an individual and his literary world until the end. With this connection, Ramakrishna Bhattacharya has compared Bibhutibhushan with the basic concepts of Marxism, and ChandikaPrasad Ghoshal has compared Bibhutibhushan with Life of Western scholar and philosophy. Chandika Prasad Ghoshal was ultimately able to compose a post-colonial orientalism in the practice of Bibhutibhushan, as a result, it was not reduced to a mere comparison of the West and the East. Ramakrishna Bhattacharya also explored the social history from a realistic perspective. He viewed Bibhutibhushan's literature according to his criteria. As a result, despite seemingly two different dimensions, the two critics were able to meet in a single integral orientalism. And in criticism of Bengali literature, Bibhutibhushan's literary criticism was made most important here, that even if viewed from different ideologies, Bibhutibhushan's literature ultimately speaks a single integral 'word of the soul'.

Keyword: Life of Verrier Elwin, Walden, theory of Erich Fromm, Western Romanticism, Marxist Contradiction

একুশ শতকের প্রথম কুড়ি-পঁচিশ বছরে বিভূতিভূষণের সাহিত্য নিয়ে মার্কসীয় দর্শন এবং বাস্তববাদী দৃষ্টি দিয়ে আলোচনা করেছেন প্রধানত রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য তাঁর "বিভূতিভূষণ ও কথাসাহিত্যে বাস্তববাদ" গ্রন্থে। আরেক সমালোচক চণ্ডিকাপ্রসাদ ঘোষাল "বিভূতিভূষণ: স্ববিরোধী সংবেদ" গ্রন্থে উপনিবেশবাদের প্রভাবে পশ্চিমী রোমান্টিকতা এবং বিশ্বায়নের যুগে বিশ্ব-সত্তার অখণ্ডতা নিয়ে বিভূতি-সাহিত্যের পাঠ নিয়েছেন। আমি আমার নিবন্ধে এই দুটি গ্রন্থ গ্রহণ করে বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্যের চর্চার কয়েকটি দিককে চিহ্নিত করছি।

এক

"পথের পাঁচালী" শুরু থেকেই এক ক্ষুদ্র বিরোধিতা নিয়েই এগিয়ে চলেছে। সে হোক্ গ্রন্থপাঠ কিংবা পত্রিকাপাঠ। খাদ্যরত বুড়ি পিসির সামনে থেকে দুর্গাকে 'উঠে আয় ইদিকে' ডাক দেয় মা সর্ব্বজয়া, অন্যদিকে পিসি বলেন "থাক্"। এই সাধারণ অনুষঙ্গের সঙ্গেই কি ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের শেষ বাক্য "... সেকালের অবসান হইয়া গেল"[১]

মেলানো যায়? খুকি-দুর্গা উঠে গিয়েছিল। ইন্দির ঠাকরুণ 'সেকাল'-এর নিদারুণ বাস্তবতা নিয়ে একাই ছয়টা পরিচ্ছেদ জুড়ে হেঁটে চলে বেড়িয়েছেন। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য এর দুটি গুরুত্ব স্বীকার করেছেন তাঁর আলোচনায়: প্রথমত, গ্রামের মানুষের চোখে সমাজ-ইতিহাসের যে পরম্পরা ধরা পড়েছে, সেখানে কুলীনকন্যার মৃত্যুই 'সে-কাল-এর অবসান'। দ্বিতীয়ত, ইতিহাস এগিয়ে চলার মূল চাবিকাঠি হলো 'দ্বন্দ্ব'। ইন্দির ঠাকরুণের সেকালের সঙ্গে একালের আসলে 'কুলীনকৌলীন্যর জায়গায় কাঞ্চনকৌলীন্যর প্রতিষ্ঠা'।[২] এই আলোচনাটির অধ্যায়ের শিরোনাম "উপন্যাসের মার্কসীয় বিচার..."। সুতরাং স্পষ্ট হয়ে যায়, ইন্দির ঠাকরুণকে বুঝতে আলোচক বাস্তববাদের মূল অস্ত্র হিসেবে এখানে মার্কসীয় বীক্ষণ নিয়ে এসেছেন। সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব এবং প্রয়োজনে যে শোষণ ও তোষণের রাজনীতি গোটা ভারতের ইতিহাসে সংঘটিত হয়েছিল, তা বিপ্লবের সূত্রপাত তো বটেই। কিন্তু তার প্রক্রিয়া কী ছিল? 'দ্বন্দ্ব'। উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রেণিদ্বন্দ্বের অবস্থিতিকে ইতিহাস পরিবর্তনের প্রধানতম অংশ ক'রে ব্যাখ্যা দেয় মার্কসবাদ। সেই তত্ত্বের ক্রমপরিবর্তন ঘটেছে নানা তাত্ত্বিকের হাতে। লেনিনীয় দর্শনে এই দ্বন্দ্বের প্রকার ত্রিবিধ: প্রথম, শ্রম-এর সঙ্গে পুঁজি-র দ্বন্দ্ব; দ্বিতীয়, পুঁজিবাদের নতুন গোষ্ঠীর সঙ্গে বনেদি গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব; তৃতীয়, উপনিবেশস্থিত জাতির দুই মেরূকরণ।[৩]

ইন্দির ঠাকরুণের প্রসঙ্গে যে দুই কালের দ্বন্দ্ব,তা স্পষ্টত দ্বিতীয় শ্রেণির। সমাজের বনেদি-সংস্কারের কৌলীন্যের জায়গায় নব্য-পুঁজিবাদ প্রাধান্য পায়। তাই তেত্রিশ সংখ্যক পরিচ্ছেদে বৃদ্ধ রাণীর মধ্য দিয়ে সর্ব্বজয়ার অন্তরে ইন্দির ঠাকরুণের প্রত্যাবর্তনে দুইকালের ব্যবধান স্পষ্ট করে দেন আলোচক। "পয়সারই আদর ... ওদের তো আপনার লোক... গেরাজ্জি করে কেউ!"[৪]

ঠিক এই 'দ্বন্দ্ব'-এর আরেকরূপ চিহ্নিত করেছেন আলোচক হরিহরের মধ্য দিয়ে। উক্ত ত্রিবিধ দ্বন্দ্বের প্রথমটি, অর্থাৎ শ্রম আর পুঁজির দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত চরিত্র হরিহর। একদিকে পূর্বপুরুষের বংশগত অভিসম্পাতকে নাকচ করে বাড়ির বড়ো ছেলে হয়ে সংসার করছে দিব্য, অন্যদিকে বংশগত কথকতার স্থাবরতায় থিতু থাকতেও পারছে না। সংস্কারের বুকে আঘাত দিয়ে সদ্ গোপকে মন্ত্রদীক্ষা দেবে সে অর্থাৎ পুঁজির দরবারে নিজেকে সঁপে দেওয়া ,নচেৎ দুরবস্থাকে সঙ্গী করে তলিয়ে যাওয়া। শ্রম আর পুঁজির দ্বন্দ্বে শ্রমিকদের এই দ্বিবিধ অভিমুখ থেকে বাঁচার উপায় ছিল বিপ্লব। হরিহরের বংশে বিপ্লব নেই। নিশ্চিন্দিপুরে তাদের বাস। নানা স্থানের অভিজ্ঞতা হরিহরের পরিসরে দ্বন্দ্ব এনেছে বটে, কিন্তু বিপ্লবের জন্ম দিতে পারেনি। তাই দেশ ঘুরে ঘরে ফিরে ভাবতে বসে কীভাবে সাজাবে জমাট করে তার পাঁচালী-কথকতা। অর্থাৎ ইন্দির ঠাকরুণ এবং হরিহরকে কেন্দ্র করে অর্থনীতি ও ইতিহাসের এক সমান্তরাল এবং যুগ্ম পাঠ নিয়েছেন আলোচক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। দেখিয়ে দিয়েছেন নিরলস শান্ত 'পথের পাঁচালী'-র বুকেও কীভাবে উত্তাল হাওয়া ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি করেছিল। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের নিজ অভিমত, মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাস,দর্শন, শিল্প -সাহিত্য চর্চার প্রথম ধাপ হলো সমাজ বিন্যাসের মধ্যে উৎপাদন সম্পর্কের প্রকৃতি নির্ধারণ করা। তাই তো গ্রিসের পুরাণকথার প্রকৃতি বুঝতে গেলে সেই প্রাচীন গ্রিক সমাজের বৈষয়িক বিন্যাসে খোঁজ করতে হয়।[৫]

বাঙাল কথকের মধ্যেও যুগের এই মাত্রা সরগরম। অসহায় হতদরিদ্র কথকও জাল-দানপত্র নিয়ে তৈরি হয় অর্থ এবং সংসারের প্রয়োজনে। সব ছেড়ে চলে আসা কথকও যখন মহা-বামন-ভিক্ষায় কিছুই পেয়ে ওঠে না, তখন অচল দোয়ানি সমেত পাঁচ সিকের মূল্য তখন শ্রমের সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ তো হবেই। ঠিক যেভাবে পিতম কাঁসারি লুট করবে দুর্গাদের বাসনপত্র। নতুন পুঁজিবাদের রেশ যখন অজগাঁয়ে অল্পস্বল্প পৌঁছতে লেগেছে, তখন তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে উঠতে পারছে না পুরাতনের দল। হয় হরিহরের মতো দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হবে নয়তো বাঙাল কথক কিংবা পিতম কাঁসারির মতো পথ খুঁজে নেবে অনালোকিত পথে, ঠকানোর মধ্য দিয়ে, জালিয়াতি ক'রে। এই "মূর্তির পেছনে বড় একটা চালচিত্র"[৬] রাখার রীতিই আসলে তুলে ধরেছেন আলোচক রামকৃষ্ণ

ভট্টাচার্য। সেখানকার জীবনযাত্রার সঙ্গে মিলিয়ে যে বাস্তববাদের পাঠ তিনি নিলেন, সেখানে অবধারিতভাবে ইতিহাসের পটভূমিতে সমাজ, সমাজের পটভূমিতে ব্যক্তির নির্মাণ নির্ধারিত হয়ে গেছে।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য তাঁর "কথাসাহিত্যে বাস্তববাদ" গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় 'বাস্তববাদ' প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন "বাস্তববাদের সঙ্গে উপন্যাসের নাড়ির যোগ; অতিপ্রাকৃত ও নিছকই কাল্পনিক পুরাণকথা ছেড়ে উপন্যাস এল সমকালের জীবন ও ধ্যানধারণাকে হাজির করতে।"[৭]- উল্লেখযোগ্য বিষয় 'ধ্যানধারণা' শব্দটি, সমকালের ধ্যানধারণা কি ঠিক সেই 'কাল্পনিক পুরাণকথা'-কে ছেড়ে সম্পূর্ণ নতুন মৌলিক কোনো বিষয়কে আঁকড়ে ধরেছিল? পারেনি। অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস ব্যাপারটি মানবজীবনের অংশ এবং তার বাস্তবায়ন উপন্যাসের অধিকার। বিভূতিভূষণকে সেই অধিকারের দাবিতে সমর্থন জানিয়েছেন আলোচক। কিন্তু আলোচক আবেগপ্রবণ, অযৌক্তিকতা, মরমী কুয়াশা থেকে বিভূতিভূষণের সাহিত্যকে উদ্ধার ক'রে উজ্জ্বল আলোয় ফেলে দেখেছেন।ফলে প্রকৃতির অতীন্দ্রিয়বাদকে অতিক্রম ক'রে নিখিল প্রকৃতিতে মানব-প্রকৃতির জীবনাচরণকে খুঁজে পেয়েছেন। "বাস্তববাদ বলতে বোঝায় এক ত্রিমাত্রিকতা, এমন এক সর্বব্যাপকতা যা চরিত্র ও মানবীয় সম্পর্কের মধ্যে স্বাধীন সত্তা সঞ্চার করে।... যার বিরোধিতা এ করে তা হচ্ছে ক্ষণিক মেজাজের মাত্রাতিরিক্ত ভক্তি শ্রদ্ধা দ্বারা মানবীয় ব্যক্তিত্বের পূর্ণতার এবং মানুষ ও পরিস্থিতির বস্তুনির্ভর প্রতিনিধিত্বশীল নমুনার ধ্বংসসাধনের।"[৮]

বিশ শতকের তিনের দশক থেকে যে বিচারমূলক বাস্তববাদের ঐতিহ্যে তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য সংজ্ঞায়িত হয়েছে, বিভূতিভূষণের সাহিত্যে সেই বাস্তববাদের ইঙ্গিত ও অবস্থানগুলি চিহ্নিত করে তুলে ধরেছেন আলোচক। হরিহর সেখানে বীরু রায়ের বংশগত অভিশাপ থেকে মুক্ত জ্যেষ্ঠ পুত্র। পৈতৃক পেশায় দ্বন্দ্বকাতর এবং পরিবর্তনোৎসাহী। ক্ষুধাই অপু দুর্গার জীবনে মূল সূত্র ধরে বাস্তববাদকে বহন করে চলেছে। বাস্তববাদ মূলত জীবনের বস্তুকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতা এবং ব্যক্তি বা পরিবেশকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতাজাত তত্ত্ব। তাই হয়তো রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য "স্বপ্ন আর সত্য"-র মতো অধ্যায় লিখলেন। হরিহর, সর্বজয়া,দুর্গার স্বপ্ন তুলে ধরে তার ব্যর্থতা দেখিয়ে দেন। অপুই একমাত্র পূরণ করতে পেরেছে। ব্যবধান মেটাতে পেরেছে স্বপ্ন আর সত্যের। কারণ হরিহর-সর্বজয়া-দুর্গাও তাদের স্বপ্ন নিয়ে 'সেকাল'-এরই বশবর্তী। নতুন কালের নিয়মে সর্বজয়া বা হরিহর কেউই স্বস্তি পায়নি। কথক ঠাকুরকে ট্রেনে তুলে দিয়ে হরিহর তাই বয়সের পার্থক্য গুণে ভাবতে পারে: "সুতরাং তাহারই বা বয়সটা এমন কি হইয়াছে ? কোন্ কাজ করিবার সময়ের অভাব হইতে পারে তাহার?"[৯]

সর্বজয়ার স্বপ্ন স্বচ্ছলতার। দুর্গার স্বপ্ন আবছা আলোয় অনির্দিষ্ট। অপুর স্বপ্ন দিগন্তের। অপু পূর্ণতা পেয়েছে বটে, তবে 'অপরাজিত'-এ। তার নির্মাণের সঙ্গে মিশে আছে লেখকের বেদনা, দুঃখ, অনুভূতি। অন্তত বিভূতিভূষণের জীবনীমূলক গ্রন্থ তাই লিখেছে। তাই লেখক ও চরিত্রের সমন্বয়মূলক বাস্তবতা (যা অবশ্যই শিল্পীত, শিল্পেরও নিজস্ব বাস্তবতার পরিসর আছে)-কে আবার দেখবার প্রয়োজন অনুভব করেন আলোচক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। 'ক্যুন্‌স্ট্‌লার্‌রোমান' অর্থাৎ শিল্পীর জীবন নির্মিত হবার পরিসরে ঝোঁক পড়ে। এক ইউরোপ-বিচ্যুত নতুন 'ক্যুন্ট্‌স্‌লার্‌রোমান'-এর পরিচয় মেলে। যেখানে সমাপ্তি বা পরিণতি বলে কিছু নেই। কেবল হয়ে ওঠার নিরিখেই আলোচক এই গরমিলকে চিহ্নিত করে দিতে পারেন তাই। আলোচক আর্নেস্ট ব্লচের যে প্রবন্ধটির উল্লেখ করেছেন "A philosophical view of the Novel of the Artist"[১০], সেখান থেকেই উল্লেখ করা যায় "... when the character's life assumes a more colourful aspect than what is usual. A life like this doesn't always have to be successful particularly not in a cheap sense."

তবে, কেবল এই দৃষ্টি বিভূতিভূষণের সাহিত্যের একটি খণ্ড পাঠ হিসেবে বিবেচিত হবে। অখণ্ড বিভূতিভূষণকে ধরতে গেলে এটিরও একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। রুশতী সেন অর্থনীতি ও ইতিহাসের সংযোগ সাধন ক'রে

'আরণ্যক' উপন্যাসের যে গভীর পাঠ নিয়েছেন ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে, সেই ধারার বিকশিত পূর্ণরূপ হিসেবে ধরা যায় "বিভূতিভূষণ: কথাসাহিত্যে বাস্তববাদ"-কে।

মার্কসবাদ বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করেছে স্বাধীনতাপূর্বেই। কিন্তু সেটি বিকশিত হয়ে ধরা দিয়েছে অনেক পরে। বিভূতিভূষণের সাহিত্য, যা কিনা প্রকৃতি, পরিবেশ, বাস্তব থেকে পলাতক ইত্যাদি প্রশংসা বা নিন্দামুখর আলোচনায় গ্রস্ত, তাতেও এমন এক সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার প্রবর্তনা বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে বিভূতিভূষণের সাহিত্য পাঠের প্রতি মনোযোগ, যত্ন এবং বৈচিত্র্য আনার দিক থেকে সার্থক হয়েছে। কিন্তু বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কি এই বাস্তবতার পরিসরকেই খুঁজে নিতে চেয়েছিলেন? দিলীপকুমার রায়ের একটি চিঠি থেকে জানা যায়, বানানো প্লটে বিভূতিভূষণের আস্থা নেই। সহজভাবে যা দেখেছেন তাই লিখেছেন তিনি।[১১] সেই সহজভাবে দেখার বিশ্লেষণে একুশ শতকীয় হতাশা, বেকারত্ব, অভাব অভিযোগের ভিত্তিতে রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের পাঠ নতুন দৃষ্টি উন্মোচিত করেছে। গুরুগম্ভীর নন্দনতাত্ত্বিক খোঁজ নয়, মার্কসবাদের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি, মতাদর্শের নিরিখেই বিভূতি-পাঠ অনন্যতা লাভ করেছে।

দুই

'পথের পাঁচালী'-র মধ্যে যে দ্বন্দ্ব রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য লেখক বিভূতিভূষণের ব্যক্তিগত অনুভূতির সঙ্গে কখনো কখনো মিলিয়ে দেখেছেন, আরেক সমালোচনা চণ্ডিকাপ্রসাদ ঘোষালও সেই সম্পর্ক-বিয়োগ ঘটাননি। তবে চণ্ডিকাপ্রসাদ ঘোষাল ব্যক্তিগত বিরোধিতাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন সমগ্র বিভূতি-সাহিত্যের অখণ্ড পাঠে। পাশ্চাত্য মতাদর্শের দৃষ্টিতেই ওঁর "জঙ্গলের, জীবনের উৎসবে বিভূতিভূষণ" মুখরিত। সেখানেও আলোচক বিভূতিভূষণের স্ববিরোধ তুলে এনেছেন। তবে, এই বিরোধিতা অন্তরাত্মার পথ খুঁজে নেবার। তাই হয়তো পথ খুঁজতে খুঁজতে আলোচক সুদূর পাশ্চাত্যের অরণ্যবাসী ডেভিড থরোর সঙ্গে অরণ্যবাসী বিভূতিভূষণের এবং বনবাসী সত্যচরণের আত্মিক ও বাহ্যিক কাঠামোগত যোগসূত্র রচনা করতে পারেন। এই যোগসূত্রে প্রকৃতি ও মানুষ একই বিশ্বতানে বাঁধা পড়ে। যাকে সমালোচক বিভূতিভূষণের "দিবাবসান" গল্পের সঙ্গে মিলিয়ে পড়েছেন।

অপু সর্বজয়ার বৃত্তে নিভৃতে থেকেছে এবং যখন মুক্তি পেয়েছে,তখনও অন্য নারী-বৃত্তেও সেই মা-মা-গন্ধটি খোঁজ করে। একান্ত অপুর বেড়ে ওঠার নির্মাণে আলোচকের আলোকদৃষ্টি শিল্পের নিজস্ব প্রতিবেশে ক্রিয়াশীল। তিনি অন্য কোনো বাহ্যিক তত্ত্ব বা সূত্র দিয়ে "অপু-সর্বজয়া ও পিছুটানের পাঁচালী" নির্মাণ করেননি। এদিক থেকে দুই সমালোচকের সমালোচনার মেজাজ ভিন্ন প্রকৃতির।

অপুর পরিণতির পিছনে সর্বজয়ার অবদান মনস্তাত্ত্বিক দর্শনে বিচার্য হয়েছে আলোচক চণ্ডিকাপ্রসাদ ঘোষালের দৃষ্টিতে। গ্রেগরি ই. ল্যাঙ্গ (G.E. Lang)-এর "why a son needs a mom"- এর প্রসঙ্গে লিখিত কয়েকটি চরণ: "My mother did many things for me that, taken one at a time may seem inconsequential but when taken altogether, made me who I am"[১২]- অপু সম্পর্কে সঠিক বিশ্লেষণই তুলে ধরা হয়েছে। আর ফ্রয়েডীয় দর্শন নয়, তাকে প্রশ্ন করে এরিখ ফ্রোম বাচোফোন-কে স্মরণ করেছেন। ঔপনিবেশিক বৃত্ত থেকে বেরিয়ে সেই বৃত্তকেই প্রশ্ন করার নাম হয় উত্তর-উপনিবেশবাদ, সেই উত্তর উপনিবেশবাদের চর্চায় নৃতত্ত্বের নতুন জিজ্ঞাসা চোখের সামনে উঠে আসে, এখন আর সমাজের বিবর্তনমূলক ঐতিহাসিক পটভূমি নয়। এক দ্বৈত সমাজব্যবস্থার ইঙ্গিত, "In the same way, the understanding of love differs between the sexes: While a mother loves her child unconditionally, just because s/he exists, a father's love is always conditional, a love to be earned, which demands something in return."[১৩] অথচ এই দ্বৈত সংস্কারকে একাত্মীভূত ক'রে সামাজিক পরিসরে উপস্থাপন করে সন্ধান করতে

চেয়েছেন তার প্রবণতা, গতিপ্রকৃতি এবং প্রভাব। "In a letter on the 1st of June, 1936, Fromm writes: 'The task seems to me to be to understand the struc tures of character and instincts as a result of adaptation to the given social conditions and not as a product of the erogenous zones' Horkheimer saw in Freud's instincts the materialistic basis for physical phenomena. But Fromm criticized Freud's instinct-based psycho-logy specifically in this respect: [to look at] man as an animal coerced by his instincts but domesticated by society."[১৪] সুতরাং অপু ও সর্বজয়ার যে স্নেহবৃত্ত সামাজিক পরিসরের তত্ত্ব-কাঠামোয় বিচার্য হয়েছে, তা একুশ শতকে শিল্প-সাহিত্যে 'মাল্টিডিসিপ্লিনারি' বোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

ভেরিয়ার এলউইন তাঁর আত্মজীবনীতে লিখছেন, ছোট থেকে মামাদের সাম্রাজ্যবাদী চেতনায় আচ্ছন্ন মন। মায়ের ধর্মবিশ্বাসও ছিল সুগ্রথিত। কিন্তু ডিন ক্লোজ স্কুলে ভর্তি হবার পর বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে সেই বিশ্বাসে বাস্তবতার করাল ছায়া সঞ্চারিত হতে লাগলো। পরপরই ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী। অক্সফোর্ডে পরিচয় হওয়া বার্নার্ড অ্যালুইয়ারের সাহচর্যে ভারতীয়-দর্শন,সাহিত্যে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। আর শ্যামরাও হিভালের থেকে ভারতীয় জীবনধারার বোধে উত্তোরিত হয়েছিলেন। যমনালাল বাজাজের মুখে শোনা 'গোণ্ড' উপজাতির কথা, এবং ঝাঁপিয়ে পড়া আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে,এক আশ্চর্য উপলব্ধির স্বাক্ষর বহন করছে। বিশপ উডের পরামর্শে দুর্গম করনজিয়া গ্রামে পৌঁছানো, সরকারি পরিতোষ-সমন্বিত প্রতিশ্রুতিনামায় স্বাক্ষর করে তারপর পাসপোর্ট পাওয়া, অবশেষে মিলে মিশে যাওয়ার সফলতা বা স্বস্তি। এর সঙ্গেই বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' মিলিয়ে পাঠ নিয়েছেন আলোচক।[১৫]

এর আগে যে বিভূতিভূষণের সঙ্গে অন্য কোনো পণ্ডিত- ব্যক্তিত্বের তুলনা হয়নি তা নয়। জীবনানন্দ, টমাস হার্ডি র সঙ্গে বিভূতিভূষণের সাহিত্যের সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে গোটা আস্ত বই লেখা হয়েছে। তবে পাশ্চাত্যের খুদকুঁড়ো থেকে স্বর্ণকণা খুঁজে পাওয়ার মতো করে ভেরিয়ার এলউইনের জীবনকে, কখনো বা জিম করবেটের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার মধ্যে একুশ শতকের সাহিত্য সমালোচনার গভীরতা, ব্যাপ্তি এবং বিশ্বায়নের এক অখণ্ড মাত্রার বিস্তারই চোখে পড়ে।

ডেভিড থরোর মতো একই প্রত্যাবর্তন সত্যচরণের ঘটেনি। সত্যচরণের আশ্রয়ের সঙ্গে মিলে যায় বটে থরো কিংবা এলউইনের একাত্মীভূত হয়ে ওঠাটি, কিন্তু সর্বসাকুল্যে তো কিছুই মেলে না। চণ্ডিকাপ্রসাদ ঘোষাল সেটাই তুলে ধরেছেন, "একটি নির্দিষ্ট জীবনে অন্তরিন থাকা তাঁর (ডেভিড থরো) জন্য নয়। বিভূতিভূষণ সেভাবে ফিরে আসেননি। তিনি বারবার ফিরে গেছেন অরণ্যের সান্নিধ্যে।"[১৬] তবে তাতে নৈকট্যের অভাবে রোমান্টিকতার আতিশয্যই আলোচক খুঁজে পেয়েছেন। বিভূতিভূষণের সত্যচরণ কিংবা ডেভিড থরো, দুজনেই সীমায় বন্দি। কিন্তু সত্যচরণের স্মৃতিচারণের মধ্যে দিয়ে কি সেই নৈকট্যের অভাব কিছুটা মিটে যায় না! যে 'আদিমতাবাদ' -এর পরিচয় দিতে গিয়ে আদিবাসী-জীবন-দ্রষ্টা এলউইন ও 'আরণ্যক'-এর চরিত্রের অভিজ্ঞতা মিলে মিশে যায়, সেই আদিমতাবাদের সংজ্ঞা নির্ধারণে রয়েছে আদিম অধিবাসীদের প্রসঙ্গ, যে আদিমতা গোপিকানাথ রায়চৌধুরী হাডসনের উপন্যাসে পেয়েছেন, তার প্রকৃতি এর চেয়ে ভিন্ন। একুশ শতক আদিমতার এক নতুন না হলেও, বিশিষ্ট মানদণ্ড গড়ে দিয়েছে: "যারা প্রকৃতিকে জয় করতে সক্ষম,তারাই অগ্রবর্তী। যারা প্রকৃতির বশবর্তী হয়ে পড়ে থাকে তারা আদিম।"[১৭] তবে বিভূতিভূষণ শেষপর্যন্ত "তাঁর অরণ্য-সন্দর্শন সমগ্র পর্ব জুড়ে এক এলিটিস্ট প্রকৃতি বিলাসিতার মাত্রায় বাঁধা পড়ে।"[১৮]— বিভূতিভূষণের নির্মিত জগতে এবং স্বয়ং লেখকের প্রতি সেই অভিযোগ এনেছেন আলোচক।[১৯] স্বয়ং যেমন লেখক ও কথকের ব্যবধান মেটাতে পারেননি, ঠিক তেমনই

বিভূতিভূষণের প্রতিষ্ঠিত-ভারতীয় দৃষ্টির প্রতি আঘাতও হেনেছেন। ফলে বিশ শতকের প্রতিষ্ঠা, একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকেই ভেঙে দিলেন আলোচক।

পশ্চিমী দুনিয়ার নির্মাণ রিসার্ভ ফরেস্ট এবং সেই দুনিয়ার হাতেই শাসিত ভারত। সংরক্ষণের ব্যবস্থা একান্ত পাশ্চাত্য সভ্যতার। সেই দৃষ্টিতে আচ্ছন্ন সত্যচরণ। যুগলপ্রসাদের সঙ্গে বিলাতী বুনোফুলের বীজ বোনে। সুতরাং যে 'আরণ্যক' উপন্যাস কখনো উপনিষদ, কখনো স্মৃতিচারণমূলক প্রকৃতির উপাখ্যান, কখনো উপনিবেশবাদের পরাকাষ্ঠা ও স্বাতন্ত্র্যধর্মী, সেই উপন্যাসকে প্রকৃতি ও নাগরিক কথকের ভাবনাবিশ্ব দিয়ে উত্তরোপনিবেশবাদী পাঠ নিলেন সমালোচক। দেখিয়ে দিলেন, নাগরিক সত্যচরণের দৃষ্টিতে এই অরণ্যসভ্যতা ঠিক কী? আমাদের প্রাচ্য-বৃত্তের মধ্যেই যে এই পাশ্চাত্য সংস্কার একীভূত হয়ে এক মিশ্র ভাবনা বৃত্ত গড়ে তুলেছে,বিশ্বায়ন তারই পরিশীলিত নাম।

তাই যেন দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী পাঠের প্রয়োজন হয়।তাই পার্থক্য দেখিয়ে দেওয়া হলো ঠিক কোথায় গিয়ে আলাদা বিভূতিভূষণ ও দেবেন্দ্রনাথ। যেমন, প্রথমত, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ধর্মীয় বিশ্বাসের আধ্যাত্মিক তাড়নায় জগত পরিব্রজনে ব্রতী ছিলেন। বিভূতিভূষণে তা নিসর্গ জগতের বিশালতা অনুভব করার পরিণাম। দ্বিতীয়, পরিবেশের তীব্র রূপে মহর্ষি পরমেশ্বরের জ্যোতির্ময়ী রূপ দেখেছেন। বিভূতিভূষণ দেখেছেন পশ্চিমী ঊষর প্রান্তরের রূপ। যেন টাকলামাকান মরুভূমি বা গোবি।

তবে আশ্বাসের সুরে বিভূতিভূষণের "জাল" গল্পের কথা আলোচক উল্লেখ করেছেন। ভারহেচ্ নগরেও একদিন ছোটনাগপুরের নামকরা বাঘের দল হাওয়া খাবে। নগর আবার অরণ্য গ্রাস করবে। একুশ শতকও শেষ পর্যন্ত এই আশ্বাসের ভিত্তিতে ভর করেই দাঁড়াবে। এই সুর একান্তভাবে আমাদের। সমালোচকও তা ধারণ করেই রাখলেন। একুশ শতকের সাহিত্য সমালোচনার ধারা আসলেই প্রাচ্য বৃত্ত এবং বিশ শতকের আবহেই প্রসৃত, বলা যায়।

তথ্যসূত্র:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। বিভূতি রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ), প্রথম খণ্ড। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি: কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৪০১, পৃ. ২০।
২. ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ। বিভূতিভূষণ ও কথাসাহিত্যে বাস্তববাদ। বহুস্বর, কলকাতা,বহুস্বর সংস্করণ ২০২৪, পৃ. ৪৫।
৩. দাশগুপ্ত, পীযূষ, সেনগুপ্ত, কল্পতরু, সিংহ, প্রভাস, দাশগুপ্ত, শঙ্কর, রায় চৌধুরী, সুদর্শন (সম্পাদিত)। স্তালিন রচনাবলী। নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৫, পৃ. ৮৩।
৪ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। বিভূতি রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ), প্রথম খণ্ড। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি: কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৪০১, পৃ. ১৬৭।
৫. ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ। মার্কসবাদ জিজ্ঞাসা। অবভাস, কলকাতা, সংশোধিত দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১৮, পৃ. ৩৩।
৬. ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ। বিভূতিভূষণ ও কথাসাহিত্যে বাস্তববাদ। বহুস্বর, কলকাতা,বহুস্বর সংস্করণ ২০২৪, পৃ.৭৪।
৭ তদেব, পৃ.১১।
৮. সাঈদ-উর রহমান। মার্কস ও মার্কসবাদীদের সাহিত্যচিন্তা । জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা, অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৩, পৃ. ১৫৬।
৯ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। বিভূতি রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ), প্রথম খণ্ড। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি: কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৪০১, পৃ. ১৫৪।
১০. ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ। বিভূতিভূষণ ও কথাসাহিত্যে বাস্তববাদ। বহুস্বর, কলকাতা,বহুস্বর সংস্করণ ২০২৪, পৃ.
১১. রায়, দিলীপকুমার। পথের পাঁচালী। পরিচয় পত্রিকা, মাঘ ১৩৩৮। সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

১২. ঘোষাল, চণ্ডিকাপ্রসাদ। বিভূতিভূষণ: স্ববিরোধী সংবেদ। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নতুন দিল্লি, প্রথম প্রকাশ ২০১৯, পৃ. ১৬।

১৩. FUNK, RAINER. Erich Fromm: His Life and Ideas. Translated by Ian Portman and Manuela Kunkel. CONTINUUM, New York, London, 2000 A.D., P. 75.

১৪. FUNK, RAINER. Erich Fromm: His Life and Ideas. Translated by Ian Portman and Manuela Kunkel. CONTINUUM, New York, London, 2000 A.D., P. 93.

১৫. দেবী, মহাশ্বেতা, সাহা, পৃথ্বীশ। ভেরিয়ার এল্যুইন-এর আদিবাসী জগৎ। সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি, ১৯৬৩।

১৬. ঘোষাল, চণ্ডিকাপ্রসাদ। বিভূতিভূষণ: স্ববিরোধী সংবেদ। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নতুন দিল্লি, প্রথম প্রকাশ ২০১৯, পৃ. ৫২।

১৭. ঘোষাল, চণ্ডিকাপ্রসাদ। বিভূতিভূষণ: স্ববিরোধী সংবেদ। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নতুন দিল্লি, প্রথম প্রকাশ ২০১৯, পৃ. ৬৭।

১৮. তদেব, পৃ. ৫৭।

১৯. তদেব, পৃ. ৬০।

গ্রন্থপঞ্জি:

আকর গ্রন্থপঞ্জি:

১. ঘোষাল, চণ্ডিকাপ্রসাদ। বিভূতিভূষণ: স্ববিরোধী সংবেদ। প্রথম প্রকাশ ২০১৯, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নতুন দিল্লি।

২. ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ। বিভূতিভূষণ ও কথাসাহিত্যে বাস্তববাদ। বহুস্বর সংস্করণ ২০২৪, বহুস্বর, কলকাতা।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১. দাশগুপ্ত, পীযূষ, সেনগুপ্ত, কল্পতরু, সিংহ, প্রভাস, দাশগুপ্ত, শঙ্কর, রায় চৌধুরী, সুদর্শন (সম্পাদিত)। স্তালিন রচনাবলী। প্রথম প্রকাশ ১৯৭৫, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা।

২. দেবী, মহাশ্বেতা, সাহা, পৃথ্বীশ। ভেরিয়ার এল্যুইন-এর আদিবাসী জগৎ। ১৯৬৩, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি।

৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। বিভূতি রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ), প্রথম খণ্ড। প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৪০১, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা।

৪. ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ। মার্কসবাদ জিজ্ঞাসা। সংশোধিত দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১৮, অবভাস, কলকাতা।

৫. রায়, কিরণ কুমার (অনূদিত)। ওয়ালডেন। ১৯৬০, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি।

৬. সাঈদ-উর রহমান। মার্কস ও মার্কসবাদীদের সাহিত্যচিন্তা। অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৩, জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা।

৭. FUNK, RAINER. Erich Fromm: His Life and Ideas. Translated by Ian Portman and Manuela Kunkel. 2000 A.D., CONTINUUM, New York, London.

সহায়ক পত্রিকা:

১. 'পরিচয়', মাঘ,১৩৩৮। সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। উক্ত পত্রিকার দিলীপকুমার রায়ের 'পথের পাঁচালী' প্রবন্ধটি গ্রহণ করা হয়েছে।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1340-1345
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.354

ভ্রমণে সংস্কৃতি: সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ‘রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যাম-দেশ’

বর্ণালী দত্ত, *গবেষক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 19.03.2026; Accepted: 24.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Traveling is the act of moving from one place to another for the purposes like education, exploration, work, relaxation or enjoyment. Humans have always been interested in knowing the unknown. Traveling is a part of our life because it helps us to reduces daily life stress and refreshes the mind. But also, it’s a process to gather khowledge about different traditions and cultures. Culture is the things that focus on the people and their daily life. Travel and culture are related to each other. Travel builds connections between people in different places. If you turn the pages of history, you will see that people have been traveling since very long time to conquer countries, establish relations, expand trade, acquire knowledge When people travel to different places, they experience the lifestyle, food habits, rituals, language of other communities. Through travel we can learn about various unknown cultures of different places that are completely unknown to us. Suniti Kumar Chattopadhyay is world famous as a linguist. In his youth, he went to England on a scholarship to study linguistics, end wrote his first travel experiences in ‘patha chalti’ (1st volume). ‘Rabindra-sangame dipomay bharat o shyam-desh’ was published in 1927. Then travelogue ‘Europe’ was published in 2 volumes. In this essay I am describing the various form of culture besed on the travelogue ‘Rabindra-sangame dipomay bharat o shyam-desh’ written by Sunitikumar Chattopadhyay. This travelogue is the testament to the experiences of traveling to places such as java, bali, shyam desh, Sumatra etc.

Keywords: Travel, Culture, Food, Clothing, Customs, Dance, Drama

অজানার আহ্বানে বেরিয়ে পড়ার আকুলতা মানুষের অন্তরে চিরকাল বিদ্যমান। ভ্রমণ হল নিজের কর্মস্থান বা বাসস্থান থেকে স্থানচ্যুতি; অর্থাৎ স্বস্থান ত্যাগ করে অন্য কোনো স্থানে যাত্রা। কারো কাছে ভ্রমণ দৈনন্দিন কর্মব্যস্ত জীবনের মাঝে মুক্তির আস্বাদ; কারো কাছে তথ্য, তত্ত্ব ইত্যাদি সংগ্রহের ভাবগম্ভীর ক্রিয়াযজ্ঞ। আবার কারো কাছে ভ্রমণ অজানা রহস্যের অনুসন্ধান। প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য ভান্ডারের আকর্ষণে, নতুন নতুন দেশের নতুন নতুন মানুষ তাদের সমাজ, কৃষ্টিকলা, সংস্কৃতি, তাদের কথাবার্তা, আচার-আচরণ প্রত্যক্ষ করার তীব্র আকর্ষণে মানুষ ভ্রমণ করে। অজানাকে জানা অচেনাকে চেনার আকাঙ্ক্ষাই হল ভ্রমণ। অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর ‘চেনাশোনা’ ভ্রমণকাহিনিতে ভ্রমণ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন-

> "এত কাল যার সঙ্গে ঘর করছি, এক একদিন তাঁর দিকে তাকিয়ে মনে হয় না কি- কতটুকু এর চিনি! তেমনি স্বদেশের। স্বদেশকে আর একটু চিনতে চাই বলে বেড়াতে যাই। বেড়ানো বলতে বুঝি চেনাশোনা।"[১]

আসলেই ভ্রমণ হল অজ্ঞাত বিষয়কে জানা, অচেনাকে চেনা। ইতিহাসের পাতা উলটালে দেখা যাবে মানুষ সেই স্মরণাতীত কাল থেকে দেশ জয়ের জন্য, কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন, বাণিজ্যের প্রসার, জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রভৃতি নানা কারণে ভ্রমণ করে চলেছে। ভ্রমণসাহিত্য আসলে কোনো গাইডবুক নয় যা মানুষকে যাত্রাপথ প্রদর্শন করে। ভ্রমণসাহিত্য হল পঞ্চইন্দ্রিয়ের সচেতন অনুভূতির ফল।

বিশ্ব কবি বরীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে 'ভাষাচার্য' নামে অভিহিত করেন। তবে শুধু ভাষাবিদ্ বললে তাঁর প্রতিভার কিয়দংশের পরিচয় দেওয়া হবে। ভাষা, উপভাষা, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, ইত্যাদি নানা শাখায় তাঁর পদচারণা ছিল অবলীলায়। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত অবস্থায়ই তিনি কেল্ট, ইতালিক, জার্মানিক, বাল্‌তিক, ভোট, মঙ্গোল, বর্মি, কোল, ভীলন কিরাত ইত্যাদি বহু বিচিত্র জন জাতির মানুষ ও তাদের সমাজ-সংস্কৃতির প্রতি তিনি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তিনি গ্রীক ভাষা শিক্ষা লাভ করেন এমনকি প্রাচীন ও মধ্য ইংরেজি, জারমানিক ইংরেজি ভাষাতত্ত্ব নিয়েও পড়াশোনা করেন। তাঁর এই অসাধারণ প্রতিভার প্রকাশ 'The Origin and Development of the Bengali Language'. ১৯২৭ সালে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রমণ সঙ্গী হয়ে পাড়ি দেন সুদুর সুমাত্রা, মালয়, জাভা, বলিদ্বীপ। এই ভ্রমণকাহিনি সাতটি সংখ্যায় ধারাবাহিক ভাবে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়। পরে শ্যামদেশ ভ্রমণ বৃত্তান্ত একত্রে যুক্ত হয়ে 'রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ' প্রকাশিত হয়। ১৯৩৮ সালের ইউরোপ ভ্রমণ কাহিনি 'ইউরোপ' নামে দুই খণ্ডে প্রকাশ পায় ১৯৪৪ ও ১৯৪৫-এ। যৌবনে ভাষাতত্ত্ব অধ্যায়নের জন্য বৃত্তি নিয়ে ইংল্যান্ড যান ১৯১৯-১৯২১। সেই সময়ের ভ্রমণের স্মৃতি 'লন্ডনে আমাদের দুর্গোৎসব', 'লন্ডনে রবীন্দ্রনাথ : ১৯২০-১৯২১', 'ভ্রমণ প্রসঙ্গ', 'আমার নিগ্রো বন্ধুরা'- শিরোনামে 'পথ চলতি' (প্রথম খন্ড ১৯২৬)-তে স্থান পায়। তাঁর সমগ্র জীবনের বিপুল সাহিত্যকর্মে ইংরেজি ভাষায় পুস্তক ৩০টি, সম্পাদনা ৩টি, প্রবন্ধ ২০৯টি, পুস্তক সমালোচনা ১৩০টি। বাংলা ভাষায় পুস্তক ১১টি, ব্যাকরণ ৫টি, সম্পাদিত গ্রন্থ ৭টি, ভাষা ও ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ ১৬১টি, পুস্তক সমালোচনা ২৭টি। হিন্দি ভাষায় গ্রন্থ ৭টি, নিবন্ধ ৪২টি, ভূমিকা ও মুখবন্ধ ১১টি। ১৯২৭ সালের আগস্ট-অক্টোবর মাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সস্নেহ ও সানুগ্রহ আহ্বানে তাঁর সঙ্গএ মালয়, সুমাত্রা, জাভা, বলিদ্বীপ, শ্যামদেশ ইত্যাদি স্থানে ভ্রমণ করেন। সেই ভ্রমণকাহিনি 'প্রবাসী'তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ হয়। পরে ১৯৪০ সালে 'দ্বীপময় ভারত' নামে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সময়ে আর পরিবর্ধিত আকারে 'রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যাম-দেশ' ভ্রমণবৃত্তান্তটি প্রকাশিত হয়।

ভ্রমণ এবং সংস্কৃতি অবিচ্ছেদ্য ভাবে সম্পর্কযুক্ত। কোনো গোষ্ঠী বা সমাজের নিজস্ব ঐতিহ্যকে সংজ্ঞায়িত করে সংস্কৃতি। এক কথায়, একটি সমাজের মানুষের সম্মিলিত জীবনচর্চা হল সংস্কৃতি। ভ্রমণের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানের মানুষের সংস্পর্শ লাভ সম্ভব ফলে তাদের জীবনযাপন পদ্ধতি, রীতিনীতি, আচার-আচরণ, খাদ্য, পোশাক, আমোদ প্রমোদ, বিনোদন ইত্যাদি সাংস্কৃতিক নানা উপাদানের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যাম-দেশ' ভ্রমণ বৃত্তান্তটি মালয়, সুমাত্রা, জাভা, বলিদ্বীপ, শ্যামদেশ ইত্যাদি স্থান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও সেই সকল স্থানের শিল্প-সংস্কৃতির এক অনন্য দলিল স্বরূপ।

খাদ্য: রেল ও জাহাজ পথে মালয়, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ ইত্যাদি স্থান ভ্রমণের সূত্রে বিভিন্ন জন-জাতীর মানুষ ও তাদের খাদ্য সংস্কৃতির সঙ্গে যে পরিচয়লাভ ঘটেছে তার বিক্ষিপ্ত চিত্র আমরা এই ভ্রমণবৃত্তান্তে পেয়েছি। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর যাত্রা শুরুতে মাদ্রাজ যাওয়ার পথে ভোরের স্টেশনের একটি দৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি

আকর্ষণ করেছেন। ভোরে স্টেশনে চা, কফি, গরম গরম ডালের বড়া, পিঠে, নানা ধরনের তরকারি বিক্রি হচ্ছে। এই দৃশ্য খুব সাধারণ হলেও মূল উল্লেখযোগ্য বিষয় হল খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত পাত্রের ব্যবহার। তামিল ব্রাহ্মণ হোটেল ওয়ালারা সকলে অ্যালুমিনিয়াম বা পিতলের পাত্রে খাদ্য প্রস্তুত করছে এবং সকল তামিল তেলেগু যাত্রীরাও অ্যালুমিনিয়াম বা পিতলের পাত্র হাতেই খাওয়ারের স্টলগুলোতে ভিড় জমিয়েছে। মাদ্রাজের তামিল ব্রাহ্মণদের খাদ্য বিষয়ে ধর্মীয় গোঁড়ামির টুকরো তথ্যও প্রাবন্ধিক এই অংশে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন এরা কোন বিদেশিদের কাছে চা-কফি বা অন্য কোন খাদ্য বিক্রয় করে না। তামিলে ডালের ধারণাও আমাদের থেকে কিছুটা ভিন্ন। তাদের কাছে ডাল হল টক-ঝাল দেওয়া নানা মশলা মিশ্রিত মুখরোচক একটি উপাদান যা সাম্বার নামে পরিচিত এবং নানা অনুষ্ঠানে মিষ্টি স্বরূপ আবশ্যক পদ হল মিষ্টি দালপুরী, ও বেসন বুদিয়ার লাড্ডু।

বিভিন্ন জাতির মানুষের সঙ্গে জাহাজে যাত্রা কালে ফরাসি ও অনামী (উত্তরে টঙকিঙ-এর লোক এবং দক্ষিণে কোচিন-চীনের লোক)-দের বিপরীতমুখী খাদ্যাভ্যাসের বিবরণ পাই যা বহুমুখী খাদ্য সংস্কৃতির বৈচিত্র্যকে উপস্থাপন করে। সকালে সাতটায় ফরাসীরা একবাটি কফি ও সঙ্গে রুটি খায়। ওপর দিকে অনামীরা খায় চিনি ও দুধ ছাড়া সবুজ চা এবং সঙ্গে দুটো ঠোটে কলা। দুপুরে ফরাসীরা খায় সুপ, মাংস সঙ্গে রুটি এবং অত্যাবশ্যক লাল মদ। অনামীদের খাদ্য তালিকায় থাকে ভাত মাংস, তরকারী ও সবুজ চা।

চীনাদের খাদ্য বিষয়ে যে বহু বৈচিত্র্য আছে তারও উদাহরণ আমরা এই ভ্রমণবৃত্তান্তে পাই। বাবা চীনা অর্থাৎ straits-born Chinese (জন্মসূত্রে যারা মালয় দেশের অধিবাসি)-দের মধ্যে খাদ্যরীতির পরিবর্তন ঘটেছে। এরা মালাইদের মতই কাচালঙ্কা বাটা ও নারকেলের দুধ দিয়ে শুঁটকী মাছ খায়। কিন্তু আহেলি চীনারা এত লঙ্কার ঝাল বা মশলা জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করে না। চীনা সংস্কৃতির আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল পূজার ভোগ তাদের কাছে ভোজের খাদ্য। মাছ, ডিম, হাঁস সিদ্ধ, নানা ধরনের তরকারী, সুপক্ক বরাহ সবই খাদ্য রূপে গৃহীত হয়। প্রসঙ্গত আর একটি বিষয় বলা প্রয়োজন যে চীনাদের আহারের রীতিও ভিন্ন। চীনা খাওয়ায় ভাতের বাটি যার যার নিজস্ব হয়ে থাকে। বাঁ হাতে ভাতের বাটি মুখের কাছে নিয়ে chop-stick-এর সাহায্যে ভাত ঠেলে মুখে পুরে দেয়। সামনে কিছু বড়ো বাটিতে তরকারী রাখা থাকে (এই বাটিগুলি তাদের যৌথ সম্পত্তি) সেখান থেকে chop-stick-এর সাহায্য তরকারি তুলে খায়।

দ্বীপময় ভারতের বিখ্যাত আহার রীতি 'রাইস্ট্-টাফল' বা 'ভাতের হাজরী'-র বিষয়েও আমরা জানতে পারি। 'রাইস্ট্-টাফল' বা 'ভাতের হাজরী' হল যবদ্বীপীয় রীতিতে প্রস্তুত 'পঞ্চাশ-ব্যঞ্জন ভাত' ইউরোপীয় রীতিতে পরিবেশন। এটি হল যবদ্বীপীয় ভোজনের ডচ্ সংস্করণ। এই খাদ্যরীতিতে তরকারীর মধ্যে মাছের উপকরণই বেশি থাকে। এমনকি মাছের পাপর, মাছের চাটনি ইত্যাদিও এই আহারপর্বের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া ডচ্ খাদ্যের একটি অন্যতম উপাদান যা বর্তমানে বাঙালিদের মধ্যেও ভীষণভাবে প্রচলিত সেটি হল pankookje ইংরেজিতে pancake.

পোশাক: সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় নিজদেশের মহিলাদের পরিচ্ছদ বিষয়ে বিশেষ পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করে বলেছেন-

> "যদি কোনও পরিচ্ছদ, বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্ট পদার্থের অন্যতম ব'লে, জ্ঞানতঃ পুরুষের চিত্তের বিশুদ্ধিতে কোনও রকম বিকার না এনে, যথোপযুক্ত সম্মান বজায় রেখে নারী দেহের সৌষ্ঠবকে দেখাতে পেরে থাকে, তা আমাদের ভারতীয় সাড়ী-"[২]

দ্বীপময় ভারত ভ্রমণের সূত্রে তিনি বহু দেশের মানুষের ঐতিহ্যগত পোশাকের পরিচয় আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। বলিদ্বীপের ঐতিহ্যবাহী পোশাকের সঙ্গে আমাদের প্রাচীন বাংলার পোশাকের কিছুটা সামঞ্জস্য লক্ষ্য

করা যায়। ধোত্র, উষ্ণীষ, উত্তরীয়- এই তিনটি কাপড় মিলে তাদের পরিধেয় সম্পূর্ণ হয়। একটি ছোট ভীতর বস্ত্র যার নাম ধোত্র। উষ্ণীষ হল কোমর থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত দুই-আড়াই ফের কাপড় যা সরু কটি বন্ধ দিয়ে বাঁধা থাকে, এই কটি বন্ধের নাম হল 'কাইন' কাপড়। তৃতীয় বস্ত্র খণ্ড হল উত্তরীয় যা নেটের বা জালের হয়ে থাকে। এটি বলির নারীরা প্রায়ই কোমরে জড়িয়ে রাখে। পরিচিত-অপরিচিত সকলের সামনে এইরকম নিরাবরণ বক্ষে চলাফেরা করাইও এই দেশের রীতি। কিন্তু দেব-মন্দিরে প্রবেশের সময় উত্তরীয় আবেষ্টনের দ্বারা বক্ষদেশ আবৃত করা অত্যাবশক রীতি রূপে প্রচলিত ছিল। বলির পুরুষের পোশাকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ছোবা বা তলওয়ার যাকে 'ক্রিস্' বলে। হাতলে সোনার রাক্ষসমূর্তি যুক্ত এই তলওয়ার এরা পিঠে বাঁধত। সামনে বা পাশে ঝুলানোর রীতি ছিল না।

মালাই নারীদের জাতীয় পোশাক হল 'সারঙ্'। এটি সেলাইবিহীন উজ্জ্বল রঙের রেশমি কাপড় যা লুঙ্গির মতো কোমরের বেঁধে পরতে হয়। তামিলদেশের হিন্দুরা লুঙ্গির মতো করে ধুতি পরে এবং মুসলিমরা লুঙ্গি পরে। চীন দেশের নারী-পুরুষ উভয়েরই প্রাচীন পোশাক ছিল জোব্বা। জোব্বা হল শরীরের উপরিভাগ থেকে গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা ঢিলেঢালা একধরণের পোশাক। জাপানিদের জাতীয় পোশাক 'কিমোনো'-র ধারণাটিও এই জোব্বার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আরব দেশের ঐতিহ্যগত পোশাক হল পুরুষদের ক্ষেত্রে কালো কাপড়ের লম্বা আবা, ভিতরে সাদা চাপকান, কাঁধ ও ঘাড় ঢাকা বড়ো রুমাল এবং পাগড়ী। নারীরা পরিধান করে কালো লম্বা 'সওব্' বা বহির্বাস এবং মুখ ঢাকার 'বুরকা্'। আবার একই ধরনের কর্মে নিযুক্ত হলেও দুটি ভিন্ন জাতির মানুষের পোশাকও যে ভিন্ন হয় তার সুক্ষ বিশ্লেষণও এই ভ্রমণ প্রবন্ধে পাই। তিনি খুব নিখুঁত ভাবে আনামী সেপাই এবং ফরাসী সেপাইদের পরিহিত পোশাকে ভিন্ন রকম টুপির কথা উল্লেখ করেছেন। আনামীদের টুপি গান্ধী টুপির মতো ছোট উর্দীব কাপড়ের তৈরি খাকী টুপি। আর ফরাসীদের মাথায় বড়ো সোলার 'টোপা'। পরিচ্ছদের এই সুক্ষ বিশ্লেষণ জাতীর সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশিত করে।

রীতিনীতি:

শবদাহ রীতি ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠান:

বলি বা বালিদ্বীপের ভাষায় শ্রাদ্ধানুষ্ঠানকে বলা হয় 'মেমুরুর'। এদের দাহ রীতি ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠান রীতিটি বেশ আকর্ষণপূর্ণ। পরিবারে সদস্য কেউ মারা গেলে তারা কাঠের শবাধারে মৃতদেহকে নানা ওষুধ মেখে কাপড় জড়িয়ে রক্ষিত করা হয়। বছরে দুইবার দাহকার্যের উপযোগী ভালো সময় আসে। সেই নির্দিষ্ট দিনের পূর্বে শবাধারকে কেন্দ্র করে পূজা, নৈবেদ্য প্রদান, শ্রাদ্ধ ভোজ, শোভাযাত্রা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। গরীব বা আর্থিক দিক থেকে দুর্বল মানুষ অবশ্য শবদেহ সংরক্ষণের জন্য অত অর্থ ব্যয় করতে পারে না তারা মৃতদেহকে মৃত্যুর পর ভূ-প্রথিত করে দেয়। পরে শুভ দিনে মাটি খুঁড়ে দেহাবশেষ যা পাওয়া যায় তাই নিয়ে এবং মৃতের তালপাতার প্রতীক মূর্তি তৈরি করে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যোগদান করে। একই দিনে একাধিক অগ্নিকর্ম অনুষ্ঠিত হয়। শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে মৃতের উদ্দেশ্যে খাদ্যদ্রব্য অর্পণের রীতিও আছে, এই সকল খাদ্য মানুষ উপহারণস্বরূপ নিবেদন করে থাকে।

উবুদ অঞ্চলে এই দাহ অনুষ্ঠানটির রীতিটিও বেশ চমকপ্রদ। দাহের পূর্বে সাতদিন ধরে নানা উৎসব হয়। তাদের রীতি অনুসারে মৃতদেহ বাড়ির দরজা দিয়ে বের করা যাবে না। সেই জন্য প্রাচীরের উপর দিয়ে উচু করে বাঁশের মাচা তৈরী করা হয়। সেই মাচা দিয়ে শবাধার দেওয়ালে অপর পারে যায়। উল্টো পাশে শবাধার বহনের জন্য থাকে বিশাল মানুষের কাঁধে বওয়া মঞ্চ যা 'ওয়াদাঃ' (wadah) নামে পরিচিত। শবদেহকে কেন্দ্র করে শোভাযাত্রা হয়। নৃত্য-গীত অনুষ্ঠানও পরিবেশিত হয়। সব চেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হল যাত্রাভিনয়। রাক্ষস

ও দেবতার লড়াই অভিনয়ের দ্বারা উপস্থাপিত হয়। মৃতের আত্মাকে যমালয়ে নিয়ে যেতে ভূত-প্রেত-রাক্ষস আসে, দেবতাদের সঙ্গে লড়াইতে তারা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়। এই হল মূল অভিনীত বিষয়। আবার জাতি অনুসারে কিছু প্রতীক চিহ্ন যেমন- মাছের মূর্তি, সিংহের মূর্তি, গোরুর মূর্তি ইত্যাদি দাহ-কার্যে ব্যবহার করে থাকে।

বিবাহ রীতি:

দক্ষিণে তামিল, তেলেগু, কানাড়ী, মালায়ালীদের মধ্যে নারীদের কোনো অবরোধ প্রথা নেই। নারীরা কেউ মাথায় ঘোমটা দেয় না। তাই বিয়েতে কনের সাজেও মাথায় ঘোমটার ব্যবহার হয় না। বরের পরনে দক্ষিণের চিরপ্রচলিত পোশাক লুঙ্গির মতো করে সাদা জরীপাড় ধুতি ও গায়ে শার্ট। উড়ে কামান মাথা। আস্ত পান ও জাফরান দেওয়া কাটা সুপারি দিয়ে অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করা হয়ে থাকে। দক্ষিণের বিবাহের সবচেয়ে সুন্দর রীতি হল দোলা পিঁড়ি প্রচলন। বর-কনেকে পাশাপাশি দোলায় বসিয়ে দেওয়া হয় এবং সেখানেই মালাবদলও সম্পন্ন করা হয়। মাদ্রাজের প্রতিটি ভদ্র ঘরেই এই দোলা পিঁড়ির ব্যবস্থা থাকে। বিয়ের জন্য দেখা-সাক্ষাৎ পর্বেও এই দোলা-পিঁড়ি টাঙ্গানো হয়।

মালয় দেশের কোয়ালালম্পুর ভ্রমণকালে পেরার রাজবাড়ির বিয়ের রীতির উল্লেখ আমরা পাই। মালাই রাজকুমার ও পেরার রাজকুমারীর বিয়ে। মালয় বিয়ের উল্লেখযোগ্য রীতি হল বর-কনেকে দামি গদির বিছানায় বসানো হয়। এই বিছানার গদির দুই পাশে রূপার কাজ করা চাকতি মতন থাকে। রাজা বা বড়োলোকদের বাড়িতে এই বর-কনের গদি বা বিছানা রাখার জন্য আলাদা ঘর থাকে। তাদের বিশ্বাস এই গতি হল পবিত্র গদি। বিয়ের বর-কনে ছাড়া অন্য কেউ কখনো এই গদিতে বসেনা। এই গদিকে যবদ্বীপে 'দেবী শ্রী গদি' বলে।

উবুদের বিয়ের রীতি অতি সরল। এই দেশে বর-কনে নিজেরাই পরস্পরকে নির্বাচন করে। বাবা মায়ের অমত থাকলে ছেলে-মেয়ে কোথাও পালিয়ে গিয়ে একত্রে বসবাস করে, তাতেই বিবাহিত বলে গণ্য হয়।

নৃত্য-গীতি ও নাটক:

বিভিন্ন স্থানে মানুষের ভাষা-পোশাক-রীতিনীতির মতো নিজস্ব নাচ-গানেরও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল থাকে। কোয়ালালম্পুরের মালাইদের নিজস্ব নাচ হল 'রোঙ্গেঙ্' (Ronggeng)। 'রোঙ্গেঙ্' শব্দের অর্থ হল 'নাচওয়ালী'। সুনীতিকুমারের মতে-

> "সমগ্র মালাই-জাতির মধ্যে তাদের সৌন্দরয-বোধের আর সৌন্দর্য-সৃষ্টির প্রধান প্রকাশ হ'য়েছে তাদের নাচে। গান-কথা বা সুর- এদের হয় তো নগণ্য, কিন্তু নাচ এদের আশ্চর্য-রূপে ভাব-প্রকাশক।"[৩]

এই নাচ মূলত মালাই পল্লী জীবনের ছেলে ও মেয়েদের প্রাণময় স্ফূর্তি ও বিবাহ উদ্দেশ্যে তাদের প্রণয় রীতির একটি মনোহর কলা-সৌন্দর্যপূর্ণ অভিব্যক্তি।

মালাইদের গানও তাদের ভিন্ন সংস্কৃতির পরিচায়ক। তাদের গানের নাম হল 'পান্তুম' (pantum)। এই গানের বিষয় মূলত প্রেম। চার লাইনের ছোট ছোট সম্পূর্ণ কবিতাই হল পান্তুম গান। এই মালাই গীতি থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে ফরাসী কবিতাও রচনা হয়েছে।

যবদ্বীপে নৃত্যের একটি ভিন্ন রূপ পরিলক্ষিত হয়। তাদের বেশিরভাগ নৃত্যকলায় যুদ্ধের একটি সুকুমার প্রকটন প্রদর্শিত হয়। নাচের গতি এবং হাতের প্রতিটি ভঙ্গী প্রাচীন শাস্ত্রে বর্ণিত কর-মূদ্রা। নাচ বা নৃত্যাভিনয়ে অংশগ্রহণকারী সকলেই মূলত পুরুষ। যবদ্বীপের নাচের তালিকা-

১) wireng pandji henem (orde dans)- প্রাচীন যবদ্বীপের ইতিহাস বর্ণিত আখ্যায়িকার নৃত্যাভিনয়।
২) wireng reden hindradjit kalijan wanara hanoman- রামায়ণের ঘটনা অবলম্বনে যুদ্ধাভিনয়।
৩) bekaan golek- নারীদের নৃত্য।
৪) wireng raden werkocdoro kalijan praboc partipejo- রাজপুত্র বৃকোদর ও রাজা প্রতীপেয়ের যুদ্ধ।
৫) wireng panab hocdoro- তীরধনুক নিয়ে নৃত্যাভিনয়।
৬) petilan langendrijo- menak djinggo den damar woelan- প্রাচীন যবদ্বীপের কোন ঘটনা বিশেষের নৃত্যাভিনয়।

যবদ্বীপের নান্দনিক সংস্কৃতির আরো একটি নিদর্শন হল 'ওআইয়াঙ্ কুলিং' বা পুতুলের ছায়া নাটক। নাটকের পাত্র-পাত্রিদের চামড়ায় কাটা মূর্তি বা ছবির ছায়া আলোর সাহায্যে সাদা পর্দার উপর ফেলে এই নাটকের প্রদর্শন করা হয়। এই মূর্তিগুলি দুটি নির্দিষ্ট রকমের হয়- একটি দেব প্রকৃতির ও অন্যটি অসুর প্রকৃতির। দেব প্রকৃতির পাত্রের নাক সরল ভাবেই আঁকা হয়, কিন্তু অসুর প্রকৃতির পাত্রের নাক হয় উঁচু। মূর্তির ঘাড়ের আকৃতিও নির্দিষ্ট অর্থ বহন করে। উঁচু ঘাড় বীরত্ব ভাবের প্রকাশক, বাঁকানো ঘাড় বৈরাগ্য ভাবের পরিচায়ক। আবার পুতুলের গায়ের রংও নানা তাৎপর্য বহন করে। ওআইয়াঙ্ মূর্তি দেবতা আর ঋষির হলে পায়ে জুতা আঁকা আবশ্যক।

ভ্রমণই একমাত্র মাধ্যম যার দ্বারা বিশ্বের যে কোন স্থানের মানুষের সংস্পর্শ লাভ এবং তাদের জীবন-যাপন পদ্ধতি ও সংস্কৃতির বাস্তব ধারণা লাভ করা সম্ভব। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যাম-দেশ' এই ভ্রমণ বৃত্তান্তটিতে মালয়, সুমাত্রা, জাভা, বলিদ্বীপ, শ্যামদেশ ইত্যাদি স্থানগুলির মানুষের সংস্কৃতির যে পরিচয় তুলে ধরেছেন তা আমাদের কাছে সেই সময়কালের সমাজ-সংস্কৃতির প্রামাণ্য দলিল স্বরূপ। এই সকল স্থানগুলির নাচ-গান-নাটক, তাদের পোশাক, খাদ্য, নানান রীতিনীতি, বিশ্বাস সকল বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা তিনি দিয়েছেন। ১৯২৭ সালের ভ্রমণ কথা, সেই সময়ের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমাজ-রাজনীতি, সংস্কৃতি, মানুষের আচার আচরণ, চিন্তা-ভাবনায় সব বিষয়ে এখন পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। তাই এই সকল গ্রন্থের মূল্য সাহিত্য সম্ভারে অমূল্য।

তথ্যসূত্র:

১) দাশগুপ্ত, ধীমান(সম্পা.)। অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী (অষ্টম খণ্ড)। বাণীশিল্প, ১৯৯৭, কলকাতা, পৃ.৩।
২) চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যাম-দেশ। প্রকাশ ভবন, ১৯৬৪, কলকাতা, পৃ. ৫১।
৩) তদেব, পৃ. ১৮৯।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. চক্রবর্তী, বনানী। বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের রূপ ও রূপান্তর। রত্নাবলী, কলকাতা, ২০১৩।
২. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ। বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যে মুক্তচিন্তা। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি: কলকাতা, ২০১১।
৩. মুখোপাধ্যায়, কুন্তল। সংস্কৃতি পাঠ। আপন পাঠ: কলকাতা,২০২১।
৪. রায়, নীহাররঞ্জন। বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদি পর্ব। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৩।
৫. সেন, ক্ষিতিমোহন। ভারতের সংস্কৃতি। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৫৪।
৬. হালদার, গোপাল। সংস্কৃতির রূপান্তর। পুথিঘর, কলকাতা, ১৯৪৯।

আকর গ্রন্থ:

১) চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যাম-দেশ, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ১৯৬৪।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1346-1354
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.355

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ভাবনা ও দেশপ্রেমের স্বরূপ

সায়ন সরকার, *গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 19.03.2026; Accepted: 21.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Rabindranath Tagore was not a conventional political thinker, but his ideas about the nation and his motherland are reflected in his various writings. Rabindranath took an active role in politics during the first Partition of Bengal and despite being a leading proponent of constructive swadeshi or '*Atmashakti*', he later distanced himself from mainstream politics. After that, he expressed his thoughts on the various political upheavals happening in the country. There were some ideological agreements and disagreements between Tagore and Gandhi, who was the central figure of India's freedom movement. But Tagore still accepted Gandhi as a true national leader. This helps us understand an important aspect of Tagore's idea of the nation. It further explains what Tagore meant by 'nation', why he believed that in India society was more important than the concept of a nation-state, and what '*Swadesh*' meant to him. His criticism of western nationalism and his warning about the 'terrible dangers' hidden within it are major elements of his political thought. His views on 'Patriotism' and his thoughts on his homeland are expressed in his literary works. Tagore's voice often carried the message of universal brotherhood, and his political thinking reflected a deep sense of internationalism. In essence, this article tries to explore Tagore's patriotic identity– someone who was critical of aggressive or narrow forms of nationalism, but deeply devoted to his motherland, and for whom the well-being of all human beings came first.

Keywords: Rabindranath, Motherland, Patriotism, India, Nationalism, Human beings

প্রকৃত বা কঠোর অর্থে রাজনৈতিক চিন্তাবিদ বলতে যা সাধারণত আমরা বুঝে থাকি রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় তা ছিলেন না। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এমন একজন ব্যক্তি যার বিভিন্ন সাহিত্যকর্মের মধ্যে দিয়ে তাঁর স্বদেশ ভাবনা ও দেশপ্রেমের স্বরূপ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে; তবে সমসাময়িক বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কিত তাঁর রচিত বিভিন্ন রচনা এবং বিভিন্ন ব্যক্তিকে লেখা তাঁর চিঠি পত্রের মধ্যে দিয়ে আমরা অত্যন্ত সচেতন একজন স্বদেশপ্রেমী মানুষকে আবিষ্কার করতে পারি যার প্রাণ দেশমাতৃকার জন্য চিরদিন নিয়োজিত ছিল। তাঁর লেখা 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্টনৈতিক মত' প্রবন্ধে তিনি নিজেই তাঁর রাষ্ট্র চিন্তা সম্পর্কে লিখেছেন যে,

> "বাল্যকাল থেকে আজ পর্যন্ত দেশের নানা অবস্থা এবং আমার নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দীর্ঘকাল আমি চিন্তা করেছি এবং কাজও করেছি।...যে মানুষ সুদীর্ঘকাল থেকে চিন্তা করতে করতে লিখেছে তার রচনার ধারাকে ঐতিহাসিকভাবে দেখাই সঙ্গত।...রাষ্ট্রনীতির মতো বিষয়ে কোনো বাঁধা মত একেবারে সুসম্পূর্ণভাবে কোনো এক বিশেষ সময়ে আমার মন থেকে উৎপন্ন হয়নি– জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্যে তারা গড়ে উঠেছে। সেই

> সমস্ত পরিবর্তন-পরম্পরার মধ্যে নিঃসন্দেহ একটা ঐক্যসূত্র আছে । সেইটিকে উদ্ধার করতে হলে রচনার কোন্ অংশ মুখ্য, কোন্ অংশ গৌণ, কোনটা তৎসাময়িক, কোনটা বিশেষ সময়ের সীমাকে অতিক্রম করে প্রবাহমান, সেইটে বিচার করে দেখা চাই। বস্তুত সেটাকে অংশে অংশে বিচার করতে গেলে পাওয়া যায় না, সমগ্রভাবে অনুভব করে তবে তাকে পাই।"[১]

যে কোন ব্যক্তিকে তাঁর সমসাময়িক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা গভীরভাবে প্রভাবিত করে থাকে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন তাঁর মননে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। তাইতো তাঁর সমসাময়িককালে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে তিনি তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করেছিলেন। এই মহান ভারতীয় কবি, দার্শনিক এবং শিক্ষাবিদ ছিলেন একজন প্রবল মানবতাবাদী। তাঁর বিভিন্ন রচনার মধ্যে দিয়ে তাঁর এই মানবতাবাদী চিন্তাধারা প্রতীয়মান হয়ে ওঠে। মূলত মানুষের কল্যাণই তাঁর কাছে প্রধান ছিল। অধ্যাপক গৌতম নিয়োগীর মতে,"...বৃহৎ মানুষের সাধনাকেই রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন প্রকৃত ভারতীয় পথ। বাইরের প্রভেদ দূর করে অন্তরের এক মানব– তার বিশ্বমানসলোক।"[২]

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক বিষয়ে লেখালেখির শুরু ১৮৮০ সাল থেকে। 'সাধনা' পত্রিকায় রাষ্ট্রীয় বিষয়ে তিনি প্রথম আলোচনা করেন। সদ্য গড়ে ওঠা জাতীয় কংগ্রেস এর সম্পর্কে তাঁর গভীর আগ্রহ ও মনোযোগ, জাতীয় সম্মেলনগুলিতে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ লক্ষণীয়। কিন্তু কংগ্রেসের কাজকর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে তেমন অনুরাগ ছিল না, বরং বীতরাগের মাত্রাই ছিল প্রবল। রবীন্দ্রনাথ এই সময়কাল থেকে তাঁর অসংখ্য রচনায় কংগ্রেস নরমপন্থী নেতাদের এবং তাদের ভিক্ষাবৃত্তির পদ্ধতিকে চরম সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, এই সময় রাজনীতির সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোনো সংযোগ ছিল না। নেতৃবর্গ বিদেশি আদবকায়দায়, বিদেশি রীতি পদ্ধতি অনুযায়ী, বিদেশি ভাষায় জনসাধারণকে তাঁদের কথাবার্তা শোনাবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু জনগণের তাতে কোনো উৎসাহ ছিল না। তিনি কংগ্রেসি নরমপন্থী নেতাদের পোশাকি আচরণের বিলেতপ্রীতি মানতে পারেননি।[৩] তিনি ১৮৯৭ সালে নাটোরের কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন বাংলা ভাষায় চালানোর জন্য তরুণদের উদ্দীপিত করেন। ১৯০৮ সালে পাবনায় কংগ্রেসের সভায় সভাপতির ভাষণ রবীন্দ্রনাথ প্রথম বাংলায় দিয়েছিলেন। যদিও এর জন্য কংগ্রেসের নেতারা ব্যঙ্গ করেছিলেন কবিকে।

১৯০৫ সালে প্রথম বঙ্গভঙ্গের সময় রবীন্দ্রনাথের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় আসে। এই বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যে স্বদেশী আন্দোলন হয়েছিল তাতে রবীন্দ্রনাথের অংশগ্রহণ এই আন্দোলনকে অত্যন্ত শক্তিশালী করে তোলে। স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়েছিল বয়কট কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে। অরবিন্দ ঘোষ হাজির করেছিলেন বিলেতি পণ্য, সরকারি শিক্ষা, বিচার ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক কাজকর্মে বয়কটের কর্মসূচি। এই বয়কট কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে স্বদেশী আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। রবীন্দ্রনাথ আশঙ্কা করেছিলেন যে বঙ্গ বিভাজন বাংলাকে দুর্বল করে দেবে। তিনি মনে করতেন সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হলে বহিরাগত কোন শক্তি বাংলাকে দুর্বল করতে পারত না, ঠিক যেমনি একজন সুস্থ ব্যক্তিকে রোগ কাবু করতে পারে না। একটা শক্তিশালী সমাজই হিন্দু এবং মুসলিমদের মধ্যেকার সম্প্রীতিকে নিশ্চিত করতে পারে, যা ভারতের বহুত্ববাদ রক্ষা করার জন্য অপরিহার্য।[৪] তাই দেশবাসীর মধ্যে স্বাদেশিকতা জাগ্রত করার জন্য এই সময়কালে রবীন্দ্রনাথ লিখে ফেললেন 'বাংলার মাটি, বাংলার জল', 'আমার সোনার বাংলা' এর মতো স্বদেশী সংগীত। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় রাখিবন্ধনের দিন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য যে হিন্দু-মুসলিম সম্মিলিত শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে 'বাংলার মাটি , বাংলার জল' গানটি গাওয়া হয়।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনকে ইতিহাসবিদ সুমিত সরকার তাঁর 'দ্য স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল' গ্রন্থে নরমপন্থী ধারা, গঠনমূলক স্বদেশী (আত্মশক্তি), রাজনৈতিক চরমপন্থা (নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ) এবং বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ– এই চার ভাগে বিভক্ত করেছেন। এরমধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বাঙালি জাতির আত্মশক্তি বা গঠনমূলক স্বদেশী আন্দোলনের প্রবক্তা; তাঁর মতে, স্বদেশী তাঁতে তৈরি কাপড়, হাতে তৈরি শিল্পদ্রব্যের ব্যবহার, গ্রামীণ পঞ্চায়েতে বিচার, মাতৃভাষার মাধ্যমে স্বদেশী বিদ্যালয়ে শিক্ষা, সমবায় ব্যাংক, কৃষি খামার স্থাপন প্রভৃতি ছিল 'আত্মশক্তি'। সুমিত সরকারের মতে, এই সময় বাংলায় যে নতুন চেতনার বিকাশ ঘটেছিল তার সবচেয়ে স্পষ্ট এবং স্মরণীয় প্রমাণ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে দিয়ে।[৫] তিনি 'মানসী' কাব্যগ্রন্থে যে কবিতাগুলি লিখেছিলেন সেখানে চিরাচরিত রাজনৈতিক আন্দোলনের পদ্ধতি থেকে সরে এসে অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত দিক দিয়ে আত্মশক্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গুরুত্ব দেন। ১৯০৪ সালে 'স্বদেশী সমাজ' নামক প্রবন্ধে এই বিষয়টি আরো বিস্তারিত করেন। এই স্বদেশী সমাজের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বাধীন সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তবে রবীন্দ্রনাথের এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। তাঁর এই ভাবাদর্শ সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েছিল, যদিও পরবর্তীকালে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রায় সমস্ত বৈশিষ্ট্য গুলির পূর্বাভাস এর মধ্যে দিয়ে পাওয়া যায়।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ রাজনীতিতে ঢুকে পড়লেও পরবর্তীকালে তিনি নিজেকে এর থেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। এর কারণ হয়তো ছিল তাঁর গঠনমূলক স্বদেশীর বিরুদ্ধে অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র এর মতো নেতাদের বিভিন্ন লেখনী। সে যাই হোক, এর পরে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে না থাকলেও দেশের বিভিন্ন সংকটে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রের নানা বিষয়ে, দেশবাসীর নানা প্রয়োজনে তাঁর কলম সর্বদা এগিয়ে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবী আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন না, এই ধরনের রাজনীতি তাঁর পচ্ছন্দ ছিল না। 'ঘরে-বাইরে', 'চার অধ্যায়' প্রভৃতি উপন্যাসে তিনি বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির বিরুদ্ধাচারণ করেছেন। তরুণ বিপ্লবীদের আত্মবলিদানকে শ্রদ্ধা জানালেও তিনি তাদের অবলম্বন করা পদ্ধতিকে সমালোচনা করতে ছাড়েননি। তা সত্ত্বেও তাদের প্রতি তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। তাই তো সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের সমর্থক না হওয়া সত্ত্বেও তিনি বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাকে 'স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্তি' বলে সম্বোধন করেন। আবার পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্র বসুকে 'দেশনায়ক' হিসেবে বরণ করে লিখেছিলেন 'দেশনায়ক' প্রবন্ধ, উৎসর্গ করেছিলেন 'তাসের দেশ' নাটিকাটি। ১৯১৯ সালে রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডে। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ 'নাইটহুড' উপাধি ত্যাগ করেন।

ইতিমধ্যে ভারতীয় রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর আর্বিভাব ঘটে গিয়েছে। বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক প্রমথনাথ বিশী 'রবীন্দ্র সাহিত্যে গান্ধী চরিত্রের পূর্বাভাস' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের কিছু কবিতার আলোচনার মধ্যে দিয়ে দেখিয়েছেন যে, গান্ধীজীর আবির্ভাবের পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ গান্ধীর ন্যায় এক প্রতিরূপ নির্মাণ করেছিলেন। প্রবন্ধের একেবারে প্রারম্ভে তিনি লিখেছেন যে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট "মহামানবের কাল্পনিক আভাসের সঙ্গে এযুগের একজন মহামানবের বাস্তব রূপের অপ্রত্যাশিত সাদৃশ্য দেখিতে পাইব। সেই বাস্তব – মহামানব গান্ধী। গান্ধীর নামটিও জানিবার আগে রবীন্দ্রনাথ আভাসে গান্ধী চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন।"[৬] এই প্রসঙ্গে তিনি রবীন্দ্রনাথের ১৮৮৮ সালে রচিত 'গুরুগোবিন্দ' কবিতাটির উল্লেখ করে লিখেছেন, "বস্তুত কবির কাছে গুরুগোবিন্দ উপলক্ষ্য মাত্র, তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ একজন মহামানবের চিত্র আঁকিতেছিলেন এবং সে অঙ্কনপ্রয়াসের মূলে ছিল তাঁহার কালের বেদনা ও আকাঙ্খা–

"আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগ রে সকল দেশ।"

ইহা গুরুগোবিন্দ সিংহের পক্ষে আকাঙ্ক্ষা, কবির পক্ষে কল্পনা, কিন্তু গান্ধীজীর পক্ষে ইহা বাস্তব সত্য, এবং তাহা আমাদের চোখের উপরেই এমন ভাবে ঘটিয়া গিয়াছে যে, ভারতবর্ষের আর কোনো মহামানব নিজের জীবনকালে এমন সার্থক দাবি করিতে পারেন নাই।"[৭] এই প্রবন্ধে প্রমথনাথ বিশীর দেওয়া বিভিন্ন উদাহরণ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে গান্ধীজীর জীবন, কর্ম ও বাণীর সার্থক পূর্বাভাস রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সাহিত্য কর্মের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল যখন "গান্ধীজির নাম তখন তাঁহার পরিবারের বাহিরে কে জানিত?"[৮]

রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজীর মধ্যে মতাদর্শগত ঐক্য ও অনৈক্য দুই-ই ছিল। তাঁরা দুজনেই আশ্রমকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার সমর্থক ছিলেন, যেখানে জাতি-বর্ণ-ধর্ম-লিঙ্গ নির্বিশেষে সবাই বিদ্যা শিক্ষার সুযোগ পেতে পারত। দুজনেই জাতপাত এবং অস্পৃশ্যতার তীব্র বিরোধী ছিলেন এবং এবং দুজনেই ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ। গান্ধীজি বিশ্বাস করতেন স্বাধীনতা লাভের আগে দেশবাসীকে সেটা রক্ষা করার জন্য গড়ে তোলা আবশ্যক। তাঁর কাছে ভারতের জনসাধারণের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আত্মিক উন্নয়ন সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথও সাধারণ মানুষের প্রকৃত বিকাশ সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন। 'লোকহিত' রবীন্দ্রনাথ এসম্পর্কে বিশদে আলোচনা করেছেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধীজীর অন্যতম অবলম্বন ছিল তাঁর সত্যাগ্রহ পদ্ধতি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই সত্যাগ্রহকে পূর্ণ সমর্থন করতেন। একইভাবে গান্ধীজীর অহিংসা নীতির প্রতিও রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ সমর্থন ছিল। পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রেও তাদের চিন্তা ভাবনা ছিল একই ধরনের। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর চরকা কাটা ব্রতকে, তাঁর অসহযোগ আন্দোলনকে, তাঁর প্রতি দেশবাসীর অন্ধ আনুগত্যকে এবং তাঁর অনশনের পন্থাকে কখনো সমর্থন করতে পারেননি। গান্ধীজীর অহিংসার তত্ত্বকে পূর্ণ সমর্থন জানালেও এর ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে তাঁর মনে নানা দ্বিধা ছিল। তবুও রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন গান্ধীই ভারতের প্রকৃত জননেতা। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন,

> "...মহাত্মা গান্ধি এসে দাঁড়ালেন ভারতের বহুকোটি গরিবের দ্বারে-- তাদেরই আপন বেশে, এবং তাদের সঙ্গে কথা কইলেন, তাদের আপন ভাষায়। এ একটা সত্যকার জিনিস, এর মধ্যে পুঁথির কোনো নজির নেই। এইজন্যে তাঁকে যে মহাত্মা নাম দেওয়া হয়েছে এ তাঁর সত্য নাম। কেননা, ভারতের এত মানুষকে আপনার আত্মীয় করে আর কে দেখেছে।"[৯]

এবার আসা যাক রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্র তথা স্বদেশ ভাবনা এবং দেশপ্রেম সম্মন্ধে তাত্ত্বিক আলোচনায়। ১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ দুটো প্রবন্ধ লিখেছিলেন। একটি হল 'নেশন কী?' এবং দ্বিতীয়টি 'ভারতবর্ষীয় সমাজ'। এই দুটি প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেখাতে চাইলেন এ দেশে 'নেশন' নয়, সমাজ-ই প্রধান। 'নেশন' বলে কোন বস্তু আমাদের ঐতিহ্য ছিল না।[১০] রাজদণ্ড লাভের জন্য জাতিদের মধ্যে হানাহানি সময়ও সমাজই দেশের ধর্মকে রক্ষা করতে পেরেছিল। 'ভারতবর্ষীয় সমাজ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন,

> "... আমাদের দেশে সমাজ সকলের বড়। অন্য দেশে নেশন নানা বিপ্লবের মধ্যে আত্মরক্ষা করিয়া জয়ী হইয়াছে— আমাদের দেশে তদপেক্ষা দীর্ঘকাল সমাজ নিজেকে সকল প্রকার সংকটের মধ্যে রক্ষা করিয়াছে। আমরা যে হাজার বৎসরের বিপ্লবে, উৎপীড়নে, পরাধীনতায়, অধঃপতনের শেষ সীমায় তলাইয়া যায় নাই...সে কেবল আমাদের প্রাচীন সমাজের জোরে। এ সমাজ আমাদিগকে সুখকে বড়ো করিয়া জানায় নাই— সকল কথাতেই, সকল কাজেই, সকল সম্পর্কেই, কেবল কল্যাণ, কেবল পুণ্য এবং ধর্মের মন্ত্র কানে দিয়াছে। সেই সমাজকেই আমাদের সর্বোচ্চ আশ্রয় বলিয়া তাহার প্রতিই আমাদের বিশেষ করিয়া দৃষ্টিক্ষেপ করা আবশ্যক।"[১১]

রবীন্দ্রনাথের বহু ব্যবহৃত 'স্বদেশ' শব্দটির প্রকৃত অর্থ কী? এই সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায় অসহযোগ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথের 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধটির কিছু বক্তব্য তুলে ধরেছেন।[১২] সেখানে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "আমার দেশ আছে এই আস্তিকতার একটি সাধনা আছে। দেশে জন্মগ্রহণ করেছি বলেই দেশ আমার, এ হচ্ছে সেই-সব প্রাণীর কথা যারা বিশ্বের বাহ্য ব্যাপার সম্বন্ধে পরাসক্ত। কিন্তু,যেহেতু মানুষের যথার্থ স্বরূপ হচ্ছে তার আত্মশক্তিসম্পন্ন অন্তরপ্রকৃতিতে, এই জন্য যে দেশকে মানুষ আপনার জ্ঞানে বুদ্ধিতে প্রেমে কর্মে সৃষ্টি করে তোলে সেই দেশই তার স্বদেশ।"[১৩] পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতে, "রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটির ভেতর তার নেশন-চিন্তার রহস্য লুকিয়ে আছে।"[১৪] অনুরাধা রায় মনে করেন, রবীন্দ্রনাথের "আত্মশক্তির আদর্শে এক হয়ে যায় ব্যক্তির মুক্তি আর দেশের মুক্তি। আরো বড়ো করে দেখলে, ব্যক্তির মুক্তি আর সার্বজনিক মুক্তি।.. এই আত্মশক্তির অনুবন্ধী মন্ত্র হল মানুষ বাঁধা। দুটি আদর্শ বা মূল্যবোধই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।"[১৫] তিনি আরো মনে করেন, "এই আত্মশক্তি আর মানুষ বাধা মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের যে সৃজনশীল স্বদেশ চিন্তা তা যেন অ্যান্ডারসনের জাতি তত্ত্বের সঙ্গে বেশ সুসঙ্গত।"[১৬]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথমদিককার কিছু লেখাতে 'প্যাট্রিয়টিজম' ও 'নেশনতন্ত্র' কে সমার্থক শব্দ হিসেবেই দেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেকে প্যাট্রিয়ট বলে পরিচয় দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। ১৯২১ সালে এন্ড্রুজকে লেখা এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, তিনি তাঁর ভারতকে ভালোবাসেন, কিন্তু তাঁর ভারত একটা ভাবনা, কোনো ভৌগোলিক অভিব্যক্তি নয়। তাই তিনি 'প্যাট্রিয়ট' নয়; তিনি সারাবিশ্বে তাঁর স্বদেশিদের খুঁজতে চান।[১৭] যদিও সেই সময় দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে প্যাট্রিয়ট বলে স্বীকার না করলেও, সমসাময়িককালে ন্যাশনালিজম ও প্যাট্রিয়টিজম এর মধ্যে যে ধারণাগত পার্থক্য করা হয়, তাহলে রবীন্দ্রনাথকে অবশ্যই প্যাট্রিয়ট বলে অভিহিত করতে হয়। অধ্যাপক কৃত্যপ্রিয় ঘোষ এর মতে, "রবীন্দ্রনাথ দেশের ভূখণ্ডের ওপর কোন দেবত্ব আরোপ করতে চাননি, দেশ মাতৃকার প্রতি যুক্তিহীন অন্ধ আনুগত্য প্রদর্শন করেননি। তিনি বিশ্ব মানবিকতার প্রতি আস্থা রেখে স্বদেশের মঙ্গল চেয়েছেন। মানুষের অপমান তাঁকে আহত করেছে, ভারতীয় মানুষ বলে আলাদা কোন অনুভূতির কথা কবি বলেন না।"[১৮]

রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ বিষয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা হল 'ন্যাশনালিজম' গ্রন্থটি। মূলত এটি হলো প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময় জাপানে ও আমেরিকায় ভ্রমণ কালে ওই দুই দেশে দেওয়া তিনটি বক্তৃতার সংকলন।[১৯] বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইউরোপের কিছু দেশে উগ্র, জঙ্গি ও আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষার উদ্ভবের পটভূমিতে জাতীয়তাবাদের উপর তার বিশ্লেষণ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তিনি ইউরোপের সেই সমস্ত দেশে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ফসল হিসেবে জাতীয়তাবাদের ধারণার জন্মকে ব্যাখ্যা করেছেন। পশ্চিমী জাতীয়তাবাদের সমালোচনা করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

> "সত্য কথাটি হ'ল পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবোধের উৎসমূলে এবং কেন্দ্রস্থলে রয়েছে সংঘাত ও জয়ের প্রবল ইচ্ছা; সামাজিক সহযোগিতা এর ভিত্তি নয়। পশ্চিমী জাতীয়তাবোধ ক্ষমতার সুষ্ঠু সংগঠন গড়ে তুলেছে, কিন্তু কোন আধ্যাত্মিক আদর্শবাদ গড়ে তোলেনি। এই জাতীয়তাবাদ লুণ্ঠনকারী জীবের মতো, যার সব সময় কোন-না-কোন বধ্য শিকারের প্রয়োজন।"[২০]

আবার, 'ন্যাশনালিজম ইন ইন্ডিয়া' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন,

> "ভারতবর্ষে সত্যিকারের 'ন্যাশনালিজম' এর চেতনা কখনো ছিল না। যদিও শৈশব কাল থেকে আমাদের শেখানো হয়েছে যে, 'নেশন' এর প্রতিমূর্তি ঈশ্বর বা মানবতার প্রতি শ্রদ্ধার চাইতেও মহৎ, কিন্তু আমার বিশ্বাস আমি সে-শিক্ষা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি এবং এটা আমার

> প্রবল বিশ্বাস,আমার স্বদেশবাসী সংগ্রাম করে মানবতার আদর্শ থেকে স্বদেশের মূর্তি বড় এই ধারণা ত্যাগ করে লাভবান হবে।"[২১]

সমাজতত্ত্ববিদ আশিস নন্দী এ প্রসঙ্গে মনে করেন যে, যদি কোন ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও নেশন-স্টেটের নীতিগুলিকে সর্বজনীন বলে ভাবেন তাহলে তিনি নিজের অজান্তেই রবীন্দ্রনাথের ভাবনার বিরুদ্ধে অবস্থান করছেন।[২২]

রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন যে পশ্চিমী জাতীয়তাবাদের আদর্শ স্বাধীনতা এবং মানবিক মূল্যবোধগুলিকে ধ্বংস করে দেয়, যার সাথে ভারতীয় ঐতিহ্যের এক গভীর বিরোধ আছে। অধ্যাপক কৃত্যপ্রিয় ঘোষ রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদী আদর্শের মূল্যায়নে লিখেছেন যে,

> "জাতীয়তাবাদের আদর্শ তাহলে একটি জাতিকে মুক্ত করতে পারেনা, বৃহত্তর মনুষ্যত্বের চর্চা করতে শেখায় না, কেবল অন্ধ রাষ্ট্রপ্রীতি ও ক্ষমতার রাজনীতির পথ প্রশস্ত করে। অতএব এই লুণ্ঠনকারী জাতীয়তাবাদ সামরিক সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের জনক, সহযোগিতানির্ভর, বিশ্বশান্তির পথে সহায়ক সমাজ তৈরি করে না। তাই জাতীয়তাবাদ সভ্যতার পরিপন্থী।"[২৩]

সেই জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে 'জাতীয়তাবাদ হল এক ভয়াবহ বিপদ'।

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তাকে সঠিকভাবে বোঝার জন্য তাঁর মৌলিক সাহিত্যগুলিকেও বিশ্লেষণ করতে হয়। তাঁর 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে রচিত একটি ত্রিকোণ প্রেমের গল্প। উপন্যাসটিতে রবীন্দ্র আত্মার দোসর নিখিলেশের বক্তব্য তথা নানা ভাবনার মধ্যে দিয়ে আমরা রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ভাবনাকে উপলব্ধি করতে পারি। এখানে নিখিলেশ বিদেশী দ্রব্য বয়কট ও বিলেতি কাপড় পোড়াবার আন্দোলনকে সমর্থন করে না। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসে আমরা দেখি গোরা চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথের ভারত ভাবনার বাহক। এই উপন্যাসে ভারতীয় সমাজের বর্ণ বৈষম্য, জাতিভেদ প্রথা, জনসাধারণের দারিদ্র্য ও দুঃখ কষ্টের স্বরূপকে রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন। তাঁর ভারত ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে গোরার বিভিন্ন বক্তব্যে। ভারতবর্ষের বহুত্ববাদকে বোঝাতে রবীন্দ্রনাথ গোরার মধ্যে দিয়ে বললেন,

> "আপনি আমাকে আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন যিনি হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান ব্রাহ্ম সকলেরই– যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে, কোনো ব্যক্তির কাছে কোনোদিন অবরুদ্ধ হয় না– যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।"[২৪]

একইভাবে 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে নারী-পুরুষের ব্যক্তিগত প্রেম আর স্বদেশপ্রেমের টানাপোড়েনের চিত্র অঙ্কন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। আশিস নন্দী রবীন্দ্রনাথের এই উপন্যাস ত্রয়ীর মধ্যে দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক ভাবনা ও সত্তার গুরুত্বপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক সূত্র বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে,"তিনটি উপন্যাসেই রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তাধারা এক সুরে বাঁধা; এই চিন্তাধারা তিনটি উপন্যাসের রচনাকালের পঁচিশ বছরে এতটুকু পরিবর্তন হয়নি।"[২৫] এছাড়া, রবীন্দ্রনাথের 'সংস্কার', 'বদনাম', 'ঘোড়া', 'কর্তার ভূত' প্রভৃতি ছোট গল্প, 'প্রায়শ্চিত্ত', 'মুক্তধারা' প্রভৃতি নাটকে আমরা তাঁর স্বদেশ ভাবনা ও দেশপ্রেমের স্বরূপ বিভিন্নভাবে আবিষ্কার করতে পারি। একইভাবে এই বিষয়ে রয়েছে তাঁর লেখা অজস্র গান, কবিতা এবং প্রবন্ধ, যেগুলির কথা আলাদা করে উল্লেখের প্রয়োজন নেই বলে মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেম কখনো তাঁর সরাসরি বক্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে, কখনোবা আবার পরোক্ষে। প্রাশ্চাত্য সভ্যতার শিল্প-সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল। যদিও পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তিনি বরাবরই সোচ্চার হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ যখন বিভিন্ন দেশ ভ্রমণে গিয়েছিলেন সেখানে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা থেকে তার স্বদেশ সমস্যার নানাদিক উঠে এসেছে। যেমন- রাশিয়া ভ্রমণ রবীন্দ্রনাথকে উদ্দীপ্ত

করেছিল। তাঁর রাশিয়ার চিঠিতে সে কথাই তিনি বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ দেশ গড়ার কাজে শিক্ষাকে বারবার গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর ভাবনায় শিক্ষা হবে জীবন ভিত্তিক, যাতে দেশ গড়ার কাজটি সহজ হয়। রাশিয়ার চিঠিতে আমরা দেখব রবীন্দ্রনাথের লেখায় উঠে এসেছে সেখানকার শিক্ষার কথা, গ্রামোন্নয়নের কথা, চাষী ও শ্রমজীবী মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দময় জীবনের কথা। রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেম ভাবনায় যে বিষয়টি মূলত প্রধান ছিল বা তার বিভিন্ন লেখায় বার বার এসেছে তা হল মানুষের কথা। তাঁর মতে, মানুষের সমাজ যদি গঠিত না হয় তাহলে সমাজ, দেশ সমস্ত কিছুই অর্থহীন হয়ে যায়, আর স্বাধীনতা তো বটেই।

রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তবে তিনি ছিলেন একজন নিখাদ দেশপ্রেমী মানুষ। জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমকে যদিও অনেকে একই মনে করে, তবুও স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ এই দুটি শব্দের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য অবশ্যই আছে। রজার স্ক্রুটন এর মতে স্বদেশপ্রেম হল এক ধরনের সংলগ্নতার অনুভূতি, অন্যদিকে জাতীয়তাবাদ হল এক ধরনের মতাদর্শ যা জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের ধারণার উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। তাই তার কাছে জাতীয়তাবাদ একটি ভাবাদর্শ এবং স্বদেশপ্রেম হলো স্বাভাবিক অনুভূতি।[২৬] আশিস নন্দীর মতে, রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদকে দেখতেন একটা ভাবাদর্শ হিসাবে এবং জাতীয়তাবাদের তত্ত্বটিকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি চাইছিলেন স্বদেশপ্রেমকে জাতীয়তাবাদের থেকে আলাদা করে নিতে।[২৭] যদিও তাঁর কাছে সবার উপরে ছিল মানবতাবাদ। রবীন্দ্রনাথের রচনায় মানুষের কথা বারে বারে এসেছে। ১৯০৮ সালে তিনি এ এম বোস কে লেখা চিঠিতে এ বিষয়ে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করে লিখেছেন,

> "দৈশিকতা (প্যাট্রিয়াটিজম) আমাদের আত্মাকে চরম আশ্রয় দিতে পারবে না, আমি মনুষ্যত্বকে বরণ করে নিয়েছি – আমি হীরের মূল্যে কাচ কিনব না দৈশিকতা যে মনুষ্যত্বকে লঙ্ঘন করবে, এতো আমি আমার জীবনে ঘটতে দিতে পারব না।"[২৮]

এ বিষয়ে তাঁর 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে অনেক কথা আছে। সেখানে রবীন্দ্র আত্মার দোসর নিখিল তার স্বমতে অবিচল –

> "দেশের সেবা আমি করতে চাই, কিন্তু আমার পূজা তোলা থাকবে দেশের চেয়ে অনেক বড়। কে দেবতা বলে পুজো করলে তার ওপরেই অভিশাপ নেমে আসে।"[২৯]

সমসাময়িককালের ভারতে যখন উগ্র জাতীয়তাবাদীদের গর্জন তীব্রতর হচ্ছে, সেই সময়ে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ সম্পর্কে এই ভাবনা গুলিকে আমাদের পাথেয় করে তুলতে হবে।

আমরা রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ভাবনা ও দেশপ্রেম সম্পর্কে আলোচনা করছি বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো মহামানবকে কোনো ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে আটকে রাখা সম্ভব নয়। তাঁর মধ্যে আমরা আন্তর্জাতিকতাবাদকে প্রত্যক্ষ করতে পারি। তাঁর কণ্ঠে শোনা যায় বিশ্বভ্রাতৃত্বের সুর। তাঁর মতে,

> "...প্রত্যেক জাতিই বিশ্বমানবের অঙ্গ। বিশ্বমানবকে দান করিবার, সহায়তা করিবার সামগ্রী কী উদ্ভাবন করিতেছে, ইহারই সদুত্তর দিয়া প্রত্যেক জাতি প্রতিষ্ঠালাভ করে...বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপন— ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম। ভারতবর্ষ পার্থক্যকে বিরোধ বলিয়া জানে না, সে পরকে শত্রু বলিয়া কল্পনা করে না।"[৩০]

বস্তুত রবীন্দ্রনাথ সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে নিজেকে মিলিত করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি লেখেন,

> "বিশ্বধর্মের সঙ্গে আমাদের ইচ্ছাকে মেলাতে পারলেই আমরা বস্তুত স্বাধীন হই। স্বাধীনতার নিয়মই তাই। আমি স্বেচ্ছায় বিশ্বের সঙ্গে যোগ না দিই যদি, তা হলেই বিশ্ব আমার প্রতি জবরদস্তি করে আমাকে তার অনুগত করবে– তখন আমার আনন্দ থাকবে না, গৌরব থাকবে না, তখন দাসের মতো সংসারের কানমলা খাব।"[৩১]

বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে কাঁটাতারের বেড়া ছিন্ন করে আমাদের বিশ্ববাসী গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

আসলে রবীন্দ্রনাথের মতো মহামানবের স্বদেশ চিন্তা ও দেশপ্রেমকে কোন নির্দিষ্ট ধাঁচ মেনে আলোচনা করা প্রায় অসম্ভব, সে চেষ্টা এখানে করাও হয়নি, একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র। তবে সামগ্রিক একটা আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন জাতীয়তাবাদের বিরোধী কিন্তু দেশপ্রেমী মানুষ। আবার দেশপ্রেমের নানা সমালোচনাও তিনি করেছেন। মূলত তাঁর কাছে মানব কল্যাণই ছিল মুখ্য। আজ ভারতের স্বাধীনতার ৭৮ বছর পর আমরা বলতে পারি রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ সম্পর্কিত ভাবনা চিন্তা দেশ গড়ার ক্ষেত্রে উপেক্ষিতই থেকেছে, প্রতিদিন ধ্বংস করার চেষ্টা চলছে বহুত্ববাদী, ধর্মনিরপেক্ষ ভারতকে, যা তাঁর স্বদেশ চিন্তার অন্যতম দিক। এ প্রসঙ্গে গৌরকিশোর ঘোষ এর মন্তব্য বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। তাঁর মতে, " রবীন্দ্রনাথ ভারতকে নেশন হিসেবে স্বীকার করেননি, তিনি বলেছিলেন ভারততীর্থ। তিনি দেখেছিলেন, ভারতকে নেশনের আঁটসাট অনেকে পরিধির মধ্যে ফেলা যায় না। ভারতের সাধনা সমন্বিত সংস্কৃতির সাধনা। ভারত এক জাতি নয়, বহু জাতির মিলন ক্ষেত্র। এই কথাটি সেকুলার গণতন্ত্রবাদীদের সর্বদা মনে রাখতে হবে।"[৩২] অনেকে মনে করেন রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা নিয়ে আজ আর আমাদের কোন কাজ নেই। এ প্রসঙ্গে অনুরাধা রায় এর মতের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমরা বলতে পারি, "রবীন্দ্রনাথ যদি আজকের দিনের একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর কাজে না-ও লাগেন, আমার মতো অসংখ্য সাধারণ মানুষের পক্ষে তাঁর স্বদেশ চিন্তা কিন্তু আজও বেশ প্রাসঙ্গিক বলেই মনে হয়। সেটা তাঁর স্বদেশ চিন্তায় নিহিত মূল্যবোধগুলির জন্য...– আত্মশক্তি, মানুষ বাঁধা ও মুক্তি।"[৩৩]

তথ্যসূত্র:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত। কালান্তর। রবীন্দ্র রচনাবলী (এয়োদশ খন্ড)। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃ. ৭১৩-৭১৪।

২. নিয়োগী, গৌতম। রবীন্দ্রনাথ ও মানুষের ধর্ম। অভিযান পাবলিশার্স, ২০১৯, পৃ. ২৯৫।

৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ন্যাশনল ফন্ড। সমাজ। Tagore Web, https://tagoreweb.in/Essays/samaj-72/national-fund-5965। প্রবেশের তারিখঃ ৮ মার্চ ২০২৬।

৪. Mukherjee, Subrata. The Political Ideas of Rabindranath Tagore. Rupa Publications, 2020, p. 32.

৫. Sarkar, Sumit. The Swadeshi Movement in Bengal. Permanent Black, 2020, p. 43.

৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেশ কুমার, সম্পাদনা। গান্ধী পরিক্রমা। গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়, ২০২০ পৃ. ২৮২।

৭. তদেব, পৃ. ২৮৪।

৮. তদেব, পৃ. ২৮২।

৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। সত্যের আহ্বান। কালান্তর। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪১-৬৪২।

১০. মুখোপাধ্যায়, অশোক কুমার, সম্পাদনা। ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা পরিচয়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১৩ পৃ. ২০২.

১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ভারতবর্ষীয় সমাজ। আত্মশক্তি। ১৯৯০। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১।

১২. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ। প্রজা ও তন্ত্র। অনুষ্টুপ, ২০২১, পৃ. ৮৬।

১৩.ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। সত্যের আহ্বান। কালান্তর। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩৮।

১৪. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ। পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭।
১৫. রায়, অনুরাধা। ইতিহাসের হরেক গেরো। অনুষ্টুপ, ২০১৯, পৃ. ২৬২।
১৬. তদেব
১৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবজ্যোতি। রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ-বিরোধী স্বদেশপ্রেম। সেতু প্রকাশনী, ২০১২, পৃ. ৩৩।
১৮.মুখোপাধ্যায়, অশোক কুমার, সম্পাদনা। পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৪।
১৯. তদেব, পৃ. ২০৫।
২০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। জাতীয়তাবাদ। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১২, পৃ. ৭০।
২১. তদেব, পৃ. ৯০।
২২. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবজ্যোতি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪।
২৩. মুখোপাধ্যায়, অশোক কুমার সম্পাদনা। পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৫ -২০৬।
২৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। গোরা। রবীন্দ্র রচনাবলী (সপ্তম খন্ড)। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৫ পৃ. – ৯২৪।
২৫. নন্দী, আশিষ। জাতীয়তাবাদ ও ভারতচিন্তা। বুক পোস্ট পাবলিকেশন, ২০২০, পৃ. ২১।
২৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবজ্যোতি। পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪।
২৭. তদেব, পৃ. ৮২-৮৩।
২৮. সেন, অমর্ত্য। তর্কপ্রিয় ভারতীয়। আনন্দ পাবলিশার্স, ২০২১ পৃ. ১০৫।
২৯. তদেব।
৩০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। স্বদেশী সমাজ। আত্মশক্তি। রবীন্দ্র রচনাবলী (এয়োদশ খন্ড)। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃ. ৫৮।
৩১. ঠাকুর,রবীন্দ্রনাথ। ত্যাগ। শান্তিনিকেতন। Tagore Web, https://tagoreweb.in/Essays/shantiniketan-86/tyag-675। প্রবেশের তারিখঃ ১০ মার্চ ২০২৬।
৩২.. অধিকারী, রণজিৎ, সম্পাদনা। পূর্ব, সপ্তদশবর্ষ সংখ্যা ১ম ও ২য়, ২০২১, পৃ. ৪৪৭।
৩৩. রায়, অনুরাধা। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৮।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1355-1362
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.356

ন্যায় দর্শনে অনুমিতি জ্ঞানের করণ: ব্যাপ্তিজ্ঞান না পরামর্শ— একটি সমীক্ষা

সৌরভ মণ্ডল, *স্বাধীন গবেষক, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 19.03.2026; Accepted: 26.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Nyāya philosophy, the system of logic and reasoning, gives great importance to inference (anumāna) as a source of knowledge. Inference is knowledge that comes from a sign (liṅga) based on prior experience. In this context, an important question arises about the karaṇa (instrument) of inferential knowledge (anumiti). The main issue is whether vyāpti-jñāna or parāmarśa should be accepted as the true karaṇa.

Nyāya philosophy clearly distinguishes between kāraṇa (cause) and karaṇa (instrument). Some philosophers accept parāmarśa as the karaṇa, while Navya-Nyāya thinkers like Gaṅgeśa and Viśvanātha consider vyāpti-jñāna as the real karaṇa and parāmarśa as a process.

From this discussion, it can be said that both are important, but vyāpti-jñāna is more acceptable as the true karaṇa of inference.

Keywords: Nyāya Philosophy, Inference, Anumiti, Karaṇa, Vyāpti, Parāmarśa

বেদের প্রামাণ্যের উপর ভিত্তি করে ভারতীয় দর্শনকে আস্তিক ও নাস্তিক এই দুটি সম্প্রদায় ভাগ করা হয়। আস্তিক দর্শনের মধ্যে অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ সম্প্রদায় হল ন্যায় দর্শন। মহর্ষি গৌতম মুনি হলেন এই দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি 'অক্ষপাদ' নামেও পরিচিত ছিলেন। এইজন্য মাধবাচার্য তাঁর "সর্বদর্শনসংগ্রহ" গ্রন্থে ন্যায় দর্শনকে অক্ষপাদ দর্শন বলেছেন। এছাড়াও ন্যায় দর্শনকে আন্বিক্ষীকী বিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, প্রমাণশাস্ত্র, সর্বশাস্ত্রপ্রদীপও বলা হয়। মহর্ষি গৌতম রচিত 'ন্যায় সূত্র'ই হল ন্যায় দর্শনের মূল গ্রন্থ। মহর্ষি গৌতমের এই ন্যায়সূত্রের উপর ভিত্তি করে প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ, যেমন বাৎসায়নের ন্যায়ভাষ্য, উদ্দ্যোতকরের ন্যায়বার্ত্তিক, বাচস্পতি মিশ্রের ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্যটীকা, উদয়নের ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্যটীকাপরিশুদ্ধি রচিত হয়েছে। অন্যদিকে গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের, তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থকে কেন্দ্র করে নব্য ন্যায়ের আবির্ভাব হয়। নব্য নৈয়ায়িকদের মধ্যে বিশ্বনাথের ভাষাপরিচ্ছেদ, অন্নংভট্টের তর্কসংগ্রহ, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ন্যায় মতে জ্ঞান দুই প্রকার স্মৃতি ও অনুভব। এই অনুভব আবার দুই প্রকার যথার্থ অনুভব বা প্রমা এবং অযথার্থ অনুভব বা অপ্রমা। ন্যায় মতে যথার্থ অনুভব বা প্রমা চার প্রকার। ১) প্রত্যক্ষ ২) অনুমতি ৩) উপমিতি ও ৪) শাব্দবোধ।প্রমার করণকে বলা হয় প্রমাণ। তাই চার প্রকার করণ প্রমাণও চার প্রকার(প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান ও শব্দ) তারমধ্যে অনুমান হল অন্যতম।

মহর্ষি গৌতম তাঁর 'ন্যায়সূত্রে' বলেছেন- "অথ তৎ পূর্বকমনুমানম্"[১] অর্থাৎ মহর্ষি 'তৎ' শব্দের দ্বারা প্রত্যক্ষকেই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু যে কোনো প্রত্যক্ষপূর্বক জ্ঞানকে অনুমান প্রমান বললে শব্দশ্রবণরূপ প্রত্যক্ষপূর্বক শাব্দবোধ ও উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হয়। তাই ভাষ্যকার বলেছেন- "লিঙ্গ লিঙ্গিনোঃ সম্বন্ধ দর্শনং লিঙ্গদর্শনঞ্চ"[২] অর্থাৎ 'তৎপূর্বকং' এই পদের দ্বারা লিঙ্গ (হেতু) ও লিঙ্গীর (সাধ্যের) সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ, লিঙ্গের প্রত্যক্ষ এবং সেই সম্বন্ধ বিশিষ্ট লিঙ্গ ও লিঙ্গীর প্রত্যক্ষের দ্বারা সেই লিঙ্গের স্মরণরূপ জ্ঞানকে বোঝায়। অনুমানের হেতুকে বলে লিঙ্গ এবং লিঙ্গের দ্বারা যে পদার্থের অনুমিতি হয়, সেই অনুমেয় পদার্থেকে বলে লিঙ্গী। হেতু (লিঙ্গ) ও সাধ্যে ধর্মের (লিঙ্গী) ব্যাপ্তি সম্বন্ধের জ্ঞান হলে সেই হেতুর দ্বারা সেই ধর্মের অনুমিতি হয়ে থাকে। তাই অনুমান হল লিঙ্গ-লিঙ্গীপূর্বক জ্ঞান।[৩]

নব্য নৈয়ায়িক অন্নংভট্ট অনুমানের লক্ষণ দিয়েছেন "অনুমিতি করণম্ অনুমানম্"[৪] অর্থাৎ অনুমিতি জ্ঞানের করণকে অনুমান বলে। পরামর্শ হল অনুমিতির করণ। তাই পরামর্শই হল অনুমান প্রমাণ।
ন্যায় দর্শনে কারণ (kāraṇa) এবং করণ (karaṇa) এই দুটি ধারণার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য করা হয়েছে। ন্যায় মতে কারণ দুই প্রকার সাধারণ ও অসাধারণ। সাধারণ কারণগুলি ভিন্ন কোন কার্যের প্রতি অন্য কারণ গুলি হল অসাধারণ কারণ। এই অসাধারণ কারনকেই নৈয়ায়িকগণ করণ বলেছেন।

এই প্রেক্ষিতে ন্যায় দর্শনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক দেখা যায়— অনুমিতি জ্ঞানের করণ আসলে কী। কিছু দার্শনিক মনে করেন যে ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমিতির করণ, আবার অন্যদের মতে পরামর্শই অনুমিতি জ্ঞানের প্রকৃত করণ।এই প্রবন্ধে ন্যায় দর্শনে অনুমিতি জ্ঞানের করণ সম্পর্কিত এই দার্শনিক সমস্যাটি আলোচনা করা হবে এবং বিশেষভাবে ব্যাপ্তিজ্ঞান ও পরামর্শের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে দেখা হবে যে অনুমিতি জ্ঞানের প্রকৃত করণ হিসেবে কোনটি অধিক গ্রহণযোগ্য।

ন্যায় দর্শনে করণের ধারণা:

নব্য নৈয়ায়িক অন্নংভট্ট বলেছেন- "অসাধারণং কারণং করণম্"[৫]। ন্যায়দর্শনে কারণকে সাধারণ ও অসাধারণ এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। ঈশ্বর, তাঁর জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রযত্ন, অদৃষ্ট, দিক, কাল এবং প্রাগভাব—এই আটটি সর্বকার্যে বর্তমান থাকায় এগুলো সাধারণ কারণ; আর এগুলির অতিরিক্ত যে বিশেষ কারণগুলি নির্দিষ্ট কার্যের উৎপত্তিতে প্রয়োজনীয়, সেগুলোই অসাধারণ কারণ। তবে কেবল "অসাধারণ কারণ" বললে অতিব্যাপ্তির দোষ দেখা দেয়, কারণ এতে মৃত্তিকা, সূত্র, কুম্ভকার প্রভৃতিও করণ হিসেবে গণ্য হয়ে যায়। এই ত্রুটি দূর করতে নব্যন্যায়ে করণের সংজ্ঞায় "ব্যাপারবৎ" পদ সংযোজন করা হয় এবং বলা হয়—"ব্যাপারবৎ অসাধারণং কারণং করণম্"।[৬] অর্থাৎ যে অসাধারণ কারণ ব্যাপারের মাধ্যমে কার্য উৎপন্ন করে, সেটিই প্রকৃত করণ। এখানে ব্যাপার বলতে বোঝায়— "তজ্জন্যতে সতি তজ্জন্য জনকো ব্যাপারঃ"[৭]; অর্থাৎ যা কারণ দ্বারা উৎপন্ন হয়ে কার্য উৎপাদনে সহায়ক হয়। যেমন ঘট উৎপত্তির ক্ষেত্রে দণ্ড ও চক্র কপালদ্বয়সংযোগ নামক ব্যাপারের মাধ্যমে ঘট সৃষ্টি করে, তাই এগুলো করণ হিসেবে স্বীকৃত।
প্রাচীন মতে করণ হল কার্যের অন্তিম বা অব্যবহিত কারণ— "ফলাযোগ-ব্যবচ্ছিন্নং কারণং করণম্"[৮], অর্থাৎ যে কারণের ঠিক পরেই কার্য উৎপন্ন হয়, সেটিই করণ।

এই প্রেক্ষিতে অনুমান প্রমাণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে— অনুমিতি জ্ঞানের করণ আসলে কী? এই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে ন্যায় দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। কেউ কেউ মনে করেন যে ব্যাপ্তিজ্ঞানই অনুমিতি জ্ঞানের করণ, আবার অন্যদের মতে পরামর্শই অনুমিতি জ্ঞানের প্রকৃত করণ। এই মতভেদ থেকেই ন্যায় দর্শনে করণ সমস্যাটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে।

ব্যাপ্তিজ্ঞানের ধারণা:

প্রাচীন ও নব্যনৈয়ায়িকরা নানাভাবে ব্যাপ্তির লক্ষণ দিয়েছেন। সাধারণভাবে ব্যাপ্তিকে নিয়ত সাহচর্য নিয়ম বলা হয়। এই নিয়মত সাহচর্য হল, হেতুর সঙ্গে সাধ্যের সাহচর্য। শর্তশূন্য বা অনৌপাধিক নিয়ত সাহচার্যকেই ব্যাপ্তি বলে। যেমন বহ্নির সঙ্গে ধূমের সাহচার্য অনৌপাধিক সাসহচর্য। তাই ধূম ও বহ্নির সাহচার্য হল ব্যাপ্তি। ব্যাপ্তিকে ব্যাপ্য–ব্যাপক সম্পর্কও বলা হয়।[৯]

নব্য নৈয়ায়িক অন্নংভট্ট তর্ক সংগ্রহ গ্রন্থে ব্যাপ্তির লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন- "যত্র যত্র ধূমঃ তত্র তত্র অগ্নিঃ ইতি সাহচর্য নিয়েমো ব্যাপ্তিঃ"[১০] অর্থাৎ 'যেখানে ধূম সেখানেই অগ্নি'- এই প্রকার ধূমের সঙ্গে অগ্নির যে সাহচর্য নিয়ম তাই হল ব্যাপ্তি। অন্নংভট্ট দীপিকা টীকায় বলেছেন "যত্র ধূমঃ তত্র অগ্নিঃ" এই শব্দগুচ্ছের মাধ্যমে ব্যাপ্তির আকার কে বুঝতে হবে। "সাহচর্য নিয়মঃ" এইটুকুই ব্যাপ্তির লক্ষণ। এখানে অন্নংভট্ট 'ধূম' শব্দের দ্বারা অনুমানের হেতুকে বুঝিয়েছেন এবং 'অগ্নি' শব্দের দ্বারা সাধ্যকে বুঝিয়েছেন। সুতরাং- 'যত্র ধূমঃ তত্র অগ্নিঃ' এ কথার অর্থ হল যেখানে হেতু সেখানেই সাধ্য হেতু ও সাধ্যের এই সাহচার্য নিয়মই হল ব্যাপ্তি। ব্যাপ্তির লক্ষণে 'সাহচার' শব্দটির অর্থ হল সমানাধিকরণ বা একই অধিকরণ। দুটি বস্তু যখন সর্বদা একই অধিকরণে থাকে তখন তাদের মধ্যকার সম্পর্ক হল সমানাধিকরণ সম্পর্ক। এবং 'নিয়ম' শব্দটির দ্বারা ব্যতিক্রমহীনতাকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যা নিয়ত ঘটে, কখনো যার অন্যথা হয় না, তাই নিয়ম। সুতরাং 'সাহচার্য নিয়ম' কথাটির অর্থ হল ব্যতিক্রমহীন সমনাধিকরণ। অর্থাৎ দুটি বিষয় যদি ব্যতিক্রমহীন ভাবে সর্বদা একই সঙ্গে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে ওই দুটি বিষয়ের মধ্যেই ব্যাপ্তি সম্বন্ধ আছে। যেমন ধূম ও বহ্নির সম্বন্ধ।[১১]

'সাহচর্য নিয়মঃ ব্যাপ্তিঃ'-ব্যাপ্তির এই লক্ষণস্থিত নিয়ম শব্দের অর্থ ব্যাপকত্ব হতে পারে। অন্নংভট্ট দীপিকাটীকায় 'নিয়ম' শব্দের এরূপ অর্থ করে ব্যাপ্তির লক্ষণ দিয়েছেন- "হেতু সমানাধিকরণ-অত্যন্তাভাব-অপ্রতিযোগী-সাধ্য সামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ"।[১২] অর্থাৎ ব্যাপ্তি হল হেতু ও সেই সাধ্যের সামানাধিকরণ্য, যে সাধ্য হেতুর অধিকরণে থাকে যে অত্যন্তাভাব, সেই অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী। 'পর্বতঃ বহ্নিমান ধুমাৎ' এটি একটি সৎ হেতুক অনুমান, এটিতে লক্ষণ সমন্বয় করে বিষয়টি বোঝানো গেল। এখানে পক্ষ- পর্বত, সাধ্য- বহ্নি, এবং হেতু-ধূম। ধুম ও হেতুর অধিকরণ রান্নাঘর, যজ্ঞশালা, প্রভৃতি স্থানে ঘট, পট ইত্যাদি অনেক কিছুর অত্যন্তাভাব আছে, কিন্তু বহ্নির অত্যন্তাভাব নাই। সুতরাং বহ্নি হেতুর অধিকরণস্থ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী ঘট , পট হতে ভিন্ন। তাই বহ্নি ঐ অভাবের অপ্রতিযোগী। সুতরাং এই অনুমানে বহ্নি সাধ্য ঐ অভাবের অপ্রতিযোগী হওয়ায় ব্যাপ্তির লক্ষণটি সৎ-হেতক অনুমানস্থলে সমন্বয় হল। সুতরাং লক্ষণটিতে আর কোন দোষ রইল না।[১৩]

আবার অন্যদিকে নব্য নৈয়ায়িক বিশ্বনাথ তাঁর 'ভাষাপরিচ্ছেদ' গ্রন্থে একই ধারণাকে আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন-"অথবা হেতুমন-নিষ্ঠ-বিরহ-অপ্রতিযোগিনা। সাধ্যেন হেতোঃ ঐকাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ উচ্যতে।।[১৪] " অর্থাৎ হেতুর অধিকরণে আছে যে বিরহ অর্থাৎ অভাব, সেই অভাবের অপ্রতিযোগী যে সাধ্য, সেই সাধ্যের সঙ্গে হেতুর যে একাধিকরণতা, তাই ব্যাপ্তি।

পরামর্শের ধারণা:

নব্য নৈয়ায়িক অন্নংভট্ট তর্ক সংগ্রহ গ্রন্থে অনুমিতি জ্ঞানের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন- "পরামর্শজন্যং জ্ঞানং অনুমিতিঃ"[১৫] অর্থাৎ পরামর্শ হতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাই অনুমিতি। ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতা জ্ঞানকে পরামর্শ বলে। প্রথমে পক্ষ ধর্মতা জ্ঞান অর্থাৎ পক্ষে হেতুর জ্ঞান পরে ব্যাপ্তিস্মরণ, অনন্তর পরামর্শ হলে অনুমিতি হয়। আগের প্যারাতে ব্যাপ্তির স্বরূপ আলোচনা করা হয়েছে। এখন পরামর্শ নিয়ে আলোচনা করা হলো।

প্রথমে পাকশালা, যজ্ঞশালা , প্রভৃতি স্থানে ধূম ও বহ্নির সাহচার্য জ্ঞান হলে বহ্নিব্যাপ্য ধূমের জ্ঞান হয়। এই প্রাথমিক ধূম জ্ঞানই পরবর্তী অনুমিতি জ্ঞানের উৎপত্তিতে প্রথম ধূম দর্শন বা প্রথম লিঙ্গ দর্শন রূপে স্বীকৃত হয়। এই রূপ ব্যাপ্তি জ্ঞানের পর কোন ব্যক্তি যদি দূর থেকে পর্বতে ধূম দেখে, তাহলে তার 'পর্বত ধূমবিশিষ্ট' এরূপ পক্ষধর্মতা জ্ঞান হয়। এই ধূম দর্শন দ্বিতীয় লিঙ্গ দর্শন। এরপর ব্যাপ্তি বিষয়ক সংস্কার উদ্বুদ্ধ হওয়ায় 'ধূম বহ্নির ব্যাপ্য' এরূপ ব্যাপ্তিস্মরণ হয়। তারপর "বহ্নিব্যাপ্য ধুমবান অয়ং পর্বতঃ" এরূপ পরামর্শ জ্ঞান হয়। এই পরামর্শ জ্ঞানস্থলেই ধূম বা লিঙ্গের তৃতীয়বার দর্শন হয়। এইজন্যই পরামর্শকে তৃতীয় লিঙ্গ পরামর্শ বলা হয়।[১৬]

এই পরামর্শ জ্ঞানের পরক্ষণেই ‘পর্বতঃ বহ্নিমান’ এরূপ অনুমিতি জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যেমন,
যেখানে যেখানে ধূম থাকে সেখানে সেখানে বহ্নি থাকে।
পর্বতে ধূম আছে।
অতএব, পর্বতে বহ্নি আছে।

এই অনুমানটিতে পক্ষ-পর্বত, সাধ্য-বহ্নি, হেতু-ধূম। ‘যেখানে যেখানে ধূম থাকে সেখানে সেখানে বহ্নি থাকে’ এরূপ নিয়ম হলো ব্যাপ্তি (পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে) এই ধূম অর্থাৎ হেতুটিকে বহ্নি বা সাধ্যের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট বলা হয়ে থাকে। সাধ্যের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ঐ হেতু পর্বতে আছে অর্থাৎ পক্ষে আছে। এই অনুমানটি করার পূর্বে আমাদের নিশ্চয় হয় যে, আলোচ্য পর্বতটিতে যে ধূম আছে, তা বহ্নির দ্বারা ব্যাপ্য। এই জ্ঞানই হলো ‘ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পক্ষধর্মতা জ্ঞান’ অর্থাৎ পরামর্শ।

অনুমিতি জ্ঞানের করণ: ব্যাপ্তিজ্ঞান না পরামর্শজ্ঞান?

এই প্রবন্ধে করণের ধারণা দিতে গিয়ে আমরা করণের দুটি সংজ্ঞা লক্ষ্য করেছি। একটি হল প্রাচীন ন্যায় মতে করণের ধারণা, যেখানে প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ করণের সংজ্ঞায় বলেছেন- ‘ফলাযোগ-ব্যবচ্ছিন্নং কারণং করণম্’। আবার অন্যদিকে নব্য নৈয়ায়িকগণের করণের সংজ্ঞায় দেখেছি তারা বলেছেন, ‘ব্যাপারবৎ অসাধারণং কারণং করণম্’।

করণের এই দুটি লক্ষণ মাথায় রেখেই এই প্রবন্ধের মূল আলোচনা করব যেখানে দেখার চেষ্টা করা হবে যে, অনুমিতি জ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যাপ্তিজ্ঞান না পরামর্শ জ্ঞান কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ নাকি দুটোই সমান গুরুত্বপূর্ণ। ন্যায় দর্শনে হেতু, ধর্ম, সাধন, লিঙ্গ সমার্থক শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। লিঙ্গদর্শন, লিঙ্গ (হেতু)ও লিঙ্গীর(সাধ্য) ব্যাপ্তি সম্বন্ধের জ্ঞান ও পরামর্শ থেকে অনুমিতি জ্ঞান উৎপন্ন হয় বলে এগুলি সবই অনুমিতির কারণ। কিন্তু সবগুলিই অনুমিতির করণ নয়।

প্রখ্যাত প্রাচীন নৈয়ায়িক উদ্দ্যোতকর তাঁর 'ন্যায়বার্ত্তিক' গ্রন্থে বলেছেন যে, প্রথম লিঙ্গ দর্শন থেকে চরম লিঙ্গ পরামর্শ পর্যন্ত সমস্তই অনুমিতির করণ হওয়ায় তা অনুমান প্রমাণ। কিন্তু তার মধ্যে চরম লিঙ্গ পরামর্শই মুখ্য অনুমান প্রমাণ। কারণ লিঙ্গ পরামর্শ জ্ঞানের পরক্ষণেই অনুমতি জ্ঞান জন্মায়। তিনি বলেন অনুমিতি জ্ঞানের ক্ষেত্রে অনুমেয় পদার্থের ব্যাপ্তিস্মরণের অব্যবহিত পরেই অনুমিতি জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। তার জন্য লিঙ্গপরামর্শের প্রয়োজন হয়। তাই লিঙ্গপরামর্শই অনুমান প্রমাণ। তিনি আরো বলেছেন যে, লিঙ্গপরামর্শ অনুমিতির করণ হওয়ায় প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটি অবয়বের মধ্যে চতুর্থ অবয়ব উপনয় বাক্যও সার্থক হয়। কারণ তার দ্বারাই পরার্থ অনুমতি তার দ্বারা লিঙ্গ পরামর্শ জ্ঞান জন্মায়। এবং পরার্থ অনুমিতি জ্ঞান হয়।[১৭]

তবে আশ্চর্যের বিষয় হল অন্নংভট্ট নিজে নব্য নৈয়ায়িক হয়েও যেন তাঁর 'তর্কসংগ্রহ' গ্রন্থে উদ্দ্যোতকারের মতেরই সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন-"স্বার্থানুমিতি পরার্থানুমিত্যোঃ লিঙ্গপরামর্শঃ এব করণম্। তস্মাৎ

লিঙ্গপরামর্শঃ অনুমানম্"[১৮]। অর্থাৎ স্বার্থানুমিতি ও পরার্থানুমিতি জ্ঞানের করণ হল লিঙ্গপরামর্শ। এই লিঙ্গপরামর্শই অনুমান প্রমাণ।

তবে মীমাংসকরা এর বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে বলেন, অনুমিতির জন্য পরামর্শ জ্ঞান স্বীকার করা অপ্রয়োজনীয়। যেমন, 'পর্বত ধূমবান' এরূপ পক্ষধর্মতা জ্ঞানের পর 'ধূম বহ্নিব্যাপ্য'এরূপ ব্যাপ্তিস্মরণ হয়।, কিন্তু 'পর্বত বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান'- এরূপ পরামর্শ জ্ঞান হয় না, সেখানে উক্ত পক্ষধর্মতা জ্ঞান ও ব্যাপ্তিস্মরণ এর দ্বারাই অনুমতি হয়ে যায়। সুতরাং পক্ষধর্মতা জ্ঞান ও ব্যক্তি জ্ঞান, অনুমিতির আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত শর্ত। এবং এখানে পরামর্শের কোন প্রয়োজন হয় না। তাই অনুমিতির জন্য পরামর্শ স্বীকার করলে গৌরব দোষ হয়। এর উত্তরে অন্নংভট্ট বলেন, কোন কোন ক্ষেত্রে অনুমিতি উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে পরামর্শ জ্ঞান থাকেনা ঠিকই। কিন্তু লাঘবের জন্য ওইসব অনুমতির ক্ষেত্রেও পরামর্শকে স্বীকার করতে হবে। কারণ তা না হলে 'বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান পর্বতঃ' অপরের নিকট এরূপ বাক্য শুনে পর্বতে বহ্নির যে অনুমতি হয় তা শাব্দপরামর্শ জন্য অনুমিতি । এবং এই অনুমিতির ক্ষেত্রে পরামর্শ জ্ঞান অবশ্য স্বীকার্য। তাই তিনি দীপিকা টীকায় বলেছেন-"ননু ব্যাপ্তিস্মৃতি পক্ষধর্মতাজ্ঞানাভ্যাম্ এব অনুমিতিসম্ভবে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট লিঙ্গপরামর্শঃ কিমর্থং অঙ্গীকর্তব্য ইতি চেৎ ন। বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ অয়ম্ ইতি শাব্দপরামর্শস্থলে পরামর্শস্য আবশ্যকতয়া লাঘবেন সর্বত্র পরামর্শস্য এব কারণত্বাৎ"[১৯]।
উদ্দ্যোতকরকে অনুসরণ করে 'তর্কভাষা' গ্রন্থে কেশব মিশ্র বলেছেন" "লিঙ্গপরামর্শোহনু-মানং"[20]। আবার নবদ্বীপের নব্য নৈয়ায়িক ভবানন্দ সিদ্ধান্ত বাগীশও 'কারকচক্র' গ্রন্থে একই মত ব্যক্ত করেছেন। আবার 'দীপিকাপ্রকাশ' টীকায় নীলকণ্ঠ বলেছেন "ফলাযোগব্যবচ্ছিন্নং কারণং করণমিতি মতে তু পরামর্শ এব করণমিতি ধ্যেয়ং"[২১]।

অন্যদিকে আরেকজন প্রখ্যাত প্রাচীন নৈয়ায়িক উদয়ানাচার্য শুধুমাত্র লিঙ্গকে অনুমিতির করণ বলেছেন। তিনি লিঙ্গকে করণ বলায় বোঝা যায় তিনি জ্ঞেয়মান লিঙ্গকেই ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু অন্নংভট্ট এর বিরোধিতা করে দীপিকাটীকায় বলেছেন -"লিঙ্গং ন করণম্। অতীত-অনাগতাদৌ ব্যভিচারাৎ"।[22] অর্থাৎ লিঙ্গ করণ হতে পারে না তাহলে ব্যভিচার দোষ ঘটবে। কেননা লিঙ্গকে অনুমিতির করণ বললে বর্তমানকালে উপস্থিত লিঙ্গের দ্বারা অনুমিতি হলেও অতীত ও ভবিষ্যৎ লিঙ্গের দ্বারা অনুমিতি হবে না। কেননা অনুমিতি কালে অতীত ও ভবিষ্যৎ লিঙ্গ উপস্থিত থাকে না তাই ব্যভিচার দোষ ঘটবে।

সুতরাং এই আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, উদ্দ্যোতকর, অন্নংভট্ট, কেশব মিশ্র, ভবানন্দ সিদ্ধান্ত বাগীশ,ও নীলকণ্ঠ মহাশয় প্রমূখ ন্যায় দার্শনিকগণ করণের -"ফলাযোগ-ব্যবচ্ছিন্নং কারণং করণম্" অর্থাৎ চরম কারণেই করণ ।এই লক্ষণকে অনুসরণ করে লিঙ্গ পরামর্শকে অনুমিতির করণ বলেছেন। অর্থাৎ পরামর্শই হল অনুমান প্রমাণ।

অন্যদিকে নব্য নৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায় তাঁর 'পরামর্শ' গ্রন্থে বলেছেন, লিঙ্গ পরামর্শ অনুমিতির করণ হতে পারে না। তিনি বলেন অনুমতি হল ব্যাপ্তিবিশিষ্ট -পক্ষধর্মতা-জ্ঞান জন্য জ্ঞান। অর্থাৎ তার মতে অনুমিতির জন্য ব্যাপ্তিজ্ঞান, পক্ষধর্মতা জ্ঞান, এবং পরামর্শ জ্ঞান আবশ্যক হলেও অনুমিতির করণ হল ব্যাপ্তিজ্ঞান। এবং পরামর্শ হল তার ব্যাপার। তাই ব্যাপ্তিজ্ঞান হল অনুমান প্রমাণ। অর্থাৎ তিনি এখানে "ব্যাপারবৎ অসাধারণং কারণং করণম্"। এই লক্ষণ অনুসারে লিঙ্গ পরামর্শ অনুমিতির করণ হতে পারে না। কেননা পরামর্শ অনুমিতি জ্ঞানে কোন ব্যাপারকে অপেক্ষা করেনা, তাই তা নির্ব্যাপার। কিন্তু এখানে ব্যাপ্তিজ্ঞান পরামর্শ নামক ব্যাপার দ্বারা অপেক্ষিত হয়। এবং তারপরেই অনুমতি জ্ঞান জন্মায়। সেই জন্য ব্যাপ্তি হল ব্যাপারবিশিষ্ট। তাই এই ব্যাপারবিশিষ্ট ব্যাপ্তিজ্ঞানই অনুমিতির করণ।[২৩]

পরে রঘুনাথ শিরোমণি 'দধিতি টীকায়' নিজ মত ব্যক্ত করে বলেছেন যে, সর্বত্র অনুমিতি কর্তার মনই অনুমিতির করণ। কিন্তু নব্য ন্যায় এ এই মত গুরুত্ব পাইনি। নব্য নৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের মতই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী ভাষা পরিচ্ছেদের অনুমান খন্ডে বিশ্বনাথ অনুমিতির লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন- "ব্যাপারস্তু পরামর্শঃ, করণং ব্যাপ্তিধীর্ভবেৎ। অনুমায়াং, জ্ঞায়মানং লিঙ্গন্তু করণং নহি।।"[২৪] অর্থাৎ এখানে স্পষ্টভাবে বলা হচ্ছে, অনুমানের ক্ষেত্রে পরামর্শ হল ব্যাপার এবং ব্যাপ্তিজ্ঞানই করণ; লিঙ্গকে করণ বলা যায় না। এই মতকে সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলীতে আরও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে— "অনুমিতিং ব্যুৎপাদয়তি-ব্যাপারত্বিতি। অনুমায়ামনুমিতৌ ব্যাপ্তিজ্ঞানং করণং, পরামর্শো ব্যাপারঃ"[২৫]। অর্থাৎ যে উপাদান অনুমিতিকে উৎপন্ন করে, সেটাই ব্যাপার; এবং অনুমানের ক্ষেত্রে ব্যাপ্তিজ্ঞান করণ হিসেবে কাজ করে, আর পরামর্শ হল সেই কার্য-উৎপাদক ব্যাপার। সুতরাং এই মতে অনুমিতি উৎপন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপ্তিজ্ঞান মুখ্য কারণ বা করণ, আর পরামর্শ সেই হল মুখ্য কারণের ব্যাপার।

পরবর্তীতে অদ্বৈতবাদী ধর্মরাজধ্বরীন্দ্র 'বেদান্তপরিভাষা' গ্রন্থে বলেছেন-"অনুমিতি-করণঞ্চ ব্যাপ্তিজ্ঞানম্। তৎ-সংস্কারোহবান্তরব্যাপারঃ। ন তু তৃতীয়-লিঙ্গ-পরামর্শো অনুমিতৌ করণম্, তস্য অনুমিতি-হেতুত্ব-অসিদ্ধ্যা তৎ-করণত্বস্য দূর-নিরস্তত্বাৎ।।"[২৬] অর্থাৎ অনুমিতির করণ হল ব্যাপ্তিজ্ঞান। এই ব্যাপ্তিজ্ঞানের সংস্কার হল অন্তর্বর্তী ব্যাপার। কিন্তু, তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শকে অনুমিতির করণ বলা যায় না। কারণ পরামর্শকে অনুমিতির প্রকৃত কারণ হিসেবে প্রমাণ করা যায় না। তাই তা সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য।

এছাড়াও কুমারিল ভট্টও তাঁর 'শ্লোকবার্ত্তীক' গ্রন্থে ধূম, ধূমজ্ঞান ও ধূমে ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধের স্মরণই মুখ্য, গৌণভাবে অনুমিতির কারণ, লিঙ্গ পরামর্শ অনাবশ্যক। এবং মীমাংসাচার্য্য গুরু প্রভাকর মিশ্রও বলেছেন লিঙ্গ দর্শন ও ব্যাপ্তি স্মরণ এই দুয়ের পরে অনুমিতি জ্ঞান জন্মায়। আরও অনেক সম্প্রদায় এই মত সমর্থন করেছেন। শ্রীধর ভট্টও 'ন্যায়কন্দলী' গ্রন্থে ব্যাপ্তি স্মরণকে অনুমিতির করণ বলেছেন।[২৭]

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, নব্য নৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায়, বিশ্বনাথ এবং অদ্বৈতবাদী ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র, এরা সকলেই -"ব্যাপারবৎ অসাধারণং কারণং করণম্" করণের এই লক্ষণ অনুযায়ী ব্যাপ্তিজ্ঞানকেই অনুমিতি জ্ঞানের করণ বলেছেন। এবং পরামর্শকে ব্যাপার বলেছেন। কিন্তু মীমাংসক সম্প্রদায়ের কুমারিল ভট্ট ও প্রভাকর মিশ্র এবং শ্রীধর ভট্ট এদের মতে, পরামর্শজ্ঞান অনাবশ্যক হলেও কোন না কোনভাবে ব্যাপ্তজ্ঞানই অনুমান প্রমাণ।

উপসংহার:

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয় যে ন্যায় দর্শনে অনুমিতি জ্ঞানের করণ নির্ধারণ একটি গভীর ও সূক্ষ্ম দার্শনিক সমস্যা, যার সমাধান নিয়ে প্রাচীন ও নব্য নৈয়ায়িকদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়।

প্রাচীন ন্যায় মত অনুসারে— বিশেষত উদ্দ্যোতকর, অন্নংভট্ট (প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গিতে), কেশব মিশ্র, ভবানন্দ সিদ্ধান্ত বাগীশ এবং নীলকণ্ঠ প্রমুখ আচার্যগণ "ফলযোগ-ব্যবচ্ছিন্ন কারণং করণং" এই লক্ষণ গ্রহণ করে লিঙ্গপরামর্শকেই অনুমিতির প্রত্যক্ষ করণ বলে মেনে নিয়েছেন। তাদের মতে, পরামর্শ জ্ঞানের অব্যবহিত পরক্ষণেই অনুমিতি উৎপন্ন হয়, তাই সেটিই করণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য।

অন্যদিকে নব্য ন্যায় মতানুসারে— গঙ্গেশ উপাধ্যায়, বিশ্বনাথ, রঘুনাথ শিরোমণি (আংশিকভাবে), তদুপরি অদ্বৈতবাদী ধর্মরাজধ্বরীন্দ্র, প্রমুখ দার্শনিকগণ "ব্যাপারবৎ অসাধারণ কারণই করণ" এই লক্ষণ অনুসরণ করে ব্যাপ্তিজ্ঞানকেই অনুমিতির প্রকৃত করণ বলে প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং পরামর্শকে তার ব্যাপার হিসেবে ব্যাখ্যা

করেছেন। তবে মীমাংসক কুমারিল ভট্ট ও প্রভাকর মিশ্র, এবং শ্রীধর ভট্ট এদের মতে, পরামর্শজ্ঞান অনাবশ্যক হলেও ব্যাপ্তজ্ঞানই অনুমান প্রমাণ।

এই সমালোচনামূলক আলোচনার পর বলা যায় যে অনুমান প্রক্রিয়ায় ব্যাপ্তিজ্ঞান ও পরামর্শ উভয়ই অপরিহার্য হলেও করণের প্রকৃত স্বরূপ নির্ভর করে করণ-লক্ষণ গ্রহণের উপর। তথাপি নব্য ন্যায়ের বিশ্লেষণ অনুযায়ী ব্যাপারসহ অসাধারণ কারণ হিসেবে ব্যাপ্তিজ্ঞানকেই অধিক যুক্তিসংগতভাবে অনুমিতির করণ হিসেবে গ্রহণ করা যায়, আর পরামর্শ সেই করণের অবিচ্ছেদ্য ব্যাপার হিসেবে বিবেচিত হয়।

তথ্যসূত্র:

---

১ মণ্ডল, প্রদ্যোত কুমার। ভারতীয় দর্শন, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ১৫৬।

২ তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ। ন্যায়দর্শন (গৌতমসূত্র) ভাষ্যায়ন ভাষ্য ও, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ১৫২।

৩ তদেব পৃ. ১৫২।

৪ গোস্বামী, শ্রীনারায়ণচন্দ্র, তর্কসংগ্রহ (অধ্যাপনাসহিত), সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৪১০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৬২।

৫ তদেব, পৃ. ২৯০।

৬ বাগচী, দীপক কুমার। তর্কসংগ্রহ ও তর্কসংগ্রহদীপিকা (বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ)। মিত্রম, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ৭২।

৭ তদেব পৃ. ৭২।

৮ তদেব. পৃ. ৭৩

৯ মণ্ডল, প্রদ্যোত কুমার। ভারতীয় দর্শন। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ১৬০ ।

১০ বাগচী, দীপক কুমার, তর্কসংগ্রহ ও তর্কসংগ্রহদীপিকা (বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ), মিত্রম, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ১০৬।

১১ তদেব পৃ. ১০৬।

১২ গোস্বামী, শ্রীনারায়ণচন্দ্র। তর্কসংগ্রহ (অধ্যাপনাসহিত)। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৪১০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৭৯।

১৩ তদেব পৃ. ৩৮১।

১৪ বাগচী, দীপক কুমার। তর্কসংগ্রহ ও তর্কসংগ্রহদীপিকা (বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ)। মিত্রম, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ১০৭।

১৫ গোস্বামী, শ্রীনারায়ণচন্দ্র। তর্কসংগ্রহ (অধ্যাপনাসহিত)। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৪১০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৬২।

১৬ মণ্ডল, প্রদ্যোত কুমার। ভারতীয় দর্শন। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ১৫৭ ।

১৭ তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ। ন্যায়দর্শন (গৌতমসূত্র) ভাষ্যায়ন ভাষ্য ও। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ১৫৯।

১৮ গোস্বামী, শ্রীনারায়ণচন্দ্র, তর্কসংগ্রহ (অধ্যাপনাসহিত), সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৪১০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৯৫।

[১৯] বাগচী, দীপক কুমার, তর্কসংগ্রহ ও তর্কসংগ্রহদীপিকা (বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ), মিত্রম, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ১১৬।

[২০] তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন (গৌতমসূত্র) ভাষ্যায়ন ভাষ্য ও, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ১৫৯।

[২১] তদেব পৃ. ১৫৯।

[২২] বাগচী, দীপক কুমার। তর্কসংগ্রহ ও তর্কসংগ্রহদীপিকা (বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ)। মিত্রম, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ১১৬।

[২৩] তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ। ন্যায়দর্শন (গৌতমসূত্র) ভাষ্যায়ন ভাষ্য ও। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ১৬০।

[২৪] ভট্টাচার্য, পঞ্চানন। ভাষা-পরিচ্ছেদ। মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৩১১।

[২৫] তদেব পৃ. ৩১১।

[২৬] চক্রবর্তী, লোকনাথ। বেদান্ত-পরিভাষা। সংস্কৃত কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ২৬১।

[২৭] তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ। ন্যায়দর্শন (গৌতমসূত্র) ভাষ্যায়ন ভাষ্য ও। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ১৬২।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. চক্রবর্তী, লোকনাথ। বেদান্ত-পরিভাষা। সংস্কৃত কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০১৯।

২. গোস্বামী, শ্রীনারায়ণচন্দ্র। তর্কসংগ্রহ (অধ্যাপনাসহিত)। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৪১০ বঙ্গাব্দ।

৩. তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ। ন্যায়দর্শন (গৌতমসূত্র) ভাষ্যায়ন ভাষ্য ও। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০১৮।

৪. বাগচী, দীপক কুমার। তর্কসংগ্রহ ও তর্কসংগ্রহদীপিকা (বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ)। মিত্রম, কলকাতা, ২০১৯।

৫. ভট্টাচার্য, গোপীনাথ। তর্কসংগ্রহ ও তর্কসংগ্রহ-দীপিকা। অনুবাদ: ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, ২০১৫।

৬. ভট্টাচার্য, পঞ্চানন। ভাষা-পরিচ্ছেদ। মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১৬।

৭. মণ্ডল, প্রদ্যোত কুমার। ভারতীয় দর্শন। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৫।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1363-1379
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.357

শরৎ সাহিত্যে নিম্নবর্গীয় শ্রেণির ভাষা-সংলাপ

কিরণ মণ্ডল, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 19.03.2026; Accepted: 21.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Language is the main medium of expressing human feelings, which is expressed by Vocally uttering Sounds. According to expressionism, it may be oral, written or symbolic. We have brought up the written language as for review, because by this the literature is highlighted. As we represent here the language of the lower classes, so beside this the issue of casteism, the elite context and the Composition style have come up. The narrative language of sarat Chandra and the communicative dialect of his characters make the characters alive. We have seen the uses of language on mental structure of characters, besides the uses of the speakers, listeners and language composition. And also, we can see Underlexicalization and Overlexicalization of language. The sentence structure of literature, figurative position, and vocabulary of sarat Chandra is very appropriate and clear. He has represented the woes of the lower classes clearly and simply to the readers.

Keywords: Lower classes, Casteism, Dialect, alive, Mental structure, Underlexicalization, Overlexicalization, Figurative position, woes.

ভাষা হল মানুষের মনের ভাব প্রকাশের প্রধান মাধ্যম। যা বাগযন্ত্রের দ্বারা উচ্চারিত অর্থবোধক ধ্বনির সাহায্যে ভাব প্রকাশ করে। প্রকাশের ভিত্তিতে ভাষা কথ্য, লেখ্য এবং সাংকেতিক হতে পারে। মুখের ভাষা কথ্য, লেখার ভাষা লেখ্য এবং ইশারা বা সংকেতের ভাষা সাংকেতিক হয়। আমাদের আলোচ্য বিষয় লেখ্য ভাষা কেননা এই ভাষা দিয়েই গড়ে ওঠে সাহিত্য। ভাষার কার্যক্রমে সাহিত্য বিশেষ মাত্রা পায়। কথাসাহিত্য যেহেতু গদ্য ভাষায় রচিত এবং কাল্পনিক আখ্যানের মাধ্যমে জীবনের বিশ্লেষণ, তাই লক্ষ্য হয়ে ওঠে জীবনের সামগ্রিক রূপের অনুসন্ধান করা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভাষার অপরিহার্যতা প্রসঙ্গে 'বাংলা ভাষা পরিচয়' গ্রন্থে বলেছেন—

> "কোঠাবাড়ির প্রধান মসলা ইঁট। তারপরে থাকে চুন সুরকির নানা বাঁধন। ধ্বনি দিয়ে আঁট বাঁধা শব্দই ভাষার ইঁট, বাংলায় তাকে বলি কথা। নানারকম শব্দচিহ্নের গ্রন্থি দিয়ে এই কথাগুলোকে গেঁথে গেঁথে হয় ভাষা।"[১]

এ প্রসঙ্গে বলে রাখি আমাদের পর্যালোচনার বিষয় যেহেতু নিম্নবর্গীয় শ্রেণির ভাষা তাই সেই সূত্রে আমরা ভাষার সঙ্গে জাতপাতের দিকটি একটু দেখার চেষ্টা করেছি। ভাষা ও জাতপাত বিষয়টি একে অপরের সঙ্গে জড়িত। কেননা ভাষাকে আমরা শুধু যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবেই দেখি না, সেইসঙ্গে ভাষাকে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিচয়ের অংশ হিসাবে দেখা যায়। সামাজিক কাঠামোতে ভাষা বর্ণপ্রথার মতই একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর

পরিচয় হিসেবে কাজ করে। ভাষার মাধ্যমে একদিকে যেমন জাতপাতের ভেদাভেদ ও কুসংস্কার আরো বেশি শক্তিশালী হয় তেমনি অন্যদিকে আবার এই ভাষাকেই ব্যবহার করে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও জানানো হয়।

এবার আসি ভাষার আভিজাত্য প্রসঙ্গে। ভাষার আভিজাত্য বলতে মূলত কোন ধ্রুপদী ভাষার (Classical Language) সমৃদ্ধ ঐতিহ্য, স্বতন্ত্র প্রকৃতি, সাহিত্যিক উৎকর্ষ, গাম্ভীর্য ও সুষমাকে বোঝায়। ভারতের মারাঠি, বাংলা, তামিল, সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষা তাদের সমৃদ্ধ ইতিহাস ও সংস্কৃতির পরিচয়কে বহন করে।

এছাড়া দেখি ভাষার আলোচনা সূত্রে 'Style' বা রচনারীতির প্রসঙ্গ উঠে আসে। যেহেতু স্রষ্টার ব্যক্তিধর্মের বিশেষত্ব ভাষার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে, তাই ভাষা প্রসঙ্গে স্টাইল বা রচনারীতির আলোচনা করতেই হয়। ভাষা বিষয়টিকে বলতে পারি নমনীয় এক উপাদান, যাকে দুমড়ে-মুছড়ে অন্তহীন রূপ দেওয়া যায়। যার কারণে স্টাইল সম্ভবপর হয়ে ওঠে। শিল্পীর অন্তর-মানষকে সার্থকভাবে তুলে ধরে এই রচনারীতি। প্রতিটি লেখকের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যা তার ধ্বনী-বিন্যাস, শব্দ সংস্থান, বাক্য যোজনা, অনুচ্ছেদ, স্তবক রচনা, রচনা শুরু ও উপসংহার প্রভৃতি সবকিছুর মধ্যেই প্রকাশিত হয়। স্টাইল বা রচনা প্রকরণে শিল্পীর নিজস্ব ব্যাক্তিকতার প্রসঙ্গটিকে পবিত্র সরকার মহাশয় তাঁর 'গদ্যরীতি ও পদ্যরীতি' গ্রন্থে লিখেছেন—

> "স্টাইল (Style) হল আলাদা হওয়া একটি norm বা আদর্শ থেকে সরে আসা। সাধারণ থেকে বিশেষে পৌঁছানো। যা সকলের তা থেকে ব্যক্তিগত কোন অংশে উত্তীর্ণ হওয়া।"[২]

অর্থাৎ আমরা দেখি লেখককে প্রচলিত শব্দ, বাক্য ব্যবহার না করে বরং তার চিন্তা ভাবনার প্রকাশ করতে সেগুলিকে নতুনভাবে আবিষ্কার করে নিজস্ব রূপ দিতে হয়। শৈলী হল 'কেমন করে' (How)? প্রত্যেক লেখকের পারফর্মের নিজস্ব ধরন থাকে। লেখক কিভাবে শৈলীকে স্থাপন করেছেন, কেমন ধরনের ভাষা প্রয়োগ করেছেন? অর্থাৎ যেমন করে তিনি কাজটি সম্পন্ন করছেন তাকেই আমরা শৈলী বলি। ভাষাটা এখানে বাইরের উপাদান। ভিতরের উপাদান হল বিষয়কে স্পষ্ট করার জন্য শৈলী রাখা দরকার। শৈলী না রাখলে বিষয়টি প্রজ্বলিত হবে না। ধরা যাক আমরা যদি একটি মানুষের শুধু হাড় কটি বের করে দেখি তাতে কোন লাবণ্য থাকে না, চেতনাও থাকেনা। সেরকম সাহিত্যকে খামচে খামচে দেখলে লাবণ্যটা নষ্ট হয়ে যায়। শৈলী কিন্তু লাবণ্য নষ্ট করে না বরং লাবণ্যকে আরো উজ্জ্বল করে তোলে। অর্থাৎ শৈলী হচ্ছে বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি এমন উপাদান যা ভাষা দিয়েই প্রস্ফুটিত হয় কিন্তু ভাষার উপাদানগুলিকে সে কেমন করে কাজে লাগাচ্ছে সেটাই দেখার বিষয় হয়ে ওঠে। সকল সাহিত্যিকের শৈলী একই রকম নয়, সবার আলাদা আলাদা ফলে এটি ব্যক্তিনিষ্ঠ। তাছাড়া স্টাইল ব্যাপারটি আজকে যা আছে কালকে তা নাও থাকতে পারে। লেখক যে শৈলী দিয়ে গল্প উপন্যাস লেখা শুরু করেছিলেন পরিণত বয়সে একই শৈলী ব্যবহার করেননি; কারণ বারবার ভেঙেচুরে দেখেছেন ফলে বদল ঘটেছে শৈলীর। আমরা যদি তার ভাষা শিল্পের ব্যবহার ভালো করে লক্ষ্য করি, তাহলে দেখতে পাবো উপন্যাস রচনা শুরুতে তাঁর সৃষ্ট গদ্যশৈলীর প্রাঞ্জলতা, সারল্য গুণ ও সংবেদনশীলতা ছিল সহজাত স্বভাবধর্ম। কালক্রমে শেষের দিকে সেই গদ্যশৈলী শাণিত বুদ্ধিদীপ্ত ও তির্যক হয়ে উঠেছিল বলে আমাদের মনে হয়।

আবার এই Style প্রসঙ্গে David lodge তাঁর গ্রন্থে বলেছেন—

> "Style as the highest achievement of literature is a little vague, but it is classified else where in the book, and buy a more precise defination. The complete relation of a universal significance in a personal and particular expression. It is an all-inclusive concept of Style in the sense that it takes in everything that we value in literary works of art."[৩]

আমরা ভাষা আলোচনার সূত্র ধরে দেখি উপন্যাসের ক্ষেত্রে ভাষা ব্যবহারের দুটি দিক লক্ষ্য করেছি— একটি হল বর্ণনার ভাষা আর অন্যটি সংলাপের বা দ্বিরালাপের ভাষা ইংরেজিতে যাকে 'Dialogue' বলে। 'Dia' শব্দের অর্থ 'দ্বি' এবং 'logue' শব্দের অর্থ 'আলাপ' তাই দ্বিরালাপ। বর্ণনার অংশে লেখকের ভূমিকা থাকে প্রত্যক্ষ এবং সংলাপের অংশে লেখকের ভূমিকা থাকে পরোক্ষ অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়। বর্ণনা অংশে লেখক নিজের অভিজ্ঞতার জবানবন্দি বর্ণনা করে যান, কিন্তু সংলাপ অংশে চরিত্রের কথার মধ্যে যদি লেখক নিজেকে ঢোকাবার চেষ্টা করেন তাহলে সেটা তাঁর অনধিকার প্রবেশ হবে। সংলাপের ভাষার কাঠামো, শব্দের সমাবেশ, অর্থগত বৈশিষ্ট্য এ সবকিছুই চরিত্রের শ্রেণিবৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভরশীল। তাই লেখক যে ভাষায় বর্ণনা দেন, তাঁর উপন্যাসের চরিত্ররা যদি তাঁর শ্রেণীভুক্ত না হয়, তবে ঠিক তাঁর ভাষাতেই চরিত্রের কথোপকথন রচনা করলে সংলাপের নিজস্ব পরিপ্রেক্ষিত বিচলিত হয়। তাই বর্ণনার ভাষা এবং সংলাপের ভাষা এক হতে পারেনা। আবার লেখক ও চরিত্র যদি শ্রেণিবিচারে একই পর্যায়ের হলেও বর্ণনা এবং সংলাপের ভাষার মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকাটা বাঞ্ছনীয়। বর্ণনার ক্ষেত্রে লেখক সরল-জটিল-যৌগিক বাক্য কিংবা হ্যাঁবাচক-নাবাচক-প্রশ্নবাচক ইত্যাদি যে বাক্যই ব্যবহার করেন সবটাই তাঁর নিজের উক্তি। অন্যদিকে সংলাপের ভাষার মধ্যে ভাবান্তরের বিচিত্র উত্থান পতন পরিলক্ষিত হয়। চরিত্রের মনোভাবের জন্যই সংলাপ কোথাও দীর্ঘ, কোথাও হ্রস্ব আবার কোথাও অসমাপ্ত থেকে যায়। তাই সংলাপের বৈশিষ্ট্য মাপকাঠিতে মাপা সম্ভব নয়। কিন্তু এইসব বৈশিষ্ট্য আছে বলেই সংলাপ বা দ্বিরালাপ জীবন্ত হয়ে ওঠে। তাই বলা যায় যেহেতু বর্ণনা ও সংলাপের কাজ ও স্বভাব এক নয় সেহেতু দুটির ভাষাভঙ্গীর মধ্যে সবসময়ই কিছু না কিছু পার্থক্য অবশ্যই থেকে যায়।

শরৎচন্দ্র সাধারণত উপন্যাসের ভাষার ক্ষেত্রে হঠাৎ করে কোন নতুন রীতির প্রয়োগের চেষ্টা করেননি। বরং পূর্বের প্রথা অনুসারে বর্ণনার ক্ষেত্রে সাধু ভাষা এবং সংলাপের ক্ষেত্রে চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ বলা যায় বিবৃতি রচিত হতো সাধু গদ্য ভাষায় আর চরিত্রের উক্তি-প্রত্যুক্তি চলিত গদ্য ভাষায় রচনা করে স্বতঃস্ফূর্ত করে তুলতেন। তাঁর সাধু ভাষা যেন চলিত ভাষারই অপর পিঠ, কেননা— তার বর্ণনার গদ্যরূপ ও সংলাপের গদ্যরূপ বাহ্যতঃ বিভিন্ন হলেও আসলে কোন অন্তর্লীন অভিন্ন মৌল কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে আছে। তিনি সাবেক প্রথার অনুসারে বর্ণনার ভাষাকে সংলাপের ভাষার প্রত্যক্ষতা থেকে আলাদা করার জন্য গদ্যের ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের রূপগুলি দীর্ঘতর করেছেন এবং সেই সঙ্গে সংলাপের গদ্যে কথ্যরীতির মৌলিক রূপটি অক্ষুন্ন রেখেছেন। তিনি আসলে সমাজের উপভাষায় সাহিত্য রচনা করেছেন। দেবানন্দপুরে যখন সাহিত্য রচনা করেন তখন সে ভাষায় অবশ্যই রাঢ়ী উপভাষার বৈশিষ্ট্য বেশি পরিলক্ষিত হয় কিন্তু অন্যদিকে যখন তিনি ভাগলপুরে বসে সাহিত্য রচনা করেছেন তখন সেই ভাষায় অন্য উপভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি চোখে পড়ে। তবে তাঁর ভাষা বাঙালি পাঠকের কাছে সর্বাপেক্ষা পরিচিত ভাষা হয়ে উঠেছে। 'উত্তরকাল ও শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে লেখক বলেছেন—

> "শরৎচন্দ্র যেন বাঙালীর মুখের ভাষাতেই উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর রচনায় বৈদগ্ধ্যের দূর্মর আভিজাত্য বা অলংকারের নিবিড় প্রলেপ নেই; এই কারণেই তিনি সর্বাপেক্ষা পরিচিত, সর্বাপেক্ষা সুখপাঠ্য, সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়।"[৪]

শরৎ সাহিত্যে ভাষার জাদুময়ী নিপুনতা, ঘরোয়া সংলাপ ও বর্ণনার স্বাভাবিকতা পাঠকবর্গকে চুম্বকের মতো আকৃষ্ট করেছিল। তার সাহিত্যের ভাষা অলংকার সমৃদ্ধ, বৈদগ্ধপূর্ণ ভাষা নয়। তার ভাষায় সহজ সরল জীবনের মানুষের মনের দাবি প্রাধান্য পেয়েছে। এ ভাষায় স্বচ্ছতা আছে কিন্তু জীবনের তুচ্ছতা নেই। তিনি সাধারণত তার রচনায় বহিরঙ্গ বা কাঠামো রচনা করতেন সাধু গদ্যে আর সংলাপ রচনা করতেন চলিত গদ্যে। তার সাহিত্যে নিম্নবর্গীয় শ্রেণির মানুষের মুখের ভাষা এমন ভাবে ব্যবহার করেছেন তাতেই যেন নিম্নবর্গীয়

শ্রেণির সামগ্রিক পরিচয় সুন্দরভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় লিখেছেন—

> "প্রকৃতপক্ষে শরৎচন্দ্রের স্টাইল এর প্রধান গুন এই যে, এখানে তথাকথিত সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার সমন্বয় হইয়াছে। চলিত ভাষার স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা এবং সাধু ভাষার সমৃদ্ধির মধ্যে তিনি সামঞ্জস্য গঠন করিয়াছেন।"[৫]

আবার শরৎচন্দ্রের ভাষারীতির সহজ স্বতঃস্ফূর্ততা সম্পর্কে সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেছেন—

> "এ ভাষার শক্তি এইখানে যে এই অবাধ নিরবিচ্ছিন্ন প্রবাহের মতো একটানা অগ্রসর হবার ক্ষমতা রাখে। ...শরৎচন্দ্রের গদ্য কখনো বঙ্কিমের মত সংবাদবহ নয়, রবীন্দ্রনাথের মত উচ্চকল্পনাসঞ্চারীও নয়। এর একমাত্র কাজ হল গল্পকে পাঠকের কাছে পরম উপভোগ্য করে তোলা।"[৬]

উপন্যাসের গদ্য ভাষা আলোচনার সময় আমাদের কয়েকটি প্রসঙ্গ মনে রাখতে হয়, সেগুলি হল— বক্তা অর্থাৎ Speaker, শ্রোতা অর্থাৎ Audience এবং ভাষা নিবন্ধন অর্থাৎ Language Register। বক্তা হল যিনি বলছেন এবং শ্রোতা যিনি শুনছেন তা আমরা সকলেই জানি। তাই ভাষা নিবন্ধন বলতে আমরা বুঝি ভাষার আনুষ্ঠানিকতা এবং শৈলীর স্তর— যা শ্রোতা, বিষয় এবং পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়। এটি শব্দভাণ্ডার, ব্যাকরণ এবং বাক্য গঠনের পার্থক্যগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে যা নির্দিষ্ট যোগাযোগের চাহিদার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়। অর্থাৎ রেজিস্টার শব্দটি মানুষ কার সাথে কথা বলছে এবং তাদের পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন উপায়ে ভাষা ব্যবহার করে তা বোঝায়। একইভাবে লেখককে চরিত্রের Mental Structure এর ওপর ভাষা ব্যবহার করতে হয়, কেননা লেখকের সকল চরিত্রের মানসিক গঠন বা Mental Structure এক নয়। ফলে ভাষাও এক রকমের হয় না— সে বিষয়টিও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে।

ভাষার আলোচনা সূত্রে আমাদের আরও একটি বিষয়ে কিছুটা পর্যালোচনা করা দরকার, সেটি হল Underlexicalization (আন্ডারলেক্সিক্যালাইজেশন), যাকে একটি কৌশল বলতে পারি। যে কৌশলটি রজার ফাউলার দ্বারা উদ্ভাবিত হয়েছিল। Underlexicalization হল— যেখানে একজন লেখক ইচ্ছাকৃতভাবে একটি ধারণা প্রকাশ করার জন্য নির্দিষ্ট শব্দভাণ্ডারের অভাব ব্যবহার করেন, প্রায়শই একটি নির্দিষ্ট বক্তাকে চিহ্নিত করার জন্য। অর্থাৎ লেখক ইচ্ছাকৃতভাবে এমন একটি শব্দ বাদ দিতে পারেন যা সাধারণত ব্যবহৃত হয়, যার ফলে পাঠকের ওপর শব্দটির অর্থ অনুমান করার ভার পড়ে। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে এটি একটি ভাষাগত ঘটনা, যেখানে লেখক কোন আভিধানিক বিষয়কে দমন করে একটি নির্দিষ্ট ধারণা প্রকাশ করতে ব্যবহার করেন। এছাড়া একটি ভিন্ন স্বর বজায় রাখতে বা শব্দ ভান্ডারের শূন্যস্থান পূরণ করতে ব্যবহার করা হয়। Underlexicalization এর পাশাপাশি Overlexicalization (ওভারলেক্সিক্যালাইজেশন) ব্যাপারটিও একটু দেখে নেওয়া যাক। Overlexicalization হল— যখন একটি ধারণাকে বোঝাতে বা একটি নির্দিষ্ট অর্থের ওপর জোর দেওয়ার জন্য প্রচুর সংখ্যক সমার্থক বা আধা-সমার্থক শব্দের ব্যবহার করা হয় তখন তাকে আমরা Overlexicalization বলি। সাহিত্যের ক্ষেত্রে লেখকরা একটি নির্দিষ্ট প্রভাব তৈরি করতে এর ব্যবহার করে থাকেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় একটি চরিত্রের তীব্র মানসিক অবস্থার বর্ণনায় ব্যবহার করে থাকেন। অর্থাৎ আমরা Overlexicalization বলতে, যেখানে বলার মাত্রাটা অনেক বেশি কিন্তু তার সারাংশ খুঁজলে তার সারবত্তা খুব ছোট হয়ে দাঁড়ায় সেটাকেই বুঝি।

এখন আমরা দেখব শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের মধ্যে কিভাবে নিম্নবর্গের মানুষের মুখের ভাষা সাহিত্যে জায়গা করে নিয়েছে। প্রথমেই আসি 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে নিম্নবর্গের ভাষা নিয়ে। গল্পে কাঙালীর মা অভাগী যখন বলে—

> "দ্যাখ দ্যাখ বাবা, বামুন-মা ওই রথে চড়ে সগ্যে যাচ্ছে।"[৭] তখন এখানে আমরা দেখি 'দ্যাখ' শব্দটির মধ্যে 'এ' ধ্বনিটি 'অ্যা' ধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়েছে, যা বঙ্গালি উপভাষার বৈশিষ্ট্য। এছাড়া 'বামুন' ও 'সগ্যে' এই দুটি শব্দ এখানে তলভাষী (Basilect) শব্দ যা নিম্নবর্গের মানুষের মুখের শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আরও দেখি অভাগী যখন বলে— "কাঁদবো কিসের জন্যে রে! — চোখে ধোঁ লেগেছে বৈ ত নয়!"[৮]

এখানে দেখা যায় 'ধোঁ' শব্দটি চলিত গ্রাম্য শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনি 'বৈ' 'ত' ইত্যাদি অব্যয় পদের সুব্যবহার নিম্নবর্গীয় শ্রেণির ভাষাকে জীবন্ত করে তুলেছে। আবার অভাগী যখন বলে— "আমি যে দেখনু কাঙালী, বামুন-মা রথের উপরে বসে। তেনার রাঙা পা-দুখানি যে সবাই চোখ মেলে দেখলে রে।"[৯] অর্থাৎ এখানেও আমরা দেখি 'দেখনু' শব্দটির মধ্যে রাঢ়ী উপভাষার প্রান্তিক বিভাষার বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে, যা নিম্নবর্গের ভাষা হয়ে উঠেছে।

'বিলাসী' গল্পের মধ্যেও কিভাবে ভাষা ব্যবহার করে নিম্নবর্গের চিত্র ফুটে উঠেছে সেটাই দেখার বিষয়। জ্ঞাতি খুড়া যখন বলে—

> "অকালকুষ্মাণ্ডটা একটা সাপুড়ের মেয়ে নিকা করিয়া ঘরে আনিয়াছে। আর শুধু নিকা নয়, তাও না হয় চুলায় যাক, তাহার হাতে ভাত পর্যন্ত খাইতেছে।"[১০]

অর্থাৎ এখানে দেখি 'আছ' ধাতু যোগে 'আনিয়াছে', 'খাইতেছে' প্রভৃতি শব্দ যোগ করেছে যা রাঢ়ী উপভাষার বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া 'নিকা' একটি আরবি শব্দ যাকে লেখক ব্যবহার করেছেন। ফলে এর মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গের ছবি ফুটে উঠেছে। আবার দেখি বিলাসী যখন বলে—"ঠাকুর, একটু সাবধানে খুড়ো। সাপ একটা নয়, একজোড়া ত আছে বটেই, হয়ত বা বেশীও থাকতে পারে।"[১১] অর্থাৎ এখানে ঝাড়খন্ডি উপভাষার বৈশিষ্ট্য হিসাবে 'বট' ধাতুর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ফলে নিম্নবর্গের মুখের ভাষা যেন জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে।

'মহেশ' গল্পের মধ্যে লেখক কিভাবে নিম্নবর্গের মানুষের মুখে ভাষা ব্যবহার করেছেন সেটাই এখন দেখব। গফুর যখন তর্করত্নকে বলে—

> "কোথায় ছাড়বো বাবাঠাকুর, লোকের ধান এখনো সব ঝাড়া হয়নি— খামারে পড়ে; খড় এখনো গাদি দেওয়া হয়নি, মাঠের আলগুলো সব জ্বলে গেল— কোথাও একমুঠো ঘাস নেই। কার ধানে মুখ দেবে, কার গাদা ফেড়ে খাবে— ক্যামনে ছাড়ি বাবাঠাকুর?"[১২]

অর্থাৎ এখানে দেখি 'ক্যামন' শব্দটির মধ্যে 'এ' ধ্বনি 'অ্যা' ধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়েছে যা বঙ্গালী উপভাষার বৈশিষ্ট্য, সেটাই নিম্নবর্গের মুখের ভাষা হয়ে উঠেছে। তাছাড়া আরোও দেখি গফুর যখন তার মেয়ে আমিনাকে বলে—

> "ওসব থাক মা, ওতে আমার মহেশের প্রাচিত্তির হবে।"[১৩]

এখানেও দেখা যায় 'প্রাচিত্তির' শব্দটি একটি লোকশব্দ হিসাবে পরিচিত যা গফুরের মুখে বসিয়ে তাকে যেন নিম্নবর্গের জীবন্ত চরিত্র করে তুলেছে। আবার গল্পের শেষে গিয়ে দেখি গফুর যখন বলে—

> "আল্লা! আমাকে যত খুশি সাজা দিয়ো, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেচে। তার চ'রে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখে নি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয়নি, তার কসুর তুমি যেন কখনো মাপ করো না।"[১৪]

অর্থাৎ এখানেও আমরা দেখি 'আল্লা', 'কসুর' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন যা সাধারণত মুসলমানী বাংলা বলে পরিচিত। ফলে বোঝা যায় গফুর একজন নিম্নবর্গীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ। তাছাড়া এ বাক্যের মধ্য দিয়ে শুধুই বিধির দিকে বিচার চেয়ে নালিশ জানানো হয়েছে, যার মাধ্যমে নিম্নবর্গের চরিত্রটি আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে আলোচ্য গল্পের মধ্যে। ফলে আমরা আমাদের পর্যালোচনায় তুলে ধরেছি।

'মন্দির' গল্পের মধ্যেও আমরা নিম্নবর্গের মানুষের মুখের ভাষা হিসাবে কুমোর বাড়ির সরকারদাদা যখন শক্তিনাথকে বলে—

> "নাও দাদাঠাকুর, তুমি চিত্তির কর।"[১৫]

এখানে আমরা দেখি 'চিত্তির' শব্দটি লোকশব্দ হিসেবে পরিচিত যা লেখক নিম্নবর্গের চরিত্রটির মুখের ভাষা হিসাবে ব্যবহার করে চরিত্রটিকে জীবন্ত করে ফুটিয়ে তুলেছেন। ফলে আমরা আমাদের পর্যালোচনায় তুলে ধরেছি।

'হরিচরণ' গল্পের মধ্যেও আমরা দেখি নিম্নবর্গের ছেলে হরিচরণের মুখের ভাষা, সে যখন বলে—

> "মা, আমরা গরিব লোক, চিরকাল খাটতেই হবে, আর বসে থেকেই বা কি হবে"[১৬]

অর্থাৎ এখানে 'খাটতেই' এবং 'থেকেই' শব্দ দুটিতে অন্তস্বরাগমের মধ্য দিয়ে মেনে নেওয়ার ব্যাপারটি প্রাধান্য পেয়েছে। যা নিম্নবর্গের মানুষের মুখের ভাষার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। ফলে চরিত্রটি আরো জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাই আমরা বিষয়টি তুলে ধরেছি।

এতক্ষণ আমরা শরৎচন্দ্রের গল্পের মধ্যে থাকা নিম্নবর্গীয় শ্রেণির ভাষা-সংলাপ এর কথা পর্যালোচনা করলাম। এখন আমরা দেখব তার উপন্যাসগুলির মধ্যে নিম্নবর্গের ভাষা কিভাবে ফুটে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে 'উপন্যাসের ভাষাশিল্প ও শরৎচন্দ্র' প্রবন্ধে পবিত্র সরকার মহাশয় বলেছেন—

> "গল্প উপন্যাসের চরিত্র আঁকতে গিয়ে লেখকেরা নানা উপায় বেছে নেন। উদ্দেশ্য চরিত্রটিকে কমবেশি জ্যান্ত করে পাঠকদের সামনে ছেড়ে দেওয়া— যেন তারা নিজেদেরই একটা প্রাণ উপার্জন করে।"[১৭]

অর্থাৎ লেখক চরিত্রকে জ্যান্ত করেন তার মুখে সঠিক ভাষা-সংলাপ বসিয়ে।

'বিরাজ বৌ' উপন্যাসে আমরা দেখি নিম্নবর্গের মানুষ হিসাবে মতি চাঁড়ালের মুখের ভাষা। সে যখন বলে—

> "দাঠাকুর, তুমি একবার না দেখলে ত আমার ছিমন্ত আর বাঁচে না! একবার পায়ের ধুলো দাও দেবতা, তাহলে যদি এ-যাত্রা সে বেঁচে—।"[১৮]

এখানে 'ছিমন্ত' শব্দটি তলভাষী শব্দ যা সমাজের নিচু তলার মানুষের মুখে শোনা যায়। লেখক এখানে নিম্নবর্গের চরিত্র মতি চাঁড়ালের মুখে শব্দটি বসিয়ে চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলেছেন। আবার আরও দেখি মতি চাঁড়াল চোখ মুছতে মুছতে যখন বলে—

> "সে আর কি বলব! মা যেন একেবারে ঢেলে দিয়েচেন। ছোটজাত হয়ে জন্মেচি ঠাকুদ্দা, কিছুই ত জানিনে কি করতে হয়— একবার চল, বলিয়া ছে দু'পা জড়াইয়া ধরিল।"[১৯]

অর্থাৎ এই ভাষার মধ্যে দেখি 'দিয়েচেন', 'জন্মেচি' এই দুটি শব্দ অল্পপ্রাণ হয়ে উচ্চারিত হয়েছে, যা রাঢ়ী উপভাষার বৈশিষ্ট্য চোখে পড়েছে। তাছাড়া 'ঠাকুদ্দা' শব্দটিতেও আমরা ব্যঞ্জনদ্বিত্ব এর প্রয়োগ লক্ষ্য করেছি, যা রাঢ়ী উপভাষার একটি বৈশিষ্ট্য। যার ফলে নিম্নবর্গের ভাষা জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে বলে আমাদের মনে হয়েছে।

'পন্ডিতমশাই' উপন্যাসের মধ্যেও আমরা নিম্নবর্গীয় শ্রেণির চরিত্র হিসাবে বৃন্দাবনকে পাই। বৃন্দাবনের ছেলে চরণ যখন ভেদবমি করে অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন গোপাল ডাক্তারকে ডাকতে গিয়ে বৃন্দাবন বলে—

> "ঘাট মানচি, পায়ের ধূলো মাথায় নিচ্চি ডাক্তারবাবু, একবার চলুন! শিশুর প্রাণ বাঁচান। এক শ টাকা দেবো— দু'শ টাকা, পাঁচ শ টাকা— যা চান দেবো ডাক্তারবাবু, চলুন— ওষুধ দিন।"[২০]

অর্থাৎ এখানে আমরা দেখতে পাই কত সহজ সুন্দরভাবে ডাক্তারকে যাওয়ার জন্য বলছে বৃন্দাবন নিজে হীনতা স্বীকার করছে যা নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে দেখা যায়। সেটাই লেখক তার মুখের ভাষার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন আর তাতেই যেন চরিত্রটি উপন্যাসে প্রাণ পেয়েছে বলে আমাদের মনে হয়।

এছাড়া আরও দেখি যখন চরণ মারা যাওয়ার পর বৃন্দাবন ও কুসুম ফিরে এসেছে তারপর কুসুমকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বৃন্দাবন বলছে—

> "চরণকে যে তুমি কত ভালবাসতে তা আমি জানি কুসুম। তাই তোমাকেও এ পথে ডাকছি। সে তোমার মরেনি, হারায়নি, শুধু লুকিয়ে আছে— একবার ভালো করে চেয়ে দেখতে শিখলেই দেখতে পাবে, যেখানে যত ছেলেমেয়ে আছে, আমাদের চরণও তাদের সঙ্গে আছে।"[২১]

অর্থাৎ এখানে দেখি কত সুন্দর ভাবে জটিল ও যৌগিক বাক্য দিয়ে বর্ণনাটি সহজ চলিত গদ্যে সাধারণ শব্দ দিয়ে জীবন দর্শনের ব্যঞ্জনা দিয়েছেন; যা সত্যিই নিম্নবর্গের মুখের ভাষা হয়ে উঠেছে। এসব ভাষা দেখে পাঠকবর্গকে বিস্মিত হতে হয়।

আবার উপন্যাসে যখন কুঞ্জের স্ত্রী ব্রজেশ্বরীর মা কুসুমকে উদ্দেশ্য করে বলে—

> "তা ছাড়া এই পরের মেয়েটি কি পর্দার বিবি, নাকি কারুর সামনে বার হন না? ওলো, ও যেমন করে বার হতে জানে, তা দেখলে আমাদের বুড়ো মাগীদের পর্যন্ত লজ্জা হয়।"[২২]

এখানে এই যে 'ওলো' শব্দের ব্যবহার লেখক করেছেন যাকে আমরা সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে লিঙ্গোপভাষা (Genderlect) বলতে পারি। এ সকল শব্দ সাধারণত গ্রাম্য মেয়েদের মুখেই শোনা যায় ফলে এটিকে আমরা মেয়েলি ভাষাও বলতে পারি। তাছাড়া 'মাগী' শব্দটি লেখক অনায়াসে ব্যবহার করেছেন। কেননা সেকালের দিনে 'মাগী' শব্দটি সাধারণত সচরাচর শব্দ বা চল শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সেকালের দিনে অনায়াসেই এই 'মাগী' শব্দের প্রয়োগ করেছেন। ফলে শব্দটি আমাদের কাছে এখন দৃষ্টিকটু হলেও তখনকার দিনে শব্দটির চল ছিল। কিন্তু এখনকার দিনে 'মাগী' শব্দটি প্রয়োগ করলে তা গ্রাম্য বদকথা (Slang) বলে ধরা হত। তাই লেখক নিম্নবর্গের চরিত্রটির জীবন্ত রূপ ফুটিয়ে তোলার জন্য শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আবার যখন বৃন্দাবন তার ছেলের জন্য ওষুধ আনতে যায় তখন ওষুধ না দিলে বৃন্দাবনের কান্না শুনে তারিণীর স্ত্রী এসে তারিণীকে বলতে বলে গোপালকে ওষুধ দেওয়ার জন্য তখন—

> "তারিণী খিঁচাইয়া উঠিল— তুই থাম মাগী! পুরুষ মানুষের কথায় কথা কস নে।"[২৩]

অর্থাৎ এখানেও আমরা চল শব্দ হিসাবে 'মাগী' শব্দটি পাই। সেই সঙ্গে 'খিঁচাইয়া' শব্দটি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে গ্রাম্যতার ভাব ও ফুটে উঠেছে যার অর্থ দাঁত চিপে কথা বলা। ফলে এসবের মধ্য দিয়েই চরিত্রগুলি আরো বাস্তবসম্মত হয়ে ধরা পড়েছে আমাদের কাছে। এখানে লেখক চরিত্রের মুখে চলিত গদ্যের দ্বিরালাপ (Dialogue) ব্যবহার করে জীবনের নিগূঢ় সত্যকে তুলে ধরেছেন এ কথা আমরা বলতে পারি।

অধ্যাপক শ্যামলচন্দ্র দাস তার একটি প্রবন্ধে 'পন্ডিতমশাই' উপন্যাস সম্পর্কে বলেছেন—

> "ধরে নেওয়া যায় ব্যান্ডেল, বৈদ্যবাটি, দেবানন্দপুর এলাকার মৌখিক ভাষা সেকালেও ছিল, এমনকি একালেও আছে— কেন্দ্রিয় রাঢ়ী উপভাষা বা মান্য চলতি বাংলা। যা আলোচ্য উপন্যাসের চরিত্রগুলির সংলাপের ভাষা। কাজেই, এ ভাষার বাস্তবসম্মত প্রয়োগের সাফল্য সহজেই এসেছে।"[২৪]

এরপর আমরা 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের মধ্যে থাকা চরিত্রের মুখের দ্বিরালাপ (Dialogue) নানাভাবে পর্যালোচনা করেছি। উপন্যাসের চার নং পরিচ্ছেদে দেখি পৌঢ়া রমনী ক্ষ্যেন্তি বামনির মেয়ে যখন গোবিন্দ গাঙ্গুলিকে দেখিয়ে বলে—

> "ঐ উনি মুখুয্যে বাড়ির গাছ পিতিষ্ঠের সময় জরিমানা বলে ইস্কুলের নামে দশ টাকা আমার কাছে আদায় করেন নি কি? গাঁয়ের ষোল আনা শেতলা-পুজোর জন্যে দু-জোড়া পাঁঠার দাম ধরে নেন নি কি? তবে? কতবার ঐ এককথা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে চান শুনি?"[২৫]

অর্থাৎ এখানে আমরা গ্রামীণ পৌঢ়া অর্থাৎ বৃদ্ধার মুখের ভাষা হিসাবে 'পিতিষ্ঠে', 'শেতলা' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার দেখতে পাই। যে শব্দগুলিকে আমরা তলভাষী (Basilect) শব্দ বলেছি কেননা সমাজের একদম নিচুস্তরের মানুষের মুখের ভাষাকে তলভাষী বলা হয়। আবার 'ইস্কুল' শব্দটির মধ্যে আদি স্বরাগমের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই সকল শব্দ ব্যবহার করে লেখক চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলেছেন। আবার উপন্যাসের এগার নং পরিচ্ছেদে দেখি যখন নিম্নবর্গের কৃষকরা এসে রমেশকে বলে—

> "ছোটবাবু এ যাত্রা রক্ষা করুন, আপনি না বাঁচালে ছেলেপুলের হাত ধরে আমাদের পথে ভিক্ষে করতে হবে।"[২৬]

অর্থাৎ এখানে দেখি লেখক খুব সহজ চলিত মুখের ভাষাকে লিখিত ভাষার রূপ দিয়েছেন। যার ফলে নিম্নবর্গের মানুষের করুন আর্তনাদ খুব সহজেই ধরা পড়েছে। 'বাবু' সম্বোধন পদ ব্যবহার করে লেখক এখানে নিম্নবর্গের ভাষাকে জীবন্ত করে তুলেছেন বলে আমাদের মনে হয়েছে।

আবার লেখক যখন আকবরের মুখে দ্বিরালাপ (Dialogue) বসিয়েছেন তখন দেখি সে ভাষা 'মুসলমানী বাংলা' ভাষার পরিচয় বহন করে। আকবর যখন বলে—

> "হাঁ— মায়ের দুধ খেয়েছিল বটে ছোটবাবু! লাঠি ধরলে বটে! ...মুই সেলাম করে কইলাম, আল্লার কিরে ছোটবাবু, তুমি একটিবার পথ ছাড়। তোমার আড়ালে দাঁড়িয়ে এ যে ক'সম্মুন্দি মুয়ে কাপড় জড়ায়ে ঝপাঝপ কোদাল মারচে, ওদের মুন্ডু কটা ফাঁক করে দিয়ে যাই!"[২৭]

অর্থাৎ এখানে আমরা 'আল্লা', 'সেলাম' প্রভৃতি শব্দের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক ভাষা খুঁজে পেয়েছি যার মাধ্যমে মুসলমান চরিত্রটি ফুটে উঠেছে। এছাড়া এখানে 'বট' ধাতুর প্রয়োগ দেখা যায় যা ঝাড়খন্ডি উপভাষার বৈশিষ্ট্য। আরও দেখি 'মুই' চলিত সর্বনাম পদের ব্যবহার এবং 'কইলাম' চলিত ক্রিয়াপদ এর ব্যবহারে চলিত কথ্য ভাষাকে লেখক চলিত লেখ্য ভাষায় তুলে ধরেছেন। যার ফলস্বরূপ নিম্নবর্গের সমাজকে পাঠকের কাছে প্রত্যক্ষ করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন বলে মনে করেছি।

'পল্লীসমাজ' উপন্যাস প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্যামলচন্দ্র দাস মহাশয় বলেন—

> "পল্লীসমাজ উপন্যাস হয়ে ওঠে নানা ভাষার সুডৌলাধার। বিবিধ ভাষার সহাবস্থানে কোন বিরোধ নেই। ফলে এই উপন্যাসের ভাষা-পরিবেশ হয়ে ওঠে পাঠকের মানসিক বিচরণের গণ্ডিহীন নানা ভাষা বদল (Languages Shift)-এর অনন্য প্রন্যাস (System)।"[২৮]

এই সুযোগে এখানে আমরা লেখকের ব্যবহৃত বদকথা (Slang) প্রসঙ্গটি আলোচনা করে নিতে পারি। এই বদকথাকে উপভাষায় কথা বলা মানুষদের subcultural form এর একটি বিশেষ অঙ্গ হিসাবে ধরা হয়।

আমরা প্রথমেই 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের মধ্যে দেখি নিম্নবর্গের মানুষকে শাসন করার জন্য যখন জমিদারের দারোয়ান কাঙালীর বাবা রসিককে বলে—

> "শালা, একি তোর বাপের গাছ আছে যে কাটতে লেগেছিস।"[২৯]

অর্থাৎ এখানে আমরা দেখি নিম্নবর্গের মানুষের প্রতি অবজ্ঞার ভাষা হিসাবে 'শালা' শব্দটি যা বদকথা (Slang) হিসাবে প্রচলিত তা ব্যবহার করে নিম্নবর্গের স্থান সমাজে কোথায় সেটা ফুটিয়ে তুলেছেন।

আবার 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে গোবিন্দ গাঙ্গুলী যখন বলে—

> "তবে রে হারামজাদি মাগী—"[৩০]

কিংবা পরান হালদার যখন বলে—

> "এই বেশ্যে মাগীদের বাড়ি থেকে একেবারে তাড়িয়ে না দিলে এখানে আমি জলগ্রহণ করব না তা বলে দিচ্চি। ...এমন সব খানকী নটির কান্ডকারখানা জানলে কি জাতজন্ম খোয়াতে এ বাড়ির চৌকাঠ মাড়াই?"[৩১]

অর্থাৎ এখানে লেখক চরিত্রের মুখে 'হারামজাদি', 'বেশ্যে', 'খানকী' প্রভৃতি শব্দগুলি নির্দ্বিধায় ব্যবহার করেছেন যা বদকথা (Slang) হিসাবে পরিচিত। যার ফলে চরিত্রগুলি যেন উপন্যাসে বাস্তব রূপ পেয়েছে বলে আমরা মনে করি।

এছাড়া 'শ্রীকান্ত'(প্রথম পর্ব) উপন্যাসের মধ্যে দেখি লেখক ইন্দ্রনাথের মুখের ভাষার মধ্যে বদকথা (Slang) বসিয়েছেন। সে যখন বলে—

> "জোচ্চোর শালাদের ছায়া মাড়াতে নেই। হারামজাদা বজ্জাত ব্যাটারা।"[৩২]

তখন এ ভাষার মধ্যে 'জোচ্চোর', 'শালা', 'হারামজাদা' প্রভৃতি শব্দগুলি ব্যবহার করেন যেগুলিকে আমাদের বদকথা (Slang) বলেই মনে হয়েছে। যার মাধ্যমে লেখক ইন্দ্রনাথ চরিত্রের যথাযথ রূপ ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে সে দিক থেকে আমরা আমাদের পর্যালোচনায় তুলে ধরেছি।

'শ্রীকান্ত' (প্রথম পর্ব) উপন্যাসের মধ্যে আমরা নিম্নবর্গীয় চরিত্র হিসাবে শাহজী ও অন্নদাদিদিকে পাই। অন্নদাদিদি যখন ইন্দ্রনাথকে বলে—

> "আমাদের আগাগোড়া সমস্ত ফাঁকি। আর তুমি মিথ্যে আশা নিয়ে শাহজীর পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়িয়োনা। আমরা তন্ত্রমন্ত্র কিছুই জানিনে, মড়াও বাঁচাতে পারিনে; কড়ি চেলে সাপ ধরে আনতেও পারিনে। আর কেউ পারে কি না জানিনে, কিন্তু আমাদের কোন ক্ষমতাই নেই। ...আমরা যে সাপুড়ে— ভাই, ঠকানোই যে আমাদের ব্যবসা।"[৩৩]

অর্থাৎ এখানে আমরা অন্নদাদিদির মুখের ভাষার দ্বিরালাপের মধ্য দিয়ে তার সহজ, সরল, নির্ভেজাল নারী চরিত্রকে খুঁজে পাই। লেখক এখানেও চলিত কথ্য ভাষাকেই লেখ্য ভাষায় স্থান দিয়ে নিম্নবর্গের চরিত্রকে অনন্য করে তুলেছেন।

'শ্রীকান্ত' (দ্বিতীয় পর্ব) উপন্যাসে নন্দ মিস্ত্রি ও টগরের দ্বিরালাপে আমরা তাদের ভাষার মধ্যেই বুঝতে পারি তারা কোন শ্রেণির মানুষ। টগর যখন বলে—

> "পরিবার! আমার সাত পাকের সোয়ামী বলচেন, পরিবার! খবরদার বলচি মিস্তিরী, যার-তার কাছে মিছে কথা বলে আমার বদনাম করো না বলে দিচ্চি। ...বিশ বচ্ছর ঘর করচি বটে, কিন্তু একদিনের তরে হেঁসেলে ঢুকতে দিয়েচি?"[৩৪]

অর্থাৎ এখানে দেখি লেখক ইচ্ছে করেই টগরের মুখ দিয়ে 'সোয়ামী', 'মিস্তিরী' প্রভৃতি শব্দগুলি বসিয়েছেন যা মূলত তলভাষী (Basilect) শব্দ। যার ফলে নিম্নবর্গের চরিত্রটি যথাযথভাবে বাস্তবসম্মত হয়ে উঠেছে। তাছাড়া এখানেও 'বট' ধাতুর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় যাকে আমরা ঝাড়খণ্ডী উপভাষার বৈশিষ্ট্য বলে মনে করি। ফলে লেখক এখানে সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে দরিদ্র শ্রেণির নারীর মুখের ভাষা প্রয়োগ করে নিম্নবর্গের নারীর ভাষাকে ফুটিয়ে তুলেছেন বলে আমরা মনে করি।

আবার যখন আমরা নিম্নবর্গীয় পুরুষ চরিত্রের মুখের ভাষা শুনি তখনও হতবাক হয়ে যায়। নন্দ মিস্ত্রী যখন বলে—

"দেখলেন মশাই, মাগীর ছোট মন? কে বাঙ্গালী মেয়েটা রেঙ্গুনে যাচ্ছে— খবরটা নিতেও দোষ? ...তোর কি আমি পেষা বাঁদর যে, যে-দিকে শেকল ধরে নিয়ে যাবি সেই দিকে যাব? আমার ইচ্ছে হলে আবার গিয়ে বেচারাকে দেখে আসব— তুই যা পারিস, তা করিস।"[৩৫]

অর্থাৎ এখানে আমরা একজন নিম্নবর্গীয় পুরুষ চরিত্রের মনোবৃত্তি বুঝতে পারি যে, নন্দ কারো পরোয়া করে না, তার যা ইচ্ছে হবে সেটাই করবে। আসলে নিম্নবর্গের পরিবারের গতিবিধি লেখক নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন ভাষার মাধ্যমে। কেননা পুরুষ যেমন স্ত্রীকে খুব বেশি পাত্তা দেয় না তেমনি স্ত্রীরাও কিন্তু স্বামীর কথার বাইরে যায় না এমন নয়। ফলে দুদিক থেকেই আমরা নিম্নবর্গের পরিবারের চিত্র খুজে পেয়েছি। এছাড়া তাদের মুখের ভাষা তাদের পরিচয় বহন করেছে অনেকটা। যেমন— 'মাগী' শব্দটি লেখক নিম্নবর্গের চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে ব্যবহার করেছেন। যদিও শব্দটি তখনকার দিনে 'চল' শব্দ হিসাবে ধরা হতো। ফলে সবদিক দিয়েই লেখক যেন চরিত্রের জীবন্ত রূপ তুলে ধরেছেন এমন ভাষা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে।

এছাড়াও উপন্যাসের চৌদ্দ নং পরিচ্ছেদে যখন আমরা রতনের মুখের ভাষা শুনি, সে যখন বলে—

"আমার অন্যায় হয়ে গেছে বাবু, মোচলমান কুলিতে খাবারটা ছুয়ে ফেলেচে, কত বলচি, মা ইস্টিশান থেকে কিছু কিনে এনে দিই কিন্তু কিছুতেই না।"[৩৬]

অর্থাৎ এখানে আমরা রতনের ভাষায় 'ইস্টিশান' শব্দটিতে দেখি আদি স্বরাগম ঘটেছে। আর 'মোচলমান' শব্দটি এখানে একটি তলভাষী (Basilect) শব্দ হিসাবে উচ্চারিত হয়েছে। যার ফলে চরিত্রটি তার মুখের ভাষার মাধ্যমে ফুটে উঠেছে তাই আমরা আমাদের পর্যালোচনায় তুলে ধরেছি।

'শ্রীকান্ত' (তৃতীয় পর্ব) উপন্যাসে পাঁচ নং পরিচ্ছেদে দেখি মধুডোম নিম্নবর্গীয় জাতির মানুষ। তার মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে সে এসে যখন বলে—

"হুজুর, পহর রেতের মধ্যেই লগন, একবার যদি পায়ের ধূলো দেন।"[৩৭]

অর্থাৎ এখানে আমরা 'পহর' এবং 'লগন'এই দুটি শব্দের মধ্য দিয়ে বুঝতে পারি যে মধুডোম একজন নিম্নবর্গীয় পরিবারের গ্রামের বৃদ্ধ মানুষ হবে। কেননা 'পহর' ও 'লগন' শব্দ দুটি তলভাষী (Basilect) শব্দ হিসেবে বেশি ব্যবহৃত হয়। ফলে লেখক ওই ডোম পরিবারের মানুষের মুখের কথ্য ভাষাকেই এনে লেখ্য ভাষায় স্থান দিয়েছেন। যার ফলস্বরূপ চরিত্রটি আরো জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। আবার ধ্বনি পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় 'পহর' শব্দটির মধ্যে মধ্যব্যঞ্জন লোপ ঘটেছে। ঠিক তেমনি 'লগন' শব্দটিতেও মধ্যস্বরাগম ঘটেছে। ছিল 'লগ্+ন', আর হয়েছে 'ল+গন্'।

আবার উপন্যাসের এগার নং পরিচ্ছেদে দিয়ে সতীশ ভরদ্বাজ এর প্রণয়িনী হিসাবে আমরা একটি বাউরি জাতির মেয়েকে পাই, যার নাম কালিদাসী। তার মুখের ভাষায় দেখি সে যখন বলে—

"হেথকে। উ কি বাঁচবেক্! ...কাপড় নেই পেণ্টুলুন আছে।"[৩৮]

অর্থাৎ এখানে আমরা 'বাঁচবেক' শব্দটির মধ্যে ক্রিয়াপদে স্বার্থিক 'ক' প্রত্যায়ের ব্যবহার লক্ষ্য করেছি, যা ঝাড়খণ্ডী উপভাষার বৈশিষ্ট্য হিসাবে পরিচিত। তাছাড়া আগেকার দিনে যে 'পেণ্টুলুন' শব্দের প্রয়োগ ছিল তা বুঝতে পারি; যার অর্থ পায়জামা। গ্রামের বৃদ্ধ বৃদ্ধারা এখনও অনেকে এই শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। যেটিকে আমরা তলভাষী (Basilect) শব্দ হিসাবে তুলে ধরেছি। যার ফলে চরিত্রটি নিম্নবর্গীয় শ্রেণির মানুষ হিসাবে ফুটে উঠেছে।

'দেবদাস' উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দেখি যখন পার্বতী বলে তাকে পন্ডিতমশাই মেরেছে, তখন পার্বতীর পিতামহী বলেন—

> "নারান, দেখ ত মিনষের আস্পর্ধা! শুদ্দুর হয়ে বামুনের মেয়ের গায়ে হাত তোলে! কি করে মেরেচে একবার দেখ।"[৩৯]

অর্থাৎ এখানে আমরা 'মিনষে' শব্দটিকে সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে লিঙ্গপোভাষা (Genderlect) বলে থাকি; তাছাড়া শব্দটিকে লিঙ্গভেদে মেয়েলি ভাষা বলা হয়। আবার 'আস্পর্ধা' শব্দটির মধ্যে দেখি আদি স্বরাগম ঘটেছে। এছাড়াও 'শুদ্দুর' শব্দটি ধ্বনিগত পরিবর্তনের দিক থেকে দেখি মধ্য স্বরাগম ঘটেছে আবার 'শুদ্দুর' শব্দটিকে আমরা তলভাষী (Basilect) শব্দ হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি, কেননা শব্দটি গ্রাম্য সমাজের মানুষদের মধ্যেই বেশি ব্যবহার হতে দেখা যায়। ফলে সবদিক থেকেই এ ভাষা যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে বলে আমাদের মনে হয়।

আবার উপন্যাসের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে দেখি যখন চন্দ্রমুখী ভৈরব গয়লাকে তালসোনাপুর গ্রাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তখন ভৈরব গয়লা বলে—

> "হাঁ তিনি মুলুকের জমিদার। এ গাঁও তাঁর। আজ তিন বছর হল তিনি স্বর্গে গিয়েছেন; যত প্রজা একমাস ধরে সেখানে নুচিমণ্ডা খেয়েছিল। এখন তার দুই ছেলে আছে, মস্ত বড়লোক— রাজা।"[৪০]

অর্থাৎ এখানেও আমরা সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে এ ভাষা অর্থনৈতিক ভেদে দরিদ্র শ্রেণির মানুষের মুখের ভাষা হিসাবে স্থান পেয়েছে। আবার অন্যদিকে 'নুচিমণ্ডা' শব্দটির মধ্যে আমরা উপভাষাগত দিক থেকে দেখি 'ল' ধ্বনিটি 'ন' ধ্বনিতে পরিণত হয়ে উচ্চারিত হয়েছে; যা রাঢ়ী উপভাষার বৈশিষ্ট্য হিসাবে ধরা পড়েছে। ফলে নিম্নবর্গের চরিত্র হিসাবে গয়লা জাতির মানুষটির মুখের ভাষাকেই লেখক লেখ্য ভাষায় ব্যবহার করে চরিত্রটিকে বাস্তবসম্মত রূপ দিয়েছেন।

এছাড়াও এই উপন্যাসের ষোড়শ পরিচ্ছেদে দেখি যখন দেবদাস পান্ডুয়া স্টেশনে নেমে গরুর গাড়িতে করে হাতিপোতায় নিয়ে যেতে বলে তখন গাড়োয়ানের যে মুখের ভাষা, তিনি বলেন—

> "এখনো আট-দশ কোশ আছে বাবু।"[৪১]

অর্থাৎ এখানে ধ্বনিগত পরিবর্তনের দিক থেকে কোশ শব্দে দেখি 'র' লোপ পেয়েছে। আবার অন্যদিকে দেখি যেহেতু হুগলি জেলার পান্ডুয়া স্টেশন হলে তা রাঢী উপভাষার নিম্নবর্গের মানুষের কথ্য ভাষাকে লেখক এখানে ব্যবহার করেছেন ফলে আমরা আমাদের পর্যালোচনায় তুলে ধরেছি।

আবার সবশেষে দেখি যখন দেবদাস হাতিপোতার জমিদারের বাড়ির সামনে অশ্বত্থ গাছতলায় মরে পড়ে আছে, সে খবর গোটা গ্রামে ছড়িয়েছে তখন পার্বতী এক দাসীকে জিজ্ঞাসা করে বলে—

> "কি হয়েচে লা? কে মেরেচে?"[৪২]

অর্থাৎ এখানেও আমরা সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে লিঙ্গভেদে দেখি 'লা' শব্দটি শুধুমাত্র নারীরই মুখের ভাষায় স্থান পায়। ফলে এ ভাষা বাস্তবসম্মত মেয়েলি ভাষা হয়ে উঠেছে। তাই সব দিক থেকে পর্যালোচনা করে বলা যায় বিভিন্ন চরিত্রের মুখে বিভিন্ন রকম শব্দ বসিয়ে লেখক যেন চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তুলেছেন।

'চরিত্রহীন' উপন্যাসের মধ্যে আট নং পরিচ্ছেদে দেখি যখন সতীশ বিহারীকে বলে সাবিত্রী আহ্নিক কেন করছে, তখন বেহারী বলে—

> "আজ্ঞে, তিনি ত রোজ করে। একাদশীর দিনে এক ফোঁটা জলও খায় না। আমরা কত বলি বাবু, কিন্তু তিনি মাছও খায় না, রাত্তিরেও খায় না— ভদ্দরনোক কিনা তাই।"[৪৩]

এখানে আমরা সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে 'আজ্ঞে' শব্দটিকে অর্থগত দিক থেকে দেখি দুর্বল শ্রেণির মানুষের মুখের ভাষা। আবার 'ভদ্দরনোক' শব্দটির মধ্যে 'ল' ধ্বনি 'ন' ধ্বনিতে পরিণত হয়ে উচ্চারিত হয়েছে;

যা রাঢ়ী উপভাষার বৈশিষ্ট্য হিসাবে চোখে পড়ে। সেইসঙ্গে 'রাত্তির' শব্দটিতেও দেখি ব্যঞ্জনদ্বিত্ব হয়ে উচ্চারিত হয়েছে— সেটাও রাঢ়ী উপভাষার বৈশিষ্ট্য।

এছাড়া মোক্ষদার পরিচয় পাই এই পরিচ্ছেদেই, যে সতীশের পশ্চিমের বাড়িতে দাসীর কাজ করতো অনেকদিন আগে। কিন্তু এখন বর্তমানে সতীশকে মোক্ষদা তার নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছে তখন সতীশ ভুবনচন্দ্র মুখুয্যের কথা জিজ্ঞাসা করলে মোক্ষদা বলে—

> "না, মারা যাননি, কিন্তু গেলেই ছিল ভাল। তিনি বামুন মানুষ, বর্ণের গুরু, আমাদের মাথার মনি, নারায়ণতুল্য। তাঁকে অভক্তি করছি নে, তাঁর চরণের ধুলো নিচ্চি; কিন্তু কোনদিন দেখা পেলে তিনটি ঝ্যাঁটা মুখে গুনে মারব, তবে আমার নাম মোক্ষদা। ... তিনি মানুষ নয়, চামার।"[৪৪]

অর্থাৎ এখানে দেখি 'ঝ্যাঁটা' শব্দটির মধ্যে 'আ' ধ্বনি 'অ্যা' হয়ে উচ্চারিত হয়েছে, যা বঙ্গালি উপভাষার বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা যায়। তাছাড়া 'চামার' শব্দের ব্যবহারে মূলত 'Downword mobility' দেখা যায়। যেখানে পেশাগত দিক থেকে সে দাসী ফলে নিম্নবর্গের নারীর মুখের কথ্য ভাষা দিয়েই লেখক তাকে যথার্থ রূপে ফুটিয়ে তুলেছেন।

আবার উপন্যাসের শেষের দিকে তেতাল্লিশ নং পরিচ্ছেদে আমরা বাড়িউলীর মুখের ভাষা পাই, সে যখন কিরণময়ীকে বলে—

> "ভাল কথা মনে পড়েছে বৌমা, খোট্টা মিনসেকে ত সকালেই খবর পাঠিয়েছিলুম। ব্যাটার আর তর সয় না, বলে লোকজন কাজে বেরিয়ে গেলে দুপুরবেলাতেই আসব। ...তুই ত আর কুলের বউ ন'স! মানুষ-জন তোর ঘরে আসবে, বসবে, তাতে ভয়টা কাকে শুনি? তুই হলি বেবুশ্যে। ...ন্যাকামি দেখলে গা জ্বালা করে— এখন আমরাও যা, তুইও সেই পদার্থ। ভদ্দরনোক আসচে, নে ঘরে বসা।"[৪৫]

অর্থাৎ এখানে আমরা 'মিনসে', 'ন্যাকামি' প্রভৃতি শব্দগুলি দেখে সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে লিঙ্গভেদে মেয়েলি ভাষা বলতে পারি। আবার 'ভদ্দরনোক' শব্দের মধ্যে দ্বিত্বব্যঞ্জন এবং একই সাথে 'ল' ধ্বনি 'ন' ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে, যা রাঢ়ী উপভাষার বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া 'ব্যাটার', 'ন্যাকামি' প্রভৃতি শব্দের মধ্যে দেখি 'এ' ধ্বনি 'অ্যা' ধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়েছে যা বঙ্গালি উপভাষার বৈশিষ্ট্য কিন্তু সেইসঙ্গে রাঢ়ী উপভাষার কথ্য ভাষাতে 'অ্যা' ধ্বনির ব্যবহার চোখে পড়ে। ফলে সব দিক থেকে দেখা যায় লেখক চরিত্রের মুখে বর্গের ভিত্তিতে নিম্নবর্গের মুখের ভাষায় সাহিত্য রচনা করে তা বাস্তবসম্মত করে তুলেছেন।

এ প্রসঙ্গে চরিত্র নির্মাণের ভাষা নিয়ে ড. পবিত্র সরকার মহাশয় লিখেছেন—

> "কাহিনীতে চরিত্রটিকে প্রথম আনার মুহূর্তে লেখক তার শারীরিক ও মানসিক কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা পাঠককে জানিয়ে দেন। এই জানানোর ব্যাপারটা সাধারণভাবে দু'রকম। এক, লেখক সোজাসুজি একটা তালিকা পাঠকের সামনে হাজির করেন— চরিত্রটিকে দেখতে এইরকম তার ভাবভঙ্গি কথাবার্তা এইরকম। দুই, তার আচরণ বা কথাবার্তা সাজিয়ে দেন, কখনো বা নিজেই দু একটি মন্তব্যে তার বাইরেকার ও ভিতরকার পরিচয় এর উপর আলোক নিক্ষেপ করেন।"[৪৬]

'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসের এক নং পরিচ্ছেদে রাসমণি যখন তার নাতনীর উদ্দেশ্যে বলে—

> "ওলো ছুড়ী, দড়িটা ডিঙুসনি, ডিঙুলি? হারামজাদী, সগগপানে চেয়ে পথ হাঁটচ। চোখে দেখতে পাওনা যে ছাগল বাঁধা রয়েচে।"[৪৭]

অর্থাৎ এ ভাষার মধ্যে দেখি 'ওলো' শব্দটিকে সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে লিঙ্গোপভাষা (Genderlect) বলতে পারি; যেটি সাধারণত মেয়েদের মুখের ভাষায় দেখা যায়। এছাড়া 'সগগপানে' শব্দটির মধ্যে দেখি বিষম যুক্তব্যঞ্জন সমব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছে। ফলে সবদিক থেকেই চরিত্রের মুখের ভাষা বাস্তবসম্মত হয়ে উঠেছে।

আবার যখন দেখি রাসমণি জিজ্ঞেস করে দুলে মেয়েটিকে, এ পাড়ায় কেন এসেছিস? তখন দুলে মেয়েটি বলে—

> "ঠাকুরমশাই তেনার ওই গইলের ধারে আমাদের থাকতে দিয়েচে। মাকে আর আমাকে দাদামশাই তেইড়ে দিয়েচে না!"[৪৮]

অর্থাৎ এখানে আমরা 'গইলের' এবং 'তেইড়ে' শব্দগুলির মধ্যে থাকা 'ই' ধ্বনিটি নির্দিষ্ট স্থানে উচ্চারিত হওয়ার আগেই উচ্চারিত হয়েছে যা অপিনিহিতির লক্ষণ এবং একইসঙ্গে বঙ্গালী উপভাষার বৈশিষ্ট্য হিসাবে পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া এই শব্দগুলি দিয়ে নিম্নবর্গীয় দুলে চরিত্রটিকে মৃত্তিকাগন্ধি করে তুলেছে। এ ভাষার মধ্যে যেন মাটির বুনো বন্ধ উঠে আসে। ফলে ভাষা ব্যবহারের মধ্য দিয়েই লেখক চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলেছেন, ফলে আমরা আমাদের পর্যালোচনায় তুলে ধরেছি।

এছাড়া যখন দেখি জগদ্ধাত্রী এসে সন্ধ্যাকে বলে—

> "দুলে মাগীদের সরাবি, না আমাকেই কাল নাইবার আগে ঝাঁটা মেরে তাড়াতে হবে?"[৪৯]

এখানেও দেখি লেখক 'মাগী' শব্দটি ব্যবহার করেছেন যা এখনকার দিনে বদকথা (Slang) মনে হলেও সেকালের দিনে শব্দটি সচরাচর শব্দ বা চলশব্দ হিসাবেই ব্যবহার করা হত। ফলে ভাষার মধ্য দিয়েই চরিত্রগুলির বাস্তবতা খুঁজে পাই।

'দেনাপাওনা' উপন্যাসের মধ্যে দেখি জমিদার জীবানন্দ চৌধুরীর গোমস্তা এককড়ী নন্দীর মুখের ভাষা, সে যখন বলে—

> "কি করব হুজুর, সদরে আরজি করে সুবিচার পাই নে— দেওয়ানজী গেরাহ্যিই করেন না, নইলে চক্কোত্তিকে টিট্ করতে কতক্ষণ লাগে! কিন্তু এত্ত নিবেদন করচি হুজুর আশকারা দিলে ওরা রোজা বিগড়ে দেবে— তখন গাঁ শাসন করা ভার হবে।"[৫০]

অর্থাৎ এখানে দেখি 'আরজি' শব্দটি একটি আরবি শব্দ যা লেখক ব্যবহার করেছেন আবেদনপত্র হিসাবে। আবার 'গেরাহ্যি', 'চকোত্তি' প্রভৃতি শব্দ গুলি তলভাষী(Basilect) শব্দ যা লেখক চরিত্রের মুখে বসিয়ে পাঠকের সামনে তাঁর রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। আবার অন্যদিকে 'চক্কোত্তি' শব্দের মধ্যে দিত্বব্যঞ্জন ঘটেছে। এছাড়া 'গাঁ' শব্দটি মূলত সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে দেখলে তা অর্থনৈতিক ভিত্তিতে দুর্বল মানুষের মুখের কথ্য ভাষা হিসাবে পরিলক্ষিত হয়। লেখক সেই সকল শব্দকেই ব্যবহার করে যেন চরিত্রের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততা এনেছেন ফলে আমরা তুলে ধরেছি।

আবার এই উপন্যাসের মধ্যে তিন নং পরিচ্ছেদে জীবনানন্দের মুখের ভাষা দেখি, তিনি যখন ষোড়শীকে উদ্দেশ্য করে বলেন—"তোমার কথাগুলো শুনতে মন্দ নয়, কিন্তু কান্না দেখে আমার দয়া হয় না। ও আমি অনেক শুনি। মেয়ে মানুষের ওপর আমার এতটুকুও লোভ নেই— ভালো না লাগলেই চাকরদের দিয়ে দিই। তোমাকেও দিয়ে দিতুম, শুধু এই বোধ হয় আজ প্রথম একটু মোহ জন্মেছে। ঠিক জানিনে— নেশা না কাটলে ঠাওর পাচ্ছিনে।"[৫১] অর্থাৎ এখানে আমরা সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে ধনী শ্রেণির মানুষ বলব কিন্তু শিক্ষা সংস্কৃতিতে তাকে অভদ্র শ্রেণিতে ফেলা যায়, কেননা মহিলার প্রতি তিনি এতোটুকুও সম্মান প্রদর্শন করেননি বরং উল্টে অসম্মান বাচক কথা বলেছেন। ফলে তার এই ভাষার মধ্য দিয়েই চরিত্রটির নারীর প্রতি মনোভাব যথার্থভাবে ফুটে উঠেছে বলে আমরা মনে করেছি।

এছাড়াও উপন্যাসের পাঁচ নং পরিচ্ছেদে দেখি তারাদাস যে গড়চণ্ডীর সেবায়েত, সে যখন ষোড়শীকে বলে—

"হারামজাদী, তোকে যদি না খুন করি ত আমি মনোহর চক্কোত্তির ছেলে নই।"[৫২]

এখানে লেখক তারাদাসকে সেবায়ত হিসেবে দেখালেও 'হারামজাদী' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন তার মুখে। তারাদাস চক্রবর্তী জন্মগতভাবে ব্রাহ্মণ ফলে উচ্চবর্গীয় কিন্তু তার মুখের ভাষা তাকে নিম্নবর্গে নামিয়ে এনেছে। কেননা 'হারামজাদী' শব্দটি নিম্নবর্গের মানুষের মুখের কথ্য ভাষা হিসেবেই দেখা যায়। তাছাড়া 'চক্কোত্তি' শব্দটির মধ্যে দিত্বব্যঞ্জন এর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়, যা রাঢ়ী উপভাষার বৈশিষ্ট্য। ফলে ভাষার মধ্য দিয়েই চরিত্রটির বাস্তব রূপ ধরা পড়েছে তাই আমরা আমাদের পর্যালোচনায় তুলে ধরেছি।

আবার উপন্যাসের সাত নং পরিচ্ছেদে ষোড়শীর দাসীকে পাই যে জন্মগতভাবে কায়স্থের মেয়ে। দাসী যখন বলে—

> "কদিন যে উপোস করচ মা, তা কে জানে! মেলেচ্ছ বেটাদের ঘরে যে তুমি জলটুকু ছোঁবে না তা আমি বেশ জানি।"[৫৩]

অর্থাৎ এখানে আমরা দেখি 'মেলেচ্ছ' শব্দটির মধ্যে ধ্বনিগত দিক থেকে মধ্যস্বরাগম ঘটেছে, যা নিম্নবর্গীয় মানুষের মুখের ভাষা সেটা লেখক লেখ্য ভাষাতেও ব্যবহার করে চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। আবার 'ব্যাটা' শব্দটিতেও 'এ' ধ্বনি 'অ্যা' ধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়েছে যেটি বঙ্গালী উপভাষার বৈশিষ্ট্য বলে ধরা হয়। ফলে সকল দিক থেকেই লেখকের ভাষা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

ড. অজিতকুমার ঘোষ মহাশয় এ প্রসঙ্গে বলেন—

> "শরৎচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসে বর্ণনামূলক রীতি ও সংলাপাশ্রয়ী নাট্যরীতি উভয় রীতিই গ্রহণ করিয়াছেন। উপন্যাসে তিনি যে সংলাপ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা পরিমিত, আবেগগর্ভ ও ইঙ্গিতধর্মী। তিনি নিজে এক স্থানে বলিয়াছেন, 'Dialogue ছোট হওয়া চাই, মিষ্টি হওয়া চাই— কিছুতেই না মনে হয় এ প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা অক্ষর বেশি বলেছে। এই হল 'artistic form- এর ভিতরের রহস্য।' সংলাপের অনেক স্থলেই তিনি হৃদয় বৃত্তির পরস্পরবিরোধী ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। সেজন্য তাঁহার সংলাপ ঘনীভূত নাট্যরস সৃষ্টিতে সক্ষম হইয়াছে।"[৫৪]

'বিপ্রদাস' উপন্যাসের মধ্যে দেখি দুই নং পরিচ্ছেদে যখন বিপ্রদাসের মা যে পৌঢ়া বিধবা মহিলা বিপ্রদাসকে উদ্দেশ্য করে বলেন—

"হাঁ রে বিপিন, শুনচি নাকি একাদশী নিয়ে এ মাসে পাঁজিতে গোল বেধেছে? এমন ত কখনও হয় না।"[৫৫]

অর্থাৎ এখানে দেখি এই ভাষার মধ্যেই আমরা গ্রামের বৃদ্ধ-বৃদ্ধার মুখের কথ্য ভাষা হিসাবে 'হাঁ' ও 'পাঁজি' শব্দ দুটিকে তলভাষী (Basilect) শব্দ হিসাবে পাই যা চরিত্রটিকে বাস্তবসম্মত করে তুলেছে।

আবার বিপ্রদাস যখন তার মাকে উদ্দেশ্য করে বলে—

> "তার কারণ আছে মা, ইস্কুলের ক্লাসে প্রমোশন না পেয়ে ও নালিশ করলে আমার সয় না, কিন্তু দ্বিজুর মত এম.এ. পাস করে বিলিতি শিক্ষাকে যত খুশি গাল দিয়ে বেড়াক আমার গায়ে লাগে না।"[৫৬]

অর্থাৎ এখানে আমরা কতকগুলি ইংরেজি শব্দের ব্যবহার পাই, যেমন— ইস্কুল, ক্লাস, প্রমোশন, এম.এ প্রভৃতি। যার ফলে চরিত্রটি জীবন্ত রূপ পেয়েছে আলোচ্য উপন্যাসের মধ্যে।

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্যামলচন্দ্র দাস মহাশয় বলেন—

> "চরিত্রের সংলাপে হলে তা চরিত্র বা উপন্যাস পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী লেখককে করতে হয়। চরিত্র বা সমাজ-মনস্তত্ত্ব এর সঙ্গে অভিযোজন যথাযথ না হলে তা লেখক-শিল্পীরা সাধারণত প্রয়োগ করেন না।"[৫৭]

অর্থাৎ উপন্যাসের বা গল্পের চরিত্রের ভাষা লেখককে নির্বাচন করতে হয় পরিবেশ পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। সেইসঙ্গে চরিত্রের Mental Structure এর ওপর ভিত্তি করেই ভাষা বসাতে হয় লেখককে; তবেই চরিত্রটি বাস্তবসম্মত হয়ে ওঠে বলে আমরা মনে করি।

সবশেষে আমরা একথা বলতে পারি শরৎচন্দ্রের গদ্যের বাক্যগঠন, বাক্যের অন্বয়গত অবস্থান, শব্দসংস্থান অত্যন্ত যথাযথ। সহজ পরিচিত জীবন থেকে শব্দ নিয়ে তার ব্যবহার আমাদের বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল। সরল-জটিল-যৌগিক বাক্য দিয়ে বর্ণনা করে গদ্য ভাষাকে প্রবাহমানতা দিয়েছিল। সুবিন্যস্ত গতি এবং হ্রস্ব-দীর্ঘ বাক্য পরম্পরায় তাঁর ভাষারীতি চিত্রধর্মিতা সৃষ্টি করেছিল। সেই সঙ্গে শরৎচন্দ্র স্পষ্ট ভাষায় সহজভাবে, দুঃখ-বেদনার কথা, সমাজের সমস্যার কথা, নিম্নবর্গের কথা তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে। একইভাবে সমাজে প্রচলিত সংস্কার, নীতিবোধ, ন্যায়-অন্যায় প্রভৃতি দিকগুলি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন ভাষা-সংলাপের দ্বারা। সবমিলিয়ে তাই বলা যাই সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের কিছুটা দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও নিম্নবর্গের ভাষা-সংলাপ নির্মাণে অনেকখানি সফল একথা বলাই বাহুল্য।

তথ্যসূত্র:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র রচনাবলী (ত্রয়োদশ খণ্ড)। বাংলা ভাষা পরিচয়। বিশ্বভারতী পাবলিশার্স, ১৪০২। পৃ. ৫৭২।

২. সরকার, পবিত্র। গদ্যরীতি পদ্যরীতি। সাহিত্যলোক পাবলিশার্স,১৯৮৫। পৃ. ৭৪-৭৫।

৩. Lodge David, Language of Fiction, columbia university press, 1966, p.g 51.

৪. দাশ, ড. নির্মল। বাংলা উপন্যাসের ভাষা শরৎচন্দ্র ও উত্তরকালে। উৎস: উত্তরকাল ও শরৎচন্দ্র, শিশির মজুমদার সম্পাদিত। এস ব্যানার্জি এণ্ড কোং, ১৯৬০। পৃ. ১৮৭।

৫. সেনগুপ্ত, সুবোধচন্দ্র। শরৎচন্দ্র। এ মুখার্জি এন্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড পাবলিশার্স, ১৩৮১। পৃ. ৮১।

৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর। দে'জ পাবলিশার্স, ২০১২। পৃ. ৪৩।

৭. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র। শরৎ রচনাবলী(দ্বিতীয় খন্ড)। অভাগীর স্বর্গ। দে'জ পাবলিশার্স, ১৯৯৩। পৃ. ১০২০।

৮. তদেব, পৃ. ১০২০।

৯. তদেব, পৃ. ১০২১।

১০. তদেব, বিলাসী। পৃ. ৯৭৯।

১১. তদেব, পৃ. ৯৮২।

১২. তদেব, মহেশ। পৃ. ১০১১।

১৩. তদেব, পৃ. ১০১৭।

১৪. তদেব, পৃ. ১০১৮।

১৫. তদেব, মন্দির। পৃ. ৯০৯।

১৬. তদেব, হরিচরণ। পৃ. ৯৫৮।

১৭. মৈত্র, সুরেশচন্দ্র, সম্পাদিত। শরৎ সাহিত্যের ভূমিকা। পুঁথিপত্র পাবলিশার্স, ১৯৭৭। পৃ. ২৭২।

১৮. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র। শরৎ রচনাবলী (দ্বিতীয় খন্ড)। বিরাজ বৌ। দে'জ পাবলিশার্স, ১৯৯৩। পৃ. ৬৫৯।

১৯. তদেব, পৃ. ৬৫৯।
২০. তদেব, পন্ডিতমশাই। পৃ. ৩৮৯।
২১. তদেব, পৃ. ৩৯৬।
২২. তদেব, পৃ. ৩৮০।
২৩. তদেব, পৃ. ৩৮৯।
২৪. দাস, শ্যামলচন্দ্র। পন্ডিতমশাই: পন্ডার শৈলী। উৎস: পন্ডিতমশাই বিপর্যয়ের বর্ণমালা, দেবব্রত বিশ্বাস ও শ্যামলচন্দ্র দাস সম্পাদিত। প্রজ্ঞা বিকাশ পাবলিশার্স, ২০১৪। পৃ. ১৭৭-১৭৮।
২৫. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র। শরৎ রচনাবলী (দ্বিতীয় খন্ড)। পন্ডিতমশাই। দে'জ পাবলিশার্স, ১৯৯৩। পৃ. ২৩৭।
২৬. তদেব, পৃ. ২৫৮।
২৭. তদেব, পৃ. ২৬২।
২৮. দাস, শ্যামলচন্দ্র। ভাষা শৈলীর পল্লীসমাজ। উৎস: বিশ্লেষণী আলোয় পল্লীসমাজ, ড. সুজিত কুমার পাল সম্পাদিত। প্রত্যয় প্রকাশনী, ২০১৫। পৃ. ১৩৩।
২৯. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র। শরৎ রচনাবলী (দ্বিতীয় খন্ড)। অভাগীর স্বর্গ। দে'জ পাবলিশার্স, ১৯৯৩। পৃ. ১০২৪।
৩০. তদেব, পল্লীসমাজ। পৃ. ২৩৮।
৩১. তদেব, পৃ. ২৩৮।
৩২. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র। শরৎ রচনাবলী (প্রথম খন্ড)। শ্রীকান্ত (প্রথম পর্ব)। দে'জ পাবলিশার্স, ১৯৯৩। পৃ. ৬৩।
৩৩. তদেব, পৃ. ৬২।
৩৪. তদেব, শ্রীকান্ত (দ্বিতীয় পর্ব)। পৃ. ১৩৪।
৩৫. তদেব, পৃ. ১৪২-১৪৩।
৩৬. তদেব, পৃ. ২০০।
৩৭. তদেব, শ্রীকান্ত (তৃতীয় পর্ব)। পৃ. ২৪০।
৩৮. তদেব, পৃ. ২৭৯।
৩৯. তদেব, দেবদাস। পৃ. ৬৯৩।
৪০. তদেব, পৃ. ৭৪১।
৪১. তদেব, পৃ. ৭৫১।
৪২. তদেব, পৃ. ৭৫৩।
৪৩. তদেব, চরিত্রহীন। পৃ. ৪৬১।
৪৪. তদেব, পৃ. ৪৬৫।
৪৫. তদেব, পৃ. ৬৭১-৬৭২।
৪৬. সরকার, পবিত্র। উপন্যাসের ভাষাশিল্প ও শরৎচন্দ্র। উৎস: শরৎ সাহিত্যের ভূমিকা, সুরেশচন্দ্র মৈত্র সম্পাদিত। পুঁথিপত্র পাবলিশার্স, ১৯৭৭। পৃ. ২৭৩।
৪৭. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র। শরৎ রচনাবলী (তৃতীয় খন্ড)। বামুনের মেয়ে। দে'জ পাবলিশার্স, ১৯৯৩। পৃ. ৫১৭।

৪৮. তদেব, পৃ. ৫১৮।
৪৯. তদেব, পৃ. ৫৩৭।
৫০. তদেব, দেনাপাওনা। পৃ. ৭৬৪।
৫১. তদেব, পৃ. ৭৭২।
৫২. তদেব, পৃ. ৭৭৭।
৫৩. তদেব, পৃ. ৭৮৮।
৫৪. ঘোষ, ড. অজিতকুমার। শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যবিচার। দে'জ পাবলিশার্স, ১৯৯৩। পৃ. ৩৩৯।
৫৫. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র। শরৎ রচনাবলী (তৃতীয় খন্ড)। বিপ্রদাস। দে'জ পাবলিশার্স, ১৯৯৩। পৃ. ২৫৩।
৫৬. তদেব, পৃ. ২৫৩-২৫৪।
৫৭. দাস, শ্যামলচন্দ্র। পন্ডিতমশাই: পন্ডার শৈলী। উৎস: পন্ডিতমশাই বিপর্যয়ের বর্ণমালা, দেবব্রত বিশ্বাস ও শ্যামলচন্দ্র দাস সম্পাদিত। প্রজ্ঞা বিকাশ পাবলিশার্স, ২০১৪। পৃ. ১৭৯।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. ঘোষ, ড. অজিতকুমার। শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যবিচার। দে'জ পাবলিশার্স, ১৯৯৩।
২. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র। শরৎ রচনাবলী (প্রথম খন্ড)। দে'জ পাবলিশার্স, ১৯৯৩।
৩. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র। শরৎ রচনাবলী (দ্বিতীয় খন্ড)। দে'জ পাবলিশার্স, ১৯৯৩।
৪. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র। শরৎ রচনাবলী (তৃতীয় খন্ড)। দে'জ পাবলিশার্স, ১৯৯৩।
৫. দাশ, ড. নির্মল। বাংলা উপন্যাসের ভাষা শরৎচন্দ্র ও উত্তরকালে। উৎস: উত্তরকাল ও শরৎচন্দ্র, শিশির মজুমদার সম্পাদিত। এস ব্যানার্জি এণ্ড কোং, ১৯৬০।
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর। দে'জ পাবলিশার্স, ২০১২।
৭. সরকার, পবিত্র। গদ্যরীতি পদ্যরীতি। সাহিত্যলোক পাবলিশার্স,১৯৮৫।
৮. সরকার, পবিত্র। উপন্যাসের ভাষাশিল্প ও শরৎচন্দ্র। উৎস: শরৎ সাহিত্যের ভূমিকা, সুরেশচন্দ্র মৈত্র সম্পাদিত। পুঁথিপত্র পাবলিশার্স, ১৯৭৭।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1380-1389
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.358

উত্তর-ঔপনিবেশিক মেদিনীপুর জেলা: কৃষি অর্থনীতি এবং কৃষি কাঠামো (১৯৪৭-১৯৫৫)

রাজকুমার মন্ডল, *গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়,পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.03.2026; Accepted: 22.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

During the colonial era, in marked contrast to the industrialised districts of Howrah, Hooghly, and 24 Parganas situated along the banks of the Ganges, the district of Medinipur experienced no significant development of large-scale industries; consequently, agriculture emerged as the primary subsistence source of livelihood for seventy six percent of the district's population. The agrarian structure that evolved during this period which revolved primarily around land fostered relationships of subordination and subservience within the social fabric. However, from the 1930s onward, as the intensity of exploitation perpetrated under the guise of debt and revenue collection gradually escalated, resentment began to simmer among small farmers, sharecroppers, and the landless classes against the jotedars-zamindars and moneylenders; in due course, this very resentment gave rise to a distinct form of 'class consciousness' within the political sphere. However, paddy constitutes the principal crop of Medinipur district, the present study which focuses primarily on paddy production of the post-colonial Medinipur, endeavors to move beyond the confines of a unidimensional analysis based solely on a linear correlation between land area and production volume. Instead, drawing upon statistical data, this research attempts to analyze a complex web of interrelationships; specifically, it examines in detail the relationship between production levels and the district's population density; the manner in which 'technological' and 'institutional' frameworks influenced production; how the agrarian-social structure of rural areas maintained its control over these technological and institutional frameworks; and how 'market-driven commercial' forces exerted control over both the processes of production and distribution.

Keywords: Regional History, Agrarian structure, Agricultural production system.

মেদিনীপুর জেলাটি অন্যান্য জেলাগুলির তুলনায় আয়তনে বৃহত্তম। ১৯৪৯ সালের সংখ্যাতাত্ত্বিক প্রতিবেদন অনুযায়ী এই জেলার আয়তন ৫২৭৪ বর্গ মাইল যা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের ১৮.৬৯% এলাকা জুড়ে এই জেলার অবস্থান।[১] উত্তরভারত ও দক্ষিণভারতের সীমান্তে মেদিনীপুর জেলাটি অবস্থিত হওয়ায় একদিকে আর্য সংস্কৃতি এবং অন্যদিকে দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটেছে।[২] এছাড়াও জেলাটির অবস্থান উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তভাগে হওয়ায় এই অঞ্চলের সমাজজীবনে ওড়িয়া এবং বাঙ্গালী সংস্কৃতির নিজস্ব ধারার সমন্বয়ক্ষেত্র হিসেবে পরিচিতি বহন করে চলেছে; এই দুই সংস্কৃতির সঙ্গে আদিবাসী-জনজাতি সংস্কৃতির নিজস্ব ধারারও মেলবন্ধন ঘটেছে।[৩] মেদিনীপুরের উত্তর ও পশ্চিমাংশে সাঁওতাল জাতির অবস্থান সবচেয়ে বেশি;

সভ্যতার গোড়াপত্তনের সময় থেকে আদিবাসী জনজাতিগুলি এই অঞ্চলে পাথর নির্মিত হাতিয়ার দ্বারা প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নিজস্ব সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের জীবনধারা গড়ে তুলেছে।[৪] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ঝাড়গ্রামের উত্তর-পশ্চিমে বিনপুর, শিলদা ও উত্তর-পূর্বে লালগড়, রামগড় এবং গড়বেতার দক্ষিণে শালবনি ও মেদিনীপুর শহরের ভেতর দিয়ে ঝাড়গ্রামেরর দক্ষিনে গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রামের দিকে সুবর্ণরেখার ধার বরাবর জঙ্গলগুলি পরিস্কার করে সাঁওতাল সহ অন্যান্য জনজাতিগুলি এই উর্বর অঞ্চলে বসতি গড়ে তোলে।[৫] এই জেলাটিতে *'জঙ্গল-উপকূল-সমুদ্র'* এই তিনটি প্রাকৃতিক উপাদানের সমন্বয় যা পশ্চিমবঙ্গের স্বতন্ত্র ব্যতিক্রমী জেলা হিসেবে পরিচয় বহন করে।

এই জেলার জলবায়ু মিশ্র প্রকৃতির; উত্তর-পশ্চিমাংশে জলবায়ু শুষ্ক প্রকৃতির এবং দক্ষিণ-পূর্বাংশের জলবায়ু আর্দ্র হওয়ায় উত্তর-পশ্চিমাংশের তুলনায় এখানে ধানের উৎপাদন বেশি হয়। ধান(প্রধান ফসল) ছাড়াও অন্যান্য কৃষিজ ফসল যেমন ডাল, তেল, আখ, তামাক, পান, আলু, ফুলের চাষ প্রভৃতি হয়ে থাকে। তবে কৃষি প্রধান জেলা হলেও ঝড় ও বন্যার মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে প্রচুর পরিমাণে শস্যহানি ঘটে। ১৯৪৭-৫৫ সালের মধ্যে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৩৬৮.৩ মি.মি. এবং গড় তাপমাত্রা ২৬° সে.; গড় বৃষ্টিপাতের থেকে ১৯৪৮ সালে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল ১৫৯২.৬ মি.মি. এবং ১৯৫৪ সালে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন ১০০২.৮ মি.মি.।[৬] তবে এই সময়কালে সার্বিকভাবে জেলার কৃষি অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রভাব তেমনভাবে পড়েনি।

সামাজিক ক্ষেত্রে এই জেলায় মধ্যবর্ণ এবং তপশীল জাতি ও জনজাতির মানুষের বসবাস বেশি। ১৯৩১ সালে এই জেলায় ৬.৩১% উচ্চবর্ণ, ৫৮.১৭% মধ্যবর্ণ, ১৯.১৫% তপশীলী জাতি, ৮.৫৪% জনজাতি ও মুসলিম ৭.৫৯% বসবাস করে; মোট জনসংখ্যার ৩১.৫৬% মাহিষ্য জাতি বসবাস করে।[৭] এই জেলার পশ্চিমাংশে তপশীলী জাতি ও জনজাতির আধিক্য বেশি এবং পূর্বাংশে মধ্যবর্ণ শ্রেণির মধ্যে মাহিষ্যদের আধিক্য বেশি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই জাতি 'জেলে কৈবর্ত্য' থেকে 'চাষা কৈবর্ত্য'[৮] হিসেবে স্বতন্ত্র হয়ে 'মাহিষ্য জাতি' হিসেবে সামাজিকভাবে পরিচিতি লাভের মধ্যদিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। ঔপনিবেশিক পর্বের বিংশ শতকের কুড়ির দশক থেকে উত্তর-ঔপনিবেশিক সময়কালেও আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিসরে এই মাহিষ্য জাতির প্রভাব অন্যান্য জাতিগুলির তুলনায় বেশি।

আলোচ্য সন্দর্ভে ১৯৪৭ ও ১৯৫৫ সালটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে কয়েকটি দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ 'অধীনতা' থেকে মুক্ত হয়ে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে; এই স্বাধীনতা অর্জনের মধ্যদিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা বিভাজনের পাশাপাশি ভূখন্ড ও নাগরিকদেরও বিভাজন হয়েছিল। তবে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো যেমন পুলিশ, প্রশাসন, আইন(ভারতীয় দন্ডবিধি), আদালত, সেনাবাহিনীর কোনো পরিবর্তন হয়নি। বর্ণগত-শ্রেণিগতভাবে প্রান্তিক স্তরের মানুষদের দীর্ঘদিনের লাঞ্ছিত দাবিগুলি পূরণের নতুন আশার সঞ্চার করেছিল। এই সময়কাল থেকে মেদিনীপুর জেলায় 'নির্বাচনী' এবং 'বৈপ্লবিক' ধারার রাজনীতি নতুন আঙ্গিকে শুরু হয়েছিল; কৃষি কাঠামোয় জোতদার-জমিদার শ্রেণির বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র রায়ত-ভাগচাষি ও ভূমিহীন শ্রেণির প্রতিরোধ আন্দোলন বামপন্থী দলের ছত্রছায়ায় রাজনৈতিকভাবে গড়ে ওঠে।[৯] প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়(১৯৫১-৫৬) কৃষি ব্যবস্থা থেকে 'মধ্যস্বত্বভোগী' শ্রেণির উচ্ছেদ ঘটিয়ে শোষনের সমস্ত রকমের কৌশলকে সরিয়ে গ্রামীণ সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে 'কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত কৃষকদের' *(tillers of the soil)* নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল এবং রাজ্যগুলিকে তা সুনিশ্চিত করার কথা বলা হয়।[১০] এর ফলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫৫ সালে "পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার আইন" প্রণয়নের দ্বারা কৃষি ব্যবস্থায় সরকার ও কৃষকদের মধ্য থেকে মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির উচ্ছেদ ঘটিয়ে কৃষকদের জমির অধিকার ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা হয়; জমি হস্তান্তর বা

উপ-ইজারা দেওয়ার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য জনপ্রতি জমির সর্বোচ্চ সীমা*(Ceiling)* নির্ধারণ করা হয়।[১১]

জমির ধরণ:

জমির প্রকৃতি ফসল উৎপাদনে প্রাথমিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং মৌলিক গুরুত্বের দিক থেকে মেদিনীপুর জেলার কৃষিজ ফসল উৎপাদনে কর্ষণ যোগ্য জমি মূলত তিন প্রকার। যথা- উচ্চ ভূমি, নিম্ন ভূমি ও পলি ভূমি(দায়রা জমি)।[১২] উচ্চ ভূমিতে রবি শস্য ভালো হয়। এই জমি বাস্তু ও ধোসা(বর্ষাকালে আউস ধান রোপণ করা হয় এবং শীতকালে ডাল ও তৈল শস্য উৎপাদন হয়) নামে উপ বিভাগে বিভক্ত। নিম্ন ভূমিকে জলাভূমি বলা হয়। এই জমি ধান চাষের জন্য উপযুক্ত। পলি ভূমি যা নদীর পার্শ্ববর্তী জমিকে বোঝায়। এই জমি খুবই উর্বর এবং রবি শস্য, ডাল, তৈল শস্য, গম, বার্লি ও বিভিন্ন ধরনের শাক-সব্জীর চাষ ভালো পরিমাণে হয়ে থাকে। তবে কন্টাই ও তমলুক মহকুমায় কর্ষণ যোগ্য জমিকে 'মধুর' জমি এবং লবনযুক্ত জমিকে 'নিমক' বলে।[১৩]

কৃষি অর্থনীতি:

মেদিনীপুর জেলার 'Survey and Settlement Report(1911-17)'-এ পতিত জমি ব্যতীত 'চাষযোগ্য পতিত জমি'র পরিমাণ ৬১৯.৫ হাজার একর এবং 'চাষ অযোগ্য জমি'র পরিমাণ ৫৩৩.০ হাজার একর।[১৪] ১৯১৭ সালের সেটেলমেন্ট রিপোর্টে এও উল্লেখিত হয় যে, ধানের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় আখ চাষের জমিতে ধান চাষ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছিল।[১৫] কিন্তু ১৯৪৪-৪৫ সালে ইশাক রিপোর্টে ২৮৮.৪ হাজার একর কমে গিয়ে পতিত জমি ব্যতীত 'চাষযোগ্য পতিত জমি'র পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৩১.১ হাজার একর এবং 'চাষ অযোগ্য জমি'র পরিমাণ ৫৯৭.৬ হাজার একর।[১৬] জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে এই জমিগুলি চাষের কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল। আবার অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জলপথ নিয়ন্ত্রণের জন্য সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ এবং সর্বোপরি ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষ মোকাবিলা ও জনসেবার কারণে রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং ঘুর্ণিঝড়ে সমুদ্রের নোনা জল জমিতে প্রবেশ করার ফলে(বিশেষত কাঁথি ও তমলুক মহকুমায়) 'চাষ অযোগ্য জমি'র পরিমাণও ৬৪.৬ হাজার একর বৃদ্ধি পায়।[১৭] তবে এই জেলার মাটির উর্বরতা এবং বৃষ্টিপাতের ধরণ অনুযায়ী আউস ও বোরো ধানের জমির তুলনায় আমন ধানের জমিতে বেশি পরিমাণ চাষ হয়।[১৮] চাষের ক্ষেত্রে কোনো আধুনিক পদ্ধতির ব্যবহার না হওয়ায় অর্থাৎ উন্নতমানের বীজ ধানের ব্যবহার, জলসেচ ব্যবস্থার অভাব এবং জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য সারের যোগানের অভাবে এইসব জমিতে বছরে একবার ফসল হয়ে থাকে; মাত্র ৬.৬৩ শতাংশ জমিতে দুইবার চাষ হত।[১৯] তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে একর প্রতি ফসল উৎপাদনের পরিমাণ না বৃদ্ধি ঘটলেও জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষের উপযুক্ত জমি তৈরি করায় মোটামুটিভাবে ফসল উৎপাদনের পরিমাণে ভারসাম্য বজায় ছিল।

স্বাধীনতার পর মেদিনীপুরে কৃষি ক্ষেত্রে প্রকৃত চাষবাদের জমির পরিমাণ এবং প্রধান কৃষিজ ফসল ধান উৎপাদনে কিরূপ পরিবর্তন ঘটেছিল? জনঘনত্বের চাপ উৎপাদনকে বাড়িয়েছে নাকি কমিয়েছে? প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রযুক্তিগত কাঠামো(সেচ, সার, কৃষি যন্ত্রপাতি) কৃষি অর্থনীতির রূপান্তরে কতটা সহায়ক ছিল? এক্ষেত্রে শ্রম বাজারের কি ভূমিকা ছিল? ১৯৪৬-৪৭ থেকে ১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে মেদিনীপুরে মোট জমির(৩৩৬১.৮ হাজার একক) গড়ে ৬৬.৮১ শতাংশ জমি 'প্রকৃত চাষাবাদে'র জমিতে কৃষিকাজ হয়েছিল; এর মধ্যে প্রথম পাঁচ বছর(১৯৪৬-৪৭ থেকে ১৯৫০-৫১) 'প্রকৃত চাষাবাদে'র জমির পরিমাণ ছিল গড়ে ৬৭.৪৪%; পরের পাঁচ বছরে(১৯৫১-৫২ থেকে ১৯৫৫-৫৬) প্রকৃত চাষাবাদের জমির পরিমাণ ১.২৭% হ্রাস পেয়ে হয় ৬৬.১৭%; প্রথম

পাঁচ বছরে পতিত জমির পরিমাণ ছিল ৩.৪৯%, তা ৩.১৩% বৃদ্ধি পেয়ে শেষ পাঁচ বছরে পতিত জমির পরিমাণ দাঁড়ায় ৬.৬২%।[২০] এর কারণ হিসেবে বলা যায় যে, এই সময়কালে সরকার সমস্ত জমিকে অধিগ্রহণ করে। এরফলে ভাগচাষীরা যাতে জমির ওপর স্বত্ত্বাধিকারনা পায় সেকারণে জোতের মালিক নিজেদের জমি চাষ করে মজুর দিয়ে ; সুতরাং বিশাল পরিমাণ জমি একজন মালিকের পক্ষে চাষাবাদ করা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে জমি চাষ করতে দেওয়ার একটি 'সামাজিক সম্পর্ক' ছিল বলে অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ সেন দাবী করেন। তিনি বলেন মালিক সেইসব পরিবারকে জমি চাষ করতে দিতেন যাদের শ্রম দেওয়ার পর্যাপ্ত ক্ষমতা থাকতো, এতে ফলন বেশি উৎপন্ন হতো এবং মালিক লাভবান হতো। কিন্তু এই সময় জমির উৎপাদনের উপর অধিকার নিয়ে যে রাজনৈতিক আন্দোলন হয়েছিল তার ফলে সরকার ভগচাষীদের জমি থেকে উচ্ছেদ রদ করে এবং ফসলের ওপর তিন ভাগের এক ভাগ প্রদানের ব্যাপারে সুনিশ্চিত করে। এখানকার প্রধান ফসল ধান; ১৯৪৭-৫৫ সালের মধ্যে মোট এখানকার চাষের জমির পরিমাণ গড়ে ২০৭৫ হাজার একর; যা প্রথম পাঁচ বছরে গড় ধান চাষের জমির পরিমাণ ৬২,৩৫%; পরের পাঁচ বছরে(১৯৫১-৫২ থেকে ১৯৫৫-৫৬) এই পরিমাণ প্রথম পাঁচ বছরের থেকে গড়ে ১.২৬% হ্রাস পায়; কিন্তু এই সময়কালে মোট চাষের জমিতে আমন ধানের জমির পরিমাণ গড়ে ৮৯.৪৩% হলেও তুলনামূলকভাবে আউস ও বোরো ধানের জমির পরিমাণ ছিল গড়ে যথাক্রমে ৫.৯৭% এবং ০.৩২%;।[২১] বোরো ধানের জন্য পর্যাপ্ত জলের প্রয়োজন ; তাই পর্যাপ্ত জলসেচের ব্যবস্থা না থাকায় এই চাষ বাড়ানো সম্ভব হয়নি। প্রথম পঞ্চাবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট পরিকল্পিত বাজেটের ১৭. ৪% টাকা কৃষি ও জনউন্নয়নে এবং ২৭. ২% টাকা সেচ ও শক্তির জন্য বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু মেদিনীপুর জেলায় সরকারী প্রকল্পের থেকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে সেচের মাধ্যমে চাষাবাদ বেশি হয়ে থাকে। প্রথম পাঁচ বছরের(গড়ে ৮৫.২৩%) থেকে পরের পাঁচ বছরে(গড়ে ৯৩.৬৪%) আমন ধানের জমির পরিমাণ গড়ে ৮.৪১% বৃদ্ধি পায়; তবে আউস ও বোরো ধানের জমির পরিমাণ সেই হারে বৃদ্ধি পায়নি, যথাক্রমে গড়ে ০.০৭% ও ০.০৫% হারে বৃদ্ধি হয়।[২২] জলসেচের সম্ভাবনা থাকলেও উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাবে এই জেলায় তেমন আশানুরূপ ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটেনি। এই সময়কালে গড়ে ৫.৬২% জমিতে একবারের বেশি চাষাবাদ হত।[২৩] একটি আশ্চর্যজনক পরিসংখ্যান হলো বছরে একই জমিতে একাধিকবার ফসলের জমির পরিমান প্রথম পাঁচ বছরের(৫,৫৮%) তুলনায় শেষ পাঁচ বছরে(৫.৬৬%)মাত্র ০.০৮% বৃদ্ধি ঘটেছে। ধান চাষের জমির পরিমাণ কমলেও মোট ধান উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই সময়কালে প্রতি বছর গড়ে ৮০৩.৭৩ হাজার মেট্রিক টন মোট ধান উৎপন্ন হয়; যার মধ্যে আমন ধান প্রতি বছর গড়ে ৭৬৬.৫৮ হাজার মেট্রিক টন উৎপন্ন হয় এবং আউস ও বোরো ধানের উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে প্রতি বছর গড়ে ৩৪.৮৪ হাজার মেট্রিক টন ও ২.৩১ হাজার মেট্রিক টন।[২৪] প্রথম পাঁচ বছরের থেকে শেষ পাঁচ বছরের ধান উৎপাদনের বৃদ্ধির পরিমান গড়ে ৩.০৬%; আমন ধানের বৃদ্ধির পরিমান মাত্র ০.৩৮%; কিন্তু আউস ধানের উৎপাদনের পরিমান হ্রাস পায় ০.৪১% এবং বোরো ধানের উৎপাদনের পরিমান ০.০৪% বৃদ্ধি পায়।[২৫]

১৯৪৭ সালে মেদিনীপুর জেলায় গ্রামীণ এলাকায় 'জনঘনত্ব' ছিল প্রতি বর্গ কি.মি. তে ২৩০ জন; প্রকৃত চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ছিল ৬৬.২১% এবং জমিতে একের বেশি চাষাবাদ হয়েছে ৬.৬২%; মোট ধান উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৮০৬.১ হাজার মেট্রিক টন, আউস, আমন ও বোরো ধানের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৮.৭, ৭৭১.৪ ও ৬ হাজার মেট্রিক টন।[২৬] ১৯৫১ সালে মেদিনীপুর জেলায় গ্রামীণ এলাকায় জনঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গ কি.মি. তে ২২৮ জন; প্রকৃত চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ছিল ৬৯.৫৪% এবং জমিতে একের বেশি চাষাবাদ হয়েছে ৪.৬৫%; মোট ধান উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৮৮৩.৫ হাজার মেট্রিক টন, আউস, আমন ও বোরো ধানের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৭.৫, ৮৪৫.৩ ও ০.৭ হাজার মেট্রিক টন।[২৭]

১৯৫৫ সালে প্রকৃত চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ছিল ৬৭.৩০% এবং জমিতে একের বেশি চাষাবাদ হয়েছে ৫.৬৭%; মোট ধান উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৮২৯.৪ হাজার মেট্রিক টন, আউস, আমন ও বোরো ধানের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৪.৫, ৭৯৩.৩ ও ১.৬ হাজার মেট্রিক টন।[২৮]

এ থেকে পরিষ্কার যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে কৃষি উৎপাদনের ধন্বাত্মক সম্পর্ক রয়েছে। নিও মালথুসিয়ান তত্ত্বানুযায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটলে জমির উপর মনুষ্য চাপ পড়ে এবং মানুষের সঞ্চয় কমে যায়; দুর্ভিক্ষ ও মহমারী ঘটলে এই জমির উপর চাপের ভারসাম্য আসে। এর বিপক্ষে সাম্প্রতিক গবেষকগণ দাবী করেন জমির উপর চাপ বাড়লে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মানুষ বিকল্প পদ্ধতি যেমন সেচ ব্যবস্থা, উন্নতমানের বীজের ব্যবহার এবং রাসায়নিক সারের প্রয়োগ প্রভৃতি প্রযুক্তিগত কৌশল গ্রহণ করে। জাপান, আমেরিকার মতো দেশগুলিতে এই প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ফলে কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটেছে। কিন্তু ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এবং প্রাদেশিক ও মেদিনীপুরের মতো আঞ্চলিক ক্ষেত্রে চিরাচরিত পদ্ধতিতে সেচ, বীজ এবং সারের ব্যবহারের ফলে জনসংখ্যার চাহিদামতো উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি ঘটেনি তেমনি উৎপাদন বৃদ্ধি না ঘটার পিছনে গ্রামীণ সমাজে স্থানীয় প্রভাবশালী শ্রেণির প্রযুক্তিগত পরিবর্তনে অনীহাও পরিলক্ষিত হয়েছিল। ১৯৫১ সালে মেদিনীপুরে সেচ সহযোগী যন্ত্র হিসেবে ডিজেল পাম্পের সংখ্যা ছিল ১৭৫টি, তা ১৯৫৫ তে বেড়ে হয় ৪১৪টি; ১৯৫১ সালে ৩৫৮৩ টি ডোঙা দিয়ে জমি চাষাবাদ হয়েছে, ১৯৫৫ সালে ৪২২২ টি ডোঙা ব্যবহৃত হয়েছে চাষের কাজে।[২৯] সুতরাং এই জেলায় জলসেচ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা বোরো ধানের চাষাবাদে বিঘ্নিত হয়েছে। এছাড়াও এই শ্রেণি সরকারী নীতিগুলির বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকেও নিয়ন্ত্রণ করেছিল। তাই এই সময়কালে মেদিনীপুর জেলাটিতে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার তুলনায় অধিক ফসল উৎপাদিত হয়েও উৎপন্ন ফসলের অসম বন্টন এবং প্রযুক্তিগত অপ্রতুলতার কারণে খাদ্য সংকট দেখা দেয়।

অমর্ত সেন এক্ষেত্রে কৃষকদের দক্ষতার সঙ্গে উৎপাদন বৃদ্ধি আন্তসম্পর্ক আছে বলে দাবি করেন।[৩০] কিন্তু এর বিপরীতে পরবর্তী গবেষকরা দাবী করেন, ছোটো খামারে বেশি শ্রম দেওয়া দক্ষতার থেকে দারিদ্র্যতার লক্ষণ বেশি বোঝায়।[৩১] জেমস বয়েস মনে করেন, ছোটো খামারে উৎপাদন বৃদ্ধি হয় পারিবারিক শ্রমের বিনিময়ে আবার শ্রমের তীব্রতা দারিদ্র্যতা ও দক্ষতার উভয় কারনে হতে পারে বনে মনে করেন।[৩২] মেদিনীপুর জেলায় পারিবারিক শ্রমে কৃষিকাজ ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এই শ্রম 'বিনিময় পদ্ধতিতে' প্রচলিত ছিল। প্রধান কৃষিজ ফসলের উৎপাদন পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলগুলির তুলনায় বেশি হলেও এই জেলার বেশিরভাগ মানুষ দারিদ্র্য সীমায় বসবাস করেছিল। পারিবারিক ক্ষেত্রে খাদ্যসংকট তীব্র মাত্রায় ছিল। কৃষক হয়তো দক্ষতার সাথে চাষাবাদ করতো, কিন্তু ফসলের বেশিরভাগ অংশ মালিককে শর্ত অনুযায়ী ভাগে দেওয়ার ফলে তাদের বাকি অংশ তেমন থাকতো না। অর্থাৎ একদিকে ভাগচাষীদের বেশি উৎপাদনের প্রতি অনীহা এবং অন্যদিকে উৎপাদনের বৈষম্যমূলক বন্টনব্যবস্থার কারণে এই জেলায় খাদ্যসংকট হ্রাস পায়নি।

কৃষিকাঠামোর পরিবর্তন: রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত আইনি প্রয়াস:

কৃষি কাঠামো বলতে বোঝায় জমি ব্যবহারের অধিকার বণ্টনের নিয়ম। অর্থাৎ এটি কৃষি উৎপাদনের কার্যকারিতা এবং উন্নয়নের গতিকে নির্ধারণ করে থাকে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের(১৭৯৩) ফলে বাংলায় এমন এক শ্রেণির উপর রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল যাদের জমির সঙ্গে কোনো যোগসূত্র ছিল না; আবার ঐতিহ্যগতভাবে যারা জমিতে কৃষিকাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল তারাই এই আইনের দ্বারা বঞ্চিত হয়েছিল। বাংলার কৃষি কাঠামোর নতুন অবয়ব এই বন্দোবস্ত থেকেই সূত্রপাত ঘটে। জমিদারদের শোষণ থেকে রায়তদের সুরক্ষার জন্য সরকার ১৮৫৯ সালে '*Rent act*' এর দ্বারা কোনো রায়ত বারো বছর একটানা একটি

জমিতে চাষাবাদ করলে জমিদার উচ্ছেদ করতে পারবে না; কিন্তু জমিদাররা আইনের ফাঁক দিয়ে রায়তদের তার আগেই অন্য জমিতে স্থানান্তর করে দিত।[৩৩] ব্রিটিশ সরকার এই সমস্যা সমাধানের জন্য বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে(১৮৮৫) কোনো রায়ত একটি গ্রামের যেকোনও জমিতে বারো বছর চাষআবাদ করলে তিনি ওই জমির উপর স্থায়ী স্বত্বাধিকার পাবেন।[৩৪] পরবর্তীকালে ১৯২৮ এবং ১৯৩৮ সালের সংশোধনীতে রায়তদের পক্ষে আইন প্রণয়ন হয়। তবে এই সব আইনি ব্যবস্থা কৃষকশ্রেণির সব স্তরের কল্যানে উপযুক্ত হয়নি। ১৯৪০ 'ফ্লাউড কমিশন' মধ্যস্বত্বভোগী জমিদারদের উচ্ছেদ করে কৃষকদের সরাসরি সরকারের অধীনে প্রজাস্বত্ব প্রদানের সুপারিশ করে।[৩৫] ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫৩ সালের ''West Bengal Estates Acquisition Act, 1953'' পাস করে। এই আইনের মাধ্যমে জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের সমস্ত অধিকার যেমন: জমি, খনি, বন, হাট-বাজার এবং মৎস্য খামারের মালিকানা সরাসরি রাষ্ট্রের অধীনে চলে আসে।[৩৬] এরপর ১৯৫৫ সালে "West Bengal Land Reforms Act" এর মাধ্যমে সরকার রায়ত বা কৃষকদের জমির অধিকার ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা হয়। জমি হস্তান্তর বা উপ-ইজারা দেওয়ার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য জনপ্রতি জমির সর্বোচ্চ সীমা *(Ceiling)* নির্ধারণ করা হয়। এছাড়া, এই আইনে বর্গা প্রথা *(Bargadar system)* নিয়ন্ত্রণ, ভূমি রাজস্ব নির্ধারণের যৌক্তিক পদ্ধতি এবং সঠিক খতিয়ান *(Records of Rights)* রক্ষণাবেক্ষণের ওপর জোর দেওয়া হয়।[৩৭] ঔপনিবেশিক সময়কাল থেকে জমির উপর অধিকার নিয়ন্ত্রণে সরকার কর্তৃক গৃহীত আইনগুলি বাংলায় এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্বে পশ্চিমবাংলায় গ্রামীণ কৃষিকাঠামোয় একটি ধারাবাহিক প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তর লক্ষ করা যায়।

মেদিনীপুর জেলাঃ কৃষিব্যবস্থায় সামাজিক কাঠামোর বিন্যাস:

১৯১০-৩৭ সালের মধ্যে মেদিনীপুরে জমিদার (Proprietors), পত্তনিদার বা মধ্যস্বত্বভোগী(Tenure-Holders), প্রজাস্বত্বভোগকারী কৃষক (Raiyats) এবং অধস্তন রায়তদের(Under-Raiyats) জমির মালিকানার অনুপাত [সারণী: ১] পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় জমির উপর মধ্যস্বত্বভোগীর অনুপাত ২০.১৫; প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই সময়কালে মেদিনীপুরের পার্শ্ববর্তী বাঁকুড়া জেলায় মধ্যস্বত্বভোগীর অনুপাত (৪২.৫২) তুলনামূলকভাবে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলির থেকে বেশি।[৩৮]

জমির মালিক [Land Hoders]	**অনুপাত** [proportion]
জমিদার(Proprietors)	**১০.৭১**
পত্তনিদার বা মধ্যস্বত্বভোগী(Tenure-Holders)	**২০.১৫**
প্রজাস্বত্বভোগকারী কৃষক(Raiyats)	**৬৫.৭৮**
অধস্তন কৃষক(Under-Raiyats)	**৩.৩৬**

[সারনী: ১ ঔপনিবেশিক পর্বে কৃষিকাঠামো]

১৯২০ এর দশক থেকে মেদিনীপুরে *'কুলাক'*[৩৯] বা *'জোতদার'* নামে এক ধনী কৃষক শ্রেণীর উত্থান ঘটেছিল যারা গরীব কৃষকদের ঋণের অনাদায়ে জমি কেড়ে নিত; এরাই ধানের গোলা ও শস্য ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিল।[৪০] ইউনিয়ন বোর্ডের বাড়তি করের বিরুদ্ধে ধনী জোতদার কৃষকশ্রেণীর সফল সংগঠিত আন্দোলন শুধু ব্রিটিশ বিরোধী ছিল না, স্থানীয় ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল।[৪১] এই সময় থেকে কৃষকশ্রেণীর মধ্যে উল্লম্ব সম্পর্কের উদীয়মান বৈষম্যের কারণে আভ্যন্তরীণ বিরোধের সূত্রপাত ঘটে। জেলার কংগ্রেস নেতৃত্ব সমঝোতার মাধ্যমে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ঐক্যবদ্ধতার প্রতি আদর্শগতভাবে জোর দিয়েছিল।[৪২] এই

সংঘাত প্রধানত ছিল জোতদার-মহাজন-বণিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে ঋণগ্রস্ত ক্ষুদ্র কৃষক ও ভাগচাষীদের সমন্বয় শ্রেণীর।[৪৩] ক্ষুদ্র কৃষকদের ঋণের অনাদায়ে ১৯৩০ এর দশক থেকে ভূমি বিক্রি বা হস্তান্তরের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়[সারণী: ২]। ১৯৩০-৩৮ সালের মধ্যে জমি বিক্রির হার ১৬.৮৬%।[৪৪]

১৯৫১ সালের জনগনণা পরিসংখ্যানের হিসেব অনুযায়ী ০-৩৪ একর বা তার বেশি জমির মোট মালিক ছিল ৪.১৯ লাখ; এদের মধ্যে ৩.৩৯ লাখ মালিক তাদের জমিতে ভাগচাষি নিয়োগ না করে নিজেরা বা মজুর দিয়ে জমি চাষ করত। বাকি ৮০ হাজার মালিক তাদের জমির পুরোটা বা কিছুটা ভাগচাষিদের দিয়ে চাষ করাত। উল্লেখ্য যে, মাত্র ১৪৪১ জন মালিক ২০-৩৪ একর বা তার বেশি জমি ভাগচাষিদের দিয়ে চাষ করাত। এছাড়াও যারা যাদের কোন জমি নেই, অন্যের জমিতে মজুরির ভিত্তিতে কাজ করত 'ক্ষেতমজুর' শ্রেণি ছিল।[৪৫] ১৯৫১ সালের জনগনণা পরিসংখ্যানে ০-১.০ একর জমির জমির মালিকের ৮১.৮২% মালিক নিজের জমিতে শ্রমের বিনিময়ে চাষাবাদ করে এবং ২০.০০-৩৪.০০ একর জমির জমির মালিকের ৩৫.৬৭% মালিক নিজের জমিতে বর্গাদার নিয়োগ করেছিল [সারনী: ৩]।[৪৬] অর্থাৎ জমিতে জোতদারদের থেকে ক্ষুদ্র চাষী ও বর্গাদারদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি।

জমির পরিমাণ [একর]	**মোট জমির মালিকের সংখ্যা**	**মোট জমির মালিকের সংখ্যা যারা কোন বর্গাদার দিয়ে চাষ করত না [%]**	**মোট জমির মালিকের সংখ্যা যারা বর্গাদার দিয়ে চাষ করত [%]**
০-১.০০	৯৪,১৯১	৮১.৮২	১৮.১৮
১.০০-৫.০০	২১৮,০৬৭	৮৩.৭৮	১৬.২২
৫.০০-১০.০০	৭৭,৮৫৭	৭৫.৮৫	২৪.১৫
১০.০০-২০.০০	১৫,৬৭৯	৭৮.৩২	২১.৬৮
২০.০০-৩৪.০০	১৩,১৪৭	৬৪.৩৩	৩৫.৬৭

[সারণী: ৩]

১৯৫৩ সালের বর্গাদার আইনের দ্বারা বর্গাদার উচ্ছেদ রদ এবং মোট উৎপাদনের তিন ভাগের দুই ভাগ ভাগচাষীরা পাবে নির্দিষ্ট করা হয়; কিন্তু বাস্তবে তা কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি। প্রভাস চন্দ্র রায় ২৩ মার্চ, ১৯৫৪ সালে বিধানসভায় বলেন, বর্গাদার আইন মোতাবেক তিন ভাগের দুই ভাগ(তেভাগা) ভাগচাষীরা পায়নি; সমাধানের জন্য বোর্ডের কাছে আপিল করলে তা যদি জমিনদার-জোতদারদের বিপক্ষে রায় বেরোয় তারা চাষীদের ধান লুট করে নিয়ে যায়; ঘাটাল মহকুমার দাসপুর থানার চার নম্বর ইউনিয়নে ১৫৮টি আপিলের দরখাস্তের মধ্যে ১৩৫টি জমিনদার-জোতদারদের পক্ষে রায় দেওয়া হয়েছে।[৪৭] গ্রামীণ ক্ষমতাশীল শ্রেণি নিজেদের প্রভাব বজায় রাখার জন্য স্থানীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থাকেও নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছিল। এই চিত্র শুধু মেদিনীপুরে নয়, সমগ্র পশ্চিমবাংলায় গ্রামীণ ক্ষমতাশীল শ্রেণি নিজেদের অবস্থান বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত প্রাতিষ্ঠানিক এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তনকে আটকে দেয়; এর ফলে কৃষি উন্নয়নের সম্ভাবনা থাকা সত্বেও তা বাস্তবায়িত হয় নি।[৪৮] তাই জমিদার-জোতদারদের ক্ষমতার বিপক্ষে বামপন্থী ধারায় ক্ষদ্র কৃষক ও ভাগচাষীদের সাংগঠনিক রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপট এই জেলায় শুরু হয়।

কৃষিনির্ভর সামাজিক কাঠামোয় গ্রামীণ এলাকায় উচ্চকোটি শ্রেণির প্রভাবের ফলে রাষ্ট্র কর্তৃক আইনাণুগ ব্যবস্থা, উন্নয়ন প্রকল্প নেওয়া সত্ত্বেও প্রান্তিক শ্রেণির কৃষকদের দূর্দশা মোচন ঘটেনি। কায়েমী স্বার্থ চরিত্র খাজনা

আদায় থেকে বদলে গিয়ে বাজার ভিত্তিক ব্যবসায়ে মুনাফালাভে কৌশলকে বেছে নিয়েছিল। তাছাড়াও রাজনৈতিক পরিসরে স্থানীয় স্তরে এরা প্রভাব বিস্তার করে। অন্যদিকে প্রান্তিক শ্রেণির কৃষকেরা উল্লম্ব লেনদেনের[৪৯] চাপে বাজার কেন্দ্রিক ব্যবসায়ীদের একচেটিয়া পারস্পারিক সম্মতি অর্থাৎ অসম লাভে অভাবের তাড়নায় কম দামে ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হত। মেদিনীপুর জেলার উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্বের শুরু থেকেই গ্রামীণ সামজে স্বার্থগত ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার জন্য এমনই কৃষিভিত্তিক কাঠামোর রূপান্তর ঘটেছিল। তবে রাষ্ট্র কর্তৃক আইন প্রণয়ন, নীতিসমূহ দারিদ্র দূরীকরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও তা জমির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত চাষীদের সমস্যার সমাধান হয়নি। তবে ঔপনিবেশিক পর্বে গড়ে ওঠা কৃষিভিত্তিক সামাজিক কাঠামোর প্রভাব স্বাধীনতার পরেও প্রবলভাবে থাকায় সরকার সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য ধারাবাহিকভাবে ধাপে ধাপে(যাতে সামাজিক ক্ষেত্রে শ্রেণি সংঘাত না ঘটে) সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করে। ১৯৪৭-৫৫ সালের মধ্যে কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতি মুলত জীবিকা নির্ভর ছিল- প্রান্তিক শ্রেণির কাছে মুনাফার থেকে বেঁচে থাকাটাই আসল উদ্দেশ্য ছিল। কৃষি পদ্ধতির ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক পর্বের ধারাবাহিকতা মেদিনীপুরের বেশির ভাগ অংশে প্রচলিত ছিল।

তথ্যসূত্র:

১. West Bengal State Statistical Bureau. Statistical Abstract of West Bengal. 1949, no. 3, Govt. Press, 1952, Alipore Table-1.2, p. 14.

২. ঘোষ, বিনয়। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি। পুস্তক প্রকাশক, ১৯৫০, কলিকাতা, পৃ. ৩৩৯।

৩. তদেব, পৃ. ৩৩৮।

৪. তদেব, পৃ. ৩৩৬।

৫. তদেব, পৃ. ৩৩৭-৩৮।

৬. Statistical Abstract of West Bengal. 1956. West Bengal State Statistical Bureau. Govt. Press, 1958, Alipore, pp.66-68.

৭. Government of India. Census of India, 1931. Vol. V: Bengal. Government Press, 1933, Calcutta.

৮. O'Malley, L. S. S. Bengal District Gazetteers: Midnapore. Bengal Secretariat Book Depot, 1911, Calcutta, p. 58.

৯. Chatterjee, Partha. The Present History of West Bengal: Essays in Political Criticism. OUP.,1997, Delhi, p. 66.

১০. Datta, Prabhat Kumar, Land Reforms Administration in West Bengal. Daya Publishing House, 1988, Delhi, pp. 2-3.

১১. Chatterjee, D. P. The West Bengal Land Reforms Act, 1955 (Act X of 1956): Containing All Amendments & Rules. Law Book Stall, 1980, Calcutta, pp. xvi-xvii.

১২. O'Malley, L. S. S. op. cit., p. 84.

১৩. Ibid.

১৪. Mitra, A. District Census Handbook: Midnapur, Census of India, 1951, West Bengal Govt. Press, 1953, Alipore, p. cxxvi.

১৫. Ibid.

১৬. Ibid.

১৭. Ibid.
১৮. L. S. S. O'Malley, op. cit., p. 85.
১৯. Mitra, A. op. cit., p. cxxvi.
২০. Statistical Abstract of West Bengal. 1950, West Bengal State Statistical Bureau. Govt. Press, 1953, Alipore, pp. 116-117.; Statistical Abstract of West Bengal. 1956, op. cit., p. 147-150.
২১. Statistical Abstract of West Bengal. 1956, Ibid. pp. 162-175.
২২. Ibid.
২৩. Ibid.
২৪. West Bengal State Statistical Bureau. Statistical Abstract of West Bengal. 1956, Govt. Press, 1958, Alipore, pp. 180-188.
২৫. Ibid.
২৬. Ibid.
২৭. Statistical Abstract of West Bengal. 1956, Govt. Press, 1958, Alipore, pp. 147-150.; Mitra, A. District Census Handbook: Midnapur, 1951, op. cit., p. 30.
২৮. Statistical Abstract of West Bengal. 1956, op. cit., pp. 180-188.
২৯. West Bengal State Statistical Bureau. Statistical Abstract of West Bengal, 1962, Govt. Press, 1964, Alipore, p. 202.
৩০. Sen, Amartya Kumar. An Aspect of Indian Agriculture. Economic Weekly 14, no. 4-6 (January 27, 1962): 243–46.
৩১. Chattopadhyay, Manabendu and Rudra, Ashok. "Size-productivity Revisited. Economic and Political Weekly 11, no. 39 (September 25, 1976): A104–16.
৩২. Boyce, James K. Agrarian Impasse in Bengal: Institutional Constraints to Technological Change. Oxford University Press, 1987, Oxford, p. 38.
৩৩. Chatterjee, D. P. The West Bengal Land Reforms Act, 1955 (Act X of 1956): Containing All Amendments & Rules, Law Book Stall, 1980, Calcutta, pp. xiii-xiv.
৩৪. Ibid.
৩৫. Ibid., p. xv.
৩৬. Ibid., p. xvi.
৩৭. Ibid., pp. xvi-xvii.
৩৮. Partha Chatterjee. cit., p. 50, [Table no. 4.2].
৩৯. 'কুলাক' শব্দটি রুশ শব্দ যার অর্থ 'মুষ্টিবদ্ধ'। মূলত ৮ একর জমির মালিককে 'কুলাক' শ্রেণির কৃষক বলা হয়। https://en.wikipedia.org/wiki/Kulak. কমিউনিষ্টরা বাংলার 'জোতদার' শ্রেণিকে চিহ্নিত করতে 'কুলাক' শব্দটি ব্যবহার করেন। মেদিনীপুর জেলায় স্থানীয় ক্ষেত্রে 'কুলাক' শব্দটি প্রচলিত ছিল না।
৪০. Ibid., p. 55.
৪১. Sugata Bose, Agrarian Bengal: Economy, Social Structure, and Politics, 1919–1947 (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), pp. 236-37.
৪২. Ibid., p. 240-42.
৪৩. Partha Chatterjee, op. cit., p. 56.

৪৪. Ibid., p. 62, [Table no. 4.3]

৪৫. Mitra, A. op. cit., p. 164, [Table no. 3.1].

৪৬. Ibid.

৪৭. Assembly Proceedings: Official Report, West Bengal Legislative Assembly, Ninth Session, 15 February–6 April, 1954, no. 3 (Alipore: West Bengal Press, 1954), pp. 53-54.

৪৮. Boyce, James K. Agrarian Impasse in Bengal: op. cit., p. 254.

৪৯. Barbara Harriss-White. Agricultural Growth and the Structure and Relations of Agricultural Markets in West Bengal. in Sonar Bangla? Agricultural Growth and Agrarian Change in West Bengal and Bangladesh, ed. Ben Rogaly, Barbara Harriss-White, and Sugata Bose, Sage Publications, 1999, New Delhi, p. 382.

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1390-1400
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.359

নৈতিকতায় মনস্তত্ত্বের ভূমিকা

রত্না সরকার, *গবেষক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়,পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.03.2026; Accepted: 21.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In our daily lives, we constantly engage in various activities through which we try to achieve our goals, and by doing so, we directly contribute to the well-being of the people around us and the development of our society. Through appropriate actions, an individual helps in their own progress as well as the advancement of society. The morality of actions, notions of good and bad, etc., are included within ethics. Morality is expressed through individuals and the moral norms of their society; however, the moral norms of every society are not the same. Moral philosophers believe that moral principles are universal, independent of time and place. Therefore, human beings are always bound by moral principles.

Moral development of a person is closely related to morality itself. The role of psychology in moral development is very important, because human moral behavior, decisions, and values are all deeply connected with mental processes. Psychology explains how people learn morality from childhood to adulthood.

Therefore, in this article, the discussion has focused on moral development as it is closely connected with ethics. What is meant by moral development and what its conditions are have been discussed in this paper. An individual's moral development is linked with their mental development; hence, how a person's moral level is related to their mind and the views of psychologists on this matter have also been presented in this paper.

In the field of moral development, how an individual progresses through various constructive mental stages and accelerates their development has been discussed with reference to the opinions of psychologists such as Piaget and Lawrence Kohlberg, which are also included in this article.

Keywords: Ethics, Morality, Psychology, Society, Moral Development.

নীতিবিদ্যা বা এথিক্স[১] দর্শনের একটি অন্যতম শাখা। অক্সফোর্ড অ্যাডভান্সড আমেরিকান ডিকশনারি অনুযায়ী নীতিবিদ্যা হল নৈতিক নীতি যা কোন ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাবিত করে। তবে নীতিবিদ্যা এবং "নৈতিকতা" বা "ম্যরালিটি"[২] এই দুটি ধারণাকে প্রতিশব্দ হিসেবে এবং স্বতন্ত্রভাবে উভয় অর্থেই ব্যবহার করা যায়। এথিক্স শব্দটির একটি গ্রিক ভিত্তি রয়েছে। গ্রিক শব্দ "এথোস"[৩] থেকে ইংরাজি "এথিক্স" কথাটি

[১] Ethics

[২] Morality

[৩] Ethos

এসেছে। প্রাচীন গ্রিসের দুটি ভিন্ন বানান অনুযায়ী এর দুটি অর্থ উঠে আসে। খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম শতকে হোমার ও হেসিওড –এর মহাকাব্য গুলিতে এথিক্স শব্দটির খোঁজ পাই। গ্রিক মহাকাব্যে এথোস– এর অর্থ ছিল কোনো প্রাণীর স্বাভাবিক বাসস্থান বা আবাসস্থল অর্থাৎ যেখানে কেউ অভ্যস্থ ভাবে বাস করে, উদাহরণস্বরূপ "Lliad"-এ ঘোড়ার habitual place বা থাকার জায়গা বোঝাতে এই ধারণা ব্যবহার করা হয়েছে। একইভাবে "Works and Days"- এও পদটি প্রাণীর স্বাভাবিক আবাস বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। বিস্তৃতভাবে এথোস সেই স্থানটিকে বোঝায় যেখানে পশুরা আশ্রয় নেয়। অন্যদিকে "এথোস" – এর অপর একটি অর্থ হল রীতি, প্রথা বা অভ্যাস। যা একজন ব্যক্তির জীবনযাপন পদ্ধতি, অভ্যাস এবং চরিত্রকেও নির্দেশ করে। প্রসারিত অর্থে এর দ্বারা সামাজিক রীতিনীতি বা আচরণ বিধিও বোঝানো হয়। আসলে গ্রিক ভাষায় এথোসের দুটি পদের দুটি ভিন্ন অর্থ বিদ্যমান। কিন্তু গ্রিক সাহিত্য লাতিন ভাষায় অনুবাদকালে একটিমাত্র লাতিন পদ 'মোস'[৪] যার অর্থ 'অভ্যাস', 'প্রথা', 'চরিত্র', এবং 'নিয়ম' দ্বারা প্রাচীন এবং তার পরবর্তী দুটি গ্রিক পদকেই অনুবাদ করা হয়েছিল। অর্থাৎ গ্রিক ভাষায় এথোসের উভয় অর্থই লাতিন মোস পদটি দ্বারা অনুবাদ করা হয়েছিল, লাতিন ভাষায় যার মূল হল 'ম্যরালস' বা 'নৈতিকতা'।

বিংশ শতাব্দীতে মার্টিন হাইডেগারের "লেটার অন হিউম্যনিজম"[৫] এ এথোসের একটি নির্দিষ্ট অর্থ পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল। মার্টিন হাইডেগার উন্মোচন করেন যে, এথোস হল মানুষের dwelling place বা বাসস্থান যেখানে মানুষের বিয়িং প্রকাশিত হয় তাই এথিক্স বলতে তিনি বুঝিয়েছেন মানুষের বিয়িং(being)-এর মধ্যে বাস করার ধরন। আসলে দার্শনিক এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নীতিবিদ্যা এবং নৈতিকতা শব্দটি ব্যবহৃত হয় প্রতিশব্দ হিসেবে যা বর্তমান সাহিত্যে বেশ প্রচলিত, আবার স্বতন্ত্র একটি ধারণা হিসেবেও ক্রমবর্ধমান স্কলারদের কাছেও এটি একটি বিকল্প। যে সকল ব্যক্তি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নীতিবিদ্যা এবং নৈতিকতাকে নির্বিচারে ব্যবহার করেন তারা যুক্তি দেন যে, দুটি শব্দের উৎস স্বতন্ত্র হলেও তারা অভিন্ন অর্থ বহন করে।

এথিক্স বা নীতিবিদ্যাকে আবার 'ম্যরাল ফিলসফি'[৬] অর্থাৎ নীতি দর্শনও বলা হয়। 'ম্যরাল' শব্দটি এসেছে লাতিন শব্দ 'মোরেস'[৭] থেকে যার অর্থ হল অভ্যাস বা রীতি-নীতি। তাই নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হল মানুষের অভ্যাসজাত আচরণ বা রীতিসম্মত আচরণ। নীতিবিদ্যায় একটি আদর্শের নিরীখে আমাদের আচরণের মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। অধিকাংশ সময়েই মানুষ কিছু নিয়মাবলী অনুসরণ করে তার কাজকর্ম সম্পন্ন করে। নিজেকে আদর্শবান করে তোলার একটা ঝোঁক মানুষের মধ্যে রয়েছে। নৈতিকতাকে আমাদের বুঝতে হবে, আমাদের জানতে হবে কেন বা কোন নিয়মানুযায়ী আমরা কাজ করি? সেই নিয়মের ভিত্তি কি বা উৎপত্তি কোথায়? কে বা কারা সেই নিয়ম প্রণেতা? কিসের ভিত্তিতে সেই নিয়ম প্রতিষ্ঠা হল এবং সমাজে স্বীকৃত পেল ইত্যাদি।

নৈতিক বিধিগুলি সার্বজনীন, অর্থাৎ তা সকলের জন্য সমান। কোন এক বিশেষ পরিস্থিতিতে একটি নৈতিক বিধি অনুযায়ী নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে একই আচরণ করবে। নীতিদার্শনিকরা দাবি করেন নৈতিকবিধি সর্বদা শর্তহীন। আর শর্তহীনতার কারণেই তা সার্বজনীন। নৈতিকবিধি গুলি হল যুক্তিনির্ভর বা বুদ্ধিনির্ভর। ব্যক্তিগত অনুভূতি সমূহ বা স্বার্থ নৈতিকবিধি বা নৈতিকতার ভিত্তি নয়। অন্যের স্বার্থও নৈতিকতায়

---

[৪] Mos

[৫] *Letter on Humanism*

[৬] Moral Philosophy

[৭] Mores

প্রাধান্য পায়। সমাজ এবং জাতিভেদে তার নৈতিক ভাবধারা, রীতি-নীতি, আচরণাদি ভিন্ন ভিন্ন হয়। একটি সমাজের ভাবধারা, আদর্শ, নিয়মাবলী প্রভৃতি হল সেই সমাজের নৈতিকতা বা নৈতিক পরিবেশ। ব্যক্তির ওপর তার সমাজের প্রভাব লক্ষ্যনীয়। ব্যক্তি যে সমাজের মধ্যে বড় হয়ে ওঠে সেই সমাজের রীতি-নীতি, ভাবধারা, নিয়মাবলী প্রভৃতি ব্যক্তির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়। সমাজে প্রচলিত রীতি-নীতি অনুকরণের মাধ্যমে সেই সমাজের নৈতিক পরিবেশের প্রভাব ব্যক্তির স্বভাব-চরিত্র বা আচরণের মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত হয়।

প্রত্যেক আলোচনারই কিছু বিষয়বস্তু থাকে, তেমনি নীতিবিদ্যারও কিছু আলোচ্য বিষয় আছে। নীতিবিদ্যার সেই আলোচ্য বিষয় হল নীতিবিদ্যার পরিসর। নীতিবিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয় হল মানুষের আচরণ এবং ব্যক্তির আচরণের ভিত্তিতে কোন কাজটি ভাল বা মন্দ, ন্যায় অথবা অন্যায় প্রভৃতি নির্ণয় করাও নীতিবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। তবে যে কোন মানুষের যে কোন কর্মই নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হতে পারে না। শিশু, উম্মাদ, পশু প্রভৃতিকে তাদের কাজের জন্য দায়ী করা যায় না, কারণ তাদের বিচার ক্ষমতা নেই; তাই তাদের কাজকে নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হিসেবে গণ্য করা যায় না। ব্যক্তির বিচার ক্ষমতা বা বিচার করার সামর্থ্য একমাত্র তার ঐচ্ছিক কর্মের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। যে কাজ আমরা অভ্যাসবশত করে থাকি অথবা যে কাজের পশ্চাতে আমাদের কোন সচেতন উদ্দেশ্য থাকে না তাই অনৈচ্ছিক কর্ম। অপরদিকে, কোন উদ্দেশ্য লাভের জন্য পরিকল্পনামাফিক যে কাজ আমরা করে থাকি তাই ঐচ্ছিক কর্ম। নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে ব্যক্তির ঐচ্ছিক কর্মই একমাত্র প্রাধান্য পায়। তাই ঐচ্ছিক কর্ম থেকে উদ্ভূত আচরণের নৈতিক মূল্য বিচার করাই নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। ঐচ্ছিক কর্মের সাথে ব্যক্তির কামনা, উদ্দেশ্য, অভিপ্রায় ইত্যাদি মানসিক অবস্থাও যুক্ত থাকে, ফলে এই সকল মনোবিজ্ঞানের বিষয়ও নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। আমরা জানি যে অনৈচ্ছিক কর্মের নৈতিক বিচার হয় না, ব্যক্তির ঐচ্ছিক কর্মেরই একমাত্র ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বিচার সম্ভব। কিন্তু ব্যক্তির কর্মের স্বাধীনতা বা ইচ্ছার স্বাধীনতা না থাকলে ঐচ্ছিক কর্মেরও নৈতিক বিচার সম্ভব হয় না। ব্যক্তির কর্মের নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে একথা স্বীকার করে নিতে হয় যে, ব্যক্তির সেই বিশেষ কর্মটি করার অথবা না করার এই দুইয়ের স্বাধীনতাই ছিল। যে কাজে ব্যক্তি বাহ্যশক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয় অথবা যে কাজের ক্ষেত্রে ব্যক্তি পরাধীন সেই কাজের জন্য ব্যক্তিকে দায়ী করা যায় না। এই ঐচ্ছিক-অনৈচ্ছিক কর্ম, তাদের প্রভেদ, ইচ্ছার স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয়গুলি নীতিবিদ্যার সাথে সাথে মনোবিজ্ঞানেও আলোচিত হয়। তবে নৈতিক বিচারের সাথে যুক্ত এই মানসিক স্তরটি বেশ জটিল কারণ মানসিক স্তরের বিভিন্ন পরিকল্পনা অনুযায়ী নানা পর্যায় অতিক্রম করে ব্যক্তি দৈহিক স্তরে প্রবেশ করে। কারণ কামনা, উদ্দেশ্য, অভিপ্রায় প্রভৃতি নিবৃত্তির জন্য ব্যক্তি দৈহিক কর্ম তথা অঙ্গ-প্রতঙ্গ সঞ্চালনরূপ কর্ম করে থাকে।

মনোবিজ্ঞান হল মন এবং আচরণের বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন। মনোবিজ্ঞানে চেতন এবং অচেতন ঘটনার পাশাপাশি অনুভূতি এবং চিন্তাভাবনা এর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। একটি সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে মনোবিজ্ঞানের কাজ হল ব্যক্তির আচরণকে বোঝা। ব্যক্তির মনকে বিশ্লেষণ করলে আমরা তিন ধরনের উপাদান পাই– ১. চিন্তা ২. অনুভূতি এবং ৩. ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি। এই উপাদানসমূহের উৎপত্তি কিভাবে অথবা এদের স্বরূপ, প্রকারভেদ প্রভৃতি আলোচনা মনোবিজ্ঞানের আওতায় পড়ে। নীতিবিদ্যা এবং মনোবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য থেকে আমরা একথা বলতে পারি যে, উভয়েই মানুষের আচরণ, কামনা, অভিপ্রায় প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করে, ফলত উভয়ের মধ্যেই একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান। কী ধরনের কর্ম আমাদের করা উচিত বা কোন ধরনের কর্ম থেকে আমাদের বিরত থাকা উচিত তা নীতিবিদ্যা আমাদের বলে দেয়। কিন্তু তার আগে আমাদের এটা জানা প্রয়োজন যে কেন আমরা সেই কর্মে প্রবৃত্ত হলাম অথবা কোন ইচ্ছা দ্বারা চালিত হলাম যা মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা জানতে পারি। অর্থাৎ ব্যক্তির কোন কর্মের নৈতিকতা বিচারের ক্ষেত্রে সেই কর্মের পশ্চাতে যে

ইচ্ছা রয়েছে তার প্রকৃতি, গঠন, ইচ্ছার সাথে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার কারণসমূহের সম্পর্ক, উদ্দেশ্য ইত্যাদির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন হয়– এগুলি সম্পর্কে কোন সন্দেহজনক এবং অসম্পূর্ণ জ্ঞান 'নিখুঁত ভালো'[৮] বিষয়ে ত্রুটিপূর্ণ জ্ঞান প্রদান করে। যে কোন নৈতিক সিদ্ধান্তের জন্য সেই নৈতিক পরিস্থিতির একটি পূর্ণাঙ্গ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আবশ্যক। মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান ছাড়া কোন নৈতিক পরিস্থিতিকে বোঝা এবং নীতিবিদ্যাকে ব্যবহারিক করে তোলা দুরূহ। নীতিবিদ্যায় নৈতিকতা বোধের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি জানার জন্য আমাদের মনোবিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করতে হয়। তাই একথা বলাই যায় যে সঠিক নৈতিকতার একটি ভিত্তি হল সঠিক মনোবিজ্ঞান। তাই বলা যায় নীতিবিদ্যা এবং মনোবিজ্ঞান একে অপরের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। নীতিবিদ্যা মানুষের কাছে কিছু আদর্শ তুলে ধরে এবং মনোবিজ্ঞান সেগুলিকে ব্যবহার্য করার পরামর্শ দেয়।

মনোবিজ্ঞানের সাথে সমাজ তথা সমাজবিজ্ঞানের একটি সম্পর্ক রয়েছে। সমাজের কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব নির্ভর করে কিভাবে সে তার নিজের এবং তাদের সামাজিক পরিচিতি সনাক্ত করে তার ওপর। ব্যক্তিত্ব হল ব্যক্তির জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ ব্যক্তিত্ব দ্বারা ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে সচেতন হওয়ার সাথে সাথে সমাজে নিজের একাত্মতা ও নিজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে পারে। সমাজ হল কিছু মানুষের সমষ্টি যারা পরস্পর একটি অভিন্ন সংস্কৃতি এবং শারীরিক অবস্থান ভাগ করে নেয়। সামাজিক ব্যক্তিত্ব হল ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত সেই অনুযায়ী সে যে জাতি, বর্ণ, শ্রেণির অন্তর্গত সেই সম্পর্কে ব্যক্তির জ্ঞান। ব্যক্তির সুরক্ষা, আত্মমর্যাদা, সামাজিকীকরণ এবং কোন সম্প্রদায়ে থাকার জন্য ব্যক্তির সামাজিক ব্যক্তিত্ব থাকা আবশ্যক। প্রত্যেকটি সামাজিক সমস্যা বা সামাজিক ঘটনার একটি মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি থাকে। সমাজবিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানের সংমিশ্রণে বর্তমানে একটি নতুন শাখা গড়ে উঠেছে যা 'সামাজিক মনোবিজ্ঞান'[৯] নামে পরিচিতি লাভ করেছে। একইভাবে মনস্তাত্ত্বিক ঘটনা গুলিকে বোঝার জন্য সমাজের ওপর নির্ভর করতে হয়; কারণ ব্যক্তির মন, ব্যক্তিত্ব[১০] প্রভৃতি সামাজিক পরিবেশ, সংস্কৃতি, রীতি-নীতি প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাই এই সকল বিষয় ভালোভাবে বোঝার জন্য মনোবিজ্ঞান সমাজ তথা সমাজবিজ্ঞানের সাহায্য নেয়। একইভাবে নীতিবিজ্ঞানের সাথে সমাজ তথা সমাজবিজ্ঞানেরও একটি ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। মানুষের সামাজিক আচরণ, চিন্তাভাবনা, সামাজিক সম্পর্ক, সমাজের ক্রমবিকাশ, রীতি-নীতি, ভাষা, কাজকর্ম প্রভৃতি বিষয়ের দিকে সমাজবিজ্ঞান আলোকপাত করে। এককথায় সমাজবিজ্ঞান হল মনুষ্য সমাজের যাবতীয় বিষয়ের সামঞ্জস্যপূর্ণ আলোচনা। আমরা দেখেছি যে নীতিবিজ্ঞান ব্যক্তির ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় প্রভৃতি নৈতিক মূল্য নির্ণয় করে, আর ব্যক্তি যেহেতু সমাজবদ্ধ জীব তাই সমাজে ব্যক্তির স্থান কী বা ব্যক্তির ওপর সমাজের প্রভাব কী তা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে না পারলে সমাজস্থিত মানুষের নৈতিক মূল্য নির্ধারণ করা যাবে না। সমাজই ব্যক্তির শিক্ষাক্ষেত্র, কর্মক্ষেত্র; সমাজে বাস করেই ব্যক্তি নিজের বিকাশ সাধন করতে পারে, তাই সমাজ ছাড়া ব্যক্তির নৈতিক বিকাশ সম্ভবপর নয়। এইদিক দিয়ে নীতিবিজ্ঞান সমাজ বা সমাজবিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। আবার ব্যক্তি ছাড়া সমাজের অস্তিত্বও অর্থহীন। সমাজে প্রতিষ্ঠিত ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, বৈধ-অবৈধতার ধারণা থেকে সমাজস্থিত ব্যক্তির নৈতিকবোধ জাগ্রত হয়। যে সমাজে সৎ বা ভালো ব্যক্তির অস্তিত্ব যত বেশী সেই সমাজ তত উন্নত, এবং সেই সমাজের নৈতিক জীবনও তত উন্নত। তাই বলা যায় ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পর পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল।

---

[৮] Perfect good

[৯] Social Psychology

[১০] Personality

তাহলে দেখা গেল নৈতিকতা বা নীতিবিদ্যা মনোবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞান কে ছাড়া বিকাশ লাভ করতে পারে না। নৈতিকতা, সমাজ এবং মনোবিজ্ঞানের মধ্যে এক ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান। তাহলে এখন বলাই যায় যে, মনোবিজ্ঞান ও সমাজ হল নৈতিক বিকাশের অন্যতম দুটি শর্ত। এখন প্রশ্ন ওঠে নৈতিক বিকাশ বা ম্যরাল ডেভেলপমেন্ট[১১] বলতে আমরা কি বুঝি? এর উত্তরে বলা যায়, নৈতিক বিকাশ বলতে সেই প্রক্রিয়াকে বোঝায় যার দ্বারা শিশু সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আইনি নিয়মাবলীর ওপর ভিত্তি করে সমাজের ঠিক-ভুল, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় প্রভৃতি সম্পর্কে একটি ক্রমবর্ধমান ধারণা গঠন করতে পারে। এটি এমন কিছু আচরণবিধির নির্দেশ দেয় যা ব্যক্তির সংস্কৃতি, ধর্ম, সমাজ থেকে উদ্ভূদ হয়ে ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপ, আচরণ ও চিন্তাভাবনা কে পরিচালনা করে। নৈতিক বিকাশের নানাবিধ ধারণা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিবর্তিত হয়েছে; এই জন্যই একজন শিশুর নৈতিক রায়, আচরণ, চরিত্র প্রভৃতি একজন প্রাপ্ত বয়স্কের থেকে আলাদা। একদম প্রথমদিকে নৈতিক বিকাশের তত্ত্বগুলি এসেছিল অ্যারিস্টটল, রুশো প্রমুখ দার্শনিকদের থেকে। কিন্তু আধুনিক যুগে জা পিঁয়াজে, লরেন্স কোলবার্গ, প্রমুখ মনস্তাত্ত্বিকদের থেকে আমরা নৈতিক বিকাশের তত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে পারি। এইসব মনস্তাত্ত্বিকদের মতে আমরা নৈতিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হই।

পিঁয়াজের নৈতিক বিকাশ প্রক্রিয়াটি একটি গঠনমূলক প্রক্রিয়া যেখানে কর্ম এবং চিন্তার আন্তঃব্যবস্থা ব্যক্তির নৈতিক ধারণা গঠন করে। পিঁয়াজে মনে করেন শিশুর বড়ো হওয়া এবং পরিপক্ক (mature) হওয়ার ক্ষেত্রে শিশু নৈতিকতার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে দিয়ে যায়। তিনি নৈতিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে শিশুর যুক্তির ধরনের ওপর ভিত্তি করে তাঁর নৈতিক বিকাশ সংক্রান্ত গবেষণাকার্যটি করেছেন। অবিচক্ষণতা, চুরি করা, মিথ্যা বলা প্রভৃতি ক্ষেত্র গুলিতে শিশু কিভাবে তার যুক্তি প্রয়োগ করে তা জানার জন্য পিঁয়াজে কিছু পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা চালান এবং এই প্রতিটি বিষয় সম্পর্কিত কিছু গল্প তৈরি করেন, আর শিশুদের থেকে সেইসকল গল্প বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়। তিনি লক্ষ্য করলেন যে নিয়মাবলী, শাস্তি, কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রভৃতি সম্পর্কে শিশুর ধারণা গুলি বয়স বাড়ার সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়। পিঁয়াজে মূলত শিশুরা কি করে অথবা করে না সে বিষয়ে আগ্রহী নন, বরং শিশুরা কিভাবে চিন্তা করছে বা যুক্তি প্রয়োগ করছে সে বিষয়ে অধিক আগ্রহী ছিলেন। তাঁর মতে শিশু যখন জ্ঞানীয় দিক থেকে পরিপক্ক হয় তখন একটি বিষয়কে একাধিক দিক থেকে দেখার ফলে তারা বেশী ভালো নৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। পিঁয়াজে মনে করেন আমাদের জ্ঞানীয় বিকাশের যেমন পর্যায় রয়েছে তেমনি নৈতিক বিকাশেরও কিছু পর্যায় রয়েছে, এবং আমাদের নৈতিক বিকাশ জ্ঞানীয় বিকাশের সাথে যুক্ত। পিঁয়াজে নৈতিক বিকাশের দুটি মূল স্তরের কথা বলেন–

১. বিষম নৈতিকতা: বিষম নৈতিকতা বা হেটেরোন্যমাস ম্যরালিটিকে[১২] নৈতিক বাস্তববাদ বা ম্যরাল রিয়েলিজম[১৩] ও বলা হয়ে থাকে। পিঁয়াজে বলেন দুই বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর নিয়ম বা বিধি সম্পর্কে কোন সচেতনতা থাকে না এবং এই বয়সে শিশুর কাজকর্ম তার পেশী সঞ্চালন বা অঙ্গসঞ্চালন ক্ষমতা ব্যতীত অন্য কিছুর দ্বারা পরিচালিত নয়। এই সময়ে শিশু কোনরূপ সামাজিক সহযোগিতা উপলব্ধি করতে পারে না এবং সব কিছুই তারা তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, পচ্ছন্দ-অপচ্ছন্দের ভিত্তিতে করে থাকে। দুই বছরের পর থেকে সাত বছর পর্যন্ত শিশু পিঁয়াজের নৈতিক বিকাশের প্রথম পর্যায়ে থাকে। এই স্তরে শিশু তাদের নৈতিক ধারণা বিষয়ে কঠোর

[১১] Moral Development

[১২] Heteronomous Morality

[১৩] Moral Realism

থাকে। পিঁয়াজে এই প্রথম স্তরটিকে আবদ্ধতার নৈতিকতা[১৪] বলে অভিহিত করেছেন। এই স্তরে শিশু অভিপ্রায়ের পরিবর্তে কোন পরিস্থিতিকে তার ফলাফলের ভিত্তিতে মূল্যায়ণ করে থাকে। এই স্তরে শিশু আত্মকেন্দ্রিক হওয়ার দরুণ এটা উপলব্ধি করতে পারেনা যে, একটি নৈতিক পরিস্থিতিকে বোঝার একাধিক দৃষ্টিকোণ থাকতে পারে, ফলে কোন আচরণের পশ্চাতে থাকা অভিপ্রায়কে তারা পরিমাপ করতে পারেনা। এই স্তরে শিশু মনে করে নৈতিকতা হল অভিভাবক, শিক্ষক বা ঈশ্বর এইরকম কর্তৃত্বসম্পন্ন কোন ব্যক্তির দ্বারা আরোপিত কিছু নিয়মাবলী যা অপরিবর্তনীয়, আর এই নিয়মের বিরুদ্ধাচারণ হল কঠোর শাস্তিযোগ্য। শাস্তির উদ্দেশ্য হল অপরাধীর অপরাধবোধ জাগানো এবং তাকে এটা বোঝানো যে অন্যায়ের তীব্রতার সাথে শাস্তির তীব্রতা সম্পর্কিত। এই স্তরে শিশু মনে করে নিয়মগুলি হল ঐশ্বরিক এবং পরম যাকে পরিবর্তন করা যায় না, এবং নিয়মগুলি এখন যেমন ভবিষ্যতেও তেমনি থাকবে। আমাদের আচরণ ঠিক অথবা ভুল হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে আচরণ জন্য যে ফলাফল তার সাথে আপোস করার কোন অবস্থা থাকে না। সাত বছর বয়স অবধি শিশুর নিয়মাবলীর প্রতি খুব শ্রদ্ধাশীল থাকে কারণ এই বয়সে নিয়মাবলীকে পবিত্র হিসেবে দেখা ছাড়া শিশুর আর কোন জ্ঞানীয় ক্ষমতা থাকে না। ছোট্ট মেরি তার মাকে চমক দেবার জন্য একটি পোশাখ সেলাই করতে উদ্যত হয়, কিন্তু সঠিকভাবে কাঁচির ব্যবহার না জানায় সে পোশাখটিতে একটি বড় ছিদ্র করে ফেলে। অপরদিকে, ছোট্ট মার্গারেট মায়ের অনুপস্থিতির সুযোগে মায়ের কাঁচি নিয়ে খেলা করতে গিয়ে সঠিকভাবে কাঁচির ব্যবহার না জানায় সে তার পোশাখটিতে একটি ছোট ছিদ্র করে ফেলে। এই দুটি ঘটনার ক্ষেত্রে গবেষণায় অংশগ্রহণকারী শিশুদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয় 'কে বেশী দুষ্টু?' – এর উত্তরে তাদের সিদ্ধান্ত হবে, মেরি বেশী দুষ্টু। এক্ষেত্রে তারা দুষ্টুমির অভিপ্রায়ের পরিবর্তে পরিণতির তীব্রতার ওপর নির্ভর করে তাদের সিদ্ধান্ত নেয়। আর সেই কারণেই এই স্তরে একটি বড় দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি, একটি ছোট ইচ্ছাকৃত ক্ষতির তুলনায় খারাপ বলে বিবেচিত হয়। অর্থাৎ এই স্তরে শিশুর নৈতিকতাটি হল সম্পূর্ণ বাহ্য আরোপিত।

২. স্বায়ত্তশাসিত নৈতিকতা: এটি হল পিঁয়াজের নৈতিক বিকাশের দ্বিতীয় স্তর। স্বায়ত্তশাসিত নৈতিকতা বা অটোন্যমাস ম্যরালিটিকে[১৫] নৈতিক আপেক্ষিকতা বা ম্যরাল রিলেটিভিজম[১৬] ও বলা হয়। অটোন্যমাস ম্যরালিটি বা স্বায়ত্তশাসিত নৈতিকতা বলতে সেই নৈতিকতাকে বোঝায় যা শিশুর নিজের নিয়মের বা আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত। শিশু সাধারণত সাত বছরের পরে নৈতিক বিকাশের এই দ্বিতীয় স্তরে প্রবেশ করে, যাকে পিঁয়াজে সহযোগিতার নৈতিকতা[১৭] বলেছন। শিশু যখন সমবয়সীদের সাথে তার সম্পর্ক গড়ে তোলে তখন সে সমানভাবেই সবার সাথে মিলিত হয়, এই সাম্যতা তাদের পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে একসঙ্গে কাজ করার সামাজিক পরিবেশ প্রদান করে। পরিপক্ক হওয়ার সাথে সাথে শিশু জ্ঞানীয়ভাবে উন্নত হতে থাকে এবং স্কুল, প্রতিবেশী ও বন্ধুবান্ধবদের মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনে তারা এক বিস্তীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির সম্মুখীন হয়। তারা উপলব্ধি করে যে, পরম সত্য বা পরম মিথ্যা বলে কিছু হয় না এবং নৈতিকতা পরিণতির পরিবর্তে অভিপ্রায়ের ওপর নির্ভর করে। পিঁয়াজে মনে করেন নয়, দশ বছর বয়সে শিশু নৈতিক সমস্যা গুলিকে নতুনভাবে বুঝতে শেখে। এই স্তরে শিশু শৈশবের চিন্তাভাবনা গুলিকে কাটিয়ে উঠতে থাকে এবং অপরের দৃষ্টিকোণ থেকে তার নৈতিক নিয়মগুলিকে বোঝার ক্ষমতা বিকশিত হয়। শিশু যখন অপরের অভিপ্রায়, পরিস্থিতি প্রভৃতি বোঝার ক্ষেত্রে

[১৪] Morality of constraint

[১৫] Autonomous Morality

[১৬] Moral Relativism

[১৭] Morality of cooperation

বিকেন্দ্রীভূত হতে পারে সে অনেক বেশী স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমর্থ হয়, ফলস্বরূপ নৈতিক দায়িত্ব, শাস্তি, ন্যায়বিচার ইত্যাদি সংক্রান্ত শিশুর ধারণা পরিবর্তিত হতে থাকে এবং তাদের চিন্তাভাবনা প্রাপ্তবয়স্কদের মত হয়ে ওঠে। এই স্তরে শিশু বুঝতে পারে নিয়মগুলি কোন ঐশ্বরিক উৎস থেকে আসে না; মানুষই নিয়মগুলি তৈরি করে আর মানুষই সেগুলির পরিবর্তন করে, এবং ভালো-মন্দের সংজ্ঞাও পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল। শিশু বুঝতে পারে যে নিয়ম বা বিধি-নিষেধ ইত্যাদি পারস্পরিক সম্মতিতে গঠিত হয়; একটি সহযোগিতার কাঠামো তৈরি করতে, কোন গোষ্ঠীর মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ও সুষ্ঠভাবে ক্রীড়া পরিচালনার জন্যই নিয়মগুলির প্রয়োজন হয়। এই স্তরে নিয়ম অনুশীলনের মাধ্যমে শিশুর সহযোগিতা করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং পরিপক্ক হওয়ার সাথে সাথে তাদের এক যাপিত অভিজ্ঞতা হয় যা তাদের নিজস্ব নৈতিকমান নির্ণয়ে সহায়তা করে। এই স্তরে শিশু আর আত্মকেন্দ্রিক থাকে না এবং একটি পরিস্থিতির পশ্চাতে থাকা একাধিক দৃষ্টিভঙ্গিকে বিবেচনা করতে সক্ষম হয়, ফলস্বরূপ শিশু এই স্তরে কোন আচরণের পরিণতির পরিবর্তে তার পশ্চাতে থাকা অভিপ্রায়ের ভিত্তিতে নৈতিক বিচার করতে সমর্থ হয়। এই পর্যায়ে শিশুর এই আত্মোপলব্ধি হয় যে, তাদের কোন আচরণ খারাপ বলে প্রতিপন্ন হলেও সেই আচরণের পশ্চাতে থাকা অভিপ্রায় যদি ভালো হয় তবে অনিবার্যভাবেই তাদের শাস্তি কাম্য নয়। পূর্ববর্তী স্তরের মেরি ও মার্গারেটের কাহিনীটিকে অনুসরণ করে যদি প্রশ্ন করা হয় 'কে বেশী দুষ্টু?' তবে এই স্তরের দশ অথবা দশোর্ধ্ব শিশুদের কাছে মার্গারেট হবে মেরির তুলনায় দুষ্টু। যদিও মার্গারেটের তুলনায় মেরির পোশাখের ছিদ্র বড় ছিল, কিন্তু মার্গারেটের কাজের পশ্চাতে কোন সৎ অভিপ্রায় না থাকায় এই স্তরের শিশুর কাছে মার্গারেট হল দুষ্টু। এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন যে পিঁয়াজের মতানুসারে, শিশু তার জ্ঞানীয় ক্ষমতার অতিরিক্ত কোন কিছুই জানতে পারে না, তাই শিশুর বয়স এবং মানসিক বিকাশ অনুযায়ী তার নিয়মাবলী বোঝার ক্ষমতাকে, তার যৌক্তিক ক্ষমতাকে যথাযথ স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন।

পরবর্তীকালে মনোবিজ্ঞানী লরেন্স কোলবার্গের নৈতিক বিকাশ তত্ত্বে জা পিঁয়াজের নৈতিক বিকাশ তত্ত্বটিরই একটি পরিবর্তিত ও প্রসারিত রূপ দেখতে পাওয়া যায়। কোলবার্গের কাছে নৈতিক বিকাশ হল এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে শিশু তার বৌদ্ধিক বিকাশের ওপর ভিত্তি করে সার্বজনীন নৈতিক নীতিগুলিকে আবিষ্কার করে। কোলবার্গ তাঁর তত্ত্বে মূলত শিশুরা কিভাবে তাদের নৈতিকতা এবং নৈতিক যুক্তির বিকাশ ঘটায় সেইদিকে দৃষ্টিপাত করেছেন। কোলবার্গ পিঁয়াজের তত্ত্বকে প্রসারিত করলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হল, পিঁয়াজে নৈতিক বিকাশের দুটি স্তরের কথা বললেও কোলবার্গ তাঁর নৈতিক বিকাশ তত্ত্বে তিনটি স্তরের অন্তর্গত ছয়টি পর্যায়ের কথা বলেন। কোলবার্গের মতে নৈতিক বিকাশ হল একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া যা আজীবন ঘটে। নৈতিক বিকাশ সংক্রান্ত কোলবার্গের তিনটি স্তর যথাক্রমে– প্রিকনভেনশনাল[১৮] বা প্রাক-প্রচলিত, কনভেনশনাল[১৯] বা প্রচলিত এবং পোস্ট-কনভেনশনাল[২০] বা উত্তর-প্রচলিত। কোলবার্গের গবেষণার ভিত্তি ছিল একাধিক নৈতিক দ্বন্দ্ব এবং অনুরূপ নৈতিক দ্বন্দ্বে পড়লে ব্যক্তি কিভাবে তার কর্মকে ন্যায্যতা প্রদান করে তিনি সে বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন। পিঁয়াজের কাহিনী বলার পদ্ধতিটি অনুসরণ করেই কোলবার্গ তাঁর নৈতিক দ্বন্দ্ব বিষয়ক কাহিনী গুলি বলেছিলেন। নৈতিক দ্বন্দ্ব বিষয়ে কোলবার্গের কাহিনীর গুলির মধ্যে অন্যতম একটি হল 'হাইঞ্জের দ্বন্দ্ব'[২১] এই দৃশ্যে হাইঞ্জের

[১৮] Preconventional

[১৯] Conventional

[২০] Postconventional

[২১] Heinz Dilemma

স্ত্রী এক বিশেষ ধরনের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুশয্যায়। চিকিৎসকের কথানুযায়ী এক বিশেষ ধরনের ড্রাগ তাকে বাঁচাতে পারে, যা স্থানীয় এক কেমিস্ট আবিষ্কার করেছিলেন। হাইঞ্জ ড্রাগটি কেনার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু কেমিস্টটি ড্রাগের জন্য ব্যয় করা অর্থের দশ গুণ বেশী অর্থ মূল্যস্বরূপ দাবি করেন যা হাইঞ্জের সামর্থ্যের থেকে অনেক বেশী। পরিবার এবং বন্ধুদের সহায়তার পরেও হাইঞ্জ কেবলমাত্র অর্ধেক অর্থই জোগাড় করতে পেরেছিলেন। হাইঞ্জ কেমিস্টকে অনুরোধ করেছিলেন যাতে সে ড্রাগটি সস্তায় পেতে পারে অথবা অত্যধিক মূল্য পরে পরিশোধ করতে পারেন; কিন্তু কেমিস্ট তার প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। হাইঞ্জ তার স্ত্রীর প্রাণ রক্ষার্থে মরিয়া হয়ে ওঠেন এবং ফার্মেসি ভেঙ্গে ড্রাগটি চুরি করেন। এই কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে কোলবার্গ গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের নিম্নলিখিত একাধিক প্রশ্ন করেন–

১. হাইঞ্জের কী ড্রাগ চুরি করা উচিত ছিল?
২. স্ত্রীর প্রতি হাইঞ্জের ভালোবাসা না থাকলে কী কোনো কিছু পরিবর্তন হত?
৩. মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তি যদি অপরিচিত হতেন তাহলে কী কোনো পার্থক্য হত?
৪. মহিলাটি মারা গেলে তার হত্যার জন্য পুলিশ কী কেমিস্টকে গ্রেপ্তার করবে?

বিভিন্ন বয়সের ব্যক্তির থেকে প্রাপ্ত এইসব প্রশ্নের উত্তর অধ্যয়ন করে কোলবার্গ লক্ষ্য করলেন, পরিপক্ক হওয়ার সাথে সাথে কিভাবে ব্যক্তির নৈতিক যুক্তি পরিবর্তিত হয়। গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিরা হাইঞ্জের কর্মটিকে ঠিক অথবা ভুল বলে বিবেচনা করছে কিনা কোলবার্গ সে বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন না, বরং তাদের বিবেচনার পশ্চাতে থাকা যুক্তি নিয়ে তিনি অধিক আগ্রহী ছিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে এই যুক্তিগুলি ক্রমশ পরিবর্তিত হতে থাকে। কোলবার্গ তাঁর নৈতিক বিকাশ তত্ত্বে এই যুক্তিগুলিকে বিভিন্ন পর্যায়বদ্ধ করেন। পিঁয়াজে যেমন বিশ্বাস করতেন সবাই জ্ঞানীয় বিকাশের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছতে পারে না, কোলবার্গও তেমনি বিশ্বাস করতেন সকলে নৈতিক বিকাশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছতে পারে না। কোলবার্গের নৈতিক বিকাশের তিনটি স্তর ও তার অন্তর্গত পর্যায়গুলি যথাক্রমে-

১. প্রাক-প্রচলিত নৈতিকতা: এটি হল কোলবার্গের নৈতিক বিকাশের প্রথম স্তর। শিশুর প্রায় নয় বছর বয়স পর্যন্ত এই স্তরটি স্থায়ী হয়। এই স্তরে শিশুর কোন ব্যক্তিগত নৈতিক ভাবনা থাকে না। এই স্তরে প্রাথমিকভাবে প্রাপ্তবয়স্কের তৈরি করা মানদন্ড অর্থাৎ তাদের তৈরি নিয়ম অনুসরণ করা বা তার বিরুদ্ধাচারণ করার ওপর শিশুর নৈতিক সিদ্ধান্ত নির্ভর করে। এই স্তরে শিশু আত্মকেন্দ্রিক হয়, কোন কর্মকে তার পরিণতির ভিত্তিতে বিচার করে থাকে। এই স্তরের অধিকারী শিশু ঠিক বা ভুল সংক্রান্ত সামাজিক নীতিগুলি আত্মীকরণ করার পরিবর্তে কর্মের বাহ্যিক পরিণতিকে মূল্য দেয়। এই ক্ষেত্রে কোন কর্ম শাস্তিযোগ্য হলে খারাপ এবং পুরস্কারযোগ্য হলে তা ভালো বলে পরিগণিত হয়। এই স্তরের অন্তর্গত পর্যায় দুটি হল :

ক. আনুগত্য এবং শাস্তি[২২]: নৈতিক বিকাশের এই প্রথম পর্যায়টি সাধারণত অল্পবয়স্কদের মধ্যে দেখা যায়, তবে প্রাপ্তবয়স্করাও এই পর্যায়ের অধিকারীর মত যুক্তি প্রদর্শন করতে পারে। এই স্তরে শিশু মনে করে নিয়মগুলি হল অপরিবর্তনীয় এবং পরম, আর শাস্তি এড়ানোর জন্য নিয়মগুলির মান্যতা দেওয়া প্রয়োজন। হাইঞ্জের দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে পরিস্থিতির বিচার না করেই শিশুর যুক্তি হবে তার ফার্মেসি থেকে ড্রাগ চুরি করা উচিত নয়, কারণ তা আইন বিরুদ্ধ এবং ধরা পরলে তাকে কারাগারে যেতে হতে পারে। অন্যদিকে যারা বলবে হাইঞ্জের ড্রাগ চুরি করা উচিত তাদের যুক্তি হবে, কেমিস্টটি ড্রাগের ন্যায্য মূল্যের থেকে দশগুণ অতিরিক্ত মূল্য ধার্য্য করেছিলেন এবং হাইঞ্জ তা পরিশোধ করতেও ছেয়েছিলেন কিন্তু কেমিস্ট তার প্রস্তাবে রাজি হননি । এটি পিঁয়াজের প্রথম

[২২] Obedience and Punishment

স্তরের অনুরূপ, এই পর্যায়ে বিশ্বাস করা হয় যে নিয়মগুলিকে অবশ্যই মান্যতা দেওয়া হবে এবং যারা মান্যতা দেবে না নিঃসন্দেহে তারা শাস্তির মাধ্যমে নিয়মগুলি অনুসরণ করবে।

খ. স্বতন্ত্রতা এবং বিনিময়[২৩]: এই পর্যায়ে এসে শিশু উপলব্ধি করে যে কোন বিষয়েরই একাধিক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, কোন একটি দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক হিসেবে বলা হয়নি। প্রতিটি ব্যক্তি স্বতন্ত্র তাই তাদের স্বার্থ অনুযায়ী অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে। এই পর্যায়ে শিশু তার সর্বোত্তম স্বার্থে বিশ্বাসী হয়। এইক্ষেত্রে শিশু সাধারণত অন্যের চাহিদার প্রতি সীমিত আগ্রহ প্রদর্শন করে, যদি না তা তার নিজের স্বার্থান্বেষণের কারণ হয়। এই স্তরে শিশু কোন সামাজিক সম্পর্ক যেমন বন্ধুত্ব, বিশেষ কারণবশত সম্মানিত হওয়া প্রভৃতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় না বরং তার সমস্ত কর্ম নিজস্ব চাহিদা বা স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয়। হাইঞ্জের দ্বন্দ্বে শিশুর যুক্তি হবে হাইঞ্জের ড্রাগ চুরি করা উচিত কারণ তাকে কারাগারে যেতে হলেও তার স্ত্রীকে বাঁচাতে পারলে সে অধিক খুশী হবে। অপরদিকে যারা বলবে হাইঞ্জের ড্রাগ চুরি করা উচিত নয় তাদের যুক্তি হবে; কারাগার একটি ভয়ানক জায়গা তাই কারাগারে ব্যক্তির যা মানসিক ক্ষয় হয় তা স্ত্রীর মৃত্যুর শোকের তুলনায় কম।

২. প্রচলিত নৈতিকতা: সাধারণত কিশোর, কিশোরী এবং প্রাপ্তবয়স্করা নৈতিক বিকাশের এই দ্বিতীয় স্তরটির অধিকারী হয়। এই স্তরে নৈতিকতাকে সমাজের প্রত্যাশা, দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে বিচার করা হয়। ঠিক এবং ভুলের ভিত্তিতে সামাজিক নিয়মাবলীকে গ্রহণ করা হল এই স্তরের ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য। প্রাপ্তবয়স্করা এই সময় প্রশ্নাতিরিক্ত ভাবে তাদের রোল মডেলের নৈতিক মানদণ্ডকে, কর্তৃপক্ষের নিয়মাবলীকে আত্মীকরণ করে। এমনকি নিয়মগুলির মান্যতা বা অমান্যতার জন্য কোনরকম পরিণতি নেই জেনেও ব্যক্তি এই স্তরে আইন এবং সামাজিক আদর্শ মেনে চলে। এই স্তরটি নৈতিকতার তৃতীয় এবং চতুর্থ পর্যায় নিয়ে গঠিত।

গ. ভালো আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক[২৪] : এই পর্যায়ে ব্যক্তি সমাজ স্বীকৃত নিয়মাবলীকে প্রাধান্য দেওয়ার মাধ্যমে সমাজে নিজের অন্তর্ভুক্তি ঘটায়। এই স্তরের অধিকারী ব্যক্তি সমাজের আদর্শকে নিজের আদর্শ বলে গ্রহণ করে। ব্যক্তির নৈতিক সিদ্ধান্তসমূহ এক্ষেত্রে অন্যের অনুমোদনের ওপর নির্ভরশীল। এই ক্ষেত্রে ব্যক্তি অপরের অনুমোদন বা অননুমোদনের মাধ্যমে ভালো ছেলে বা ভালো মেয়ে হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। উপরোক্ত হাইঞ্জের দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে এই পর্যায়ে ব্যক্তি বলবে, হাইঞ্জের ড্রাগ চুরি করা উচিত কারণ হাইঞ্জের স্ত্রী প্রত্যাশা করে যে তিনি একজন ভালো স্বামী হয়ে উঠবেন। অন্যদিকে হাইঞ্জের চুরি করা উচিত নয় কারণ, চুরি করা অপরাধ এবং হাইঞ্জ অপরাধী নন, আইন না ভেঙ্গে তিনি তার সাধ্যমতো করার চেষ্টা করেছেন তাই তাকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না।

ঘ. সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা[২৫] : নৈতিক বিকাশের এই পর্যায়ে ব্যক্তি সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় সমাজকে অখণ্ড বলে বিবেচনা করে। আইন, সামাজিক নিয়মাবলী প্রভৃতিকে মান্যতা দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ কারণ এগুলিকে মান্যতা দেওয়ার মাধ্যমে সামাজিক সামঞ্জস্যতা রক্ষা পায়। সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি অপর ব্যক্তির ওপর প্রত্যেকের কর্মের প্রভাব সম্পর্কে সচেতন থাকে; সমাজে তাদের নিজের ভূমিকার অপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে, সামাজিক কর্তৃপক্ষ ও তাদের নিয়মাবলীর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। তৃতীয় পর্যায়ে যেখানে পরিবার বা বন্ধুদের সাথে সম্পর্কের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল, চতুর্থ পর্যায়ে সেক্ষেত্রে সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। সাধারণত সমাজের সকল সক্রিয় সদস্যরা এই পর্যায়ের অন্তর্গত, যেখানে নৈতিকতা মূলত বাহ্যশক্তি

---

[২৩] Individualism and Exchange

[২৪] Good Interpersonal Relationships

[২৫] Maintaining Social Order

আরোপিত। উপরোক্ত দৃষ্টান্ত অনুযায়ী এই পর্যায়ে ব্যক্তিগণ বলবে হাইঞ্জের ড্রাগ চুরি করা অনুচিত কারণ চুরি আইন বিরুদ্ধ কাজ। অন্যদল তাদের যুক্তি দেখাতে পারে, ড্রাগ চুরি করাতে হাইঞ্জের স্ত্রী উপকৃত হবেন ঠিকই কিন্তু সাথে সাথে হাইঞ্জের উচিত তার অপরাধের জন্য শাস্তি গ্রহণ করা ও ড্রাগের মূল্য পরিশোধ করা কারণ প্রত্যেককে তার কর্মের নির্দিষ্ট ফল ভোগ করতে হয়।

৩. উত্তর-প্রচলিত নৈতিকতা: এটি হল কোলবার্গের নৈতিক বিকাশের তৃতীয় এবং সর্বশেষ স্তর। ব্যক্তির এই স্তরের ভিত্তি হল সার্বজনীন নৈতিক বিধির বোধগম্যতা। এই স্তরে এসে ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারে, ব্যক্তি সমাজ অতিরিক্ত একটি সত্তা, ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পৃথক হতে পারে এবং ব্যক্তি তার প্রয়োজনে নিজস্ব নীতিবিরুদ্ধ নিয়ম অমান্য করতে পারে। এই স্তরে ব্যক্তিরা তাদের নিজস্ব নৈতিকবিধি দ্বারা জীবনযাপন করে, যে নীতিগুলি মানবাধিকার, সাম্যতা, ন্যায়বিচার প্রভৃতির মতো বিমূর্ত এবং সেই কারণে অসংজ্ঞায়িত। এই স্তরে ব্যক্তির কাছে বহু মানুষের সুখের জন্য, সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য নিয়মগুলি প্রয়োজনীয় বটে কিন্তু অবশ্যই তা অপরিবর্তনীয় নয় এবং প্রশ্নাতীত ভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। এই স্তরের অন্তর্গত পর্যায় দুটি হল-

ঙ. সামাজিক চুক্তি এবং স্বতন্ত্র অধিকার[২৬]: জগতে অসংখ্য দৃষ্টিভঙ্গি, মতামত ইত্যাদি রয়েছে, তাই প্রত্যেকটি মানুষ, সমাজ বা গোষ্ঠীর উচিত প্রত্যেকের এই অনন্য মতামত, দৃষ্টিভঙ্গিকে মূল্য দেওয়া। যা সর্বাধিক মানুষের কল্যাণ সাধন করে না এমন নিয়মনীতিকে পরিবর্তন করা উচিত, তবে এই পরিবর্তন অবশ্যই সর্বাধিক মানুষের সমঝোতা ও সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে করা হবে। হাইঞ্জের দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে হাইঞ্জের চুরি করা উচিত যারা বলবে তাদের যুক্তি হল, তার স্ত্রী মৃত্যুশয্যায় আর ব্যক্তির জীবন রক্ষা করা নিয়মনীতি বা আইনের উর্ধ্বে। অপরদিকে যারা মনে করেন হাইঞ্জের চুরি করা উচিত নয় তাদের মতে, হাইঞ্জের স্ত্রী অসুস্থ্য হলেও কেমিস্টের নিজের ক্ষতিপূরণের অধিকার আছে, তার স্ত্রীর অসুস্থ্যতা কখনো কেমিস্টের কাজের যথার্থতা প্রদান করে না।

চ. সার্বজনীন নীতি[২৭]: কোলবার্গের নৈতিক বিকাশের চূড়ান্ত পর্যায়টি হল সার্বজনীন নীতি। সাধারণত সার্বজনীন নৈতিকতা বা নীতি ইত্যাদি ন্যায়বিচারের ভিত্তিতেই তৈরি হয়, এবং বিমূর্ত ধারণা হওয়ার কারণে এগুলিকে সংজ্ঞায়িত করা যায় না, একটা রূপরেখা অঙ্কন করা যায় মাত্র। সাম্যতা, ন্যায়বিচার, মর্যাদা, সম্মান প্রভৃতি হল সার্বজনীন নীতির ভিত্তি, সমাজে নিয়মনীতি বা আইনবিধি তখনই বলবৎ হয় যখন তা সার্বজনীন নীতিকে সমর্থন জানায়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যক্তির আদর্শ ইত্যাদি সামাজিক নিয়মাবলী, আইন প্রভৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়; কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে সামাজিকভাবে যা গ্রহণযোগ্য এবং ব্যক্তির বিশ্বাস এই দুইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে এবং সেক্ষেত্রে ব্যক্তি তার নিজস্ব নৈতিকতা বা আদর্শকেই বেছে নেয়। অর্থাৎ এই পর্যায়ে নৈতিক যুক্তি ব্যক্তির নিজস্ব আদর্শের ওপর নির্ভর করে এবং ব্যক্তি তার নিজের নৈতিক নির্দেশিকার বিকাশ ঘটায় যা আইনানুযায়ী অথবা আইন বিরুদ্ধও হতে পারে। হাইঞ্জের দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে ব্যক্তির যুক্তি হল, হাইঞ্জের ড্রাগ চুরি করা উচিত কারণ মানুষের জীবন রক্ষা, কোন ব্যক্তির সম্পত্তি রক্ষার তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে হাইঞ্জের ড্রাগ চুরি অনুচিত কারণ অপর ব্যক্তিরও একইভাবে প্রাণদায়ী ড্রাগের প্রয়োজন হতে পারে এবং তাদের জীবনও সমান গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে বলে রাখা প্রয়োজন যে কোলবার্গের মতে, সমাজস্থ খুব অল্প সংখ্যক মানুষই তাদের নিজস্ব নৈতিক নীতি দ্বারা চালিত হয় এবং নৈতিক বিকাশের এই পর্যায়ে পৌঁছতে

[২৬] Social contract and Individual Rights

[২৭] Universal Principles

পারে। একটি গবেষণায় দেখা যায় নৈতিক বিকাশের প্রথম থেকে চতুর্থ পর্যায় গুলি বিশ্ব জনসংখ্যার নিরীখে সার্বজনীনভাবে দেখা যেতে পারে কিন্তু পঞ্চম এবং ষষ্ঠ পর্যায় দুটি বিশ্ব জনসংখ্যার নিরীখে অত্যন্ত কম।
এখন বলা যায়, নৈতিকতার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ মনোবিজ্ঞান মানুষের চিন্তা, আবেগ, আচরণকে বিশ্লেষণ করে দেখায় যে শৈশব থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত কিভাবে মানুষের নৈতিক বোধ গড়ে ওঠে। মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা জানতে পারি যে ব্যক্তির নৈতিক বোধ জন্মসূত্রে প্রাপ্ত নয়, ধীরে ধীরে তা বিকাশলাভ করে; মানুষের নৈতিক সিদ্ধান্ত কেবলমাত্র যুক্তির ওপর নির্ভরশীল নয়, ব্যক্তির আবেগ, অভিজ্ঞতা ও সমাজের প্রভাবও এর সঙ্গে যুক্ত থাকে। জা পিঁয়াজের নৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করলাম যে শিশু প্রথমে নিয়ম-নীতিকে কঠোরভাবে বোঝে এবং পরে ধীরে ধীরে তারা সেই নিয়মের কি উদ্দেশ্য তা বুঝতে পারে। কোলবার্গের ক্ষেত্রেও আমরা দেখলাম যে শিশু শাস্তির ভয় থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে ন্যায়-নীতির আদর্শে পৌঁছায়।

নৈতিকতা সাধারণত বলে যে কোন পরিস্থিতিতে মানুষের কি করা উচিত আর মনোবিজ্ঞান সেই কাজের পশ্চাতে থাকা বাস্তবতা নিয়ে কথা বলে, অনেক সময়ই মানুষের বাস্তব আচরণ নৈতিক আদর্শের সাথে মেলে না, সেক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞান সেই ফাঁকটি বোঝাতে আমাদের সাহায্য করে। তাই বলা যায় নৈতিকতা কেবলমাত্র কতগুলি বিমূর্ত নীতি নয়, বরং নৈতিকতা মানুষের মনস্তত্ত্ব এবং সামাজিক অবস্থান দ্বারা গঠিত। তাই বলা যায় নৈতিকতা ও মনোবিজ্ঞান পরস্পর পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল।

গ্রন্থপঞ্জি:

গ্রন্থ:

১. গুপ্ত, দীক্ষিত। নীতিশাস্ত্র। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৭।
২. মুখোপাধ্যায়, অপরাজিতা। ব্যক্তিচরিত্র এবং নৈতিকতা। মহাবোধি বুক এজেন্সী, ২০১৫।
৩. মিশ্র, পুষ্পা এবং ড. মাধবেন্দ্রনাথ, মিত্র। সিগমুন্ড ফ্রয়েড: মনঃসমীক্ষণের রূপরেখা। নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রা.) লিমিটেড, ১৯৯৪।
৪. মুন্সী, শ্রী রমেশচন্দ্র ও শ্রী রীতেন, সরকার। নীতিবিজ্ঞান ও ব্যবহারিক নীতিবিজ্ঞান। বৈকুণ্ঠ বুক হাউস, ২০০১।

প্রবন্ধ:

১. Cherry, Kendra. "Comparing Erikson's vs Freud's Theories."
২. https://www.verywellmind.com/freud-and-erikson-compared-2795959 . Accessed 24 Oct, 2021.
৩. Cherry, Kendra. "Kohlberg's Theory of Moral Development".
৪. https://www.verywellmind.com/kohlbergs-theory-of-moral-development-2795071 Accessed 10 July 2021, 1 a.m.
৫. Cherry, Kendra. "The 4 Stages of Cognitive Development".
৬. https://www.verywellmind.com/piagets-stages-of-cognitive-development-2795457 , Accessed 15 July 2021, 10:40 p.m.
৭. Hoffman,Riley. "Alfred Adler's theories of Individual Psychology and Adlerian therapy''. https://www.simplypsychology.org/alfred-adler.html . Accessed 20 Oct 2021, 6 p.m.

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1401-1409
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.360

অভাব পদার্থ সম্বন্ধে ন্যায়-বৈশেষিক ও মীমাংসকদের অভিমত: একটি তুলনামূলক আলোচনা

টিংকু মণ্ডল, *স্বাধীন গবেষক, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.03.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In this paper, I have tried to explain abhāva in the context of Nyāya–Vaiśeṣika philosophy and Mīmāṁsā philosophy. In Indian philosophy, abhāva is considered a padārtha. However, some schools of Indian philosophy accept abhāva as a padārtha, while others do not. The absence of something is called abhāva. The knowledge expressed in the statement "there is no pot" is the knowledge of abhāva. The Nyāya–Vaiśeṣika school accepts abhāva as a distinct entity. According to them, abhāva is also a padārtha, like dravya, guṇa, karma, sāmānya, samavāya, and viśeṣa, since non-existence can be the object of our knowledge.
According to Nyāya, abhāva is known through perception. On the other hand, the Prābhākara school does not accept abhāva as an independent padārtha, whereas the Bhāṭṭa school accepts it as an independent padārtha. According to the Bhāṭṭa view, abhāva is known through anupalabdhi pramāṇa.
In this paper, I examine which view of abhāva is more acceptable through a comparative study of Nyāya–Vaiśeṣika philosophy and Mīmāṁsā philosophy.

Keywords: padārtha, abhāva, nyāya–vaiśeṣika, mīmāṁsā, perception, anupalabdhi pramāṇa

বৈশেষিক দর্শন হল ভারতীয় দর্শনের অন্যতম একটি দর্শন সম্প্রদায়। এই দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন মহর্ষি কনাদ। বৈশেষিক দর্শনের মূল তত্ত্ব হল পদার্থ তত্ত্ব। এই দর্শনে জগতের ব্যাখ্যা পদার্থের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। বৈশেষিক দর্শনে মোট সাত প্রকার পদার্থ স্বীকার করা হয়েছে। এই সাত প্রকার পদার্থের মধ্যে সপ্তম তথা সর্বশেষ পদার্থ হল অভাব পদার্থ। প্রসঙ্গত তাঁরা পদার্থকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন— ভাব পদার্থ ও অভাব পদার্থ। দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় হল ভাব পদার্থ; আর এই ছয়টি ভাব ভিন্ন পদার্থই হল অভাব পদার্থ। এখন আমাদের জানতে হবে যে পদার্থ বলতে কি বোঝায়? পদার্থ হল— "পদস্য অর্থঃ পদার্থঃ"। অর্থাৎ পদের দ্বারা যে বিষয়কে বোঝানো হয় তাই হল 'পদার্থ'। অন্যভাবে বললে পদের অর্থ হল 'পদার্থ'। তবে এখানে 'বিষয়' বলতে বাস্তব বিষয়কে বোঝানো হয়েছে, কোন অলীক বিষয়কে নয়। কেননা অলীক বস্তু জ্ঞেয় অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় হয় না। সুতরাং পদের দ্বারা যে বাস্তব বিষয়টি জ্ঞানের বিষয় হয় তাই হল পদার্থ। 'ঘট' পদটি যে বিষয়কে বোঝায় তাই হল ঘট পদার্থ। 'ঘট', 'পট', 'বই', 'কলম' ইত্যাদি শব্দকে পদ বলা হয়। এই পদ যে বস্তুকে বোঝায়, তাই তার অর্থ। তাই ঘট, পট, বই ইত্যাদি বস্তুই হল পদার্থ। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন হয় অভাব কিরূপে পদার্থ বলে গণ্য হতে পারে ? কেননা অভাবের অর্থই হল না থাকা।

এক্ষেত্রে ন্যায়-বৈশেষিকগণ বলেন বস্তুর অস্তিত্ব যেমন আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয় তেমনি বস্তুর না থাকা অর্থাৎ নাস্তিত্বও জ্ঞানের বিষয় হয়। তাই অভাব পদার্থ রূপে স্বীকৃত। 'ঘট নেই'- এই রূপ পদ উচ্চারণের দ্বারা ঘটের নাস্তিত্বকে বোঝানো হয়। এবং ওই পদ উচ্চারণের দ্বারাই ঘটের অভাবের জ্ঞান হয়। এই ঘটাভাব জ্ঞানের বিষয় হয় ঘটের নাস্তিত্ব। তাই ঘটের নাস্তিত্ব এক প্রকার পদার্থ। যে বিষয়ে অভাব থাকে তাকে বলা হয় প্রতিযোগী এবং যে স্থলে বা স্থানে অভাব থাকে সেই স্থলটি বা স্থানটি হল ওই অভাবের অনুযোগী। ন্যায়-বৈশেষিকগণ বলেন যে, অভাবকে পদার্থরূপে স্বীকার না করলে "টেবিলে বই নেই", "ভূতলের ঘট নেই" ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান আমাদের হত না।

অনেক দার্শনিকগণ বলেন যে, বৈশেষিক দর্শনে ছয়টি পদার্থ স্বীকৃত, অভাব কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নয়। কেননা সূত্রকার ও ভাষ্যকার কেউই অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থ বলে উল্লেখ করেননি। কিন্তু নব্য ন্যায়-বৈশেষিকগণ বলেন পদার্থ সাতটি। তাঁরা বলেন বৈশেষিক সূত্রে অভাবের উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে— "কারণাভাবাৎ কার্যাভাবঃ ন তু কার্যাভাবাৎ কারণাভাবঃ"[১]। সূত্রকার কণাদ অভাব স্বীকার করেছেন শুধু তাই নয়, অভাবের বিভাগও দেখিয়েছেন— "ক্রিয়াগুণব্যপদেশাভাবৎ প্রাগসৎ"[2]। আবার মহর্ষি গৌতম ন্যায়সূত্রে বলেছেন— "নাভাবপ্রামাণ্যং প্রেময়াসিদ্ধেঃ"[৩]। সৃষ্টি ও সংহার প্রকরণে প্রাগাভাব, ধ্বংসাভাব ও অন্যোন্যাভাবের উল্লেখ আছে। সুতরাং মহর্ষি কণাদ ও মহর্ষি গৌতম অভাব পদার্থ স্বীকার করেছেন। কিরণাবলীকার উদয়নাচার্য বলেন অভাব পদার্থ হলেও অভাবের জ্ঞান বা নিরূপণ তার প্রতিযোগির জ্ঞানের বা নিরূপণের উপর নির্ভরশীল। তাঁর মতে স্বতন্ত্রভাবে অভাবের জ্ঞান হয় না অর্থাৎ 'অভাব' শব্দ প্রয়োগ করে কোন কিছুকে বোঝানো যায় না। দ্রব্যাদি ছয়টি ভাব পদার্থের কোন একটি উল্লেখ বা নিরূপণ না করে অভাবকে বোঝানো যায় না। তাই ভাব পদার্থের নিরূপণের দ্বারাই অভাব পদার্থ নিরূপিত হয়ে যায়। কেননা, দ্রব্যাদি ছয়টি পদার্থ হল অভাবের প্রতিযোগি। উদয়নাচার্য বলেন উক্ত কারণেই সূত্রকার ও ভাষ্যকার অভাবের স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করেননি, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে অভাবকে সৎরূপে তথা পদার্থ রূপে স্বীকার করেননি। এছাড়াও নব্যবৈশেষিক শিবাদিত্য মিশ্র অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থরূপে উল্লেখ করে তার লক্ষণ দিতে গিয়ে *সপ্তপদার্থী* গ্রন্থে ৭৭ নং সূত্রে বলেছেন— "প্রতিযোগিজ্ঞানাধীনজ্ঞানোহভাব"[৪]। অর্থাৎ প্রতিযোগি পদার্থের জ্ঞানাধীন যে পদার্থের জ্ঞান, সেই পদার্থই হল অভাব।

বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন অভাবের লক্ষণ দিতে গিয়ে *সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে* ১২ নং কারিকায় বলেছেন— "অভাবত্বম্ দ্রব্যাদিষটকান্যোন্যাভাবত্বম্"[৫]। অর্থাৎ যে পদার্থে দ্রব্যাদি ছয়টি ভাব পদার্থের অন্যোন্যাভাব তথা ভেদ আছে, তাই হল অভাব পদার্থ। দ্রবাদি ছয়টি ভাব পদার্থে নিজ নিজ ভেদ ছাড়া 'দ্রব্য নয়', 'গুণ নয়'— এইভাবে কেবল ভাব পদার্থের পাঁচটি ভেদই আছে, ছয়টি ভেদ নেই। একমাত্র অভাবেই ছয়টি ভাবপদার্থের ভেদ আছে। তাই দ্রব্যাদি ছয়টি ভাব পদার্থের অন্যোন্যাভাববোধক পদার্থ হল অভাব।

এখন প্রশ্ন হল অভাবের কি কোন প্রকার আছে? কেননা অভাব তো মূর্ত বিষয় নয়। এর উত্তরে ন্যায়-বৈশেষিকগণ বলেন অভাব মূর্ত না হলেও কিংবা মূর্তি না থাকলেও প্রতিযোগির ভেদে, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক

---

[১] মহর্ষি, কণাদ. *বৈশেষিক সূত্র.* মহাদেব গঙ্গাধর বাক্রে (সম্পাদিত), ১/২/১

[২] তদেব ৯/১/১

[৩] মহর্ষি, গৌতম. *ন্যায় সূত্র.* গঙ্গানাথ ঝা ও ঢুন্ডিরাজ শাস্ত্রী (সম্পাদিত), ২/২/৭

[৪] শিবাদিত্য, মিশ্র. *সপ্তপদার্থী.* জয় ভট্টাচার্য্য (সম্পাদিত), পৃ. ৬৬.

[৫] ন্যায়-পঞ্চানন, বিশ্বনাথ. *ভাষাপরিচ্ছেদ.* শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তর্কতীর্থ (সম্পাদিত), পৃ. ৪০.

ধর্মের ভেদে এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধের ভেদে অভাবের নানা প্রকার ভেদ লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের মতে অভাব প্রধানত দুই প্রকার— সংসর্গাভাব এবং অন্যোন্যাভাব।

অন্যোন্যাভাব: অন্যোন্যাভাব[৬] হল দুটি বস্তুর মধ্যে তাদাত্ম্য সম্বন্ধের (অভিন্ন সম্বন্ধের) অভাব। অন্নংভট্টের মতে, যে অভাবের প্রতিযোগি তাদাত্ম্য সম্বন্ধের দ্বারা নিষিদ্ধ হয় তাই হল অন্যোন্যাভাব।[৭] আবার বিশ্বনাথ বলেছেন, যে অভাবের প্রতিযোগি তাদাত্ম্য সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়, তাই হল অন্যোন্যাভাব।[৮] অর্থাৎ এইরূপ অভাবের ক্ষেত্রে প্রতিযোগি তাদাত্ম্য সম্বন্ধের দ্বারা নিষিদ্ধ বা অবচ্ছিন্ন হয়। "ঘট পট নয়"— এক্ষেত্রে ঘট ও পটের মধ্যে তাদাত্ম্য সম্বন্ধের অভাবের কথা বলা হয়েছে। তাই ঘটে পটের অভাব হল অন্যোন্যাভাব। কারণ ঘট ও পট দুটি ভিন্ন বস্তু, তাই তাদের মধ্যে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ থাকতে পারে না। এই জন্য ঘট ও পটের মধ্যে তাদাত্ম্য সম্বন্ধের পারস্পরিক অভাব আছে। ঘট হল অনুযোগি এবং পট হল প্রতিযোগি। প্রসঙ্গত এরূপ অভাবের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিটি কি হবে— তা নিয়ে প্রাচীন ও নব্যদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। প্রাচীন মতে অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগি হল তাদাত্ম্য সম্বন্ধ। কিন্তু নব্য মতে অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগি হবে বস্তু, তাদাত্ম্য সমন্ধ নয়। যাইহোক "ঘট পট নয়"— এক্ষেত্রে প্রতিযোগি পট অনুযোগি ঘটে তাদাত্ম্য সম্বন্ধের দ্বারা অবছিন্ন হয়, তাই এই ধরনের অভাব হল অন্যোন্যাভাব। এই অন্যোন্যাভাব অভাব হল এক এবং নিত্য।

সংসর্গাভাব: ন্যায়-বৈশেষিক মতে অন্যোন্যাভাব ভিন্ন অভাব হল সংসর্গাভাব।[৯] একটি বস্তুতে অন্য বস্তুর সংসর্গের[১০] (তাদাত্ম্য সম্বন্ধ ভিন্ন সম্বন্ধ) অভাব হল সংসর্গাভাব। "ঘটে জল নেই", "বায়ুতে রূপ নেই" ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে অভাবের কথা বলা হয় তা হল সংসর্গাভাব। "ঘটে জল নেই" যখন বলা হয় তখন ঘটে জলের সংযোগ তথা সংসর্গের অভাবের কথা বলা হয়, তাই এই ধরনের অভাবকে সংসর্গাভাব বলা হয়। এক কথায় বলতে গেলে কোন কিছুতে অন্য কিছুর অভাব হল সংসর্গাভাব। এই সংসর্গাভাব আবার তিন প্রকার— প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব।

প্রাগভাব: কোন একটি বস্তু উৎপন্ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সেই বস্তুটির যে অভাব তা হল প্রাগভাব।[১১] মৃত্তিকাতে ঘটের অভাবকে প্রাগভাব বলা হয়। ঘট সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে মৃত্তিকাতে ঘট কখনোই থাকে না, তাই মৃত্তিকাতে ঘটের অভাব হল প্রাগভাব। এক্ষেত্রে যে সম্বন্ধের অভাব আছে তা হল সমবায় সম্বন্ধের অভাব। কারণ ঘট মৃত্তিকাতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। প্রাগভাবের উৎপত্তি বা আদি নেই, কিন্তু বিনাশ আছে। ন্যায়-বৈশেষিকরা প্রাগভাবকে যে কোনো কার্যের কারণ বলে স্বীকার করেছেন। যেমন- একটি পট উৎপন্ন হবার পূর্বে, সেই পটের প্রাগভাব সর্বদাই থাকে। কেননা, যা পূর্বে ছিল না তারই উৎপত্তি হয়। সুতরাং কোন একটি কার্যের উৎপত্তির ক্ষেত্রে তার প্রাগভাবের নিয়ত অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হবে। এজন্য যে কোন কার্যের উৎপত্তিতে তার

---

[৬] 'অন্যোন্য' শব্দের অর্থ হল পরস্পর। যে দুটি পদার্থের মধ্যে পরস্পর অভাবের প্রতিযোগি ও অনুযোগি হতে পারে, সেই অভাব অন্যোন্যাভাব।

[৭] তাদাত্ম্যাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাভাবোহন্যোন্যভাবঃ। — অন্নংভট্ট. *তর্কসংগ্রহ.* শ্রী নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী (সম্পাদিত), পৃ. ৬০১.

[৮] ন্যায়-পঞ্চানন, বিশ্বনাথ. *ভাষাপরিচ্ছেদ.* শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তর্কতীর্থ (সম্পাদিত), পৃ. ৪০.

[৯] সংসর্গভাবত্বমন্যোন্যাভাবভিন্নাভাবত্বম্। ন্যায়-পঞ্চানন, বিশ্বনাথ. *ভাষাপরিচ্ছেদ.* শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তর্কতীর্থ (সম্পাদিত), পৃ. ৪০.

[১০] 'সংসৃজ্যতে একং বস্তু অন্যবস্তুনা আশ্রীয়তে যেন স সংসর্গ'। অর্থাৎ যার দ্বারা একটি বস্তু অন্য বস্তুর আশ্রয় হয়, তাকে বলা হয় সংসর্গ; যেমন- সংযোগ, সমবায় ইত্যাদি।

[১১] অনাদিঃ সান্তঃ প্রাগভাবঃ, উৎপত্তেঃ পূর্বং কার্যস্য। অন্নংভট্ট. *তর্কসংগ্রহ.* শ্রী নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী (সম্পাদিত), পৃ. ৬০১.

প্রাগভাবকে কারণ বলা হয়। ন্যায়-বৈশেষিকরা যে কোন কার্যের উৎপত্তিতে তার প্রাগভাবকে কারণ বলে স্বীকার করাই তাঁদের কার্য-কারণ সম্পর্কিত মতবাদ অসৎকার্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ধ্বংসাভাব: কোন একটি উৎপন্ন বস্তু তথা কার্যবস্তু (উৎপন্ন হওয়া মানেই কার্য) ধ্বংস বা বিনাশ হবার পর ওই বস্তুটির যে অভাব শুরু হয় তা হল ধ্বংসাভাব।[১২] যেমন- যখন কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয় তখন জগতে ওই ব্যক্তির যে অভাব অনুভূত হয় তা হল ধ্বংসাভাব। এই ধ্বংসাভাবের শুরু আছে, কেননা একটি বস্তু কোন এক বিশেষ সময়ে বিনাশ বা ধ্বংস হয়। কিন্তু ধ্বংসাভাব অনন্ত অর্থাৎ এর কোন শেষ নেই। কারণ যে বস্তুর বিনাশ হয় তার আর ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে না। আমরা জানি যে, প্রাগভাব তার প্রতিযোগির জনক (কারণ) হয়। কিন্তু ধ্বংসাভাব তার প্রতিযোগির দ্বারা জন্য (উৎপন্ন) হয়। যেমন- পটের বিনষ্ট হওয়ার কারণ পট নিজেই।

অত্যন্তাভাব: কোন একটি বস্তুতে অন্য আরেকটি বস্তুর যে চিরকালীন অভাব তাই হল অত্যন্তাভাব।[১৩] 'অতি' ও 'অন্ত' দুটি শব্দের সমন্বয়ে 'অত্যন্ত' শব্দটি গঠিত হয়। 'অতি' শব্দের অর্থ অতিক্রান্তি। 'অন্ত' শব্দের অর্থ হল অভাব। অর্থাৎ যে অভাবটি নিজের অভাবকে অতিক্রান্ত করেছে তাই হল অত্যন্তাভাব। অন্যভাবে বললে যে অভাবের কোনদিন অভাব হয় না তাই হল অত্যন্তাভাব। "বায়ুতে রূপের অভাব", "জলে গন্ধের অভাব" হল অত্যন্তাভাব। এই অভাবের কোন আদি অথবা অন্ত নেই। এই অভাব হল নিত্য। তাই এই অভাবকে বলা হয় ত্রিকালীন অভাব। কিন্তু সমস্যা হল অনেক ন্যায়-বৈশেষিকগণ, যেমন, অন্নংভট্ট 'বায়ুতে রূপের অভাব' বা 'জলে গন্ধের অভাব' ইত্যাদিকে অত্যন্তাভাব না বলে 'ভূতলে ঘটাভাব'কে অত্যন্তাভাব বলেছেন। কিন্তু 'ভূতলে ঘটাভাব'কে কী করে নিত্য বলা যাবে? কারণ বর্তমানে যে ভূতলে ঘটাভাব আছে, ভবিষ্যতে সেই ভূতলে একটি ঘট আনলে, ঐ ভূতলে আর ঘটাভাব থাকবে না; ফলে ঐ ভূতলে যে ঘটাভাব তাকে নিত্য বলা যাবে না। অভাবটি নিত্য না হলে তাকে অত্যন্তাভাব বলাও যাবে না। এই কারণে কোন কোন ন্যায়-বৈশেষিকগণ তিন প্রকার সংসর্গাভাবের পরিবর্তে চতুর্থ আর এক প্রকার সংসর্গাভাব— সাময়িক অভাবের কথা বলেছেন। 'ভূতলে ঘটাভাব', টেবিলে বইের অভাব হল সাময়িক অভাব।

ভারতীয় দর্শনে ন্যায়-বৈশেষিক ব্যতীত অভাবের আলোচনার স্থান যে সমস্ত দর্শন সম্প্রদায়ের পেয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল মীমাংসা দর্শন।। মীমাংসা দর্শনে মোট তিনটি সম্প্রদায় লক্ষ্য করা যায়— প্রভাকর সম্প্রদায়, ভাট্ট সম্প্রদায় ও মিশ্র সম্প্রদায়। ভাট্ট মীমাংসাগণ অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থ রূপে স্বীকার করেন, কিন্তু প্রভাকর মীমাংসাগণ অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থ রূপে স্বীকার করেন না।

প্রভাকর মীমাংসাগণ অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থ রূপে স্বীকার না করে, অভাবকে অধিকরণ স্বরূপ বলেছেন। "ভূতলে ঘট নেই"— এরূপ জ্ঞানের ক্ষেত্রে চক্ষুর সংযোগের দ্বারা আমরা ভূতল ছাড়া আর কিছুই দেখি না। এই ভূতল হল ভাব পদার্থ, ভূতল ছাড়া ঘটের না থাকার প্রত্যক্ষ হয় না। এই ভূতল হল অধিকরণ। কোন বস্তুর অভাব সব সময় কোনো না কোনো অধিকরণে হয়। তাই অভাবের জ্ঞান যে অধিকরণে হয় অভাব সেই অধিকরণস্বরূপ। ঘটের অভাবকে যখন ভূতল স্বরূপ বলা হয়, তখন অধিকরণে অর্থাৎ ভূতলের তৎকালীন (ঠিক সেই সময়ের) স্বরূপ (যেরূপ আছে) তাকে বুঝতে হবে। "ভূতলে ঘট নেই"— এই জ্ঞানের প্রতীতির যে বিষয় তাহল নাস্তিত্ব তথা অভাব, তা শুধুমাত্র ঘটের সংযোগ না থাকাকালীন ভূতল, তাছাড়া আর কিছুই নয়। তাই এইভাবে অভাবকে বুঝলে অভাবকে অধিকরণস্বরূপ ছাড়া অতিরিক্ত পদার্থ বলে স্বীকার করার কোনো প্রয়োজন নেই।

---

[১২] সাদিরনন্তঃ ধ্বংস উৎপত্ত্যনন্তরং কার্যস্য। তদেব, পৃ. ৬০০

[১৩] ত্রৈকালিকসংসর্গাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকোহত্যন্তাভাব। তদেব, পৃ. ৬০০

ন্যায়-বৈশেষিকগণ উক্ত মতের বিরোধিতা করে বলেন যে— অভাবকে অধিকরণস্বরূপ বললে গৌরব দোষ হবে, কিন্তু যদি অভাবকে অতিরিক্ত পদার্থ বলে স্বীকার করা হয়; তাহলে আর গৌরব দোষ হবে না। কারণ একই অভাব অধিকরণ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন অভাবে পরিণত হবে। অর্থাৎ ঐ একটি অভাব বহু অভাবে পরিণত হবে, ফলে গৌরব দোষ হবে। ঘটাভাবকে অধিকরণস্বরূপ বললে ভূতলে ঘটাভাবকে ভূতলস্বরূপ, টেবিলে ঘটাভাবকে টেবিলস্বরূপ, আকাশে ঘটাভাবকে আকাশস্বরূপ বলতে হবে। ফলে একই ঘটাভাব অধিকরণভেদে বহু তথা অনন্ত অভাবে পরিণত হবে। কিন্তু অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থ বললে আর গৌরব দোষ হবে না। কেননা একই অভাবকে বহু বলে স্বীকার করতে হয় না, বরং বলা যায় যে একই ঘটাভাব ভূতলে আছে, টেবিলে আছে, আকাশে আছে ইত্যাদি। অভাবের নিরূপণের জন্য অধিকরণ অপেক্ষিত হয় ঠিকই, কিন্তু অধিকরণ ভেদে অভাব ভিন্ন হয় না। ঘটাভাব যতগুলি অধিকরণে থাকুক না কেন, ঘটাভাব তো একটিই, বহু নয়।

তাছাড়া অভাবকে অধিকরণ স্বরূপ বললে সার্বজনীন প্রত্যক্ষসিদ্ধ নিয়মটি ব্যাহত হবে। সার্বজনীন প্রত্যক্ষসিদ্ধ নিয়মটি হল— যে পদার্থ বা বস্তু যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয়, তার অভাবও সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়। যেমন ঘটকে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করি তাই, তার অভাবও সেই ইন্দ্রিয় দ্বারাই প্রত্যক্ষ হয়। এখন অভাব যদি অধিকরণস্বরূপ হয় তাহলে বায়ুতে রূপের অভাব বায়ুস্বরূপ হবে। সার্বজনীন প্রত্যক্ষের নিয়ম অনুসারে রূপ চক্ষুরিন্দ্রিয় হওয়ায় রূপাভাবও চক্ষুরিন্দ্রিয় হবে। কিন্তু বায়ু চক্ষুরিন্দ্রিয় নয়, স্পর্শেন্দ্রিয়। ফলে স্পর্শেন্দ্রিয়ের দ্বারা বায়ুস্বরূপ রূপের প্রত্যক্ষ স্বীকার করতে হবে। আর এরূপ প্রত্যক্ষ স্বীকার করলে প্রত্যক্ষের সার্বজনীন নিয়মটি ব্যাহত হবে। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে প্রভাকরের মত অনুযায়ী অভাবকে অধিকরণ স্বরূপ না বলে অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থরূপে স্বীকার করাই শ্রেয়।

আমরা উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানলাম যে প্রভাকর সম্প্রদায় অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থের রূপে স্বীকার করেননি। কিন্তু মীমাংসা দর্শনে অন্য একটি সম্প্রদায় ভাট্ট সম্প্রদায় অভাবকে ন্যায়-বৈশেষিকদের ন্যায় স্বতন্ত্র পদার্থ রূপে স্বীকার করেছেন। কুমারিল ভট্ট তাঁর *শ্লোকবার্তিক* গ্রন্থে অভাবপরিচ্ছেদে 'অভাব'কে স্বতন্ত্র পদার্থরূপে স্বীকার করেছেন। ভাট্ট মতে ভাব পদার্থের ন্যায় অভাব একটি প্রমেয় পদার্থ। ভাট্ট মীমাংসকগণ অভাব পদার্থ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন— "অভাবোহপি প্রমাণাভাবো নাস্তীত্যস্যাসন্নিসৃষ্টস্য" (১/১/৫)।[১৪]— এই শ্লোকটি অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থ রূপে স্বীকার করার প্রমাণ। 'দুধে দধি নেই'- এইরূপ প্রমা জ্ঞানের বিষয়কে প্রাগাভাব বলা হয়েছে। আবার 'দধিতে দুধ নেই'- এই রূপ প্রতীতির বিষয়কে ধ্বংসাভাব বলা হয়েছে। অশ্বতে গরু প্রভৃতির অভাব আছে- এইরূপ জ্ঞানের বিষয়কে অন্যোন্যাভাব বলা হয়েছে।

ন্যায় বৈশেষিকগণ ও ভাট্ট মীমাংসক মতে অভাব হল একটি প্রমেয় পদার্থ অর্থাৎ অভাব জ্ঞানের বিষয় হয়। অন্যভাবে বললে অভাবের জ্ঞান আমাদের হয়। এখন প্রশ্ন হল অভাব জ্ঞানের গ্রাহক কোন প্রমাণকে বলা হবে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ না এদের অতিরিক্ত অন্য কোন প্রমাণ? অন্যভাবে বললে অভাব জ্ঞানের করণ কি? এই প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে ন্যায়-বৈশেষিক ও ভাট্ট মীমাংসকদের মধ্যে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ন্যায়-বৈশেষিক মতে অভাব জ্ঞানের গ্রাহক হল প্রত্যক্ষ বা অনুমান প্রমাণ। আর ভাট্ট মতে অভাব জ্ঞানের গ্রাহক হল অনুপলব্ধি প্রমাণ। প্রসঙ্গত প্রভাকর মীমাংসক অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থরূপে স্বীকার করেন না, তাই অভাব জ্ঞানের গ্রাহক রূপে কোন প্রমাণও স্বীকার করেন না। ভাট্ট মতে যেসকল প্রমাণের দ্বারা ভাবপদার্থের জ্ঞান লব্ধ হয় সেই সকল প্রমাণের দ্বারা অভাবের জ্ঞান কখনোই হতে পারে না। তাঁদের মতে ভাব পদার্থের

[১৪] শবরস্বামী. *শবরভাষ্য.* রত্নগোপাল ভট্ট (সম্পাদিত), পৃ. ৮

গ্রাহক ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণের দ্বারাই অভাবের জ্ঞান হয়। এইজন্য তাঁরা প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ ও অর্থাপত্তি প্রমাণ ভিন্ন অনুপলব্ধি প্রমাণ স্বীকার করেছেন।

ভাট্ট মতে অভাব যেহেতু ভাব পদার্থ নয়, সেজন্য অভাবের সাথে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ হতে পারে না। ভাব পদার্থের সাথে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ হয়। যদি অভাব পদার্থের সাথে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ না হয় তাহলে অভাবের জ্ঞান প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্য হতে পারে না। কারণ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের করণ হল ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ। অভাবের জ্ঞান অনুমান জন্য নয়, কেননা অনুমান প্রমাণ হল পরামর্শজন্য। কিন্তু অভাবের জ্ঞান পরামর্শ জন্য নয়। আবার সাদৃশ্য জ্ঞাননির্ভর না হওয়ায় অভাবের জ্ঞানকে উপমান জন্য উপমিতিও বলা যাবে না। আপ্তব্যক্তির বাক্য থেকে যেহেতু অভাবের জ্ঞান হয় না সেহেতু অভাবের জ্ঞান শাব্দিকও নয়। সুতরাং অভাব জ্ঞানের গ্রাহক রুপে প্রত্যক্ষাদি ভিন্ন অনুপলব্ধি প্রমাণ স্বীকার করতেই হয়।

উপলব্ধির অভাবকে বলা হয় অনুপলব্ধি। কোন বস্তু উপস্থিত থাকলে অন্যান্য সহকারী কারণের সহায়তায় বস্তুটির উপলব্ধি হয়, কিন্তু বস্তুটি অনুপস্থিত থাকলে বা তার অভাব থাকলে সহকারী কারণ নিশ্চয়ের বিদ্যমানতার সত্ত্বেও যদি উপলব্ধি না হয় তাহলে বস্তুটির এইরূপ উপলব্ধির অভাবকে বলা হয় অনুপলব্ধি। কোন বিষয়ের অনুপলব্ধির দ্বারা তার অভাব সিদ্ধ হয়। তবে ভাট্ট মতে যে কোন অনুপলব্ধি অভাব জ্ঞানের গ্রাহক হতে পারে না। যে অনুপলব্ধি যোগ্য সেই অনুপলব্ধি অভাব জ্ঞানের গ্রাহক হতে পারে। অনুপলব্ধি যোগ্য ও অযোগ্য উভয়ই হতে পারে। অন্ধকার কক্ষে ভূতলে ঘটের অনুপলব্ধি যোগ্য অনুপলব্ধি নয়। কোন স্থানে কোন পদার্থের থাকা সত্ত্বেও যদি তার উপলব্ধি না হয় তাহলে সেই অনুপলব্ধি যোগ্যানুপলব্ধি নয়। তাছাড়া তাঁদের মতে অতীন্দ্রিয় পদার্থের যোগ্যানুপলব্ধি হয় না। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন হয় যে যোগ্যানুপলব্ধি কিরূপে সম্ভব হবে? যোগ্যানুপলব্ধি তখনই সম্ভব হবে যখন অভাবের প্রতিযোগির উপলব্ধির সমস্ত অনুকূল শর্তগুলি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও প্রতিযোগির উপলব্ধি না হয়ে অনুপলব্ধি হয়। অভাবের জ্ঞান হতে গেলে তার প্রতিযোগির জ্ঞান তথা উপলব্ধি থাকা প্রয়োজন। কোন প্রতিযোগির উপলব্ধির জন্য অনুকূল শর্ত সমূহ হল— ঐ প্রতিযোগির উপস্থিতি, নৈকট্য, ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ, ইন্দ্রিয়-মন সংযোগ এবং পর্যাপ্ত আলো ইত্যাদি। এই সমস্ত অনুকূল শর্তগুলি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও যদি প্রতিযোগির উপলব্ধি না হয় তাহলে তা হবে যোগ্যানুপলব্ধি। আর এই যোগ্যানুপলব্ধি হল অভাবজ্ঞানের গ্রাহক। যেমন ঘটাভাবের প্রতিযোগি হল ঘট। ঘটের উপলব্ধির অনুকূল শর্তসমূহ হল ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ, আলোক-সংযোগ, চক্ষু-মন সংযোগ ইত্যাদি— থাকা সত্ত্বেও ঘটের উপলব্ধি না হওয়াই হল ঘটের অনুপলব্ধির যোগ্যতা। আর ঘটের এই যোগ্যানুপলব্ধি হল ঘটাভাব জ্ঞানের গ্রাহক।

ন্যায় বৈশেষিকগণ অভাব জ্ঞানের গ্রাহক রূপে অনুপলুব্ধি প্রমাণ স্বীকার করেননি। নৈয়ায়িক মতে প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারাই অভাব জ্ঞানের লব্ধ হয়। অভাব প্রত্যক্ষস্থলে বিশেষ্যতা বা বিশেষণতা নামক সন্নিকর্ষ হয়। নৈয়ায়িকগণ বলেন প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের দ্বারা অভাবের প্রতীতি সম্ভব। যেমন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সন্নিকৃষ্ট বিষয়ের অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মায়, তেমনি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা "এই ভূতলের ঘট নেই"— এইরূপ অভাবের অপরোক্ষ জ্ঞান আমাদের হয়। ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা যেমন ভূতলের জ্ঞান হয়, তেমনি একইভাবে অভাবের জ্ঞানও হয়। যদি বলা হয় যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কেবল ভূতলের জ্ঞান হয়, অভাবের জ্ঞান হয় না; তাহলে ভূতলের জ্ঞানের কোন প্রমাণ থাকবে না। "ঘটাভাববিশিষ্ট ভূতল"- এরূপ জ্ঞানের অভাবের স্থলে ঘটাভাব হল বিশেষণ এবং ভূতল হল বিশেষ্য। বিশিষ্ট জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষণের জ্ঞান পূর্বে হয় এবং বিশেষ্যের জ্ঞান পরে হয়। তাই বিশিষ্ট জ্ঞানের ক্ষেত্রে ভূতলের পূর্বভাবী ঘটজ্ঞানের কোন প্রমাণ নেই। সুতরাং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যেমন ভূতলের প্রত্যক্ষ হয় তেমনি ভূতলের বিশেষণ অভাবেরও প্রত্যক্ষ হয়।

বাচস্পতি মিশ্র অভাব যে প্রত্যক্ষযোগ্য তা প্রমাণ করতে গিয়ে বলেছেন— অভাব কখনো বিশেষণতা বা কখনো বিশেষ্যতা সন্নিকর্ষের দ্বারা জ্ঞাত হয়। "ঘটাভাববৎ ভূতলম"- এর ক্ষেত্রে বিশেষণতা সন্নিকর্ষের দ্বারা অভাবের প্রত্যক্ষ হয়। এখানে ভূতল হল বিশেষ্য ও ঘটাভাব হল তার বিশেষণ। ভূতলের সঙ্গে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগ হলে ভূতলের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়। ঘটাভাব ঐ ভূতলের বিশেষণ এবং বিশেষণতা সন্নিকর্ষে ঘটাভাবটি বিশেষ্য ভূতলের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়। তাই চক্ষুসংযুক্ত বিশেষণতা সন্নিকর্ষের ফলে ঘটাভাবের প্রত্যক্ষ হয়। আবার "ভূতলে ঘটাভাব"- এর ক্ষেত্রে বিশেষ্যতা সন্নিকর্ষের দ্বারা অভাবের প্রত্যক্ষ হয়। এখানে ঘটাভাব হল বিশেষ্য এবং ভূতল হল বিশেষণ। ঘটাভাবের অধিকরণ ভূতলের সঙ্গে প্রথমে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হয়। এবং ঐ ভূতলে ঘটের অভাব বিশেষ্যতা সম্বন্ধে যুক্ত থাকে। ফলে চক্ষুসংযুক্ত বিশেষ্যতা সন্নিকর্ষের দ্বারা ঘটাভাবের প্রত্যক্ষ হয়। তবে উল্লেখ্য যে বিশেষণতা সন্নিকর্ষকে নৈয়ায়িকরা অধিকরণ প্রত্যক্ষে সন্নিকর্ষের ভেদ অনুযায়ী অভাব প্রত্যক্ষে ভিন্ন ভিন্ন বলেছেন। যেমন— সংযুক্ত-বিশেষণতা, সংযুক্ত-সমবেত বিশেষণতা, সংযুক্ত-সমবেত সমবেত বিশেষণতা ইত্যাদি। কেননা নৈয়ায়িকদের মতে অভাবের সাথে অধিকরণের বিশেষ্য-বিশেষণভাব সম্বন্ধ আছে।

ভাট্ট মীমাংসকগণ বলেন, ন্যায়-বৈশেষিকগণরা অনুপলব্ধিকে যে অভাব জ্ঞানের কারণ বলেছেন— তা যুক্তিযুক্ত নয়। বস্তুতপক্ষে অনুপলব্ধি অভাবজ্ঞানের কারণ নয়, করণ। নৈয়ায়িকরা বলেন উন্মীলিত চক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তি চক্ষুর দ্বারা ভূতলে ঘট নেই- তা যেমন জানতে পারে, ঠিক সেইভাবে অন্ধ ব্যক্তি ভূতলে ঘট আছে কি না নেই তা জানতে পারে না। সুতরাং বলতে হয় যে অভাব জ্ঞান হল ইন্দ্রিয়জন্য। এর উত্তরে ভাট্ট মীমাংসকগণ বলেন অধিকরণের জ্ঞান ও প্রতিযোগির স্মরণের পর অভাবের মানস জ্ঞান জন্মায়। যে ব্যক্তির কাছে ভূতল জ্ঞাত হয় সেই ব্যক্তির কাছেই ঘট দৃশ্য হয়, উন্মীলিত চক্ষুবিশিষ্ট অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে নয়। তাই দৃশ্যের অদর্শনের জন্য ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা থাকে, অভাবজ্ঞানের জন্য নয়। তাছাড়া ভাট্ট মীমাংসকগণ বলেছেন যে— নৈয়াকিয়রা যে বিশেষ্য-বিশেষণভাব সন্নিকর্ষের দ্বারা অভাবের প্রত্যক্ষের কথা বলেছেন তা যথার্থ নয়। কারণ বিশেষ্য-বিশেষণভাবকে সন্নিকর্ষ বলা যায় না। 'সন্নিকর্ষ' বলতে 'সম্বন্ধ'কে বোঝায়। তাই সংযোগ সমবায় প্রভৃতি সম্বন্ধ হল সন্নিকর্ষ। কিন্তু বিশেষ্য-বিশেষণভাবকে সম্বন্ধ বলা যায় না। কেননা কোনো দুটি বিষয়ের মধ্যে 'সম্বন্ধ' আছে তখনই বলা যাবে, যখন তিনটি শর্ত পূরণ হবে— ১) সম্বন্ধ দ্বিনিষ্ঠ হবে। ২) সম্বন্ধ যাদের মধ্যে থাকবে, তারা সেই সম্বন্ধ থেকে ভিন্ন হবে। এবং ৩) সম্বন্ধ এক হবে। এই তিনটির মধ্যে যদি কোন একটি না থাকে তাহলে সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না। যেমন- বৃক্ষের সাথে বানরের সংযোগ সম্বন্ধ হয়। এই সংযোগ বৃক্ষ ও বানর উভয়েই আশ্রিত অর্থাৎ দ্বিনিষ্ঠ। বৃক্ষ ও বানর উভয়ই সংযোগ সম্বন্ধ থেকে ভিন্ন। এবং এই সংযোগ একই। তাই বৃক্ষের সাথে বানরের সংযোগটিকে 'সম্বন্ধ' বলা হয়। কিন্তু উক্ত তিনটি শর্ত বা বিষয় বিশেষ্য-বিশেষণভাব সম্বন্ধে থাকে না, তাই বিশেষ্য-বিশেষণভাবকে 'সম্বন্ধ' বলা যায় না। কেননা, বিশেষ্যতা ও বিশেষণতা ভিন্ন হওয়ায় বিশেষ্য-বিশেষণভাব এক হতে পারে না। কারণ বিশেষ্যতা বিশেষ্য থাকে এবং বিশেষণতা বিশেষণে থাকে। আবার বিশেষ্য-বিশেষণতা সম্বন্ধটি বিশেষ্যতা ও বিশেষণতা এই দুটি সম্বন্ধী থেকে ভিন্ন নয়। কেননা বিশেষ্যতা ও বিশেষণতা হল যথাক্রমে বিশেষ্য ও বিশেষণ স্বরূপ। এজন্য ভাট্ট মীমাংসকগণ বলেন যেহেতু বিশেষ্য-বিশেষণ সম্বন্ধ নয় সেহেতু তা অভাবের গ্রাহক হতে পারে না।

এর উত্তরে নৈয়ায়িকগণ বলেন যে— বিশেষ্য-বিশেষণভাব সম্বন্ধ না হলেও বিশেষ্যতা ও বিশেষণতার দ্বারা অভাবের জ্ঞান হতে পারে। তাছাড়া নৈয়ায়িকরা নিজেরাই বিশেষ্য-বিশেষণভাবকে অতিরিক্ত সম্বন্ধ বলেন না, বিশেষ্য-বিশেষণ স্বরূপ বলেন। যে অভাবে বিশেষণতা বা বিশেষ্যতা থাকে সেই অভাবই গৃহীত হয়, অন্য

কোন অভাব গৃহীত হয় না।— এই রূপ স্বীকার করলে অনুপলব্ধি প্রমাণের কোনো প্রয়োজন নেই, বিশেষ্যতা ও বিশেষণতার দ্বারাই অভাবের জ্ঞান হবে।

আচার্য উদয়ন ও অন্নংভট্ট উভয়ই বলেছেন যে— অনুপলব্ধি হল অভাব জ্ঞানের সহকারী কারণ এবং ইন্দ্রিয় হল কারণ। আমরা জানি যে অভাবের জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় এবং অনুপলব্ধি উভয়েই যে কারণ তা অন্বয়-ব্যতিরেক পদ্ধতির দ্বারা জানা যায়। এবং একই সাথে আমরা এটাও জানি যে, ইন্দ্রিয় হল প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কারণ। এখন প্রত্যক্ষকে অভাবজ্ঞানের করণ বলা হয়, তাহলে অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করা প্রয়োজন হয় না। কেননা অভাবের জ্ঞানের ক্ষেত্রে অনুপলব্ধির মতোই ইন্দ্রিয়ও কারণ। সুতরাং অনুপলব্ধি নয়, ইন্দ্রিয় হল অভাব জ্ঞানের গ্রাহক।

এ পর্যন্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে ভারতীয় দর্শনে অভাব পদার্থের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। অভাব পদার্থ সম্বন্ধে ন্যায়-বৈশেষিকগণ ও মীমাংসকদের মতবাদের মধ্যে যেমন কিছু সাদৃশ্য রয়েছে তেমনি আবার মতপার্থক্যও রয়েছে। ন্যায়-বৈশেষিকগণ ও ভাট্ট মীমাংসকগণ অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থ রুপে স্বীকার করেছেন। আবার ন্যায়-বৈশেষিকগণ ও প্রভাকর মীমাংসক অভাবের গ্রাহকরুপে অনুপলব্ধি প্রমাণকে স্বীকার করেননি। তবে ন্যায়-বৈশেষিকগণ ও মীমাংসকদের মধ্যে মতপার্থক্য বেশি পরিলক্ষিত হয়। ন্যায়-বৈশেষিকগণ অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থরুপে স্বীকার করেছে, কিন্তু প্রভাকর মীমাংসক অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থরুপে স্বীকার করেননি। একইভাবে ন্যায়-বৈশেষিকগণ অভাব জ্ঞানের গ্রাহক রূপে প্রত্যক্ষকে প্রমাণ রূপে স্বীকার করেছেন, কিন্তু ভাট্ট মীমাংসকগণ অভাব জ্ঞানের গ্রাহক রুপে অনুপলব্ধিকে প্রমাণ রূপে স্বীকার করেছেন।

এখন প্রশ্ন হল অভাব পদার্থ সম্বন্ধে ন্যায়-বৈশেষিকগণ মতটি গ্রহণযোগ্য না কি মীমাংসকদের মতটি গ্রহণযোগ্য? আমরা জানি ন্যায়-বৈশেষিকগণ প্রমাণসংপ্লবাদী। তাই তাঁরা মনে করেন একই বিষয়কে একাধিক প্রমাণের দ্বারা জানা যায়। এইজন্য অভাবকে কিভাবে জানা যাবে বা অভাবের জ্ঞান কিভাবে হবে— তার আলোচনা করতে গিয়ে ন্যায়-বৈশেষিকগণ বলেন অভাবকে প্রধানত প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা জানা যায়। কিন্তু তাঁরা অভাবকে কখনো অনুমান প্রমাণগ্রাহ্য, আবার কখনো শব্দ প্রমাণ গ্রাহ্য বলেছেন। এমনকি অভাব প্রত্যক্ষে যে বিশেষণতা সন্নিকর্ষের কথা বলা হয়েছে তাও বিভিন্ন প্রকারের। তাঁরা অধিকরণ প্রত্যক্ষে সন্নিকর্ষ ভেদ অনুযায়ী অভাব প্রত্যক্ষে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণতা সন্নিকর্ষ মেনেছেন। সেই ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণতা সন্নিকর্ষ হল— সংযুক্ত-বিশেষণতা, সংযুক্ত সমবেত-বিশেষণতা, সংযুক্ত সমবেত-সমবেত-বিশেষণতা, সমবেত-বিশেষণতা ও সমবেত সমবেত-বিশেষণতা প্রভৃতি। যেমন- "ভূতলে ঘটাভাব" সংযুক্ত-বিশেষণতা, সংখ্যাদিতে রূপাদির অভাব সংযুক্ত সমবেত-বিশেষণতা। অর্থাৎ বলা যায় যে ন্যায়-বৈশেষিকগণ অভাব প্রত্যক্ষে নানা প্রমাণ স্বীকার করেছেন।

মীমাংসাগণ বিশেষত ভাট্ট মীমাংসক অভাবের গ্রাহক রূপে নানা প্রমাণ বা একই প্রমাণের নানা প্রকার স্বীকার করেননি, অভাবের গ্রাহক রুপে একটি প্রমাণ অর্থাৎ অনুপলব্ধি প্রমাণ স্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে অভাব যেহেতু ভাব ভিন্ন পদার্থ, সেহেতু ভাব পদার্থের গ্রাহক প্রমাণগুলি ভিন্ন অন্য একটি প্রমাণ স্বীকার করাই শ্রেয়।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমার কাছে ন্যায়-বৈশেষিকদের তুলনায় ভাট্ট মীমাংসকদের মতটি বেশি গ্রহণীয় ও সহজ সরল বলে মনে হয়েছে।কারণ আমরা জানি জগতের প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। প্রত্যেকটি কার্যের জন্য বিশেষ বিশেষ কারণের ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন পটরূপ কার্যের বিশেষ কারণ হল তন্তু। একইভাবে অভাবের জ্ঞানরূপ (যেহেতু জ্ঞান উৎপন্ন হয়) কার্যেরও একটি বিশেষ কারণ থাকা দরকার। ন্যায়-বৈশেষিকদের মতবাদ মানলে বিশেষ কারণ ব্যবস্থা থাকে না। তাঁদের মতে অভাব কখনো

প্রত্যক্ষযোগ্য কখনো অনুমানযোগ্য আবার কখনো শব্দ প্রমাণযোগ্য। কিন্তু ভাট্ট মীমাংসকদের মতবাদ স্বীকার করলে কোন সমস্যা হয় না। কারণ তাঁরা অভাবের জ্ঞানরূপ কার্যের বিশেষ কারণ রূপে অনুপলব্ধি প্রমাণকে স্বীকার করেছেন। তাছাড়া ন্যায়-বৈশেষিকদের মতবাদ স্বীকার করলে নানা ধরনের অভাবের জ্ঞানের জন্য বিভিন্ন প্রকার বিশেষণতা সন্নিকর্ষ স্বীকার করতে হয়। কিন্তু ভাট্ট মীমাংসকদের মতবাদ স্বীকার করলে নানা ধরনের অভাবের জ্ঞানের জন্য নানা প্রকার সন্নিকর্ষ স্বীকারের প্রয়োজন হয় না, অনুপলব্ধি প্রমাণের দ্বারাই জানা হয়ে যায়। অর্থাৎ একটি বিশেষ প্রমাণের দ্বারাই নানা ধরনের অভাবের জ্ঞান আমাদের হয়। তাই ভাট্ট মীমাংসকদের মতবাদটি বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. Dasgupta, Surendranath. A History of Indian Philosophy (Vol. 1). Motilal Banarsidass Publishing House, Delhi, 2015.

২. Sharma, Chandradhar. A Critical Survey of Indian Philosophy. Motilal Banarsidass Publishing House, Delhi, 1960.

৩. উদয়ানাচার্য। কিরণাবলী। গৌরীনাথ শাস্ত্রী (সম্পাদিত)। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ১৯৯১।

৪. চক্রবর্তী, নিরদবরণ। ভারতীয় দর্শন। দত্ত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৭।

৫. ন্যায়-পঞ্চানন, বিশ্বনাথ। ভাষাপরিচ্ছেদ। শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তর্কতীর্থ (সম্পাদিত)। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, ১৯৮০।

৬. ভট্ট, অন্নং। তর্কসংগ্রহ। শ্রী নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী (সম্পাদিত)। সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ।

৭. ভট্টাচার্য্য, করুণা। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০১৩।

৮. ভট্ট, কুমারিল। শ্লোকবার্তিক। দ্বারিকাদাস (সম্পাদিত)। তারা পাবলিকেশন, বারাণসী, ১৯৭৮।

৯. ভট্ট, নারায়ণ। মানোমেয়দয়ঃ। শ্রী দীননাথ ত্রিপাঠী (সম্পাদিত)। সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা, ১৯৮৯।

১০. মন্ডল, প্রদ্যোত কুমার। ভারতীয় দর্শন। প্রগেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৯.

১১. মহর্ষি, কণাদ। বৈশেষিক সূত্র। মহাদেব গঙ্গাধর বাক্রে (সম্পাদিত)। দ্য গুজরাটী প্রিন্টিং প্রেস, মুম্বাই, ১৯১৩।

১২. মহর্ষি, গৌতম. ন্যায় সূত্র. গঙ্গানাথ ঝা ও ঢুন্ডিরাজ শাস্ত্রী (সম্পাদিত). বিদ্যাবিলাস প্রেস, বেনারস, ১৯২৫.

১৩. মিশ্র, শিবাদিত্য। সপ্তপদার্থী। জয় ভট্টাচার্য্য (সম্পাদিত)। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা, ২০১০।

১৪. শবরস্বামী, শবরভাষ্য। রত্নগোপাল ভট্ট (সম্পাদিত)। বিদ্যাবিলাস প্রেস, বেনারস, ১৯১০।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1410-1416
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.361

‘শালগিরার ডাকে’ উপন্যাসে দিকুদের আশ্রয়দাতা সাঁওতালরা: আদিবাসী ও অ-আদিবাসী মেলবন্ধন

শিবরাম হাঁসদা, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.03.2026; Accepted: 21.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This research paper examines the role of indigenous communities, particularly the Santals, as protectors and providers of refuge to non-tribal populations in Mahasweta Devi’s novel Shalgirar Dake. While pre-Kallol Bengali fiction rarely portrayed the struggles of tribal life, Mahasweta Devi, often regarded as the “Marang Dai” (elder sister) of Adivasis, foregrounds their socio-cultural realities, resilience, and ethical values. The study highlights how Adivasi societies, despite economic hardship, maintained strong communal bonds, self-sufficient village systems, and egalitarian social structures free from rigid caste hierarchies. During the devastating Bargi invasions (1742–1751), widespread violence, plunder, and displacement forced many non-tribal (Diku) communities to flee their homes. In this context, Santal villages emerged as safe havens due to their unity, martial preparedness, and relative autonomy from feudal and colonial control. Mahasweta Devi illustrates that the Santals not only provided shelter to displaced artisans such as blacksmiths, potters, and carpenters but also integrated them into their socio-economic framework by offering land, food, and dignity. This humanitarian inclusiveness transformed Adivasi villages into self-reliant, multi-occupational communities, reducing dependence on external systems. However, the paper also critically explores the long-term consequences of this openness. The gradual infiltration of exploitative non-tribal forces, aided by internal betrayal, led to economic exploitation, imposition of taxes, and eventual marginalization of the Adivasis themselves. This shift culminated in resistance movements led by figures like Tilka Murmu against colonial and feudal oppression. Thus, the paper argues that Adivasi societies, often labeled “primitive,” were in fact deeply humane, organized, and resilient, playing a crucial role as protectors of displaced populations, while simultaneously becoming victims of systemic exploitation.

Keywords: Adivasi, Indigenous communities, Santal, Mahasweta Devi, Shalgirar Dake, Diku, Non-tribal communities, Refuge, Shelter, Bargi Raids, Social structure, Self-sufficient villages, Rebellion, Resistance

কল্লোল যুগের পূর্ববর্তী বাংলা কথাসাহিত্যে আদিবাসীদের জীবনসংগ্রাম তেমনভাবে চিত্রিত না হলেও রবীন্দ্র-উত্তর যুগে যাঁদের প্রচেষ্টায় আদিবাসী জনজীবন ও সংগ্রাম বিশেষভাবে আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে, তাঁদের মধ্যে

অন্যতম হলেন আদিবাসীদের 'মারাং দাই'— অর্থাৎ বড়দিদি— মহাশ্বেতা দেবী। পিতা মনীশ ঘটকের মৃত্যুর পর ১৯৮০ সালে তিনি 'বর্তিকা' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর সম্পাদনায় 'বর্তিকা' ক্রমশ শোষিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত ও দরিদ্র আদিবাসীদের আলোকবর্তিকা হয়ে ওঠে।

মহাশ্বেতা দেবী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের এক অগ্নিগর্ভ সময়ে বড়ো হয়েছেন। তিনি ব্রিটিশদের অত্যাচার, সামাজিক অবক্ষয় এবং দুর্বলের ওপর সবলের শোষণ ও নিপীড়ন প্রত্যক্ষ করেছেন। মেদিনীপুরে বসবাসকালে সেখানকার আদিবাসীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। পরবর্তীতে বাংলা, বিহার, ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সঙ্গেও তাঁর পরিচয় বিস্তৃত হয় এবং তিনি ধীরে ধীরে তাদের পরিবারের 'মারাং দাই' হয়ে ওঠেন।

দীর্ঘদিন আদিবাসীদের সান্নিধ্যে থেকে তিনি তাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পাশাপাশি সমকালীন জীবনযাত্রা সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ করেন। এই তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে তিনি উপলব্ধি করেন যে, পরিবারকে টিকিয়ে রাখার কঠোর সংগ্রামের মতোই নিজেদের সমাজ ও অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়েও আদিবাসীরা ছিল ঐক্যবদ্ধ। এই সংগ্রামে যাঁদের বীরত্বে দিকু ও ইংরেজরা ভীত হয়ে পড়েছিল— সেই তিলকা, সিধু, কানু, চাঁদ ও ভৈরবের কথা সাহিত্যজগতে প্রায় অচর্চিত ছিল।

এছাড়াও সাঁওতালসহ অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সহানুভূতি ও মমত্ববোধ সম্পর্কেও সুশীল সমাজের অধিকাংশই ছিল অজ্ঞাত। সাঁওতাল, মুণ্ডা, পাহাড়িয়া প্রভৃতি জনজাতির অজানা জীবন ও বাস্তবতাকে তাঁর কথাসাহিত্যে তুলে ধরে মহাশ্বেতা দেবী তা এক বৃহৎ পাঠকসমাজের কাছে পৌঁছে দেন।

প্রাক-আর্য যুগ থেকেই বর্তমান বাংলা, বিহার, ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ডসহ ভারতের বিভিন্ন পাহাড়ি ও অরণ্যাঞ্চলে আদিবাসীদের বসবাস রয়েছে। 'আদিবাসী' বলতে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের আদি বাসিন্দাদের বোঝায়। নানা অভাব-অনটনের মধ্যেও আদিবাসীরা তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য, সামাজিক রীতিনীতি, পরিকাঠামো, শাসনব্যবস্থা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল। তারা সাধারণত নির্দিষ্ট অঞ্চলে জোটবদ্ধভাবে বসবাস করে।

ভারতবর্ষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আদিবাসী জনগোষ্ঠী রয়েছে। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর বিখ্যাত 'শালগিরার ডাকে' উপন্যাসে সাঁওতাল, পাহাড়িয়া ও মালপাহাড়িয়া জনজাতির কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি তাদের বাসস্থান সম্পর্কে বলেছেন যে, এরা ভাগীরথীর পশ্চিম প্রান্তে রাজমহল থেকে হাজারীবাগ ও মুঙ্গের পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে, উত্তরে ভাগলপুর থেকে দক্ষিণে রাঢ়বঙ্গের বীরভূম, বর্ধমান ও বাঁকুড়া এবং পশ্চিমে মেদিনীপুর থেকে ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ পর্যন্ত বন-জঙ্গল ও পাহাড়ি এলাকায় বসবাস করে।

ভারতের আদিবাসীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাঁওতালরা জঙ্গলের গাছ কেটে উঁচু-নিচু জমিকে চাষযোগ্য করে ধান, ডাল, সর্ষে ইত্যাদি চাষ করে। অন্যদিকে পাহাড়িয়া ও মালপাহাড়িয়ারা জঙ্গলে আগুন জ্বালিয়ে জুম চাষের মাধ্যমে কৃষিকাজ করে। রাত্রিকালীন অরণ্যের গভীর অন্ধকার দূর করতে তারা মহুয়া তেলের প্রদীপ ব্যবহার করে, যা তাদের প্রধান আলোর উৎস।

প্রাচীনকাল থেকেই তারা তথাকথিত সভ্য সমাজের বাইরে প্রান্তিক জীবনযাপন করে আসছে। সভ্য সমাজের কাছে তারা নিম্নবর্গ বা প্রান্তিক বলে বিবেচিত হলেও, তারা নিজেদের রীতিনীতি ও শাসনব্যবস্থার প্রতি অত্যন্ত অনুগত ছিল। সাঁওতাল সমাজে গ্রামের প্রধান 'মাঝি বাবা'-র নির্দেশ ছাড়া কোনো কাজ করা হতো না। এই শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাত্রার কারণেই তারা ঐক্যবদ্ধভাবে বসবাস করতে সক্ষম হয়েছে।

মহাশ্বেতা দেবীর মতে, এই আদিবাসীরা সবসময় তথাকথিত সভ্য 'দিকু' সমাজ থেকে দূরত্ব বজায় রাখত। কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় সামগ্রী— যেমন লবণ, কার্পাস বা নারীদের সাজসজ্জার জিনিসপত্র—কেনার জন্য গ্রামের

পুরুষেরা দূরের হাটে যেত। বাড়ির মহিলারা কার্পাসের সুতো দিয়ে নিজেদের কাপড় বুনে নিত। এভাবেই তারা দিকু সমাজের সঙ্গে সীমিত যোগাযোগ রেখে নিজেদের স্বতন্ত্র জীবনধারা বজায় রাখত। অন্যদিকে 'দিকু' বা অ-আদিবাসীরাও তাদের নিম্নজাত বা অসভ্য মনে করে সংস্পর্শ এড়িয়ে চলত। ফলে অরণ্যবাসী এই আদিবাসীরা বাইরের জগতের পরিস্থিতি সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবেই অজ্ঞাত রয়ে যেত। তাই মহাশ্বেতা দেবী তাঁর 'শালগিরার ডাকে' উপন্যাসের শুরুতেই বলেছেন,

> "১৭৫০ সালে দেশের অবস্থা কেমন ছিল তার কিছু জানত না ভাগলপুর থেকে রাজমহল অবধি জঙ্গল এলাকার মানুষরা। তারা সাঁওতাল, তারা পাহাড়িয়া, তারা মালপাহাড়িয়া।... তখনো সাঁওতাল পরগণা, দামিন-ই-কোহ নামগুলি অজানা। বর্গী ফৌজের বারবার হানাদারিতে বিপর্যস্ত বাংলা সুবা। কিন্তু কে তার খবর রাখে? সাঁওতালরা রাখত না, পাহাড়িয়ারা রাখত না, মালপাহাড়িয়ারা রাখত না।"[১]

ঔপন্যাসিক মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসীদের জীবনচর্যা উল্লেখ করতে গিয়ে বারবার বলেছেন, তারা মূলত নিজস্ব সমাজকেন্দ্রিক জীবনযাপন করে। তাদের মধ্যে বাহ্যিক লোভ, লালসা বা রাজনৈতিক অভিসন্ধি নেই। তারা নিজেদের সামাজিক পরিকাঠামো ও শাসনব্যবস্থাকে মান্যতা দিয়েই জীবনযাপন করে। তাই তারা সমাজের নিয়মের বাইরে যেতে চায় না। সাঁওতালদের কাছে গ্রামের মোড়ল বা মাঝি বাবা সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। উপন্যাসটিতে সাঁওতাল গ্রামের মোড়ল হলেন সুন্দ্রার বাবা। গ্রামের মোড়লের দায়িত্ব হলো গ্রামের নিয়ম-শৃঙ্খলা, রীতিনীতি ও সংস্কৃতি রক্ষা করা এবং প্রতিটি পরিবারের উন্নয়ন ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা। নিজ গ্রামের নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি, গ্রামবাসীরা যাতে অন্য গ্রামের নিয়ম-শৃঙ্খলায় ব্যাঘাত না ঘটায়, সেদিকেও তারা নজর রাখে। ঘটনাক্রমে এমন কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে, প্রতিবেশী আদিবাসী গ্রামের মোড়লদের সঙ্গে 'কুলহি দুড়ুপ' বা আলোচনা সভা ডেকে সমস্যার সমাধান করা হয়। মোড়লদের কাছে জাতপাতের চেয়ে দোষ-গুণের বিচারই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাই পাহাড়ের গায়ে থাকা পাহাড়িয়া আর মালপাহাড়িয়াদের শীতের মাঘী অমাবসায় পরব চলাকালীন সুন্দ্রার মালপাহাড়িয়া গ্রামে যাওয়ার খবর শুনেই গ্রামের মোড়ল তথা সুন্দ্রার বাবা সুন্দ্রাকে ধমক দিয়েছিল,

> "... মালপাহাড়িয়ারা পরব করছে নিজের মনে। গাঁয়ে সবাই ভাল থাকবে, তাতে গাঁওলি সাত বোন দেবতার পূজা করছে। আমাদের আখন পরব, সারজোম বাহা পরবে তারা আসে? নিজের মনে পরব পূজা করবে মানুষ, তুই অমনি কাঁড় ধনুক নিয়ে সেথা হাজির। যে যার গোতে থাকে, পরবে থাকে, গাঁয়ে থাকে, পরবে দোষও লেগে যায় বা-বাতাসে—এমন কাজ করতে নাই।"[২]

ঔপন্যাসিক মহাশ্বেতা দেবী শুরুতেই বলেছেন, সাঁওতালরা কৃষিকাজ করে। কিন্তু কৃষিকাজে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি— যেমন নাহেল (লাঙ্গল), কুডি (কোদাল), টাংগা (কুড়াল)— মেরামত করার দক্ষতা তাদের ছিল না। তাই চাষের কাজে ব্যাঘাত দূর করার উদ্দেশ্যে সাঁওতালরা গ্রামের এক প্রান্তে বসত জমি দিয়ে, ধান, চাল, চিড়ে, মুড়ি প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদান করে এক কামার পরিবারের বসবাসের ব্যবস্থা করে। দরিদ্র কামার পরিবারটি অন্যত্র যে পারিশ্রমিক পেত, তার তুলনায় অনেক বেশি অবহেলিত হতো। কিন্তু সাঁওতাল গ্রামে তারা বসত জমি, ধান, চাল, চিড়ে, মুড়ি, গোরু ইত্যাদি সাংসারিক সামগ্রীর পাশাপাশি বিশেষ সম্মানও পায়। এই পরিস্থিতি দেখে দিনমণি কামার বিস্মিত হয়। সে তার ভাই রতনমণিকে বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করে,

> "জাতপাত নেই, এরা কি মানুষ?"[৩]

এই তথাকথিত 'অসভ্য' সাঁওতাল সমাজ যে অ-আদিবাসী কর্মকারদের আশ্রয়দাতা হয়ে উঠেছে, তার প্রমাণ মেলে দিনমণির ভাই রতনমণির উক্তিতে—

> "জাতপাতে কি করে? না জেনে মুচির অন্ন খেলাম, তা বলে বিপদে পড়লে নিয়ম খাটে না। তাতে অমন লাঞ্ছনা করল? ধান পাচ্ছ, চাল পাচ্ছ, ডোল ভরা চিড়ে, মুড়ি, জীবনে এত দেখেছ?"[৪]

সাঁওতালরা শুধু অ-আদিবাসীদের আশ্রয়ই দেয়নি, তাদের সঙ্গে কুটুম্ব বা আত্মীয়ের মতো আচরণ করেছে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় দিনমণি ও রতনমণির স্ত্রীর কথায়—

> "কামার, সে লোহার কাজ করে। তীরের ফলা, বর্শা, সড়কির ফলা। কোদাল, কুড়াল, কাস্তে, দা, নিড়ানি। এমন দরকারের কাজ যে করে তার সম্মান কত। দুধ, মাছ, দই, মাংস, যার যার ঘরের জিনিস এনে দিয়ে যায়। জমিতে লাউ, কুমড়ো, বেগুন, কচু, লঙ্কা আছে নাও। গরু রাখতে চাও, রাখো। ধানের জমি? সেও ওরাই পালা করে শ্রম দিতে যায় মেয়ে-পুরুষ। এত সুখ পায় কে?"[৫]

উপন্যাসে দেখা যায়, সাঁওতালরা নিজেদের গ্রামকে স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভর করে তুলতে বিভিন্ন পেশার মানুষকে গ্রামে বসবাসের অনুমতি দেয়। এর ফলে গ্রামের এক প্রান্তে দরিদ্র নাপিত, ছুতোর, ধোপা, কুমোরসহ নানা পেশার মানুষের বসতি গড়ে ওঠে এবং তাদের প্রয়োজনীয় সুবিধাও প্রদান করা হয়। এতে সাঁওতালদের অ-আদিবাসী 'দিকু' গ্রামের উপর নির্ভরশীলতা যেমন কমে, তেমনি অ-আদিবাসী বিভিন্ন পেশার মানুষও সাঁওতাল গ্রামে আশ্রয় নিতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। ফলে আদিবাসীরা অ-আদিবাসীদের আশ্রয়দাতায় পরিণত হয়। আজও বহু বড় সাঁওতাল গ্রামের এক প্রান্তে কামারশালা দেখা যায়।

মহাশ্বেতা দেবী এই উপন্যাসে এমন এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন, যা বাংলার সামগ্রিক সামাজিক কাঠামোকে আমূল পরিবর্তন করেছিল। যে সময়ে সমাজের সামাজিক পরিকাঠামো ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল, সেই বর্গী আক্রমণের প্রেক্ষাপটে তিনি দেখিয়েছেন— কীভাবে আদিবাসীদের উপর অ-আদিবাসী 'দিকু'রা নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং তাদের আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হয়। এই বিষয়টি 'শালগিরার ডাকে' উপন্যাসে তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন।

বর্গী বলতে মারাঠা রাজার নেতৃত্বাধীন অশ্বারোহী লুটেরাদের দলকে বোঝায়। 'বর্গী' শব্দটি মারাঠি 'বারগির' শব্দ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ নিয়োগকর্তার দেওয়া ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করা বিশেষ ধরনের সৈনিক। আনুমানিক ১৭৪২ থেকে ১৭৫১ সাল পর্যন্ত প্রায় দশ বছর ধরে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে তারা অত্যাচার, লুটপাট, গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া এবং হত্যাযজ্ঞ চালায়। বাংলায় এই বর্গী আক্রমণের প্রভাব এতটাই গভীর ছিল যে, এর ভয়াবহ স্মৃতি লোকছড়ার আকারে আজও প্রচলিত— "বর্গী এলো দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেবো কিসে?" এই বর্গী দল বাংলার জমিদার ও নবাবদের ধনসম্পদ লুঠ করার উদ্দেশ্যে সুদূর পথ অতিক্রম করে আসত। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর 'শালগিরার ডাকে' উপন্যাসে দেখিয়েছেন, বর্গীরা মুর্শিদাবাদ লুঠ করতে এসেছিল। তারা মুর্শিদাবাদসহ বিভিন্ন স্থানে ধান লুঠ, অগ্নিসংযোগ এবং নারীদের উপর নির্মম নির্যাতনের মতো অমানবিক অত্যাচার চালায়। বর্গীদের এই অত্যাচার থেকে বাঁচতে সাধারণ মানুষ গ্রাম ছেড়ে পালাতে থাকে। অনেকে ভাগীরথী ও পদ্মা নদী পেরিয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে পালিয়ে যায়, কারণ বর্গীরা অশ্বারোহী হওয়ায় তারা সাধারণত ঘোড়া থেকে নামত না।

মহাশ্বেতা দেবী কবিতার আকারে এই ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন—

"গন্ধবণিক পলায় দোকান লইয়া যত।
তামা পিতল লইয়া কাঁসারি
পলায় কত।
কামার কুমার পলায় লইয়া চাক নড়ি
জাউলা মাউছা পলায় লইয়া
জাল দড়ি॥
ছোট বড় গ্রামে যত লোক ছিল
বরগির ভয়ে সব পলাইল।
চাইর দিগে লোক পলায় ঠাঁই ঠাঁই।
ছত্রিশ বর্ণের লোক পলায় তার অন্ত
নাই।।"[৬]

ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন, বর্গীদের অত্যাচারের ফলে ছত্রিশ বর্ণের মানুষ স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হয়। মূলত নিজেদের গ্রামে বর্গী আক্রমণের কারণেই তারা পালাতে বাধ্য হয়েছিল। তবে কিছু পরিবার নদী পেরিয়ে পালাতে পারেনি; তারা আশ্রয় নেয় জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত আদিবাসী সাঁওতাল গ্রামগুলোতে। এর প্রধান কারণ ছিল, আদিবাসীরা তীর-ধনুক হাতে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম। তাদের মধ্যে জাতপাতহীন একতা ছিল, যা অন্যায় অত্যাচার প্রতিরোধে যথেষ্ট কার্যকর। ফলে বর্গী আক্রমণ ও জাতপাতের বৈষম্য থেকে বাঁচতে বহু 'দিকু' সম্প্রদায় সাঁওতাল গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু বর্গী আক্রমণ দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকায় কামার, কুমোর, ছুতোর, তেলি প্রভৃতি পেশার বহু মানুষ সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। আদিবাসীরা সাধারণত অ-আদিবাসীদের নিজেদের গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে দিত না; তবে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মানবিকতার খাতিরে তাদের আশ্রয় দেয়। এই অ-আদিবাসীরা শুধু আশ্রয়ই গ্রহণ করেনি, বরং সাঁওতালদের কাছ থেকে নানা সুযোগ-সুবিধাও পেতে থাকে। মহাশ্বেতা দেবী আশ্রয়গ্রহীতাদের উদ্দেশ্যে আদিবাসী সাঁওতালদের বিশেষ শর্তের কথা বলেছেন—

> "বর্গীর হাঙ্গামা চলতে চলতেই জঙ্গল এলাকার গ্রামগুলিতে এল বাইরে থেকে অন্য সমাজ। এসো থাকো, জমি হাসিল কর কিছু। কিন্তু গ্রামে গ্রামে আমাদের সমাজপতিদের শাসন মানতে হবে। বেইমানি নয়, বিবাদ নয়, মিথ্যা কথা নয়।"[৭]

বর্গী আক্রমণের ফলে সহায়-সম্বলহীন অসহায় কামার, কুমোর, ছুতোরসহ অন্যান্য 'দিকু'রা আদিবাসী গ্রামকেই সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় বলে মনে করে। বর্গীরা সাধারণত আদিবাসী গ্রামে আক্রমণ চালাতে সাহস পেত না; ফলে দিকুরা বর্গী আক্রমণের বিপদ থেকে রক্ষা পায়। পাশাপাশি আদিবাসী গ্রামে বসবাসের ফলে তারা খামারে ধান, গোয়ালে গরু প্রভৃতি সুবিধাও লাভ করে— যা মূলত সাঁওতালদের দেওয়া।

আদিবাসী সাঁওতালরা কোনো জমিদার বা সুবাদারকে কর প্রদান করত না; বরং জমিদার ও সুবাদাররাই দুর্গাপুজোর সময় সাঁওতালদের ফল, মিষ্টান্ন, কাপড়, পাগড়ি ইত্যাদি উপহার পাঠিয়ে সম্মান জানাত। রাজা ও জমিদারেরাও সাঁওতালদের বীরত্ব ও ঐক্যবদ্ধতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল এবং তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখত। তাই করমুক্ত ও অত্যাচারমুক্ত এই অঞ্চল উদ্বাস্তু দিকুদের কাছে নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে।

আদিবাসীরা, বিশেষ করে সাঁওতালরা, সাধারণত সহজ-সরল প্রকৃতির এবং অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ায়। তারা সহজেই মানুষকে বিশ্বাস করে, ফলে অচেনা দিকুদেরও নিজেদের গ্রামে আশ্রয় দিয়েছিল। কিন্তু পাহাড়িয়ারা নিজেদের নিরাপত্তার কথা ভেবে অচেনা কাউকে আশ্রয় দিত না। তারা মিথ্যা ও বিশ্বাসঘাতকতা

সহ্য করতে পারত না। তাই তাদের গ্রামে অপরিচিত দিনমণির অনুপ্রবেশকে প্রথমে ক্ষমা করলেও, তার বিশ্বাসঘাতকতাকে ক্ষমা করেনি; বর্গীদের সঙ্গে অর্থের বিনিময়ে সহযোগিতার কথা জানতে পেরে তারা তাকে হত্যা করে। তাদের কাছে গ্রামের নিরাপত্তাই সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ।

অন্যদিকে, সাঁওতালদের কাছেও গ্রামের সুরক্ষা সর্বোপরি হলেও তারা মানসিকভাবে অত্যন্ত সহজ, সরল ও উদার। এই কারণেই তারা অসহায় দিকুদের আশ্রয়দাতা হয়ে ওঠে। তারা দিকুদের নবান্ন, পৌষ পার্বণ, মনসা পূজার মতো উৎসব গ্রামে পালনের অনুমতি দেয় এবং নিজেরাও সেইসব উৎসবে অংশগ্রহণ করে। এর ফলে ধীরে ধীরে সাঁওতাল গ্রামের সামাজিক পরিকাঠামো পরিবর্তিত হতে শুরু করে।

মহাশ্বেতা দেবী এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন, সাঁওতালরা তথাকথিত 'অসভ্য' হলেও প্রকৃতপক্ষে তারা অত্যন্ত উদার। কিন্তু এই সহজ-সরল উদারতার সুযোগ নিয়েই পরবর্তীতে সাঁওতাল গ্রামে দিকুদের আধিপত্য বিস্তার ঘটে এবং ধীরে ধীরে সাঁওতালদের ওপর শাসন, শোষণ ও অত্যাচার শুরু হয়। দিনমণির মতো কিছু আশ্রয়গ্রহীতা অর্থলোভে জমিদার, সুবাদার ও মহাজনদের সাঁওতাল গ্রামে প্রবেশ ও শাসন প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দেয়। এর ফলে সাঁওতালরা অতিরিক্ত করের বোঝায় ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের ওপর নির্মম শাসন ও শোষণ চলতে থাকে। একসময় যাদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল, সেই দিকুদেরই একটি অংশ অর্থলোভে সাঁওতালদের ভিটেমাটি ছাড়া করতে উদ্যোগী হয়। এরই পরিণতিতে বিক্ষুব্ধ সাঁওতালরা সুন্দ্রা মুরমুর বীর সন্তান তিলকা মুরমু (তিলকা মাঝি)-এর নেতৃত্বে দিকু ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে প্রথম গণবিদ্রোহ সংঘটিত করে।

মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যকর্ম, বিশেষ করে 'শালগিরার ডাকে', আমাদের কাছে আদিবাসী সমাজের জীবন, সংগ্রাম ও সংস্কৃতিকে জীবন্তভাবে তুলে ধরেছে। তিনি দেখিয়েছেন যে, প্রাচীন ও প্রান্তিক হলেও আদিবাসীরা— বিশেষ করে সাঁওতাল, পাহাড়িয়া ও মালপাহাড়িয়া— নিজেদের সমাজকেন্দ্রিক, ঐক্যবদ্ধ ও নৈতিক জীবনে অটল। বর্গী আক্রমণ, দিকু সমাজের প্রভাব, ব্রিটিশ শাসনকালীন অবক্ষয় ও অন্যান্য রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেও তারা নিজেদের সংস্কৃতি, সামাজিক নিয়মকানুন, শৃঙ্খলা এবং স্বশাসন রক্ষা করতে সচেষ্ট ছিল। এই উপন্যাসে মহাশ্বেতা দেবী দেখিয়েছেন যে, আদিবাসীরা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের জন্য নয়, বরং তাদের পুরো সমাজকে রক্ষা করতে ঐক্যবদ্ধ ছিল।

উপন্যাসে বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, সাঁওতালরা অ-আদিবাসীদের আশ্রয়দাতা হিসেবে মানবিকতা ও উদারতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বর্গী আক্রমণের সময় অসহায় ও নিরাপত্তাহীন দিকু বা অ-আদিবাসীরা তাদের গ্রামে আশ্রয় নেয়। সাঁওতালরা কেবল আশ্রয়ই দেয়নি, বরং খাদ্য, বাসস্থান এবং গ্রামসমাজে অংশগ্রহণের সুযোগও প্রদান করেছে। তারা সামাজিক নিয়ম মেনে চলার শর্তে এই আশ্রয় প্রদান করত, ফলে বিপদের সময় অ-আদিবাসীরা তাদের নির্ভরশীল হয়ে উঠতে বাধ্য হয়। এই প্রক্রিয়ায় সাঁওতালরা মানবিকতা, উদারতা এবং সমাজকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক হিসেবে প্রকাশ পায়। এছাড়া, গ্রামের সুরক্ষা ও ঐক্য রক্ষার জন্য তারা প্রতিটি পরিবারের এবং গ্রামের স্বার্থকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করত। ফলে, সাঁওতালরা তাদের নিজস্ব শক্তিশালী সামাজিক কাঠামো বজায় রেখে বিপদাপন্ন অসহায়দের রক্ষা করত এবং সমাজে ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠা করত।

মহাশ্বেতা দেবী শুধু আদিবাসীদের সংগ্রাম এবং বীরত্বের ইতিহাস উদ্ভাসিত করেননি, বরং সাধারণ পাঠককে দেখিয়েছেন কিভাবে তারা মানবিক সহমর্মিতা, উদারতা, এবং আত্মনির্ভরতার মাধ্যমে সমাজের ক্রমবিকৃত পরিস্থিতিতেও স্থিতিশীলতা বজায় রাখে। তিনি তাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, এবং সামাজিক বন্ধনকে

জীবন্তভাবে তুলে ধরেছেন, যা ইতিহাস ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেছে। মহাশ্বেতা দেবীর লেখা কেবল আদিবাসীদের জীবনচর্যার চিত্রায়ন নয়, বরং তাদের ঐক্য, সংগ্রাম, ন্যায়পরায়ণতা এবং বিপদের সময় অসহায়দের আশ্রয়দানের মানবিকতাকেও প্রতিফলিত করে। এটি বাংলা কথাসাহিত্যে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, যা সামাজিক সচেতনতা, নৈতিকতা এবং মানবিক মূল্যবোধের গুরুত্ব পাঠকসমাজের কাছে প্রতিস্থাপন করেছে। আদিবাসীদের এই আত্মনির্ভরশীল এবং মানবিক চরিত্র সমাজ ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে চিরন্তন শিক্ষার উৎস হয়ে থাকবে।

তথ্যসূত্র:

১। দেবী, মহাশ্বেতা। শালগিরার ডাকে। করুণা প্রকাশনী, অগ্রহায়ণ ১৩৪১, পৃ. ১।
২। তদেব, পৃ. ২।
৩। তদেব, পৃ. ৫।
৪। তদেব, পৃ. ৫।
৫। তদেব, পৃ. ৫।
৬। তদেব, পৃ. ১৪।
৭। তদেব, পৃ. ১৫।

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1417-1426
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.362

মতি নন্দীর ‘শবাগার’: সত্তরের উত্তাপদগ্ধ আবর্তে অবক্ষয়ী মন ও হিমশীতল মৃত্যুভয়ের ঊর্ধ্বগামী পারদ

মহেন্দ্র নাথ পাল, গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ

Received: 20.03.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The 1970s marked a period of terrifying, turbulent deadlock in the heart of Bengal. On one side stood fierce resistance; on the other, retaliatory repression. Caught in this turbulent vortex of the Naxalite era, human lives drifted like mere straws in the current. The complacent slumber of the mind and consciousness was shattered. The veneer of values—which had, until then, clung fast to human existence—began to crumble away. A chilling fear of death constantly encroached upon and consumed the very last frontiers of human consciousness. As one struggled to cut through the silt of that worm-eaten era, the decay of the human psyche emerged as the sole, undeniable truth. In a single instant, the edifice of familiar human relationships came crashing down in ruins; for when the mind plunges into the very depths of darkness, one no longer feels any imperative to preserve anything at all. Moti Nandi's short story, **'Shabagar'** is a harrowing narrative of just such a decaying psyche and the terror born of a chilling fear of death. It is a tale set in the cremation ground of the 1970s, where families stood amidst the ashes, engaging in a macabre ritual of living alongside the dead. As people carried the contagion of this terror, and as the primal instincts—hitherto lurking in the shadows of human nature—crawled out into the open, the responsibility to uphold moral values ceased to exist for anyone. A son's overwhelming revulsion toward his father—stripping away the veneer of middle-class morality—drove the father to engage in unbridled, anarchic behavior. Thus, in those turbulent times, the worm-eaten psyche poisoned every established convention. All notions of morality and ethical values were rendered utterly trivial. Consequently, the son's contemptuous attitude toward his father burst forth into the open. And in the wake of this breakdown, the father's own primal instincts—long dormant in the recesses of his mind—surged forth like a river bursting its banks, transgressing every boundary of decency and propriety to find a stage for their unbridled gratification. **'Shabagar'** stands as a faithful chronicle of that turbulent era and the conflicted psychological landscape that defined it.

Keywords: The Turbulent Decade of the Seventies, The Fear of Death, Moral Conventions, Shattered Values, A Psychology of Decay, Latent Primal Instincts, The Chemistry of the Father-Son Relationship.

বাংলার রাজনৈতিক ইতিকথায় সত্তরের দশক মানেই এক উত্তপ্ত আগ্নেয়বলয়। সত্তরের আর্থসামাজিক যাপনচিত্র পরিণত হচ্ছিল এক মৃত্যুশীতল শবাগারে। যে যুগে ক্রমশই ঊর্ধ্বমুখী হয়ে উঠছিল রাজনৈতিক উত্তেজনা ও চাপান-উতোরের পারদ। আর তা-ই ত্রস্ত ও ভীত করে তুলছিল সাধারণ জনজীবনকে। এমনই এক বিধ্বস্ত সময়ের পটভূমিকায় চলছিল পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি জাতির অতন্দ্র দিনযাপন। নকশালের সেই উত্তাল, অস্থির ও অগ্নিগর্ভ সময়চর্যায় মানবজীবনের স্থিতিসাধনার কোনো উপক্রম ছিল না। সত্তরের বাঙালি সাক্ষ্য থেকেছে সেই রক্তক্ষয়ী আলোড়নের। মানুষকে ক্রমশ পিছু ধাওয়া করে বেড়াচ্ছিল মৃত্যুভয় ও সংশয়। প্রতিটি চোখেই তখন অবিশ্বাসের দৃষ্টি। পাড়ার গলিতে-গলিতে, মোড়ে-মোড়ে ঘোরে মরণের হাতছানি। বিপর্যস্ত, আলোড়িত সেই সময়ের আবর্তে ধ্বসে পড়ল সমাজের অতীত কাঠামোগুলো। ধাক্কা খেল মধ্যবিত্ত মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ। বিপন্ন সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে অবক্ষয়ী মন নিয়ে মানুষ আত্মযন্ত্রণায় কাতর। মানুষের মনেও সংক্রমিত হয় দুরন্ত ক্যানসার। খসে পড়ে সামাজিক সংস্কার ও মূল্যবোধের আঁটোসাঁটো পলেস্তারা। ভেঙে পড়ে এতদিনের পারিবারিক ও ব্যক্তিসম্পর্কের কাঠামোর ভিতগুলি। তীব্র মনস্তাত্ত্বিক যন্ত্রণা থেকে মানবমন শামিল হয় অস্তিত্ব সংকটের মুখোমুখি। জীবনানন্দও যেমন তাঁর 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যগ্রন্থের 'জীবন' কবিতায় লিখেছিলেন –

> "যক্ষ্মার রোগীর মত ধুঁকে মরে মানুষের মন!-
> জীবনের চেয়ে সুস্থ মানুষের নিভৃত মরণ !
> মরণ, - সে ভালো এই অন্ধকার সমুদ্রের পাশে !
> বাঁচিয়া থাকিতে যারা হিঁচড়ায় করে প্রাণপণ, - "[১]

সত্তরের সেই ভয়ংকর সময়ও মানুষের মনের অপমৃত্যু ঘটিয়েছিল। শারীরিক মৃত্যুর চেয়ে যে যন্ত্রণা ছিল আরও ভয়াবহ। নকশালযুগের সেই বিপন্ন সময় ও মানুষের কর্কটাক্রান্ত অবক্ষয়ী মনকেই সাহিত্যের উপকরণ হিসাবে তুলে এনেছেন সেদিনের বহু কথাসাহিত্যিক। উত্তাল ষাট-সত্তরের বিধ্বস্ত ভগ্নস্তূপে দাঁড়িয়ে সাহিত্যিকরা যেন ইতিকথার অক্ষর রচনা করেন। আর সময়ের আবর্তে মানুষের ভাঙাচোরা মনের যন্ত্রণা ও অবক্ষয়কেই সামাজিক-পারিবারিক যাপনচিত্রে রূপ দিতে চান সমকালীন সাহিত্যিকরা। রক্তাক্ত ইতিহাস তখন সাহিত্যের ফলকে শৈল্পিক রূপ পায়। ষাট-সত্তরের নকশালপর্বের সেই উত্তাল আগুন এইভাবে রূপ পেয়েছে প্রাবন্ধিক অমলেন্দু সেনগুপ্তের কলমে–

> "কোনো গভীর অসুখের কবলে যেন বর্তমান মানব সমাজ।....সেই উথাল পাতাল সময় ছুঁয়েই.... ষাট সত্তর দশকের ইতিবৃত্ত। নিছক অবিমিশ্র স্বপ্ন ও আশার ঋতু নয় এই দশক দুটি।"[২]

নকশালযুগের উত্তাল গভীর মনোকর্কট মানবমনকে কীভাবে কুরে কুরে খায়; নৈতিক অবক্ষয়, মৃত্যুভয় ও অস্তিত্ব সংকট কীভাবে মানবমনে ঘনীভূত হয়ে ওঠে – তারই স্পষ্ট চিত্রফলক হয়ে উঠেছে মতি নন্দীর 'শবাগার' গল্পটি। সত্তরের নকশালবাদী রাজনৈতিক আবহাওয়ায় বিপন্ন মন ও ধ্বসে পড়া জীবনকাঠামোর কড়চা হয়ে উঠেছে মতি নন্দীর 'শবাগার' গল্পটি।

> "যাদের শৈশবে রূপকথার নিশ্চিত আশ্রয় ছিল না, যাদের বাল্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছায়া ফেলল, যাদের কৈশোর গেল দাঙ্গা আর দেশ বিভাগে, সেই আমরা বিশ শতকের এই দ্বিতীয়ার্দ্ধের যুবকরা কী এক আশ্চর্য সময়কালেই না পৃথিবীকে ভালোবেসেছি। কী এক আশ্চর্য সময়। আশ্চর্য এই ভালোবাসা।"[৩]

এই উক্তি পঞ্চাশের দশকের আর এক মরমী কথাশিল্পী দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এই কথাটি কেবল দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা নয়; তা তাঁর সমবয়সী সমস্ত সাহিত্যিকেরই সত্য অনুভব। পঞ্চাশের দশকের বৃত্তপটে আবির্ভূত আরেক সমকালীন কথাকার মতি নন্দীর (১৯৩১ – ২০১০) জীবন উপলব্ধিতেও একথা সমানভাবে সত্য। যাঁরা মূলত স্বাধীনতা-পরবর্তী ক্ষয়ীভূত সমাজকাঠামোর মধ্যেই পৃথিবীকে ভালোবেসে শিল্পের রসদ খুঁজেছেন। মতি নন্দী (১৯৩১-২০১০) মূলত পঞ্চাশের দশকের কথাকার। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি বা শেষদিকে কলম ধরা শুরু করে যাঁরা বাংলা ছোটগল্পের ধারায় সুদৃঢ় স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করে নিলেন, গল্পকার মতি নন্দী তাঁদেরই একজন। তারপর তাঁকে আর থামতে হয়নি। আপন শৈল্পিক প্রতিভার বলেই সচল থেকেছে তাঁর লেখনী। বিপর্যস্ত, আলোড়িত সমাজব্যবস্থায় মধ্যবিত্ত জীবনাদর্শের ভাঙন, নৈতিক সংকট ও মনস্তাত্ত্বিক যন্ত্রণাবোধই তাঁর গল্পে বেশি উপজীব্য হয়ে ওঠে। নাগরিক জীবনচর্যার গলিপথে আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক অবক্ষয়ের কারণে বারবার ধুঁকে মরে তাঁর গল্পের চরিত্ররা। মধ্যবিত্ত মনের সংকট ও মধ্যবিত্ত জীবনসংস্কারকে পর্যুদস্ত করে আত্মপ্রবৃত্তিতে অসংযমী হয়ে ওঠে তাঁর সৃষ্টিরা। মধ্যবিত্তের যত্নলালিত আদর্শবোধ ও সংস্কারের স্খলন তাঁর 'শবাগার' গল্পের মুকুন্দ চরিত্রেও প্রকট হয়ে ওঠে। গল্পকার মতি নন্দীর গল্প রচনার সেই মোটিফ(Motif)-টুকু উল্লেখ করে প্রাবন্ধিক শ্রাবণী পাল তাঁর 'বাংলা ছোটগল্প পর্যালোচনা : বিশ শতক' গ্রন্থের 'ভূমিকা' অংশে বলেছেন–

> "বাংলা ছোটগল্পে এই সময়ে একদল শিক্ষিত যুবকের দেখা পাওয়া গেল, যারা দেশপ্রেম বিপ্লব পেশাগত সাফল্য ইত্যাদিতে আস্থা হারিয়ে পরিচয় ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক ভেসে-চলা জীবনের প্রতি ক্রমশ আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল, নিতান্তই ব্যক্তিক খেয়ালে মধ্যবিত্ত যত্নলালিত 'respectability'র জীবনদর্শনকে আঘাত করা'তেই ছিল এদের আগ্রহ।"[৪]

সেইসঙ্গে তাঁর গল্পের পটভূমি হিসেবে সিংহভাগ ক্ষেত্রেই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে উত্তর কলকাতার গলিপথ ও সেই নাগরিক ভূগোলকেন্দ্রিক জীবন। এখানে আমাদের আলোচ্য 'শবাগার' গল্পের পটভূমিও সেই নকশাল পর্বের কলকাতা ও তৎজনিত অস্থিরতা।

কথাসাহিত্যিক মতি নন্দীর 'শবাগার' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৭৭ বঙ্গাব্দের ১২ অগ্রহায়ন (১৯৭০), 'দেশ' পত্রিকায়। পরবর্তীকালে গল্পটি 'কপিল নাচছে' গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। 'শবাগার' গল্পটির পটভূমিতে উঠে এসেছে ষাট-সত্তর দশকের নকশালপর্বের জ্বলন্ত ছবি। যে সময়ে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা ছিল না। পুলিশী দমননীতির কাছে যেখানে বারবার ঝরে পড়ে অজস্র নিরপরাধ তাজা প্রাণ। এমনই এক উত্তাল ভাঙনপর্বের নাম, ক্রান্তিকালের নাম ষাট-সত্তর দশক। এই সত্তর দশক মুক্তির দশক, আবার সেই সঙ্গে এটি যন্ত্রণা ও সন্ত্রাসেরও দশক বটে। একাধারে অনেকগুলি প্রতিশব্দকে ধারণ করে বয়ে যাচ্ছিল এই সময়টা। সেই বহমান সময়ের স্রোতে ভাসতে ভাসতে মানবরক্তের তাজা সোঁদাল গন্ধ সেদিনের কোনো শিল্পী-সাহিত্যিককেই স্থির থাকতে দেয়নি। তাই রাজনৈতিক স্পর্শবিচ্যুত হয়েও মতি নন্দীর বিবেক দংশন কলমের খোঁচাতেই শিল্পিত রূপ পেল। এই প্রসঙ্গে 'মতি নন্দীর গল্প-উপন্যাস' প্রবন্ধে প্রবন্ধকার রবিন পালের উক্তি –

> "মতি রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে না গেলেও সমকালীনতার দায়কে এড়াতে পারেননি, চানওনি।"[৫]

শিল্পীর সেই দায়বদ্ধতাকে না এড়িয়ে, রক্তনিমজ্জিত সময়ের স্রোত সেঁচে তিনি এই গল্পে রচনা করলেন অবক্ষয়ের কড়চা। সেই অবক্ষয়ের প্রতিনিধি গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মুকুন্দ। পচনশীল, ক্ষয়প্রাপ্ত সমাজের গর্ভে মানবমনের অবক্ষয় এখানে চিত্রিত। মুকুন্দ মৃত্যুপথযাত্রী ভাড়াটে গৌরাঙ্গের স্ত্রী শিপ্রার প্রতি নিজের যৌনপিপাসায়, আদিম প্রবৃত্তিতে ধরাশায়ী। মুকুন্দের জৈবতৃষ্ণা সেখানে আবডালের যবনিকা সরিয়ে খুঁজে নিতে চায় শিপ্রার নারীদেহ। সেই প্রাগৈতিহাসিক পিপাসায় মধ্যবিত্ত পিতার সংস্কার বাধা হয়ে দাঁড়ায় বটে। কিন্তু পুত্র মনুর উৎসারিত ঘৃণার বহিঃপ্রকাশে খসে পড়ল এতদিনের দ্বিধাবোধের আবরণ। সংকটগ্রস্ত সময়ের আবর্তে অবক্ষয়িত মনের একাধিক প্রকোষ্ঠকে লেখক এই গল্পে তুলে ধরলেন মুকুন্দ-মনু-শিপ্রা-গৌরাঙ্গসহ অন্যান্য কিছু চরিত্রের মধ্য দিয়ে। যেখানে মুকুন্দ এই বিপন্ন সময়ের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে, নিজের মনস্তাত্ত্বিক ও নৈতিক ক্ষয়কে ত্বরান্বিত করতে করতে নিজেই নিজের শবাগার রচনা করে। এবার আমরা মতি নন্দীর 'শবাগার' গল্পটি সবিস্তারে বিশ্লেষণ করে নেব।

'শবাগার' গল্পের সূত্রপাতই ঘটেছে মৃত্যুসংবাদ দিয়ে। এক মধ্যবিত্ত শহুরে কর্মচারী এ গল্পের মুখ্য চরিত্র। সমকালে অজস্র ঘটে চলা করোনারি থ্রমবোসিসের মৃত্যু-প্রহেলিকা তাকে আতঙ্কিত করে। যেন পিছু ধাওয়া করে বেড়ায় তার সজীব চৈতন্যের ক্ষেত্রটিকে। তবু সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের সংসারী গৃহবধূ লীলাবতীকে অতিক্রম করে মুকুন্দর জৈবপ্রবৃত্তি শিপ্রার শরীরে চরিতার্থতা খুঁজতে চায়। মৃত্যুভীতির চোখরাঙানি উপেক্ষা করেও শিপ্রার সদ্যস্নাত শরীর মুকুন্দর যৌনপিপাসার রসদ জোগায় –

> "চিবুক এবং বগলের কেশ থেকে জল গড়াচ্ছে। হাসতে গিয়েই ভারসাম্যটা টলে গেল সামান্য। তাইতে ওর বুক ও পাছার যৎসামান্য কম্পনটুকু উপভোগ করতে করতে মুকুন্দ মাজনের ফেনা গিলে, চেটো দিয়ে কষ মুছে নিয়ে হেসে লীলাবতীকে বলল – 'এর থেকেও পাজি রোগ ক্যানসার'।"[৬]

এই শিপ্রা হল মুকুন্দের নীচের তলার ভাড়াটে গৌরাঙ্গের স্ত্রী। ক্যানসার রোগাক্রান্ত মৃত্যুপথযাত্রী গৌরাঙ্গের মৃত্যুর প্রহর গুনছে স্ত্রী শিপ্রাও। তাই একটা অসহায় নারী হিসেবে নিজের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তাটুকু এখন থেকেই ঠিক করে নিতে চাইছে সে। তার বিনিময়ে সে বাড়ির মালিক মুকুন্দকে বন্ধক দিয়েছে নিজের নধর নারীশরীরটা। শিপ্রার সেই যৌন প্রশ্রয়ই মুকুন্দের হাতকে শিপ্রার পাছা অবধি পৌঁছে দিয়েছে। এভাবেই সত্তরের উত্তর কলকাতায় এক মধ্যবিত্ত পরিবারের নীচুতলায় বয়ে যাচ্ছিল অবৈধ যৌনসম্পর্কের চোরাস্রোত। সেই স্রোতে গা ভাসিয়েই তাদের যৌনচুম্বনে ঠোঁট ডোবাতে চাওয়া। গুপ্ত যৌন আবেশের সেই চোরা মুহূর্ত অতৃপ্ত হয়ে রইল মুকুন্দর বাইশ বছরের পুত্র মনুর উপস্থিতিতে। একান্ন বছর বয়সী এক মধ্যবয়স্ক, প্রৌঢ়পিতার যুবকপুত্রের সামনে এমন নিরাবরণ; তার পিতৃত্বের মাংস খুবলে খায় বৈকি–

> "মনু সদর দরজার কাছে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে। মুকুন্দর শরীরের মধ্যে তখন ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে মাথায় উঠছে, হাড় থেকে মাংস খুলে খুলে পড়ছে।"[৭]

এরপর থেকেই একমাত্র পুত্রের সামনে মুকুন্দর নৈতিক অবক্ষয়ের প্রকাশ্যতায় শুরু হল তার মনস্তাত্ত্বিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। তৈরি হল আহত পিতৃত্বের নিরাপত্তার সংশয়। তার প্রতি মনুর ঘৃণার আশঙ্কায় তার যৌনতাতাড়িত

মনটাও যেন এবার থেকে হুমড়ি খেতে থাকল পিতৃত্বের দিকে। এক পঞ্চাশোর্ধ্ব পিতার মানসিক দ্বন্দ্ব গল্পকারের কলমে রূপ পেল এভাবে –

> "মুকুন্দ তখন ভাবতে লাগল, আরো পনেরো কুড়ি বছর যদি বাঁচি তাহলে মনুকে নিয়েই তো বাঁচতে হবে! কিন্তু কি করে বাঁচব যদি ও ঘেন্না করে?"[৮]

গল্পে এরপর থেকেই দেখি থ্রমবোসিসের মতো মৃত্যুভয় মুকুন্দকে তাড়া করে বেড়াতে লাগল। সেইজন্য বুকপকেটে তার শব শনাক্তকরণের উপায়স্বরূপ স্বপরিচয়জ্ঞাপক চিরকূট রেখে সে আত্মসান্ত্বনার অবকাশ খোঁজে। এ তো মৃত্যুকে সামনে থেকে দেখা! এই মৃত্যুবিভীষিকাই মুকুন্দকে তাড়িত করেছে চৈতন্যের এক প্রকোষ্ঠ থেকে অন্য প্রকোষ্ঠে। প্রসঙ্গত বলতে হয়, মতি নন্দীর 'শবাগার' গল্পের মতো তাঁর 'পর্দার নীচে এক জোড়া পা', 'বাওয়াব', 'একটি মহাদেশের জন্য', 'পিকনিকের অপমৃত্যু' ইত্যাদি গল্পেও বারবারই মৃত্যুভীতি, ভয়ংকর সময়ের আলোড়ন ও তা থেকে ঘটে চলা অস্তিত্বের অবক্ষয়, নৈতিক সংকট ইত্যাদি বড় হয়ে ওঠে। আসলে পুত্রের ঘৃণা তার শবদেহেও ঝরে পড়বে কিনা সেই আশঙ্কায় দ্বিধান্বিত তার পিতৃমন। প্রকৃত অর্থে সত্তরের বিপর্যস্ত দিনগুলিতে আর্থসামাজিক ভাঙনপর্বেই তো মুকুন্দ শিপ্রার শরীরে নিজের যৌনপিপাসা চরিতার্থ করার অবসর পেয়েছে। সেই সত্তর এইভাবেই নৈতিক অবক্ষয়ের সঙ্গে পিতৃমনে তৈরি করে দিল এক অস্তিত্ব-সংকট।

সত্তর দশকের রক্তাক্ত দিনগুলিতে ঘরে বসেও মানুষের নিরাপত্তা ছিল না। আর পথেঘাটে তো ছিলই না। সর্বদা মানুষের প্রতি মানুষের এক আড়চোখে তাকানো বাঁকা সংশয়, অবিশ্বাস। সত্তরের সেই অগ্নিগর্ভ প্রহরে, রাজনৈতিক অস্থিরতায় গোলা-বারুদ-বন্দুকের স্তূপ সরিয়ে মুকুন্দকে অফিস থেকে ঘরে ফেরার পথ করে নিতে হয়। জীবন সেখানে কঠিন। গলিতে-গলিতে, জমাট অন্ধকারে সর্বত্রই যেন মৃত্যুর ঈশারা। রাস্তায় পুলিশী পর্যবেক্ষণের মুখে পড়ে এক মৃত যুবকের মৃতদেহ শনাক্ত করতে গিয়ে মনু ভেবে শঙ্কিত হয় মুকুন্দর পিতৃত্ব। আসলে মৃত্যুভয়তাড়িত সময়ের আবর্তে মানুষ সর্বদা নিজের ও আপনজনের মৃত্যুই দেখে। মুকুন্দও তা-ই দেখেছিল। নকশালপর্বে একঝাঁক তরুণ ও যুবকেরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এই লড়াইয়ে। আর তার থেকেও কঠিন হয়ে উঠেছিল পুলিশী দমননীতি। নকশাল আন্দোলনের এই প্রকৃতিটুকু প্রাবন্ধিক বিজিত ঘোষের 'নকশাল আন্দোলনের গল্প' গ্রন্থের 'ভূমিকা'য় ('সম্পাদকের কৈফিয়ৎ') উঠে এসেছে এভাবে–

> "নকশালবাদীদের ডাকে বিপ্লবের নামে হাজার হাজার তরুণ ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মদানে। অগণিত যুবক, কিশোর প্রাণ হারায়।"[৯]

এই গল্পে মনুর সমবয়সী যুবক তাজুর মৃত্যুও তারই প্রতীক। সে যুগে বিনা পরোয়ানায় স্রেফ সন্দেহের বশেই পুলিশ অসংখ্য যুবককে হত্যা করে। প্রতিটি যুবকই তখন প্রশাসনিক নিরাপত্তাহীনতার শিকার। প্রশাসনই তখন অজস্র তাজা প্রাণের নির্বিচার ঘাতক। সেই সন্দেহের বশেই এই গল্পেও উঠে এল অজস্র তরুণের প্রাণ ঝরে যাওয়ার কথা। মুকুন্দের অফিস-সতীর্থ শিশিরের বয়ানে উঠে এসেছে সেই অনিরাপত্তার প্রসঙ্গ –

> "এখন সব থেকে সেফ বুড়ো হয়ে যাওয়া। আমার পাশের বাড়ির ছেলেটাকে মাসখানেক আগে পুলিশ রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে এমন মেরেছে যে হাঁটুদুটো এখনও ভালো করে মুড়তে পারে না। আমি জানি ছেলেটা কোনো গোলমালে নেই। শুধু ডাঁটো বয়সের জন্যই ওর সর্বনাশ হল।"[১০]

এমন আশঙ্কায়, দ্বন্দ্বে বারবার অনিরাপত্তাবোধের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়েছে মধ্যবয়সী মুকুন্দের পিতৃত্ব। যুবশক্তির ওপর সেই পুলিশী নির্যাতন এ গল্পে জীবন্ত দলিলের রূপ নিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয়, মতি নন্দীর এই 'শবাগার' গল্পের মতো ষাট-সত্তরের দশকের সেই রক্তক্ষয়ী আলোড়ন, উত্তাল পরিস্থিতি, বীভৎস মৃত্যু, সন্দেহ, অবিশ্বাসের ছবি উঠে এসেছে তপোবিজয় ঘোষের 'এখন প্রেম', অসীম রায়ের 'অনি', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পলাতক ও অনুসরণকারী', মহাশ্বেতা দেবীর 'দ্রৌপদী' ইত্যাদি গল্প ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'কেন এল না' ইত্যাদি কবিতায়। সত্তরের সেই উত্তাল আবর্তই নির্মাণ করে দিল এই গল্পের আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক পটভূমি।

সেদিন অপার মৃত্যুর স্তূপ ঠেলে বাড়ি ফিরে মুকুন্দ তার নৈতিক কর্তব্যে ফেরার কৃত্রিম মূল্যবোধ জাগাতে চাইল। তাই সে শিপ্রার কাছে গৌরাঙ্গের অবস্থার খোঁজ নিল। শিপ্রা নিজের যৌনাচারে শঙ্কিতও বটে। তবে আর্থসামাজিক ভবিষ্যতের কথা ভেবে সে মুকুন্দের প্রতি দায়বদ্ধ দরদকে মুছে ফেলতে পারবে না। সেইজন্যই তো মুকুন্দর বাড়ি না-ফেরা; অনাত্মীয় শিপ্রাকেও আতঙ্কিত করে। গোলা-বারুদের পাহাড় ভেঙে মুকুন্দ বাড়ি ফেরার পর, পিতার প্রতি পুত্রের রাস্তাঘাটের সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সতর্কবার্তা ও উদ্বিগ্নতা তার পিতৃহৃদয়কে সম্পৃক্ত করে। মুকুন্দর তখন মনে হয় –

"ছেলেটা আমার জন্য ভাবে, হয়তো বমি করবে না।"[১১]

এই আত্মস্বস্তি মুকুন্দকে বেঁচে থাকার রসদ জোগায়। কিন্তু তারপরেই ঘটে সেই দারুণ বিপর্যয়। পুলিশী হেফাজতে থানাবন্দী হল মুকুন্দর যুবপুত্র মনু ওরফে মানবেন্দ্র সেন। এই খবর মুকুন্দর পিতৃত্বকে আসন্ন বিপদ সম্ভাবনায় কম্পিত করে। মৃত্যুভয়তাড়িত একটি মানুষের আত্ম-অস্তিত্ব ক্ষরিত আত্মজকে, নিজের উত্তরাধিকারকে বাঁচাতে থানায় গিয়ে সে কি গভীর আকুতি! তখন ছটফট করা যন্ত্রণায় নিজের অস্তিত্ব সংকটে কাতর হয়েছে মুকুন্দ। ছেলের মুক্তি তার মনকে তৃপ্তির রসদ জোগালেও; মনুর চোখে মুকুন্দ খুঁজে পেয়েছে শিপ্রার মৃত্যুপথযাত্রী স্বামী গৌরাঙ্গের জমাটবাঁধা ক্রোধ, ঘৃণা ও বিবমিষা –

> "ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে দিয়ে আবছাভাবে সে গৌরাঙ্গের চোখদুটি দেখতে পেল। ঠিক এই চাহনিতেই সে চিত হয়ে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়েছিল। মুকুন্দর আবার মনে হল, মনুর যেন ক্যানসার হবে।"[১২]

পরিস্থিতির অসহায়তা যেমন গৌরাঙ্গের সমস্ত চেতনা ও প্রতিবাদকে গৌরাঙ্গের দৃষ্টিতে সন্নিবেশিত করেছিল; ঠিক তেমনই মনুরও পিতার প্রতি সমস্ত অব্যক্ত বিবমিষা গিয়ে সঞ্চিত হয়েছিল মনুর চোখে। তখন থেকেই খসে পড়তে লাগল মুকুন্দের এযাবৎ লালিত সংস্কারের পলেস্তারা। তীব্র মানসিক আঘাতে মুকুন্দ সেদিন বাড়ি এল মাতাল হয়ে। এক বিপন্ন সময়ের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বাড়তে থাকল পিতাপুত্রের সম্পর্কের ফাটল। আসলে সেই রক্তক্ষয়ী সময়ের বাতাবরণই এই পটভূমি তৈরি করে দিল। তবুও মুকুন্দ এই ফাটল জোড়া লাগাতে চেয়েছে তার পিতৃত্বের সুতোয়। ছেলের প্রতি উদ্বেগের কারণ জানিয়ে মুকুন্দর ঘুণধরা, আহত পিতৃত্বের আকুতি –

"আমাকে ঘেন্না করার নিশ্চয় অন্য কারন আছে কিন্তু এজন্য করিসনি।"[১৩]

সেই সংঘাতপূর্ণ, বিধ্বস্ত সময়ের স্রোত এভাবে বহু সম্পর্কে বিভেদরেখা বইয়ে দেয়। এমনকি বহু পিতাপুত্রের সম্পর্কেও। সময়ের উত্তাল অস্থিরতায় পিতাপুত্রের সম্পর্কের নির্মম ফাটলদৃশ্য এই গল্পের মতো প্রকট হয়ে উঠেছে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'স্টীলের চঞ্চু', মতি নন্দীর 'চোরাঢেউ', 'কপিল নাচছে', 'ব্লেজার',

'ছটা পয়তাল্লিশের ট্রেন', 'রাস্তা', 'দুভাগে' ইত্যাদি গল্পে এবং মতি নন্দীর 'দ্বাদশ ব্যক্তি', 'সাদা খাম', 'বারান্দা', 'পুবের জানালা' প্রভৃতি উপন্যাসেও। 'শবাগার' গল্পেও মৃত্যুতাড়িত সত্তর দশকের অস্থির আবর্তই এই কৃষ্ণগহ্বর সৃষ্টির কারণ।

'শবাগার' গল্পে পিতাপুত্রের এই সংঘাত চরমতা লাভ করে মনুর এই উক্তিতে –

> "তোমার জন্য; শুধু তোমার জন্য। তুমি আমায় করাপ্ট করেছ।"[১৪]

মনু তার নীতিভ্রষ্টতার দায় প্রকাশ্যে ছুঁড়ে দিয়েছে বাবার দিকে। বাবার নৈতিক অবক্ষয়, চারিত্রিক ভ্রষ্টতা মনুকে অসংযমী করেছে তাদের পিতাপুত্রের সম্পর্কে। পিতার সঙ্গে বাকযুদ্ধের এই নিয়ন্ত্রণহারা মূল্যবোধের জন্যও সে কাঠগড়ায় তুলেছে পিতাকেই। আসলে শিপ্রার সঙ্গে বাবার সেই অসামাজিক যৌন কদাচারের ছবি মনুর চেতন-অবচেতনে তার মর্মবোধকে আহত করে। বারবার দংশন ঘটায় তার প্রথাগত মূল্যবোধ ও সংস্কারের চামড়ায়। মনুর অন্তর্চেতনায় মিশে থাকা পিতার প্রতি সেই ঘৃণা, বিবমিষাই বমিরূপে বেরিয়ে আসে মুকুন্দের গায়ে –

> "'কি হল'! বলে মুকুন্দ দ্রুত গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল। মনু তখন হড়হড় করে মুকুন্দর গায়ে বমি করল।"[১৫]

মনুর এই বমন কেবল শারীরিক থুৎকার নয়। এ তার চেতনায়, অস্তিত্বে মিশে থাকা মুকুন্দের প্রতি তীব্র ঘৃণা। যে ঘৃণা সে বহন করছিল শিপ্রার দরজার সামনের সেই চোরাদৃশ্য দেখা থেকেই। বাবার প্রতি লালিত সেই ঘনীভূত ঘৃণাই সে তার গায়ে উগরে দিয়েছে বমিরূপে। তাহলে এখন আর থাকল না কোনো প্রচলিত সংস্কারের আবডাল। এতদিন পর্যন্ত শিপ্রার প্রতি মুকুন্দর যৌনপ্রবৃত্তি চরিতার্থতা পাচ্ছিল আড়ালে-আবডালে, সামাজিক সচেতনতায়। কিন্তু যখনই ছেলের মনে জমে ওঠা ঘৃণা বমিরূপে বেরিয়ে এল, তখনই খসে পড়ল মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের পলেস্তারা। সত্তরের উত্তপ্ত আবর্ত, মনুর সপ্রকাশ্য ঘৃণা ও বমনই মুকুন্দর নৈতিক অবক্ষয়ের মাত্রাকে সম্পূর্ণ করল। এবার সে লিপ্ত হবে যৌন-স্বেচ্ছাচারে। সর্বোপরি মুকুন্দর দিক থেকে আর কোনো সামাজিক সংস্কারের গোপনীয়তা বা আবডাল রইল না। বাবার যে অবৈধ প্রবৃত্তির জন্য মনুর আজ প্রকাশ্য ঘৃণা; সেই প্রবৃত্তির গোপনীয়তা রক্ষার দায় আর তাই মুকুন্দর রইল না। সে তখন মাঝরাতে শিপ্রার ঘরে নেমে এসে মৃত্যুপথযাত্রী গৌরাঙ্গের উপস্থিতিকে উপেক্ষা করে তার যৌনক্ষুৎপিপাসাকে চরিতার্থতা দিয়েছে। তার এই সপ্রকাশ্য নিরাবরণে আর কোনো লজ্জা নেই –

> "শিপ্রাকে মেঝেতে শোয়াতে শোয়াতে মুকুন্দ বলল, 'ও তো মরে যাচ্ছেই। তাহলে আবার ভয় কিসের'।"[১৬]

এভাবে লেখক মতি নন্দী অবক্ষয়িত সময় ও সমাজের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পূর্ববর্তী কথাশিল্পী জগদীশ গুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়দের মতো মানুষের আত্মপ্রতারণা, মুখ-মুখোশের দ্বন্দ্ব ও জৈবপ্রবৃত্তিতাড়িত চেতনাকে সার্থক রূপ দিলেন এই গল্পে। মধ্যবিত্ত মুকুন্দ আত্মপিপাসার রাজত্বে যৌনতৃষ্ণার পাহাড় নিয়েও নিজের প্রবৃত্তিকে চাপা রাখার অগাধ প্রয়াস চালিয়েছে। রক্ষা করতে চেয়েছে নিজের পিতৃত্বের 'ইমেজ'(Image)টুকু। কিন্তু পিতাপুত্র সম্পর্কের চওড়া ফাটল ও সপ্রকাশ্য ঘৃণা সেই মেকি নিয়ন্ত্রণকে শেষ রক্ষা করতে পারেনি। বরং তা হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে এসেছে নীচের তলায় শিপ্রার ঘরে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কালের পুত্তলিকা' গ্রন্থে বলেছেন –

> "এইসব গল্পে মতি নন্দীর রঞ্জন-রশ্মি-দৃষ্টিতে আমাদের সমস্ত দুর্বলতা আত্মপ্রতারণা উদঘাটিত হয়েছে।"[১৭]

মুকুন্দদের সেই আত্মপ্রতারণাকে এ গল্পে চিনিয়ে দিলেন গল্পকার। যে আত্মপ্রতারণা সত্তরের বিক্ষুব্ধ সময়সঞ্জাত। যে মেকি ছলনা, নৈতিক অবক্ষয় ও মধ্যবিত্ত জীবনসংকটের ফাঁদ তৈরি করে দিয়েছিল সময়। যে সময়টার নাম ষাট-সত্তর দশক, যার নাম উত্তাল আবহ।

'শবাগার' শব্দের অর্থ হল মৃতদেহ রাখার স্থান অর্থাৎ মর্গ বা লাশকাটা ঘর। যে শব্দটি এক ভয়ংকর শীতল মৃত্যুবিভীষিকার ছবি আমাদের সামনে স্পষ্ট করে। এই গল্পজুড়ে বহাল থেকেছে মানুষের সেই মৃত্যুভয়ই। প্রতিটি মানুষকেই সেই মৃত্যুভয় তাড়া করে বেড়িয়েছে। আর তার সর্বোচ্চ যন্ত্রণাদীর্ণ শরিক হয়েছে মুকুন্দ। সে নিজেরসহ ছেলের মৃত্যুভয়েও পীড়িত। তার যন্ত্রণা তাই দ্বিগুণ। সত্তরের দশকের বিপন্ন সময়ের দায় আপন রক্তে মিশিয়ে নিয়ে এ গল্পে মুকুন্দ 'করাপ্টেড' হয়েছে তার মধ্যবিত্ত মূল্যবোধে। এভাবে সমাজের বুকে তার নৈতিক মনের অপমৃত্যু ঘটিয়ে মুকুন্দ নিজের হাতেই নিজের শবাগার সুসজ্জিত করে তুলেছে। তাই সামগ্রিক বিশ্লেষণে বলা যায়, ষাট-সত্তর দশকের সেই উত্তাল রাজনৈতিক আবর্তই সৃষ্টি করেছিল ভগ্নপ্রায় আর্থসামাজিক কাঠামোর। বলা ভালো সেই ভগ্নতার শিকার হয়েই শিপ্রা-গৌরাঙ্গরা মুকুন্দদের বাড়ির ভাড়াটে। সেই সুযোগেই মুকুন্দের জৈবক্ষুৎপিপাসা উপযুক্ত মাধ্যম খুঁজে নিতে চায় শিপ্রাদের নারীমাংসে। তা থেকেই মুকুন্দদের অপরাধবোধের গ্লানি, আহত পিতৃত্ব রক্ষার দায়। আর সর্বোপরি পচনশীল সময়ের ঘূর্ণাবর্তে চৈতন্যতাড়িত মৃত্যুভয়। উত্তপ্ত সময়ের আবর্তে মুকুন্দের মনেও তৈরি হয়ে ওঠে একটা আস্ত শবাগার। যেখানে মুকুন্দ দেখতে পায় আত্মশব। যে মগ্নচৈতন্যে সে নিজের মৃতদেহের ঘ্রাণ পায়। আর মুকুন্দর মনের বাইরেও বিপন্ন সময়, ভেঙে পড়া আর্থসামাজিক কাঠামোর আলোড়নে গোটা গল্পটাই যেন হয়ে উঠেছে এক মস্ত শবাগার। এই ব্যঞ্জনায় গল্পের নামকরণও তার শৈল্পিক সার্থকতা খুঁজে পায়। সবশেষে সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের এই উক্তি দিয়েই 'শবাগার' গল্পটির মূল্যায়ন করা চলে –

> "মতি নন্দীর বড় কৃতিত্ব, অনায়াস ভঙ্গিতে মানুষের ভেতরের চেহারাটা দেখানো। অপরাধবোধ কীভাবে আমাদের অতি-পরিচিত সাধারণ মানুষকে কুরে কুরে খায় তা নিপুণভাবে দেখিয়েছেন মতি নন্দী। তাঁর গল্পের ভিত্তি বাস্তব-অভিজ্ঞতা, কিন্তু তার শিল্প-রূপায়ণে মতি নন্দীর স্বাতন্ত্র্য অনস্বীকার্য। .....মতি ছুঁয়ে আছেন অবিশ্বাসকে, সংশয়কে।"[১৮]

এভাবে আলোড়িত সত্তরের পারদ ছুঁয়ে, সমাজের প্রত্যক্ষ শবাগারে দাঁড়িয়ে গল্পকার মতি নন্দী মুকুন্দের মনের ব্যবচ্ছেদ ঘটালেন। অস্তিত্ব সংকটে অপমৃত্যু ঘটে যাওয়া মুকুন্দের মনের ব্যবচ্ছেদ ঘটিয়ে তিনিও রচনা করলেন এক হিমশীতল শবাগার। যে শবাগারের বাসিন্দা মুকুন্দ। যে শবাগারে আপন শবদেহের পচনশীল দুর্গন্ধ মুকুন্দকে অতিষ্ঠ করে তোলে। সেই স্বরচিত শবাগারের যন্ত্রণাদগ্ধ দহন মুকুন্দকে বাস্তবিক শবাগারের অভিযাত্রী করে তোলে। তাকে উৎকণ্ঠা, সংশয়ে মুখোমুখি করে তোলে এক অচেনা মৃত্যুচেতনার। তাই সবশেষে প্রবৃত্তিতাড়িত পচনশীল মনের দুর্গন্ধ ছড়িয়ে মুকুন্দ তার মানসিক অপমৃত্যুটুকু রোধ করতে চাইল চিরতরে। তবুও এই উপদ্রব থেকে নিষ্কৃতি নেই। কারণ সময়টা সত্তর। তখন শিয়রে শমন, আর ঘরে-ঘরে শবাগার। কলকাতার মহানাগরিক জীবনের অন্ধস্রোত গিয়ে মিশল মহাকালের রাজপথে। সাহিত্যের ফলকে মতি নন্দীর 'শবাগার' হয়ে থাকল প্রত্যয়ী ইতিকথার বিশ্বস্ত বর্ণমালা। সত্তরের উত্তাপদগ্ধ আবর্ত এভাবে

রচনা করে দিল অবক্ষয়ী মন ও বিপন্ন সমাজের আনকোরা অগ্নিকুণ্ড। যেখানে থাকে শুধু অন্ধকার, থাকে শুধু হিমশীতল মৃত্যুভয়! সময়ের এমন উত্তপ্ত অগ্নিকুণ্ডে এত হিমশীতল স্নায়ু-মৃত্যুর কথা কে-ই বা জানত!

তথ্যসূত্র:

১। দাশ, জীবনানন্দ। 'জীবন' কবিতা। ইসলাম, রেজওয়ানুল, সম্পাদনা, জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র, মাইতি বুক হাউস, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৫, কলকাতা, পৃ-১০৭।

২। সেনগুপ্ত অমলেন্দু। 'মুখবন্ধ' অংশ। জোয়ার ভাটায় ষাট সত্তর, পার্ল পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭, কলকাতা।

৩। বন্দোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ। 'আমাদের যৌবন ও স্বাধীনতা', দৈনিক 'স্বাধীনতা' পত্রিকা, ২৫ ডিসেম্বর ১৯৬০, কলকাতা।

৪। পাল, শ্রাবণী। 'বাংলা ছোটগল্পের ধারা : বিশ শতক' (ভূমিকা)। পাল, শ্রাবণী, সম্পাদনা, বাংলা ছোটগল্প পর্যালোচনা : বিশ শতক, অক্ষর প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, কলকাতা, পৃ-২৭।

৫। পাল, রবিন। 'মতি নন্দীর গল্প-উপন্যাস'। মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার, সম্পাদনা, পঞ্চাশের দশকের কথাকার, প্রজ্ঞাবিকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ২০১৩, কলকাতা, পৃ-৫৮।

৬। নন্দী, মতি। 'শবাগার'। নন্দী, মতি, শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং, পুনর্মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১৯, কলকাতা, পৃ-১৬২।

৭। তদেব, পৃ-১৬৩।

৮। তদেব, পৃ-১৬৩।

৯। ঘোষ, বিজিত। 'সম্পাদকের কৈফিয়ৎ' (ভূমিকা)। ঘোষ, বিজিত, সম্পাদনা, নকশাল আন্দোলনের গল্প, পুনশ্চ, তৃতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১২, কলকাতা, পৃ-৭।

১০। নন্দী, মতি। 'শবাগার'। নন্দী, মতি, শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং, পুনর্মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১৯, কলকাতা, পৃ-১৬৫।

১১। তদেব, পৃ-১৬৭।

১২। তদেব, পৃ-১৬৯।

১৩। তদেব, পৃ-১৭১।

১৪। তদেব, পৃ-১৭১।

১৫। তদেব, পৃ-১৭১।

১৬। তদেব, পৃ-১৭১।

১৭। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার। কালের পুত্তলিকা। দে'জ পাবলিশিং, পুনর্মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৬, কলকাতা, পৃ- ৪৪৬।

১৮। তদেব, পৃ- ৪৪৫।

অন্যান্য সহায়ক গ্রন্থ:

১। আচার্য, অনিল। সম্পাদনা। সত্তর দশক, অনুষ্টুপ, ১৯৯৪, কলকাতা।

২। ঘোষ, নির্মল। নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য। করুণা প্রকাশনী, আষাঢ় ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, কলকাতা।

৩। ঘোষ, ফটিকচাঁদ। নকশাল আন্দোলন ও বাংলা কথাসাহিত্য। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

৪। দাস, অরূপকুমার। ষাট ও সত্তর দশকের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলা কথাসাহিত্য। করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ২০১২, কলকাতা।

৫। বন্দোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম ও চট্টোপাধ্যায়, সাধন। সম্পাদনা। প্রতিবাদের গল্প : নকশালবাড়ি। রাডিক্যাল ইম্প্রেশন, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৯, কলকাতা।

৬। ভট্টাচার্য, দেবাশিস। সত্তরের দিনগুলি। এখন বি-সংবাদ, ২৫তম বইমেলা, ২৬ জানুয়ারি ২০০০, কলকাতা।

৭। দত্ত, বীরেন্দ্র। বাংলা কথাসাহিত্যের একাল। পুস্তক বিপণি, ১৯৯৮, কলকাতা।

৮। চট্টোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন। স্বাধীনতা উত্তর বাংলা সাহিত্য। নবম প্রকাশন, ১৯৮৯, কলকাতা।

৯। মুখোপাধ্যায়, সত্য। সম্পাদনা। বাংলা সাহিত্যে বিশ্বাস ও মূল্যবোধের সঙ্কট, রাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ১৯৮৬, কলকাতা।

১০। মুখোপাধ্যায়, তরুণ। সম্পাদনা। বাংলা ছোটগল্প : পর্ব-পর্বান্তর, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৫, কলকাতা।

১১। চক্রবর্তী, সুমিতা। ছোটগল্পের বিষয় আশয়। পুস্তক বিপণি, চতুর্থ মুদ্রণ, মার্চ ২০২১, কলকাতা।

১২। ঘোষ, প্রসূন। বাংলা ছোটোগল্প : ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার। আশাদীপ, প্রথম প্রকাশ, মে ২০২৩, কলকাতা।

১৩। ভট্টাচার্য, তপোধীর। ছোটোগল্প : সময়ের শিল্প। এবং মুশায়েরা, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ২০১৬, কলকাতা।

সহায়ক পত্র-পত্রিকা:

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ। 'সময়ের দাগ ও বিদীর্ণ দর্পণ'। 'দেশ' পত্রিকা, ৪ এপ্রিল ১৯৮৭, কলকাতা।

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1427-1434
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.363

মনসামঙ্গল কাব্যে নারীর সামাজিক অবস্থান

পুনম মুখার্জী, *গবেষক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.03.2026; Accepted: 21.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Half of the world is made up of women and the other half of men. Yet, throughout history, women have often been neglected and marginalized by men. This reality is also reflected in literature. In the history of Bengali literature, *Mangal-kāvya* occupies a significant and memorable position. Among the different branches of this tradition, *Manasamangal* holds a unique place.

The story of Manasa and Chand Saudagar is widely known in rural Bengal and has long been transmitted through both oral and literary traditions. At its core, the narrative presents Manasa's struggle to gain recognition as a goddess. However, within the framework of *Mangal-kāvya*, her identity as a woman often becomes more prominent than her divine status. In this sense, the conflict between Manasa and Chand Saudagar can also be interpreted as a symbolic struggle between feminine agency and masculine authority.

Manasa's battle against Chand Saudagar reflects the challenges faced by a female figure within a patriarchal order. Despite resistance and opposition, she ultimately succeeds in establishing her position. Through this victory, Manasa emerges as a distinctive and powerful character in the *Mangal-kāvya* tradition.

Keywords: Manasamangal, Mangal-kāvya, Women's Social Status, Patriarchy, Medieval Bengali Literature, Goddess Manasa, Chand Saudagar, Behula, Gender Representation, Feminine Agency.

পৃথিবীর যে-কোনও জনসংখ্যার অর্ধেক জুড়ে আছে নারী। শুধু অর্ধেক জুড়ে থাকা নয় সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক স্তরে নারী নিজেকে প্রমাণ করেছে বারবার। প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে নারীর অবদান আছে। তবুও বেশিরভাগ সময় দেখা যায় পুরুষ এর ছায়াসঙ্গীতে পরিণত হয়েছে নারী। তাঁর আলাদা কোনও স্বাতন্ত্র্য বা অবস্থান চিহ্নিত হয় না। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে নারীর এই স্বতন্ত্র অবস্থানকে বুঝে নেওয়ার বা পিছনে ফিরে তাকিয়ে নারীর অগ্রগতির পথকে দেখার প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। বৈদিক যুগে নারীর অবস্থান একরকম ছিল। নারীর বিদ্যাশিক্ষার অধিকার ছিল। বিশ্ববারা, ঘোষা, অপলার মতো নারীদের কথা আমরা জানতে পারি। বৈদিক থেকে বেদোত্তর এবং ধর্মশাস্ত্রের যুগে সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নারীর ধর্ম অর্থাৎ তার কর্তব্য, আচরণ ও সামাজিক অবস্থানের কিছুটা পরিবর্তনের সূত্রপাত হতে

থাকে। বহিঃশক্তির আক্রমণ এবং সেই আক্রমণের ফলস্বরূপ নারীর উপর নির্যাতন, অপহরণের মতো ঘটনাগুলি ঘটেছে। এর ফলে নারীর স্বাধীনতায় সমাজের হস্তক্ষেপ বাড়তে থাকে। নারীর স্থান ক্রমশ হতে থাকে অন্তঃপুরে। এখানে একটি বিষয় লক্ষ করার মতো প্রাচীন সমাজব্যবস্থায় পুরুষ নারীকে অন্তঃপুরে রাখতে চেয়েছে তাকে রক্ষা করার জন্য। কিন্তু নারীকে শক্তিশালী করে নিজেকে রক্ষা করার শিক্ষা দেওয়া হয়নি। ভারতীয় জীবনধারায় নারী সম্পর্কে কিছু সাধারণ ধারণা তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। নারী হবে সমাজ, পরিবার এবং চারপাশে সকলের জন্য মমতাময়ী, কল্যাণকর। নারী প্রতি যত অন্যায় অবিচারই হোক না কেন তাকে যেন সবক্ষেত্রে তা মেনে নিতে হবে। কোন নারী যদি বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রমী হয় তাহলে সমাজ তাকে দেখে অন্য নজরে। অনেক ক্ষেত্রে মেয়েদের জন্ম লগ্নই লেখা হয়ে যায় অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনের ইতিবৃত্ত। আর নারীকে তাই পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে হয়। এই আখ্যানগুলি আসলে আমাদের সমাজ ইতিহাসের জীবন্ত দলিল। পুরুষশাসিত সমাজের কথা বললেও মনসামঙ্গল কাব্য আসলে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠা, প্রতিবাদীসত্তার স্বরূপ। মঙ্গলকাব্য রচনার কারণ হিসাবে, প্রাচীন সমাজের এই অনুষঙ্গগুলি খুব সহজেই মাথায় আসে।[১] তুর্কি আক্রমণোত্তর কালে, নতুন শক্তির আগমনের কালে বাঙালির সমাজজীবন, সাংস্কৃতিক জীবনে একটা অদল-বদল এসেছিল। প্রাগার্য জাতির মানুষ দীর্ঘকাল আদিম অধিবাসী হিসেবে বসবাস করলেও বৈদিক সাংস্কৃতিতে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি প্রথম দিকে এই আদিম অধিবাসীদের তেমন স্বীকৃতি দেয়নি। কিন্তু বিরুদ্ধ রাজশক্তির অপশাসনে এক গোষ্ঠীবদ্ধ জনজীবন গড়ে তোলার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অপৌরাণিক দেবদেবীরা দ্রুত উঠে এসে অধিকার করে নিলেন বাঙালির ধর্মবিশ্বাসের জগৎ। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক এর সূচনা থেকেই, বিভিন্ন প্রকৃতির লৌকিক শক্তি দেবাদিগের মাহাত্ম্যকীর্তন করাই এই মঙ্গলকাব্যগুলির উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে। মনসামঙ্গলের কাহিনি কোনও প্রাচীন পুরাণে নেই। শুধু দেবীভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, পদ্মপুরাণ-এর মতো অর্বাচীন পুরাণগুলিতে মনসার সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। বৈদিক যুগে স্ত্রীদেবতার বিশেষ কোনও স্থান ছিল না। প্রাক-বৈদিক যুগে মৃত্তিকা পূজা প্রচলিত ছিল। মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হওয়ার সময়, দেবতাদের পাশাপাশি দেবীর আধিক্য দেখা গেল। পুরুষ চরিত্রের পাশাপাশি স্ত্রী চরিত্ররাও গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করল। মনসামঙ্গলের কবি হিসাবে হরিদত্ত, বিজয়গুপ্ত, গঙ্গাদাস সেন, জগজ্জীবন ঘোষাল, ষষ্ঠীবর দত্ত, রামজীবন, জীবনমৈত্র, বিষ্ণুপাল, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, তন্ত্রবিভূতি প্রভৃতি কবির নাম পাওয়া যায়। প্রতিটি কবির কাব্য রচনার মূল কাহিনির মধ্যে বেশ কেন্দ্রীয়ভূত মিল আছে।[২] মনসামঙ্গল কাব্যে নারীর অবস্থান বিচার করার প্রসঙ্গে আমি মূলত বিজয়গুপ্ত এবং কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলের ব্যাখ্যার উপর দিয়ে নারীর সামাজিক অবস্থান বিচার করার চেষ্টা করব। বিজয়গুপ্তের কাব্যে সমকালের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রভাব চোখে পড়ে। বিজয়গুপ্ত তাঁর কাহিনিটি রচনা করেছিলেন পাঠান রাজত্বের ঐতিহাসিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলের মধ্যে। সামন্তদের প্রতাপ, মুসলমান কাজীদের ব্যবহার, ষড়যন্ত্র, গুপ্তহত্যা, ক্ষমতার লড়াই এই ধরনের সামাজিক লক্ষণগুলি বিজয়গুপ্তের কাব্যে ভিড় করে এসেছে। তাছাড়া কবি মনসা চরিত্রের গড়ে ওঠার পিছনের কারণ হিসেবে দেখেছেন দেবীর নানাবিধ অপ্রাপ্তি আর যন্ত্রণাকে। মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবী চরিত্র: 'আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতে' প্রবন্ধে অধ্যাপক সনৎকুমার নস্কর লিখেছেন— "শৈশবে যিনি অমূল্য মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত যৌবনে যিনি অনতি পরিচিত পিতার কাছ থেকে কাম প্রস্তাব পান। বিমাতা চন্ডীর সন্দিগ্ধতায় যাঁকে শারীরিক নিপীড়নের সঙ্গে হারাতে হয় একটি চোখ, দেবকন্যা হয়েও যাঁর স্বর্গলোকে ঠাঁই হয় না, বিবাহ হয় ভোগসুখ বিরহিত পৌঢ় এক মুনির সঙ্গে— যিনি বিবাহের রাতেই পরিত্যাগ করে যান মনসাকে, সেই দেবী রূপী নারী পক্ষে এত যন্ত্রণা ও অপমান সহ্য করা সম্ভব হয় না। আত্মপ্রতিষ্ঠা লড়াই তাই মনসার কাছে এক তীব্র জীবন-সংগ্রাম।"[৩] মনসামঙ্গল কাব্যে মনসাকে বাদ দিয়েও সনকা, বেহুলা,

নেতা-র মতো কিছু অন্যতম প্রধান নারী চরিত্র আছে। এছাড়াও আছে চণ্ডী, পুরনরনারী, মালিনী, শঙ্কর বাউরি-র স্ত্রীর মতো কিছু চরিত্র। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যগুলির তুলনায় মনসাকে সর্বাঙ্গভাবেই বেশি ভয়ংকর, হিংসাত্মক, দাম্ভিক করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন মনসামঙ্গল কাব্যের কথাকাররা। মনসার প্রতিশোধ নেওয়ার বাসনার উপরই কোথাও না কোথাও জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ভেবে দেখার মতো বিষয় মনসার এই তিক্ততা কি সমাজ নির্মিত নয়? নারী দেবী হলেও, শক্তিশালী হলেও আদতে সে যে, সমাজে পুরুষ নিয়ন্ত্রিত; এই ভাবনায় মধ্যযুগে নারীর অবস্থানকে স্পষ্ট করেছে। মনসা দেবী হিসাবে চাঁদকে অভিশাপ দিলে চাঁদ সেই অভিশাপের প্রতুত্তর দিয়েছেন এই ভাবে। 'আমি পূজা না করলে তুমিও পূজা পাবে না।' একজন দেবীর অভিশাপের প্রত্যুত্তর করার এই দম্ভ চাঁদ চরিত্রের দৃঢ়তাকে আরও মহিমান্বিত করার চেষ্টা। পুরুষ যে মধ্যযুগের নারীর উপর কর্তৃত্ব করেছে তা সহজেই বোঝা যায়। মনসামঙ্গলের আলোচনায় চাঁদ চরিত্রটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। নারীর সামাজিক অবস্থানকে বুঝতে গেলে চাঁদ চরিত্রটির উপর একটু আলোকপাত করা দরকার। চাঁদ তাঁর কার্য দ্বারা তাকে ঘিরে থাকা প্রতিটি নারী চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছেন। চাঁদ তাঁর ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণে মনসার সঙ্গে লড়াইয়ে ব্যস্ত, যার ফলে তাঁর স্ত্রী সনকাকে সন্তান হারিয়ে ভোগ করতে হয়েছে। সনকাকে কেবল 'মা' হিসেবেই চিত্রিত করা হয়েছে। তাঁর নারীত্ব বা ক্রোধ সবকিছুই ঢাকা পরে গেছে চাঁদ সদাগরের ব্যক্তিত্বের কাছে। নটীরূপী মনসার ছলনায় মজে চাঁদ তাঁর মহাজ্ঞান হারিয়েছে। 'কামভাবে নটীর কাছে' নিজেকে নিবেদন করেছে চাঁদ। সাময়িক নটীর সঙ্গলাভের জন্য। বিজয় গুপ্ত তাঁর

'ছয়কুমার বধ পালা'তে বলেছেন—
"বিধাতা বিমুখ হইলে বুদ্ধিহীন হয়
নটীর কাণে চান্দ মহাজ্ঞান কয়।"[৪]

ঘরে স্ত্রী, ছয় পুত্র, পুত্রবধূ থাকা সত্ত্বেও 'মহাজ্ঞান'-এর মতো বস্তু নটীর কানে দেওয়াতে মঙ্গলকাব্যের কবি কেবলমাত্র 'বুদ্ধিহীন'-এর মতো শব্দ ব্যবহার করেছেন। চাঁদ চরিত্রের ত্রুটির কথা মনে হয়নি কবি বিজয় গুপ্তের! আসলে মনসাদেবী তাঁর বুদ্ধিবলে চাঁদের কাছ থেকে মহাজ্ঞান অর্জন করেছেন। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের কবি নারীর সেই মেধা, চতুরতাকে বড় করে দেখাতে চাননি। নারী শুধুমাত্র দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হয়ে থেকে গেছে।

মনসামঙ্গল কাব্যের আর একটি বিষয় অবশ্যই চণ্ডীর সঙ্গে মনসার সম্পর্ক। চণ্ডী নিজে একজন নারী হয়েও মনসাকে হেয় করতে চেয়েছে। স্বামী শিবকে নিয়ে এক ধরনের অধিকার হারিয়ে ফেলার ভয় চণ্ডীর মনের মধ্যে কাজ করেছে। মনসামঙ্গলের কবিরা চণ্ডীর মনসার প্রতি বিদ্বেষকে কেবলমাত্র 'সৎ মেয়ে'-এর প্রতি হিংসা, ক্রোধ হিসাবে দেখিয়েছেন। যে সমাজে স্ত্রী স্বামীর উপর নির্ভরশীল সেই সমাজে নিজের অধিকারকে ধরে রখার জন্য কবি মাতৃত্বের অপমৃত্যু ঘটিয়েছেন। কারণ সমাজে নারীর অধিকার সুস্থাপিত হয় না। মনসার সঙ্গে বিবাদে চণ্ডী যখন বিষের জ্বালায় কাহিল, অবসন্ন তখন বিজয় গুপ্তের কথায়—

"চারিদিকে চাহে দেবী কাতর নয়ন
চণ্ডিকার মুখ দেখিয়া কৌতুক দেবগন।"

চণ্ডী স্বর্গের দেবতাদের বারেবারে রক্ষা করেছেন, অসুরদের হাত থেকে। যিনি 'অসুরদলনী' তাকে বিপর্যস্ত দেখে অন্য দেবতারা 'কৌতুক'বোধ করেছেন। দেবী হোক বা মানবী, নারীকে অপ্রস্তুত হতে দেখে পুরুষের এই কৌতুকসমাজে নারীর স্থানকে নির্দেশ করে। দেবী হয়ে, সর্বশক্তি হয়েও, পুরুষ দেবতাদের রক্ষক হয়েও দেবী শুধুমাত্র নারী হয়েই থেকে যান।

মনসামঙ্গলের কাহিনিতে বাঙালি ঘরের বাৎসল্য-প্রতিবাৎসল্য ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও দেখা যেতে পারে। মনসামঙ্গলের দেবতা ও মানুষের বৃত্তান্তের আড়ালে আছে নারী স্বাধীনতা স্বাধিকারের বিশ্লেষণ। চাঁদ পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি। অন্যদিকে মনসা দেবাদিদেব মহাদেবের কন্যা হলেও সর্বহারা নারী সমাজের প্রতিনিধি। তবে নারী ও পুরুষের লিঙ্গ বৈচিত্র্যকে দূরে সরিয়ে রেখে নারীরাও পুরুষতান্ত্রিকতা স্তর ফুটিয়ে তুলেছেন নিজেদের স্বরে। মনসামঙ্গলের কাহিনির লোক প্রিয়তা বাংলাদেশের ঘরে ঘরে। সনকার মাতৃত্ব, বেহুলার সতীত্ব, চাঁদ সদাগরের পৌরুষ, সনকা-বেহুলা-চাঁদের সকরুণ রসের প্রস্রবণ গিরি এবং অলৌকিক কাহিনির সঙ্গে ঐশী শক্তির অন্তরালে বাঙালির চির-বেদনার মূল খুঁজে পাওয়া যায় এই কাহিনিতে। কালনাগিনী লখিন্দরকে দংশন করে। বেহুলার অকাল বৈধব্য বা চাঁদের অন্তিম পুত্র লখিন্দরের জন্য মনসা কোন সমবেদনা অনুভব করেনি। বরং প্রতিষ্ঠা লাভের পথকে প্রশস্ত হতে দেখে আত্মহারা হয়ে বলে উঠেছে—

মনসা বোলেন বাণী শুন বাছা নাগিনী
বাহির হঅ সত্বর গমনে।
সাধিলে বিষম বাদ নেই আসি পরসাদ
চল যাই আপন ভুবনে।।
ধন্য তোর জন্মদাতা সাফল তোমার মাতা
যার গর্ভে হৈল তোর জন্ম।
বানিয়ার অহঙ্কার সব হৈল ছারখার
সাধিলে দারুন মহাকর্ম্ম।।[৫]

বানিয়ার অহংকারের পতন অর্থাৎ চাঁদ সওদারের শেষ আসার প্রদীপ নিভে যাওয়াতে মনসা খুশি কিন্তু নারী হিসাবে বেহুলা বা সনকার যাতনা প্রাপ্তি নিয়ে তিনি চিন্তিত নন। এখানে মনসা বড়ই নির্মম। তাঁর নারী মননকে ঢেকে দিয়েছে পুরুষ চাঁদকে পরাজিত করবার বাসনা।

মনসামঙ্গল কাব্যে মনসাকে বারে বারে নিম্নবর্গের নারীদের রূপ নিতে হয়েছে, পুরুষকে ভুলিয়ে নিজের কাজ হাসিল করার জন্য । মধ্যযুগের যে সমাজ ব্রাহ্মণ্যবাদের আদর্শে ঢাকা, সেই সমাজের ভণ্ডামি মঙ্গলকাব্য রচয়িতারা কাব্যে স্থান দিয়েছেন। যে নারী সামাজিক অবস্থানে নিম্নবর্গ, কামইচ্ছা জাগলে সেই নারীকেই সঙ্গী হিসাবে পেতে চেয়েছে আপাতভাবে সামাজিক অবস্থানে শক্তিশালী, উচ্চবর্গীয় পুরুষ। নারী শরীর তা সে যে-কোনও বর্ণ-কূলের হোক না কেন। পুরুষ তাকে ভোগের সামগ্রী হিসাবেই দেখেছে।

নারীর স্বাধীন ইচ্ছার মর্যাদা দেওয়ার প্রবণতা কোথাও দেখা যায় না। সনকা সর্প পূজা করলে চাইলেও চাঁদের ইচ্ছায় সনকার ইচ্ছা চাপা পড়ে যায়। চাঁদের বিক্রম এখানে মহিমান্বিত হয় কিন্তু সনকা নারী হওয়ায় তাঁর ইচ্ছা থেকে যায় ঘরের অন্ধকারে আবদ্ধ।

আশুতোষ ভট্টাচার্য মনসাপূজার ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে বৌদ্ধ দেবী 'জাঙ্গুলী তারা'র সঙ্গে মনসার মিল খুঁজে পেয়েছেন। খ্রিস্ট্রীয় একাদশ শতকেরও আগে মনসা পূজা এই দেশের সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হওয়ার পিছনে ছিল বিরূপ রাজশক্তির প্রচ্ছন্ন হুঙ্কার। এই বিরূপতা সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে একত্রিত হতে সাহায্য করেছিল। সেই কাহিনিকে বোঝার জন্য নানা ছাপ তৎকালীন কাব্য রচয়িতারা তাঁদের রচনায় রেখে গেছেন। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্যটি পাঠ করে রচনার সময়পর্ব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এখানে একটি বিষয় লক্ষ করার মতো বিজয়গুপ্ত তাঁর কাব্যে জানিয়েছেন পূর্বজন্মে

কীভাবে বেহুলা ঊষা নামে, লখিন্দর অনিরুদ্ধ নামে স্বর্গে অবস্থান করেছেন। চাঁদ সদাগরও স্বর্গে অবস্থান করতেন। মনসার চক্রান্তে তাঁর মর্ত্যে মানুষরূপে জন্ম গ্রহণ করেছে অব্রাহ্মণ ঘরে। শুধু মনসামঙ্গল নয় চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতুর চরিত্রের ক্ষেত্রেও আমরা পূর্বজন্মে দেবলোকে বিরাজ করার কথা জানতে পারি। মধ্যযুগীয় সমাজ ব্রাহ্মণ্যবাদ দ্বারা কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে তার একটা সূক্ষ্ম ছাপ এই ঘটনার মধ্যেও আছে। হিন্দু সমাজ ধর্ম, বহুজন্মবাদে বিশ্বাস মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের চরিত্রগুলি অব্রাহ্মণ, নিম্নবৃত্তের মানুষের মধ্যে থেকে উঠে এসেছে। এই চরিত্রগুলির পূর্বজন্মের দেবলোকের ইতিহাস জানিয়ে, সমাজের মাথা সেজে বসে থাকা ব্রাহ্মণ সমাজের সঙ্গে, মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের চরিত্রগুলির সঙ্গে একটা যোগ রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। বিরূপ ভয়ংকর রাজশক্তির ভয় সমাজে কীভাবে কার্যকর ছিল সেই প্রসঙ্গ বোঝাতে গিয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, মনসাকে এত আত্মকেন্দ্রিক, কুটিল, হিংস্র করে গড়ে তোলার পিছনে মনসামঙ্গল কাব্যের কবিদের সচেতন অভিপ্রায় ছিল। মনসার সঙ্গে বিরুদ্ধ রাজশক্তির একটা যোগ ঘটানো বা বিরুদ্ধ রাজশক্তির ছায়াতে মনসাকে গড়ে তোলা। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মনসা চরিত্র বিচারের এই ব্যাখ্যা মধ্যযুগের নারীর অবস্থান বিষয়ে আমাদের চিন্তা ভাবনাকে জাগ্রত করে। অন্যান্য প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলির তুলনায় বেহুলা চরিত্রটি অনেকাংশেই অন্যরকম। মনসামঙ্গল কাব্য মধ্যযুগের ফসল। এই কাব্যের বেহুলা চরিত্র আধুনিক নারীর বৈশিষ্ট্যে ভরপুর। বেহুলার বয়সের পরিণতি না থাকলেও তাঁর ছিল মানসিক পরিণতি। এই মানসিক পরিণতের জন্যই বেহুলার তাঁর পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বুঝে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে। কাহিনীর প্রথম পর্ব থেকেই বেহুলা নিজের চরিত্রের আলোকে বিকশিত। বেহুলা দৈব-বিধানের প্রতি একান্তভাবে ভক্তিমান। অন্যদিকে নিজের চরিত্রের শুচিতা সম্পর্কেও সচেতন। বেহুলার মনের গহীনে ছিল না কোন অপরাধবোধ বা হীনমন্যতা তাই পরাজয়ের কাম্যতা তাকে গ্রাস করতে পারেনি, শুধু পুরুষদের প্রভাব নয়, নারীদের কাছ থেকেও বেহুলাকে শুনতে হয়েছে পুরুষ তান্ত্রিকতার স্বর কিন্তু তারপরেও সে নিজ কর্তব্যে ও লক্ষ্যে অবিচল থেকেছে। মনসামঙ্গলের কবিগণ বেহুলার মতো আদর্শবাদী নারীকে সতীত্বের পরীক্ষায় অবতীর্ণ করিয়েছেন। কিন্তু বেহুলা নারীর এই অপমানকে শিরোধার্য না করে সামন্ততান্ত্রিক পুরুষ-সমাজকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে নিজের জীবনকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। চাঁদ এবং মনসা চরিত্রদুটি সমাজব্যবস্থা এবং পারস্পরিক ভাবে একে অপরের বিরুদ্ধে অবস্থান করেছে। এই দুটি চরিত্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করেছে বেহুলা। বেহুলার নাচে তাঁর অভীষ্ট সাধনের এক বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মঙ্গলকাব্যের কবিরা সচেতনভাবে মনসার মতো বেহুলা চরিত্রকেও সচেতনভাবে গড়ে তুলেছেন। আর তাই হয়তো ভীত সাধারণ প্রজার মনের দ্বিধা ভয় কাটানোর জন্য পুরুষের কর্তৃত্বে অবস্থান যে নারীর, সেই নারীর জয়জয়কার দেখানো হয়েছে বেহুলা চরিত্রের মাধ্যমে। বেহুলা একজন নারী হয়েও নিজের কলা, সাধনা, বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে মনসার সমস্ত বিরূপতাকে জয় করেছে। কথাকারেরাও সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে এমন ভাবে নিজেদের সুপ্ত প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে রাজশক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দিয়েছেন। পুরুষের কর্তৃত্বে থাকা একজন নারী হয়তো সেই কারণেই হয়ে উঠেছে কাহিনির অন্যতম শ্রেষ্ঠ চরিত্র। পুরুষ সামাজিক শক্তিতে নারীর চেয়ে এগিয়ে। নারী যদি পারে, তবে যে পুরুষ নারীর চেয়ে এগিয়ে সে কেন পারবে না? এই মানসিকতা কাজ করেছে বেহুলা চরিত্র সৃষ্টির পিছনে। নারীকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে আসলে তাঁর অবস্থান যে পুরুষের নীচে তা বোঝানোর জন্য। মনসামঙ্গল কাব্য পাঠের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক তা উপলব্ধি করতে পারে।

মধ্যযুগের সমাজে নারীর সতীত্ব, তাকে বিচার করার একটি বড় বিষয় হয়ে দেখা দেয়। যদিও নারীর সতীত্বের বিচার বর্তমান সমাজের ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক তা বলার দাবি রাখে না। মনুর সময়কালের বিভিন্ন সংহিতা ও সামাজিক অনুশাসন তৈরি হওয়ার সময় থেকেই নারীর স্বাধীনতার পরিসরটি ক্রমশ হ্রাস পেতে

থাকে। 'মনুসংহিতা'য় বলা হয়েছে সুরাপান, অসৎ পুরুষ সঙ্গ, পতি বিরহ, ইতস্তত ভ্রমণ, পরগৃহে বাস এবং অকারণ নিদ্রা এই ছয়টি লক্ষণ নারীর ব্যভিচারের চিহ্ন। মধ্যযুগের সমাজেও যে মনুর এই মতবাদগুলি নারী চরিত্র বিচারের মানদণ্ড তা বোঝা যায় লখিন্দরকে সাপে কাটার বৃত্তান্তের সময়। সাপে কামড়ানোর পর যখন লখিন্দর বলে—

"জাগ জাগ বেহুলা সায় বাণ্যার ঝি।
তোরে পাইল কালনিদ্রা মোরে খাইল কি॥"[৬]

সমস্ত রাত্রি বেহুলার বুদ্ধিমত্তার কারণে লখিন্দর সাপের কামড়ের হাত থেকে রক্ষা পাবার পরও তাঁর অসতর্ক অবস্থায় ঘুমানোর কারণকে দায়ী করা হয়েছে লখিন্দরকে সাপে কামড়ানোর কারণ হিসাবে।

কবির সুমন তাঁর একটি বিখ্যাত গানে লিখছিলেন— "বেহুলা কখনও বিধবা হয় না এটা বাংলার রীতি"[৭], আসলে বাংলার এই রীতি পুরুষতান্ত্রিকতার রীতি, সামন্ত্রতান্ত্রিকতার রীতি। যে রীতিতে ছেলে লখিন্দর মারা যেতে পারে জেনেও পুরুষ চাঁদ সতীত্বের পরীক্ষা নিয়ে তাঁর স্ত্রী হওয়ার জন্য মেয়ে খোঁজে। সতী নারীর কাঁধে চাপিয়ে দিতে চায়, নিজের তৈরি করা অহংকারের বোঝা। লোলুপ পুরুষ পচাগন্ধে মরা কোলে বসে থাকা এক নারীর সুযোগ নিতে চায়। তাকে সাহায্য করার বদলে পুরুষ তার দিকে বাড়িয়ে দেয় কামনার থাবা। ছয় ছেলের জননী সনকাকে স্বামীর অনুপস্থিতিতে সপ্তম পুত্র জন্ম দেওয়ার সময় ভাবতে হয়, স্বামীর অনুপস্থিতিতে জন্ম নেওয়া সন্তানকে সমাজ কীভাবে মেনে নেবে।

পুরুষতন্ত্র আসলে একটা চিন্তা ধারা। যার বীজ নারী-পুরুষ ভেদে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে থাকতে পারে। নারীর পুরুষ মন অনেক সময় অন্য নারীর অস্তিত্বের উপর প্রশ্ন তোলে এই পুরুষ মনের তাড়নায়। সনকা জানতেন লখিন্দর মারা যেতে পারে। এই সম্পর্কে সনকার ধারণা থাকা সত্ত্বেও সদ্য স্বামীহারা বেহুলাকে বলেছে—

সোনা বলে বধূ তুমি পরম রূপসী।
আমার বাছা খাইতে আইলা কপট রাক্ষসী।।
স্বরূপে জানিলাম তুমি নিশাচর জাতি।
বিয়ার রাত্রে খাইলা স্বামী নহিল বাসি রাতি।।[৮]

বিধবা হওয়ার অভিশাপ সম্পর্কে নারী হিসাবে সনকা অবগত। বেহুলাকে দোষারোপ করার পিছনে সনকার পুরুষ মনের তাড়না কাজ করেছে। এমনকী নারীকে সতীত্বের ফানুসে উড়িয়ে পুরুষ সমাজ তার পায়ে বেড়ি পড়িয়ে রেখেছে। লখিন্দর মারা যাবার পর বেহুলার একটি উক্তিতে তাঁর প্রমাণ মেলে—

"খাইনু আপন পতি
কে মোরে বলিবে সতী॥"

পুরুষ সমাজ যখন নারীর সমান অধিকারের দাবিকে কেবলমাত্র ঠুনকো সতীত্বের আবরণে ঢেকে রাখতে চায় তখন বেহুলাদের মতো মেয়েদের কাছে সতী হওয়াটাই সম্মান পাওয়ার একমাত্র মানদণ্ড হয়ে দাঁড়ায়।

পুরো মনসামঙ্গল কাব্য জুড়েই মনসার নারীত্বের রূপ এর অজস্র মণিমুক্ত ছড়িয়ে আছে। চাঁদকে বিপদে ফেলেও মনসা তাকে রক্ষা করেছেন আবার 'বস্ত্র বিবর্জিত' চাঁদকে দেখে লজ্জাশীল নারীর মতো তাকে কাপড় জুগিয়েছেন। চাঁদের মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নিজের নারীত্বকে অক্ষুণ্ণ রেখে লড়াই করেছেন। শিব কন্যা হওয়ার পরও দেবীত্ব অর্জন করেছেন, বংশ পরম্পরায় পাননি। কিন্তু তবুও বেহুলাকে তাঁর হারানো ঐশ্বর্য ফিরিয়ে দেবার পর বেহুলা মনসাকে বলেছে—

"তুমি গো পুরুষ নারী"

মনসামঙ্গল কাব্যে নারীর সামাজিক অবস্থানের সত্যতা আসলে এখানেই, যেখানে একজন নারীর নারীত্ব সম্মান পায় না। তাকে সমস্ত লড়াইয়ের শেষে শুনতে হয় সে 'পুরুষ নারী'। অর্থাৎ পুরুষ বা পুরুষত্ব তাঁর নারীত্বকে হরণ করে নেয়। পুরুষ নারীর অধিকারকে খর্ব করে দেয়। পুরুষতান্ত্রিকতার আবরণে আবদ্ধ থাকতে থাকতে নারী কখনও পুরুষের মনকে আশ্রয় করে বেড়ে ওঠার চেষ্টা করেছে। মনসা, সনকা, বেহুলা সকলেই হয়ে উঠেছে সামাজিক পরিকাঠামোর শিকার। কিন্তু সবশেষে একথা স্বীকার না করে উপায় নেই, মনসা, সনকা, বেহুলা প্রমূখ নারী চরিত্র তাঁদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র, বুদ্ধিমত্তা, আত্মসচেতনতাই পাঠকের মনে জায়গা করে নিয়েছে। সমাজ-সংস্কার, কঠোর অনুশাসনের বিরুদ্ধে তাদের এই স্বীকারবোধ পাঠককে বারে বারে বিস্মিত করে ভাবতে বাধ্য করেছে।

মনসামঙ্গল কাব্যের নারীর অবস্থানকে বোঝার পর মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, একবিংশ শতব্দীতে দাঁড়িয়েও মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য কেন পড়ব? বর্তমানকে বোঝার জন্য, বর্তমানে নারীর অবস্থানকে বোঝা জরুরি হয়ে পড়েছে। মধ্যযুগের পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শে কীভাবে নারীত্বের ধারণা গড়ে উঠেছে, সেটা জানা প্রয়োজন। আলথুসারের মতাদর্শ ও ক্ষমতা-কাঠামো বিষয়টি এখানে বলা দরকার। তাঁর মতে মতাদর্শ শ্রেণি-বর্ণ-লিঙ্গ বিভক্ত সামাজিক ক্ষমতার অসম বিন্যাসকে 'স্বাভাবিক ও প্রকৃতিদত্ত' হিসাবে উপস্থাপিত করে আর সে কারণেই এই সব বিভাজনকে প্রশ্নহীন মেনে নিতে বলে। সাহিত্য ও সংস্কৃতি হল 'মতাদর্শভিত্তিক রাষ্ট্রীয় যন্ত্রগুলোর' অন্যতম একটি অংশ। আমাদের মধ্যযুগের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে জানতে হবে মধ্যযুগের এই পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শের স্বরূপকে বোঝার জন্য।[৯] বাংলাদেশের বিখ্যাত সংগীত শিল্পী সায়ন একটি গানে লিখেছিলেন—

"রেখো মাটির পরে দুটি পা রেখো মাটির সাথে দস্তি।"[১০]

মধ্যযুগের সাহিত্যে নারীর অবস্থানকে জানা আদতে মাটিতে পা রাখা। বন্ধুত্ব রাখা মাটির সঙ্গে, যার উপর ভর করে আজকের মেয়েরা পুরুষতান্ত্রিকতা, ব্রাহ্মণ্যবাদের তৈরি করা ঝুট মোহ জাল ভেঙে নতুন আলোর পথের সন্ধান দেবে।

তথ্যসূত্র:

১. বসু, রাজশ্রী ও চক্রবর্তী, বাসবী (সম্পাদিত)। প্রসঙ্গ মানবীবিদ্যা। কলকাতা, উর্বী প্রকাশন, ২০০৮ পৃ.৩৫-৪৯।

২. ভট্টাচার্য, আশুতোষ (সম্পাদিত)। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস। কলকাতা, কলিকাতা বুক হাউস, ১৩৪৬, পৃ.১৫-৪২।

৩. গিরি, সত্যবতী ও মজুমদার, সমরেশ (সম্পাদিত)। প্রবন্ধ সঞ্চয়ন। নস্কর সনৎকুমার। মঙ্গলকাব্যে দেব-দেবী চরিত্র: আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত রত্নাবলী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ— পৌষ ১৪১৮, পৃ- ১৫৭।

৪. https://www.milansagar.com/kobi/bijoy_gupta/kobi-bijoygupta_kobita10.html, সময় 10:41 A.M, তারিখ: 10/03/2026

৫. ভট্টাচার্য, শ্রী সুরেন্দ্র চন্দ্র ও দাস, আশুতোষ (সম্পাদিত)। কবি জগজ্জীবন বিরচিত ও মনসামঙ্গল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৪, পৃ- ২২৭।

৬. ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস। ভট্টাচার্য, আশুতোষ (সম্পাদিত)। মনসামঙ্গল। কলকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২, পৃ.২০২।

৭. কবির সুমনের গানের লিঙ্ক: https://www.youtube.com/watch?v=L4by83FqkRQ সময় 01:41 A.M, তারিখ: 01/03/2026।

৮. গুপ্ত, বিজয়, পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল, শ্রীবসন্ত কুমার ভট্টাচার্য (সংকলক), শুধাংশু সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, বৈশাখ ১৩৪২, পৃ:২০৭।

৯. দাস, অপু (সম্পাদিত)। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ: নারীবাদী পাঠ। কলকাতা, বাণীশিল্প, ২০১৬, পৃ.২১-২৩

১০. সায়নের গানের লিঙ্ক: https://www.youtube.com/watch?v=vDhJTrVO38U সময় 12:41 P.M, তারিখ: 22/02/2026।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1435- 1442
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.364

শিবাজীকালীন মারাঠা জাতির আমোদ-প্রমোদ ও অবসর যাপনের ইতিকথা: রাজব্যবহারকোশের আলোকে একটি বীক্ষণ

শ্রাবন্তী কাঞ্জিলাল, *গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.03.2026; Accepted: 21.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The mainstream history of India is full of wars, military activities, and social and political activism of its rulers. The rise and fall of empires have also been understood in terms of racial affinity, cultural values, character of the leader, etc. The history of the Maratha Empire, which was established and nurtured under the dynamic leadership of Chhatrapati Shivaji Maharaj, is one such case. It will not be an exaggeration to suggest that Maratha history revolves primarily around Shivaji's political ideology and his relentless wars against the mighty Mughals, showcasing the Maratha military strategy, tactics, and logistical organisation. He united the Marathas for a purpose and infused them with an unprecedented zest for the establishment of Swarajya by achieving political independence from the Mughals. The unavailability of contemporary sources is the main obstacle in writing their story. Marathi sources mostly focus on the court activities. In the absence of written and archival records, it is difficult to reconstruct the mundane lives of the hardy people of the Maratha race, who displayed exemplary courage and a willingness to sacrifice for their leader and for Swarajya. Drawing on a contemporary Sanskrit source, the Rajvyavaharakosha, this paper attempts to outline the day-to-day life and activities of the Marathas. The aim is to show how the war-hardened Marathas kept themselves motivated and prepared afresh for the challenges ahead. This paper notes the various types of amusement and leisure activities the Maratha people engaged in, viz., the consumption of intoxicants, hunting expeditions, visiting brothels, engaging in various games and sports, and playing different musical instruments. It is argued that spending leisure time with pleasure was an integral part of Maratha culture during the seventeenth century, a dimension that has not been adequately highlighted in academic writings on the Marathas.

Keywords: Shivaji, Swarajya, Rajvyavaharakosha, Culture, Intoxicants, Hunting, Musical Instruments

শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা জাতির সঙ্গবদ্ধতার কাহিনী:

সপ্তদশ শতাব্দীতে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তিমলগ্নে যে সমস্ত আঞ্চলিক শক্তিগুলির উত্থান ঘটে, শিবাজীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা মারাঠা সাম্রাজ্য তাদের মধ্যে অন্যতম। কেন অন্যতম?- এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে বলা যায়, এটি অন্যান্য আঞ্চলিক শক্তি যেমন বাংলা, অবধের মতো মুঘল শক্তির উত্তরাধীকার হিসাবে উত্থান ঘটেনি।[১] বরং

মুঘল-এর মতো বৃহৎ শক্তির চোখ রাঙ্গানীকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা দেখিয়েছিল। মারাঠা জাতির নায়ক, শিবাজীর কথা অল্পবিস্তর আমরা সকলেই জানি। যদিও সেই ইতিহাস রাজনৈতিক তথ্যের কচকচানি ছাড়া আর কিছুই নয়। শিবাজীর উত্থান, আফজল খান কে হত্যা, শায়েস্তা খানকে শায়েস্তা করার গল্প, ঔরঙ্গজেবের চোখের ধুলো দিয়ে দিল্লি থেকে প্রত্যাবর্তন প্রভৃতি ঘটনাগুলি পর্যায়ক্রমে ইতিহাস বইতে বর্ণিত আছে। কিন্তু এসবই ব্যক্তি মানুষের তথ্য। সামগ্রিক ইতিহাস নয়। এখানে উল্লেখ করার বিষয়, মারাঠা জাতির ইতিহাস আলোচনা তাই প্রাসঙ্গিক; কারণ জাতির ইতিহাস ব্যতীত জাতীয় ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়।

মারাঠা জাতির ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে তাদের সঙ্গবদ্ধতা, আত্মনির্ভরতা ও স্বাধীনচেতা মানসিকতার সন্ধান মেলে। যারা শিবাজীর নেতৃত্বে অল্প যুদ্ধ সামগ্রী নিয়ে অকুতোভয়ে লড়ায় করে সমসাময়িক প্রবল ক্ষমতা সম্পন্ন শক্তিগুলির সাথে। তাদের এই লড়াকু মানসিকতা গড়ে ওঠার কারণ ছিল মহারাষ্ট্রের ভৌগোলিক পরিবেশ। ভূপ্রাকৃতিক অবস্থান মারাঠা সাম্রাজ্যের উত্থান ও সমৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দক্ষিণের পার্বত্য ঘেরা শুষ্ক এলাকা, মারাঠা জাতিকে পৃথক অস্তিত্ব তৈরি করতে সহায়তা করে। উচ্চনীচ পাহাড়ি এলাকা মারাঠা সাম্রাজ্যকে অসমতল, ভারতের ইতিহাসে এমন দুর্গম স্থান নেই।[২] এরকম দুর্ভেদ্য ভৌগোলিক পরিবেশ মারাঠা জাতিকে পরিশ্রমী ও অদম্য সাহসী, স্বাধীনতাপ্রিয় হওয়ার প্রেরনা জোগায় বলে যদুনাথ সরকার উল্লেখ করেছেন।[৩]

শিবাজীর সৈন্যদলে কর্মরত বেশিরভাগ লোক ছিলেন কৃষক, যা মারাঠা জাতীর মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তুলেছিল। এই মারাঠা কৃষক-সৈন্যদল প্রথা অনুযায়ী গ্রামের সীমা ছাড়িয়ে যুদ্ধ-অভিযানে বের হতেন এবং অক্ষয় তৃতীয়ার দিন স্বগৃহে ফিরে এসে চাষ করতেন।[৪] হিসাব মতো মারাঠি কৃষক-সৈন্যরা ছয় মাস যুদ্ধ করত, বছরের বাকি সময় নিজেদের জমিতে চাষ-আবাদে যুক্ত থাকতেন।[৫]

বিস্মিত হওয়ার মতো বিষয়, ভূপ্রাকৃতিক-ভাবে বিচ্ছিন্ন, কষ্টসহিষ্ণু, আত্মনির্ভর, স্বাধীনচেতা এই জাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে তথ্য প্রদানে ব্যর্থ মারাঠি উপাদানগুলি। যে কোন ধরনের সুন্দর অবসর যাপন নতুন কাজের জন্য অনুপ্রাণিত করে। মারাঠা জাতির পক্ষেও এটি সত্য। তাই, সপ্তদশ শতাব্দীর মারাঠিদের জীবনে আনন্দ-উৎসব, আমোদপ্রমোদ উদযাপনের ব্যবস্থা সহ মারাঠা জাতির অবসর যাপনের ইতিকথা আমরা পাই সমসাময়িক একটি অমারাঠি প্রাথমিক ঐতিহাসিক উপাদান থেকে, যা জাতির সংস্কৃতিকে জীবনকেও একাধারে প্রতিফলিত করে।

রাজব্যবহারকোশ:

ছত্রপতি শিবাজীর নির্দেশে সংস্কৃত ভাষায় সংকলিত একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থের নাম *রাজব্যবহারকোশ*। শ্লোক আকারে লেখা গ্রন্থটিতে যেখানে শিবাজীকালীন মারাঠি প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, রণনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবন প্রতিবিম্বিত হয়েছে। ১৬৭৪ সালে শিবাজীর রাজ্যাভিষেকের সময় তাঁর দরবারের অমাত্য রঘুনাথ পন্ডিতকে তিনি নির্দেশ দেন এই কাজটি সম্পন্ন করার জন্য। রঘুনাথ পন্ডিত ছিলেন কর্ণাটক নিবাসী সংস্কৃত ভাষায় সুপন্ডিত; যিনি একাধারে রাজনীতিবিদ, কূটনীতিবিদ ও ভৌগলিক জ্ঞান সম্পন্ন, সমরকুশলী, অভিজ্ঞ ব্যক্তি। পূর্বে মহারাষ্ট্র ও তৎসংলগ্ন এলাকা মুঘল প্রভাবাধীন থাকায় মহারাষ্ট্রে ফারসি ভাষার প্রশাসনিক কাজকর্ম চলার একটা রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। রঘুনাথ পন্ডিত সেই সমস্ত ফারসি শব্দগুলি যা দৈনন্দিন জীবন এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সঙ্গে যুক্ত সেগুলিকে নির্বাচিত করেন এবং গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করার পর সংস্কৃত ভাষায় প্রতিশব্দ দিয়ে পরিবর্তিত করেন। এই দ্বিভাষিক শব্দকোশ রচনার উদ্দেশ্য ছিল, দীর্ঘকাল মুঘল শাসনের অধীনে থাকায় সাধারণ মানুষের মনে মুঘল ভাষা ও সংস্কৃতির যে প্রভাব থেকে গিয়েছে তা দূরীকরণ। শিবাজী উপলব্ধি করেন সাধারণ মানুষের মনের থেকে মুঘল শাসনের প্রভাব মুক্ত করা শুধু যুদ্ধ দ্বারা সম্ভব নয় তার

জন্য মনে ও প্রাণে স্বাধীনচেতা হওয়া প্রয়োজন। তাঁর এই ভাবনার সার্বিক প্রতিফলন ঘটে নতুন শব্দকোশ রচনার মাধ্যমে।

রাজব্যবহারকোশ নামক সংস্কৃত ভাষায় রচিত এই শব্দকোশটি দশটি বর্গ বা অধ্যায়ে বিভক্ত। যথা,

রাজবর্গ- যা রাজা ও রাজদরবারের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন প্রশাসনিক পদ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

কার্যস্থানবর্গ- যেখানে শিবাজীকালীন মহারাষ্ট্রে গড়ে ওঠা কারখানা ও সেখানে উৎপাদিত হওয়া বিভিন্ন জিনিসপত্রের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে।

ভোগ্যবর্গ- এই অধ্যায়ে কবি সপ্তদশ শতাব্দীতে ভোগের সামগ্রী যেমন আতর ও সুগন্ধির তেলের তালিকা প্রদান করেছেন। পাশাপাশি শিকারের বর্ণনা, নেশাজাত দ্রব্য সেবন এই বিষয়ে, আলোকপাত করা হয়েছে। অর্থাৎ শিবরায়ন যুগের সাধারণ মানুষের যে সাংস্কৃতিক জীবন তা প্রতিফলিত হয়েছে এই পর্বে।

শস্ত্রবর্গ- শস্ত্র শব্দটির আক্ষরিক অর্থই বোঝায় অস্ত্রশস্ত্র-কে। শিবাজীকালীন মহারাষ্ট্রে কোন ধরনের অস্ত্র ব্যবহৃত হত, অস্ত্রাগার, এই বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

চতুরঙ্গবর্গ- এই বর্গে কবি রঘুনাথ পন্ডিত মারাঠা সেনাদলে নিযুক্ত পশু যথা ঘোড়া, হাতি, উট প্রভৃতির যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন।

সামন্তবর্গ- সামন্ত বর্গে বিশেষ করে পদাতিক বাহিনীতে নিযুক্ত সেনা ও তাদের পদমর্যাদার উল্লেখ আছে। এছাড়া মারাঠা রণকৌশল-এর বর্ণনা আছে।

দুর্গবর্গ- মহারাষ্ট্রের অসমতল ভূমিতে গড়ে উঠেছিল অসংখ্য দুর্গ। এই সমস্ত দুর্গগুলিতে প্রশাসনিক কাজকর্ম কিভাবে চলত, সেই বিষয়টি আলোচিত হয়েছে এই পর্বে।

লেখনবর্গ- প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যে ধরনের কাজ করা হত, তার বিস্তারিত তথ্য লিখিত রাখার জন্য শিবাজীর সময় গড়ে উঠেছিল লেখ্যশালা। এখানে লিখন পদ্ধতি এবং লেখার কাজে সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট পদের উল্লেখ আছে।

জনপদবর্গ- মুঘল প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে যে সম্পূর্ণ রূপে উৎপাটিত করে শিবাজী নতুন প্রশাসনিক বন্দোবস্ত শুরু করেছিলেন এবং সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক বিভাগেও পরিবর্তন আনেন। কৃষি পদ্ধতির যে পরিবর্তন করা হয়েছিল সে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে সেই এই পর্বে।

পণ্যবর্গ- পণ্য বর্গে; কি ধরনের পণ্যদ্রব্য বাজারে বিক্রি হত, তার সাথে যুক্ত সামাজিক শ্রেণীরও বর্ণনা করা হয়েছে রাজব্যবহারকোশের শেষ অধ্যায়টিতে।

৩৭৪ টি শ্লোক নিয়ে রচিত এই প্রাথমিক ঐতিহাসিক উপাদানটি শিবাজীকালীন মহারাষ্ট্রের সামগ্রিক ইতিহাসের কাঠামো রচনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই উপাদানটিকে আমরা official document হিসেবে ব্যবহার করতে পারি যেহেতু এটা শিবাজীর নির্দেশে রচিত।

রাজব্যবহারকোশ-এর চতুর্থ অধ্যায় ভোগ্যবর্গ, যা মারাঠা সংস্কৃতির একটি অজানা কাহিনী আমাদের সামনে চিত্রিত করে। শিবাজিকালীন মহারাষ্ট্রে সাধারন মানুষের অবসর যাপনের ইতিবৃত্ত তুলে ধরার মাধ্যমে তৎকালীন সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনের বর্ণনা করা হয় উক্ত গ্রন্থে। সেসময় অবসর যাপন, আমোদ-প্রমোদের ও বিনোদনের অঙ্গ হিসাবে বিভিন্ন ধরনের পানীয় ও নেশাজাত দ্রব্য ব্যবহারের তালিকা প্রদান করে। এছাড়া পতিতালয় গমন, পাশা খেলা, অভিনয়, নাচ-গানে সাধারন মানুষের অংশগ্রহণ, সর্বোপরি বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র বাজানোর হদিশ দেয়, যা শিবাজিকালীন মহারাষ্ট্রের জাতির ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এক নয়া সংযোজন। *রাজব্যবহারকোশ*-এর ভাষায় বর্ণিত হয়েছে-

ধূমযন্ত্র গুড়গুড়ী তমাখু ধূমপত্রকম:

ধূমপান সপ্তদশ শতাব্দীর মহারাষ্ট্রের মানুষদের অবসর যাপনের একটি প্রিয় উপায় ছিল। ধুম পানের যন্ত্রটি গুড়গুড়ি নামে পরিচিত ছিল বলে *রাজব্যবহারকোশে* উল্লেখ আছে। এই রকম নামকরনের উদ্দেশ্য সম্ভবত যেমন হুঁকা খাওয়ার সময় জলে বুদবুদ উঠে এইরকম আওয়াজ হয় বলে। এর সংস্কত প্রতিশব্দ হল ধুমযন্ত্র।[৬] গ্রামবাংলায় আজও বয়স্ক মানুষেরা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে সমবেত হন, এবং হুঁকা গুড়গুড় শব্দে মুখরিত হয়ে ওঠে। মারাঠি সমাজেও এই ধুমযন্ত্রে তামাক সাজানো থাকত, সংস্কৃত ভাষায় বলা হত ধূমপত্র। ধুমযন্ত্রের যে স্থানে তামাক (ধূমপত্র) রাখা ও জ্বালানো হত তা উপস্করপাত্র।[৭] এই স্থানে একটি পাইপ লাগানো থাকত, এই পাইপের দ্বারা তামাক সেবন করা হত।

রাজব্যবহারকোশ-এর একটি শ্লোকে বর্ণিত আছে- সুরাগারং শরাবখানা সুরাদাতা শরাবদার[৮]; এখানে বলা হয়েছে যে স্থানে সুরাজাত দ্রব্য বিক্রি হয়, তাকে সংস্কৃত ভাষায় সুরাগার বলা হত। যে ব্যক্তি এই সুরাগার চালাতেন তিনি সুরাদাতা নামে পরিচিত ছিলেন। মদদ্রব্য-এর উল্লেখ আছে, যা একধরনের নেশাজাত পানীয়। সুধা- পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ একপ্রকার সুস্বাদু পানীয়।[৯]

পান চেবানো চিত্তবিনোদনের একটি উপায় হিসাবে গৃহীত হয়। পান খাওয়া হত চুন ও সুপুরি দিয়ে। প্রাচীন ভারতে পান খাওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। জাতক কথা নামক গ্রন্থে এই প্রথার কথা বর্ণিত আছে। দশম শতাব্দীর প্রথমভাগে আরব লেখক আবু জাহিদ উল্লেখ করেছেন পান রীতি ছিল বন্ধুত্ব বা সম্মানের প্রতীক হিসাবে। আল বিরুনী বর্ণনা করেছেন- ভারতীয়রা রাত্রে খাবার খাওয়ার পর, পানের মধ্যে চুন লাগিয়ে চেবাতেন হজম করার জন্য।[১০] পানকে উন্নতির প্রতীক মানা হতো। ভারতীয় সামাজিক উৎসব এবং ধর্মীয় আচার-অনুস্থানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকত। এছাড়া পান কাউকে দেওয়ার অর্থ ছিল সম্মানের সাথে অতিথি সেবার সমার্থক। *রাজব্যবহারকোশ* পান এর উল্লেখ আছে তম্বুল নামে। তম্বুলদান এর অর্থ পান রাখার পাত্র। যে পাত্রে চুন রাখা হতো তা চূর্ণপাত্র।[১১]

আমরা আফিমের কথাও পাই উক্ত প্রাথমিক ঐতিহাসিক উপাদানটিতে। P. N. Chopra তাঁর গ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন- রাজপুতরা 'মাধব রা-পেয়ালা' নামক এক ধরনের মাদকদ্রব্যর প্রতি আসক্ত ছিল। বার্নিয়ার লিখেছেন, যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার আগে রাজপুতরা আফিম সেবন করত, তাদের মাথার উপর দেখা যেত আফিমের ধোঁয়া। এই উত্তেজক শরীরে সাহস জোগাত ও মনোবল বৃদ্ধি করতে সহায়তা করত।[১২] তাই যুদ্ধে হোক বা অবসর সময়ে মারাঠা জাতির মানুষ আফিম সেবন করত, এই বিষয়টি সন্দেহাতীত।

উপরিউক্ত আলোচনা আমাদের উপলব্ধি করতে সাহায্য করে শিবাজীকালীন মহারাষ্ট্রে সামাজিক জীবন কিরূপ ছিল। কাজের ফাঁকে অবসর কি ভাবে যাপন করা যায় সে সম্পর্কে তারা অবহিত ছিলেন। আমরা জানি মুঘল সেনাবাহিনী নিজেদের মনোরঞ্জন এর জন্য মহিলা নিয়ে যেত। মারাঠা সেনারা শিবাজীর নির্দেশ মতো রণক্ষেত্রে মহিলাদের নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। তাই হয়তো নিজেদের প্রিয় মানুষদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার দুঃখ ভুলে থাকার উপায় হিসাবে নেশাজাত দ্রব্য সেবন করত।

বিশ্রামকষায়, একটি সংস্কৃত শব্দ যার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায় পতিতালয় বা সাময়িক আনন্দ লাভের জন্য যে স্থানে যাওয়া হত।[১৩] বনিতাভিক্ষা শব্দটির ব্যবহার পতিতা স্ত্রীদের উল্লেখ *রাজব্যবহারকোশ* নাট্যস্ত্রী[১৪]-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যারা অভিনয় ও এই ধরনের গুণ দ্বারা মনোরঞ্জন করত।

রাজব্যবহারকোশে উল্লিখিত দৃষ্টিপ্রিয়[১৫] শব্দটির অর্থ সুন্দর মহিলা। গায়ক শ্রেনীর কথা বর্ণিত আছে যারা গান গেয়ে মনোরঞ্জন করত। এছাড়া কলাবন্তা[১৬] ও বনিতা[১৭] শ্রেনীর উল্লেখ পাই এই গ্রন্থে। কলাবন্তা শব্দটি আমাদের স্মরণ করাই চৌষট্টি কলাবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এই শ্রেনীর মহিলারা নিজেদের গুণের প্রদর্শন করে

দর্শক ও খরিদ্দারদের চিত্তবিনোদন করতেন। প্রাচীন ভারতবর্ষে এই শ্রেনীর অস্তিত্বের আভাস পাই অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি গ্রন্থ কামসূত্র থেকে। অন্যদিকে বনিতা শব্দটি যৌনকর্মী-দের বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

রাজব্যবহারকোশে 'শিকারং মৃগয়া ভবেৎ'[18] শ্লোকে মৃগয়া কথাটির উল্লেখ আছে, যার তর্জমা করলে দাঁড়ায় শিকার। ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল থেকেই রাজা কিংবা পার্ষদ-দের আমোদের পরিচিত মাধ্যম ছিল। এমনকি সাহিত্যে ব্যাধ জাতির উল্লেখ আছে যারা শিকার করে নিজেদের জীবন-যাপন করতেন। মহাকবি কালিদাস তাঁর 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' মহাকাব্যে, নায়ক দুষ্মন্ত ও নায়িকা শকুন্তলার প্রথম দর্শনের প্রেক্ষাপট ছিল- শিকার। যে পশুদের শিকার করা হতো, তাদের নামোল্লেখ আছে *রাজব্যবহারকোশের* শ্লোকগুলিতে। শিবাজিকালীন মহারাষ্ট্রে বাঘ শিকারের চল ছিল। *আইন-ই-আকবরীতে,* বাঘ শিকারের বিভিন্ন পদ্ধতির আলোচনা আছে।[১৯] সম্ভবত, বাঘ জাতীয় পশু শিকার অভিজাত ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। যা অর্থনৈতিক ক্ষমতা এবং সামাজিক প্রতিপত্তির সমার্থক। মুঘল যুগে জাহাঙ্গীর, বাঘ শিকার সম্পর্কে একটি নির্দেশনা জারি করেন, শুধুমাত্র পুরুষ বাঘদের শিকার করা যাবে এই বিষয়ে।[২০] চিতা বাঘ শিকারের হদিশ মেলে *রাজব্যবহারকোশে*। যা সংস্কৃত ভাষায় দ্বীপি নামে পরিচিত।[২১]

শিবরায়ন যুগে ঐন্দ্রজালিক বলে এক শ্রেনীর উল্লেখ পাই।[২২] শব্দটির বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায় জাদুকর। *রাজব্যবহারকোশ* গ্রন্থটিতেই এই সংস্কৃত শব্দটির সন্ধান মেলে, যা মারাঠা ইতিহাসের সামাজিক জীবন সম্পর্কে অমূল্য তথ্য প্রদান করেছে। রাজব্যবহারকোশের দশম অধ্যায়ে এই ঐন্দ্রজালিকদের অবস্থান আমাদের অবগত করে শিবাজীকালীন মারাঠা সমাজের শিল্পী শ্রেনীর সামাজিক অবস্থান বিষয়ে। সম্ভবত, জাদুকররা গ্রামে গিয়ে জাদু দেখিয়ে সাধারন মানুষদের বিশেষত ছোট বাচ্চাদের মনোরঞ্জন করত। তবে, রাজদরবারে এদের স্থান সম্পর্কে বা কার্যকলাপ সমন্ধে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

উল্লেখ করার মতো বিষয় হল, পাশা খেলা ছিল মারাঠি দৈনন্দিন আমোদের অঙ্গ। *রাজব্যবহারকোশ* সাক্ষ্য দেয়, দ্যুতকারক-দের যার বাঙ্গলা অর্থ হল পাশকক্রীড়ক।[২৩] যারা পাশা খেলে। পাশা খেলার ইতিহাস বহু প্রাচীন। সিন্ধু সভ্যতার যুগেও পাশা খেলার সরঞ্জাম পাওয়া যায়। আবার মহাভারতের যুদ্ধের একটি অন্যতম কারন ছিল, দ্যুতক্রীড়ার সময় পাণ্ডবদের প্রতি কৌরবদের ছলনা। যা প্রমাণ করে পাশা খেলার জন্য যথেষ্ট বুদ্ধি ও ধৈর্য ছিল অপরিহার্য গুণ। যা মারাঠা জনসমাজে ছিল বলে ধারনা করা যায়।

মারাঠা সংস্কৃতিতে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার:

মারাঠা সাংস্কৃতিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল উৎসব- অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার। *রাজব্যবহারকোশের* অন্তর্ভুক্ত শ্লোকগুলি আমাদের হদিশ দেয় সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজদরবারে পৃথক বাদ্যযন্ত্র নির্মাণ ও সংরক্ষণ স্থান ছিল, যাকে সংস্কৃত ভাষায় বাদ্যশালা বলা হতো।[২৪] এই বাদ্যশালায় উপস্থিত বাদ্য যন্ত্রের তালিকা দেওয়া আছে। যথা,

দুন্দুভি[২৫]- যার বাংলা তর্জমা করলে হয় বৃহৎ ঢক্কা বা ঢাক। এর আকৃতি খুব বড় হয়। ঢাকের থেকে নির্গত আওয়াজ খুব উচ্চ ও জোরাল হয়।

আনক[২৬]- এটি মৃদঙ্গ নামক বাদ্যযন্ত্রের সমার্থক। এর আকৃতি অনেকটা ঢাকের মতো হলেও, আয়তনে ছোট। মৃদঙ্গ ধ্বনি মৃদু তবে গভীর হয়।

ভেরী[২৭]- আমরা মগধ সাম্রাজ্যের ইতিহাস পড়তে গিয়ে দেখি, সম্রাট অশোক ভেরীঘোষ- এর পরিবর্তে ধর্মঘোষ এর ঘোষণা করেন। ভেরী একধরনের রনদামামা যা যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহারের রীতি ছিল। শিবরায়ন যুগে যুদ্ধে বাদ্যযন্ত্রের উপস্থিতি মারাঠা রননীতির এক অনন্য বৈশিষ্ট। এটিও একপ্রকারের ঢোল। যা যুদ্ধক্ষেত্রে বাজানোর উদ্দেশ্য ছিল মারাঠা যোদ্ধাদের মধ্যে ভয় দূর করে রণউন্মাদনা তৈরি করা।

পণব[২৮]- এটিও এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র। বাংলায় চর্যাপদের যুগে ব্যবহারের প্রমান মেলে। সপ্তদশ শতাব্দীর মহারাষ্ট্রে এর ব্যবহার আমাদের মারাঠি ও বাঙালি সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান সম্পর্কে পরোক্ষ প্রমান দেয়।

শৃঙ্গ[২৯]- এটি একটি সংস্কৃত শব্দ; যা বাংলা ভাষায় শিঙ্গা নামে বহুল পরিচিত। সাধারনত এটি আকারে লম্বা হত। পশুর সিং দিয়ে তৈরি এই বাদ্যযন্ত্রটি ফুঁ দিয়ে বাজানোর রীতি প্রচলিত ছিল।

আনদ্ধ[৩০]- এটিও এক ধরনের মৃদঙ্গ, যা বাদ্যযন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতো।

কম্বু[৩১]- কম্বু শব্দটির বাংলা অর্থ হল শঙ্খ। ভারতীয় সংস্কৃতিতে শঙ্খ-এর ব্যবহার সম্পর্কে সকলেই অবহিত। শঙ্খের আওয়াজকে মঙ্গলের প্রতীক বলে উৎসব ও শুভ অনুষ্ঠানে, সম্ভবত যুদ্ধক্ষেত্রেও শঙ্খ ধ্বনি দেওয়া হতো।

বেণু[৩২]- এর বাংলা অর্থ হল বাঁশি। *রাজব্যবহারকোশের* দশম অধ্যায় যেখানে কবি বিভিন্ন পেশাগত শ্রেনীর তালিকা দিয়েছেন, সেখানে বেণুকার শব্দটির উল্লেখ আছে।[৩৩] যা অবশ্যই বংশীবাদকদের নির্দেশ করে। সম্ভবত, নাট্যস্ত্রীরা যখন নিজেদের কলা মঞ্চস্থ করতেন। এই বংশীবাদকরা সেখানে উপস্থিত থেকে সুরের জাদুতে দর্শকদের মনোরঞ্জন করতেন তা অনুমেয়।

ডমরু[৩৪] - এই বাদ্যযন্ত্রটি ডুগডুগি নামে বহুল পরিচিত। এটি আকারে অনেকটা ছোট হওয়ার জন্য অনায়াসে হাতে নিয়ে বাজানো যায়।

শ্রীশিবভারতে, উল্লেখ আছে- শিবাজীর জন্মের সময় হাজারটা ভেরী একসঙ্গে বাজানো হয়।[৩৫] এর থেকে অনুমেয়, মারাঠা জাতির শিশুর জাতকর্ম অনুষ্ঠানে, বিবাহ উৎসব, পূজা উপলক্ষে, যুদ্ধ জয়ের আনন্দে কিংবা সাধারন আমদ-প্রমোদের অঙ্গ হিসাবে গান গাওয়া, বাজনা বাজানোর রীতি প্রচলিত ছিল।

শেষের কথা:

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এই বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হওয়া গেল যে অনবরত যুদ্ধে মেতে থাকা একটা জাতি, যাদের কাছে মৃত্যুর হাতছানি বেঁচে থাকার নিশ্চয়তার থেকে অনেক বেশি ছিল; নিজেদের অবসর জীবনযাপনে কোনো রকম কার্পণ্য করেননি। নিজেদের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার অদম্য ইচ্ছা এই জাতি কাজের দ্বারা প্রমান করেছে। সেটা গান-বাজনা করার মাধ্যমেই হোক কিংবা তামাক খেতে খেতে গল্পের আসর জমিয়ে নিজেদের ছোট ছোট দুঃখ-সুখ ভাগ করে নেওয়ার মধ্যে দিয়েই হোক। মারাঠা জাতির বেঁচে থাকার রসদ জুগিয়েছিল এই অবসরযাপন। এখানে প্রশংসা করার মতন বিষয় হল যে বণিতা বা নাট্যস্ত্রীরা আজকের সমাজেও যথাযথ স্থান পান না। সেখানে মধ্যযুগীয় একজন কবি যিনি অনায়াসে এই শ্রেণীর কথা বর্ণনা করেছেন এবং এদের পেশা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ভাবে আলোচনা করেছেন। তৎকালীন মারাঠি বা ফারসি ঐতিহাসিক উপাদান যেখানে ঐন্দ্রজালিক বা বংশীবাদকদের মতো সামাজিক শ্রেণীর কথা উল্লেখ করার বিষয়ে সচেতনতা দেখা যায়নি, সেখানে একটি শব্দকোশে এদের উপস্থিতির কথা বর্ণিত হয়েছে। মারাঠা যুদ্ধ-নীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত ছিল বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার। যেমন, রণক্ষেত্রে জোরালো শব্দযুক্ত বাদ্যযন্ত্র দুন্দুভি ব্যবহৃত হচ্ছে কিংবা সামাজিক উৎসবে মৃদঙ্গ, বেণু, শঙ্খর ব্যবহার-এই সামান্য বিষয়ে পার্থক্য আলোচনা করে *রাজব্যবহারকোশ* নিজের অসাধারনত্বের পরিচয় দিয়েছে। যেখানে অন্যান্য প্রাথমিক উপাদানগুলি এ বিষয়ে নিশ্চুপ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য *রাজব্যবহারকোশ* একটি শব্দকোশ মাত্র। তাই মারাঠা সাম্রাজ্য সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনা এতে থাকবে না এটাই স্বাভাবিক। এটি তথ্যসমৃদ্ধ তবে বিশ্লেষণের দায়িত্ব লেখক এর ওপরেই বর্তায়। তাই এই প্রাথমিক ঐতিহাসিক উপাদানটির যথাযথ বিশ্লেষণের দ্বারা মারাঠা সাম্রাজ্যের ও জাতির ইতিহাসের এক নবদ্বার উন্মোচন-এর সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা যায় না।

(*রাজব্যবহারকোশ* সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রাথমিক ঐতিহাসিক উপাদান। সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য আমি সংস্কৃত শ্লোকগুলি লিখতে বাংলা অক্ষর ব্যবহার করেছি)।

তথ্যসূত্র

[১] বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর। *পলাশি থেকে পার্টিশান*। ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১১, কলকাতা, পৃ. ২৪।

[২] রায়, শরৎকুমার। *শিবাজী ও মারাঠা জাতি*। মেটকাফ্ প্রিন্টিং ওয়ার্কাস, ১৩১৬(ব), কলকাতা, পৃ. ৫।

[৩] সরকার, যদুনাথ। *শিবাজী*। ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯২৯, কলকাতা, পৃ. ৪।

[৪] পানসারে, গবিন্দ। *কে ছিলেন শিবাজি?*। পৃ. ২৫।

[৫] রায়, শরৎকুমার। *শিবাজী ও মারাঠা জাতি*। পৃ. ২।

[৬] রঘুনাথ পন্ডিত রচিত *রাজব্যবহারকোশ*, সম্পা., কে. এন. সানে. (প্রকাশিত) দি. ভি. আপটে এবং এস. এম. দিভেকর, *শিবচরিত্রপ্রদীপ*, (ভারতীয় ইতিহাস সংশোধক মন্ডল, পুনর্মুদ্রণ ২০০৯, পুণা), শ্লোক. ৮৯, পৃ. ১৫১।

[৭] তদেব।

[৮] তদেব, শ্লোক. ৯৫, পৃ. ১৫২।

[৯] তদেব, শ্লোক. ৮৮, পৃ. ১৫১।

[১০] Singh, Upinder. *A History of Ancient and Early Medieval India*: *From the Stone Age to the 12th Century*. Pearson, 2018, Noida, p. 596.

[১১] *রাজব্যবহারকোশ*, শ্লোক. ৯৬, পৃ. ১৫২।

[১২] Chopra, P. N. *Some Aspects of Society and Culture during the Mughal Age, (1526-1707).* Shiva Lal Agarwala & Co. (P.) Ltd., 1963, Agra, p. 50.

[১৩] *রাজব্যবহারকোশ*, শ্লোক. ৮৭, পৃ. ১৫১।

[১৪] *রাজব্যবহারকোশ*, শ্লোক. ৩৩, পৃ. ১৪৬।

[১৫] তদেব, শ্লোক. ৩১।

[১৬] তদেব, শ্লোক. ৩২।

[১৭] তদেব।

[১৮] তদেব, শ্লোক. ১০৪, পৃ. ১৫২।

[১৯] Chopra, P. N. *Some Aspects of Society and Culture*, p. 70.

[২০] তদেব।

[২১] *রাজব্যবহারকোশ*, শ্লোক. ১০২, পৃ. ১৫২।

[২২] *রাজব্যবহারকোশ*, শ্লোক. ৩৮২, পৃ. ১৭৪।

[২৩] *রাজব্যবহারকোশ*, শ্লোক. ৩৭২, পৃ. ১৭৪।

[২৪] *রাজব্যবহারকোশ*, শ্লোক. ১৭৪, পৃ. ১৫৮।

[২৫] *রাজব্যবহারকোশ*, শ্লোক. ১৭৪, পৃ. ১৫৮।

[২৬] *রাজব্যবহারকোশ*, শ্লোক. ১৭৪, পৃ. ১৫৮।

[২৭] *রাজব্যবহারকোশ*, শ্লোক. ১৭৪, পৃ. ১৫৮।

[২৮] *রাজব্যবহারকোশ*, শ্লোক. ১৭৪, পৃ. ১৫৮।

[২৯] *রাজব্যবহারকোশ*, শ্লোক. ১৭৪, পৃ. ১৫৮।

[৩০] *রাজব্যবহারকোশ*, শ্লোক. ১৭৫, পৃ. ১৫৮।

[৩১] *রাজব্যবহারকোশ*, শ্লোক. ১৭৫, পৃ. ১৫৮।

[৩২] *রাজব্যবহারকোশ*, শ্লোক. ১৭৬, পৃ: ১৫৮।

[৩৩] *রাজব্যবহারকোশ*, শ্লোক. ৩৭৬, পৃ. ১৭৪।

[৩৪] *রাজব্যবহারকোশ*, শ্লোক. ১৭৬, পৃ. ১৫৮।

[৩৫] কবীন্দ্র পরমানন্দ রচিত *শ্রীশিবভারত*, সম্পা. ও মারাঠী ভাষান্তর, সদাশিব মহাদেব দিবেকর (মর্বেন টেক্নলজীজ্, পুনর্মুদ্রণ ২০২১, পুণা), পৃ. ৮০।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১. Kulkarni, A. R. *Maharashtra in the Age of Shivaji (A Study in Economic History).* Diamond Publications, 2008, Pune.

২. Sen, S. N. *Siva Chhatrapati.* University of Calcutta, 1920, Calcutta.

৩. Sen. S. N. *Military System of the Marathas.* The Book Company Ltd., 1928, Calcutta.

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1443-1448
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.365

প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাপ: অন্তর্মনের কালোরজ্জু

রাখী মিস্ত্রী, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.03.2026; Accepted: 24.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

"Intense opposition" and "excessive romanticism," which were essentially the dominant tones of the Kallol Movement (1923–1929), introduced into Bengali literature themes such as bohemian sensibilities, the helplessness of the lower and middle classes, a critical reassessment of "accepted values," and a pervasive sense of despair. Among the leading figures of this movement was the eminent writer Premendra Mitra (1904–1988). Even among contemporary writers, the distinctive tone and texture of Mitra's narrative style are easily recognizable. His stories, marked by innovative form and thematic presentation, explore the consciousness of the lower classes, the struggles of middle-class life, the interplay of reality and surrealism, subtle psychological depths, and the anguish of urban existence in a truly striking manner.

In the short story *"Sap" (The Snake)*, similar tensions, conflicts, and psychological intricacies of middle-class life are delicately portrayed. The narrative presents the seemingly simple married life of Uma and Umesh, who live in a quarter allotted through Umesh's job. Next door lives another couple, Adhar and Rangaboudi, whose married life also appears normal and content from an external perspective. Like many newly married women, Uma enters her marital life with the determination to adjust and adapt. Initially, she develops a cordial relationship with Rangaboudi, but gradually her attitude turns bitter.

This change occurs as Uma becomes increasingly aware that the relationship between Umesh and Rangaboudi is not entirely natural or innocent; rather, it carries deeper, more ambiguous undertones. Umesh's crude jokes and indecent behavior centered around Rangaboudi begin to poison Uma's mind, giving rise to a kind of melancholia that engulfs her subconscious. Troubled by this situation, Uma plans to leave with Umesh and start a new life elsewhere, but this plan fails due to Umesh himself. She gradually realizes that Umesh is almost like a puppet in Rangaboudi's hands. Rangaboudi, in turn, openly asserts her authority over Umesh, even in Uma's presence.

At one point, Uma becomes frightened by the sight of a snake in the kitchen and locks herself inside a room. However, while she can shut the physical door, she cannot confine the turmoil within her mind. Overwhelmed by unbearable thoughts, she falls asleep, and the tangled complexities of her husband's relationship with Rangaboudi coil around her psyche like a venomous snake. The story ultimately explores how Uma confronts and frees herself from these toxic mental entanglements.

Thus, the narrative presents a subtle and profound portrayal of Uma's psychological state.

Keywords: Snake, Id, Consciousness, Vulgarity, Psychology, Libido, Indecency

"গানের সুরের মতো বিকালের বাতাসে
পৃথিবীর পথ ছেড়ে— সন্ধ্যার মেঘের রঙ খুঁজে
হৃদয় ভাসিয়া যায়,—সেখানে সে কারে ভালোবাসে!"[১]

ভালোবাসা তো চিরন্তন মানুষের অভিপ্রেত। ভালোবাসার যে রূপ রঙ মানুষ আপনার মধ্যে আপনার হৃদয়ে শুভ্র কোমল শিউলির মতো স্নিগ্ধতায় ভরিয়ে রেখেছে, আবহমান কাল থেকে তা সাহিত্যেও রূপ রং ভাষার প্রয়োগে শিল্পীরই হাতের চালচিত্র হয়ে উঠেছে। হয়ে উঠেছে বাস্তবজীবনের প্রতিচ্ছবি। কখনো তা 'গানের সুরের মতো' হৃদয়ের আকাশ ছুঁয়েছে অবলীলায়, আবার যার পরিণতি হিংসাত্মক ক্রূরতায় হানি ঘটিয়েছে অপরের। কিন্তু প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির এই কামনা-বাসনা তো কেবলমাত্র মানুষের আপনার হৃদয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, তা কখনো কখনো দেহসর্বস্ব হয়ে উঠেছে- বলা ভালো Libido বা যৌনতাই যার মূল। তবু সামাজিক কতগুলি অলিখিত নিয়মে সীমাবদ্ধ মানুষ। একে অপরের প্রতি দায়বদ্ধও খানিকটা। যদিও অপরূপ ভাবেই কী ভীষণ আলাদা প্রতিটি মানুষ, আলাদা তাদের জীবনের গল্প, আলাদা তাদের স্বপ্ন-আশা-আকাঙ্ক্ষা, আলাদা তাদের জীবনতৃষ্ণা। জীবনের সার্থকতার প্রশ্নের সীমাংসা হয়না সহজে। তবুও মানুষ বাঁচে। বাঁচে স্বপ্নে-বাঁচে আপ্তি প্রাপ্তিতে, বাঁচে রক্তে-মাংসে, প্রেমে-অপ্রেমে- ভালোবাসায়। আর এই ভালোবাসা তো শরীরকে উপেক্ষা করে নয়। 'লালসা ও লিবিডো' ছাড়িয়ে মানুষ এগোতে যে পারেনি শিল্প সাহিত্যে তার প্রমাণ মিলেছে বারবার। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) 'প্রগৈতিহাসিক', জগদীশ গুপ্তের (১৮৮৬-১৯৫৭) 'আদি কথার একটি', 'চন্দ্র সূর্য যতদিন', প্রেমেন্দ্র মিত্রের (১৯০৪-১৯৮৮) 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে', 'সাপ' এবং তারও অনেক পরে মতি নন্দীর (১৯৩১-২০১০) 'শবাগার' গল্পে যার প্রমাণ মেলে, উনিশ শতক এবং বিশ শতকের লেখকদের লেখায় এই চিত্র ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ধরা পরেছে। ব্যতিক্রমী সেসব জীবনের নানা চিত্রই গল্প উপন্যাসের আবর্তে উঠে এসেছে। 'অধীর পাতার মতো' ভালোবাসা চেয়েছে যারা, "নীড়ের মতন বুকে একবার তার মুখ গুজে/ ঘুমোতে চেয়েছে,— তবু ব্যথা পেয়ে গেছে ফেঁসে—"[২] তেমন মানুষের সংখ্যাও কিছু কম নয় এই পৃথিবীতে, তবু অন্তরে অবসাদও থেকে যায় অনেক মানুষের, 'অনেক চলার পথ' না মিললেও পথ মেলাবার সংকল্প ও স্বপ্ন বুকে নিয়ে একদল মানুষ হেঁটে চলে পৃথিবীর বুকে, অন্ধ গলিতে আলো জ্বালাবার আর্তি নিয়ে কড়া নাড়ে পৃথিবীর দরজায়; হৃদয়ের বারুদে ঘষা খেয়ে দেহে জ্বলে ওঠে কামনার আগুন। আকাঙ্ক্ষিত জীবন-সুখ-স্বপ্ন-প্রেম-যৌনতা সমস্ত কিছুর পরেও থেকে যায় আরও কিছু, অন্য কোনো সুর, অন্য কোনো জীবন, অবসাদ, ঘৃণা, বিদ্বেষ, প্রেম, অপ্রেম বিরহ, যন্ত্রণা, লোভ, লালসারও পরে আরও গভীরে রয়ে যায় ইঙ্গিত আকাঙ্ক্ষার বীজ আর তারও গভীরে নিহিত মানুষের অতল মনস্তত্ত্ব।

রবীন্দ্রত্তোর বাংলা সাহিত্যের কয়েকজন সেরা গল্পকার তাঁদের গল্পে সাধারণ মানুষের জীবনের যে চালচিত্র, মনস্তত্ত্ব, মনবিকলন, দাম্পত্যের খুঁটিনাটি, প্রেম, প্রতিহিংসা ও নির্মমতাকে তুলে ধরেছেন তাঁদের সাহিত্যে— তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮) এবং তাঁর সমকালীন জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫১), তারাশঙ্কার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬), বুদ্ধদের বসু (১৯০৮-১৯৭৪), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬), শিবরাম চক্রবর্তী (১৯০৩-১৯৮০) এঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের গল্পে বাংলাসাহিত্য পেয়েছে নতুনত্বের স্বাদ। কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্রকে আলাদা করে চেনা যায় এঁদের সকলের মধ্যে। তাঁর 'মুন্সিয়ানা' ও Uniqueness তাঁর সাহিত্যের মূল স্বর। "প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখায় কোন সৌখিন বিলাস নেই, যা সত্য যা বাস্তব তারই প্রতিচ্ছবি গল্পগুলিতে।... তিনি যেমন গোটা মানুষের মানে চেয়েছিলেন, তেমনি জীবনকে বিশেষ করে নাগরিক জীবনকে যেন ল্যাবরেটরীতে নিয়ে গিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন নিরাসক্তভাবে।"[৩] তবু অতীত ইতিহাসের মতো

গল্পের স্বাদ বদলে যায়, আর এই বদলের ছাপ আনে সাহিত্যে স্বতন্ত্রতা। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সাপ' গল্পে বিদ্যমান বিকৃত রুচি ও যৌনমনস্তত্ত্ব বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের আলোচনার বিষয়। এই গল্পে রয়েছে সম্পূর্ণ আলাদা জীবনবোধ। 'সাপ'- এর Symbol- এ উঠে আসা মনস্তত্ত্ব এই গল্পের মূল বিষয়বস্তু।

'সাপ' গল্পটিতে চেতনাপ্রবাহের যে সুর উমা চরিত্রের মধ্যে দিয়ে উপস্থাপিত হয়ছে, বিষের কুণ্ডলীর কালোরজ্জুর পাকে যেভাবে তার মনন জড়িয়ে পড়েছে তা সত্যি ভাববার মত। উমেশ ও উমার দাম্পত্যের মধ্যে রাঙাবৌদি রয়েছে যেন দৃশ্যমান কাঁটার মতো। উমেশ ও রাঙাবৌদির সম্পর্কের মিথস্ক্রিয়ার যে টুকরো টুকরো ছবি পাওয়া যায় তা সহজ হলেও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নয়; তাদের মধ্যেকার বার্তালাপের কিছু অসঙ্গতি বড় বেশি নাড়া দেয় উমাকে। রাঙাবৌদির প্রতি উমেশের আচরণে শালীনতার মাত্রা কিন্তু সমাজগণ্ডি পেরিয়ে একটু বাড়তি কিছুই, যা অভব্য ও অরুচিকর- আর এগুলিই উমাকে অপ্রতিভ করেছে বারবার। চিরাচরিত সমাজ কাঠামোয় রক্তের সম্পর্কে তারা কেউ নয়, নেই কোন আত্মীয়তার সম্পর্কও, শুধু পাশাপাশি কোয়াটারে বসবাসের সূত্রেই অধর এবং রাঙাবৌদির সঙ্গে সম্পর্ক উমেশের। অধরকে উমেশ দাদা সম্মোধন করে এবং সেই সূত্রেই রাঙাবৌদির সঙ্গে ঠাট্টা ইয়ারকির সম্পর্ক তার। কিন্তু এই ঠাট্টা শুধু যে অপ্রীতিকর তাই নয় বরং খানিকটা কুরুচিকরও বটে। শালীনতার গণ্ডি বহির্ভূত এই অভব্যতা মাত্রাছাড়া 'নোংরা রসিকতা'র বাইরে যে আরও কিছু রয়েছে তা উমা ভালোভাবেই বোঝে। তাই এই কোয়াটার ছেড়ে উমেশকে অন্যত্র যেতে বললেও সে কিন্তু রাজি হয় না। উমেশের হাসি ঠাট্টা সমস্তটাই রাঙাবৌদিকে ঘিরে। বিয়ের পর যে স্বপ্ন বুকে নিয়ে উমা তার সংসারে পা রেখেছিল, সেই স্বপ্ন তার অধরাই থেকে গেল। রাঙাবৌদির উমেশের প্রতি করা ব্যবহারে যে আভাস উমা পায় তা তো কোনো গোপন সংকেত নয়, তা একেবারেই প্রচ্ছন্ন নয়, তা প্রকাশ্য। তার প্রতি কর্তৃত্বটাই যেন জাহির করতে চায় উমার কাছে। উমেশ যেন রাঙাবৌদির হাতের অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা পুতুল, 'ক্ষ্ম অদৃশ্য দড়ি' তার নাকে বাধা, সেখানে ইচ্ছে খুশি রাঙাবৌদি টান দিতে পারে। চোখের উপর এমন দৃশ্য নিরন্তর সহ্য করতে হয় উমকে। যে সমীচীনতা সে তদের সম্পর্কের কাছে প্রত্যাশা করেছিল, যে বিশ্বাস যে ভালোবাসা একটি সম্পর্কের ভিত্তিভূমি তা তো তাদের দাম্পত্যে অনুপস্থিত। অথচ রাঙাবৌদি কিংবা উমেশের মধ্যে বিন্দুমাত্র লজ্জা অনুতাপ অনুশোচনা নেই। উমেশের বিন্দুমাত্র দ্বিধাও কাজ করেনি কোথাও, বিন্দুমাত্র সেন্টিমেন্টাল নয় সে, বরং বেশ খানিকটা 'খণ্ডিত' উদ্ধত এবং 'চূড়ান্ত অসংযত'। উমার সঙ্গে তার সম্পর্কের 'কেলাসন' যথার্থই অপরিণত, খাপছাড়া। রাঙাবৌদির সাঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার কোনো লুকোচুরিও নেই। একারণেই উমার মন ক্রমশ বিষিয়ে উঠেছে তাদের সম্পর্কের প্রতি, বিষিয়ে উঠেছে উমেশের প্রতি, বিষিয়ে উঠেছে রাঙাবৌদির প্রতি। পাশাপাশি কোয়াটারে বসবাস করেও একে অপরের পাশাপাশি বা কাছাকাছি আসতে পারেনি উমা এবং রাঙাবৌদি, দূরে সরে থাকতে হয়েছে উমাকে, তার এই সরে যাওয়ার জন্য উমেশ এবং রাঙাবৌদিকেই দায়ী করা যায় সহজে। রাঙাবৌদির স্বামী অধর হয়তো বা উপলব্ধি করতে পারে তাদের সম্পর্কের রসায়ন। রোগে অভাবে শ্রমে ভুক্তভোগী মানুষটা তাই হয়তো আরও অসুস্থ হয়ে পড়ে। সে হয়তো উপলব্ধি করতে পারে রাঙাবৌদি ঠিক কতখানি Vulgar, কতখানি Vulgar উমেশ। রাঙাবৌদির প্রকাশ্য উচ্চারণ সে কলঙ্কের ভয়েই উমেশের বিয়ে দিয়েছে, সমস্তটুকুই তার লোক দেখানো, যেটুকু আড়াল যেটুকু গোপনতা তাদের সম্পর্কের মধ্যে ছিল তা রাঙাবৌদি নিজেই ভেঙে দিয়েছে। উমাকে সে বলেছে- "যা পেয়েছিস আমি হাত উবুড় করেছি বলেই পেয়েছিস, দিয়েও আবার ভাগ রাখতে চাই নি।"[৪] এখানেই রাঙাবৌদির মনোভাব স্পষ্ট হয়ে গেছে। রাঙাবৌদির Conscious এবং subconscious ও libido তার দমিত আকাঙ্ক্ষা (repressed desire) প্রকাশিত এখানে। তার 'Id' এর চাহিদা বা আকাঙ্ক্ষা তো প্রচ্ছন্ন নয়, 'Ego' ও 'Superego' দ্বারা দমিত হলেও শেষ পর্যন্ত উমেশের প্রতি ব্যবহারে তা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। কিন্তু উমার বিপন্নতা, অবরুদ্ধ ঘৃনায়

চালিত করে তাকে, রাঙাবৌদির থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরে যায় সে। অন্যদিকে লক্ষ করা যায় রাঙাবৌদির ভেতরে রয়েছে animus, অধরের মধ্যে সে যা পায় না, সেই না পাওয়া থেকেই হয়তো সে উমেশের প্রতি আসক্ত। বাইরে থেকে অধরের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যে তার কোনো মালিন্য কোনো অসন্তোষ নেই, তবু তার Novelty Seeking, অপূর্ণ চাহিদা সমস্তটা মিলিয়েই হয়তো উমেশের সঙ্গে তার সম্পর্কের রসায়ন এত গভীর এত কুরুচিপূর্ণ।

সমস্ত গল্পটিতে 'সাপ' যেন Symbol হয়ে উঠেছে। উমা রান্নাঘরে 'সাপ' দেখে শিকল তুলে ঘরে চলে এসেছে, কিন্তু মনের ভেতরের 'সাপ'কে সরিয়ে দিতে পারেনি। ঘরে এসে সে ঘুমিয়ে পড়েছে- আবার সেই উদ্বেগ থেকে সে কুণ্ডলীকৃত 'সাপ'কে স্বপ্নেও দেখছে। উমার অন্তরের ভয় তার Subconscious- এ থাকা আতঙ্ক উদ্বেগ, তার দমিত যৌনাকাঙ্ক্ষা, নিষিদ্ধ ইচ্ছের distorted প্রকাশের ফল হলো 'সাপ'। এই 'সাপ' আসলে archetype (রূপান্তর, শক্তি, Shadow)। এই 'সাপ' উমার অন্তর্মনের সাপ, ঘুমের মধ্যেও এই সাপ তার Subconscious- এ সাড়া ফেলেছে, তাই স্বপ্নেও সে কুন্ডলীকৃত সাপকে দেখেছে। দরজায় ধাক্কা শুনে দরজা খুলে রাঙাবৌদিকে দরজায় দেখে বিতৃষ্ণায় তার মনটা তেতো হয়ে গেছে, সাপের আতঙ্কের চেয়েও যা ঢের বেশি ভয়ানক তার কাছে। অসুস্থ স্বামী অধরের হাপানির টান হঠাৎ সাংঘাতিক বেড়ে যাওয়ায় নিতান্ত অস্থির হয়ে রাঙাবৌদি ছুটে আসে উমার দরজায়। ঘরে তার মধু ফুরিয়ে গেছে এবং কবিরাজের কথা অনুযায়ী তাকে অধরকে এই সময় মধুর সঙ্গে ঔষধ মিশিয়ে অধরকে দিতে হবে। স্বামীর জন্য এই অস্থিরতা উদ্বেগ দেখে উমার উপলব্ধি হয় সমস্তটাই কেমন নাটুকে— লোক দেখানো, মন তার সাপের মতোই কুন্ডলী পাকাতে থাকে। মনোবিদ সিগমুন্ড ফ্রয়েড তার 'Civilization And it's Discontents (1930)' বইটিতে বলেছেন— "The impression forces itself upon one that men mesure by false standrads..."[৫] সত্যিই এমন একটি ভ্রান্ত ধারণা আমাদের মনের মধ্যে ঢুকে পড়ে জোর করে যে মানুষ ভ্রান্ত মানদণ্ড দিয়ে সবকিছু বিচার করে, উমার মধ্যেও সেই মানদণ্ড একটা মুহূর্তের জন্য তার বিচারবুদ্ধিকে যেন স্তিমিত করে ফেলে। তাই রান্নাঘরে 'সাপ' সম্পর্কে রাঙাবৌদিকে সতর্ক করতে গিয়েও করা হয় না। মনে হয়, "যা-ই এখন হোক তার আর কোনো দায়িত্ব নেই।" মনের কোণে চূড়ান্ত কোনো অভিসন্ধিই যেন খেলা করে যায় তার। যে দুর্বোধ্য অনুভূতি কুণ্ডলীর মতো তার বুকের ভেতর পাক দিয়ে যায় তা-ই যেন এই গল্পে 'সাপ' হয়ে উঠেছে।

কিন্ত উমাকে সামান্য দূরে সরিয়ে রেখে যদি রাঙাবৌদি এবং উমেশের সম্পর্কের রসায়নে আমরা একটু মনোযোগ দিই, তাহলে কি পাব? যে অমার্জিত কামনা-লালসা তাদের সম্পর্কের মধ্যে রয়েছে তা কি সত্যিই সমর্থনযোগ্য? সমাজের অনুমোদনের যোগ্য? তাদের সম্পর্কটাও তো আসলেই সর্পিল। যে যৌনবোধ দ্বারা তারা পরস্পর চালিত হয়েছে তা মার্জিত রুচিশীল চেতনাপ্রবাহে তাদেরকে চালনা করতে পারেনি। তাদের এই সম্পর্কের ফল কতটা মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে উমার প্রতি, কতখানি ভয়াবহ হতে পারে অধরের কাছে, উভয়ের মনোজগতে কতখানি আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে তা উমেশ বা রাঙাবৌদি কারও কাছেই চিন্তাযোগ্য নয়। আর হয়তো একারণেই অধর আরও অসুস্থ বোধ করেছে, হয়তো মানসিকভাবে খানিকটা বিরূপতা এসেছে উমার মনে, "লাভ-লোভ-লিবিডো আর পরিস্থিতি যাদের ভূপল্লবে ডাক দিয়ে চন্দনের বনে নিয়ে যেতে পারে আর নীল জ্যোস্নায় সবুজ অন্ধকারে নাচাতে পারে অন্ধের মতো"[৬] উমেশ এবং রাঙাবৌদি সেইসব মানুষেরই পর্যায়ভুক্ত। বাকি পৃথিবীর আর কারও কাছে তারা যেন দায়বদ্ধ নয়, দায়বদ্ধ নয় সমাজের কাছে। 'সভ্যতা-ভব্যতা' রুচির আচ্ছাদন উভয়েই যেন খসিয়ে ফেলেছে, রক্তে যেন তাদের 'গতির নেশা', তা যেন একইসাথে ব্যধি ও বিকার। উমেশের প্রেমের আকাশের শোভিত শশী উমা নয় রাঙাবৌদি। প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর একটি কবিতায় বলেছেন—

"আমি যুগ থেকে যুগান্তরে দেশ থেকে দেশান্তরে
মনের সড়ক তৈরি করলাম।
আমার তবু থামা হবে না।
পথই যে আমার প্রাণ— আমার অসীম পথের পিপাসা।"[৭]

আর এই অসীম 'পিপাসা'ই তাঁকে মানুষের মনের অন্ধ গলিঘুঁজির পথেও টেনে নিয়ে গেছে। তাই মানুষের অন্তর্জগতের বিকলন ও উৎকর্ষ এই দুই-ই তাঁর লেখায় সূক্ষ্মচিত্রে ধরা পড়েছে। 'যৌনতা' আর 'অগ্রাসী মনোভাব' যে মানুষের মনস্তত্ত্বের সঙ্গে সমান্তরালভাবে চলে একথা ফ্রয়েডও অস্বীকার করেননি। 'সাপ' গল্পে এই দুটি দিক যেন উমেশ ও রাঙাবৌদির চরিত্রে ধরা পড়েছে, এবং তাদের বিপরীত অক্ষরেখায় স্থাপিত হয়েছে উমা। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে মতি নন্দীর (১৯৩১ - ২০১০) 'শবাগার' গল্পটির। এই গল্পটিতেও আমারা দেখি মুকুন্দর সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে তারই ভাড়াটিয়া শ্রিপার। অথচ মুকুন্দর স্ত্রী লীলাবতীর সঙ্গে তার দাম্পত্যের যে চিত্র ধরা পড়ে তা খুবই স্বাভাবিক। অন্যদিকে শিপ্রার স্বামী গৌরাঙ্গ ক্যান্সারে ভুগছে, বেশিদিন বাঁচাবে না। মুকুন্দের শিপ্রার প্রতি ঘনিষ্ঠ ও অশালীন আচরণের যে চিত্র গল্পটিতে ধরা পড়ে তা সত্যিই অভব্য ও কুরুচিকর। শিপ্রা হয়তো খানিকটা তার জীবনসমস্যার কাছে জর্জরিত, তার কাছে কোনো উপায় নেই, মুকুন্দর উপর সে অনেকাংশে নির্ভরশীল, মুকুন্দর থেকে আর্থিক সহায়তা না পেলে তার সংসার মুখ থুবড়ে পড়বে। কিন্তু মুকুন্দর তো তেমন কোনো নির্ভরশীলতা নেই, স্ত্রী সন্তান নিয়ে একরকম সুখী গৃহকোণ তার, অথচ তার চিন্তা চেতনা হয়ে উঠেছে কামুক প্রবৃত্তির, হয়ে উঠেছে Vulgar। এই গল্পে কোনো রকম Ethical Stage- এ আমরা মুকুন্দকে দেখতে পাই না। শিপ্রার সঙ্গে তার এই কুরুচিকর সম্পর্কটা ছেলে মনুর চোখে পড়ে গেলে সাময়িকভাবে মুকুন্দ একটু লজ্জাবোধ করেছে ঠিকই কিন্তু তারপরেও তার মধ্যে শুভবুদ্ধির উদ্ভব ঘটেনি। তার বিবেকদংশনও হয়নি। মুত্যুপথযাত্রী গৌরাঙ্গের সামনেই তার স্ত্রীকে সম্ভোগ করেছে সে, সামান্য চক্ষু লজ্জাও নেই তার। নকশাল আন্দোলনের সমকালীন চিত্রপট ভয়াবহ অবস্থা ও পরিস্থিতি এই গল্পের পটভূমি। সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক এর প্রেক্ষাপট। তবু সমস্তটুকুর মধ্যে যৌনমনস্তত্ত্বের যে ফোটোগ্রাফ গল্পটিতে পাওয়া যায় তা মর্মান্তিক হৃদয় বিদারকই বটে। একদিকে 'সাপ' গল্পের উমেশ অধর অসুস্থ থাকাকালীনও রাঙাবৌদির সঙ্গে তার ব্যবহার ও অশালীন বার্তালাপে কোনো কুণ্ঠাবোধ করেনি, কুণ্ঠাবোধ করেনি উমার উপস্থিতিতেও, তেমনি 'শবাগার' গল্পে মুকুন্দ গৌরাঙ্গের অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে তার স্ত্রী শিপ্রাকে তারই উপস্থিতিতে সম্ভোগ করেছে। তা যেন এখানে একপ্রকার vulgar Sex- এর কথাই বলে। পুত্রের তাদের এই অবৈধ সম্পর্ক অবগত হওয়াতেও মুকুন্দর মানসিকতার কোনো পরিবর্তন হয়নি। 'শবাগার' গল্পে বেশিরভাগ চরিত্রগুলি বেঁচে থেকেও যেন মৃত। উমেশ ও মুকুন্দ দুজনেই যেন libido- দ্বারা চালিত। তাদের 'Id'- এর আকাঙ্ক্ষা এতই প্রবল যে 'ego' বা 'superego' তা দমনে ব্যর্থ। তাদের অবস্থান কোনো Ethical Stage- এ নেই। মানসিকভাবে তারা দুজনেই যেন বিকারগ্রস্থ। এবং তাদের এই বিকলনের ফল একদিকে ভোগ করেছে উমেশের স্ত্রী উমা, অন্যদিকে ভোগ করেছে মুকুন্দর ছেলে মনু, ফলত ভুলপথে চালিত হয়েছে সে। আবার উমাও মানসিকভাবে জর্জরিত হয়েছে, মন তার 'সাপের' মতই ভয়াবহ হয়ে উঠেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে সাপের কুণ্ডলীকৃত বিষের পাক থেকে মুক্ত করেছে সে। 'সাপ' গল্পটি শেষ পর্যন্ত বিষমুক্ত সুন্দর পৃথিবীরই ইঙ্গিত রেখে যাচ্ছে। নাটকীয়তায় লীন যার শেষটুকু। উমা যে শেষ পর্যন্ত তার মহৎ উচ্চতা থেকে নিজেকে পতনের ঘরে নিয়ে যেতে যেতেও থামতে পেরেছে তা সত্যিই ভাববার মত। নিজের অন্তরের কালোরজ্জুকে শেষ অবধি সে কালরজ্জু হতে দেয়নি, নিজেকে সঙ্কীর্ণতার সর্পিল আবর্ত থেকে মুক্ত করেছে সে। 'সাপ' গল্পের মনস্তত্ত্ব নির্মাণে প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই কুশলী 'মুন্সিয়ানা' সত্যিই ভাববার মতো।

প্রকৃতপক্ষে আমাদের মনের ভিতরে রয়েছে রিপুর ঘর।কামনা-বাসনা, লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ প্রেম সে ঘরে বাসা বেঁধে থাকে, বাসা বাঁধে সন্তর্পণে— আমরা নিজেরাও তার অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত নই সম্পূর্ণ। কিন্তু জীবনের প্রয়োজনে এই রিপুই আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলে আমাদের মনন, সাপের মতোই বিষময় কুণ্ডলীকৃত পাক তার, এই সর্পিলতা থেকে মুক্ত হওয়া সহজ নয়। হরিণ মন হিংসা বিদ্বেষে লোভে আকাঙ্ক্ষায় জর্জরিত। 'সহজ লোকের' মতো বাঁচতে চাইলেও জীবন ঠিক ততখানি সহজ হয়ে ওঠে না। স্বপ্ন শান্তি সুখের প্রত্যাশা তো নিছক প্রত্যাশা নয়, হয়তো চোখে ' কালোশিরার অসুখ' এসে যায়, কানে আসে উদ্দাম 'বধিরতা', জীবনও একরকম 'কুঁজ গলগণ্ড' মাংসে ভরে যায়, তবু আত্মআবিষ্কার সহজ হয়ে ওঠে না। প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর সমস্ত জীবন ধরে যে 'মানুষের মানে' খুঁজেছেন তা তো মানব মনের বাইরে নয়, আরও গভীরে নিহিত ব্যঞ্জনাময় জীবন। শিল্পের কাছে তাই দায় থেকে যায় শিল্পের, দায় থেকে যায় শিল্পীর— স্রষ্টার। মানুষের অন্তর্মনের জটিলতা একমাত্র সাহিত্যই এতো সহজ ভাবে এতো নিখুঁত নিপুণতার সাথে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে, আর প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যে সেই মুন্সিয়ানার সাক্ষ্যই রাখে।

তথ্যসূত্র:

১। সৈয়দ, আবদুল মান্নান (সম্পাদনা)। ‘প্রকাশিত অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র জীবনানন্দ দাশ’। আদিত্য পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৪২৯, পৃ. ৬৭।
২। তদেব, পৃ. ৬৭ ।
৩। রায়, রামরঞ্জন। ‘গল্পের ভুবন: প্রেমেন্দ্র মিত্র’। প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৭, পৃ. ৬।
৪। পাঠক, আশিস (সম্পাদনা)। ‘প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প ২’। দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৫, বৈশাখ ১৪২২, পৃ. ২৩৬।
৫। তদেব, পৃ. ২৩৭।
৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, হিমবন্ত। ‘গল্প নিয়ে উপন্যাস নিয়ে’। প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৪১২, পৃ. ৭১।
৭। মিত্র, প্রেমেন্দ্র। ‘কবিতাসমগ্র’। সিগনেট প্রেস, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০১৫, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০২৩, পৃ. ৫০।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1449-1458
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.366

পশ্চিমবঙ্গে রেশনিং ব্যবস্থার আর্থ-সামাজিক ইতিহাস ও রূপান্তর পর্যালোচনা

সেখ সুজাউদ্দিন, *স্বাধীন গবেষক, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.03.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The rationing system— that is, the distribution of foodgrains at government-controlled prices— is an inseparable part of West Bengal's socioeconomic structure. Rationing is not merely a technical exercise in food distribution; it is a state intervention that temporarily reduces economic inequality in society. This essay seeks to analyze that system not just from an administrative policy perspective, but in the context of economic disparity, labor market pressures, social stratification, and the power relationship between the state and its citizens. From the great famine of 1943 to the free ration scheme of 2024 — at every stage, this essay fundamentally examines how the system was built, whose interests it served, where it failed, and how it can become more effective and equitable in the future.

Keywords: Rationing System, Food Distribution, Great Famine, Free Ration, Food Security, Government Policy, BPL

খাদ্য নিরাপত্তার প্রশ্নটি মূলত একটি অর্থনৈতিক প্রশ্ন। কোনো সমাজে যথেষ্ট খাদ্য আছে কি না, সেটা যতটা গুরুত্বপূর্ণ, তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো— সেই খাদ্য কেনার ক্ষমতা সবার আছে কি না। অর্থনীতির ভাষায়, এটা 'Supply' নয়, 'Entitlement' বা 'Purchasing Power'-এর প্রশ্ন। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন তাঁর গবেষণায় প্রমাণ করেছেন যে আধুনিক কালের বড় দুর্ভিক্ষগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খাদ্যের পরম ঘাটতির কারণে হয়নি— হয়েছে দরিদ্র মানুষের হাতে খাদ্য কেনার সামর্থ্য ছিল না। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রেশনিং ব্যবস্থাকে দেখলে বোঝা যায়— এটি বাজারের ব্যর্থতা সংশোধনের একটি রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ। বাজার যখন দরিদ্র মানুষের কাছে খাদ্য পৌঁছে দিতে পারে না, তখন রাষ্ট্র ভর্তুকিমূল্যে বা বিনামূল্যে সেই কাজটা করে। কিন্তু রাষ্ট্র নিজেও নিরপেক্ষ নয়— রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনা করেন নির্দিষ্ট শ্রেণির মানুষ, নির্দিষ্ট রাজনৈতিক স্বার্থ সেখানে কাজ করে। তাই রেশনিং ব্যবস্থার বিশ্লেষণে বাজার, রাষ্ট্র এবং সমাজ— এই তিনটিকে একসাথে দেখতে হয়। এই বিশ্লেষণের জন্য এটি হল একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কেস স্টাডি। কারণ এই রাজ্যে আছে ঔপনিবেশিক শিল্পের উত্তরাধিকার, দেশভাগের বিশাল সামাজিক ক্ষত, বামফ্রন্টের দীর্ঘ শাসন, এবং বর্তমানের তৃণমূল সরকারের কল্যাণ রাজনীতি— এই সব মিলিয়ে রেশনিং ব্যবস্থার একটি জটিল, বহুস্তরীয় ইতিহাস তৈরি হয়েছে।

ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ও ১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষ:

(ক) ঔপনিবেশিক বাংলার কৃষি-অর্থনীতি:

ব্রিটিশ আমলে বাংলার কৃষি-অর্থনীতি একটি ঔপনিবেশিক নির্যাসরূপী কাঠামোয় আটকে ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) ভূমির উপর জমিদারদের নিরঙ্কুশ অধিকার দিয়েছিল, কিন্তু কৃষককে দিয়েছিল সীমাহীন শোষণের সুযোগ। বর্গাদার ও ক্ষেতমজুরদের কোনো আইনি সুরক্ষা ছিল না, ফসলের ন্যায্য মূল্য পাওয়ার নিশ্চয়তা ছিল না, এবং দুর্যোগের সময় রাষ্ট্রের কাছে কোনো দাবি করার অধিকার ছিল না। এই কাঠামোয় কৃষকের কাছে খাদ্য থাকার সম্ভাবনা সর্বদাই ক্ষীণ ছিল। বাজারে ফসলের দাম বাড়লে তারা উপকৃত হতেন না কারণ ফসলের বড় অংশ খাজনা হিসেবে বেরিয়ে যেত। দাম কমলে সর্বনাশ। মন্দার সময় সঞ্চয় ছিল না, ঋণ মেটানোর চাপ ছিল প্রচণ্ড। এই আর্থিক ভঙ্গুরতার প্রথা ভিন্ন রুপে ১৯৪৩ সালে মানুষকে মারণ দুর্ভিক্ষের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল।

(খ) ১৯৪৩ সালের মহাদুর্ভিক্ষ: বাজার ব্যর্থতার চরম পরিণতি:

অমর্ত্য সেন তাঁর Poverty and Famines (১৯৮১) গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে ১৯৪৩ সালে বাংলায় মাথাপিছু খাদ্যশস্যের পরিমাণ ১৯৪১ সালের চেয়ে কম ছিল না। অর্থাৎ শস্যের পরম ঘাটতি ছিল না। তাহলে মানুষ মারা গেল কেন? কারণ যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতিতে চালের দাম হঠাৎ বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল। যে মৎসজীবী, তাঁতি বা কৃষিমজুর আগে ন্যায্যমূল্যে চাল কিনতে পারতেন, তার ক্রয়ক্ষমতা রাতারাতি শেষ হয়ে গেল। বাজারে চাল ছিল, কিন্তু তা কেনার সামর্থ্য তাদের হাতে ছিল না। এর পাশাপাশি ব্রিটিশ সরকারের কিছু ভ্রান্ত নীতিও বিপর্যয় ঘটিয়েছিল। জাপানি আক্রমণের আশঙ্কায় উপকূলবর্তী অঞ্চল থেকে খাদ্যবাহী জাহাজ সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল, ফলে সরবরাহ ব্যাহত হয়েছিল। কিছু অঞ্চলে সরকার খাদ্যশস্য বাজার থেকে কিনেছিল সামরিক প্রয়োজনে, যা বাজারমূল্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। এটি ছিল রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের সবচেয়ে বিকৃত রূপ যা ছিল বাজারকে সংশোধন নয়, বরং আরও বিপজ্জনক করে তোলা। এই ঘটনাটি পশ্চিমবঙ্গের সমাজমানসে একটি গভীর ক্ষত তৈরি করেছে। সেই ক্ষত থেকেই জন্ম নিয়েছে রাষ্ট্রের কাছে খাদ্য-নিরাপত্তার দাবির একটি তীব্র আবেগ। স্বাধীনতার পরের প্রতিটি সরকারকে সেই দাবির মুখোমুখি হতে হয়েছে। অর্থাৎ এটি পরিস্কার বাজার একা কখনো খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে না। বিশেষত সংকটের সময়ে বাজার মূল্য বাড়িয়ে দরিদ্রকে আরও দরিদ্র করে। তাই এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ শুধু বাঞ্ছনীয় নয়, অপরিহার্য — তবে সেই হস্তক্ষেপ যদি সঠিক না হয়, সেটিও বিপর্যয় ডাকতে পারে।

স্বাধীনতা-পরবর্তী অর্থনৈতিক কাঠামো (১৯৪৭–১৯৬৭):

(ক) শিল্প-কেন্দ্রিক অর্থনীতি ও শ্রমিকের খাদ্য:

স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবঙ্গ ছিল দেশের শিল্পের প্রাণকেন্দ্র। কলকাতা বন্দর, হাওড়ার ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, উত্তর কলকাতার পাট শিল্প, হুগলির বস্ত্র শিল্প— এই সব মিলিয়ে একটি বিশাল শিল্পশ্রমিক শ্রেণি তৈরি হয়েছিল। এই শ্রমিকরা শহরে বাস করতেন, কৃষি থেকে বিচ্ছিন্ন, সম্পূর্ণ বেতননির্ভর। বাজারে খাদ্যমূল্য বাড়লে তাদের মজুরি কমে যায়, যা শ্রমিক অসন্তোষ ও উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার কারণ হয়। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাই শিল্পশ্রমিকদের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা ছিল মূলত উৎপাদন খরচ নিয়ন্ত্রণের একটি পরোক্ষ উপায়। ভর্তুকিমূল্যে খাদ্য দিলে শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধির চাপ কমে, কারখানার মালিক কম খরচে উৎপাদন চালাতে পারে, এবং রাষ্ট্র শিল্পের মুনাফা ধরে রাখতে পারে। এটি ছিল একটি ত্রিপক্ষীয় অর্থনৈতিক বোঝাপড়া— যেখানে শ্রমিকের কল্যাণ প্রাথমিক উদ্দেশ্য নয়, শিল্পের স্থিতিশীলতা ছিল প্রাথমিক উদ্দেশ্য।

(খ) গ্রামীণ অর্থনীতির বঞ্চনা:

একই সময়ে গ্রামীণ পশ্চিমবঙ্গের বিশাল কৃষিজীবী জনগোষ্ঠী রেশন ব্যবস্থার বাইরে ছিলেন। তাঁরা খাদ্য উৎপাদন করতেন, কিন্তু নিজেরা খাদ্য নিরাপত্তার বাইরে ছিলেন। ভাগচাষি বা বর্গাদাররা ফসলের অর্ধেক জমিদার বা মহাজনকে দিয়ে দিতেন। বাকি যা থাকত, তা দিয়ে সারা বছর চলত না। ফলে তাঁরাও বাজার থেকে চাল কিনতেন — এবং চালের দাম বাড়লে তাঁরাও দরিদ্র থেকে আরও দরিদ্র হতেন। এই বৈষম্যের একটি স্পষ্ট আর্থনৈতিক ব্যাখ্যা হল রাষ্ট্রের কাছে শহরের শিল্পশ্রমিকের অর্থনৈতিক মূল্য গ্রামের ভাগচাষির চেয়ে বেশি বলে মনে করা হত। পুঁজিবাদী শিল্পায়নের যুক্তিতে শহরকে অগ্রাধিকার দেওয়া স্বাভাবিক মনে হয়েছিল। এই শহুরে পক্ষপাত পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যনীতিতে দীর্ঘকাল ধরে বিদ্যমান ছিল।

(গ) দেশভাগের অর্থনৈতিক ধাক্কা:

১৯৪৭ সালে দেশভাগের ফলে পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) চলে যাওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। প্রথমত, পাটের কল কলকাতায় ছিল কিন্তু পাটের প্রধান উৎপাদনস্থল চলে গেল পূর্ব পাকিস্তানে ফলে কাঁচামালের সংকট দেখা দিল। দ্বিতীয়ত, কোটি কোটি শরণার্থী এসে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমবাজার, আবাসন ব্যবস্থা ও খাদ্যসরবরাহের উপর প্রচণ্ড চাপ তৈরি করলেন। তৃতীয়ত, রাষ্ট্রের সামাজিক ব্যয়ের উপর এক বিশাল বোঝা পড়ল, যা রেশনিং ব্যবস্থা পরিচালনার সক্ষমতাকে সরাসরি প্রভাবিত করেছিল। শরণার্থীদের জন্য কোনো সংগঠিত রেশন ব্যবস্থা ছিল না। তাঁরা ছিলেন কার্যত অর্থনৈতিক ও সামাজিক উদ্বাস্তু — নতুন পরিচয়ে নতুন দেশে, কোনো সম্পদ ছাড়া, কোনো সামাজিক নিরাপত্তা ছাড়া। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক পুনর্বাসন সম্পূর্ণভাবে কখনোই হয়নি — তাঁদের বংশধরেরা আজও পশ্চিমবঙ্গের দরিদ্রতম মানুষদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ।

১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলন: শ্রেণি সংঘাত ও খাদ্য অধিকার

খাদ্যের দাবি যখন রাজনৈতিক রূপ নেয়, তখন সেটি শুধু পেটের প্রশ্ন থাকে না— হয়ে ওঠে মর্যাদার প্রশ্ন, নাগরিকত্বের প্রশ্ন। ১৯৫৯ সালের আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গে সেই রূপান্তরের একটি প্রতীকী বিশেষ মুহূর্ত। ১৯৫৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে যে খাদ্য আন্দোলন হয়েছিল, সেটিকে সাধারণত রাজনৈতিক ঘটনা হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু এর পেছনে একটি স্পষ্ট আর্থনৈতিক কারণ ছিল। ১৯৫৮-৫৯ সালে কলকাতায় চালের দাম হঠাৎ বেড়ে গেল সেই সময় একটি পরিবারের মাসিক চালের খরচ তাদের মোট আয়ের বড়

একটি অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সরকারি অপর্যাপ্ত রেশন সরবরাহ, বাজারে দাম আকাশছোঁয়া — এই অবস্থায় নিম্নবিত্ত পরিবারগুলোতে প্রকৃত সংকট দেখা দিয়েছিল। আন্দোলনটি দেখিয়ে দিল যে শহরের দরিদ্র মানুষ, বিশেষত অসংগঠিত খাতের শ্রমিকরা, বাজারের স্বেচ্ছাচারিতার সামনে সম্পূর্ণ অসহায়। তাঁদের কোনো সঞ্চয় নেই, কোনো বিকল্প নেই, এবং রাষ্ট্রের কাছে কার্যকর দাবি করার সংগঠিত মঞ্চ নেই। বামপন্থী দলগুলি সেই অসহায়ত্বকে রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত করেছিল— এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, কারণ এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারলেন যে খাদ্যের দাবি একটি রাজনৈতিক অধিকার। ৩১ আগস্ট লক্ষাধিক মানুষের 'খাদ্য চাই ,খাদ্য দাও' সরবের ব্যাপক আন্দোলনে পুলিশের গুলিচালনা এবং মানুষের মৃত্যু সেই সময়ের কংগ্রেস সরকারের একটি গভীর শ্রেণি-অবস্থানকে স্পষ্ট করে দিয়েছিল। যে সরকার দরিদ্রের খাদ্যের দাবির বিরুদ্ধে গুলি চালায়, সে সরকার কার পক্ষে— এই প্রশ্নটি পরবর্তী দশকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিকে বামদিকে টেনে নেওয়ার একটি কারণ হয়েছিল।

বামফ্রন্টের রেশন-অর্থনীতি (১৯৭৭–২০১১):

(ক) ভূমি সংস্কার ও রেশনিং: একটি সমন্বয়ী কৌশল:

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর দুটি নীতি একসাথে চলল- ভূমি সংস্কার ও রেশনিং সম্প্রসারণ। এই দুটো আলাদা মনে হলেও অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে একই লক্ষ্যে কাজ করেছে- গ্রামীণ দরিদ্রের কাছে অর্থনৈতিক সম্পদের পুনর্বণ্টন। অপারেশন বর্গার মাধ্যমে প্রায় ১৫ লক্ষ বর্গাদার তাদের চাষের অধিকার নথিভুক্ত করালেন। এতে তাঁদের আয় কিছুটা বাড়ল, কারণ আর ফসলের বড় অংশ জমির মালিককে দিতে হয় না। অন্যদিকে রেশন ব্যবস্থা সম্প্রসারণের ফলে গ্রামীণ পরিবারে খাদ্যব্যয়ের উপর চাপ কিছুটা কমল। এই দুটো মিলিয়ে বামফ্রন্ট আমলে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ মানুষের মাথাপিছু প্রকৃত আয় কিছুটা বেড়েছিল— এটি অনেক গবেষণায় নথিভুক্ত। তবে এই উন্নতির একটি সীমা ছিল। ভূমি সংস্কার মূলত ছিল 'Asset Redistribution'— সম্পদের বণ্টন, কিন্তু উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ছিল— সেচ, সার, প্রযুক্তি, বাজারে প্রতিযোগিতার সুযোগ— সেটা পর্যাপ্ত পরিমাণে আসেনি। ফলে বর্গাদার কিছুটা বেশি পেলেও, কিন্তু প্রাথমিকভাবে দরিদ্রই রইলেন।

(খ) পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও রেশনিংয়ের রাজনৈতিক অর্থনীতি:

বামফ্রন্ট আমলে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে রেশনিং পরিচালনা একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছিল। কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রের হাত থেকে স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে কিছুটা ক্ষমতা এসেছিল। তাত্ত্বিকভাবে এটি গণতান্ত্রিক একটি পদক্ষেপ— যদি স্থানীয় মানুষ পঞ্চায়েত সদস্যকে চেনেন ও চাপ দিতে পারেন, তাহলে রেশন বিতরণে স্বচ্ছতা বাড়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে যা হল তা অর্থনৈতিক ভাষায় হল 'Rent-Seeking Behaviour'— যখন রাজনৈতিক সংযোগই অর্থনৈতিক সুবিধার নির্ধারক হয়ে ওঠে, তখন সবচেয়ে দরিদ্র মানুষ— যাঁর রাজনৈতিক সংযোগ নেই— খুব সুবিধাভোগী হন না ।

(গ) কেন্দ্রীয় বরাদ্দ ও রাজ্যের সক্ষমতা:

বামফ্রন্ট সরকারের একটি দীর্ঘস্থায়ী অভিযোগ ছিল যে কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গকে প্রাপ্য বরাদ্দ দিচ্ছে না। এই অভিযোগের কিছুটা সত্যতা আছে— কেন্দ্রে বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতায় থাকা দলগুলি রাজ্যের রাজনৈতিক অবস্থানের ভিত্তিতে বরাদ্দ প্রভাবিত করেছে, এটা রাজনৈতিক অর্থনীতির একটি পরিচিত বাস্তবতা। কিন্তু একটি আর্থনৈতিক বিশ্লেষণে এও দেখতে হবে যে পশ্চিমবঙ্গ নিজে তার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট বিনিয়োগ করেছিল কিনা। সবুজ বিপ্লব পাঞ্জাব-হরিয়ানায় যেভাবে কৃষিতে রূপান্তর এনেছিল, পশ্চিমবঙ্গে সেটা হয়নি। বর্ধমান জেলায় কিছুটা সাফল্য এলেও রাজ্যজুড়ে কৃষি উৎপাদনশীলতায় আমুল পরিবর্তন ঘটেনি। ফলে রেশন সরবরাহের জন্য কেন্দ্রনির্ভরতা কমেনি।: বামফ্রন্ট একদিকে সার্বজনীন রেশনের দাবি তুলেছিল, কিন্তু কৃষি উৎপাদন বাড়িয়ে রেশন সরবরাহের স্বনির্ভর ভিত্তি তৈরিতে বিনিয়োগ করেনি। এই দ্বন্দ্বটি দীর্ঘকাল পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-অর্থনীতিকে দুর্বল রেখেছে।

উদারীকরণ ও TPDS: বাজার ও সামাজিক ন্যায়ের দ্বন্দ্ব

(ক) ১৯৯১ সালের অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রভাব:

১৯৯১ সালের উদারীকরণের পর ভারতের খাদ্য বাজারে ধীরে ধীরে বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়তে লাগল। সুপারমার্কেট, প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের কোম্পানি, খুচরা— এই সব শহরের মধ্যবিত্ত বাজারে ছেয়ে গেল। এই নতুন বাজারে মধ্যবিত্তের আয়ও বাড়ল, তারা রেশন দোকান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। কিন্তু উদারীকরণের সুফল সমানভাবে বিতরিত হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে পাটশিল্প ধসে পড়ল, পুরনো ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাগুলো বন্ধ

হতে লাগল। এই 'Deindustrialisation'-এর ফলে বহু শ্রমিক পরিবার হঠাৎ আয়হীন হলেন। তাঁরা অসংগঠিত খাতে চলে যেতে থাকলেন— রিকশা, হকারি ও জোগাড়— যেখানে আয় অনিশ্চিত। এই মানুষগুলোর কাছে রেশন আরও বেশি দরকারি হয়ে উঠল।

(খ) TPDS: টার্গেটিংয়ের অর্থনৈতিক যুক্তি ও সামাজিক বিপদ:

ভারতের সরকারি বিতরণ ব্যবস্থার ইতিহাসে ১৯৯৭ সালে চালু হওয়া লক্ষ্যভিত্তিক সরকারি বিতরণ ব্যবস্থা (TPDS) একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়। এর আগে সর্বজনীন PDS-এর মাধ্যমে সকলের কাছে রেশন পৌঁছানোর চেষ্টা হলেও তা অর্থনৈতিকভাবে ব্যয়সাধ্য হয়ে পড়ে। তাই সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে কেবল দারিদ্রসীমার নিচের (BPL) পরিবারগুলোকে বিশেষ ভর্তুকি দেওয়া হবে। এর পিছনে যুক্তি ছিল— বাজেটের প্রতিটি টাকা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন যার কাছে তার কাছেই যাওয়া উচিত। কিন্তু এই যুক্তির একটি সমস্যা হল, যেটাকে অর্থনীতির ভাষায় 'Targeting Error' বলে। বাস্তবে দুই ধরনের ভুল হয়: প্রকৃত দরিদ্র বাদ পড়ে যায় এবং অ-দরিদ্ররা সুবিধা পায় । পশ্চিমবঙ্গে দুটো ভুলই ঘটেছে, কিন্তু প্রথমটি বেশি ক্ষতিকর— কারণ যে মানুষটা সত্যিই খেতে পাচ্ছেন না তিনি সুবিধাবঞ্চিত হলে তার শরীর ও স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়।

জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইন ২০১৩ ও পশ্চিমবঙ্গে তার বাস্তবায়ন

(ক) আইনের আর্থনৈতিক তাৎপর্য:

২০১৩ সালের জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইন (NFSA) ভারতের ইতিহাসে প্রথমবার খাদ্যকে একটি আইনি অধিকারে পরিণত করল। দেশের ৬৭ শতাংশ মানুষ— গ্রামে ৭৫ শতাংশ, শহরে ৫০ শতাংশ— প্রতি মাসে মাথাপিছু ৫ কেজি শস্য পাওয়ার অধিকার পেলেন। চালের দাম মাত্র ৩ টাকা, গম ২ টাকা কেজি। আর্থনৈতিক দৃষ্টিতে এই আইনের সবচেয়ে বড় তাৎপর্য হলো এটি 'Entitlement'-কে আইনি মর্যাদা দিল। আগে রেশন ছিল সরকারের অনুগ্রহ— যখন খুশি দেওয়া, যখন খুশি কমানো। এখন এটি আইনি অধিকার— না পেলে আদালতে যাওয়া যাবে। এই পরিবর্তনটি সূক্ষ্ম কিন্তু গভীর- এটি নাগরিক ও রাষ্ট্রের সম্পর্ককে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করে। পশ্চিমবঙ্গে NFSA বাস্তবায়নে কিছু অনন্য সমস্যা দেখা গেছে। উপকারভোগীর তালিকা তৈরিতে রাজ্য এখনো ২০১১ সালের জনগণনার ভিত্তিকেই মূলত ব্যবহার করছে। এই এক দশকেরও বেশি সময়ে শহরে অভিবাসন হয়েছে, নতুন দরিদ্র তৈরি হয়েছে, কেউ কেউ দারিদ্র্য থেকে বেরিয়েছেন তাই এই গতিশীলতাকে স্থির তালিকায় রাখা যায় না।

(খ) খাদ্য সাথী:

তৃণমূল সরকার ২০১৬ সালে খাদ্য সাথী প্রকল্পের মাধ্যমে NFSA-র আওতার বাইরে , রাজ্যের নিজস্ব বরাদ্দ থেকে আরও মানুষকে রেশনের সুবিধা দেওয়া শুরু করে। উদ্দেশ্য ছিল রাজ্যের প্রায় ৮.৫-৯ কোটির বেশি মানুষকে খাদ্য সুরক্ষার আওতায় আনা এবং কাউকে খাদ্যশস্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত না করা। আর্থনৈতিক দৃষ্টিতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ— রাজ্য বলছে, কেন্দ্র যতটুকু দেয়, তার চেয়ে বেশি মানুষের দরকার আছে এবং রাজ্য নিজে সেই দায়িত্ব নিচ্ছে। তবে এই বাড়তি ব্যয়ের একটি অর্থনৈতিক চাপও আছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজস্ব ঘাটতি দীর্ঘকাল ধরে উচ্চ। খাদ্য ভর্তুকির উপর বাড়তি ব্যয় মানে হতেই পারে অন্য খাত যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিকাঠামো থেকে অর্থ সরানো। এটি এমন একটি পদ্ধতি যা দীর্ঘমেয়াদে বিবেচনা করা দরকার। স্বল্পমেয়াদে মানুষের পেটে ভাত দেওয়া জরুরি, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে বিনিয়োগ না হলে দারিদ্র্যের মূল কারণ সমাধান হয় না।

সরবরাহ ব্যবস্থাপনার অর্থনৈতিক কাঠামো

(ক) একটি রাজনৈতিক অর্থনীতির কাঠামো:

পশ্চিমবঙ্গের রেশনিং ব্যবস্থার সরবরাহ শৃঙ্খল শুরু হয় কেন্দ্রীয় সংস্থা Food Corporation of India (FCI)-এর মাধ্যমে, যেখানে কৃষকদের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে শস্য সংগ্রহ করা হয়। এরপর রাজ্য সরকারের খাদ্য দপ্তর সেই শস্য গ্রহণ করে জেলাভিত্তিক গুদামঘরে সংরক্ষণ করে। জেলা থেকে পাইকারি ডিপোর মাধ্যমে শস্য পৌঁছায় স্থানীয় ন্যায্য মূল্যের দোকানে । সেখান থেকে রেশন কার্ড ব্যবহারকারী সাধারণ মানুষ নির্ধারিত পরিমাণ চাল ও গম সংগ্রহ করেন। পশ্চিমবঙ্গে রেশনিং ব্যবস্থার সরবরাহ শৃঙ্খলটা দেখতে অনেকটা এরকম : ভারতীয় খাদ্য নিগম (FCI) → রাজ্য গুদাম → জেলা ডিপো → রেশন ডিলার → উপকারভোগী। প্রতিটি ধাপে যদি সামান্য করেও লিকেজ হয়, তাহলে মোট ক্ষতি বিশাল হতে পারে। অর্থনৈতিক সমীক্ষায় 'Leakage Rate' পরিমাপের চেষ্টা হয়েছে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে ভারতে সামগ্রিকভাবে রেশন শস্যের ৩৫-৪৫ শতাংশ লিকেজ হয়। পশ্চিমবঙ্গে এই হার কম বা বেশি — নিখুঁত পরিসংখ্যান পাওয়া কঠিন কারণ কোনো সরকারই এই তথ্য স্বেচ্ছায় প্রকাশ করে না।

লিকেজ শুধু সরাসরি চুরি নয়— এটি বিভিন্ন রূপে হয়। ওজনে কম দেওয়া, নিম্নমানের শস্য প্রতিস্থাপন, মৃত বা চলে যাওয়া পরিবারের কার্ডে শস্য তোলা, 'Ghost Ration Shop' যেটা কাগজে আছে কিন্তু বাস্তবে নেই— এই প্রতিটি পদ্ধতি অর্থনৈতিক দুর্নীতির আলাদা রূপ।

(খ) রেশন ডিলারের অর্থনৈতিক বাস্তবতা:

রেশন ডিলারদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ করার আগে তাদের অর্থনৈতিক বাস্তবতাটা বোঝা দরকার। পশ্চিমবঙ্গে রেশন ডিলাররা প্রতি কুইন্টাল খাদ্যশস্য বিতরণের বিপরীতে সরকার নির্ধারিত একটি নির্দিষ্ট কমিশন পান, যা সাধারণত বিতরণের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল। দীর্ঘদিন ধরে এই কমিশনের হার অত্যন্ত কম থাকায় ডিলাররা ন্যায্য পারিশ্রমিক পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করে আসছেন। কম কমিশনের কারণেই অনেক ডিলার অতিরিক্ত আয়ের জন্য কালোবাজারি ও শস্য চুরির দিকে ঝুঁকে পড়েন বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। বিনামূল্যে রেশন প্রকল্প চালু হওয়ার পর ডিলারদের আয় আরও কমে যায়, কারণ বিক্রয়মূল্য শূন্য হলে কমিশনের ভিত্তিও দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে রেশন ডিলারদের কমিশন কাঠামো পুনর্বিবেচনা না করলে সরবরাহ শৃঙ্খলের এই গুরুত্বপূর্ণ স্তরটি ক্রমশ অকার্যকর হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। এটি ব্যক্তিগত নৈতিকতার ব্যর্থতা নয়, একটি বিকৃত অর্থনৈতিক কাঠামোর ফলাফল। সমাধান তাই শুধু ডিলারদের শাস্তি দেওয়া নয়— কমিশন কাঠামো পুনর্বিন্যাস করে সৎভাবে কাজ করা আর্থিকভাবে সম্ভব করা। এই সহজ অর্থনৈতিক সমাধানটি বহু বছর ধরে সুপারিশ হচ্ছে, কিন্তু বাস্তবায়ন হচ্ছে না।

তথ্যপ্রযুক্তিকরন: প্রযুক্তির অর্থনীতি ও সামাজিক বিভাজন

(ক) ePOS ও আধার: সংস্কারের প্রতিশ্রুতি:

রেশনে ইলেকট্রনিক পয়েন্ট অফ সেল (ePOS) মেশিন ও আধার-সংযুক্ত বায়োমেট্রিক যাচাই ব্যবস্থা চালু করার পেছনে অর্থনৈতিক যুক্তিটি মজবুত। যদি প্রতিটি লেনদেন ডিজিটালি নথিভুক্ত হয়, তাহলে বরাদ্দ ও রেশন বিতরণের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যাবে। 'Ghost Beneficiary' বা মৃত ব্যক্তির নামে শস্য তোলা বন্ধ হবে। একটি নির্দিষ্ট তথ্যভাণ্ডারে সব তথ্য থাকলে নজরদারি সহজ হবে। পশ্চিমবঙ্গে ePOS চালুর পরে কিছু ইতিবাচক ফলাফল দেখা গেছে। নথিভুক্ত Ghost Beneficiary-র সংখ্যা কমেছে এবং লেনদেনের স্বচ্ছতা

বেড়েছে। 'One Nation One Ration Card' প্রকল্পে যোগ দেওয়ার পর পরিযায়ী শ্রমিকরা রাজ্যের বাইরেও রেশন নিতে পারছেন। এগুলো সত্যিকারের উন্নতি।

(খ) ডিজিটাল ডিভাইড: বিভেদীকরন:

কিন্তু প্রযুক্তিভিত্তিক সমাধানের একটি মৌলিক সীমাবদ্ধতা আছে — মনে করা হয় যে সকল উপকারভোগী সমানভাবে প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধাপ্রাপ্ত। কিন্তু বাস্তবে 'Digital Divide' এর দ্বারা: যারা প্রযুক্তিতে সহজ, তারা সুবিধা পায় , যারা নয়, তারা আরও অসুবিধায় পড়ে ও বঞ্চিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে এই বিভাজনের সুনির্দিষ্ট রূপ দেখা যায় : বৃদ্ধা বিধবা যার আঙুলের ছাপ আর মেশিন আসে না— তিনি বায়োমেট্রিক ফেলিওর এর শিকার। ইটভাটার শ্রমিক যার হাতের চামড়া ক্ষয়ে গেছে পরিশ্রমের কারনে— তার ক্ষেত্রে প্রযুক্তি কাজ করে না। দুর্যোগের পর নেটওয়ার্ক না থাকলে পুরো ব্যবস্থাই অচল হয়ে পড়ে। এই সমস্যাটি কেবল প্রযুক্তিগত নয়, সামাজিক। যে মানুষগুলো সবচেয়ে বেশি রেশনের উপর নির্ভরশীল, তারাই প্রায়ই সবচেয়ে বেশি প্রযুক্তির কারনে সমস্যায় পড়ে ও বঞ্চিত হয় । ফলে তথ্যপ্রযুক্তিকরণ নিজের অজান্তেই একটি নতুন বৈষম্য তৈরি করে ।

পরিযায়ী শ্রমিক ও রেশনিং ব্যবস্থা:

পশ্চিমবঙ্গের রেশনিং ব্যবস্থার কাঠামো মূলত স্থায়ী বাসিন্দাদের কথা মাথায় রেখে তৈরি, ফলে জীবিকার সন্ধানে এক জেলা বা রাজ্য থেকে অন্যত্র যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকরা এই ব্যবস্থার বাইরে পড়ে যান। রেশন কার্ড নির্দিষ্ট ঠিকানার সঙ্গে যুক্ত থাকায় কর্মস্থলে রেশন মেলে না, আবার বাড়িতে না থাকায় সেখানকার রেশনও তোলা হয় না— এই দ্বিমুখী বঞ্চনায় পরিবারটি খাদ্য সুরক্ষার বাইরে চলে যায়। ২০১৯ সালে চালু হওয়া One Nation One Ration Card (ONORC) প্রকল্প এই সমস্যার সমাধান দেওয়ার কথা থাকলেও সচেতনতার অভাব ও ধীর বাস্তবায়নের কারণে বহু শ্রমিক এখনও এর সুবিধা পাচ্ছেন না। ২০২০ সালের কোভিড লকডাউনে এই সংকট চরম আকার ধারণ করে, যখন লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কর্মহীন অবস্থায় না পেয়েছেন মজুরি, না পেয়েছেন রেশন। তাই পরিযায়ী শ্রমিকদের খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে রেশনিং ব্যবস্থাকে ঠিকানাভিত্তিক কাঠামো থেকে বের করে ব্যক্তিভিত্তিক পরিচয়ের উপর দাঁড় করানো বাধ্যতামুলক হয়ে পড়ে।

সামাজিক বর্গ ও রেশন:

(ক) লিঙ্গ বৈষম্য ও খাদ্য বিতরণ:

পরিবারের মধ্যে খাদ্য বিতরণ সমান হয় না— এটি পুষ্টি গবেষণায় বারবার প্রমাণিত হয়েছে। বাংলার গ্রামীণ পরিবারে পুরুষরা প্রথমে খান, মহিলারা পরে। পরিবারে সংকটের সময় মহিলারাই বেশি ত্যাগ করেন। ফলে রেশনে পরিবারের জন্য শস্য আসলেও সেটা সমানভাবে পৌঁছায় না। মহিলা ও মেয়েশিশুরা পুষ্টিহীনতায় বেশি ভোগেন। এই বাস্তবতায় শুধু পরিবারকে শস্য দিলে লিঙ্গসমতা নিশ্চিত হয় না। কিছু গবেষক প্রস্তাব করেছেন যে রেশন কার্ড সরাসরি মহিলাদের নামে হওয়া উচিত এবং মহিলারাই রেশন তুলবেন — এতে পরিবারের মধ্যে খাদ্য বিতরণে লিঙ্গসমতার দিকে একটি পদক্ষেপ হয়। কিছু রাজ্যে এটি করা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গেও কিছুটা চলছে, কিন্তু পুরোপুরি নিয়ম হয়নি।

(খ) শহরের অসংগঠিত শ্রমিক:

কলকাতা ও শহরতলির বস্তিবাসী, হকার, রিকশাচালক, গৃহকর্মী— এই মানুষগুলো প্রায়ই ঠিকানার অভাবে বা নথিপত্রের সমস্যায় রেশন কার্ড পাচ্ছেন না। তারা শহরে আছেন কিন্তু শহরের আনুষ্ঠানিক নাগরিকত্বের

সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ভাড়াটে হিসেবে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছেন বলে স্থায়ী ঠিকানার প্রমাণপত্র নেই। এটি আধুনিক নগরায়নের একটি নতুন সামাজিক সংকট।

এছাড়াও সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও ভাষাগত বাধা, তথ্যের অভাব এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতা তাদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে দূরে রাখে। সুতরাং রেশনিং ব্যবস্থার সমস্যা শুধু প্রশাসনিক নয়, এটি গভীরভাবে সামাজিক বর্গবিভাজনের সঙ্গে সম্পর্কিত — এবং সেই বৈষম্য দূর না করলে কোনো সংস্কারই প্রকৃত অর্থে কার্যকর হবে না।

পুষ্টি শুধু ক্যালরি নয়:

রেশনিং ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য ছিল দরিদ্র মানুষের খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা। কিন্তু দশকের পর দশক ধরে এই ব্যবস্থা কেবল চাল ও গম বিতরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে। এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের পেট ভরালেও শরীর ও মনের সামগ্রিক বিকাশের জন্য যে বৈচিত্র্যময় পুষ্টির প্রয়োজন, তা পূরণ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। একজন সুস্থ মানুষের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় কার্বোহাইড্রেটের পাশাপাশি প্রোটিন, স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ জাতীয় খাবার অপরিহার্য। কিন্তু রেশনের মাধ্যমে যা মেলে তা কার্যত শুধুই শর্করা। দরিদ্র পরিবারগুলো রেশনের চাল ও আটার উপর এতটাই নির্ভরশীল হয়ে পড়ে যে বাজার থেকে ডাল, সবজি, ডিম বা মাছ কেনার সামর্থ্য তাদের আর থাকে না। ফলে পরিবারের সদস্যরা, বিশেষত শিশু ও গর্ভবতী মহিলারা, দীর্ঘমেয়াদি অপুষ্টি ও রক্তাল্পতার শিকার হন। অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অপুষ্টি কেবল একটি স্বাস্থ্য সমস্যা নয় — এটি একটি গভীর অর্থনৈতিক সংকটও বটে। অপুষ্ট শিশু বিদ্যালয়ে মনোযোগ দিতে পারে না, তার শেখার ক্ষমতা কমে যায় এবং ভবিষ্যতে উৎপাদনশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার সম্ভাবনা সংকুচিত হয়। অপুষ্ট প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিক কম পরিশ্রম করতে পারেন, বেশি অসুস্থ হন এবং চিকিৎসা ব্যয় বহন করতে গিয়ে আরও দারিদ্র্যের দিকে এগিয়ে যান । এইভাবে অপুষ্টি একটি বিশাল সমস্যা যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে দারিদ্র্যকে স্থায়ী করে তোলে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে এই সমস্যা আরও জটিল। রাজ্যের বিস্তীর্ণ গ্রামীণ এলাকায়, বিশেষত সুন্দরবন, জঙ্গলমহল ও উত্তরবঙ্গের চা-বাগান অঞ্চলে, পুষ্টিহীনতা এখনও একটি গুরুতর সমস্যা। মিড-ডে মিল ও অঙ্গনওয়াড়ি প্রকল্পের মাধ্যমে শিশুপুষ্টির কিছুটা উন্নতি হলেও প্রাপ্তবয়স্ক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টির চাহিদা এখনও অনেকাংশে উপেক্ষিত।

তাই রেশনিং ব্যবস্থাকে যদি সত্যিকার অর্থে মানুষের জীবনমান উন্নয়নের হাতিয়ার করতে হয়, তাহলে শুধু ক্যালরি সরবরাহের গণ্ডি পেরিয়ে ডাল, তেল, পুষ্টিকর বিস্কুট বা ফর্টিফাইড খাদ্যপণ্য রেশনের আওতায় আনা দরকার। উন্নত দেশগুলোর অভিজ্ঞতা দেখায় যে খাদ্য সহায়তা কর্মসূচিতে পুষ্টির বৈচিত্র্য নিশ্চিত করলে দীর্ঘমেয়াদে স্বাস্থ্য ব্যয় কমে, শ্রম উৎপাদনশীলতা বাড়ে এবং সামগ্রিক মানব উন্নয়ন সূচক উন্নত হয়। শুধু ক্যালরি নয়, সমৃদ্ধ জীবনের জন্য চাই সমৃদ্ধ পুষ্টি— এই দৃষ্টিভঙ্গিই হওয়া উচিত আগামী দিনের রেশন নীতির মূল ভিত্তি।

পশ্চিমবঙ্গে সামাজিক অডিট ও দায়বদ্ধতা: বর্তমান পরিস্থিতি ও গৃহীত পদক্ষেপ

পশ্চিমবঙ্গের রেশনিং ব্যবস্থায় সামাজিক অডিটকে স্বাধীন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় আনার চেষ্টা হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রাজ্য সরকার স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছে। জবাবদিহির প্রশ্নে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এসেছে ডিজিটায়নের মাধ্যমে। রাজ্য সরকার রেশন কার্ডের সঙ্গে আধার কার্ড সংযুক্ত করার জন্য বাধ্যতামূলক eKYC প্রক্রিয়া চালু করেছে, যার মূল লক্ষ্য হলো নকল ও ভুয়ো রেশন

কার্ড বাতিল করা এবং ভর্তুকি সঠিক সুবিধাভোগীর কাছে পৌঁছে দেওয়া। এই পদক্ষেপ কিছুটা হলেও দুর্নীতি কমাতে সাহায্য করেছে। অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর সপ্তাহে সাত দিন সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত দুটি টোল-ফ্রি নম্বর— ১৯৬৭ এবং ১৮০০-৩৪৫-৫৫০৫— চালু রেখেছে, যাতে সাধারণ মানুষ সরাসরি অভিযোগ জানাতে পারেন। এটি একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হলেও প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষের কাছে এই তথ্য এখনও পুরোপুরি পৌঁছায়নি। ২০২৫ সালে রেশন দুর্নীতি প্রতিরোধে রাজ্যজুড়ে বিশেষ অভিযান চালানোর কথাও খাদ্য দপ্তর ঘোষণা করেছে। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, ডিজিটায়ন, eKYC এবং টোল-ফ্রি অভিযোগ ব্যবস্থা কিছুটা অগ্রগতির ইঙ্গিত দিলেও রেশনিং ব্যবস্থায় গ্রামসভা-ভিত্তিক স্বাধীন সামাজিক অডিটের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এখনও অনুপস্থিত। MGNREGA-র মতো রেশন বিতরণেও যদি বাধ্যতামূলক সামাজিক অডিট চালু না হয়, তাহলে প্রযুক্তিগত সংস্কার যতই হোক না কেন, প্রকৃত জবাবদিহি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না।

ভবিষ্যতের পথে করনীয়:

(ক) আর্থনৈতিক সুপারিশ:

প্রথমত, রেশন ডিলারদের কমিশন কাঠামো এমনভাবে পুনর্গঠন করা দরকার যাতে সৎভাবে ব্যবসা চালানো আর্থিকভাবে সম্ভব হয়। প্রতি কুইন্টালে উপযুক্ত কমিশন নির্ধারণ করা এবং সেটা নিয়মিত মূল্যস্ফীতির সাথে সমন্বয় করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, উপকারভোগীর তালিকা সময়ের ভিত্তিতে যাচাই করা দরকার— প্রতি পাঁচ বছরে বা প্রতিটি জনগণনার পরে নিরপেক্ষভাবে আপডেট হওয়া উচিত। এই প্রক্রিয়াটি রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত, স্বাধীন প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় হওয়া দরকার।

তৃতীয়ত, রেশনে ডাল ও ভোজ্যতেল যোগ করার বিষয়টা নীতিগত অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। এর অতিরিক্ত ব্যয়ের বিপরীতে দীর্ঘমেয়াদি মানবসম্পদ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্যব্যয় হ্রাসের হিসাব করলে এটি অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক।

(খ) সামাজিক সুপারিশ:

প্রথমত, রেশন কার্ড সরাসরি পরিবারের নারী সদস্যের নামে করা এবং নারীর হাতে শস্য তুলে দেওয়া— এটি লিঙ্গসমতার দিকে একটি কার্যকর পদক্ষেপ হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, শহরের অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য রেশন কার্ড পাওয়ার প্রক্রিয়া সহজ করা দরকার।

তৃতীয়ত, রেশনিং ব্যবস্থার সামাজিক অডিটকে প্রতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া দরকার। প্রতিটি ওয়ার্ড ও গ্রাম পঞ্চায়েতে বছরে অন্তত একবার প্রকাশ্য সভায় রেশন ডিলারের হিসাব পেশ করা বাধ্যতামূলক করা উচিত।

চতুর্থত, প্রযুক্তিভিত্তিক সমাধান যখনই চালু হবে, তখন বিকল্প ব্যবস্থা রাখতে হবে — বায়োমেট্রিক ব্যর্থ হলে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে রেশন দেওয়ার সুযোগ থাকা চাই।

উপসংহার:

পশ্চিমবঙ্গের রেশনিং ব্যবস্থার আর্থসামাজিক রুপান্তর বিশ্লেষণ করতে বসে একটা বিষয় বারবার স্পষ্ট হয়— খাদ্যনীতি আসলে একটি দেশের মানবনীতির প্রতিফলন। দেশ তার সবচেয়ে দুর্বল মানুষটিকে কতটা মূল্য দেয়, সেই পরিমাপই খাদ্যনীতিতে প্রকাশ পায়। ১৯৪৩ সালের মহাদুর্ভিক্ষ দেখিয়েছিল একমাত্র বাজার একাই সমস্যার সমাধান করতে পারে না। ১৯৫৯ সালের আন্দোলন দেখিয়েছিল মানুষ চিরদিন চুপ থাকে না, একসময় তারা ন্যায্য অধিকারের দাবিতে সোচ্চার হয়। বামফ্রন্টের ভূমি সংস্কার ও রেশন সম্প্রসারণ নীতি

দেখিয়েছিল রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ কিছুটা পার্থক্য আনতে পারে। তৃণমূলের খাদ্য সাথী প্রকল্প দেখিয়েছে কল্যাণ রাজনীতি আজও কার্যকর অস্ত্র হতে পারে । কিন্তু প্রতিটি পর্যায়েই একটি প্রশ্ন থেকেই যায় এই ব্যবস্থা কি মানুষের মর্যাদা বাড়াচ্ছে, নাকি তাদের নির্ভরশীল করে রাখছে? সত্যিকারের খাদ্য নিরাপত্তার অর্থ শুধু পেটে ভাত নয়— পুষ্টিকর খাবার, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও কর্মসংস্থান মিলিয়ে একটি সম্পূর্ণ জীবন পাওয়ার সুযোগ। রেশনিং সেই বৃহত্তর লক্ষ্যের দিকে একটি পদক্ষেপ হতে পারে, কিন্তু সেটা যদি রাজনৈতিক হাতিয়ার হয়ে ওঠে, তাহলে মানুষের সত্যিকারের ক্ষমতায়নের দিকে পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

পশ্চিমবঙ্গের জন্য সামনের পথ হল - একটি স্বচ্ছ দায়বদ্ধতামুলক, পুষ্টিকেন্দ্রিক এবং রাজনৈতিক পক্ষপাতমুক্ত গণবণ্টন ব্যবস্থা, যেখানে প্রতিটি নাগরিক তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন এবং সেই অধিকার দাবি করার সাহস ও সুযোগ পাবে । এই লক্ষ্যটা এখনও পূর্ণ হয়নি, কিন্তু একেবারেই অসম্ভব নয়।

Bibliography:

1. Sen, Amartya. (1981). Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation. Oxford: Clarendon Press.
2. Sen, Amartya. (1999). Development as Freedom. New York: Alfred A. Knopf.
3. Bose, Sugata. (1986). Agrarian Bengal: Economy, Social Structure and Politics, 1919–1947. Cambridge: Cambridge University Press.
4. Howes, S., & Jha, S. (1992). Urban bias in Indian public distribution system. Economic and Political Weekly, 27(19), 1022–1030.
5. Khera, Reetika. (2011). Revival of the public distribution system: Evidence and explanations. Economic and Political Weekly, 46(44–45), 36–50.
6. ভারত সরকার। (২০১৩). National Food Security Act, 2013. নতুন দিল্লি: খাদ্য ও গণবণ্টন মন্ত্রণালয়।
7. পশ্চিমবঙ্গ সরকার। (২০১৬). খাদ্যসাথী প্রকল্প — নির্দেশিকা ও বাস্তবায়ন কাঠামো। কলকাতা: খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ।
8. Planning Commission of India. (2005). Performance Evaluation of Targeted Public Distribution System (TPDS). New Delhi: Programme Evaluation Organisation.
9. পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর। (২০২৪). রেশনিং সংক্রান্ত তথ্য। সংগ্রহের তারিখ: ১৫ জানুয়ারি ২০২৫। https://wbpds.wb.gov.in
10. ভারত সরকার। (২০২৪). Aadhaar-enabled Public Distribution System (AePDS). সংগ্রহের তারিখ: ২০ জানুয়ারি ২০২৫। https://aepds.gov.in
11. Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2023). The State of Food Security and Nutrition in the World 2023. সংগ্রহের তারিখ: ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫। https://www.fao.org/publications
12. Right to Food Campaign India. (2024). ভারতে খাদ্যের অধিকার: পর্যালোচনা ও সংস্কার প্রস্তাব। সংগ্রহের তারিখ: ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫। https://www.righttofoodindia.org

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1459-1468
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.367

উৎপলকুমার বসুর কবিতা: পরাবাস্তববাদের আধারে আত্মসমীক্ষণ-প্রয়াস

ড. সৌরভ মজুমদার, *স্বাধীন গবেষক, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.03.2026; Accepted: 21.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Utpal Kumar Basu was a Bengali poet who belonged to the so-called 'Turbulent Fifties' of 20th Century. The poets of his generation grew up in an all-encompassing phase of anarchy and anxiety—The Second World War, recurring communal rife, incomplete Indian independence, refugees flocked at Sealdah station—each and every event marked their negative impressions on these tender minds. The typical political belief-system had lost its appeal to them, and without any substitute narrative to put their hope on, they gradually grew apart from the usual Bengali middle-class morals. In a creative frenzy, they tried to create their own narratives by jotting down their very own personal experience and emotions as poetry. This introspective tendency clashed against lost morals, and created a sense of alienation and impotence in the poetry of fifties. Utpal Kumar Basu created his own poetic diction with surrealistic properties. As Surrealism itself was an attempt to express the "true functioning of thought … in the absence of all control by the reason", it resonated well with the self-reflective tendency of Basu's poetry. This liaison between Surrealism and self-reflection in Utpal Kumar Basu's poetry is explored in this article.

Keywords: Utpal Kumar Basu, Surrealism, Self-reflection, Alienation, Impotence

> এই হলেন উৎপল—উৎপলকুমার বসু—বাংলা কবিতায় টারবুলেন্ট ফিফটিজ-এর অন্যতম প্রধান কবি—নির্জন, মিস্টিক, স্বপ্নতাড়িত, ইমেজিস্ট, চতুর, ভূতগ্রস্ত, সুররিয়ালিস্ট, যুগপৎ চেতনানিশ্চেতনায় সাবলীল ভ্রমণকারী, দাদাইস্ট, 'আর্কেটাইপ'(মনস্তাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক অর্থে) ও 'ব্যারাক' কারুশিল্পে ভরা এক অভিনব ধরনের রহস্যময় বাংলা-কবিতার পথিকৃৎ বিপ্লবী।[১]

একজন সহ-ব্যবসায়ী কবির চোখে এই ছিল উৎপলকুমার বসুর স্থান— আধুনিক বাংলা কবিতায়। বস্তুত, কবিদের কবি ছিলেন উৎপলকুমার বসু। ভূবিজ্ঞানের ছাত্র এই কবি কবিতায় প্রবেশ করেছিলেন তার কারুকর্মের দিকটিকে সামনে রেখে। বিষয়বাহুল্যকে নিজের কবিতা থেকে বিসর্জন দিয়ে তিনি কবিতাকে করে তুলেছিলেন খনকযন্ত্রের মতো তীক্ষ্ণ, আর তার সূচিমুখকে চালনা করেছিলেন মানব-মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে। আত্ম-আবিষ্কারের প্রয়াস তাঁকে বাস্তবের অন্তর্লীন বন্ধনসূত্রগুলিকে অস্বীকার করে ক্রমশ পরাবাস্তব-অভিমুখী করে তুলেছিল, করে তুলেছিল মানবচেতনায় আরও গভীরসঞ্চারণে সক্ষম। নিজের সত্তাকে পরিপূর্ণতায় জানার চেষ্টা

ছিল পরাবাস্তববাদীদের মৌলিক উদ্দেশ্য। নিজ অস্তিত্ব এবং বাস্তবতার কেন্দ্রে পৌঁছনোর তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁদের একধরনের 'Hamletism'–এর দোরগোড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল, "which is an excessive analysis and study of self"[২]। জয় গোস্বামী উৎপলকুমার বসুকেও চিহ্নিত করেছিলেন সেই কবিদের একজন বলে, "যাঁরা মনে করেন, আমি কবিতাটি লিখতে লিখতে নিজের অন্তর্জগতে প্রবেশ করতে থাকব। তাতে নিজেকে হয়তো আরও একটু জানা সম্ভব হবে।"[৩] নিজেকে জানার এই বিশেষ প্রবণতাকে আত্মসমীক্ষণাত্মক প্রবণতা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, যেখানে 'সমীক্ষণ' শব্দটির অভিধাননির্দিষ্ট অর্থ হল— "সম্যক দৃষ্টি; অন্বেষণ; বিবেচনা; যত্ন; সম্যক জ্ঞান"[৪]; অর্থাৎ 'আত্মসমীক্ষণ' শব্দটির অর্থ হয় 'আত্ম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান' কিংবা 'আত্ম অন্বেষণ'। পরাবাস্তবিক চেতনায় সমসময়ের প্রেক্ষাপটে নিজেকে স্থাপন করে কবি উৎপলকুমার বসু কীভাবে কবিতায় নিজেকে খুঁড়ে চলেন, ঋদ্ধ হ'ন আত্মসমীক্ষণলব্ধ জ্ঞানে, তা আমরা আলোচনা করতে চাইব বর্তমান নিবন্ধে।

একজন সাহিত্যিককে অবশ্যই হতে হবে সমাজসচেতন— এই ছিল উৎপলের অভিমত। সময়ের নিহিত চিত্ররূপ তাঁর কবিতাতেও ফুটে উঠতে দেখা যায় তাই। এক ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় উৎপলকুমার বসু বলেছিলেন,

> "তথাকথিত রাজনৈতিক সচেতনতা আমাদের একেবারেই ছিল না। দুটো বড় ঘটনার সন্তান আমরা, এক—দেশ স্বাধীন হওয়া এবং দুই—দেশ ভাগ হওয়া। দলগত মতাদর্শ বা তাত্ত্বিক পড়াশোনার বিশেষ সুযোগ হয়নি তখন ১৯৫৯-৬০ সালে, কলকাতা শহর উদবাস্তুতে ছেয়ে গেছে। শিয়ালদা স্টেশনে দলে দলে উদ্‌বাস্তুর ভিড়। ... যৌনতা, জন্ম-মৃত্যু সবই চলছে ওরই মধ্যে।... চোখের সামনে—হাতের কাছে এগুলো ছিল বলে এতেই বেশি উৎসাহিত হয়ে পড়ি আমরা।"[৫]

চল্লিশ-পঞ্চাশের উত্তাল বছরগুলিতে(১৯৪১-৬০ খ্রি.) কেটেছিল উৎপলের কৈশোর-যৌবন। একদিকে ধরা পড়ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের(১৯৩৯-৪৫ খ্রি.) তীব্র অভিঘাত, অন্যদিকে ঘটে গিয়েছিল ১৯৪৩-এর ভয়াবহ মন্বন্তর(পঞ্চাশের মন্বন্তর)। শহরের রাস্তাগুলি ভরে উঠেছিল অনাহারে মৃত অজস্র মৃতদেহে, রুগ্ন শিশুর ভিড়ে। ১৯৪৬-এর ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা, ১৯৪৭-এর দেশভাগ ও স্বাধীনতা— এসমস্তই সমসময়ের তীব্র অস্থিরতাকে প্রকট করে তুলেছিল। চল্লিশের মার্কসবাদী লেখকদের 'ক্লাস-কলোনিয়ালিজম-ইম্পিরিয়ালিজম'-কেন্দ্রিক মতবাদ দ্বারা ক্রমাগত এইসব ঘটনাবলীর বিশ্লেষণের চেষ্টাকে 'সন্দেহ করতে' শুরু করেন উৎপল ও তাঁর প্রজন্মের কবিদল। "এগুলোকে এত সুপারফিসিয়াল লেভেল-এ মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না"[৬], তাঁদের নজর পড়েছিল দেশভাগের 'সাইকিক ইমপ্লিকেশন্স-এর ভয়ংকরতার' দিকে। আর সেইসঙ্গে প্রকট হয়ে উঠেছিল রাজনৈতিক-ক্ষমতাসীন-ব্যক্তিবর্গের বিরাটব্যাপ্ত দুর্নীতির জগতটি। বস্তুত যে অশান্ত আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশে বিংশ শতকের সূচনায় ইউরোপে সুররিয়ালিজমের জন্ম হয়, উৎপলের সমসাময়িক পরিস্থিতি তার থেকে খুব ভিন্ন ছিল না। পারিপার্শ্বিক এই সুতীব্র বাস্তবকে অস্বীকার করতেই হয়তো পরাবাস্তবমুখী হওয়া উৎপলের—আত্ম-অন্বেষণে নিজস্ব অস্তিত্বকে অনুধাবনের চেষ্টা, নিজেকে চেনার প্রয়াস। কিন্তু উপরোল্লিখিত প্রক্রিয়াতেই, আত্ম-আবিষ্কার পরিপার্শ্বকেও চিনতে, জানতে, বুঝতে শেখায় কবিকে। সেই পথে এগিয়েই হয়তো সমাজ এবং তার অন্তর্গত বিভিন্ন স্তরের মানুষকে উৎপল দেখেছেন এক করায়ত্ত সত্যদৃষ্টিতে— চারপাশে ঘিরে থাকা বাস্তব ঢেউ তুলেছে অবচেতনার গভীর মহলে। তৈরি হয়েছে পরাবাস্তবতার নিমগ্ন ঘোর, যা বাস্তবকেই নতুন করে দেখতে শিখিয়েছে পাঠককে।

এক আশ্চর্য 'শোভাযাত্রা'র অঙ্গ হিসেবে কবি একের পর এক দেখে যান যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দেশভাগ, স্বাধীনতা। সে শোভাযাত্রা পায়নি কোনো 'পরার্থপর মৃত্তিকার দিগন্তনির্দেশ' ('শোভাযাত্রা-১'/ আবার পুরী সিরিজ), ছিল না

কোনো 'কম্পাসের খলনির্ভরতা'। "বস্তু হতে অবাস্তব ভূতের আশ্লেষে/ ক্রমশ লুপ্ত" (ঐ) হয়ে গেছে অজস্র মানুষ। আকাশে উড্ডীন সূর্যও 'শকুনতাড়িত'— "হেলে পড়ে কম্পাসকাঁটায়" (ঐ)। পথ খুঁজে পাওয়া যায় না কোথাও, কেবল 'দূর বিমানের ধাতু-আলেয়ায়' আচ্ছন্ন পড়ে থাকে 'বিপুল এয়ারোড্রোম' বৈমানিকবিহীন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনুষঙ্গ টেনে আনে এ পঙ্‌ক্তি, কিন্তু এ বিমানবন্দর এ দেশেরও প্রতীক হয়ে ওঠে— দিশাহীন যে দেশের 'অব্যবহৃত পিচের পথের পাশে' জেগে উঠতে দেখা যায় 'জায়মান মৃত্তিকার শব', আর— "সহস্র একরব্যাপী অনুর্বর জমি, জল, কম্পমান সাঁকো,/ নিরন্ন প্রজার দেশ।" (ঐ) 'বহু বাদুড়ের বিধ্বস্ত ফলের দেশ' পার হতে হয়েছে কবিকে বারবার, প্রতিটি প্রিয় স্মৃতিতে থাবা বসিয়েছে 'উন্মুক্ত ডানার লক্ষ বাদুড়', তাই— "এখন তোমাকে ভাবি ছিন্নত্বক ফলে ও ছায়ায়।" ('শোভাযাত্রা-২'/ঐ) কেবল মনে পড়ে 'গোমড়ক, মন্বন্তর, তপশিলী গ্রামের উৎখাত', আর—

"অতিরিক্ত মনে পড়ে পথ-ঘাট, হা-হা বিদ্যমান
আমানি খাবার গর্ত, মনে পড়ে শূন্য ক্ষেত, ভাঙা ভিটা গ্রাম-গণিকার,
দিগন্তে ধূলির মেঘে, আর্তকণ্ঠ, উপবাসী হাতিদের স্নান।" (ঐ)

বাস্তব প্রেক্ষাপটে আপাত-অসংলগ্ন চিত্র সংযোজনে পরাবাস্তবের পরিসর নির্মাণ করেন কবি। কেবলই রূপকের সীমায় আবদ্ধ থাকেনা কবিতা যখন কবি বলে ওঠেন— "জামের মধ্যাহ্নবনে ঘুরে যায় সে-কড়িখেলার/ বেদনা-আহত হাসি। অত কড়ি পেয়েছিলে ভালো কি বাসায়?" (ঐ) কিংবা,

"আজো জাগরণে
তোমার বাড়ির পথ ততদূর মনে হয়—ওগো প্রিয়, উন্মুক্ত ডানার
লক্ষ বাদুড় ঠেলে যেতে হয় জামের হরণে—" (ঐ)

এ 'জাম' কি কবির প্রেম? তাঁর শৈশব? নাকি কবির অন্তর্গত সত্তা, যার আকাশ আর জমি ছেয়ে যায় দেশভাগের রাজনৈতিক 'কড়িখেলার বেদনা-আহত হাসি'তে? কাঁটাবেড়ার ওপারে ফেলে আসা জামের সন্ধানে যেতে হলে 'অন্তর্গত রক্তের' ভিতরেই কি ভিড় করে আসে 'উন্মুক্ত ডানার লক্ষ বাদুড়'? এই অবচেতনা থেকেই কি ছিটকে উঠে আসে ফাটল-জমির ফাঁকে উত্তপ্ত কান্নার স্রোত, তীব্র অথচ অসহায় এক ব্যঙ্গ—

"এই তো আমার দেশ, দরবিগলিত ভাঁড় দু'হাতে উপুড়—
এই তো আমার দেশ, দরবিগলিত ভাঁড় দু'হাতে উপুড়—
ফাটা গেলাসের শব্দে আমার মাতৃভূমি-জন্মভূমি নির্মীয়মাণ
যা-তোমার হাত থেকে খসে পড়ে তাই আমি সাগ্রহে ধরেছি
শব্দময় মূর্ছায়, পতনে ও আত্মআবিষ্কারে পেতে আছি কান" ('শোভাযাত্রা-৩'/ঐ)

'ফাটা গেলাসের শব্দে' নির্মীয়মান এই কবির স্বদেশ— যেন ভিক্ষার দান কোনো। আমর্ম আকুলতায় যেন প্রশ্ন করেন কবি কোনো অনির্দেশ্য 'তুমি'-কে— "তোমাদের রাষ্ট্রে কেউ ঘোষণা করে কি নেমে 'এবার বিকেল'" (ঐ)। এ বিকেল প্রস্তুতির নির্দেশ বয়ে আনে, ঘরে ঘরে নির্মিত হয় 'অপ্রস্তুত শেল'— "বোনের, বাবার হাতে ঐ সবই গড়ে ওঠে দ্রুত" (ঐ)। 'মশলা-ঝাড়ার গান' থেমে যায়, 'উৎকেন্দ্রিক কুলো' ঘেমে ওঠে মায়ের, দাসীর হাতে। মনে পড়ে ইয়েটস-এর 'The Second Coming' কবিতার অমোঘ পঙ্‌ক্তি— "Things fall apart; the center cannot hold;/ Mere anarchy is loosed upon the world,"[৭] ('The Second Coming'/ Michael Robartes and the Dancer)। 'জাতীয়তাবাদী কৃমি'র আক্রমণে রুগ্‌ণ শিশুতে ভরে ওঠে দেশ।

অথবা রুগ্নতা এ দেশেরই শৈশবকালীন। সে রুগ্ন , 'রক্তমাখা প্রেত'-এর মুখোমুখি হয়ে বিপন্ন বোধ করেন কবি—

"আমি বরাবর রাস্তার
উপরে হেঁটে দেখেছিলাম পথ শেষ হয়ে যায় গাছের বিচূর্ণ রঙিন জালে যেখানে সমাধি
আর প্রসূতির হাসি আর রক্তমাখা প্রেত, তার ভয়াবহ প্রশ্ন ও বিচার"
('ভোর থেকে দেখেছি আগুন'/ আবার পুরী সিরিজ)

শিশুকে সুস্থ ভবিষ্যৎ দেওয়ার দায়িত্ব পিতার— "পিতা, তুমি খরশান, তুমি তাপ ও বিদ্যুৎ একাধারে" (ঐ)। কিন্তু একজন পিতা হিসেবে কবি শিশুকে সেই নিরাপত্তা দিতে পারেননা। শিশু এবং পিতা—দুটি ধারণাই (concept) এখানে সামাজিক গ্রাফপেপারের ত্রিমাত্রিকতায় বিস্তৃত হয়ে যায়। "ঐখানে শত শত শূকর ছাগল মেষ ভোর ও রাত্রির অব্যবহিত সময়ে আমাদেরই জন্য নিয়ে আসে রক্তাল্পতা ও কিলোওজনের অর্ধেক চাঁদ" (ঐ) রক্তাল্পতায় ভোগা, রুগ্‌ণ শিশুর মুখ নিয়তির মতো কবির চেতনে-অবচেতনে হানা দিয়ে যায় বারবার। ওদিকে 'উৎসব' উপলক্ষ্যে শূকর ছাগল মেষের মতোই বিনা-প্রশ্নে মরে যেতে থাকে মানুষ, যেমন "শব্দহীন ভোরের বাতাসে জল কল থেকে পড়ে যায়" (ঐ); বাড়ির উঠোনে স্তূপাকৃতি হয়ে ওঠে 'শেষরাত্রির মাংস'। খড়্গ— হত্যাকারী— সে আর ঐ শিশুর পিতা যেন একই ভূমিকায় অভিনয় করে চলে— "খড়্গ, তুমি তাপ ও বিদ্যুৎ একাধারে" (ঐ)।

"আমার মাথায় আজ জমে ওঠে জঞ্জাল, যেন বান সরে গেছে ঢালু আঘাটার দিকে,
যেন পরিত্যাগ, আমি খুঁজে পাই সোডাবোতলের ছিপি, তাই আবিষ্কার মনে হয়—মাতাল
হিসেবে আমি প্রতিশ্রুত—মাতাল হিসেবে আমি কিছু গান ভেবে নিতে পারি—আমি
ভোর ও রাত্রির অব্যবহিত সময়ে স্ত্রীলোকের কানে মুখ রেখে বলি: তুমি কংগ্রেস।"(ঐ)

কুমাতার মতোই কংগ্রেস প্রসব করে এই রক্তাল্পতা-রুগ্‌ণ, অর্ধেক চাঁদের মতো বিভক্ত স্বদেশ। 'অস্বাভাবিক লোমবীজাণুর ভিতরে ডুবে গিয়ে' এই শিশু স্বদেশ আঘাত হানছে মধ্যবিত্তের বিলাসী অন্ধকারের দরজায়, থাকতে দিচ্ছে না তাকে আড়ালে। একই পটভূমিকায় 'ধ্বংস ও সূর্যোদয়' খেলা করে যায় এখন।

"...তবু আমার আত্মায় কোনো ভঙ্গিমা জাগে না ইউক্যালিপটাস থেকে অমাবস্যা
অন্ধকারে পাখি উড়ে যায় আমার নিরুজ্জ্বল ভবিতব্যতার কথা ভাবি তুমি আমার সন্তান
নও তাই আমার আত্মার চেয়ে সহজ চাতুর্যময় তোমার যাবার ভঙ্গি তোমার যাবার
পথে আমি নেশাতুর চোখ মেলে দেখে নিই উলঙ্গ মেয়েরা ক্রমাগত গ্রাম আক্রমণ
করে এবং প্রকাশ্য মাঠে রামধুন গী'ত হয় এবং স্বল্পমূল্যে পুংমহিষের পুরুষত্ব নষ্ট করা
চলে তবু বেদনা জাগে না আজ কিছুতেই।" ('প্রকৃতির ছবি'/পুরী সিরিজ)

এই নেশাতুর অসংবেদ আসলে সমাজমানসেরই সাধারণ ধর্ম। 'স্বাধীনতা' শব্দটিকে নিয়েই সন্দেহ ওঠে— যেন সে 'সভ্যতার নাভির ভিতরে' আচ্ছন্ন এক 'নির্নিমেষ করুণ অঙ্গার', ক্রেমলিনে, যুক্তরাষ্ট্রে, কিংবা 'বৈকুণ্ঠের যৌন মখমলে' ধোঁয়ায় আবিষ্ট থাকে সে, 'হিন্দুর জিজ্ঞাসা নয়।' আসলে—

"শুধু কিছু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের
কেবলই মঙ্গল করো। তুমি আপেক্ষিক
অন্য সকলের প্রতি— যেহেতু বিভেদ
'আন্তর্কজাতিক' বলে উদ্যত মুষল— যেহেতু মানুষ

রেডিওর মতো এক অর্বাচীন বক্তার সম্মানে
পরিবারসহ শ্রোতা। যেহেতু কাগজে
নিত্যই সম্পাদক ছাপার কলের সঙ্গে কী ভাবে সঙ্গম করে—
তারই বিবরণ ধুরন্ধর লিখেছে বিশদ" ('ফেরীঘাট'/পুরী সিরিজ)

মনে হয় সূর্যও যেন শ্রেণিভেদে বিশ্বাসী— সে "সাবলীল সোনার গাছের/ প্রচ্ছায়ায়, অন্ধকারে সমস্ত তৃণের রোমে একইসঙ্গে/ ক্ষুধা ও চুম্বন" স্তম্ভিত করে রাখে বলে মনে হলেও, দিনের শেষে অপরাহ্নের ফুল ঝরে যায়, একে একে মরে যায় অরণ্যের গাছ— "প্রার্থনারত কঙ্কালের বাহুবদ্ধ ছায়া/ খুলে ফেলে একে একে কৌতুহলহীন ত্বক, মাংসের জটিল/ উপশিরাগ্রস্ত পাতা।", কারণ—

"কেননা দিগন্তে তুমি
কীর্ণ হয়ে উঠে এলে এইমাত্র—কেননা সোনার গাছ
গ্রাস করে বেড়ে ওঠে—বেড়ে ওঠে উন্মাদ হাওয়ায়
অন্য সব ফুল, ফল, জীবের বিজ্ঞান
সাম্যতার, প্রতিসাম্যতার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে" (ঐ)

ক্ষুধা থাকে এক শ্রেণির জন্যে— 'ক্ষীরের আর্শি' থেকে যে যক্ষ্মা-রোগিনীরা 'স্বাস্থ্য ভিক্ষা' করেছিল, দিল্লীর যে বাসিন্দা চেয়েছিল 'ফলের আর্শি' থেকে একবাটি 'স্বচ্ছন্দ রস', যে মৃত্যুপথযাত্রীরা চেয়েছিল 'দুধের আর্শি' থেকে 'দীর্ঘ পরমায়ু'—ক্ষুধা তাদের জন্যেই প্রসারিত। আর চুম্বন তাদের প্রাপ্য, যাদের জন্যে মাটির গর্ভ খুঁড়ে অর্জিত হয় লোহার আকর, যাদের 'মঙ্গলে পরস্পর প্রতিবন্ধে' লোহা গড়ে তোলে 'এঞ্জিন, স্তব্ধ রেল, সাঁকো, বাড়ি, কলোনি, বাজার'। এসব 'ধূলির খেলা' ফেলে দিয়ে কবিও অন্য সকলেরই মতো 'ধ্রুব তত্ত্বে, আত্মজিজ্ঞাসায়' ফিরে যেতে চান যৌবনে, কিন্তু প্রশ্ন থেমে থাকে না—

"তবু আত্মরতিহীন কোন সৌরময়দানে আধিপত্য মানুষের?
তবু ব্যথাহীন কোন্ বিচ্ছেদের নীল?
কোন্ মৃত্যু ঔদাসীন্যহীন?" (ঐ)

এসব 'বিপরীত প্রতিদ্বন্দ্বী বোধ, ইচ্ছা' কবিকে তাড়িত করে। "কুয়াশায় রাজহংসের ফৌজ দৌড়ে চলে যায়" (ঐ), "কেননা সমস্ত হাঁস যুদ্ধের সন্তান" (ঐ)। সৌন্দর্যের প্রতিনিধি হয়ে আর বাঁচে না হাঁসের দল। জ্যোৎস্নায় যে উৎসব শুরু হয়, সে 'এক জাগতিক, বাঁকা উপত্যকা'—"চাঁদের প্লাবন, শিরা, রক্ত, বুদ্ধি, তীব্রতা ডিমের/ ফুল ফোটানোর আগে" (ঐ)। অবচেতনার গভীর, গভীরতর অন্ধকারে মাখামাখি হয়ে উঠে আসে এসব চিত্রকল্প, যা সমকালীন বিদীর্ণ বাস্তবকে তার প্রকৃত চেহারায় তুলে ধরে। বস্তুত, "Surrealism is the explosion of a society, beneath the repressive anguish of an antiquated morality."[৮] মানুষ কেবলই ঘুরে যায় 'যুদ্ধে, জন্মে, যোনির শিখরে'। বিচ্ছেদের মতোই কষ্টকর হয়ে ওঠে জন্ম, আর 'গম্বুজের ভাঙা দেওয়ালের মতো'ই ভয়ঙ্কর যাবতীয় 'রক্তপাত'। অনুভূতির ধারগুলি মরে মরে যায় মানুষের, জন্ম-মৃত্যুর বোধ ক্রিয়াশীল হয় না। 'হেমন্তলীন, পাতার ঔরসে' জাত মানুষের সত্তা আজ "নির্বেদ শূন্যতায় ঝরে যাওয়া ত্যক্ত বিপুলতা" (ঐ)।

আত্ম-সমীক্ষণে প্রয়াসী হয়ে উৎপলকুমার বসু নিজস্ব নিয়তি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছেন। অনুভব করেছেন, বনের ভিতরে উদ্দেশ্যহীন ঘোরা দমকলের মতোই নিয়তি তাঁর—উদ্দেশ্যহীনতা এবং অক্রিয় এক 'অগ্নিনির্বাপক ক্ষমতা'—

> "বনের ভিতর আজ সকালের উদ্দেশ্যবিহীন দমকল একা একা ঘুরছে আমাকে টেনে
> নিয়ে চলো ঐ অগ্নিনির্বাপক ক্ষমতা আমারো আছে স্ত্রী আছেন পুরুষের আয়ত্তে যেমন"
> ('আমারই প্রাণের দিকে চেয়ে দেখি'/পুরী সিরিজ)

আঁদ্রে ব্রেতোঁর 'Nadja' রচনাটির নায়িকা নাড্জাকে যখন নায়ক জিজ্ঞাসা করে, "who are you?"[৯], তখন তার উত্তর দেয় সে—"I am the wondering soul"[১০]। একা একা ঘোরা উদ্দেশ্যহীন দমকল বোধহয় এই যুগগত নিয়তিরই প্রচারক হয়ে ওঠে। আর সেই সঙ্গে থাকে এক অক্রিয় অগ্নিনির্বাপক ক্ষমতা—যা কবির আয়ত্তে থাকে, যেমন পুরুষের আয়ত্তে থাকে নারী, কিংবা যেমন 'ফুল থাকে দানবীর আয়ত্তে'—আয়ত্তাধীন ক্ষমতা বা অস্তিত্বের কোনো মূল্য থাকেনা কারো কাছেই। বাঁ চোখে ব্যথা হতে কবির ভয় হয়— "অন্ধতা আমার বেশিদূর যাবে কি যৌবনে—না হয় গাড়ির টায়ারচিহ্ন ধরে চলেছি" (ঐ)। অদ্ভুত এক অসুস্থ পরিণতিহীন যৌবনে পথ চলা কবির। ঘটনার অর্থহীন 'টায়ারচিহ্ন' ধরে এগিয়ে চলা এখন মানুষের নিয়তি হয়ে দাঁড়ায়— এমনকি মৃত্যুও সেখানে মুক্তির আশ্বাস নয়, কেবল অভ্যাসের পদাঙ্ক অনুসরণ—"যেখানে মরণশীল উদ্ভ্রান্ত মোরগ ক্রমে উড়ে যায় মৃত্যুর পরেও লাল টালি-বারান্দায়" (ঐ)। 'ভরাট লেবুর মতো' পৃথিবী পর্যবসিত হয় 'গোল অর্থহীনতা'-য়— "ফাঁপা, নিষিক্ত ও সহিষ্ণু জীবন ও জীবনব্যাপী কলরোল" ('স্মৃতি'/পুরী সিরিজ)। অদিতির বাণী হয়ে দাঁড়ায় শুধু— "যুবক নষ্ট কোরো না বীজ" ('আমারই প্রাণের দিকে চেয়ে দেখি'/ঐ)—আর 'নভোরশ্মির শাদা জরিপোষাকের দিকে' তাকিয়ে কবি অনুধাবন করেন জীবনের সারাৎসার— "'যায় দিন, গ্রীষ্মের দিন যায়, যায় সূর্য, যায় দুর্ঘটনা'" (ঐ)। এক অর্থহীনতা, লক্ষ্যহীনতা, পরিণতিহীনতার আবর্তে পড়ে কেবলই 'জীবন যাপন' করে চলে মানুষ। পুরুষেরা ব্যস্ত থাকে 'সব্জির কাজে' আর 'স্ত্রীলোকেরা গোয়ালের কাজে', দুর্ঘটনার খবরের প্রতিক্রিয়া হয় 'চলো দেখে আসি'। দমকলের মতোই মানুষ শুধু উদ্দেশ্যহীন ঘুরে যায় গভীর বনে—দাবানল নেভানোর দায়িত্ব নেয় না কেউ, কারণ সকলেই জানে, 'যায় দিন, গ্রীষ্মের দিন যায়, যায় সূর্য, যায় দুর্ঘটনা'। স্বপ্নের মতো এই কবিতায় পরপর কতকগুলি চিত্র উঠে এসেছে যেগুলি আপাতভাবে পরস্পর সংগতিবিহীন। তাছাড়া কালগত সীমারেখা ধ্বস্ত হয়েছে একাধিকবার। 'Physical object'-এর পাশাপাশি 'Supernatural forces'-এর ক্রিয়াশীলতা লক্ষ করা যায়, যা বাস্তব ঘটনাক্রমকে পরাবাস্তবের সীমানায় উন্নীত করে দেয়। নিজস্ব সত্তার পরিচয় খুঁজতে চেয়ে একের পর এক চিত্রে কবি কেবল খুঁজে পান একটিই 'latent content'—যাপনের উদ্দেশ্যহীনতা।

কেবলই উদ্দেশ্যহীনতা নয়। সত্তার গভীরে কবি খুঁজে পান এক কিম্পুরুষ— "খর্ব, খোঁড়া, পারঙ্গম— তার চোখ আমাতে লেগেছে" ('ক্ষুধা-পিপাসা'/ শ্রেষ্ঠ কবিতা)। সে সত্তা তার খর্বত্ব এবং খঞ্জত্ব নিয়েও নদী পারাপারে সক্ষম, কারণ সে দুই নৌকায় পা দিয়ে চলতে পারে। সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ— দুদিকেই তার সমান গতায়াত। কিন্তু "গজগমনের রোষে টলোমল নৌকা দু'টি" (ঐ)। আর অন্যদিকে থাকে অকর্মণ্য, ঘরকুনো এক সত্তা, যে 'চৌকাঠে মাদুর পেতে' বসে থাকে। অন্য সত্তাটির সাপেক্ষে নিজেরই নিষ্ক্রিয়তা সে বোঝে, তাই "হাসি নয়। নীরবতা হয়।" (ঐ)। কিন্তু সেই সঙ্গে অবিশ্বাস্য মনে হয় অপর সত্তার তীব্র গতিশীলতা, প্রশ্ন ওঠে—"হ্যাঁ গা, এঁরা কি বাস্তব?" (ঐ)। 'সেনানীর মতো' দূরে দাঁড়িয়ে সে দেখে— "...এই কাঁকুড়জাঙালে/ সহিসবিযুক্ত অশ্বে শ্বেত রানি, কালো রানি" (ঐ) চলে যায়। আলো আর অন্ধকার— শুভ-অশুভ, আনন্দ-বিষাদ, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি—সমস্তই যেন বল্গাহীন ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে চলে যায়, আর সেই ঘোড়ার খুরের নিচে মাটি হয়ে ওঠে অনুর্বর, পরিণতিহীন। চোখের আড়ালে থেকে সেই অন্যনির্ভর খঞ্জ, খর্ব সত্তা যেন উকুনের মতোই রক্ত শুষে

নেয়, 'পত্রহীন ডালে ডালে' দেখা দেয় 'সূর্যের বিষাক্ত ছাল'। রোদ আর আলো আনে না, আনে জ্বালাময়, বিষাক্ত মৃত্যু কেবল—

"পত্রহীন ডালে ডালে সূর্যের বিষাক্ত ছাল—কোকিল কি
মরেছে মাদুরে? তার শব উকুনবাস্তব?" (ঐ)

সেই পঙ্গু অস্তিত্ব কবির কানে দেয় আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের মন্ত্র—যেখানে কন্যাসমা নারীও কেবল উপভোগের পাত্রী—তার মেদ-মাংস-রক্ত-অস্থি—সমস্তই 'পানীয়',—"—শোনো, সে-ও বলে—হেথা যে-মেয়েটি দেখছ এ তোমার কন্যা যেন/ একে ক্রিশ্চান রুটির মতো টুকরো করো, গুচ্ছ আঙুরে পেষো, মদ হবে,/ পুণ্য পান..." (ঐ)। 'পিপাসা'-ই কবির নিজস্ব ধর্ম হয়ে উঠুক, তাই চায় সেই সত্তা—"তুমি হও নিজের পিপাসা" (ঐ)। কবি অনুভব করেন, 'বাতাসে উড়ন্ত এক বীজপশু'-র ধর্ম যেন তাঁর অস্তিত্বের চিহ্নায়ক হয়ে উঠতে চায়—"বীজ সেই, যাকে নাম ধরে ডাকি।/সে জেগে ওঠে খিদের জগতে, পশুহননের সন্ধ্যায়, ধুলোর ঝড়ে..."(ঐ)। আসলে এই বীজ তাঁরই সত্তার আরেক প্রকাশ, যার 'ক্ষুধা-পিপাসা' অন্তহীন। মগ্ন চৈতন্যের আশ্চর্য রূপায়ন ঘটান কবি এই কবিতায়—যে চৈতন্যের অন্ধকার গহ্বরে বাসা বেঁধে থাকে অবদমিত,অতৃপ্ত কামনা-বাসনা-আকাঙ্ক্ষা, যে বুভুক্ষু সত্তা কেবল ফ্রয়েডীয় 'সুখ তত্ত্ব' (Pleasure Principle)-এর অধীন—আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্তি যার একমাত্র চাহিদা। সে সত্তা যখন ব্যক্তির সচেতন সত্তাটিকে গ্রাস করে নিতে চায়, তখন সে ব্যক্তি যেন এক ক্ষুৎ-পিপাসাকাতর বন্য জন্তু হয়ে ওঠে— "ঐ তার আক্ষেপ শোনো।"(ঐ) লালসা-উদ্রেককারী বস্তুসামগ্রীর ভিড় থেকে কবি দূরে পালিয়ে যেতে চান তাই, চান না তার সমগ্র সত্তা গ্রসিত হোক ঐ বীজপশুর দ্বারা। কিন্তু তার অবস্থান যে কবিরই মনের অতল গহনে, তাঁর বাহ্য সত্তাও যেন সে সত্তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে তাই। পৌরাণিক দৈত্য বাতাপী আর ইল্বল ছিল দুটি আলাদা সত্তা—ইল্বল বাতাপিকে মেষে রূপান্তরিত করে ঋষিদের ভক্ষণ করাতো, আর তারপর তার ডাকে বাতাপি ঋষিদের পেট চিরে বেরিয়ে আসতো। কিন্তু এক্ষেত্রে ইল্বল আর বাতাপি যেন একই সত্তা—বাতাপির অবস্থান যেন ইল্বলেরই অভ্যন্তরে—

"দরজার আড়াল থেকে, ছাদের কার্নিশ থেকে, নারকেল গাছের
মাথা থেকে তাকে আমি দু'বেলা ডাকি
সে একমাত্র আমার ডাকেই সাড়া দেয়
—জানে ইল্বল তাকে ডাকছে।" (ঐ)

বস্তুত কবিতাটির শেষে কবি যেখানে এসে পৌঁছান তাতে কোনো একটি সত্তাকে ভালো, অন্যটিকে মন্দ বলে দেগে দেওয়া যায় না আর। ভালো-মন্দ, ভগবান-শয়তান সমস্ত একাকার হয়ে যায় যেন এখানে। এ কবিতার আলোচনায় প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে এখানে শার্ল বোদলেরের 'আত্ম-প্রতিহিংসা' (L'Heautontimoroumenos) কবিতাটির এই পঙ্‌ক্তিগুলি—

"আমিই চাকা, দেহ আমারই দলি!
আঘাত আমি, আর ছুরিকা লাল!
চপেটাঘাত, আর খিন্ন গাল!
আমি জল্লাদ, আমিই বলি।"[১১] (অনুবাদ: বুদ্ধদেব বসু)

রোম্যান্টিক কবির মতো উৎপল 'পৃথিবীকে শ্বাপদ' আর নিজেকে 'নিষ্পাপ হরিণ' বলে মনে করেননা। 'বলি' এবং 'জল্লাদ' বলে অভিহিত করা না গেলেও, কবি জানেন তাঁরই অভ্যন্তরে বাস করে ভালো মন্দ—দুইধরনেরই

সত্তা। অবিমিশ্র ভালো নন কবি— তিনি নিজের মধ্যেকার শ্বাপদটিকেও চিনতে পারেন, স্বীকার করেন তার অস্তিত্ব।

বস্তুত, গভীরে গিয়ে দেখলে দেখা যায়, উৎপলের কবিতায় তাঁর আত্মগত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে ব্যোদলেয়ার-কথিত le dandy-র স্বরূপ। ড্যান্ডি হল এমন একজন মানুষ যে সুগঠিত চরিত্র, সুবিকশিত সংবেদনশীলতা এবং বিচারবুদ্ধির অধিকারী। কিন্তু সে ক্রমাগত চেষ্টা করে একজন অসংবেদী, শীতল ও কঠিন চরিত্রের মানুষ হয়ে উঠতে। "This is a tight fitting musk which he must forge every day in order not to betray himself when in the world."[১২] সে অভ্যাস করে ক্রুরতা এবং সংবেদনহীনতা—এটাই তার সামাজিক মুখোশের অঙ্গ হয়ে যায়। বাহ্য পৃথিবীতে আন্তরিক হয়ে ওঠা মূঢ়তার সামিল—এই ভয় সর্বক্ষণ তার মধ্যে খেলা করে যায়। এই ড্যান্ডি প্রতিটি আধুনিক শিল্পীরই সত্তার পরিচায়ক বলে মনে করেছিলেন ব্যোদলেয়ার। উৎপলও যেন কবিতায় এভাবেই নিজেকে নির্মাণ করেন এবং সমাজের দিকে এগিয়ে চলেন। "কত না নৈকট্যবোধে দূরত্ব বজায় রাখি, বুঝে দ্যাখো।" (১৬ নং কবিতা/পিয়া মন ভাবে)—এ পঙ্‌ক্তি সেই অভিমুখের প্রতিই ইশারা করে।

দৈনন্দিন সামাজিক পরিসরে নেমে এসে কবি লক্ষ করেন,এ প্রজন্মের মানুষের মধ্যে যে সমস্যাটি প্রধান হয়ে উঠেছে তা হল সংযোগহীনতার সমস্যা, পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতার সমস্যা। এক আশ্চর্য বিনষ্ট প্রজন্মের প্রতিনিধি হয়ে কবি দেখতে পান—

> "... চেনামুখ, তবু কাঁটাতারে ঘেরা
> আন্তর্জাতিক ভূমি, যার গায়ে দিন নেই, রাত্রি নেই
> সাবান ফেনায় মাখা কাঠচাঁপা ফুলগুলি ঝরে পড়ে সামান্য বাতাসে,
> উঠোনপ্রান্তিক দেশে এ-ভাবেই মুক্তি হবে আমাদের:" ('বিজলীবালা'/লোচনদাস কারিগর)

যাবতীয় চেনামুখ ক্রমে পতিত জমি হয়ে যায়। আন্তর্জাতিকতার ছোঁয়ায় পৃথক হয়ে যায় মানুষ আর ডাক্তার—কেউ কারো ভাষা বোঝে নে, মুখ চেনে না। চেতনার আড়ালে থাকা আদিম অনুষঙ্গে ফিরতে চান কবি—"আমাকে জঙ্গল বলো, ডাকো রেলস্টেশনের ভুলে যাওয়া নামে" (ঐ)। কিন্তু সে প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। দেখা যায়—

> "ঘুম আর বোঝাপড়ার মাঝখানে ধ্বনিবহুল ধানক্ষেত, সঙ্গীতময় সরীসৃপ আর
> দাদাকে জিজ্ঞেস করি সাহেবগঞ্জ কত দূর" ('বৌভাত'/খণ্ডবৈচিত্র্যের দিন)

ব্যক্তিগত আর সামাজিকের সীমারেখার মাঝে এসে দাঁড়ায় 'ধ্বনিবহুল ধানক্ষেত', 'সঙ্গীতময় সরীসৃপ'-এর মতো আপাত-অসম্ভব অস্তিত্ব। স্বপ্নের মতো এই অসংলগ্ন জগৎ ক্রমে প্রকাশ করে এক আবিল দ্বন্দ্বের অভিমুখ—

> "—চলেছি স্বাজাত্যবোধে, ভাত খেতে, লুচি-মাংস খেতে
> —এমনকি কুঁদুলে নেপাল চুপে, আলপথে, সঙ্গে চলেছে—তার নিমন্ত্রণ নাই" (ঐ)

'সঙ্গীতময় সরীসৃপ'-এর মতোই আশ্চর্য আবেশ এই অনৃতমদির 'নিমন্ত্রণ-লিপি'-র—যা মানুষকে কেবল বস্তুসমাকলনে পর্যবসিত করে দেয়। 'ছেঁড়া খবরকাগজ' আর 'তোমাদের হৃদয়বত্তা নেড়ে' কোনো তফাৎ দেখেন না কবি, দেখা যায় শুধু "আতসবাজির মর্মে উড্ডীন আঁধার।"('পুরী সিরিজ: ১' / পুরী সিরিজ) কবি অনুভব করেন, "অপার আমার স্বপ্নে অসম্ভব বাণিজ্য চলেছে"—

> "এখন তোমাদের মুখ চামচের মতন উজ্জ্বল
> তোমার বিনষ্টমুখে রুধিরের বিসস্বাদী ডৌল

টলায় নাবিক, পণ্য, কফি, নুন, কস্তুরী, গন্ধক,
নাকছাবিটির হীরা— এত বস্তুগত সবই!" (ঐ)

রোদের আঙুল শুধু 'গরাদের ক্রমপরম্পরা'য় নেমে আসে—আর ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর বৃত্তে ঘিরে আসা সেই 'গরাদের স্তব্ধ ছায়া'-র থেকে মুক্তি পেতে কবির 'মস্তিষ্ক, নেশা, চৈতন্য, সমাধি' 'মাল্যবান পাহাড়ের ব্যাকুল লাক্ষাবনে' চলে যায় 'পাদ্রীদের, সন্ন্যাসিনীদের হাতে'। আফিম কিংবা জলের শব্দে যে দেবতার আশীর্বাদ খুঁজে পান কবি, তা তাঁর মগ্নচৈতন্যের তীব্র মুক্তিকামনাসঞ্জাত বোধ—"অখিল শুশ্রূষা এই লাবণি লাবণ্যরাশি এই জল, এই প্রতিকার"(ঐ)। সুররিয়ালিস্ট কবিদের মতোই মৃত্যুকে তিনি এই অসহ্য পণ্যসংস্কৃতি থেকে মুক্তির অন্যতম বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করেন—"Surrealism at all times seemed to offer suicide as one alternative"[১৩]—

"মৃতের করুণ বাহু আপনার মাথায় রেখেছ
মৃত্যুই তোমার ঘরে শব্দময়, কোলাহলরত
মৃত্যুই তোমার ঘরে বসন্তের অদ্ভুত স্ফূলিঙ্গ
জ্বালায় বারংবার।" (ঐ)

আবার কখনো এই পলায়নবাদিতার বিপরীতে দাঁড়িয়ে 'ধ্বনিবহুল ধানক্ষেত'-এর স্নিগ্ধতায় কবির আকাঙ্ক্ষা জাগে— "কোথাও রয়েছে এই সমাজমেঘের মুখোমুখি ছিঁড়ে আসা বিকেলের আলো, ঐ তপ্ত/ উঠোনের চারপাশে কড়াই বসেছে যেন ধুন্ধুমার জংশন পার হয়ে সাবেকি আগুনে/ পুরনো দিনের কয়লা জ্বলমান, ছাঁটা মাটির আড়ালে, ধুলো-খালে, খনির আঁধারে ('বৌভাত'/ঐ) এ বিকেলের আলো যেন এক 'collective unconscious'-এর উদ্ভাস— প্রজন্মান্তরের স্মৃতিবাহী হয়ে আসে এই আলো। 'ধুন্ধুমার জংশন' যেন এই জটপাকানো বর্তমান, যা পেরিয়ে অবচেতন সত্তা চলে যায় সেই দিনে যেখানে 'সাবেকি আগুনে পুরনো কয়লা জ্বলমান'। আসলে এ আগুন জ্বলে পুরনো মানুষের মনে— যারা কর্মসূত্রে পৃথক হয়েও মনে ছিল একাত্ম, এক 'তপ্ত উঠোনের' অধিকারী ছিল তারা—হৃদয়ের উষ্ণতাই ছিল যাদের সম্পদ। কিন্তু সে দিন ফেলে এগিয়ে এসেছে মানুষ অনেকদূর। যদিও কবির আকাঙ্ক্ষা 'আমাদের লৌকিকতা শেষ হোক', তবু তিনি জানেন—"এখন আকাশে দশটা আঙুল জ্বলে। বসুধারা জ্বলে।/ ঘুম পায়। নিমন্ত্রণলিপি শুধু— তার চেয়ে কে আর জাগ্রত!" (ঐ) মানুষের একাত্মতা জ্বলে-পুড়ে যায় শুধু। তবু কবির চেষ্টা থাকে শেষ পর্যন্ত মানুষে-মানুষে বিভেদের অন্ত হোক।

"উদ্বেল আখের বনে, বার্লিক্ষেতে, যবের কিনারে,
তরঙ্গশাসিত তটে, কাপ্তানের বাইনাকুলারে,
শত্রুজাহাজে, পণ্যে, অন্ধকারে গুপ্ত আর্মাডায়
হে সূর্য, আলোকবিন্দু, একই সঙ্গে প্রসারিত করো
তোমার জ্যোতির থাবা—ক্ষুধা ও চুম্বন।" ('ফেরীঘাট'/ঐ)

কবি চান সূর্য যেন 'কুয়াশালীন, খিন্ন প্রাণীর মর্মে' পৌঁছে দেয় ভাষা। 'ক্ষুধা ও চুম্বনের' আলো প্রতিটি মানুষের উপরেই সমানভাবে পড়ুক, এই হয়ে ওঠে কবির শেষতম আকাঙ্ক্ষা।

এক বিনষ্ট, বিক্ষত সময়ের সন্তান উৎপলকুমার বসু তাঁর সমসময়কে উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন অন্তরাত্মায়। সেজন্যেই তাঁর সুনিবিড় আত্ম-অন্বেষণের উদ্যোগ— যা তাঁকে নিয়ে যায় পরাবাস্তববাদী কবিদের কাছাকাছি। সমকালীন বাস্তবতার কেন্দ্রে অবস্থানের জন্যে পরাবাস্তববাদী কবিদের নিজেদের অস্তিত্ব, তার মৌল ধর্ম সম্বন্ধে নিগূঢ় সচেতন হয়ে উঠতে হয়। কিন্তু সেই জ্ঞানলাভের উৎস বাহ্য জগৎ নয়, কবির নিজেরই

অবচেতনা। নিজের স্বরূপ অনুধাবন করে কবি প্রসারিত হয়ে যান সমাজকে, সময়কে চেনার, জানার প্রচেষ্টায়— ব্যষ্টি থেকে সমষ্টির দিকে। ওয়ালেস ফাউলি বলেছিলেন, পরাবাস্তববাদীদের মতে সৎ কবিতা সেটিই যা মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য ক্রিয়াশীল প্রতিটি প্রচেষ্টার অংশ হয়ে ওঠে। একজন কবি যেহেতু সাধারণ জীবনচর্যারই অঙ্গ, প্রতিটি মানুষের জীবনের সঙ্গেই তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকেন, তাই তাঁর কবিতার উদ্দেশ্য হবে মানুষে মানুষে বিভেদের অবসান ঘটানো। পরাবাস্তববাদীদের বিবেচনায় কবিতা হল মানুষের বিশুদ্ধতা সম্পাদনের সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। সুররিয়ালিজম যদি জ্ঞানের উৎস হিসেবে বিবেচিত হয় তাহলে তার প্রধান কর্তব্য মানুষের বিবেককে জাগিয়ে তোলা, আর কবির কর্তব্য আত্ম-সচেতনতা থেকে অন্য-সচেতনতায় যাত্রা, এবং সকল মানুষের সম্মিলন ঘটানোর প্রচেষ্টা করা—"Knowledge of self will lead to knowledge of all men and from there to the union of all men."[১৪] বস্তুত, আত্মজ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে ব্যষ্টি-সমষ্টির আপাত-বিভেদের অবসান ঘটিয়ে এক সম্মিলিত মানবসমাজের নির্মাণ, যেখানে প্রতিটি মানুষ একে-অপরের জন্য দায়বদ্ধ— সুররিয়ালিজমের এই যে লক্ষ্য, তাকে অর্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং অসামর্থ্যজনিত অসহায়তার বোধই আত্মসমীক্ষণের প্রয়াসের উপজাত ফসল। উৎপলকুমার বসুর কবিতায় এভাবেই পরাবাস্তববাদ ওতপ্রোতভাবে লিপ্ত হয়ে থাকে, এবং এই লিপ্ততাই তাঁর কবিতায় আত্মসমীক্ষণাত্মক প্রয়াসটিকে বিশিষ্টতায় সার্থক করে তোলে।

তথ্যসূত্র:

১. চক্রবর্তী, সুব্রত। 'উৎপলকুমার বসুর কবিতা'।, গৌতম মণ্ডল সম্পাদিত। 'আদম', একবিংশ বর্ষ, মে ২০১৬, পৃ. ২২০।

২. Fowlie, Wallace, Age of Surrealism, The Swallow Press and William Morrow and co. INC, USA, 1950, p. 20.

৩. গোস্বামী, জয়। 'অন্তর্হিত সিংহ ও বাদুড়ের খোঁজ'। গৌতম মণ্ডল সম্পাদিত, তদেব, পৃ. ২৩৩।

৪. বিশ্বাস, শৈলেন্দ্র (সংকলিত)। 'সংসদ বাঙ্গালা অভিধান', সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ৬৬৯।

৫. সাক্ষাৎকার ২, গৌতম মণ্ডল সম্পাদিত, তদেব, পৃ. ১৬৬।

৬. ঐ, পৃ. ১৭০

৭. Finneran, Richard J., The Collected Poems of W. B. Yeats, Revised 2nd Ed., Scribner Paperback Poetry, New York, 1996, p. 187

৮. ভট্টাচার্য, তপোধীর। ভট্টাচার্য, স্বপ্না। 'জীবনানন্দ ও পরাবাস্তব'। অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ১৭৯।

৯. Fowlie, Wallace, ibid, p. 117.

১০. Ibid, p. 117.

১১. বসু, বুদ্ধদেব। 'কবিতা সংগ্রহ: চতুর্থ খণ্ড'। দে'জ, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ১৯৮।

১২. Fowlie, Wallace, ibid, p. 37.

১৩. Ibid, p. 24.

১৪. Ibid, p. 139.

আকর গ্রন্থ:

১. বসু, উৎপলকুমার। 'কবিতা সংগ্রহ'। ২য় পরিবর্ধিত সং। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৬।

২. বসু, উৎপলকুমার। 'কবিতা সংগ্রহ ২'। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৭।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1469-1476
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.368

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের ‘গোত্রহীন’: প্রতিবাদে, প্রতিরোধে

ড. সুভাষ মণ্ডল, *স্বাধীন গবেষক, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 21.03.2026; Accepted: 24.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In the period following the Partition, some infiltrators entered India. However, their arrival was not always a source of happiness; rather, it often brought disruption and turmoil to human lives. The playwright Rudraprasad Sengupta's play *Gotrohin* (1973) is no exception and reflects this very idea. Into the family of the central character, Salek Ahmed Khan, enter intruders such as Enayet and Nilu, who are relatives of his wife Zainab. In reality, they come to India from Chittagong, Bangladesh, in search of work and financial stability.

However, their arrival casts a shadow of disaster over Salek Ahmed Khan's family. Due to his experiences working at the docks, Salek does not easily trust people. Yet, paradoxically, he places blind trust in Enayet and Nilu, and like a tragic hero under the control of fate, his life moves toward a sorrowful end. Nilu, while being sheltered in their home, falls in love with Shaheen, which Salek cannot accept. In trying to separate Nilu from Shaheen, cracks begin to appear in the mutual trust within his own family.

Despite his efforts to reclaim his "honour and rightful dignity," the protesting Salek fails. Ultimately, centering on the issue of illegal entry into India, Salek informs the police, which leads to conflict with Enayet. In the ensuing confrontation, Salek is killed at Enayet's hands.

Through this narrative, the playwright seeks to portray how the intrusion of displaced individuals can lead to the deterioration of interpersonal relationships, thereby endangering the harmony of a well-structured family life.

Keywords: Rudraprasad Sengupta, *Gotrohin*, Drama, Family, India

নাট্যকার রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত (জ. ১৯৩৫) অভিনেতা, পরিচালক, নাট্যকার এমন একাধিক পরিচয়ে তিনি পরিচিত। যদিও তাঁর রচিত নাটকের অধিকাংশই বিদেশি নাটকের রূপান্তর। তিনি জন্মগ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায়। তবে নাট্যপ্রাণ এই মানুষটি ১৯৬১ সালে ‘নান্দীকার’ নাট্যগোষ্ঠীতে যুক্ত হয়েছেন। ১৯৭০ সালে এই নাটগোষ্ঠীতে নাট্যপরিচালক রূপে কাজ করেন। যদিও তিনি পরিচালক রূপে কাজ করেছেন প্রথম ‘আন্তিগোনে’ নাটকের মধ্যে দিয়ে। তবে বেশি করে নাটক মঞ্চস্থ করবার অভিপ্রায়ে তিনি ভালো নাটকের সন্ধান করে গেছেন। কারণ যে নাটক অভিনয় হবে তা হবে মূলত পেশাদারির মতো। তিনি এমন নাটক গ্রহণ করতে চেয়েছেন যেখানে নাটক আর্টিস্টিকালি চ্যালেঞ্জিং রূপে প্রতিভাত হবে, আর তার অভিনয়ে তথা প্রযোজনায় দর্শকদের চাহিদায় গ্রহণ যোগ্যতা থাকবে একাধিকবার। অন্যদিকে তিনি দেখতে পান মোহিত চট্টোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র প্রমুখের নাটক তখন অন্যত্র প্রযোজিত হচ্ছে, এই সময় তাঁদের দলের

প্রয়োজনে এমন কোনো নাট্যকারের সন্ধান করেছিলেন যার দ্বারা নাটক লেখা যেতে পারে। কিন্তু তেমন নাট্যকারের সন্ধান তিনি পাননি। এই কারণেই নাট্যকার রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত বিদেশি নাটকের দিকে ঝুঁকেছিলেন, এ বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি আরও জানিয়েছেন—

> "...অজিতেশ বেঁচে থাকতে এবং এখনো নান্দীকার এমন একটা থিয়েটার গ্রুপ যেটা প্রফেশনাল হতে চায়। যে প্রত্যেককে পে করে মানে মান্থলি বেসিস। খুবই কম হলেও মান্থলি বেসিসে পে করি আমরা। সে রকম একটা দল চালাতে গেলে যে কি করতে হয়, একি ভাবছে ওকি করছে ও কেন থাকছে না, ও কেন কম আসছে, আর সেগুলো আনফর্চুনেটলি অধিকাংশই আমার ওপরে এসে পড়ে। এইসবের ফলে আমি কখনোই সময় পাইনি, নাটক লেখবার। অবসর পাইনি। থিয়েটার প্রোডাকসন করতে গেলে আমি ফেল করে যেতেই পারি কিন্তু ওটা আমার কম্পালসন। নাটক লেখাটা আমার কাছে কম্পালসন হয়ে ওঠেনি..."[১]

সহজেই অনুভব করা যায়, থিয়েটারের সঙ্গে তিনি গভীরভাবে সম্পৃক্ত। আর এই কারণেই নাটক রচনার থেকে থিয়েটার তাঁর কাছে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। তবুও বিদেশি নাটকের রূপান্তরের মাধ্যমে তিনি তাঁর নাট্যপ্রতিভাকে সমুজ্জ্বল করেছেন।

থিয়েটারের প্রয়োজনে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত রচনা করেছেন যে নাটকগুলি, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— 'নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র' (১৯৬৭), 'ফুটবল' (১৯৬৭), 'ফেরিওয়ালার মৃত্যু' (১৯৬৯), 'গোত্রহীন' (১৯৭৩) প্রভৃতি। নাট্যকার রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত আমেরিকান নাট্যকার আর্থার মিলারের (১৯১৫-২০০৫) নাটক অবলম্বনে নির্মাণ করেছেন একাধিক নাটক। প্রসঙ্গক্রমে জানিয়ে রাখা ভালো, পাশ্চাত্য জগতের বিশেষ করে আমেরিকায় বিশ শতকের ত্রিশের দশকে এক অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। মূলত প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত উৎপাদন এই ধনতান্ত্রিক আমেরিকায় আর্থিক সংকটের পথকে প্রসারিত করে দেয়। ১৯২৯ সালে এই পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করে। দেখা যায় কলকারখানা বন্ধ হয়ে যুবকদের বেকারত্বের পরিস্থিতি তৈরি হয়। আর এই আর্থিক সংকটের অভিজ্ঞতার নিরিখে আর্থার মিলারের ভাবনাগুলি প্রতিফলিত হয়েছে— 'Death of a salesman' (১৯৪৯), এবং 'A view from the Bridge' (১৯৫৫)-এর মতো নাটকগুলিতে।

'ফেরিওয়ালার মৃত্যু' নাটকটি আমেরিকান নাট্যকার আর্থার মিলারের 'Death of a salesman' (১৯৪৯) অবলম্বনে নির্মিত। আর্থার মিলারের সেলস্‌ম্যান যেন কলকাতার ফেরিওয়ালা রূপে পরিগণিত হয়েছে। নাটকে ফেরিওয়ালা অমলকান্তির কাছে তার দেখা স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবতার দূরত্ব ক্রমশ বেড়ে গেছে। আসলে ফেরিওয়ালাদের স্বপ্ন দেখতে নেয়, দেখাতে হয় তা হয়তো অমলকান্তি ভুলে গেছে।

'গোত্রহীন' নাটকটিও আমেরিকান নাট্যকার আর্থার মিলারের লেখা 'A view from the Bridge' (১৯৫৫) অবলম্বনে রচিত। দেখা যায়, মূল নাটকে একজন সাধারণ শ্রমিকশ্রেণি মানুষের বিয়োগান্ত পরিণতি এই নাটকের মূল উপজীব্য। আইন বহির্ভূত অনুপ্রেবেশকারী Rodolpho-এর বিষয়ে নীরবতা আর বিধিভঙ্গের দায়ে মূল চরিত্র Eddie'-এর করুণ ট্র্যাজিক পরিণতি এই নাটকের আলোচ্য বিষয়। তবে 'গোত্রহীন' নাটকে নাট্যকার রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত দেখালেন Eddie-এর ভূমিকায় সালেক আহমেদ খানকে আর Rodolpho-এর ভূমিকায় নীলুকে, Catherine রূপে শাহীনকে, Manco রূপে এনায়েৎ আলি মনুকে। এইরূপে তিনি সকল চরিত্রগুলিকে পরিবর্তন করেছেন। প্রথমেই খোন্দকার মহম্মদ হারুণের মাধ্যমে নাটকের প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছে।

মূল নাটকের মতোই রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের 'গোত্রহীন' নাটকটিও দুটি অঙ্কের দ্বারা নির্মিত। নাটকের প্রথমেই দেখা যায় সালেক, স্ত্রী জয়নাব এবং শাহীনকে নিয়ে তাদের সুখীপরিবার। শাহীন ছিল জয়নাবের মরা বুইন নইলার মাইয়া। যে পরিবারের সদস্যরা কখনোই ভাবেনি একে অপরের প্রতি তারা কখনো বিমখু কিংবা অবিশ্বাসী হতে পারে। তাই এই পরিবারে অন্য কাউকে বিপদের সময় আশ্রয় দেওয়াতেও তারা কুণ্ঠিত হয়নি। কেননা বিপদ মানুষের যে কোনো সময়ে ঘটতে পারে। এই কারণেই হয়তো সালেক আশঙ্কা প্রকাশ করেছে এইরূপে—

> "এইখানে আমার কত বড়ো সম্মান! আইজ ভাইবতাছিলাম—ধরো, আমার আব্বাজান এই ইন্ডিয়ায় আসে নাই...আর আমি সেইখানে গেরামের আর পাঁচজন সমর্থ জোয়ানের মতো প্যাটে কিল দিয়া ঘুইরা ব্যাড়াই..."[২]

সত্যিইতো কর্মহীনরূপে মানুষের জীবন অতিবাহিত করা সম্ভব নয়। ভারতে বসবাস করে নিজের মতো করে সে তার পরিবারকে সুখী রাখতে পেরেছে। একজন শ্রমজীবী মানুষ রূপে স্বাভাবিক জীবন অতিবাহিত করতে পারলেই সে নিজেকে সুখী মনে করে।

আত্মীয়তার সূত্রে জামাই রূপে সালেক শাহীনের স্বপ্ন এবং তার জীবনের লক্ষ্য পূরণে সর্বদাই অবিচল থেকেছে। এই কারণেই কলিম স্ট্রিটে একটা বড়ো পাইপের কোম্পানিতে তিন হাজার টাকার বেতনে স্টেনোগ্রাফার রূপে শাহীন কাজ করতে চাইলে প্রাথমিকভাবে সালেক রাজি হয় না, যদিও এই কাজে পরবর্তীতে শাহীনের সেক্রেটারি হবার সম্ভাবনা রয়েছে তবুও সালেক তাকে লেখাপড়া শেষ করার কথা বলেছে। আসলে একজন শুভাকাঙ্ক্ষী অভিভাবকের মতোই সে চেয়েছিল—

> "আমি চাই তুমি খানদানি লোকেদের সঙ্গে মেশবা—ভালো জায়গায় ভালো অফিসে কাম করবা। এ্যাকটাই কথা—যদি এইখান থিকা চইলে যেতে চাও, যাও। কিন্তু এ্যাক নরক থিকা আর এ্যাক নরকে যেয়্যে পইচো না!"[৩]

তবে জীবনের অভিজ্ঞতায় মানুষের বিচিত্ররূপ সে ভালোভাবেই অনুভব করেছিল। এই কারণেই শাহীনকে বাইরের মানুষজন সম্পর্কে বলতে গিয়ে সালেক জানায়—

> "...সকল মানুষই মানুষ হয় না। হুঁশিয়ার না থাকলে লোকে তারে কাঁচা চিবাইবে! [শাহীনকে] কথাডা মনে রাখিস—যতো কম বিশ্বাস করবি, ততো কম দুঃখ পাবি।"[৪]

তবে এই কঠিন নিস্তরঙ্গ জীবনে যতটা সততার প্রয়োজন, সেটুকু তার ছিল। জাহাজের ডকে কাজ থাকলে সে কাজ পেতো। রোজগারের সবটুকুই সে বাড়ি নিয়ে আসতো। এইভাবেই সালেকের সাধারণ সুষ্ঠু জীবন অতিবাহিত হয়। আর এমন পরিবারেই জয়নাবের জ্ঞাতি ভাইয়েরা আসার পর থেকেই তাদের জীবনে নেমে আসে এক ট্র্যাজিক পরিণতি। সেখানে জীবনের নানা টানাপোড়েনে সমস্যা এসে উপস্থিত হয়। আসলে জয়নাবের খালাতো ভাইয়েরা বাংলাদেশের চট্টগ্রামের কোনো এক গ্রাম থেকে ভারতবর্ষে কর্মের উদ্দেশ্যে তাদের বাড়িতে আসে। তবে এই বাংলাদেশ থেকে কীভাবে মানুষ ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছে তা সালেক জানায়—

> "আপটু বটম কাপ্তান থিকা আমাগো তৌফিক পইর্যন্ত পয়সা খাওয়ানো আছে না!"[৫]

আসলে উদ্‌বাস্তু মানুষেরা কীভাবে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে তার প্রতি একটি ইঙ্গিত নাট্যকার এখানে প্রতিভাত করেছেন। সালেকের পরিবারে আসা জয়নাবের জ্ঞাতি ভাইদের মধ্যে এসেছিল বছর বত্রিশের চাষী এনায়েৎ আর সঙ্গে ছিল তার ভাই নীলু। নীলুর সম্পূর্ণ নাম ছিল হেদায়েৎ আলি নীলু। বেশি বেশি রোজগারের আশায়

এনায়েৎ ভারতবর্ষে পাঁচ-ছয়বছর থাকতে চেয়েছে। কেননা এনায়েৎ-এর পরিবারে আর্থিক সংস্থানের অভাবে তার স্ত্রী এবং তিন ছেলেকে অভুক্ত থাকতে হয়।

ভবিষ্যৎ-এর কথা যেমন কেউ জানতে পারে না, সালেকও তা জানতে পারেনি। সালেকের মতো একজন সাধারণ মানুষের জীবনেও যে ট্রাজেডির নায়কের মতো করুণ পরিণতি ঘনিয়ে আসবে তা সে কখনো ভাবতে পারেনি। আসলে এই শ্রেণির মানুষেরা কাজ করে, পরিবার প্রতিপালন করে, আড্ডা মারে, খায়, বুড়ো হয়, তারপর সে মরে যায়। কিন্তু সে দেখতে পায় তার ভবিষ্যৎ-এর এক অচেনা রূপ যা তার জীবনে ভয়াবহ বিপর্যয় বয়ে আনে। আর এই বিপর্যয় আসে এইরূপে যেখানে একজন অভিভাবকের মতোই শাহীনকে সে আগলে রাখতে চায়। কিন্তু অন্যদিকে সিনেমা হল থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় নীলুকে নিয়ে শাহীনের সময় অতিবাহিত করা মেনে নিতে পারে না সালেক। কেননা সালেক জানায়—

"এই পোলাডা ভালোই! তারে দ্যাখলেই আমার সারা শরীর গুলায়..."[৬]

আর এইখানেই শুরু হয় পরিবারকে বিপন্ন করে তোলার প্রাথমিক ধাপ। আসলে শাহীনের সঙ্গে নীলুর বিয়ের প্রস্তাবে সালেক রাজি নয়। কেননা এই ছেলের স্বাভাবিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে সে, এমনকি সকলে এই ছেলেকে নিয়ে ব্যঙ্গ করে বলে— 'চিটা গাঙের মেমসাহেব'। নীলুর আচার-আচরণ কিংবা তার ব্যবহার সবকিছুই সালেকের খারাপ লাগে। আবার একদিকে তার মাথার লম্বা চুলের জন্য নীলুকে সে যাত্রা দলের সখী বলে মনে করে তেমনি অন্যদিকে ডেকের ওপর নৃত্য সহকারে সংগীত করাটাকে সালেক খারাপ বলে মনে করে।

তবে সালেকের পরিবারে স্ত্রী জয়নাব নীলুর সঙ্গে শাহীনের বিয়েতে রাজি হয়েছে এবং সে ক্রমাগত চেষ্টা করে গেছে সালেককে বোঝাতে কিন্তু সে অভিভাবকত্বের দায়িত্ব নিয়ে যেন বলতে থাকে—

> "ঝামেলা তো কিছু করি নাই! কিন্তু তাইর অর্থ এই না—আমি চুপচাপ শুধু দেইখ্যে যাবো! সেই মালের জইন্য আমি ঐ মাইয়ারে বড়ো করি নাই!"[৭]

অন্যদিকে শাহীনও চেষ্টা করে সালেককে তাদের বিয়েতে রাজি করানোর জন্য, এমনকি নীলুকে দেখতে কিংবা সহ্য করতে না পাওয়ার প্রসঙ্গে শাহীন তাকে বোঝায় যে সালেক আসলে ভুল বুঝেছে। কেননা নীলু তাদের দুজনকে ইজ্জত দেয়। সালেক তার নিজস্ব সিদ্ধান্তে অনড় থাকে এবং নীলুর উদ্দেশ্য সম্পর্কে শাহীনকে মনে করিয়ে দেয় যে, লিগালি ইন্ডিয়ার সিটিজেন হবার অভিপ্রায়ে নীলু তাকে বিয়ে করতে চায়। নীলু যে তার জন্য উপযুক্ত নয় সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সালেক আরও জানায়—

> "প্রথম উপার্জন কইর‍্যাই সে একখান চকমইক্যা জ্যাকেট কেনছে, গাদা-গাদা ক্যাসেট কেনছে, এ্যাকখান ছুঁচলি জোতা কেনছে—ঐ দিকে তার ভাতিজারা যক্ষ্মায় মরে! তার মাথার মইধ্যে চৌরঙ্গীর আলো ঝলমলায়—সে হেরাফেরি করে! অরে তুই বিয়া করবি? বিয়ার পরে আবার তারে দ্যাখতে পাবি যেদিন সে তরে তালাক দিতে আসবে!"[৮]

আসলে তার মধ্যে দায়িত্ব কিংবা নিজেদের আর্থিক উন্নতি সম্পর্কে সে বাস্তাবানুগ নয়, খাম খেয়ালি স্বভাবের— এই সত্যটিকেই যেন প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

অন্যদিকে জয়নাবের পরামর্শে স্বাধীন এবং পূর্ণ নারীরূপে শাহীন সিদ্ধান্ত নেয়, সে নীলুকেই বিয়ে করবে। তার এই সিদ্ধান্তে সালেক উকিল হারুণের কাছে আসে, চেষ্টা করে আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমে শাহীন আর নীলুর মেলামেশা কিংবা বিয়ের সম্পর্ককে বাঁধা দিতে। যদিও হারুণ তাকে জানায়, একটা মেয়ে কোনো বিদেশির প্রেমে পড়লে—তাতে বে-আইনি কিছু ঘটে না। আসলে সালেকের মধ্যে কাজ করে ইগো, পরাজয় না মানার এক অদম্য জেদ। কেননা তার বাড়িতে আতিথ্য নেয় এমন এক ছেলে, যে তার অনুমতি না নিয়েই

শাহীনের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাবে পর্যন্ত চলে যায়। এই কারণেই নীলুকে শায়েস্তা করতে যে ব্যবস্থায় বা উপায়ে ইললিগাল রূপে এরা ভারতে প্রবেশ করেছে সেই উপায়কে হাতিয়ার করে থানায় কিংবা ইমিগ্রেশনে রিপোর্ট করার কথা সে ভাবে। সালেক মনে করে এই সম্পর্ক তথা সমস্যা থেকে বার হবার এটাই একমাত্র সমাধান। দেখা যায় শাহীনের মঙ্গল চিন্তায় সে যেন আরও বিপদ বাড়িয়ে তোলে। সমাজের কোনো প্রকার সমস্যায় না জড়িয়ে পড়ে তার জন্য সালেকের এই সিদ্ধান্ত দেখে আইনজীবী হারুণ তাকে জানাতে ভোলেনি—

> "...প্রইত্যেক মানুষ কাউরে ভালোবাসে—বিবিরে, নয়তো বাচ্চারে, নয়তো আরও কারে—কিন্তু কখনও কখনও সেই ভালোবাসা তার সীমা ছাড়ায়্যা যায়। তখন সেইটা যে দিকে গতি ন্যায়, সেইট্যা হওয়া উচিত না! বোঝলা কথাডা?"[৯]

নিজের অভিভাবকত্ব নিয়ে নিজেই যেন দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে সালেক, কেননা সন্তানের মতো স্নেহে বড়ো করে তোলা শাহীন যখন অন্যের কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছে, বিশেষ করে তার অপছন্দের মানুষের কাছে তাতে সে অপমানিত বোধ করেছে। সালেকের থানায় খবর দেওয়ার সিদ্ধান্তে হারুণ অনুধাবন করে ভবিষ্যত আসলে কোন পথে যেতে চলেছে—

> "হারুণ। এক একটা সময় আসে—যখন ইচ্ছা করে চিৎকার করে বলি, 'বিপদ বিপদ'! কিন্তু কি বিপদ—কারে বোঝাবো—কেমনে বোঝাবো?"[১০]

বলা যায় এই সূত্রকে অবলম্বন করে নাট্যঘটনা চূড়ান্ত পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। সালেক নিজেকে ঠিক রাখতে পারেনি, এই কারণেই হয়তো তার পরিবারের মেয়েকে প্রেম কিংবা বিয়ের কথা জানালে নীলু এবং তার দাদা এনায়েৎকে অপমান করে আর তাদের উদ্দেশ্যে সে জানায়—

> "সে যদি কাম-কাজ্যের জইন্যই আইসা থাকে, তয় সেইটাই মন দিয়া করুক! আর যদি ফুর্তি মারণের জন্য আসে—এনায়েৎ, আমি তো জানতাম তোমরা রোজগার করতে আইছো এই দ্যাশে—নিজের জইন্য, পরিবারের জইন্য—"[১১]

দ্বিতীয় অঙ্কে এই সমস্যা আরও প্রবলরূপে ধরা দেয়। নীলু আর শাহীনের সকলের অনুপস্থিতিতে সালেকের ঘরে একে অপরের সঙ্গে একাকী সময় যাপনকে ভালো চোখে দেখেনি সালেক, সে নীলুকে বাড়ি থেকে বার করে দেয়। নীলু শাহীনকে ভালোবাসে কিন্তু এই ভালোবাসা পেতে গিয়ে তাকে বারবার অপমানিত হতে হয়েছে। শাহীন বাংলাদেশের চট্টগ্রামে তাকে নিয়ে সংসার করার প্রসঙ্গ জানালে নীলু প্রধান সমস্যার কথাটি শাহীনের কাছে ব্যক্ত করে—

> "...তুমি ভাবো—যারে ভালোবাসি না, তারেও বিয়া করবো শুধু ইন্ডিয়ার সিটিজেন হওয়ার লালসে?... এ কি ইন্দ্রপুরী? ... শুধু সাধারণ সৎ মানুষের জইন্য কাজ নাই সেখানে। এই দেশে এ্যাখনও কাজ আছে—শুধু কাজের জইন্যই এইখানে থাকতে চাই আমি—কাজ!"[১২]

আসলে নীলু একপ্রকার বাধ্য হয়েই ভারতবর্ষে থাকতে চেয়েছে। কিন্তু যার বাড়িতে শাহীন বড়ো হয়ে উঠেছে তার প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ শাহীনের ছিল আর এই কারণেই সালেককে সে ভুলতে পারেনি—

> "...আমি যদি ওর কষ্টের কারণ হই—আমার যে বড়ো লজ্জা করবে! আমি যে চিরকাল ভেবেছি—আমার যেদিন বিয়ে হবে—উনি হৈ-হৈ করবেন...হাসতে হাসতে আশীর্বাদ করবেন....চোখে জল নিয়ে আমায় বিদায় দেবেন—আর আজ সর্বক্ষণ কি খারাপ খারাপ কথা—কি দুর্বহার..."[১৩]

সালেকের আদরে বড়ো হয়ে ওঠা এবং তার জীবনে এই মানুষটির যে কোনো স্থান নেই তা বলার সাহস শাহীন কখনো দেখায়নি। তবে পরিস্থিতির চাপে এবং সময়ের পরিসরে 'পরিপূর্ণ নারী' রূপে বুইন মাসির মতোই তাকে আঘাত দিয়েছে—

"জামাই! মেসো! ছেড়ে দাও! আমি খুন করে ফেলবো তোমাকে! ছেড়ে দাও ওকে—"[১৪]

শাহীনের এই কথাতে সালেক নিজেকে আর সামলাতে পারিনি, সে কষ্ট পায়। তবে যখন সবকিছু কাটিয়ে আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে, তাদের একত্র হওয়ার জন্য হারুণ সালেককে জানায় তদের আশীর্বাদ করার জন্য। তাকে আরও আশ্বস্ত করে হারুণ বলে—

> "সারা পৃথিবী তোমার দুষমন হয়্যে যাবে, সালেক! যারা তোমার মন বুঝে, তারাও মুখ ঘুরায়্যা নেবে! এ্যামনকি যারা এই এ্যাকই কষ্ট পায়, তারাও তোমারে ঘিন্না করবে!"[১৫]

আসলে সালেক তার 'হকের ইজ্জৎ' ফিরে পেতে চেয়েছে। সকল প্রকার বিবাদ মিটিয়ে বিয়েতে জয়নাব তাদের আশীর্বাদ দেওয়ার জন্য সালেককে রাজি করাতে চাইলেও, সে নিজের ইগোর লড়াইয়ে থানায় ফোন করে দুইজন অনুপ্রেবেশকারীর সম্পর্কে অভিযোগ জানায়। যারা বসবাস করে ৪৩ নম্বর পুরোনো মসজিদ স্ট্রিটে। সালেকের বাড়িতে পুলিশ আসে আর তাদের গেপ্তার করে। এই অবস্থায় এনায়েৎ-দের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে, আর এই ভয়ানক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জয়নাব পুলিশদের উদ্দেশ্যে জানায়—

> "খোদার কসম—তারা কার পাকা ধানে মই দিছে? —কি চান তাদের থিকা? এইটা বোঝেন না—তারা সেইখানে না খাইয়া মরে! এনায়েৎ... মনু..."[১৬]

এনায়েৎ দিশেহারা হয়ে পড়ে কেননা তার পরিবার অভুক্ত থাকবে, এই কারণেই সালেকের উপর তার ক্রোধ চেপে যায়। একে অপরের প্রতি প্রতিহিংসায় মেতে ওঠে। সালেকের উদ্দেশ্যে এনায়েৎ বলতে থাকে—

> "সেই লোকটা বেইমান! সেই বেইমান আমার তিনটা পোলারে খুন করছে! সেই বেইমান আমার বাচ্চাদের মুখের ভাত ছিনায় নিছে!"[১৭]

যে এনায়েৎ কখনো খুন কিংবা দাঙ্গা করেনি তার মাথাতে খুনের নেশা চেপে ধরে। আবার শাহীনের বিয়ের অনুষ্ঠানের দিনে জয়নাব যেতে চাইলে সালেক তার ইগোর লড়াইয়ে তাকে যেতে নিষেধ করে। এমনকি সে যদিও জোর-পূর্বক যায় তার জন্য সালেক স্ত্রী জয়নাবের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করে দেবার কথা জানায়। সালেক তার 'হকের ইজ্জৎ' ফিরে পেতে, তারা সকলে এসে তার কাছে মাফ চাইবে এটা সে আশা করেছিল। এই কারণেই শাহীন রেগে তাকে জানাতে ভোলেনি— 'এ্যাকটা চুকলিখোর— চুহা'। এইরূপে অকৃতজ্ঞ হয়ে শাহীন আরও জানায় যে সালেকের স্থান নাকি আস্তাকুঁড়ে কিংবা পচা নর্দমায়। যদিও স্বামীর উদ্দেশ্যে বলা শাহীনের এইকথাগুলি শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে পারেনি জয়নাব আর এই কারণেই সে জানায় যা কিছু ঘটেছে এই দায় সকলের। আসলে এনায়েৎ সারা মহল্লার সামনে সালেককে বেইমান কিংবা তার বাচ্চাগো-জল্লাদ বলাতে সালেক তা ভালোভাবে নেয়নি, ক্রমশ তারা একে অপরের দুষমনি হয়ে ওঠে।

নীলু সবকিছু ভুলে একে অপরের মধ্যে মিল করার চেষ্টা করেছে, এমনকি সালেকের কাছে মাফ চেয়ে নিয়েছে। তবুও সালেক নিজের ইগো কিংবা জেদের কাছে হার না মেনে তার জীবনকে বিপন্ন করে তোলে। কারণ পরাজয় না মানার অদম্য জেদকে অনড় রেখেছে তার বলা এই কথাগুলির মধ্যে দিয়ে—

> "আমি—এই মানুষটা—আমি তার মাথায় ছাত দিছি, নিজের গেরাস তার মুখে তুইল্যা দিচ্ছি, নিজের গেরাস তার মুখে তুইল্যা দিচ্ছি? কোরাণে তো সেইটাই কয়। জীবনে চিনি নাই যে মানুষেরে...আমার ঘরের মেজেতে পাও রাইখ্যা সিটিজেন হবার লোভে কচি ম্যাইয়াডারে

> ফুসল্যয়্যা লয়? এইটা এ্যাট্টা পরিবার ছিলো না?—এইটা কি রাণ্ডিখানা ছিলো?—আমারে জিগাইলাও না? আর বদলিতে আমিই এ্যাখন কাঠগড়ায়?"[১৮]

এই ভাবনায় যেন তাকে অবিচল করে তোলে, সালেক এনায়েতের লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত সালেকের মৃত্যু হয়।

আসলে জীবনের কিছু সত্যকে সালেক মানতে চায়নি আর এই কারণেই হয়তো তার জীবনে নিয়তি যেন মৃত্যু এনে দেয়। এই সত্যটি প্রসঙ্গে তাই হারুণ জানায়—

> "আজকাল আমরা অর্ধেকটা পেলেই খুশি মানি, প্রয়োজনে বাকি অর্ধেক ছেড়ে দিই। কিন্তু যা সত্য—সে'তো পাক পবিত্র। এবং যদিও জানি কতো বড়ো অন্যায় সে করেছিলো, কত অর্থহীন তার এই মৃত্যু—তবুও যখনই তার কথা স্মরণে আসে, আমি কাঁপি। অবাক হয়ে ভাবি, বিকৃতি কি করে এত পবিত্র এত সরল হতে পারে! সেই জন্যই হয়তো আমার আর পাঁচজন বুঝদার মক্কেলের চেয়ে চিরকালই চুপি চুপি ওকে আমি বেশি ভালোবাসবো।"[১৯]

নাটকটিতে বাংলাদেশ-ভারতবর্ষের বিশেষ করে খিদিরপুর পোর্ট অঞ্চলের পরিবেশ ও প্রেক্ষাপট বিদ্যমান, যা মূল নাটক থেকে পৃথক করেছে। নাটকে দেখি এক সামাজিক অবক্ষয়ের ছবি। নীলুকে ভালোবাসার জন্য কন্যাসমা শাহীনের জামাই তথা মেসো সালেকের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব যা তাদের পারিবারিক সম্পর্কে জটিলতা সৃষ্টি করেছে। আসলে উদ্‌বাস্তু কিছু অনুপ্রবেশকারীর জন্য তাদের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে নেমে আসে এক অমোঘ নিয়তি, যার পরিণাম হয়েছে ভয়াবহ। তবে নাট্যকারের এমন নির্মাণশৈলী প্রসঙ্গে আলোচক কুন্তল মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন—

> "রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত অবিভাজিত কমিউনিস্ট পার্টির কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সম্পাদক ছিলেন। বাঙালি জীবনে বাস্তুহারা-উদ্বাস্তু সমস্যা তাঁর পরিচিত। কলকাতার নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের দৈনন্দিন জীবনের কলহ-দ্বন্দ্ব-প্রেম-প্রীতির মধ্যেই তিনি বড় হয়ে উঠেছেন। ৭০-এর দশকের নকশাল মুক্তিসংগ্রাম এবং মুক্তি-যুদ্ধ-এর অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ তিনি। সাম্প্রতিক অতীতের অবক্ষয় আজ পর্যন্ত বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের হাল-হকিকৎ সবই তাঁর জানা।"[২০]

এই অভিজ্ঞতার রসদেই তাঁর নাট্যভাবনায় প্রতিফলিত হয়েছে কলকাতার নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন সমস্যা, অর্থনৈতিক সংকট ও জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে বেঁচে থাকার অভীপ্সা। এমনকি তার সঙ্গে রয়েছে হতাশা আর অবসাদের গ্লানি।

তথ্যসূত্র:

১। সেনগুপ্ত, রুদ্রপ্রসাদ। "রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত: সুমন মুখোপাধ্যায়" (সুমন মুখোপাধ্যায়কে প্রদত্ত সাক্ষাৎকার)। 'নাটক সমগ্র প্রথম খণ্ড'। সপ্তর্ষি প্রকাশন, ডিসেম্বর ২০০২, শ্রীরামপুর, পৃ. ৩৬৮।
২. সেনগুপ্ত, রুদ্রপ্রসাদ। 'নাটক সমগ্র প্রথম খণ্ড'। সপ্তর্ষি প্রকাশন, ডিসেম্বর ২০০২, শ্রীরামপুর, পৃ. ২৬৪।
৩. তদেব, পৃ. ২৬৬।
৪. তদেব, পৃ. ২৬৭।
৫. তদেব, পৃ. ২৬৯।
৬. তদেব, পৃ. ২৭৭।
৭. তদেব, পৃ. ২৭৮।
৮. তদেব, পৃ. ২৮১।

৯. তদেব, পৃ. ২৮৭।
১০. তদেব, পৃ. ২৮৮।
১১. তদেব, পৃ. ২৯১।
১২. তদেব, পৃ. ২৯৬।
১৩. তদেব, পৃ. ২৯৭।
১৪. তদেব, পৃ. ২৯৯।
১৫. তদেব, পৃ. ৩০১।
১৬. তদেব, পৃ. ৩০৮।
১৭. তদেব, পৃ. ৩০৯।
১৮. তদেব, পৃ. ৩১৪।
১৯. তদেব, পৃ. ৩১৫।
২০. মুখোপাধ্যায়, কুন্তল। দ্র. রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের 'নাটক সমগ্র প্রথম খণ্ড'। সপ্তর্ষি প্রকাশন, ডিসেম্বর ২০০২ শ্রীরামপুর, পৃ. ৩২৭।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1477-1488
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.369

মহাশ্বেতা দেবীর নির্বাচিত ছোটোগল্প: নারীর অস্তিত্ব রক্ষার সংকট ও সংগ্রাম

সোমনাথ চ্যাটার্জী, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.03.2026; Accepted: 24.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

It is from the inquiry into life itself that the human crisis and struggle for survival begin. Since literature serves as the verbal expression of society, it naturally reflects the domestic and familial aspects of people's daily lives. In the works of the writer Mahasweta Devi (1926–2016), women forge a vital link—within their specific socio-economic and cultural contexts— between their own individual identities and the environments they inhabit. Their very modes of existence are invariably shaped by the various forms of social discrimination and prejudice prevalent in society. Through an analysis of five selected short stories— 'Giribala', 'Sanjh Sakaler Ma', 'Bayen', 'Dhauli', and 'Rudali'— this study explores and illustrates the diverse manifestations of women's crises and struggles for survival.

keywords: Existence, Social Power, Prestige, Crisis, Struggle, Self-realization

মানুষ তার জীবনযাত্রার সংগ্রামে অফুরন্ত পরিশ্রম করে চলেছে। তার এই পরিশ্রম "জীবিকার তাড়না ও জীবনের তাগিদ"[১]– এই দুইয়ের সমন্বিত অবস্থানের জন্য। জীবনে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করেছে ও নিজের মানব প্রকৃতিকেও পরিবর্তিত করে চলেছে। আর এই মানব সমাজে নারী তার গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। তবে তার অবস্থান সমাজে প্রকৃতপক্ষে কতটা হওয়া উচিত, তা নিয়ে মতপার্থক্য দেখা গেছে। 'মনুসংহিতা'-য় বলা হয়েছে যে: "পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে/ রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।।"[২] (৯/৩) জীবনের প্রত্যেক অবস্থায় নারীকে পরনির্ভর হতে দেখা যাচ্ছে। নারীকে কুমারী জীবনে বাবা, স্বামী যৌবনে ও পুত্রের দ্বারা বার্ধক্যে রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। 'ন স্বাতন্ত্র্যমর্হতি'- কথাটির মধ্যে মানুষ ও তার পারিপার্শ্বিকের অন্তহীন পরিণামের ইঙ্গিত থেকে গেছে। ছোটোগল্পকার মহাশ্বেতা দেবীর (১৯২৬-২০১৬) ছোটোগল্পে নারী অসংখ্য অবরুদ্ধ অবস্থানের মাঝে দাঁড়িয়েও নিজের পথ খুঁজে নিতে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়েছে। নির্বাচিত 'গিরিবালা', 'সাঁঝ সকালের মা', 'বাঁয়েন', 'ধৌলী' ও 'রুদালী'- এই পাঁচটি ছোটোগল্পে সমাজ সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন রূপের সঙ্গে নারীর মান-সম্মান, জ্বালা-যন্ত্রণা, দুঃখ-আর্তি অর্থাৎ বেঁচে থাকার অদম্য ইচ্ছে পরিলক্ষিত হয়েছে। নারী মা রূপে, স্ত্রী রূপে নিজের সন্তানটিকে যেমন বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছে, তেমনই তার নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে চেয়েছে। গল্পগুলিতে নারীর অস্তিত্বের সংকটও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। সামাজিক সত্তা হিসেবে সেও যে একজন মানুষ, তারও যে ইচ্ছে-অনিচ্ছা, ভালোলাগা-মন্দলাগা থাকতে পারে, তা 'বাঁয়েন', 'ধৌলী', 'রুদালী'-র মতো গল্পগুলির ভেতর দিয়ে

উঠে এসেছে। "কেননা সংগ্রাম কখনো ফুরায় না।"[৩]- নারীর অস্তিত্ব রক্ষার সংকট ও সংগ্রামের ভিন্ন ভিন্ন রূপ নির্বাচিত গল্পগুলিতে আলোচনা করে দেখানো হয়েছে।

'গিরিবালা' গল্পে দেখা গেছে যে, নারীর আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রটি ভালোভাবে না দাঁড়ানো থাকলে তাকে প্রতিমুহূর্তে হতে হয় লাঞ্ছিত, প্রতারিত। "সবাই নিশ্চিত হল যে আউলচাঁদ নয়, গিরিবালা মেয়েটি আসলে মন্দ।"[৪] গিরিবালা মেয়েটিকে গ্রামের মানুষেরা সন্দেহ করেছে। শুধু সন্দেহ নয়, তার চরিত্র নিয়ে কথা উঠেছে। তার বড় মেয়ে বেলারানি ও ছোটো মেয়ে পরিবালা দুজনেই বিক্রি হয়ে গেছে। মেয়ে পাচারের কারবারে নিযুক্ত মোহন আউলচাঁদের (গিরিবালার স্বামী) মেয়ে দুটিকে পাচার করেছে। "মুর্শিদাবাদ জেলায় সর্বত্র চলছে কারবার। এসে কয়েকশো টাকা দেয়। . . . থানা পুলিশ ছেঁড়া মামলা নেবে না। বলে দেবে, বাপ মেয়ের বিয়ে দিলে থানা কি করবে?"[৫] এত সবকিছুর পরেও যে টাউনে গিরিবালা তার ছোটো মেয়ে মরুনিকে নিয়ে চলে যায়, সেই টাউনেই পরি নিখোঁজ হয়েছে। পাচার সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের কাছে আলোচনা না করে ও কাউকে না জানিয়ে চলে যাওয়া- ঘটনা দুটি গ্রামবাসীদের কাছে অস্বাভাবিক ঠেকেছে। সেজন্য তারা গিরির নামেই নিন্দে করেছে। গিরি মেয়েটিই আসলে 'মন্দ'। আসলে প্রত্যেক গল্পে জন্মের একটা সত্য থাকে। একটা বিশেষ মুহূর্ত তৈরি করে গল্পকার চেষ্টা করেন তাঁর দার্শনিকবোধকে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে। গিরিবালা মেয়েটি কেমন ও তার চরিত্রে 'মন্দে'র দোষ লাগার কারণটি খুবই বৈপরীত্যে ভরা। চার কুড়ি টাকা পণ দিয়ে আউলচাঁদ গিরিবালাকে তার স্ত্রী রূপে এনেছে। গিরিবালার বয়স তখন ছিল চোদ্দ বছর। আনার পর স্বামীর দিনরাত সহযোগী হয়ে নিজেদের একটা টিনের ঘর তুলতে পেরেছিল। মেয়েটি ভারি 'কাজ পাগল'[৬] বটে। কাজও খুব 'পরিষ্কার'[৭]। গিরি খুব ব্যক্তিত্বেরও অধিকারী। কেঁদে কেটে গিরি তার বাপের কাছে কিছু পয়সা আর এক মন চাল আদায় করে নিতে পারত, কিন্তু সে তা করেনি। নিশিন্দা সাব-পোস্ট অফিসের পিয়ন বংশী ধামালি গিরিকে বহরমপুরের কোনো এক ডাক্তারের বাড়িতে কাজ দেবার কথা বললে গিরির সবকিছু 'স্বপ্ন' ও 'অলীক' বলে মনে হয়েছে। "ঘর হচ্ছে, জমিও হতে পারে। স্বামী তার অত্যন্ত বাউন্ডুলে তা সে জানে। তবুও স্বামীর উপর অপার মমতা হচ্ছিল তার।"[৮] পতিভক্তি গিরির বরাবর আছে। অবশ্য তার স্বামী আউলচাঁদ গিরির চুলের মুঠি ধরে 'এই মারে তো সেই মারে'।[৯] তবু স্বামীর উপর তার অগাধ আস্থা আছে। সেজন্যই তো আউলচাঁদ যখন তার বড় মেয়ে বেলারানির বিয়ের কথা তুলেছে, তখন গিরি ছেলের খোঁজ করতে বলে পরিবালাকে নিয়ে বাপের বাড়ি ঘুরতে গেছে। এমনকি বড় মেয়েকে বিক্রি করে দেওয়ার পরেও সে তার স্বামীর মুখের উপর কোনো জবাব দিতে পারেনি। গিরির প্রতিক্রিয়া:

> "গিরি দেয়ালে ঠেস দিয়ে চুপ করে থাকে। চোখ বুজে থাকে সে। বড় দুঃখে তার মনে সত্যি কথার ঝিলিক জাগে...।"[১০]

গিরির 'দেয়ালে ঠেস' দিয়ে চুপ করে বসে থাকাটা তার অসহায়তাকে তুলে ধরেছে। মেয়েসন্তানকে নিয়ে গ্রামবাসীরা এত ভাবতে চায়নি। তাদের কাছে এ যেন অদৃষ্টের লিখন। গিরিবালার লিখন এখানেই যে, সে অসহায়! কিন্তু সে তো বাপের বাড়ির আদর পেয়েছে। খুব খাওয়া ও খুব যত্নও পেয়েছে। "একটু আরামেই যেন স্বর্গসুখ পাচ্ছিল সে।"[১১] আসলে গিরি তার সন্তানদের ভালো চেয়েছে। সে মেয়েদের ভালো ঘরে বিয়ে দেওয়া ও ছেলেমেয়ে যাতে শহরের স্কুলে পড়াশোনা করতে পারে সেই স্বপ্ন দেখেছে, কিন্তু তার এই স্বপ্ন বারবার স্বামী নামে আইডিয়ল মানুষটিকে ঘিরেই থেকেছে। সে বুঝতে পেরেছে তার স্বামী "বাউণ্ডুলে"[১২]। বাবা হয়েও সে তার মেয়েকে "বিয়ের ভুজুং"[১৩] করে চালান করেছে। তবু গিরি পরিস্থিতিকে মেনে নিয়েছে। গিরি শুধু নিজের জীবন নয়। তার ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে তাদের অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল করে

তুলতে চেয়েছে। কারণ দারিদ্র্য তার বেষ্টনী। আর এসবের মাঝে থেকে গেছে সামাজিক বচন। গিরি এই বচন পেয়েছে সমাজ অভ্যন্তরে বসবাস করেই। সমাজে থেকে সমাজকে অস্বীকার করতে পারেনি গিরিবালা।

দু-দুটো মেয়েকে পাচার করে আউলচাঁদ যে টাকা পেয়েছে, সেই টাকা দিয়ে গিরি মনের মতো করে ঘর তুলেছে। "গিরি তার দিকে নির্নিমেষে চেয়ে থাকে। চেয়েই থেকে। আউল চাঁদ মনে মনে বোঝে, যত দুঃখ পাক ঘরটি নিশ্চয়ই মনে ধরেছে।"[১৪] ঘরের দিকে চেয়ে চেয়ে থাকা গিরি সংযোগ রচনা করতে চেয়েছে। সে বুঝতে পেরেছে যে, তার বাপের কাছ থেকে বাঁশ নিয়ে ঘর তুললে হয়তো মেয়েদের আজ এই পরিস্থিতি হত না। সামাজিক বচনের ঘেরাটোপে না আটকে থাকলে সে বেলারানি ও পরিবালাকেও রক্ষা করে রাখতে পারত। গিরি থেমে থাকেনি। সবাই "অবাক"[১৫] হয়ে দেখেছে যে, গিরিবালা ভোর রাতে মেয়ে মরুনিকে কোলে নিয়ে রাজীবের (গিরির নিজের ছেলে) হাত ধরে টাউনে চলে গেছে। গিরিবালা গর্জে উঠতে পারেনি সামাজিক বচনের বিরুদ্ধে। তবে তার টাউনে চলে যাওয়া এক তীব্র কষাঘাত। যাবার আগে সে বংশী ধামালিকে বলে গেছে যে, পরির বাবাকে বলে দিতে যে, সে যেন তার ঘরে "জন্ম জন্ম"[১৬] বাস করে। "গিরি টাউনে ঝি খাটবে, ছেলেমেয়েকে মানুষ করবে।"[১৭] গিরির এই প্রতিবাদ তার একার। সমস্ত গ্রামবাসী তার আচরণের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছে। একথা জেনে সবাই অবাক হয়ে গেছে। "বেলা আর পরির যা হয়েছে, সে তো এখন ঘরে ঘরে হচ্ছে। তা বলে স্বামী ছেড়ে চলে যায় কে? কোন্ মেয়েছেলে ?"[১৮] এই 'মেয়েছেলে' শব্দবন্ধনটি পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতায়নের দিকটিকে মেলে ধরেছে। বেলা ও পরির পাচার কারবার গ্রামের মানুষ মেনে নিয়েছে। সামাজিক বচনের চক্রব্যূহ থেকে গিরি বাইরে বেরিয়ে আসতে পারলেও কথাকার চক্রপথে নারীর ঐতিহ্যলালিত সংস্কারকে মেনে নিয়েছেন। তবে এই সংস্কৃতির মধ্যে থেকেও গিরির একক সংগ্রাম তার অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামকে সূচিত করেছে। "আইবুড়ো মেয়ে বাপের সম্পত্তি।"[১৯] না, গিরিবালা সে। এটাই তার পরিচয়। সে আর আউলচাঁদের স্ত্রী নয়। গ্রামের সামান্য মেয়ে নয়। গিরির যাত্রা তার আত্মসম্মানের পরিচয়কে মেলে ধরেছে। "তবু সে হেঁটে চলল।"[২০] তাকে হাঁটতেই হবে, হয়েছেও। প্রকৃত প্রস্তুতি নিয়েই গল্পকার হেঁটেছেন তাঁর লিখনশৈলীর উপর ভর দিয়ে। এই লিখন গ্রামের মেয়ে গিরিকে 'গিরিবালা' করে তুলেছে।

"আমি বাঁয়েন লই গো, বাঁয়েন লই!"[২১]- 'বাঁয়েন' গল্পের এই বাক্যের কাতরতা দিগন্তব্যাপী। এই বাঁয়েনকে পোড়ানো যায় না। তাকে মারা যায় না। তাকে মেরে ফেললে গ্রামের ছেলেপিলে বাঁচে না। তার চলাফেরাটাও গণ্ডীবদ্ধ। মানুষের যুক্তিবোধ যেখানে এসে থমকে দাঁড়ায়, সেখান থেকেই শুরু হয় অলৌকিক জগতের যাত্রাপথ। তা পুরোপুরি অদৃশ্য। বাঁয়েনের এই উক্তি তার স্বভাবের দিকটিকে তুলে ধরেছে। সে নিজেও জানে যে, তার দৃষ্টি বড়ই "ক্ষুধিত।"[২২] তার ছায়াতেও ছোটো ছেলের শরীরে "ক্ষতি"[২৩] হয়ে যায়। সেজন্যই তো মলিন্দরের ছেলে ভগীরথ মজা বিলের ধারে তার কাছে নিস্তব্ধ দুপুরে গিয়ে কথা বলতে চাইলে বাঁয়েন নিজেই তা বারণ করেছে। "...বাঁয়েনের ধারে কুনদিন আসবে না...।"[২৪] এই যে বাঁয়েনের আত্মোপলব্ধি সেটা সংস্কৃতি নির্মিত বয়ান, যে বয়ান মানুষকে তার নিজের সম্বন্ধে সমাজের কাছে প্রতিনিয়তই পরিচিত করে চলে। আর এখানেই পাঠক চিত্তকে হোঁচট খেতে হয়েছে। বাঁয়েনের নিজেকে বারবার 'বাঁয়েন' না বলা, অন্যদিকে ভগীরথের কাছে নিজেকেই 'বাঁয়েন' রূপে সম্বোধন করা-এই দু'য়ের বৈপরীত্যে গল্পকাহিনি দ্বন্দ্বমুখর পরিস্থিতি তৈরি করেছে। বাঁয়েনের নিজের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়াস গল্পের ছত্রে ছত্রে ধরা পড়েছে। মলিন্দর অঞ্চলের শ্মশানের শিক্ষিত ডোম। নাম সই করতে পারে। মহকুমার লাশ ঘরে বিয়াল্লিশ টাকা মাইনের কাজ পেয়েছে। গোটা মানুষের হাড় নয়তো খুলি চুন আর ব্লিচিং পাউডার দিয়ে পচিয়ে বের করে। হবু ডাক্তারদের কাছে খুলি হাড়-কঙ্কাল মোটা লাভে বেচে দেয়। পাড়ার সে "সম্মানী"[২৫] মানুষ। বহু বছর

আগে ভগীরথের বাবা মলিন্দরের এক জ্ঞাতি বোনকে নিয়ে তার স্ত্রী চন্ডী শীতলাতলায় পুজো দিতে গেলে সে বোন মারা যায়। এই ঘটনাটি চন্ডীকে 'বাঁয়েন' রূপে চেনাতে শুরু করেছিল। এই চন্ডীকেই মলিন্দর নিজে ঢোল পিটিয়ে পিটিয়ে "বাঁয়েন হয়্যাছে"[২৬] বলে চিৎকার করে ঘোষণা করেছিল। চণ্ডীর এই 'বাঁয়েন' হবার পেছনে দায়ী থেকেছে তার বংশের পিতৃপুরুষের কাজ! এই কাজ তাদের বংশের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িয়ে থেকেছে। তারা বংশগত কাঁচা ভাগাড়ের কাজ করত। পাঁচ বছরের নিচে যে সমস্ত শিশু মরে তাদেরকে উত্তর বিলের ধারে বটগাছ তলায় পুঁতে দেওয়া হত। সেই ভাগাড়েই চন্ডীর বাবা খন্ত দিয়ে গর্ত খুঁড়ত, কাটা গাছ দিয়ে গর্ত ঢেকে রাখত, যাতে শিয়াল উৎপাত না করে। তার বাবার এই পেশা মেয়ে হয়েও চন্ডী গ্রহণ করেছিল:

> "...কিন্তু মরাকে কি কেউ বাড়িতে ধরে রাখে, না রাখতে পারে? তার সৎকার করাটা তো চন্ডীর কাজ। ওর জীবিকা। এতে ভয়ের কী আছে, নিষ্ঠুরতাই বা কি?"[২৭]

এই চন্ডীকেই মলিন্দর বিয়ে করেছিল। তবে চন্ডীর সংসারে মন টিকত না। কারণ সেই মানুষটির বংশের একজন হয়ে চণ্ডী তার জাতকর্ম ছাড়তে চায়নি। চণ্ডীর এই আর্থিক স্বনির্ভরতা তার বংশগত ঐতিহ্যকে বহন করেছে। সে স্বনির্ভর হতে চেয়েছে। "গঙ্গাপুত্র"[২৮] বলে পরিচিত হলেও সে পূর্বপুরুষের কাজের মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে খুঁজে পেয়েছে। কেননা তারা যে আদিম যুগের "শ্মশানের দাস।"[২৯] পূর্বপুরুষদের সেই কাজকে চন্ডী বহন করে নিয়ে যেতে চেয়েছে। এমনকি পুত্র ভগীরথের প্রতি তার মমত্ববোধ এসবের মধ্যেও অটুট থেকেছিল:

> "যদি বটতলায় বেশি সময় থাকতে হয়, ওর বুকে দুধ টনটন করে। মুখ নিচু করে ও গর্ত খোঁড়ে ও বাপকে মনে মনে দোষ দেয়। মেয়েকে কেন সে এই নিষ্ঠুর কাজে ব্রতী করে গেল?"[৩০]

অর্থাৎ বংশপুরুষের ঐতিহ্যপ্রসূত কাজ ও তার ছেলের প্রতি বাৎসল্যবোধ তাকে প্রতিনিয়ত পীড়া দিয়েছে। বাপের কাজকে 'নিষ্ঠুর' (নিজেই বলেছে) বলা তার মনকেও দ্বিধাগ্রস্ত করেছে। সত্তার এই দ্বিমুখীনতায় তার মন হয়েছে ক্লান্ত। বংশগত পেশা ও সন্তান বাৎসল্য- এই দু'ইয়ের দ্বন্দ্বে চণ্ডীর অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। গ্রামীণ সমাজের নিজের তৈরি সংবিধানকে সে উপেক্ষা করতে পারে না, করেনি। তবু যথাপ্রাপ্ত স্থিতাবস্থাকে অটুট রাখার জন্য তার নিরন্তর প্রয়াস চলেছে।

তবু গ্রামবাসীদের কথা শুনে ও নিজের উপর বাঁয়েনের অপবাদ শুনে সে এই কাজ ছাড়তে চেয়েছিল। "পিতৃপুরুষের শাপ মোকে লাগুক, ডর করি না। উ কাজ ছেড়ে দিলাম আজ হতে।"[৩১] তবে শেষ রক্ষা হয়নি। তাকে 'বাঁয়েন' রূপেই চেনানো হয়েছে। এই 'বাঁয়েন'ই প্রমাণ করেছে যে সে 'বাঁয়েন' নয়। সে সাধারণ এক গ্রাম্য নারী। রেললাইনের উপর বাঁশ সরাতে গিয়ে তার মৃত্যু ঘটেছে। গল্পকার প্রশ্ন তুলেছেন: "ও যদি বাঁয়েন হয় তো ওর পোষা অন্ধকারের দানবগুলো এসে এ ট্রেনটাকে থামিয়ে দিচ্ছে না কেন? সমাজ তো এই পারে।"[৩২] এই প্রথম সে বুঝতে পেরেছে যে, সে বাঁয়েন নয়। রক্ত মাংসের সাধারণ মানুষ। তার ক্ষমতা নেই লাইনের নিজের 'পোষা অন্ধকারের দানবগুলোকে' ডেকে এনে লাইনের উপর থেকে বাঁশ তুলে ফেলা, যাতে করে রেলের যাত্রীদের কোনো ক্ষতি না হয়। রেললাইন থেকে বাঁশ তুলে সে প্রমাণ করেছে সে সাধারণ মানুষ। তার মৃত্যু ঘটেছে। রেল কোম্পানি 'বাঁয়েনকে' এই কাজের জন্য মেডেল দিতে গেলে গ্রামাঞ্চলের মানুষ তাকে "জ্ঞাতি"[৩৩] বলে সম্বোধন করেছে। এই প্রথম সে জ্ঞাতি লোকের কাছ থেকে সম্মান পেয়েছে! না, তার এই সম্মান তার জাতির সম্মান। তার কাজের প্রতি সম্মান করা নয়। কেননা রেল কোম্পানি তাকে মেডেল দেওয়ার আগে পর্যন্ত নিজের জ্ঞাতির কাছ থেকে কোনোরকম সম্মান সে পায়নি।

তবু একথাটা অস্বীকার করা যায় না যে, সমাজের সদস্যদের চণ্ডীকে 'জ্ঞাতি' সম্মানে গ্রহণ করার মধ্যে সে অর্জন করে নিতে পেরেছে তার নিজের জীবনের অর্থ। তার মানবিক কাজ তাকে সামাজিক সম্পর্কের চিরাচরিত কাঠামোয় এনে দিয়েছে। মায়ের ইতিহাস পরম্পরার পেশাকেই পুত্র ভগীরথ দুহাত তুলে সম্মান দিয়েছে। শুধুমাত্র পিতৃপরিচয়ে আবদ্ধ না থেকে ভগীরথ মা চণ্ডীর পরিচয়ে বাঁচতে চেয়েছে: "...মা ঈশ্বর চণ্ডী গঙ্গাদাসী.....।"[৩৪] সমাজ প্রদত্ত পিতৃপরিচয়ের সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে এসে মায়ের পরিচয়ে পরিচিত হতে চাওয়া এই গল্প হল চণ্ডীর আত্মকথার একটি লিখিত সংবিধান। চণ্ডীর সামাজিক সত্তা পুত্র সকলকে বুঝিয়েছে। এখানেই চণ্ডীর সংগ্রাম সমাজের সঙ্গে, নিজের সঙ্গেও। তার এই সংগ্রাম পুত্রের চরিত্রে অঙ্গীভূত হয়েছে।

'সাঁঝ-সকালের মা' গল্পে জটির অস্তিত্ব তার বংশের কাজের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। একটু আগেই 'বাঁয়েন' গল্পে দেখেছি যে, চণ্ডী তার জাতকর্মকে আঁকড়ে থাকতে চেয়েছে, কিন্তু পারেনি। নিজের কুল থেকে বেরিয়ে আসতে তাকে হারাতে হয়েছিল তার আত্মপরিচয়। 'সাঁঝ-সকালের মা' গল্পে জটিরা পাখমারা সম্প্রদায়। তাদের সমাজ পাখি শিকার করে। তারা জরা ব্যাধের বংশধর। তারা "মহাপাপীর"[৩৫] সমাজ। স্বজাতেই তাদের বিয়ে করতে হয়। এটাই তাদের বিধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। তদের ধর্মানুসারে, জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই ওদের সমাজের প্রতিটি মেয়ের বিয়ে হয়ে যায় দেবতার সঙ্গে। দৈববাণীতে ওদেরকে সমাজ না ছাড়ার কথা ঘোষিত হয়েছিল। কেননা তারা শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে বাণ মেরেছিল। কুলের মধ্যে থেকেই তাদের সমাজের প্রতিটি মেয়ে নিজেদের অস্তিত্বকে চিনতে শিখেছে। কিন্তু জটি তার ছেলে সাধনকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত বলে গেছে তারা "জেতে বড়, অ্যানেক বড়।"[৩৬] জটির এই মন্তব্য ও তার নিজের জাতির পরিচয় দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থান করেছে। তামাটে রং, নীল চোখ, কটা চুলের অধিকারিণী জটিকে বিয়ে করেছে উৎসব কান্দোরী। উৎসব চিকন পাটি বোনে। সে মনে মনে জানে, তাদের জাত পাখমারাদের চেয়ে অনেক উঁচুতে। সে শহরে মজুর খাটতে যায়। সে জটিকে বলেছে: "এখন তুমি জাতে উঠেছ, শ্রেণী বদলিয়েছ।"[৩৭] উৎসব তাকে বলেছে কীভাবে জাতে উঠতে হয়। আর তার এই জাতে ওঠার বিষয়টি জটির দুঃখের কারণ হয়েছে। তার সমাজ তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। জটির আশংকা সত্যি হয়েছে। "চিরঅভিশপ্ত ওরা, ঈশ্বরকে যারা হত্যা করে গোড়ালিতে বাণ মেরে, তাদের বুঝি ঘুরে ঘুরেই জীবন শেষ করতে হয়।"[৩৮] জটির ভাগ্যে সেটাই হয়েছে। তার স্বামী মরেছে। জটির ধারণা পিতামহীর বাণেই উৎসব মরেছে। সে বুঝেছে, তার বিয়ে করাটা ভগবান মেনে নেয়নি। "পাপ"[৩৯] হয়েছে। জটি যে উৎসবের হাত ধরে নিজের কুল পরিচয়কে অতিক্রম করতে চেয়েছে, তাতে তারই ক্ষতি হয়ে গেছে। তার এই ক্ষতি শুধু বিধাতার লিখন নয়। সত্তার গভীরে লুকিয়ে আছে তার ভাগ্যের চোরাবালির ইতিহাস। যা তার জন্মানোর মুহূর্তেই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। গল্পের বহুমাত্রিক অভিব্যক্তি প্রকাশ পেল জটি যখন অনেক রূপ, অনেক স্বাস্থ্য ও অনেক যৌবন নিয়ে সংসারের বাইরে পা বাড়িয়েছে। সমাজের সংকটদীর্ণ চেহারা বুঝেই বিজ্ঞের মতো এক সন্ন্যাসী জটিকে পরামর্শ দিয়েছে শুধু একখানা কাপড় ও লাল ত্রিশূল ধারণ করতে। সাংস্কৃতিক মানদণ্ডকে সন্ন্যাসী বেশ ভালোই বুঝেছে বলে সে জটিকে তার জীবন ধারণের উপায় বাতলে দিয়েছে। জটিও বুঝেছে যে, "ঠাকুরনি"[৪০] না হলে সে তার তিরিশ বছর বয়সি হাবাগোবা ছেলেকে বাঁচাতে পারত না। নিজেকেও বাঁচাতে পারত না মানুষের নজর থেকে। জটি তার সম্ভাব্য জটিল জীবনে ধর্মকেই ঘিরে ধরেছে। সে বুঝেছে যে, সাংস্কৃতিক প্রতাপ-ই পারে তার ছেলের জীবনকে বাঁচিয়ে রাখতে। সেজন্য সে ছেলের উদ্দেশে উচ্চারণ করেছে তার পরিকল্পিত বয়ান:

> "'মা বলে ডাক্যে না বাপ, বাপো আমার।'.... লা বাপো, খুব বিয়েনবেলা, সুয্যি না উঠতে মা বলে ডেকে লিবি। সুয্যি ডুবতে মা বলে ডাকবি।"[৪১]

নতুন এক আখ্যানের আকল্প সে হয়ে উঠতে পারত কিন্তু সময় তাকে হতে দেয়নি। সমাজ জীবনের নিরুচ্চার চিহ্নগুলিকে জটি তার অস্তিত্বের জন্য ধারণ করে নিলেও তাকে মৃত্যুপথযাত্রী হতে হয়েছে। আবার এখানেই সে জন্ম দিয়ে গেছে তার নতুন সামাজিক সত্তার: "সকলের মনে মহা কৌতূহল। সাধনের মাটির উঠোনে পাড়া-পড়শির ভিড়।"[৪২] সমাজের কাছে জটি এইসময়ে তার নতুন অভিধা প্রাপ্ত হয়েছে। সে তার উৎসব কান্দোরীর পরিচয় ত্যাগ করে জনমানসে 'ঠাকুরনি' হয়ে উঠেছে। চিরাচরিত অলৌকিকতাকে নিজের শরীরে ধারণ করার ফলে তার অস্তিত্ব সমাজ দিগন্তে প্রসারিত হয়েছে। তাই এত 'ভিড়'। যে জটিকে উৎসব জাতে তুলতে চেয়েছিল, সেই জটিই সংগ্রাম করেছে তার ছেলের জন্য। ফলে পূর্বনির্দিষ্ট কেন্দ্রীভূত প্রতাপের বিরুদ্ধে সে তার সংগ্রাম ছেলে সাধনের রক্তের ভেতরেও ছড়িয়ে দিতে পেরেছে। জটির শ্রাদ্ধ করতে দেওয়া চাল ব্রাহ্মণ নিতে চাইলেও তিরিশ বছরের হাবাগোবা ছেলেটি চেঁচিয়ে ওঠে: "ঘরে কানাকড়ি লাই যে চাল কিনে আধব।... চাল আমার!"[৪৩] এই চালেই সাধন তার মাকে খুঁজে নিতে চেয়েছে। পাখমারা সম্প্রদায়ের পরিসরে বন্দি না থেকে জটির ছেলেও সময় সচেতন হয়ে উঠেছে।

কথাকারের সৃষ্ট গল্পগুলিতে নারীর অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে। কারণ নারী তার আশেপাশে গড়ে ওঠা সমাজের সূক্ষ্ম বয়ানগুলিকে চিনতে শিখেছে। 'ধৌলী' ও 'রুদালী' ছোটোগল্প দুটি সেসবের দৃষ্টান্ত বহন করেছে। 'ধৌলী' গল্পের শুরুতেই ধৌলী পারশনাথের মুদির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে কারোর জন্যে অপেক্ষা করেছে। সে ভেবে পায় না ও "কী করবে।"[৪৪] নিশ্চয়ই এমন কিছু সংকেত দ্যোতিত হতে চলেছে, যা তার জীবনকে নাড়া দিয়েছে। কারণ তার মা পর্যন্ত সামাজিক বচনকে উপেক্ষা করে থাকতে পারেনি। তার সঙ্গে তার মায়ের কথোপকথনের কিছু অংশ নিম্নে তুলে ধরা হল:

"ধৌলী— তোহর গলৎ। স্বামী মরে যেতে শ্বশুরালে ফেলে রেখে দিতিস, যা হবার হত।
ধৌলীর মা— তারা কি রাখল? তুইও চলে এলি।
ধৌলী— ধরম রাখত না ভাশুর।
ধৌলীর মা— মিশ্রিলাল রাখল। ধৌলীর বুকে তির বেঁধে গেল।"[৪৫]

বোঝা যাচ্ছে যে, দুসাদের মেয়ে ধৌলি বিধবা। সে জন্মদুখীও বটে। কারণ শ্বশুর বাড়িতে তার জায়গা হয়নি। বরটা ভালো ছিল না। তাকে মারত। তার বাবাও জমিদারদের ধার শোধ করতে করতে মরে যায়। শৈশবে পিতা ও যৌবনে স্বামীর দ্বারা রক্ষা করার সামাজিক দায়িত্ব থেকে তাকে অব্যহতি দেওয়া হয়েছে। সে স্বাধীন! তার এই স্বাধীনতা তাকে নিয়ে গেছে তারই অস্তিত্বের কান্নায়। দারিদ্র্য, অনাহার আর হাড়ভাঙা খাটুনি এই হয়েছে তার জীবন। জীবনের শখ-আহ্লাদ থেকে হয়েছে সে বঞ্চিত। কারণ সে যে বিধবা। তাকে আয়নায় যে মুখ দেখতে নেই। গালার চুরি পরতে নেই। পরতে নেই কোনো সিঁদুরের ফোঁটা। যদিওবা সে এই বিধবা সমাজ অনুশাসনের দিকটি অবহেলা করে প্রেম করে বসেছে। শুধু প্রেম নয়, বিয়েও করেছে মিশ্র পরিবারের কর্তা বুরুডিহার হনুমান মিশ্রের ছেলে মিশ্রিলালকে। আর সেকারণেই তো সামাজিক প্রতাপ তার ছায়া ছাড়েনি। এই প্রতাপ তার মায়ের কণ্ঠেও ভেসে এসেছে। হনুমান মিশ্রের চোখে তার ছেলে বংশের "কলঙ্ক।"[৪৬] মিশ্রিলালের মায়ের মতেও সে "দোষ"[৪৭] করেছে ও "ব্রাহ্মণ দেওতার ঘর নষ্ট"[৪৮] করেছে। প্রতাপের এই কণ্ঠস্বরে নিমজ্জিত হয়েছে দুসাদদের সমাজও। যে কোনো সৃষ্টিশীল লেখক সমাজকে অস্বীকার করতে পারেন না। সমাজের বাস্তবতাকে অবলম্বন করেই থাকে তাঁর শিল্প নির্মাণ। দুসাদ সমাজ "নজর"[৪৯] রেখেছে তার উপর। কারণ সে স্ব সমাজের ছেলেদের আমল দেয়নি। সমাজের মতে, এক্ষেত্রে ধৌলী স্বেচ্ছায় এগিয়ে গেছে যা "অমার্জনীয় অপরাধ।"[৫০] "দুসাদ মেয়েকে ব্রাহ্মণের ছেলে কি এই প্রথম নষ্ট করল? গ্রাম সমাজের বিচারে সব দোষ ধৌলীর।"[৫১] এই সমাজ খুবই সংবেদনশীল! ব্রাহ্মণ সমাজ ও দুসাদ সমাজ তথা

তার নিজের সমাজ-এই দুই সমাজের কাছেই সে 'নষ্ট' ও 'অপরাধ' তার নিজের। দুই ভিন্ন সমাজ ব্যবস্থার গ্রহণ ও বর্জনের মধ্যে দিয়েও ধৌলী এগিয়েছে, যতটা তার এগোনোর কথা। সে আত্মহত্যার কথা ভেবেছে, কিন্তু পারেনি। "বেইমানের"[৫২] মুখ না দেখে সে আত্মহত্যা করতে চায়নি। হ্যাঁ, স্বামী নামের পাঠকল্পে সে আর আস্থা রাখতে চায়নি। কেননা মিশ্রিলাল এসেছে, তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আবার প্রতিশ্রুতি ভেঙে বিয়েও করেছে অন্য মেয়েকে। জীবন যখন যুদ্ধক্ষেত্র, সেখানে প্রতিটি স্তরে যুদ্ধের শেষ নেই। ধৌলী সে যুদ্ধ করেছে। যুদ্ধ করেছে সমাজের সঙ্গে। সে নিজে কাজ করে সমাজে বেঁচে থাকতে চেয়েছে। শুধুমাত্র ছেলের জন্য। কারণ সে বুঝেছে: "ও মরলে মাকে গ্রামসমাজ দেখবে কিন্তু বাচ্চাটা?"[৫৩] সম্ভাব্য উত্তরের আশায় সে পথ বাঁধতে চায়নি নিজের। সে বুঝেছে যে, সে মরলে তার মা পারলে তার ছেলেকে বাঁচাবে নয়তো সেও মরবে। বাক্যের এই উচ্চারণ আপতিক সিদ্ধান্ত নয়। এর সঙ্গে মিশে আছে অলিখিত সংবিধান। যে সংবিধানে সমাজে ছেলেকে তার পিতার পরিচয়ে পরিচিত করে তোলা হয়। ধৌলীর বাস্তববুদ্ধি ব্যাপ্ত হয়েছে নবজাগ্রত শিশুর মুক্তি চেতনায়। ধৌলী "রাণ্ডী"[৫৪] হয়েছে। সে বেঁচে থাকার পথ চিনেছে। পঞ্চায়েতের সভায় স্থির হয়েছে যে, তাকে গ্রাম থেকে বাইরে বের করে দিতে হবে। কারণ "গ্রামের বুকে বসে এত বড়ো অধর্ম সে চালাতে পারবে না।"[৫৫] সমাজ মতে, ব্রাহ্মণের ছেলের সঙ্গে কেলেঙ্কারি হয়েছে বলে তার 'পাপের' দায় ধৌলী নিজেই। ব্রাহ্মণ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় দুসাদের মেয়ে ধৌলী প্রান্তকায়িত হয়ে পড়েছে। অধঃপতিত বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে তাকে গ্রাম ছাড়া হতে হয়েছে। তবে অস্তিত্বকে চিন্তার কেন্দ্রে প্রতিস্থাপন করার ফলে তার ব্যক্তিসত্তা ও সামাজিক-সত্তার সূক্ষ্ম অনুরণন নিজস্ব গতিবেগ পেতে চেয়েছে। মিশ্রিলালের সঙ্গে তার কথোপকথনে এই ব্যক্তি সত্তার রূপটি ধরা পড়েছে:

"মিশ্রিলাল— তুই রাণ্ডী হয়েছিস?
ধৌলী— জরুর।
মিশ্রিলাল— কেন হলি?
ধৌলী— তুমি মজা লুটে পালালে। তোমার দাদা ভাতে মারল। তোমার ছেলেকে বাঁচাতে, ঔর নিজে বাঁচতে।
মিশ্রিলাল— এর চেয়ে তুই মরলি না কেন?
ধৌলী— মরতে গিয়েছিলাম। তারপর ভাবলাম, কেন মরব? তুমি সাদী করবে, দুকান চালাবে, দুলহনিয়া নিয়ে সিনেমা দেখবে, মরব আমি? কেন? কেন? কেন?"[৫৬]

রাণ্ডী হবার সত্তাকে সে স্বীকার করে নিয়েছে। তবে মিশ্রিলালের 'কেন হলি?' প্রশ্নের আধিপত্যবাদী দম্ভের কাছে সে নতি স্বীকার করতে চায়নি। এর এখানেই ধৌলী আলাদা হয়েছে। সে সংগ্রাম করেছে অনুশীলিত আগ্রাসী দম্ভের বিরুদ্ধে। সে মরবে না। কিছুতেই সে মরতে চায় না। তার সামগ্রিক অস্তিত্ব সমাজ সত্তার কাছে দায়বদ্ধ থেকেছে। 'কেন? কেন? কেন?'- তিনটি 'কেন'-র উচ্চারণ তার স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে চেয়েছে। সমাজ বাস্তবতা হল অস্তিত্ব হয়ে ওঠার যোগদানের একটি বিশেষ ধরণ। আমরা সমাজে কে, কীভাবে যোগ দিচ্ছি, তার উপর নির্ভর করেই জেগে ওঠে সামাজিক সত্তা। ব্যক্তির চেয়ে সমাজের শক্তির অনেক বেশি তা ধৌলী প্রমাণ করে দিয়েছে। নারী তার সংগ্রাম চালিয়েছে ব্রাহ্মণশাসিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। পিতৃতন্ত্রের পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে। নারী দেহের জৈবিক চিহ্নকে সে করে তুলেছে সামাজিক সত্তার মাধ্যম। গল্পকার ধৌলীর সংগ্রামকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন তার সামাজিক সত্তায়; "সবচেয়ে শক্তিমান তারা।"[৫৭]

"বাস, লাইন ধরিয়ে দিলাম, এখন লড়ে যা।"[৫৮]- এই লড়ে যাওয়ার কাহিনি হল 'রুদালী' ছোটোগল্প। মালিক মহাজন মরলে রুদালীরা আসে কাঁদতে। রুদালীদের এই কারবার পেশাদারী কারবার। এই

কারবারের জন্য বড় বড় শহরের পেশাদারী বেশ্যারা পর্যন্ত লড়ে যায়। জমিদার ভৈরব সিংয়ের মৃত্যুতে শনিচরী কেঁদেছে। তার সুনাম হয়েছে। ভৈরব সিংয়ের মৃত্যুযাত্রায় যারা কেঁদেছিল তাদের আনাটা যেন গল্পের অন্যান্য জমিদারদের "মান"[৫৯]-এর লড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছে। নাথুনি সিংয়ের মায়ের মৃত্যুতে তিরিশ হাজার টাকা খরচ করা হয়েছে। মরে গেলে ধুমধাম করে ক্রিয়ার কাজ করে তাদের 'মান' উঠবে। নাথুনের মেজো বউ তার বাপের মৃত্যুর পর দেখিয়ে দিতে চেয়েছে তাদের ধনগৌরব: "আমার বাপের দাহ ঔর কিরিয়া এমন হবে, যে গল্প রয়ে যাবে মুল্লুকে।"[৬০] জমিদারদের মান রক্ষার পালা এমন পর্যায়ে গেছে যে, গম্ভীর সিং তার নিজের চিকিৎসা করাতে চায়নি। তার গোমস্তার সঙ্গে কথা বলে রুদালী জানতে পেরেছে যে, গম্ভীর সিং শুক্লপক্ষে মরতে চায়। তার মতে, শুক্লপক্ষে মরলে "সিধে বৈকণ্ঠ"।[৬১] আর কৃষ্ণপক্ষে যুধিষ্ঠিরের মতো প্রথমে "নরক"[৬২] দর্শন তারপরে "স্বর্গ"[৬৩] বাস। তার বান্ধবী বিখনির মৃত্যুতেও শনিচরী শোকতপ্ত হয়েছে তবু কাঁদেনি। কারণ পয়সা, চাল, নতুন কাপড় না পেলে কাঁদাটা তার কাছে "বাজে বিলাসিতা।"[৬৪] দুলন বলেছে, রান্ডী ডেকে কাঁদানো এক মজার খেলা। মালিক মহাজনের টাকা "পাপের টাকা। তার রয় ক্ষয় নেই।"[৬৫] রুদালী পাপ-পুণ্যের হিসেব করতে গেলে দুলন তাকে অত পাপ-পুণ্য না বিচার করার কথা শুনিয়েছে। তার মতে, পাপ-পুণ্য "মালিকদের এক্তিয়ারের জিনিস। ওরাই সে হিসেবে ভাল বোঝে। তুই আমি বুঝি খিদের হিসাব।"[৬৬] পেটের হিসেব সবচেয়ে বড় হিসেব। শ্বাশুড়ি, ভাশুর, জা- এই তিনটে মৃত্যুর পর সে ব্যস্ত থেকে গেছে। কাঁদতে সে সময় পায়নি। এই ব্যস্ততা তার নিজের সংসারকে ধরে রাখার ব্যস্ততা। প্রত্যেক মৃত্যুর সময়কালীন ঘরের অবস্থা নিম্নে তুলে ধরা হল:

১) শাশুড়ির মৃত্যুর সময়: "ঘরে নেই এক খুঁচি গম। প্রায়শ্চিত্তের কড়ি আসবে কোত্থেকে?"[৬৭]

২) ভাশুর ও জায়ের মৃত্যুর সময়: তার গ্রামের মালিক মহাজন রামাবতার সিং। গ্রামের সংখ্যাগুরু দুসাদ ও গঞ্জুদের গ্রাম থেকে তাড়াবে বলে উঠে পড়ে লেগেছে। সেই ভয়ে শনিচরী কাঁটা হয়ে থাকতো। "কাঁদবে, না লাশ জ্বালাবার, সস্তায় শ্রাদ্ধ সারবার কথা ভাববে?"[৬৮]

৩) স্বামীর মৃত্যুর পর: স্বামীর শ্রাদ্ধ করতে গিয়ে শনিচরীকে ব্রাহ্মণ মোহনলালকে সন্তুষ্ট করতে হয়েছে কিছু দক্ষিণার বিনিময়ে। এর জন্য ধারে সে ক্ষেতে বেগার খাটার বিনিময়ে রামাবতার সিংয়ের কাছে কুড়ি টাকা ধার করেছে। সেবারেও সে কাঁদতে পায়নি।

৪) ছেলের মৃত্যুর সময়: সে এক বৈদ্যের কাছে গিয়েছে ওষুধ চাইতে। বৈদ্য তাকে 'ছোট জাত'[৬৯] বলে ওষুধ দেয়নি। ছেলের বউটাও পালিয়ে গিয়েছিল। বউমা পালাবার 'কেচ্ছা'[৭০] চাপা দিতে ছোটাছুটি করতে গিয়ে ছেলের জন্যও সে কাঁদতে সময় পায়নি।

আর্থ-সামাজিকভাবে মার খেতে খেতে তবেই না শনিচরী নেমেছে রোজগারের পথে। জমিদারদের মৃত্যুর পর কান্নার জন্য শনিচরী রুদালীর কাজ গ্রহণ করেছে। দুসাদ জাতের একজন ঘরের বধু শনিচরী নিজের পরিচয়কে সমাজের সামনে মেলে ধরেছে। সে নিজে গেছে শহরে রান্ডী জোগাড় করতে। শত শত বেশ্যারা তাকে "হুজরাইন"[৭১] বলে সম্মান জানিয়েছে। শুধু নিজের পরিচয় নয়। সে আরও শত শত রান্ডীর সম্মানকে ফিরিয়ে এনেছে। গম্ভীর সিংয়ের বাধা রান্ডী মোতিয়া। তার মেয়ে গুলবদনকে বিয়ে দেবার কথা বলেছিল গম্ভীর সিং। কিন্তু দেখা গেছে, তার ভাতিজা সেই কথা শোনেনি। ভাতিজার নিজের মায়ের মৃত্যুর পর সে গুলবদনকে বলেছিল, "রান্ডীর মেয়ে তোর ভাতের অভাব কি ?"[৭২] সেই গুলবদন গম্ভীর সিংয়ের মৃত্যুতে তার চোখ "বিশ্রী"[৭৩]ভাবে মটকে ভাতিজার দিকে চেয়ে হেসেছে। নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার গুলবদনের যে এই দীর্ঘ সংকল্প তার নিজের আর্থিক স্বনির্ভরতার ফলে এসেছে। এই লড়াই এক গৃহবধূর, একজন স্ত্রীর,

একজন মায়ের, একজন দিদার। এতসবকিছুর পরেও এই লড়াইটা নারীর অস্তিত্বের লড়াই। নিজেকে সমাজে বাঁচিয়ে রাখার লড়াই। গল্পে শনিচরী এই লড়াইকে বুকে বহন করে নিয়েছে। শনিচরী থেকে 'রুদালী' বনে যাবার পথে দেখা গেছে অসংখ্য কাঁটা থেকেছে। নিজের জন্য সে বেঁচে থাকতে চেয়েছে। জীবনের বেঁচে থাকার স্বাদ যে অগাধ ও বিশাল, সেই স্বাদ সে পেতে চেয়েছে। তার কণ্ঠস্বর ও কাজ নারী সমাজের স্বাতন্ত্র্য আবিষ্কারের প্রবেশ দরজা খুলে দিয়েছে।

দিন যত এগিয়েছে, ততই বেড়ে চলেছে শ্লীলতাহানির সংখ্যা। আর এই হানির প্রাণকেন্দ্রে স্থাপন করেছে মানুষের অসন্তুষ্ট জীবন-যাপন। নারীরা সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী। অথচ ঘটনা এমন ভাবে দেখানো হয়, যেন সবটাই প্রত্যাশিত। মাকে অপমান করা, গৃহবধূকে অপমান করা সবকিছুই যেন স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। জীবন জিজ্ঞাসা থেকেই শুরু হয় মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম। কষ্টে ভরা জীবন তবু চলতে থাকে। জীবনের প্রতিটি বাঁকে যশোদা, গিরিবালা, জটি, চণ্ডী, ধৌলী, শনিচরীরা অস্তিত্ব সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও পূর্ণতার জন্য সংগ্রাম চালিয়েছে। এই পূর্ণতা এসেছে তাদের আত্মোলব্ধির ফলে। 'গিরিবালা' গল্পে গিরিবালা প্রতিটি মুহূর্তে নিজেকে তৈরি করে নিতে চেয়েছে। গিরিবালার অস্তিত্ব স্বামী নামে প্রতাপের বিরুদ্ধে গিয়ে সমাজের সঙ্গে নিজের নতুন সম্পর্ক প্রতিস্থাপন করেছে। সামাজিক প্রতাপ ও ভাবাদর্শের সম্পর্ক যেহেতু পরস্পর সমান্তরাল অবস্থানে চলে, সেহেতু চন্ডীর মতো নারীকে সমাজের কাছে নিজের মানুষ পরিচয়কে তুলে ধরতে প্রমাণ দিতে হয়। আবার এ কথা সত্য যে, মানুষ থাকতেও এক বাঁয়েনকে মরে প্রমাণ করে করতে হল সে 'বাঁয়েন' নয়। একজন সাধারণ রক্ত মাংসের নারী। সাহিত্য মূলত সামাজিক উচ্চারণ হওয়াতে তাকে সমাজ সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না। সেজন্যই তো যে রক্ষণশীল ধর্মীয় সমাজ ধৌলীকে 'বেশ্যা' চিহ্নিত করেছে, সেই সমাজের চিহ্নই জটি 'ঠাকুরণি' রূপে বুকে ধারণ করেছে। 'সাঁঝ সকালের মা' ছোটোগল্পে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আঁকড়ে থেকেই জটি তার ছেলের ভবিষ্যৎ জীবনযাপনের পথ খুঁজে বের করে গেছে। জটি পিতৃপুরুষের পেশাগত পরম্পরাকেই অস্তিত্ব রক্ষার বাণে পরিণত করেছে। কথাকারের ছোটোগল্পে নারীরা সমাজের রুদ্ধ পরিসরকে ভেঙে ফেলার অনবরত সংগ্রাম করেছে।

তথ্যসূত্র:

১. হালদার, গোপাল। সংস্কৃতির বিশ্বরূপ। প্রকাশ ভবন, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ ভবন সংস্করণ ২০১৪, পৃ ১৯।

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র (অনুবাদক)। মনুসংহিতা। আনন্দ, কলকাতা, ৭০০০০৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৩, পৃ ২৪৮।

৩. দেবী, মহাশ্বেতা। রচনা সমগ্র (১১)। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, ৭০০০৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৪, পৃ ৫৪২।

৪. দেবী, মহাশ্বেতা। রচনা সমগ্র (১৩)। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, ৭০০০৭৩, পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ ৫২৮।

৫. তদেব, পৃ ৫২৩।

৬. তদেব, পৃ ৫১৯।

৭. তদেব, পৃ ৫১৯।

৮. তদেব, পৃ ৫২২।

৯. তদেব, পৃ ৫২০।
১০. তদেব, পৃ ৫২৩।
১১. তদেব, পৃ ৫২২।
১২. তদেব, পৃ ৫২২।
১৩. তদেব, পৃ ৫২৩।
১৪. তদেব, পৃ ৫২৮।
১৫. তদেব, পৃ ৫২৮।
১৬. তদেব, পৃ ৫২৮।
১৭. তদেব, পৃ ৫২৮।
১৮. তদেব, পৃ ৫২৮।
১৯. তদেব, পৃ ৫২৩।
২০. তদেব, পৃ ৫২৮।
২১. দেবী, মহাশ্বেতা। রচনা সমগ্র (৯)। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০৩, পৃ ৪২২।
২২. তদেব, পৃ ৪১৬।
২৩. তদেব, পৃ ৪২৪।
২৪. তদেব, পৃ ৪২৪।
২৫. তদেব, পৃ ৪১৭।
২৬. তদেব, পৃ ৪২৪।
২৭. তদেব, পৃ ৪২০।
২৮. তদেব, পৃ ৪১৯।
২৯. তদেব, পৃ ৪২০।
৩০. তদেব, পৃ ৪২১।
৩১. তদেব, পৃ ৪২১।
৩২. তদেব, পৃ ৪২৫।
৩৩. তদেব, পৃ ৪২৬।
৩৪. তদেব, পৃ ৪২৬।
৩৫. দেবী, মহাশ্বেতা। রচনা সমগ্র (৯)। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০৩, পৃ ৪৩৬।
৩৬. তদেব, পৃ ৪৩১।
৩৭. তদেব, পৃ ৪৩৭।
৩৮. তদেব, পৃ ৪৩৫।
৩৯. তদেব, পৃ ৪৩৯।
৪০. তদেব, পৃ ৪২৬।
৪১. তদেব, পৃ ৪২৭।
৪২. তদেব, পৃ ৪৩২।

৪৩. তদেব, পৃ ৪৪৩।
৪৪. দেবী, মহাশ্বেতা। রচনা সমগ্র (১০)। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, ৭০০০৭৩, পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ ৪০১।
৪৫. তদেব, পৃ ৪০৩।
৪৬. তদেব, পৃ ৪০৭।
৪৭. তদেব, পৃ ৪০৭।
৪৮. তদেব, পৃ ৪০৭।
৪৯. তদেব, পৃ ৪০৯।
৫০. তদেব, পৃ ৪০৭।
৫১. তদেব, পৃ ৪০৭।
৫২. তদেব, পৃ ৪০৩।
৫৩. তদেব, পৃ ৪১৪।
৫৪. তদেব, পৃ ৪১৭।
৫৫. তদেব, পৃ ৪১৭।
৫৬. তদেব, পৃ ৪১৬-৪১৭।
৫৭. তদেব, পৃ ৪১৭।
৫৮. তদেব, পৃ ৪২৯।
৫৯. তদেব, পৃ ৪২৯।
৬০. তদেব, পৃ ৪৩২।
৬১. তদেব, পৃ ৪৩৭।
৬২. তদেব, পৃ ৪৩৭।
৬৩. তদেব, পৃ ৪৩৭।
৬৪. তদেব, পৃ ৪৩৮।
৬৫. তদেব, পৃ ৪৩৯।
৬৬. তদেব, পৃ ৪৩৯।
৬৭. তদেব, পৃ ৪১৮।
৬৮. তদেব, পৃ ৪১৮।
৬৯. তদেব, পৃ ৪২১।
৭০. তদেব, পৃ ৪২১।
৭১. তদেব, পৃ ৪৪০।
৭২. তদেব, পৃ ৪৪০।
৭৩. তদেব, পৃ ৪৪০।

আকর গ্রন্থ:

১. দেবী, মহাশ্বেতা। রচনা সমগ্র (৯)। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০৩।

২. দেবী, মহাশ্বেতা। রচনা সমগ্র (১০)। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, ৭০০০৭৩, পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৫।
৩. দেবী, মহাশ্বেতা। রচনা সমগ্র (১৩)। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, ৭০০০৭৩, পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৫।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. হালদার, গোপাল। সংস্কৃতির বিশ্বরূপ। প্রকাশ ভবন, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ ভবন সংস্করণ ২০১৪।
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র (অনুবাদক)। মনুসংহিতা। আনন্দ, কলকাতা, ৭০০০০৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৩।
৩. দেবী, মহাশ্বেতা। রচনা সমগ্র (১১)। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, ৭০০০৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৪।

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1489-1501
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.370

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা দলিত সাহিত্য: একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক পাঠ

রাজা তালুকদার, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি, অসম, ভারত*

Received: 20.03.2026; Accepted: 21.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Post-independence Dalit literature in India emerged as a powerful voice of protest, identity, and social transformation. Rooted in the historical experiences of caste-based oppression, it reflects the lived realities of marginalized communities who were long excluded from mainstream literary and cultural spaces. After 1947, with the spread of education, democratic ideals, and constitutional rights, Dalits gradually gained the confidence to articulate their own stories, pain, and resistance. Dalit literature is not merely a literary expression but also a socio-political movement. It challenges the deep-rooted caste hierarchy, untouchability, and systemic discrimination prevalent in Indian society. Inspired largely by Dr. B.R. Ambedkar's ideology of equality, education, and self-respect, Dalit writers began to assert their identity and dignity through their works. They rejected upper-caste literary norms and instead focused on realism, directness, and authenticity. The movement first gained prominence in Marathi literature during the 1960s and later spread to other Indian languages, including Hindi, Tamil, Telugu, and Bengali. Dalit autobiographies, poems, short stories, and novels became significant forms through which writers expressed their struggles against poverty, humiliation, and social exclusion. In post-independent India, Dalit literature also became closely associated with political awakening and activism. It highlighted issues such as land rights, labour exploitation, gender discrimination, and violence against Dalits. Over time, it established itself as an important and independent literary tradition, giving voice to the voiceless and reshaping Indian literature by bringing marginalized perspectives to the forefront.

Keywords: Dalit, Bengal, Independence, Movement, Literature

বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগ শুরু হওয়ার আগে প্রাচীন ও মধ্যযুগ বলে যে দুটি সাহিত্য পর্ব ছিল সেখানে অন্ত্যজ, ও অস্পৃশ্যরা থাকলেও তারা কখনোই কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে ওঠেনি। তারা যেন প্রান্তিক থেকে গিয়েছিল। চর্যাপদের কিছু পদে কিংবা মঙ্গলকাব্যের আখ্যানভাগে শ্রমজীবী মানুষের কথা এলেও তা ছিল সীমিত ও পরোক্ষ। বিশ শতকে এসে সাহিত্যে প্রান্তিক মানুষের জীবন আরও স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হতে থাকে। যদিও সেসময় জাতিগত প্রশ্ন সবসময় মুখ্য হয়ে ওঠেনি; বরং লেখকদের দৃষ্টি বেশি ছিল শ্রমজীবী ও নিপীড়িত মানুষের সামগ্রিক দুঃখকষ্টের প্রতি। সমাজের জাতিভিত্তিক বিভাজনে যারা উপেক্ষিত, তাদের কথা ধীরে ধীরে সাহিত্যে স্থান পেতে শুরু করে বিশ শতকের প্রথমার্ধে। গত পঞ্চাশ বছর ধরে দলিত সাহিত্যের যে উপস্থিতি

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা দিয়েছে তা বাংলায় বিশেষ দেখা যায়নি। উপস্থিতি বলতে বোঝাতে চাইছি ছাপার মাধ্যমে প্রকাশিত, সংকলিত,আর তারপর বিভিন্ন ক্ষেত্রে চর্চিত হয়ে সাহিত্যের এক বিশিষ্ট ধারারূপে গৃহীত হওয়া। ভারতবর্ষে 'দলিত সাহিত্য'এবং দলিত বোঝানোর জন্য প্রথমেই বর্ণাশ্রমভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার উল্লেখ করতে হয়। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী ভারতবর্ষের বর্ণাশ্রমভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় যেভাবে সমাজ গঠিত হত, তাতে সমাজের উচ্চ তিন বর্ণের প্রতি সব সুবিধা প্রদানকারী চতুর্থ বর্ণটি সেই খেটে খাওয়া মানুষগুলো যুগে যুগে নির্যাতিত ও শোষিত হয়ে এসেছিল। তারা ছিল সমাজের 'দলিতবর্গ'-উপেক্ষিত, অনিকেত, অস্পৃশ্য, পীড়িত ও অসহায় জনতার দল। বর্ণশ্রমভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় শ্রেণিবিভাজন একটি অভিশাপ। সেই অভিশাপের হাত থেকে আমরা এখনো মুক্ত হতে পারিনি। এই অভিশাপের ফলে দলিতদের দলিত্ব দিন দিন আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। দলিতদের দুঃখ,হয়রানি,দাসত্ব,অধঃপতন,দরিদ্রতা ইত্যাদির শৈল্পিক প্রকাশ যে সাহিত্যের মধ্যে দেখা যায় তাকেই বলা হয় দলিত সাহিত্য। দলিত সাহিত্য নিছক সাহিত্যকর্ম নয়, দলিত সাহিত্য একটি আন্দোলনের নাম। এই আন্দোলন জাতপাতের কুসংস্কার, আর্থ-সামাজিক বৈষম্য ও ধর্মীয় শোষণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। 'দলিত সাহিত্য' শব্দটি চলু হয়েছিল ১৯৫৮ সালে আয়োজিত "দলিত লিটারেচর কনফারেন্স"[১]এ। ভারতবর্ষে প্রথম মারাঠি ভাষায় দলিত সাহিত্য রচনা আত্মপ্রকাশ করলেও আজ তা বিভিন্ন ভাষায় বেগবতী স্রোতস্বিনী। বর্তমানে দলিত সাহিত্যের প্রধান উৎস হিসেবে আম্বেদকরের দর্শন ও তাঁর আন্দোলনকে ধরা হয়।

১৯৪৭-এর পর দলিত রাজনীতির ধরণ ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়। নব্বইয়ের দশকের আগে দলিত আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল শিক্ষা ও চাকরিতে সংরক্ষণ। পরবর্তীকালে কৃষিজমির অধিকার, ন্যূনতম মজুরি এবং দলিতদের উপর অত্যাচারের মতো বিষয়গুলো গুরুত্ব পায়। আন্দোলন ক্রমে রাজনৈতিক রূপ নেয় এবং দলিতরা সংগঠিতভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে শুরু করে— নির্বাচনে লড়াই করা, দাবি আদায় করা ও দলিত প্রার্থীদের সমর্থন করা প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত বহুজন সমাজ পার্টি (BSP) অনেক বেশি সাফল্য অর্জন করে। ১৯৮৯ থেকে ২০০২ সালের মধ্যে উত্তরপ্রদেশে এর রাজনৈতিক প্রভাব দ্রুত বৃদ্ধি পায়। কাঁশিরামের নেতৃত্বে এই দল 'বহুজন' ধারণাকে সামনে এনে ভারতীয় রাজনীতিতে নতুন দিশা দেয় এবং দলিতদের রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের পথ তৈরি করে। ২০০৬ সালে কাঁশিরামের মৃত্যুর পর মায়াবতীর নেতৃত্বে দল এগিয়ে চলে। ১৯৯৫ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে কয়েকবার উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হন, প্রথম দলিত মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

বাংলার মানুষের কাছে প্রান্তিক কথাটি বহুদিন আগে পরিচয় হলেও বাংলার মানুষের কাছে দলিত শব্দটি নতুন। বাংলার দলিত সাহিত্যের যাত্রা শুরু হয়েছে মহারাষ্ট্রে শুরু হওয়ার প্রায় বছর কুড়ি পরে। আটের দশকের মাঝামাঝি 'বঙ্গীয় দলিত লেখক পরিষদ' গঠনের মধ্য দিয়ে দলিত সাহিত্য আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গে প্রথম বিকশিত হতে শুরু করে। নকুল মল্লিক হন এর সম্পাদক আর বিমল বিশ্বাস সভাপতি। অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন রণেন্দ্রলাল বিশ্বাস। ১৯৮৭ সালের এপ্রিলের শেষ দিকে উত্তর ২৪ পরগণার মসলন্দপুরে প্রথম দুইদিন ব্যাপী দলিত সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে ১৯৯২ সালে কলকাতার সল্টলেকে মূলত স্বপন বিশ্বাসের উদ্যোগে গড়ে ওঠে 'বাঙলা দলিত সাহিত্য সংস্থা'। অমর বিশ্বাস হন সম্পাদক, সভাপতি হন অধ্যাপক জগদ্বন্ধু বিশ্বাস আর কোষাধ্যক্ষ হন ঊষারঞ্জন মজুমদার। এই সংস্থার উদ্যোগে ১ম বর্ষ দলিত সাহিত্য সম্মেলন (সঙ্গীতি) হয় নদীয়া জেলার বগুলার সন্নিকটে ভায়না গ্রামে, ১৯৯২ সালের ৫-৬ ডিসেম্বর। দলিত মানুষদের মাঝখানে গিয়ে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এই সংস্থা পরবর্তীকালে উত্তর ২৪ পরগণার হৃদয়পুর, হুগলীর খন্যান, মালদহের পাকুয়াহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগণার রঘুনাথপুরে (মাধবপুর) ও চক পাঁচঘরিয়ায়, পুরুলিয়ার আদ্রায়, হুগলির কামারকুণ্ডু, পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি প্রভৃতি স্থানে রাজ্য সম্মেলন এবং রাণাঘাটের কুপার্স ক্যাম্প

ও মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুরে জেলা সম্মেলন করে এবং প্রবল উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সকলকে সংগঠিত করে দলিত সংস্কৃতি চেতনাকে ছড়িয়ে দিতে থাকে।

দলিত আন্দোলনের প্রাণপুরুষ বাবা সাহেব আম্বেদকরের সাথে বাংলার সম্পর্ক ছিলো গভীর এবং নিবিড়। এই বাংলারই এক প্রান্ত থেকে তিনি যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের মহতী প্রয়াসে সংবিধান সভার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নির্বাচিত হন। বাংলার দলিত মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সচেতন, সংগঠিত অগ্রবর্তী অংশ নমঃশূদ্র। যাদের ১৯৯১ সালের পূর্ব পর্যন্ত চণ্ডাল বলা হতো। বর্তমানে যার সংখ্যা প্রায় ২ কোটির কাছাকাছি। নমঃশূদ্র মানুষদের ৯০ শতাংশের বসবাস ছিলো পূর্ব বঙ্গের ফরিদপুর, খুলনা, যশোর জেলাগুলোয়, যে জেলাগুলো দেশভাগের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের(বর্তমানে বাংলাদেশ) অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়ে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে রাতের অন্ধকারে সর্বস্ব হারিয়ে এই সব মানুষেরা পালিয়ে আসেন এপার বাংলায়। এপার বাংলায় এসে তাদের সাহিত্য চর্চা শুরু হয়। বতর্মান বাংলার দলিত সাহিত্য সেই অন্ধকার সময় কাটিয়ে মাথা উঁচু করে চলতে শুরু করেছে, একঝাঁক কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, প্রবন্ধকার, নাট্যকার এগিয়ে এসেছেন। যাঁদের রচনা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। যে দলিত, সে শুধুমাত্র জন্মজনিত কারণে অর্থনৈতিক বঞ্চনার সাথে উপরি পায় অস্পৃশ্যতাসহ চরম ঘৃণা অপমান। এ যন্ত্রণা একা তার, যা জীবনধারণের যন্ত্রণাকে শত সহস্রগুণ অসহনীয় করে তোলে। এ যন্ত্রণার সামান্যতম অনুধাবন অদলিত জাতের কোনও মানুষের পক্ষেই বোঝা সম্ভব নয়। তাদের যন্ত্রনার কথা এভাবে বলা যায়–

"সে যাতনা বিষে
বুঝিবে সে কিসে
কভু আশি বিষে
দংশেনি যারে।"[২]

বাংলার দলিত সাহিত্য আন্দোলনের মূল আলোচনায় প্রবেশের আগে মতুয়া সাহিত্য বিষয় দু'এক কথা বলে নেওয়া খুব দরকার, যে সাহিত্য জাতিভেদ ব্যবস্থা, ঘৃণা এবং গোলামির দর্শনতত্ত্বকে নস্যাৎ করে চৈতন্যদেব প্রতিষ্ঠিত 'বৈষ্ণব' ধর্মের মতো এক বিশ্বজনীন ধর্ম আবেদনে সমৃদ্ধ। ঊনবিংশ শতকের বাংলা সমাজ-সংস্কৃতি ধর্ম রাজনীতির ক্ষেত্রে মতুয়াধর্ম আন্দোলন একটি যুগান্তকারী ঘটনা। মতুয়া ধর্ম আন্দোলন মূলত পূর্ব বঙ্গের সবচেয়ে সংগঠিত, অধিক সংখ্যক, অপেক্ষাকৃত সচেতন, শিক্ষিত হয়ে ওঠা নমঃশূদ্র শ্রেণির মানুষকে আবর্তন করে গড়ে ওঠা একটি আন্দোলন। এই ধর্ম আন্দোলনের জনক হরিচাঁদ বিশ্বাস। যাঁকে মানুষ হরিচাঁদ ঠাকুর বলেন। তাঁর জীবদ্দশায় দীর্ঘ ৬৬ বৎসর কাল নমঃশূদ্র শ্রেণির মানুষ, যাদের সেকালের কিছু উচ্চবর্ণের মানুষরা ঘৃণা করতো চণ্ডাল, অস্পৃশ্য, অচ্ছুৎ বলতো সেই জাতির আত্মিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রাণপাত প্রয়াস করেন। তবে সে প্রয়াস সেই সময় ততটা ফলবতী হয়নি, যতটা হয় মতুয়া সংগঠনের দায়ভার হরিচাঁদ ঠাকুরের (বিশ্বাস) সুযোগ্য পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরের ওপর ন্যাস্ত হবার পর। মতুয়াদের ডাক দিয়ে বলেন-

"যে জাতির দল নাই, সে জাতির বল নাই।"[৩]

আবার তিনি বলেন-

"খাও বা না খাও তাতে ক্ষতি নাই, ঘরে ঘরে আমি বিদ্যালাভ চাই।
এই আমি বলে যাই সবাকার তরে, অবিদ্বান যেন পুত্র নাহি থাকে ঘরে।"[৪]

সেকালে শূদ্র পুত্রদের জন্য কোনও বিদ্যালয়ের দ্বার খোলা ছিলো না। উনি নিজের প্রচেষ্টায় অস্ট্রেলিয়ান ধর্মযাজক মিঃ মীড সাহেবের সহায়তায় ওড়াকান্দিতে হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলার সর্ববৃহৎ দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ সেইকালে কী অবস্থায় জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছিল, তার একটি চিত্র পাওয়া যায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধর্মের অধিকার প্রবন্ধে। বাংলার দরদী কবি ১৯১১ সালে তার ক্ষোভ, দুঃখ প্রকাশ করে লিখেছেন-

> "আমি পল্লীগ্রামে গিয়া দেখিয়া আসিলাম, যেখানে নমঃশূদ্রদের ক্ষেত্র অন্য জাতিতে চাষ করে না। তাহাদের ধান্য কাটে না, তাহাদের ঘর তৈরি করিয়া দেয় না।অর্থাৎ পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে মানুষের কাছেমানুষ যে সহযোগিতা দাবি করিতে পারে, আমাদের সমাজ ইহাদিগকে তাহার অযোগ্য বলিয়াছে। বিনা অপরাধে আমরা ইহাদের জীবনযাত্রাকে দুরূহ ও দুঃসহ করিয়া তুলিয়া জনমকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্রতিদিনই দণ্ড দিতেছি।"[৪]

জাতিকে শিক্ষিত করে না তুলতে পারলে দলন, পীড়ন থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব। তাই দলিতদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানালেন-

> "বিদ্যা ধর্ম, বিদ্যা কর্ম, বিদ্যা সর্ব সার
> বিদ্যা বিনা এই জাতির নাহিকো উদ্ধার।
> অজ্ঞান ব্যাধিতে ভরা এই দেশ
> জ্ঞানের আলোকে ব্যাধি তুমি কর শেষ
> প্রাণ যায় চলে যাক তাতে ভয় নাই
> বিদ্যা চাই, বিদ্যা চাই, বিদ্যা মাত্র চাই।"[৫]

মতুয়া আন্দোলন যদিও ধর্ম আন্দোলন, তবে এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো ধর্ম ও কর্মের এক মহা সম্মিলন। 'শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ চরিত' গ্রন্থে তৎকালীন সমাজে নিম্নবর্ণের মানুষের ওপর জমিদার মহাজনদের অত্যাচারের চিত্র বর্ণনা করেছেন-

> "যত মহাজন, জমিদারগণ
> ধনেবলে সবে রয়।
> অস্পৃশ্য যাহারা,কাঙ্গাল তাহারা
> দুঃখে দুঃখে দিন যায়।
> কর্জ করি কত অভাজন
> সুদের পাষাণতলে ছেড়েছে জীবন।"[৬]

বাংলায় বরাবরই অব্যবসায়িক, মতাদর্শ নির্ভর ক্ষুদ্র পত্র পত্রিকা প্রকাশের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরম্পরা আছে। এইসব পত্রিকা অতি দরিদ্রতার কারণে কৃশ এবং বাহ্যিক আড়ম্বর বর্জিত, যা শুধুমাত্র প্রাণের টানে এগিয়ে চলে অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে। আর্থিক সংগতিহীন স্বল্পায়ু এইসব পত্রিকার নাম লিটল ম্যাগাজিন(ক্ষুদ্র পত্রিকা)। ১৯৪৭ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত বাংলা দলিত সমাজ দ্বারা এইরকম প্রায় শতাধিক সাহিত্য সংস্কৃতি এবং সংবাদ বিষয়ক ক্ষুদ্র প্রকাশন হয়েছে; সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক এসব পত্রিকার একটি তালিকা যা পাওয়া গেছে তা হল- ১৯৪৭ সালে আগরতলা থেকে প্রকাশিত হয় 'মানবতা' মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক জিতেন্দ্রলাল মজুমদার। ১৯৪৭ সালের পর বাংলার দলিত জীবনে যে চরম বিপর্যয় নেমে আসে তার ধাক্কায় সাহিত্য আন্দোলনও থমকে যায়। তবুও সেই দুর্দিনে ১৯৫২ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় অপূর্বলাল মজুমদার সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা 'পাথেয়'। ১৯৫৫ সালে কলকাতা থেকে মনোরঞ্জন বড়ালের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'কোনও পথে' মাসিক পত্রিকা। ১৯৬২ সালে কলকাতার দমদম থেকে চিত্তরঞ্জন বিশ্বাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'ফেডারেশন' মাসিক পত্রিকা। ১৯৬৪ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় 'পূর্ব ভারত' মাসিক পত্রিকা, সম্পাদক শ্রী নিকুঞ্জবিহারী হালদার। ১৯৬৮ সালে নোনা চন্দনপুর থেকে প্রকাশিত হয় রাজু

দাসের সম্পাদনায় 'নবারুণ' নামে ত্রৈমাসিক পত্রিকা। পরে রাজু দাস ১৯৭৩ সালে 'নবরূপ' নামে আরেকটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন। ১৯৭০ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় ধীরেন বিশ্বাস ও ড. গুণধর বর্মনের সম্পাদনায় 'সংসপ্তক' মাসিক পত্রিকা। ১৯৭১ সালে প্রকাশিত হয় 'রিপাবলিকান' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা যার সম্পাদক ছিলেন রণজিৎ কুমার সিকদার। উনি ১৯৯১ সালে বহুজন দর্পণ নামে আরেকটি ত্রৈমাসিকও চালান। ১৯৭২ সালে কলকাতা থেকে নীতিশ বিশ্বাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'ঐকতান গবেষণাপত্র'। মাসিক এই পত্রিকায় বিশেষত উচ্চবর্ণের অসংখ্য বুদ্ধিজীবী নিয়মিত লিখে থাকেন। 'ঐকতান গবেষণাপত্রে' উল্লেখযোগ্য সংখ্যা 'দলিত সাহিত্য' সংখ্যা। সারা ভারতবর্ষের দলিত লেখকদের রচনা মূল্যায়ন করা হয়েছে এই সংখ্যায়। 'ঐকতান গবেষণাপত্র' ত্রিপুরা সরকারের দ্বারা 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ' পুরস্কারে ভূষত হ্য। ১৯৭৪ সালে কলকাতা থেকে 'পথ সংকেত' নামের একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শ্রী ক্ষীরোদবিহারী কবিরাজ। ১৯৭৬ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় 'অতএব' পত্রিক, সম্পাদক ছিলেন চিন্ময় রায়। ১৯৭৬ সালে কৃষ্ণনগর থেকে নীলকমল সরকারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'বাংলার নব চেতনা' নামের মাসিক পত্রিকা। ১৯৭৭ সালে নামে 'হরি সেবক' একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, সম্পাদক ছিলেন দেবেন্দ্রলাল বিশ্বাস। ১৯৭৭ সালে 'অতএব' নামে একটি পত্রিকার কথা জানা যায়, যার সম্পাদক ছিলেন শ্রী ননীগোপাল সিকদার। ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত হয় 'মতুয়া' নামে আরেকটি মাসিক পত্রিকা, বড়োচাঁদঘর থেকে অক্ষয় মৌলিকের সম্পাদনায়। ১৯৭৮ সালে কাকদ্বীপ থেকে প্রকাশ হয় 'মূক নায়ক' নামে একটি ষাণ্মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক সুনীল রতন বিশ্বাস। ১৯৭৮ সালে উত্তর ২৪ পরগণার মসলন্দপুর থেকে প্রকাশিত হয় 'গ্রাম বাংলা' ত্রৈমাসিক পত্রিকা। সম্পাদক ছিলেন নকুল মল্লিক। শ্রী মল্লিকের সম্পাদনায় ওই স্থান থেকে 'দলিত কণ্ঠ' নামে অন্য একটি ত্রৈমাসিকও ১৯৯৪ সাল থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। ১৯৮০ সালে প্রকাশিত হয় 'সন্তোষ' মাসিক পত্রিকা। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মন্মথনাথ মিস্ত্রী। প্রকাশনা স্থান কলকাতা। ১৯৮৩ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়, 'নিখিল ভারত' মাসিক পত্রিকা, সম্পাদক ছিলেন বীরেন বিশ্বাস। ১৯৮৫ সাল থেকে প্রকাশিত হয়ে চলেছে সাপ্তাহিক 'বহুজন নায়ক' পত্রিকা কলকাতা থেকে। যদিও পত্রিকা সম্পাদক হিসেবে কাশীরামের নাম মুদ্রিত হয়ে থাকে, কিন্তু সম্পাদনার সব দায়িত্ব সম্পন্ন করেন শ্রী মহেন্দ্রনাথ তালুকদার। ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত হয় মাসিক পত্রিকা 'লৈখী'। সম্পাদক ছিলেন ড. জ্ঞান প্রকাশ। ১৯৮৬ সালে উত্তর ২৪ পরগণার ঠাকুরনগর থেকে প্রকাশিত হয় 'হরিচাঁদ সেবা' সংঘ পত্রিকা। সম্পাদক ছিলেন নিতাই চন্দ্র মণ্ডল। ১৯৮৭ সালে ওই একই স্থান থেকে প্রকাশিত হয় 'মতুয়া সেবা সংঘ' পত্রিকা। মাসিক এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন স্বপন কুমার বিশ্বাস। ১৯৯০ সালে উত্তর ২৪ পরগণার হেলেঞ্চা থেকে বাদল সরকারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক পত্রিকা 'মধুমতি'। ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত হয় 'আজকের একলব্য' সম্পাদক ছিলেন বসন্ত কুমার মণ্ডল। ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত হয় 'মতুয়া প্রতিবিম্ব' দূর্গাপুর থেকে। মাসিক এই পত্রিকার সম্পাদকের নাম সন্তোষ বারুই।

১৯৯৮ সালে প্রকাশিত হয় ষাণ্মাসিক 'এখন তখন' পত্রিকা। মঞ্জ বালা ছিলেন সম্পাদিকা। ১৯৯৪ সালে প্রকাশ হয় মনোহরমৌলি বিশ্বাসের সম্পাদনায় 'চতুর্থ দুনিয়া' ত্রৈমাসিক পত্রিকা। মনোহরমৌলি বিশ্বাস 'Dalit Mirror' নামে একটি ইংরেজি পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন ১৯৯৬-৯৭ সাল থেকে। 'নির্ভীক সংবাদ' নামে একটি পত্রিকা ১৯৯৭ সালে নকুল মল্লিক ও রণজিৎ কুমার সিকদার উভয় মিলে প্রকাশ করেন। সাপ্তাহিক ওই পত্রিকার প্রকাশ স্থান ছিল কলকাতা। উত্তর ২৪ পরগণার হৃদয়পুর থেকে শ্রী কপিলকৃষ্ণ ঠাকুরের সম্পাদনায় ২০০০ সালে প্রকাশিত হয় 'নিখিল ভারত' মাসিক পত্রিকা। ২০২০ সালে প্রতিস্থিত হওয়া 'পশ্চিমবঙ্গ দলিত সাহিত্য আকাদেমি' বাংলার দলিত আন্দোলন কে সাহিত্যের মাধ্যমে অগ্রসর করেছে। তাই বলা যায় বাংলা

দলিত পত্র-পত্রিকার জগৎ বর্তমানকালে এক বৃহৎ রূপ নিয়েছে,দলিত সাহিত্যের মধ্যে কোন কোন সাহিত্য অন্তভূক্ত হবে তার একটি তালিকাও তৈরি হয়েছে। বাংলার নানা প্রান্তে এখনও অনেক পত্রিকা আছে,অনেক দলিত মানুষ পত্রিকা প্রকাশের মাধমে প্রতিদিন এগিয়ে আসছেন তাঁদের কথা জনসমক্ষে তুলে আনার উদ্দেশ্য নিয়ে।

বাংলা দলিত সাহিত্যের স্রষ্টা হবেন কারা-এ প্রশ্ন নিয়ে দলিত বুদ্ধিজীবিদের শিবির দ্বিধাবিভক্ত। এক দলের মতে ,দলিতদের প্রতি প্রকৃত সহানুভূতিসম্পন্ন যেকোনও লেখকই লিখতে পারে এমন সাহিত্য কিন্তু অন্য দল বলেন , নিগ্রোত্ব বা নারীত্ব যেমন আলাদা ভাবে লাভ করা যায় না, তেমননি অ–দলিত লেখকদেরও দলিত্ব অর্জন করা সম্ভব নয়। একজন দলিত সাহিত্যের গবেষক হিসেবে আমি মনে করি সাহিত্য বিষয়ক কোনও আলোচনায় যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এড়িয়ে যাবার উপায় থাকে না, তেমনই বাংলা দলিত সাহিত্য বিষয়ে কোনও কথা বলতে গেলে সবার আগে সম্মানের সাথে উঠে আসে একটি নাম অদ্বৈত মল্লবর্মণ। বাংলা কথা সাহিত্যে তিনি এমন একজন সাহিত্যিক, যিনি মাত্র একটি সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে সাহিত্য জগতে স্বশক্ত এক চিরস্থায়ী আসনে আসীন হয়ে গেছেন। তাঁর 'তিতাস একটি নদীর নাম', উপন্যাসটি কুমিল্লা জেলার নদীর তীরে বসবাসকারী মৎস্যজীবী মালো সম্প্রদায়ের উপাখ্যান। তাদের প্রেম,প্রীতি, স্নেহ, আশা, ভরসা, জীবন সংগ্রামের ধ্রুপদী চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এই উপন্যাসে। লেখক নিজেও যেহেতু মালো সম্প্রদায়ের মানুষ তাই এই জীবনকে তিনি দেখেছেন একেবারে ভিতর থেকে। সেই জীবন যন্ত্রণাকে তিনি দলিতদের মুখের ভাষার কাব্যময় বর্ণনার দ্বারা জীবন্ত করে তুলেছেন। মালো মানবগোষ্ঠীর জীবনের প্রাপ্তি, হারাবার বেদনা, হারিয়ে দেবার পৌরুষ এই সব এক মসৃণ পেলবতায় উপস্থাপিত হয় এই উপাখ্যানে, যা উপাখ্যানের অবয়ব গঠনে এক যাদু বাস্তবতার স্পর্শ পেয়ে এগিয়ে চলে উপসংহারের দিকে।

আধুনিক কালে বাংলা দলিত সাহিত্য নিয়ে যিনি প্রথম চর্চা শুরু করেছিলেন তিনি হলেন মনোহরমৌলি বিশ্বাস। জন্ম খুলনা জেলার মেটের গাতি গ্রামে ৩রা অক্টোবর ১৯৪৩ সালে, মনোহর বিশ্বাস নামে সমধিক পরিচিত। দরিদ্র বাবা-মায়ের সাথে কৃষিজমিতে শিশু-শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে করতে বিদ্যালয়ের পথে যাত্রা শুরু। পিতার নাম প্রহ্লাদ চন্দ্র বিশ্বাস ও মাতার নাম পঞ্চবালা। গাঁয়ের পাঠশালার শিক্ষকের কাছে লেখাপড়ায় হাতে খড়ি। বাড়ি থেকে অনেকটা দূরের উচ্চবিদ্যালয় থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে বৃত্তি-পরীক্ষা দিয়ে খুলনা-যশোহর জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করায় লেখাপড়ার পথ অনেকটা সুগম হয়ে ওঠে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৩ সালে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের স্নাতক। ১৯৬৭ সালে কলায় স্নাতক। লেখালিখির শুরু স্কুল থেকে। ইংরেজি ও বাংলায় প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা অনেক।প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখ্য 'দলিত সাহিত্যের দিগ্বলয়', 'দলিত সাহিত্যের রূপরেখা', 'প্রবন্ধে প্রান্তজন' অথবা 'অস্পৃশ্যের ডাইরি' 'ভিন্ন চোখে প্রবন্ধমালা' 'The Wheel will Turn', 'An Interpretation of Dalit Literature Aesthetic Theory and Movements: Through the Lens of Ambedkarism', 'Poetic Rendering As Yet Unborn', 'বিবিক্ত উঠোনে ঘর', 'বিক্ষত কালের বাঁশি', ইত্যাদি। এই লেখকের একটি ছোটগল্প 'নানচেরা বাল্মীকি', আত্মকথন 'Surviving in My world: Growing Up Dalit in Bengal' এবং 'Dalit Aesthetic' বইটি কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যসূচির অন্তর্গত হয়েছে। মনোহরমৌলি বিশ্বাসের পরে আর একজন দলিত সাহিত্যিকের নাম উল্লেখ করা খুব দরকার তিনি হলেন কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়াল। তাঁর কাব্যগ্রন্থের 'নাম ধরলেই যুদ্ধ সুনিশ্চিত', 'অশ্ব সিরিজ' এবং জীবনীগ্রন্থ 'কৃষ্ণচন্দ্র ঠাকুর স্মৃতি সম্ভার'। বর্তমান সময়ে যতীন বালা বাংলা দলিত সাহিত্য আন্দোলনের একজন একনিষ্ঠ কর্মী। বালা মহাশয়ের জন্ম পূর্ব বাংলার যশোর জেলার পাড়িয়ালী গ্রামে। দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে চলে এসে আশ্রয় পান অস্থায়ী উদ্বাস্তু শিবিরে। সেই অবর্ণনীয় দুরবস্থার মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ পাশ

করেন। কিছুকাল শিক্ষকতা করার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আধিকারিক হন। এই জীবনে আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকলেও স্বশ্রেণীর দরিদ্র দলিত মানুষের কথা বিস্মরণ হতে পারেননি তিনি। তাই দলিত জীবনে দুর্দশা মোচনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন সাম্য আর ন্যায়ের সংগ্রামে। রচনা করেন উপন্যাস 'অমৃতের জীবন কথা'। গল্পসংকলন'নেপো নিধন পর্ব, 'গণ্ডিভাঙ্গে বাঁধন'। কবিতা সংকলন 'মিনতি রাখেনি কেউ' এবং গবেষণা গ্রন্থ দলিত সাহিত্য আন্দোলন।যতীন বালার বিষয়ে আর একটি তথ্য হলো হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত প্রথম দলিত সাহিত্য সম্মেলনে সর্বভারতীয় প্রতিনিধির মধ্যে বাংলার যে আটজন আমন্ত্রণ পান, তার অন্যতম ছিলেন তিনি। আর একজন 'অদল বদল' পত্রিকার সম্পাদক বিমল বিশ্বাস। বর্তমানে অনেক দলিত গল্পকার তাঁদের অধিকারের লড়াইএ এগিয়ে এসেছেন তাঁদের লেখার মাধ্যমে। কুশলী গল্পকার সুশীল দাসের গল্প সংকলনের নাম 'দলিত মানুষের গল্প'। সুকুমার দাস ইনি যেমন ঔপন্যাসিক, তেমন ঐতিহাসিকও। তার দলিত চেতনায় জড়িত উপন্যাস 'কামতাপুরের পতন' এবং ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতার প্রতি বিশ্বস্ত পুস্তক 'উত্তরবঙ্গের ইতিহাস'

দলিত সাহিত্য নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সবে তার কৈশোরকাল অতিক্রম করে যৌবনের সিংহ দরজায় পা রেখেছে। তাই শিল্প নৈপুণ্যে কিংবা প্রকাশ কারিগরীর আঁটোসাঁটো বাঁধনে সে পরিস্ফুট, পরিণত হতে কিছু সময় নেবে। বর্তমান সময়ে যে সব দলিত কবি নিজস্ব প্রতিভার দ্বারা কাব্য সম্পদের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের কয়েকজন কবি অনীল সরকার, কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর, শ্যামল প্রামাণিক, দিলীপ দাস, অমর বিশ্বাস, অচিন্ত্য বিশ্বাস, গৌতম আলি, মনোহর বিশ্বাস, শান্তি বিশ্বাস, কঙ্কর গুপ্ত, মঞ্জু বালা, নিখিলেশ রায়, মনোরঞ্জন রায়, অনিল বিশ্বাস, নিশাকান্ত মজুমদার, পশুপতি মাহাতো, ক্ষীরোদ বিশ্বাস, অনিল চন্দ্র পোদ্দার, ভুবনেশ্বর নাথ, চিরপ্রশান্ত বাগদী, সুকুমার মজুমদার, জঙ্গল রাম, হেল্লা, সুকুমার দাস, সুধাংশ শেখর মণ্ডল, রাইচরণ সিদ্ধা, মধুরিমা মণ্ডল, বিমলকান্তি বিশ্বাস, অশোক অরিদা, মনোজকুমার বাইন, চিন্ময় রায়, আশিষ বরণ সরকার, সুধমা মৈত্র, শ্যামল বিশ্বাস, হীরা সাধক, বসন্ত কুমার মণ্ডল, মহিতোষ বিশ্বাস, ঋষিকেশ হালদার, কিরণ ব্রহ্ম, চুনীরাম মাহাতো, বাদল সরকার, অনিলকৃষ্ণ মল্লিক সহ আরও অনেকে এবং কবি মনীষী অনিল রঞ্জন বিশ্বাস। অনিল রঞ্জন বিশ্বাসের দশখানি কাব্যগ্রন্থের মর্মকথাই যেন মর্মরিত হয়েছে তাঁর একটি কবিতায়

"কল্পনায় ডানায় উড়ে উড়ে যায়
কালের হাজারো সিঁড়ি বেয়ে
শোনা যায় অন্তহীন শুধু তার পাখার ঝাপট
ধ্বনি নয় প্রতিধ্বনি
ভবিষ্যৎ পানে।"[৭]

কবি অনিল রঞ্জন বিশ্বাস চর্যাপদের কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ২০০জন বাঙালি কবির, ১৮২টি কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করে বিশ্বজনের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন। কবি অনিল সরকার কবি ত্রিপুরার মন্ত্রী। এত দায়িত্বপূর্ণ পদ সামলিয়েও তিনি কবিতা রচনায় নিমগ্ন রয়েছেন। তার কবিতা যুগ যুগ ধরে যারা ঘৃণিত অপমানিত হয়েছে, তাদের বুকের তলদেশ থেকে উঠে আসা দীর্ঘশ্বাসের মতো মনে হয়, এই পংক্তি ক'টায়। কবিতার পংক্তি ক'টি 'ব্রাত্য জনের কবিতা' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া

"মাগো তুমি শুধু বল
আমি নাকি একদিন রাজসূয় যজ্ঞের অশ্ব চড়ে
যাবো দিক দিগ্বিজয় হতে ভূমি ও বাণিজ্য দখলে
আমি বুঝি না, কেন বুঝি না মাগো

শুধু ভাবি তোর গর্ভে জন্মের যন্ত্রণা
কেন মোরে দিলি জননী।
আমৃত্যু বয়ে যাবো তাই যত অসম্মান।''[৮]

পৃথিবীর সব কবি তার সময় সমাজ, মানব, প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারেন না। এবং যা অসুন্দর, অমানবিক তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। দলিত কবিদের কবিতায় এই প্রতিবাদ একটু বেশি মাত্রায় মুখর। কবি অনিল সরকার অসংখ্য কবিতা লিখেছেন। তার কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের নাম: 'ব্রাত্যজনের কবিতা', 'স্বজনের মুখ', 'শেষ পল্টন', 'বাতাসে পায়ের শব্দ', 'অশ্বমেধের ঘোড়া', 'হীরা সিং', 'হরিজন'। এছাড়া স্বনির্বাচিত কবিতা ও কবিতা সমগ্র। এছাড়াও রয়েছে তার পাঁচখানা ছড়ার বই– 'আয়, রঙ্গ দেখে যা', 'সার্কাস', 'টক, ভীষণ টক', 'হাওলা এক্সপ্রেস', 'কলকাতার কাল সাপ'। আছে কিছু ইংরাজি কবিতার বইও। দিল্লির দলিত সাহিত্য আকাডেমী তাঁকে দিয়েছে আম্বেদকার জাতীয় ফেলোশিপ সহ নানান পুরস্কার। অচিন্ত্য বিশ্বাস অধ্যাপক। অধ্যাপনার কাজের ফাঁকে অবসরটুকু বরাদ্দ কবিতার জন্য। তীব্র তীক্ষ্ণ ভাষায় আক্রমক মেজাজে মানবতার শত্রুদের প্রতি এইভাবে ছোঁড়েন শব্দবাণ

''মনে রাখে ভদ্দর লোকজন
আকাশের সূর্যও ভোলে না
পৃথিবীটা এখানে থেমে নাই, ঘুরছে।
ঘৃণা আর লাঞ্ছনা ছুঁড়ে আছো দিব্যি
যারা যুগিয়েছে ভাত খাদ্য
তাদের করেছ ঘৃণা তীব্র
যাদের জন্য আছে সব ঠিকঠাক
এমন কী নর্দমা
পথ ঘাট জঞ্জাল মুক্ত
তাদের হেনেছো ঘৃণা এত কাল
বদলার দিন তাই আসছে
এইসবের পাই পাই হিসাব নেবার দিন আসছে।''[৯]

কবির কাব্যগ্রন্থ 'বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ' এবং 'চারু বাউরীর গান'।

কবি শান্তি বিশ্বাস, যার কবিতা সংকলনের নাম 'শিকড়ের ডাক', 'সাক্ষী নাম্বার এক', 'মাটি মাঝি মেঘনা' 'বাউলের চিঠি', 'শতাব্দীর আলো ছাড়া'। কবির একটি কবিতায় ছিন্নমূল দলিত যন্ত্রণায় প্রকাশ হয় এই ভাষায়

''শৈশবের নদীর বুকে ভাসা
কুল পাইনি আজও
আল ছিঁড়েছে সেই অনেক বছর
হাল ধরে সেই বসে আছি।''[১০]

কবি শ্যামল প্রামাণিকের কবিতা সংকলন 'কখনও আকাশ কখনও মাটি', 'শোনো এইখানে রেখে গেলাম' এবং 'আগুনের বর্ণমালা'। এই তিনখানি কাব্য সংকলন সোচ্চার প্রতিবাদে দৃঢ় কবিতায় ভরা।

যে সব কবিদের সামান্য পরিচয় এখানে রাখা গেলো, তার বাইরে রয়ে গেছেন বহু কবি। যেমন, হরেন্দ্রনাথ ভক্ত, 'দলিতায়ন' কাব্য তার এক অনুপম কাব্য সৃষ্টি, যা বহুদিন যাবৎ 'অদল বদল' মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। প্রাচীন, আভিজাত্যময় শব্দ, অলংকার আর মননশীলতায় লেখা এই

কাব্যে পৌরাণিক বিবরণকে নতুনভাবে দেখা ও দেখানোর আন্তরিক প্রয়াস পাঠক সাধারণের প্রশংসা পাচ্ছে। আছেন কবি তেজেন্দ্র লাল মজুমদার, সুকান্ত মণ্ডল, চুনী দাস, মণীন্দ্র বিশ্বাস, অমলকান্তি নস্কর, চিন্ময় রায়, ধীরেন মজুমদার, ভবেশ রায়, তপন মণ্ডল, বিমল বিশ্বাস, সুধীর রঞ্জন হালদার, সত্যরঞ্জন হালদার, ভগবান চন্দ্র বিশ্বাস, শিবেন দাস, সুনীল ভৌমিক এবং বদরুদ্দোজা শেখ ছাড়াও বহু দলিত কবি। সামগ্রিকভাবে এই সকল কবিদের রচনা মধ্যে প্রতিবাদের রূপ বড়ো প্রখর। কখনও দারিদ্রের জন্মদাতা শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে, কখনও দমন পীড়ন অত্যাচারের বিরুদ্ধে। কখনও জাতপাত, বর্ণব্যবস্থার বিরুদ্ধে। কখনও অশিক্ষা কুশিক্ষা কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে। এইসব কবিতা তাদের কাব্যকলার মধ্য দিয়ে এক অনাগত ভবিষ্যতের ইঙ্গিত প্রকাশ করে। যেকোনও দেশের যেকোনও সংগ্রামে কবিরা পালন করে থাকেন তাঁদের মানবিক দায়িত্ব। দলিত কবিরাও তার ব্যতিক্রম নন।

উপন্যাস, গল্প, কবিতার পর বাংলা দলিত সাহিত্যের সর্বাধিক প্রকাশিত হয়েছে প্রবন্ধ। মানুষের মনন চর্চার প্রত্যক্ষ বাহন এই প্রবন্ধ সাহিত্যে যেসব প্রাবন্ধিক উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন, তার মধ্যে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় নকুল মল্লিকের। ইনি বাংলার দলিত আন্দোলনের একজন পুরোধা পুরুষ, ইনি মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলের জীবনী লিখে বাঙালি পাঠককে পরিচিত করিয়েছেন এক পথিকৃৎ মারাঠি সাহিত্যিক, সংগ্রামীকে। অনুরূপভাবে শ্রীমতি কিরণ তালুকদার, জননায়ক মুকুন্দ বিহারি মল্লিকের জীবনী লিখে শূদ্র সমাজের একজন মানুষকে প্রকৃত মূল্যায়ন করে স্মরণীয় করে রাখবার চেষ্টা করেছেন। এই প্রকারের কাজ দলিত সাহিত্যকে তার নিজস্ব ভঙ্গিতে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বিশেষ ভূমিকা পালন করে; যে কাজ একপ্রকার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। দলিত সমাজের শিক্ষিত সচেতন বুদ্ধিজীবীদের এ দায়িত্ব বহন করে যেতে হবে নিজের স্বার্থে।

হিন্দু ধর্মের বিষয়ে কোনও আলোচনা বাদানুবাদ তর্ক মীমাংসা যেমন বেদ বেদান্ত বাদ দিয়ে অসম্ভব, তেমন ভারতবর্ষের দলিত আন্দোলন বা সাহিত্য বিষয়ক কোনও লেখা কোনও আলোচনা সভা সেমিনার আম্বেদকারকে বাদ দিয়ে অসম্পূর্ণ, অর্থহীন, অবান্তর। বাংলার বিশিষ্ট লেখকরা আম্বেদকরের চিন্তাধারাকে বাঙালি পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেবার অক্লান্ত প্রয়াস করেছেন। যার মধ্যে সর্বপ্রথম রঞ্জিৎ কুমার সিকদার, ননীগোপাল বিশ্বাস, ননীগোপাল দাস, শ্যামল কুমার বিশ্বাস, নরেশ চন্দ্র সরকার, স্বপন কুমার বিশ্বাস, সুকৃতি রঞ্জন বিশ্বাস, শান্তিরঞ্জন বিশ্বাস, মনোহর বিশ্বাস, যতীন বালা, ননীগোপাল সিকদার, প্রমুখ। রঞ্জিৎ কুমার সিকদারের বঞ্চিত জনতার মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ আম্বেদকার, আম্বেদকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী, সমাজ সম্পর্কে আম্বেদকারের চিন্তাধারা, জাত ব্যবস্থার বিলুপ্তি, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। কপিলকৃষ্ণ ঠাকুরের মতুয়া আন্দোলন ও বাংলার অনুমত সমাজ এবং তাঁরই সম্পাদিত গ্রন্থ গুরুচাঁদ ঠাকুর ও অন্তাজ বাংলার নবজাগরণ। বাংলার ইতিহাসের এক বিস্মৃত অধ্যায়কে এইসব পুস্তকে গভীর সংবেদনশীলতায় তুলে ধরা হয়েছে।

দলিত প্রাবন্ধিক জীবনের অমোঘ তাড়নায় দলিত মুক্তির তীব্র তৃষ্ণায় দলিত সাহিত্য আন্দোলনকে বেগবান করার উদ্দেশ্যে প্রবন্ধ নিবন্ধকে হাতিয়ার করে লক্ষ্যের দিকে যাত্রা করেছেন। প্রখর যুক্তিবোধ, বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন মতাদর্শগত সিদ্ধান্ত।দলিত প্রবন্ধকার একদিকে যেমন ইতিহাসের সত্যাসত্য পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ অনুসন্ধানের ওপর বর্তমান সময়ে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দলিত অবস্থানকে প্রতিফলিত করে আগামীর সম্ভাবনা এবং বিজয়ের চূড়ান্ত পরিণতি প্রমাণিত করতে চেয়েছেন; অন্যদিকে বিশ্লেষণ করেছেন দলিত আন্দোলনের ক্রমপর্যায়ের অভ্যন্তরীণ সমস্যা, মন্থর গতির কারণ ও ব্যর্থতার সূত্রগুলো। এক একজন প্রাবন্ধিক এক এক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়গুলো দেখলেও সামগ্রিকভাবে সবার উদ্দেশ্যে একটাই তা চির অবনত মানবগোষ্ঠীর মুক্তির পথনির্দেশ। যে কারণে প্রবন্ধগুলো নিছক নিরস প্রবন্ধ না হয়ে, হয়ে উঠেছে সংগ্রামী মানুষের এগিয়ে চলার পাথেয়। দলিত সাহিত্য আন্দোলনের একজন তাত্ত্বিক নেতা মনোহর

বিশ্বাস একখানি অনন্যসাধারণ প্রবন্ধগ্রন্থ রচনা করেছেন 'দলিত সাহিত্যের দিগ্বলয়'। এই গ্রন্থের এক অভিনব সংযোজন ভারতীয় সাহিত্য ধারায় স্থান করে নেওয়া দলিত মারাঠি, কানাড়ি সাহিত্যসহ অন্যান্য ভাষায় লিখিত দলিত সাহিত্যের বিষয় উপস্থাপন। বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত ১৩টি প্রবন্ধের আলোচনা দ্বারা বাঙালি পাঠকদের কাছে মোটামুটিভাবে দলিত সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে একটি ধারণা গড়ে দিতে চেষ্টা করেছেন। ১৯৯২ সালে পুস্তকটি প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বই দলিত ১৯৯৭ সালে সম্পাদনা করেছেন দেবেশ রায়, যিনি নিজে দলের নন। সাহিত্য একাডেমী থেকে এই প্রবন্ধ পুস্তকটি আসলে মারাঠি দলিত লেখক অর্জুন ডাঙলে সম্পাদিত পয়জন ব্রেড এর বাংলা অনুবাদ।

দলিত মুক্তি আন্দোলন ও দলিত সাহিত্য সম্পর্কে কিছু ভিন্ন ধরণের আলোচনা করেছেন হরেন্দ্রনাথ ভক্ত তার 'দলিতবাদের রূপ ও স্বরূপ' (প্রথম খণ্ড, ১৯৮৭) পুস্তকে ও নকুল মল্লিক তার 'ভাবনা চিন্তা' (১৯৯৩) গ্রন্থে।

বাংলা দলিত সাহিত্য আলোচনায় মনোরঞ্জন ব্যাপারীর নাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ দলিত সাহিত্য আকাদেমির সভাপতি। অধুনা বিলুপ্ত পূর্ব পাকিস্তানে বরিশাল জেলার এক দরিদ্র দলিত পরিবারের জন্ম। জন্মের প্রায় সাথে সাথে দেশভাগজনিত কারণে পরিবারের সবাই এপার বাংলায় চলে আসেন এবং এক রিফিউজি ক্যাম্পে স্থান পান। প্রায় ছয় বৎসর ক্যাম্প বাসের পর মনোরঞ্জনের বাবার দণ্ডকারণ্য না যেতে চাওয়ার অপরাধে সব রকম সরকারি সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়। সংসারে নেমে আসে চরম অভাব অনটন অরন্ধন। ফলে মনোরঞ্জনের কোনও স্কুলে যাবার সুযোগ ঘটে না। বাল্যকাল কাটে ছাগল, গরু চরিয়ে। একটু বড়ো হলে চায়ের দোকান, হোটেলের টেবিলবয়, তারপর মুটে মজুর, রিকশা চালক, রান্নার লোক। জীবনে প্রায় এক দেড়শো রকম কাজ করতে হয় তাঁকে দু'বেলা দুমুঠো অন্ন সংস্থানের জন্য। জুতো সারাই, ডোম, সুইপার, নাইট গার্ড, এমনকি এক অনাথ আশ্রমের হয়ে কিছুকাল কমিশনে ভিক্ষা করে বেড়াতে হয় ক্ষিদের তাড়নায়। জীবনের এক পর্বে জড়িয়ে যান উগ্র বাম রাজনীতির সঙ্গে। ফলে জেলযাত্রা ঘটে জীবনে। জেলে বসে নিতান্ত সময় কাটাবার বাসনায় লেখাপড়া শুরু করেন। দীর্ঘদিন পরে যখন জেল থেকে ছাড়া পান, তখন মন মস্তিষ্কে এক অদৃশ্য ভাইরাসের মতো চাড়িয়ে গেছে বই পড়ার ভয়াবহ নেশা। শুরু হয় তার বইয়ের সাথে সহবাস। ফুটপাতে, গাছতলায়, রেলস্টেশনে যেখানে যে অবস্থায় থাকেন দু'চোখ থাকে কোনও বইয়ের পাতায়। তখন মনোরঞ্জন রিকশা চালাতেন। সেই দিনে এক সময় ওঁর রিকশায় সওয়ার হন স্বনামধন্য সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী। মনোরঞ্জন শিক্ষিকা জ্ঞানে ওঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলো "জিজীবিষা" শব্দের অর্থ। জীবন বদলে যায়, মনোরঞ্জনের। মহাশ্বেতা, তাঁর পত্রিকা বর্তিকা র জন্য মনোরঞ্জনকে লিখতে অনুপ্রাণিত করেন। মনোরঞ্জনের সেই প্রথম লেখা; যা 'মদন দত্ত' ছদ্মনামে 'রিকশা চালায়' শিরোনামে ১৯৮১ সালের জানুয়ারি সংখ্যা 'বর্তিকা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তারপর এই পর্যন্ত শতাধিক পত্র পত্রিকায় গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ লিখেছেন। তার প্রথম প্রকাশিত গল্প সংকলনের নাম 'বৃত্তের শেষ পর্ব'। ২০০০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত ২২টি বাছাই গল্প আছে এই সংকলনে। তাঁর লেখা 'খাঁচার পাখিরাও গান গায়' এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রে রয়েছে একজন নিম্নবর্গের অপরাধ প্রবৃত্তির মানুষ। যার ধারণায় নির্ধন, নিরন্ন মানুষের বেঁচেবর্তে থাকার প্রকৃষ্ট স্থান হচ্ছে জেলখানা, যেখানে খাবার, শোবার, অসুখে চিকিৎসা পাবার সামান্য হলেও কিছু ব্যবস্থা আছে, যা তথাকথিত মুক্ত জগতে নেই। তাই তার সগর্বে ঘোষণা জেল ছাড়া আমাদের আর হারাবার কিছু নাই। 'নেশা' নামক গল্পের প্রধান চরিত্রে আছে একজন অন্নদাতা রিকশা চালক, যে পেট বোঝাই ক্ষিদে নিয়ে সওয়ারী তুলছে নিজের রিকশায়। ইচ্ছা, সওয়ারী নামিয়ে পয়সা নিয়ে চাল কিনে বাসায় যাবে। ভাত খাবে। মোটা চালের ধোঁয়া ওঠা গরম ভাত। কিন্তু ক্ষিদে চালিত অশক্ত শরীর তাকে শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে দেয় না। মাঝপথেই অজ্ঞান করে পথের ধুলোয় ফেলে দেয়। গরম

ভাতের স্বপ্ন দেখতে দেখতে মরে যায় রিকশাওয়ালা। 'স্বাধীনতা' গল্পের নায়ক একজন বুভুক্ষ মানুষ, যে রেশন দোকানে মোট বয়। যেদিন সারা দেশ স্বাধীনতার উৎসবে মাতোয়ারা, সেদিন তার ঘরে চাল নাই। মোট বইবে বলে রেশন শপে গিয়ে দেখে তালা বন্ধ। কেননা আজ সরকারি ছুটি যে! সামনে হাজার বস্তা চাল, পিছনে উৎসব মুখর মানুষ, দুইয়ের মাঝে একজন মানুষ যে আশি কোটি জনতার প্রতিনিধি। বন্ধ তালার সামনে তার বিক্ষুব্ধ আবিষ্কার এই স্বাধীনতা অর্থহীন, মানার কোনও মানে নেই। 'কঠিন গদ্য' একটি চোরের গল্প, যে খিদের তাড়নায় চুরি করে বসে তারই মতো আরেক ক্ষুধার্তের মুখের অন্নগ্রাস। ধরা পড়ে বেদম মার খায় আর একজন অন্নহীন আবাসহীন স্টেশন বাসিন্দার হাতে। 'ভাতের রাজা', এটিও না খাওয়া মানুষের গল্প। গল্পের নায়ক তার শিশুপুত্রদের খেতে দিতে না পেরে গলা টিপে মেরে ফেলে এবং সেই কেসে যাবোজ্জীবন সাজা পেয়ে জেলে এসে ভাতঘরের 'মেট' হয়ে যায়। দশ বারো হাজার কয়েদির জন্য রান্না করা ভাতের গাদার সামনে দাঁড়িয়ে সে ফেটে পড়ে তীব্র চিৎকারে "বাপরে একমুঠো ভাতের জন্য তোরা মরে গেলি, চেয়ে দেখ আজ কত ভাত আমার। আমি ভাতের রাজা।" বৃত্তের শেষ পর্বের সংকলিত সবকটা গল্পই নিরন্ন নির্ধন মানুষের হলেও শুধুমাত্র 'নারায়ণ সেবা' ছাড়া অন্য গল্পকে সেই অর্থের দলিত সাহিত্য বলা চলে না। 'নারায়ণ সেবা' গল্পে নায়ক এক উচ্চবর্ণীয় সামন্ত প্রভু। যার ইচ্ছা পৈত্রিক শ্রাদ্ধে এমন অতুল কীর্তি করা যা বহু বছর মানুষের স্মৃতিতে অমলিন হয়ে গেঁথে যায়। সেই উদ্দেশ্যে সে পিতৃ শ্রাদ্ধের ভোজে যত কাওড়া বাগদী উপোসী সম্প্রদায়ের মানুষকে নিমন্ত্রণ করে আনে। নানা প্রলোভন দিয়ে তাদের উস্কাতে চায় অতিমাত্রায় ভোজন করার জন্য। কিন্তু পূর্বে গুরুভোজন করে এক সামন্তগৃহে কয়েকজন মারা যাওয়ায় উপোসী মানুষেরা সতর্ক ছিলো। তারা ফাঁদে পা দেয় না। উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায় দেখে অবশেষে খাদ্যে বিষ প্রয়োগ করা হয়, সামন্ত প্রভুর নির্দেশে। বহু লোক মারা যায়। স্থাপিত হয় অতুল অতুল কীর্তি! এই গল্পটিতে নিরন্ন দলিত মানুষকে কীভাবে উচ্চবর্ণের মানুষরা গিনিপিগ তুল্য মনে করে নিজস্ব পরীক্ষানিরীক্ষা চালানো হয় যার সূচনা হয়েছিলো সেই মহাভারতের কালের জতুগৃহে পাঁচ নিষাদ পুত্রকে সমাতৃক পুড়িয়ে মারার মধ্য দিয়ে তা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

মনোরঞ্জনের দ্বিতীয় গল্প সংকলনের নাম 'জিজীবিষার গল্প'। ১৭টি গল্প নিয়ে ২০০০ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত পত্র পত্রিকায় বাছাই গল্পের সংকলন এটি। রবিশস্য, অদল বদল, হাটে বাজারে, আটুল বাটুল, জলাভূমি, প্রতিদিন, পদক্ষেপ, সবুজ, আলিঙ্গন, কথা, সাময়িক, প্রভৃতি পত্রিকায় পূর্বে প্রকাশিত হয় এই গল্পগুলো।

স্বাধীনতার-পরবর্তী দলিত সাহিত্যের উপস্থিতি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যাচ্ছে। তবে বাংলায় সেই উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে দেরিতে দৃশ্যমান হয়েছে। কিন্তু এখানে 'উপস্থিতি' বলতে বোঝানো হচ্ছে-পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ, সংকলন, অনুবাদ এবং ধীরে ধীরে একটি স্বতন্ত্র সাহিত্যধারায় পরিণত হওয়া। বলা যায়, বাংলা সাহিত্যের মূল ধারার ভেতরেও এই প্রবাহ ক্রমশ জায়গা করে নিচ্ছে আজকাল। পশ্চিম ভারতে বেশ কয়েক দশক ধরে দলিত সাহিত্য একটি সচেতন আন্দোলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু বাংলায় দীর্ঘদিন তা তেমন গুরুত্ব পায়নি। আজও স্কুল-কলেজের পাঠ্যক্রমে দলিত সাহিত্যের উপস্থিতি সীমিত। এর একটি বড় কারণ, সাহিত্য নির্ধারণের ক্ষেত্রেও দীর্ঘদিন ধরে জাতি ও বর্ণের আধিপত্য কাজ করেছে। পরিস্থিতি এখনও সম্পূর্ণ বদলায়নি কিন্তু পরিবর্তনের ইঙ্গিত স্পষ্ট। তাই বলা দরকার দলিত সাহিত্য শুধুমাত্র আন্দোলনের মুখপাত্র নয়, কেবল একটি বিশেষ বাস্তবের উপস্থাপনাও নয়।তার চেয়ে বেশি কিছু।

তথ্যসূত্র:

১. মহুয়া, অনিন্দিতা ও রমন, শুভা। হিন্দি দলিত সাহিত্য। প্যাপিরাস, ১৯২১, কলকাতা, পৃ. ৭।

২. ব্যাপারী, মনোরঞ্জন।জীবনের ডানদিক বামদিক। ঋতবাক, কলকাতা, ১৪২৭, পৃ. ৩২২।

৩. ব্যাপারী, মনোরঞ্জন। জীবনের ডানদিক বামদিক। ঋতবাক, কলকাতা, ১৪২৭, পৃ. ৩২৪।

৪. ব্যাপারী, মনোরঞ্জন। জীবনের ডানদিক বামদিক। ঋতবাক, কলকাতা, ১৪২৭, পৃ. ৩২৫।

৫. ব্যাপারী, মনোরঞ্জন। জীবনের ডানদিক বামদিক। ঋতবাক, কলকাতা, ১৪২৭, পৃ. ৩২৫।

৬. ব্যাপারী, মনোরঞ্জন। জীবনের ডানদিক বামদিক। ঋতবাক, কলকাতা, ১৪২৭, পৃ. ৩২৭।

৭. প্রামাণিক, মৃণ্ময়। অনুবাদ শরণকুমার লিম্বালে (মূল গ্রন্থ)। দলিত নন্দনতত্ত্ব, তৃতীয় পরিসর, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৩৫।

৮. প্রামাণিক, মৃণ্ময়। অনুবাদ শরণকুমার লিম্বালে (মূল গ্রন্থ)। দলিত নন্দনতত্ত্ব। তৃতীয় পরিসর, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৩২।

৯. প্রামাণিক, মৃণ্ময়। অনুবাদ শরণকুমার লিম্বালে (মূল গ্রন্থ)। দলিত নন্দনতত্ত্ব, তৃতীয় পরিসর, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৩৮।

১০. প্রামাণিক, মৃণ্ময়। অনুবাদ শরণকুমার লিম্বালে (মূল গ্রন্থ)। দলিত নন্দনতত্ত্ব, তৃতীয় পরিসর, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৩৯।

Primary Sources:

1. Ambedkar, B. R. Annihilation of Caste. In Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches, Vol. 1, edited by Vasant Moon. Dr. Ambedkar Foundation, 1979. Reprint 2014, pp. 23–96.
2. Ambedkar, B. R. Buddha or Karl Marx. In Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches, Vol. 3, edited by Vasant Moon. Dr. Ambedkar Foundation, 1987. Reprint 2014, pp. 441–462.
3. Bagul, Baburao. “Dalit Literature is but Human Literature.” In Poisoned Bread, edited by Arjun Dangle. Bombay: Orient Blackswan, 2009, pp. 274–294.
4. Byapari, Manoranjan. “Is There a Dalit Writing in Bangla?” Translated and introduced by Meenakshi Mukherjee. Economic and Political Weekly, Vol. 42, No. 41, 2007, pp. 4116–4120.
5. Dangle, Arjun, ed. Poisoned Bread: Translations from Modern Marathi Dalit Literature. Bombay: Orient Blackswan, 2009.
6. Das, Sisirkumar. “The Narratives of Suffering: Caste and the Underprivileged.” In A History of Indian Literature: 1911–56. New Delhi: Sahitya Akademi, 1995.
7. Dasan, M., et al., eds. Malayalam Dalit Writing. New Delhi: Oxford University Press, 2012.
8. Dhasal, Namdeo. Namdeo Dhasal: Poet of the Underworld: Poems 1972–2006. Edited by Dilip Chitre. New Delhi: Navayana, 2007.
9. Kothari, Rita. “Short Story in Gujarati Dalit Literature.” Economic and Political Weekly,vol36 no45,2001,pp 4308-4311
10. Limbale, Sharankumar. Towards an Aesthetic of Dalit Literature. Translated by Alok Mukherjee. New Delhi: Orient Longman, 2010.

Online Sources:

Dalit Panthers Manifesto

https://raiot.in/dalit-panthers-manifesto/
Dr Ambedkar's Journalism: From "Mooknayak" to "Prabuddha Bharat"
https://www.forwardpress.in/2020/01/dr-ambedkars-journalism-from-mooknayak-to-prabuddha-bharat/
Ganesh, Deepa. "From the Fringes."
https://www.thehindu.com/features/friday-review/theatre/From-the-fringes/article16215491.ece

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1502-1508
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.371

শ্রমিক ইতিহাস চর্চায় ঔপনিবেশিক বাংলার কবি-সাহিত্যিকদের চিন্তা-চেতনা: প্রসঙ্গ বাংলার নাবিক

ড. আজহারুল মিদ্দা, *স্বাধীন গবেষক, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বঙ্গ, ভারত*

Received: 20.03.2026; Accepted: 26.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In Spreading labour consciousness throughout the world progressive Marxist thinkers such as Karl Marx, Friedrich Engels and Vladimir Lenin have made significant contributions. In the 20th Century, two eminent historians Eric Hobsbawm and E. P. Thompson have opened new avenues in the exploration of labour history through their examination of the relationship between labour and capital within the context of sociological practice. Historians like Sanat Kumar Bose, Sukomal Sen, Dipesh Chakrabarty, Nirban Basu, Amiya Kumar Bagchi, Subho Basu, Samita Sen and many other scholars have approached the concept of labour consciousness in colonial India from a fresh perspective. The organized movements of workers in Bengal played a crucial role during the colonial period in addressing the imbalance of labour and capital in society and class exploitation. The movements embodied the fight against imperialism and capitalist exploitation, while also fostering the spirit of nationalism. Renowned poets and literary figures in colonial Bengal depicted the exploitation of workers by capitalists through their writings. The writings of poets and writers of the contemporary period played a particularly significant role in transmitting class exploitation and nationalism among the workers. These thoughts of poets and writers on the working life and struggles of sailors in Bengal viewed through the lens of labour consciousness became a part of the fight against imperialist capital exploitation.

Keywords: Colonial, Labour, Bengal, Sailor, Poet, literary, consciousness

বিশ্বের শ্রমিকদের অবস্থান নিয়ে মার্কস[১], এঙ্গেলস[২] এবং লেনিনের[৩] মতো মার্কসীয় প্রগতিশীল চিন্তনগুলি আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এক উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। বিংশ শতকে এরিক হবস্‌বম[৪] এবং ই. পি. থমসন[৫] নামক দুইজন প্রথিতযশা ঐতিহাসিক শ্রমিক ইতিহাস চর্চায় নতুন এক দ্বার উন্মোচন করেছেন। এই ইতিহাস চেতনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিংশ শতকের মধ্যভাগের পর ভারতে একদল স্বনামধন্য গবেষক শ্রমিক ইতিহাস চর্চায় বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। এসকল গবেষকদের মধ্যে ছিলেন সনৎ কুমার বসু[৬], সুকোমল সেন[৭], দীপেশ চক্রবর্তী[৮], নির্বাণ বসু[৯], অমিয় কুমার বাগচী[১০], শুভ বসু[১১], শমিতা সেন[১২] প্রমুখ। এই গবেষক ইতিহাসবিদদের দ্বারা ঔপনিবেশিক ভারতে শ্রমিক ইতিহাস নতুন আঙ্গিকে পরিবেষ্টিত হয়েছে। এখানে ঔপনিবেশিক ভারতে শ্রমিকদের উপর পুঁজির শোষণ থেকে নিয়ে নারী

শ্রমিকদের শোষণের দিকটিও আলোকপাত করা হয়েছে। ঔপনিবেশিক সময়কালে শ্রমিকদের অবস্থান নিয়ে ঐতিহাসিকদের এই গবেষণাগুলি শ্রমিক ইতিহাস অনুসন্ধানের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক হয়ে উঠেছে। এর পাশাপাশি তৎকালীন সময়ে কবি ও সাহিত্যিকদের সাহিত্যকেন্দ্রিক বিভিন্ন লেখনীগুলিতেও শ্রমচেতনা পরিস্ফুট হতে দেখা গিয়েছে। সাহিত্যকেন্দ্রিক লেখনীর মধ্যে কবিতা, গল্প, নাটক, উপন্যাস, স্মৃতি কথা মূলক গ্রন্থ সহ নানা লেখাতে ঔপনিবেশিক বাংলার শ্রমিকদের কথা প্রকাশ পেয়েছে। এই লেখালেখিগুলিতে বাংলার কৃষি শ্রমিক থেকে নিয়ে বিভিন্ন শিল্প ও কলকারখানার শ্রমিকদের কথা উঠে এসেছে। আবার একইসঙ্গে সাহিত্যকেন্দ্রিক ভাবনায় অনেক লেখাতে বাংলার নাবিক শ্রমিকদেরও প্রসঙ্গ উঠে এসেছে যা শ্রমিক ইতিহাস চর্চার আর এক অন্যতম খোরাক হিসাবে পরিগণিত। বাংলা হল নদী মাতৃক দেশ এখানে নদনদী, খাল-বিল প্রচুর সংখ্যায় থাকায় এখানকার দৈনন্দিন জীবনে মানুষের সঙ্গে নদীর সম্পর্ক ছিল অন্তরঙ্গ। বিশেষত পূর্ববঙ্গে (বর্তমান বাংলাদেশ) অসংখ্য নদ-নদী ও ব-দ্বীপ সমন্বিত জায়গায় মানুষদের জীবনযাত্রা অনেকটাই জলের সাথে সম্পর্কিত ছিল। নদীপথে মাছ ধরা, পণ্য পরিবহণ, যাত্রা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করার ফলে জলপথে এরা অনেকটাই অভিজ্ঞ ও দক্ষ হয়ে উঠেছিল। এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এরা অনেকেই জাহাজী শ্রমিক হিসাবে নিজেদের উপনীত করেছিল। সাহিত্যকেন্দ্রিক অনেক লেখাতেই এই শ্রমিকদের কথা বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে আলোচিত হয়েছে যা আমার আলোচনার মূল উপজীব্য বিষয়।

ঐতিহাসিক চেতনায় বাংলার শ্রমিক চর্চা ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সাহিত্য ভাবনা:

ঔপনিবেশিক সময়কালে বাংলার শ্রমিকেরা নানাভাবে ব্রিটিশ শাসকদের দ্বারা শোষিত, অত্যাচারিত ও নিপীড়িত হয়েছিল। এই শ্রমিকদের কথা ইতিহাস চর্চার মধ্যদিয়ে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে পরিবেশিত হতে দেখা গেছে। ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোয় পুঁজি শোষণ বাংলার শ্রমিকদের অবস্থা যে কতটা শোচনীয় করে তুলেছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মূলত ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের ছায়া ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগের পর ঔপনিবেশিক ভারতে শিল্পায়ন হিসাবে রূপায়িত হতে দেখা গিয়েছিল। একইভাবে ঔপনিবেশিক বাংলায় ১৮৫০ সালের পর পাট, কার্পাস, তাঁত, চা-বাগিচা, কয়লা খনি, রেলওয়ে, ট্রামওয়ে, লৌহ-ইস্পাত, জাহাজ, বন্দর প্রভৃতি শিল্পগুলি গড়ে উঠতে দেখা গিয়েছিল। এই গড়ে ওঠা শিল্প কারখানাগুলিতে বাংলার বহু শ্রমিক দলে দলে যোগদান করেছিল। এই শ্রমিকেরা একদিকে যেমন ঔপনিবেশিক পুঁজি মালিকদের দ্বারা শোষিত হয়েছিল অন্যদিকে এরা দেশীয় মুনাফা লোভী দালালদের দ্বারা প্রতারিত হয়ে বঞ্চনার শিকার হয়েছিল।[১৩] বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই শ্রমিকদের জীবন সংগ্রাম ইতিহাস চেতনায় এক গভীর জায়গা করে নিয়েছে। শ্রমিকদের জীবন সম্পর্কিত এই ইতিহাস চেতনা অনেক ক্ষেত্রে সাহিত্যকেন্দ্রিক ভাবনা থেকে গৃহীত হয়েছে যা শ্রম ইতিহাস চর্চাকে অনেকটা প্রভাবিত করেছিল।

ঔপনিবেশিক বাংলায় শ্রমিকদের জীবন সংগ্রামের বিভিন্ন দিক নিয়ে ঐতিহাসিকদের চুলচেরা বিশ্লেষণ শ্রমিক ইতিহাস চর্চার এক নতুন দিক উন্মোচন করে। একইসঙ্গে বাংলার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে শ্রমিকদের জীবন সংগ্রামের পর্বগুলি কেমন ছিল তা তৎকালীন কবি-সাহিত্যিকদের কবিতা, গল্প, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি সাহিত্যকেন্দ্রিক লেখনীগুলিতে খুঁজে পাওয়া যায়। ঔপনিবেশিক সময়কালে বাংলার স্বনামধন্য কবি ও সাহিত্যিকদের লেখনীগুলিতে শ্রমিকদের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে যা কেবলমাত্র তাঁদের কল্পনা প্রসূত দিক ছিল না, অনেক ক্ষেত্রেই তৎকালীন সমাজে সাধারণ মানুষ জীবিকার তাগিদে শ্রমিক হিসাবে জীবনধারণের যে প্রতিচ্ছাপ রেখেছে তা বিভিন্ন কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও নাটকে সাহিত্যকেন্দ্রিক ভাবনার দ্বারা ফুটে

উঠেছে। পুঁজি শোষণের সঙ্গে ঔপনিবেশিকতার অবকাঠামো যেভাবে বাংলার সমাজ জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল তা তৎকালীন সাহিত্যকেন্দ্রিক লেখনীগুলিতে খুঁজে পাওয়া যায়।

ঔপনিবেশিক বাংলায় চা-বাগিচা শ্রমিকদের অত্যাচারিত হওয়ার বিষয়টি দক্ষিণা চরণ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'চা-কর দর্পণ' (১৮৭৫)[১৪] নাটকে ফুটিয়ে তুলেছেন। শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' (১৯২৬)[১৫] গল্পে গ্রামের জমিদারের অত্যাচারে গফুর তার একমাত্র মেয়ে আমিনাকে নিয়ে চটকলে কাজের সন্ধানে শহরমুখী হয়েছিল। এখানে এদের চটকলের কাজে শহর অভিমুখী হওয়ার বিষয়টি একদিকে যেমন অত্যাচারী জমিদারের কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার এক উপায় হিসাবে ধরা হয়েছে তেমনি অন্যদিকে গ্রাম থেকে শহরে গিয়ে গফুরের শ্রমিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার বিষয়টিও খুব একটা সুখকর হয়নি কারণ গল্পে আমিনা অনেকক্ষেত্রে চটকলে কর্মরত শ্রমিকের স্ত্রী ও মহিলাদের মান ইজ্জত হানির আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল। আবার শরৎচন্দ্র তাঁর 'শ্রীকান্ত' (২য় পর্ব, ১৯১৮)[১৬] উপন্যাসে জাহাজের খালাসিদের অত্যাচারিত হওয়ার কথা ব্যাক্ত করেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখালেখিতে শ্রেণীবৈষম্য, শোষণ এবং সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে মার্কসীয় দৃষ্টিকোণের ছাপ পরিলক্ষিত হতে দেখা গেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'শিল্পী' (১৯৪৩)[১৭] গল্পটিতে মহাযুদ্ধের দুর্ভিক্ষকালীন পরিস্থিতিতে বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার দিকটি তুলে ধরেছেন। এখানে মদন তাঁতি চরিত্রের এক নিষ্ঠাবান তাঁতকর্মীর উল্লেখ পাওয়া যায়, এই হত দরিদ্র তাঁতি অতিকষ্টে জীবন কাটালেও কখনোও তার শিল্পীসত্ত্বাকে দালাল শ্রেণীর কাছে বিকিয়ে দেয়নি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'পদ্মা নদীর মাঝি' (১৯৩৬)[১৮] উপন্যাসে পদ্মা নদীকে কেন্দ্র করে মাঝিদের দারিদ্রতা ও প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে তাঁদের জীবিকা নির্বাহের এক চিত্র তুলে ধরেছেন। এর পাশাপাশি বাংলার স্বনামধন্য কবিদের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যেও ঔপনিবেশিক বাংলার শ্রমিকদের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। নজরুলের 'সাম্যবাদী' (১৯২৫)[১৯] কাব্যগ্রন্থের 'কুলি-মজুর' কবিতাটিতে শ্রমিকদের বাবু শ্রেণীর দ্বারা অত্যাচারিত ও শোষিত হওয়ার বিষয়টি ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের 'ওরা কাজ করে' (১৯৪১)[২০] কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন বড় বড় সাম্রাজ্য ধূলিসাৎ হয়ে গেলেও সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ মাটি আঁকড়ে তাদের কাজ চালিয়ে যায়। এই শ্রমজীবী মানুষেরা তাদের শ্রমের দ্বারা সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখে, তাদের প্রতিদিনের এই কাজ তাদেরকে সামাজের প্রকৃত নায়ক হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছে। আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনার তরী' (১৮৯৩)[২১] কাব্যগ্রন্থের 'সোনার তরী' কবিতায় বহু মর্মকথা উঠে এসেছে এবং তৎকালীন সময়ে এই কবিতা নিয়ে বহু বিতর্ক হতেও দেখা গিয়েছে। বর্ষায় মেঘ বাদলার দিনে নৌকা নিয়ে কৃষকের কষ্টসাধ্য পরিশ্রম ও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ধান কাটার বিষয়টি সুন্দরভাবে এই কবিতায় তুলে ধরা হয়েছে। কবি-সাহিত্যিকদের সাহিত্যকেন্দ্রিক বিভিন্ন লেখালেখিগুলি তৎকালীন সময়কালে মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশিত হত। এখানে লেখালেখিগুলিতে শ্রমিকদের প্রসঙ্গ টেনে কবি-সাহিত্যিকগণ শ্রমিকদের প্রতি এক রাশ ভালোবাসা দেখিয়েছেন। ১৯২০ সালে মুজফ্ফর আহ্মেদকে সঙ্গে নিয়ে নজরুল ইসলাম 'নবযুগ' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করেন। নজরুল গভীর ভাবে অনুভব করেছিলেন প্রতিবাদী আন্দোলনে শ্রমিক ও কৃষকদের সামনের সারিতে আনা প্রয়োজন, এই কারণে তিনি নিজ উদ্যোগ নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন 'লেবার স্বরাজ পার্টি' (১৯২৫) এবং 'বঙ্গীয় কৃষক শ্রমিক দল' (১৯২৭)। 'নবযুগ' (১৯২০) পত্রিকা প্রকাশ করার পরে কৃষক শ্রমিকদের একত্রিত করার জন্য নজরুল 'লাঙল' (১৯২৫) নামক আরও একটি পত্রিকা বের করেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর সম্পাদিত 'প্রবাসী' (১৯০১) পত্রিকায় শ্রমিকদের আন্দোলন ও জীবন সংগ্রামের কথা সুন্দরভাবে তুলে ধরেন। ঔপনিবেশিক সময়কালে সামাজব্যবস্থা এবং মানুষের স্বাধীনতার প্রশ্ন নিয়ে রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিমূলক প্রসঙ্গ টেনে 'অরণি' (১৯৪১) নামক এক সাময়িক পত্রিকা সত্যেন্দ্রনাথ

মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশ পায়। মুজফ্ফর আহ্মেদ সম্পাদিত 'গণবাণী' (১৯২৬) পত্রিকাটি কৃষক ও শ্রমিক দলের এক অন্যতম মুখপত্র হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল।

কবি-সাহিত্যিকদের সাহিত্য চেতনায় বাংলার নাবিক জীবন:

ঔপনিবেশিক বাংলায় উক্ত কবি-সাহিত্যিকদের লেখনীগুলিতে বিভিন্ন ধরণের শ্রমিকদের প্রসঙ্গ উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার নাবিকদের কথাও উঠে এসেছে। বাংলার নাবিকেরা যে কলকাতা ও চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজের কাজে নিয়োজিত হয়ে জাহাজী শ্রমিক রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল এসকল নাবিকদের প্রসঙ্গ নিয়ে কবি ও সাহিত্যিকদের লেখালেখির অন্ত নেই। আবার বাংলায় নদী এবং উপকূলবর্তী অঞ্চলে চলাচলরত বোট, স্টিমার ও স্টিমশিপ জাতীয় তুলনামূলক ছোট অন্তর্বর্তী জলযানগুলিতে অনেক সময় কবি-সাহিত্যিকদের যাত্রা সূত্রে জলপথে নাবিকদের জীবন কেমন ছিল তা প্রত্যক্ষভাবে দেখার প্রতিচ্ছাপ তাঁদের লেখার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। বাংলার এই কবি-সাহিত্যিকরা নাবিক সম্পর্কিত তাঁদের লেখনীগুলির মাধ্যমে সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলার নাবিকদের কর্মজীবন কীরূপ ছিল তার চিত্র খুব সহজভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। আবার আত্মজীবনী বা স্মৃতিমূলক গ্রন্থেও বাংলার নাবিকদের কথা উঠে আসে। মুজফ্ফর আহ্মেদ সন্দ্বীপে থাকাকালীন তাঁর বাল্য স্মৃতি কথায় বাংলার নদীকেন্দ্রিক জলযানগুলিতে নাবিকদের অবস্থান গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। চারিপাশে জল দ্বারা পরিবেষ্টিত সন্দ্বীপের অধিবাসীদের সেরূপ কোনো জীবিকা না থাকায় এরা দ্বীপ সাগরে গিয়ে বোট বা নৌকার কাজে যোগ দিয়েছিল। এসকল মানুষদের নিত্যদিন জলপথে যাতায়াত, মৎস শিকার, পণ্য পরিবহণ প্রভৃতি কাজগুলি নদীপথে এদের অনেকটা সাহসী করে তুলেছিল।[২২] এদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে এসকল মানুষদের কলকাতা বন্দর অভিমুখী করে জাহাজী শ্রমিক হিসাবে আত্মপ্রকাশের পথ দেখিয়েছিল। রূপদর্শী ছদ্মনামে লেখা 'রূপদর্শীর নক্শা'[২৩] গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায় পূর্ব বাংলা থেকে হাজারে হাজারে নাবিক এসে কলকাতা বন্দরে ভিড় জমিয়ে জাহাজের কাজে যোগদান করেছিল। এই নাবিকেরা কঠিন পরীক্ষার মধ্যদিয়ে সফল হয়ে CDC বা Continues discharge certificate হাতে পেয়েছিল।

বাংলার নাবিকদের নিয়ে কবি-সাহিত্যিকদের লেখালেখিগুলিতে একদিকে যেমন নদী, সমুদ্রের আকর্ষণীয় প্রাকৃতিক চিত্র বর্ণিত হতে দেখা গেছে তেমনি অন্যদিকে জাহাজের পাটাতনে নাবিকদের অবিরত জীবন সংকুল পরিস্থিতি ও কর্মজীবনের সংগ্রামের দিকটিও ফুটে উঠেছে। অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'নদীপথে' (আষাঢ়, ১৩৪৪)[২৪] ভ্রমণ কাহিনীতে বাংলার নাবিকদের জীবন সম্পর্কে নানা তথ্য উঠে এসেছে। এখানে লেখক, নাবিকরা জলযানগুলিতে কীভাবে কর্মসম্পাদন করত ও জাহাজের প্রতিকূল পরিস্থিতি সামাল দেওয়া থেকে নিয়ে জলপথে যাত্রাকালের বিভিন্নধরণের খুঁটিনাটি তথ্য এই ভ্রমণ কাহিনীতে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করেছেন। বাংলা ও আসামে প্রবাহিত নদীতে চলাচলরত অভ্যন্তরীণ জলযানগুলিতে ভ্রমণকালে লেখক নাবিকদের জীবনধারণ এবং তার সঙ্গে নদীপথ ও নদী ঘাট স্টেশনের (জগন্নাথ ঘাট, গোয়ালন্দ ঘাট, চাঁদপুরি ঘাট, ফুলছড়ি ঘাট প্রভৃতি) নানা তথ্য উল্লেখ করেছেন। এর পাশাপাশি নদীতে চলাচলরত মিঙ্গিন, গুর্খা, দোয়ারি, মূলতানি প্রভৃতি স্টিমশিপ জলযানগুলির কথাও আমরা লেখকের বর্ণনায় জানতে পারি। এছাড়া নদীপথে অভ্যন্তরীণ জলযানে কর্মরত নাবিকদের সারেঙ, মাস্টার, মেটস্ এবং ড্রাইভার প্রভৃতি উচ্চপদ থেকে নিম্নপদের জায়গাগুলি সম্পর্কেও সম্যক ধারণা লাভ করি। ঔপনিবেশিক সময়ে বাংলার নাবিকদের ইউরোপীয় নাবিকদের তুলনায় মাইনে কতটা কম প্রদান করা হত তা এই ভ্রমণ কাহিনীর এক জায়গায় তুলে ধরা হয়েছে। নোয়াখালীর এক সারেঙ যার দীর্ঘ ২৫ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও তার বেতন ছিল ১৮০ টাকা, যেখানে একই দক্ষতা ও যোগ্যতা সম্পন্ন ইউরোপীয় নাবিকেরা পেত ৫০০ টাকা।[২৫] অচিন্ত্যকুমার

সেনগুপ্তের 'সারেঙ' (অগ্রহায়ণ, ১৩৫৪)[২৬] গল্পে দরিদ্র কৃষক পরিবারের নাসিম নামে এক বালক কিছু খাবারের জন্য দীর্ঘদিন জাহাজের সারেঙ –এর ফাইফরমাশ খেটে পদোন্নতি পেয়েছিল। এখান থেকে বোঝা যায় জাহাজে নাবিকদের পদোন্নতি লাভের প্রক্রিয়াটি খুব একটা সহজসাধ্য ছিল না, দীর্ঘদিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে তবেই মিলত উচ্চপদ। বাংলার একজন অন্যতম প্রতিভাদীপ্ত সাহিত্যিক ছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। বাংলার নদী, বন্দর ও জাহাজকে কেন্দ্র করে এক শ্রেণীর মানুষ যে জীবিকা নির্বাহ করেছিল তাদের কথা তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর সাহিত্য ভাবধারায়। তাঁর 'তিমির-তীর্থ' (১৯৪৪)[২৭] উপন্যাস এবং 'ভাঙা বন্দর' (১৯৪৫)[২৮] গল্পে নদ-নদী, স্টিমার, বন্দর প্রসঙ্গে বাংলার নাবিকদের কথাও উঠে এসেছে। নদী বন্দরকে কেন্দ্র করে জাহাজের আসা-যাওয়া ও বন্দরকে নির্ভর করে বিভিন্ন শিল্পের উদ্ভাবন ঘটে শহর গড়ে ওঠার বিষয়টি 'ভাঙা বন্দর' ছোট গল্পে সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। এখানে উঠে এসেছে ঝালকাঠি বন্দরটি কীভাবে অবক্ষয় ও ধ্বংসের মুখে পতিত হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময় ঔপনিবেশিক শোষণ এতটাই চরম পর্যায়ে ছিল যে ঝালকাঠি বন্দর সংলগ্ন তেলমিলগুলি প্রায় বন্ধ হতে বসেছিল। সৈয়দ মুজতবা আলির 'নোনাজল' (১৯৫৩)[২৯] গল্পে সমীরুদ্দীর জাহাজে দীর্ঘদিন কঠোর পরিশ্রম করে যে অর্থ উপার্জন করেছিল তা তার ছোটভাই কীভাবে অপব্যয় করেছিল সে কথা ভগ্ন হৃদয় নিয়ে এক সারেঙকে শুনিয়েছিল। পাশ্চাত্যে ভ্রমণকালে জাহাজে নাবিকদের বয়লারে আগুনের সামনে কঠোর পরিশ্রমের কথা বিবেকানন্দ তাঁর 'পরিব্রাজক' (মাঘ, ১৩১২)[৩০] ভ্রমণ বৃত্তান্তে তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'নৌকাডুবি' (১৯০৬)[৩১] উপন্যাসে দেখিয়েছেন রমেশ খালাসিদের কাছ থেকে রান্না করা খাবার এনেছিল বলে তাকে কমলার কাছে ভর্ৎসনার শিকার হতে হয়েছিল। তাঁরই 'ছুটি' (১২৯৯ বঙ্গাব্দ)[৩২] গল্পে জাহাজের খালাসিদের উল্লেখ পাওয়া যায় যেখানে খালাসিদের কাছি ফেলে জলের গভীরতা মাপার বিষয়টি অতল গভীরে ফটিকের মৃত্যুকালীন যাত্রার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জাপান-যাত্রী' (১৯১৯)[৩৩] ভ্রমণ কাহিনীতে জাহাজ সমুদ্রে দুর্যোগ পরিস্থিতির মধ্যে পড়লে নাবিকদের তৎপরতার সঙ্গে নানা ক্রিয়া-কর্ম করে জাহাজকে সুরক্ষিত রাখার প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালানোর বিষয়টি লক্ষ্য করেছেন। এছাড়া 'গোরা' (১৯১০)[৩৪] উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ জাহাজের খালাসিরা কর্মকালে যাত্রীদের সঙ্গে যে খারাপ আচরণ করেছিল সে বিষয়টি তুলে ধরেছেন।

বাংলা সাহিত্যে আরও বহু কিছু লেখায় বাংলার নাবিকদের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হতে দেখা গিয়েছে। এই লেখাগুলির মধ্যে অন্যতম হল রবীন্দ্রনাথের 'রবিবার' (১৩৪৬ বঙ্গাব্দ)[৩৫] গল্প, 'সহযাত্রী' (১৯৩২)[৩৬] কবিতা, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্মৃতির রেখা' (১৩৬২ বঙ্গাব্দ)[৩৭], 'অভিযাত্রিক' (১৯৪০)[৩৮], 'হীরামানিক জ্বলে' (১৯৪৬)[৩৯], অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কোট্‌রা' (১৩২৬ বঙ্গাব্দ)[৪০], শরৎচন্দ্র চট্টপাধ্যায়ের 'চরিত্রহীন' (১৯১৭)[৪১], জীবনানন্দ দাশের 'সাতটি তারার তিমির' (১৯৪৮)[৪২] কাব্যগ্রন্থের 'নাবিক' এবং 'নাবিকী' কবিতা, প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা 'প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমগ্র কবিতা' (১৩৯৬ বঙ্গাব্দ)[৪৩] অংশে 'বেনামী বন্দর' ও 'জাহাজের ডাক' কবিতা, শঙ্কু মহারাজের 'গঙ্গাসাগর' (১৩৬৭ বঙ্গাব্দ)[৪৪] যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'সুন্দরবনের চিঠি' (১৩৭০ বঙ্গাব্দ)[৪৫] প্রভৃতি। এই সকল গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও ভ্রমণ কাহিনীতে কবি-সাহিত্যিকেরা নাবিক শ্রমিকদের কর্মজীবন সম্পর্কিত নানা তথ্য তুলে ধরেছেন যা সাহিত্য চেতনায় পরিস্ফুটিত হয়েছে।

উপসংহার:

বাংলার নাবিকদের নিয়ে কবি-সাহিত্যিকদের লেখালেখিগুলি তৎকালীন ব্রিটিশ শাসিত বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল। ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোয় বাংলার নাবিকরা যে এক শ্রেণীর কাছে শোষিত, নিপীড়িত ও অত্যাচারিত হয়েছিল তা সাহিত্যকেন্দ্রিক লেখায় অনেকাংশে উঠে এসেছে। সামাজিক এই অসাম্য বা শ্রেণী বিভাজন যেখানে এক শ্রেণী আর এক শ্রেণীর দ্বারা শোষিত ও

শাসিত, এই মার্কসীয় চেতনা সাহিত্যে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। ঔপনিবেশিক সময়ে বাংলার নাবিকেরা এই শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন, সমাবেশ ও ধর্মঘট করে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। এই শ্রমিকদের প্রতিবাদ ও অভাব-অভিযোগের বিষয়গুলি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এদের সামাজিক অবস্থান ও জীবন সংগ্রামের নানাদিকগুলি সাহিত্য সম্বলিত কবিতা, গল্প, নাটক, উপন্যাস, ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়েছিল। এই লেখনীগুলি শ্রমিকদের ঔপনিবেশিক পুঁজি শোষণ ও শাসিত হওয়ার দিক সম্পর্কে অনেকটাই সচেতনশীল করে তুলেছিল যা সাহিত্যকেন্দ্রিক ভাবনায় শ্রমিক ইতিহাস চর্চার এক অন্যতম জায়গা রাখে।

তথ্যসূত্র:

১. Marx, Karl. Capital Vol. 1. London, Penguin Books, 1982.

২. Engels, Frierich. Condition of the Working Class in England. Otto Wigand, Leipzing, 1845.

৩. Lenin, V. I. Imperialism. The Highest Stage of Capitalism, Moscow, Foreigen Languages Publishing House, 1917.

৪. Hobsbawam, E. J. Labouring Men: Studies in the history of Labour. New York, Anchor Books, 1964.

৫. Thompson, E. P. The Making of the English Working Class. New Delhi, Penguin Books, 1980.

৬. Bose, Sanat Kumar. Capital and Labour in the Indian Tea Industry. Bombay, All-India Trade Union Congress, 1954.

৭. সেন, সুকোমল। ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস ১৮৩০–২০০০। কলকাতা, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি, ২০০৫।

৮. Chakrabarty, Dipesh. Rethinking Working-Class History, Bengal 1890 to 1940. Princeton, Princeton University Press, 2000.

৯. Basu, Nirban. The Working-Class Movement, A Study of Jute Mills of Bengal 1937-47. Calcutta, K.P. Bagchi & Company, 1994.

১০. Bagchi, Amiya Kumar. Capital and Labour Redefined, India and the Third World. Delhi, Tulika Books.

১১. Basu, Subho. Does Class Matter? Colonial Capital and Workers' Resistance in Bengal, 1890 – 1937. New Delhi, Oxford University Press, 2004.

১২. Sen, Samita. Women and Labour in Late Colonial India, The Bengal Jute Industry. Cambridge, Cambridge University Press, 1999.

১৩. Panikkar, K. N., Byres, Terence J & Patnaik, Utsa (eds.). The Making of History, Essays Presented to Irfan Habib. New Delhi, Tulika Books, 2000, pp. 315-317. ঔপনিবেশিক সময়ে ইউরোপীয় শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত উচ্চপদে স্থলাভিষিক্ত অফিসার বর্গের লোকেরা গ্রামের প্রান্তিক অঞ্চল থেকে শ্রমিক সংগ্রহের জন্য কিছু দেশীয় লোককে নিয়োগ করেছিল এরা 'সর্দার', 'বাবু', 'সাহেব' নামে পরিচিত ছিল। এরা স্বল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিত গ্রামের সাধারণ নিরীহ লোকেদের কাজ পাইয়ে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে শিল্প কারখানায় এনে ঘুষ সহ বিভিন্নপ্রকার মুনাফা গ্রহণ করে এই শ্রমিকদের আর্থিক দিক দিয়ে প্রতারিত করেছিল।

১৪. গোস্বামী, প্রভাতকুমার (সম্পাদিত)। ঊনিশ শতকের দর্পণ-নাটক। চট্টোপাধ্যায়, দক্ষিণা চরণ। চা-কর দর্পণ। কলকাতা, শুকসারী প্রকাশক, ১৯৫৮, পৃ. ১২৯-১৭৫।

১৫. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র। মহেশ। প্রথম বঙ্গবাণী পত্রিকায় ১৯২২ সালে প্রকাশিত।

১৬. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র। শ্রীকান্ত ২য় পর্ব। কলকাতা, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড, প্রকাশকাল ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ।
১৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক। শ্রেষ্ঠ গল্প। শিল্পী, ঢাকা, অবসর প্রকাশনা, ১৯৯৮, পৃ. ১২৪-১২৯।
১৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক। পদ্মা নদীর মাঝি। কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ১৯৩৬।
১৯. ইসলাম, কাজী নজরুল। সাম্যবাদী, কুলি-মজুর। ১৯২৫ সালে প্রথম লাঙল পত্রিকায় প্রকাশিত, পৃ. ৯৪।
২০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। সঞ্চয়িতা, ওরা কাজ করে। বিশ্বভারতী, বীরভূম, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮২৯ - ৮৩০।
২১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। সোনার তরী (১৮৯৩), সোনার তরী। কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৮৯৩, পৃ. ১৭১।
২২. আহ্‌মেদ, মুজফ্‌ফর। আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। কলকাতা, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি, ১৯৬০, পৃ. ২৩।
২৩. রূপদর্শী, রূপদর্শীর নক্‌শা। মিত্রালয়, কলকাতা, ১৯৫২, পৃ. ১৭।
২৪. গুপ্ত, অতুলচন্দ্র। নদীপথে। কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, প্রকাশকাল ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ।
২৫. তদেব, পৃ. ১৩।
২৬. সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার। সারেঙ। কলকাতা, দিগন্ত পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ।
২৭. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ। তিমির-তীর্থ। কলকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ।
২৮. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ। ভাঙা বন্দর। কলকাতা, কমলা পাবলিশিং হাউস, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ।
২৯. আলী, সৈয়দ মুজতবা ও মজুমদার, রঞ্জন। দ্বন্দ্ব মধুর। আলী, সৈয়দ মুজতবা। নোনাজল। কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, প্রকাশকাল শ্রাবণ, ১৩৬০।
৩০. স্বামী বিবেকানন্দ, পরিব্রাজক। কলকাতা, রামকৃষ্ণ মিশন, প্রকাশকাল মাঘ, ১৩১২, পৃ. ৪৬-৪৭।
৩১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। নৌকাডুবি। কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, প্রথম প্রকাশ ১৯০৬, পৃ. ১০১–১০২।
৩২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। গল্পগুচ্ছ, ছুটি। কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২০২।
৩৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। জাপান-যাত্রী। বীরভূম, শান্তিনিকেতন প্রেস, ১৯২৬, পৃ. ১৭।
৩৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। গোরা। ঢাকা, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ পৃ. ৬৩ - ৬৪।
৩৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। গল্পগুচ্ছ, রবিবার। কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ।
৩৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। পুনশ্চ, সহযাত্রী। কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ।
৩৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। স্মৃতির রেখা। কলকাতা, ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ।
৩৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। অভিযাত্রিক, কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ।
৩৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। হীরামানিক জ্বলে, কলকাতা, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি, ১৯৪৬।
৪০. ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। অবনীন্দ্র রচনাবলী চতুর্থ খন্ড। কোট্‌রা, কলকাতা, প্রকাশ ভবন, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ।
৪১. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র। চরিত্রহীন। কলকাতা, কামিনী প্রকাশালয়, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ।
৪২. দাশ, জীবনানন্দ। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, সাতটি তারার তিমির, নাবিক, নাবিকী। কলকাতা, নাভানা, ১৯৫৪।
৪৩. মিত্র, প্রেমেন্দ্র। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমগ্র কবিতা, বেনামী বন্দর, জাহাজের ডাক। কলকাতা, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৯।
৪৪. শঙ্কু মহারাজ, গঙ্গাসাগর। অমর সাহিত্য প্রকাশন, কলকাতা, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ।
৪৫. গুপ্ত, যোগেন্দ্রনাথ। সুন্দরবনের চিঠি। কলকাতা, বিদ্যালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1509-1517
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.372

প্রতিবাদী ভাবধারায় সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতার পাঠ বিশ্লেষণ

জুলিয়েট দীপা বিশ্বাস, *গবেষক, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.03.2026; Accepted: 21.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The teenage poet Sukanta Bhattacharya requires no new introduction in the realm of Bengali poetry. Born in 1926, he graced this world for a very brief period before passing away in 1947. He primarily took up his pen to protest against the Second World War, the Great Famine of 1350 (Bengali era), fascist aggression, communal riots, and the exploitation and oppression by wealthy hoarders. In the history of Bengali literature, he remains a rare and exceptional poet. In 1944, Sukanta Bhattacharya obtained membership in the Communist Party and used to edit the 'Kishore Sabha' section of the party's daily newspaper. A firm believer in Marxist ideology, he authored several significant volumes of poetry, including: 'Chharpatra' (1947), 'Ghum Nei' (1954), 'Purbabhas' (1950), 'Mithekora' (1951), 'Hartal' (1962). Despite his short lifespan, Sukanta was deeply conscious of global events and politics. Although his career in poetry was not long, his work continues to evoke intense interest among readers. He was deeply absorbed in creating inspiration for the liberation of the masses. While he mastered the art of writing people-centric poetry, he was greatly inspired by the ideals of Lenin. His defiant voice continues to attract both common people and Bengali readers alike.

As a progressive poet, he was never detached from national or international developments. He observed ongoing events and the future with great awareness. The horrors of the Second World War deeply stirred his poetic soul. Protests, movements, famines, the cries of helpless and starving people, and the life struggles and agonies of the common man turned his poetry into a voice of rebellion. Through metaphors, he protested against the oppression of the common classes by money-hungry, selfish owners and hoarders. In truth, he became one with the exploited and oppressed. This is why he could easily claim: "I am a poet of famine, daily I see the clear reflection of nightmares of death. My spring is spent in food queues." There is no doubt about the timelessness of his poems such as 'Bidroher Gan', 'Siri', 'Ekta Moreger Kahini', 'Bodhan', 'Priyatamasu', 'Kolom' and 'Rabindranather Proti'. Both Sukanta Bhattacharya and his poetry remain, and will always remain, immortal in the hearts of Bengali readers.

Keywords: Famine, Deceiver, Humiliation, Rival, Self-interested

বাংলা কাব্যসাহিত্যে এক জনপ্রিয় নাম সুকান্ত ভট্টাচার্য। তাঁর নতুন করে আর পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। তিনি বাংলা কাব্যসাহিত্যে এক বিরল প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর মতো এমন সহজ, সরল ও বলিষ্ঠবোধ সম্পন্ন ব্যক্তির আবির্ভাব কোনোকালেই ঘটেনি। তাঁর পূর্ববর্তী এমনকি পরবর্তী কালেও। তিনি

নবযুগের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অত্যন্ত সহজ-সরল ভাবনার মাধ্যমে সর্ববোধগম্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ছাড়পত্র' (১৯৩৪-১৯৪৭ খ্রি.), তারপর একে একে রচনা করেছেন 'ঘুম নেই' (১৯৫৪ খ্রি.), 'পূর্বাভাস' (১৯৫০ খ্রি.), 'মিঠেকড়া' (১৯৫১ খ্রি.), 'হরতাল' (১৯৬২ খ্রি.), 'ছড়ার বই' প্রভৃতি। সেই সময় ঘটে যাওয়া ঘটনা একদিকে যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষ, বন্যা আর মহামারী; অন্যদিকে জীবন প্রতিষ্ঠার মৃত্যুপণ সংগ্রাম। সাধারণ মানুষের জয়-পরাজয়, উত্থান-পতন, আশা-নিরাশায় ঘেরা জীবন আবার অপরদিকে অত্যাচার, লাঞ্ছিত, শোষিত, পীড়িত, অনাহারে মৃত মানুষের ছবি দেখতে দেখতে তাঁর কবিতা হয়ে উঠেছে তলোয়ারের মতো ধারালো। তিনি হয়ে উঠেছেন এক প্রতিবাদী কবি। তাঁর কবিতার মধ্যে আমরা দেখতে পাই একদিকে দেশপ্রেম, সমাজের সাধারণ মানুষ, কৃষক-শ্রমিক শ্রেণি মানুষদের দুঃখ-দুর্দশার কথা ও প্রতিবাদী চেতনা। তাঁর কবিতা সম্পর্কে কবিবন্ধু সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেছেন—

> "সুকান্তের কবিতা শুধুই বিরাট সম্ভাবনার ইঙ্গিত নয়, তাতে আছে মহৎ পরিণতির সুস্পষ্ট পদধ্বনি।.....কবিতার বিচিত্র কলাকৌশলে, ছন্দের আশ্চর্য দক্ষতায়, শব্দ নির্বাচনের অশেষ নৈপুণ্যে এই কবি কিশোরের রাজনৈতিক বিরুদ্ধবাদীদেরও অভিভূত করেছে।"[১]

আমার প্রবন্ধের মূল আলোচনার বিষয় 'প্রতিবাদী ভাবধারায় সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতার পাঠ বিশ্লেষণ'। সেদিকে আলোকপাত করার চেষ্টা করা যাক। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে। মৃত্যু হয় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে। তিনি খুব স্বল্প সময়ের জন্য এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। এই সময়ের মধ্যে কবি চোখের সামনে ঘটতে দেখেছেন নানা অরাজকতা, পঞ্চাশের মন্বন্তর, ফ্যাসিবাদী আন্দোলন, দুর্ভিক্ষের জীবন্ত কঙ্কালসার মানুষদের শোভাযাত্রা, বন্দীমুক্তি আন্দোলন প্রভৃতি এই সমস্ত দেখতে দেখতে তিনি অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। তাই তাঁর কবিতার মধ্যেও তীব্রভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। ফলে কবিতা হয়ে উঠেছে খাপহীন তলোয়ারের মতো ঝাঁ চকচকে তীক্ষ্ণ ও ধারালো। যুদ্ধ বিধ্বস্ত ভারতবর্ষের চিত্র দেখতে দেখতে তাঁর হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। তিনি অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে তাঁর 'অনুভব' কবিতায় বলেছেন—

> "অবাক পৃথিবী! অবাক করলে তুমি
> জন্মেই দেখি ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি।
> অবাক পৃথিবী! আমরা যে পরাধীন
> অবাক, কী দ্রুত জমে ক্রোধ দিন দিন।" (অনুভব/ছাড়পত্র)

তিনি জন্ম থেকেই জ্বলছেন অর্থাৎ বলা যায় তিনি জীবনভর জ্বলেছেন চারপাশের পরিস্থিতি দেখে। সেই জ্বালা যন্ত্রণারই প্রতিফলন দেখা যায় তাঁর কবিতার মধ্যে। যে শিশু জন্মগ্রহণ করেছে পৃথিবীতে তার মধ্যেও তিনি প্রতিবাদী ভাবনা খুঁজে পেয়েছেন—

> "যে শিশু ভূমিষ্ঠ হলো আজ রাত্রে
> তার মুখে খবর পেলুম
> সে পেয়েছে ছাড়পত্র এক,
> নতুন বিশ্বের দ্বারে তাই ব্যক্ত করে অধিকার
> জন্মমাত্র সুতীব্র চিৎকারে।
> এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি
> নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।" (ছাড়পত্র)

সদ্য জন্ম নেওয়া শিশুটির প্রতি কবির যে দরদ ছিল তাকে কি সত্যিকারের একটি সুস্থ বাসযোগ্য পৃথিবীতে স্থান করে দিতে পেরেছিলেন? নাকি এ দরিদ্র পীড়িত শিশুরা চিরকালই অবহেলিত? এখনও যারা পথে-ঘাটে

ঘুরে বেড়ায়, তীব্র শীতের মধ্যেও উলঙ্গ হয়ে ফুটপাতে শুয়ে রাত কাটায়, তাদের নিয়ে কারও মাথা ব্যথা নেই। সেই সমস্ত শিশুদের জন্য কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ভাবনা—

"হে সূর্য!
তুমি আমাদের উত্তাপ দিও
শুনেছি তুমি এক জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড
তোমার কাছে উত্তাপ পেয়ে পেয়ে
একদিন হয়ত আমরা প্রত্যেকেই এক একটা
অগ্নিপিণ্ডে পরিণত হবো।
তারপর সেই উত্তাপে যখন পুড়বে আমাদের জড়তা।
তখন হয়ত গরম কাপড়ে ঢেকে দিতে পারব
রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।" (প্রার্থী/ছাড়পত্র)

তিনি নিজেকে দুর্ভিক্ষের কবি হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। তাঁর সমকালীন দুঃখ-দুর্দশার ও মনুষ্যত্বের চরম লাঞ্ছনার কথা ব্যক্ত করেছেন। চোখের সামনে দেখেছেন মৃত্যুর সুস্পষ্ট ছবি। তাঁর দিন কেটেছিল খাদ্যের লাইনে দাঁড়িয়ে। তাইতো কবি উচ্চারণ করেছেন—

"আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি,
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি, মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।
আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়,
আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়," (রবীন্দ্রনাথের প্রতি/ছাড়পত্র)

ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষ থেকে যখন শুরু হয়েছিল বাংলা বাঁচাও আন্দোলন, তখন কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তা মেনে নিতে পারেননি। শহরের রাজপথে নগ্ন ক্ষুধার্ত মানুষের মিছিল দেখে কবি তীব্র কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন—

"একদা দুর্ভিক্ষ এল
ক্ষুধার ক্ষমাহীন তাড়নায়
পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি সবাই দাঁড়ালে একই লাইনে
ইতর ভদ্র, হিন্দু আর মুসলমান
একই বাতাসে নিলে নিঃশ্বাস।
চাল, চিনি, কয়লা, কেরোসিন?
এসব দুষ্প্রাপ্য জিনিসের লাইন।" (ঐতিহাসিক/ছাড়পত্র)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রভাব কবি চোখের সামনে দেখেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়ংকর বিধ্বংসী রূপ কবির অন্তরকে ব্যথিত করে তুলেছিল। ক্ষুব্ধ কবি বলেছিলেন—

"দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশে অতর্কিতে শত্রু তার পদচিহ্ন রাখে
এখনো শত্রুকে ক্ষমা? শত্রু কি করেছে ক্ষমা
বিধ্বস্ত বাংলাকে?
আজকের এ মুহূর্তে অবসন্ন শ্মশানস্তব্ধতা,
কেন তাই মনে মনে আমি প্রশ্ন করি সেই কথা।
তুমি কি ক্ষুধিত বন্ধু? তুমি কি ব্যাধিতে জরোজরো?
তা হোক, তবুও তুমি আর এক মৃত্যুকে রোধ করো।" (মণিপুর/ঘুম নেই)

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি রাজনৈতিক কবিতা রচনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন এবং সফলতা লাভও করেছিলেন। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেছেন—

> "সুকান্ত রাজনীতির কাঁধে চড়েনি। রাজনীতিকে নিজের করে নিয়েছিল। রাজনৈতিক আন্দোলন ও সুকান্ত দিয়েছে তাই সানন্দ স্বীকৃতি। নিজেকে নিঃশর্তে জীবনের হাতে সঁপে দেওয়াতেই স্বতোৎসারিত হতে পেরেছিল সুকান্তর কবিতা"[২]

আবার, তাঁর রাজনৈতিক সহকর্মী অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য বলেছেন—

> "একে অবরুদ্ধ লেলিনগ্রাডের রক্তাক্ত প্রতিরোধ ও স্টালিনগ্রাদের পতিগৃহের হাতাহাতি লড়াই, লাল ফৌজের পাল্টা আক্রমণ ও শেষ পর্যন্ত হিটলারসহ বর্বর ফ্যাসিস্ট শক্তির চূড়ান্ত পরাজয় বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রের এই অনিবার্য জয়যাত্রা সুকান্তর মনে এনে দিয়েছিল এক উদ্দাম উদ্দীপনা। তারই প্রতিফলন তার কবিতার সর্বত্র, তাই তার কবিতার মেজাজে এতো জেহাদ ও এতো গভীর আত্মপ্রত্যয়।"[৩]

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ডাকে সারা বাংলা জুড়ে ধর্মঘট আহ্বান করলে কলকারখানা, অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ কেউ বাদ যায়নি; সকলেই দলে দলে যোগ দিয়েছে। তা কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'অনুভব' কবিতায় ধরা পড়েছে—

> "এত বিদ্রোহ কখনো দেখেনি কেউ
> দিকে দিকে ওঠে অবাধ্যতার ঢেউ;
> স্বপ্নচূড়ার থেকে নেমে এসো সব–
> শুনেছ? শুনছ উদ্দাম কলরব?
> নয়া ইতিহাস লিখছে ধর্মঘট;
> রক্তে রক্তে আঁকা প্রচ্ছদ পট।
> প্রত্যহ যারা ঘৃণিত ও পদানত
> দেখ আজ তারা সবেগে সমুদ্যত;" (অনুভব/ছাড়পত্র)

তাঁর 'বিদ্রোহের গান' কবিতাটির কথা না বললে আমাদের এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এই কবিতাটি পড়লে আমাদের সামনে কবির বিদ্রোহী সত্তার সুস্পষ্ট ছবি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে—

> "মানবো না বাধা, মানবো না ক্ষতি
> চোখে যুদ্ধের দৃঢ় সম্মতি
> রুখবে কে আর এ অগ্রগতি সাধ্য কার?
> রুটি দেবে নাকো? দেবে না অন্ন?
> এ লড়াইয়ে তুমি নও প্রসন্ন?
> চোখ-রাঙানিকে করি না গন্য ধারি না ধার।" (বিদ্রোহের গান)

বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গণআন্দোলন কর্মী সোমেন চন্দ সমাজবিরোধীদের হাতে নিহত হন। তাঁর প্রতি কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতায় ঝলসে ওঠে—

> "হত্যা চলে শিল্পীদের, শিল্প আক্রান্ত
> দেশকে যারা অস্ত্র হানে তারা তো নয় ভ্রান্ত
> বিদেশী চর ছুরিকা তোলে দেশের হৃদবৃন্তে

সংস্কৃতির শত্রুদের পেরেছি তাই চিনতে।" (ছুরি/ঘুম নেই)

চট্টগ্রামে বারবার বোমা পড়লে কবি চেয়েছিলেন চট্টগ্রামে স্তালিনগ্রবাদের পথ অনুসরণ করবে—

"বন্ধু তোমরা ছাড়ো উদ্বেগ সুতীক্ষ্ণ করো চিত্ত
বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি বুঝে নিক দুর্বৃত্ত।"

কবির হাতে কোনোকিছুই বাদ যায়নি। কৃষক শ্রমিকদের ওপর মালিক জমিদারদের অকথ্য অত্যাচারের করুণ পরিণতির ছবিও তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি জানতেন যারা ক্ষেতের ফসল ফলায় তাদের নিজেদের জন্য একমুঠো অন্নও থাকে না। অভুক্ত অবস্থায় থাকতে হয়। কেননা মন্বন্তরের সময় মজুতদারেরা খাদ্য মজুত করে রেখেছে নিজেদের মুনাফা লাভের জন্য আর অনাহারে মরছে সাধারণ শ্রমিক শ্রেণির মানুষ। তা দেখে কবি কৃষকদের উদ্দীপ্ত করতে চেয়ে বলেছেন—

"তোমার ক্ষেতের শস্য
চুরি করে যারা গুপ্ত কক্ষেতে জমায়
তাদেরি দু পায়ে প্রাণ ঢেলে দিলে দুঃখ ক্ষমায়।" (বোধন)

অসহায় দরিদ্র পীড়িত সাধারণ শ্রেণির ওপর শোষণের নিদারুণ চিত্র দেখতে দেখতে কবি হয়ে উঠেছিলেন ব্যঙ্গ বিদ্রুপাত্মক। শোষণ ত্রাষণের ভয়ে তাড়া খেতে খেতে অসহায় সাধারণ শ্রেণির মানুষ এসে পড়েছে এক দুর্গম পাহাড়ের পাদদেশে। সে পাহাড়ের কাছ থেকে ফেরবার আর কোনো পথ নেই। তাই কবিকে বলতে শুনি—

"দগ্ধ হৃদয়ে যদিও ফেরাও ঘাড়
সামনে পেছনে কোথাও পাবে না পারে।" (বোধন)

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য একদিকে সাধারণ মানুষের ওপর হওয়া অত্যাচারের কথা যেমন বলেছেন অপরদিকে মালিক মজুতদারের কাছে জানতে চেয়েছেন—

"শোনরে মালিক, শোনরে মজুতদার
তোদের প্রাসাদে জমা হল কত মৃত মানুষের হাড়
হিসাব দিবি কি তার?" (বোধন)

প্রতিবাদের দৃঢ় কণ্ঠ চিনিয়ে দেয় সচেতন সাধারণ শ্রেণির মানুষকে। অনেক অন্যায় অত্যাচার ও যন্ত্রণার ফলে মানুষ উঠে দাঁড়িয়েছে অর্থাৎ ঘুরে দাঁড়িয়েছে মানুষ তাদের নিজেদের প্রাপ্য ছাড়তে রাজি নয়। বরং তাদের উপর হওয়া অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে এগিয়ে এসেছে। প্রয়োজনে চাষের জমিতে ফসল নয় মজুতদারদেরই রোপণ করবে, আত্মীয়-স্বজন হারানো চিতায় জ্বালাবে শোষিত, অত্যাচারিত মানুষদের চিতা।

"আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউই
স্বজনহারানো শ্মশানে তোদের
চিতা আমি তুলবই।
শোন্ রে মজুতদার,
ফসল ফলানো মাটিতে রোপণ
করব তোকে এবার।" (বোধন)

প্রতিবাদে মুখর নির্যাতিত সাধারণ শ্রেণির মানুষ শেষ পর্যন্ত এই বিশ্বাস ও উপলব্ধিতে পৌঁছাতে পেরেছে যে ক্ষমতালোভী স্বার্থান্বেষী মানুষ অধিকাংশ সময়ই সাধারণ শ্রেণির মানুষের কাছ থেকে তাদের স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নেয়, পৃথিবীটাকে সাধারণ শ্রেণির মানুষের বাসযোগ্য থাকতে দিচ্ছে না। তারা

কখনোই মানুষের পরিচয়ে উপযুক্ত হতে পারে না। নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের হয়ে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য স্বপ্ন দেখেছেন—

"তারপর বহুশত যুগ পরে
ভবিষ্যতের কোনো যাদুঘরে
নৃতত্ত্ববিদ্ হয়রান হয়ে মুছবে কপাল তার,
মজুতদার ও মানুষের হাড়ে মিল খুঁজে পাওয়া ভার।
তেরোশো সালের মধ্যবর্তী মালিক, মজুতদার
মানুষ ছিল কি? জবাব মেলে না তার।" (বোধন)

নতুন করে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের মধ্য দিয়েই মানুষ বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজে পায়, নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে।

তিনি শোষিত নিপীড়িত জনগণের পাশে সবসময় ছিলেন এবং হতবাক হয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন— 'ধূর্ত প্রবঞ্চকদের কিভাবে ঈশ্বর ক্ষমা করেছেন'। এ ভাবনা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে মিলে যায়। যেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন— "তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?" আবার একই কথা কাজী নজরুল ইসলামও বলেছিলেন—

"যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মানুষের মুখের গ্রাস।
যেন লেখা হয় আমার রক্ত লেখায় তাদের সর্বনাশ।" (আমার কৈফিয়ৎ)

আর সেখানে সুকান্ত ভট্টাচার্য বলেছেন—

"তবুও আজো বিস্ময় আমার—
ধূর্ত, প্রবঞ্চক যারা কেড়েছে মুখের শেষ গ্রাস
তাদের করেছ ক্ষমা, ডেকেছ নিজের সর্বনাশ।" (বোধন)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পঞ্চাশের মন্বন্তর, ফ্যাসিবাদের উত্থান ও পরাজয়, রসিদ আলি দিবস, নৌ-বিদ্রোহ, বন্দীমুক্তি আন্দোলন প্রভৃতি তাঁর কবিতায় যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে, তা মুলত সাধারণ মানুষের কথা ভেবেই। তাঁর অধিকাংশ কবিতাই রূপকের আড়ালে অসহায় দুঃখী-দরিদ্র সাধারণ শ্রেণির মানুষের কথা বলেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কবিতার নাম আমরা করতেই পারি। যেমন— 'সিঁড়ি', 'একটি মোরগের কাহিনী', 'কলম', 'সিগারেট', 'দেশলাই কাঠি', 'বোধন' প্রভৃতি। এইগুলি মূলত রূপক ধর্মীয় কবিতা। যার অন্তরালে আছে শোষিত, পীড়িত, অত্যাচারিত মানুষের আত্মকাহিনি। যা মূলত প্রতিবাদের আকারে ধরা পড়েছে। 'সিঁড়ি' কবিতায় দেখি সিঁড়ির উপর দিয়ে উচ্চবিত্ত প্রাসাদবিলাসী ধনীর দল প্রতিদিন ক্রমশ উঁচু থেকে আরও উঁচুতে ওঠে। তাদের পদাঘাতে সাধারণ জনগণের বুক ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। তা জানা সত্ত্বেও তারা কিন্তু সাধারণ শ্রেণির মানুষের ওপর অত্যাচার করতে পিছুপা হয় না। তাইতো কবিকে বলতে শুনি—

"তোমরাও তা জানো
তাই কাপের্টে মুড়ে রাখতে চাও আমাদের বুকের ক্ষত,
ঢেকে রাখতে চাও তোমাদের অত্যাচারের চিহ্নকে
আর চেপে রাখতে চাও পৃথিবীর কাছে
তোমাদের গর্বোদ্ধত, অত্যাচারী পদধ্বনি।" (সিঁড়ি)

তবে কবিতাটির শেষ স্তবকে কবি বলতে চেয়েছেন যে, সাধারণ দরিদ্র প্রজা আর কতদিন সহ্য করবে? সহ্যের সীমা অতিক্রম হলেই তারাও বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। যেমন—

"তবু আমরা জানি
চিরকাল আর পৃথিবীর কাছে
চাপা থাকবে না
আমাদের দেহে তোমাদের পদাঘাত
আর সম্রাট হুমায়ুনের মতো
একদিন তোমাদের ও হতে পারে পদস্থলন" (সিঁড়ি)

'একটি মোরগের কাহিনী' কবিতাটির মধ্য দিয়ে কবির সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। একটি মোরগ হঠাৎ আশ্রয় পেল এক বিরাট প্রাসাদের ছোট্ট কোণে, ভাঙা প্যাকিং বাক্সের গাদায় অন্যান্য মুরগিদের সঙ্গে। আশ্রয় পেলেও উপযুক্ত খাবার পেল না, তার শুরু হলো আস্তাকুঁড়ে আনাগোনা করা কিন্তু সেখানেও শুরু হলো তার নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী। এখানেও কবি রূপকের আড়ালে মোরগের ঐ অন্তিম পরিণতির মধ্য দিয়ে বলতে চেয়েছেন— যে আশ্রয় চায়, খাবার চায়, খাবার না পেলে প্রতিবাদ করে। তার প্রতিবাদ কখনই গুরুত্ব দেয় না ক্ষমতাসীন শাসনতন্ত্র। তবে বেশি প্রতিবাদী হয়ে উঠলে সমাজের ক্ষমতাবানরা একে গোড়া থেকে উপরে ফেলে দেন। তখন খাদ্য ও খাদকের যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তা কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর 'বিবৃতি' কবিতায় বলেছেন—

"পথে পথে দলে দলে কঙ্কালের শোভাযাত্রা চলে,
দুর্ভিক্ষ গুঞ্জন তোলে আতঙ্কিত অন্দরমহলে।
দুয়ারে দুয়ারে ব্যগ্র উপবাসী প্রত্যাশীর দল
নিষ্ফল প্রার্থনা-ক্লান্ত, তীব্র ক্ষুধা অন্তিম সম্বল;" (বিবৃতি)

তাঁর যন্ত্রণাময় অনুভূতি ছিল প্রতীকাশ্রয়ী। ধীরে ধীরে তা আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কবির অনুভব গভীর সত্যের উপলব্ধি মোরগের শেষ পরিণতি। 'একটি মোরগের কাহিনী' কবিতায় বাস্তব জীবনের সত্য ফুটে উঠেছে—

"অসহায় মোরগ খাবারের সন্ধানে,
বারবার চেষ্টা করলো প্রাসাদে ঢুকতে
প্রত্যেকবারই তাড়া খেল প্রচণ্ড।
ছোট্ট মোরগ ঘাড় উঁচু করে স্বপ্ন দেখে—
প্রাসাদের ভেতরে রাশি রাশি খাবারের।
তারপর সত্যিই সে একদিন প্রাসাদে ঢুকতে পেলো;
একেবারে সোজা চলে এলো
ধপধপে সাদা দামী কাপড়ে ঢাকা খাবারের টেবিলে।" (একটি মোরগের কাহিনী)

এখানে মোরগটি হয়ে উঠেছে সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের প্রতীক। যাদের স্বপ্ন, শ্রম— সমস্তটা নিংড়ে নেয় সমাজের অর্থলোভী কিছু মানুষ। এই সাধারণ মানুষের রক্ত, শ্রম ও ঘামের বিনিময়ে ধনবানদের টেবিলে ধবধবে সাদা কাপড়ের ঢাকনা দেওয়া খাবার সাজানো হয়ে থাকে।

অপর আরেকটি কবিতা 'দেশলাই কাঠি' এই কবিতাটিতেও রূপকের আড়ালে কবির প্রতিবাদী সত্তার ছবি ফুটে উঠেছে। সেখানে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য বলেছেন—

"আমরা বারবার জ্বলি, নিতান্ত অবহেলায়—

তা তো তোমরা জানোই!
কিন্তু তোমরা তো জানো না:
কবে আমরা জ্বলে উঠব—
সবাই— শেষবারের মতো।।" (দেশলাই কাঠি)

আবার 'কলম' কবিতায় রূপকের আড়ালে ব্যঞ্জনার্থে কবি কলমের অন্তরালে যারা থাকে তাদের কথায় এখানে তুলে ধরতে চেয়েছেন—

"কলম! বিদ্রোহ আজ! দল বেঁধে ধর্মঘট করো।
লেখক স্তম্ভিত হোক, কেরানীরা ছেড়ে দিক হাঁফ,
মহাজনী বন্ধ হোক, বন্ধ হোক মজুরের পাপ;
উদ্বেগ আকুল হোক প্রিয়া যত দূর দূর দেশে,
কলম। বিদ্রোহ আজ, ধর্মঘট, হোক অবশেষে;
আর কালো কালি নয়, রক্তে আজ ইতিহাস লিখে
দেওয়ালে দেওয়ালে এঁটে, হে কলম,
আনো দিকে দিকে।" (কলম)

বন্দীমুক্তি আন্দোলনের সঙ্গেও কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। কমরেড রজনীপাম দত্ত বাংলার বিপ্লবীদের মুক্তি করার জন্য আন্দোলন তীব্রতর করার জন্য দেশজুড়ে সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর সেই আহ্বানকে অভিনন্দন জানিয়ে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য শানিত বাক্যে উচ্চারণ করেছেন—

"লাল আগুন ছড়িয়ে পড়েছে দিগন্ত থেকে দিগন্তে
কী হবে আর কুকুরের মতো বেঁচে থাকায়
কতদিন তুষ্ট থাকবে আর
অপরের ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্ট হাড়ে।" (১লা, মে-র কবিতা' ৪৬)

বন্দীমুক্তির দাবিকে দুর্বার করার জন্য ছাত্র ধর্মঘটের প্রস্তুতির ফলস্বরূপ কলকাতার 'ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল'-এর কর্মীসভায় সুকান্ত ভট্টাচার্য স্বয়ং কবিতা পাঠ না করলেও আন্দোলনের সভাপতি গৌতম চট্টোপাধ্যায় 'জনতার মুখে ফোটে বিদ্যুৎবাণী' কবিতাটি পাঠ করেছিলেন। বলেছিলেন—

"প্রতিশোধ প্রতিশোধ
হাজার হাজার শহীদ ও বীর
স্বপ্নে নিবিড় স্মরণে গভীর
ভুলিনি তাদের আত্মবিসর্জন।" (জনতার মুখে ফোটে বিদ্যুৎবানী)

আবার, বন্দীমুক্তি কমিটি ও ছাত্র ফেডারেশনের ডাকে কলকাতার আনাচে কানাচে মানুষের দৃপ্ত মিছিল ছুটে চলেছে আইন সভার দিকে। সেদিনের কলকাতাকে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য অমর করে রেখেছেন তাঁর 'মুক্ত বীরদের প্রতি' কবিতায়—

"সেদিন দুপুরে সারা কলকাতা হারিয়ে ফেলেছে দিশে
হাজার হাজার জনসাধারণ ধেয়ে চলে সম্মুখে
পরিষদ গেটে হাজির সকলে, শেষ প্রতিজ্ঞা বুকে
গর্জে উঠল হাজার হাজার ভাই;
রক্তের বিনিময়ে হয় হোক, আমরা ওদের চাই।" (মুক্ত বীরদের প্রতি)

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য বাস্তবিক অর্থেই একজন প্রতিবাদী কবি। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। তিনি কিশোর কবি হিসেবে আমাদের কাছে চির অমর হয়ে আছেন। তাঁর বস্তুমানবিক দর্শন একালেও সঞ্চালিত। বাংলা সাহিত্যেকে তাঁর দেওয়ার ছিল আরও অনেক কিছু। কিন্তু স্বল্প সময়ে চলে যাওয়াই কিছুটা অপূর্ণ থাকলেও তাঁর কবিতার জন্য তিনি সর্বক্ষণ মানুষের হৃদয়ে সজীব হয়ে আছেন এবং আগামী দিনেও থাকবেন।

তথ্যসূত্র:

১. মিশ্র, অশোককুমার। আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা (১৯০১-২০২০)। দে'জ পাবলিশিং, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত তৃতীয় দে'জ সংস্করণ: অক্টোবর ২০২০, আশ্বিন ১৪২৭, কলকাতা, পৃ. ৩০০।
২. গুণ, সুমন। বাংলা কবিতার সহস্র ধারা। অনুষ্টুপ, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৩, কলকাতা, পৃ. ২৬২।
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্রিতা। আধুনিক কবিতার নিবিষ্ট পাঠ। অক্ষর প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ: ৯ মে ২০০৯, কলকাতা, পৃ. ১৭৬।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. ভট্টাচার্য, সুকান্ত। সুকান্ত সমগ্র। বসাক বুক স্টোর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।
২. ভট্টাচার্য, জগদীশ। আমার কালের কয়েকজন কবি। ভারবি, পুনর্মুদ্রণ: আশ্বিন ১৪২৭, কলকাতা।
৩. মিশ্র, অশোককুমার। আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা (১৯০১-২০২০)। দে'জ পাবলিশিং, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত তৃতীয় দে'জ সংস্করণ: অক্টোবর ২০২০, কলকাতা।
৪. মুখোপাধ্যায়, তরুণ। বাংলা কবিতা: অনেক আকাশ। প্রজ্ঞাবিকাশ, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ: বইমেলা, জানুয়ারি ২০২২, কলকাতা।
৫. সেনমজুমদার, জহর। বাংলা কবিতা: সময়ের স্বর সময়ের সংকেত। জয়শ্রী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ: বৈশাখ ১৪৩০, কলকাতা।
৬. মুখোপাধ্যায়, ধ্রুবকুমার। কবি এবং কবিতার বিষয়-আশয়। দে'জ পাবলিশিং, পুনর্মুদ্রণ: আগস্ট ২০২২, কলকাতা।
৭. গুণ, সুমন। বাংলা কবিতার সহস্র ধারা। অনুষ্টুপ, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৩, কলকাতা।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1518-1528
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.373

লালন ফকিরের গানে সুফি প্রভাব: একটি আলোচনা

মৌমিতা পাল, *গবেষক, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, অসম, ভারত*

Received: 21.03.2026; Accepted: 21.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

It is not known exactly who founded the *Baul* community or how it originated. The Baul philosophy was established around the 16th century. The Bauls are the result of Vaishnavism and Sufi influence in Bengal since the Muslim rule. The Bauls were born in Bengal. Baul is generally become popular by people who are not formally educated or who are illiterate. UNESCO included Baul songs in the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity in 2008. The best example of the philosophical knowledge hidden in Baul songs is Lalon's Baul song. Both Hindu and Muslim communities belong to this Baul community. Baul songs are passed down orally through the 'Guru Parampara'. The Bauls kept their philosophy secret. They learn this philosophy from their 'Guru'. They wear saffron or black robes('*Alkhalla*'), a garland of seeds around their necks, their hair tied high, a beard on their face and a 'Ekatara' in their hands. They roam from one place to another singing songs. Humanism is their main message. Famous Baul saints include Lalon Fakir, Hason Raja, Shitalang Fakir, Ponja Shah. Among them, Lalon Fakir is considered the greatest Baul. He composed many songs in his long life. So far, five hundred and fifty songs have been found. Lalon was a rare personality. He was a saint, singer, and poet all at once. He is still discussed and respected in our society. He did not follow Vedic rituals or worldly customs. Many people used to call Lalon a Sufi. He never identified himself as a Sufi. However, Sufi influence is evident in his songs. Lalon never called himself a Baul anywhere. He introduced himself as a '*Fakir*'. In this musical genre, Lalon Fakir was talented and at the top of all in terms of depth and artistic subtlety. Analyzing Lalon songs, it can be understood that, like Sufi doctrine, Lalon Fakir's songs feature humanism, *Guruism* or *Murshidism*, non-scriptural spiritual practices, criticism of the formal path, opposition to the Sharia approach, etc. This article examines the above issue in detail.

Keywords: Baul, Sufi, Lalan, Guru Parampara, Humanism

বাউল গান হচ্ছে লোকসংস্কৃতির একটি অঙ্গ। বাংলাতেই এই বাউলের জন্ম। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত নন বা নিরক্ষর লোকেদের মুখে মুখে প্রচলিত হয় বাউল। অন্যান্য লোকসংগীতের মতো যেমন— ভাদু, টুসু, গম্ভীরা প্রভৃতি সাধারণ মানুষকে নীতিকথা শেখানোর জন্য বাউলের উদ্ভব হয়নি। ইউনেস্কো বাউল গানকে ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে The Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity-র অন্তর্ভুক্ত করে। বাউল গানের মধ্যে যে তত্ত্বজ্ঞান লুকিয়ে রয়েছে, তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ লালনের বাউল গান। লালন দীর্ঘ

অধ্যাত্ম সাধনার দ্বারা জ্ঞান আহরণ করেছিলেন। তিনি তাঁর তত্ত্ববিষয়ক চিন্তা চেতনাকে বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিলেন তাঁর গানের মধ্য দিয়ে।

লালনের সম্পর্কে আলোচনা প্রবেশের পূর্বে বাউলের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের উপর আলোকপাতের অবকাশ রয়েছে। বাউল সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বা এর উদ্ভব কীভাবে হয়েছিল তা স্পষ্ট নয়। তাঁদের গুরু সম্পর্কে বা তাঁদের ধর্মের সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের লোকই এই বাউল সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। নদীয়া যেহেতু অবিভক্ত বাংলার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছিল তাই অনুমান করা যেতে পারে এই সব বাউলেরা নদীয়ার অধিবাসী ছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে বখতিয়ার খিলজির সময় থেকে বাংলায় মুসলমান শাসন চালু হয়। সেই সময়ই বাংলায় সুফিবাদের প্রভাব বিস্তার লাভ করতে শুরু হয়েছিল।

'বাউল' শব্দের প্রথম উল্লেখ পাই আমরা মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য'-এ—

"মুকুল(ত) মাথার চুল নাংটা যেন বাউল
রাক্ষসে রাক্ষসে বুলে রণে।
বিকটান কাড়িরায় বলে মাংস কাড়ি খায়
রক্ত পড়ে গলিয়া বদনে।।"[১]

এরপর কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁর 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে বহু জায়গায় 'বাউল' শব্দের ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সেখানে চৈতন্যদেবের দশার সঙ্গে 'বাউল' শব্দটিকে মিলিয়ে দিয়েছেন। অনেক গবেষক আউয়াল বা আউলিয়াকেই 'আউল-বাউল' শব্দের উৎস সম্পর্কে বলেছেন। শুধাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'Baul songs of Bengal' গ্রন্থে বলেছেন—

> "The word 'Baul', some think, has come from the abbreviation of the Sanskrit word 'Byakul' or ever anxious to meet his beloved, as 'Akul' also denotes an over-anxiety. It is a fact that Man and womanin union and erotic gesture form a part of Baul Sadhana."[২]
>
> "অক্ষয়কুমার দত্ত, ক্ষিতিমোহন সেন, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ বাউলদের একটি সম্প্রদায় হিসাবে বর্ণনা করেছেন।"[৩]
>
> "আধুনিক কালের প্রথমার্ধ হান্টার ও রিজলে বৈষ্ণব উপসম্প্রদায় হিসাবে বাউলদের চিহ্নিত করেছেন।"[৪]

ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর 'বাংলার বাউল' গ্রন্থে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত 'সাধক-গায়ক-পদকর্তাদের' বাউল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কেউ কেউ বাউলদের লৌকিক উপাসকগোষ্ঠী আবার কেউ বিশিষ্ট সাধনার সঙ্গে যুক্ত করেছেন। কিন্তু ক্ষেত্র সমীক্ষায় জানা গেছে হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সমাজেই বাউল বর্তমান রয়েছে।

রাহুল পিটার দাস মন্তব্য করেছেন যে—

> "The Commercialization of Baul songs has resulted in a mighty industry…..which springs out fake Baul songs written and set to tunes by professional artists on their hacks."[৫]

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' গ্রন্থে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'বাউল' শব্দের বিভিন্ন অর্থ করেছেন। যেমন— ক) উন্মত্ত, পাগল, খ) বিহ্বল, গ) কাতর, ঘ) প্রেমে আত্মহারা ইত্যাদি।

তাছাড়া অক্ষয়কুমার দত্ত, ক্ষিতিমোহন সেন, দীনেশচন্দ্র সেন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রমুখেরা 'বাউল' শব্দের উদ্ভবের পেছনে বিভিন্ন অর্থ দেখিয়েছেন।

বাউলদের গানের পূর্ণরূপ প্রকাশিত হয় মৌখিকভাবে গুরু পরম্পরার মাধ্যমে। বাউলেরা তাঁদের তত্ত্বকথা গুপ্ত রাখতেন। এই তত্ত্বজ্ঞানের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য গুরুর দ্বারা এগিয়ে যেতে হয়। এই মুর্শিদ বা গুরু হচ্ছেন সর্বশক্তিমান—

"মুরশিদ বিনে কী ধন আর আছে রে মন এ জগতে।
যে নাম স্মরণে মন রে, তাপিত অঙ্গ শীতল করে
ভববন্ধন জ্বালা যায় গো দূরে জপ ঐ নাম দিবারাতে।।"[৬]

তাই শেষে গিয়ে আল্লাহ-মুর্শিদ একাকার হয়ে যায়। বাউলেরা জ্যান্তে মরা হতে চান। পাশবিক অহংবোধকে মাটিতে মিশিয়ে দিতে চান। তাঁদের কাছে আমি তুমির ভেদ থাকে না। তাঁরা পরিবারের বন্ধন থেকে মুক্ত। তাঁদের কোনো ধর্ম নেই, জাত নেই। তাঁরা তাঁদের সাধনা গোপন করে রাখেন। বেশভূষার দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, তাঁরা গেরুয়া বা কালো আলখাল্লা পরিধান করেন, গলায় বীজের মালা, চুল উঁচু করে বাঁধা, মুখে দাঁড়ি এবং হাতে একতারা। তাঁরা আপন মনে গান গেয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়ান। তাঁদের সাধন পদ্ধতি হয় গানের মাধ্যমে। কখনো মৃদু মৃদু হাসেন আবার কাঁদেন। বাউলেরা মূলত ভবঘুরে। সাধারণ মানুষ তাঁদের পাগল বলেই বিবেচিত করতে পারে। কিন্তু তাঁদের অন্তরে অন্য কিছু ভাবনা থাকে। তাঁরা সংসারের মোহ থেকে দূরে থাকেন। তাঁদের কাছে জাতপাত, উচ্চ-নীচ প্রাধান্য পায় না। তাঁদের কাছে একটা জিনিসই প্রাধান্য পায় সেটা হলো মানুষ। মানুষই তাঁদের মূল কথা। লালন ফকির, হাছন রাজা, শীতলাং ফকির, পঞ্জা শাহ প্রমুখ বিখ্যাত বাউল সাধক। এঁদের মধ্যে লালন ফকিরকেই শ্রেষ্ঠতম বাউল হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

বাউল গানের নির্দিষ্ট কোনো সুর নেই। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, বাকুঁড়া অঞ্চলের বাউল গানের সুর ঝুমুর। নদিয়া, রাজশাহি, মুর্শিদাবাদের দিকে বাউলের সুর হচ্ছে কীর্তন। আর পূর্ববঙ্গের বাউলের সুর ভাটিয়ালি এবং উত্তরবঙ্গের অঞ্চলের বাউলের সুর ভাওয়াইয়া। লালনের গানের মূল সুর হলো কীর্তন। লালনের গানে নদিয়া, যশোর ও পাবনা অঞ্চলের ধাঁচ পাওয়া যায়—

"দেখলাম এ সংসার ভোজবাজি প্রকার
দেখতে দেখতে অমনি কেবা কোথা যায়।
মিছে এ ঘর-বাড়ি মিছে ধন টাকা-কড়ি
মিছে দৌড়াদৌড়ি করি কার মায়ায়।।"[৭]

তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনে প্রচুর গান রচনা করে গেছেন। এখনও পর্যন্ত সাড়ে পাঁচশ গানের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। আবার বেশিরভাগ সমালোচক মন্তব্য করেন যে, লালন আড়াই হাজার বাউল গান রচনা করেছেন।

লালনের ধর্মান্তর নিয়ে অন্নদাশংকর রায় তাঁর 'লালন ফকির ও তাঁর গান' গ্রন্থে বলেছেন—

"লালন যে দীক্ষা নিয়েছিলেন সেটি আনুষ্ঠানিক মুসলিম দীক্ষা নয়। সেটি গোপনীয় দরবেশ দীক্ষা বা ফকিরি দীক্ষা.....যারা ফকিরি নেয় তারা কোনো সমাজেরই ধার ধারে না। লালন হিন্দু বা মুসলিম কোনো সমাজেই সামিল ছিলেন না।"[৮]

লালন ছিলেন এক বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি একাধারে সাধক, গায়ক, কবি ছিলেন। তিনি এখনও আমাদের সমাজে আলোচিত ও আদৃত। তিনি বৈদিক আচার, লৌকিক আচার-আচরণ মানতেন না। এই সংগ্রামে আকৃষ্ট হয়ে বহু লেখক, ভূস্বামী, গ্রাম্য সাধারণ মানুষ, রক্তসম্পর্কহীন মানুষ নিয়ে লালনের পরিবার গড়ে উঠেছিল।

লালনের গানের দুটি খাতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংগ্রহ করেছিলেন এবং তা পরে প্রকাশ করেছিলেন। এই গানগুলি প্রকাশের পর থেকেই সাধারণ জনগণ লালনের গানের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাঁর গানের মাধ্যমে যে দর্শন উঠে এসেছে তা নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। লালনের গান অনেকেই শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুশীলন করেন এখনও।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত গ্রন্থে লিখেছেন—

> "রবীন্দ্রনাথ লালন ফকিরের বাউল গান অত্যন্ত ভালবাসিতেন, তাঁহার জন্যই লালনের গান সম্বন্ধে আধুনিক কালের শিক্ষিত সমাজ কৌতূহলী হইয়া উঠেন।.....খুব সম্ভব রবীন্দ্রনাথ লালনকে চোখে দেখেন নাই, কারণ জমিদারী কর্মোপলক্ষে তাঁহার শিলাইদহে যাইবার পূর্বেই লালনের তিরোধান হয়।.....কিন্তু তাঁহার পদে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মসংক্রান্ত যে সমস্ত ইঙ্গিত ও উল্লাখ আছে, তাহাতে তাঁহাকে একজন মনীষী পণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়াই বোধ হয়।.....লালন নাম তাঁহার প্রকৃত লৌকিক নাম, অথবা বাউল ফকিরী দীক্ষা লাভের পর তিনি এই নামে পরিচিত হন, তাহা জানা যাইতেছে না।.....লালন বাহ্যতঃ মুসলমান ফকিরবৎ আচরণ করিলেও খুব সম্ভব আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নাই, করিলে হিন্দুসমাজে তিনি এতটা শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারিতেন না।"[৯]

এবার আমরা লালনের জন্মবৃত্তান্ত, ব্যক্তিজীবন ইত্যাদি সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়াস করব। লালনের জন্মবৃত্তান্ত রহস্যময় হয়ে রয়েছে। লালনের জন্ম নিয়ে বিভিন্ন সমালোচক বিভিন্ন মত দিয়েছেন। কোনো কোনো সমালোচক লালনের জন্ম সালের উল্লেখ করেছেন। আবার কোনো কোনো সমালোচক বলেছেন, তাঁর জন্ম সংক্রান্ত কোনো সূত্রই পাওয়া যায় না। এমনকি তাঁর পিতা-মাতার নাম পর্যন্ত মেলে না। জনশ্রুতি আছে যে, ফাল্গুন মাসে ছেঁউড়িয়ার কালীগঙ্গার ঘাটে একজন মৃতপ্রায় যুবক এসে ভিড়ল। তার পুরো শরীরে বসন্ত। দরিদ্র ফকির মলম শাহ এবং তাঁর পত্নী মতিজান ফকিরানী তাকে তুলে নিয়ে এলেন। দম্পত্তির সেবা-শুশ্রূষায় সেই যুবক আরোগ্য লাভ করল। এই নিঃসন্তান দম্পত্তি সেই অচেনা যুবককে আপন ঘরে আশ্রয় দিলেন। আপন ঘরে লালিত-পালিত হলেন বলে নাম দিলেন 'লালন'। তাই বেশিরভাগ সূত্রানুসারে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, তাঁর জন্মসূত্র বা জন্মসাল অজ্ঞাত। তাঁর জন্ম সম্পর্কে কোনো লিখিত প্রমাণ নেই। মলম শাহ এবং মতিজান ফকিরানীর দ্বারা লালন লালিত-পালিত হয়েছেন এবং তাঁদেরই তিনি পিতা-মাতা হিসেবে জ্ঞান করতেন। তাঁর গুরু হলেন সিরাজ সাঁই। এবং তাঁর খুব কাছের শিষ্য হলেন দুদ্দু শাহ। লালন সম্পর্কে বহু বিভ্রান্তকর মন্তব্য রয়েছে। লালনের আখড়া ছিল ছেঁউড়িয়াতে। ১৮৯০ সালে তৎকালীন 'হিতকারী' পত্রিকায় লালনের পরিচয় সম্পর্কে লেখা রয়েছে যে—

> "লালন ফকীরের নাম এ অঞ্চলে কাহারও শুনিতে বাকী নাই। শুধু এ অঞ্চলে কেন, পূর্ব্বে চট্টগ্রাম, উত্তরে রঙ্গপুর, দক্ষিণে যশোহর এবং পশ্চিমে অনেকদূর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বহুসংখ্যক লোক এই লালন ফকীরের শিষ্য; শুনিতে পাই ইঁহার শিষ্য দশ হাজারের উপর। ইঁহাকে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি; আলাপ করিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। কুষ্টিয়ার অনতিদূরে কালীগঙ্গার ধারে সেওরিয়া গ্রামে ইঁহার একটি সুন্দর আখড়া আছে।"[১০]

১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ অক্টোবর অর্থাৎ ১২৯৭ বঙ্গাব্দের ১ কার্তিক ভোর পাঁচটায় ফকির লালন শাহ দেহত্যাগ করেন। এই দিনটি ছেঁউড়িয়াতে উৎসবমুখর পরিবেশ হয়ে উঠে প্রত্যেক বছর। বিভিন্ন জায়গা থেকে বাউল ফকিরেরা এই স্থানটিতে ১ কার্তিক এসে ভিড় করেন। সে যাই হোক, আমরা লালনের জন্ম বৃত্তান্ত সম্পর্কিত আলোচনার বেশি গভীরে না গিয়ে, আমাদের আলোচ্য বিষয় লালনের গানে সুফিবাদ কীভাবে প্রভাবিত করেছে সেই বিষয়ের দিকে আমরা এবার আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

লালনকে অনেকেই সুফি বলে থাকেন। কিন্তু তিনি নিজেকে কখনোই সুফি বলে পরিচয় দেননি। তবে তাঁর গানে সুফি প্রভাব লক্ষ করা যায়। শক্তিনাথ ঝা উল্লেখ করেছেন—

> "বৈদিক আচার এবং লৌকিক অনাচারের বিরুদ্ধে লালনের দ্বিমুখী সংগ্রামে আকৃষ্ট হয়েছিল সেকালের বহু শিষ্ট ভূস্বামী, ঐতিহাসিক, সম্পাদক, বুদ্ধিজীবি লেখক এবং গ্রাম্য জনতা।"[১১]

লালনপন্থীদের অনেকেই লালনকে সুফি সাধক হিসেবে স্বীকৃতি দেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লালনের জাত সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি যে গানটি শুনিয়েছিলেন—

> "সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।
> লালন কয়, জেতের কি রূপ, দেখলাম না এ নজরে।।"[১২]

লালন নিজেকে কোথাও বাউলও বলেননি। নিজেকে পরিচয় দিয়েছেন 'ফকির' হিসেবে। তাঁর সাধনা হচ্ছে সহজ সাধনা। তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে 'দরবেশ', 'সাঁই' বলেছেন। লালন বলেছেন সবার উপরে মানুষ। লালনের গানে সুফিদের মতোই ভক্তি, জাগতিক মোহ থেকে মুক্তি ইত্যাদি প্রতিফলিত হয়েছে। কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াই লালন একজন দার্শনিক হয়ে উঠেছেন। এই দার্শনিক ধারাটি বাউলদের সাধনার ধারার মধ্যেই নিহিত ছিল। আর এই সাধনার ধারার উপর বৌদ্ধ, নাথ, বৈষ্ণব, সুফিদের প্রভাব ছিল। কেউ কেউ তাঁকে বৈষ্ণবও বলেছেন, আবার কেউ কেউ সুফি সাধকও বলেছেন। কিন্তু এই যে সাংগীতিক ধারাটিতে লালন ফকিরের গভীরতা, শৈল্পিক সূক্ষ্মতার দিক থেকে তিনি ছিলেন প্রতিভাবান এবং সকলের শীর্ষে। বাউল গানের মধ্যে সহজ-সরল জীবনদর্শনের চিত্র পাওয়া যায়। লালন ধর্মীয় গোঁড়ামিমুক্ত মানুষ ছিলেন একজন। লালনের বহু গানে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির সুর শোনা যায়।

সুফিদের সর্বশেষ স্তর মারেফত, তেমনি বাউলদের কাছেও মারেফত হচ্ছে সাধনার শেষ পর্যায়। লালনের ভাষায়—

> "আলেফে আল্লাজি, মিম মানে নবি
> নামের হয় দুই মানে
> এক মানে হয় শরায় প্রচার
> আরেক মানে মারফতে।।"[১৩]

তাঁদের এই অশাস্ত্রীয় সাধনচর্চা ও সংবেদনশীল মন যেন সুফিদের মতোই প্রেমময়।

সুফি মতবাদে বিনয় ও ভালোবাসা প্রকাশ পায়। সুফি মতবাদ ও বাউলের একই বিষয় হচ্ছে ঐশ্বরিক সত্তার সঙ্গে যে প্রেম-ভালোবাসার বন্ধন। সেটাই লালন চর্চা করেছেন।

এই যে প্রেমানলে ডুবে সুফিরা উন্মাদ হয়ে যান, তেমনি বাউলেরাও উন্মাদ হয়ে যান এই প্রেমানলে ডুবে। যেন সর্বদাই মনের গভীরে তুষের আগুন জ্বলছে। এই উন্মাদনার অবস্থা লালনের গানে পাওয়া যায়—

> "আসার সাঁই দরদী আর কতদিন রব?
> দেশ বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াই, আর বা কোথায় যাব?

যার জন্যে হ'য়েছি পাগল, তারে কোথায় পাব?
মনের আগুন দ্বিগুণ জ্বলে, তারে কি দিয়ে নিবাব?"[১৪]

এই প্রেমোন্মাদনার মাধ্যমে অজ্ঞাত রহস্যময়কে জ্ঞাত হতে চান। কিন্তু পারেন না। ফলে তাঁরা দৃষ্টি দেন নিজের অন্তরের গভীরে। তাঁরা বিশ্বাস করেন, এই অধরা, এই অজানা কোথাও নয়, মন্দির-মসজিদ কিংবা গির্জায় নয়, আছেন নিজের শরীরের মধ্যেই। তিনি রহস্যময় হলেও তাঁকে ডাকলে সাড়া অবশ্যই পাওয়া যায়—

"আয়ু থাকিতে আগে মরা
সাধক যে তার এমনি ধারা
প্রেমোন্মাদে মাতোয়ারা
সে কি বিধির ভয় করে...।"[১৫]

সুফিরা যেমন তাঁদের সাধনার জন্য কোনো আনুষ্ঠানিক পথ বা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মাচরণ বেছে নেন না, তেমনি লালনও কোনো আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি কিছুই মানতেন না—

"আমার নাই মন্দির কি মসজিদ
পূজা কি বকরিদ
তিলে তিলে মোর মক্কা-কাশী
পলে পলে সুদিনা।"[১৬]

সুফিদের মতো লালন কোনো শরিয়তি পন্থা বা মুসলমানদের পাঁচ কৃত্য অর্থাৎ (কলমা, নামাজ, রোজা, হজ এবং জাকাত) সম্পর্কে বিরোধী মনোভাব পোষণ করেছেন। কারণ লালন মারফতি পন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন—

"মারফতের পথিক যারা
শরার কেতাব নেয় না তারা।"[১৭]

লালন সুফিদের মতো শরিয়তকে মান্যতা দেননি। তিনি বলেছেন শরিয়ত ও মারফতের বিমিশ্রণে শরিয়ত মূল্যহীন হয়ে পড়ে থাকে এবং মারেফত হয়ে উঠে মূল্যবান—

"শরিয়ত আর মারফত যেমন
দুগ্ধেতে মিশালে মাখন,
মাখন তুললে দুগ্ধ তখন
ঘোল বলে তাতো জানে সবায়।।"[১৮]

সুফিদের মতো লালনও জাতিপ্রথার বিরুদ্ধে ছিলেন। তাই তিনি লিখেছেন—

"যখন তুমি ভবে এলে
তখন তুমি কী জাত ছিলে
যাবার বেলায় কী জাত নিলে
এ-কথা আমায় বল না।।"[১৯]

আবার—

"ও মন যে যা বোঝে সেইরূপ সে হয়।
রাম-রহিম করিম-কালা একই আল্লা জগৎময়।।"[২০]

সুফিদের মধ্যে মানুষ-ই শেষ কথা। তেমনি লালনের গানেও মানুষভজন ও মানবমহিমা গুরুত্ব পেয়েছে—

"মানুষতত্ত্ব যার সত্য হয় মনে।

সেকি অন্য তত্ত্ব মানে।।
মাটির ঢিবি কাঠের ছবি
ভূত ভাবি সব দেবদেবী
ভোলে না সে অন্যরূপী
মানুষ ভজে দিব্যজ্ঞানে।।"[২১]

বাউল হচ্ছে গুরুবাদী সম্প্রদায়। সুফিধারাতেও গুরুবাদ রয়েছে। আমরা লালনের গানে পাই—

"গুরু তুমি তন্ত্রের তন্ত্রী
গুরু তুমি মন্ত্রের মন্ত্রী
গুরু তুমি যন্ত্রের যন্ত্রী
না বাজাও বাজবে কেনে।।"[২২]

তিনি আরও বলেছেন—

"গুরু বিনে কী ধন আছে।
কী ধন খুঁজিস ক্ষ্যাপা কার কাছে।"[২৩]

গুরুর উপদেশ ছাড়া ভজন সাধনা বৃথা। সুফি সাধক ও লালন একই মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন গুরুকে নিয়ে—

"গুরুচরণ অমূল্য ধন বাঁধ ভক্তিরসে।
মানব-জনম সফল হবে গুরু উপদেশে।"[২৪]

বাউলেরা তাঁদের তত্ত্বকথা গুপ্ত রাখতেন। এই তত্ত্বজ্ঞান শিখতেন গুরু পরম্পরার মাধ্যমে। এই তত্ত্বজ্ঞানের পথ গুরুর হাত ধরে শিখতে হয়। এই মুর্শিদ বা গুরু শিষ্যদের কাছে সর্বশক্তিমান—

"মুরশিদ বিনে কী ধন আর আছে রে মন এ জগতে।
যে নাম স্মরণে মন রে, তাপিত অঙ্গ শীতল করে
ভববন্ধন জ্বালা যায় গো দূরে জপ ঐ নাম দিবারাতে।।"[২৫]

তাই শেষে গিয়ে আল্লাহ-মুরশিদ একাকার হয়ে যায়।

'মনের মানুষ' শব্দটি লালনের গানেই আমরা প্রথম লক্ষ করি। এই মনের মানুষ সুফিদের অদ্বিতীয়-র সমতুল্য। সুফি সাধকেরা যে অদ্বিতীয়ের সঙ্গে মিলিত হতে চান বাউলেরা নিজেদের সেই অদ্বিতীয়ের নামকরণ করেছেন 'মনের মানুষ'। সুফিদের মতো লালন ফকিরও মনের মানুষের অনুসন্ধানে ঘুরে ফিরেছেন—

"মিলন হবে কতদিনে।
আমার মনের মানুষের সনে।।"[২৬]

মুর্শিদ ধরে সাধনার পথে এগিয়ে যাওয়ার কথা লালন তাঁর বিভিন্ন গানে প্রকাশ করেছেন—

"মুরশিদ ভজনা বিনে ও জীবের উপায় নাই।
রোজা নামাজ হজ জাকাত মানা কিছু নাই—
মুরশিদ ভজনা বিনে জীবের আর গতিক নাই।।"[২৭]

সুফিরা যেমন মুর্শিদকে সামনে রেখে তাঁদের ভজন সাধনা করেন তেমনি লালনও একই কথা বলেন—

"খোদ খোদার প্রেমিক যে জনা।
মুর্শিদের রূপ হৃদয়ে রেখে কর ভজন-সাধনা।।"[২৮]

সুফিদের মতো লালনও মানবাধিকারকে গুরুত্ব দিয়েছেন। শুধু সুফি নয় সব ধর্মের একই বার্তা মানবপ্রেম। মানবতাবাদের জয়গান সব ধর্মের লক্ষণীয় বিষয়। লালন তাই গেয়েছেন—

"মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি।
মানুষ ছাড়া ক্ষ্যাপা রে তুই মূল হারাবি।।"[২৯]

সুফিদের কিছু কিছু শব্দ বাউল গানে পাওয়া যায়। লালনের গানেও এই শব্দগুলোকে খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন— আল্লাহ, মুর্শিদ, মুরিদ, রসুল, নবি, ফানা, শরিয়ত।

আল্লাহ শব্দটি লালনের গানে বহু জায়গায় দেখা মেলে—

"আল্লাহ মালিক দিন দুনিয়ার
প্রিয় তুমি হে পরোয়ার,
দু'হাত তুলেছি তোমার দরবারে
প্রার্থনা কবুল করো আমার।।"[৩০]

নবি— "অপারের কাণ্ডার নবিজি আমার
ভজন-সাধন বৃথা নবি না চিনে।"[৩১]

রসুল— "মক্কায় যেয়ে হজ্ব করিয়ে
রাসুলের রূপ নাহি দেখি
মদিনাতে যেয়ে রাসুল
মরেছে তার রওজা দেখি।।"[৩২]

মুর্শিদ— "মুরশিদকে মানিলে খোদার মান্য হয়।
সন্দ যদি হয় কাহারো কোরান দেখলে মটে যায়।।"[৩৩]

জিকির— "হরদমে যে করে জিকির
তাকে জানিও ফকির
খোদে খোদা তার কল্‌বে হাজির
ফকির লালন তাই বলে।"[৩৪]

ফানা— "সাঁই দরবেশ যারা আপনারে ফানা করে
অধরে মিশে তারা
.....
ফানার ফিকির না জানিলে
ভস্ম মাখা হয় মস্করা।।"[৩৫]

শরিয়ত— "শরিয়তের বুনিয়াদে
পাবে না তা কোন মতে
জানা যাবে মারেফাতে
যদি মনের বিকার যায়।"[৩৬]

সামগ্রিক আলোচনার শেষে বলা যায়, সুফিদের জন্ম পারস্য, আরবে হলেও, তা বিকাশ লাভ করেছিল মধ্য এশিয়া ও ভারতবর্ষে। বাংলায় প্রবেশের পূর্বে সুফিরা উত্তর ভারতে নিজেদের ভিত স্থাপন করেছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে সুফিবাদ বঙ্গে বিস্তার লাভ করে। বাউল মতবাদের সাল-পঞ্জি নির্ণয় করা অসম্ভব। আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীতে বাউল মত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মুসলিম শাসনের পর থেকে বঙ্গে বৈষ্ণব ও সুফি প্রভাবের

ফল হলো বাউল। বাউলে যে নিজেকে জানার কথা আছে, উপনিষদের 'আত্মানং বিদ্ধি'। সুফিতত্ত্বে যে প্রেমের মধ্য দিয়ে এক এবং অদ্বিতীয়-এর কাছে পৌঁছতে চান, বাউলেরা তেমনি 'মনের মানুষ' বা 'অচিন পাখি'-র সন্ধান করেছেন। লালনের বহু গানেই এই মনের মানুষের সন্ধান লক্ষ করা যায়।

লালন বাউল শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলে অত্যুক্তি হবে না। লালন ফকির-দরবেশ, লালন একজন সুফি, লালন বৈষ্ণব নাকি লালন হিন্দু না মুসলমান– তিনি যে প্রকৃতপক্ষে কী, এই বিষয়ে দ্বন্দ্ব রয়েছে। কুষ্টিয়াতে লালনের আখড়া ছেউরিয়াতে বৈষ্ণব ও সুফিবাদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। ফলে লালনের চিন্তাধারাতেও এই দুই মতবাদের প্রভাব রয়েছে। সুফি ধারার মতোই লালন তাঁর গানে শরিয়তি পন্থাকে দূরে রেখে মারফতি পন্থাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। সুফিদের মতোই লালনের গানে মানুষই প্রাধান্য পেয়েছে। আবার এই যে সাধন পথ তা গুরু পরম্পরার মাধ্যমে এগিয়ে যেতে হয় এবং মুর্শিদের হাত ধরেই সাধক মুরিদে উন্নীত হন তা সুফিধারার অনুরূপ লালনের গানেও একই বার্তা ঘোষিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১. গনী, ওসমান। ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ। পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৮, কলকাতা, পৃ. ৪৫১।
২. মণ্ডল, তাপস, সম্পাদনা। বাউল চর্চা ও বাংলার লোকসংস্কৃতি। পুস্তক বিপণি, নভেম্বর ২০১৬, কলকাতা, পৃ. ১২৮।
৩. ঝা, শক্তিনাথ। ফকির লালন সাঁই: দেশ কাল এবং শিল্প। সংবাদ, বইমেলা ২৬ জানুয়ারি ২০০৭, কলকাতা, পৃ. ১৫০-১৫১।
৪. তদেব, পৃ. ১৫১।
৫. Das, R.P New Publications on Bengali Syncretistic Religion, University of Hamburg, Journal of the American Oriental Society, Pg. 114.
৬. আহসান চৌধুরী, আবুল, সম্পাদনা। লালনসমগ্র। পাঠক সমাবেশ, জানুয়ারি ২০১৪, ঢাকা, পৃ. ৫৮৩।
৭. তদেব, পৃ. ৪০৭।
৮. রায়, অন্নদাশংকর। লালন ফকির ও তাঁর গান। কবি, কলকাতা, পৃ. ১৭।
৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (তৃতীয় খণ্ড: দ্বিতীয় পর্ব)। মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৩-১৪, কলকাতা, পৃ. ৩৮৪-৩৮৬
১০. আহসান চৌধুরী, আবুল সম্পাদনা। লালনসমগ্র। পাঠক সমাবেশ, জানুয়ারি ২০১৪, ঢাকা, পৃ. ৭০৭।
১১. ঝা, শক্তিনাথ। ফকির লালন সাঁই: দেশ কাল এবং শিল্প। সংবাদ, বইমেলা ২৬ জানুয়ারি ২০০৭, কলকাতা, পৃ. ১৪৯।
১২. ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ। বাংলার বাউল ও বাউল গান। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১ বৈশাখ ১৪২৬, কলকাতা, পৃ. ৬৪২।
১৩. আহসান চৌধুরী, আবুল সম্পাদনা। লালনসমগ্র। পাঠক সমাবেশ, জানুয়ারি ২০১৪, ঢাকা, পৃ. ১৪৭।
১৪. এনামুল হক, মুহম্মদ। বঙ্গে স্বূফী প্রভাব। র‍্যামন পাবলিশার্স, ২০১৫, ঢাকা, পৃ. ১৩৪।
১৫. সাইফুল, সাইফুদ্দিন। মহাত্মা লালন গুরুবাদী দর্শনের মহাসাধক। রোদেলা প্রকাশনী, একুশে বইমেলা ২০২১, ঢাকা, পৃ. ৬৮।
১৬. এনামুল হক, মুহম্মদ। বঙ্গে স্বূফী প্রভাব। র‍্যামন পাবলিশার্স, ২০১৫, ঢাকা, পৃ. ১৩৬।
১৭. চক্রবর্তী, সুধীর। ব্রাত্য লোকায়ত লালন। নবযুগ প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০১৮, ঢাকা, পৃ. ১১৪।
১৮. তদেব, পৃ. ১২১।

১৯. আহসান চৌধুরী, আবুল সম্পাদনা। লালনসমগ্র। পাঠক সমাবেশ, জানুয়ারি ২০১৪, ঢাকা, পৃ. ৩৫৪।
২০. তদেব, পৃ. ১৯৭।
২১. তদেব, পৃ. ৫৭২।
২২. তদেব, পৃ. ৩২৪।
২৩. তদেব, পৃ. ৩২১।
২৪. তদেব, পৃ. ৩২৫।
২৫. তদেব, পৃ. ৫৮৩।
২৬. তদেব, পৃ. ৫৭৮।
২৭. চক্রবর্তী, সুধীর। ব্রাত্য লোকায়ত লালন। নবযুগ প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০১৮, ঢাকা, পৃ. ১১৮।
২৮. আহসান চৌধুরী, আবুল সম্পাদনা। লালনসমগ্র। পাঠক সমাবেশ, জানুয়ারি ২০১৪, ঢাকা, পৃ. ৩০৩।
২৯. তদেব, পৃ. ৫৭৪।
৩০. সাইফুল, সাইফুদ্দিন। মহাত্মা লালন গুরুবাদী দর্শনের মহাসাধক। রোদেলা প্রকাশনী, একুশে বইমেলা ২০২১, ঢাকা, পৃ. ৯৫।
৩১. তদেব, পৃ. ৯৬।
৩২. আহসান চৌধুরী, আবুল, সম্পাদনা। লালনসমগ্র। পাঠক সমাবেশ, জানুয়ারি ২০১৪, ঢাকা, পৃ. ৬২৯।
৩৩. তদেব, পৃ. ৫৮৪।
৩৪. মিঞা, করিম ও মো, আবদুল সম্পাদনা। বাংলার বাউল-ফকির সাধনা ও দর্শন। নবযুগ প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, ঢাকা, পৃ. ৬২।
৩৫. দ্রষ্টব্য। তদেব, পৃ. ৭০।
৩৬. তদেব, পৃ. ২৬২।
৩৭. এনামুল হক, মুহম্মদ। বঙ্গে স্থূফী প্রভাব। র‍্যামন পাবলিশার্স, ২০১৫, ঢাকা, পৃ. ১৩৩।

গ্রন্থপঞ্জি:

সহায়ক গ্রন্থ:

১. আহসান চৌধুরী, আবুল সম্পাদনা। লালনসমগ্র। পাঠক সমাবেশ, জানুয়ারি ২০১৪, ঢাকা।
২. এনামুল হক, মুহম্মদ। বঙ্গে স্থূফী প্রভাব। র‍্যামন পাবলিশার্স, ২০১৫, ঢাকা।
৩. করিম মিঞা ও মো, আবদুল সম্পাদনা। বাংলার বাউল-ফকির সাধনা ও দর্শন। নবযুগ প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, ঢাকা।
৪. গনী, ওসমান। ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ। পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৮, কলকাতা।
৫. চক্রবর্তী, সুধীর। ব্রাত্য লোকায়ত লালন। নবযুগ প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০১৮, ঢাকা।
৬. ঝা, শক্তিনাথ। ফকির লালন সাঁই: দেশ কাল এবং শিল্প। সংবাদ, বইমেলা ২৬ জানুয়ারি ২০০৭, কলকাতা।
৭. Das, R.P New Publications on Bengali Syncretistic Religion, University of Hamburg, Journal of the American Oriental Society.
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (তৃতীয় খণ্ড: দ্বিতীয় পর্ব)। মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৩-১৪, কলকাতা।
৯. ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ। বাংলার বাউল ও বাউল গান। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১ বৈশাখ ১৪২৬, কলকাতা।

১০. মণ্ডল, তাপস, সম্পাদনা। বাউল চর্চা ও বাংলার লোকসংস্কৃতি। পুস্তক বিপণি, নভেম্বর ২০১৬, কলকাতা।
১১. রায়, অন্নদাশংকর। লালন ফকির ও তাঁর গান। কবি, কলকাতা।
১২. সাইফুল, সাইফুদ্দিন। মহাত্মা লালন গুরুবাদী দর্শনের মহাসাধক। রোদেলা প্রকাশনী, একুশে বইমেলা ২০২১, ঢাকা।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1529-1535
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.374

ভারতীয় দর্শনে বিবর্তন ও প্রকাশ: সাংখ্য, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং শ্রী অরবিন্দের তুলনামূলক অধ্যয়ন

সম্পা দত্ত, *স্বাধীন গবেষক, বাঁকুড়া, পশ্চিম বঙ্গ, ভারত*

Received: 22.03.2026; Accepted: 24.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The concept of evolution occupies a central yet distinct place in Indian philosophical traditions, particularly in Sāṅkhya, Viśiṣṭādvaita Vedānta, and the integral philosophy of Sri Aurobindo. In Sāṅkhya, evolution (pariṇāma) is understood as a systematic unfolding of Prakṛti, driven by the proximity of Puruṣa, resulting in a hierarchical manifestation from subtle to gross elements. Viśiṣṭādvaita Vedānta reinterprets evolution as a real transformation of Brahman, where the universe and individual souls are modes (prakāra) of a personal, qualified Absolute, emphasizing divine immanence and teleology. Sri Aurobindo, drawing from both classical and modern insights, advances a dynamic and spiritualized vision of evolution, wherein consciousness progressively manifests from matter to life, mind, and ultimately to the supramental realization. While Sāṅkhya presents a dualistic and mechanical model, Viśiṣṭādvaita integrates evolution within a theistic and purposive framework, and Sri Aurobindo offers a synthesis that is both evolutionary and transcendental. This comparative study highlights the continuity and transformation of evolutionary thought within Indian philosophy, revealing a movement from metaphysical analysis to spiritual teleology and integral realization.

Keywords: Consciousness, Evolution, Sankhya, Sri Aurobindo, Visistadvaitavedanta

বিবর্তনবাদ হল জগতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত একটি মতবাদ। বিবর্তনবাদ অনুসারে এই জগৎ আকস্মিকভাবে সৃষ্টি হয়নি। জগতের জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ থেকে শুরু করে মানুষ সকলেই এক সহজ-সরল আদিম অবস্থা থেকে বিকশিত হয়ে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। এবং এই বিবর্তন ধারা অগ্রসর হয়ে চলেছে নিরন্তর। এই জগৎ এক অবিরাম পরিবর্তন প্রবাহ। আর এই পরিবর্তন ধারায় নিয়ত বদল হচ্ছে জগৎ, জীবন তথা সমাজের সবকিছু।

এই পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিবর্তনের ধারনা খুঁজে পাওয়া যায়। তবে বিবর্তনের স্বরূপ সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ বলেন বিবর্তন যান্ত্রিক, কেউ বলেন উদ্দেশ্যেমূলক, কারও মতে বিবর্তন সৃষ্টিশীল, আবার কেউ বলেন এটি উন্মেষমূলক। ভারতীয় দর্শনও এর ব্যতিক্রম নয়। বিবর্তন তত্ত্ব নিয়ে ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলির মধ্যেও মতপার্থক্য রয়েছে। সাংখ্য দর্শনে অচেতন, নিরবয়ব প্রকৃতি সচেতন আত্মা বা পুরুষের সংস্পর্শের মাধ্যমে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। অদ্বৈত বেদান্ত ব্রহ্ম বিবর্তবাদের কথা বলে যেখানে ব্রহ্মের উপর জগৎ বা মায়ার মিথ্যা রূপান্তরকে বোঝায়। বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্তে ব্রহ্ম থেকে চিৎ অর্থাৎ জীব এবং অচিৎ অর্থাৎ জড়তে

রূপান্তরের মাধ্যমে জগৎ সৃষ্টির ব্যাখ্যা রয়েছে। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন পরমাণুসমূহের সমন্বয়ের মাধ্যমে জগৎ সৃষ্টির ব্যাখ্যা করে। আবার অরবিন্দ দর্শনে বিবর্তনবাদ হল জড় থেকে জীবে এবং জীব থেকে অতিমানস স্তরে রূপান্তরের একটি আধ্যাত্মিক পথ। বর্তমানে আমরা সাংখ্য দর্শন, বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্ত দর্শন ও শ্রী অরবিন্দ দর্শনে বিবর্তনবাদ সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা করব।

সাংখ্য দর্শনে বিবর্তনবাদ:

সাংখ্য বিবর্তন তত্ত্ব হল মহর্ষি কপিল প্রবর্তিত প্রাচীন ভারতীয় দর্শন, যা প্রকৃতি (জড়) ও পুরুষ (চৈতন্য) এর পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে জগৎ সৃষ্টির ব্যাখ্যা করে। সাংখ্য দর্শন দ্বৈতবাদী। তাই এখানে দুটি মূল তত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে– প্রকৃতি এবং পুরুষ। এককথায় সাংখ্য বিবর্তনবাদ হল প্রকৃতি পরিণামবাদ। প্রকৃতির অস্তিত্ব সিদ্ধির জন্য ঈশ্বরকৃষ্ণ 'সাংখ্যকারিকা' গ্রন্থে বলেছেন–

"ভেদানাং পরিমাণাৎ সমন্বয়াচ্ছক্তিত: প্রবৃত্তেশ্চ।
কারণকার্যবিভাগাদবিভাদ্বৈশ্বরূপ্যস্য।।"[১]

১. সাংখ্য মতে কারণ থেকে কার্য উৎপন্ন হয়। তাই মহৎ ইত্যাদি কার্য বস্তুর কারণ রূপে অব্যক্ত প্রকৃতিকে স্বীকার করতে হয়।

২. জগতের প্রতিটি বস্তুর মধ্যেই সত্ত্ব, রজ: ও তম: গুণের সমন্বয় ঘটে। সুতরাং সত্ত্ব, রজ: ও তম: গুণ যুক্ত কোনো বিশেষ কারণ থেকেই জগতের সৃষ্টি হয়েছে। সেই বিশেষ কারণই হল প্রকৃতি।

৩. যেকোনো সৃষ্ট বস্তু তার উপাদান কারণে অব্যক্ত অবস্থায় বর্তমান থাকে। জগৎ সৃষ্টির সেই অব্যক্ত শক্তি হল প্রকৃতি।

৪. 'কারণকার্যবিভাগাৎ'- কারণ থেকে কার্যের বিভাগ হয়, অভিব্যক্তি হয় ও ভিন্ন রূপে প্রতীতি হয়। উপাদান কারণে অবস্থিত কার্যেরই অভিব্যক্তি হয় ও ভিন্ন রূপে প্রতীতি হয় বলে চরম কারণ রূপে অব্যক্ত (প্রকৃতি) স্বীকার করতে হয়।

৫. বিশ্বরূপ যে অধিষ্ঠানের প্রলয়কালে বিলীন হয় এবং যে অধিষ্ঠান থেকে বিশ্বরূপ সৃষ্টি হয়, সেই অধিষ্ঠানই হল প্রকৃতি।

প্রকৃতি হল নির্বিশেষ, নিরবয়ব ও অকারন। তা প্রত্যক্ষগোচর নয়। জগতের মূল কারণ প্রকৃতি, প্রকৃতির পরিণামই এই জগৎ। প্রকৃতির পরিণাম ঘটে ত্রিবিধ গুনের তারতম্যের ফলে। এই ত্রিবিধ গুন হল সত্ত্ব, রজ: ও তম:। 'সত্ত্বং লঘু প্রকাশকম্' অর্থাৎ সত্ত্বগুণ হল হালকা প্রকাশক এবং সুখ উৎপাদক। 'উপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজ:' অর্থাৎ রজ: গুন হল চঞ্চল, গতিশীল ও দু:খ উৎপাদক। 'গুরূবরণকমেব তম:' অর্থাৎ তম: গুণ ভারী, আবরনকারী এবং এটি ভ্রম, প্রমাদ, নিদ্রা ও আলস্য উৎপাদক।[২] সত্ত্ব, রজ: ও তম: গুণের সাম্যাবস্থা থাকলে মহৎ ইত্যাদির আর্বিভাব হয় না। কিন্তু ঐ অবস্থাতেও প্রকৃতি স্থির থাকে না, তখনও সে সজাতীয় প্রধানান্তরে পরিণত হয়। অর্থাৎ সত্ত্ব সত্ত্বরূপে, রজ: রজ: রূপে এবং তম: তম: রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। এরূপ পরিণামকে স্বরূপ পরিণাম বলে। এর ফলে জগতের লয় হয এবং প্রকৃতিতেই তা বিলীন হয়ে যায়। অন্যদিকে, যখন

---

[১] সাংখ্যকারিকা, ১৫

[২] সত্ত্বং লঘু প্রকাশকমিষ্টমুপষ্টম্ভ কং চলঞ্চ রজ:।
গুরু বরণকমেব তম: প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তি:।। (সাংখ্যকারিকা, ১৩)

সৃষ্টির মূহুর্ত উপস্থিত হয়, গুণত্রয়ের তারতম্য হয়, সাম্যাবস্থা থাকে না তখন মহৎ ইত্যাদির আবির্ভাব ঘটে। যে পরিণামের ফলে মহদাদি আবির্ভূত হয় তাকে বিরূপ পরিণাম বলে। এর ফলে জগতের সৃষ্টি হয়।

অন্যদিকে পুরুষের অস্তিত্ব সিদ্ধির জন্য ঈশ্বরকৃষ্ণ 'সাংখ্যকারিকা' গ্রন্থে বলেছেন–

"সঙ্ঘাতপরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্যয়াদধিষ্ঠানাৎ।
পুরুষোহস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ।।"[৩]

১. সংঘাত বস্তু মাত্রই অপরের প্রয়োজন সাধন করে। একাধিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত বস্তুই হল সংঘাত। প্রকৃতি সত্ত্ব, রজ: এবং তম: গুণের সমন্বয়ে গঠিত এবং তা জড়াত্মক। কোনো চেতন সত্তার প্রয়োজন সাধনের জন্যই এই সংঘাত পদার্থের উৎপন্ন হয়। সেই চেতন সত্তাই হল পুরুষ।

২. দ্বিতীয় যুক্তিতে বলা হয়েছে, সংঘাত পদার্থ ত্রিগণাত্মক হওয়ায় সংঘাত পদার্থ যার প্রয়োজন সাধন করে তাকে ত্রিগুনশূন্য হতে হবে। সেই ত্রিগুনশূন্য, বিবেকী, অবিষয়,অসামান্য, অপ্রসবধর্মী ও চেতন সত্তাই হল পুরুষ।

৩. ত্রিগুণাত্মক বস্তু মাত্রই কোন এক নিয়ামকের দ্বারা পরিচালিত হয়। তাই প্রকৃতি এবং প্রকৃতির পরিণামজাত সকল বস্তুর নিয়ামক হিসেবে চেতন পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়।

৪. সুখ, দু:খ, আনন্দ ইত্যাদির অনুভূতি একজন চেতন সত্তারই হয়ে থাকে। তাই প্রকৃতিভূত যাবতীয় বস্তুর ভোক্তা, দ্রষ্টা ও জ্ঞাতারূপে পুরুষ অস্তিত্বশীল।

৫. সাংখ্য দর্শনে কৈবল্য শব্দের অর্থ হল দু:খের আত্যন্তিক নিবৃত্তি, যে নিবৃত্তির দ্বারাই দুঃখ জর্জরিত জীবের পরম কল্যাণ সাধিত হতে পারে। প্রকৃতি এবং প্রকৃতিজাত যাবতীয় বস্তু দু:খস্বরূপ হওয়ায় তাদের এরূপ প্রবৃত্তি উৎপন্ন হতে পারে না। সুতরাং কৈবল্যের জন্য যে প্রবৃত্তি হয় তার কর্তা হিসেবে প্রকৃতি ও মহদাদির অতিরিক্ত এক সত্তা স্বীকার করতে হয়। সেই অতিরিক্ত সত্তাই হল পুরুষ।

অর্থাৎ সাংখ্য দর্শনে পুরূষকে 'জ্ঞ' বলা হয়েছে। অর্থাৎ পুরুষ ব্যক্তও নয় আবার অব্যক্ত ও নয়, তা হল উপাদানহীন, নির্গুণ।[৪] পুরুষ হল এক অপরিণামী, অপরিবর্তনীয় সত্তা। পুরুষ এবং প্রকৃতি নিজ নিজ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য একে অপরের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়। প্রকৃতি ক্রিয়াশীল কিন্তু অচেতন, পুরুষ চেতন কিন্তু নিষ্ক্রিয়। পুরূষের চরম ও পরম কাম্যবস্ত হল কৈবল্য। ত্রিবিধ দু:খ (আধিভৌতিক, আদিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক)- এর আত্যন্তিক নিবৃত্তিই হল কৈবল্য। আবার পুরুষ প্রকৃতির সুখ দুঃখ ভোগ করে, প্রকৃতি তখন সার্থকতা লাভ করে। এজন্য প্রকৃতি যেমন পুরূষের অপেক্ষা করে, তেমনি পুরূষ ও প্রকৃতির অপেক্ষা করে। প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে পুরুষ হন খোঁড়া; পুরুষকে বাদ দিয়ে প্রকৃতি অন্ধ।

অবশেষে পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগের মাধ্যমে প্রথমে মহৎ বা বুদ্ধির সৃষ্টি হয়। যাবতীয় জাগতিক বস্তুর উৎস হল এই মহৎ যা মানুষের মধ্যে বুদ্ধি রূপে অবস্থান করে। মহৎ বা বুদ্ধির পরিণাম হল অহংকার। এই অহংকারের জন্য পুরুষ নিজেকে জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা মনে করে। তিনটি গুন অনুসারে অহংকার তিন প্রকার- সত্ত্ব গুণের আধিক্যে সাত্ত্বিক অহংকার, রজ: গুণের আধিক্যে রাজসিক অহংকার এবং তম: গুণের আধিক্যে তামসিক অহংকার। এই অহংকার থেকে মন (অন্তরীন্দ্রিয়), পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রীয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক); পঞ্চকর্মেন্দ্রীয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ) এবং পঞ্চতন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ)- এর সৃষ্টি

---

[৩] সাংখ্যকারিকা, ১৭

[৪] ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ (সাংখ্যকারিকা, ২)

হয়। আবার পঞ্চ তন্মাত্রের পরিণাম হিসাবে পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্টি হয়। পঞ্চ মহাভূত হল- ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরূৎ ও ব্যোম।

এই ২৫ টি তত্ত্ব আবার চারটি ভাগে বিভক্ত—
কেবল প্রকৃতি– প্রকৃতি
প্রকৃতি বিকৃতি– মহৎ, অহংকার, পঞ্চতন্মাত্র
ন প্রকৃতি ন বিকৃতি– পুরুষ
কেবল বিকৃতি– মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রীয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রীয় এবং পঞ্চ মহাভূত।

সাংখ্য মতে সৃষ্টি বলতে বিবর্তনকে বোঝায়। অর্থাৎ সৃষ্টি বলতে শূন্য থেকে শুরু নয়। সৃষ্টির পূর্বে তা উপাদান কারণে অব্যক্ত রূপে অবস্থান করে। আবার ধ্বংস বলতে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় না, রূপান্তর হয়। এটি চক্রাকারে চলতে থাকে।

বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্তে বিবর্তনবাদ:

রামানুজের বিবর্তনবাদ তাঁর বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা ব্রহ্ম পরিণাম বাদ নামে পরিচিত। রামানুজ তিন প্রকার সত্তা মেনেছেন– ব্রহ্মসত্তা, জীবসত্তা ও জগৎ সত্তা।

রামানুজ ব্রহ্মকে সর্বোচ্চ বা সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব বলেছেন কিন্তু তা একমাত্র সত্য নয়। কারণ জীব এবং জগৎ ব্রহ্মেরই মতো সত্য। ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি নির্গুণ নন, সগুণ; অনন্ত সংখ্যক গুণের আধার। তিনি নির্বিকার হলেও নিষ্ক্রিয় নন। কারণ তার দ্বারা দুটি প্রধান কার্য সাধিত হয়– সৃষ্টি এবং মুক্তি। জীবের কর্ম অনুসারে তিনি সৃষ্টির মাধ্যমে জীবকে সংসারে আবদ্ধ করেন। আবার জীবের সাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে তিনি মোক্ষ প্রদান করেন– এটাই ব্রহ্ম লীলা। জগতের মধ্যে অন্তরলীণ হয়ে থাকলেও তিনি জগৎ অতিরিক্ত। ব্রহ্ম ও ঈশ্বর অভিন্ন। রামানুজের মতে বিষ্ণুই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এবং তাঁর নিত্য সহচরী হলেন লক্ষ্মী।

জীব হল জ্ঞান স্বরূপ এবং অজড়। সংসারী জীব দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রান, মন, বুদ্ধি ও আত্মার সমাহার। জীবের উদ্দেশ্য দুটি– ভোগ এবং অপবর্গ। জীব তার কৃতকর্মের ফল ভোগের জন্য সংসারে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরিশেষে সংসার চক্র থেকে মুক্তি বা অপবর্গ লাভ করেন। জীব তিন প্রকার– বদ্ধ, মুক্ত ও নিত্যমুক্ত। বদ্ধজীবের পাঁচটি অবস্থা রয়েছে, যথা- জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মূর্ছা এবং মরণ। জীবের তিনটি অবস্থা হল- স্বর্গ, নরক ও অপবর্গ। পূণ্যার্থীরা স্বর্গে স্থান পান, পাপীরা নরক যন্ত্রণা ভোগ করেন এবং জ্ঞানীরা জ্ঞান ও উপাসনার দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্ত হন।

জগৎ সত্তা হল ব্রহ্মের অচিৎ অংশ। অচিৎ ত্রিবিধ - প্রকৃতি, কাল এবং শুদ্ধ তত্ত্ব। প্রকৃতি হল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল কারণ। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মক- সত্ত্ব, রজ: ও তম:। প্রলয়কালে ব্রহ্মকে 'কারণ ব্রহ্ম' বলা হয়। তখন চিৎ ও অচিৎ সুপ্ত অবস্থায় ব্রহ্মের অংশ রূপে বর্তমান থাকে। সৃষ্টিকালীন ব্রহ্মকে 'কার্য ব্রহ্ম' বলা হয়। দ্বিতীয় অচিৎ কাল হল নিরবয়ব, নিত্য এবং অংশ হীন। আর শুদ্ধ তত্ত্ব হল কেবল সত্ত্বগুণাত্বক।

রামানুজাচার্য সৎকার্যবাদী। তিনি ব্রহ্ম পরিণামবাদের কথা বলেন অর্থাৎ জীব এবং জগৎ ব্রহ্মেরই পরিণাম। তাঁর মতে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাঁর মঙ্গলময় ইচ্ছাশক্তির দ্বারা জীব ও জড় সমন্বিত এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তিনি ব্রহ্ম ও জীবজগতের মধ্যে স্বগতভেদ মেনেছেন। স্বগতভেদ বলতে বোঝায় একই বস্তুর বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভেদ। যেমন একটি গাছের ডাল ও পাতার ভেদ। ব্রহ্ম থেকেই জীও জগতের উৎপত্তি। এক্ষেত্রে ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ উভয়েই। মাকড়শা যেমন তার অভ্যন্তর থেকে তন্তু বের করে জাল

বোনে, ব্রহ্ম ও তেমনি তাঁর চিৎ অংশ থেকে জীবজগৎ এবং অচিৎ অংশ থেকে জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন। রামানুজের মতে ব্রহ্মের চিৎ এবং অচিৎ অংশের মধ্যে ভেদ রয়েছে কিন্তু তাদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা যায় না। এদের মধ্যে 'অপৃকসিদ্ধি' সম্বন্ধ রয়েছে। অপৃথকসিদ্ধি সম্বন্ধ বলতে বোঝায় দুটি ভিন্ন বস্তুর মধ্যে যদি এরূপ সম্বন্ধ থাকে যে একটি ব্যতীত অপরটির অস্তিত্ব সম্ভব নয়।

সর্বোপরি বলা যায়, রামানুজের বিবর্তনবাদ হল ব্রহ্ম থেকে জীব ও জগতে রূপান্তর মাত্র। সৃষ্টির আগ জীব ব্রহ্মের চিৎ অংশে এবং জড় জগৎ ব্রহ্মের অচিৎ অংশে অব্যক্ত রূপে উপস্থিত।

শ্রী অরবিন্দ দর্শনে বিবর্তনবাদ:

বিবর্তনবাদ নিয়ে বিংশ শতাব্দীর চিন্তাবিদদের মধ্যেও মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ পুনরাবৃত্তিমূলক বিবর্তনবাদের কথা বলেন, যেখানে বলা হয় বিবর্তন হল সময়ের সাথে সাথে কমবেশি একই আকৃতি ও বিষয়ের পুন:সংগঠন মাত্র। এ জাতীয় বিবর্তন একই সত্তার পুনরাবৃত্তি মাত্র। কেউ উন্মেষমূলক বিবর্তনবাদের কথা বলেন, যেখানে বিশ্বাস করা হয় বিবর্তনের প্রত্যেক স্তরেই নতুন কিছুর সৃষ্টি হয়। আবার কেউ যান্ত্রিক বিবর্তনের কথাও বলেছেন। যান্ত্রিক বিবর্তনবাদে সবকিছুকে ব্যাখ্যা করা হয় পূর্ব শর্তের ভিত্তিতে। কিন্তু এইসব দার্শনিকদের সঙ্গে শ্রী অরবিন্দের বিবর্তন তত্ত্বের ভাবনার কোনো মিল নেই। অরবিন্দের বিবর্তনবাদ হল অখণ্ড বিবর্তন (Integral Evolution). কেননা তাঁর বিবর্তন তত্ত্বে দেখানো হয়েছে পরম সত্তার সুপ্ত চেতনা থেকে জড়, প্রান এবং শেষে অতিমানস স্তরে রূপান্তর প্রক্রিয়া। তিনি জড়, প্রান ও মনের সাথে এক আধ্যাত্মিক চেতনার সমন্বয় ঘটিয়ে ঐশ্বরিক সত্তার সাথে মিলিত হওয়ার চেষ্টা করেছেন।

শ্রী অরবিন্দের মতে সত্তা এক। কিন্তু তিনি যখন তার স্তরগুলি ব্যাখ্যা করেন তখন সত্তার স্বরূপ বহু। তিনি সত্তার আটটি স্তরের কথা বলেন— ১. শুদ্ধ সত্তা (pure existence) ২. চিৎ শক্তি (consciousness force) ৩. আনন্দ (bliss) ৪. অতিমানস (super mind)— এই চারটি ঊর্ধ্বলোকস্থ। ৫. মন (mind) ৬. চিদাত্মা (psyche) ৭. প্রান (life) এবং ৮. জড় (matter)– এ চারটি নিম্নলোকস্থ। তিনি পরম সত্তাকে 'সচ্চিদানন্দ' বলেছেন, যা জড়সহ সকল কিছুর উৎস। শুদ্ধ সত্তা সামান্য, স্বয়ংসম্পূর্ণ, নিরপেক্ষ ও অসীম শক্তির আধার। এর ব্যাখ্যা অসম্ভব ও অনির্বচনীয়। চিৎ অর্থাৎ চেতন শক্তিকে অরবিন্দ 'মা' (the mother) বলেছেন। এই শক্তি জগতের সৃষ্টি ও ধাত্রী। চেতনার মতো, আনন্দের মতো এটি সর্বত্র বিরাজমান। দিব্য চিৎ শক্তির প্রভাবে অহমাত্মক কামনা বাসনা দূর হলে আনন্দ প্রকটিত হয়।

অরবিন্দ জগৎ সৃষ্টির দুটি প্রক্রিয়ার কথা বলেছেন— অবরোহণ (Descent) এবং আরোহণ (Ascent)। অবরোহণ প্রক্রিয়ায় বিশ্বের গতি অধোমুখী। আবার বিশ্বের গতি যখন স্বরূপে অবস্থিত সত্তার দিকে অগ্রসর হয় তখন তাকে বলা হয় আরোহণ। এই আরোহণ প্রক্রিয়া সম্ভব হয় সংকোচন (involution) এবং বিবর্তন (evolution) এর মধ্য দিয়ে। শ্রী অরবিন্দের মতে বিবর্তনের পূর্বাবস্থা হল সংকোচন বা কুণ্ডলীকরন (involution) । বিবর্তন সম্ভব হয় কারণ কুণ্ডলীকরন প্রক্রিয়াটি ইতিপূর্বে ঘটে গেছে। এই দুই পদ্ধতির মধ্যেই যুক্ত আছে সত্তার আটটি স্তর। আধ্যাত্ম শক্তি প্রথমে জড়, প্রাণ, মন ইত্যাদি নিম্নস্তরে অবরোহণ করে। তারপর তা শুদ্ধ সত্তা ইত্যাদি উচ্চস্তরে আরোহণ করে। জড় থেকে প্রাণের উদ্ভব হয়েছে, কেননা প্রাণ জড়ের মধ্যেই সুপ্ত অবস্থায় ছিল। শ্রী অরবিন্দের মতে বিবর্তন ঘটে তিনটি পদ্ধতির মাধ্যমে– প্রশস্তকরণ (weidening), উন্নতিসাধন (leightening) এবং অখন্ড সমন্বয়করণ (integrations)। প্রশস্তকরণ পদ্ধতিতে নতুন তত্ত্বের জন্য সুযোগ সৃষ্টি হয়। উন্নতিসাধন পদ্ধতিতে একধাপ থেকে অন্য ধাপে আরোহণ করা হয় এবং অখণ্ড সমন্বয়করণ পদ্ধতিতে অখন্ডতাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শ্রী অরবিন্দ মনে করেন বিবর্তনের হাত ধরেই জড়

প্রাণে উন্নীত হয় এবং প্রাণ মনে উন্নীত হয় এবং তারপর মন অপেক্ষা করে পরবর্তী স্তর অর্থাৎ অতিমানস স্তরে পৌঁছানোর জন্য। এই মন যেমন অতিমানস স্তরে যেতে পারে তেমনি আবার অতিমানস স্তর থেকে নেমেও আসতে পারে।

মন থেকে অতিমানস স্তরে পৌঁছানোর জন্য কয়েকটি স্তর অতিক্রম করতে হয়। স্তরগুলি হল— ১. Higher mind বা উচ্চতর স্তর। এই স্তরে সাধারণ মনের মতো সত্যের অন্বেষণ করতে হয় না। ব্যক্তি চিন্তার মাধ্যমে সাক্ষাৎ ও স্বত:স্ফূর্তভাবে সত্যকে প্রত্যক্ষ করে। ২. Illumined mind বা দীপ্ত মন। এই স্তরে শক্তি ও প্রখরতা অনেক বেশি। এখানে দিব্য আলোকের মধ্য দিয়ে সত্য মনের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়। ৩. Intuition বা সজ্ঞা। এখানে নিবিড় ও নির্ভুল সত্য দৃষ্টি, সত্যচিন্তন ও সত্য উপলব্ধি হয়। ৪. over mind বা অধিমানস। এটি অতিমানস এর পূর্ববর্তী স্তর। এখানে খন্ড খন্ড রূপে অখন্ডের ধারণা থাকে। ৫. super mind বা অতিমানস স্তর। এই স্তরে অখণ্ড সত্য, জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি একইসাথে কাজ করে এবং মানুষের প্রাণ, শরীর ও মনকে ঐশ্বরিক জীবনে পরিণত করে। এই অতিমানস স্তরে সব বিজ্ঞানময় পুরুষ যে একই হবে এমন নয় কিন্তু সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য থাকবে। সে নিজেকে সকলের সাথে একাত্ম মনে করবে এবং প্রতি ক্ষণে, দেহের প্রতিটি কোষে স্বয়ং ভগবানের উপস্থিতি অনুভব করবে।

পরিশেষে বলা যায়, বিবর্তনের চরম ও পরম লক্ষ্য হল দিব্যজীবন (life devine) । অরবিন্দের বিবর্তন হল আধ্যাত্মিক বিবর্তন, যার দ্বারা দিব্যজীবন প্রতিষ্ঠা হবে। তিনি সৎকার্যবাদে বিশ্বাসী। বিবর্তনের পূর্বাবস্থা হল কুণ্ডলীকরন এবং শূন্য থেকে বিবর্তন সম্ভব নয়। বিবর্তনের পূর্বে পরম ব্রহ্ম অব্যক্ত অবস্থায় জড়ের মধ্যেই নিহিত ছিল। যোগ বা সাধনার দ্বারা; প্রশস্তকরণ, উন্নতিসাধন ও অখণ্ড সমন্বয়করণের মাধ্যমে ক্রমানুসারে জড়, প্রাণ, মন এবং শেষে অতিমানস স্তরে রূপান্তরিত হয়।

উপরিউক্ত তুলনামূলক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যাচ্ছে যে; সাংখ্য, বিশিষ্টাদ্বৈতবেদান্ত ও অরবিন্দের বিবর্তনবাদের মধ্যে যেমন কিছু মিল রয়েছে তেমনি কিছু অমিলও রয়েছে।

মিল:

১. তিনটি সম্প্রদায়ই সৎকার্যবাদে বিশ্বাসী, যেখানে বলা হয় উৎপত্তির পূর্বে কার্য তার উপাদান কারণে নিহিত থাকে। এক্ষেত্রে সাংখ্যরা প্রকৃতি পরিণামবাদের কথা বলে, রামানুজ ব্রহ্ম পরিণামবাদের কথা বলে এবং অরবিন্দ অখণ্ড বিবর্তনবাদের কথা বলে।
২. তিনটি সম্প্রদায়ই স্বীকার করেন শূন্য থেকে বিবর্তন সম্ভব নয়।
৩. তিনটি সম্প্রদায়ই জড় থেকে চেতনায় উত্তরণের কথা বলেন।
৪. এদের সৃষ্টি ও প্রলয় প্রণালীও একই।

অমিল:

১. সাংখ্য মতে পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতির বিবর্তন ঘটে এবং জগৎ সৃষ্টি হয়। রামানুজের মতে ব্রহ্মের স্ব ইচ্ছায় বিবর্তন ঘটে। আবার অরবিন্দের মতে জগৎ সৃষ্টি হয় দুটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে– অবরোহণ এবং আরোহণ।
২. সাংখ্য বিবর্তনবাদের লক্ষ্য হল পুরুষের স্বরূপ উপলব্ধি বা কৈবল্য লাভ। রামানুজের বিবর্তনবাদের লক্ষ্য হল জীবাত্মার সাথে পরম কল্যাণময় ঈশ্বরের মিলন। অরবিন্দের বিবর্তনবাদের লক্ষ্য শুধু মুক্তি নয়, জড় বা মানবদেহের দিব্যজীবন লাভ।
৩. সাংখ্য মতে প্রকৃতি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। ব্রহ্ম বলে কিছু নেই। রামানুজ বলেন প্রকৃতি ব্রহ্মেরই অংশ।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. অনির্বাণ (অণু.)। দিব্যজীবন। শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, পন্ডিচেরী, ২০০১।
২. গোস্বামী, শ্রী নারায়ণ চন্দ্র। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী। সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ২০১৬।
৩. চৌধুরী, রমা। বেদান্ত দর্শন। অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ২০২৫।
৪. পাল, শ্রী বিপদভঞ্জন। সাংখ্যকারিকা। সদেশ, কলকাতা, ২০২১।
৫. ভট্টাচার্য, ঝর্ণা। অদ্বৈতবেদান্ত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবেদান্ত। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০১৭।
৬. রায়, দিলীপকুমার। শ্রী অরবিন্দের দর্শন। শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, পন্ডিচেরী, ১৯৩১।
৭. সরস্বতী, শ্রী প্রজ্ঞানানন্দ। বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস। শ্রী শঙ্করমঠ, বরিশাল এবং সরস্বতী লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯২৭।
৮. Gupta, Anima Sen. The Evolution of Sankhya School of Thought. Munshiram Manhorlal publisher, 2nd edition, 1986.

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1536-1544
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.375

পিণ্ডারিদের উত্থান ও বিকাশ ব্রিটিশপূর্ব ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

পুলক সরকার, *স্বাধীন গবেষক, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 21.03.2026; Accepted: 21.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This essay analyses the origin, development, and political role of the Pindaris in the period preceding the establishment of British rule. In the context of the Mughal Empire's decline and the rise of Maratha power, the Pindaris first emerged as auxiliary cavalry for various Indian armies. Subsequently, under Maratha chiefs, they became a significant military element by conducting looting and destructive activities in enemy territories. By the end of the 18th century, the weakness of the Maratha Confederacy and the lack of central control helped the Pindaris gradually evolve into an independent force. Under leaders such as Karim Khan Pindari and Chitu Pindari, they began conducting raids for their own interests, and their relationship with the Maratha power became largely strained. Through an analysis of their military structure, social composition, and economic foundation, this essay demonstrates that they were a multi-ethnic and unorganized group whose primary goal was the acquisition of wealth through plunder. At the same time, their internal conflicts, lack of centralized leadership, and mutual rivalries weakened their political stability. In conclusion, it can be said that even before British rule, the Pindaris had emerged as a significant yet volatile force, whose rise and development were deeply connected to the political instability and power shifts of contemporary India.

Keywords: Pindari, Maratha, British, Politics, Military, Plunder, Power

১

পিণ্ডারি– ইতিহাসের ছাত্রছাত্রীদের কাছে খুবই চেনাপরিচিত একটি নাম, অথচ ইতিহাসের তাঁদের ব্যাপারে তথ্যের থেকেও বেশি কুখ্যাতি বিদ্যমান। সমসাময়িক ব্রিটিশ লেখকদের দৃষ্টিতে তাঁদের কর্মকাণ্ড প্রায়ই তৎকালীন সতীদাহ, শিশুহত্যা এবং মানববলির মতো প্রথার সমপর্যায়ভুক্ত ছিল। ব্রিটিশদের কথানুযায়ী তাঁদের সভ্যতা, শান্তি ও সমৃদ্ধির আগমনের এক প্রতিবন্ধকতা ছিল পিণ্ডারি। সেই কারণে পিণ্ডারিদের নিয়ে ঐতিহাসিক গবেষণা করাও যথেষ্ট কঠিন এক বিষয়। তাঁদের সম্পর্কিত ব্রিটিশ বর্ণনাগুলো তাঁদের নিজস্ব পক্ষপাতদুষ্টতার কারণে অনেকক্ষেত্রে বিকৃত হয়েছে, অন্যদিকে তাঁদের প্রাথমিক ইতিহাসও বেশ অস্পষ্ট। তাঁরা নিজেদের কার্যকলাপ সম্পর্কে কোনো লিখিত নথিও রেখে যাননি। ইতিহাসে সেন এবং সরদেশাইয়ের মতো গবেষকেরা সীমিত সংখ্যক প্রাথমিক উৎস বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁদের গবেষণার ফলেও উল্লেখযোগ্য কোনো নূতন তথ্য সামনে উঠে আসেনি। নির্ভরযোগ্য উৎসের অভাব এবং নূতন কোনো উৎস আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের একটি পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তৃত ইতিহাস রচনা করা বর্তমানে সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন ঐতিহাসিক ফিলিপ এফ

ম্যাকএল্ডোনির।[১] আজকের এই প্রবন্ধে সেই কারণে তথাকথিত ব্রিটিশ পিণ্ডারি সংঘর্ষের দিকে না গিয়ে ব্রিটিশপূর্ব পিণ্ডারিদের ইতিহাস অনুসন্ধান করার সামান্য প্রচেষ্টা করলাম।

পিণ্ডারিদের উদ্ভব ঘটে আনুমানিক খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী নাগাদ এবং ক্রমে তাঁরা ভারতীয় বিভিন্ন সেনাবাহিনীর সহায়ক বাহিনী (auxiliaries) হিসেবে গড়ে ওঠে। তবে দুর্ভাগ্যবশত তাঁদের উৎপত্তি ও প্রাথমিক ইতিহাস বেশ অস্পষ্ট। প্রাথমিক সূত্রগুলিতে যে অল্প কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়, তার ভিত্তিতে কেবল কিছু অনুমান করা সম্ভব হয়। এমনকি "পিণ্ডারি" শব্দটির অর্থ নিয়েও ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সবচেয়ে সম্ভাব্য ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী, পিণ্ডারি শব্দটি এসেছে *পিণ্ডা* থেকে, যা একটি মাদকজাতীয় পানীয় ছিল এবং পিণ্ডারিরা প্রায়ই সেটি পান করতেন। অনেক পিণ্ডারিই মনে করত যে তাদের নামের উৎস এই পানীয় থেকেই এসেছে।[২] আরও দুটি সম্ভাব্য উৎস হলো হিন্দি ও মারাঠি ভাষার *pendha hare* এবং *pind parna* শব্দগুচ্ছ। প্রথমটির অর্থ "যে খড়ের আঁটি সংগ্রহ করে।" এটি সেই কাজের প্রতি ইঙ্গিত করে, যা পিণ্ডারিরা কখনও কখনও সেনাবাহিনীর জন্য ঘোড়ার খাদ্য সংগ্রহকারী হিসেবে করতেন। দ্বিতীয়টির অর্থ "ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করা" বা "মৃত্যু পর্যন্ত অনুসরণ করা।" এটি ইঙ্গিত করে যে পিণ্ডারিরা অনেকসময় কোনো সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তার পেছনে পেছনে চলতেন।

Pandhar এবং *Bidaris* শব্দদুটিও দুটি ভৌগোলিক অঞ্চলের সঙ্গে সম্পর্কিত, যেগুলোর সঙ্গে পিণ্ডারিদের সম্ভাব্য যোগসূত্র থাকতে পারে। তবে *Pandhar* সম্পর্কিত তত্ত্বটির পক্ষে খুব বেশি প্রমাণ নেই, কারণ নর্মদা নদীর তীরবর্তী এই অঞ্চলটি পিণ্ডারিরা জমির অধিকার লাভ করার অনেক পরে তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন।[৩] এর আগে তারা দাক্ষিণাত্যের আরেকটি অঞ্চল, অর্থাৎ বিদার অঞ্চলের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। তাই ধারণা করা হয় যে "পিণ্ডারি" শব্দটি সম্ভবত *Bidari* শব্দের বিকৃত রূপ, যার অর্থ বিদার অঞ্চল থেকে আগত মানুষ। একটি সম্ভাব্য ধ্বনিগত পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা হতে পারে— *Bidari* থেকে *Bindari,* এবং সেখান থেকে *Pindari*। উল্লেখযোগ্য যে এই অঞ্চলটিতেই প্রথম লেখকেরা পিণ্ডারিদের সম্পর্কে উল্লেখ করেছিলেন।

এই বিভিন্ন ব্যুৎপত্তি একত্রে পিণ্ডারিদের একটি মৌলিক সংজ্ঞা প্রদান করে। পিণ্ডারিরা ছিলেন অপেক্ষাকৃত স্বল্পসংগঠিত একদল অশ্বারোহী যোদ্ধা, যাঁরা কোনো সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে শত্রুপক্ষের অঞ্চল ও শিবিরে লুটতরাজ চালানো এবং তাদের হয়রানি করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতো। তাঁদের উৎপত্তি দাক্ষিণাত্যের বিদার অঞ্চলের আশেপাশে বলে মনে করা হয় এবং পরবর্তীকালে তাঁরা এমন একটি অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন, যা একসময় *Pandhar* নামে পরিচিত ছিল। তাঁদের অস্তিত্বের শেষ পর্যায়ে তাঁরা ধীরে ধীরে কোনো নির্দিষ্ট সেনাবাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন এবং এরপর তাঁরা নিজেদের স্বার্থে বিভিন্ন অঞ্চলে লুঠতরাজ শুরু করেন— সেটি শত্রু অঞ্চল হোক বা না হোক।

এই মৌলিক সংজ্ঞার প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে এই ধরনের গোষ্ঠী ভারতীয় রাজনীতি ও সামরিক ব্যবস্থায় নতুন কিছু ছিল না। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত দুটি সুপরিচিত গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে কোনো রাজাকে তার শত্রুর বিরুদ্ধে কৌশল হিসেবে দস্যু ও চোরদের ব্যবহার করা উচিত।[৪] যদিও এগুলো মূলত একজন রাজাকে কী করা উচিত সেই বিষয়ে নির্দেশনা দেয়, তবুও সম্ভবত এগুলো কোনো না কোনোভাবে বাস্তব পরিস্থিতিকেও প্রতিফলিত করে। এই কারণেই ধারণা করা যায় যে অনেক শাসক তাদের নিজস্ব উদ্দেশ্যসাধনের জন্য এ ধরনের গোষ্ঠীকে ব্যবহার করতেন।

ভারতে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠার পর তাই অবাক হওয়ার কিছু নেই যে তারাও ধীরে ধীরে তাদের পূর্বসূরিদের মতো এই ধরনের সামরিক গোষ্ঠীকে নিজেদের সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে এ ধরনের

একটি দল তাদের সেনাবাহিনীর অংশ হয়ে ওঠে। পিণ্ডারি ইতিহাসের এই কম পরিচিত সময়কালটিকে পরবর্তী দুই পর্যায়ের তুলনায় "মুসলিম যুগ" হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এর পরবর্তী পর্যায়, অর্থাৎ "মারাঠা যুগ"-এ মারাঠা প্রধানেরা পিণ্ডারিদের নিজেদের সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে। অবশেষে "স্বাধীন যুগ"-এ পিণ্ডারিরা ধীরে ধীরে মারাঠা নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে যায় এবং নিজেদের স্বার্থে স্বাধীনভাবে লুটতরাজ শুরু করে।

মুসলিম ইতিহাসবিদ মহম্মদ কাশিম ফেরিস্তা প্রথমবারের মতো ১৬৮৯ সালে দাক্ষিণাত্যে ঔরঙ্গজেবের অভিযানের সময় "পিণ্ডারি" নামটির স্পষ্ট উল্লেখ করেন।[৫] একই সময়ে আরেকটি সূত্রে বলা হয়েছে যে বিদারি বা পিণ্ডারিরা মুঘল সেনাবাহিনীর সঙ্গে "স্বীকৃত ও বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত চোর" হিসেবে অগ্রসর হতেন। ইতালীয় অভিযাত্রী নিকোলাই মানুচির মতে তাঁরা হতেন শত্রুর ভূখণ্ডে প্রথম আক্রমণকারী, যাঁরা যা পেতেন তাইই লুঠ করে নিয়ে যেতেন।[৬]

২

পরবর্তী "মারাঠা যুগ"-এর ক্ষেত্রেও উৎস উপাদান প্রায় মুঘল যুগের ন্যায় সমানভাবে সীমিত। মারাঠারা শিবাজীর সময়ে পিণ্ডারিদের তেমন ব্যবহার করতেন না। তবে সম্ভবত বালাজী বাজিরাওয়ের শাসনকালে মারাঠারা প্রথম পিণ্ডারিদের ভাড়াটে যোদ্ধা হিসেবে নিয়োগ করে, এবং সেই সময় তাদের নেতৃত্বে ছিলেন পিণ্ডারি নেতা গর্দি খান।[৭]

পিণ্ডারিরা কেন মুঘলদের পক্ষ ত্যাগ করে মারাঠাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, সে বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। সম্ভবত পিণ্ডারিরা মুঘলদের কঠোর নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন, অথবা তাঁরা মনে করেছিলেন যে মারাঠাদের অধীনে লুটতরাজের সুযোগ আরও বেশি এবং লাভজনক হবে।[৮] তাই হয়তো তাঁরা এইসময় থেকে মারাঠা সেনাবাহিনীর একটি নিয়মিত অংশে পরিণত হয়েছিলেন।

পুনে দরবার যশবন্ত হোলকার এবং দৌলত রাও সিন্দিয়ার ন্যায় মারাঠা নেতাদের নিজ নিজ শিবিরে নির্দিষ্ট সংখ্যক পিণ্ডারি রাখার অনুমতি দেয়। মারাঠা সামরিক ব্যবস্থার মধ্যে পিণ্ডারিরা অশ্বারোহী বাহিনীর চতুর্থ শ্রেণি (খাসগি পাগা, শিলেদার এবং একান্দাসের পর) হিসেবে বিবেচিত হতেন।[৯] অষ্টাদশ শতাব্দী জুড়ে এই ব্যবস্থার অধীনে পিণ্ডারিরা মারাঠা প্রধানদের জন্য আয়ের একটি উৎসে পরিণত হন। মারাঠা প্রধানেরা তাঁদের সুরক্ষা দিতেন এবং মারাঠা সেনাবাহিনী যে সব অঞ্চলের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতো সেখানে পিণ্ডারিদের লুটতরাজ করার অনুমতি দিতেন। এর বিনিময়ে পিণ্ডারিরা মারাঠা প্রধানদের "পালপট্টি" নামক একটি কর প্রদান করতেন।[১০] আসলে পিণ্ডারিরা দক্ষ অশ্বচালক, লুটেরা এবং স্বাধীনচেতা হবার কারণে মারাঠারা তাঁদের নিজেদের সুবিধার্থে পিণ্ডারিদের ব্যবহার করতেন।[১১]

পিণ্ডারিদের সঙ্গে এই ব্যবস্থা মারাঠাদের জন্য ততদিন পর্যন্ত লাভজনক ছিল, যতদিন মারাঠা সেনাবাহিনী একটি সুসংগঠিত বাহিনী হিসেবে রাষ্ট্রের স্বার্থে কাজ করছিল এবং যতদিন শক্তিশালী মারাঠা প্রধানেরা পিণ্ডারি ও তাঁদের বাহিনীকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছিলেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে মারাঠা নেতৃত্বের অবনতি ঘটে এবং তুলনামূলকভাবে অযোগ্য ব্যক্তিরা শাসনক্ষমতায় আসতে শুরু করে। তাদের অধীনে মারাঠা কনফেডারেসির ঐক্য ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে। প্রতিটি প্রধান নিজের এলাকায় কর্তৃত্ব বজায় রাখতে এবং নিজেকে কনফেডারেসির প্রধান নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়ে ওঠে।

এই পরিস্থিতিতে শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে পিণ্ডারিদের সংখ্যা ও সম্পদ উভয়ই দ্রুত বৃদ্ধি পায়। তাদের চরিত্রও উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়। তারা আর কেবল কোনো সেনাবাহিনীর সহায়ক বাহিনী হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং নিজেদের নেতাদের অধীনে তারা একটি আধা-স্বাধীন অশ্বারোহী বাহিনীতে পরিণত হয়, যাদের

মারাঠা প্রধানদের সঙ্গে সম্পর্ক অনেক সময় কেবল নামমাত্র জোটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই পরিবর্তনই পিণ্ডারি ইতিহাসে মারাঠা যুগ থেকে স্বাধীন যুগে উত্তরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংক্রমণ পর্যায়কে নির্দেশ করে। যেকোনো ঐতিহাসিক সময়বিভাগের মতোই পিণ্ডারিদের "স্বাধীন যুগ" কিছুটা ইচ্ছামতো নির্ধারিত। তবে গবেষণার সুবিধার্থে ঐতিহাসিক ফিলিপ এফ ম্যাকএল্ডোনির এই সময়কালকে আনুমানিক ১৮০০ থেকে ১৮১৮ সাল পর্যন্ত ধরেছেন। এই দুই দশকে পিণ্ডারিরা এবং তাঁদের নেতারা প্রায় বাধাহীনভাবে লুঠতরাজ চালাতে থাকে, আর মারাঠা নেতৃত্ব খুব কম ক্ষেত্রেই তাদের ওপর এমনকি নামমাত্র নিয়ন্ত্রণও প্রয়োগ করতে পারত। এই কারণেই এই সময়কালকে "স্বাধীন যুগ" বলা যেতে পারে।

তবে বাস্তবে পিণ্ডারিরা এতটা শক্তিশালী ছিলেন না যে তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারতেন, এবং তাঁরাও তা করতে আগ্রহী ছিলেন না। তাঁরা যেহেতু এমন এক অঞ্চলে বসবাস করতেন যা মারাঠাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল, তাই তারা কখনোই মারাঠাদের অস্পষ্ট বা আনুষ্ঠানিক কর্তৃত্বকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেনি। ১৮১৫ সালের মধ্যে পিণ্ডারিরা একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী বাহিনীতে পরিণত হওয়ার পেছনে তিনটি প্রধান কারণ ছিল— প্রথমত, তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি, দ্বিতীয়ত তাঁদের সম্পদের বৃদ্ধি, এবং তৃতীয়ত, নতুন ও স্বাধীন নেতৃত্বের উত্থান।

পিণ্ডারিদের সংখ্যা কত ছিল তা নির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন, কারণ সেই সময়ে কোনো জনগণনা বা নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান ছিল না। ব্রিটিশ পর্যবেক্ষকেরা কখনো কখনো নিজের চোখে দেখে পিণ্ডারিদের সংখ্যা অনুমান করতেন, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অনুমান করতেন। এই তথ্যগুলো সাধারণত বিভিন্ন দুরাহ বা পিণ্ডারি দলের (যেগুলো কোনো স্বীকৃত পিণ্ডারি নেতার অধীনে থাকত) সংখ্যা যোগ করে তৈরি করা হতো।

১৮১০ সালে বেরার দরবারে নিযুক্ত ব্রিটিশ প্রতিনিধি ক্যাপ্টেন সিডেনহাম অভিযোগ করেছিলেন যে তাঁর কাছে থাকা "অসম্পূর্ণ তথ্যের" কারণে তিনি পিণ্ডারিদের সম্পর্কে কোনো নিয়মিত বা সঠিক বিবরণ দিতে পারেননি।[১২] এর পাশাপাশি "পিণ্ডারি" বলতে ঠিক কাদের বোঝানো হবে তারও কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা ছিল না। ফলে কিছু পর্যবেক্ষক যে সব পিণ্ডারিদলকে অন্তর্ভুক্ত করতেন, অন্যরা আবার সেগুলোকে বাদ দিতেন। কিছু প্রতিবেদনে কেবল নির্বাচিত কয়েকটি দলকে অন্তর্ভুক্ত করা হতো, আবার কিছু প্রতিবেদনে ওই অঞ্চলের সব ধরনের অনিয়মিত অশ্বারোহী বাহিনীকে পিণ্ডারি হিসেবে গণনা করা হতো। ফলে অধিকাংশ হিসাবই অস্পষ্ট, ভুল বা পরস্পরবিরোধী হয়ে পড়ে।

পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে এই কারণে যে পিণ্ডারিদের সংখ্যা তাদের লুঠতরাজের সাফল্য বা ব্যর্থতার ওপর নির্ভর করে বাড়ত বা কমত।[১৩] অনেক সময় দেখা যেত একটি নির্দিষ্ট লুঠ অভিযানে (*লুবার*) পিণ্ডারিদের সংখ্যা মূল সংখ্যার দ্বিগুণ হয়ে গেছে। কারণ যাদের ওপর তারা লুটতরাজ চালাত, তাদের অনেকেই সবকিছু হারিয়ে হতাশায় সেই পিণ্ডারি দলে যোগ দিত। এছাড়াও সমাজের দুষ্কৃতকারী ও ভবঘুরে মানুষও সেই লুটকারী দলে যোগ দিত যখন তা তাদের এলাকার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করত।[১৪] ফলস্বরূপ, ১৮১২ সালে পিণ্ডারিদের সংখ্যা নিয়ে তিনটি আলাদা প্রতিবেদনে যথাক্রমে ২২,০০০, ২৬,০০০ এবং ৪৪,০০০ জনের হিসাব দেওয়া হয়েছিল।[১৫] তাই পিণ্ডারিদের সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা বেশ কঠিন।

এই সময়ে পিণ্ডারিদের জমি ও সম্পদের পরিমাণ কতটা বৃদ্ধি পেয়েছিল তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করাও সমানভাবে কঠিন। পূর্বে উল্লেখিত তিনটি প্রতিবেদনে পিণ্ডারিদের জমি থেকে বার্ষিক আয়ের পরিমাণ যথাক্রমে

৮৩৪,০০০, ১,২০০,০০০ এবং ১,৯৫৭,০০০ টাকা বলে উল্লেখ করা হয়েছিল।[১৬] এর তুলনায় ১৮০০ সালের আগে তাদের বার্ষিক আয়ের একমাত্র উল্লেখিত পরিমাণ ছিল মাত্র ৫০,০০০ টাকা।[১৭]

পিণ্ডারিদের জমি সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিবেদনে দেখা যায় যে এই সময়ে মারাঠা প্রধানেরা— বিশেষত দৌলত রাও সিন্ধিয়া এবং যশবন্তরাও হোলকার— তাদের সামরিক সেবার বিনিময়ে পিণ্ডারি নেতাদের জমি দান করতেন। পিণ্ডারিরা এই অঞ্চলগুলো নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখে সেগুলো আরও বিস্তৃত করার চেষ্টা করতেন। এইভাবে মধ্যভারতের নর্মদা নদীর ঠিক উত্তরে অবস্থিত জমির অধিকাংশই পিণ্ডারিদের জন্য স্থায়ী আয়ের উৎস হয়ে ওঠে। পাশাপাশি এগুলো তাদের পরিবারের বসবাসের স্থান এবং লুঠতরাজ পরিচালনার একটি কেন্দ্র হিসেবেও কাজ করত।

মারাঠা যুগে প্রথম বাজীরাও এবং পরবর্তীকালে ভোঁসলে রাজাও পিণ্ডারিদের জমি দান করেছিলেন। তবে সেই জমিগুলো খুব দ্রুতই তাদের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে যায়। তাছাড়া সেগুলো স্বাধীন যুগে পিণ্ডারিদের অধীনে থাকা জমির মতো বিস্তৃত বা লাভজনক ছিল না।[১৮]

জমি থেকে প্রাপ্ত আয়ের পাশাপাশি পিণ্ডারি নেতারা মাঝে মাঝে নগদ অর্থও পেতেন, শর্ত ছিল যে তারা নির্দিষ্ট অঞ্চল লুঠ করবে না। তবে এই আয়ের পরিমাণ সম্পর্কে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্যও পাওয়া যায় না।[১৯] পিণ্ডারিরা শক্তিশালী হয়ে ওঠার পর তারা কখনও কখনও মধ্য ভারতের কোনো প্রধানকে লুঠতরাজের হুমকি দিয়েও অর্থ আদায় করত। ১৮১১ সালের দশেরা উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত একটি বৈঠকের প্রতিবেদনে এই ধরনের ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায়। তৎকালীন পিণ্ডারি নেতা করিম খান পিণ্ডারি অন্য এক পিণ্ডারি নেতা চিতু পিণ্ডারিকে পাশের ভোঁসলে রাজ্যের অঞ্চল লুঠ করার জন্য রাজি করানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু চিতু এতে অংশ নিতে অস্বীকার করেন। যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমান করা যায় যে ভোঁসলে শাসক সম্ভবত চিতুকে একটি বড় অঙ্কের ঘুষ দিয়েছিলেন। ফলে সেই লুট অভিযান আর ঘটেনি।[২০]

লুঠতরাজ পিণ্ডারিদের আয় ও সম্পদের সবচেয়ে বড় উৎস ছিল, যদিও এটি স্থায়ী ছিল না। ঋণ পরিশোধ, আনন্দ উল্লাস এবং ভোগ বিলাসেই পিণ্ডারিদের দ্রুত লুঠ করা সম্পদ ব্যয় হয়ে যেত।[২১] যদি পিণ্ডারিরা আরও বিস্তৃতভাবে এবং দীর্ঘসময় ধরে লুঠতরাজ চালাত, তবে হয়তো তারা ভারতীয় অর্থনীতিতে এক ধরনের রূপান্তরও ঘটাতে পারত। তারা সাধারণত যে সম্পদ লুঠ করত তার বেশিরভাগই ছিল মূল্যবান গয়না অথবা নগদ অর্থ। অনেক সময় নির্যাতনের মাধ্যমে এই সঞ্চিত সম্পদ আদায় করা হতো। ফলে দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা স্থবির সম্পদ আবার অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রবাহিত হতে শুরু করত এবং এর ফলে মুদ্রাস্ফীতিও ঘটতে পারত, এমনটা মনে করতেন ফিলিপ এফ ম্যাকএল্ডোনির।

পিণ্ডারিদের স্বাধীন শক্তি হিসেবে বিকাশের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল একটি নতুন ধরনের নেতৃত্বের আবির্ভাব। একদিকে পিণ্ডারি নেতৃত্ব আরও স্বাধীন হয়ে ওঠে, তবে তা এই কারণে নয় যে তারা বিশেষভাবে দক্ষ নেতা পেয়েছিল; বরং মধ্য ভারতে যে ক্ষমতার শূন্যতা তৈরি হয়েছিল, সেই পরিস্থিতিতে তারা সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে সক্ষম হয়েছিল।

এই সময়ে মারাঠাদের নেতৃত্বও তুলনামূলকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। পুনের পেশোয়া ইতিমধ্যেই ব্রিটিশদের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন, যেমন পরাজিত হয়েছিলেন দৌলত রাও সিন্ধিয়া। অন্যদিকে যশবন্তরাও হোলকার তাঁর স্বাধীনতা বজায় রেখেছিলেন, কিন্তু ১৮০৮ সালে তাঁর মানসিক অসুস্থতা দেখা দেওয়ার পর তার দরবারে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয় এবং অন্যান্য শক্তির সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাও দুর্বল হয়ে পড়ে।[২২]

এই সুযোগে পিণ্ডারিরা ধীরে ধীরে মারাঠা প্রধানদের প্রতি তাঁদের প্রধান আনুগত্য ও বাধ্যতা কমিয়ে এনে নিজেদের দুরাহ অর্থাৎ পিণ্ডারি দলের নেতাদের প্রতি বেশি অনুগত হয়ে পড়েন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে পিণ্ডারি দলগুলোকে সহজেই চিহ্নিত করা যেত যে তাঁরা যশবন্তরাও হোলকার (হোলকারশাহী) অথবা দৌলত রাও সিন্ধিয়া (সিন্দিয়াশাহী) র অধীনে কাজ করে। কিন্তু পরবর্তী বছরগুলোতে এই মারাঠা প্রধানদের সঙ্গে পিণ্ডারিদের সম্পর্কও ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সক্রিয় এবং বড় পিণ্ডারি দলগুলোর অধিকাংশই তখন নামমাত্রভাবে সিন্দিয়াশাহীর অধীনে ছিল। ফলে এই উপাধিটি ধীরে ধীরে তার গুরুত্ব হারায় এবং তার পরিবর্তে দুরাহ বা পৃথক পিণ্ডারি দলের পরিচয়ই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।[২৩] পিণ্ডারি নেতাদের ইতিহাস আরও কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করলে এই পরিবর্তনের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়।

ঘাট-স-উদ্দীন ছিলেন প্রথম পিণ্ডারি যাকে মারাঠারা নিয়োগ করেছিলেন। তিনি প্রথম বাজিরাওয়ের অধীনে হিন্দুস্তানে যুদ্ধ করেছিলেন। যখন হোলকার তাঁর সামরিক কৃতিত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেন, তখন তিনি এবং তাঁর এক পুত্র গার্দি খান হোলকারের দরবারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। এই পিণ্ডারি দলটি, তাদের বংশগত নেতৃত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পরেও, স্বাধীন যুগ পর্যন্ত হোলকারদের অধীনেই থেকে যায়।

মানসিক অসুস্থতা দেখা দেওয়ার আগে যশবন্তরাও হোলকার পিণ্ডারিদের দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন। সম্ভবত তিনি তাদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার পরিকল্পনাও করেছিলেন। কিন্তু পরে যখন তুলসীবাই ক্ষমতা গ্রহণ করেন, তখন তিনি পিণ্ডারিদের উপাধি ও জমি প্রদান করেন। এর ফলে পিণ্ডারিরা আরও শক্তিশালী অবস্থানলাভ করে।[২৪]

৩

স্বাধীন যুগে, কন্দির বখ্‌শের নেতৃত্বে থাকা এই পিণ্ডারি দলটি অন্য পিণ্ডারি দলগুলোর তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম সক্রিয় ছিল। শাহবাজ খান পিণ্ডারিদের দ্বিতীয় প্রধান শাখাটি সংগঠিত করেছিলেন, যা সাধারণত দৌলতরাও সিন্ধিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিল। তিনি সিন্ধিয়ার হয়ে হিন্দুস্তানের একটি অভিযানে অংশগ্রহণের সময় মারা যান, তবে তার দলটি পরবর্তীতেও সিন্ধিয়া বংশের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বজায় রাখে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে শাহবাজ খানের দুই পুত্র— হিরো এবং বারুন ভোপালের নবাবের কাছে তাদের সামরিক সেবা প্রদানের প্রস্তাব দেন। কিন্তু নবাব এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে দ্বিধা করলে নাগপুরের ভোসলে পরিবার তাদের নিয়োগ করে।

পিণ্ডারিদের প্রথম দায়িত্ব ছিল ভোপাল অঞ্চল লুঠ করা, এবং তারা অত্যন্ত উৎসাহ ও সাফল্যের সঙ্গে এই কাজ সম্পন্ন করেন। কিন্তু এই অভিযানে সংগৃহীত বিপুল লুঠের সম্পদ দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে ভোঁসলে রাজা পিণ্ডারিদের শিবিরেই আক্রমণ চালান এবং বারুনকে বন্দি করেন।[২৫] এই ঘটনার পর হিরো নিজের নিরাপত্তা নিয়ে অনিশ্চিত হয়ে সিন্ধিয়ার কাছে পালিয়ে যায়। অল্প সময়ের মধ্যেই, প্রায় ১৮০০ সালের দিকে, এই দুই নেতা মারা যান।

১৮০০ সালের পর সিন্ধিয়াশাহীর অধীনে বংশানুক্রমিক নেতৃত্বের গুরুত্বও অনেকটাই কমে যায়, যেমনটি হোলকার শাহীর ক্ষেত্রেও ঘটেছিল। এই সময়ে দুই নতুন নেতা করিম খান পিণ্ডারি এবং চিতু পিণ্ডারি উত্থিত হন। স্বাধীন যুগে এই দুই নেতাই পিণ্ডারিদের প্রধান নেতৃত্বে পরিণত হন।

করিম খান কিছু সময়ের জন্য সবচেয়ে ধনী ও শক্তিশালী পিণ্ডারি নেতা ছিলেন। তরুণ সৈনিক হিসেবে তিনি ধারাবাহিকভাবে পেশওয়া, সিন্ধিয়া এবং বারুনের অধীনে কাজ করেছিলেন। যখন ভোঁসলে রাজা বারুনকে বন্দি করেন, তখন করিম খান পালিয়ে গিয়ে সিন্ধিয়ার অধীনে যোগ দেন।

খড়দার যুদ্ধে হায়দ্রাবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিয়ে তিনি লুঠতরাজের মাধ্যমে বিপুল সম্পদ অর্জন করেন। এই নতুন অর্জিত সম্পদ রক্ষা করার জন্য তিনি মধ্য ভারতের শুজলপুর অঞ্চলে নিজের ঘাঁটি স্থাপন করেন। সেখানে তিনি অনেক পিণ্ডারিকে নিজের অনুসারী হিসেবে আকর্ষণ করেন।

পরবর্তীতে ১৮০৪ সালে সিন্ধিয়া তার এই এলাকার ওপর কর্তৃত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেন। এই ভূমির বার্ষিক আয় ছিল প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা। নিজেকে একজন রাজপুত্রের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে করিম খান পিণ্ডারি ভোপাল অঞ্চলে তার ক্ষমতাবিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু এতে তিনি সফল হননি। ১৮০৬ সালে দৌলত রাও স্কিন্দিয়া করিম খানের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও সম্প্রসারণবাদী আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আতঙ্কিত হয়ে তাকে নিজের শিবিরে প্রলুব্ধ করে ডেকে আনেন এবং বন্দি করে ফেলেন।[২৬]

এরপর করিম খানের মা তার ছেলের সংগৃহীত সম্পদ নিয়ে কোটার রাজপুত্র জালিম সিংয়ের কাছে আশ্রয় নেন। পরবর্তী পাঁচ বছর করিম খান সিন্ধিয়ার বন্দিত্বে থাকেন, আর এই সময়ে অন্যান্য পিণ্ডারি নেতারা তাদের ক্ষমতা আরও বিস্তার করতে থাকে।

স্বাধীন যুগের আরেকজন উল্লেখযোগ্য পিণ্ডারি নেতা ছিলেন চিতু পিণ্ডারি। দিল্লির কাছে এক জাট পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ডোবলে খান, যার পুত্ররা বারুনের দুররাহ (পিণ্ডারি দল) পরিচালনা করত, তিনি চিতুকে একজন দাস হিসেবে কিনেছিলেন এবং পরে তাকে নিজের পুত্র হিসেবে দত্তক নেন। পরবর্তীকালে চিতু বারুনের দলের নেতৃত্ব অর্জন করেন।[২৭]

করিম খানের মতোই ১৮০৪ সালে সিন্ধিয়া চিতুকেও উপাধি ও জমি প্রদান করেন, কিন্তু ১৮০৭ সালে তাকেও বন্দি করে ফেলেন।[২৮]

১৮১১ সালে বড় অঙ্কের মুক্তিপণ দেওয়ার পর সিন্ধিয়া এই দুই নেতাকেই মুক্তি দেন। ওই বছরের দশেরা উৎসবের সময় তারা সিন্ধিয়া ও ভোঁসলে শক্তির বিরুদ্ধে যৌথভাবে অভিযান চালানোর পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু পূর্বে উল্লেখিতভাবে নাগপুরের ভোঁসলে শাসক চিতুকে জমি প্রদান করে নিজের দিকে টেনে নেন। ফলে চিতু সিন্ধিয়ার পক্ষে যোগ দেন এবং তার কর্মকর্তা জাগো বাপুকে সাহায্য করে করিম খানকে পরাজিত করেন।[২৯]

পরাজয়ের পর করিম খান আবার জালিম সিংয়ের কাছে আশ্রয়ের জন্য পালিয়ে যান। কিন্তু একই সময়ে সিন্ধিয়া জালিম সিংকে হুমকি দেন যে তিনি যদি করিম খানকে আশ্রয় দেন, তবে প্রতিশোধ নেওয়া হবে।

অবশেষে করিম খান সাহায্যের জন্য আমির খান পিণ্ডারি এবং হোলকার শক্তির কাছে যান। আলোচনার মাধ্যমে একটি সমঝোতা হয়, যার ফলে করিম খান ১৮১৬ সাল পর্যন্ত তাদের তত্ত্বাবধানে বা বন্দিত্বে থাকেন। পরে ওইবছরে মুক্তি পেলে তিনি চিতু পিণ্ডারির সাথে ঐক্য গড়ে তোলার প্রচেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁদের পারস্পরিক বিরোধ ও দ্বন্দ্বের কারণে এই জোট বাস্তবে রূপ নিতে পারেনি।

এই সময়ে ছোট ছোট দুররাহ (পিণ্ডারি দল)-এর নেতৃত্বে নমদার খান এবং ওয়াসিল মহম্মদ উল্লেখযোগ্য ছিলেন। করিম খানের ভ্রাতুষ্পুত্র হিসেবে নমদার খান মাঝে মাঝে সিন্ধিয়ার অঞ্চলে লুটতরাজ চালাতেন, মূলত তার চাচার অপমান ও দমন-পীড়নের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য।[৩০] তার দুররাহে প্রায় ২,০০০ জন সৈন্য ছিল, যেখানে করিম খানের দলে প্রায় ১০,০০০ জন ছিল। অন্যদিকে, হিরোর পুত্র ওয়াসিল মুহাম্মদ সাধারণত দৌলত রাও সিন্ধিয়ার প্রতি অনুগত ছিলেন এবং তার অধীনে প্রায় ৫,০০০ জনের একটি দুররাহ ছিল।[৩১]

এইভাবে পিণ্ডারি নেতৃত্ব তাদের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও সম্পদ অর্জন করে ১৮০৪–০৬ সালের মধ্যে, যখন সিন্ধিয়া তাদের উপাধি প্রদান করেন এবং জমির অধিকার স্বীকৃতি দেন বা দান করেন। তবে একই সময়ে সিন্ধিয়া যে করিম খান ও চিতুকে একসময় বন্দি করেছিলেন, তা থেকেই বোঝা যায় যে তিনি তাদের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও স্বাধীনতা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন।

৪

পিণ্ডারিদের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, তাদের শক্তি যেমন দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল, তেমনি তাদের পতনের বীজও তাদের নিজেদের মধ্যেই নিহিত ছিল। বিশেষ করে ১৮১১ ও ১৮১৭ সালের দশেরা সমাবেশে তাদের ঐক্যের অভাব এই দুর্বলতাকে প্রকট করে তোলে। করিম খান পিণ্ডারি, চিতু পিণ্ডারি প্রমুখ নেতাদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও অবিশ্বাস পিণ্ডারিদের একটি সুসংগঠিত শক্তি হিসেবে গড়ে উঠতে বাধা দেয়।

এই অভ্যন্তরীণ বিভাজনের সুযোগ নিয়েই মারাঠা শক্তি এবং পরবর্তীকালে ব্রিটিশরা কৌশলগতভাবে তাদের দুর্বল করে তোলে। কখনও ঘুষ, কখনও প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীগুলিকে একে অপরের বিরুদ্ধে ব্যবহার—এই নীতির মাধ্যমে পিণ্ডারিদের ঐক্য সম্পূর্ণভাবে ভেঙে দেওয়া হয়। ফলে তারা আর কোনো কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অধীনে সংগঠিত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি।

অবশেষে ব্রিটিশ শক্তি এই বিভক্ত ও দুর্বল পিণ্ডারিদের সহজেই দমন করতে সক্ষম হয় এবং এর মাধ্যমে মধ্য ভারতে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। সুতরাং বলা যায়, পিণ্ডারিদের পতন শুধুমাত্র বাহ্যিক শক্তির ফল নয়; বরং তাদের অভ্যন্তরীণ অস্থিতিশীলতা ও ঐক্যের অভাবই ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান সহায়ক হয়ে উঠেছিল।

তথ্যসূত্র:

[১] *McEldowney, Philip F. Pindari Society and the Establishment of British Paramountcy in India. University of Wisconsin, 1966, Madison, Wisconsin*

[২] *Malcolm, John. A Memoir of Central India. Kingsbury, Parbury & Allen, 1824, London, Vol. I, p. 433.*

[৩] *Renou, Louis. Hinduism. George Braziller, 1961, New York, p. 186.*

[৪] *Sen, Surendra Nath. The Military System of the Marathas. Orient Longmans, 1958, Bombay, pp. 73-74.*

[৫] *Scott, Jonathan. Firishta's History of the Deccan. John Stockdale, 1794, London, Vol. II, p. 122.*

[৬] *Manucci, Niccolao. Storia do Mogor. John Murray, 1907, London, Vol. II, p. 459.*

[৭] *Malcolm, John. A Memoir of Central India. Kingsbury, Parbury & Allen, 1824, London, Vol. I, p. 432 And Sen, Surendra Nath. The Military System of the Marathas. Orient Longmans, 1958, Bombay, p.74*

[৪] *Ross-of-Bladensburg, John Foster. The Marquess of Hastings and the Final Overthrow of the Maratha Power. Clarendon Press, 1900, Oxford, p. 51. And Yule, Henry and Arthur Coke Burnell. Hobson-Jobson: A Glossary of Colloquial Anglo-Indian Words and Phrases. John Murray, 1903, London, p. 712.*

[৯] *Sen, Surendra Nath. The Military System of the Marathas. Orient Longmans, 1958, Bombay,* pp. 67-69.

[১০] Ibid, p. 73

[১১] Mehta, Mohan Sinha. *Lord Hastings and the Indian States*. Taraporevala Sons & Co., 1930, Bombay, p. 477.

[১২] *Great Britain, House of Commons. Parliamentary Papers. University of Wisconsin (Microcard Edition), 1818, London, Vol. XI, p. 246, Captain Sydenham, Letter, March 10, 1810.*

[১৩] Malcolm, *Central India*, I, p. 428-29.

[১৪] Malcolm, *Central India*, I, p. 429. And H.D. Sandeman, *Selections from Calcutta Gazettees* (Calcutta: 1869), vol. V, p. 192.

[১৫] *Jenkins, Richard. A Report by R. Jenkins, Resident at the Court of the Raja of Berar, June 21, 1812. In: Great Britain, House of Commons, Parliamentary Papers, 1818, London, Vol. XI, pp. 267-68.*

[১৬] *Gr. Br., P.P., 1818, XI, p. 267-68 of Jenkins' report.*

[১৭] *Gr. Br., P. P., 1818, XI, p. 273 of Jenkins' report.*

[১৮] George A.E. Fitzclarence, *Journal of a Route across India, through Egypt, to England* (London 1819), p. 5.

[১৯] Malcolm, *Central India*, I, p. 436.

[২০] *Prinsep, Henry T. A Narrative of the Political and Military Transactions of British India, under the Administration of the Marquess of Hastings. John Murray, 1820, London, p. 27*

[২১] *Malcolm, Central India, II, p. 178*

[২২] *V. Smith, Oxford History of India (London: 1958), p. 561.*

[২৩] *Gr. Br., P.P., 1818, XI, p. 271-75.*

[২৪] *Malcolm, Central India, I, p. 436-37.*

[২৫] *Ibid, p. 438-39. And Gr. Br., P.P., 1818, XI, p. 273,*

[২৬] *Prinsep, Narrative, p. 25-26.*

[২৭] *Malcolm, Central India, I, p. 440.*

[২৮] *Gr. Br., P.P., 1818, XI, p. 271, Jenkins' report.*

[২৯] *Gr. Br., P.P., 1819, XVIII, p. 665, Letter no. 8, March 1, 1812.*

[৩০] *Malcolm, Central India, I, p. 456.*

[৩১] *Ibid, p. 439*

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1545-1555
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.376

১৯৭১ পরবর্তী করিমপুরের উদ্বাস্তু কলোনির একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা

সৌভিক মন্ডল, *গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

রমা প্রামানিক, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 15.03.2026; Accepted: 17.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In 1971, during the Bangladesh Liberation War, nearly 10 million refugees took shelter in India between early May and the end of June. The majority of these refugees stayed in West Bengal, with about 1.2 million settling in Nadia district. One of the border blocks of Nadia that witnessed this influx was Karimpur. In the decades following 1971, the large number of refugees who arrived and permanently settled in the Karimpur region gave rise to colonies. Some of these colonies include Sukanta Colony (1973), Upananda Colony (1977), Dinesh Colony (1984), Tarak Colony (1986), and Pramod Dasgupta Colony (1984). The residents of these colonies were uprooted people from East Pakistan, primarily from lower-caste Hindu communities such as Namashudras, Dhobis, Rajbanshi, and others. They had no wealth, education, or exposure to advanced culture. The colony dwellers often joined movements demanding food, clothing, housing, rehabilitation loans, education, and agricultural land, with leadership provided by members of the CPI(M) party. In the early years of refugee life, they were economically dependent, but over time they became self-reliant through farming, fish cultivation, handloom industries, and later even by working abroad. Their religious practices, language, food habits, and social customs differed from those of the locals. As a result, the blending of refugee culture with local traditions created a mixed culture in the Karimpur region. Today, the colony residents— Namashudra, Dhobi, Rajbanshi and other marginalized groups— have embraced the motto "work in hand, God's name on lips" and have successfully left their mark in fields such as economy, politics, and education.

Keywords: Agriculture, handloom, food-habits, social-customs, communities, Political party

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট দ্বিজাতী তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত ও স্বাধীন হয়। স্বাধীনতা ও তার বিভাজনকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হাঙ্গামা ও অপ্রীতিকর ঘটনার ফলে পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীতির সঞ্চার ঘটে। অসংখ্য ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক ঘটনার সাক্ষী হয়ে প্রথম পর্যায়ে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত এবং পরবর্তী পর্যায়ে নিম্নবিত্ত বাঙালি হিন্দু উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেয়। পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দু উদ্বাস্তু আগমনের ধারা নোয়াখালী দাঙ্গা থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময় পর্যন্ত ব্যাপকহারে লক্ষ্য করা যায়। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে উদ্বাস্তু সমস্যা তীব্র থেকে তীব্রতর আকার

ধারণ করে। এই সময় পূর্ব পাকিস্তানের বসবাসকারী নিম্ন বর্ণের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ওপর পাক হানাদার বাহিনীর অপহরণ, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, হত্যা ও অগ্নিসংযোগের এর মত ঘটনা ঘটতে থাকে। যার ফলে নিম্ন বর্ণের প্রধানত মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষগুলো পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

১৯৭১ সালে মে মাসের প্রথম দিক থেকে জুন মাসের শেষ পর্যন্ত সময়কালে প্রায় এক কোটি শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নেয়। যার সিংহভাগই পশ্চিমবঙ্গে থেকে যায় এবং নদিয়াতে আশ্রয় নেই প্রায় ১২ লক্ষ শরণার্থী। উদ্বাস্তুদের আগমন ও আশ্রয়ের ফলে সীমান্তবর্তী জেলা গুলি পূর্বের মতো (১৯৪৭ সাল) উদ্বাস্তু সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়ে। এর মধ্যে অন্যতম জেলা হল নদিয়া ও তার সীমান্তবর্তী ব্লক গুলি। এমনই একটি ব্লক হল করিমপুর। করিমপুরে ১৯৭১ সালের পরবর্তী সময়ে উদ্বাস্তু আগমন ও বসতি স্থাপনকে কেন্দ্র করে কয়েকটি কলোনি গড়ে ওঠে, এমনই কয়েকটি কলোনি হল সুকান্ত কলোনি, দীনেশ কলোনি, উপানন্দ কলোনি, তারক কলোনি, প্রমোদ দাশগুপ্ত কলোনি।

সুকান্ত কলোনি:

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময়কালে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত ১৬ টি উদ্বাস্তু পরিবার করিমপুরের সেনপাড়া অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। তবে সেখানে কিছুদিনের মধ্যে লুটপাট ও ডাকাতির ঘটনা ঘটলে এই পরিবারগুলো ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে রহমতপুর অঞ্চলে চলে আসে। রহমতপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েক বছর বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করে ১৯৭৩ সাল নাগাদ তারা রহমতপুর জি.এস কলোনি (১৯৪৭ সালে গড়ে ওঠে) ও আনন্দ নগর কলোনির (১৯৫৬ সালে গড়ে ওঠে) পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে স্থায়ী বসতি গড়ে তোলে। স্থায়ী বসতি স্থাপনের সময় তারা স্থানীয়দের বাধার সম্মুখীন হয়। তারা যে সরকারি জমিতে কলোনিটি গড়ে ওঠে সেই নিম্ন সমতলভূমি গুলো স্থানীয়রা আমন ধান চাষ, মৎস্য শিকার, পাট পচানো, পশু চরণ ক্ষেত্র সহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করত। ফলে এইসব স্থানে নতুন করে উদ্বাস্তুদের বসতি স্থাপনের বিরোধিতা করা ছিল স্বাভাবিক। বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে তারা পার্শ্ববর্তী নমঃশূদ্র কলোনির বাসিন্দা ও স্থানীয় সিপিআইএম পার্টির নেতৃবৃন্দের শরণাপন্ন হন এবং তাদের সমর্থন লাভ করেন। রহমতপুর জি. এস কলোনি এবং আনন্দনগর কলোনির উদ্বাস্তু বাম নেতাদের সহায়তায় ১৯৭৩ সালের শেষের দিকে কলোনিটি গড়ে ওঠে।

উদ্বাস্তু জীবন ও সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা এই কলোনিটির নাম করণ করা হয় প্রয়াত স্থানীয় বামপন্থি নেতা সুকান্ত বিশ্বাসের নাম অনুসারে সুকান্ত কলোনি। মনমোহন সরকার, কেশবচন্দ্র বিশ্বাস, সমর মন্ডল, শিবশঙ্কর বিশ্বাস সহ অন্যান্য বামপন্থি নেতাদের সহায়তায় কলোনিটি গড়ে ওঠে। কলোনি গড়ে উঠলেও কলনিবাসীদের জীবনযাত্রার তেমন কোনো পরিবর্তন সে সময় লক্ষ্য করা যায়নি। নামে মাত্র যাযাবর জীবন থেকে তারা স্থায়ী বসতি পায়। শুরু হয় জীবন সংগ্রামের বেঁচে থাকার লড়াই। খাদ্য সংকট, নিম্ন জলাভূমির বর্ষার জলমগ্নতা, পোকামাকড়ের উপদ্রপ, ডেঙ্গি, কলেরা সব মিলিয়ে কলোনিবাসীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। পূর্ববঙ্গে তারা নিম্ন অর্থনীতির মানুষ হলেও এইরূপ সমস্যার সম্মুখীন পূর্বে তারা হয়নি। কয়েক মাসের মধ্যে আরআর বিভাগের (Refugee Relief & Rehabilitation Department) সদস্যরা এসে মনমোহন সরকারের বাড়িতে প্রায় চার দিন থেকে সুকান্ত কলোনি পর্যবেক্ষণ করেন। কিছুদিনের মধ্যে শিকারপুর বিডিও অফিসের প্রতিনিধিরাও এসে কলোনি পর্যবেক্ষণ করেন এবং কিছুদিনের মধ্যে কলোনির পাট্টা প্রদান করেন। সরকারিভাবে কলোনিতে একটি টিউবওয়েল বসানোর ব্যবস্থা করা হয়। আরআর বিভাগের উদ্যোগে চাল, মাইলো, ত্রিপল কলোনি বাসীদের দেওয়া হয়। তবে পূর্বে গড়ে ওঠা কলোনিবাসীরা চাষের জমি, চাষের জন্য বলদ গরু, ডোল সহ যেরূপ সরকারি সহায়তা পেয়েছিল তাদের তা দেওয়া হয়নি। সুকান্ত কলোনি গড়ে ওঠার সময় ১৬ টি পরিবার নিয়ে গড়ে উঠলেও পরবর্তী কয়েক দশকে নতুন কয়েকটি পরিবার এই কলোনিতে

আশ্রয় নেয়। বর্তমান সময়ে প্রায় ৩৮০ টি পরিবার ও ১৭০০ থেকে ১৮০০ মানুষের বসবাস এই কলোনিতে। যদিও ১৯৭৫ ও ১৯৮২ সাল সহ পরবর্তী সময়ে অনেক উদ্বাস্তু পরিবার কলোনিতে নতুন করে বসতি স্থাপন করে, আবার কিছু পরিবার পরবর্তী সময়েও হবিবপুর সহ অন্যান্য জায়গায় চলে যায়। বর্তমানে এই কলোনির ৮১ শতাংশ মানুষ কৃষিকাজ, ৬ শতাংশ মানুষ তাঁত শিল্প, ৯ শতাংশ বিদেশে কর্মরত পরিযায়ী শ্রমিক, ৪ শতাংশ ব্যবসা, চাকুরি ও পরিবহন সহ বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত।

দীনেশ কলোনি:

১৯৪৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ত্রাণ পুনর্বাসন দপ্তরের সহায়তায় গড়ে ওঠা রহমতপুর জি.এস কলোনির বাসিন্দা উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস পুনর্বাসনের প্রাপ্ত জমি ও ঘরবাড়ি ছেড়ে ১৯৭৪ সাল নাগাদ বাংলাদেশে চলে যান। উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের ছেড়ে যাওয়া জমিগুলো কলোনির অন্যান্য বাসিন্দারা, প্রধানত বালা পরিবারের সদস্যরা নিজেদের দখলে নেন। এমতাবস্থায় ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ থেকে আগত বারোটি উদ্বাস্তু পরিবার আনন্দ নগর কলোনি (১৯৫৬ সালে গড়ে ওঠে) ও সুকান্ত কলোনি সহ বিভিন্ন স্থানে তাদের আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে আশ্রয় নেয় এবং তারা জনমজুর, রাখালী ও খাদ্যের বিনিময়ে শ্রমদান করে জীবন যাপন করতে থাকে। অর্ধ যাযাবরের মত নিজের স্থায়ী আশ্রয় ছাড়া আত্মীয়-স্বজনের কাছে এই ১২ টি উদ্বাস্তু পরিবার প্রায় নয় বছর কাটিয়ে দেয় এভাবেই। ১৯৮৪ সাল নাগাদ স্থানীয় সিপিআইএম নেতা যতীন্দ্রনাথ মন্ডলের সহায়তায়, উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের ছেড়ে যাওয়া জমি অর্থাৎ বালা পরিবারের দখলিকৃত জমিতে এই উদ্বাস্তু পরিবার গুলোর পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। বালা পরিবারের অধীনস্থ জমিতে পুনর্বাসন কে কেন্দ্র করে বালাপরিবার ও যতীন গোষ্ঠীর মধ্যেও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এই দ্বন্দ্ব খুব সহজেই রাজনৈতিক চরিত্র লাভ করে কারণ উভয় গোষ্ঠীর সদস্যরা ছিলেন রাজনৈতিকভাবে সিপিআইএম দলের সদস্য। এই দ্বন্দ্বের ফলে জি.এস কলোনি, আনন্দনগর কলোনি ও সুকান্ত কলোনি সহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। পুলিশ প্রশাসন এক্ষেত্রে তেমন হস্তক্ষেপ করেননি। তবে অনেক বাধা বিপত্তি ও দ্বন্দ্বের সত্ত্বেও স্থানীয় উচ্চ নেতৃত্বের সমর্থনে রাজনৈতিকভাবে যতীন গোষ্ঠী অধিক ক্ষমতাশালী হওয়ায় ১৯৮৪ সালে ১২ টি উদ্বাস্তু পরিবারকে একটি রাত্রির মধ্যে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।

কলোনি স্থাপনের আগে বা পরে এই ছিন্নমূল মানুষগুলো সরকারের কাছে থেকে কোনরূপ সাহায্য পাইনি। তারা দেশান্তর হবার পর প্রায় ৯ বছর যাযাবরের মত আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে থেকে পুনর্বাসন ছাড়াই কাটিয়ে দেয়। এই সময় তাদের কাছে 'ত্রাতা' হয়ে আসেন উদ্বাস্তু বামপন্থী নেতা যতীন্দ্রনাথ মন্ডল। তিনি নিজ উদ্যোগে অনেক বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়েও কলোনিবাসীর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। তবে স্থানীয় সিপিআইএম নেতৃবৃন্দ নিজেদের রাজনৈতিক সমর্থন লাভ ও নিজ গোষ্ঠীর শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পূর্বে এই কলোনিবাসী দের কাজে লাগিয়েছিলেন। কলোনিবাসীরা রাজনৈতিক আন্দোলন, মিটিং, মিছিল সব ক্ষেত্রে নেতৃবৃন্দের কথায় অংশগ্রহণ করতেন। ফলপ্রসূত তারা প্রথম পর্বে ভোটের কার্ড, রেশন কার্ড ও অন্যান্য সরকারি সুবিধা লাভ করেন। উদ্বাস্তু পরিবারগুলো নিজেদের উদ্যোগে মাটি, পাটকাঠি, টিন, টালি ও দরমার বেড়া দিয়ে মাথা গোজার আস্তানাটি গড়ে তোলেন।[১] ১৯৮৪ সালে গড়ে ওঠা কলোনিটির নামকরণ করা হয় প্রয়াত স্থানীয় সিপিআইএম নেতা দীনেশ মণ্ডলের নাম অনুসারে 'দীনেশ কলোনি'। আবার কলোনিটি 'হঠাৎ কলোনি' নামেও পরিচিত, কারণ দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বের মধ্যে হঠাৎ করেই কলোনিটি গড়ে ওঠে। যতীন্দ্রনাথ মন্ডল এর নেতৃত্বে হঠাৎ এই গড়ে ওঠা কলোনি তাই 'হঠাৎ কলোনি' নামেও পরিচিত। বর্তমানে কলোনিটিতে প্রায় ৫০ টি পরিবার ও ২১০ জন মানুষের বসবাস। মোট জনসংখ্যার ৭৫ শতাংশ মানুষ কৃষিকাজ, ১০ শতাংশ তাঁত শিল্প, ১১ শতাংশ বিদেশে কর্মরত পরিযায়ী শ্রমিক, ৪ শতাংশ চাকুরী, পরিবহন সহ বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত।

সুকান্ত কলোনি (১৯৭৩ সাল), দীনেশ কলোনি (১৯৮৪ সাল), আনন্দ নগর কলোনী (১৯৫৬ সাল) পাশাপাশি অবস্থান করার ফলে কলোনি গুলোর সমস্যা ও সমাধান ছিল প্রায় একই। কলোনি গুলো স্থাপনের পর মূল সমস্যা লক্ষ্য করা যায় যাতাযাতের সমস্যা। নিম্ন ভূমি অঞ্চলে কলোনি গুলোর অবস্থান ও চতুর্দিকে খাল, বিল জলভূমি দ্বারা বেষ্টিত হওয়ায় বাইরের জগতের সঙ্গে কলোনির যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম ছিল নৌকা সংযোগ অথবা পায়ে হাঁটা বাঁশের সাঁকো। এছাড়া কলোনি গুলোর অভ্যন্তরে চলাচলের জন্য কোন প্রধান রাস্তা না থাকায় কলোনি বাসিরা একে অপরের বাড়ি, ধান খেতে, চাষ জমি সহ অন্যান্য স্থান দিয়ে যতায়াত করতো। উদ্বাস্তুদের প্রতিনিধি ও রহমতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মনমোহন সরকার ও কেশবচন্দ্র বিশ্বাসের উদ্যোগে পঞ্চায়েত সভাপতি তথা ব্রিটিশ সময়ের মুহুরী হবিবুর রহমান ও পঞ্চায়েত প্রধান শংকর বিশ্বাসের উদ্যোগে ১৯৮৫ সালের মাঝামাঝি সময়সময় ভূমি দপ্তরের ম্যাপ থেকে কলোনির মাঝ বরাবর একটি নতুন রাস্তা তৈরি করা হয় ম্যাপে। কলোনির অভ্যন্তর দিয়ে তৈরি ম্যাপের উক্ত রাস্তাটি তৎকালীন বিডিও অফিস শিকারপুরে জমা দিলে সেটি কলোনির প্রধান রাস্তা হিসেবে বৈধতা পায় এবং কলোনির অভ্যন্তরে মাটির রাস্তা গড়ে তোলা হয়। এই রাস্তাটিই প্রায় চারটি কলোনি ও পার্শ্ববর্তী গোয়াস গ্রামের প্রধান রাস্তা হিসেবে গড়ে ওঠে।

১৯৮৩ সালে বামফ্রন্ট গ্রাম পঞ্চায়েতে দ্বিতীয় বার ক্ষমতায় এলে উদ্বাস্তুদের প্রতিনিধি মনমোহন সরকার উপপ্রধান নির্বাচিত হন। এই পরিস্থিতিতে কলোনিবাসীদের স্বার্থে তিনি নানান জনকল্যাণকারী কার্যাবলীর সঙ্গে যুক্ত হন। তাঁর উদ্যোগে কলোনির অভ্যন্তরে চলাচলে সুবিধা হলেও কলোনি থেকে বাইরে বেরোনোর মাধ্যম ছিল বাঁশের সাঁকো অথবা নৌকার মাধ্যমে। সাঁকো বছরের সব মরশুমে ব্যবহার করা ও ছিল দুষ্কর, যার কারণে কলোনিবাসীদের নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো। তাদের সমস্যা দূর করার উদ্দেশ্যে মনমোহন সরকার বাসের সাঁকোটি সরিয়ে নিম্ন জলাভূমির মধ্যে দিয়ে মাটির বাঁধ নির্মাণ করে স্থায়ী রাস্তা নির্মাণে উদ্যোগী হন। পঞ্চায়েতের 'ফুড ফর ওয়ার্ক' কর্মসূচির শ্রমিকদের কাজে লাগিয়ে বাঁধ ও রাস্তা নির্মাণের কাজটি দ্রুত শুরু হয়। প্রথমদিকে এই কাজে বাধা হয়ে আসে নিম্ন জলভূমির কাদা। নিম্ন জলাভূমির কাদায় প্রায় ২০০ মিটার বাঁধ নির্মাণ করতে সময় লাগে দীর্ঘ চার মাস। বাঁধ ও রাস্তা নির্মাণের ফলে কলোনির মানুষ সরাসরি উপকৃত হয়।

আর্থ-সামাজিক সংকটে পরিবারের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের চিন্তায় প্রায় অর্ধ যায করেন নাই দেড় দশক কাটিয়ে ছিন্নমূল মানুষগুলো দিশেহারা হয়ে পড়ে। ফলে তারা বিক্ষোভও আন্দোলনের দিকে ঝোঁকে। যদিও পূর্বে রাজনৈতিক দল গুলো নিজেদের স্বার্থে তাদের কাজে লাগিয়ে অসংখ্য বিক্ষোভ আন্দোলনে শামিল করেছিলেন। তাদের বিক্ষোভ ও আন্দোলনে বামপন্থী দলগুলো ধীরে ধীরে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার এবং নেতৃত্ব প্রদান করতে থাকে।[২] কলোনিবাসীরা খাদ্য, বস্ত্র, পুনর্বাসন ঋণ, শিক্ষা, প্রতি উদ্বাস্তু পরিবারকে অন্তত ১০ কাঠা চাষযোগ্য জমি, শ্যালো-মেশিন প্রদান ও খাস, উদ্বৃত্ত, পয়স্তি জমি উদ্ধার, জোতদার ও মহাজনদের নামে-বেনামের অবৈধ জমি উদ্ধার ও বাজেয়াপ্ত করা সহ নানান দাবীতে তারা আন্দোলন শুরু করে।[৩] এই সময় অনেক কলোনিবাসী নকশাল আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক অসচেতনতার কারণে তারা অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে, তবে পরবর্তী সময়কালে এই ধারা বদলাতে থাকে।

সুকান্ত কলোনি, দীনেশ কলোনি এবং আনন্দ নগর কলোনির ছিন্নমূল মানুষগুলোর সাহায্যের জন্য আনন্দ নগর কলোনিতে গড়ে ওঠে ফাইটিং ক্লাব। গৌরীশংকর সরকার, রঘুনাথ বিশ্বাস, স্বপন বিশ্বাস, আনন্দ বিশ্বাস, চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস, সুধাংশু বালা সহ প্রমুখের উদ্যোগে ১৯৭২ সালে ক্লাবটি গড়ে ওঠে। তবে ১৯৮৩ সালে ক্লাবটির রেজিস্ট্রেশন করা হয় এবং নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'অনির্বাণ ক্লাব'। ক্লাবটি গড়ে ওঠার সময়কাল থেকেই বাস্তহারা কলোনিবাসীদের সার্বিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন ক্লাবের সদস্যরা। প্রথমদিকে

কলোনিবাসীকে চাল, ডাল, বস্ত্র দিয়ে সাহায্য করলেও পরবর্তী সময়কালে দরিদ্র কলোনিবাসীর ছেলে মেয়ের বিবাহে আসবাবপত্র অনেক ক্ষেত্রে অর্থ দিয়ে সাহায্য করে। এছাড়া ক্লাবে সদস্যরা দরিদ্র উদ্বাস্তু কৃষকের জমির ফসল কেটে দেওয়া, মাড়াই করা সহ শস্য ঘরে তুলে দেবার মতো কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। ১৯৭৭, ১৯৮৬ ও ২০০০ সালের বন্যার সময় ক্লাবের সদস্যরা উদ্ধার কাজ ও ত্রাণশিবির খোলার পাশাপাশি খাদ্য, ত্রিপল প্রভৃতি বিতরণ করে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে ক্লাবের উদ্যোগে কলোনি গুলোর মধ্যে খেলার টুর্নামেন্ট এবং রক্তদান শিবির, কুইজ প্রতিযোগিতা ও শংসাপত্র প্রদান সহ বিভিন্ন সমাজ সচেতন মূলক কর্মসূচি পালন করে। ১৯৯০ এর দশকে ক্লাবের সদস্য তপন বিশ্বাস, কার্তিক সরকার, হরেণ সরকার, প্রভাস মজুমদার, শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস সহ প্রমুখের উদ্যোগে ক্লাবের পক্ষ থেকে কলোনি গুলোর ছাত্র ছাত্রীদের বিনা পারিশ্রমিকে পড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। আবার কোন ক্ষেত্রে পারিশ্রমিক নিলেও তা ক্লাবের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করা হয়। এভাবেই ক্লাবটি কলোনি গুলোর বিভিন্ন সামাজিক কাজের অংশীদার হয়ে ওঠে।[৪]

পুনর্বাসনের পর কলোনিবাসী দের কাছে একটি বড় সমস্যা ছিল জীবিকার সমস্যা। ইতিমধ্যে তাদের বাসস্থান গড়ে উঠলেও জীবনধারণের জন্য জীবিকা তাদের কাছে ছিল না। তাই এই সময় তারা স্থানীয়দের জমিতে অস্থায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ রাখালী, মাছ ধরা, কলোনি সংলগ্ন নিম্ন জলাভূমিতে আমন ধান চাষ, ঘরামির কাজ, পশুপালন ছাড়াও বাড়ির মহিলারা পশুপালন, সুতো কাটা, বিড়ি তৈরির মতো বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে।[৫] সুকান্ত কলোনি, দীনেশ কলোনি, আনন্দ নগর কলোনি ও উপানন্দ কলোনির পাশে অবস্থিত বিলের উপর কলোনিবাসীরা অর্থনৈতিকভাবে অনেকটাই নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। তবে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিলটি মালিকানাধীন করলে কলোনি বাসীরা প্রচন্ড আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হয়। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পূর্বে স্থানীয় নেতাদের স্লোগান ছিল 'জাল যার জল তার' অর্থাৎ জাল যার আছে জলে মাছ সে ধরবে। তবে ক্ষমতায় আসার পর সেই কথার পরিবর্তন হয়। বিলটিকে ব্যক্তি মালিকানাধীন করায় কলোনি বাসীরা অর্থনৈতিকভাবে সমস্যা সম্মুখীন হয়। ফলে তারা বাধ্য হয়ে বিকল্প অর্থনৈতিক পথ হিসেবে শান্তিপুর থেকে তাঁত শিল্পের আগমন ও বিকাশ ঘটায়। বিশ শতকে আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে কলোনিগুলোতে তাঁত শিল্পের ব্যাপক হারে প্রসার ঘটে। নারী পুরুষ উভয়েই তাঁত শিল্পে নিযুক্ত হয়ে পড়েন। চরকায় সুতো কাটা, কাপড় বোনা, সুতোয় রং করা, নকশা আঁকা সহ বিভিন্ন কাজে কলোনির মহিলারা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কলোনি থেকে তাঁত শিল্পের মহাজনেও পরিণত হয়। যারা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে স্থানীয় মাহিষ্য, তিলি, সাহা সহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে তাঁত শিল্পের বিকাশ ঘটায়।

তাঁত শিল্পে মন্দার কারণে কলোনি বাসীর অর্থনৈতিক অবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন না হওয়ায় পুরুষেরা দেশে-বিদেশের বিভিন্ন স্থানে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজের উদ্দেশ্যে যেতে থাকে। তারা প্রথমদিকে চেন্নাই, দিল্লি, মুম্বাই, পুনে, কেরালা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে কাজের উদ্দেশ্যে গেলেও পরবর্তী সময়ে অধিক উপার্জনের আশায় ভিসার মাধ্যমে সিঙ্গাপুর, দুবাই, কাতার, কুয়েত, ইতালি, মালয়েশিয়া, ইরান সহ বিভিন্ন দেশে পাড়ি দেয়। ২০০০ সালের পরবর্তী সময় থেকেই কলোনিবাসীর অর্থনৈতিক পট পরিবর্তন ঘটতে থাকে। কলোনি গুলোর মধ্যে থেকে প্রথম বিদেশে কাজের উদ্দেশ্যে ইরানে যাই সুভাষ বিশ্বাস। যিনি কলোনিবাসীদের কাছে 'সাদ্দাম' নামেই পরিচিত হয়ে ওঠে। এবং পরবর্তী সময়কালে সুকান্ত কলোনি (১৯৭৩ সাল), দীনেশ কলোনি (১৯৮৪ সাল), আনন্দ নগর কলোনি (১৯৫৬ সাল), রহমতপুর জি.এস কলোনি (১৯৪৭ সাল) র শত শত যুবক প্রবাসে কাজ করে কলোনি গুলির বিরাট অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। বর্তমান সময়ে কলোনি গুলির অর্থনীতির প্রায় ৪০ শতাংশ প্রবাসী অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল। এবং এই বৈদেশিক অর্থ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অর্থনীতির ওপর সদর্থক প্রভাব ফেলছে।

জীবন জীবিকার লড়াই চালানোর সঙ্গে সঙ্গে কলোনি বাসীরা তাদের সন্তানদের শিক্ষাদানে উদ্যোগী হন। তাদের আন্দোলনের অন্যতম দাবি ছিল সরকারি উদ্দ্যোগে শিক্ষাদান। তাই কলোনি বাসীদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে মনমোহন সরকার করিমপুরের এম.এল.এ চিত্তরঞ্জন বিশ্বাসের সহায়তায় কলোনিতে একটি প্রাইমারি স্কুল গড়ে তোলেন। বর্ডার সংলগ্ন অঞ্চলে বরাদ্দকৃত স্কুলটি স্থাপনের যথাযথ কোন জায়গা না পাওয়ায়, স্কুলটিকে কলোনিতে স্থাপন করা হয়। কলোনির বাসিন্দারা চাঁদা তুলে স্কুল স্থাপনের জন্য জমি কেনেন এবং স্থানীয় ধনী ব্যক্তি মোহন বিশ্বাস ০.৫ শতক জমি দান করলে সুকান্ত কলোনিতে প্রায় সাড়ে তিনশতক জমিতে ১৯৮৩ সালে স্কুলটি গড়ে ওঠে। বর্তমানে এই স্কুলে প্রায় ১০০ জনের কাছাকাছি ছাত্র, ছাত্রী পঠন পাঠন করে।

ছিন্নমূল মানুষগুলোর কাছে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ছিল সংগ্রামের ও বিতাড়নের আতঙ্কে জর্জরিত। তাই তারা অনুভব করে যে রাজনৈতিক ছত্র ছায়ায় থাকা তাদের কাছে অনেকটা সুবিধার ও সুরক্ষিত।[৬] কলোনি স্থাপনের প্রথম দিন থেকে কলোনি গুলোতে বামপন্থী দলগুলির প্রাধান্য ছিল ব্যাপক। ছিন্নমূল মানুষ গুলোর মধ্যে থেকে নির্বাচিত বাম প্রার্থী মনমোহন সরকার রহমতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এছাড়া কেশবচন্দ্র বিশ্বাস, যতীন্দ্রনাথ মন্ডল সহ প্রমুখেরা কলোনির বাম রাজনীতির প্রধান মুখ ছিলেন। কলোনি গুলো স্থাপনের প্রথম কয়েক দশক কলোনিতে কোন বিকল্প রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ছিলনা। কলোনি বাসীরা ছিল বামফ্রন্টের 'বন্দী ভোটার'।[৭] ১৯৯৪ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে কলোনি গুলোতে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ছোঁয়া লক্ষ্য করা যায়। চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস, হরিপদ বিশ্বাস, কার্তিকচন্দ্র সরকার সহ প্রমুখের হাত ধরে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রভাব বিস্তার ও কলোনিতে ক্ষমতা লাভ ঘটে। যে চিত্র ধীরে ধীরে লক্ষ্য করা যায় সুকান্ত কলোনি, দীনেশ কলোনি, আনন্দ নগর কলোনি ও উপানন্দ কলোনিতে।

উপানন্দ কলোনি:

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও তার পরবর্তী সময়ে রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্ত কিছু পরিবার বিতাড়িত ও বাস্তুচ্যুতো হয়ে শরণার্থী হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত সংলগ্ন মুর্শিদাবাদের উদয়নগর কলোনিতে বসতি স্থাপন করে। বসতি স্থাপনের কয়েক বছরের মধ্যেই সীমান্ত সংলগ্ন জলঙ্গী নদীর তীরবর্তী এই কলোনিতে ভাঙ্গন দেখা দিলে কলোনিবাসীরা পুনঃরায় বাস্তুচ্যুতো হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় করিমপুর থানার রহমতপুর গ্রামের একটি পুরানো পরিত্যক্ত মসজিদে ১৯৭৪ সাল নাগাদ তারা বসবাস শুরু করে। ১৯৭৪ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত তারা প্রায় তিন বছর মসজিদে বসবাস করে। এই তিন বছর তারা যাযাবরের মতো অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশায় ধর্ম কে আঁকড়ে বেঁচে থাকে। এই সময় তারা জীবন ধারনের জন্য অন্যের জমিতে দিনমজুরি, রাখালি, পশুপালন, মৎস্য শিকার, খাদ্যের বিনিময়ে অন্যের বাড়িতে কাজ করতে থাকে। রাজবংশী সম্প্রদায়ের মহিলারা ছিল অত্যন্ত কর্মঠ প্রকৃতির, তারা কোন অংশেই পুরুষদের থেকে কম ছিল না পশুপালন, নিড়ানি, শাকসব্জী চাষ, জ্বালানি সংগ্রহ ও তা বিক্রয় করা সহ নানান কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই বাস্তুচ্যুত মানুষগুলো অত্যন্ত দুঃখ, কষ্ট ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতকে সঙ্গী করে সীমাহীন যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে মসজিদে কাটিয়ে দেন তিন বছর, কোনরূপ সরকারি সহযোগিতা ছাড়াই। তারা তাদের দাবি দাওয়া আদায়ের জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে অনেক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন তবে তা কখনো ফলপ্রসু হয়নি। এই পরিবারগুলোর জীবনে পরিবর্তন আসে ১৯৭৭ সাল নাগাদ রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে।

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট রাজ্যে সরকার গঠন করলে উদ্বাস্তু মানুষগুলোর কাছে তা আশীর্বাদ হয়ে আসে। এই বছরেই স্থানীয় বামপন্থী নেত্রী বর্গের উদ্যোগে মসজিদে বসবাসকারী ১৪ টি উদ্বাস্তু পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। রহমতপুর অঞ্চলের মাঝামাঝি স্থানে সরকারি পরিত্যক্ত নিম্ন সমতল ভূমিকে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দখলদারি থেকে উদ্ধার করে উদ্বাস্তু পরিবার গুলোকে পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করা

হয়। বামপন্থী নেতাদের সহযোগিতায় মসজিদে বসবাসকারী ছিন্নমূল মানুষগুলো রাতারাতি বাঁশ, কাঠ, পাটকাঠি, টিন, মাটি দিয়ে বসতি গড়ে তোলে। দুষ্কৃতীদের হাতে নিহত বাম নেতা উপানন্দ বিশ্বাসের নাম অনুসারে কলোনির নামকরণ করা হয় 'উপানন্দ কলোনি'। কলোনি স্থাপনে স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ মঙ্গল বিশ্বাস, সত্যেন মন্ডল, পঞ্চায়েত প্রধান সমর সরকার, চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস সহ প্রমুখেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৭৮ সালে রহমত পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বামপন্থীরা ক্ষমতায় আসলে উদ্বাস্ত পরিবার গুলোর জীবন জীবিকার সমস্যা কিছুটা সমাধান ঘটে। সরকারের 'Food for work scheme' এর অধীনে উদ্বান্ত পরিবারগুলোকে কাজের বিনিময়ে গম, চাল, মাইলো সহ অন্যান্য খাদ্য শষ্য প্রদান করে। ১৯৭৯ সালে পঞ্চায়েতের উদ্যোগে কলোনির বাসিন্দাদের মাটির দেওয়াল সহ টালির চালের ঘর নির্মাণ, ভোটার কার্ড ও রেশন কার্ড করে দেওয়া হয়।

কলোনিবাসীরা সম্পূর্ণরূপে বসতি স্থাপন গড়ে তোলার আগেই ১৯৭৮ সালের শেষ নাগাদ বন্যায় কলোনিটি ডুবে যায়। বন্যার কারণে কলোনিবাসীরা আবারও বাস্তুচ্যুত হয় ও স্থানীয় প্রাইমারি স্কুলে আশ্রয় নেয়। স্থানীয়দের সহযোগিতা আবার কখনো অসহযোগিতার সম্মুখীন হয়েও তারা না দমে পুনঃরায় সেই স্থানে বসতি গড়ে তোলে। কলোনির বাচ্চাদের স্কুলে যাওয়ার জন্য প্রায় এক কিমি কাঁদা জলাভূমি পথ অতিক্রম করতে হত। যার ফলে কলোনির বাচ্চারা স্কুলে আসার সময় সাধারণ জামাকাপড় পরে স্কুলে এসে, স্কুল সংলগ্ন স্থানীয়দের বাড়িতে তা পরিবর্তন করে স্কুলে যেত। কলোনিতে প্রবেশের একমাত্র পথ ছিল পায়ে হাঁটা অন্যথায় কোনভাবেই প্রবেশ করা যেত না, তাই তারা কলোনি থেকে প্রায় এক কিলোমিটার আগে স্থানীয়দের বাড়িতে সাইকেল, রিক্সা সহ অন্যান্য জিনিসপত্র রেখে আসতে বাধ্য হত। ২০১৩ সাল পর্যন্ত এই চিত্র লক্ষ্য করা যেত তবে ওই বছরের শেষের দিকে রহমতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে জলাভূমির মধ্য দিয়ে বাঁধ দিয়ে করে ঢালাই রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। ১৪ টি পরিবার নিয়ে উপানন্দ কলোনি গড়ে উঠলেও বর্তমানে কলোনিতে ৪০ টি পরিবার ও ১৭৩ জন মানুষের বসবাস। কলোনির প্রায় ৮৯ শতাংশ মানুষ কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত এবং ৬ শতাংশ মানুষ দেশে বিদেশে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কর্মরত এবং ৫ শতাংশ মানুষ তাঁত শিল্প, চাকুরী, পরিবহন সহ বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত। বর্তমান সময়ে অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল কলোনিবাসীদের কলোনি পরিত্যাগের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

তারক কলোনি:

১৯৬৮ সাল ও তার পরবর্তী সময়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রায় ত্রিশটি শরণার্থী পরিবার মুর্শিদাবাদের জলঙ্গী নদীর চর সংলগ্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। তবে সেখানেও ধর্মীয় উৎপীড়ন ও নদীর ভাঙ্গনের কারণে ভাগ্যের পরিহাসে তাদের পুনরায় বাস্তুচ্যুত হতে হয়। ১৯৮৬ সালে এই ৩০ টি শরণার্থী পরিবার করিমপুর থানার অন্তর্গত রহমতপুর অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। পূর্বে গড়ে ওঠা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বিভিন্ন কলোনির বাসিন্দা ও স্থানীয়দের সহায়তায় এই শরণার্থী পরিবারগুলো স্বল্পমূল্যে জমি ক্রয় করে স্থায়ী বসতি গড়ে তোলে। কলোনিটি গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে কোন রাজনৈতিক দলের সহযোগিতার প্রয়োজন হয়নি, এক্ষেত্রে তারা স্থানীয়দের সহযোগিতা পায়। কলোনিতে তেমন রাজনৈতিক প্রভাব না থাকলেও কলোনির নামকরণ হয় প্রয়াত বামপন্থী নেতা তারক বিশ্বাসের নাম অনুসারে 'তারক কলোনি'। যেহেতু উদ্বান্তরা নিজেদের উদ্যোগে জমি ক্রয় করে কলোনিটি গড়ে তোলে তাই কলোনি স্থাপনের ক্ষেত্রে তাদের কোন বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি অন্যান্য কলোনির মতো। তারক কলোনি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উদ্বাস্তরা সরাসরি স্থানীয় বিত্তশালী ধনী কৃষকদের কাছে থেকে জমি ক্রয় করে। বিশ শতকের যাট থেকে নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত স্থানীয় মানুষের অন্যতম প্রধান সমস্যা ছিল ডাকাতি ও লুটপাটের সমস্যা। যার ফলে কলোনিটি গড়ে ওঠায় লুটপাট ও ডাকাতির ঘটনা অনেকটাই কমে। কারণ স্থানীয়দের স্বল্পমূল্যে বিক্রিত যে জমিগুলোতে উদ্বাস্তরা বসতি স্থাপন করেছিল,

সেই জমিগুলো ছিল মূল গ্রামের বাইরের দিকে অবস্থিত করিমপুর ও কৃষ্ণনগর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন ফাঁকা মাঠে। যে স্থানগুলো ডাকাতরা যাতায়াতের রাস্তা হিসেবে ব্যবহার করত সেই এলাকাগুলোতে তারা বসতি গড়ে তোলে। তৎকালীন সময়ে বর্ডারে কোন কাঁটাতারের বেড়া না থাকায় বর্ডার সংলগ্ন এই অঞ্চল গুলোতে বাংলাদেশি ডাকাতদের ব্যাপক উপদ্রব ছিল। প্রায় প্রতিদিন ডাকাতির ঘটনা ঘটত। পরবর্তী সময়ে কিছু উদ্বাস্তু পরিবার জীবন জীবিকার উদ্দেশ্যে ও ডাকাতির উপদ্রব থেকে রেহাই পেতে অন্যত্র চলে যায়, আবার কিছু পরিবার নতুন করে কলোনিতে বসতি গড়ে তোলে। বর্তমানে কলোনিটিতে ৬৫টি পরিবার ও ৩৩০ জন মানুষ বসবাস করে। কলোনির প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ কৃষিকাজ, ৫ শতাংশ মানুষ দেশে-বিদেশে শ্রমিক হিসেবে কর্মরত এবং ৫ শতাংশ মানুষ তাঁত শিল্প, পরিবহন ব্যবস্থা, চাকুরী সহ বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত।

তারক কলোনির বাসিন্দাদের দুবার উদ্বাস্তু হতে হয় প্রথমবার দেশ ভাগকে কেন্দ্র করে ও দ্বিতীয় বার জলঙ্গি নদীর চর সংলগ্ন অঞ্চলে ধর্মীয় উৎপীড়ন ও নদীর ভাঙ্গনের কারণে। তবে তারা অন্যান্য কলোনির বাসিন্দাদের মত বসতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হয়নি। দ্বিতীয়বারও তারা জমি ক্রয় করে নিজেদের উদ্যোগে স্থায়ী বসতি গড়ে তোলে, সেই পরিস্থিতিতে তাদের প্রধান সমস্যা ছিল ছিল জীবিকা। কারণ ইতিপূর্বে তারা নদী, খাল, বিল কে কেন্দ্র করে নিজেদের অর্থনীতি পরিচালনা করে আসছিল। রহমতপুর অঞ্চলে এসে তারা জলকেন্দ্রিক অর্থনীতি থেকে দূরে চলে আসে এবং কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির অংশ হয়ে ওঠে। পরবর্তী সময়কালে তারা ভাগ চাষ, জমি লিজ নেওয়া, জমি ক্রয় করে চাষবাস শুরু করে। নিম্ন জলাভূমি অঞ্চলে তারা স্বল্প মূল্যে জমি ক্রয় করে আমন ধান, পাট, রসুন, পেঁয়াজ সহ বিভিন্ন শাকসব্জি চাষ শুরু করে। রসুন, পেঁয়াজ ও অন্যান্য বিভিন্ন সব্জি যা সাধারণত স্থানীয় কৃষকেরা পূর্বে চাষ করত না। যার ফলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের হাত ধরে এই অঞ্চলগুলিতে এক নতুন ধারার চাষবাসের সূত্রপাত ঘটে। বর্তমান সময়ে অনেক উদ্বাস্তু পরিবার প্রায় ১০ থেকে ১৩ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিক এবং তারা সকলেই স্বচ্ছলতার সঙ্গে জীবন যাপন করছে।

প্রমোদ দাশগুপ্ত কলোনি:

পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাস্তুচ্যুতো হয়ে বিভিন্ন সময় অসংখ্য উদ্বাস্তু নানান স্থানে স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে যাযাবরের মতো জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। ১৯৮৪ সালে করিমপুর থানার গোয়াস অঞ্চলে মতুয়া সম্প্রদায়ভুক্ত প্রায় ৪৮ টি উদ্বাস্তু পরিবার বসতি গড়ে তোলে এবং প্রথম পর্যায়ে তারা মুর্শিদাবাদের উদয়নগর কলোনিতে বসতি স্থাপন করলেও সেখানে ধর্মীয় উৎপীড়ন ও নদীর ভাঙ্গনের কারণে গোয়াস দক্ষিণপাড়া অঞ্চলে চলে আসে বসতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে। বাস্তুচ্যুত মানুষ গুলোর পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেন গ্রাম পঞ্চায়েতের বামপন্থী নেতা কেশব চন্দ্র বিশ্বাস ও উপপ্রধান মনমোহন সরকার। এই ছিন্নমূল মানুষ গুলোর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয় স্থানীয় বাসিন্দা প্রয়াত নিপেন পালের ২২ বিঘা জমিতে। নিপেন পাল উত্তরাধিকারহীন হওয়ায় তাঁর পরিত্যক্ত জমিতে স্থানীয় সিপিআইএম নেতাদের সহায়তায় কলোনিটি গড়ে ওঠে। সিপিআইএমের প্রয়াত প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্তের নাম অনুসারে কলোনির নামকরণ করা হয় ‘প্রমোদ দাশগুপ্ত কলোনি বা PDG কলোনি’।

প্রমোদ দাশগুপ্ত কলোনি গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রথম সমস্যা দেখা যায় প্রয়াত নিপেন পালের দূর সম্পর্কের ভাইপো মানব পালের কাছে থেকে। তবে সেক্ষেত্রে মানব পালের জমির উপর কোন বৈধ উত্তরাধিকার ও কাগজপত্র না থাকাই তিনি একপ্রকার বাধ্য হয়েই কলোনি স্থাপন মেনে নেন। বামপন্থী সিপিআইএম নেতা কেশবচন্দ্র বিশ্বাস, ভক্তগোপাল মণ্ডল, অনিল বিশ্বাস, বাবর আলী মন্ডল, জুরান বিশ্বাস, পঞ্চায়েত প্রধান শংকর বিশ্বাস, ও করিমপুর বিধানসভার বিধায়ক চিত্তরঞ্জন বিশ্বাসের উদ্যোগে কলোনির বাসিন্দাদের সিপিআইএমের

সদস্যপদ দেওয়া হয় ও কলোনিতে পতাকা উত্তোলন করা হয়। এই পরিস্থিতিতে জেলা পরিষদের সিপিআইএম সদস্য প্রফুল্ল কুমার ভৌমিকের নেতৃত্বে গোয়াস অঞ্চলের স্থানীয় সিপিআইএম নেতা সিরাজ আলী মন্ডল, গফুর মন্ডল, গফুর বিশ্বাস সহ অন্যান্যদের উদ্যোগে কলোনি উচ্ছেদের কথা উল্লেখ করে কলোনিবাসীদের অন্যত্র চলে যাওয়ার নির্দেশ ও পরামর্শ দেওয়া হয়। প্রফুল্ল কুমার ভৌমিকের নেতৃত্বে কলোনিতে সভা করে উল্লেখ করা হয় কলোনি গড়ে ওঠার পিছনে সিপিআইএম পার্টির কোন সমর্থন নেই, তাই কলোনিতে উত্তোলিত সিপিআইএম এর পতাকা খুলে ফেলারও তিনি নির্দেশ দেন। স্থানীয় সিপিআইএম নেতা জুরান বিশ্বাস ও অন্যান্যদের বিরোধিতায় উভয় পক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। তবে জেলা পরিষদের সদস্য প্রফুল্ল কুমার ভৌমিক নিজ প্রভাব খাটিয়ে পুলিশ প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে কলোনি উচ্ছেদের নানান প্রচেষ্টা করেন। পুলিশকে কাজে লাগিয়ে কলোনিবাসীদের গ্রেপ্তার করা, ঘরবাড়ি ভেঙে দেওয়া সহ নানান পন্থা অবলম্বন করে ও কলোনিবাসীদের উচ্ছেদ করা সম্ভব হয়নি। রাত্রে ঘরে ঘরে আলো জ্বালিয়ে কলোনিবাসীরা সজাগ থাকার জানান দেয়, তাদের ঘরবাড়ি ভাঙতে আসা পুলিশ বাহিনীকে। তবে পুলিশ প্রশাসনও চাপে পড়ে এক প্রকার বাধ্য হয়েই এই কাজ করতো। তৎকালীন করিমপুর থানার আইসি রনজিৎ বিশ্বাস কলোনিবাসীদের প্রতি ছিলেন সহৃদয়। তিনি প্রশাসনিক বিভিন্ন খবরা খবর প্রধানত কলোনির উপর পুলিশি অভিযানের খবরা খবর দিয়ে কলোনিবাসীকে সচেতন করে দিতেন। করিমপুর বিধানসভার বিধায়ক, পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান ও পুলিশ প্রশাসনের অসহযোগিতার কারণে প্রফুল্ল ভৌমিকের পক্ষে কলোনি উচ্ছেদ করা আর সম্ভব হয়নি।

১৯৯৪ সালের মার্চ মাসে (বাং ১৪০০ সালের চৈত্র মাস) সুকান্ত কলোনি, দীনেশ কলোনি, আনন্দনগর কলোনি, প্রমোদ দাশগুপ্ত কলোনির মতুয়া সম্প্রদায়ের বাসিন্দারা ডংকা, কাসর বাজিয়ে হরিবোল নাম সংকীর্তন করে প্রমোদ দাশগুপ্ত কলোনির পার্শ্ববর্তী গোয়াস দক্ষিণপাড়া ঈদগাহ মসজিদ সংলগ্ন রাস্তা দিয়ে বেতায়ে শিবরাত্রি পালনে যাওয়াকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি হয়। দাঙ্গার কারণে প্রমোদ দাশগুপ্ত কলোনিতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটালে সম্পূর্ণ কলোনি পুড়ে যায় (৪৮ টি বাড়ি)। দাঙ্গা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যাপক আকার ধারণ করে ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। দাঙ্গায় প্রথম দিকে প্রচুর কলোনিবাসী গুরুতরও আহত হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে অল্প সময়ের মধ্যে পার্শ্ববর্তী নন্দনপুর ক্যাম্প থেকে বিএসএফ আসে। কলোনি বাসীদের বিবরণ অনুযায়ী দ্বিতীয় পর্যায়ে উভয় পক্ষের মানুষের ক্ষয়ক্ষতি হলেও মুসলিম পক্ষের কিছু মানুষ নিহত হয়, যারা বেশিরভাগই ছিল পার্শ্ববর্তী মুর্শিদাবাদ জেলার বাসিন্দা। দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে প্রচুর কলোনিবাসীর গ্রেপ্তার ও হাজতবাস হয়। বর্তমানে কলোনিতে ১৮৫ টি পরিবার ও প্রায় ৮০০ জনেরও বেশি মানুষ বসবাস করে কলোনি শতকরা ৯০ শতাংশ মানুষ কৃষিকাজ, ৩ শতাংশ মানুষ চাকুরীজীবী, ৩ শতাংশ মানুষ পরিযায়ী শ্রমিক ও ৪ শতাংশ তাঁত শিল্প পরিবহন সহ অন্যান্য পেশার সঙ্গে যুক্ত। প্রমোদ দাশগুপ্ত কলোনির বাসিন্দারা বর্তমানে দুটি ভাগে বিভক্ত। অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ ও শিক্ষিত উদ্বাস্তুদের নিয়ে গঠিত একটি অংশ অপরটি অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল স্বল্পশিক্ষিত ও শ্রমিক শ্রেণীর মানুষদের নিয়ে গঠিত অংশ। কলোনির সমৃদ্ধ শিক্ষিত ও চাকুরিজীবী উদ্বাস্তুরা বর্তমানে নিজেদের কলোনির বাসিন্দা হিসেবে পরিচয় দিতে সংকোচ বোধ করে ও নিজেদের অন্য পরিচয় দেন। এইরূপ ৪৪ টি পরিবার আছে যাদের প্রায় ১৮০ জন মানুষের মধ্যে ২২ জন সরকারি চাকরি ও প্রায় ১০ জন ব্যবসা-বাণিজ্য সহ অন্যান্যরা স্বচ্ছল কৃষক। অপরদিকে দিন আনা দিন খাওয়া শ্রমজীবী, কম শিক্ষিত, দরিদ্র মানুষগুলো নিজেদের কলোনিবাসী ও উদ্বাস্তু হিসেবেই পরিচয় দিয়ে থাকে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়কালে করিমপুর ও মহিষবাথান অঞ্চলে বেশ কিছু অস্থায়ী কলোনি গড়ে ওঠে। কলোনি গুলো প্রধানত সরকারি সহযোগিতায় গড়ে ওঠে। এই অস্থায়ী কলোনিগুলির বাসিন্দারা ছিল প্রধানত মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ, যারা পাক সরকার বিরোধী মুজিবপন্থী হিসেবে পরিচিত। মুক্তিযুদ্ধে

জয়লাভের কয়েক মাসের মধ্যেই তারা বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করে। আবার অনেক উদ্বাস্তু পরিবার করিমপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে বিচ্ছিন্ন ভাবে বসবাস শুরু করে। শিশা গ্রামে প্রায় পাঁচটি হিন্দু পরিবার ও মালিয়ানতলা গ্রামে বেশ কিছু মুসলিম পরিবার স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে তোলে। এছাড়া বর্তমান সময়েও করিমপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে বর্ডার দিয়ে অবৈধভাবে শরণার্থী ও অনুপ্রবেশকারীদের আগমন ঘটছে। নদিয়া জেলার ২৬৯ কিমি সীমারেখা পূর্ববঙ্গ বা স্বাধীন বাংলাদেশের সীমানা স্পর্শ করে আছে। এই ২৬৯ কিমি সীমারেখার মধ্যে রয়েছে সাতটি ব্লক যেগুলি উদ্বাস্তুদের প্রবেশ ও বসবাসের প্রধান অঞ্চল। করিমপুরে উদ্বাস্তু আগমনের ধারা ছিল ব্যাপক ও বৃহৎ। ১৯৭১ সালে করিমপুরে ভোটার সংখ্যা ছিল ৭২ হাজার ২৯০ জন এবং ১৯৯১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১ লাখ ৩৯ হাজার ৩৯৩ জন।[১৩] মাত্র কুড়ি বছরে করিমপুরের ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ৬৭ হাজার ১০৩ জন। ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৯১ সালের মধ্যে এইরূপ অস্বাভাবিক ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হলো উদ্বাস্তুদের আগমন।

উপসংহার:

দেশভাগ, উদ্ধাস্তু সমস্যা ও ১৯৭১ সাল পরবর্তী সময়ে উদ্বাস্তু আগমনের ঘটনা আধুনিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত ছিন্নমূল কলোনিবাসীদের ভাষা, খাবার দাবার, ধর্মীয় রীতিনীতি সবকিছুই ছিল স্থানীয় মানুষদের থেকে ভিন্ন। যার ফলে তাদের ভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গে স্থানীয়দের সংস্কৃতির মিলনে করিমপুর অঞ্চলে এক নতুন সংস্কৃতির জন্ম হয়, যা এই অঞ্চলে সর্বত্রই কমবেশি লক্ষ্য করা যায়। তবে কলোনিগুলোর বর্তমান প্রজন্ম নিজেদের কলোনিবাসী বা উদ্বাস্তু হিসেবে পরিচয় দিতে সংকোচ বোধ করে। তাদের অনেকেই নিজেদের ধর্মীয় আচার-আচরণ, ভাষা, খাদ্যাভাস সহ নানান ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছে।[৯] আবার অনেকে নিজেদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে গর্বের সঙ্গে বহন করছে। এরা 'হাতে কাম মুখে নাম' এই মন্ত্র নিয়ে গর্বের সঙ্গে কলোনিতে বসবাস করছে।[১০] তবে লক্ষ্যনীয় বিষয় কলোনিবাসী মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষগুলো আজও তেমন কোনো সরকারি সহযোগিতা পাননি। তারা শুধুমাত্র ভোটের উৎস হিসেবেই ব্যবহৃত হয়ে গেছে প্রথমে সিপিআইএমের ও পরবর্তী সময়ে অন্যান্য রাজনৈতিক দল গুলোর। এসবের সত্বেও এই ছিন্নমূল কলোনিবাসী মানুষগুলো কঠিন পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করে অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের সাফল্যের ছাপ রাখতে সক্ষম হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরন্ময়। উদ্বাস্তু। দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০২১, পৃ. ২৩৯।
২. বিশ্বাস, সুভাষ। দেশভাগ ও বাঙালি বাস্তহারা। দিশা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ১৪১।
৩. চক্রবর্তী, প্রফুল্ল কুমার। প্রান্তিক মানব পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু জীবনেরকথা। দীপ প্রকাশন, কলকাতা ২০২১, পৃ. ৬৮।
৪. ধংস ও নির্মাণ বঙ্গীয় উদ্বাস্তু সমাজের স্বকথিত বিবরণ। সেরিবান পাবলিশার, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ১৩।
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরন্ময়। উদ্বাস্তু। দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০২১, পৃ. ২৪২।
৬. ধংস ও নির্মাণ বঙ্গীয় উদ্বাস্তু সমাজের স্বকথিত বিবরণ। সেরিবান পাবলিশার, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ১৩।
৭. চক্রবর্তী, প্রফুল্ল কুমার। প্রান্তিক মানব পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু জীবনেরকথা। দীপ প্রকাশন, কলকাতা ২০২১, পৃ. ২১১।
৮. https://resultuniversity.com/election/karimpur-West-bengal-assembly-constituency .
৯. ধংস ও নির্মাণ বঙ্গীয় উদ্বাস্তু সমাজের স্বকথিত বিবরণ। সেরিবান পাবলিশার, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ১৬।
১০. বিশ্বাস, সুভাষ। দেশভাগ ও বাঙালি বাস্তহারা। দিশা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ৩৭।

সাক্ষাৎকার:

১. সরকার, মনমোহন। উদ্বাস্তু নাগরিক, প্রাক্তন উপপ্রধান, উদ্বাস্তু আন্দোলনের নেতা, সাংবাদিক, নাট্যকার, ০৬/০৯/২০২২।

২. মন্ডল, মঙ্গলচন্দ্র। বয়স্ক নাগরিক, সিপিআইএম নেতা, রহমতপুর সমবায় সমিতির সভাপতি ১০/১০/২০২২।

৩. টিকাদার, কানাইলাল। বয়স্ক নাগরিক, কলোনীর বাসিন্দা ১১/১০/২০২২।

৪. সরকার, কার্তিকচন্দ্র। সমাজকর্মী, পঞ্চায়েত সদস্য, অনির্বাণ ক্লাবের প্রাক্তন সম্পাদক, কলোনির বাসিন্দা, ১৩/১০ ২০২২।

৫. বিশ্বাস, সুধীর। বয়স্ক উদ্বাস্তু নাগরিক, ৩১/১০/২০২২।

৬. সরকার, বাসুদেব। বয়স্ক উদ্বাস্তু নাগরিক, প্রাক্তন শিক্ষক, ৩১/১০/২০২২।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1556-1573
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.377

শৈলী চিন্তার আলোকে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কিশোর উপন্যাস: 'পাতাল ঘর'

ড. সবিতা বিশ্বাস, *স্বাধীন গবেষক, শিলচর, অসম, ভারত*

Received: 21.03.2026; Accepted: 24.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This article examines the stylistic features of Shirshendu Mukhopadhyay's juvenile novel Patal Ghar through the lens of stylistics. Style, as a manifestation of an author's individuality, reflects distinctive linguistic choices in terms of diction, syntax, and narrative technique. Drawing upon theoretical perspectives from scholars such as Arun Kumar Mukhopadhyay and Pabitra Sarkar, the study highlights how stylistics serves as a scientific method for analyzing literary language.

The paper contextualizes children's and adolescent literature in Bengali literary tradition before focusing on the stylistic traits of Patal Ghar. It identifies key features such as the predominance of short and simple sentences, along with the use of complex, compound, and mixed sentence structures. The narrative also employs T-units, incomplete sentences, and conversational language to maintain accessibility and engagement for young readers.

Further, the study explores the use of verbs (including impersonal and compound forms), onomatopoeic expressions, reduplication, slang, and code-switching as integral stylistic devices. The novel's discourse structure alternates between descriptive and dialogic modes, enhancing narrative dynamism. Additionally, figures of speech like imagery and simile contribute to vivid visualization and emotional resonance.

Overall, the article argues that Mukhopadhyay's stylistic craftsmanship— marked by simplicity, variety, and expressive richness— effectively caters to the cognitive and imaginative world of adolescent readers, establishing him as a significant figure in Bengali juvenile fiction.

Keywords: Stylistics, Juvenile Literature, Narrative Style, Bengali Fiction, Language and Expression

কবি বা লেখকের নিজস্ব ভাবনারাজির সুললিত ভাষিক উপস্থাপন হলো শৈলী। যার মাধ্যমে একজন লেখক অন্যান্য লেখকের লেখা থেকে নিজের লেখাকে স্বতন্ত্র রূপে পাঠকের সন্মুখে তুলে ধরতে পারে। পক্ষান্তরে শৈলী কেবল একজন লেখকের ভাব প্রকাশের মাধ্যমই নয় বরং সমগ্র সাহিত্য সৃষ্টিকে নান্দনিক ও সাবলীল করে তুলতে সাহায্য করে। বিস্তৃত অর্থে শৈলী কথ্য এবং লিখিত উভয় ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যেতে পারে। শৈলী শব্দটি ইংরেজি স্টাইল শব্দের বাংলা পারিভাষিক রূপ। বিশিষ্ট শৈলী চিন্তক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় শৈলীর সংজ্ঞা প্রদানে বলেছেন-

> "যে কোনো গদ্য রচনা বা কবিতায় লেখকের ব্যক্তিত্বের এমন সব গুণ ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় যেগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখানো যায় না। অথচ অনুভব করা যায়। এবং সেই সব গুণ এর যোগফল লখক ব্যক্তিত্ব, এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তাকে এককথায় বলা যায় স্টাইল।"[১]

অর্থাৎ শৈলী হলো লেখকের ব্যক্তিগত চিন্তার ফসল। এই কারণেই প্রত্যেক ব্যক্তির বলার কৌশল যেমন আলাদা তেমনি প্রত্যেক লেখকের লেখার কৌশলও আলাদা হয়। ভাষাবিজ্ঞানী পবিত্র সরকারের মতে-

> "প্রত্যেক লেখকের নিজস্ব রচনালক্ষণ কিছু আছে। ধ্বনিবিন্যাস, শব্দসংস্থান, বাক্যযোজনা, প্যারাগ্রাফ বা স্তবক রচনা, রচনার আরম্ভ ও উপসংহার-ইত্যাদি সমস্ত কিছুতেই সেই লক্ষণগুলি ধরা পড়ে।"[২]

আর এর জন্যই একজন লেখককে অন্য একজন লেখকের থেকে পৃথক করে তোলে। একজন লেখক তাঁর রচনায় শব্দ তাত্ত্বিক, ব্যাকরণিক, চিত্রকল্প, ভাষা, ছন্দ-অলংকার, বাক্য প্রয়োগ বৈচিত্র প্রভৃতি বিষয় গুলি যে কৌশলের মাধ্যমে ব্যক্ত করেন তা যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে শৈলীবিজ্ঞান। শৈলীবিজ্ঞান ফলিত ভাষাবিজ্ঞানের অন্তর্গত হয়েও সতন্ত্ররূপে বিরাজিত। শৈলীবিজ্ঞানী জিওফ্রে লীচ শৈলীবিজ্ঞানে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন-

> "Style is a relational term: we talk about 'the style of 'x' referring through 'style' to characteristics of language use, and correlating these with some extralinguistic x, which we may call the stylistic domain."[৩]

অর্থাৎ শৈলী হল ভাষা বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একটি শব্দ। ইউরোপের মার্কিন দেশে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে শৈলীবিজ্ঞানের প্রাথমিক আলোচনা শুরু হয়েছিল। এ সময়ে Stylistics বা শৈলী বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণাধর্মী আলোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তিত্ব হলেন- এরিক ইঙ্কভিস্ট, পলপারভিন, সেমুর চ্যাটম্যান, স্টিফেন উলম্যান, এম.এ. কে হ্যালিডে, ডোনাল্ড সি.ফ্রিম্যান, জে.এম.সি.এইচ. সিনচেয়ার, জে.পি. থর্ন, মাইকেল হোয়ে, স্যামুয়েল লাভিন, রিচার্ড ওম্যান, জিওফ্রে লীচ, এইচ.জি উইডোসন প্রমূখ। তাঁদের আলোচনার পথ ধরেই পরবর্তী সময়ে বাংলা ভাষায় শৈলীবিজ্ঞান বিষয়ক চিন্তাভাবনার সুত্রপাত ঘটে। বাংলায় শিশির কুমার দাস তাঁর 'Early Bengali prose' (১৯৬৬) গ্রন্থের মধ্যে প্রথম শৈলীবিজ্ঞানের প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। পরবর্তীতে অরুণ কুমার বসু সম্পাদিত 'বাংলা গদ্যে শৈলীবিজ্ঞান' (১৯৮১), আশীষ কুমার দে-র 'উপন্যাসের শৈলী' (১৯৮৩), পবিত্র সরকারের 'গদ্যরীতি পদ্যরীতি' (১৯৮৫), অপূর্ব রায়ের 'শৈলীবিজ্ঞান' (১৯৮৯), অভিজিৎ মজুমদারের 'শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্য তত্ত্ব (২০০৭), গিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'শৈলী বিজ্ঞান পরিচিতি' প্রভৃতি গ্রন্থে শৈলীবিজ্ঞান নিয়ে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন।

শৈলীবিজ্ঞান সাহিত্যের ভাষা বিচার-বিশ্লেষণ করার গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। কোন একটা পাঠকৃতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে লেখকের বাক্য গঠনের বৈশিষ্ট্য, শব্দ প্রয়োগে নৈপুণ্য, পদ ও পদগুচ্ছের ব্যাকরণিক বিশিষ্টতা, ছন্দ, অলঙ্কার , চিত্রকল্প রূপায়নের বৈশিষ্ট্য, ইত্যাদি নির্ণয়ের স্বরূপ ব্যক্ত করা ও লেখকের নিজস্ব চিন্তাভাবনার কৌশল তুলে ধরা শৈলী বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। লেখকের শব্দ চয়ন, পরিসংখ্যান পদ্ধতি (Stylistics) এবং বাক্য ও বাক্যাংশের দৈর্ঘ্য নির্ণয় পদ্ধতির অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা শৈলীবিজ্ঞানের একটি বিচার্য বিষয়। উল্লেখ্য প্রবন্ধে আমাদের আলোচিত বিষয় শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কিশোরদের জন্য রচিত 'পাতাল ঘর' উপন্যাসের শৈলী। এর পূর্বে শিশু-কিশোর সাহিত্য ও শিশু কিশোর সাহিত্যের শৈলী সম্পর্কে জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে নারী জীবনের মতই শিশু-কিশোরদের 'জীবনরহস্য' দীর্ঘকাল যাবত অবহেলিত পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থেকেছে। ক্ষমতার দ্বারা নির্মিত সমাজব্যবস্থায় ক্ষমতাসীনরা ও 'প্রাপ্তবয়স্ক'রা মনে করেন শিশু-কিশোরদের তাঁরা তাঁদের তৈরি করে দেওয়ার নিয়ম কানুনের কাঠামোতে আবদ্ধ রাখবেন। সেই ভাবনা অনুযায়ীই সাহিত্যেকরাও শিশু-কিশোরদের আদর্শ জীবন গড়ে তোলার অভীপ্সাতে শিশু-কিশোরদের উপযোগী সাহিত্য রচনা করেছেন ও এই দৃষ্টিভঙ্গি সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হতে থাকে। শিশু-কিশোরদের নিয়ে তাঁদের মনে নানা প্রশ্ন জাগতে থাকে। শিশু-কিশোরদের অবলম্বন করে বিভিন্ন তত্ত্ব গড়ে উঠতে থাকে। প্রথমদিকে শিশু কিশোর সাহিত্যের উৎস ছিল কল্পলোক, কিংবদন্তি এবং পৌরাণিক উপাদান সমূহ। ধীরে ধীরে শিশু-কিশোর ভিত্তিক সাহিত্যে কল্পলোকের পাশাপাশি বাস্তব অনুভূতির ছোঁয়া লেগেছে। শিশু-কিশোর সাহিত্যের নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা নেই। লীলা মজুমদার শিশু-কিশোর সাহিত্য বলতে পাঁচ থেকে ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য রচিত সাহিত্যকে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেছেন-

> "ইংরেজিতে যখন বলা হয় বুকস্ ফর চিল্ড্রেন, কিংবা জুভেনাইল লিটারেচার, সকলেই বুঝে নেয়, ঐসব বই ৫ থেকে ১৬ পর্যন্ত ছেলে মেয়েরা অর্থাৎ স্কুলের ছেলে মেয়েরা পড়বে। কিন্তু আমাদের দেশে শিশু সাহিত্য বাদে ঐ অর্থে ব্যবহার করলে কেউ কেউ আপত্তি করেন, বলেন ৮-৯ বছরের পর কেউ শিশু থাকে না, হয়ে ওঠে কিশোর। যদিও শিশুদের জন্য আর কিশোরদের জন্য দু'রকম বই লেখা হয়, সুবিধার জন্য আমরা শিশু সাহিত্য বলতে ৫ থেকে ১৬ পর্যন্ত পাঠকদের মনে করি।"[৪]

খগেন্দ্রনাথ মিত্রের মতে বিদ্যালয়ের পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রচিত সাহিত্যই শিশু-কিশোর সাহিত্য। সহজ ভাষায় বলা যায় শিশু-কিশোরদের জন্য রচিত সাহিত্যই শিশু-কিশোর সাহিত্য।

বাংলা সাহিত্য ধারায় শিশুসাহিত্য ও কিশোর সাহিত্যের মধ্যেও আংশিক পার্থক্য রয়েছে। এই দুটি ধারার কিছুটা পার্থক্য থাকলেও বাংলায় দুটি ধারাই একই সঙ্গে আলোচিত। অনেক সময় দেখা যায় কিশোর পাঠকরা শিশুদের জন্য রচিত সাহিত্যের মধ্যেও নিজেদের আনন্দ অনুভূতি খুঁজে নেয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শিশু ভোলানাথ', উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর টুনটুনির বই, ছোটদের রামায়ণ, সুকুমার রায়ের হ-য-ব-র-ল, বিষ্ণু শর্মার 'পঞ্চতন্ত্র' প্রভৃতি গ্রন্থ গুলি শিশুসাহিত্যের সীমা পেরিয়ে কিশোর সমাজেও সমাদৃত। অনুরূপভাবেই প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য রচিত বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী উপন্যাসটিও কিশোরদের মনে জায়গা করে নিয়েছে।

মূলত উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে বাংলা বিদ্যালয়ে পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিদ্যা ও সাহিত্যের পাঠ চালু করার মধ্য দিয়ে শিশু-কিশোর সাহিত্যের বিকাশ শুরু হয়েছিল। ১৮১৮ সালে স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত 'নীতিকথা' নামক গ্রন্থটিকে প্রথম বাংলা শিশু-কিশোর পাঠ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই সময়ে রচিত গ্রন্থ গুলোর উদ্দেশ্য ছিল নীতি শিক্ষা। বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে মদনমোহন তর্কালঙ্কার, অক্ষয় কুমার দত্ত, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, প্রমূখরাও যে বই গুলো রচনা করেছিলেন সেগুলোও ছিল উপদেশধর্মী ও নীতিকথা মূলক। বিদ্যাসাগরের পরে রবীন্দ্রনাথের হাত ধরেই শিশু কিশোর সাহিত্যের সার্থক রূপায়ন শুরু হয়। গল্প, কবিতা, ছড়া, নাটক প্রভৃতি সকল সাহিত্য ধারাতেই ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ। ১৮৮১ সালে 'বাল্মিকী প্রতিভা', ১৮৮২ সালে 'কালমৃগয়া' রবীন্দ্রনাথের অন্যতম সৃষ্টি।

পরবর্তীতে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের ইতিহাসে এক ভিন্ন মাত্রা যুক্ত করেছেন। তাঁর রচিত প্রভৃতি গ্রন্থ গুলি শিশু সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলা শিশু কিশোর সাহিত্যের আরেকজন অন্যতম প্রতিভাবান রচনাকার হলেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। তাঁর 'ঠাকুরমার ঝুলি'

(১৯০৬), 'ঠানদিদির থলে' (১৯১৩), 'ঠাকুরদার ঝুলি' (১৯০৯), 'দাদা মশাই এর থলে' (১৯১৩) প্রভৃতি গ্রন্থ গুলি শিশু-কিশোর সাহিত্যের ইতিহাসে অন্যতম সৃষ্টি।

বাংলা ভাষায় মৌলিক শিশু কিশোর সাহিত্যের সূচনা হয় 'বালক বন্ধু' (১৮৭৮) প্রকাশিত হওয়ার পর। এই পত্রিকাটি কেশবচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এরপর প্রমদাচরণ সেনের 'সখা' (১৮৮৩), জ্ঞানদানন্দিনী দেবী 'বালক' (১৮৮৫), ভুবন মোহন রায়ের 'সখা ও সাথী' (১৮৯৩), শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মুকুল' (১৮৯৫), 'প্রীতি' পত্রিকাগুলি শিশু কিশোর সাহিত্যের পথ আরো সুগম করে তুলেছিল। 'সখা' পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই বাংলা ভাষায় প্রথম মৌলিক কিশোরপাঠ্য গ্রন্থ প্রমদাচরণ সেনের 'ভীমের কপাল' প্রকাশিত হয়। এই পত্র-পত্রিকাগুলো কে কেন্দ্র করে বহু লেখক শিশু-কিশোর সাহিত্য রচনা করেন। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, ভুবন মোহন রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, নারায়ণ সান্যাল, মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, অম্বিকাচরণ সেন, যোগীন্দ্রনাথ সরকার লাবণ্যপ্রভা বসু প্রমুখ ব্যক্তিত্বরা এই ধারায় স্বাক্ষর রেখে গেছেন। যোগীন্দ্রনাথের 'সাত ভাই চম্পা', 'ভুলো ও বাঘা', ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কঙ্কাবতী' (১৮৯৩) নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের 'শিশু রঞ্জন রামায়ণ' (১৮৮১), 'আমার খুকু', 'মজার পড়া', 'সোনামনির রাগ', 'ক্ষীরের পুতুল', প্রমোদাচরণ সেনের 'কেরানি পাখি' প্রভৃতি গ্রন্থ গুলি শিশু-কিশোর সাহিত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই গ্রন্থ গুলি বাক্যবিন্যাস রীতিতে শিশু-কিশোরদের লেখন বিশ্বে একটা নতুনত্ব সৃষ্টি করেছে। বিশ শতকের প্রথম দিকে 'সন্দেশ' (১৯১৩) 'মৌচাক' (১৯২০), 'শিশু ও সাথী' (১৯২২), 'রঙ মশাল' (১৯০৭), 'রামধনু' (১৯২৭), 'মাস পয়লা' (১৯২৯) ইত্যাদি পত্রিকাগুলি বাংলা শিশু কিশোর সাহিত্যের জগতে চমক নিয়ে এসেছিল। এই সব পত্রিকায় রূপকথার পরিবর্তে অ্যাডভেঞ্চার , গোয়েন্দা কাহিনি, কল্পবিজ্ঞান , ছোটগল্প প্রভৃতি নতুন ভাবে উঠে আসে। ফলে এই ধরনের গ্রন্থগুলি শিশু-কিশোরদের মনে অনায়াসেই জায়গা করে নেয়। সুকুমার রায়, সুনির্মল বসু, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, হেমেন্দ্রকুমার, শিব্রাম চক্রবর্তী প্রভৃতি লেখকেরা এই ধারার অন্যতম পথিকৃৎ। সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল', 'পাগলা দাশু', 'ঝালাপালা', 'লক্ষণের শক্তিশেল', 'অবাক জলপান', 'শব্দ কল্প দ্রুম', 'হ-য-ব-র-ল' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি কিশোর সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। সুকুমার রায়ের ভাষা চয়ন, 'শব্দ ব্যবহার, বাক্য গঠনের কৌশল সবই শিশু-কিশোরদের মনকে হাস্যরসে ভরিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি তৎকালীন সমাজের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে। তাছাড়াও ক্ষিতিন্দ্র নারায়ন ভট্টাচার্য, নজরুল, কুলদা রঞ্জন, বন্দে আলী মিয়া, বিমল ঘোষ, ধীরেন্দ্রলাল ধর, অখিল নিয়োগী, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন, গিরীন্দ্রশেখর বসু, সত্যজিৎ রায় প্রমূখ সাহিত্যিকদের রচনা শিশু কিশোর সাহিত্যের সার্থক রূপায়নে ঘটেছে।

সত্যজিৎ রায়ের পর বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্য তুলনামুলক ভাবে কম রচিত হয়েছে। সত্তরের দশকে 'আনন্দমেলা' পত্রিকা কে অবলম্বন করে শিশু-কিশোর সাহিত্য আবার পুরনো রূপে ফিরে আসে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাব্যসমগ্রের 'ভয়ঙ্কর সুন্দর', 'পাহাড় চূড়ায় আতঙ্ক', 'সবুজ দ্বীপের রাজা', 'খালি পাহাড়ের রহস্য' প্রভৃতি কিশোর উপন্যাস গুলি শিশু-কিশোরদের মন জয় করে। ষষ্ঠী চরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'পান্ডব গোয়েন্দা' সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'মিতিনমাসি সমগ্র' প্রভৃতি বাংলা কিশোর উপন্যাসের জগতে এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। এই ধারারই একজন অন্যতম জনপ্রিয় সাহিত্যিক হলেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়।

সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় শৈলীবিজ্ঞানের প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা হলেও শিশু-কিশোর উপন্যাসে শৈলী নিয়ে আলোচনা অপ্রতুল। শিশু-কিশোর সাহিত্যের শৈলী নিয়ে আলোচনা করেছেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হল ডেভিড হারম্যান (১৯৯৪), সি.সি আন্ডারসন (১৯৪৫), হান্ট পিটার (১৯৯৭) জনেসা (২০১২), রবার্ট লুই (?), পেডিকর্ড মেরি হিল (২০০০) প্রমূখ। তাঁরা শিশু-কিশোর সাহিত্যে শৈলী নিয়ে যে

গ্রন্থগুলিতে আলোচনা করেছেন তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হল- মেরী হিল পেডিকর্ডের 'Linguistic Stylistics and Children's literature', জঁ গুটেরি'র 'Style in Children's Literature', পিটার হান্টের 'Understanding Children's literature', জন স্টিফেনের 'Analysing Text for Children: Linguistics and Stylistics', প্রভৃতি।

Celia catlett Anderson তাঁর 'Style in children literature: a comparison of passage' গ্রন্থের ভূমিকা অংশে কিশোরসাহিত্য কে চিহ্নিত করার জন্য শৈলীগত কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন-

- ছোট ছোট বাক্যের অধিক ব্যবহার থাকবে।
- টি-ইউনিট এর ব্যবহার থাকবে।
- খন্ড বাক্য বা অসম্পূর্ণ বাক্যের ব্যবহার থাকবে।
- শব্দগত পুনরাবৃত্তির ব্যবহার থাকবে।
- বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্ত হবে।
- কিশোর উপন্যাস লেখার সময় উপন্যাসিক মৌখিক ঐতিহ্য থেকে কাহিনী গ্রহণ করেন।

Perry Nodelman তাঁর 'The hidden adult defining children's literature' (2008) গ্রন্থে শিশু সাহিত্য কে চিহ্নিত করার জন্য শৈলীগত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন-

- শিশু-কিশোরদের বই সাধারণত সংক্ষিপ্ত হবে।
- বর্ণনা এবং অন্তর্নিহিত করণ এর পরিবর্তে একটি সংলাপ বা ঘটনার উপর বেশি জোর দিতে হবে।
- শিশু-কিশোরা আখ্যানের প্রধান চরিত্র হবে এবং শিশু-কিশোর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি বেশি ব্যবহৃত হবে।
- শিশুদের বই এর মধ্যে বিষন্নতার পরিবর্তে আশাবাদী মনোভঙ্গি থাকবে।
- বয়ানের ভাষা হবে শিশু অনুসারী।
- বয়ানে অবিরাম জাদু কথা বলা কল্পনা প্রবণতা বেশি থাকবে।

Laina Ho তাঁর 'Children Literature in Education' (2000, Vol. 31) কিশোর সাহিত্য কে চিহ্নিত করার জন্য শৈলীগত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন-

- অনুপ্রাস এর ব্যবহার থাকবে।
- ধনাত্মক শব্দের ব্যবহার থাকবে।
- স্বরের সাদৃশ্য থাকবে।
- অতিশয়োক্তির প্রয়োগ থাকবে।
- ছন্দ ও লয় থাকবে।
- কবিতায় শব্দ বা চরণের শেষে অন্তমিল থাকবে।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির প্রেক্ষিতকে মাথায় রেখেও শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'পাতাল ঘর' উপন্যাসের বিশ্লেষণ করা যায়।

'পাতাল ঘর' উপন্যাসে ছোট ছোট বাক্য বা সরল বাক্যের ব্যবহার:

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর 'পাতাল ঘর' উপন্যাসে ছোট ছোট বাক্য বা সরল বাক্য প্রয়োগ করে ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের মতোই তাঁর কিশোর উপন্যাসে বাক্য গুলির দৈর্ঘ্যে ছোট। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একটি কর্তৃপদ, ও একটি ক্রিয়াপদ বা দুই-তিনটি বিশেষণ পদের দ্বারা সরল বাক্য রচনা করেছেন। বাক্য প্রয়োগে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মুখের ভাষা প্রয়োগ করে নিজস্বতা ফুটিয়ে তুলেছেন। যেমন-

"ভূতের দাম আছে দেখছি।" (পৃ-১৭৭)

"সুবুদ্ধি এতক্ষণ বড় অস্বস্তি বোধ করছিল।" (পৃ-১৭৯)

"বাড়িটাও কেনা হয়ে গেল। এখন একটু মেরামত করে নিলেই হয়।" (পৃ-১৮০)

কিশোর উপন্যাস মানেই যে শুধুমাত্র ছোট ছোট কথা, ছোট ছোট শব্দাবলী, কাব্য গুণান্বিত বর্ণনা থাকতে হবে এই ভাবনায় শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বিশ্বাসী নন। তাঁর 'পাতাল ঘর' উপন্যাসে ছোট ছোট বাক্য বা সরল বাক্যের পাশাপাশি জটিল বাক্য, যৌগিক বাক্য ও যৌগিক মিশ্র বাক্যের ব্যবহার করেছেন।

'পাতালঘর' উপন্যাসে জটিল বাক্যের ব্যবহার:

কিশোর উপন্যাসের কাহিনি বিন্যাসে জটিল বাক্য নির্বাচনের একাধিক উদ্দেশ্য হতে পারে। বহুবিধ কাহিনির মধ্যে সংযোগের বন্ধন দৃঢ় করতে এবং উপন্যাসের সামগ্রিকতা ও অখন্ডতা যাতে বিনষ্ট না হয় সে দিকে লক্ষ রেখেই লেখক কিশোর উপন্যাসে জটিল বাক্যের ব্যবহার করেন। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় কিশোর উপন্যাসে বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে চরিত্রের যোগসূত্র স্থাপন করতে গিয়ে জটিল বাক্য গুলি ব্যবহার করেন। যেমন-

"আর যতই হামলে পড়ছে ততই ভূতেরা গা-ঢাকা দিচ্ছে।" (পৃ-১৭৮)

"সমাজ মিত্তিরের গলায় যে এতো জোর, তা তাদের জানা ছিল না।" (পৃ-১৯৫)

'পাতার ঘর' উপন্যাসে যৌগিক বাক্যের ব্যবহার:

এক বা একাধিক সরল বাক্য বা জটিল বাক্য পাশাপাশি বসে অর্থ ও গঠন অপরিবর্তিত রেখে সংযোজক অব্যয় এর দ্বারা একত্রিত হয়ে বাক্য নির্মাণ করে তখন তাকে যৌগিক বাক্য বলে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় উপন্যাসে সরল বাক্য ও জটিল বাক্যের পাশাপাশি যৌগিক বাক্যের ব্যবহার আখ্যানের বক্তব্যকে গাম্ভীর্যপূর্ণ করে তুলেছে। তাঁর কিশোরদের জন্য লিখিত উপন্যাস থেকে উদাহরণ নিয়ে যৌগিক বাক্যের বিষয়টি স্পষ্ট করা হল।

"মিলিটারিতে খাইখরচ লাগে না, পোশাক-আশাকও বিশেষ লাগে না, ইউনিফর্ম তো সরকার দেয়।" (পৃ-১৭৯)

"অন্ধকার এবং অজানা প্রতিপক্ষ সামনে থাকলে একটু কৌশল নিতেই হয়।" (পৃ-২০০)

'পাতাল ঘর' উপন্যাসে যৌগিক মিশ্র বাক্যের ব্যবহার:

"প্রথমটায় পাথর বলে মনে হলেও আরো কিছু মাটি খসাবার পর দরজায় যেমন লোহার কড়া লাগানো থাকে তেমনই একটা মস্ত এবং ভারী কড়া হাতে পেল।" (পৃ-২০১)

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের পাতাল ঘর উপন্যাস থেকে সংগৃহিত প্রথম দুশো (২০০) বাক্য নিয়ে বাক্য বিন্যাসের (সরল বাক্য, জটিল বাক্য, যৌগিক বাক্য, যৌগিক মিশ্র বাক্য) শতকরা পরিমাপ নিম্নে সংগঠন চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হল-

'পাতাল ঘর' উপন্যাসে বাক্যের সংগঠন চিত্র:

উপন্যাস	মোট গৃহীত বাক্য সংখ্যা	সরল বাক্যের সংখ্যা (%)	জটিল বাক্যের সংখ্যা (%)	যৌগিক বাক্যের সংখ্যা (%)	যৌগিক মিশ্র বাক্যের সংখ্যা (%)
পাতাল ঘর	২০০	১১৩ (৫৬.৫%)	৩৮ (১৯%)	৪৩ (২১.৫%)	৬ (৩%)

উপরের এই সংগঠন চিত্র থেকে বোঝা যায় সে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় তার 'পাতাল ঘর' উপন্যাসে জটিল বাক্য, যৌগিক বাক্য, ও মিশ্র বাক্যের তুলনায় সরল বাক্য বেশি ব্যবহার করেছেন।

'পাতাল ঘর' উপন্যাসে সাকাঙ্ক্ষ বাক্যের ব্যবহার:

কোনো একটি বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ ভাবে বোঝার জন্য একটি পদ শোনার পর অন্যপদটি শোনার যে ইচ্ছে প্রকাশ পায়, তাই হল আকাঙ্ক্ষা। যেমন- 'সামনে পুকুর' এই বাক্যটির দ্বারা মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়না। 'সামনে পুকুর' শোনার পর আরও কিছু শোনার আগ্রহ তৈরী হয়। সামনে পুকুর আছে বা সামনে পুকুর ছিল, তা স্পষ্ট নয়। এখানে বাক্যটির উদ্দেশ্য বোঝা যাচ্ছে না তাই বাক্যটি সাকাঙ্ক্ষ বাক্য। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'পাতাল ঘর' উপন্যাসে সাকাঙ্ক্ষ বাক্যের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যথা-

> "বড় গঞ্জ, মেলা লোকজনের যাতায়াত।" (পৃ-১৭৯)
> "পেছনে একটা মজা পুকুর।" (পৃ-১৮৮)
> "সাপ-খোপ আর তক্ষকের বাসা।" (পৃ-২২৪)

উপরের বাক্যগুলিতে প্রথম বাক্যে লোকজনের যাতায়াত আছে কি নেই তা শোনার আগ্রহ থেকে যায়, দ্বিতীয় বাক্যে মজা পুকুর আছে কি নেই তা স্পষ্ট নয়, তৃতীয় বাক্যে সাপ-খোপ তক্ষকের বাসা আছে কি নেই তা শোনার আগ্রহ প্রকাশ পায়। সুতরাং এই বাক্যগুলো সাকাঙ্ক্ষ বাক্য

'পাতাল ঘর' উপন্যাসে ক্রিয়াপদ ব্যবহারের বিশেষত্ব:

বাক্যের মধ্যে অবস্থিত যে পদের দ্বারা কোন ক্রিয়া বা কাজ করা বোঝায় তাই হল ক্রিয়া। ক্রিয়াপদের মূলে রয়েছে ধাতু। ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি প্রত্যয় যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদ গঠন করে। সুকুমার সেনের ভাষায়-

> "যে মূল অংশে কাল ও ভাববাচক, বচন ও পুরুষ বাচক এবং বিভিন্ন অসমাপিকা অর্থবাচক বিকরণ ও বিভক্তি যোগ করিয়া সমাপিকা ও অসমাপিকা পদ নিষ্পন্ন হয়- তাহাকে বলে ধাতু অর্থাৎ ক্রিয়া ধাতু (root)।"[৫]

অর্থাৎ ধাতু হলো ক্রিয়ার মূল অংশ। ধাতু বা ক্রিয়ামূলের সঙ্গে বিভক্তি ও প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যে পদ সৃষ্টি হয় এবং যে পদের দ্বারা থাকা, খাওয়া, আসা-যাওয়া, প্রভৃতি কাজ করা বোঝায় তাকে ক্রিয়াপদ বলে। বাংলা ব্যাকরণে ক্রিয়াপদকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়-

অর্থ ও ভাবের দিক দিয়ে ক্রিয়াপদ দুই প্রকার। (১) সমাপিকা ক্রিয়া (২) অসমাপিকা ক্রিয়া। এছাড়াও আরও চার প্রকার ক্রিয়াপদ রয়েছে। যেমন- (৩) অকর্তৃক ক্রিয়া (Impersonal verb) (৪) যৌগিক ক্রিয়া (Compound verb) (৫) নিজন্ত ক্রিয়া (Causative verb) (৬) অসম্পূর্ণ ক্রিয়া (Effective verb)

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তার 'পাতাল ঘর' উপন্যাসে সমাপিকা ক্রিয়া, অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহারের পাশাপাশি ক্রিয়া অকর্তৃক ক্রিয়া এবং যৌগিক ক্রিয়া প্রয়োগ করে ক্রিয়াশ্রয়ী শৈলীর বিশেষত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন।

অকর্তৃক ক্রিয়ার ব্যবহার:

বাংলা ব্যাকরণে যে ক্রিয়াপদের কোনো কর্তা থাকে না তাকে অকর্তৃক ক্রিয়া বা কর্তাবিহীন ক্রিয়া বলে। বাংলা বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে যে ক্রিয়াপদের এক বা একাধিক কর্তা থাকে সেইসব ক্রিয়াপদ থেকে পৃথক অর্থাৎ এই পদটি একটি কর্তা কিংবা দ্বিকর্তৃক ক্রিয়া থেকে আলাদা একটি পদ। ক্রিয়াপদের এই ধর্মকে অকর্তৃত্ব বলে। কে বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে অকর্তৃক ক্রিয়া যুক্ত বাক্যের কোনো উত্তর পাওয়া যায় না। গল্প-উপন্যাসে বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে অকর্তৃক ক্রিয়ার ব্যবহার লেখকের বিশিষ্ট শৈলী ভাবনাকে প্রকাশ করে। এক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসে বাক্যের মধ্যে কর্তাকে অনুপস্থিত রেখে বাক্যের কার্য সম্পাদন করেন। অকৃর্তক ক্রিয়া যুক্ত

বাক্যে কর্তৃকারকের বিভক্তি লোভ পায় এবং সম্বন্ধ পদের বিভক্তি যুক্ত হয়। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর 'পাতাল ঘর' উপন্যাসে অকর্তৃক ক্রিয়ার ব্যবহার করে ক্রিয়াশ্রয়ী শৈলীর পরিচয় দিয়েছেন। যেমন-

"একডাকে সবাই চেনে।" (পৃ-১৮১)

"খাঁজ ভেঙে মাটির চাপড়া খসে পড়ে গেল।" (পৃ-২০১)

"তারপর হাত ছেড়ে দিতেই দড়াম করে পড়ল নীচে একটা বাঁধানো জায়গায়।" (পৃ-২০৩)

এখানে প্রথম দৃষ্টান্তে ক্রিয়াপদ হল একডাকে চেনে। কাকে একডাকে চেনে তা উল্লেখ নেই। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে খসে পড়ে গেল হল ক্রিয়াপদ। এখানে কে খসে পড়ল তা উল্লেখ নেই। তৃতীয় দৃষ্টান্তে ক্রিয়াপদ হল দড়াম করে পড়ল, এখানে কে পড়ল তার উল্লেখ নেই। সুতরাং এই বাক্যগুলো কর্তাবিহীন বাক্য।

'পাতাল ঘর' উপন্যাসে যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার:

যে ক্রিয়াপদে একটি ক্রিয়ার মাধ্যমে অপর একটি ক্রিয়ার পরিণতি জানা যায় বা একের অধিক ক্রিয়ার সাহায্যে একটি পদ গঠিত হয় তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। সুকুমার সেন যৌগিক ক্রিয়ার সংজ্ঞা প্রদানে বলেছেন-

"কোনো ক্রিয়া অন্য পদের যোগে একটিমাত্র অর্থ প্রকাশ করিলে যৌগিক ক্রিয়া বা ধাতু বলে।"[৬]

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'পাতাল ঘর' উপন্যাসে যৌগিক ক্রিয়াপদের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়-

"সুবুদ্ধি একটু ভেবে তার লাঠিটাও নিয়ে নিল।" (পৃ-১৯৯)

"তারপর সরু একটা ফালি ফোকর উন্মোচিত হয়ে গেল সুবুদ্ধির সামনে।" (পৃ-২০৩)

"সেএকটু চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বেরিয়ে এল।" (পৃ-২২৫)

এখানে বাক্য গুলিতে ব্যবহৃত নিয়ে নিল, হয়ে গেল, বেরিয়ে এল ইত্যাদি পদ গুলি যৌগিক ক্রিয়া।

'পাতাল ঘর' উপন্যাসে অসম্পূর্ণ বাক্যের ব্যবহার:

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কিশোর উপন্যাসে গদ্যরীতির আরেকটা বৈশিষ্ট্য হলো অসম্পূর্ণ বাক্যের মধ্যে দিয়ে ভাব ব্যক্ত করা। তাঁর কিশোর উপন্যাসে অসম্পূর্ণ বাক্যের প্রয়োগও লক্ষ করা যায়-

"এটাই কি..." (পৃ-২০০)

"তাঁর ছিল পাঁচ ছেলে..." (পৃ-২১৬)

"তবে একটা গন্ডগোল হয়ে গেছে কিনা, তাই বলছিলুম...।" (পৃ-২১৭)

"আজ্ঞে আপনার ঘুমটা একটু বেশি লম্বা হয়ে গেছে কিনা, তাই..." (পৃ-২১৭)

'পাতাল ঘর' উপন্যাসে 'টি-ইউনিট' এর ব্যবহার:

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কিশোর উপন্যাস রচনার একটা বড় বৈশিষ্ট্য হল টি- ইউনিট এর ব্যবহার। টি-ইউনিট হল খণ্ডবাক্য। Celia Catlett Anderson তাঁর 'Style in children literature a comparison a passage' গ্রন্থে শিশু-কিশোর সাহিত্যকে চিহ্নিত করার জন্য শৈলীগত যে বৈশিষ্ট্যগুলির কথা বলেছেন তার মধ্যে টি-ইউনিটের ব্যবহার একটি বিশেষ দিক। ভাষাবিজ্ঞানের শাখায় ১৯৬৫ সালে ভাষাবিজ্ঞানী কেলোগ হান্ট প্রথম 'টি-ইউনিট' শব্দটি ব্যবহার করেন। তিনি তাঁর 'Grammatical Structures Written at Three Grade Levels' এ 'টি-ইউনিট' সম্পর্কে বলেন- 'টি-ইউনিট' হল বাক্য গঠন সংক্রান্ত বিকাশ পরিমাপের মানদন্ড। শিশু বড় হওয়ার সাথে সাথে তাদের বাক্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাক্যের দৈর্ঘ্য ও জটিলতা পরিবর্তিত হতে দেখা যায়। টি-ইউনিট বাক্য গঠনের এই মানদণ্ড নির্ধারণ করে দেয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় খুব অল্প বয়সের শিশুরাও যৌগিক বাক্য ব্যবহার করে দীর্ঘ বাক্য লেখে, যার ফলে প্রতিটি বাক্যে ব্যবহৃত শব্দ সংখ্যার মান

নির্ধারণ করা যায় না, এরকম পরিস্থিতিতে কেলোগ হান্টের টি ইউনিট যথেষ্ট কার্যকরী। তিনি প্রতিটি মেইন ক্লজের গড় শব্দ সংখ্যা নির্ধারণ করে দেন। মেইন ক্লজ এর ব্যাখ্যা যেহেতু সময় বিশেষে আলাদা আলাদা হয় সেহেতু তিনি একে 'Minimally terminable unit' নামে আখ্যায়িত করেন। এটি ব্যাকরণগতভাবে অনুমোদিত সংক্ষিপ্ততম বাক্য। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'পাতাল ঘর' উপন্যাসে টি-ইউনিটের প্রচুর ব্যবহার লক্ষ করা যায়-

"এক লাখ।" (পৃ-১৮০)
"যে আজ্ঞে।" (পৃ-১৮১)
"তোর মাথা।" (পৃ-১৮২)
"দূর পাগলা।" (পৃ-১৮৭)
"ভুল হচ্ছে।" (পৃ-১৯২)
"নরম মাটি।" (পৃ-২০১)
"আজ্ঞে সাংঘাতিক।" (পৃ-২১৭)

'পাতাল ঘর' উপন্যাসে ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার:

শৈলীর আলোচনায় ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগ বিশ্লেষণ এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যারা কিশোর উপন্যাসের শৈলী নিয়ে আলোচনা করেছেন তারা বলেছেন যে কিশোর উপন্যাসের একটি শৈলীগত বৈশিষ্ট্য হল ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার। ধ্বন্যাত্মক শব্দ একাধিক ধ্বনির সংযোজন। এই ধ্বনি সংযোজন একদিকে যেমন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য অনুকৃতি অন্যদিকে ব্যঞ্জনাত্বক অনুভূতির প্রতীক।

> "নৈসর্গিক ধ্বনি মানুষ যেভাবে শোনে তার ভাষায় বর্ণ ও ধ্বনির মামে সেই ভাবে ব্যক্ত করে। সেই অভিব্যক্তির ফলস্বরূপ ভাষায় বর্ণ বা ধ্বনি গুলির নৈসর্গিক ধ্বনির অনুকৃতি বা ব্যঞ্জনারপে অন্যদিকে সইন্দ্রিয় গ্রাহ্য অনুভূতির প্রতীক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।"[৭]

বাংলা ভাষায় নৈসর্গিক ধ্বনির অনুকৃতি বা ব্যঞ্জনাত্বক, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির প্রতীক শব্দগুলিই ধ্বন্যাত্মক শব্দ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই শব্দগুলি কে 'বিশেষ এক শ্রেণীর শব্দ' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আসলে, ধ্বন্যাত্মক শব্দ বাস্তব ধ্বনির ব্যঞ্জনা ও অনুভূতির দ্যোতক। এই ধ্বনি ব্যঞ্জক শব্দগুলি প্রতীকের মাধ্যমে অর্থ বহন করে। যেমন- 'ঝমঝম', 'ছমছম', 'কনকন', 'গনগন', 'ঝর ঝর', 'ছল ছল', 'কল কল', 'টল টল', 'ঢল ঢল', 'বকবক', 'পক পক', 'হর হর', 'গপ গপ' ইত্যাদি। এই ধ্বন্যাত্মক শব্দ গুলি সময় বিশেষে ব্যক্তি, বস্তু, বিষয়, ভাব, ভঙ্গি, ক্রিয়া, কলাকে পৃথকভাবে চিনিয়ে দিতে সহায়তা করে। ভাষাবিজ্ঞানী ব্লুমফিল্ড ধ্বন্যাত্মক শব্দের ভাব প্রসঙ্গে বলেছেন-

> "Symbolic forms have a connotation of somehow illustrating the meaning more immediately than do ordinary speech forms."[৮]

অর্থাৎ প্রতীকী শব্দগুলি সাধারণ বক্তব্য থেকেও তাতক্ষনিক অর্থ প্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়-

> "যে সকল শব্দ ধ্বনি ব্যঞ্জক, কোন অর্থসূচক ধাতু হইতে যাহাদের উৎপত্তি নহে তাহাদিগকে ধ্বন্যাত্মক নাম দেওয়া গেছে; যেমন, ধাঁ সাঁ, চট, খট ইত্যাদি।"[৯]

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'The Origin and development of the Bengali language' গ্রন্থে ধ্বন্যাত্মক শব্দ নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন-

> "Onomatopoetics also falls under denominations. These can be classed under two heads- onomatopoeias proper and Roots Reduplicated or

Repeated, which produce a jungle, onomatopoetisk proper can also be either simple or reduplicated."[১০]

তাঁর মতে ধ্বন্যাত্মক শব্দ দুই প্রকার:

(১) মৌলিক ধ্বন্যাত্মক শব্দ। যেমন- 'চিল্লা (Cilla)', 'চুয়া (Cua)', 'টুপা (Tupa)', 'টুসা (Tusa)', 'বুক (phuk)', 'ফোঁসা (phosa)', 'হাঁক (Hak)', 'হাঁচ (Hach)' ইত্যাদি।

(২) ধ্বন্যাত্মক শব্দের দ্বিতীকরণ। যেমন- 'কটকটা', 'কড়মড়', 'ক্যাঁচক্যাঁচা', 'খটখটা', 'গড়গড়া', 'পিলপিলা', 'ফরফরা', 'বিড়বিড়া', 'সপসপা' প্রভৃতি।

আবার অর্থগত ও ভাবগত দৃষ্টিতে ধ্বন্যাত্মক শব্দ কে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) অনুকারজাত ধ্বন্যাত্মক শব্দ (২) ভাবপ্রকাশক ধ্বন্যাত্মক শব্দ।

(১) **অনুকারজাত ধ্বন্যাত্মক শব্দ**: অনুকারজাত ধ্বন্যাত্মক শব্দ দুই প্রকার।

(ক) প্রকৃতিগত, যেমন- বৃষ্টি ও জল পড়ার শব্দ, বাতাসের ধ্বনি, বজ্রপাতের ধ্বনি, পশু পাখির ডাক।

(খ) মানব প্রকৃতিগত, যথা- কান্নার ধ্বনি, নৃত্যের ধ্বনি, হাসির ধ্বনি, চলাচলের ধ্বনি প্রভৃতি।

(২) **ভাবপ্রকাশক ধ্বন্যাত্মক শব্দ-** শূন্যতা বোধক, পূর্ণতা বোধক, আধিক্য, রাগ ও অভিমান, ভয় ও আশঙ্কা, দুঃখ ও বেদনা, আনন্দ, বর্ণবৈচিত্র্য জ্ঞাপক, ঔজ্জ্বল্য।

বাংলা ভাষায় এই ধ্বন্যাত্মক শব্দ গুলির প্রয়োগ বিশেষ ভাব প্রকাশ করে। বাংলা সাহিত্যে ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগ মধ্যযুগ থেকেই কিছু কিছু সাহিত্যে ব্যবহৃত হতো। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্য থেকে শুরু করে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল', 'বিদ্যাসুন্দর' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। পরবর্তীতে অষ্টাদশ শতকের লেখক বা কবিয়ালদের লেখায় ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার অনেক বেশি লক্ষ করা গেছে। পরবর্তীতে ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার গল্প উপন্যাসে প্রচলিত হওয়ার পাশাপাশি কিশোর উপন্যাসেও ব্যবহার শুরু হয়। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় পাতাল ঘর উপন্যাসে ধ্বনিবাচক শব্দ হিসেবে অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার করেছেন। আবার কখনো ঔজ্জ্বল্য, আধিক্য, পূর্ণতা, বর্ণবৈচিত্র্য, ভয় ও আশঙ্কা, দুঃখ ও বেদনা, শূন্যতা, হাস্যধ্বনির তারতম্য বোঝাতে তিনি অনুকার অব্যয় বা ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার করেছেন। যেমন-

ধ্বনিবাচক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত-

"এমনকী একটা রিক্সা ওয়ালা পর্যন্ত চোখ বুজে পঁক পঁক করে হর্ণ দিতে দিতে চলে গেল।" (পৃ-১৮২)

"নোনায় ধরেছে ঝুরঝুর করে চুনবালি খসে পড়ছে।" (পৃ-১৭৮)

ভয় ও আশঙ্কা বোঝাতে-

"দিনের বেলাতেই এলাকাটা যেন ছমছম করে।" (পৃ-১৮৮)

"তবে তার মনটা খচখচ করছিল।" (পৃ-১৯৮)

আধিক্য বোঝাতে-

"বাঁ হাতের পাথরটা দপ করে জ্বলে ওঠে একটা নীল শিখা লকলক করতে লাগল।" (পৃ-২০৪)

"আরও ঘন্টা খানেক বাদে সনাতন মিটমিট করে তাকাতে লাগল।" (পৃ-২০৮)

ঔজ্জ্বল্য বোঝাতে-

"তার চোখ জ্বলজ্বল করতে লাগল।" (পৃ-২২০)

"প্রদীপের আলোয় চারদিকটা বেশ ফট ফট করছে।" (পৃ-২২৮)

'পাতাল ঘর' উপন্যাসের শব্দদ্বৈত বা শব্দজোটের ব্যবহার:

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কিশোর উপন্যাস নির্মাণের একটি বড় বৈশিষ্ট্য শব্দদ্বৈত বা শব্দজোটের ব্যবহার। শব্দদ্বৈত হল একই শব্দের পরপর দুইবার ব্যবহার। বাংলা ভাষায় কোন কোন পদ বা শব্দ বা অনুকার শব্দ একের অধিক অর্থাৎ পাশাপাশি দুইবার ব্যবহার করলে জোরালো অভিব্যক্তি প্রকাশ পায় এগুলোকে দ্বিরুক্ত শব্দ বলে। সুকুমার সেন এর ভাষায়-

"শব্দদ্বৈত মানে একক শব্দে স্থানে জোড়া শব্দের ব্যবহার"[১১]

অর্থাৎ একক শব্দে স্থানে দুটি শব্দ ব্যবহার করার নামই শব্দদ্বৈত। শব্দদ্বৈত প্রধানত তিন প্রকার-

(১) দ্বিরুক্ত শব্দের শব্দদ্বৈত।

(২) যুগ্ম শব্দের শব্দদ্বৈত।

(৩) পদবিকার বাচক শব্দদ্বৈত।

(১) দ্বিরুক্ত শব্দের শব্দদ্বৈত- একটি বাক্যে যখন কোন একটি শব্দের পুনরাবৃত্তি ঘটে বা পরপর দুইবার ব্যবহারের মাধ্যমে শব্দ তৈরি করে নতুন অর্থের দ্যোতনা সৃষ্টি করে।

(২) যুগ্ম শব্দের শব্দদ্বৈত- বাক্য গঠনের সময় একটি শব্দের সাথে আরেকটি সমার্থক শব্দ বা প্রায় সমার্থক শব্দ বা বিপরীতার্থক শব্দ পাশাপাশি বসে ভাব ব্যক্ত করে তাকে যুগ্ম শব্দদ্বৈত বলে। যুগ্ম শব্দদ্বৈত প্রধানত তিন প্রকার। যথা-

(১) সমার্থক শব্দদ্বৈত (২) প্রায় সমার্থক এবং (৩) শব্দদ্বৈত বিপরীতার্থক শব্দদ্বৈত। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর কিশোর উপন্যাসে প্রচুর শব্দদ্বৈত বা শব্দজটের প্রয়োগ করেছেন। কিশোর উপন্যাসের কাহিনি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে, বিভিন্ন চরিত্রের বুলিতে এবং নিজস্ব বয়ানে শব্দদ্বৈত বা শব্দজোটের প্রয়োগ করেছেন। এই শব্দদ্বৈত গুলো কখনো বহুত্ব, কখনো তীব্রতা, কখনো প্রবাহমানতা, কখনো আসন্ন অর্থে, কখনো শব্দগত পুনরাবৃত্তি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন-

'পাতাল ঘর' উপন্যাসে শব্দদ্বৈত বা শব্দ জোটের ব্যবহার:

দীর্ঘ সময় বোঝাতে-

"থাকতেই তো এসেছেন থাকতে থাকতেই জানতে পারবেন।" (পৃ-১৮০)

"কিন্তু আনন্দটা এখন ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে।" (পৃ-১৮১)

পুনরাবৃত্তি বোঝাতে-

"দেখলুম সব লোক চোখ বুজে হাতড়ে হাতড়ে হাঁটছে।" (পৃ-১৮২)

"সবাই সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে পা ঘষটে ঘষটে হাঁটছে।" (পৃ-১৮২)

"দুবার কোঁক কোঁক শব্দ করে বলে উঠলেন, যে আজ্ঞে।" (পৃ-১৮৯)

বহুত্ব বোঝাতে-

"সেই ছেলেবেলা থেকে সবাই **অপয়া অপয়া** বলে পেছনে লাগত, কেউ মিশতে চাইত না।" (পৃ-১৮৭)

"মাঝে মাঝে রাতচোরা পাখি ডাক, ঝিঁ ঝিঁ র শব্দ, কখনো কুকুরের একটু ঘেউ ঘেউ।" (পৃ-১৯৯)

আসন্ন অর্থে-

"কাজ করছে আন্দাজে আন্দাজে।" (পৃ-২০২)

'পাতাল ঘর' উপন্যাস প্রায় সমার্থক শব্দের ব্যবহার:

শব্দদ্বৈত বা শব্দজোটের পাশাপাশি ঔপন্যাসিকরা তাঁদের আখ্যান নির্মাণে বাক্যের শাব্দিক সৌন্দর্য এবং প্রকাশভঙ্গিতে অভিনবত্ব আনতে প্রায় সমার্থক শব্দ ব্যবহার করেন। প্রায় সমার্থক শব্দ উপন্যাসে ভাষাশৈলীর অবয়বকে দৃঢ় ও সাবলীল করে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর 'পাতাল ঘর' উপন্যাসে প্রায় সমার্থক শব্দের প্রয়োগ করে বাক্য বিন্যাসের ক্ষেত্রে মাধুর্য সৃষ্টি করেছেন।যথা-

"নাকি গলায় কথা-টথাও বলছিল।" (পৃ-১৭৮)

"কুনো বাড়িতে ভুত-টুত কুছু নাই।" (পৃ-১৭৮)

"শুনে-টুনে জিজ্ঞেস করল, কোন বাড়িটা কিনলেন।" (পৃ-১৮০)

"সকালবেলায় হয়তো অম্বুজবাবুর সঙ্গে ভগবান নিয়ে তর্ক বাধিয়ে প্রমাণ করেই ছাড়ল যে ভগবান-টগবান বলে কিছু নেই।" (পৃ-১৮৭)

"আর দেখো বাতি-টাতি কিছু আছে কিনা।" (পৃ-১৯৬)

উপরের বাক্য গুলিতে ব্যবহৃত 'কথা-টথা', 'ভুত-টুত, 'শুনে-টুনে', 'ভগবান-টগবান', 'বাতি-টাতি', প্রভৃতি শব্দ গুলি প্রায় সমার্থক শব্দ।

'পাতাল ঘর' উপন্যাসে স্ল্যাং শব্দের ব্যবহার:

স্ল্যাং শব্দটি মান্য চলিত ভাষা থেকে কিছুটা বিচ্যুত, অনাচারিক (Informal) পরিস্থিতিতে ব্যবহৃত, মানব সমাজে প্রচলিত আটপৌরে (Demotic) জাতীয় শব্দ। প্রখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী এম.এ.কে হ্যালিডে এগুলোকে 'Antilanguage' নামে অভিহিত করেছেন। এই স্ল্যাং শব্দের কোনো একক সংজ্ঞা নেই। স্ল্যাং এমন একটি বাগরীতি যা সবসময় অশালীন বা অশ্লীল নয় আবার তথাকথিত ভদ্ররুচি গ্রাহ্যও নয়। স্ল্যাং শব্দ গুলি শোনা অপ্রচলিত অর্থে প্রচলিত শব্দ, বিদেশি শব্দ, নতুন শব্দ, খন্ডিত বা মুন্ডমাল প্রভৃতি শব্দ দ্বারা গঠিত। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'পাতাল ঘর' উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্রের স্বরূপ উদঘাটন করতে গিয়ে আটপৌরে বা স্ল্যাং শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়-

"দ্বিজপদ শুধু খাপ্পা হয়ে বলল, ওরকম একটা জঘন্য, খুনিয়া, গুন্ডা, তেরিয়া, অভদ্র লোক কিনা তেজস্বী!" (পৃ-১৯১)

'পাতাল ঘর' উপন্যাসে অধিবাচন রীতি:

ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্যতত্ত্বের প্রাঙ্গণে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল অধিবাচন বা সন্দর্ভের ভাষা। এককথায় অধিবাচন হল 'ভাষা প্রয়োগের স্বয়ংসম্পূর্ণ একক'। কোন একটি টেক্সটকে শৈলী বিজ্ঞানীরা বিশ্লেষণ করার সময় গুরুত্ব দেন অধিবাচনের ভাষার উপর। কারণ সাহিত্যের সঙ্গে ভাষার ভাব বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে অধিবাচন। ভাষাগত কার্যসম্পাদনের মূল একক হল অধিবাচন বা ডিসকোর্স। এই অধিবাচন অনুচ্ছেদ কথোপকথন এবং সাক্ষাৎকারের সময় ও ভাষার বৃহত্তর একক হিসেবে কাজ করে। শৈলীবিজ্ঞানের আলোচনায় কোন উপন্যাসের অধিবাচন রীতির প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রেই অনিবার্য হয়ে ওঠে। শৈলীবিজ্ঞানীরা কোন একটা টেক্সটকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রকৃতি অনুসারে রচনার অধিবাচন বা সন্দর্ভকে কয়েকটি কয়েকটি শ্রেণীতে

বিভক্ত করে নেন। আমাদের বর্তমান প্রবন্ধে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'পাতাল ঘর' উপন্যাসে দুই ধরনের অধিবাচন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে-

(১) বর্ননা ধর্মী অধিবাচন (২) সংলাপ ধর্মী অধিবাচন

(১) বর্ণনামূলক অধিবাচন:

বর্ণনামূলক অধিবাচনে লেখক কাহিনি বর্ণনার মাধ্যমে পাঠকের সামনে শব্দময় জগতের ছবি তুলে ধরতে সক্ষম হন। আবার কখনো লেখক আখ্যানের কাহিনি বর্ণনা করার সময় মূল ঘটনা থেকে সরে গিয়ে সামাজিক ও পারিবারিক এবং অন্যান্য প্রেক্ষাপট বর্ণনায় তৎপর হয়ে ওঠেন। আমরা জানি একজন লেখক কথন শৈলীর মাধ্যমে নির্মাণ করেন তাঁর সাহিত্য। এক্ষেত্রে লেখকে 'কথকের ভুমিকায়' অবতীর্ণ হতে হয়। লেখক নিরপেক্ষ থেকে পাঠককে মূল ঘটনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। লেখক স্বয়ং হয়ে ওঠেন 'নামহীন নির্বিশেষ' চরিত্রের প্রতিনিধি। 'পাতাল ঘর' উপন্যাসে নন্দপুর গ্রামের বর্ণনা দিতে গিয়ে দেড়শো বছর পূর্বে নন্দপুরে কি ছিল তার বর্ণনার মাধ্যমে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন-

> "নন্দপুরের পুবপাড়া যেখানে শেষ হয়েছে তার পর থেকে ঘোর জঙ্গল, দিনের বেলাতেও জায়গাটা অন্ধকার। দেড়শো বছর আগে একসময়ে এখানে কুখ্যাত তারা তান্ত্রিকের ডেরা ছিল। জনশ্রুতি আছে এখানে নিয়মিত নরবলি হত। জঙ্গলের একেবারে ভেতরে নিবিড় বাঁশবনের মাঝখানে পুরনো পরিত্যক্ত একখানা কালী মন্দির। মন্দিরের বেশিরভাগই ভেঙে পড়েছে। সাপ-খোপ আর তক্ষকের বাসা। বাদুর আর চামচিকের আড্ডা। বহুকাল এই জায়গায় কোনও মানুষ আসেনি। কালী মন্দিরের লাগোয়া পুকুরটাও সংস্কারের অভাবে হেজেমজে গিয়েছিল। তবে মাঝখানটায় এখনও গভীর জল। "(পৃ-২২৪)

(২) সংলাপ ধর্মী অধিবাচন:

যে অধিবাচন রীতিতে চরিত্রেরা নিজেদের মধ্যে সংলাপ আদান-প্রদান করে তাকে সংলাপ ধর্মী অধিবাচন বলে। সংলাপধর্মী অধিবাচন সম্পূর্ণভাবে গল্প, উপন্যাস বা আখ্যানের চরিত্র নির্ভর। শৈলীবিজ্ঞানী জিওফ্রে লীচ উপন্যাস বা আখ্যান উপস্থাপনের ক্ষেত্রে তিন ধরনের সংলাপ রীতির কথা বলেন। যথা-

এক, প্রত্যক্ষ সংলাপ

দুই, পরোক্ষ সংলাপ

তিন, মুক্ত পরোক্ষ সংলাপ

বাংলা কথাসাহিত্যে বিশেষত গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই তিন ধরণের ধরণের সংলাপ রীতিই লক্ষ করা যায়। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'পাতাল ঘর' উপন্যাসে এক ধরনের সংলাপ রীতির ব্যবহার রয়েছে। সেটা হল পত্যক্ষ সংলাপ রীতি। প্রত্যক্ষ সংলাপ রীতিতে ঔপন্যাসিক চরিত্রের কথা চরিত্রের বুলিতেই বিবৃত করান। লেখক প্রত্যক্ষ সংলাপের ক্ষেত্রে পূর্বে আলোচিত চরিত্র দুটির নাম উল্লেখ না করে পর পর সংলাপ সাজিয়ে যান। প্রসঙ্গ অনুযায়ী পাঠককে বুঝে নিতে হয় কোনটি কোন্ চরিত্রের সংলাপ।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কিশোর উপন্যাসে প্রত্যক্ষ সংলাপ রীতি ব্যবহারের একটা বিশেষত্ব হলো উদ্ধৃতি চিহ্নের ("……") মধ্য দিয়ে সংলাপের ব্যবহার। তাঁর কিশোর উপন্যাসের সংলাপ প্রয়োগের আর একটা বৈশিষ্ট্য হল বর্ণনার তুলনায় সংলাপের দৈর্ঘ্য ছোট এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চরিত্রের বুলিতে মুখের ভাষায় বাক্য প্রয়োগ করেছেন। শৈলীবিজ্ঞানী সি.সি অ্যান্ডারসন কিশোর উপন্যাসে শৈলী নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন,

কিশোর উপন্যাসের বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্ত হবে তার সঙ্গে সংলাপের দৈর্ঘ্য ছোট হবে। 'পাতাল ঘর' উপন্যাসে সনাতন ও সুবুদ্ধির সংলাপে-

> "সনাতন- আমার নাম সনাতন বিশ্বাস! হ্যাঁ, সেরকম যেন মনে হচ্ছে। আজ এত ভুলভাল হচ্ছে কেন কে জানে! অঘোরবাবুর ওষুধটা খেয়ে ইস্তক মাথাটা গেছে দেখছি। আচ্ছা আমি একটা কলসির মধ্যে শুয়ে আছি কেন বল তো!
> সুবুদ্ধি- কলসি! আগে কলসির মধ্যে শোওয়া কঠিন ব্যাপার। এ হল গে তাকে বলে বাক্স। কফিন ও বলতে পারেন।
> সনাতন- হ্যাঁ বাক্সই বটে বাপের জন্মে কখনও বাক্সে শুয়নি বাপ। এ নিশ্চয়ই এই বিটকেলে অঘোরবাবুর কান্ড।
> সুবুদ্ধি- যে আজ্ঞে।
> সনাতন- এখন রাত কত হলো বল তো!
> সুবুদ্ধি- তা শেষ রাত্রিরই হবে মনে হয়।
> সনাতন- বলিস কী? সেই সকালবেলাটায় ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়াল, এর মধ্যেই শেষ রাত্রির। আজব কান্ড।" (পৃ-২০৯)

'পাতাল ঘর' কিশোর উপন্যাসে ভঙ্গি বাচক শব্দের ব্যবহার:

ভঙ্গি হলো একটি বিশেষ রীতি বা প্রণালী। সংজ্ঞাপক কার্য সম্পন্ন করার জন্য একজন ব্যক্তি অপর একজন ব্যক্তির সঙ্গে মুখের ভাষার পাশাপাশি শরীরের ভাষার যে বিশেষ পদ্ধতি বা উপায় অবলম্বন করে তাকে ভঙ্গি বলে। যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি অপর একজন ব্যক্তির মনের ভাব বুঝে নিতে পারে যে , সে কি বলতে চেয়েছে। যেমন- রাগের ভাব করে কথা বলা, হাসি হাসি ভাব করে কথা বলা, চাপা স্বরে কথা বলা, ভার ভার কণ্ঠে কথা বলা, কাঁদো কাঁদো ভাব করে কথা বলা, গম্ভীর গলায় কথা বলা, কাঁচুমাচু মুখ করে কথা বলা, বিরক্ত হয়ে কথা বলা, মৃদুস্বরে কথা বলা, বিষন্নমুখে কথা বলা প্রভৃতি। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'পাতাল ঘর' উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্রের মুখাবয়বে ভঙ্গির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। সেগুলিকে ভঙ্গি বাচক শব্দ বলে আমরা চিহ্নিত করতে পারি। যেমন-

> "নরহরি উদাস হয়ে বললেন, কে জানে কি থাকে!" (পৃ-১৭৭)
> "হরেন গলা চুলকোতে চুলকোতে বলল, পুরনো বললে কিছুই বলা হয়না।" (পৃ-১৮০)
> "সুবুদ্ধি শুকনো মুখে বলল, কোনদিকে তাকানোর কথা বলেছেন।" (পৃ-১৮১)
> "লোকটা ভ্রু কুঁচকে বলল, চোখের রোগ।" (পৃ-১৮৩)
> "সুবুদ্ধি মলিন মুখ করে বলল বড্ড বিপদ যাচ্ছে দাদা।" (পৃ-১৮৪)
> "লোকটা রক্ত-জল-করা চোখে চেয়ে জলদ গম্ভীর স্বরে বলল, বাড়ি যা।" (পৃ-১৯০)

'পাতাল ঘর' উপন্যাসে সমান্তরালতার ব্যবহার:

বাংলা সাহিত্যের শৈলীগত আলোচনায় একটি বিশেষ দিক হলো সমান্তরলতা বা Parallelism। কবি বা লেখক তাঁদের কবিতা ও উপন্যাসের বাক্য গঠনে সমান্তরলতার ব্যবহার করেন। সমান্তরালতা শব্দটির প্রায়োগিক অর্থ হলো সৌষম্য বা সমগঠন। যা কবিতা বা বয়ানের বাক্যটিতে সমন্বয় ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়। যখন কোন কবিতা বা উপন্যাসের বাক্য গঠনে একই শব্দ বা শব্দগুচ্ছ দুইয়ের অধিক বার বা বারবার পুনরাবর্তিত হয়ে কবিতা বা রচনার মধ্যে বৈচিত্র সৃষ্টি করে তাকে সমান্তলতা বা Parallelism বলে। ভাষাবিজ্ঞানী জিওফ্রে লীচের ভাষায়-

> "In any parallelistic pattern there must be an element of identity and contrast."[১২]

অর্থাৎ কোন গদ্য রচনা একটি বাক্য বা অনুচ্ছেদের দুই বা ততোধিক অংশে ব্যাকরণগত ভাবে একই শব্দ বা শব্দগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি কে ডঃ শিশির কুমার দাশ সমান্তরালতা আখ্যা দিয়েছেন। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর পাতাল ঘর উপন্যাসে একই ধরনের বাক্যিক উপাদান প্রয়োগ করে গঠনগত সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন। যেমন-

> "ঘাম ঝরে যাচ্ছে, শরীর দুর্বল লাগছে, তেষ্টা পাচ্ছে, এই অবস্থায় হঠাৎ বেশি পরিশ্রম করলে তার দম একেবারেই ফুরিয়ে যাবে।" (পৃ-২০২)
>
> "পয়সা বাঁচছে, সময় বাঁচছে, ঝামেলা বাঁচছে।" (পৃ-২১৩)

উপরের বাক্যগুলোতে শব্দ গুচ্ছের শেষে 'ছ' ধ্বনির পুনরাবৃত্তি সৌষম্য গঠন করে এবং শ্রুতি মাধুর্য দান করে। যা শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গদ্যশৈলীর বিশেষ পরিচায়ক।

'পাতাল ঘর' উপন্যাসে কোড পরিবর্তন রীতির প্রয়োগ:

সমাজ ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে যখন কোনো একজন ব্যক্তি কোন একটি নির্দিষ্ট উপভাষার বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে তখন তাকে কোড বলে। আবার পরিস্থিতি অনুযায়ী কোন একজন ব্যক্তি তার নিজস্ব ভাষার পরিবর্তে অন্য ভাষায় কথা বলে তখন তাকে কোড পরিবর্তন বা কোড সুইচিং বলে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'পাতাল ঘর' উপন্যাসে কোড পরিবর্তন বিশেষ দিক পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ-

ভুতনাথ নন্দীর বুলিতে-

> "স্ট্রেঞ্জ থিং।" (পৃ-১৯৬)

উপরের বাক্যটি ইংরেজি বাক্য। এখানে ভুতনাথ নন্দীর বুলিতে লেখক বাংলা বাক্য ব্যবহারের পরিবর্তে ইংরেজি বাক্য ব্যবহার করেছেন।

'পাতাল ঘর' উপন্যাসে কোড মিশ্রণ রীতির প্রয়োগ:

পরিস্থিতি অনুযায়ী যখন মানুষের ভাষা ব্যবহারে মধ্যে অন্য ভাষার শব্দ বা বাক্যের আনয়ন ঘটে তখন তাকে কোড মিশ্রন বলে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'পাতাল ঘর' উপন্যাস থেকে কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হল।

> "বোধহয় টায়ার্ড হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন।" (পৃ-১৯৫)
>
> "ট্রেসপাসিং হচ্ছে না।" (পৃ-১৯৫)
>
> "জল পাওয়া গেল ভূতনাথের ওয়াটার বটলে।" (পৃ-১৯৬)
>
> "আজ্ঞে, সে তো ইমপ্রেশন।" (পৃ-২২৯)

উপরের বাক্যগুলি লক্ষ করলে দেখা যাবে লেখক বিভিন্ন চরিত্রের মুখে বাংলা ইংরেজি মিশ্রিত বাক্য প্রয়োগ করেছেন যা লেখকের রচনারীতির বিশেষত্বকে চিহ্নিত করে।

'পাতাল ঘর' উপন্যাসে আন্বয়িক বৈচিত্র

শৈলী আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আন্বয়িক বিচ্যুতি প্রয়োগ ঘটানো। আন্বয়িক বিচ্যুতির (Deviation) কারণে আদর্শ গদ্য থেকে কথ্য ভাষা অনেক সময় আলাদা হয়ে যায়। বাংলা ব্যাকরণে বাক্য গঠনশৈলীর বিচার-বিশ্লেষণে পদ সজ্জার অন্যতম নিয়ম হল- কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া জাতীয় গঠন বৈচিত্র্য। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভাষাশৈলীতে এই জাতীয় পদসজ্জার অনেক ক্ষেত্রে বিকৃতি ঘটেছে। এটি কাব্যশৈলী প্রধান কারণ হিসেবে বলেছিলেন Jan Mukarovsky। একজন ঔপন্যাসিকের রচনায় কর্তা-কর্ম -ক্রিয়া পদের স্থান

পরিবর্তন তাঁর গদ্য শৈলীর পরিচায়ক। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'পাতাল ঘর' উপন্যাসের আন্বয়িক বিচ্যুতির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। 'পাতাল ঘর' উপন্যাসের আন্বয়িক বৈচিত্র নিম্নরূপ-

উপন্যাস থেকে গৃহীত বাক্য	আন্বয়িক গঠন
ক) "তার ঘন্টাখানেক পরেই পুরোটা না হলেও খানিকটা বুঝল সুবুদ্ধি।" পৃ-১৮৩	ক) সুবুদ্ধি তার ঘন্টাখানেক পরেই পুরোটা না হলেও খানিকটা বুঝল। পৃ-১৮৩
খ) "আজকাল দু'পয়সা বেশ রোজগারও হচ্ছে আমার।" (পৃ-১৮৪)	খ) আমার আজকাল দু'পয়সা বেশ রোজগারও হচ্ছে। পৃ-১৮৪
গ) "তার মধ্যেই পড়েছিল হারুয়া।" (পৃ-১৯৬)	গ) হারুয়া তার মধ্যেই পড়েছিল পৃ-১৯৬
ঘ) "দরজাটা কোনদিকে খুলবে তাও বুঝতে পারছিল না সে।" (পৃ-২০২)	ঘ) সে দরজাটা কোনদিক খুলবে তাও বুঝতে পারছিল না। পৃ-২০২

'পাতাল ঘর' উপন্যাসে চিত্রকল্পের ব্যবহার:

বাংলা গদ্য সাহিত্যে চিত্রকল্পের প্রয়োগ স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাশিত। ছড়া, কবিতা, গল্প উপন্যাস এর ক্ষেত্রে চিত্রকল্প একটি অতি পরিচিত বিষয়। ইংরেজি ইমেজ শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে চিত্রকল্প শব্দটি ব্যবহার করা যায়। ইমেজ শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ imago, imitare যা থেকে বাংলা কল্প শব্দটি গৃহীত হয়। এই কল্প শব্দটি কবি বা লেখকের কল্পনাকেই চিহ্নিত করে। কবি বা লেখকের তার কল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য শব্দ ও বাক্যের জাল বুনে বুনে বিভিন্ন চিত্রকল্প অঙ্কন করেন। শব্দ বা বাক্যের অবয়বে নির্মিত কোন চিত্র বা ছবি যখন কোন লেখকের রচনায় ব্যবহৃত হয়ে পাঠকের মনে উদ্বেগ সৃষ্টি করে তখন তাকে সাহিত্যের ভাষায় চিত্রকল্প বলে। সিসিল ডে-লুইস এর ভাষায়-

> "In its simplest term it is a picture made out of words. An epithet or a metaphor simply may create an image; aur and image may be presented to us in a phrase of passage on the face of it purely descriptive. But conveying to our imagination something more than the accurate reflection of an extreme exlity" [১৩]

অর্থাৎ চিত্রকল্প বা ইমেজ হল শব্দ বা বাক্য দিয়ে তৈরি মানুষের মনে জাগরিত হওয়া চিত্র বা ছবি। যে ছবির সাহায্যে একটি রূপক চিত্র অঙ্কন করা যায়। অনেক সময় 'visual imagination' দিয়ে ইমেজ কে আয়ত্ব করা সম্ভব হয়ে উঠে না। তখন লেখক পাঠককে তাঁর কল্পনার অনুভূতি ভাষার মাধ্যমে 'দৃশ্যানুভূতির' মতোই শ্রবণাভূতি ও স্পর্শানুভূতির অনুভব করান। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কিশোর উপন্যাসে চিত্রকল্প গুলির উপাদান বিচারে লক্ষ করলে দেখা যাবে গ্রাম ও শহর উভয় কেন্দ্রিক মানুষের জীবন- যাপনের ছবি, ভৌতিক পরিবেশ, বিভিন্ন কাল্পনিক ঘটনা, প্রকৃতি যেমন- নদী, পুকুর, জঙ্গল মহল, পাতাল, বিভিন্ন ঐতিহাসিক জায়গা, পুরোনো বাড়ি, ভিন গ্রহ, বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার, খেলার মাঠ, প্রভৃতি। তাঁর 'পাতাল ঘর' উপন্যাসে ইমেজ বা চিত্রকল্প ব্যবহারের বহুধা বৈচিত্র্য ছবি লক্ষ করা যায়। যেমন-

> "গোবিন্দ বিশ্বাসের বাজার হয়ে যায় একেবারে সাতসকালে। দিনের আলো ফোটবার আগেই যখন নন্দপুরের মানুষজন ঘুম থেকে ওঠেইনি ভালো করে। তা বাজার করার জন্য গোবিন্দ বিশ্বাসের কোন ঝামেলাই নেই, এমনকি বাজারে অব্দি যেতে হয় না। সামনের বারান্দায়

ঝুড়ি, ধামা গামলা সব সাজানো থাকে পরপর। ব্যাপারীরা বাজারে যাওয়ার পথে আলু, বেগুন, পটল, মুলো যখনকার যা সব ঝুড়িতে দিয়ে যায়।" (পৃ-২১৩)

উপরে দৃষ্টান্তে গোবিন্দ বিশ্বাসের বাজার করতে যাওয়ার প্রসঙ্গে নন্দপুর গ্রামের বাজারে বিভিন্ন চিত্র ছবি আকারে নিখুঁত বর্ণনার মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন।

'পাতাল ঘর' উপন্যাসে উপমার ব্যবহার:

উপমা বিষয়টি মানব সমাজের শিক্ষিত ও নিরক্ষর উভয় শ্রেণীর কাছেই পরিচিত। যখন কোন একটি বাক্যে দুটি ভিন্ন বিষয় বা বস্তুর মধ্যে তুলনা করা হয় তখন তাকে উপমা অলংকার বলে। যেযন- "তাঁর মুখখানা দেখতে চাঁদের মতো সুন্দর" এখানে উপমেয় হল মুখ, উপমার হল চাঁদ, আর সাদৃশ্যবাচক শব্দ হচ্ছে মতো, সাধারণ ধর্ম হল সুন্দর। গল্প-উপন্যাস ও কবিতার মতোই কিশোর উপন্যাসের বিষয়বৈচিত্র্য ও আঙ্গিক বৈচিত্র্যে উপমার ব্যবহার পাঠকের সামনে এক অনুভূতিময় জগতের উত্তরণ ঘটায়। লেখকের বক্তব্যকে স্পষ্ট রূপদান দিতে উপমার বিকল্প নেই। কারণ লেখক যা দীর্ঘ বর্ণনার মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে না পারে তা উপমার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উপমার মধ্য দিয়ে এক বিশেষ প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে যার দ্বারা পাঠকের মনে স্বচ্ছ ধারণা জাগরিত হয়। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সমস্ত কিশোর উপন্যাস জুড়ে উপমার নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে। তাঁর কিশোর উপন্যাসে চিত্রকল্পের পাশাপাশি উপমা অলংকারের প্রয়োগ কৌশলও আলোচ্য বলে বিবেচিত। উপমা অলংকার নির্মাণে উপমেয়-উপমান ব্যবহার তাঁর কিশোর উপন্যাসের বয়ানে বহু বিচিত্র রূপে উঠে এসেছে। যা তাঁর গদ্য শৈলীতে রূপময়তা দান করে। লেখক তাঁর কিশোর উপন্যাসে প্রকৃতি বাচক, বস্তু ধর্মী প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক, ভাব ব্যঞ্জনাধর্মীমুলক উপমার ব্যবহার করে শৈলীর বিশেষত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর 'পাতাল ঘর' উপন্যাসে উপামা প্রয়োগের বিভিন্ন দিক গুলো দেখানো যেতে পারে। যেমন-

বস্তুধর্মী উপমা: অপ্রাণিবাচক

"প্রথমে তার মুখে একটা প্রবল ঘুসি মুগুরের মতো এসে পড়ল।" (পৃ-২০০)

"লোকটার শরীরের শক্তি যন্ত্রের মতো।" (পৃ-২২৬)

ভাব বা ব্যঞ্জনাধর্মী উপমা-

"সুবুদ্ধি অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মতো মাথা নেড়ে বলল, 'তা তো বটেই।" (পৃ-১৭৮)

"সুবুদ্ধি ক্যাবলাকান্তের মতো বলল, হায়ার করে কেন? (পৃ-১৮৫)

"লোকটা সেলাম ঠুকে বলেছিল 'আপনার মতো মস্তান দেখিনি।" (পৃ-২২৭)

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রচলিত ভাষারীতির প্রয়োগ ঘটিয়ে সতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। 'পাতাল ঘর' উপন্যাস পাঠে দেখা গেছে ইতিবাচক বাক্যের ব্যবহার বেশি যা শিশু-কিশোরদের সহজেই প্রভাবিত করে। আঙ্গিক বিচারেও উপন্যাসটি দীর্ঘ নয়, বয়ানের ভাষা সহজ, সরল ও সাবলীল। সেদিক থেকে বলা যায় শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ভাষাশিল্পের সচেতন রূপকার।

টীকা:

আলোচ্য নিবন্ধে উপন্যাস থেকে যতগুলি উদাহরণ নেওয়া হয়েছে সবগুলি 'পাতাল ঘর' কিশোর উপন্যাস থেকে নেওয়া হয়েছে এবং পৃষ্ঠাসংখ্যা দেওয়া হয়েছে। মুখোপাধ্যায় শীর্ষেন্দু। 'কিশোর উপন্যাস সমগ্র'। তৃতীয় খন্ড। আনন্দ পাবলিশার্স। কলকাতা। ২০০৯।

তথ্যসূত্র:

১. মুখোপাধ্যায়, অরুণ কুমার। বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস। ক্লাসিক প্রেস, কলকাতা, ১৯৬৮।
২. সরকার, পবিত্র। গদ্যরীতি পদ্যরীতি। পৃ. ১৪০।
৩. Leech, Geoffrey. A linguistics guide to English Poetry. Longman, London. 1969, p 10.
৪. মজুমদার, লীলা, বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন (সম্পাদিত)। ছোটদের জন্য বই। দুই দশকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ১৯৮১, পৃ. ২৮২।
৫. সেন, সুকুমার। ভাষার ইতিবৃত্ত। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৩৯, পৃ. ২২২।
৬. সেন, সুকুমার। ভাষার ইতিবৃত্ত। আনন্দ পাবলিশার্স। কলকাতা, ১৯৩৯, পৃ. ২৪৫।
৭. দাক্ষী, অলিভা। বাংলা ধ্বন্যাত্মক শব্দ। সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ২।
৮. Bloomfield, L. 'Language' London: George Allen & Unwin Ltd., 1935, P 156.
৯. 'ভাষার ইঙ্গিত'। শব্দতত্ত্ব। 'রবীন্দ্র রচনাবলী দ্বাদশ খন্ড'। বিশ্বভারতী। পশ্চিমবঙ্গ সরকার। আশ্বিন ১৯৪২, পৃ. ৫৪।
১০. Chatterji, Suniti Kumar. The Origin and development of the Bengali language. Calcutta, 1926, P 889.
১১. সেন, সুকুমার। ভাষার ইতিবৃত্ত। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৩৯, পৃ. ৫৩।
১২. Leech, GN. ALinguistic guide to English Poetry. Longman London.1969, P 79.
১৩. Day, Lee's. C. The poetic image'. First Publication 1947, Janathan cope 30 Benford square London, P 18.

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1574-1580
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.378

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'বাঙলার ডাকাত': অন্তরঙ্গ অবলোকন

শাশ্বতী সেনগুপ্ত, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, ঝাড়খণ্ড, ভারত*

Received: 19.03.2026; Accepted: 22.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The evolution of Bengali children's literature reached its peak in the 20th century, with historian Yogendranath Gupta playing a pivotal role. His most celebrated work, 'Banglar Dakat' stands as a unique masterpiece that blends historical research with gripping storytelling. Rather than relying on pure fantasy, Yogendranath drew from his background as a historian to investigate the real-life accounts of notorious bandits across rural Bengal, particularly during the early years of British rule when the Nawabs held only nominal power. The book vividly portrays a period of extreme lawlessness where the lives of ordinary people were made miserable by constant exploitation and violence. Yogendranath categorizes these bandits into two distinct groups- the cruel oppressors and the humanitarian outlaws. The former often included wealthy landlords who led double lives, acting as pillars of society by day and committing brutal robberies by night. In sharp contrast, the latter group functioned much like the Western 'Robin Hood' or Bankim Chandra's 'Bhabani Pathak'. These bandits targeted oppressive zamindars and redistributed stolen wealth among the impoverished, acting as protectors of the needy during times of crisis.

Beyond the historical data, the literary brilliance of the work lies in Yogendranath's ability to create a suspenseful and atmospheric narrative. By employing short, simple sentences and dramatic dialogues, he transformed historical and geographical facts into an engaging experience for the reader. Ultimately, 'Banglar Dakat' is not merely a collection of adventure stories; it is a profound socio-political reflection of Bengal's past that satisfies the reader's curiosity with reliable information rather than mere exaggeration.

Keywords: Children's literature, Bandits, Miserable, Robberies, Adventure

স্রষ্টা তাঁর আপন লীলায় যে জগতের সৃজন করেন তাকে সাহিত্য-শিল্প-ভাস্কর্যে তাঁরই সৃষ্ট মনুষ্য করে তোলে অনন্য। স্থূল প্রয়োজনীয়তায় পড়ে মনোধর্মের প্রলেপ। আর সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার বহুবিধ শাখায় আমরা সেই সব নিদর্শন পাই। সুপ্রাচীন কাল থেকে লোকমুখে প্রচলিত রূপকথা-উপকথার গল্প সময়ের প্রবহমানতার সাথে সাথে শিশু-কিশোর সাহিত্যে পর্যবসিত হয়। রহস্য, রোমাঞ্চ ও ভূতের গল্পের পাশাপাশি চোর, ডাকাত এবং ঠ্যাঙাড়েদের কাহিনিও অচিরেই কিশোর-কিশোরীদের মনের মণিকোঠায় স্থান দখল করে নেয়। মূলত ঊনবিংশ শতকে শিশু-কিশোরদের উপযোগী বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হতে শুরু করলেও বিশ

শতকে তা পত্রে-পুষ্পে-পল্লবে বিকশিত হয়। আর এক্ষেত্রে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের অবদান যে অনস্বীকার্য সেকথা বলাই বাহুল্য।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের অভূতপূর্ব তথা বিপুল সাহিত্যসম্ভারের মধ্যে কণ্ঠহারে রত্নতুল্য একটি পরম আস্বাদনীয় গ্রন্থ হল 'বাঙলার ডাকাত'। এই নামে বাংলা সাহিত্যে একাধিক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এর মধ্যে খগেন্দ্রনাথ মিত্র,ধীরেন্দ্রনাথ ধর এবং পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য প্রমুখের রচনা বিশেষ কৃতিত্বের দাবি রাখে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই একই শিরোনামে 'মহালয়া' উপলক্ষে দূরদর্শন কেন্দ্র কলকাতা কর্তৃক সম্প্রচারিত 'মহিষাসুরমর্দিনী' অনুষ্ঠানের জনপ্রিয় ভাষ্যকার বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র রচিত দু:স্প্রাপ্য একটি গল্পেরও সন্ধান পাওয়া যায়। তবে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের লেখা 'বাঙলার ডাকাত' সর্বাধিক জনপ্রিয় ও পঠিত গ্রন্থ বিশেষ। যদিও এই ধরনের গল্পগ্রন্থ লেখার পরিকল্পনা লেখকের ছিল না বলেই জানা যায়। এ প্রসঙ্গে তিনি উৎসর্গপত্রে লেখেন-

> "কল্যানীয়া শ্রীমতী সুনন্দা দাশগুপ্তা, এম.এ. চিরায়ুষ্মতীষু,
> তুই যখনরে ছোট ছিলি নিতি সাঁজের বেলা,
> আমার একটি কাজ ছিল মা, তোরে গল্প বলা।
> .....
> ডাকাতদের গল্প বলো যাদের হাতে হাতিয়ার,
> হা-রে-রে-রে করে ছোটে কত বন নদীর পার।
> তে-মহলা বাড়ী লোটে, নাইকো তাদের ডর,
> কালিমাখা ঝাঁকড়া চুলেতে দেখায় ভয়ংকর।
> তাই তো আজ এনেছি ধরি 'বাঙলার ডাকাতে'
> আশিসবাণী সাথে দিলাম তোরেই কোমল হাতে।
> -বাবা"[১]

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মূলত একজন ইতিহাসবিদ হওয়ায় তৎকালীন বাংলাদেশের অতীতের নানান তথ্যের অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে যেসব দুর্ধর্ষ ডাকাতির কাহিনির খোঁজ পান তারই উপর ভিত্তি করে 'বাঙলার ডাকাত' গ্রন্থটি রচনা করেন। তবে প্রথমে এই গল্পগুলি মাসিক 'শিশুসাথী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হলেও পরবর্তীতে বিপুল জনপ্রিয়তার কারণে ক্রমান্বয়ে চারটি খন্ডে (প্রথম খন্ড-১৯৫৫ খ্রি:, দ্বিতীয় খন্ড-১৯৫৮ খ্রি:, তৃতীয় খন্ড-১৯৭৫ খ্রি: ও চতুর্থ খন্ড-১৯৭৮ খ্রি:) প্রকাশিত হয়। যা অখন্ড সংস্করণে ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত হয়।

এই গ্রন্থের অধিকাংশ গল্পের প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছে ইংরেজ শাসনের প্রথম যুগে। তখন নবাব ছিলেন নামেমাত্র শাসক। অর্থাৎ তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অব্যবস্থার চিত্র যে গল্পগুলিতে ফুটে উঠেছে একথা বলাই বাহুল্য। সেসময় শুধু বাংলা নয়, চরম অরাজকতা, শোষণ ও বিশৃঙ্খলায় দেশ ভরে যায়। খুন-জখম, চুরি-ডাকাতি ও অন্যায়-অত্যাচারে সাধারণ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এমনকি নরবলির মতো নৃশংস ঘটনাও প্রায়শই সংঘটিত হত, "নরবলি দিয়া মায়ের পূজা করা ডাকাতির প্রথা ছিল।"[২] লেখক এই বিশৃঙ্খল সময়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, "দেশে শাসন নাই, কেহ কাহাকেও দেখে না- দস্যুদল নির্ভীক ভাবে ডাকাতি করে।"[৩] তবে ডাকাত দলে কোন জাতিভেদ ছিল না।

এইসময় ধনী তথা উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষের তুলনায় নিম্নবিত্ত তথা সাধারন মানুষেরা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। একদিকে কোম্পানির অত্যাচার-অনাচার অন্যদিকে দুর্বৃত্ত তথা ডাকাতের ভয়ে তারা দিশেহারা

হয়ে পড়ে। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষগুলোর জীবনে ঘনিয়ে আসে দুর্যোগের ঘনঘটা। চাষ-আবাদ, ব্যবসা-বাণিজ্য বা নিজ বৃত্তি পরিত্যাগ করে অনেকেই একপ্রকার বাধ্য হয়ে দস্যুদলে যোগদান করে।

ডাকাতির মতো ঘটনা সেকালের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হওয়ায় অধিকাংশ মানুষই লাঠি, সড়কি ও বল্লম চালনায় পারদর্শী ছিল। আর এ ব্যাপারে নারীরাও যথেষ্ট দক্ষ ছিল। বিপদকালে পরিবার তথা প্রজাবর্গের রক্ষাকারিণী হয়ে রণরঙ্গিণী মূর্তি ধারণ করে পাপ ও পাপীর বিনাশে তারা পিছপা হতেন না। 'বীরাঙ্গনা অন্নদা দেবী ও ডাকাত দল' গল্পে অন্নদার সাহসিকতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়,

> "অন্নদা দেবী তাহার কেশ এলাইয়া দিলেন- তাঁহার দীর্ঘ ও মেঘের মত কালো কেশ পিঠে এলাইয়া পড়িল। তিনি কপালে পরিলেন বড় করিয়া সিন্দুরের টিপ- সারামুখে ও সর্ব্বাঙ্গে মাখিলেন কালি, কাপড় হাঁটুর উপর পর্যন্ত টানিয়া পরিলেন এবং খড়্গ হাতে লইয়া জিহ্বা বাহির করিয়া কালীমূর্তির মত নিজের ঘরে দাঁড়াইয়া রহিলেন, নিশ্চল ও নিস্পন্দ ভাবে- অনড় অটল। ... তাহারা দেখিল ভীমা ভয়ংকরী কালীমা দাঁড়াইয়া আছেন।"[৪]

তার এই অসম সাহসিকতার স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত হন। ১২৯৪ সনের এই ঘটনাটি তৎকালীন বিভিন্ন সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের 'ডাডুভাই, ডাডুভাই, টুমি ডাকাট', 'মহামায়া ঠাকুরণ ও চাঁদা ডাকাত', 'বীরাঙ্গনা দয়াময়ী', 'ব্রাহ্মণী ও ডাকাত দল', 'সাহসিকা বধূ', 'মেয়ের বুদ্ধি' প্রভৃতি গল্পে নারীর অসম সাহসিকতা ও বীরত্বের কাহিনী বিধৃত হয়েছে।

যদিও ডাকাতদের সকলেই যে অত্যাচারী ছিল এ কথা সর্বৈব সত্য নয়। লক্ষ্যণীয় বিষয়, 'বাঙলার ডাকাত' গ্রন্থে লেখক যেসব ডাকাতের কথা বলেছেন তাদের কার্যকলাপ অনুযায়ী দুটি ভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করে আলোচনাকে অগ্রসর করা যেতে পারে। এর মধ্যে এক শ্রেণির ডাকাত ছিল 'তুলসি বনের বাঘ'। তারা কখনো সৎ, অতিথিবৎসল গৃহস্থ সেজে; কখনো আবার ভন্ড ধার্মিক বা সাধুবেশধারী সদাশয় ব্যক্তি সেজে ডাকাতি করত। এজন্য তারা পরোপকারীর মুখোশ পরে প্রথমে রাস্তা-ঘাটে বিপদগ্রস্ত মানুষদের নিজেদের ডেরায় আশ্রয় দিত এবং রাত্রি গভীর হলে স্বরূপে তথা সদলবলে যাত্রীদের সর্বস্ব লুঠ করত। এজন্য তারা সাধারণ মানুষদের মারধোর থেকে শুরু করে হত্যা পর্যন্ত করতে কুণ্ঠিত হত না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তৎকালীন জমিদারদের অধিকাংশেরই পেশা ছিল দিনে নিজের জমিদারি পরিচালনা করা ও রাত্রিতে দস্যুবৃত্তিতে লিপ্ত হওয়া।

'এ কার আংটি বাবা' গল্পে উত্তরবঙ্গের কুলপি গ্রামের জমিদার রামজীবন সান্যাল ছিলেন এমনই এক কুখ্যাত ডাকাত। নিষ্ঠুর, লোভী রামজীবনের এই অসৎ কর্মের প্রতিবাদ করার সাহস পরিবার বা প্রজাবর্গের মধ্যে কারোরই ছিল না। তিনি দিনের বেলা জমিদারি আর রাতের বেলা ডাকাতি করতেন। এমনই এক নৈশ অভিযানে তিনি আপন জামাতা ক্ষিরোদকুমারের ডিঙা লুঠ করে তাকে হত্যা করে সোনার হার ও আংটি আত্মসাৎ করেন। পরদিন মধ্যাহ্নে কন্যাকে সেই আংটি উপহারস্বরূপ দিতে গেলে নির্মম সত্য উদঘাটিত হয়-

> "কন্যা আংটি দুইটি হাতে লইয়া চমকিয়া উঠিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কাতর কণ্ঠে বলিল- এ কি! এ কি করেছো বাবা? দেখ একবার চেয়ে দেখ- এ কার আংটি বাবা? এ যে তোমার জামাই-এর আংটি।"[৫]

এই দুঃসংবাদে সারা বাড়িতে কান্নার রোল পড়ে যায় এবং গল্পের শেষে রামজীবন উন্মাদ হয়ে যান।

'নদীর বুকে ডাকাতি' গল্পে এরকমই এক ভয়ঙ্কর ডাকাতির কথা জানা যায়। মহাজন জগদীশচন্দ্র দত্ত বরিশালের দক্ষিণের এক গঞ্জের বড়ো ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি নদীপথে ব্যবসার দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে চার-পাঁচটি

নৌকায় অতি সন্তর্পনে যাতায়াত করতেন। ফলে ডাকাতেরা কিছুতেই সুবিধা করে উঠতে পারছিল না। পরে নমঃশূদ্র দলের সর্দার কানাই ওরফে কিনু মন্ডল সঙ্গীদের নিয়ে দত্তবাবুর নৌকা লুঠ করার পরিকল্পনা করে। কুমড়ো ও হাঁড়ি বোঝাই করে বিক্রির ছলে তারা দত্তবাবুর নৌকার মাঝি মদনের সঙ্গে ভাব জমায় এবং অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে তাকেও নিজেদের ষড়যন্ত্রে সামিল করে। এরপর অপরাহ্নকালে জগদীশবাবুর অনিচ্ছা সত্ত্বেও মদন সন্ধ্যার মধ্যেই আড়তে পৌঁছানোর কথা বলে নৌকা খোলে। নৌকা মাঝনদীতে পৌঁছানো মাত্র কুমড়ো ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশধারী ডাকাতেরা দত্তবাবুর নৌকাকে ঘিরে ফেলে এবং ক্ষণিকের মধ্যে জগদীশবাবু সহ সকলকে নির্মমভাবে হত্যা করে নদীর জলে ফেলে দিয়ে টাকা-কড়ি সহ সমস্ত জিনিসপত্র লুঠ করে নেয়। যে ডাকাতদের প্ররোচনায় মদন বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল সে যাতে পরে তাদের পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিতে না পারে তাই ডাকাতেরা তাকেও হত্যা করে নৌকাটি জলে ডুবিয়ে দেয়।

'বৈশাখী ঝড়ের রাতে' গল্পে সেকালের দুর্ধর্ষ ডাকাত কলিমুদ্দি মিঞার কথা জানা যায়। প্রায় একশ বছর আগের ঘটে যাওয়া এক লোমহর্ষক ঘটনার বর্ণনা আছে এই গল্পে। সেসময় বিক্রমপুরের রাজধানী রামপাল ভয়ানক জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। একদিন চিকনিসার গ্রামের বাসিন্দা রাজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক ভদ্রলোক তার কন্যা ও কন্যার এক বছরের শিশুসন্তান কে নিয়ে রামপালের পার্শ্ববর্তী একটি খাল দিয়ে নৌকায় করে গৃহাভিমুখে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ কালবৈশাখী ঝড় শুরু হলে নৌকা চালানো দুষ্কর হয়ে পড়ে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং সঙ্গের টাকা- পয়সা, অলঙ্কারাদি নিয়ে রাজেন্দ্রবাবু মহাফাঁপরে পড়লেন,

> "এমন সময় সন্ধ্যার অল্প পরেই আরম্ভ হইল কালবৈশাখীর প্রবল তাণ্ডব নৃত্য। মাঝি ভয় পাইল। ঝড়ে খালের বুকে ঢেউ উঠিয়াছে। নৌকা আছাড়ি- পাছাড়ি খাইতেছে। শুকুর মোল্লা 'আল্লা, জান-প্রাণ বাঁচাও', বলিয়া চিৎকার করিতেছে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মেয়েকে বলিলেন- মা, দাদুকে বুকে ধরে রাখ। যেন ঝড়- ঝাপটা ওর গায়ে না লাগে.... নারায়ন নারায়ণ! রক্ষা কর।"[৬]

উপায়ন্তর না দেখে তারা বাধ্য হয়ে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজতে শুরু করে। সেই সময় কলিমুদ্দি ঝড়-জল উপেক্ষা করে বাইরে গিয়ে তাদের নিজের বাড়িতে নিয়ে আসে। তার স্ত্রী রহিমাবিবিও রাজেন্দ্রবাবুর কন্যা ও কন্যার শিশু সন্তানটিকে সস্নেহে ঘরের ভিতর নিয়ে যায় এবং শিশুটির জন্য জ্বাল দেওয়া গরম দুধের ব্যবস্থা করে তাকে ব্যাকুলভাবে আদর করতে থাকে। কিন্তু রাত্রি গভীর হলেই কলিমুদ্দির পরোপকারীর মুখোশ খুলে পড়ে,

> "ঐ ঘরের মধ্যে ডাকাত কলিমুদ্দি নিজ মূর্তি ধারণ করিয়া বলিল- সঙ্গে কি আছে সব বাইর কর বামুন! যদি না দেও তবে সকলকে কাইটা বিলের জলে ফালাইয়া দিমু! ...এ- অঞ্চলে কলিমুদ্দি ডাকাতের নাম কেনা জানে? সব দেও, নইলে এখনি নিমু গার্দানা।"[৭]

কিন্তু ইত্যবসরে রহিমাবিবি 'দৃপ্তা সিংহিনী'র মতো বঁটি- দা হাতে কলিমুদ্দি সহ ডাকাত দলকে নিরস্ত করে। রাজেন্দ্রবাবু, তার কন্যা ও কন্যার শিশু পুত্রটির প্রাণ রক্ষা হয় এবং তারা নিজ গন্তব্যে নিরাপদে পৌঁছায়।

এছাড়াও, রহিম, গঙ্গারাম ও নিতাই ডাকাতের চরিত্রে নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতার যে চরম দৃষ্টান্ত পাই তাতে আজও আমরা স্তম্ভিত হয়ে যাই।

অন্যদিকে অপর এক শ্রেণির ডাকাতেরা ছিল মানবতার দীপ্ত আলোকে উদ্ভাসিত। অরাজকতাময় ও তমসাদীর্ণ সেই সময়ে তারা ছিল আশার আলো স্বরূপ। তারা তখন গরিবের পরিত্রাতা রূপে অবতীর্ণ হয়। ইতিহাস সাক্ষী সময়, সমাজ ও পরিস্থিতি অনেক ক্ষেত্রেই মানুষকে বিপথে পরিচালিত করে। সুকোমল প্রবৃত্তিগুলিকে করে বিনষ্ট। তবুও অন্তরের অন্ত:স্থলে বহমান সুগুপ্ত ফল্গুধারার মতো দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রেম, ভালোবাসার রসে সিক্ত হৃদয়ের পরিচয় আমরা ডাকাতদের চরিত্রেও পাই। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানির মতো

সমাজনিন্দিত ঘৃণ্যকর্মে তারা লিপ্ত হলেও শুধুই 'আখের গোছানো'-ই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। দেশভক্তি ও পরোপকারের পরাকাষ্ঠা স্বরূপ বহু ডাকাতের সন্ধান দিয়েছেন লেখক এই গ্রন্থে। পাশ্চাত্যের 'রবিন হুড' বা বঙ্কিমচন্দ্রের 'ভবানী পাঠক'-এর মতোই তারা অত্যাচারী, ধনী, প্রজাপীড়ক জমিদারের ধন-সম্পদ লুঠ করে গরিব-দুঃখীদের মধ্যে অকাতরে বিলি করেছে। দু:খে-কষ্টে তাদের পাশে থেকেছে।

এই গ্রন্থের 'ঠগীর হাতে প্রাণরক্ষা' গল্পে ডাকাতদের বিশ্বস্ততা ও মহানুভবতার পরিচয় পাওয়া যায়। কালী বাগ্দী আদতে একজন ডাকাত হলেও রানী সর্বমঙ্গলা দেবীর কাছে পুলিশের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাঁর সাথে পুরীতীর্থে যাওয়ার ও তাঁকে সর্বতোভাবে রক্ষা করার বিষয়ে সম্মতি জানায়। রাণীমাও তাদের পরিবারের জন্য এক মাসের উপযোগী টাকাকড়ির ব্যবস্থা করলে পরদিনই সকলে পুরীযাত্রা করে। কিন্তু রাত্রি গভীর হলে সুযোগ বুঝে ঠগীরা রাণী সর্বমঙ্গলার তাঁবুর উপর সহসা হামলা চালায়। তীর্থযাত্রীদের তীব্র আর্তনাদে কোলাহল শুরু হয়। কালী মুহূর্তের মধ্যে চার-পাঁচ জন ঠগীকে হত্যা করে এবং যে ঠগী সর্বমঙ্গলা দেবীর গলায় রুমালের ফাঁস লাগাতে গিয়েছিল তার পা-দুটি কেটে ফেলে। এভাবেই ডাকাতদলের তৎপরতায় সকলেই ঠগীর হাত থেকে রক্ষা পায়।

'বিশ্বনাথ ডাকাত' গল্পে আমরা এক মানবিক ডাকাতের সন্ধান পাই। প্রায় একশ বছর আগে গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত রিষড়া গ্রামটি জনবিরল এবং ভয়ংকর জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। এই গ্রামে বিশ্বনাথ ডোম নামে এক দুর্ধর্ষ ডাকাত বাস করত। ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণের সবল এই ডাকাত লাঠি, তরোয়াল চালনায় এবং বর্ষা নিক্ষেপে ছিল অত্যন্ত দক্ষ। তার নামে সকলে সন্ত্রস্ত থাকত,

> "বিশ্বনাথের সুগম্ভীর কর্কশ কণ্ঠস্বর, মদ্যপানের জন্য জবাফুলের মত রক্তচক্ষু, হা-রে-রে-রে চিৎকার ও নিত্য নতুন উপদ্রবের জন্য তাহাকে সাক্ষাৎ যমের ন্যায় ভয় করিত।"[৮]

কিন্তু তা সত্ত্বেও তার একটা মহৎ গুণ ছিল,

> "সে দীন-দরিদ্রদের উপর কখনও কোন অত্যাচার- উৎপীড়ন করিত না, এজন্য দরিদ্রেরা তাহাকে সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিত। অনেক সময় দীন- দরিদ্রদের সে গোপনে সাহায্য করিত।"[৯]

একবার নবদ্বীপের কাছাকাছি একটি গ্রামে 'ওলাউঠা' বা 'কলেরা' রোগের প্রকোপ দেখা যায়। সেই গ্রামের এক বুড়ির একমাত্র নাতির ওলাউঠা হওয়ায় সেই বাড়িতে কান্নার রোল পড়ে যায়। সেই সময় সে গ্রামেরই জমিদার বাড়িতে এক ডাক্তার পালকি করে রোগী দেখতে যাচ্ছিলেন। ডাক্তারের পালকি দেখে বৃদ্ধা তার অসুস্থ নাতির প্রাণ রক্ষার আর্জি জানালে ডাক্তারবাবু তাকে টাকা ছাড়া পরিষেবা দিতে রাজি হয় না। এইসময় বিশ্বনাথ ডাকাত সেখানে উপস্থিত হয়ে নাতিদূর থেকে বৃদ্ধা ও ডাক্তারের কথোপকথন শুনে তার দলের লোকেদের ডাক্তারকে ধরে নিয়ে আসার নির্দেশ দেয়। বিশ্বনাথ, ডাক্তারকে বুড়ির নাতিকে ভালো করে দিলে পঞ্চাশ টাকা নগদ দেওয়ার কথা জানায়। কিন্তু একাজে রাজি না হলে তার গর্দান নেওয়ার কথাও জানায়। অবশেষে ডাক্তারের চেষ্টায় বৃদ্ধার নাতি সুস্থ হয়ে ওঠে। এমনকি বিশ্বনাথ সে গ্রামের ওলাউঠায় মৃতদের সৎকারের ব্যবস্থাও করে। বৃদ্ধা তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালে এবং তার ডাকাত পরিচয় জেনে ভীত হলে সে বলে, "কোন ভয় নেই মা, কখনও বিপদে পড়লে, মনে রাখিস্ তোর এই ডাকাত ছেলেকে।"[১০] তাই আদতে একজন ভয়ংকর ডাকাত হওয়া সত্ত্বেও অনেকেই তাকে ভালোবাসতো।

যোগেন্দ্রনাথের এরকমই আরেকটি বিখ্যাত ছোটগল্প হল 'মনোহর ডাকাত'। প্রায় দুশো বছর আগে মনোহর বাগ্দী ওরফে মনোহর ডাকাত নামে এক দুর্ধর্ষ ডাকাত চন্দননগর, ত্রিবেণী, বাঁশবেড়িয়া সংলগ্ন জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় ডাকাতি করে বেড়াত। একদিন গভীর রাতে বনপথে ডাকাতি করে ফেরার সময় মনোহর ডাকাত ও তার সঙ্গী-সাথীরা এক মৃতপ্রায় স্ত্রীলোক ও শিশুর নিথর দেহ খালের ধারে পড়ে থাকতে

দেখে। মনোহরের নির্দেশে ও ডাকাতদলের তৎপরতায় তাদের মনোহরের বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। ডাকাতদের সেবাযত্নে শিশুটি কোনোক্রমে প্রাণে বাঁচলেও স্ত্রীলোকটি মারা যায়। এমতাবস্থায় অনন্যোপায় হয়ে শিশুটিকে সে নিজের কাছে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। বিধবা পিসিকে শিশুটির দায়িত্ব নিতে বললে উল্টে পিসি তাকে গলা টিপে হত্যা করার পরামর্শ দেয়। তখন রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে মনোহর বলে, "ডাকাত বটি কিন্তু এ হাতে কোনদিন মাইয়া মানুষ আর ছোট ছোট ছাইল্যা মাইয়া মারি নাই।"[১১] মনোহরের এই উক্তির মাধ্যমে তার চারিত্রিক গুণাবলী তথা সুকোমল হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। এরপর মনোহর নিজেই সেই ছেলেটির দায়িত্ব নেয় ও তার নাম দেয় হারাধন। শেষাবধি সে ডাকাতি ছেড়ে কৃষিকাজে মন দেয় এবং হারাধনকে সুশিক্ষিত করার পাশাপাশি তার নিজের মধ্যেও পরিবর্তন আসে। তাই মৃত্যুর আগে ডাকাতি করা ধন-সম্পদ হারাধনকে দিয়ে গরিব মানুষ ও গবাদি পশুর তৃষ্ণা নিবারণের জন্য কয়েকটি পুকুর খননের নির্দেশ দেয়। কালের অমোঘ নিয়মে মনোহরের জীবন প্রদীপ নিভে গেলেও দক্ষিণ কলকাতার বিখ্যাত 'মনোহরপুকুর রোড' আজও তার স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রয়ে গেছে।

গল্পের আবহ তৈরিতে পরিবেশ-পরিস্থিতি যে বিশেষ ভূমিকা পালন করে একথা বলাই বাহুল্য। গল্পগুলির রহস্য রসায়িত পরিবেশ সৃষ্টিতেও লেখক বিশেষ যত্নশীল ছিলেন। সেই সঙ্গে চেনা পরিবেশকে বাস্তব ও তথ্যসমৃদ্ধ ঘটনাবলী সহযোগে লেখক আপন মুন্সিয়ানায় হৃদয়গ্রাহী করে তুলে ধরেছেন। ফলে পাঠক সহজেই সেই পরিবেশে একাত্মবোধ করেন, রহস্যের শিহরণ হৃদয়ে চমক জাগায়,

> "বৈদ্যনাথের আড্ডার চারিদিকে ছিল গভীর জঙ্গল। সাপ-বাঘের ভয়। সেই জঙ্গলের পাশে ছিল একটি ছোট নদী। নাম খড়িয়া। খড়িয়ার পারে সেই ভীষণ অরন্যানীর বুকে ছিল এক মন্দির। মন্দিরে ছিল ভীমা মহিষমর্দিনী দুর্গা মূর্তি বিরাজমানা। ভগ্ন জীর্ণ মন্দির। গাছপালা লতায় এমন করিয়া চারিদিক বেড়ায়াছিল যে, মন্দিরের সংবাদ খুব অল্প লোকেই জানিত। ঐ অঞ্চলে দস্যুভয় ছিল অত্যন্ত প্রবল।"[১২]

ঠিক তেমনই 'গোবিন্দ হালদার ও হরিচরণ মাঝি' গল্পে দেখি,

> "রাত্রিকাল। অগ্রহায়ণ মাসের সাতাশে কি আঠাশে তারিখ। আসন্ন শীতের রাত্রি। নৌকা চলিয়াছে নদীর বুকে। তীরে তীরে ঘন অন্ধকার। আচ্ছন্ন আকাশ। নদীপারের পল্লীগুলি মসীমাখা। আকাশে তারা ফুটিয়াছে। নদীর জল ছলছল কলকল করিয়া ছুটিতেছে। নৌকার ভিতর দিয়া সোঁ সোঁ করিয়া শীতের বাতাস ঢুকিতেছে।"[১৩]

আসলে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সাহিত্য সৃষ্টির পাশাপাশি ঐতিহাসিক হিসেবেও বহু তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ করতেন। তাই গল্পগুলি বাস্তবের পটভূমিতে স্বতঃস্ফূর্ত গতি লাভ করেছে। ডাকাতির মতো লোমহর্ষক সত্য ঘটনাগুলিও তথ্য ও তত্ত্বসমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্যরসে জারিত হয়ে পাঠকের কাছে পরম আস্বাদনীয় হয়ে উঠেছে।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁর 'বাঙলার ডাকাত' গ্রন্থের গল্পগুলির নির্মাণশৈলী বিষয়েও বিশেষ যত্নবান ছিলেন। ছোট ছোট সহজ- সরল বাক্যের ব্যবহারে গল্পগুলি গতি লাভ করেছে। শুধুমাত্র ভাষার যথাযথ প্রয়োগে লেখক অনবদ্য চিত্র অঙ্কন করেছেন। এমনকি প্রকৃতি চিত্রণেও লেখকের দক্ষতা প্রশংসাতীত। দু-একটি কথায় চরিত্রাঙ্কন তথা ডাকাত ও নারীর চরিত্র চিত্রণেও লেখকের সংলাপ কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে ভাষায় নাটকীয়তা সৃষ্টি এবং উপমা ও ব্যঞ্জনার ব্যবহারে বীভৎস রসের উৎসারে গল্পগুলি অন্য মাত্রা পেয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'বাঙলার ডাকাত' গ্রন্থটিতে ইতিহাস, ভূগোল, সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতির এক সামগ্রিক পরিকাঠামো পরিলক্ষিত হয়। লেখক কল্পনার পাখায় ভর করে গল্পগুলিকে

অতিরঞ্জিত করেননি। বরং নির্ভরযোগ্য তথ্য দ্বারা পাঠকের জ্ঞানপিপাসাকেও চরিতার্থ করেছেন। তাই দুর্ধর্ষ তথা নৃশংস ডাকাতের হৃদয়ের অতলে সুকোমল মানবিক গুণাবলীর সন্ধান পেয়ে আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। আসলে কিশোর-কিশোরীদের মনে ছোটবেলা থেকেই ডাকাতের প্রতি যে ভয় মিশ্রিত কৌতূহল দেখা যায় 'বাঙলার ডাকাত' গ্রন্থে তার যথাযথ রূপায়ণ ঘটেছে বলা যায়। তাই গ্রন্থটি আজও আবালবৃদ্ধবনিতার দরবারে সমান জনপ্রিয় ও প্রাসঙ্গিক।

তথ্যসূত্র:

১. গুপ্ত, যোগেন্দ্রনাথ। বাঙলার ডাকাত। শৈব্যা প্রকাশন, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০৪, পৃ. উৎসর্গ।
২. তদেব, পৃ. ৪৩।
৩. তদেব, পৃ. ৪৯।
৪. তদেব, পৃ. ১৪।
৫. তদেব, পৃ. ১৪৯।
৬. তদেব, পৃ. ১৪১।
৭. তদেব, পৃ. ১৪২।
৮. তদেব, পৃ. ২৪।
৯. তদেব, পৃ. ২৪।
১০. তদেব, পৃ. ২৫।
১১. তদেব, পৃ. ৫৬।
১২. তদেব, পৃ. ১৫০।
১৩. তদেব, পৃ. ১৬৮।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১. গঙ্গোপাধ্যায়, আশা। বাংলা শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশ (১৮০০-১৯০০)। ডি.এম. লাইব্রেরী, কলকাতা,প্রথম মুদ্রণ ১৩৬৬
২. মিত্র, খগেন্দ্রনাথ। শতাব্দীর শিশু- সাহিত্য (১৮১৮-১৯১৮)। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৫৮
৩. বসু, বুদ্ধদেব। বাংলা শিশুসাহিত্য। সাহিত্যচর্চা, দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, ৩য় সংস্করণ আগস্ট ১৯৯৯
৪. সেন, নবেন্দু। বাংলা শিশুসাহিত্য: তথ্য, তত্ত্ব, রূপ ও বিশ্লেষণ। পুঁথিপত্র, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ জুন ২০০০
৫. গোস্বামী ভট্টাচার্য, মহুয়া। বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের ইতিহাস ও বিবর্তন (১৯৫০-২০০০)। পত্রলেখা, কলকাতা, ২০১১।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1581-1589
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.378

শোলাশিল্প: একটি ঐতিহ্যবাহী আঙ্গিক

আশিস হালদার, *গবেষক, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

সুজয়কুমার মণ্ডল, *প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 22.03.2026; Accepted: 26.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Shola-pith craft is an important form of folk Craft. Shola pith is a type of aquatic plant. In India, two varieties of shola are found: (1) *Kath Shola* and (2) *Bhat Shola* or Phul Shola. Most shola-based folkcrafts are made from *Bhat Shola* or *Phul Shola*. Shola art is widely practiced across West Bengal, especially in districts such as Birbhum, Bardhaman, Murshidabad, Kolkata, Nadia, and Bishnupur. The major forms of this folk Craft include *topor* (traditional wedding headgear), sithimor, palanquin decorations, *chandmala*, *kadam* flowers, *dolongi,* flower vases, Durga idols, Bishahari figures, idol decorations, and various other sculptures. Common motifs used in shola craft include peacock, kalka (paisley), leaves, rolls, betel shapes, beads, pea-like forms, half chakki, and full chakki patterns. The tools used in this craft include kat or kait (cutting tools), pencil, *sarna, chairi*, *rolling* pin, pais, scale, and scissors. In the process of making shola crafts, the brown outer layer of the shoal-pith is first removed using a cutting tool. Then, designs are drawn on the soft white inner part to create various artistic items. The Malakar Community has traditionally been the main tradition bearer of this craft. However, people from other communities are now also involved. Both men and women participate in this work. Shola-pith craft products are marketed in different ways—through home-based sales, fairs and exhibitions, middlemen, and various government and non-government organizations. This craft has been practiced for generations across different parts of West Bengal. Field studies show that artisans generally follow similar methods of production. However, some changes and modern influences are now visible in the materials used. New types of cutting tools, zigzag scissors, decorative paper, zari, sequins, poplin cloth, and tracing paper are increasingly being used. Despite its richness, the craft faces several challenges, such as shortage of raw materials, financial constraints, low rainfall, lack of skilled artisans, disinterest among the younger generation, high cost of raw materials, and insufficient government support. If these challenges can be addressed, shola craft can regain its former glory. Therefore, it is essential for us to take active steps to preserve and promote this traditional folk Craft.

Keywords: Shola-pith Craft, Motif, Tools, Artisan Community, Development, Challenges

সমাজ জীবনের জীবন্ত দলিল সংস্কৃতি। সভ্যতার উষালগ্ন থেকে শ্রমজীবি মানুষ তাঁদের শ্রমের মাধ্যমে সভ্যতার গতিধারাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। সংস্কৃতি বলতে বোঝায় সাধারণ মানুষের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, বিশ্বাস-সংস্কার, পোষাক-পরিচ্ছদ, ধর্ম প্রভৃতি। লোকশিল্পের একটি বিশিষ্ঠ ধারা শোলাশিল্প। শোলাশিল্পে লোকায়ত সমাজের সমষ্টিগত আবেগ-অনুভূতি, প্রয়োজন-প্রতীতি, বিশ্বাস-সংস্কার, ব্যবহারিক প্রয়োজন ইত্যাদি শিল্পরূপে বিভিন্ন মাধ্যম ও আঙ্গিকের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।

শোলা একপ্রকার জলজ উদ্ভিদ-যার বৈজ্ঞানিকি নাম Aeschynomene Aspera. ভারতবর্ষে দু'প্রকারের শোলার প্রজাতি দেখা যায়।

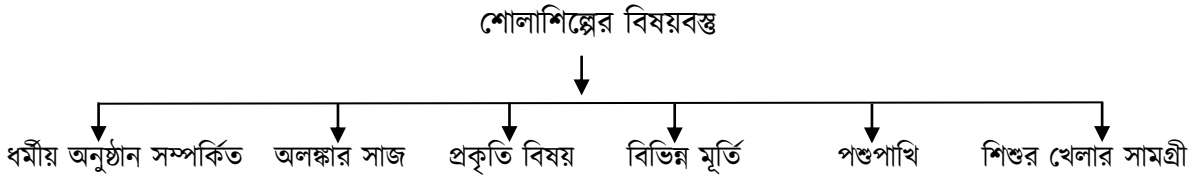
১. Kath Sola (কাঠ শোলা)

২. Bhat Sola (ভাতশোলা বা ফুল শোলা)

শোলার যাবতীয় শিল্প আঙ্গিকগুলি ভাতশোলা বা ফুলশোলার দ্বারা তৈরি করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের একটি ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্পকলার আঙ্গিক শোলাশিল্প। যার খ্যাতি আজ বিশ্বব্যাপী। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র শোলাশিল্প লক্ষ্য করা যায়। যেমন- বীরভূমের সুরুল, বর্ধমানের বনকাপাসি, কাটোয়া, জামুরিয়া, মুর্শিদাবাদের খাগড়া, ইন্দ্রপ্রস্থ, কলকাতার কুমোরটুলি, মানিকতলা, চব্বিশ পরগনার মহেশপুর, বারুইপুর, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর, পোকাবাঁধ, সোনামুখি, নদীয়ার কৃষ্ণনগর, বাদকুল্লা, তেহট্ট প্রভৃতি স্থানে ঐতিহ্যগতভাবে বংশ পরম্পরায় মালাকার সম্প্রদায়ের মানুষেরা শোলার শিল্পকর্ম সম্পাদন করে থাকেন।

শোলাশিল্পের শিল্প আঙ্গিকগুলি হল- টোপর, সিঁথিমোড় পালকি, মালা, কদমফুল, দোলঙ্গি, ফুলদানি, দুর্গামূর্তি, ময়ূরপঙ্খী নৌকা, ডাকের সাজ, বিষহরি, পটাশি, চাঁদমালা, গাছ, লতাপাতা, উড়োজাহাজ, কলসী কাঁখে নারী, হরিন, বাঘ, প্রজাপতি, রাজকীয় হাতি, রাজা-রানী, তাজমহল, মন্দির, প্রতিমার চালচিত্রের দ্রব্যাদি, ঠাকুর-দেবতার মূর্তি প্রভৃতি।

শোলাশিল্পের বিষয়গুলিকে একটি ছকের সাহায্যে দেখানো হল:



ঐতিহ্যগতভাবে শিল্পীরা শোলাশিল্প সামগ্রীর আঙ্গিকে বিভিন্ন মোটিফ ফুটিয়ে তোলেন। এই মোটিফগুলি হল- ময়ূর, কলকা, পাতা, রোল, পান, জ্যামিতিক নক্সা করলাচাকী, দাঁতবীট, সুসুনি পদ্ম, মটর দানা, হাফচাকী, ফুলচাকী, সুতেন প্রভৃতি। এই শিল্প সামগ্রীর যন্ত্রপাতিগুলি হল- কাত বা কাইত, পেনসিল, পাটা, সর্না, চেয়াড়ি, কম্পাস, বেলনা, করাত, হাতুড়ি, পাইপ, ছেকনি, সুচঁ, স্কেল, তুম্না, বসমা পেশাই মেশিন বা তই ভাজা কল, জিকজাক, কাইচি বা ইন্টারলক কাইচি, বাটালি, ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি।

শিল্প সামগ্রী তৈরির ক্ষেত্রে প্রথমে বাজার থেকে শোলার বান্ডিল সংগ্রহ করা হয় চড়া দামে। সেই বান্ডিল থেকে মোটা শোলাগুলি বেছে আলাদা করা হয়। উন্নত কাজের জন্য ভালো পরিস্কার ও মোটা শোলা ব্যবহার করা হয়। এই মোটা শোলায় নক্সা ভালো হয়। শোলার বিভিন্ন সামগ্রী নির্মান পদ্ধতি ভিন্ন ধরনের। তবে যে কোন সামগ্রী নির্মানের ক্ষেত্রে প্রথমে শোলার বাদামি অংশ বা ছাল কাত দিয়ে তোলা হয়। তারপর শোলা থেকে কাত-এর সাহায্যে চাদরের মত পাতলা করে 'কাপ' তোলা হয়। 'কাপ' তোলার পর সামগ্রী অনুযায়ী বিভিন্ন নক্সা কাটা হয়। এবারে একটা বেস বা ভিত তৈরি করা হয়। তার উপর ছোট ছোট বিভিন্ন

কাত নক্সা আঠা দিয়ে আটকানো হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ক্ষেত্রসমীক্ষা করে দেখেছি শিল্পীদের কর্মপদ্ধতি প্রায় এক। এখানে ময়ূরপঙ্খী নৌকা নির্মান পদ্ধতি তুলে ধরা হল। প্রথমে মাপ, অনুযায়ী আট পেপারের উপর পেন্সিল দিয়ে নক্সা এঁকে নেওয়া হয়।

এবার খারাপ শোলা দিয়ে নৌকার মত বেঁকিয়ে ৫-৬ টি সরু ছাল ছাড়ানো শোলা আঠা দিয়ে শক্ত করে 'বেস' তৈরি করা হয়। 'বেস' এর তলার দিকটা গোল করা হয় এবং উপরের দিকটা চারকোনা রাখা হয় যাতে সেখানে ছোট ছোট মানুষ দাঁড় হাতে বসে আছে এমন নক্সা আটকানো যায়। সরু ছুরি দিয়ে তৈরি করা 'বেস'টি মসৃণ করা হয়। যার ফলে তোলা 'কাপ' বডিতে সহজেই আঠা দিয়ে লাগানো হয়। একটি মোটা শোলা কাত দিয়ে কেটে ময়ূর মুখ তৈরি করা হয়। এই মুখটিকে তার দিয়ে মূল বডির সঙ্গে আটকানো হয়। এবার ময়ূরের বডিতে কাপ পরানো শেষ হলে গায়ের মসৃন অংশে বিভিন্ন কাট নক্সা হাফ চাকি, ফুল চাকি, মটর দানা, পাতা, ফুল, খেজুর পাতা প্রভৃতি নক্সা সেটিং করা হয়। ময়ূরের উপরের দিকে দাঁড় বাহী মানুষ, পাল, ঘর, পতাকা যেগুলি সূক্ষভাবে তৈরি করা হয়েছিল, সেগুলি সেটিং করা হয়। এবারে ময়ূরের তলাটাকে একটি শক্ত প্যাডের উপর আঠা দিয়ে বসানো হয়। বিভিন কালারের ভেলভেট পেপার দিয়ে প্যাডটি মোড়া থাকে। নৌকার মাপ অনুযায়ী কাঁচের বাক্স নির্মান করা হয়। সেই বাক্সে নৌকাটি সেট করা হয়। এইভাবে একটি নৌকা নির্মান প্রনালী সমাপ্ত হয়।

শোলাশিল্পের ধারক ও বাহক মালাকার সম্প্রদায়। বংশ পরমম্পরায় ঐতিহ্যগতভাবে মালাকাররা শোলার নানা ধরনের শিল্প সামগ্রী সৃজন করে চলেছেন। মধ্যযুগের ময়ূর ভট্টের 'ধর্মপূরান' কাব্যে বিবিধ জাতির মধ্যে মালাকার সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে-

"সদ্গোপ কৈবর্ত আর গোয়ালা তাম্বুলি।
উগ্রক্ষেত্রী কুম্ভকার একাদশ তিলি।।
যোগী ও আশ্বিন তাঁতী মালী মালাকার
নাপিত রজক দুলে আর শঙ্খধর"[১]

বিবর্তনের ধারায় এই শিল্পকর্মে মালাকার সম্প্রদায় প্রায় অনেকাংশে কমে গেছে। বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি পরিবার এই শিল্পকর্ম করে থাকেন। তবে বর্তমানে জীবন ও জীবিকার তাগিদে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষ যেমন-সরকার, বাগ, দাস। পাল, রায়, চৌধুরী প্রভৃতি শোলার কাজ করে থাকেন।

মালাকার সম্প্রদায়ের মানুষেরা নানা অভাব-অনটন সত্ত্বেও বাঁচার তাগিদে ঐতিহ্যগত ভাবে বংশপরম্পরায় শিল্প সৃষ্টি করে চলেছেন। বিভিন্ন স্থান ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে জানা গিয়েছে শিল্পীরা না খেতে পেলেও শোলার কাজ ছাড়তে পারবে না। কারণ তাঁদের এই পেশা নেশাতে পরিনত হয়েছে। মালাকার সম্প্রদায়ের মানুষেরা শোলাশিল্পের ঐতিহ্যকে কঠোর শ্রম, নিষ্ঠা ও বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে গতিশীল রেখেছে। বাংলার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এধরেন লোকশিল্পের আঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। শোলাশিল্পীরা মূলত সমাজের সুখ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে দিয়ে দিন যাপন করে চলেছেন এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা। একটি গ্রামের বসবাসকারী মানুষের চাহিদা, সেই গ্রামের বিভিন্ন পেশার মানুষের সেই চাহিদা মেটাতো। এই শ্রেণির মানুষেরা নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেনির। বর্তমানে কয়েক হাজার মানুষ শোলাশিল্পের আশ্রয়ে বেঁচে আছে। বেশিরভাগ মানুষই মুখ্য পেশা হিসাবে শোলাকে বেঁছে নিয়েছে। বর্তমানে জীবন ও জীবিকার চাহিদার জন্য অন্যান্য পেশার সঙ্গে তার যুক্ত হচ্ছেন। কারণ এই পেশার কাজ করে সারাবছর সংস্কার চালানো অসম্ভব হয়ে যায়। কিছু মানুষের জমিজমা থাকলেও ভূমিহীন শোলাশিল্পীর সংখ্যা বেশি। বর্তমান প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা এই শিল্পকর্মের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইছে না। কারণ এই শিল্পের

ভবিষ্যৎ সংকটের মুখে। বেশিরভাগ মানুষ জীবিকার জন্য ভিন্ন রাজ্যে চলে যাচ্ছে। কারণ যে পরিমান অর্থ এই শিল্পকাজ থেকে উপার্জন হয় তা দিয়ে সংসার পরিচর্চা করা খুবই কঠিন। কয়েকজন ছাড়া অধিকাংশ শিল্পী পরিবার দারিদ্রের মধ্যে জীবন-যাপন করছে। বর্তমানে শোলাশিল্পের চাহিদা বেড়েছে কিন্তু শিল্পীদের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটেছে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্র আমি ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে দেখেছি এই শিল্পের সঙ্গে শিশু শ্রম তেমনভাবে যুক্ত নয়। শিল্পীর ছেলে মেয়েরা তাঁদের পড়াশোনার পাশাপাশি পরিবারের বৃত্তি হিসাবে এই কাজ সাহায্য করে। শিশুরা ভালো শোলা বাছায়, রং করা উপাদান-উপ-করণ হাতের কাছে এগিয়ে দেওয়ার ফলে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। তবে যখন কাজের বেশি চাপ থাকে তখন শিশুরা কাজে সাহায্য করে। বীরভূমের সুরুল-এ কেবল মাত্র একটি শিশুকে শিল্প শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে দেখা গিয়েছে। তার আর্থিক দুরবস্থার জন্য সে এই কাজের সাথে যুক্ত হয়ে সংসার চালাচ্ছে। তার পিতা মারা গেছেন এবং মা অসুস্থ বলে জানতে পেরেছি। ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে জানা গিয়েছে মালাকার সম্প্রদায়ের পরিবারের গড় আয় ৬০০০ থেকে ৭০০০ হাজার টাকা মাত্র। যা দিয়ে সংসার চালানো কঠিন।

শোলা শিল্পে যৌথশিল্প হিসাবে পরিগণিত হয়। পুরুষ এর পাশাপাশি মহিলারা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকেন। মহিলারা শোলা বাছাই, রং করা, কদম ফুল তৈরি, দোলঙ্গি তৈরি, প্যাকিং প্রভৃতি কাজ করে থাকেন। মহিলারা শিল্পীর পাশাপাশি পরিবারের সহায়ক হিসাবে কাজ করে থাকে।

লোকশিল্পের উৎপাদন ও তার বিপণন ব্যাহত হচ্ছে কাঁচামালের অপ্রতুলতা ও অত্যাধিক মুল্য বৃদ্ধির জন্য। বর্তমানে শোলাশিল্পে কাঁচামালের দাম প্রায় দ্বিগুণ, তাও ভালো মানের কাঁচামাল পাওয়া যায় না। বহরমপুরের অঞ্চলের শোলাশিল্পী সুভাষ চন্দ্র সরকারের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুয়ায়ী ৬-৭ টি, শোলার পূর্বে দাম ছিল ১০-১৫ টাকা। বর্তমানে দাম ২০০-৩০০ টাকা। তাও উন্নতমানের নয়। সেই তুলনার সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পায়নি। এক বাণ্ডিল শোলার মধ্যে ১০-১৫ টি ভালো থাকে। বর্ধমান জেলার বনকাপাসি অঞ্চলের শোলাশিল্পী নরহরি ঘোষের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী ৩হাত দড়ির শোলার বর্তমান দাম ১৪০০-২০০০ হাজার টাকা, যা পূর্বে দাম ছিল ২০০-৩০০ টাকা। শিল্পীরা আগে ময়দার সঙ্গে তুঁতে মিশিয়ে জ্বাল দিয়ে আঠা তৈরি করত। বর্তমানে কাজের সুবিধার জন্য এখন ফেভিকল জাতীয় আঠা ব্যবহার করেন। যার দাম ১ কেজি ২০০ টাকা। এছাড়াও অন্যান্য উপাদানের দাম বেড়ে গিয়েছে। যেমন-জরি, চুমকি প্রভৃতি।
নিম্নে ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে শোলাশিল্পের বিভিন্ন সামগ্রীর বিক্রয় মূল্য উল্লেখ্য করা হল:

ক্রমিক নং	শোলার উৎপাদিত সামগ্রীর নাম	বিক্রয় মূল্য
১	ভালো টোপর (১ পিস)	১০০-১৫০০ টাকা
২	কমা প্রতিমার সাজ (১ সেট)	৫০০-৬০০ টাকা
৩	উন্নত মানের সাজ (১ সেট)	১০০০০-২৫০০০ টাকা
৪	পাল তোলার নৌকা (১ পিস)	২০০০ টাকা
৫	পালকি (১ পিস)	২০০০ টাকা
৬	অন্নপ্রাশনের টোপর (১ পিস)	১০০-২০০ টাকা
৭	১৮ ইঞ্চি ময়ূরপঙ্খি নৌকা (১ পিস)	৩০০০ টাকা
৮	কদমফুল (১ পিস)	১০ টাকা
৯	১থেকে ৪ ফুট প্রতিমা (১পিস)	১৫০০ – ৫০০০০ টাকা

১০	দোলঙ্গি (১ পিস)	১০ টাকা
১১	প্রজাপতি (১২ পিস)	২৮০-৩০০ টাকা
১২	পাখি (১২পিস)	২০০-৪০০ টাকা
১৩	বিষহরি (১২ পিস)	২০০-৪০০ টাকা
১৪	কুলোতে দুর্গার মুখ (১ পিস)	৫০০-২০০০ টাকা
১৫	পালকি (৪ জন বাহক সহ)	১৫০০-৩০০০ টাকা

শোলার উৎপাদিত সামগ্রী বিভিন্নভাবে বিপণন হয়ে থাকে।

ক. শোলাশিল্পীরা নিজেরা সরাসরি বাড়ি থেকে সামগ্রী বিক্রি করে থাকে।

খ. দশকর্মা দোকানের মাধ্যমে শিল্প সামগ্রী বিক্রি হয়ে থাকে।

গ. আরেকটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হলো পাইকারি ব্যবসায়ী, এদের মাধ্যমে বেশি পরিমাণে শিল্প-সামগ্রী বড় বড় দোকানে বিক্রি করা হয়।

ঘ. শিল্পীদের তৈরি সমবায় সমিতির মাধ্যমে শিল্প সামগ্রী বিপণন হয়ে থাকে।

ঙ. পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'মঞ্জূষা' ভারত সরকারের অধীনস্থ জাতীয় হস্তশিল্প কেন্দ্র প্রভৃতি সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শোলার শিল্প সামগ্রী দেশ-বিদেশে পাড়ি দিয়ে থাকে।

চ. মেলা উৎসব ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে শিল্পসামগ্রী বিপণন হয়ে থাকে। সরকারি ও বেসরকারি হস্তশিল্প, লোকশিল্প মেলার মাধ্যমে শিল্প সামগ্রীগুলি বিক্রি হয়ে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে ঐতিহ্যগতভাবে বংশ পরম্পরা শোলাশিল্পীরা শোলার বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য সৃজন করে চলেছেন। ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে জানা গিয়েছে শিল্পীরা ও তার শিক্ষা গুরু একই পদ্ধতি মেনে শোলার সামগ্রী নির্মাণ করে চলেছেন। ঐতিহ্যগত ভাবে টোপর, চাঁদমালা, কদমফুল, দোলুঙ্গি, সিঁথিমোড়, প্রভৃতি সামগ্রী তৈরি করা হয়। তবে বর্তমানে মানুষের চাহিদা প্রেক্ষিতে শিল্পবস্তুকে সৌন্দর্য্য বিকাশের জন্য কিছু নতুন সংযোজন ঘটেছে। যেমন বসমা কাগজ, বুলেন, বিভিন্ন ধরনের চুমকি, ট্রেসিং পেপার প্রভৃতি। পূর্বে মানুষের ধর্মীয় সংস্কৃতি, আচার, রীতি-নীতি প্রভৃতিতে শোলার সামগ্রী ব্যবহার করা হতো। বর্তমানে মানুষের সৌন্দর্য্যবোধের দিকটি তুলে ধরা হয়।

শোলাশিল্পের উপকরণের ক্ষেত্রেও বিবর্তন দেখা দিয়েছে। প্রধান উপকরণ বলতে 'কাত' এর ব্যবহার এখনো আছে। কিন্তু তার অবয়ব পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন মাপের সরু-মোটা, ছোট-বড় শিল্পীর কাজের সুবিধা অনুযায়ী শিল্পীরা তৈরি করে থাকেন। সুক্ষ নকশা করার জন্য সরু ছুরি, কম্পাস, ছেনি, কাটা, ডিজাইন কাইচি যাকে অনেক স্থানে জিগ যাগ কাইচি বলে। এই কাইচি বসমা কাগজ খাজ ভাবে কাটার কাজে ব্যবহার করা হয়। বিবর্তনের ধারায় আর একটি উপকরণ হলো তৈপেসা মেশিন। এই দুটি উপকরণ কেবলমাত্র বর্ধমানের বনকাপাসির শিল্পীরা ব্যবহার করে থাকে। প্যান্ডেল সজ্জার মূর্তি নির্মাণের ক্ষেত্রে প্লাস্টার অফ প্যারিস ব্যবহার করা হয়। শোলা থেকে খোসা আলাদা করার জন্য লম্বা পাইপ ব্যবহার করা হয়।

আগে কাগজের ওপর নকশা অঙ্কন করে শোলা সেট করে প্রতিমা নির্মাণ করা হত। কিন্তু বর্তমানে কালারিং পপলিন কাপড় ট্রেসিং পেপারের ওপর নকশা এঁকে শোলা সেট করছেন। নকশার ফাঁকা অংশে কালারিং মার্বেল পেপার আটকে দিচ্ছেন। ফলে নকশার ফাঁকে কালারিং অংশ ফুটে উঠেছে। সেগুলি আলোতে চকচক করে মানুষের দৃষ্টিনন্দন ঘটায়।

শোলাশিল্পের মোটিফের ব্যবহার কিছু বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। জীবজগৎ, পশু, পাখি, সৌরজগৎ, জ্যামিতিক বিভিন্ন নকশার ক্ষেত্রেও বিবর্তন ঘটেছে। শোলাশিল্পে নকশার ক্ষেত্রেও বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পূর্বে ফুল, চাকি, বিট, মটরদানা, ময়ূর ইত্যাদি নকশা ব্যবহার করা হতো। বর্তমানে ক্ষেত্রসমীক্ষা করে দেখা গেছে ময়ূরের নকশা সবচেয়ে বেশি এই শোলার কাজে ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও প্রজাপতি, ফুল, চুমকি, পদ্ম, সিঁদুরের কৌটা, গুটি ফুল, বেলী, চমা, বর্ডার, দাঁত, চরণ, ড্যারা, চাকি, তিসরা বর্ডার, শোলার কাপ, কলকা, বরফি, চাঁদ, গোল, পাঁচফুল, তিন ফুল, সাতফুল, বেকি, মটরদানা, যবশিস, কলম, ডালিয়া, ট্যাবলেট ইত্যাদি নকশা চলে এসেছে। শোলাশিল্পের বিবর্তনের ধারাকে কয়েকটি বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষ্য করা যায়। বিষয়গুলি হলো:

ক. স্থানগত বিবর্তন
খ. শিল্পী ও তাদের সমাজ জীবনগত বিবর্তন
গ. কৃৎকৌশল ও উপকরণগত বিবর্তন
ঘ. শিল্প দ্রব্য ব্যবসা-বাণিজ্যগত বিবর্তন
ঙ. ব্যবহারকারীদের সামাজিক তাৎপর্যগত বিবর্তন

কালের ধারায় এই শিল্পের বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। শোলার চেয়ে হালকা সস্তা বিভিন্ন বিকল্প বস্তু বাজারে চলে আসার ফলে শোলাশিল্পের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। শোলা এক প্রকার জলজ উদ্ভিদ, যা বিভিন্ন খাল, বিল, পুকুর, ডোবা প্রভৃতি স্থানে আপনা আপনি জন্মায়। পূর্বের শিল্পীরা এই সমস্ত স্থান থেকে নিজেরা শোলা কেটে এনে শিল্পসামগ্রী তৈরি করত। কিন্তু বর্তমানে এই সমস্ত খাল, বিল, ডোবা মানুষ নিজের প্রয়োজনে ভরাট করে বসবাসের উপযোগী করেছে। ফলে শোলার বাসস্থান নষ্ট হয়ে গেছে। শোলার বিকল্প হিসাবে বর্তমানে কেমিক্যালজাত থার্মোকলের প্রভাব দেখা দিচ্ছে। থার্মোকল শোলার চেয়ে শক্ত। তা দিয়ে খুব সহজে কম সময়ে প্রচুর শিল্পদ্রব্য তৈরি হচ্ছে।

ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে শোলাশিল্প ও শিল্পীদের সমস্যা গুলিকে তুলে ধরা হলো:

১. কাঁচামালের অভাব, যা এই শিল্পের মূল অন্তরায়।
২. শোলাশিল্পের অপর একটি মূল সমস্যা হল পুঁজির অভাব। শিল্পীরা অর্থের অভাবে সিজিনের সময় বেশি করে শোলা কিনে রাখতে পারে না।
৩. পূর্বের তুলনায় বৃষ্টিপাত কম হওয়ার ফলে শোলা গাছ জন্মানোর পক্ষে চরম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।
৪. মহজনদের কাছে বেশি সময় ধরে টাকা গচ্ছিত থাকে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংস্থা 'মঞ্জুষা'-এখানে শিল্পীদের শিল্পী সামগ্রী দিয়ে আসতে হয় এবং বিক্রির পর শিল্পীরা সেখান থেকে টাকা পান।
৫. শোলাশিল্পের সংকটের জন্য বর্তমান প্রজন্ম এই শিল্প কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইছে না।
৬. শোলাশিল্পের কারিগরের সমস্যা। শিল্পীরা বাইরে কাজ করে বেশি অর্থ উপার্জন করছে।
৭. শোলশিল্পের উপাদান শোলা তথা জরি, চুমকি, অভ্র, রং প্রভৃতির অত্যাধিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে বাসন্তী, গোলাপী, বেগুনি, প্রভৃতি রং ৩৫০ থেকে ৪০০ টাকা কেজি। অভ্রের দাম আগে ১৫০ টাকা কেজি ছিল কিন্তু বর্তমানে তা ৮০০ টাকা কেজি।
৮. শোলার সামগ্রী বেশি দিন ঘরে ফেলে রাখার সমস্যা, ফলে কালার নষ্ট হয়ে যায়।
৯. বিভিন্ন প্রদর্শনী, মেলা প্রভৃতি স্থানের শিল্পীকে নিজের খরচে যেতে হয়, শিল্পীর সঠিক গুণমান বিচার করা হয় না, বিদেশে পাঠানোর জন্য প্যাকিং করা খুব কঠিন, শিল্পীদের কাছ থেকে সরাসরি সামগ্রি বিক্রি

না হওয়া, বিদেশ থেকে আগত ক্রেতারা কলকাতা বাজার মুখী হয়ে থাকে, মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ গ্রহণ ইত্যাদি এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতার কারণে শোলাশিল্প চরম সংকটের মুখে আছে।

পশ্চিমবঙ্গের শোলাশিল্পের সংকটের দিকটি আলোচনার পর এই শিল্পের সম্ভাবনার বিষয়ে আলোকপাত করব। পশ্চিমবঙ্গে র শোলাশিল্পের পুনরুজ্জীবন, ভবিষ্যত রক্ষা এবং শোলাশিল্পীদের সার্বিক উন্নয়নে ও ভবিষ্যত সুরক্ষার জন্য যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন তা শিল্পীদের চাহিদা ও বর্তমান গবেষকের এই গবেষণা কাজের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাবাকারে তুলে ধরা হল:

১. শোলাশিল্পীদের নিয়ে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় সমবায় সমিতি গঠন করে সুপরিকল্পিত ও সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করে শিল্পীদের সমস্ত রকম সহায়তা করাযে সমস্ত সমবায় সমিতি বর্তমানে অচল হয়ে পড়ে আছে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে তাদের পুনরুজ্জীবন করতে হবে। একমাত্র সক্রিয় সমবায় সমিতিই মহাজন ও ব্যবসায়ীদের হাত থেকে শিল্পীদের জীবন সুরক্ষিত করতে পারবে।

২. বর্তমানে জলাশয়ের অভাবে শোলা অর্থাৎ কাঁচামাল পাওয়া যাচ্ছে নামানুষ তার নিজের প্রয়োজনে জলাশয় ভরাট করে বাসযোগ্য করে তুলছে। মানুষকে সুস্পষ্ট দৃষ্টি নিয়ে জলাশয় ভরাট না করে শোলাকে বাঁচাতে সচেষ্ট হবে যাতে প্রাচীন ঐতিহ্যময় শিল্পের অস্তিত্ব রক্ষা পায়।

৩. সরকারী উদ্যোগে সঠিকভাবে শিল্পীদের কাঁচামাল সরবরাহ করতে হবেকাঁচামালের দাম প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে। সেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দিকটি সরকারকে দরিদ্র শিল্পীদের কথা মাথায় রেখে উন্নত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ। করতে হবে। প্রয়োজনে সরকারকে দরিদ্র শিল্পীদের জন্য ভর্তুকির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

৪. শিল্পীদের সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে স্বল্প সুদে ঋণ দানের ব্যবস্থা করা দরকার।

৫. শোলাশিল্পের দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে বাজার তৈরি করতে হবে।

৬. শোলাশিল্পকে বিশ্ববাজারে প্রতিযোগীতায় টিকে থাকার জন্য উন্নত মানের শোলা শিল্পদ্রব্য সুজনের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক, মহকুমা ও জেলা স্তরে বিভিন্ন কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। নতুন প্রজন্মকে এই শিল্পে আগ্রহী করে তোলার জন্য, দক্ষ শিল্পীদের দ্বারা সরকারী বা বেসরকারী উদ্যোগে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এই কর্মশালার মধ্য দিয়ে শিল্পীরা আগ্রহী হয়ে প্রাচীন এই শিল্পকে বয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

৭. সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে শিল্পমেলা ও প্রদর্শনীর সংখ্যা বাড়াতে হবেশিল্পীদের যাতায়াত ও রাহা খরচ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে শিল্পীরা এই সমস্ত জায়গায় আগ্রহের সাথে অংশগ্রহনে উদ্যোগী হয়।

৮. সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে ব্লক, জেলা, রাজ্য ও জাতীয় স্তরে প্রতিযোগীতার মাধ্যমে দক্ষও নিপুণ শিল্পীদের বিভিন্ন ধরনের পুরস্কার ও সম্মানিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৯. শিল্পীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের বীমার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১০. শিল্পীরা যাতে ঘরে বসে কাঁচামাল, জরি, চুমকি, রাংতা, অস্ত্র প্রভৃতি সামগ্রী পাই তার দিকে নজর দিতে হবে শিল্পীদের কলকাত থেকে নানা উপকরণ ক্রয় করে আনতে হয়। এতে দিন যেমন কামাই হয় আবার অর্থ ও খরচ হয়। ফলে শিল্পীর অসুবিধা হয়এই জন্য যাতে সমস্ত উপকরণ যাতে শিল্পীরা ঘরে বসে পায় তার দিকে দৃষ্টিপাত করা দরকার।

১১. জেলা শিল্প দপ্তর (DIC)কে শোলাশিল্পের প্রসার ও উন্নয়নে সঠিক ভূমিকা পালন করতে হবে। জেলা শিল্প দপ্তরের মাধ্যমে শোলার বিভিন্ন শিল্প সামগ্রী যাতে আরও বেশি বিক্রি হয় তার দিকে নজর দিতে হবে।

১২. এই শিল্পকে প্রতিযোগীতায় টিকে থাকার জন্য বিভিন্ন নতুন নতুন নক্সার বই শিল্পীদের প্রদান করতে হবে যাতে শিল্পীরা আরও উন্নত নক্সার সামগ্রী তৈরি করে মানুষের সৌন্দর্য প্রীয়তাকে চরিতার্থ করতে পারে

১৩. শোলাশিল্পের প্রচার ও প্রসারে বিভিন্ন গণমাধ্যমকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। শোলাশিল্পীদের জীবন ও শিল্পকৌশল বিষয়ে তথ্যচিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে হবে। এবং বিভিন্ন অঞ্চলে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হবে।

১৪. শোলাশিল্পীদের উৎপাদন কৌশল ও বিষয়বস্তুতে অভিনবত্ব আনতে হবে। যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী শিল্পীদের শিল্পবস্তু নির্মাণ করতে হবে।

১৫. শিল্পীদের সরাসরি শিল্প সামগ্রী বিপণনের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে মধ্যস্থতাকারী দালাল চক্রের হাত থেকে শিল্পীরা রক্ষা পায়শিল্পীরা নিজেরা শিল্পসামগ্রী বিক্রি করলে অধিক লাভবান হবেন।

১৬. স্বল্প ব্যয়ে শিল্পীদের সরকারী প্রচেষ্টায় সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। শিল্পীদের স্বাস্থ্য নিয়মিত পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৭. শিল্পীদের সরকারীভাবে স্বাস্থ্য বীমার ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারী বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় শিল্পীদের আনতে হবে, যাতে তারা শেষ পর্যন্ত আগ্রহের সাথে শোলার কাজ করতে পারেন।

১৮. এই শিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য সরাকারীভাবে দক্ষ শিল্পীদের দ্বারা ট্রেনিং করাতে হবে। যেমন বিশ্বভারতীর আর্টকলেজের শিক্ষক দ্বারা ট্রেনিং করানোর কথা বীরভূমের সুরুলের শিল্পীরা বলেছেন।

১৯. এই শিল্পের স্ত্রীবৃদ্ধি ঘটানোর জন্য প্রত্যেক শিল্পীদের সরকারী অনুদান দিতে হবে

২০. উন্নত মানের নক্সার জন্য প্রত্যেক শোলার কারখানাতে নক্সার বই প্রদান করতে হবে।

২১ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার শিল্পীদের নিয়ে বেশি বেশি করে ট্রেনিং করাতে হবে তাহলে এক স্থানের শিল্পীদের সাথে অন্য স্থানের শিল্পীদের কাজের ভাব বিনিময় ঘটবে। বিভিন্ন শিল্পীরা জানিয়েছেন স্কুলের মত যদি নক্সা শেখানো যায় তাহলে এই শিল্পের আরও অগ্রগতি ঘটবে।

সবশেষে পশ্চিমবঙ্গের শোলাশিল্পের সংকট ও দৈন্যদশা কাটাতে উল্লিখিত প্রস্তাবগুলির বাস্তবায়ন প্রয়োজন, না হলে শেলাশিল্পের সচলতা ক্রমশ কমে যাবেপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্পের একটি বিশেষ ধারা শোলাশিল্পকে ক্রমশ অবলুপ্ত হয়ে যেতে দেখবো। লোকসংস্কৃতির একটি মূল্যবান উপাদান ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাবে। যদি উল্লিখিত প্রস্তাবগুলি কিছুটা হলেও কার্যকরী হয় তাহলে প্রাচীন এই শোলাশিল্প স্বমহিমায় বেঁচে থাকবে, এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

শোলার চেয়ে হাল্কা, সস্তা বিভিন্ন বিকল্প বস্তু বাজারে প্রাধান্য লাভ করায় শোলাশিল্প অনেকটাই পশ্চাতে চলে গেছে। হ্রমশ অবলুপ্তির পথে হাঁটতে থাকা শোলার একেবারে অবলুপ্তি সম্ভব না হলেও অস্তিত্ব বজায় রাখার যথেষ্ট সমস্যা বর্তমানে, সেই সমস্যার দিকগুলিকে চিহ্নিত করে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। তবে সমস্যা থাকলে তার যেমন সমাধান সূত্র থাকে তেমন শোলাশিল্পেরও নানা পরিবর্তন পরিবর্ধনের মাধ্যমে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা আছে, সেই সম্ভাবনার কোটি এখানে আলোচনা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের শোলাশিল্প নানা রকম সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়েছে। সেগুলি সম্পর্কে এই অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছেএই শিল্পে কাঁচামালের অভাব, অন্যান্য উপাদানের অত্যধিক মৃতবৃদ্ধি, আধুনিক পণ্যের প্রভাব, শিল্পীর অনীহা, যন্ত্রপাতির অভাব, মহাজনদের আধিপতা, উপযুক্ত চাহিদার অভাব, সিরীদের পুঁজির অভাব, বিপণন ব্যবস্থার অভাব, সরকারী ও বেসরকারী সহায়তার অভাব, সমবায় সমিতি পরিচালনার অভাব, শিল্পীদের নানা শারীরিক সমস্যা ইত্যাদি শোলাশিল্পের নানা সমস্যাগুলি এই অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই

শিল্পের সম্ভাবনার নানা দিক এখানে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন: কাঁচামালের যোগান, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ, শোলার উৎপাদন বাড়ানো, শিল্পীদের বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারীভাবে পুরস্কার, খেলা, প্রদর্শনী প্রভৃতির যথোপযুক্ত ববস্থ, বিভিন্ন অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি, মহাজনদের প্রভাব রোধ করা, এই শিল্পের চাহিদা বাড়ানো, সরকারী ও বেসরকারীভাবে সিরীদের স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান, সমবায় সমিতিগুলি সঠিক পদ্ধতিতে পরিচালনা করা, শিল্পীদের স্বাস্থ্য বীমার আওতায়। অনা, বিভিন্ন কর্মশালার নবীন প্রজন্মকে এই শিল্পের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি, সাধারণ মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি, জেলা পির দপ্তর (DIC) এই শিল্পের প্রসার ও উন্নয়নে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ। এই শিল্পের প্রসার ও সংরক্ষণে সাধারণ মানুষের সচতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

ঐতিহ্যবাহী শোলাশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের পথগুলিকে আমাদের উন্মোচন করতে হবে। বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তা ভাবনার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে শোলাশিল্প সৃষ্টি হয়েছে। পূজার প্রাক্কালে আজও শোলশিল্পীরা নিত্য নতুন শোলার সাজ, চালি, মুখা, বিভিন্ন মডেল তৈরি করে চলেছেন। প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী আঙ্গিক শোলাশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমাদের বদ্ধপরিকর হতে হবে।

তথ্যসূত্র:

১. সুর, অতুল। বাংলা ও বাঙ্গালী। সাহিত্য লোক, কোলকাতা, পৃ. ১৪-১৫।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. ঘোষ, প্রদ্যেৎ। বাংলার লোকশিল্প। পুস্তক বিপণী, কলকাতা, ২০০৪।

২. চক্রবর্তী, বরূণকুমার (সম্পা)। লোকজশিল্প। পারুল প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, ২০১১।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1590-1601
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.380

ভারতে মধ্যযুগে ভক্তি আন্দোলনে নারীদের অবদান

বীথি দাস, *স্বাধীন গবেষক, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 23.03.2026; Accepted: 26.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The main theme of the Bhakti Movement that emerged in India in the medieval period, was to attain liberation or salvation through devotion. Many saint gurus preached love and devotion through their bhajans and kirtans during this time. Women saints also contributed equally to the spread of this movement. Some of such notable women saints are Karaikkal Ammaiyar, Andal and Akka Mahadevi from South India, Lal Ded of Kashmir, Mirabai of Rajasthan, Gangasati of Gujrat, Muktabai, Janabai and Bihanabai from Maharastra, Jhanva Devi, Sita Devi, Hemalata Devi from West Bengal etc. However, no such attempt has been made to uphold their biographies and writings in contemporary times. That is why many women saints may have remained in the shadow of History. Each of them is an outstanding devotee who has renounced everything and became a Goddess. Besides, they have played an important role in the history of Bhakti. In this movement, devotion means complete surrender at the feet of God and these women have fulfilled it by expressing self-sacrifice and deep love for God. Some of them have accepted God as their father, some as their husband and some as their friend. In their lives, some have played the role of a supreme devotee, some a renunciative saint, some a worldly devotee and some a guru. They have portrayed each role skillfully and have proven that everybody can meet God. Some of them are devotees of God with attributes and some are the devotees of the attributeless God but the conditions for walking on both paths are the same. Only a simple, honest and pure heart can attain the Supreme Soul through detachment and surrender. Their bhajans, kirtans and compositions are notable in this regard.

Keywords: Bhakti, Women, Medieval period, God, Surrender, Saint, Devotion

নারী পুরুষের সমতা খুজতে গেলে আমাদের যেতে হবে সম্ভবত মানব সভ্যতার একেবারে আদিম পর্যায়ে, যখন শিকার এবং ফলমূল সংগ্রহ ছিল তাদের পেশা। সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের সাথে সাথে এই পেশাই নারী পুরুষের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করেছিল, শেষপর্যন্ত যা পরিণতি পায় বর্তমানের পুরুষশাসিত সমাজ ব্যাবস্থায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও নারীরা কখনো পিছিয়ে থাকেননি, তারা সংগ্রাম করে গেছেন এবং আজও করছেন। বর্তমানে অনেক নারীবাদী ঐতিহাসিক, এই সমস্ত সংগ্রামী নারীদের ইতিহাসের আলোয় তুলে ধরেছেন। আজকের আলোচনায় আমি, ভক্তি আন্দোলনের পটভূমিতে এইরূপ কিছু অসামান্য নারী ভক্তের অবদান তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। ভক্তি আন্দোলন শব্দদুটিকে আক্ষরিকভাবে বিশ্লেষণ করলে ভক্তি এবং আন্দোলন এই দুটি শব্দ আমরা পাই। ভক্তি বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে যেমন দেশভক্তি, গুরুজনের প্রতি ভক্তি কিন্তু আলোচ্য অংশে ভক্তির

তাৎপর্য আধ্যাত্মিক, অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি। ভক্তি শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'ভজ' থেকে যার অর্থ হল সেবা করা বা অর্চনা করা। আন্দোলন শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল সঞ্চালন বা আলোড়ন। বিশ্বের প্রতিটি আন্দোলনই সংগঠিত হয়ে থাকে প্রচলিত ব্যাবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ।প্রাচীন ভারতে যেমন প্রতিবাদী ধর্ম আন্দোলনের উত্থান ঘটেছিল আচারসর্বস্ব গোঁড়া জাতপাতভিত্তিক ব্রাহ্মন্যধর্মের বিরুদ্ধে, ঠিক তেমনই মধ্যযুগের ভারতীয় ইতিহাসে ভক্তি আন্দলনের উত্থান ঘটেছিল তৎকালীন ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে অহিংসা ও সাম্যের আদর্শযুক্ত বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের উত্থান ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্য অনেকাংশে হ্রাস করলেও ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ্য ধর্মও রূপান্তরের মাধ্যমে নিজের স্থান পুনরায় দখল করে নিতে সমর্থ হয়। অন্যদিকে ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা, বৈদেশিক আক্রমন, রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা হ্রাস প্রভৃতি কারণে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগুলিও ধীরে ধীরে লোপ পায়। আদি মধ্য যুগ থেকেই ভারতীয় ধর্মে বৈচিত্র্যতা লক্ষ্য করা জায়। হিন্দু সমাজে তখন শৈব, বীরশৈব, শক্তিপূজা, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম ইত্যাদি প্রচলিত ছিল। নবম শতকে শঙ্করাচার্য অদ্বৈতবাদ ও নির্গুণ ব্রহ্মের ধারনা দ্বারা এক নতুন হিন্দু সংস্কারবাদী আন্দোলন শুরু করেন। আচারসর্বস্বতা যা সনাতন ধর্ম কে গ্রাস করেছিল তা পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি জ্ঞানমার্গের পথ দেখান, যার ভিত্তি ছিল বেদান্ত দর্শন। তাঁর প্রধান মন্ত্র ছিল 'ব্রহ্ম সত্য জগত মিথ্যা'। অর্থাৎ জীবাত্মা সেই এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মের থেকে অভিন্ন, তার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। তার মতে এই জ্ঞানই হল মুক্তি। অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে বহু দেবতার আরাধনাকে প্রাধান্য দেওয়া হত। এর ফলে সমাজের কিছু মানুষ গৃহে বা মন্দিরে পূজা করত আর কিছু মানুষ জ্ঞানমার্গে বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু সমাজের নিম্নবর্গের সাধারণ মানুষ ব্রাহ্মণদের দ্বারা শোষিত ও নিপীড়িত হত এবং জ্ঞানমার্গ তাদের কাছে ছিল অলীক কল্পনা মাত্র। তাদের আবেদন, ছিল সহজ ও সরল কোন পন্থার যাতে তারাও ভক্তির পথে চলতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ভক্তিবাদের উন্মেষ প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। ডক্টর রামশরণ শর্মার মতে হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর থেকে তুর্কিদের আগমনের আগে পর্যন্ত কেন্দ্রীয় শক্তির অনুপস্থিতির ফলে উত্তর ভারতে স্থানীয় ভুমধ্যকারীদের শক্তি বৃদ্ধি ঘটেছিল, যার ফলে ব্রাহ্মন্যধর্মও রক্ষণশীল হতে থাকে। পুনরায় সমাজে বর্ণাশ্রম, অস্পৃশ্যতা ব্যাপক আকার ধারণ করে। এরূপ পরিস্থিতিতে ভারতে ইসলামের আগমন ঘটে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ইসলামের একেশ্বরবাদ, সামাজিক সাম্য ও বিশ্বজনীন ভাতৃত্বের দ্বারাই ভক্তি আন্দোলনের নেতারা অনুপ্রাণিত হন। আবার কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, মুসলিম শাসকদের নির্যাতনে বহু মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহন করতে থাকায় ভক্তি আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। কেউ কেউ বলে থাকেন খ্রিষ্টান ধর্ম থেকে একেশ্বরবাদ ও ভক্তির ধারণা ভারতে এসেছিল। কিন্তু পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ভক্তির ধারণা অনেক প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে প্রচলিত ছিল। ভক্তি শব্দটির উল্লেখ পাওয়া গেছে ঋকবেদে, বৃহদআরণ্যক উপনিষদে, ছান্দোগ্য উপনিষদে, কঠ ও কৌশিতকী উপনিষদেও। শ্রীমদভাগবত গীতার ভক্তিযোগ নামক অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিশদে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভক্তি ধর্মের মূল কথা হল ভক্তির মাধ্যমে মানুষের মুক্তি। ভাগবত পুরাণেও এই ভক্তি ধর্মের কথা বলা হয়েছে।

ভক্তি আন্দোলন প্রথম সূচিত হয়েছিল দক্ষিণ ভারতে সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে। নায়নার বা শৈব ভক্তি এবং আলবার বা বৈষ্ণব ভক্তি এই দুটি ভাগে ভক্তি আন্দোলন এখানে বিকশিত হয়। মূলত বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের বিরুদ্ধে ভক্তি আন্দোলন এখানে সোচ্চার হয়েছিল। বিশিষ্টাদ্বৈতের প্রবক্তা রামানুজ ছিলেন বৈষ্ণব ভক্তির শ্রেষ্ঠ সাধক। কন্নড় ব্রাহ্মণ মাধাবাচার্য মাধবপন্থী মতকে এবং তেলেগু ব্রাহ্মণ নিম্বার্ক, মথুরায় রাধা কৃষ্ণের প্রেম কাহিনি জনপ্রিয় করেছিলেন। তেলেগু বৈষ্ণব বল্লভাচার্য শুদ্ধাদ্বৈত মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন, তার উদ্যোগে রাজপুতানা ও গুজরাটে ভক্তিবাদ প্রসারিত হয়। উত্তর ভারতে ভক্তিবাদকে জনপ্রিয় করেন রামানন্দ। মহারাষ্ট্রে ভক্তি আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল বারকরী সম্প্রদায়। জ্ঞানেশ্বর বা জ্ঞানদেবকে

এই বারকরী মতের সূচনাকারী বলা হলেও একে আন্দোলনের রূপ দিয়েছিলেন নামদেব। মহারাষ্ট্রে ভক্তি আন্দোলনে আরাধ্য ছিলেন বিঠোবা, যিনি হলেন শ্রীবিষ্ণুর এক রূপ। এই মতের অপর এক সাধক হলেন তুকারাম। এদের রচিত ভক্তিগীতিগুলিকে বলা হত অভঙ্গ। বাংলায় ভক্তিবাদের প্রধান কান্ডারী ছিলেন শ্রী চৈতন্যদেব। কৃষ্ণপ্রেমের মাধ্যমেই যে মানুষ মুক্তি পেতে পারে একথাই তিনি বলতে চেয়েছিলেন।

পূর্বে ধর্মীয় কার্যাবলীতে ব্রাহ্মণদের ভূমিকাই ছিল প্রধান, সেখানে শূদ্র ও চণ্ডালের প্রবেশাধিকার ছিল না। কিন্তু ভক্তি আন্দোলন সকলের কাছে ঈশ্বরকে উন্মুক্ত করে দেয়। কোন মাধ্যম ছাড়াই মানুষ ঈশ্বরের সেবা করার অধিকার প্রাপ্ত হয়। নতুন এই ধর্মে বিভিন্ন শ্রেণী আর সম্প্রদায়ের গুরুরা প্রাধান্য পান। এই সময়ের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল আঞ্চলিক ভাষায় ভক্তিমূলক রচনা। যার ফলে এই সন্ত মহাত্মারা তাঁদের বার্তা খুব সহজেই সাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে পারতেন।

ভক্তি আন্দোলনের এই বিকাশ নারীদের দুইভাবে সাহায্য করেছিল। ভারতীয় সমাজ ব্যাবস্থায় নারীরা চার দেওয়ালে আবদ্ধ থাকত এবং রীতিনীতির বেড়াজালে তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। একজন ব্রাহ্মণ বিধবাকে বাধ্যতামূলক মস্তক মুণ্ডন করতে হত, এক বেলা আহার করতে হত। সধবাদের কঠোর নিয়মনীতি যেমন ব্রত, উপবাস, ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা দেওয়া প্রভৃতি করতে হত। ব্রাহ্মণদের প্রভাব হ্রাস পেলে নারীদের এই দুরবস্থারও উন্নতি হয়। দ্বিতীয়ত, একজন নারী যেকোনো সময় ঈশ্বরের সেবা ও স্মরণ করতে পারত, নিজের কাজে কর্মরত অথবা শিশু সামলাতে ব্যাস্ত অবস্থায় কিংবা শারীরিক অসুস্থতায় থাকলেও। এই তত্ত্ব নারীর স্বাধীনতাকে আরও বর্ধিত করে। তাঁরা এটা উপলব্ধি করতে পারে যে, বাহ্যিক আচারগত পবিত্রতা অপেক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল কর্ম ও চিন্তার পবিত্রতা রক্ষা। নারীরা তখন সমাজের প্রচলিত বিধিনিষেধ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ভক্তিকেই মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে। এই নারীরা শুধু অনুগামী ভক্ত রুপেই নয় বরং ভক্ত গুরু এবং সন্ত রূপেও অবতীর্ণ হন। নারী ও পুরুষ উভয় সন্তই প্রশ্ন তুলেছিলেন, পরমাত্মা যিনি নারী ও পুরুষ দেহে অবস্থান করেন তিনি কি পৃথক ? এই প্রশ্নের নেতিবাচক উত্তরই ধর্মে নারীর অংশগ্রহণকে বৈধতা দেয়। ভারতীয় নারী যারা চার দেওয়ালের অন্তরালে ছিলেন তারা সাহসের সঞ্চার করেন এবং বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনে যোগদান করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কর্ণাটকের বীরশৈব সম্প্রদায়ের বহু নারী সন্ত দার্শনিক আলোচনা সভা 'অনুভব মণ্ডপে' যোগদান করেন। মহারাষ্ট্রের বারকরী সম্প্রদায়ের অনেক মহিলা পান্ধারপুরের বিঠোবা ভগবানের উদ্দেশে দ্বিবার্ষিক তীর্থযাত্রায় অংশগ্রহণ করতেন।

এত কিছুর সত্ত্বেও পিতৃতান্ত্রিক এই সমাজ ব্যাবস্থায় নারীর উত্থানের পথ এতটা সুগম ছিল না। যে সমস্ত নারী সাধিকারাই এইসময় এগিয়ে এসেছিলেন তাদের ব্যাক্তিগত জীবনে অনেক বাধিবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। উল্লেখনীয় যে, নারীরা যখন স্পষ্টবাদী হয় এবং স্বাধীন ভাবে বাঁচার দাবী তোলে তখনও কিন্তু পুরুষরা সমাজে নারীর অবস্থা নিয়ে উদাসীন। নারীদের অবস্থার উন্নতি নিয়ে কোন সন্তই কথা বলেননি। আরও একটি বিষয়, ভক্তি আন্দোলনের পুরুষ সন্তদের ব্যাপারে অনেক তথ্য পাওয়া গেলেও নারী সন্তদের সম্পর্কে তা খুবই কম। তার কারণ ভক্তি একটি মৌখিক ঐতিহ্য ছিল এবং অন্যান্য প্রাচীন উৎসের মত এখানেও পুরুষতান্ত্রিক প্রাধান্য ছিল প্রভাবী এবং নারী মতকে উপেক্ষা করা হয়েছিল। কোন রাজা বা শাসক তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেননি এবং তাদের ব্যাপারে কোন ধর্মীয় সাক্ষ্যও পাওয়া যায় না। তাদের কথা বেশিরভাগই পরবর্তীকালের মধ্যবিত্ত শ্রেণির লেখক বা জীবনীকারদের দ্বারা উদ্ধৃত হয় এবং সময়ের সাথে সাথে এসব কাহিনীতে অনেক মিশ্রণও চলে আসে। তাদের রচিত ভজন ও কবিতাগুলি থেকেই তাদের জীবনের কিছু ঝলক পাওয়া যায়। এইরকম কিছু নারী সন্তদের কথাই আমরা জানব।

করাইক্কালআম্মাইয়ার:

করাইক্কালআম্মাইয়ার একজন শৈব নায়নার ভক্ত ছিলেন। তাঁর আসল নাম ছিল পুনিতাবতী। চোল রাজ্যের বন্দর শহর করাইকলের এক ধনী বৈশ্য পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই ভগবান শিবের প্রতি তাঁর ভক্তি অপরিসীম। তাঁর বিবাহের বয়স হলে নাগাপট্টিনামের এক যুবকের সাথে তাঁর বিবাহ দেওয়া হয়। তিনি শিব ভক্তদের অবাধে স্বর্ণ, বস্ত্র ইত্যাদি দান করতেন। একদিন তাঁর স্বামী বাড়িতে দুটি আম পাঠালে পুনিতাবতী একটি আম এক শিবনাদিয়ারকে দিয়ে দেন। তার স্বামী একটি আম খেয়ে সুস্বাদু অনুভব করায় দ্বিতীয় আমটিও খেতে চায়। তখন পুনিতাবতী উপায় না পেয়ে শিবের ধ্যানমগ্ন হন এবং প্রার্থনা করতে থাকেন, তৎক্ষণাৎ আশীর্বাদ স্বরূপ তিনি একটি আম পেয়ে যান। তার স্বামী আমটি খেয়ে সন্দেহাতীত হয়ে প্রশ্ন করে এমন আম ত্রিভুবনে কোথাও পাওয়া যায় না তিনি সেটি কোথায় পেলেন। তখন পুনিতাবতী সত্যিটা তার স্বামীকে জানালে তাঁর স্বামী প্রমাণ চায়। প্রমাণ স্বরূপ তিনি আরেকটি আম হাজির করলে তাঁর স্বামী ভয় পেয়ে যায়। তাঁর স্বামী তাকে জানায় যে, তিনি একজন দেবী এবং সে তাঁর সাথে সংসার করতে পারবে না। এই ঘটনায় আহত হয়ে পুনিতাবতী ভগবান শিবের কাছে তাকে প্রেত বানিয়ে দেওয়ার জন্য প্রার্থনা জানান। ভগবান শিব তাঁর এই ইচ্ছা পূরণ করেন। তারপর তিনি কৈলাস পর্বতের উদ্দেশে যাত্রা করেন। তার ভয়ঙ্কর রূপ দেখলে সবাই পালিয়ে যেত। সেই পবিত্র পর্বত পায়ে হাঁটার পরিবর্তে তিনি মস্তকে আরোহণ করেন। মাতা পার্বতী তাঁর এই রূপ দেখে বিস্মিত হলে শিব পার্বতীকে বলেন যে, তাঁর ভক্তই এই রূপের প্রার্থনা করেছেন। তাঁর কাছে আসতেই শিব তাকে 'আম্মাই' (মা) বলে সম্বোধন করলেন এবং তাঁর কাছে গেলেন। পুনিতাবতী ভগবান শিবকে 'আপ্পা' (বাবা) বলে ডেকে সাষ্টাঙ্গে প্রনাম করলেন। ভগবান শিব সানন্দে তাঁর ইচ্ছাগুলি পূরণ করলেন, যথা- চিরস্থায়ী ও সুখকর শিব ভক্তি; জন্মের অবসান (মোক্ষ); চিরস্থায়ী শিব চেতনার অবস্থা এবং ভগবান শিবের পবিত্র চরণতলে থেকে তাঁর নৃত্য দর্শন করতে করতে আনন্দের সাথে তাঁর মহিমা কীর্তন করা। এরপর শিব তাকে দক্ষিনে তিরুভালঙ্গানাডুতে যেতে বললেন। সশ্রদ্ধভাবে বিদায় জানিয়ে তিনি সেখানে রওনা হলেন। সেখানে তিনি পরম আনন্দে ভগবান শিবের তাণ্ডব নৃত্য দেখে সেই উচ্ছ্বাস তার ভক্তিগীতিতে তুলে ধরেন, যা 'তিরভলঙ্গত্তু মুত্ত তিরুপ্পাদিগম' নামে পরিচিত। এটি হল তিরুভলঙ্গাদু মন্দিরের শিবের উদ্দেশে রচিত দুটি দশক, এর মধ্যে এগারোটি করে গান রয়েছে যার বিষয়বস্তু হল শিবের নৃত্য, শ্মশান এবং সেখানকার ভুতেদের কার্যকলাপ। এছাড়া তিনি ভগবান শিবের উদ্দেশে 'তিরুভিরাত্তাই মণিমালাই' রচনা করেন। এটিতে কুঁড়িটি শ্লোক রয়েছে, যার মধ্যে পঞ্চাক্ষর মন্ত্র উচ্চারণের তাৎপর্য, প্রভুর চরণ পূজা, শিবের ধ্যানের মত বিষয়গুলি পাওয়া যায়। 'অর্পুদা তিরুভান্দাদি'কে তাঁর রচনাগুলির মধ্যে প্রথম বলে মনে করা হয়। এটি প্রবন্ধের 'আন্দাদি' শ্রেণির অন্তর্গত, তামিলে প্রথম পূর্ণাঙ্গ আন্দাদি রচনার কৃতিত্ব তারই। এটি একটি সরল ও মনোরম রচনা, যা ভক্তদের হৃদয়কে বিগলিত করে সহজেই। এটিতে ভগবান শিবের কর্ম, খ্যাতি ও প্রকাশ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এছাড়া এটিতে তাঁর ব্যাক্তিগত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার কথাও আছে। ৬৩ জন নায়নার সন্তের মধ্যে তিনিই প্রথম সঙ্গীত ও পদ্য রচনার সমন্বয় ঘটান। তাঁর কবিতায় তিনি সাধারণ মানুষের উদ্দেশে বলেন, ভগবান শিবকে সর্বদা তাদের চিন্তন করতে, তাকে যে রূপেই ভাবা হয় তিনি সে রূপেই আবির্ভূত হন, তিনি সর্বদা আমাদের সাথেই আছেন। তিনিই পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, সূর্য, চন্দ্র এবং আত্মা এর মাধ্যমে নিজেকে অষ্টমূর্তি রূপে প্রকাশ করেন। কেবল তাঁর কৃপাতেই জন্মের অবসান ঘটে এবং মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। যারা তাঁর শরণাপন্ন হন তিনি তাদের রক্ষা করেন। করাইক্কালআম্মাইয়ার এর ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি পরবর্তীকালের তামিল শৈব ধর্মকে অনেকাংশে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর রচনাগুলি স্বচ্ছতা, সারল্য ও স্পষ্টবাদীতার জন্য প্রশংসনীয়।

অন্দাল:

সন্ত কবিয়ত্রী অন্দাল যার আসল নাম হল গোদাদেবী। তিনি ছিলেন ১২ জন আলবার বৈষ্ণবদের মধ্যে একজন। অন্দাল ছিলেন বিখ্যাত আলবার বৈষ্ণব পেরিয়ালওয়ার বা বিষ্ণুচিত্তের পালিতা কন্যা। কিংবদন্তি অনুসারে পেরিয়ালওয়ার তাঁর বাগানের তুলসী অরণ্যের নীচে অন্দালকে খুঁজে পান। তিনি তাকে ভালোবেসে গোদা নাম দেন যার অর্থ পৃথিবীর উপহার। শৈশব থেকেই অন্দালের মনে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তীব্র প্রেম ছিল এবং তিনি নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রী বলে মনে করতেন। তাঁর পিতার অনুপস্থিতে তিনি শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে গাঁথা মালা পরিধান করে তা পুনরায় রেখে দিতেন। একদিন তাঁর পিতা এটি দেখে ফেলেন এবং ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন এই মালা আর শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করা যাবে না। এই ঘটনায় ভগবান বিষ্ণু পেরিয়ালওয়ারকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বলেন যে, তিনি কেবলমাত্র গোদার পরিধান করা মালাই গ্রহণ করবেন। এতে পেরিয়ালওয়ার বুঝতে পেরেছিলেন যে, গোদা প্রকৃতই ভগবান বিষ্ণুর স্ত্রী এবং তিনি সেই মালাই শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করেন। বড় হওয়ার সাথে সাথে অন্দালের শ্রী বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি ও প্রেম আরও তীব্র হতে থাকে। তিনি নিজেকে বৃন্দাবনের গোপী স্বরূপ মনে করে বিভিন্ন ব্রত পালন করতে থাকেন। একদিন শ্রী রঙ্গনাথ (শ্রী বিষ্ণুর আরেক রুপ) পেরিয়ালওয়ারের স্বপ্নে আসেন এবং তাঁর কন্যার পানি গ্রহণের অনুমতি চান। অন্দালকে বিবাহের সাজে শ্রী রঙ্গনাথ মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে তিনি শ্রী রঙ্গনাথের বিগ্রহে বিলীন হয়ে যান। তারপর থেকেই তামিলনাড়ুতে অন্দাল শ্রী বিষ্ণুর স্ত্রী হিসেবে পূজিত হন। অন্দালের দুটি বিখ্যাত রচনা হল 'তিরুপ্পাভাই' ও 'নাচিয়ার তিরুমোঝি'। এই দুটি রচনাই সাহিত্যকর্মে অনন্য। তিরুপ্পাভাই হল ৩০টি ভক্তিমূলক গীতির সংকলন যেগুলিকে 'পাশুরাম' বলা হয়, সেখানে অন্দাল নিজেকে একজন গোপী হিসেবে তুলে ধরেন যিনি প্রভুর চিরন্তন সঙ্গ লাভের কামনা করতেন। উল্লেখনীয় যে, অন্দাল তার সমবয়সী সকল মেয়েকে ব্রত এবং 'কৃষ্ণানুভব' এর জন্য আহ্বান করেছিলেন। নারীদের কোন মহৎ ও উদ্দেশ্যমূলক লক্ষ্যে সংগঠিত করার উদ্যোগ তিনিই প্রথম নিয়েছিলেন। সুতরাং বর্তমানকালের নারী সংগঠনগুলির পথিকৃৎ তাকেই বলা যায় নিঃসন্দেহে। তাঁর সঙ্গীতগুলিতে সদা শ্রী বিষ্ণুর শরণে থাকার অভিব্যাক্তি প্রতিফলিত হয়েছে। এই গানগুলিতে বৈষ্ণবীয় ঐতিহ্যের তিনটি মূলমন্ত্র যথা থিরুমন্ত্রম, ধ্যানম ও চরমশ্লোকম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এগুলির তাৎপর্য হল, পরমাত্মা সর্বত্র বিরাজিত আছেন। এই গানগুলিতে শুধু পরম গন্তব্যই নয়, সেই গন্তব্যে যাওয়ার পথও ব্যাখা করা হয়েছে। উদাহরন স্বরূপ একটি পাশুরামে অন্দাল বলেছেন, একজন শিষ্যকে এই তিনটি মন্ত্রের এমনকি বেদের মর্মার্থ বুঝতে গেলেও আচার্যের নির্দেশ মেনে চলতে হবে। তিরুপ্পাভাই এর ৩০টি সঙ্গীতের প্রথম পাঁচটি ভগবান বিষ্ণুর প্রতি তপস্যা এবং প্রার্থনার কথা বলে। পরবর্তী দশটি সঙ্গীতে সম্মিলিতভাবে ভগবানের সেবায় অংশগ্রহণের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। পরবর্তী পাঁচটি সঙ্গীত মন্দির পরিদর্শনের বর্ণনা দেয়, শেষ সঙ্গীতটিতে অন্দালকে বিষ্ণু চিত্তের কন্যা হিসেবে ব্যাখা করা হয়েছে যিনি এই ৩০টি সঙ্গীত ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন। তিরুপ্পাভাই এর সবথেকে বিখ্যাত সঙ্গীত হল ২৯তম পাশুরাম, যেটি আজও অনেক ভক্ত তাদের দৈনিক প্রার্থনায় গেয়ে থাকেন। এই সঙ্গীতে বলা হয়েছে, বারংবার ভগবান বিষ্ণুর দর্শন করে তাঁর পাদপদ্মে মাথা নোয়ানো এবং তাঁর স্তুতিপাঠ করার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র তার আশীর্বাদ এবং বরলাভের জন্য নয় বরং এই মিনতি করার জন্য যে, পরবর্তী সাত জন্মে আমরা ভক্তরা যেন তাঁর সেবায় নিযুক্ত থাকতে পারি এবং সমস্ত কামনা বাসনা যেন আমাদের মন থেকে দূরীভূত হয়। নাচিয়ার তিরুমোঝি তে, অন্দাল ভক্তদের উপদেশ দিয়েছেন জল ছাড়া মাছ যেমন ছটফট করে ঠিক তেমন ব্যাকুলতার সাথে ঈশ্বরের চরণে নিজেকে উৎসর্গ করলেই পরমাত্মার প্রাপ্তি হয়। অন্দালের রচনাগুলিতে এই নশ্বর জীবনের চূড়ান্ত গন্তব্যের প্রতি দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়।

আক্কা মহাদেবী:

আক্কা মহাদেবী কর্ণাটকের শিবমোঙ্গা জেলার উদুটাডিতে ১১৫০ সালে জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পিতামাতা বীরশৈব মতবাদের অনুগামী ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি শিবের গভীর ভক্ত ছিলেন এবং অল্পবয়সেই একজন অজানা গুরুর দ্বারা দীক্ষিত হন। বয়স বাড়ার সাথে সাথে চেন্নামল্লিকার্জুন (শিবের এক রুপ) এর প্রতি তাঁর ভক্তি ও নিষ্ঠা আরও দৃঢ় হয়। ষোল বছর বয়সেও তিনি অবিবাহিত ছিলেন, যা সেই সময়ে একটি বিরল প্রথা ছিল। এর কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে, চেন্নামল্লিকার্জুন এর সাথেই তাঁর বিবাহ হয়েছে। তবে তিনি বেশিদিন বিয়ে এড়াতে পারেননি, কৌশিকা নামে এক গোষ্ঠীপ্রধান তাকে বিয়ে করতে চান এবং তাঁর পিতামাতাকে রক্ষার জন্য তিনি শর্তানুযায়ী বিয়েতে রাজি হন। কিন্তু কৌশিকা যখন শর্ত উলঙ্ঘন করে তাঁর সাথে জবরদস্তি করার চেষ্টা করে তখন তিনি সমস্ত কিছু এমনকি পরিধানের বস্ত্রও ত্যাগ করে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়েন। কিংবদন্তি অনুসারে কেশরাশি দ্বারা তিনি নিজেকে আচ্ছাদিত করে রাখতেন। প্রথমে তিনি কর্ণাটকের বিদর জেলার কল্যান শহরে পাড়ি দেন এবং এখানের ধর্মীয় সভা অনুভব মণ্ডপে যোগ দেন। এখানে থাকাকালীন তিনি তাঁর প্রভুর সাক্ষাতের জন্য আলাম্মা প্রভু এবং বাসবেশ্বর এর পরামর্শ চেয়েছিলেন। আলাম্মা প্রভু তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, 'আমি ভাব ও তুমি ভাব' থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারলে তবেই তিনি দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত করে ঈশ্বরের দর্শন করতে পারবেন। কিছুদিন পর মহাদেবী অনুভব মণ্ডপ ত্যাগ করেন এবং এক কষ্টকর যাত্রার পর শ্রীশৈলম পর্বতে পৌঁছে তাঁর প্রভু চেন্নামল্লিকার্জুন এর আরাধনায় মগ্ন হন। কথিত আছে, তাঁকে বনের গুহা ও ঝরনার কাছে ঘুরে বেড়াতে এবং গান গাইতে দেখা যেত। তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশে ৪৩০ টি বচন লিখেছিলেন যা কন্নড় সাহিত্যের এক অন্নতম নিদর্শন। এই বচনগুলিতে তিনি নিজেকে 'অঙ্কিতা' বলে পরিচয় দিতেন। এগুলির মাধ্যমে মহাদেবী তাঁর গভীর প্রেম, আকুতি এবং বিরহের যন্ত্রণা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করতেন। তাঁর শেষদিকের একটি বচন থেকে জানা যায় যে, দীর্ঘ প্রতীক্ষার ও বহু আধ্যাত্মিক সাধনার পর অবশেষে তিনি তাঁর প্রভু চেন্নামল্লিকার্জুন এর দর্শন পেয়েছিলেন।

লাল দেদ:

লাল দেদ ছিলেন চতুর্দশ শতাব্দীর কাশ্মীরের একজন ভক্তিবাদী সাধিকা। তিনি শ্রীনগরের কাছে পান্দ্রেথান গ্রামে জন্মগ্রহন করেছিলেন যা বর্তমানে কাশ্মীর নামে পরিচিত। তাঁর পিতামাতা তাঁর নাম রেখেছিলেন লাল্লা আরিফা। এছাড়াও তিনি লাল্লা যোগেশ্বরী, লালেশ্বরী বা লাল্লা নামেও পরিচিত। বারো বছর বয়সে পামপুর অঞ্চলের নিকা ভট্ট নামক এক ব্রাহ্মনের সাথে তাঁর বিবাহ হয়। সেখানে শাশুড়ির দ্বারা তিনি যন্ত্রণার শিকার হতেন। আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতার সন্ধানে তিনি তাঁর পৈতৃক এবং শ্বশুরবাড়ির পরিবার উভয়ই ত্যাগ করেন। বাস্তু জীবনের মায়া-মোহ ত্যাগ করে তিনি ঈশ্বরের খোঁজে কাশ্মীরের পাহাড় এবং উপত্যাকা ভ্রমণ করতে থাকেন। গৃহ ত্যাগ করার সময় তিনি তাঁর বস্ত্রও ত্যাগ করেছিলেন, অর্থাৎ তিনি শারীরিক দেহ অপেক্ষা আত্মার অস্তিত্বকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে এই নারী সাধিকা প্রচলিত পুরুষশাসিত পারিবারিক কাঠামোকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় বিশ্বাসের বিরোধিতা করেছিলেন এবং ঈশ্বরের সাথে সরাসরি এবং ব্যাক্তিগত সংযোগ স্থাপনের ধারণা প্রচার করেছিলেন। লাল্লা তাঁর জীবনে শত শত গান লিখেছিলেন যেগুলি 'ভখ' নামে পরিচিত কিন্তু সেগুলি সমসাময়িককালে সংগ্রহ বা লিপিবদ্ধ করা হয়নি। এই গানগুলি কাশ্মীরি ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য বহন করে। তাঁর গানগুলো সরল প্রকৃতি কিন্তু একই সঙ্গে গভীরতা ও বিচক্ষণতার জন্য পরিচিত। উল্লেখনীয় যে, অন্যান্য ভক্তিবাদী সন্তদের মত লাল দেদ তাঁর এই সঙ্গীতগুলো ভক্তি প্রচারের উদ্দেশে নয় বরং তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরার জন্যই রচনা করেছিলেন। তিনি সংসার ত্যাগের পরামর্শ

দেননি বরং তাঁর মতে সেই প্রকৃত ঈশ্বর প্রেমী যে কাম, ক্রোধ, লোভ, অহম, দয়া ও ভালোবাসা সব কিছুর মধ্যে দিয়ে যায়। তিনি মূর্তিপূজাকে স্বীকৃতি দেননি বরং তিনি বলেন যে, প্রকৃত পূজা হল ভগবানের নিরন্তর স্মরণ করা। আত্মার উচ্চতম স্বরূপ উপলব্ধি করার জন্য তিনি নৈতিক ও মানসিক বিশুদ্ধতার পাশাপাশি মনকে সংযমে আনার জন্য শ্বাস বায়ুর উপর নিয়ন্ত্রণের উপর জোর দেন। লাল দেদের ভাষায়, পরম আত্মা হলেন চিদানন্দ জ্ঞান প্রকাশ অর্থাৎ চিৎ-আনন্দ; কেবল চিৎ বা বিশুদ্ধ (অবিভক্ত) চৈতন্যই নন, বরং আনন্দও। ভগবানকে চিন্ময় এবং অন্তর্জগৎ উভয়েই দেখা যায়, কেবল সাক্ষী আত্মাতেই নয় বরং নাম ও রূপের জগতেও, প্রতিটি ক্ষণস্থায়ী বস্তুর মধ্যেও। আর এভাবেই লাল দেদ উপলব্ধি করেন সেই পরম ঈশ্বরকে যিনি আরোহী রূপে আরোহণ করেন। সাধকগণ একেই উচ্চতম অবস্থা, মোক্ষ বলে মনে করেন। কেউ কেউ বলেন তিনি কাশ্মীরি শৈব মতাবলম্বী বা হঠযোগিনী ছিলেন। তবে যাই হোক মধ্যযুগীয় পুরুষশাসিত সমাজে তাঁর জীবন ও শিক্ষা ছিল বিপ্লবী।

মীরা বাই:

মীরা বাঈ ষোড়শ শতাব্দীতে রাজস্থানের একটি ছোট রাজ্য শাসনকারী রাঠোর রাজবংশের মহারাজা রতন সিং ও বীরকুনওয়ারির কন্যা ছিলেন। মীরার পৈতৃক পরিবার বৈষ্ণব ছিল এবং উত্তরাধিকার সূত্রে মীরাও বৈষ্ণব ভক্তি প্রাপ্ত হন। কিংবদন্তী অনুসারে একদা অল্প বয়সে একটি বিবাহ শোভাযাত্রা দেখার পর মীরা বাঈ তাঁর মাকে তাঁর বর কোথায় বলে বিরক্ত করতে থাকলে তাঁর মা তাকে এড়ানোর জন্য শ্রী কৃষ্ণের একটি মূর্তির দিকে ইঙ্গিত করে বলেন যে ইনিই হলেন তাঁর বর। তারপর থেকে মীরা শ্রী কৃষ্ণকেই নিজের স্বামী বলে গ্রহণ করেন। রাঠোররা মেওয়ারের সিসোদিয়া রাজপুতদের সঙ্গে রাজনৈতিক মৈত্রী স্থাপনের জন্য মীরাকে সেখানে বিয়ে দিতে উদ্যত হন। মীরার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়েটি হয়। তাঁর স্বামী হিসেবে মহারাজ কুম্ভ অথবা রানা সাঙ্গার পুত্র ভোজরাজের কথা বলা হয়। কথিত আছে যে, মীরা বাঈ যখন শ্বশুরবাড়ি আসেন তখন তাঁর স্বামী এবং পরিবারের মঙ্গলের জন্য তাঁকে দেবী শক্তির পূজা করতে বলা হয় এবং তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন কারণ শ্রী কৃষ্ণই ছিলেন তাঁর পতি এবং পরমেশ্বর উভয়ই। স্বাভাবিক ভাবেই এই বিষয়টি তাঁর শ্বশুর বাড়ির লোকেরা ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারেনি এবং এই ভক্তির জন্য তাঁকে প্রতিদিনই অনেক কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হত। তাঁর স্বামী মারা যাওয়ার পর তাঁকে হত্যা করার বহু প্রচেষ্টা চালানো হয়। এরপর তিনি প্রাসাদ ত্যাগ করে প্রাসাদ প্রাঙ্গণের একটি মন্দিরে থাকতে শুরু করেছিলেন কিন্তু এখানেও শান্তি পাননি। অবশেষে তিনি গৃহত্যাগ করেন এবং অনান্য সাধু সন্তদের সাথে মিলিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কিত বিভিন্ন মন্দির এবং স্থান পরিদর্শন করেন। তিনি প্রথমে ডাকুর পরে বৃন্দাবন এবং অবশেষে দ্বারকায় যান। কিংবদন্তি আছে যে সম্রাট আকবর এবং তানসেন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দ্বারকায় আসেন এবং তানসেন সেখানে একটি ভজনও গেয়েছিলেন। যখন দ্বারকা সমুদ্র উপকূলের রণছোরজি মন্দিরে তিনি ছিলেন তখন তাঁর পরিবারের মানুষেরা তাঁকে ফিরে আসতে রাজি করানোর জন্য একদল পুরোহিতকে দূত হিসেবে পাঠিয়েছিল। মীরা বাঈ ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জানালে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা মন্দিরের বাইরে আমরণ অনশন শুরু করেন। তিনি তখন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পরেন এবং ব্রাহ্মণ রক্তপাতের কারণ হতে চাননি। এরপর তিনি মন্দিরে প্রবেশ করেন এবং বলা হয় যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের মূর্তিতে বিলীন হয়ে যান। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, তিনি সমুদ্রমুখী পশ্চিমী দরজা দিয়ে সমুদ্রে ঝাপ দেন। যাই হোক মীরার ভক্তি রাজপুত বিবাহ ব্যাবস্থার মূলে থাকা স্বার্থ ও আধিপত্য থেকে মুক্তিলাভের প্রতীক হয়ে ওঠে। তাঁর কাহিনী যুদ্ধ, প্রতিহিংসা এবং রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান শক্তির একটি যুগ এবং সমাজে, প্রেমের নীতিকে তুলে ধরে। মীরা তাঁর শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে প্রচুর ভজন রচনা করেছিলেন। তিনি যে রাজপুত বংশের উত্তরাধিকারী ছিলেন তাদের আদেশে বহু শতাব্দী ধরে তাঁর নাম ও ভজন উল্লেখ করার

অনুমতি ছিল না। তবে চারণকবি এবং অস্পৃশ্য বর্ণের নারীরা গোপনে তাঁর গানগুলি গেয়েছিলেন বলে সেগুলি সংরক্ষিত হয়েছে। তাঁর ভজনগুলি আজ সারা ভারতে সুপরিচিত। তাঁর কিছু বিখ্যাত ভজন হল, "পায়োজি ম্যায়নে রাম রতন ধন পায়ো", "পগ ঘুঙ্গরু বান্ধ মীরা নাচি রে", "এয়সি লাগি লগন মীরা হো গ্যায়ি মগন", "হরি তুম হরো জন কী ভীর", "মেরে তো গিরধর গোপাল দুসরো না কোই" ইত্যাদি। তাঁর ভজনগুলিতে তাঁর অন্তরের বিরহ ও বেদনা ফুটে উঠেছে। তিনি তাঁর প্রেমিক শ্রী কৃষ্ণের সমালোচনা করে বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাকে মিষ্টি কথায় আকর্ষণ ও মুগ্ধ করে তাঁর প্রেমে মত্ত করেন কিন্তু তারপর তিনি তাকে অগ্রাহ্য করে একা ফেলে চলে যান। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে একজন দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রেমিক বলে নিন্দা করেন। এই যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা মীরা বাঈ এর জীবনে চলতে থাকে তবুও তিনি আশা ছাড়েন না। তিনি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষায় থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর এই আকর্ষণ ছিল মুক্তির প্রতি আকর্ষণ। নির্যাতন, অবজ্ঞা, দুঃখ, কষ্ট সত্ত্বেও মীরা বাঈ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তার নিঃশর্ত প্রেম ত্যাগ করেননি। ভক্তির পথে চলে আপামর ভক্তের কাছে তিনি ত্যাগ ও আত্মসমর্পণের এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন। সাধিকা হওয়ার পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন ঐতিহাসিক নারী যিনি তাঁর সময়কালের পুরুষতান্ত্রিক ব্যাবস্থার বিরুদ্ধে গিয়ে লৌকিক ও পারলৌকিক উভয় মুক্তি অর্জন করেছিলেন।

গঙ্গা সতী:

গঙ্গা সতী ছিলেন গুজরাটের একজন ভক্ত নারী। তাঁর রচনাগুলো সমকালীন সময়ে লিপিবদ্ধ করা হয়নি এবং মৌখিক ঐতিহ্যেই সেগুলি সংরক্ষিত হয়েছে, তাই তাঁর জনপ্রিয়তা বেশি হয়নি কখনও। তাঁর বিবাহ হয়েছিল সৌরাষ্ট্রের কালুভ নামক একজন রাজপুতের সঙ্গে যিনি নিজেও ভজন এবং সাধুসঙ্গ ভালবাসতেন। তাঁদের গৃহ শীঘ্রই একটি মন্দিরে পরিণত হয়। তাঁর স্বামী সংসারে অনাসক্ত হয়ে সমাধি গ্রহন করেন। গঙ্গাসতীও সমাধি গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু কালুভ তাকে বলেছিলেন সমাধি গ্রহণের আগে তাদের পুত্রবধূ পান বাঈকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রদান করে যেতে। এই উদ্দেশে গঙ্গা সতী পান বাঈ এর জন্য প্রায় চল্লিশটি ভজন রচনা করেন যেখানে তিনি তাকে সত্যের পথে শিক্ষা দেন। গঙ্গা সতী যখন ঈশ্বরের কথা বলেন তখন কিন্তু তিনি হিন্দু দেবদেবীদের কথা বলেননি বরং পরম ব্রহ্ম অর্থাৎ গুন ও রূপহীন পরমাত্মার কথাই বলেন, যার সঙ্গে মানব আত্মা কেবল কঠোর অনুশাসন ও আত্মসমর্পণের মাধ্যমেই মিলন লাভ করতে পারে। তিনি এক্ষেত্রে প্রকৃত গুরুর আনুগত্যের উপর জোর দেন, তিনি বলেন প্রকৃত গুরুর গুণাবলী শিষ্যকে অর্জন করার চেষ্টা করতে হবে। যেমন, কামনা ও বাসনার উপর বিজয় লাভ, অহম বিসর্জন এবং ঈশ্বরের প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তি। তিনি দিব্য অভিজ্ঞতা লাভের জন্য আচার অনুষ্ঠান অপেক্ষা যোগাভ্যাসের উপর বেশি গুরুত্ব দেন। তাঁর একটি ভজনে তিনি বলেন, 'মেরু পর্বত হয়তো টলে যেতে পারে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ বিচূর্ণ হতে পারে কিন্তু একজন হরিজনের মন কখনো টলে না, সুখ দুঃখ প্রভৃতি তার মনকে কখনো প্রভাবিত করতে পারে না, সে গুরুর আদেশ মেনে চলে এবং অহমকে বিসর্জন দিয়ে গুরুর চরণে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে'। এভাবেই মহাত্মা গান্ধীর ছয় শতাব্দী আগেই তিনি 'হরিজন' শব্দটি উল্লেখ করেছিলেন।

মুক্তা বাঈ:

মহারাষ্ট্রের মুক্তা বাঈ ত্রয়োদশ শতাব্দীর সমসাময়িক ছিলেন। তিনি বারকরী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা নিবৃত্তি, জ্ঞানদেব এবং সোপানের বোন ছিলেন। তাদের পিতা একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তিনি সন্ন্যাস গ্রহন করার পর পুনরায় সংসার জীবনে ফিরে আসলে তাদের পরিবারকে সমাজচ্যুত করা হয় এবং প্রায়শ্চিত্ত স্বরুপ তাদের চার ভাইবোনকে অনাথ করে দিয়ে তাদের পিতামাতা জলে ডুবে প্রাণত্যাগ করেন। মুক্তার জীবন তাঁর ভাইদের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল এবং যেখানেই তারা যেত একটা ছোট পরিবারের মত একসঙ্গে থাকত।

তারা সকলেই ছিল অবিবাহিত। মুক্তা বাঈ ছিলেন একজন সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী তরুণী, যিনি আধ্যাত্মিকভাবে ছিলেন অত্যন্ত উন্নত এবং বিদূষী। অনান্য নারী ভক্তের মত তিনি কখনো তাঁর নারীত্বকে জাহির করেননি। তিনি সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিকতায় নিমগ্ন ছিলেন। তিনি প্রায় পঞ্চাশটির মত অভঙ্গ রচনা করেছিলেন। তাঁর বেশিরভাগ অভঙ্গগুলোই সন্তদের সাথে কথোপকথনের আকারে রচিত এবং তিনি নিজেকে তাদের সমকক্ষ হিসেবে মনে করতেন। যেমন, "নিবৃত্তি মুক্তি সংবাদ" এ তিনি এবং তাঁর ভাই নিবৃত্তি একে অপরকে নির্দেশ দেন।

জনা বাঈ:

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মহারাষ্ট্রের বার করী সাধকদের মধ্যে এক অন্যতম সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। জনা বাঈ এক নিম্নবর্গীয় শূদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যখন তাঁর মাত্র সাত বছর বয়স তখন তাঁর বাবা মা তাকে শ্রদ্ধেয় বারকরী গুরু নামদেবের পিতা দামা শেট্টীর পরিবারের হাতে তুলে দেন। জনা বাঈয়ের বাকি জীবনটুকু সেই গৃহেই কেটেছিল। তিনি বর্ণনা করেছেন সেই গুরুভার ও অন্তহীন গৃহকর্মের কথা, যা তার ভাগ্যে জুটেছিল। একজন নারী হিসেবে জীবনযাপনের কঠোরতা এবং গৃহস্থালির শ্রমের বোঝা এই দুটি বিষয়ই তাঁর রচনায় সর্বদা উপস্থিত ছিল। পান্ধারপুরের অধিষ্ঠাতা ভগবান বিঠোবা তাঁর কাছে কেবল ভগবানই নন বরং একজন বন্ধু, এক নির্ভরযোগ্য অবলম্বন এবং তাঁর কঠোর গৃহকর্মের পথে এক অবিচল ও নিত্যসঙ্গী ছিলেন। জনা বাঈ বেশ কিছু অভঙ্গ রচনা করেছিলেন এবং এই অভঙ্গগুলো 'নামদেব গাথা'তে স্থান পেয়েছে। জনা বাঈ এর অন্যতম সুপরিচিত একটি অভঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, বিঠোবা তাকে ভালবেসে চুল ধুয়ে ও বিনুনি করে দিত, স্নানের জল বয়ে আনা ও তা গরম করা, আঙিনাতে ঝরে পরা পাতা ঝাট দেওয়া, বাসনপত্র মাজা এমনকি মাথায় উকুন কামড়ালে তাঁর মাথা চুলকে দেওয়া পর্যন্ত সব কাজই করে দিত। তাঁর অভঙ্গগুলির মধ্যে দিয়ে তাঁর অন্তরের গভীর ভক্তি ও ভগাবানের সাথে তাঁর অতি নিকট সম্পর্কই ব্যক্ত হয়েছে। প্রভু ছাড়া যার কেও নেই প্রভু তাঁর মাতা, পিতা, সখা, প্রেমিক প্রভৃতি জাগতিক সমস্ত সম্পর্কের অভাব পূরণ করেন এই মর্মার্থটি তাঁর অভঙ্গগুলিতে স্পষ্ট। মহীপতির 'ভক্তবিজয়' এ পাওয়া একটি গল্প অনুসারে, একদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাকে বারকরীরা বিঠঠল বলে ডাকতেন, নামদেবের বাড়িতে ভোজ খেতে এসেছিলেন। পুরো পরিবার তাঁর সঙ্গে খেতে বসলেও জনা বাইরেই রয়ে যান। তাঁর বিষণ্ণতা দেখে শ্রীকৃষ্ণের খিদে চলে যায়, তাই তিনি ভালভাবে না খেয়ে উঠে যান। এরপর জনা বাঈ উচ্ছিষ্ট খাবারগুলো সংগ্রহ করেন। সেই রাতে বিঠঠল ভগবান জনার কুটিরে গিয়ে তাঁর সাথে খাবার খান, তাকে শস্য পেষায় সাহায্য করেন এবং সেখানেই ঘুমিয়ে পড়েন। পরদিন সকালে তাঁর ঘুম ভাঙতে দেরি হয়ে গেলে তিনি তাড়াহুড়োয় তাঁর কম্বল ও গয়না জনার কুটিরে ফেলে রেখে মন্দিরের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন। জনাকে এই জিনিসগুলি চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় এবং তাঁকে মৃত্যুদণ্ডও দেওয়া হয়, কিন্তু কেবল শ্রী বিঠঠলের হস্তক্ষেপে তিনি বেঁচে যান। এখান থেকে বোঝা যায়, সেই সময় সমাজে একজন নারী ও নিম্নবর্ণের মানুষের প্রতি সামাজিক বৈষম্য ছিল তীব্র। জনা বাঈয়ের অভঙ্গগুলিতে শস্য পেষাই ও ঝাড়াইয়ের ছন্দ রয়েছে যা মহারাষ্ট্রের ঐতিহ্যবাহী লোকগান 'ওভি' র প্রতিফলন।

বহিনা বাই:

সপ্তদশ শতাব্দীর মহারাষ্ট্রের দেইগোয়া গ্রামের এক গরীব ব্রাহ্মণ পরিবারে বহিনা বাঈ জন্মগ্রহন করেন। তিনি ছিলেন একমাত্র নারী সন্ত যিনি নিজের আত্মজীবনী লিখেছেন। তিন বছর বয়সে জনা বাঈয়ের সঙ্গে রত্নাকর পাঠক নামক একত্রিশ বছর বয়সী এক পুরোহিত ও জ্যোতিষীর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। ভক্তির জন্য তাকেও অনেক নিপীড়ন সইতে হয়েছিল। তাঁর অনেকগুলি অভঙ্গ তাঁর দাম্পত্য জীবনের টানাপোড়েন এবং সেগুলোর সমাধানের বিষয়কে কেন্দ্র করে রচিত। বর্তমানে প্রাপ্ত তাঁর ৪৭৩ টি অভঙ্গের মধ্যে ৭৮টি অভঙ্গের প্রথম

অংশে বহিনা বাঈ তার জীবনের শৈশবকাল থেকে শুরু করে নিজের জীবন বৃত্তান্ত তুলে ধরেছেন। ছোটবেলা থেকেই অন্য শিশুদের সাথে খেলাধুলা অপেক্ষা তিনি ঈশ্বরের নাম জপ করতেই অধিকতর পছন্দ করতেন। বহিনা বাঈ কিন্তু দাম্পত্য জীবনের বন্ধন ছিন্ন করে মুক্ত বিহঙ্গের মত তাঁর প্রেমিক রুপী ঈশ্বরের সন্ধানে পথে পথে ঘুরে বেড়াননি বরং তাঁর স্বামীর প্রতি কর্তব্যপরায়নতা এবং ঈশ্বর ও সাধু সন্তদের প্রতি ভক্তি এই দুইয়ের মধ্যে চমৎকার সমন্বয় সাধন করেছিলেন। বহিনা বাঈ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন- "আমার বয়স এখন ১১ বছর কিন্তু আমি এক মুহূর্তের জন্যও সুখ পাইনি"। একদা তাঁর স্বামীর অত্যাচারে তাঁর এক প্রাণপ্রিয় বাছুর মারা গেলে বিহনা গভীরভাবে শোকা হত হয়ে পড়েন এবং তিনদিন ধরে অচৈতন্য হয়ে যান। সেই অবস্থায় তিনি স্বপ্নে বিঠোবার দর্শন লাভ করেন এবং তুকারামের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর স্বামী বিষয়টি মোটেই পছন্দ করেনি কারণ তুকারাম ছিলেন একজন নিম্ন বর্গের মানুষ আর তারা ছিলেন ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ তখন তাঁর স্বামী তাকে নির্যাতন করতে শুরু করে এবং তাকে ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়। হঠাৎ তাঁর স্বামী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে বিহনা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তার সেবা শুশ্রূষা করে তাকে সুস্থ করে তোলেন। নিজের ভুল বুঝতে পেরে তিনি পরে বিহনার ভক্তি পথকেই নিজের পথ হিসেবে গ্রহন করেন।

জাহ্নবা দেবী:

গৌরাঙ্গদেবের পর বাংলায় বৈষ্ণবীয় আন্দোলন পরিচালনার মুখ্য সাংগঠনিক দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন নারীরা। তাঁরা শুধু শিক্ষিতাই ছিলেন না তার সঙ্গে ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ এবং স্ত্রী গুরু হিসেবে সম্মানিত। চৈতন্য পরবর্তী আমলে বৈষ্ণব আচার্যদের পাশাপাশি এই স্ত্রী গুরুরাও বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। এমনই এক উল্লেখযোগ্য নারী হলেন জাহ্নবা দেবী। তাঁর জন্ম হয় ১৫০৯ সালে অম্বিকা, কালনায়। পিতা সূর্য দাসের দুই কন্যা ছিলেন বসুধা ও জাহ্নবা। ১৫২১ সালে নিত্যানন্দ প্রভুর ইচ্ছায় বসুধা ও যৌতুক স্বরুপ জাহ্নবাকে নিত্যানন্দের কাছে সম্প্রদান করেন সূর্য দাস। নিত্যানন্দ প্রভুর প্রয়াণের পরেই জাহ্নবা দেবীর ভূমিকা বৈষ্ণব সমাজে ক্রমশ বাড়তে থাকে। নিত্যানন্দ প্রভুর সুবিশাল শিষ্যমণ্ডলীকে পরিচালনা ও সেই সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের গুরুদায়িত্ব ছিল তাঁর উপর। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তিনি অন্তত তিনবার বৃন্দাবন যাত্রা এবং বাংলার বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন। খড়দহ থেকে তিনি প্রথমে যান কাটোয়ায়, এরপর একে একে মৌরেশ্বর, একচক্রা, গৌড় হয়ে গয়াধামে শ্রীবিষ্ণুর পাদ পদ্ম দর্শন করে বৃন্দাবনে পৌঁছান। বৃন্দাবনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন রূপ ও সনাতন গোস্বামী। তিনিই প্রথম বৈষ্ণব মহিলা যিনি ভ্রমণের মাধ্যমে চৈতন্য ভক্তি প্রচার করেন। সেই সময় বঙ্গদেশ থেকে বৃন্দাবন যাত্রা এত সহজ ছিল না। পথে ছিল ডাকাত আর দস্যু আক্রমণের ভয়। জাহ্নবা দেবীকেও একাধিকবার আক্রান্ত হতে হয়েছিল, কিন্তু শেষমেষ দস্যু দল তাঁর মহিমা অবগত হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহন করে। নিত্যানন্দ প্রভুর মৃত্যুর পরে বিধবা হয়েও তিনি সপত্নী পুত্র বীরচন্দ্রকে দীক্ষাদান করেন, যেটা সেই সময়ের সমাজে দুঃসাহসিক ছিল। কথিত আছে, বীরচন্দ্র প্রথমে তাঁর কাছে দীক্ষা নিতে রাজি না হলে জাহ্নবা দেবী নিজের ষড়ভুজ মূর্তি প্রকাশ করেন এবং তারপর থেকেই বীরচন্দ্রের কাছে তিনি হয়ে ওঠেন ঈশ্বরী। তাঁর আর একটি অন্যতম কৃতিত্ব ছিল ১৫৮২ সালে রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত খেতুরি মহোৎসবে বৈষ্ণব সমাজকে নেতৃত্বদান করা। এই উৎসবে তিনি নরোত্তম দাসকে ব্রাহ্মণ উপাধি দেন এবং এই ঘটনার মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেন জাতপাত অপেক্ষা ঈশ্বর ভক্তি শ্রেষ্ঠ। জাহ্নবা দেবী নিজে কোন রচনা না করলেও অনেক বৈষ্ণব কবি ও পণ্ডিতকে বৈষ্ণব পদ, গ্রন্থ ও তত্ত্ব রচনায় উৎসাহ দিতেন। তারই আদেশে ভক্ত কবি নিত্যানন্দ দাস "প্রেম বিলাস" গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। জনশ্রুতি আছে যে, বৃন্দাবনে রাধা গোপীনাথ মন্দিরে গোপীনাথের শ্রী অঙ্গে তিনি লীন হয়ে যান এবং গোপীনাথের ডান দিকে অনঙ্গ রাধিকার রূপ পরিগ্রহ করেন।

তাঁকে নিয়ে রচিত কাব্যের মধ্যে রয়েছে রামচন্দ্র গোস্বামী রচিত 'অনঙ্গমঞ্জরীসম্পূটীকা', গীতগোবিন্দ রচিত 'জাহ্নবাতত্ত্ব মর্মার্থ', সুভদ্রা দেবী রচিত 'অনঙ্গকদম্বাবলী', জীব গোস্বামী রচিত 'জাহ্নবাষ্টকম'।

সীতা দেবী:

সীতা দেবীর পিতা ছিলেন নৃসিংহ ভাদুড়ী। পণ্ডিত ভাদুড়ীর দুই কন্যা ছিলেন সীতা ও শ্রী। যদু নন্দনের পৌরোহিত্যে দুই বোনের বিবাহ হয় কুবের আচার্যের পুত্র কমলাক্ষর সঙ্গে। পরে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার পর কমলাক্ষর নতুন নাম হয় অদ্বৈত আচার্য। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর "শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থে বলেছেন, নিমাইয়ের জন্মের পর সীতাদেবী এবং অদ্বৈত আচার্য নিমাইকে দেখতে এসেছিলেন। অদ্বৈত আচার্যের ধর্মাচরণের প্রধান সহায়ক ছিলেন তিনি। শ্রী চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পর অস্থির বৈষ্ণব সমাজে সমতা ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি বিষ্ণুপুরে পাঁচ হাজার বৈষ্ণব নারীদের একটি সম্মেলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সমকালীন বৈষ্ণব সমাজে তাঁর শিষ্যমণ্ডলীও ছিল। সীতা দেবীর জীবনীকাব্যের মধ্যে আছে বিষ্ণু দাসের 'সীতাগুণকদম্ব', ও লোকনাথ দাসের 'সীতাচরিত্র'। আজও শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের বিগ্রহের পাশাপাশি তিনি পূজিত হন।

হেমলতা ঠাকুরানী:

শ্রীনিবাস আচার্যের তিন পুত্র ও চার কন্যা ছিল। কন্যাদের মধ্যে হেমলতাই ছিলেন জ্যেষ্ঠা। 'গোবিন্দবিলাস', 'কর্ণানন্দ' প্রভৃতি কাব্যের রচয়িতা যদুনন্দন দাস হেমলতা ঠাকুরানীর শিষ্য ছিলেন। তারই নির্দেশে যদুনন্দন দাস 'কর্ণানন্দ' কাব্যটি রচনা করেন। মধ্যযুগে নারী শিক্ষার বিশেষ অবসর না থাকলেও হেমলতা দেবী বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারিণী ছিলেন। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের অতীব দুরূহ বিষয়কে সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করে তিনি অপ্রাকৃত ধর্ম ও জীবনকে প্রাকৃতজনের বোধগম্য করে তোলেন। তাঁর রচিত 'মানবীবিলাস' কাব্যে তাঁর এই সহজ কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে তিনি মানব কে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিয়েছেন। এছাড়া তিনি মালিহাটি বৈষ্ণব শ্রীপাট যা একটি বৈষ্ণব কেন্দ্র ছিল সেটি পরিচালনায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

উপসংহার:

পরিশেষে এই কথা বলা যায়, ভক্তি আন্দোলনের পটভূমিতে এই নারী ভক্তদের অবদান ছিল নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য। ভক্তি আন্দোলনের মূল বাণী প্রচারে এই নারীদের জীবন ও উদ্যোগ প্রামাণ্য স্থান অর্জন করেছে। ব্রত আচার নয় বরং নিঃশর্ত আত্মসমর্পণই যে মূল ভক্তি এবং তাঁর মাধ্যমেই যে ঈশ্বরকে লাভ করা যায় সেটাই এই নারী সন্তরা বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। এক্ষেত্রে তাদের ব্যাক্তিগত জীবন ও রচনা দুটোই প্রাসঙ্গিক। ভক্তিকে অবলম্বন করেই তাঁরা সাহস অর্জন করেছেন এবং প্রয়োজনে পুরুষশাসিত সমাজের বেড়াজাল ভেঙে ঈশ্বরের অন্বেষণে বাইরে বেরিয়ে পড়তেও দ্বিধা করেননি। বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এই নারীদের প্রত্যেকের জীবন স্বকীয় হলেও একটি দিকে মিল ছিল, তা হল ভক্তি। শেষ পর্যন্ত এই ভক্তির মাধ্যমে তারা প্রত্যেকেই তাদের চরম লক্ষ্যে পৌছাতে পেরেছিলেন এবং ভক্তিকে বাস্তবায়িত করেছিলেন। সাধারণ মানুষকে তারা উপলব্ধি করান যে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত করে ঈশ্বরের সাথে একাত্ম হওয়া যায়। ভক্তির পথে সাধারণ মানবী হিসেবে যাত্রা শুরু করলেও আজ আমাদের কাছে তারা সকলেই ঈশ্বরী এবং পূজনীয়। এর পাশাপাশি তাদের জীবন সংগ্রাম থেকে তৎকালীন সমাজব্যাবস্থারও প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। জীবনের কোন ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ একজন নারীর পক্ষে সুগম ছিল না, এমনকি ভক্তির ক্ষেত্রেও নয়। তাদের অনেককে নিপীড়নের শিকার এবং বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। একজন নারী হিসেবে সমাজে যে সমস্ত বাধার সম্মুখীন হতে হত

তাঁরা তার উল্লেখ তাঁরা করেছিলেন বারংবার। কিন্তু তা সত্তেও তাঁরা কখনো ভক্তির পথ ত্যাগ করেননি। তৎকালীন সমাজব্যাবস্থায় দাড়িয়ে তাঁদের এই লড়াই আজ সত্যিই তাই প্রশংসনীয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমসাময়িককালে তাদের জীবন ও বাণীকে তুলে ধরার কোন চেষ্টাই করা হয়নি। তাই এমন অনেক নারী ভক্তই রয়েছেন যারা আমাদের কাছে অজানাই রয়ে গেছেন। তবে আজকের প্রেক্ষপট থেকে দেখলে বোঝা যাবে, ভক্তি আন্দোলনকে সার্থক করে তূলতে নারী জাতির অবদানে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তারা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, নারীরা কোন ক্ষেত্রেই পিছিয়ে ছিল না এবং আজও নেই। যদিও প্রচলিত পুরুষশাসিত ব্যাবস্থার বিরুদ্ধে নারীবাদকে তুলে ধরার প্রবণতা নয়, বরঞ্চ ভক্তিই তাঁদেরকে চালিত করেছিল। কিন্তু তবুও তাঁরা পরোক্ষভাবে সমাজ এবং ইতিহাসে নারীর অবস্থানকে শক্তিশালী করে তুলেছেন। তাই না চাইতেও তাঁরা সমসাময়িক এবং বর্তমান যুগে নারী সমাজকে অনুপ্রাণিত করে গেছেন তাদের ভক্তির মাধ্যমে। তাদের এই সংগ্রাম এবং অসামান্য অবদানের জন্য আপামর ভক্ত সম্প্রদায়, নারী জাতি, সমাজ ও ইতিহাস চিরজীবন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে।

তথ্যসূত্র

১. শ্রীমানী, সৌমিত্র । ভারতের মধ্যযুগ । নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রা.) লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৪৮৭-৪৯০।

২. মুখোপাধ্যায়, সুবোধ কুমার । আদিমধ্য ও মধ্যযুগে ভারত ৬৫০-১৫৫৬ । রাওয়াত পাবলিকেশনস, জয়পুর,১৯১৯, পৃ. ৪৮৭-৪৯০।

৩. সাহা, অমরেন্দ্র নাথ। বৈষ্ণব দর্পণ। পুস্তক বিপনি, কলকাতা,১৯৬৪, পৃ. ৭৪-৭৫।

৪. পাল, প্রমা। ষোড়শ শতকের আধুনিক নারী জাহ্নবাদেবী। Trisangam International Refereed Journal (TIRJ), সংখ্যা ৫, ২০২৫, পৃ. ৩-৪।

৫. Pande, Rekha. Women's voice in Bhakti literature. Research in world Literature, (A refereed Journal in literature Studies), 2012. p.70-71.

৬. Ibid, p.80-81.

৭. Mullatti, L. The Bhakti movement and the status of women: A case study of virasaivism. Abhinav Publications, 1989, p.4-5.

৮. Kaul, Jaya Lal. Lal Ded. Sahitya Academy, 1973, p.47-49.

৯. Tharu, Susie. , Lalita, K. Women writing in India : 600 B.C. to the present. Feminist Press, New York, 1991, p.107-108.

১০. Kumaracharya, V.S. Musings on SAINT ANDAL'S TIRUPPAVAI. D.V.K. Murthy, Krshnamurthipuram, Mysore, 2002, p.11-13.

১১. Ibid, p.28.

১২. Bhattacharyya, N.N. Medieval Bhakti Movements in India. Munshiram Manoharlal Publishers Pvt.Ltd, New Delhi, 1989, p.149-153.

১৩. Mudaliar, Chandra Y. Religious experiences of Hindu Women: A Study of Hindu Women: A Study of Akka Mahadevi. Mystics Quarterly, Penn State University Press, 1991, p.137-146.

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1602-1608
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.381

জৈন নীতিতত্ত্বের প্রেক্ষিতে জীব ও অজীব তত্ত্ব: একটি পর্যালোচনা

ঝুমা মন্ডল, *আংশিক সময়ের অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ, বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 23.03.2026; Accepted: 26.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Jainism is one of the most ancient philosophical and religious traditions of India. Umāsvāti identifies seven fundamental principles: Jīva (soul), Ajīva (non-soul), Āsrava (influx of karma), Bandha (bondage), Saṃvara (stoppage of karmic influx), Nirjarā (shedding of karma), and Mokṣa (liberation). These constitute the core doctrinal framework of Jain philosophy. According to Jain metaphysics, reality is fundamentally composed of two categories: Jīva and Ajīva. Jīva is a conscious entity characterized by knowledge, perception, bliss, and energy. However, due to karmic bondage, the soul is unable to realize its true nature and remains entangled in the cycle of saṃsāra. In contrast, Ajīva consists of non-conscious elements that support and condition the existence and activities of Jīva.The concepts of Jīva and Ajīva are central not only to the metaphysical structure of Jain philosophy but also to its ethical and spiritual dimensions. A proper understanding of karmic processes, the nature of bondage, and the path to liberation requires a detailed examination of these two categories.This paper seeks to present a systematic analysis of the nature, classification, and interrelationship of Jīva and Ajīva within the framework of Jain philosophy. It also aims to explore their philosophical significance and their connection to the Jain doctrine of liberation (mokṣa), thereby offering a comprehensive understanding of their overall importance.

Keywords: Jain Philosophy, Jīva and Ajīva, TattvārthaSūtra, Umāsvāti, Karma Theory, Mokṣa (Liberation), Indian Philosophy, Metaphysics in Jainism

ভারতীয় দর্শনের আবির্ভাব ঘটেছে সাধারণ মানুষের জীবন জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হেতু। ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলি প্রধানত আস্তিক ও নাস্তিক ভেদে দ্বিবিধ। বেদের উপর ভিত্তি করেই ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলির এরূপ শ্রেণীবিন্যাস। বেদের প্রামাণ্যে বিশ্বাসী দর্শন সম্প্রদায়গুলি আস্তিক বা বৈদিক এবং বেদের প্রামাণ্যে অবিশ্বাসী দর্শন সম্প্রদায়গুলি নাস্তিক বা অবৈদিক নামে পরিচিত। নাস্তিক দর্শন সম্প্রদায় হল তিনটি- চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন। নাস্তিক হলেও এই তিন দর্শন সম্প্রদায় স্বমহিমায় মহিমান্বিত হয়ে এই আস্তিক দর্শনের ভূমিতে বহুকাল ধরে বিরাজমান। নাস্তিক মানেই যে ধর্ম ও নীতি বিরোধী নয়, তার প্রমাণস্বরূপ আমাদের সামনে উপস্থিত রয়েছে জৈন দর্শন। নাস্তিক হওয়া সত্বেও এই দর্শন সম্প্রদায় ধর্ম ও নীতির মহিমায় যে কোনো আস্তিক দর্শন সম্প্রদায়ের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। জৈন ধর্মের ইতিহাস বহু প্রাচীন। জৈন শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে 'জিন' শব্দ থেকে এবং 'জিন' শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে সংস্কৃত 'জি' ধাতু

থেকে। যার অর্থ হল 'জয়লাভ করা' বা 'জয়ী'। অর্থাৎ যিনি কঠোর সংযমের দ্বারা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য আদি বন্ধনের কারণগুলিকে জয় করেছেন এবং বস্তুর যথাযথ স্বরূপ অবধারণ করে তত্ত্বগ্য হয়েছেন তিনিই হলেন জিন। জিনদের 'তীর্থঙ্কর' বা 'সিদ্ধপুরুষ' বলা হয়। যারা জিন বা তীর্থঙ্করদের উপদেশ অনুসরণ করেন তারা 'জৈন' নামে পরিচিত। ভারতীয় দর্শনের মূল উদ্দেশ্য হল জীবের মোক্ষপ্রাপ্তি। অর্থাৎ দুঃখ থেকে চিরনিবৃত্তি লাভ। জৈন দর্শনও এর ব্যতিক্রম নয়। ভারতীয় দর্শনের অনুরূপ জৈন দর্শনেরও মূল উদ্দেশ্য হল মোক্ষ লাভ। মোক্ষ লাভ করলে জীবন পরিপূর্ণ হয় এবং জীবের জন্ম-মৃত্যু চক্রের পরিসমাপ্তি ঘটে। সাধারণত জন্ম জনিত জীবের নানান প্রকার দুঃখ-কষ্ট ভোগকে বন্ধন বলা হয়। জৈন দর্শনে দুঃখ কষ্ট জর্জরিত সংসারী আত্মাকেই জীব বলা হয়েছে। জীবের এই সংসারী অবস্থায় হল বদ্ধাবস্থা। এই বদ্ধাবস্থা হল দুঃখ ও বেদনার অবস্থা, কিন্তু জীব বা আত্মার স্বরূপত নিত্য, শুদ্ধ ও মুক্ত। অনন্তজ্ঞান, অনন্তশক্তি ও অনন্ত আনন্দের অধিকারী। 'এই দর্শনের মূল কথা হল- জীব ও (পুদ্গল) অজীব সংযুক্ত হলে জীবের সঙ্গে পুদ্গল বা কর্মপুদ্গালের সংযোগ ঘটে। পুদ্গল সংযোগ হেতু জীবের দেহ প্রাপ্তি হয় এবং দেহ প্রাপ্তির জন্যই বন্ধন হয়। এই প্রক্রিয়া বন্ধ করে পুদ্গালের সম্পূর্ণ বিযুক্তি ঘটিয়ে মুক্তি লাভ সম্ভব হয়'।[১] কিন্তু কোন উপায়ে মুক্তি লাভ সম্ভব? এ প্রসঙ্গে উমাস্বাতি তাঁর তত্ত্বার্থসূত্র গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম সূত্রে বলেছেন- "সম্যগ্দর্শন-জ্ঞান-চারিত্রানি মোক্ষমার্গঃ"। অর্থাৎ সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান ও সম্যক্ চরিত্র- এই তিনটি হল মোক্ষ লাভের উপায়, এই তিনটিকে একত্রে "ত্রিরত্ন" বলা হয়।[২] জৈন মতে চরিত্র নিরপেক্ষ জ্ঞান বা জ্ঞান নিরপেক্ষ চরিত্র বা কেবল শ্রদ্ধা দ্বারা কখনো মোক্ষ প্রাপ্তি সম্ভব নয়। অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করতে হলে ত্রিরত্নের একত্র অনুশীলন প্রয়োজন। সম্যক্ দর্শন প্রসঙ্গে উমাস্বাতি তাঁর তত্ত্বার্থসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় সূত্রে বলেছেন- "তত্ত্বার্থশ্রদ্ধানাং সম্যগ্দর্শনম"। অর্থাৎ তত্ত্বভূত পদার্থ বিষয়ে শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও তার বিপরীত অভিনিবেশ বর্জনই হল সম্যক্ দর্শন।[৩] কিন্তু তত্ত্ব কি? এ প্রসঙ্গে শ্রুতসাগরসুরী তাঁর তত্ত্বার্থবৃত্তি গ্রন্থে বলেছেন- "যে অর্থ যেভাবে ব্যবস্থিত সেই অর্থকে সেভাবে জানাই হল তত্ত্ব।"[৪] জৈন দর্শনে তত্ত্বের সংখ্যা বিষয়ে মতভেদ থাকলেও উমাস্বাতি তাঁর তত্ত্বার্থসূত্র গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ সূত্রে বলেছেন- "জীবাজীবাস্রব-বন্ধ-সংবর-নির্জরা মোক্ষাস্তত্ত্বম্।" অর্থাৎ জীব, অজীব, আস্রব, বন্ধ, সংবর, নির্জরা ও মোক্ষ- এই সাতটি তত্ত্বই হল জৈনদের মূলতত্ত্ব।[৫] জৈন মতে, সমগ্র বিশ্বজগৎ দুটি মৌলিক তত্ত্বের সমন্বয়ে গঠিত- জীব ও অজীব। জৈন দর্শনে জীবকে চৈতন্য সম্পন্ন সত্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যার প্রকৃত স্বরূপ হল জ্ঞান, দর্শন, আনন্দ ও শক্তি। কিন্তু কর্মের বন্ধনের কারনে জীব তার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না এবং সংসার চক্রে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। অন্যদিকে অজীব হল সেই সকল অচৈতন্য উপাদান, যা জীবের অস্তিত্ব ও ক্রিয়াকলাপে সাহায্য করে। জৈন দর্শনের আলোকে জীব ও অজীব তত্ত্ব কেবল বিশ্বতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ নয় বরং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের ক্ষেত্রেও এর গভীর তাৎপর্য রয়েছে। জীবের উপর কর্মের প্রভাব, কর্মবন্ধন ও তার থেকে মুক্তির উপায় বোঝার জন্য জীব ও অজীব তত্ত্বের বিশ্লেষণ অপরিহার্য। তাই জৈন দর্শনের মৌলিক কাঠামো অনুধাবন করার জন্য জীব ও অজীব- এই দুই তত্ত্বের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা অত্যন্ত জরুরী। এই গবেষণা প্রবন্ধে জৈন দর্শনের আলোকে জীব ও অজীব তত্ত্বের প্রকৃতি, শ্রেণীবিন্যাস ও পারস্পরিক সম্পর্কের একটি বিশদ পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হবে। পাশাপাশি এই তথ্য গুলির দার্শনিক গুরুত্বের এবং জৈন মোক্ষতত্ত্বের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিষয়টির সামগ্রিক তাৎপর্য অনুধাবনের চেষ্টা করা হবে।

জীব:

অন্যান্য দর্শনে যাকে আত্মা বলা হয়, তাই জৈন দর্শনে 'জীব' নামে পরিচিত। ভারতীয় সকল দর্শন সম্প্রদায়গুলির লক্ষ্য যেহেতু মোক্ষ লাভ তাই আত্মার আলোচনা সকল দর্শনেই একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। তবে আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে দার্শনিকদের অভিমত ভিন্ন ভিন্ন। যেমন- নাস্তিক শিরোমনি চার্বাকদের আত্মা সম্পর্কিত মতবাদ দেহাত্মবাদ নামে পরিচিত। এই মতে দেহের অতিরিক্ত আত্মা বলে কিছু নেই, চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা। চার্বাক মতে সমগ্র জীব ও জড়জগৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ- এই চতুর্ভুতের সমন্বয়ে গঠিত। এই চর্তুভূতের সমন্বয়ে জীবদেহে চৈতন্য নামক গুণ উদ্ভূত হয়। দেহের বিনাশ ঘটলে চৈতন্যেরও বিনাশ ঘটে। বৌদ্ধদের আত্মা সম্পর্কিত মতবাদ নৈরাত্মবাদ নামে পরিচিত। এই মতে সবকিছুই অনিত্য। আত্মা বলে বাহ্য জগতে স্থায়ী দ্রব্য বলে কিছু নেই এবং মনোজগতেও আত্মা বলে কোন স্থায়ী দ্রব্য নেই। এই মতে বিজ্ঞান বা চৈতন্য প্রবাহই আত্মা। বিজ্ঞান ক্ষণিক। "ক্ষণিকবাদ অনুযায়ী একটি বস্তু যে ক্ষনে উৎপন্ন হয়, তার পরক্ষণেই বিনষ্ট হয়। বস্তুর বিনাশ ক্ষনেই ওই বস্তুর সদৃশ্য অপর একটি বস্তু উৎপন্ন হয়।"[৬] চক্র, দন্ড, আসন প্রভৃতি অংশের অতিরিক্ত রথ বলে যেমন কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকে না তেমনি পঞ্চ স্কন্ধের (রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান-এর) অতিরিক্ত আত্মা বলে কিছু নেই। ন্যায় দর্শনে আত্মাকে দ্বাদশ প্রমেয়র মধ্যে প্রথম প্রমেয় বলা হয়েছে। ন্যায় মতে আত্মা নিত্য; আত্মার উৎপত্তিও নেই, বিনাশও নেই। আত্মা বিভু, চৈতন্য আত্মার আগন্তুক গুণ। সাংখ্য দর্শনে আত্মাকেই পুরুষ বলা হয়েছে। মীমাংসা মতে আত্মা নিত্য ও অসীম দ্রব্য বিশেষ। অদ্বৈত বেদান্ত মতে আত্মা হল ব্রহ্ম। আত্মা চৈতন্য, আনন্দস্বরূপ, একমাত্র সৎ।

জৈন দার্শনিক উমাস্বাতি তত্ত্বের যে ক্রমবিন্যাস করেছেন, তার মধ্যে প্রথম তত্ত্ব হল 'জীব'। সাধারণত আমরা জীব বলতে বুঝি, যার জীবন আছে। তবে জৈন দর্শনে বলা হয়েছে, যার চৈতন্য আছে তাই জীব। অর্থাৎ চেতনা যে দ্রব্যের স্বরূপ ধর্ম, সেই দ্রব্যই হল জীব। জৈন মতে, যে কোন চেতন দ্রব্য, তাতে সে যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন বা তার চেতনা যতই স্বল্প হোক না কেন- তা জীব পদবাচ্য। জৈন মতে জীব কখনোই চেতনাহীন হয় না। জীব জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা। জীবের লক্ষণে উমাস্বাতি তাঁর তত্ত্বার্থসূত্র গ্রন্থে বলেছেন- "উপযোগো লক্ষণং"। অর্থাৎ যা উপযোগ লক্ষণ বিশিষ্ট, তাই হল জীব।[৭] যার দ্বারা প্রতিটি বস্তুর চেতন ও অচেতনের স্বতন্ত্রীকরণ বা পৃথকীকরণ করা হয়, সেই যে বস্তুর স্বরূপের জ্ঞান, তাকে বলা হয় উপযোগ। এই উপযোগ সাকার ও নিরাকার ভেদে দ্বিবিধ। জ্ঞান উপযোগকে বলা হয় সাকার ও দর্শন উপযোগকে বলা হয় নিরাকার। জ্ঞান উপযোগ হল আটটি- মতিজ্ঞানোপযোগ, শ্রুতজ্ঞানোপযোগ, অবধিজ্ঞানোপযোগ, মনঃপর্যায়জ্ঞানোপযোগ, কেবলজ্ঞানোপযোগ, মত্যজ্ঞানোপযোগ, শ্রুতাজ্ঞানোপযোগ এবং বিভঙ্গজ্ঞানোপযোগ। আবার দর্শন উপযোগ চারটি- চক্ষু দর্শনোপযোগ অচক্ষু দর্শনোপযোগ, অবধি দর্শনোপযোগ এবং কেবল দর্শনোপযোগ।[৮]

জীবের স্বরূপ প্রসঙ্গে তত্ত্বার্থসূত্রে বলা হয়েছে- "ঔপশমিক-ক্ষায়িকৌ ভাবৌ মিশ্রশ্চ জীবস্য স্বতত্ত্বমৌদয়িক- পারিনামিকৌ চ"। অর্থাৎ ঔপশমিক, ক্ষায়িক, মিশ্র, ঔদয়িক ও পারিণামিক- এই পাঁচটি ভাব হল জীবের স্বরূপ।[৯] যে অবস্থা জীবের কর্ম দমনের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাকে বলে ঔপশমিক ভাব। এই অবস্থায় কষায়গুলি নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে সেগুলি একেবারে নষ্ট হয়ে যায় না। ফলে জীবের মধ্যে সম্যকত্ব ও চারিত্র লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় ভাব হল ক্ষায়িক। প্রথম স্তরটি থেকে উন্নত হয়ে জীব আরও অগ্রসর হলে তার পক্ষে কর্মকে অপসারণ করা সম্ভব হয়, এই ভাবই হল ক্ষায়িক ভাব। যেহেতু কর্মের বন্ধন থাকে না, তাই এই স্তরে সব কিছুর উন্নতি হয়। জ্ঞান, দর্শন, দান, লাভ, ভোগ, উপযোগ, বীর্য, সম্যকত্ব ও চারিত্র- এই

নয়টি হলো ক্ষায়িক ভাব। কর্ম আংশিক নিয়ন্ত্রিত হলে এবং আংশিক বর্জিত হলে জীবের সেই অবস্থাকে বলা হয় মিশ্রভাব। চার প্রকার জ্ঞান (মতিজ্ঞান, শ্রুতজ্ঞান, অবধিজ্ঞান, মনঃপর্যায় জ্ঞান), তিন প্রকার অজ্ঞান (মত্যজ্ঞান, শ্রুতাজ্ঞান ও বিভঙ্গজ্ঞান), তিন প্রকার দর্শন (চক্ষু দর্শন, অচক্ষু দর্শন ও অবধি দর্শন), পাঁচ প্রকার লবধি (দান লবধি, লাভ লবধি, ভোগ লবধি, উপভোগ লবধি এবং বীর্য লবধি), সম্যকত্ব, চারিত্র ও সংযমাসংযম- এ আঠারোটি হল মিশ্র ভাব বা ক্ষায়োপশমিক ভাব। জীব নিজের চেষ্টায় যে সকল কর্মগুলিকে দমন করে রাখে বা যে সকল কর্মগুলিকে নিজের চেষ্টায় বর্জন করে সেগুলি পুনরায় উদিত হয় এবং তাদের ফল উৎপন্ন করে, এরূপ স্তরকে বলা হয় ঔদয়িক ভাব। চার প্রকার গতি (নরক গতি, তির্যক গতি, মনুষ্য গতি ও দেব গতি), চার প্রকার কষায় (ক্রোধ, মান, লোভ ও মায়া), তিন প্রকার লিঙ্গ (স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ ও নপুংসক লিঙ্গ), মিথ্যা দর্শন, অজ্ঞান, অসংযম, অসিদ্ধভাব এবং ছয় প্রকার লেশ্যা (কৃষ্ণ লেশ্যা, নীল লেশ্যা, কপোত লেশ্যা, তেজো লেশ্যা এবং শুক্ল লেশ্যা)- এই একুশটি হল ঔদয়িক ভাব। সর্বশেষ অবস্থা তথা সর্বশেষ ভাব হল পারিণামিক ভাব। এটি হল জীবের স্বাভাবিক প্রবণতার স্তর, যা কর্ম বিনষ্ট করতে পারে না। যেমন- তার আধ্যাত্মিক স্বরূপ, মোক্ষের সামর্থ্য বা অসামর্থ্য প্রভৃতি।জীবত্ব, ভব্যত্ব ও অভব্যত্ব- এই তিনটি হল পারিণামিক ভাব।

উমাস্বাতি তাঁর তত্ত্বার্থসূত্র গ্রন্থে জীবের প্রকারভেদ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন- "সংসারিনো মুক্তাশ্চ"। অর্থাৎ জীব দুই প্রকার-সংসারী ও মুক্ত।[১০] যে সকল জীব সংসার বন্ধনে আবদ্ধ থাকে বা জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হতে থাকে, তারা সংসারী জীব। অর্থাৎ সংসারী জীব জন্ম থেকে জন্মান্তরে বিচরণশীল। অপরক্ষেত্রে যারা পদার্থকে ক্ষয় করে জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে নিজেদের মুক্ত করেছেন, তারা হলেন মুক্তজীব। সংসারী জীবকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে- সমনস্ক ও অমনস্ক। সমনস্ক জীবের চিন্তন ক্ষমতা আছে। অমনস্ক জীবের চিন্তন ক্ষমতা নেই। আরও অন্য এক দিক থেকে সংসারী জীব দ্বিবিধ- ত্রস ও স্থাবর। যে সকল জীব গতিশীল, অর্থাৎ যারা নড়াচড়া করতে পারে তারা হল ত্রস। ত্রস জীব দ্বিবিধ- বিকলেন্দ্রীয় ও সকলেন্দ্রিয়। দ্বীন্দ্রিয় থেকে চতুরিন্দ্রিয় জীবকে বলা হয় বিকলেন্দ্রীয় জীব এবং পঞ্চেন্দ্রিয় জীবকে বলা হয় সকলেন্দ্রিয় জীব। দ্বীন্দ্রিয়- স্পর্শ ও রসনা- শঙ্খ, শামুক। ত্রিন্দ্রিয়- স্পর্শ, রসনা ও ঘ্রাণ- পিপীলিকা, জোঁক। চতুরিন্দ্রিয়- স্পর্শ, রসনা, ঘ্রাণ ও চক্ষু- মৌমাছি, মাছি। পঞ্চ ইন্দ্রিয়- স্পর্শ, রসনা, ঘ্রাণ, চক্ষু ও কর্ণ- মানুষ, পশু, পক্ষী।[১১] যে সকল জীব গতিহীন, অর্থাৎ যারা নড়াচড়া করতে পারে না তারা হল স্থাবর। স্থাবর জীব একেন্দ্রীয় বিশিষ্ট হয় এবং এদের শুধুমাত্র স্পর্শ অনুভূতি আছে। এদের চেতনা সবচেয়ে নিম্ন স্তরের হয়। উমাস্বাতি তাঁর তত্ত্বার্থসূত্রে স্থাবর জীবকে তিন প্রকার বলেছেন- পৃথিবীকায়িক, জলকায়িক ও বনস্পতিকায়িক।[১২] তবে সিদ্ধসেন গণী ও অন্যান্য জৈন দার্শনিকদের মতে বায়ুকায় ও তেজোকায়ও স্থাবর জীবের অন্তর্ভুক্ত।

অজীব:

জৈন মতে অজীব হল চেতনহীন জড়। আত্মা বা জীব সম্পর্কে যেমন দার্শনিকদের অভিমত ভিন্ন ভিন্ন তেমনি জড় সম্পর্কেও দার্শনিকদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত লক্ষ্য করা যায়। যেমন- চার্বাক দর্শন জড়বাদী দর্শন নামে পরিচিত। এ প্রসঙ্গে বলতে হয়, যে মতবাদ জগৎ ও জীবনকে কেবল জড়ের সাহায্যে ব্যাখ্যা করে বা জীবনকে জড়ের রূপান্তর বলে বর্ণনা করে, সেই মতবাদকে বলা হয় জড়বাদ। চার্বাক মতে জড়তত্ত্বই একমাত্র সত্য। এই মতে চেতনাও জড় থেকে উৎপন্ন হয় এবং তা জড়েরই গুন বা ধর্ম বিশেষ। বৌদ্ধ সৌত্রান্তিক ও বৈভেষিকগণ হলেন বস্তুবাদী। অর্থাৎ এরা মন-নিরপেক্ষভাবে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। বিজ্ঞানবাদ অনুযায়ী বিজ্ঞান বা চেতনায় একমাত্র সত্য এবং মাধ্যমিক শূন্যবাদ অনুযায়ী সকল প্রকার তত্ত্ব শূন্য। এছাড়াও ন্যায়-বৈশেষিক মতে সাবয়ব পদার্থ পরমাণুর সৃষ্টি। এই মতে পার্থিব, জলীয়,

তৈজস ও বায়বীয় ভেদে পরমাণু চর্তুবিধ। এই চর্তুবিধ পরমাণু থেকেই জাগতিক স্থূল বস্তুর উৎপত্তি হয়। সাংখ্য মতে প্রকৃতি হল জগতের আদি উপাদান ও অধিষ্ঠান। এই মতে বিচিত্র জগৎ প্রকৃতির পরিনাম ছাড়া আর কিছুই নয়। একইভাবে মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শনেও এ বিষয়ে নিজস্ব মতামত লক্ষ্য করা যায়।

জৈন মতে জীবের মত অজীবও সৎ। জীবের লক্ষণের বিপরীত লক্ষণই অজীব। অর্থাৎ অজীব হল চেতনাহীন জড়। তত্ত্বার্থসূত্র অনুযায়ী - "অজীবকায়া ধর্মাধর্মাকাশপুদগলাঃ"। অর্থাৎ ধর্ম, অধর্ম আকাশ ও পুদগল - এই চারটি হল অজীবকায়।[১৩] আমরা সাধারণত ধর্ম ও অধর্ম শব্দ দুটিকে 'পূণ্য' ও 'পাপ' অর্থে ব্যবহার করে থাকলেও জৈন দর্শনে অজীব তত্ত্ব রূপে ধর্ম হল 'গতি' ও অধর্ম হল 'স্থিতি'। জৈন মতে ধর্ম হল গতির অনুকূল, তা গতিকে সম্ভব করে তোলে। অধর্ম হল স্থিতির অনুকূল। তবে ধর্ম ও অধর্ম গতি ও স্থিতির সহায়ক হলেও এরা গতি ও স্থিতির উৎপাদক নয়; আবার ধর্ম ও অধর্ম গতি ও স্থিতির সহকারী কারণ মাত্র, মুখ্য কারণও নয়। আকাশ হল বিস্তৃতিযুক্ত দ্রব্যের অধিষ্ঠান। জৈন মতে কাল ছাড়া সকল দ্রব্যই বিস্তৃতি যুক্ত। ফলে কাল ছাড়া সকল দ্রব্যের আশ্রয় হল আকাশ। তাই বলা যায়, এমন কিছু নেই যা আকাশে অবস্থান করে না। আকাশ সর্বত্র বিরাজমান। আকাশকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করা যায় না। বস্তুর বিস্তৃতি দেখে আকাশের অস্তিত্ব অনুমান করতে হয়। জৈন মতে আকাশ দ্বিবিধ- লোকাকাশ ও আলোকাকাশ। লোকাকাশ বিস্তৃতিযুক্ত দ্রব্যের অধিষ্ঠান এবং আলোকাকাশ বস্তুশূন্য। পুদগল হল চেতনাহীন জড়দ্রব্য, যে দ্রব্য সংযোগ ও বিভাগযোগ্য (পুরয়ন্তি গলন্তি চ) তাই পুদগল।[১৪] দ্রব্যের দুটি রূপ- অনু ও সংঘাত বা স্কন্ধ। একটি জড় দ্রব্যকে ক্রমাগত বিভাগ বা বিশ্লেষণ করলে যে ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য কণা পাওয়া যায়, তাই হল অনু এবং একাধিক অনুর সমন্বয়ে উৎপন্ন হয় সংঘাত বা স্কন্ধ। ঘট, পট আদির মতো সকল স্থূল দ্রব্য হল সংঘাত। আবার কোন কোন জৈন দার্শনিক জীব ও অজীবএই দুটি তত্ত্বকে স্বীকার করে কালকে অজীব তত্ত্বের অন্তর্গত করেছেন। তাদের মতে কাল হল অনস্তিকায় অজীব দ্রব্য। উমাস্বাতী তাঁর তত্ত্বার্থসূত্রে বলেছেন- স্থায়িত্ব, পরিবর্তন, গতি, নতুন গুণের সংযোজন ও পুরাতন গুণের পরিবর্তন কালের জন্য সম্ভব।[১৫] জৈন মতে কাল নিত্য ও অবিভাজ্য। কাল দেশ বা স্থান অধিকার করে থাকে না বা তার দ্বারা সীমিতও নয়। এই জন্যই কালকে অনস্তিকায় বা বিস্তৃতিহীন দ্রব্য বলা হয়। পারমার্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে কাল এক, অবিভাজ্য ও নিত্য হলেও ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে কাল দিন, ক্ষণ, প্রহর প্রভৃতিতে বিভক্ত ।

উপসংহার:

জৈন দর্শন হল ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্যের একটি প্রাচীন ও স্বতন্ত্র দর্শন। যেখানে বিশ্বজগতের প্রকৃতি, জীবনের উদ্দেশ্য ও মোক্ষ লাভ সম্পর্কে একটি সুসংহত ও যুক্তি নির্ভর ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। এই মতে সমগ্র বিশ্বজগত দুটি মৌলিক তত্ত্বের সমন্বয়ে গঠিত- জীব ও অজীব। জীব হল চৈতন্য সম্পন্ন এবং অজীব হল জীবের বিপরীত তথা চেতনাহীন। এই দুই তত্ত্বের পারস্পারিক সম্পর্কই বিশ্বজগতের গঠন ও পরিবর্তন ব্যাখ্যা করে। জৈন মতে জীব স্বরূপত অনন্তজ্ঞান, অনন্তদর্শন, অনন্তআনন্দ ও অনন্ত শক্তির অধিকারী। কিন্তু সংসারী জীব তার এই প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেনা, কারণ সে কর্মবন্ধনের আবদ্ধ থাকে। কর্ম জীবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জীবকে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবদ্ধ করে রাখে। অন্যদিকে পুদগল, ধর্ম, অধর্ম ও আকাশ- এই চারটি হল অজীব তত্ত্ব। পুদগল ভৌত জগতের গঠনমূলক উপাদান হিসেবে কাজ করে, ধর্ম গতির নিয়ামক ও অধর্ম স্থিতির নিয়মক এবং আকাশ কাল ছাড়া সকল বিস্তৃতিযুক্ত দ্রব্যের অধিষ্ঠান- এভাবে জৈন দার্শনিকরা বিশ্বজগতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপে ব্যাখ্যা করেছেন, যেখানে কোন সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বরের প্রয়োজন স্বীকার করা হয় না। এছাড়াও জীব ও অজীব এই দুই তত্ত্বের পারস্পরিক সম্পর্ক জৈন দর্শনের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গিকেউ গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। যেহেতু জৈন মতে সকল জীবের মধ্যে আত্মা বিদ্যমান

এবং প্রত্যেক জীবের মধ্যেই মুক্তি লাভের সম্ভাবনা থাকে, তাই এই দর্শনে সকল জীবের প্রতি সহমর্মিতা ও সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এভাবেই অহিংসা জৈন নীতিতত্ত্বের কেন্দ্রীয় নীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অহিংসা কেবল মানুষের প্রতি নয় বরং সকল জীবের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তাতে সে যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি জৈন দর্শনকে মানবতাবাদী ও পরিবেশ সংবেদনশীল দর্শনে পরিণত করেছে।

তথ্যসূত্র:

১. বাগচী, দীপক কুমার। (২০১৪), ভারতীয় নীতিবিদ্যা। প্রগতিশীল প্রকাশক, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা, পৃ. ৯৭।
২. তত্ত্বার্থসূত্র, ১/১
৩. তদেব, ১/২
৪. তত্ত্বার্থবৃত্তি, ১/২
৫. তত্ত্বার্থসূত্র, ১/৪
৬. মন্ডল, প্রদ্যোত কুমার। (২০০৮) ভারতীয় দর্শন। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৮১।
৭. তত্ত্বার্থসূত্র, ২/৮
৮. তদেব, ২/৯
৯. তদেব, ২/১
১০. তদেব, ২/১০
১১. ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র। (২০১৩), ভারতীয় দর্শন। বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ১১৯।
১২. তত্ত্বার্থসূত্র, ২/১৩
১৩. তদেব, ৫/১
১৪. মন্ডল, প্রদ্যোত কুমার। (২০১৪), ভারতীয় দর্শন। প্রগতিশীল প্রকাশক, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা, পৃ. ১২৩।
১৫. Chatterjee and Dutta, S.C. and D.M. An Introduction To Indian Philosophy (1984). C.U., P- 97.

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১. ভট্টাচার্য, অমিত। জৈন দর্শন। সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ২০০৩।
২. মুণিজী, শ্রী সুজয়। জৈন ধর্ম ও শাসনাবলী। শ্রী অখিল ভারতীয় স্বারক জৈন সংগঠন, প্রথম সংস্করণ ৬ই মে, ২০০০।
৩. সেন, অমূল্যচন্দ্র। জৈন ধর্ম। বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ, প্রথম প্রকাশ ১৩৫৮, শ্রাবণ।
৪. চক্রবর্তী, সত্যজ্যোতি। (অনুদিত) মাধবাচার্যের সর্বদর্শন সংগ্রহ। প্রথম খন্ড ১৩৮৩, দ্বিতীয় খন্ড ১৩৬৩।
৫. ব্রহ্মচারী, শ্রী নিরঞ্জন স্বরূপ। জৈন দর্শনের দিগদর্শন। সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা, ১৯৭৫।
৬. গুপ্ত, দীক্ষিত। নীতিবিদ্যা। পরিবেশক প্রেস, প্রথম প্রকাশ ২০০৩ ।
৭. সাধুখাঁ, সঞ্জিত কুমার (বঙ্গানুবাদ)। সর্বদর্শন সংগ্রহ (সায়ন মাধবীয়)।সদেশ, কলকাতা ২০১১।
৮. মন্ডল, প্রদ্যোত কুমার। ভারতীয় দর্শন। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা- ৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৮।

৯. বাগচী, দীপক কুমার। ভারতীয় নীতিবিদ্যা। প্রগতিশীল প্রকাশক, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা- ৭৩, চতুর্থ সংস্করণ, অক্টোবর, ২০১৪।

১০. ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র। ভারতীয় দর্শন। বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, ২০১৩।

১১. Bhargava, Dayananda. Jain Ethics. Motilal Banarsidass, Delhi, Vanarasi, Patna, First edition - 1968.

১২. Williams, R. Jain Yoga. London, Oxford University Press, New York, Toronto - 1963.

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1609-1615
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.382

সাঁওতাল সমাজে রাজনৈতিক সংস্কৃতির বহুরূপতা: পুরুলিয়া জেলার প্রেক্ষাপটে ঐতিহ্য ও রূপান্তর

রূপসিং টুডু, *রিসোর্স পারসেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ (সাঁওতালি মাধ্যম), সাধু রামচাঁদ মুর্মু বিশ্ববিদ্যালয় ঝাড়গ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 23.03.2026; Accepted: 26.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Political culture plays an important role in shaping the political behaviour, attitudes and values of any society. Political culture among the Santals has traditionally been rooted in Community based governance, collective decision making and adherence to customary laws. What this paper intends to explore the dynamic nature of political culture in santal society with special reference to Purulia district of West Bengal by analysing the interaction between traditional governance structures and modern democratic institution. The study highlights the role of customary institutions such as the Majhi-Pargana system, which historically governed social order, conflict resolution and collective participation and analyse their interaction with formal democratic structures like Panchayet Raj Institution. In this particular system different administrative, social and religious responsibility are taken and this role are played by Majhi, Jogmajhi, Naike, Godet and Bhadda. It argues that particular culture in santal society is neither static nor wholly assimilated into main stream political frameworks; rather, it reflects a hybrid form where tradition and modernity coexist and negotiate with each other. Factor such as education, state policies, political mobilisation and socio-economic changes have significantly influenced this transformation. Special attention is given to the changing role of marginalized groups, particularly women and youth whose participation in political process is gradually increasing. This paper explores traditional governance institutions and modern political institutions coexist in santal society. By focusing on the Purulia district, the study highlights the dynamic relationship between tradition and transformation in the political culture of indigenous communities.

Keywords: Santal society, Political culture, Political Institution, Transformation, Purulia

ভারতবর্ষের সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামো বহুমাত্রিক ও বহুসাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ, যেখানে আদিবাসী সমাজগুলি একটি স্বতন্ত্র ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এই প্রেক্ষাপটে সাঁওতাল সমাজ শুধুমাত্র একটি জাতিগত গোষ্ঠী নয়, বরং একটি সুসংগঠিত সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর ধারক ও বাহক, যা দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গড়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলা, যা ভৌগোলিকভাবে জঙ্গলমহলের অন্তর্গত, সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর বসবাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। এই

অঞ্চলের সাঁওতাল সমাজের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ঐতিহ্য, প্রথা, বিশ্বাস এবং আধুনিক রাজনৈতিক প্রভাবের সংমিশ্রণে একটি গতিশীল রূপ ধারণ করেছে।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে সাধারণত একটি সমাজের মানুষের রাজনৈতিক মূল্যবোধ, বিশ্বাস, আচরণ এবং প্রতিষ্ঠানগত অংশগ্রহণের ধরণকে বোঝানো হয়। সাঁওতাল সমাজে এই রাজনৈতিক সংস্কৃতি মূলত তাদের নিজস্ব প্রথাগত প্রতিষ্ঠান— যেমন 'মাঝি-পারগানা' ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। এই ব্যবস্থা শুধুমাত্র প্রশাসনিক কাঠামো নয়, বরং এটি সামাজিক ন্যায়বিচার, সংঘাত নিরসন এবং সামষ্টিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ঐতিহ্যগতভাবে এই প্রতিষ্ঠানগুলি স্বনির্ভর ও গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, যেখানে সম্প্রদায়ের সকল সদস্যের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

তবে, উপনিবেশিক শাসন, আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার বিস্তার এবং গণতান্ত্রিক রাজনীতির প্রসারের ফলে সাঁওতাল সমাজের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ব্রিটিশ শাসনামলে ভূমি রাজস্ব নীতি এবং প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ সাঁওতালদের প্রথাগত শাসনব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছিল। স্বাধীনতার পর ভারতীয় সংবিধানের পঞ্চম তফসিল এবং বিভিন্ন নীতিমালা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রণীত হলেও, বাস্তবক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন এবং প্রথাগত শাসনব্যবস্থার মধ্যে একটি দ্বৈততা ও টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়েছে।

বর্তমান সময়ে পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থা, নির্বাচনভিত্তিক রাজনীতি এবং রাজনৈতিক দলগুলির ক্রমবর্ধমান প্রভাব সাঁওতাল সমাজের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে নতুনভাবে রূপান্তরিত করছে। একদিকে আধুনিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি সাঁওতালদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করেছে, অন্যদিকে এটি তাদের ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠানগুলির প্রভাবকে কিছুটা ক্ষয় করেছে। এই পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ, যুবসমাজের ভূমিকা এবং শিক্ষা ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিশেষত, সাঁওতাল নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা ঐতিহ্যগত পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করছে।

পুরুলিয়া জেলার সাঁওতাল সমাজে এই ঐতিহ্য ও আধুনিকতার পারস্পরিক ক্রিয়া একটি জটিল রাজনৈতিক বাস্তবতা তৈরি করেছে। এখানে প্রথাগত মূল্যবোধ ও আধুনিক রাজনৈতিক চেতনার মধ্যে একটি সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়, যা কখনও সহযোগিতামূলক, আবার কখনও দ্বন্দ্বপূর্ণ। এই দ্বৈততা সাঁওতাল সমাজের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে একটি পরিবর্তনশীল ও গতিশীল রূপ প্রদান করেছে।

রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারণা:

রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারণাটি মূলত পশ্চিমা রাজনৈতিক তত্ত্বে বিকশিত হলেও, আদিবাসী সমাজের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ একটি বিশেষ ব্যখ্যার দাবী রাখে। রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত নাগরিকদের রাজনৈতিক মূল্যবোধ, মনোভাব, আবেগ ও বিশ্বাসের সমষ্টিকেই বোঝায়। অন্যভাবে বলা যায় কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নাগরিকগন কিভাবে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করছে, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃত্বের প্রতি তাদের মনোভাব বা অনুভুতি কি রকম, রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষও নাগরিকদের প্রতি কিরূপ আচরণ করছে তার সামগ্রিক যোগফলই হল রাজনৈতিক সংস্কৃতি। রাজনৈতিক সংস্কৃতি মূলত তিনটি প্রধান উপাদানের সমন্বয়ে গড়ে উঠে। যথা- ১. রাজনৈতিক মূল্যবোধ, ২. রাজনৈতিক বিশ্বাস, ৩. রাজনৈতিক আচরণ।

সাঁওতাল সমাজে রাজনৈতিক সংস্কৃতি সাধারণত তাদের সমাজ কাঠামো, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং প্রথাগত নিয়ম-নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে। তাদের সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক সংহতি, পারস্পারিক সহযোগিতা ও সমষ্টিগত সিদ্ধান্ত গ্রহন রাজনৈতিক সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ঐতিহ্যগত রাজনৈতিক কাঠামো:

সাঁওতাল সমাজের রাজনৈতিক সংস্কৃতির মূল ভিত্তি তাদের ঐতিহ্যগত শাসনব্যবস্থা, যা আদিকাল থেকে বিকশিত হয়ে একটি সুসংগঠিত সামাজিক কাঠামো হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই ঐতিহ্যগত রাজনৈতিক কাঠামো শুধুমাত্র প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি সামাজিক নিয়ন্ত্রন, ন্যায়বিচার, সাংস্কৃতিক সংহতি এবং সম্প্রদায়িক পরিচয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এই কাঠামোকে বোঝার জন্য সাঁওতাল সমাজের জীবনযাত্রা, বিশ্বাস, প্রথা এবং সামাজিক সম্পর্কের সঙ্গে গভীর সংযোগ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

আদিবাসী সাঁওতাল সমাজের রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রধানত গ্রাম্যকেন্দ্রিক এবং তাদের ঐতিহ্যবাহী সামাজিক প্রতিষ্ঠান গুলোর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। তাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রাচীনকাল থেকেই প্রবহমান এবং এটি সমাজ জীবনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। প্রতিটি সাঁওতাল গ্রামে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সুসংগঠিত নেতৃত্বের কাঠামো বিদ্যমান যা গ্রামের সামাজিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করে। যিনি গ্রামের এই দায়িত্ব সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করে তাকে গ্রামপ্রধান বা মাঝি বলা হয়। মাঝি মূলত গ্রামবাসীদের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন এবং বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা বা বিরোধ 'কুলহি দুড়ুপ' এর মাধ্যমে সমাধান করেন। এই প্রক্রিয়াটি মূলত ঐকমতের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে। তাছাড়া গডেৎ নামক একজন ব্যক্তি গ্রামের সংবাদ বাহক হিসেবে কাজ করেন এবং বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বা সংবাদ গ্রামবাসীদের কাছে পৌঁছে দেন। গ্রামের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য নায়কে থাকেন। গ্রামের যুবসমাজকে সঠিক নির্দেশদান বা সংগঠিত রাখার জন্য জগমাঝি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই সকল নেতৃত্ব কেবল ক্ষমতার প্রতীক নয়; বরং এটি সামাজিক দায়িত্ব ও নৈতিক কর্তব্যের প্রতিফলন। তাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সাংস্কৃতিক চর্চার সঙ্গে গভীর ভাবে সম্পর্কিত। বিভিন্ন উৎসব, আচার-অনুষ্ঠান ও সামাজিক প্রথা রাজনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত।

আধুনিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও তার প্রভাব:

ভারতীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিকাশ স্বাধীনতার পর গনতান্ত্রিক শাসন কাঠামোর সম্প্রসারণ সাঁওতাল সমাজের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা যায়। বিশেষ করে সাংবিধানিক গনতন্ত্র, নির্বাচনী ব্যবস্থা, স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে আধুনিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার প্রবেশ ঘটে। পুরুলিয়া জেলার সাঁওতাল সমাজও এই বৃহত্তর পরিবর্তনের বাইরে নয়; বরং এই পরিবর্তন এক জটিল সামাজিক ও রাজনৈতিক পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, যেখানে ঐতিহ্যগত ও আধুনিক উভয় উপাদান একসাথে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

আধুনিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অন্যতম প্রধান উপাদান হল নির্বাচনী গনতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যা সাঁওতাল সমাজের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রকে ব্যপকভাবে প্রসারিত করেছে। পূর্বে যেখানে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ মূলত গ্রামভিত্তিক ঐতিহ্যগত কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, সেখানে এখন সাঁওতালরা পঞ্চায়েত, বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে। এটি কেবল ভোটদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলির সাথে সম্পৃকতা, নির্বাচনী প্রচার প্রার্থী নির্বাচনের প্রক্রিয়াতেও তাদের

ভূমিকা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেলেও একই সঙ্গে দলীয় বিভাজন এবং প্রতিযোগিতার এক নতুন সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, যা ঐতিহ্যগত সামাজিক ঐক্যের উপর প্রভাব ফেলছে।

পঞ্চায়েতরাজ ব্যবস্থা আধুনিক রাজনৈতিক কাঠামোর এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে সাঁওতাল সমাজে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে স্থানীয় স্তরে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটেছে এবং প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক সিদ্ধান্তগ্রহন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ এনেছে। গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের মাধ্যমে সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়ন, সম্পদ বণ্টন এবং উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রনয়নে স্থানীয় জনগনের ভূমিকা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এই রাজনৈতিক কাঠামো ঐতিহ্যগত মাঝি-পারগানা ব্যবস্থার সঙ্গে একটি দ্বৈত সম্পর্ক তৈরি করেছে। অনেক ক্ষেত্রে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে ঐতিহ্যগত নেতৃত্বের মধ্যে সংঘাত দেখা দেয়, আবার অনেক ক্ষেত্রে তারা পারস্পারিক সহযোগিতার মাধ্যমে একটি সমন্বিত শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলে।

আধুনিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সাঁওতাল সমাজের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে এক গভীর ও বহুমাত্রিক রূপান্তরের মধ্যদিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এটি একদিকে যেমন রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, প্রতিনিধিত্ব ও উন্নয়নের সম্ভাবনা সৃষ্টি করছে অন্যদিকে তেমনি নতুন চ্যালেঞ্জও তৈরি করছে। যেমন সামাজিক বিভাজন ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন। এই দ্বৈত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সাঁওতাল সমাজ এক নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতার দিকে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে।

রাজনৈতিক অংশগ্রহণে পরিবর্তন ও নতুন প্রবনতা:

সাঁওতাল সমাজে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ঐতিহ্যগতভাবে একটি সমষ্টিভিত্তিক ও প্রথাভিত্তিক প্রক্রিয়া ছিল, যেখানে ব্যক্তি নয়; বরং গোটা সম্প্রদায় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহনে অংশগ্রহণ করত। মাঝি-পারগানা ব্যবস্থার অধীনে গ্রামসভার মতো অনানুষ্ঠানিক প্ল্যাটফর্মে আলোচনা, মতবিনয় এবং ঐক্যমতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তগ্রহন ছিল অংশগ্রহণের প্রধান রূপ। এই ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের পরিধি সীমিত থাকলেও গভীরতা ছিল অধিক। কারন প্রত্যেক সদস্য নিজেকে সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করত এবং সামাজিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকত।

সাঁওতাল সমাজে আধুনিক গনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিস্তারের ফলে রাজনৈতিক অংশগ্রহণে মৌলিক পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। শিক্ষার প্রসার রাজনৈতিক অংশগ্রহণের পরিবর্তনে একটি প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। শিক্ষিত তরুন প্রজন্ম এখন রাজনৈতিক অধিকার, সাংবিধানিক ব্যবস্থা ও গনতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পর্কে অধিক সচেতন। তারা শুধুমাত্র ভোটদানে সীমাবদ্ধ নয়; বরং বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক ইস্যুতে সক্রিয়ভাবে মতপ্রকাশ এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণ করছে। নতুন প্রজন্ম সামাজিক মাধ্যম ও আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিসরের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে, যা তাদের রাজনৈতিক চেতনা এবং অংশগ্রহণকে আরও বিস্তৃত করছে।

রাজনৈতিক অংশগ্রহণ পরিবর্তনে অভিবাসনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জীবিকার তাগিদে গ্রাম্য জীবন ত্যাগ করে শহুরে জীবনযাপনের ফলে সাঁওতালরা নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে পরিচিতি হচ্ছে। এই পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক মতাদর্শ, সংগঠন ও নাগরিক আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ফলে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই অভিজ্ঞতা যখন তারা শহর ছেড়ে গ্রামে আসছে তখন তা স্থানীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে নতুন চিন্তার সঞ্চার ও অংশগ্রহণে অন্যরূপ দেখা যাচ্ছে।

নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণে বৃদ্ধি এই রাজনৈতিক পরিবর্তনের এক উল্লেখযোগ্য দিক। সাঁওতাল সমাজে নারীরা সামাজিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক নেতৃত্বে তাদের উপস্থিতি সীমিত ছিল। কিন্তু পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় সংরক্ষণের ফলে তারা এখন নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে। যদিও বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ সীমাবদ্ধ তবুও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক রূপান্তরের সুচনা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সহাবস্থান:

সাঁওতাল সমাজের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিশ্লেষণ করতে গেলে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে তা হল- এটি কোনো একরৈখিক বা দ্বৈত বিভাজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, যেখানে ঐতিহ্য এবং আধুনিকতা একে অপরের বিপরীত শক্তি হিসেবে কাজ করে। বরং বাস্তবে দেখা যায়, এই দুই ধরনের উপাদান একটি জটিল পারস্পারিক সম্পর্কের মাধ্যমে এক নতুন ধরনের রাজনৈতিক বাস্তবতার সৃষ্টি করেছে; যাকে 'Hybrid Political culture' বলা যেতে পারে। এই হাইব্রিডিটি এমন এক প্রক্রিয়া যেখানে পুরাতন-নতুন, স্বদেশীয় এবং রাষ্ট্রিক, অনানুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক সব ধরনের উপাদান একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করে। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং গনতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামো সাঁওতাল সমাজে এক নতুন ধরনের রাজনৈতিক বাস্তবতা তৈরি করেছে। পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থা, নির্বাচনী প্রক্রিয়া এবং প্রশাসনিক কাঠামোর মাধ্যমে রাষ্ট্রের উপস্থিতি গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। এই কাঠামো নাগরিক অধিকার, প্রতিনিধিত্ব এবং উন্নয়ন মূলক সুযোগের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। ফলে সাঁওতাল সমাজের সদস্যরা এখন দ্বৈত রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে সহাবস্থান করছে- একদিকে ঐতিহ্যগত শাসনব্যবস্থা এবং অন্যদিকে আধুনিক রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা। এই দুই ব্যবস্থার মধ্যে কখনও সহযোগিতামূলক আবার কখনও সংঘর্ষমূলক সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যায় যে, পঞ্চায়েত ব্যবস্থার নির্বাচিত প্রতিনিধিরা স্থানীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মাঝি বা অন্যান্য পদাধিকারীদের সঙ্গে পরামর্শ করে। এরফলে সমন্বিত শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠে, যেখানে উভয় কাঠামো পরস্পর পরস্পরের সম্পূরক হিসেবে কাজ করে। এই হাইব্রিড রাজনৈতিক বাস্তবতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এর অভিযোজন ক্ষমতা। সাঁওতাল সমাজ আধুনিকতার প্রভাবকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেনি; বরং তা নিজেদের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে পুনর্নির্মাণ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, নির্বাচনী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করলেও অনেক ক্ষেত্রে প্রার্থীদের নির্বাচন বা সমর্থন নির্ধারণে ঐতিহ্যগত সামাজিক সম্পর্ক এবং নেতৃত্বে প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া তাদের সমাজের রাজনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা পরিবর্তনশীল সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশে নিজেদের টিকিয়ে রাখার জন্য তারা যে অভিযোজন কৌশল গ্রহন করেছে, তা তাদের সমাজকে একটি গতিশীল ও স্থিতিশীল অবস্থানে নিয়ে এসেছে।

চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা:

পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলা ভৌগলিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দিক থেকে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন অঞ্চল, যেখানে সাঁওতালসহ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বসবাস করে। এই অঞ্চলের রাজনৈতিক সংস্কৃতি অনুধাবন করার জন্য স্থানীয় বাস্তবতা, অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা, পরিবেশগত অবস্থা ও সামাজিক কাঠামোকে সমন্বিতভাবে বিশ্লেষণ করা একান্ত প্রয়োজন। এই প্রেক্ষাপটে সাঁওতাল সমাজের রাজনৈতিক রূপান্তর যেমন নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে, তেমনি একাধিক কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জও সামনে এনেছে।

প্রথমত, পুরুলিয়া জেলার অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ হল এর দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা। এই অঞ্চলটি খরাপ্রবন, কৃষিনির্ভর এবং শিল্পোনয়নের দিক থেকে তুলনামুলকভাবে অনেকটা পিছিয়ে। ফলে

সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ জীবিকার জন্য অনিশ্চয়তার মধ্যে বসবাস করে। তাই তাদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে সরাসরি প্রভাবিত করে, কারন জীবিকা নির্বাহের সংগ্রাম অনেক সময় রাজনৈতিক সচেতনতা এবং সক্রিয় অংশগ্রহণকে সীমিত করে দেয়।

দ্বিতীয়ত, পুরুলিয়া জেলার ভৌগলিক বিচ্ছিন্নতা অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। অনেক অধ্যুষিত গ্রাম আজ পর্যন্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার দিক থেকে উন্নত নয়, ফলে প্রশাসনিক পরিষেবা, তথ্যপ্রবাহ এবং রাজনৈতিক সচেতনতা গ্রামীণ স্তরে যথাযথভাবে পৌঁছতে পারে না। এই অবস্থায় সাঁওতাল সমাজ প্রায়শই রাষ্ট্রের মূল ধারার রাজনৈতিক কাঠামো থেকে আংশিকভাবে বিচ্ছিন্ন থেকে যায়। যার ফলে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পথে বাধার সৃষ্টি হয়।

তৃতীয়ত, শিক্ষা ও তথ্যপ্রাপ্তির সীমাবদ্ধতা পুরুলিয়া জেলার আদিবাসী সাঁওতাল সমাজে রাজনৈতিক বিকাশে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষার প্রসার ঘটেছে তবুও অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার মান এবং প্রাপ্যতা এখনও পর্যাপ্ত নয়। এর ফলে রাজনৈতিক অধিকার প্রশাসনিক প্রক্রিয়া এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্প সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা গড়ে উঠে না।

চতুর্থত, দলীয় রাজনীতির প্রভাবে তাদের সমাজে একটি দ্বৈত বাস্তবতা তৈরি হয়েছে। একদিকে যেরকম বৃহত্তর রাজনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি সম্প্রদায়ের অভন্ত্যরে বিভাজনের সৃষ্টি হয়েছে। ঐতিহ্যগতভাবে যেখানে সামাজিক ঐক্য এবং সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হত, সেখানে এখন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রভাবে সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে টানাপড়েন দেখা যাছে।

পঞ্চমত, ঐতিহ্যগত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যেমন মাঝি-পারগানা ব্যবস্থা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়া এক চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আধুনিক প্রশাসনিক কাঠামোর প্রভাব এবং তরুণ প্রজন্মের পরিবর্তিত মানসিকতার কারণে এই প্রথাগত ব্যবস্থার প্রভাব কিছু ক্ষেত্রে কমে যাচ্ছে। ফলে সামাজিক নিয়ন্ত্রন এবং মূল্যবোধের ধারাবাহিকতা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

তবুও এই সমস্ত চ্যালেঞ্জের মধ্যেও রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা রয়েছে। গনতান্ত্রিক কাঠামোর মাধ্যমে রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তির সুযোগ পাচ্ছে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় সংরক্ষণের ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে এখন শিক্ষিত যুবকদের একটি নতুন শ্রেণি তৈরি হচ্ছে, যারা নিজেদের সামাজিক পরিচয় বজায় রেখে আধুনিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করছে। স্থানীয় সমস্যা যেমন ভূমি অধিকার, বনসম্পদ এবং কর্মসংস্থানের প্রশ্নে আরও সংগঠিতভাবে দাবী জানাতে সক্ষম হচ্ছে।

উপসংহার:

এই গবেষণায় আলোচনার ভিত্তিতে স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার সাঁওতাল সমাজের রাজনৈতিক সংস্কৃতি একটি স্থির বা অপরিবর্তনীয় কাঠামো নয়; বরং এটি একটি ক্রমাগত পরিবর্তনশীল, অভিযোজনশীল এবং বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় মধ্যে একদিকে রয়েছে দীর্ঘকাল ধরে গড়ে ওঠা ঐতিহ্যগত মাঝি-পারগানা শাসনব্যবস্থা, অন্যদিকে রয়েছে আধুনিক রাষ্ট্রের প্রবর্তিত গনতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামো। এই দুই ধারার পারস্পারিক মিথস্ক্রিয়ার ফলেই তাদের সমাজে একটি স্বতন্ত্র 'হাইব্রিড রাজনৈতিক সংস্কৃতি' গড়ে উঠেছে যা, ঐতিহ্য ও আধুনিকতার কার্যকর সমন্বয়কে প্রতিফলিত করে। গনতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্তির ফলে পুরুলিয়া জেলার সাঁওতাল সমাজে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের পরিধি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, নির্বাচনী রাজনীতি এবং বিভিন্ন

উন্নয়নমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে তারা এখন রাষ্ট্রের মূল ধারার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়েছে। খরাপ্রবন পরিবেশ, কৃষিনির্ভর অর্থনীতি এবং অবকাঠামোগত পশ্চাদপদতার মধ্যে বসবাসকারী সাঁওতাল সম্প্রদায় তাদের সামাজিক কাঠামোর উপর দীর্ঘদিন নির্ভর করে এসেছে। তবে এই রূপান্তরকে শুধুমাত্র ইতিবাচক পরিবর্তন হিসেবে দেখা যায় না; এর সঙ্গে একাধিক চ্যালেঞ্জও যুক্ত রয়েছে। যেমন অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা, ভৌগলিক বিচ্ছিন্নতা, শিক্ষার সীমাবদ্ধতা এবং দলীয় রাজনীতির প্রভাব সাঁওতাল সমাজের রাজনৈতিক বিকাশে বিভিন্ন ধরনের বাধা সৃষ্টি করেছে। এই প্রেক্ষাপটে তাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বোঝার জন্য একটি সমন্বিত এবং সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। শুধুমাত্র আধুনিক প্রশাসনিক কাঠামো বা উন্নয়নমূলক নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে এই সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়; বরং তাদের ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং স্বদেশীয় কাঠামোকে সমান গুরত্ব দিতে হবে। মাঝি-পারগানা প্রথার মতো ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠানগুলিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা না করে আধুনিক শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সমন্বয় সাধন প্রয়োজন।

সবশেষে বলা যায় যে, পুরুলিয়া জেলার সাঁওতাল সমাজের রাজনৈতিক সংস্কৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, যেখানে ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রাখার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। এই ভারসাম্য রক্ষা করা ভবিষ্যতের জন্য অতন্ত্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর মাধ্যমেই টেকসই, ন্যায় ভিত্তিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। এই প্রবন্ধে এটাই বোঝার প্রাথমিক প্রচেষ্টা, যা ভবিষ্যতে আরও গভীর গবেষণার জন্য নতুন দিকনির্দেশনা প্রদান করতে পারে।

তথ্যসূত্র:

১. মহাপাত্র, অনাদিকুমার। রাজনীতিক সমাজতত্ত্ব। সুহৃদ পাব্লিকেশন, ১৯৯৭, কলকাতা, পৃ. ৩৬৫-৩৮৪।

২. মুখোপাধ্যায়, চণ্ডীদাস। সমাজতত্ত্ব ও ভারতীয় সমাজ। প্রগতিশীল প্রকাশক, ২০১১, কলকাতা, পৃ. ১৭০-১৭৩।

৩. মজুমদার, দীপিকা। রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব। প্রগতিশীল প্রকাশক, ২০১৭, কলকাতা, পৃ. ১৮৩-২০৪।

৪. খান, ইয়াসিন, সম্পাদনা। রাজনৈতিক সমাজ তত্ত্ব ও বাস্তব। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০২২, কলকাতা, পৃ. ১৬৯-১৭৪।

৫. স্ক্রেফসরুড, রেভারেন্ড এল.ও। হড়কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়াঃ কাথা। পশ্চিমবঙ্গ সান্তালি অ্যাকাদেমি, ২০১০, কলকাতা।

৬. মুরমু, রামেশ্বর। জাহের বঙ্গা সান্তাড়ক। আদিম পাবলিকেশন, নিউ আলিপুর।

৭. সরেন, লক্ষণ। সাঁওতাল সমাজতত্ত্ব, শারদীয়া আদিবাসী জগৎ পত্রিকা, অক্টোবর ২০০১, বালি হাওড়া।

৮. Saren, Baidyanath. The Kherwal: Ancient History of the Santals. Adibasi Socio Educational & Cultural Association (W.B), 2008.

৯. Maddi, Shunti. (2025). The Santal Tribe and Regional Politics: Challenges and Possibilities. IJSSER, 7(2), 721-725. https://www.socialsciencejournals.net/archives/2025/vol7issue2/PartI/7-2-142-279.pdf

১০. Baskey, Sunny. (2019). Socio-cultural Background and Changes of Santal Society in West Bengal. IBJCAL, 1(2-3), 55-60. https://indianadibasi.com/journal/index.php/ibjcal/article/view/8

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1616-1633
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.383

টুসু: কৃষি উৎসব ও ধনলক্ষ্মীর লোকায়ত স্বরূপ

রঞ্জিত কুমার মাহাত, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, ওয়াই. বি. এন. বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচি, ঝাড়খন্ড, ভারত*

Received: 23.03.2026; Accepted: 26.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Tusu Utsav or Makar Manbhum is the most popular folk festival of the Jharkhand region. Although the word Tusu is a regional form, Makar or Makar Sankranti is known as a pan-Indian festival today. Not only that, people outside the agricultural culture also take holy baths and celebrate festivals in various ways on Makar Sankranti. However, the scale and importance of this festival is not seen anywhere else in Manbhum, or the greater Jharkhand region. While in other regions the festival lasts for one day, in this region it begins on Agrahayana Sankranti and ends on Paush Sankranti. The work of harvesting and bringing rice into the house of the peasant community basically ends on the day of Agrahayana Sankranti. On that very day, Dini Thakuran or Dhanalakshmi is brought into the house. A paddy field is given to her. A sturdy stalk of the rice plant is collected and placed in an earthen vessel. With great purity, the girls place the goddess Tusu or Dhanalakshmi in a clean niche. This rice sheaf is called Tusu or Dhanalakshmi and the day of Agrahayana Sankranti is called Chota Makar. The Tusu or Makar festival began from that day. From that day on, every night, the girls gather near the goddess Tusu or Dhan Devi and worship her with Geet Anjali. This goes on for a month. Then, on the day of Paush Sankranti, the rice husk is replaced with a broad cloth and immersed in a pond, water body or river while singing songs.

Keyword - Tusu, Makar, Dini, Choudal, Tusu Geet

দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলাকে বলা যায় নৃত্য, গীত ও পরবের দেশ। আর এই পরব বা লোক উৎসবগুলির মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় লোক উৎসব টি হলো মকর বা টুসু পরব। কেবল জনপ্রিয়তায় নয়, টুসু উৎসবের ব্যাপকতা ও সর্বজন তা এমনি যে, একে দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার জাতীয় উৎসব আখ্যা দেওয়া যায়। আর ভৌগোলিক বিস্তৃতি তো বটেই, পুরো একমাস জুড়ে উৎসবের ব্যাপ্তি এবং ঘরে ঘরে মানুষের উন্মাদনা, জনমান্য তার বিচারে টুসুকে সীমান্ত বাংলার কেবল উৎসব নয় মহোৎসব বলা উচিত। এই মহোৎসবের প্রাণের আবেগটা বড় সুন্দর ভাবে ধরা পড়ে টুসু গীতে। -

গীত

"এত বড় পোষ পরবে
রাখলি মা পরের ঘরে
পরের মা কি বেদন জানে
জ্বালায় গো আমার প্রাণে।
শশুর ঘরে মন কেমন করে
যেমন শোল মাছে উফাল মারে।।"[১]

টুসু যে এই অঞ্চলের কৃষি জীবি প্রান্তিক খেটে খাওয়া মানুষের একান্তই প্রাণের উৎসব তা উপরোক্ত গীতটি থেকে বোঝা যায়। কিন্তু মকর বা টুসু শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? বা এই উৎসবের প্রকৃত তাৎপর্যটিই বা কি এই বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে নানা বিবাদ ও বিতর্ক রয়েছে। কেউ বলেন টুসু উৎসব হলো বাংলার তুষ-তোষলা মেয়েলি ব্রতেরই ঝাড়খন্ডী রূপ। আবার কেউ বলেন টুসু হলেন শস্যদেবী অর্থাৎ ধনলক্ষী। কেউ বলেন এটি হলো একান্তই শস্য উৎসবক ফসল তোলার উৎসব এমনকি বলা হয়েছে টুসু সব শস্যের মরণোৎসব। কিন্তু কারো কারো মতে টুসু হলো এই অঞ্চলের মেয়ে বা মা। এই উৎসব তাদেরই প্রাণের প্রতীক। একান্তই নারীরা এই বিভিন্ন বিবাদ ও মতাদর্শ প্রসঙ্গে কার কি অভিমত তা দেখে নেওয়া যেতে পারে। ড. সুধীর কুমার করন তাঁর 'সীমান্ত বাংলার লোকযান' গ্রন্থে টুসু সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন-

> "বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তোষ-তোষলা বা তুষু নামক ব্রতের প্রচলন আছে। পূর্ববঙ্গে-পশ্চিমবঙ্গে দু জায়গাতেই মেয়েরা এই ব্রত করে থাকে।"[২]

তুষু বা তোষলা পরবের নামকরণের মূলে তিষ্যা নক্ষত্রের প্রভাব থাকা কিছু অসমীচীন নয়, তবে এ কথাও স্বীকার করা যেতে পারে যে মূলত 'তুষু' শব্দের সঙ্গেই এর যোগাযোগ, ধানের তুষ, তুমু ব্রতের একটি অপরিহার্য উপকরণ। গরুর গোবর, সরষে ফুল, নতুন ধানের তুষ প্রভৃতি উপকরণকে আদিম মানুষের যাদু প্রক্রিয়ার উপকরণ হিসেবেও গ্রহণ করা চলে। বলা বাহুল্য এর সঙ্গে দুর্বলতা বাদের যোগ সূত্রটি সুস্পষ্টী গোবরের নাড়ুর উপর তুষ ছড়িয়ে শূন্য গর্ভ তুষের ভেতর থেকে পূর্ণ শস্য ধানের কামনাটি অস্বাভাবিক নয়। তুষ বা তোষলা ব্রত সম্পর্কে বলতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ এর বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: প্রতিদিন পৌষ মাসের সকালে মেয়েরা এই ব্রতটি করে। ব্রতের বিধি এই অঘ্রাণের সংক্রান্তি থেকে পৌষের সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রতি সকালে স্নান করে গোবরের ছ-কুড়ি ছ-গন্ডা বা একশো চুয়াল্লিশটি গুলি পাকিয়ে, কালো দাগ শূন্য নতুন সরাতে বেগুন পাতা বিছিয়ে তার উপরে গুলি কটি রাখতে হয়। তার উপর নতুন আলো চালের তুষ ও কুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে, সরষে, শিম, মুলো ইত্যাদির ফুল দিয়ে ছড়া বলা হয়। ব্রতের নাম এবং উপকরণ গুলি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এটি সার মাটি দিয়ে ক্ষেত উর্বর করে তোলার ব্রত।

ড. করন এই মতকে সমর্থন করলেও ঝাড়খন্ড লোক সংস্কৃতির অন্য এক প্রথিত যশ্য অধ্যাপক ড. বঙ্কিম মাহাত তার মতকে সমর্থন করেননি। তিনি সরাসরি এর বিরোধিতা করেছেন। 'ঝাড়খণ্ডের লোক সাহিত্য' গ্রন্থে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন:-

> "টুসু যে বাংলার তোষলা ব্রতের ঝাড়খন্ডি রূপ নয়, তাল তলিয়ে বিচার করলে বোঝা যায়। যে কোনো ব্রতের আচারেই মৌলিক পরিচয়, ছড়া কিংবা প্রার্থনা মন্ত্র পরবর্তী কালের সংযোজন। ঝাড়খন্ড যদি বাংলার তোষনা ব্রতকে গ্রহণ করে থাকত তাহলে ছড়াটিও গ্রহণ করত। টুসুর মধ্যে এই ব্রতের আদিমতম রূপটি পাওয়া যায়, যা বাংলার তোষলা ব্রতের

> মধ্যে নেই।.....বরং এখনকার টুসু ঝাড়খণ্ডের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উঁচু বর্ণের লোকেদের মধ্যে প্রচার লাভ করে উন্নত পর্যায়ের তোষলা ব্রতে পরিণত হয়ে থাকাটাই স্বাভাবিক।"[৩]

ড. বঙ্কিম মাহাত এর যুক্তিটি অত্যন্ত বাস্তব এবং তথ্যনিষ্ঠ। অন্যপক্ষে টুসু ও তুষু উৎসবের জন মান্যতা ও ব্যাপকতা বিচার করলেই এই সত্যটি আরও পরিস্ফুট হয়। সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলায় এক একটি টুসু মেলায় হাজার নয় লক্ষ মানুষের উপস্থিতি, জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এর জনমান্যতা, আর মাত্র কয়েকটি ছড়া দিয়ে তোষলাকে টুসুর উপরে বসিয়ে স্থান দেওয়া একপ্রকার সাম্রাজ্যবাদী চাপিয়ে দেওয়ার অভিসন্ধি বলেই মনে হয়। ঝাড়খণ্ডের সারা বছরের সমস্ত উৎসব কৃষির সঙ্গে জড়িত উৎসব। টুলু উৎসবটি বাংলাদেশ বা বাংলা সংস্কৃতি থেকে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে এই ভাবনার মধ্যে ভুল ও বিভ্রান্তি থাকায় স্বাভাবিক।

এই প্রসঙ্গে এই অঞ্চলের অপর একটি বিশিষ্ট গবেষক ড. ক্ষিরোদ চন্দ্র মাহাতোর বক্তব্যটি অনেকটায় যুক্তিপূর্ণ এবং মূল সত্যটিকে অনুধাবন করার চেষ্টা করেছেন। 'মানভূমের টুসু পরব' সংকলন গ্রন্থে তাঁর প্রবন্ধ- 'মানভূমের টুসু পরব নৃতত্ত্বের আলোকে' তে বলেছেন- আসলে একটা দিক স্পষ্টতই বোঝা যায়, টুসু মানভূম সহ সীমান্ত বাংলার মানুষের চেতনায় লক্ষ্মীরই আরেক রূপা জল-জমি, জঙ্গল কেন্দ্রীক মানুষজন টুসু-র মধ্যে কল্পনা করে এসেছে তারই ছায়া। সে জন্য অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির দিন মাঠের ফসল ঘরে তোলার পর শুরু হয় টুসুর বোধন্য তুলসী মঞ্চের এক পাশে গর্ত খুঁড়ে বা দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে গাঁদা ফুল দিয়ে পাতানো হয় টুস। সেই দিন থেকে পুরো পৌষ মাসজুড়ে প্রতিদিন একটি করে গাঁদা ফুল দিয়ে টুসুকে সাজিয়ে রাখা হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যা বেলায় মেয়েরা সমবেত হয়ে টুসু গান গায় দীর্ঘ একমাস চলে আসা টুসু ব্রতের সমাপ্তি ঘটে পৌষ সংক্রান্তির দিন টুসুর বিসর্জনে। টুসুর বিসর্জন উপলক্ষে চলে মেলা। টুসুর গানে যেমন মুখরিত হয়ে ওঠে মেলা প্রাঙ্গণ তেমনি মনোহারি দ্রব্যের ব্যবসায়ীরা দোকান সাজিয়ে বসে। কেনা বেচা চলে প্রসাধনী সামগ্রীর সঙ্গে সংসারের টুকিটাকি জিনিসপত্রের সব মিলিয়ে টুসু পরবের দিন মেলা প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে ওঠে। পৌষ সংক্রান্তির দিন টুসুর বিসর্জন উপলক্ষে সাবেক মানভূম সহ তামাম দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার জন মানসে জাতীয় উৎসবের চেহারা নেয়। এর কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন-

> "জাতীয় উৎসব বলিতে যাহা বুঝায় এবং পুরুলিয়ার টুসু উৎসবের মধ্যে আমরা আজও যাহা দেখিতে পাই নাই তাহার রূপ পূর্ব বাংলা কিম্বা পশ্চিমবাংলার কোথাও দেখা যায় না। ইহার কারণ সামাজিক সংহতি ব্যতীত জাতীয় সম্ভব হয় না। পুরুলিয়ায় এখন পর্যন্ত সমাজ জীবনের যে সংহতি বর্তমান আছে, বাংলাদেশের আর কোথাও তাহা নাই, সেই জন্য জাতীয় উৎসবের রূপ, এই অঞ্চলেই এখনও প্রত্যক্ষ করা যায়, অন্য কোথাও নহো সেই জন্য শস্যোৎসব বলিতে যাহা বুঝায়, পুরুলিয়া ব্যতীত পূর্ব ও পশ্চিমবাংলার আর কোথাও নাই।"[৪]

ড. ভট্টাচার্য প্রকৃত সত্যের কাছে পৌঁছেছেন। এই উৎসবের সংহত রূপটি কেবল পুরুলিয়া এবং সীমান্ত বাংলাতেই রয়েছে আর কোথাও নয়। তাই এই উৎসবের তাৎপর্য টিকে পূর্ববঙ্গে বা তুষ-তোষনার ভিতরে খোঁজা হবে সবচেয়ে ভুল। আসলে পণ্ডিতগণ তুষ শব্দের অর্থ বুঝতে পারলেও টুসু এবং মকর শব্দের অর্থ ও তার তাৎপর্যের বিষয়টিকে তলিয়ে দেখেননি। এখানেই বিভ্রান্তি। উর্বরতা বাদের তত্ত্ব, ধন লক্ষ্মীর ভাবনাটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বিষয়টি এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এর সঙ্গে সূর্যের উত্তরায়ণ থেকে দক্ষিণায়ন যাত্রা এবং সূর্য দেবতার পূজা আরাধনা ও জাড়ুত রয়েছে। জাওয়া করমে সূর্যের বিষুব হওয়া এবং আখানে দক্ষিণায়নের সূচনা সীমান্ত বাংলার কৃষি উৎসবগুলির বৈজ্ঞানিক তাৎপর্যটিকেই তুলে ধরে।

এই অঞ্চলে টুসু উৎসবের অন্যতম জনপ্রিয় নামটি হলো মকর পরব। মকর শব্দটি কে পণ্ডিতগণ কেবল মকর রাশি বলেই বিবেচনা করেছেন। কিন্তু কেবল তাই নয়, রাজস্থানী, গুজরাঠী সহ ভারতীয় বহু ভাষাতে মকর শব্দের অন্যতম অর্থ হলো সূর্য। জাওয়া-করম উৎসবে ঈদ দেবতা কেও ইন্দ্র হিসেবে মান্যতা দেওয়া হয় যা পুরোপুরি ভুল। ঈদ অর্থেও সূর্য দেবতাকেই বোঝায়। এই অঞ্চলের মানুষ শস্য উৎপাদনের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সহায়ক শক্তি সূর্য দেবতার সূচনা করেছে তার অবদানের জন্য তিনি ব্যতিরেকে এই সৃষ্টি বেঁচে থাকতে পারে না, তাই তার পূজা আরাধনা। আর টুসু শব্দটি কে যদি আমরা কুড়মালি 'টুই' ও 'সু' শব্দের সংযোগে গঠিত বলে মনে করি তাহলে এই ব্যাখ্যা আরো সম্পূর্ণতা পায়। টুই শব্দের অর্থ দাঁড়ায় সূর্যের শেষ সীমায় অবস্থান। ঐ দিনটি হলো মকর। পরদিন আখান হলো তার শুভ উত্তরায়ন যাত্রা। আসলে উৎসবটিতে ধনদেবী ধান শীসটির সঙ্গে সূর্যের পূজাই হলো টুসু ও মকর উৎসবের মূল বিষয়। তুষ বা তোষলা ব্রতের সঙ্গে এর সম্পর্কটি একেবারেই গৌণ। সূর্য পূজার এই সম্পর্কটির প্রসঙ্গে ড. বঙ্কিম মাহাত তাঁর ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য গ্রন্থে আচার্য যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধির একটি উল্লেখ যোগ্য বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন- আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বলেন যোন শত বৎসর পূর্বে পৌষ সংক্রান্তির দিন উত্তরায়ন আরম্ভ হইল। পরদিন ১লা মাঘ নতুন বৎসরের প্রথম দিন। সেদিন আমরা দেব খাতে প্রাতঃস্নান করি। লোকে বলে মকর স্নান। এই প্রসঙ্গে ড. মাহাত এর বক্তব্যটি হলো-

> "তার মতে ৩১৯ খ্রিস্টাব্দে পৌষ সংক্রান্তিতে উত্তরায়ন হত। মকর পরব যে ঝাড়খণ্ডের নববর্ষ উৎসব, তাতে কোন সন্দেহ নাই।"[৫]

লোকসংস্কৃতিবিদগণ টুসু উৎসবের এই বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক ঐতিহাসিক বিষয়গুলিকে গুরুত্ব নিয়ে জাওয়া-করম এবং টুসুকে একটি মেয়েলি ব্রত হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং বিষয়টিকে একেবারে লঘু করে দেখেছেন। রায় বিদ্যানিধি মহাশয় ১লা মাঘে নতুন বর্ষের কথা বলেছেন কিন্তু সেটি কোন ক্যালেন্ডার বা কার নববর্ষ? এতো কুড়মালি নববর্ষের কথায় তিনি বলেছেন। যে কথা আমরা বার বার বলেছি। কুড়মালি কৃষি সভ্যতার প্রাচীন ইতিহাস ও তার পরম্পরাটি এবং এই কৃষিকে কেন্দ্র করে তার সাংস্কৃতিক পরম্পরাটিকে সঠিক ভাবে পর্যবেক্ষণ করা উচিত, যা করা হয়নি। এই লোকোৎসবগুলি কেবল মেয়েলি ব্রত বা মেলা পার্বণ নয় এর ভেতরে রয়েছে এই সমাজ ও সভ্যতার বহু অকথিত কাহিনী ইতিহাসের নিরব কথা।

পুরুলিয়ার বিখ্যাত লোক গবেষক কিরিটি মাহাত 'মানভূমের টুসু পরব' সংকলন গ্রন্থে 'লোক বিজ্ঞানের আলোকে টুসু উৎসব' প্রবন্ধে বলেছেন- মকরের স্নানোৎসব রীতি ও ঐতিহ্যটি কেবল সর্বভারতীয় নয় বহু প্রাচীন ও বলা যায় প্রাগ-ঐতিহাসিক। কারণ ভারতবর্ষের প্রাচীন কৃষি সভ্যতার কেন্দ্র সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতাতেও এই অনুষ্ঠানটি অর্থাৎ সমবেত স্নান উৎসব পালন করা হতো এমন অনুমান করেছেন পুরা তত্ত্ববিদ ও প্রত্ন বিজ্ঞানীগণ। এই প্রসঙ্গে আমরা সস্মরণ করতে পারি পৃথিবী বিখ্যাত প্রত্ন বিজ্ঞানী G.L. Possechi এর সেই বিখ্যাত উক্তিটি। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে বলেছেন-

> "That such emphasis should have been placed on batting even in this remote age in not a surprise given the importance the Indian has attached to ceremonial ablutions in saered tanks, pools and rivers since time immemorial."[৬]

সিন্ধু সংস্কৃতির সর্বভারতীয় স্বরূপের এটি একটি বড় প্রমাণ। এতে গেল সর্বভারতীয় স্বরূপ। কিন্তু টুসু উৎসব বা নববর্ষ উৎসবের পাঁচদিনব্যাপী এই আনন্দ উৎসবের উদযাপনের রীতিটি প্রাচীনকাল থেকেই ছিল

আন্তর্জাতিক। মানব সভ্যতায় কৃষি এবং কৃষি বর্ষোৎসবের এ রীতিটি ভারতবর্ষ থেকেই সারা বিশ্বে ছড়িয়েছে কি না তা অবশ্যই আরও গবেষণা সাপেক্ষ বিষয়। তবে তা হওয়ায় স্বাভাবিক। কারণ বিখ্যাত ভারত তত্ত্ব বিদ এ.এল. বশম অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেছেন- "প্রাক আর্য যুগে এদেশে কৃষিকার্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল এর জন্য সারা বিশ্ব ভারতের কাছে ঋনী"। এত প্রসঙ্গ অবতারণার কারণ সুদূর মিশর সভ্যতায় টুসু বা মকরের মতোই ৫দিন ব্যাপী বর্ষ শেষে আনন্দ অনুষ্ঠানের আয়োজন রীতি ছিল তা বলা হয়েছে গ্রগোরি বেনগাদ লেভিনের 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' গ্রন্থে। লেভিন বলেছেন- প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার মানুষেরা জানও সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে ৩৬৫ দিনে। তাদের ক্যালেন্ডার ছিল বারটি মাসে বিভক্ত এবং এক একটি মাস ছিল ৩০ দিন নিয়ে।

বাকি পাঁচটি দিন তারা ভূরিভোজন ও আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে থাকত। দুটি দেশের দূরত্ব অনেক হলেও বিষয়টি একেবারেই উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। কারণ ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ এই মিশরীয় সভ্যতা কে বহিরাগত সভ্যতা বলেই দাবি করেছেন"। (পৃ. ৫২,৫৪) এইগুলি কোন কাকতালীয় ঘটনা নয়। বিষয়টি বিশেষ ভাবেই গবেষকদের ভেবে দেখা উচিত। কৃষি সভ্যতার ফসল হলো এই লোকোৎসব গুলি। তাই উৎসব গুলির মধ্যে কৃষি সভ্যতার নানা বিষয় ও নানা কথা এর ভেতরে লুক্কায়িত থাকবে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। মানুষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মানব সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। অজ্ঞানতা বা অন্ধ বিশ্বাস সবকিছুতে খোঁজা হবে নির্বুদ্ধিতা।

গীত

"জলে হেল জলে খেল, জলে তোমার কি আছে
আপনার মনকে সুদ্ধাঞ দেখ, জলে শশুর ঘর আছে।"[৭]

এই গীত ইঙ্গিত করে টুসুর অনেক কিছুর ভিতরেই রহস্য ময়তা রয়েছে। অন্তর্নিহিত সত্য কোথাও লুকিয়ে রয়েছে। জলে শশুর ঘর থাকাকে যদি বলেন, এ হলো পাগলের প্রলাপ তাহলে তবে তা হবে আমাদের বোকার অক্ষমতা।

একমাত্র একটি ধান শিস জলে হেলে এবং জ্বলে খেলে যার শশুর ঘর হলো জলে। রূপক উপমা অলংকারের শোভায় সংগীতটির দুটি পক্ষতি শোভিতা সেই ধান শিসটিই হলো টুস। টুসু উৎসবের প্রকৃত সত্য ও তাৎপর্য কে খুঁজে পেতে হলে ভারতের কৃষি সভ্যতা সংস্কৃতিকে ভালো করে বুঝতে হবে। তার ইতিহাস ও পরম্পরাকেও সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হবে। এভিন্ন হবে অন্ধের হস্তি দর্শন। বিভিন্ন গবেষক ও পন্ডিত জনের উপরোক্ত মন্তব্য গুলি অন্তত সে কোথায় প্রমাণ করে।

টুসু লোক পূরান কথা:-

জাওয়া-করম বা সহরই-বাঁদনা নিয়ে যেমন প্রাচীন লোক পুরান কথা রয়েছে সে অর্থে টুসুকে নিয়ে কোন প্রাচীন লোক পুরান কথা নাই। তবে বিভিন্ন অঞ্চলে কিছু কাহিনী ও কিংবদন্তি শোনা যায় যা তলিয়ে দেখলে তুলনা মূলক অর্বাচীন বলে মনে হয়। অন্যান্য কৃষি উৎসবগুলির মতোই টুসুও হলো একটি প্রাচীন কৃষি উৎসব এবং কৃষি সভ্যতার অভিন্ন অন্ধ তাই কোন কাহিনী বা কিংবদন্তিতে তা যদি অন্যভাবে পরিবেশিত হয় তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আসলে মানুষ যে কোন জিনিস জানতে গেলে তার উৎস ও ইতিহাসের অনুসন্ধান করে। এটাই স্বাভাবিক। যখন তা জানা যায় না, তখন নিজেরাই মনের বিশ্বাস ও মাধুরী মিশিয়ে রচনা করে তার কাহিনী। টুসু উৎসবের ক্ষেত্রে এই বিষয়টিই ঘটেছে। তবে এই কিংবদন্তি গুলি যখন বিদগ্ধ পন্ডিত জনের গ্রন্থে স্থান পায় তখন তাকে কিছুটা হলেও মূল্য দেওয়া ছাড়া পথ থাকে না।

ড. সুধীর কুমার করন অনুরূপ একটি কাহিনী উল্লেখ করেছেন তাঁর বিখ্যাত গবেষণা গ্রন্থ 'সীমান্ত বাংলার লোকযানে'। তিনি হুবহু যা বলেছেন বা লিখেছেন তা নিম্নে দেওয়া হলো।

> "টুসু সম্পর্কে একটি লোককথা প্রচলিত আছে মানভূমের কোন কোন অঞ্চলে। লোক কথাটি বহু প্রচলিত নয় বলেই এর মৌলিকতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। লোক কথাতে বলা হয়:-কর্মী সমাজে এক রূপবতী কন্যার ডাক নাম ছিল টুসু, ভালো নাম রুকমিনী। কন্যাটি রূপে গুণে লক্ষীর মতো। এক কর্মী যুবকের সঙ্গে তার বিবাহের কথা নির্ধারিত ছিল। রুকমিনী আর সেই কর্মী যুবক সম্পর্ককে গভীরভাবে ভালোবাসতো আগে থেকেই। এদের বিবাহ উৎসবের তিথি যত ঘনিয়ে আসে, তত খুশি হয় কর্মী সমাজের আবাল বৃদ্ধ বণিতা সবাই। কিন্তু বিবাহ তিথিতে বিবাহ কার্য শেষ হওয়ার পূর্বে মুসলমানরা এসে অন্যান্য ধন-সম্পত্তির সঙ্গে লুঠ করে নিয়ে যায় তাদের। মুসলমানদের অভক্ষ শূকর মাংসে এদের প্রীতি আছে শুনে, শেষ পর্যন্ত তারা এদের অস্পৃশ্য জ্ঞানে বর্জন করে। রুকমিণী এবং সেই কর্মী যুবক যখন গ্রামে ফিরে আসে তখন কর্মী যুবকের অভিভাবকেরা রুকমিণীর সঙ্গে তার বিবাহে বাধা দেয়। যে মেয়েকে মুসলমান ছুঁয়েছে, সে মেয়ের সঙ্গে কারুরেই বিয়ে হতে পারে না। কিন্তু এর ফলে তাদের পারস্পরিক প্রেম মোটেই ব্যাহত হয়নি। কর্মী যুবকটি অভিভাবকদের মত পরিবর্তন করতে না পেরে মনের দুঃখে বনে যায়, সন্ন্যাসী হয়ে। এদিকে রুকমিণী অনাহারে অনিদ্রায় দিনাতি পাত করতে থাকে, আর কি করে তার প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলিত হবে এই চিন্তায় নিমগ্ন থাকে। একদিন সবাই শুনলো টুসুমনি ঘর থেকে নিরুদ্দেশ। কথাটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। রুকমিনীর ডাক নামটাই বেশি প্রচলিত ছিল দেশে। ফলে ঘরে ঘরে শুধু টুসুর আলোচনা। ভালোবাসার ধনকে ফিরে পাবার জন্য টুসুর গৃহত্যাগের কাহিনী কুমারী মেয়েদের মুখে মুখে ফিরতে লাগল। টুসু তাদের আদর্শ হয়ে উঠলো। অবশেষে একদিন সবাই শুনলো প্রস্তুত আর বরকে খুঁজে পেয়েছে, সুবর্ণরেখা নদীর তীরে। টুসুর একান্ত ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। চারদিক থেকে সবাই ছুটে চললো। টুসুকে দেখতে, ইচাগড় থানার সতী ঘাটায়। সুবর্ণরেখার একটি ঘাটে তারা দেখতে পেল টুসুকে আর সেই সন্ন্যাসী বেশি বরকে। লোকের আনন্দের অবধি রইল না। কিন্তু এত আনন্দ সইল না। অনাহারে অনিদ্রায় প্রচুর স্বাস্থ্য খারাপ হয়েছিল। বাঞ্চিতকে পাবার পরেই তার মৃত্যু ঘটে সেইখানে। বঞ্চিতের জন্য টুসুর এই আত্মবিসর্জনকে কর্মী বা মাহাতো সম্প্রদায়ের মেয়েরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে চলেছে আজও। ইচাগড় থানায় (বর্তমানে সিংভূম জেলার অন্তর্গত) সতীঘাটায় আজও টুসু উৎসব উপলক্ষে বিরাট জন সমাবেশ হয়।"[৮]

ড. করণ কাহিনীর শুরুতেই বলে দিয়েছেন যে, কাহিনীটি বিশেষ বিশেষ কিছু অঞ্চলে এবং কিছু মানুষের মধ্যে প্রচলিত রইলেও গোটা টুসু উৎসবের মানুষের মধ্যে প্রচলিত নয় বা সর্বজন পরিচিত, সর্বজন মান্য কোন কাহিনী নয়, তাই লেখক নিজেই কাহিনীটি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। প্রাচীন এই কৃষি উৎসব গুলি দুই-পাঁচশত বৎসরের ঘটনা নয়। উৎসবগুলির আচার অনুষ্ঠান, সংস্কার, বিশ্বাসগুলি যে পরিচয় বহন করে তা কেবল হাজার নয় হাজার হাজার বৎসর প্রাচীন বলেই অনুমান করা যায়। দ্বিতীয়ত এত বড়, সার্বজনীন একটি লোকায়ত উৎসব কোন বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায়ের ঘটনা বলে মেনে নেওয়াটা কঠিন। এছাড়াও উপরোক্ত ঘটনাটি নিছকই একটি প্রেম কাহিনী। কিন্তু টুসু উৎসবের সমস্ত আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে কৃষির সম্পর্ক। যে সম্পর্কিত আচার-নেগ। তাই কাহিনীটি কাশীপুরের রাজা এবং তার কন্যা ভদ্রাবতীর যে কাহিনী পুরুলিয়া অঞ্চলে প্রচলিত রয়েছে এই কাহিনীটি ও অনুরূপ একটি মিথ বা কল্পকাহিনী

মাত্র। আসলে একটি প্রাচীন উৎসবের অর্থ এবং তার তাৎপর্য মানুষ যখন আর যোগসূত্রগুলি খুঁজে পায় না তখন মনগড়া কাহিনীর সৃষ্টি করে নিতে বাধ্য হয়। টুসুর কাহিনীটিও তেমনি। এছাড়াও ড. সুভাষ রায় আর একটি কিংবদন্তি উল্লেখ করেছেন 'মানভূমের টুসু পরব' গ্রন্থে তাঁর টুসুকে কেন্দ্র করে কাহিনী ও কিম্বদন্তি প্রবন্ধো কাহিনীটি নিম্নরূপ-

এক কুড়মি রাজা ও তার স্ত্রী ১২ বৎসর তপস্যা করে এক কন্যা সন্তান লাভ করে। কন্যাটি ছিল পরমা সুন্দরী। মা-বাবা কন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে আদর করে তার নাম দেন টুস। টুসু রূপে গুনে ক্রমশ বড় হতে থাকে। বাল্যকালেই টুপুর খেলাধুলার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ শখ ছিল বাগান করার। মাতা-পিতা তার এই ঝোঁক দেখে কন্যার জন্য খুব সুন্দর একটি ফুল ও ফলের বাগান তৈরি করে দেন। সারাদিন খেলাধুলা আর ঐ ফুলের বাগানেই তার সময় কাটত। তখন দেশে চলছিল মুসলমান শাসন। দিল্লী ও গৌড়ে তখন মুসলমান নবাব। ঠিক এই সময় একটি ঘটনা ঘটে। গৌড়ের নবাবের রাজ মহিষী এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। বহু চিকিৎসক কে তাকে দেখানো হয়, কবিরাজ দেখানো হয় কিন্তু তার রোগ আর সারে না। নবাব এর কোন কূল-কিনারা করতে না পেরে বিমর্ষ হয়ে পড়েন। অবশেষে একদিন এক জ্যোতিষী এসে নবাবকে বলেন, কোন রমণীর হাতে লাগানো পুকুরে এবং গাছে পাকে না এমন আম যদি জোগাড় করতে পারেন তাহলে তার থেকে ওষুধ তৈরী করে রাজমহিষীকে সেবন করালে তাঁর রোগ সেরে যাবে এবং তিনি বেঁচে যাবেন। জ্যোতিষীর কথা শুনে নবাব চারিদিকে লোক লস্কর পাঠালেন এমনতর বস্তু দুটি আনার জন্য নবাবের রাজত্ব যতদূর বিস্তৃত তার চারিদিকে ঢেঁড়া পিটিয়ে মানুষকে জানিয়ে দেওয়া হলো জিনিসগুলি সম্পর্কে আর বহু মূল্য পুরস্কার ঘোষণা করে দেওয়া হলো যে সন্ধান দিতে পারবে তার জন্য। একদিন সেই নবাবের ঘোষক এসে পৌঁছালো কুড়মিদের গ্রামে। সংবাদটি পৌঁছালো গ্রামের সব মানুষের কাছেই। টুসু ও শুনলো, রাজমহিষীর দুরারোগ্য ব্যাধির কথা এবং তারা যে দুটি বস্তু সন্ধান করছে তার কথা। সুঁচু তার বাগানেই একটি ছোট্ট জলাধারে ফুটিয়েছিল পদ্ম আর বোতলের পাকিয়েছিল সেই আম। টুসু তার বাবাকে অনুরোধ করলো তার বাগানের এই দুটি বস্তু নবাবকে দিতে যাতে রাজমহিষীকে বাঁচিয়ে তোলা যায়। টুসুর কথায় তার বাবা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাদশাহর লোকেদের বস্তু দুটি দিলেন। নবাব বস্তুটি পেয়ে রাজমহিষীকে ওষুধ করে তা খাওয়ালেন এবং রাজমহিষী সে ওষুধ খেয়ে সম্পূর্ণ সেরে উঠলো। নবাব অত্যন্ত খুশি হয়ে প্রচুর উপঢৌকন পাঠালেন টুসুকে। কিন্তু টুসু নবাবের কোন উপঢৌকন গ্রহণ করতে রাজি হলো না। এইদিকে বাদশাহর দূত টুসুর অসামান্য রূপ ও গুণের কথা গিয়ে নবাবকে সব খুলে বললে বাদশাহো টুসুকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। কিভাবে টুসুকে লাভ করা যায় তার উপায় খুঁজতে লাগলেন। এদিকে কুড়মিদের কাছে নবাবের এই অভিসন্ধির কথা পৌঁছে গেলে তারা ভয়ে কাতর হয়ে পড়লেন। অত অতঃপর একদিন রাতের অন্ধকারে টুসুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন পথে পরদিন সকালে তারা পৌঁছে গেলেন এক সাঁওতাল গ্রামে। সাঁওতালদের চলছিল পাঁতা পূজা। এদিকে নবাবের সৈন্যবাহিনী, লোক লস্কর টুসুকে ধাওয়া করে পেছনে পেছনে আসছিল। কুড়মিরা হলো সাঁওতালদের বড় ভাই। তাই তারা শত শত সাঁওতাল সমাজের সমাবেশের ভিড়ে মিশে গেল। সাঁওতালরা পাঁতা পূজায় প্রচুর শূকর বলি দেয়। আর এই বলির পরে পরস্পর হাত ধরাধরি করে গোলাকার হয়ে নৃত্য করতে লাগলো। টুসুরাও সেই নাচে অংশগ্রহণ করল। কুড়মিরা সাঁওতালদের কাছে সব বিষয়টি খুলে প্রকাশ করলে সাঁওতালরা তাদের কথা দিল তাদের কোন বিপদ হবে না। নাচ গান শেষে সকলেই ভাত খাওয়া দাওয়া করল। ওদিকে নবাবের সৈন্য সামন্ত এসে তাদের আক্রমণ করল। সাঁওতাল তীরন্দাজরা তীরে শুকরের মাংস গেঁথে তাদের দিকে ছুড়তে লাগল। মুসলমানদের কাছে শুকরের মাংস হলো নিষিদ্ধ এবং হারাম। তারা তোউবা তোউবা করে পিছু হটে পালিয়ে গেল। এই ঘটনার পর টুসুর মনে এক বিশেষ

দুঃশ্চিন্তা দেখা দেয় সে বুঝতে পারে নবাব যখন একবার তার রূপে মুগ্ধ হয়ে পিছু ধাওয়া করেছে তা সে সহজে ছেড়ে দেবে না। টুসুর বাবাও টুসুর দুঃশ্চিন্তার কারণ বুঝতে পারলেন। তাই আর দেরি না করে তাড়াতাড়ি টুসুর বিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু টুসু বিয়ে করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করল। কারণ যদি সে বিয়ে করে তাহলেও তাদের মুক্তি থাকবে না। নবাব তাদের দুজনকেই মেরে ফেলবে নিশ্চয়। এইভাবে নানা দিক বিবেচনা করে টুসু তার জীবন আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল। একদিন তাই ঘটল। খুব ভোরে টুসু কাঁসাই নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মত্মহত্যা করল। নিজের সতীত্ব রক্ষার জন্য এই আত্মহত্যার ঘটনাটি ঘটেছিল পৌষ সংক্রান্তি মকরের দিনে। এই বিশেষ ঘটনাটিকে স্মরণে রাখতেই তথা টুসুর আত্মত্যাগের স্মরণে সেদিন থেকেই এই অঞ্চলের কাসাই, শিলাই, সুবর্ণরেখা আদি সকল নদীর তীরে তীরে আয়োজিত হয়ে আসছে টুসুর ভাসান ও মেলা।

লক্ষ্য করার বিষয় দুটি ঘটনার মধ্যেই মূল Motive বা ভাবগত মিল রয়েছে। সম্ভবত এই সকল কিম্বদন্তি বা কল্প কাহিনী সৃষ্টি হওয়ার পর থেকেই টুসু উৎসবে টুসুকে মেয়ে ও মায়ের রূপকটির প্রাধান্য পেয়েছে। জাওয়া-করম উৎসবেও মেয়েরা হলো করমতি বা জাওয়ার মাঞ আর টুসু পরবের ব্রত চারিনীরা টুসুর মাঞ। ভাবনাটিকে আরও একটু তলিয়ে বিশ্লেষণ করলে বলা যায় তারা মা বৈকি। কারণ এই মেয়েরাই কোন একদিন জন্ম দিয়েছিল জাওয়ার আর তাদের রোপনের ফলেই তো সেই ধান শিসটির সৃষ্টি। যেটি তারা টুসুর সরাতে তুষ গোবরের সঙ্গে রেখে পূজা করে এক মাস। আসলে একটি এমন মহত্ত্বপূর্ণ কৃষি উৎসব ক্রমশঃ লোকায়ত জন মানসে তার স্বরূপটি পরিবর্তিত হয়ে যায়। হারিয়ে ফেলেছে তার মূল তাৎপর্য। বিকৃত হয় ইতিহাসও। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই এই ঘটনাটি হতে পারে। লোক বিশ্বাস, সংস্কার, নেগ-নেগাচার, কাহিনী কিংবদন্তি সব ক্ষেত্রেই। প্রকৃত কৃষি সংস্কার, সংস্কৃতি ও তার ঐতিহ্যটিকে আমাদের স্মরণে রাখতে হবে। তাহলেই এই প্রক্ষিপ্ত বিষয় ও ঘটনা গুলিকে আমরা চিহ্নিত করতে পারব।

টুসু উৎসবের নেগ নেগাচারঃ

টুসু বা মকর পরব হলো কৃষি বর্ষে শেষ কৃষি উৎসব। আখান থেকে যার শুরু হয় মকরে তার সমাপ্তি ঘটে। তবে নানা কারণেই টুসু বা মকর পরবের বৈচিত্র্য ও বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ পুরো একমাস ব্যাপী অনুষ্ঠান আর কোন উৎসবে নাই। অগ্রহায়ণ সাঁকরাইত বা সংক্রান্তিতে যার সূচনা তার শেষ মকরে পৌষ সংক্রান্তিতে। টুসু পাতা বা প্রতিষ্ঠা হয় অগ্রহায়ন মাসের সংক্রান্তিতে আর তার ভাসান হয় মকর দিনে বা পৌষ সংক্রান্তির দিনে। এটিও একটি পুরোপুরি কৃষি উৎসব মানে একটি ধান শিসকে টুসু বলে প্রতিষ্ঠা করে এক মাস ধরে তার পূজা আরাধনা করা হয় এবং মকর দিনে নদী বা পুকুরের জলাশয়ে তার বিসর্জন দেওয়া হয়। গীতে বলা হয়-

গীত

"জলে হেল জলে খেল জলে তুমার কি আছে
আপনার মনকে শুধাঞ দেখ জলে শশুর ঘর আছে।"[৯]

চাষীর ক্ষেতের জলে যে হেলে খেলে বড় হয় তাকে তার শশুর বাড়ী অর্থাৎ জলেই তাকে বিসর্জন দেওয়া হয়। এটিই টুসু উৎসবের মূল তাৎপর্য। টুসু তাই পুরোপুরি একটি কৃষি উৎসব। একটি ধান শিস হলো তার পূজ্য দেবী। ধনদেবী বৃহৎ অর্থে অবশ্যই ধনলক্ষীও। কুড়মালি প্রবাদ ছড়ায় তাকে বলা হয়েছে-

"ক্ষেতে ধানি
খেরইয়ে ডিনি বা ডেনি
ঘর ভিতর ডিমনি

আর অঞে টুসু মনি।।"[১০]

অর্থাৎ যে বা যাকে আমরা ক্ষেতে থাকলে ধানি বা ধান বলছি, সেই হচ্ছে ডেনি বা ডিনি মাঞ দেবী। আর ঐ ডিনি মাঞই হলো ঘরের ভিতরে ডিমনি। ঐ ধানি, তিনি বা ডিমনিই হলো টুসুমনি। তাই লোক ছড়া বা প্রবাদে পরিষ্কার ভাবেই বলা হয়েছে ঐ ধান বা ধান শিসটিই হলো টুসুমনি বা টুসু উৎসবের মূল আরাধ্যা দেবী। পন্ডিতগণ তুষ, তোষলা থেকে যে নানা তত্ত্ব হাতড়ে বেড়িয়েছেন তা হলো পুরোটাই বিভ্রান্তিমূলক।
টুসু উৎসব পুরো একমাস জুড়ে ব্যাপ্ত। এরপর আমরা দেখে নেব উৎসবটির নেগ-আচার ও অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্ব গুলির পরিচয়-

ক। টুসু পাতা বা টুসু থাপনাঃ

এই যে একমাস জুড়ে টুসু উৎসব তার প্রথম দিন হলো অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি। এই দিনেই টুসু প্রতিষ্ঠা বা পাতা হয়। এই দিনটি তাই বলে 'ছুটু মকর'। পূর্বেই বলেছি টুসু পরব হলো পুরোপুরি নারীদের উৎসব। টুসু পাতা বা থাপনার কাজটিও তাই তারাই করে। তারাই টুসুর মা। সাধারণত পুরো অগ্রহায়ন মাস জুড়ে এই অঞ্চলে ধান কাটার কাজ চলে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। মানুষ ক্ষেতে গঠে কাজের মাঝেই টুসু পরবের আগমনী গীত গাইতে থাকে।

১. আইসছে মকর দুদিন সবুর কর, তরা বাঁকা পিঠার জগাড় কর।
২. পৌষ পরবে যাবই বাপের ঘর, অ-তুই বিহা কর আর সাঁঘা কর।
৩. আসছে মকর দুদিন সবুর কর, তরা শায়া শাড়ি জগাড় কর।
৪. আসছে টুসু পৌষের একদিনে, টুসু ধনকে রাখবে যতনে।
৫. মকর, মকর, মকর পরবে তদের পা পড়ে না গরবে।
৬. বার মাসে তের পরব, চলে গেল গোপনে টুসু মায়ের পূজা আমরা করব অতি যতনে।

অগ্রহায়ন সংক্রান্তির দিন ধান কাটা, খামার খলাতে তা গাদা করে বসানো এবং আনুষঙ্গিক সকল কাজ সমাধান করার নিয়ম। কারণ এই দিন ক্ষেত থেকে ডেনি ঠাকরানকে যেমন খামারে আনার নিয়ম তেমনি এই দিনেই সন্ধ্যা নেমে এলেই বাড়ীতে চলে টুসু পাতার কাজ। ডেনি ঠাকুরান বাড়ীতে আসবেন এবং টুসু পাতার দিনটি তাই অতি শুভ ও পবিত্র একটি দিন। এইজন্য ভোর থেকেই ঘর-দুয়ার গোবর মাটি দিয়ে লিপা লরা এবং বাড়ীঘর পরিষ্কার করার কাজ শুরু হয়ে যায়। গৃহকর্তা সারাদিন ক্ষেতে খামারের কাজে ব্যস্ত থাকলেও বিকাল হলে বা সন্ধ্যা নামার আগে ক্ষেত থেকে ডেনি বা ডিনি মাঞ পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে মাথায় করে এনে খামারে প্রতিষ্ঠা করে। বেলা ডোবার পর শুরু হয় টুসু পাতার কাজ। মেয়ে দুটি মাটির তৈরী সরাকে গুড়ি দিয়ে গাবানো হয়। খামার থেকে আঙ্গিনা এবং টুসু পাতার স্থান পর্যন্ত আলপনা আঁকা হয়। মেয়েরা দিনের বেলায় বিভিন্ন ধরনের ফুল জোগাড় করে। বিশেষ করে বাঁদু ও গেঁদা ফুল টুসুর জন্য অবশ্যই লাগবে। সাধারণত টুসুকে পাতা হয় কোন ঘর বা ঘরের চালিতে থাকা কুলুঙ্গিতে। মাটির সরা দুটিতে তিনটি বা পাঁচটি গোবর নাড়ু ডেনি মাঞ এর থেকে নেওয়া ধান শিস, কিছু তুষ বা ভুঁসা, প্রদীপ, ধুপ ধুনা ফুল দিয়ে কুলুঙ্গিতে সরা দুটি স্থাপন করতে হয়। কুলুঙ্গিতে স্থাপন করে সকল মেয়ে হাঁটু গেড়ে প্রণাম নিবেদন করে। একটি পরিবার এককভাবে টুসুপাতে অথবা পাশাপাশি ঘরের সকলে মিলেও কোন এক জায়গাতে টুসু স্থাপনা করে থাকে। এরপর সকল মেয়ে সমবেত কণ্ঠে টুসুর গীত পরিবেশন করে। গীতই হলো মূলত টুসু পূজার মূল উপাচার। যদিও কমপক্ষে ১টি ফুল টুসুমনিকে দিতে হয়। আর সাতদিন পর পর লাগে আট কলইয়া। আট কলইয়া হলো আট প্রকার কলাই বা ডাল শস্যের ভাজা দানা নিবেদন। এটাকে ভোগ বলা যেতে পারে। যাই হোক টুসু পাতার পর শুরু হয় টুসু গীতের বন্যা।

"১। খামার ভরা সনার ধানে
টুসু পাইতব যতনে
আই গো তোরা সঁগি জুড়ি
টুসু পাতি এক মনে।।
২। আঘন মাসের শেষে টুসু
আলে সাঁকরাইতের দিনে।
টুসু ধনকে রাইখব আমরা
আদরে আর যতনে।।"[১১]

টুসু পাতার পর এই ভাবে এক মাস ধরে চলে প্রতিদিন সন্ধ্যায় টুসু পূজা ও আরাধনা। তবে মূলত তা গানে গানে। আনুষ্ঠানিক কোন পূজার আয়োজন থাকে না। প্রত্যেক বাড়ীর মেয়েরাই একটি করে ফুল সংগ্রহ করে টুসুর জন্য নিয়ে আসে। কুমারী মেয়েরা বা কখনো কখনো সদ্য বিবাহিতা বউ এরাও নানা মনস্কামনা পূরণে মানসিকও করে থাকে টুসুর কাছে। তবে সেই সব মানসিকে টুসুকে অন্যান্য দেব-দেবীর মতো পাঠা-ভেড়া বা হাঁস মুরগি লাগেনা। টুসু যে প্রকৃতই একটি প্রকৃতির দেবী বা দেবীর মধ্যে মানবিক ভাবনা যে নাই এটি তার একটি বড় প্রমাণ। মানুষকে দেবতা সৃষ্টি করেছে কিনা তা আমাদের জানা নাই; কিন্তু দেবতাকে যে মানুষ তার মনের মাধুরী দিয়ে নিজের মতো করে কল্পনার তুলিতে অঙ্কন করে নেই এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। টুসু পাতার কালে টুসুদেবী, আরাধ্যা, পূজা অবশ্যই কিন্তু তারপর ক্রমশঃ তার মধ্যে আরোপিত হয় সে কেবল মেয়ে অথবা মা। ছোট ছোট মেয়েরা কল্পনা করে মাতৃ স্বরূপে তার বয়স্ক মহিলাদের কাছে সে কেবলই একটি আদরের ছোট্ট মেয়ে। মেয়েদের মনে যে কামনা, বাসনা, আকাঙ্খা থাকে তারই সুন্দর বিমূর্ত রূপ বহিঃপ্রকাশ ঘটে গীতে।

গীত

"টুসু হামরা থাপনা করি, অঘন সাঁকরাইত দিনে গো
অবলা বাছুরের গোবর, লগন চালের গুড়ি গো।
লউতন পেতিলাই রাখি, চুনি চুলা গোবর চুলা গো
তার উপরে ডিনি মাঁই, গেঁদা ফুলের হালা গো।
লিহ লিহ লিহ টুসু, নানা বরণ ফুল গো
সব দিন যে দিব মাঁই গো, সারই, বাঁদু ফুলা গো।
সকাল সাঁঝে দিব মাইগো, ধুপ ধুনা বাতি গো
সঁগি সভে গীত গাঁহে, তর মন ভুলাব গো।
চলল সঁগতি সভে, টুসু গীতে রিঝাব গো
টুসু মাঞের আশীষ নিয়ে, সংসারে ঘর বইসাব গো।"[১২]

মেয়েরা সকলে সমবেত হওয়ার পর টুসুকে জাগরণ গীত দিয়ে জাগায় আবার যখন বাড়ি ফিরে যায় তখন ঘুম পাড়ানি গীত গেয়ে তাকে একটি শিশু কন্যাকে যেমন ঘুম পাড়ানি গীত মা গায় এক্ষেত্রেও তাই ঘটে।

গীত

"উঠ উঠ উঠ টুসু, তুমায় উঠ করাতে আস্যেছি
আমরা যে সব সঁগি জুড়ি, তুমার পূজায় বস্যেছি।
টুসু পূজার খনে
সনঝা দেবী বন্দী গো, মনে মনে।।"[১৩]

সন্ধ্যা পেরিয়ে অন্ধকার গাঢ় হতে থাকলে মেয়েরা আপন আপন বাড়ী যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। তারা নিজেরা যেমন ঘুমাবে তেমনি টুসুমনিকেও ঘুমাবার জন্য আবাহন করে।

গীত

"ঘুমাও ঘুমাও ঘুমাও টুসু,
রাইত হল্য অনেক ভারি,
গেঁদা ফুলের মালা নিয়ে,
কইরব না কাল আর দেরি।।
রং:- টুসু ডাক মা বলে
হামরা রা দিব বদন ভরে।
হামরা চুমু খাব বাদন ভরে।।"[১৪]

পৌষ মাসের শেষ চার দিন উৎসবের শেষ দিন গুলি হলো-আউড়ি, চাঁউড়ি, বাঁউড়ি, মকর এবং আখান। তবে মূল উৎসবের আয়োজনের পূর্বেই মেয়েরা সকলে মিলে আয়োজন করে পৌষালু বা বনভূজা। গ্রামের পাশাপাশি কোন জঙ্গল অথবা ডুংরি এবং নদীর মনোরম জায়গা দেখে এই বনভূজার আয়োজন করা হয়। মাছ, মাংস সহ ভাল ভাল খাবারের আয়োজন করা হয়। ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের হলেও সকলে পরস্পর বোন বোনের মতো ভালোবাসা, মমতা, সহৃদয়তা জড়িয়ে পড়ে। সখ্যতা ও প্রেমের অদ্ভুত বন্ধন তৈরী হয় টুসু পাতা ও বনভূজা আদি আচার অনুষ্ঠান গুলির ফলে। সারাদিন প্রকৃতির কোলে খাওয়া-দাওয়া, গীত-নাচের পর সন্ধ্যায় ফিরে এসে আবার শুরু হয় টুসু পূজা ও গীত। টুসু উৎসবের শেষ পর্যায়ে হলো উৎসবের মূল পর্ব আর এই দিনগুলিকে বলা হয় আউড়ি, বাঁউড়ি, মকর এবং আখান। পৌষ মাসের শেষ চার দিন হলো আউড়ি, চাঁউড়ি, বাঁউড়ি, মকর এবং আর নববর্ষের প্রথম দিনটি হলো আখান। উৎসবটিকে কেউ কেউ ফসল তোলার উৎসব আবার কেউ কেউ বলেন নববর্ষের উৎসব। হ্যাঁ তা বলা যায় বৈকি? প্রথম চার দিনকে আমরা বিগত বর্ষের বর্ষ সমাপন উদযাপন এবং আখানকে বর্ষবরণ উৎসব বলা যেতেই পারে। জানা যায় মিশর দেশেও অনুরূপ বর্ষ সমাপন উদযাপন রীতির প্রচলন ছিল। বৎসরের শেষ পাঁচ দিন তাঁর আনন্দ উৎসব এবং খাওয়া-দাওয়া করে উদযাপন করত। বিষয়টি অবশ্যই বিস্ময়কর। ভারতীয় কৃষি সভ্যতার উৎসব ও রীতিনীতি এবং কৃষি ক্যালেন্ডার মিশরে কিভাবে গেল তা গভীর গবেষণার প্রয়োজন। সূর্য পূজা মিশরেও ছিল, ভারতের কৃষি সভ্যতার মানুষেরও রয়েছে। মকর শব্দটির অর্থও হয় সূর্য। তাই বলা যায় মকর উৎসব হলো সূর্য দেবতার স্মরণ মনন পূজার উৎসব। আঁউড়ি, চাঁউড়ি, বাঁউড়ি শব্দগুলি এবং ঐদিন গুলির আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে নানা তাৎপর্য গুলি আমরা আলোচনা করব।

আঁউড়িঃ- টুসু উৎসবের মূল পর্বের প্রথম দিনটি হলো আঁউড়ি। আঁউড়ি শব্দটি অবশ্যই কুড়মালি ভাষার কিন্তু গবেষকগণ শব্দটির বিষয়ে তেমন কিছুই উচ্চবাচ্য করেননি। কুড়মালি ভাষাতে আঁউড়ি শব্দের প্রকৃত অর্থ কি তা জানা না গেলেও 'আউড়ান' বলে একটি শব্দ রয়েছে যার অর্থ হলো সূচনা বা শুরু। কিন্তু প্রশ্নটি হলো কিসের সূচনা বা শুরু? উৎসবের নাকি মকর বা সূর্যের উত্তরায়ন যাত্রার। কারণ নামকরণ গুলি

কেবল মাত্র পরব বা আনন্দ উৎসবকে ঘিরেই সৃষ্টি হয়নি। এর পিছনে লুকিয়ে রয়েছে প্রাচীন সভ্যতা সংস্কৃতির মানুষের নানা জ্ঞান, সিদ্ধান্ত এবং বৈজ্ঞানিক সত্য। তাই আমার মনে হয় সূর্যের সেই উত্তরায়ন যাত্রার আউড়ান বা আয়োজনের শুভ সূচনার ইঙ্গিত শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে। যাই হোক ঘরে ঘরে যখন টুসু উৎসবের প্রস্তুতি চলতে থাকে সেই কাজ গুলি হলো ১) খামার নিমটা ২) চালধোয়া ৩) তিল ধোয়া ৪) চাল ভেজা ইত্যাদি।

১) খামার নিমটাটি হলো চাষী পরিবারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সারা বছরের ফসল খামারে যা তোলা হয়েছে তার ঝাড়াই মাড়াই শেষ করতে হয়। আগড়া থসড়া গুটানো, পাঁখি পুয়াল গুছানো, আঁউড়ি পুয়াল কে গাদা করে বসানো এর মধ্যে অন্যতম কাজ। নিমতা শব্দটি ও কুড়মালি ভাষার যার অর্থ শেষ করা বা সমাপন করা। এই দিনটিতে এই সকল কাজ সমাধান করা বাধ্যতা মূলক। তা না হলে উৎসবের আনন্দও থাকেনা কারণ চাষীর চিন্তা যদি খামারের কাজের দিকে থাকে তাহলে তা বাধা প্রাপ্ত হবে।

২) চাল ধোয়া কাজটিও চাষী পরিবারে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে মনে করে। কারণ কৃষি উৎসবগুলির প্রতিটি উৎসবের আয়োজনের অন্যতম কাজ হলো পিঠার আয়োজন। পিঠা না হলে পরব বা উৎসব বলে মনে করাই হয় না। আবার পিঠারও রয়েছে নানা প্রকারভেদ। বিশেষ করে টুসু বা মকর পরবের পিঠা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই পিঠার নাম উধি পিঠা, গড়গইড়া পিঠা, ডুবু পিঠা এবং পোষ পিঠা। এই বিধার মূল উপাদান চালের গুঁড়ি হলেও তাতে পুর হিসেবে ভিতরে থাকে তিল, আলু, নারকেল, চিনি বা বিশেষ কোন বস্তু। গরম জলের ভাপ বা বাস্প দিয়ে সিদ্ধ করে তা তৈরী করা হয়। পিঠের আকার আকৃতিতে নানা ফুল ফল বা জিনিসের ঢং এ তৈরী করা হয়। আর এই পিঠার প্রস্তুতির প্রথম কাজটি হলো চাল ধোয়া। চাল ধোয়া অর্থে চালের মধ্যে থাকা কাঁকর, মাটি, পাথর, আগড়া থসড়াকে ভালো করে বেছে চালকে বাছাই করা। কারণ ঐ সব্য আবর্জনার সামান্যতম থাকলেও তা পিঠা খাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়। ক্ষতিকারক ও বটে। তাই সমস্ত চাল ভালো করে বেঁছে বাঁধ বা পুকুর থেকে ধুইয়ে আনতে হয়। এই কাজটি হলো চাল ধোয়া।

৩) তিল ধোয়া:- পূর্বেই বলেছি উধি পিঠা তৈরীর জন্য মশলা বা পুরের দরকার হয়। আসলে উধি পিঠার তৈরীর মধ্যেই রয়েছে স্বাতন্ত্র্য। আর এই স্বাতন্ত্র্য বিশেষ প্রকার পদ্ধতিতে গরম জলের বাষ্প দ্বারা সিদ্ধ করা আর পিঠের ভিতর নানা রকমের পুর দেওয়া। এই অঞ্চলে যেটি প্রধান পুর হিসেবে প্রচলিত বা জনপ্রিয় তা হলো তিল। তিল হলো চাষেরই একটি তৈল বীজ। তেল হিসেবেও তিল তেলের ব্যবহার রয়েছে আবার তিলকে নানাভাবে খাওয়াও যায়। কারণ তিল চোখের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী একটি খাদ্য। উধি পিঠায় তিলের ব্যবহারের পিছনে এটিও একটি কারণ হতে পারে। যাই হোক চাল ধোঁয়ার মতোই মেয়েরা পুকুরে গিয়ে তিলের খোসা ছাড়িয়ে তাকে ভালো করে ধৌত করে এবং রৌদ্রে তারপর ভালো করে শুকনো করা হয়। তারপর পিঠেতে তা ব্যবহার করা হয়।

চাল ভেজা:- টুসু পরবের আনন্দ অনুষ্ঠানের সঙ্গে খাবারের আয়োজনটি একটি বিশেষ বিষয়ের মধ্যে পড়ে। বাড়িতে বাড়িতে উধি পিঠা তো হয়েই এর সঙ্গে মাংস পিঠা, সিম পিঠা, সহ নানা ধরনের পিঠার ও আয়োজন করা হয়। পাঁচ দিন উৎসবের প্রতিদিনই এ আয়োজন হয়ে থাকে। এর জন্য প্রয়োজন হয় অনেক পরিমাণ চাল গুঁড়ির। তাই পরিবারের মেয়েরা চাঁউড়ির দিন থেকেই চাল ভেজানোর কাজটিও শুরু করে। আর এই পরবে মেয়েদের প্রধান কাজটি হয় পিঠে করা। আঁউড়ির দিনটি বলতে গেলে উৎসবের প্রথম দিন। তাই সেদিন থেকেই টুসুর কাজে আরও বেশিক্ষণ ধরে চলে গীতের আয়োজন। টুসু উৎসব আর সেই উৎসবকে ঘিরে মেয়েদের নানা আশা-আকাঙ্খা কিভাবে তাদের হাসায় কাঁদায় তার বিচিত্র কথা পাওয়া যায় টুসু গানে।

"১। এত বড় পোষ পরবে
রাখলি মা পরের ঘরে
পরের মা কি বেদন জানে
জ্বালা দেয় আমার প্রাণে।
রং।।
বল মা আমার মন কেমন করে
যেমন শেলি মাছে উফাল মারে।।
১। সোব সঁগতি পরান গতি
রইল মা একা ঘরে
যখন আমার মা কাঁদিবে
বধাবে সবাই মিলে।।"[১৫]

চাঁউড়ি:- চাঁউড়ি হলো মূল উৎসবের দ্বিতীয় দিন। উৎসব যত চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাতে থাকে ততই উত্তেজনা। কাজের চাপ ও বাড়তে থাকে। বিশেষ করে চাষী ঘরের মেয়েদের খাবার সময় থাকেনা। তবে এই দিনের প্রধান নেগা-চারের কর্ম গুলি হলো (১) তিল ছুলা (২) গুঁড়ি কুঠা (৩) মেয়েকে শ্বশুর ঘর থেকে বাড়ীতে নিয়ে আসা।

১) তিলছুলা:- আঁউড়ির দিনে তিল ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে শুকোনোর পর উপরের যে কালো অংশ থাকে তাকে ছুলে পরিষ্কার করার প্রয়োজন হয়। এই দিন এই কাজটি করা হয়। কালো অংশটি ছুলে বাদ না দিলে পিঠের স্বাদ পরিবর্তন হয়ে যায়। তাই কাজটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আজকের দিনে এই কাজগুলির দিনের অনেক সময় পরিবর্তন হয় কিন্তু চাঁউড়ির দিনের মধ্যেই তা করতেই হয়।

২) গুঁড়ি কুটা:- আগেই বলেছি পরের পাঁচ দিনের প্রতিদিন নানা খাবার দাবারের আয়োজন করা হয়। তার মধ্যে পিঠা থাকে বাধ্যতামূলক। আর পিঠার জন্য অনেক চাল গুঁড়ির প্রয়োজন হয়। তাই গুঁড়ি কুটার কাজটি শেষ করা হয় চাঁউড়ির দিনেই। এরপর নানা ধরনের পিঠে তৈরী করা হয়।

৩) মেয়েদের শ্বশুর ঘর থেকে আনা:- এই অঞ্চলের সংস্কৃতিতে একটি বিশেষ সামাজিক রীতি হলো পরব-তিহারে মেয়েকে বাপের বাড়ীতে নিয়ে আসা। বয়স্ক মহিলাদের ক্ষেত্রে এটি না ঘটলেও নতুন বিবাহিত মেয়েদের ক্ষেত্রে এটি ১০০% সত্য যদি বাপ-মা মেয়েকে না আনে তবে মেয়ে ভাবে বাপ-মা তাকে আর সে ভাবে ভালবাসে না বা বিয়ে দিয়ে তারা নিজের দায় সেরেছে। মাতৃভূমি ও মা-বাবার প্রতি মেয়ের টানে মেয়েরা বাপের বাড়ী আসার জন্য উৎসবের বহু আগে থেকেই উৎসুক হয়ে থাকে। তাই বাপ-মা শেষ পর্যন্ত চাঁউড়ি দিনে মেয়েকে বাড়িতে আনবেই। কারণ তারপরের দিন হলো বাঁউড়ি বা টুসু জাগরণের দিন। সেখানে তাকে ভাগ নিতে হবে। আমি জানি ছোট বেলার সঙ্গী সাথীদের সাথেও মিলন ঘটবে। শশুর বাড়ির নানা কষ্টের লাগব হবে উৎসবের আনন্দে। তাই উৎসব গুলিতে সমাজের নানা রীতি নীতি এর নানা তাৎপর্য গুলিকে বুঝতে আমাদের সহায়তা করে। সে কথা প্রতিধ্বনিত হয় টুসু গানে।

"(১) আমার টুসু সাধের বিটিগো
অন্য লকে কি জানে?
কারু কথা কারু ব্যথা

কারউ লাগে নয়নে।।
রং।। কুলহির কদম তলে
টুসু আমার ডাল ভাঙে খেলা করে।।"[১৬]

চাঁউড়ি শব্দটির অর্থ নিয়ে কোন গবেষকেই কোন উচ্চবাচ্য করেননি। কুড়মালি ভাষাতেও এর অর্থ হয় কিনা, অন্তত পক্ষে আমার জানা নেই। তবে 'চঁউরা' শব্দটি কুড়মালি ভাষাতে রয়েছে। উৎসবটিকে যদি মকর পরব বলি অর্থাৎ উৎসবটিকে সূর্য বন্দনার উৎসব বলে যদি স্বীকার করি তাহলে 'চঁউরা' শব্দটি থেকে এর একটি অর্থ হতে পারে। চঁউরা শব্দটি থেকেও চাঁউরা বা চাঁউরি এবং চাঁউড়ি শব্দ আসতে পারে। যার অর্থ করা যায় সূর্যের ঘূর্ণনের দিক পরিবর্তন। আসলে এই ব্যাখ্যা গুলির সব গুলিই হচ্ছে আমাদের নিজস্ব মতামত। এ অঞ্চলের কৃষি উৎসবগুলির বিষয়ে চর্চা, গবেষণা সেভাবে আজও হয়নি। তাই আমাদের কাছে আজও কোন রেডিমেড ডেফিনেশন বা শব্দ তাৎপর্য নাই। তবে কৃষি উৎসব গুলির মূল দৃষ্টিকোণ, তথা সামাজিক ও আধ্যাত্মিক দর্শন থেকে শব্দগুলির এভাবে ব্যাখ্যা সম্ভব।

বাঁউড়ি:- টুসু উৎসবের পাঁচটি দিনের মধ্যে বাঁউড়ি দিনটির মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। তাই এদিনের আচার-অনুষ্ঠান নেগ-যোগ, আজি আয়োজনও অনেক বেশি। এই দিনেই টুসুর জাগরণ তাই সকাল থেকেই মেয়েদের সাজ সাজ ব্যস্ততা শুরু হয়ে যায়। সকাল থেকে ঘরদোর আঙিনা গোবর দিয়ে লিপা-লরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তো বটেই এই দিনেই পিঠার বিশেষ আয়োজন করা হয়ে থাকে। এমনকি বাড়ীতে ভাত রান্নারও রীতি নাই। সকলেই পিঠা, মুড়ি, চিড়া ও নানা খাবার খেয়েই বাঁউড়ি উদযাপন করে। এই দিনের মূল মূল নেগ-নেগাচার গুলি হলো (১) মাছ দেখা (২) ঘরদোর পরিষ্কার (৩) বাঁউড়ি সিনান (৪) বাঁউড়ি পিঠা (৫) বাঁউড়ি বাঁধা (৬) টুসু জাগরণ (৭) মালা বদল (৮) তল পা তল হাতে সরিছা তেল নেওয়া।

১। মাছ দেখা:- মাছ শুভ ও যাত্রার প্রতীক বলে এই অঞ্চলের মানুষ মনে করে। তাই প্রতিটি বাড়ীতে প্রতিটি মানুষ এই দিনটিতে মাছ দর্শণ করে। ঘুম থেকে উঠেই এই কাজটি করতে হয়। তাহলে তা সৌভাগ্যের প্রতীক বলে মনে করা হয়। হয় পূর্ব দিন না হয় ঐ দিন জেলে সম্প্রদায়ের মানুষ বাড়ীতে বাড়ীতে মাছ পৌঁছে দিয়ে আসে। এটি তাদের বাৎসরিক কর্ম বলে তারা মনে করে। সাধারণত চ্যাং মাছ তারা দেয়। এবং প্রতিটি বাড়ী থেকেই পাওনা আদায় করে। মাছ দেখে কোথাও গেলে যেমন যাত্রা শুভ হয় তেমনি নববর্ষের পূর্বে এই মাছ দেখা পুরো বৎসর শুভ যাবে বলে মানুষের বিশ্বাস।

২। বাঁউড়ি সিনান:- প্রতিটি বাড়ীর মেয়েরা ভোর থেকে ঘরদোর গোবর দিয়ে নিকানো থেকে শুরু করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার পর স্নান করার জন্য পুকুরে চলে যায় সকাল সকাল। একে বলা হয় বাঁউড়ি সিনান।

৩। বাঁউড়ি পিঠা:- বাঁউড়ি দিনের গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হলো বাঁউড়ি পিঠার আয়োজন। মেয়েরা বাঁউড়ি সিনান করার পর সকলে মিলে উঁধিপিঠা কেউ বা মাংস পিঠা করার জন্য বসে যায়। উঁধি পিঠা তৈরীর পদ্ধতিটিও বিচিত্র। প্রথমে একটি বড় হাঁড়ি নেওয়া হয়। হাঁড়িটিকে জল ভর্তি করে উনুনের উপর বসানো হয়। জল গরম ও ফুটতে থাকলে হাঁড়িটির মুখে অন্য একটি ছোট ছিদ্র যুক্ত মাটির ছোট হাঁড়ি বসানো হয়। এই হাঁড়ির ভিতরেই দেওয়া হয় গুঁড়ির তৈরী কাঁচা পিঠা গুলি। মেয়েরা নানা আকার ও নানা আকৃতির পিঠা তৈরী করে, যার ভিতর দেওয়া থাকে তিল, ছাঁছি, গুড়, চিনি, নারকেল, সর আদি নানা বস্তু দিয়ে পুর। কাঁচা পিঠা গুলি সিদ্ধ হয়ে গেলে পুরো হাঁড়ির পিঠা গুলি নামিয়ে রাখা হয়। এরপর আবার পিঠা ভর্তি করে মূল হাঁড়ির উপরে বসিয়ে দেওয়া হয়। একেই অঞ্চল ভেদে উঁধি পিঠা, পোষ পিঠা, ডুবু পিঠা এবং ভাপা পিঠাও বলা হয়ে থাকে। কোন গোষ্ঠীতে যদি কেউ মারা যায় তাহলে ঐ বৎসর সেই পুরা গোষ্ঠীতে পিঠা করে না বা করা নিষিদ্ধ।

(৪) বাঁউড়ি বাঁধা:- বাঁউড়ির দিনে বাঁউড়ি বাঁধা কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণা। এই কাজ করে ছেলেরা। ঐ বৎসরের চাষের জন্য প্রয়োজনীয় ধান বীজ গুলি পৃথক পৃথক ভাবে কুঁচড়ি করে বেঁধে রাখা হয়। কেবল ধান বীজ নয় ঐ বৎসরের জন্য অনেকেই ধান থেকে চাল তৈরী করে তা কুঁচড়ি করে বেঁধে রাখে। একে বলে বাঁউড়ি বাঁধা। কুঁচড়ি ও ধানের গোলায় গুঁড়ি প্রলেপ বা চোক তৈরী করে তার উপর সিঁদুরের দাগ দেওয়া হয়। এই নেগাচার গুলির মধ্যে সামাজিক ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্যটি সহজেই প্রতীয়মান হয়।

(৫) টুসু জাগরন :- টুসু পূজা ও আরাধনার শেষ দিন হলো এই জাগরণ দিন। বাঁউড়ির দিন সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকেই শুরু হয়ে যায়, টুসু জাগরণের কাজ। মেয়েরা যেখানে টুসু পাতে তার চারিদিকে নানা ফুলের মালা দিয়ে সাজায়। রঙিন শাড়ি দিয়ে ঘিরে ডেকোরেশন তৈরী করে। চারিদিকে আলপনা এঁকে দিয়ে সাজায়। ধূপ, ধুনা, প্রদীপের আলোয় চারিদিক আলোকিত করে। বাজার থেকে অথবা হাট থেকে নিয়ে আসে চৌড়ন বা চৌডল। টুসু থাপনার পাশেই সেটি রাখা হয়। আগে মাইক ছিল না। এখন তো ডি.জে ব্যতিরেকে কোন জাগরনই হয় না। আয়োজন করা হয় চিড়া, গুড়, বাতাসা, বোঁন্দে, মিঠাই, মিষ্টি এবং লুচির ভোগ। কারণ সারা রাত্রি ব্যাপি পহরে পহরে তা দেওয়া হয়। আর আট কলইয়া বা আট প্রকার শস্যদানার ভাজা ভোগ তো থাকবেই। এছাড়া ডেকোরেশনের অভিনবত্ব হলো ফুটন্ত শালুক ফুলকে দড়ি টান দিয়ে চারিদিকে ঝুলিয়ে দেওয়া। স্থানে স্থানে রঙিন কাগজের ফুল তৈরী করেও দেওয়া হয়। টুসুকে দেওয়া হয় গেঁদা ফুলের মালা। আর একটি অন্য মালা রাখা হয় গ্রামের অন্য মেয়েদের দলের সঙ্গে মালা বদল করার জন্য। রাত্রির খাবার পর সকল মেয়েরা টুসুর কাছে চলে আসে। কেউ বাদ যায় না। সারা রাত্রি যাপনের মত সাজগোজ করে আসে। পাশাপাশি আসন পেতে শুরু করে টুসুর গীত। এ কোন বই পুঁথিতে ছাপানো বা কারউ লিখে দেওয়া গীত নয়। মেয়েরা নিজেরাই মুখে মুখে রচনা করে গীতের ডালি। তৎক্ষণাৎ গীত রচনা করার আশ্চর্য ক্ষমতা রয়েছে মেয়েদের। আসলে তারা তো মা, তারাই তো জননী হতে পারে। সৃষ্টি ও সৃজনের ক্ষমতা তাদের সংসার গত। কোন কল্প কথা বা বিষয় নয় চিন্তা চেতনার বাস্তব অনুভূতির কথায় গানে গানে উঠে আসে। কৃত্রিমতার এখানে সুযোগ নাই। মায়ের ভাষায়, মুখের ভাষায় রচনা করে সেই গীত।

গীত

"রং:- কুলির ধুলা বাঁশ পাতের কুলা
আমরা খেলেছি ছুটুর বেলা।।
১। চাল ভাজা, কড়কড়্যা ভাজা
কুথি ভাজা রগড়ে
আমার টুসু চলে গেলে
কাঁদব আমি সগড়ে।।"[১৭]

এই ভাবে চলতে থাকে গীত রচনা। এমনকি কখনো কখনো মেয়েরা দুটি দলে বিভক্ত হয় ও চলে গীতের লড়াই। কবিগানের লড়াইয়ের মত। গান আর থামে না। এদিন রাত্রিতে ঘুমানো বারণ। কেউ ঘুমায়ও না। গ্রামের একদল মালা বদল করতে অন্য দলের আখড়াতে যায়। মালা বদল হয়। প্রীতি বিনিময় হয়। একে অপরকে ভোগ খাইয়ে দেয়। তবে গীতের লড়াইও হতে পারে। পরস্পর নিন্দা অপবাদ ও গানের মাধ্যমে দেওয়ার রীতি রয়েছে। অপর দলও অন্য পক্ষকে ছাড়ে না। উত্তর দেয় তাদের মতন করেই।

"রং:-লেলেলে মালা বদল কর
আমরা আসেছি হেঁট কুলহির দল।

১। উপর কুলহি নাম কুলফি
টাঁগালি বনমালা
বনমালার ফুলে ফুলে
উড়ে বসে ভমরা।।"[১৮]

এভাবে মেয়েদের হইহুল্লোড়ে নাচে-গানে বাঁউড়ির জাগরণ রাত্রি অতিবাহিত হয়। সকালেই মকর। টুসুকে বিদায় জানাতে হবে। মেয়েরা বিষাদ মনে বাড়ি ফিরে এসে সেই টুসু ভাসানের প্রস্তুতি শুরু করে। বাঁউড়ির রাত্রির সমাপন ঘটে এই ভাবেই। কিন্তু বাঁউড়ি শব্দটি নিয়ে দ্বন্দ্ব ও জট কাটেনি আজও। শব্দটির অর্থ ও দিনটির তাৎপর্য নেগ-নেগাচার পর্যবেক্ষণ করে নানা প্রকারের মতামত দিয়ে থাকেন অনেকেই। এর মধ্যে একটি দিক হলো 'বাঁউড়ি বাঁধা'। কথাটির প্রচলন রয়েছে বেশ। বাঁউড়ি বাঁধা বলতে সকলেই বীজ ধান বা চালের পুড়া বা কুঁচড়ি বাধার যে কাজ হয় সেটিকেই বুঝে থাকেন। নিঃসন্দেহে সাধারণ দৃষ্টিতে এর সরল ব্যাখ্যা সেটিই হতে পারে। অন্য অর্থ আমাদের কাছে না থাকায় আজ এটিকেই মেনে নিতে হয়। কিন্তু একটি প্রাচীন কৃষি উৎসব ও তার বিজ্ঞান ভিত্তিক তাৎপর্যটিকে যদি বিচার করা হয় তাহলে আরও অন্য দিক উন্মোচিত হয়। বিশেষ করে আমরা যদি সূর্যের উত্তরায়ণ প্রসঙ্গটিকে যদি মেনেনি তাহলে বাঁউড়ি হয়ে যায় অন্য কিছু। কুড়মালি ভাষায় 'বাঁউ' বা 'বাঁউয়া' শব্দ রয়েছে। যার অর্থ বাম বা বাম দিক। আমার অনুমান বাঁউড়ি শব্দটি বাঁউয়া+মহড়ি শব্দের সংযোগে গঠিত। বাঁউয়া মহড়ি- বাঁউড়ি শব্দটির সৃষ্টি সম্ভব যার অর্থ করলে দাঁড়ায় বাম দিকে যাত্রা বা গতি। সূর্যের দক্ষিণায়নের শেষ বিন্দু হলো এই দিন। এর পর তার গতি হবে বাম দিকে। তাই দিনটি চিহ্নিত হয়েছে বাঁউড়ি নামও অনেকের মনে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসতেই পারে একটি লোক উৎসবকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের এই গভীর তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া কি বাস্তব সম্মত। আমাদের বিচারে তার উত্তর হ্যাঁ। বিষয়টি বিস্ময়ের হলেও অতি প্রাচীন কালেই মানুষ বিজ্ঞানের এই নিগূঢ় সত্যগুলিকে পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছিল তা না হলে আখান থেকে রহিন এবং রহিন থেকে ঈদ এবং মকরে তার নির্দিষ্ট গতিপথ অবস্থানকে চিহ্নিত করে লোক উৎসব গুলির আয়োজন করল কিভাবে? বিষয়টি বিবাদ ঠিক কিন্তু ধারণা ও মতামতটিকে জড়িয়ে দিয়ে উৎসবগুলির তাৎপর্য কে আমরা খাটো বা একপেশে করতে পারি না।

মকর:- টুসু উৎসবের টুসু ভাসান বা শেষ পর্বটি হলো পৌষ সংক্রান্তি। আর এই দিনটিকে বলা হয় মকর। মকর শব্দটি প্রায় একটি সর্বভারতীয় শব্দ যা টুসু শব্দের নাই। মানুষের বিশ্বাস ও জ্যোতিষ মতে সূর্য এই দিন মকর রাশিতে অবস্থান করে এবং তারপর তার উত্তরায়ন যাত্রা শুরু হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞান মতে বিষয়টি তাই ঠিক কিন্তু লোকসংস্কৃতি গবেষকগণ লোক সংস্কৃতির সঙ্গে বিজ্ঞান বা জ্যোতির্বিজ্ঞান কে জুড়তে কখনোই রাজি নন। তাই এই উৎসব গুলি ব্যাখ্যা মেনে আসে চূড়ান্ত বিভ্রান্তি এবং তার বিকৃতি। ইঁদ থেকে ইন্দ্রধ্বজের পূজা, বাঁদনা থেকে "বন্দনা" বা 'বাঁধনা' বিকৃতি এই ভাবেই এসেছে মনে করে অন্তত পক্ষে বিজ্ঞানের সূর্যের গতি ও অবস্থানটির কথা বলা হয়ে থাকে। আমাদের কাছে এটিই হলো শেষ সত্য। যাই হোক এই বিশেষ দিনের এবং উৎসবটির শেষ পর্বের নেগ-নেগাচার গুলি হলো- ১) মকর স্নান ২) টুসু ভাসান ৩) বেজা বিঁধা ৪) ফোদি খেলা।

(১) মকর স্নান:- মকর দিনের সবচেয়ে প্রাথমিক ও শুভ কাজটি হলো মকর স্নান। এই স্নান পর্বটি কেবল আর মেয়েদের থাকে না। বালক বৃদ্ধ জাতি সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষ খুব ভোর থেকে মকর স্নান করে। তার বিশেষ ভাবেই লক্ষণীয় বিষয় এই স্নানের রীতি বা স্নান উৎসবটি প্রায় সর্বভারতীয় একটি রীতি। এই দিনটিকে পবিত্র মানা হয় এবং স্নান উৎসব সর্বত্র উদযাপিত হয়। আমাদের ভেবে দেখা উচিত টুসু

উৎসবের এই বিশেষ দিনটি কিভাবে সর্বভারতীয় হয়ে গেল। এছাড়াও পূর্বেই বলেছি প্রাগ ঐতিহাসিক কালে সিন্ধু সভ্যতাতেও এই স্নান উৎসব ছিল সে কথা বলেছেন বিশিষ্ট মানববিজ্ঞানী G.L. Possehl. যাই হোক মেয়েরাও সকাল সকাল ঘরের প্রাথমিক কাজকর্ম সেরে টুসুকে নিয়ে শুরু করে শোভাযাত্রা। যা ভাসান শোভাযাত্রা। আবার সকলে এক জায়গায় সমবেত হয়ে ধান শিস সহ মাটির সরা দুটিকে চৌড়লের ভিতরে স্থাপন করে। তারপর চৌড়লটিকে দু-হাতে ধরে উপরে তুলে নেয়। আজকাল অনেক বড় বড় চৌড়ল হয়। সেখানে একজন তা বহন করতে না পারলে দুজনে মিলে তাকে বহন করে। এরপর শুরু হয় টুসুর বিদায় যাত্রা। কোন নদী অথবা বড় পুকুরে তাকে ভাসান করার জন্য। আর এক মাস ধরে তার স্মৃতি সম্পর্কের ব্যাখ্যা বেদনার গীত গাইতে গাইতে এগিয়ে চলে সমবেত মেয়েদের দল।

গীত

"১। তিরিশ দিন রাখলাম টুসু
তিরিশটি ফুল পালে গো আর রাখিতে লারি মাকে মকর হল্য বাদী গো।
রং:- টুসু ধনকে জলে দিব না
আমার মনে বড় বেদনা।
২। যাছ যাছ যাছ টুসু
ফিরে ডাঁঢ়াও আগনাতে
সম বছরের মনের কথা
বলে রাখ সাক্ষাতে।।"[১৯]

এরপর জলঘাটে পৌঁছে চৌড়লটিকে সমবেত ভাবে ধরে গভীর জলে ভাসিয়ে দেয়। জলে সকলেই স্নান করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে। থালায় করে চিড়ে গুড়, বাতাসা, মিঠাই, বোঁদে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়। স্নান করার পর তা ভোগ হিসেবে সকলকে বেঁটে দেওয়া হয়। মা ও মেয়েদের সঙ্গে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও থাকে। তারাও ভোগ পেয়ে সকলেই খুশি হয়। এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক পরম্পরা অনুসারে জল ঘাট থেকে বাড়ি ফেরার পথে মেয়েরা উধোয়া গীত গেয়ে গেয়ে বাড়ি ফিরে। কিন্তু এই গীত আজ বিলুপ্ত। তাই আজ আর শোনা যায় না। এক মাস ধরে কৃষি সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় উৎসবটির সমাপ্তি ঘটে। বিকাল বেলা আগের দিনে গ্রামের প্রান্তে অনুষ্ঠিত হতো বেঝা বিধা বা বাৎসরিক তীরন্দাজি প্রতিযোগিতা। আর ফদি খেলা। কালের প্রবাহে এগুলি আজ হারিয়ে গেছে। মূল টুসু উৎসবের সঙ্গেও এইগুলির কোন সম্পর্ক নাই। টুসু বা মকর উৎসবকে উপলক্ষ্য করে গ্রামে গ্রামে, বিভিন্ন নদী-ঘাটকে কেন্দ্র করে বিরাট বিরাট টুসু মেলার আয়োজন হয়। পাশাপাশি তো বটেই দূর দূরান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ মেলাগুলিতে পশু ভাসান করতে আসে ও মেলা দেখতে আসে। এমন কিছু মেলা এই পুরুলিয়া জেলাতেই রয়েছে যেখানে লক্ষ মানুষের সমাগম হয়। যেমন- শিলাই, কাঁসাই, দারকেশ্বর, সুবর্ণরেখা, সতীঘাটা, ইত্যাদি। এছাড়াও আখ্যান থেকে আরও কয়েকদিন বিভিন্ন গ্রামে হয় খেলাই চন্ডীর মেলা। ভাও বা ভান সিং মেলা। চারিদিকে শুধু উৎসব, মেলা, গীত এবং বাজনার অসাধারন আবহ।

তথ্যসূত্র:

১. মাহাত, তিলকা (ক্ষেত্র সমীক্ষা- বয়স ৬২)। হরিয়ালগাড়া, পুরুলিয়া (মঃফঃ), পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ।
২. করন, ডঃ সুধীর কুমার। সীমান্ত বাংলার লোক লোকযান। করুণা প্রকাশ, ১৪০২, পৃ. ১৬৭।

৩. মাহাত বঙ্কিম। ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য। প্রকাশনী বাণী শিল্প, ১৯৭৮, পৃ. ১০৪।

৪. ভট্টাচার্য, ড. আশুতোষ। লোকসঙ্গীত রত্নাকর (তৃতীয় খন্ড)। এ মুখার্জী এন্ড কোম্পানি প্রাঃ লিমিটেড, ১৯৬০, পৃ. ২৬-২৭।

৫. মাহাত, বঙ্কিম। ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য। প্রকাশনী বাণী শিল্প, ১৯৭৮, পৃ. ১০১।

৬. G.L. Possehl. The Indus Civilization. Rowman & Littlefield Publishers, Inc. 1630, Page. 147

৭. মাহাত, তিলকা (ক্ষেত্র সমীক্ষা- বয়স ৬২)। হরিয়ালগাড়া, পুরুলিয়া (মঃফঃ), পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ।

৮. করন, ডঃ সুধীর কুমার। সীমান্ত বাংলার লোক লোকযান। করুণা প্রকাশ, ১৪০২, পৃ. ১৭৫-১৭৬।

৯. মাহাত, তিলকা (ক্ষেত্র সমীক্ষা- বয়স ৬২)। হরিয়ালগাড়া, পুরুলিয়া (মঃফঃ), পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ।

১০. পুনুড়িয়া, নগেন (ক্ষেত্রসমীক্ষা- বয়স ৭০)। টিমাংদা, কোটশীলা, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ।

১১. কল্পনা, মাহাত (ক্ষেত্রসমীক্ষা- বয়স ৫২)। গোলকুন্ডা, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ।

১২. সরস্বতী, মাহাত (ক্ষেত্রসমীক্ষা- বয়স ৩৫)। উশিড়, চেলিয়ামা, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ।

১৩. মাহাত, কিরীটি (ক্ষেত্র সমীক্ষা- বয়স ৬৭)। রামকৃষ্ণপুর, পাড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ।

১৪. মাহাত, সাইমনি, (ক্ষেত্র সমীক্ষা- বয়স ৪৮)। হাঁসলতা, কোটশীলা, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ।

১৫. মাহাত, মমতা (ক্ষেত্র সমীক্ষা- বয়স ৪০)। পাঁড়রা, কোটশীলা, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ।

১৬. মাহাত, মমতা (ক্ষেত্র সমীক্ষা- বয়স ৪০)। পাঁড়রা, কোটশীলা, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ।

১৭. মাহাত, সাইমনি (ক্ষেত্র সমীক্ষা- বয়স ৪৮)। হাঁসলতা, কোটশীলা, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ।

১৮. মাহাত, পুষ্পা রানী (ক্ষেত্র সমীক্ষা- বয়স ৪২)। আমডিহা, কাশিপুর, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ।

১৯. মাহাত, কিরীটি (ক্ষেত্র সমীক্ষা- বয়স ৬৭)। রামকৃষ্ণপুর, পাড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ।

আকর গ্রন্থ:

১. করন, ডঃ সুধীর কুমার। সীমান্ত বাংলার লোক লোকযান। করুণা প্রকাশ, ১৪০২

২. মাহাত, বঙ্কিম। ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য। প্রকাশনী বাণী শিল্প, ১৯৭৮

৩. সাহা, ধীরেন্দ্রনাথ। ঝাড়খন্ডি লোক ভাষার গান। প্রকাশনী মুক্তধারা, ৭৪ ফরাসগঞ্জ, ঢাকা-১, ১৩৭৮

অন্যান্য ঋণ:

১. মাহাতো ড. ক্ষীরোদ চন্দ্র। মানভূম সংস্কৃতি। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৬।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1634-1643
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.384

ফিরে চাও ধর্মরাজ' ও মহাভারতের আলোচনায় ভীম চরিত্রের পর্যালোচনা

রীনা বিশ্বাস, *ছাত্রী, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 24.03.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The critical analysis of characters within the literary domain of the Mahabharata is not a new subject. In examining the traits of these characters, it is essential to understand that most of the principal figures embody a kind of epic power. This power is not ordinary; rather, it is deeply intertwined with Indian society's religion, philosophy, and ethics, transforming each character into a symbol of profound universality. Conversely, in a strikingly opposite manner, where there is an absence of ধর্ম (dharma) and moral order, injustice and immorality are also portrayed within certain characters with such epic magnitude that their force is no less significant. It is precisely here that the broader philosophical vision of the Mahabharata comes into focus.

Thus, in the history of Mahabharata literature, the epic grandeur of each hero and villain has been examined from multiple perspectives in various scholarly works. From grandsire Bhishma to Yudhishthira, Karna, Arjuna, and Duryodhana, the more these characters have been discussed in literature, the more expansive their significance has become. However, amidst this extensive body of character analysis, the position and representation of Bhima have been comparatively less explored and discussed in Mahabharata studies.

Therefore, keeping this gap in mind, the primary objective of this paper is to highlight various aspects of Bhima's character through a discussion of Akhil Ghosh's novel "Phire Chao Dharmaraj", and to analyze its importance in relation to the broader philosophical vision of the Mahabharata.

Keywords: Mahabharata Literature, Epic Power, History of Mahabharata Literature, Bhishma, Yudhishthira, Karna, Arjuna, Duryodhana, Bhima, Overall Philosophy of the Mahabharata.

"যা নাই ভারতে তা নাই ভারতে অর্থাৎ মহাভারতে সবকিছু রয়েছে, এটি কেবল প্রবাদ বাক্যই নয়; মহাভারত হল সেই মহাকাব্য যার মধ্যে ইতিহাস ও দর্শন একত্রিত হয়ে রয়েছে"।[১] সেইজন্যই মহাভারতের গল্প, দর্শন ও ইতিহাস নিয়ে লেখা উপন্যাস, প্রবন্ধ, কাব্য, অনুবাদ এবং বিভিন্ন আলোচনার সংখ্যাও কম নয়। ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে মহাভারত নিয়ে লেখা ও অনুবাদের ইতিহাসও অনেক বিস্তর। 'Jadavpur Journal of Comparative Literature' থেকে পাওয়া একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থবিবরণী দেওয়া হলঃ

[১] শামিম আহমেদ, *মহাভারতের নাস্তিকতা, কলকাতাঃ সিগনেট প্রেস, ২০২০, পৃঃ ০১।*

- "Ganguli, Kisari Mohan (Tr.), The Mahabharata, Bharata Press, Calcutta, 1888-1896. This complete and faithful translation – the first of the two complete renderings into English of the epic and only edition now available- the monumental accomplishment strangely referred to by scholars and bibliographers alike, as 'the P. C. Roy translation' " [২]
- "Reed, Elizabeth A., Hindu Literature; or the Ancient Books of India. S. C. Griggs & Co., Chicago, 1891. It retells some of the important parts of Ramayana and Mahabharata. Some chapters discuss the Puranas and the cult of Krishna.[৩]
- "Onam, Joseph Campbell, The Great Indian Epics: The Ramayana and the Mahabharata. George Bell & Sons, 1894. Onam says here, " for the Indian people it is the great war ending with Kurukshetra, which is the central event of their history. It closes them for their golden age. Before that was a world of transcendent knowledge and heroic deeds; since then intellectual decay and physical degeneracy" ". [৪]
- "Hopkins, E. Washburn, The Great Epics of India. 1901. Hopkins contention is that "The Pandu-Epic, in its present form, was composed after the reek invasion (circa 400 B.C.)" [৫]
- "Horrwits, Ernst, A Short History of Indian Literature. Unwin, London, 1907. It discusses the origin of Mahabharata.[৬]
- "Roy, Dwijendra Chandra (compiler), Tales from the Mahabharata Karyalaya, Calcutta, 2nd Edition, 1912. It is taken from the Kisari Mohan Ganguli translation of Mahabharata, and revised and re-told for children"[৭]
- "Penzer, Norman A., Nala and Damayanti. A. M. Philpot, London, 1926. Penzer narrates Nala and Damayanti story with great lyrical charm and delicacy[৮]
- "Archer, W. G., The Loves of Krishna., Allen & Unwin, 1957. Archer traces the Krishna story from the Upanishad through the Mahabharata" [৯]
- "Ghoshal, U. M., A History of Indian Political Ideas. Oxford University Press, 1959. Dr. Ghoshal subjects the Mahabharata's Santi (peace) and Anusasana (advice) parvas to a meticulous seventy pages examination and emerges with a lucid presentation of the principal political ideas and theories in the epic". [১০]

---

[২] P. C. Lal, 'An Annotated Mahabharata Bibliography', *Jadavpur Journal of Comparative Literature,* 1961, Jadavpur University, p. 72.

[3] P. C. Lal, 'An Annotated Mahabharata Bibliography', *Jadavpur Journal of Comparative Literature,* 1961, Jadavpur University, p. 82

[4] P. C. Lal, 'An Annotated Mahabharata Bibliography', *Jadavpur Journal of Comparative Literature,* 1961, Jadavpur University, p. 78.

[5] P. C. Lal, 'An Annotated Mahabharata Bibliography', *Jadavpur Journal of Comparative Literature,* 1961, Jadavpur University, p.75.

[7] P. C. Lal, 'An Annotated Mahabharata Bibliography', *Jadavpur Journal of Comparative Literature,* 1961, Jadavpur University, p.76.

[7] P. C. Lal, 'An Annotated Mahabharata Bibliography', *Jadavpur Journal of Comparative Literature,* 1961, Jadavpur University, p.83.

[8] P. C. Lal, 'An Annotated Mahabharata Bibliography', *Jadavpur Journal of Comparative Literature,* 1961, Jadavpur University, p.79.

[9] P. C. Lal, 'An Annotated Mahabharata Bibliography', *Jadavpur Journal of Comparative Literature,* 1961, Jadavpur University, p.76.

[১০] P. C. Lal, 'An Annotated Mahabharata Bibliography', *Jadavpur Journal of Comparative Literature*, 1961, Jadavpur University, p.75.

- "Vora, Dhairyabala P., Evolution of Morals in the Epics. Popular Book Depot, Bombay, 1959. Dr. Vora gives copious references of promiscuity, polyandry, premarital sex relations, fidelity in wedlock, marriage taboos, and the status of women. It also includes an interesting bit on the practice of meat eating in the epic period" [১১]
- "Narayan, R. K., Gods, Demons and others. Heinemann, 1964. Retelling of legends from the Ramayana and Mahabharata by a popular Indian novelist in the English language" [১২]

তাই বলা যেতেই পারে, যে মহাকাব্যের দর্শন নিয়ে এত আলোচনা, ইতিহাস নিয়ে এত তর্ক বিতর্কের ক্ষেত্র, চরিত্রগুলির এত সূক্ষ্ম তাত্ত্বিক সমালোচনা, সেই মহাভারতের ভীম চরিত্রের বিশ্লেষণ, দ্বন্দ্ব ও সমালোচনার বিস্তার আর পাচঁটি চরিত্রের তুলনায় অনেকাংশেই কম।

মহাভারতের কাহিনীকে অবলম্বন করে লেখা বিভিন্ন কাব্যের, গল্পের, উপন্যাসের, প্রবন্ধের আলোচনা ও সমালোচনা বর্তমান পাঠক সমাজের কাছে আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। এই আলোচ্য ক্ষেত্রের অনেকাংশেই মহাভারতের দর্শন ও আখ্যানের, ইতিহাস ও চরিত্রের বিভিন্ন পরিসর লেখক তার কল্পনা ও যুক্তির গভীরতায় ফুটিয়ে তোলেন। এর ফলস্বরূপ, বর্তমান ব্যস্ততায় ডুবে থাকা এক শ্রেণীর পাঠক সমাজের কাছে যখন একটা আস্ত অখন্ড মহাভারত পড়ে ফেলা সম্ভব হয় না, ঠিক তখনই এই লেখনী গুলো যতটা অবকাশ পায় ততটুকু দিয়ে এমন পাঠক সমাজকে সমৃদ্ধ করে। তবে, এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি, পাঠক সমাজ বলতে আমরা শুধুই 'বিদগ্ধসমাজ'এর কথা বলছি না। বুদ্ধদেব বসুর মতানুযায়ী, পাঠক সমাজ বলতে,
"তথাকথিত সাধারণ পাঠক, চাকুরীজীবী, সিনেমাপ্রিয় মহিলা, ধনার্জনকারী ব্যস্ত ব্যবসায়ী, সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত।" [১৩]

এমনই অনেক লেখনীর মধ্যে মহাভারতের মহাপ্রস্থান পর্ব কে অবলম্বন করে লেখা অখিল ঘোষের 'ফিরে চাও ধর্মরাজ' উপন্যাসটিতে অখন্ড মহাভারতের সামগ্রিকতার বিষয়টি না থাকলেও, ঘটনাবলীর সংক্ষেপিকরণ এমনই ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যা সাধারণ পাঠক পাঠিকাদের কাছে মহাভারত নামক জটিল এবং ভারী বিষয়টি হৃদয়গ্রাহী ও চিত্ররূপময় হয়ে উঠেছে।

উপন্যাসের নামকরণ থেকে আলোচনার বিষয়টি শুরু করা যাক। মহাপ্রস্থানে স্বর্গারোহনের উদ্দেশ্যে দ্রৌপদী সহ পঞ্চপাণ্ডবদের যাত্রা শুরু হয়। পথমধ্যে দ্রৌপদী সহ অন্যান্য পাণ্ডবদের মৃত্যু ঘটলেও ভীম ও যুধিষ্ঠির যাত্রাপথে তখনও এগোতে থাকে। এমন সময়ই ভীম যুধিষ্ঠিরকে জানায় "পদযুগল ও দেহের ভার সে বহন করতে পারছে না" [১৪], সে ক্লান্ত, তখন দৃঢ় কণ্ঠে যুধিষ্ঠির উত্তর দেয় এসবের জন্য সে কোনোভাবেই ভীমকে সাহায্য করতে বা সহানুভূতি প্রকাশে ব্যর্থ, কারণ এতে তার মার্গ ভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এতে ভীম চমকে উঠে। অনেকটা আশ্চর্যে এবং তারও বেশী অনেকটা রাগে, তিক্ততায়, আক্ষেপের স্বরে ভীম একের পর এক যুদ্ধ-পূর্ববর্তী ও যুদ্ধ-পরবর্তী ঘটনা স্মৃতিচারণ করতে থাকে। এর মাধ্যমে যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের

[১১] P. C. Lal, 'An Annotated Mahabharata Bibliography', *Jadavpur Journal of Comparative Literature,* 1961, Jadavpur University, p.83.
[12] P. C. Lal, 'An Annotated Mahabharata Bibliography', *Jadavpur Journal of Comparative Literature,* 1961, Jadavpur University, p.78.
[১৩] বুদ্ধদেব বসু, 'মহাভারতের কথা', এম.সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা- ৭৩, ১৯৭৪, পৃ.৩৭.
[১৪] অখিল ঘোষ, 'ফিরে চাও ধর্মরাজ', পত্রপাঠ, কলকাতা- ১৩২, মে ২০২২, পৃ. ১২.

বিভিন্ন দিক প্রকাশ হতে থাকে, যা তার 'ধর্মরাজ' আখ্যাটিকে প্রশ্নের মুখে ঠেলে দেয়। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর একটি লেখা বেশ প্রাসঙ্গিক,

> "আমি কোনো নতুন কথা বলছি না, রাজশেখর বসুও তার সারানুবাদের ভূমিকায় মহাভারতের নায়ক ও কেন্দ্রস্থ পুরুষরূপে যুধিষ্ঠিরকেই চিহ্নিত করেছেন।কিন্তু তার নায়কত্ব কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত সেটা তলিয়ে দেখা দরকার। যাঁকে সাধারণত এক দুর্বল ও উদ্যমহীন পুরুষ বলে ভাবি আমরা, ভীমার্জুনের বাহুবল ও কৃষ্ণের বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল, কৃষ্ণ, বিদুর বা ভাইদের পরামর্শ ছাড়া কোনো পদক্ষেপে যিনি অপারগ; যিনি প্রায় ধৃতরাষ্ট্র মতোই অবস্থিত, ধর্মভীরু হয়েও কখনো কখনো অবিশ্বাস্য রূপে সদাচারভ্রষ্ট - সেই যুধিষ্ঠিরের নায়কত্ব আমরা কোন যুক্তিতে মেনে নিতে পারি ?" [১৫]।

আবার, ইরাবতী কার্‌ভের 'Yuganta: the End of an Epoch' বইয়ের ভূমিকা পর্বে জন ব্রকিংটন জানান,

> "…and Yudhisthira remains in the background. There is no study of Yudhisthira in the book and stray remars reveal that Karve found him an uncongenial figure, yet he is central figure in the story…" [১৬] ।

তাই, এই প্রাসঙ্গিকতা কে সামনে রেখে উপন্যাসটি পড়লে বোঝা যায়, এই নামকরণও কোথাও না কোথাও 'যুধিষ্ঠিরের নায়কত্ব' কে বা 'ধর্মরাজ' আখ্যাকে শুধু প্রশ্নের মুখে ঠেলছে না, বরং তা যুক্তির নিরিখে বিচারও করছে। এ প্রসঙ্গে আরও জানিয়ে রাখি, যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের এই দিকটি নিয়ে কিছু লেখা অবশ্যই আছে। তবে, ভীমের যুক্তি, বিচার ও দৃষ্টিভঙ্গিতে যুধিষ্ঠিরের চরিত্র বিশ্লেষন-বিষয়টি এই উপন্যাসে বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়, "ভীমের বিচারে যুধিষ্ঠিরের পাপের সংখ্যাও তো নেহাত কম নয়। অত হিসেব না করেও ভীম অনুভব করে শুধুমাত্র দুটি একটির বিচারেই ওঁর স্বর্গে যাবার পথ বন্ধ হয়ে যাবার কথা। ওঁর যে কীর্তির জন্য সমগ্র ভারতভূমি ধিক্কারধনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছে, যে ঘটনার জন্য আজও যুধিষ্ঠিরের ধর্মপ্রাণতার কথা উঠলেই একটা প্রশ্নচিহ্ন আপনা থেকেই অঙ্কিত হয় মানসে, যে ঘটনাটা তার 'ধর্মপুত্র' পরিচয়টিকে উপহাসে পরিণত করেছে, 'ধর্মপুত্র' কথাটিকেই 'বক-ধার্মিক' এর সমার্থক করে তুলেছে, সেই গুরু দ্রোণাচার্যের হত্যাকান্ডের মহাপাতক কি ধর্মপুত্রকে স্বর্গ পর্যন্ত পৌঁছতে দেবে?" [17]।

এবার আসি চরিত্র বিশ্লেষণ পর্বে। আপাতদৃষ্টিতে এটা যুধিষ্ঠির এবং ভীম কেন্দ্রিক লেখা মনে হলেও, অন্যান্য অনেক চরিত্রের পর্যালোচনাও লেখক খুব দক্ষতার সাথে করেছেন। আরও বলা যায়, উপন্যাসটি ভীমের স্মৃতিচারণার একটি দলিল রচনা। ভীমের লড়াই আর বাকী পাণ্ডবদের মতো শুধুই কৌরবদের বিরুদ্ধে ছিল না, বরং সে লড়ে গেছে তার মা, তার স্ত্রী, তার ভাইদের বিশেষত যুধিষ্ঠিরের অস্তিত্বের জন্যও। ভীম তার অনিচ্ছা সত্বেও সন্দেহাতীত মনোভাবকে দূরে ঠেলেও মায়ের আদেশ নীরবে পালন করে গেছে। যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্যলিপ্সা মনোভাবকে বুঝতে পেরেও নিঃশব্দে দাদার আদেশ মেনে চলেছে, যার ফলস্বরূপ "পাতকী হয়েছে ভীম আর পুরুষোত্তমত্ব লাভ করেছে কৃষ্ণ, একরাটত্ব লাভ হয়েছে যুধিষ্ঠিরের" [১৮]। দ্রৌপদীর উপর ভালোবাসা যেমন আবেগী ভীমকে অভিমানী করে তুলত, ঠিক তেমনই 'আদিম, বুনো প্রসাধন', 'কামকলা' হিড়িম্বার সোহাগ তাকে 'পরিতৃপ্তির পরিবর্তে অত্যাচারিত' বোধ করাত। ভীমপুত্র হওয়া সত্বেও

---

[১৫] বুদ্ধদেব বসু, 'মহাভারতের কথা', এম. সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা- ৭৩, ১৯৭৪, পৃ.৪১.

[১৬] Irawati Karve, '*Yuganta: The End of an Epoch', Orient Black Swan Private Limited, Hydrabad, P.* XV, Introduction

[১৭] অখিল ঘোষ, 'ফিরে চাও ধর্মরাজ', পত্রপাঠ, কলকাতা- ১৩২, মে ২০২২, পৃ. ৩২৩.

[১৮] অখিল ঘোষ, 'ফিরে চাও ধর্মরাজ', পত্রপাঠ, কলকাতা- ১৩২, মে ২০২২, পৃ. ৪৮.

ঘটোৎকচকে তার যোগ্য সম্মান ও মর্যাদাটুকু দিতে পারেনি, তা নিয়ে দুঃখপ্রকাশ ও করে গেছে। এ প্রসঙ্গে, পরশুরামের 'পুনর্মিলন' গল্পটির কথা মনে পড়ে যায়, যেখানে ভীম, হিড়িম্বা এবং ঘটোৎকচ কে নিয়ে এক সুন্দর হাসির খোরাক জমানো উপস্থাপনা আছে। যাই হোক, এত কিছুর পরেও, ভীম তার পাণ্ডবভাইদের আদেশ পালন করে, দাঁতে দাঁত চেপে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে গেছে। জরাসন্ধ বধের পর ভীমের আত্মধিক্কার, কর্ণের পরিচয় জানার পর তীব্র অনুশোচনা, ইত্যাদি পরিসরগুলি ভীম-চরিত্রে এক অন্য মাত্রা আনে। আরও বলা যায়, আমরা ছোটবেলা থেকেই, যেখানে যুধিষ্ঠির, অর্জুন এবং অন্যান্যদের বীরত্বের কাহিনীর পাশাপাশি তাদের জীবনদর্শনের বিষয়টি নিয়েও আলোচনা হতে দেখেছি, সেখানে ভীমকে শুধুই তার বাহুবল, তার শারীরিক ক্ষমতার আদিরূপাত্মক হিসেবে পেয়ে এসেছি। এ প্রসঙ্গে কার্‌ভে বলেছেন,

> "Whatever he (Yudhisthira) got was through the valour of others. His beautiful wife, his powerful father-in-law, he owed to Arjuna andfor protection in both exiles, he was indebted to Bhima" [19]।

অনেকক্ষেত্রে পাঠকগনের কাছে ভীম চরিত্রটি বেশি হাস্যকর এবং কম রাশভারী হিসেবেই উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এই উপন্যাসে ভীম চরিত্রের উপস্থাপনা এই মিথকে অনেকখানিই ভেঙে দিতে সক্ষম হচ্ছে। এখানের প্রেমিক-ভীম তীব্র আবেগী,

> " 'দ্রৌপদী! দ্রৌপদী! তোমার জন্য ব্রহ্মশিরকেও উপেক্ষা করেছি, যক্ষ –রক্ষ-গন্ধর্ব-মানব যেই হোক না কেন তোমার অসম্মানকারী, সবার সঙ্গে আমি লড়েছি মৃত্যুর ভয়কে তুচ্ছ করে! কৃষ্ণা! তোমারই প্রতীক্ষায় যৌবন জীবন অতিবাহিত করেছি! তুমি কি বোঝোনি তা?' চলতে চলতে আপনমনে বলতে থাকে ভীম; ব্যর্থ যৌবনের হাহাকারের আজ প্রৌঢ়ত্বে ওর মুখ থেকে যেন প্রতিধ্বনি বেজে যাচ্ছে, 'আজ এই জীবনের শেষ সময়ে এসেও আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে, যদিও তুমি সাথে নেই এখন, চলে গেছ জীবনের ওপারে, তবু প্রশ্ন জাগে, কৃষ্ণা! তুমি কি সত্যিই বোঝ নি আমার মনের ব্যাকুলতা, নাকি বুঝতে চাও না?'" [২০]

এখানের পিতা-ভীম সন্তানের জন্য কষ্ট পায়, "মাতৃসদৃশ মুখাবয়বটিকে বাদ দিলে ঘটোৎকচ যেন ছায়াভীম। সেই পরিঘ তুল্য কড়ীশূণ্ডেড় মত বলিষ্ঠ বাহু, শালপ্রাংশু ঊরু, সেই সুদীর্ঘ দেহ, বিশাল চওড়া বুকের ছাতি– সব মিলিয়ে নকল ভীম যেন একটা; আর, ভীমের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি যা সাদৃশ্যপূর্ণ তা হল ঘটোত্কচ জাতক্রোধ এবং অতুল দেহবলে বলীয়ান ছিল। পিতামহ ভীষ্মও নাকি ওকে অতিরথ বলে জ্ঞান করতেন। হায় ঘটোতকচ! ভীমপুত্র হওয়ার যোগ্য মর্যাদাটুকু ও পায় নি কোনওদিন। জন্মক্ষণেই ওকে ত্যাগ করেছিল ভীমেরা। রাক্ষসী মায়ের তত্ত্বাবধানে মানুষ হয়েছে সে। পান্ডব বংশের প্রথম কুমার হয়েও তাঁর স্থান ছিল জঙ্গলেই। ও তবু কোনও খেদ রাখেনি মনে এজন্য। তবু পিতা ভীমের জন্য নিবেদিত প্রাণ ছিল সে।...যখনই ভীম বা যুধিষ্ঠিরের প্রয়োজন পড়েছে, ছুটে এসেছে, ক্রীতদাসের মতো খেটেছে নির্দ্বিধায়। প্রয়োজন ব্যতীত তো ওকে স্মরণেই রাখা হয়নি কোনও কালে" [২১]।

বুদ্ধদেব বসুর মতানুযায়ী, "আমরা দেখিছি ভীমকে, যখন দ্যূতসভায় চন্ডমূর্তি ধারণ করেছেন তিনি, চাইছেন যুধিষ্ঠিরের বাহু দগ্ধ করতে, যখন তাঁর ক্রোধ তাঁর প্রতিটি রোমকূপ থেকে নিঃসৃত হচ্ছে– যেন জলন্ত কোনো গাছেন গা থেকে 'সমূধস্ফুলিঙ্গ হুতাশন' (সভা; ৬৬, ৬৯,৭০); ...আর বলবান ভীম প্রতিহিংসায়

---

[১৯] Irawati Karve, '*Yuganta: the End of an Epoch', Orient Black Swan Private Limited, Hydrabad, p.68.*

[২০] অখিল ঘোষ, 'ফিরে চাও ধর্মরাজ', পত্রপাঠ, কলকাতা- ১৩২, মে ২০২২, পৃ. ১৯২.

[২১] অখিল ঘোষ, 'ফিরে চাও ধর্মরাজ', পত্রপাঠ, কলকাতা- ১৩২, মে ২০২২, পৃ. ২০৫.

উন্মত্ত হয়ে, নিপাতিত ও নিঃসহায় দুর্যোধনের মস্তকে পদাঘাত করলেন (শল্য ; ৬০); ...এবং দেখেছি আকিলেউসকেও, হেক্তোর যখন ভূলুণ্ঠিত ও করুণাপ্রার্থী, ভীমের মতোই নরকভুকবৃত্তির পরিচয় দিয়ে যিনি গর্জে উঠেছিলেন – 'কুকুর! তুই দয়ামায়ার কথা তুলিস না, তোর গা থেকে কাঁচা মাংস কেটে ভোজন করার মতো ক্ষুধা থাকলে তবে আমার সুখ হতো আজ।"[২২]। এমন বহুশত্রুহন্তা ক্ষাত্রতেজসম্পন্ন ভীমও যুদ্ধের নৃসংসতার কাছে মাথা নত করে নিজেদের করা কৃতকর্মের কাছে প্রশ্ন করে, " কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে জয়টা ওদের কি আদৌ জয়, নাকি আসলে পরাজয় তা ভীম আজও বুঝতে পারে না। জয়ের কি এত জ্বালা হয়? ওঁরা স্বপ্ন দেখত একটা যুদ্ধের, যে যুদ্ধের অবসানে সূচনা হবে এক নতুন প্রভাতের, যে প্রভাতের কল-কাকলিমুখর কিরণজাল সমস্ত গ্লানি-মলিনতা দূরীভূত করবে, যে প্রভাতের সুগন্ধিত বাতাস অন্তরের সমস্ত ক্ষতগুলিকে নিরাময় করে দেবে।...যুদ্ধে ওদের তথাকথিত জয় হল ঠিকই, কিন্তু প্রভাতের শোণিত গন্ধযুক্ত বাতাস হৃদয়ের ক্ষতগুলিকে ঘুলিয়ে দিতে লাগল হাজারো বিষ জ্বালায়।...ভীমের অন্তরেও হাহাকার ভরিয়ে দিয়ে গেল। হায় ! জীবনে যা কিছু অপরিপূর্ণ ছিল তা পূরণ করতে চেয়েছিল যে যুদ্ধের মাধ্যমে, সেই যুদ্ধই তো আরও নিঃস্ব করে দিয়ে গেল। আত্মীয় বান্ধব সুহৃদ পুত্র পিতা পিতামহ গুরু শিষ্য সবাইকে কেড়ে নিয়ে গেল কুরুক্ষেত্র। হাজার হাজার সদ্য বিধবার অন্ধকারাচ্ছন্ন আগামী, বার্ধ্যক্যের সহায়রুপ পুত্রের অকাল বিয়োগে লক্ষ লক্ষ পিতার দীর্ঘশ্বাস, শূন্যক্রোড় অযুত জননীর গুমড়ে গুমড়ে কান্নার রব, অজস্র পিতৃহারা অনাথ শিশুর করুণ চাহনি এসবই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের উপহার ওদেরকে। হস্তিনাপুরকে খা খা শ্মশানে পরিণত করে দিয়ে গেল। "[23]

এখানের প্রতিবাদী-ভীম দৃঢ় কণ্ঠে যুদ্ধের বিরোধিতা করে প্রশ্ন করে বসে, "যুদ্ধটা কি এড়ানো যেত না একেবারেই?" [24]।

এখানে দার্শনিক-ভীম শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জীবনের অর্থ খুঁজতে তীব্র চেষ্টা চালিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে বলতেই হয়, জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে ভীমের স্মৃতিচারণই ভীমের চরিত্র পর্যালোচনার এক অন্য ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়।

শুধু তাই নয়, দ্রৌপদীর প্রতি কর্ণের ঈর্ষা, প্রতিশোধস্পৃহা এবং শ্রদ্ধার দিকটিও ভীমের নজরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বস্ত্রহরণ মুহূর্তে কুরুবৃদ্ধরা কেন নীরব সেই প্রশ্ন ভীম পাঠকের কাছে তুলে ধরেছে। কুন্তীর সংকোচকে অনবরত প্রশ্ন করে গেছে ভীম, "প্রজ্ঞাবতী কুন্তীর তো অজানা ছিল না যে, সমাজে কানীন পুত্র স্বীকৃত এবং বিবাহোত্তর সময়ে জাত সন্তানদের সঙ্গে সে সম মর্যাদা, সম গোত্র এবং সম পিতৃপরিচয় প্রাপ্ত হবে! সেক্ষেত্রে পাণ্ডুপুত্র বলেই তো ধরা হতো কর্ণকে। তাছাড়া কর্ণ তো যার-তার ঔরসজাত নয়, সূর্যদেব তার পিতা। তাহলে কীসের লজ্জা, কীসের কুণ্ঠা ছিল পৃথার ? বরং সে তো ছিল গৌরবেরই বিষয় !" [25]।

জন্মান্ধ হবার সাথে সাথে পুত্র-স্নেহে-অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রর সিংহাসনলোভী, ক্ষমতাগৃধ্ন চরিত্রের তীব্র নিন্দা করতেও সে পিছপা হয়নি। এভাবেই, ভীম তার প্রতিবাদী স্বত্বাকে কথকের স্থানে রেখে বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে মহাভারতের প্রধান চরিত্রগুলোর সাথে সাথে, আর্যসমাজে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা টুকরো টুকরো চরিত্রগুলোরও সূক্ষ্ম দিক পাঠকের সামনে তুলে ধরেছে।

---

[২২] বুদ্ধদেব বসু, 'মহাভারতের কথা', এম.সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা- ৭৩, ১৯৭৪, পৃ. ৯৪.

[২৩] অখিল ঘোষ, 'ফিরে চাও ধর্মরাজ', পত্রপাঠ, কলকাতা- ১৩২, মে ২০২২, পৃ.১৯৭.

[২৪] অখিল ঘোষ, 'ফিরে চাও ধর্মরাজ', পত্রপাঠ, কলকাতা- ১৩২, মে ২০২২, পৃ.২৬০.

[২৫] অখিল ঘোষ, 'ফিরে চাও ধর্মরাজ', পত্রপাঠ, কলকাতা- ১৩২, মে ২০২২, পৃ.২২০.

সমস্ত ধরনের রাজনীতির সূক্ষ্ম আলোচনা, চরিত্রের জটিলতা, ঘটনার ঘনঘটা এসবের বাইরেও এই উপন্যাসটিকে একটি যুদ্ধ বিরোধী রচনা হিসেবে দাবি করা যেতেই পারে। যুদ্ধকালীন কূটনীতি, ভয়াবহতা এবং যুদ্ধ পরবর্তী যে হাহাকার, আর্তনাদ তার এক জ্বলন্ত চিত্র এই লেখাতে ফুটে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে ভীষণভাবে মনে পড়ে, বুদ্ধদেব বসুর লেখা 'প্রথম পার্থ' তে, দ্রৌপদীর কল্পনায় উঠে আসা যুদ্ধের আসন্ন ভয়াবহ অবস্থা, যা তার চূড়ান্ত জেদি মনকেও যুদ্ধ নিয়ে সংশয়ে ফেলে দেয়,

"দুঃশাসনের বাহু ছিন্ন, দুর্যোধনের উরু চূর্ণ-কিন্তু শুধু তাই নয়
আরো হবে, আরো অনেক -যা আমি চাইনি, এখনো চাই না।
আরো অনেক হত্যা, আরও অনেক মৃত্যু - হিংসার উত্তরে প্রতিহিংসা
পুনরাবৃত্ত। বলি হবে সজ্জনেরাও, বালকেরাও..." [26]।

দ্রৌপদীর এই ভয়, সংশয়কেই যেন এই উপন্যাসে লেখক তার কল্পনায় বাস্তব রূপ দিয়েছেন,

"ওদের রাত পোহাতে লাগলো হাজারো মানুষের বুক চাপড়ানোর শব্দে। হাহাকার ধ্বনি মুখরিত সকালই দেখতে পেল ওরা। পথে হাহাকার, ঘাটে হাহাকার, আকাশে হাহাকার, বাতাসে হাহাকার, বৃক্ষলতাগুল্মতৃণে হাহাকার, কুটীরে হাহাকার, সুরম্য রাজপ্রাসাদের দেওয়ালে হাহাকার, অন্তরে অন্তরে হাহাকার" [27]।

আবার অন্যদিকে, শুধুই যুদ্ধের মর্মান্তিক পরিণতি এবং যুদ্ধের বিরোধিতা করেই লেখক থেমে থাকেননি। বরং, ভীম-চরিত্র কে সামনে রেখে পাঠক সমাজের কাছে, "বিনাশ না করেও তো উদ্ধার করা যেত পিতৃরাজ্য" [28]। এমন বিষয়ও উপস্থাপন করেছেন। শুধু তাই নয়, "প্রথম পার্থ" তে দ্রৌপদী যেমন যুদ্ধ বিকল্প হিসেবে এক অন্য পন্থার কথা বলেছেন,

"কিন্তু আছে এক অন্য পথ,
সপক্ষে নয়, বিপক্ষে নয় - বিবিক্ত
ত্যাগ নয়, অত্যাগ নয় - নির্লিপ্ত।" [29]

আবার অন্যদিকে, শামিম আহমেদ, তার মহাভারতের নাস্তিকতা গ্রন্থে বলেছেন, "আচার্য আনন্দবর্ধন থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রত্যেকেই সহমত যে মহাভারতের মূল আখ্যান যুদ্ধবর্ণনা হলেও যুদ্ধবর্ণনাই তার মূল লক্ষ্য নয়। মহাকাব্যের উদ্দেশ্য হল, শান্তিপর্বে পৌঁছানো। মহাভারত নামক বৃক্ষের ফল হল শান্তিপর্ব" [30]।

ঠিক তেমনই, এই উপন্যাসে ভীম-চরিত্রও এমন অনেক যুক্তি তার সাহস, দৃঢ়তা এবং প্রতিবাদের স্বরে তুলে ধরেছে, যা যুদ্ধ নামক বিনাশের পথে না গিয়েও রাজ্য উদ্ধারের কাজটি অনায়াসে করা যেত। যুদ্ধ বিরোধী এবং যুদ্ধ বিকল্প পন্থাগুলো এই উপন্যাসের এক অন্যতম সংযোজন, যা ভবিষ্যতের পাঠকদের আলোচনা সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতেই পারে।

এবার আসি অন্য পরিসরে। খুব সূক্ষ্ম ভাবে দেখলে বোঝা যায়, আমাদের নিত্যদিনের সংসারে হাজারো চরিত্রের প্রতি ক্ষেত্রেই মহাভারতের গল্প গাঁথা আছে। সেইজন্য বলে হয়তো, মহাভারত এমনই প্রতিদিনের সংসারে ঘটতে থাকে ঘটনার এক অন্যতম লিখিত স্বরূপ। এর জীবনদর্শনই এর নিস্কর্ষ। এই উপন্যাসে ভীমের স্মৃতিচারণ বারবার তাকে জীবনের অস্তিত্ব-উদ্দেশ্য-প্রাপ্য, ভালো-খারাপ, পাপ-পুণ্য, বন্ধু-শত্রু, আপন-

---

[২৬] অখিল ঘোষ, 'ফিরে চাও ধর্মরাজ', পত্রপাঠ, কলকাতা- ১৩২, মে ২০২২, পৃ.১১৮.

[২৭] অখিল ঘোষ, 'ফিরে চাও ধর্মরাজ', পত্রপাঠ, কলকাতা- ১৩২, মে ২০২২, পৃ.১৯৬.

[২৮] অখিল ঘোষ, 'ফিরে চাও ধর্মরাজ', পত্রপাঠ, কলকাতা- ১৩২, মে ২০২২, পৃ.২২৩.

[২৯] বুদ্ধদেব বসু, 'অনাম্নী অঙ্গনা ও প্রথম পার্থ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, ১৯৬০, পৃ. ১২৫.

[৩০] শামিম আহমেদ, 'মহাভারতে নাস্তিকতা', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা- ০৯, জানুয়ারি ২০২০, পৃ.০১.

পর ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন করে। যখন যুধিষ্ঠির তার অনুগত ও শরণাগত কুকুরের জন্য স্বর্গ ছাড়তে রাজি হয়, ভীম তখন প্রচন্ড তিক্ততায়, তীব্র ঘৃণায়, অসহ্য জ্বালায় বলে ওঠে, "ভাইদের আজ আপনি কোথায় নামিয়ে দিলেন ধর্মরাজ! ...কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট করে দিলেন তাদের!" [31]। মনে পড়ে যায়, কিছুদিন আগেই, এই লেখকেরই লেখা "খালাস" নামক একটি গল্পের কথা। গায়ে কাঁটা দেওয়া এক মুহূর্ত সেখানে বর্ণিত, যেখানে দারিদ্রে জর্জরিত নেপুর পোয়াতি বউ চিকিৎসার অভাবে ঘরে গোঙাতে গোঙাতে মরে আর অন্যদিকে নেপুর মা তার বিশহাজারি গরুর সদ্যোজাতর জন্য ডাক্তার আনে, কারণ,

"নেপুরে আবার বিয়া দিয়া ঘরে বউ আনবার পাবা, কিন্তুক বিশহাজারি গোরুডা মইরা গ্যালে-" [32]।

এই তো জীবন! সবটাই বড় শূন্যতায় ভরা, সবাই বড় কঠিন, বড় জটিল, বড় বাস্তব। এখানে হিসেব মেলাতে যাওয়া বৃথা। কিন্তু এসবের পরেও, এত হতাশাতেও ভীম তার সমস্ত যুক্তি-বুদ্ধি-বোধ-আবেগ দিয়ে জীবনের হিসেব মেলাতে চায়। কখনও সে তিক্ত হয়ে জীবন থেকে মুখ ফেরায়, আবার কখনও সংসারের মায়াজালে, দায় কর্তব্যে জর্জরিত হয়ে পুনরায় জীবন সংগ্রামে নেমে পড়ে। তারপর, জীবনের উপান্তে এসে জীবনের প্রতি তার হঠাৎ মায়া হয়, সে বলে ওঠে, "কেমন করে যে কেটে গেল জীবনটা, বোঝাই গেল না। বাঁচাই তো হলো না ঠিকমতন" [33]। এটাই সংসার। এটাই আমাদের নিত্যদিনের ব্যস্ততা, অস্তিত্বের সংগ্রাম, টিকে থাকার গল্প, এটাই মহাভারত। এখানে সাহসী, জেদি, বলশালী বীরেরাও আর পাঁচটা নেপুর বউয়ের মতনই সাধারণ চরিত্রের মতো, জীবনের অন্তিমপর্বে গিয়ে হিসেব মেলানোর চেষ্টায় ব্যর্থ হয়। উপসংহারে তারা জীবনকে জীবনের মতো করে ছেড়ে দেওয়াই শ্রেয় মনে করে। যাইহোক, এই সমস্ত যুক্তি, তর্ক ও আলোচনার উর্ধে গিয়ে, সামগ্রিকতার বিচারে এটা অবশ্য বলতে হয়, এই উপন্যাসটি অনেকখানি জীবনমুখী, সুখপাঠ্য এবং অবশ্যপাঠ্য।

এমনকি, লেখক তাঁর সাক্ষাৎকারেও এমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন। বিস্তারিত সাক্ষাৎকারটি নিম্নে দেওয়া হল।

রীনা বিশ্বাস: আপনার লেখা পড়ে অরুনেশ ঘোষ বলেছিলেন, "আমি বাংলাদেশের প্রখ্যাত কোনও লেখকের লেখা পড়ছি।...পূর্ববঙ্গের শৈশব কৈশোরকে খুঁজে পেয়েছিলাম।" [34] আবার অন্যদিকে, 'সাপ্তাহিক বর্তমান' পত্রিকায় আপনার লেখা বিষয়ে বলা হয়েছিল,"গল্পগুলি যথেষ্ট বলিষ্ঠ। প্রান্তিক ও দরিদ্রজনের মানসিক যন্ত্রণা, আর্তি ও গভীর মর্মবেদনা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। মাটির কাছাকাছি অসহায় মানুষের কথা তিনি তুলে ধরেছেন নির্ভীকভাবে।" [35] অর্থাৎ, আপনার লেখায় আঞ্চলিকতার প্রাধান্য বেশি। এমতাবস্থায়, আপনি মহাভারতের মতো মহাকাব্যকে নিয়ে উপন্যাস লেখার বিষয়টি কিভাবে ভাবলেন?

অখিল ঘোষ: আসলে শৈশব কৈশোরে মহাভারত আমার ব্যক্তিগতভাবে দৈনন্দিন জীবনেরই অঙ্গ ছিল। আমার পিতা সুরেশ চন্দ্র ঘোষ একজন দরিদ্র ব্যক্তি ছিলেন। জীবনযুদ্ধে খাবি খেতে খেতে দিনশেষে বাড়ি ফিরে নিয়ে বসতেন মহাভারত, রামায়ণ, ভাগবত ইত্যাদি। তারই মতো আরও কিছু হতদরিদ্র জীবনযুদ্ধে অবসন্ন কিছু মানুষও এসে জুটতেন সে সময়। বাবা পাঠ করতেন, তারা তন্ময় হয়ে শুনতেন। আমিও শুনতাম পড়াশুনার ফাঁকে অথবা পড়াশুনা ফাঁকি দিয়ে। এক অমোঘ আর্কষণে মন ছুটে যেত সেই পাঠ শুনতে। কখনও ঠাকুরের আসন থেকে শালুকাপড়ে মুড়ে রাখা মহাভারত নিয়ে নিজেই পড়তে থাকতাম। মহাভারত

---

[৩১] অখিল ঘোষ, 'ফিরে চাও ধর্মরাজ', পত্রপাঠ, কলকাতা- ১৩২, মে ২০২২, পৃ.৩২৮.

[৩২] অখিল ঘোষ, 'খালাস', কবিতীর্থ, কলকাতা- ২৩, জানুয়ারি ২০১০, পৃ.১৮.

[৩৩] অখিল ঘোষ, 'ফিরে চাও ধর্মরাজ', পত্রপাঠ, কলকাতা- ১৩২, মে ২০২২, পৃ.২৯৭.

[৩৪] অখিল ঘোষ, 'খালাস', কবিতীর্থ, কলকাতা- ২৩, জানুয়ারি ২০১০, মুখবন্ধ.

[৩৫] কাকলি চক্রবর্তী, 'খাসা গল্প', সাপ্তাহিক বর্তমান, ১৭ জুলাই ২০১০.

আমার কাছে গল্পের বা আকর হিসেবে ধরা পড়েছিল সেই কৈশোরবেলায়। মহাভারতীয় চরিত্রগুলি ভীষনভাবে মনে প্রভাব ফেলেছিল। আবার, একটু বড় হয়ে মহাভারতে ধর্মের মোড়কে অধর্মগুলো চোখে পড়তে লাগল। মহাপ্রস্থানের বিষয়টি মনে গভীরভাবে দাগ কাটে। দীর্ঘদিন একসাথে থাকা একান্ত আপন মানুষগুলোকে এক এক করে চলে যেতে দেখেও নির্বিকার যুদ্ধিষ্ঠিরকে ভীষণ স্বার্থপর ও নিষ্ঠুর মনে হতো। পরবর্তীতে প্রত্যন্ত গ্রামে বসে যতটুকু মহাভারতের সমালোচনা পড়ার সুযোগ হয়েছে, তার দ্বারাই মহাভারতে বর্ণিত ন্যায়নীতি, ধর্ম-অধর্ম বিষয়ে মনে প্রশ্নের বীজ উত্তপ্ত হয়েছে। আর, আমি যে পরিমন্ডলে বড় হয়েছি, সেখানে শুধু অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার কঠিন সংগ্রাম আমার চোখ এড়ায়নি কখনও। মহাভারতের কাহিনীও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ের গল্পই বলে।

রীনা বিশ্বাস: আপনার লেখা 'প্রবাহ' গল্পে মরা রায়ডাকের খরতর প্রবাহেও নিখিলের পাটের জাঁক খুঁজে পেয়ে কাঁদতে থাকা, 'দুলারী' গল্পে ছাপান্ন বছর বয়সি ধানু মুচি তার পোয়াতি বউ লছমিকে নিয়ে সমাজের তোয়াক্কা না করে শুধু কন্যা সন্তান পাওয়ার ইচ্ছায় বেরিয়ে পড়া, এমন নিয়ত সমাজে ঠোক্কর খাওয়া, তারপরেও থেমে না থাকা চরিত্রের মাঝে ঐশ্বরিক শক্তিতে মহিমান্বিত 'ভীম' চরিত্র নিয়ে লেখার কথা কেন ভাবলেন?

অখিল ঘোষ: ভীমকে আমার মনে হয়েছে এ লড়াইয়ের একনিষ্ঠ সৈনিক। অন্যদের লড়াইয়ের বহুবিধ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্য ছিল, স্বার্থের নগ্ন ও সূক্ষ নানান সিদ্ধিকাম ছিল। ভীমকে সেখানে আমার মনে হয়েছে বিশুদ্ধ যোদ্ধা বা সৈনিক।

মহাভারতের ঐশ্বরিক বা অলৌকিক আবর্জনাটুকু সরিয়ে দিলে, মহাভারত যেন আমাদেরই পরিবারের, সমাজের এবং রাজনৈতিক পরিমন্ডলের চিরচেনা চিত্র। মৃত্যুমুখে প্রায় প্রতিটি সাংসারিক জীব জীবনের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির হিসেব নিয়ে বসে এবং প্রায় প্রতিটি মানুষের হিসেবের খাতায় অপ্রাপ্তির আলেখ্যই প্রতিভাত থাকে। ভীম যেন সংসারের প্রয়োজনে নিয়োজিত অনলস সংসারী জীব। জীবন সায়াহ্নে এসে সেও খুলে বসেছে তার খাতা। সেখানে অনিবার্যভাবেই এই অপ্রাপ্তির হাহাকার এ উপন্যাসে সংসারে প্রতিটি লড়াকু মানুষের সেই অন্তিম হাহাকারের মাধ্যম হয়ে উঠেছে। ভীম ক্ষয়িষ্ণু যৌথ পরিবারের সেই চরিত্রকে তুকে ধরেছে যে পরিবারের বটগাছসম অগ্রজ বা কর্তাব্যক্তির প্রশ্নাতীত অনুসরণে রয়ে গেছে চিরবঞ্চিত হয়ে।

প্রাবন্ধিক কর্তৃক নেওয়া সাক্ষাৎকার:

তথ্যদাতার নাম : অখিল ঘোষ

বয়স : ৪৯

পেশা : শিক্ষকতা

ঠিকানা : বালাকুঠি (জোড়াইমোড়), থানা- বক্সিরহাট, জেলা- কোচবিহার, পিন নম্বর- ৭৩৬১৩১।

সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ১৭.০২.২০২৩

সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান : কোচবিহার।

গ্রন্থপঞ্জিঃ

- অখিল ঘোষ, 'খালাস', কবিতীর্থ, কলকাতা- ২৩, জানুয়ারি ২০১০.
- অখিল ঘোষ, 'ফিরে চাও ধর্মরাজ', পত্রপাঠ, কলকাতা- ১৩২, মে ২০২২.
- কাকলি চক্রবর্তী, 'খাসা গল্প', সাপ্তাহিক বর্তমান, ১৭ জুলাই ২০১০.
- বুদ্ধদেব বসু, 'মহাভারতের কথা', এম.সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা- ৭৩, ১৯৭৪.
- বুদ্ধদেব বসু, 'অনাম্নী অঙ্গনা ও প্রথম পার্থ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, ১৯৬০.
- শামিম আহমেদ, 'মহাভারতে নাস্তিকতা', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা- ০৯, জানুয়ারি ২০২০.
- Irawati Karve, 'Yuganta: the End of an Epoch', Orient Black Swan Private Limited, Hydrabad.
- P. C. Lal, 'An Annotated Mahabharata Bibliography', Jadavpur Journal of Comparative Literature, 1961, Jadavpur University.

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1644-1651
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.385

বিশ শতকে প্রচলিত অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে শিক্ষিত মহিলাদের কণ্ঠস্বর: 'ভারত-মহিলা' পত্রিকায়

অনন্যা সামন্ত, *গবেষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 24.03.2026; Accepted: 26.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The magazine 'Bharat-Mahila' was published in the month of Bhadra in the year 1312 of the Bengali calendar. It was an illustrated monthly magazine, edited by Sarajubala Dutta.
In the early twentieth century, although women's education had begun to spread among girls, many women were still confined within the inner quarters of their homes. They could neither live according to their own wishes nor step outside the house. They often compared their condition to that of a bird trapped in a cage.
At that time, a sense of awareness about their situation began to grow among some educated women. They started to realize that they had the right to live life on their own terms. This realization awakened in them a desire for freedom. Through their writings, they repeatedly expressed the many hardships and sufferings they endured while living within the inner quarters.
In this essay, I have discussed how educated women protested against this state of confinement within the inner quarters, known as the purdah system.

Keywords: 'Bharat-Mahila', Sachitra Masik Patrika, Sarajubala Dutta, Twentieth century, Women's Freedom, Seclusion of Women

বৈদিক যুগে মেয়েদের জন্য লেখাপড়ার রীতি প্রচলিত থাকলেও সময়ের সঙ্গে সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছিল। উনিশ শতকেরমেয়েরা পড়াশোনা করার কথাভাবতেও ভয় করত। কারণ তখনকার দিনে এই ধারণা প্রচলিত ছিল— স্ত্রীশিক্ষা শাস্ত্রসম্মত নয়, কেউ বলত লোকাচার বিরুদ্ধ, কেউ বা বলত লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা বিধবা হবে, আবার কারোর মতামত ছিল লেখাপড়া শেখার মতো বুদ্ধি মেয়েদের নেই।[১] সেকালে এই প্রচলিত মতের বিরোধিতা করেগৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' (১৮২২) বইয়েতে 'দুই স্ত্রীলোকের কথোপকথন'–এর মাধ্যমে সেকালে অন্তঃপুরের মেয়েরা লেখাপড়া নিয়ে কি মনে করত সেই দিকটি দেখিয়েছিলেন—

> "প্র। ভাল, লেখা পড়া শিখিলে কি ঘরের কায কর্ম্ম করিতে হয় না? স্ত্রীলোকের ঘর দ্বারের কায রাঁধা বাড়া ছেলাপিলা প্রতিপালন না করিলে চলিবে কেন? তাহা কি পুরুষে করিবে।

> উ। না, পুরুষে করিবে কেন? স্ত্রীলোকেরই করিতে হয়, কিন্তু লেখা পড়াতে যদি কিছু জ্ঞান হয় তবে ঘরের কাজ কর্ম্ম সারিয়া অবকাশ মতে দুই দণ্ড লেখা পড়া নিয়া থাকিলে মন স্থির থাকে, এবং আপনার গণ্ডাও বুঝিয়া পড়িয়া নিতে পারে।
>
> প্র। ভাল। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার কথায় বুঝলাম যে লেখা পড়া আবশ্যক বটে। কিন্তু সে কালের স্ত্রীলোকেরা কহেন, যে লেখা পড়া যদি স্ত্রীলোকে করে, তবে সে বিধবা হয় এ কি সত্য কথা যদি এটা সত্য হয় তবে মেনে আমি পড়িব না, কি জানি ভাঙ্গা কপাল যদি ভাঙ্গে।"[২]

উনিশ শতকেতারশঙ্কর তর্করত্ন, হরচন্দ্র দত্ত, দ্বারকানাথ রায় ছাড়াও অনেক মহিলার লেখাতেও স্ত্রীশিক্ষার কথা ফুটে উঠেছিল। যেহেতুমেয়েদের মধ্যে জ্ঞানের অভাব ছিল, তাই এই বিষয়ে অনেক অন্তঃপুরে বন্দি মহিলাদের মধ্যে লেখাপড়া নিয়ে ভীতি থাকলেও, কিছু মহিলার মধ্যে পড়াশোনার প্রতি উৎসাহও জেগেছিল। প্রথম বাঙালি মহিলা আত্মজীবনীকার রাসসুন্দরী দাসী তাঁর সময়ের মেয়েদের অবস্থা সম্পর্কে 'আমার জীবন' গ্রন্থে লিখেছিলেন—

> "তখন মেয়েছেলেরা লেখাপড়া শিখিত না, সংসারে খাওয়া দাওয়ার কর্ম্ম সারিয়া কিঞ্চিৎ অবকাশ থাকিত, তখন কর্ত্তা ব্যক্তি যিনি থাকিতেন, তাঁহার নিকট অতিশয় নম্রভাবে দন্ডায়মান থাকিতে হইত। যেন মেয়েছেলের গৃহকর্ম্ম বৈ আর কোন কর্ম্মই নাই। তখনকার লোকের মনের ভাব এইরূপ ছিল। বিশেষতঃ তখন মেয়েছেলের এই প্রকার নিয়ম ছিল, যে বৌ হইবে, সে হাতখানেক ঘোমটা দিয়া ঘরের মধ্যে কাজ করিবে, আর কাহারও সঙ্গে কথা কহিবে না, তাহা হইলেই বড় ভাল বৌ হইল।"[৩]

অর্থাৎ ভালো বউ মানে ছিল যে সারাদিন সংসারের কাজ করে যাবে, মাথাতে একহাত ঘোমটা দেবে এবং কোন কথা বলবে না।এছাড়াও উনিশ শতকের আরও এক লেখিকা কৈলাসবাসিনী দেবী 'হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থ' (১৮৬৩) গ্রন্থে মেয়েদের লেখাপড়া নিয়ে পুরুষদের নানারকম দৃষ্টিকোণের কথা লিখেছিলেন। এই গ্রন্থের অন্তর্গত 'বঙ্গদেশীয় অঙ্গনাদিগের স্বাধীনতা'তে তিনি বলেছিলেন—

> "হায়! কি ভ্রান্তিমূলক বাক্য, আমাদিগের বঙ্গদেশীয় মহাত্মাগণের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি বলেন; "অবলাগণকে বিদ্যাভ্যাস করাইলে, তাহারা আর অন্তঃপুররূপ পিঞ্জর বদ্ধ হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করিবে না, এবং অন্যান্য দেশীয় যোষাগনের ন্যায় স্বেচ্ছা-মত সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে ইচ্ছুক হইবে, ও ইউরোপীয় বর-বর্ণিগণের তুল্য ভাব ধারণ করিয়া সকল পুরুষের সহিত বাক্যালাপ করণে প্রবৃত্ত হইবে। এইরূপে তাহারা সর্ব্বত্র গতায়াত ও সর্ব্ব বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিয়া আপনাপন অবস্থার প্রতি বিরক্ত হইবে, এবং অধীনতা-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করিবে। অতএব নারীগণকে বিদ্যা শিক্ষা করান কোন ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে।" আহা! হিন্দুধর্ম্মাভিমানী মহদাশয়গণ কি যুক্তিই করিয়া থাকেন; বিদ্যার কি আকর্ষণী শক্তি আছে যে তদ্দ্বারা নারীগণকে বাহির করিবে; আর নারীগণ যে স্বাধীনতা ইচ্ছা করিবে, তাহারই বা প্রমাণ কি? একাল পর্য্যন্ত ত কোন দেশীয় কামিনীগণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয় নাই, তবে বঙ্গদেশীয় মহিলাগণ কি প্রকারে স্বাধীনতা ইচ্ছা করিবে।"[৪]

এছাড়া তাঁর আরও একটি গ্রন্থ 'হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি' (১৮৬৫)তে মেয়েদের নিয়ে পুরুষদের মানসিকতা কেমন ছিল সেই সম্পর্কে বলেছিলেন—

> "তাঁহারা কহিতেন যে অবলাগণকে ঈশ্বর স্বভাবতই নির্ব্বোধ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, আর উহাদিগের বিদ্যাভ্যাসের প্রয়োজনই বা কি আছে কারণ উহাদিগের ত অর্থ উপার্জ্জন করিতে হইবেক না, উহারা গৃহকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবে, গৃহকর্ম্মে বিদ্যার কি আবশ্যক, তবে যদি এরূপ হয় যে তাহারা লেখাপড়া শিখিয়া রাণী ভবানী প্রভৃতির ন্যায় স্ব স্ব বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হয় তবে উহাদিগের বিদ্যাভ্যাসের প্রয়োজন বটে, নচেৎ উহাদিগের বিদ্যাভ্যাসের কোন আবশ্যক নাই, আর আমরা মধ্যবিধ গৃহস্থ, আমাদিগের বনিতাগণের বিদ্যাভ্যাসে কোন প্রয়োজন নাই।"[৫]

পরবর্তীকালে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন হওয়ার পরে মেয়েদের অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হলেও, অনেক মহিলাই ছিলেন অশিক্ষিত ও অন্তঃপুরে বন্দি। কিন্তু সময়ের সঙ্গে অন্তঃপুরের মহিলারা শিক্ষিত হওয়ার ফলে, তাঁদের মধ্যে মানসিকতার পরিবর্তন হতে শুরু করেছিল। তাঁরা নিজেদের অন্তঃপুরের একঘেয়ে গৃহবন্দি জীবনথেকে মুক্ত হতে চাইছিলেন।নিজেদের অবস্থাকে খাঁচায় আবদ্ধ পাখির মতো বলে মনে হচ্ছিল তাঁদের। ১৩০৪ সালে কৃষ্ণভাবিনী দাস মেয়েদের এই অবস্থার বিরোধিতা করে লিখেছিলেন—

> "আমি এখন স্পষ্ট দেখিতেছি ও দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করিতেছি–হিন্দু নারীদের এই নীচগামী অবস্থার প্রথম ও প্রধান কারণ–সম্পূর্ণরূপে অবরোধ-প্রথা ও পবনির্ভরতা। ইংরেজ মহিলাদের বাদ দিলেও এই ভারতবর্ষের মধ্যেই আমরা দেখিতে পাই, যে, যে জাতির মধ্যে অপেক্ষাকৃত স্ত্রীস্বাধীনতা চলিত আছে, তাহাদের স্ত্রীলোকদের অবস্থাই অধিকতর উন্নত। আর সেই স্বাধীন নারীদের জীবন অধিকতর কর্ম্মক্ষম, সাহসী ও আত্মনির্ভর। অনেকেই জানেন, পার্সীদের মধ্যে অবরোধপ্রথা হিন্দুদের ন্যায় অত দৃঢ় নহে, সে জন্য পার্সী নারীরাও তাঁদের হিন্দু ভগিনীদের অপেক্ষা অধিক সাহসী, বলিষ্ঠ ও আত্মনির্ভর।"[৬]

অর্থাৎ পার্সীরা ছাড়া প্রায় মহিলারা অবরোধ প্রথারদ্বারা ভুক্তভোগী ছিলেন। তাঁরা না বাইরে যেতে পারতেন, না নিজের ইচ্ছে মত বাঁচতে পারতেন। বেগম রোকেয়া 'অবরোধ-বাসিনী' গ্রন্থের প্রথমেই বলেছিলেন—

> "আমরা বহু কাল হইতে অবরোধে থাকিয়া থাকিয়া অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি সুতরাং অবরোধের বিরুদ্ধে বলিবার আমাদের— বিশেষতঃ আমার কিছুই নাই। মেছোণীকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, "পচা মাছের দুর্গন্ধ ভাল না মন্দ?" —সে কি উত্তর দিবে?"[৭]

এর থেকে আমরা বুঝতে পারি— মানুষ দীর্ঘদিন যে অবস্থার মধ্যে বেঁচে থাকে, সেই অবস্থাকে তাঁর ভাগ্য বলে ধীরে ধীরে স্বীকার করে নেয়। তাঁর প্রতিবাদ ক্ষমতা হারিয়ে যায়। কিন্তু সময় কখনো এক জায়গায় থেমে থাকে না। তাই সেই সময় কিছু মহিলা শিক্ষিত হওয়ার পরেগতিহীন, একঘেয়ে, দুঃখ-কষ্টের জীবন থেকে বার হয়ে নিজেদের আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবি করেছিলেন। তাঁরা নিয়তির হাতে সব কিছু ছেড়ে না দিয়ে, লড়াই করে নিজেদের ভাগ্যকে নতুন করে লিখতে চেয়েছিলেন। কারণ তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন,পথ যেখানে তৈরি না থাকে সেখানেনিজের পথ নিজেকেই তৈরি করে নিতে হয়।

উনিশ শতকের মহিলারা শিক্ষিত হওয়ার সঙ্গে নিজেদের অবস্থা নিয়ে সচেতনহয়ে উঠলেও, সমস্ত মেয়েদের মধ্যে এই সচেতনতা তখনও জন্মায়নি। কারণ—

> "ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলারা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিলেও, বিংশ শতাব্দীর নারীমুক্তি আন্দোলনকারী আদর্শের সঙ্গে এই মহিলাদের আদর্শের তেমন সাদৃশ্য ছিলো না। তাঁরা তখনো পুরুষ সমাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যিক মূল্যবোধের প্রতি আস্থাবান ছিলেন। শিক্ষা লাভ করে তাঁরা সেই ধরনের মহিলা

> হতে চাচ্ছিলেন শিক্ষিত ভদ্রলোকরা যাঁদের আদর্শ বলে গণ্য করছিলেন। তাঁরা লক্ষ্য করেন, পুরুষপ্রধান সমাজে শিক্ষা লাভ করে 'আধুনিক' স্ত্রী এবং মাতা হওয়া ছাড়া তাঁদের আর কোন বিকল্প নেই।"[৮]

যদিও সব শিক্ষিত মহিলাদের এক ইচ্ছা ছিল না। কোন মহিলা যেমন সমাজের চোখে আদর্শ হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন, তেমনই কিছু মহিলার ইচ্ছা ছিল নিজের মত করে বাঁচার। ১৩০২ সালে নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী অবরোধ প্রথার প্রসঙ্গে লিখেছিলেন,

> "আমরা পিঞ্জরের পাখীর ন্যায় নিয়ত অবরোধরূপে পিঞ্জরে আবদ্ধ হইয়াছি, কাজেই আমাদের মনোবৃত্তি সকল ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের হৃদয়ে জ্ঞানালোক প্রস্ফুটিত হইতে পারিতেছে না। সৎজ্ঞানলাভ করিতে না পারিলে জীবন উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে পারে না। সৎজ্ঞান ব্যতীত দুর্লভ মানব জীবন পশুর অপেক্ষাও হেয় ভাবে যাপন করিতে হয়। আমরা বাল্যকাল হইতে পিঞ্জরাবদ্ধ আমরা সৎজ্ঞান কোথায় পাইব?"[৯]

তাঁর এই উক্তি থেকে আমরা বুঝতে পারি, সেই সময় কোন কোন মহিলা গৃহবন্দি জীবনকে পাখির মতো খাঁচাতে বন্দি বা পশুর থেকেও হীন অবস্থা বলে ভাবত।

উপরিউক্তগ্রন্থগুলি ছাড়াও অবরোধ প্রথা নিয়ে সেকালে বহু লেখালেখি প্রকাশিত হয়েছিল। তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'ভারত-মহিলা' পত্রিকাতে। বিশ শতকের প্রথম দিকে অর্থাৎ ১৩১২ সালের ভাদ্র মাসে সরযূবালা দত্তের সম্পাদনায় 'ভারত-মহিলা' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। দীর্ঘ তেরো বছর ধরে চললেও ১৩২৪ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসের সংখ্যাটি প্রকাশের পরে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।অবরোধ প্রথা বৈদিক ও রামায়ণ-মহাভারতের যুগে প্রচলিত ছিল না। সেই সময় মেয়েরা বাড়ির বাইরে যেতে পারতেন এবং বিদ্যাচর্চাও করতেন। এই পত্রিকাতে কমলা সথিয়ানাধনের লেখা একটি ইংরাজি প্রবন্ধের অনুবাদ 'প্রাচীন ও নব্য ভারতে নারীজাতির অবস্থা' নামে ১৩১২ সালের কার্তিক মাস থেকে কয়েকটি মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন—

> "বৈদিক সময়ে আর্য্যনারীর অবস্থা অতি সম্মানিত, অতি গৌরবময় ছিল। সে সময়ে তাঁহাদের কার্য্যে কেহ কোন অন্যায় প্রতিবন্ধক স্থাপন করিত না। তাঁহারা সমাজে উন্মুক্ত স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। নারীদিগকে অশিক্ষিতা রাখিবার জন্য তখন কোন চেষ্টা করা হইত না, এবং সকল বিষয়েই তাঁহারা স্বামীর সমাবস্থাপন্না ছিলেন, তাঁহাদিগকে কাহারও,—এমন কি শাশুড়ীরও অধীনতা স্বীকার করিতে হইত না। হিন্দুনারী জ্ঞানালোচনায় তখন স্বামীর সহযোগিনী ছিলেন। স্বামীর নিকট তিনি প্রচুর সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হইতেন এবং পত্নী ও মাতারূপে গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন।"[১০]

প্রাবন্ধিক এই বিষয়ে আরও স্পষ্ট ধারণা দেওয়ার জন্য বেদের ব্রাহ্মাণাংশে উল্লেখিত যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদের উদাহরণ দিয়েছিলেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য গার্হস্থ্য আশ্রম পরিত্যাগ করে বানপ্রস্থ যাওয়ার সময় তাঁর পত্নী মৈত্রেয়ী ওসপত্নীকে বিষয়-সম্পত্তি ভাগ করে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মৈত্রেয়ী দেবী বিষয় গ্রহণ করতে অসম্মত হয়েছিলেন। তার বিনিময়ে 'অমৃতত্ব-তত্ত্ব' লাভ করার পথ জানতে চেয়েছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য তাঁকে সেই শিক্ষাও দিয়েছিলেন। একবারের জন্যেও তাঁর স্ত্রীকে বারণ করেননি। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি, সেকালে শিক্ষিত মহিলাদের কাছে বিষয়-সম্পত্তির থেকে জ্ঞান-চর্চা বেশি মূল্য পেয়েছিল। এমনকি তাঁদের ধর্মতত্ত্ব ও সাধারণ প্রয়োজনীয় বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া মুনি-ঋষিদের চোখে অযৌক্তিক বলে বিবেচিত হত না।

এরপর হেমলতা সরকারের লেখা 'নারীজাতির শিক্ষা' ১৩১৪ সালের বৈশাখ মাস থেকে কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই লেখাটি তিনি মহিলা সমিতিতে পড়েছিলেন। সেখানে তিনি বলেছিলেন, স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন যে আমাদের দেশে আগে ছিল, তার প্রমাণ— গার্গী, মৈত্রেয়ী, লীলাবতী প্রভৃতি মহিলাদের নাম আমরা সকলেই শুনেছি।সেকালের সমাজে মেয়েদের অবস্থান কেমন ছিল সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন— হিউয়েন সাং যখন ভারতবর্ষে ভ্রমণ করতে এসেছিলেন, তখন প্রকাশ্য রাজসভায় সম্রাট হর্ষবর্ধনের দক্ষিণে তাঁর বিধবা ভগ্নী রাজ্যেশ্বরী বসেছিলেন। তিনি সেখানে বসে জ্ঞান ধর্মের আলোচনা শুনেছিলেন। এর থেকে আমরা জানতে পারি, তখনকার দিনে মেয়েদের জন্য অন্তঃপুরের বাইরে থাকার অধিকার ছিল। প্রাবন্ধিকের মতে, শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল দুটি। প্রথম, জ্ঞান লাভ। দুই, অর্থ উপার্জন। তাঁর মতে, দেহের এবং মনের বিকাশ হল প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য। যে শিক্ষা দ্বারা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, তা প্রকৃত শিক্ষা নয়। এদেশের নারীরা শারীরিক দিক থেকেও সুস্থ এবং সবল নয়। এই স্বাস্থ্যোন্নতির প্রধান অন্তরায় হিসাবে তিনি অবরোধ প্রথাকে দায়ী করেছিলেন। কারণ এই প্রথার জন্য মহিলারা মুক্ত বায়ু নিতে এবং পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করতে পারতেন না। অন্তঃপুরবাসীদের জন্য এই স্বাভাবিক ব্যাপার অনুভব করারও অধিকার ছিল না। সমাজ পুরুষের হাতে নারীর সমগ্র জীবনের ভার দিতে সক্ষম কিন্তু তার নিজের হাতে নিজের ভার অর্পণ করতে প্রস্তুত ছিল না। নারীদের মনে করা হত—

> "বাল্যে পিতৃবশে তিষ্ঠেৎ পতিগ্রাহস্য যৌবনে,
> রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রাঃ ন স্ত্রীস্বাতন্ত্র্যমর্হতি।
> নারী বাল্যকালে পিতার বশে থাকিবেন, যৌবন পতির বশে থাকিবেন, বার্দ্ধক্যে পুত্রগণ তাঁহাকে রক্ষা করিবেন, নারী স্বাধীন থাকিতে পারেন না।"[১১]

ভারতবর্ষে মেয়েদের নিয়ে এমন মতাদর্শপ্রচলিত থাকলেও, একই সময়ে আমেরিকা এবং ইউরোপীয় মহিলারা জ্ঞানার্জনে, আশ্চর্য কাজের দক্ষতায়, প্রবল পরোপকার বৃত্তিতে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার ফলে সমগ্র নারী জাতির তাঁদের জন্য গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছিল। শিক্ষার ফলে তাঁদের চরিত্র দিন দিন উন্নত হয়েছিল। অথচ এই সমস্ত দেশে তার অর্ধ শতক আগেও মেয়েরা কেবলমাত্র লিখতে এবং পড়তে শিখেছিলেন। তারপরেও অনেক যুক্তিতর্কের পরেমেয়েদের জন্য উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মোচিত হয়েছিল। সে সময়ের মাত্র ৩৭ বছরআগে মেয়েরা প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণেরঅনুমতি পেয়েছিলেন। অথচ তাঁরা এর মধ্যেই স্কুলবোর্ডের সভ্যপদ, কলকারখানার পর্যবেক্ষণ, স্বাস্থ্যের ইনস্পেক্টর, ডাক বিভাগের উচ্চ কর্মচারী, শিল্প, সাহিত্য, সংবাদপত্র পরিচালনা, বিজ্ঞান-চর্চা প্রভৃতি সমস্ত বিভাগের সকল কাজে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন।তাই প্রবন্ধকার ভারতবর্ষের মহিলাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন—

> "আমাদিগকে নিরাশ বা ভীত হইলে চলিবে না। যে কোন মহৎ কার্য্যে যাহাদিগকে অগ্রণী হইতে হয়, তাঁহাদিগকে অনন্যসাধারণ সাহসিকতা ও বিচক্ষণতা প্রদর্শন করিতে হয়। শিক্ষিতা নারীগণ যেন উচ্চ শিক্ষার প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা এবং সম্ভ্রম উদ্রেক করিতে সক্ষম হন।"[১২]

কারণ মানুষ অনুকরণকারী জীব। একজন শিক্ষিত নারীকে দেখে সমাজে পিছিয়ে থাকা নারীরা এগিয়ে আসার অনুপ্রেরণাপাবে।

'ভারত-মহিলা' পত্রিকায় ১৩১৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে রাজকুমারী দাসের লেখা 'অবরোধ-প্রথা' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধের প্রথমেই তিনি লিখেছিলেন—

> "আমাদের দেশে প্রায় সর্ব্বত্রই নারীর অবরোধ-প্রথা প্রচলিত আছে। মুসলমানদিগের শাসনের সঙ্গে সঙ্গেই যে এই প্রথার সূত্রপাত হয়, ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাহার অনেক প্রমাণ আছে। সুতরাং যেখানে মুসলমানের প্রাদুর্ভাব হয় নাই, সেখানে অদ্যাপি স্ত্রীলোকেরা উন্মুক্ত ভাবে বিচরণ করিয়া থাকেন। মহারাষ্ট্রীয় ও পার্শী রমণীগণ ইহার দৃষ্টান্ত।"[১৩]

অর্থাৎ প্রাবন্ধিক মনে করতেন, এই দেশে অবরোধ প্রথা শুরু হয়েছিল মুসলমানদের শাসনের জন্য। কারণ তাঁর মতে, ঋগ্বেদে অবরোধপ্রথার উল্লেখ নেই। তখন নারী স্বাধীন ছিলেন ও বিদ্যাচর্চা করতেন। সমস্ত সংসারের ভার তাঁর উপর থাকত। অবিবাহিত দেবর ও ননদগণ তাঁর অধীনে ছিলেন। তিনি সকলকে শাসন করতে পারতেন। তখন স্ত্রীদের শিক্ষা গ্রহণ করতে এতো বাধা অতিক্রম করতে হত না।[১৪]কারণ বিশ্ববারা নামে একজন মহিলা সেকালে বৈদিক গীত রচনা করতে পেরেছিলেন। এই প্রচলিত অবরোধ-প্রথাকেপ্রাবন্ধিক ভারতবাসীর জন্য অভিশাপের চোখে দেখেছিলেন। কারণ এই প্রথার জন্যেই এই দেশেরমেয়েদের স্বাধীনতা এবং বিদ্যাচর্চা ক্রমে হ্রাস পেয়েছিল। সেকালে বিদ্যার অভাবে মহিলারা সহধর্মিণী হলেও প্রকৃত পক্ষে জীবনের সঙ্গিনী হতে পারতেন না। তাঁরা গুরুতর বিষয়ে মতামত প্রকাশ করতে অক্ষম ছিলেন। গার্হস্থ্য জীবনের নিম্নতম স্তর ভিন্ন আর কিছুই তাঁদের অধিকারে ছিল না। ফলে তাঁরা সন্তানের শিক্ষা ও শাসনের ভার গ্রহণ করতেও সম্পূর্ণ অক্ষম ছিলেন। কারণ, যে মা নিজেই শিক্ষা লাভ করেননি, তিনি কি প্রকারে সন্তানকে সুশাসন করবেন? তিনি নিজের সেবার ভার নিতে সক্ষম থাকলেও, মায়ের যে গুরুকর্তব্য অর্থাৎ সন্তান-শাসনে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম ছিলেন। পরের ইচ্ছা দমন করে তা নিজের ইচ্ছায় পরিণত করার নাম শাসন। শাসন করতে গেলে সম্পূর্ণরূপে নিজের ইচ্ছা বজায় থাকে না, সেটাও কিছুটা পরিমাণে দমন করতে হয়, নতুবা শাসন অত্যাচারে পরিণত হয়। কি পরিমাণে শাসিতের ইচ্ছা দমন করতে হবে ও কি পরিমাণে তা অনুমোদন করতে হবে, তা অশিক্ষিতের বিচার কবার ক্ষমতা নেই।[১৫] তাই প্রাবন্ধিক রাজকুমারী দাসের চোখে,আমাদের দেশের মেয়েরা সন্তান শাসন বা মানুষ করার জন্য পারদর্শী ছিল না।

প্রাবন্ধিক শ্রীমতী রমণ পিলাই-এর ইংরেজি বক্তৃতার মর্ম্ম প্রকাশিত হয়েছিল 'সমাজে নারীর স্থান' নামে। এই প্রবন্ধের প্রথমেই তিনি মহিলাদের নিয়ে বলেছিলেন—

> "The hand that rocks the cradle rules the world— যে হাতখানি শিশুর দোলনায় দোল দেয় তাহাই সাম্রাজ্য শাসন করে,— ইংরেজী ভাষায় একটি সর্ব্বজনবিদিত প্রবাদ বাক্য। ...অন্য কথায় ইহার অর্থ— কোন জাতির নারীরা যেমন জাতিটীও তেমন। কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ গুণগুলি প্রধানতঃ তাহার অন্তর্গত নারীদিগের দ্বারাই গঠিত হয়। অন্যান্য প্রভাব নারীর প্রভাবের নিম্নে। শৈশবাবস্থায় মানুষের উপর যে প্রভাব প্রধান ভাবে কাজ করে তাহা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী প্রভাব আর কিছু নাই বলিলেই চলে। জননীর প্রভাবের অপেক্ষা মানবজীবনে আর কোন প্রভাবই শ্রেষ্ঠ নহে।"[১৬]

তাই প্রাবন্ধিক মনে করতেন, কোন দেশের নারী যদি শুধু বাড়ির কাজের মধ্যেই নিজের শক্তিকে সীমাবদ্ধ রাখেন, তাহলে অর্ধাংশ উন্নতির শীর্ষে পৌঁছালেও বাকি অংশ পিছিয়ে থাকবে। তাই সেই দেশের সার্বজনীন উন্নতি অসম্ভব। বিশ শতকের মহিলাদের থেকে বৈদিক যুগের নারীরা শুধু ব্যক্তিগত ভাবেই স্বাধীন চিন্তক ছিলেন না, সামাজিক দিক থেকেও তাঁরা স্বাধীন ছিলেন। পুরুষের সঙ্গে মিলিত ভাবেযাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং একসঙ্গে ধর্ম সাধন করতেন। অনেক শিক্ষিত নারী বেদ মন্ত্র রচনাও করেছিলেন। তখনকার দিনে নারীর স্বাধীনতার উপর কোনরকম হস্তক্ষেপ করা হত না। সমাজে তাদের যে ন্যায্য স্থান ছিল, তা থেকে তাদের দূরে রাখতে কেউ চেষ্টা করত না। প্রাচীন গ্রন্থে নারীর অবগুণ্ঠনের উল্লেখ থাকলেও অবরোধের কোন উল্লেখ

নেই। তাঁরা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতেন। বড়ো বড়ো রাজকীয় সভায় উপস্থিত থাকতেন। প্রকাশ্য ভাবে যেখানে সেখানে যাতায়াত করতেন। তখনকার দিনে মহিলারা নানা প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এমনকি রাজনৈতিক আলোচনায় এবং শাসন কার্যেও তাঁরা দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাই প্রাবন্ধিক মনে করেন, পুনরায় নারীদের উন্নতি করার প্রধান উপায় হল শিক্ষা। অন্তরে জ্ঞানের আলো না জ্বললে সমাজে তাঁদের অধিক অধিকার দেওয়া বৃথা। নিজের কর্তব্যের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক জগতের জ্ঞান না জন্মালে স্বাধীনতা লাভ ও স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার জন্মাবে না। আর স্বাধীন ভাবে না বাঁচতে পারলে সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়। যে সমাজে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের সুন্দর বিকাশ হয়েছে, সেই সমাজ উন্নত না হয়ে পারেনি। ইউরোপ ও আমেরিকার লোক যে উন্নতির শীর্ষে পৌঁছাতে পেরেছে, তার একটা প্রধান কারণ তাদের মহিলারা সমান ভাবে শিক্ষা লাভ করেছে। এরপরেও তাদের সভ্যতা ও সমাজে যে সমস্ত দোষ আছে, তার প্রধান কারণ শিক্ষা প্রণালীর দোষ। এশিয়ার মধ্যে জাপানের দৃষ্টান্ত আদর্শ জনক।জাপানের উন্নতির এক প্রধান কারণ স্ত্রী-পুরুষ সকলকে শিক্ষা লাভের উপযুক্ত বয়স থেকে স্কুলে যেতে হয়। সাধারণ শিক্ষার পর প্রত্যেক বালক-বালিকাকেই নিজ নিজ বিশেষত্ব অনুসারে জীবন সংগ্রামের উপযোগী শিক্ষা দেওয়া হয়। স্ত্রীস্বাধীনতা বলতে আমরা অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার থেকে নারীদের মুক্তি লাভকে বুঝে থাকি। কিন্তু জাপানের কাছে তা নয়।[১৭]বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা নিলেই নারীদের উন্নতি বা পূর্ণ বিকাশ হবে— প্রাবন্ধিক রমণ পিলাই তা বলেননি। আবার তাঁর এই অভিপ্রায় ছিল না যে— বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত নারীগণই দেশের সর্বাপ্রেক্ষা উন্নত নারী সম্প্রদায়। তাঁর বলার উদ্দেশ্য ছিল— আমাদের দেশে, যেমন পুরুষদের মধ্যে তেমনি স্ত্রীদের মধ্যেও অনেকে আছেন, যাঁরা উচ্চ জ্ঞানচর্চায় এবং উদার, উন্নত, চরিত্র-গুণে সমাজের অলংকার-স্বরূপ।এছাড়াও তিনি দৃঢ় ভাবেই বিশ্বাস করতেন, নারীদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার বিস্তার হলে দেশ পরম লাভবান হবেন।[১৮]তাই তিনি চেয়েছিলেন সকলের বিকাশ।

বিশ শতকে অবরোধ প্রথা নিয়ে বহু লেখালেখি হলেও, কার্যকরী ভাবে মেয়েদের উন্নতি তখনই সম্ভব হয়েছিল, যখন মেয়েরা নিজে থেকে সচেতন হয়ে উঠেছিল। কারণ একজন মানুষ যতক্ষণ না নিজের জন্য লড়াই করতে শেখে, তার পাশে কেউ দাঁড়ায় না। আর যে নিজের জন্য লড়াই করতে পারে, সে দুনিয়ার সকলের বিরুদ্ধে লড়তে পারে। কারণ আত্মবল হল সবথেকে বড়ো বল। তবে এটাও ঠিক, সেদিনের মহিলারা অল্প করে হলেও, এগিয়ে আসার জন্যেই আজকের মেয়েরা এতো উন্নত হয়েছে। কারণ প্রথম পদক্ষেপ ক্ষুদ্র হলেও তার একটা মূল্য আছে।

তথ্যসূত্র:

১. বসু, স্বপন সম্পাদনা। উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষা। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২০১৯, কলকাতা, পৃ. ৪৩।
২. তদেব, পৃ. ৬৭।
৩. দাসী, রাসসুন্দরী। আমার জীবন। দে'জ পাবলিকেশন, ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ৩৮।
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিন্দিতা। কৈলাসবাসিনী দেবী রচনা-সংগ্রহ। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২০১৯, কলকাতা, পৃ. ৬৬-৬৭।
৫. তদেব, পৃ. ৮৩।
৬. চট্টোপাধ্যায়, অরুণা সম্পাদনা। কৃষ্ণভাবিনী দাসের নির্বাচিত প্রবন্ধ। সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৬০, কলকাতা, পৃ. ৯২।
৭. কাদির, আবদুল সম্পাদনা। রোকেয়া রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ১৯৭১, ঢাকা, পৃ. ৩৭৫।

৮. মুরশিদ, গোলাম। নারী প্রগতি: আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী, নয়া উদ্যোগ, ২০১৪, কলকাতা, পৃ. ৪৯।
৯. রায়, ভারতী সংকলন ও সম্পাদনা। নারী ও পরিবার বামাবোধিনী পত্রিকা (১২৭০–১৩২৯ বঙ্গাব্দ), পুস্তক বিপণি, ১৯৯৯, কলকাতা, পৃ. ১৮৪।
১০. দত্ত, সরযূবালা সম্পাদনা। ভারত-মহিলা, প্রথম ভাগ, তৃতীয় সংখ্যা, কার্ত্তিক ১৩১২, পৃ. ৬৩।
১১. তদেব, তৃতীয় ভাগ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩১৪, পৃ. ৬।
১২. তদেব, তৃতীয় ভাগ, তৃতীয় সংখ্যা, আষাঢ় ১৩১৪, পৃ. ৫২।
১৩. তদেব, তৃতীয় ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪, পৃ. ২৫।
১৪. তদেব, পৃ. ২৭।
১৫. তদেব, পৃ. ২৫।
১৬. তদেব, দ্বাদশ ভাগ, তৃতীয় সংখ্যা, আষাঢ় ১৩২৩, পৃ. ৯৩।
১৭. তদেব, পৃ. ৯৪।
১৮. তদেব, পৃ. ১০২।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1652-1658
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.386

পথের আহ্বান ও মায়ার বাঁধন: বিভূতিভূষণের দৃষ্টিতে জীবন ও মৃত্যু

ড. নয়ন সরকার, *স্বাধীন গবেষক, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 24.03.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The present research article seeks to unveil a new and deeper layer of meaning in Pather Panchali, the timeless novel by Bibhutibhushan Bandyopadhyay. While the novel has traditionally been interpreted as a melancholic narrative set in a rural backdrop, the central argument of this paper proposes that the "path" (pather) is not merely a physical route or inert setting; rather, it emerges as an autonomous, conscious, and sovereign entity. The philosophical foundation of this study rests upon the narrative seed— "the path chooses the traveler."

At the outset, the paper demonstrates that this "path," as conceived by Bibhutibhushan, is profoundly detached and selective. The primary condition for responding to its call is complete liberation from worldly attachments or maya. The study evaluates the disappearance (death) of characters through this lens of detachment. The deaths of Indir Thakrun and Durga are not treated as accidental tragedies; instead, they are interpreted as inevitable consequences of being rejected by the "path" due to their lingering attachment to decaying material possessions and a desire for static shelter. Durga's "box of trinkets" becomes a symbolic representation of worldly attachment, binding her to the roots of the earth and preventing her from merging with the larger flow of movement.

Subsequent sections analyze the deaths of Harihar and Sarbajaya, alongside Apu's survival, within an existential framework. Drawing upon critical interpretations, the paper suggests that Sarbajaya's maternal affection attempted to confine Apu within a safe and familiar orbit, which stood in opposition to the free development of his artistic self. Thus, the sovereignty of the "path" gradually severs all emotional bonds surrounding Apu, transforming him into an aniket—a rootless, homeless being.

In a comparative literary context, Apu's great departure is positioned alongside figures such as Siddhartha from Siddhartha by Hermann Hesse, and Stephen Dedalus from A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce. Ultimately, the study concludes that in Bibhutibhushan's philosophy, death is not an end but a cosmic transformation. The apparent cruelty of the "path" reflects a deeper artistic responsibility—one that liberates

Apu from the trivialities of domestic life and transforms him into a traveler on an eternal and indestructible journey.

Thus, Pather Panchali is not merely a tale of separation, but an eternal hymn to the triumph over attachment and the onward movement toward the infinite.

Keyword: Pather Panchali, Path as Conscious Entity, Maya and Detachment, Existential Journey, Bibhutibhushan Bandyopadhyay

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহাকালোত্তীর্ণ শিল্পকীর্তি ‘পথের পাঁচালী’ কেবল গ্রাম-বাংলার নিসর্গশোভা কিংবা দারিদ্র্যের সংক্ষুব্ধ আখ্যান নয়; বরং এটি মহাকালের অমোঘ প্রবহমানতার এক শাশ্বত আখ্যান। সাধারণ পাঠে এই উপন্যাসকে প্রকৃতির প্রশস্তি বলে মনে হলেও, এর অন্তঃসলিলা ধারায় প্রবাহিত হয় এক নিগূঢ় ও অনাসক্ত জীবনবীক্ষা। এই দর্শনের কেন্দ্রে সক্রিয় হয়ে আছে ‘পথ’—যা একটি ধূলিধূসর জড় পটভূমি ও এক স্বয়ংসম্পূর্ণ, নির্বাচক এবং সার্বভৌম চেতনা। প্রচলিত ধারণায় পথিক পথকে নির্বাচন করে, কিন্তু বিভূতিভূষণের শিল্প-ভুবনে এই সত্যটি সম্পূর্ণ বিপরীত—এখানে পথই তার যোগ্য যাত্রীকে খুঁজে নেয়। এই জীবন-জিজ্ঞাসার প্রেক্ষাপটে ‘মৃত্যু’ এখানে কোনো আকস্মিক বিয়োগান্তক বিপর্যয় হিসেবে আসে না, তা আসে মায়ামুক্তির এক অনিবার্য শর্ত হিসেবে। মানুষের অস্তিত্ব যখনই কোনো সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক গণ্ডি, বস্তুগত সঞ্চয় কিংবা সম্পর্কের নিবিড় মায়াজালে স্থবির হয়ে পড়েছে, তখনই ‘পথ’ তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। ইন্দির ঠাকরুনের জীর্ণ আশ্রয়লিপ্সা কিংবা দুর্গার কড়ির বাক্সে সঞ্চিত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তুচ্ছ জিনিসের প্রতি আসক্তি—এসবই ছিল গতির পথে একেকটি অন্তরায়। প্রখ্যাত সমালোচক প্রমথনাথ বিশীর মতে, বিভূতিভূষণের এই পথ কেবল সুন্দরের আকর নয়, তা এক নির্লিপ্ত ও কঠোর শক্তি। এই শক্তিই নিরন্তর ছেঁটে ফেলেছে সেইসব চরিত্রকে, যারা চলিষ্ণু হতে শেখেনি। দুর্গা কিংবা সর্বজয়ার প্রস্থান তাই কোনো নিছক রিক্ততার শোকগাথা নয়, বলা যায় অপুর ‘বিশ্বপথিক’ হয়ে ওঠার পথে অপরিহার্য এক আধ্যাত্মিক রিক্ততা। অপু এখানে এক ‘অনিকেত’ সত্তার প্রতীক, যার পাথেয় কোনো স্থাবর সম্পত্তি নয়, বরং বিচ্ছেদজাত পরিশুদ্ধ স্মৃতি। ‘মায়ার বাঁধন’ বনাম ‘পথের আহ্বান’—এই দুই মেরুর টানাপোড়েনেই উপন্যাসের কুশীলবদের প্রাক-নির্দিষ্ট জীবনলিপিতে গ্রথিত হয়েছে। যে মায়ার শিকল ছিঁড়তে পারেনি, পথ তাকে স্থবিরতার অন্ধকারেই অর্ঘ্য হিসেবে নিবেদন করেছে; আর যে সর্বস্ব হারিয়েও পথের বাঁশিতে মহাকালের ইশারা শুনতে পেয়েছে, পথ তাকেই আপন করে নিয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধটি এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট যে ‘পথের পাঁচালী’র মৃত্যুগুলো আসলে এক একটি সুচিন্তিত প্রস্থান, যা অপুর শিল্পীসত্তাকে মায়ার নাগপাশ থেকে মুক্ত করে এক অন্তহীন ও আদিগন্ত বিস্তৃত গতির অভিমুখ দান করেছে।

এই জীবন-মহাকাব্যে ইন্দির ঠাকরুন ও দুর্গা কেবল দুটি জাগতিক অবয়ব মাত্র নন; বরং তাঁরা পার্থিব আসক্তি ও মর্ত্যের মমত্বের এক একটি নিবিড় ও ঘনীভূত অভিপ্রকাশ। পথ যখন কাউকে খুঁজে নেয়, তখন তার প্রথম শর্তই হয় নিরাসক্তি। কিন্তু এই দুই চরিত্রের অস্তিত্বের এই অন্তঃসলিলা প্রবাহকে ব্যবচ্ছেদ করলে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁরা কোনো এক অদৃশ্য মায়ার নোঙরে নিজেদের আটকে ফেলেছিলেন, যা তাঁদের ‘পথের’ সচল গতির পরিপন্থী ছিল। ইন্দির ঠাকরুনের অস্তিত্ব ছিল তাঁর পৈতৃক ভিটের জীর্ণ একচিলতে দাওয়ায় ও তাঁর অতি সামান্য কিছু তৈজসপত্রের মধ্যে। এই ‘অধিকারবোধ’ এবং ‘আশ্রয়লিপ্সা’ তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিশেষভাবে অনুধাবনীয় যে, ঔপন্যাসিক তাঁকে তখনই জীবন-মঞ্চ থেকে অপসৃত করলেন, যখন তাঁর এই মায়া অপমানের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছাল। সর্বজয়ার গৃহ থেকে বিতাড়িত হয়েও যখন তিনি বারবার সেই একই ভিটের মায়ায় ফিরে আসছিলেন, তখন তাঁর এই অনড় অবস্থান মহাজীবনের গতিময়তাকে অন্তরিত করছিল। তাঁর মৃত্যু তাই কেবল জরাগ্রস্ত শরীরের অবসান নয়, বরং এক স্থবির

আসক্তির বিলোপ। বিভূতিভূষণ তাঁকে বনের প্রান্তে প্রকৃতির উন্মুক্ত অবারিত পথে ঠাঁই দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে, যে গৃহ তাঁকে ধারণ করতে পারেনি, সেই গৃহের মায়া ত্যাগ করাই ছিল তাঁর মুক্তির একমাত্র পথ। আবার দুর্গা চঞ্চল ছিল ঠিকই, কিন্তু তাঁর সেই চঞ্চলতা ছিল একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক ও মানসিক বৃত্তের মধ্যে। তাঁর সেই 'কড়ির বাক্স' বা তুচ্ছ জিনিসের সংগ্রহ ছিল তাঁর পার্থিব মোহের প্রতীক। অপু যেখানে অজানার আহ্বানে উন্মুখ, সেখানে দুর্গা ব্যস্ত বনের ফলমূল বা কাঁচের চুড়ি দিয়ে নিজের একটি ক্ষুদ্র জগত সাজাতে। তাঁর এই সংগ্রহ করার নেশা তাঁকে নিশ্চিন্দিপুরের মাটির সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিল। রেলপথ দেখার তীব্র বাসনা সত্ত্বেও দুর্গা সেখানে পৌঁছাতে পারেনি, কারণ তাঁর পা ছিল মায়ার শেকলে বন্দি। ঔপন্যাসিক সতর্ক সংবিৎ সহকারে দুর্গাকে সরিয়ে দিলেন, কারণ দুর্গা বেঁচে থাকলে অপু কোনোদিনও সেই মায়ার গণ্ডি পেরিয়ে বাইরের পৃথিবীর নাগরিক হয়ে উঠতে পারত না। দুর্গার মৃত্যু আসলে অপুর শৈশবের সেই 'আবদ্ধ মায়া'র মৃত্যু, যা অপুকে সম্পূর্ণ ভারমুক্ত হয়ে পথের সঙ্গী হওয়ার সুযোগ করে দিল। বিভূতিভূষণ এখানে একজন নিস্পৃহ বিচারকের ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি দেখেছেন, যারা ক্ষুদ্র সীমানার মধ্যে নিজেদের বন্দি করে ফেলেছে পথ তাদের আর বহন করতে আগ্রহী নয়। তাই 'পথের' সার্বভৌমত্ব বজায় রাখতেই এই চরিত্রগুলোর প্রস্থান অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। পথের পাঁচালী-তে নিশ্চিন্দিপুরের প্রকৃতি কেবল একটি পটভূমি নয়, বরং এটি মায়ার এক ঘনীভূত রূপ। বাঁশঝাড়ের অন্ধকার, শেওলাধরা পুরনো ভিটে আর বন-জঙ্গলের নিবিড় ছায়া চরিত্রগুলোকে এক প্রকার অলস মায়ায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে। এই জড় প্রকৃতিই প্রথম বাধা যা চিরন্তন গতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে চায়। বাঁশঝাড়ের নিভৃত ছায়াতলে ইন্দির ঠাকরুনের মহাপ্রয়াণ ঘটে; মনে হয় প্রকৃতি জননী যেন এক অমোঘ আকর্ষণে আপন জঠরেই তাকে চিরতরে আশ্রয় দান করলেন। নীলমণি রায়ের সেই পোড়ো ভিটেটি ছিল এক জীবন্ত মায়া, যা হরিহরকে বারবার ফিরে আসতে প্ররোচিত করেছে। কিন্তু 'পথ' যখন অপুকে বেছে নিল, তখন সে প্রথমেই অপুর মন থেকে জড় প্রকৃতির সেই স্থাণুবৎ মায়া-বন্ধনকে ছিন্ন করল। প্রকৃতি যখন মায়ার বন্ধন হয়ে দাঁড়ায়, পথ তখন সেই চরিত্রকে প্রকৃতির লীনতায় পাঠিয়ে দিয়ে পথিকের যাত্রাপথকে ভারমুক্ত করে। প্রমথনাথ বিশীর মতে, 'এই প্রকৃতি যেমন একদিকে আশ্রয় দেয়, অন্যদিকে সে ঘরমুখো মানুষকে অচল করে রাখে। অপুর ক্ষেত্রে আমরা দেখি, সে এই প্রকৃতির রূপমুগ্ধ হলেও এর মোহে বন্দি হয়নি, বরং এই বন-পাহাড়ের ওপারেই সে খুঁজে পেয়েছে অজানার ডাক'।

পথ কেবল শৈশব বা কৈশোরের মায়া ছেঁড়ে না, বরং তা রক্তমাংসের সম্পর্কের যে গভীরতম শিকড়— মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব— তাকেও ছিন্ন করে। হরিহর ও সর্বজয়া চরিত্র দুটির প্রস্থান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাঁরা দুজনেই ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় অপুর 'পথের যাত্রী' হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। হরিহর ছিলেন আজীবন এক আশাবাদী মানুষ, কিন্তু তাঁর সেই আশা ছিল একটি নির্দিষ্ট 'স্থিতি'র ওপর নির্ভরশীল। তিনি বারবার গ্রাম ছেড়ে বাইরে গিয়েছেন অর্থ উপার্জনের জন্য, কিন্তু তাঁর মনের অবচেতন স্তরে কাজ করত নিশ্চিন্দিপুরের সেই ভাঙা ভিটে মেরামত করে পুনরায় সেখানে থিতু হওয়ার এক প্রবল মোহ। একে আমরা বলতে পারি 'প্রত্যাবর্তনের মায়া'। হরিহর যখনই কিছু অর্থ উপার্জন করে ভাবলেন এবার তিনি সংসারকে একটি স্থায়ী রূপ দেবেন এবং অপুকে সেই পৈতৃক ভিটের কক্ষপথে আটকে দেবেন, তখনই লেখক তাঁকে সরিয়ে দিলেন। এখানে হরিহরের মৃত্যু কোনো দুর্ঘটনা নয়; বরং পথ যখন দেখল যে হরিহরের এই 'সুদিনের মরীচিকা' অপুকে চিরদিনের জন্য নিশ্চিন্দিপুরের জীর্ণতায় আবদ্ধ করে ফেলবে, তখনই তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটল। হরিহরের মৃত্যু অপুকে কাশীর মতো এক মহাজীবনের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে প্রসারিত করল, যেখানে তার বিকাশের পরিধি আর গ্রাম্য গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ রইল না। সর্বজয়া অপুর চারপাশে এক নিবিড়

স্নেহের গণ্ডি টেনে দিয়েছিল। সে চেয়েছিল অপুকে সেই গ্রাম্য জীবনের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে ধরে রাখতে। কিন্তু মহাকালের রথচক্র সেই মমতার বাঁধন চিনে নেয়নি। সর্বজয়া চরিত্রটি মায়ার সবচেয়ে জটিল এবং শক্তিশালী রূপ। তাঁর সমস্ত অস্তিত্ব ছিল অপুকে ঘিরে। কিন্তু লক্ষ্যণীয় যে, সর্বজয়ার এই ভালোবাসা ছিল 'সংরক্ষণশীল'। তিনি চেয়েছিলেন অপুকে নিজের চোখের সামনে আগলে রাখতে, তাকে একটি নিরাপদ ও পরিচিত বলয়ের নিশ্চলতায় আবদ্ধ রাখতে। তিনি অপুর উচ্চশিক্ষা বা অজানার পথে যাত্রাকে নিজের একাকীত্বের পথে বাধা হিসেবে দেখেছিলেন। সর্বজয়া হলেন সেই চূড়ান্ত 'নোঙর', যা অপুর জীবনতরণীকে মাঝদরিয়ায় ভাসতে দিচ্ছিল না। বিভূতিভূষণ অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সাথে এই নোঙরটি উপড়ে ফেললেন। সর্বজয়া যখন কাশীতে গিয়েও অপুর সান্নিধ্য এবং অস্তিত্বের সমগ্র নির্যাস বাজি রাখলেন, তখনই লেখক তাঁর প্রস্থান নিশ্চিত করলেন। কারণ, সর্বজয়া বেঁচে থাকলে অপু কখনোই বিশ্বপথিক হতে পারত না; সে কেবল একজন দায়িত্বশীল পুত্র হিসেবে নিজের ডানা ছেঁটে ফেলত। সর্বজয়ার মৃত্যু অপুকে মানসিকভাবে 'অনাথ' করলেও তাকে জাগতিকভাবে 'স্বাধীন' করে দিল। আখ্যানে অপু এক 'অনিকেত' বা ঘরহীন সত্তার প্রতীক। পথ আমি খুঁজি না, পথ আমায় খোঁজে অপুর এই ঠিকানাহীন ভবঘুরে বৃত্তির মধ্যেই সার্থকতা পায়। জাঁ-পল সার্ত্রের অস্তিত্ববাদী দর্শনে মানুষ যেমন কোনো পূর্বনির্ধারিত পরিচয়ে আবদ্ধ থাকে না, অপুর অস্তিত্বও তদ্রূপ কোনো ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতায় শৃঙ্খলিত নয়। সর্বজয়া বা হরিহর চেয়েছিলেন অপুকে একটি সামাজিক ও পারিবারিক ছাঁচে গড়ে তুলতে, কিন্তু পথের সার্বভৌমত্ব সেই প্রচেষ্টাকে পর্যুদস্ত করে দেয়। অপুর প্রিয়জনদের মৃত্যু আসলে তার চারপাশের সেই দেয়ালগুলোকে ভেঙে ফেলা, যা তাকে একটি সংকীর্ণ গৃহকোণের আধারে সীমাবদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছিল। ঘরের মায়া যখন অপুকে স্পর্শ করতে পারল না, তখনই সে প্রকৃত অর্থে 'বিশ্বপথিক' হয়ে উঠল। এই নিঃসঙ্গতা অপুর জন্য কোনো অভিশাপ নয়, বরং এটি সেই স্বাধীনতা যা পথ তাকে উপহার দিয়েছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুটি চরিত্রের মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, অনেক সময় শুভাকাঙ্ক্ষী বা অভিভাবকত্বের মায়াও জীবনের বৃহত্তর অগ্রগতির পথে বিঘ্ন ঘটায়। পথ যখন অপুকে খুঁজে নিল, তখন সে একে একে সেই সব মানুষদের সরিয়ে দিল যারা অপুর পায়ে ভালোবাসার শিকল পরাতে চেয়েছিল। হরিহর ও সর্বজয়া সেই মায়ার প্রতীক বলেই পথের অমোঘ নিয়মে তাঁদের মহাপ্রস্থান অনিবার্য হয়ে উঠল।

এই উপন্যাসে বিভূতিভূষণ একটি সূক্ষ্ম কিন্তু গভীর পার্থক্য দেখিয়েছেন— তা হলো 'স্মৃতি' এবং 'মায়ার' মধ্যে পার্থক্য। দুর্গা যে কড়ির বাক্স বা তুচ্ছ স্মৃতিচিহ্নের এক বিষণ্ণ সম্ভার রেখে গিয়েছিল, তা ছিল জড়বস্তুর প্রতি আসক্তি বা 'মায়া'। দুর্গার মৃত্যুর পর অপু যখন সেই বাক্সটি বনের ঝোপে ফেলে দেয়, তখন সে আসলে দুর্গার সেই লৌকিক আসক্তিকে অতিক্রম করে। কিন্তু অপু কি দুর্গার স্মৃতিকে ভুলে যায়? না। অপু সেই স্মৃতিকে বহন করে নিয়ে যায় নিজের হৃদয়ে। এখানেই পথের আসল কারসাজি। পথ আমাদের কাছ থেকে 'বস্তু' কেড়ে নেয়, কিন্তু 'স্মৃতি' কেড়ে নেয় না। দুর্গা, ইন্দির ঠাকরুন বা সর্বজয়া—এঁরা যখন মারা যান, তখন তাঁরা অপুর কাছে আর কোনো 'বোঝা' থাকেন না, বরং তাঁরা হয়ে ওঠেন অপুর পথচলার 'পাথেয়' বা প্রেরণা। অপুর এই শিল্পী-সত্তার উন্মেষের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল ছিল বিচ্ছেদজাত এক ধরণের রিক্ততা, যা স্মৃতির সুধায় পূর্ণ। যারা মায়ার বশবর্তী হয়ে বস্তুকে আঁকড়ে ধরেছিল, তারা হারিয়ে গেল; কিন্তু অপু স্মৃতিকে পাথেয় করে পথের আহ্বানে সাড়া দিল। এই 'স্মৃতির পরিশুদ্ধি' অপুকে সাধারণ মানুষ থেকে একজন কালজয়ী শিল্পী বা দ্রষ্টায় রূপান্তরিত করেছে।

উপন্যাসের একটি অত্যন্ত শক্তিশালী রূপক হলো রেললাইন এবং ট্রেনের সেই সুদূরগামী বাঁশি। 'পথের সেই ডাক' যা কেবল উপযুক্ত পথিকই শুনতে পায়। দুর্গা রেললাইন দেখতে চেয়েছিল এক প্রকার কৌতূহল

থেকে, কিন্তু তার মনে পথের সেই দার্শনিক ডাক পৌঁছায়নি; তাই সে মাঝপথেই মায়ার টানে থেমে গেল। অন্যদিকে, অপুর শ্রুতিমূলে সেই ধ্বনি মহাকালের এক গূঢ় সংকেত রূপে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। ট্রেনের বাঁশি অপুকে প্রতিনিয়ত মনে করিয়ে দিয়েছে যে, তার অভিসার নিশ্চিন্দিপুরের ঝোপঝাড়ের ক্ষুদ্রতায় নিবদ্ধ নয়, বরং এক আদিগন্ত বিস্তৃত রহস্যময় বিশ্বচরাচরে। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'র দর্শনের মতো এখানেও 'গতি'ই হলো সত্য, আর 'স্থিতি' হলো মায়া। ট্রেনের সেই ধূসর ধোঁয়া আর কম্পন অপুর ভেতরের মায়াবদ্ধ সত্তাকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল, যার অনিবার্য সার্থকতা আমরা প্রত্যক্ষ করি তার নিশ্চিন্দিপুর ত্যাগের মাহেন্দ্রক্ষণে।

অপুর এই নির্লিপ্ত জীবনচেতনা ও পথের দুর্নিবার আহ্বানে সাড়া দেওয়ার প্রক্রিয়াটিকে বিশ্বসাহিত্যের কতিপয় চিরায়ত চরিত্রের সারিতে বিন্যস্ত করা যায়। হারম্যান হেসের 'সিদ্ধার্থ' উপন্যাসের নায়ক যেমন সত্তার গহন মুক্তি-তৃষ্ণায় ঘর, পরিজন এবং পার্থিব প্রেমের মায়া বিসর্জন দিয়ে নদীর অবিনাশী প্রবাহের কাছে সর্বস্ব সমর্পণ করেছিলেন, বিভূতিভূষণের অপুও তেমনি নিশ্চিন্দিপুরের চেনা গণ্ডি পেরিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। হেসের দর্শনে নদী যেমন গতির প্রতীক, বিভূতিভূষণের কাছে 'পথ' ঠিক তেমনই এক সক্রিয় সত্তা। আবার জেমস জয়েসের স্টিফেন ডিডালাস যেভাবে শিল্পী হয়ে ওঠার তাগিদে ধর্ম, দেশ ও পারিবারিক আসক্তির নিগড় মোচন করেছিলেন, অপুর ক্ষেত্রেও দেখা যায় সেই একই 'নিস্পৃহ বিচ্ছেদ'। পার্থক্য কেবল এই যে, জয়েসের নায়ক সচেতনভাবে নির্বাসন বেছে নেন, আর অপুর ক্ষেত্রে তার জীবনের প্রতিটি মায়ার নোঙরকে পথ নিজেই সচেতনভাবে উপড়ে ফেলে। অপুর এই পথ চলা কোনো আকস্মিক বিচ্ছিন্নতা নয়, বরং তা বিশ্বসাহিত্যের সেই চিরন্তন মহাযাত্রারই অংশ, যেখানে মায়ার বিনাশই হলো নবজন্মের একমাত্র শর্ত।

পথের পাঁচালী'র এই মহানিষ্ক্রমণের আখ্যানে আর একটি বিশেষ দিক হলো স্মৃতির ভূমিকা। অপু যখন নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে অজানার এক অলঙ্ঘ্য অভিসারে নির্গত হয়, তখন সে কেবল রিক্ত হাতে বের হয় না; বরং তার অন্তরে অক্ষয় হয়ে থাকে দুর্গার স্মৃতি, সর্বজয়ার স্নেহ আর অপূর্ণ শৈশবের হাজারো বিষণ্ণ মুহূর্ত। বিভূতিভূষণের দর্শনে স্মৃতি কেবল অতীতের রোমন্থন মাত্র নয়; এ তো চির-পথিকের এক পাথেয় সঞ্চয়। পথের দেবতা অপুর কাছ থেকে সব কেড়ে নিলেও তাকে এক গভীর সংবেদনশীল হৃদয় দান করেছেন, যা দিয়ে সে মহাকালের নিঃশব্দ পদধ্বনি শুনতে পায়।

এখানেই বিভূতিভূষণের সাথে আধুনিক অস্তিত্ববাদী লেখকদের একটি এক সুগভীর ও গুণগত পার্থক্যের বাতাবরণ রচিত হয়। যেখানে পাশ্চাত্য দর্শনে একাকীত্ব প্রায়শই হতাশা বা শূন্যতার নামান্তর, সেখানে অপুর এই নিঃসঙ্গতা একধরণের অলৌকিক ব্যাপ্তি। প্রমথনাথ বিশী যথার্থই বলেছেন যে, প্রকৃতি একদিকে যেমন মানুষকে বেঁধে রাখে, অন্যদিকে সে-ই আবার মুক্তির পথ দেখায়। অপুর ক্ষেত্রে নিশ্চিন্দিপুরের প্রকৃতি আর মানুষের মৃত্যু তাকে জীবনবিমুখ করেনি, বরং এক বৃহত্তর জীবনের প্রতি অনুরাগী করে তুলেছে। দুর্গার মৃত্যু তাকে শিখিয়েছে যে, জীবন নশ্বর কিন্তু জীবনের প্রবাহ অবিনাশী। তাই অপুর ঘর ছাড়া কোনো পলায়ন নয়, বরং তা হলো খণ্ড জীবন থেকে অখণ্ড জীবনের দিকে এক সাহসী অভিযাত্রা। মহাকালের রথচক্র সব মায়ার বাঁধন গুঁড়িয়ে দিলেও সেই ধুলো থেকেই জন্ম নেয় এক নতুন শিল্পীসত্তা, যে চিরকাল পথের বাঁশিতে সুর বেঁধে চলে।

'পথের আহ্বান ও মায়ার বাঁধন: বিভূতিভূষণের দৃষ্টিতে জীবন ও মৃত্যু' শীর্ষক এই আলোচনার শেষে আমরা এক অনিবার্য ও ধ্রুব সত্যের মুখোমুখি হই। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' কেবল এক পল্লী-বালকের বেড়ে ওঠার কাহিনী নয়; এ আখ্যান মায়া ও মুক্তির এক চিরন্তন মহাকাব্যিক বয়ান। সমগ্র

প্রবন্ধের নিহিতার্থ ও নিবিড় বিশ্লেষণে এই সত্যটি প্রতিভাত হয় যে, নিশ্চিন্দিপুরের সেই ধূলিধূসর পথ কোনো জড় রেখা নয়, বরং তা এক জীবন্ত ও আধ্যাত্মিক সত্তা। এই পথ যাকে আহ্বান করে, তাকে নিঃস্ব করেই বরণ করে নেয়। পথের সেই অলঙ্ঘ্য আহ্বান যাঁদের মরমী চেতনাকে স্পর্শ করেছে, তাদের চেনা ঘর, চেনা মানুষের ভিড় আর সঞ্চিত মায়ার সংসার থেকে ছিন্নমূল হতেই হয়েছে। আমরা দেখেছি, ইন্দির ঠাকরুন কিংবা দুর্গার প্রস্থান কেবল প্রকৃতির এক নিষ্ঠুর নিয়ম নয়; একে 'পথের' এক সচেতন নির্বাচন হিসেবেই গণ্য করা যায়। দুর্গার সেই 'কড়ির বাক্স' কিংবা সর্বজয়ার 'স্নেহের গণ্ডি' এই সবকিছুই ছিল অপুর চিরন্তন গতির বিপরীতে এক একটি স্থবির মায়াবন্ধন। মহাকালের রথচক্র সেইসব স্থবিরতাকে চূর্ণ করে অপুকে এক মুক্ত প্রান্তরের দিকে ঠেলে দিয়েছে। সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যেমন আভাস দিয়েছেন, অপুর এই নিঃসঙ্গতা আসলে তার রিক্ততা নয়, বরং এক পরম পূর্ণতা। এই রিক্ততাই তাকে সাধারণের গণ্ডি ছাড়িয়ে একজন 'বিশ্বপথিক' ও 'শিল্পী' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মায়া যাকে নিবিড় আলিঙ্গনে আচ্ছন্ন করেছিল, মৃত্যু তাকে মুক্তি দিয়েছে; আর যে মৃত্যুকে পাথেয় করে স্মৃতিকে সঙ্গী করেছে, পথ তাকে আপন করে নিয়েছে। যাবতীয় আলোচনার সূত্র ধরে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বিভূতিভূষণের জীবনদর্শন এক আশ্চর্য নির্লিপ্ততায় ভাস্বর। তিনি দেখিয়েছেন, জীবন এক বহমান নদী, আর মৃত্যু সেই নদীরই এক বাঁক পরিবর্তন। অপুর নিশ্চিন্দিপুর ত্যাগ কোনো পরাজয় নয়, বরং তা হলো মায়ার ক্ষুদ্র গণ্ডি পেরিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে এক মহিমান্বিত মহানিষ্ক্রমণ। পথের এই আহ্বান চিরন্তন—যা প্রতিনয়ত যোগ্য পথিককে খুঁজে নেয় এবং অযোগ্যকে ঝরিয়ে দেয়। 'পথের পাঁচালী'র এই জীবন ও মৃত্যুর আখ্যান তাই শেষ পর্যন্ত গতিরই জয়গান গায়। পথ যেখানে শেষ হয়েছে বলে মনে হয়, সেখান থেকেই আসলে এক নতুন দিগন্তের শুরু হয়—যেখানে পথিক একা, নিঃসঙ্গ, কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাধীন। আর এই পথেরই আদি ও অন্তহীন মন্ত্র হলো—পথ পথিককে খোঁজে না, বরং পথই তার আজন্ম পথিককে খুঁজে নেয়।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. আহমেদ, হুমায়ূন। বিভূতিভূষণ কেন বড় সাহিত্যিক (প্রবন্ধ সংকলন/বক্তব্য)। অন্যপ্রকাশ, ঢাকা।
২. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ। সাহিত্য ও সাহিত্যিক। বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৫৬। পৃষ্ঠা ১১২-১১৫।
৩. ঘোষ, সাগরময় (সম্পাদক)। বিভূতি-স্মরণ। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।
৪. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৪।
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ছিন্নপত্রাবলী। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।
৬. দাশগুপ্ত, অলকরঞ্জন। শিল্পীর স্বাধীনতা ও অন্যান্য প্রবন্ধ। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৭৪। পৃষ্ঠা ৪৫-৪৮।
৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। পথের পাঁচালী। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯২৯ (বর্তমান সংস্করণ ২০১০)। পৃষ্ঠা ৮২, ২১০-২১৫।
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, রুশতী সেন। আরণ্যক ও পথের পাঁচালী: একটি নির্লিপ্ত পাঠ। সিগনেট প্রেস, কলকাতা।
৯. বিশী, প্রমথনাথ। বিভূতিভূষণ ও পথের পাঁচালী। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৬২ (সংস্করণ ২০০৫)। পৃষ্ঠা ১৪-২০ এবং ১৮-২০।

১০. ভট্টাচার্য, আশুতোষ। বাংলা কথা-সাহিত্যের ইতিহাস। অক্ষয় লাইব্রেরি, কলকাতা, ১৯৭০। পৃষ্ঠা ২৭৫-২৮০।

১১. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার। বিভূতিভূষণ: মন ও সাহিত্য। সাহিত্যমণি, কলকাতা, ১৯৭৫। পৃষ্ঠা ৬২-৬৭।

১২. মুখোপাধ্যায়, দিলীপকুমার। বিভূতি-মানস। ক্যালকাটা পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬৮। পৃষ্ঠা ৯০-৯৪।

১৩. রাহা, অশোককুমার। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্য আকাদেমি, দিল্লি।

১৪. সরকার, অলক। বিভূতিভূষণের শিল্পকলা। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮২।

১৫. সেন, সুকুমার। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড)। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

১৬. Campbell, Joseph. The Hero with a Thousand Faces. Princeton University Press, 1949.

১৭. Eliot, T.S. Four Quartets. Faber and Faber, 1943.

১৮. Hesse, Hermann. Siddhartha. Translated by Hilda Rosner, New Directions, 1951.

১৯. Joyce, James. A Portrait of the Artist as a Young Man. B.W. Huebsch, 1916.

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1659-1665
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.387

স্মৃতি-সত্তা ও সময়ের দর্পণ: ওড়িয়া ছোটগল্পের পঞ্চরত্ন

হায়দার সেখ, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 24.03.2026; Accepted: 28.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The triumphant journey of Odia short stories began with the timeless writings of Fakirmohan Senapati, where social reform and realistic depiction of rural life were the main themes. However, a radical change can be observed in Odia fiction from the middle of the twentieth century. The storytellers of this time did not only paint a picture of the external society, but also took the complexity of the inner being of man, the crisis of existence and the indelible influence of time as the main subject of the story. The research paper under discussion has attempted to make a comparative dissection of human 'memory', 'being' and 'time'in the light of five best stories of five prominent artists of Odia literature—Raj Kishore Pattanayak, Kishori Charan Das, Godavarish Mahapatra, Kalindi Charan Panigrahi and Surendra Mohanti.

'Memory' is the anchor of human existence, which binds him to the past. But time is like a flowing stream, which constantly changes the world known to man. When man's 'being' or self-identity faces a crisis while adapting to this changing world, higher literature is born. In Rajkishore Pattnaik's story 'Fanki', we see how a simple mango tree becomes the holder of a family's memories and how its fall in the storm of time highlights the uncertainty of life. On the other hand, in Kishore Charan Das' story 'Bhanga khelna', a subtle analysis of child psychology shows how the artificiality of the adult world hurts the simple being of a child. Here 'time' is a cruel craftsman who takes away the simplicity of childhood.

Godavarish Mohapatra has skillfully depicted the degradation and struggle of being in the mirror of social reality in his story 'Neela Mastarani'. The tragedy of an educated woman's transformation from a teacher to a washerwoman proves how much social time and reform can degrade an individual's being. Again, in Kalindicharan Panigrahi's story 'MangserBilap', we see a unique moral evolution. There, rising above the relationship between animals and humans, at a special moment in time, how the primitive brutality of man is transformed into a new human being by burning in the fire of regret. Finally, Surendra Mohanty's story 'Kather Ghora'is a tragic tale of searching for the nostalgia or scent of memory of the past while standing on the rough sands of modernity.

Keywords: Odia Short Story, Memoir / Reminiscence, Existentialism, Social Realism, Child Psychology, Human Relationships, Symbolism etc

ওড়িয়া সাহিত্যের বিবর্তনের ইতিহাসে বিংশ শতাব্দী একটি অনন্য মাইলফলক। এই সময়ে ওড়িয়া কথাশিল্পীরা কেবল গ্রামীণ জীবনের স্থবিরতা বা সরল চিত্রায়নে সীমাবদ্ধ থাকেননি, বরং তারা মানুষের মনের

গহীন কোণে থাকা জটিলতা, অস্তিত্বের সংকট এবং সময়ের সাথে সাথে স্মৃতির বদলে যাওয়া রূপকে অত্যন্ত নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। আলোচ্য পাঁচটি গল্প— 'ফাঁকি', 'ভাঙ্গা খেলনা', 'নীলা মাষ্টারনী', 'মাংসের বিলাপ' এবং 'কাঠের ঘোড়া'— একত্রে পাঠ করলে দেখা যায় যে, প্রতিটি গল্পই এক একটি স্বতন্ত্র দর্পণ। এই দর্পণে কখনও প্রতিফলিত হয়েছে শৈশবের হারানো সারল্য, কখনও সমাজের নির্মম কুসংস্কার, আবার কখনও মানুষের আদিম পাশবিকতার বিপরীতে নৈতিক জাগরণ। স্মৃতির রোমন্থন এই গল্পগুলোর একটি সাধারণ সূত্র,যা বর্তমানের রুক্ষ বাস্তবতাকে সহ্য করার শক্তি জোগায় অথবা সেই বাস্তবতাকে আরও করুণ করে তোলে।

ওড়িয়া সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী'র 'মাংসের বিলাপ' গল্পটি ইকো-ক্রিটিসিজম (Eco-criticism) এবং প্রাণী অধিকারের (Animal Rights) প্রেক্ষাপটে বিচার্য। পিটার সিঙ্গারের মতে, প্রাণীদেরও নৈতিক মর্যাদা রয়েছে। এখানে জলি ও ডোরার বন্ধুত্ব ডারউইনীয় 'সারভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট' তত্ত্বকে ভুল প্রমাণ করে এক নতুন 'মেটামরফসিস' বা রূপান্তরের ইঙ্গিত দেয়। তিনি 'মাংসের বিলাপ' গল্পের মাধ্যমে এমন এক জগতের দ্বার উন্মোচন করেছেন, যেখানে প্রাণীর সহজাত প্রবৃত্তি আর মানুষের অর্জিত কুপ্রবৃত্তি এক বিশাল সংঘাতের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। এই গল্পের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এক অনন্য বন্ধুত্ব—একদিকে সুদূর লন্ডন থেকে আসা মাংসাশী শিকারি কুকুর 'ডোরা', অন্যদিকে ওড়িশার গভীর অরণ্যে জন্ম নেওয়া নিরামিষাশী কৃষ্ণসার হরিণ 'জলি'। লেখক গল্পের শুরুতেই এই দুই অসম সত্তার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, "জলি ওডোরা আবাল্য সঙ্গী। ক্ষণেক একে অপরকে ছাড়িয়া থাকিতে সহজে রাজি হয় না।"[১] এই উদ্ধৃতিটি কেবল তাদের বন্ধুত্বের গভীরতাই প্রকাশ করে না, বরং প্রকৃতির আদিম নিয়ম— শিকারী ও শিকারের যে চিরন্তন সম্পর্ক— তাকে এক আশ্চর্য মানবিক আবেদনে অস্বীকার করে।

গল্পের প্রেক্ষাপটটি গড়ে উঠেছে স্মৃতি ও সত্তার এক বিমূর্ত বুননে। ডোরা এবং জলির এই বন্ধুত্ব আমাদের শেখায় যে, প্রেম ও মমত্ববোধ কোনো ভৌগোলিক সীমা বা খাদ্যাভ্যাসের দাস নয়। যখন ডোরার পা জখম হয়, তখন জলি তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে এবং লেখকের ভাষায়— "তার পায়ে মুখ-স্পর্শ করিয়া কোথায় তার ব্যথা তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিল।"[২] এই যে প্রাণীর অন্তরের মমতা, তা মানুষের তথাকথিত শ্রেষ্ঠত্বের দাবিকে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দেয়। ডোরার সত্তা এখানে বদলে গেছে; সে শিকারি থেকে রক্ষক হয়ে উঠেছে। কিন্তু সময়ের ট্র্যাজেডি শুরু হয় যখন এই পবিত্র সম্পর্কের মাঝে মানুষের লালসা ও শিকারি প্রবৃত্তি প্রবেশ করে।

জমিদার বাবুর শিকারে জলির মৃত্যু এই গল্পের সবচেয়ে অন্ধকার দিক। জলি যখন মারা যায়, তখন ডোরা কেবল তার বন্ধুকে হারায়নি, তার অস্তিত্বের এক বড় অংশও হারিয়ে ফেলে। কিন্তু গল্পের প্রকৃত দর্শন ফুটে ওঠে যখন জমিদারের 'সত্তা'র পরিবর্তন ঘটে। শিকারি হিসেবে জলিকে ভক্ষণ করার পর তাঁর ভেতরে যে মানসিক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়, তা লেখক অত্যন্ত নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। জলির সেই পবিত্র মাংস যখন জমিদারের শরীরে প্রবেশ করে, তখন তা পুষ্টির বদলে এক তীব্র দহন তৈরি করে। লেখক বলছেন— "হরিণ শাবকের প্রতিটি ভুক্ত মাংসখণ্ডের ক্রন্দন তাঁর প্রতি রোমকূপ হইতে ফুটিয়া বাহির হইতেছে তিনি শুনিতে পাইলেন।"[৩] এই 'মাংসের বিলাপ' আসলে মৃত জলির কোনো আর্তনাদ নয়, বরং জমিদারের সুপ্ত বিবেকের এক তীব্র দংশন। স্মৃতি এখানে অপরাধবোধের রূপ নিয়েছে, যা জমিদারের বর্তমান সত্তাকে তিলে তিলে ধ্বংস করে নতুন এক সত্তার জন্ম দিচ্ছে।

জমিদার বাবুর দুই সপ্তাহব্যাপী সেই মারণোত্তর জ্বর এবং অনাহার আসলে তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত। সুস্থ হওয়ার পর তিনি যখন বলেন, "সাহেবের উপযোগী অতিথিশালা দরিদ্রের পান্থশালায় পরিণত হইল"[৪] এবং পুরো জমিদারি এলাকায় হরিণ শিকার নিষিদ্ধ করেন, তখন আমরা এক নতুন মানুষের সত্তা প্রত্যক্ষ করি। সময়ের দর্পণ এখানে মানুষের নিষ্ঠুরতাকে প্রতিফলিত করে তাকে পরিশুদ্ধ করার সুযোগ করে দিয়েছে। জলি মারা গিয়েও জমিদারের ভেতরের পশুত্বকে মেরে ফেলে এক উচ্চতর মানবিক বোধ জাগ্রত করেছে। এটিই গল্পের প্রকৃত 'বিলাপ'— যা ধ্বংসের নয়, বরং সৃষ্টির।

অন্যদিকে, ডোরার পরিণতি আমাদের বিদীর্ণ করে। মানুষের তৈরি 'বধ্যভূমি'তে সে বারবার ফিরে যায় তার প্রিয় সখাকে খুঁজতে। ডোরার সেই আঘ্রাণ নেওয়ার আকুলতা প্রমাণ করে যে, পশুর স্মৃতিশক্তি অনেক সময় মানুষের চেয়েও বেশি প্রখর এবং বিশ্বস্ত। ডোরার নিরুদ্দেশ হওয়া গল্পের এক গভীর দার্শনিক সমাপ্তি টানে। সে যেন সেই সমাজের কাছে আর ফিরতে চায়নি, যেখানে বন্ধুত্বের চেয়ে মাংসের স্বাদ বড় হয়ে দেখা দেয়।

এই গল্প আলোচনার অন্তিমে এসেবলাযায়, 'মাংসের বিলাপ' কেবল একটি শিকারের গল্প নয়, এটি হলো সত্তার রূপান্তরের এক মহাকাব্য। সময়ের স্রোতে জলি হারিয়ে গেলেও তার স্মৃতি জমিদারের জীবনধারা বদলে দিয়েছে। কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী এই গল্পের মাধ্যমে আমাদের মনে করিয়ে দেন যে, জগতের প্রতিটি প্রাণের প্রতি মমত্ববোধই মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। মাংসের সেই বিলাপ আসলে আমাদেরই অবদমিত বিবেক, যা বারবার মনে করিয়ে দেয়—অহিংসাই পরম ধর্ম। স্মৃতি-সত্তা ও সময়ের এই দর্পণে দাঁড়িয়ে 'মাংসের বিলাপ' আমাদের আদিম পাশবিকতাকে বিসর্জন দিয়ে এক পূর্ণাঙ্গ মানুষ হওয়ার পথ দেখায়।

ওড়িয়া ছোটগল্পের বিবর্তনে রাজকিশোর পট্টনায়ক মানুষের অস্তিত্বের গভীরে প্রোথিত থাকা বিষাদ ও সময়চেতনাকে শৈল্পিক রূপ দিয়েছেন। রাজকিশোর পট্টনায়কের অসাধারণ গল্প 'ফাঁকি'। গল্পটি মূলত অস্তিত্ববাদের (Existentialism) একটি ধ্রুপদী উদাহরণ। দার্শনিক মার্টিন হাইডেগারের মতে, মানুষের অস্তিত্ব সবসময় সময়ের সাথে সম্পর্কিত (Being and Time)। এই গল্পে আমগাছটি কেবল একটি উদ্ভিদ নয়, বরং এটি একটি পরিবারের 'অস্তিত্বের নোঙর'। গাছটি যখন উপড়ে পড়ে, তখন সেটি হাইডেগারের ভাষায় 'Dasein' বা জগতের মধ্যে থাকা সত্তার বিলুপ্তি ঘটায়। 'ফাঁকি' গল্পটি শুরু হয় এক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের জমি কেনা ও বাড়ি তৈরির স্বপ্ন দিয়ে। কিন্তু সেই জড় কাঠামোর চেয়েও গল্পকারের কাছে মুখ্য হয়ে উঠেছে একটি প্রাণবন্ত আমগাছ। গোপালের বাবার কাছে এই গাছটি ছিল এক দীর্ঘমেয়াদী সাধনা। তিনি যখন বলেন, আগে গাছ লাগাব। তার পরে যত বাগান করবে কর, তখন বোঝা যায় তাঁর কাছে বসতবাড়ির চেয়েও বড় ছিল প্রকৃতির সাথে সখ্য স্থাপন। ভাগলপুর থেকে আনা সেই 'লেংড়া' আমের চারাটি যখন বড় হতে থাকে, তখন সেটি কেবল একটি গাছ থাকে না, হয়ে ওঠে এক 'হৃদয়বান' সত্তা। গাছটি বড় হওয়ার পর তার বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক বলছেন, "সে গাছ আর নাই। ভারী বুদ্ধিমান গাছ ছিল। সেই হৃদয়বান আমগাছটি আর বাঁচিয়া নাই।"[৫] গাছের মৃত্যুতে প্রকৃতির এই মানবিকীকরণ আমাদের সত্তার সাথে জড় ও প্রাণের নিবিড় বন্ধনকেই স্পষ্ট করে।

গাছটির পতন কেবল একটি আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়, বরং তা সময়ের এক নিষ্ঠুর পরিহাস বা 'ফাঁকি'। ঝড়ে গাছটি উপড়ে যাওয়ার পর যখন প্রতিবেশীরা বলতে থাকে, "কী ঝড়টা না হয়েছিল, এত বড় ফলন্ত গাছটা উপড়ে পড়ল! আহা! আহা!"[৬], তখন বোঝা যায় একটি পরিবারের ব্যক্তিগত শোক কীভাবে সর্বজনীন হয়ে ওঠে। কিন্তু সবচেয়ে মরমী পর্যবেক্ষণটি হলো যখন দেখা যায়— "গাছটা কত ভাল। পড়িয়াছে যে, তা

ঘরের উপর পড়ে নাই। বাড়ীর উপরকার বিজলী বাতিটা ভাঙ্গে নাই। দিনের বেলা পড়ে নাই।"[৭] এই উদ্ধৃতিটি প্রমাণ করে যে, আমগাছটি মরার মুহূর্তেও তার আশ্রয়দাতাদের ক্ষতি করতে চায়নি। কিন্তু সময়ের অমোঘ নিয়মে সেই স্মৃতিবিজড়িত অস্তিত্ব যখন খণ্ড-বিখণ্ড হয়, তখন সংবাদপত্রের পাতায় তা কেবল একটি শুষ্ক খবর হয়ে ধরা দেয়: "খবর-কাগজে লিখিয়াছিল- কটকে অর্ধরাত্রে ভীষণ ঝড় বৃষ্টি। শহরের ভিতরে পুরীঘাটে আমগাছ উপড়াইয়া পড়িয়াছে।"[৮] এই বাক্যটি দিয়ে লেখক বুঝিয়েছেন, যে স্মৃতির ভার একটি পরিবারের কাছে পাহাড়সম, মহাকালের কাছে তা কেবল এক লাইনের সংবাদ মাত্র।

ওড়িয়া সাহিত্যের দিকপাল কিশোরীচরণ দাসের অন্যতম গল্প 'ভাঙ্গা খেলনা'। গল্পটি সিগমুন্ড ফ্রয়েডের শিশু মনস্তত্ত্ব এবং 'ইডিপাস কমপ্লেক্স'-এর ছায়া ফেলে। গীতর জগতটি ছিল সহজ ও রৈখিক, কিন্তু বড়দের জগতের জটিলতা তার সেই সরলতাকে 'ফ্র্যাগমেন্টেড' বা খণ্ডিত করে দেয়। তাজমহলের মডেলটি এখানে জ্যাক লাকাঁ-র 'মিরর স্টেজ' (Mirror Stage)-এর মতো কাজ করে, যেখানে গীতনিজের সত্তাকে একটি কৃত্রিম সৌন্দর্যের আয়নায় দেখতে পায়। স্মৃতি ও সময়ের এই জটিল সমীকরণ কিশোরীচরণ দাসের 'ভাঙ্গা খেলনা' গল্পে আরও মনস্তাত্ত্বিক রূপ পরিগ্রহ করে। এখানে দশ বছরের বালিকা গীতর চোখ দিয়ে আমরা দেখি এক বিপন্ন শৈশবকে। বড়দের জগত যে কতটা কৃত্রিম ও আনন্দহীন, তা গীতর ভাবনার মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে: "দশ বছরের মেয়ে। বড়দিনের ছুটির দুপুর, বাড়ীর পিছনের দিকে সিঁড়ির ধাপে বসে চেয়ে আছে রোদের দিকে চিন্তার ছবি বয়ে চলেছে মনের মধ্যে।"[৯] গীতর সরল মনে বড়দের প্রতি এক ধরনের অবিশ্বাসের বীজ উপ্ত হয়েছে, যা তার বাবার আচরণের পরিবর্তনে স্পষ্ট। তার শৈশবের সারল্য যখন বড়দের জটিলতায় পিষ্ট হয়, তখন তার কাছে চারপাশের মানুষগুলোও মেকি মনে হয়। সে ভাবে— "কুলিআটা মিথ্যুক।"[১০]

গল্পের মূল মুহূর্তটি আসে যখন গীত তার বাবার ঘরে একটি নতুন ও দামি খেলনা বা শোপিস দেখতে পায়। ধপধপে সাদা সেই তাজমহলটি দেখে তার মনে হয়— "ধপধপে সাদা। সাদা পাথর না রুপো? সবটা আলো গিয়ে পড়েছে ওর উপরে। কত বড়, কী সুন্দর!"[১১] কিন্তু এই বাহ্যিক সৌন্দর্যের আড়ালে লুকিয়ে আছে এক পরম শীতলতা। গীত যখন সেই মডেলটি স্পর্শ করে, তখন লেখকের ভাষায়— "হাতে কী মোলায়েম লাগছে। ঠাণ্ডা লাগছে। কত টাকা দাম হয়তো।"[১২] এই 'ঠাণ্ডা' লাগার অনুভূতিটি আসলে সম্পর্কের শৈত্য ও বড়দের জগতের প্রাণহীন আভিজাত্যের প্রতীক। তাজমহল নিজেই একটি সমাধি, যা প্রেমের স্মৃতির চেয়েও বেশি মৃত্যুর সাক্ষ্য বহন করে। গীতর হাতে সেই 'ভাঙ্গা খেলনা'র মতো তার শৈশবও যখন উপেক্ষিত হয়, তখন এই দামী উপহারটি কেবল এক নীরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

ওড়িয়া ছোটগল্পের বিবর্তনে গোদাবরীশ মহাপাত্র এবং সুরেন্দ্র মহান্তি দুই ভিন্ন সময়ের প্রতিনিধি হলেও তাঁদের উভয়ের লেখনীতেই মানুষ ও তার চারপাশের বৈরী পরিবেশের এক নিপুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। গোদাবরীশ মহাপাত্রের 'নীলা মাষ্টারনী' গল্পটি মার্ক্সবাদী ও নারীবাদী তত্ত্বের মিশেলে বিশ্লেষণ করা যায়। সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস (Social Stratification) কীভাবে একজন শিক্ষিত মাষ্টারনীকে কেবল তাঁর জীবিকার কারণে

'নিচু জাতের' পরিচয়ে আবদ্ধ করে, তা এখানে মুখ্য। জুডিথ বাটলারের 'পারফরমেটিভিটি' তত্ত্ব অনুযায়ী, নীলা এখানে ধোপানীর ভূমিকা পালন করতে বাধ্য হচ্ছে, যা সমাজ তাঁর ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। আর 'কাঠের ঘোড়া' গল্পটি আধুনিকোত্তরবাদ বা পোস্ট-মডার্নিজমের এক গভীর প্রকাশ। বিজনবিহারী এখানে একজন 'ফ্ল্যানিউর' (Flâneur) বা ভবঘুরে, যিনি বর্তমানের কংক্রিটের ভিড়েও অতীতের সুগন্ধ খুঁজে বেড়ান।

ফ্রেডরিক জেমসন যাকে 'নস্টালজিয়া ফিল্ম' বলেন, বিজনবিহারীর মনটিও ঠিক তেমনি একটি স্মৃতির প্রেক্ষাগৃহ।

'নীলা মাষ্টারনী' গল্পটি আমাদের এমন এক সামাজিক প্রেক্ষাপটে নিয়ে যায় যেখানে মানুষের পরিচয় তার গুণ বা শিক্ষার চেয়ে তার পেশা এবং বংশমর্যাদার ওপর বেশি নির্ভরশীল। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র নীলা, যে একসময় শিক্ষকতা বা 'মাষ্টারনী' হিসেবে তিন গ্রামে পরিচিত ও সম্মানিত ছিল, সময়ের নিষ্ঠুর পরিহাসে তাকে ধোপানীর কাজ বেছে নিতে হয়। এই রূপান্তরটি কেবল পেশার পরিবর্তন নয়, বরং এটি একটি সত্তার অবক্ষয় যা সমাজ চাপিয়ে দিয়েছে। গোদাবরীশ মহাপাত্র এখানে অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে দেখিয়েছেন যে, সমাজ কীভাবে একজন নারীকে তার প্রতিকূলতায় সাহায্য করার বদলে তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে মেতে ওঠে। নীলা যখন ধোপানী হিসেবে কাপড় কাচতে ঘাটে যায়, তখন তার সেই পুরোনো 'মাষ্টারনী' সত্তাটি কেবল স্মৃতির ধুলোয় ঢাকা পড়ে থাকে। লেখক অত্যন্ত মর্মস্পর্শীভাবে বর্ণনা করেছেন যে, নীলার পরিচয় এখন তার শিক্ষার মাধ্যমে নয়, বরং সে কার বাড়ির ময়লা কাপড় পরিষ্কার করছে তার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়।

স্মৃতির দর্পণে নীলার জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হলো তার পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা। ভাইয়ের বিয়ের উৎসব যখন শুরু হয়, তখন নীলার সেই অন্তরের বোন বা দিদি সত্তাটি জেগে ওঠে। সে চেয়েছিল তার ভাইয়ের বউয়ের বিয়ের 'চেলী' বা পবিত্র বস্ত্রটি নিজ হাতে পরিষ্কার করতে। এখানে নীলার আকুতি ছিল কেবল কাপড় কাচা নয়, বরং সেই বস্ত্রের মাধ্যমে নিজের হারিয়ে যাওয়া পারিবারিক মর্যাদাকে পুনরুদ্ধার করা। যখন সে বলে, "আমি কেচে দেব লো, আমি কেচে দেব। আমার ভাই বউয়ের চেলী আমায় দাও, আমি কেচে আনব"[১৩], তখন তার কণ্ঠস্বরে পেশাদারিত্বের চেয়ে বেশি ছিল এক বোন হিসেবে ভাইয়ের প্রতি অধিকারবোধ। কিন্তু সমাজ ও তার নিজের ভাই তাকে সেই মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত ছিল। গল্পের শেষে যখন অন্ধকারের মধ্যে ভাই দিদির কাছে আসে এবং নীলা তাকে জড়িয়ে ধরে, তখন সেই অশ্রুভেজা মিলন প্রমাণ করে যে, সামাজিক পদমর্যাদা বা ধোপানীর পরিচয় কোনোটিই রক্তের বন্ধনকে ছিন্ন করতে পারে না। নীলার সত্তাটি এখানে একাধারে লড়াকু এবং মমতাশবলিত, যা সময়ের প্রতিকূলতাকে ডিঙিয়ে নিজের অস্তিত্বের জানান দেয়।

অন্যদিকে, সুরেন্দ্র মহান্তির 'কাঠের ঘোড়া' গল্পটি আমাদের নিয়ে যায় এক বৃদ্ধের মনস্তাত্ত্বিক জগতের গভীরে, যেখানে স্মৃতিই একমাত্র ধ্রুব সত্য। গল্পের নায়ক বিজনবিহারী দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর নিজের শহরে ফিরে আসেন, কিন্তু তাঁর কাছে সবকিছুই অচেনা মনে হয়। তাঁর সত্তাটি গড়ে উঠেছে বিমূর্ত সব অনুভূতির সমন্বয়ে। তিনি যখন ভাবেন, "শৈশবের গন্ধ আছে? তা'হলে তা গোবর-লেপা মাটির বারান্দা আর মধুমালতী ফুল এই দুইয়ের মেশামিশি একটা গন্ধ"[১৪], তখন বোঝা যায় তাঁর কাছে সময় কেবল ঘড়ির কাঁটা নয়, সময় হলো গন্ধ, রঙ আর শব্দের এক মায়ার জগত। বিজনবিহারীর এই যে বিমূর্ত বস্তুর দ্রব্যগুণ নির্ণয় করার 'হবি', তা আসলে যান্ত্রিক বর্তমান থেকে পালিয়ে অতীতের সেই অপাপবিদ্ধ জীবনে ফেরার এক ব্যাকুল চেষ্টা। 'কাঠের ঘোড়া' এখানে এক সচল অথচ প্রাণহীন গতির প্রতীক— যা আধুনিক জীবনকে নির্দেশ করে, যেখানে কোনো আবেগ নেই, আছে কেবল যান্ত্রিকতা।

বিজনবিহারীর এই স্মৃতির জগত বর্তমানের কর্কশ বাস্তবের সাথে ধাক্কা খায় যখন তিনি ট্রেনের কামরায় বা রেস্তোরাঁয় বর্তমান প্রজন্মের মুখোমুখি হন। গল্পের সেই নিষ্ঠুর লোকটি যখন বিজনবিহারীকে "ইডিয়ট" বলে সম্বোধন করে এবং তাঁর সযত্নে কেনা মল্লিকার মালাটি জুতোর তলায় পিষে ফেলে, তখন তা কেবল একটি ফুলের মৃত্যু থাকে না। সেই পিষ্ট হওয়া মালাটি আসলে বিজনবিহারীর সেই সযত্নে লালিত স্মৃতি এবং কোমল সত্তারই এক করুণ পরিণতি। লেখক এখানে দেখিয়েছেন যে, আধুনিক পৃথিবীতে বিজনবিহারীর

মতো মানুষেরা আসলে এক একজন 'কাঠের ঘোড়া', যাদের ভেতরে প্রাণ আছে কিন্তু বাইরে তারা স্থবির ও অপ্রাসঙ্গিক। মল্লিকার সুগন্ধ তাঁকে যখন সেই স্কুল-বোর্ডিং-এর ভোরের প্রার্থনায় ফিরিয়ে নিয়ে যায়— "অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি মো জীবনস্বামী"[১৫]-র সুর যখন তাঁর কানে বাজে, তখন বর্তমানের নিষ্ঠুরতা সেই পবিত্রতাকে তছনছ করে দেয়। সুরেন্দ্র মহান্তি এখানে বার্ধক্যের একাকীত্বকে এমন এক দর্পণে ফেলেছেন যেখানে অতীত অত্যন্ত উজ্জ্বল কিন্তু বর্তমান অত্যন্ত ধূসর ও মলিন।

এই দুটি গল্পকে একত্রে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, 'নীলা মাষ্টারনী'তে যে লড়াইটি ছিল সামাজিক এবং বাহ্যিক, 'কাঠের ঘোড়া'য় সেই লড়াইটি হয়ে উঠেছে মানসিক এবং অস্তিত্ববাদমূলক। নীলা লড়ছে তার হারানো সম্মানের জন্য, আর বিজনবিহারী লড়ছেন তাঁর হারানো সময়ের স্মৃতির জন্য। উভয় গল্পেই সময় একটি নিষ্ঠুর প্রতিপক্ষ। নীলার ক্ষেত্রে সময় তার পেশা কেড়ে নিয়েছে, তার সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। আর বিজনবিহারীর ক্ষেত্রে সময় তাঁর চেনা শহর ও চেনা মানুষগুলোকে বদলে দিয়েছে। গোদাবরীশ মহাপাত্রের লেখনীতে যে সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং শোষণের চিত্র আছে, সুরেন্দ্র মহান্তির লেখনীতে সেখানে আছে নাগরিক একাকীত্ব এবং আধুনিকতার শূন্যগর্ভ আস্ফালন। 'নীলা মাষ্টারনী'তে চেলী বা বিয়ের কাপড়টি যেমন সম্পর্কের সেতুবন্ধন হয়ে উঠেছিল, 'কাঠের ঘোড়া'য় মল্লিকার মালাটি তেমনি স্মৃতির বাহন হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সমাজ যেমন নীলাকে ধোপানী হিসেবে তাচ্ছিল্য করেছে, বর্তমান সময়ও বিজনবিহারীকে 'ইডিয়ট' বলে অবজ্ঞা করেছে।

ওড়িয়া সাহিত্যের এই দুই রত্ন আমাদের অস্তিত্বের গভীরে লুকিয়ে থাকা এক শাশ্বত সত্যকে উন্মোচন করে। আমরা যতই আধুনিক হই না কেন, আমাদের সত্তা সবসময় অতীতে ফেলে আসা স্মৃতি এবং মানুষের সাথে গড়ে ওঠা সম্পর্কের মধ্যেই আশ্রয় খোঁজে। নীলা যখন অন্ধকারের মধ্যে ভাইকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে ওঠে, তখন সেই কান্না কেবল ব্যক্তিগত দুঃখের নয়, তা সমাজের বিরুদ্ধে এক নীরব বিদ্রোহের বহিঃপ্রকাশ। একইভাবে বিজনবিহারী যখন পকেটে থাকা পিষ্ট হয়ে যাওয়া ফুলের গন্ধ অনুভব করেন, তখন তা আধুনিকতার চাপে পিষ্ট হওয়া আমাদের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলোরই এক প্রতীকী প্রতিবাদ। স্মৃতি-সত্তা ও সময়ের এই দর্পণে দাঁড়িয়ে আমরা বুঝতে পারি যে, 'নীলা মাষ্টারনী' বা 'বিজনবিহারী' কোনো বিচ্ছিন্ন চরিত্র নন— তাঁরা আমাদের সবার ভেতরে থাকা সেই সত্তা, যা হারানো সময় আর বদলে যাওয়া সমাজের মাঝে নিজের আসল পরিচয় খুঁজে পেতে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে চলেছে। এই দুই গল্পের বিস্তারিত পাঠ আমাদের শেখায় যে, জীবন মানে কেবল টিকে থাকা নয়, জীবন মানে সেই স্মৃতিগুলোকে লালন করা যা আমাদের প্রকৃত মানুষ হিসেবে পরিচয় দান করে।

পরিশেষে বলা যায়, এই পাঁচটি গল্পই আমাদের জীবনের এক একটি অধ্যায়কে স্পর্শ করে। রাজকিশোর পট্টনায়ক আমাদের শেখান জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব, কিশোরীচরণ দাস দেখান শৈশবের ভাঙন, গোদাবরীশ মহাপাত্র আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন সামাজিক কাঠিন্যের সাথে, কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী আমাদের বিবেকের দরজায় কড়া নাড়েন এবং সুরেন্দ্র মহান্তি আমাদের একাকীত্বের দর্পণে দাঁড় করান। এই গল্পগুলো ওড়িয়া সাহিত্যের কেবল 'পঞ্চরত্ন' নয়, বরং এগুলো বিশ্ব সাহিত্যের সম্পদ। 'ফাঁকি' গল্পের সেই আমগাছটি যেমন সময়ের কাছে পরাজিত হয়েও 'হৃদয়বান' সত্তার পরিচয় দিয়ে গেছে, তেমনি 'ভাঙ্গা খেলনা'র গীতর অমলিন শৈশব বড়দের কৃত্রিমতার কাছে হেরে গিয়েও এক অব্যক্ত প্রশ্নের পাহাড় তৈরি করেছে। 'নীলা মাষ্টারনী'র লড়াই আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, সামাজিক পরিচয়ের আড়ালে থাকা প্রকৃত সত্তাটি কেবল মমত্বের পরশেই বিকশিত হয়। অন্যদিকে, 'মাংসের বিলাপ' গল্পে আমরা দেখি পশুর বন্ধুত্বের পবিত্রতা কীভাবে মানুষের নিষ্ঠুর সত্তাকে পরিবর্তিত করে এক উচ্চতর নৈতিকতায় পৌঁছে দেয়। স্মৃতির

সরণি বেয়ে এই গল্পগুলো আমাদের যে সত্যের মুখোমুখি করে, তা হলো— সময় বয়ে যাবেই, সমাজ বদলাবে, মানুষ মারা যাবে, কিন্তু আমাদের ফেলে আসা স্মৃতি এবং গড়ে তোলা সত্তাই আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এক অমর আখ্যান হিসেবে রয়ে যাবে। এই থিসিসের মাধ্যমে আমরা এটাই উপলব্ধি করি যে, মানুষের জীবন আসলে একটি দীর্ঘ ভ্রমণ, যেখানে প্রতিটি মোড়ে অপেক্ষা করে আছে কোনো না কোনো 'ভাঙ্গা খেলনা' বা 'পিষ্ট হওয়া মল্লিকার মালা', আধুনিক যান্ত্রিকতার বুকে এক দীর্ঘশ্বাস হয়ে রয়ে যায়, যা প্রমাণ করে যে, অনুভূতির জগতকে কোনো বস্তুগত শক্তি দিয়ে মুছে ফেলা সম্ভব নয়।

ওড়িয়া সাহিত্যের এই 'পঞ্চরত্ন' আসলে সময়ের বালুচরে অঙ্কিত এমন এক আল্পনা, যা কালান্তরের ঝড় ঝাপটাতেও ম্লান হয় না। এই গবেষণাপত্রের মাধ্যমে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, মানুষের জয়গান কেবল তার সাফল্যে নয়, বরং প্রতিকূল সময়ের দর্পণে নিজের মানবিক সত্তাকে চিনে নেওয়ার প্রচেষ্টায় নিহিত। এই পাঁচটি কালজয়ী গল্প পাঠককে সেই ধ্রুব সত্যের পথেই আজীবন পরিচালিত করবে।

তথ্যসূত্র:

১. পঠাণি, পট্টনায়ক (সম্পাদিত)। ওড়িয়া ছোটগল্প সংকলন। নয়াদিল্লি, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৮০,পৃ. ১৫।
২. তদেব, পৃ. ১৫।
৩. তদেব, পৃ. ২৩।
৪. তদেব, পৃ. ২৩।
৫. তদেব, পৃ. ৬৩।
৬. তদেব, পৃ. ৬৩।
৭. তদেব, পৃ. ৬৩।
৮. তদেব, পৃ. ৬৪।
৯. তদেব, পৃ. ৯৮।
১০. তদেব, পৃ. ৯৮।
১১. তদেব, পৃ. ১০৭।
১২. তদেব, পৃ. ১০৭।
১৩. তদেব, পৃ. ১৩।
১৪. তদেব, পৃ. ৭৮।
১৫. তদেব, পৃ. ৮৬।

গ্রন্থপঞ্জি:

আকরগ্রন্থ:

১. পট্টনায়ক, পঠাণি (সম্পাদিত)। ওড়িয়া ছোটগল্প সংকলন। নয়াদিল্লি, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৮০

সহায়কগ্রন্থ:

1. Mansinha, Mayadhar. History of Oriya literature. New Delhi, Sahityaakademi, 1960.

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1666-1679
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.388

ঔপনিবেশিক ভারতে ঠগীদের অপরাধ: উইলিয়াম হেনরি স্লিম্যানের বিবরণ ও অপরাধ-তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

কুন্দন চক্রবর্তী, *স্বাধীন গবেষক, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 24.03.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This study examines the criminality of Thuggee in colonial India through a critical and criminological reading of administrative narratives. It analyzes how the British administration represented Thugs as a mysterious and organized community of killers and portrayed their suppression as a significant achievement of colonial governance. By interrogating these narratives, the paper questions their evidentiary validity and explores the ways in which crime was conceptualized, constructed, and institutionalized within colonial discourse. The study seeks to reassess the idea of Thuggee beyond conventional historiography and to reinterpret it as a product of power, knowledge, and colonial intervention.

Keywords: Thuggee, William Henry Sleeman, Colonial India, Criminality, Colonial Discourse, Criminology, Mysterious Killers, Organized Crime

ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের বিভিন্ন উপাদানে উঠে এসেছে নানা অপরাধ এবং অপরাধীদের কথা এবং এই অপরাধীদের মধ্যে অন্যতম রহস্যময় সম্প্রদায়টি ছিল ঠগীদের। এরা ছিল অপরাধীদের একটি সংগঠন যারা তাদের বিচিত্র পদ্ধতির দ্বারা পথিকদের হত্যা করত এবং তাদের লুঠ করত। এদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এরা নিজেদের অপরাধের কোন প্রমাণ রাখতো না। ব্রিটিশরা ভারতে নিজেদের ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই সম্মুখীন হচ্ছিল নানা অপরাধী এবং অপরাধের। তবে প্রাথমিক দিকে ব্রিটিশ প্রশাসন ঠগীদের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত ছিল না। ব্রিটিশদের কাছে ঠগীদের প্রথম বিবরণ আসে ১৮১৬ সালে ডঃ রিচার্ড সি. শেরউড এর লেখা থেকে, যেখানে তিনি হিন্দুস্তানের দক্ষিণাঞ্চলে ঠগীদের অস্তিত্বের কথা বলছেন এবং ফাঁসিগার (Phasigars) শব্দটি ব্যবহার করেছেন ঠগীদের উদ্দেশ্যে। ইউরোপীয় সাম্রাজ্য ভারতবর্ষে বিস্তারের সাথে সাথেই ইউরোপীয় প্রসাশন লক্ষ্য করেছে যে ভারতবর্ষের রাস্তাঘাটে বিচরণকারী পথিকদের একটি বিরাট অংশ প্রতিবছর রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে যাচ্ছে এবং সংখ্যাটা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ঘটনাগুলির পেছনে উঠে আসছে 'The phansigars', 'stranglers' শব্দগুলি এবং এই শব্দগুলি নেওয়া হচ্ছে হিন্দুস্তানি শব্দ ফাঁসি (phansi)। উত্তর ভারতে এই হত্যাকারীদের বা অপরাধীদের বলা হচ্ছে thugs অর্থাৎ প্রতারক। তামিল ভাষায় এদের বলা হচ্ছে- "অরি তুলুকার (ari tulucar) অর্থাৎ "মুসলমান ফাঁসুড়ে"। এই যে মুসলমান ফাঁসুড়ে কথাটি এটা সম্ভবত ঠগী গোষ্ঠীতে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য, যা আমরা পরে আলোচনা করব।

অনুরূপভাবে কন্নড় ভাষায়–তান্তি কল-লেরু (tanti cal-leru) অর্থাৎ এমন চোর যারা একটি তার বা বিড়ালের অস্ত্র ব্যবহার করে ফাঁস হিসাবে। তেলেগু ভাষায়– ওয়ার্লু ওয়ার্ন্ডলু (warlu warndlu), ওয়ার্লু বৈষয় ওয়াহন্ডলু (warlu vayshay wahndloo) অর্থাৎ যারা ফাঁস ব্যবহার করে। ভারতবর্ষে ঠগীদের দমনের ক্ষেত্রে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন উইলিয়াম হেনরি স্লিম্যান যিনি ১৮৩০ এর দশক নাগাদ ভারতবর্ষে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। তাই এই রচনার প্রধান তথ্যসূত্র হিসেবে আমি ব্যবহার করেছি ১৮৩৯ সালে প্রকাশিত স্লিম্যানের History of the Thugs or Phansigars of India গ্রন্থটি। আমি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি একজন ব্রিটিশ প্রশাসক হিসেবে উইলিয়াম হেনরি স্লিম্যান ঠগীদের সম্পর্কে কী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করছেন। এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ঠগীরা কেন অন্যান্য অপরাধী গোষ্ঠীদের থেকে আলাদা। এ প্রসঙ্গে যাওয়ার জন্য আমরা ঠগীদের অপরাধ পদ্ধতি বা মোডাস অপারেন্ডি, তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস, এবং সর্বোপরি নারীদের ওপর তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব।

স্লিম্যান সাহেবের লেখা থেকে জানা যায় ভারতবর্ষে প্রথম ঠগীদের গ্রেপ্তার করা হয় ১৮০৭ সালে, চিত্তর এবং আর্কট অঞ্চলের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয় যারা লুঠের মাল নিয়ে ফেরত আসছিল। তারপর থেকেই কোম্পানির সামনে এই অপরাধীদের নৃশংসতা এবং চরিত্র প্রকাশ পায়। যদিও এই গ্রেপ্তারিতে স্লিম্যান যুক্ত ছিলেন না। তবে এই গ্রেফতারিগুলির মাধ্যমেই ঠগীদের সম্পর্কিত অনেক তথ্য ব্রিটিশ কর্তা-ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছেছিল। তবে এই সময়ও সম্ভবত ইউরোপীয়রা ঠগীদের একটি পৃথক অপরাধী সম্প্রদায় হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি। স্লিম্যান সাহেবের লেখা থেকে আরও জানা যাচ্ছে এই ফাঁসিগাররা বা ঠগীরা দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে বসতি স্থাপন করেছিল। প্রথমে তারা বসতি স্থাপন করে মহীশূর এবং কর্ণাটকের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে। এখানকার দুর্গম প্রাকৃতিক পরিবেশ পাহাড় এবং জঙ্গলগুলি তাদেরকে স্বাভাবিক সুরক্ষা প্রদান করেছিল। এবং দক্ষিণাত্যে ঠগীরা পলিগার বা স্থানীয় সামন্ত প্রভুদের সুরক্ষা লাভ করেছিল। এরা তাদের নিয়ন্ত্রণ করত এবং সুরক্ষা প্রদান করত এবং বিনিময়ে এদের লুণ্ঠিত সম্পদের একটি অংশ এই সমস্ত প্রভুরা লাভ করত। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে ঠগীরা একটি সামাজিক এবং রাজনৈতিক সুরক্ষা লাভ করতে শুরু করেছিল। ঠগীরা এই সমস্ত প্রভুদের অধীনে একটি পরিবারের মধ্যে বসবাস করত এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গেও শান্তিপূর্ণ সুসম্পর্ক বজায় রাখত, এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একটি পেশার সঙ্গে যুক্ত থাকত যা অনেক সময়তে চাষবাস সংক্রান্ত হতো। যার ফলে এদের আলাদাভাবে চিহ্নিত করা বেশ কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়াতো। তবে এইসব অঞ্চলগুলিতে কোম্পানির ক্ষমতা সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রভুদের ক্ষমতাও হ্রাস পায়। ঠগীরাও নিজেদের পদ্ধতি পরিবর্তন করতে শুরু করে এবং এই সময় থেকে নিজেরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা শুরু করে। যার ফলে তারা সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেই ভাবেই তাদের অভিযান পরিচালনা করতে থাকে। অনেক ঠগীদলই ছিল যারা যাযাবর প্রকৃতির, আবার অনেক ঠগীরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে নিজেদের স্থায়ী বসতি স্থাপন করে। তবে এই ঠগীদের অস্তিত্ব সম্পর্কিত জ্ঞান প্রশাসনিক স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ১৮৩৬ সালে উইলিয়াম হেনরি স্লিম্যান ঠগীদের সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা কে একত্রিত করে রামাসীনা (Ramaseeana) বলে একটি বই প্রকাশ করেন, আর এরপর থেকেই ঠগীরা ইউরোপ তথা ভারতীয় সমাজে পরিচিতি লাভ করছে। ঠগীদের জনপ্রিয়তাতে ভূমিকা ছিল সাহিত্যেরও। ঠগীদের উপাত্ত করে প্রথম সাহিত্য রচনা করছেন ফিলিপ মিডোজ টেলর ১৮৩৯ সালে। তাঁর লেখা উপন্যাসটির নাম কনফেশনস অফ এ ঠগ। এর পর বহু সাহিত্যে ঠগীদের কথা উঠে আসছে। এবং প্রায় প্রত্যেকটি সাহিত্যেই ঠগীদের একটি নৃশংস হত্যাকারী রূপে চিত্রায়িত করা হয়েছে। স্বভাবতই পরবর্তীতে ঠগীরা সিনেমা নির্মাতাদেরও আকৃষ্ট করে এবং ঠগীদের নিয়ে বহু সিনেমা রচনা হয়। ঠগীদের কেন্দ্র করে প্রথম সাদা কালো সিনেমা হল গঙ্গা-দিন (১৮৩৯)। এরপর ১৯৬০ সালে দ্য

স্ট্র্যাংলারস অফ বোম্বে এবং ১৯৮৪ সালে নির্মিত স্টিভেন স্পিলবার্গ এর ইন্ডিয়ানা জোন্স অ্যান্ড দ্য টেম্পল অফ ডুম, ১৯৮৮ সালের দ্য ডিসিভার্স সিনেমাগুলিতে বারবার ঠগীদের প্রসঙ্গ তুলে ধরা হতে থাকে। এই সাহিত্য এবং সিনেমাগুলি ঠগীদেরকে একটি নৃশংস এবং রহস্যময় খুনি সম্প্রদায়ের রূপে সমাজের কাছে দৃঢ়ভাবে চিত্রায়িত করেছে। এমনকি ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকেরাও ব্রিটিশদের দ্বারা ঠগীদমনকে গৌরবান্বিত করেছেন। এই ঐতিহাসিকদের মধ্যে জেমস হিউটন এই ধারণাকে দৃঢ়ভাবে উপস্থাপন করেছেন। তবে মজার বিষয় হল ঠগীদেরকে বেশিরভাগ ঐতিহাসিকই হিন্দু ধর্মের নৃশংস অনুসারী রূপে বর্ণনা করেছেন, এবং এদের আচার অনুষ্ঠানগুলিকে বর্বর হিন্দু অনুষ্ঠান রূপে বর্ণনা করেছেন।[১]

তবে আমার মতে ঠগীদেরকে এতটা সরলরৈখিকভাবে বর্ণনা করা যায় না। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের বিভিন্ন দলিলে উল্লেখ রয়েছে বহু ধরনের অপরাধীদের। এবং এই সমস্ত অপরাধীগণ চিহ্নিত হতো তাদের কার্যপ্রদ্ধতির বা তাদের মোডাস অপারেন্ডির মাধ্যমে। উদাহরণ হিসেবে কয়েক প্রকারের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন ধুতুরিয়া- এরাও ছিল ভ্রাম্যমান খুনির দল। পথিকের ছদ্মবেশে এরাও ভারতবর্ষের রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াতো এবং পথিকদের সঙ্গে ভাব জমাত এবং সুযোগ বুঝে তাদের খাবার বা হুকোর তামাকের সঙ্গে মিশিয়ে দিত ধুতরার বীজ। পথিক প্রাণ হারালে এরা তাদের সর্বস্ব লুট করতো। ধুতুরার বীজ প্রয়োগ করে হত্যা করত বলেই এদের নাম হয়েছিল ধুতুরিয়া। স্লিম্যান এর মতে এদের সংখ্যাও ছিল সহস্র। এরাও ঠগীদের মত নৃশংস এবং ধূর্ত হলেও এরা ছিল ঠগীদের থেকে আলাদা। অনেক সময়তে দেখা গেছে ঠগীদের জনপ্রিয়তার ফলে তাদের নকল করেই অপরাধীরা অপরাধীদের দল গড়ে তুলছে। এমনই এক উদাহরণ হল তুসমাবাজ ঠগ। এরাও ছিল ভ্রাম্যমান খুনি। এদের আবির্ভাব ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে। ক্রেয়াগ নামে কানপুর নিবাসী জনৈক ইংরেজ সৈনিকের হাত ধরে এদের উত্থান। ক্রেয়াগ ছিল স্বাধীন সৈনিক। হঠাৎ তার ইচ্ছে হয় সে ঠগী হবে। তাই যেমন ভাবা তেমন কাজ। তিনি বেশ কিছু শিষ্য জোগাড় করে কাজে নেমে পড়লেন। দেখতে দেখতে এদের দল উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ল। এই ক্রেয়াগ সাহেবের ঘটনাটি থেকে বোঝা যায় ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে শুধুমাত্র যে দেশীয় অপরাধীরা ছিল তা নয়, বরং অনেক সময় দেখা যাচ্ছে তথাকথিত সভ্য ইউরোপীয়রাও ভারতবর্ষের মাটিতে অপরাধ করছে। তুসমাবাজরা দিনে দুপুরে দল বেঁধে দড়ির খেলা দেখায়। একটি দড়ির ফাঁস তৈরি করে বাজি ধরে সেখানে পথিককে দিয়ে কাঠি দেওয়ানো হয়। যদি কাঠি দড়ির ফাঁসে আটকে যায় তাহলে পথিক জিতল। আর যদি ফাঁস কাঠিতে না আটকায় তাহলে পথিক হারলো। এই খেলাই হল তুসমাবাজী। সাহেবরা বলতেন প্রিকিং দি-গাটার। তুসমাবাজরা কখনো ঠকে না, বরং তারা পথিকদেরকে এই খেলায় ভুলিয়ে সর্বস্বান্ত করে। কিন্তু যদি কখনো দেখা যায় পথিক ক্রমাগত জিতে যাচ্ছে, তাহলে তাকে এরা বিষ প্রয়োগে হত্যা করে। এরাও ছিল সংখ্যায় বিপুল। ১৮৪৮ সালে কানপুরে প্রায় ৫০ জনের একটি তুসমাবাজ ঠগী দল ধরা পড়ে। এছাড়াও ছিল ম্যাকফেনসা, ঠ্যাঙারে প্রভৃতি সংঘবদ্ধ অপরাধীদের দল। তবে এরা সঙ্ঘবদ্ধ হলেও ঠগীদের সাথে এদের বেশ কিছু পার্থক্য ছিল। এদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল লুট করা এবং সেই প্রয়োজনে যদি হত্যা করতে হয় তাহলেও তারা পিছপা হত না। কিন্তু সত্যিকারের ঠগী কখনো হত্যা ছাড়া লুট করে না। এছাড়া ঠগীরা পরিচালিত হতো একটি সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে, যেখানে প্রত্যেকটি ঠগী দলে প্রত্যেকটি কাজের জন্য বিশেষজ্ঞ লোক ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রত্যেকটি

[১] *W.H. Sleeman, History of the Thugs or Phansigars of India, Philadelphia: Carey & Hart, 1839, pp. 14-15; Kim A. Wagner, Banditry and the British in Early Nineteenth-century India, New York, Palgrave, 2007, pp. 1-4*

দলে এমন কিছু লোক রাখা হতো যাদের প্রধান দায়িত্বই ছিল মৃতদেহ গুলি কবরস্থ করা। এমনকী এদের নির্দিষ্ট ভাষা পর্যন্ত ছিল, এরা নিজেদের পরবর্তী প্রজন্মকেও এই পেশাতে আসার জন্য রীতিমতো প্রশিক্ষণ দিত। সর্বোপরি ঠগীরা পরিচালিত হতো একটি সুনির্দিষ্ট ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এবং তাদের নিজস্ব বেশ কিছু ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল যা তারা মেনে চলত। যদিও ঠগী দলে বিভিন্ন ধর্মের লোকরাই থাকতো কিন্তু তাও এই নিয়মগুলি সবার জন্যই ছিল সমান।[২]

অন্যান্য অনেক অপরাধীদের মত ঠগীরাও চালিত হতো একটি নির্দিষ্ট কার্যপদ্ধতি বা মোডাস অপারেন্ডি দ্বারা। ঠগী দের চিহ্নিতকরণের মূল বৈশিষ্ট্যই হল তাদের এই বিচিত্র অপরাধ পদ্ধতি বা তাদের মোডাস অপারেন্ডি। ঠগীদের বিরুদ্ধে অভিযানকালে বহু ঠগী ধরা পড়ে এবং তাদের জবানবন্দি থেকেই তাদের কার্য পদ্ধতির কথা জানা যায়। ঠগীদের কার্য পদ্ধতির সবথেকে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এরা কখনোই খুন ছাড়া শুধুমাত্র লুটপাট করে না। তারা তাদের কর্মকাণ্ডের কোনরকম প্রমাণ রাখে না এবং হত্যা করার পর মৃতদেহগুলি কবরস্থ করে। ঠগীদের খুন করার পন্থাটি বড় অদ্ভুত। তারা তাদের শিকারকে গলায় ফাঁস দিয়ে শ্বাস রোধ করে খুন করে এবং এ কাজের জন্য তাদের অস্ত্রটিও বড়ই বিচিত্র। অস্ত্র বলতে মাত্র এক ফালি কাপড় যার মোট দৈর্ঘ্য ছিল ৬০ ইঞ্চি এবং দুভাঁজ করার পর সেটির দৈর্ঘ্য হতো ৩০ ইঞ্চি, এবং ১৮ ইঞ্চি দূরে দেয়া হত একটা শক্ত গিট। এবং গিটের ফাঁস মজবুত করতে সেখানে বেঁধে দেয়া হতো রুপোর মুদ্রা বা সিক্কা। এই কাপড় খন্ডটি হাঁটুর মধ্যে বেঁধে বা কোমরে গুঁজে এরা হেঁটে বেড়াতো মাইলের পর মাইল। এবং এই কাপড় খন্ডটি দেখলে কোনমতেই সন্দেহ হতো না যে এটি মানুষ খুনের কাজে ব্যবহার হতে পারে। এই কাপড় খন্ডটিকে তারা বলতো পেলহুঁ। ঠগীরা কিন্তু হঠাৎ করেই পথিকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো না। বরং তারা পথিকদের সাথে মিশে হয়ে উঠতো তাদের বিশ্বাসভাজন। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে এক স্থান থেকে অন্য স্থান ভ্রমণের জন্য বড় বড় সড়ক ধরেই মানুষ ভ্রমণ করতো। এবং সেই সময়তে তারা নিজেদের সাথে প্রচুর জিনিসপত্র বহন করত। যদি কোন ধনী ব্যক্তি ভ্রমন করতেন তাহলে তিনি নিজের সাথে একটি বিরাট লটবহর এবং তাদের পার্শ্বচরদের একটি বিরাট বড় দল নিয়ে চলাফেরা করতেন। এমন কি অনেক ধনী ব্যাংকারেরাও তাদের সম্পদ গুলি এক শহর থেকে অন্য শহরে পাঠানোর জন্য সড়ক পথই ব্যবহার করত। পথিকেরা রাস্তার ধারের সরাইখানা গুলিতে রাত্রিযাপন করত। যে স্থানে কোন সরাইখানা থাকতো না, সেই স্থানে তারা খোলা আকাশের নিচেও রাত্রি যাপন করত। যারা একটু বিত্তশালী ছিল তারা নিজেদের সাথে তাঁবু বহন করতো এবং তারা গাছের ছায়াতে তাঁবু খাটিয়ে সেখানে বিশ্রাম করত। অনেক সময়ই ছোট ছোট দলগুলি বড় বড় দলগুলোর সাথে সুরক্ষার প্রয়োজনে একত্রিত হয়ে চলাফেরা করতো। এবং ভারতবর্ষের এই পরিবহন পরিস্থিতির সবথেকে বড় সুযোগ নিয়েছিল ঠগীরা। ঠগীরা সাধারণত বছরে এক থেকে দুটি অভিযান করতো। প্রত্যেকটি দলের একজন করে দলনেতা থাকতো যারা ঠগীদের কার্যপ্রণালী স্থির করতো। দলের সদস্যদের মধ্যে কেউ কেউ বাড়িতে থাকতো (হয়তো তাদের কাজ ছিল দলের বাকিদের পরিবারের দেখাশোনা করা) তারা ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সড়ক গুলি দিয়ে চলাফেরা করতো এবং পথিকদের জন্য অপেক্ষা করত। এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পথিকদের অনুসরণ করত। এবং নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য তারা এটি নির্দিষ্ট স্থানে

[২] Sleeman (1839), p.16; শ্রীপান্থ, ঠগী, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৬০, পৃ. ৪৩- ৪৫; অরিন্দম রায়, "ঠগী- এক ভ্রাম্যমাণ খুনে সম্প্রদায় ও তৎকালীন অন্যান্য অপরাধ গোষ্ঠী", ইতিহাস ও সংস্কৃতি, খণ্ড ৪, ভাগ ৩, ২০১৮, পৃ. ১৬৫-১৬৬।

মিলিত হতো। ঠগীরা সাধারণত ছদ্মবেশ ধারণ করত এবং বেশিরভাগ সময়ই নিজেদেরকে বণিক বলে পরিচয় দিত। প্রয়োজনে তারা ঘোড়ার পিঠে চেপেও ভ্রমন করতো। এবং মূলত বড় সড়ক কিংবা এমন কোন শহরের কাছে অপেক্ষা করত যেখানে পথিকরা সাধারণত বিশ্রাম নেয় না। তারা সুন্দর আদব-কায়দা এবং কথার জালে পথিক দের থেকে খবর সংগ্রহের চেষ্টা করতো। এরা পথিকদের সাথে অকস্মাৎ দেখা হওয়ার ভান করত এবং তাদের ছলনার মাধ্যমে পথিকদের যাত্রা পথ সম্পর্কে খবর জোগাড় করত এবং কতটা ধন-সম্পত্তি বহন করছে তারও একটা অনুমান তারা করত। সন্দেহে এড়ানোর জন্য তারা কখনো কখনো নিজেদের সাথে ১০ বা ১২ বছরের বাচ্চা রাখতো।[৩]

যখন ঠগীরা তাদের শিকার সম্পর্কে নিশ্চিত হয় তখন, তারা সেই দলটির সঙ্গ নেয়। না হলে সেই দলটিকে অনুসরণ করে। তারা পথিকদেরকে নিরাপত্তার স্বার্থে একত্রে ভ্রমণ করার প্রস্তাব দেয়। কিছুদূর একসাথে চলার পর ঠগীরা একটি সুবিধাজনক স্থান নির্বাচন করে এবং দলের একজন সদস্য হঠাৎ করে হতভাগ্যদের গলায় ফাঁস দেয়। এই হত্যাকাণ্ডে সাধারণত তিনজন থাকে। হত্যার পদ্ধতি হলো একজন ঠগী ফাঁসের কাপড়টির সাহায্যে শিকারের গলায় ফাঁস দেয় এবং অন্য দুজন হাত এবং পা ধরে শিকারকে নিশ্চল করে। এই পরিস্থিতিতে প্রতিরোধের খুব সামান্য সুযোগই অবশিষ্ট থাকে এবং পা ধরে থাকা ব্যক্তিটি হতভাগ্যটির সংবেদনশীল স্থানে লাথি মারতে থাকে। ফাঁস দেওয়ার পদ্ধতিটি যেনো খড় এর আঁটি বাঁধার মতো। হত্যাকাণ্ডটির পদ্ধতিটির ভিন্নতা থাকলেও সাধারণভাবে এটিই প্রচলিত। কিছু জনকে হত্যার স্থলের সামনের দিকে রাখা হতো এবং কিছু জনকে পেছনের দিকে রাখা হতো। এদের উদ্দেশ্য থাকত হত্যার সময় অপ্রত্যাশিতভাবে যদি কেউ এসে পড়ে তাহলে তাদের প্রতিরোধ করা বা যদি কেউ পালানোর চেষ্টা করে তাহলে তাকে আটকানো। ঠগীরা হত্যা করবার জন্য বিশেষ রকমের জায়গা নির্ধারণ করত। সাধারণভাবে তারা খুন করার জন্য এমন একটি স্থান নির্বাচন করে যেটি সাধারণত জনশূন্য, কখনো কখনো একটি শুষ্ক জলপথের ধারে, বিস্তীর্ণ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার রাস্তার মাঝখানে যেখানকার মাটি নরম সেই স্থানকে তার উপযুক্ত বলে মনে করত। ঘুমন্ত ব্যক্তিদের হত্যা করার জন্য এরা বিশেষ পন্থা অবলম্বন করতো। এক্ষেত্রে তারা ঘুমন্ত ব্যক্তিকে সাপ বা অন্য কিছুর ভয় দেখিয়ে ঘুম থেকে তুলে তারপর তাদের ফাঁস দিত। ঘোড়ার পিঠে থাকা যাত্রীদের হত্যা করার জন্য একটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করা হতো- প্রথমে ঘোড়াটির সামনে একজন এবং ঘোড়াটির পিছনে একজন অবস্থান নিত এবং তৃতীয় ব্যক্তি আরোহীকে কে কথায় আচ্ছন্ন করে রাখতো। এবং হঠাৎ করেই তার হাত ধরে আরোহীকে মাটিতে ফেলে দিত এবং চিরাচরিত প্রথা দ্বারা তাকে ফাঁস দেয়া হতো। যদি কোন ব্যক্তি নিজের সাথে অস্ত্র ধারণ করতো তাহলে ঠগীরা তাকে ফাঁস দেয়ার আগে সর্বপ্রথম তার হাত দুটিকে অচল করতো। ঠগীদের সাফল্যের অন্যতম কারণ ছিল তারা তাদের অপরাধের কোন রকমের চিহ্ন ফেলে রাখত না এবং সেই জন্যেই তারা মৃতদেহগুলিকে বিশেষ পদ্ধতিতে কবরস্থ করতো। এজন্য প্রত্যেকটি ঠগী দলেই বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা থাকতো যাদের কাজই ছিল এই মৃতদেহগুলির কবর দেওয়া। এ ক্ষেত্রে ঠগীরা একটি নির্দিষ্ট স্থান নির্বাচন করে সেখানে তিন থেকে চার ফুট গভীর গর্ত করতো। এই গর্তগুলো প্রয়োজন বিশেষে গোলাকার কিংবা চারকোণা দুই প্রকারের হতো। এরপরই গর্তে মৃতদেহ গুলির মুখ নিচের দিকে করে কবর দেয়া হতো। অনেক সময় ছুরি দিয়ে হাত এবং কাঁধের জয়েন্ট গুলিকে বিভক্ত করা হতো। গর্তটি ছোট হলে হাঁটুগুলিও বিচ্ছিন্ন করা হতো এবং পা শরীরের উপর দিকে ফিরিয়ে রাখা হত। মৃতদেহ যেন ফুলে না উঠে তার জন্য পেটটিকেও ফুটো করে দেয়া হতো। যদি কাছাকাছিতে মৃতদেহগুলিকে কবর দেয়ার উপযুক্ত স্থান খুঁজে না পাওয়া যেত তাহলে তারা

[৩] Sleeman (1839), pp. 49-51; শ্রীপান্থ, পৃ. ৫৮-৫৯; রায়, পৃ. ১৬০।

মৃতদেহগুলিকে একটি সুবিধাজনক স্থানে বস্তায় ভরে নিয়ে যেত, যেখানে এটি খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই, অথবা এটি কূপে ফেলা হত; শিকারের সাথে যদি কুকুর থাকে তবে সেটিকেও হত্যা করা হত, কারণ অনেক সময় বিশ্বস্ত পোষ্য মৃতদেহগুলিকে চিহ্নিত করে দেয়। ঠগীরা সবসময় নিজেদের সাথে ছুরি এবং কোদাল রাখতো।[৪]

ঠগীরা তাদের প্রাপ্ত লুট এর সম্পত্তিগুলিকেও যথাযথভাবে ভাগ করত। প্রথমে লুটের মধ্যে যদি কোন ভালো ঘোড়া বা অন্য কোন মূল্যবান বস্তু থাকে তা প্রভু স্থানীয় বা পলিকারদের জন্য তুলে রাখা হতো। লুটের একটি অংশ রাখা হতো ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের জন্য। একটি অংশ দেওয়া হতো দলের মৃত সদস্যদের পরিবারকে। অবশিষ্ট অংশ কয়েকটি অংশে বিভক্ত হতো- নেতার জন্য থাকতো দুটি অংশ, যে সকল ব্যক্তি প্রত্যক্ষ হত্যায় অংশ নিয়েছে এবং যে ব্যক্তি লাশ কেটেছে বা কবর দিয়েছে তারা পেত দেড় অংশ করে করে, এবং দলের প্রত্যেককে পেত এক অংশ করে করে। তবে সব সময় যে ভ্রমণকারীদের কাছ থেকে মূল্যবান কিছু পাওয়া যেত এমন নয় এমনও ঘটনা দেখা গেছে একসাথে ১২-১৩ জনের একটি দলকে হত্যা করার পর বিশেষ কিছুই পায়নি। তবে সে ঘটনা বিরল। ঠগীরা সাধারণত যে স্থানে তারা বিশ্রাম নেবার জন্য থামত সেই স্থানের বাসিন্দাদের হত্যা করা থেকে বিরত থাকত, তাদের লক্ষ্য থাকত এমন অভিযাত্রীর দল যারা নিজেদের গ্রাম বা বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে সফর করছে। এক্ষেত্রে অভিযাত্রীদের বাড়ি ফেরার দিনক্ষণের ঠিক থাকে না তাই তারা যখন দীর্ঘ দিন পর্যন্ত বাড়ি ফেরেনা তখনও তাদের বন্ধুদের মনে তাদের খুন হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি সন্দেহে আসে না এবং যতদিনে তার সন্দেহ হয় ব্যক্তির কোন চিহ্ন এই দুনিয়ায় থাকে না। অনেক সময় দেখা যেত বেশ কিছু কোম্পানির সিপাহী ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়ে আর ফিরে এসে কোম্পানির বাহিনীতে যোগদান করত না। এক্ষেত্রে ধারণা করা হতো তারা হয়তো পালিয়ে গিয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যেত তারা রাস্তাতেই নিখোঁজ হয়ে গেছে এবং পরিবারের কাছে পৌঁছায়নি।

ঠগীরা যখন কোন দলকে শিকারের জন্য চিহ্নিত করত তখন তারা সেই দলের সাথে মিশে যেত এবং সেই দল সম্পর্কে সমস্ত খবর সংগ্রহ করত, যেমন তারা কোথা থেকে আসছে এবং কোন দিকে যাচ্ছে তাদের নিজের বাসস্থান কোথায় ইত্যাদি এবং এইসব খবর তারা ব্যবহার করত নিজেদের প্রয়োজনে। তারা নিশ্চিত করত যে লুটের মালগুলি যেন তাদের বাসস্থান বা তাদের পরিচিত অঞ্চলগুলির আশেপাশে না পৌঁছায়। ভারতবর্ষের প্রায় সব জায়গাতেই পেশাগতভাবে অর্থবাহক রয়েছে, যারা সমাজের নিচুশ্রেণীর হলেও স্বর্ণ রত্ন-জহরত এবং বিপুল পরিমাণ অর্থ দূরবর্তী স্থানে পরিবহন করে নিয়ে যায়। এরা প্রায়শই বিনা প্রহরী এবং বিনা অস্ত্রে যাতায়াত করত, তাদের বিশ্বস্ততা এবং বিচক্ষণতা নির্ভর করত তাদের ভিক্ষুক চেহারার উপর। সাধারণত এই শ্রেণীর লোকেরাই বোম্বে, সুরাটের বণিকদের স্বর্ণ এবং স্বর্ণ রত্ন-জহরত বহন করে নিয়ে যেত খান্দেশ, মালওয়া, ইন্দোর, এবং রাজপুতানা অঞ্চলে। ঠগীদের লক্ষ্য থাকতো এই ধরনের অর্থবাহকেরা এবং পিওনেরা। এছাড়াও তারা ধনী বণিক বা ব্যবসায়ীদের বড় দলগুলিকে আক্রমণ করতো। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি ঘটনার কথা বলা যায়– ১৮২৬ সালে চৌপাড়ায় তপতী নদীর ধারে ১৪ জন কে হত্যা করা হয় এবং প্রায় ২৫ হাজার টাকা লুঠ করা হয়। ১৮২৭ সালে খান্দেশ অঞ্চলের মালাগাউতে সাত জনকে হত্যা করা হয় এবং প্রায় ২২ হাজার টাকা লুঠ করা হয়। ১৮২৮ সালে খান্দেশ অঞ্চলের ধোরকোটে তিন জনকে হত্যা করা হয় এবং প্রায় ১২ হাজার টাকা লুঠ করা হয়। ১৮২৯ সালে নর্মদা নদী সংলগ্ন বুরবাহঘাট অঞ্চলে একসাথে ন'জনকে হত্যা

[৪] Sleeman (1839), pp. 19-24.

করা হয় এবং প্রায় ৪০ টাকা লুট করা হয়। অন্যদিকে ১৮২৯ সালে খান্দেশের ধরি অঞ্চলে ছয় জনকে হত্যা করে ৮২ হাজার টাকা লুঠ করা হয়। এই কর্মকাণ্ড গুলি সবই ছিল ঠগীদের, পরবর্তীকালে এদের গ্রেপ্তারের মাধ্যমে যা প্রমাণিত হয়। কিন্তু এই ঘটনাগুলি এবং এই বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রমাণ করে ঠগী কার্যকৌশলতার কথা। সম্ভবত ঔপনিবেশিক ভারতে আর কোন অপরাধী গোষ্ঠী ঠগীদের মতন কার্যকৌশলতার প্রমাণ রাখতে পারেনি।[৫]

ঠগীরা এতটাই সঙ্ঘবদ্ধ ছিল যে তারা নিজেদের মধ্যে সাংকেতিক ভাষায় কথা বলতো। এই সাংকেতিক ভাষার নাম হল রামসি। এই ভাষার প্রায় সমস্ত ক্রিয়াপদ গুলি ভারতীয় ভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে। তবে অঞ্চল ভেদে এই ভাষার সামান্য পার্থক্য হলেও প্রায় সকল ঠগী এই ভাষা বুঝতে এবং বলতে পারতো। অবস্থা অনুযায়ী দলপতিরা এই ভাষার সাহায্যেই বাক্য গঠন করে আদেশ দিতেন। যেমন ঝিরনী শব্দটির অর্থ হল ফাঁসি দেওয়ার চূড়ান্ত আদেশ। এর সাথে অন্য কোন শব্দ জুড়ে দলপতিরা বাক্য গঠন করে আদেশ দিতেন। যাতে শিকারের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ না জন্মায়। হেনরি স্লিম্যান এই রামসি ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন গ্রেপ্তার হওয়া বিভিন্ন ঠগীদের মাধ্যমে। তিনি এ ভাষার বেশ কিছু শব্দ ভান্ডার তৈরি করেছিলেন। উদাহরণ হিসেবে এ ভাষার কয়েকটি নমুনা এবং তার শব্দার্থ তুলে ধরা হলো-

১. আউলা / বোরা- ঠগী।

২.বিট্ট বা কুজ- ঠগী নয় ।

৩. আউলে খান, সালাম, আউলে ভাই, রাম রাম / আউলে সাহেব সালাম – সাম্মুখের দল ঠগী কিনা জানতে বলা হত, সাংকেতিক সম্বোধন বাক্য।

৪. জমাদার- ঠগী দলের দলপতি।

৫. চিসা- পয়সাওয়ালা শিকার।

৬. সোথা- যারা শিকারের সাথে বন্ধুত্ব করে এবং তাদের বিশ্বাস অর্জন করে।

৭. চান্দুরা- সোথাকে সাহায্য এবং শিকারের মনোরঞ্জন করে।

৮. লুগহা- কবর নির্মাণের দায়িত্বে।

৯. ভুকোত বা ভুরতোত- গলায় ফাঁস দেবার দায়িত্বে থাকা রুমাল ধারি যে ঠগী ।

১০. চামোচি বা চুমিয়া- শিকারের পা ধরে রাখবে।

১১. চুমোসিয়া বা সামসিয়া- শিকারের হাত আটকে রাখবে।

১২. বিয়াল বা বিল- হত্যাস্থান।

১৩. বেলহা বা বিলহো- যারা হত্যার স্থান নির্বাচনের দায়িত্বে থাকে।

১৪. ভোজারা- মৃতদেহ কবরে নিয়ে যাবে।

১৫. কুত্তরী মঞ্চ লেও- কবর প্রস্তুত করার নির্দেশ।

১৬. তামাকু লাও - হত্যার আদেশ। অবস্থা অনুযায়ী দলপতিরা এই আদেশ নানা রকম ভাবে দিতেন যেমন।

১৭. ধাগা লে আনা- যাত্রীদের সমন্ধে খোঁজ-খবর নিয়ে আসার নির্দেশ।

১৮. ঝিরনি- শ্বাসেরাধ করার নির্দেশ বা চূড়ান্ত নির্দেশ।

---

[৫] Sleeman (1839), pp .25, 41-42, 52-63, 77।

১৯. মাহি বা কাস্সি বা খুসসি- মন্ত্রপূত কোদাল। (আয়তনে ছোট, লম্বায় ছয় থেকে আট ইঞ্চি, ওজন ২ থেকে ৩ কিলো)।

২০. গুঙ্গা রাম- বিপদ, সাবধান।

২১. বাজিত খান- অর্থাৎ, কাজ শেষ (ভুকোত এর ঘোষণা)।

২২. তিলহাই- খবর সংগ্রহকারী গুপ্তচর।

২৩. লুগহা- কবর খুড়বার লোক।

২৪. কুরওয়া- চৌকো কবর ।

২৫. গাব্বা- গোলাকার কবর।

২৬. নাসার- নিরাপদ, টিক্কুর- বিপদ সংকুল ।

২৭. মাউলি- ঠগী পরিবারের জন্য টাকা বহনকারী।[৬]

স্লিম্যান সাহেব সারা ভারতবর্ষেই ঠগীদের ছড়িয়ে থাকার কথা বলেছেন। তবে তিনি এও বলেছেন অঞ্চল ভেদে ঠগীদের নানা রকম পার্থক্য ছিল তবে সে পার্থক্যগুলি খুব বেশি মৌলিক ছিল না। তবে তার মতে দাক্ষিণাত্যের অঞ্চলগুলিতে ঠগীদের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বেশি ছিল। তবে তার কারণ হয়তো এখানকার পরিবেশ এবং রাজনৈতিক অবস্থা তাদের জন্য অনুকূল ছিল। দাক্ষিণাত্যের ঠগীরা যে মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ ছিল তা সাহিব খান নামে এক ঠগী নিজের জবানবন্দিতে স্লিম্যান কে জানায়। তবে এরা যে উত্তর ভারতেও যথেষ্ট পরিমাণে সক্রিয় ছিল সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। স্লিম্যান সাহেব উত্তর ভারতের ঠগীদের মূলত তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন- প্রথমটি মূলত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে গঠিত এবং এরা দেশীয় জমিদারদের সুরক্ষা প্রাপ্ত, যেমন হুরা সিং, দিয়া রাম। দ্বিতীয় ধরনটি হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে গড়ে উঠেছিল, যারা বেশিরভাগই লোদেহ (lodeh) গোষ্ঠীর ছিল। এরা ইটাওয়ার পূর্ব অংশে এবং কানপুরের পার্শ্ববর্তী জেলায় প্রচুর সংখ্যায় বসবাস করত। এরা চাষবাসের সাথে জড়িত থাকার কারণে অনেকটাই সন্দেহ এড়াতে পেরেছিল। তৃতীয় শ্রেণিটি সংখ্যার বিচারে পূর্বোক্ত শ্রেণীগুলির থেকে বৃহত্তর এবং দেশের একটি বৃহত্তর অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত। এটি সমস্ত বর্ণ নিয়ে গঠিত। সিন্দাউস এবং পুরহারা পরগনা এবং মারাঠা অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে এদের আধিক্য লক্ষ্য করা যেত। ঠগ শব্দটি ভারতের দক্ষিণে অজানা নয়, তবে ফাঁসিগারদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, বরং এরা একশ্রেণীর প্রতারক, যারা প্রায়শই মুক্তা এবং প্রবাল বিক্রেতা হিসাবে উপস্থিত হতো এবং সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন রকম ভাবে প্রতারণা করত। ঠগীদের এই কার্যকলাপ বংশানুক্রমিক হয়ে উঠেছিল এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। স্লিম্যান যখন ঠগীদের এই ব্যাপারে প্রশ্ন করেছেন এটা কি তাদের ব্যবসা, উত্তরে তারা বিস্মিতভাবে জানায় যে তারা নিজেদেরকে বাঘ বা অন্যান্য হিংস্র জন্তুর সাথে তুলনা করে, যারা নিজেদের বেঁচে থাকার জন্য অন্য পশুকে হত্যা করে। তারা মনে করে হত্যা করার অধিকার প্রকৃতি তাদেরকে দিয়েছে। তাদের এই অসংবেদনশীলতা এবং অবজ্ঞা তাদের নৃশংসতাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়। তবে ঠগীরা অন্যান্য অপরাধী গোষ্ঠীদের মত কিন্তু এই পেশাতে আসেনি। বরং ছোটবেলা থেকেই তাদের অভ্যাসের মধ্যে একজন ঠগীর অভ্যাসগুলি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের মতে একজন ঠগী কখনোই একটি বাঘকে হত্যা করে না এবং তারা বিশ্বাস করত বাঘটিও তাদের হত্যা করবে না যদি না সে নিজের দলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে থাকে।[৭]

---

[৬] Sleeman (1839), pp. 75-76; শ্রীপান্থ, পৃ. ৬৩, ৮৯ -৯৩; রায়, পৃ. ১৬৪-১৬৫।

[৭] Sleeman (1839), pp. 39, 43-44, 124.

তবে ঠগীদের এই কার্যকলাপে কিভাবে তারা নিজেদের সন্তানদেরকে নিয়ে আসতো সে কাহিনী জানা যায় স্লিম্যান এর দ্বারা ফিরাঙ্গিয়া এবং সাহিব খান এর জবানবন্দী থেকে। প্রথমেই তাদের থেকে জানা যায় যে তাদের সন্তানেরাও তাদেরই নৃশংস পেশার সাথে পরিচিত ছিল এবং সাহিব খানের থেকে জানা যায় এই পেশায় নিযুক্ত হওয়ার জন্য কোন বয়সের বিধি-নিষেধ ছিল না। সাধারণভাবে পিতার হাত ধরেই সন্তানেরা এই পেশাতে প্রবেশ করত। এরা রীতিমতন দীক্ষা দান করে নতুনদের এই পেশাতে আগমন ঘটাতো। এর সূচনা হতো অভিযানে যাত্রার সময় সন্তানদের সাথে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে। প্রথম যাত্রায় তারা কিছুই জানতে পারত না। শুধুমাত্র এখানেই তাদের দেশ-বিদেশের ঘুরে বেড়ানোর নেশাটি ধরিয়ে দেওয়া হতো। দ্বিতীয় বার যাত্রায় তারা জানতে পারতো তাদের পিতা খুন বা লুটের সাথে যুক্ত। তবে প্রত্যক্ষভাবে খুন দেখার জন্য তাদের অপেক্ষা করতে হতো তাদের তৃতীয়বারের যাত্রার জন্য। তবে এই সময় গুলি নতুন ছেলেটিকে লুটের ভাগ দেওয়া হতো। তবে অবশ্যই তা নানা রকম উপহার এর মাধ্যমে। এবং এরপরই একজন অভিজ্ঞ ঠগীকে তাদের গুরু বানিয়ে নব্যাগত এর দায়িত্ব দেয়া হতো। এই অভিজ্ঞ ঠগীর তত্ত্বাবধানে নব্যাগতরা ঠগী কার্যকলাপের সাথে পরিচয় লাভ করত। ঠগী দলপতি একটি নির্দিষ্ট দিন দেখে তার দীক্ষার ব্যবস্থা করত। এই দীক্ষা ব্যবসায় বেশ কিছু আচার অনুষ্ঠান পালিত হতো এবং এরপর হতো শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠান। যদি ছেলেটি মুসলিম হয় তাহলে সে কোরান ছুঁয়ে কিম্বা হিন্দু হলে গঙ্গাজল ছুঁয়ে সে শপথ নিত। এরপর তার মুখে তুলে দেয়া হতো এক টুকরো মন্ত্রপুত গুড়। ঠগীদের বিশ্বাস এই গুড় যে একবার মুখে দেয় সে আজন্মকাল ঠগী হয়ে থেকে যায়। এরপর বাকি থেকে যায় শুধুমাত্র হাতে-কলমের শিক্ষা। তবে তার জন্য একটু অপেক্ষা করে খোঁজা হতো সহজ শিকার। কারণ নতুনদের হাতে প্রথমে বলিষ্ঠ পথিককে তুলে দেয়া যায় না। তাদের প্রথম হত্যার জন্য গুরু তাদের জন্য একটি বয়স্ক শিকারকে চিহ্নিত করত। এবং দলপতির আদেশে অবশেষে শিক্ষানবিশ ঝিরনি দান করত। সফলভাবে ঝিরনি দান করামাত্র তাকে একজন পরিপূর্ণ ঠগী হিসেবে ধরে নেয়া হতো। তবে শিক্ষাদানের ব্যাপারটি যে এতটা সোজা ছিল তা কিন্তু নয়। সে ঘটনা শোনা যায় স্লিম্যান এর জেরা কালীন শাহিব খান, ফিরঙ্গিয়া নামক ঠগীদের জবানবন্দীতে। তারা জানায় শিক্ষা চলাকালীন সময়ে খারহোরা নামক একটি ছেলে হত্যার দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে মারা যায়।

যদিও স্লিম্যান সাহেব ঠগীদের এই শিক্ষাদানের ব্যাপারটিকে তাদের একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার ভারতবর্ষ প্রাচীনকাল থেকেই গুরু শিষ্য পরম্পরার ধারক এবং বাহক এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন পেশার অনুসারীরাও তাদের পেশার খুঁটিনাটি বিষয়গুলি শিক্ষাদানের মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে স্থানান্তরিত করে। স্বভাবতই ভারতবর্ষের অপরাধীরাও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে ঠগীরা তাদের ঠগীবৃত্তিকে যে শুধুমাত্র একটি পেশা মনে করত তা নয় বরং এটি ছিল তাদের জীবন ধারণের পদ্ধতি। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তারা তাদের এই পরম্পরার নানা খুঁটিনাটি বিষয় তাদের সন্তানদের বা পরবর্ত প্রজন্মের কাছে স্থানান্তরিত করতে চেয়েছিল। এই ঠগীদের মধ্যে এই শিক্ষাদানের ঘটনা অত্যন্ত স্বাভাবিক। আবার এর থেকে এদের জটিল পরিবার তন্ত্রের বিষয়টিও সামনে আসে যেখানে এরা বংশপরম্পরায় অপরাধী হয়েও পিতা পুত্রের মত স্বাভাবিক সম্পর্ক গুলি বজায় রাখতে পেরেছিল। এ বিষয়ে শাহিব খান জানিয়েছিল তাদের পুত্ররাও অন্যান্য দের মত তাদের পিতাদের সম্মান দেয়।[৮]

ঠগীদের এই জটিল পরিবারতন্ত্রের অন্যতম উল্লেখযোগ্য অংশটি ছিল তাদের পরিবারের নারীরা। ঠগী পরিবারের নারীরা অন্য ঠগীগোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ করত। তবে ঠগীদের এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যেও যে বিভাজন

[৮] Sleeman (1839), pp. 127-128; শ্রী। পান্থ, পৃ. ৬৬- ৭২

ছিল একথা পষ্ট। বেশ কিছু ঠগীগোষ্ঠী নিজেদের অন্য ঠগীগুলির থেকে বেশি কুলীন বলে মনে করত। তার কারণ সম্ভবত এই দলগুলি কয়েক প্রজন্ম ধরে ঠগীবৃত্তির সাথে জড়িত। শাহিব খানের জেরা থেকে জানা যায় এই কুলীন দলগুলি নিম্ন শ্রেণীর দলগুলির সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করত না। আবার এরা অনেক সময় সাধারণ পরিবারের নারীদেরও বিবাহ করত। শাহিব খান স্লিম্যানকে জানায় যে দক্ষিণাঞ্চলের ঠগীরা নিজেদের কর্মকাণ্ড তাদের স্ত্রীদের থেকে গোপন রাখত। অর্থাৎ অঞ্চলভেদে ঠগী স্ত্রীদের ভূমিকার পরিবর্তন হতো। ঠগী পরিবারের নারীদের প্রধান ভূমিকা ছিল যখন পুরুষেরা বাইরে থাকবে তখন পরিবারের প্রতিপালন। তবে থেভেনট নামক এক বিদেশি পর্যটক এক ধরনের ঠগী বা ফাঁসিগার দের কথা বলেছেন যারা তাদের কাজে টোপ হিসাবে সুন্দরী মহিলাদের ব্যবহার করত। দক্ষিণ ভারতে এর কথাও তিনি বলছেন। এই জায়গাতেই একটি পরস্পর বিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়। কারণ শাহিব খান দাক্ষিণাত্যেরই ঠগী। সম্ভবত যে সকল ঠগীরা তাদের স্ত্রীদেরকে তাদের কর্মকাণ্ডের কথা জানাতো সেই সকল স্ত্রীরা হয়তো এই কর্মকাণ্ডগুলিতে অনেক সময় যুক্ত থাকতো। আবার অনেক ঠগী স্থায়ী ভাবে বসবাস করত না, বরং যাযাবর ভাবে জীবন কাটাতো। তাই এই অবস্থায় সেই সকল ঠগী পরিবারের নারীরা নিশ্চয়ই ঠগীদের এই নৃশংস কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত ছিল এবং প্রয়োজনে তাদের সাহায্য করত। তবে ঠগীরা হত্যার প্রক্রিয়ায় বা তাদের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যকলাপে নারীদের কতটা ব্যবহার করত বা যুক্ত থাকার অনুমতি দিত সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। শাহিব খান জানায় তাদের সত্যিটা পরিবারের মহিলাদের কাছে প্রকাশ পেলে কিছু জন বাদে সবাই তাদের সঙ্গ দেবে। এবং তাকে যখন প্রশ্ন করা হয় তাদের পরিবারের স্ত্রীরা কি তাদের ভয় পায় তখন সে জানায় হয়তো তারা ভয় পায় কিন্তু ঠগীদের মধ্যে নারী হত্যার ঘটনা খুবই কম। তবে ঠগীদের নারী হত্যার প্রসঙ্গে আলোচনা করতে হলে তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান বা বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন, কারণ নারী হত্যার প্রসঙ্গ ঠগীদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। রুক্মিণী নামে একজন ঠগী দলপতির স্ত্রী ধরা পড়েন, যিনি তাঁর স্বামীকে সাহায্য করতেন। জেরা থেকে জানা যায় রুক্মিনীর বাবা-মাকেও ঠগী হত্যা করে এবং ছোটবেলা থেকেই সে ঠগী দলেই বড় হয়েছে। পরবর্তীতে ঠগী সর্দারের সাথেই তার বিয়ে হয়। অনেক সময় দেখা যেত ঠগী সর্দারদের একাধিক স্ত্রী থাকতো।[৯]

ঠগী সম্প্রদায়ের সবথেকে চমকপ্রদ জিনিসটি ছিল তাদের ধর্মীয় আচার-আচরণ। স্লিম্যান ঠগীদের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন ঠগীরাও অন্যান্য ভারতীয় অপরাধী শ্রেণীর মতন কুসংস্কার আচ্ছন্ন এবং অন্ধবিশ্বাসী ছিল। যা হয়তো তৎকালীন সময়ের ভারতবর্ষকে কুসংস্কারের দেশ বলা ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গিরি প্রতিফলন। তবে ধর্মীয় আচার-আচরণের দিক থেকে ঠগীদের যে একটি আলাদা পরিচিতি গড়ে উঠেছিল একথা অবশ্যই সত্য। এবংতাদের এই ধর্মীয় বিশ্বাস কে ঠগীদের মূল মেরুদন্ড বললে ভুল হয় না। ঠগী সম্প্রদায়ের ধর্মের সবথেকে চিত্তাকর্ষক দিকটি হল ঠগী সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাবে মুসলিম হলেও এদের আচার অনুষ্ঠানগুলি প্রায় সবগুলি হিন্দু ধর্মীয়। ঠগীদের মধ্যে মূর্তি পূজার প্রচলন ছিল। তারা মূলত ভবানী বা কালী এবং বেশ কিছু আঞ্চলিক দেবীদের পূজো করতো। ঠগীদের ধর্মীয় বিশ্বাসের বীজ নিহিত রয়েছে একটি পৌরাণিক উপাখ্যানের মধ্যে। তাই সমস্ত ঠগীরা এই পৌরাণিক গল্পটিকেই তাদের উদ্ভব কাহিনী বলে দাবি করে।

সেই পৌরাণিক উপাখ্যান অনুসারে পৃথিবীতে একসময় রক্তবীজ নামক এক মহাদানবের আবির্ভাব ঘটে এবং যার থেকে মানবকুলকে উদ্ধার করার জন্য দেবী ভবানী বা দেবী কালী তার সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন।

---

[৯] Sleeman (1839), pp. 45- 46, 122-126; শ্রীপান্থ, পৃ. ৬০-৬১।

তবে এই রক্তবীজের বিশেষ ক্ষমতা ছিল যে তার পড়া প্রতিটি রক্ত বিন্দুর থেকে আবার নতুন এক দানব জন্ম নিত। হিন্দু ধর্মের মূল কাহিনীটি মোটামুটি ভাবে একই রকম হলেও ঠগীদের প্রচলিত কাহিনীটিতে সামান্য রদবদল রয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে যে সেই দানবের সাথে যুদ্ধ করার সময় দেবী যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েন, তখন তাঁর শরীর থেকে নিঃসৃত দুই ফোঁটা ঘাম থেকে জন্ম নেয় দুইজন মানুষ। তখন দেবী নিজের পরিহিত বস্ত্র থেকে দুই খন্ড কাপড় সেই দুজনকে দেন ফাঁস হিসাবে এবং আদেশ দেন সেই অসুরদেরকে ফাঁস দেবার। দানবের দমন করার পর দেবী সেই দুজন মানুষকে আশীর্বাদস্বরূপ সেই ফাঁস টি দেন এবং যারা ধর্মের বিপক্ষে তাদের নিধন করার আদেশ দেন। প্রথমদিকে হত্যার পর দেহের দায়িত্ব ছিল দেবীর, তবে কিছু ঠগী দেবীর শর্ত ভঙ্গ করে হত্যা করার পর পেছনে ফিরে তাকায়। যার ফলে দেবী কুপিত হন। তবে অনেক অনুনয়-বিনয়ের পরে দেবী পুনরায় প্রসন্ন হয়ে নিজের একখানা দাঁত থেকে তাদের একটি কোদাল ও বুকের পাঁজর থেকে ছুরি দেন এবং বলেন এই ছুরির দ্বারা তোমরা মৃতদেহকে খন্ড করে এবং কোদাল দিয়ে কবর খুঁড়ে তার মধ্যে মৃতদেহকে রাখবে। এই কাহিনীটিকেই ঠগীরা বংশ পরম্পরায় তাদের উদ্ভব কাহিনী বলে মনে করে থাকে। দেবীর প্রতি অগাধ বিশ্বাস থেকেই তারা নারী হত্যা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করে। তবে বেশ কিছু ঘটনার কথা আলোচনা করলে বোঝা যায়, অনেক ক্ষেত্রেই তারা নারী হত্যা করতে পিছপা হত না। নারী হত্যার একটি উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৮০০ সাল নাগাদ মোহাম্মদ রউস নামে একজন ঠগী দ্বারা কৃষ্ণা রায়ের স্ত্রীসহ তার ভাগ্নে, একজন ব্রাহ্মণ রাঁধুনি, দুই মহিলা পরিচারিকা, দুইজন পিয়ন, দুইজন কুলি, এবং চারটি ঘোড়ার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার ঘটনা রয়েছে। প্রসঙ্গত শাহিব খানের কথা থেকে উঠে এসেছে যে যদি কখনো বেশ ধনী মহিলা পাওয়া যায় তখন তাকে হত্যা করার জন্য লুটের কিছু অংশ বেশি দেওয়ার লোভ দেখিয়ে দলের একজনকেই সেই ভার দেয়া হয়, যেন নারী হত্যার সেই পাপ সেই ব্যক্তি একাই ভোগ করে।[১০]

ঠগীদের কাছে দুটি প্রধান তীর্থক্ষেত্র ছিল কলকাতার কালীঘাটের কালী মন্দির এবং বিন্ধ্যাচলের ভবানী মন্দির। তবে তারা তাদের আচার অনুষ্ঠানগুলি পালন করতো নিজ নিজ স্থানে এবং অত্যন্ত গোপনে। স্লিম্যানের গ্রেপ্তার করা বহু ঠগীর জবানবন্দী থেকে এইসব আচার অনুষ্ঠানগুলির কথা উঠে আসে। অঞ্চল ভেদে এবং গোষ্ঠী ভেদে ঠগীদের আচার অনুষ্ঠান গুলিতে নানারকম পরিবর্তন থাকলেও মৌলিক কাঠামোটি ছিল অপরিবর্তিত। ঠগীদের মধ্যে যে মূর্তিপূজার বিশেষ চল ছিল একথা সর্বজনবিদিত, হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে। ঠগীরা তাদের যাবতীয় অনুষ্ঠানগুলি যাত্রা শুরুর আগে পালন করতো এবং এ বিষয়ে তারা বিভিন্ন রকমের লক্ষণ চিহ্ন কে বিশেষ গুরুত্ব দিত, এগুলিকে দৈব ইঙ্গিত হিসেবে মনে করতো। এদের অনুষ্ঠানগুলিতে ছিল নানা রকমের আইন কানুন এবং বিধি-নিষেধ। ঠগীরা নিজেদের ব্যবহৃত সরঞ্জাম গুলিকেও দৈব গুণসম্পন্ন বলে মনে করত এবং এর মধ্যে সবথেকে রহস্যময় এবং গুরুত্বপূর্ণ ছিল কোদাল। ঠগীদের উৎপত্তি বিষয়ক অলৌকিক কাহিনীতে বলা হয়েছে দেবীর দাঁত থেকেই থেকেই তাদের কোদালের উৎপত্তি, তাই এটি তাদের কাছে বিশেষ পবিত্র ও অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন। তাই যাত্রা শুরু করার প্রথমেই ঠগী দলের সরদার একটি ভালো দিন দেখে নিজে গিয়ে কামারের কাছ থেকে এই কোদাল গড়িয়ে আনেন। কোদালটি আকৃতিতে হতো ছোট আকারের। লম্বায় মাত্র ছয় থেকে আট ইঞ্চি এবং ওজন দুই থেকে ৩ কিলো। কোদালটি কোন হাতল থাকতো না প্রত্যেকবার দরকারের সময় এতে নতুন কাঠের হাতল লাগিয়ে ব্যবহার করা হতো। এরপর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কোদালটিকে মন্ত্রপুত করা হয় এবং অনুষ্ঠান শেষে সেই কোদালটি একজন বিশ্বস্ত ঠগীর

[১০] Sleeman (1839), pp. 26, p29-30; Colonel James L. Sleeman, *Thug or A Million Murders*; London: Sampson Low, Marston & Co.Ltd, 1918; pp., 21-22, 12; শ্রীপান্থ, পৃ. ১০৫-১০৭।

হাতে তুলে দেয়া হয় এবং এই যাত্রার সময় কোদালের দায়িত্ব থাকবে সেই দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠগীর উপরেই। প্রত্যেকটি যাত্রার সময়ে এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটে। ঠগীদের কাছে এই কোদালের মাহাত্ম্য অপরিসীম। এই কোদালকে ঘিরে ঠগীদের অনেক বিশ্বাস। ঠগীদের দল কোন দিকে যাত্রা করবে এ বিষয়ে জানার জন্য ঠগীরা কোদালের উপর নির্ভর করত। এ বিষয়ে জানার জন্য তারা প্রথমে যাত্রার জন্য একটি দিক নির্ধারণ করে কোদালের মাথাটি সেই দিকে রেখে তাকে সারারাত মাটি চাপা দিয়ে রাখা হতো। পরের দিন ভোরবেলায় যদি দেখা যেত কোদালের মাথাটি যেই দিকে পুঁতে রাখা হয়েছিল যদি সেই দিকেই থাকে তাহলে তারা ঠিক দিকেই যাত্রা করছে কিন্তু যদি মাথাটি দিক পরিবর্তন করতো তবে তারাও দিক পরিবর্তন করতো। কোদাল কে জুড়ে ঠগীদের আরেকটি সব থেকে বড় বিশ্বাস ছিল যে মন্ত্রপূত কোদাল তার বাহকের আবাহনে নিজে নিজেই কুয়ো থেকে উঠে আসে এবং এ বিষয়ে স্লিম্যানকে শাহিব খানও একই কথা জানিয়েছে। তবে শাহিব খানকে যখন প্রশ্ন করা হয় যে সে কখনো কোদালের অলৌকিক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করেছে কিনা তখন সে জানায় যে সে জীবনে মাত্র একবার এরকম ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে যখন সে আর্কট এর একটি দলের সাথে অভিযানে ছিল। তবে সে নিজের চোখে কোদালটিকে উঠে আসতে দেখেনি। তবে অলৌকিকতাকে বাদ দিল ঠগীরা যে কোদাল হাতে যথেষ্ট পটু ছিল সে কথা প্রমাণ করে তাদের নিপুন কৌশলের দ্বারা মৃতদেহগুলিকে কবরস্থ করার মধ্য দিয়ে। এবং তারা এই কাজে এতটাই দক্ষ ছিল যে তাদের দ্বারা কবরীকৃত স্থান গুলি দেখে কোনোমতেই সন্দেহ হতো না যে সেই স্থানে মৃতদেহ প্রথা রয়েছে এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা বলা যায়। যেখানে ফিরিঙ্গিয়া নামক একজন ঠগী স্লিম্যানকে মৃতদেহ কবর দেয়া আছে বলে এমন স্থান দেখায় যে স্থান ছিল খোদ স্লিম্যানের তাঁবুর নিচে এবং এই তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য যখন সেই স্থানগুলি খনন করা হয় তখন সেইখান থেকে সত্যি সত্যি মৃতদেহ পাওয়া যায়।[১১]

কোদালের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার পর একটি দিন নির্বাচন করা হতো যাত্রার দিন হিসেবে। যাত্রা শুরু করার আগে আরেকটি অনুষ্ঠান পালন করা হতো। অনুষ্ঠানে দেবীর একটি প্রতিকৃতি রাখা হতো এবং তাঁর সামনে রাখা হতো কোন সরীসৃপের প্রতিকৃতি। ঠগীদের যাবতীয় সরঞ্জামও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতো। এই অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল বলিদান। বলি প্রদত্ত জীবটি সাধারণভাবে হতো ভেড়া কিংবা ছাগল। অনুষ্ঠানে বলিদান এর পর জীবটির কাটা মাথার উপর একটি জ্বলন্ত প্রদীপ রেখে দেবীর সামনে অর্পণ করা হত এবং যদি দেখা যেত মাথাটির কান বা নাক দিয়ে কোন রকমের তরল নির্গত হচ্ছে তাহলে ধরে নিতে হবে যাত্রায় দেবীর সম্মতি রয়েছে। কিন্তু যদি তা না হয় তাহলে বুঝতে হবে দেবী সম্মতি দিচ্ছেন না। এরপর সেই বলির প্রসাদ সকল ঠগীরাই গ্রহণ করত। এই অনুষ্ঠানের ১৫ থেকে ২০ দিন পর দল যাত্রা শুরু করতো। ঠগীরা বিভিন্ন রকমের নিয়ম মেনে চলত এবং তারা শুভ এবং অশুভ কে বিশেষ গুরুত্ব দিত। বেশকিছু ঘটনা কে ঠগীরা তাদের জন্য শুভ লক্ষণ বলে মনে করতো, আবার বেশ কিছু ঘটনাকে মনে করতো অশুভ বলে। তারা মনে করত এই সকল ঘটনাগুলির দ্বারাই দেবীর সাবধান বাণী বা আদেশ তাদের কাছে পৌঁছে থাকে। উদাহরণস্বরূপ ঠগীদের জন্য বেশ কিছু শুভ লক্ষণ হলো একটি টিকটিকি কিচিরমিচির করছে, যাত্রার সূচনাপথের বাম পাশে একটি জীবন্ত গাছে একটি কাক শব্দ করছে, একটি বাঘের উপস্থিতি। এছাড়া বেশ কিছু লক্ষণের বিভিন্ন রকমের মানে ঠগীদের কাছে ছিল যেমন পথের ডান দিকে একটি তিতির শব্দ করছে যা থেকে বোঝায় যে খুব ভাল লুঠ পাওয়া যাবে। অনুরূপভাবে অশুভ লক্ষণ গুলি হল একটি খরগোশ বা একটি সাপ রাস্তা

[১১] Sleeman (1839), pp. 97, 120- 122; Sleeman (1918), pp. 8-9; শ্রীপান্থ, পৃ. ৬১-৬৩।

অতিক্রম করছে। একটি কাক পাথর বা মরা গাছে বসে আওয়াজ করছে। একটি পেঁচা চিৎকার করছে। একাকী শিয়ালের আওয়াজ। ঠগীরা তাদের জন্য চরম অশুভ লক্ষণ বলে মনে করতো তাদের বলি দেওয়া প্রাণীটির মাথা কুকুরে টেনে নিয়ে নিয়ে যাওয়াকে। এছাড়াও ঠগীরা আরো বহু ধরনের নিয়ম মেনে চলার চেষ্টা করত। তবে সব ক্ষেত্রেই যে যথাযথভাবে নিয়মগুলি পালন করা হতো এমন কোন পাথুরে প্রমাণ নেই। ঠগীরা বিশ্বাস করতো যে এই সমস্ত নিয়মগুলি তারা ঠিক ঠিক ভাবে পালন করলে দেবী স্বয়ং তাদের রক্ষা করবেন। এমনকি স্লিম্যান এর কাছে নাসির নামে একজন ঠগী নিজের সাথে আরো ১৭ জন ঠগীর ধরা পড়ার জন্য একটি খরগোশের রাস্তা পারাপার করার ঘটনাকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যাওয়াকে দায়ী করেছেন। হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষেই প্রায় সমস্ত ঠগীরাই এই সকল নিয়মগুলিকে যথাসম্ভব মেনে চলার চেষ্টা করত, যদিও অঞ্চল এবং গোষ্ঠীভেদে এই সকল নিয়ম গুলির সামান্য কিছু তারতম্য অবশ্যই ছিল। তবে ঠগীদের এই বিচিত্র ধর্মীয় বিশ্বাসে কখনোই কোন ঠগীর নিজস্ব ধর্মীয় পরিচয় বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি, বরং সেখানে দেখা গেছে অদ্ভুত এক বোঝাপড়া। স্লিম্যান যখন এক মুসলিম ঠগীকে প্রশ্ন করে তার কোরান-কে মেনে চলার ব্যাপারে তখন সে অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে জানায় যে তারা যথাযথভাবে কোরান-কে অনুসরণ করে। কিন্তু যখন সেই একই ঠগীকে প্রশ্ন করা হয় যে ঠগীদের আরাধ্য দেবী ভবানী বা কালীর কথা কি কোরানেও লেখা আছে তখন সে জানায় হিন্দুস্তানের মুসলিম ঠগীরা মনে করে, মুহাম্মদের কন্যা এবং আলির স্ত্রী ফাতিমা এবং ভবানী এক এবং ফাতিমাই ঠগীদের কিংবদন্তির দেবী। ঠগীরা মনে করত তারা শুধুমাত্র দেবীর আদেশে খুন করে, তাই এই খুনগুলোর জন্য না তাদের কোন রকমের অনুশোচনা হয় না তারা পাপের ভাগীদার হয়। একজন মুসলিম ঠগীকে যখন প্রশ্ন করা হয় হিন্দুদের দেবী ভবানীর কি তোমাদের স্বর্গের উপর কোন কর্তৃত্ব আছে, তখন সে জানায় যে সেই দেবীর তাদের স্বর্গের উপর কোন কর্তৃত্ব না থাকলেও সেই দেবী মৃত্যুর আগেই এই পৃথিবীতে তাদের ভাগ্যকে পরিচালিত করেন। তাই মৃত্যুর পর তারা অবশ্যই স্বর্গের অধিকারী হন এবং তার জন্য ধর্ম কখনোই বাধা হয় না।[১২]

ভারতবর্ষের ইতিহাসে ঠগী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যের একমাত্র আকর ধরা হয় হেনরি স্লিম্যানের রচনাগুলিকে। আবার স্লিম্যানও তাঁর রচনাগুলির মূল তথ্যের ভিত্তি হিসেবে তুলে ধরেছেন প্রশাসনের হাতে গ্রেপ্তার হওয়া বিভিন্ন ঠগীদের জবানবন্দিকে। তাই ঠগী সংক্রান্ত যাবতীয় রচনার ক্ষেত্রে মূল সমস্যা এটিই। স্লিম্যান যেহেতু একজন ব্রিটিশ রাজকর্মচারী ছিলেন এবং তিনি নিজেও ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা চালিত ছিলেন তাই তাঁর রচনাগুলিকে কখনোই নিরপেক্ষ বলে ধরে নেয়া যায় না। গ্রেপ্তার হওয়া ঠগীরাও যে স্লিম্যানকে সমস্ত সত্যি কথা বলবে এটাও ধরে নেয়া যায় না। তাই স্বাভাবিকভাবেই স্লিম্যানের ঠগী সম্পর্কিত যাবতীয় কাজকে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। অনেক ঐতিহাসিকই ঠগীদেরকে একটি পৃথক অপরাধী সম্প্রদায় হিসেবে মানতে রাজি হননি। বরং ঠগীদেরকে একটি কাল্পনিক ও ঔপনিবেশিক স্বার্থান্বেষী উপস্থাপন বলে তুলে ধরেন। তাদের মূল বক্তব্য ছিলো স্লিম্যানের রহস্যময় অপরাধী শ্রেণি হিসাবে ঠগীদের আবিষ্কার এবং নিজেই সেই রহস্য উন্মোচন করে ঠগী দমন আর কিছুই নয় বরং ঔপনিবেশিক শাসনের বৈধতা ও প্রয়োজনীয়তা প্রমাণের একটি দিক মাত্র। প্রসঙ্গত, তাদের প্রধান যুক্তি ছিল স্লিম্যানের দলিল গুলির প্রামাণ্যতা।[১৩]

---

[১২] Sleeman (1839), pp. 26-28, 124- 126; শ্রীপান্থ, পৃ. ৭২ -৭৫।

[১৩] তপোবন ভট্টাচার্য, "উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক ভারতে ঠগীর উপস্থাপন: একটি কাল্পনিক অপরাধিত্ব নির্মাণের রূপরেখা", *ইতিহাস এষণা ৫*, ২০২৪, পৃ ১৬৫, ১৬৭ -১৭০।

তবে গোটা ঠগী বিষয়টিকেই কাল্পনিক বলে ব্যাখ্যা করা যুক্তিযুক্ত নয়। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষ যে অস্থির এবং টালমাটাল রাজনৈতিক পরিস্থিতির শিকার ছিল এ কথা প্রায় সর্বজনবিদিত। এই পরিস্থিতির সুযোগে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল নানা অপরাধী এবং অপরাধ। তাদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন ব্যতিক্রমী পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন এই অপরাধগুলি সংগঠিত করার জন্য। তাছাড়া ভারতবর্ষের বিপুল অস্ত্রাগারে নানা ভয়ংকর অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও ঠগীরা কেন ফাঁসকেই তাদের অস্ত্র নির্বাচন করেছিল এবং ঠগীদের বিচিত্র কার্যপদ্ধতি (মোডাস অপারেন্ডি) বা নৃশংসতাই কেন তাদেরকে অন্যান্য অপরাধীদের থেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করছিল, তাও ভাবার বিষয়। ঠগীরা তাদের অপরাধের বৈধতা প্রদান করার চেষ্টা করেছিল তাদের ধর্মীয় ব্যাখ্যা এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানগুলির মাধ্যমে। এই প্রবন্ধের কাজে ব্যবহৃত আমার প্রধান উপাদান গুলি দেখলে এবং স্লিম্যানের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করলে বলতে হয় স্লিম্যান নিজেও ঠগীদেরকে একটি সংঘবদ্ধ অপরাধী শ্রেণী হিসেবেই দেখতে বা দেখাতে চেয়েছেন। তবে স্লিম্যান ঠগীদের দ্বারা ঘটিত অপরাধের যে বিবরণ দিয়েছেন তা দেখলে মনে হয় ঠগীরা সত্যিই এটি সঙ্ঘবদ্ধ শ্রেণীর রূপেই বিচরণ করতো। সেক্ষেত্রে আমাদের মাথায় রাখা দরকার ঔপনিবেশিক উপাদানের কতটুকু গ্রহণযোগ্য এবং স্লিম্যানের রচনায় কতটা অতিরঞ্জন রয়েছে। তবে ফাঁস ব্যবহারকারী এক শ্রেণীর অপরাধী যে ভারতবর্ষে ছিল একথা বিদেশি পর্যটক থেভেনটও বলেছেন। সর্বশেষে, এই গবেষণা প্রমাণ করে যে, ঠগীদের সম্পর্কে স্লিম্যানের গ্রন্থের বিশ্লেষণ কেবলমাত্র একটি ঐতিহাসিক নথির দৃষ্টিতে নয়, বরং ঔপনিবেশিক ক্ষমতার কৌশল ও নীতির অন্তর্দৃষ্টির দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। ঠগীদের অপরাধের প্রকৃতি ও তাদের সমাজে প্রভাব বোঝার জন্য স্লিম্যানের কাজ একটি মূল্যবান উৎস হলেও, এটিকে একটি রাজনৈতিক ও সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্য পূরণের অংশ হিসেবে দেখা উচিত।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. Wagner, Kim A. Thuggee: Banditry and the British in Early Nineteenth-Century India. New York: Palgrave Macmillan, 2007।

২. সিংহ, রাধিকা। এ ডেসপটিজম অফ ল': ক্রাইম অ্যান্ড জাস্টিস ইন আর্লি কলোনিয়াল ইন্ডিয়া। দিল্লি: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৮।

৩. Sleeman, W. H. History of the Thugs or Phansigars of India. Philadelphia: Carey & Hart, 1839।

৪. Sleeman, James L. Thug or A Million Murders. London: Sampson Low, 1918।

৫. শ্রীপান্থ। ঠগী। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৬০।

৬. ভট্টাচার্য, তপোবন। "উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক ভারতে ঠগীর উপস্থাপন।" ইতিহাস এষণা, ২০২৪।

৭. রায়, অরিন্দম। "ঠগী: এক ভ্রাম্যমাণ খুনে সম্প্রদায়।" ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ২০১৮।

৮. নন্দী, সুগত। "গুন্ডাস অফ ক্যালকাটা।" Routledge Handbook, ২০২০।

৯. বাসু, সৌমিত্র। দ্য হিস্ট্রি অফ ফরেনসিক সায়েন্স ইন ইন্ডিয়া। নিউ ইয়র্ক: রাউটলেজ, ২০২১।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1680-1687
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.389

অজ্ঞানতা থেকে আত্মপরিচয়: দলিত ও নারী চেতনার জাগরণে ফুলের দর্শন

সংযুক্তা পান, *গবেষক, দর্শন বিভাগ, সিকম স্কিলস বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 25.03.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This article focuses on the life philosophy and social reform struggles of the nineteenth-century reformers Jyotirao Phule and Savitribai Phule. The central inquiry of the paper is to examine how so-called religious and social "ignorance" binds marginalized communities within chains of oppression, and how education and rational consciousness enable them to attain a strong sense of "identity." Drawing upon Jyotirao Phule's seminal work Gulamgiri and Savitribai Phule's Kavya Phule, the article analyzes the awakening of Dalit and women's consciousness.

The study demonstrates that Phule's philosophy was not limited to mere literacy; rather, it represented a structural revolution that built a powerful resistance against the parallel systems of oppression—caste hierarchy and patriarchy. Finally, the paper discusses the continuing relevance of this philosophy in the context of contemporary social and gender inequalities in India.

Keywords: Jyotirao Phule, Savitribai Phule, Dalit Consciousness, Education and Social Reform, Caste and Gender Inequality

উনিশ শতকের ভারতীয় নবজাগরণের ইতিহাসে জ্যোতিরাও ফুলে এবং সাবিত্রীবাই ফুলের আবির্ভাব কোনো সাধারণ সমাজসংস্কার ছিল না, বরং তা ছিল একটি বৈপ্লবিক কাঠামোগত পরিবর্তনের সূচনা। সচরাচর যে নবজাগরণকে আমরা উচ্চবর্ণের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা হিসেবে দেখি, ফুলের দর্শন ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি ভূমিঘেঁষা, প্রান্তিক এবং সরাসরি শোষণের মূলে আঘাতকারী। এই দর্শনের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল 'অজ্ঞানতা' বা 'অবিদ্যা'র বিলোপ ঘটিয়ে এক বলিষ্ঠ 'আত্মপরিচয়' (Identity) গড়ে তোলা। জ্যোতিরাও ফুলে গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে, ভারতের বর্ণাশ্রম প্রথা এবং পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা কেবল গায়ের জোরে নয়, বরং নিচুতলার মানুষের মনে এক গভীর হীনম্মন্যতা ও অজ্ঞানতা গেঁথে দিয়ে টিকে আছে। ফুলে জানতেন যে, এই দাসত্বের জিঞ্জির ভাঙার একমাত্র চাবিকাঠি হলো জ্ঞান। তাঁর বিখ্যাত শ্লোকে তিনি স্পষ্ট করেছিলেন যে:

> "বিদ্যার বিনা মতি গেল, মতির বিনা নীতি গেল, নীতির বিনা গতি গেল, গতির বিনা বিত্ত গেল এবং অবশেষে বিত্তহীন শূদ্ররা ধ্বংস হলো"[১]

অর্থাৎ, অজ্ঞানতাই দারিদ্র্য এবং সামাজিক শোষণের মূল উৎস। ফুলে দম্পতি অনুভব করেছিলেন যে, নারী ও দলিতদের বঞ্চনার ধরণ আলাদা হলেও শোষণের উৎস একই—পিতৃতন্ত্র এবং বর্ণপ্রথা। ১৮৪৮ সালে পুণের ভিড়ে ওয়াডায় যখন তাঁরা ভারতের প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন সাবিত্রীবাই ফুলে কেবল জ্যোতিরাওয়ের স্ত্রী ছিলেন না, তিনি ছিলেন এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বিপ্লবের মূর্ত প্রতীক। প্রথম ভারতীয় মহিলা শিক্ষিকা হিসেবে যখন তিনি স্কুলে যেতেন, তখন মানুষ তাঁর ওপর কাদা এবং গোবর ছুড়ে মারত। সাবিত্রীবাই অপমানের প্রতিবাদ জানাতেন অটল ধৈর্যের মাধ্যমে। তিনি রক্ষণশীলদের উদ্দেশ্যে বলতেন:

> "আমার ভাইরা, তোমরা যে ঢিল বা গোবর আমার ওপর ছুড়ছো, তা আমার কাছে ফুলের মতো। কারণ এটি আমাকে আমার বোনের সেবায় আরও উৎসাহিত করছে"[২]

সাবিত্রীবাই তাঁর 'কাব্য ফুলে' কাব্যে লিখেছিলেন:

> "জেগে ওঠো, শিক্ষিত হও এবং নিজের শৃঙ্খল ভেঙে ফেলো"[৩]

তাঁর এই আহ্বান ছিল সরাসরি আত্মপরিচয় খোঁজার লড়াই।

১৮৪৮ সালে এক উচ্চবর্ণের বন্ধুর বিয়েতে যোগ দিতে গিয়ে জ্যোতিরাও চরম জাতপাতভিত্তিক অপমানের শিকার হন, যা তাঁর দর্শনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। এই ব্যক্তিগত লাঞ্ছনা তাঁকে শিখিয়েছিল যে, বর্ণবাদ আসলে মানুষের আত্মসম্মানকে ধ্বংস করার এক হাতিয়ার। এই ক্ষোভ থেকেই তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'গুলামগিরি' (১৮৭৩) রচনা করেন। এই গ্রন্থে ফুলে অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে দেখিয়েছেন যে, কোনো জনগোষ্ঠীকে দীর্ঘকাল পরাধীন রাখতে হলে তার ইতিহাস বিকৃত করা এবং তাকে শিক্ষা থেকে দূরে রাখা অপরিহার্য। এই গ্রন্থে ফুলে অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে দেখিয়েছেন যে, কোনো জনগোষ্ঠীকে দাসত্বের জিঞ্জিরে আবদ্ধ রাখার প্রধান অস্ত্র হলো তাকে ইতিহাস ও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখা। তিনি 'গুলামগিরি' বা দাসত্ব বলতে কেবল শারীরিক পরাধীনতাকে বোঝাননি, বরং এটি ছিল এক ধরনের মানসিক ও ধর্মীয় দাসত্ব, যা উচ্চবর্ণের চাতুরীর মাধ্যমে নিম্নবর্ণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফুলে এই গ্রন্থে আর্য আক্রমণ তত্ত্বের এক নিজস্ব বয়ান তৈরি করেন, যেখানে তিনি দাবি করেন যে এদেশের আদিবাসীরাই (শূদ্র ও অতি-শূদ্র) ছিলেন প্রকৃত বীর এবং ভূস্বামী, যাঁদের চাতুর্য ও বলপ্রয়োগের মাধ্যমে আর্যরা দাসে পরিণত করেছিল। তিনি ধর্মের নামে প্রচলিত পুরাণ ও অবতারতত্ত্বকে যুক্তির তুলাদণ্ড দিয়ে বিচার করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন যে, এগুলি আসলে উচ্চবর্ণের আধিপত্য বজায় রাখার কাল্পনিক আখ্যান মাত্র।

'গুলামগিরি' গ্রন্থে ফুলে যে অবিদ্যা বা অজ্ঞানতার কথা বলেছিলেন, তা ছিল দলিত ও নারীদের সামাজিক পতনের মূল কারণ। তিনি এক অমর শ্লোকে ব্যক্ত করেছিলেন যে, বিদ্যার অভাবে বুদ্ধি নাশ হয়, বুদ্ধির অভাবে নীতি হারায়, আর নীতির অভাবে উন্নয়ন থমকে যায়—যার ফলে শূদ্ররা সম্পদহীন ও ধ্বংসের মুখে পড়ে। তাঁর মতে, শিক্ষা কেবল অক্ষরজ্ঞান নয়, বরং তা হলো নিজের শিকড় চেনার এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী মিথ্যে সংস্কার বা 'False Consciousness' ভেঙে ফেলার প্রধান হাতিয়ার, এসম্পর্কে সাবিত্রীবাই-এর উক্তি আজও প্রাসঙ্গিক তা হল:

> "যাও শিক্ষা নাও, স্বনির্ভর হও, অলস হয়ে থেকো না, জ্ঞান ও তথ্য সংগ্রহ করো"[৪]

ফুলে দম্পতি অনুভব করেছিলেন যে, লিঙ্গবৈষম্য এবং বর্ণবৈষম্য একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ, তাই তাঁদের লড়াই ছিল এই দুই শোষণের বিরুদ্ধেই সমান্তরাল। এই লড়াইয়ের প্রথম এবং প্রধান ব্যবহারিক ধাপ ছিল শিক্ষা। ১৮৪৮ সালে পুণের ভিড়ে ওয়াডায় যখন জ্যোতিরাও ও সাবিত্রীবাই ভারতের প্রথম বালিকা

বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন তা কেবল একটি পাঠশালা ছিল না, বরং তা ছিল প্রচলিত রক্ষণশীল সমাজের মূলে এক প্রচণ্ড আঘাত। সাবিত্রীবাই ফুলে নিজে শিক্ষিত হয়ে প্রথম ভারতীয় মহিলা শিক্ষিকা হিসেবে যখন স্কুলে যেতেন, তখন তাঁকে অবর্ণনীয় লাঞ্ছনা সহ্য করতে হতো। রক্ষণশীলরা তাঁর গায়ে কাদা এবং গোবর ছুড়ে মারত, কিন্তু তিনি দমে যাননি। এই ধৈর্য এবং লড়াই ছিল ফুলের দর্শনের বাস্তব প্রতিফলন। তাঁরা জানতেন যে, নারী শিক্ষিত না হলে একটি সমাজ কখনোই অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্তি পেতে পারে না। ফুলের মতে, সমাজে শোষণ ও বৈষম্যের মূল কারণ হলো অজ্ঞানতা। তিনি মনে করতেন যে, শিক্ষা মানুষকে তার প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে সচেতন করে এবং তাকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী করে তোলে।তিনি বলেন:

> "Without education, wisdom was lost; without wisdom, morals were lost; without morals, development was lost; without development, wealth was lost; without wealth, the Shudras were ruined."[৫]

এই উক্তির মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন যে শিক্ষা কেবল ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য নয়, বরং সামাজিক মুক্তির জন্য অপরিহার্য।

এই সামাজিক রূপান্তরের লক্ষ্যে ১৮৭৩ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'সত্যশোধক সমাজ', যার মূল মন্ত্র ছিল সত্যের অনুসন্ধান এবং মানুষের ওপর মানুষের শোষণ বন্ধ করা। এই সমাজের প্রধান নিয়মাবলী ছিল বৈপ্লবিক; এখানে ঘোষণা করা হয়েছিল যে সমস্ত মানুষই এক স্রষ্টার সন্তান এবং জন্মগতভাবে সবাই সমান। সত্যশোধক সমাজের অনুসারীদের জন্য কোনো মধ্যস্থতাকারী বা পুরোহিতের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা হয়েছিল। সত্যশোধক সমাজের সদস্যদের প্রতি তাঁর প্রধান আহ্বান ছিল:

> "নিজের ওপর বিশ্বাস রাখো এবং অন্যের গোলামি করো না"[৬]

ফুলের দর্শনে প্রার্থনা ছিল সরাসরি স্রষ্টার সাথে সংযোগ, যেখানে কোনো জটিল ধর্মীয় আচার বা উপঢৌকনের স্থান ছিল না। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, প্রতিটি মানুষ স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা রাখে এবং ধর্ম কখনোই যুক্তিহীন হওয়া উচিত নয়। এই সংগঠনের মাধ্যমে তিনি শিখিয়েছিলেন যে, ঈশ্বর ও মানুষের মাঝে কোনো মধ্যস্থতাকারী বা পুরোহিতের প্রয়োজন নেই। এই ঘোষণাটি ছিল দলিতদের জন্য এক বিরাট মনস্তাত্ত্বিক মুক্তি, কারণ এটি তাদের হীনম্মন্যতা দূর করে নিজেদের অস্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শিখিয়েছিল। ফুলের দর্শনে কেবল তাত্ত্বিক আলোচনা ছিল না, ছিল প্রত্যক্ষ সক্রিয়তা। তৎকালীন সময়ে দলিতদের জন্য সর্বসাধারণের জলাশয় ব্যবহার যখন নিষিদ্ধ ছিল, তখন জ্যোতিরাও নিজের বাড়ির জলের ট্যাঙ্ক দলিতদের জন্য খুলে দিয়ে জাতপাতের অস্পৃশ্যতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। ফুলে ভারতীয় বর্ণব্যবস্থাকে একটি কৃত্রিম ও শোষণমূলক কাঠামো হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাঁর গ্রন্থ '*Gulamgiri*' (১৮৭৩)-তে তিনি ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন এবং দলিতদের ঐতিহাসিক শোষণের চিত্র তুলে ধরেন। তিনি লিখেছেন:

> "The Brahmins have made the Shudras and Atishudras ignorant and have thus enslaved them."[৭]

এই বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি দেখান যে শোষণের মূল অস্ত্র ছিল জ্ঞানের উপর একচেটিয়া অধিকার।

তেমনিভাবে বিধবা বিবাহ এবং কুমারী মাতাদের আশ্রয় প্রদানের মাধ্যমে সাবিত্রীবাই প্রমাণ করেছিলেন যে, নারীর আত্মপরিচয় কেবল তার শরীরের পবিত্রতা বা সামাজিক স্বীকৃতির ওপর নির্ভর করে না, বরং তার মানবিক মর্যাদাই আসল। তাঁরা অনাথ শিশুদের আশ্রয় দিয়েছেন, মহামারীর সময় আর্তের সেবা করেছেন এবং নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন এক সমমর্যাদার সমাজ গড়তে। 'গুলামগিরি' গ্রন্থে ফুলে যে

তাত্ত্বিক ভিত্তি দিয়েছিলেন, বাবাসাহেব আম্বেদকর যখন পরবর্তীকালে দলিত আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন, তিনি তাকেই পূর্ণতা দান করেন এবং জ্যোতিরাও ফুলেকে তাঁর প্রধান অনুপ্রেরণা ও 'গুরু' হিসেবে স্বীকার করেন। বর্তমান সময়েও যখন আমরা সামাজিক বৈষম্য, নারী নির্যাতন বা প্রান্তিক মানুষের বঞ্চনার কথা বলি, তখন ফুলের দর্শন আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, প্রকৃত মুক্তি কেবল অর্থনৈতিক নয়, বরং তা বৌদ্ধিক এবং আধ্যাত্মিক। অজ্ঞানতার শৃঙ্খল ভেঙে যখন একজন দলিত বা একজন নারী নিজের অধিকার এবং মেধা সম্পর্কে সচেতন হন, তখনই সার্থক হয় ফুলের জীবনদর্শন। এই ধারাবাহিক সংগ্রামের পথ ধরেই আজকের দলিত সাহিত্য এবং নারীবাদী আন্দোলনগুলি তাদের শক্তির উৎস খুঁজে পায়। ফুলে এবং তাঁর স্ত্রী সাবিত্রীবাই ফুলে ভারতের প্রথম নারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ছিল নারীদের জন্য শিক্ষার দরজা খুলে দেওয়ার একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।সাবিত্রীবাই বলেন:

"Awake, arise and educate, smash traditions—liberate!"[৮]

এই আহ্বান নারী চেতনার জাগরণের একটি শক্তিশালী বার্তা বহন করে।

পরিশেষে বলা যায়, সাবিত্রীবাইয়ের লেখা পঙক্তিগুলো আজও প্রাসঙ্গিক:

"যাও শিক্ষা নাও, স্বনির্ভর হও, অলস হয়ে থেকো না, জ্ঞান ও তথ্য সংগ্রহ করো"[৯]

জ্যোতিবা ফুলের জীবনদর্শন ও তাঁর অমর সৃষ্টি 'শেতকরয়াচা আসুদ' বা 'কৃষকের চাবুক' আধুনিক ভারতের সমাজ সংস্কার ও কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। জ্যোতিবা ফুলে বিশ্বাস করতেন যে, একটি জাতির প্রকৃত উন্নতি তখনই সম্ভব যখন সেই জাতির কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষ শিক্ষিত এবং সচেতন হবে। ১৮৮১ সালে রচিত এই গ্রন্থে তিনি অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তৎকালীন সমাজব্যবস্থা, ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র এবং ধর্মীয় শোষণের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। ফুলের দর্শনের মূলে ছিল শিক্ষার অভাবজনিত অন্ধকার। তিনি মনে করতেন, বিদ্যার অভাবেই কৃষকদের বুদ্ধি বা 'মতি' নষ্ট হয়েছে, যার ফলে তারা সঠিক নীতি নির্ধারণ করতে পারছে না এবং পরিশেষে আর্থিক ও মানসিকভাবে পঙ্গু হয়ে পড়ছে। এই গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে অশিক্ষিত কৃষকদের নানা ধর্মীয় আচার ও কুসংস্কারের ভয় দেখিয়ে পুরোহিত শ্রেণি তাদের অর্থ শোষণ করে। আবার অন্যদিকে, সরকারি দপ্তরে উচ্চবর্ণের আধিপত্য থাকায় কৃষকরা আইনি ও প্রশাসনিকভাবেও পদে পদে লাঞ্ছিত হয়। বন বিভাগ থেকে শুরু করে রাজস্ব বিভাগ পর্যন্ত সর্বত্র কৃষকদের ওপর যে জুলুম চলত, ফুলে তাকে সরাসরি আক্রমণ করেছেন।

ফুলের অর্থনৈতিক দর্শনে কৃষকের মুক্তি কেবল খাজনা কমানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন কৃষির আমূল আধুনিকীকরণ। তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে, সরকারকে বিশাল বিশাল বাঁধ ও সেচ খাল নির্মাণ করতে হবে যাতে কৃষকদের কেবল বৃষ্টির ওপর নির্ভর করে থাকতে না হয়। তিনি গবাদি পশুর প্রজনন উন্নত করা এবং কৃষকদের আধুনিক কৃষি সরঞ্জাম ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি শেখানোর ওপর জোর দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, কৃষক যদি নিজের উৎপাদিত ফসলের সঠিক মূল্য না পায় এবং মহাজনদের চড়া সুদের ঋণের জালে বন্দি থাকে, তবে দেশের উন্নতি অসম্ভব। এই গ্রন্থে তিনি তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্বকেও সতর্ক করেছিলেন যে, সাধারণ কৃষকের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন না করে কেবল তাত্ত্বিক স্বাধীনতার কথা বলা অর্থহীন।

জ্যোতিবা ফুলের সার্বিক জীবনদর্শন ছিল মূলত 'সত্যের অনুসন্ধান'। তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'সত্যশোধক সমাজ'-এর মাধ্যমে প্রচার করেছিলেন যে, মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই এবং ঈশ্বর বা 'নির্মিক'-এর কাছে পৌঁছাতে কোনো পুরোহিতের মধ্যস্থতার প্রয়োজন নেই। তাঁর কাছে মানবতাই ছিল শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তিনি নারী শিক্ষার প্রসার এবং অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের যে লড়াই শুরু করেছিলেন, তার প্রতিফলন আমরা

'শেতকরয়াচা আসুদ' গ্রন্থেও দেখতে পাই। তিনি বিশ্বাস করতেন, সমাজ সংস্কার এবং অর্থনৈতিক মুক্তি একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। নারী ও নিম্নবর্ণের মানুষ যদি শিক্ষিত না হয়, তবে তারা কখনোই তাদের অধিকার বুঝে নিতে পারবে না। 'কৃষকের চাবুক' কেবল একটি বই নয়, এটি ছিল শোষিত মানুষের মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়ানোর এক দীপ্ত আহ্বান, যা আজও ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

জ্যোতিবা ফুলের জীবনদর্শনের এক মহত্তম ও পরিণত ফসল হলো তাঁর অমর গ্রন্থ 'সার্বজনিক সত্য ধর্মপুস্তক' (The Book of True Religion for All)। ১৮৯১ সালে তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত এই গ্রন্থটিকে সত্যশোধক আন্দোলনের 'বাইবেল' বা প্রধান পথপ্রদর্শক হিসেবে গণ্য করা হয়। এই গ্রন্থে ফুলে চিরাচরিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মীয় ব্যবস্থার পরিবর্তে এক মানবিক ও বৈজ্ঞানিক জীবনদর্শনের প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ধর্ম কেবল কিছু আচার-অনুষ্ঠানের সমষ্টি নয়, বরং এটি হওয়া উচিত মানুষের কল্যাণের পথ। ফুলের দর্শনে ঈশ্বরকে তিনি 'নির্মিক' বা সৃষ্টিকর্তা হিসেবে সম্বোধন করেছেন। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে, যদি ঈশ্বর আমাদের সকলের পিতা বা মাতা হন, তবে তাঁর সন্তানদের মধ্যে উচ্চবর্ণ বা নিম্নবর্ণের ভেদাভেদ থাকা অসম্ভব। এই গ্রন্থে তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, ঈশ্বর ও মানুষের মাঝে কোনো মধ্যস্থতাকারী বা পুরোহিতের প্রয়োজন নেই; মানুষ সরাসরি তাঁর সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারে।

'সার্বজনিক সত্য ধর্মপুস্তক'-এ ফুলে তেত্রিশটি অধ্যায়ের মাধ্যমে জীবনের বিভিন্ন সামাজিক ও নৈতিক দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর দর্শনের একটি প্রধান স্তম্ভ ছিল নারী ও পুরুষের সমান অধিকার। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, কেন সমাজ পুরুষকে একাধিক বিবাহের অনুমতি দেয় কিন্তু বিধবা নারীদের নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে বাধ্য করে? তাঁর মতে, পরিবারে এবং সমাজে নারী ও পুরুষ উভয়েরই সমান মর্যাদা ও স্বাধীনতা থাকা উচিত। তিনি ধর্মগ্রন্থগুলোর অন্ধ অনুকরণ না করে মানুষের বিবেক ও যুক্তিকে প্রধান্য দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। ফুলে মনে করতেন, যে ধর্ম মানুষকে ঘৃণা করতে শেখায় বা অস্পৃশ্যতার নামে অপমান করে, তা কখনোই 'সত্য ধর্ম' হতে পারে না। তাঁর প্রস্তাবিত 'সত্য ধর্ম' হলো এমন এক ব্যবস্থা যেখানে প্রতিটি মানুষ অন্যকে ভাই বা বন্ধুর মতো দেখবে এবং একে অপরের দুঃখে এগিয়ে আসবে।

এই গ্রন্থের ভাষায় এক গভীর সারল্য ও আন্তরিকতা লক্ষ্য করা যায়। ফুলে এখানে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি চেয়েছিলেন একটি শোষণমুক্ত সমাজ, যেখানে কোনো মানুষ জন্মপরিচয়ের কারণে অবজ্ঞাত হবে না। তাঁর দর্শনে সত্যের অনুসন্ধানই হলো শ্রেষ্ঠ উপাসনা। তিনি সমাজকে সতর্ক করেছিলেন যে, যতক্ষণ না আমরা বর্ণবৈষম্য এবং ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে মুক্ত হচ্ছি, ততক্ষণ আমাদের জাতীয় উন্নতি সম্ভব নয়। 'সার্বজনিক সত্য ধর্মপুস্তক' আসলে কেবল একটি ধর্মীয় বই নয়, এটি একটি সামাজিক বিপ্লবের ইশতেহার। এটি আমাদের শেখায় যে, সত্য কথা বলা, সৎ পথে চলা এবং আর্তের সেবা করাই হলো পরম ধর্ম। আজ দেড়শ বছর পরেও তাঁর এই উদার ও মানবিক দর্শন আমাদের এক সুন্দর ও সমতাভিত্তিক সমাজ গড়ার অনুপ্রেরণা জোগায়।

জ্যোতিবা ফুলে রচিত 'ব্রাহ্মণাঞ্চে কসব' (Priestcraft Exposed) বা 'পুরোহিততন্ত্রের পর্দাফাঁস' ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত একটি অত্যন্ত সাহসী ও বিশ্লেষণাত্মক গ্রন্থ। এই পুস্তিকায় ফুলে তৎকালীন হিন্দু সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে থাকা পুরোহিততন্ত্রের শোষণ ও চাতুর্যের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। তাঁর জীবনদর্শনের অন্যতম প্রধান শত্রু ছিল সেই ব্যবস্থা, যা ধর্মের দোহাই দিয়ে সাধারণ মানুষকে মানসিকভাবে

পরাধীন করে রাখে। এই গ্রন্থে তিনি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ভাষায় দেখিয়েছেন কীভাবে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠানে পুরোহিতরা সাধারণ মানুষের অজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে অর্থ উপার্জনের পথ তৈরি করে নিয়েছে।

ফুলের মতে, পুরোহিততন্ত্র কেবল একটি পেশা নয়, এটি ছিল একটি সুসংগঠিত শোষণের যন্ত্র। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে, ঈশ্বর যদি সবার পিতা হন, তবে তাঁর কাছে প্রার্থনা করার জন্য কোনো নির্দিষ্ট মধ্যস্থতাকারীর প্রয়োজন কেন হবে? 'ব্রাহ্মণাঞ্চে কসব' গ্রন্থে তিনি হিন্দুদের বিভিন্ন সংস্কার যেমন—বিবাহ, শ্রাদ্ধ, গৃহপ্রবেশ এবং ব্রত-পার্বণের উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন কীভাবে সাধারণ মানুষকে নরকের ভয় বা পাপের ভয় দেখিয়ে তিল তিল করে সর্বস্বান্ত করা হয়। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ধর্মের এই বাহ্যিক আড়ম্বর আসলে নিম্নবর্ণের মানুষ এবং নারীদের অবদমিত রাখার এক কৌশল। ফুলে মনে করতেন, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এই মানসিক দাসত্ব থেকে মুক্ত না হবে, ততক্ষণ তাদের প্রকৃত সামাজিক বা রাজনৈতিক মুক্তি সম্ভব নয়।

এই গ্রন্থের দর্শনে 'যুক্তি' এবং 'বিবেক' ছিল প্রধান হাতিয়ার। ফুলে পাঠকদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন প্রশ্ন করতে। তিনি বলেছিলেন, কোনো ধর্মগ্রন্থ যদি মানুষের অবমাননা করে বা কাউকে অস্পৃশ্য বলে ঘোষণা করে, তবে তা কখনোই ঈশ্বরের বাণী হতে পারে না। তিনি পুরোহিতদের তৈরি 'মন্ত্র' এবং 'অনুষ্ঠানের' আড়ালে লুকিয়ে থাকা ব্যবসায়িক স্বার্থকে জনসমক্ষে নিয়ে আসেন। তাঁর মতে, প্রকৃত ধর্ম হলো অন্তরের ভক্তি এবং সৎ কর্ম; এর জন্য কোনো দামি উপাচার বা সংস্কৃত মন্ত্রের প্রয়োজন নেই যা সাধারণ মানুষ বুঝতেই পারে না। তিনি ভাষার এই জটিলতাকেও শোষণের একটি অস্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন।
'ব্রাহ্মণাঞ্চে কসব' কেবল একটি সমালোচনা গ্রন্থ ছিল না, এটি ছিল একটি জাগরণী গান। এই বইয়ের মাধ্যমে ফুলে সাধারণ মানুষকে আত্মমর্যাদা শিখিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন মানুষ যেন নিজের বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে ধর্মের নামে চলা এই প্রহসন বন্ধ করে। তিনি কৃষকদের এবং সাধারণ শ্রমজীবী মানুষকে সচেতন করেছিলেন যেন তারা তাদের কষ্টার্জিত অর্থ এই অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠানে ব্যয় না করে সন্তানদের শিক্ষার পেছনে ব্যয় করে। জ্যোতিবা ফুলের এই গ্রন্থটি ভারতীয় সমাজ সংস্কার আন্দোলনে এক মশাল হিসেবে কাজ করেছিল, যা আজও আমাদের শেখায় যে—অন্ধবিশ্বাসমুক্ত মনই হলো প্রকৃত স্বাধীনতার প্রথম ধাপ।

জ্যোতিবা ফুলে রচিত 'ইশারা' (Warning) ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং দূরদর্শী প্রবন্ধ। এটি কেবল একটি পুস্তিকা নয়, বরং তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্বকে দেওয়া এক অমোঘ সতর্কবার্তা। এই গ্রন্থের মাধ্যমে ফুলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা এবং সাধারণ কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের প্রকৃত মুক্তি নিয়ে তাঁর সুচিন্তিত দর্শন ব্যক্ত করেছেন।

ফুলের জীবনদর্শনের একটি প্রধান দিক ছিল 'অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ'। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, তৎকালীন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠনগুলো মূলত উচ্চবর্ণের শিক্ষিত ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিল। 'ইশারা' গ্রন্থে তিনি অত্যন্ত সাহসের সাথে প্রশ্ন তুলেছিলেন যে, যে আন্দোলনে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক, মালি, ধাঙর এবং অতি-শূদ্রদের কোনো অংশগ্রহণ নেই, সেই আন্দোলন কীভাবে 'জাতীয়' হতে পারে? তিনি সতর্ক করেছিলেন যে, ইংরেজরা ভারত ছেড়ে চলে গেলেও যদি ক্ষমতা কেবল মুষ্টিমেয় উচ্চবর্ণের হাতে কুক্ষিগত থাকে, তবে সাধারণ মানুষের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হবে না। একে তিনি 'ব্রাহ্মণ্যবাদী আধিপত্যের পুনরুত্থান' হিসেবে ভয় পেতেন।

এই গ্রন্থে ফুলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক দর্শনের এক চমৎকার সমন্বয় দেখা যায়। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতার চেয়েও সামাজিক সমতা এবং জাতিভেদ প্রথা বিলোপ করা বেশি জরুরি। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, জাতিভেদ প্রথা বজায় রেখে কোনো জাতি ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না। তিনি উচ্চবর্ণের নেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন যেন তারা আগে নিজেদের ঘর সংস্কার করেন, অস্পৃশ্যতা দূর করেন এবং কৃষকদের অধিকার স্বীকার করেন। ফুলে মনে করতেন, কৃষকের ঘাম ও শ্রমের ওপর দাঁড়িয়ে যারা বিলাসিতা করে, তাদের মুখে দেশপ্রেমের কথা মানায় না।

'ইশারা' বইটিতে ফুলে এক গভীর মানবিক দর্শনের কথা বলেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, প্রকৃত দেশপ্রেম হলো দেশের প্রতিটি মানুষের প্রতি ভালোবাসা। তিনি কৃষকদের দুরবস্থা এবং অশিক্ষার কথা বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন। তাঁর মতে, যতক্ষণ না পর্যন্ত গ্রামের সাধারণ মানুষ শিক্ষিত হচ্ছে এবং নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে, ততক্ষণ যেকোনো রাজনৈতিক আন্দোলন হবে কেবল ওপরতলার মানুষের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার। তিনি চেয়েছিলেন এক এমন সমাজ যেখানে কৃষক কেবল কর দাতা হবে না, বরং হবে দেশের প্রকৃত অংশীদার।

জ্যোতিবা ফুলের 'ইশারা' ছিল এক অন্ধকার সময়ের মশাল। এটি আমাদের শেখায় যে, সাম্য ও ন্যায়বিচার ছাড়া স্বাধীনতা অর্থহীন। আজকের গণতান্ত্রিক ভারতেও ফুলের এই 'ইশারা' বা সতর্কবার্তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক; কারণ এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, উন্নয়নের সুফল যতক্ষণ না সমাজের অন্তিম ব্যক্তির কাছে পৌঁছাচ্ছে, ততক্ষণ জাতির মুক্তি অসম্পূর্ণ।

ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে বর্ণভেদ ও লিঙ্গবৈষম্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল সমাজের একটি বৃহৎ অংশ— দলিত ও নারী সম্প্রদায়। এই অবদমিত মানুষের মুক্তি, আত্মসম্মান ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যে কয়েকজন মহাপুরুষ পথপ্রদর্শকের ভূমিকা নিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে জ্যোতিরাও ফুলে অন্যতম। তাঁর দর্শন ও চিন্তাধারা দলিত ও নারী চেতনার জাগরণে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিল।

প্রথমত, ফুলে উপলব্ধি করেছিলেন যে সমাজের মূল সমস্যা নিহিত আছে অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের মধ্যে। তিনি বিশ্বাস করতেন, শিক্ষা হলো মুক্তির একমাত্র পথ। সেই কারণেই তিনি দলিত ও নারী শিক্ষার প্রসারে বিশেষ গুরুত্ব দেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলি শুধু শিক্ষার আলো ছড়ায়নি, বরং দলিত ও নারীদের আত্মসম্মান ও আত্মপরিচয়ের বোধ জাগ্রত করেছিল। তাঁর স্ত্রী সাবিত্রীবাই ফুলে এই আন্দোলনের অগ্রণী সৈনিক ছিলেন, যিনি নারী শিক্ষার পথিকৃৎ হিসেবে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

দ্বিতীয়ত, ফুলের দর্শনে সামাজিক সাম্য ও মানবিক মর্যাদার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। তিনি ব্রাহ্মণ্যবাদী সামাজিক কাঠামোর তীব্র সমালোচনা করেন এবং বলেন যে, জন্ম নয়, কর্মই মানুষের প্রকৃত পরিচয়। তাঁর মতে, সমাজের প্রতিটি মানুষের সমান অধিকার থাকা উচিত। এই চিন্তাধারা দলিতদের মধ্যে আত্মমর্যাদার বোধ জাগিয়ে তোলে এবং তাদের সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে অনুপ্রাণিত করে।

নারী চেতনার জাগরণেও ফুলের অবদান অনস্বীকার্য। তিনি নারীদের শিক্ষিত ও স্বাবলম্বী হওয়ার ওপর জোর দেন। তাঁর মতে, নারী যদি শিক্ষিত হয়, তবে একটি পরিবার এবং পরবর্তীতে পুরো সমাজ শিক্ষিত হয়ে উঠবে। তিনি বাল্যবিবাহ, সতীদাহ প্রথা এবং বিধবাদের প্রতি অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। তাঁর চিন্তাধারা নারীদের নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলে এবং তাদের আত্মনির্ভরশীলতার পথে এগিয়ে দেয়।

সবশেষে বলা যায়, ফুলের দর্শন শুধুমাত্র একটি সামাজিক আন্দোলনের ভিত্তি নয়, বরং এটি একটি মানবিক ও প্রগতিশীল চিন্তাধারা, যা আজও প্রাসঙ্গিক। দলিত ও নারী চেতনার জাগরণে তাঁর অবদান

ভারতীয় সমাজকে নতুন আলো দেখিয়েছে। তাঁর আদর্শ অনুসরণ করেই একটি সাম্যভিত্তিক, ন্যায়নিষ্ঠ সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। ফুলের দর্শন কোনো বিশেষ সময়ের জন্য সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি সমতা ও ন্যায়বিচারকামী প্রতিটি মানুষের জন্য চিরকালীন এক আলোকবর্তিকা, যা আজও আমাদের শেখায় কীভাবে অন্ধবিশ্বাসের কুয়াশা কাটিয়ে সত্যের আলোয় নিজের আত্মপরিচয় খুঁজে নিতে হয়।

তথ্যসূত্র:

১. Phule, Jyotirao Govindrao. *Gulamgiri*. 1873, Page-24.
২. Keer, Dhananjay. *Mahatma Jotirao Phooley: Father of Our Social Revolution*. Popular Prakashan, 1964. Page-32.
৩. Phule, Savitribai. *Kavya Phule (Poetry Blossoms)*. Translated into English, Various Editions. Page-12.
৪. Phule, Savitribai. *Kavya Phule (Poetry Blossoms)*. Translated into English, Various Editions. Page-45.
৫. Phule, Jyotirao Govindrao. *Gulamgiri*. 1873, Page-42.
৬. Deshpande, G. P., editor. *Selected Writings of Jotirao Phule*. LeftWord Books, 2002. Page-78.
৭. Phule, Jyotirao Govindrao. *Gulamgiri*. 1873, Page-44.
৮. Phule, Savitribai. *Kavya Phule (Poetry Blossoms)*. Translated into English, Various Editions. Page-16.
৯. Phule, Savitribai. *Kavya Phule (Poetry Blossoms)*. Translated into English, Various Editions. Page-45.

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1688- 1695
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.390

পরেশ মন্ডলের কবিতায় রঙ: বৈচিত্র্যের সন্ধানে

চৈতালি ঘোষ, গবেষক, *উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 25.03.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The use of Color in the poetry of Paresh Mandal, a significant poet of the 1960s in Bengali literature, constructs dimensions that are simultaneously aesthetic and psychological. Throughout his poetic oeuvre, Color does not remain confined to the visible spectrum but becomes a medium for expressing emotion, consciousness, and living experience. The present paper aims to explores this multidimensional approach of Color across the various poems of Paresh Mandal. By analyzing the application of Color at biological, psychological, and cultural levels, the paper demonstrates how the Poet portrays vitality and passion through red, pain and depth through blue, emptiness and loneliness through white, and optimism and life-force through green. Additionally, the shades of darkness, corruption, and social decay emerge through the Color black. Furthermore, this paper elucidates how Color serves as a powerful, symbolic language in Paresh Mandal's poetry, encapsulating the individual psyche, social consciousness, and the sense of time.

Keywords: Color, Diversity, Time-consciousness, Aesthetics, Paresh Mandal, Modern Poetry

বাংলা সাহিত্যে ছয়ের দশকের জনপ্রিয় কবি পরেশ মন্ডল। মূলত শ্রুতি আন্দোলনের সহযোদ্ধা হিসাবেই তিনি খ্যাতির আসন লাভ করেন; যুক্ত ছিলেন 'অব্যয়', 'ঈগল', 'মহাদিগন্ত', 'শাস্ত্রবিরোধী' ইত্যাদি পত্রপত্রিকার সাথে। 'অদূরে জলের শব্দ', 'প্রতিবিম্ব', 'মানমন্দির', '৪৪৪', 'পেণ্ডুলাম', 'লোডশেডিং ১৯৮৩', 'হাত', 'শেষ এবং শুরু' 'নিজস্ব বলয়'- নামে প্রকাশিত তাঁর একাধিক কাব্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রেখেছেন একান্ত অনুভূতিনির্ভর রঙের রহস্যময় খেলা। পরেশের কবিতায় রঙ কেবল অনুভূতির সংক্রামক হিসাবে কাজ করেনি, কখনো পাঠকের সাথে, কখনো বা নিজের সাথে নিজের যোগাযোগ স্থাপনের উপায় হয়ে উঠেছে। ধীমান দাশগুপ্ত 'রঙ' গ্রন্থে রঙকে দুটি ভিন্ন তাৎপর্যে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন-

> রঙ বলতে আমরা দুটো ভিন্ন প্রতীতিকে বোঝাই, ১. মানুষের দৃশ্যানুভূতি বিশেষ কোনো আলো থেকে রঙের বিষয়ে যে অনুভব প্রাপ্ত হয় তা, ২. বস্তুর বিশেষ ধর্ম হিশেবে রঙ, যে ধর্মের ফলে বস্তুটির নির্দিষ্ট বর্ণের আলোককে প্রতিফলিত বা প্রেরণ করার প্রবণতা দেখা যায়।[১]

চোখে দেখার মধ্য দিয়ে আমরা যে ইন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতা লাভ করি, তার অনেকটা জুড়েই থাকে রঙের অস্তিত্ব। সেই রঙ দিয়েই পরিচয় ঘটে বিশ্বপ্রকৃতির সাথে মানবপ্রকৃতির। গবেষক সহেলি চৌধুরী তাঁর গবেষণা অভিসন্দর্ভে এ প্রসঙ্গে যথার্থ মন্তব্যই করেছেন-

> "একটু গভীর ভাবে ভাবলে বুঝি রঙের অস্তিত্ব বা অনুভব সবটাই আসলে জীবন জারিত একটি একঘন বোধ। রঙের চেতনা আমাদের কাছে এমন এক সম্পূর্ণ অনুভূতি যা সহজ স্বাভাবিক নিঃশ্বাসের মত জীবনকে আবহমান কাল ধরে ধারণ করে আসছে।"[২]

রঙের উপলব্ধির সাথে আমাদের চেতনা তথা প্রজ্ঞা গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। কবির ভাষায়- "আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,/ চুনি উঠল রাঙা হয়ে।"[৩] প্রতিটি রঙেরই একটা নিজস্ব আবেদন আছে, যা আমাদের চেতনাকে প্রভাবিত করে। কবিরা অনেকক্ষেত্রে গূঢ় অনুভূতি, জটিল মানসিক সংবেদনগুলিকে কথার দ্বারা যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারেন না। সেক্ষেত্রে 'রঙ' হয়ে দাঁড়ায় উপযুক্ত মাধ্যম। কবি পরেশ মন্ডলও তাঁর অনেক কবিতায় ভাবপ্রকাশক হিসাবে বর্ণের ব্যবহার করেছেন অনেক ক্ষেত্রে। রঙ সম্পর্কে ধীমান দাশগুপ্ত তাঁর 'রঙ' গ্রন্থের 'রঙ : বিজ্ঞানের কথা' প্রবন্ধে বলেছেন-

> "বিজ্ঞান তিনটে পৃথক ও সুস্পষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে রঙকে বিচার করে দেখে: পদার্থবিজ্ঞান, মনোপদার্থবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান। পদার্থবিজ্ঞান অনুসারে রঙ হল বিকীর্ণ শক্তি। মনোপদার্থবিজ্ঞান অনুসারে রঙ হল ভৌত উদ্দীপকের প্রতি দর্শকের অক্ষিপটের প্রতিবেদন বা প্রতিক্রিয়া। মনোবিজ্ঞান অনুসারে রঙ হল এক ধরনের চাক্ষুষ সংবেদন, যার অস্তিত্ব শুধুমাত্র মনের অস্থায়ী সচেতনতা রূপে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে রঙ সংক্রান্ত তৃতীয় দৃষ্টিকোণটিতেই আমরা মূলত অভ্যস্ত।"[৪]

মনস্তত্ত্ব অনুসারে দেখা যায় প্রতিটি রঙের সঙ্গে একাধিক মানসিক সংবেদনগুলির প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে। অনেক সময় সেগুলি পরস্পর বিরোধী। পরিবেশ, প্রসঙ্গ অনুসারে রঙ অর্থ তৈরি করে, বিশেষ করে কবিতার ক্ষেত্রে দেখা যায় একই রঙ প্রসঙ্গ অনুসারে একাধিক ভাবকে প্রকাশ করছে। কবির মনোভাব অনুসারে তৈরি হচ্ছে রঙের ব্যঞ্জনা।[৫] পরেশ মন্ডলের কবিতা আলোচনার মধ্য দিয়ে রঙের সাথে মনস্তত্ত্বের সূচারু যোগসূত্রটিকেও খুঁজে বার করার চেষ্টা করব। কোনো ব্যক্তিমানুষ তিনভাবে নিজেকে রঙের সাথে একাত্ম করতে পারে, যথা- জৈবিকভাবে, সংস্কৃতিগতভাবে এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে। পরেশ মন্ডলের কবিতায় এই তিনটি দিক কীভাবে উঠে এসেছে তাও আমরা এই আলোচনার মধ্য দিয়ে অনুসন্ধান করব। পরেশ মন্ডল 'নিলাজ নগ্নতা' কবিতায় বলছেন-

> আরক্তিম মুখখানা ছুঁয়েছিল মেঘ ঝড় জল,
> চোখে চোখে তৃষ্ণা কোনো অতীতের মৃত করবীর,
> যেহেতু ও-নায়িকার অভিমানটুকুই সম্বল
> এবং নিলাজ প্রেম হাসি নিয়ে পরিধিতে স্থির।[৬]

আরক্তিম মুখে অন্তরঙ্গ হতে চাওয়ার অভিব্যক্তি স্পষ্ট। একই সাথে তৃষ্ণার্ত চোখ স্মরণ করিয়ে দেয় অতীতের কোনো স্মৃতিসুধার কথা। জৈবিক অভিব্যক্তির প্রকাশক রূপে আরক্তিম মুখের উল্লেখ তাই যথাযথ হয়েছে। 'মুখোমুখি অন্ধকার' কবিতায় কবি সৌন্দর্য ও নিষ্ঠুরতাকে সমান্তরালভাবে উপস্থাপন করেছেন-

> সর্বদাই জলাতংক সারাদিনটা শয্যাশায়ী
> অন্যপারে ঘূর্ণিবাতাস
> মরুভূমি মৃত্যুর নাম জ্যোৎস্না এবং রক্তের দাগ[৭]

মানব-অভিজ্ঞতার জটিল থেকে জটিলতর রহস্যের উন্মোচন করেছেন কবি তাঁর এই কবিতায়। মরণশীলতা ও ক্ষণস্থায়িত্বই এই কবিতার বিষয়বস্তুর মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে। 'জ্যোৎস্না' ও 'রক্তের দাগ'—ছবি-দুটি পাশাপাশি রেখে অদ্ভূত এক রহস্যময় পরিবেশ কবি সৃষ্টি করেছেন। সৌন্দর্য ও নিষ্ঠুরতা, আশা ও নিরাশার দ্বন্দ্ব এই দুই চিত্রের মধ্য দিয়ে যথাযথভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। "লালের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি সম্পর্কে Ellen Conroy বলেন Red is the colour of the blood; hence it is not surprising that red is the colour denoting life and action, cheerfulness and enthusiasm. Red is used by healers as a powerful stimulant and tonic thus it has the meaning of health and vigour. একদিকে এটি খুব উষ্ণ রঙ যার শরীরে ও মনে ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে...শক্তিচক্রের সঙ্গে এই রঙের প্রত্যক্ষ যোগ আছে বলে প্রেম-ভালোবাসা, যৌনতার মত ইতিবাচক আবেগকে যেমন তা নিয়ন্ত্রিত করতে পারে অন্যদিকে তীব্র ঘৃণা, ভয়, প্রতিহিংসা প্রভৃতির মত ভাবগুলিকেও বহন করতে পারে"[৮] কবিতায় জৈব অভিব্যক্তির সাথে সাযুজ্যপূর্ণ হওয়ায় লাল রঙের অনুষঙ্গ যথাযথ হয়েছে। 'করুণা কে চায়' কবিতায় এসেছে নীল রঙের প্রসঙ্গ। হালকা নীল রঙ যেখানে সহনশীলতা, রোমান্টিসিজম, অসীমতা, জ্ঞানের প্রকাশ করে সেখানে গাঢ় নীল রঙ ভয়, অস্বস্তি, উদ্বেগ, হিংস্রতার প্রকাশক।[৯] পরেশ মন্ডল তাঁর কবিতায় বলছেন-

সবাই যাতনা দেয় অকৃপণ সাধে
গলায় পরাতে চায় মন্ত্রপূত বিষের মাদুলি,
কোনোকালে নীলকণ্ঠ ছিলাম না আমি
তাহলে কি ক'রে বলো দুটো হাতে একা একা এ-বন্ধন খুলি?[১০]

কবিতায় বিষজর্জর যন্ত্রণা বা কাতরতা সহ্য করার প্রসঙ্গে এসেছে পৌরাণিক দেবতা শিবের অনুষঙ্গ। সমুদ্রমন্থনে যে গরল উঠেছিল তা নিজকণ্ঠে ধারণ করে শিব হয়েছিলেন নীলকণ্ঠ। শিবের মতো বিষের জ্বালা সহ্য করার ক্ষমতা কথকের নেই। অথচ টিকে থাকার জন্য ঝুঝতে হবে সকল জখমের সাথে। 'কলকাতা ১৯৬৮' কবিতায় বিধ্বস্ত কোলকাতার নাগরিক যাপনের ছবি ফুটে উঠেছে। কবি বলছেন-

ধুলোবালি নীল রোদে শরীর পুড়ে যাচ্ছে
চোখের নিচে দাগ
গলার স্বরে চিড়[১১]

'নীল রোদ' কবিতায় তীব্র জ্বালাবাহী অর্থে ব্যঞ্জিত হয়েছে। 'চোখের নিচে দাগ', 'গলার স্বরে চিড়' বিধ্বস্ত নাগরিক যাপনের ছবিটিকে তুলে ধরায় নীল রোদের ব্যঞ্জনা বিশেষ তাৎপর্যবাহী হয়েছে। 'গোপনীয়' কবিতায় নীল রঙ কামনা ও গোপনীয়তার প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। গোপনীয়তার নিজেকে স্থায়ী করার প্রবণতা রয়েছে। লাল সাধারণত কামনা বা প্যাশানকে ইঙ্গিত করলেও এখানে নীল রঙের মধ্য দিয়ে সেই অভিব্যক্তি ব্যক্ত হয়েছে-

অবশ্য পাঁচটি ফুলে—এবং ফুলের নীল জ্যোৎস্নার ভিতর
স্বেচ্ছাচার বেড়েছে কেবল।
গোপনে
নর্মদা যেন—গোপনীয়—আরো
গোপনীয় হতে চায়।[১২]

'..... এবং দশটি পাখি' কবিতায় এমন একটি দৃশ্যের উপস্থাপনা করা হয়েছে যেখানে দশটি পাখি প্রোজ্জ্বলিত নীল বাতিটার দিকে উড়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ কুয়াশা এসে পাখিদের 'নরম লাল ঠোঁট' স্পর্শ করায়

প্রোজ্জ্বলিত নীল শিখাটি পাখিদের কাছে গভীর ক্ষতের মতো দুর্বোধ্য ও রহস্যময় মনে হয়েছিল। কবিতাটিকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যেখানে নীল আলোর দিকে ধাবিত পাখিদের মধ্য দিয়ে স্বাধীন আনন্দঘন অনুভূতি ব্যক্ত। অন্যদিকে কুয়াশার আগমন ও পাখিদের নরম লাল ঠোঁট স্পর্শ করা স্বাধীন নিস্তরঙ্গ জীবনে আকস্মিক বিশৃঙ্খল অনুপ্রবেশের মতো—যা তাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট করেছে, বাধ্য করেছে জটিল আবর্তে মিশে যেতে-

হঠাৎ কুয়াশা এসে তাদের নরম লাল ঠোঁট
স্পর্শ করতে
বাতির শিখাটি এক গভীর ক্ষতের মতো দুর্বোধ্য ও
বিভীষিকাময় মনে হলো,
ডানার চঞ্চল শব্দে তরঙ্গ—তরঙ্গ
স্থির হতে হতে দূরে চোখের দৃষ্টির চেয়ে জটিল আবর্তে
মিশে গেল।[১৩]

পাখিদের 'নরম লাল ঠোঁট'-এর উল্লেখ জৈবিক অনুষঙ্গকেই দ্যোতিত করেছে। 'নিমগাছ নীল ছায়া' কবিতায় 'নীল ছায়া' মৃত্যুর পূর্বাভাস বহন করে-

বাড়িটা
পাশে
নিমগাছ
নীল ছায়া
শুয়ে আছে সেই মৃত নাবিকের মতো
তার
বরফের সাদা রক্তের ভেতরে[১৪]

'বরফের সাদা রক্ত' প্রাণহীনতার প্রতীক যেখানে মৃত্যু ও স্থবিরতার এক গাঢ় চিত্র ফুটে উঠেছে। 'প্রদর্শনী' কবিতায় কবি পাশাপাশি দুটি চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন—একটি মরুভূমি, ঊষর প্রান্তরের ছবি। অন্যটি ক্লোরোফিলের গন্ধমাখা পার্কের বসন্তের ছবি। একটি অতীত সময়কে নির্দেশ করেছে, অন্যটি বর্তমান সময়কে। প্রকৃতির এই বিচিত্রতা—কোথাও ধূ ধূ মরুভূমি, কোথাও সবুজ অরণ্যানি। এক সময় কবির জীবনও প্রাণপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণ ছিল। বসন্ত ছিল, ছিল মানুষের নিত্য আনাগোনা। কিন্তু আজ জীবন মরুভূমির বালির মতো তপ্ত, যেখানে একটা গাছের খুব প্রয়োজন—যে ছায়া দিয়ে আগলে রাখবে। সবুজ যৌবনের রঙ, আশার রঙ। এখানে সরাসরি সবুজ রঙের উল্লেখ না থাকলেও সবুজতার আভাস স্পষ্ট হয়েছে উদ্ধৃত ছত্রের মাধ্যমে- ক্লোরোফিলের গন্ধ পার্কের বসন্তে।[১৫]

'পড়ে রইল' কবিতা শুরু হয়েছে ডিসেম্বরের এক শীতের রাতের বর্ণনা দিয়ে। শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য নিয়ে যে মনুষ্য জীবনদশা তাকে কবিতায় পর্ণমোচী গাছের সাথে তুলনা করেছেন কবি। গাছ যেমন করে শীতে পাতা ঝরায়, পড়ে থাকে শুধু 'ফেরারী যৌবন'—তেমনি মানুষও একসময় যৌবনের প্রাণপ্রাচুর্য হারায়। তখন পড়ে থাকে শুধুই যৌবন দিনের স্মৃতি। 'হলুদ চাঁদের আলো' ক্ষয়িষ্ণু যৌবনের ইঙ্গিত দেয়। সামাজিকভাবে নাগরিকতা, প্রাচুর্য, ঐশ্বর্য, আনন্দ, উচ্ছ্বাস প্রভৃতি ভাবগুলির সঙ্গে হলুদের যেমন সম্পর্ক রয়েছে তেমনি মৃত্যু, বিবর্ণতা, বিশ্বাসঘাতকতা, সাম্রাজ্যবাদ প্রভৃতি প্রসঙ্গগুলি জুড়ে আছে এর সঙ্গে। অন্যদিকে বিবর্ণ হলুদ আবার নেতিবাচক ভাবকে প্রভাবিত করতে পারে। বিবর্ণ হলুদের সঙ্গে মৃত্যু, ভয়, প্রতারণা, অবিশ্বাস, অবসাদ, লোভ, প্রভৃতি ভাবগুলির যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা।[১৬] হলুদ চাঁদের

আলোর বিপরীতে 'সবুজ বসুন্ধরা'-র প্রতিস্থাপন বৈপরীত্যের সৃষ্টি করেছে অবশ্যম্ভাবীভাবে। সময়ের সাথে সাথে যৌবনের প্রাণস্ফূর্ততা হারিয়ে প্রিয়জনদের হারানোর স্মৃতি-কাতরতা জড়িয়ে আছে কবিতার পরতে পরতে-

ডিসেম্বরে
কাঁপানো শীতের রাতে
সব পাতা ঝরে যায়
থাকে শুধু ফেরারী যৌবন
হলুদ চাঁদের আলো
কুমারী বাগানে[১৭]

'লোডশেডিং ১৯৮৩' কাব্যের অন্তর্গত 'ছাগলটা' কবিতাটি কবি লিখেছেন বাস্তবিক পরিস্থিতি অনুসরণ করে। ঈশপ যেমন তার চারপাশের মানুষজনের আচার-আচরণ দেখে বিভিন্ন পশুপাখির রূপকে, তাদের প্রকৃতি, প্রবৃত্তিগুলি তুলে ধরতেন, তেমনি কবিও এখানে কালো ছাগলটার রূপকে বিশেষ এক শ্রেণীর মানুষের কথাই বলতে চেয়েছেন। আমাদের চারপাশে তাকালেও এমন কিছু মানুষকে দেখতে পাওয়া যায়, যারা আদ্যোপান্ত দুর্নীতিগ্রস্ত। পেটে তাদের একফোঁটা বিদ্যাও নেই, কেবল ফাঁপা বুলি আওরে তারা সমাজে একটা জায়গা দখল করে নিয়েছে এবং লোভের বশবর্তী হয়ে নিজেদের উদরপূর্তি করে চলেছে। কালো যেমন গোপনীয়তার রঙ তেমনি অবসাদ ও নিরাপত্তাহীনতার ভাবকে বহন করে। বিষণ্ণতা, উদ্বেগ প্রভৃতি নেতিবাচক চিন্তার বিকাশে কালো রঙের বিশেষ ভূমিকা আছে। শুধু তাই নয় মনস্তত্ত্ব অনুসারে কালো ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ আর পাপের রঙ।[১৮] কবিতায় উল্লিখিত 'কালো ছাগলটা'র প্রসঙ্গ তাই বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ-

জিভ রসালো
ছাগলটা abcd জানে না
কেবল ভ্যা করতে পারে
ছাগলটা
কালো ছাগলটা[১৯]

'হঠাৎ' কবিতায় 'কালো ঘোড়া'-র দিগন্ত পেরিয়ে ছুটে আসার যে ইঙ্গিত কবি বর্ণনা করেছেন তা বিশেষ ইঙ্গিতবাহী। কবিতায় বিশেষ করে সময়কাল লক্ষ্য করার মতো-

কালো ঘোড়া ছুটে আসে দিগন্ত পেরিয়ে
মাঘ মাস-এ
ঘাসে ঘাসে কুয়াশার লিপ্‌স্‌টিক্
আকাশে সূর্যের শেষ বিস্মরণ[২০]

দিগন্ত পেরিয়ে কালো ঘোড়ার ছুটে আসা পরিবর্তমান সময়কেই ইঙ্গিত করছে। শীতের আবহ, কুয়াশার আচ্ছাদন, সূর্যাস্তের অন্তিম রশ্মির বর্ণনার মধ্য দিয়ে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। দাঁতাল ক্ষুরের ফ্রেমে সবুজ চেতনার পিষে যাওয়া বন্ধ্যাত্ব, অনুৎপাদনশীলতাকেই চিহ্নিত করতে চেয়েছে- 'খুরের দাঁতাল ফ্রেমে পিষে যায় চেতনা সবুজ[২১]। 'সিগন্যাল' কবিতায় কবি রাতের এক নিঃশব্দ, শিশিরভেজা দৃশ্যের অবতারণা করেছেন-

রাতজাগা সিগ্‌ন্যালের লাল চোখে
শীতের শিশির
রেললাইনটা শুয়েছিল[২২]

কবিতার নামকরণের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে 'লাল চোখে'-র ইঙ্গিত তাৎপর্যবাহী। 'লাল চোখ' বিপদ সংকেতের কথা ব্যক্ত করে। কিন্তু এই কবিতায় 'লাল চোখ' অন্য তাৎপর্যে উপনীত। সিগন্যালের লাল চোখ ট্রেনের আগমন বা প্রস্থানের বার্তা নিয়ে আসে। ট্রেনের আগমন, প্রস্থান কবিতায় সম্পর্ক, জীবন বা সুযোগের ক্ষণস্থায়িত্বকে সংকেতিত করেছে। কবিতার পরবর্তী অংশটি পড়লে এটা বুঝে নিতে পাঠকের অসুবিধা হয় না-

ট্রেন এল
চলে গেল
প্ল্যাট্‌ফর্ম্‌-এ আমি
একা[২৩]

'সিগন্যাল'-কে একটি অন্তর্দশনের কবিতা বলা যেতে পারে যেখানে উদাসীন পৃথিবীর একলাযাপনে মানুষ কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর সাথে সংযোগের সন্ধান করে। সিগন্যাল সেই সংযোগের বার্তা বয়ে নিয়ে আসে এবং 'লাল চোখ' সংযোগের ক্ষণস্থায়িত্বকে সূচিত করে। 'ট্রেন' কবিতায় 'লাল সংকেত' আবার মৃত্যুর অনুষঙ্গ বহন করেছে। ট্রেন আসলে জীবনের গতিপ্রবাহকেই ইঙ্গিত করেছে, জন্ম পেরিয়ে মৃত্যুর দিকে যার যাত্রা। রাতের বাঁশি বাজিয়ে ছুটে চলা—জীবন থেকে মৃত্যুর যাত্রাপথে ক্রমশ সঞ্চারমানতাকে বোঝানো হয়েছে। নিজেকে 'মূঢ় যাত্রী উপায়হীন' বলে কবিকথক নিয়তির কাছে নতিস্বীকার করেছেন। 'লাল সংকেত' এখানে বিপদের আভাস বহন করে যার অনিবার্য পরিণতি 'নিঃশব্দে ছুটে চলা' ট্রেনের গতি চিরতরে থামিয়ে দিতে পারে-

আমি এক মূঢ় যাত্রী উপায়হীন
চেয়ে আছি বিপদসূচক ঘণ্টাধ্বনি শুনবো বলে
লাল সংকেতের আকাঙ্ক্ষায়
ট্রেনটা নিঃশব্দে ছুটে চলেছে[২৪]

'শুধু' কবিতায় সবুজ সিগ্‌ন্যাল সদর্থকতার ইঙ্গিত বহন করে। কথক তার প্রিয় মানুষের প্রতি নিজেকে নিবেদিত করে বলেছেন-

তোমার সবুজ সিগ্‌ন্যাল পেলে
লাফিয়ে পাঁচিল পেরোতে পারি
...
দেখো
কেমন সহজে
ঘরের জন্যে ঘর ভেঙে ফেলি[২৫]

সবুজ সিগন্যাল আশার সঞ্চালন ঘটায়। জীবনে স্বতঃস্ফূর্ততা ও উচ্ছ্বাস বয়ে নিয়ে আসে। 'সবুজ সিগন্যাল' এখানে উদ্দামতার প্রতীক, যা সমস্ত বাধা অতিক্রম করে কর্মে ঝাপিয়ে পড়ার প্রেরণা যোগায়। 'সবুজ সিগন্যালের জোরে 'ঘরের জন্য ঘর' ভেঙে ফেলা যায়, 'স্বপ্নের জন্য স্বপ্ন' কিংবা 'ইতিহাস দলা পাকিয়ে' গঙ্গাজলে ভাসিয়ে দেওয়া যায়। নিজের সীমাবদ্ধতাকে সরিয়ে রেখে নতুন উদ্যমে কোনো কিছু শুরু করার প্রত্যাশা এখানে ব্যক্ত। 'নারকাণ্ডা ২২। ১০। ৭২' কবিতায় পাইন গাছের সবুজ শাদা হয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে সম্পর্কের বিবর্ণতা সূচিত। যে প্রাণবন্ততা, সবুজতা এক সময় ছিল তা আর নেই; অপসৃত হয়েছে। এই পরিবর্তনশীলতাকে ভয় পান না কবি। তাই বলতে পারেন-

চারিদিকে পাহাড়ে বরফ পড়ছে

পাইনের সবুজ এখন শাদা
রাত বাড়ছে শীত বাড়ছে
তা হোক ভয় নেই[২৬]

'কেউ খুশি হবে জানলে' কবিতায় 'শ্বেত নিশান' যুদ্ধবিরতির ইঙ্গিত দেয়। জীবনযুদ্ধে চলার পথে 'আমার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই' বলে কবিকথক মনে করেছেন। গন্তব্য অগ্রগামী। স্পষ্ট উচ্চারণে কথক নিজের অবস্থান জানিয়ে দেন। তথাপি কথককে কেউ প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করলে কথকের বক্তব্য-

আমি
পরাজিত হতেও রাজি
...
নতজানু হবো
এবং
শ্বেত নিশান ওড়াবো[২৭]

এখানেই কবির মহানুভবতা প্রকাশ পায়। অন্যের আত্মতুষ্টির জন্য 'নতজানু' হতেও তার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। অহিংসার প্রতীক হিসাবে বা শান্তিস্থাপনের ইঙ্গিতার্থে 'শ্বেত নিশান'-এর অভিধাটি তাই যথাযথ। ধূসর হল এমন একটি রঙ যা সাদা ও কালোর মধ্যবর্তী। মনস্তত্ত্ব অনুসারে ধূসরতা একেবারেই বিচ্ছিন্নতা ও বিষণ্ণতার রঙ। এই রঙের সঙ্গে উদাসীনতা, হতাশা, বিষাদ, নির্বেদ, ক্লান্তি, ক্ষয়, যান্ত্রিকতা, একাকিত্ব, বিচ্ছিন্নতা এই ভাবগুলির যোগ আছে। মানসিক অবসাদে, দ্বন্দ্বে এই রঙের চেতনা মনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।[২৮] 'আরতির ধ্বনি' কবিতায় ধূসর রঙ জীবনের অনিশ্চয়তাকে ব্যক্ত করে। ধূসর রঙ খুব বেশি উজ্জ্বল নয়, আবার খুব বেশি ম্লানও নয়। ধূসর রঙ যেন অনেকটা স্বপ্নের মতো যা আমাদের অবচেতন মনের প্রতিনিধিত্ব করে-

শুনতে পেলাম
আরতির ধ্বনি
যেন
স্বপ্নের মতো ধূসর[২৯]

আরতির ধ্বনি শুনে কথক ফিরে গিয়েছেন সুদূর অতীতে। 'আশ্বিনের মেঘ', 'নদীর প্রবাহ'—গতিময়তা ও প্রবাহমানতাকে সূচিত করেছে। 'একে একে বিস্মৃত প্রান্তরে' নেমে যাওয়ার মধ্য দিয়ে হারিয়ে যাওয়া বা ভুলে যাওয়ার প্রবণতাই ব্যক্ত হয়।

প্রাচীন কালে পৃথিবীর সর্বত্রই রঙের ব্যবহারে যুক্তি ও সৌন্দর্য নয়, প্রতীকতা ও রহস্যময়তা ছিল মুখ্য বিবেচ্য।[৩০] পরেশ মন্ডলের কবিতাতেও রঙ বহুমাত্রিক প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। লাল, নীল, সাদা, সবুজ, কালো— প্রতিটি রঙই একটি নির্দিষ্ট আবেগ, অভিজ্ঞতা বা দার্শনিক ভাবনার প্রকাশ ঘটাচ্ছে। তাই বলা যায়, পরেশের কবিতায় রঙ হয়ে উঠেছে গভীর অনুভূতি ও সময়চেতনার এক শক্তিশালী নান্দনিক ও দার্শনিক ভাষা।

তথ্যসূত্র:

১. দাশগুপ্ত, ধীমান। রঙ। বাণীশিল্প, ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ১৬।
২. চৌধুরী, সহেলি। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় রঙের প্রতীকী ব্যঞ্জনার স্বরূপ সন্ধান (নির্বাচিত পনেরো জন কবি)। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৭, পৃ. ১।
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। শ্যামলী। বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়, অগ্রহায়ণ ১৩৫২, কলিকাতা, পৃ. ১৬।
৪. দাশগুপ্ত, ধীমান। রঙ। বাণীশিল্প, ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ২৩।
৫. চৌধুরী, সহেলি। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় রঙের প্রতীকী ব্যঞ্জনার স্বরূপ সন্ধান (নির্বাচিত পনেরো জন কবি)। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৭, পৃ. ৩।
৬. মন্ডল, পরেশ। কবিতা সংগ্রহ। এবং মুশায়েরা, ২০১২, কলকাতা, পৃ. ১৮।
৭. তদেব, পৃ. ৩৪।
৮. চৌধুরী, সহেলি। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় রঙের প্রতীকী ব্যঞ্জনার স্বরূপ সন্ধান (নির্বাচিত পনেরো জন কবি)। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৭, পৃ. ৮।
৯. দাশগুপ্ত, ধীমান। রঙ। বাণীশিল্প, ২০১৫, কলকাতা পৃ. ৪১।
১০. মন্ডল, পরেশ। কবিতা সংগ্রহ। এবং মুশায়েরা, ২০১২, কলকাতা, পৃ. ২৩।
১১. তদেব, পৃ. ৪৬।
১২. তদেব, পৃ. ৩৫।
১৩. তদেব, পৃ. ৩১।
১৪. তদেব, পৃ. ৪৪।
১৫. তদেব, পৃ. ৬১।
১৬. চৌধুরী, সহেলি। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় রঙের প্রতীকী ব্যঞ্জনার স্বরূপ সন্ধান (নির্বাচিত পনেরো জন কবি)। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৭, পৃ. ১০-১১।
১৭. মন্ডল, পরেশ। কবিতা সংগ্রহ। এবং মুশায়েরা, ২০১২, কলকাতা, পৃ. ২৩।
১৮. চৌধুরী, সহেলি। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় রঙের প্রতীকী ব্যঞ্জনার স্বরূপ সন্ধান (নির্বাচিত পনেরো জন কবি)। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৭, পৃ. ১০-১১।
১৯. মন্ডল, পরেশ। কবিতা সংগ্রহ। এবং মুশায়েরা, ২০১২, কলকাতা, পৃ. ২৩।
২০. তদেব, পৃ. ৯৭।
২১. তদেব।
২২. তদেব, পৃ. ১০১।
২৩. তদেব।
২৪. তদেব, পৃ. ৮৭।
২৫. তদেব, পৃ. ৭৯।
২৬. তদেব, পৃ. ৭৮।
২৭. তদেব।
২৮. চৌধুরী, সহেলি। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় রঙের প্রতীকী ব্যঞ্জনার স্বরূপ সন্ধান (নির্বাচিত পনেরো জন কবি)। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৭, পৃ. ২০।
২৯. মন্ডল, পরেশ। কবিতা সংগ্রহ। এবং মুশায়েরা, ২০১২, কলকাতা, পৃ. ৪৩।
৩০. দাশগুপ্ত, ধীমান। রঙ। বাণীশিল্প, ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ৩৬।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1696-1703
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.391

প্রমথনাথ বিশীর আত্মচেতনায় রবীন্দ্রনাথ: জীবন সাধনা ও অর্চনার একটি রূপ

মৃণালকান্তি মুর্মু, *স্বাধীন গবেষক, রাঙ্গিয়াম, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 25.03.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The contribution of Pramathanath Bishi to Bengali literature is remarkable. He was one of the earliest students established by Rabindranath Tagore at Santiniketan and was simultaneously a writer, critic, and professor. His father's deep respect and attraction toward Tagore's educational philosophy led to his admission to Santiniketan. The environment of the institution and Tagore's close association gradually sowed the seeds of literary creativity in the young Pramathanath, which later grew into a vast intellectual and creative legacy.

Throughout his life, he was profoundly influenced by Tagore. Under the guidance of this great poet, he broke free from the narrow confines of conventional education and developed a broad, liberal, and enlightened educational outlook. At the same time, he gained a clear understanding of what constitutes the true essence of a literary personality. From Tagore, he learned how the qualities of a poet, human being, landlord, and teacher can be harmoniously integrated into one's personality and conduct.

For this reason, he carried Tagore within his thoughts and consciousness throughout his life, revering him as a guru in the innermost sanctum of his heart. Consequently, Tagore's influence repeatedly appears in every aspect of his life, contemplation, practice, devotion, and creative expression. This essay highlights the deep and enduring Rabindranath influence within Pramathanath's inner world.

Keywords: Pramathanath's Rabindranath-inspired thought, educational philosophy, literary ideas, worldview, humanism, tribute, literary creation.

প্রমথনাথ বিশী (১১ই জুন ১৯০১ — ১০ই মে ১৯৮৫) বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের এক স্বতন্ত্র ধারার শিল্পী। তিনি একাধারে সৃষ্টিশীল লেখক, প্রাবন্ধিক ও সাহিত্য সমালোচক। তাঁর রচনা সৃষ্টির অতিপ্রাচুর্যে এবং বহু বৈচিত্র্যের অনন্যতায় ভাস্বর। প্রখর মননশীলতার সঙ্গে নিবিড় রসনির্মাণের অপূর্ব মিলনসাধনে, হাস্যরসের কন্টক জ্বালাময় মধু পরিবেশনে এমন রচয়িতা বাংলায় খুব অল্পই আছেন। তিনি যখনি যে রচনায় হাত দিয়েছেন তাতেই মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার সাথে ইতিহাস, রাজনীতি, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা— বিচিত্র ও বিভিন্ন বিষয় উঠে এসেছে। কাব্য, উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প,

মনীষীদের, জীবনী গ্রন্থ, রম্যরচনা প্রভৃতির প্রসঙ্গ তাঁর লেখনীর মধ্যে নবতর রূপ লাভ করেছে। সাহিত্যের একাধিক শাখা সৃষ্টির সঙ্গে প্রতিটি শাখায় সাহিত্যের বিভিন্ন ধরন, সাহিত্যধর্ম, আঙ্গিক ও বিবিধ প্রসঙ্গের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত নানান বিষয় নিয়ে সমালোচনামূলক রচনাও লিখেছেন। সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক ও বিবেকী ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিটি লেখাই হয়েছে অসাধারণ, সরস, সপ্রাণ ও সুগভীর।

স্বনামধন্য ও যশস্বী এই সাহিত্যিকের জন্ম **১৯০১** খ্রীষ্টাব্দের **১১**ই জুন, মঙ্গলবার বেলা **১১**টা, বাংলা সন **১৩০৮** বঙ্গাব্দের ২৮শে জৈষ্ঠ। জন্মস্থান পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশে) নাটোর জেলার অন্তর্গত জোয়াড়ি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। তাঁর পিতার নাম নলিনীনাথ বিশী এবং মাতা সরোজা বাসিনী দেবী। প্রমথনাথের পিতা ছিলেন গোপালনগর পাবনার দ্বারিকা জমিদার। তাঁদের সাতপুত্র পাঁচ কন্যা। প্রমথনাথ পিতা-মাতার দ্বিতীয় সন্তান ও প্রথম পুত্র। বাংলাদেশের মাটিতে জন্ম হলেও বাল্যের বেশিরভাগ সময় কেটেছে দেওঘরে এমনকি অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠানও হয় সেখানে। জন্মস্থান ছেড়ে বাইরে বসবাস করলেও জোয়াড়ি ও তার আশেপাশের মাটি মানুষ তাঁর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। জোড়া-দীঘি পর্যায়ের উপন্যাসগুলি ('জোড়া-দীঘির চৌধুরী পরিবার', 'অশ্বত্থের অভিশাপ', 'চলনবিল') তার অনেকখানি সাক্ষ্য বহন করেছে।

নলিনীনাথের মনে পুত্র প্রমথনাথকে নিয়ে যে শিক্ষাচিন্তা তার মধ্যে এক নবতর মানসিকতার পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। বিশী পরিবারের প্রথম শিশু সদস্য প্রমথনাথ। তাঁর বড়দিদি ছোটবেলায় অত্যন্ত আদর ও প্রশ্রয়ে লালিত হয়েছিলেন। শোনা যায়, তাঁরা যখন মাঠে বল খেলতেন তখন সেখানে সতরঞ্চি বিছিয়ে দেওয়া হোত। যাতে কচি পায়ে কোন অবস্থাতেই কাঁটা না ফোটে। আবার ঘরের মেঝেও ছিল মাটির তৈরি যাতে পড়ে গেলে কোনক্রমে আঘাত না লাগে। এইরকম গৃহের পরিস্থিতিতে মানুষ হতে থাকা সন্তানদের সুদূর শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক বিদ্যালয়ে একাকী শিক্ষা লাভের জন্য প্রেরণ করার অন্তরালে রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শের গরিমাই কাজ করেছে। প্রসঙ্গক্রমে মনে রাখা দরকার সেই সময় সরকারি বিদ্যালয়ের মর্যাদা ও স্বীকৃতি শান্তিনিকেতন পায়নি। তথাপি নলিনীনাথের মনে শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রতি এই আস্থা প্রকারান্তরে রবীন্দ্রনাথের প্রতি গভীর শ্রদ্ধারই পরিচয়।

পূর্বপুরুষদের বিদ্যাশিক্ষার প্রভাব খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রমথনাথের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। বিদ্যান, বিদগ্ধ, মহাপন্ডিত ও প্রজ্ঞাবান পরিবারে তাঁর জন্ম। এই ধারাটিকেই তিনি সারাজীবন নিজের অস্তি-মজ্জায় বহন করেছেন, কর্মের মধ্যে, সৃষ্টিশৈলীর মধ্যে তাকে সতেজ, সরস, প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। বলাবাহুল্য আমাদের দেশে যে সমস্ত কৃতবিদ্য ব্যক্তি ও মনীষী জন্মেছিলেন প্রমথনাথ তাঁদের মধ্যে একজন। যিনি সমগ্র জীবন দিয়ে সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প এবং সর্বোপরি দেশের উন্নতিকল্পে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। তিনি মানবজাতির নব আদর্শের অভিব্যক্তি, পরিপূর্ণ ভাবাত্মক সৃষ্টিশীল জীবনের এক ভাস্বর দৃষ্টান্ত।

প্রমথনাথের পড়াশোনা শুরু হয়েছিল বাড়িতে গৃহশিক্ষকের কাছে। প্রথমে পিতা নলিনীনাথ তাঁকে হরিদ্বারের গুরুকূলে ভর্তি করবেন বলে মনস্থির করলেও পরে রাজশাহীর এক স্বনামধন্য প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্র-র (রবীন্দ্রনাথের অন্যতম বন্ধু) পরামর্শে শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। মৈত্র মহাশয়ের পরামর্শকে মান্যতা দিয়েই নলিনীনাথ পুত্র প্রমথনাথ ও সহোদর প্রফুল্লকে নিয়ে **১৯১০** সালে আষাঢ়ের এক সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে আসেন। সেইসময় প্রমথনাথের বয়স ছিল নয় বছর। বস্তুত: এই সন্ধ্যাকালীন আশ্রমের পরিবেশই যেন প্রমথনাথের মনে সাহিত্য চর্চার প্রথম অঙ্কুর রোপিত করেছিল, যার প্রভাব রবীন্দ্র-বিষয়ক একাধিক গ্রন্থের মধ্যে বারেবারে পাওয়া যায়। গভীর রবীন্দ্র-অনুধ্যান ও সাধনা যেন তাঁর সাহিত্য রচনার মূল প্রেরণার স্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাইতো মাত্র নয় বছর বয়সে আশ্রমে আসার প্রথম দিনটির ছাপ পরিণত বয়সেও স্পষ্টভাবে রয়ে গেছে। এ বিষয়ে তাঁর নিজেরই স্বগতোক্তি —

> "এতদিন পরেও আজ আমার বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে, একদিন আষাঢ়ের সন্ধ্যা বেলায় শান্তিনিকেতনে গিয়া উপস্থিত হইলাম।"[১]

আপন মানসে, নিজস্ব প্রতিভার প্রভাবে সাহিত্যিক সাহিত্য সৃষ্টি করেন। কিন্তু অন্তর্নিহিত প্রতিভার পূর্ণ বিকাশে, বাহ্যিক কোন উদ্দীপনাই সেখানে সাড়া জাগায়। প্রমথনাথের মনে রবীন্দ্রনাথ সেই উদ্দীপনার জাগরণের পূর্ণ সহায়ক। আশ্রমে ভর্তি হওয়ার থেকে শুরু করে পরবর্তী সমস্ত সময়ই প্রমথনাথের জীবনে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এ যেন স্মৃতির পটে জীবনের ছবি এঁকে যাওয়া, যা কোন এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা।

আশ্রমে ভর্তি হওয়ার দ্বিতীয় দিনে রবীন্দ্রনাথের সাথে সাক্ষাতের মুহূর্তটি, যেটি প্রমথনাথের মনের মণিকোঠায় চির অম্লান রূপে সদা বিরাজমান। সে সম্পর্কে প্রমথনাথের নিজেরই সাক্ষ্য —

> "ক্লাসের একটি ছাত্রকে শিক্ষক প্রশ্ন করছিলেন: আচ্ছা ইংরেজিতে বলতো সবি' র একটি গাধা আছে। তার উত্তরে ছাত্রটি তর্জমা করে বলল 'Sabi is an ass' ছাত্রটি পুরোপুরি ভুল করলেও শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ কোন রক্তচক্ষু বা ছড়ি হাতে আস্ফালন করেননি। বরং ব্যাপারটি হেসে উড়িয়ে দেন। এই ঘটনাটি যেন আমার কাছে রবীন্দ্র চরিত্রের অন্যতম প্রতীকে পরিণত হয়েছে।"[২]

সেদিনের শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রনাথের মানস সন্তান। শিক্ষা-সংস্কৃতির আদর্শ পীঠস্থান রূপে তাকে গড়ে তুলতে তিনি কোনো কিছু বাকি রাখেননি। সংকল্পে অটল থেকে সমস্ত প্রতিকূলতার বিপক্ষে নিয়ত সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। বালক প্রমথনাথ, যুবক প্রমথনাথ সেই সংগ্রামের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। তাঁর আপন হাতে গড়া মানুষ হিসাবেও প্রমথনাথ দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী। তাই সেই স্মৃতিগুলিই যে পরবর্তীতে অমূল্য সাহিত্য সম্পদের মর্যাদা পাবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

শান্তিনিকেতনের পুরো পরিবেশই ছিল সাহিত্য সৃষ্টির পরিবেশ, আর তার মূল আধার ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। যিনি সাহিত্যের উন্নতিকল্পে আজীবন নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। তাইতো তাঁর ছত্রছায়ায় পরবর্তীতে একাধিক সাহিত্যিকের সাহিত্য সৃষ্টি প্রাণ পেয়েছে। এই মহান, সুহৃদ ব্যক্তিত্বের প্রত্যক্ষ স্নেহ-প্রশ্রয়ে বেড়ে উঠেছেন প্রমথনাথ। দীর্ঘ সতেরো বছর রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আত্মনির্মাণে ব্যাপৃত থাকার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। বলতে গেলে তিনি ছিলেন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছাত্র, যিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের হাতে গড়া। সেখানকার একাধিক সাহিত্য সৃষ্টির উপকরণ ও পরিবেশ আজীবন প্রমথনাথের মনে পাথেয় হয়ে রয়েছে। পরিণত বয়সে তাঁর সাহিত্য জীবনের সূচনা সম্বন্ধে জানিয়েছেন —

> "সাহিত্য সম্বন্ধে আমার মনে কোন পূর্ব সংস্কার ছিল না। কাজেই প্রথম অঙ্কুরোদগম যে এখানেই (শান্তিনিকেতনে) ঘটিয়াছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।"[৩]

প্রমথনাথ রবীন্দ্রনাথকে জীবনের ধ্রুবতারা করে সেই পথে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর কাছে বিভিন্ন সময়ে গেছেন নানা জিজ্ঞাসা নিয়ে এবং কৌতূহল নিবৃত্তির সাথে সাথে পেয়েছেন জগত-জীবন সম্বন্ধে সাধনলব্ধ জ্ঞান। তাঁর প্রাণপ্রদীপ থেকে তিনি নিজের আত্মদীপ যেমন জ্বালিয়ে নিয়েছেন, তেমনি আবার অন্যের আলো দেখানোকেও এক অবশ্যকৃত্য বলে গ্রহণ করেছেন, যা উদারচরিত এক মনীষীর প্রাণধর্ম।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে প্রমথনাথের লেখা একাধিক প্রবন্ধ গ্রন্থ রয়েছে। যেগুলির মধ্যে প্রাবন্ধিকের নিজের ব্যক্তিসত্তার ও শিল্পীসত্তার উন্মুক্ত উন্মোচন এবং অনন্য অন্তঃপুরুষের বিশ্লেষণ লক্ষ্য করা যায়। একজন শিল্পীর জীবনদর্শন, সত্য-সৌন্দর্য ও মানবপ্রেমের অন্বেষণী দৃষ্টি কীভাবে মননশীলতায়, যুক্তিপূর্ণ

উপস্থাপনায় শিল্পসৌন্দর্য লাভ করেছে প্রতিটি রচনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তথ্য, তত্ত্ব ও জীবন সাধনার সুগভীর অনুধ্যানে সেগুলির বিষয়বস্তু হয়েছে অনন্যতায় ভাস্বর। রবীন্দ্রচর্চার সেই সকল গ্রন্থগুলি হল—'রবীন্দ্র-সরণী' (১৯৪৩ খ্রী.), 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' (১৯৪৪ খ্রী.), 'রবীন্দ্র-বিচিত্রা' (১৯৫৫ খ্রী.), 'রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ' (১৯৬০ খ্রী.), 'শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬৭খ্রী.), 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প' (১৯৭৫ খ্রী.), 'রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ' (১৯৭৭ খ্রী.)। প্রতিটি রচনার মধ্যে মহামানব রবীন্দ্রনাথকে কর্মের প্রেক্ষিতে এবং সাহিত্যের প্রেক্ষিতে সুগভীর অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করেছেন। যেখানে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের রচনাশৈলী, ব্যক্তিত্ব, জীবনকথা ও কর্মের মূল্যায়ন। যার ফলে প্রমথনাথের প্রতিটি নিবন্ধ হয়েছে সরস, সুন্দর, প্রাণবন্ত ও মর্মস্পর্শী।

রবীন্দ্র-বিষয়ক প্রমথনাথ বিশীর একটি অন্যতম গ্রন্থ 'রবীন্দ্র-সরণী'। রবীন্দ্রনাথ কবি — স্রষ্টা এবং দ্রষ্টা সুতরাং ঋষি। এমন মনীষীদের পরিচয় তাঁদের বাণীমুখেই এক যুগ থেকে অন্য যুগে প্রচারিত হয়। এর জন্য তাঁর রচিত গ্রন্থ ব্যতীত অন্য আয়োজন আবশ্যক হয়না। এই গ্রন্থটির মধ্যে রবীন্দ্র-ভাবনার গভীর প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। যেখানে তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব ও ব্যক্তিত্ব যে পথ অনুসরণ করে অগ্রসর হয়েছে তার একটা খসড়া মানচিত্র প্রস্তুত করেছেন বইটিতে। রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় রচনা ও কর্মকে একটি তত্ত্বসূত্রে গ্রথিত করেছেন। যে সূত্রটি রবীন্দ্রনাথ নিজেই যুগিয়েছেন —

> "আমার তো মনে হয়, আমার কাব্য রচনার এই একটিমাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে, সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা।"[৪]

এই সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধন রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ও জীবনে কতখানি হয়েছে, সেটাই এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়।

গ্রন্থটিতে মোট আঠারোটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের নাম 'রবীন্দ্রসাহিত্যের তিন জগৎ'। এই তিন জগৎ বলতে রবীন্দ্রসাহিত্য রচনার যে তিন চরম উপাদান — ১. মানুষ ২. প্রকৃতি ৩. ব্রহ্ম তার সুবিস্তৃত আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রসাহিত্যের মূল প্রেরণা বিশ্ববোধ। এই বিশ্ববোধ আর রবীন্দ্রনাথ কথিত সীমা ও অসীম অর্থাৎ সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধন সমার্থক। রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব সর্বব্যাপক, তা একই সঙ্গে সীমা-অসীমে সমন্বিত, ভূয়া ও ভূমিতে গঠিত। তাঁর দৃষ্টিতে মানুষ ও প্রকৃতি বিশ্বের সীমার কোটি আর ব্রহ্ম বিশ্বের অসীমের কোটি। তাঁর মতে যিনি অসীম তিনি স্বেচ্ছায় সীমার মধ্যে আনন্দরূপে ধরা দিচ্ছেন, স্বভাবত যিনি নির্গুণ তিনি স্বেচ্ছায় সীমার মধ্যেই সৌন্দর্যরূপে ধরা দিয়েছেন, আর যিনি নির্বিকার তিনি সীমার মধ্যে প্রেমরূপে ধরা দিয়েছেন যা অনন্ত বিশ্বের লীলা। সীমা ও অসীমের এই বিচিত্র লীলার আসরই রবীন্দ্রসাহিত্য। তারই স্বরূপ ও সার্থকতাকে প্রমথনাথ এখানে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম 'মানুষের মন চায় মানুষেরই মন'। এখানে রবীন্দ্রনাথের 'কবিকাহিনি' কাব্যের বিষয়বস্তু ও সেসম্পর্কে কবির স্বগতোক্তিকে প্রাবন্ধিক প্রমথনাথ নিজের আত্মপলব্ধির মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। যেখানে কবিধর্মের স্বভাব সম্পর্কে স্বয়ং কবির উক্তি —

> "এই প্রথম বৎসরের ভারতীতেই 'কবিকাহিনি' নামক একটি কাব্য বাহির করিয়াছিলাম। যে বয়সে লেখক জগতের আর সমস্তকে তেমন করিয়া দেখে নাই, কেবল নিজের অপরিস্ফুটতার ছায়ামূর্তিটাকেই খুব বড়ো করিয়া দেখিতেছে, ইহা সেই বয়সের লেখা।"[৫]

এখানে লেখকের লৌকিক জীবন নয়, এটি কবিব্যক্তিত্ব বা Poetic Personality, যা কিছুটা বাস্তবের সঙ্গে মেলে আবার কিছুটা মেলে না। যে অংশ মেলে সেই অংশে লেখক নিজেকে যা বলে কল্পনা করে ও ঘোষণা করে এটি তাই, আর যে অংশ মেলে না তা কবির সচেতন ইচ্ছার বহির্ভূত শক্তির সৃষ্টি। সচেতন ও

অবচেতনের দুই হাতের সম্মিলনে গঠিত যে কবিব্যক্তিত্ব তাই কবির প্রণিধানযোগ্য। 'কবিকাহিনি' কাব্য রবীন্দ্রনাথের অভিব্যক্তিত্বের প্রথম অস্পষ্ট কাহিনি। এই কারণে রবীন্দ্র-প্রতিভার ইতিহাসে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রমথনাথ বিশীর লেখা 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' গ্রন্থটি রবীন্দ্র-ভাবনার এক অনন্য স্বাক্ষর। যেখানে প্রমথনাথের শান্তিনিকেতন আশ্রমে বসবাসের পরিচয় সুচারুভাবে বিধৃত আছে। সেইসঙ্গে সেখানকার আশ্রমের অনন্য সাধারণ পরিবেশ বালক প্রমথনাথের পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের অভাব মিটিয়ে ছিল এবং যে কারণে প্রমথনাথ ব্যক্তিত্বের গন্ডি ছাড়িয়ে বিশ্বের দরবারে উপনীত হতে পেরেছেন তার কারণ অনুসন্ধানে গ্রন্থটির ভূমিকা অনস্বীকার্য। এখানে ব্যক্তি, শিক্ষক, অভিভাবক, সাহিত্যিক, মনীষী এবং সর্বোপরি বিশ্ববোধের পরম সান্ত্বনার এক অনন্য আশ্রয়স্থল হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে চিহ্নিত করেছেন। প্রমথনাথের চেতন-অবচেতন মনে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি কিভাবে শাশ্বত রাত্রির বুকে অনন্ত সূর্যোদয়ের আবির্ভাব ঘটিয়েছে লেখনীর প্রতিটি ছত্রে ছত্রে তার পরিচয় সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। বলতে গেলে নিবিড়, গভীর, সুদীর্ঘ, কঠোর রবীন্দ্র-সাধনায় একনিষ্ঠ আত্মমগ্ন থেকে সিদ্ধি লাভের উৎকৃষ্ট ফসল এই গ্রন্থটি।

গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র তথা রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। উক্ত গ্রন্থটিতে সাতান্নটি অধ্যায় এবং তেরোটি চিত্র রয়েছে, যেগুলি লেখনীর গভীরতাকে অনেক বেশি সজীব ও প্রাণবন্ত করেছে। এছাড়াও তখনকার শান্তিনিকেতনের গুরুত্বকে তুলে ধরার জন্য ছবিগুলির মূল্য অপরিসীম। বইটিতে প্রমথনাথের শান্তিনিকেতনে আসার প্রথম দিন থেকে শুরু করে সতেরো বছরের বিভিন্ন বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনা ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেছেন। যেখানে 'প্রথম অভিজ্ঞতা', 'প্রাচীন শান্তিনিকেতন', 'রবীন্দ্র-সান্নিধ্য', 'পাঠচর্চার আরম্ভ', 'প্রথম ছুটি', 'প্রথম নাট্যদর্শন', 'শীতের প্রারম্ভ', 'যে-কোনো একটি দিন', 'কাপ্তেনগণ', '৭ই পৌষের উৎসব', 'দুর্দৈব', 'বসন্তরাত্রির বৈতালিক', 'ছাত্র-স্বরাজ', 'সাহিত্যচর্চা', 'পত্রিকাপ্রকাশ', 'অভিনয়প্রসঙ্গ', 'রবীন্দ্রনাথের অভিনয়', 'রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ', 'শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ', 'আরও রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ' প্রভৃতি নামের সমস্ত অধ্যায়গুলির সুন্দর সার্থক উপস্থাপন করেছেন। প্রসঙ্গের সাথে সঙ্গতি রেখে শালবীথিকা, ছাতিমতলা, উপাসনামন্দির, ঘন্টাতলা, ছেলেদের সভা, ঘরের বাহিরে ক্লাস, বীথিকাগৃহ প্রভৃতি ছবিগুলি গ্রন্থের সাহিত্যমূল্যকে যেমন বাড়িয়েছে তেমনই সহৃদয় পাঠকের মনের হৃদয় সিংহাসনে তা শাশ্বতকালীন স্থান গ্রহণ করেছে।

'শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে প্রমথনাথ বিশী রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহে জমিদারি পরিদর্শন (১৮৯১ থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত) ও সেখানকার যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে তুলে ধরেছেন। যেখানে রবীন্দ্রনাথের তিরিশ বছর বয়সের জীবন অভিজ্ঞতার ছাপ স্পষ্ট। ব্যক্তিগত বিষণ্ণতা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির জটিলতায় তাঁর চিত্ত তখন সংক্ষুব্ধ। সেই মুহূর্তে যৌবনের সজন-নির্জনের নিত্য-সংগমে পদ্মার বুকে, প্রকৃতির মধ্যে শুরু হয় তাঁর আশ্রয় অন্বেষণ। কবির নিজের কথায় —

> "কাছারির পরপারের নির্জন চরে বোট লাগিয়ে বেশ আরাম বোধ হচ্ছে। দিনটা এবং চারিদিকটা এমনি সুন্দর ঠেকছে সে আর কী বলব।"[৬]

একদিকে মুগ্ধ কবি-দৃষ্টি অকৃপণ প্রকৃতির সৌন্দর্যে পুষ্ট হয়, অন্যদিকে কৃপণ পৃথিবীতে মানুষের দুঃখ ও দৈন্য সম্পর্কে গল্পকারের রূপকারী বিবেকের চৈতন্যলাভ ঘটে। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের উক্তি —

> "খুব লিখে যেতে ইচ্ছে করছে — কিন্তু আর কিছু নিয়ে নয়, এই জলের শব্দ, এই রোদ্দুরের দিন, এই বালির চর।"[৭]

বস্তুত:পক্ষে জমিদারী পরিদর্শনে এসে কবি পূর্ববাংলার গ্রামীণ পরিবেশের মুখোমুখি হন। এখানেই স্বতন্ত্র বাস্তবতায় তাঁর জীবনবোধ হয় ভূমিসংলগ্ন, প্রসারিত এবং দ্বন্দ্বময়। স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের এই বিশিষ্ট মর্মপাতের ফলেই ছোটগল্পের নর-নারীর মধ্যে লক্ষ্য করা যায় বৈচিত্র্য। কখনও চরিত্রের স্বাভাবিকতার সঙ্গে উদার আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব, কখনও বা পরিবেশের মধ্যে কোন দৃঢ় বন্ধনের অর্গল থেকে বের হওয়ার দ্বন্দ্ব। স্রষ্টার এই উপস্থাপনার কৌশলে বিস্মিত হয়ে কবি-সমালোচক বুদ্ধদেব বসু মন্তব্য করেছেন —

"রবীন্দ্রনাথ ধীরে এগিয়েছেন হঠাৎ কিছু বদল ঘটাতে যান নি।"[৮]

প্রমথনাথ এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ দিনের সঞ্চিত অনেক সকাল দুপুর সন্ধ্যার নানা বিচিত্র মুহূর্তের ঘটনাবলীকে তুলে ধরেছেন। বিশ্বকবি এখানে প্রকৃতির বুকে জীবনের চরম বাস্তবতার দ্বারে উপনীত হয়েছেন এবং এখানকার উন্মুক্ত পরিবেশ থেকে যা সংগ্রহ করেছেন তা যেন এক একটা দুর্লভ সৌন্দর্য, দুরমূল্য সম্ভোগের সামগ্রী, সেগুলো কবির জীবনের অসামান্য উপার্জন। সেই উপার্জিত রবীন্দ্র-জীবনের গভীরে প্রবেশ করে প্রমথনাথ যে অমূল্য নির্যাস সংগ্রহ করেছিলেন তার দ্বারা যেমন নিজে পুষ্ট হয়েছেন তেমনই অপরকে পুষ্ট হতেও সহায়তা করেছেন তারই অভিনব প্রকাশ এই গ্রন্থ।

'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প' গ্রন্থটিতে রবীন্দ্র-ছোটগল্পের সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন প্রমথনাথ বিশী। রবীন্দ্র-ছোটগল্পগুলির মধ্যে পাই সুখদুঃখবিরহমিলনপূর্ণ মানবসমাজে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা। তিনি মানুষের কবি, তাই অন্তরঙ্গভাবে মানুষের প্রসঙ্গ প্রতিটি রচনায় এসেছে, ছোটগল্পগুলিও তার ব্যতিক্রম নয়। রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতাগুলির পরেই রবীন্দ্র-প্রতিভার বিশেষ প্রকাশ হিসাবে তাঁর ছোটগল্পগুলির স্থান। কবির সুদীর্ঘ জীবনে যে সব পরিবর্তন ও ছায়ালোকপাত ঘটেছে সে সমস্তই চিহ্নিত এই গল্পগুলিতে। গ্রন্থটির এক নম্বর পরিচ্ছেদে প্রাবন্ধিক বলেছেন —

> "আমার আলোচনার বিষয় রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প। ছোটগল্প বলিতে এখন বুঝিতেছি, তিন খন্ডে সম্পূর্ণ গল্পগুচ্ছ, সে, গল্পসল্প ও তিনসঙ্গী।"[৯]

যার রচনাকাল ১৮৮৪ সাল থেকে ১৯৪১ সাল। অর্থাৎ কবিজীবনের সাতান্ন বছর পর্যন্ত। অতএব আলোচনার বস্তু-পরিধি দাঁড়ায় ১১৮টি গল্প আর কালপরিধি কবিজীবনের সাতান্ন বছর। কবির এই দীর্ঘ সময়ের রচনাগুলিকে প্রমথনাথ তাঁর নিজস্ব আত্মপ্রত্যয়ে বিশ্লেষণ করেছেন।

এই গ্রন্থটি প্রমথনাথ উৎসর্গ করেছেন শ্রী গজেন্দ্রকুমার মিত্র মহাশয়ের করকমলে। নিবেদন অংশে তিনি রচনাটির সূত্রপাত প্রসঙ্গে বলেছেন 'রবীন্দ্রসাহিত্যে অগাধ প্রীতিই ইহার আসল কারণ'। রবীন্দ্রনাথ উৎকৃষ্ট রূপে সার্থক গল্প রচনা যেমন করেছেন, তেমনই বিষয়বস্তু অনুযায়ী ভাষা ও ভঙ্গিরও পরিবর্তন করেছেন। যা তাঁর রচনা শৈলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ প্রসঙ্গে সজনীকান্ত দাসের মন্তব্য —

> "রবীন্দ্রনাথ ভালো গল্প বলতে পেরেছেন, তার চাইতেও বড়োকথা তিনি গল্পের বিষয়বস্তু অনুযায়ী ভাষা ও ভঙ্গিরও পরিবর্তন করার ক্ষমতা দেখিয়েছেন।"[১০]

রবীন্দ্রনাথের প্রসন্ননির্মল হিউমার সৃষ্টির কৃতিত্ব ও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে অসাধারণ দক্ষতা গল্পগুলির বিষয়বস্তুকে আকর্ষণীয় করেছে। অত্যন্ত কঠিন নির্মম বেদনাদায়ক বিষয়কে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গবিদ্রূপের ভঙ্গিতে উপস্থাপিত করে পাঠকের সহনীয় করে তুলেছেন, অশ্রুসিক্ত অনাবিল ক্রন্দনকে পরিণত করেছেন চাপা দীর্ঘশ্বাসে। অনেকগুলি সামাজিক ও পারিবারিক বহু আধুনিক জটিল সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে তিনি পাঠককে বিবিধ ভাবনার মধ্যে ফেলে আকর্ষণ করে নিয়ে গেছেন। সজনীকান্ত দাসের মতে —

> "তিনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিকবি, গল্প বলতে গিয়ে সেগুলিকে প্রয়োজনীয় স্থলে অপূর্ব কাব্যরসে মন্ডিত করেছেন।"[১১]

নিসর্গলোকের ও মানুষের গহন অন্তর্লোকের খবর এমন সুনিপুণ সহৃদয়তার সঙ্গে দিয়েছেন যে পাঠকের সাধ্য নেই তার প্রভাব থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখে। বাংলা ভাষার ওপর তাঁর অসাধারণ দখল এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। রবীন্দ্র-ছোটগল্পের মধ্যে এমন একটি সূক্ষ্ম ভারসাম্য আছে যা সমশ্রেণীর সাহিত্যিকের রচনায় বিরল।

প্রমথনাথের রবীন্দ্র-ভাবনার অফুরান স্ফুরণ ঘটেছে 'রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ' গ্রন্থে। এই গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের করকমলে। ভূমিকা অংশে মন্তব্য করেছেন —

> "১৯২৬ সালে শান্তিনিকেতনে থাকিবার সময়ে এই গ্রন্থের সূত্রপাত — কিন্তু বর্তমান আকারে ইহা অনেক কাল পরে লিখিত।"[১২]

অর্থাৎ ১৯২৬ সালে গ্রন্থটি রচনার কাজ শুরু করলেও তার পর কিছু সময় কাজ বন্ধ থেকে ১৯৩০ সালে আবার পুরোপুরি গ্রন্থরচনা আরম্ভ হয়ে ১৯৩৪ সালে তা সম্পূর্ণ হয়।

গ্রন্থটি তিনটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বে চারটি, দ্বিতীয় পর্বে পনেরোটি এবং তৃতীয় পর্বে নয়টি পরিচ্ছেদ রয়েছে। তারমধ্যে প্রথম পর্বে — সন্ধ্যাসংগীত থেকে বলাকা পর্বের, দ্বিতীয় পর্বে — 'সন্ধ্যাসংগীত' থেকে 'বলাকা' কাব্যের প্রসঙ্গে আলোচনা, তৃতীয় পর্বে — রবীন্দ্রনাথের ওপর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কবি-সাহিত্যিকদের প্রভাব নিয়ে সুগভীর বিশ্লেষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভার প্রধান ধর্ম মানবমুখীতা। এ গুণটিই প্রমথনাথকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। এ প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি —

> "কালিদাসের পর এত বিরাট মানবমুখী কবিপ্রতিভা আমাদের দেশে জন্মিয়াছেন কি না সন্দেহ।"[১৩]

এখানে ব্যাস-বাল্মীকির প্রসঙ্গ আসেনি, কারণ তাঁরা কালিদাসের পূর্ববর্তী। সেই সময়ের লোকোত্তর কবিরা যে জগতের সৃষ্টি করে গেছেন সেখানে প্রতিভার সাধর্মে ও বিরাটত্বে কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ অতৃতীয়।

গ্রন্থটির মধ্যে রবীন্দ্র-কাব্যরচনার বিভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন, সেই আলোচনার সুবাদে পদ্মা নদীর প্রসঙ্গটি এসেছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে পদ্মা নদী। তাঁর বিভিন্ন কাব্যের অন্তরে সূক্ষ্ম স্বর্ণসূত্রের মত পদ্মার প্রভাব প্রবাহিত। এই নদীটিই একটি আদর্শ সত্তার অখন্ড, অচ্ছেদ্য গতিরূপে সর্বত্র প্রসারিত। মর্ত্যলোকের এই পদ্মাই আদর্শায়িত হয়ে বলাকার আকাশগঙ্গায় পরিণত হয়েছে। ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তশায়ী এই দেশের যে বৈশিষ্ট্য বাংলার প্রাণপ্রতীক এই নদী। পদ্মা বিশেষত বাংলারই নদী, গঙ্গার সাথে যার নাড়ির যোগ আছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের স্বভাব চলতা বা গতি; এই চলতা বা গতিই যেন পদ্মার স্রোতে প্রবাহিত।

প্রমথনাথের প্রতিটি রচনায় রবীন্দ্র-ভাবনার সার্থক প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ভক্ত, পূজারী। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর জীবনের দার্শনিক ও পথ প্রদর্শক। পরবর্তীকালে তাঁর মানস অনুভূতির নানা রদবদল ঘটলেও রবীন্দ্রনাথকে মনের আড়ালে কোনদিন রাখেননি। রবীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্বে সত্য, সৌন্দর্য, শিল্প ও আনন্দ পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কায়িত। রাবীন্দ্রিক বিশ্ববীক্ষায় দৃঢ় বিশ্বাসী প্রমথনাথ নন্দনতত্ত্বে, প্রেম ভাবনায়, সৌন্দর্যবোধে, জীবনবোধে, ধর্মবোধে ও সত্যের সাধনায় তাঁর খুবই কাছাকাছি থেকেছেন। রবীন্দ্রনাথ যেমন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনে আজীবন বিশ্বাসবান ছিলেন তেমনি প্রমথনাথ সেই প্রবাহে সামিল হয়েছেন। প্রমথনাথের কাছে রবীন্দ্রনাথের তাৎপর্য এই যে, তিনি মানবজাতির এক আদর্শ অভিব্যক্তি, এক পরিপূর্ণ ভাবাত্মক সৃষ্টিশীল জীবনের ভাস্বর দৃষ্টান্ত। প্রকৃতপক্ষে তাই প্রমথনাথের জীবনে রবীন্দ্রনাথের গুরুত্ব অনেকান্ত। তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথের অর্থ আনন্দ, তারুণ্য, সৌন্দর্য, কল্যাণবৃত্তি, বিকাশশীলতা, মানবিকতা, সহযোগিতা, সর্ব গ্রহিষ্ণুতা, সমন্বয়, সর্বদেশের ও সর্বকালের মানুষের এক অন্তরতর জাগ্রত মর্মবাণী। আবার জগৎ-জীবন জিজ্ঞাসার এক সত্য ও নিঃশব্দ উত্তর, অন্তর্নিহিত মহত্ত্ব,

প্রজ্ঞার দীপ্তিতে প্রোজ্জ্বল অম্লান আত্মদীপ, স্বদেশের মাতৃমন্দিরের প্রসন্ন হৃদয়, জীবনের সমস্ত সুমন্ত্রণার আধার, বাংলার রেনেসাঁসের পরিপূর্ণতা, আত্মজিজ্ঞাসার যাবতীয় নিরসন, আত্মোপলব্ধির প্রেরণা, দেশ ও বিশ্বসঙ্কটের মাঝে মানবিকবোধের প্রতিষ্ঠার অফুরন্ত বিশ্বাস, মুক্ত পুরুষের দৃষ্টান্তে লক্ষ্য মুক্ত পুরুষের আবাহন, জীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশের সুষ্ঠু অনুশীলন, প্রকৃতি ও মানব সংসারকে অন্তরে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অনুধাবন, সত্যের সৌন্দর্যকে অন্তর্ধারায় অনুভব, সারা পৃথিবীকে অন্তরের কেন্দ্রবিন্দুতে পরম আশ্রয়ে গ্রহণ, স্বদেশের বিপুল ধারাবাহিক ঐতিহ্যের মিলনসূত্র, মানুষের ভবিষ্যতমুখী সমাজ গঠনের শুভবুদ্ধি, বিশুদ্ধ শব্দের ভেতরে রসাস্বাদন ও সেইসঙ্গে মানুষের মনুষ্যত্বের প্রতি কল্যাণকামী আদর্শে দৃঢ় বিশ্বাস ও আস্থা। সর্বোপরি প্রমথনাথের অন্তরে রবীন্দ্রনাথ এক অমূল্য,অমর বাণীস্বরূপ। তাই সমগ্র জীবন তিনি রবীন্দ্র-সাধনা ও অর্চনায় নিয়োজিত করেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. বিশী, প্রমথনাথ। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন। বিশ্বভারতী, আষাঢ় ১৩৫১, কলকাতা ৭, পৃ. ৯।
২. তদেব, পৃ. ১২।
৩. তদেব, পৃ. ৪৯।
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। জীবনস্মৃতি। সাহিত্যম্, মাঘ ১৪১০, কলকাতা ৭৩, পৃ. ১৩৩।
৫. বিশী, প্রমথনাথ। রবীন্দ্র-সরণী। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ফাল্গুন ১৪২৩, কলকাতা ৭৩, পৃ. ৪৬।
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ছিন্নপত্র। বিশ্বভারতী, আষাঢ় ১৪২২, কলকাতা ১৭, পৃ. ৬১।
৭. তদেব, পৃ.৬১।
৮. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ। বাংলা সাহিত্য পরিচয়। তুলসী প্রকাশনী, ১৯৯৯, কলকাতা ৯, পৃ. ৬১৬।
৯. বিশী, প্রমথনাথ। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কার্তিক ১৪২৪, কলিকাতা ৭৩, পৃ. ৩।
১০. দাস, সজনীকান্ত। রবীন্দ্রনাথ জীবন ও সাহিত্য। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯১, কলকাতা ২০, পৃ. ১৭১।
১১. তদেব, পৃ. ১৭২।
১২. বিশী, প্রমথনাথ। রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৪২১, কলকাতা ৭৩, পৃ. ১।
১৩. তদেব, পৃ. ১।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1704-1710
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.392

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ‘দীপ জ্বেলে যাই’: অভিনয়ের আড়ালে এক নারীর ভালোবাসা ও আত্মত্যাগের গল্প

রাধা গোবিন্দ নসিপুরী, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি, অসম, ভারত*

Received: 25.03.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Ashutosh Mukherjee was one of the greatest fiction writers in the 20th-century Bengali Literature. His story ‘*Deep Jwele Jai*’ created a lot of sensation at that time. The narrative of this text revolved around a mental hospital and a nurse. The chief medical officer of this hospital was Colonel Pakrashi. He was a psychiatrist. Three of his patients suffered from mental disorder due to trauma of betrayal in love. He was running an experiment to treat these three patients. The new experiment of Dr. Colonel was to cure the patients by an act of romantic love. Since they had lost their mental stability through betrayal in love, it was only the play-acting of love that could bring them back to their normal state. The nurse Rekha Mitra was assigned the duty of curing them back to normalcy through a romantic play-acting. She has made the new experiment successful by curing the two patients Samaresh Chakraborty and Madhav Some. Next arrived Amar Dutta who had the same history of losing mental balance due to betrayal in love. Rekha Mitra has cured him as well through her love and nursing. From the viewpoint of Dr. Colonel and other nurses she has done a role-playing in this case, but in reality, she cured each of these patients through real love and sacrifice without paying any heed to Colonel’s medical instructions. It is as if she lighted the lamp of love and affection within her heart and helped the patients to transcend the world of darkness and reach the world of light. She did not get any reciprocation from any of these persons and hence she turned a mental patient herself in that hospital. This paper attempts to analyze and find how Rekha Mitra’s emotions of love and sacrifice transcended her ability of role-playing.

Keywords: Deep Jwele Jai, Mental Hospital, Mental Patients, Nurse, Role-playing, Love, Sacrifice, Cure

খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আবির্ভাব ১৯২০ সালের ৭ সেপ্টেম্বর ঢাকার বিক্রমপুরের মুখোপাধ্যায় বংশে। পিতা পরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মাতা তরুবালা দেবীর পঞ্চম সন্তান ছিলেন তিনি।[১] স্বাধীনতা পরবর্তীকালের বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় একজন কৃতী লেখক। শরৎচন্দ্রের ‘পথের দাবী’, তারাশঙ্করের ‘কালিন্দী’ এবং ইংরেজি বই ‘ইটারন্যাল সিটি, ও ‘ওয়ার ওয়াইন অ্যান্ড উইমেন’ এই চারটি বই পড়ে তাঁর লেখক সত্তার জাগরণ হয়েছিল। তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের নাম ‘কালচক্র’। উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে ‘জীবনতৃষ্ণা’, ‘কাল তুমি আলেয়া’, ‘নগর পারে রূপ নগর’, ‘সোনার হরিণ নেই’,

পর কপালে রাজারাণী', 'পঞ্চতপা' ইত্যাদি। প্রাণতোষ ঘটকের প্রেরণায় ও উৎসাহে মাসিক 'বসুমতী' পত্রিকায় লিখলেন 'নার্স মিত্র' (রচনাকাল ১৯৫১-১৯৫৩) গল্প। যেটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প। 'দীপ জ্বেলে যাই' গল্পটি নেওয়া হয়েছে লেখকের 'রূপসী বাংলার মুখ' (১৯৯১) গল্পগ্রন্থ থেকে। গল্পটির পুর্ববর্তী নাম ছিল 'নার্স মিত্র'। পরবর্তীকালে গল্পটির নাম পরিবর্তিত করে 'দীপ জ্বেলে যাই' রাখা হয়।

> "বাংলা সাহিত্যের পূর্বসূরী দু'জন লেখকের রচনা তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। একজন শরৎচন্দ্র (১৮৭৬-১৯৩৮), অন্যজন তারাশঙ্কর (১৮৯৮-১৯৩৯)। উভয়ের সাহিত্য যে মানবিক মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেই মানবিক মূল্যবোধে আশুতোষ উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।"[২]

যে মানবিক মূল্যবোধ তাঁর সাহিত্যের অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা একটি অন্যতম ছোটগল্প 'দীপ জ্বেলে যাই'। আধুনিক সাহিত্যে নারীকে নিয়ে অনেক কিছুই লেখা হয়েছে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সৃষ্ট এই চরিত্রটি আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ব্যতিক্রমী এক নারী চরিত্র। গল্পে যে নারীর অভিনয়ের আড়ালে ভালোবাসা ও আত্মত্যাগের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে তার নাম রেখা মিত্র। সে মেন্টাল অবজারভেটরির একজন বড়ো নার্স। মনোবিজ্ঞানী কর্নেল পাকড়াশী এই অবজারভেটরির একজন বড়ো ডাক্তার। আর তাঁর একজন প্রধানা সহায়িকা হল নার্স রেখা মিত্র। মানসিক হাসপাতালকে কেন্দ্র করে তার দৈনিক কর্মযজ্ঞ গল্পে উঠে এসেছে। প্রসঙ্গত বলে রাখি, গল্পে 'মেন্টাল-অবজারভেটরি' এবং 'মানসিক হাসপাতাল' দুটি কথাই ব্যবহৃত হয়েছে। এই অবজারভেটরিতে ডাক্তার কর্নেল এক নতুন এক্সপেরিমেন্ট করার চেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন। সেটি হল মানসিক রোগীদের প্রেম ও ভালোবাসার অভিনয়ের দ্বারা তাদের সুস্থ এবং আরোগ্য করে তোলা। গল্পে তিনজন এমন রোগীর কথা পাওয়া যায়, যারা তাদের ভালোবাসার নারীদের অমোঘ স্মৃতি ভুলতে না পেরে প্রত্যেকেই মানসিক রোগী হয়ে গেছে। এদের যে কারণে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঠিক সেই ভালোবাসার সুনিপুণ অভিনয়ের দ্বারাই তাদের আরোগ্য করার পরিকল্পনা করেন ডাক্তার কর্নেল। এই কাজে একমাত্র সহায়ক ভূমিকা নিয়েছে নার্স মিত্র। যার সুনিপুণ অভিনয়ের দক্ষতার জন্যই দু দু'জন রোগীর পরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু যে বিশেষ দিকটি এ গল্পের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে তা হল নার্স রেখা মিত্রের ভালোবাসার অভিনয় নয়, রোগীদের প্রতি তার সত্যিকারের ভালোবাসা এবং আত্মত্যাগ। কেননা নার্স মিত্র সবার চোখে হয়তো ভালোবাসার নিপুণ অভিনয় করেছিল কিন্তু সে জানত শুধু অভিনয় নয়, তাদের মানসিক প্রশান্তি আনার জন্য অন্তরের ভালোবাসা দেওয়াটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। নার্স মিত্রের হৃদয়ে কখনো সখনো প্রেমের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের যে আলপনা অঙ্কিত হয়েছে সে দিকগুলি বিশ্লেষণ করলে সাধারণ দুঃখ-বেদনার পাশাপাশি আমরা ভালোবাসার অরুণোদয়ের বিশেষ দিকটিই ব্যঞ্জিত হতে দেখব গল্পের শেষে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সৃষ্ট এই নারী চরিত্র নিজের জীবনের দীপশিখা জ্বেলে অপর জীবনের অন্ধকার যেভাবে আত্মত্যাগ ও ভালোবাসার মাধ্যমে পূর্ণ করেছে সে নারী নিশ্চয় অভিনয় করতে জানে না। তারও ভালোবাসার মতো হৃদয় আছে, আর সে হৃদয়-নীড়ে প্রেমও আছে। উপযুক্ত পাত্র পেলে সেখানে কেবল অভিনয় নয় প্রকৃত ভালোবাসা পুষ্প হয়ে ফুটে উঠে। কিন্তু নিজের জীবনের সমস্ত কিছু দিয়েও নার্স মিত্র ভালোবাসার ব্যক্তিটিকে কাছে পেল না। কেননা সে যে সবার চোখে ভালোবাসার কেবল অভিনয় করেই তিনজন মানসিক রোগীকে সুস্থ করেছে। তাদের দৃষ্টিতে সে কি সত্যি ভালোবাসতে পারে? শেষপর্যন্ত সে নিজেই হাসপাতালের তৃতীয় রোগী অমর দত্তকে আপন করে না পেয়ে একজন মানসিক রোগী হয়ে গেছে। তার ভালোবাসা ও আত্মত্যাগের দিকটি আবেগঘন ভাষায় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রস্ফুটিত করলেন 'দীপ জ্বেলে যাই' গল্পে। বাংলা সাহিত্যে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করল এই গল্প।

গল্প শুরু হচ্ছে এক মেন্টাল অবজারভেটরি বা মানসিক হাসপাতালের বর্ণনা দিয়ে। ঝকঝকে একটা বাড়ি। পুরুষ মহিলা মিলিয়ে মোট চল্লিশেক রোগী আছে এখানে। সবার মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণ এক নয় তাই চিকিৎসা ব্যবস্থাও তাদের ভিন্ন। বিশেষত গল্পকার এ কাহিনিতে প্রেম-ভালোবাসার বিচ্ছেদ জনিত কারণে যে মস্তিষ্ক বিকৃতি চিকিৎসা ব্যবস্থার সেই দিকটি গল্পে তুলে ধরেছেন। এই মানসিক হাসপাতালে নার্সের চাকরি করে রেখা মিত্র। সে বর্তমানে এখানে নতুন সিস্টার ইনচার্জ হয়ে এসেছে। অন্যান্য নার্সদের দৃষ্টিতে সে আগের ইনচার্জের চেয়ে ভালো এবং দরকার মতো তাকে দু-একটা কথাও বলা যায়। চ্যারিটি মিশনের মেয়ে না হলে এতদিনে সে বাড়ি-গাড়ির মালিক হয়ে যেত এ কথা তারা উপলব্ধি করে। এ থেকে বোঝা যায় যে সে একজন নিঃস্বার্থ সেবিকা।

হাসপাতালের বড়কর্তা হলেন মনস্তাত্ত্বিক কর্নেল পাকড়াশি। এই পাকড়াশির দু'দুটো উদ্ভট এক্সপেরিমেন্ট সফল করেছে রেখা মিত্র। উদ্ভট এক্সপেরিমেন্টটি হল মানসিক রোগীদের ভালোবাসার অভিনয় করে সুস্থ করে তোলা। হাসপাতালে আসা সমরেশ চক্রবর্তী ও মাধব সোম মানসিক রোগের স্বীকার। যে ভালোবাসার অমোঘ স্মৃতি তাদের মস্তিষ্ক বিকারের কারণ হয়েছে সেই ভালোবাসাই পারে তাদের সুস্থ এবং নিরাময় করে তুলতে। সেজন্য ভালোবাসার অভিনয় একমাত্র পথ। এটাই কর্নেলের নতুন প্ল্যান। এই প্ল্যান অনুযায়ী সে কর্নেলের নির্দেশ মতো নিঁখুত অভিনয় করে পর পর দু'বছরের মধ্যে দু'জন মৃত্যুপথযাত্রী মস্তিষ্ক বিকৃতির মানুষকে আরোগ্য করে তুলেছে কোনো ভুলত্রুটি ছাড়াই। এরপরই এখানে তৃতীয় রোগীর আবির্ভাব ঘটল। যার একই রোগ এবং একই কারণে মস্তিষ্ক বিকৃতি। তাই কর্নেল আগ্রহের সঙ্গেই রেখা মিত্রকে ডাক পাড়েন। এই তৃতীয় রোগীকে নিয়েই গল্পের কাহিনিবৃত্ত প্রস্ফুটিত হয়েছে। রেখা মিত্রের অন্তরের অন্তঃকরণকে জানতে হলে এই তৃতীয় রোগীর এক্সপেরিমেন্টকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা অংশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম দুই'জন রোগীর প্রতি ভালোবাসার অভিনয়ের মাধ্যমে সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তোলার বর্ণনা সামান্যই পাওয়া যায় গল্পে। তৃতীয় রোগীর প্রতি একদিকে সেবাযত্ন, ভালোবাসার অভিনয় এবং অন্যদিকে তার প্রতি সত্যিকারের ভালোবাসা সূক্ষ্মভাবে মিশে গেছে গল্পের শিকড়ে। মানসিক হাসপাতালে আসা প্রথম ও দ্বিতীয় রোগীর নাম সমরেশ চক্রবর্তী ও মাধব সোম। এদের মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণ গল্পে সরাসরি উল্লেখ না থাকলেও তখন বোঝা যায় যখন তৃতীয় রোগী অমর দত্ত হাসপাতালে ভর্তি হয়। নারীর ভালোবাসার অমোঘ স্মৃতি তাদের এমন পরিস্থিতির কারণ। তারা দুজনেই ছিল সুপুরুষ। পাগল অবস্থায় বীভৎস আচরণ করত। কিন্তু রেখা সে সবের তোয়াক্কা না করে তার রূপ-গুণের মাধুর্যে ভালোবাসা দিয়ে তাদের ভালো করে তোলে। দ্বিতীয় রোগী মাধব সোমের চিকিৎসার ভার কর্নেল প্রথম দিয়েছিলেন অপর এক নার্স বীণা সরকারকে। প্রাণপণ চেষ্টা করেছে কর্নেলের নির্দেশ কলের মতো মেনে চলতে। কিন্তু তবুও সে অসমর্থ হয় তাকে স্বাভাবিক করে তুলতে। তার

> "অভিনয়ে এতটুকু ফাঁক বা ফাঁকি ছিল না তারও। তবু পারল না। তাকে সরিয়ে কর্ণেল রেখাকে নিয়ে এলেন আবার। এখনো ভেবে পায় না, সেই মুমূর্ষু উন্মাদকেও সে কি করে ছ'মাসের মধ্যে একটু একটু করে সম্পূর্ণ নীরোগ করে তুলল।"[৩]

বীণা যা পারেনি রেখা তা সম্ভব করে দেখিয়েছে। বীণা কৃত্রিম ভালোবাসায় ফাঁক রাখেনি ঠিকই, কিন্তু তাতে রোগীর মনের কাছাকাছি আসতে ব্যর্থ হয়েছে। অকৃত্রিম ভালোবাসায় রোগীর মনের কাছাকাছি আসা সম্ভব যেটা রেখা সাফল্যের সঙ্গে করেছে। 'ভালোবাসি প্রিয়তম, আগের সব কথা ভোলো'— এমন মিষ্টি সংলাপ এবং ভালোবাসার অভিনয় তো পুরুষের মন জয় করবেই। সাধারণের চোখে সে অভিনয় করেছে কিন্তু আসল সত্য হল রোগীর প্রতি তার অন্তরের ভালোবাসাটি। এই দু'জন রোগী সুস্থ হয়ে চলে যাওয়ার সময় রেখা মিত্রকে বলে গেছে প্রাণের জন্য চিরকাল তারা কৃতজ্ঞ থাকবে। এতে সে কোন ভ্রূক্ষেপ করেনি।

তৃতীয় রোগী এসে পড়েছে তাই নিয়ম মতো আবার ডাক পড়েছে নার্স রেখা মিত্রের। নিখুঁত অভিনয় করতে হবে তাই প্রয়োজন সুন্দর বেশবাস ও প্রসাধনের। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখতে দেখতে আত্মবিস্মৃত তন্ময়তা এল তার। নিজের রূপ দেখে নিজের ওপরই বিস্ময় এল। আবার ডাক পড়ল তার। কর্নেল তাকে বললেন, 'এ থার্ড কনসিকিউটিভ সাকসেস উইল মেক ইউ এ ফিনিসড এ্যাকট্রেস'— যার বাংলা 'উপর্যুপরি আসা তিনটি সাফল্য তোমাকে একজন সম্পূর্ণ অভিনেত্রী করে তুলবে'। তৃতীয় রোগীটি স্বভাব চরিত্রে একটু আলাদা। রোগীর নাম অমর দত্ত। নাটক নভেল কি সব লেখে। টাইপ করা কেস হিস্ট্রি বাড়িয়ে দিলেন তার দিকে। সেগুলোর এক অক্ষরও পড়ল না কেননা সে জানে এসবে আর রোগী ভালো হবে না। তাকে নতুন করে রোগে ফেলতে হবে এবার— ভালোবাসার রোগ। সুলেখা নামের এক নারীর অমোঘ স্মৃতি তার মনকে বিকল করেছে, দুর্বল করেছে সেই স্মৃতি মূলশুদ্ধ উপড়ে ফেলতে হবে। যে নারীর ভালোবাসার স্মৃতি তার মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণ হয়েছে সেই ভালোবাসা দিয়েই তার মনে নতুন স্মৃতি তৈরি করবে রেখা মিত্র। কিছুদিনের জন্য তার মানসপটে অধিষ্ঠাত্রিণী হবে সে। প্রাথমিক চিকিৎসা এটুকুই। তারপরের কাজ ডাক্তার কর্নেলের। দরজার বাইরে থেকে কোন সাড়া না পেয়ে রেখা দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করল। বাহুতে হাত ঢেকে শুয়ে আছে অমর দত্ত। পায়ের শব্দে সাড়া পেয়ে নমস্কার জানাল। আগের দু'জন রোগীর কাছে যাওয়াটা নিরাপদ ছিল না প্রথম প্রথম। এই রোগীটির ব্যবহার বেশ ভালো। রকিং চেয়ারে বসে অপেক্ষা করতে থাকল কথা বলার জন্য। কিন্তু আধ ঘন্টা কেটে গেলেও কোন সাড়া পাওয়া গেল না তার। রেখার অপেক্ষা কেবল রোগীর মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করে তার মনের মধ্যে জায়গা করে নেওয়া। এ রেখার কর্তব্য রক্ষার লড়াই। যে কিনা অপরের জীবনে আলো জ্বেলে দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করে আছে নিজের জীবনের কথা না ভেবে।

রোগী অমর দত্ত সাহিত্যচর্চা করে। সে কোন একটি কবিতার লাইন মনে করতে না পেরে নার্স রেখা মিত্রকে জিজ্ঞাসা করে। নার্স উত্তর দিতে না পারলে নিজের অজান্তে সে বলেছে সুলেখা কিন্তু ফস করে বলে দিত। নিজের মুখে সুলেখা নাম শুনেই সে ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো চমকে ওঠে। পাগলের মতো আচরণ করতে থাকে। সুলেখার ছবি মনে ভেসে উঠতেই রেগে গিয়ে নার্সকে রুম থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছে এবং বলেছে সে আর মেয়েদের দেখতে চাই না। রেখা মিত্র কিন্তু অপমান গায়ে না মেখে তেমনি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে রোগীর রূপান্তরটা উপলব্ধি করার জন্য। উত্তেজনা কমানোর জন্য একটু পরে তার ঘরে এসে ইনজেকশন দিয়েছে। চলে না গিয়ে নীরবে সেবা করেছে তার। লেখকের মতে এর পরের দু'তিন মাসের চিকিৎসা পর্বে নতুন কিছু বর্ণনার নেই। কেবল:

> "এক নারীর স্মৃতি মনে এলেই অমর দত্ত চিৎকার-চেঁচামেচি করে ওঠে তেমনি, নিঃস্ব হিমশীতল জীবনের হাহাকারে জলে-পুড়ে খাক হয়ে যায়। রেখা কখনো ঘর ছেড়ে চলে যায় তার কথা মত, কখনো বা উল্টে ধমকে ওঠে সুষ্ঠু অভিনেত্রীর মত, কখনো বা প্রণয়িনীর আকুলতায় কাছে এসে গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। শেষের দিকে একটু পরিবর্তন যেন উপলব্ধি করতে পারে। তর্জন-গর্জন তেমনি আছে, কিন্তু বেশিক্ষণ সে অনুপস্থিত থাকলে অসহিষ্ণুতাও বাড়ে।"[৪]

এ থেকে বোঝা যায় যে নার্স মিত্র অভিনয় নয় প্রণয়িনীর আকুলতায় রোগীর অনেকটা কাছাকাছি আসতে পেরেছে। মানসিক রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থায় রোগীর মনে মধুর একটা জায়গা করে নেওয়া খুব প্রয়োজন, যেটা করতে সে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে।

যখন প্রেমের আঘাতে পুরোনো স্মৃতি থেকে জন্ম নেওয়া রোগ তখন সেই প্রেমই পারে রোগীকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক করে তুলতে। তাই রোগী তাকে ঘর থেকে বের করে দিলেও সে আবার তার ঘরে যাওয়া আসা শুরু করে। সে মনকে বোঝাতে চেষ্টা করে দিন বদলাবে এবং অমর দত্ত ভালো হবে এই বিধিলিপি। আরও মাস

দুই পরের সেই বিশেষ মুহূর্তটির অপেক্ষা শুধু। রোগী পাশের চেয়ারে বসে থাকা নার্স রেখার দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখতে থাকে। রোগীকে নতুন প্রেমের জগতে আনতে কর্নেলের নির্দেশ মতো সে সিনেমায় অভিনীত নায়িকার মতো প্রেমের সম্পর্ক নয়, অন্তরের অকৃত্রিম ভালোবাসার দ্বারাই উত্তরণের সোপানে পৌঁছে যেতে চেয়েছে। তার জন্য এতটা করেন কেন? অমর দত্ত এ কথা জানতে চাইলে নার্স মিত্র বলেন: "আপনি একজন এত বড় লেখক, আপনার জন্য করব না তো কার জন্য করব! কত লোক কত কিছু আশা করে আপনার কাছে।"[৫] একথা শুনে রোগী অমর দত্ত আর্তকণ্ঠে বলে এগুলো সুলেখার কথা। সুলেখা বলত তার মতো লেখক নেই, তার জন্য সব পারা যায়, সে গরীব ইত্যাদি। বোঝা যায় আর পাঁচজন নার্সদের মতো সে শুধুই তার সেবা করেনি, ভালোবাসার মোহে তাকে আকৃষ্ট করে ফেলেছে। রোগী তাই রেখার আকুলতার মধ্যে সুলেখার আকুলতার ছবিই দেখতে পেয়েছে। এরপর রেখা তাকে যত্ন করতে শয্যায় ঠেস দিয়ে বসে। শুভ্র, নিটোল দুই হাত দিয়ে মুখখানা ঘুরিয়ে দেয় নিজের দিকে। আরও কাছে ঝুঁকে গিয়ে উভয়ে কয়েক মুহূর্ত দৃষ্টি বিনিময় করে।

নিবিড় স্পর্শের আশ্রয়ে রোগীর পুরোনো স্মৃতিগুলো মিলিয়ে যায়। অশান্ত রোগী শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। এরপর রেখা মিত্র তাকে নিয়ে বাইরে বেড়ানো, সিনেমা দেখা, থিয়েটার দেখা প্রভৃতি করেছে নিপুণ অভিনেত্রীর মতো। তারপর অমর দত্ত সুস্থ এবং স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। তাকে কর্নেল পাকড়াশির কাছে নিয়ে আসা হয়েছে। কর্নেল এবার রীতিমতো রোগীর প্রেমের ঘোর কাটানোর জন্য তার রোগজীর্ণ প্রতিচ্ছবিটি দেখিয়েছেন। আর পাগলামোর কিছু কিছু রেকর্ডও শুনিয়েছেন যাতে রোগীর ঘোর কেটে যায়। আসলে মানসিক রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থায় প্রেমের অভিনয় করার পরবর্তী ধাপে এসবই করা হয়। যাতে রোগীরা আসল বাস্তবতাটুকু বুঝতে পারে। রেখা মিত্রের দ্বারা আগের দুই রোগীর এবং নিজের আরোগ্য লাভের সব ঘটনাই অমর দত্ত শুনল।

চলে যাওয়ার সময় অমর দত্ত নার্স রেখা মিত্রের সঙ্গে দেখা করে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেছে: "যাবার সময় হল, এই জন্যেই ডেকেছিলাম।...আপনাকে চিরকাল মনে থাকবে আমার।"[৬] একথা আগের রোগী সমরেশ চক্রবর্তী এবং মাধব সোমও বলেছিল। রেখা হেসে জবাব দেয়, 'সেটা কি খুব ভালো কথা হবে? তার এ কথার মধ্য দিয়ে এটাই অনুভব করা যায় যে, মনে কেউ রাখে না, আগের দু'জনও রাখেনি, অমর মিত্রও রাখবে না। কিংবা রেখা শুধু 'মনে রাখার' কথায় সন্তুষ্ট হয়নি কেননা কত মনে রাখার বিষয় মানুষ মনে রাখে না। নিছক কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য মানুষ বড়ো বড়ো বিশেষণ ব্যবহার করে বলে থাকে—আপনাকে আমার চিরকাল মনে থাকবে, আমি আপনার প্রতি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব ইত্যাদি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতার কথায় বলা যায়:

> "কেউ কথা রাখে নি, তেত্রিশ বছর কাটলো, কেউ কথা রাখে নি...
> কেউ কথা রাখে নি, তেত্রিশ বছর কাটলো, কেউ কথা রাখে না!"[৭]

রেখা মিত্র কেবল কৃতজ্ঞতাই আশা করেনি, সে একটু ভালোবাসা আশা করেছিল। নিজের রূপলাবণ্য ও ভালোবাসা দিয়ে সে তাদের আরোগ্যের জগতে ফিরিয়ে এনেছিল কিন্তু তার মনের ব্যথাটা কেউ বুঝতে পারেনি, বোঝার চেষ্টাও করেনি। মনে রাখার কথা বললেও তাদের মন থেকে কোন তিমিরে হারিয়ে গেছে রেখা মিত্র। রেখা মিত্রের মনের ভাষাকে বুঝতে হলে আমাদের গল্পের প্রথম অংশে ফিরে যেতে হবে যখন হাসপাতালে সদ্য তৃতীয় রোগী এসে পৌঁছেছে। তারপর রীতিমতো তলব পড়েছে তার। কর্নেলের তলব উপেক্ষা করা কারোর সাধ্য নেই তাই সে ঘরের দরজা বন্ধ করে কী করছে সবার সন্দেহ হয়:

> "কিন্তু রেখা মিত্র কিছুই করছে না। শিথিল আলস্যে স্রেফ শুয়ে আছে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে। বুকের ওপরের বইখানা দেখলেও সহকর্মিণীরা হাঁ করে ফেলত হয়ত। বিবেকানন্দের

> কর্মযোগ। তুলে নিল। উল্টে-পাল্টে দেখল একবার। হঠাৎ ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে।... চোখের সামনে ভাসছে দুটি মুখ। সমরেশ চক্রবর্তী আর মাধব সোম।"[৮]

লেখকের এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে রেখা মিত্রের অন্তরের অভিব্যক্তিকে বুঝে নিতে হবে। শিথিল আলস্যে বিছানায় বুকের উপর বই নিয়ে শুয়ে থাকা এবং কর্মযোগের মতো বইকে ছুঁড়ে ফেলা স্বাভাবিক বিষয় নয়। পরক্ষণেই সমরেশ ও মাধবের দুটি মুখ ভেসে উঠে সে যাদের ভালোবেসেছিল। স্বাভাবিক দৃষ্টিতে সে অভিনয় করলেও অভিনয়ের আড়ালে সে সত্যিই ভালোবেসেছিল তাদের। আবার গল্পের মাঝামাঝি অংশে অমর দত্তের শুশ্রূষা চলাকালীন পর্বে তার কিছু আচরণ লক্ষ করার মতো। তার ঘর ছেড়ে চলে যাওয়া, সুষ্ঠু অভিনেত্রীর মতো ধমকে ওঠা, আবার কখনো প্রণয়িনীর আকুলতায় কাছে এসে গায়ে হাত বুলিয়ে দেওয়ার মধ্যে ভালোবাসার সূক্ষ্ম অনুভূতিটা উপলব্ধি করা যায়।

গল্পের প্রায় শেষ অংশে অমর দত্ত রেখা মিত্রের সঙ্গে দেখা করল এবং নমস্কার প্রদান করে চলে গেল। এখানেই কিন্তু গল্পকার গল্প শেষ করেননি। এখানে অমর দত্তর কাহিনি শেষ হয়েছে কিন্তু রেখা মিত্রের কাহিনি নয়। গল্পের চূড়ান্ত মুহূর্তে গল্পকার বলেছেন:

> "অনেক, অনেক দেরীতে জেনেছে বীণা সরকার, বেখা মিত্রর রোগী ভালো করবার রহস্যটুকু কি! অনেক, অনেক দেরীতে জেনেছেন মনোবিজ্ঞানী কর্ণেল পাকড়াশী, কোন নির্দেশই তাঁর মেনে চলেনি রেখা মিত্র। অনেক, অনেক দেরীতে জেনেছে বাকি সকলে, রেখা মিত্র রোগী ভাল করেছে, ফাঁকি দিয়ে নয়, ভালবাসার অভিনয় করে নয়, সত্যিকারের ভালবেসে। পর-পর তিন জনকেই।"[৯]

অর্থাৎ এ থেকে এটুকু স্পষ্ট যে রেখা মিত্র মনোবিজ্ঞানী কর্নেল এবং অন্যান্য নার্সদের দৃষ্টিতে ভালোবাসার অভিনয় করে আরোগ্য করে তুললেও সে কিন্তু প্রকৃত ভালোবাসা দিয়েই তাদের এক একজনকে কাছে টেনে নিয়েছিল। ভালোবাসার বিচ্ছেদজনিত কারণে সমরেশ, মাধব এবং অমরের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল, শেষপর্যন্ত প্রকৃত ভালোবাসার ছোঁয়ায় তারা একে একে আরোগ্য লাভ করল। কর্নেলের অনেক অনেক দেরিতে জানা এবং তাঁর নির্দেশ না মেনে চলার মধ্যে ইঙ্গিত করছে গল্পের সেই অংশটি, যখন তিনি বলেছিলেন 'এ থার্ড কনসিকিউটিভ...'। অমর দত্তের শুশ্রূষা করার সময় সেই কথা মনে করে হঠাৎ কর্নেলের উপর রেগে আগুন হয়ে গেছিল রেখা মিত্র। কেননা অমর দত্তের মতো রোগীরা ভালো কি মন্দ সে কথা একবারও তার মনে আসেনি। সে শুধু ভেবেছে তাদেরই একজনের মতো মেয়েদের জন্য এই মানুষটার এমন পরিণতি। তার এমন ভাবনার কারণ অতীতে সুলেখা নাম্নী এক মেয়ে তার মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণ হয়েছে। রেখা মিত্রকে রোগীদের ভালোবাসার মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ করতে হয়েছে বারবার। সে কারোর আদেশ না মেনে নিজের মতো ভালোবেসে গেছে রোগীদের। নিজের অন্তরের ভালোবাসাকে আত্মবিসর্জন করতে হয়েছে পরপর তিনবার। অপর নার্স বীণা যেটা করতে পারেনি সেটা সে করতে সক্ষম হয়েছে ফাঁকি দিয়ে নয়, অভিনয় করে নয়, সত্যিকারের ভালোবেসে। গল্পের একদম শেষে গল্পকার রেখা মিত্র সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তাতে গল্পের ব্যঞ্জনাটি লিপিবদ্ধ হয়েছে: "হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা আর একজন বেড়েছে। রোগী নয়, রোগিণী। সে রেখা মিত্র।"[১০] এ থেকে বোঝা যায় যে, রেখা মিত্র ভালোবাসার ব্যক্তিকে কাছে না পাওয়ার জন্য সে নিজেই একজন মানসিক হাসপাতালের রোগী হয়ে গেছে। কারণ মানসিক রোগীদের সুস্থ করতে গিয়ে যে মানসিক কষ্ট তাকে সহ্য করতে হয়েছে তাতে এমন হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার।

অবশেষে বলা যায় যে, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচিত 'দীপ জ্বেলে যায়' গল্পে আমরা এমন একজন নারীর চিত্র অঙ্কিত হতে দেখলাম যার রোগীর প্রতি অগাধ স্নেহ, ভালোবাসা, দায়িত্ব ও খেয়াল রয়েছে। হাসপাতালের

নার্স রেখা মিত্র শুধু ভালোবাসার অভিনয় নয়, রোগীদের অকৃত্রিম ভালোবাসা দিয়ে আরোগ্যের আলোর জগতে উত্তরণ করতে সক্ষম হয়েছেন। শেষপর্যন্ত গল্পের শেষে দেখা গেল জীবনের সবকিছু দান করে নিঃস্ব এবং রিক্ত হয়ে তাকে হাসপাতালের মানসিক রোগী হয়ে যেতে। দীপের কাজ তো আলো নেওয়া নয়, আলো দিয়ে অন্ধকার দূর করা। তাই বলা যায়, রোগীদের জীবন-অন্ধকারে ভালোবাসার দীপশিখা প্রজ্জ্বলিত করে যে আত্মত্যাগের জীবনবেদ সে রচনা করেছে তাতে 'দীপ জ্বেলে যাই' অভিনয়ের আড়ালে ভালোবাসা ও আত্মত্যাগের সার্থক গল্প হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র:

১. মুখোপাধ্যায়, সর্বাণী। কিছু কথা, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী (খণ্ড ১)। মিত্র ও ঘোষ, জানুয়ারি ১৯৯৬, কলকাতা, পৃ. ৪।
২. মজুমদার, মানস। ভূমিকা, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী (খণ্ড ১৩)। মিত্র ও ঘোষ, আষাঢ় ১৪০৬, কলকাতা, পৃ. ১।
৩. মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী (খণ্ড ৮)। মিত্র ও ঘোষ, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩, কলকাতা, পৃ. ৩৭৮।
৪. তদেব, পৃ. ৩৮১।
৫. তদেব, পৃ. ৩৮২।
৬. তদেব, পৃ. ৩৮৩।
৭. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল। শ্রেষ্ঠ কবিতা। ভারবি, মে ১৯৬০, কলকাতা, পৃ. ৭৬-৭৭।
৮. মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী (খণ্ড ৮)। মিত্র ও ঘোষ, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩, কলকাতা, পৃ. ৩৭৮।
৯. তদেব, পৃ. ৩৮৩।
১০. তদেব, পৃ. ৩৮৩।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1711-1723
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.393

পশ্চিমবঙ্গের প্রথম শ্রেণির শিক্ষা ব্যবস্থায় ‘সহজপাঠ প্রথম ভাগ’কে কেন্দ্রে রেখে ‘আমার বই’ নির্মাণ কৌশল: পর্যবেক্ষণ ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

সেখ সামিম আলি, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 25.03.2026; Accepted: 28.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

First of all, it should be mentioned that ‘Sahaj Path’, written by Rabindranath Tagore, is an integrated book. Here, both prose and poetry are blended to create a mixed structure of language learning. In our analysis, we have observed that even within the prose of ‘Sahaj Path’, there is a resonance of rhythm which can be described as ‘Rhythmic prose’ or ‘Nritya Gadya’. The main reason behind Tagore’s construction of such prose is an attempt to reduce the monotony of prose in accordance with the child’s mind.

For first-grade children, geometric shapes should be taught through coloring activities. However, it should be kept in mind that, except for one or two, most of the shapes should come from the child’s familiar environment. At the same time, a few unfamiliar elements should also be included in early education. Familiar elements increase the child’s interest in learning, while a few unfamiliar ones help initiate new knowledge.

In the first part of ‘Sahaj Path’, Tagore constructed the book using the picture-learning method, and he further evaluated this method in the second part of ‘Sahaj Path’. In this part, such illustrations are provided that children can color themselves—indicating that Tagore had already sown the seeds of what we now call Continuous Comprehensive Evaluation (CCE). In ‘Amar Boi’, too, we can observe a transition from picture-learning methods to activity-based picture work.

Here, a system of familiar, nature-centered education has been established. Overall, the integrated thinking of nature and social awareness found in ‘Sahaj Path’ has been placed at the foundation of ‘Amar Boi’. The joyful learning approach of ‘Sahaj Path’ has been adopted, along with its integrated method of teaching and its stress-free approach to education.

Keywords: Rhythmic prose, Picture-based learning, Amar Boi, Nature-centered, Geometric shape. Sahaj path

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘সহজপাঠ’ বইকে কেন্দ্রে রেখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাথমিক বিদ্যালয় স্তরের প্রথম শ্রেণির ‘আমার বই’ নামক ইন্টিগ্রেটেড পাঠক্রম নির্মাণ করা হয়েছে। আমরা এখানে প্রথম শ্রেণির শিক্ষা ব্যবস্থায় ‘সহজপাঠ’কে কেন্দ্র করে কিভাবে ‘আমার বই’ নির্মাণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করব। আমাদের এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য দুটি, যথা- প্রথমটি হল, কিভাবে ‘সহজপাঠ’ বইকে বাংলা, ইংরেজি ও

গণিত শিক্ষার কেন্দ্রে রাখা হয়েছে এবং তা কতটা যুক্তিসঙ্গত! আর দ্বিতীয়টি হল 'আমার বই' শিশুর বিকাশে কতটা কার্যকর ভূমিকা নিতে পারবে সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করা।

প্রথমেই বলে রাখি 'সহজপাঠ' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত একটি ইন্টিগ্রেটেড বই। এখানে গদ্য ও পদ্য উভয় মিলেমিশে ভাষা শিক্ষার একটি মিশ্র কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। আমরা অনুসন্ধানে লক্ষ্য করেছি যে 'সহজপাঠে'র গদ্যের মধ্যেও ছন্দের এমন একটা অনুরনণ আছে যাকে আমরা নৃত্যগদ্য বা rhythmic Prose বলতে পারি। নামটি নূতন হলেও অবান্তর নয়। নিম্নে নমুনা স্বরূপ বিষয়টি আলোচনা করা হলো-

> "বাদল করেছে। মেঘের রং ঘন নীল। ঢং ঢং ক'রে নটা বাজলো। বংশু ছাতা মাথায় কোথায় যাবে? ও যাবে সংসার-বাবুর বাসায়। সেখানে কংসবধের অভিনয় হবে। আজ মহারাজ হংসরাজ সিংহ আসবেন।"[১]

এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে বাক্যগুলি ছোট ও সহজ বোধের যা শিশু শিক্ষার উপযোগী। পদ্যে যেমন সরাসরি ছন্দ ব্যবহৃত হয়, এখানে তেমন সরাসরি ছন্দ ব্যবহৃত হয়নি। এখানে ছন্দের স্পন্দন ও গদ্যের মাঝখানে একটা আবরণ আছে, যার ফলে শব্দগুলি যেন মৃদুমন্দ গতিতে নৃত্য বা ডান্স করতে করতে এগোচ্ছে; তবে একে গদ্যছন্দ বলাও ভুল হবে; কারণ, গদ্যছন্দে ছন্দ ও গদ্যের মধ্যে কোনও আবরণ থাকে না। গদ্যছন্দ একটি বিশেষ ছন্দ কিন্তু 'নৃত্যগদ্য' কোনও বিশেষ ছন্দ নয়, আসলে এটি একটি বিশেষ ধরনের গদ্য রীতি যার সামান্য দূরেই ছন্দের স্পন্দন বাজছে এবং এই স্পন্দন শুনে কিছু কিছু সাধারণ শব্দ যেন নাচতে নাচতে এগোচ্ছে। যেমন, উপরের নমুনাটিতে যে শব্দগুলি 'নৃত্যগদ্য' তৈরিতে সাহায্য করেছে সেগুলি হল- বাদল, ঘন নীল, ঢং ঢং, বংশু, সংসার বাবুর বাসায়, হংসরাজ সিংহ... ইত্যাদি

এই শব্দগুলিকে আমরা 'শব্দতরঙ্গ' নামে অভিহিত করলাম। অতএব এই শব্দতরঙ্গ গুলি বাক্যের পূর্ববর্তী কিংবা পরবর্তী সাধারণ শব্দগুলিকে নৃত্যের মতো গতিদান করেছে এবং সেই সঙ্গে সামগ্রিক গদ্যটিকে নৃত্যগদ্য বা rhythmic Prose-এ পরিণত করেছে।

এখানে সাধারণ শব্দগুলি হলো- করেছে, মেঘের রং, নটা বাজলো, ছাতা মাথায় কোথায় যাবে? ও যাবে, সেখানে, অভিনয় হবে, ইত্যাদি। এই সাধারণ শব্দগুলি শব্দতরঙ্গের বাজনায় যেন নাচতে নাচতে এগোচ্ছে, এবং পুরো গদ্যটিকে নৃত্যগদ্যে পরিণত করছে।

রবীন্দ্রনাথের এই ধরনের গদ্যনির্মাণের মূল কারণ হলো, শিশু মনের সাপেক্ষে গদ্যের ক্লান্তিকে দূর করার একটা প্রচেষ্টা। নৃত্যগদ্যকে আমরা Activity Based Learning বলতে পারি। কারণ, এই গদ্য পাঠের ফলে শিশুর মনে শিশুর অজান্তেই নৃত্যের আনন্দ প্রবিষ্ট হয়। ফলে শিশুরা একপ্রকার আনন্দপূর্ণ শিক্ষা পায়। এবং তাদের পড়ার প্রতি আগ্রহ বাড়তে থাকে।

আমরা একটু আগেই জেনেছি, রবীন্দ্রনাথের 'সহজপাঠ' গদ্য-পদ্য, কবিতা, ও গল্পের একটি ইন্টিগ্রেটেড বই। এখন আমরা 'সহজপাঠ' থেকে কিছু নমুনা দিয়ে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করলাম। যথা-

> "নাম তার মোতিবিল বহুদূর জল
> হাঁসগুলি ভেসে ভেসে করে কোলাহল
> পাকে চেয়ে থাকে বক চিল উড়ে চলে,
> মাঝরাঙ্গা ঝুপ করে পড়ে এসে জলে"[২]

এটি একটি পদ্যের উদাহরণ। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে গদ্য, পদ্য ও কবিতার সংমিশ্রণে এই গ্রন্থ সৃষ্টি হয়েছে। আর 'সহজপাঠে'র প্রায় প্রত্যেকটি বিষয় শিশুর চেনা-জানা বিষয়কে তুলে ধরা হয়েছে। কারণ, চেনা জানা

বিষয় শিশুর মনের কৌতুহল বাড়ায়, যার ফলে শিশু যে বিষয়টি পড়তে থাকে সেটার সঙ্গে নিজেকে খুব সহজেই একাত্ম করতে পারে।

শিশু শিক্ষা কাঠামোর মূল ভিত্তি হল, শিশুদের কম বেশি চেনাজানা বা অতি পরিচিত বিষয়গুলির সঠিক অভ্রান্ত ও সত্যতা যাচাই করে তবেই সেটা বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

এরপর আমরা 'সহজপাঠ' প্রথম ভাগ থেকে প্রথম পাঠের কয়েক লাইন তুলে ধরে তার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হলো-

> "বনে থাকে বাঘ।
> গাছে থাকে পাখি।
> জলে থাকে মাছ।
> ডালে আছে ফল।
> পাখি ফল খায়।
> পাখা মেলে ওড়ে।"[৩]

এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, এই লেখাটি আসলে পদ্য নয়, আসলে এর অন্ত্যে মিল নেই। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ বুঝেই এই ধরনের গদ্য নির্মাণ করেছেন। শিশুরা পদ্য বেশি ভালোবাসে কিন্তু শিশুদের জন্য বা তার পরবর্তী জীবনে ক্লান্তিকর গদ্য তাদের একান্ত প্রয়োজন আছে। তাই একজন শিশু যখন তার পরবর্তী জীবনে গদ্যের ক্লান্তিকে দূর করতে পারে তার জন্য রবীন্দ্রনাথ এই ধরণের গদ্য নির্মাণ করেছেন। আসলে গদ্যটি হলো পদ্যের চেহারায় নৃত্যগদ্য। আমরা পূর্বে এই গদ্য সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করেছি।

এখন আমরা আলোচনা করব রবীন্দ্রনাথের 'সহজপাঠ'কে কেন্দ্রে রেখে কীভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিশেষজ্ঞ কমিটি প্রথম শ্রেণির জন্য 'আমার বই' নামক ইন্টিগ্রেটেড বইটির নির্মাণ করেছেন! এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ কমিটি শিখন পরামর্শে কী জানিয়েছেন একটু জেনে নেই। যথা-

> "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সহজপাঠ' প্রথম ভাগ রয়েছে এই সমন্বিত শিখন পরিকল্পনার কেন্দ্রে প্রথমাংশের প্রস্তুতি পর্বের শেষ বইটিতে যে পাঠগুলি রয়েছে সেগুলি 'সহজপাঠ' প্রথম ভাগে'র সঙ্গে ওতপ্রোত পাঠ গুলি 'সহজপাঠে'র বিভিন্ন অধ্যায়কে অনুধাবন করার জন্য কখনো ভিত্তিপাঠ আবার কখনো অনুসারীপাঠ হিসাবে গ্রহণ করার জন্য লেখা হয়েছে।"[৪]

'আমার বই'য়ের প্রথমেই আছে বিশাল একটি পরিবেশের দৃশ্য। এই দৃশ্যটি দেখে সেখানে কী কী হচ্ছে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা আলোচনা করবে। স্থিরচিত্র দেখার ফলে শিশুর মধ্যে এমন একটা ভাবস্তর তৈরি হবে যা সে ভাষায় রূপান্তরিত করবে, এর মাধ্যমে বাচ্চাদের যোগাযোগ দক্ষতা তৈরি হবে। এবং কল্পনা শক্তির বিকাশ হবে এই পদ্ধতিটিকে আমরা বলতে পারি ইমেজারি লার্নিং বা চিত্রশিক্ষণ পদ্ধতি বলে।

এরপর আমরা লক্ষ্য করেছি রং করা বর্গক্ষেত্র দেখে ফাঁকা বর্গক্ষেত্রে বাচ্চাদের দিয়ে রং করানোর প্রচেষ্টাকে এবং তারপর বিভিন্ন পশু-পাখি গাছপালা চিত্র রং করানোর প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেছে। আমরা কম-বেশি সকলেই জানি এই পদ্ধতিকে Activity based learning বলা হয়। তবে এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে, ছবিতে রং করার মাধ্যমে শিশু শুধু যে রঙ করা শেখে তা কিন্তু নয়; বরং বাস্তব জগতের বস্তু বা প্রাণীটি কীরকম প্রকৃতির? যা সে তার চেনাজানা পরিবেশে দেখেছে, তার হুবহু রং করার মাধ্যমে শিশুটির স্মৃতিশক্তির বিকাশ ঘটছে; আবার শিশুটি সেই বস্তু বা প্রাণীটির সঙ্গে বিশেষভাবে একাত্ম হতে পারছে।

প্রথম শ্রেণির শিশুদের Geometric Shape বা জ্যামিতিক আকার যত আছে সেগুলি রং করা শেখাতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে, আকৃতিগুলির দু'একটি ব্যতীত প্রায় সবগুলি তার চেনাজানা পরিবেশের হয়,

তবে শিশু শিক্ষার জন্য দু-একটি বিষয় যেন শিশুদের অজানা হয়। চেনা-জানা বিষয়গুলি শিশুটির শিখন প্রচেষ্টার আগ্রহকে বাড়িয়ে তুলবে এবং দু'একটি অজানা বিষয় শিশুর জ্ঞান সূচনা ঘটাবে। যেমন- আয়তক্ষেত্র, ত্রিভুজ, বর্গক্ষেত্র, ইত্যাদি জ্যামিতিক চিত্র গুলির পাশেই বাস্তব বস্তুগুলির ছবি দেওয়া বাঞ্ছনীয়। শিশুরা বাস্তব বস্তুগুলো হয়তো অবশ্যই আগে থেকেই চিনে থাকবে। এবং বিমূর্ত আকৃতি গুলি রং করার মাধ্যমে তার মধ্যে আস্তে আস্তে বিমূর্ত ধারণা তৈরি হতে থাকবে। একেই আমরা গণিত শিক্ষার প্রাথমিক ধাপ বলতে পারি। গণিত যেহেতু একটি বিমূর্ত ধারণার বিষয় সেহেতু বাস্তব বস্তু বা প্রাণী থেকে সরাসরি বারকোডের মাধ্যমে যোগ শেখানো যুক্তিযুক্ত নয়। তাই প্রাথমিকভাবে গণিত শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথমে রাখতে হবে, জ্যামিতিক বস্তু তারপরে রাখতে হবে জ্যামিতির চিত্র, এবং সব শেষে রাখতে হবে বারকোড। জ্যামিতিক বস্তুগুলি বিমূর্তরূপকে প্রকাশ করতে অক্ষম হলেও জ্যামিতিক চিত্রগুলি বিমূর্তরূপকে প্রকাশ করে থাকে। যেমন- প্রথমে, দুটি ইঁটের চিত্র রাখতে হবে তারপর দুটি আয়তক্ষেত্রের চিত্র রাখতে হবে এবং তারপর দুটি বারকোড রাখতে হবে। এসব শিশুরা বাস্তব জগতে দেখে থাকবে এরপর ইঁটের মতো সে যখন আয়তক্ষেত্রর চিত্রটি দেখবে তখন সে সেটাকে এক মনে না করলেও তার সঙ্গে মিল খুঁজে পাবে। এবং এই চিত্রটি বাস্তবে সে দেখেনি অর্থাৎ এখানেই শিশুর মন তার অজান্তেই বিমূর্ত ধারণার সঙ্গে পরিচিত হতে থাকবে। এরপর সে যখন বারকোডের মাধ্যমে যোগ-বিয়োগ ইত্যাদি শিখবে তখন তার মধ্যে এমন এক বিমূর্ত ধারণা তৈরি হতে থাকবে যা তার পরবর্তী গণিত শিক্ষাকে অনেক সহজ করে তুলবে।

'আমার বই' প্রথম পর্বে শিশুদের বর্ণপরিচয় শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তবে বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' এর ৯ এবং অন্তস্থ (য) দুটিকে বাদ দেওয়া হয়েছে।[৫] বাংলায় বর্গীয় ব ও অন্তঃস্থ ব দুটির মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই, অন্যদিকে শিশুদের শব্দশিখন ও যুক্তাক্ষর শিখন -এর ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' -এর মনস্তত্ত্বকে কিছুটা গ্রহণ করা হয়েছে।

'আমার বই' নির্মাণে 'সহজপাঠ'কে কেন্দ্রে রাখা প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞ কমিটি জানিয়েছেন-

> ''সহজপাঠে' বলা পরিবেশের চেনা উপাদান শিশুর প্রথম ভাষা, দ্বিতীয় শিক্ষা গণিত শিখনের উপকরণ ও পথ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। খেয়াল রাখা হয়েছে শিশু যাতে এভাবে জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষার মাধ্যমে তার চেনা জগত থেকে অচেনা জগতে বিচরণ করার প্রয়োজনীয় উদ্দীপনা ও শক্তি পায়।''[৬]

এখন আমরা দেখে নেব 'সহজপাঠ' থেকে কী কী উপাদান গ্রহণ করা হয়েছে-

''এখানে আমরা লক্ষ্য করেছি- 'ছোট খোকা বলে অ আ /শেখেনি সে কথা কওয়া।''[৭]

এটি আমার বই'য়ে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। কিন্তু এটা তো শিশুরা অলরেডি শিখেছে। এখানে নিরবিচ্ছিন্ন সামগ্রিক মূল্যায়নকে ধরে রাখার জন্য এই লাইন দুটি থেকে কর্মপত্র দিলে আরো বইটি যুক্তি সম্মত হয়ে উঠত। একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ভিন্ন ভাবে করা উচিত। এবং একই বিষয় একটি পাতার মধ্যে তিনবার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন। তার ফলে শিশু একই বিষয় বারবার পড়বে, এর ফলে শিক্ষককে বলতে হবে না যে বিষয়টি বারবার পড়ার জন্য। এখানে শিশুর শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা হয়ে যাবে। এবং কিছুক্ষেত্রে একই বিষয়ের ভিন্ন ভাবে পাঠ্য করতে হবে।

দ্বিতীয় ভাষা শিখনের ক্ষেত্রে সহজপাঠের চেনাজানা বিষয়গুলি অধিকাংশই অনুসরণ করা হয়েছে নমুনা ১

> ''Twinkle, twinkle Little Star
> How I wonder what you are!
> Up above the world so high

Like a diamond in the sky."[৮]

নমুনা ২:

"তারাগুলো নিয়ে বাতি
জেগেছিল সারা রাতি
নেমে এলো পথ ভুলে
বেল ফুলে জুঁই ফুলে"[৯]

দুটি কবিতার অর্থ আলাদা হলেও বিষয় একই। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে 'সহজপাঠে'র অনুসরণে দ্বিতীয় ভাষার বিষয়গুলি নির্বাচন করা হয়েছে। এখানে তারা জানার মধ্যেই অজানাকে জানছে।

'সহজপাঠে'র প্রথম ভাগে রবীন্দ্রনাথ চিত্রশিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করে বইটিকে নির্মাণ করেছিলেন এবং তিনি সেই চিত্রশিখন পদ্ধতির মূল্যায়ন করেছেন 'সহজপাঠে'র দ্বিতীয় ভাগে। এখানে এমন ছবি নির্মাণ করা হয়েছে যেগুলি শিশুরা রং করবে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ সহজপাঠ-এ Continuous Comprehensive Evaliuation এর বীজ বপন করে দিয়েছিলেন। 'আমার বই'য়েও চিত্রশিক্ষণ পদ্ধতি থেকে চিত্রকর্মপদ্ধতির অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়।[১০]

'আমার বই' প্রথম পর্বে তুলনামূলকভাবে রং করা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যেমন- মাথার চুলের সঙ্গে কাকের পালকের তুলনা। এই তুলনামূলক শিক্ষা সামগ্রিক নিরববচ্ছিন্ন বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। এরপর ছবির মাধ্যমে শিশুদের স্বাস্থ্য ও শরীর সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে। এই বইটি শুধুমাত্র শিশুদের কাছে পাঠ্য বই নয়, এটা তাদের কাছে একটা খাতাও বটে অর্থাৎ এই বইয়েই তারা ছবি আঁকতে শিখছে এবং এই বইয়ের মধ্যেই Doted lines -এর মাধ্যমে তারা অ আ এ বি সি ডি ইত্যাদি লিখতে পরিসর পাচ্ছে। এর ফলে শিশুর কাছে পাঠ্য বইটি ভারী বলে মনে হবে না। বইটি একদিক থেকে বিনোদনের, ভাষা শিক্ষার, গণিত শিক্ষার, স্বাস্থ্য শিক্ষার, এবং নৈতিক শিক্ষার একটি ইন্টিগ্রেটেড বই।

'আমার বই' প্রথম পর্ব –এ যা যা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো-

- চিত্রশিখন পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।[১১]
- বাংলা বর্ণ পরিচয় শেখানো হয়েছে।[১২]
- সোজা-বাঁকা, কম-বেশি, ছোট-বড়, ভারী-হালকা ইত্যাদির শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।[১৩]
- ছবি ও বারকোডের মাধ্যমে গণিত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।[১৪]
- ছবি ও শব্দের মাধ্যমে বর্ণ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।[১৫]
- দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ইংরেজি নাম দেওয়া হয়েছে।[১৬]
- 'Two little hands to clap, clap, clap' নামক ইংরেজি ছড়া।[১৭]
- সরলরেখা, বক্ররেখা, ও বৃত্তের টান দিতে শেখানো হয়েছে।[১৮]
- Rub rub rub your hands নামক কবিতা।[১৯]
- ছবির মাধ্যমে ইংরেজি শব্দভাণ্ডার শেখানো হয়েছে।[২০]
- 'মুনিরাম মুন্সি' নামক বাংলা ছড়া।[২১]
- 'I can skip, I can hop' নামক ইংরেজি ছড়া।[২২]
- সিঁড়ির মাধ্যমে ক্রোনোলজির শিক্ষা।[২৩]
- 'My hands upon my head I place' নামক ইংরেজি ছড়া।[২৪]
- ছড়ার মাধ্যমে এ, বি, সি, ডি শেখানো হয়েছে।[২৫]

- প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সংখ্যার সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে।[২৬]
- ইংরেজি ও বাংলা সংখ্যা লেখানোর প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।[২৭]
- ছোট ও বড়ো সংখ্যা চেনানো হয়েছে।[২৮]
- সংখ্যা ও ভাষার মাধ্যমে যোগের ধারণা নির্মাণ করা হয়েছে।[২৯]
- ক্রোনোলজিক্যাল ছবি দেখে গল্প বলা হয়েছে।[৩০]
- বস্তুর সঙ্গে জ্যামিতিক আকারের মিল শেখানো হয়েছে।[৩১]

এই অধ্যায়টিতে প্রকৃতির সঙ্গে শিক্ষার একপ্রকার সম্বন্ধ তৈরির প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। এবং শিশুরা বইয়ের মধ্যেই যাতে লিখতে পারে সেই জন্য 'আমার বই' কে বই ও খাতা উভয় হিসাবেই নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে শিশুরা শুধু আনন্দই পাবে না, তাদের শিক্ষা ভারমুক্ত হয়ে উঠবে।

এই বইয়ে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, এখানে চেনা-জানা প্রকৃতিকেন্দ্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। একই শিক্ষা বারবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। যার ফলে, শিশুরা যাতে খুব সহজেই সেটা বারবার অনুশীলনের সুযোগ পায়। এবং তাদের শিক্ষা যাতে সুদৃঢ় হয় তার জন্য প্রধানত এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবং এই বই নির্মাণের ক্ষেত্রে 'সহজপাঠে'র মনস্তত্ত্ব অনেকাংশই গ্রহণ করা হয়েছে। 'সহজপাঠে' ছড়ার মাধ্যমে বর্ণপরিচয় শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, এর অনুসরণে বাংলা ও ইংরেজি বর্ণপরিচয় শিক্ষা ছড়ার মাধ্যমে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছড়ার মাধ্যমে বর্ণপরিচয় শিক্ষা শিশুদের মনে অনেকদিন পর্যন্ত গেঁথে যায়। তবে এই পর্বে সহজপাঠ'কে কেন্দ্র করে কোনও অনুসারী পাঠ কিংবা ভিত্তিপাঠ নির্মাণ করা হয়নি।

এই পর্বটিতে সমাজ ও প্রকৃতিকে আলাদা ভাবে দেখানো হয়নি। বরং জগতকে সহজ ভাবে চেনানোর একটা প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শিশুরা যখন পৃথিবীতে আসে তখন এই পৃথিবী তাদের কাছে অনেকটা অচেনা, তাই প্রাথমিক ভাবে তাদের এই পৃথিবীকে চেনাতে হবে, এই পৃথিবীকে চেনানো মানে, পৃথিবীর মাটি, জল, বাতাস, আলো, গাছপালা ইত্যাদিকে চেনানো। এই পৃথিবীতে একজন শিশু জন্মে নিজের উপলব্ধিতে পৃথিবী দেখতে থাকে, শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের উপলব্ধির গতিপ্রকৃতি কী সে সম্পর্কে শিক্ষক ও পাঠ্য বইয়ের জানার আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে। একজন প্রথম শ্রেণির শিশুকে প্রাথমিক ভাবে সমাজ সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আগে তাকে জগতকে চেনাতে হবে, তাকে সামাজিক করে তোলার আগে তাকে জাগতিক করে তুলতে হবে। জগতের সঙ্গে তার এমন টান তৈরি করতে হবে, যার ফলে সে যখন সামাজিক হয়ে উঠবে তখন সে নাগরিক হিংস্র হয়ে উঠবে না।

এখন আমরা 'আমার বই' দ্বিতীয় পর্বে যা যা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে সেগুলি দেখে নিই-

- 'Rainbow violet' নামক একটি ইংরেজি ছড়া।[৩২]
- রং করানোর প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।[৩৩]
- যোগ-বিয়োগের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।[৩৪]
- ছবির মাধ্যমে প্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনা ও দিনরাত সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া হয়েছে।[৩৫]
- বর্ণ সাজিয়ে শব্দ গঠন করতে দেওয়া হয়েছে।[৩৬]
- সংখ্যাকে শব্দে লেখানোর প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।[৩৭]
- ক্রোনোলজিক্যাল ছবির মাধ্যমে গল্প সাজানো হয়েছে।[৩৮]
- 'Red light red light' নামক ইংরেজি Rhyme song।[৩৯]
- ইংরেজি ও বাংলা সংখ্যা শেখানো হয়েছে।[৪০]
- Vowel sound শেখানোর ক্ষেত্রে মিল যুক্ত ইংরেজি শব্দ দেওয়া হয়েছে।[৪১]

- 'বনে থাকে বাঘ' –এর ভিত্তিপাঠ 'এই দেখো বন'।[৪২]
- 'আলো হয় গেল ভয়' এর ভিত্তিপাঠ 'পাখির ডাকে ভোর হলো'।[৪৩]
- ছোট ছোট ইংরেজি বাক্য এবং পাশে ছবি।[৪৪]
- হাতের আঙুলের মাধ্যমে ইংরেজিতে ওয়ান, টু, থ্রি, ফোর, ফাইভ।[৪৫]
- সংখ্যার ক্রম শেখানোর জন্য সিঁড়ির ধাপের ব্যবহার করা হয়েছে।[৪৬]
- বাংলায় ছড়া শিক্ষার পাশাপাশি কবিতা শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়েছে।[৪৭]
- ছড়া কবিতা ও সংখ্যার সমন্বয় শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।[৪৮]
- ছোট ও বড়োর মধ্যে পার্থক্য বোঝানো হয়েছে।[৪৯]
- সুখলতা রাওয়ের 'কাঁচা আম' ছড়াটি পাঠ্য আছে।[৫০]
- = ও ≠ এর শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।[৫১]
- জলের মধ্যেকার জীবন সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে।[৫২]
- বিমূর্ত চিহ্নে ছোট-বড় –এর শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।[৫৩]
- 'ওই সাদা ছাতা'র অনুসারী পাঠ 'দাদা বাজারে গেছেন।[৫৪]
- কবিতার মাধ্যমে পরিবার সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে।[৫৫]
- 'Our family' নামক ইংরেজি ছড়া।[৫৬]
- ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ ও বৃত্তের আকারের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।[৫৭]
- 'নাম তার মোতিবিল' এর ভিত্তিপাঠ 'আমাদের চারপাশ'।[৫৮]
- শিলা বৃষ্টি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে।[৫৯]
- 'বিনি-পিসির' অনুসারী পাঠ 'সকাল-বিকেল'।[৬০]
- সংখ্যার সঙ্গে বস্তুর সমন্বয় করা হয়েছে।[৬১]
- সুকুমার রায়ের 'চলে হনহন ছোটে পনপন' কবিতাটি সহজপাঠে'র 'বিনি-পিসি'র অনুসারী পাঠ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।[৬২]
- 'বিনি-পিসি'র অনুসারী পাঠ হিসেবে বিভিন্ন পাখিদের সম্পর্কে একটি পাঠ দেওয়া হয়েছে।[৬৩]
- কার্তিক ঘোষের 'আমাদের ময়না' নামক কবিতা পাঠ্য আছে।[৬৪]

'আমার বই' দ্বিতীয় পর্বে প্রথম পর্বের শিক্ষার অনেক পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। এখানে কবিতা ও গল্পের মাধ্যমে শিশুদের ভাষার বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। কারণ, ভাষার সঙ্গে সমস্ত শিক্ষার নিবিড় যোগ আছে। তাই শিশুদের ভাষা শিক্ষার প্রতি বেশি নজর দিতে হবে। প্রথম শ্রেণির শিশুদের ভাষা শিক্ষার জন্য, তিনটি বিষয় খুব গুরুত্ব দিতে হবে। প্রথমত, তার চেনা পরিচিত শব্দ, ও উপভাষার সঙ্গে মান্য ভাষার সম্পর্ক। দ্বিতীয়ত, ভাষা ও ভাবের সমন্বয় শিক্ষা। তৃতীয়ত, চিন্তা-ভাবনা ও কল্পনার বিকাশে সহায়তা করা।

যাই হোক, এই পর্বে 'ছায়ার ঘোমটা'র ভিত্তিপাঠ হিসেবে 'পথে লোক চলে' ব্যবহার করা হয়েছে। ভিত্তিপাঠ বলতে বোঝানো হচ্ছে, একটি লেখার উপর নির্ভর করে আরেকটি লেখা। 'ছায়ার ঘোমটা' কবিতায় বলা হয়েছে যে-

> "ছায়ার ঘোমটা মুখে টানি/ আছে আমাদের পাড়াখানি।
> দিঘি তার মাঝখানটিতে, /তালবন তারি চারি ভিতে।"[৬৫]

এই কবিতাটির উপর নির্ভর করে 'আমার বই' –এ লেখা হয়েছে-

"পথে লোক চলে। পথের পাশে বিজলি বাতির খুঁটি। মইটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে রেখেছে। পাশে কালুদা দাঁড়িয়ে আছে। বিজলির তার সারাই হবে।"[৬৬]

সহজপাঠের উপরোক্ত লেখাটিতে গ্রামের সাধারণ জীবনের কথা আছে, অন্যদিকে ভিত্তিপাঠটিতে সেই সাধারণ জীবনের উপর নির্ভর করে বর্তমান জীবনের কথা ফুটে উঠেছে। আর অনুসারী পাঠ বলতে বোঝায়, যে পাঠে একই ধরণের চিন্তা-ভাবনা ভিন্ন বিষয়ে আরোপিত হয়। যেমন- সহজপাঠের ফুলের প্রজাপতি হওয়ার ঘটনা এবং ভবানীপ্রসাদ মজুমদারের রূপান্তর কবিতায় ফুলের ফুলকপিতে পরিণত হওয়ার ঘটনা, এবং উটের উটপাখিতে পরিণত হওয়ার ঘটনা।

যাই হোক, এই পর্বটিতে সিংহ ও ইঁদুরের একটি গল্পকে ছবির মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ ক্রোনোলজিক্যাল ভাবে ছবিগুলি দেওয়া হয়েছে। যাতে ছবি দেখে শিশুরা ভাষার মাধ্যমে গল্প তৈরি করতে পারে। এইভাবে গল্পের মাধ্যমে শিশুদের ক্রোনোলজিক্যাল শিক্ষা দেওয়া আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি। শিশুরা সমাজে বসবাস করে তাই একজন শিশু স্বাভাবিকভাবেই তার সমাজকে সে প্রথমত চিনে ওঠে। এবং যে শহরে বসবাস করে তার কাছে বনের প্রকৃতি জানা সম্ভব নয়। হয়তো বা সে ভ্রমণে গিয়ে দেখে থাকবে নয়তো বা কোনও আত্মীয় পরিজনের গ্রামের বাড়িতে গিয়ে দেখে থাকবে। একজন শিশুর যাতে বনের জগত সম্পর্কে তার পরিচিতি হয় সে সম্পর্কে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। এই পর্বে সেই বনের জীবনের অনেক কথা উঠে এসেছে। বনের মধ্যে কারা কারা থাকে সে সম্পর্কে শিশুরা একটা ধারণা পাবে যার ফলে শিশুর মধ্যে বৈচিত্র্যময়তার বোধ তৈরি হবে। তবে শিশুদের মধ্যে শহর এবং গ্রামের বৈচিত্র্যময়তার দিকগুলো তুলে ধরা উচিত। গ্রামের শিশুরা যাতে শহর সম্পর্কে পরিচিত হয় সে সম্পর্কেও আমাদের নজর দিতে হবে এবং শহরের শিশুরাও যাতে গ্রাম জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয় সে সম্পর্কেও বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। গ্রাম জীবন ও শহরের জীবন উভয় সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া উচিত। এই পর্বটিতে মূলত প্রকৃতি ও পরিবার সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং পরিবারকে কেন্দ্র করে সমাজ যেভাবে জড়িয়ে আছে সেই দিকটি বিস্তর ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তবে সমাজকে এখানে বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়নি। কারণ, প্রথম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সমাজবোধ তৈরি যতটা গুরুত্বপূর্ণ তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রকৃতিবোধ ও পরিবার সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা তৈরি করার। আর সেই প্রচেষ্টায় এই পর্বটিতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যে কারণে এই পর্বটি শিশুশিক্ষার উপযোগী হয়ে উঠেছে।

এখন দেখে নেওয়া যাক 'আমার বই' তৃতীয় পর্বে কী কী শিক্ষা দেওয়া হয়েছে-

- Row, row, row your boat নামক একটি ইংরেজি ছড়া।[৬৭]
- 'ছায়ার ঘোমটা'র ভিত্তিপাঠ 'পথে লোক চলে'।[৬৮]
- Vowel sound সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে।[৬৯]
- নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'পাখিরা' নামক কবিতা।[৭০]
- Circle এর মাধ্যমে শব্দ তৈরি করা। [৭১]
- লুডো খেলার মাধ্যমে গণিত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।[৭২]
- নদী বিষয়ক 'আমাদের ছোট নদী'র ভিত্তিপাঠ রয়েছে। [৭৩]
- ছড়ার মাধ্যমে বর্ষা সম্বন্ধে একটা ধারণা।[৭৪]
- মানের ঊর্ধ্বক্রম ও নিম্নক্রম সম্পর্কে ধারণা।[৭৫]
- 'কাল ছিল ডাল খালি'র ভিত্তিপাঠ 'এই দেখো গাছ'।[৭৬]
- সহজ পাঠের 'ভোর হলো। ধোবা আসে'র অনুসারী পাঠ 'পাখি গাছে বাসা বানায়'।[৭৭]

- নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'বনেবাদাড়ে' ছড়া পাঠ্য আছে।[৭৮]
- Bring the bat and bend the ball নামক ইংরেজি ছড়া।[৭৯]
- এসো, এসো গৌর এসো'র অনুসারী পাঠ 'গাছে আছে মৌচাক।[৮০]
- ইংরেজিতে ফুলের নাম পাঠ্য হিসাবে রয়েছে। [৮১]
- We wake up early in the day নামক ইংরেজি ছড়া।[৮২]
- 'এসেছে শরৎ হিমের পরশ' এর ভিত্তিপাঠ 'শিউলি ফুল, শিউলি ফুল'।[৮৩]
- বিভিন্ন ধাঁধার সমাধান করা।[৮৪]
- 'The sun bright and red' নামক ইংরেজি ছড়া।[৮৫]
- ভবানীপ্রসাদ মজুমদারের 'রূপান্তর' কবিতাটি 'কতদিন ভাবে ফুল' এর অনুসারী পাঠ।[৮৬]
- যোগ সম্বন্ধে নির্মিত ধারণার প্রয়োগ।[৮৭]
- (ঋ) কার যুক্ত শব্দের প্রয়োগ।[৮৮]
- রবি ঠাকুর ও বোলপুর সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।[৮৯]
- My week নামক একটি ইংরেজি ছড়া।[৯০]
- কাজী নজরুলের জীবন সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।[৯১]
- 'পশুর দেশে' নাটক পাঠ্য দেওয়া হয়েছে।[৯২]
- বাজারে কেনাবেচার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। [৯৩]

এখানে 'সহজপাঠ'কে কেন্দ্রে রেখে অনেক ভিত্তিপাঠ, অনুসারী পাঠ, ও কর্মপত্র দেওয়া হয়েছে। এই পর্বটিতে শিশুর যাতে বাস্তববোধ তৈরি হয় সেদিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়েছে। লুডো খেলার মাধ্যমে গণিত শিক্ষাকে তাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা খেলা-জীবনের কাছে মিশিয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এর ফলে শিশুরা পাঠে অনেকটা আগ্রহী হয়ে উঠবে। 'পাখিরা' কবিতায় খোকনের সঙ্গে পাখির একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করা হয়েছে, যার ফলে শিশুরা প্রকৃতির পশু পাখিদের ভালবাসতে শিখবে, এরং এর ফলে তাদের সমাজ শুধুমাত্র কংক্রিটের হয়ে উঠবে না তাদের সমাজ গাছপালা ও প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় জড়িয়ে থাকবে। বাংলার বিভিন্ন নদী সম্পর্কে যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তার ফলে শিশুরা যেমন নদীদের নাম শিখবে তেমনি এই বাংলার বৈচিত্র্য এবং নদীর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা জীবনের কথাও জানবে। শিক্ষক মহাশয়দের এ বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ভাবিয়ে তোলা উচিত হবে। তারা সহজপাঠে যে 'আমাদের ছোট নদী' পড়েছে সেখানে তারা নদী সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা পেয়েছে। বর্ষাকাল সম্পর্কেও এই পর্বে তাদের একটা ধারণা দেওয়া হয়েছে। কারণ, তাদের মধ্যে যাতে বর্ষার প্রতি একটা কৌতুহল জন্মায় সেদিকে নজর দিতে হবে, বর্ষার আনন্দকে তারা যাতে উপলব্ধি করতে পারে অর্থাৎ প্রকৃতির প্রত্যেকটা ঋতু যাতে তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় সেদিকে নজর দেওয়া হয়েছে। উর্ধ্বক্রম ও নিম্নক্রম সম্পর্কেও এ পর্বে একপ্রকার ধারণা দেওয়া হয়েছে সিঁড়ির মাধ্যমে অর্থাৎ তারা সিঁড়ির মাধ্যমে কোনও জায়গায় ওঠে এবং নামে এই ওঠা-নামা তাদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই বিখ্যাত কবিতা 'কাল ছিল ডালখালি' এর অনুসরণে 'এই দেখো গাছ' নামে ভিত্তিপাঠ রচনা করা হয়েছে। এখানে গাছের মূল, কাণ্ড, বীজ, পাতা এবং তার জীবন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে অর্থাৎ সহজপাঠকে কেন্দ্র করে এই যে শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি তা তাদের শিক্ষাকে অনেকটা সহজবোধ্য করে তুলেছে।

উপসংহার:

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, 'সহজপাঠ' বইকে কেন্দ্রে রেখে 'আমার বই' নির্মাণ করা হয়েছে। প্রথম পর্বে জগতকে চেনানোর পাশাপাশি শিক্ষাকে শিশুদের সঙ্গে পরিচিতি করানোর একটা প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমার বইকে কিভাবে আনন্দময় করে তোলা যায় তার সব রকম ব্যবস্থা করা হয়েছে। বইটিকে প্রাকৃতিক রঙে ভরিয়ে তোলা হয়েছে, যার ফলে শিশুরা বইটি আকর্ষণীয় ভাবে গ্রহণ করে। কারণ, রং শিশুরা খুব সহজেই পছন্দ করে। প্রথম পর্বে 'সহজপাঠে'র কোনও অনুসারী বা ভিত্তিপাঠ দেওয়া হয় নি। প্রথম পর্বের একই বিষয়ের অনেকবার পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। এই ধরনের একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তিমূলক শিক্ষা শিশু শিক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, শিশুরা যে কোনও বিষয় খুব তাড়াতাড়ি যেমন মনে রাখতে পারে আবার খুব তাড়াতাড়ি ভুলেও যেতে পারে। তাই শিশুদের অনুশীলন যদি বারবার হয় তাহলে তারা সেই বিষয়টি খুব সহজে আত্মস্থ করতে পারবে।

এই পর্বে বইটিকে তারা খাতা হিসাবে ব্যবহার করবে। এর ফলে শিশুরা বইয়ের মধ্যে লিখতে পেয়ে তারা অত্যন্ত আনন্দিত হবে। কারণ, প্রথাগত শিক্ষায় সাধারণত বইয়ের মধ্যে লিখতে দেওয়া হতো না। বইয়ে লিখতে দেওয়ার ফলে শিক্ষাটা তাদের কাছে ভারমুক্ত মনে হবে। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি অঞ্চল ভীষণভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ। 'আমার বই'য়ে হয়তো ততটা বৈচিত্রপূর্ণ জীবনের ছবি নেই! তাই একজন শিক্ষক যখন পড়াবেন তার গ্রামের তার পরিবেশের সেই বৈচিত্র্যময় জীবনকে শিশুদের কাছে তুলে ধরবেন। এই বৈচিত্র্য তুলে ধরলে শিশুরা অনেক সহজে সেই বিষয়টি আত্মস্থ করতে পারবে। বিশেষ করে সেই অঞ্চলের উপভাষার সঙ্গে মান্য ভাষার একটা সমন্বয় সাধন করবেন শিক্ষক। যার ফলে শিশুদের বিকাশ ভালো হবে। এই পর্বে বাংলা গণিত ও ইংরেজি ইন্টিগ্রেটেড ভাবে বারবার আবর্তিত হয়েছে। এর প্রধান কারণ হলো, শিশুরা প্রধানত অগোছালো, প্রাথমিকভাবে তাদের ক্রোনোলজিক্যাল শিক্ষা দিতে নেই। অর্থাৎ তখনও তারা এক একটি বিষয়ে আলাদা আলাদা ভাবে পড়ার মতো তৈরি হয়নি। শিক্ষা যেন তাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যায় সেদিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে।

দ্বিতীয় পর্বটিতে 'সহজপাঠ' থেকে অনেক কর্মপত্র অনুসারী পাঠ ও ভিত্তি পাঠ দেওয়া হয়েছে। যার ফলে শিশুরা অনেক ক্ষেত্রেই 'সহজপাঠে'রে বিষয়ের সঙ্গে 'আমার বই'য়ের বিষয়ের মিল পাবে। এই পর্বটিতে বিশেষ করে তাদের চেনাজানা জীবনের বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে পরিচিতি ঘটানোর একটা প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জগতকে তারা কিভাবে দেখেছে তার মূল্যায়নের সুযোগ পাচ্ছে এই পর্বে এসে। ভাষার সঙ্গে এই জগতের একটা সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যেহেতু যে কোনও শিক্ষার মূলে রয়েছে ভাষা, শিশুর ভাষা বিকাশ না হলে তার সামগ্রিক নিরববচ্ছিন্ন বিকাশ হওয়া সম্ভব নয়। সে কারণেই নানান দিক থেকে শিশুর ভাষা বিকাশের উপর নজর দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় ভাষা শেখানোর ক্ষেত্রে 'সহজপাঠে'র চেনা-জানা বিষয়কে উপকরণ হিসাবে নেওয়া হয়েছে, যাতে তারা চেনা থেকে অচেনার জায়গায় পৌঁছতে পারে।
আমরা লক্ষ্য করেছি, তৃতীয় পর্বের শিশুর মধ্যে একটা বাস্তববোধ তৈরির প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই পর্বে এসে শিশুরা ক্রমান্বয়ের শিক্ষা পাচ্ছে। বিমূর্ত পদ্ধতিতে শিশুদের ছোট ও বড়োর পার্থক্য বোঝানো হয়েছে। আমরা দেখেছি, দ্বিতীয় শ্রেণিতে শিশুরা তুলনামূলক শিক্ষা পাচ্ছে এবং সমাজ সম্পর্কে শিক্ষা পাচ্ছে। কিন্তু এখানে তুলনামূলক শিক্ষার সূচনা ঘটছে বলা চলে। সমাজ সম্পর্কে শিক্ষা শিশুদের জন্য অত্যন্ত জরুরি কিন্তু এই সমাজকে প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়ে না শিক্ষা দিলে তা তাদের জন্য হীতকর হয়ে উঠবে।

সবমিলিয়ে সহজপাঠের প্রকৃতি ও সমাজবোধের অখণ্ড চিন্তা-ভাবনাকে আমার বই নির্মাণের মূলে রাখা হয়েছে। সহজপাঠের আনন্দপূর্ণ শিক্ষাকে গ্রহণ করা হয়েছে। সহজপাঠের সমন্বিত শিক্ষাকে কাজে লাগানো হয়েছে। এবং সহজপাঠের ভারমুক্ত শিক্ষাকেও গ্রহণ করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ডিসেম্বর ২০২৫, সহজপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিকাশ ভবন, কলকাতা-৯১, পৃষ্ঠা- ১।

২) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ডিসেম্বর ২০২৫, সহজপাঠ, প্রথম ভাগ, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিকাশ ভবন, কলকাতা-৯১, পৃষ্ঠা- ২৭।

৩) তদেব, প্রথম পাঠ, পৃ-২০।

৪) বিশেষজ্ঞ কমেটি, ডিসেম্বর ২০২৩, আমার বই, প্রথম শ্রেণি, তৃতীয় পর্ব, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিকাশ ভবন, কলকাতা-৯১, পৃষ্ঠা- ৩৪৪।

৫) বিশেষজ্ঞ কমেটি, ডিসেম্বর ২০২৩, আমার বই, প্রথম শ্রেণি, প্রথম পর্ব, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিকাশ ভবন, কলকাতা-৯১, পৃষ্ঠা- ৭।

৬) বিশেষজ্ঞ কমেটি, ডিসেম্বর ২০২৩, আমার বই, প্রথম শ্রেণি, প্রথম পর্ব, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিকাশ ভবন, কলকাতা-৯১, পৃষ্ঠা- ১২৬।

৭) তদেব, প্রথম পাঠ, পৃ-৮।

৮) তদেব, প্রথম পাঠ, পৃ-১৪।

৯) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ডিসেম্বর ২০২৫, সহজপাঠ, প্রথম ভাগ, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিকাশ ভবন, কলকাতা-৯১, পৃষ্ঠা- ২৫।

১০) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ডিসেম্বর ২০২৫, সহজপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিকাশ ভবন, কলকাতা-৯১, পৃষ্ঠা- ১৩।

১১) বিশেষজ্ঞ কমেটি, ডিসেম্বর ২০২৩, আমার বই, প্রথম পর্ব, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিকাশ ভবন, কলকাতা-৯১, পৃষ্ঠা-১।

১২) তদেব, বর্ণ কার্ড, পৃ-৭।

১৩) তদেব, চিত্রপাঠ, পৃ-৯।

১৪) তদেব, চিত্র ও বারকোড পাঠ, পৃ-১১।

১৫) তদেব, বর্ণ কার্ড, পৃ-১৩।

১৬) তদেব, চিত্ররঙ, পৃ-১৬।

১৭) তদেব, প্রথম পাঠ, পৃ-১৬।

১৮) তদেব, বর্ণ কার্ড, পৃ-২৩।

১৯) তদেব, প্রথম পাঠ, পৃ-২৬।

২০) তদেব, Wordstock, পৃ-৩১।

২১) তদেব, ছড়াভিনয়, পৃ-৩৬।

২২) তদেব, Rhyme song, পৃ-৩৭।

২৩) তদেব, ক্রমান্বয় শিখন, পৃ-৩৯।

২৪) তদেব, Rhyme song, পৃ-৪১।

২৫) তদেব, English Alphabet, পৃ-৪৪।

২৬) তদেব, ঊর্ধ্বক্রম ও অধঃক্রম, পৃ-৪৬।

২৭) তদেব, বাংলা ও ইংরেজি সংখ্যা লিখন, পৃ-৫০।

২৮) তদেব, ক্রমান্বয় শিখন, পৃ-৭৯।
২৯) তদেব, যোগের ধারণা, পৃ-৯৭।
৩০) তদেব, চিত্রগল্প, পৃ-১০৭।
৩১) তদেব, আকার শিখন, পৃ-১১৭।
৩২) বিশেষজ্ঞ কমেটি, ডিসেম্বর ২০২৩, আমার বই, প্রথম শ্রেণি, দ্বিতীয় পর্ব, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিকাশ ভবন, কলকাতা-৯১, পৃষ্ঠা- ৮।
৩৩) তদেব, রং করা, পৃ-১২৮।
৩৪) তদেব, বিয়োগের ধারণা, পৃ-১২৯।
৩৫) তদেব, কবিতা, পৃ-১৩১।
৩৬) তদেব, শব্দ গঠন, পৃ-১৩৩।
৩৭) তদেব, কথায় লেখা, পৃ-১৩৫।
৩৮) তদেব, ক্রমান্বয় চিত্রগল্প, পৃ-১৩৯।
৩৯) তদেব, ইংরেজি ছড়া, পৃ-১৩২।
৪০) তদেব, বিয়োগ শিক্ষা, পৃ-১৪২।
৪১) তদেব, Vowel sound, পৃ-১৪৭।
৪২) তদেব, ক্রমান্বয় শিখন, পৃ-১৪৫।
৪৩) তদেব, ভিত্তিপাঠ, পৃ-১৫১।
৪৪) তদেব, English sentence, পৃ-১৫৩।
৪৫) তদেব, Rhyme song, পৃ-১৫৫।
৪৬) তদেব, সংখ্যার ক্রম, পৃ-১৬১।
৪৭) তদেব, কাঁচা আম, পৃ-১৭০।
৪৮) তদেব, কর্মপত্র, পৃ-১৭৭।
৪৯) তদেব, ছোট-বড়ো, পৃ-১৬০।
৫০) তদেব, কাঁচা আম, পৃ-১৭০।
৫১) তদেব, সমান ও অসমান, পৃ-১৭২।
৫২) তদেব, জল-জীবন, পৃ-১৮১।
৫৩) তদেব, ছোট ও বড়োর চিহ্ন, পৃ-১৮৩।
৫৪) তদেব, অনুসারী পাঠ, পৃ-১৮৬।
৫৫) তদেব, প্রথম পাঠ, পৃ-১৯২।
৫৬) তদেব, Our family, পৃ-১৯৩।
৫৭) তদেব, আকার শিখন, পৃ-১৯৫।
৫৮) তদেব, ভিত্তিপাঠ, পৃ-২০১।
৫৯) তদেব, শিলাবৃষ্টি, পৃ-২০৬।
৬০) তদেব, অনুসারী পাঠ, পৃ-২০৮।
৬১) তদেব, সংখ্যার সঙ্গে সমন্বয় পৃ-২১০।
৬২) তদেব, অনুসারী পাঠ, পৃ-২১৩।
৬৩) তদেব, অনুসারী পাঠ, পৃ-২১৮।
৬৪) তদেব, আমাদের ময়না, পৃ-২২২।
৬৫) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ডিসেম্বর ২০২৫, সহজপাঠ, প্রথম ভাগ, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিকাশ ভবন, কলকাতা-৯১, পৃষ্ঠা- ৩১-৩২।

৬৬) বিশেষজ্ঞ কমেটি, ডিসেম্বর ২০২৩, আমার বই, প্রথম পর্ব, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিকাশ ভবন, কলকাতা-৯১, পৃষ্ঠা- ২২৫।
৬৭) বিশেষজ্ঞ কমেটি, ডিসেম্বর ২০২৩, আমার বই, প্রথম শ্রেণি তৃতীয় পর্ব, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিকাশ ভবন, কলকাতা-৯১, পৃষ্ঠা- ৮।
৬৮) তদেব, ভিত্তিপাঠ, পৃ-২২৫।
৬৯) তদেব, Vowel sounds, পৃ-২২৭।
৭০) তদেব, পাখিরা, পৃ-২৩১।
৭১) তদেব, শব্দগঠন, পৃ-২৩২।
৭২) তদেব, কর্মপত্র, পৃ-২৪০।
৭৩) তদেব, ভিত্তিপাঠ, পৃ-২৪২।
৭৪) তদেব, বর্ষা সম্বন্ধে শিখন, পৃ-২৪৬।
৭৫) তদেব, ঊর্ধ্বক্রম ও নিম্নক্রম, পৃ-২৫১।
৭৬) তদেব, ভিত্তিপাঠ, পৃ-২৫৩।
৭৭) তদেব, অনুসারী পাঠ, পৃ-২৬০।
৭৮) তদেব, বনেবাদাড়ে পৃ-২৬৩।
৭৯) তদেব, Rhyme song, পৃ-২৬৬।
৮০) তদেব, অনুসারী পাঠ, পৃ-২৬৭।
৮১) তদেব, ইংরেজি শব্দ, পৃ-২৬৯।
৮২) তদেব Rhyme song, পৃ-২৭৭।
৮৩) তদেব, ভিত্তিপাঠ, পৃ-২৭৮।
৮৪) তদেব, বাংলা ধাধা পৃ-২৮৯।
৮৫) তদেব, Rhyme song, পৃ-২৯৩।
৮৬) তদেব, অনুসারী পাঠ, পৃ-২৯৪।
৮৭) তদেব, গণিতের ভাষায় যোগ, পৃ-২৯৫।
৮৮) তদেব, যুক্ত শব্দ শিখন পৃ-৩০১।
৮৯) তদেব, ছোট রবি ও ছোটদের রবি, পৃ-৩০৭।
৯০) তদেব, my week, পৃ-৩১৩।
৯১)তদেব, কাজী নজরুল ইসলাম, পৃ-৩১৪।
৯২)তদেব, পশুর দেশে, পৃ-৩১৮।
৯৩) তদেব, বাজারে কেনাবেচাঃ নানারকম নোট, পৃ-৩২৮।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1724-1731
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.394

এখনো যারা (ব্রাত্যজন) নাগরিকত্ব সংকটে: প্রসঙ্গ ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল

বিমল সরকার, *গবেষক, স্কুল অফ ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস এন্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 25.03.2026; Accepted: 28.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The India–Bangladesh enclave issue is a long-standing geographical and humanitarian crisis in South Asia, where populations living in isolated, landlocked territories remained outside the framework of citizenship, basic rights, and state services for many years. The exchange and integration of enclaves were completed through the 2015 Land Boundary Agreement between India and Bangladesh, marking a significant step toward resolving this prolonged issue.

However, in the post-agreement reality, many residents still face challenges in obtaining citizenship, securing legal recognition of land ownership, acquiring identity documents, and achieving full socio-economic inclusion. These ongoing difficulties highlight the complexity of transitioning from statelessness to formal citizenship and integration.

This study examines the changes following the agreement and the current challenges of the citizenship crisis. It also identifies policy limitations and gaps in implementation, emphasising the need for sustainable, inclusive, and effective solutions to ensure the rights and integration of enclave residents. This research also underscores the need for human-centred solutions to ensure the complete integration and protection of the rights of enclave residents.

Keywords: Enclaves, citizenship crisis, India–Bangladesh border, Land Boundary Agreement 2015, state identity, human-centred, sustainable, social inclusion, integration.

প্রাক-কথন:

সমাজে প্রত্যেক মানুষের তার নিজস্ব এক পরিচিতি আছে, মানুষ যেহেতু সমাজে বসবাস করে এবং সমাজের একটি অংশ হিসেবে তার কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে সে তার সমাজে এক নিজস্ব পরিচিতি তৈরি করে। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, জাতীয়, আন্তর্জাতিক ইত্যাদি। এই পরিচিতি গুলোর মধ্যেও বর্তমানে যে কোন দেশে বসবাসের জন্য তার জাতীয় পরিচয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। জাতি-ধর্ম ,বর্ণ পেশা ইত্যাদি সবকিছুর ঊর্ধ্বে উঠে একজন মানুষের দেশের নাগরিকত্ব হচ্ছে তার আসল পরিচিতি। কারণ এই নাগরিকত্ব দিয়ে একজন মানুষ সেই দেশের সমস্ত রকমের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে এবং ঠিক একইভাবে নাগরিকত্বহীন মানুষকে তার সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। তাই বর্তমানে বিশ্বের প্রত্যেকটি মানুষের নাগরিকত্ব বা

ন্যাশনাল আইডেন্টিটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। একজন মানুষের কোন দেশের নাগরিকত্ব না থাকলে কি কি বঞ্চনা অত্যাচার এবং দৈনন্দিন জীবনে যে প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হয় তা গল্প আকারে তুলে ধরা হবে। ছিটমহল এবং এর পাশাপাশি ২০১৫ সালের পর নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত মানুষগুলো নাগরিকত্ব পাওয়ার পরে জাতীয় পরিচিতি সমস্যা সমাধান হলেও নাতুন করে তারা আবার কোন সামাজিক পরিচিতি সংকটের মুখোমুখি হয় কিনা তা নিয়ে আলোচনা করা হবে। ভারত ও বাংলাদেশ ছিটমহলে বসবাসকারী মানুষের নাগরিকত্ব না থাকার কারণে তারা দীর্ঘ ৬৮ বছর কি কি প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছে এবং বর্তমানেও তাদের যে সামাজিক পরিচিতি সংকটের সম্মুখীন হতে হয় তার একটি পর্যালোচনা এই নিবিন্ধে তুলে ধরা হবে।

এখনো যারা নাগরিকত্ব বা পরিচিতি সংকটে:

ছিটমহল বিনিময়ের ফলে ছিটমহলের মানুষ অবশেষে নাগরিকত্ব পেল। কিন্তু বিগত ৬৮ বছরে নাগরিকত্ব হীনতা ও কর্মহীনতা ছিটমহলের বিভিন্ন মানুষ যখন ছিটমহল ছেড়ে বিভিন্ন শহর বন্দরে পেটের দায়ে কাজ করতে গেছে তারা সেই নাগরিকত্বের সুযোগ আর পেলেন না। সেই সমস্ত পরিবারের কথা কেউ ভাবেনি এমনকি তাদের পরিসংখ্যানের হিসাবপত্রও নথিভুক্ত নেই। এতদিন তাও ছিটমহলে বসবাসকারী মানুষ বিদেশে কাজে গেলে তাদের একটা পরিচিতি ছিল যে তারা ছিটের মানুষ। কিন্তু ছিটমহল বিলুপ্ত হওয়ার ফলে সেই ঠিকানাও তাদের জন্য আর অবশিষ্ট রইল না। তারা এখন ভারত বা বাংলাদেশের নাগরিক নন বা ছিটমহলের মানুষও নন তাদেরকে এক কথায় বলা হয় **'নেই মানুষ'**। বাংলাদেশে এরকম মানুষের কোন সন্ধান পাওয়া না গেলেও ভারতে ছিটমহল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া মানুষ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে রয়েছে বলে জানা যায়। তবে তাদের ভাষা বাংলা হওয়ার কারণেই সহজেই তাদের চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। তাদেরকে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত করে বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার চালানো হয়। ছিটমহলের জন্ম থেকে শুরু করে দেশভাগের আগে পর্যন্ত ছিটমহলের মানুষের তেমন কোন জটিলতা বা সংকট ছিল না। কিন্তু ভারত পাকিস্তান সীমানা নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় তাদের জন্য নতুন করে পরিচয় সংকট সৃষ্টি করা হয়। তাদের পিতৃ পুরুষের বসতবাড়ির উপর অন্যায় ভাবে অন্য রাষ্ট্রের মালিকানা চাপিয়ে দেওয়ার ফলে তারা হয়ে ওঠে নিজ ভুমে পরবাসী। আর ঠিক এভাবেই তারা অধঃপতিত হয়ে 'নাগরিকত্বহীন' 'রাষ্ট্রহীন' মানুষে।

ছিটমহলে থেকেও যারা নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছেন:

ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল বিনিময় লক্ষ্যে ২০১১ সালে যখন জনগণনা হয়েছিল তখন যারা তালিকাভুক্ত হয়েছিল, যাদের নাম সমীক্ষায় নথিভুক্ত করা হয়েছিল কেবলমাত্র তাদের ২০১৫ সালে চূড়ান্ত তালিকায় নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়। বিভিন্ন কারণে যারা ২০১১ সালে জনগণনা নাম তুলতে পারেনি তারা নাগরিকত্বহীন হয়ে পড়ে। তবে ২০১১ সালের জনগণনা থেকে বাদ পড়া মানুষের মধ্যে অনেকেই নাগরিকত্ব পেয়েছে বলে প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়। এ বিষয়ে উদাহরণ হিসেবে একটি পরিবারকে উপস্থাপন করা যায় যেমন বাংলাদেশের সঙ্গে অঙ্গীভূত হওয়া বিলুপ্ত ছিটমহল দশিয়ার ছড়ার বাসিন্দার মোঃ নবীন উদ্দিনসহ তার পরিবারের মোট আটজন ২০১১ সালে জনগণনা থেকে বাদ পড়েন। এ বিষয়ে পত্রপত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের পর প্রশাসনের উচ্চ পর্যায় থেকে বিষয়টি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এ থেকে বোঝা যায় যে বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আছে। অবশ্য বাংলাদেশের স্থানীয় প্রশাসন তাদের বাড়ির হোল্ডিং নম্বর বসিয়ে দিয়েছে। তাই তাদের বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগও দেওয়া হয়েছে ভোটার তালিকায় নাম উঠেছে তবু জাতীয়

পরিচয়পত্র না থাকায় বা না পাওয়া পর্যন্ত তাদের দুশ্চিন্তার যেন শেষ নেই।[১] তবে বাংলাদেশে যেহেতু ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী সংক্রান্ত কোনো রাজনৈতিক ইস্যু নেই তাই কোন বাক্তির অন্তত পুলিশি হয়রানির হাত থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু ভারতের ছিটমহলে যারা এখনো নাগরিকত্ব পায়নি তাদের কি হবে এই প্রশ্নটা কিন্তু থেকেই যায়।

ভারতের বিলুপ্ত বাংলাদেশের ছিটমহল দক্ষিণ মশালডাঙ্গায় দশটি পরিবারের প্রায় ৫০ জন মানুষ এখনো ভারতের নাগরিকত্ব পায়নি। ২০১১ সালের জনগণনায় তাদের নাম লিপিবদ্ধ না হওয়ার কারণেই তারা এই সংকটের মুখোমুখি। ছিটমহল বিনিময়ের পর তাদের বিপদ যেন আরো বেড়ে গেছে কারণ এখন তো তাদের ছিটমহল নেই যে তারা ছিটমহলে মানুষ হিসেবে পরিচয় দিতে পারবে বরং এখন তারা দেশহীন নাগরিকত্বহীন ছিটমহল হীন 'নেই মানুষ' হিসাবে পরিচিত।[২] পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসনের কাছে এ বিষয়ে বিভিন্ন দপ্তরে অনেক আবেদন নিবেদন করেও এদের কোন লাভ হয়নি। প্রশাসনে তরফ থেকে জানানো হয়েছে ২০১১ সালের জনগণনা সময় এদের নাম বাদ পড়ার কারণেই এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। বিষয়টি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নজরেও রয়েছে অথচ ২০১৫ সালে যখন পুনগণনা হয়েছিল তখন এই সমস্ত মানুষ যারা ২০১১ সালে জনগণনা থেকে বাদ পড়েছিল তাদের নাম নথিভুক্ত করার জন্য আরজি জানানো হয়েছিল। কিন্তু ২০১১ সালের তালিকায় নাম না থাকার কারণে প্রশাসন জেনেশুনেই এই মানুষগুলোকে চূড়ান্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেনি।[৩]

ভারতের সঙ্গে অঙ্গীভূত হওয়া দক্ষিণ মশালডাঙ্গায় ছিটমহলে নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত হওয়া তালেব আলী সাক্ষাৎকারে বলেন,

> ২০১১ সালে জনগননা হল আমার পরিবারের ছয় জন লোক সমস্ত লিখে দিলাম। ২০১৫ সালে পুনরায় জনগননা করার জন্য যখন লোক এলো তখন তাদের কাছে থাকা ২০১১ সালের তালিকায় দেখলাম আমাদের নাম নেই। সকল ছিটমহলের মানুষের নামের তালিকায় খোঁজাখুঁজি করে দেখলাম আমার ঘর সহ পরপর দশটি ঘরের কোন নাম ওই তালিকায় নেই। সামনে আছে পিছে আছে মাঝখানে থেকে আমাদের দশ ঘরের নাম নেই। এই দক্ষিণ মশালডাঙ্গার মাঝখানের দশটি বাড়ির মানুষের নাম কেমনে বাদ পড়ে তা এখনো বুঝে উঠতে পারলাম না। আমার পূর্বপুরুষ থেকেই এই ছিটমহলে স্থায়ী ভাবে বসবাস করছি। এত বছর পর এত আন্দোলন সংগ্রাম করার পর সবাই যখন নাগরিকত্ব পাইল তখন আমরা বাদ পরলাম। নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য পঞ্চায়েত ডি এম এসডিও সহ অনেকের কাছে গেলাম। দু জায়গায় দরখাস্ত করা হইল বাদ পড়া ১০ ঘরের নাম দেওয়া হইলো, খালি কইল হবে হবে, আজ পর্যন্ত হইল না। আজ পর্যন্ত আমার আধার কার্ড হলো না ভোটার কার্ড হইল না, কিছুই হলো না আমার।[৪]

ছাবুর আলীর নাগরিকত্ব হারানোর কথা;

ভারতের সদ্য বিলুপ্ত বাংলাদেশি ছিটমহল মশালডাঙ্গার বাসিন্দার ছাবুর আলী ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট এর সকালটা এখনো তার স্মৃতিতে ভাসে। দেশ স্বাধীন হওয়ার আনন্দে তিনি ভারতের তেরঙ্গা পতাকা নিয়ে দিনভর

---

[১] গোলাম রব্বানী, মোহাম্মদ, বাংলাদেশ-ভারত ছিটমহল, অবরুদ্ধ ৬৮ বছর প্রথমা , প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ২০২, পৃষ্ঠা ১৩০

[২] আনন্দবাজার পত্রিকা ২৪ শে জুলাই ২০১৫ থেকে (সংগৃহীত ও সংক্ষেপিত)।

[৩] রব্বানী Op,cit ,p.130

[৪] পশ্চিমবঙ্গের একটি অস্থায়ী ছিট মহল শিবিরের এক বাসিন্দার এই বয়ান দিয়েছে,(সাক্ষাৎকার মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী) ২০১৬ সালের ১৪ নভেম্বর ,

বেরিয়েছিলেন। কিন্তু তার বাপ জানের ভিটের উপর কখন যে ছিটমহলের তকমা লাগু হয়ে গিয়েছিল তা বুঝতেই পারেননি সেই সময়কার কিশোর ছাবুর আলী। দেশ স্বাধীন হওয়ার আনন্দ অবশ্য কয়েক দিনের মধ্যেই কেড়ে নিয়েছিল দেশভাগের বিষাদ আর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বর্বরতা। সাবুর আলী বলেন, আমাদের মশালডাঙ্গা নতুন পরিচয় হইলো ছিটমহল। আর আমরা রাতারাতি হইলাম এক 'না' দেশের মানুষ। এক নিঝুম দুপুরে মশালডাঙ্গা গ্রামের পুলিশ এসে ঘোষণা করেছিল তাদের ভারতীয় নাগরিকত্ব হারানোর কথা। তারপর থেকে সারা জীবন প্রিয় পিতৃ-ভিটে আঁকড়ে থেকে সেই হারানো নাগরিক পরিচয় খুজেছেন ছাবুর আলী। অবশেষে ৬৮ বছর পর ছাবুর আলি পেল নাগরিকত্বের স্বাদ। জীবনের প্রায় শেষ মুহূর্তে এসে ছাবুর আলী ভারতে নাগরিকত্ব অর্জন করল। কিন্তু সাথে নাগরিকত্ব ফিরে পাওয়া গেলেও ফিরে পাওয়া যাবে কি তার জীবনের থেকে হারিয়ে যাওয়া সেই দুরন্ত কৈশোর সেই যৌবন? এর উত্তরে কিন্তু একটাই কথা বলা যায় যে না মিলবে না সেই হারিয়ে যাওয়া জীবনের সময় গুলো। তবুও হয়তো ছাবুর আলী সব কিছু ভুলে যাবেন নাগরিকত্ব পাওয়ার আনন্দেই জীবনের অল্প সময় কাটানোর জন্য। কিন্তু যারা এখনো নাগরিকত্ব পেলেন না তাদের কি হবে?[৫]

বাড়ি ছিটমহলে, কিন্তু দেশ কোথায় জানেন না দিল্লিবাসী তসলিমরা:

তসলিম শেখ, পেশায় রিকশাচালক, বাড়ি দিল্লি এক্সটেনশনের বস্তিতে। ৩০ বছর আগে কোচবিহারের ছিটমহল ছেড়ে পেটের ধান্দায় চলে এসেছিলেন দিল্লি। তারপর থেকেই দিল্লিতেই আছেন বিয়ে করেছেন। উভয় দেশের ছিট মহলের বাসিন্দারা কে কোন দেশে যাবেন তা জানতে যখন যৌথ সমীক্ষা হয়েছিল তখন রুজি রোজগার ছেড়ে নিজের ইচ্ছার কথা জানাতে পারেননি তিনি। ছিটমহল বিনিময়ের পর তার জন্মভিটা এখন বাংলাদেশের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়েছে। তিনি চাইলেও আর ভবিষ্যতে ফিরে যেতে পারবেন না সেখানে। তসলিমের মত আরো অনেকে আছেন যারা সেই জনগণনার খবরটুকুও পাননি। জনগণনার সব কার্যপ্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরে তারা হয়তো শুনেছে। তাই তাদের পরিচয় ঠিক কি কোন দেশের বাসিন্দার তারা এটা ভেবে দিশেহারা হয়ে যাচ্ছেন দিল্লির বস্তিবাসী তসলিম, রিয়াজ ও মোহাম্মদ আজ়গররা। ভারত না বাংলাদেশ কোন দেশের নাগরিক এ নিয়ে সংশয়ের মধ্যে এখন তারা দিল্লির সেই পরিচয়কেই আকড়ে ধরতে চাইছে। দীর্ঘদিন দিল্লিতে থাকার ফলে আধার কার্ড ভোটার কার্ড ও তারা বানিয়ে নিয়েছে অনেকেই আর এটাই তাদের একমাত্র ভরসা। তবে তাতে অবশ্য পুলিশের জুলুম কমেনি মাঝেমধ্যেই দিল্লি পুলিশ হানা দেয় সেই বস্তিতে এবং তাদের উপর অত্যাচার চালায় রাতের অন্ধকারে। ওই বস্তির আরেক বাসিন্দার নিয়াজ বলেন, আমাদের আধার কার্ড আছে এমন কি যে বাচ্চারা এখানে জন্মেছে তাদের জন্ম সনদ রয়েছে। তবু পুলিশ আমাদের বাংলাদেশি বলে ভাষাগত কারণে অনুপ্রবেশকারীর তকমা দিয়ে অত্যাচার করে হুমকি দেয়। স্থানীয় পরিচয়পত্র দেখানো সত্ত্বেও বাঙালি হওয়ার কারণে বাংলা ভাষায় কথা বলার কারণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোন পরিচয় পত্র দেখানোর জন্য বলা হয়। এই উপরিক্ত ঘটনাগুলি থেকে একথা বলা যায় যে নাগরিকত্ব ও পরিচিতি দুটোই খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাদের কাছে। এই গুরুত্বপূর্ণ পরিচিতি যখন কোন মানুষের না থাকে তখন তাঁকে যে কি সংকটের মুখোমুখি হতে হয় তার বাস্তব চিত্র আমরা এই ঘটনা বিশ্লেষণ করলে অনুভব করতে পারি।[৬]

---

[৫] গোলাম রব্বানী, মোহাম্মদ, বাংলাদেশ-ভারত ছিটমহল, অবরুদ্ধ ৬৮ বছর প্রথমা , প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ২০২২, পৃষ্ঠা,১২৭

[৬] ৬ই আগস্ট ২০১৫ আনন্দবাজার পত্রিকা।

বেকারত্বের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই ছিটমহলের কিছু মানুষ ছিটমহল ছেড়ে অন্যত্র কাজের সন্ধানে পাড়ি দেয় আর যার দরুন আজ তাদের এই করুণ পরিণতি। তাই এই সব বিষয় নিয়ে তাদের কোন অভাব অভিযোগ নেই। এই সহায় সম্বলহীন মানুষ গুলো হয়তো কেউ কোন এক সময় বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী হিসেবে পুলিশের হাতে ধরা পড়বে এবং যাবজ্জীবন কারাবাস কাটবে আবার কেউ হয়তো পুস-ইন হয়ে বাংলাদেশে ফিরে যাবেন। আবার কেউ কেউ হয়তো পুলিশের তাড়া খেয়ে এক শহর থেকে আরেক শহর ভেসে বেড়াবে। যতদিন তাদের শরীরে শক্তি আছে ততদিন কোন না কোন কাজে যুক্ত হয়ে খাবারটুকু জোগাড় করতে পারবে। হয়তো এভাবে একদিন তাদের জীবনের অবসান ঘটবে কেউ তাদের খবর রাখবে না। এভাবেই নাগরিকত্বহীন বা পরিচিতি সংকটের সম্মুখীন হয়ে অনেক পরিবার নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে।

উপরে বর্ণিত সংবাদপত্রের তথ্যগুলি থেকে বুঝতে পারা যায় পরিচিতি বা নাগরিকত্ব নিয়ে যে সংকট তার শিকরে অনেক গভীরে, এর মধ্যে মেখলিগঞ্জ ভোট বাড়ি অস্থায়ী ক্যাম্পে একটি সমীক্ষা থেকে তাদের পরিচিতি সংকটের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভোট বাড়ি অস্থায়ী ক্যাম্পে যখন জানতে চাওয়া হয় প্রতিবেশীরা তাদের সঙ্গে কেমন আচরণ করে বিশেষ করে ক্যাম্পে বসবাসকারী ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে স্কুলে বা অন্যত্র প্রতিবেশীরা বা ছাত্র-ছাত্রীরা বন্ধুত্বসুলভ আচরণ করে কিনা বা খেলাধুলায় তারা অংশ নেয় কিনা। এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরে বাংলাদেশে ছিট বাঁশ কাটা থেকে আগত চ্যাংড়াবান্ধা হাই স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র ধনঞ্জয় বর্মন বয়স ১৬ জানায়, না স্কুলে বা খেলার সময় কেমন কেউ কিছু বলেনা। তবে মাঝে মাঝে কয় তোরা তো বাংলাদেশী আগত ছিটত ছিলি। [7]একই স্কুলের নবম শ্রেণির আর এক ছাত্র শুভ বর্মন (বয়স ১৫ বৎসর) বলে অপমান করে না কিন্তু হিংসা করে আমরা বাংলাদেশি জন্য হিংসা করে। মেখলিগঞ্জ অবস্থিত ছিটমহল।[৮] আরেকজন বয়স ত্রিশের ভদ্রমহিলা যার সন্তান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র তিনি জানালেন স্কুলে বাচ্চাদের মারামারি লাগলে এটেকার মানশিলা কয় বাংলাদেশের ছাওয়া বাংলাদেশত পাঠে দেমো যেটে কার ছাওয়া সেটে চলি যাইবেন।[৯] গল্প কথকের ভাবনায় কথাকার যখন বলেন ছেলেটি টোটো চালক চরিত্রটি মুখে যেন প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ দেখতে পেলাম। তখন এই জাতীয় মনোভাবের নিমৃত কারণ রূপে কেউ কেউ ঘটি ও বাঙ্গাল তান্ত্রিক সম্পর্কের দিকটিকে ইঙ্গিত করতেই পারেন।[১০] কিন্তু মনে রাখতে হবে কলকাতা কিংবা দক্ষিণবঙ্গের সাপেক্ষে এই অঞ্চলের মানুষের অনুভূতি বিচার করা ভুল হবে। দেশভাগ এবং তার পরবর্তীকালে নানা সময় ধরে বাংলাদেশ থেকে আগত অসংখ্য মানুষ কোচবিহার, জলপাইগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাস করে চলেছে। স্থানীয় বা দেশীও মানুষদের (ভূমিপুত্র রাজবংশী ও নস্যশেখ মুসলিম) কাছে যারা ভাটিয়া নামের পরিচিত। এই ভাটিয়া বনাম দেশীয় আপাত তান্ত্রিক সম্পর্ক থাকলেও দীর্ঘদিনের সহাবস্থানের ফলে মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছে এমন কি বৈবাহিক সম্পর্কে ও বাধা থাকছে না। কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষ দেখা গেছে এই ভাটিয়া বা বাঙ্গাল ,বাংলা থেকে আগত অনেক মানুষেরাও এই নবাগতদের সম্পর্কে সমানুভাব পোষণ করেন। আবার পাশাপাশি এও মনে রাখতে হবে আগত ছিটবাসি যারা ক্যাম্পে বসবাস করেন এবং সাবেক ছিটমহলে অধিকাংশ

---

[7] মেখলিগঞ্জে অবস্থিত ছিটমহল অস্থায়ী শিবিরে বসবাসকারী ধনঞ্জয় বর্মনের সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত, ১৭ ই নভেম্বর ২০১৭। (সাক্ষাৎকার লতিফ হোসেন)।

[8] মেখলিগঞ্জে অবস্থিত ছিটমহল অস্থায়ী শিবিরে বসবাসকারী শুভ বর্মনের সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত, ১৭ ই নভেম্বর ২০১৭। (সাক্ষাৎকার লতিফ হোসেন)

[9] মেখলিগঞ্জে অবস্থিত ছিটমহল অস্থায়ী শিবের ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত ক্ষেত্র সমীক্ষার তারিখ ১৭ই নাম্বার ২০১৭।

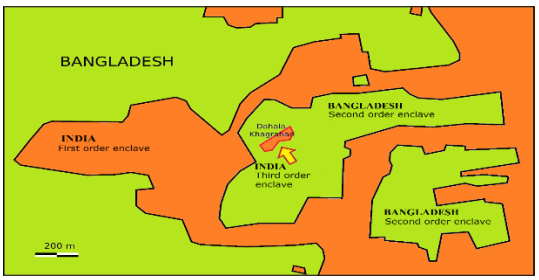
[10] বিশ্বাস, রাজর্ষি,(সম্পাদিত)ছিটমহলের নতুন গল্প ,গাংচিল , কলকাত, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৮,পৃষ্ঠা ২৬১।

মানুষই নৃতাত্ত্বিক পরিচয় এর দিক থেকে রাজবংশী এবং নস্যশেখ মুসলিম। তাই এক্ষেত্রে জাত্যাভিমানের প্রশ্ন ধোপে টেকে না। যদিও কোচবিহার, জলপাইগুড়ি অঞ্চলে বসবাসকারী অনেক রাজবংশীরাই ওপার বাংলা থেকে আগত রাজবংশী, রংপুরিয়া রাজবংশী নামে অভিহিত করে থাকেন। তবে এর কারণ হিসেবে কৃষি নির্ভর এক প্রান্তিক অঞ্চলের কর্মহীনতা বেকারত্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে দায়ী করা যায়। একের পর এক চা বাগান বন্ধ হয়ে যাওয়া শিল্পে মন্দা কারখানা নির্মাণের প্রতিকূল পরিবেশ প্রভৃতির কারণে প্রতি বছর শত শত মানুষ নির্মাণ শ্রমিক হিসাবে সপরিবারে দিল্লি মুম্বাই সহ বিভিন্ন মহানগরীতে পাড়ি দিচ্ছেন কাজেই জীবন জীবিকার প্রশ্নেও নব্য ভারতীয়দের অতিরিক্ত চাপ স্থানীয়দের শুধু আশঙ্কার কারণেই হয়ে উঠছে না বরং ভিন রাজ্যে গিয়ে তারা পরিচিতি সংকটের বা বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য নানা প্রতিকূল ব্যবহারের সম্মুখী হচ্ছে।

ছিটমহলের বর্তমান হালহকিকত:

ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত সমস্যার একটি সমার্থক সমস্যা হল ছিটমহল সমস্যা। ৩১ শে জুলাই ২০১৫ সালে মধ্যরাতে ছিটমহল চুক্তি কার্যকর হলে সারা বিশ্বে আলোড়ন পরে যায়। দেশ বিদেশ থেকে নানা সংবাদ মাধ্যম ছুটে আসে এই সংবাদ পরিবেশন করার জন্য। বিশ্বের নামিদামি সংবাদপত্রে ফলাউ করে এই খবর পরিবেশন করা হয়। এক অতি জটিল আন্তর্জাতিক সীমান্ত সমস্যার সমাধানের পর ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকায় অ্যাডাম টেলার অদ্ভুত সীমান্তবিরোধ মিটলো শীর্ষক এক প্রতিবেদনে লেখেন, "উৎসুক মানচিত্রকর ও রাজনৈতিক বিদঘুটে অবস্থার কারণে পীড়িতদের জন্য এটা একটা যুগের অবসান।"[১১] বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে এসব ছিটমহল বিনিময়ের অর্থ হল বিশ্বে এখন থেকে অত্যন্ত বিদঘুটে সীমান্তের অস্তিত্ব যেমন থাকবে না তেমনি বিশ্বে আর তৃতীয় অর্ডারের ছিটমহলও থাকবে না। তৃতীয় অর্ডারের ছিটমহল হল, যে ছিটমহল অন্য দেশের ছিটমহল দ্বারা বিস্তৃত থাকে আবার সেটি বিস্তৃত থাকে আরেক দেশের ছিটমহল দ্বারা এরপর সেটি আবার অন্য দেশের ভূখণ্ড দ্বারা বেষ্টিত। এ ধরনের পরিস্থিতি কি সাধারন ভাবে চিন্তা করা যায়! বসবাসের ভূমি রয়েছে অথচ বসবাসকারীদের স্বাধীনভাবে চলাচল বা ভুখন্ড থেকে আরেক ভূখন্ডে যাওয়ার অধিকার নেই। এ সমস্যার সমাধানের কোন সম্ভাবনা ছিল না। এখানে আমরা দহলা খাগড়াবাড়ি তৃতীয় অর্ডারের ছিটমহল কে বোঝার জন্য উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করতে পারি। এটা ভারতের অংশ ছিল, এটি বেষ্টিত ছিল বাংলাদেশের ছিটমহল দ্বারা, সেটি আবার ভারতের ছিটমহল বেষ্টিত ছিল, আবার পুনরায় এটি বেষ্টিত ছিল বাংলাদেশের ভূখণ্ড ধারা। বিষয়টি নিম্নে মানচিত্র দ্বারা দেখানো হল।

[১১]TaylorAdam (say goodbye to the weirdest border dispute in the world) ,The Washington Post, 1 August 5015.Availablefrom https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/08/0 1/say-goodbye-to-the-weirdest-border-dispute-in-the world/?utm_term=.13ed9223e711.



মানচিত্র; ৩, ভারত ও বাংলাদেশের দহলা খাগড়াবাড়ির তৃতীয় অর্ডারের ছিটমহল। source, https://en.wikipedia.org/wiki/Dahala_Khagrabari

এ ধরনের ছিটমহলের অস্তিত্ব বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী এই জায়গা ছাড়া দুনিয়ার আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।[১২] এই বিষয়টি থেকে এটাই স্পষ্ট যে ছিটমহলের সমস্যা কতটা গভীর এবং কাউন্টার কাউন্টার ছিট বা তৃতীয় অর্ডারের ছিটমহল কে কেন্দ্রা করে মানুষের জীবনযাপন পরিচিতি সংকটকে কেন্দ্র করে কতটা প্রতিকূল হয়ে উঠেছিল। যেমন ভারতীয় ছিট মহল দহলা খাগড়া বাড়ির সমস্যার বিষয়ে বাংলাদেশর সমকাল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এখানকার কিছু নাগরিক মনে করেছেন তাদের জরিপ থেকে বাদ রাখা হয় এবং তাদের উদ্বেগ এই কারণে যে তারা হয়তো তাদের নাগরিকত্ব বেছে নেওয়ার সুযোগ পাবে না এবং তাদের ভূমি সত্যত্য বজায় রাখতে পারবেন না। তাই খাগড়াবাড়ির কিছু পরিবার বিভক্ত হয়ে পড়েছে ভিন্ন ভিন্ন দেশের নাগরিকত্ব বেছে নেওয়ার কারণে। কলাকৌশলগত খুঁটিনাটি বিবেচনায় বিশ্বের অন্যতম অত্যন্ত বিস্ময়কর সীমান্তবিরোধ সমাধান হয়ে গেল। তবে বাস্তব পরিস্থিতি অনেক জটিল।[১৩] ছিটমহল বিনিময় সম্পূর্ণ হলেও কিছুতেই যেন তাদের সমস্যা পিছু ছাড়ছে না নতুন করে শুরু হয় এক আতঙ্ক ও ভয়ের পরিবেশ।

দীর্ঘ ৫৮ বছরের পরিচয় হীনতা অসহায়তা স্তব্ধতা দীর্ঘশ্বাস নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি তথাকথিত সভ্যতার সম্পূর্ণ বিপরীত দিন যাপনের পর ২০১৫ তে এসে ছিটমহলবাসীরা অনেক আশায় বুক বেঁধেছিলেন। তাদের কাছে ছিটমহল বিনিময়ে সম্পূর্ণ হওয়াটা ছিল এক ধরনের দ্বিতীয় স্বাধীনতা দিবস। ২০১৫ সালের ৩১ শে জুলাই মধ্যরাতে ছিটমহল বিনিময় কার্যকর হলে অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিটমহল গুলি জেনারেটর ও মশালের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছিল। দেশভাগের প্রায় ৭ দশকের পর ছিটমহলবাসী বন্দীদশা থেকে মুক্তির আনন্দ সীমান্তের এপার ওপার জাতীয় পতাকার আলোয় আলোকিত হয়েছিল। দশকের পর দশক ধরে স্তব্ধতায় ঢুকে থাকা এই হতদরিদ্র মানুষগুলি দিন পাল্টানোর স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। কিন্তু অচিরেই ফানুসের মতো উড়ে যায় সদ্য নাগরিকত্ব পাওয়া ছিটমহলের মানুষের স্বপ্ন। এদিকে তিন মাস পরেই সীমান্তের ওপার থেকে অপশন দিয়ে প্রায় হাজার মানুষ ভিটেমাটি ছেড়ে সপরিবারে চলে আসেন এপারে। তাদেরও চোখে ছিল হাজারো স্বপ্ন সেই স্বপ্ন নিয়ে তারা ভারতের সদ্য গড়ে ওঠা ক্যাম্পে হাজির হয়। আবারো ফিরে আসে তাদের জীবনে ৪৭ ও ৭১ এ শরণার্থীদের ক্যাম্প জীবনের স্মৃতি।[১৪] পার্থক্য হল-এই ক্যাম্পের আশ্রিতরা হলেন ভারতীয় এবং এরাও দীর্ঘ অনুন্নয়ন এর শিকার। প্রায় ৭ দশকের অনুন্নয়ন কোন জাদু দণ্ড দিয়ে এক মুহূর্তে পরিবর্তন করা সম্ভব ছিল না কিন্তু এই ছিটমহলবাসীদের প্রত্যাশা ছিল উর্ধ্বমুখী যা অচিরেই স্বাধীনতার মত স্বপ্নভঙ্গের

[১২] অ্যাডাম টেলরের উল্লেখিত প্রতিবেদন, ভাষান্তর সুভাষ সাহ, 'সমকাল' বাংলাদেশ, ৪আগস্ট ,২০১৫

[১৩] বিশ্বাস, Op.cit.p.208

[১৪] বিশ্বাস, রাজর্ষি , দেশভাগে বঙ্গ সিমান্ত, গাংচিল, জানুয়ারী ২০২৩, পৃষ্ঠা ২৩৯

পুনরাবৃত্তি হয়। বাংলাদেশের অন্তর্গত পাঠগ্রাম, হাতীবান্ধা কালিয়াগঞ্জ, লালমনিরহাট ও ফুলবাড়ির যে ৫১ টি ছিটমহল ভারতভুক্ত হয় বিনিময়ের পর সেগুলির উন্নয়নের কর্মধারা চলতে থাকে। কিন্তু এই উন্নয়নের পাশাপাশি প্রবেশ করেছে রাজনীতির এক অশনি সংকেতের পঙ্কিলতাও। স্থলসীমা চুক্তির আগে নিজেদের পরিচিতি সংকট থেকে বাঁচার জন্য তারা সকলেই একত্রিত হয়ে জীবন যাপন করতো ফলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ কখনোই মাথা চারা দিয়ে ওঠেনি। কিন্তু বর্তমানে ছিটমহলগুলিতে রাজনীতির প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সমগ্র ছিট মহলবাসীদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সংকীর্ণতা গ্রাস করে চলেছে। এই হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার ফায়দা নিচ্ছে কিছু সুবিধাভোগী রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা। যার ফলে ছিটমহলগুলিতে বর্তমানে ধর্মীয় পরিচিতি সংকটের এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে।[১৫] অবশেষে একটা প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে যে ছিট মহলবাসীরা কি কোনদিন পরিচিতি সংকট থেকে থেকে মুক্তি পাবে না?

[১৫] Ibid.p.240

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1732- 1738
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.395

মাহাত্মা গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কৃপা হত্যা

কিয়া মুর্মু, *গবেষক, দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়,পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 25.03.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This paper presents an analytical account of Mahatma Gandhi's philosophical and ethical perspective on one of the most debated issues in practical ethics—euthanasia. The discussion originates from the historical controversy in India surrounding Gandhi's decision in 1928, at his ashram, to end the suffering of a terminally ill calf through a painless death.

The study resolves the apparent contradiction between Gandhi's doctrine of ahimsa (non-violence) and euthanasia by arguing that the taking of life, when motivated by pure intention and selfless compassion, may be regarded as a meaningful and even the highest expression of non-violence. The paper further examines the specific conditions outlined by Gandhi for the justification of euthanasia, emphasizing incurable illness and the inability of the patient to express consent.

In addition, a comparative framework is developed between Gandhi's views and the concept of non-voluntary euthanasia as articulated by Peter Singer. The relevance of Gandhi's philosophy of seva (care) is also evaluated in the context of modern palliative care.

The study concludes that Gandhi accepted euthanasia only as an extreme and final option—applicable solely when no other possibilities of care or service remain.

Keywords: Euthanasia, Practical Ethics, Ahimsa (Non-violence), Non-voluntary Euthanasia, Palliative Care, Moral Intention

'Euthanasia' ব্যবহারিক নীতিবিদ্যায় বহুল চর্চিত ও বিতর্কিত বিষয়। Euthanasia শব্দটি গ্রীক শব্দ 'eu' অর্থাৎ good এবং 'tantos' অর্থাৎ death এই দুই শব্দ যুগলের সমন্বয়ে গঠিত। এই শব্দের আভিধানিক অর্থ হল- 'a gentle and easy death' অর্থাৎ, শান্ত ও সহজ মৃত্যু। Peter singer কে অনুসরণ করে বলা যায়- euthanasia হল- "the killing of those who are incurably ill and in great pain or distress , for the sake of those killed, and in order to spare them further suffering or distress,"[1] অর্থাৎ নিরাময়ের অযোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত যন্ত্রণা কাতর ব্যক্তির মঙ্গলার্থে এবং ভবিষ্যতের তীব্র যন্ত্রণা ও দুর্ভোগ থেকে মুক্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে তার প্রাণহানি ঘটানো। Euthanasia শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হল করুণা হত্যা বা সৌজন্য হত্যা বা কৃপা হত্যা, যা মৃত্যুকাঙ্খী ব্যাক্তির শান্তি পূর্ণ সহজ মৃত্যু কেই বোধিত

[1] Singer, Peter. *Practical Ethics*. 3rd ed. New York: Cambridge UP, 2011. P 157.

করে। ভারতবর্ষের কথা উল্লেখ করলে মহাভারতে পিতামহ ভীষ্মের ইচ্ছা মৃত্যুর বর এবং জৈন ধর্মে প্রচলিত সান্থারা (Santhara) ব্রত অনেকাংশে কৃপা হত্যা বা Euthanasia এর ধারণার অনুরুপ। মহর্ষি বেদব্যাস রচিত মহাকাব্য মহাভারতে ভীষ্ম তথা দেবব্রত তাঁর পিতা রাজা শান্তনুর নিকট হতে ইচ্ছা মৃত্যুর বর লাভ করেছিলেন। জৈন ধর্মাবলম্বী মানুষেরা মূলত যারা বৃদ্ধ ও দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত তারা খাদ্যগ্রহণ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখার মাধ্যমে স্বেচ্ছায় মৃত্যু অভিমুখী হয়, মহাবীর অনুমোদিত এই ব্রত সান্থারা (Santhara) নামে পরিচিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সতেরো শতকে Francis Bacon তাঁর 'Euthanasia Medica' গ্রন্থে এই Euthanasia শব্দটিকে চিকিৎসা ক্ষেত্রের বিষয় হিসেবে প্রথম ব্যবহার করেন এবং তার দ্বারা এক সহজ যন্ত্রণাহীন ও শান্তিপূর্ণ মৃত্যুকে বোধিত করেছেন। Euthanasia কেবল চিকিৎসা বিষয়ক একটি বিষয় হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকেনি বর্তমানে তার পরিসর সম্প্রসারিত হয়ে আইন কানুন, নীতিবিদ্যা ইত্যাদির এক গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়েছে ।বর্তমানে নেদারল্যান্ড থেকে শুরু করে বিশ্বের বহু দেশে কৃপাহত্যা আইনি বৈধতা লাভ করেছে এবং ভারত বর্ষ তার ব্যতিক্রম নয়। 2018 সালে সুপ্রিম কোর্ট passive euthanasia এর বৈধতা করণ প্রসঙ্গে রায় দিতে গিয়ে 1928 সালে কৃপা হত্যা বিষয়ে জনসম্মুখে সংঘটিত এক বিতর্কের উল্লেখ করেন। এবং সেই বিতর্কের একজন গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হলেন মহাত্মা গান্ধী। এই বিতর্কের কেন্দ্রে ছিল দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত তীব্র যন্ত্রণাতে কাতর গান্ধীজীর আশ্রমের এক বাছুর। বাছুরটির অবস্থা এতই দুর্দশা গ্রস্থ হয়ে পড়েছিল যে চিকিৎসকদের পক্ষেও তার অবস্থার উন্নতি সাধন অসম্ভবপর হয়ে পড়েছিল এমতাবস্থায় গান্ধীজী গোসেবা সংঘের পরিচালক সমিতির সঙ্গে আলোচনার পর বাছুরটির যন্ত্রণাহীনভাবে জীবনাবসানের সিদ্ধান্তে উপনীত হন । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে অনুমান করা হয় তা হল ভারতবর্ষে কৃপাহত্যা বিষয়ে প্রথম প্রকাশের সংঘটিত বিবাদ যা নথিভুক্তও আছে।[2] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গান্ধীজী কৃপাহত্যা বা ইউথেনেশিয়া শব্দটি কে ব্যবহার না করলেও অসহনীয় যন্ত্রণাতে কাতর পশু তথা মানুষের জীবন যুদ্ধ ত্যাগের বাসনার অনুমোদন প্রদান ন্যায় সঙ্গত বলে বিবেচিত হবে কি না- তাঁর এই বিষয়ক আলোচনা Euthanasia এর আলোচনার অনুরূপ।

গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গিতে কৃপা হত্যা:

কৃপাহত্যা বিষয়ে গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে তাঁর দ্বারা রচিত চিঠিপত্র এবং প্রবন্ধ সমূহের বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে গান্ধীজীর রচিত চিঠির উল্লেখিত এক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যায়। তাঁর মতে জলাতঙ্কের আক্রান্ত কোন সারমেয়ের ক্ষেত্রে যদি সকল রকম কার্যকরী চিকিৎসা বিফল হয়ে পড়ে তাহলে সেক্ষেত্রে ওই সারমেয়ের প্রাণনাশ করা কর্তব্য বলেই বিবেচিত হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি আরোও উল্লেখ করেন সারমেয়ের অনুরূপ পরিস্থিতিতে যদি কোন মানব শিশু থাকতো এবং তার পরিস্থিতির উন্নতি তে কোন আশাপ্রদ চিকিৎসা না থাকতো তাহলে ওই শিশুর যন্ত্রনাময় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটানোও গান্ধীজীর কাছে কর্তব্য।[3]

গান্ধীজীর মতে হত্যাকাণ্ডকে ন্যায় সঙ্গত হিসেবে গণ্য করা যাবে যদি তা নিঃস্বার্থ সহানুভূতিশীল ও পরম করুণা বোধ থেকে উদ্ভূত হয়।এই প্রসঙ্গে গান্ধীজী প্যারিসের এক অভিনেত্রীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। প্যারিসের ওই অভিনেত্রী তার প্রেয়সীর অনুরোধে তাকে গুলি করে হত্যা করেন কারণ তিনি আরোগ্যের সম্ভাবনা হীন

[2] Gandhi, M. K. *The Collected Works of Mahatma Gandhi*. Vol. 37. New Delhi: Publications Div., Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India, 1970. P 310-311.

[3] Gandhi, M. K. *The Collected Works of Mahatma Gandhi*. Vol. 32. New Delhi: Publications Div., Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India, 1969. P 42.

ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে অসহ্যন্ত্রণায় ভুগছিলেন। এক্ষেত্রে এই হত্যাকে যথোচিত কর্ম হিসেবে গণ্য করা চলে কারণ গান্ধীজীর মতে কাজের নৈতিকতা নির্ভর করে উদ্দেশ্যের বিশুদ্ধতার ওপর।[4]

গান্ধীজী এই প্রসঙ্গে মূলত কয়েকটি নির্দিষ্ট শর্তের উল্লেখ করেছেন যেগুলি একযোগে পূরণ হলে তবে কৃপাহত্যা ন্যায়সঙ্গতভাবে অনুমোদিত হতে পারে। সেগুলি নিম্নরূপ,

1. The disease from which the patient is suffering should be incurable.
2. All concerned have despaired of the life of the patient.
3. The case should be beyond all help or service.
4. It should be impossible for the patient in question to express his or its wish.

অর্থাৎ, ব্যাধিটি যদি নিরাময়ের অযোগ্য হয় এবং চিকিৎসক যদি ব্যাধির অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে আশাহত হয়ে পড়েন। ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি সমস্ত সম্ভাব্য সহায়তা সেবা যদি অকার্যকর হয়ে পড়ে। এবং ব্যক্তিটি যদি তার ইচ্ছা প্রকাশ্যে অসমর্থ হয়ে পড়ে।[5]

উল্লেখিল ক্ষেত্রেই কৃপা হত্যা ন্যায়সংগত বলে গণ্য হতে পারে। অর্থাৎ বলা চলে ব্যক্তি যদি নিরাময়ের অযোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত ও সম্পূর্ণরূপে অন্যের সেবার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং ন্যূনতম সেবা প্রদানেও ব্যাহত হয় প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কেবল শারীরিক নয় মানসিক সেবা অর্থাৎ বিশুদ্ধ চিন্তা, উপদেশ ইত্যাদি প্রদানে অসমর্থ হয়ে পড়ে তবেই সেই ব্যক্তির আত্মহননের প্রত্যাশা ন্যায় সঙ্গত বলে বিবেচিত হতে পারে।

অহিংসা ও কৃপা হত্যা:

গান্ধীজীর দর্শন মূলত যে দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে তা হল সত্য ও অহিংসার ফলে এক্ষেত্রে প্রশ্নের উদ্ভব হয় তার অহিংসা ও Euthanasia এই দুই ধারণার মধ্যে কি দ্বন্দ্বের উদয় হয়?

এ প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে গান্ধীজীর অহিংসা সম্পর্কে ধারণা পর্যালোচনা প্রয়োজন। গান্ধীজীর সত্য ও অহিংসাকে একই মুদ্রার দুই দিক বলে অভিহিত করেছেন। তার মতে সত্য হলো লক্ষ্য এবং অহিংসা হলো সত্য লাভের উপায়। বিশদভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তার দর্শনে অহিংসা মাধ্যম এবং লক্ষ্য উভয়। অহিংসার মাধ্যমে যেহেতু মানুষের মধ্যে প্রেম, সহানুভূতি ও ন্যায়বোধ গড়ে ওঠে তাই তা উপায় এবং তা লক্ষ্যও কারণ অহিংসা সাধনের দ্বারা মানুষ দেবত্বের দিকে অগ্রসর হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য জৈন ও বৌদ্ধ মতের সঙ্গে গান্ধীজীর অহিংসা দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য বিদ্যমান। ক্রোধ বা ব্যক্তিগত স্বার্থের বশবর্তী হয়ে অপরকে হত্যা করা বা আঘাত করা থেকে বিরত থাকা অর্থাৎ সকল প্রকার সহিংসতা থেকে বিরতি অহিংসার এই নঞর্থক দিক টিকেই কেবল গান্ধীজী গ্রহণ করেননি। তিনি অহিংসার এক সদর্থক দিকের কথাও উল্লেখ করেছেন। সদর্থক অর্থে অহিংসা ভালবাসা রূপ প্রত্যয় যা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস থেকে নিঃসৃত এবং এর মাধ্যমেই ব্যক্তি সমগ্র মানবজাতিকে ভালবাসতে পারে তথা সম্পূর্ণ হৃদয়ে অহিংসার চর্চাতে সমর্থ্য হতে পারে। অহিংসার সমর্থক হলেও তিনি বিশ্বাস করতেন ক্ষেত্র বিশ্বাসে সহিংসতা বেছে নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। এই প্রসঙ্গে পূর্বের পর্বে উল্লেখিত 'জলাতঙ্কে আক্রান্ত সারমেয়, যার ক্ষেত্রে সকল রকম কার্যকরী চিকিৎসা বিফল হয়ে পড়েছে সেক্ষেত্রে ওই সারমেয়ের প্রাণনাশ করা কর্তব্য বলেই বিবেচিত', তাঁর এই দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা চলে। এছাড়াও দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত তীব্র যন্ত্রণাতে কাতর আশ্রমের বাছুরটির জীবনাবসান ঘটানোর সিদ্ধান্ত ও প্যারিসের

[4] Gandhi, M. K. *The Collected Works of Mahatma Gandhi*. Vol. 32. New Delhi: Publications Div., Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India, 1969. P 477-478.

[5] Gandhi, M. K. *The Collected Works of Mahatma Gandhi.* Vol. 37. New Delhi: Publications Div., Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India, 1970. P 410.

অভিনেত্রীর তার প্রেয়সীর অনুরোধে তাকে গুলি করে হত্যা করার ঘটনাগুলিও উল্লেখ করা চলে। এক্ষেত্রে তিনি জীবনাবসান ঘটানো কে কর্তব্য রূপে দেখেছেন । বলা বাহুল্য বহু মানুষ তাঁর এই সিদ্ধান্তে সহিংসতার পরিচয় পেয়েছেন ও বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু গান্ধীজীর মতে কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে জনমতের প্রভাব থাকলে ব্যক্তি জনমতের চাপে সঠিক ও ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবনে ব্যর্থ হয় এবং বিবেকবোধে যে সিদ্ধান্ত সঠিক বলে পতিত হয় তা গ্রহনেও ব্যর্থ হয়। তাঁর মতে কর্মের হিংস্রতা বা অহিংস্রতা নির্ভর করে কর্মের অন্তর্নিহিত অভিপ্রায় এর ওপর এবং উপরে উল্লেখিত সফল ক্ষেত্রেই যেহেতু কর্মের অভিপ্রায় ছিল মর্মাহত যন্ত্রণা মুক্তি তাই তা সহিংসতার পরিচয় হতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে তিনি এক শল্য চিকিৎসকের দৃষ্টান্তের উপস্থাপন করেছেন। শল্য চিকিৎসক যে রূপ ব্যধি গ্রস্থ ব্যক্তির যন্ত্রণাদায়ক অঙ্গটি কেটে বাদ দিয়ে ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দান করেন এবং তা হিংসা রূপে বিবেচিত হয় না। অনুরূপভাবে, জীবের মঙ্গলার্থে দেহ থেকে প্রাণ বিচ্ছিন্ন করা অনিবার্য হয়ে পড়লে জীবন সংহার করা হিংসার পরিচয় নয়। এক্ষেত্রে যন্ত্রণা প্রদ অঙ্গ রূপ দেহ থেকে আত্মাকে মুক্ত করা হয়, আত্মার যন্ত্রনা লাঘবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন কোন জীবের প্রতি ক্রোধ বা স্বার্থান্বেষী উদ্দেশ্য থেকে কষ্ট দেওয়া, অমঙ্গল করা বা তার প্রাণ সংহার করাই হিংসা। অপরদিকে, স্নিগ্ধ বিচার ও বিশুদ্ধ স্বার্থহীন মনোভাব থেকে কোন জীবের শারীরিক বা আধ্যাত্মিক কল্যাণার্থে প্রাণ সংহার করা হতে পারে অহিংসায় শুদ্ধতম রূপ। বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট রূপে বোধগম্য করতে তাঁর এক পত্রের উল্লেখ করা চলে, একজন পিতা তার চার মাসের আরোগ্যের সম্ভাবনা হীন সন্তানের কথা জানিয়ে গান্ধীজীর উদ্দেশ্যে চিঠিতে লেখেন, তার সন্তানের অবস্থা সম্পর্কে চিকিৎসকরা পর্যন্ত আশাহত এবং তিনি তার সন্তানের যন্ত্রণা, পারিবারিক চাপ, আর্থিক চাপ সহ্য করতে অসমর্থ হয়ে পড়েছেন এমতাবস্থায় কি করনীয়? গান্ধীজী প্রত্যুত্তরে জানান এক্ষেত্রে ওই শিশুর প্রাণনাশ ন্যায় সঙ্গত বলে বিবেচিত হতে পারে না। কারণ এক্ষেত্রে পিতার উদ্বেগ মূলত নিজের কষ্ট ও আর্থিক চাপকে কেন্দ্র করে যা জীবননাশের সিদ্ধান্তের ন্যায্য কারণ হতে পারে না। [6]

তাঁর মতে, হিংসা দেহধারী জীবের এক অন্তর্নিহিত প্রয়োজন। এজন্য একজন প্রকৃত অহিংসা ব্রতী সর্বদা প্রার্থনা করেন যাতে তিনি এই দেহ বন্ধন থেকে চূড়ান্ত মুক্তি লাভ করতে পারেন। অহিংসা ব্রতী ব্যাক্তির উচিত হিংসার পরিধিকে সর্বদাই হ্রাস করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

পাশ্চাত্যের ধারণার সাথে তুলনামূলক আলোচনা:

গান্ধীজীর Euthanasia সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করে বলা যায় তা কিয়দাংশিক ভাবে পাশ্চাত্যের Non-Voluntary Euthanasia বা নিরৈচ্ছিক স্বস্তি মৃত্যুর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য Peter Singer তাঁর Practical Ethics গ্রন্থে তিন প্রকারের Euthanasia এর উল্লেখ করেছেন। যথা-

Voluntary Euthanasia (ঐচ্ছিক স্বস্তি মৃত্যু)– Peter Singer কে অনুসরণ করে বলা চলে "Voluntary Euthanasia is euthanasia carried out at the voluntary request of the person killed, who must be, when making the request, mentally competent and adequately informed."[7] অর্থাৎ সাধারণ ভাবে বলা যায়, ব্যাধিগ্রস্থ বা যন্ত্রণাকাতর ব্যক্তি যখন যন্ত্রণা লাঘবে নিজের জীবন নাশের মৌখিক বা লিখিত কামনা প্রকাশ করলে তা Voluntary Euthanasia বা ঐচ্ছিক স্বস্তি মৃত্যুর অন্তর্গত রূপে গণ্য করা হয়।

---

[6] Gandhi, M. K. *The Collected Works of Mahatma Gandhi*. Vol. 38. New Delhi: Publications Div., Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India, 1970. P 66-67.

[7] Singer, Peter. *Practical Ethics*. 3rd ed. New York: Cambridge UP, 2011. P 157.

Involuntary Euthanasia (অনৈচ্ছিক স্বস্তি মৃত্যু)– Involuntary Euthanasia বা অনৈচ্ছিক স্বস্তি মৃত্যু ক্ষেত্রে Peter Singer অভিমত হল "|Euthanasia as involuntary when the person killed is capable of consenting to her own death but does not do so, either because she is not asked or because she is asked and chooses to go on living."[8] অর্থাৎ, ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি কৃপা হত্যার প্রস্তাবে সম্মতি দেওয়ার যোগ্য হলেও তার দিক থেকে সম্মতি আসে না, সম্ভবত দুটি কারণে, হয় তাকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়নি অথবা জিজ্ঞাসা করা হলেও তিনি অসম্মতি জানিয়ে বেঁচে থাকার পক্ষে মত দিয়েছেন।

Non-voluntary Euthanasia(নিরৈচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যু)– Non-voluntary Euthanasia বা নিরৈচ্ছিক স্বস্তি মৃত্যু প্রসঙ্গে Peter Singer-কে অনুসরণ করে বলা চলে, "If a human being is not capable of understanding the choice between life and death, Euthanasia would be neither voluntary nor involuntary, but nonvoluntary."[9] অর্থাৎ, ব্যক্তি যখন জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কার সিদ্ধান্ত গ্রহণে অসমর্থ হয়ে পড়ে এবং মৃত্যুর সম্মতি দেওয়া বা অস্বীকার করার মতো মানসিক বা জ্ঞানগত সক্ষমতা হারিয়ে ফেলে সেক্ষেত্রে রোগীর যন্ত্রণা প্রসমে মৃত্যুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে তা হবে Non-voluntary Euthanasia বা নিরৈচ্ছিক স্বস্তি মৃত্যু।

উল্লেখ্য, গান্ধীজীর কৃপাহত্যা বিষয়ে উল্লেখিত মূল শর্ত গুলির মধ্যে দুর্দশাগ্রস্থ পরিস্থিতির দরুণ ব্যক্তির মৃত্যু কামনার স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে ইচ্ছা প্রকাশের অসামর্থ্যতা এই শর্ত Non-voluntary Euthanasia বা নিরৈচ্ছিক স্বস্তি মৃত্যুর মূল ধারণার সদৃশ। কিন্তু শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে প্রতিবন্ধী তথা বার্ধক্যজনিত কারণে যে সকল ব্যক্তি জীবন ও মৃত্যুর ভেদ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে সেই সমস্ত ব্যক্তিদের নিরৈচ্ছিক স্বস্তি মৃত্যুর পাত্র হিসেবে গণ্য করা হয়। আর গান্ধীজী সর্বদা জীবনকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার আহ্বান জানিয়েছেন এবং আরোগ্যের সম্ভাবনা হীন পরিস্থিতিতেও মানবসেবা এবং পরিচর্যার উপর জোর দিয়েছেন। তাই সম্পূর্ণরূপে গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গিকে নিরৈচ্ছিক স্বস্তি মৃত্যুর সদৃশ রূপে গণ্য করা চলে না। তিনি বিশ্বাস করতেন, আরোগ্যের সম্ভাবনা হীন পরিস্থিতিতেও সহানুভূতি দ্বারা সেবা প্রদান সম্ভব।

সেবা সম্পর্কিত ধারনা:

গান্ধীজী অসুস্থ বাছুরের জীবন নাশ সমর্থন করে অনুরূপ পরিস্থিতিতে মানুষের জীবননাশের কথা বললেও স্পষ্ট করে দেন যে এর বাস্তব প্রয়োগ ক্ষেত্র অতি স্বল্প।পশুর সঙ্গে মানুষের পার্থক্য হল মানুষের শরীর পশুর তুলনায় অনেক বেশি পরিচর্যা যোগ্য এবং মানুষ নিজের ইচ্ছা প্রকাশের সমর্থ্য।[10] মানুষের ক্ষেত্রে শারীরিক যন্ত্রণার পাশাপাশি তার আত্মিক ও মানসিক দিকটিও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তির আরোগ্যের সম্ভাবনা না থাকলেও সহানুভূতি দ্বারা সেবা প্রদান সম্ভব। এই অকৃত্রিম ভালোবাসা, সহানুভূতি এবং পরিচর্যার মাধ্যমে একজন অসহায় রোগগ্রস্থ ব্যক্তির লুপ্তপ্রায় আত্মমর্যাদা ও মানসিক শক্তির পুনরুদ্ধার ঘটানো সম্ভব। গান্ধীজী আরও উল্লেখ করেছেন এমন বহু দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা গেছে যে সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তি মুহূর্তিক বেদনা বা হতাশার বশবর্তী

[8] Singer, Peter. *Practical Ethics.* 3rd ed. New York: Cambridge UP, 2011. P 158.
[9] Singer, Peter. *Practical Ethics*. 3rd ed. New York: Cambridge UP, 2011. P 158.
[10]Gandhi, M. K. *The Collected Works of Mahatma Gandhi*. Vol. 37. New Delhi: Publications Div., Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India, 1970. P 410.

হয়ে মৃত্যু কামনা করলেও উপযুক্ত সেবা ও পরিচর্যা লাভ করে সেই মুহূর্তিক জীবনাবশানের ইচ্ছা উপেক্ষিত হওয়ার ফলে পরে কৃতজ্ঞতাই স্বীকার করেছেন[11] ।

গান্ধীজীর পরিচর্যা ও সেবা সম্পর্কিত এই ধারণা অনেকাংশে আধুনিক palliative care (উপশমমূলক যত্ন) এর ধারণার অনুরূপ। World Health Organization (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা) palliative care কে এমন একটি পদ্ধতি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছে, "that improves the quality of life of patient's adults and children and their families who are facing problems associated with life threatening illness. It prevents and relieves suffering through the early identification, impeccable assessment and treatment of pain and other problems, whether physical, psychosocial, or spiritual."[12] অর্থাৎ,যা প্রাণঘাতী রোগে আক্রান্ত প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি তথা শিশুর এবং তাদের পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা করে। রোগ শনাক্তকরণ, তার নিখুঁত মূল্যায়ন এবং শারীরিক তথা মানসিক বেদনা ও অন্যান্য সমস্যাগুলির চিকিৎসা পূর্বক ব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তির কষ্ট প্রতিরোধ এবং উপশমের প্রচেষ্টা। palliative care (উপশমমূলক যত্ন) জীবনের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে এবং মৃত্যুকে একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বলে মনে করে, ব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তির জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সহায়াতা করনের মাধ্যমে রোগের গতিপ্রকৃতির ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে সচেষ্ট হয় এবং ব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তির অসুস্থতার সময় তথা মৃত্যুর পর ঐ ব্যক্তির শোকগ্রস্থ পরিবারকে সাহায্য করতে একটি সহায়তা ব্যবস্থা প্রদান করে। সাধারন ভাবে বলা চলে, palliative care (উপশমমূলক যত্ন) হল বেদনা গ্রস্থ দীর্ঘস্থায়ী রোগাক্রান্ত তথা মৃত্যুর পথযাত্রী ব্যক্তির পরিচর্যা ও সেবার দ্বারা শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তি প্রদান এবং জীবনের প্রতি এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি লাভে সহায়তা করা। এই প্রক্রিয়া সেবা, শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির মাধ্যমে মর্যাদা পূর্ণ মৃত্যুর কথা বলে। গান্ধীজীর মতে একজন ব্যক্তির মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা যদি সম্পূর্ণরূপে অন্যদের সুবিধা বা ব্যক্তির নিজের দুর্দশার কারণবশত হয় তাহলে তা হবে কর্তব্য চ্যুতি। যতক্ষণ পর্যন্ত পরিচর্যা ও সেবার সুযোগ বিদ্যমান ততক্ষণ পর্যন্ত জীবন রক্ষা করাই হলো পরম কর্তব্য। এই প্রসঙ্গে গান্ধীজীর উদ্দেশ্যে রচিত এক পত্রের উল্লেখ করা চলে। এক ব্যক্তি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত কুড়ি বছর বয়সী তার ভগিনীর মানসিক দুশ্চিন্তার কথা উল্লেখ করে গান্ধীজীর উদ্দেশ্যে চিঠিতে লেখেন- আশ্রমের বাছুর হত্যার ঘটনা সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর তার ভগিনীর মনে প্রশ্নের উদয় হয়েছে তাহলে কি তার জীবনাবসান ঘটানো উচিত কর্ম বলে বিবেচিত হবে এবং এভাবে কর্মফল থেকে পলায়নের ফলে তা কি বিঘ্নিত হবে না ? প্রত্যুত্তরে গান্ধীজী জানান কর্মফল কোন অচল নিস্তেজ নিয়ম নয় তা জীবন্ত সদা বৃদ্ধিশীল চলমান এক বিশাল শক্তি এবং মহিলার জীবনের ইতি টানার ক্ষণিক ইচ্ছা নিজেকে পরিবারের বোঝা স্বরূপ বিবেচনা করা থেকে উদিত হয়েছে। এক্ষেত্রে পরিবারের থেকে সেবা নেওয়া ওই মহিলার কাছে কষ্ট বা অসুবিধা রূপ পতিত হলেও তা পরিবারের কর্তব্য এবং তাদের কাছে সম্মানের। [13] পরিবার বা পরিজনদের আর্থিক বা অন্যান্য পারিপার্শ্বিক চাপ কিংবা ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির মানসিক কষ্ট রোগীর জীবনাবসানের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে কখনোই ন্যায়সঙ্গত রূপে গৃহীত হতে পারে না। তাই এক্ষেত্রে জীবনাবসান ঘটানো ন্যায্য বলে বিবেচিত হতে পারে না এবং সেবার পন্থা অবলম্বন করায় হবে উচিত কর্ম।

---

[11] Gandhi, M. K. *The Collected Works of Mahatma Gandhi.* Vol. 32. New Delhi: Publications Div., Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India, 1969. P 42.

[12] Palliative care, World Health Organization, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care, 5 August 2020.

[13] Gandhi, M. K. *The Collected Works of Mahatma Gandhi*. Vol. 38. New Delhi: Publications Div., Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India, 1970. P 108-109.

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের 'Palliative care'-এর ধারণার সাথে সাযুজ্য রেখে তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, যতক্ষণ ন্যূনতম সেবা, শুশ্রূষা ও ভালোবাসার মাধ্যমে রোগীকে মানসিক প্রশান্তি দেওয়ার সুযোগ রয়েছে, ততক্ষণ জীবন রক্ষা করাই মানবধর্ম।

সিদ্ধান্ত:

কৃপাহত্যা বা Euthanasia প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গি এক গভীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি যথেচ্ছভাবে কৃপাহত্যাকে সমর্থন করেননি, বরং চরমতম অহিংসা এবং নিঃস্বার্থ করুণার মাপকাঠিতে এটিকে বিচার করেছেন। গান্ধীজিকে অনুসরণ করে বলা চলে সঠিক পরিচর্যা ব্যক্তিকে মানসিক নেতিবাচকতা ত্যাগ করে জীবনের প্রতি নতুন ইচ্ছা শক্তি ও প্রত্যয় অর্জনের সহায়তা করে যা আধুনিক Palliative Care এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁর মতে যতক্ষণ পর্যন্ত পরিচর্যা ও সেবার সুযোগ বিদ্যমান ততক্ষণ পর্যন্ত জীবন রক্ষা করাই হলো পরম কর্তব্য। তৎসত্ত্বেও বলা চলে বিশেষ পরিস্থিতি সাপেক্ষে এবং পূর্বে উল্লেখিত শর্তের উপস্থিতিতে অর্থাৎ, ব্যাধিটি যদি নিরাময়ের অযোগ্য হয় এবং চিকিৎসক যদি ব্যাধির অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে আশাহত হয়ে পড়েন, ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি সমস্ত সম্ভাব্য সহায়তা সেবা যদি অকার্যকর হয়ে পড়ে এবং ব্যক্তিটি যদি তার ইচ্ছা প্রকাশ্যে অসমর্থ হয়ে পড়ে, তবে কেবল সেই ক্ষেত্রেই গান্ধীজী কৃপা হত্যার ক্ষেত্রে সম্মতি প্রকাশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর উল্লেখিত এক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যায়- যুদ্ধক্ষেত্রে গুরুতর আহত এক সহযোগী যোদ্ধার ক্ষেত্রে যেখানে চিকিৎসাগত সকল প্রকার সাহায্য প্রদান অসম্ভব সে ক্ষেত্রে কৃপাহত্যার প্রয়োগ ব্যতীত আর কোন পন্থা অবলম্বন করা সম্ভবপর নয়।[14] তাই পরিশেষে বলা যায় গান্ধীজীর মূল বক্তব্য হলো, সকল সম্ভাব্য বিকল্প ও প্রযত্নের প্রয়োগ করে তবেই শেষ পন্থা হিসেবে কৃপা হত্যাকে গ্রহণ করা তবেই তা যথোচিত কর্ম রূপে বিবেচিত হবে। গান্ধীজীর এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের এক অনন্য মানবিক পথের সন্ধান দেয়, যা জীবনের পবিত্রতা এবং মর্যাদাপূর্ণ মৃত্যু উভয়কেই পরম শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করতে শেখায়।

গ্রন্থপঞ্জি:

1. Singer, Peter. Practical Ethics. 3rd ed. New York: Cambridge UP, 2011.
2. Sharma, I. C. Ethical Philosophies of India. London: George Allen & Unwin, 1965.
3. Gandhi, M. K. The Collected Works of Mahatma Gandhi. Vol. 32. New Delhi: Publications Div., Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India, 1969.
4. Gandhi, M. K. The Collected Works of Mahatma Gandhi. Vol. 37. New Delhi: Publications Div., Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India, 1970.
5. Gandhi, M. K. The Collected Works of Mahatma Gandhi. Vol. 38. New Delhi: Publications Div., Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India, 1970.
6. Gandhi, M.K. Young India 1927-1928. Madras: S. Ganesan, 1935.
7. Singer, Peter. Applied Ethics. Oxford: Oxford UP, 1986.
8. Jain, Champat Rai. The Ranta-Karanda-Sravakachara. The Central Jaina Publishing House, 1917.
9. গোয়েন্দকা, জয়দয়াল। সংক্ষিপ্ত মহাভারত। গায়ত্রী বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অনুবাদিত, প্রথম খণ্ড, গীতাপ্রেস, ২০১২।
10. Iyer, Raghavan N. The Moral and Political Thought of Mahatma Gandhi. Oxford UP, 1973.

[14] Gandhi, M. K. *The Collected Works of Mahatma Gandhi*. Vol. 32. New Delhi: Publications Div., Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India, 1969. P 478.

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1739- 1746
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.396

কিন্নর রায়ের ‘অন্ধকারের ছবি’: সংখ্যালঘু মনস্তত্ত্ব ও অস্তিত্বের সংকট

সোনালী কুণ্ডু, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 25.03.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Kinnar Roy, a distinguished figure in contemporary Bengali literature, is celebrated for his profound portrayal of marginalized lives. This paper provides a comprehensive analysis of his notable novel 'Andhokarer Chobi' (1992), which serves as a poignant document of the psychological and existential crises faced by the Muslim minority in late 20th-century West Bengal. Through the protagonist, Ansar, the narrative explores the deep-seated fear of social exclusion that compels individuals to conceal their religious identity, epitomized by the symbolic renaming of his garage to ‘Mishtu Automobiles’.

The study examines how a lack of formal education and an all-pervasive inferiority complex foster alienation and a sense of belonging to another mental landscape. It further delves into the community's internal complexities, including the sectarian friction between Shia and Sunni groups and the influence of religious conservatism like the Tablighi movement. Additionally, the paper highlights the intersectional struggles of women like Rahima, who navigate a rigid patriarchal structure. By situating the 1992 text within the broader context of post-partition social polarization, the article demonstrates the novel's enduring relevance. Ultimately, ‘Andhokarer Chobi’ acts as a mirror to a fragmented society, capturing a tragic quest for dignity amidst systemic insecurity.

Keywords: Minority Psychology, Existential Crisis, Kinnar Roy, Social Insecurity, Religious Divide

যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষের মাটিতে বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের মানুষ এসেছে। কেউ এসেছে শাসন করতে, আবার কেউ নিছক ভাগ্যান্বেষণে। তাদের মধ্যে অনেকেই এদেশকে ভালোবেসে থেকে গেছে এবং এই দেশের মাটির সাথে মিশে গেছে। ভারতবর্ষের এই উদার ভূমি সবাইকে পরম মমতায় আপন করে নিয়েছে। যদিও সময়ের প্রবাহে কখনও কখনও পারস্পরিক দূরত্ব বা বিচ্ছিন্নতা দেখা দিয়েছে, তবুও নানা জাতি, নানা ভাষা ও ধর্মের দেশ এই ভারতবর্ষ চিরকাল ‘মহামানবের পুণ্যতীর্থ’। তাই তো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীকে এই পুণ্যতীর্থে আহ্বান জানিয়ে বলেছেন—

> “এসো হে আর্য, এসো হে অনার্য, হিন্দু মুসলমান—
> এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃস্টান।
> এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার।
> এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমানভার।

মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা, মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা
সবার-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে—
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।।"[১]

ভারতবর্ষে হিন্দু, মুসলিম, খৃস্টান, বৌদ্ধ, জৈন, পারসিক ইত্যাদি বহু ধর্মের মানুষের বাস। এই দেশের মতো এমন সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য পৃথিবীর আর কোনো দেশে দেখা যায় না, যেখানে সাতটি বড় ধর্ম এবং অসংখ্য উপভাষায় মানুষ কথা বলে। সুতরাং, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ, বেশভূষা কিংবা খাদ্যাভ্যাসে বৈচিত্র্য থাকাটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক। জনসংখ্যার বিচারে ভারতে মুসলমানদের স্থান হিন্দুদের ঠিক পরেই। ভারতের মোট জনসংখ্যার একটি বড় অংশ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের জীবনধারা সম্পর্কে আমাদের ধারণা অনেক ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। তাঁদের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আমরা অনেকেই সঠিকভাবে জানি না। এর অন্যতম প্রধান কারণ সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভাব। ভারতবর্ষের মাটিতে হিন্দু ও মুসলমান— এই দুই সম্প্রদায় দীর্ঘকাল পাশাপাশি বাস করলেও হৃদয়ের টানে একে অপরের খুব একটা কাছে আসতে পারেনি। কিন্তু অখণ্ড ভারতবর্ষকে চিনতে হলে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবার জীবনছন্দকে উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। এই জানার তাগিদেই আমরা সাহিত্যের শরণাপন্ন হই। মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের জীবন ও তাঁদের অন্তরের কথা আমরা অনেকটাই সাহিত্যের পাতায় খুঁজে পাই। তবে এটি ঠিক যে, বাংলা সাহিত্যের সূচনালগ্নে অমুসলিম লেখকদের কলমে সাধারণ মুসলমান সমাজজীবন সেভাবে ফুটে ওঠেনি। এর কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে—

> "হিন্দু (অমুসলিম) লেখকরা খানদানি মুসলিমদের কাছাকাছি এসেছিলেন, কিন্তু গ্রাম বাংলার চাষি, মজুর, মুসলিমদের ঘরের উঠোন পর্যন্ত তাঁদের দৃষ্টি এসে পৌঁছায়নি। এইজন্য বাংলা গল্প, উপন্যাসের প্রথমদিকে হিন্দু গল্পকার এবং ঔপন্যাসিকদের কলমে রাজা-রানী, বাদশা-বেগমদের কথাই উঠে এসেছে। এছাড়াও বাস্তব জীবনে নানা কারণে মুসলিম সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা (ধারণা) ছিল সীমাবদ্ধ। তেমনি মুসলিমরাও সাহিত্য চর্চায় তেমন আগ্রহ দেখায়নি। মুসলিম লেখকরা যদি তাঁদের নিজের সমাজ ও জীবন নিয়ে সাহিত্য রচনা করতেন, তাহলে হিন্দু লেখকদের পক্ষে মুসলিম সমাজকে জানা ও চেনা সহজ হত।"[২]

তবে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা কথাসাহিত্যে এবং সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় হিন্দু ও মুসলিম উভয় ধারার সাহিত্যিকদের লেখনীতে 'আরশি নগরের পড়শি' এই মুসলমান সম্প্রদায়ের জীবনধারা ক্রমশ উন্মোচিত হয়েছে। বিশেষ করে আধুনিক যুগের লেখকদের হাত ধরে তাঁদের সমাজবাস্তবতা এবং মানসিক টানাপোড়েনের চিত্রগুলো আরও স্পষ্ট ও স্বচ্ছ হয়ে আমাদের সামনে ধরা দিয়েছে।

বর্তমান সময়ের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কথাকার কিন্নর রায় হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, পারসিক ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষদের নিয়ে আখ্যান নির্মাণ করেছেন। তাঁর বিশ্বাস— "...আমার দেশ কখনো শুধুমাত্র হিন্দুর দেশ নয়, মুসলমান, খ্রিস্টান, শিখ, জৈন, পারসিক–এদের সকলের দেশ।"[৩] লেখকের জীবন-অভিজ্ঞতা তাঁকে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে পরিচিত করিয়েছে। তিনি লক্ষ্য করেছেন, আমাদের দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষরা মানসিকভাবে সংখ্যাগুরু সমাজ থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন থাকেন। এর ফলে সংখ্যাগুরু হিসেবে আমরা যেমন তাঁদের অন্দরমহল সম্পর্কে জানি না, তাঁরাও হয়তো আমাদের সম্পর্কে একই রকম ধারণা পোষণ করেন। এভাবে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবধান নিরন্তর বেড়ে চলেছে। আমরা যাদের সুখ-দুঃখের হদিস রাখি না, তাদের সাথে আমাদের আত্মিক মিলন ঘটা প্রায় অসম্ভব। এই দায়বদ্ধতা থেকেই কিন্নর রায় ইসলামধর্মী মানুষের জীবন ও সমাজকে তাঁর সাহিত্যের উপজীব্য করেছেন। লেখকের যেসব উপন্যাসে এই জীবনযাত্রা ফুটে উঠেছে, সেগুলো হলো— 'অন্ধকারের ছবি' (১৯৯২), 'আগুনের সিঁড়ি' (১৯৯৩),

'নিরপেক্ষ' (১৯৯৪), 'সংখ্যালঘু' (১৯৯৫) ইত্যাদি। ছাড়াও তাঁর বিভিন্ন গল্পগ্রন্থে মুসলিম সমাজের নিরাপত্তাহীনতা, ধর্মীয় রীতিনীতি, সাম্প্রদায়িক বিভেদ এবং মুসলিম নারীদের অবস্থান নিটোল বাস্তবতায় ধরা পড়েছে। লেখক এই মানুষদের খুব কাছ থেকে দেখেছেন বলেই হয়তো এই সমাজের খুঁটিনাটির চিত্র নিখুঁতভাবে তাঁর লেখায় তুলে ধরতে পেরেছেন—

> "...মুসলিম সমাজ, জীবন, ধর্মীয় ব্যাপার, গোপন সমস্যা, যাবতীয় বিষয় নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ (সূক্ষ্ম) ব্যাখ্যা (অনুসন্ধান) নিখুঁত বর্ণনা আর অন্তরের দরদ ঢেলে চরিত্রগুলোর অঙ্কন—এ সবই যেন বুঝিয়ে দেয় কিন্নর রায় মুসলিম সমাজের একজন বিশ্বস্ত প্রতিনিধি কিংবা মুসলিম সমাজের দর্পণ।"[৪]

এই প্রবন্ধে কিন্নর রায়ের 'অন্ধকারের ছবি' উপন্যাসে সংখ্যালঘু মনস্তত্ত্বের আলোকে ইসলামধর্মী মানুষের জীবনযাপন এবং সংখ্যাগুরু সমাজের প্রতি তাঁদের মনোভঙ্গি কীভাবে চিত্রিত হয়েছে, তাই হবে আমাদের আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু।

আলোচ্য 'অন্ধকারের ছবি' (১৯৯২) উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয় হলো এক বিশেষ সময়ের প্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু মুসলমান জনমানষের নিরাপত্তাহীনতা ও অস্তিত্বের সংকট। পাশাপাশি ঔপন্যাসিক এই বিশেষ জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন ও তাঁদের বহুমুখী সমস্যার এক নিপুণ আলেখ্য নির্মাণ করেছেন। প্রধান চরিত্র 'আনসার'-কে কেন্দ্র করেই উপন্যাসের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে। উপন্যাসটি তিন দশক আগের অস্থির সামাজিক পটভূমিতে লেখা হলেও বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে এর বিষয়বস্তু ও সংকটগুলো অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ১৯৪৭-এর দেশভাগের পর দীর্ঘ সময় পার হয়ে গেলেও সাম্প্রদায়িক বিভেদ আর ধর্মীয় মেরুকরণের বিষবাষ্প আজও সমাজমানসে বর্তমান। এমনই এক গুমোট পরিস্থিতিতে লেখক তুলে ধরেছেন আনসারের মতো সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন ও প্রান্তিক মানুষের কথা, যারা কেবল 'মুসলমান' এই ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে সমাজের মূল স্রোত থেকে দূরে এক ভিন্ন মানসিক ভূখণ্ডে বাস করতে বাধ্য হয়। মূলত কলকাতার ভৌগোলিক সীমানার ভেতরেই এক 'অ-কলকাতা'র জনপদে বসবাসকারী সংখ্যালঘু বাঙালি মুসলমান সমাজের যাপনের এক জীবন্ত দলিল এই উপন্যাস।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি আনসার উপলব্ধি করে যে, কোনো 'ধর্মীয় পরিচয়বাহী' নামে নিজের গ্যারাজের নাম রাখলে জীবিকা নির্বাহে বা ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হতে পারে। এই আশঙ্কা থেকেই সে নিজের গ্যারেজের নাম রাখে 'মিষ্টু অটোমোবাইলস'। কেবল পেশাগত সুবিধাই নয়, সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার আশায় সে বিভিন্ন হিন্দু উৎসবে বা সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রেও নিজের প্রকৃত পরিচয় গোপন রাখে। শুধু আনসার নয়, তার গ্যারেজের অন্যান্য মুসলিম কর্মচারীরাও 'দিলীপ' বা 'বাবুয়া'-র মতো হিন্দু ছদ্মনামে নিজেদের পরিচয় দেয়। প্রশ্ন জাগে, কেন তারা এই আত্মপরিচয় প্রকাশে এতটা দ্বিধা বা হীনম্মন্যতায় ভোগে? আসলে এর গভীরে নিহিত আছে এক গভীর সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সংকট। লেখকের ভাষায়—

> "এই ঘটনাটুকু থাকেই–ইনফিরিয়ারিটি কমপ্লেক্স–আমি মুসলমান, আমার সঙ্গে ওরা মিশবে না। আর বাস্তব তো তাই-ই। মানুষ হিসেবে এখনও তো সম্মান পাওয়া হয়ে ওঠে না পুরোপুরি, শুধু এই নাম পদবী অথবা জীবন-যাপনের আচার-আচরণে। বিচ্ছিন্নতা গোপনে বাড়ে। অপমানে অপমানে একজন মানুষ সত্যিকারের 'বাগি' হয়ে ঘুরে দাঁড়াতে চায়। এই নাম বদলের আবরণটুকু থেকেই মিষ্টু অটোমোবাইলস। সেই নামে ছাপানো প্যাড। জীবন এরকমই।"[৫]

পরিচয় গোপনের এই মানসিক চাপ ও বাধ্যবাধকতা থেকেই আনসারের মনে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি এক ধরনের বিদ্বেষ জন্মায়। নিজের অস্তিত্ব নিয়ে সে সব সময় সংশয়ের মধ্যে থাকে। এভাবেই এক বিচ্ছিন্নতার পরিবেশ আমাদের সমাজে দিন দিন বেড়েই চলেছে। লেখক এই উপন্যাসে কেবল পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু মুসলিমদের নিরাপত্তাহীনতার কথাই বলেননি, বরং বাংলাদেশের হিন্দুরাও যে একই সমস্যার শিকার— সে কথা জানাতেও ভোলেননি। বাংলাদেশের রং-মিস্ত্রি সুরেন দেবনাথ এপার বাংলায় কাজের সূত্রে থাকলেও সংখ্যালঘুদের এই সংকট সম্পর্কে বেশ অবগত। কারণ বাংলাদেশেও অবস্থা একই রকম। তার ভাই মন্টু, যার ভালো নাম হরেন— সে বাংলাদেশে 'সাফদার হোসেন মন্টু' নামে সিরামিক টালির ব্যবসা করে। এই পরিচয় লুকানোর ফলে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে তার 'পার্টি' বা 'পেমেন্ট' পেতে সুবিধা হয়। নিজের দেশ ও পরিবার থেকে দূরে এসে সুরেনের মন সব সময় ছটফট করে, কিন্তু দেশে ফেরার কোনো আশা তার আর নেই; কারণ অভাব আর অর্থ উপার্জনের টানে সে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছে।

ইসলামধর্মে বিশ্বাসী আনসার ধর্মকে আঁকড়ে ধরতে চায় মূলত জীবনের সব 'না-পাওয়া'-র দুঃখকে মুছে ফেলতে। তার এই 'না-পাওয়া' কেবল অভাব-অনটন নয়, বরং সমাজে আত্মসম্মানের সঙ্গে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার আকুলতা। ধর্মকে গুরুত্ব দিলেও কাজের চাপে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া হয় না, তবে সে নিয়ম করে শুক্রবারের 'জুম্মা' পড়তে যায়। নামাজের মতো ধর্মীয় আচারের মধ্য দিয়ে আনসার নিজের মদের নেশাকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। কিন্তু অনেক সময়ই নিজেকে সামলাতে পারে না। ইসলামে মদ বা সুদ নিষিদ্ধ জেনেও মাঝেমধ্যে মদ খায় আর ব্যাঙ্কে টাকা রাখে। এমনকি পতিতা নারীদের সঙ্গেও মেলামেশা করে। আসলে লেখক আনসারকে এমন এক সাধারণ যুবক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে এঁকেছেন, যাদের আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের সমাজেই দেখতে পাই। মূলত আনসারের এই মদ খাওয়া বা নিষিদ্ধ পল্লীতে যাতায়াত আসলে কোনো চারিত্রিক বিলাসিতা নয়, বরং এটি তার যন্ত্রণাময় জীবন থেকে এক ধরনের পলায়নবৃত্তি (Escapism)। জীবনের না-পাওয়া আর অভাবের গ্লানি সাময়িকভাবে ভুলে থাকতেই সে এই নেশার আশ্রয়ে নিজের ভেতরের জ্বালাটুকু নিভিয়ে ফেলতে চায়।

সংসারের দায়িত্বের ভারে আনসার ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত। তার পৈতৃক বাড়ি কামালগাজিতে হলেও ছেলেবেলা থেকেই সে ব্রহ্মপুরে মামাবাড়িতে মানুষ হয়েছে। বাবার দায়িত্বহীনতার কারণে অতি অল্প বয়সেই তাকে উপার্জনের তাগিদে ঘর ছাড়তে হয়। তার বাবা কেবল ধর্মের নেশায় মেতে থেকে স্ত্রী ও দশটি সন্তানের কোনো খোঁজ রাখেননি। তাবলিগ-জামাত, আল্লা-চিন্তা, পরকালের 'বেহস্তের রাস্তা' পাকা করার ভাবনায় ডুবে থেকে তিনি সংসারের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। বিপরীতে আনসারের মায়ের জীবন হয়ে উঠেছিল এক অন্তহীন সংগ্রাম। একজন সাধারণ মুসলিম গৃহবধূর পক্ষে দশটি সন্তান নিয়ে একা সংসার চালানো যে কতটা দুঃসহ ও যন্ত্রণার, আনসারের মায়ের জীবন তারই এক করুণ দৃষ্টান্ত। এখানে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মুসলিম পরিবারের প্রান্তিক নারীদের অসহায়ত্বের এক করুণ ছবি ফুটে ওঠে। বাবার এই দায়িত্বহীনতা সম্পর্কে আনসার বলেছে—

> "মাঝে মাঝে আমরা ভাই-বোনেরা হয়েছি। মাথায় বেড়েছি। বাবা এসব ভাবে নি। অর্থ রোজগারের কথা ভাবে নি। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ডিসিপ্লিনে তার পায়ের পাতার কড়া, সিজদায় সিজদায়–ক্রমাগত প্রণামে কপালে কালো দাগ। মুঠ ভরা তবলিগি দাড়ি। ছোট করে ছাঁটা চুল, যাতে টুপির বাইরে না যায়। গোঁফের চুল যাতে না জলে পড়ে। প্রতি বছর নিয়ম করে রোজা–ইসলামী আরও নানা নিতকিত।"[৬]

শিক্ষা মানুষের জীবন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সন্তানকে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ দেওয়ার প্রাথমিক দায়িত্ব মূলত বাবা-মায়ের ওপরই থাকে। তবে শৈশবে বাবার সাংসারিক উদাসীনতার কারণে আনসার ও তার ভাইবোনদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা হয়ে ওঠেনি। আনসার ও আক্রাম বড়জোর পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার সুযোগ পেয়েছে। কেবল কায়দা করে ইংরেজিতে নাম লিখতে পারা এবং ক্লাস এইট পাসের একটি সার্টিফিকেট থাকায় কোনোমতে কাজের বাজারে তারা টিকে আছে। অন্যদিকে তার বোনেরা কেবল মসজিদে আরবি পড়ার মতো যৎসামান্য শিক্ষা পেয়েছে। এই অপূর্ণতা আনসারের মনে এক ধরণের মানসিক জড়তা তৈরি করে এবং সমাজে চলার পথে তাকে বারবার ধাক্কা খেতে হয়। আনসার নিজের এই অপূর্ণতা নিয়ে ভাবে—

> "...পৃথিবীর দরজা যে অনেক বড়। এখন বুঝতে পারি। পার্টিকে কাজের কোনো টেন্ডার বা বিল দেয়ার সময়, অথবা ব্যাঙ্কের চেক সই করে জমা দিতে গেলে নিজেকে ইংরেজি না জানা পাথর মনে হয়। অপমান বাজে। অনেক কথা ঠিক ঠিক বুঝতে পারি না, বলতে, বোঝাতে পারি না। এখানে আমার বয়েসীরা প্রায় সবাই এরকম। অথচ বাবা যদি গোল টুপি, লম্বা টুপি, দাড়ির মাপ না করে আমাদের লেখা-পড়ায় একটু জোর দিত।"[৭]

আর্থিক অনটনের কারণে প্রান্তিক ও নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানদের মধ্যে ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনা ছেড়ে রোজগারের তাগিদ তৈরি হয়। ফলে তাদের শৈশব কাটে ঘুড়ি উড়িয়ে, গোবর কুড়িয়ে কিংবা চায়ের দোকানে কাজ করে। যখন তারা যৌবনে পা দেয়, তখন এই পিছিয়ে পড়ার গ্লানি থেকে বাঁচতে অনেকেই অন্ধ সংস্কার বা পরিকল্পনাহীন জীবনচক্রে আটকে যায়। ঔপন্যাসিক এখানে মূলত দরিদ্র পরিবারগুলোর অশিক্ষা এবং পরিবার পরিকল্পনার অভাবের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। জীবনের এই ব্যর্থতা থেকে সাময়িক মুক্তি খুঁজতেই অনেকে নেশার পথে পা বাড়ায়। এমন হতাশাজনক পরিস্থিতিতে আনসারের হাহাকার ফুটে ওঠে— "আমাদের শিক্ষা নেই, আমরা কী করব!"[৮]

ব্যক্তিগত এই জীবনসংগ্রাম থেকেই জন্ম নেয় সামাজিক তিক্ততা। মূলত সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের প্রতি আনসারের যে চাপা ক্ষোভ, তার বীজ লুকিয়ে ছিল শৈশবের সেই অপূর্ণতায়। শিক্ষার অভাবে সে যখন কোনো শিক্ষিত বা উচ্চবিত্ত মানুষের মুখোমুখি দাঁড়ায়, তখন নিজের অজান্তেই তার মধ্যে এক ধরণের হীনম্মন্যতা (Inferiority Complex) কাজ করে। নিজেকে 'ছোট' মনে করার এই নিদারুণ বোধ থেকেই সফল মানুষদের প্রতি তার মনে এক ধরণের বিদ্বেষ ও বিরক্তি তৈরি হয়। অর্থাৎ, আনসারের ব্যক্তিগত এই হীনম্মন্যতাই কালক্রমে সমাজের প্রতি এক প্রবল ক্ষোভ ও অভিমানে রূপান্তরিত হয়েছে।

শিক্ষার অভাব এবং জীবনযুদ্ধে পিছিয়ে পড়ার গ্লানি থেকেই অনেক সময় মানুষের মধ্যে ধর্মীয় রক্ষণশীলতা দানা বাঁধে। আলোচ্য উপন্যাসে লেখক কেবল সংখ্যালঘু হিসেবে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের বাইরের জীবনসংগ্রাম নয়, বরং ধর্মের অভ্যন্তরীণ শিয়া ও সুন্নি সম্প্রদায়ের দীর্ঘদিনের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বিষয়টিও নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। মুর্শিদাবাদ থেকে কাজের সূত্রে ব্রহ্মপুরে আসা রাজমিস্ত্রি সেন্টু শেখ এবং তার সঙ্গীরা মহরমের আগে যখন 'মরশিয়া' বা শোকগাথা গাইতে থাকে, তখন সুন্নি মতাদর্শে বিশ্বাসী আনসার একে 'না-জায়েজ' বলে মনে করে। ক্ষোভের বশে সে সেন্টুকে চড় পর্যন্ত মারে। সেন্টুকে আঘাত করার আগে আনসারের মনে হয়েছে:

> "আমরা সুন্নি। আমাদের এই সবই না-জায়েজি। পারলে মহরম মাসে রোজা রাখব, নয়তো নয়। মহরমের দিন তলোয়ার-লাঠি খেলব না। তাজিয়া, দুলদুল বের করব না। হা-হাসান, হা-হোসেন করে বুক চাপড়াব না। বাড়িতে এদিন গোস্ দিয়ে খিচুড়ি হবে। খাব। পবিত্র ভাবে

> মনকে রাখব। আর তা নয়, এই সব বুক চাপড়ে চাপড়ে গান, মহরমের আগের রাতে— বাবা জন্মে কোনো দিন দেখি নি।"[৯]

অন্যদিকে সেন্টু মনে মনে বলে—

> "আমরা শিয়া, তোদের মতো জমির লোভে মুসলমান হয়নি। ইরান থেকে বহুকাল আগে বহে আসা-রক্তধারা..."[১০]

লেখক এই ঘটনার মধ্য দিয়ে দুই গোষ্ঠীর ভিন্নধর্মী রীতিনীতি এবং তাদের পারস্পরিক বিরোধের এক বাস্তব রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। এছাড়াও উপন্যাসে তবলিগি জামাত, চিল্লা, হজ, নামাজ, রোজা এবং ধর্মীয় নানা অনুশাসনের বিস্তারিত উল্লেখ পাওয়া যায়। বিশেষ করে তবলিগি সদস্যদের মনে পরকাল নিয়ে যে গভীর বিশ্বাস বা ভীতির ধারণা কাজ করে, তা লেখক সরাসরি তুলে ধরেছেন—

> "এই জীবন কোনো জীবনই নয়। মৃত্যুর পর যে অনন্ত জীবন, সেখানে বেহস্তে আমরা সবাই সুখে থাকব। তার জন্যে ইমানদার হওয়া দরকার, দীন হতে হবে, নয় তো দোজখের আগুনে... উঃ সে বড় ভয়ঙ্কর! ছোট হয়ে আসবে কবরের মাপ, ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে শরীরের সব হাড়। সে বড় যন্ত্রণা। সেই যে সাপ লোহার নখে কেয়ামত পর্যন্ত তুলে আনবে তোমায়, তার পর আবার সত্তর ফুট নিচে ঢুকিয়ে দেবে। তুলবে। এভাবেই চলবে। চলবে।"[১১]

তবলিগি সদস্যরা যুবসমাজকে ধর্মের পথে বা মসজিদের শাসনে আনতে চাইলেও, আধুনিক প্রজন্মের মধ্যে সেই উৎসাহের অভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে লেখক এখানে কেবল ধর্মের নেতিবাচক দিকটিই দেখাননি, বরং ইসলাম ধর্মের মানবিক বিধানের কথাও বলেছেন। যেমন— নিজের অন্তত চল্লিশজন প্রতিবেশীর আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নিশ্চিত করে তবেই হজে যাওয়া যাবে। এইভাবে লেখক উপন্যাসে ইসলাম ধর্মের নানা রীতিনীতি, কুসংস্কার এবং পাশাপাশি মানবিক দিকগুলোকে অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন।

সামাজিক ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে সংখ্যালঘু মানসিকতায় আনসারের মধ্যে প্রবলভাবে নিরাপত্তাহীনতা জন্ম নেয়। আশি ও নব্বইয়ের দশকের রাজনৈতিক অস্থিরতা, তৎকালীন ঘনীভূত ধর্মীয় মেরুকরণ এবং সাম্প্রদায়িক উত্তজনার যে গুমোট পরিবেশ তৈরি হয়েছিল, সেই আবহে আনসার এদেশকে নিজের বলে ভেবে নিতে পারে না। তার ভাষায়—

> "মাঝে মাঝেই শুনি দেশটা হিন্দুদের হয়ে যাবে। মুসলমানদের ঝেঁটিয়ে তাড়াবে। মুসলমানরা এখানে জবাইয়ের মুরগি। কী হবে ঘর-বাড়ি করে! জমি বাড়িয়ে! মুসলমানের ছেলে তো চাকরি পায় না। আসলে আমাদের এডুকেশন নেই। মাথা তুলে তাই দাঁড়াতে পারি না।"[১২]

আনসার মনে করে ভারতীয়ত্বের নামে তার ওপর যা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়, তা আসলে এক ধরনের সংখ্যাগুরুর দাপট। সংখ্যাগুরু সমাজ আনসারের মতো মানুষদের সব সময় দূরে সরিয়ে রাখে। অনেকেই তাকে 'মোল্লার ছেলে' বলে ব্যঙ্গ করে, কিন্তু এই অপমান সে হাসিমুখে সহ্য করতে বাধ্য হয়। ভোটের সময় রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকের কদর থাকলেও, জীবনযুদ্ধে পিছিয়ে পড়া আনসারের কাছে ভোটাধিকারের কোনো মূল্য নেই। আনসার ভাবে—

> "মুসলমানের ছেলের এমনিই চাকরি হবে না। ভোঁট দিলেই বা কি! না দিলেই বা কি! সরকার কার, তোমার-আমার?"[১৩]

সাতচল্লিশ ও চৌষট্টির দাঙ্গার ক্ষত হিন্দুদের মতো অনেক মুসলমানের শরীর-মনে গভীর দাগ কেটেছে। অতীতের সেই আতঙ্কেই তারা নিজেদের চারপাশে এক অদৃশ্য দেয়াল তুলে নিয়েছে এবং নিজেদের ধর্মীয়

বিশ্বাসকে আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরেছে। নিজেদের গুটিয়ে রাখার এই প্রবণতার কারণেই তারা আধুনিক শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করার সুযোগ পায়নি; আর তাদের ধর্ম কখন যে অন্ধ সংস্কারে পরিণত হয়েছে, তা তাদের অজানাই থেকে গেছে।

আনসারের হতাশ ও ক্লান্ত জীবনে কেবল রহিমা কিছুটা উষ্ণতা নিয়ে আসে। রহিমা সম্পর্কে আনসারের বড় ভাইয়ের স্ত্রী বা ভাবি। তাদের এই সম্পর্ককে ভালোবাসা না বলে, বরং শারীরিক তাড়না বলাই বেশি সংগত। তাই পরিবারেরই সদস্য শাগির যখন রহিমাকে ভোগ করে, তখন সামাজিকলজ্জার ভয়ে আনসার তাকে বাধা দিতে পারে না। অন্যদিকে রহিমা নিজেও স্বামীর অবহেলা ও অন্য পুরুষের লালসার শিকার। রহিমার স্বামী আকিল যখন পেশাগত কারণে বাইরে থাকে, তখন আনসার ও শাগির রহিমাকে কেবল ভোগের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করে। রহিমা ভাবে—

> "আমি কোথায় যাই! আমার স্বামী আমায় নেয় না। দুজন পুরুষ আমারে নিয়ে খেলা করে। খেলতে খেলতে সর্বনাশের বাঁকে দাঁড়ায়। আমার কী হবে?"[১৪]

রহিমা নিজের জীবন শেষ করে দিতে চাইলেও পারে না; কারণ সে বিশ্বাস করে আত্মহত্যা 'না-জায়েজ' এবং জীবনের প্রতি তার এক গভীর টানও রয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যন্ত্রণা যখন অসহ্য হয়ে ওঠে, তখন রহিমা আশ্রয়ের মায়া ত্যাগ করে জনসমুদ্রে হারিয়ে যায়। রহিমার এই হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া আনসারের জীবনে এক বিরাট শূন্যতা তৈরি করে। আনসার ভাবে—

> "এই যে এত কাজ, কার জন্যে? অনন্ত বিহস্ত্ অথবা অনন্ত দোজখের হিসেব করে কাটাকুটি, যোগ বিয়োগফল কী হবে আমার জানা নেই। তবু তো খিদে থাকে ঘুম থাকে। রহিমার জন্যে শরীর, মন খারাপ হয়।"[১৫]

আনসার মনে মনে জানে রহিমার সাথে তার এই সম্পর্ক অন্যায়। রহিমার স্বামী তাকে ত্যাগ করলেও আনসার তাকে কোনোদিন গ্রহণ করতে পারবে না— এসব জেনেও সে এক বিষণ্ণ ও আশাহীন জীবনের গ্লানি বয়ে বেড়ায়। উপন্যাসের শেষে দেখা যায়, চরম হতাশায় ডুবে থাকা আনসার নিজের সামনে যেন এক সমাধি-ভূমি দেখতে পায়। এক অজানা অন্ধকার তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে—

> "কবরের নিচে যে শীতল মরণ-ঘুম, কেয়ামতের দিনে জেগে ওঠার প্রতীক্ষায়—সেও তো আমার স্বপ্নে আছে।"[১৬]

পরিশেষে বলা যায়, কিন্নর রায় তাঁর 'অন্ধকারের ছবি' উপন্যাসে সংখ্যালঘু মুসলমান সমাজের প্রাত্যহিক জীবনযাপন, তাঁদের অস্তিত্বের সংকট এবং ধর্মীয় রীতিনীতির এক অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ ছবি তুলে ধরেছেন। প্রধান চরিত্র আনসারের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক কেবল একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের যন্ত্রণাকেই দেখাননি, বরং দেখিয়েছেন কীভাবে অশিক্ষা, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এবং নিরাপত্তাহীনতা একজন মানুষকে ক্রমশ এক অন্ধকার মনস্তাত্ত্বিক জগতের দিকে ঠেলে দেয়। একদিকে রহিমা বা আনসারের মায়ের মতো নারীদের টিকে থাকার লড়াই, অন্যদিকে শিয়া-সুন্নি দ্বন্দ্ব কিংবা তবলিগি রক্ষণশীলতার ঘেরাটোপ— সব মিলিয়ে উপন্যাসটি সংখ্যালঘু জীবন-বাস্তবতার এক প্রামাণ্য দলিল হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। সঞ্চয়িতা। কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা ৯, প্রথম কামিনী সংস্করণ জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৪৩৯।

২. অধিকারী, রণজিৎ (সম্পা.)। কিন্নর রায়ের ক্রোড়পত্র, পূর্ব। আশ্বিন ২০১২, পৃ. ২৯৩।

৩. নন্দী, সাথী। কিন্নর রায়ের সাহিত্য জীবন ও সাহিত্য ভুবন। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০২০, পৃ. ১০৯।
৪. অধিকারী, রণজিৎ (সম্পা.)। কিন্নর রায়ের ক্রোড়পত্র, পূর্ব। আশ্বিন ২০১২, পৃ. ২৯৪।
৫. রায়, কিন্নর। অন্ধকারের ছবি। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯২, পৃ. ১০।
৬. তদেব, পৃ. ১২-১৩।
৭. তদেব, পৃ. ১৩।
৮. তদেব, পৃ. ২৪।
৯. তদেব, পৃ. ৩০।
১০. তদেব, পৃ. ৩০।
১১. তদেব, পৃ. ৪২।
১২. তদেব, পৃ. ৮৪।
১৩. তদেব, পৃ. ১২২।
১৪. তদেব, পৃ. ৬৬।
১৫. তদেব, পৃ. ১২৫।
১৬. তদেব, পৃ. ১২৫।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. অধিকারী, রণজিৎ (সম্পা.)। কিন্নর রায়ের ক্রোড়পত্র, পূর্ব। আশ্বিন ২০১২।
২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। সঞ্চয়িতা। কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা ৯, প্রথম কামিনী সংস্করণ জানুয়ারি ২০০২।
৩. নন্দী, সাথী। কিন্নর রায়ের সাহিত্য জীবন ও সাহিত্য ভুবন। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০২০।
৪. রায়, কিন্নর। অন্ধকারের ছবি। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯২।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1747-1754
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.397

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বর্ধমান: শিক্ষা, সমাজ-সংস্কার ও মানব সেবামূলক কর্মকাণ্ডের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ

ড. সোমনাথ মিশ্র, *রাজ্য সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, শিক্ষা বিভাগ, দাশরথি হাজরা মেমোরিয়াল কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 19.03.2026; Accepted: 21.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Ishwar Chandra Vidyasagar, one of the foremost figures of the nineteenth-century Bengal Renaissance, made remarkable contributions in the fields of education, language reform, social reform, and humanitarian service. His activities were not confined to Kolkata or greater Bengal alone; rather, he developed a deep and meaningful association with the district of Bardhaman during his lifetime.

The present study aims to analyze Vidyasagar's historical connection with Bardhaman district, his role in the spread of education, the promotion of women's education, the widow remarriage movement, and his broader humanitarian initiatives. The research is primarily based on historical and descriptive methodologies, drawing upon biographies, historical documents, research articles, and contemporary sources.

The findings reveal that Vidyasagar played a crucial role in expanding education in Bardhaman by establishing several schools, including girls' schools, thereby significantly contributing to the advancement of female education. During his stay in Bardhaman town, he also composed Barnaparichay, a foundational text in the history of Bengali language education, which continues to serve as a primary learning tool at the elementary level.

In the domain of social reform, his efforts to promote widow remarriage and to prevent polygamy played a vital role in bringing about social change in the Bardhaman region. Furthermore, his humanitarian work during times of famine and malaria epidemics—providing medical aid and assistance to the poor—stands as a shining example of his commitment to social welfare.

This study demonstrates that the relationship between Vidyasagar and Bardhaman carries deep historical and cultural significance, encompassing education, social reform, literary contribution, and humanitarian service.

Keyword: Ishwar Chandra Vidyasagar, Bardhaman District, Bengal Renaissance, Women's Education and Social Reform, Humanitarian Service

ভূমিকা: ঊনবিংশ শতকের বাংলা সমাজে যে নবজাগরণ আন্দোলনের সূচনা হয়, তা মূলত শিক্ষা বিস্তার, সমাজসংস্কার এবং আধুনিক চিন্তাধারার বিকাশের মাধ্যমে সমাজজীবনে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে।

এই নবজাগরণের অন্যতম প্রধান পুরোধা ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০–১৮৯১)। তিনি একাধারে শিক্ষাবিদ, সমাজসংস্কারক, ভাষাবিদ এবং মানবতাবাদী চিন্তক হিসেবে বাঙালি সমাজে গভীর প্রভাব বিস্তার করেন। বাংলা গদ্যভাষার বিকাশ, শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার, নারীশিক্ষার প্রসার, বিধবা বিবাহ আন্দোলন এবং মানবকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তিনি উনিশ শতকের সমাজ পরিবর্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রদূত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন (রমেশচন্দ্র মজুমদার, ১৩৭৬; বদরুদ্দীন উমর, ১৯৮২)।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান সাধারণত কলকাতা ও বৃহত্তর বঙ্গদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করা হয়। কিন্তু তাঁর কর্মজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় জুড়ে রয়েছে তৎকালীন বর্ধমান জেলার সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক। দক্ষিণবঙ্গের বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি বর্ধমান জেলায় শিক্ষা বিস্তার, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং বিশেষত নারীশিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় এই অঞ্চলে একাধিক মডেল বিদ্যালয় ও বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, যা তৎকালীন সমাজে শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একই সঙ্গে তিনি বর্ধমান শহরে অবস্থানকালে বাংলা ভাষা শিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাঠ্যগ্রন্থ 'বর্ণপরিচয়' রচনা করেন, যা দীর্ঘকাল ধরে বাংলা শিক্ষার প্রাথমিক স্তরের অন্যতম ভিত্তিপাঠ হিসেবে স্বীকৃত (গোপাল হালদার, সম্পা., ১৯৭৪)।

বর্ধমান অঞ্চলে বিদ্যাসাগরের কার্যক্রম কেবল শিক্ষা বিস্তারেই সীমাবদ্ধ ছিল না; তিনি সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বিধবা বিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ রোধ এবং নারীশিক্ষা প্রসারের মতো সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে বর্ধমান অঞ্চলের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পাশাপাশি দুর্ভিক্ষ ও ম্যালেরিয়া মহামারির সময় দরিদ্র ও অসহায় মানুষের সেবায় তাঁর মানবিক উদ্যোগ তাঁকে একজন প্রকৃত সমাজসেবক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। এই ঘটনাগুলি বিদ্যাসাগরের মানবতাবাদী আদর্শ এবং সমাজকল্যাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

এই প্রেক্ষাপটে বর্তমান গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বর্ধমান জেলার মধ্যকার ঐতিহাসিক সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করা এবং শিক্ষা বিস্তার, সমাজসংস্কার, সাহিত্যচর্চা ও মানবসেবার ক্ষেত্রে তাঁর অবদানকে নতুনভাবে মূল্যায়ন করা। একই সঙ্গে এই প্রবন্ধের মাধ্যমে বর্ধমান অঞ্চলের সামাজিক ও শিক্ষাগত ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের প্রভাবকে একাডেমিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। বিদ্যাসাগরের বহুমাত্রিক কর্মধারাকে আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে বাংলা নবজাগরণের ইতিহাসকে আরও সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হবে।

সাহিত্য পর্যালোচনা : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবন, কর্ম ও চিন্তাধারা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন গবেষক ও সাহিত্যিক আলোচনা করেছেন। বাংলা নবজাগরণ, সমাজসংস্কার আন্দোলন, শিক্ষা বিস্তার এবং বাংলা ভাষার বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বহু গবেষণায় তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কর্মধারার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। এই গবেষণাগুলি বিদ্যাসাগরের ঐতিহাসিক গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সহায়তা করে এবং তাঁর কর্মকাণ্ডের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব সম্পর্কে একটি বিস্তৃত ধারণা প্রদান করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রবন্ধ "বিদ্যাসাগর চরিত"-এ বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব, মানবিকতা এবং সমাজসংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের গভীর মূল্যায়ন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে, বিদ্যাসাগর ছিলেন একদিকে জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের প্রতীক, অন্যদিকে গভীর মানবিক সহানুভূতির অধিকারী একজন মহান ব্যক্তিত্ব। তিনি বিদ্যাসাগরকে বাংলা গদ্যের প্রথম প্রকৃত শিল্পী হিসেবে অভিহিত করেন এবং তাঁর ভাষা সংস্কারের ভূমিকার গুরুত্ব বিশেষভাবে তুলে ধরেন (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৫৫)। রবীন্দ্রনাথের এই মূল্যায়ন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের স্থান নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর গবেষণায় বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তা এবং সমাজসংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডকে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে বিদ্যাসাগরের শিক্ষা সংস্কারের প্রচেষ্টা আধুনিক

শিক্ষাব্যবস্থার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বিশেষত নারীশিক্ষা প্রসার এবং বিধবা বিবাহ আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় উদ্যোগ তৎকালীন সমাজে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করে (রমেশচন্দ্র মজুমদার, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ)। মজুমদারের বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় যে বিদ্যাসাগরের কার্যক্রম কেবল শিক্ষাক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তা সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রেও গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

সমাজবিজ্ঞানী বদরুদ্দীন উমর তাঁর গবেষণায় উনিশ শতকের বাঙালি সমাজে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার আন্দোলন ছিল মূলত মানবতাবাদী আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত। বিধবা বিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ রোধ এবং নারীশিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে তিনি সমাজে মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন (বদরুদ্দীন উমর, ১৯৮২)। উমরের বিশ্লেষণে বিদ্যাসাগরের কর্মকাণ্ডকে উনিশ শতকের সামাজিক পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

গোপাল হালদার সম্পাদিত 'বিদ্যাসাগর রচনা সম্ভার' গ্রন্থে বিদ্যাসাগরের বিভিন্ন রচনা এবং তাঁর চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে তাঁর শিক্ষা ও সমাজসংস্কার সম্পর্কিত ভাবনা, ভাষা সংস্কারের প্রচেষ্টা এবং সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংকলিত হয়েছে। গোপাল হালদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত এই গ্রন্থ বিদ্যাসাগরের চিন্তাধারা ও কর্মধারা বোঝার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচিত হয় (গোপাল হালদার, সম্পা., ১৯৭৪)।

এছাড়া ইন্দ্রমিত্র, রাধারমণ মিত্র এবং অন্যান্য গবেষকরাও বিদ্যাসাগরের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। তাঁদের গবেষণায় বিদ্যাসাগরের মানবিক চরিত্র, দরিদ্র মানুষের প্রতি সহানুভূতি এবং শিক্ষা বিস্তারে তাঁর ভূমিকার উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে অধিকাংশ গবেষণাই বিদ্যাসাগরের সামগ্রিক জীবন ও কর্মের উপর কেন্দ্রীভূত; বর্ধমান জেলার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নিয়ে তুলনামূলকভাবে কম আলোচনা হয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে বর্তমান গবেষণায় বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বর্ধমান জেলার সম্পর্ককে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। পূর্ববর্তী গবেষণাগুলির আলোচনার ভিত্তিতে এই প্রবন্ধে শিক্ষা বিস্তার, নারীশিক্ষা, সমাজসংস্কার এবং মানবসেবামূলক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা বর্ধমান অঞ্চলের প্রেক্ষাপটে মূল্যায়ন করা করেছি। এর মাধ্যমে বিদ্যাসাগরের কর্মকাণ্ডের একটি আঞ্চলিক ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য : বর্তমান গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বর্ধমান জেলার মধ্যকার ঐতিহাসিক ও সামাজিক সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করা। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নিম্নলিখিত নির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করা হল —

- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বর্ধমান জেলার ঐতিহাসিক সম্পর্কের প্রকৃতি ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা।
- বর্ধমান জেলায় শিক্ষা বিস্তার এবং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বিদ্যাসাগরের ভূমিকা আলোচনা করা।
- বর্ধমান অঞ্চলে নারীশিক্ষার প্রসার এবং বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বিদ্যাসাগরের অবদান মূল্যায়ন করা।
- বিধবাবিবাহ প্রচলন ও বহুবিবাহ রোধ আন্দোলনের ক্ষেত্রে বর্ধমান অঞ্চলে বিদ্যাসাগরের উদ্যোগ ও প্রভাব বিশ্লেষণ করা।
- বর্ধমান শহরে অবস্থানকালে তাঁর সাহিত্যকর্ম, বিশেষত 'বর্ণপরিচয়' এবং অন্যান্য রচনার সঙ্গে বর্ধমানের সম্পর্ক আলোচনা করা।
- দুর্ভিক্ষ ও ম্যালেরিয়া মহামারির সময় বর্ধমান অঞ্চলে বিদ্যাসাগরের মানবসেবামূলক কর্মকাণ্ড এবং সামাজিক ভূমিকার গুরুত্ব মূল্যায়ন করা।

- বর্ধমানের সামাজিক ও শিক্ষাগত ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের প্রভাব এবং তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব নিরূপণ করা।

গবেষণা পদ্ধতি: বর্তমান গবেষণাটি মূলত ঐতিহাসিক ও বর্ণনামূলক গবেষণা পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে সম্পাদিত হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বর্ধমান জেলার ঐতিহাসিক সম্পর্ক, শিক্ষা বিস্তারে তাঁর ভূমিকা, সমাজসংস্কারমূলক কার্যক্রম এবং মানবসেবামূলক উদ্যোগের তাৎপর্য বিশ্লেষণের জন্য বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই গবেষণায় প্রধানত দ্বিতীয়িক তথ্যসূত্র ব্যবহার করা হয়েছে, যার মধ্যে বিদ্যাসাগরের জীবনীগ্রন্থ, তাঁর রচনাবলী ও সংকলন, ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা গ্রন্থ, গবেষণা প্রবন্ধ এবং সমকালীন পত্রপত্রিকা ও ঐতিহাসিক নথি উল্লেখযোগ্য। সংগৃহীত তথ্যসমূহকে বিষয়ভিত্তিকভাবে বিশ্লেষণ করে বিদ্যাসাগরের শিক্ষা বিস্তার, সমাজসংস্কার, সাহিত্যচর্চা এবং মানবসেবামূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে বর্ধমান জেলার সম্পর্কের ঐতিহাসিক ও সামাজিক গুরুত্ব মূল্যায়ন করা হয়েছে।

মূল আলোচনা ও বিশ্লেষণ

- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বর্ধমান জেলার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। শিক্ষা বিস্তার, সমাজসংস্কার, সাহিত্য রচনা এবং মানবসেবামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তিনি এই অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। নিম্নে বর্ধমানের প্রেক্ষাপটে তাঁর বিভিন্ন কার্যক্রম বিশদভাবে আলোচনা করা হলো।

বর্ধমানে শিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা:

ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বাংলায় আধুনিক শিক্ষার প্রসার একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হয়। এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সংগঠক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। দক্ষিণবঙ্গের বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি বর্ধমান জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষাবিস্তার কার্যক্রমে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

১৮৫৫ সালের ২৬ আগস্ট বর্ধমান জেলার আমাদপুরে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি এই অঞ্চলে আধুনিক শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে একই বছরে জৌগ্রাম, খণ্ডঘোষ এবং দাঁইহাটে আরও কয়েকটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয়গুলি শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত করে। বিদ্যাসাগরের এই উদ্যোগের ফলে বর্ধমান অঞ্চলে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি সুদৃঢ় হয়।

বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসেবে তিনি নিয়মিতভাবে বিভিন্ন গ্রাম ও জনপদে ভ্রমণ করতেন এবং স্থানীয় মানুষকে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করতেন। কখনও পায়ে হেঁটে, কখনও গরুর গাড়িতে অথবা পালকিতে চেপে তিনি দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলেও বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য যেতেন। এই ধরনের উদ্যোগ তাঁর শিক্ষা বিস্তারের প্রতি আন্তরিকতা ও দায়বদ্ধতার পরিচয় বহন করে।

নারীশিক্ষা প্রসারে বিদ্যাসাগরের উদ্যোগ:

ঊনবিংশ শতকের সমাজে নারীশিক্ষা ছিল অত্যন্ত সীমিত। বিদ্যাসাগর নারীশিক্ষার প্রসারকে সমাজ উন্নয়নের একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচনা করতেন। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিনি বর্ধমান জেলায় একাধিক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮৫৭ সালের ১ ডিসেম্বর বর্ধমান জেলার রানাপাড়ায় তিনি প্রথম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এর পরবর্তী সময়ে জামুই, শ্রীকৃষ্ণপুর, রাজারামপুর, জোৎ-শ্রীরামপুর, দাঁইহাট, কাশীপুর, সানুই, রসুলপুর, বন্তীর এবং বেলগাছি প্রভৃতি অঞ্চলে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয়গুলির মাধ্যমে বর্ধমান অঞ্চলে

নারীশিক্ষার প্রসার ঘটে এবং সমাজে শিক্ষার নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা হয়।

প্রথমদিকে এই বিদ্যালয়গুলির ব্যয়ভার বিদ্যাসাগর নিজেই বহন করতেন। যদিও বর্ধমানের মহারাজ মহতাবচাঁদ কিছু ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছিলেন, পরে বিভিন্ন কারণে কিছু বিদ্যালয় আর্থিক সংকটে পড়ে। তবুও বিদ্যাসাগরের এই উদ্যোগ নারীশিক্ষার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়।

বর্ণপরিচয় রচনা ও বর্ধমানের ভূমিকা:

বাংলা ভাষা শিক্ষার ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' গ্রন্থ একটি যুগান্তকারী সৃষ্টি। এই গ্রন্থ বাংলা ভাষার শিক্ষার্থীদের জন্য একটি সহজ ও যুক্তিনির্ভর পাঠ্যপুস্তক হিসেবে রচিত হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, বিদ্যাসাগর বর্ধমান শহরে অবস্থানকালে এই গ্রন্থের রচনা করেন।

দক্ষিণবঙ্গের বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসেবে কাজ করার সময় তিনি বর্ধমান শহরের পার্কাস রোড ও প্যারীচাঁদ মিত্র লেনের সংযোগস্থলে বসবাস করতেন। তিনি লেখক প্যারীচাঁদ মিত্রের বাড়িতে থাকতেন এবং সেখান থেকেই বিভিন্ন জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শনের দায়িত্ব পালন করতেন। কাজের অবসরে তিনি 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। ১৮৫৫ সালের এপ্রিল মাসে প্রথম ভাগ এবং জুন মাসে দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়।

এই গ্রন্থে বর্ধমান অঞ্চলের বিভিন্ন বাস্তব ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়। যেমন রসুলপুরের উমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, মেমারির পাঠশালার তারক, ঈশান ও কৈলাশ অথবা খণ্ডঘোষের গোপাল ও রাখালের নাম এই গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। এই ঘটনাগুলি থেকে বোঝা যায় যে বিদ্যাসাগরের সাহিত্য রচনায় বর্ধমান অঞ্চলের বাস্তব অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

বিধবাবিবাহ আন্দোলন ও সমাজসংস্কার:

ঊনবিংশ শতকের হিন্দু সমাজে বিধবাদের জীবন অত্যন্ত দুর্বিষহ ছিল। এই পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্য বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ প্রচলনের আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর প্রচেষ্টার ফলেই ১৮৫৬ সালে বিধবাবিবাহ আইন প্রণীত হয়।

বর্ধমান জেলাতেও এই আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য প্রভাব দেখা যায়। বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধানে পলাশডাঙার ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের অল্পবয়সী বিধবা কন্যা কালীমতির বিবাহ সম্পন্ন হয়। এই ঘটনাটি বর্ধমান অঞ্চলে সমাজসংস্কারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়।

এই আন্দোলনে বর্ধমানের মহারাজ মহতাবচাঁদ বিদ্যাসাগরের অন্যতম সহযোগী ছিলেন। তিনি বিধবাবিবাহ আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন এবং সমাজসংস্কারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বিদ্যাসাগরকে সহায়তা করেছিলেন।

দুর্ভিক্ষ ও ম্যালেরিয়া মহামারিতে বিদ্যাসাগরের মানবসেবা:

১৮৬৬ সালে বর্ধমান অঞ্চলে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং তার কয়েক বছর পর ১৮৬৯ সালে ম্যালেরিয়া মহামারি আকার ধারণ করে। এই সময় বিদ্যাসাগর অসুস্থ ও দরিদ্র মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসেন।

তিনি বর্ধমান শহরে একটি ডিস্পেনসারি স্থাপন করেন এবং ডাক্তার গঙ্গানারায়ণ মিত্রকে চিকিৎসার দায়িত্ব দেন। এই চিকিৎসাকেন্দ্রে দরিদ্র মানুষদের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করা হতো। বিদ্যাসাগর নিজে বিভিন্ন গ্রাম ও বস্তিতে গিয়ে রোগীদের সেবা করতেন এবং ওষুধ, খাদ্য ও বস্ত্র বিতরণ করতেন।

জাতি বা ধর্মের ভেদাভেদ না করে সকল মানুষের প্রতি তাঁর এই মানবিক আচরণ তাঁকে একজন প্রকৃত মানবদরদী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। দরিদ্র মানুষের চিকিৎসা ও সহায়তার জন্য তিনি বিপুল অর্থ ব্যয় করেছিলেন, যা তাঁর সামাজিক দায়বদ্ধতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত।

বর্ধমান রাজপরিবারের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক:

বর্ধমানের মহারাজ মহতাবচাঁদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। মহতাবচাঁদ শিক্ষা ও সমাজসংস্কারের বিভিন্ন উদ্যোগে বিদ্যাসাগরকে সহায়তা করেছিলেন। বিধবাবিবাহ আন্দোলনেও তিনি সমর্থন জানিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগর তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'ভ্রান্তিবিলাস' মহারাজ মহতাবচাঁদকে উৎসর্গ করেছিলেন। এই ঘটনা বিদ্যাসাগর ও বর্ধমান রাজপরিবারের পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়।

এছাড়াও তৎকালীন বর্ধমানের সাহিত্যিক ও কবিদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। প্যারীমোহন কবিরত্ন, দাশরথি রায় প্রমুখ কবি তাঁর উদ্দেশ্যে কবিতা রচনা করেছিলেন। এই সাহিত্যিক সম্পর্ক বর্ধমান অঞ্চলের সাংস্কৃতিক জীবনে বিদ্যাসাগরের প্রভাবকে নির্দেশ করে।

গবেষণালব্ধ ফলাফল ও আলোচনা:

বর্তমান গবেষণার আলোচনার ভিত্তিতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বর্ধমান জেলার সম্পর্ক সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিদ্যাসাগরের শিক্ষা বিস্তার, সমাজসংস্কার, সাহিত্যচর্চা এবং মানবসেবামূলক কর্মকাণ্ড বর্ধমান অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। নিম্নে এই গবেষণা থেকে প্রাপ্ত প্রধান ফলাফল ও তার বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হলো।

প্রথমত, বর্ধমান জেলায় আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার বিস্তারে বিদ্যাসাগরের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষিণবঙ্গের বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসেবে তিনি এই অঞ্চলে একাধিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং শিক্ষার প্রসারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তাঁর উদ্যোগে আমাদপুর, জৌগ্রাম, খণ্ডঘোষ, দাঁইহাট প্রভৃতি স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, যা গ্রামীণ অঞ্চলে শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত করতে সহায়তা করে। এর ফলে বর্ধমান অঞ্চলে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি সুদৃঢ় হয় এবং শিক্ষার প্রসারে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়।

দ্বিতীয়ত, নারীশিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের উদ্যোগ বর্ধমান অঞ্চলে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। তিনি রানাপাড়া সহ বিভিন্ন স্থানে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং সমাজে নারীশিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করেন। তৎকালীন সমাজে নারীদের শিক্ষার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত ছিল; এই প্রেক্ষাপটে বিদ্যাসাগরের উদ্যোগ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদিও আর্থিক সংকটের কারণে কিছু বিদ্যালয় পরবর্তীকালে বন্ধ হয়ে যায়, তবুও তাঁর প্রচেষ্টা নারীশিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক সূচনা হিসেবে বিবেচিত হয়।

তৃতীয়ত, বর্ধমান শহরে অবস্থানকালে বিদ্যাসাগরের সাহিত্যচর্চা বাংলা ভাষা ও শিক্ষার ইতিহাসে একটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এখানে বসেই তিনি 'বর্ণপরিচয়' গ্রন্থ রচনা করেন, যা বাংলা ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি মৌলিক পাঠ্যগ্রন্থ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই গ্রন্থে বর্ধমান অঞ্চলের বাস্তব জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, যা বিদ্যাসাগরের জীবনানুভূতি ও স্থানীয় অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটায়। ফলে বর্ণপরিচয় কেবল একটি পাঠ্যপুস্তক নয়, বরং বাংলা সমাজ ও সংস্কৃতির একটি প্রতিফলন হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে।

চতুর্থত, সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা বর্ধমান অঞ্চলেও সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। বিধবাবিবাহ প্রচলন এবং বহুবিবাহ রোধ আন্দোলনে তাঁর উদ্যোগ সমাজে একটি প্রগতিশীল চিন্তার বিকাশ ঘটায়। বর্ধমান অঞ্চলে তাঁর তত্ত্বাবধানে বিধবাবিবাহ সম্পন্ন হওয়ার ঘটনা তৎকালীন সামাজিক রীতিনীতির পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। এই আন্দোলনে বর্ধমানের মহারাজ মহতাবচাঁদের সমর্থন বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডকে আরও শক্তিশালী করে।

পঞ্চমত, দুর্ভিক্ষ ও ম্যালেরিয়া মহামারির সময় বিদ্যাসাগরের মানবসেবামূলক কর্মকাণ্ড তাঁর ব্যক্তিত্বের মানবিক দিকটিকে বিশেষভাবে উজ্জ্বল করে তোলে। তিনি বর্ধমান শহরে একটি ডিস্পেনসারি স্থাপন করে দরিদ্র মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন এবং নিজে বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে অসুস্থ মানুষের সেবা করেন। জাতি, ধর্ম বা সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও সহায়তা তাঁর মানবতাবাদী আদর্শের পরিচয় বহন করে।

সর্বোপরি এই গবেষণা থেকে প্রতীয়মান হয় যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বর্ধমান জেলার সম্পর্ক কেবল প্রশাসনিক বা পেশাগত সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। শিক্ষা বিস্তার, সাহিত্যচর্চা, সমাজসংস্কার এবং মানবসেবামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এই সম্পর্ক একটি গভীর মানবিক ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য লাভ করে। বর্ধমান অঞ্চলের সামাজিক ও শিক্ষাগত ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের অবদান একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

উপসংহার: ঊনবিংশ শতকের বাংলা সমাজে যে নবজাগরণ আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, তার অন্যতম প্রধান পুরোধা ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। শিক্ষা, সমাজসংস্কার, ভাষা ও সাহিত্য এবং মানবসেবামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তিনি বাঙালি সমাজে এক গভীর পরিবর্তনের সূচনা করেছিলেন। বর্তমান গবেষণায় বিদ্যাসাগর ও বর্ধমান জেলার মধ্যকার ঐতিহাসিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে তাঁর বহুমাত্রিক কর্মধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা হয়েছে।

গবেষণার আলোচনার ভিত্তিতে দেখা যায় যে বর্ধমান জেলায় শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন এবং গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার প্রসারে তাঁর উদ্যোগ এই অঞ্চলের শিক্ষাগত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। তাঁর প্রচেষ্টার ফলে বর্ধমান অঞ্চলে আধুনিক শিক্ষার একটি সুদৃঢ় ভিত্তি গড়ে ওঠে, যা পরবর্তীকালে শিক্ষার প্রসারকে আরও গতিশীল করে তোলে।

নারীশিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগরের উদ্যোগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি সমাজের প্রচলিত কুসংস্কার ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারীদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করেন। এই উদ্যোগ তৎকালীন সমাজে একটি প্রগতিশীল চিন্তার বিকাশ ঘটায় এবং নারীশিক্ষা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়।

একই সঙ্গে বর্ধমান শহরে অবস্থানকালে তাঁর সাহিত্যচর্চা বাংলা ভাষা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। বর্ণপরিচয় গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে তিনি বাংলা ভাষা শিক্ষাকে সহজ, যুক্তিনির্ভর ও সুসংগঠিত রূপ প্রদান করেন। এই গ্রন্থ দীর্ঘদিন ধরে বাংলা শিক্ষার ভিত্তিপাঠ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এখনও তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিধবাবিবাহ প্রচলন এবং বহুবিবাহ রোধ আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি সমাজে মানবিকতা ও ন্যায়বোধের প্রতিষ্ঠা ঘটানোর চেষ্টা করেন। বর্ধমান অঞ্চলে তাঁর এই উদ্যোগ সামাজিক পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। পাশাপাশি দুর্ভিক্ষ ও ম্যালেরিয়া মহামারির সময় দরিদ্র ও অসহায় মানুষের সেবায় তাঁর মানবিক উদ্যোগ তাঁকে একজন প্রকৃত সমাজসেবক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

সর্বোপরি বলা যায়, বিদ্যাসাগর ও বর্ধমান জেলার সম্পর্ক কেবল প্রশাসনিক বা ভৌগোলিক সম্পর্ক নয়; বরং এটি শিক্ষা, সমাজসংস্কার, সাহিত্য ও মানবিক মূল্যবোধের এক গভীর ঐতিহাসিক বন্ধন। এই গবেষণা বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটকে নতুনভাবে বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে বাংলা নবজাগরণের ইতিহাসকে আরও সমৃদ্ধভাবে উপলব্ধি করতে সহায়তা করে। ভবিষ্যতে এই বিষয়ে আরও বিস্তৃত গবেষণা বিদ্যাসাগরের কর্মধারার আঞ্চলিক প্রভাব সম্পর্কে নতুন তথ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি উন্মোচন করতে সক্ষম হবে।

তথ্যসূত্র:

1. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ এবং দাস, সজনীকান্ত (সম্পাদক)। 'বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী'. ৩ খণ্ড। বিদ্যাসাগর স্মৃতি সংরক্ষণ সমিতি, ১৩৪৪–১৩৪৬ বঙ্গাব্দ।
2. ঘোষ, বিনয়। 'বাংলার নবজাগরণ'। বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬৫।
3. ঘোষ, শঙ্খ, এবং চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (সম্পাদক)। 'বিদ্যাসাগর'। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি।
4. দত্ত, কালিপ্রসন্ন। 'ঊনবিংশ শতকের বাংলা সমাজজীবন'। আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৩।
5. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। 'বিদ্যাসাগর-চরিত'। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।
6. মজুমদার, রমেশচন্দ্র। 'বিদ্যাসাগর: বাংলা গদ্যের সূচনা ও ভারতের নারী প্রগতি'। জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ।
7. মিত্র, ইন্দ্রমিত্র। 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর'। আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৬৬।
8. মিত্র, রাধারমণ। 'কলিকাতায় বিদ্যাসাগর'। জিজ্ঞাসা, ১৯৪২।
9. বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র। 'বর্ণপরিচয়'। সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটরি, ১৮৫৫।
10. সেন, সুকুমার। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'। আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০২।
11. হালদার, গোপাল, (সম্পাদক)। 'বিদ্যাসাগর রচনা সম্ভার' ৩ খণ্ড। পশ্চিমবঙ্গ নিরুক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, ১৯৭৪–১৯৭৬।
12. উমর, বদরুদ্দীন। 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ'। চিরায়ত প্রকাশন, ১৯৮২।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1755-1761
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.398

খল চরিত্রের স্বরূপ ও ক্ষমতার রাজনীতি: সিংহাসনের ক্ষয়রোগ

সন্দীপ ঘোষ, *গবেষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 19.03.2026; Accepted: 30.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Mohit Chattopadhyay (1934–2012) is a legendary name in Bengali drama. This essay explores his famous play Singhasaner Khayrog (1967), focusing on how he portrays 'villainy' or the 'antagonist' in a unique way. Unlike traditional plays where a villain is just a bad person, Mohit Chattopadhyay shows that in this play, the "villain" is actually the corrupt system and the hunger for power.

Set against the backdrop of the political unrest in the 1960s and 70s, the play tells the story of a dying monarchy where a Queen is the face of the throne, but the real power is held by the cruel 'Durgashashak'. The essay analyzes how the ruling class—including the Scientist, the 'Barta Adhikarta', and the 'Palli Sebak'—uses lies, fear, and fake threats to control the common people.

'Khayrog' mentioned in the title refers to the moral rot that happens when people become obsessed with staying in power. By using symbols and deep psychological insights, Mohit Chattopadhyay shows that the real monsters are not outside, but within the greedy rulers who exploit the poor. This essay concludes that the play is still relevant today as a powerful protest against any form of dictatorship and social injustice.

Keywords: Singhasaner Khayrog, The 1960s-70s, Lust for Power, Antagonist, Mass Awakening, Self-interest, Durgosashak, The Queen.

বাংলা নাট্যসাহিত্যে মোহিত চট্টোপাধ্যায় এক স্মরণীয় নাম। তিনি ১ জুন ১৯৩৪ সালে বাংলাদেশের বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। স্বাধীনতার বছরই মাত্র তের বছর বয়সে তিনি পরিবারসহ বাংলাদেশ ত্যাগ করে কলকাতায় চলে আসেন। মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুর কলেজের প্রভাষক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় এবং পরে তিনি সিটি কলেজে বাংলা রিডার হিসেবে যোগ দেন। সিটি কলেজে পড়াকালীন তাঁর পরিচয় হয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিদের সঙ্গে, যাদের মধ্যে অন্যতম হলেন- সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। তারপরেই শুরু হয় তাঁর সাহিত্যচর্চা। মোহিত চট্টোপাধ্যায় শুরুতে শুধুমাত্র কবিতা লিখতেন। পরে কবিতা লেখা বন্ধ করে নাটক লিখতে শুরু করেন। তিনি যে সময়ে নাটক লিখছেন সেই সময়েই লিখছেন বাদল সরকার, শম্ভু মিত্র, মনোজ মিত্র, উৎপল দত্তের মত বিখ্যাত সাহিত্যিকেরা। তাই তার পথটা মোটেই সহজ ছিল না। তারপরেও অল্প সময়ের মধ্যেই অভিনব বিষয়বস্তু, অন্য স্বাদের চরিত্র, গঠন

বিন্যাস, সংলাপের মাধ্যমে সমকালের একজন অন্যতম এবং ব্যতিক্রমী নাট্যকার হিসাবে মর্যাদা পান। তিনি খুব সহজ সরল ভাবে যুগের সমস্যাগুলিকে অভিনব কায়দায় তুলে ধরতেন। আসলে তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ও স্বাধীনতার সমকালের হিংসা, দলাদলি, মারামারি, মিছিল এসব যেমন প্রত্যক্ষভাবে দেখেছেন। ঠিক তেমনই তিনি দেখেছেন সাধারণ মানুষের করুণ অবস্থাও। এরকম একটা সময়ে তিনি নাটকের প্রভাব নিয়ে বলেছেন – "নাটকের কাছে দুঃসময়ে মানুষ পাশে এসে দাঁড়ায়। নাটকের মধ্যে একটা দুর্জয় প্রাণশক্তি আছে।... সেখানে কোন বাধাই বাধা নয়। নাটক সংকটকে বিশ্লেষণ করে এবং তার গ্রাস থেকে উদ্ধারের সংকেত দেয়। নাটক মনে করায় মানুষ কীভাবে মিলেমিশে বলবান হয়ে উঠতে পারে, নাটক শিখিয়ে দেয় বিষাদ সরিয়ে আমরা কীভাবে হেসে উঠতে পারি, নাটক ঘোষণা করে অন্যায় শেষ পর্যন্ত পরাজিত হতে বাধ্য।"[১]

তাই তাঁর কলমে অন্যায়, অত্যাচার, হতাশা, কান্না, প্রতিবাদ সবকিছু উঠে এসেছে। যা তাঁকে সমকালীন অন্য লেখকদের থেকে আলাদা করে। তাই শুরুতে কবিতা লিখলেও সাহিত্যের জগতে নাট্যকার হিসেবেই তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তবে একথাও ঠিক যে সমকালের বাকি নাট্যকারেরা যেমন ভাবে আলোকিত হয়েছেন, মোহিত চট্টোপাধ্যায় ততটা হন নি। তাঁর নাটকের সংখ্যা প্রায় শতাধিক এবং নাটকগুলি বিভিন্ন শ্রেণির। তিনি সামাজিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক, প্রতিবাদী, একাঙ্ক, জীবনী সব ধরণের নাটক রচনা করেছেন। সর্বোপরি নাটকগুলি পাঠ করলে আমরা নাট্যকারের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাই।

আমরা জানি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব ভারতে খুব বেশি না পড়লেও, ১৯৩৯ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব ভারতে পড়েছিল। সামাজিক, পারিবারিক বিপর্যয়ের সঙ্গে অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি মানুষের জীবনকে তছনছ করে দিয়েছিল। তারপরে ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা আন্দোলন ও দেশভাগ। ফলে মানুষের অবস্থা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। মানুষ তার কাঙ্খিত স্বাধীনতা পেলেও, স্বাধীনতা পরবর্তী যে সুখ-শান্তি পাবার কথা তা পায়নি। তাদের আশা-প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। কারণ সরকার যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল- অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি, অন্ন-বস্ত্রের জোগান, সামাজিক বৈষম্য তুলে দেওয়া, শ্রেণি শোষণ তুলে দেওয়া, সকলের জীবিকার ব্যবস্থা করা কোন কিছুই পূরণ করতে পারে নি। বরং উল্টো জিনিস দেখা গেল। সমাজে সংঘাত ও বৈষম্য আরও চরম আকার নিল। বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মালিক শ্রেণি আরও অর্থবান হয়ে উঠল। অন্যদিকে নিম্নশ্রেণির সাধারণ মানুষের অবস্থা আরও খারাপ হল। তার ফলস্বরূপ এতদিন ধরে দারিদ্র ও হতাশায় ভুক্তভোগী একশ্রেণির শ্রমজীবী মানুষ প্রতিবাদী হয়ে উঠল। মালিক শ্রেণির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস দেখাল। কোন অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ আর সহ্য করল না তারা। শাসন ব্যাবস্থার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠল তারা। এই সবকিছুই মোহিত চট্টোপাধ্যায় রচিত বিভিন্ন নাটকে উঠে এল। শাষক শ্রেণির মুখোশ টেনে খুলে দিলেন তিনি তাঁর নাটকে। এই পটভূমির উপরেই লেখা তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক 'সিংহাসনের ক্ষয়রোগ'। যেখানে তিনি শোষিত, অত্যাচারিত, বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে শাসক শ্রেণির অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন।

বাংলা নাটকে খল চরিত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে এখানে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'সিংহাসনের ক্ষয়রোগ' নাটকটিকে বেছে নিয়েছি। নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'নক্ষত্র' পত্রিকায়, ১৯৬৭ সালে। তিনটি দৃশ্যে নাট্যকার তৎকালীন শাসনব্যবস্থার নানান সমস্যার কথা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন নাটক কেবল বিনোদন নয়, বরং তা সমাজের গভীরে থাকা পচনকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার মাধ্যম। তবে তিনি তা সরাসরি না করে, করতেন প্রতীকের মোড়কে।

যে কোনো সার্থক নাটকের প্রাণভোমরা হলো তার চরিত্রায়ন। বিশেষ করে 'খল চরিত্র' বা 'Antagonist'-এর উপস্থিতি নাটকের দ্বন্দ্বকে তীব্রতর করে তোলে। তবে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের এই নাটকে 'খল' স্বভাব কোনো একক ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এখানে খল চরিত্রগুলো কেবল ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা দ্বারা চালিত নয়, বরং তারা এক একটি ব্যবস্থার প্রতিনিধি। এই নাটকে শাসক শ্রেণির দম্ভ, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং সুযোগসন্ধানী রাজনীতির যে চিত্র ফুটে উঠেছে, তার প্রতিটি স্তরে খল চরিত্রের বিভিন্ন মাত্রা পরিলক্ষিত হয়।

প্রথাগত নাটকে খল চরিত্রকে আমরা যেভাবে কেবল 'ভিলেন' হিসেবে দেখি, মোহিত চট্টোপাধ্যায় এখানে সেই ধারণাকে ভেঙে দিয়েছেন। খল চরিত্র বলতে আমরা বুঝি যার মধ্যে ব্যক্তিগত ঘৃণা, ঈর্ষা বা কোনো খারাপ উদ্দেশ্য থাকবে। কিন্তু এই নাটকে খল চরিত্রের ধারণাটি অনেক বেশি গভীর এবং মনস্তাত্ত্বিক। এখানে খল কোনো একক ব্যক্তির স্বভাব নয়, তা একটা 'সিস্টেমে'র ফসল। এখানে ক্ষমতার মোহগ্রস্ত মানুষগুলো নিজেরাই নিজেদের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। খলনায়ক এখানে কোনো নির্দিষ্ট অবয়ব নয়, বরং সিংহাসন টিকিয়ে রাখার অন্তহীন পিপাসা।

বিংশ শতাব্দীর সত্তর দশকের উত্তাল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে মোহিত চট্টোপাধ্যায় যখন 'সিংহাসনের ক্ষয়রোগ' রচনা করেন, তখন বাংলা নাটকের ধারা এক আমূল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। চারপাশের পরিবেশ তখন অত্যন্ত প্রতিকূল। মানুষের সাধারণ জীবনের ছন্দ ভেঙ্গে পড়েছে। মানুষের প্রতি মানুষের হিংসা, দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার তখন তুঙ্গে। তখনই এই প্রতিবাদী নাটকে সূক্ষ্ম কৌশলের মাধ্যমে প্রতিবাদ ভাবনার বীজ রোপণ করলেন তিনি। তাই এই নাটকটি কেবল একটি রাজনৈতিক রূপক নয়, বরং এটি ক্ষমতার অমোঘ লালসা এবং তার ফলে সৃষ্ট চারিত্রিক বিচ্যুতির এক নিপুণ ব্যবচ্ছেদ। নাটকের নামটির মধ্যেই লুকিয়ে আছে এর মূল উপজীব্য— ক্ষমতা বা 'সিংহাসন' যখন মানুষকে গ্রাস করে, তখন তা এক মরণব্যাধি বা 'ক্ষয়রোগে'র মতো তার বিবেক ও মনুষ্যত্বকে ক্ষয় করতে থাকে।

নাটকে একটি রাজ্যের কথা এসেছে, যে রাজ্যে রাজা মৃত, তাই রানিই শাসক। নাটকটিতে মোট নয়টি চরিত্র আছে। যাদের মধ্যে খল স্বভাবের চরিত্র হল - রানি, দুর্গশাসক, বৈজ্ঞানিক, পল্লীসেবক, বার্তা-অধিকর্তা প্রমুখেরা। কিন্তু এদের মধ্যে প্রধান খল চরিত্র হিসেবে আমরা চিহ্নিত করতে পারি দুর্গশাসককে। লক্ষ করলে দেখা যায় দুর্গশাসকের প্রভাবেই নাটকের অন্যান্য চরিত্র খারাপ কাজে লিপ্ত হয়েছে। এবং নাটকে তারাও খল চরিত্র হিসেবে উপস্থিত হয়েছে।

শাসন ক্ষমতার উর্ধে রানি থাকলেও সকলকে আদেশ করে দুর্গশাসক তা নাটকের শুরুতেই জীবনলালের কথায় স্পষ্ট – "দুর্গশাসক আমাকে সমাহিত জনতা বলতেই শিখিয়েছে।"[২]

অর্থাৎ জীবনলাল যে ঘোষণা করছে তার বুলি তাকে শিখিয়ে দিয়েছে দুর্গশাসক, রানি নয়। নাটকের খল চরিত্র যে দুর্গশাসক এবং সে অত্যাচারী তা শুরুতেই স্পষ্ট হয়ে যায় চিত্রলেখার কথায়– "ঐ শোন, সেই শকুনটা আসছে, পালাই। দুর্গশাসকের সামনে যেন আবার কাব্য করতে বোসনা। হাতের চাবুকটা ছাড়া ও আর কিছু বোঝে না।"[৩]

নাটকে যে রাজ্যের কথা বলা হয়েছে তার রাজাকে চক্রান্ত করে হত্যা করা হয়েছে। রানি এখন সে রাজ্যে সিংহাসনে উপবিষ্ঠা। তবে রানিকে সামনে রেখে জনগণকে অত্যাচার করে এবং সম্পূর্ণ শাসনকার্য চালায় দুর্গশাসক। রাজ্যের প্রশাসনিক থেকে অর্থনৈতিক সমস্ত বিভাগে ক্ষমতার অধিকারী। একথা আরও

স্পষ্ট হয়ে যায় সৈন্যাধ্যক্ষের কথায়– "যেখানে আপনি ক্ষমতাসম্পন্ন, সেখানে রাণীর জন্য আদেশের অপেক্ষা শাসনে দ্বিধা এবং আলস্য এনে দিতে পারে।"[৪]

রানি এবং রাজ্যের অন্যান্য ক্ষমতাশীল ব্যক্তি যেমন- বৈজ্ঞানিক, সৈনাধ্যক্ষ, বার্তা-অধিকর্তা, পল্লীসেবক প্রমুখদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের কাজটাও সেই করে। দুর্গের মধ্যে কে প্রবেশ করবে, কে রানির সঙ্গে দেখা করতে পারবে সেই সিদ্ধান্তও দুর্গশাসকেরই। রানি এখানে নামমাত্র শাসক। তাইতো দুর্গশাসক স্পষ্টই বলেন- "রাণীর আদেশ একটা কূটনৈতিক সৌজন্য মাত্র। ওটি দরকার।"[৫] আর এই ব্যাপারে দুর্গশাসকে প্রশ্রয় দেয় রানি নিজেই। চিত্রকর দুর্গশাসকের সঙ্গে কথা না বলে রানির সঙ্গে কথা বলতে চাইলে রানির বক্তব্য বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে– "দুর্গশাসক আমার হয়েই প্রশ্ন করেছেন।"[৬] আর এই প্রশ্রয়ের ফলেই রানিকে সামনে রেখে তার আড়ালে সর্বময় কর্তা হয়ে উঠেছে দুর্গশাসক। এই প্রশ্রয় এতটাই বেশি যে জনগণের ক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ হিসাবে সরাসরি রানিকে দায়ী করেছে দুর্গশাসক।

রাজ্যের অন্যান্য ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিরাও সামনে রানির প্রশস্তি আওড়ালেও তারা প্রত্যেকেই একথা স্পষ্ট জানে যে, যে-কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্গশাসকের মতই প্রাধান্য পাবে। তাইতো দক্ষিণ গাঁয়ের সাঁকো মেরামত বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থের থেকে বেশি বরাদ্দ করার দাবি পল্লীসেবক দুর্গশাসকের কাছেই করেছে, রানির কাছে নয়। দুর্গশাসকের ক্ষমতা ও শঠতা সম্পর্কে বাকিরা জানে বলেই তার কূটনৈতিক চক্রান্ত রানি আসার আগে আলোচনা করার প্রস্তাবে বার্তা-অধিকর্তা যখন আশঙ্কা প্রকাশ করে- "এ রাজ্যের পুরনো রাজার যে পরিণতি ঘটেছিল, রাণীর ক্ষেত্রেও কি তার পুনরাবৃত্তি ঘটছে?"[৭] তখন দুর্গশাসকের জবাব প্রমাণ করে যে রানি শুধু হাতের পুতুল- "রাণী আসলেই মৃত, বহুকাল মৃত। আপনারা সবাই যাকে দেখেন তিনি কেবল একটি সাম্রাজ্ঞীর ছায়ামূর্তি।"[৮]

শাসকের সঙ্গে শোষিতের সবথেকে বড় লড়াই বাঁধে রাজ্যের ফুলবাগানটি নিয়ে। আসলে বিশেষ কিছু উদ্দেশ্যকে সফল করতে রাজ্যের বহুমূল্য পুষ্পোদ্যানকে নিলাম করতে চায় দুর্গশাসক। এমনকি এই ব্যাপারে নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে জীবনলালকে দিয়ে গোটা রাজ্যে ঘোষণা করিয়ে দেবার পর নিয়ম রক্ষার জন্য সেই সিদ্ধান্তের কথা রানিকে জানিয়েছেন মাত্র। তাদের অভিপ্রায় ওই ফুলবাগান তাদের মধ্যেই কেউ একজন কিনে নেবে এবং প্রাপ্ত অর্থ রানি জনসাধারণকে দান করবেন। যাতে রাজ্যবাসীর মনে হয় রানির উদ্দেশ্য সৎ। কিন্তু এই মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এর আড়ালে তারা এক ভয়ংকর পরিকল্পনাকে রূপ দিতে চায়। আসলে তারা যে কোন উপায়ে জনগণের প্রতিবাদকে থামাতে চায়। তাই সেই ফুলবাগান কেটে গবেষণাগার তৈরি হবে। সেখানে বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কৃত যন্ত্র থেকে একদল উদ্ভট ও ভয়ংকর প্রাণীর আবির্ভাব ঘটবে। যারা সমগ্র অঞ্চলকে অধিকারের জন্য আক্রমণ করবে। এই ধরনের একটা খবর বার্তা-অধিকর্তা, পল্লিসেবক বিদ্রোহী জনতার মধ্যে প্রচার করবে। তাদের উদ্দেশ্য এর মাধ্যমে জনতাকে বহিঃশত্রুর ভয় দেখানো। যাতে ভয়ে তাদের বিদ্রোহ রদ হয়। এবং বহিঃশত্রুদের হাত থেকে বাঁচতে আশ্রয় নেয় রাজশক্তির। দুর্গশাসকের এই ঘৃণ্য পরিকল্পনাতে রানিও বলে উঠেছেন- "আমাদের দুর্গশাসকের মৌলিক শঠতা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।"[৯]

কিন্তু তাদের এই চালাকি রাজ্যের জনগণের অজ্ঞাত নয়। ওদের প্রত্যেকের আসল রূপ জনতা জানে বলেই এই বিক্ষোভ। তারা জানে বলেই চিত্রকরকে যখন ভয়ঙ্কর, উদ্ভট প্রাণীর ছবি আঁকতে বলা হল তখন সে সভাস্থিত ওই ব্যক্তিদেরই কারো চোখ, কারো মুখ, কারো চোয়ালকে বাড়িয়ে কমিয়ে তার সঙ্গে প্রাচীন প্রাণীর অবয়ব জুড়ে ছবি এঁকেছে। এথেকে একথা স্পষ্ট যে তাদের অহঙ্কার, ক্ষমতার অপব্যবহার ও

স্বার্থপরতার লড়াই রাজ্যে প্রতিবাদ ডেকে আনবে। যার মূলে দুর্গশাসক। কিন্তু সেই কাজ সম্পর্কে অবগত হয়ে জনগণ যখন বাধা দিয়েছে তখন তাদের শায়েস্তা করতে সৈন্যাধ্যক্ষ দুর্গশাসকের স্বাধীনতা চেয়ে রানিকে বলেছে – "দুর্গশাসকের কিছু অতিরিক্ত স্বাধীনতার প্রয়োজন আছে এ ব্যাপারে।"[১০] অর্থাৎ জনগণকে থামাতে রানির আদেশের থেকে এই ব্যাপারে দুর্গশাসকের স্বাধীনতা প্রয়োজন বলে মনে হয়েছে সৈন্যাধ্যক্ষের।

নাটকের শেষে যখন সমবেত জনতা তাদের এই ঘৃণ্য কৌশলকে ধরে ফেলেছে, দুর্গ আক্রমণ করেছে তখন দুর্গশাসকের স্বার্থপরতা আরও একবার স্পষ্ট রূপে দেখা গিয়েছে। দুর্গশাসক নিজ পরিকল্পনার সঙ্গী বৈজ্ঞানিক ও বার্তা-অধিকর্তাকে ক্ষিপ্ত জনতার হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে এসেছে দুর্গে। পরিকল্পনা করেছে দুর্গ ছেড়ে পালানোর। তার মতে প্রাণে মরার থেকে অপমান ও পরাজয় মেনে নিয়ে সিংহাসনে ফিরে পুনরায় ক্ষমতা লাভই কাম্য। রানি তার এই ভীরুতাকে ধিক্কার জানালে দুর্গশাসক বলে- "রানির ব্যক্তিগত দম্ভের থেকেও আমাদের সিংহাসন অধিক মূল্যবান। যতদিন সিংহাসন বাঁচে, ততদিন আধিপত্যের সুযোগও বাঁচে।"[১১]

এই ক্ষমতা ও আধিপত্য বিস্তারই তার একমাত্র কামনার বস্তু। তাই নিজের কূটকৌশল ও শঠতা দিয়ে রানিকে নিজের হাতে রাখতে চায়। সিংহাসনের যাবতীয় ক্ষমতা ও সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে চায়। নাটকটির শেষে গিয়ে মনে হয় রানির সঙ্গে তার এক গোপন অবৈধ সম্পর্ক আছে। কারণ সর্বসমক্ষে রানিকে 'আপনি' বললেও, আড়ালে 'তুমি' সম্বোধন করেছে। আবার সংকট সময়ে তার রানিকে নিয়ে দুর্গ ত্যাগ করতে চাওয়ার মধ্যে কোথাও কিন্তু তাদের প্রেম সম্পর্কের উজ্জ্বলতা নেই বরং সেখানে দুর্গশাসকের ক্ষমতার লোভ ও স্বার্থপরতাই ধরা পড়েছে। তাই সে বলেছে- "সিংহাসনের সঙ্গে শাসকের মিলনই সত্য- আমাকে বাদ দিয়ে সিংহাসনটা খেলনা মাত্র। রানির বিলাস আর মোহ দুর্গশাসকের সঙ্গে বহুকালের অবৈধ সম্পর্কে বাঁধা।"[১২]

আর এই শাসনকার্য চালাতেই তার প্রয়োজন হয়েছিল বার্তা-অধিকর্তা, বৈজ্ঞানিক, পল্লিসেবকদের। তাই প্রয়োজন ফুরালে তাদের ক্ষিপ্ত জনতার কবলে ছেড়ে আসতে দুর্গশাসক দুবার ভাবেনি। কিন্তু রানির প্রয়োজন তার ফুরায়নি। কারণ রানি থাকলে তবেই সিংহাসন থাকবে। আর সিংহাসন থাকলেই থাকবে ক্ষমতা। তাই আজও রানি তার পথের সঙ্গী। নাটকের শুরু থেকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাব নাটকের বেশিরভাগ ঘটনাই দুর্গশাসকের অঙ্গুলি হেলনে সংঘটিত হয়েছে। তার শঠতা, পরিকল্পনা নাটকটিতে গতি সঞ্চার করেছে। তার স্বার্থপরতাই সাধারণ জনতাকে উত্তেজিত করে তুলেছে। খল চরিত্র হিসেবে এখানেই তার সার্থকতা।

'সিংহাসনের ক্ষয়রোগ' নাটকটিতে সিংহাসনের অধিষ্ঠাত্রী হলেন রানি। রাজা মৃত। তিনিই সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু নাটকের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখতে পাব তিনি নিজেই চালিত হচ্ছেন দুর্গশাসকের দ্বারা। তবে দুর্গশাসকের এই শঠতা রানি জানেন না তা নয়। সব জানা সত্ত্বেও রানি তাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন এবং পুনরায় প্রজাদেরকে বঞ্চিত করে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করার কাজে তাকে পরোক্ষভাবে সাহায্যও করেছেন। সেদিক থেকে দেখতে গেলে দুর্গশাসকের পাশাপাশি রানিও একটা অন্যতম খল চরিত্রের উদাহরণ।

সিংহাসনে উপবিষ্ট রানির যে চিত্র আমাদের মনের মধ্যে আসে তার সঙ্গে নাটকের রানির কোনো মিল আমরা পাই না। রানি বুদ্ধিমতী, তাই তিনি চিত্রলেখার মত বোকা ছাড়া কাজের লোক রাখেন না। রানি সাহসী, বুদ্ধিমতীও। কিন্তু তিনি একবারেই জনদরদি নন। তাই তো দুর্গশাসকদের নানাবিধ অত্যাচারে যখন

স্থানীয় এলাকার মানুষজনের মধ্যে বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠতে শুরু করে তখন সেই বিদ্রোহ দমনের জন্য সাধারণ মানুষের বিপক্ষে যেতে রানি দুবার ভাবেন না। দুর্গশাসকরা ফুলবাগান বিনষ্ট করে সেখানে গবেষণাগার তৈরী করেছে এবং কৃত্রিম ভয়ংকর প্রাণীর আবির্ভাব ঘটিয়ে সাধারণ মানুষকে ভয় দেখিয়ে নিজেদের পদদলিত করে রাখতে চেয়েছে। রানিও তাদের সেই ঘৃণ্য পরিকল্পনায় যুক্ত হয়েছেন। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য চিত্রকরকে রূপের মোহে প্রলুব্ধ করে কাজ হাসিল করতেও পিছ-পা হননি তিনি। কাজ সম্পূর্ণ হলে চিত্রকর যাতে তাদের কোনো ক্ষতি না করতে পারে তাই তাকে কৌশলে দুর্গে নজরবন্দী করে রেখেছেন। তাকে নিজের বশীভূত করে শুভ উদ্দেশ্য থেকে বিমুখ করতে চেয়েছেন। এসব কাজ একজন আদর্শ রানির থেকে কূট ছলনাময়ীর রূপকে বেশি সুস্পষ্ট করে তোলে। কারণ তিনিও ক্ষমতালোভী। স্বার্থসিদ্ধির জন্য রানি সত্যকে আড়াল করেছেন, দোষীকে শাস্তি না দিয়ে তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন যা আদর্শ শাসকের কর্তব্য নয়।

তাছাড়া নাটকের অন্যান্য কিছু খল চরিত্র বার্তা-অধিকর্তা, পল্লিসেবক, বৈজ্ঞানিক, সৈন্যাধ্যক্ষ। নাটকে যাদের কোন নিজস্বতা নেই। তারা দুর্গশাসককে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। দুর্গশাসকের সাহায্য করতেই তারা খল চরিত্রে পরিণত হয়েছে। পল্লীসেবক সাঁকো মেরামতের জন্য অর্থ বেশি করে নিতে আর্জি জানিয়েছে। যাতে সেই অর্থ নিজে ভোগ করতে পারে। আবার জনগণ যখন নিজেদের প্রাপ্যের দাবিতে প্রতিবাদ করেছে, তখন পল্লীসেবক ভগবানের কাছে বন্যা বা ভূমিকম্পের প্রার্থনা করেছে। যাতে সেই প্রাকৃতিক বিপর্যয় জনগণকে সর্বস্বান্ত করে এবং তারা বিদ্রোহ ভুলে রানির শরণাপন্ন হয়। শুধু তাই নয় বন্যা হলেই জনজীবন বিপর্যস্ত হবে। সেই পরিস্থিতিতে বাঁধ, সাঁকো প্রভৃতি বানানোর সুযোগ আসবে, আর তাতে লাভবান হবে পল্লীসেবক। অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক ঈশ্বরের উপর আস্থা রেখে বসে না থেকে, বিজ্ঞানের সাহায্যে বন্যা এনে জনজীবনকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে চেয়েছে। যাতে করে জনগণ ক্ষমতার কাছে মাথা নত করে। সংবাদপত্রের কর্তব্য মানুষের কাছে সঠিক তথ্য পৌঁছে দেওয়া। জনগণের দাবিকে তুলে ধরে শাসক গোষ্ঠীকে সচকিত করা। কিন্তু তার জায়গায় বার্তা-অধিকর্তা বিপর্যস্ত জনগণের প্রতিবাদ থামাতে ভুল, মিথ্যা বার্তা পৌঁছাতে চেয়েছে। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। এভাবেই খল চরিত্রগুলি এঁকেছেন লেখক।

গল্পটি তিনি লিখছেন ১৯৭০-এর দশকে। সময়টা পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের ইতিহাসে এক চরম নৈরাজ্য, অস্থিরতা এবং মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কাল। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'সিংহাসনের ক্ষয়রোগ' নাটকটি এই সময়ের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি নাটকটির প্রতিটি ছত্রে মিশে আছে। ষাটের দশকের শেষে শুরু হওয়া নকশালবাড়ি আন্দোলন, সত্তর দশকের শুরুতে এক চরম আকার ধারণ করে। মেধাবী তরুণ প্রজন্মের রাষ্ট্রবিরোধী বিদ্রোহ এবং তার বিপরীতে রাষ্ট্রের ভয়াবহ দমননীতি সমাজকে এক গভীর অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়েছিল। 'সিংহাসন' বা ক্ষমতাকে রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্র যে কতটা নিষ্ঠুর হতে পারে, সেই রূঢ় বাস্তবই এই নাটকের খল চরিত্রের মনস্তত্ত্ব গঠনে সহায়তা করেছে বলেই মনে হয়। তাছাড়া ক্ষমতা কুক্ষিগত করার লড়াই, বিরোধী কণ্ঠরোধ এবং প্রশাসনিক স্তরে দুর্নীতির যে ব্যাপকতা দেখা গিয়েছিল, মোহিত চট্টোপাধ্যায় তাকেই 'ক্ষয়রোগ' বা মরণব্যাধি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। নাটকের রাজা বা শাসক চরিত্রগুলোর মধ্যে যে অসংলগ্নতা এবং ভয় দেখা যাচ্ছে, তা আসলে তৎকালীন শাসকদলের ক্ষমতা হারানোর আতঙ্কেরই প্রতিফলন।

পরিশেষে বলা যায়, মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'সিংহাসনের ক্ষয়রোগ' নাটকের খল চরিত্রগুলো কেবল অশুভ শক্তির প্রতীক নয়, বরং তারা একটি ক্ষয়িষ্ণু শাসনব্যবস্থার অনিবার্য পরিণাম। এই নাটকে 'খলত্ব' কোনো ব্যক্তিগত বিচ্যুতি নয়, বরং তা একটি কাঠামোগত ব্যাধি। রাজা থেকে শুরু করে অমাত্যবর্গের প্রতিটি

স্তরে— বৈজ্ঞানিক, বার্তা-অধিকর্তা, সৈন্যাধ্যক্ষ ও পল্লীসেবকের যে নৈতিক পতন আমরা লক্ষ্য করি, তা আসলে ক্ষমতার সেই 'ক্ষয়রোগ' যা মানুষের বিবেককে কুরে কুরে খায়।

এই নাটকের খল চরিত্ররা জনকল্যাণের মুখোশ পরে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতে মত্ত। তারা ভয়কে পণ্য করে, বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ করে এবং সংবাদমাধ্যমকে মিথ্যার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে কেবল একটি লক্ষ্যেই— সিংহাসন বা ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করা। চিত্রকর যখন এই অমাত্যদেরই অবয়ব দিয়ে এক ভয়ংকর দানবের ছবি আঁকেন, তখন নাট্যকার মূলত এই সত্যটিই প্রতিষ্ঠিত করেন যে, শোষক শ্রেণির সম্মিলিত রূপই হলো প্রকৃত দানব, যা সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।

মোহিত চট্টোপাধ্যায় সত্তর দশকের রাজনৈতিক অস্থিরতাকে রূপকের মাধ্যমে তুলে ধরলেও, এই নাটকের খল চরিত্রগুলোর প্রাসঙ্গিকতা আজও ফুরিয়ে যায়নি। ক্ষমতা যখনই জনবিচ্ছিন্ন হয় এবং শাসকেরা যখনই নিজেদের গদি বাঁচাতে সাধারণ মানুষের ওপর কাল্পনিক ভয় ও শোষণের জাল বিস্তার করে, তখনই 'সিংহাসনের ক্ষয়রোগ' মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে। তখনই জনগণ প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। তাই এই নাটকের খল চরিত্ররা কোনো নির্দিষ্ট সময়ের নয়, বরং তারা সর্বকালের স্বৈরাচারী ও সুবিধাবাদী মানসিকতার এক জীবন্ত দলিল। শোষিত জনতার জাগ্রত হওয়ার মধ্য দিয়েই এই ক্ষয়রোগাক্রান্ত ব্যবস্থার অবসান ঘটে— নাট্যকার এই আশাবাদ ব্যক্ত করেই ক্ষমতার দম্ভকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। তাই সমাজের একজন দায়বদ্ধ লেখক হিসাবে নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায় যে জীবন্ত দলিলের ছবি এঁকেছেন তা আজকের দিনেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

গ্রন্থপঞ্জি:

১। দাস, তপনজ্যোতি (সম্পা.)। রঙ্গপট নাট্যপত্র, মোহিত চট্টোপাধ্যায় স্মরণ সংখ্যা। ২০১২, কলকাতা, পৃ. ৬৭।
২। চট্টোপাধ্যায়, মোহিত। নাটক সমগ্র (প্রথম খণ্ড)। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ২৩৯।
৩। তদেব, পৃ. ২৪০।
৪। তদেব, পৃ. ২৪১।
৫। তদেব, পৃ. ২৪১।
৬। তদেব, পৃ. ২৪৫।
৭। তদেব, পৃ. ২৪২।
৮। তদেব, পৃ. ২৪২।
৯। তদেব, পৃ. ২৪৮।
১০। তদেব, পৃ. ২৫৮।
১১। তদেব, পৃ. ২৭০।
১২। তদেব, পৃ. ২৭৪।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1762-1770
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.399

ভারতীয় জীবনাদর্শে অহিংসা

ফারহানা আখতার, *গবেষক, দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 19.03.2026; Accepted: 30.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Ahimsa or non-violence is the highest virtue, as an ideal moral code rooted in ancient scripture and ethics. It is highlighted in various forms across different contexts. Non-violence is the universal duty. Excluding Charvakas, all major schools of Indian philosophy including Buddhism, Jainism and yoga advocate for the principal of non-violence. Ahimsa is not just absence of killing or harm and injury but the presence of love and compassion for all beings. In Buddhism non-violence is included in Shila, while in Jainism it is included in the Pancha-mahabrata and it is a part of Yama, the first limb of Astanga yoga or Eightfold path, as per Patanjali's Yoga. Ahimsa is the universal law of love and compassion. Contemporary Indian thinker Gandhiji's philosophy non-violence is an extremely vital and fundamental principle. Among the eleven fundamental vows advocated by Gandhiji the first is truth (end) and second is non-violence (means). In his philosophy non-violence and truth deeply interconnected. Mahatma believes in nonviolence in all areas of life, such as politics society economic and legal.

In the modern era Technology has advancement in visible everywhere but the spirit of nonviolence has vanished from among the people, being replaced by violent thoughts. Unfortunately, in today's world, of the non- violence is being over Shadowed by violence across all political social economical and legal sector. To preserve every life and living creature and create a better world the principle of non-violence is indispensable.

Keywords: Ahimsa, Non-Violence, Highest virtue, Universal duty, Buddhism, Shila, Jainism, Pancha-mahabrata, Yoga, Yama, End-means, Gandhiji.

অহিংসার অর্থ : 'অহিংসা' শব্দটি সংস্কৃত শব্দ। যে শব্দটি হিংস শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ ক্ষতি করা বা আঘাত করা। 'অ'যুক্ত হয়ে নঞর্থক হিসেবে অহিংসা শব্দটি হয়েছে যার অর্থ ক্ষতি না করা বা আঘাত না করা। অহিংসার দুটি ঠিক আছে, একটি নেতিবাচক দিক এবং অপরটি ইতিবাচক দিক। নেতিবাচক দিকে যেমন কাউকে হত্যা না করা, কারো ক্ষতি না করা কাউকে আঘাত না করাকে বোঝায়, তেমনি আবার ইতিবাচক দিকে অন্যের প্রতি ভালোবাসা, করুণা এবং দয়াকে বোঝায়। সমস্ত জীবের প্রতিই এই কর্তব্যটি একান্ত বাঞ্চনীয় বক্তব্য। সবাইকে সমানভাবে ভালোবাসো। "যেমন ভাবে নিজেকে

ভালোবাসো তেমনিভাবে নিজের প্রতিবেশীকে ও ভালোবাসতে হবে এবং প্রত্যেকটি জীবেই তোমার প্রতিবেশীস্বরূপ"।[1] আমরা জানি যে ভারতীয় দর্শন কেবল চর্চা বা তাত্ত্বিক জ্ঞানের কথাই বলেনা বরং তার সাথে সাথে চর্যা অর্থাৎ তার ব্যবহারিক প্রয়োগের কথাও বলে। তাই অহিংসা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলেই হবে না এই অহিংসাকে আমাদের ব্যবহারিক জীবনে অনুশীলনও করতে হবে। অহিংসা নৈতিক নিয়ম, অবশ্যসম্ভব পালনীয় কর্তব্য। এ ই অহিংসার দ্বারা আত্মশুদ্ধি হয়। এটি মোক্ষ লাভের সহায়ক। ভারতীয় দর্শনের বিশেষ করে শ্রমনদের (বৌদ্ধ-জৈন) ক্ষেত্রে এবং যোগদর্শনে অহিংসা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সাধারণ ধর্মরূপে অহিংসা : ভারতীয় দর্শনে - ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এইরুপ চারটি পুরুষার্থ পাই। মোক্ষ হচ্ছে প্রধান এবং বাকি তিনটে মোক্ষ লাভের উপায়মাত্র। চার্বাক ব্যতীত অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিকরা এটি স্বীকার করে। মনু ও প্রশস্তপাদ বলেন ধর্ম দ্বিবিধ- সাধারণ ধর্ম বা সামান্য ধর্ম এবং স্বধর্ম বা বিশেষ ধর্ম। স্বধর্ম বা বিশেষধর্ম গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। কিন্তু সাধারণ ধর্ম, গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে নিরধারিত হয়না। সাধারণ ধর্ম- গুণ-কর্ম-ধর্ম-জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের ক্ষেত্রেই বাধ্যতামূলক। মানুষ সামাজিক জীব তাই মানুষকে প্রতিটি সংবেদনশীল জীবের ক্ষেত্রেই এই সাধারন ধর্মটি পালন করতে হবে।

মনুসংহিতার শ্লোক (৪/১৩৮) :

"সত্যং ব্রূয়াৎপ্রিয়ংব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যম অপ্রিয়ম্।
প্রিয়ং চ নানৃতং ব্রূয়াৎ এষ ধর্মঃ সনাতনঃ"।।[2]

সনাতন ধর্মে বলা হয়েছে কাউকে আঘাত না করে সব সময় সত্য কথা বলবে এবং কাউকে কষ্ট দিয়ে সত্য কথা বলা উচিত নয়, এবং মিথ্যা প্রিয় হলেও সেটিও বলা উচিত নয়।

বৈশেষিক দর্শনের প্রধান ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ ও সাধারণ ধর্মের কিছু লক্ষণ দিয়েছেন। তিনি যেগুলিকে সাধারণ ধর্ম বলে উল্লেখ করেছেন সেগুলি হল- ধর্মে শ্রদ্ধা, অহিংসা, ভূতহিতত্ব, সত্য বচন, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অনুপধা, ক্রোধবর্জন, স্নান বা অভিসেচন, শূচি দ্রব্য সেবন, বিশিষ্ট দেবতাভক্তি, উপবাস, অপ্রমাদ।
যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি বলা আছে-

"অহিংসা সত্যমস্তেয়ংশৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
দানং দমো দয়া ক্ষান্তিঃ সর্বেষাং ধর্মসাধনম্"॥[3]

অর্থাৎ অহিংসা, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, দান, দম, দয়া, ক্ষান্তি এই নয়টি ধর্ম সব মানবজাতিকেই পালন করতে হবে। পদ্মপুরাণে- "আত্মনঃ প্রতিকূলানি পরেষাং ন সমাচরেৎ"[4]। তোমার নিজের প্রতি যেরকম আচরণ কাম্য নয়, অন্যের প্রতি সেই রূপ আচরণ করবে না। ছান্দোগ্য উপনিষদে ও অহিংসার বিষয়টি উল্লেখ আছে।

উপরিউক্ত শ্লোকগুলি দ্বারা এটাই বোঝা গেল যে অহিংসা পরম ধর্ম এবং এটি সবাইকে পালন করতে হবে।সব সময় নিজের এবং অন্যের হিতকর কাজে মন দিতে হবে।

মহাভারত ও গীতায় অহিংসা: মহাভারতের অনুশাসন পর্বে ১১৪ অধ্যায় ভীষ্ম অহিংসার কথা বলেন উনি করুণাকে কর্মে এবং চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলেছেন এবং এই করুণার পরিণতি হলো অহিংসা। ১১৭ অধ্যায়ের অহিংসার উপর বহু শ্লোক উল্লেখ আছে—

"অহিংসা পরমো ধর্মস্তথাহিংসা পরো দমঃ।
অহিংসা পরমং দানমহিংসা পরমং তপঃ॥
অহিংসা পরমো যজ্ঞস্তথাহিংসা পরং ফলম্।
অহিংসা পরমং মিত্রমহিংসা পরমং সুখম্॥
অহিংসা পরমং সত্যম অহিংসা পরমং শ্রুতম"॥[5]

অর্থাৎ অহিংসা সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম, শ্রেষ্ঠসংযম, শ্রেষ্ঠ দান,শ্রেষ্ঠ তপস্যা, শ্রেষ্ঠ শক্তি, শ্রেষ্ঠ বন্ধু, শ্রেষ্ঠ সুখ, শ্রেষ্ঠ সত্য, শ্রেষ্ঠ জ্ঞান।

শ্রীমদ্ভগবত গীতায় অহিংসাকে নানারূপে এবং নানানিধ নামে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। গীতার দশম অধ্যায় অহিংসাকে "দৈবী চিন্তন পদ্ধতির লক্ষণ"[6] রূপে বর্ণনা করা হয়েছ।ত্রয়োদশ অধ্যায়ে অহিংসা "তত্ত্বজ্ঞানের আকার"[7]রূপে প্রতিষ্ঠিত। ষষ্ঠদশ অধ্যায় বর্ণিত ছাব্বিশটি দেবী সম্পদের মধ্যে একটি "দেবী সম্পদ"[8] হচ্ছে অহিংসা ।সপ্তদশ অধ্যায়ে অহিংসাকে "কায়িক তপস্যার"[9] অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

জৈন দর্শনে অহিংসা : জৈনদের প্রতিষ্ঠাতা ২৪ জন তীর্থঙ্কর,২৪ তম তীর্থঙ্কর মহাবীর জৈন,জৈন ধর্মাবলম্বীরা এনার মত মেনে চলে। জৈন সম্প্রদায়ে ও মনে করেন- কর্ম বন্ধন থেকে মুক্ত হতে মোক্ষ লাভের প্রয়োজন। যাহা ত্রিশরণের দ্বারা আসে।অর্থাৎ সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞান, সম্যক চরিত্র(সম্যগ্দর্শনজ্ঞানচারিত্রাণি মোক্ষমার্থঃ)[10]। সম্যক চারিত্র মোক্ষ লাভের সবচেয়ে সহায়ক, সম্যক চারিত্র লাভের জন্য পাঁচটি মহাব্রত পালন করতে হয়। এগুলি কঠোরভাবে অনুশীলন করতে হয়- অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ। সন্ন্যাসীদের এই ব্রত অত্যন্ত কঠোরভাবে পালন করত হয়, তাই এইগুলিকে পঞ্চমহাব্রত বলে। এবং গৃহস্থদের জন্য নিয়মগুলি কিছুটা সরল, নিয়মগুলিকে পঞ্চঅনুব্রত বলা হয়। ব্রতগুলির মধ্যে **অহিংসা** সর্বশ্রেষ্ঠ এবং বাকিগুলি তারই অন্তর্ভুক্ত। অহিংসার সারকথা- "ন হন্যতে ন ঘাতয়েৎ"[11] কায়, মন, বাক্যে কোনোভাবেই অতিক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র প্রাণীরও যেন হানি না হয়।এই নৈতিক নীতিগুলি কেবল মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, প্রতিটি জীবেরই স্বকীয় মূল্য আছে। এই অহিংসতত্ত্বে, জৈনরা বুঝিয়েছেন প্রতিটি জীবের সাথে জীবের এক নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। সমস্ত জীবেকে প্রেম বিতরণ এবং তাদের হিতকর কর্মে যোগ দিতে হবে।জীবের প্রতি হিংসা করে জীবকে হত্যা করা হয় তাহলে নিজেকেই হত্যা করা হবে।উপনিষদে আত্মতত্ত্বে এটাই বলা হয়েছে যে ব্রহ্মস্বরূপ আত্মা সর্বভূতে বর্তমান। জৈনরা পাঁচটি সাবধানতা বা সমিতির কথা বলেছেন। ঈর্ষা সমিতি -হাঁটা চলার সময় কোনো কীট পতঙ্গের ক্ষতি না হয়। ভাষা সমিতি- ভাষার দ্বারা যেন কেউ আঘাত না পায়।এষণা সমিতি-খাদ্যওপানীয় বিষয়ের সাবধানতা। আদান সমিতি- শ্বাসপ্রশ্বাসের ফলে যাতে কোন ক্ষুদ্র জীবের ক্ষতি না হয় তার জন্য মুখাবরনি দিয়ে নাক-মুখ ঢেকে রাখা। উক্কার সমিতি- বজ্য, মল-মূত্র- থুতু ত্যাগের সময় সাবধানতা।

জৈনরা অহিংসাকে চরমঅর্থে গ্রহণ করেছেন তারা মাছ,মাংস ভক্ষণ করতেন না, কঠোর নিরামিষভোজী ছিলেন। গৃহস্থের ক্ষেত্রে নিয়মগুলি কিছুটা সহজ ছিল। গৃহস্থদের অহিংসার নিয়ম-ক্ষতিকর নয় এমন সচল জীবকে হত্যা না করা,ভ্রুন হত্যা না করা, আত্ম হত্যা না করা, কোন মানুষকে অস্পৃশ্যরূপে গণ্য না করা এবং কোন মানুষের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ না করা।

এই নীতিগুলি পালনের দ্বারা যেমন ওনাদের মোক্ষ প্রাপ্তি হয় তেমনি পরিবেশ ও জীবজগতের ভারসাম্য বজায় থাকে। অহিংসা নীতির জন্য মানুষ এবং জগতের অন্যান্য সকল প্রাণী এবং উদ্ভিদ সকলের কল্যাণ সাধন সম্ভব হয়। বাস্তুতন্ত্র রক্ষার ক্ষেত্রেও অহিংসা নীতিটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান লক্ষ্য করা যায়।

বৌদ্ধ দর্শেন অহিংসা :বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম বুদ্ধ। অহিংসার বাণী প্রচার করেন। বুদ্ধদেব বলেন জীবন দুঃখময়। ওনার দেওয়া চারটি আর্য সত্য- দুঃখ, দুঃখ-সমুদয়, দুঃখ-নিরোধ, দুঃখ নিরোধমার্গ। দুঃখ নিরোধের উপায় হিসেবে অষ্টাঙ্গিকমার্গ দেন- সম্যক্ দৃষ্টি,সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক,সম্যক কর্মান্ত,সম্যক আজীব,সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি,সম্যক সমাধি । এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ যথাযথভাবে পালন করলে সকল প্রকার দুঃখের অবসান হয় এবং নির্বাণ লাভ হয়। সম্যক দৃষ্টি অর্থাৎ সমস্ত জীবজগতের যথার্থ জ্ঞান লাভ।সম্যক সংকল্প -সংকল্প করা যে হিংসা, দ্বেষ, আসক্তি, এই গ্রুলি থেকে বিরত থাকা। সম্যকবাক মিথ্যা কথা,পরনিন্দা ,যে কথা থেকে অপর আঘাত পায় সেগুলি থেকে বিরত থাকা। সম্যক কর্মান্ত- প্রত্যেকটি কর্মই সব বিধি নিষেধগুলি মেনে এবং করুনা দ্বারা পরিচালিত হয়ে করা উচিত। সম্যক আজীব - আজীব বলতে যে জীবিকার দ্বারা জীবণ চলে।সৎ পথে জীবিকা নির্বাহ করা, পশু হত্যা, পশু শিকার, মদ বিক্রয় এগুলিকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ না করাই হচ্ছে সম্যক আজীব। সম্যক ব্যায়াম- শারীরিক ব্যায়াম, যার দ্বারা চিত্ত শান্ত হবে এবং সৎ চিন্তায় মন নিমজ্জিত হবে। সম্যক স্মৃতি- সব বিষয়ে যথার্থ স্বরূপের স্মরণই হল সম্যক স্মৃতি। সম্যক সমাধি- সর্বশেষ স্তর,এই স্তরে সমস্ত দুঃখে সমাপ্তি ঘটে। সম্যক সংকল্প ,সম্যক বাক,সম্যক কর্মান্ত,সম্যক আজীব, সম্যক স্মৃতি এই পাঁচটিকে একত্রে পঞ্চশীল বলা হয়। শীলের অর্থ সৎআচরণ এবং সমস্ত পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা ।সম্যক কর্মান্তে আরো দশটি শীলের উল্লেখ আছে।এই দশটি শীল গুলি হল ১) অহিংসা/ প্রাণাতিপাত বিরতি /কাউকে হত্যা না করা, ২) মৃষাবাদ বিরতি/মিথ্যা থেকে বিরতি/ সত্য, ৩) চৌর্যকর্ম বর্জন /অদত্তাদান /অস্তেয়, ৪) কামেষু মিথ্যাচার/ অব্রহ্মচর্য, ৫) সুরামৈরেয়/ মদ্যপান, ৬) পিশুনবাক /ক্রুর কথা, ৭) সম্ভিন্ন প্রলাপ /চপল ও অবান্তর কথা, ৮) ব্যাপাদ/বিদ্বেষপরায়ণতা, ৯) অভিধ্যা/লোলুপতা, ১০) মিথ্যাদৃষ্টি/ সন্দেহপ্রবণতা। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের দশটি শীলগুলি পালন করতে হত। কিন্তু গৃহস্থদের ক্ষেত্রে কেবল প্রথম পাঁচটি শীল পালন করতে হত, এবং উপবাসের দিনে আটটি শীল পালনীয়। বুদ্ধদেব কায়-মন-বাক্যে অহিংসাকে পালন করতে বলেছেন। প্রাণী হত্যা করাকেই কেবল হিংসা বলা হয় এমনটা নয়। দুর্বল ও সবল কোন প্রাণীকেই কোন ভাবে আঘাত করা হিংসার একটি রুপ। কোন প্রাণীর ক্ষতি করা এমন চিন্তাটাও হিংসা, যদিও তাকে শারীরিকভাবে আঘাত করা হয়নি। কাউকে বাজে কিছু বলে কথার দ্বারা আঘাত করাটাও হিংসা। গৌতমবুদ্ধ অহিংসা পালনের জন্য ব্রহ্মবিহারের কথা বলেন যেখানে -মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা। জীবের মঙ্গল চিন্তায় মন নিয়োজিত থাকে এগুলো মৈত্রী ভাবনা।
মৈত্রীভাব- প্রতিনিয়ত প্রত্যেকটি জীবের মঙ্গলের চিন্তা করা, জীবকে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসাই মৈত্রীভাব।
করুণাভাব- জীবের দুঃখ দূর করার ইচ্ছা। মৈত্রীভাব ও করুণাভাব একে অপরের সাথে যুক্ত।
মুদিতা- স্বার্থ ছাড়াই পরের সুখে আনন্দিত হওয়া।
উপেক্ষা- সুখ-দুঃখের প্রতি উদাসীন থেকে সমগ্র কল্যাণের কথা চিন্তা করা।এই চারটি মৈত্রীভাবের অন্তর্ভুক্ত। "বুদ্ধদেবের এই অহিংসা সম্মত মৈত্রীভাবনা পরিবেশকে সুরক্ষিত রেখে সমগ্র জীবজগতের মঙ্গল সাধন করছে"।[12]

যোগ দর্শনে অহিংসা : যোগ দর্শনের প্রণেতা মহর্ষি পতঞ্জলি। তিনি কৈবল্য লাভের উপায় হিসেবে প্রকৃতি-পুরুষ ভেদ জ্ঞান অর্থাৎ বিবেকখ্যতির কথা উল্লেখ করেছেন। বিবেক জ্ঞান দ্বারাই অবিদ্যা নাশ হবে এবং কৈবল্য লাভ সম্ভব। এই বিবেকের লাভের জন্য চিত্ত পরিশুদ্ধি প্রয়োজন। চিত্তপরিশুদ্ধির জন্য অষ্টাঙ্গযোগ/যোগাঙ্গের অনুশীলন অবশ্যক। যোগ সূত্রে সাধনপাদে-২৯ এ "যমনিযমাসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণাধ্যান সমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি"॥ [13] অর্থাৎ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি এই

অষ্টাঙ্গযোগ অনুশীলনের দ্বারা চিত্ত পরিশুদ্ধি হবে। যমের অঙ্গগুলি- অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ। সাধনপাদে ৩০এ ("অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহা যমাঃ"॥)[14] যম হচ্ছে নিষেধ বিধি - হত্যা করা, কথার দ্বারা আঘাত, অপরের অনিষ্ট করার চিন্তাভাবনা এইগুলি থেকে বিরত থাকা। কায়িক বাচক মানসিকভাবে অহিংসা পালন করা।

শান্ডিল্য উপনিষধে শান্ডিল্য ও অথর্বনের কথোপকথনের দারাও আমরা অষ্টাঙ্গের বিষয়ে জানতে পারি। শান্ডিল্য অথর্বনের কাছে আত্মপ্রাপ্তির উপায় হিসেবে যে যোগাঙ্গ সেই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চান। তখন অথর্বণ উত্তরে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান সমাধি এই অষ্টাঙ্গযোগের উল্লেখ করেন। পতঞ্জলি যেখানে যমের পাঁচটি অঙ্গের কথা বলেন "অথর্বণ যমের দশটি অঙ্গের কথা বলেন - অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, দয়া, আর্জব, ক্ষমা, ধৃতি, মিতাহার, শৌচ"[15]। ইনি ও অহিংসা বলতে কায়, মন, বাক্যে কোন জীবকে যন্ত্রনা না দেওয়াকে বুঝিয়েছেন।

গান্ধীজির দর্শনে অহিংসা : গান্ধীজি ও বৌদ্ধ এবং জৈনদের মতো অহিংসার বাণী প্রচার করেছেন। অহিংসাকে চরম কর্তব্য বলেছেন, যদিও উনি জৈনদের মতো গুপ্তি এবং সমিতিগুলি কঠোরভাবে মানেন নি, কারণ দৈনন্দিন জীবনে তা মেনে চলা ভীষণই কঠিন। মহাত্মা গান্ধী সত্য এবং অহিংসাকে একটি মুদ্রার দুটি দিকের সাথে তুলনা করেছেন, যারা একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যাদের একে অপরের থেকে আলাদা করা সম্ভব নয়। তিনি সত্যও অহিংসাকে প্রাচীন পর্বতের সাথেও তুলনা করেছেন। সত্য হচ্ছে লক্ষ্য এবং অহিংসা হচ্ছে সেই লক্ষ্য পৌঁছানোর উপায় বা পথ। উনি অহিংসাকে -কেবল কাউকে হত্যা করা বা কারোর ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকা এমন সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করেননি, হিংসাকে আরো ব্যাপক অর্থে দেখেছিলেন, তিনি অহিংসার অপর দিক ভালবাসা কেও বুঝিয়েছেন (বৌদ্ধ-জৈনদের মতো)। অহিংসার জন্য সুস্থ মানসিকতার প্রয়োজন যে মনে কারোর প্রতি হিংসা, ক্ষোভ, ঘৃণা, লোভ, এই ধরনের কোন নঞর্থক বৃত্তিগুলি থাকবে না। অহিংসা একটি সদগুণ। অহিংস ব্যক্তিকে অবশ্যই ঈশ্বরের বিশ্বাস থাকতে হবে। সত্য হল ঈশ্বর এবং অহিংসা হলো সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায় অর্থাৎ অহিংসা হলো সত্যে পৌঁছানোর উপায়। অহিংসার কৌশল হল সত্যাগ্রহ। অহিংসা মানব জাতির বড় শক্তি, গান্ধীজীর হিন্দস্বরাজ গ্রন্থে উপায়েকে বীজ এবং লক্ষ্যকে গাছের সাথে তুলনা করেছেন। গান্ধীজী অহিংসা সমাজের স্তরে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন।তিনি বলেন অস্ত্রের সাহায্যে কখনো সাফল্য আসতে পারে না। তাই তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন নিরস্ত্র শান্তিপূর্ণভাবে লড়াই চালিয়ে গেছেন। তিনি সামাজিক, রাজনৈতিক, সর্বক্ষেত্রে অহিংসা পালনের কথা বলেন। উনি অহিংসাকে Active-force, Love-force, truth-force সবলের শক্তি ইত্যাদি বলে সংজ্ঞায়িত করেছেন, এবং ভালোবাসা হল তপস্যা।

গান্ধীজীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনেকেই অহিংসাকে তাদের জীবনের আদর্শ রূপে গ্রহণ করেছেন। পরবর্তীকালে অনেকেই আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই অহিংসাকে গ্রহণ করেছেন এবং নিরস্ত্র শান্তিপূর্ণ অহিংস আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

"১৯৭৩ থেকে ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের "চিপকো আন্দোলন" ছিল গান্ধীজীর অহিংসা ও সত্যাগ্রহ নীতির বাস্তব প্রতিফলন। সুন্দরলাল বহুগুনা, এবং চন্ডিপ্রসাদ ভাট এনাদের নেতৃত্বে চিপকো আন্দোলন হয়, যার ভিত্তি ছিল পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা।এই আন্দোলনে গ্রামবাসীরা কোনো মারামারি হানাহানি না করে গাছকে জড়িয়ে ধরে কাঠুরেদের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন। আন্দোলনকারীরা মনে করতেন গাছ কাটলে কেবল

কাঠ নয়, মাটির উর্বরতা নষ্ট হয়, জলবায়ু পরিবর্তন নানাভাবে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে। এনাদের উদ্দেশ্য ছিল বনকে রক্ষা করা এবং বনের সম্পদকে কাজে লাগিয়ে ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন করা"।[16]

আধুনিককালে কিছু ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ অস্ত্র ছাড়া ধর্মঘট, অনশন, পদযাত্রা মিছিল, মানব বন্ধন ও মোমবাতি হাতে মিছিল, বয়কট, সোশ্যাল মিডিয়া প্রতিবাদ এগুলি সবই অন্যায়ের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ, এগুলি গান্ধীজীর পথ আদর্শকেই প্রতিফলিত করছে। "সোনমওয়াংচুকের লাদাখ জলবায়ু আন্দোলন,"[17] আর.জি.কর তিলোত্তমা, হাসদেও অরণ্য বাঁচাও, "কৃষকআন্দোলন২.০"[18] এগুলির শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের দৃষ্টান্ত যা অহিংসার একটি রূপ। একটি ছকের সাহায্যে অহিংসার একটি ছোট রূপ তুলে ধরার চেষ্টা--

আন্দলনের নাম	স্থান	সাল	ধরন(অহিংসা পদ্ধতি)
লাদাখ জলবায়ু আন্দোলন	লাদাখ- দিল্লি	২০২৪- ২৬	শান্তিপূর্ণ অনশন দীর্ঘ পথ যাত্রা
আর. জি. কর 'তিলোত্তমা'	পশ্চিমবঙ্গ	২০২৪- ২৫	রাত দখল মোমবাতি মিছিল ও গান।
কৃষক আন্দোলন২.০	পাঞ্জাবি-হরিয়ানা	২০২৪ থেকে ২৫	সিমানায়ে শান্তিপূর্ণ অবস্থান
হাসদেও অরণ্য বাঁচাও	ছত্তিশগড়	২০১১- ২৬	গাছ জড়িয়ে ধরা ও গ্রাম সভা

যদিও এই অহিংসা নীতিটি সর্বক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে না। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, কর্মক্ষেত্রে, লিঙ্গবৈষম্য, ইত্যাদি ক্ষেত্রে অহিংসার বদলে হিংসা সব জায়গা দেখা যাচ্ছে।

সাম্প্রতিককালের দুটি মর্মান্তিক ঘটনা আমাদের কাছে সমাজে ভয়াবহ ও কুৎচিত রূপ দেখিয়ে দিয়েছে। গণমাধ্যমের দ্বারা আমাদের কাছে —১) Epstein file, ২) ইসরায়েল, যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরানের যুদ্ধের ঘটনাটি উঠে এসেছে। ১)Epstein file এ সমাজের প্রভাবশালী নেতা, ব্যবসায়ী ব্যক্তিদের করা অপরাধ নথিভুক্ত আছে। এই file এ ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের নারী এবং শিশুদের প্রতি গোপনে করা পৈশাচিক অত্যাচারের চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে। এটিই হিংসার বীভৎস রূপ। এতদিন যা গোপনে ছিল সবার সামনে এসেছে কারণ সত্যকে চিরদিন লুকিয়ে রাখা যায় না। এই ঘটনাটি যে সামনে এসেছে এটি সত্যের জয়।
২) "ইসরাইল, যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের যুদ্ধ: শুরু হয় ২৮শে ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে ইসরাইল ও যুক্তরাষ্টের বিমান হামলায় ইরানের ভয়াবহ যুদ্ধ (অপারেশন রোয়ারিং লায়ন/অপারেশন এপিক ফিউরি) শুরু হয়েছে। এর ফলে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে(আনুমানিক ৩৬৫০০ জনেরও বেশি)। আমরা জানি যে সশস্ত্র ও হিংসাযুক্ত যুদ্ধের ফলাফল হয় মানুষের ক্ষয়ক্ষতি, পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি। যুদ্ধের ফলে অর্থনৈতিক সংকট, জ্বালানি গ্যাসের দামবৃদ্ধি এছাড়াও জলদূষণ, বায়ুদূষণ(কালোবৃষ্টি) মৃত্তিকা দূষণ ইত্যাদি ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে"।[19] যুদ্ধ কখনও শান্তি আনে না।

আমাদের অহিংস সমাজ গড়ে তোলার জন্য প্রত্যেককে ভালবাসতে হবে। এই ভালোবাসার সম্পর্ক মানুষকে একসূত্রে বাঁধে। শুধু মানুষকেই নয় প্রত্যেক জীবকে ভালবাসতে হবে কারণ প্রত্যেক জীবের মধ্যেই ঈশ্বর বিদ্যমান।

"জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন
সেবিছে ঈশ্বর"।[20]

তথ্যসূত্র:

1) Hiriyanna, Mysore. *Outlines of Indian Philosophy*, Motilal Banarasidass publishers Private Limited Delhi, 2005.P-23

2) *মনুস্মৃতি*- ৪/১৩৮।

3) বাগচী, দীপক কুমার। *ভারতীয় নীতিবিদ্যা*। প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা, ২০২১. পৃ:৬৭।

4)Deshpande, N.A. Translator- *The Padmapuran*. Motilal Banarsidass, 1988. WisdomLib, www.wisdomlibs.org/hidhuism/book/the-padmapurana.1.19.336

5) Vyasa, Krishna-Dwipayana.*The Mahabharata*. Translated by Kisari Mohan Ganguli, 188-1896. Internet Sacred Text Archivr, sacred-texts. com. Accessed 28th Feb 2026. Anushashon Parva-117.37-38.

6) মহারাজ, স্বামী অড়গড়ানন্দজী।*যথার্থ গীতা*: *শ্রীমৎভাগবতগীতা*। স্বামী অড়গড়ানন্দজি আশ্রম ট্রাস্ট, হরিয়ানা, ২০২১. ১০/৫ পৃ: ২১০-২১১।

7)তদেব, ১৩/৭-১১, পৃ:২৬৪-২৬৬।

8)তদেব, ১৬/১-৩, পৃ: ২৯৭-২৯৯।

9)তদেব, ১৭/১৪, পৃ: ৩১২।

10)মন্ডল, প্রদ্যোত কুমার.- *ভারতীয় দর্শন*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০২১. পৃ:১৩৫।

11) সমরেন্দ ভট্টাচার্য, *ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা*, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ২০১৬. পৃ:২৭৬।

12) তদেব, পৃ:২৮৫ ।

13) মহর্ষি পতঞ্জলি। *যোগসূত্র*, সাধনপাদ-২৯।

14) তদেব, সাধনপাদ-৩০।

15) Naraysvami, Aiyer, *Thirty Minor Upanishads*, Archive organisation, 7th March 2026, page-273.

16) "চিপকো আন্দোলন"- *উইকিপিডিয়া*, ৮ই মার্চ ২০২৬, bn.wikipedia.org/wiki/ চিপকো_আন্দোলন ।

17) Patel, Shivam.
"*Indian activist's hunger strike for Ladakh autonomy drwas thousands of supporters*". Reuters,23rd Mar 2024,www.reuters.com.Accessed 4th Mar.2026 .

18) "ভারতে কৃষকদের দিল্লি অভিযান ঘিরে উত্তপ্ত পাঞ্জাব-হরিয়ানা-দিল্লি সিমান্ত".VOA Bangla,13th Feb.2024,www.voabangla.com.accessed 5th March.2026

19)"2026 Iran Massacres". Wikipedia: The Free Encyclopedia, Wikimedia Foundation, 23Mar, en.wikipedia.org/wiki/2026_Iran_massac res.Accessed 28Mar.2026.

20) বিবেকানন্দ, স্বামী । *বীরবাণী* -কবিতা '*সখার প্রতি*' । বিবেকানন্দ সোসাইটী, কলকাতা ১৩১২, পৃ:১১ ।

গ্রন্থপঞ্জি :

১)Hiriyanna, Mysore. *Outlines of Indian philosophy*, Motilal Banarasidass publishers Private Limited Delhi ,2005.

২)Sinha, Jadunath. *Outlines of Indian philosophy*, Sinha publishing house, Calcutta, 1963 .

৩)Sharma, Chandradhar. *A critical survey of Indian philosophy*, Motilal Banarasi dass publishers Private Limited, Delhi,2016.

৪)Aiyer, Narayansvami. Thirty *minor Upanishads*, Archive organisation, 7th March 2026 .

৫)Lal, Basant Kumar. *Contemporary Indian philosophy*, Motilal Banarasi dass publishers Private Limited, Delhi, 2002.

৬) Deshpande, N.A. Translator- *The Padmapuran* .Motilal Banarsidass, 1988. WisdomLib, www.wisdomlibs.org/hidhuism/book/the-padmapurana.

৭) Vyasa, Krishna-Dwipayana. *The Mahabharata*. Translated by Kisari Mohan Ganguli,188-1896. Internet Sacred Text Archivr, sacred-texts. com. Accessed 28th Feb 2026.

৮) ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র । *ভারতীয় দর্শন* । বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড ,কলকাতা ২০২০।

৯) বাগচী, দীপক কুমার । *ভারতীয় দর্শন* । প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা, ২০২১।

১০) মন্ডল, প্রদ্যোত কুমার । *ভারতীয় দর্শন* । প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০২১।

১১) ঘোষ, গোবিন্দচরণ । *সমকালীন ভারতীয় দর্শন* । প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স কলকাতা, ২০২০।

১২) বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিলেশ । *বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় দর্শন* । সদেশ, কলকাতা, ২০১৬ ।

১৩) ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র । *ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা* । বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ২০১৬

১৪) গুপ্ত, দীক্ষিত । *নীতিশাস্ত্র* । পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ,কলকাতা ।

১৫) মহারাজ,স্বামী অড়গড়ানন্দজী । *যথার্থ গীতা: শ্রীমৎভাগবতগীতা.* স্বামী অড়গড়ানন্দজি আশ্রম ট্রাস্ট ,হরিয়ানা, ২০২১ ।

১৬) বাগচি, দীপক কুমার । *ভারতীয় নীতিবিদ্যা* । প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা, ২০২১.

১৭) সেন, রনব্রত । *ধম্মপদ* । হরফ প্রকাশনী, কলকাতা , ১৯৯৬ ।

১৮) সেন, দেবব্রত । *ভারতীয় দর্শন* । পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৫৫।

১৯) 2026 Iran massacres-En.wikipedia.org https://en.wikipedia.org/wiki/2026_Iran_massacres#:~:text=Table_content:%20header:%20%7C%202026%20Iran%20massacres%20%7C,Iran%20massacres:%20Deaths%20%7C%20:%206%2C488%E2%80%9336%2C500%20%7প্রকাশিত ২৩সে ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ,(সংগৃহীত হয়েছে ৮ ই মার্চ ২০২৬)

২০) "ভারতে কৃষকদের দিল্লি অভিযান ঘিরে উতপ্ত পাঞ্জাব-হরিয়ানা-দিল্লি সীমান্ত" - *WWW.voabangla.com* https://www.voabangla.com/amp/7485833.প্রকাশিত ১৩ই ফেব্রুয়ারি ২০২৪(সংগৃহীত হয়েছে ৫ইমার্চ ২০২৬)

২১) "চিপকো আন্দোলন"- *উইকিপিডিয়া* - Chipko. bn.wikipedia
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A7%8B_%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8B%E0%A6%B2%E0%A6%A8#
(সংগৃহীত হয়েছে ৪ঠা মার্চ ২০২৬)
২২)Indian activist's hunger strike for Ladakh autonomy drwas thousands of supporters Http://www.reuters.com
https://www.reuters.com/world/india/indian-activists-hunger-strike-ladakh-autonomy-draws-thousands-supporters-2024-03-23
প্রকাশিত ২৩শে মার্চ ২০২৪ (সংগৃহীত হয়েছে ৪ ঠা মার্চ ২০২৬)

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1771-1788
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.400

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থান প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য নক্ষত্র চলচ্চিত্র পরিচালক অপর্ণা সেন

শুভেন্দু বোস, *রাজ্য সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, সাংবাদিকতা ও গনজ্ঞাপণ বিভাগ, ইস্ট ক্যালকাটা গার্লস কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 19.03.2026; Accepted: 21.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Cinema is a traditional art which has been snapping the social, cultural and political, values of people of the society. Film personalities specially directors and other creative collaborate stands and creatives closely behind the scenes work to showcase their artistic vision. Some of these film directors like Satyajit Ray, Raj Kapoor, Mrinal Sen, Hrishikesh and, Shyam Benegal, Yash Chopra etc. are already legendary.

Many women have emerged and succeeded for their skills as actors, writers, screen writer in the male-dominated film industry. But the presence of women behind the camera have been found comparatively less. There have been relatively few women film directors in India. There are Some of the India's pioneering female directors are Mira Nair, Kalpana Lajmi, Deepa Mehta, Anusha Rizvi, Rima Das. Undoubtedly Aparna Sen is one of the best among them. Acclaimed Indian movie actress, screenwriter and film director Aparna Sen is known for her creative work in Indian cinema. Most of her creativity have been in Bengali and Hindi, and also in English cinema.

As a female actor and director Aparna Sen's perspective of seeing the world is different from men. Aparna Sen's films have never been restricted to a modern or progressive ideological framework instead they make their way into breaking all the boundaries of a backward society. She has been playing an important role to pronote women's Empowerment by her film in the post-Independence era. She is well-known for her films that focus on women. Her women-centric films are a prominent example of how women telling women's stories has been revolutionary. Aparna Sen has masterfully addressed women's need, interest, suffering, desire, conflict and complexity through her films. In this article, I take a close look at some of her prominent works.

Keywords: Cinema, values, male-dominated, women directors, women-centric, revolution.

মানব জগতে চলচ্চিত্রের এক বিশেষ প্রভাব রয়েছে। চলচ্চিত্র সৃষ্টির সেই আদিকাল থেকে মানবজগত চলচ্চিত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আদিকাল থেকে শুরু করে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকাল এই চলচ্চিত্র ছাড়া মানবজগত অস্তিত্বহীন। সিনেমা হল জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং মনোরঞ্জনের এক উপায় মাত্র।

বর্তমানে চলচ্চিত্রের এক নতুন বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি আভাস পাওয়া যায়। আর এই নতুন বৈশিষ্ট্য হল বিষয়বস্তু সম্পর্কিত। মানবজীবন ও মানবসমাজ সম্পর্কিত অনেক ঘটনা, অনেক সমস্যা আজকাল ছবিতে স্থান পাচ্ছে। বর্তমানে সিনেমা সমাজ ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের যোগসূত্রের বন্ধন হিসাবে বিবেচিত হয়। এই সিনেমাজগত সমসাময়িক সমাজে মানুষ এবং মানুষের জীবনকে প্রতিফলিত করে।

গত বেশ কিছু বছরে ছায়াছবির রীতি ও প্রকৃতির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। বিষয়বস্তুর পরিধি বেড়েছে অনেক। বলার রীতি, ক্যামেরার ব্যবহার, ***সম্পাদনা***র কায়দা কানুন সবই বদলেছে। এই বদলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বদলেছে আবহসংঙ্গীতের উপস্থাপন, অভিনেতা- অভিনেত্রীদের সংলাপ, অভিনয়ের রীতি, ক্যামেরার ও শব্দের ব্যবহার , ছবির ছন্দ ও লয়। সবকিছুই ছবির ভাব প্রকাশে সহায়তা করে। এই সমস্ত উপাদান একটি সিনেমাকে পরিপূর্ণতা প্রদান করে অর্থাৎ সম্পূর্ণ করে।

গত চার দশক ধরে ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে এক অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন নারী হলেন অপর্ণা সেন। একজন অভিনেত্রী হিসাবে তিনি তার কর্মজীবন শুরু করেন মাত্র ষোলো বছর বয়সেই। তিনি প্রখ্যাত পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের **'সমাপ্তি'** (১৯৬১) সিনেমায় অভিনয় করেন। প্রথম ছবিতে তিনি তার প্রতিভার সাক্ষর রাখেন। সত্যজিৎ রায়ের **'তিনকন্যা'** (১৯৬১) সিনেমায় অভিনয় করার পরই মৃণাল সেনের সিনেমা **'আকাশ কুসুম'** (১৯৬৫) সিনেমায় অভিনয় করেন। পরর্বতীকালে এই সিনেমাই **'মনজিল'** নামে তৈরি হয় যেখানে তিনি সুপারস্টার অমিতাভ বচ্চন এবং মৌসুমী চ্যাটার্জির সঙ্গে কাজ করেন। এছাড়া অভিনেত্রী হিসাবে **'অপরাজিত'** সিনেমায় অভিনয় করেন। **'অপরাজিত'** সিনেমা অপর্ণা সেনের কমার্শিয়াল হিসাবে সাফল্য লাভ করে। এরপর তিনি **'বসন্ত বিলাপ'** সিনেমায় অভিনেত্রী হিসাবে কাজ করেন এবং মিস ক্যালকাটা নামে পরিচিত হন। এইভাবে ধীরে ধীরে সেন নিজেকে বাংলা সিনেমা জগতে প্রতিষ্ঠা করেন। পরর্বতী প্রজন্মে তিনি দুই দশক ধরে প্রচুর সিনেমা করেন। মোটামুটি ৩০টি আর্ট এবং কমার্শিয়াল সিনেমা করেন বাংলা, হিন্দি, ও ইংরাজি সিনেমায়। এছাড়া তার জনপ্রিয় সিনেমাগুলির মধ্যে উল্ল্যেখযোগ্য হল **'শ্বেতপাথরের থালা'** , **'জনঅরণ্য**, **'যুগান্তর'** প্রভৃতি। ৭০ র এবং ৮০ র দশকে তিনি বাংলা সিনেমায় মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন এবং সেই সময়ে তার হিট জুটি ছিল বাংলার মহানায়ক উত্তমকুমার এবং বিখ্যাত তারকা সৌমিত্র চ্যাটার্জির সঙ্গে। তিনি খ্যাতনামা পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষের সঙ্গে কাজ করেন **'১৯শে এপ্রিল'** সিনেমায় এবং নিজের অসামান্য পরিচয় তৈরি করেন। তিনি থিয়েটার জগতে তার অসামান্য অভিনয়ের জন্য অফুরন্ত প্রশংসা কুড়িয়েছেন সমালোচকদের কাছ থেকে। তিনি মার্চান্ড আইভরি প্রোডাকসনের সঙ্গে কিছু ইংরাজি সিনেমায় কাজ করেন।এছাড়া তিনি প্রচুর হিন্দি সিনেমা করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল **'একদিন আচানাক',** 'কোতয়াল **সাহেব'**, **'বিশ্বাস'** প্রভৃতি। এইসব সিনেমায় অভিনেত্রী হিসাবে কাজ করে আমাদের দর্শকদের প্রচুর সিনেমা উপহার দিয়েছেন।

অপর্ণা সেন তার অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের প্রমান রাখেন একজন পরিচালিকা হিসাবে। তিনি সিনেমার কাজ করতে করতে ১৯৮১ সালে পরিচালিকা হিসাবে কাজ করতে শুরু করেন। ভারতের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের মধ্যে অন্যতম এক বাঙালি পরিচালিকা এবং অসামান্য অভিনেত্রী হলেন অপর্ণা সেন। চলচ্চিত্রের সঠিক উন্নয়ন, শক্তিশালী শিল্প মাধ্যম হিসাবে চলচ্চিত্রের বিকাশে তার সক্রিয় ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি একাধারে যেমন অভিনেত্রী তেমনি আর একাধারে শ্রেষ্ঠ পরিচালিকা। শিল্প ভাবনার মাধ্যম

হিসাবে তিনি চলচ্চিত্রকে নিজস্ব আঁধারে এমনভাবে গড়ে তুলেছেন যা বিশ্বের চলচ্চিত্রের দরবারে এক নতুন দিগন্ত রচনা করেছে।

২০বছর ধরে সিনেমা জগতে অভিনেত্রী হিসাবে কাজ করার পর তিনি পরিচালিকা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে তথ্যকে কতটা তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে পরিবেশন করা যায় তা বাস্তবায়িত করে তার অসাধারণ সিনেমা ৩৬ চৌরঙ্গী লেন (১৯৮১) সিনেমার মাধ্যমে। এই সিনেমা দ্বারা তিনি তার সুদক্ষ পরিচালিকার প্রমান দেন। এছাড়া 'সতী', 'পরমা', (১৯৮৪), 'পারমিতার একদিন'(২০০০), 'মিস্টার অ্যন্ড মিসেস আইয়ার'(২০০১), 'পার্ক এভিনিউ'(২০০৫), 'জাপানিস ওয়াইফ'(২০১০), 'ইতি মৃণালিনী'(২০১১) এবং 'সোনাটা' প্রভৃতি সিনেমাগুলির মাধ্যমে তিনি একজন অসামান্য পরিচালিকার প্রমান রাখেন। তিনি অনেক সিনেমা পরিচালনা করে আমাদের প্রচুর সিনেমা উপহার দিয়েছেন।

রক্ষণশীল মানসিকতাকে দূরে সরিয়ে রেখে নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রাপ্তির বিষয়টি প্রায়শই গুরুত্ব পেয়েছে তার নির্মিত সিনেমাগুলিতে। এছাড়া তিনি সানন্দা নামে একটি বাংলা মাসিক পত্রিকার এডিটার হিসাবে কাজ করেন। সব মিলিয়ে অপর্ণা সেন হলেন 'Rare combination of Beauty & Brain' র প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

গবেষণার বিষয়বস্তু :

"The means of saving bengali cinema from the hands of directers is not mine. my job is to work hard & come up with my best"...

স্বাভাবিক সিদ্ধ স্বচ্ছতায় জানিয়েছেন অপর্ণা সেন। নিজের কাজের মধ্যে তিনি তার কঠোর পরিশ্রমের স্বাক্ষর রেখেছেন বারবার এবং এগিয়ে গেছেন সিনেমা জগতে। তিনি তার সিনেমায় অভূতপূর্ব অভিনয়ের জন্য আজ সকলের কাছে প্রিয়। তার অসাধারন অভিনয়ে তার ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে এবং তিনি সকলের প্রিয় হয়ে ওঠেন। নিজের কঠোর পরিশ্রমের জন্য তিনি সমালোচক এবং দর্শকদের কাছ থেকে যথেষ্ট প্রশংসা কুড়িয়েছেন। অর্জন করেছেন সেরা অভিনেত্রীর সন্মান। তিনি নিজেকে শুধুমাত্র অভিনেত্রী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে থেমে যাননি, অভিনেত্রীর সঙ্গে সঙ্গে তিনি হয়ে উঠেছেন একজন আন্তর্জাতিক মানের পরিচালিকাও। তিনি আজ চলচ্চিত্র জগতে হয়ে উঠেছেন সকলের প্রেরণা।

অপর্ণা সেন হলেন বহুমুখী সম্পন্ন ব্যক্তির অধিকারী। অপর্ণা সেনের সিনেমায় সমাজে নারীর অধিকার ও সন্মান রক্ষার ব্যাপারটা বার বার উঠে এসেছে। তার পরিচালিত সিনেমায় নারী মুখ্য চরিত্র অর্থাৎ নারীই ছবির নায়ক। ভারতের মত পুরুষ তান্ত্রিক সমাজে যেখানে ছেলেরা সিনেমার নায়ক থাকত সেখানে অপর্ণা সেনের সিনেমায় নারীরা এগিয়ে তাদের কে ঘিরেই গড়ে উঠেছে সিনেমার গল্প। নারীরা সিনেমার মুখ্য ভুমিকায় অভিনয়ে থাকে। তারা কোন অংশে পিছিয়ে নয় এবং তারাও তাদের ইচ্ছে মত জীবন কাটাতে পারে তা প্রমাণিত করেন নিজের সিনেমা গুলির দ্বারা। নারী চরিত্র কেন্দ্রিক সিনেমার মাধ্যমে তিনি ভারতবর্ষে এক নারীবাদী চিন্তা ধারার পথকে প্রশস্ত করে। তিনি বাংলার পাশাপাশি হিন্দি, ইংরাজী, এবং জাপানি প্রভৃতি ভাষায় সিনেমা করেন। তিনি সিনেমা জগতে নিউ ওয়েব এবং প্যারালাল সিনেমার সংমিশ্রন ঘটান। তিনি জাতীয় পুরুষকার ও সম্মানের পাশাপাশি বহু আন্তর্জাতিক সন্মান পেয়েছেন। এই গবেষণা পত্রে অপর্ণা সেন সংক্রান্ত যে যে দিক গুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে সেগুলো নিম্নলিখিত-

ক) অপর্ণা সেন তার পরিচালিত সিনেমায় নারী চরিত্রকে বিভিন্নরূপে বারংবার তুলেছে ধরেছেন। অপর্ণা সেন তার চলচ্চিত্রে বারবার নারীর অধিকার, লড়াই অবহেলা অত্যাচারের কথা তুলেছে ধরেছেন।

খ) একাধারে তিনি অভিনেত্রী, পরিচালিকা এবং চিত্র নাট্যকার। বহুমুখী প্রতিভার অন্যতম স্রষ্টা হিসাবে প্রকাশ পেয়েছেন।

গ) অপর্ণা সেনের সিনেমা গুলি কেন অন্যান্য পরিচালক দের থেকে আলাদা।

ঘ) অপর্ণা সেনের সিনেমাগুলো সব শ্রেণীর সব ধরণের দর্শকদের জন্য সর্বত্র সমাদৃত।

ঙ) অপর্ণা সেনের সিনেমার স্ক্রীপ্ট সকল পরিচালক এবং চিত্রনাট্যকারদের থেকে ভিন্ন। যা সকলের মন ছুঁয়ে যায়।

চ) সেনের চিন্তাভাবনার র এই ব্যতিক্রমতাই তাকে বহুমুখী প্রতিভার পদে উন্নীত করে।

ছ) তার আধুনিক চিন্তা ধারার প্রমান পাওয়া যায় তার অভিনয় এবং তার পরিচালিত সিনেমা গুলিতে।

জ) অপর্ণা সেনের সিনেমাগুলি পরিবার সচেনতামূলক হয়ে থাকে। নিত্যদিনের ঘটনাকে তিনি অতি সাধারন ভাবে তুলে ধরেন তার সিনেমা গুলিতে।

ঝ) অপর্ণা সেন সিনেমা গুলিতে সম্পর্কের জটিলতা ও সম্পর্কের বাঁধন ক্রমশ প্রকাশ্য।

ঞ) অপর্ণা সেনের ছবিতে মহিলা কেন্দ্রিক সামাজিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়।

ট) তার সিনেমায় মহিলাদের খুবই শক্তিশালী হিসাবে দেখান হয় পুরুষদের তুলনায় অর্থাৎ মহিলা চরিত্রের প্রাধান্য বেশী মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। তারাই সিনেমাকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

গবেষনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

বাংলার তথা বিশ্বের গর্ব অভিনেত্রী ও পরিচালিকা অপর্ণা সেন আজ সকল নারীর প্রেরণা। তার আধুনিক চিন্তাভাবনা, শিল্পী মনোভাব তাকে অন্যের থেকে পৃথক করে। তিনি ধীরে ধীরে নিজেকে সিনেমা জগতে যেভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন তা সকল কে অনুপ্রেরণা যোগায় বড় হওয়ার এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার।

অপর্ণা সেন প্রতিটি মেয়ের আদর্শ। মেয়েদের সহনশীলতা, বুদ্ধিমত্তা প্রগতির পথ প্রশস্ত করার জন্য সিনেমা মাধ্যমটিকে বেছে নিয়ে যে বিপ্লব ঘটিয়েছেন তা অনবদ্য এবং লক্ষণীয়। এই গবেষনার মাধ্যমে দেখাতে চাইছি যে কিভাবে পুরুষ তান্ত্রিক সমাজে অপর্ণা সেনের মত অন্যান্য মেয়েরা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টার দৌড়ে লেগে রয়েছে এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছে।

এই গবেষণার উদ্দেশ্য হল –

- বাংলা চলচ্চিত্র জগতে সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন এবং অন্যান্য পরিচালকদের সৃষ্ট নারী চরিত্রে অপর্ণা সেনের অভিনয় আলোচনা এই গবেষণার প্রথম বিষয়।
- ৮০র দশকের পর যখন সিনেমার মান যখন নিম্নগামী তখন সিনেমা কেবলই নারী বর্জিত ও পুরুষ বেষ্টিত হয়ে উঠতে থাকে, এমন সময়ে বাধা ধরা চিন্তাধারা বিপরীত গতিপথে বাংলা চলচ্চিত্র জগতে নারী চরিত্র রূপায়নে অপর্ণা সেন নির্মিত চলচ্চিত্র গুলি কতটা প্রাসঙ্গিকতা লাভ করেছে তা আলোচনা করাই এই গবেষণার দ্বিতীয় বিষয়।
- পরিচালিকা অপর্ণা সেন তার ছবিতে নারীর ক্ষমতায়ন বা নারী চরিত্র মননের দিকে জোড় দিয়েছেন। সমাজে নারী এবং পুরুষ সকলের অধিকার সমান এবং সমাজে ইতিবাচক বার্তা নিয়ে পর্যালোচিত করা এই গবেষণার তৃতীয় বিষয়।

বাংলা চলচ্চিত্র জগতে অপর্ণা সেনের সৃষ্ট নারী চরিত্রের ক্রমপরিবর্তন ধারা কিভাবে আন্তর্জাতিক সিনেমার অঙ্গ হয়ে উঠেছে তা পর্যালোচনা করা এই গবেষণার চতুর্থ বিষয়।

- নারী হিসাবে সেন কতটা উন্মুক্ত, নির্ভিক, যুক্তিসঙ্গত ও প্রাসঙ্গিক তার উপর আলোকপাত করা হয়েছে এবং এই সকল সৃষ্টির জন্য পুরুষ তান্ত্রিক সমাজে ব্যতিক্রমী সেন সম্পর্কে পর্যালোচনা করা এই গবেষণার পঞ্চম বিষয়।
- এছাড়া পরিকল্পনা পত্রটির সাপেক্ষে গৃহিত বিশেষজ্ঞের মতামত ও জনসাধারনের মতামতের বিস্তারিত আলোচনা সম্পর্কের পর্যালোচনা এই গবেষণার অন্তিম বিষয়।

গবেষণার পদ্ধতি : এই গবেষণা পত্রটি মূলত স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থান প্রতিষ্ঠায় চলচ্চিত্র পরিচালক হিসাবে অপর্ণা সেনের অগ্রণী অবদান পর্যালোচনা করার লক্ষে প্রস্তুত করা হচ্ছে। পরিচালিকা অপর্ণা সেন সৃষ্ট নারী চরীত্রগুলিকে সমাজে নারীর অবস্থান প্রতিষ্ঠায় কতটা বাস্তবিকতা দান করতে সক্ষম হয়েছে তার উপর আলোকপাত করেছে এবং নির্বাচিত আলোচ্য বিষয়ের প্রয়োজনীতাকে তুলে ধরার লক্ষ্যে গবেষণার প্রয়াস করেছে। এই গবেষণা ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতির অবলম্বন করা হয় যেমন-

বিষয় সূচির বিশ্লেষণ : বিষয় সূচির বিশ্লেষণ অর্থাৎ মুখ্য উৎসের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যার ভিক্তিতে গবেষণা। বিষয় সূচির ভিত্তিতে বাংলা চলচ্চিত্র জগতে নারী চরিত্র রুপায়নে অপর্ণা সেন এর সার্থকতা প্রসঙ্গে বিস্তারিত পর্যালোচনা। বিশ্বের গর্ব অভিনেত্রী ও পরিচালিকা অপর্ণা সেন আজ সকল নারীর প্রেরণা। তার আধুনিক চিন্তাভাবনা, শিল্পী মনোভাব তাকে অন্যের থেকে পৃথক করে। তিনি ধীরে ধীরে নিজেকে সিনেমা জগতে যেভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন তা সকলকে অনুপ্রেরণা যোগায় বড় হওয়ার এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার। অপর্ণা সেন প্রতিটি মেয়ের আদর্শ। মেয়েদের সহনশীলতা, বুদ্ধিমত্তা প্রগতির পথ প্রশস্ত করার জন্য সিনেমা মাধ্যম টিকে বেছে নিয়ে যে বিপ্লব ঘটিয়েছেন তা অনবদ্য এবং লক্ষণীয়। এই গবেষণার মাধ্যমে দেখাতে চাইছি যে কিভাবে সমাজে অপর্ণা সেনের মত অন্যান্য মেয়েরা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টার দৌড়ে লেগে রয়েছে এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছে। এই গবেষণার উদ্দেশ্য হল – বাংলা চলচ্চিত্র জগতে সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন এবং অন্যান্য পরিচালক দের সৃষ্ট নারী চরিত্রে অপর্ণা সেনের অভিনয় আলোচনা এই গবেষণার প্রথম বিষয়। ৮০র দশকের পর যখন সিনেমার মান যখন নিম্নগামী তখন সিনেমা কেবলই নারী বর্জিত ও পর্বতবেষ্টিত হয়ে উঠতে থাকে, এমন সময়ে বাধা ধরা চিন্তাধারা বিপরীত গতি পথে বাংলা চলচ্চিত্র জগতে নারী চরিত্র রূপায়নে অপর্ণা সেন নির্মিত চলচ্চিত্র গুলি কতটা প্রাসঙ্গিকতা লাভ করেছে তা আলোচনা করাই এই গবেষণার দ্বিতীয় বিষয়। পরিচালিকা অপর্ণা সেন তার ছবিতে নারীর ক্ষমতায়ণ বা নারী চরিত্র মননের দিকে জোড় দিয়েছেন। সমাজে নারী এবং পুরুষ সকলের অধিকার সমান এবং সমাজে ইতিবাচক বার্তা নিয়ে পর্যালোচিত করা এই গবেষণার তৃতীয় বিষয়। বাংলা চলচ্চিত্র জগতে অপর্ণা সেনের সৃষ্ট নারী চরিত্রের ক্রম পরিবর্তন ধারা কিভাবে আন্তর্জাতিক সিনেমার অঙ্গ হয়ে উঠেছে তা পর্যালোচনা করা এই গবেষণার চতুর্থ বিষয়। নারী হিসাবে সেন কতটা উন্মুক্ত, নির্ভীক, যুক্তিসঙ্গত ও প্রাসঙ্গিক তার উপর আলোকপাত করা হয়েছে এবং এই সকল সৃষ্টির জন্য পুরুষ তান্ত্রিক সমাজে ব্যতিক্রম সেন সম্পর্কে পর্যালোচনা করা এই গবেষণার পঞ্চম বিষয়। এছাড়া পরিকল্পনা পত্রটির সাপেক্ষে গৃহিত বিশেষজ্ঞের মতামত ও জনসাধারণের মতামতের বিস্তারিত আলোচনা সম্পর্কের পর্যালোচনা এই গবেষণার অন্তিম বিষয়। গবেষণার পদ্ধতি এই গবেষণা পত্রটি পরিচালিকা অপর্ণা সেন সৃষ্ট নারী অগ্রাধিকারগুলিকেও বাংলা চলচ্চিত্র জগতে কতটা বাস্তবতা দান করতে সক্ষম হয়েছে তার উপর আলোকপাত করেছে এবং নির্বাচিত আলোচ্য বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরার লক্ষ্যে গবেষণার প্রয়াস করেছে। এই গবেষণা ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতির অবলম্বন করা হয় যেমন- বিষয় সূচি

বিশ্লেষণ- অর্থাৎ মুখ্য উৎসের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা ভিত্তিতে গবেষণা। বিষয় সূচির ভিত্তিতে বাংলা চলচ্চিত্র জগতে নারী চরিত্র রুপায়নে অপর্ণা সেন এর সার্থকতা প্রসঙ্গে বিস্তারিত পর্যালোচনা, যথা:-

- অভিনেত্রী হিসাবে ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে অপর্ণা সেনের অবদান
- পরিচালিকা হিসাবে ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে অপর্ণা সেনের অবদান
- একজন চলচ্চিত্র কার হিসাবে চলচ্চিত্র জগতে অপর্ণা সেনের সার্বিক অবদান ও প্রাপ্তি।

পূর্বানুমান : ভারতের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে অন্যতম এক বাঙালী পরিচালিকা ও আসামান্য অভিনেত্রী হলেন অপর্ণা সেন। চলচ্চিত্রের সঠিক উন্নয়ন, শক্তিশালী শিল্প মাধ্যম হিসাবে চলচ্চিত্রের বিকাশে তার সক্রিয় ভূমিকা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি শুধুমাত্র অভিনেত্রী ও পরিচালক নন, তিনি হলেন চলচ্চিত্র ও শিল্পের অনন্য দার্শনিক। শিল্প ভাবনার মাধ্যম হিসাবে তিনি চলচ্চিত্রকে তার নিজস্ব আঁধারে এমন ভাবে গড়ে তুলেছেন যার সব দিকেই বিশ্বে চলচ্চিত্র দরবারে এক নতুন দিগন্ত রচনা করেছে। এককথায় বলা যেতে পারে অপর্ণা সেন এক অনন্য ও সার্থক অভিনেত্রী। এই গবেষণা পত্রটিতে ভারতীয় সিনেমায় তার অবদান পর্যলোচনা করা হবে।

কমার্শিয়াল সিনেমার বাড়বাড়ন্তের যুগে কেবলমাত্র নারী চরিত্রকে কেন্দ্র করে একটা গোটা বাংলা সিনেমা তৈরী হয়েছে এমন নজির হাতে গোনা। যদিও কিছু ব্যাতিক্রম লক্ষ্যনীয়। প্রযোজকের ব্যবসায়ী বুদ্ধির অমতে স্রোতের বিপরীত ধারায় নারী চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন অনেকেই, তবে এদের মধ্যে যে সর্বকালের সেরা নক্ষত্রটি হলেন অপর্ণা সেন, তা বলায় বাহুল্য। ১৯৬৮ সালে তাঁর মুক্তি পাওয়া প্রথম ছবি ৩৬ চৌরঙ্গী লেন এর মধ্য দিয়ে তিনি যে নারীকেন্দ্রীক চিত্ররুপায়ণের পথ প্রসস্থ করেছিলেন তা তাঁর চিন্তা চেতনার বহিঃপ্রকাশ থেকে প্রমাণিত। তাঁর এই সৃষ্টি বর্তমানে পিছিয়ে পড়া নারী সমাজে এবং নারীকেন্দ্রীক চিত্র রুপায়নে আগ্রহী পরিচালকের কাছে যে অনেকটাই গুরুত্বপূর্ণ ও গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে পারছে তা এই গবেষণা পত্রটির আলোচনার অন্যতম বিষয়, আর একদিকে এই আলোচনা যেমন সমাজ সচেতনতার একটি আনুমানিক রুপরেখা প্রমাণ করতে পারে বলে এই প্রকল্পটির অনুমান অন্যদিকে আগামী দিনে এটি আর ও উন্নত গবেষণা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সহায়ক হবে বলে অনুমান।

অভিনেত্রী অপর্ণা সেন - এক উজ্জ্বল চলচ্চিত্র নক্ষত্র : চলচ্চিত্র সমলোচক ও চলচ্চিত্র নির্মাতা চিদানন্দ দাসগুপ্ত এবং সুপ্রিয়া দেবির কন্যা অপর্ণা সেন হলেন একজন খ্যাতনামা তারকা। তিনি তার আসামান্য অভিনয়ের দ্বারা বিভিন্ন পরিচালক, সমালোচক এবং দর্শকদের মুগ্ধ করেন এবং ক্রমেই এক উজ্জ্বল চলচ্চিত্র নক্ষত্রে পরিনত হন। অপর্ণা সেন একজন অতুলনীয় প্রতিভাসম্পন্ন অভিনেত্রী যিনি শুধুমাত্র তার কাজের জন্য বাংলা চলচ্চিত্র জগতে স্বপ্রতিষ্ঠিত। তিনি ১৯৬০-৭০ দশকের একজন নামী অভিনেত্রী। তিনি ৮টি BFJA পুরষ্কারে পুরষ্কৃত হন। একটি লাইফটাইম অ্যচিভমেন্ট পুরষ্কার পান। তিনি তার অসাধারন প্রতিভার জন্য জাতীয় পুরষ্কারে সন্মানিত হন। তিনি ১৯৮৭ সালে পদ্মাশ্রী ,দ্যা ফরথ হাইয়েস্ট সিভিলিয়ান পুরষ্কার পান সরকারের তরফ থেকে। তিনি তার অভূতপূর্ব অভিনয় র জন্য অফুরন্ত প্রসংশা কুড়িয়েছেন।

গত চার দশক ধরে বাংলা চলচ্চিত্র জগতের শ্রেষ্ঠ তারকাদের মধ্যে এক অনন্য অভিনেত্রী হলেন অপর্ণা সেন। তিনি মাত্র ১৬ বছর বয়সে বাংলা সিনেমা জগতের পাশাপাশি সারা ভারতের অতুলনীয় প্রতিভাসম্পন্ন পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে তার কর্মজীবন শুরু করেন একজন অভিনেত্রী হিসাবে। অপর্ণা সেন ১৯৬১ সালে প্রথম অভিনয় জীবনে পা দেন। সত্যজিত রায়ের তিনকন্যা সিনেমার সমাপ্তি তে মৃন্ময়ীর চরিত্রে

অভিনয় করে দর্শকদের নজর কারেন এবং জাতীয় পুরষ্কারে সন্মানিত হন। তারপর তাকে আর কখন পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি।

কলেজে পড়াকালীন তিনি সত্যজিত রায়ের সাথে অনেক সিনেমা করেন। সত্যজিত রায়ের সঙ্গে 'পিকু' (১৯৮১) নামে একটি শর্ট ফিল্ম করেন যেখানে তিনি এক বউ র এবং মায়ের চরিত্রে অভিনয় করেন। সত্যজিত রায়ের সাথে সিনেমা করতে করতে তিনি ১৯৬৫ সালে মৃণাল সেনের 'আকাশ কুসুম' সিনেমায় অভিনয় করেন পরবর্তীকালে এই সিনেমা 'মনজিল' নামে তৈরি হয়। যেখানে তিনি সুপারস্টার অমিতাভ বচ্চন, মৌসুমি চ্যাটার্জীর সঙ্গে অভিনয় করেন। এই সিনেমার জন্য তিনি মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা অভিনেত্রী খেতাব অর্জন করেন। এইভাবে ধীরে ধীরে তিনি বাংলা সিনেমা জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ১৯৭০ এ একজন সেরা অভিনেত্রী হিসাবে নিজের পরিচয় তৈরি করেন এবং অসামান্য অভিনেত্রীর পর্যায় নিজেকে উন্নীত করেন। তারপর তিনি অপরাজিত সিনেমায় অভিনেত্রী হিসাবে কাজ করেন। ১৯৬৯ সালে সলিল দত্তের ফিল্ম অপরাজিত সিনেমায়ে সেন প্রথম বাংলা কমার্শিয়াল সিনেমা হিসাবে জারনালিস্ট অ্যসোসিয়েসান খেতাব সেরা অভিনেত্রী রুপে অর্জন করেন ৭০র দশকে অপর্ণা সেনের জুটি ছিল কলকাতার মহানায়ক উত্তমকুমার এবং বিখ্যাত তারকা সৌমিত্র চ্যাটার্জী। অপর্ণা সেন তার পরবর্তী জীবনে 'সুজাতা' (১৯৭৫), 'জন অরণ্য' (১৯৭৬) 'একান্ত আপন'(১৯৮৮), প্রভৃতি সিনেমাগুলি করেন। ১৯৭৩ সালে কমেডি সিনেমা 'বসন্ত বিলাপে' অভিনয় করেন যেখানে তিনি সৌমিত্র চ্যাটার্জীর সঙ্গে কাজ করেন। তিনি তার অভিনয় ও কমেডি দ্বারা দর্শকদের মন জয় করেন। তিনি এই সিনেমার অতি জনপ্রিয় গান 'আমি মিস ক্যালকাটা'-এই গানে চমকপ্রদ অভিনয় ও জনপ্রিয়তার দ্বারা 'মিস ক্যালকাটা নামে পরিচিতা লাভ করেন। এছারা তিনি প্রচুর সিনেমায়ে অভিনয় করেন 'মেম সাহেব'(১৯৭২), 'সোনার খাঁচা'(১৯৭৩),'শ্বেতপাথরের থালা' (১৯৯২), 'রাগে অনুরাগে' (১৯৭৫), 'জীবন স্কৈত', 'আলোর ঠিকানা', 'জয়জয়ন্তী', 'ছুঁটির ফাঁদে', 'ইন্দিরা'(১৯৮৪) প্রভৃতি সিনেমার জন্য সমলোচকদের কাছ থেকে প্রচুর প্রশংসা কুঁড়িয়েছেন। তিনি বাংলার পাশাপাশি প্রচুর হিন্দি সিনেমায় অভিনয় করেছেন। তাদের মধ্যে জনপ্রিয় একটি সিনেমা হল 'ইমান ধরম'(১৯৭৭) অমিতাভ বচ্চন, শশী কাপুর, সাঞ্জিব কাপুর,এবং রেখার সঙ্গে অভূতপূর্ণ অভিনয় করে সেরা অভিনেত্রী হিসাবে সাক্ষ্য বহন করেন। এছাড়া 'সাগিনা' 'কোতয়াল সাহেব' প্রভৃতি সিনেমায় কাজ করেন। এছাড়া তিনি বেশ কতকগুলি ইংরেজি ভাষার সিনেমা করেন। তিনি বাঙালি নায়িকাদের মধ্যে একজন যিনি আইভরি প্রডাকশানের সঙ্গে কিছু ইংরেজি সিনেমায় অভিনয় করেন যেমন 'মার্চান্ড আইভরি', 'বোম্বে টকিস' (১৯৭০),এবং 'হুলাবালো অভার জর্জ অ্যান্ড বনিস পিকচারস' (১৯৭৮) প্রভৃতি। একজন অভিনেত্রী হিসাবে অপর্ণা সেনের সবচেয়ে দর্শক সমাদৃত ছবি হল বিশিষ্ট পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষের '১৯শে এপ্রিল'। সহ অভিনেত্রী চরিত্রে অভিনয় করতে মুখ্য চরিত্রের মতোই তিনি যথার্থই সাবলিল। ২০০৯ সালে অপর্ণা সেন শর্মিলা ঠকুর এবং রাহুল বোসের সঙ্গে অনিরুদ্ধ রায় চৌধুরির বাংলা সিনেমায় অভিনেত্রী হিসাবে কাজ করেন এবং জাতীয় পুরুষ্কারের সন্মানে সন্মানিত হন। সেন তার পরিচালিত বেশ কিছু সিনেমায় সহ অভিনেত্রী রুপে কাজ করেন এবং উল্ল্যেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেন। তাদের মধ্যে 'পারমিতার একদিন' (২০০০) বাংলার হিট ছবির মধ্যে একটি। এই ছবি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে অনেকগুলি পুরষ্কারে পুরষ্কৃত হয়। সেরা বাংলা সিনেমা হিসাবে জাতীয় পুরষ্কারে সন্মানিত হন। ইতি মৃণালীনি সিনেমায় সেন তার অফ স্ক্রিন কন্যা কঙ্কনা সেন শর্মার সঙ্গে অভিনয় করেন। অপর্ণা সেন তার নিজের সিনেমায় অভিনয় করে প্রমান রাখেন যে তিনি এক অনন্য সৃষ্টিকর্তা ও সার্থক অভিনেত্রী। বর্তমান দিনের অভিনব পরিচালক সৃজিত মুখার্জীর সঙ্গে কাজ করেন চঃতুষ্কোন সিনেমায়ে সহ অভিনেত্রী রুপে কাজ করেন।

বিগত চার দশক ধরে অপর্ণা সেন বাংলা চলচ্চিত্র জগতে আজ সমান ভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছেন। বাংলা তথা সারা ভারতে অভিনেত্রী হিসাবে তার অবদান অনবদ্য। জাতিয় তথা আন্তর্জাতিক স্তরে শিল্পের এক অভূতপুর্ব রুপকার হলেন শিল্পী অপর্ণা সেন।

অভিনেত্রী অপর্ণা সেনের চলচ্চিত্র তালিকা :

চলচ্চিত্র	বছর	চলচ্চিত্র	বছর
শাবানা	২০০২	জন অরণ্য	১৯৭৬
তিতলি	২০০২	রাগ অনুরাগ	১৯৭৫
ঘাট	২০০০	আসাতি	১৯৭৪
পারমিতার এক দিন	২০০০	যদু বংশ	১৯৭৪
গাচ	১৯৯৮	সাগিনা	১৯৭৪
আমোদিনী	১৯৯৪	বসন্ত বিলাপ	১৯৭৩
উনিশে এপ্রিল	১৯৯৪	কেয়া হিনের কাহিনী	১৯৭৩
মহাপৃথিবী	১৯৯২	সোনার খাচা	১৯৭৩
শেঠ পাথারের থালা	১৯৯২	খুঞ্জে বেরাই	১৯৭১
সুন্দর কাণ্ড	১৯৯২	অরন্য'র দিন রাত্রি	১৯৭০
নজান গন্ধর্বণ	১৯৯১	বাক্স বাদল	১৯৭০
এক দিন আচনক	১৯৮৯	কলঙ্কিতা নায়ক	১৯৭০
শ্যাম সাহেব	১৯৮৬	অপরাচিত	১৯৬৯
পারোমা	১৯৮৪	গুরু	১৯৬৯
বিষবৃক্ষ	১৯৮৩	বিশ্বাস	১৯৬৯
ইন্দিরা	১৯৮৩	হাংসা-মিথুন	১৯৬৮
নাউকাডুবি	১৯৭৯	আকাশ কুসুম	১৯৬৫
ইমান ধরম	১৯৭৭	কিশোর কন্যা	১৯৬১
কোতোয়াল সাব	১৯৭৭		

পরিচালক অপর্ণা সেন – চিত্রনির্মাণ দক্ষতা ও অভিনভত্ব: ১৯৮১ সালে অপর্ণা সেন '৩৬ চৌরঙ্গী লেন' সিনেমার মাধ্যমে পরিচালনার জগতে পদার্পণ করেন। শুধু পরিচালকই নয় এই সিনেমার চিত্রনাট্যকারও ছিলেন তিনি। শশী কাপুর এই সিনেমাটির প্রযোজক ছিলেন। এই চলচ্চিত্র তাঁকে সেরা পরিচালক বিভাগে জাতীয় পুরস্কার এনে দিয়েছিল। এই সিনেমাটি ম্যানিলা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে গ্র্যান্ড প্রিক্স পুরস্কারও জিতেছিল। এই সাফল্যের পর তিনি আর থেমে থাকলেন না। একের পর এক সিনেমা পরিচালনা করতে থাকলেন এবং অসাধারণ জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে বহু বিতর্কের সূত্রপাতও হল তাঁর ছবির বিষয়কে কেন্দ্র করে। তাঁর পরিচালিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সিনেমা হল, 'পরমা' (১৯৮৪), 'সতী' (১৯৮৯) ইত্যাদি। ২০০০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা 'পারমিতার একদিন' তাঁর আরেকটি জনপ্রিয় এবং একাধারে বিতর্কিত একটি কাজ। তাঁর এই সমস্ত সিনেমায় লক্ষ্য করা যাবে যে তিনি আধুনিক সময়ের মেয়েদের সময়োচিত মুক্ত এক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে তুলে ধরতে চেয়েছেন বড় পর্দায়। ২০০২ সালে মুক্তি পাওয়া সিনেমা 'মিস্টার অ্যান্ড

মিসেস আইয়ার' তাঁর আরেকটি অন্যতম সেরা সৃষ্টি। এই সিনেমার জন্যও সেরা পরিচালক বিভাগে জাতীয় পুরস্কার পান তিনি। এছাড়া আরও ফিল্মগ্রাফির মধ্যে রয়েছে-

- 36 চৌরঙ্গী লেন (1981),
- পারোমা (1985),
- সতী (1989),
- পিকনিক (1989),
- যুগান্ত (1995),
- পারোমিতার এক দিন (2000),
- মিস্টার অ্যান্ড মিসেস আইয়ার (2002),
- দ্য ওয়াইফেনিউ (1502),
- দ্য পার্ক (2010),
- ইতি মৃণালিনী:(2010),
- গয়নার বকশো (2013),
- শাড়ি রাত (2015),
- আরশিনগর (2015),
- সোনাটা (2017),
- ঘাওরে বাইরে আজ (2019)।

পরিচালক এবং লেখক হিসেবে চলচ্চিত্র তালিকা :

চলচ্চিত্র	**বছর**	**চলচ্চিত্র**	**বছর**
৩৬ চৌরঙ্গী লেন	১৯৮১	পারমিতার এক দিন	২০০০
পারোমা	১৯৮৪	মিঃ এবং মিসেস আইয়ার	২০০২
সতী	১৯৮৯	১৫ পার্ক অ্যাভিনিউ	২০০৫
যুগান্ত	১৯৯৫	গুলেল	২০০৫

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থান প্রতিষ্ঠায় অপর্ণা সেন পরিচালিত উল্লেখযোগ্য সিনেমা সম্পর্কে আলোচনা করা হল : অপর্ণা সেন অভিনয়ের পাশাপাশি সিনেমা পরিচালনা করেন এবং বাংলা সিনেমাজগতের পথপ্রদর্শক হয়ে ওঠেন। সেন যে সময়ে পরিচালনায়ে নাবেন তখন বাংলা চলচ্চিত্র জগতে মহিলা পরিচালিকা ছিলনা বললেই চলে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মহিলারা ক্যামেরার পিছনে কাজ করতেন না। তাদের দেখা যেত সিনেমার পর্দায় পন্যদ্রব্য ও কাম লালসার পাত্রী হিসাবে। কিন্তু এই চিন্তাধারা পথভঙ্গ করলেন অপর্ণা সেন। তিনি অভিনেত্রী সাথে পরিচালনা ও শুরু করেন। এবং নারী সমাজকে পরিচালনা পথে অগ্রসর হতে অণূপ্রেরণা যোগান। তখনকার দিনে কিছু সংখ্যক মহিলাই ভারতে পরিচালনা শুরু করেন তাদের মধ্যে একজন ছিলেন সেন। তবে বর্তমানে ডিরেকশানের ক্ষেত্রে এক নব তরঙ্গ দেখা দিয়েছে যেখানে মহিলারা সিনেমা পরিচালনা করতে এগিয়ে আসছেন। তিনি পরিচলার নতুন পথের দিশা উন্মাচন করেন। তার সিনেমা বানিজ্যিক সফলতা অর্জন করে।

তিনি বাংলা সিনেমাজগতে তার কাজের জন্য জানা যায়। তিনি সফলতা অর্জন করেছেন ৩৬ চৌরঙ্গী লেন, সতী, য়ুগান্ত, পারমিতার একদিন, দ্যা জাপানিস ওয়াইফ, মিস্টার অ্যান্ড মিসেস এর মত পথভঙ্গ সিনেমা করে। অপর্ণা সেন আমাদের সময়ের সবচেয়ে উচ্চমানের এবং বুদ্ধীমত্বা পরিচালিকার মধ্যে একজন।

৩৬ চৌরঙ্গি লেন

মুক্তি- ২৯ আগস্ট ১৯৮১

পরিচালক ও রচয়িতা -অপর্ণা সেন

শ্রেষ্ঠাংশে -জেনিফার কেন্ডাল,দেবাশ্রী রায়,ধৃতিমান চ্যাটার্জী,জেফ্রি কেন্ডাল

বিষয় পর্যালোচনা: এটি অপর্ণা সেনের পরিচালক হিসাবে প্রথম ছবি। ১৯৮১ সালে তার পরিচালনায় প্রথম ছবি হল ৩৬ চৌরঙ্গী লেন। একজন অ্যাঙ্গলো ইন্ডিয়ান শিক্ষকের জীবন কে ফুটিয়ে তুলেছিলেন এই ছবিতে। এই সিনেমায়ে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেন জেনিফার কেন্দাল ও দেবশ্রী রায় । এই ছবি অপর্ণা সেনের প্রথম *পরিচালিত* সিনেমা কিন্তু এই ছবিতে তিনি তার একজন পরিনত পরিচালকের পরিচয় দিয়েছেন।

ছবির বিষয়ে এক অ্যাঙ্গলো ইন্ডিয়ান মহিলার নিঃসঙ্গতা যা বিষয় হিসাবে *আন্তর্জাতিক* কিন্তু ৮০ র দশকে ভারতীয় সামাজিক জীবনে অপ্রাসঙ্গিক হয়তো। তবু নিজের *অভিজ্ঞতার* স পক্ষে তার চিত্রনাট্য ও যথাযথ চরিত্রয়ানের চেষ্টা, অসংখ্য খন্ডদৃশ্যের পাশাপাশি দক্ষ ডিজিটালের কাজ ফুটিয়ে তুলে অপর্ণা সেন এই সিনেমার জন্য সমলোচকদের এবং দর্শকদের কাছ থেকে প্রচুর প্রশংসা কুড়িয়েছেন। তিনি এই ছবির জন্য যে বিভিন্ন পুরুষ্কার পান তার মধ্যে উল্ল্যেখযোগ্য হল 'golden eagle awards for the best feature film' at the manila international film festival & 'best director awards'

পরমা (১৯৮৪)

পরিচালক - অপর্ণা সেন

রচয়িতা - অপর্ণা সেন

শ্রেষ্ঠাংশে - রাখী, অপর্ণা সেন, অনিল চ্যাটার্জি, দীপঙ্কর দে,মুকুল শর্মা

বিষয় পর্যালোচনা : অপর্ণা সেন এর পরবর্তী পরিচালিত সিনেমা হল পরমা। এই ছবিতে। এই ছবিতে ডিরেকশান দেওয়ার পাশাপাশি তিনি অভিনয় করেছিলেন। এই সিনেমায় তিনি একজন ৪০বছর বয়সী বিবাহিতা মহিলা। প্রথমবার এই সিনেমাতে তিনি এক্সট্রা মেরেটিয়াল রিলেসানশিপ ব্যাপারটিকে খুব সুন্দর ভাবে সিনেমার পর্দায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন। এটি একটি নারীবাদী ছবি। একটি মেয়ের ছোট থেকে মা হওয়া অবধি প্রতিটি ধাপে ধাপে বিভিন্ন সম্পর্কগুলির জন্য যে দায়িত্ব এবং ও কর্তব্য পালনের মধ্যে দিয়ে কতকগুলি চরিত্র অজান্তে পালন করে, তাহলে আসল নারীটি কে? এবং পরম একটা অবস্থানে গিয়ে যখন সে পৌছালো তখন তার শেষ অবধি পরিচয় কি হল তার ভাবনা থেকে তিনি এই সিনেমা করেন এবং নামে রাখেন পরমা।

সতী (১৯৮৯)

পরিচালক - অপর্ণা সেন

প্রযোজক -এনএফডিসি

চিত্রনাট্যকার -অপর্ণা সেন, অরুণ ব্যানার্জী

কাহিনীকার -কমল কুমার মজুমদার

শ্রেষ্ঠাংশে - শাবানা আজমি,অরুণ ব্যানার্জী,কালী ব্যানার্জি,প্রদীপ মুখোপাধ্যায়,অরিন্দম গাঙ্গুলী

সুরকার - চিদানন্দ দাসগুপ্ত, চন্দন রায়চৌধুরী

চিত্রগ্রাহক - অশোক মেহতা

সম্পাদক -শক্তিপদ রায়

মুক্তি - ২৩ নভেম্বর ১৯৮৯

বিষয় পর্যালোচনা : তার পরিচালিত পরবর্তী সিনেমা সতী। এই সিনেমার মুখ্য চরিত্রে ছিলেন সাবানা আজমি। ভারতীয়দের টিপিক্যাল কিছু চিন্তাধারা এই সিনেমায় তিনি ভীষন সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। এই ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্রে রয়েছে একটি ইয়ং ব্রাহ্মন মেয়ে। এই মেয়ের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে তৎকালীন সময়ের সংস্কার কুসংস্কার এবং নানা সামাজিক বিধি নিষেধের এক ছবি। দুটি মূক প্রাণীর মধ্যে একটি জ্ঞাপন। অদ্ভূত নিঃশব্দ একটি আদানপ্রদান। দুটি মূক প্রাণীর মধ্যে নীরব প্রেম একটি গাছ এবং একটি মেয়ের মাঝে।

চলচ্চিত্রটিতে প্রদর্শীত নারীর অবস্থান পর্যালোচনা -অপর্ণা সেন বিষয়বস্তু চয়নে সম্পূর্ণ ভারতীয়। এ ছবিতে তিনি সমসাময়িক নন । একটি মূক মেয়েকে সম্প্রদান করার মতো পাত্র জোটেনা। সুপাত্র না জুটলেও সমাজে দুষ্কৃতির অভাব নেই। জগতের প্রানের হিল্লোলে সে শব্দময় হয়ে উঠতে পারেনা। তাই তার আশ্রয় হয় নির্বাক সেই প্রাণসত্বা- একটি বটবৃক্ষ। ঝড়ে গাছটি উৎপাটিত হলে মেয়েটির *আবেগ – অনুভূতিগুলোও* তার ই নীচে চাপা পড়ে মারা যায়। এও তো একধরনের সহমরন। বহু দম্ভিক পরবর্তী বহু পরিবর্তনে সেন মূক নারীর যে অসহায় কাহিনী ফুটিয়ে তুললেন তা একই সঙ্গে বেদনা করুন ও বিদ্রুপে বলিষ্ঠ। এই সিনেমার জন্য তিনি জাতীয় পুরষ্কারে সন্মানিত হন।

যুগান্ত (১৯৯৫):

পরিচালক - অপর্ণা সেন

রচয়িতা -অপর্ণা সেন

প্রযোজক - এনএফডিসি

অভিনয় - অঞ্জন দত্ত, রূপা গাঙ্গুলি

প্রকাশ সময় -১৯৯৫

বিষয় পর্যালোচনা : সতীর পর অপর্ণা সেনের পরবর্তী পরিচালিত সিনেমা হল যুগান্ত। তিনি একি সঙ্গে এই সিনেমার লেখিকাও। এই ছবিতে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন অঞ্জন দত্ত এবং রুপা গাঙ্গুলি। *সমালোচকরা বলেন* যুগান্ত এখনো পর্যন্ত সেনের সবচেয়ে *পরিণত* ছবি, সবচেয়ে অ্যাডাল্ট ছবি, সম্পূর্ণ মর্ডান ছবি। এই বাংলা ছবিটি অর্থাৎ সারা পৃথিবীর মানুষ দেখতে পাবে এমন একটি সিনেমা যুগান্ত। এই ছবির মাধ্যমে অপর্ণা সেন আমাদের জীবনের আর একটি দিক তুলে ধরেছিলেন সিনেমার পর্দায়। দুটি মুখ্য চরিত্রের মাধ্যমে আমরা দেখলাম আমাদের নিজের জীবনের কিছু চাওয়া পাওয়া। এই সিনেমায়ে সবথেকে সিম্পেথেটিক চরিত্রে রয়েছে স্বামী দীপক এবং মেয়েটি ভীষণ ইনসেন্ট যে ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে এমন একটি চরিত্রে আছে। পৃথীবিকে মেটাফর হিসাবে দেখান হয়েছে যেভাবে পৃথীবিতে ক্রমশ যুদ্ধবিগ্রহ বেড়ে চলেছে, পৃথীবির পরিবেশ নস্ট হয়ে যাচ্ছে সেভাবে যে মেয়েটি শিশুর মত সরল সে প্রাণবন্ত কারিয়ারের জন্য ক্রমশ বিলীন হয়ে যাছে। বর্তমানে সমাজ যেভাবে ভাঙ্গছে সেভাবে পৃথীবিটাও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই ছবি স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী একটি দুর্দান্ত সিনেমা।

যুগান্তর শেষ দৃশ্যটিতে গভীর দার্শনিক বোধের স্বাক্ষর রেখে যান পরিচালিকা। সমুদ্রের জলে আগুন, অনির্বান আগুনের শিখা, তার দিকে দীপুর ধীরে ধীরে এগিয়ে যাওয়া, চূড়ান্ত মিলনের জোৎস্না মাখা পার্থিব

আদর আর তার আড়ালে লুকোনো শানিত অস্ত্রবুদ্ধির বৈষায়িতাকে ফেলে দীপুর আত্মদহন ও আত্ম অণ্বেষণ সুলভ একধরেনের ইন্টিরিয়র সিনেমা হয়ে ওঠে যুগান্ত।

পারমিতার একদিন(২০০০) :

পরিচালক -অপর্ণা সেন

রচয়িতা- অপর্ণা সেন

শ্রেষ্ঠাংশে -ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত,অপর্ণা সেন,সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

মুক্তি - ৮ জানুয়ারি, ২০০০

বিষয় পর্যালোচনা : অপর্ণা সেন পরবর্তী পরিচালিত ছবি হল পারমিতার একদিন। এবং তিনি এই ছবির লেখিকাও। এই সিনেমায় কেন্দ্রীয় চরিত্রে রয়েছে অপর্ণা সেন নিজে এবং ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। এই সিনেমার বিষয়বস্তু হল বন্ধুত্ব এবং একাকিত্ব। এটি একটি নারীবাদী সিনেমা । শিক্ষা, আধুনিকতা এবং মনোভাব ইত্যাদি কিভাবে মহিলাদের চিন্তাধারা এবং সম্পর্ককে বদলে দিতে পারে তা নিয়ে এ সিনেমা।

চলচ্চিত্রটিতে প্রদর্শীত নারীর অবস্থান পর্যালোচনা-পারমিতার একদিন সম্ভবত অপর্না সেনের সবচেয়ে দর্শক সমাদৃত ছবি। কাহিনিতে নাটকীয়তা আছে, দ্রুতি আছে, পরিণতিতে নারীর পছন্দ মত জীবন নির্বাচনের সম্মানিত অধিকারের ইঙ্গিত আছে। শাশুড়ি সনকার শ্রাদ্ধ বাসরে পারমিতা তার প্রথম বিবাহ জীবনের কথা ভাবে; স্মৃতি রোমান্থনে উঠে আসে তার পূর্বাতন স্বামী বীরেশ, শাশুড়ি সনকা, সনকার বাল্যবন্ধু মনিময়। ক্রনিক সিজোফ্রেনিয়ার দ্রুন তার ননদ খুকু এবং পারমিতা বীরেশের সন্তান পঙ্গু বাবলুকে ঘিরে জীবনের নানা খণ্ডিত দৃশ্য। কাহিনিতে পারমিতার সঙ্গে তার স্বামী বীরেশের এবং সনকার সঙ্গে তার স্বামীর মানসিক ব্যবধান স্পষ্ট। মণিময় সনকাকে গ্রহণ করতে সাহস পায়নি। কিন্তু সময় পাল্টেছে। তাই পারমিতা তার মন মতো সঙ্গী রূপে রাজীব কে নির্বাচন করে। একটা সম্পর্ক ভেঙ্গে আরেকটা সম্পর্কে নিগূঢ়, সমাজ স্বীকৃত, সম্মমানিত, পূবর্তন শ্বশুর বাড়িতে শাশুড়ীর শ্রাদ্ধবাড়িতে উপস্থিত থাকা আজও সমালোচিত। অপর্ণা সেন আরেকবার আধুনিকতার সংজ্ঞা আমাদের সামনে মেলে ধরেন। ছবিতে টাইম এবং স্পেস বার বার পরিবর্তিত এবং এই পরিবর্তনের মধ্যে যোগসূত্র মোবাইল ফোন। পারমিতার ঘন ঘন মোবাইল ফোন বেজে ওঠায় তার অতীত থেকে বর্তমানের সর্বত্তোরণ দর্শক কেও স্তম্ভিত করে তোলে। অন্তিম দৃশ্যে লং টপ শট এ দেখা যায় রাজীব পারমিতার গাড়ীটা গলি থেকে বেরিয়ে ট্রাফিক এর স্রোতে মিশে যায়। এইভাবে জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ট্র্যাজেডি পেরিয়ে বৃহত্তর জীবন সত্যে অবগাহন করাতেই জীবনের সার্থকতা। এই ছবি জাতীয় পুরুষ্কার অর্জন করে বেস্ট বাংলা ফিচার ফিল্ম হিসাবে। সেন এই সিনেমার জন্য তিনি কালাকার পুরষ্কারে সন্মানিত হন এবং বেস্ট ডিরেক্ট্রের খেতাব হাসিল করেন।

মিস্টার অ্যান্ড মিসেস আইয়ার (২০০১):

পরিচালক - অপর্ণা সেন

রচয়িতা - অপর্ণা সেন

প্রযোজক - এন, ভেঙ্কটেসন ও রূপালী মেহতা

অভিনয় - রাহুল বোস, কঙ্কনা সেন শর্মা

সঙ্গীত - জাকির হোসেন

বিতরণ করেছেন

বিষয় পর্যালোচনা : অপর্ণা সেনের অন্যতম বিখ্যাত সিনেমা হল 'মিস্টার অ্যান্ড মিসেস আইয়ার'। এই ছবিতে তিনি ডিরেকশানের পাশাপাশি লেখিকাও। এই সিনেমার কেন্দ্রীয় চরিত্রে রয়েছে কঙ্কনা সেন শর্মা এবং রাহুল বোস। এই সিনেমায় হিন্দি, বাংলা এবং তামিল।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রতিকে কেন্দ্র করে এই ছবিটির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে একটি মেসেজ ছুড়ে দিয়েছেন অপর্ণা সেন। ধর্মীয় কুসংস্কার, আচার, কৌলিন্যতা আমাদের পদে পদে বিচরণ করলেও এর বাইরেও একটা *সত্ত্বা* আছে আমাদের তা হল মানবিকতা। এই ছবিটিতে আমাদের সেই সত্ত্বাটির ধীরে ধীরে উত্তরন ঘটে। দক্ষিণ ভারতীয় আইয়ার ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের একটি বিবাহিতা মহিলা তার কয়েক মাসের শিশুপুত্রকে নিয়ে কোলকাতার বাসে ওঠেন। বাসযাত্রাকালীন একটি অপরিচিত পুরুষ ফটোগ্রাফারের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। দীর্ঘ যাত্রায় ছেলেটি অনেক ভাবে তাকে সাহায্য করে এবং তারা পরস্পরের কাছে অনেকটা সহজ হয়ে ওঠে। মাঝপথে উগ্র হিন্দু সম্প্রদায়ের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অপর হামলা চলাকালীন জানা যায় ছেলেটি মুসলিম। এরপর ক্রমানয়ে গৃহবধূটি তার রক্ষণশীল মনোভবের বেড়া ভাঙ্গিয়ে প্রকৃত মানবিকতা স্তর উত্তীর্ণ হয় এবং দাঁঙ্গাবাজদের কাছে পরিচয় দেয় মিস্টার অ্যান্ড মিসেস আইয়ার হিসাবে। অপর্না মতে এই ছবিটির মূল পটভূমি কেবল সাম্প্রদায়িক নয় এটি বিশেষ সম্পর্কের ছবি। ছবিটিতে কিভাবে একটি রক্ষনশীল মেয়ের সঙ্গে একটি মুসলিম ছেলের এমন এক মানবিক সম্পর্কে গভীরতা সৃষ্টি হয় যার মাঝে জাত, ধর্ম কোনো বাধার সৃষ্টি করেনা। এই সিনেমার জন্য তিনি অনেকগুলি পুরষ্কার পান। সেগুলি হল English national award for best direction & Nargis dutt award for best feature film on national integration

১৫ পার্ক এভিনিউ(২০০৫):

পরিচালক - অপর্ণা সেন

রচয়িতা - অপর্ণা সেন

প্রযোজক - বিপিন ভোহরা

অভিনয় - শাবানা আজমি, কঙ্কনা সেন শর্মা, সৌমিত্র চ্যাটার্জি, ওয়াহিদা রেহমান, ধৃতিমান চ্যাটার্জি, রাহুল বোস

কানওয়ালজিৎ সিং

মুক্তির তারিখ- ২৭ অক্টোবর ২০০৫

বিষয় পর্যালোচনা : অপর্ণা সেনের পরবর্তী পরিচালিত সিনেমা হল ১৫ পার্ক এভিনিউ। এই ছবিতে মুখ্য চরিত্রে রয়েছে কঙ্কনা সেন শর্মা, রাহুল বোস এবং সাবানা আজমি। এটি একটি প্যারালাল সিনেমা। ১৫ পার্ক এভিনিউ সব অর্থেই আধুনিক অ্যাডাল্ড ছবি। ছবিটির কাহীনি আবর্তিত হয় মিঠি বা মিতালী কে নামের মেয়েটিকে ঘিরে। মিঠি ঘটনা পরম্পরায় ধর্ষিত হওয়ার পর রক্তাত্ব জ্ঞানহীন শরীরটা হাসপাতাল থেকে যখন বেরিয়ে এল তখন ৯২ ভাগ সে নিজের মনোজগতে বাস করছে। সে খোঁজ করছে। ১৫ পার্ক এভিনিউ এর বাড়িটির, যেখানে তার ৫ সন্তান এবং স্বামী জোজো বাস করে। মিতালীর একমাত্র অবলম্বন তার দিদি অঞ্জলি। ডিভোর্সি অঞ্জলির চোখ শুধু বোনের উপর। তার আচরনের মাঝে মাঝে ক্ষুদ্ধ হয়ে ওঠে সে। আবার সামলে নেয় মায়ের মতো। তার সহকর্মী সঞ্জীব যে তার দিকে হাত বাড়িয়ে অপেক্ষা করছে তা সে জানে তবু হাত স্পর্শ করতে সে সাহস পায়না বোনের কথা ভেবে। বরং ডাক্তার কুনালের সঙ্গে কথা বলে সে স্বস্তি পায়। অঞ্জলী মিতালীকে নিয়ে বেড়তে আসে পাহাড়ে। সেখানে দেখা যায় অঞ্জলির প্রাক্তন প্রেমিক জয়দীপের সঙ্গে। জয়দীপ তার দুই সন্তান ও স্ত্রী কে নিয়ে ছুটি কাটাতে আসে। জয়দীপ মিতালীকে দেখে স্তম্ভিত। ছবির

শেষে কোলকাতায় ফিরে জয়দীপ মিতালীকে খোঁজ করতে বেড়োয়। ১৫ পার্ক এভিনিউ এ খুঁজতে গিয়ে বিচ্ছন্ন হয় দু'জন। মিতালী আচমকা ১৫ নম্বর বাড়িটি দেখতে পায়। *স্বপ্নের* পথে হেঁটে ভেতরে ঢুকতেই ৫ শিশু এবং স্বামী জোজোকে পায় সে। বাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে মিশিয়ে যায় সেই স্বপ্নের ভিতর। অঞ্জলি, ডাক্তার, জয়দীপ সেই স্বপ্নের হদিশ পায়না। গল্পো উপন্যাসে এই ধরনের কাহিনি নিয়ে অবশ্যই পরীক্ষা চালান যায়। কিন্তু সেলুল্যেডের মতো ব্যয় বহুল মাধ্যমে অপর্ণা সেন সেই সাহস দেখেছেন তা অবশ্যই কৃতিত্বের।

দ্যা জাপানিস ওয়াইফ(২০১০):

পরিচালক- অপর্ণা সেন

চিত্রনাট্যকার - অপর্ণা সেন

কাহিনিকার - কুনাল বসু

অভিনয়-রাহুল বসু,রাইমা সেন,মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়

সুরকার - সাগর দেসাই

মুক্তি - ৯ এপ্রিল ২০১০

বিষয় পর্যালোচনা : অপর্ণা সেনার পরবর্তী পরচালিত ছবি হল দ্যা জাপানিস ওয়াইফ একটি অস্বাভাবিক প্রেমকাহিনি। এই সিনেমার মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন রাহুল বোস, রাইমা সেন, ছিগুয়াসু টাকায়ু, মৌসুমী চ্যাটার্জী।

এই সিনেমার গল্পটি সংকলিত কুনাল বসুর ছোটগল্প থেকে। যা সেন লঞ্চ করেন ৪ই ফেব্রুয়ারি মুম্বাইতে। তিনি গল্পটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে ফেলেন যে এটি নিয়ে সিনেমা করবেন এবং তা নিয়ে ফিচার ফিল্ম করার অনুমতি ও চেয়ে ফেলেন কুনাল বসুর কাছ থেকে। সেই ছবির নতুন নামকরণ করেন 'দ্যা জাপানিস ওয়াইফ'। পরবর্তীকালে প্রকাশকের ও নাম পছন্দ হয়ে এবং তিনি এই বইয়ের নাম রাখেন 'দ্যা জাপানিস ওয়াইফ।

ছবিটির বিষয় হল একজন বাঙালি শিক্ষক এবং একজন জাপানি মহিলাকে নিয়ে, তারা পরস্পরের সঙ্গে কথোপকোথন করতেন ইংরেজিতে ভাষায় অনেক কষ্ট করে। এইভাবে তারা তাদের ভালোবাসাকে ব্যক্ত করতেন চিঠি আদান প্রদানের মাধ্যমে। জাপানি মহিলা অত্যন্ত জটিলতার সঙ্গে তার প্রেমিকের নাম উচ্চারণ করতেন 'স্নেহময়' সেনের এই ছবিটি করার প্রধান উদ্দেশ্য হল তিনি তার এই সিনেমার মাধ্যমে প্রেমের নিরীহ ও পবিত্র রূপটি তুলে ধরতে চেয়েছেন। এই সিনেমার শ্যুটিং করা হয়েছিল ওয়েস্ট বেঙ্গলের সুন্দরবনে এবং জাপানে। স্নেহময় (রাহুল বোস) এক লাজুক ছেলের চরিত্রে অভিনয় করেন যিনি নিজেকে নিজে রক্ষা করতেন এবং নিজেই নিজেকে সামলাতেন। তিনি বড় হয়েছেন নিজের মাসির কাছে সুন্দরবনের এক গ্রামে। এইভাবে ধীরে ধীরে স্নেহময় এবং ম্যাগী বন্ধুত্ব পরিণত প্রেমে পরিণত হয়ে। বেশ কিছু বছর পর স্নেহময়র মাসি তার বিয়ে ঠিক করে তার ছোটবেলার বান্ধবীর মেয়ে সন্ধ্যা র (রাইমা সেনেরা) সাথে। এই বিষয়টি যখন ম্যাগী শোনে তখন ম্যাগী তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে ফেলে। ফলে স্নেহ সন্ধ্যার প্রস্তাব প্রত্যাখান করে এবং তার জাপানী প্রেমিকা বিয়ে করেন। পরবর্তা কেলে স্নেহময় খুব ভালো স্বামীতে পরিণত হয়ে।

কিছু বছর পর স্নেহময়ের জীবনে সন্ধ্যা ফিরে আসে, সে একজন বিধবা এবং তার সাথে রয়েছে তার একটি ছেলে। স্নেহময় তাদের দেখভাল করে খেয়াল রাখে।

১৫ বছর পর স্নেহময় ম্যাগীর কাছ থেকে একটি চিঠি এবং ঘুড়ি পায়। চিঠিতে ম্যাগী লেখে যে যদি তারা দেখা করত তাহলে তাদের আজ ১৫ বছরের ছেলে থাকত এবং সে এই ঘুড়িটি ওড়াতো।

এই সিনেমায় রাহুল বোস অসাধারণ অভিনয়ের প্রমাণ রাখেন। এটি সেনের পরিণত সিনেমার মধ্যে একটি। এই সিনেমা বেস্ট ফিচার ফিল্ম এর জন্য পুরষ্কারে সন্মানিত হয় কানাডাই কালগারী চলচ্চিত্র উৎসবে।

গয়নার বাক্স(২০১৩):

পরিচালক- অপর্ণা সেন

প্রযোজক-শ্রীকান্ত মোহতা ও মহেন্দ্র সোনি

অভিনয়- মৌসুমি চট্টোপাধ্যায়, কঙ্কনা সেন শর্মা, শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

সুরকার - দেবজ্যোতি মিশ্র

মুক্তি - ১২ এপ্রিল ২০১৩

বিষয় পর্যালোচনা: অপর্ণা সেন পরিচালিত সিনেমা হল গয়নার বাক্স। এই সিনেমার কেন্দ্রীয় চরত্রে রয়েছেন মৌসুমী চ্যাটার্জী এবং কঙ্কনা সেন শর্মা। এছাড়া রয়েছেন শ্রাবন্তী, শাশ্বত, পরাণ *বন্দ্যোপাধ্যায়* এবং অপরাজিতা। এটি একটি মনোরঞ্জনমূলক ম্যাজিকাল সিনেমা।

সেন তার সিনেমায়ে প্রত্যেক বার কিছু না কিছু নতুন নিয়ে আসেন। এটি কারিকার্য করা গয়নার বাক্স, বাক্স ভরা গয়না আর তিন প্রজন্মের তিন নারী সোমলতা, চৈতালী, এবং রাসমনি এদের নিয়ে ছবি। শীর্সেন্দু মুখোপাধ্যার উপন্যাস গয়নার বাক্স। গয়নার র সঙ্গে মেয়েদের সম্পর্ক আজকের নয় যুগ যুগ ধরে কখনো তাদের শৃঙ্গার কখনো তাদের অঙ্গের শোভা আবার কখন দুর্সময়ের সম্বল এই স্ত্রী ধন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সম্পর্ক বদলেছে যেমন বদলেছে মেয়ের সামজিক অবস্থান। এই ছবিতে একটি গয়নার বাক্সর সঙ্গে এই তিন প্রজন্মের তিন নায়িকার সম্পর্কের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে সেই বিবর্তনের চেহারা এই সিনেমায়। এটি সেনের একটি বিনোদন প্রদানকারী সিনেমা। এই ছবিতে পরাশক্তি অভিনয়কারী কঙ্কনা সেন শর্মাকে আবার তার মায়ের সিনেমায় অভিনয় করতে দেখা যায়। আর সেন জানেন যে কিভাবে তিনি তার মেয়ের কাছ থেকে ভালোটা পেতে পারেন। কঙ্কনা একজন ভিত বিবাহিত মহিলার চরিত্র অভিনয় করেছেন, যে তোতলামি করে। কক একজন স্বতঃস্ফূর্ত নায়ক। সে তার চরিত্রটকে খব সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছে।

জাপানিস ওয়ায়িফ সিনেমার পর অপর্ণা সেনের এই ছবিতে মৌসমি চ্যাটার্জী আবার সিনেমার প্রধান চাবিকাঠির চরিত্রে অভিনয় করেন। তার অভিনীত চরিত্রে টি হল পিসিমা, একজন ভূত। তিনি তার অসাধারণ অভিনয়ের দ্বারা সিনেমাকে মনোরঞ্জন দান করেন। তার কমেডি সমলোচক এবং দর্শকদের সমাদৃত। তিনি তার অভিনয়ের জন্য প্রচুর প্রসংশা কুড়িয়েছেন। তিনি এই সিনেমায়ে একজন অত্যাধিক হাসিখুসি কুখ্যাত ভূত। একই সিনেমায় ভূত এবং থ্রিলার র অনুভূতি দর্শকরা খুব ভালোবাসে। তাছাড়া বর্তমানে এই ধরনের ছবি টলিউডের নতুন ট্রেন্ড। অনেক ভূতের ব্যাপার আছে এই সিনেমায়। এই সিনেমাকে আকর্ষনীয় করে তুলতে সেন খুবই সুন্দর সেট তৈরী করেন এবং আকর্ষনীয় লাইটিং র ব্যবহার সিনেমাকে আকর্ষণীয় করে তোলেন। এই ছবিতে প্রাণচ্ছল অভিনয়ে করেছেন পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পিয়ূষ গাঙ্গুলি, মাণষী, অপরাজিতা ওধ্যা এবং আরও অনেকে। সকলে তাদের অসাধারন প্রতিভার প্রমান এই সিনেমায়। film making is a strenuous job but with such gifted actors around, my job was easy, said Aparna sen. এই সিনেমার সংগেত পরিচালক হলেন দেবজ্যোতি মিশ্র এবং এছারা এই সিনেমায়ে ২টো র‍্যাপ গেয়েছে। এটি সেনের প্রথম ছবি যেখানে তিনি ২টি র‍্যাপ ব্যবহার করেছেন বাংলা ভাষায় যেটি কবি গান বা তর্জা নয়। সিনেমার টাইটাল গান গেয়েছেন উপাল ও অনিন্দ্য এবং লিখেছেন সৃজাত।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় সমাজব্যবস্থা ও অপর্ণা সেনের ছবিতে নারী অবস্থান: বিখ্যাত ভারতীয় পরিচালক লেখিকা এবং অভিনেত্রী অপর্ণা সেন পরিচিত সমাজে নারী অবস্থার প্রকৃত চিহ্নিতকারী হিসাবে। তিনি

সবসময় সমাজে পিছিয়ে পড়া, অবহেলিত, শোষিত নারী অবস্থান বিষয়ে উদ্বিগ্ন। অপর্ণা সেনের ছবিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে নারী চরিত্র। তার সিনেমায় সমাজে নারীর অধিকার ও সন্মান রক্ষার বিষয়টি বার বার উঠে এসেছে। তার পরিচালিত সিনেমায় নারী কেন্দ্রীয় চরিত্র অর্থাৎ নারীরাই ছবির নায়ক। তিনি তার ছবিতে নারীর ক্ষমাতায়ন বা নারী মননের দিকে বেশি জোড় দিয়েছেন। তার সৃষ্টি নারী নির্ভীক, উন্মুক্ত, যুক্তিযুক্ত এবং প্রাসঙ্গিক।

অপর্ণা সেন তার পরিচালিত সিনেমায় নারী চরিত্র বারংবারং প্রস্ফূটিত হয়েছে। নারীর জীবনকে কেন্দ্র করে তার সিনেমা গড়ে ওঠে। তিনি নারী অধিকার সমর্থন নিয়ে বহু সিনেমা করেছেন। তিনি তার নারী কেন্দ্রীক চিত্ররুপায়ণের মাধ্যমে ভারতবর্ষে এক নারীবাদী চিন্তাধারার পথকে প্রশস্ত করেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের আধিপত্য তৈরি করতে তিনি অনন্য।

অপর্ণা সেনের সিনেমাগুলি মহিলা পরিচয় তৈরির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমাদের মতে আজ অবধি সেনের মত ডিরেক্টর খুবই হাতে গোনা, যারা ভারতের মহিলাদের মহিলা চরিত্র ভিন্ন ভিন্ন স্তরের নিয়ে গিয়ে নিশ্চিতভাবে প্রস্ফূটিত করেছেন।

তার সমস্ত সিনেমার চিত্রিত হয়েছে নারী চরিত্রের নিজস্ব পরিচয়, এই পরিচয় দিয়ে সিনেমার পরিচয় তৈরী হয়েছে যা সিনেমাগুলিকে অন্য মাত্রা দান করেছে। প্রত্যেকটি সিনেমা নিজের নামের পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে সিনেমার চরিত্রের নামে ব্যক্তিগত পরিচয় তৈরী করেছে একইভাবে।

তার নারীবাদী সিনেমাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সিনেমা হল –'৩৬ চৌরঙ্গী লেন', 'পরমা', 'পারমিতার একদিন', 'মিস্টার অ্যান্ড মিসেস আইয়ার', '১৫ পার্ক এভিনিউ' প্রভৃতি। সেন তার এই সিনেমাগুলি দ্বারা ভারতে নারীবাদী আন্দোলনকে প্রস্ফুটিত করেন। সেন নারীবাদী বিষয় সহানুভূতিশীল হওয়ার কারন হল তিনি এই নারী অধিকার কে মানবঅধিকার বলে মনে করেন। এই নিম্নলিখিত সিনেমাগুলির মধ্যে তার পরমা হল সুবচেয়ে নারীবাদী সিনেমা। কারন পরমার মত ঘটনা যে কোন নারীর সাথে ঘটতে পারে বলে তিনি মনে করেন।

তিনি নারীবাদী মশীহ নন তবে তবে নারী কে ইতিবাচক আলোর রূপ রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। অনেকে মনে করে নারী শুধুমাত্র দঃখিত বিষয় নিয়ে সিনেমা করতে পারে। নারী রা যে পুরুষের মত সম ভাবতে পারে বা তারা কথাও পুরুষের চেয়ে কম নয় তা প্রমাণ করে দেন সেন। তিনি তার সিনেমার মাধ্যমে নারী চরিত্রগুলিকে খুব সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন তার বিভিন্ন সিনেমায়- তা ৩৬ চৌরঙ্গী লেন সিনেমার অ্যাংলো জেনিফার এর নিঃসঙ্গতা হোক কিংবা মিস্টার অ্যান্ড মিসেস আইয়ার ছবিতে কঙ্কনা সেন শর্মা র তামিলিয়ান ব্রাহ্মণ চরিত্র হোক বা পারমিতার একদিন এ সেনের নিজস্ব চরিত্র একজন উত্তর ক্যালকাটার হাউস ওয়াইফ র চরিত্র হোক। তিনি যে শুধুমাত্র নারীদের তার সিনেমায় গভীর ভাবে সন্মান করেন তা নয় তাদের নৈতিকশক্তিকে সুন্দর ভাবে প্রস্ফুটিত করেন।

তিনি তার ছবিতে ভালোবাসাকে বিভিন্ন রুপে প্রকাশ করেছেন- '৩৬ চৌরঙ্গী লেন' সিনেমায়ে অবৈধ ভালবাসা, 'পরমা' সিনেমায়ে বহির্মুখী প্রেম, 'দ্যা জাপানিস ওয়াইফ' ছবিতে বিশুদ্ধ ভালোবাসা, 'মিস্টার অ্যান্ড মিসেস আইয়ার' সিনেমাতে দাঙ্গার সময় ভালোবাসা, 'পারমিতার একদিন' ছবিতে শাশুড়ি এবং বউমার বন্ধুত্বপূর্ণ ভালোবাসা প্রভৃতি নানান রুপে তিনি তার সিনেমায় ভালোবাসাকে চরিতার্থ করেছেন।

তিনি যে শুধুমাত্র তার সিনেমাতে নারী চরিত্রকে শক্তশালী রুপে রুপায়ণ করেছেন তা নয়। তিনি তার ছবিতে নারী অধিকার রক্ষা ও তাদের অধিকারকে সমর্থন করার মত প্রেমময় পুরুষ চরিত্র চিত্রিত করেছেন

যেমন দ্যা জাপানিস ওয়াইফ সিনেমায় রাহুল র স্নেহময় চরিত্র কিংবা পারমিতার একদিনে রাজেশ শর্মা চরিত্র বা ইতি মৃণালীনি ছবিতে কৌশিক সেন চরিত্র প্রভৃতি মনে রাখার মত চরিত্র।

তবে তার সিনেমা পরিচালনার ধরন অন্যান্য পরিচালকদের থেকে ভিন্ন। তিনি চাক্ষুষ এবং মৌখিক সঠিক সংমিশ্রনের প্রকৃষ্ট উধাহরণ। কিছু ডিরেকটরদের দর্শকরা ভালোবাসেন তাদের অনবদ্য ব্যঙ্গকারী সংলাপের জন্য আবার কিছু পরিচালকদের ভালোবাসেন তাদের বিস্ময়কর চাক্ষুষ চিত্রাবলীর জন্য কিন্তু সেনের মধ্যে সিনেমা তৈরীর দুই দিকই বজায় রয়েছে।

অপর্ণা সেন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রাপ্তি ও সন্মান : একজন সফল চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব হওয়ার পাশাপাশি তিনি ছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর জনপ্রিয় পত্রিকা 'সানন্দা'র সম্পাদক। তিনি সম্পাদক হিসেবে ১৯৮৬ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

১৯৮৯ সালে মস্কোতে অনুষ্ঠিত ১৬তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে তিনি জুরির সদস্য ছিলেন। ২০০৮ সালে, তিনি এশিয়া প্যাসিফিক স্ক্রিন পুরস্কারে আন্তর্জাতিক জুরিতে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ২০১৩ সালে লাদাখ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের জুরির প্রধান ছিলেন অপর্ণা সেন। ২০০৫ - ০৬ এ তিনি কলকাতা টিভিতে ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টরের দায়িত্ব সামলেছেন। ২০১১ সালে সারদা গ্রুপ প্রকাশিত 'পরমা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন অপর্ণা সেন।

অপর্ণা সেন এখনও পর্যন্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে নয়টি পুরস্কার জিতেছেন।ন'টি জাতীয় পুরস্কার ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে নানা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। বাংলার চলচ্চিত্র সাংবাদিক অ্যাসোসিয়েশনের পুরস্কার পেয়েছেন কখনও অভিনয়, কখনও চিত্রনাট্য, আবার কখনও বা পরিচালনার জন্য। ২০০১ সালে সেরা অভিনেত্রীর জন্য পেয়েছিলেন আনন্দলোক পুরস্কার। কলাকার পুরস্কার পেয়েছেন ২০০০ সালে 'পারমিতার একদিন' এবং ২০১০ সালে 'ইতি মৃণালিনী' সিনেমার জন্য সেরা পরিচালক বিভাগে। এছাড়াও ফিল্ম ফেয়ার পুরস্কার পেয়েছেন বহুবার। ১৯৮৭ সালে চলচ্চিত্রে অবদানের জন্য অপর্ণা সেনকে 'পদ্মশ্রী' সম্মানে ভূষিত করা হয়।

উপসংহার: দেশের সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি নিয়ে বরাবর সোচ্চার অপর্ণা সেন। রাজনীতির বহু পালাবদল দেখেছেন চোখের সামনে। এমনকি তাঁর পরিচালনাতেও বারবার উঠে এসেছে যুদ্ধ ও দাঙ্গা বিধ্বস্ত মানুষের গল্প, জায়গা পেয়েছে নারীবাদের আসল মনস্তত্ত্ব। অপর্ণা বারবার বলেন, ফেমিনিস্ট না হয়ে আন্দোলন হিউম্যানিস্ট হতে পারত। বারবার তাই নারীবাদকে নিজের মতো করে ভেঙেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন, কখনও নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করেছেন। নারীবাদ আন্দোলনের সময় যে ক্ষিপ্রতা, যে গতির প্রয়োজন ছিল তা সাধারণ জীবনে এসে হয়তো অন্য রূপ নেয়।

অপর্ণা সেনের চলচ্চিত্র ভাবনা বাংলা সিনেমাজগতে এক নবতরঙ্গ এর সূচনা করেছেন। তিনি চলচ্চিত্র জগতে নিউওয়েব এবং প্যারালাল সিনেমার সংমিশ্রন ঘটান। তার মর্ডান চিন্তাধারা, শিল্পস্বত্বা মনোভব, মর্ডান স্টাইল, আচার ব্যবহার নব মেয়েদের প্রেরণা যোগায়। অপর্ণা সেন বাংলা সিনেমাজগতকে এক নতুন জীবনে আলোকিত করেছেন যা পরবর্তি অভিনেত্রী ও ফিল্ম নির্মাতা দের উৎসাহ প্রদান করে। তিনি নিজে সতিজিৎ রায়ের সঙ্গে কাজ করে বড় হয়েছেন, যে তাকে নিজে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, সেই আজ সকল নারী অভিনেত্রী এবং চলচ্চিত্র অভিনেত্রীদের তথা সমাজের অনুপ্রেরণা।

তিনি তার সিনেমায় যে শুধুমাত্র নারী চরিত্র নিয়ে তুলে ধরেন তা নয়। নারীকে আবেষ্টিত সম্পর্কের জটিলতাগুলিকে তার সিনেমায় বর্নিত করেন। তার সৃষ্ট ছবিতে যে বিষয়গুলি উঠে আসে সেগুলি হল যে কেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মহিলাদের পন্যদ্রব্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে? তারা কি শুধুমাত্র কাম লালসার চাহিদা

মেটনোর বস্তু? কেন বিধবা মহিলাদের সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়ে? কেন মহিলাদের অক্ষম সম্প্রদায় মনে করা হয়।

পরিচালক হিসেবে তার চলচ্চিত্র সৃষ্টি কেবল ভারতীয় সিনেমার গতিপথই নয়, ভারতীয় সিনেমা দর্শকদের দৃষ্টিভঙ্গিও বদলে দিয়েছে, বিশেষ করে 'পারোমা'-এর মতো যুগান্তকারী ছবি, যেখানে প্রচলিত বিবাহিত জীবনে একজন অবিশ্বস্ত ব্যক্তির (মহিলা) দ্বিধা এত সংবেদনশীলতা এবং সততার সাথে চিত্রিত করা হয়েছে। এবং তারপরে 'পারমিতার এক দিন' এবং '১৫ পার্ক অ্যাভিনিউ'- এর মতো ছবি রয়েছে, যেগুলি যথাক্রমে প্রতিবন্ধী এবং স্কিজোফ্রেনিয়া আক্রান্ত শিশুদের যত্নশীল এবং পরিবারের সদস্যদের জীবনের ব্যতিক্রমী সূক্ষ্ম চিত্রায়ন। মিস্টার অ্যান্ড মিসেস আইয়ার এবং 'ঘাওরে বাইরে আজ'-এর মতো ছবিগুলিতে সেনের মৌলবাদ-বিরোধী, ধর্মনিরপেক্ষ অবস্থান স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

তিনি শুধুমাত্র অভিনেত্রী এবং পরিচালিকা হয়ে থেমে থাকেন নি। তিনি লেখিকা চিত্রনাট্য, সম্পাদনার এবং অনান্য কাজে নিজের পথ কে প্রশস্ত করেন। তার সিনেমা সাধারনত মহিলাকেন্দ্রিক যা নারী সমাজ কে অনুপ্রেরণা দান করে। তবে তিনি যে শুধু মাত্র মহিলাতান্ত্রিক ছবি করেন তা নয়। তার সিনেমায় একটা পজিটিভ মেসেজ থাকে। যা নারী তথা সমগ্র সমাজ কে সঠিক পথের দিশা দেখায়।

তথ্যসূত্র :

1. "অপর্ণা সেন — নিজের গভীরতায় ডুবে যাওয়া এক নদী" । জার্নাল অফ ইন্ডিয়ান সিনেমা । ২৫ অক্টোবর ২০২০।
2. "ইতি মৃণালিনী"। 12 অক্টোবর 2020 এ মূল থেকে আর্কাইভ করা হয়েছে । সংগৃহীত 11 ডিসেম্বর 2009
3. পরমা এবং অন্যান্য বহিরাগত: অপর্ণা সেনের সিনেমা, লেখক: শোমা এ. চ্যাটার্জি। পারমিতা পাবলিকেশন্স, ২০০২। আইএসবিএন ৮১-৮৭৮৬৭-০৩-৫।
4. সিনেমার অ আ ক খ; লেখক: ধীমান দাশগুপ্ত (সম্পা); প্রকাশক: বাণীশিল্প; সাল: ২০০৯.
5. হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান সিনেমা, রেনু সারান -ডায়মন্ড পকেট বুকস ২০১২,
6. আই এস বি এন ৮১২৮৮৩৭৬১৩, ৯৭৮৮১২৮৮৩৭৬১৬
7. নাসরিন মুন্নী কবির (২০০১) । বলিউড: দ্য ইন্ডিয়ান সিনেমা স্টোরি । চ্যানেল ৪ বই। আইএসবিএন ৯৭৮-০-৭৫২২-১৯৪৩-১.
8. অপর্ণা সেন সিদ্ধান্ত নেন (ভারতীয় চলচ্চিত্রে নারী), লেখক: রাজশ্রী দাশগুপ্ত। জুবান, ২০০৯।
9. ইন্ডিয়ান সিনেমা: নাসরিন মুন্নি কবির
10. 'অপর্ণা সেনের সর্বশেষ ছবি 'আরশিনগর' হল দেব অভিনীত 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট'-এর একটি বাংলা রূপান্তর" । সিএনএন-আইবিএন। ১ ডিসেম্বর ২০১৫।
11. "১৬তম মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (১৯৮৯)" । MIFF । ১৬ মার্চ ২০১৩ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা ।
12. "লাদাখ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের জুরির প্রধান হবেন অপর্ণা সেন" । দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া । ১৩ জুন ২০১৩।
13. অপর্ণা সেনের সংবেদনশীলতার ২৫ বছর" । হিন্দুস্তান টাইমস । ৫ জানুয়ারী ২০০৬।

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1789-1796
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.401

আয়ুর্বেদে শল্যচিকিৎসা: একটি ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

স্নিগ্ধা চ্যাটার্জী, *রাজ্য সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক-১, সংস্কৃত বিভাগ, রামপুরহাট কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 19.03.2026; Accepted: 21.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Surgery, or operative medicine, is one of the most complex and significant branches in the history of medical science. At a time when modern medicine has reached remarkable heights, the contributions of Sushruta, the pioneer of ancient Indian surgery, have once again become a focal point of global research. The primary objective of this paper is to analyze the depth of Ayurvedic Shalya Tantra (surgical science), its practical methodologies, and its theoretical as well as applied similarities with modern surgical practices.

This research paper reviews ancient Sanskrit manuscripts, particularly the Sushruta Samhita, along with contemporary studies by historians of medicine. Special emphasis has been placed on the Ashtavidha Shalya Karma (eight types of surgical procedures), plastic surgery (rhinoplasty), and the treatment of urinary calculi (lithotomy). The analysis reveals that nearly 2,500 years ago, Sushruta designed 121 surgical instruments, many of which resemble modern surgical tools. His method of nasasandhana (rhinoplasty) continues to be recognized as a foundational technique in plastic surgery.

Furthermore, his scientific approach to early anesthesia and sterilization techniques—such as fumigation (dhupana)—was remarkably advanced. The study also highlights that traditional therapies like Ksharasutra can be more effective than modern treatments in certain cases.

Ayurvedic surgery is not merely an ancient tradition but represents the true foundation of modern surgical science. Although its practice declined during the medieval period due to various socio-political factors, its revival within the framework of integrative medicine could be highly beneficial for humanity. By integrating this ancient body of knowledge with modern technology, it is possible to develop more advanced and effective surgical techniques.

Keyword: Ayurveda, Shalya Tantra (Ayurvedic Surgery), Sushruta, Plastic Surgery and Rhinoplasty, Sushruta Samhita, Ksharasutra Therapy, Ancient Indian Medicine

আয়ুর্বেদ হলো জীবনের বিজ্ঞান। দীর্ঘায়ু লাভ এবং রোগমুক্ত জীবনের জন্য প্রাচীন ঋষিরা যে জ্ঞানের ধারা প্রবর্তন করেছিলেন, তার মধ্যে 'শল্য তন্ত্র' (Surgery) ছিল সবচেয়ে বৈপ্লবিক। শল্য তন্ত্র আয়ুর্বেদের অষ্টাঙ্গ (আটটি শাখা) এর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাখা হিসেবে বিবেচিত।

মহর্ষি সুশ্রুত তাঁর 'সুশ্রুত সংহিতা'-য় উল্লেখ করেছেন:

"তত্র ধন্বন্তরিপ্রথমেহিঙ্গং শল্যং; তৎপ্রধান্যং চ সর্বেষঙ্গেষু।"[১]

অর্থাৎ: অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের মধ্যে শল্য শাস্ত্রই প্রধান এবং প্রাচীনতম।

এর প্রধান কারণ হলো, অন্যান্য শাখায় ওষুধ কাজ করতে সময় নিলেও শল্যচিকিৎসায় তাৎক্ষণিক উপশম পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধে আমরা প্রাচীন ভারতের শল্যচিকিৎসার বিবর্তন, মহর্ষি সুশ্রুতের অবদান এবং আধুনিক শল্যবিদ্যার সাথে এর যোগসূত্র বিশ্লেষণ করব।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও উৎপত্তি

ভারতীয় ঐতিহ্যে শল্যবিদ্যার আদি শিক্ষক হিসেবে দেবতা ধন্বন্তরিকে গণ্য করা হয়। তিনি কাশীরাজ দিবোদাস রূপে মর্ত্যে অবতীর্ণ হয়ে সুশ্রুতসহ অন্যান্য ঋষিদের এই বিদ্যা দান করেন।

বৈদিক যুগ ও শল্যবিদ্যা

ঋগ্বেদ এবং অথর্ববেদে শল্যচিকিৎসার প্রাথমিক ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বৈদিক দেবতাদের চিকিৎসক 'অশ্বিনী কুমারদ্বয়' যুদ্ধে আহত সৈন্যদের কাটা পা জুড়ে দেওয়া (কৃত্রিম অঙ্গ স্থাপন) বা অন্ধত্ব দূর করার মতো অলৌকিক অস্ত্রোপচার করতেন বলে উল্লেখ আছে। তবে এই অসংলগ্ন জ্ঞানকে একটি সুশৃঙ্খল বিজ্ঞানের রূপ দেন মহর্ষি সুশ্রুত।

মহর্ষি সুশ্রুত: শল্যচিকিৎসার জনক

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে বারানসীতে সুশ্রুত তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ 'সুশ্রুত সংহিতা' রচনা করেন। তিনি কেবল তাত্ত্বিক জ্ঞান দেননি, বরং হাতে-কলমে ব্যবচ্ছেদ (Dissection) এবং অস্ত্রোপচারের গুরুত্ব বুঝিয়েছিলেন। আধুনিক বিশ্বের চিকিৎসাবিজ্ঞানীরাও তাকে 'Father of Surgery' এবং 'Father of Plastic Surgery' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

শারীরস্থান বা শরীরতত্ত্ব (Anatomy)

সুশ্রুতের মতে, একজন ভালো সার্জন হওয়ার প্রথম শর্ত হলো মানবদেহের নিখুঁত গঠন জানা। তিনি বলেছিলেন, "যে চিকিৎসক কেবল শাস্ত্র পড়েন কিন্তু ব্যবচ্ছেদ করেন না, তিনি অস্ত্রোপচারে ব্যর্থ হন।"

মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ পদ্ধতি

সেই সময় আজকালের মতো ফরমালিন বা রাসায়নিক ছিল না দেহ সংরক্ষণের জন্য। সুশ্রুত একটি প্রাকৃতিক পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন:

- একটি সম্পূর্ণ মৃতদেহকে খাঁচায় ভরে ধীরগতিতে বয়ে যাওয়া নদীর জলে নিমজ্জিত করে রাখা হতো।
- কয়েকদিন পর দেহটি যখন নরম হতো, তখন ঘাস বা তুলির ব্রাশ দিয়ে স্তরে স্তরে চামড়া সরিয়ে ভেতরের পেশি, হাড় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পর্যবেক্ষণ করা হতো।

শরীরতত্ত্বের পরিসংখ্যান

সুশ্রুত সংহিতায় মানবদেহের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা অবাক করার মতো:

- অস্থি (Bones): ৩৬০টি (তিনি দাঁত ও তরুণাস্থিকেও গণনায় ধরেছিলেন)।
- সন্ধি (Joints): ২১০টি।
- পেশি (Muscles): ৫০০টি।
- মর্ম স্থান (Vital points): ১০৭টি। (এই ১০৭টি স্থানে আঘাত লাগলে মৃত্যু বা পঙ্গুত্ব হতে পারে, যা আধুনিক 'Trauma Surgery'-র ভিত্তি)।

[১] সুশ্রুত সংহিতা, সূত্রস্থান, প্রথম অধ্যায়, শ্লোক ১৫-১৬।

শল্য যন্ত্রের শ্রেণীবিন্যাস (Surgical Instruments)

সুশ্রুত প্রায় ১২১ ধরনের শল্য যন্ত্রের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি এগুলোকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছিলেন:

বিভাগ	বর্ণনা	উদাহরণ
যন্ত্র (Yantra)	ভোঁতা বা ব্লান্ট ইনস্ট্রুমেন্ট (Blunt tools)	১০১ প্রকার (যেমন- চিমটা বা Forceps)
শস্ত্র (Shastra)	ধারালো বা শার্প ইনস্ট্রুমেন্ট (Sharp tools)	২০ প্রকার (যেমন- স্ক্যালপেল বা ছুরি)

তিনি যন্ত্রগুলোর নকশা করার সময় বিভিন্ন পশুপাখির মুখের আকৃতি কল্পনা করেছিলেন (যেমন— সিংহমুখ যন্ত্র), যাতে সেগুলো শরীরের নির্দিষ্ট স্থানে সহজে ব্যবহার করা যায়।

অষ্টবিধ শল্য কর্ম (Eight Types of Surgical Operations)

মহর্ষি সুশ্রুত অস্ত্রোপচারকে কেবল একটি কাজ হিসেবে দেখেননি, বরং একে একটি শিল্প এবং বিজ্ঞানের সমন্বয় হিসেবে গণ্য করেছেন। তিনি সমস্ত শল্য চিকিৎসাকে আটটি প্রধান পদ্ধতিতে ভাগ করেছেন, যা আজও আধুনিক সার্জারির মূল ভিত্তি।

> "ছেদ্যং ভেদ্যং তথা লেখ্যং বেধ্যমেষ্যমহার্য্যচ।
> বিস্রাব্যং সীব্যমিত্যেতদষ্টধা শল্যকর্ম চ।।"[২]

এই আটটি পদ্ধতি হলো:

১. ছেদন (Excision): শরীরের কোনো রোগাক্রান্ত অংশ বা টিউমার কেটে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া।

২. ভেদন (Incision): কোনো ফোড়া বা পুঁজ জমে থাকা স্থান চিরে ফেলা (যেমন— Abscess draining)।

৩. লেখন (Scraping/Scarification): কোনো দূষিত কলা বা ডেড টিস্যু চেঁছে ফেলা।

৪. বেধন (Puncturing): সুঁই বা তীক্ষ্ণ যন্ত্র দিয়ে বিঁধিয়ে তরল বের করা (যেমন— Hydrocele বা জলশোথ চিকিৎসা)।

৫. এষণ (Probing): নালী ঘা বা ফিস্টুলার গভীরতা মাপার জন্য বিশেষ শলাকা ব্যবহার করা।

৬. আহরণ (Extraction): শরীর থেকে বিজাতীয় বস্তু (যেমন— তীরের ফলা বা পাথর) টেনে বের করা।

৭. বিস্রাবণ (Drainage): দূষিত রক্ত বা তরল বের করে দেওয়া।

৮. সীবন (Suturing): ক্ষতস্থান সেলাই করা।

সীবন বা সেলাই পদ্ধতি

সুশ্রুত ক্ষত সেলাই করার জন্য রেশম সুতো, গাছের ছাল (বল্কল), পাটের তন্তু এবং বিশেষ ক্ষেত্রে পিঁপড়ের মুখ (Ant heads) ব্যবহার করার কথা বলেছেন। অন্ত্রের অস্ত্রোপচারে বড় কালো পিঁপড়েকে কামড় দেওয়ানো হতো এবং তাদের মাথা আটকে যাওয়ার পর শরীর আলাদা করে দেওয়া হতো, যা আজকের 'Surgical Staples'-এর আদি রূপ।

প্লাস্টিক সার্জারি ও রাইনোপ্লাস্টি (The Origin of Plastic Surgery)

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে সুশ্রুতকে 'Father of Plastic Surgery' বলা হয়। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো 'নাসাসন্ধান' বা রাইনোপ্লাস্টি।[৩]

---

[২] সুশ্রুত সংহিতা, সূত্রস্থান, ২৫তম অধ্যায়, শ্লোক ৩।

[৩] সুশ্রুত সংহিতা, সূত্রস্থান, ১৬তম অধ্যায়, শ্লোক ২৮-৩২।

নাসাসন্ধান (Rhinoplasty)

প্রাচীন ভারতে অপরাধীকে শাস্তি হিসেবে নাক কেটে ফেলার প্রথা ছিল। সুশ্রুত এই বিচ্ছিন্ন নাক পুনরায় জোড়া লাগানোর পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

- পদ্ধতি: তিনি গালের চামড়া (Pedicle Flap) ব্যবহার করে নাকের আকৃতি তৈরি করতেন।
- প্রক্রিয়া: প্রথমে একটি পাতা দিয়ে নাকের মাপ নেওয়া হতো, তারপর সেই মাপে গাল থেকে চামড়া কেটে (পুরোটা আলাদা না করে) নাকের ওপর বসিয়ে দেওয়া হতো। রক্ত চলাচলের জন্য চামড়ার একটি অংশ মূল স্থানের সাথে যুক্ত রাখা হতো।
- ঔষধি প্রয়োগ: ক্ষতস্থানে চন্দন, যষ্টিমধু এবং অ্যান্টিসেপটিক হিসেবে তিল তেলের প্রয়োগ করা হতো।

এটি বর্তমান যুগের 'Pedicle Grafting' পদ্ধতির সাথে হুবহু মিলে যায়। ১৭৯৪ সালে 'Gentleman's Magazine'-এ ভারতের এই পদ্ধতি প্রকাশিত হওয়ার পরই পাশ্চাত্য জগৎ প্লাস্টিক সার্জারি সম্পর্কে ধারণা পায়।

অ্যানেস্থেশিয়া ও ব্যথা উপশম (Ancient Anaesthesia)

অস্ত্রোপচারের সময় রোগীর যন্ত্রণা কমানোর জন্য সুশ্রুত অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। বর্তমানের মতো ক্লোরোফর্ম বা আধুনিক গ্যাস না থাকলেও তিনি প্রাকৃতিক উপাদানের ওপর নির্ভর করতেন।

- মদ ও হর্ষক দ্রব্য: অস্ত্রোপচারের আগে রোগীকে প্রচুর পরিমাণে 'মদ্য' (Strong wine) পান করানো হতো যাতে স্নায়বিক উত্তেজনা কমে যায় এবং রোগী তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকে।
- ধূমপান ও ভেষজ: নির্দিষ্ট কিছু ভেষজ ধোঁয়া (যেমন— গাঁজা বা ভাং এর বিশেষ মিশ্রণ) ইনহেলার হিসেবে ব্যবহার করা হতো।
- অন্যান্য পদ্ধতি: সুশ্রুত রোগীর মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার ওপর জোর দিতেন। তিনি মনে করতেন, অস্ত্রোপচারের সময় রোগীর সাহস বাড়াতে তাকে আশ্বস্ত করা এবং দ্রুত অস্ত্র চালানো জরুরি।

রক্তমোক্ষণ ও জলৌকা চারণ (Bloodletting & Leech Therapy)

আয়ুর্বেদ মতে, রক্ত দূষিত হলে অনেক চর্মরোগ ও প্রদাহ সৃষ্টি হয়। এই দূষিত রক্ত বের করার জন্য সুশ্রুত 'রক্তমোক্ষণ' পদ্ধতির বর্ণনা দিয়েছেন।

- জলৌকা (Leech): বিষাক্ত রক্ত চুষে নেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট প্রজাতির জোক ব্যবহার করা হতো। এটি বর্তমানে 'Hirudotherapy' নামে পরিচিত এবং আধুনিক মাইক্রো-সার্জারিতে (যেমন— কাটা আঙুল জোড়া লাগানো) ব্যবহৃত হচ্ছে।
- শৃঙ্গ (Horn) ও অলাবু (Gourd): ভ্যাকুয়াম বা কাপিং থেরাপির মাধ্যমে রক্ত টেনে বের করার জন্য পশুর শিং বা শুকনো লাউয়ের খোল ব্যবহার করা হতো।

অশ্মরী চিকিৎসা: মূত্রথলির পাথর অপসারণ (Lithotomy)

প্রাচীন ভারতের শল্যচিকিৎসার অন্যতম বিস্ময়কর অধ্যায় হলো 'অশ্মরী' বা কিডনি ও মূত্রথলির পাথর অপসারণ। মহর্ষি সুশ্রুত এই অত্যন্ত জটিল অস্ত্রোপচারের প্রতিটি ধাপ বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।[৪]

অস্ত্রোপচারের প্রস্তুতি ও পদ্ধতি

সুশ্রুত সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, অশ্মরী অপারেশন কেবল তখনই করা উচিত যখন ওষুধ বা অন্যান্য চিকিৎসায় ফল পাওয়া যায় না। এটি ছিল একটি জীবন রক্ষাকারী অস্ত্রোপচার।

[৪] সুশ্রুত সংহিতা, চিকিৎসাস্থান, ৭ম অধ্যায়

- রোগীর অবস্থান: রোগীকে একটি নিচু বিছানায় শুইয়ে তার হাঁটু ভাঁজ করে বাঁধা হতো (যাকে আধুনিক চিকিৎসায় 'Lithotomy Position' বলা হয়)।
- অস্ত্রের ব্যবহার: তিনি মলদ্বার বা ভ্যাজাইনা দিয়ে আঙুল ঢুকিয়ে পাথরটিকে নির্দিষ্ট স্থানে স্থির করতেন এবং তারপর তলপেটের বাম দিকে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে ছিদ্র (Incision) করে পাথরটি বের করে আনতেন।
- সতর্কতা: সুশ্রুত জানতেন যে যদি এই অস্ত্রোপচারের সময় 'সেবনী' (Sutures of the perineum) বা শুক্রবাহী নালী ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে রোগী যৌনক্ষমতা হারাতে পারে বা রক্তক্ষরণে মৃত্যু হতে পারে। এই শারীরস্থানিক সচেতনতা প্রমাণ করে যে তাদের অ্যানাটমি জ্ঞান কতটা গভীর ছিল।

শল্য চিকিৎসকের গুণাবলী- একজন আদর্শ সার্জনের গুণ সম্পর্কে বলা হয়েছে:

"শৌর্য্যমাশুক্রিয়া শস্ত্রতৈক্ষ্ণ্যমস্বেদবেপথু।
অসংমোহশ্চ বৈদ্যস্য শস্ত্রকর্মণি শস্যতে।।"[৫]

একজন শল্য চিকিৎসকের সাহস, ক্ষিপ্রতা, হাতের স্থিরতা (যাতে হাত না কাঁপে) এবং উপস্থিত বুদ্ধি থাকা একান্ত প্রয়োজন।

শালাক্য তন্ত্র: চক্ষু ও ঊর্ধ্বজত্রুগত চিকিৎসা (Ophthalmology)

আয়ুর্বেদের যে শাখায় চোখ, কান, নাক ও গলার চিকিৎসা করা হয়, তাকে শালাক্য তন্ত্র বলে। সুশ্রুত ৭৬টি চোখের রোগের বর্ণনা দিয়েছেন, যার মধ্যে ৫১টিই ছিল অস্ত্রোপচারযোগ্য।

লিঙ্গনাশ বা ছানি অপারেশন (Cataract Surgery - Couching)

সুশ্রুতই বিশ্বের প্রথম চিকিৎসক যিনি ছানি অপারেশনের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। একে বলা হতো 'লিঙ্গনাশ'।

- পদ্ধতি: তিনি একটি বিশেষ শলাকা (Needle) ব্যবহার করতেন। রোগীর চোখের মণির পাশের সাদা অংশ দিয়ে শলাকা ঢুকিয়ে লেন্সের অস্বচ্ছ অংশটিকে ঠেলে সরিয়ে দিতেন।
- পরবর্তী যত্ন: অপারেশন শেষে চোখে মাতৃদুগ্ধ বা ঘৃত (Ghee) দিয়ে ধোয়া হতো এবং ব্যান্ডেজ করে রাখা হতো। এটি বর্তমানের 'Couching' পদ্ধতির আদি রূপ।

জীবাণুমুক্তকরণ ও স্টেরিলাইজেশন (Antisepsis and Sterilization)

আজকের দিনে আমরা 'সেপটিক' বা ইনফেকশন নিয়ে খুব সচেতন। কিন্তু কয়েক হাজার বছর আগেই সুশ্রুত জানতেন যে নোংরা অস্ত্র বা পরিবেশে অস্ত্রোপচার করলে রোগীর মৃত্যু হতে পারে।

ধূপন (Fumigation)

অস্ত্রোপচারের ঘর এবং যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করার জন্য তিনি 'ধূপন' পদ্ধতি ব্যবহার করতেন।

- নিম পাতা, গুগলু, বচ এবং শ্বেত সর্ষের ধোঁয়া দিয়ে ঘর এবং ক্ষতস্থানকে ধূপায়িত করা হতো।
- আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে নিমের ধোঁয়ায় শক্তিশালী অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল উপাদান থাকে।

ভেষজ ক্বাথ (Antiseptic Lotions)

ক্ষত ধোয়ার জন্য তিনি ত্রিফলা (আমলকী, হরীতকী, বহেরা) বা নিমের ক্বাথ ব্যবহার করতেন। ক্ষতের ওপরে 'মধু' এবং 'ঘি' প্রয়োগ করা হতো, যা প্রাকৃতিক অ্যান্টিবায়োটিক হিসেবে কাজ করত।

শল্যচিকিৎসায় প্রশিক্ষণ পদ্ধতি (Surgical Training)

---

[৫] তদেব, সূত্রস্থান, ৫ম অধ্যায়, শ্লোক ১০

সুশ্রুত বিশ্বাস করতেন কেবল তত্ত্ব জানলে চলবে না, হাতে-কলমে দক্ষ হতে হবে। তিনি সরাসরি মানুষের ওপর অস্ত্র চালানোর আগে কৃত্রিম বস্তুর ওপর অনুশীলনের পরামর্শ দিয়েছিলেন:

- ছেদন (Cutting): তরমুজ, শসা বা লাউয়ের ওপর অনুশীলন করা হতো।
- ভেদন (Incision): জলের থলি বা পশুর চামড়ার ওপর শেখানো হতো।
- সীবন (Suturing): কাপড়ের টুকরো বা চামড়ার ওপর সেলাই শেখানো হতো।
- ব্যান্ডেজ (Bandaging): বিভিন্ন পুতুলের ওপর ব্যান্ডেজ বাঁধার কৌশল শেখানো হতো।

ভগ্ন চিকিৎসা: প্রাচীন অস্থি-চিকিৎসা (Orthopaedics)

সুশ্রুত কেবল কোমল কলার (Soft tissue) সার্জারি নয়, বরং হাড়ের চিকিৎসাতেও অসামান্য দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। তিনি হাড়ের ফাটল বা ভেঙে যাওয়াকে 'ভগ্ন' হিসেবে অভিহিত করেছেন।

হাড়ের শ্রেণীবিন্যাস ও চিকিৎসা

তিনি হাড় ভাঙাকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করেছিলেন:

- সন্ধিমুক্ত (Dislocation): হাড়ের জোড়া বা জয়েন্ট সরে যাওয়া।
- কাণ্ডভগ্ন (Fracture): হাড়ের মাঝখান থেকে ভেঙে যাওয়া।

চিকিৎসা পদ্ধতি:

১. আঞ্চন (Traction): হাড়কে টেনে সঠিক অবস্থানে আনা।

২. পীড়ন (Pressure): হাতের চাপে হাড়ের সংস্থাপন ঠিক করা।

৩. সংক্ষেপণ (Stabilization): বাঁশের কঞ্চি বা গাছের ছাল দিয়ে হাড়টিকে স্থির করে বেঁধে রাখা (আজকের দিনের Splinting)।

৪. ব্যান্ডেজ (Bandaging): বিভিন্ন ধরণের কুশ বা তন্তু দিয়ে শক্ত করে ব্যান্ডেজ করা হতো যাতে হাড় না নড়ে।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, সুশ্রুত হাড় দ্রুত জোড়া লাগার জন্য বিশেষ ধরণের পথ্য এবং 'লাক্ষা' (Lac) জাতীয় ভেষজ ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছিলেন, যা ক্যালসিয়াম মেটাবলিজমে সাহায্য করে।

মর্ম বিজ্ঞান (Science of Vital Points)

সুশ্রুত সংহিতার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো 'মর্ম শারীর'। শরীরের ১০৭টি বিশেষ বিন্দুকে 'মর্ম' বলা হয়, যেখানে মাংস, শিরা, স্নায়ু, অস্থি ও সন্ধি মিলিত হয়।

- মর্মের গুরুত্ব: শল্যচিকিৎসককে অবশ্যই এই ১০৭টি বিন্দু সম্পর্কে জানতে হতো। কারণ, অস্ত্রোপচারের সময় এই বিন্দুগুলোতে আঘাত লাগলে তাৎক্ষণিক মৃত্যু (সদ্য প্রাণহর) অথবা স্থায়ী পঙ্গুত্ব (বৈকল্যকর) হতে পারে।
- প্রয়োগ: আজকের 'অ্যাকিউপাঙ্কচার' বা 'অ্যাকিউপ্রেসার' পদ্ধতির মূলে রয়েছে এই মর্ম বিজ্ঞান। একজন দক্ষ সার্জন এই বিন্দুগুলো বাঁচিয়ে অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করতেন।

আয়ুর্বেদীয় শল্যবিদ্যার পতন ও বিবর্তন (Decline and Evolution)

এত উন্নত হওয়া সত্ত্বেও কেন এক সময় ভারতে শল্যচিকিৎসা স্তিমিত হয়ে পড়েছিল, তার কিছু ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে:

১. অহিংসা নীতি: পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রসারের ফলে রক্তপাত বা ব্যবচ্ছেদের প্রতি অনীহা তৈরি হয়। মৃতদেহ স্পর্শ করাকে অপবিত্র মনে করার সামাজিক ধারণা তৈরি হওয়ায় হাতে-কলমে শিক্ষা বাধাগ্রস্ত হয়।

২. বৈদেশিক আক্রমণ: নালন্দা ও তক্ষশীলার মতো প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ধ্বংস হওয়ায় প্রচুর অমূল্য পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যায়।

৩. ঔপনিবেশিক শাসন: ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় চিকিৎসা ব্যবস্থার পরিবর্তে পাশ্চাত্য চিকিৎসাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়, যার ফলে স্থানীয় শল্যবিদরা (যেমন— নাপিত বা কুমোর যারা বংশপরম্পরায় সার্জারি করতেন) গুরুত্ব হারান।

আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে তুলনা ও প্রাসঙ্গিকতা

বর্তমানে আধুনিক শল্যবিদ্যা বা Modern Surgery অনেক উন্নত হলেও, এর মূল দর্শন সুশ্রুতের থেকেই আগত।

- রাইনোপ্লাস্টি: আধুনিক প্লাস্টিক সার্জনরা আজও সুশ্রুতের বর্ণিত 'ফ্ল্যাপ সার্জারি' অনুসরণ করেন।
- ক্ষারসূত্র (Ksharsutra): ফিস্টুলা বা ভগন্দর চিকিৎসায় আধুনিক লেজার সার্জারির চেয়েও ক্ষারসূত্র বেশি কার্যকর এবং এতে রোগ পুনরায় হওয়ার সম্ভাবনা (Recurrence rate) প্রায় শূন্য।
- অ্যানাটমি: সুশ্রুতের বর্ণিত অ্যানাটমি এবং আজকের মডার্ন অ্যানাটমির মধ্যে বিস্ময়কর মিল পাওয়া যায়।

উপসংহার:

আয়ুর্বেদীয় শল্যচিকিৎসা বা 'শল্য তন্ত্র' কেবল প্রাচীন ভারতের একটি চিকিৎসা পদ্ধতি ছিল না, বরং এটি ছিল মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক বৈজ্ঞানিক বিপ্লব। মহর্ষি সুশ্রুত আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে যে শল্যবিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, তা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায়— সেটি প্লাস্টিক সার্জারি হোক কিংবা জেনারেল সার্জারি-প্রদীপ্ত শিখার মতো পথ দেখাচ্ছে।

সুশ্রুতের অবদানকে কেবল 'প্রাচীন' বলে চিহ্নিত করলে তার প্রকৃত মূল্যায়ন হয় না। তিনি যে সময়ে অ্যানাটমি (Anatomy) বা শারীরস্থানবিদ্যার জন্য মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদের কথা বলেছিলেন, তখন বিশ্বের অন্য প্রান্তের চিকিৎসকরা মানবদেহের অভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিলেন। তাঁর উদ্ভাবিত ১২১টি শল্য যন্ত্রের নকশা প্রমাণ করে যে, প্রাচীন ভারতীয়রা যন্ত্রকৌশল এবং ধাতববিদ্যায় কতটা উন্নত ছিল। বিশেষ করে রাইনোপ্লাস্টি (Rhinoplasty) বা নাসাসন্ধান পদ্ধতির যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, তা আজও আধুনিক সার্জনদের বিস্মিত করে।

ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিভিন্ন কারণে মধ্যযুগে এই মহান বিদ্যা স্থবির হয়ে পড়েছিল। উপনিবেশবাদ এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার একাধিপত্যের ফলে আয়ুর্বেদীয় শল্যচিকিৎসাকে কেবল 'লোকজ জ্ঞান' হিসেবে দেখার প্রবণতা তৈরি হয়েছিল। তবে বিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিশ্বজুড়ে প্রাকৃতিক ও ঐতিহ্যগত চিকিৎসার প্রতি মানুষের আগ্রহ পুনরায় বৃদ্ধি পেয়েছে। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান এখন স্বীকার করছে যে, ক্ষারসূত্র (Ksharsutra) থেরাপির মতো পদ্ধতিগুলো অ্যানোরেক্টাল সার্জারিতে আধুনিক অ্যান্টিবায়োটিক বা লেজার থেরাপির চেয়েও অনেক সময় বেশি কার্যকর এবং নিরাপদ। বর্তমানের গবেষণার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত 'ইন্টিগ্রেটিভ মেডিসিন' (Integrative Medicine)। অর্থাৎ, সুশ্রুতের প্রাচীন অভিজ্ঞতা এবং কৌশলকে আধুনিক রোবোটিক সার্জারি বা ন্যানো-টেকনোলজির সাথে যুক্ত করা।

- প্রাচীন মর্ম বিজ্ঞানের জ্ঞানকে ট্রমা সার্জারিতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

- জলৌকা চারণ (Leech Therapy) এবং ধূপন (Sterilization) পদ্ধতিগুলোকে আরও উন্নত ল্যাবরেটরি পরীক্ষার মাধ্যমে মূলধারার হাসপাতালে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব।

পরিশেষে, আয়ুর্বেদে শল্যচিকিৎসা কেবল একটি চিকিৎসা পদ্ধতি নয়, এটি একটি জীবনদর্শন। এটি আমাদের শেখায় যে, জ্ঞান কখনো পুরনো হয় না, কেবল সময়ের সাথে তার রূপ পরিবর্তিত হয়। মহর্ষি সুশ্রুতকে 'শল্যচিকিৎসার জনক' হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি প্রদান কেবল তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন নয়, বরং এটি বিজ্ঞানের সেই সত্যকে স্বীকার করা— যা বলে যে সত্য ও যুক্তিনির্ভর জ্ঞান হাজার বছরের ব্যবধানেও তার প্রাসঙ্গিকতা হারায় না। ভারতের এই গৌরবময় ঐতিহ্যকে যথাযথ গবেষণার মাধ্যমে বিশ্বদরবারে প্রতিষ্ঠিত করা বর্তমান প্রজন্মের গবেষকদের নৈতিক দায়িত্ব।

তথ্যসূত্র:

১. Bhishagratna, K. K. (Ed. & Trans.). (1907–1916). The Sushruta Samhita: An English translation based on original Sanskrit text. Bharat Bhavan.
২. Kutumbiah, P. (1962). Ancient Indian medicine. Orient Longmans.
৩. Mukhopadhyaya, G. (1913). The surgical instruments of the Hindus: With a comparative study of the surgical instruments of the Greek, Roman, Arab and the modern European surgeons. Calcutta University.
৪. Sharma, P. V. (1992). History of Indian medicine: From antiquity to 1000 A.D. Indian National Science Academy.
৫. Singhal, G. D., & Guru, L. V. (1973). Anatomical and obstetrical considerations in ancient Indian surgery: Based on Sarira-Sthana of Susruta Samhita. Banaras Hindu University Press.
৬. Srivastava, A. K. (2014). Susruta: The father of surgery. Journal of Medical Biography, 22(1), 23–25. https://doi.org/10.1177/0967772013479275
৭. Thatte, D. G. (1994). Sushruta Samhita and its relevance to modern surgery. Chaukhambha Orientalia.
৮. মুখোপাধ্যায়, জি. (১৯২৩)। ভারতীয় ভেষজ ও শল্যবিদ্যার ইতিহাস। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস।
৯. শাস্ত্রী, এ. (সম্পা.). (২০১০)। সুশ্রুত সংহিতা: সূত্রস্থান ও শারীরস্থান (বঙ্গানুবাদ)। নবপত্র প্রকাশন।
১০. সেন, এস. এন. (১৯৯০)। প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1797-1805
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.402

রাণী চন্দের স্মৃতিকথায় ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ

সায়ন্তন নন্দী, *স্বাধীন গবেষক, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.03.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Rabindranath Tagore is a supreme wonder in the creation of the universe. Can we truly describe him, or fully understand him? In her memoir, Rani Chanda did not attempt to explain that vast greatness. Instead, she relied on the perspectives of learned and wise people to speak about it. What Rani Chanda described was the man who lived beside her, her everyday neighbour, the person who shared her joys and sorrows. He protected her with his affectionate shadow and saved her from the troubles and hardships of the outside world. Like a cluster of tender leaves, Rani grew and swayed in the deep and generous affection of Rabindranath. Rani lost her father at the age of four, but she received the boundless affection of a father from Rabindranath himself. In this essay, four aspects of that personal Rabindranath, drawn from Rani's memoir, have been discussed.

Keywords: Rabindranath Tagore, Rani Chanda, Shantinietan

ভালো শিল্প যখন ক্লিষ্ট জীবনের নির্মোক ভেঙে আত্মকে উপলব্ধি করতে শেখায় তখন আমরা শিল্পের মাধ্যমে শিল্পীর কাছাকাছি পৌঁছতে চেষ্টা করি, বুঝতে চেষ্টা করি তাঁর জীবনযাপন, খুঁজে পেতে চাই শিল্প উৎসকে। 'কবিরে পাবে না তাহার জীবন চরিতে' বলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাবধান বানী শোনালেও শিল্পী মন থেকে সম্পূর্ণ শিল্পীমানুষকে নতুন করে আবিষ্কার করার আগ্রহে আমাদের কোথাও ছেদ পড়েনা। সেকারণেই হয়তো রবীন্দ্রালোচনা আজও সমান ভাবে প্রাসঙ্গিক। রবীন্দ্রজীবনের খুঁটিনাটি তথ্য জানবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের মধ্যে ক্রমশই বেড়ে চলেছে এবং তার সবটাই অকারণ আবেগ নয়। তিনি এমন একজন সাহিত্যিক যিনি শিল্পকে বহু আঙ্গিকে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সমগ্র জীবনযাপনে ছিল তার প্রভাব। তাই সাহিত্যিক-শিল্পী রবীন্দ্রনাথকে জেনে আমাদের রবীন্দ্রচর্চা শেষ হওয়া উচিত নয়। তাঁর শৈল্পিক জীবনরীতি প্রত্যক্ষ ভাবে না জানলে মানুষ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে জ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অন্নদাশংকর রায় যখন তাঁকে 'জীবনশিল্পী' আখ্যা দেন, তার ব্যখ্যায় আমরা কেবল কাব্যের শিল্পরূপই বুঝিনা, সাহিত্যের সমান্তরালে ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, লাভ-ক্ষতির দ্বান্দিকতার মধ্যেও কিভাবে তিনি জীবন ও কর্মের শিল্প মূর্তি রচনা করেছেন তার কথাও বুঝি। দান্তের জীবনকথা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন কোনো ক্ষণজন্মা ব্যক্তি কাব্যে এবং জীবনের প্রাত্যহিক কাজে উভয় ক্ষেত্রেই নিজের প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারেন; কাব্য ও কর্ম উভয়ই তাঁর একই প্রতিভার ফল। তাঁহাদের কাব্যকে তাঁহাদের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে তার অর্থ বিস্তৃততর,

ভাব নিবিড়তর হইয়া উঠে। একথা তাঁর নিজের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। দৈনন্দিন আলাপচারিতায়, অতিথিবাৎসল্যে, বাসাবদলের আপন খেয়ালে, বিচিত্রগামী বহুমুখী সৃষ্টি কর্ম, পোশাক পরিচ্ছদে, আহারে-বিহারে, মননে-চিন্তনে নিজেকে একটু বিকশিত করেছেন তিনি। সেই ঘরোয়া মানুষ রবীন্দ্রনাথকে আরো একবার ফিরে পাওয়ার উদ্দেশ্যে এই আলোচনা। এই আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের চারটি দিক উঠে এসেছে।

রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র খেয়াল: রাণী চন্দ রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যে থাকাকালীন বেশ কিছু গুরুদেবের খেয়ালকে লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর খেয়াল ছিল হরেকরকম। রাণী চন্দ বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ হয়তো কোথাও গিয়েছেন, সেখানে সব রকমের সব রঙের পোশাকই নিয়ে যাওয়া হয়েছে, কেবল মেটে সবুজ রঙের জোব্বাটাই হয়তো নিয়ে যাওয়া হয়নি। সেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠিক ওই মেটে সবুজ রঙের জোব্বাটারই খোঁজ করবেন। ওটাই যেন তাঁর ওই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি দরকার। আবার কখনো এমন দেখা গেছে, রবীন্দ্রনাথের টেবিলে গোছা গোছা পেন্সিল তুলি রয়েছে। কেউ হয়তো টেবিল গোছাতে গিয়ে ক্ষয়ে যাওয়া হলুদ রঙের আড়াই ইঞ্চি পেন্সিলটাই ফেলে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ঝোঁক পড়বে সেই পেন্সিলটর উপরেই। রবীন্দ্রনাথের এই বিচিত্র খেয়ালের কথা বলতে গিয়ে রাণী চন্দ এক ঘটনার উল্লেখ করেছেন। নানা জায়গা থেকে নানারকমের অনুরোধ আসত-বক্তৃতা দিতে, কোন কিছু উদ্বোধন করতে, রবীন্দ্রনাথ সহজেই রাজি হয়ে যেতেন। পরে হয়তো নিজেরই খেয়াল হতো কিংবা অন্যরা খেয়াল করে দিয়ে বলতেন, 'ও জায়গায় আপনার যাওয়া ঠিক হবে না, তখন তিনি খবর পাঠিয়ে দিতে বলতেন যে তাঁর যাওয়া সম্ভব নয়।' একবার এক সিগারেট কোম্পানির মালিক এসে রবীন্দ্রনাথকে ধরলে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর ফ্যাক্টরিতে যেতে রজি হন। ভদ্রলোক নানা জায়গা থেকে বন্ধুবান্ধব এনে ঘটা করে আয়োজন করে। সেখানে যাবার আগের দিন রাত্রে সরোজিনী নাইডু খবর পেয়ে রবীন্দ্রনাথকে বলেন, 'সিগারেট ফ্যাক্টরিতে যাবেন আপনি? এ কখনো হতে পারে না– absurd।' পরেরদিন ভোরে ফ্যাক্টরির মালিক রবীন্দ্রনাথকে নিতে এসে যখন শোনেন, রবীন্দ্রনাথের যাওয়া কিছুতেই সম্ভব না তখন ভদ্রলোক জানায়, 'আপনার তরফ হতে আর কেউ আসুন। তা না হলে বড়ো অপ্রস্তুত হতে হবে আমাকে। হাতের কাছে কাউকে না পেয়ে রবীন্দ্রনাথ রাণী চন্দ এবং অমল চন্দকে পাঠান। রাণী চন্দ লিখেছেন –

> "আমাদের দুজনকে পাঠিয়ে দিলেন গুরুদেব। সে এক বিপদ সেদিন। ফ্যাক্টরিতে এলাম। ফ্যাক্টরিতে ঢুকবার আধমাইল আগে হতে পথ ফুলে ফুলে ঢাকা, ফুলের মালায় ছাওয়া। তোরণ ঝালর বাঁশি সানাই; সে যেন এক রাজপুত্রের বিবাহ-আসর। গম্ভীর আপনা হতে হয়ে আছি ব্যাপার দেখে, চেষ্টা আর করতে হয় নি। তোরণের পর তোরণ পেরিয়ে ভিতরে ঢুকলাম, তখন পর্যন্ত ঠিক ছিলাম কিছুই তেমন মনে হয় নি। কিন্তু ফুলের তৈরি প্রকাণ্ড একটা সিংহাসনের উপর উঠিয়ে রাজারানীর মতো আমাদের পাশাপাশি বসিয়ে দিল আর সামনে দাঁড়িয়ে ভাটের দল 'জয় জয় রবীন্দ্র কবীন্দ্র জয়তু' বলে হাত তুলে তুলে সিংহাসন দেখিয়ে গান গাইতে লাগল তখন মনে হল মাটির সঙ্গে মিশে যাই।"[১]

রবীন্দ্রনাথ বাইরে কোথাও যাবেন দিন ঠিক হয়েছে, কিন্তু কতবার যে তিনি সেই দিন বদলাতেন তার ঠিক থাকতো না। আর বদলাতেনও একেবারে শেষ মুহূর্তে। অমল চন্দ বলতেন,'গুরুদেব ট্রেনে না ওঠা পর্যন্ত বলা যায় না কবে তিনি যাবেন।' আসলে এইসব বিচিত্র খেয়াল নিয়ে রবীন্দ্রনাথ খুব আমোদ পেতেন। রবীন্দ্রনাথ বলতেন –

> "জানিস নে, আমি দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাতি, বাবু চেঞ্জেস্ হিজ মাইন্ড।"[২]

দিয়ে বলতেন, দ্বারকানাথ তখন বিলেতে, সঙ্গে যারা থাকতেন তাঁরা বাড়িতে চিঠি লিখে পাঠাতেন আজ আমরা অমুক জায়গায় অমুক সময়ে অমুক ডিউকের কাছে যাচ্ছি। অমুক জায়গায় তিন দিন থেকে অমুকদিন ফিরে আসব ইত্যাদি ইত্যাদি লিখে সব চিঠিরই শেষে লিখতেন –'But one can never be sure – for the Babu changes his mind so often.'

পোশাকে রবীন্দ্র-রুচি: রাণী চন্দ তাঁর স্মৃতিকথায় রবীন্দ্রনাথের পোশাক নিয়ে বেশ কয়েকটি কথা বলেছেন। যেমন রবীন্দ্রনাথের টুপি ছিল নতুন ধরনের। সুতির বা ভেলভেটের বা ঘন রঙের মোটা সিল্কের টুপি পড়তেন রবীন্দ্রনাথ। সে টুপি অন্য কারো টুপির সঙ্গে মেলে না। একেবারে আলাদা। আকারে অনেক বড়ো, নরম। রবীন্দ্রনাথ অনেকবার অনেকরকম করে তৈরি করার পর এ এ টুপির আবিষ্কার করেছিলেন। মন্দিরে বা উৎসব-অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ গরদের ধুতি পাঞ্জাবি পড়তেন। বাইরে কোথাও গেলে ব্যবহার করতেন পাজামা বা সিল্কের লুঙ্গি। নয়তো সদাসর্বদা মোটা দু-সুতির লুঙ্গি আর ঢিলে হাতার পাঞ্জাবি পরতেন। কখনো থাকতো তা গেরুয়া রঙের, কখনো থাকতো সাদা ধবধবে। তার উপরে পরতেন লম্বা জোব্বা।।বাইরে বেরোনোর সময় দুটো জোব্বা পড়তেন। ভিতরের জোব্বা বুক-ঢাকা, পুরাতন কুর্তার মতো বুকের উপরে আড়াআড়ি করে কোমরে বোতাম আঁটা। আর উপরেরটি গলা হতে পা পর্যন্ত সামনের দিকে সবটাই খোলা। যেন গায়ে আলগা হয়ে ঝুলতে থাকত জোব্বাটা। নানা রঙের জোব্বা ছিল রবীন্দ্রনাথের। কালো, ঘননীল, খয়েরী, বাদামী, কমলা, গেরুয়া, বাসন্তী, মেঘ-ছাই- সিল্কের, সুতোর। রাণী চন্দ বলেছেন –

> "যখন যেটি পরতেন, মনে হত এইটিই যেন বেশি মানাল তাঁকে। দিনে দিনে মাসে মাসে রঙ বদলে বদলে সাজতে তিনি ভালোবাসতেন। কখনো নতুন সাজে সেজে বসে আছেন -ঘরে ঢুকে দেখে আপনা-আপনি মুখ হতে বেরিয়ে আসত 'বাঃ'। গুরুদেব খুশির হাসি হাসতেন। শীত সবে যাব-যাব করছে, এক বিকেলে দেখি গুরুদেব বাসন্তী রঙের জোব্বা পরে বাইরে বসে আছেন। বেলাশেষের আলো পড়ে সে রঙ যেন জ্বলে উঠল। বিস্ময় উচ্ছ্বাস দুই মিলিয়ে দেখি, দেখে হাসি, বলি, এই সময়ে এই সাজে যে? গুরুদেবও হাসেন, বললেন, বসন্তের আসার সময় হলো যে। আমি যদি তাকে ডেকে না আনি কে আনবে বল? তাই তো বাসন্তী রঙে সেজে বসন্তকে আহ্বান করছি।"[৩]

রবীন্দ্রনাথের খাওয়া-দাওয়া: রাণী চন্দ তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন, রবীন্দ্রনাথকে কখনো তিনি হাতে খেতে দেখেননি। তিনি খেতেন কাঁটাচামচ এ। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অত্যন্ত মিতহারী। সব মিলিয়ে দু-তিন চামচ পরিমাণ খাবার খেতেন। তাই বলে তাঁকে কম করে খাবার দেওয়া চলতো না, অসন্তুষ্ট হতেন। থালায় বাটিতে নানারকমের খাবার সাজিয়ে তাঁর সামনে ধরা হলে তিনি বাটিগুলির ঢাকা খুলে খুলে আগে দেখতেন কি কি আছে। তারপর যে মাংস ভালোবাসে তাঁর বাড়িতে মাংস পাঠিয়ে দিতেন, যে মাছ ভালোবাসে তাঁর বাড়িতে মাছের বাটিটা পাঠাতেন, এইভাবে কারুর জন্য চপ, কারুর জন্য পায়েস, কারুর জন্য বড়ির ঝোল, এইকরে প্রায় সবটাই বিলি করে দিতেন। কাছে কেউ থাকলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সেখানে বসিয়েই খাওয়াতেন। রাণী চন্দ বলেছেন –'খাওয়াতে খাওয়া দেখতে গুরুদেব খুব ভালোবাসতেন।' রবীন্দ্রনাথ সকালে খেতেন চা পাউরুটি এবং টোস্ট। কোনদিন বা একটা আধসেদ্ধ ডিম। আমের দিনে আম খেতেন, রবীন্দ্রনাথ আম খেতে খুব ভালোবাসতেন। দুপিঠ কেটে চামচ দিয়ে তুলে নিতেন মাঝখানটা। রাণী চন্দ বলেছেন –

> "গুরুদেবের চা খাওয়াটা ছিল বড়ো মজার। চা নামেই থাকত শুধু। কেটলিভরা গরম জলে কয়েকটা চা পাতা ফেলে দিতেন, জলে রঙ ধরত কি না ধরত তারই আধপেয়ালা ঢেলে নিয়ে বাকিটা দুধ দিয়ে ভর্তি করে নিতেন, দু চামচ চিনি দিতেন; এই হল তাঁর চা। চা-এর জন্যই যে চা খেতেন, তা নয়। গরম পানীয় একটা খেতে হবে তাই নামেমাত্র চা খেতেন। 'চীনে চা'ই পছন্দ করতেন তিনি।"[৪]

রবীন্দ্রনাথ বেলা নটা নাগাদ খেতেন এক পেয়ালা স্যানাটোজন কিংবা হরলিক্স কিংবা ঐ জাতীয় কিছু পানীয় বস্তু। স্নানে যেতেন বেলা দশটা সাড়ে-দশটায়। এগারোটা সাড়ে-এগারোটার মধ্যে দুপুরের খাবার খেয়ে নিতেন। রাণী চন্দ বলেছেন – 'দুপুরে দিশি ধরনের রান্না হত, শ্বেতপাথরের থালা বাটিতে খাবার সাজিয়ে আনা হয়। খাবার শেষে এ বেলায় একটু দই রোজই খেতেন।' বিকেলে রবীন্দ্রনাথ চা সঙ্গে নোন্তা মিষ্টি যা থাকত একটু মুখে দিতেন। কখনো কখনো কিছুই খেতেন না চা ছাড়া। রবীন্দ্রনাথ যেখানে বসে লিখতেন সেখানেই লেখার টেবিল সরিয়ে অন্য টেবিল লাগিয়ে বনমালী খাবার এনে দিত। কখনো কখনো রাত্রে উদয়নে গিয়ে খেতেন। পায়ে চলার এই একমাত্র সময় ও স্থান।কোনার্ক, উদীচী, পুনশ্চ, শ্যামলী – যেখানে থকতেন সেখান হতে সন্ধ্যের দিকে উদয়নে যেতেন। বিশেষ অতিথি অভ্যাগত এলে তাঁদের নিয়ে উদয়নে খাবার ঘরে টেবিলে বসেও খেতেন। সন্ধ্যেরাত্রেই খেতেন তিনি। খাবার সম্বন্ধে কোন কিছুর প্রতি আকর্ষণ রবীন্দ্রনাথের কোন কালেই ছিল না। তবে 'চই'সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ ছিল। রাণী চন্দ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন-

> "যশোরে হত; কচি বাঁশের গুঁড়ি নাকি, আমি কখনো দেখি নি হতে, গুরুদেবের কাছেই প্রথমে এর নাম শুনি, তিনি গেয়েছেন বহুবার। একবার একজন এনে দিলেন, ডাল দিয়ে রান্না হল, গুরুদেব আমাদেরও খেতে দিলেন; ডাঁটার মতো খেতে খানিকটা। খুব বেশি স্বাদ-স্বোয়াদ পেলাম না। গুরুদেব কিন্তু বেশ আগ্রহ নিয়েই খেলেন। চই নিয়ে গুরুদেবের আগ্রহ দেখে বোঠান আড়ালে হাসতেন, বলতেন, বাবামশায়ের শ্বশুরের দেশের জিনিস কিনা তাই তাঁর এত ভালো লাগে।"[৫]

বাড়ির মতো খাবার নিয়েও ছিল রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র খেয়াল। কোন খাবারই একটানা বেশিদিন খেতেন না। একদিন এক পণ্ডিত অতিথি আসেন। কথায় কথায় বলেন, 'আমাদের দেশে হবিষ্যান্নই একমাত্র উপযুক্ত আহার, শাস্ত্রে পুরাণেও সেই কথাই বলে;' এই বলে কতকগুলি আখ্যান ও উপমার উল্লেখ করলেন লোকটি। রবীন্দ্রনাথ মন দিয়ে শুনছিলেন কথাগুলি। লোকটি চলে গেলে রবীন্দ্রনাথ বলে উঠলেন-

> "ইনি যা বলে গেলেন ঠিক কথাই, আমাদের দেশ গরম দেশ। এ দেশে দেহ মন ঠিক রাখতে হবিষ্যান্নই একমাত্র আহার হওয়া উচিত। কাল থেকে আমাকে তাই দিও বউমা। আমি কিছুকাল থেকেই স্পষ্ট টের পাচ্ছিলাম যা খাচ্ছি তার আমার দেহ ঠিকমত নিতে পারছে না। অথচ বুঝতে পারছিলাম না কি করা যেতে পারে। এবারে ঠিক আচার্য বস্তুটির সন্ধান পাওয়া গেল।"[৬]

রবীন্দ্রনাথের কথামতো তখনি লোক ছুটল হাটে, কুমোরের ঘর থেকে সদ্য পোড়া লালমাটির এক ঝুড়ি মালসা নিয়ে আসে। এবেলা ওবেলা নতুন নতুন মালসায় কর্মচারীরা রবীন্দ্রনাথকে হবিষ্যান্ন রান্না করে দেন। রবীন্দ্রনাথও খেয়ে খুব খুশি। বললেন,'মাছ মাংস সাত-পাঁচ জিনিস, এতে করে পাকযন্ত্রের উপর চাপ দেওয়া হয়, অপকারই ঘটে শরীরের। এই খাবার খেয়ে বেশ বুঝতে পারছি, কাল হতে খুব ভালো বোধ করছি

আমি।' এইভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর শান্তিনিকেতন আশ্রমে এক বিদেশী বন্ধু আসে। তিনি বললেন 'ডিম হচ্ছে আসল খাদ্য ডিমে সব রকমেরই খাদ্যগুণ আছে।' যেই কথা তেমনি কাজ। পরদিন রান্নাঘরে চাল কাঁচকলার জায়গায় ডিম আসে। রবীন্দ্রনাথ কাঁচা কাঁচা ডিম ভেঙে পেয়ালায় ঢালেন এবং একটু নুন গোলমরিচ দিয়ে চুমুক দিয়ে খেয়ে নেয়। রাতের খাবার, দিনের খাবার এই একভাবে চলে। এতেই যেন রবীন্দ্রনাথ ভালো বোধ করেন। বলেন,'এই খাবারই চলবে আমার এখন থেকে।' এইভাবে কিছুদিন যেতে না যেতে আশ্রমে আর এক অতিথি আসেন। এই অতিথির আবার আয়ুর্বেদ এ ছিল বিশেষ অধিকার। তিনি বলেন, নিমপাতার রস হলো সর্বরোগনাশক। এই রস রোজ কিছুটা খেলে শরীর একেবারে সুস্থ থাকে। রবীন্দ্রনাথও শুরু করে দিলেন নিমপাতার রস খেতে। রাণী চন্দ বলেছেন –

> "সে কি একটু আধটু? বড়ো একটা কাঁচের গ্লাসভর্তি রস, সবুজ রঙের থকথকে রস দেখে আর নিমপাতার তেতো গন্ধে আমাদের গা গুলিয়ে উঠত। গুরুদেব তা হাতে নিয়ে চুমুক দিতেন, যেন পেস্তাবাটা শরবত খাচ্ছেন। বলেন, জানিস- কি ভালো জিনিস এটা। এ খেয়ে অবধি আমি এত ভালো বোধ করছি, এমনটি কখনো করি নি। বেশি ডিম খাওয়া ভালো নয়; বেশি কেন-ডিম একেবারেই খাওয়া উচিত নয়। বরং নিমপাতার রস খাবি রোজ কিছুটা করে।"[৭]

একদিন সেবাগ্রাম থেকে একজন লোক আসে। তিনি বললেন যে, রসুন খুবই উপকারী -বিশেষ করে বৃদ্ধলোকের পক্ষে। এতে হাত-পায়ের বেদনা ইত্যাদি যায়, এবং আরো বহুরকম উপকার হয়। রবীন্দ্রনাথও যেন প্রতিদিন রসুন খায়। রবীন্দ্রনাথও দুবেলা করে বাটা রসুনের ডেলা বড়ি খেতে শুরু করেন। আবার এক বিদেশী ডাক্তার এসে জানায়, আগুনে সিদ্ধ করা রান্না তরকারিই আমাদের যত সর্বনাশের মূল। আগুনের তাপ লাগা মাত্র খাদ্যের সমস্ত পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়ে যায়। তাই সব কিছু কাঁচা খাওয়া উচিত। পরদিন সকাল থেকে আগের সমস্ত ব্যবস্থা পাল্টে যায়। রবীন্দ্রনাথ আবার বললেন-

> "তাই তো এরা আমায় কেবল যা-তা খাওয়াচ্ছে এতদিন ধরে। আজেবাজে সতেরো রকমের তরকারি-এ রাঁধতে বাড়তেও তো কম ঝঞ্ঝাট নয়। অথচ কি উপকার এতে! তার চেয়ে কাঁচা সবজি কেটে কুচিয়ে খাও, একটু নুন দাও, লেবুর রস দাও -ব্যস্! খেতেও সুস্বাদু, স্বাস্থ্যও ভালো থাকে। এখন থেকে আমি এটাই খাব।"[৮]

রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলে দিলেন, কি কি সবজি চাই; সেই সব কুচোনো সবজি আশ্রমের রান্নাঘরে নিয়ে আসা হয়। মায় আলু পর্যন্ত। রবীন্দ্রনাথ সব সবজি একটা বড়ো বাটিতে নিয়ে নুন লেবুর রস মিশিয়ে নিজে খেলেন খানিকটা, বাকিটা বাটিতে বাটিতে বেঁটে দিলেন স্নেহভাজনদের। সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'যত ইচ্ছে খাও- পেটও ভরবে, আলাদা একটা শক্তিও অনুভব করবে।' কিন্তু এভাবে সবকিছু ঠিকঠাক এগোলেও সবচেয়ে মুশকিল হয় যখন এক গুজরাটি অতিথি এসে বলেন, ক্যাস্টর অয়েলের ময়ান দিয়ে পরোটা বানিয়ে খেলে জীবনে আর ডাক্তার ডাকতে হয় না। রবীন্দ্রনাথের খাবার সময়ে যারা ধারে কাছে থাকেন একথা শোনার পর সেদিন তাদেরও মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছিল। এদিকে রবীন্দ্রনাথ ক্যাস্টর অয়েলের পরোটা খেয়ে খুব খুশি। বললেন,'এই এতদিনে ঠিকটি হল-যেমনটি নাকি আমি চাইছিলুম।'

অতিথি আপ্যায়ন এবং সকলের আশ্রয় যখন রবীন্দ্রনাথ: বিচিত্র রকমের অতিথি আসতেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। রাণী চন্দ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন-

> "পাগল-পাগলই আসত কত রকমের। এত রকমের যে পাগল আছে সংসারে গুরুদেবের কাছাকাছি থেকে না জানলে তা ভাবতেই পারতাম না কখনো। Overজিনিয়াস, ছিটগ্রস্ত, উন্মাদ, বদ্ধ-উন্মাদ, অর্ধ-উন্মাদ মতলবের উন্মাদ, সাজা-উন্মাদ-সে কত রকমের। কাউকে তিনি কাছে আসতে বাধা দিতেন না। সকাল হতে একদিকে চলত গুরুদেবের লেখার কাজ, আর এক দিকে বইত লোকজনের অনবরত আসা-যাওয়ার স্রোত। বিরাম ছিল না এর। অবারিত দ্বার, কেউ দেখা করতে এসে ফিরে গেছে, শুনি নি কখনো। আশ্রমেরও ছোটোবড়ো সকলে কাজে অকাজে দিনে কত কত বার আসছে যাচ্ছে, কখনো বিরক্ত হতে দেখিনি তাতে। দূরদূরান্ত দেশদেশান্ত হতেও কতশত জন আসতেন। সময় নেই, অসময় নেই হাসিমুখে সবাইকে অভ্যর্থনা করেছেন, ভালো বেসেছেন। তাঁরা আসতে তিনি হাতের কলম ক্ষণে ক্ষণে বন্ধ করেছেন, চলে গেলে পর আবার লিখেছেন। এমনি ভাবেই লেখা চলত সারাদিন। দুপুরে বিশ্রাম নিতেও রাজি থাকতেন না। এক এক সময়ে ভেবে অবাক হতাম, এখনো হই যে, কি করে একজন মানুষ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এণনতরো একটানা একটা পিঠ-সোজা চেয়ারে বসে লিখে যেতে পারেন।"[৯]

রাণী চন্দ তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন, একবার এক পাগল এল, কিছুতেই সে আর রবীন্দ্রনাথকে ছাড়ে না অথচ কি যে তার বলবার কথা সে জানে না। রবীন্দ্রনাথ যতবারই লেখায় মন দিতে চান ততবারই বাধা পান। এদিকে রবীন্দ্রনাথের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে কিছু একটা লেখার জন্য তিনি ব্যাকুল। বারবার বাধা পড়ায় রবীন্দ্রনাথের মুখের সে ভাব আরো করুণ হয়ে উঠেছে। সেইদিন সন্ধেবেলা রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে বললেন, 'সবারই সময়-অসময় আছে, নেই কেবল আমারই। আমার নিজের বলে দিনের একটুখানি সময়ও আমি পাই নে কখনো।'পরেরদিন থেকে সেক্রেটারি অমল চন্দ তাঁর অলক্ষ্যে নিয়ম বাঁধলেন, যখন-তখন রবীন্দ্রনাথের কাছে যাওয়া চলবে না কারো। আশ্রমের লোকের কথা আলাদা, তবে বাইরে থেকে যাঁরা আসবেন তাঁদের জন্য সময় স্থির করা থাকলো ঘড়ির এতটা থেকে এতটা। দুদিন বেশ লোক আটকানো গেলেও তিন দিনের দিন একটি লোককে বাড়ির সামনে ঘোরাফেরা করতে দেখে রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন কিছু-একটা হয়েছে যাতে করে এদের সহজ আসার পথ বন্ধ। সেক্রেটারিকে ডেকে তিনি বললেন-

> "তোরা কি ভাবিস আমি একটা কেউ-কেটা, নবাব-বাদশা? আমার কাছে আসতে হলে সেপাই-সান্ত্রী পেরিয়ে তবে আসতে হবে? আহা, বেচারারা- দূর দূর হতে আসে, কি, না- আমায় একটু দেখে যাবে, কি, প্রণাম করবে- নাহয় দুটো কথাই বলবে। তার জন্য এত কি কড়াকড়ি? দোর আমার খোলা থাকবে, যার যখন মন চায় আসবে আমার কাছে, কাউকে বাধা দিস নে যেন তোরা আর কখনো।"[১০]

সেক্রেটারি ইতস্তত করেন। বলেন, 'আপনার লেখার সময়ে বিরক্ত করলে আপনার অসুবিধে হতে পারে!' রবীন্দ্রনাথ তখন জানান, 'তা হয় হোক, তবু কেউ এসে দূরে বসে অপেক্ষা করবে এ ভারি অন্যায়।' রোজ সকালে পোস্ট অফিস থেকে রবীন্দ্রনাথের জন্য যে ডাক আসত তা ছিল দেখার মতো। সে এক বোঝা। দৈনিক, মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক, সংবাদপত্রেরই এক স্তূপ। কত বিচিত্র নাম সে-সবের। এত কাগজও দেশবিদেশের আনাচকানাচ হতে বের হয় রোজ, না দেখলে যেন কারুর বিশ্বাস হয় না। ডাক নিয়ে এলেই রাণী চন্দ সহ আশ্রমের বালিকারা পিছনে চেয়ার ধরে দাঁড়িয়ে থাকতেন। বাংলা সংবাদপত্র আর গল্প-উপন্যাসের বইগুলির উপরই ছিল রাণী চন্দের নজর। চিঠিগুলি নিজের হাতেই

রবীন্দ্রনাথ ছিঁড়তেন। রাণী চন্দ বলেছেন, নানা ধরনের পাগলের চিঠিও থাকতো। অনেককে আবার রবীন্দ্রনাথ নিজের হাতে চিঠিও লিখতেন। ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ, তাঁর কাছে কেউ দুরারোগ্য ব্যাধির ওষুধ চেয়ে পাঠিয়েছেন। কেউ ছাপিয়েছেন কবিতার বই, অনুরোধ জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ যেন বিলেতে লিখে তাঁকে এই বছরের নোবেল প্রাইজটা পাইয়ে দেন। কেউ লিখেছেন তাঁর অনূঢ়া কন্যার জন্য সুপাত্র দেখে দিতে; কেউ-বা নিজেই পাত্রী চোখে বসেছেন, প্রথমা স্ত্রীকে আর সহ্য করতে পারছেন না, কেউ চেয়েছেন দেড় লক্ষ টাকা, যেন রবীন্দ্রনাথ পত্রপাঠ এই টাকা তাঁকে পাঠিয়ে দিয়ে কর্তব্য পালন করেন, এই টাকা পেলে তবেই ভদ্রলোক সংসারের ভার হতে মুক্ত হয়ে সাহিত্য নিয়ে মেতে থাকতে পারবেন বাকি জীবন-ভর, নয়তো তাঁর প্রতিভার অপমৃত্যুতে যে মহা ক্ষতি সাধিত হবে সেজন্য রবীন্দ্রনাথকেই জবাবদিহি করতে হবে সারা পৃথিবীর কাছে। এরকম রোজ কত কত চিঠি আসতো রবীন্দ্রনাথের কাছে। শুভবিবাহের নিমন্ত্রণপত্রের সঙ্গে আসত আশীর্বাদী কয়েক লাইন কবিতার চাহিদা। আসত রঙে পেন্সিলে কাঁচা-পাকা হাতে আঁকা রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি, আবদার থাকত নাম সই করে ফেরত পাঠিয়ে দেবার। লেখা বা কবিতা সংশোধন করে দিতে হবে এমন চিঠিও আসত অগুনতি। প্রশংসাপত্র লিখে পাঠানোর অনুরোধও অজস্র। ভালো চিঠি- যা পেয়ে রবীন্দ্রনাথ খুশি হতেন, তা খুব কমই থাকত। চিঠিগুলি দেখে, পড়ে ভাগাভাগি করে ফেলতেন। কতকগুলি টেবিলের উপরে রাখতেন, উত্তর দেবেন। কতকগুলি ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলতেন, উপভোগ্য পাগলামির চিঠিগুলি সেক্রেটারি অনিল চন্দের হাতে তুলে দিতেন- 'বলতেন, নাও, সর্বস্বত্ব ত্যাগ করে দিলুম তোমাকে।'এ-সব ছাড়া আসত নানা দেশের নবীন প্রবীণ নানা লেখকের নতুন ছাপা বই রোজ একগাদা। বই ম্যাগাজিন সবগুলিই রবীন্দ্রনাথ একবার করে হাতে নিয়ে উল্টে দেখতেন। ওতেই তাঁর পড়া হয়ে যেত বেশির ভাগ বইগুলিই। এ এক দেখবার মতো ছিল। বই একটি হাতে তুলে নিতেন, নিয়ে ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠতে চেপে এক-এক করে পৃষ্ঠাগুলি ছেড়ে দিতেন, এক সেকেণ্ড কি দু সেকেণ্ড এক-এক পৃষ্ঠায় নজর পড়ত, তারই মধ্যে বলে বলে যেতেন, এই হল-তাই হল, সেই তো বড়ো দুর্ভোগ তো তার, আহা মেয়েটা মরেই গেল, ছেলেটা সন্নেসী হয়ে বেরিয়ে গেল, হল- হয়ে গেল- নাও, বলে কাঁধের উপর দিয়ে পিছন দিকে হাত বাড়িয়ে দিতেন, সঙ্গে সঙ্গে পিছন দিকে হাত বাড়িয়ে দিতেন। রাণী চন্দও সঙ্গে সঙ্গে বইটি নিয়ে নিতেন। রাণী চন্দ বলেছেন, এমন করেই কয়েক মিনিটের মধ্যে কয়েকখানা বইই রবীন্দ্রনাথের পড়া হয়ে যেত। শুধু পড়া নয়, সে-সবের ভালোমন্দ সমালোচনাও রবীন্দ্রনাথ করে যেতেন। সময়মত ভালো করে পড়ে দেখবেন যে-সব বই সেগুলি কাছে রেখে দিতেন। অন্য বইগুলি দু হাতে বুকের উপরে জড়ো করে রাণী চন্দ ঘরে চলে আসতেন। রাণী চন্দ বলেছেন, নিত্য এ ছিল এক নেশার মতো যেন তার। অনেক সময়ে রবীন্দ্রনাথ কারো চিঠির উল্টো পাতায় ছেঁড়া খামে টুকরো টুকরো কবিতা লিখতেন, লিখে টেবিলের তলায় পায়ের কাছে রাখা ওয়েস্ট পেপারের ঝুড়িতে ফেলে দিতেন। বনমালী সাফ করত ঝুড়ি, বাইরে সব ঝেড়ে ফেলে দিত। তখন রাণী চন্দ সহ কারুরই খেয়াল হয়নি যে সে-সব টুকরো কাগজ কুড়িয়ে রাখি। সহজ কথাবার্তার মধ্যে সহজ রহস্যের ছলেও দু-চার লাইনের কত কবিতা লিখতেন, লিখে ফেলে দিতেন রবীন্দ্রনাথ। রাণী চন্দের স্মৃতিকথায় রয়েছে, একবার কোনো-এক কন্যার বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র এসেছিল। কন্যাটি একটু চপলা স্বভাবের ছিল। রবীন্দ্রনাথ কৌতুকভরে শুভবিবাহের নিমন্ত্রণপত্রের উল্টো পাতায় লিখলেন-

"অবিয়ের প্রশস্ত প্রাঙ্গণ দূরে রবে পড়ি,
অন্য সব বন্যমৃগী যত ছিঁড়ে দড়াদড়ি
যখন করিবে সঞ্চরণ,
মন তব উঠিবে সন্তাপি।

মায়াবনে যে করে মৃগয়া,
নাই তার দয়া।"[১১]

লিখেই ছিঁড়ে ফেললেন, বললেন, 'দেখিস, এ যেন বাইরে না যায়।' রাণী বলেছেন তেমনি আর-এক দিনের বিপরীত এক ঘটনা- আঘাত পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ কারো অকৃতজ্ঞতায়। হাত তখনো কাঁপছে, চিঠি লিখলেন তাকে। এমনতরো কাঁপুনি হাতের লেখা রাণী আর কখনো দেখেননি। সেক্রেটারিকে তখনই সে চিঠি ডাকে ফেলতে দিলেন। উনি দেখেন আর ভাবেন এ চিঠি ডাকে দেবেন কি দেবেন না। খানিকপরেই রবীন্দ্রনাথ ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'চিঠিটা ডাকে দিয়েছিস? দিস নি? ভালোই করেছিস। ছিড়ে ফেলে দে।'অসংখ্য অটোগ্রাফখাতা আসত রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রতিদিন। শুধু নাম-সইয়ে চলবে না, কবিতাও চাই। কয়েক ঝুড়ি কবিতা হবে সব একসঙ্গে করলে। একবার কে একজন এসে বললে, গান্ধীজী তাঁর প্রতিটি নাম-সইয়ে পাঁচ টাকা করে নেন, হরিজন ভাণ্ডারের জন্য। রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'এতো মন্দ কথা নয়। রোজ কত কত অটোগ্রাফ-খাতায় লিখি, এবার হতে আমিও এক টাকা করে নেব দরিদ্র-ভাণ্ডারের জন্য।' সচ্চিদানন্দ রায় রবীন্দ্রনাথের দেখাশোনার ভার নিয়ে আছেন কিছুদিন থেকে। রবীন্দ্রনাথ সচ্চিদানন্দ রায়ের উপরে ভার দিলেন এই কাজের, মানে, হিসেবমাফিক টাকা তুলবার। ছেলেরা অটোগ্রাফ খাতা নিয়ে আসে, রবীন্দ্রনাথ কবিতা লেখেন- সচ্চিদানন্দ রায়েরা গিয়ে সামনে দাঁড়ান। লেখা হয়ে গেলেই টাকাটা চাইবেন। গুরুদেব ধমকে ওঠেন, 'এরা এখানকার ছেলে, এদের কাছ হতে টাকা নিবি কি।'রাণী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, বাইরের কেউ অটোগ্রাফ নিতে এলে, পাছে সচ্চিদানন্দ রায় টাকা চেয়ে বসেন, আগে হতে সচ্চিদানন্দকে রবীন্দ্রনাথ চোখের ইশারায় মানা করে দেন। ছাত্রীরা কেউ এলে তাদের নিজেই সাবধান করে দেন, 'আলু' টাকা চাইলে যেন দিস নে তোরা। দৌড়ে পালিয়ে যাস। এদিকে একদিন সচ্চিদানন্দ বলেন, 'তবে নিয়ম করলেন কেন?'রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'নিয়ম করলেই কি সব মান তোমরা? যাও, নিজের কাজে যাও।' রাণী চন্দ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন –

> "এই আমারই হাত দিয়ে কত অটোগ্রাফ-খাতা এসেছে গেছে- কত লোকের। সে-সব কবিতা এমনিই চলে গেল। লিখে রাখি নি কখনো। কত কত কাজের জন্য কত অনুতাপ জাগে মনে ক্ষণে ক্ষণে। একজন গুরুদেবের কিছু কথা চেয়ে অটোগ্রাফ-খাতা পাঠিয়েছেন। গুরুদেব কেমন একটু উন্মনা ছিলেন, সেদিন খাতাটি সামনে এনে ধরতে বলে উঠলেন, কি হবে রে কথা দিয়ে? কেবল কথা, কথা, কথা। বলে খাতাটা টেনে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন –
>
> বাজে কথার ঝুলি
> যতই কেন ভর্তি কর
> ধূলিতে হবে ধূলি
>
> ভাবলাম, তাই বুঝি বা। ধূলিই হয়ে যাবে সব। বুঝতে পারি নি তখন যে, কোন কথা ধূলি হয়- আর কোনটা হয় না।"[১২]

তথ্যসূত্র:

১। চন্দ, রাণী। 'গুরুদেব'। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা ১৭, প্রথম প্রকাশ ২২ শ্রাবণ ১৩৬৯, পুনর্মুদ্রণ আশ্বিন ১৪২৬, পৃ. ৫৬।
২। তদেব। পৃ. ২৬।

৩। তদেব। পৃ. ৪৭।
৪। তদেব। পৃ. ১০৬।
৫। তদেব। পৃ. ১০৬-১০৭।
৬। তদেব। পৃ. ১০৮।
৭। তদেব। পৃ. ১০৯।
৮। তদেব। পৃ. ১০৯।
৯। তদেব। পৃ. ৬৬।
১০। তদেব। পৃ. ৬৭।
১১। তদেব। পৃ. ৬৯।
১২। তদেব। পৃ. ৭১।

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1806-1811
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.403

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ছোটোগল্পে প্রান্তিক শ্রেণির মধ্যবিত্তে উত্তরণ

ড. প্রিয়াঙ্কা প্রধান, *স্বাধীন গবেষক, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.03.2026; Accepted: 24.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Saiyad Mustafa Siraj is an author of fifties of 20th century. He was born and raised in Murshidabad District. His short stories reflect the village life of Murshidabad. His writings describe the lifestyle of lower caste people like 'bagdi', 'bauri', 'bayen', 'hanri' etc living in Murshidabad district. Their society, culture, language, religion, customs can be observed in his writings. He also showed that how their lifestyle becomes changed over the time. They are leaving villages and moving towards the cities. The younger generation is leaving rural professions and looking to work in cities in the hope of earning more. Their mindset is gradually changing. Saiyad Mustafa Siraj has highlited this change in village life over time in his short stories as well as he also depicts the transition of people from the lower classes to the middle class.

Keywords: 'Rarh' area, 'Bagri' area, middle class people, lower caste people, occupation of murshidabad

বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের সাহিত্য জগতে আবির্ভাব বিশ শতকের পঞ্চাশের দশক। বাংলায় তখন নাগরিক সাহিত্যের যুগ। নগর-কেন্দ্রিক সাহিত্যের ভিড়ে সিরাজ চিরাচরিত স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে বাংলা সাহিত্যে অভিনবভাবে তুলে ধরলেন গ্রামবাংলাকে। তাঁর কাছে গ্রাম মানে কেবল গাছ-পালা, নদী-পুকুর-মাঠ, চাষের ক্ষেত নয়, তাঁর দৃষ্টিতে গ্রামজীবন ধরা পড়েছে অন্যভাবে। সেখানে প্রকৃতির রূপ যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনই প্রকাশ পেয়েছে মানুষের রূপ। সরলতা, জটিলতা, হিংসা, কাম, ক্রোধ নিয়ে তারা একেবারেই অন্য আধুনিক। তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা মুর্শিদাবাদ জেলার ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরস্থ রাঢ় অঞ্চলের খোশবাসপুরে গ্রামে। রাঢ়ের রুক্ষ মাটি, পরিবেশ, প্রকৃতি, মানুষ তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন, তাঁর সেই বাস্তব অভিজ্ঞতাই প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর সাহিত্যে তথা ছোটোগল্পে। রাঢ় অঞ্চলের প্রান্তিক মানুষ, তাদের জীবন জীবিকা, সুখ-দুঃখ, হতাশা বেদনা, উৎসব বিনোদনের নানান আলেখ্য ধরা পড়েছে তাঁর রচনায়। পাশাপাশি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের জীবনযাত্রা, চিন্তা চেতনার যে বিবর্তন ঘটেছে, যা তাদের সামাজিক অবস্থানকেও পরিবর্তনের পথে ঠেলে দিয়েছে— এই বিষয়েও তিনি আলোকপাত করেছেন তাঁর গল্পমালায়।

মুর্শিদাবাদের প্রায় মাঝ বরাবর প্রবাহিত হয়েছে ভাগীরথী নদী। এই নদীর পশ্চিম দিকের অংশকে বলা হয় রাঢ় অঞ্চল। রাঢ় অঞ্চলের মানুষের কথা বলতে গেলে প্রথমেই রাঢ় অঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস জেনে নেওয়া প্রয়োজন। প্রাচীনকাল থেকেই মুর্শিদাবাদের রাজবৃত্তের ইতিহাসে নানা বৈদেশিক

রাজশক্তির আগমন ঘটেছে। কারণ এই অঞ্চল অতীত সময়ে ব্যবসা বানিজ্যের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। তাই এখানে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির মানুষের আনাগোনা ছিল। বাণিজ্যের কারণে দীর্ঘদিন এদের একসাথে বসবাস করার ফলে এদের মধ্যে সমাজ ও সংস্কৃতিগত সমন্বয় সাধন হয়েছে। এবং ক্রমশই এরা এই অঞ্চলের বাসিন্দা হয়ে উঠেছে। তবে মুর্শিদাবাদ জেলার বিশেষত রাঢ় অঞ্চলের আদি বাসিন্দার কথা বললে বলতে হয় অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়দের কথা-

> "বেদাচারহীন অস্ট্রিক এবং দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মানুষেরা ছিল রাঢ়ের আদি বাসিন্দা। সাঁওতালদের একাংশ পরাজিত হয়ে ক্রমশ অরণ্যের অধিবাসী হয়। আর্যীকৃত দ্রাবিড় অস্ট্রিকদের একাংশ সমতলে থাকে এবং হিন্দু সমাজের নিম্নকোটিতে স্থান পায়। রাঢ়ে তপশিলী সম্প্রদায়ের হিন্দুদের প্রাধান্য আছে।"[১]

এখানে অনার্য তপশিলী জাতির মানুষেরই অধিক বসবাস। সাঁওতাল, দ্রাবিড়, মাল পাহাড়ী, ভোটমঙ্গলীয়, রাজবংশী প্রভৃতি নিম্নবর্গের জনজাতিকে এখানে দেখতে পাওয়া যায়। এরা এবং তপশিলী সম্প্রদায় হিন্দু সমাজ বিশেষভাবে বলতে গেলে হিন্দু সমাজের নিম্নবর্গ গঠন করেছে। বিহার থেকে আগত চাঁই জনগোষ্ঠী এখানকার হিন্দু সমাজে মিশে গেছে। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারে আবার হিন্দু জাতির শ্রেণি বিভাজনেও পরিবর্তন এসেছে। অব্রাহ্মণ জনতার একাংশ ব্যবসা বাণিজ্য করে ধনশালী হলেও তারা নিজেদের নীচু জাত থেকে পৃথক করে সমাজে উচ্চস্তরে স্থান পেতে চেয়েছে এবং পেয়েছেও। যেমন তেলি, ধোপা, কৈবর্ত, গোপ থেকে সৃষ্টি হয়েছে যথাক্রমে- তিলি, চাষ, ধোবা, মাহিষ্য ও সদগোপ। মুর্শিদাবাদের রাঢ় অঞ্চলে এই নিম্নবর্গের হিন্দুর সংখ্যাই অধিক। এখানে মূলত কৈবর্ত্য, চাষা, বায়েন, বাগদি, বাউরি, ডোম প্রভৃতি তপশিলী গোষ্ঠীর মানুষ অধিক বসবাস করে। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের লেখনীতে এই সকল প্রথা সংস্কারে আবদ্ধ অখ্যাত নর নারীর জীবনচর্যা প্রতিফলিত হয়েছে। তাদের প্রকৃতি-নির্ভর জীবন যাপনের চিত্র ধরা পড়েছে এখানে। যেমন 'পুষ্পবনে হত্যাকাণ্ড', 'কালুডিহির বৃত্তান্ত', 'গাজনতলা', 'জোড়াবট ও বাঁধাঘাটের উপকথা' প্রভৃতি গল্পে মাটির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা প্রান্তিক মানুষের জীবন যাপনের চিত্র ফুটে উঠেছে। পাশাপাশি সময়ের সঙ্গে গ্রাম সমাজেও যে বিবর্তন ঘটেছে তা লেখক এড়িয়ে যান নি। গ্রামজীবনে অর্থাভাব, দারিদ্র্য, জীবিকার সংকট, আর্থিক চাহিদার বৃদ্ধি প্রভৃতি মানুষকে ক্রমশ বিকল্প রোজগারের পথ খুঁজে নিতে বাধ্য করছে। গ্রামের প্রান্তিক মানুষেরা ক্রমশ শহুরে চাকচিক্যতায় মোড়া জীবনের প্রতি আকর্ষিত হয়ে পড়ছে। এছাড়া গ্রামের নতুন প্রজন্ম আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বুদ্ধি এবং বিত্তকে কাজে লাগিয়ে জীবন নির্বাহ করছে। যার ফল স্বরূপ একদিকে যেমন গ্রামের দরিদ্র প্রান্তিক মানুষের অর্থাভাব ঘুঁচেছে অন্যদিকে তেমনই তাদের সামাজিক শ্রেণিগত অবস্থানও পরিবর্তিত হয়েছে। ক্রমশ দারিদ্র্যের সীমা থেকে বেড়িয়ে এসে তাদের 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণিতে উত্তরণ ঘটেছে।

'মধ্যবিত্ত' শ্রেণির আলোচনা প্রসঙ্গে শুরুতেই 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণি কাকে বলে- এই সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। সাধারণভাবে বিত্তের অধিকারী হিসাবে যারা খুব উচ্চস্তরে নয় আবার একেবারে নিম্নস্তরেও নয়, মাঝামাঝি স্তরে যাদের অবস্থান তাদের 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। তবে শুধুমাত্র এভাবে 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণিকে সংজ্ঞায়িত করলে তা যথাযথ হবে না। 'বিত্ত'কে যদি শ্রেণি নির্ণয়ের মানদণ্ড হিসাবে ধরা হয় তাহলে বিত্তের নিরিখে কেউ হবে উচ্চ মধ্যবিত্ত আবার কেউ হবে নিম্ন মধ্যবিত্ত। কিন্তু এখানে সমস্যা অন্যত্র। আমাদের চারাপাশের সমাজে এরকম দৃষ্টান্তও রয়েছে যেখানে দেখা যায় কারও হয়তো এক কালে অনেক সম্পত্তি অর্থ ছিল, বর্তমানে তার কিছুই নেই, একেবারে নিঃস্ব, তাকে যদি প্রশ্ন করা হয় তাহলে বলবে সে 'মধ্যবিত্ত'। সুতরাং 'মধ্যবিত্ত' তার কাছে স্বতন্ত্র মর্যাদার পরিচায়ক। আবার আমাদের সমাজে এমনও নজির রয়েছে যারা 'বিত্ত'এর মাপকাঠিতে নিম্ন কিন্তু জীবনচর্যায় উৎকর্ষতা অর্জনের মধ্য দিয়ে সমাজে বিশিষ্ট মর্যাদার

অধিকারী হয়েছে। তাদেরকেও 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণিতে ফেলা হয়। সুতরাং বিত্তের মাপকাঠিতে 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণি নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে এটাও ঠিক যে 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণি 'বিত্ত' এর মাপকাঠিতে নির্ণীত না হলেও 'বিত্ত'ই তার মানসিকতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। সাম্প্রতিক কালে অনেকে মনে করেন বিত্ত নয়, বিদ্যা নয়, বুদ্ধি নয়, 'মধ্যবিত্ত' আসলে একপ্রকার মানসিকতা যারা সব সময় দ্বন্দ্বে ভোগেন। সুতরাং বলা যেতে পারে বিত্তের অধিকারী হিসেবে একেবারে উঁচুতেও নয়, আবার একেবারে নীচেও নয়, মোটামুটিভাবে যারা মধ্যম স্তরে অবস্থান করে, যারা বিভিন্ন বৃত্তি বা পেশার সঙ্গে নিযুক্ত থেকে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে আর্থিকভাবে সচ্ছল হতে চায় কিন্তু নিজেদের বৃত্ত ভেঙে বেড়িয়ে আসতে পারে না, আয় ব্যয়ের সামঞ্জস্য করতে গিয়ে নানাবিধ টানাপোড়েনে ভোগেন, যারা একই সঙ্গে রক্ষণশীল এবং প্রগতিশীল আবার ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার দ্বন্দ্বে ভোগেন, কখনও সাহায্যকারী, কখনও বা সুযোগ সন্ধানী এই বিপরীত মিশ্র বৈশিষ্ট্যযুক্ত মানুষেরাই সাধারণত 'মধ্যবিত্ত' নামে পরিচিত হওয়ার দাবী রাখে।

ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন পাকাপাকিভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নানান রকম পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। স্টীম ইঞ্জিন, রেলপথ, টেলিগ্রাফ লাইন, মুদ্রণ যন্ত্র প্রভৃতির প্রচলন হয়। আইন, বিচার ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা সবক্ষেত্রেই আসে পরিবর্তন। গড়ে ওঠে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সেনা বাহিনী, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, প্রশাসনিক অফিস, আদালত প্রভৃতি। এই সবক্ষেত্রেই প্রয়োজন শিক্ষিত পেশাদারী মানুষের। এবং এখান থেকেই মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান। শুধুমাত্র শহরে নয় গ্রামে গঞ্জে ভূমিনির্ভর মানুষেরাও লেখা পড়া শিখে চাকরি করতে শহরে ভিড় করে। তার ফলে তাদের সামাজিক মর্যাদারও উত্তরণ ঘটে। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'পুষ্পবনে হত্যাকাণ্ড' গল্পে এর দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়। এখানে রয়েছে দুই সময়ের দুই মানুষ, ষষ্ঠীচরণ আর নিমাই। সম্পর্কে তারা পিতা ও পুত্র। ষষ্ঠীচরণ পেশায় মালি, আর পুত্র নিমাই সরকারি চাকুরে। ষষ্ঠীচরণ ছেলেকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পিছুপা হয়নি। সে চাইনি তার ছেলে তারই মতো মালি হয়ে বেঁচে থাকুক। তার ছেলে নিমাই বি.এ পাশ, শহরে সরকারি চাকরি করে। ছেলের চাকরি যেমন তার সংসারে আর্থিক অভাব মিটিয়েছে এবং তেমনই গ্রামে তার সম্মান, মর্যাদাও বেড়েছে। ছেলের মধ্য দিয়ে সে পরিচিত হয়েছে শহুরে চাকচিক্য বিলাসিতায় মোড়ানো মধ্যবিত্ত জীবনের সঙ্গে–

> "নিমাই ঘরে না থাকলে সে তার জিনিসপত্র খুঁটিয়ে পরখ করতে বসে। ক্রিমের কৌটো, পেস্ট কত কী হাতের তালুতে নিয়ে তাকিয়ে থাকে, শোঁকে, ভাবে। অবচেতন আদিম আবেগে ভূতগ্রস্তের মতো মাঝে মাঝে সে যা করে বসে, পরে নিমাই এসে টের পায় এবং ক্ষেপে যায়। একগাদা পেস্ট ওগরানো, মেঝেয় মাখামাখি—নয় তো চুলের ক্রিমের শিশি খতম, এই সব নষ্টামি। আজকাল নিমাই এত ক্ষেপে যায় যে অভব্য কথাও তার মুখে আটকায় না।"[২]

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নিমাই তার বাবার মতো গ্রামের প্রান্তিক জীবনে পড়ে থাকে নি। শহরের মধ্যবিত্ত সমাজের বিলাস ও ভোগবাদী জীবনে ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে সে। নিমাই সেই 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণির প্রতিনিধি যারা প্রান্তিক গোষ্ঠীর অন্তর্গত হলেও বিদ্যা এবং বুদ্ধিকে অবলম্বন করে বিত্তের অধিকারী হয়ে 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গ্রামবাংলায় এভাবেই পেশাগত বিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রান্তিক মানুষের সামাজিক শ্রেণিগত রূপান্তর ঘটেছে-

> "বিশ শতকের গোড়ার দিকে বৃত্তি পরিবর্তনের ফলে বা নতুন নতুন বৃত্তি সৃষ্টির ফলে সমাজে আসে গতিশীলতা। বর্ণ ও বৃত্তি ভিত্তিক সমাজে দেখা দেয় আলোড়ন। নিম্নবর্ণের মানুষ উচ্চ বৃত্তি নিয়ে সমাজে উচ্চস্থান পায়, জাতি কাঠামো দুর্বল হতে থাকে।"[৩]

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ নিমাই চরিত্রটির মধ্য দিয়ে প্রান্তিক মানুষের 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণিতে উত্তরণের পাশাপাশি রূপান্তরিত মধ্যবিত্ত মানসিকতাকেও চিত্রিত করেছেন। শহুরে ভোগবাদী জীবনের প্রতি আকর্ষণ, গ্রামীণ ঐতিহ্য, মূল্যবোধে আঘাত হেনেছে। নিমাই গ্রামীণ বৃত্ত থেকে বের হতে চায়। তার চোখে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জ্বলজ্বল করে। বাবার পুষ্পবাগানের রেয়ার ফুল সে দেখতে চায় আভিজাত্য হিসাবে। পুষ্পবাগানের দুর্লভ ফুল আভিজাত্য বহন করলেও পুষ্পবাগানের মালিকে পিতার পরিচয় দেওয়া তার কাছে মর্যাদাহানিকর। তাই বাড়িতে বান্ধবী আসার কথায় সে তার বাবাকে জানায় যে আগামীকাল শহর থেকে তার বান্ধবী আসবে তাই সে সেদিন সে তাকে বাবা বলে ডাকতে পারবে না। কলকাতায় চাকরি করা নিমাই শ্রেণি বদলের স্বপ্ন দেখে, বনেদি পরিবারে নাম লেখাতে চায়। উন্নয়ন চায় সামাজিক অবস্থানের। সময়ের সঙ্গে গ্রামবাংলার এই সামাজিক শ্রেণিগত রূপান্তর ও মানসিকতার পরিবর্তনের বাস্তব চিত্র সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের লেখনীতে ধরা পড়েছে। তাঁর 'গাজনতলা', 'বাগাল' গল্পেও গ্রামের প্রান্তিক মানুষের মধ্যে 'মধবিত্ত'তে উত্তরণের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। 'গাজনতলা' গল্পের অন্যতম চরিত্র রামপদ বাগদী চৈত্রের গাজনে যাত্রা করে। যাত্রাদলের বিবেক সে। গমগমে গলায় গান করে। কিন্তু তার মনে সুপ্ত বাসনা রয়েছে যে সে একদিন শহরে রেডিওতে গান করবে। তাই সে বোরজে মশাইয়ের কাছে যায় যদি তিনি তাঁর কলকাতায় বাস করা জামাইকে চিঠি লিখে দেন তাহলে হয়তো সে রেডিওতে চাকরি করার সুযোগ পাবে। অন্যদিকে 'বাগাল' গল্পে রাঙাদাসীর মধ্যেও ভালোভাবে জীবন নির্বাহের জন্য শহরাভিমুখী হওয়ার মানসিকতা লক্ষ করা যায়। রাঢ় বাংলার মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারের একটি রীতি হল বাড়িতে 'বাগাল' রাখা। বাগালের কাজ মূলত গোরু-মোষ চড়ানো, তাদের দেখাশোনা করা, চাষের কাজে সাহায্য করা। এছাড়া মালিক পক্ষের নানান ফরমায়সি কাজও করতে হয় তাদের। বাগালদের চিহ্নিত করা হত কপালে ধারালো শিলা দিয়ে ক্ষত তৈরি করে যাকে 'রাখাল ফোঁটা' বলা হয়। বর্তমানে অবশ্য রাখাল ফোঁটার ধারণাটা প্রায় উঠে গেছে। গল্পের মূল চরিত্র বছর আটেকের হরিবুলা বাগাল। একজন বাগালের সারাদিনের রোজনামচা লেখক হরিবুলার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। হরিবুলা গোরুদের ভালোবাসে। তাদের শরীর খুঁটিয়ে দেখে। ঘা হলে দুর্বো ঘাস মচলে ঘসে দেয়। গোঁদল পোকা ছাড়িয়ে দেয় পেট থেকে। কিন্তু তার মা রাঙাদাসী চায় নি যে সে তার বাবার মতো বাগাল হয়ে জীবন অতিবাহিত করুক। সে চাইতো তার ছেলে স্কুলে লেখাপড়া শিখে চাকুরি করে তাকে খাওয়াবে। কালের পরিহাসে হরিবুলার জীবনের এই উজ্জ্বল সম্ভবনা হয়তো শেষ কিন্তু রাঙাদাসীর আশা ফুরিয়ে যায় নি। সে একজন অতিসাধারণ মণিবের ঘরে গৃহস্থালীর কাজ করা বধূ, তার স্বামী মারা গেছে তারপরেও সে হরিবুলার বাগালী জীবন মেনে নিতে পারে না। তার মনের মধ্যে সুপ্ত বাসনা রয়েছে যে– "ভগবান যদি মুখ তুলে তাকায়, মা বাছা মিলে টাউনে দোকান দুবো।"[৪] গ্রামের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষ যারা আজীবন গ্রামে থেকেছে, প্রকৃতির মাঝে বেড়ে উঠেছে, পিতৃপুরুষের সনাতনী পেশাকে আঁকড়ে ধরে জীবন নির্বাহ করেছে তাদের মধ্যেও যে মানসিকতার বিবর্তন ঘটেছে, নিজেদের দরিদ্র থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে রূপান্তকরণের চেষ্টা করেছে— গ্রামের এই সামাজিক শ্রেণিগত বিবর্তন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাঁর রচনায় স্পষ্ট করেছেন।

বিশ শতক থেকেই মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের একটা বড় অংশ দ্রুত গতিতে ছুটছে 'বিত্ত' এবং 'ভোগ'-এর পিছনে। মূল্যবোধ, মানবিক সম্পর্ক, আদর্শবাদের থেকেও তাদের কাছে বড় হয়ে ওঠে বিত্ত ও ভোগবাদী জীবন। প্রতিনিয়ত বিভিন্ন নিত্যনতুন বিলাসপণ্যের তারা উপেক্ষা করতে না পেরে যেন তেন উপায়ে অধিক অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় ঝাঁপিয়ে পড়ে মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের একটা বৃহৎ অংশ। বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের এই চালচলন, ভোগবিলাস মানসিকতা শুধু শহর নয়, গ্রামবাংলাতেও সমান্তরালভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'হলুদ পাখির পা' গল্পে এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ভুবন পাখি ধরা ব্যাধ। যদিও এই পেশায় সে কিছুটা বাধ্য হয়েই এসেছে। তার বাবা ছিল ক্ষেত মজুর। একসময়ে তিনি খুরপী

হাতে শস্যের চারা বুনেছেন, ফসল ফলিয়েছেন। কিন্তু ভুবন বন্যা সংকুল এলাকায় কেবলমাত্র ক্ষেতমজুর হিসাবে নিজেকে আটকে রাখেনি। তার চাহিদা, শৌখিনতা, আধুনিক সংস্কৃতির ছোঁয়া তাকে বাধ্য করেছে যেকোনোভাবে অতিরিক্ত টাকা রোজগারের পথে হাঁটতে। সে শিব পুজোর মেলায় ফাঁক পেলেই জুয়া খেলতে চায়। তার সাধ হয়-

> "আজ পেটপুরে রসগোল্লাই খাবে। পান খাবে এক খিলি। কিনবে একটা সিগ্রেট্র। রাঙা ঠোঁটে সিগ্রেট টানতে টানতে সোজা চলে যাবে রতনের বাড়ি। বলবে – বন্ধু কেমন আছ, দেখতে এলাম হে। তখন, তখন আলোপুরী কি হাসবে আড়চোখে চেয়ে?"[৫]

এখানে সিরাজ দেখিয়েছেন প্রজন্মের হেরফেরে কিভাবে মনোভাব চাহিদা আশা আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তন ঘটেছে। ভুবনের বাবা যেভাবে প্রকৃতি নির্ভর দরিদ্র জীবন কাটিয়েছে, ভুবন সেভাবে জীবন কাটায় না। তার কাছে সুখ, বিলাসিতা, অর্থ- এগুলোই প্রাধান্য পেয়েছে। পাশাপাশি মধ্যবিত্ত জীবনের মানসিক দ্বন্দ্বও তার মধ্যে লক্ষ করা যায়। মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনের একাংশ কেটে যায় শুধুমাত্র সামাজিক সম্মান নষ্ট হওয়ার ভয় নিয়ে। ভুবনের মধ্যেও সেই বৈশিষ্ট্য বর্তমান। কুসুমপুরের ছোটোবাবু সে, গ্রামের শ্রেষ্ঠ 'পাখ্‌মারা' হিসাবে তার একটা সম্মান রয়েছে। তাই সে এমন কোনো কাজ করতে পারে না যাতে তার সম্মান নষ্ট হয়। সে আলোপুরীকে ভালোবাসলেও যেহেতু আলোপুরী পরস্ত্রী, তার বন্ধু রতনের সঙ্গে বিয়ে হয়ে হয়েছে তাই সে তার ভালোবাসার ডাকে সাড়া দিতে চেয়েও দিতে পারে না। মানসিক দ্বন্দ্বে ভোগে। গাঁয়ের সম্মান, মূল্যবোধ নাকি অন্তরের কামনা বাসনা— এই দু'ইয়ের দ্বন্দ্ব তার মধ্যে লক্ষ করা আয়। এভাবেই সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ কালের নিয়মে গ্রামের প্রান্তিক মানুষের মধ্যে মধ্যবিত্ত মানসিকতার বীজ রোপণ হতে দেখেছেন।

'মধ্যবিত্ত' মানুষের মূল বৈশিষ্ট্য বুদ্ধি এবং বিত্তকে অবলম্বন করে জীবন নির্বাহ করা। গ্রামে বুদ্ধি অবলম্বন করে জীবন নির্বাহ করা মধ্যবিত্তের সংখ্যা খুব বেশি নেই বরং বিত্ত-নির্ভর মধ্যবিত্ত মানুষের সংখ্যা তুলনামূলক অনেক বেশি। এরা গ্রামে সাধারণ মানুষের উপর প্রভাব বিস্তারকারীর দিক থেকে মধ্যবিত্ত। 'আলেকজান্ডার' গল্পে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ শিবুর চরিত্রের মধ্য দিয়ে গ্রাম বাংলায় এই বিত্ত-নির্ভর মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে উপস্থাপিত করেছেন। একসময়ে শিবুও ছিল দরিদ্র, প্রান্তিক খেটে খাওয়া মানুষ। রেনবো সাহেবের হাতে পড়ে তার দরিদ্র থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে উত্তরণ ঘটেছে—

> "আমেরিকার লোক ছিলেন রেনবো সাহেব। শিবুকে পছন্দ করতেন। সেই সুযোগে শিবু ওই বয়সেই খুব কামিয়ে নিয়েছিল নানা সূত্রে। যাকে বলে টাউটগিরি। শালা ঘেন্না ধরে যায় জীবনটার উপর। দু-চারটে টাকার লোভে কোর্টের ডুমুরতলায় দাঁড়িয়ে বিড়ি টানত। ডুমুরগাছটা মরে গিয়ে এখন শিবুর তেতো স্মৃতিটা ঝাপসা হয়ে গেছে। ওখানে কারও একটা মূর্তি বসালে কেমন হয়? সব খরচ শিবুর।"[৬]

শিবুর অতীত জীবনের স্মৃতি তার মনকে এখনও তাড়িত করে। সে বর্তমানে একজন জোতদার, তার কাছে অনেক ক্ষেত মজুর কাজ করে, সে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিক্ষেত্রে নানান বিবর্তন আনান চেষ্টা করে, দিল্লিতে কৃষি বিষয়ক সেমিনারে যায়, সেরা ফলনের প্রাইজ পায় কিন্তু তার মনের মধ্যে এখনও রয়ে গেছে অতীত জীবনের একরাশ স্মৃতি। 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণির মধ্যে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার টানাপড়েন, ইতিহাসবোধ, পাশাপাশি ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য— এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যই লক্ষ করা যায় শিবু চরিত্রের মধ্যে। প্রান্তিক দরিদ্র জীবন থেকে তার যথার্থই উত্তরণ ঘটেছে মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে। এভাবেই সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ গ্রামবাংলায় কখনও জীবন জীবিকার হাত ধরে কখনও বা সময়ের সঙ্গে মানুষের চাহিদা ও মনস্তাত্ত্বিক চিন্তা চেতনার বিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রান্তিক মানুষের 'মধ্যবিত্ত'তে উত্তরণের রূপরেখাকে চিহ্নিত করেছেন তাঁর গল্পমালায়।

তথ্যসূত্র:

১) ঝা, শক্তিনাথ। বস্তুবাদী বাউল। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ২৬।
২) সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা। গল্প সমগ্র ১ম খণ্ড। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ৩২৭।
৩) মুখোপাধ্যায়, সুবোধ কুমার। বাঙালি মধ্যবিত্ত ও তার মানসলোক। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা,১৯৯৮, পৃ. ৮২।
৪) সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা। গল্প সমগ্র ১ম খণ্ড। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ৩৫৮।
৫) তদেব, পৃ. ২১২।
৬) সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা। গল্প সমগ্র ৩য় খণ্ড। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৫৪।

গ্রন্থপঞ্জি:

আকর গ্রন্থ:

১) সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা। গল্প সমগ্র ১ম খণ্ড। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩।
২) সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা। গল্প সমগ্র ২য় খণ্ড। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩।
৩) সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা। গল্প সমগ্র ৩য় খণ্ড। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৪।

সহায়ক গ্রন্থ:

১) চৌধুরী, কমল। মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, প্রথম পর্ব। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৮।
২) কমল চৌধুরী, মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, দ্বিতীয় পর্ব। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১১।
৩) হাসান, জাহিরুল। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ও বাঙালি সমাজ। পূর্বা, কলকাতা, ২০১৮।
৪) ঝা, শক্তিনাথ। বস্তুবাদী বাউল। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯১।
৫) বসু, সজল। ভারতের সমাজভাবনা। প্রাচী পাবলিকেশন্‌স, হাওড়া, ২০০৫।
৬) বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ। গ্রামবাঙলার গড়ন ও ইতিহাস। অনুষ্টুপ, কলকাতা, ১৯৮২।
৭) মুখোপাধ্যায়, সুবোধ কুমার। বাঙালি মধ্যবিত্ত ও তার মানসলোক। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৮।

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1812-1819
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.404

গান্ধীর নন্দনতত্ত্ব: একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ

শুভঙ্কর পোদ্দার, *গবেষক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.03.2026; Accepted: 21.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This paper examines Mahatma Gandhi's philosophy of art and aesthetics. Although Gandhi is primarily known as a political thinker, his writings reveal a consistent and original aesthetic theory. Against the dominant Western tradition that treats art as autonomous and separable from moral life, Gandhi argued that art, labour, and ethics are inseparable. For Gandhi, beauty is not an independent quality to be appreciated in isolation— it is the natural outcome of honest, ethical, and purposeful human activity.

The paper traces the philosophical sources of Gandhi's aesthetics, including the influence of Tolstoy and Ruskin from the Western tradition, and the Upanishads, the Bhagavad Gita, and Jain philosophy from the Indian tradition. It then analyses the central pillars of his aesthetic thought: his rejection of 'art for art's sake,' his elevation of hand labour as a form of creative expression, his critique of industrialism in 'Hind Swaraj,' and his use of the charkha as both a philosophical symbol and an aesthetic ideal. The paper also considers satyagraha as a lived aesthetic practice in which moral and artistic values merge.

While noting the limitations of Gandhi's position, the paper argues that his ethical aesthetics remains deeply relevant today— particularly as a critical response to the commodification of art and the displacement of artisan labour in the digital age.

Keywords: Gandhi, aesthetics, ethics, labour, satyagraha, folk art

দর্শনের ইতিহাসে নন্দনতত্ত্ব বা aesthetics সবসময়ই একটি কেন্দ্রীয় প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছে: শিল্প কি কেবল সৌন্দর্যের জন্য, নাকি তার একটি নৈতিক উদ্দেশ্য আছে? পাশ্চাত্য দর্শনে কান্ট-এর 'disinterested pleasure' থেকে শুরু করে Oscar Wilde-এর 'art for art's sake' পর্যন্ত একটি ধারা শিল্পকে নৈতিকতার বাইরে স্বতন্ত্র একটি ক্ষেত্র হিসেবে দেখেছে। এই ধারার মূল যুক্তি হলো, শিল্পের নিজস্ব একটি অভ্যন্তরীণ যুক্তি আছে— সৌন্দর্য নিজেই একটি পরম মূল্য এবং তাকে নৈতিকতা বা রাজনীতির মানদণ্ডে বিচার করা অনুচিত। Alexander Baumgarten থেকে Benedetto Croce পর্যন্ত পাশ্চাত্য নন্দনতত্ত্বের মূলধারা এই শিল্পের এই স্বতন্ত্র ধারণাকেই পোষণ করে এসেছে।

এই ধারার বিপরীতে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী শিল্পকে জীবনের সঙ্গে, শ্রমের সঙ্গে এবং নৈতিকতার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করে দেখেছেন। গান্ধীকে সাধারণত একজন রাজনৈতিক চিন্তাবিদ ও স্বাধীনতা

সংগ্রামী হিসেবে দেখা হলেও, তাঁর লেখা, বক্তৃতা ও কর্মকাণ্ডের গভীরে একটি নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, যা প্রচলিত শিল্পতত্ত্বকে মৌলিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

গান্ধীর নন্দনতত্ত্ব গড়ে উঠেছে পাশ্চাত্য ও ভারতীয় দুটি ধারার সমন্বয়ে। একদিকে Tolstoy ও Ruskin-এর নৈতিক শিল্পদর্শন, অন্যদিকে উপনিষদের 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' এবং ভগবদ্গীতার নিষ্কাম কর্মের ধারণা— এই দুটি ধারা মিলিয়ে গান্ধী এমন একটি শিল্পদর্শন তৈরি করেছেন যা একই সঙ্গে দার্শনিকভাবে মৌলিক ও সামাজিকভাবে প্রাসঙ্গিক।

দার্শনিক উৎস ও প্রভাব

ক) Tolstoy-র প্রভাব: গান্ধীর শিল্পদর্শন গড়ে ওঠার পেছনে লিও টলস্টয়ের প্রভাব অত্যন্ত গভীর। টলস্টয় তাঁর 'What is Art?' (১৮৯৭) গ্রন্থে পাশ্চাত্য নন্দনতত্ত্বের মূলধারার সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, পাশ্চাত্যের তথাকথিত 'উচ্চশিল্প' মূলত সুবিধাভোগী অভিজাত শ্রেণির বিলাসিতা। শিল্পের সংজ্ঞা নির্ধারিত হওয়া উচিত সৌন্দর্য বা আনন্দের মানদণ্ডে নয়, বরং তার নৈতিক বার্তা দেওয়ার ক্ষমতার মানদণ্ডে। অর্থাৎ যে শিল্প মানুষের মধ্যে নৈতিক অনুভূতি জাগাতে পারে এবং মানুষকে মানুষের কাছে নিয়ে আসতে পারে, সেটিই প্রকৃত শিল্প।[1]

১৯০৮-০৯ সালে গান্ধী ও টলস্টয়ের মধ্যে চিঠিপত্রের মাধ্যমে দার্শনিক মতের বিনিময় হয়।[2] টলস্টয়ের 'Letter to a Hindu' পড়ে গান্ধী অনুপ্রাণিত হন এবং শিল্পকে নৈতিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে দেখার ধারণাটি ভারতীয় সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন। তবে গান্ধী টলস্টয়ের ধারণাকে হুবহু গ্রহণ করেননি— তিনি তা রূপান্তরিত করেছেন। টলস্টয়ের আলোচনা মূলত ইউরোপীয় শিল্পজগতকে কেন্দ্র করে। গান্ধী সেই ধারণাটিকে ঔপনিবেশিক ভারতের দারিদ্র্য ও বৈষম্যের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করেছেন।

খ) John Ruskin-এর প্রভাব: গান্ধীর জীবনে John Ruskin-এর 'Unto This Last' (১৮৬২) গ্রন্থটির যথেষ্ট প্রভাব ছিল। বইটির মূল ভাবনাগুলো তাঁর নিজের গভীরতম বিশ্বাসের প্রতিফলন বলে তাঁর মনে হয়েছিল।[3]

Ruskin -এর মতে, পুঁজিবাদী অর্থনীতি শ্রমিকের কাজকে কেবল একটি পণ্য হিসেবে দেখে— সেখানে শ্রমিকের ব্যক্তিত্ব, তার সৃজনশীলতা, তার আত্মার প্রকাশের কোনো মূল্য নেই। তাঁর 'The Stones of Venice' গ্রন্থে Ruskin বলেছেন যে Gothic স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠত্বের পেছনে আছে কারিগরের সৃজনশীল স্বাধীনতা— সেখানে প্রতিটি পাথর কাটার মধ্যে একজন মানুষের আত্মার ছাপ লক্ষ্য করা যায়।[4] শিল্পবিপ্লবের পরবর্তীতে বিভিন্ন যন্ত্র সেই মানবিক মাত্রাকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

গান্ধী Ruskin-এর এই ধারণাটিকেও ভারতের প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ করেছেন। ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ভারতের হস্তশিল্পকে ধ্বংস করে তার পরিবর্তে ম্যানচেস্টারে তৈরি কলের কাপড় নিয়ে এসেছে। এই

---

[1] Tolstoy, Leo. *What is Art?* Translated by Aylmer Maude. Oxford University Press, London, 1929, Chapter 5.

[2] Collected Works of Mahatma Gandhi. Vol. 10, Publications Division, Government of India, New Delhi, 1963, pp. 160-175.

[3] Gandhi, M.K. *Autobiography: The Story of My Experiments with Truth.* Navajivan Publishing House, Ahmedabad, 1927, p. 298.

[4] Ruskin, John. *The Stones of Venice.* Smith, Elder & Co., London, 1851, Vol. 2, Chapter 6.

প্রক্রিয়ায় কেবল ভারতের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি— ভারতীয় কারিগরের সৃজনশীল আত্মাও এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাঁর খাদি আন্দোলন তাই শুধু একটি অর্থনৈতিক প্রতিরোধ নয়, এটি ভারতীয় শিল্পীদের নান্দনিক সত্তাকে রক্ষার একটি প্রতিরোধ।

গ) ভারতীয় দার্শনিক উৎস: গান্ধীর নন্দনতত্ত্বের শিকড় কেবল পাশ্চাত্য দর্শনে নয়, ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যেও গভীরভাবে প্রোথিত। বলা যায়, Tolstoy ও Ruskin তাঁকে যা দিয়েছেন তা ভারতীয় দর্শনের আলোয় আরও সমৃদ্ধ ও গভীর হয়ে উঠেছে।

উপনিষদের 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' সূত্রে সত্য, মঙ্গল ও সুন্দরকে অভেদ হিসেবে দেখা হয়েছে। এই ত্রয়ী গান্ধীর শিল্পদর্শনের একটি মূল ভিত্তি। তাঁর কাছে সুন্দর কেবল নৈতিক জীবনের মধ্য দিয়েই সম্ভব— যা সত্য নয়, যা মঙ্গলজনক নয়, তা সুন্দর হতে পারে না। এই ধারণাটি পাশ্চাত্যের aesthetic autonomy-র ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত।

ভগবদ্গীতার নিষ্কাম কর্মের ধারণাও গান্ধীর শিল্পভাবনায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে।[5] গীতায় কৃষ্ণ বলেছেন, ফলের প্রত্যাশা না করে কর্ম করাই শ্রেষ্ঠ কর্ম। গান্ধী এই ধারণাকে শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। একজন প্রকৃত শিল্পী বা কারিগর যখন খ্যাতি বা অর্থের প্রত্যাশা না করে কেবল সৃষ্টির আনন্দে ও সমাজের সেবায় কাজ করেন, তখনই সেই কাজ সর্বোচ্চ নান্দনিক মূল্য অর্জন করে। এই অর্থে চরকায় সুতো কাটা একটি আধ্যাত্মিক সাধনাও বটে।

জৈন দর্শনের অহিংসার ধারণাও গান্ধীর নন্দনতত্ত্বকে একটি বিশেষ নৈতিক রূপ দিয়েছে। যে শিল্প হিংসার উপর নির্মিত— মানুষের শোষণের উপর, প্রকৃতি-ধ্বংসের উপর— সেই শিল্প গান্ধীর কাছে অসুন্দর। বড় কারখানার যন্ত্রে তৈরি পণ্য কেবলমাত্র কারিগরের জীবিকা কেড়ে নেয় না, সেই উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে হিংসা নিহিত আছে— প্রকৃতির বিরুদ্ধে, মানুষের সৃজনশীল সত্তার বিরুদ্ধে। সেই হিংসাযুক্ত শিল্প প্রকৃত নন্দনতাত্ত্বিক মূল্য বহন করতে পারে না।

এই তিনটি ভারতীয় ধারা— উপনিষদের সত্য-সুন্দরের অভেদ, গীতার নিষ্কাম কর্ম এবং জৈন দর্শনের অহিংসা— Tolstoy ও Ruskin-এর পাশ্চাত্য নৈতিক নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে মিলে গান্ধীর শিল্পদর্শনকে একটি অনন্য দার্শনিক কাঠামো দিয়েছে।

গান্ধীর শিল্পদর্শনের মূল বৈশিষ্ট্য

ক) 'Art for Art's Sake'-এর প্রত্যাখ্যান: উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের শুরুতে পাশ্চাত্যে 'art for art's sake' আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠেছিল। Oscar Wilde, Walter Pater প্রমুখ শিল্পী ও চিন্তাবিদরা যুক্তি দিচ্ছিলেন যে শিল্পের কোনো বাহ্যিক উদ্দেশ্য থাকা উচিত নয়— শিল্প নিজেই তার নিজের লক্ষ্য। Wilde-এর বিখ্যাত উক্তি অনুযায়ী, "All art is quite useless"— এবং এই 'uselessness'-এর মধ্যেই শিল্পের মহত্ত্ব। Kant-এর দর্শনেও শিল্পানুভূতিকে বলা হয়েছে 'purposiveness without purpose' অর্থাৎ উদ্দেশ্যহীন উদ্দেশ্যমুখিতা। গান্ধী এই ধারণাটিকে ভারতের বাস্তবতার নিরিখে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেননি। তিনি নৈতিক ও রাজনৈতিক ভাবে ধারণাটি খণ্ডন করেন।

নৈতিক স্তরে তিনি প্রশ্ন করেছেন, যখন ভারতের কোটি কোটি মানুষ অনাহারে, অপমানে ও দারিদ্র্যে দিন অতিবাহিত করছেন, তখন একটি সুবিধাভোগী শ্রেণি কেবল নিজেদের আনন্দের জন্য শিল্পচর্চা করবে—

[5] ভগবদ্গীতা, অধ্যায় ৩, শ্লোক ১৯।

এটি নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। 'Young India' পত্রিকায় তিনি লিখেছেন যে, যে শিল্প সাধারণ মানুষের জীবনকে স্পর্শ করে না, যা তাদের কষ্ট ও সংগ্রামের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখে না, সে শিল্পে তিনি কোনো প্রকৃত সৌন্দর্য দেখেন না।[6]

রাজনৈতিক স্তরে গান্ধী দেখিয়েছেন যে 'art for art's sake'-এর ধারণাটি মূলত একটি ঔপনিবেশিক ও শ্রেণি-বিভক্ত সমাজের পণ্য। এই ধারণা একটি বিশেষ শিক্ষিত ও সম্পন্ন শ্রেণির সাংস্কৃতিক আধিপত্যকে বৈধতা দেয়। তাদের রুচি, তাদের সৌন্দর্যবোধই 'উচ্চশিল্প' হিসেবে স্বীকৃত হয়, আর সাধারণ মানুষের লোকশিল্প, হস্তশিল্প 'নিম্নমানের' বলে উপেক্ষিত হয়। গান্ধী এই সাংস্কৃতিক শ্রেণিবিভাজনকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

তবে গান্ধী একথা বলেন না যে শিল্পে আনন্দের কোনো স্থান নেই। তাঁর মতে, প্রকৃত আনন্দ ও প্রকৃত সৌন্দর্য কেবল সেখানেই সম্ভব যেখানে শিল্প মানুষের জীবনের সঙ্গে, তার সংগ্রামের সঙ্গে ও তার মুক্তির সঙ্গে যুক্ত। নৈতিকতাবিহীন সৌন্দর্য তাঁর কাছে একটি অসম্পূর্ণ ও অন্তঃসারশূন্য ধারণা।

খ) শ্রমকে শিল্পের কেন্দ্রে স্থাপন: গান্ধীর শিল্পদর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো শ্রমকে শিল্পের কেন্দ্রে স্থাপন করা। প্রচলিত নন্দনতত্ত্বে শিল্পী ও কারিগরের মধ্যে একটি স্পষ্ট শ্রেণিবিভাজন আছে— শিল্পী সৃষ্টি করেন, কিন্তু কারিগর তৈরি করেন। 'Fine arts' ও 'craft'-এর এই বিভাজন পাশ্চাত্যের দার্শনিক চিন্তায় গভীরভাবে রয়েছে। গান্ধী এই বিভাজনকে মূলত শ্রেণি-বিভক্ত সমাজের একটি সাংস্কৃতিক প্রকাশ হিসেবে দেখেছেন এবং তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

তাঁর কাছে একজন তাঁতি যখন হাতে কাপড় বোনেন, একজন কুমোর যখন মাটির পাত্র তৈরি করেন, একজন ছুতোর যখন কাঠের আসবাব নির্মাণ করেন— এই সৃজনশীল শ্রম প্রকৃত শিল্পসৃষ্টি থেকে কোনো অংশে কম নয়। বরং এই হস্তশিল্পে মানুষের ব্যক্তিত্ব ও আত্মার প্রকাশ ঘটে, যা যন্ত্রের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যে সম্ভব নয়। 'Harijan' পত্রিকায় গান্ধী লিখেছেন যে হাতের শ্রমের মতো মহৎকারী আর কিছু নেই, কারণ সেখানে মানুষের সত্তা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়।[7]

এই ধারণার একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দিক আছে। ভারতে দীর্ঘদিন ধরে কারিগর শ্রেণি— কুমোর, তাঁতি, লোহার, ছুতোর— জাতিভেদ-প্রথার কারণে সামাজিকভাবে অবহেলিত হয়ে এসেছে। গান্ধী তাদের শ্রমকে শিল্পের মর্যাদা দিয়ে একটি গভীর সামাজিক বার্তা দিয়েছেন—যাঁরা সৃষ্টি করেন, তাঁরা সম্মানের যোগ্য।

গ) 'হিন্দ স্বরাজ' ও যন্ত্রসভ্যতার সমালোচনা: ১৯০৯ সালে রচিত 'হিন্দ স্বরাজ' গ্রন্থে গান্ধী আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার বিরোধিতা করেছেন।[8] যন্ত্র যখন মানুষের হাতের কাজকে প্রতিস্থাপিত করে, তখন শুধু কর্মসংস্থান নষ্ট হয় না— মানুষের সৃজনশীল আত্মাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারখানায় উৎপাদিত একটি কাপড় আর হাতে বোনা একটি কাপড়ের মধ্যে পার্থক্য শুধু প্রযুক্তিগত নয়, নন্দনতাত্ত্বিকও। হাতে বোনা কাপড়ে কারিগরের ব্যক্তিত্ব, তাঁর সৃজনশীলতা ও তাঁর আত্মার প্রকাশ থাকে। যন্ত্রে উৎপাদিত পণ্যে সেগুলি অনুপস্থিত। গান্ধীর দৃষ্টিতে এই অনুপস্থিতি কেবল একটি অর্থনৈতিক সমস্যা নয়, এটি একটি নন্দনতাত্ত্বিক ও নৈতিক বিপর্যয়।

---

[6] Gandhi, M.K. *Young India*, 11 August 1920. In *Collected Works of Mahatma Gandhi*, Vol. 18, p.132.

[7] Gandhi, M.K. *Harijan*, 1 February 1935. In *Collected Works of Mahatma Gandhi*, Vol. 60, p. 98.

[8] গান্ধী, মোহনদাস করমচাঁদ. *হিন্দ স্বরাজ,* নবজীবন পাবলিশিং হাউস, আহমেদাবাদ, ১৯০৯, পৃ. ৩৫-৪২।

গান্ধী আরও দেখিয়েছেন যে যন্ত্রসভ্যতা মানুষকে তার নিজের সৃজনশীলতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। যখন একজন মানুষ কেবল একটি যন্ত্রের একটি অংশ হিসেবে কাজ করেন— একই কাজ বারবার করেন— তখন তাঁর মধ্যে যে সৃজনশীল সত্তা আছে তা ধীরে ধীরে মরে যায়। এই অর্থে শিল্পায়ন কেবল অর্থনৈতিক শোষণ নয়, এটি একটি নন্দনতাত্ত্বিক শোষণও।

ঘ) চরকা: একটি দার্শনিক প্রতীক: গান্ধীর চরকা শুধু একটি অর্থনৈতিক হাতিয়ার নয়। এটি একটি গভীর দার্শনিক প্রতীক, যা তাঁর সমগ্র শিল্পদর্শনকে একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করে। চরকায় সুতো কাটার কাজে ধ্যান, শ্রম ও নান্দনিক সৃষ্টি একীভূত হয়— এই তিনটির মিলনই গান্ধীর আদর্শ শিল্পকর্মের সংজ্ঞা।

চরকার সামনে বসার মধ্যে গান্ধী দেখেছিলেন আত্মনিয়ন্ত্রণের সাধনা। মন স্থির হয়, হাত সক্রিয় থাকে, এবং সেই সাধনার ফলে একটি সুন্দর ও প্রয়োজনীয় বস্তু তৈরি হয়। এখানে শ্রম, নৈতিকতা ও সৌন্দর্য পরস্পরের থেকে অবিচ্ছেদ্য। Bhikhu Parekh লিখেছেন যে গান্ধীর কাছে চরকা ছিল একটি সম্পূর্ণ জীবনদর্শনের প্রতীক, যেখানে ব্যক্তির আত্মিক বিকাশ ও সমাজের নৈতিক পুনর্গঠন একই প্রক্রিয়ার দুটি দিক।[9]

চরকার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নান্দনিকতাত্ত্বিক মাত্রা হলো তার সাম্যবাদী চরিত্র। এটি এমন একটি শিল্পকর্মের হাতিয়ার যা সকলের নাগালের মধ্যে। ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত— সকলেই চরকা চালাতে পারেন। এই অর্থে চরকা গান্ধীর গণতান্ত্রিক নন্দনতত্ত্বের একটি বাস্তব প্রকাশ।

ঙ) লোকশিল্পের পুনর্মূল্যায়ন: গান্ধী ভারতীয় লোকশিল্পকে জাতীয় ও নৈতিক সংস্কৃতির ভিত্তি হিসেবে পুনর্মূল্যায়ন করেছিলেন। ঔপনিবেশিক শাসন ভারতীয় লোকশিল্পকে 'primitive' ও 'inferior' বলে চিহ্নিত করে পাশ্চাত্য শিল্পরুচিকে আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এই সাংস্কৃতিক আধিপত্য রাজনৈতিক আধিপত্যের মতোই গভীর ও ক্ষতিকর ছিল, কারণ এটি ভারতীয়দের নিজস্ব সৌন্দর্যবোধ ও সৃজনশীলতার প্রতি আস্থাহীন করে তুলেছিল।

গান্ধীর দৃষ্টিতে মধুবনী চিত্রকলা, মৃৎশিল্প, বাঁশের কাজ, তাঁত— এসব শিল্প পাশ্চাত্য শিল্পের চেয়ে কোনো অংশে নিম্নমানের নয়। বরং এই লোকশিল্পগুলো আরও সমৃদ্ধ, কারণ এগুলো সাধারণ মানুষের জীবন, বিশ্বাস ও সংগ্রামের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। এই শিল্পে সমাজের নৈতিক মূল্যবোধ, তাদের আধ্যাত্মিক বিশ্বাস ও তাদের দৈনন্দিন সৌন্দর্যবোধ একীভূত হয়— যা গান্ধীর আদর্শ শিল্পের সংজ্ঞার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

নৈতিকতা ও নন্দনতত্ত্বের অভেদ: গান্ধীর মতে aesthetics ও ethics দুটি আলাদা দার্শনিক ক্ষেত্র নয়। পাশ্চাত্য দর্শনে এই দুটি শাখাকে সাধারণত আলাদা রাখা হয়— নৈতিকতা প্রশ্ন করে "কী করা উচিত?" এবং নন্দনতত্ত্ব প্রশ্ন করে "কী সুন্দর?" গান্ধী এই বিভাজনটিকে মূলগতভাবে স্বীকার করতে চাননি। তাঁর মতে এই দুটি প্রশ্নের উত্তর একই জায়গায় পাওয়া যেতে পারে।

ক) "Truth is God": সত্য ও সৌন্দর্যের অভেদ: গান্ধীজি প্রথমে বলতেন "God is Truth"— ঈশ্বরই সত্য। পরে তিনি এই সূত্রটি উল্টে দিয়ে বললেন "Truth is God"— সত্যই ঈশ্বর।[10] এই পরিবর্তন কেবল ধর্মতাত্ত্বিক নয়, এর নন্দনতাত্ত্বিক তাৎপর্যও গভীর।

---

[9] Parekh, Bhikhu. *Gandhi's Political Philosophy: A Critical Examination.* Macmillan, London,1989, p. 114.

[10] Gandhi, M.K. *In Search of the Supreme*, Vol. 3. Edited by V.B. Kher. Navajivan Publishing House, Ahmedabad, 1962, p. 4.

যদি সত্যই ঈশ্বর হন, তাহলে সৌন্দর্যও সত্যের একটি প্রকাশ। উপনিষদের 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্'-এর মতো গান্ধীর কাছে সত্য ও সুন্দর অভেদ হয়ে ওঠে। সত্যিকার সুন্দর কেবল নৈতিক জীবনেই সম্ভব। যে শিল্প মিথ্যার উপর নির্মিত, যে শিল্প শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে শিল্প বাহ্যত যতই চমকপ্রদ হোক না কেন, প্রকৃত অর্থে তা সুন্দর হতে পারে না। এই ধারণাটি গান্ধীর নন্দনতত্ত্বের কেন্দ্রীয় দার্শনিক ভিত্তি।

খ) জীবন নিজেই একটি শিল্পকর্ম: গান্ধীর শিল্পদর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হলো— জীবন নিজেই একটি শিল্পকর্ম হতে পারে। নৈতিক জীবনযাপনই সর্বোচ্চ নান্দনিক প্রকাশ। এই ধারণাটি পাশ্চাত্য নন্দনতত্ত্বের মূলধারার সঙ্গে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

প্রচলিত নন্দনতত্ত্বে শিল্পী ও দর্শক আলাদা— একজন সৃষ্টি করেন, অন্যজন উপভোগ করেন। শিল্পকর্ম একটি বিশেষ বস্তু— একটি ছবি, একটি কবিতা, একটি নৃত্য। গান্ধীর কাছে এই সংজ্ঞা অসম্পূর্ণ। তাঁর মতে প্রতিটি মানুষই একজন সম্ভাব্য শিল্পী, কারণ প্রতিটি মানুষই তার নিজের জীবনকে নৈতিক ও সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারেন।

গ) উচ্চ ও নিম্ন শিল্পের বিভাজন প্রত্যাখ্যান: গান্ধী শিল্পের অভ্যন্তরীণ শ্রেণিবিভাজনকেও প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্রচলিত নন্দনতত্ত্বে 'fine arts' ও 'craft'-এর মধ্যে যে মূল্যগত পার্থক্য করা হয়, তা মূলত একটি শ্রেণি-বিভক্ত সমাজের প্রতিফলন। যারা হাতের কাজ করেন— কুমোর, তাঁতি, কামার— তাদের শ্রম 'craft' বা কারিগরি বলে চিহ্নিত হয়। যারা তুলি বা কলম ধরেন, তারা 'শিল্পী' বলে সম্মানিত হন। গান্ধী এই বিভাজনকে নৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন।

তাঁর কাছে সকল সৃজনশীল শ্রম সমান মূল্যের। একজন বেহালাবাদক ও একজন তাঁতি— উভয়েই সৃজনশীল কাজ করছেন, উভয়ের কাজেই আত্মার প্রকাশ ঘটছে। গান্ধীজির এই ভাবনা ভারতের জাতিভেদ-প্রথার বিরুদ্ধেও প্রতিরোধ— কারণ জাতিভেদ-প্রথা নির্দিষ্ট শ্রেণির মানুষকে নির্দিষ্ট শ্রমে আবদ্ধ রেখে সেই শ্রমকে অবমানিত করেছে। গান্ধীজি সেই শ্রমকেই শিল্পের মর্যাদা দিয়ে একটি সামাজিক ও নান্দনিকতাত্ত্বিক বিপ্লবের সূচনা করেছেন।

গান্ধীজির মতবাদের সীমাবদ্ধতা: গান্ধীর নন্দনতত্ত্ব সংক্রান্ত মতবাদ তা সমালোচনামুক্ত নয়।

ক) শিল্পের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন: গান্ধী শিল্পের স্বায়ত্তশাসনকে যেভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন, তা নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক আপত্তি উঠতে পারে। Kant থেকে শুরু করে আধুনিক নন্দনতত্ত্ব পর্যন্ত একটি শক্তিশালী যুক্তি হলো, শিল্পের নিজস্ব একটি যুক্তি আছে— একটি অভ্যন্তরীণ নিয়ম ও স্বাধীনতা— যা নৈতিকতা বা রাজনীতির যুক্তি থেকে আলাদা। যদি শিল্পকে সম্পূর্ণভাবে নৈতিকতার অধীন করা হয়, তাহলে শিল্পী তাঁর সৃজনশীল স্বাধীনতা হারান এবং শিল্প একটি উপদেশমূলক বা প্রচারমূলক মাধ্যমে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

ইতিহাসেও এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। যখনই কোনো রাজনৈতিক বা নৈতিক মতাদর্শ শিল্পকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে— যেমন সোভিয়েত 'socialist realism' বা নাৎসি জার্মানির 'degenerate art' নিষিদ্ধকরণ— শিল্প তার প্রাণশক্তি হারিয়েছে। গান্ধীর নন্দনতত্ত্বের কঠোর নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, অনেক সমালোচকের মতে, শিল্পকে এই ধরনের নিয়ন্ত্রণের দিকে ঠেলে দিতে পারে।

তবে এই আপত্তি পুরোপুরি প্রযোজ্য হতে পারে না। গান্ধী কোনো রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের কথা বলেননি— তিনি বলেছেন শিল্পীর নৈতিক দায়িত্বের কথা। এই দুটি অবস্থানের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য আছে।

গান্ধীর কাছে নৈতিকতা বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া কোনো বাধ্যবাধকতা নয়, এটি শিল্পীর অন্তরের সত্যনিষ্ঠা থেকে উৎসারিত।

খ) কাল্পনিক অতীতমুখিতার সমস্যা: গান্ধীর শিল্পদর্শনের বিরুদ্ধে আরেকটি সমালোচনা হলো, এটি একটি আদর্শ অতীতের দিকে নির্দেশ করে। হস্তশিল্প ও লোকশিল্পের যে জগৎ গান্ধী কল্পনা করেছেন, তা অনেকাংশে একটি কাল্পনিক নির্মাণ। বাস্তবে ঔপনিবেশিক আমলের আগেও ভারতীয় কারিগরদের জীবন মোটেই আদর্শ ছিল না— জাতিভেদ-প্রথা, দারিদ্র্য ও সামাজিক বৈষম্য সেই জীবনকে কঠোর করে রেখেছিল। গান্ধী যন্ত্রসভ্যতার আগের যে সমাজের কথা বলেছেন, তা অনেকটাই তাঁর নিজের নৈতিক আকাঙ্ক্ষার কাল্পনিক রূপ।

তাছাড়া প্রযুক্তির সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান বাস্তবসম্মত নয়। আধুনিক চিকিৎসা, যোগাযোগ ও শিক্ষার জন্য যে প্রযুক্তি প্রয়োজন, তাকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করলে মানুষের জীবনমান উন্নত হওয়ার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। এই অর্থে গান্ধীর অবস্থান কিছুটা অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও গান্ধীর নন্দনতত্ত্বের একটি গভীর ও স্থায়ী প্রাসঙ্গিকতা আছে। বাজারকেন্দ্রিক শিল্পের বিরুদ্ধে, শিল্পের পণ্যায়নের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান আজ আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কারিগরি শিল্পের মর্যাদা রক্ষায়, পরিবেশবান্ধব উৎপাদন পদ্ধতির পক্ষে গান্ধীর ধারণার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা

ক) ডিজিটাল ও পণ্যায়িত শিল্পের যুগে গান্ধী: আজকের যুগে শিল্পের পণ্যায়ন একটি নতুন ও জটিল মাত্রায় পৌঁছেছে। NFT (Non-Fungible Token) আর্ট, AI-generated art— এই নতুন শিল্পরূপগুলো সৌন্দর্য ও মূল্যের সম্পর্ককে মৌলিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। একটি ডিজিটাল ছবি বহুমূল্যে বিক্রি হলেও সেই ছবির পেছনে কোনো মানবিক শ্রম নেই, কোনো নৈতিক উদ্দেশ্য নেই, কোনো সামাজিক দায়বদ্ধতা নেই। শিল্পকর্ম এখন মূলত একটি আর্থিক বিনিয়োগের মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। গান্ধীর দৃষ্টিতে এই প্রবণতা শিল্পের মানবিক সারসত্তাকে ধ্বংস করছে। টলস্টয়ের সংজ্ঞা অনুযায়ী যে শিল্প মানুষের মধ্যে নৈতিক অনুভূতি জাগাতে পারে না, যা মানুষকে মানুষের কাছে নিয়ে আসে না, তা প্রকৃত শিল্প নয়। AI যখন কোনো মানবিক অনুভূতি ও নৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়া ছবি বা সংগীত তৈরি করে, সেটি গান্ধীর শিল্পসংজ্ঞার সঙ্গে সম্পূর্ণ অসামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ সেখানে মানবিক শ্রম, নৈতিক উদ্দেশ্য, সৃজনশীল আত্মার প্রকাশ— কোনোটিই নেই।

খ) লোকশিল্প ও গান্ধীর নন্দনতত্ত্ব: বাংলার সমৃদ্ধ লোকশিল্প ঐতিহ্য— বাউল সংগীত, পটচিত্র, মৃৎশিল্প, কাঁথাশিল্প, বাঁশ ও বেতের কাজ— গান্ধীর নন্দনতত্ত্বের জীবন্ত উদাহরণ হিসেবে দেখা যেতে পারে। এই শিল্পগুলোতে শ্রম, নৈতিকতা ও সৌন্দর্য স্বাভাবিকভাবেই অবিচ্ছেদ্য। একজন বাউল শিল্পী যখন গান করেন, সেখানে আধ্যাত্মিক সাধনা, নৈতিক বার্তা ও নান্দনিক সৌন্দর্য একীভূত হয়— ঠিক যেমনটি গান্ধী কল্পনা করেছিলেন। একজন পটচিত্রশিল্পী যখন রামায়ণ বা মনসামঙ্গলের কাহিনি আঁকেন, সেখানেও সামাজিক নৈতিকতা ও নান্দনিক সৃষ্টি পাশাপাশি চলে।

কিন্তু আজ এই লোকশিল্পগুলো গভীর সংকটের মুখে। বাজারের চাপে অনেক কারিগর তাঁদের ঐতিহ্যবাহী শিল্প ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। পর্যটনের চাহিদা মেটাতে লোকশিল্পের রূপ পরিবর্তিত হচ্ছে— ঐতিহ্যবাহী নকশার জায়গায় আসছে বাজারমুখী নকশা, যা বিক্রি হয় কিন্তু সমাজের সঙ্গে তার নৈতিক ও

আধ্যাত্মিক যোগ ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। গান্ধীর দর্শনের আলোয় এই সংকটকে দেখলে বোঝা যায়, এটি শুধু অর্থনৈতিক সংকট নয়— এটি একটি নান্দনিকতাত্ত্বিক ও নৈতিক সংকটও।[11]

গান্ধীর কুটিরশিল্প আন্দোলনের ধারণা আজও বাংলার লোকশিল্পের পুনরুজ্জীবনে প্রাসঙ্গিক। শিল্পকে বাজারের হাত থেকে রক্ষা করতে, কারিগরের সৃজনশীল স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখতে এবং শিল্পকে সমাজের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত রাখতে গান্ধীর দর্শন একটি শক্তিশালী বিকল্প কাঠামো প্রদান করে।

উপসংহার: গান্ধীর নন্দনতত্ত্ব পাশ্চাত্যের প্রচলিত শিল্পতত্ত্বের একটি মৌলিক বিকল্প। যেখানে পাশ্চাত্য নন্দনতত্ত্বের মূলধারা শিল্পকে নৈতিকতা থেকে আলাদা করে একটি স্বায়ত্তশাসিত ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছে, সেখানে গান্ধী শিল্প, শ্রম ও নৈতিকতাকে একটি অবিচ্ছেদ্য সমগ্রে পরিণত করেছেন। তাঁর কাছে সৌন্দর্য কোনো বিচ্ছিন্ন গুণ নয়— এটি নৈতিক জীবনযাপনের স্বাভাবিক ফল।

Tolstoy ও Ruskin-এর পাশ্চাত্য নৈতিক নন্দনতত্ত্ব এবং উপনিষদ, ভগবদ্গীতা ও জৈন দর্শনের ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে একত্রিত করে গান্ধী যে শিল্পদর্শন নির্মাণ করেছেন, তা একই সঙ্গে দার্শনিকভাবে গভীর ও রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। লোকশিল্পকে সাংস্কৃতিক ভিত্তি হিসেবে পুনর্মূল্যায়ন করে তিনি দেখিয়েছেন যে শিল্প কেবল মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগীদের আনন্দের বিষয় নয়— শিল্প হতে পারে একটি গণতান্ত্রিক, নৈতিক অভিজ্ঞতা।

তাঁর নন্দনতত্ত্বের সীমাবদ্ধতা আছে— শিল্পের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে তাঁর অবস্থান কিছুটা কঠোর, এবং তাঁর অতীতমুখী দৃষ্টিভঙ্গিতে কখনো কখনো একটি রোমান্টিক আদর্শায়নের ছায়া পড়ে। কিন্তু এই সীমাবদ্ধতা তাঁর দর্শনের মূল অবদানকে ম্লান করে না। বরং আজকের ভোগবাদী শিল্পজগতে, যেখানে শিল্প ক্রমশ পণ্যে পরিণত হচ্ছে এবং কারিগরের সৃজনশীল শ্রম বাজারের চাপে বিপন্ন হয়ে পড়ছে, গান্ধীর প্রশ্নগুলো আরও জরুরি হয়ে উঠছে।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। গান্ধী, মোহনদাস করমচাঁদ. হিন্দ স্বরাজ, নবজীবন পাবলিশিং হাউস, আহমেদাবাদ, ১৯০৯।

২। Gandhi, M.K, Collected Works of Mahatma Gandhi, Publications Division, Government of India, New Delhi, 1958-1994.

৩। Gandhi, M.K. Autobiography: The Story of My Experiments with Truth, Navajivan Publishing House, Ahmedabad, 1927.

৪। Gandhi, M.K. In Search of the Supreme, Vol. 3. Edited by V.B. Kher. Navajivan Publishing House, Ahmedabad, 1962.

৫। Parekh, Bhikhu. Gandhi's Political Philosophy: A Critical Examination, Macmillan, London, 1989.

৬। Ruskin, John. The Stones of Venice, Smith, Elder & Co., London, 1851.

৭। Ruskin, John. Unto This Last, Smith, Elder & Co., London, 1862.

৮। Tolstoy, Leo. What is Art? Translated by Aylmer Maude. Oxford University Press, London, 1929.

[11] Ruskin, John. *Unto This Last.* Smith, Elder & Co., London, 1862, p. 156.

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1820-1827
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.405

রামায়ণের আধ্যাত্মিক ধারণা: ঐশ্বরিক নীতি ও মানবিক মূল্যবোধের মেলবন্ধন

সুফল মণ্ডল, *গবেষক, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

ড. সুজয়কুমার মণ্ডল, *অধ্যাপক, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.03.2026; Accepted: 28.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The Ramayana composed by the great poet Valmiki is the most prominent among the four principal Aryan epics. Moreover, it is the pristine epic of the primordial poet. The Ramayana is the holder and carrier of human culture of India as well as of South East Asia. Our civilization and culture are cherished and observed under the aegis of this epic. The Ramayana acts as a spiritual guide to the morality of people, religiousness and to protect existential crisis. The events of Ramayana uphold divine principles and human value and it make the core of religion concrete. Lord Rama had steadfast trust for righteousness and truth, Sita upholds the concrete image of womanhood, honesty and a faithful wife, Lakshmna represents renunciation and bravery and Hanuman is the symbol of selfless loyalty and devotion. These characters broaden the path of communal harmony and spiritual upliftment. On the other side Indian Hindu philosophy and Buddhist philosophy preach that attachment and illusion lead people to wrong path. Consequently we get detached remotely from the realisation of worldly truth. Like the characters of Ramayana we become errant for impiety, pride and uncontrolled desire and finally we face fall. The Ramayana determines a set of duties for people. The characters of the Ramayana prove that how the giving up a personal interest leads to greater interest and help greater social upliftment. The path of communal harmony and spiritual upliftment broadens through love, affection and respect. We also get the ultimate lesson of life I.e death is the only true and beautiful. The battle of quality among the characters opens up the direction of moral and spiritual education in this stinking world.

Keyword: Spirituality, Sacrifice, Illusion, Consciousness, Interactions, self-realization

ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্যকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়- প্রথমটি শ্রব্য কাব্য ও অপরটি দৃশ্য কাব্য। শ্রব্যকাব্যের মধ্যে অন্যতম হলো মহাকাব্য। এই মহাকাব্য কে আবার দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। একটি সাহিত্যিক মহাকাব্য বা আর্ষ মহাকাব্য ও অপরটি কলাত্মক মহাকাব্য। আর্ষমহাকাব্যের মধ্যে প্রধান চারটি মহাকাব্য হলো রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড ও ওডিসি।

পৃথিবীর আদি কবির আদি কাব্য হল মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণ মহাকাব্য। সুপ্রাচীন অখণ্ড ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান- সূর্য বংশের রাজাদের কাহিনীকে অবলম্বন করে বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেন।

রামায়ণ শুধুমাত্র ভারতের চিরন্তন মহাকাব্য নয়, প্রায় সমগ্র বসুন্ধরার সর্বকালের সকল মানুষের কাছেই শ্রেষ্ঠ জীবন আদর্শ। ভারতবর্ষের মহৎ আদর্শ ও আধ্যাত্মিক বক্তব্যকে রামায়ণের মধ্যদিয়ে বাল্মীকি প্রকাশ করেছেন। কবি তাঁর কল্পনায় মনের মাধুরী মিশিয়ে নিজের সুখ-দুঃখও নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে বিশ্ব মানবের চিরন্তন হৃদয়ের আবেগ ও জীবনের মর্মকথা ব্যক্ত করেছেন রামায়ণের চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে। এই কারণে ভারতবর্ষের প্রতিটি গ্রামের পর্ণকুটির থেকে শহরের অট্টালিকায় পরম যত্নসহকারে রামায়ণকথা পঠিত হয়ে থাকে। ভারতবর্ষের প্রতিটি ঘরে ঘরে গ্রীষ্মকালের বারিধারার মতো শক্তি ও শান্তির বাণী বর্ষণ করে চলেছে আদি কাব্য রামায়ণ। ভারতবর্ষের সাধনা, সংকল্প ও আরাধনা এই আদিকবি বাল্মীকি রামায়ণের মর্মবাণী। এই রামায়ণের মধ্যে দিয়ে প্রস্ফুটিত হয়েছে আমাদের সুজলা সুফলা ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থা ও সমাজের কল্যাণকর দিকগুলি যা যুগের পর যুগ ধরে আদর্শের সঙ্গে মান্যতা পেয়ে এসেছে ভারতবর্ষের প্রতি মানুষের হৃদয়ে। সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত রামায়ণ মহাকাব্য ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। সাহিত্য, চিত্রকলা, নৃত্যকলা, অভিনয়, শিল্প-স্থাপত্য ও অসংখ্য প্রবাদ এবং প্রবচনের মধ্য দিয়ে রামায়ণের গতি এখনও ফল্গু ধারার মত প্রবহমান। রামায়ণ কালীন সমাজ ব্যবস্থা বর্তমান কালেও যেন জীবন্ত ফসিল রূপে আমাদের ভারতবর্ষে দৃশ্যমান, উজ্বল রবির ন্যায় সর্বত্র প্রতীয়মান। ভারতের সমাজ ব্যবস্থার উপর রামায়ণের প্রভাব সর্ব ধর্মকে ছাড়িয়ে গার্হস্থ্য ধর্মের মানবিক সম্পর্ক আজও আমাদের সমাজে আদর্শ রূপে গণ্য হয়।

রামায়ণ ইক্ষাকুবংশীয় রাজাদের কাহিনী হলেও এর মূল ঘটনা মূলতঃ রাম ও রাবণকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। রাম দশরথের প্রথম পুত্র, ভাগবান বিষ্ণুর সপ্তম অবতার। রামের জীবন চরিত দ্বারা মুলতঃ ধর্মের সারাংশ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। রামায়ণ আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার সংমিশ্রণের দ্বারা মানুষের জীবনকে মহাজাগতিক আদেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলে। ভাগবান রামচন্দ্র তাঁর জীবন ও কর্মের মাধ্যমে ধর্মের মুখ্য নীতি ও ধারাগুলোকে তুলে ধরেছেন। রাক্ষসরাজ রাবণকে পরাজিত করে সীতাকে উদ্ধার করার মধ্য দিয়ে ভগবান রামচন্দ্রের সাহস, সততা, কর্তব্য, সম্মান ও সহানুভুতি প্রভৃতি গুণাবলীগুলি মূর্ত হয়ে ওঠে। রামায়ণের চরিত্রগুলি এখনও আদর্শরূপে আমাদের সমাজে বিদ্যমান, যা মানবিক বৈশিষ্ট্যচ্যুত ও হতাশাগ্রস্থ জীবনে আশার আলো সঞ্চার করে। রামচন্দ্র আদর্শ পুরুষ ও আদর্শ রাজা। তাঁর ধর্মের প্রতি নিঃস্বার্থ আনুগত্য, হাজারো প্রতিবন্ধকতার মধ্যে আদর্শ মানবের অনুপ্রেরণার আলোকবর্তিকা রূপে প্রতীয়মান। অন্যদিকে সীতা নারিশক্তির প্রতীক, হনুমান নিঃস্বার্থ সেবা, বন্ধুত্ব ও আনুগত্যকে মূর্ত করে তোলে। রামায়ণের প্রতিটি চরিত্র জীবনের গভীরতা ব্যক্ত করে, যা পাঠক ও শ্রোতৃবৃন্দের ব্যক্তিগত জীবন ও তাদের মূল্যবোধকে আধ্যাত্মিকতার মার্গে যাত্রা করতে সাহায্য করে। শুধু তাই নয় রামায়ণের চরিত্রগুলি ব্যক্তিগত ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপরও আলোকপাত করে। পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দমূলক সম্পর্ক গড়ে তোলার শিক্ষা আমরা রামায়ণে পাই। তেমনই রামায়ণ তুলে ধরে জীবনের প্রতিবন্ধকতাগুলিকে দূর করার জন্য আত্মত্যাগ, সমর্থন ও ভালবাসার মাহাত্ম্য। এই কাব্যের শিক্ষা শুধু ব্যক্তিগত নয়, পারিপার্শ্বিক লোকজন এবং সমাজকেও প্রভাবিত করে, যার ফলে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এই কাব্যের শিক্ষনীয় বিষয়গুলি ব্যক্তিগত আচরণ ব্যতীত বিস্তৃত বৃহত্তর সমাজেরও মঙ্গল সাধন করে। রামায়ণের শিক্ষণীয় বিষয়াদি হাজার বছর আগেও যেমন প্রাসঙ্গিক ছিল, আজও তেমনি মানব সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মার্গ নির্দেশ করে।

রামায়ণের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে ধর্মের সুগভীর ও জটিল ধারণা। এটি দায়িত্ব-কর্তব্য, ন্যায়পরায়ণতা ও নৈতিক আচার-আচরণের ধারণাকে প্রকাশিত করে। ধর্ম নিছক কিছু আদেশ বা নির্দেশের

সমষ্টি নয়, এটা নিজের জন্য, সমাজের জন্য ভাল কিছু নীতি নিজের মধ্যে ধারণ করা, যার দ্বারা একটি সুস্থ স্বাভাবিক সমাজ গড়ে তোলা যায়। রামায়ণে ধর্মকে অত্যন্ত অপরিহার্য নির্দেশক নিয়ম-নীতি হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, যেটি বাধা-বিঘ্নময় হতাশাগ্রস্থ জীবনে একান্ত নিজস্ব ও ব্যক্তিগত আচরণ থেকে শুরু সামাজিক নিয়মগুলিকে সুষ্ঠভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।

রামায়ণের নায়ক রামচন্দ্র তাঁর প্রত্যেকটি কর্মে ও সিদ্ধান্তে ধর্মের নীতি-আদর্শকে মূর্ত করে তুলেছেন। রাজা দশরথের প্রথম পুত্র হিসেবেও রামচন্দ্র সদগুণের মূর্ত প্রতীক। নীতি আদর্শকে মেনে চলার জন্য তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাঁর পিতৃসত্ত্ব পালনের জন্য সিংহাসন, চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাস যাত্রা সবই তাঁর ধর্মের প্রতি আনুগত্যের নিদর্শন। অযোধ্যাকাণ্ডে কৈকেয়ীর কথার উত্তরে রাম বলেন:

"অহো ধিঙ্ নার্হসে দেবি বক্তুং মামীদৃশং বচঃ।
অহং হি বচনাদ্ রাজ্ঞঃ পতেয়মপি পাবকে ।।
ভক্ষয়েহয়ং বিষং তীক্ষ্নং পতেয়মপি চার্ণবে।
নিযুক্তো গুরুণা পিত্রা নৃপেণ চ হিতেন চ।।
তদ্ ব্রুহি বচনং দেবি রাজ্ঞো যদভিকাঙ্ক্ষিতম্।
করিষ্যে প্রতিজানে চ রামো দ্বির্নাভিভাষতে।।"[১]

অর্থাৎ-

> "অহো ধিক, দেবী, আমাকে এমন বাক্য বলবেন না। আমি রাজার কথায় অগ্নিতে প্রবেশ করতে পারি, তীক্ষ্ন বিষ খেতে পারি, সমুদ্রেও পড়তে পারি, কারণ ইনি গুরু, পিতা, নৃপ এবং হিতার্থী। অতএব বলুন রাজা কি চান, আমি তাই করব। নিশ্চয় জানবেন, রাম দুরকম কথা বলে না।"

- এই বক্তব্যের দ্বারা শুধু তাঁর নিজের সততাই প্রকাশিত হয় না, বৃহত্তর সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কেও তাঁর আত্মোপলব্ধি প্রকাশিত হয়, যেখানে নিজস্ব ক্ষুদ্র স্বার্থ অপেক্ষা পরিবার ও বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থই প্রাধান্য লাভ করে। অপর দিকে রাম নিজে বিষ্ণুর অবতার হয়েও ধর্মের প্রতি অবিচল আস্থা ও ভক্তির নিদর্শন দিয়েছেন, ভগবান হয়েও ভগবানকে পূজা করেছেন। তাইতো মেঘনাথবধ কাব্যেও ধ্বনিত হয়:

আজন্ম আমি ধর্মে লক্ষ্য করি,
পূজিনু দেবতাকুলে।[২]

রামায়ণ মহাকাব্যের প্রত্যেকটি চরিত্রের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ধর্মের বিভিন্ন দিক চিহ্নিত করে। লক্ষ্মন রামের একনিষ্ঠ প্রাণপ্রিয় ভাই, যে সুরক্ষা ও আনুগত্যের প্রতীক। রামচন্দ্রের প্রিয়তমা স্ত্রী সীতা সদগুন ও বিশ্বস্ততার প্রতিনিধি। এইসমস্ত চরিত্রগুলি ছাড়াও অন্যান্য চরত্রগুলিও ধর্মের নানা দিক নির্দেশ করে। ধর্মের মূলবিষয়বস্তু স্বতন্ত্র কর্ম ব্যতীত বহুধা বিস্তৃত। এটি ব্যক্তির সমাজে প্রবহমান বিভিন্ন ভূমিকার সঙ্গে আগত বিভিন্ন দায়-দায়িত্বগুলিকে একত্রীভূত করে। এই রামোপাখ্যানটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, কিপ্রকারে রাজন্যবর্গের ন্যায়বিচারের সহিত রাজ্য শাসন করতে হবে তার সুন্দর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়:

"রক্ষিতা স্বস্য বৃত্তস্য স্বজনস্য চ রক্ষিতা।
রক্ষিতা জীবলোকস্য ধর্মস্য চ পরন্তপঃ।।"[৩]

সৈন্যদের ন্যায়-নীতি মেনে সম্মানপূর্বক যুদ্ধ করতে হবে, কীভাবে রাজ্যে বসবাসরত অধিবাসীদের নৈতিক নীতি ও আইন ব্যবস্থা মেনে চলতে হবে তার প্রত্যেকটি নীতি-আদর্শ তুলে ধরেছে। এভাবেই রামায়ণ প্রত্যেকের ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের মধ্যে সাম্যতা বুঝতে পারার একটি নৈতিক শিক্ষা প্রদান করে।

একজন মানুষকে কীভাবে জীবন অতিবাহিত করতে হবে তার ব্যাখ্যাও রামায়ণে পাই। ক্ষমতার শীর্ষে উঠেও সব কিছুকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে- এই বার্তা রামায়ণে বারংবার ধ্বনিত হয়েছে। মহৈশ্বর্যে নম্র থাকা, মহাদৈন্যে নত না হওয়ার, সম্পদে ও বিপদে অটল থাকার শিক্ষা আমরা রামায়ণ থেকে পাই। জীবনে যত সম্পদের প্রাপ্তি ঘটে, তাঁর থেকে বেশী দান করতে হবে। এই প্রসেঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় বলেছেন:

"কহ মোরে বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মানিক্যের অঙ্গদের মতো
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয়নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সবচেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক..."[৪]

ভগবান রামচন্দ্র ও হনুমানের মধ্যে যে সম্পর্ক তা ভক্তির আধ্যাত্মিক নীতিমালার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রামচন্দ্রের প্রতি হনুমানের অবিচল বিশ্বাস ও ভক্তিই এখানে মুখ্য। এই ভক্তির মাধ্যমেই আসল শক্তি মহান শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেই উদ্ভব হয়। এই ভক্তি কখনো অন্ধবিশ্বাসের মাধ্যমে অর্জিত হয় না, বরং তা ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও সুগভীর আত্মিক ভাবের মাধ্যমে অর্জিত হয়। ভক্ত হনুমানের ক্রিয়াকলাপের দ্বারা রামায়ণ দেখিয়েছে ভক্তি হল নিঃস্বার্থ আত্মসমর্পণ। রামের প্রতি হনুমানের অদম্য উৎসর্গ ভক্তির শক্তিকে চিত্রিত করে। সীতাকে উদ্ধার করা এবং রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রামকে সাহায্য করা তাঁর নিছক কৃতিত্ব ও বীরত্বের কাজ নয়, যাপ্রেম ও ভক্তির গভীর প্রকাশ। রামায়ণ এই শিক্ষা দেয় যে আন্তরিক ভক্তিসবচেয়ে কঠিন বাঁধা অতিক্রম করতে সাহস যোগায়। কেউ যখন ঐশ্বরিক ইচ্ছার সঙ্গে একাত্ম হয়, তখন সে বড় কোন বাধা-বিপত্তি লঙ্ঘন করার মত সামর্থ্য অর্জন করে। ভক্তির আধ্যাত্মিক অনুশীলন আমাদের শিক্ষা দেয় যে, আত্মসমর্পণ মানে নিষ্ক্রিয়তা নয়, আত্মসমর্পণ মানে ঈশ্বরের সাথে সম্পৃক্ততা, যা আমাদের ধার্মিক ভাবাপন্ন হতে সাহায্য করে ও মোক্ষ প্রাপ্তির দিকে এগিয়ে দেয়।

বিশেষতঃ হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্ম মতে মায়া বাস্তব ও বিভ্রমের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। মায়াকে মানুষের কাছে প্রতারণামূলক শক্তি হিসাবে বর্ণনা করা হয়, যা আমাদের উপলব্ধি করার ক্ষমতাকে হ্রাস করে দেয়। এই মায়া এমন ভাবে মোহগ্রস্থ করে তোলে যার ফলে স্থায়ী বাস্তবতা ভুলে মানুষ ক্ষণস্থায়ী ঘটনার দিকে অগ্রসর হয়। মানুষের বাস্তব উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতাকে কি ভাবে মায়া প্রভাবিত করে তার সুন্দর ব্যাখ্যা রামায়ণ তুলে ধরেছে রাবণের চরিত্রের মধ্য দিয়ে। রাবণের চরিত্রটি মোহগ্রস্থ প্রলোভনশীল মায়ার শক্তিকে প্রকাশিত করে। তিনি অপরিমিত শক্তিশালী ও অপরাজেয়, তবুও শেষ অবধি আকাঙ্ক্ষা, অধার্মিকতা ও অহংকারের দ্বারা চালিত হয়ে পরাজিত ও নিহত হন। বুদ্ধিমান মানুষকে মায়া কি ভাবে বিপথে চালিত করে এই আখ্যানটির দ্বারা তা আখ্যায়িত হয়েছে। অপর দিকে রামচন্দ্র সত্যের সাধক, মায়ার মোহগ্রস্থতা লঙ্ঘনকারী হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করেন। তাঁর সাথে রাবণের যে যুদ্ধ সেটা শুধু বাহ্যিক যুদ্ধ নয়,

প্রলুব্ধ ও বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে আভ্যন্তরীণ যুদ্ধও বটে। রামচন্দ্র তাঁর ধর্মের প্রতি অবিচল প্রতিশ্রুতির মধ্য দিয়ে, তাঁর ধার্মিকতার আদর্শকে প্রকাশিত করে তোলেন। প্রকাশ করেন জাগতিক সত্যগুলিকে।

রামায়ণের আরও একটি আলোচ্য বিষয় হল- মৃত্যুই একমাত্র চিরস্থায়ী সত্য। আমাদের আশা-ভরসা, দুঃখ-বেদনা, এমনকি আমাদের প্রিয় বস্তুও একদিন মৃত্যুতেই বিলীন হয়ে যায়। তাইতো দেখি- রাম সুন্দর রাজত্ব ছেড়ে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছেন। অপরদিকে ব্রহ্মার কথা রাখার জন্য ও অযোধ্যা রাজ্যকে অভিশাপের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য লক্ষণ নিজে মৃত্যুকে বরণ করে নেন। থেকে তাইতো রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'অপূর্ব রামায়ণে' বলেছেন:

> "যেসব জিনিস আমাদের এত প্রিয় যে, কখনো তাদের বিনাশ কল্পনাও করিতে পারি না, সেগুলিকে মৃত্যুর হস্তে সমর্পণ করিয়া দিয়া জীবনান্ত কাল অপেক্ষা করিয়া থাকি।"[৫]

রাবণ বধান্তে সুগ্রীবের ন্যায় বিভীষণের মনেও এক সংশয়ের জন্ম হয়। পাপী ভ্রাতা রাবণের মৃত্যুর পর বিভীষণ তাঁর সৎকাজ করতে অনীহা প্রকাশ করে। রাম তখন বলেন: মৃত্যুতে সমস্ত শত্রুতার মুক্তি ঘটে। তারপর ঘৃণার আর কোন অবকাশ রাখতে নেই। রামচন্দ্রের মতে জগতে ক্ষমার মত শান্তি অন্য কোন কিছুতে নেই। লক্ষ্মণ বিভীষণকে আশ্রয় দিতে নিষেধ করলে রাম বলেন: বিভীষণকে কেন রাবণকেও আশ্রয় দিতে প্রস্তুত। তাইতো বাল্মীকি রামায়ণে ধ্বনিত হয়:

"সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ব্রুতং মম।"[৬]

রামোপাখ্যান মানব জীবনের জটিল সমস্যাগুলিকে সমাধান করার ক্ষেত্রে বিচক্ষণতার উপর আলোকপাত করে। হনুমান ও সীতার মত চরিত্রগুলি মোহ-মায়ার বন্ধনপাশ অতিক্রমকারী। ভক্তি, প্রজ্ঞা ও সত্যের সাধনার দ্বারা তাঁরা মোহ-মায়ার বন্ধন ছিন্ন করেছেন। রামায়ণের মায়ার অন্বেষণ জ্ঞানপিপাসুদের নিজস্ব জীবনে তাঁদের যে বিভ্রমের সম্মুখে দাড়াতে হতে পারে সেই সম্পর্কিত চিন্তা করার আহ্বান জানায়। সাথে সাথে আত্মোপলব্ধি, নৈতিকতা, ত্যাগ ও ভক্তির মাধ্যমে মুক্তির সেই পথ বাতলে দেয়। সুপ্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যগুলির মধ্যে প্রাধান্যের দিক দিয়ে প্রথমে অবস্থান করে রামায়ণ। এই মহাকাব্যটি ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সীমানা অতিক্রম করে মানুষের সাথে সম্পৃক্ত। এই কালজয়ী মহাকাব্যটি সত্য, ন্যায় ও আধ্যাত্মিকতার মত সার্বজনীন বিষয়গুলিকে সহজভাবে ব্যাখ্যা করে, যা প্রাচীনকালের ন্যায় আজও উন্নত বিশ্বে প্রসঙ্গিকতার দাবী রাখে।

রামায়ণের অন্তরে রয়েছে ধর্মের সুগভীর ধারণা, যা ধর্মপিপাসুদের ধার্মিকতার খোঁজ দেয়। ব্যক্তির নৈতিক বাধ্যবাধকতা ও আদর্শ কর্তব্যের মধ্যে জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলিকে ফুটিয়ে তোলে করে। রামের চরিত্রে সত্য ও ন্যায়ের প্রতি অবিচল প্রতিশ্রুতি নির্দেশ করে। রামায়ণের যুদ্ধ শুধু সীতাকে উদ্ধার করা নয়, এটি একটি নৈতিক যুদ্ধ, যা প্রতিকুলতার সম্মুখে পুণ্যকে টিকিয়ে রাখার উপর জোর দেয়। উপাখ্যানটি বিভিন্ন সংস্কৃতি ও সমাজের মধ্যে প্রতিফলিত হয়, সার্বজনীনরূপে প্রযোজ্য নৈতিক নীতিগুলির অন্বেষণ করতে সাহায্য করে। এটা সততা, ন্যায্যতা ও মানবিক অবস্থা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ভাবনা উত্থাপিত করে। প্রাচীনকাল থেকে প্রত্যেক প্রজন্মকে অন্যায়ের সাথে আপোষ না করতে ও ন্যায়পরায়ণতার নিমিত্ত সংগ্রাম করতে সাহস যুগিয়ে এসেছে রামায়ণ। অন্যায়ের সাথে আপোষহীন সংগ্রামই মানুষের একমাত্র কর্তব্য হওয়া

উচিৎ। এই বিষয়গুলি আমাদের অনুপ্রাণিত করে যা আধ্যাত্মিকতার পথে এগিয়ে দেয়। এই প্রসঙ্গে মহাভারতের বিদুরের উক্তিতে পাই:

"ত্যজেৎ কুলার্থে পুরুষং গ্রাম্যর্থে কুলং ত্যজেৎ
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ।"[৭]

অর্থাৎ, বংশগৌরবের মান রক্ষার জন্য কোন মানুষকে ত্যাগ করা জেতে পারে, গ্রামকে রক্ষার জন্য বংশকে ত্যাগ করবে, দেশ রক্ষার নিমিত্ত গ্রামকে ও আত্মার কল্যাণ হেতু পৃথিবীকে ত্যাগ করা উচিত।

পৃথিবীতে একা এসেছি, একাই চলে যেতে হবে- এই আধ্যাত্মিক ধারনাও আমরা রামায়ণ থেকে পাই। দেশ, রাজ্য, নাগর, পাড়া ও স্বীয় আত্মীয় পরিজনদের কার উপরেই কারও সম্পূর্ণ স্বত্ব নেই। থাকলেও তা ক্ষণিকের জন্য। ঋষি জনক ব্রাহ্মণকে অধিকার প্রসঙ্গে উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন:

> "পৃথিবীস্থ কোনো পদার্থেই আমার সম্পূর্ণ অধিকার নাই। আমি প্রথমে সমুদয় পৃথিবীতে, তৎপরে একমাত্র মিথিলা নগরীতে ও পরিশেষে স্বীয় প্রজামণ্ডলী-মধ্যে আপনার অধিকার অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু কোনো পদার্থেই আমার সম্পূর্ণ স্বত্ব প্রতীত হইল না।"[৮]

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় প্রতিফলিত হয়- মানুষের শরীর ও মনের মধ্যে সম্বন্ধ থাকলেও পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ অধিকার বোধ নেই। মানুষ এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র, দরিদ্র ও অধিকারহীন জীব মাত্র। কিছু দিনের জন্য আমরা পৃথিবী নামক রঙ্গমঞ্চে এসেছি অভিনয় করতে। অভিনয় শেষ হলে আবার ফেরার পালা। তাই তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'অনধিকার' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন:

> "আমাদের শরীর ও মনের সহিত আমাদের সম্বন্ধ আছে বটে, কিন্তু তাহাদের উপর আমাদের অধিকার নাই। আমরা নিতান্ত দরিদ্র...।"[৯]

প্রাচীন ভারত থেকে আধুনিক ভারতের সমাজ ব্যবস্থায় প্রচলিত লোকবিশ্বাস শ্রীরামের স্মরণে গেলে বারংবার আমাদের এই নশ্বর দেহ ধারণ থেকে মুক্তি পাবো। তাইতো প্রতিটি গৃহস্থের ঘরে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ও পারলৌকিক শ্রদ্ধানুষ্ঠানে রামায়ণ পাঠ করা হয়। তাইতো কৃত্তিবাস আত্মার স্বর্গ প্রাপ্তি প্রসঙ্গে বলেছেন:

"রাম না জন্মিতে ষাটি হাজার বছর।
অনাগত পুরাণ রচিল মুনিবর।।
রাম নাম স্মরিলে যমের দায় তরি।
শ্রীরামের প্রীতি ভাই মুখে বল হরি।।"[১০]

এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রসম্মত প্রমাণও পাওয়া যায়। দস্যু রত্নাকর থেকে বাল্মীকি হয়ে ওঠা, অহল্যার পাথরের মূর্তি থেকে মানব শরীর ধারণ করা- এই রকম অনেক প্রমাণ রামায়ণের আখ্যানগুলিতে ছড়িয়ে আছে। রাম নামের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ মঠের জনৈক মহারাজ বলেছেন-

> "রামনামের মুর্ছনায় মানবমনের আনন্দবর্ধন হয়। রামনামের মহিমা ব্যাখ্যায় এই রামরহস্য আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে শুধু রাজা তার ধর্মপথ, জ্ঞানপথ, দানধ্যান বৈরাগ্যের পরকাষ্ঠায় রামনামের দ্বারা ঐশ্বর্য্য লাভ করবেন না, যোগিগণ, উপাসকগণ, যার এই রামনামে রুচি হবে তিনিই এক অপূর্ব ভাব বা হৃদয়ের ঐশ্বর্যলাভ করবেন।"[১১]

বেদব্যাসকৃত অষ্টাদশ পুরাণের মুখ্য বিষয় হল পাপ-পুন্যের হিসাব। পুরাণে জগতের সমস্ত পাপ পুণ্যকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। তাঁর মতে আপরকে সাহায্য করা হল পুণ্য আর অপরকে পীড়াদানই হল পাপ।

এই সাহায্য বা উপকারের প্রত্যুপকার নেওয়া সমাজে শোভা পায়না। কিন্তু উপকার গ্রহীতার উচিৎ উপকারী ব্যক্তিকে সাহায্য করা এবং উপকারী ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা। রামায়ণেও দেখি রামের অভিষেকের পর হনুমান বিদায় নেবার পালা। হনুমানের সামনে দাড়িয়ে রাম বলছেন: 'কপিবর! তমার এক একটি উপকারের পরিবর্তে আমি প্রান দিতে পারি, সুতরাং অবশিষ্ট উপকারের জন্য ঋণী রইলাম।'- এই মানবিক মূল্যবোধও আমরা রামায়ণ থেকে পাই।

উপসংহার: রামায়ণের আধ্যাত্মিক ধারণা মূলত ঐশ্বরিক নীতি ও মানবিক মূল্যবোধের এক অনন্য মেলবন্ধন। এখানে ধর্ম, সত্য, ন্যায় ও কর্তব্য পালনকে ঐশ্বরীয় আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং একই সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব, প্রেম, দয়া, আনুগত্য ও আত্মত্যাগের মতো মানবিক গুণাবলীর মাধ্যমে সমাজকে নৈতিকভাবে সুসংহত করার দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এই সমন্বয় রামায়ণকে কেবল একটি ধর্মীয় গ্রন্থ নয়, বরং একটি নৈতিক ও সামাজিক নির্দেশিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে, যা ব্যক্তিগত কর্তব্য ও সামাজিক দায়িত্বকে একত্রে যুক্ত করে মানবজীবনের পূর্ণতা অর্জনের পথ দেখায়। অতএব বলা যায়, রামায়ণের আধ্যাত্মিক দর্শন আজও মানবসমাজের জন্য প্রাসঙ্গিক, কারণ এটি আমাদের শেখায় যে প্রকৃত জীবনদর্শন তখনই গড়ে ওঠে, যখন ঐশ্বরীক আদর্শ ও মানবিক মূল্যবোধ একে অপরের পরিপূরক হয়। আর প্রকৃত জীবন দর্শনের মাধ্যমেই আমরা পরম পুরুষের সাথে একাত্ম হতে পারি। তাই বলা হয়- "ধর্মো হি পরমো লোকে ধর্মে সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্।"

তথ্যসূত্র:

১। বাল্মীকি রামায়ণের সারানুবাদ, রাজশেখর বসু, পৃঃ-৮২।
২। মেঘনাথবধ কাব্য জিজ্ঞসা, শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, পৃঃ-৮৯।
৩। বাল্মীকি রামায়ণ, অয্যোধ্যা কাণ্ড - ৬৭/৩৪।
৪। রামায়ণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, বারিদবরণ ঘোষ, পৃঃ- ৭৯।
৫। রামায়ণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, বারিদবরণ ঘোষ, পৃঃ- ৬৪।
৬। বাল্মীকি রামায়ণ, ৬.১৮.৩৩।
৭। রামায়ণ কথা, স্বামী তথাগতানন্দ, পৃঃ- ১৪১।
৮। মহাভারত, কালীপ্রসন্ন সিংহ, আশ্বমেধিক পর্ব,পৃঃ- ৪২।
৯। রামায়ণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, বারিদবরণ ঘোষ, পৃঃ- ৯৪।
১০। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, বিরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, পৃঃ- ২২৬।
১১। বঙ্গভূমিতে রামায়ণ চর্চার ঐতিহ্য, পৃঃ-৫০।

গ্রন্থপঞ্জি:

১। করণ, সুধীরকুমার। রামায়ণের বিশ্বায়ন। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১২।
২। বসু, রাজশেখর। বাল্মীকি রামায়ণের সারানুবাদ। কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ডসন্স, ১৯৯০।
৩। ভট্টাচার্য, হেমচন্দ্র। বাল্মীকি-রামায়ণ। কলকাতা, ভারবি, ১৯৭৮।
৪। সেন, দীনেশচন্দ্র। রামায়ণী কথা। কলকাতা, পাতাবাহার, ১৪১৬ বং।
৫। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ। বাল্মীকির রাম ও রামায়ণ। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট

লিমিটেড, ২০১০।

৬। ভট্টাচার্য, শ্রীশিবপ্রসাদ। মেঘনাথবধ কাব্য জিজ্ঞসা। কলকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাঃলিঃ, ১৩৬৬ বং।

৭ ।বরকত, হিমেল। চন্দ্রাবতীর রামায়ণ ও প্রাসঙ্গিক পাঠ। ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স,২০১২।

৮। কর্মকার, সপ্তদীপা। প্রসঙ্গ বাংলা রামায়ণ। কলকাতা, দোসর পাবলিকেশন, ২০২২।

৯। চক্রবর্তী, তনিমা। কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও বাংলার লোকঐতিহ্য। কলকাতা, পুস্তক বিপনি, ২০১১।

১০। তর্করত্ন, পঞ্চানন। অধ্যাত্ম-রামায়ণ। কলকাতা, বিহারীলাল সরকার, ১৮৮৮।

১১। মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ। রামায়ণ যুগের ভারত। কলকাতা, নির্মলচন্দ্র ঘোষ, ১৩১৯ বং।

১২। ঘোষ, তপন কুমার। জন্মভিত্তিক জাতি ও বর্ণ এবং রামের শক্তিপথ। কলকাতা, তুহিনা প্রকাশনী, ১৪২১ বং।

১৩। তর্কভূষণ, চন্দ্রকান্ত। রঘুবংশ। কলকাতা, সংস্কৃত প্রেস, ১৮৬৯।

১৪। ঘোষ, বারিদবরণ। রামায়ণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ। করুণা প্রকাশনী, ২০০৮।

১৫। সিংহ, কালিপ্রসন্ন। মহাভারত (অনুবাদ)। ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, কলকাতা, ১৭৮১ শকাব্দ।

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1828-1834
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.406

বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতা ও রেল: উত্তর ঔপনিবেশিক প্রেক্ষিত

সঙ্গীতা চ্যাটার্জী, *গবেষক, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 23.03.2026; Accepted: 30.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

During the colonial era, the railway emerged as one of the primary vehicles of modernity. Far from being merely a mode of transportation, the railway played a pivotal role in the restructuring of India's regional culture and society. Among the diverse genres found within the tradition of the Bengali novel, the 'regional novel' stands out as a distinct category. This study delineates the evolution of the twentieth-century Bengali novel, situated against the backdrop of regionalism and the railway. It presents a comparative analysis of the railway's role within regional contexts—contrasting its significance during the colonial period with that of the post-colonial era. Furthermore, the discussion explores the profound interrelationship between regional culture, the railway, and the broader discourse of post-colonialism.

Keywords: Railway, Society, Bengali novel, Twentieth-century, colonial period, post-colonial.

পৃথিবীতে সাহিত্য সংস্কৃতি নির্বিশেষে বিভিন্ন তত্ত্বের উদ্ভব ঘটেছে। তাছাড়াও সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি নানান ক্ষেত্র বিশেষে তত্ত্বের অন্ত নাই। প্রাচ্য -পাশ্চাত্যে এই দুই ধারাতেই যার প্রমাণ পাওয়া যায়। বস্তুত এমনই একটি মৌলিক দর্শন হলো উত্তর- ঔপনিবেশিক তত্ত্ব। ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির পাল্টা হিসাবে যার উৎপত্তি। মূলত ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে Frantz Fanon এর লেখা 'The Wretched of the Earth' বইটির মধ্য দিয়েই উত্তর ঔপনিবেশিক তত্ত্বের যাত্রাপথ শুরু হয়। বিশেষ করে উপনিবেশিক শাসনের অধীন দেশগুলোর শিল্প ও সংস্কৃতির পাল্টা স্রোত থেকেই যেহেতু প্রধান ভাবে এই উত্তর ঔপনিবেশিকতাবাদের জন্ম হয়, তাই সেই পরাধীন দেশ গুলির সাংস্কৃতিক আবর্তের মধ্যেই জারিত হতে শুরু করেছিল এই নবভাবনার প্রাক্ লগ্ন। যে প্রাক্ লগ্নের চিত্র পরিলক্ষিত হয় ভারতীয় তথা বঙ্গ শিল্প সংস্কৃতির ধারায়। কবিতা, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ, পত্রসাহিত্য, চিত্রকলা, সংগীত, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, এই সমস্ত শিল্প নির্বিশেষে উপনিবেশবাদকে অতিক্রম করার একটা প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় বাংলার সাংস্কৃতিক পটভূমিতে। বিশেষ করে আঞ্চলিক উপন্যাসের আখ্যান গুলিতে বিষয় ও শৈলীর উপস্থাপনায় উত্তর ঔপনিবেশিক চিন্তা চেতনার একটা ব্যাপক মুখ ও মুখোশ হয়ে দাড়ায় বাংলা ভাষায় রচিত বিভিন্ন আঞ্চলিক উপন্যাস গুলি। উত্তর

ঔপনিবেশিক চিন্তাধারা ও বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতা যেন হয়ে ওঠে একটা কয়েনের দুটি পিঠ অর্থাৎ একে অপরের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত।

উনিশ শতকে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের যাত্রা শুরু, তখন ইংরেজ শাসনের কাল ও বাংলা উপন্যাস যাত্রায় ছিল ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব। উনিশ শতকের উপন্যাসিকদের রচনায় বাংলা উপন্যাসের শিকড় সন্ধান পাওয়া গেলেও তা ছিল ইউরোপীয় সাহিত্যিকদের দ্বারা প্রভাবিত। তারা বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে যে যুগের সূচনা করেছিলেন তার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয় কল্লোল যুগে। এই সময় থেকে উত্তর উপনিবেশিক পর্বের সূত্রপাত ঘটে। এই পরিবর্তনীয় ভাবধারায় বাংলা উপন্যাসে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত জীবনের পরিধিকে অতিক্রম করে সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নবর্গের মানুষের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। ঠিক এই সময় থেকেই উত্তর ঔপনিবেশিক পর্বের সূত্রপাত ঘটে। বিশেষভাবে উপনিবেশিক শাসনের সুফল হিসাবে উদ্ভূত রেল ক্রমশ আঞ্চলিকতার একটা বিশেষ আকর হয়ে দাঁড়ায়।

আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও রেল: উত্তর ঔপনিবেশিক তত্ত্বের সংযোগ সূত্র

আলোচনার শুরুতেই আঞ্চলিক উপন্যাস বলতে ঠিক কী বোঝায়, কতটুকুই বা তার পরিসর এই বিষয়টিকে জানা আবশ্যিক। 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে আঞ্চলিক উপন্যাসের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে ড.শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন,

> "এই জাতীয় উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য হল অপরিচয়ের রহস্যমণ্ডিত সুদূর ভৌগোলিক ব্যবধানে অবস্থিত কোন অঞ্চলের বিশিষ্ট জনপ্রকৃতি, সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্মবিশ্বাস সংস্কারের ব্যাপারে চিত্রাংকন অথবা কোন বিশেষ ধরনের বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর বিশিষ্ট জীবনবোধে পরিস্ফুট। আঞ্চলিক সাহিত্যের সংজ্ঞা নির্দেশ কিছুটা দুরহ। পরিবেশ সাধারণত সকল মানুষের মনের উপরই প্রভাবশীল। মানবজীবন লীলার স্বাধীন ছন্দও উহার নিগূঢ়, কখনো দুর্নিরিখ্য নিয়ন্ত্রণের চিহ্ন বহন করিয়া থাকে।"[১]

অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের বিশিষ্ট ভূপ্রকৃতি সহ সেখানে বসবাসকারী মানুষজনের জীবনচর্চা অর্থাৎ তাদের জীবন জীবিকা, আচার-আচরণ, রীতি পদ্ধতি, বিশ্বাস সংস্কার, লোকাচার- লোকরুচি বিশিষ্ট ধর্ম বিশ্বাস, বিশিষ্ট পোশাক–পরিচ্ছদ, খাদ্য তালিকা ও খাদ্যাভ্যাস, নিজস্ব ভাষা প্রভৃতি বিষয়গুলি একত্রিতভাবে প্রকাশিত হয়ে এক ধরনের আঞ্চলিক রং বা লোকাল কালার প্রকাশ করে নির্দিষ্ট অঞ্চলটি একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হয়ে উঠলে সেই আখানধর্মী রচনাটিকে আমরা আঞ্চলিক উপন্যাস বলতে পারি।

বাংলা উপন্যাসে এই আঞ্চলিকতার অন্যতম আশ্রয় হয়ে ওঠে রেল, রেলের পটভূমি। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে বাংলায় রেল চালু হয় ১৮৫৪ সালের ১৫ই আগস্ট। বস্তুত রেলকে কেন্দ্র করে জনগণের পাশাপাশি সাহিত্যের মধ্যেও একটা উন্মাদনা লক্ষ করা যায়। রেল কেন্দ্রিক অঞ্চল, রেল শহর, রেল কেন্দ্রিক মানুষের জীবন জীবিকা রেলের প্রেক্ষিতে বদলে যাওয়া সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে রেল হয়ে ওঠে স্বতন্ত্র। উপনিবেশিক চেতনাকে কাটিয়ে সাধারণ নিম্নবর্গের জীবনাচরণের মাধ্যমে রেলমাধ্যম শুধুমাত্র যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক উন্নতির বাহন হিসাবেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, সেই পটভূমিতে সচেতন ও অবচেতন স্তরে পরিলক্ষিত হয় উত্তর ঔপনিবেশিক দর্শন এর বিষয় ও বৈশিষ্ট্য। উত্তর ঔপনিবেশিক তত্ত্ব ও আঞ্চলিক উপন্যাসের ধারা একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে। এই পরিপূরক সম্পর্কের বিষয়টি কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের নিরিখে আরো বেশি সুদৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের জাতীয়তাবাদী ইতিহাস চিন্তা উচ্চ বর্গীয় এলিট শ্রেণীর তাই সমাজের উচু তলার মানুষেরাই একসময় শুধু ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছে। উত্তর ঔপনিবেশিক পর্বে ক্রমশ নিম্নবর্গের মানুষদের নিয়েও ইতিহাস ও সাহিত্যচর্চার ধারা লক্ষ করা যাচ্ছে। এমনকি সাহিত্যেও প্রধান চরিত্ররূপে স্থান পাচ্ছে এই নিম্নবর্গের মানুষরা। আঞ্চলিক উপন্যাসের চরিত্রগুলি ও অনুন্নত শ্রেণীর তাদের পুঁথিগত শিক্ষা দীক্ষাও থাকে না তেমন, এদের ওপর সেই নির্দিষ্ট অঞ্চলের সংস্কৃতি ও প্রকৃতির অমঘ প্রভাব লক্ষ করা যায়। উত্তর ঔপনিবেশিক চর্চার এই ভাবধারা প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে অঞ্চলগত উপন্যাস গুলির কাহিনি চরিত্র ও পটভূমিজুড়ে।

ঔপনিবেশিক পর্বে রচিত উপন্যাস গুলিতে দেখি মানুষ খাদ্যাভ্যাস ও পোশাক পরিচ্ছেদে শাসক শ্রেণীর অন্ধ অনুকরণ করেছে। কিন্তু উত্তর ঔপনিবেশিক পর্বে এই অন্ধ অনুকরণ কে কাটিয়ে ওঠার একটা প্রবণতা লক্ষ করা যায়। যার প্রতিফলন ঘটে আঞ্চলিক উপন্যাস গুলিতে।

উত্তর ঔপনিবেশিক পর্বে উপন্যাসিকরা আঞ্চলিক ভাষায় উপন্যাস রচনা করতে শুরু করলেন। আঞ্চলিক ব্যাকরণ, শব্দ, উচ্চারণের প্রয়োগই হয়ে উঠলো এই সময়ের রচিত আঞ্চলিক উপন্যাস গুলির প্রধান উপকরণ।

সংস্কৃতির সমন্বয় উত্তর উপনিবেশিক কাল পর্বের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আঞ্চলিক উপন্যাস গুলিতে ভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয় লক্ষ করা যায়।

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের নিম্নবর্গের মানুষের আখ্যান নির্মাতা তিন বন্দোপাধ্যায়ের রচিত বিভিন্ন উপন্যাস গুলিতে একাধিক আঞ্চলিক উপাদান পাওয়া যায় যা উত্তর ঔপনিবেশিক পর্বের বৈশিষ্ট্য গুলির ধারক ও বাহক তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় রচিত ‘কবি’ উপন্যাসটি যে কারণে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে তা হল অস্পৃশ্য ডোম বা দলিত জনগোষ্ঠীর থেকে কবি নির্মাণ। অন্যদিকে তার ‘গণদেবতা’ উপন্যাসে রেল প্রেক্ষিতে অনিরুদ্ধ কর্মকারের জীবিকার রদবদলের কাহিনি, ‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’ উপন্যাসে রেল প্রেক্ষিতে জীবিকার বিবর্তন চিত্র, কাহার সমাজের মানুষের আখ্যানের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে।

আঞ্চলিকতা ও রেলের পটভূমিতে বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসের ক্রমানতর ও তার স্বরূপ সন্ধান: সমগ্র বিশ্বে একটি জনপ্রিয় সাহিত্য শাখা হল উপন্যাস। সাহিত্যে উপন্যাস আবির্ভাবের সময় থেকে আজ পর্যন্ত নানা বিবর্তন ঘটেছে। উপন্যাসের রূপান্তর হয়েছে। বিবর্তনের ধারা বেয়ে উপন্যাসের নানা শ্রেণীবিভাগ তৈরি হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল আঞ্চলিক উপন্যাস। গতানুগতিক উপন্যাসের স্বাদ পরিবর্তিত হয়ে পাঠকমনে নানা কৌতূহলের সূচনা হল। ইংরেজি সাহিত্য তথা বিশ্ব সাহিত্যে প্রথম আঞ্চলিক উপন্যাস লেখেন আইরিশ লেখিকা মারিয়া এজওয়াথ। পরবর্তীকালে এলিজাবেথ গ্যাসকেল, জর্জ এলিয়ট, রিচার্ড ব্ল্যাক মোর, টমাস হার্ডি প্রভৃতি স্বনামধন্য উপন্যাসিকরা উপন্যাস রচনা করেন। বাংলা সাহিত্যে যথার্থভাবে আঞ্চলিক উপন্যাস রচিত হয় বিশ শতকের দুই এর দশকে। কল্লোল পর্বের দুজন ঔপন্যাসিক প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত রচিত যথাক্রমে ‘পাক’ ও ‘বেদে’ উপন্যাস দুটি প্রথম বাংলা উপন্যাসের পরিচিত ছক ভেঙ্গে নির্দিষ্ট অঞ্চল ও সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের গল্প বলে। সেই ধারা বেয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ীর মতো অজস্র কথাসাহিত্যিকদের আবির্ভাব ঘটে।

সার্বিকভাবে কোন বিশেষ অঞ্চলকে পটভূমি করে রচিত উপন্যাস গুলি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে পরিগণিত হয়। যেমন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'হাসুলী বাঁকের উপকথা'উপন্যাসটি শুরুই হচ্ছে নির্দিষ্ট অঞ্চলের বর্ণনার মধ্য থেকে –

> "...কোপাই নদীর প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় যে বিখ্যাত বাঁকটার নাম হাঁসুলী বাঁক অর্থাৎ যে বাঁকটায় অত্যন্ত অল্প পরিসরের মধ্যে নদী মোড় ফিরেছে, সেখানে নদীর চেহারা হয়েছে ঠিক হাওলী গয়নার মত। বর্ষাকালে সবুজ মাটিকে বের দিয়ে পাহাড়িয়া কোপাইয়ের গিরিমাটি গোলা জলভরা নদীর বাঁকটিকে দেখে মনে হয়, শ্যামলা মেয়ের গলায় সোনার হাঁসুলি, কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসে জল যখন পরিষ্কার সাদা হয়ে আসে তখন মনে হয় রুপোর হাসুলি। এইজন্য বাঁকটার নাম হাঁসুলী বাঁক। নদীর বেড়ের মধ্যে হাঁসুলি বাঁকে ঘন বাঁশবনে ঘেরা মোটমাট আড়াই শো বিঘা জমি নিয়ে মৌজা বাঁশবাঁদি লাট জঙ্গলের অন্তর্গত। বাঁশবাঁদির উত্তরেই সামান্য খানিকটা ধানচাষের মাঠ পার হয়ে জাঙল গ্রাম। বাঁশবাদি ছোট গ্রাম, দুটি পুকুরের চারি পাড়ে ঘর তিরিশেক কাহারদের বসতি, জাঙ্গল গ্রামে ভদ্রলোকের সমাজ– কুমার–সদ্ গোপ, চাষী নন্দগোপ এবং গন্ধবণিকের বাস, এ ছাড়া নাপিতকূল ও আছে এক ঘর,এবং তন্তুবায় দুঘর। জাঙলের সীমানা বড় হাঁসিল জমিই প্রায় তিন হাজার বিঘা, পতিত ও অনেক নীলকুঠির সাহেবদের সায়েবডাঙার পতিতই প্রায় তিন শো বিঘা।"[২]

বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতা নির্মাণের অন্যতম উপাদান রূপে উঠে আসে রেল। রেল শহর, রেল কেন্দ্রিক জীবন সংস্কৃতি, হকারদের কথা, নির্দিষ্ট রেল স্টেশনে সংলগ্ন মানুষের কথা। শহরকেন্দ্রিক রেলজীবন থেকে শুরু করে শহরতলীর স্টেশন গুলির জীবন সংকট ও রোমান্সের ডিসকোর্স নির্মিত হচ্ছে রেলকে কেন্দ্র করে। উদাহরণ হিসাবে নিমাই ভট্টাচার্যের 'ইনকিলাব', বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'রেলরঙ্গ', শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'চন্দনেশ্বর জংশন' প্রভৃতি উপন্যাসের কথা বলা যায় । নির্দিষ্ট রেল স্টেশনের ক্ষুদ্র পটভূমিকায় জীবনযাপনের বিচিত্র অনুভবের ডিসকোর্স নির্মিত হয়েছে উপন্যাস গুলির গঠন প্রক্রিয়ায় –

> "লাইট রেলওয়ে স্টেশনের ঠিক সামনেই নবনির্মিত একটি ছোট্ট বাংলোয় অলোকরা এসে উঠেছে। পক্ষকালের মধ্যে অলোকের শারীরিক গ্লানি দুর্বলতা দূরীভূত হয়েছে। ডা: রায়ের পিসিমা অলোককে যথেষ্ট স্নেহ করেন, সে যে তাদের কেউ নয় নতুন আলাপী বোঝবার কোন উপায় নেই। পিসিমার কথাবার্তায় মনে হয় অলোকের সঙ্গে যেন তার বহু দিনের পরিচয়, তিনি যেন তাকে শিশু কাল থেকে মানুষ করে তুলেছেন।"[৩]

বস্তুত এইভাবে বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতা ও রেল সংমিশ্রণের ধারায় পরিণত হয়েছে একক মাত্রায়।

মোটকথা রেলকে কেন্দ্র করে এভাবেই অঞ্চলগত উপন্যাসের একটি দ্বিমাত্রিক সংমিশনের ধারা গড়ে উঠেছে। আবার যে ধারা তৈরি হচ্ছে, কখনও বা রেলকে অপ্রধান করে আখ্যান নির্মাণের ধারায় কখনও বা গড়ে উঠেছে রেলকেই প্রত্যক্ষ চরিত্র করার মধ্য দিয়ে। একপ্রকার রেলই হয়ে উঠেছে উপন্যাসগুলির প্রধান নায়ক রূপ। 'রেলরঙ্গ', 'রেলকলোনি' 'রেললাইনের ধারে', 'মরিয়ম', 'ইনকিলাব', 'প্রথমপ্রহর' 'হারানো ট্রেন' প্রভৃতি উপন্যাসের আখ্যান নির্মাণের অন্যতম প্রধান চরিত্র হয়ে উঠল রেল। 'মরিয়ম' উপন্যাসের শুরুই হচ্ছে নির্দিষ্ট রেল অঞ্চলের এক কোয়ার্টারের বর্ণনার মধ্যে দিয়ে —

"রেল কোয়ার্টার আশ্বিনের সোনালী রোদে ভেজা চুল মেলে দিয়ে মরিয়ম সদ্য ঘুমন্ত ছেলের দোলনার দড়িটা মৃদু টান লাগাচ্ছিল মাঝে মাঝে, আশঙ্কা হচ্ছিল দোলা থামলেই বুঝি ছেলে জেগে ওঠে।

আনিম ধপ করে বারান্দায় রেশনের ধামাটা নামিয়ে রেখে বলল, নাও অতিকষ্টে এইটুকু পাওয়া গেল। তেল নেই, ডাল উধাও! একটা হেস্তনেস্ত না করলে হবেনা। স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে মরিয়ম বলল খুব হয়েছে! যাও এবার গোসল করে এস। ভাত হয়ে গেছে। এত সকালে ভাত খাব না। আমাকে একটু চা করে দাও না। মিনতির সুরে গৃহিনীর মন গলল না, আবার চা? দশটার ট্রেন সেই কখন চলে গেছে। যাও গোসল করে এস বলছি।"[৪]

বস্তুত উপন্যাসের শুরুর কথাই জানান দিয়ে দিচ্ছে রেলপ্রেক্ষিতের গুরুত্বকে — রেলের পটভূমির মধ্য দিয়ে কাহিনির বুনোন কথার সূত্রকে। অর্থাৎ বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসের যে আঞ্চলিকতার নির্মাণ ও তার প্রকাশের একটি সচেতন ধারা তৈরি হয়েছিল, সেই ধারার অন্যতম একটি আশ্রয় রূপে উঠে এসেছে রেলপ্রসঙ্গ – নির্দিষ্ট রেল অঞ্চলের প্রেক্ষাপট। একই সাথে তা যেমন আঞ্চলিক উপন্যাসের ভিন্ন ভিন্ন স্তর গুলিকে উদঘাটন করেছে তেমনি আবার রেলের কথাপ্রসঙ্গ নির্মিতি হয়েছে বিশেষ শিল্প প্রকাশের ভঙ্গিমা। কাহিনি চরিত্র পটভূমি এসবই একজোটে একটা রেলকেন্দ্রিক আঞ্চলিকতার সামগ্রিক গঠন ও বিষয়কে প্রকাশ করেছে।

বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসের রেল প্রসঙ্গ ও আঞ্চলিকতা -:উত্তর ঔপনিবেশিক পূর্ববর্তী পর্যায়–

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের মধ্য দিয়ে বাংলা উপন্যাসের যাত্রা শুরু হলেও কথাসাহিত্যে যাত্রা প্রারম্ভের অর্ধশতাব্দী অতিক্রম করলেও সেই অর্থে আঞ্চলিকতার অনুপ্রবেশ ঘটেনি। বিশ শতকের দুই এর দশকে বাংলা কথাসাহিত্যে প্রথম আঞ্চলিকতার অনুপ্রবেশ ঘটান শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। তার সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেছেন –

"....বাংলা সাহিত্যে ইনি সেই কয়লা কুঠির আবিষ্কর্তা। নিঃস্ব, রিক্ত, বঞ্চিত জনতার প্রথম প্রতিনিধি, বাংলা সাহিত্যে যিনি নতুন বস্তু নতুন ভাষা নতুন ভঙ্গি এনেছেন....।"[৫]

এছাড়াও বিশ শতকের শুরুতে যারা উপন্যাস চর্চায় এগিয়ে এসেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। 'কালের প্রতিমা' গ্রন্থে অরুন কুমার মুখোপাধ্যায় প্রেমেন্দ্র মিত্রকে আঞ্চলিক জীবনের সবচেয়ে বড় রসস্রষ্টা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বসূরী বলেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের জনপ্রিয় উপন্যাস 'পাঁক' এই উপন্যাসটিতে তিনি পরিচিত কোন শহরাঞ্চল বা গ্রামীণ এলাকাকে পটভূমি না করে মূল সমাজে অবস্থান করলেও বিচ্ছিন্ন সমাজের উচ্চ সম্প্রদায়ের চোখে অবহেলিত অস্পৃশ্য মুচিপাড়া কে বেছে নিয়েছেন। কালাচাঁদ, নেত্য, পাঁচী, আহ্লাদীর মত বস্তির মানুষজনের প্রতিনিধিত্ব করেছে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের লেখা 'বেদে', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পদ্মা নদীর মাঝি' জনপ্রিয় আঞ্চলিক উপন্যাস গুলির অন্যতম।

আবার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'আরণ্যক' উপন্যাসটি লবটুলিয়া,বইহার, ফুলকিয়া, প্রভৃতি অঞ্চলের অরণ্য প্রকৃতি ও মানুষের জীবনযাত্রা অবলম্বনে রচিত। উপন্যাসটির বিজ্ঞাপন অংশে বলা হয়েছে,-

"আরণ্যক এর পটভূমি সম্পূর্ণ কাল্পনিক নয়, কুশী নদীর অপর পাড়ে এরূপ দিগন্ত বিস্তর অরণ্য প্রান্তর পূর্বেও ছিল এখনো আছে। দক্ষিণ ভাগলপুর ও গয়া জেলার বন পাহাড় তো বিখ্যাত।"[৬]

ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কে আঞ্চলিক উপন্যাসের স্রষ্টা বলা যেতে পারে। তার রচিত 'ধাত্রী দেবতা', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', সর্বোপরি 'কবি' উপন্যাসটিকে আঞ্চলিক উপন্যাসের খনি বলা যেতে পারে। বিশ শতকের প্রথমার্ধে একেবারেই শেষে আরো একটি উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক উপন্যাস হল সতীনাথ ভাদুড়ি রচিত 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'।

আবার জ্যোতির্ময়ী দেবী রচিত 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাসটিতে রেলের প্রেক্ষাপটে ভিন্ন সংস্কৃতির (শিখ, পাঞ্জাবি, মারাঠী, বিহারী, বাঙালি) মানুষের মিলন ঘটেছে, সংস্কৃতির আদান-প্রদান ঘটেছে। ট্রেনের একটি নির্দিষ্ট কামরা যা আঞ্চলিকতার মাত্রা রূপে পরিগণিত হয়েছে। তেমনি আবার আঞ্চলিক উপন্যাসের সংকীর্ণ গন্ডিকে অতিক্রম করেছে রেল প্রেক্ষিত।

এইভাবে লক্ষ করলে দেখতে হবে পাব উত্তর উপনিবেশিক তত্ত্ব আবিষ্কারের অনেক পূর্বেই বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসের মধ্যে তার একটা ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয় উত্তর ঔপনিবেশিক চেতনায় যেভাবে অন্ত্য বর্গের জীবনচর্চার একটা ব্যাপক পরিধি গড়ে ওঠে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে একটু গভীরভাবে অনুধাবন করলেই আমরা দেখতে পাবো উক্ত তত্ত্ব আবির্ভাবের আগেই নিম্ন বর্গীয় চিন্তা চেতনার বীজ রোপিত হয়েছিল বাংলা উপন্যাসের পৃষ্ঠায়।

বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসের রেল প্রসঙ্গ ও আঞ্চলিকতা : উত্তর ঔপনিবেশিক পর্ব : বিশ শতকের বিশের দশকে বাংলা গল্প উপন্যাসে যে আঞ্চলিকতার সূত্রপাত ঘটে, ছয়ের দশকের পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ উত্তর ঔপনিবেশিক সময়কালে তা চরমসীমায় পৌঁছায়। বিশেষ করে ভারতীয় তথা বাংলা পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতা লাভের পর চিন্তা চেতনাকে সরিয়ে দেশীয় ভাবধারায় সংস্কৃতি চর্চার উদ্যোম আরও বেশি করে পরিলক্ষিত হয়। সেই চেতনার মধ্যেই আরও ঘৃতাহুতি দান করে উত্তর ঔপনিবেশিক তত্ত্বের আগমন। একদিকে যেমন ইতিহাস চর্চা, শিল্পচর্চা, ভাষা চর্চা, নির্বিশেষে বিভিন্ন দিকে এই উত্তর ঔপনিবেশিক ভাবনার একটা ব্যাপকতর প্রভাব লক্ষ করা যায়, তেমনভাবেই সাহিত্যের বিভিন্ন আঙিনায় তার ছাপ পড়ে। বিশেষ করে বাংলা ভাষায় রচিত আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রকরণে এই তত্ত্বের প্রভাব আরো গভীরতর রূপ ধারণ করে। নারীবাদী চেতনা, নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবন চর্চা, আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও ভাষা চর্চার একটা বৃহৎ ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায় আঞ্চলিক উপন্যাস গুলি। পাশাপাশি রেলও হয়ে ওঠে তার অন্যতম একটা আকর উপাদান।

উত্তর ঔপনিবেশিক সময়কালে রচিত বিভিন্ন উপন্যাসের আখ্যান নির্মাণে রেল হয়ে উঠেছে অন্যতম উপাদান ও চরিত্র। উপন্যাসের বুননে অন্যতম জায়গা করে নিয়েছে রেল। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসে আমরা দেখি –

> "রাত সাড়ে নটায় ট্রেন থেকেই প্রতাপ বেরিয়ে পড়ার জন্য তারা দিচ্ছেন। হাওড়া স্টেশনে পৌঁছাতে ঘন্টা দেড়েক লাগবে, আগে ভাগে গিয়ে ট্রেনে জায়গা দখল করতে হবে। কিন্তু মমতার খুঁটিনাটি কিছুতেই শেষ হয় না.... "[৭]

মোহিতোষ বিশ্বাস রচিত 'উচ্ছিন্ন পরবাস' উপন্যাসটিতে রেল সকল মানুষের অন্যতম প্রধান আশ্রয়ে পরিণত হয়েছে। রেলকে কেন্দ্র করে অতি সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে উপন্যাসিকের বর্ণনায়-

> "দূর মফস্বল উজিয়ে ট্রেন আসে। নিহতই সে ট্রেন যাত্রীবাহন ক্ষমতার ঊর্ধ্ব সীমারেখা অতিক্রান্ত। কেরানী বাবু, শিক্ষক, ছাত্র, ব্যবসায়ী, ভবঘুরে ভিখারী হরেক ধান্দায় কর্মকাণ্ডের এক বিশাল প্রবাহ..."[৮]

রমাপদ চৌধুরীর 'স্বজন' উপন্যাসটিতে রাঁচি পালামৌ হাজারীবাগের কয়লা খনি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে রচিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত এই উপন্যাসটিতে খনি অঞ্চলের শ্রমিকদের জীবন সংকটের আখ্যান নির্মিত হয়েছে রমাপদ চৌধুরীর কলমে। এই পর্বের আরও এক জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক মহাশ্বেতা দেবী ইতিহাসের বিনির্মাণ ঘটিয়েছেন তার কালজয়ী উপন্যাস 'অরণ্যের অধিকার' আখ্যানটির মধ্যে। নিম্ন শ্রেণীর মানুষের জীবন সংকটের সুনিপুন রূপায়ণ ঘটিয়েছেন এই উপন্যাসটিতে। ঔপনিবেশিক চেতনার বিরুদ্ধে পরিপন্থী এক বিকল্প ভাবনার পরিচায়ক হয়ে যায় 'অরণ্যের অধিকার'।

অর্থাৎ ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিক থেকেই রেল হয়ে উঠেছে উত্তর ঔপনিবেশিক চিন্তা প্রকাশের অন্যতম প্রধান আশ্রয় স্বরূপ,কখনো নির্দিষ্ট রেল অঞ্চলের সীমার মধ্যে কখনো আবার সেই নির্দিষ্ট পরিধিকে ছাড়িয়ে আঞ্চলিকতারও নতুন মাত্রা যোগ করেছে রেল।

তথ্যসূত্র:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা। মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৩৪৫, পৃ. ৭২৭।

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর। হাঁসুলী বাঁকের উপকথা। বেঙ্গল পাবলিশার্স লিমিটেড, ষষ্ঠ সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৬৬, পৃ. ১।

৩. দাশগুপ্ত অজয়, 'রেল কলোনি' ডি এম লাইব্রেরী, প্রথম সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৩৫৫,পৃষ্ঠা ২২৭-২২৮।

৪. বিশ্বাস কুমুদ, 'মরিয়ম', সাধারণ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, আষাঢ় ১৩৬২, পৃ. ৫।

৫. সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার। কল্লোল যুগ। এম.সি সরকার এন্ড সনস প্রাইভেট লিমিটেড, দশম মুদ্রন, শ্রাবণ ১৪১৬, পৃ. ১৬।

৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। আরণ্যক। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, দ্বাবিংশ মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪১৫, পশ্চাৎ প্রচ্ছদের বিজ্ঞাপন অংশ।

৭. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল। পূর্ব-পশ্চিম (অখণ্ড সংস্করণ)। আনন্দ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৩, পৃ. ৩।

৮. বিশ্বাস, মোহিতোষ। উচ্ছিন্ন পরবাস। গ্রন্থ তীর্থ, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৩,পৃ. ২৬।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'চন্দনেশ্বর জংশন' প্রথম প্রকাশ, আনন্দ, এপ্রিল ১৯৬০।

২. দেবী মহাশ্বেতা, 'অরণ্যের অধিকার 'করুণা প্রকাশনী, ত্রয়োবিংশ মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪১৮।

৩. চৌধুরী প্রদোষ,' সামাজ চিত্রে ভারতীয় রেল' গাঙচিল, দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০২০।

৪. চৌধুরী ফখরুল,' উপনিবেশবাদ ও উত্তর ও উপনিবেশিক পাঠ ', আগামী প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৯।

৫. বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ, 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর' নতুন সাহিত্য ভবন, প্রথম সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৬৮।

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1835-1848
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.407

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে সমবায়: প্রমাণতাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ

পূর্ণিমা গুছাইত, *গবেষক, দর্শন বিভাগ, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 23.03.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

According to the realist tradition of Nyāya–Vaiśeṣika philosophy, the Saptapadārtha theory occupies a central place in explaining the structure and diversity of the world. In this context, the present paper examines Samavāya as an independent and nitya ontological category. Following the doctrines of Kaṇāda and Praśastapāda, the nature of Samavāya is analysed based on Ayutasiddhi, Ādhāra–Ādheya-bhāva, and Iha-pratyaya. It is established that Samavāya is not merely a relation but the indispensable ground of ontological unity and Kārya–Kāraṇa-bhāva. The paper further investigates the applicability of Samavāya across five domains: Avayava–Avayavī, Guṇa–Guṇī, Kriyā–Kriyāvān, Jāti–Vyakti, and Nitya-dravya–Viśeṣa. Through this analysis, Samavāya is established as a single and eternal principle, distinct from Saṃyoga and Svarūpa-sambandha, thereby enabling a coherent understanding of the world as an integrated whole rather than a mere aggregate of entities. A critical discussion is undertaken on the epistemological debate between the Naiyāyikas, who uphold Pratyakṣa as the means of Samavāya-siddhi, and the Vaiśeṣikas, who advocate Anumāna. This tension is addressed through the synthetic perspective of Udayanācārya and later thinkers. The study concludes that Samavāya constitutes the foundational basis of ontological order and epistemic structure. Its Svarūpa-lakṣaṇa, classification, and associated debates reveal its indispensable role in establishing the material coherence and philosophical consistency of the Nyāya–Vaiśeṣika system.

Keywords: অযুতসিদ্ধ, আধার-আধেয়, সম্বন্ধ, একত্ব, নিত্যত্ব, কার্য-কারণ, সংযোগ, প্রত্যক্ষ, অনুমান

ভারতীয় দর্শনের আস্তিক ধারার নয়টি প্রস্থানের মধ্যে ন্যায় ও বৈশেষিক অত্যন্ত প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ দুটি সম্প্রদায়। সমান্তরাল লক্ষ্য, মোক্ষলাভের উপায় এবং অভিন্ন তত্ত্বালোচনার কারণে এই দুই দর্শনকে একত্রে 'সমানতন্ত্র' অভিহিত করা হয়। ন্যায়বৈশেষিক মূলত একটি বস্তুবাদী বা বাস্তববাদী (Realist) দর্শন, যা যুক্তিবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যার এক সার্থক সমন্বয়। এই দর্শনের মূল ভিত্তি হলো, আমাদের দৃশ্যমান এই বৈচিত্র্যময় জগত অলীক নয়, বরং সম্পূর্ণ বাস্তব ও সত্য। এ জগতের প্রতিটি বস্তু জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশ্য (জ্ঞেয়) এবং নামের দ্বারা পরিচিত বা অভিধেয়। পদের দ্বারা প্রকাশিত বা নির্দিষ্ট হওয়ার কারণেই জাগতিক এই বস্তুসমূহকে 'পদার্থ' বলা হয়। এই দর্শন বিশ্বাস করে যে, এই সকল পদার্থের যথাযথ তত্ত্বজ্ঞান বা যথার্থ অনুভবের মাধ্যমেই মানুষের পরম পুরুষার্থ তথা মুক্তি বা অপবর্গ লাভ সম্ভব।

নব্য-ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের অভিমত অনুযায়ী, এই পরিদৃশ্যমান জগতের সমস্ত জ্ঞেয় বস্তুকে সাতটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, যা সপ্ত-পদার্থ নামে পরিচিত। এগুলি হলো- দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং অভাব। এই সপ্ত-পদার্থের মাধ্যমেই জগতের গঠন ও বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করা হয়। এই ক্রমতালিকায় ষষ্ঠ স্থানে অবস্থিত 'সমবায়' কেবল একটি সম্বন্ধই নয়, বরং এটি একটি স্বতন্ত্র ও স্বয়ংপ্রকাশ পদার্থ হিসেবে স্বীকৃত। ভারতীয় দর্শনের শাস্ত্রীয় রীতি অনুযায়ী, যে কোনো পদার্থকে সিদ্ধ বা প্রতিষ্ঠা করতে হলে তার সুনির্দিষ্ট লক্ষণ (সংজ্ঞা) এবং উপযুক্ত প্রমাণ (যুক্তি) থাকা আবশ্যক। যেহেতু সকল দার্শনিক সম্প্রদায় সমবায়কে স্বতন্ত্র পদার্থ হিসেবে স্বীকার করে না, তাই যুক্তি ও বিচারবুদ্ধি দিয়ে একে প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন।

মহর্ষি কণাদ প্রবর্তিত বৈশেষিক সূত্রে সমবায়কে কার্যকারণসম্বন্ধের অবিচ্ছেদ্য ভিত্তি হিসেবে নির্দেশ করা হলেও, পরবর্তীকালে প্রশস্তপাদাচার্য তাঁর ভাষ্যে অযুতসিদ্ধি ধারণার মাধ্যমে এই সম্বন্ধকে সুসংহত তাত্ত্বিক রূপ প্রদান করেন। শাস্ত্রীয় পরম্পরায় বহু আচার্য সমবায়ের বিভিন্ন লক্ষণ নিরূপণ করলেও অযুতসিদ্ধি নির্ভর লক্ষণই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। এই প্রেক্ষিতে সমবায় এমন এক নিত্য ও অবিনাশী সম্বন্ধ, যা ইহপ্রত্যয়ের উৎপত্তির মাধ্যমে বিশিষ্টজ্ঞানকে সম্ভব করে এবং জগতকে সমন্বিত বাস্তবতা হিসেবে প্রতিভাত করে।

এই নিবন্ধে বৈশেষিক স্বীকৃত ষষ্ঠ পদার্থ সমবায়ের একটি সামগ্রিক রূপরেখা উপস্থাপন করা হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন দার্শনিকের প্রদত্ত লক্ষণের তুলনামূলক বিচার করে সমবায়সিদ্ধির প্রমাণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সমবায়কে স্বতন্ত্র পদার্থ হিসেবে গ্রহণের প্রশ্নে ভারতীয় দর্শনে যে মতভেদ বিদ্যমান, তাও এখানে আলোচিত হয়েছে। ন্যায় মতে সমবায় প্রত্যক্ষসিদ্ধ, পক্ষান্তরে বৈশেষিক মতে এটি অনুমানপ্রমাণগম্য; এই জ্ঞানতাত্ত্বিক বিরোধের যৌক্তিক ভিত্তি অনুসন্ধানই আলোচনার অন্যতম লক্ষ্য। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সমবায়ের স্বরূপ, লক্ষণ ও প্রকারভেদ বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর অন্টোলজিক্যাল অপরিহার্যতা প্রতিষ্ঠা করা এবং প্রত্যক্ষ ও অনুমানপ্রমাণের মধ্যে বিদ্যমান দ্বন্দ্বের একটি সমন্বিত ব্যাখ্যা প্রদান করা। এই প্রসঙ্গে আচার্য উদয়নের সমন্বয়মূলক দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, যেখানে প্রত্যক্ষ প্রতীতি ও অনুমাননির্ভর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণকে পরস্পর পরিপূরক হিসেবে গৃহীত হয়েছে। অতএব প্রতিপন্ন করা যায় যে সমবায় কেবল সম্বন্ধমাত্র নয়, বরং কার্যকারণসংগতি, বস্তুগত ঐক্য এবং জ্ঞানশৃঙ্খলার এক অবিচ্ছেদ্য নিত্য ভিত্তি। এর সংজ্ঞা, প্রকারভেদ ও প্রমাণের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমবায়ের প্রকৃত তাৎপর্য উদ্ভাসিত হয় এবং ভারতীয় দর্শনের তাত্ত্বিক ভিত্তি আরও সুসংহত হয়ে ওঠে।

- **সমবায়ের সংজ্ঞা ও লক্ষণ**

সমবায়ের লক্ষণ প্রসঙ্গে মহর্ষি কণাদ বৈশেষিক দর্শনে একটি কালজয়ী সূত্র প্রদান করেছেন-

"ইহেদমিতি যতঃ কার্যকারণয়োঃ স সমবায়ঃ"[1]।

এই সূত্রের মূল তাৎপর্য হলো, কার্য ও কারণের মধ্যে যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের ফলে 'এই আধারে এই আধেয় বর্তমান' এরূপ অখণ্ড জ্ঞান উদয় হয়, তাকেই সমবায় বলা হয়। এখানে আধার ও আধেয়ের অবিনাভাব সম্বন্ধই প্রধান নির্ণায়ক। ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের পরবর্তী বিকাশে দেখা যায়, যদিও কণাদ মূলত কার্য কারণ সম্বন্ধের উল্লেখ করেছেন, তথাপি নিত্যদ্রব্য ও বিশেষ, অথবা নিত্যদ্রব্য ও নিত্যগুণের মধ্যেও সমবায় স্বীকার

[1] মহর্ষি কণাদ প্রণীত *বৈশেষিক সূত্র*, সপ্তম অধ্যায়, দ্বিতীয় আহ্নিক, ২৬ নম্বর সূত্র (৭.২.২৬)

করা হয়েছে। ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ এই আপাত বৈপরীত্য দূর করে বলেন যে, 'কার্যকারণ' পদটি এখানে ব্যাপক অর্থে গ্রহণীয়। এর দ্বারা কার্য কারণ এবং অকার্য কারণ উভয় ক্ষেত্রেই সমবায়ের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয়।

মহর্ষি কণাদের এই সংজ্ঞাকে সুসংহত করতে *উপস্কার* ভাষ্যকার আচার্য শঙ্কর মিশ্র ব্যাখ্যা করেন যে, সূত্রে ব্যবহৃত 'কার্যকারণয়োঃ' পদটি কেবল উপলক্ষণমাত্র। সমবায় কেবল কার্য ও কারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং নিত্য ও অনিত্য, কার্য ও অকার্য উভয় প্রকার পদার্থের মধ্যেই এর প্রযোজ্যতা রয়েছে। যেখানেই আধার আধেয় ভাব বিদ্যমান এবং যা বিশিষ্ট বুদ্ধির বিষয় হয়, সেখানেই সমবায় স্বীকৃত। এই প্রেক্ষিতে সমবায়কে নিত্য ও অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধ বলা হয়, যা তন্তু ও পটের ন্যায় দুই সত্তাকে অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত করে এবং 'তন্তুতে পট বর্তমান' এরূপ প্রত্যয়ের উদ্রেক ঘটায়। এই ধারণার মাধ্যমে সমবায় কেবল বস্তুগত গঠনের নয়, জ্ঞানগত ঐক্যেরও ভিত্তি হিসেবে প্রতিভাত হয়।

আবার, প্রখ্যাত পণ্ডিত বীর রাঘবাচার্যের বিশ্লেষণানুসারে, মহর্ষি কণাদ তাঁর পূর্ববর্তী প্রসঙ্গের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেই সমবায় সূত্রে 'কার্য-কারণ' পদের উল্লেখ করেছিলেন। বৈশেষিক দর্শনের যুক্তি অনুযায়ী, যে সকল বস্তুর মধ্যে 'যুতসিদ্ধি' বা পৃথক অস্তিত্বের অবকাশ থাকে না, তাদের মধ্যে সংযোগ কিংবা বিভাগ সম্ভব নয়। সেই শাস্ত্রীয় যুক্তিতেই মহর্ষি যুতসিদ্ধিহীন কার্য-কারণভাবাপন্ন বস্তুসমূহের আধারে এই বিশেষ সম্বন্ধের অবতারণা করেছেন। যদিও কণাদ তাঁর মূল সূত্রে সরাসরি 'অযুতসিদ্ধ' শব্দটি প্রয়োগ করেননি, তথাপি তাঁর বর্ণনায় এই গূঢ় ধারণাটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে নিহিত ছিল। বস্তুত যা যুতসিদ্ধ নয়, তা-ই অযুতসিদ্ধ- আর এই অযুতসিদ্ধ বস্তুদ্বয়ের অবিনাশী সম্বন্ধই যে সমবায়, সে বিষয়ে কোনো সংশয় নেই।

মহর্ষি কণাদের সূত্রের গূঢ় তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পরবর্তীকালে ভাষ্যকার প্রশস্তপাদাচার্য সমবায়ের লক্ষণকে পূর্ণতা দান করেছেন। তাঁর সুবিখ্যাত লক্ষণটি হলো-

"অযুতসিদ্ধানাম্ আধার্যাধারভূতানাং যঃ সম্বন্ধ ইহ-প্রত্যয়হেতুঃ স সমবায়ঃ"।[2]

অর্থাৎ, যে দুটি পদার্থ 'অযুতসিদ্ধ' (অবিচ্ছেদ্য) এবং যাদের মধ্যে 'আধার-আধেয়' ভাব বিদ্যমান, তাদের মধ্যে যে সম্বন্ধের ফলে 'এখানে এটি আছে'- এরূপ ইহ-প্রত্যয় বা জ্ঞানের উদয় হয়, তাকেই সমবায় বলে। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের বিভিন্ন গ্রন্থে সমবায়ের বহু সংজ্ঞা থাকলেও প্রশস্তপাদ নির্দেশিত এই লক্ষণটিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ও প্রামাণিক। তিনিই প্রথম সমবায়ের সংজ্ঞায় 'অযুতসিদ্ধি' বা অবিচ্ছেদ্যতার ধারণাটি সুনিশ্চিতভাবে অন্তর্ভুক্ত করেন। প্রকৃতপক্ষে, সমবায়ের প্রায় প্রতিটি উত্তরকালীন সংজ্ঞাতেই এই অযুতসিদ্ধির বিষয়টি অপরিহার্য হয়ে উঠেছে; তাই সমবায়ের লক্ষণকে মূলত অযুতসিদ্ধি-ঘটিত লক্ষণ হিসেবেই অভিহিত করা সমীচীন।

প্রাচীন ন্যায় দর্শনে সমবায়ের সুনির্দিষ্ট এবং বিস্তারিত আলোচনা অপেক্ষাকৃত সীমিত থাকলেও, পরবর্তীকালে নব্যনৈয়ায়িকগণ বৈশেষিক সম্প্রদায়ের সংজ্ঞাকেই প্রামাণিক হিসেবে গ্রহণ করে নিজস্ব দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তার গূঢ় ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। আচার্য উদয়ন তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ *কিরণাবলী*-তে সমবায়ের সারমর্ম প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন-

"নিত্যপ্রাপ্তিঃ সমবায় ইতি লক্ষণং সূচিতম"।[3]

---

[2] প্রশস্তপাদ। *প্রশস্তপাদভাষ্যম্: পদার্থধর্মসংগ্রহ (ন্যায়কন্দলী ও বিবৃতি টীকাসহ)* । সম্পাদিত এবং অনূদিত: দামোদর চঞ্চল ভট্টাচার্য, ২য় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯৩, পৃ. ৩০১। মূল গ্রন্থ আনুমানিক ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত।

অর্থাৎ, সমবায় হলো সেই নিত্যপ্রাপ্তি বা অযুতসিদ্ধত্ব, যা দুই সম্বন্ধীর মধ্যে অবিনাশী সংযোগ রক্ষা করে। এই পরম্পরাকে আরও প্রাঞ্জল করে নব্যনৈয়ায়িক অন্নংভট্ট তাঁর *তর্কসংগ্রহ*গ্রন্থে সমবায়ের লক্ষণ দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন-

"সম্বন্ধিভিন্নত্বে সতি নিত্যত্বে সতি সম্বন্ধত্বম্"।[4]

এর নিহিতার্থ হলো, যে সম্বন্ধ তার সম্বন্ধীদ্বয় থেকে ভিন্ন হয়েও স্বয়ং নিত্য, তাকেই সমবায় বলা হয়। একইভাবে প্রখ্যাত নব্যনৈয়ায়িক বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননও সমবায়কে এই সংজ্ঞার আধারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সুতরাং দেখা যায় যে, নব্য-ন্যায় দর্শনে সমবায় কেবল একটি আধার-আধেয় সম্বন্ধ নয়, বরং এটি একটি স্বয়ংপ্রকাশ ও নিত্য তাত্ত্বিক সত্তা।

- **সমবায়ের প্রকারভেদ (পঞ্চবিধ ক্ষেত্র)**

যদিও মহর্ষি কণাদ তাঁর বৈশেষিক সূত্রে সমবায়কে স্বতন্ত্র বিষয়ের পরিবর্তে মূলত কার্য-কারণ নিয়মের অংশ হিসেবেই বিচার করেছিলেন, তথাপি এই সম্বন্ধের পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণে 'অযুতসিদ্ধত্ব' এবং 'আধার-আধেয়ভাব'-এই দুটি শর্তই অপরিহার্য। এখানে 'যুত' পদের অর্থ হলো যারা পৃথক বা অসংযুক্ত অবস্থায় স্বাধীনভাবে অবস্থান করতে পারে; কিন্তু 'অযুতসিদ্ধ' বলতে এমন দুটি সত্তাকে বোঝায় যাদের একটির বিনাশ ব্যতিরেকে অন্যটি পৃথকভাবে অবস্থান করতে অসমর্থ (যেমন আকাশ ও তার বিশেষ ধর্ম শব্দ)। সমবায়ের দ্বিতীয় অপরিহার্য শর্তটি হলো আধার-আধেয়ভাব, যার অর্থ হলো একটি বস্তু অন্যটির ওপর আশ্রিত থাকা; যেমন তন্তুতে পটের কিংবা দ্রব্যে গুণের যে অবস্থান, সেখানে একটি আধার বা আশ্রয় এবং অন্যটি আধেয় বা আশ্রিত হিসেবে বর্তমান থাকে। মূলত সমবায় হলো এমন একটি নিত্য সম্বন্ধ যা দুটি অযুতসিদ্ধ বিষয়ের মধ্যে বিদ্যমান থেকে তাদের অবিনাশী ঐক্য রক্ষা করে। প্রখ্যাত নৈয়ায়িক বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন তাঁর *ভাষা-পরিচ্ছেদ* ও *সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী*গ্রন্থে সমবায়ের পাঁচটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করেছেন-

> "অবয়বাবয়বিনোর্জাতিব্যক্ত্যোর্গুণগুণিনোঃ। ক্রিয়াক্রিয়াবতোর্নিত্যদ্রব্যবিশেষয়োশ্চ যঃ সম্বন্ধঃ, স সমবায়ঃ।"[5]

১. অবয়ব ও অবয়বী (Part and Whole): কোনো বস্তু (অবয়বী) এবং তার গঠনকারী অংশসমূহের (অবয়ব) মধ্যে সমবায় সম্বন্ধ থাকে। যেমন- তন্তু (সুতো) হলো অবয়ব এবং পট (কাপড়) হলো অবয়বী। এখানে তন্তুকে ছাড়া পটের কোনো অস্তিত্ব সম্ভব নয়।

২. গুণ ও গুণী (Quality and Substance): কোনো দ্রব্যের (গুণী) সাথে তার গুণের সম্বন্ধ হলো সমবায়। যেমন- একটি নীল রঙের ঘটের ক্ষেত্রে 'নীল রূপ' হলো গুণ এবং 'ঘট' হলো গুণী। রূপটি সর্বদা ঘটের আধারে আশ্রিত থাকে।

৩. ক্রিয়া ও ক্রিয়াবান (Action and Agent): কোনো সচল বস্তুর সাথে তার চলন বা ক্রিয়ার সম্বন্ধ। যেমন- একটি চলন্ত বল এবং তার 'চলন' ক্রিয়া। ক্রিয়াটি বস্তুর বিনাশ বা স্থবিরতা ছাড়া পৃথকভাবে থাকতে পারে না।

---

[3] উদয়নাচার্য, *কিরণাবলী*, সম্পা. গৌরীনাথ শাস্ত্রী, কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯০, পৃ. ২৬৪।

[4] অন্নংভট্ট। *তর্কসংগ্রহ: দীপিকা টীকা ও সিদ্ধান্ততত্ত্ব ব্যাখ্যাসহ*। সম্পাদিত: পঞ্চানন তর্করত্ন, ৩য় সংস্করণ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৮৮, পৃ. ৮২।

[5] বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন। *ভাষা-পরিচ্ছেদ ও সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী: মুক্তাবলী-সংগ্রহ টীকাসহ*। সম্পাদিত: পঞ্চানন শাস্ত্রী, ২য় সংস্করণ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৭০, পৃ. ৪৩৭।

৪. জাতি ও ব্যক্তি (Universal and Particular): কোনো বিশেষ প্রাণীর সাথে তার সাধারণ ধর্মের সম্বন্ধ। যেমন- 'গো-ত্ব' (গরুর সাধারণ ধর্ম বা জাতি) এবং একটি নির্দিষ্ট 'গরু' (ব্যক্তি)। গরুর অস্তিত্ব থাকলেই কেবল তাতে 'গো-ত্ব' জাতিটি সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান থাকে।

৫. বিশেষ ও নিত্যদ্রব্য (Particularity and Eternal Substance): বৈশেষিক দর্শন মতে, পরমাণু বা আকাশের মতো নিত্যদ্রব্যগুলিকে একে অপরের থেকে আলাদা করার জন্য তাদের মধ্যে একটি 'বিশেষ' নামক পদার্থ থাকে। এই নিত্যদ্রব্যের সাথে তার 'বিশেষ'-এর সম্বন্ধই হলো সমবায়।

তবে এখানে একটি সূক্ষ্ম বিচার্য বিষয় হলো, সমবায় যদি কেবল অযুতসিদ্ধ পদার্থের সম্বন্ধ হয়, তবে আত্মা ও তার বিশেষ গুণ চৈতন্যের মধ্যে এই সম্বন্ধের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। ন্যায়মতে আত্মা একটি দ্রব্য এবং চৈতন্য তার গুণ; ফলে এদের মধ্যে সমবায় সম্বন্ধ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সুষুপ্তি বা মূর্ছাকালে আত্মাতে চৈতন্যের অভিব্যক্তি থাকে না বলে কেউ কেউ এখানে অযুতসিদ্ধির অভাব ও ফলত সমবায়ের লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষের আশঙ্কা করেন।

নব্য-নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক আচার্যগণ 'অযুতসিদ্ধি' লক্ষণের এক সূক্ষ্ম ও যৌক্তিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে এই অব্যাপ্তি দোষের নিরসন করেছেন। শাস্ত্রীয় সংজ্ঞায় বলা হয়েছে-

"যয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে একমবিনশ্যদবস্থমপরাশ্রিতমেবাবতিষ্ঠতে তাবযুতসিদ্ধৌ"[6]

অর্থাৎ যে দুটি পদার্থের মধ্যে একটি বিনষ্ট না হওয়া পর্যন্ত অন্যটির আশ্রয়েই অবস্থান করে, তারা অযুতসিদ্ধ। এই প্রেক্ষাপটে আত্মা ও চৈতন্যের সম্বন্ধটি অযুতসিদ্ধ হিসেবেই গণ্য হয়। যদিও সুষুপ্তি বা মূর্ছাকালে আত্মাতে চৈতন্যের অভিব্যক্তি থাকে না, তবুও চৈতন্য যখনই উৎপন্ন হয়, তা সর্বদা আত্মাকেই আশ্রয় করে থাকে; আত্মা ব্যতীত অন্য কোনো দ্রব্যে (যেমন ঘট বা পটে) এর অস্তিত্ব অসম্ভব। অযুতসিদ্ধির প্রকৃত অর্থ আধেয়কে সর্বদা আধারে বর্তমান থাকা নয়, বরং আধেয়টি যখনই বর্তমান থাকবে, তখন তার সেই নির্দিষ্ট আধারেই অবস্থান করা। যেহেতু চৈতন্য একটি অনিত্য বিশেষ গুণ, তাই সুষুপ্তিকালে তার অভাব ঘটলেও তা অযুতসিদ্ধির মূল শর্তকে ক্ষুণ্ণ করে না। সুতরাং, এই আশ্রিতাবস্থা ও গুণ-গুণী সম্বন্ধের নিরিখে আত্মা ও চৈতন্যের যোগসূত্রটি সমবায় হিসেবেই সিদ্ধ হয় এবং সেখানে কোনো অব্যাপ্তি দোষের অবকাশ থাকে না। পরিশেষে বলা যায়, অযুতসিদ্ধি মানে 'সর্বদা উপস্থিতি' নয়, বরং 'অন্যত্র আশ্রিত না হওয়া'- যার ফলে চৈতন্য ও আত্মার অবিনাশী সম্বন্ধটি যৌক্তিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে সমবায়ের অস্তিত্ব নিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। মূলত ন্যায়-বৈশেষিক এবং মীমাংসক দর্শনের প্রভাকর পন্থী (গুরুমত) ব্যতীত অন্য কোনো সম্প্রদায়ই সমবায়কে স্বতন্ত্র পদার্থ হিসেবে স্বীকার করেননি; বরং তারা কঠোর যুক্তির মাধ্যমে একে খণ্ডন করেছেন। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ ক্ষণিকবাদ ও অনাত্মবাদে বিশ্বাসী হওয়ায় তাঁরা অবয়ব-অবয়বীর কোনো স্থায়ী সম্বন্ধ বা সমবায় স্বীকার করেন না। অন্যদিকে, শঙ্করের অদ্বৈত বেদান্ত মতে সমবায় একটি অসম্ভব ধারণা, কারণ তাঁদের মতে এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কোনো স্বতন্ত্র সম্বন্ধী বা সম্বন্ধ থাকতে পারে না; তাঁরা সমবায়কে অনবস্থা দোষে (Infinite Regress) দুষ্ট বলে অগ্রাহ্য করেন। এমনকি সাংখ্য দর্শনও 'অযুতসিদ্ধ'

[6] অন্নংভট্ট। *তর্কসংগ্রহ: দীপিকা টীকা ও সিদ্ধান্ততত্ত্ব ব্যাখ্যাসহ*। সম্পাদিত: পঞ্চানন তর্করত্ন, ৩য় সংস্করণ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৮৮, পৃ. ৮২।

সম্বন্ধের পরিবর্তে 'তাদাত্ম্য' বা অভেদ সম্বন্ধেই গুরুত্বারোপ করেছে। সুতরাং, ন্যায়-বৈশেষিক ও প্রভাকর মীমাংসকগণই এই অযুতসিদ্ধ ও নিত্য সম্বন্ধের প্রধান প্রবক্তা।

- **সমবায়ের একত্ব ও নিত্যত্ব (Unity of Samavaya & Eternity of Samavaya):**

ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে সমবায়ের একত্ব ও নিত্যত্ব ধর্ম দুটি অত্যন্ত মৌলিক এবং তাত্ত্বিক গুরুত্বসম্পন্ন। প্রশস্থপাদভাষ্যে সমবায়কে "নিত্যং একত্বাবৎ" বলে অভিহিত করা হয়েছে, কারণ এটি স্বরূপত অদ্বৈত ও অখণ্ড। বৈশেষিকগণের মতে, জগতজুড়ে অনন্ত গুণ, কর্ম বা জাতি থাকলেও তাদের আধারের সঙ্গে যুক্ত করার মূল 'সম্বন্ধ-শক্তি' বা সূত্রটি অভিন্ন। তাঁদের প্রধান যুক্তি হলো, যেহেতু সমবায়ের লক্ষণ তথা অযুতসিদ্ধি-ঘটিত ইহ-প্রত্যয়হেতুত্ব সর্বত্র এক, তাই প্রতি আধারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সমবায় কল্পনা করার কোনো যৌক্তিক প্রয়োজন নেই। ঠিক যেমন একটি প্রদীপ অসংখ্য বস্তুকে আলোকিত করলেও তার প্রকাশিকা শক্তি এক, তেমনি একটি একক সমবায়ই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধ রক্ষা করে। যদিও সম্বন্ধীভেদে (যেমন ঘট বা পট) সমবায়ের পরিচয় ভিন্ন মনে হয়, কিন্তু লোকপ্রত্যক্ষে আধার-আধেয় বোধের যে অবিভাজ্য প্রতীতি ঘটে, তা সমবায়ের একত্ব ও অবিভেদ্যতাই প্রমাণ করে। যেমন লাল তুলোর রক্তিমতার ন্যায় বিষয়গুলো সর্বদা অভিন্ন ও অবিভাজ্যভাবেই প্রতীত হয়। বৈশেষিকমতে অনুমানের মাধ্যমেও এটি সিদ্ধ হয় যে, ব্যক্তি (ভেদ) ও জাতির (অভেদ) মধ্যে সমন্বয় স্থাপনের জন্য একটি একক সম্বন্ধ আবশ্যক, যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো গৌর গো-ব্যক্তিতে গো-জাতি ও ব্যক্তির অভিন্ন সমন্বয়। অন্যথায় জাগতিক শৃঙ্খলায় বৈপরীত্য দেখা দিত। সুতরাং, সমবায় সপ্ত-পদার্থের এমন এক ষষ্ঠ পদার্থ, যা দ্রব্য-গুণ বা অবয়ব-অবয়বীর মধ্যে একক যোগসূত্র হিসেবে বিদ্যমান।

ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের সিদ্ধান্তানুসারে সমবায় আবার একটি নিত্য (Eternal) সম্বন্ধ, যার নিজস্ব কোনো উৎপত্তি বা বিনাশ নেই। সংযোগ যেমন দুটি পৃথক বস্তুর মিলনে উৎপন্ন হয় এবং বিচ্ছেদে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, সমবায় সেভাবে অনিত্য নয়; বরং যা সৎ অথচ অকারণবৎ, তা-ই নিত্য। শংকর মিশ্র তাঁর 'উপস্কার' ভাষ্যে স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, সমবায়ের কোনো নির্দিষ্ট কারণ নির্ণয় করা সম্ভব নয়; কারণ পট যে সম্বন্ধে তন্তুতে আশ্রিত থাকে, ঘটও সেই একই নিত্য সম্বন্ধে কপালে অবস্থান করে এবং সর্বত্র একরূপ 'ইহ-প্রত্যয়' বা বিশিষ্ট বুদ্ধির উদয় ঘটায়। প্রশস্তপাদভাষ্যের মতে, আধার (তুলা) ও আধেয়-র (রক্তিম গুণ) মধ্যেকার এই স্বাভাবিক ও অপরিবর্তনীয় বন্ধনটিই সমবায়। যদি সমবায় অনিত্য হতো, তবে গুণ বা কর্মের বিনাশে আধারেরও বিনাশ ঘটত; কিন্তু লৌকিক প্রত্যক্ষে দেখা যায় যে রক্তিমতা অপসারিত হলেও তুলার অস্তিত্ব অবিচ্ছিন্ন থাকে। বৈশেষিকমতে পরমাণুর নিত্যতা এবং গৌর গো-ব্যক্তিতে গো-জাতির অবিনশ্বর আধার-আধেয় ভাব বজায় রাখতে সমবায়কে নিত্য হওয়া আবশ্যক। অন্যথায়, ব্যক্তি বা গুণের বিনাশে জাতি বা ধর্মের চিরায়ত সম্বন্ধটি বিলুপ্ত হয়ে জাগতিক শৃঙ্খলায় ব্যাঘাত ঘটত। সুতরাং, সমবায় স্বয়ংপ্রকাশ এবং অন্য কোনো সম্বন্ধের ওপর নির্ভরশীল নয় বলেই এটি এক অনাদি ও অনন্ত পারমার্থিক সত্তা।

ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের আরোও যুক্তি হলো, সমবায় যদি অনিত্য হতো, তবে তার উৎপত্তির জন্য অন্য কোনো সম্বন্ধের প্রয়োজন হতো, যা প্রকারান্তরে অনবস্থা দোষের (Infinite Regress) সৃষ্টি করত। যেহেতু সমবায় স্বয়ং একনিষ্ঠ ও স্বতন্ত্র পদার্থ, তাই এর অস্তিত্ব অন্য কোনো সম্বন্ধের ওপর নির্ভরশীল নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধীদ্বয় (যেমন তন্তু ও পট) বর্তমান থাকে, ততক্ষণ তাদের মধ্যবর্তী সমবায় সম্বন্ধটি অবিনাশীভাবে বিদ্যমান থাকে। এমনকি প্রলয়কালেও যখন স্থূল জগত বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তখনো পরমাণু ও

তার 'বিশেষ' পদার্থের মধ্যেকার সমবায় নিত্যকাল অবস্থান করে। এই অবিনাশী আধার-আধেয় ভাবই প্রমাণ করে যে সমবায় কালজয়ী ও শাশ্বত।

নব্য-নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি এবং মীমাংসক প্রভাকর সমবায়কে অনিত্য ও বহু বলে অভিমত দিলেও, প্রাচীন ন্যায়বৈশেষিক আচার্যগণ এই মত খণ্ডন করে এর একত্ব ও নিত্যত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁদের মতে, জগতজুড়ে 'কপালে ঘট নষ্ট হয়েছে'- এরূপ জ্ঞান লৌকিক হলেও 'ঘট-সমবায় নষ্ট হয়েছে'- এরূপ প্রতীতি কখনো ঘটে না; যা প্রমাণ করে যে আধেয় নষ্ট হলেও সম্বন্ধটি অর্থাৎ সমবায় অবিনাশী। তাত্ত্বিক বিচারে সমবায় প্রাগভাবের অপ্রতিযোগী; আর যে ভাবপদার্থের প্রাগভাব নেই, তা অপরিহার্যভাবেই নিত্য। দার্শনিকদের মতে, আমাদের যে 'বিশিষ্ট বুদ্ধি' বা আধার-আধেয় বোধ (যেমন- 'এই ঘটে রূপ আছে') উৎপন্ন হয়, তার মূল ভিত্তি হলো এই সমবায়। যদি সমবায় অনিত্য বা অনেক হতো, তবে আমাদের এই শাশ্বত বিশিষ্ট বুদ্ধিতে অনিশ্চয়তা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। সুতরাং, সমবায়ের একত্ব ও নিত্যতাই জগতের বস্তুগত শৃঙ্খলার মূল চাবিকাঠি।

- **সমবায় এবং অন্যান্য সম্বন্ধ**

ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে সংযোগ ও স্বরূপ সম্বন্ধের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও কেন সমবায়কে একটি স্বতন্ত্র পদার্থ হিসেবে স্বীকার করা প্রয়োজন, সেই প্রশ্নটি অত্যন্ত মৌলিক। এই দর্শনের প্রবক্তাগণ অত্যন্ত সুসংগত যুক্তির মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, সমবায়কে কখনোই সংযোগ সম্বন্ধের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়। মূলত সংযোগ ও সমবায়ের মধ্যকার মৌলিক পার্থক্যই সমবায়ের অস্তিত্বকে অপরিহার্য করে তোলে।

সংযোগের সঙ্গে পার্থক্য: সংযোগ হলো একটি 'যুতসিদ্ধ' সম্বন্ধ, যা কেবল দুটি পৃথক ও স্বাধীন অস্তিত্বসম্পন্ন দ্রব্যের (যেমন- টেবিল ও কলম) সাময়িক মিলন মাত্র; যেখানে সম্বন্ধী দুটিকে বিচ্ছিন্ন করলেও তাদের নিজস্ব সত্তা ক্ষুণ্ণ হয় না। অন্যদিকে, সমবায় হলো একটি 'অযুতসিদ্ধ' সম্বন্ধ, যেখানে সম্বন্ধীদ্বয় (প্রতিযোগী ও অনুযোগী) পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। যেমন- গুণ ও গুণী কিংবা অবয়ব ও অবয়বীর ক্ষেত্রে একটিকে ব্যতিরেকে অন্যটির অস্তিত্ব কল্পনা করা অসম্ভব। সংযোগ কেবল দুটি দ্রব্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু সমবায় দ্রব্য-গুণ, দ্রব্য-কর্ম বা জাতি-ব্যক্তির মতো বহুবিধ সম্বন্ধীযুগলের মধ্যে এক নিত্য আধার-আধেয় ভাব রক্ষা করে। সুতরাং, এই অবিনাশী ও অযুতসিদ্ধ যোগসূত্রটি ব্যাখ্যার জন্যই সমবায়কে একটি স্বতন্ত্র ও শাশ্বত পদার্থ হিসেবে স্বীকার করা যুক্তিসিদ্ধ।

ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের বিচারে সংযোগ ও সমবায়ের মধ্যে আরও একটি মৌলিক পার্থক্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিত্যতা ও অনিত্যতার নিরিখে সমবায় একটি নিত্য সম্বন্ধ; এর নিজস্ব কোনো উৎপত্তি বা বিনাশ নেই। অন্যদিকে, সংযোগ সর্বদা অনিত্য, কারণ এটি দুটি পৃথক বস্তুর মিলনে উৎপন্ন হয় এবং বিয়োগ বা বিভাজনের মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে যায়, অর্থাৎ সংযোগ বহু এবং ক্ষণস্থায়ী। এদের মধ্যে আরোও একটি গভীর পদার্থগত পার্থক্য বিদ্যমান। বৈশেষিক মতে, সমবায় নিজেই সপ্ত-পদার্থের অন্তর্গত একটি স্বতন্ত্র পদার্থ। পক্ষান্তরে, সংযোগ কোনো স্বাধীন পদার্থ নয়, বরং এটি চতুর্বিংশতি (২৪টি) গুণের অন্তর্ভুক্ত একটি বিশেষ গুণ মাত্র। যদিও উভয়ই সম্বন্ধ হিসেবে কাজ করে, তথাপি সংযোগ যেখানে গুণের আশ্রয়ে থাকে, সমবায় সেখানে স্বয়ং এক সম্বন্ধরূপ স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে জগতকে অবিচ্ছেদ্যভাবে গেঁথে রাখে।

সংযোগ ও সমবায়ের পার্থক্যের ক্ষেত্রে আধার-আধেয় ভাব এবং ব্যাপ্তি বা একত্ব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ দুটি বিচার্য বিষয়। সমবায়ের ক্ষেত্রে সর্বদা একটি সুনির্দিষ্ট আধার (Container) এবং অন্যটি আধেয় (Content)

হিসেবে অবস্থান করে, যেমন পটে নীল রূপের অবস্থানে পট হলো আধার এবং রূপ হলো আধেয়। কিন্তু সংযোগের ক্ষেত্রে এই আধার-আধেয় ভাবের আবশ্যকতা নেই; সেখানে উভয় বস্তুই পরস্পরের সঙ্গে সমানভাবে যুক্ত থাকে (যেমন দুটি হাতের তালুর সংযোগ)। আবার সমবায় সমগ্র জগতজুড়ে এক ও অভিন্ন, যা এক অখণ্ড সম্বন্ধ-শক্তি হিসেবে কাজ করে। পক্ষান্তরে, সংযোগ বস্তুভেদে ভিন্ন ভিন্ন এবং বহু; অর্থাৎ দুটি কলমের সংযোগ এবং দুটি বইয়ের সংযোগ সম্পূর্ণ আলাদা দুটি গুণ বা ঘটনা। সুতরাং, সমবায়ের এই একত্ব ও নিশ্চিত আধার-আধেয় ভাবই একে সংযোগ থেকে পৃথক এক অনন্য মর্যাদা দান করেছে।

স্বরূপ সম্বন্ধের সঙ্গে পার্থক্য: সমবায় আবার স্বরূপ সম্বন্ধও হতে পারেনা। কারণ, ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে সমবায় এবং স্বরূপ সম্বন্ধের মধ্যেও সূক্ষ্ম তাত্ত্বিক পার্থক্য বিদ্যমান। সমবায় হলো একটি স্বতন্ত্র নিত্য পদার্থ, যা অযুতসিদ্ধ দুটি বস্তুর মধ্যে আধার-আধেয় ভাব রক্ষা করে (যেমন- তন্তু ও পট)। অন্যদিকে, স্বরূপ সম্বন্ধ কোনো স্বতন্ত্র পদার্থ নয়; এটি সম্বন্ধীদ্বয়ের নিজস্ব প্রকৃতিরূপ বা স্বরূপাত্মক একটি সম্বন্ধ মাত্র। সমবায়ের ক্ষেত্রে সম্বন্ধী (অনুযোগী ও প্রতিযোগী) এবং সম্বন্ধ সম্পূর্ণ ভিন্ন (যেমন- ঘট এবং ঘটে থাকা সমবায় এক নয়); কিন্তু স্বরূপ সম্বন্ধে সম্বন্ধটি সম্বন্ধীর চেয়ে আলাদা কিছু নয় (যেমন- ভূতলে ঘটাভাবের ক্ষেত্রে 'অভাব' ও 'ভূতল' নিজেই এখানে সম্বন্ধের ভূমিকা পালন করে)। এছাড়া, স্বরূপ সম্বন্ধ যেমন নিত্য হয় তেমনি অনিত্যও হতে পারে, কিন্তু সমবায় সর্বদা নিত্য। বিশেষত, 'রূপবান ঘটঃ' এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিবার ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ সম্বন্ধ স্বীকার করলে গৌরব দোষ হয়; তাই ন্যায়বৈশেষিক দার্শনিকগণ লাঘব হেতু এক ও নিত্য সম্বন্ধ রূপে সমবায়কে স্বীকার করেছেন। সমবায় জগতজুড়ে এক ও অখণ্ড হলেও স্বরূপ সম্বন্ধ বস্তুর প্রকৃতিভেদে অনন্ত ও বিচিত্র হতে পারে। নব্য-নৈয়ায়িকগণের মতে, যেখানে সমবায় বা সংযোগের মতো কোনো বাহ্যিক সম্বন্ধ সম্ভব নয় (যেমন- অভাব বা কালের ক্ষেত্রে), সেখানেই স্বরূপ সম্বন্ধের কল্পনা করা হয়। মূলত সমবায় একটি স্বতন্ত্র বস্তুগত যোগসূত্র, আর স্বরূপ সম্বন্ধ হলো সম্বন্ধীর নিজস্ব অস্তিত্বের এক বিশেষ পারমার্থিক অবস্থা।

- **আন্তঃসম্বন্ধ ও বহিঃসম্বন্ধ**

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দর্শনেই 'সম্বন্ধ' একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিচার্য বিষয়। ভারতীয় দর্শনে সংযোগ ও সমবায়ের ন্যায় নানা সম্বন্ধের উল্লেখ থাকলেও ন্যায়-বৈশেষিক প্রস্থানে সমবায়কে একটি স্বতন্ত্র 'পদার্থ' হিসেবে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। পাশ্চাত্য দর্শনে সম্বন্ধকে মূলত আন্তঃসম্বন্ধ (Internal Relation) ও বহিঃসম্বন্ধ (External Relation)- এই দুই ধারায় বিন্যস্ত করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আধুনিককালে ড. রাধাকৃষ্ণানসহ অনেক দার্শনিক এই দুই ধারার তুলনা করতে গিয়ে জানিয়েছেন যে, সংযোগ হলো একটি বহিঃসম্বন্ধ এবং সমবায় হলো আন্তঃসম্বন্ধ; যদিও কিছু ভাষ্যকার সমবায়কেও বহিঃসম্বন্ধ হিসেবে অভিহিত করেছেন। আন্তঃসম্বন্ধের ক্ষেত্রে সম্বন্ধীদ্বয় (Relata) একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে টিকে থাকতে পারে না, যাকে ভারতীয় দর্শনের পরিভাষায় 'অসম্বন্ধ অবস্থায় অসিদ্ধ' বলা হয়। অর্থাৎ, এই সম্বন্ধের মাধ্যমেই সম্বন্ধী দুটির নিজস্ব স্বরূপ নির্ধারিত হয় এবং সম্বন্ধটিকে তার সম্বন্ধীগুলো থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন কিছু হিসেবে গণ্য করা যায় না। অন্যদিকে, বহিঃসম্বন্ধের ক্ষেত্রে সম্বন্ধটি না থাকলেও সম্বন্ধী দুটির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না এবং এটি সম্বন্ধীদের নিজস্ব প্রকৃতিতে কোনো পরিবর্তন আনে না; এখানে সম্বন্ধটি তার সম্বন্ধীদ্বয় থেকে সম্পূর্ণ অতিরিক্ত ও স্বতন্ত্র একটি সত্তা হিসেবে বিদ্যমান থাকে। সহজ কথায়, সম্বন্ধ থাকা বা না থাকার ওপর প্রতিযোগী বা অনুযোগীর নিজস্ব স্বরূপ পরিবর্তন নির্ভর করে না।

ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের পরিভাষায়, সমবায় একটি স্বতন্ত্র সম্বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও তা সম্বন্ধীর স্বরূপে কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটায় না; একারণেই সমবায়কে পাশ্চাত্য দর্শনের 'আন্তঃসম্বন্ধ' বলা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত নয়। ভারতীয় দর্শনে 'অযুতসিদ্ধত্ব' বলতে মূলত সম্বন্ধীদ্বয়ের মধ্যে অন্তত একটির (যেমন- গুণের ক্ষেত্রে দ্রব্য) অসম্পৃক্ত অবস্থায় অস্তিত্বহীনতাকে বোঝায়, যা সমবায়ের পাঁচটি ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য নয়। অবয়ব-অবয়বী সম্বন্ধের বিশ্লেষণে দেখা যায়, কাপড় (অবয়বী) ধ্বংস হলেও সুতো (অবয়ব) তার নিজ অস্তিত্বে অটুট থাকে; অর্থাৎ অযুতসিদ্ধ থাকার শর্তটি এখানে অবয়বীর জন্য আবশ্যিক হলেও অবয়বের জন্য নয়। যেহেতু এই সম্বন্ধ সুতোর মূল স্বরূপ বা প্রকৃতি পরিবর্তন করে না, তাই একে পাশ্চাত্য সংজ্ঞায় আন্তঃসম্বন্ধ বলা চলে না।

ন্যায়-বৈশেষিকদের অসৎকার্যবাদ অনুযায়ী, 'অযুতসিদ্ধত্ব' বা অবিচ্ছেদ্যতার শর্তটি গুণ, কর্ম বা জাতির ক্ষেত্রে আবশ্যিক হলেও দ্রব্য বা ব্যক্তির ক্ষেত্রে তা সবসময় খাটে না। তাঁদের মতে, কারণ (দ্রব্য) কার্যের (গুণ বা কর্ম) ঠিক পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত নির্গুণ বা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় স্বতন্ত্রভাবে সিদ্ধ হতে পারে, যদিও গুণ বা কর্ম দ্রব্য ব্যতিরেকে অস্তিত্বশীল হতে পারে না। একইভাবে, ব্যক্তি বিনাশপ্রাপ্ত হলেও জাতি (যেমন: গো-ত্ব) তার নিত্য স্বভাবের কারণে বুদ্ধিগোচর থাকে। অর্থাৎ, সমবায় সম্বন্ধে দুটি সম্বন্ধীর মধ্যে অন্তত একটি (যেমন গুণ, কর্ম বা অবয়বী) অপরটির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হলেও, অন্যটি (যেমন দ্রব্য বা অবয়ব) স্বতন্ত্র থাকতে পারে। এর ফলে পাশ্চাত্য 'আন্তঃসম্বন্ধ'-এর মতো এখানে উভয় সম্বন্ধীর স্বরূপ পরিবর্তন বা পারস্পরিক অসিদ্ধতা অনিবার্য নয়।

ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের পঞ্চবিধ সমবায়ের অন্তিম ক্ষেত্রটি হলো নিত্যদ্রব্য ও বিশেষের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। যেহেতু 'বিশেষ' নামক পদার্থটি সর্বদা নিত্যদ্রব্যকেই (যেমন পরমাণু) আশ্রয় করে অবস্থান করে, তাই সম্বন্ধীর নিত্যত্ববশত একেও নিত্য বলা হয়। অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তির ন্যায় এদের সম্পর্কও অযুতসিদ্ধ এবং আধার-আধেয় ভাবে বিন্যস্ত। তবে এই সমবায় সম্বন্ধটি সম্বন্ধীদ্বয়ের স্বরূপে কোনো মৌলিক পরিবর্তন সাধন করে না; কারণ বিশেষের কোনো পরিবর্তন ঘটলে নিত্যদ্রব্যের নিজস্বতা বা প্রাতিস্বিক পরিচয়ই বিলুপ্ত হয়ে যেত। সারসংক্ষেপে বলা যায়, সমবায় সম্বন্ধের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিযোগী অথবা অনুযোগী- উভয় সম্বন্ধীর মধ্যে অন্তত একজন সম্বন্ধ দ্বারা অপরিবর্তিত (Unmodified) থাকে। এই বৈশিষ্ট্যই প্রমাণ করে যে, সমবায় যেমন অযুতসিদ্ধ বস্তুকে যুক্ত রাখে, তেমনি সম্বন্ধীদের নিজস্ব সত্তা ও স্বরূপকেও অক্ষুণ্ণ রাখতে সহায়তা করে।

পূর্ববর্তী আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সমবায়কে পাশ্চাত্য দর্শনের 'আন্তঃসম্বন্ধ' হিসেবে গণ্য করার কোনো যৌক্তিক ভিত্তি নেই। আন্তঃসম্বন্ধের মূল শর্ত হলো সম্বন্ধটি সম্বন্ধীদ্বয়ের স্বরূপগত পরিবর্তন ঘটাবে, কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিক সিদ্ধান্তে সমবায় সম্বন্ধীদের নিজস্ব প্রকৃতি বা স্বতত্ত্ব অক্ষুণ্ণ রাখে। অন্যদিকে, সমবায়কে সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য 'বহিঃসম্বন্ধ' বলাও সম্ভব নয়; কারণ বহিঃসম্বন্ধের ক্ষেত্রে সম্বন্ধী দুটি স্বতন্ত্রভাবে টিকে থাকতে পারে, কিন্তু সমবায়ের ক্ষেত্রে অবয়বী, গুণ বা কর্ম তাদের আধার ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন। যেহেতু সমবায়ের বৈশিষ্ট্যগুলো পাশ্চাত্য দর্শনের কোনো নির্দিষ্ট ঘরানার সাথেই পূর্ণাঙ্গভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, তাই ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে একে একটি 'স্বতন্ত্র পদার্থ' হিসেবে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় দার্শনিকদের নিকট পাশ্চাত্য এই শ্রেণিবিন্যাস বিশেষ গুরুত্ববহ ছিল না; কারণ তাঁরা সমবায় ছাড়াও সংযোগ বা স্বরূপের ন্যায় ভিন্নধর্মী সম্বন্ধের সার্থকতা স্বীকার করতেন। পরিশেষে বলা যায়, সমবায়কে

পাশ্চাত্য দর্শনের ছাঁচে ফেলে অনুধাবনের চেষ্টা করা খুব একটা ফলপ্রসূ বা যুক্তিযুক্ত নয়; বরং এটি ভারতীয় দর্শনের নিজস্ব তাত্ত্বিক কাঠামোর এক সার্থক ও স্বতন্ত্র পারমার্থিক সত্তা।

- **সমবায়সিদ্ধির প্রমাণ**

নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক দর্শনে সমবায়ের স্বরূপ নিয়ে ঐক্যমত্য থাকলেও এর প্রমাণ বা অস্তিত্ব সিদ্ধির উপায় নিয়ে এক গভীর মৌলিক বিরোধ বিদ্যমান। বৈশেষিক আচার্য প্রশস্তপাদের মতে, সমবায় প্রত্যক্ষের বিষয় নয়, বরং তা 'অয়মিতি প্রত্যয়' বা বিশিষ্ট জ্ঞানের অনুপপত্তি হেতু 'অনুমান' প্রমাণের সাহায্যে সিদ্ধ হয় (যথা: 'তন্তুব্যতিরিক্তঃ পটো নাস্তি, তন্তুভ্যঃ পৃথগুপলব্ধ্যভাবাৎ')। অন্যদিকে, নব্য-নৈয়ায়িকগণ মনে করেন, সমবায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে 'বিশেষণতা' অলৌকিক সন্নিকর্ষের দ্বারা প্রত্যক্ষ গোচর হয়। ভারতীয় যুক্তিবিদ্যার এই জ্ঞানতাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব কেবল প্রমাণের প্রকারভেদ নয়, বরং পদার্থতত্ত্বের গভীর দৃষ্টিভঙ্গিকে স্পর্শ করে। যদিও পরবর্তীকালে টীকাকারগণ এই বিরোধ সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন, তবুও প্রত্যক্ষ বনাম অনুমানের এই দ্বান্দ্বিক অবস্থান ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে এক অনন্য বৌদ্ধিক তর্কের আধার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ন্যায় মত (প্রত্যক্ষ): মহর্ষি গৌতম প্রবর্তিত ন্যায়দর্শনে চতুর্বিধ প্রমাণ- প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ- এর মধ্যে প্রত্যক্ষকেই জ্যেষ্ঠ ও প্রধান প্রমাণরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ন্যায়সূত্র (১.১.৪) অনুসারে-

"ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানম্ অব্যপদেশ্যম্ অব্যভিচারী ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্"[7]

অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষজাত, অব্যভিচারী ও নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানই প্রত্যক্ষ। নব্যনৈয়ায়িকদের মতে "প্রত্যক্ষস্য সাক্ষাৎকারিত্বং লক্ষণম্"[8], অর্থাৎ অবিলম্ব, অপরোক্ষ প্রতীতিই প্রত্যক্ষের প্রকৃত স্বরূপ। প্রাচীন ন্যায় মতে ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষের মুখ্য শর্ত হলেও, ইন্দ্রিয় (দ্রব্য) সরাসরি গুণ বা জাতির সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে না। এই তাত্ত্বিক সমস্যার সমাধানে নৈয়ায়িকগণ ষড়বিধ সন্নিকর্ষের তত্ত্ব প্রবর্তন করেন। ফলে ঘটের রূপ প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে 'সংযুক্ত-সমবায়' এবং রূপের জাতি (যেমন নীলত্ব) উপলব্ধির ক্ষেত্রে 'সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়' সন্নিকর্ষ কার্যকর হয়। এই প্রেক্ষিতে 'সমবায়' (অযুতসিদ্ধ নিত্যসম্বন্ধ) বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। নৈয়ায়িকরা সমবায়কে অভাবের ন্যায় আধারের বিশেষণরূপে গণ্য করেন এবং 'বিশেষণ-বিশেষ্যভাব' বা 'বিশেষণতা'-সন্নিকর্ষের মাধ্যমে এর প্রত্যক্ষতা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁদের মতে সমবায় কোনো অতীন্দ্রিয় অনুমেয় সত্তা নয়, বরং লৌকিক ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজাত প্রত্যক্ষপ্রমাণগম্য পদার্থ এবং এটি সর্বেন্দ্রিয়গ্রাহ্য।

আচার্য গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রবর্তিত নব্যন্যায় দর্শনে সমবায় সম্বন্ধের প্রত্যক্ষযোগ্যতা এক অনন্য তাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বৈশেষিকগণ সমবায়কে অনুমেয় মনে করলেও নব্যনৈয়ায়িকগণের মতে আধার ও আধেয় উভয়ই যদি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, তবে তাদের মধ্যবর্তী অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধটিও প্রত্যক্ষসিদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। অনুমানের তুলনায় প্রত্যক্ষের নিশ্চয়তা ও অব্যভিচারিত্ব অধিক হওয়ায় 'নীল ঘট' বা 'রক্তবর্ণ তন্তু' প্রত্যক্ষকালে দ্রব্য ও গুণের সঙ্গে তাদের সমবায় সম্বন্ধটিও বিশেষণতা সন্নিকর্ষের মাধ্যমে অবিলম্বে প্রতিভাত হয়। বাস্তব অভিজ্ঞতায় বিশিষ্টজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষণ-বিশেষ্যভাবের যে প্রতীতি ঘটে, তা মূলত সবিকল্পক প্রত্যক্ষের অন্তর্গত। নির্বিকল্পক স্তরে কেবল বস্তুর স্বরূপ উদ্ভাসিত হলেও সবিকল্পক স্তরে জাতি, গুণ ও

[7] গৌতম। *ন্যায়দর্শনম (বাৎস্যায়নভাষ্য ও ফণিভূষণ তর্কবাগীশকৃত ব্যাখ্যাসহ)*। সম্পাদিত ও অনূদিত: ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ১ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮১, পৃ. ১০০।

[8] অন্নংভট্ট। *তর্কসংগ্রহ: দীপিকা টীকা ও সিদ্ধান্ততত্ত্ব ব্যাখ্যাসহ*। সম্পাদিত: পঞ্চানন তর্করত্ন, ৩য় সংস্করণ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৮৮, পৃ. ২৮।

কর্মবিশিষ্ট বস্তুর যে ঐক্যবদ্ধ অনুভব হয়, সেখানে সমবায় সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ অনিবার্য। এমনকি শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রেও শব্দ ও আকাশের সম্বন্ধ সমবায় সন্নিকর্ষের মাধ্যমেই সিদ্ধ হয়, যা সমবায়ের সর্বেন্দ্রিয়গ্রাহ্যতাকে সমর্থন করে।

তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থে আচার্য গঙ্গেশ দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করেছেন যে সমবায় যদি প্রত্যক্ষগোচর না হতো, তবে বিশিষ্টজ্ঞানের প্রামাণ্য ব্যাখ্যা করা অসম্ভব হয়ে পড়ত। পঞ্চাবয়ব ন্যায়ে ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ভ্রমের অবকাশ থাকায় অনুমাননির্ভর সিদ্ধান্ত তাত্ত্বিক অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করতে পারে। তাই নব্যন্যায় মতে গুণ-গুণী বা জাতি-ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধটি কেবল বৌদ্ধিক অনুমান নয়, বরং তা ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষের মাধ্যমে লব্ধ এক স্বতঃসিদ্ধ অনুধাবন। সুতরাং, ন্যায়দর্শনে সমবায়কে সপ্তম পদার্থরূপে স্বীকার করে তাকে লৌকিক প্রত্যক্ষানুভবের আধারে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এর ফলে জ্ঞানতত্ত্বে অব্যভিচারিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয় এবং যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে অজ্ঞাননিবৃত্তি ঘটিয়ে মোক্ষপ্রাপ্তির পথ সুপ্রসারিত হয়।

বৈশেষিক মত (অনুমান): বীপরিতে, মহর্ষি কণাদ প্রবর্তিত বৈশেষিক দর্শন প্রমাণতত্ত্বে লাঘবতা স্বীকার করে প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দ্বিবিধ প্রমাণের উপর গুরুত্বারোপ করেছে। এই পরম্পরায় আচার্য প্রশস্তপাদ ও শঙ্কর মিশ্র সমবায়কে এক অতীন্দ্রিয় নিত্য এবং অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধ রূপে প্রতিপন্ন করেছেন। তাঁদের মতে সমবায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় নয় কারণ চাক্ষুষ বা অন্যান্য প্রত্যক্ষ কেবল দ্রব্য গুণ ও কর্মকে গ্রহণ করতে পারে কিন্তু তাদের মধ্যবর্তী সম্বন্ধকে নয়। এই কারণে বৈশেষিকগণ নৈয়ায়িকসম্মত সমবায় সন্নিকর্ষ তত্ত্বটিকে কল্পনাপ্রসূত বলে সমালোচনা করেন। বৈশেষিক যুক্তিতে ইন্দ্রিয় কেবল আধারের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আধেয়কে উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেও সম্বন্ধকে সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ আকাশ ও শব্দের সম্পর্কের ক্ষেত্রে নৈয়ায়িকগণ শ্রোত্রেন্দ্রিয় দ্বারা সমবায় প্রত্যক্ষের কথা বললেও বৈশেষিক মতে শব্দ আকাশের গুণরূপে প্রত্যক্ষ হয় এবং তাদের সম্বন্ধটি অনুমানসিদ্ধ থাকে। সমবায় জ্ঞানের উৎপত্তি মূলত ইহ প্রত্যয় অর্থাৎ এখানে এটি আছে এইরূপ বিশিষ্ট বুদ্ধি এবং আধার আধেয়ভাবের অবিচ্ছেদ্য যৌক্তিক অনিবার্যতা থেকে নিঃসৃত হয়। তন্তু ও পট অথবা ব্যক্তি ও জাতির ক্ষেত্রে উভয় পদার্থ প্রত্যক্ষগোচর হলেও তাদের অবিচ্ছিন্ন বন্ধনটি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের অযোগ্য। বৈশেষিকগণের মতে এই সম্বন্ধটি সংযোগের ন্যায় অনিত্য বা বিচ্ছেদযোগ্য নয় বরং এটি একটি অদৃশ্য ও অবিভাজ্য শক্তি যা কেবল অনুমানের মাধ্যমেই সিদ্ধ হয়। আধেয় ও আধারের এই নিত্য সম্বন্ধটি প্রত্যক্ষের পরিধি বহির্ভূত হওয়ায় একে কেবল এক যৌক্তিক ভিত্তি হিসেবেই গণ্য করা যুক্তিযুক্ত।

প্রশস্তপাদভাষ্যে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, রক্তবর্ণ তুলো প্রত্যক্ষ করার সময় চক্ষুরিন্দ্রিয় পৃথকভাবে দ্রব্য ও গুণ উপলব্ধি করলেও তাদের মধ্যবর্তী সমবায় সম্বন্ধ ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষে ধরা পড়ে না। সমবায় যদি প্রত্যক্ষগ্রাহ্য হতো তবে তার নিত্যতা ও অবিভাজ্যতা ইন্দ্রিয়গোচর হওয়া উচিত ছিল যা বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিপন্থী। অতএব সমবায়কে কেবল অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ পদার্থ হিসেবেই গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত যেখানে ভেদ ও অভেদের এককালীন সহাবস্থান বা একস্থানীয়তা থেকে এই সম্বন্ধের অনুমান ঘটে। বৈশেষিক দার্শনিকগণ ন্যায়সম্মত পঞ্চাবয়ব যুক্তির কাঠামো অর্থাৎ পক্ষ হেতু দৃষ্টান্ত উপনয় ও নিগমনের মাধ্যমে এই অদৃশ্য সম্বন্ধটি প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে লিঙ্গ ও লিঙ্গী সম্পর্কের সাহায্যে সমবায়ের সত্তা নির্ণীত হয় যা মূলত অযুতসিদ্ধ ভেদাভেদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বিশেষণ বিশেষ্যভাব সন্নিকর্ষটি অভাব সাপেক্ষ জ্ঞানব্যবস্থার অন্তর্গত হওয়ায় সমবায়ের ন্যায় ভাবাত্মক পদার্থের প্রত্যক্ষতা এই প্রক্রিয়ায় সম্ভব নয়।

কোনো সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ হওয়ার জন্য প্রতিযোগী ও অনুযোগী উভয়েরই প্রত্যক্ষযোগ্য হওয়া আবশ্যক কিন্তু সমবায় সর্বব্যাপী ও এক হওয়ায় তা সর্বত্র প্রত্যক্ষের বিষয় হতে পারে না। এই কারণে বৈশেষিকগণ সমবায়কে সত্তার ন্যায় অতীন্দ্রিয় মেনে ইহবুদ্ধি ও অনুমানের ওপর নির্ভর করেন। তাঁরা মনে করেন সংযোগের ন্যায় সমবায় প্রত্যক্ষগোচর নয় বরং এটি আধার ও আধেয়ের এক অবিচ্ছেদ্য যৌক্তিক বন্ধন।

অন্নম্ভট্ট প্রবর্তিত ন্যায়দর্শনে সবিকল্পক প্রত্যক্ষের স্তরে রক্তিমতাযুক্ত তুলোত্ববিশিষ্ট দ্রব্যের যে বিশিষ্ট জ্ঞান হয়, সেখানে সমবায় সম্বন্ধটি অন্তর্নিহিত থাকে বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু বৈশেষিক দার্শনিকগণ এই লৌকিক প্রতীতিকে প্রত্যক্ষ না মেনে একে আধার ও আধেয়ের সম্মিলিত উপলব্ধি হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। তাঁদের মতে সমবায় সর্বতোভাবে সূক্ষ্ম, অদৃশ্য এবং যুক্তিাশ্রয়ী এক অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ পদার্থ। তাঁদের যুক্তিতে সমবায়ের সঙ্গে সম্বন্ধীর প্রত্যক্ষযোগ্য কোনো ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ না থাকায় এটি অতীন্দ্রিয় হিসেবে বিবেচিত হয়। যদি সমবায়কে প্রত্যক্ষগ্রাহ্য করা হতো তবে তাকে পুনরায় অন্য কোনো আশ্রয়ে সমবেত থাকতে হতো এবং এইভাবে অনবস্থা দোষের সৃষ্টি হতো। এই যৌক্তিক সংকট এড়াতে বৈশেষিকগণ সমবায়কে স্বাত্মস্থিতিক বা নিজস্ব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত এবং অসমবেত পদার্থ বলে স্বীকার করেন, যা কেবল অনুমেয়।

সংযোগ ও বিভাগের অনিত্যতা মূলত সমবায়ের নিত্যতাকেই পরিস্ফুট করে তোলে। দণ্ড ও পুরুষের সংযোগ স্থাপনযোগ্য বা বিচ্ছেদযোগ্য হলেও গুণ ও গুণী অথবা ক্রিয়া ও ক্রিয়াবানের সম্পর্ক অযুতসিদ্ধ ও অবিচ্ছেদ্য। সুতরাং এই অবিনাশী এবং অবিভাজ্য নিত্য সম্বন্ধটি প্রত্যক্ষের পরিধি বহির্ভূত হলেও যুক্তিসিদ্ধ এক পরম তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

কাজেই উপরোক্তপায়ে দেখতে পাচ্ছি, ন্যায় ও বৈশেষিক মতভেদের কেন্দ্রে রয়েছে প্রমাণতত্ত্বের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি : ন্যায় যেখানে প্রত্যক্ষকে প্রাধান্য দিয়ে সমবায়কে স্বতঃসিদ্ধ ও প্রত্যক্ষগম্য বলে মান্য করে, বৈশেষিক সেখানে সমবায়ের মতো সূক্ষ্ম পদার্থের ক্ষেত্রে অনুমানকেই একমাত্র বৈধ প্রমাণরূপে প্রতিষ্ঠা করে এবং নৈয়ায়িকদের অবস্থানকে "প্রত্যক্ষের অতিরঞ্জন" বলে সমালোচনা করে।

সমন্বয়বাদ: আচার্য প্রশস্তপাদ প্রণীত *পদার্থধর্মসংগ্রহ* গ্রন্থে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের এক অনন্য সমন্বয় সাধিত হয়েছে। এখানে ন্যায়ের প্রত্যক্ষ ও বৈশেষিকের অনুমানকে পরস্পরের পরিপূরক রূপে গ্রহণ করে সমবায়কে ষষ্ঠ পদার্থ হিসেবে সপ্রতিষ্ঠ করা হয়। এই সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রত্যক্ষ সমবায়ের অস্তিত্ব প্রতীতি করে এবং অনুমান তার প্রকৃত স্বরূপ নির্ধারণে সহায়তা করে। ফলে প্রত্যক্ষের সরলতা ও অনুমানের যুক্তিগম্ভীরতা একত্রে বিন্যস্ত হয়। পরবর্তীকালে উদয়নাচার্য তাঁর *ন্যায়কুসুমাঞ্জলি* গ্রন্থে এই সমন্বয়কে আরও সুসংহত রূপ দান করেছেন। তাঁর মতে সমবায় প্রথমে প্রত্যক্ষে প্রতিভাত হলেও এর নিত্যতা, একত্ব ও অযুতসিদ্ধতা কেবল অনুমানের মাধ্যমেই নিশ্চিতভাবে নিরূপিত হওয়া সম্ভব। ন্যায় বৈশেষিক সমন্বয়ে এক দ্বিস্তরীয় জ্ঞানতত্ত্ব পরিলক্ষিত হয় যেখানে প্রত্যক্ষ সমবায়ের সত্তাকে অবিলম্বে উপস্থাপন করে আর অনুমান তার সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ ঘটায়।

এই সমন্বয়ের ফলে ন্যায় ও বৈশেষিক মতের মৌলিক বিরোধগুলি এক নতুন তাত্ত্বিক ভারসাম্য লাভ করে যা ভারতীয় দর্শনের বাস্তববাদী পরম্পরাকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রমাণতত্ত্বের এই দ্বৈততা সমবায় তত্ত্বে বিতর্কের উৎস হিসেবে অবশিষ্ট থাকলেও তা দর্শনকে অধিকতর বিশ্লেষণাত্মক গভীরতা প্রদান করেছে। এই বৈচারিক দ্বন্দ্বই মূলত ভারতীয় বস্তুবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে সাহায্য করে।

এখন সমবায়ের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বৈশেষিকরা একটি অনুমান প্রস্তাব করেন-

"গুণক্রিয়াদিবিশিষ্টবুদ্ধিঃ বিশেষণবিশেষ্যসম্বন্ধবিষয়া, বিশিষ্টবুদ্ধিত্বাৎ, দণ্ডপুরুষ ইতি বিশিষ্টবুদ্ধিবৎ।"[9]

এখানে 'গুণ-ক্রিয়া-বিশিষ্ট বুদ্ধি' পক্ষ, 'বিশেষণ–বিশেষ্যসম্বন্ধবিষয়তা' সাধ্য, এবং 'বিশিষ্টবুদ্ধিত্ব' হেতু। যেমন দণ্ডী পুরুষ এই জ্ঞানে দণ্ড ও পুরুষের মধ্যে একটি সম্বন্ধ অবশ্যম্ভাবী, অন্যথা এই প্রকার বিশিষ্ট জ্ঞান সম্ভব হতো না। তবে এই অনুমানের মাধ্যমে কেবল একটি সাধারণ সম্বন্ধের অস্তিত্বই প্রমাণিত হয়, কোনো বিশেষ সম্বন্ধের নয়। যদি বিশেষ সম্বন্ধই অনুমেয় হতো, তবে সংযোগকেও অনুমানের মাধ্যমেই জানতে হতো যা বৈশেষিকগণ স্বীকার করেন না। দ্রব্য ও গুণ উভয়ই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হওয়া সত্ত্বেও বৈশেষিকগণ সমবায়কে প্রত্যক্ষের পরিধি বহির্ভূত রেখে অনুমানের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সুতরাং, বৈশেষিক মতে প্রত্যক্ষ কেবল আধার ও আধেয়ের সম্মিলিত প্রতীতি প্রদান করে কিন্তু সমবায়ের স্বরূপ উদ্ভাসিত করে না। সমবায় এক নিত্য, অবিভাজ্য ও অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধ যা সংযোগের ন্যায় অনিত্য বা বিচ্ছেদযোগ্য নয়। এই কারণেই ইন্দ্রিয়াতীত সমবায়কে অনুমেয় পদার্থ হিসেবে গণ্য করা যৌক্তিক বলে তাঁরা মনে করেন।

উপসংহার: উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, ন্যায়–বৈশেষিক দর্শনে সমবায় কেবল একটি সম্বন্ধমাত্র নয়, বরং জগতের অন্টোলজিক্যাল গঠন ও কার্যকারণ সংগতি ব্যাখ্যার এক অপরিহার্য তাত্ত্বিক ভিত্তি। অযুতসিদ্ধি ও আধার আধেয়ভাবের নিরিখে এটি এমন এক নিত্য ও অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র, যা অবয়ব অবয়বী, গুণ গুণী, ক্রিয়া ক্রিয়াবান এবং জাতি ব্যক্তির মধ্যে অন্তর্নিহিত ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে এবং ইহপ্রত্যয়ের মাধ্যমে বিশিষ্টজ্ঞানকে সম্ভবপর করে তোলে। এর একত্ব ও নিত্যত্ব জাগতিক বৈচিত্র্যের অন্তরালে এক সুসংগঠিত ও অবিচ্ছিন্ন কাঠামোর অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করে; অন্যথায় দ্রব্য গুণ, কার্য কারণ এবং সামান্য বিশেষের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যাতীত হয়ে জগত বিচ্ছিন্ন সত্তাসমষ্টিতে পরিণত হতো।

সমবায় পদার্থের অস্তিত্ব ও সিদ্ধি সম্পর্কিত মতভেদ মূলত ভারতীয় প্রমাণশাস্ত্র ও পদার্থতত্ত্বের এক গভীর দ্বান্দ্বিক প্রতিফলন। নৈয়ায়িকদের প্রত্যক্ষবাদ এবং বৈশেষিকদের অনুমানবাদ এই বিতর্ককে তাত্ত্বিক গভীরতা প্রদান করেছে। এই প্রসঙ্গে প্রশস্তপাদ ও উদয়নাচার্য সমন্বয়মূলক দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, যেখানে প্রত্যক্ষ সমবায়ের সত্তাকে প্রতীয়মান করে এবং অনুমান তার নিত্যতা ও অযুতসিদ্ধ স্বরূপকে যুক্তিসংগতভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। এই দ্বিমুখী পদ্ধতির মাধ্যমে সমবায়ের দার্শনিক উপযোগিতা পূর্ণতা লাভ করে এবং তা সপ্তপদার্থের এক অপরিহার্য ভিত্তি হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমন্বিত বিশ্লেষণের ফলে সমবায় কার্যকারণভাব ও অবয়ব অবয়বীর অলঙ্ঘ্য ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরমাণুবাদের আলোচনায় পরমাণু ও দ্ব্যণুকের পারম্পর্য ব্যাখ্যায় এর নিত্য অস্তিত্ব অপরিহার্য হয়ে ওঠে, যা জগতের বাস্তবতা ও স্থায়িত্বকে সুসংহত করে। গুণ গুণীর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের ব্যাখ্যায় এটি বৌদ্ধ ক্ষণিকবাদ বা সাংখ্য অভেদতত্ত্বের বিপরীতে একটি স্বতন্ত্র তাত্ত্বিক সংহতি নির্মাণ করে।

প্রয়োগক্ষেত্রেও সমবায়ের গুরুত্ব অনস্বীকার্য; দ্রব্য ও গুণের অবিচ্ছেদ্য সংলগ্নতা এর মাধ্যমেই যুক্তিসিদ্ধ হয়। নৈতিক স্তরে এটি কর্মফলের সুশৃঙ্খল বিন্যাস ব্যাখ্যা করে আত্মা ও তদ্গত ধর্মসমূহের নিত্য সংযোগ স্থাপন করে মুক্তির পথকে সুস্পষ্ট করে। অতএব, সমবায় কোনো সাধারণ সম্বন্ধ নয়, বরং জগতের বস্তুগত

[9] প্রশস্তপাদ। *প্রশস্তপাদভাষ্যম্: পদার্থধর্মসংগ্রহ (ন্যায়কন্দলী ও বিবৃতি টীকাসহ)*। সম্পাদিত এবং অনূদিত: দামোদর চঞ্চল ভট্টাচার্য, ২য় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯৩, পৃ. ৩০৩।

সংহতি, জ্ঞানশৃঙ্খলা এবং কার্যকারণ নীতির এক মৌলিক ভিত্তি; এর যথার্থ অনুধাবন জাগতিক বৈচিত্র্যের অন্তরালে নিহিত শাশ্বত ঐক্যকে উদ্ভাসিত করে এবং দর্শনের চূড়ান্ত লক্ষ্যকে সুসংগতভাবে প্রতিষ্ঠা করে।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। অন্নম্ভট্ট। তর্কসংগ্রহ। সম্পাদিত: শ্রী নারায়ণ গোস্বামী, ২য় পরিবর্তিত সংস্করণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৯০।

২। অন্নম্ভট্ট। তর্কসংগ্রহ ও তর্কসংগ্রহদীপিকা। অনুবাদ ও ব্যাখ্যা: দীপক কুমার বাগচী, মিত্রম্, কলকাতা, ২০১০।

৩। উদয়ন, আচার্য। কিরণাবলী (প্রথম খণ্ড)। সম্পাদিত: গৌরীনাথ শাস্ত্রী, প্রথম পর্ষদ, জানুয়ারি ১৯৯০।

৪। তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ। ন্যায় দর্শন (প্রথম খণ্ড)। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

৫। ভট্টাচার্য, আশুতোষ। ভারতীয় দর্শন। পকুই পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০২০।

৬। ভট্টাচার্য, করুণা। ন্যায়বৈশেষিক দর্শন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

৭। ন্যায়পঞ্চানন, বিশ্বনাথ। ভাষাপরিচ্ছেদ: সিদ্ধান্তমুক্তাবলী সমেত। দেবেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, কলকাতা, ১৯১৩।

৮। প্রশস্তপাদাচার্য। প্রশস্তপাদভাষ্যম (প্রথম ভাগ)। অনুবাদক: ব্রহ্মচারী মেধা চৈতন্য দণ্ডস্বামী দামোদরাশ্রম, ১ম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৭।

৯। রায়চৌধুরী, অনামিকা। ভাষাপরিচ্ছেদ। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ২০০৮।

১০। সেনগুপ্ত, প্রমোদবন্ধু। ভারতীয় দর্শন (প্রথম খণ্ড)। ব্যানার্জি পাবলিশার্স।

১১। Hiriyanna, M. Outlines of Indian Philosophy. 6th impression, George Allen & Unwin Ltd., 1967.

১২। Sharma, C. A Critical Survey of Indian Philosophy. Motilal Banarsidass, 1979.

১৩। Shastri, Biswanarayan. Samavaya: Foundation of Nyaya-Vaisesika Philosophy. Sharada Publishing House, 1993.

১৪। Vidyabhusana, S. C. A History of Indian Philosophy. Motilal Banarsidass, 1988.

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1849-1855
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.408

শূন্যতা ও মধ্যমা প্রতিপদ: বৌদ্ধ দর্শনের পারমার্থিক বিবর্তনে আচার্য নাগার্জুনের অবদান

আব্দুল সামাদ সেখ, *স্বাধীন গবেষক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 25.03.2026; Accepted: 28.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Acharya Nagarjuna occupies a unique and monumental position in the history of Buddhist philosophy. His seminal contribution, the doctrine of Sunyata, serves to illuminate and deepen the foundational teachings of Gautama Buddha. This article aims to examine the profound interrelation between Nagarjuna's concept of Sunyata and the Buddha's Middle Way (Madhyama Pratipad). The analysis clarifies that Sunyata is not a state of nihilism or non-existence; rather, it signifies the absence of independent existence. Nagarjuna argues that no phenomenon in the world is autonomous, as every entity arises in dependence upon specific causes and conditions. This fundamental interdependence is defined as Sunyata or Nisvabhavata (the lack of intrinsic nature). What the Buddha identified as Pratityasamutpada (Dependent Origination) is, according to Nagarjuna, ultimately equivalent to Sunyata at the ultimate level of reality. Furthermore, the paper explores how Nagarjuna employed rigorous logic to demonstrate that objects possess no permanent essence and that motion or change cannot exist independently. It also highlights Nagarjuna's masterful refutation of the misconception that accepting Sunyata would invalidate the Four Noble Truths. Ultimately, the study concludes that Sunyata is not merely a complex theoretical construct, but also a profound practical method for dispelling mental delusions and conceptual fabrications. To truly grasp the essence of Buddhist teachings and to facilitate the path toward Nirvana, Nagarjuna's philosophical insights remain profoundly relevant in the contemporary era.

Keywords: Acharya Nagarjuna, Emptiness (Śūnyatā), Middle Way (Madhyamāpratipad), Dependent Origination (Pratītyasamutpāda), Non-essentialism / Lack of inherent nature (Niḥsvabhāvatā), Nirvana

বৌদ্ধ দর্শনের সুদীর্ঘ ও বৈচিত্র্যময় বিবর্তনের ইতিহাসে আচার্য নাগার্জুন প্রবর্তিত মাধ্যমিক দর্শন বৌদ্ধ চিন্তাধারাকে কেবল সমৃদ্ধই করেনি, বরং বুদ্ধের আদি শিক্ষাকে এক অনন্য পারমার্থিক উচ্চতায় উন্নীত করেছে। এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য হলো নাগার্জুনের দর্শনে শূন্যতা এবং বুদ্ধের মধ্যমা প্রতিপদের মধ্যে গভীর ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কটি তাত্ত্বিকভাবে অনুসন্ধান করা। বৌদ্ধ দর্শনে শূন্যতা কোনো আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন উদ্ভাবন নয়। গৌতম বুদ্ধ তাঁর উপদেশে বারবার জগতের অনিত্যতা এবং অনাত্মা বা সারবস্তুহীনতার কথা বলেছিলেন। প্রাচীন পালি নিকায়গুলোতেও শূন্যতার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তবে সেই আদি বীজকে একটি পূর্ণাঙ্গ ও অকাট্য দার্শনিক বৃক্ষে রূপান্তর করার কৃতিত্ব আচার্য নাগার্জুনের। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে বৌদ্ধ দর্শনের বিভিন্ন শাখা বিশেষ করে সর্বাস্তিবাদীগণ, জগতের মূল উপাদান বা ধর্মগুলোকে স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংসিদ্ধ সত্য বলে মনে করতে শুরু

করেছিলেন। নাগার্জুন তাঁর প্রখর যুক্তিবোধ এবং দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির মাধ্যমে এই ধারণাকে পরম নিষ্ঠার সাথে প্রমাণ করেন যে জগতের কোনো কিছুই একক, নিরপেক্ষ বা স্বতন্ত্রভাবে বিরাজ করতে পারে না।

নাগার্জুনের শূন্যতাতত্ত্বের প্রাণভোমরা হলো বুদ্ধের প্রতীত্যসমুৎপাদ বা নির্ভরশীল উৎপত্তির তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুসারে যেকোনো কিছুর উৎপত্তি বা অস্তিত্ব অনিবার্যভাবে অন্য কোনো কারণ বা শর্তের ওপর নির্ভর করে। নাগার্জুন এই পরনির্ভরশীলতাকেই শূন্যতা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর অকাট্য যুক্তি হলো যেহেতু প্রতিটি বস্তু বা ধারণা অন্য কিছুর ওপর নির্ভর করে আছে সেহেতু সেই বস্তুটির নিজস্ব কোনো স্বভাব বা স্বয়ংসিদ্ধ সত্তা থাকতে পারে না। যাকে আমরা সাধারণত বস্তুর অস্তিত্ব বলে মনে করি, তা আসলে কতগুলো হেতু ও প্রত্যয়ের সমষ্টি মাত্র। এই নিঃস্বভাবতা বা নিজস্ব স্থায়ী সত্তার অভাবকেই তিনি পারিভাষিক অর্থে শূন্যতা বলেছেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে নাগার্জুনীয় শূন্যতা কোনোভাবেই নাস্তিত্ববাদ বা Nihilism নয়। এটি মূলত একটি মহান মধ্যপথ বা মধ্যমা প্রতিপদ, যা অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব এই দুই চরম বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। বস্তু একেবারে নেই বা অলীক এটি যেমন পরম সত্য নয়, তেমনি বস্তুর একটি স্থায়ী, অপরিবর্তনীয় ও শাশ্বত রূপ আছে এটিও সত্য নয়। এই দুই প্রান্তিক ধারণার ভারসাম্যই হলো শূন্যতা, যা বুদ্ধের মূল দর্শনের পারমার্থিক নির্যাস।

নাগার্জুন যখন এই শূন্যতাতত্ত্ব প্রচার করেন, তখন সমকালীন অনেক রক্ষণশীল পণ্ডিতই একে বৌদ্ধ ধর্মের মূল স্তম্ভগুলোর বিরোধী বলে মনে করেছিলেন। তাঁদের প্রধান আশঙ্কা ছিল যে, যদি সবকিছুই শূন্য বা নিঃস্বভাব হয়, তবে বুদ্ধের দেওয়া চতুরার্য সত্য, কর্মফল, নির্বাণ কিংবা বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘের মতো মৌলিক ধারণাগুলোও অর্থহীন হয়ে পড়বে। বর্তমান প্রবন্ধটিতে এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেই নাগার্জুনের যুক্তিনির্ভর ব্যাখ্যাগুলোকে গভীর মনোযোগের সাথে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নাগার্জুন অত্যন্ত নিপুণভাবে দেখিয়েছেন যে, শূন্যতা বুদ্ধের শিক্ষাকে অস্বীকার তো করেই না, বরং তাকে পরম সত্যের আধারে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, যদি বস্তুসমূহ শূন্য না হয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ বা অপরিবর্তনীয় হতো, তবে জগতের কোনো বিবর্তন, আধ্যাত্মিক উত্তরণ বা মুক্তি সম্ভব হতো না। তাঁর দর্শনে শূন্যতা কোনো নিছক শুষ্ক তাত্ত্বিক কূটতর্ক নয়, বরং এটি মানুষের মনের ভ্রান্ত ধারণা বা প্রপঞ্চ দূর করার একটি মহৌষধ। মানুষ যখন মোহবশত বস্তুকে স্থায়ী মনে করে তখনই সে দুঃখের জালে আবদ্ধ হয়। আর যখন সে বস্তুর শূন্যতা উপলব্ধি করতে পারে তখনই সে সেই মোহ এবং আসক্তি থেকে চিরতরে মুক্তি পায়। এই মুক্তিই হলো বৌদ্ধ দর্শনের চূড়ান্ত লক্ষ্য বা নির্বাণ।

নাগার্জুনের তাঁর অনন্য দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি বা 'চতুষ্কোটির' প্রয়োগ ঘটিয়ে লৌকিক সংবৃত্তি এবং পারমার্থিক সত্যের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন তৈরি করেছেন। নাগার্জুনের শূন্যতাতত্ত্ব কীভাবে বুদ্ধের মধ্যপথের এক শ্রেষ্ঠ পারমার্থিক রূপায়ণ সেই মূল সুরটি এখানে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। নাগার্জুন তাঁর দর্শনে বারবার সতর্ক করেছেন যে, শূন্যতাকে যেন কেউ ভুলভাবে না বোঝে। তিনি একে তুলনা করেছেন বিষধর সাপের সাথে। ভুলভাবে ধরলে যেমন সাপ ধ্বংসের কারণ হয় তেমনি শূন্যতাকে নাস্তিত্ব মনে করলে তা সাধকের পতন ঘটাতে পারে। শূন্যতাকে একটি নির্দিষ্ট মতবাদ বা দৃষ্টি হিসেবে না দেখে, বরং সমস্ত ভ্রান্ত মতবাদ থেকে চিত্তের মুক্তির একটি অপরিহার্য উপায় হিসেবে দেখাই হল প্রধান উদ্দেশ্য। আচার্য নাগার্জুনের এই প্রজ্ঞা কেবল তাঁর সমকালেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং আধুনিক জ্ঞানতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের অনেক জটিল প্রশ্নের সমাধানেও তাঁর প্রাসঙ্গিকতা আজও অনস্বীকার্য। বুদ্ধের অমিয় বাণীর এই পারমার্থিক বিবর্তন ও দার্শনিক সার্থকতা অনুধাবন করাই বর্তমান নিবন্ধের প্রধান উপজীব্য।

প্রতীত্যসমুৎপাদ ও নিঃস্বভাবতার আলোকে শূন্যতাতত্ত্ব:

বৌদ্ধ দর্শনের আলোচনায় শূন্যতা এবং প্রতীত্যসমুৎপাদ শব্দ দুটি পরস্পর পরিপূরক। আচার্য নাগার্জুন তাঁর *মূলমধ্যমককারিকায়* অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, যা প্রতীত্যসমুৎপাদ বা নির্ভরশীল উৎপত্তি, তাই হল শূন্যতা।[১] এই তত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যায় যে, জগতের প্রতিটি বস্তু বা ধর্ম অন্য কোনো কারণ বা হেতুর ওপর নির্ভর করে উৎপন্ন হয়। এই পরনির্ভরশীলতাই প্রমাণ করে যে, বস্তুর নিজের কোনো স্বাধীন বা নিরপেক্ষ সত্তা নেই। দর্শনের পরিভাষায় একেই বলা হয় 'নিঃস্বভাবতা'। অর্থাৎ বস্তুর এমন কোনো স্থায়ী বৈশিষ্ট্য নেই যা অন্য কিছুর সাহায্য ছাড়া নিজে নিজে টিকে থাকতে পারে। নাগার্জুন তাঁর যুক্তির ধারাকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে প্রথমেই বিশ্লেষণ করেছেন আমাদের সাধারণ বোধ বা স্বভাবের ধারণাকে। আমরা সাধারণত মনে করি বস্তুর নিজস্ব স্বরূপ বা স্বভাব আছে। কিন্তু নাগার্জুন দেখিয়েছেন, যদি কোনো বস্তুর নিজস্ব স্বভাব থাকতো তবে সেই বস্তুটির কোনো পরিবর্তন সম্ভব হতো না। স্বভাব মানেই হলো যা অপরিবর্তনীয় এবং যা অন্যের ওপর নির্ভর করে না। কিন্তু জগতের অভিজ্ঞতা আমাদের ভিন্ন কথা বলে। এখানে প্রতিটি বস্তু পরিবর্তনশীল এবং বিনাশী। এই পরিবর্তনের ধারণাটি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নাগার্জুন অত্যন্ত চমৎকার কিছু যুক্তি পেশ করেছেন।

প্রথমেই আসা যাক গতি বা পরিবর্তনের যুক্তিতে। নাগার্জুন প্রশ্ন তুলেছেন একটি বস্তু যখন পরিবর্তিত হয় তখন সেই পরিবর্তনটি ঠিক কোথায় ঘটে? ধরা যাক একজন যুবক সময়ের সাথে সাথে বৃদ্ধে পরিণত হন। এখন প্রশ্ন হলো, এই 'বৃদ্ধ' হওয়ার প্রক্রিয়াটি কি যুবকের মধ্যে ঘটছে, নাকি অন্য কোথাও? যদি আমরা বলি যুবকই বৃদ্ধ হন, তবে একটি যৌক্তিক অসংগতি দেখা দেয়। যুবক এবং বৃদ্ধ এই দুটি দশা সম্পূর্ণ বিপরীত। যে মুহূর্তে তিনি যুবক, সেই মুহূর্তে তিনি বৃদ্ধ নন। আবার যখন তিনি বৃদ্ধ তখন তিনি আর যুবক নন। ফলে যুবক নিজে কখনোই বৃদ্ধ হতে পারে না, কারণ বৃদ্ধ হওয়ার সাথে সাথেই তার যুবক সত্তাটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। আবার যুবক ছাড়া অন্য কেউ বৃদ্ধ হচ্ছে একথা বলাও অসম্ভব। অর্থাৎ, যুবক এবং বৃদ্ধের মধ্যে কোনো স্থায়ী যোগসূত্র বা স্বভাব খুঁজে পাওয়া যায় না। তারা একে অপরের ওপর নির্ভর করে আমাদের জ্ঞানে প্রকাশিত হয় মাত্র। অনুরূপভাবে, ক্ষীর বা দুধ থেকে দধির উৎপত্তির উদাহরণটি এখানে প্রাসঙ্গিক। যদি দুধের নিজস্ব কোনো স্থায়ী স্বভাব থাকতো তবে তা কখনোই দধিতে রূপান্তরিত হতে পারতো না। কারণ স্বভাব মানেই হলো অপরিবর্তনীয়তা। যদি দুধ নিজের স্বভাব বজায় রাখে তবে সে চিরকাল দুধই থেকে যাবে। আর যদি সে নিজের স্বভাব ত্যাগ করে দধি হয় তবে বোঝা যাচ্ছে যে তার কোনো স্থায়ী স্বভাব ছিল না। সুতরাং দুধ বা দধি কারোরই নিজস্ব কোনো পরম সত্তা নেই; তারা কেবল নির্দিষ্ট কারণ ও শর্তের (হেতু ও প্রত্যয়) সমষ্টি। এই যে বস্তুর নিজস্ব কোনো স্থায়ী রূপ না থাকা, একেই নাগার্জুন 'নিঃস্বভাবতা' বলেছেন।[২]

নাগার্জুন এই আলোচনাকে আরও গভীরে নিয়ে গিয়েছেন সংস্কৃত ধর্মের লক্ষণগুলোর বিচার করার মাধ্যমে। বৌদ্ধ দর্শনের বিভিন্ন শাখা মনে করত যে উৎপত্তি, স্থিতি এবং বিনাশ এই তিনটি হলো জগতের সবকিছুর সাধারণ লক্ষণ। নাগার্জুন প্রশ্ন তুললেন, এই তিনটি লক্ষণ কি স্বতন্ত্রভাবে সত্য? যদি উৎপত্তি একটি স্বতন্ত্র ধর্ম হয়, তবে তার নিজেরও তো উৎপত্তি হওয়া প্রয়োজন। আর যদি উৎপত্তির জন্য অন্য কোনো উৎপত্তির প্রয়োজন হয়, তবে এক 'অনবস্থা' দোষ তৈরি হবে অর্থাৎ যুক্তির কোনো শেষ থাকবে না।[৩] তিনি প্রমাণ করলেন যে, যা উৎপন্ন হয়েছে তার নতুন করে উৎপত্তি সম্ভব নয়, আবার যা অনুৎপন্ন তারও উৎপত্তি হচ্ছে বলা যায় না। ফলে উৎপত্তি, স্থিতি বা বিনাশ এগুলো কোনো স্বতন্ত্র বা স্বয়ংসিদ্ধ সত্য নয়। এগুলো কেবল লোকব্যবহার বা আমাদের বোঝার সুবিধার্থে ব্যবহৃত কতগুলো ধারণা মাত্র।

নাগার্জুনের এই নিঃস্বভাবতার তত্ত্ব আসলে বুদ্ধের প্রতীত্যসমুৎপাদকে এক অনন্য উচ্চতা দান করে। তিনি দেখিয়েছেন যে, প্রতীত্যসমুৎপাদ শব্দের প্রকৃত অর্থই হলো শূন্যতা। প্রতীত্যসমুৎপাদ মানে অন্যের ওপর নির্ভর করে উৎপন্ন হওয়া, আর শূন্যতা মানে নিজস্ব স্বভাব না থাকা। অন্যের ওপর নির্ভর করা মানেই হলো নিজের মধ্যে খামতি থাকা বা রিক্ততা। তাই অভাব বা নাস্তিত্ব দিয়ে শূন্যতাকে ব্যাখ্যা করা ভুল। অভাব মানে হলো 'কিছুই না', কিন্তু নাগার্জুনের শূন্যতা হলো 'পারস্পরিক নির্ভরশীলতা'। তিনি রথের উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি আরও স্পষ্ট করেছেন। একটি রথ বলতে আমরা যা বুঝি, তা আসলে তার চাকা, অক্ষ, আসন এবং অন্যান্য অংশের একটি বিন্যাস মাত্র। এই অংশগুলোকে সরিয়ে নিলে 'রথ' বলে স্বতন্ত্র কোনো বস্তু খুঁজে পাওয়া যাবে না। আবার অংশগুলোও রথ ছাড়া অর্থহীন। অর্থাৎ রথ সত্তাটি তার অংশগুলোর ওপর নির্ভরশীল এবং অংশগুলোও সমগ্রের ওপর নির্ভরশীল। এই যে একে অপরের ওপর নির্ভর করে একটি ধারণার সৃষ্টি হওয়া, একেই নাগার্জুন 'উপাদায় প্রজ্ঞপ্তি' বলেছেন।[৪]

নাগার্জুন তাঁর *শূন্যতাসপ্ততি* গ্রন্থে আরও সূক্ষ্ম যুক্তি প্রয়োগ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যারা মনে করেন ভাবপদার্থ বা বস্তুসমূহ শূন্য নয়, তাদের প্রধান যুক্তি হলো সংখ্যার অস্তিত্ব। প্রতিপক্ষ বলে থাকেন যে, যেহেতু আমরা 'এক', 'দুই' বা 'বহু' এই ধরণের সংখ্যা ব্যবহার করি, তাই বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হয়। নাগার্জুন এর উত্তরে বলেছেন, সংখ্যা নিজেই একটি প্রতীত্যসমুৎপন্ন ধারণা।[৫] 'এক' না থাকলে 'অনেক' এর ধারণা জন্মায় না, আবার 'অনেক' না থাকলে 'এক' এর কোনো অর্থ থাকে না। সুতরাং সংখ্যার অস্তিত্বই প্রমাণ করে যে সবকিছুই আপেক্ষিক এবং নিঃস্বভাব। নাগার্জুন যখন বলেন "যঃ প্রতীত্যসমুৎপাদঃ শূন্যতাং তাং প্রচক্ষ্মহে"[৬], তখন তিনি আসলে বৌদ্ধ দর্শনের এক পরম সত্যকেই উদ্ভাসিত করেন। তাঁর মতে শূন্যতাই হলো জগতের গতিশীলতার আধার। যদি সবকিছু 'অশূন্য' বা নিজস্ব স্বভাবে স্থির হতো তবে জগতের কোনো পরিবর্তন সম্ভব হতো না, কোনো সাধনা সফল হতো না এবং দুঃখ মুক্তি বা নির্বাণও অসম্ভব হয়ে পড়ত। কারণ যা স্বভাবত সৎ তার বিনাশ নেই আর যা স্বভাবত অসৎ তার উৎপত্তি নেই। একমাত্র 'শূন্যতা' বা নিঃস্বভাবতা আছে বলেই জগত সচল এবং নির্বাণ সম্ভব। এই পরম উপলব্ধিই নাগার্জুনের দর্শনকে বৌদ্ধ পারমার্থিক বিবর্তনের এক শ্রেষ্ঠ ধাপে পরিণত করেছে। শূন্যতা এখানে কেবল একটি শব্দ নয়, বরং এটিই হলো জগতের প্রকৃত স্বরূপ এবং বন্ধনমুক্তির মূল চাবিকাঠি।

চতুরার্য সত্যের পারমার্থিক ভিত্তি ও নির্বাণ উপলব্ধিতে শূন্যতার ভূমিকা:

নাগার্জুনের শূন্যতাতত্ত্ব যখন তৎকালীন বৌদ্ধ দার্শনিক মহলে প্রচারিত হতে শুরু করে, তখন তা এক প্রবল বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল। বিশেষ করে স্থবিরবাদী বা সর্বাস্তিবাদী দার্শনিকরা মনে করেছিলেন যে, যদি জগতের সবকিছুই 'শূন্য' বা 'নিঃস্বভাব' হয় তবে বৌদ্ধ ধর্মের মূল ভিত্তিগুলোই ভেঙে পড়বে। নাগার্জুনের *মূলমধ্যমককারিকার* চব্বিশতম অধ্যায়ে এই বিতর্কের এক চমৎকার প্রতিফলন পাওয়া যায়। প্রতিপক্ষের প্রধান অভিযোগ ছিল যদি সবকিছুই শূন্য হয়, তবে বুদ্ধের দেওয়া 'চতুরার্য সত্য' (দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখ নিরোধ এবং নিরোধের পথ) অর্থহীন হয়ে পড়বে। কারণ যদি দুঃখের নিজস্ব কোনো স্বভাব না থাকে তবে সেই দুঃখের কারণ বা বিনাশেরও কোনো প্রশ্ন ওঠে না। এর ফলে বৌদ্ধ ধর্মের 'ত্রিরত্ন' (বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ) এবং আধ্যাত্মিক সাধনার কোনো মূল্যই অবশিষ্ট থাকে না। আচার্য নাগার্জুন এই গুরুতোর অভিযোগের যে উত্তর দিয়েছেন, তা বৌদ্ধ দর্শনের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী মোড়। তিনি এর উত্তরে প্রতিপন্ন করেছেন যে, যারা শূন্যতাকে 'নাস্তিত্ব' বা 'অভাব' মনে করে ভয় পাচ্ছেন, তারা আসলে শূন্যতার প্রকৃত অর্থই বোঝেননি। নাগার্জুনের মতে, শূন্যতা চতুরার্য সত্যকে অস্বীকার করে না, বরং শূন্যতা আছে বলেই চতুরার্য সত্য সম্ভব হয়। তাঁর বিখ্যাত যুক্তি হলো যদি বস্তুসমূহ শূন্য না হয়ে 'অশূন্য' বা নিজস্ব স্বভাবে স্থির হতো, তবে জগতের কোনো পরিবর্তনই সম্ভব হতো

না। দুঃখ যদি স্বভাবত 'সৎ' হতো, তবে তা চিরকাল দুঃখই থেকে যেত, তাকে দূর করা যেত না। আবার দুঃখ যদি স্বভাবত 'অসৎ' হতো, তবে তার উৎপত্তিই হতো না। সুতরাং, জগতের সবকিছু নিঃস্বভাব বা শূন্য বলেই মানুষ দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে নির্বাণ লাভ করতে পারে।[৭]

শূন্যতা তত্ত্বের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে নির্বাণের ধারণা। নাগার্জুন নির্বাণকে কোনো ভৌগোলিক স্থান বা জগতের বাইরের কোনো বিষয় হিসেবে দেখেননি। তাঁর দর্শনে নির্বাণ হলো এক বিশেষ প্রকার উপলব্ধি। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে, আমাদের দুঃখের মূলে রয়েছে কর্ম এবং ক্লেশ। এই কর্মক্লেশ উৎপন্ন হয় আমাদের মনের 'বিকল্প' বা ভ্রান্ত কল্পনা থেকে। আমরা যখন জগতকে দেখি, তখন আমাদের মন নানা প্রকার শব্দ, নাম এবং ধারণার বিস্তার ঘটায়, যাকে বৌদ্ধ পরিভাষায় বলা হয় 'প্রপঞ্চ'। আমরা বস্তুকে স্থায়ী মনে করে 'আমি' এবং 'আমার' এই বোধে আচ্ছন্ন হই। নাগার্জুন দেখিয়েছেন যে, যখন একজন সাধক বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ অর্থাৎ 'শূন্যতা' উপলব্ধি করেন, তখন তাঁর মনের এই সমস্ত প্রপঞ্চ বা মিথ্যা ধারণার বিস্তার বন্ধ হয়ে যায়। চন্দ্রকীর্তি তাঁর *প্রসন্নপদা* টীকায় এই বিষয়টি আরও পরিষ্কার করেছেন। তিনি বলেছেন যে, মানুষের মনের বিকল্পগুলো অনাদি কাল থেকে চলে আসা নানা সংস্কারের ফল। মানুষ যখন শূন্যতা বা নিঃস্বভাবতা উপলব্ধি করে, তখন তার 'সৎকায়দৃষ্টি' বা নিজেকে একটি স্থায়ী সত্তা মনে করার ভ্রমটি দূর হয়। এই ভ্রম দূর হওয়ার সাথে সাথেই আসক্তি ও দ্বেষ স্তিমিত হয়ে আসে এবং নতুন করে কোনো কর্ম সম্পাদিত হয় না। কর্মের অভাবে নতুন জন্ম বা সংসারচক্রের অবসান ঘটে। এই যে সমস্ত প্রকার বিকল্প ও প্রপঞ্চের অবসান ঘটা, একেই নাগার্জুন 'নির্বাণ' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর ভাষায়- "প্রপঞ্চোপশমঃ শিবঃ"[৮] অর্থাৎ সব ধরণের মানসিক বিস্তারের শান্ত হওয়াই হলো পরম কল্যাণ বা নির্বাণ। নাগার্জুন বলেছেন পারমার্থিক দৃষ্টিতে 'সংসার' এবং 'নির্বাণ'-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আমরা যখন জগতকে অবিদ্যা বা ভ্রান্ত ধারণার মাধ্যমে দেখি, তখন তা 'সংসার' হিসেবে প্রতীয়মান হয়। আবার যখন সেই জগতকেই প্রজ্ঞা বা শূন্যতার দৃষ্টিতে দেখি, তখনই তা 'নির্বাণ'। অর্থাৎ, নির্বাণ কোনো নতুন প্রাপ্তি নয়, বরং জগতকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন। এই উপলব্ধির মাধ্যমেই নাগার্জুন বৌদ্ধ দর্শনের সেই মহান লক্ষ্যকে সার্থক করেছেন, যেখানে আধ্যাত্মিকতা এবং যুক্তিবাদ একীভূত হয়েছে।[৯]

প্রতিপক্ষের আরেকটি বড় সংশয় ছিল বুদ্ধের উপদেশ নিয়ে। বুদ্ধ যদি জানতেন সবকিছু শূন্য, তবে তিনি কেন স্কন্ধ, ধাতু বা আয়তনের মতো নানাত্বের উপদেশ দিলেন? নাগার্জুন এর উত্তরে বুদ্ধের 'অভিপ্রায়িক দেশনা' বা উপদেশের বিশেষ উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন। তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, বুদ্ধের দেশনা মূলত দুই প্রকার সত্যের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। একটি হলো 'সংবৃত্তি সত্য' বা লোকব্যবহারিক সত্য, এবং অন্যটি হলো 'পরমার্থ সত্য'। সাধারণ মানুষকে ধর্মের পথে চালিত করার জন্য বুদ্ধ সংবৃত্তি বা লৌকিক সত্যের আশ্রয় নিয়ে নানা উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল পরমার্থ সত্য বা শূন্যতার বোধ জাগিয়ে তোলা। যারা সংবৃত্তি সত্যকে না জেনে সরাসরি পরমার্থ সত্য বুঝতে চায়, তারা যেমন ব্যর্থ হয়, তেমনি যারা কেবল সংবৃত্তি সত্যেই আটকে থাকে, তারা নির্বাণ লাভ করতে পারে না।[১০]

নাগার্জুন প্রমাণ করেছেন যে, শূন্যতা বুদ্ধের শিক্ষার কোনো ক্ষতি করে না। বরং যারা শূন্যতাকে অস্বীকার করে, তারাই বৌদ্ধ ধর্মের প্রকৃত কাঠামোকে নষ্ট করে। কারণ যদি সবকিছুকে 'অশূন্য' বা স্থায়ী মনে করা হয়, তবে বুদ্ধের 'অনিত্যবাদ' মিথ্যা হয়ে যায়, 'অনাত্মবাদ' অর্থহীন হয়ে পড়ে এবং মানুষের মুক্তির সব পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। নাগার্জুনের দর্শনে শূন্যতা তাই কেবল একটি শব্দ নয়, এটি হলো এক পরম 'চিকিৎসা'। তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন যে, শূন্যতা যেন আবার কোনো নতুন 'মতবাদ' হিসেবে আঁকড়ে ধরা না হয়। যারা শূন্যতাকে একটি স্থায়ী মতবাদ (View) হিসেবে গ্রহণ করে, তাদের অবস্থা সেই রোগীর মতো যাকে ওষুধ

দেওয়া হয়েছিল রোগ সারানোর জন্য, কিন্তু সে সেই ওষুধটিকেই নিজের রোগ বানিয়ে ফেলেছে।[১১] সুতরাং, সমস্ত মতবাদ ও প্রপঞ্চ থেকে মুক্ত হয়ে জগতের নিঃস্বভাবতাকে অনুভব করাই হলো নাগার্জুনীয় দর্শনের সার্থকতা এবং নির্বাণের প্রকৃত রূপ।

উপসংহার:

আচার্য নাগার্জুনের শূন্যতাতত্ত্ব কেবল বৌদ্ধ দর্শনের একটি শাখা নয়, বরং এটি মানব চিন্তার ইতিহাসে এক অনন্য বিপ্লব। এই প্রবন্ধে আমরা দেখেছি কীভাবে নাগার্জুন বুদ্ধের 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' এবং 'মধ্যমা প্রতিপদকে' এক অকাট্য যৌক্তিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর দর্শনের মূল সুরটি হলো জগতের কোনো কিছুই পরম বা স্বতন্ত্র নয়; সবকিছুই আপেক্ষিক এবং শর্তসাপেক্ষ। এই আপেক্ষিকতাই হলো বস্তুর 'শূন্যতা'। নাগার্জুনের এই শূন্যের ধারণাটি আধুনিক বিদগ্ধ সমাজে আজও গভীর কৌতূহলের জন্ম দেয়। এই প্রসঙ্গে ভারততত্ত্ববিদ ও দার্শনিক অধ্যাপক বিমলকৃষ্ণ মতিলালের একটি বিশ্লেষণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি নাগার্জুনের দার্শনিক শূন্যতাকে গণিতের 'শূন্য' (Zero) এর সাথে তুলনা করেছেন। আমরা জানি যে, গণিতের শূন্যের নিজস্ব কোনো একক মান নেই, কিন্তু যখন তা অন্য কোনো সংখ্যার পাশে বসে (যেমন ১ এর পাশে ০ বসে ১০ হয়), তখন তার একটি 'স্থানিক মান' বা 'Place Value' তৈরি হয়। অর্থাৎ, গণিতের শূন্য যেমন স্বতন্ত্রভাবে মানহীন কিন্তু অন্য সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, নাগার্জুনের শূন্যতাও ঠিক তেমনই। জগতের কোনো ভাবপদার্থের নিজস্ব কোনো স্থায়ী সত্তা বা 'স্বভাব' নেই, কিন্তু তারা যখন একে অপরের ওপর নির্ভর করে (প্রতীত্যসমুৎপন্ন হয়), তখন আমাদের লৌকিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের একটি কার্যকরী রূপ তৈরি হয়। এই যে নিজের শূন্যতাকে স্বীকার করেও অন্যের সাপেক্ষে অস্তিত্বশীল হওয়া, এটাই নাগার্জুনীয় শূন্যতার আসল সৌন্দর্য। এই প্রবন্ধের মাধ্যমে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়েছে যে, নাগার্জুন শূন্যতাকে কোনো 'অভাব' বা 'নাস্তিত্ব' হিসেবে দেখেননি। তাঁর কাছে শূন্যতা হলো এক প্রকার মুক্তি। মানুষ যখন মনে করে বস্তু স্থায়ী বা শাশ্বত তখনই সে সেই বস্তুর প্রতি আসক্ত হয় এবং দুঃখের সাগরে নিমজ্জিত হয়। কিন্তু শূন্যতার বোধ মানুষকে শেখায় যে জগত পরিবর্তনশীল এবং কোনো কিছুরই স্থায়ী মালিকানা সম্ভব নয়। এই উপলব্ধিই মানুষের মনের 'প্রপঞ্চ' বা ভ্রান্ত কল্পনার জাল ছিঁড়ে দেয়। নাগার্জুন অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন যে, শূন্যতা বুদ্ধের চতুরার্য সত্য বা নির্বাণকে অস্বীকার করে না, বরং শূন্যতা আছে বলেই আধ্যাত্মিক সাধনা এবং পরম শান্তি লাভ সম্ভব হয়। পরিশেষে বলা যায়, নাগার্জুন যখন বলেন যে সব কিছুই 'শূন্য' তখন তিনি আমাদের জগতত্যাগী হতে বলেন না, বরং জগতকে সঠিক দৃষ্টিতে দেখতে শেখান। তাঁর দর্শন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে শূন্যতা কোনো নতুন 'মতবাদ' নয়। যারা শূন্যতাকে আবার একটি নতুন দর্শন হিসেবে আঁকড়ে ধরতে চায়, নাগার্জুন তাদের 'অসাধ্য' বা 'অপ্রতিকার্য' রোগী বলে অভিহিত করেছেন। কারণ শূন্যতার লক্ষ্য হলো মানুষকে সব ধরণের মতবাদ ও আসক্তি থেকে মুক্ত করা। বর্তমান আধুনিক সময়েও, যেখানে ভোগবাদ এবং স্থায়ীত্বের মোহ মানুষকে অস্থির করে তুলছে, সেখানে নাগার্জুনের এই 'নিঃস্বভাবতা' বা শূন্যতার শিক্ষা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বুদ্ধের আদি শিক্ষার এই পারমার্থিক বিবর্তনটি নাগার্জুনের লেখনীতে যে পূর্ণতা পেয়েছে, তা আজও মুক্তিকামী মানুষের কাছে এক চিরন্তন আলোকবর্তিকা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তথ্যসূত্র:

১. "যঃ প্রতীত্যসমুৎপাদঃ শূন্যতাং তাং প্রচক্ষ্মহে।
সা প্রজ্ঞপ্তিরুপাদায় প্রতিপৎ সৈব মধ্যমা।।"- নাগার্জুন। মূলমধ্যমককারিকা। কারিকা- ২৪.১৮।
২. চন্দ্রকীর্তি, আচার্য। সম্পা. পি. এল. বৈদ্য। প্রসন্নপদা। মিথিলা ইনস্টিটিউট, ১৯৬০, দরভাঙ্গা, পৃ. ১০৫।

৩. নাগার্জুন। মূলমধ্যমককারিকা। কারিকা- ৭.১৯।
৪. চন্দ্রকীর্তি, আচার্য, সম্পা. পি. এল. বৈদ্য। প্রসন্নপদা। মিথিলা ইনস্টিটিউট, ১৯৬০, দরভাঙ্গা, পৃ. ২২০।
৫. নাগার্জুন। শূন্যতাসপ্ততি। কারিকা- ৭।
৬. নাগার্জুন। মূলমধ্যমককারিকা। কারিকা- ২৪.১৮।
৭. চন্দ্রকীর্তি, আচার্য, সম্পা. পি. এল. বৈদ্য। প্রসন্নপদা। মিথিলা ইনস্টিটিউট, ১৯৬০, দরভাঙ্গা, পৃ. ২১০।
৮. তদেব, পৃ. ১৫০।
৯. গারফিল্ড, জে. এল. দ্য ফান্ডামেন্টাল উইজডম অফ দ্য মিডল ওয়ে। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৫, অক্সফোর্ড, পৃ. ৩৩১।
১০. মতিলাল, বিমলকৃষ্ণ, সম্পা. জনার্দন গানেরি। মাইন্ড, ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড: দ্য কালেক্টেড এসেস অফ বিমলকৃষ্ণ মতিলাল। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০২, দিল্লি, পৃ. ২০৯-২১২।
১১. "শূন্যতা সর্বদৃষ্টিনাং প্রোক্তা নিঃসরনং জিনৈঃ।
যেষাং তু শূন্যতাদৃষ্টিস্তানসাধ্যান বভাষিরে।।"- নাগার্জুন। মূলমধ্যমককারিকা। কারিকা- ১৩.৮।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. আম্বেদকর, ভীমরাও রামজি। দ্য বুদ্ধ অ্যান্ড হিজ ধম্ম। সিদ্ধার্থ কলেজ পাবলিকেশন, ১৯৫৭, মুম্বাই।
২. গারফিল্ড, জে. এল। দ্য ফান্ডামেন্টাল উইজডম অফ দ্য মিডল ওয়ে। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৫, অক্সফোর্ড,।
৩. ঘোষ, বটকৃষ্ণ, সম্পা. সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজ্ঞানবাদ। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৭৪, কলকাতা।
৪. চন্দ্রকীর্তি, আচার্য, সম্পা. পি. এল. বৈদ্য। । প্রসন্নপদা। মিথিলা ইনস্টিটিউট, ১৯৬০, দরভাঙ্গা।
৫. চৌধুরী, সুকোমল। বৌদ্ধদর্শনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা। সংস্কৃত কলেজ, ১৯৭৫, কলকাতা ।
৬. দত্ত, সুকুমার। বৌদ্ধ দর্শনের রূপরেখা। সাহিত্য সংসদ, ১৯৮৫, কলকাতা ।
৭. নাগসেন, অনু. ধরমধর ভান্তে। মিলিন্দপঞ্হ। মহাবোধি সোসাইটি, ১৯৯০, কলকাতা।
৮. বড়ুয়া, বেণীমাধব। বৌদ্ধ দর্শন। সংস্কৃত বুক ডিপো, ১৯৭৮, কলকাতা।
৯. বোধি, ভিক্ষু। দ্য কানেক্টেড ডিসকোর্সেস অফ দ্য বুদ্ধ। উইজডম পাবলিকেশন, ২০০০, বোস্টন।
১০. ভট্টাচার্য, কালিদাস। বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্র। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৮২, কলকাতা।
১১. মতিলাল, বিমলকৃষ্ণ, সম্পা. জনার্দন গানেরি। মাইন্ড, ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড: দ্য কালেক্টেড এসেস অফ বিমলকৃষ্ণ মতিলাল। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০২, দিল্লি।
১২. রাহুল, ওয়ালপোলা। হোয়াট দ্য বুদ্ধ টট। গ্রোভ প্রেস, ১৯৫৯, নিউ ইয়র্ক।
১৩. রাধাকৃষ্ণান, এস। ইন্ডিয়ান ফিলোসফি, ১ম খণ্ড। জর্জ অ্যালেন অ্যান্ড আনউইন, ১৯২৩, লন্ডন।
১৪. শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন। দে'জ পাবলিশিং, ১৯৭৫, কলকাতা।
১৫. হিরিয়ানা, এম। আউটলাইনস অফ ইন্ডিয়ান ফিলোসফি। জর্জ অ্যালেন অ্যান্ড আনউইন, ১৯৩২, লন্ডন।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1856-1864
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.409

সাবয়ব বস্তুর প্রত্যক্ষযোগ্যতা বিচার: ন্যায় মতের আলোকে একটি পর্যালোচনা

ভাস্কর পাল, *গবেষক, দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 25.03.2026; Accepted: 28.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Almost all of us strongly believe not only in the reality of compound objects like jar, table etc. but also recognize that we do perceive those objects in suitable situaltion. But there are philosophers like Buddhist who beg to deffer from this commonsense view, either by denying the reality of external objects or by launching the thesis that, we perceive only the components in the name of objects like jar and table. Nyāya-Vaiśeṣikas, commonly familiar as a defender of a robust form of realism, have tried their best to retain the common-sense-view by dismissing Buddhist claim. In this paper and attempt would be made to revisit and cross examine the arguments that Nyāya and Vaiśeṣika adduce to establish the possibility and perceptibility of compound objects.

Keywords: Avayavīvāda, paramāṇupuñja, vastubāda, catuṣkaṭi vinirmukta, mahattva and anekadravyatva, sākṣāt pratyakṣabāda.

ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন হল অধ্যাত্মবাদী দর্শন। যেখানে আত্মার অস্তিত্ব ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা সত্ত্বেও বস্তুজগতকে অস্বীকার করা হয় নি এবং সেই বস্তুজগতের উৎপত্তি যে সম্পূর্ণ ভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারেই উপাদান নিরপেক্ষভাবে হয়ে যায়, এমন মতও তারা সমর্থন করেন না। তাদের মতে এই জগতের উৎপত্তির নিমিত্ত কারণ যদি ঈশ্বর হয় তাহলে তার উপাদান কারণ হল পরমাণু। পরমাণুগুলি ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে সংযুক্ত হয়ে জগত সৃষ্টি করে মাত্র। সুতরাং ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে বস্তুবাদের কোন বিরোধ নেই। যদিও ভাববাদ (idealism), বস্তুবাদ (realism) অভিধাগুলি পাশ্চাত্য ঐতিহ্য থেকে এসেছে তাহলেও অতি প্রাচীন ভারতীয় দর্শনেও যে তার নিদর্শন মেলে একথা বহু আধুনিক পণ্ডিতই স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্যে সেই বস্তুবাদের নিদর্শন যে রয়েছে তার নমুনা আমরা ভারতীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মূল তত্ত্বগুলিকে অনুধাবন করলেই পেতে পারি।

পাশ্চাত্য দর্শনে আমরা যেভাবে বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে একটা সরল বিভাজন করতে পারি সেইভাবে কিন্তু ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে এই বিভাজন করা সম্ভব নয়। কেননা এখানে অধ্যাত্মবাদ, বস্তুবাদ ও অ-বস্তুবাদের মধ্যে কোন নিশ্ছিদ্র বিভাজন সীমা নির্দেশ করা যায় না। তাসত্ত্বেও যদি আমরা সাধারণ দৃষ্টিকোন থেকে ভারতীয়

দর্শনের ক্ষেত্রে ভাববাদ এবং বস্তুবাদের আলোচনা করি তাহলে দেখব এখানে ভাববাদীধারার প্রাচীন উৎস যেমন বর্তমান তেমনই এখানে আদিম বস্তুবাদও রয়েছে।

সেক্ষেত্রে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের পরিচিতি বস্তুবাদী হিসেবেই; এটা এক দিকে যেমন তাদের বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী মনোভাবের কারণে, তেমনই তারা যে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন তা অনেকখানি realistic অর্থাৎ বাস্তব জীবনের প্রেক্ষিত থেকে উঠে আসার কারণে। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে ন্যায় বা বৈশেষিক দর্শনে যে সমস্ত বস্তুকে বা পদার্থকে স্বীকার করা হয়েছে এবং যেভাবে তাদের বিশ্লেষণ করা হয়েছে সেগুলি লৌকিক জীবনের সমর্থন পায়। যেমন দ্রব্যকে যখন গুণ, ক্রিয়ার আধার হিসেবে বা সমবায়ী কারণ হিসেবে দেখা হয় তখন আসলে লৌকিক ধারণাকেই সমর্থন করা হয়। ব্যবহারিক অভিজ্ঞতায় গুণ ও কর্মের মধ্য দিয়েই যে কোন দ্রব্যের সাথে আমাদের পরিচয় ঘটে। যেমন একটি টেবিলকে যখন আমারা জানি তখন তার বর্ণ, আকার, মসৃণতা, কাঠিন্য ইত্যাদির কতকগুলি ধর্মের মধ্য দিয়েই জানি। কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হয় তার কিছু গুণ ও ক্রিয়াকে অবলম্বন করে। আমরা গুণ ও কর্মের আশ্রয় হিসেবেই দ্রব্যের কথা কল্পনা করে থাকি।

দ্রব্য, গুণ, কর্ম এই তিনটি দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বিষয় হিসাবে গৃহীত হয়। বাকি যে পদার্থ গুলি যেমন সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব এগুলি আপাতদৃষ্টিতে আমাদের কাছে অভিজ্ঞতা বা অনুভব লব্ধ বলে মনে হয় না কিন্তু যখন আমরা সকল মানুষকে একই শ্রেণীভুক্ত করি তখন আসলে নিজেদের অজান্তেই একটি ধর্মকে তাদের উপর আরোপ করি। একই ভাবে যখন মানুষকে অ-মানুষ থেকে পৃথক করি তখন আসলে কিছু পার্থক্য সূচক ধর্মকে স্বীকার করে নিয়েই পথ চলি অর্থাৎ কিনা ব্যবহারই অনুমোদন করে সামান্য ও বিশেষের অস্তিত্বকে। অভাবের সঙ্গেও পরিচয় আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার সূত্র ধরেই। অভাবকে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবন ব্যবহারের মধ্যেই উপলব্ধি করতে পারি। উপলব্ধিরকে অগ্রাহ্য করে কোন পদার্থকেই মান্যতা দেননি ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিকরা।

সাক্ষাৎ বস্তুবাদ ও ন্যায় পরম্পরা:

ইতিপূর্বে আমরা লক্ষ্য করেছি যে নৈয়ায়িকদের কি কারণে বস্তুবাদী বলা হয়ে থাকে। এব্যাপারে কিছু বিতর্ক থাকলেও অধিকাংশ ভারতীয় চিন্তাবিধ এই বিষয়ে একমত যে ন্যায় বৈশেষিক আধিবিদ্যক মতবাদ এক ধরণের বস্তুবাদই। এখন যে প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটি হল নৈয়ায়িক বা বৈশেষিকের যে বস্তুবাদ এই বস্তুবাদকে আমরা কোন ধরণের বস্তুবাদ বলতে পারি। এই প্রশ্নটিকে জ্ঞানতত্ত্বের দিক থেকে বিচার করা যাক। জ্ঞানের দিক থেকে একটি বস্তুকে আমরা কিভাবে জানি- সেই জিজ্ঞাসা সামনে রাখলে পাশ্চাত্য দর্শনে মূলত দুই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায়। একটি হচ্ছে সরল বস্তুবাদ অন্যটি হল প্রতিরূপী বস্তুবাদ।

ইংরেজিতে সরল ও প্রতিরূপী বস্তুবাদকে যথাক্রমে naive realism এবং representative realism বলা হয়। এখন প্রশ্ন হল সরল বস্তুবাদ ও প্রতিরূপী বস্তুবাদ উভয়েই বস্তুবাদকে সমর্থন করলেও পরস্পরের মধ্যে এত বিরোধ কেন? যার কারণে সমগ্র দার্শনিক সমাজ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেলেন। প্রথমেই আসা যাক সরল বস্তুবাদের কথায়। সরল বস্তুবাদকে 'naive' অর্থাৎ গ্রাম্য বা শিশুসুলভ বলার একটি কারণ সম্ভবত এই যে সাধারণ মানুষের সহজ বিশ্বাসের সঙ্গে এই মতবাদ সঙ্গতিপূর্ণ। এই বস্তুবাদ মূলত দুটি দাবি করে থাকে- প্রথমত, সরলতার দিক থেকে মনে করা হয় বস্তু যেমন ঠিক তেমন ভাবেই সরাসরি আমরা তাকে জানতে পারি এবং দ্বিতীয়ত বস্তুবাদের দিক থেকে মনে করা হয় যে আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতায় উদ্ভাসিত বস্তুর বাস্তবিক মনোনিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে। এই দাবি গুলির কারণেরই অনেকে এই তত্ত্বকে 'common-sense realism' নামেও আখ্যায়িত করেছেন। অন্য দিকে বস্তুকে মনোনিরপেক্ষ বলে মান্যতা দিলেও প্রতিরূপী

বস্তুবাদীরা তার সাক্ষাৎ জ্ঞানকে অস্বীকার করেন এবং তারা মনে করেন বস্তু কোন না কোন প্রতিরূপের মধ্য দিয়ে আমাদের জ্ঞানে প্রতিভাসিত হয়।

দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় অধিকাংশ বস্তুবাদীই প্রতিরূপী দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক। ভারতীয় দর্শনেও অধিকাংশ সম্প্রদায় বস্তুর পরোক্ষ জ্ঞান স্বীকার করেন। বৌদ্ধ মতে স্বলক্ষণ পুঞ্জেরই কেবল প্রত্যক্ষ হয় সাবয়ব বস্তুর নয়। অবয়ব থেকেই আমরা অবয়বীর অস্তিত্ব অনুমান করি এই ধারণা জৈনরাও সমর্থন করেন। সাংখ্য মতে জ্ঞান মাত্রই এক অর্থে পরোক্ষ। প্রকৃতির পরিনাম যে সত্ত্ব প্রধান বুদ্ধি তাতে পুরুষের চৈতন্য প্রতিবম্বিত হলে বিষয় সম্বন্ধে বুদ্ধির জ্ঞান হয়। সেই জ্ঞান যখন পুনরায় পুরুষে প্রতিবিম্বিত হয় তখন পুরুষের হয় বুদ্ধি। এই বিম্ব প্রতিবিম্ব প্রক্রিয়ার মধ্যে বস্তুর যে জ্ঞান হয়, তা যে সাক্ষাৎ হতে পারে না একথা স্পষ্ট। বস্তুর প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ ভাবে হয় এই মত ভারতীয় পরম্পরায় সমর্থন করেন চার্বাক, মীমাংসা ও ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়।

ভারতীয় অবস্তুবাদী সম্প্রদায় গুলির মধ্যে বৌদ্ধ দর্শন অন্যতম। বাহ্য বস্তুর সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের দাবী প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নৈয়ায়িকরা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সঙ্গে দীর্ঘ বিবাদে পতিত হন। বৌদ্ধ হীনযানসম্প্রদায়ের অন্তর্গত সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক সম্প্রদায় ভৌত বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করলেও পরমাণুর সমূহের অতিরিক্ত কোন সাবয়ব বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কাজের পরমাণুপুঞ্জের অতিরিক্ত অবয়বীর যেহেতু কোন অস্তিত্ব নেই সেহেতু অবয়বীর প্রত্যক্ষও তাদের মতে সম্ভব নয়। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু সম্প্রদায় রয়েছেন যেমন শূন্যবাদী যারা বাহ্য-অন্তর কোন বস্তুরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাদের মতে সকল কিছুই চতুষ্কটি বিনির্মুক্ত যথা স্বভাব শূন্য অর্থাৎ শূন্য। আর যোগাচার বৌদ্ধরা বিজ্ঞানের অতিরিক্ত কোন বাহ্য বস্তু স্বীকার করেন না। তারা জ্ঞান বা বিজ্ঞানকেই একমাত্র সৎ পদার্থ বলে মনে করেন। বাকি বৌদ্ধরা বাহ্য বস্তু স্বীকার করলেও তারা বস্তুকে ক্ষণিক এবং স্বলক্ষণ বলে গন্য করেন। এই ক্ষণিক স্বলক্ষণ ধারার অতিরিক্ত কোন বস্তুর অস্তিত্বও নেই এবং তার প্রত্যক্ষও আমাদের হয় না। একমাত্র স্বলক্ষণ বস্তুরই আমাদের প্রত্যক্ষ হয় এবং তার ওপরেই ভিত্তি করে ন্যায়বিন্দুর রচয়িতা আচার্য ধর্মকীর্তি প্রত্যক্ষের লক্ষণ করেছেন- "তত্র প্রত্যক্ষং কল্পনাপঢ়মভ্রান্তম্।।৪।।" অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হল কল্পনা রহিত অভ্রান্ত জ্ঞান। কল্পনা যখন জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় তখন তা আর প্রত্যক্ষ থাকে না। এই কারণেই সাবয়ব বস্তুর যে জ্ঞান আমরা লাভ করি তাকে প্রত্যক্ষ বলে তারা মানতে চান না। তাদের মতে সকল প্রত্যক্ষই নির্বিকল্পক চরিত্রের সবিকল্পক কোন প্রত্যক্ষ হতে পারে না। জ্ঞানের দুটি রূপ তারা স্বীকার করেন- সাক্ষাৎকারী ও বিকল্প। এদের প্রত্যেকটি আবার যথার্থ ও অযথার্থ ভেদে দ্বিবিধ। আর এই সাক্ষাৎকারী অবস্থাতেই প্রকৃত জ্ঞানের গ্রহণ হয় বিকল্পে নয়। স্বলক্ষণ বস্তু সাক্ষাৎকারের বিষয় হলেও বিকল্পের বিষয় নয়। বৌদ্ধরা, প্রত্যক্ষ-পৃষ্ঠভাবী-বিকল্প জ্ঞানকে সবিকল্পক জ্ঞান বলেন। আর এই জ্ঞান তাদের মতে অযথার্থ। কেননা বৌদ্ধমতে প্রমাণের লক্ষণই হল- যে বস্তু অধিগত বা জ্ঞাত হয় নি কেবল সেই বিষয়ের জ্ঞানকে প্রমাণ বলা হয়। আর অধিগতবিষয়ক জ্ঞান হল অপ্রমাণ। এখন সাবয়ব বস্তু যেহেতু বিকল্পের বিষয় সেহেতু তার প্রত্যক্ষ হয় এমন কথাও বলা যায় না। এখন বাহ্য বস্তুর অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে নৈয়ায়িককে যেমন একাধারে অবয়ব অতিরিক্ত অবয়বী অর্থাৎ বস্তু যে কেবল পরমাণুপুঞ্জের সমাবেশ মাত্র নয়, তা যেমন প্রতিষ্ঠা করতে হবে তেমনই সাবয়ব বস্তুর যে প্রত্যক্ষ হয় সে কথাও প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মহর্ষি গৌতমের ন্যায়সূত্র থেকে শুরু করতে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ও আর অনেক টীকাকার নানান যুক্তির উপন্যায় করেছেন এবং অবয়বীবাদ ও প্রত্যক্ষবাদ সিদ্ধ করেছেন।

ন্যায় মতে 'ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ' জন্য বাহ্য বস্তুর যে সাক্ষাৎ জ্ঞান জন্মায় তা'ই প্রত্যক্ষ জ্ঞান। বৌদ্ধগণ মনে করেন তা প্রত্যক্ষ নয়, অনুমান। তাৎপর্য এই যে, একটি বৃক্ষের সঙ্গে চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হলে 'এটি বৃক্ষ' ইত্যাকারে আমাদের যে প্রতীতি তাকে আমরা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বলে থাকি। কিন্তু সম্মুখে উপস্থিত বৃক্ষের কিছু অংশের সঙ্গেই আমাদের চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হয় মাত্র, সমগ্র বৃক্ষের সঙ্গে নয়। কাজেই আমরা বৃক্ষের কিছু অংশমাত্রকেই দেখতে পাই সম্পূর্ণ বৃক্ষটিকে নয়। আর বৃক্ষের কিছু অংশমাত্রকে সমগ্র বৃক্ষ বলা যায় না। সুতরাং বৃক্ষের যে জ্ঞান আমাদের হয় তাকে বৃক্ষের প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলা চলে না। বৃক্ষের অংশমাত্রের জ্ঞান থেকে আমরা বৃক্ষটিকে অনুমান করি। অতএব 'এটি বৃক্ষ' ইত্যাকারে যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় বলে আমরা মনে করি তা প্রত্যক্ষ নয়, অনুমান।

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন পূর্বপক্ষ বৌদ্ধ মতটিকে আর স্পষ্ট করে উল্লেখ করেন এবং তা খণ্ডনও করেন। তিনি বলেন- বৌদ্ধ মতে বাহ্য বস্তু পরমাণুর সমষ্টি। যেমন বৃক্ষাদি বস্তু কোন একটি মাত্র পদার্থ নয়। বিলক্ষণ-সংযুক্ত কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টিই হল বৃক্ষ। কেননা বৃক্ষাদি একই পদার্থে কখনোই সকম্পত্ব-অকম্পত্ব, রক্তত্ব-অরক্তত্ব, আবৃতত্ব-অনাবৃতত্ব ইত্যাদি বিরুদ্ধ ধর্ম একই সঙ্গে থাকতে পারে না। বৃক্ষের শাখার কম্প থাকলেও মূলে নেই, বৃক্ষের কোন প্রদেশ আবৃত আবার কোন প্রদেশ অনাবৃত দেখা যায়। বৃক্ষ যদি একই পদার্থ হত তাহলে তাতে কখনোই পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম গুলি থাকতে পারত না। যেমন গোত্ব এবং অশ্বত্ব বিরুদ্ধ ধর্ম হওয়ায় একই পদার্থে থাকে না। সুতরাং কতকগুলি বিলক্ষণ পরমাণুবিশেষের সমষ্টিই হল বৃক্ষাদি পদার্থ, তা একটিমাত্র পদার্থ নয় তা নানা।[১] অবয়ব ভিন্ন পৃথক কোন অবয়বী নেই অর্থাৎ পরমাণুর সমষ্টি ভিন্ন বৃক্ষ বলে অতিরিক্ত কোন পদার্থ নেই। যে কারণে বৌদ্ধগণ মনে করেন সম্মুখে উপস্থিত কতকগুলি অবয়ব দেখে আমরা বৃক্ষের অনুমান করি। এখন প্রশ্ন হবে- যে বৃক্ষজ্ঞানকে অনুমিতি বলা হয় সেই জ্ঞানে অনুমেয় কী? বৃক্ষ এখানে অনুমেয় হতে পারে না। কারণ বৌদ্ধ মতে কতকগুলি অবয়ব সমষ্টিই বৃক্ষ, সেই সমষ্টির অন্তর্গত অংশবিশেষকে বৃক্ষ বলা যায় না। কাজেই বৃক্ষের অনুমিতিও হতে পারে না। বস্তুতঃ যদি বলা হয় বৃক্ষের অনুমিতি হয় না বৃক্ষের সামনের দিকের কিছু অংশকে দেখে অদৃশ্য অংশবিশেষের অনুমিতি হয়। তাহলে প্রশ্ন হবে অদৃশ্য অংশকে বৃক্ষ বললে দৃশ্যমান অংশকে বৃক্ষ বলা যাবে না কেন? অপর দিকে যদি সম্মুখস্ত দৃশ্যমান অংশবিশেষ বৃক্ষ না হয় তাহলে অদৃশ্য অংশবিশেষকে বৃক্ষ বলব কি করে? এখন যদি কেউ বলেন দৃশ্যমান বৃক্ষের অংশ দেখে বৃক্ষের অনুমান করি তাহলে তিনি উপহাসের পাত্র ছাড়া আর কিছুই হবেন না।

তাৎপর্যটীকাকার পূর্বপক্ষী বৌদ্ধ মত ব্যক্ত করতে গিয়ে আরও বলেন যে অবয়বগুলিই পারমার্থিক বস্তু পৃথক অবয়বী বলে কিছুই নেই। আসলে কতকগুলি অবয়ব দেখে আমরা তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য অবয়বগুলিরও অনুমান করি, শেষে সকল অবয়বের প্রতিসন্ধান জন্য আমাদের 'বৃক্ষ' এই প্রকার অনুমিতি জ্ঞান হয়। সুতরাং প্রমাণ বিভাগ সূত্রে প্রত্যক্ষকে যে অতিরিক্ত প্রমাণ বলা হয়েছে তার উপপত্তি হয় না। ফলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও প্রমাণের অপলাপ হয়ে যায়। এই রকম গুরতর আপত্তির উত্তর উদ্দ্যোতকরও দিয়েছেন। তাঁর মতে- যদি বৃক্ষের অংশগুলির প্রতিসন্ধান জন্য শেষে 'বৃক্ষ' এরূপ অনুমিতি জ্ঞান হয় তাহলে অনুমানের আশ্রয় যে বৃক্ষ তাকে আগে জানা প্রয়োজন। কারণ সম্মুখবর্তী অংশরূপ যে ধর্মের উপর ভিত্তি করে অনুমান করা হবে সেই ধর্মের ধর্মীকে আগে জানা আবশ্যক, নাহলে কিছুতেই অনুমান হতে পারে। তাছাড়াও অনুমান হতে হলে সবার আগে

---

[১] মহর্ষি গৌতম, *ন্যায় দর্শন ও বাৎস্যায়ন ভাষ্য* (দ্বিতীয় খণ্ড), মহামহোপাধ্যায় ফণীভূষণ তর্কবাগীশ (সম্পাঃ), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ১৫৯।

বৃক্ষের সম্মুখের দৃশ্যমান অংশ এবং পশ্চাতে অদৃষ্ট অংশের মধ্যে ব্যাপ্তি নিশ্চয় হওয়া জরুরি। কিন্তু যে অনুমানকারী বৃক্ষের পূর্বভাগ ও পরভাগ দেখেই নি কেবল পূর্বভাগ দেখেছে তার পক্ষে অনুমান করা অসম্ভব। কেননা অনুমানের ক্ষেত্রে পূর্বে ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব নিশ্চয় হওয়া আবশ্যক।[২] অবয়ব ভিন্ন যদি বৃক্ষ বলেই কিছু না থাকে তাহলে বৃক্ষের প্রতিসন্ধান কথার অর্থ কি? অবয়বের প্রতিসন্ধান জন্য কখনোই বৃক্ষ-বুদ্ধির উপলব্ধি হতে পারে না। এক পদার্থের জ্ঞানকে অবলম্বন করে অন্য পদার্থ বিষয়ে যে সমূহালম্বন জ্ঞান তাকেই প্রতিসন্ধান জ্ঞান বলা হয়। এখন যদি বৃক্ষের সম্মুখভাগ দর্শনের পর পশ্চাৎভাগের অনুমান হয় তাহলে 'এটি সম্মুখভাগ ও পশ্চাৎভাগ' এরূপ প্রতিসন্ধান জ্ঞান হলেও 'এটি বৃক্ষ' এরূপ জ্ঞান কিছুতেই হতে পারে না।

এ ব্যাপারে বাৎস্যায়নের অবস্থান স্পষ্ট: বিষয় না থাকলে কখনোই উপলব্ধি হতে পারে না। অবয়বী বৃক্ষই হোক কিংবা সমগ্র অবয়বসমষ্টি; ঐ উপলব্ধির বিষয় বলে স্বীকার না করলেও যতটুকু অংশ উপলব্ধির বিষয় হয় তা যে প্রত্যক্ষেরই বিষয় একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। কাজেই যতটুকু অংশ উপলব্ধির বিষয় হয় ততটুকু অংশ প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিষয়রূপে স্বীকৃত হওয়ায় তা প্রত্যক্ষের ব্যবস্থাপকই হয়। সুতরাং পৃথক প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও প্রমাণ অবশ্য স্বীকার্য।

এরপরেও যদি কেউ বলেন যে অনুমানের দ্বারাই বৃক্ষের একদেশের পাশাপাশি বৃক্ষেরও অনুমান হয়, প্রত্যক্ষ বলে পৃথক কোন জ্ঞান নেই। তাহলে একদেশের জ্ঞানকেও আর অনুমানাত্মক বলা যাবে না। কারণ যেহেতু পূর্বপক্ষী পৃথক প্রত্যক্ষ প্রমাণ মানেন না সেহেতু অনুমানের জন্য প্রয়োজন যে হেতু তার জ্ঞানও অনুমানের দ্বারাই গৃহিত হবে এমনটা স্বীকার করতে হয়। কিন্তু অনুমানের দ্বারাই যদি অনুমানের হেতু নিশ্চয় করে তার দ্বারা আবার একদেশের অনুমান করা হয় তাহলে অনবস্থাদোষের আপত্তি হবে। সুতরাং বৃক্ষের একদেশের জ্ঞানকেও অনুমিতিরূপ বলা যায় না। মূল কথা হল প্রত্যক্ষ ব্যতীত অনুমান কেন কোন প্রকারের জ্ঞানই সম্ভব নয়। সকল প্রকার জ্ঞানের ভিত্তি কোন না ভাবেই প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপরেই নির্ভরশীল।

পরবর্তীতে বাহ্য বস্তুর প্রত্যক্ষ সমর্থন করেও বৌদ্ধরা আপত্তি করতে পারেন যে বৃক্ষের যে দেশে চক্ষু সন্নিকর্ষ হয় কেবল সেই দেশেরই প্রত্যক্ষ স্বীকার্য। কেননা অবয়বসমষ্টির মধ্যে কিছু অবয়বের সঙ্গেই চক্ষুাদি ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হতে পারে, সকল অবয়বের সঙ্গে তা কখনোই হতে পারে না। অতএব বৃক্ষাদির যেটুকু অংশের সঙ্গে সন্নিকর্ষ হয় তা প্রত্যক্ষ হলেও অবয়বের সঙ্গে সম্বন্ধিত অবয়বীর প্রত্যক্ষ কখনো সম্ভব নয়। এই আপত্তির নিরাকরণের উদ্দেশ্যে বাৎস্যায়ন বলেন- সমগ্র অবয়বের প্রত্যক্ষ ব্যতীত যদি অবয়বীর প্রত্যক্ষ সিদ্ধ না হয় তাহলে একদেশের অবস্থিত অবয়বেরও প্রত্যক্ষ হতে পারে না।[৩] কেননা কোন অবয়বেরও সর্বাংশে চক্ষুসন্নিকর্ষ হতে পারে না কোন একটি অংশের সঙ্গেই ইন্দ্রিয় সংযোগ হয়। কোন অবয়বের সঙ্গে ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ ঘটলে সাথে সাথেই সমবায় সম্বন্ধযুক্ত অবয়বীর সঙ্গেও ইন্দ্রিয় সম্বন্ধযুক্ত হয়ে যায়। প্রত্যক্ষের কারণ ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ, মহত্ব, উদ্ভূত রূপ প্রভৃতি থাকলে অবয়বের পাশাপাশি অবয়বীরও প্রত্যক্ষ আমাদের হয়।

লক্ষণীয় বিষয় হল পরমাণুবিশেষের সমষ্টি বলে যদি বৃক্ষাদি পৃথক কোন অবয়বী স্বীকার করা না হয় তাহলে কোন পদার্থেই জ্ঞান হতে পারে না। তাৎপর্য এই যে, পদার্থকে পরমাণুবিশেষের সমষ্টি বললে পরমাণুগুলি অতীন্দ্রিয় হওয়ায় তাদের সমষ্টিও অতীন্দ্রিয়ই হবে। কাজেই কোন পদার্থই প্রত্যক্ষের বিষয় হতে পারবে না। আর যদি বলা হয় পদার্থের জ্ঞান লাভের জন্য প্রত্যক্ষ নয়, অনুমানই প্রমাণ তাহলে কোন প্রমাণের

---

[২] তদেব, পৃষ্ঠা- ১৪২।

[৩] তদেব, পৃষ্ঠা- ১৪৯।

দ্বারাই কোন পদার্থের জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হবে না।[৪] কারণ সাবয়ব মহৎ ঘটাদি পদার্থ বিষয়েই আমাদের বহিরিন্দ্রিয়-জন্য লৌকিক প্রত্যক্ষ হয়। ঘটাদি রূপ অবয়বী না থাকলে প্রত্যক্ষের বিষয় কোন পদার্থই থাকে না। আর প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকলে অনুমানাদি কোন প্রমাণই সম্ভব নয়। কেননা অনুমানাদি সকল প্রমাণ প্রত্যক্ষমূলক। ফলে কোন প্রমাণের দ্বারাই পদার্থের জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হবে না।

অবয়বীববাদ খণ্ডন ও পুঞ্জবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আরও কিছু যুক্তির অবতারণা করেন বৌদ্ধরা। পূর্বপক্ষীর সেই বক্তব্যকেই ব্যক্ত করতে গিয়ে মহর্ষি গৌতম চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে বলেছেন- পরমাণু অতীন্দ্রিয় একথা ঠিকই কিন্তু একটি একটি পরমাণু প্রত্যক্ষের অবিষয় হলেও পরমাণুপুঞ্জ দর্শনের অবিষয় নয়। যেমন তিমির রোগগ্রস্ত ব্যক্তি একটি কেশ দেখতে না পেলেও কেশগুচ্ছ দেখতে পায়।[৫] কোন বৃদ্ধ ব্যক্তি যুবকের মতো ক্ষুদ্র অক্ষর দেখতে পান না ঠিকই কিন্তু স্থূল অক্ষরগুলিকে দেখতে তার অসুবিধা হয় না। এও দেখা যায় সৈন্য দলের হস্তি বা অরন্যের বৃক্ষ গুলি স্বতন্ত্র ভাবে প্রত্যক্ষিত না হলেও সেনা ও বনানীকে এক বলেই মনে হয়। ঠিক তেমনই চক্ষুষ্মান ব্যক্তির কাছে অতীন্দ্রিয় প্রত্যেকটি পরমাণু দৃষ্টিগোচর না হলেও পরমাণুপুঞ্জ অর্থাৎ সংযুক্ত পরমাণুসমূহ প্রত্যক্ষের বিষয় হতে পারে। কাজেই প্রত্যক্ষের অপলাপও হয় না এবং দৃশ্যমান ঘটাদি যে পরমাণুর সমূহ তাও সিদ্ধ হয়ে যায়।

এখানে বলা দরকার প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের নিজ নিজ পটুতা ও মন্দতা রয়েছে। চক্ষু কখনোই তার অবিষয় গন্ধকে গ্রহণ করতে পারে না। ইন্দ্রিয়গুলি কেবল তার স্ব স্ব গ্রাহ্য বিষয়কেই গ্রহণ করে। এখন সমস্ত পরমাণুই অতীন্দ্রিয় হওয়ায় তারা ইন্দ্রিয়ের বিষয়ভূতই নয়। এমতাবস্তায় যদি বলা হয় যা ইন্দ্রিয়ের অবিষয় তারও গ্রহণ হয় তাহলে যেকোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যেকোন বিষয় গ্রহণের আপত্তি হবে। সেক্ষেত্রে চক্ষুর দ্বারা গন্ধের গ্রহণ হয় এমন অসম্ভব কথাও স্বীকার করতে হয়। তিমির রোগগ্রস্ত ব্যক্তি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বৈকল্যবশত কেশবিশেষ প্রত্যক্ষে অক্ষম হলেও কেশপুঞ্জকে প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম। কিন্তু যিনি তিমির রোগগ্রস্ত নন তিনি একটি কেশ এবং কেশপুঞ্জ উভয়ই প্রত্যক্ষ করতে পারেন। কারণ একটি কেশকেও আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি। সুতরাং কেশ ইন্দ্রিয়ের অবিষয় নয়।[৬] কিন্তু পরমাণু সমস্তই অতীন্দ্রিয় কাজেই একটি পরমাণুর ইন্দ্রিয়ের বিষয় না হলে পরমাণুপুঞ্জ কীভাবে ইন্দ্রিয়ের বিষয় হবে?

এখানে পূর্বপক্ষী আত্মপক্ষ সমর্থনে বলতে পারেন একক ভাবে পরমাণু অতীন্দ্রিয় হলেও তারা যখন পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয় তখন সেই সম্মিলিত পরমাণু রাশি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব লাভ করে এবং পরমাণু বিচ্ছিন্ন হলে আবার অতীন্দ্রিয় হয়ে যায়। পূর্বপক্ষীর এহেন সাফাই বাৎস্যায়নের বিচারে অতিমহান ব্যাঘাত দোষে দুষ্ট হবে। কারণ অতীন্দ্রিয়ত্ব ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ। পরমাণু কোন এক সময় অতীন্দ্রিয় ও কোন এক সময় তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এটা কখনোই হতে পারে না। পরমাণুগুলি যখন অতীন্দ্রিয় তখন তাদের সংযোগের দ্বারা উৎপন্ন সমষ্টিও অতীন্দ্রিয়ই হবে। ফলে সংযুক্ত পরমাণুও প্রত্যক্ষের বিষয় হতে পারে না।

---

[৪] তদেব, পৃষ্ঠা ১৬২-১৬৩।

[৫] "কেশসমূহে তৈমিরিকোপলব্ধিবত্তদুপলব্ধি।।৪/২/১৩।।"- ন্যায়সূত্র।

[৬] "উভয়ং হ্যতৈমিরিকেণ চক্ষুষা গৃহ্যন্তে। পরমাণবস্তুতীন্দ্রিয়া ইন্দ্রিয়াবিষয়াভূতা না কেনচিদিন্দ্রিয়েণ গৃহ্যন্তে..."- মহর্ষি গৌতম, *ন্যায় দর্শন ও বাৎস্যায়ন ভাষ্য* (পঞ্চম খণ্ড), মহামহোপাধ্যায় ফণীভূষণ তর্কবাগীশ (সম্পাঃ), কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ৬৯।

এর প্রতিক্রিয়ায় পুঞ্জবাদী হয়ত বলবেন- বস্তুত পরমাণু প্রত্যক্ষের অযোগ্য পদার্থ নয়। আবরণ বা প্রতিবন্ধকের কারণে যেমন ঘটপটাদির প্রত্যক্ষ হয় না ঠিক তেমনই প্রতিবন্ধকের কারণে পরমাণুরও প্রত্যক্ষ ব্যাহত হয়। অথচ তারা পরস্পর সংযুক্ত হলে আবরণাদি অপসারিত হওয়ায় তাদের প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়। পূর্বপক্ষীর এই সকপোলকল্পনার নিরাস্কল্পে ভাষ্যকার বলেন- যে পদার্থ প্রত্যক্ষের বিষয় হয় সেই পদার্থেরই যদি অন্য স্থানে (উপস্থিতির সত্ত্বেও) প্রত্যক্ষ না হয় তাহলে প্রতিবন্ধক আবরণাদির উপস্থিতিই ঐ অপ্রত্যক্ষের কারণ বলে মানা যায়; কিন্তু যা কোন কালে কোন দেশেই প্রত্যক্ষের বিষয়ই হয় না সেই পদার্থের অপ্রত্যক্ষের প্রতি প্রতিবন্ধক আবরণাদিকে কারণ বলা যায় না। এখন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দৌর্বল্যের কারণে আমরা পরমাণুকে প্রত্যক্ষ করতে পারি না এমন কথাও কেউ বলতে পারেন। যেমন তৈমিরিক ব্যক্তি যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দৌর্বল্যবশত কেশ প্রত্যক্ষে ব্যর্থ ঠিক একই ভাবে সাধারণ ব্যক্তিও চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দৌর্বল্যবশত পরমাণুর প্রত্যক্ষে অক্ষম। কিন্তু একথাও বলা যায় না। কারণ সকল ব্যক্তির চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গন্ধের অপ্রত্যক্ষ কারণ ইন্দ্রিয় দৌর্বল্য জন্য নয়, বরং তা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয়ই নয় বলে।[৭] পরমাণু সকল ইন্দ্রিয়েরই অবিষয় হওয়ায় তা অতীন্দ্রিয়। পরমাণুপুঞ্জবাদ খণ্ডন করে অবয়বীবাদ প্রতিষ্ঠায় মহর্ষি দ্বিতীয় অধ্যায়ে "নাতীন্দ্রিয়ত্বাদণূনাং" (ন্যায়সূত্র- ২/১/৩৫) সূত্রবাক্যের দ্বারা সমর্থন করেছেন।

পুঞ্জবাদ খণ্ডন করে অবয়বীবাদ পাশাপাশি সেই অবয়বীর সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষত্ব সমর্থন করেছেন নৈয়ায়িক সম্প্রদায়। তাদের মতে পদার্থ মাত্রই প্রত্যক্ষ যোগ্য হতে পারে যদি তাদের মধ্যে দুটি বিশিষ্ট থাকে- মহত্ত্ব এবং অনেকদ্রব্যত্ব। মহত্ত্ব হল একপ্রকার পরিমানবিশেষ। দ্রব্য প্রত্যক্ষে যে কারণ তার সামান্যগুণকে বলা হয় মহত্ত্বত্ব।[৮] অর্থাৎ এই মহৎ পরিমাণ হল দ্রব্য প্রত্যক্ষের একটি কারণ বিশেষ। আবার যা অনেক দ্রব্যের আশ্রয় তাকে অনেকদ্রব্য বলা হয় তার ভাব হল অনেকদ্রব্যত্ব। কোন পদার্থ স্বসমবেতসমবেতত্ব সম্বন্ধে অনেকদ্রব্যবত্ত্ব হয়। স্ব-পদে পরমাণু ধরলে তাতে সমবেত দ্ব্যনুক, তৎসমবেতত্ব ত্র্যনুকে আছে। সুতরাং ত্র্যনুকাদি স্থূল মহৎদ্রব্যে অনেকদ্রব্যত্ব আছে। কিন্তু লাঘব বশত মহত্ত্বকেই প্রত্যক্ষের কারণ বলা হয় অনেকদ্রব্যকে নয়।[৯]

দ্ব্যনুক সাবয়ব পদার্থ হলেও মহৎ পদার্থ না হওয়ায় তার প্রত্যক্ষ হয় না। আবার আকাশাদি দ্ব্যনুকের ন্যায় অনু পরিমান না হলেও মহৎ পরিমান বিশিষ্ট নয়, বরং পরমমহৎ পরিমান বিশিষ্ট তাই তাদের বাহ্য প্রত্যক্ষ হয় না। আর আকাশাদি আন্তর প্রত্যক্ষের বিষয়ও নয়। একমাত্র আত্মা পদার্থই পরমমহৎ পরিমান বিশিষ্ট হয়েও 'অহং সুখী', 'অহং দুখী' এই ভাবে প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। অপরাপর বাহ্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দ্রব্যের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ স্বীকার করা হয়েছে ন্যায় দর্শনে।

উপসংহার:

পূর্বের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে আমরা যখন কোন বস্তুকে প্রত্যক্ষ করি তখন সেই বস্তুর সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষই আমদের হয়ে থাকে। একথা আরও স্পষ্ট করতে নানা মুনি প্রত্যক্ষের নানান লক্ষণ করলেও নব্য নৈয়ায়িক গঙ্গেশোপাধ্যায় তাঁর 'তত্ত্বচিন্তামনি'র সন্নিকর্ষবাদে প্রত্যক্ষের লক্ষণে বলেছেন- "প্রত্যক্ষস্য

---

[৭] "যথা নেন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্যাচ্চক্ষুষাঽনুপলব্ধির্গন্ধাদীনামিতি।"- তদেব, পৃষ্ঠা- ৭০।

[৮] "দ্রব্যসাক্ষাৎকারকারণবিষয়নিষ্ঠসামান্যগুণত্বং বা মহত্ত্বত্বম্"- মিশ্র, শঙ্কর, *বৈশেষিকসূত্রোপস্কারঃ*, শ্রী নারায়ণ মিশ্র (সম্পাঃ), আচার্য দুণ্ডিরাজ শাস্ত্রী (ব্যাখ্যাঃ), বারাণসি, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা- ৩৭৯।

[৯] ভট্টাচার্য, শ্রীমোহন এবং শ্রী দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, *ভারতীয় দর্শন কোষ*, কলকাতা, সংস্কৃত কলেজ গবেষণা গ্রন্থমালা, ১৯৫৮, পৃষ্ঠা- ১৪।

সাক্ষাৎকারিত্বং লক্ষণং"[১০]। অতএব গঙ্গেশের মতে কেবল ইন্দ্রিয়-অর্থ-সন্নিকর্ষ জন্য জ্ঞান প্রত্যক্ষ নয়, আমি বিষয়কে সাক্ষাৎ ভাবে জেনেছি এটিই হল প্রত্যক্ষ। কেবল ইন্দ্রিয়-অর্থ-সন্নিকর্ষ জন্য জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলা যায় না কারণ সকল জ্ঞানই ইন্দ্রিয়-অর্থ জন্য তা যথার্থই হোক আর অযথার্থ। ইন্দ্রিয়-অর্থ জন্য বস্তুর সাক্ষাৎ জ্ঞানকেই তাই তিনি প্রত্যক্ষ বলেছেন।

বাহ্য বস্তুর সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হলে এখন প্রশ্ন হল সেই প্রত্যক্ষ কোন্ সন্নিকর্ষের দ্বারা তা হয়। ন্যায় শাস্ত্রে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ও পরম্পরা সম্বন্ধকে বোঝানোর জন্যই 'সন্নিকর্ষ' শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে। এখন সম্বন্ধ হতে গেলে অন্তত দুটি সম্বন্ধীর প্রয়োজন হয়। এখানে ইন্দ্রিয় এবং অর্থ বা বাহ্য বস্তুই হল সেই দুটি সম্বন্ধী যাদের সম্বন্ধের কারণে আমাদের প্রত্যক্ষ মূলক সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ হয়। অর্থাৎ স্ব স্ব গ্রাহ্য বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধই হল সন্নিকর্ষ। যদিও নৈয়ায়িকরা দুই ধরণের প্রত্যক্ষকে স্বীকার করেছেন- লৌকিক এবং অলৌকিক। অলৌকিক সন্নিকর্ষ সাক্ষাৎ ভাবে হয় কিনা এ বিষয়ে প্রশ্ন দেখা গিলেও লৌকিক সন্নিকর্ষ যে সাক্ষাৎ ভাবেই হয় এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই। কাজেই নৈয়ায়িকরা মতে বস্তুর যে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হয় তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ হল তাদের সন্নিকর্ষের বিভাজন। তবে তর্কসংগ্রহকার অন্নংভট্ট সন্নিকর্ষ বলতে লৌকিক সন্নিকর্ষকেই বুঝেছেন[১১]। বিশেষত বাহ্য বস্তুকে যদি দ্রব্য হিসাবে গন্য করা হয় তাহলে দ্রব্যের প্রত্যক্ষ সংযোগ সন্নিকর্ষের দ্বারাই হয়। ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের সাথে সংযুক্ত বিষয় যে সাক্ষাৎ ভাবেই গৃহিত হতে পারে এটা প্রমাণ করতে গিয়ে তারা বলেন যে দুটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারার দ্রব্যের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হয় সেগুলি হল চক্ষু এবং ত্বক। চক্ষুর দ্বারা যেমন একটি ঘটের প্রত্যক্ষ হয় তেমনই ত্বকের দ্বারাও একটি ঘটকে প্রত্যক্ষ করা যায়। আর এই দুটি ক্ষেত্রেই সাক্ষাৎ ভাবেই দ্রব্যের গ্রহণ হয়ে যায়। এছাড়াও মানস দ্রব্য অর্থাৎ মনের দ্বারা গৃহিত দ্রব্য যেমন আত্মার প্রত্যক্ষও এরা স্বীকার করে থাকেন। এই প্রত্যক্ষ মনের মাধ্যমে সংযোগ সন্নিকর্ষের দ্বারাই হতে পারে। কাজেই নৈয়ায়িকরা সাক্ষাৎ ভাবেই বস্তুর প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন এবিষয়ে কোন সংশয় নেই। দ্রব্য ছাড়াও অন্যান্য যে সমস্ত পদার্থ রয়েছে তাদের মধ্যে প্রায় সকল পদার্থের ক্ষেত্রেই নৈয়ায়িকরা প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বীকার করেছেন।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. গোস্বামী, শ্রীনারায়ণচন্দ্র (অধ্যাপনাসহিত)। অন্নংভট্ট, তর্কসংগ্রহ (সটীক)। কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৮।

২. পিটারসন, পিটার (সম্পাঃ)। আচার্য ধর্মোত্তর, ন্যায়বিন্দুটীকা। ক্যালকাটা, দ্যি ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেস, ১৯২৯।

৩. তর্কবাগীশ, পণ্ডিত কামাখ্যানাথ (সম্পাঃ)। গঙ্গেশোপাধ্যায়, তত্ত্বচিন্তামণি (প্রত্যক্ষখণ্ড)। দিল্লি, মতিলাল বনারসিদাস, ১৯৭৪।

[১০] গঙ্গেশোপাধ্যায়, *তত্ত্বচিন্তামণি* (প্রত্যক্ষখণ্ড), পণ্ডিত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ (সম্পাঃ), দিল্লি, মতিলাল বনারসিদাস, ১৯৭৪, পৃষ্ঠা- ৫৪৩।

[১১] তর্কসংগ্রহদীপিকায় তিনি বলেছেন- সন্নিকর্ষঃ সংযোগাদিঃ। 'আদি' শব্দের দ্বারা অলৌকিক সন্নিকর্ষকেও গ্রহণ করা যেত কিন্তু তার পরেই তিনি "প্রত্যক্ষজ্ঞানহেতুরিন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষঃ ষড়-বিধঃ সন্নিকর্ষষট্কজন্যং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্" বলায় সন্নিকর্ষ বলতে যে তিনি লৌকিক সন্নিকর্ষকেই বুঝেছেন একথা স্পষ্টতই বোঝা যায় (অন্নংভট্ট, *তর্কসংগ্রহ (সটীক)*, শ্রীনারায়ণচন্দ্র গোস্বামী (অধ্যাপনাসহিত), কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা- ৩২১।)

৪. চৌধুরী, ড. সুকোমল (সম্পাঃ)। বসুবন্ধু, বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধিঃ। কলকাতা, সংস্কৃত কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৭।

৫. ভট্টাচার্য, শ্রীমোহন এবং ভট্টাচার্য, শ্রী দীনেশ চন্দ্র। ভারতীয় দর্শন কোষ। কলকাতা, সংস্কৃত কলেজ গবেষণা গ্রন্থমালা, ১৯৫৮।

৬. মহর্ষি গৌতম, ন্যায় দর্শন ও বাৎস্যায়ন ভাষ্য (দ্বিতীয় খণ্ড)। মহামহোপাধ্যায় ফণীভূষণ তর্কবাগীশ (সম্পাঃ), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১৫।

৭. মহর্ষি গৌতম, ন্যায় দর্শন ও বাৎস্যায়ন ভাষ্য (পঞ্চম খণ্ড)। মহামহোপাধ্যায় ফণীভূষণ তর্কবাগীশ (সম্পাঃ), কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ।

৮. মিশ্র, শঙ্কর। বৈশেষিকসূত্রোপস্কারঃ। শ্রী নারায়ণ মিশ্র (সম্পাঃ), আচার্য দুণ্ডিরাজ শাস্ত্রী (ব্যাখ্যাঃ), বারাণসি, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, ১৯৬৯।

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1865-1872
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.410

আলুচাষে কীটনাশক-নির্ভরতা, জৈব কৃষির সম্ভাবনা, সরকারি নীতি ও স্বাস্থ্য-সংকট: হুগলি জেলার প্রেক্ষিত

ড. মৌ সাউ, *রাজ্য সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, ভূগোল বিভাগ, রাজা রামমোহন রায় মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 25.03.2026; Accepted: 28.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Potato cultivation occupies a pivotal place in the agrarian economy of Hooghly district, West Bengal. It is not only a food crop but also a major cash crop that shapes rural income, labour demand, storage, transport, and local trade. Yet the expansion of potato farming has increasingly been accompanied by intensive use of chemical pesticides and fertilisers, especially to control blight and other crop diseases. This article examines the growing dependence on pesticides in potato cultivation, its implications for farmers' health, soil quality, water resources, and rural ecology, and the importance of connecting this debate with organic and sustainable alternatives. Drawing on findings from Hooghly district, the paper shows that frequent pesticide application, inadequate protective gear, weak access to scientific guidance, and market uncertainty have together deepened both production risk and health vulnerability. At the same time, bio-pesticides, crop rotation, healthy seed, organic composting, and farmer awareness are gradually opening a path toward safer cultivation. The article argues that sustainable potato farming requires an integrated policy framework involving farmer training, fair marketing, regulated storage, crop insurance, cooperative institutions, and support for value-added processing. The future of potato cultivation in West Bengal depends on balancing productivity, ecological resilience, farmer welfare, and public health.

Keywords: Potato Cultivation, Pesticides, Organic Farming, Health Risks, Government Policy, Hooghly District, Sustainable Agriculture

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-অর্থনীতিতে আলু বহুদিন ধরেই একটি গুরুত্বপূর্ণ ফসল, কিন্তু হুগলি জেলার প্রেক্ষিতে এর তাৎপর্য আরও গভীর। এখানে আলু কেবল পারিবারিক ভোগের জন্য উৎপাদিত শস্য নয়; এটি নগদ আয়ের প্রধান উৎস, বিপুল শ্রমসংস্থানের ক্ষেত্র, ঠান্ডা ঘর-নির্ভর বিপণনব্যবস্থার ভিত্তি এবং গ্রামীণ সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনের এক অনিবার্য অংশ। গবেষণায় দেখা গেছে, বিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিশেষ করে আশির দশক পরবর্তী সময়ে হুগলিতে আলুচাষ এমনভাবে বিস্তার লাভ করে যে বহু ক্ষেত্রে তা ধান ও পাটকেও পিছনে ফেলে প্রধান নগদ ফসলের মর্যাদা পায়।[১] অনুকূল জলবায়ু, তুলনামূলক কম সময়ে ফসল

ওঠা, বিস্তৃত বাজার, ঠান্ডা ঘর ও রাস্তা-ঘাটের উন্নতি—সব মিলিয়ে আলু এই জেলার কৃষিজ অর্থনীতিকে নতুন মাত্রা দিয়েছে।[২]

তবে এই সাফল্যের আড়ালে একটি অস্বস্তিকর বাস্তবতাও ক্রমশ স্পষ্ট হয়েছে। আলুচাষ যত বেশি বাজারমুখী হয়েছে, ততই তা রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। বেশি ফলনের চাপ, ব্লাইট ও লেট ব্লাইটের মতো রোগের ভয়, তাড়াহুড়ো করে বাজারে বিক্রি করতে না পারলে ক্ষতির আশঙ্কা, এবং কৃষকের সীমিত বৈজ্ঞানিক পরামর্শ— এই সব কারণ মিলিয়ে কীটনাশক যেন আলুচাষের এক প্রায়-অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এ নির্ভরতার অর্থ শুধু উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে মাটির ক্লান্তি, জলের দূষণ, কৃষিশ্রমিকের স্বাস্থ্যঝুঁকি, খাদ্যনিরাপত্তা এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিবেশগত সংকট।[৩]

এই প্রবন্ধে তাই আলুচাষকে কেবল উৎপাদন বা বাজারের প্রশ্ন হিসেবে নয়, বরং একটি সমন্বিত ভূগোল-সামাজিক সমস্যা হিসেবে দেখা হয়েছে। কীটনাশক-নির্ভর আলুচাষের বর্তমান চরিত্র, জৈব ও সমন্বিত বিকল্প পদ্ধতির সম্ভাবনা, সরকারি নীতির ভূমিকা, বাজারের অসাম্য, এবং মানবস্বাস্থ্যের ঝুঁকি—এই কয়েকটি স্তরকে একসঙ্গে বিবেচনা করেই এই প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে। আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে হুগলি জেলার অভিজ্ঞতা, তবে তার মধ্য দিয়ে বৃহত্তর পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-বাস্তবতাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

হুগলি জেলায় আলুচাষের বিস্তার ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য: আলুর গুরুত্ব বোঝার জন্য প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে এটি একটি "দ্বৈত চরিত্রের" ফসল। একদিকে এটি সাধারণ মানুষের খাদ্যতালিকার অপরিহার্য অংশ; অন্যদিকে এটি কৃষকের কাছে লাভজনক নগদ ফসল। হুগলির কৃষকেরা দীর্ঘদিন ধরে এমন ফসলের সন্ধানে ছিলেন যা স্বল্প সময়ে তুলনামূলক বেশি আয় দেবে, বাজারে দ্রুত বিক্রিযোগ্য হবে এবং অন্য ফসলের ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখবে। এই কারণেই আলু দ্রুত জনপ্রিয় হয়। গবেষণায় উল্লেখ আছে, হুগলির অনেক এলাকায় আলু এমন এক ক্ষতিপূরণকারী ফসলে পরিণত হয় যা অন্য ফসলে লোকসান হলে কৃষককে আবার ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ দেয়।[৪]

কিন্তু এই লাভের সঙ্গে ঝুঁকিও সমানতালে বেড়েছে। আলু একটি ব্যয়বহুল ফসল; বীজ, সার, কীটনাশক, সেচ, শ্রম, পরিবহণ, বস্তা, ঠান্ডা ঘর—সব মিলিয়ে এর উৎপাদনব্যয় ছোট ও প্রান্তিক কৃষকের জন্য খুবই চাপের। ফলে অনেক কৃষক ঋণ নেন, স্থানীয় মহাজন বা মধ্যস্বত্বভোগীর উপর নির্ভর করেন, এবং ফসল ওঠার পর তাৎক্ষণিক নগদের চাপে কম দামে আলু বিক্রি করে দেন। এর ফলে বাজারে যে লাভের চক্র তৈরি হয়, তার প্রধান অংশ কৃষকের হাতে না গিয়ে যায় আড়তদার, ফড়িয়া, ঠান্ডা ঘর-মালিক ও পাইকারদের হাতে।[৫]

এই পরিস্থিতি কৃষককে একটি কঠিন সিদ্ধান্তের সামনে দাঁড় করায়—তিনি জানেন খরচ বাড়ছে, তবু ফলন কমানোর ঝুঁকি নিতে পারেন না। বরং বেশি ফলন তুলতে এবং রোগ-পোকার আক্রমণ ঠেকাতে তিনি আরও বেশি রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহার করতে বাধ্য হন। ফলে আলুচাষ একদিকে আয়ের প্রতিশ্রুতি দিলেও অন্যদিকে তা কৃষককে এক অনিশ্চিত, ঋণনির্ভর ও পরিবেশ-সংকটময় কৃষি ব্যবস্থার দিকে ঠেলে দেয়। এই অর্থনৈতিক কাঠামো না বুঝলে আলুচাষে কীটনাশকের প্রশ্নটিও সঠিকভাবে বোঝা যায় না।

কীটনাশক-নির্ভর আলুচাষের বর্তমান চিত্র: হুগলি জেলার আলুচাষে কীটনাশকের ব্যবহার নিয়ে করা সমীক্ষা একটি উদ্বেগজনক চিত্র তুলে ধরে। ২০২১ সালের মে-জুন মাসে জেলার চারটি উপবিভাগে ২০০ জন

আলুচাষির উপর পরিচালিত সমীক্ষায় দেখা যায়, প্রায় সব কৃষকই ছত্রাকনাশক ব্যবহার করেন; কারণ ব্লাইট ও লেট ব্লাইট রোগকে তাঁরা সবচেয়ে বড় বিপদজনক বলে মনে করেন। পাশাপাশি কীটনাশক, আগাছানাশক ও ব্যাকটেরিয়ানাশকেরও ব্যবহার রয়েছে, যদিও ছত্রাকনাশকের ব্যবহারই সবচেয়ে বেশি।[৬] অনেক ক্ষেত্রেই রোগের বাস্তব উপস্থিতির চেয়ে রোগের আশঙ্কাই ওষুধ ব্যবহারের বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সমীক্ষায় আরও দেখা যায়, আলুচাষিরা বিভিন্ন বাণিজ্যিক নামের ওষুধ ব্যবহার করেন—যেমন কপার অক্সিক্লোরাইড, ম্যানকোজেব, ক্লোরপাইরিফস, ইমিডাক্লোপ্রিড, ফিপ্রোনিল ইত্যাদি। এগুলির অনেকই অপেক্ষাকৃত তীব্র রাসায়নিক প্রকৃতির। কিছু কিছু ক্ষেত্রে একই মৌসুমে তিন থেকে চার বার, আবার কিছু এলাকায় ছয় বার পর্যন্ত ছত্রাকনাশক প্রয়োগের ঘটনা দেখা গেছে। গবেষণায় এমনও উল্লেখ আছে যে, অনেক সময় প্রকৃত সংক্রমণ না ঘটলেও "হয়ে যেতে পারে" এই আশঙ্কায় কৃষক ওষুধ ছিটিয়ে দেন।[৭] অর্থাৎ আলুচাষে কীটনাশকের ব্যবহার অনেকাংশে প্রতিরোধমূলক নয়, বরং ভয়নির্ভর।

এই ব্যবহারের পেছনে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ঘাটতিও বড় কারণ। সমীক্ষায় পাওয়া যায়, কৃষকেরা মূলত দোকানদার, প্রতিবেশী কৃষক এবং নিজের অভিজ্ঞতার উপর ভরসা করেন। কৃষি আধিকারিককে নিয়মিত তথ্যসূত্র হিসেবে উল্লেখ করেছেন অত্যন্ত অল্পসংখ্যক মানুষ। আবার লেবেল পড়ে সঠিক ডোজ বোঝেন এমন কৃষকের সংখ্যাও খুব কম; সঠিক মাত্রা জানলেও বাস্তবে তা প্রয়োগ করেন আরও কম।[৮] এই তথ্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এর মধ্যে কৃষি সম্প্রসারণব্যবস্থার দুর্বলতা, বৈজ্ঞানিক পরামর্শের অপ্রতুলতা এবং গ্রামীণ জ্ঞান-অবকাঠামোর সীমাবদ্ধতা একসঙ্গে ধরা পড়ে।

কৃষকেরা নিজেরাও লক্ষ করেছেন যে আগের বহু ওষুধ এখন আর আগের মতো কার্যকর নয়। ফলে একই রোগ দমনে বেশি মাত্রার ওষুধ বা নতুন প্রজন্মের ওষুধ ব্যবহার করতে হচ্ছে। সমীক্ষায় একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জানিয়েছেন যে গত দশ বছরে তাঁরা ওষুধের মাত্রা বাড়িয়েছেন।[৯] এর ফলে একটি দুষ্টচক্র তৈরি হয়েছে—ওষুধের ডোজ বাড়ে, খরচ বাড়ে, প্রতিরোধক্ষমতা আরও জোরদার হয়, আবার নতুন ওষুধের প্রয়োজন পড়ে। কৃষক মনে করেন তিনি ফসল বাঁচাচ্ছেন; বাস্তবে তিনি আরও বেশি ব্যয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন এবং পরিবেশে আরও বেশি রাসায়নিক সঞ্চিত করছেন।

স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও মাটির উপর প্রভাব: আলুচাষে কীটনাশকের প্রশ্নটি কেবল কৃষি-প্রযুক্তির নয়; এটি জনস্বাস্থ্যেরও প্রশ্ন। ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা গেছে, খুব অল্পসংখ্যক কৃষক দস্তানা ব্যবহার করেন, আরও কমসংখ্যক সুরক্ষিত জুতো পরেন; মুখ ঢাকার জন্য কাপড় বা সাদামাটা মুখোশ ব্যবহার করলেও তা পর্যাপ্ত নয়। বহু ক্ষেত্রেই কৃষকেরা খালি হাতে রাসায়নিক মেশান, স্প্রে-মেশিন পরিষ্কার করেন বা ওষুধের ডোজ নির্ধারণ করেন।[১০] ফলে বিষাক্ত রাসায়নিক কেবল ত্বকে নয়, শ্বাস-প্রশ্বাস ও চোখের মাধ্যমেও শরীরে প্রবেশ করে।

এর তাৎক্ষণিক ফল হতে পারে মাথা ঘোরা, চোখ জ্বালা, ত্বকে জ্বালা, শ্বাসকষ্ট, দুর্বলতা বা বমি বমি ভাব। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি আরও উদ্বেগজনক। বারবার অল্পমাত্রায় বিষাক্ত পদার্থ শরীরে ঢুকলে স্নায়ু, লিভার, শ্বাসযন্ত্র, ত্বক এবং প্রজননস্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। ক্ষেত্রপর্যায়ের গবেষণায় স্পষ্ট বলা হয়েছে যে কৃষক-পরিবার, কৃষিশ্রমিক এবং গ্রামীণ পরিবেশ—সকলেই এই ঝুঁকির মধ্যে পড়ে।[১১] শুধু ক্ষেতের শ্রমিক নন, বাড়িতে রাখা কীটনাশকের বোতল, ব্যবহৃত প্যাকেট, দূষিত জামাকাপড় বা স্প্রে-যন্ত্রের মাধ্যমে শিশুরাও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

পরিবেশগত প্রভাবও সমান গুরুতর। বৃষ্টির জল, সেচের অতিরিক্ত জল অথবা জমির ঢাল বেয়ে কীটনাশক ও রাসায়নিক সার নিকটবর্তী পুকুর, খাল কিংবা ভূগর্ভস্থ জলের অঞ্চলে পৌঁছে যেতে পারে। গবেষণায় স্পষ্ট বলা হয়েছে যে এই রাসায়নিক মিশ্রিত পানীয় জল, গবাদিপশু, পোকামাকড়, উদ্ভিদ ও সামগ্রিক জীববৈচিত্র্যের জন্য হুমকি তৈরি করে।[১২] জলদূষণের প্রভাব অনেক সময় তাৎক্ষণিকভাবে চোখে পড়ে না, কিন্তু দীর্ঘদিনে তা গ্রামীণ স্বাস্থ্যের উপর গভীর ছাপ ফেলে।

মাটির অবস্থাও একইভাবে আক্রান্ত হয়। দীর্ঘকাল একমুখী রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারে মাটির জৈব উপাদান কমে যায়, অণুজীবের স্বাভাবিক ক্রিয়াশীলতা বাধাগ্রস্ত হয়, এবং মাটি ধীরে ধীরে তার প্রাকৃতিক ভারসাম্য হারায়। গবেষণায় আলুচাষের সঙ্গে মাটির উর্বরতা হ্রাস, পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট হওয়া এবং জমির 'উৎপাদন ক্ষমতা'-র সম্পর্কের কথা স্পষ্টভাবে উত্থাপিত হয়েছে।[১৩] অর্থাৎ আজ যে ফসলকে বাঁচাতে অতিরিক্ত ওষুধ প্রয়োগ করা হচ্ছে, দীর্ঘমেয়াদে সেই প্রক্রিয়াই কৃষিভিত্তির স্থায়িত্বকে দুর্বল করছে।

এই প্রেক্ষাপটে স্বাস্থ্য ও পরিবেশের প্রশ্নকে আলাদা করে দেখলে চলবে না। কৃষকের শরীর, মাটি, জল, খাদ্য এবং বাজার—এই পাঁচটি একে অপরের সঙ্গে জড়িত। তাই আলুচাষে কীটনাশক ব্যবহারের সমস্যা আসলে একটি সমন্বিত মানব-পরিবেশ সমস্যা, যার সমাধানও সমন্বিত পথেই খুঁজতে হবে।

জৈব কৃষি, জীব নিয়ন্ত্রণ ও টেকসই বিকল্পের সম্ভাবনা : সমস্যার এই তীব্রতা সত্ত্বেও আশার জায়গা আছে। হুগলি জেলার অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, সব কৃষক এখনও রাসায়নিকের অন্ধ সমর্থক নন; বরং ধীরে ধীরে একটি সচেতনতার সঞ্চার হচ্ছে। গবেষণায় উল্লেখ আছে, কৃষকেরা লক্ষ্য করছেন যে পুরনো কীটনাশক কম কাজ করছে, খরচ বাড়ছে, জমি ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। এই অভিজ্ঞতাই তাঁদের একাংশকে বিকল্প পদ্ধতির দিকে ভাবতে বাধ্য করছে।[১৪]

এখানে "জৈব কৃষি"কে শুধুমাত্র সম্পূর্ণ রাসায়নিকবর্জিত কৃষি হিসেবে দেখলে বিষয়টি সংকীর্ণ হবে। বরং জৈব কৃষি ও সমন্বিত রোগ-পোকা ব্যবস্থাপনাকে একটি ধারাবাহিক রূপান্তরের প্রক্রিয়া হিসেবে ভাবা উচিত। নিমতেল বা বায়োপেস্টিসাইডের ব্যবহার, রোগ-প্রতিরোধী জাত নির্বাচন, সুস্থ ও শোধিত বীজ আলুর ব্যবহার, জৈব কম্পোস্ট, ফসল পর্যায়ক্রম, আগাছা নিয়ন্ত্রণ এবং জমির স্বাস্থ্য রক্ষার পদ্ধতি—এসবই সেই রূপান্তরের অংশ।[১৫]

ফসল পর্যায়ক্রম এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একই জমিতে বারবার আলু করলে নির্দিষ্ট রোগ-পোকার চাপ বাড়ে এবং মাটির পুষ্টি-সমতা নষ্ট হয়। অথচ অন্য ফসলের সঙ্গে পর্যায়ক্রমিক চাষ করলে রোগচক্র ভাঙা যায়, রাসায়নিকের প্রয়োজন কমে, মাটির ভৌত ও জৈব গুণ কিছুটা পুনরুদ্ধার হয়। একইভাবে সোলানেসিয়াস গোত্রের ফসলকে পরপর না নেওয়ার পরামর্শও গবেষণায় দেওয়া হয়েছে।[১৬] অর্থাৎ জৈব চাষ শুধু সার বদলের বিষয় নয়; এটি জমির সঙ্গে এক নৈতিক ও বৈজ্ঞানিক সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রশ্ন।

পশ্চিমবঙ্গে আলু উৎপাদনে জৈব পুষ্টিসূত্রের প্রভাব নিয়ে করা গবেষণাও দেখায় যে জৈব উপাদান আলুর উৎপাদন-ব্যবস্থায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। গোবরসার, কম্পোস্ট, জৈব পুষ্টি ও মাটির গুণগত পুনরুদ্ধার কৃষিকে দীর্ঘমেয়াদে স্থিতিশীল করতে সাহায্য করে।[১৭] স্বীকার করতে হবে, রূপান্তরের এই পথে কিছু বাস্তব বাধাও আছে—প্রথম কয়েক বছরে উৎপাদন-ঝুঁকি, জৈব উপাদানের জোগান, প্রশিক্ষণের অভাব, বাজারে আলাদা মূল্য না পাওয়া, এবং কৃষকের তাৎক্ষণিক লাভের চিন্তা। কিন্তু এই বাধা অতিক্রম করা

অসম্ভব নয়। বরং কৃষক-সহযোগিতা, প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী প্লট, সরকারি প্রণোদনা এবং জৈব পণ্যের জন্য আলাদা বিপণনব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে পরিবর্তন দ্রুত সম্ভব।

মূল বিষয় হল, জৈব বা সমন্বিত পদ্ধতি কৃষককে "বেশি স্প্রে মানেই বেশি নিরাপত্তা" এই মনস্তত্ত্ব থেকে বের হতে সাহায্য করে। সেখানে জমিকে কেবল উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে নয়, একটি জীবন্ত সম্পদ হিসেবে দেখা হয়। টেকসই কৃষির ভবিষ্যৎ এই মনোভাবের উপরই নির্ভর করছে।

সরকারি নীতি, বাজারব্যবস্থা ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার প্রয়োজন: আলুচাষের সংকটের একটি বড় অংশ বাজার ও নীতিনির্ভর। উৎপাদন ভালো হলেও কৃষক লাভবান হবেন, এমন নিশ্চয়তা নেই; আবার খারাপ দামের বছরে ক্ষতির বোঝা বহন করেন মূলত ছোট ও প্রান্তিক কৃষকেরাই। হুগলি জেলার গবেষণায় বারবার উঠে এসেছে যে মধ্যস্বত্বভোগী, কমিশন এজেন্ট, ফড়িয়া ও ঠান্ডা ঘর-মালিকদের প্রভাব আলুচাষের অর্থনীতিতে অত্যন্ত শক্তিশালী।[১৮] কৃষকেরা প্রায়ই উৎপাদনের শুরুতেই ঋণ, উপকরণ বা আগাম সহায়তার মাধ্যমে এই চক্রে ঢুকে পড়েন, ফলে ফসল ওঠার পরে স্বাধীন বিক্রির ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন।

এই পরিস্থিতিতে সরকারি নীতির প্রথম কাজ হওয়া উচিত ন্যায্য মূল্য ও বাজারস্থিতি নিশ্চিত করা। গবেষণায় সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে আলুর দামের অস্বাভাবিক ওঠানামা নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের নির্দিষ্ট নীতি দরকার, যাতে কৃষক সরাসরি ক্রেতার কাছে বিক্রি করার সুযোগ পান এবং সারা বছর তুলনামূলক স্থিতিশীল মূল্য বজায় থাকে।[১৯] সমবায়ভিত্তিক বিপণন, কৃষক-উৎপাদক সংগঠন, কৃষিমণ্ডি ব্যবস্থার সক্রিয় ব্যবহার এবং ডিজিটাল বাজারতথ্য এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, কোল্ড স্টোরেজ ও সংরক্ষণনীতিতে সংস্কার প্রয়োজন। গবেষণায় বলা হয়েছে যে ছোট কৃষক অনেক সময় নগদের চাপে ফসল কাটার পরই বিক্রি করে দেন; তাই সরকার যদি কোল্ড স্টোরেজে রাখা আলুর বিপরীতে অগ্রিম অর্থপ্রদানের ব্যবস্থা, অথবা সেই মজুতের ভিত্তিতে ব্যাংকঋণের সুযোগ তৈরি করে, তবে কৃষক কম দামে তাৎক্ষণিক বিক্রির চাপ থেকে কিছুটা মুক্তি পাবেন।[২০] এটি বাজারে অতিরিক্ত সরবরাহের চাপও কমাবে।

তৃতীয়ত, কৃষিঋণ ও বীমার কার্যকর প্রয়োগ অত্যন্ত জরুরি। ক্ষেত্রসমীক্ষায় পাওয়া গেছে যে ব্যাঙ্কঋণের জটিলতা ও বিলম্বের কারণে অনেক ছোট কৃষক মহাজনি ঋণের উপর নির্ভর করেন, যার সুদের হার অস্বাভাবিকভাবে বেশি।[২১] এ অবস্থায় স্বল্পসুদে সহজ কৃষিঋণ, সময়মতো ঋণমঞ্জুরি, এবং বাস্তবসম্মত কিস্তি-পরিশোধ ব্যবস্থা দরকার। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা ও বাংলা ফসল বীমা যোজনার মতো প্রকল্পের প্রকৃত সুফল যাতে আলুচাষির হাতে পৌঁছায়, সেই দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। গবেষণায় উল্লেখ আছে, এই নীতিগুলি কাগজে থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে পূর্ণ সুবিধা এখনও মাঠপর্যায়ে পৌঁছয়নি।[২২]

চতুর্থত, উৎপাদনের সঙ্গে মূল্যসংযোজনের সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। আলুচিপস, স্টার্চ, ফ্লেক্স, গ্র্যানুল, ডিহাইড্রেটেড কিউব বা পাপড়ের মতো প্রক্রিয়াজাত শিল্প গড়ে উঠলে উদ্বৃত্ত আলুর বিকল্প বাজার তৈরি হবে। গবেষণায় স্থানীয় শিল্পোদ্যোগ ও ক্ষুদ্র-প্রক্রিয়াকরণকে উৎসাহ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।[২৩] একই সঙ্গে রপ্তানি ও আন্তঃরাজ্য বিপণনের জন্য নীতিগত সহায়তা, পরিবহণ-লজিস্টিক, এবং কৃষিপণ্যের গুণমান যাচাইব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করতে হবে।

সব মিলিয়ে, শুধুমাত্র ভর্তুকি বা মৌসুমি হস্তক্ষেপ যথেষ্ট নয়। আলুর জন্য একটি সমন্বিত কৃষিনীতি দরকার—যেখানে উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিপণন, ঋণ, বীমা, জৈব প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্যসুরক্ষা এবং কৃষক-সমবায়—সব কিছুকে একসঙ্গে ভাবা হবে।

বর্তমান সংকট ও ভবিষ্যতের রূপরেখা: হুগলি জেলার আলুচাষকে টেকসই পথে নিয়ে যেতে গেলে কয়েকটি বড় চ্যালেঞ্জ সামনে আসে। প্রথম চ্যালেঞ্জ হলো কৃষকের মানসিকতা ও বাস্তবতা—তিনি দীর্ঘমেয়াদি পরিবেশগত লাভের চেয়ে তাৎক্ষণিক ফলন ও নগদ আয়কে বেশি গুরুত্ব দেন, এবং তা অস্বাভাবিকও নয়। ঋণগ্রস্ত বা প্রান্তিক কৃষকের কাছে জৈব রূপান্তর একটি নৈতিক আহ্বান নয়, বরং অর্থনৈতিক ঝুঁকির প্রশ্ন। তাই পরিবর্তনের ভাষা হতে হবে কৃষকবান্ধব, ধৈর্যশীল ও বাস্তবসম্মত।

দ্বিতীয় সমস্যা জ্ঞান-অবকাঠামো। যতদিন কৃষকের প্রধান উপদেষ্টা থাকবেন দোকানদার বা প্রতিবেশী কৃষক, ততদিন কীটনাশকের সঠিক ব্যবহার, বিকল্প পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতা, কিংবা স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ—কোনওটাই সুসংহতভাবে গড়ে উঠবে না। প্রত্যেক ব্লকে কৃষি সহায়ক শিবির, ক্ষেত্রপ্রদর্শনী, মাটি পরীক্ষা, জল পরীক্ষা, কীটনাশক ব্যবহারের প্রশিক্ষণ এবং স্থানীয় ভাষায় সহজ পরামর্শপুস্তিকা প্রয়োজন। স্কুল-কলেজ, কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র ও পঞ্চায়েত স্তরেও সচেতনতা বাড়ানো যেতে পারে।

তৃতীয় সমস্যা বাজার। যতদিন কৃষক তাঁর ফসলের ন্যায্য দাম পাবেন না, ততদিন তিনি কম-ইনপুট, উচ্চ-মানের টেকসই কৃষির দিকে স্বাভাবিকভাবে এগোবেন না। বাজারে যদি কেবল চেহারায় সুন্দর, বড় এবং "দাগবিহীন" আলুরই চাহিদা থাকে, তাহলে কৃষকও রোগভীতির কারণে বেশি ওষুধ ব্যবহারের দিকে ঝুঁকবেন। তাই ভোক্তা-সচেতনতাও জরুরি—নিরাপদ খাদ্য, কম রাসায়নিক অবশেষ, স্থানীয় কৃষকের সুরক্ষা—এই ধারণাগুলিকে কৃষিনীতি ও খাদ্যসংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

চতুর্থ সমস্যা স্বাস্থ্যসুরক্ষা। যতদিন না গ্রামাঞ্চলে সুলভ সুরক্ষা সামগ্রী, ব্যবহৃত কীটনাশকের নিরাপদ সংরক্ষণ ও বর্জ্যব্যবস্থাপনা, এবং কৃষিশ্রমিকের নিয়মিত স্বাস্থ্যপরীক্ষা চালু হচ্ছে, ততদিন সমস্যাটি আংশিকই থেকে যাবে। কৃষকের স্বাস্থ্যকে কৃষি-উৎপাদনের বাহ্যিক বিষয় বলে ভাবলে চলবে না; সুস্থ কৃষকই টেকসই কৃষির ভিত্তি।

তবু ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ সমস্যাময় নয়। হুগলির আলুচাষিরা পরিশ্রমী, অভিযোজনক্ষম এবং অভিজ্ঞ। তাঁদের বাস্তব জ্ঞানের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পরামর্শ, জৈব বিকল্প, বাজারসংস্কার ও নীতিগত সমর্থন যুক্ত করা গেলে আলুচাষ একটি স্বাস্থ্যকর ও পরিবেশসম্মত পথে এগোতে পারে। রাসায়নিকের সম্পূর্ণ বর্জন হয়তো একদিনে সম্ভব নয়, কিন্তু নির্বিচার ব্যবহারের বদলে বিবেচনাশীল, পর্যায়ক্রমিক এবং সমন্বিত ব্যবস্থায় যাওয়া অবশ্যই সম্ভব।

উপসংহার: হুগলি জেলার আলুচাষ আমাদের সামনে এক জটিল কিন্তু অত্যন্ত শিক্ষণীয় বাস্তবতা তুলে ধরে। এই ফসল কৃষকের ঘরে নগদ আয় আনে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে, বাজারকে সচল রাখে এবং আঞ্চলিক অর্থনীতিতে প্রাণসঞ্চার করে। একই সঙ্গে এই ফসলকেন্দ্রিক কৃষি-ব্যবস্থা অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার, ঋণনির্ভরতা, বাজারে দামের অস্থিরতা, জল-মাটি দূষণ এবং কৃষক-স্বাস্থ্যের ঝুঁকিকে তীব্র করে তোলে। ফলে আলুচাষকে শুধু "বেশি ফলন" বা "বেশি লাভ"-এর সূত্রে বিচার করলে চলবে না।

এই প্রবন্ধের আলোচনায় স্পষ্ট যে সমস্যার মূল তিনটি স্তর—প্রযুক্তিগত, অর্থনৈতিক এবং নীতিগত। তথ্যের অভাব এবং রাসায়নিকের সহজলভ্যতা প্রযুক্তিগত স্তর তৈরি করে; ঋণ, কম দামে বিক্রি, মধ্যস্বত্বভোগীর দৌরাত্ম্য এবং সংরক্ষণ-সঙ্কট অর্থনৈতিক স্তর তৈরি করে; আর অপর্যাপ্ত কৃষি-সম্প্রসারণ, দুর্বল বাজারনিয়ন্ত্রণ ও অসম্পূর্ণ বীমা-সহায়তা নীতিগত স্তরকে স্পষ্ট করে। এই স্তর ভেঙে না দিলে আলুচাষে টেকসই পরিবর্তন আসবে না।

অতএব, ভবিষ্যতের পথ একটাই—কৃষককেন্দ্রিক, স্বাস্থ্যসচেতন, পরিবেশসম্মত এবং ন্যায্য বাজারভিত্তিক আলু- উৎপাদন নীতি। জৈব কৃষি, সমন্বিত রোগ-পোকা ব্যবস্থাপনা, ফসল পর্যায়ক্রম, সরাসরি বিপণন, সমবায়, প্রক্রিয়াজাত শিল্প, কৃষিঋণ ও বীমার বাস্তব কার্যকারিতা—এসবকে একত্রে গ্রহণ করলেই হুগলির আলুচাষ নতুন সম্ভাবনার দিকে এগোবে। কৃষির সাফল্য তখন শুধু উৎপাদনের পরিমাপে নয়, মানুষের সুস্থতা, মাটির প্রাণশক্তি এবং গ্রামীণ জীবনের মর্যাদায়ও পরিমাপ করা যাবে। এই বোধই টেকসই কৃষির আসল ভিত্তি।

তথ্যসূত্র:

১। সাউ, মৌ। Emerging Trends of Potato Cultivation in Hooghly District, West Bengal, India। পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, RKDF University, Ranchi, ২০২৩, পৃ. ১-৫, ১০৭-১১৪।

২। তদেব, পৃ. ৬-১৪।

৩। সাউ, মৌ এবং টপনো, শীতল। "Pesticides Use in Potato Cultivation: A Sample Survey Study from the Hooghly District, West Bengal, India," International Journal of Health Sciences। ৬(S2), ২০২২, পৃ. ৬৮-৭৫।

৪। সাউ, মৌ। Emerging Trends of Potato Cultivation in Hooghly District, West Bengal, India। পৃ. ১-৩।

৫। তদেব, পৃ. ৭৩-৮০, ১১৫-১১৮।

৬। সাউ, মৌ এবং টপনো শীতল। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮-৭২।

৭। তদেব, পৃ. ৭১-৭৩।

৮। তদেব, পৃ. ৭২-৭৪।

৯। তদেব, পৃ. ৭৩-৭৫।

১০। তদেব, পৃ. ৭৪।

১১। মৌ সাউ', Emerging Trends of Potato Cultivation in Hooghly District, West Bengal, India, পৃ. ১১৩-১১৪।

১২। তদেব, পৃ. ১১৪-১১৫।

১৩। সাউ, মৌ। Emerging Trends of Potato Cultivation in Hooghly District, West Bengal, India, পৃ. ১৩-১৪, ১০৪-১০৫।

১৪। তদেব, পৃ. ১১৪।

১৫। তদেব, পৃ. ১১৪-১১৫।

১৬। তদেব, পৃ. ১১৫।

১৭। চেত্রী, এম., বসু, এ., কনার, এ., এবং মণ্ডল, বি। "Effect of Organic Sources of Nutrients on Potato Production in West Bengal," Potato Journal, ৩২(১), ২০০৫, পৃ. ১৬৩-১৬৪।

১৮। মৌ সাউ', Emerging Trends of Potato Cultivation in Hooghly District, West Bengal, India, পৃ. ৭৭-৮০।

১৯। তদেব, পৃ. ১১৫-১১৬।

২০। তদেব, পৃ. ১১৭-১১৮।

২১। মৌ সাউ', Emerging Trends of Potato Cultivation in Hooghly District, West Bengal, India, পৃ. ৭৪-৭৫।

২২। তদেব, পৃ. ১১৮।

২৩। তদেব, পৃ. ১১৭।

সহায়ক গ্রন্থ:

- সাউ', মৌ। Emerging Trends of Potato Cultivation in Hooghly District, West Bengal, India। পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ। RKDF University, Ranchi, ২০২৩।
- সাউ', মৌ এবং শীতল টপনো। "Pesticides Use in Potato Cultivation: A Sample Survey Study from the Hooghly District, West Bengal, India।" International Journal of Health Sciences, ৬(S2), ২০২২, পৃ. ৬৮-৭৫।
- চেত্রী, এম., বসু, এ., কনার, এ., এবং মণ্ডল, বি। "Effect of Organic Sources of Nutrients on Potato Production in West Bengal।" Potato Journal, ৩২(১), ২০০৫, পৃ. ১৬৩-১৬৪।
- চৌধুরি, এইচ. সি। Potato in West Bengal। কলকাতা: Director of Agriculture, Government of West Bengal, ১৯৫৭।
- পাণ্ডে, এস. কে. এবং সরকার, ডি। "Potato in India: Emerging Trends and Challenges in the New Millennium।" Potato Journal, ৩২(৩-৪), ২০০৫, পৃ. ৯৩-১০৪।
- কুমার, এন., পাণ্ডে, এন., দহিয়া, পি., রানা, আর., এবং পণ্ডিত, এ। "Post Harvest Losses of Potato in West Bengal: An Economic Analysis।" Potato Journal, ৩১(৩-৪), ২০০৪, পৃ. ২১৩-২১৬।

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1873-1886
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.411

বাক্যার্থবোধের স্বরূপ: ন্যায় ও বৈশেষিক মতের একটি পর্যালোচনা

রাহুল মান্না, *গবেষক, দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 25.03.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In the Nyāya system of philosophy, four kinds of valid means of knowledge (pramāṇa) are accepted: perception (pratyakṣa), inference (anumāna), comparison (upamāna), and verbal testimony (śabda). In contrast, the Vaiśeṣika system recognizes only two pramāṇas, namely perception and inference. However, it is not tenable for the Veda-authoritative Vaiśeṣikas to deny the validity of śabda altogether. This raises an important question: do they accept the authority of the Veda while rejecting the validity of ordinary (laukika) verbal statements? Such a position is equally implausible, for without acknowledging the validity of ordinary linguistic communication, everyday practical life would become impossible. Therefore, the validity (prāmāṇya) of verbal cognition (śābdabodha) is implicitly accepted in both Nyāya and Vaiśeṣika systems. While the Naiyāyikas accord śabda the status of an independent pramāṇa, the Vaiśeṣikas do not grant it such autonomy. Instead, they attempt to subsume verbal cognition under inference. To establish this, Vaiśeṣika philosophers advance two types of inferential models: padapakṣaka (word-based) inference and padārthapakṣaka (meaning-based) inference, both aimed at explaining sentence-meaning comprehension. According to the Vaiśeṣika view, just as the hetu (middle term) in inference functions in a specific manner to produce knowledge of the sādhya (probandum), so too does the word function in generating the cognition of sentence meaning. To properly understand this standpoint, it is necessary first to examine these two forms of inference accepted by the Vaiśeṣikas and critically evaluate their adequacy. Subsequently, by analyzing the nature of verbal cognition as understood by the Naiyāyikas, it becomes evident that the process of sentence-meaning comprehension (śābdabodha) is distinct from inferential cognition. This demonstrates why śabda must be regarded as an independent pramāṇa. Furthermore, it establishes that the causal conditions (kāraṇa and karaṇa) underlying inference are fundamentally different from those that give rise to verbal cognition.

Keyword: pramāṇa, anumāna, śābdabodha, padapakṣaka inference, padārthapakṣaka inference.

ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায় ও বৈশেষিক সম্প্রদায় সমানতন্ত্ররূপে স্বীকৃত হলেও তাদের মধ্যে যে যে বিষয়ে মতপার্থক্য আছে তার মধ্যে প্রমাণের সংখ্যা অন্যতম। ন্যায় দর্শনে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং

শব্দ এই চার প্রকার প্রমাণ স্বীকার করা হয়েছে।[1] অপরপক্ষে, বৈশেষিক দর্শনে কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ ও অনুমান ভেদে দ্বিবিধ প্রমাণ স্বীকৃত হয়েছে।[2] কিন্তু শব্দকে প্রমাণরূপে অস্বীকার করা বেদ প্রামাণ্যবাদী বৈশেষিকের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রশ্ন থেকে যায়, তাহলে কি তাঁরা বেদ প্রামাণ্য স্বীকার করেন কিন্তু লৌকিক বাক্যের প্রামাণ্য অস্বীকার করেন? এই পক্ষও সম্ভব নয়। কারণ লৌকিক বাক্যকে প্রমাণরূপে স্বীকার না করলে দৈনন্দিন ব্যবহার অসম্ভব। সেই কারণে শাব্দবোধের প্রমাত্ব তথা প্রামাণ্য ন্যায় ও বৈশেষিক উভয় দর্শনেই স্বীকৃত। শব্দকে নৈয়ায়িক অতিরিক্ত প্রমাণরূপে স্বীকার করলেও বৈশেষিক শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণের মর্যাদা দেননি। শব্দ বা বাক্য শ্রবণ জন্য বাক্যার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং সেই জ্ঞান যে প্রমাও হতে পারে এই বিষয়ে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণের মধ্যে কোনও মতপার্থক্য নেই। কিন্তু ন্যায়মতে শাব্দ বুদ্ধি একটি স্বতন্ত্র প্রমা। অপরপক্ষে, বৈশেষিক মতে শাব্দ বুদ্ধি অনুমিতিরূপ প্রমার অন্তর্ভুক্ত, তদতিরিক্ত প্রমা নয়। ফলস্বরূপ শব্দকে তাঁরা অতিরিক্ত প্রমাণরূপে স্বীকার করেননি, তাকে অনুমানের অন্তর্গতরূপে স্বীকার করেছেন। এখানেই উভয় সম্প্রদায়ের মতভেদ।

আমারা জানি প্রমার করনকে প্রমাণ বলা হয়। প্রমাণ হতে গেলে তাকে প্রমার জনক হতে হয়। কিন্তু স্বতন্ত্র প্রমাণ হতে গেলে তাকে স্বতন্ত্র প্রমার জনক হতে হয়। শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণ রূপে গণ্য করা যায় যদি তা প্রত্যক্ষাদি ভিন্ন শাব্দবোধের জনক হয়। বৈশেষিক মতে শব্দ অনুমিতি অতিরিক্ত শাব্দবোধের জনক নয়। কারণ শব্দ যে প্রক্রিয়াতে বাক্যার্থবোধ উৎপন্ন করে তা অনুমান প্রক্রিয়ার থেকে অভিন্ন। অনুমান যে প্রক্রিয়াতে উৎপন্ন হয় শব্দও সেই প্রক্রিয়াতেই বাক্যার্থবোধ উৎপন্ন করায়, উৎপন্ন প্রমাটি অনুমিতি স্বরূপ।[3] অনুমিতি ন্যায় ও বৈশেষিক উভয় দর্শনে স্বীকৃত প্রমা। সেই কারণে শব্দ থেকে উৎপন্ন জ্ঞানকে অনুমিতি রূপে গণ্য করলে লাঘব পক্ষ অবলম্বিত হয়; তাকে অতিরিক্ত প্রমা রূপে স্বীকার করলে বরঞ্চ গৌরব হয়। কেবলমাত্র শব্দ হেতু উৎপন্ন হয় বলেই যদি তাকে অতিরিক্ত শাব্দবোধ বলে স্বীকার করতে হয় তবে জ্ঞানের অপরাপর অন্য প্রকারভেদও স্বীকার করতে হয়। যেমন আকার, ইঙ্গিত থেকেও তো জ্ঞান জন্মায়, তাদেরও কি আমরা স্বতন্ত্র বোধ বলে স্বীকার করি। অনুব্যবসা নামক মানস প্রত্যক্ষের দ্বারাই জ্ঞানের স্বরূপ জানার যায়। জ্ঞানোৎপত্তির অনন্তর যে অনুব্যবসায় উৎপন্ন হয় সেই অনুব্যবসায়ে জন্য জ্ঞানটির যে বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হয় সেই বৈশিষ্ট্যই তার অন্যান্য প্রকার জ্ঞান থেকে তার ভেদের সূচক। বৈশেষিক মতে শব্দ শ্রবণ হেতুক উৎপন্ন জ্ঞানের অনন্তর "অহং অনুমিনোমি" এই আকারের অনুব্যবসায়ই তার নির্ধারক। অপরপক্ষে, নৈয়ায়িক মতে বাক্যার্থবোধ যে অতিরিক্ত শাব্দবোধই এই বিষয়ে প্রমাণ উক্ত জ্ঞানের উৎপত্তির অনন্তর "অহং শাব্দয়ামি" এই আকারের অনুব্যবসায়। অনুব্যবসায়কে যদি জ্ঞান স্বরূপের নির্ধারক বলে স্বীকার করতে হয় তাহলে বাক্যার্থবোধকে বৈশেষিকমত অনুসরণপূর্বক অনুমিতি এবং নৈয়ায়িক মতানুসারে শাব্দবোধ বলে স্বীকার করতে হয়। কিন্ত একটি জ্ঞান একই সময়ে শাব্দ ও অনুমিতি উভয়ই হতে পারে না। কারণ শাব্দত্ব ও অনুমিতিত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ।

---

[১] "প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি।। ন্যায়সূত্র, ১/১/৩।।"

[২] বিভিন্ন বৈশেষিকসূত্রের মাধ্যমে এটি সূচিত হয়েছে, যেমন:-

"সংশয়নির্ণয়ান্তরাভাবচ্চ জ্ঞানান্তরত্বে হেতুঃ"।।১০/১/২।।

"তয়োর্নস্পত্তিঃ প্রত্যক্ষলৈঙ্গিকাভ্যাম্"।। ১০/১/৩।।

[৩] "শব্দোহনুমানমর্থস্যানুপলব্ধেরনুমেয়ত্বাৎ"।। ন্যায়সূত্র, ২/১/৪৯।।

বাক্যার্থবোধ অনুমান প্রক্রিয়াতেই উৎপন্ন হয় বা বাক্য শ্রবণ পূর্বক যে বাকর্থবোধ উৎপন্ন হয় তা অনুমিতাত্মক, এই বৈশেষিক মতের সম্যক উপলব্ধির জন্য বৈশেষিকসম্মত অনুমান প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। সেই কারণে বৈশেষিক স্বীকৃত অনুমানের স্বরূপ আলোচনা করা প্রয়োজন। আবার, নৈয়ায়িকগণ কেন বাক্যার্থবোধকে অতিরিক্ত শাব্দবোধরূপেই স্বীকার করেন তা বোঝার জন্য নৈয়ায়িক সম্মত শাব্দবোধের স্বরূপও আমাদের আলোচনা করতে হবে।তবেই উভয় সম্প্রদায় শাব্দবোধের উৎপত্তিতে বাক্যরূপ শব্দ কিরূপ ভূমিকা স্বীকার করেন তা বোঝা যাবে।

বৈশেষিকমতে অনুমিতির উৎপত্তিতে হেতুর যে ভূমিকা শাব্দবোধ বা, বাক্যার্থবোধ উৎপত্তিতে শব্দের ভূমিকাও অনুরূপ, আবার হেতু সাধ্যের মধ্যে যেমন ব্যক্তি সম্বন্ধ আছে ঠিক তেমনি শব্দ ও অর্থের মধ্যে বাচ্যবাচক ভাব সম্বন্ধ আছে।[4] বক্তব্য বিষয় হলো অনুমানের ক্ষেত্রে আমরা যেখান ধুম হেতুকে দেখি সেখানে আগুন সাধ্যের উপলব্ধি হয় না সেজন্য তাকে আমরা অনুমেয় মানছি। ঠিক সেরকম ঘট, পট ইত্যাদি শব্দ শুনে ঘট পদার্থের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ না হওয়ার সত্ত্বেও ঘট পদার্থের স্মরণ পূর্বক শাব্দবোধ হয়। যেমন অনুমানের ক্ষেত্রে আমরা হেতু দেখে সাধ্যের অনুমান করছি ঠিক তেমনি শব্দ শ্রবণ করে আমরা অর্থের স্মরণ করছি। তাই শাব্দবোধ অনুমান। বস্তুতঃ এই যুক্তির ভিত্তিতে বৈশেষিক দর্শনে বাক্যার্থবোধের অনুমিতিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। তাঁরা বাক্যার্থবোধকে অনুমিতিরূপে সিদ্ধ করতে পদপক্ষক ও পদার্থপক্ষক ভেদে দুই ধরণের অনুমান প্রদর্শন করেন। অনুমানস্থলে হেতুটি যে রূপে ও যে প্রক্রিয়ায়, সাধ্যের অনুমিতি উৎপত্তিতে সাহায্য করে শব্দও অনুরূপভাবে বাক্যার্থবোধউৎপত্তিতে সাহায্য করে বৈশেষিকগণের এই অভিমত উপলব্ধি করতে হলে বৈশেষিকগণ সম্মত পদপক্ষক অনুমান ও পদার্থপক্ষক অনুমানের আলোচনা পূর্বক উভয়ের গ্রহণযোগ্যতাও বিচার করা প্রয়োজন। তারপর নৈয়ায়িকসম্মত শাব্দবোধের স্বরূপ আলোচনা দ্বারা নৈয়ায়িক বাক্যার্থবোধের উৎপত্তিতে শব্দের শাব্দবোধের উৎপত্তি প্রক্রিয়া যে অনুমান উৎপত্তির থেকে স্বতন্ত্র এবং শব্দ কেন পৃথক প্রমাণ তা স্পষ্ট হবে। অনুমিতির কারণ, করণ যে শাব্দবোধের কারণ ও করণ থেকে ভিন্ন তাও প্রতিপন্ন হবে।

পদপক্ষক অনুমান স্বরূপ: যে অনুমানের সাহায্যে বৈশেষিকগণ বাক্যার্থবোধকে অনুমিতিরূপে সিদ্ধ করেন সেই অনুমানের সম্পূর্ণ আকারটি কীরূপ? বৈশেষিক আচার্যগণ তাঁদের সিদ্ধান্তস্থাপনের জন্য উক্ত অনুমান প্রদর্শন করেছেন। এমনকি নৈয়ায়িকগণও পূর্বপক্ষের অভিমত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বৈশেষিক সম্মত উক্ত অনুমান উপস্থাপন পূর্বক খণ্ডন করেছেন।' বৈশেষিকগণের আলোচনা থেকে বোঝা যায় তাঁরা বাক্যার্থবোধকে অনুমিতিরূপে সিদ্ধ করতে পদপক্ষক ও পদার্থপক্ষক ভেদে দুই ধরণের অনুমান প্রদর্শন করেন। উক্ত অনুমানগুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা বৈশেষিকগণের অভিমত অনুধাবন করতে পারি। প্রথমে আমারা বৈশেষিক সম্মত পদপক্ষক অনুমানের স্বরূপ বিশ্লেষণের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করা হবে উক্ত অনুমানের দ্বারা বৈশেষিক প্রদত্ত বাক্যার্থের অনুমিতির স্বরূপ কি প্রকার এবং এই অনুমানের মাধ্যমে বৈশেষিকের কোন্ অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। পদপক্ষক অনুমানের পর আমারা পদার্থপক্ষক অনুমানের পর্যালোচনা করবো। অতঃপর তার গ্রহণযোগ্যতা কতোখানি তা আলোচনা করে দেখতে হবে।

পদপক্ষক অনুমান নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই আমরা যে অনুমানটির উল্লেখ করবো সেটি হল "এতানি পদানি স্মারিতার্থসংসর্গজ্ঞানপূর্বকাণি আকাঙ্ক্ষাদিমত্ত্বে সতি তৎস্মারকত্বাৎ গামভ্যাজেতি

[8] "সম্বন্ধাচ্চ"।। ন্যায়সূত্র, ২/১/৫১।।

পদকদম্ববদিতি"।[5] অর্থাৎ, এই পদগুলি স্মারিত অর্থের সংসর্গজ্ঞানপূর্বক প্রযুক্ত, যেহেতু এই পদগুলি আকাঙ্ক্ষাদি বিশিষ্ট হয়ে ঐসকল অর্থের স্মারক। যেমন, গামভ্যাজ এই পদসমূহ। এই অনুমানে প্রযুক্ত (সামান্য) ব্যাপ্তির আকারটি হল "যত্র যত্র আকাঙ্ক্ষাদিমত্ত্বে সতি তৎস্মারকত্ব তত্র তত্র স্মারিতার্থসংসর্গজ্ঞানপূর্বকত্ব"। এই অনুমানটি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, এই অনুমানে পক্ষ হল এই পদসমূহ, সাধ্য হল স্মারিত অর্থের সংসর্গজ্ঞানপূর্বকত্ব, হেতু হল আকাঙ্ক্ষাদিমত্ত্বে সতি তৎস্মারকত্ব। এক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হলো গামভ্যাজ এই পদসমূহ।উক্ত অনুমানের সাধ্য হল স্মারিতার্থ সংসর্গ জ্ঞান পূর্বকত্ব। এই জ্ঞান বক্তারই; যিনি এই জ্ঞানের উপস্থাপনার্থে আলোচ্য বাক্যের উপস্থাপনা করেছেন। কিন্তু বৈশেষিকের অভিপ্রায় তো হচ্ছে বাক্যার্থের অনুমিতিত্ব স্থাপন করা। এখন উক্ত পদপক্ষক অনুমানে হেতুর দ্বারা বক্তারস্মারিতার্থসংসর্গজ্ঞানপূর্বকত্ব সিদ্ধ হলেও বাক্যার্থের বোধ অর্থাৎ পদার্থ সমূহের মধ্যে সংসর্গের সিদ্ধি হয় কীরূপে? এই অনুমানের দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে, বক্তা যে বাক্য প্রয়োগ করেছেন সেই বাক্যের অন্তর্গত পদসমূহ শ্রবণ করলে যে অর্থের স্মরণ হয় সেই অর্থসমূহের সংসর্গের জ্ঞানপূর্বক বক্তা উক্ত পদসমূহ প্রয়োগ করেছেন। উক্ত অনুমান স্থলে সরাসরি বক্তার পদার্থ সংসর্গ জ্ঞানের অনুমান হয় শ্রোতার। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় উক্ত অনুমানে পদার্থ সমূহের সংসর্গ অনুমিত হচ্ছে কিভাবে? উক্ত অনুমানের সাধ্যরূপে 'স্মারিতার্থসংসর্গজ্ঞানপূর্বকত্ব' সিদ্ধ হলেও পদার্থ সমূহের সংসর্গবোধরূপ বাক্যার্থের বোধ সিদ্ধ হয় না। অর্থাৎ, উক্ত অনুমানের দ্বারা পদার্থসমূহের সংসর্গের জ্ঞান হয় না বরং, পদার্থসমূহের সংসর্গজ্ঞানের জ্ঞান হয়। সুতরাং উক্ত অনুমানের দ্বারা বাক্যার্থবোধে অনুমিতিত্ব স্থাপন সম্ভব নয়।

বৈশেষিক পক্ষ থেকে এই প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর কি হতে পারে তা আমরা একটি উদাহরণের সাহায্যে উল্লেখ করতে পারি। যেমন, ঘটজ্ঞানের জ্ঞান (অনুব্যবসায়) কালে উক্ত অনুব্যবসায়ের বিষয়রূপে ঘটজ্ঞান এবং ঘটজ্ঞানের আশ্রয় আত্মার যেমন বোধ হয়তেমনি ঘটজ্ঞানের বিষয় যে ঘট সেটিও বিষয় হয়ে থাকে। তেমনি 'গামানয়' এই বাক্য শ্রবণ করে শ্রোতা যদি এইরূপ অনুমান করেন যে, এই পদসমূহ স্মারিত অর্থের সংসর্গজ্ঞানপূর্বক, যেহেতু এই পদগুলি আকাঙ্ক্ষাদিযুক্ত এবং ঐ ঐ অর্থের স্মারক, যেমন 'গামভ্যাজ' এই বাক্যের অন্তর্গত পদ সমূহ; তা হলে উক্ত অনুমানের যেটি সাধ্য তথা অনুমেয়, সেই অনুমিতির বিষয়রূপে উক্ত ‘পদার্থসমূহের সংসর্গের জ্ঞান’ যেমন বিষয় হবে তেমনি সেই জ্ঞানের বিষয়রূপে ‘পদার্থসমূহের সংসর্গ’ও বিষয় হবে। অর্থাৎ, জ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান স্ববিষয়ীভূত জ্ঞানের বিষয়কেও বিষয় করে। বিষয়টিকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করতে গিয়ে বলা যায়, বস্তুতঃপক্ষে উক্ত অনুমানে বক্তা কর্তৃক উচ্চারিত পদ সমূহ পক্ষরূপে ব্যবহৃত হয়। সাধ্য হলো সংসর্গজ্ঞানপূর্বকত্ব এবং এক্ষেত্রে আকাঙ্ক্ষাদিমৎপদস্মারিতত্ব হেতুরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। বস্তুতঃ পদার্থসংসর্গ জ্ঞান বক্তার পদার্থসংসর্গ জ্ঞানপূর্বকত্বের অংশবিশেষ। বৈশেষিক মতে শ্রোতার সেই বিষয়ে সরাসরি জ্ঞান জন্মাতেই পারে না কেবলমাত্র বক্তার পদার্থসংসর্গ জ্ঞানের জ্ঞানের মাধ্যমে ছাড়া। নৈয়ায়িক কিন্তু এই বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন পদার্থসংসর্গের জ্ঞান স্বতন্ত্র উপায়ে লাভ করা সম্ভব। মূলতঃ এই বিষয়েই বৈশেষিকের সঙ্গে ন্যায়মতের পার্থক্য। পদার্থসংসর্গ অনুমিত হলে যে উদ্দেশ্য সাধন করে বক্তার পদার্থসংসর্গের অনুমিতির অংশ হিসাবেও তা একই উদ্দেশ্য সাধন করে। তাই, বাক্যার্থের জ্ঞান অর্থাৎ সংসর্গেরজ্ঞান উক্ত পদপক্ষক অনুমানের দ্বারা হয় না এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নয়।[6]

---

[৫] উদয়নাচার্য, ২০০২, *কিরণাবলী*, নরেন্দ্র চন্দ্র বেদান্ততীর্থ (সম্পাদিত), কলকাতা: এশিয়াটিক সোসাইটি, পৃষ্ঠা: ৫৭৩।

[৬] "তস্য চ সংসৃজ্যমানোপহিতস্যৈবাবচ্ছেদকত্বান্ন বিশেষাপ্রতিলম্ব ইতি।"- উদয়নাচার্য, ১৯৯৫, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলী*, শ্রী শ্রীমোহন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃষ্ঠা: ২৭৭।

উপস্কারকার শঙ্করমিশ্রও অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। তাঁর মতে পদপক্ষক অনুমানের সাধ্যরূপে যা স্বীকার করা হয়েছে সেই সাধ্যের বিষয়রূপেই পদার্থসমূহের মধ্যে সংসর্গের জ্ঞান হয়ে যায়।[7]

বৈশেষিকগণের উক্ত সিদ্ধান্তের প্রতি পূর্বস্বীকৃতি হল- জ্ঞানের জ্ঞান পূর্ব জ্ঞানের বিষয়কেও বিষয় করে। অর্থাৎ, জ্ঞানের জ্ঞান হওয়ার অর্থ পূর্ববর্তী জ্ঞানের বিষয়েরও জ্ঞান হওয়া। অর্থাৎ ঘটজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞানে ঘটজ্ঞান বিষয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটজ্ঞানের বিষয় ঘটও বিষয় হয়। ফলে ঘটজ্ঞানের জ্ঞান হলে ঘটেরও জ্ঞান হয়ে যায়। বৈশেষিকগণ বলেন বক্তার বাক্যার্থ বিষয়ক জ্ঞান অনুমিত হলেই বাক্যার্থেরও অনুমিতি হয়ে যায়। বাক্যার্থ উভয় জ্ঞানেই বিষয় হয়েছে। সেই কারণে বাক্যার্থ জ্ঞানের জ্ঞান বাক্যার্থ জ্ঞানও বটে। কিন্তু নৈয়ায়িক পক্ষ আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে যে, ঘট বিষয়ক জ্ঞানের জ্ঞান এবং ঘট বিষয়ক জ্ঞান এই দুটি জ্ঞান অভিন্ন কীভাবে হবে? যেমন ঘটজ্ঞান ও ঘটজ্ঞানের জ্ঞান কখনোই এক হতে পারে না তেমনই বাক্যার্থজ্ঞান ও বাক্যার্থজ্ঞানের জ্ঞান এই দুটিও এক হতে পারে না। এক্ষেত্রে প্রথম জ্ঞানের বিষয় হলো বাক্যার্থ, আর দ্বিতীয় জ্ঞানটি হলো বাক্যার্থ জ্ঞানের জ্ঞান। বিষয়ের জ্ঞান সেই জ্ঞানের জ্ঞান কখনোই এক হতে পারে না কারণ, প্রথম জ্ঞানটি দ্বিতীয় জ্ঞানের এক অর্থে প্রকার হয়েছে। কেউ ঘটকে জানলো। অতঃপর তার 'আমি ঘটকে জানি' এই আকারের ঘটজ্ঞানের জ্ঞান হল। 'ঘট' এই আকারের জ্ঞানের প্রকার অংশে ভাসমান হল ঘটত্ব। কিন্তু ঘট জ্ঞানের জ্ঞান অংশে ঘটত্ব প্রকার হয়নি। বরঞ্চ ঘটত্ব প্রকারতাবচ্ছেদক অংশে ভাসমান। সুতরাং দুটি জ্ঞান অভিন্ন হওয়ার অবকাশ কোথায়? পরিষ্কার করে বলতে গেলে আলোচ্য স্থলে বস্তুতঃপক্ষে এই জ্ঞানদুটিকে এক বলা সম্ভব নয়। পদার্থসংসর্গের জ্ঞানের জ্ঞান এবং পদার্থ সংসর্গের জ্ঞান কখনও এক হতে পারে না। কিন্তু একথা খুবই সত্য যে, বক্তার পদার্থ সংসর্গের জ্ঞানের জ্ঞান পদার্থ সংসর্গের জ্ঞান ছাড়া অনুমিত হতে পারে না। কিন্তু পদার্থসংসর্গের জ্ঞান পদার্থসংসর্গ জ্ঞানের জ্ঞানের অবচ্ছেদকরূপে থাকায় তা পদার্থসংসর্গ জ্ঞানের সঙ্গে অভিন্ন হতে পারে না। অথবা ভিন্ন ভাষায় সেই জ্ঞানকে পদার্থসংসর্গের জ্ঞান বলা যায় না। পদার্থসংসর্গ জ্ঞানের প্রকারাংশে যা ভাসমান পদার্থসংসর্গের জ্ঞানের জ্ঞানে তাই প্রকাররূপে ভাসমান না হওয়ায় জ্ঞানদ্বয়কে ভিন্ন বলেই মানতে হবে।[8]

যদি বলা হয় বাক্যার্থটি অনুমিতই হবে, কারন বাক্য শ্রবণজন্য সরাসরি বক্তার বাক্যার্থবোধের অনুমান করা হচ্ছে এবং তার মাধ্যমে বাক্যার্থটিও অনুমিত হচ্ছে তাও সম্ভব নয়। আমরা ব্যাপকের অনুমান করি যার সঙ্গে ব্যাপকের ব্যাপ্তি সম্বন্ধ আছে সেই ব্যাপ্যের জ্ঞানের ভিত্তিতে। এখন ব্যাপক যে তাতে ব্যাপকতা ধর্ম আছে। ব্যাপকতা আবার নির্দিষ্ট ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন, যাকে বলে ব্যাপকতাবচ্ছেদক ধর্ম। তাহলে ব্যাপকতাবচ্ছেদক ধর্ম বিশিষ্ট ব্যাপক হলো অনুমিতির বিধেয় বা, সাধ্য। আমাদের আলোচ্য এই অনুমানস্থলে অনুমেয় হলো বক্তার বাক্যার্থসংসর্গজ্ঞানপূর্বকত্ব। বাক্যার্থসংসর্গ হচ্ছে সেই বক্তার জ্ঞানের বিষয়। বক্তার যে জ্ঞানের অনুমান করা হচ্ছে তার নিরূপক বা অবচ্ছেদক হলো পদার্থসংসর্গ। কিন্তু প্রশ্ন হলো ব্যাপক অনুমেয় হলেও তন্নিষ্ঠ যে ব্যাপকতাবচ্ছেদক তা কি অনুমেয় হয়? ব্যাপকতাধর্মাবচ্ছিন্ন ব্যাপকের অনুমান হয় একথা ঠিক, কিন্তু যদি বলা হয়, বক্তার বাক্যার্থবিষয়ক জ্ঞানের জ্ঞানের ভিত্তিতে বাক্যার্থের অনুমান হয় তাহলে বলতে হবে, বাক্যার্থরূপ যে ব্যাপকতাবচ্ছেদক ধর্ম তারও অনুমান হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষেব্যাপকতাবচ্ছেদক

---

[৭] "...জ্ঞানবচ্ছেদকতয়াহভিমতবিশেষসিদ্ধিঃ।"- শঙ্করমিশ্র, ১৯৬৯, *বৈশেষিকসূত্রোপস্কার*, নারায়ণ মিশ্র (সম্পাদিত), বারানসী: চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, পৃষ্ঠা: ৫০১।

[৮] "ন চৈবমর্থাসিদ্ধিঃ, জ্ঞানবচ্ছেদকতয়ৈব তৎসিদ্ধিঃ।"- উদয়নাচার্য, ১৯৯৫, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলী*, শ্রী শ্রীমোহন ভট্টাচার্য,কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃষ্ঠা: ২৭৭।

ধর্মের অনুমান হয় না, ব্যাপকের অনুমান হয়ে থাকে। বৈশেষিকমত অনুসরণ করলে বলতে হয়, জ্ঞানের জ্ঞান ও জ্ঞানের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। কিন্তু আমরা দেখি যে, বস্তুতঃ পার্থক্য আছে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে জ্ঞানদুটির প্রকার ভিন্ন। উপরন্তু জ্ঞানটি না থাকলে জ্ঞানের জ্ঞান হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। কারণ 'ঘট' এই আকারের জ্ঞানটি থাকলে তবেই ঘটজ্ঞানের জ্ঞানের অবকাশ আছে। জ্ঞানের জ্ঞানের প্রতি পূর্ববর্তী জ্ঞানটি এক অর্থে কারণ। কারণ না থাকলে কার্য উৎপত্তির প্রসঙ্গ নেই।

সাধারণতঃ দার্শনিকগণ মনে করে থাকেন জ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যবহারের প্রসঙ্গ আবশ্যিকভাবেই আসবে। বস্তুতঃ বাক্যশ্রবণ করে অর্থবোধ হয় ও তজ্জন্য প্রবৃত্তিও হয়। বৈশেষিক মত স্বীকার করলে শ্রোতার বক্তার বাক্যার্থ জ্ঞানের অনুমিতি থেকে প্রবৃত্তি হয় তা বলতে হবে। কিন্তু বস্তুতঃ এই পক্ষে একইসাথে গৌরব দোষ ও ব্যভিচার দোষ হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে কার্যকারণের সামানাধিকরণ্যও ব্যাহত হয়। যাঁর বস্তুর জ্ঞান আছে তাঁরই সেই জ্ঞান জন্য উক্ত বস্তু বিষয়ে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় স্বীকার করলে জ্ঞান ও প্রবৃত্তির আশ্রয়কে অভিন্ন বলতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে বক্তার বস্তু বিষয়ক যে জ্ঞান হয়ে থাকে তার জন্য শ্রোতার প্রবৃত্তি কীরূপে স্বীকার করা যাবে? বস্তুতঃ বক্তার কোনও বিষয়ের জ্ঞানের জ্ঞান শ্রোতার থাকলেও সেই বিষয়ে শ্রোতার প্রবৃত্তি হয়নি এই রকম হতেই পারে। অর্থাৎ শ্রোতার, বক্তার বাক্যার্থ জ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান থাকলেও সেই বিষয়ক প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়নি এমন সম্ভাবনা বর্তমান।

'ক' বিষয়ক জ্ঞান, 'ক' বিষয়ক প্রবৃত্তির হেতু হলে 'ক' বিষয়ক জ্ঞানের জ্ঞান থেকে 'ক' বিষয়ক প্রবৃত্তি হয় স্বীকার করলে তা গৌরব দোষে দুষ্ট হবে। কোনো বিষয়ক জ্ঞানকে যদি আমি উক্ত বিষয়ে প্রবৃত্তির হেতুরূপে পেয়েই যাই তাহলে অনর্থক তার জ্ঞানের জ্ঞানকে উক্ত বিষয়ের প্রবৃত্তির হেতুরূপে কল্পনা করতে যাবো কেন? সেক্ষেত্রে লাঘব নীতি লঙ্ঘিত হবে এবং উক্ত মতটি গৌরব দোষে দুষ্ট হবে, যা কখনোই নৈয়ায়িকগণের অভিপ্রেত হতে পারে না। বস্তুতঃ বাক্যের বক্তার 'ক' বিষয়ক জ্ঞান আছে তা জানলেও শ্রোতার 'ক' বিষয়ক প্রবৃত্তি নাও হতে পারে। যাঁর "ইদং রজতম্" এইরূপ জ্ঞান আছে তাঁরই রজত আহরণে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হতে দেখা যায়। বক্তার রজত বিষয়ক জ্ঞান আছে এটি জানা সত্ত্বেও রজত আহরণে কারও প্রবৃত্তি নাই হতে পারে। সুতরাং এক্ষেত্রে ব্যভিচারের সম্ভাবনা বর্তমান এবং ব্যভিচারের সম্ভাবনা কার্য-কারণ সম্বন্ধ স্বীকারের প্রতিবন্ধকরূপে কাজ করে।

পদপক্ষক অনুমানের বিরুদ্ধে অন্য আপত্তির উত্থাপনও সম্ভব। বৈশেষিকগণ কর্তৃক প্রদত্ত অনুমানের পদার্থসমূহেরসংসর্গরূপ সাধ্য সিদ্ধি করতে হলে উক্ত অনুমানের হেতুর বিষয়ীভূত আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ নির্ণয় করা আবশ্যক। কারণ, আকাঙ্ক্ষার জ্ঞান ব্যতীত হেতুর জ্ঞান সম্ভব নয়। আর হেতুর জ্ঞান না হলে উক্ত হেতুর দ্বারা সাধ্য সিদ্ধি সম্ভব হবে না। এখন দেখা যাক হেতুর বিষয়ীভূত আকাঙ্ক্ষা শব্দের দ্বারা 'বিশেষণ-বিশেষ্যভাব' বা 'বিশেষণ - বিশেষ্যভাবযোগ্যতা' কোনটিকেই গ্রহণ করা যায় কিনা।কারণ, বিশেষণবিশেষ্যভাব বলতে বিশেষণ ও বিশেষ্যের সংসর্গকেই বোঝায় যেটি উক্ত অনুমানের সাধ্যরূপে গৃহীত হয়েছে। সুতরাং, বিশেষণবিশেষ্যভাবরূপ আকাঙ্ক্ষাকে হেতুর অংশরূপে গ্রহণ করে পূর্বোক্ত প্রকার পদপক্ষক অনুমান প্রয়োগ করলে হেতুর জ্ঞানের দ্বারাই সাধ্যের জ্ঞান হয়ে যাওয়ায় সিদ্ধসাধন দোষ দেখা দেবে। অপরদিকে, বিশেষণবিশেষ্যভাবযোগ্যতাকেও আকাঙ্ক্ষা বলা যায় না। কারণ, হেত্বংশে নিবিষ্ট 'আকাঙ্ক্ষাদি' অংশের দ্বারা যোগ্যতাকেও বোঝানো হয়ে থাকে। উদয়নাচার্যের মতে হেতুর বিষয়ীভূত যোগ্যতার দ্বারাই বিশেষণবিশেষ্যভাবযোগ্যতার বোধ হয়ে যাওয়ায় হেত্বংশে পৃথকরূপে 'আকাঙ্ক্ষা' শব্দের প্রয়োগ ব্যর্থ হয়। সুতরাং, আকাঙ্ক্ষার অর্থরূপে বিশেষণবিশেষ্যভাব বা বিশেষণবিশেষ্যভাবযোগ্যতা কোনোটিকেই গ্রহণ করা

যায় না। আবার, পদজন্য উপস্থিত পদার্থসমূহের পরস্পর অবিনাভাবকেও আকাঙ্ক্ষা বলা যায় না। কারণ, অবিনাভাবের অভাবেও বাক্যার্থবোধ হয়ে থাকে। যেমন, 'নীলং সরোজম্' এই বাক্যস্থলে নীল ও সরোজের মধ্যে অবিনাভাব নেই। নীল ও সরোজ পরস্পর পরস্পরের সম্বন্ধরহিত হয়েও থাকতে পারে। অর্থাৎ, নীল ও সরোজের মধ্যে অবিনাভাব না থাকলেও 'নীলং সরোজম' এই বাক্য থেকে বাক্যার্থবোধ হয়ে থাকে। সুতরাং, অবিনাভাবকে আকাঙ্ক্ষা বলা যায় না।[৯] আকাঙ্ক্ষা বলতে প্রকৃতপক্ষে কি বুঝতে হবে? জিজ্ঞাসার যোগ্যতাকেই কি আকাঙ্ক্ষা বলা যাবে? কিন্তু প্রশ্ন হল 'জিজ্ঞাসার যোগ্যতা' বলতে কি বুঝতে হবে? এর উত্তরে বলা যায়, পদস্মারিত পদার্থদ্বয়ের অবিনাভাব এবং শ্রোতার সেই বাক্যজন্য সংসর্গাবগতির প্রাগভাবই জিজ্ঞাসার যোগ্যতারূপে বিবেচিত। আরজিজ্ঞাসার এইরূপ যোগ্যতাই আআকাঙ্ক্ষা।[10] যেমন, 'ওদনং পচতি' এই বাক্য স্থলে বাক্যান্তর্গত পদস্মারিত কারক ও ক্রিয়া এই পদার্থদ্বয়ের মধ্যে অবিনাভাব রয়েছে। কারণ, ক্রিয়া না থাকলে কারক হয় না, আবার কারক না থাকলে ক্রিয়াও হয় না। আবার 'ওদনং পচতি' এই বাক্যজন্য যে সংসর্গের বোধ সেই সংসর্গবোধের প্রাগভাবও শ্রোতার রয়েছে। অপরদিকে 'নীলম্ উৎপলম্' এই বাক্যস্থলে নীল পদের দ্বারা স্মারিত নীলের দ্বারা আক্ষিপ্ত যে গুণসামান্য এবং উৎপল পদের দ্বারা স্মারিত উৎপলের দ্বারা আক্ষিপ্ত দ্রব্যসামান্যের মধ্যে অবিনাভাব আছে, এবং 'নীলম্ উৎপলম' এই বাক্যজন্য যে সংসর্গবোধ তার প্রাগভাবও শ্রোতার আছে। এইরূপ প্রাগভাবই হল আকাঙ্ক্ষা। আরও প্রশ্ন হতে পারে, এইরূপ আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাতসৎরূপে অন্বয়বোধের কারণ না স্বরূপসৎরূপে অন্বয়বোধের কারণ? বস্তুতঃ এইরূপ আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাতসৎ নয়, স্বরূপসৎরূপেই অন্বয়বোধের কারণ হয়ে থাকে। কারণ, আমরা জানি অভাবের জ্ঞান প্রতিযোগির জ্ঞানাধীন তাই ঐরূপ প্রাগভাবের জ্ঞান তার প্রতিযোগী যে সংসর্গবোধ তার জ্ঞানকে অপেক্ষা করে আর সংসর্গবোধের জ্ঞান সংসর্গবোধকে অপেক্ষা করে। সুতরাং, আকাঙ্ক্ষাকে জ্ঞাতসৎরূপে অন্বয়বোধের কারণরূপে স্বীকার করলে বাক্যার্থবোধের পূর্বেই সংসর্গবোধরূপ বাক্যার্থবোধ স্বীকার করতে হবে। ফলে বাক্যকে অভিনব অর্থেরজ্ঞাপকরূপে স্বীকার করা যাবে না, সেটিকে অনুবাদকরূপে স্বীকার করতে হবে। সুতরাং আকাঙ্ক্ষা স্বরূপসৎরূপে অন্বয়বোধের কারণ হওয়ায়, অর্থাৎ জ্ঞাতসৎরূপে অন্বয়বোধের কারণ না হওয়ায় আকাঙ্ক্ষাকে হেতুর বিশেষণরূপে গ্রহণ করে পদপক্ষক অনুমানের দ্বারা অন্বয়বোধরূপ সাধ্য সিদ্ধি সম্ভব নয়। কারণ, আকাঙ্ক্ষাকে হেতুর বিশেষণরূপে গ্রহণ করলে তাকে জ্ঞাতসৎরূপেই গ্রহণ করতে হবে, স্বরূপসৎরূপে নয়। অতএব বৈশেষিক বাক্যার্থবোধকে অনুমিতিরূপে প্রতিষ্ঠার জন্য যে পদপক্ষক অনুমান প্রদান করেছেন তার দ্বারা বাক্যার্থবোধের অনুমিতিত্ব স্থাপন সম্ভব নয়। তাই বাক্যার্থবোধকে পৃথক প্রমিতিরূপে অবশ্যই স্বীকার কারতে হবে। আর বাক্যার্থবোধ পৃথক্ প্রমিতিরূপে স্বীকৃত হলে তার করণকে অবশ্যই স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে গণ্য করতে হবে।

বৈশেষিক সম্মত পদপক্ষক অনুমানের আরেকটি আকার হতে পারে "গৌঃ পদমস্তিত্ববদ্গোগোচরজ্ঞানপূর্বকম্ অস্তিপদসাকাঙ্ক্ষগৌঃ পদত্বাৎ, যগ্নৈবম্ তগ্নৈবম্ যথাহহকাশম...।"[11] বিশিষ্ট নব্য নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার তাঁর শব্দশক্তিপ্রকাশিকা নামক গ্রন্থে এইভাবে পদপক্ষক অনুমানের উপস্থাপনা করেছেন, যেখানে বিশেষ ব্যাপ্তি প্রদর্শন করা হয়েছে। পদপক্ষক অনুমান সংক্রান্ত আলোচনার

---

[৯] "ন তাবদ বিশেষণবিশেষ্যভাবঃ, তস্য সংসর্গস্বভাবতয়া সাধ্যত্বাৎ। নাপি তদ্যোগ্যতা, যোগ্যতয়ৈব গতার্থত্বাৎ। নাপ্যবিনাভাবঃ, নীলং সরোজমিত্যাদৌ তদভাবেহপি বাক্যার্থপ্রত্যয়াৎ।"- তদেব, পৃষ্ঠা: ২৭৯।

[১০] "সা চ পদস্মারিত তদাক্ষিপ্তয়োরবিনাভাবে সতি শ্রোতরি তদুৎপাদ্যসংসর্গাবগম প্রাগভাবঃ।"- তদেব, পৃষ্ঠা: ২৮৫-২৮৬।

[১১] জগদীশ তর্কালঙ্কার, ২০১৪, *শব্দশক্তিপ্রকাশিকা*, শ্রী গঙ্গাধর কর (অনুঃ), কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, পৃষ্ঠা: ৫৩।

ক্ষেত্রে এই আকারটি অভিনবত্বের দাবী রাখে, তাই এখানে জগদীশ প্রদত্ত আকারটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হলো। এই অনুমানে বৈশেষিকগণ "গো" পদটিকে পক্ষরূপে গ্রহণ করে অস্তি পদ সাকাঙ্ক্ষ গো পদত্বরূপ হেতুর দ্বারা অস্তিত্ববিশিষ্ট গোবিষয়ক জ্ঞানপূর্বকত্বরূপ সাধ্য প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এক্ষেত্রে ব্যতিরেক দৃষ্টান্তমূলে গৃহীত ব্যাপ্তির আকারটি হলো:- "যত্র যত্র অস্তিত্ববদ্গোগোচরজ্ঞানপূর্বকত্বাভাব তত্র তত্র অস্তিপদসাকাঙ্ক্ষ গৌঃপদত্বাভাব", যেমন- আকাশ। অর্থাৎ বৈশেষিকগণের অভিপ্রায় হল, "গৌরস্তি" -এইরূপ বাক্য প্রয়োগ হলে শ্রোতা উক্ত বাক্য শ্রবণ করে অনুমান করতে সক্ষম হবেন যে বক্তা "গো" পদটি অস্তিত্ববিশষ্ট গোবিষয়ক জ্ঞানপূর্বক প্রয়োগ করেছেন কারণ, "গো" পদটি অস্তি পদের সঙ্গে আকাঙ্ক্ষাদি বিশিষ্ট। অতএব, বৈশেষিক মতে "গৌরস্তি" এই বাক্য শ্রবণজন্য শ্রোতার যে বাক্যার্থের বোধ হয় সেটি হলো অনুমিতি এবং বাক্যরূপ শব্দ হলো উক্ত অনুমিতির সাধক হেতু। এই অনুমানের খন্ডনও সেখানে করা হয়েছে।

পদার্থপক্ষক অনুমানের স্বরূপ: পদার্থপক্ষক অনুমানের আকারটি প্রদর্শন করতে গিয়ে বৈশেষিক বলেন "এতে পদার্থাঃ মিথঃ সংসর্গবন্তঃ আকাঙ্ক্ষাদিমদ্ভি পদৈঃ স্মারিতত্বাৎ, গামভ্যাজ ইতি পদার্থবৎ"।[12] অর্থাৎ, এই পদার্থগুলি পরস্পর সংসর্গ বিশিষ্ট যেহেতু এগুলি আকাঙ্ক্ষাদি বিশিষ্ট পদের দ্বারা স্মারিত। এখানে প্রযুক্ত (সামান্য) ব্যাপ্তির আকারটি হল "যত্র যত্র আকাঙ্ক্ষাদিমডি পদৈঃ স্মারিতত্ব তত্র তত্র মিথঃ সংসর্গবস্তত্ব"। এই অনুমানের পক্ষ হল এই পদার্থগুলি, সাধ্য হল পদার্থ সমূহের পরস্পর সংসর্গ বিশিষ্টত্ব, এবং হেতু হলআকাঙ্ক্ষাদি বিশিষ্ট পদের দ্বারা স্মারিতত্ব। দৃষ্টান্ত হল গামভ্যাজ ইত্যাদি পদার্থসমূহ। বৈশেষিক প্রদত্ত পদার্থপক্ষক অনুমানটি বিশ্লেষণ করলে আমরা বুঝতে পারি যে, পদার্থপক্ষক অনুমানের হেতু হল আকাঙ্ক্ষাদি বিশিষ্ট পদের দ্বারা স্মারিতত্ব। অর্থাৎ, আকাঙ্ক্ষাদি বিশিষ্ট পদ উক্ত অনুমানের হেতু হয়নি, আকাঙ্ক্ষাদি বিশিষ্ট পদের দ্বারা স্মারিতত্ব হেতু হয়েছে। উদয়নাচার্য তাঁর 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলী' শীর্ষক গ্রন্থে বৈশেষিকাচার্যগণ কর্তৃক প্রদত্ত পদার্থপক্ষক অনুমানের সাধ্য বিষয়ে দুটি বিকল্প প্রদর্শনের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে উক্ত অনুমানের সাধ্য বিষয়ক উভয় প্রকার বিকল্পই গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর মতে বৈশেষিকগণ যখন পদার্থসমূহের সংসর্গকে সাধ্য বলেন তখন তাঁরা উক্ত সংসর্গের নিশ্চয়কে অথবা সংসর্গের সম্ভাবনাকে সাধ্যরূপে বোঝাতে পারেন। সুতরাং, প্রশ্ন উঠতে পারে বৈশেষিকগণ বাক্যার্থবোধকে অনুমিতিরূপে প্রতিষ্ঠার জন্য যে পদার্থপক্ষক অনুমান প্রদর্শন করেন সেই অনুমানের সাধ্যরূপে পদার্থসমূহ পরস্পর সংসৃষ্টই হবে এইরূপ নিশ্চয়কে গ্রহণ করেন অথবা পদার্থসমূহের মধ্যে সম্ভাবিত সংসর্গকেই সাধ্যরূপে গণ্য করেন?[13] যদি পদার্থসমূহের সংসর্গের নিশ্চয়কে বৈশেষিকগণ শাব্দবোধের অনুমিতিত্বের সাধক অনুমানের সাধ্যরূপে গ্রহণ করেন তাহলে তা দোষদুষ্ট হবে। কারণ, অনাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত পদসমূহ থেকে উপস্থিত পদার্থের মধ্যে সংসর্গ থাকে না। যেমন, কোনব্যক্তি শ্রোতাকে প্রতারিত করার জন্য যদি বলেন "নদী তীরে ফল রয়েছে" তা হলে, উক্ত বাক্যান্তর্গত পদ জন্য উপস্থিত পদার্থসমূহের মধ্যে সংসর্গ থাকবে না। সুতরাং, পদার্থসমূহের মধ্যে সংসর্গকে সাধ্য করলে উক্ত অনুমানে ব্যভিচার দোষ দেখা দেবে। অপরদিকে পদার্থসমূহের মধ্যে সংসর্গের সম্ভাবনাও উক্ত পদার্থপক্ষক অনুমানের সাধ্য হতে পারে না। কারণ, শাব্দবোধে পদজন্য উপস্থিত পদার্থসমূহের মধ্যে

---

[১২] উদয়নাচার্য, ২০০২, *কিরণাবলী*, নরেন্দ্র চন্দ্র বেদান্ততীর্থ (সম্পাদিত), কলকাতা: এশিয়াটিক সোসাইটি, পৃষ্ঠা: ৫৭২- ৫৭৩।

[১৩] "এতে পদার্থা মিথঃ সংসর্গবস্তু ইতি সংসৃষ্টা এবেতি নিয়মো বা সাধ্যঃ সম্ভাবিতসংসর্গা ইতি বা? ন প্রথমতঃ, অনান্তোক্তপদকদম্ব স্মারিতৈরণৈকান্তাৎ।"- উদয়নাচার্য, ১৯৯৫, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলী*, শ্রী শ্রীমোহন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃষ্ঠা: ২৭৮।

সংসর্গের নিশ্চয়ই হয়ে থাকে। অর্থাৎ, পদার্থসমূহের মধ্যে সংসর্গের নিশ্চয়ই বাক্যার্থবোধ বা শাব্দবোধের ফল, নিশ্চয়ের সম্ভাবনা নয়। তাছাড়া, বৈশেষিকগণ শাব্দবোধকে অনুমিতিরূপে প্রতিষ্ঠার জন্য "আকাঙ্ক্ষাদিমডি পদৈঃ স্মারিতত্বাত্'রূপ যে হেতু প্রয়োগ করেন সেই হেতুর বিষয়ীভূত "আকাঙ্ক্ষাদি" পদের দ্বারা যোগ্যতাকেও বুঝিয়ে থাকেন। পরিষ্কারকার পঞ্চানন তর্করত্ন স্পষ্টতোই বলেছেন "আদিনা যোগ্যতা পরিগ্রহঃ।"[14] অপরদিকে, চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা যোগ্যতার স্বরূপ আলোচনায় দেখিয়েছি বাক্যান্তর্গত পদজন্য উপস্থিত এক পদার্থের সঙ্গে অপর পদার্থের সম্বন্ধের সম্ভাবনাই যোগ্যতা। সুতরাং, বৈশেষিক আচার্যগণ কর্তৃক প্রদত্ত হেতুর বিষয়ীভূত "যোগ্যতা" শব্দের দ্বারাই সিদ্ধ হয় যে বাক্যান্তর্গত পদজন্য উপস্থিত পদার্থ সমূহের মধ্যে সংসর্গের সম্ভাবনা রয়েছে। তাই, "আকাঙ্ক্ষাদিমডি পদৈঃ স্মারিতত্বাত্"-রূপ হেতুর দ্বারা সংসর্গের সম্ভাবনাসাধন করলে সিদ্ধসাধন দোষ দেখা দেবে। শঙ্কর মিশ্রও তাঁর উপস্কার টীকাতে অনুরূপ আপত্তির উত্থাপন পূর্বক তার নিরসনে সচেষ্ট হয়েছেন।[15] এখানে বলা আবশ্যক যে, উদয়নাচার্য, শঙ্কর মিশ্র প্রমুখ আচার্যগণ পদার্থসমূহের মধ্যে সংসর্গের নিশ্চয়কে সাধ্যরূপে গণ্য করা যায় না এইরূপ পূর্বপক্ষের উপস্থাপনার অনন্তর উক্ত প্রকার সংসর্গের সম্ভাবনাও সম্ভব নয় এইরূপ পূর্বপক্ষের উপস্থাপন করেছেন। কারণ, তাঁদের অভিপ্রায় হল কেউ কেউ মনে করতে পারেন পদার্থসমূহের মধ্যে সংসর্গের নিশ্চয় শাব্দবোধের অনুমিতিত্ব সাধক অনুমানের সাধ্য না হলেও সংসর্গের সম্ভাবনা সাধ্য হতে পারে। তাই প্রথমে সংসর্গের নিশ্চয় পক্ষের উল্লেখের পর সংসর্গের সম্ভাবনার উল্লেখ করা হয়েছে। শঙ্কর মিশ্রও অনুরূপ ক্রমাবলম্বনে পূর্বপক্ষরূপে "আকাঙ্ক্ষাদিমডি পদৈঃ স্মারিতত্ব"-রূপ হেতুর দ্বারা যে সংসর্গ নিশ্চয়রূপ সাধ্য সিদ্ধ সম্ভব সেটি প্রদর্শন করেছেন এবং পরিশেষে সংসর্গের সম্ভাবনাও যে বৈশেষিকসম্মত সাধ্য হতে পারে না- এই অভিমত প্রতিষ্ঠাপূর্বক স্বমত স্থাপন করেছেন। কিন্তু, সংসর্গের নিশ্চয়কে সাধ্যরূপে প্রতিষ্ঠার পর সংসর্গের সম্ভাবনার আলোচনা ব্যর্থ হওয়ায় তিনি প্রথমে সংসর্গের সম্ভাবনা খণ্ডনপূর্বক বৈশেষিকগণের অভিপ্রেত সংসর্গের নিশ্চয়কে কীভাবে শাব্দবোধের অনুমিতিত্বের সাধক অনুমানের সাধ্যরূপে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব সে বিষয়ে আলোকপাতে সচেষ্ট হয়েছেন। শঙ্কর মিশ্রের মতে সংসর্গের সম্ভাবনা নয়, সংসর্গের নিয়ম বা নিশ্চয়ইশাব্দবোধের অনুমিতিত্বের সাধক অনুমানের সাধ্য। সংসর্গের সম্ভাবনাকে কেন সাধ্যরূপে গ্রহণ করা যায় না সেই প্রশ্নে তিনি উদয়নাচার্যেরই অনুবর্তী হয়েছেন। তিনিও মনে করেন সম্ভাবনাকে সাধ্যরূপে গ্রহণ করলে সিদ্ধসাধন দোষ দেখা দেবে।[16] কারণ, হেতুর বিষয়ীভূত "আকাঙ্ক্ষাদি" শব্দের দ্বারা যোগ্যতাকেও বোঝায়। আমরা দেখেছি যোগ্যতা বলতে বাক্যান্তর্গত পদজন্য উপস্থিত এক পদার্থের সঙ্গে অপর পদার্থের সম্বন্ধের সম্ভাবনাকে বোঝায়। ফলে, হেতুর বিষয়ীভূত "যোগ্যতা" শব্দের দ্বারাই সাধ্য (পদার্থ সমূহের মধ্যে সংসর্গের সম্ভাবনা) সিদ্ধি হয়ে যাওয়ায় পুনরায় সাধ্য সিদ্ধিরজন্য হেতু প্রয়োগ করলে সিদ্ধসাধন দোষ দেখা দেয়। সুতরাং, পদার্থ সমূহের মধ্যে সংসর্গের নিশ্চয়ই শাব্দবোধের অনুমিতিত্বের সাধক অনুমানের সাধ্য। পদার্থ সমূহের মধ্যে সংসর্গের নিশ্চয়কে সাধ্যরূপে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বলা যায়, পূর্বপক্ষিগণ কর্তৃক উত্থাপিত ব্যাভিচার দোষ অনাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত বাক্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও আপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত

---

[১৪] তর্করত্ন, পঞ্চানন, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ, *পরিষ্কার* (বৈশেষিক সূত্রোপস্কার টীকা), কলিকাতা: বঙ্গবাসী ইলেকট্রোমেসিন প্রেস, পৃষ্ঠা: ৪৪৪।

[১৫] "নম্বেতে পদার্থাঃ সংসৃষ্টা এবেতি বা সাধ্যম্ সম্ভাবিতসংসর্গী ইতি বা?"- শঙ্করমিশ্র, ১৯৬৯, *বৈশেষিকসূত্রোপস্কার*, নারায়ণ মিশ্র (সম্পাদিত), বারানসী: চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, পৃষ্ঠা: ৪৯৮।

[১৬] "ন দ্বিতীয়ঃ, যোগ্যতামাত্রসিদ্ধাবপি সংসর্গানিশ্চয়ান্নিষ্কম্প প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ, যোগ্যতায়াশ্চ পূর্বমেব হেতুবিশেষণত্বেন জ্ঞাতত্বাত্ কিমনুমানেনেতি চেড়্.....।" তদেব, পৃষ্ঠা: ৪৯৯।

বাক্যের ক্ষেত্রে নয়।[17] কিন্তু, প্রশ্ন হল আপ্তরূপে আমরা কাকে গ্রহণ করবো? এর উত্তরে উপস্কারকার আপ্তের লক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দেখিয়েছেন কেবলমাত্র অপ্রতারক ব্যক্তি আপ্ত নয় কারণ, এমনও হতে পারে বক্তা প্রবঞ্চক নাহলেও বস্তুর প্রকৃত স্বরূপের জ্ঞান তাঁর নেই। তাই উক্ত ব্যক্তির বাক্য থেকে শ্রোতা যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে পারবেন না। তাঁর মতে বক্তা যে বাক্য প্রয়োগ করছেন সেই বাক্যার্থ বিষয়ে যদি প্রকৃত জ্ঞানবান হন এবং তিনি যদি প্রবঞ্চক না হন তাহলেই তাঁকে আপ্তবক্তারূপে গণ্য করা হবে, অন্যথায় নয়। ন্যায়-সূত্রভাষ্যে বাৎস্যায়নও আপ্তের লক্ষণ প্রদান করতে গিয়ে অনুরূপ অভিমতই পোষণ করেছেন। তাঁর মতে যিনি সুদৃঢ় প্রমাণের দ্বারা পদার্থকে জেনেছেন এবং যে রূপে পদার্থকে জেনেছেন সেইরূপেই উপদেশ করেন অর্থাৎ যিনি প্রবঞ্চক নন এবং যথার্থরূপে উপদেশের সামর্থ্যও যার আছে তিনিই আপ্ত। উদয়নাচার্য পূর্বোক্ত প্রকার সমাধানের সম্ভাবনা অনুধাবন করেছিলেন এবং উক্ত সমাধানের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে বলেন, কোন একজন বক্তা যখন বাক্য প্রয়োগ করেন তখন তাঁর বাক্য শ্রবণপূর্বক বাক্যার্থ উপলব্ধির পূর্বে শ্রোতার পক্ষে বক্তার আপ্তত্ব নিশ্চয় সম্ভব নয়। ফলে "আপ্তোক্তত্ব"কে হেতুর বিশেষণরূপে গ্রহণ করলে বাক্যার্থ বোধের পূর্বে অর্থাৎ, সাধ্য সিদ্ধির পূর্বে আপ্তোক্তত্বের জ্ঞান সম্ভব না হওয়ায় হেতুর বিশেষণের জ্ঞান সম্ভব হবে না। বিশেষণের জ্ঞান সম্ভব না হলে বিশেষণ বিশিষ্টবিশেষ্যরূপ হেতুর জ্ঞানও সম্ভব হবে না। ফলে উক্ত হেতুর দ্বারা সাধ্য সিদ্ধিই সম্ভব হবে না। সুতরাং, আপ্তোক্তত্বকে পদার্থসমূহের সংসর্গবোধের সাধক হেতুর বিশেষণরূপে গণ্য করা যায় না। আর স্থূল বিশেষে যদি আমরা কোন একজন বিশেষ বাক্যের বক্তাকে আপ্তরূপে গণ্যও করি, যেমনটি উপস্কারকার পরবর্তীকালে প্রদর্শন করেছেন, তাহলেও ব্যভিচারের আশঙ্কা থেকেই যায়। যেমন, সাধারণত আমরা আমাদের পিতা- মাতাকে তাঁদের বক্তব্য বিষয়ে অভ্রান্ত বা আপ্তরূপে গণ্য করি। তবে অনেক সময় দেখা যায় তাঁদের বাক্যান্তর্গত পদজন্য উপস্থিত পদার্থ সমূহের মধ্যে সংসর্গের অভাব রয়েছে। তবে এমন নয় যে তাঁরা কখনোই কোন বিষয়েই আপ্ত নন। অনেক বিষয়েই তাঁরা আপ্ত হয়ে থাকেন। এমনকি যাঁরা আধিকাংশ ক্ষেত্রে ভ্রান্ত হয়ে থাকে তাঁরাও কোন কোন সময় আপ্ত হয়ে থাকেন। কিন্তু, অসর্বজ্ঞ পুরুষমাত্রেরই যেহেতু ভ্রান্তি হতে পারে তাই ভ্রান্তি বশতঃ তাঁরা কোন একটি বাক্য বিষয়ে অনাপ্ত হতে পারেন। সেক্ষেত্রে তাঁদের প্রযুক্ত বাক্যান্তর্গত পদজন্য উপস্থিত পদার্থসমূহের মধ্যে সংসর্গের অভাব থাকায়ব্যভিচার দোষ দেখা দেবে। সুতরাং, সামান্যতঃ আপ্তত্ব নিশ্চয়ের মাধ্যমে হেতুর নিশ্চয়ের যে উপায় বৈশেষিকগণ প্রদর্শনে সচেষ্ট হয়েছেন তা গ্রহণযোগ্য নয়।

বিশিষ্ট নব্য নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার তাঁর শব্দশক্তি প্রকাশিকা শীর্ষক গ্রন্থে এই পদার্থপক্ষক অনুমানটিকেই ভিন্ন এক আকারে উপস্থাপন করেছেন, যেখানে বিশেষ ব্যাপ্তি প্রদর্শন করা হয়েছে। পদার্থপক্ষক অনুমান সংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্রে এই আকারটি অভিনবত্বের দাবী রাখে, তাই এখানে জগদীশ প্রদত্ত আকারটি উল্লেখ করা হল: "গৌরস্তিতাবান্ স্বধর্মিকাস্তিত্বান্বয়বোধানুকূলাকাঙ্ক্ষাশ্রয়পদস্মারিতত্বাত্ ঘটবত্, অস্তিপদসমভিব্যাহৃত-গৌঃপদস্মারিতত্বাদ্ বা চক্ষুর্বদিত্যাদ্যনুমানত এবাস্তস্বয়ধিয়োহন্যথাসিদ্ধিঃ" [18] এইরূপ অনুমানের দ্বারা গো প্রভৃতি ধর্মীতে অস্তিত্বের অনুমিতি সম্ভব হওয়ায় অনুমিতির অতিরিক্ত বাক্যার্থবোধ নামক পৃথক প্রমিতি স্বীকার ব্যর্থ। বৈশেষিক সম্মত এইরূপ অনুমানের দ্বারা গো পদার্থরূপ পক্ষে অস্তিত্বরূপ সাধ্য অনুমিত হয় বলে উক্ত অনুমানটি পদার্থপক্ষক অনুমানরূপে প্রসিদ্ধ।

---

[১৭] "ননু নদীতীরে পঞ্চ ফলানি সন্তীতানাপ্তবাক্যে ব্যভিচারাগ্নে দমনুমানমিতি চেন্ন, আপ্তোক্তত্বেনাপি বিশেষণাড়"- তদেব, পৃষ্ঠা: ৪৯৭।

[১৮] জগদীশ তর্কালঙ্কার, ২০১৪, *শব্দশক্তিপ্রকাশিকা,* শ্রী গঙ্গাধর কর (অনুঃ) কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি,পৃষ্ঠা: ৪৬।

ন্যায়সম্মত শব্দ প্রমাণ এবং বাক্যার্থবোধের স্বরূপ বিষয়ে ন্যায়মতের পক্ষে সাধক যুক্তি:- নৈয়ায়িক মতে অনুমিতি উৎপত্তির প্রক্রিয়াই যে কেবলমাত্র বাক্যার্থবোধ উৎপত্তির প্রক্রিয়া থেকে ভিন্ন তা নয়, উভয়ের কারণকূট, করণ অংশেও প্রভেদ বর্তমান। শাব্দবোধের প্রক্রিয়া শুরু হয় পদ শ্রবণ জন্য। তদনন্তর পদ শ্রবণ জন্য পদার্থের স্মরণ উৎপন্ন হয় (শক্তি ও লক্ষণার অন্যতর সম্বন্ধরূপ বৃত্তি দ্বারা পদজন্য পদার্থের স্মরণ বুঝতে হবে) তারপর শাব্দবোধ হয়। শাব্দবোধ বা বাক্যান্তর্গত পদজন্য উপস্থিত পদার্থের মধ্যে অন্বয় বোধের প্রতি পদজ্ঞান, পদার্থের স্মরণ সাক্ষাৎ কারণ। পদ শ্রবণ জন্য পদার্থের স্মরণ আবার পদ ও পদার্থের সম্বন্ধজ্ঞানকে অপেক্ষা করে এবং আসত্তি, যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা এবং তাৎপর্য এই সকল বিষয়ের জ্ঞান হল শাব্দবোধের প্রতি সহকারী কারণ। অনুমিতির ক্ষেত্রে ব্যাপ্তিজ্ঞান করণ, পরামর্শ ব্যাপার আর অনুমিতি হল ফল। এক্ষেত্রে প্রথমে পক্ষধর্মতার জ্ঞান তদনন্তর ব্যক্তি স্মরণ তারপর পরামর্শ (পরামর্শ জ্ঞানটি ব্যাপ্তিবিশিষ্ঠ পক্ষধর্মতার জ্ঞানে অপেক্ষা রাখে) এই ক্রমে অনুমিতির উৎপত্তি হয়।বোঝাযাচ্ছে অনুমিতির ক্ষেত্রে আকাঙ্ক্ষাদির জ্ঞান কারণরূপে আবশ্যক নয়; যা বাক্যার্থবোধের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রয়োজন। উপরন্তু অনুমিতির ক্ষেত্রে ব্যাপ্তিজ্ঞানাদি আবশ্যক যা বাক্যার্থবোধস্থলে অপ্রয়োজনীয় তাই জ্ঞান দুটি পৃথক মানতেই হবে।

আমরা উভয় জ্ঞানের স্বরূপাংশে যে ভেদ আছে সেই বিষয় উল্লেখ করবো। যেমন, 'ঘটাদন্যঃ' এইরূপ বাক্যস্থলে পঞ্চম্যন্ত 'ঘট' পদের পর প্রথমান্ত 'অন্য' পদের প্রয়োগ হয়েছে। ফলে আকাঙ্ক্ষাদির জ্ঞানজন্য ঘটগত প্রতিযোগিতার নিরূপক যে ভেদস্বরূপ 'অন্যত্ব' সেই অন্যত্বকে বিশেষণ করে তার আশ্রয়ের অন্বয়বোধ হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে অন্যত্বের আশ্রয় হল বিশেষ্য। তবে এই আশ্রয়টি যে কোন্‌টি তা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না বলে উক্ত বিশেষ্যের কোন অবচ্ছেদক স্বীকার করা যায় না। অর্থাৎ উক্ত বিশেষ্যটি নিরবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতারূপে প্রতীয়মান হবে। ফলে 'ঘটাদন্যঃ' বাক্যজন্য শাব্দবোধটি নিরবচ্ছিন্ন বিশেষ্যক হবে।'[19] কিন্তু অনুমিতি কখনোই নিরবচ্ছিন্ন বিশেষ্যক হয় না। কিন্তু, 'ঘটাদন্যঃ' এইরূপ বাক্য প্রযুক্ত হলে তা হতে 'ঘটভিন্ন' বা 'ঘটভেদবিশিষ্ট' এইরূপ শাব্দবোধে পটাদি পদার্থ বিষয় হলেও পটত্বাদিরূপে বিষয় হয় না। কারণ, পটাদি পদার্থের উপস্থাপক কোনও শব্দ (পটাদি শব্দ) এই বাক্যে নেই। সুতরাং 'ঘটাদন্যঃ' এই বাক্যের অর্থ (ঘটভেদবিশিষ্ট) বিশেষণ হওয়ায় এখানে বিশেষ্য বাচক পটাদিপদ অধ্যাহার করতে হয়। নিয়ম হল, যে ধর্মরূপে যে পদার্থ কোন পদের দ্বারা উপস্থিত হয়, সেই ধর্মরূপে সেই পদার্থই শাব্দবোধের বিষয় হয়। উক্ত স্থলে 'ঘটাদন্যঃ' এই বাক্যে পট পদ নেই। সুতরাং পটত্বাদিরূপে পটাদি পদার্থ এখানে কোনোভাবেই উপস্থিত হতে পারছে না এবং পটত্বাদিরূপে পটাদি পদার্থও শাব্দবোধের বিষয় হতে পারে না। এই পটাদি পদার্থবিষয়ক শাব্দবোধে পটত্বরূপ ধর্মের দ্বারা পটপদার্থ অবচ্ছিন্ন না হওয়ায় এই বোধ নিরবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতাক শাব্দবোধই হবে। কিন্তু অনুমিতির বিশেষ্য সবসময় বিশেষ্যতাবচ্ছেদক ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হবেই। যেমন 'পর্বতো বহ্নিমান' এই অনুমিতিতে পর্বতে বহ্নি বিশেষণরূপে বিষয় হওয়ায় পর্বত হয় বিশেষ্য, আর পর্বতত্ব হয় বিশেষ্যতার অবচ্ছেদক। এখানে পর্বতত্ব ধর্মবিশিষ্ট পর্বতে বহ্নিব্যাপ্য ধুমের জ্ঞান হয় বলে পর্বতত্বরূপেই পর্বতে বহ্ন্যনুমিতি হয়; কেবল 'বহ্নিমান' -এরূপ অনুমিতি কখনও হয় না। সুতরাং 'ঘটাদন্যঃ' এই বাক্যের দ্বারা নিরবচ্ছিন্নবিশেষ্যতাক শাব্দবোধ অনুমানের দ্বারা কিছুতেই নির্বাহ করা সম্ভব হয় না। কেবল 'বহ্নিমান' -এরূপ অনুমিতি যেমন অসম্ভব, তেমনি কেবল 'ঘটভেদবিশিষ্ট' এইরূপ অনুমিতিও অসম্ভব।

---

[১৯] "কিঞ্চ ঘটাদন্য ইত্যাদি বাক্যাদ্ ঘটপ্রতিযোগিতাকান্যত্বাদিপ্রকারেণ নিরবচ্ছিন্নবিশেষ্যতাকো ঘটান্যস্য বোধঃ সর্বজনসিদ্ধঃ, ...।" জগদীশ তর্কালঙ্কার, ১৯৮০, *শব্দশক্তিপ্রকাশিকা*, মধুসূদন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলিকাতা: সংস্কৃত কলেজ, পৃষ্ঠা: ৪৯।

অনুমিতি পক্ষেই হয়ে থাকে এবং অনুমানবাক্যে পক্ষ (বিশেষ্য) পদের উল্লেখ থাকায় তা অনুমিতিতে বিশেষ্যতাবচ্ছেদক পর্বতত্বাদির দ্বারা অবচ্ছিন্ন হবেই। সুতরাং শব্দপ্রমাণকে অনুমান হতে অতিরিক্ত প্রমাণরূপেই স্বীকার করতে হয়।

বৈশেষিকগণ বলতে পারেন 'ঘটাদন্যঃ' ইত্যাদি বাক্য থেকে শাব্দবোধের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তাই 'ঘটাদন্যঃ' ইত্যাদি বাক্যজন্যবোধকে অনুমিতির অন্তর্ভাব প্রদর্শনের প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ, বৈশেষিকগণের অভিপ্রায় হল বাক্যার্থবোধের অনুমিতিত্ব প্রতিষ্ঠার বাধক দৃষ্টান্তরূপে নৈয়ায়িকগণ যে বাক্য প্রদর্শন করেছেন সেই বাক্যের দ্বারা বাক্যার্থবোধের উৎপত্তি প্রক্রিয়া প্রদর্শিত না হলে পূর্বোক্ত আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। সুতরাং নৈয়ায়িকগণকে 'ঘটাদন্যঃ' ইত্যাদি বাক্যজন্য বাক্যার্থবোধের স্বরূপ ব্যক্ত করতে হবে। বৈশেষিকগণের উক্তপ্রকার অভিপ্রায় উপলব্ধি করেই নৈয়ায়িকগণ বলেন পঞ্চম্যন্ত 'ঘট' ইত্যাদি সাকাঙ্ক্ষপদোত্তর 'অন্য' পদ প্রয়োগজন্য আকাঙ্ক্ষাদিজ্ঞানত্বপুরস্কারে 'ঘটপ্রতিযোগিতাক অন্যত্বপ্রকারক তদাশ্রয় বিশেষ্যক বাক্যার্থবোধ উৎপন্ন হতে পরে। এক্ষেত্রে বাক্যার্থবোধে বিশেষ্যটি কোন অবচ্ছেদক ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়নি। ফলে নিরবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতাক বাক্যার্থবোধ উৎপন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু ন্যায় এবং বৈশেষিক উভয় সম্প্রদায়ই স্বীকার করেন যে, নিরবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতাক অনুমিতি স্বীকার করা যায় না। বৈশেষিকগণ নিরবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতাক অনুমিতি স্বীকার না করায় 'ঘটাদন্যঃ' ইত্যাদি বাক্যস্থলে উৎপন্ন নিরবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতাক অন্বয়বোধকে অনুমিতিরূপে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না। এই কারণেই 'বাক্যার্থবোধ অনুমিতি' বৈশেষিকগণের এই অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়। এর বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, পঞ্চম্যন্ত ঘটপদসাকাঙ্ক্ষ অন্যপদস্মারিতত্বকে হেতুরূপে গ্রহণ করে ভেদত্বপুরস্কারে ভেদে (পক্ষে) ঘটপ্রতিযোগিতাকত্ব সিদ্ধ করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে অনুমানের আকারটি হবে 'ভেদো ঘট প্রতিযোগিতাকঃ পঞ্চম্যন্তঘটপদসাকাঙ্ক্ষান্যপদস্মারিতত্বাৎ'। সুতরাং বাক্যার্থবোধকে অতিরিক্ত প্রমিতিরূপে স্বীকার করা অনাবশ্যক; এটি অনুমিতিরই অন্তর্ভুক্ত।

বৈশেষিকগণের এইরূপ অভিপ্রায় কল্পনা করে নৈয়ায়িকগণ বলতে পারেন পূর্বোক্ত প্রকার অনুমানের দ্বারাও বাক্যার্থবোধকে অনুমিতিরূপে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। কারণ, 'ঘটাদন্যঃ' ইত্যাদি স্থলে ঘটপ্রতিযোগিতাকভেদবান্-এইরূপে যে বাক্যার্থবোধ উৎপন্ন হয় সেই শাব্দবোধে ঘটপ্রতিযোগিতাক ভেদ বা অন্যত্ব প্রকার হয়ে থাকে। ফলে উক্ত বোধে ভেদ বা অন্যত্বটি নিরবচ্ছিন্নরূপে অর্থাৎ শুদ্ধরূপে ভাসমান হয়। তাই উক্ত অনুভবে শুদ্ধ ঘটান্যত্বপ্রকারে ঘটান্যের অর্থাৎ পটাদির বোধ হয়ে থাকে। কিন্তু 'ভেদোঘট প্রতিযোগিতাকঃ' ইত্যাদি অনুমিতিতে ভেদ বা অন্যত্বটি নিরবচ্ছিন্নরূপে ভাসমান হয়না, ভেদত্বপুরস্কারে ভেদ বা অন্যত্বই ভাসমান হয়। সুতরাং 'ঘটাদন্যঃ' ইত্যাদি স্থলে উৎপন্ন বোধকে অনুমিতিরূপে গণ্য করা যাবে না। উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করে বলা যেতে পারে 'ঘটাদন্যঃ' ইত্যাদি বাক্য থেকে কোন শাব্দবোধই উৎপন্ন হয় না। তাঁদের মতে, 'অন্য' পদটি শক্ত নয়, লাক্ষণিক পদ। এই লাক্ষণিক পদের দ্বারা ঘটান্যরূপ অর্থের বোধ হয়। অপরদিকে 'ঘট' পদটি লাক্ষণিক অর্থের তাৎপর্যের গ্রাহক। সুতরাং 'ঘটাদন্যঃ' বাক্য থেকে লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা ঘটান্যত্বপুরস্কারে ঘটের স্মরণাত্মক বোধ উৎপন্ন হয়ে থাকে, কোন বিশিষ্ট বোধ (শাব্দবোধ বা অনুমিতি) উৎপন্ন হয় না। এইরূপ অভিমতের বিরুদ্ধে বলা যায় বিশিষ্ট অর্থের বোধক বাক্যস্থলে যদি একটি পদের বিশিষ্ট অর্থ স্বীকার করা হয় তা হলে 'ঘটহস্তি' ইত্যাদি সকল বাক্যস্থলেও বিশিষ্ট অর্থের অর্থাৎ অস্তিত্ববিশিষ্ট ঘটের স্মরণ স্বীকার করতে হবে। ফলে 'অস্তিত্ববিশিষ্ট ঘট' এই আকারের বিশেষ্য-বিশেষণভাবে বাক্যার্থবোধ স্বীকার করা যাবে না। অর্থাৎ বাক্যার্থবোধের বা অন্বয়বোধের অপলাপের প্রসক্তি হতে পারে।

সুতরাং 'ঘটাদন্যঃ' ইত্যাদি বাক্যজন্য লক্ষণার দ্বারা ঘটান্যত্বপুরস্কারে ঘটান্যের বিশিষ্ট স্মৃতিউৎপন্ন হবে, বাক্যার্থবোধরূপ বিশিষ্ট অনুভব হবে না বৈশেষিকগণের এই অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়। 'ঘটাৎ ভিন্ন' এই প্রকার বাক্য থেকে যে অন্বয়বোধ বা, বাক্যার্থবোধই হয়, অনুমিতি হতে পারে না তার সপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে আরও বলা যায়, 'ঘটাৎ ভিন্ন' - এখানে বিশেষ্যের কোনো উল্লেখ নেই। তাই সেই বিশেষ্যটির বিশেষ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বিশেষ্য নিরূপিত সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রকারতাশালী জ্ঞান হওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই। তাই এখানে অনুমান সম্ভব নয়। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে বোঝানো যায়। যেমন, আমরা যখন পর্বতে বহ্নির অনুমান করে বলি "পর্বতঃ বহ্নিমান্" অর্থাৎ পর্বতে বহ্নি আছে তখন আমরা প্রকৃতপক্ষে যা বোঝাতে চাই তা হলো: পর্বতত্বাবচ্ছিন্ন পর্বতে বহ্নি আছে। অর্থাৎ অনুমিতির ক্ষেত্রে বিশেষ্যের উল্লেখ আবশ্যক এবং উক্ত বিশেষ্যটির বিশেষ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বিশেষ্য নিরূপিত সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রকারতাশালী জ্ঞান থাকাও আবশ্যক। যদিও বাক্যার্থবোধের ক্ষেত্রে তার আবশ্যকতা নেই। যদি কেউ বলেন, অনুমিতির ক্ষেত্রে বিশেষ্যতা নিরূপিত সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রকারতাশালী জ্ঞান স্বীকার করবো না, তাহলে তার উত্তরে বলাযায়, অনুমিতির ক্ষেত্রে বিশেষ্যতা নিরূপিত সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রকারতাশালী জ্ঞান যদি না মানা হয়, তাহলে পক্ষের দোষ বা, হেত্বাভাস স্বীকার করা যাবে না।

সুতরাং বৈশেষিক সিদ্ধান্ত অনুসারে বাক্যার্থবোধকে অনুমিতিরূপে স্বীকার করলে 'ঘটাদন্যঃ' এই বাক্যজন্য বোধের উপপাদন সম্ভব নয়। অতএব সাকাঙ্ক্ষাদি বিশিষ্ট পদার্থের উপস্থিতি মূলে তৎ তৎ পদার্থের সংসর্গ বিষয়ক যে বিশিষ্ট বোধ উৎপন্ন হয় তা প্রত্যক্ষত্বাদি বিলক্ষণ শাব্দত্বজাত্যবচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র প্রমিতি। এই আকারের শাব্দবোধ সম্ভব হলেও এই আকারের অনুমিতি কখনোই সম্ভব নয়। সেই কারণে বাক্যার্থবোধকেঅনুমিতি স্বরূপ বলা যাবে না।

দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় আমরা আরও দেখি যে কোনও বাক্য প্রযুক্ত হলে শ্রোতা সেই বাক্য শ্রবণ জন্য জ্ঞান বিশেষ লাভ করেছেন। তাঁকে যখন প্রশ্ন করা হয় তিনি কীভাবে উক্ত বিষয়টি জানলেন? তখন কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই শ্রোতা উত্তর দেন, শব্দের সাহায্যে বা, বাক্যের সাহায্যে তিনি উক্ত জ্ঞান লাভ করেছেন। কাজেই দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার দ্বারা এটিই প্রতিপাদিত হয় যে বাক্যার্থবোধ, শব্দ তথা বাক্য শ্রবণজন্যই উৎপন্ন হয়েছে। তাই 'বাক্যার্থবোধ অনুমিত্যাত্মক'– একথা প্রতিষ্ঠা করা যায় কিনা সেই বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ থেকেই যায়। বর্তমানে এইটুকু বলাই সম্ভব যে, বাক্যার্থবোধের স্বরূপ বিষয়ে বৈশেষিক মত স্বীকার করলে তাকে অত্যন্ত জটিল বলেই স্বীকার করতে হবে।

তথ্যসূত্র:

১। উদয়নাচার্য, ২০০২, *কিরণাবলী*, নরেন্দ্র চন্দ্র বেদান্ততীর্থ (সম্পাদিত), কলকাতা: এশিয়াটিক সোসাইটি।

২। উদয়নাচার্য, ২০১৫, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলিঃ*, শ্রীমোহন ভট্টাচার্য (সম্পাঃ), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পষদ।

৩। জগদীশ তর্কালঙ্কার, ২০১৪, *শব্দশক্তিপ্রকাশিকা*, শ্রী গঙ্গাধর কর (অনুবাদক) কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি।

৪। তর্করত্ন, পঞ্চানন, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ, *পরিষ্কার* (বৈশেষিক সূত্রোপস্কার টীকা), কলিকাতা: বঙ্গবাসী ইলেকট্রোমেসিন প্রেস।

৫। মহর্ষি কণাদ, ১৩১৩ সন, *বৈশেষিক-দর্শনম্*, শ্রী পঞ্চানন তর্কারত্ন (সম্পাদিত) কলিকাতা: বঙ্গবাসী ইলেক্ট্রো মেশিন প্রেস।

৬। মহর্ষি গৌতম, ১৯৯৬, *ন্যায় দর্শন ও বাৎস্যায়ন ভাষ্য (প্রথম খণ্ড)*, মহামহোপাধ্যায় ফণীভূষণ তর্কবাগীশ (সম্পাঃ), কলকাতা: ব্যানার্জী পাবলিশার্স।

৭। মহর্ষি গৌতম, ২০১৫, *ন্যায় দর্শন ও বাৎস্যায়ন ভাষ্য (দ্বিতীয় খণ্ড)*, মহামহোপাধ্যায় ফণীভূষণ তর্কবাগীশ (সম্পাঃ), কলকাতা: ব্যানার্জী পাবলিশার্স।

৮। শঙ্করমিশ্র, ১৯৬৯, *বৈশেষিকসূত্রোপস্কার*, নারায়ণ মিশ্র (সম্পাদিত), বারানসী: চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ।

৯। শ্রী জগদীশ তর্কালঙ্কার, ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ, *শব্দশক্তিপ্রকাশিকা*, শ্রীমধুসূদন ন্যায়াচার্য (সম্পাদিত), কলকাতা, সংস্কৃত কলেজ।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1887-1895
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.412

উত্তরাধুনিকতা: লিওটার্ড ও ফুকোর অভিমত অনুসারে সমসাময়িক জ্ঞানের স্বরূপ বিষয়ক আলোচনা

আবৃতা নিয়োগী, *দর্শন বিভাগ, গবেষিকা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 25.03.2026; Accepted: 28.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The discussion of knowledge has held a central place since ancient times. With the passage of different historical epochs—ranging from the Greek period to the medieval, modern, and more recently the postmodern era—the understanding of the nature of knowledge has undergone significant transformations. In contemporary times, knowledge is examined within specific contexts and perspectives, leading to new interpretations. Alongside this, discussions of power and truth have become intrinsically linked with the concept of knowledge.

This paper presents an analytical study of knowledge from a postmodern perspective, particularly through the ideas of Jean-François Lyotard and Michel Foucault. It explores how postmodern thought redefines knowledge by situating it within discourses of power, truth, and contextual interpretation.

Keywords: Knowledge, Truth, Power, Postmodernism

পাশ্চাত্য দর্শনের অন্যতম শাখা হল জ্ঞানতত্ত্ব, যা জ্ঞানের উৎস, স্বরূপ, পরিধি, সীমা ইত্যাদি বিষয়ক আলোচনাকে প্রাধান্য দিয়েছে। প্রাচীন গ্রীক দর্শন থেকে আধুনিক যুগের দার্শনিক আলোচনার ধারায় জ্ঞান সংক্রান্ত বিবিধ মতবাদ স্বীকৃত হয়েছে। পাশ্চাত্য দর্শনে জ্ঞান সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ আলোচ্য বিষয়টি হল জ্ঞানের উৎস সম্পর্কিত। অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকগণ অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানের উৎস বলে মনে করলেও বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগণের মতে বুদ্ধিই জ্ঞানের উৎস, যদিও বিচারবাদী দার্শনিক ইম্যানুয়েল কান্টের মতে জ্ঞান হতে হলে অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি উভয়েরই প্রয়োজন হয়। তাঁর মতে অভিজ্ঞতা জ্ঞানের উপাদান বা উপাত্তের সরবরাহ করে এবং বুদ্ধি সংগৃহীত উপাদানে আকার প্রদান করে।

জ্ঞান সম্পর্কিত এরূপ আলোচনা বর্তমানেও অতিপ্রাসঙ্গিক এবং গবেষণাক্ষেত্রের অন্যতম বিষয়বস্তু হিসেবে পরিগণিত হয়। তবে পাশ্চাত্য দর্শনচিন্তার যুগপরম্পরা লক্ষ্য করলে একে কতকগুলি পর্যায়ে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন– প্রাক সক্রেটিসের যুগ, প্রাচীন গ্রীকযুগ, মধ্যযুগ, আধুনিক যুগ এবং বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী উত্তর আধুনিক যুগ। প্রতিটি যুগের চিন্তাশৈলী প্রবর্তিত হয়েছে তার পূর্ববর্তী যুগের চিন্তাশৈলী দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, যদিও পূর্ববর্তী যুগের দার্শনিক ও তাত্ত্বিক চিন্তার মধ্যে যা ত্রুটি তার সংশোধনের প্রয়াসও পরিলক্ষিত হয়।

তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল প্রতিটি যুগে পরিবর্তন ঘটে প্রেক্ষাপটের। যেমন– মধ্যযুগে চার্চ প্রভৃতি ধর্মীয় প্রভাব থাকলেও আধুনিক যুগে সেই স্থান দখল করে বুদ্ধি ও বিজ্ঞান। ফলত, তৎকালীন দার্শনিক তথা চিন্তাবিদদের মধ্যে বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানকেই গ্রহণযোগ্য হিসেবে মনে করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন– দার্শনিক দেকার্তের মতে যা কিছু আমাদের চিন্তার কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট ও বিবিক্ত, তাই সত্যরূপে পরিগণিত হতে পারে। তিনি 'চিন্তার কর্তা রূপে আমি আছি'- এরূপ বিশুদ্ধ বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানকেই স্পষ্ট ও বিবিক্ত বলেছেন। এই অর্থে বলা যায় বিশুদ্ধ বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানই সত্য। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত ব্যাপক উন্নতি ঘটে। শিল্পোত্তর সময়ের সূচনা হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে কম্পিউটারের তথা অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়, যা জ্ঞানের বিষয়কে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তথ্যের আকারে পরিবেশন করতে শুরু করে। জ্ঞানের জন্য জ্ঞান লাভের পরিবর্তে জ্ঞান ও ক্ষমতার আনুপাতিক সম্পর্ক দ্বারা জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। জ্ঞান এই পর্যায়ে মূলত বিক্রয়দ্রব্যে পরিণত হয়। অর্থাৎ জ্ঞানের স্বরূপে পরিবর্তন ঘটে, এমনকি এই সময়ে প্রশ্ন হয় জ্ঞানের অধিকারী কে হবেন? জ্ঞানের সাথে ক্ষমতার সম্পর্কই বা কীরূপ?

জ্ঞান সংক্রান্ত এই নব নব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় উত্তর আধুনিক যুগের অন্যতম দুজন প্রখ্যাত চিন্তাবিদ্ জাঁ ফ্রাঁসোয়া লিওটার্ড এবং মিশেল ফুকোর জ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনা থেকে। লিওটার্ড মূলত *Postmodern condition: a report on knowledge* প্রতিবেদনে সমসাময়িককালে জ্ঞানের শর্ত, স্বরূপ, বৈধতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। আধুনিক যুগে সকল কিছুর ব্যাখ্যা প্রদানকারী মহাআখ্যানগুলিকে খণ্ডন করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আখ্যানের কথা বলেছেন। সর্বোপরি প্রেক্ষাপট, দৃষ্টিভঙ্গির ভেদে জ্ঞানের এবং সত্যতার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। দার্শনিক ফুকোর জ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনায় ক্ষমতা, জ্ঞান ও সত্যতার মধ্যে সম্পর্কের নির্ণয় অন্যতম বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। যদিও সমকালীন দুই দার্শনিক চরম বা একক অখণ্ড কোন জ্ঞান বা সত্যের স্বীকার করেননি। উভয়ই জ্ঞান ও ক্ষমতার সম্পর্ক বিষয়ে সচেতন থেকেছেন, জ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনা কালে। তবুও, উভয়ের মতভেদ পরিলক্ষিত হয়।

এই প্রবন্ধটির মূল আলোচ্য বিষয় হল লিওটার্ড ও ফুকোর অভিমত অনুযায়ী জ্ঞানের স্বরূপ সংক্রান্ত বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা। এই প্রসঙ্গে প্রবন্ধের সূচনায় উত্তর আধুনিকতার রূপরেখা বিষয়ক সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যেতে পারে।

উত্তর আধুনিকতার রূপরেখা:

আক্ষরিক অর্থে বিশ্লেষণ করলে বলা যায় আধুনিকতার পরে যার সূচনা হয়েছে, তাই উত্তর আধুনিকতা। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'Postmodernism'। এই শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয় ১৯১৪ সালে *The Hibbert Journal* এ। উক্ত শব্দবন্ধটি প্রয়োগের মাধ্যমে J.M Thompson মূলত তৎকালীন সমাজে ধর্মীয় চিন্তা–চেতনা, বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গির যে পরিবর্তন ঘটে তার প্রকাশ করেছেন।[১] যদিও এই শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে ১৯৭০-এর দশকে দার্শনিক তথা চিন্তাবিদগণের আলোচনার মাধ্যমে, যার মধ্যে অন্যতম হলেন জাঁ ফ্রাঁসোয়া লিওটার্ড। যদিও এই সময়ে উত্তর আধুনিকতা বলতে লিওটার্ড বুঝিয়েছেন আধুনিকতায় স্বীকৃত মহাআখ্যানের প্রতি অবিশ্বাস।[২] এই মহাআখ্যান (Metanarraive) হল কতকগুলি গল্প, যা একটিমাত্র মানদণ্ডে তথা একক সত্য ও মূল্যের ভিত্তিতে

[১] Pathak, Shailendra K. "eGyankosh." 10 April 2020. *http://egyankosh.ac.in//handle/123456789/57858.* English. 10 04 2020. Page no.84-91.

[2] "Simplifying to the extreme, I define postmodern as incredulity towards metanarratives"- Lyotard, Jean Francois. *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*. Vol. 10. Minnesota: University of Minnesota Press, 1984. English . page no.xxiv.

সামাজিক যাবতীয় ঘটনা, ইতিহাস, অভিজ্ঞতা, সংস্কৃতিকে ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হয়। তাই বলা যায় উত্তর আধুনিকতা আধুনিকতা দ্বারা সমর্থিত একক অখণ্ড নিরপেক্ষ সত্যকেও অস্বীকার করে সংস্কৃতি সাপেক্ষ সত্যের প্রতি আস্থা রেখেছে। তাই উত্তর আধুনিকতাকে আধুনিকতার প্রতিক্রিয়া হিসেবেও গণ্য করা হয়ে থাকে। আধুনিকতায় মতামতের বৈচিত্র্যকে অবজ্ঞা করার যে প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়, এই মতবাদ তার বিরোধিতা করে। সামগ্রিকভাবে বলা যায় উত্তর আধুনিকতা হল চিন্তার একটি বিশেষ পদ্ধতি যা সত্য, বুদ্ধি, সার্বিক উন্নতি, সার্বিক মুক্তি, একক দৃষ্টিভঙ্গি, মহাআখ্যান (Metanarrative) ইত্যাদি বিষয়ক সমাজে প্রচলিত চিরাচরিত ধ্যান-ধারণার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করে। আলোকায়নের (Enlightenment) যুগের সমস্ত নীতিকে খণ্ডনপূর্বক এই মতবাদ জগতকে আপতিক, বৈচিত্র্যময়, অনৈক্যময় সংস্কৃতিবিশিষ্ট হিসেবে মনে করে।

শিল্প, সাহিত্য, দর্শন সকল ক্ষেত্রই উত্তর আধুনিক চিন্তাশৈলী দ্বারা প্রভাবিত হলেও এর দার্শনিক আলোচনার দিকটি জনপ্রিয় হয়েছে। উত্তর আধুনিক যুগের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে ফুকো, ডেরিডা, বোর্দলেয়ার, লিওটার্ড প্রমুখ চিন্তাবিদগণের তাত্ত্বিক রচনার মাধ্যমে। উত্তর আধুনিক দর্শনচিন্তা মূলত আধুনিক ভিত্তিবাদ, সত্তাবাদ, আলোকায়নের (Enlightenment) মহাআখ্যান ইত্যাদির বিরোধিতা করেছে। এই দর্শন ভাষা, সত্য, ক্ষমতা, জ্ঞানের ধারণাকে বিনির্মাণ করতে চেয়েছে। উত্তর আধুনিক দর্শন বহুত্ববাদ, বিভিন্নতা, বুদ্ধির বিচিত্রতা, বিনির্মাণকরণ ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে, যা জ্ঞানকে তার প্রেক্ষিত অনুসারে বুঝতে সাহায্য করে।

নিট্‌শেকে অনুসরণ করে নাঘিয়া (Nghia) বলেছেন চিরাচরিত দর্শনে বিদ্যমান নানা ত্রুটি–বিচ্যুতি, স্ববিরোধিতার সমালোচনায় উত্তর আধুনিকতার অবদান আছে। আধুনিক দর্শনচিন্তার নানাবিধ তত্ত্ব, বক্তব্য, আলোচ্য বিষয়ের সমালোচনাকে উপজীব্য করেই উত্তর আধুনিক দর্শনচিন্তার উদ্ভব ঘটেছে। জগৎ, জীবন, সমাজের প্রতি পূর্বতন দর্শনের সামগ্রিকতা ও সার্বিকতার দৃষ্টিভঙ্গিকে খণ্ডন করেছে উত্তর কালের দর্শনচিন্তা। তবে এই দুটি দর্শন তথা চিন্তাশৈলী বা মতবাদ পরস্পরের বিরোধী, বা দ্বিতীয়টি প্রথমটির প্রতিক্রিয়াস্বরূপ হিসেবে যেমন পরিগণিত হয় তেমনি সমকালীন বহু দার্শনিকের মতে দুটি মতবাদ পরস্পরের বিপরীত নয় বরং উত্তর আধুনিকতা হল আধুনিকতারই বিস্তার। লিওটার্ডের মতে উত্তর আধুনিকতা আধুনিকতার পরিসমাপ্তিকে সূচনা করেনা বরং এটি তার প্রারম্ভ । উত্তর আধুনিকতা এবং আধুনিকতার সম্পর্ক কীরূপ, উত্তর আধুনিকতা কি আধুনিকতারই বিস্তার অথবা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র দুটি মতবাদ নাকি দুটি মতবাদই সমান্তরালে প্রবাহিত হয়- এই বিষয়ে মতানৈক্য আছে যার সমাধানসূত্র নির্ণয়ের অবকাশ থেকেই যায়।[৩]

তবে উত্তর আধুনিকতাবাদ বিষয়ে বলা যায় সকল কিছুর প্রতি সংশয় উপস্থাপিত করে বলে মনে করা হয়, ফলত এই মতবাদের নিজ অবস্থান নিয়ে অস্পষ্টতা দেখা যায়। এই মতবাদকে অভিমুখহীন, সিদ্ধান্তশূন্য তথা পক্ষশূন্য বলে মনে হয়। এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই এর সামগ্রিক কোনো সংজ্ঞা উপস্থাপন করাও সম্ভবপর হয় না। যদিও নানা রচয়িতার লেখায় এর বিভিন্ন তত্ত্বের বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন– বেস্ট এবং কেল্লনার-এর মতে আলোকায়নের (Enlightenment) যুগে আধুনিকতা সম্মত তত্ত্ব কিংবা সামাজিক তত্ত্ব পরিলক্ষিত হয়। দেকার্ত বা কোঁৎ, মার্ক্স এবং ওয়েবার প্রমুখ হলেন আলোকায়নের (Enlightenment) যুগের আধুনিকতাবাদী চিন্তাবিদগণ। তাঁদের মতে সার্বিকীকরণ ও সামগ্রিকতাই হল জ্ঞানের ভিত্তি। অপরদিকে উত্তর-আধুনিকতাবাদীগণ জ্ঞানের বহুত্ববাদী তত্ত্ব, প্রেক্ষাপট-সাপেক্ষতাবাদী তত্ত্ব এবং জ্ঞানের অনির্ণীয়তার তত্ত্বের সমর্থনে আধুনিকতাবাদস্বীকৃত কার্য কারণবাদ তত্ত্ব এবং একক সামাজিক জ্ঞানতত্ত্বের (Unified Social

[3] Ali, Amjad. "Theory Of Knowledge: The Postmodern Perspective Of Lyotard." *Pakistan Journal of Educational Research* (2023): English,page no. 295.

Knowledge) খণ্ডন করেছে। এই প্রসঙ্গে সিম (Sim) বলেন- পাশ্চাত্য চিন্তাধারার কর্তৃত্বমূলক জ্ঞানের প্রতি, সর্বজনীন রাজনীতি এবং সামাজিক রীতিনীতির প্রতি সংশয় পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে বিকশিত হওয়া এক দার্শনিক আন্দোলন হল উত্তর আধুনিকতা।

উত্তর আধুনিকতার বৈশিষ্ট্যগুলির দ্বারা তৎকালীন সময়ের জ্ঞানতত্ত্বও প্রভাবিত হয়েছে। উত্তরাধুনিক তত্ত্বগুলির আলোচনা থেকে বোঝা যায় এই মতে জ্ঞান অসম্পূর্ণ এবং ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সমাহার বিশেষ। এই মতবাদটি সত্যতাকে একক অখণ্ড চরম হিসেবে দেখার পরিবর্তে সমভাবে বৈধ একাধিক দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে স্বীকৃতি দিতে চেয়েছে। এটি আসলে একাধিক ভাষা-খেলা, সংস্কৃতি নির্দিষ্ট সত্যতাকে গুরুত্ব প্রদান করেছে। তাহলে এই সময়ে জ্ঞান যে ভাষায় প্রকাশিত হয় তার ওপরেই কেবল জ্ঞানের আকার নির্ভর করে না, যে সংস্কৃতিতে জ্ঞান গঠিত হল সেটিও জ্ঞানের আকার প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উত্তর আধুনিক তত্ত্বে চরম সত্যকে খণ্ডন করার প্রবণতাকে সত্যের অস্বীকার হিসেবে মনে করা সঙ্গত নয়। কারণ এটিই আসলে বিচিত্র সংস্কৃতি, দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যক্তির অভিজ্ঞতা ইত্যাদি প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে সত্যের গঠনে বিশ্বাসী। অর্থাৎ সত্য ব্যক্তি, সংস্কৃতির পারস্পরিক মেলবন্ধনের দ্বারা ক্রমশ বিবর্তনশীল বলে পরিগণিত হয় এই মতবাদে।

লিওটার্ডকে অনুসরণ করে উত্তর আধুনিক সমাজে জ্ঞানের স্বরূপ:

উত্তর আধুনিক যুগের ফরাসি দার্শনিক এবং চিন্তাবিদগণের মধ্যে অন্যতম হলেন জাঁ ফ্রাঁসোয়া লিওটার্ড। সমকালীন সংস্কৃতি বিষয়ে তার মননশীল সমালোচনা তৎকালীন সময় থেকে অধুনাকাল পর্যন্ত অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে আছে। তিনি উন্নত দেশগুলিতে জ্ঞানের স্বরূপ, শর্ত, অধিকারী, ক্ষমতা ও জ্ঞানের সম্বন্ধ, আধুনিকতার ফসল মহাআখ্যানের পতন ও ভাষা খেলার গুরুত্ব ইত্যাদিকে বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে তৎকালীন কিউবেক সরকারের প্রেসিডেন্টের অনুরোধে *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge* শীর্ষক প্রতিবেদন রচনা করেন, যা উত্তর আধুনিক দর্শনের অন্তর্গত জ্ঞানতত্ত্ব শাখাকে বহুলাংশে সমৃদ্ধ করেছে।

প্রতিবেদনটি ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত হয় ১৯৭৯ সালে। ৮০র দশকে গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ করা হয়। উক্ত সময়ে বিজ্ঞান তথা প্রযুক্তি বিদ্যার সর্বাধিক উন্নতিও পরলক্ষিত হয়, (লিওটার্ড মূলত সকল কিছুকে যথা- জ্ঞানকে কম্পিউটারের উপযোগী হিসেবে নির্মাণ করার প্রবণতার কথা বলেছেন।) যা একটি রাষ্ট্রের ক্ষমতার মাপকাঠি হয়ে ওঠে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটাতে পারে- এমন জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানভিত্তিক প্রযুক্তি নির্মাণে সমর্থ রাষ্ট্র অধিক শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ফলত জ্ঞান তার স্বমূল্য হারায়। জ্ঞানের জন্য জ্ঞান লাভের পরিবর্তে ক্ষমতা অর্জনের জন্য জ্ঞান লাভই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। লিওটার্ড বলেন, "প্রযুক্তির উন্নয়নে জ্ঞানের স্বরূপ অপরিবর্তিত থাকতে পারে না। শিক্ষাকে বিপুল পরিমাণ তথ্যের আকারে অনুবাদ করা সম্ভবপর হলেই জ্ঞান বর্তমান মাধ্যমের জন্য সঙ্গত ও কার্যকরী হিসেবে গণ্য হবে"।[৪] অর্থাৎ যে জ্ঞান কম্পিউটারের ভাষায় অনুবাদের অযোগ্য তা বর্জিত হবে। এভাবে জ্ঞান মূলত পণ্য দ্রব্যে পরিণত হবে, যার ক্রয়-বিক্রয়ই উন্নতি তথা ক্ষমতার অর্জনের উপায় হয়ে উঠবে। যে যত অধিক তথ্যের অধিকারী তার ক্ষমতা তত অধিক। এই প্রকার জ্ঞানের যিনি নিয়ন্ত্রক তার কাছে রাজনৈতিক ক্ষমতাও কুক্ষীগত হয়ে যায়। লিওটার্ড আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ভবিষ্যৎ- এ রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ভূখণ্ডগত দ্বন্দ্ব ক্রমে তথ্যের কর্তৃত্বের দ্বন্দ্বে পর্যবসিত হবে। এই উত্তর আধুনিক যুগীয় জ্ঞানই আধুনিকতার অন্যতম প্রতিশ্রুতি এবং মহাআখ্যানমূলক সার্বিক মুক্তি তথা আলোকায়নের

[৪] "The nature of knowledge cannot survive unchanged within this context of general transformation." Lyotard, Jean Francois. *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*. Vol. 10. Minnesota: University of Minnesota Press, 1984. English .page no.04.

(Enlightenment) প্রকল্পের পতনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। লিওটার্ড উক্ত প্রতিবেদনে এই বিষয়ে অনুসন্ধানে সচেষ্ট হয়েছেন। এমনকি সমসাময়িক কালের জ্ঞানের পরিকাঠামো কীভাবে মানুষের জীবনযাপনকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং ব্যক্তি বিশেষের পরিচয় গঠন করে সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন লিওটার্ড।

উত্তর আধুনিক কালের দার্শনিক লিওটার্ড জ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনার প্রারম্ভিক প্রকল্প হিসেবে বলেছেন জ্ঞানের অবস্থা বা শর্তসমূহ সমাজ এবং সংস্কৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে যায়। তিনি এই সমাজ পরিবর্তনকে শিল্পোত্তর যুগে ও সংস্কৃতির পরিবর্তন বলতে উত্তর আধুনিক যুগে অনুপ্রবেশের কথা বলেছেন।[৫] বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সমাজ এবং সংস্কৃতিতে দ্রুত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, যা প্রকৃতপক্ষে আধুনিকতার মহাআখ্যান বিষয়ে সংশয়ের সূচনা করেছিল। বিজ্ঞান, ধর্ম, মার্কসবাদ, হেগেলবাদ সম্মত জগৎ বিষয়ক দর্শনকে মহাআখ্যান হিসেবে মনে করেছেন লিওটার্ড। এই প্রসঙ্গে সিম (Sim) বলেছেন আধুনিক যুগের পরিবর্তনে শিল্পোত্তর যুগ এবং উত্তর আধুনিক যুগের সূচনা ঘটে। যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং সকল কিছুর কম্পিউটার মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণের সুবিধা।

অন্যদিকে এই আধুনিক যুগে স্বীকৃত মহাআখ্যানগুলির প্রতি অবিশ্বাস এই সময়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। লিওটার্ড আধুনিক যুগের দুই প্রকার মহাআখ্যানের উল্লেখ করেছেন। যথা– অনুমানমূলক আখ্যান (Speculative Grand narrative) ও মুক্তিমূলক আখ্যান (Grand narrative of emancipation)। আধুনিক যুগে এই দুই প্রকার আখ্যান ভিত্তিক জ্ঞানলাভের মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রথমটির অস্তিত্ব জার্মান দর্শনে বিশেষত হেগেলের দর্শনে অনুভূত হয়। এর মূল বক্তব্য হল মানুষের জীবন তথা আত্মার উন্নতির মাধ্যম হল জ্ঞান। অর্থাৎ জ্ঞান যদি আত্মার বিকাশে, জীবনের উন্নতিতে উপযোগী হয় তবে তা জ্ঞান হিসেবে গণ্য হবে। ভিন্ন ভিন্ন ভাষা-খেলাকে একটি মাত্র কর্ম সম্পাদনে নিযুক্ত করা হয়, সেটি হল আত্মার বিকাশ সাধন। দ্বিতীয়টির বক্তব্য হল জ্ঞান মুক্তির সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন। সর্বজনীন শিক্ষার মাধ্যমে দমন, পীড়ন থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব। মানুষ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভের মাধ্যমে কুসংস্কার, অজ্ঞানতার বন্ধন থেকে মুক্ত হবে। সমগ্র মানবতার মুক্তির জন্যে জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয় আধুনিকতাবাদে। এভাবে মহাআখ্যান ভিত্তিক জ্ঞান অর্জনের প্রবণতা স্বতন্ত্র ভাবে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের শাখার চর্চার ব্যাঘাত ঘটায়।[৬]

লিওটার্ড মহাআখ্যানের পরিবর্তে ক্ষুদ ক্ষুদ্র আখ্যান, প্রেক্ষাপট অনুযায়ী জ্ঞানের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি এমন কোনো বৃহৎ তত্ত্বকে স্বীকৃতি দিতে সম্মত নন যা যাবৎ বিষয়বস্তুকে একটিমাত্র মূল্যে বিচার করে। যেমন– মার্ক্সীয় তত্ত্বে বর্ণিত বিশ্বের ইতিহাস বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনহীনভাবে প্রচলিত হয়ে আছে। ঘটনা সাপেক্ষে কিংবা সংস্কৃতি সাপেক্ষে তার কোনোরূপ পরিবর্তন হয়নি। লিওটার্ডের মতে এমন কর্তৃত্বমূলক বৃহৎ আখ্যানকে খণ্ডন করা উচিত। যার পরিবর্তে ক্ষুদ্র আখ্যান গুলিকে স্থান করে দিতে হবে। যার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর সমস্যা, প্রয়োজনকেও গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব হয়, যেহেতু এই আখ্যানগুলিকে প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন, সংশোধন করা সম্ভব। মহাআখ্যানের পরিবর্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আখ্যান গৃহীত হলে বিভিন্ন মতামতের সুচারু প্রতিফলন সম্ভবপর হয়। একাধিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দেওয়ার মাধ্যমে জগৎ বিষয়ক পরিশীলিত ধারণা গড়ে ওঠে। বৃহৎ আখ্যানের প্রেক্ষিতে তাৎপর্যহীন ছোটো ছোটো ঘটনাগুলি তথা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর সমস্যা, প্রয়োজন, লক্ষ্যগুলিও গুরুত্ব

[৫] "Our working hypothesis is that the status of knowledge is altered as societies entry what is known as the Postindustrial age and Culture enter what is known as the Postmodern age"- ibid. page no. 03.

[৬] Bheemnath, Binu G.The crisis of narratives_implications in Lyotard. 2011.University of Kerala, Kerala, Ph. D dissertation, page no. 224-229.

পায় ক্ষুদ্র আখ্যান স্বীকৃত হওয়ার মাধ্যমে। তবে আধুনিকতার মহাআখ্যানকে সম্পূর্ণ বর্জন করাও যায় না। এই আখ্যানগুলিই মানবজাতিকে মহান লক্ষ্য লাভের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে পারে। কিন্তু মহান লক্ষ্য লাভের তাড়নায় ক্ষুদ্র স্বার্থ, সংস্কৃতি সাপেক্ষ লক্ষ্যগুলি মূল্যহীন হয়ে পড়ে। আসলে মহাআখ্যানগুলিতে আত্মবলিদানের মাধ্যমে বৃহৎ কল্যাণ, উন্নতি, বিকাশের স্বপ্ন দেখানো হয়। এই কাহিনিগুলি প্রাচীন তথাকথিত কাহিনির থেকে এখানেই অভিনব হয়ে ওঠে। অর্থাৎ চিরাচরিত আখ্যানে একদা ঘটে যাওয়া অবনতি, উন্নতি, সাফল্য বর্তমান কথকের দ্বারা যুগোপোযোগী হিসেবে উপস্থাপিত হয়। কিন্তু আধুনিক কালের মহাআখ্যান ভবিষ্যতের সাথে সংযুক্ত, অর্থাৎ আগামীর সাফল্যের কথা বলে। যেমন- আলোকায়নের (Enlightenment) অন্যতম অংশ ঔপনিবেশিকতাবাদের মাধ্যমে অনুন্নত দেশ, জাতি, সভ্যতার উন্নয়নের স্বপ্ন দেখা হয়। যদিও এর করুণ ফলাফলগুলি যথা বিভিন্ন সংস্কৃতির ধ্বংস, ভাষার অবক্ষয়, পরাধীনতা ও দাসত্বের শৃঙ্খল ইত্যাদি পরিণতিগুলি আলোচিত হয়নি। লিওটার্ড তাই ক্ষুদ্র আখ্যানগুলিকেই সমর্থন জানিয়েছেন।

দার্শনিক লিওটার্ড বিশ্লেষণী দর্শনের অন্যতম প্রবক্তা উইটগেনস্টাইনকে অনুসরণ করে ভাষা-খেলার (Language Game) উল্লেখ করেছেন। উত্তর আধুনিককালে মহাআখ্যানসমূহ বিপর্যস্ত হলে তার স্থান অধিগ্রহণ করে একাধিক ভাষা-খেলা। প্রতিটি প্রেক্ষাপট, বিষয়, প্রয়োজন, আলোচনার শাখায় নিজ নিজ ভাষা-খেলা উদ্ভূত হয়। সমাজে প্রচলিত জ্ঞানের শাখা যথা- পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, সাহিত্য, আইন, নীতিবিদ্যা এমনকি গালগল্প এই সকল ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র নিয়ম থাকে যা সেই ক্ষেত্রে প্রযুক্ত বাক্যের বৈধতা নির্ধারণ করে। সেক্ষেত্রে একটি ভাষা-খেলায় যে বাক্য বৈধ, অন্য ভাষা খেলায় তা অবৈধ রূপেও প্রতিপাদিত হতে পারে। যেমন– ইতিহাসের কাহিনি হল অতীত বিষয়ক, মনোবিদ্যা মনের কথা বলে, সমাজবিজ্ঞানের কাহিনিগুলি সমাজের পরিবর্তন ও সমাজস্থ মানুষের ওপর তার প্রভাব নিয়ে কথা বলে। একই ভাবে বিজ্ঞান বহিরাগত তথা ইন্দ্রিয়লব্ধ জগৎকে কেন্দ্র করে আখ্যানের উপস্থাপন করে। এভাবে প্রতিটি ভাষা-খেলাই গুরুত্বপূর্ণ হয়। এই একাধিক ভাষা-খেলার পরিবর্তে একটিমাত্র ভাষা-খেলায় সকল ভাষা-খেলার বিষয়বস্তুকে পর্যবসিত করার চেষ্টা যুক্তিহীন কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়।

অর্থাৎ লিওটার্ডের মতে উত্তর আধুনিকযুগের জ্ঞানের উৎস হল পরস্পর সঙ্গতিহীন, বিরোধী ভাষা-খেলা। আধুনিক যুগে বিভিন্ন ক্ষেত্রের মতামতের ঐক্যমত্যের মধ্য দিয়ে পূর্ণ জ্ঞানে উপনীত হওয়ার প্রয়াসের ফলে এক বা একাধিক মতামত অবহেলিত হয়। এটি স্বাধীন চিন্তার ক্ষেত্রটিকেও অবরুদ্ধ করে। লিওটার্ড, তাঁর আলোচনায় মতানৈক্যকে, বৈচিত্র্যকে, বহুত্বকে গুরুত্ব দিয়েছেন। বর্তমানে সমাজে বিদ্যমান চিন্তা, মতবাদের বিরুদ্ধে প্রশ্নের উত্থাপন ও মতানৈক্যের দ্বারাই নব জ্ঞানের উন্মোচন সম্ভব। উত্তর আধুনিক জ্ঞান কোনো কর্তৃত্ববোধক হাতিয়ার নয়। এই জ্ঞান বৈচিত্র্যকে গ্রহণের জন্য পারদর্শী করে তোলে। এই জ্ঞান সহিষ্ণু করে তোলে। একই সমাজে একাধিক মত, ভাষা-খেলার অবস্থান আসলে আমাদের চিন্তার ক্ষেত্রকে, সম্ভাবনার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে।

মিশেল ফুকোকে অনুসরণ করে জ্ঞানের আলোচনা:

উত্তর আধুনিক যুগের ফরাসি দার্শনিকদের মধ্যে অন্যতম মিশেল ফুকোর আলোচনা ক্ষেত্রটি জ্ঞানের নানা শাখায় বিস্তার লাভ করেছে। দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, মনোবিদ্যা, আইন তথা জ্ঞানের প্রমুখ শাখায় তাঁর চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর আলোচনার অন্যতম কেন্দ্রীয় বিষয় হল ক্ষমতা (Power), তিনি ক্ষমতা বিষয়ে চিরাচরিত ধারণাকে গ্রহণ করেননি। ক্ষমতাকে দমনমূলক, নঞর্থক হিসেবে চিহ্নিত করার পরিবর্তে ক্ষমতাকে গঠনমূলক, সদর্থক, কার্যকরী হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন। ফুকোর ক্ষমতা সম্পর্কিত মতবাদের

মধ্যেই জ্ঞানের আলোচনা প্রস্ফুটিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতার মাধ্যমে জ্ঞানের আকার যেমন গঠিত হয়, একইভাবে জ্ঞানের মাধ্যমে ক্ষমতার গঠনমূলক রূপটিও প্রকাশিত হয়। এই অর্থে এই দুটিকে বিচ্ছিন্ন করে বোঝা যায় না। তাই এই দুটি পদকে ক্ষমতা/জ্ঞান এইরূপে ব্যবহার অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয় ফুকোর দর্শনে।

মিশেল ফুকোর দার্শনিক আলোচনার ধারাকে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। তাঁর আলোচনায় দুই প্রকার পদ্ধতির প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। প্রথম পর্বের কাজে Archaeology of Knowledge এবং পরবর্তী পর্বে Geneology of Power এই পদ্ধতির প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। ফুকো কর্তৃক প্রযুক্ত দ্বিবিধ পদ্ধতির চালিকাশক্তিরূপে আলোচনা যার ইংরেজী অনুবাদ হল 'Discourse', তা স্বীকৃত হয়েছে। সমাজের নানা স্তরে ও প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন প্রকার বক্তৃতা (স্পীচ) র প্রয়োগ দেখা যায়। এই বক্তৃতাগুলির অনুশীলনের সংকলন হল আলোচনা (Discourse)। প্রতিটি আলোচনা সমাহারের নিজস্ব কিছু মূল্যবোধ, অর্থ, বিভাগ আছে। আলোচনা অর্থাৎ ডিসকোর্সগুলি বিষয়ের সত্যতাকে নির্মাণ করে, আবার সত্যতার মাপকাঠিতে বিষয়কে গঠন করে। তিনি উত্তর আধুনিকতার দুটি বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়েছেন; প্রথমত, আলোকায়নের (Enlightenment) মানবতাবাদী প্রকল্পের খণ্ডন এবং স্বাধীন মানবতাবাদ ও কাঠামোবাদের বিরোধিতা। ফুকো আধুনিকতার সামগ্রিক একক অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গিকে বর্জন করেছেন, যেহেতু সমাজে প্রচলিত ডিসকোর্সগুলি একটি স্থানে বা কালে স্থায়ী নয়, সেগুলি বিভিন্ন স্থান, কালে পরিবর্তিত হয়ে যায়। সেই অনুসারে ডিসকোর্সে ব্যবহৃত পদ বা শব্দের অর্থকরণ ঘটে এবং প্রেক্ষাপট অনুসারে শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যায়। ফুকো *Madness and Civilization* গ্রন্থে madness পদটির পরীক্ষণের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন কীভাবে একটি পদ সমাজ, কাল, স্থান ভেদে ভিন্ন অর্থের জ্ঞাপক হয়ে ওঠে। যেমন একসময় একটি ডিসকোর্স অনুযায়ী madness বলতে একপ্রকার নৈতিক দুর্নীতিকে বোঝানো হলেও পরবর্তী কালে অন্য ডিসকোর্স অনুযায়ী বৌদ্ধিকতার বিরোধী হল madness, অর্থাৎ চিকিৎসা কার্যের সাথে সম্পর্কিত কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মনের অসুস্থতা হিসেবে স্বীকৃত হয়। তাহলে প্রতিটি ডিসকোর্স পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজ, প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃত্বের প্রকার, ক্ষমতা, সমাজে একটি বিষয়কে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়ে যায়। অর্থাৎ ডিসকোর্সগুলি কেবল কতকগুলি বক্তৃতা সমাহারই নয়, সমাজস্থ প্রতিষ্ঠানগুলির নিয়ম নীতিরও নিয়ন্ত্রক হয়। তাই এক অখণ্ড সত্য স্বীকার করা যায় না। তিনি বলেন কোনোকিছু সত্য হয় সেই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে, অন্য প্রেক্ষাপটে তা সত্য নাও হতে পারে। ফুকো একথাও স্বীকার করেননা যে দুটি ভিন্ন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে একই ঘটনা ঘটবে, তাহলে প্রেক্ষাপট অনুযায়ী সত্য পরিবর্তিত হবে, প্রত্যেক কালে ডিসকোর্সগুলি ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের সৃষ্টি করবে, ডিসকোর্স অনুসারে বস্তু, বিষয়, জ্ঞানের চর্চার প্রকার পরিবর্তিত হবে। যেমন– ম্যাডনেসের কোনো বস্তুনিরপেক্ষ অস্তিত্ব বা অর্থ স্বীকৃত হয়নি। ঐতিহাসিক কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে উক্ত শব্দের অর্থের বিনির্মাণ ঘটে।

অর্থাৎ ইতিহাস ও সংস্কৃতি অনুসারে জ্ঞানের বিষয় এবং জ্ঞানের চর্চা নির্দিষ্ট হয়। ওই বিশেষ সংস্কৃতি তথা ডিসকোর্সের বাইরে একটি শব্দ তার অর্থ হারায়। বিশেষ সমাজে ও সময়ের বাদানুবাদ ও কৌশল দ্বারা নির্ধারিত অর্থ যুক্ত হয়ে সেই সময়ের ডিসকোর্সের তথা জ্ঞানের অংশ হয়। ফুকো ঐতিহাসিক সময়সমূহের মধ্যে কোনো অন্তর্বর্তী যোগাযোগ স্বীকার করেননি। দুটি সময়কালকে অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন হিসেবে স্বীকার করেছেন। সেই অনুসারে ডিসকোর্স ও জ্ঞান পরিবর্তিত হতে থাকে।

ফুকো তাঁর কাজের দ্বিতীয় পর্বে জ্ঞান কীভাবে একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে অপরের আচরণ নিয়ন্ত্রণে নিযুক্ত হতে পারে সেইদিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এই পর্যায়ে ডিসকোর্স বলতে কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে কতকগুলি বাক্যের স্বতন্ত্র নির্মাণকে বোঝানো হয়নি। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ডিসকোর্সের মাধ্যমে জ্ঞান

ও ক্ষমতার বিচিত্র সম্বন্ধ উপস্থাপিত হয়েছে। তিনি জ্ঞান ও ক্ষমতার সম্বন্ধের স্বরূপ নিরূপণে সচেষ্ট হয়েছেন। এরই সাথে একটি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নির্দিষ্ট নিয়ম-শৃঙ্খলা, কৌশল ইত্যাদির মধ্যে ক্ষমতা কীরূপে পরিচালিত হতে পারে তার, আলোচনায় গুরুত্ব দিয়েছেন।

দার্শনিক ফুকো ক্ষমতাকে দমন-পীড়নমূলক নঞর্থক হিসেবে গ্রহণ করেননি। চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে ক্ষমতা হল এমনকিছু যা সমাজের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বা সার্বভৌম বা রাষ্ট্রের দিক থেকে নিম্নস্তরে প্রবাহিত হয়। সামাজিক পিরামিডের উপরিস্থিত শ্রেণির হাতে কুক্ষীগত থাকে ক্ষমতা। ফুকোর মতে ক্ষমতা চক্রাকারে প্রবাহিত হয়। এই অর্থে সমাজের প্রতিটি স্তরেই ক্ষমতার উপস্থিতি। ক্ষমতা কার্যকরী হয় জ্ঞানের মাধ্যমে। জ্ঞান কোন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ হতে পারে অথবা কোন ক্ষেত্রে তা প্রয়োগযোগ্য নয় তার নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে ক্ষমতা জ্ঞানের সাথে সংযুক্ত হয়। আবার ক্ষমতার সদর্থক রূপটিও প্রকাশ পায় জ্ঞানের আকার প্রদানের মাধ্যমে।

তাহলে প্রশ্ন হয় ক্ষমতা সম্পৃক্ত জ্ঞানই কি সত্য? এই প্রসঙ্গে বলা যায় জ্ঞান ক্ষমতার অধীনস্থ হয়ে বা পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত হয়ে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হলে তার বাস্তব প্রভাব থাকবে, সেই অনুসারে তা সত্য হবে। যেমন- একক অভিভাবকত্ব একটি অপরাধ এরূপ জ্ঞান সত্য হতে পারে অথবা মিথ্যা হতে পারে। এখন একটি সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তি দ্বারা যদি একক অভিভাবকত্ব অপরাধমূলক কাজ হিসেবে গ্রহণ করা হয় তাহলে সেই অনুসারে একক অভিভাবকের শাস্তি হবে, যার বাস্তব প্রভাব অভিভাবক এবং শিশু উভয়ের ওপরই পড়বে। বাস্তব প্রভাব অনুসারে বিশেষ সমাজ, পরিস্থিতি, প্রেক্ষাপটে উক্ত জ্ঞান সত্য হবে। যদিও সার্বিক অর্থে তা সত্য নয়।[৭]

প্রাচ্য-পাশ্চাত্য নির্বিশেষে সকল ক্ষেত্রের তথা কালের মানুষ অজানাকে জানার জন্য, অচেনাকে চেনার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। বৈচিত্র্যময় জগৎ মানুষকে যেমন বিস্মিত করে তেমনি ব্যাকুল করে সেই সম্বন্ধে জানার জন্য। জ্ঞান লাভের জন্য প্রয়াসী হয় মনুষ্য জাতি। জ্ঞানের বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের মাধমে সেই বিষয়ক সংশয় নিবৃত্ত হয়, কিন্তু প্রশ্ন হয় জ্ঞান কীভাবে লাভ হয়? তার স্বরূপ কী? তার সীমা বা পরিধি কতটা?, প্রত্যেক যুগে এই প্রশ্ন নব নব আঙ্গিকে উদ্ভাসিত হয়। যেহেতু কালের সাথে, যুগের সাথে তাল মিলিয়ে পরিবর্তিত হয় সামাজিক অবস্থা ও সমাজস্থ মানুষের ধ্যান-ধারণা ও আশা আকাঙ্ক্ষা। আধুনিক যুগে বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান তথা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানই চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য হয়। যেহেতু এই সময়ে গড়ে ওঠা মহাআখ্যানগুলিতে যে মানবতার বিকাশ বা স্বাধীনতা, প্রগতির কথা বলা হয় তা এই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অন্যতম ফসল হিসেবে পাওয়া যাবে বলে মনে করা হতো। তাই এই সময়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে তথা বুদ্ধির দ্বারা সকল কিছুকে বিচার করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু পর পর দুইটি ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধ মানুষকে আশাহত করে। মহাআখ্যানগুলির প্রতি মানুষ আস্থা হারায়। এর মধ্য দিয়েই উত্তর আধুনিক যুগের সূচনা ঘটে। যা অখণ্ড জ্ঞান ও অখণ্ড সত্যের পরিবর্তে প্রেক্ষাপট অর্থাৎ context অনুযায়ী জ্ঞান ও সত্যের কথা বলে। উপরোক্ত উত্তর আধুনিক যুগীয় দুইজন দার্শনিক যথাক্রমে লিওটার্ড ও ফুকোর আলোচনায় সেরূপ জ্ঞানের পরিচয় মেলে। উভয় দার্শনিকের জ্ঞান সম্বন্ধীয় আলোচনার গতি এক হলেও দার্শনিক ফুকোর আলোচনায় ডিসকোর্স এর অবতারণা জ্ঞান বিষয়ক আলোচনায় অভিনবত্ব প্রদান করেছে। এমনকি জ্ঞানের সাথে ক্ষমতার সম্বন্ধ দুই দার্শনিকের আলোচনাতেই আলোচিত হয়েছে। কিন্তু এই সম্বন্ধকে দেখার আঙ্গিক সম্পূর্ণ ভিন্ন। লিওটার্ডের মতে জ্ঞানের তথা তথ্য আকারে আকারিত

[৭] Hall, Stuart. "Foucault: Power,Knowledge and Discourse." Hall, Stuart. *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. London: Sage Publications, 1997. Page no. 76.

জ্ঞানের পরিমাণ যত বেশি হবে ক্ষমতাও তত বেশি হবে। ফুকো জ্ঞানের স্বরূপের আলোচনা প্রসঙ্গেই ক্ষমতার কথা বলেন। ক্ষমতার ধারণাটি ফুকোর দর্শনে সদর্থকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। তা সম্ভবপর হয়েছে ক্ষমতা ও জ্ঞানের ধারণার মেলবন্ধনের ফলে। অন্যদিকে লিওটার্ড আশঙ্কা করেছেন বর্তমান তথ্যভিত্তিক জ্ঞানের বিস্তারের সাথে ক্ষমতার সমহারে বিস্তার ঘটায় তা তথ্যের অধিকারকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত ঘটাতে পারে।

তবুও সমকালীন এই দুই দার্শনিক জ্ঞান সম্পর্কে যে মতবাদের উপস্থাপন করেছেন তা উত্তর আধুনিক জ্ঞানতত্ত্বকে সমৃদ্ধ করেছে। বৈজ্ঞানিক উন্নতি– অত্যাধুনিক প্রযুক্তির দৌলতে মানুষের জীবনে পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী হয়েছে। জ্ঞানের বিষয়সমূহেও নবত্ব এসেছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেও বিপুল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এই সময়ে জ্ঞানকে যুগ ও কালের উপযোগী করে আলোচনা তাই অপরিহার্য হয়ে ওঠে। জাঁ ফ্রাঁসোয়া লিওটার্ড ও মিশেল ফুকো বর্তমান পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতি রেখে জ্ঞানের নব আঙ্গিকের উপস্থাপন করেছেন। যা জ্ঞানের আলোচনাকে সমৃদ্ধ করে তোলে।

Bibliography:

১. Ali, Amjad. "Theory Of Knowledge: The Postmodern Perspective of Lyotard." Pakistan Journal of Educational Research (2023): 293 - 302. English.
২. Best, Steven and Kellner Douglas. Postmodern theory: critical interrogations. New York: Guillford Press, 1991. English.
৩. Bheemnath, Binu G. The crisis of narrative implications in Lyotard. Kerala: University of Kerala, 2011. English.
৪. Foucault, Michel. Archaeology of Knowledge and the Discourse of Language. New York: Harper Colophon, 1965. English.
৫. Hall, Stuart. "Foucault: Power, Knowledge and Discourse." Hall, Stuart. Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London: Sage Publications, 1997. 72-80. English.
৬. Lyotard, Jean Francois. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Vol. 10. Minnesota: University of Minnesota Press, 1984. English.
৭. Pathak, Shailendra K. "eGyankosh." 10 April 2020. http://egyankosh.ac.in//handle/123456789/57858. English. 10 04 2020.
৮. Sim, Stuart. The Routledge Companion to Postmodernism. Ed. Stuart Sim. Abingdon, Oxfordshire: Routledge, 2011. English.

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1896-1903
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.413

রবীন্দ্র কাব্যনাট্য ‘চিত্রাঙ্গদা’: একটি বিশ্লেষণ

ড. শতাব্দী ভৌমিক, *স্বাধীন গবেষক, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 28.03.2026; Accepted: 29.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

While engaged in the work of the Zamindari in Orissa, Rabindranath composed the poetic drama 'Chitrangada' while sitting in the hut of Pandua. However, it was published in the 'Sadhana' magazine in the month of Bhadra, a year after its composition. Rabindranath Tagore translated this poetic drama 'Chitrangada' into English again, naming it 'Chitra' (1913). Rabindranath Tagore used the story of Arjuna and Chitrangada in the Mahabharata in a different way. The connection between the original Mahabharata story and the poetic drama written by Rabindranath is very tenuous. The character of Chitrangada is a completely independent creation of Rabindranath. He has molded this character. Rabindranath wanted to express a special theory through the character of Chitrangada, which Rabindranath himself hints at at the beginning of the poetic drama: If a beautiful young woman feels that she has deceived her lover's heart with the illusion of her youth, he may reproach her for making her beauty the main part of his fortune. When Rabindranath tried to give this idea the form of a poetic drama, he was reminded of the story of Arjuna and Chitrangada from the Mahabharata. Incidentally, in this case, when Rabindranath Tagore is making some structural changes from a poetic drama to a drama 'Chitra', there are some differences due to translational changes.

Keywords: Sadhana, molded, deceived, illusion, reproach, translational

রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১–১৯৪১) যখন ‘চিত্রাঙ্গদা’ (১৮৯১) রচনা করছেন তখন তিনি উড়িষ্যার জমিদারি দেখাশোনার জন্য পান্ডুয়ার কুঠিতে ছিলেন। উড়িষ্যার জমিদারীর কাজে নিযুক্ত থাকার সময় পান্ডুয়ার কুঠিতে বসে রবীন্দ্রনাথ ‘চিত্রাঙ্গদা’ কাব্যনাট্য রচনা করেন। কিন্তু প্রকাশিত হয় রচনার এক বছর পরে ১২৯৯ সালে ভাদ্র মাসে ‘সাধনা’ পত্রিকায়। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে এই কাব্যনাট্যের জন্য ছবি এঁকেছিলেন তরুণ শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ। আর সেকারণেই রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থটি তাঁকেই উৎসর্গ করেন। সেখানে লেখেন- “তুমি আমাকে তোমার যত্নরচিত চিত্রগুলি উপহার দিয়াছ, আমি তোমাকে আমার কাব্য এবং স্নেহ-আশীর্বাদ দিলাম।”[১] মহাভারতে চিত্রাঙ্গদা এবং অর্জুনের যে কাহিনি রয়েছে তাকে অবলম্বন করেই রবীন্দ্রনাথ এই অসামান্য কাব্যনাট্য রচনা করলেন। রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এ সম্পর্কে লিখছেন –

> "নরনারীর যৌন-অনুরাগে পরস্পরকে পাইবার শাশ্বত আকাঙ্ক্ষা এই কাব্যে ভাষা পাইয়াছে। মানব-বুভুক্ষার আদিম প্রেরণাকে কবি স্থূল হস্তে স্পর্শ করেন নাই – যদিও তাহার অবসর ছিল যথেষ্ট; উহাকে লইয়া সৌন্দর্যলোকের একটা নূতন স্বর্গ, নারীচিত্তের একটি অপরূপ মহিমা সৃষ্টি করিলেন। ভাষার মধ্য দিয়া শব্দের 'কুহকজাল' প্রধানত নিন্দার্থক দীপ্তিতে কী অসীম সৌন্দর্য সৃষ্টি করা যাইতে পারে, তাহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হইতেছে 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যকাব্য"[২]

রবীন্দ্রনাথ মহাভারতে অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার কাহিনিকে প্রয়োগ করলেন অন্যভাবে ভিন্ন আঙ্গিকে। মহাভারতে আমরা দেখি অর্জুন অগস্ত্যবট, বশিষ্ঠ পর্বত এবং তুঙ্গনাথে উপস্থিত হয়ে আত্মশুদ্ধি করার পর ব্রাহ্মণদের অনেক ধন দান করলেন। তারপর তিনি বিভিন্ন তীর্থ দর্শনের উদ্দশ্যে গমন করলেন। তাঁর অনুগামী ব্রাহ্মণেরা কলিঙ্গ রাজ্য থেকে ফিরে গেলে, অর্জুন অল্পসংখ্যক সহচর নিয়ে সমুদ্র সন্নিহিত দেশগুলিতে যাত্রা শুরু করলেন। এরপর তিনি মহেন্দ্র পর্বত দর্শনের পর সমুদ্র বরাবর পথ অনুসরণ করে মণিপুর রাজ্যে উপস্থিত হন। মণিপুর রাজ্যের বিভিন্ন তীর্থ ও পবিত্র স্থান পরিভ্রমণের পর মণিপুরের ধার্মিক রাজা চিত্রবাহনের কাছে এসে উপস্থিত হন। রাজার চিত্রাঙ্গদা নামের এক পরম সুন্দরী কন্যা ছিল। অর্জুন চিত্রাঙ্গদার রূপে মুগ্ধ হন এবং রাজাকে বলেন –

> "দৃষ্ট্বা চ তাং ববারোহাং চকমে চৈত্রবাহনীম্।।১৬।।
> অভিগম্য চ রাজানমবদৎ স্বং প্রয়োজনম্।
> দেহি মে খল্বিমাং রাজন্! ক্ষত্রিয়ায় মহাত্মনে।।১৭।।
> তচ্ছ্রু ত্বা ত্বব্রবীদ্রাজা কস্য পুত্রোহসি নাম কিম্।
> উবাচ তং পান্ডবোহহং কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ।।১৮।।"[৩]

অর্জুন রাজার কাছে তাঁর কন্যার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব দেন। রাজা তখন অর্জুনের পরিচয় জানতে চান। অর্জুনের পরিচয় জানার পর রাজা অর্জুনকে জানান তাদের বংশে প্রভঞ্জন নামে এক রাজা ছিল। অপুত্রক হওয়ার জন্য রাজা পুত্র কামনায় মহাদেবের উদ্দেশ্যে তপস্যা করেন। মহাদেব তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে রাজাকে বর দেন –

> "স তস্মৈ ভগবান্ প্রাদাদেকৈকং প্রসবং কুলে।। ২১।।
> একৈকঃ প্রসবস্তস্মাদ্ভবত্যস্মিন্ কুলে সদা।
> তেষাং কুমারাঃ সর্ব্বেষাং মম জজ্ঞিবে।।২২।।"[৪]

অর্থাৎ রাজার বংশে প্রত্যেক পুরুষের একটি করে পুরুষ সন্তান হবে। রাজার পূর্বপুরুষ সকলের পুরুষ সন্তান ছিল। কেবলমাত্র রাজারই একটা কন্যা সন্তান হয়। রাজা অর্জুনকে জানান, তিনি তাঁর কন্যাকেই পুত্র হিসেবে পালন করে এসেছেন। এই কন্যার যে পুত্রসন্তান হবে সেই রাজার বংশকর হবে এই বিধান অনুসারে রাজা যজ্ঞানুষ্ঠান করেছেন। তাই অর্জুনের যে সন্তান হবে তাকে যদি অর্জুন চিত্রবাহন রাজার বংশকর হিসেবে দিতে বদ্ধ পরিকর হন তাহলে রাজা তাঁর কন্যার সঙ্গে অর্জুনের বিবাহে সম্মতি দেবেন এই কথা জানান। অর্জুন রাজাকে কথা দেন এবং তিন বছর রাজবাড়িতে বাস করেন। এটা ছিল মহাভারতে অর্জুন এবং চিত্রাঙ্গদার কাহিনি। যে কাহিনিতে উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। চিত্রাঙ্গদা চরিত্রটির কেবলমাত্র উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথ রচিত কাব্যনাট্যের সঙ্গে মূল মহাভারতের কাহিনির সংযোগ খুবই ক্ষীণ। চিত্রাঙ্গদা চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথের সম্পুর্ণ স্বতন্ত্র সৃষ্টি। এই চরিত্রটিকে ঢেলে সাজয়েছেন তিনি।

রবীন্দ্রনাথ একটি বিশেষ তত্ত্বকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন চিত্রাঙ্গদা চরিত্রটির মাধ্যমে। যার ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং দিচ্ছেন কাব্যনাট্যের সূচনায় –

> "সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হৃদয় ভুলিয়েছে তা হলে সে তার সুরূপকেই আপন সৌভাগ্যের মূখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতিন বলে ধিক্কার দিতে পারে। এ যে তার বাইরের জিনিস, এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহ-বিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে যদি তার অন্তরের মধ্যে যথার্থ চরিত্রশক্তি থাকে তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমিকের পক্ষে মহৎ লাভ, যুগল জীবনের জয়যাত্রার সহায়। সেই দানেই আত্মার স্থায়ী পরিচয়, এড় পরিণামে ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই, অভ্যাসের ধূলিপ্রলেপে উজ্জ্বলতার মালিন্য নেই। এই চারিত্রশক্তি জীবনের ধ্রুব সম্বল, নির্মম প্রকৃতির আশু প্রয়োজনের প্রতি তার নির্ভর নয়।"[৫]

এই ভাবটিকে রবীন্দ্রনাথ যখন কাব্যনাট্যের অবয়বে রূপ দিতে চেয়েছেন তখনই তাঁর স্মরণে এসেছে মহাভারতের অর্জুন এবং চিত্রাঙ্গদার কাহিনি। হয়তো রাজা প্রভঞ্জনের কন্যাকে পুত্র হিসেবে পালন করার এই বিষয়টি রবীন্দ্রনাথকে কোথাও নাড়া দিয়েছিল। আর তাই চিত্রাঙ্গদার, পুরুষের মনকে নারীর সহজাত প্রতিভায় জয় করে নেওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত থাকা। যা থেকেই কাহিনির সূত্রপাত। এই ভাবটিকে কাব্যনাট্যের আঙ্গিকে পরিবেশনের জন্য রবীন্দ্রনাথ এগারোটি দৃশ্যে এটিকে বিভক্ত করলেন। রবীন্দ্র কাব্যনাট্যে দেখি, চিত্রাঙ্গদা অর্জুনকে প্রত্যক্ষ করে এবং তার বর্ণনা সে মদন ও বসন্তের কাছে করে। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ মহাভারতে চিত্রাঙ্গদার যে জন্মবিবরণ রয়েছে তা চিত্রাঙ্গদার সংলাপের মধ্য দিয়ে তুলে ধরলেন তাঁর এই রচনায় –

"চিত্রাঙ্গদা। আমি চিত্রাঙ্গদা মণিপুররাজকন্যা।
মোর পিতৃবংশে কভু পুত্রী জন্মিবে না –
দিয়াছিলা হেন বর দেব উমাপতি
তপে তুষ্ট হয়ে। আমি সেই মহাবর
ব্যর্থ করিয়াছি।"[৬]

পুরুষের বেশে যুবরাজরূপে সে স্বেচ্ছায় তার জীবন যাপন করেছে। তাই নারীর সহজাত সুনিপুণ ভঙ্গিমা তার অজানা। শিকারের সময় অর্জুনকে কীভাবে চিত্রাঙ্গদা দর্শন করেছে এবং তার ফলস্বরূপ তার মধ্যে নারীচিত্তের জাগরণ ঘটেছে তার ভাব ব্যক্ত করেছেন নাট্যকার –

"চিত্রাঙ্গদা। একদিন
গিয়েছিনু মৃগ-অন্বেষণে একাকিনী
ঘন বনে, পূর্ণা–নদীতীরে। তরুমূলে
বাঁধি অশ্ব, দুর্গম কুটিল বনপথে
পশিলাম মৃগপদচিহ্ন অনুসরি।
ঝিল্লিমন্দ্রমুখরিত নিত্য–অন্ধকার
লতাগুল্মে গহন গম্ভীর মহারণ্যে
... ...

সেই মুহূর্তেই জানিলাম মনে, নারী
আমি। সেই মুহূর্তেই প্রথম দেখিনু
সম্মুখে পুরুষ মোর।"[৭]

নারীত্বের বিকাশ তথা জাগরণের বিবরণ চিত্রাঙ্গদা স্বয়ং দিয়েছেন মদনের কাছে। এরপরই চিত্রাঙ্গদার মুখে ব্যক্ত হয়েছে তাঁর প্রেম নিবেদনের ব্যর্থতার কাহিনি। অনভ্যস্ত সাজে নিজেকে সজ্জিত করে চিত্রাঙ্গদা অরণ্যের শিবালয়ে উপস্থিত হয়ে প্রেম নিবেদন করলে, তাঁর কাছে ফিরে আসে অর্জুনের প্রত্যাখ্যান বাণী –

"চিত্রাঙ্গদা। শেষ কথা তাঁর
কর্ণে মোর বাজিতে লাগিল তপ্ত শূল –
"ব্রহ্মচারিব্রতধারী আমি। পতিযোগ্য
নহি বরাঙ্গনে।"[৮]

অর্জুনের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে চিত্রাঙ্গদা নিজেকে ধিক্কার জানিয়েছে। নারী হয়ে পুরুষের মনকে জিততে না পারায় নিজের সকল অধীত বিদ্যা তাঁর কাছে ব্যর্থ মনে হয়েছে। তাই মদন এবং বসন্তের কাছে সৌন্দর্যের ভিক্ষা জানিয়েছে যাতে সে জিতে নিতে পারে অর্জুনের মন। তাই চিত্রাঙ্গদার কণ্ঠে ধ্বনিত কাতর আবেদন –

"চিত্রাঙ্গদা। হে অনঙ্গদেব, সব দম্ভ মোর
এক দন্ডে লয়েছ ছিনিয়া – সব বিদ্যা
সব বল করেছ তোমার পদানত।
এখন তোমার বিদ্যা শিখাও আমায়,
দাও মোরে অবলার বল, নিরস্ত্রের
অস্ত্র যত।"[৯]

চিত্রাঙ্গদার মনে হয়েছে হাতে সময় থাকলে সে নিশ্চয়ই অর্জুনের হৃদয় তিলে তিলে জয় করতে সক্ষম হত। সঙ্গীরূপে রণক্ষেত্রে সারথি হয়ে, মৃগয়ায় অনুচর সেজে, শিবিরে রাতের প্রহরী হিসেবে ক্ষত্রিয়ের মহাব্রত পালন করত সে। তারপর হৃদয় উন্মোচন করত, অর্জন করে নিত সে অর্জুনের মনে তাঁর চিরস্থান। কিন্তু সেই সুযোগ না থাকায় চিত্রাঙ্গদা ঋতুরাজের কাছে একদিনের জন্য অপূর্ব সুন্দরী হতে চেয়েছে। মদন এবং বসন্ত কেবল একদিনের জন্যে নয় এক বছরের জন্যে চিত্রাঙ্গদার বাসনাকে স্থায়িত্ব দান করে, তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করেছে। আর এখানেই প্রথম দৃশ্যের সমাপ্তি ঘটেছে। দ্বিতীয় দৃশ্য শুরু হয়েছে অর্জুনের মনে চিত্রাঙ্গদার রূপদর্শনের মোহমুগ্ধতা দিয়ে –

"অর্জুন। ... ভাবিলাম মনে, ধরণী খুলিয়া দিল
ঐশ্বর্য আপন। কামনার সম্পূর্ণতা
চমকিয়া মিলাইয়া গেল।"[১০]

এরপর অর্জুন নিজে চিত্রাঙ্গদার আশ্রমে উপস্থিত হয়। ভঙ্গ হয় দ্বাদশবর্ষব্যাপী ব্রহ্মচর্য ব্রত। অর্জুনের মনে হয় খ্যাতি, বীর্য, সব মিথ্যা, চিত্রাঙ্গদার কাছেই সে তাঁর পূর্ণতাকে খুঁজে পায়। কিন্তু এইখানেই নাট্যকার তাঁর মূল যে তত্ত্ব সেটিকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। অর্জুনের মুখে নিজের স্তুতি শুনে হাহাকার ওঠে চিত্রাঙ্গদার মনে

"চিত্রাঙ্গদা। ... কোথা গেল

প্রেমের মর্যাদা? কোথায় রহিল পড়ে
নারীর সম্মান? হায়, আমারে করিল
অতিক্রম আমার এ তুচ্ছ দেহখানা,
মৃত্যুহীন অন্তরের এই ছদ্মবেশ
ক্ষণস্থায়ী।"[১১]

চিত্রাঙ্গদার বাহ্যিক সৌন্দর্যে অর্জুন আকৃষ্ট হওয়ায়, চিত্রাঙ্গদা মনে মনে আহত হয়েছে। আর তাই তৃতীয় দৃশ্যে মদনকে তার বর ফিরিয়ে নিতে বলেছে। দেহের সোহাগে অন্তর জর্জরিত হয়েছে চিত্রাঙ্গদার। আর তাই নিজের স্বরূপে ফিরে আসতে চেয়েছে সে। কিন্তু বসন্তের আশ্বাস বাক্যে চিত্রাঙ্গদার অন্তরের দোলাচলতা দূরীভূত হয়েছে। এরপর চতুর্থ থেকে অষ্টম দৃশ্য পর্যন্ত ক্রমে চিত্রঙ্গদার প্রেমকে তীব্র আসক্তি এবং ক্রমে সেই আসক্তি থেকে পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার বিষয়কেই নাট্য সংলাপের কাব্যিক ছন্দ মাধুর্যে পরিবেশন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। আর তাই নবম দৃশ্যে, রাজ্যে চিত্রাঙ্গদার অনুপস্থিতিতে, বনচরদের মনে নিরাপত্তাহীনতা দেখে, অর্জুনের মনে রমণী রক্ষকের প্রতি কৌতূহল জন্মেছে। যা সে প্রকাশ করেছে নবযৌবন প্রাপ্ত মদন বসন্তের আশির্বাদ ধন্য চিত্রাঙ্গদার কাছে। সেই কৌতূহলকে নিরসন করেছে চিত্রাঙ্গদা নিজেরই অতীত অভিজ্ঞতাকে, নিজেরই যন্ত্রনাকে, রাজকন্যার রূপকে পরিবেশন করে। আর এখানেই ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে যান পাঠক। একদিকে অর্জুন 'পুষ্পগন্ধমদিরার নিদ্রাঘনঘোর অরণ্যের অন্ধগর্ভ' থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতে চেয়েছে, অন্যদিকে চিত্রাঙ্গদার মনেও দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে নিজের আসল স্বরূপে ফিরে আসবে! নাকি 'দুদিনের অমূল্যধন' এই যৌবনকে আঁকড়ে ধরবে। ক্রমশ নিজের প্রেয়সীকে রহস্যময়ী বলে প্রতিভত হয় অর্জুনের কাছে। কিন্তু অর্জুন তাঁর প্রিয়তমের মনে কোনো আঘাত দিতে নারাজ। এই রহস্য, দোলাচলতা এবং দ্বন্দ্ব দিয়ে নবম দৃশ্যের সমাপ্তি ঘটেছে। দশম দৃশ্যে, মদন, বসন্ত এবং চিত্রাঙ্গদার কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে বুঝতে পারি, রাত্রি শেষে চিত্রাঙ্গদার স্বরূপে প্রত্যাবর্তন। শেষ দৃশ্যে, অনিবার্যভাবেই এসেছে অর্জুন এবং চিত্রাঙ্গদার কথোপকথন। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই চিত্রাঙ্গদার রাজকন্যারূপে নিজের অভিব্যক্তিকে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ছদ্মবেশের কারণ এবং নিজের আত্মনিবেদনের যথার্থতা অসংকোচে নিজের ভালোবাসার কাছে প্রকাশ করেছে। জানিয়েছে, সুখে দুখে সহচরী করলেই তাঁর প্রকৃত পরিচয় জানা সম্ভব। চিত্রাঙ্গদা সন্তানসম্ভবা। অর্জুনকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সন্তানকে দ্বিতীয় অর্জুন তৈরী করবে সে এবং পাঠিয়ে দেবে অর্জুনের কাছে। এখানেই চিত্রাঙ্গদা চরিত্রটির সার্থকতা। যেখানে স্বয়ং অর্জুন যেন কোথাও গিয়ে ম্লান হয়ে যান। তাঁর যেন সত্যিই আর কিছু বলার থাকে না কেবল এটুকু ছাড়া –

"প্রিয়ে, আজ ধন্য আমি।"[১২]

সুতরাং কাহিনি এবং দৃশ্য সংস্থাপন আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমি দেখালাম মহাভারতের কাহিনিকে কীভাবে উপকরণ হিসেবে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যে নতুনত্ব আনলেন যা এক অমর সৃষ্টির মর্যাদা লাভ করেছে। মহাভারতে চিত্রাঙ্গদা চরিত্রটির কেবলমাত্র উল্লেখ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্গদাকেই নিজে হাতে গড়ে তুললেন। অর্জুনকে রাখলেন গৌণ ভূমিকায়। খুব অসহায়ভাবে ঘটনা ঘটতে দেওয়া ছাড়া, যার কোনো ভূমিকাই নেই। অন্যদিকে মদন এবং বসন্ত চরিত্র দুটি রবীন্দ্রনাথের সংযোজন। এদের দিয়ে কাহিনি নিজের হাতে পরিচালনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। চরিত্র দুটি কাব্যনাট্যে ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। চরিত্র দুটির নির্মাণ সার্থক হয়েছে। যৌবনে উচ্ছ্বাস এবং একঘেয়েমিকে তুলে ধরতে এদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। নাটকীয় ঘটনা পরম্পরা পাঠকের কাছে অনেক বেশি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। এই কাব্যনাট্য রীতিতে, সংলাপ চরিত্রের আবেগকে পাঠকের হৃদয়ের আরও কাছে পৌঁছে দিতে সাহায্য করেছে। আর তাই কাহিনি বয়ন, চরিত্র নির্মাণ, ঘটনার

পরিবেশন, সংলাপ সব কিছুই রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব কল্পনায় জারিত করে পাঠককুলের রসভোগ্য করে নির্মাণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কাব্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা'-র আবার ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন, যার নাম দিচ্ছেন 'চিত্রা' ('Chitra' 1913). আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না, সময়টা ছিল রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজয়ের কাল। 'গীতাঞ্জলি' –র বিশ্বস্বীকৃতির পর, রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব প্রতিভার দ্বার পাশ্চাত্য সভ্যতার কাছে তুলে ধরতেই তাঁর বিভিন্ন সৃষ্টিকর্মের অনুবাদ কার্যে লিপ্ত হচ্ছেন। নাটকের ক্ষেত্রে তার সূচনা করছেন 'চিত্রাঙ্গদা' দিয়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যখন কাব্যনাট্য থেকে নাট্য 'Chitra'-র খানিকটা কাঠামোগত পরিবর্তন করছেন। তাতে ভাষান্তরগত পরিবর্তনজনিত কিছু স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। 'Chitra'-য় মূল কাব্যনাট্যের হুবহু অনুসরণ করলেও বেশ কিছু পরিবর্তন আমি লক্ষ করেছি। যেমন, কাহিনি বয়নের ক্ষেত্রে 'Chitra' নাটকের পঞ্চম দৃশ্য পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ মূল কাব্যনাট্যের অনুসরণ করেছেন। মূলের ষষ্ঠ ও অষ্টম দৃশ্যকে মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'Chitra'-র ষষ্ঠ দৃশ্য লিখছেন। মূলের সপ্তম দৃশ্যকে বর্জন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। অন্যদিকে মুলের নবম, দশম ও একাদশ দৃশ্য যথাক্রমে সপ্তম, অষ্টম এবং নবম দৃশ্যে পরিণত হচ্ছে 'Chitra'-য়। মূল কাব্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' র শেষ দৃশ্যে নিজের স্বরূপে ফিরে আসার মুহূর্তেই চিত্রাঙ্গদার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে 'আমি চিত্রাঙ্গদা। রাজেন্দ্রনন্দিনী।' আর সেই মুহূর্তেই হয়েছে সূর্যোদয়। 'Chitra'- য় অবগুণ্ঠন মোচন হয়েছে বেশ কিছুটা আগেই। "[Unveiling in her original male attire]. Now, look at your worshiper with gracious eyes."[১৩] এছাড়াও মুলের অনেক কিছুকেই বর্জন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। যেমন –

"ধন্য সেই মুগ্ধ মুর্খ ক্ষীণ-তনুলতা
পরাবলম্বিতা, লজ্জাভয়ে লীনাঙ্গিনী
সামান্য ললনা, যার ত্রস্ত নেত্রপাতে
মানে পরাভব বীর্যবল, তপস্যার
তেজ।"[১৪]

মদন ও বসন্তের কাছে চিত্রাঙ্গদার এই কথন 'Chitra' য় নেই। এছাড়া, অনেক সংলাপ ইংরেজি অনুবাদে সংক্ষিপ্ত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। যেমন, 'চিত্রাঙ্গদা' য় দেখি, মদনের কাছে অর্জুনকে প্রথমবার দেখার অনুভূতি যখন চিত্রাঙ্গদা প্রকাশ করছে –

" সরল সুদীর্ঘ দেহ
মুহূর্তেই তীরবেগে উঠিল দাঁড়ায়ে
সন্মুখে আমার, - ভস্মসুপ্ত অগ্নি যথা
ঘৃতাহুতি পেয়ে, শিখারূপে উঠে উর্দ্ধে
চক্ষের নিমেষে।"[১৫]

তা 'Chitra' য় অনুবাদ করেছেন –

> "Instantly he leapt up with straight, tall limbs, like a sudden tongue of fire from a heap of ashes."[১৬]

এর প্রধান কারণ হল ভাষাগত রূপান্তর। সাধারণ অনুবাদের ক্ষেত্রে লেখকের প্রধান লক্ষ্যই হল যে ভাষায় লেখাটি অনূদিত হচ্ছে তাতে মূল ভাব যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেই বিষয়টি সুনিশ্চিত করা। কিন্তু প্রতিটি শব্দের আক্ষরিক অনুবাদ সেই শব্দভান্ডারে থাকবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ যেহেতু

পাশ্চাত্য পাঠকদের জন্য অনুবাদ করছেন তারা ভারতীয় ঐতিহ্য, পুরাণ সম্পর্কে কতটা তথ্য সমৃদ্ধ সে বিষয়ে অনিশ্চয়তা থাকার জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ মূলের বেশ কিছু পরিবর্তন আনছেন। যেমন পঞ্চশরকে রবীন্দ্রনাথ অনুবাদে বলছেন 'The Lord of Love'। এছাড়া অনেক একোক্তি ও আবেগাকুল সংলাপকে বর্জন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। অর্জুন যখন সুরূপা চিত্রাঙ্গদাকে দেখে আবেগাপ্লুত সংলাপ রাখছেন তার অনেক অংশই রবীন্দ্রনাথ অনুবাদে বর্জন করেছেন। আসলে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য পাঠকের ভাবনাচিন্তার পরিসরের মধ্যেই তাঁর রচনাকে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। আর সেক্ষেত্রে তাদের ভাষার যথার্থ প্রকৃতিকে বজায় রাখতেও সচেষ্ট ছিলেন। তাই ফলত এটি কাব্যনাট্য হয়ে উঠতে পারেনি নাট্য হিসেবেই সফল সৃষ্টিকর্মের আসন লাভ করেছে। আসলে রবীন্দ্রনাথ যেহেতু তাঁর 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্যের ইংরেজি অনুবাদ করেছেন, সেটি কিন্তু তখন আর কাব্যনাট্য থাকছে না। সেটি হয়ে উঠছে কেবলমাত্র নাটক।

রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন তাঁর সৃষ্টিকর্মকে নিয়ে নানা পরীক্ষানিরীক্ষায় নিয়োজিত ছিলেন। কখনো তিনি গল্প বা উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছেন, কখনো পূর্বে রচিত নাট্যকর্মকে সংশোধন, পরিমার্জন করেছেন। এই সব মিলিয়ে কাব্য, নাটক, সঙ্গীত আঙ্গিকের সকল ক্ষেত্রে নিত্য নতুন পরীক্ষায় রত থেকেছেন তিনি। গীতিনাট্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য গানের মধ্যে দিয়ে নাট্যবস্তুকে রূপ দেওয়া। গীতিনাট্যে সংলাপের ভূমিকা নেয় সংগীত। অভিনয়ের সকল রীতি বজায় থাকে। কেবল নাট্যবস্তু গানের সুরে অভিব্যক্ত হয়। কাব্যনাট্যের ক্ষেত্রে কাব্য গানের স্থান অধিকার করে। সেইসঙ্গে নাট্যধর্ম প্রকাশ পাওয়ায় তাকে কাব্যনাট্য আখ্যা দেওয়া হয়।

তথ্যসূত্র:

১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। চিত্রাঙ্গদা। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ২৮ ভাদ্র ১২৯৯, পুনর্মুদ্রণ চৈত্র ১৩৬১, পৃ. ৬
২। মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার। রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক, প্রথম খন্ড। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা ১৭, প্রথম প্রকাশ – অগ্রহায়ণ ১৩৪০, পরিবর্ধিত সংস্করণ – বৈশাখ, ১৩৫৩, পুনর্মুদ্রণ – অগ্রহায়ণ ১৩৯২, পৃ. ৩৪০
৩। বেদব্যাস, শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন। মহাভারতম্ (আদিপর্ব্ব)। শ্রীমদ্ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য। বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ৭৯/১ বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা – ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ – ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, দ্বিতীয় সংস্করণ – চৈত্র, ১৩৮৩, পৃ. ২০০৪
৪। তদেব। পৃ. ২০০৫
৫। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ (প্রথম খন্ড)। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা -১৭, প্রথম প্রকাশ – মাঘ, ১৪০৬, পৃ. ৩২৭
৬। তদেব। পৃ. ৩২৯
৭। তদেব। পৃ. ৩৩০ – ৩৩১
৮। তদেব। পৃ. ৩৩২
৯। তদেব। পৃ. ৩৩২ - ৩৩৩
৯। তদেব। পৃ. ৩৩৫ – ৩৩৬
১০। তদেব। পৃ. ৩৩৮
১১। তদেব। পৃ. ৩৫৭

১২। Tagore, Rabindranath. 'CHITRA', A PLAY IN ONE ACT (THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA RIVERSIDE, EX LIBRIS C.K. OGDEN), PUBLISHED BY THE INDIA SOCIETY LONDON 1913, PAGE 33

১৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র-রচনাবলী তৃতীয় খন্ড। বিশ্বভারতী, ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ- জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫১, পৃ. ১৬৬

১৪। তদেব। পৃ. ১৬৩

১৫। Tagore, Rabindranath. 'CHITRA', A PLAY IN ONE ACT (THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA RIVERSIDE, EX LIBRIS C.K. OGDEN), PUBLISHED BY THE INDIA SOCIETY LONDON 1913, PAGE 3

সহায়ক গ্রন্থ:

১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। জীবনস্মৃতি। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ৬/২ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা – ৭০০০০৭, গ্রন্থ-প্রকাশ – ১৩১৯, সুলভ সংস্করণ – জৈষ্ঠ, ১৩৬০ (বিশেষ সংস্করণ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬)

২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। চিত্রাঙ্গদা। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ২৮ ভাদ্র ১২৯৯, পুনর্মুদ্রণ চৈত্র ১৩৬১

৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ (প্রথম খন্ড)। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা -১৭, প্রথম প্রকাশ – মাঘ, ১৪০৬

৪। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র-রচনাবলী তৃতীয় খন্ড। বিশ্বভারতী, ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ- জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫১

৫। মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার। রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক, প্রথম খন্ড। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা ১৭, প্রথম প্রকাশ – অগ্রহায়ণ ১৩৪০, পরিবর্ধিত সংস্করণ – বৈশাখ, ১৩৫৩, পুনর্মুদ্রণ – অগ্রহায়ণ ১৩৯২,

৬। বেদব্যাস, শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন। মহাভারতম্ (আদিপর্ব্ব)। শ্রীমদ্ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ৭৯/১ বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা – ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ – ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, দ্বিতীয় সংস্করণ – চৈত্র, ১৩৮৩

৭। বসু, সৌমিত্র। রবীন্দ্রনাটকের নির্মাণশৈলী উনিশ শতক', সেরা প্রকাশক প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ২৯ শে অগ্রহায়ণ, ১৪০০

৮। পাল, হরনাথ। নাট্য কবিতায় রবীন্দ্রনাথ। ক্যালকাটা বুক হাউস, ১/১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা – ৭০০০১২, প্রথম সংস্করণ মহালয়া, ১৩৬৭

৯। Tagore, Rabindranath. 'CHITRA', A PLAY IN ONE ACT (THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA RIVERSIDE, EX LIBRIS C.K. OGDEN), PUBLISHED BY THE INDIA SOCIETY LONDON 1913

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1904-1913
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.414

‘জিজ্ঞাসা’: বিজ্ঞান-দর্শন-সাহিত্যের ত্রিবেণী সঙ্গম

দেবী মন্ডল, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 14.03.2026; Accepted: 16.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In Bengali prose literature, Ramendrasundar Tribedi occupies an important place. His essay collection ‘Jijnasa’ presents a unique synthesis of science, philosophy, and literature. In this work, he attempts to explore humanity’s eternal questions, the pursuit of knowledge, and the mysteries of the universe. Firstly, the scientific perspective in ‘Jijnasa’ is very clear. The author explains various scientific topics through logic, observation, and analysis. Subjects such as nature, the universe, matter, and energy are examined in the light of scientific facts and theories. Through this method, Trivedi tries to cultivate a rational and inquisitive mindset among readers. Secondly, the depth of philosophy in this work is also remarkable. The author does not merely present information; rather, he reflects on its deeper meaning and significance. He expresses philosophical thoughts on issues such as human existence, the origin of the universe, and the nature of truth and knowledge. Thus, philosophy here is not simply a collection of ideas but a path toward deeper contemplation about life and the world. Thirdly, the literary beauty of ‘Jijnasa’ is especially captivating. The language is simple, lucid, and rich in expression. The essayist presents complex scientific and philosophical ideas in an elegant literary style. His use of metaphors, examples, and descriptive narration attracts readers and makes difficult concepts easier to understand. Therefore, in ‘Jijnasa’, science provides logical foundation, philosophy adds depth of thought, and literature makes the expression graceful and engaging. Through the harmonious blending of these three streams, the work truly becomes a confluence of science, philosophy, and literature.

Keywords: Inquiry (Jijnasa), Science and Literature, Ramendrasundar Trivedi, Philosophy, Science

বিজ্ঞানের সাধক, সাহিত্যের অনুরাগী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সৃজনশীল সৃষ্টিকর্মে দার্শনিক চিন্তার প্রতিফলন লক্ষিত হয়। বিজ্ঞানের যুক্তিনির্ভর দৃষ্টির দ্বারা বিশ্বপ্রকৃতির যে রূপ তিনি দেখতে চেয়েছেন, তা অনেকাংশে ব্যাহত হয়েছে। জগৎস্বরূপ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি যখন বিজ্ঞানের কাছে সফলকাম হল না তখন তিনি তার উত্তর খুঁজেছেন দর্শনের কাছে। সেই উত্তরও তাঁর মনঃপূত হয়নি। জগৎ-প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর এই ভাবনা জিজ্ঞাসার মধ্যে প্রকাশ করেছেন- যার অবয়বে বিজ্ঞান, অন্তরে দর্শন এবং প্রকাশে সাহিত্য। এই ত্রিবেণীর সার্থক সহাবস্থান হলো ‘জিজ্ঞাসা’ গ্রন্থ। ১৯০৪ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থে জগৎতত্ত্বের রহস্য সম্পর্কে লেখকের নানা জিজ্ঞাসা জগৎকে ভাবান্বিত করে তুলেছে। ইতিপূর্বে সাহিত্যরূপে বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায়

প্রকাশিত এই গ্রন্থের সংকলিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে লেখক জগৎ সৃষ্টির গোড়ার রহস্য সম্পর্কে বিভিন্ন জিজ্ঞাসা বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকে বিচার করেছেন— যা এই অংশের আলোচ্য বিষয়।

বাইশটি প্রবন্ধের সংকলন গ্রন্থ 'জিজ্ঞাসা'। সূক্ষ্ম বিষয়ভেদে প্রবন্ধগুলিকে চারটি শ্রেণীতে পর্যায়ভুক্ত করা যায়— বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞানে দর্শন, দর্শনে বিজ্ঞান এবং দার্শনিক প্রবন্ধসমূহ। বিজ্ঞান ও দর্শন বিষয়ক এই সকল প্রবন্ধের ভাষা বাংলা, প্রকাশ মাধ্যম বাংলা সাহিত্য।

'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধগুলির মধ্যে খাঁটি বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যা চার- মাধ্যাকর্ষণ, বর্ণ-তত্ত্ব, উত্তাপের অপচয় এবং নিয়মের রাজত্ব। 'মাধ্যাকর্ষণ' প্রবন্ধ মধ্যে লেখক কোপার্নিকাস থেকে শুরু করে কেপলার, দেকার্ত, নিউটন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণের ব্যাখ্যা অনুসারে বিভিন্ন উদাহরণযোগে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। উক্ত সকলেই তাঁদের ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অস্তিত্ব নিয়ে। কোপার্নিকাসের ব্যাখ্যা লেখক সাহিত্যের ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। সূর্য স্থির। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বারা পৃথিবীসহ অন্যান্য গ্রহগুলি যেমন সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে, তেমন অন্য অন্য উপগ্রহগুলিও গ্রহের চারদিকে ঘুরছে কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত সুনির্দিষ্ট পথে নিয়ম মেনে। কোপার্নিকাসের কথাকে মেনে নিয়ে কেপলার গ্রহদের গতিবিধি বিষয়ে তাদের বৃত্তাভাস বা অপবৃত্ত পথের কথা বলেছেন। অর্থাৎ একটা গোলাকৃতির আংটিকে দুপাশ থেকে চাপ দিলে যেমন হয়, জ্যামিতিক ভাষায় তাকে বৃত্তাভাস বা অপবৃত্ত বলে। গ্রহগণ এমন একটা পথে সূর্যকে কেন্দ্রে রেখে আবর্তিত হয়। আর সূর্য থেকে দূরত্ব ভেদে তাদের গতির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। যে গ্রহের দূরত্ব যত বেশি, সূর্য প্রদক্ষিণের সময়সীমা তার তত বেশি এবং আকর্ষণ-বলের পরিমাণ দূরত্বের বর্গানুসারে তত অল্প। এখন লেখকের জিজ্ঞাসু মনের প্রশ্ন- এই গ্রহগুলি নিয়ম মেনে ঘোরে কেন? সাহিত্যিক হয়ে তিনি তার উত্তর অন্বেষণ করেছেন এবং সাহিত্যের ভঙ্গিতে সরস ভাষায় বলেছেন-

> "উহারা ঘুরে উহাদের মর্জি; উহারা বড় লোক ও ভাল লোক, উহারা কি আর অসংযতভাবে অনিয়মে ঘুরিতে পারে? অথবা এক একটা গ্রহ এক একটা দেবতার বাহন; দেবতারা কি একটা মতলব আঁটিয়া ঐরূপ খেলা খেলিতেছেন।"[১]

সৃষ্টির সূচনা থেকেই গ্রহগুলি অনবরত তাদের স্থান পরিবর্তন করে চলেছে। বিজ্ঞানের এই নিরস বিষয়ের মধ্যেও লেখক নির্মল হাস্যরসের উদ্রেক করেছেন। বিজ্ঞানের ভাষায় গ্রহগুলি নির্দিষ্ট নিয়মাধীন হলেও তাদের এই ভ্রমণ সম্পর্কে সাহিত্যের রসসিক্ত ভাষায় লেখক বলেছেন—

> "এই গ্রহগুলি নিতান্ত অকারণে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াইতেছে, হয়ত এইরূপ নির্দেশ উচিত হইল না। গ্রহগণের এইরূপ ভ্রমণের উদ্দেশ্য কেহ কেহ আবিষ্কার করিয়াছেন। তোমার জন্মকালে বৃহস্পতি যখন কর্কটরাশিস্থ ছিলেন, তখন তুমি পঁয়ত্রিশটি বিবাহ করিতে বাধ্য, ইহা অনেক ভদ্রলোকে অদ্যাপি পুরা সাহসে বলিয়া থাকেন। গ্রহগণের অবস্থান মনুষ্যের শুভাশুভ নির্দেশ করে; ইহাতে যে সন্দেহ করে, সে নির্বোধ; কেন না, চন্দ্রের অবস্থানভেদে জোয়ার-ভাটা কি প্রত্যক্ষ ঘটনা নহে? আর ঐরূপ একটা উদ্দেশ্য না থাকিলে বিধাতা কি এতই কাণ্ডজ্ঞানহীন যে, এতগুলি প্রকাণ্ড জড়পিণ্ডকে অনর্থক ঘুরিয়া মরিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন?"[২]

আসলে সৌরজগৎস্থিত সমস্ত কিছুই এক অদৃশ্য শক্তির দ্বারা এক অলিখিত নিয়মের বশীভূত। নিউটন যে আপেল-ফল পতনের কারণ নির্দ্দেশ করে গেছেন তাতে প্রমাণিত, আপেল-ফল জগতে যে নিয়মে চলে, গ্রহ উপগ্রহ থেকে ধূমকেতু উল্কাপিণ্ড পর্যন্ত সেই নিয়মেই চলে।

এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তিই হলো প্রাকৃতিক নিয়মের আধার। যার আকর্ষণে পার্থিব দ্রব্য সকল কেন্দ্রের অভিমুখে পতিত হয় তেমনি অপার্থিব দ্রব্যও সূর্যের আকর্ষণকে অগ্রাহ্য করতে না পেরে তার চারিদিকে ধাবমান হয়। এখন প্রশ্ন, আপেল নিচে নামে, কিন্তু বেলুন উপরে উঠে যায় কেন? এই অনিয়মের মধ্যেও লেখক নিয়মের ব্যাখ্যা করেছেন। পৃথিবী যেমন সকল দ্রব্যকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বারা নিজের কেন্দ্রে আনতে চায়, তেমনি তরল বা বায়বীয় পদার্থ মাত্রই দ্রব্যকে উপরে তুলতে চায়। এর নাম চাপ। তাই বেলুন উপরে উঠে যায়। অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বস্তুকে নিচে নামায়, আর চাপ ওপরে ওঠায়। যেখানে চাপের তুলনায় আকর্ষণ বেশী দ্রব্য তখন নিচে নামে এবং বিপরীত ক্রিয়ায় ওপরে উঠে যায়। আর উভয়েই যখন সমান থাকে দ্রব্য সেখানে 'ন যযৌ ন তস্থৌ'। আবার যেখানে নিউটনের সূত্র চলে না সেখানে অন্য নিয়ম চলে, সেখানে সেটাই নিয়ম। অর্থাৎ 'সর্বত্রই নিয়মের বন্ধন- জগৎ নিয়মের রাজ্য'।

'উত্তাপের অপচয়' প্রবন্ধের মূল বিষয় হলো- পঞ্চভূতের অন্যতম 'তেজ'-এর অপচয় কমিয়ে মহাপ্রলয় সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে সচেতনতার বার্তা দেওয়া। এই তেজের উৎস হলো সূর্য। সূর্য থেকে যে পরিমাণ তাপ পৃথিবীতে পতিত হয় তার কিয়দংশ পরিমাণ কাজে লাগে মাত্র। আর তাতেই জগত সংসার সচল থাকে। বাকি অংশের অপচয় ঘটে। সূর্য থেকে যে তাপ পাওয়া যায় তার দ্বারা জগত সংসারের কাজ ঠিকমতোই চলে যায়। কিন্তু মনুষ্য জাতির তাতে নিবৃত্তি নেই। সে আরো চায়। পৃথিবীরে এপ্রান্ত-ওপ্রান্ত খুঁজে ভূ-গর্ভস্থ সম্পত্তি সকল খুঁজে এনে রাত্রির শীতলতা দূর করতে অগ্রসর হয়েছে মানবজাতি। তাপের ধর্ম সম্পর্কে লেখক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, জল যেমন স্বভাবতই নিম্নপ্রবণ তাপ তেমনি শৈত্যপ্রবণ হয়ে থাকে। অর্থাৎ তাপের গতি উষ্ণ স্থান থেকে শীতলস্থানে প্রবাহিত হয়। এর বিপরীত নিয়মের বিরুদ্ধ। প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে সূর্য থেকে তাপ শীতল পৃথিবীতে পতিত হয়ে প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখে রাত্রিকালীন সময়ে শীতল অন্ধকারে। কিন্তু মানব জাতির প্রয়োজনার্থে রাত্রির অন্ধকার দূর করতে আলোর প্রয়োজনে যে পরিমাণ শক্তি ব্যয় দরকার, আকাশ তরঙ্গের দ্বারাই সেই প্রয়োজন সাধিত হতে পারে। কিন্তু আমরা তেল বাতি গ্যাস কয়লা পুড়িয়ে তাপের সহস্র গুণ অপচয় করি। তাপের এই অপচয় বিষয়টিকে লেখক উপমার প্রয়োগে সাহিত্য গুণান্বিত করে তুলেছেন—

> "আচমনে এক গণ্ডুষ জল আবশ্যক; আমরা হিমালয় হইতে খাল কাটিয়া গঙ্গা আনিয়া গৃহদ্বারে উপস্থিত করি, এবং তজ্জন্য একটা রাজ্যের তহবিল অপব্যয় করি। বিশল্যকরণীর একটা শিকড়ের জন্য আমরা প্রকাণ্ড গন্ধমাদনকে স্কন্ধে করিয়া সমুদ্র লঙ্ঘনের আয়োজন করি। প্রকৃত পক্ষে ইহা প্রহসন;"[৩]

প্রকৃতির এই কৃত্রিম উষ্ণায়ন রুদ্ধ হলে তবেই মহাপ্রলয় বিলম্বিত হবে মাত্র।

'বর্ণ-তত্ত্ব' হলো প্রকৃতিতে সৌন্দর্য সৃষ্টিকারী রংয়ের উৎপত্তি বিষয়ক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। আমরা জানি, ঈথর নামক দিগন্ত প্রসারিত পদার্থে কম্পনের ফলে যে তরঙ্গ সৃষ্টি হয় তার দ্বারা আলোর উৎপত্তি। সেই তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ভেদে আলো থেকে নানা রঙের অনুভূতি গ্রহণ করে চোখ। সূর্যের আলো সাধারণত সাদা। আকাশের পথ ধরে সেখানে নানা হিল্লোলের সঞ্চার ঘটে এবং রঙের সৃজন হয়। রঙ সাধারণত সাত প্রকার। নির্দিষ্ট পরিমাপ দৈর্ঘ্যের কম বা বেশি হলে সেই রং বা আলো আর আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। তখন কেবল তা অন্ধকার বলেই প্রতীত হয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় রঙের এই বর্ণবৈচিত্র সজীব প্রফুল্লতা দান করে।

বিজ্ঞানে-দর্শন বিষয়ক প্রবন্ধগুলির মধ্যে অন্যতম হলো 'সৌন্দর্য-তত্ত্ব' ও 'সৌন্দর্যবুদ্ধি' রচনা দুটি। প্রবন্ধ দুটির আলোচ্য বিষয় হলো মানুষের সৌন্দর্যবোধ। প্রথম প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক এবং দ্বিতীয়টিতে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য লাভ করেছে। প্রবন্ধ দুটির প্রকাশকাল যথাক্রমে সাধনা পত্রিকায় ১৩০০ ভাদ্র ও প্রদীপ পত্রিকায় ১৩০৭

মাঘ সংখ্যায়। লেখক এই দুই প্রবন্ধের মধ্যে বিভিন্ন সাহিত্যের নানা অনুষঙ্গ উত্থাপন করে মনের সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতির দার্শনিক তত্ত্বটিকে পরিস্ফুট করেছেন। সৌন্দর্যবোধ মানব-মনের একটি অবিচ্ছেদ্য ভাব প্রবণতা। বলা চলে সৌন্দর্য উপভোগের ক্ষমতা মানবজীবনে অন্যান্য প্রবৃত্তির মতই অন্যতম। প্রকৃতিতে জীব মাত্রেই সৌন্দর্য পিয়াসী। তন্মধ্যে মনুষ্য জীবের এই অনুভূতি প্রবল। মানুষ সুখ সন্ধানীর আর জীবন দুঃখময়। তাই সুখের এত প্রাধান্য। দুঃখময় পথের মধ্য দিয়ে মানুষ সুখের সন্ধান করে বলেই দুঃখ এত সুন্দর আর সুখ এত আকর্ষণীয়। প্রকৃতিতে কেবল সুখ বা কেবল দুঃখ থাকলে তার মধ্যে কোন সৌন্দর্য থাকতো না। তাই মানুষের সুখ-দুঃখ অনুভূতির মধ্যে সৌন্দর্যবোধের উপস্থিতি। মোটের উপর যা আমাদের মনে আনন্দ, তৃপ্তি বা সুখের অনুভূতি জাগ্রত করে তা সুন্দর এবং যার দ্বারা মনে দুঃখ, ক্লেশ, ঘৃণার উদ্রেক হয় তাই অসুন্দর বা কুৎসিত। উভয়ের উপস্থিতির জন্যই সৌন্দর্য আরাধ্য আর মানুষ সুন্দরের উপাসক। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলা যায়— 'যেখানে অনুভূতি নিত্য পরিবর্তনশীল, সেইখানেই চৈতন্য স্ফূর্তিমান'। অর্থাৎ চৈতন্যের সঙ্গে অনুভূতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ভয়-ক্লেশ প্রভৃতি অনুভূতি ভেদে চৈতন্যের পার্থক্য ঘটে। যেখানে অনুভূতির বৈচিত্র্যের প্রকাশ সেখানে চৈতন্যের সম্যক বিকাশ— সেখানেই রূপ এবং সেখানেই প্রকৃত সৌন্দর্য। আবার ডারউইনের 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' তত্ত্বের স্বপক্ষে বলা যায়, যা জীবনধারণের সহায়ক বা উপযোগী তাই প্রকৃতি কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে অভিব্যক্ত ও পরিস্ফুট হয়। প্রজাপতি যেমন ফুলের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়, ফলে উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি ঘটে। তেমন সিংহের কেশর, পাখির কলতান, ময়ূরের পুচ্ছ থেকে মানবজাতি পর্যন্ত সর্বত্রই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অভিব্যক্ত ভাব প্রকাশ পায়। সুতরাং বলা যেতে পারে, প্রাকৃতিক নির্বাচন হলো এই সৌন্দর্যবোধের জনক ও বিকাশক। আসলে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য কেবল উপভোগের সামগ্রী– আর এর ফল বিশুদ্ধ নির্মল আনন্দ।

এ তো গেল দর্শন ও বিজ্ঞানের তত্ত্ব। সাহিত্যের মাধ্যমেও লেখক সৌন্দর্যবোধের তত্ত্বটিকে পরিবেশন করতে প্রয়াসী হয়েছেন। আমরা পূর্বে জেনেছি দুঃখ সুন্দর। কেননা দুঃখ আছে বলেই সুখের এত প্রাধান্য। জীবনের তিন ভাগের একের অর্ধাংশ মাত্র সুখের পরিমাণ। অতএব জীবন দুঃখময়। ক্রৌঞ্চ-মিথুন দ্বয়ের একটি শরাহত হওয়ায় যে শ্লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে উচ্চারিত হয়েছে বাল্মিকীর কণ্ঠে তা থেকে সৃষ্টি হয় রামায়ণী গাথার। সেখানে রামের সীতা নির্বাসন আমরা মেনে নিতে পারি না। কারণ তা আমাদের মনে দুঃখের ভাব জাগ্রত করে এবং এই ভাব মনের কোণে এক সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের বাতাবরণও তৈরি করে দেয়- যা মানুষের সহজাত রহস্যময় প্রবৃত্তি। প্রাবন্ধিকের এই 'সৌন্দর্য-তত্ত্ব' অনুধাবনে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার প্রভাব পড়েছে। কালিদাসের শকুন্তলা কিংবা বঙ্কিমের কৃষ্ণকান্ত বা শেক্সপিয়ারের লীয়র প্রভৃতি প্রসঙ্গ উত্থাপন করে সৌন্দর্য-তত্ত্ব বিষয়ে লেখক সাহিত্যিক ভাষা প্রয়োগ করে বলেছেন-

> "সৌন্দর্য্য-বোধ মানব-জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। সৌন্দর্য্য উপভোগের ক্ষমতা মানবজীবনের প্রধান সম্পত্তি। কেবল যে কবি-নামধেয় মনুষ্যবিশেষই সৌন্দর্য্যমধুর অন্বেষণে ভ্রমরবৃত্তি হইয়া জীবনপাত করিতেছে, তাহা বলা চলে না। কেন না, জগৎ হইতে তাহার সৌন্দর্য্যটুকু কোনরূপে হরণ করিতে পারিলে সম্পূর্ণ কাব্যরসবর্জ্জিত বিষয়ী লোকদিগের জন্যও দড়ি-কলসী সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। সাংসারিক নিত্যনৈমিত্তিক সুখদুঃখের সহিত সৌন্দর্য্যতৃষ্ণার এমন প্রগাঢ় সম্পর্ক যে, বোধ করি, মনুষ্য মাত্রেরই জীবনকাহিনী বিশ্লেষণ করিলে সেই তৃষ্ণার সফলতার বা নিষ্ফলতার পরিচয় পাওয়া যায়। মনুষ্য মাত্রেরই জীবনকালে এমন একটি মুহূর্ত্ত আইসে, যখন সে সুদূর বনপ্রদেশ হইতে সায়ংকালীন বংশীধ্বনি কর্ণাগত করিয়া চন্দ্রাপীড়ের ঘোড়ার মত সেই অনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি দিগ্বিদিক্ ছুটিতে থাকে, এবং

> হয়ত শেষ পর্য্যন্ত তাহার উদ্ভ্রান্ত জীবন চরম লক্ষ্যের ঠাহর না পাইয়া নিয়তিবশে কোনরূপ অচ্ছোদ সরোবরের সলিলতলে সমাধি লাভ করে।"[৪]

মূলত এই সৌন্দর্যবোধের শক্তি মনুষ্য ভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। কবিদের মধ্যে তা বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়। তাদের এই সাধনা সমাজে জীবিকা অর্জনের জন্য অনুকূল না হলেও তা যেহেতু মনে আনন্দ, ভালো লাগার সঞ্চার করে সেহেতু তাদের সৃষ্টি সৌন্দর্যময়।

জগত সৃষ্টির রহস্য বিষয়ে প্রাবন্ধিক 'সৃষ্টি' প্রবন্ধের শুরুতে একটি কথকতাংশ স্মরণ করেছেন-

> "আফ্রিকা-নিবাসী কোন অসভ্য জাতির মধ্যে অদ্ভুত সৃষ্টিতত্ত্ব প্রচলিত আছে। চাঁদ ও ব্যাঙের মধ্যে বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়া জগতের সৃষ্টি-ঘটনাটা সমাহিত হইয়া যায়; তবে উভয়ের বিরোধের ফলে সৃষ্ট জগৎটা সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। বিবাদ হইল চাঁদে ও ব্যাঙে; তাহার ফলভাগী হইল মানুষে; আধি-ব্যাধি জরামরণ আসিয়া জগৎ অধিকার করিল।"[৫]

আফ্রিকার একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে প্রচলিত এই গল্পটিকে সর্বগ্রহণযোগ্য করতে লেখক চাঁদ ও ব্যাঙের স্থানে ঈশ্বর ও শয়তানকে প্রতিস্থাপন করেছেন। ঈশ্বর হলেন এই সৃষ্টির স্রষ্টা। তিনি সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিময় তাই জগত এত বিশাল। ঈশ্বর ন্যায়ের বিধাতা তাই জগতে পুণ্যের জয়। আর শয়তানের কারসাজিতে যে সুন্দরের মধ্যে অসুন্দরের, সুখের মধ্যে দুঃখের, পুণ্যের মধ্যে পাপের বাস তাও ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন। সুতরাং এই জগত নামক যন্ত্রের চালক হলেন সর্বময় ঈশ্বর এবং তার ইচ্ছায় হল শক্তি— তাতেই জগতের উৎপত্তি ও সুশৃঙ্খল টিকে থাকা।

বিজ্ঞানের মতে জগৎ নির্মিত হয়েছে ঈথর ও পরমাণুর মিশ্রণে। জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় বিষয়ে প্রশ্ন করলে বিজ্ঞান তার উত্তর দিতে সক্ষম। কিন্তু দর্শনের মতে জগত ও ঈশ্বর অভিন্ন, জগৎ ছাড়া ঈশ্বর অস্তিত্বহীন। আবার 'আমি' ব্যতীত জগত অস্তিত্বহীন। আমা হতেই এই জগৎ ও জগৎ-নিয়মের প্রতষ্ঠা। এর ফলেই আমার চেতনার বিকাশ ঘটে ও জ্ঞান প্রসারতা লাভ করে। সর্বত্র যে জয়লাভ হবে তা নিশ্চিত নয়। তবে এই নিয়ম প্রতিষ্ঠার সফলতা ধরেই আমার আত্মবিকাশের পরিমাণ নির্ধারিত হবে এবং এই আত্মবিকাশের নামই হলো বিজ্ঞানচর্চা - যার ফলে জ্ঞানের উন্নতি ও বিকাশ সম্ভবে। এই আত্মবিকাশের সাথে জগতের পরিধি বাড়ে, মুছে যায় দেশ ও কালের সীমারেখা।

দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রাবন্ধিক আরো বলেছেন যে, জগত যেমন অনাদি নয়, কালও তেমন অনন্ত নয়। যখন যতটুকু আমি দেখছি তখন কেবল সেইটুকুরই অস্তিত্ব বর্তমান এবং সেটাই তখন আমার কাছে পরম সত্য। লেখকের কথায়—

> "অনাদি অনন্ত এই সকল দীর্ঘ বিশেষণ কবিকল্পনা, বাক্যালঙ্কার; উহা কাব্যে শোভা পায়; বিজ্ঞানে উহাদের অস্তিত্ব নাই।"[৬]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে একটি বিষয়কে প্রতিস্থাপিত করতে লেখক সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন।

'অমঙ্গলের উৎপত্তি' প্রবন্ধে ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদের আশ্রয়ে লেখক বলতে চেয়েছেন যে, পরম করুনাময় ঈশ্বর-সৃষ্ট জগতে যে ভয়াবহ জীবন সংগ্রাম চলছে, সবলের অত্যাচার, দুর্বলের নিগ্রহ, সর্বোপরি মৃত্যু পরিলক্ষিত হয়, আপাতদৃষ্টিতে তা অমঙ্গল বলে প্রতীত হলেও এর মূলে মঙ্গলই রয়েছে। কেননা দুঃখ না থাকলে যেমন সুখ উপলব্ধি করা যায় না, মৃত্যু না ঘটলে যেমন জন্ম উদযাপন করা যায় না, তেমনি অমঙ্গল ঘটে বলে মঙ্গলের এত জয়জয়কার। জীবনের সঙ্গে জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, মঙ্গল-অমঙ্গলের নিত্যসমন্ধ। এগুলি

ব্যতীত জীবন জড়ত্ব বিশেষ। আবার জীবন ছাড়াও এসব চেতনা অনস্তিত্ব। যতদিন চেতনার জাগ্রতবস্থা স্ফূর্তি পাবে ততদিন মঙ্গলের সাথে অমঙ্গলের সহাবস্থান। তাই প্রবন্ধের শেষে প্রাবন্ধিক অমঙ্গলেরই জয়গান গেয়েছেন।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্গত দর্শনে-বিজ্ঞান রচনাগুলির মধ্যে অন্যতম হলো 'মায়া-পুরী' এবং 'বিজ্ঞানে পুতুলপূজা'। এর মধ্যে 'মায়া-পুরী' রচনাটি ১৯১১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় সাহিত্য পত্রিকায় এবং পরে ১৯১৪ সালে 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে পুনর্মুদ্রিত হয়। রামেন্দ্রসুন্দরের সমগ্র বিজ্ঞান দর্শনের স্বরূপ এই প্রবন্ধ মধ্যে উৎঘাটিত হয়েছে। মায়াপুরী অর্থে লেখক বিশ্ব-জগতকে বুঝিয়েছেন। কিন্তু 'আমি' ব্যতীত, 'আমার খেয়াল বা চেতনা' ব্যতীত এই জগতের কোন অস্তিত্ব নেই। জীবের চেতনা থেকেই জগৎ উৎপন্ন। এই বিশ্বজগৎ একটা প্রকাণ্ড অংশ আর চেতনা সম্বলিত জীবদেহ তার তুলনায় নিতান্ত ক্ষুদ্র একটি অংশ মাত্র। এই জগতই হচ্ছে জীবের একমাত্র শত্রু ও একমাত্র মিত্র। কেননা বাহ্যজগৎ ষড়ঋতুর রুদ্রমূর্তির সাথে প্লেগ, কলেরা, ম্যালেরিয়ার মত নানা মহামারী ছাড়াও নানা জন্তু-জানোয়ারের সহস্ররূপ ধারণ করে জীব দেহকে ধ্বংস করতে তৎপর থাকে। আবার মিত্র এই কারণে যে, এই বাহ্যজগত থেকেই জীব তার দেহ ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় মশলা সংগ্রহ করে তার দেহকে পুষ্টিত ও বর্ধিত করে গঠন করছে প্রতিনিয়ত। শুধু তাই নয় বাহ্যজগতের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষার্থে সে শক্তি ও অস্ত্র সংগ্রহ করছে এই বাহ্যজগৎ থেকেই। 'বাহ্য জগতের একমাত্র লক্ষ্য— জীবনকে লোপ করা; জীবনের এক মাত্র লক্ষ্য— আপনাকে কোন-না-কোনরূপে বাহাল রাখা'।

এই রচনার মধ্যে প্রাবন্ধিক জীবদেহকে যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করলেও তার জীবন প্রবাহই প্রধান বিষয়। যন্ত্র পূর্বনির্ধারিত বিষয় ছাড়া অন্য কোন কাজে সক্ষম নয়, কিন্তু জীবদেহ নতুন অবয়বে আপনাকে গড়ে নিতে পারে— তাই তো ব্যাঙাচি ব্যাঙে পরিণত হয়, মর্কট হয় মানুষ। পারিপার্শ্বিক শক্তির আঘাত ও আক্রমণে নিজেকে পরিণত ও পরিবর্তিত করার ক্ষমতা জীবদেহেই বর্তমান। জীবের সন্তানোৎপাদনের মধ্য দিয়ে তার বীজের নবজীবন আরম্ভ হয়, ফলে ব্যক্তি মৃত্যু মুখে পতিত হলেও জাতি থেকে যায়। ডারউইনের 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' তত্ত্বের সাহায্যে বলা যায় জীব-সমাজে অবিরাম বাছাই কার্য চলছে। যে সদা পরিবর্তনশীল প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে পরিবর্তন করতে পারে সে টিকে যায় অন্যথা ধ্বংস বা বিলুপ্তিই তার একমাত্র আগামী। এই জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার লড়াইয়ে জীব সতত হেয় পদার্থ বর্জন এবং উপদেয় গ্রহণ করছে। উপদেয় পদার্থ মাত্রেই জীবের কাছে সুখ প্রদানকারী। আর এটাই প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফল। সুখ অন্বেষণ ও দুঃখের পরিহারই অবশ্য কাম্য। এই শিক্ষাই প্রকৃতির পাঠশালায় অবিরত শেখানো হয়। বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচারশক্তির দ্বারাই মনুষ্য জীবজগতে শ্রেষ্ঠ জীব বলে প্রমাণিত হয়েছে।

বিজ্ঞান ও দর্শন ছাড়া এই প্রবন্ধের সাহিত্যগুণও বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণকারী। লেখক বিজ্ঞান দর্শনের বিষয়কে যেভাবে সাহিত্য গুণান্বিত ভাষায় প্রকাশ করেছেন তা প্রশংসার যোগ্য। এই প্রবন্ধ মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্তের 'চারুপাঠ', বিদ্যাসাগর প্রণীত 'বোধোদয়' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রভাব তো পড়েছেই, সেই সাথে আছে লেখকের ভাষার ওজস্বী প্রকাশভঙ্গী। তিনি এই বিশ্বজগতকে মায়াপুরী বলেছেন, আর মনুষ্য জাতিকে অন্যান্য জীবের মতো একপ্রকার জীব বলে উল্লেখ করেছেন—

> "পৃথিবীটা একটা প্রকাণ্ড চিড়িয়াখানা; এক পয়সা দর্শনী না দিয়া আমরা এই চিড়িয়াখানায় প্রবেশ করিয়াছি।"[৭]

এই ভাষা যেমন সহজ সরল, এর পরিবেশন তেমনি প্রাঞ্জল। 'মায়া-পুরী' প্রবন্ধ মধ্যে লেখক বিশ্বকে একটা পরীক্ষাগার আর মনুষ্য জাতিকে পর্যবেক্ষক বলে উল্লেখ করেছেন। সেখানে সর্বদা কিছু না কিছু এক্সপেরিমেন্ট চলছে—

"...কেহ ইন্দুরের লেজ কাটিয়া দেখিতেছেন, তাহার বাচ্চার লেজ গজায় কি না;"[৮]

-এহেন সরস বাক্যের দ্বারা লেখকের রসিক মনের পরিচয় যেমন পাওয়া যায় তেমনি প্রবন্ধ মধ্যে হাস্যরসের ফল্গুধারার অবারিত দ্বার খুলে যায়।

আর্য্যাবর্ত্ত পত্রিকায়, অগ্রহায়ণ ১৩১৭-তে প্রকাশিত 'বিজ্ঞানে পুতুলপূজা' প্রবন্ধ মধ্যে লেখক বিজ্ঞানবিদ্যার অস্পষ্টতা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। আমরা দেবতাকে না পেয়ে কতগুলি পুতুল কল্পনা করে তার মূর্তি বানিয়ে যেমন ষোড়শোপচারে পূজার ব্যবস্থা করি, তেমনি বিজ্ঞানবিদ্যাও। এতে বিজ্ঞানের কোন দোষ নেই। এই সত্যটি উপলব্ধি করে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সত্যের শ্রেণীবিভাগ করেছেন- স্বতঃসিদ্ধ সত্য ও মনঃকল্পিত সত্য বলে। এমন কতগুলি সত্য আছে যা আমরা মানতে বাধ্য সেগুলি স্বতঃসিদ্ধ সত্য। 'দুই দ্রব্য প্রত্যেকে তৃতীয় দ্রব্যের সমান হলে তারা পরস্পর সমান হবে'- ইউক্লিডের শাস্ত্রে এটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য হলেও সকল শাস্ত্র ও সকল ক্ষেত্রে তা স্বতঃসিদ্ধ সত্য নাও হতে পারে, প্রবন্ধ মধ্যে উদাহরণ প্রয়োগে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তা দেখিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে লেখক স্থান ভেদে দৈর্ঘ্যের পার্থক্যের তুলনামূলক বিচারের দৃষ্টান্তও দিয়েছেন।

এরপর প্রাবন্ধিক জড়ের জড়ত্ব বিষয়ে Mass-এর বাংলা প্রতিশব্দ করেছেন 'বস্তু'। জড়ের সাধারণ ধর্মে ভার (Weight) ও বস্তু (Mass) আবশ্যিক। কিন্তু বস্তু ও ভার এক নয়, উভয়ের পার্থক্য আছে। জড় পদার্থে ভার স্বাভাবিক ধর্ম নয়, কিন্তু বস্তু জড়ের স্বাভাবিক ধর্ম। জড় পদার্থে বস্তুর পরিমাণ অল্প হলে তার ভারও অল্প হবে- এটা পরীক্ষালব্ধ সত্য, স্বতঃসিদ্ধ সত্য নয়। কেননা স্থানভেদে অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে যত উচ্চে বা নিম্নে যাওয়া যাক না কেন বস্তুর ভারের পরিবর্তন হলেও বস্তুর পরিমাণের কোন পরিবর্তন হয় না। অষ্টাদশ শতকের বিজ্ঞানশাস্ত্র জড়ের ও ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানশাস্ত্র শক্তির অবিনাশিতা প্রমাণ করেছে, তার ভ্রান্তি প্রদর্শনে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেছেন যে, শক্তি নানাবিধ রূপ গ্রহণ করতে পারে কিন্তু তার পরিমাণের কখনো হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। জড় পদার্থের ধাক্কা দেওয়া ও ধাক্কা খাওয়ার শক্তি দিয়ে তার জড়ত্ব বা বস্তুর পরিমাণ নিরূপণ করা হয়। তড়িতের সেই শক্তি আছে। যতক্ষণ তড়িৎ-এর কণিকাগুলি স্থির থাকে ততক্ষণ তাদের জড়ত্ব থাকে না। যখন বেগে চলে তখনই জড়ত্বের জন্ম হয় এবং বেগ যত বাড়তে থাকে জড়ত্বও তত বৃদ্ধি পায়। জড়ের এই জড়ত্ব ও শক্তি আসলে আমাদেরই মনগড়া পদার্থ মাত্র। বিশ্বজগৎ সম্পর্কে আমাদের ধারণা পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভরশীল। এদের সাহায্যে বিশ্বজগতের কিয়দংশমাত্র আমরা প্রত্যক্ষ করি। এই সংকীর্ণতা থেকেই আমরা জড় ও শক্তির অবিনাশিতা বিষয়ে কল্পনা করে নিই। এবং বিজ্ঞান যে বিশ্বজগতের কল্পনা করে বাস্তবের তার কোন অস্তিত্বই নেই। লেখকের মতে, 'আমি' এবং 'আমরা'ই একমাত্র এই জগতের পরমার্থরূপ অধিষ্ঠানকর্তা, এই পরমার্থ ব্যতীত বিজ্ঞান অচল, তার অস্তিত্ব জগতে নাস্তি। প্রবন্ধ শেষে লেখক বলেছেন—

> "মৎকল্পিত ও মদ্রচিত বিশ্ব-জগতের দেবালয় জুড়িয়া আমিই এক মাত্র পরমদেবতা অধিষ্ঠান করি। আমিই এই বিশ্ব-জগতের কল্পনাকর্তা এবং আমিই উহার রচনাকর্তা; ইংরেজীতে বলিলে আমিই এই বিশ্ব-জগতের ডিজাইনার ও আমিই উহার আর্কিটেক্ট। আমিই উহার 'রূপ' দিয়াছি এবং আমিই উহার 'নাম' দিয়াছি। আশ্চর্য্য এই যে, কি জানি, কি খেয়ালের বশ হইয়া আমি যেন তাহা জানি না, এইরূপ অভিনয় করি, এবং আমার বাহিরে এবং আমার উপরে আর এক জন কল্পনাকর্ত্তার ও রচনাকর্ত্তার কল্পনা করিয়া, কোথায় তিনি, কোথায় তিনি, এইরূপ জিজ্ঞাসার পণ্ড শ্রমে আমি প্রবৃত্ত হই। অথবা স্বতন্ত্র আমার, স্বাধীন আমার, মুক্ত আমার, এইরূপ পরতন্ত্রবৎ, পরাধীনবৎ, বন্ধুবৎ আচরণেই,—এই পণ্ড শ্রম স্বীকারেই, -আমার আহ্লাদ এবং এই জিজ্ঞাসাতেই আমার আনন্দ।"[৯]

'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থভুক্ত দার্শনিক প্রবন্ধগুলি হল- 'সুখ না দুঃখ?', 'সত্য', 'অতিপ্রাকৃত- প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব', 'কে বড়?' এবং 'পঞ্চভূত'। এই রচনাগুলির মধ্যে প্রাবন্ধিক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর দার্শনিক মনোভাবের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। 'সুখ না দুঃখ?' তার মধ্যে অন্যতম। এই প্রবন্ধে লেখক জগতে সুখ না দুঃখ- কার আধিক্য বেশি তার উত্তর দিতে গিয়ে ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদের উল্লেখ করেছেন এবং দুঃখবাদীদের মধ্যে শোপেনহাওয়ার ও হার্টম্যানকে অগ্রবর্তী করে বলেছেন যে, জীবন সর্বাংশে দুঃখময় এবং সুখ হলো দুঃখের অভাবমাত্র। বিজ্ঞানের কাছেও এর সদুত্তর নেই। সেখানে দেখা যায় প্রকৃতি নিষ্ঠুর। সে তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে মানবজীবনকে ধ্বংস করতেও ভাবিত হয় না। কেননা ব্যক্তিগত বৃদ্ধি নয় জাতীয় জীবনের বৃদ্ধিই প্রকৃতির উদ্দেশ্য। আবার সাহিত্যকে লেখক কবিজীবনের প্রতিবিম্বরূপে দেখে বলেছেন যে, কালিদাস অনন্ত সুখ ও সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন; শেক্সপিয়রের রচনায় পরীরাজ্যের চঞ্চলতা থেকে ইংরেজের জাতীয় জীবনের চঞ্চলতা অনুভব করা যায়; বন্ধুশোকার্ত টেনিসন প্রকৃতির উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে না পেরে দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হয়েছেন; যেমন হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের কুন্দনন্দিনী। মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দুঃখ-সঙ্গীত হলো 'রামায়ণ'। অতএব জীবনে দুঃখ থাকবে কিন্তু তাই ব'লে বৈরাগ্য সাধন প্রকৃতির উপদেশ নয়।

'সত্য' প্রবন্ধে দর্শন ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ে ঘটেছে। হর্বর্ট স্পেন্সর সত্যের একটি সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন যে, আমরা যার বিকল্প কল্পনা করতে পারি না তাই সত্য। প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা সত্য। কিন্তু প্রকৃতি চিরকাল যে নিয়মে চলেছে, আগামীতেও যে সেই নিয়মে চলবে তার নিশ্চয়তা নেই। তবে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলেও প্রকৃতি অন্য এক নিয়মের অধীন হবে এই মাত্র বলা যায়। ভূয়োদর্শনও এই একই কথা বলেছে- আজ যা নিয়ম কাল তা অনিয়ম হতেই পারে। এই ভাবনার অনুরূপ প্রকাশ লক্ষিত হয় 'অতিপ্রাকৃত- প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব' রচনাদ্বয়ের মধ্যে। রচনা দুটি দশ বছরের ব্যবধানে প্রকাশিত হয় সাধনা ও বঙ্গদর্শন পত্রিকায়। রচনা দুটির মধ্যে লেখক প্রাকৃত নিয়মের যা বিরুদ্ধ সেই অতিপ্রাকৃত বিষয়ের মূল অনুসন্ধানে তৎপর হয়েছেন। যা প্রকৃতি নির্দিষ্ট ও প্রকৃতির নিয়মসঙ্গত তা প্রাকৃত এবং প্রকৃতির নিয়মের বাইরে যা কিছু ঘটমান তাই হল অতিপ্রাকৃত। লেখক প্রথম প্রস্তাবে বলেছেন যে, অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সেই বিশ্বাস কমে আসছে। অনভিজ্ঞতার কারণে কোন সত্য ঘটনাও অলীক বলে প্রতীত হলেও তা সর্বাংশে প্রকৃতির নিয়ম ছাড়া নয়। বিশ্বব্যাপী যা কিছু ঘটমান তার সবই প্রকৃতির নিয়মাধীন অর্থাৎ প্রাকৃত। হিউম, টিণ্ডাল প্রমুখ দার্শনিকগণের মতে, জগতে অতিপ্রাকৃত বা মিরাকলের কোন স্থান নেই। প্রাবন্ধিক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেছেন—

> "অতিপ্রাকৃত ঘটনা অর্থশূন্য প্রলাপবাক্য। উহা বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় নিরর্থক শব্দ।" [১০]

'কে বড়?' প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণে প্রাবন্ধিক প্রথমে বিজ্ঞানের পরে দর্শনের কাছে উত্তর খুঁজেছেন। মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ জীব কি না তার মীমাংসার্থে লেখক বিজ্ঞানের দ্বারস্থ হয়ে ডারউইন ও লাপ্লাসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার উল্লেখ করেছেন। প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্বানুযায়ী মানুষের উপকারে আসে না এমন কোন বস্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নেই। কিছুকাল পরেই আবার বিজ্ঞান জানায় যে, এই বিরাট বিশ্বজগতের কাছে মানুষ অতি ক্ষুদ্র কীট তুল্য বালুকণা বিশেষ। এই উত্তর মনোঃপূত না হওয়ায় লেখক দার্শনিক মীমাংসার পথ অবলম্বন করে জানেন, জগৎ অসীম নয়, কালও অনন্ত নয়—

> "মানুষে কাল্পনিক অনন্তের ও কাল্পনিক অনাদির সৃষ্টি করিয়া আপনার সম্মুখে ধরিয়া তাহার কাল্পনিক বৃহত্ত্বের তুলনায় আপনাকে ক্ষুদ্র মনে করিয়া প্রতারিত হয়।"[১১]

দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যায় লেখক বলেছেন যে, মানুষের অন্তরেই জগতের বাস। মানুষই এই জগতের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা। সে তার অন্তরের জগতকে বাইরে প্রক্ষেপ করেই এই বিশাল কাল্পনিক জগতের সৃষ্টি করেছে। আর মানুষের জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সেই জগতের পরিধিও বিস্তৃততর হয়ে চলেছে।

আশ্বিন-কার্তিক ১৩০৫ বঙ্গাব্দে পুণ্য পত্রিকায় প্রকাশিত 'পঞ্চভূত' নামক দার্শনিক প্রবন্ধে দর্শনের পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক মতবাদ আলোচিত হয়েছে। দার্শনিক মতে, পঞ্চভূত অর্থাৎ পাঁচটি ভূতের (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) সমন্বয়ে জগৎ নির্মিত। ভূত শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো এলিমেন্ট। আবার বৈজ্ঞানিক মতে, জগৎ আশিটি এলিমেন্টের দ্বারা নির্মিত (ভবিষ্যতে সংখ্যাটি বাড়তে পারে)। এই বিষয়ে দর্শন ও বিজ্ঞান-উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই; কেবল তাদের প্রণালী, পথ ও ভাষা স্বতন্ত্র মাত্র। তারা উভয়েই জগতকে বিশ্লেষণ করে জগতের মূল উপাদানগুলি নির্ণয়ের চেষ্টা করে। একজনের অন্বেষণ পদ্ধতির নাম মনোবিজ্ঞান, অন্যজনের জড়বিজ্ঞান।

শুধু বিজ্ঞান-দর্শন নয়, এ দেশীয় দার্শনিকদের মতো গ্রীক দার্শনিকেরাও ভৌতিক পদার্থের বিশ্লেষণে পঞ্চভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। আবার জগৎ বিশ্লেষণে দর্শনের দুটি শাখা সাংখ্য ও বেদান্তের বিশ্লেষণ প্রণালীও প্রায় একই রকম। উভয়েই পঞ্চভূতের (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ) সমন্বয়ে জগতকে বিশ্লেষণ করেছেন। তা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম প্রভেদ বিদ্যমান। যেমন সাংখ্য দর্শনের মহাভূত এবং বেদান্ত দর্শনের সূক্ষ্মভূত ও স্থূল ভূত মনঃকল্পিত বিষয়, বাস্তবে যার কোন অস্তিত্ব নেই। সাংখ্য মতে পাঁচটি মহাভূতের (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) মধ্যে ক্ষিতি হলো শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চভূতের সমষ্টি। অপ অর্থাৎ জলে বর্ণ ব্যতীত চারটি গুণ বিদ্যমান। তেজ তিনগুণের সমষ্টি যথা- শব্দ, স্পর্শ ও বর্ণ। মরুৎ অর্থাৎ বায়ুতে কেবল শব্দবহন শক্তি ও স্পর্শজনন শক্তি আছে। ব্যোম বা আকাশের কেবল আছে শব্দগুণ। এই পঞ্চভূতের অন্বয়ে এক-একটি মহাভূত এবং পঞ্চ মহাভুতের সমন্বয়ে ভৌতিক পদার্থরূপ জগৎ নির্মিত হয়েছে। অন্যদিকে বেদান্তের পরিভাষায় ভূত দ্বিবিধ- সূক্ষ্ম ভূত ও স্থূলভূত— যাদের একটি ব্যতীত অন্য কোন গুণ নেই। যেমন আকাশের কেবল শব্দগুণ, বাতাসের স্পর্শগুণ, জলের রস, তেজের রূপ ব্যতীত অন্য কোন গুণ নেই। এই পাঁচটি সূক্ষ্ম ভূত বিভিন্ন মাত্রায় যুক্ত করলে নির্মিত হয় স্থূল ভূত। বেদান্তের পরিভাষা অনুসারে, প্রত্যেক সূক্ষ্ম ভূতের চার ভাগে অন্য চারটি সূক্ষ্ম ভূতের প্রত্যেকের এক ভাগ করে যোগ করলে স্থূলভূত হয়। অর্থাৎ স্থূল ভূতের ষোল আনা বিশ্লেষণ করলে একটা সূক্ষ্ম ভূতের আট আনা এবং অন্য চারটা সূক্ষ্ম ভূতের প্রত্যেকটি দু আনা করে বিদ্যমান থাকে— প্রত্যেক স্থূল ভূতেই রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ- এই পাঁচ গুণ বিদ্যমান; একটা প্রবল, বাকিগুলো দুর্বল। এইভাবে পাঁচ গুণ মিশিয়ে বা পঞ্চ সূক্ষ্মভূত সমন্বয়ে স্থূল ভূত নির্মাণকে 'পঞ্চীকরণ' বলা হয়। মোটকথা সাংখ্য ও বেদান্ত— উভয়ের জগত ব্যাপার বিশ্লেষণের পরিভাষা কিঞ্চিৎ ভিন্ন হলেও রীতি ও মত এক ধরনের। উভয়েই বাহ্য জড়জগৎকে পঞ্চভূতের দ্বারা বিশ্লেষণ করেছেন এবং সাংখ্যের মহাভূত ও বেদান্তের স্থূলভূত— 'উভয়ই তন্মাত্রের সমষ্টি মাত্র'। আবার বৈজ্ঞানিকের এলিমেন্ট ও দার্শনিকের ভূত— উভয় শব্দের অর্থ এক হলেও, তাৎপর্য ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি কিন্তু এক নয়।

পরিশেষে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'জিজ্ঞাসা' পর্যালোচনা করে স্পষ্ট হয় যে, তিনি কেবল একজন বিজ্ঞানমনস্ক প্রাবন্ধিকই নন, বরং বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যের এক অনন্য সমন্বয়কারী চিন্তক। বিজ্ঞানের কঠোর সত্যকে তিনি দর্শনের ভাবনায় যেমন বিশ্লেষণ করেছেন তেমন সেই বিশ্লেষণকে সাহিত্যিক ভাষার মাধুর্যে পাঠকের কাছে সহজ ও গ্রহণযোগ্য করে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর রচনায় যেমন বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে, তেমনি আছে অস্তিত্ব ও বিশ্ববোধ সম্পর্কে দার্শনিক অনুসন্ধান, এবং সেই অনুসন্ধানকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে সাহিত্যিক

প্রকাশভঙ্গি। তাই 'জিজ্ঞাসা' কেবল একটি প্রবন্ধধর্মী রচনা নয়, বরং বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যের ত্রিবেণী সঙ্গমস্থল।

তথ্যসূত্র:

১. বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ, দাস শ্রীসজনীকান্ত, রামেন্দ্র-রচনাবলী প্রথম খণ্ড, আষাঢ় ১৩৫৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা-৩৭, পৃ- ২৫৫।
২. তদেব, পৃ- ২৫২।
৩. তদেব, পৃ- ৩৪৮।
৪. তদেব, পৃ- ১৭৬।
৫. তদেব, পৃ- ১৮৯।
৬. তদেব, পৃ- ১৯৭।
৭. তদেব, পৃ- ৪৩৪।
৮. তদেব, পৃ- ৪৪৬।
৯. তদেব, পৃ- ৪৭৮।
১০. তদেব, পৃ- ২০৯।
১১. তদেব, পৃ- ২৪৭।

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1914-1920
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.415

সন্‌জীদা খাতুনের স্মৃতিকথায় শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গ

সুপর্ণা মণ্ডল, *গবেষক, তুলনামূলক সাহিত্য কেন্দ্র, ভাষা ভবন, বিশ্বভারতী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 15.03.2026; Accepted: 17.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

From the very inception of Visva-Bharati, students, scholars, and teachers have come to Santiniketan from across the world. Many students also come from the neighbouring country, Bangladesh. These students later form a special connection with Santiniketan. Sanjida Khatun was one of them. She became famous later in life as a Rabindrasangeet singer and founder of Chhayanaut, but she spent her early days in Santiniketan. She wrote about her memories of Santiniketan in her books titled 'Santiniketaner Dinguli' and 'Sahaj Kothin Dwande Chhonde.' These books reflect life in Santiniketan at that time. As East Pakistan (later Bangladesh) was going through a lot of turmoil at the time, Santiniketan became her place of refuge. This essay aims to discuss Sanjida Khatun's experience in Santiniketan, as recounted in her memoirs.

Keywords: Sanjida Khatun, Santiniketan, Visva-Bharati, Memoir, Bangladesh

বিশ্বভারতীর সূচনালগ্ন থেকেই বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থী, গবেষক ও শিক্ষকেরা যোগ দিয়েছেন বিদ্যাচর্চার এই প্রাঙ্গনে। "যত্র বিশ্বম্ ভবত্যেকনীড়ম্"- বিশ্বভারতীর এই মূল মন্ত্র সার্থক হয়েছে বিশ্বের যোগদানে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকেও বহু শিক্ষার্থী বিভিন্ন সময় বিশ্বভারতীতে এসেছেন এবং সেই সূত্রে শান্তিনিকেতনের সঙ্গেও তাঁদের একটা যোগসূত্র তৈরি হয়ে গেছে। এমনই একজন ব্যক্তিত্ব সন্‌জীদা খাতুন। রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী, রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ ও সাংস্কৃতিক সংগঠক হিসাবে সুপরিচিত সন্‌জীদা খাতুন বিশ্বভারতীতে পড়াশোনার সূত্রে দীর্ঘ সময় এখানে যাপন করেছেন। তাঁর সেই অভিজ্ঞতা তিনি নথিভুক্ত করেছেন 'সহজ কঠিন দ্বন্দ্বে ছন্দে' নামক তাঁর আত্মজীবনী এবং 'শান্তিনিকেতনের দিনগুলি' নামক স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থে। এই গ্রন্থদুটি থেকে তৎকালীন শান্তিনিকেতনের পরিবেশ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। সেই সময়ের শান্তিনিকেতনে বসবাসকারী বহু সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে সন্‌জীদা খাতুনের আলাপ হয়েছিল যার বর্ণনা রয়েছে এই গ্রন্থদুটিতে। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী হিসাবে সব সময় যে তাঁর ভালো অভিজ্ঞতা হয়েছে তা নয়, খারাপ অভিজ্ঞতার কথাও কিছু কিছু উল্লেখ করেছেন তিনি। ১৯৫৪ সালের শেষ দিকে তিনি প্রথম শান্তিনিকেতনে আসেন। তার পর থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাজে তিনি এখানে এসেছেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের যখন টালমাটাল অবস্থা তখন শরণার্থী হয়েও তিনি এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে। তাঁর অভিজ্ঞতায় শান্তিনিকেতন, সেখানকার মানুষ ও পরিবেশ যেভাবে পরিস্ফুট হয়েছে তা এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে।

ছোটবেলা থেকেই সন্‌জীদা খাতুনের কাছে শান্তিনিকেতন ছিল এক "স্বপ্নের দেশ।" রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রীতির ভাব থেকে শান্তিনিকেতন নিয়ে একটা কল্পনা তাঁর মনে জেগে উঠেছিল। কিন্তু সেই সময় একটি মেয়ের বিদেশে পড়তে আসা এত সহজ ছিল না। পরিবার থেকে স্বাভাবিক ভাবেই রাজি ছিল না। তবে তিনিও হাল ছাড়েননি। বি.এ. অন্তিম বর্ষে নিজেই উদ্যোগ নিয়ে বিশ্বভারতীতে আবেদনপত্র পাঠিয়ে দেন। আবেদন গৃহীত হলে তাঁর বাবা-মাও শেষ অব্দি রাজি হয়ে যান। বিশ্বভারতী বাংলা বিভাগের তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান প্রবোধচন্দ্র সেন ছিলেন সন্‌জীদা খাতুনের বাবা কাজী মোতাহার হোসেনের বন্ধু। গবেষণার বিষয়ে বিভিন্ন ভাবে সন্‌জীদার পথ প্রদর্শন করেছিলেন তিনি। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে নিয়ে গবেষণার অনুপ্রেরণাও তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছিলেন সন্‌জীদা। সেই সময় বিশ্বভারতীতে গবেষণা ও পঠনপাঠনের সংস্কৃতির একটা পরিচয় লেখিকার স্মৃতিকথা থেকে পাওয়া যায়।

শান্তিনিকেতনে দৈনন্দিন জীবনযাপনের নানা স্মৃতিও ধরা রয়েছে সন্‌জীদা খাতুনের 'শান্তিনিকেতনের দিনগুলি' গ্রন্থে। এম.এ. শিক্ষার্থী হিসাবে ভর্তি হওয়ার পর তিনি শ্রীসদন (তৎকালীন শ্রীভবন) হস্টেলে থাকতেন। তখনকার অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি লিখেছেন,

> "স্কুলের ওপরদিককার শিক্ষার্থীরা আমাদের একতলা ব্লকের বাথরুম ব্যবহার করত। যাবার পথে মিনুদিকে সম্ভাষণ না করলে চলত না ওদের। সেভেন, এইট, নাইন, টেন-এর গানপাগল মেয়ে এরা। সেভেনের শ্যামলী খাস্তগীর, এইটের রমা, নাইনের ইন্দ্রাণী, মহাশ্বেতা আরও সব কারা। নতুন গান শিখলে শোনাত, গাইতে হতো মিনুদিকেও। প্রিয় গানের ফরমাশ হতো তো! আমি এমএ দ্বিতীয় পর্বের ছাত্রী। ওদের সঙ্গে কলকল করে গল্প চলত। কোথায় ভেসে যেত বয়সের বাধা।"[১]

মিনুদি নামেই তিনি এত বেশি পরিচিত ছিলেন যে অনেকে তাঁকে ওই নামেই চিনত, সন্‌জীদা নামটি হয়তো জানতই না। 'সহজ কঠিন দ্বন্দ্বে ছন্দে' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে একটি অভিজ্ঞতার কথা তিনি লিখেছেন। একবার আমেরিকায় গানের অনুষ্ঠানে গিয়ে শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী সুপর্ণা লাহিড়ীর সঙ্গে সন্‌জীদা খাতুনের দেখা হয়। অনুষ্ঠান শেষে তাঁর কাছে এসে তিনি বলে ওঠেন, "অ্যাই মিনুদি, তুমি আবার কবে সন্‌জীদা খাতুন হলে?"[২] নামের কারণে কখনও কখনও তাঁকে বিড়ম্বনার শিকারও হতে হয়েছে। সকলে "মিনু" নামটি শুনে ধরে নিত তিনি হিন্দু। একবার যেমন শান্তিনিকেতনে তেজেশ সেনের সঙ্গে তিনি দেখা করতে গিয়েছিলেন তখন পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন তেজেশ সেন। কথা প্রসঙ্গে সন্‌জীদা জানান যে তাঁর বাবা স্ট্যাটিসটিক্সে বিভাগের প্রধান। এই কথা শুনে তিনি মন্তব্য করে বসেন যে ওই বিভাগে মুসলমান না পাওয়ায় তাঁর বাবাকে প্রধান করা হয়েছে। এই কথা শুনে স্বভাবতই বিব্রত হন সন্‌জীদা খাতুন। আসলে তেজেশ সেন সন্‌জীদা খাতুনের "মিনু" নাম শুনে তাঁকে হিন্দু ভেবে নিয়ে এই মন্তব্য করেছিলেন। পরে অবশ্য নিজের ভুল বুঝতে পেরে সন্‌জীদার কাছে ক্ষমাও চেয়েছিলেন তিনি।[৩] ধর্মীয় কারণে এমন বহু অপ্রীতিকর ঘটনার সাক্ষী থেকেছেন সন্‌জীদা খাতুন। তবে ধর্মীয় গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে উঠে আপন করে নেওয়ার মতো মানুষের সংখ্যাও কম ছিল না শান্তিনিকেতনে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের পরিবার ছিল এমন একটি জায়গা। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন-

> "শান্তিনিকেতনের প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের পরিবারের প্রতি আমার মা খুব অনুকূল ছিলেন। জীবনে কত জায়গাতেই তো মুসলমান বলে হেনস্তার পাত্র হয়েছেন! তাই ওঁদের বাসায় আমাকে পরিচয় করিয়ে। দিয়ে বলেছিলেন–এই বাড়িতে মুসলমান বলে কোনো

> মানুষকে ছোট করা হয় না। সত্যি সত্যি ওঁদের বাড়িতে কারও কাছে কোনো অবহেলা পাইনি।"[৪]

শান্তিনিকেতনের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে ওতোপ্রোত ভাবে জড়িয়ে গিয়েছিলেন সন্‌জীদা খাতুন। 'শান্তিনিকেতনের দিনগুলি' গ্রন্থটিতে তিনি সময়ের সরলরৈখিক গতি অনুসারে লেখেননি। স্মৃতিতে যখন যা এসেছে সেই ভাবেই লিখেছেন। তবে এই গ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তাঁর গান শোনার স্মৃতি। এভাবেই এসেছে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা, শান্তিদেব ঘোষের কথা, নীলিমা সেনের কথা-

> "কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বপন যদি ভাঙিলে' শুনেছিলাম একবার পৌষমেলার সময়ে ছাতিমতলার উপাসনায়। ওঁর গান ছিল প্রথমেই। আমি ওখানে পৌঁছে তখনো বসতে পারিনি, 'ভাঙিলে'র টানের সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখ দিয়ে দরদর করে জল ঝরে পড়ল! কী লাবণ্যময় যে সে-উচ্চারণ!"[৫]

সেই সময় শান্তিনিকেতনে গান গাওয়ার, গান শোনার যে সংস্কৃতি ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় সন্‌জীদা খাতুনের স্মৃতিকথায়। গান নিয়ে গোঁড়ামির কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন এক জায়গায়। শান্তিনিকেতনের মেয়েরা শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীতই গাইবে এই ছিল অনেকের ধারণা। একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সকারশনে কটকে বেড়াতে গিয়ে মুজতবা আলীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল তাঁদের। সেখানে মুজতবা আলী সন্‌জীদার কাছে পল্লিগীতি শুনতে চেয়েছিলেন। তিনি পল্লিগীতি গাওয়ায় তা নিয়ে অনেকে আপত্তি জানিয়েছিল। এই বিষয়ে আর একটি অভিজ্ঞতার কথাও তিনি লিখেছেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিবে একবার একটি গীতি-আলেখ্য হয় 'রূপান্তরের গান' নামে। সেখানে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' থেকে শুরু করে অনেক গণসংগীত ছিল। সেই নিয়ে অনেকে আপত্তি তুলেছিল। কিন্তু সন্‌জীদা কখনই এই ধরনের গোঁড়ামিকে সমর্থণ করেননি। তিনি লিখেছেন-

> "অথচ লাইব্রেরির বারান্দায় নির্মলেন্দু চৌধুরীর গানও তো হয়েছে। তিনি তো পল্লিগীতিই গেয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথের আমলে সাহেবদের অদ্ভুত উচ্চারণে রবীন্দ্রসংগীতও তো হয়েছে আশ্রমে। তার বেলা? এসব আপত্তির কোনো মানে বুঝি না। বুঝি, রবীন্দ্রনাথের অন্তত ও রকমের অদ্ভুত গোঁড়ামি ছিল না।"[৬]

এই ধরনের সংকীর্ণতার কারণে অনেক চেষ্টা করেও সংগীত ভবনে গান শেখার জন্য চেষ্টা করেও সেখানে টিকতে পারেননি তিনি।

এছাড়া শান্তিনিকেতনের সাহিত্যচর্চার প্রসঙ্গও পাওয়া যায় সন্‌জীদা খাতুনের স্মৃতিকথায়। শিক্ষা ও বিদ্যা ভবনে সেই সময় 'সাহিত্যিকা'-র আসর বসত যেখানে শিক্ষার্থীরা নিজেদের লেখা গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি পাঠ করত। 'সাহিত্যিকা'-র সম্পাদক পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় একবার সন্‌জীদা খাতুনকে সেখানে কবিতা পাঠের আহ্বান জানান। তিনি কবিতা লেখেন না বলাতে শেষ অব্দি কবিতাবিষয়ক একটি প্রবন্ধ পাঠের জন্য তাঁকে ডাকা হয়। সভাপতি অশোকবিজয় রাহা তাঁর প্রবন্ধের অনেক প্রশংসাও করেছিলেন। প্রবোধচন্দ্র সেন সেই সময় কিছু সমালোচনা করলেও পরে প্রবন্ধটি একটি পত্রিকায় ছাপার ব্যবস্থাও করে দেন।[৭] এই সমালোচনার জন্য অবশ্য একটু অভিমানও হয়েছিল তাঁর। এম.এ. ক্লাসের সেমিনারে প্রমথ চৌধুরীর উপর লেখা প্রবন্ধ একটি পত্রিকায় ছাপা হলে সেটিও খুব প্রশংসিত হয়েছিল। এম.এ.-এর পরেও বিভিন্ন সময় যখন তিনি আসতেন কোন লেখা শেষ হওয়ার পর মতামত নেওয়ার জন্য কখনও সত্যেন সেন, কখনও শান্তা ও অসিত

ভট্টাচার্যকে শোনাতে যেতেন। রতনকুঠীর স্কলার্স ব্লকে নিজের ঘরেও কখনও কখনও এইসব পাঠের আসর আয়োজন করতেন তিনি।

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর বাংলাদেশে পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক হয়ে ওঠায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছয় মাসের স্টাডি লিভ নিয়ে শান্তিনিকেতনে গবেষণার কাজে ফিরে আসেন সন্‌জীদা। তবে ভর্তি হতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় তাঁকে। উপাচার্য তাঁকে জানান যে কিছুদিন আগে শান্তিনিকেতনে নাকি প্রাচীরঘেরা সি.আই.এ.-এর আস্তানা পাওয়া গেছে তাই সরকারি নির্দেশ ছাড়া আর কোন বিদেশীকে ভর্তি নেওয়া হবে না। তবে এরপর দিল্লি থেকে তাঁর নামে একটি বড় টেলিগ্রাম আসে যার ফলে তাঁকে ভর্তি নিয়ে নেওয়া হয়। পরে তিনি জেনেছিলেন এই টেলিগ্রামের পিছনে কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ভূমিকা ছিল। তাঁর প্রতি যথাযোগ্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন সন্‌জীদা খাতুন।[৮] নয় মাস পরে তিনি যখন গবেষণাপত্র জমা দেন তখন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অবাক হয়ে যান। সার্বিক ভাবে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে তাঁদের অভিজ্ঞতা ভালো ছিল না। তবে গবেষণা পর্বে অনেক জ্ঞানীগুণীজনের সহায়তাও পেয়েছিলেন তিনি যা তাঁর গবেষণাকর্মটিকে সমৃদ্ধ করে তুলতে সাহায্য করেছিল।

হস্টেল ছাড়াও শান্তিনিকেতনে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জনের বাড়িতে থাকার অভিজ্ঞতা নিয়েও লিখেছেন সন্‌জীদা। এই প্রসঙ্গেই এসেছে শ্যামলী খাস্তগীরের কথা। তাঁর বিখ্যাত 'পলাশ' বাড়িতে কিছু দিন ছিলেন লেখিকা। আণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে শ্যামলী খাস্তগীরের প্রতিবাদী অবস্থানের কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি। প্রতিবাদের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে শ্যামলী খাস্তগীর বেছে নিয়েছিলেন তাঁর ছবিগুলিকে। সেই সব ছবির প্রদর্শনী হলে সেখানে সন্‌জীদা খাতুন গান গাওয়ার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। দুজনের মধ্যে খুবই আন্তরিক সম্পর্ক ছিল।

এছাড়া শান্তিনিকেতনে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক নিয়েও বেশ কিছু মজার মজার গল্প ও অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন সন্‌জীদা খাতুন। কবি ও অধ্যাপক অশোকবিজয় রাহার সেই বিখ্যাত কবিতা "চমকে উঠি– আরে! আধখানা চাঁদ আটকে আছে টেলিগ্রাফের তারে!" এই নিয়ে ছাত্ররা তাঁর সঙ্গে ঠাট্টা করত। শৈলেশ্বর বাগ নামের এক ছাত্র একবার তাঁর কাছে গিয়ে বলেছিল, "অশোকদা, আমি একটা কবিতা লিখেছি— 'অশোকবিজয় রাহা/আ-হা!" অশোকবিজয় রাহাও একদিন সেই ছাত্রটিকে ডেকে বললেন, "শোনো হে, আমিও একখান কবিতা লিখেছি। সেটা হলো— 'শৈলেশ্বর বাগ/ভাগ।"[৯] এই ধরনের অনেক মজাদার কাণ্ড চলত শান্তিনিকেতনে। আর একটি ঘটনার কথা যেমন সন্‌জীদা খাতুন লিখেছেন-

> "শিল্পী মুকুল দের কন্যা মঞ্জরী একদিন ক্লাসে গিয়ে দেখে চিরকুমারী খিটখিটে স্বভাবের নলিনীদি মেয়েদের একে একে দাঁড় করিয়ে প্রতিজ্ঞা করাচ্ছেন, 'আমি জীবনে কখনো বিবাহ করিব না।' মঞ্জরীর পালা এলে ও উঠে দাঁড়িয়ে গড়গড় করে বলল, 'আমি জীবনে সুযোগ পাওয়ামাত্র বিবাহ করিব'।"[১০]

তবে শান্তিনিকেতনে সব সময় যে তাঁর ভালো অভিজ্ঞতাই হয়েছিল এমন নয়। কখনও কখনও এখানে অবহেলার শিকারও হতে হয়েছে সন্‌জীদা খাতুনকে। বাংলাদেশে উনি যতটা বিখ্যাত ছিলেন রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী আর ছায়ানটের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে, শান্তিনিকেতনে সব সময় সকলে তাঁর সেই পরিচয় জানত না। ফলে নিজের যোগ্যতা নিয়ে অনেক বাঁকা মন্তব্য তাঁকে শুনতে হয়েছে বিভিন্ন সময়। একবার উপাচার্য অম্লান দত্তের বাড়িতে আগত লন্ডনপ্রবাসী এক দম্পতি তাঁর ছাত্র ইকবালের গানের কথা বলছিলেন।

কিন্তু ইকবাল তাঁর ছাত্র একথা বলতেই তাঁরা সন্দেহের চোখে ওনার দিকে তাকান। তারপর ছায়ানটের অধ্যক্ষ হিসাবে নিজের পরিচয় দেওয়াতে তাঁদের সন্দেহ আরো বেড়ে যায়।[১১] আসলে পোশাক-পরিচ্ছদের দিক দিয়ে তিনি সব সময় সাধারণ থাকতেই ভালোবাসতেন। এই কারণে অনেকে তাঁর যোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ করত।

শান্তিনিকেতনে জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে দেখা হওয়ার অভিজ্ঞতাও আলোচ্য গ্রন্থদুটিতে লিপিবদ্ধ করেছেন সন্‌জীদা খাতুন। নেহেরু শান্তিনিকেতন এলে বিদেশি ছাত্রছাত্রীদের তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল একবার। উদয়নের একতলার ঘরে বসে তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন নেহেরু। মনোযোগ দিয়ে সকলের কথা শুনেছিলেন। প্রতিটি দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক নিয়ে বলতে বলতে বারবার এশিয়ার ঐক্যের উপরেই জোর দিয়েছিলেন তিনি। উদয়ন ভবনের বাইরে তাঁদের সঙ্গে ছবিও তুলেছিলেন নেহরু। পাকিস্তান আমলে সন্‌জীদা খাতুনের বাড়ি থেকে এই ছবি চুরি যায়। ভারত আর নেহরুর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতার প্রমাণ হিসাবে কেউ সেই ছবি নিয়ে চলে যায়। সন্‌জীদা খাতুন মজা করে লিখেছেন, "গুপ্তচর বিভাগের দপ্তরে ওগুলোর খুব কদর হয়েছিল নিশ্চয়ই!"[১২] একদিকে বাংলাদেশের একটা শ্রেণি তাঁকে ভারতের গুপ্তচর ভাবত, অন্যদিকে ভারতেও একবার তাঁকে নিয়ে গুজব রটে যায় যে তিনি নাকি কেজিবির এজেন্ট। নরেশ গুহ নাকি প্রতিভা বসুর বাড়িতে এই কথা বলেছিলেন। এই কথা শুনে তিনি খুবই মর্মাহত হয়েছিলেন- "দেশে বাঙালি সংস্কৃতির উন্নয়ন আর প্রসারের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে অবশেষে এই নাম জুটল আমার!"[১৩] তবে এই গুজব রটার কারণ পরে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর কন্যা রুচিরা মস্কোয় পড়াশোনা করতেন। তিনি একবার 'সিসিসিপি' লেখা একটা ব্যাগ নিয়ে আসেন। সন্‌জীদা সেই ব্যাগ নিয়ে শান্তিনিকেতন এসেছিলেন। হয়তো সেই ব্যাগ থেকেই লোকজন তাঁকে রাশিয়ার গুপ্তচর ভেবে বসেছিল।[১৪] উপাচার্য প্রতুল গুপ্ত সন্‌জীদা খাতুনকে রবীন্দ্রভবনের একটি ফেলোশিপ দিয়েছিলেন। তা নিয়েও অনেকে সমালোচনা করত। অনেকে বলতেন, "ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের ওদের চাকরি দিতে চান, ভালো কথা, চাকরি তৈরি করুন! আমাদের জন্যে যেসব চাকরি, তা ওদের দেওয়া হবে কেন?"[১৫] এই ধরনের সমালোচনা সাময়িক ভাবে তাঁর মনকে বিষিয়ে দিত ঠিকই কিন্তু পরে তিনি নিরপেক্ষ ভাবেও এগুলি বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। 'সহজ কঠিন দ্বন্দ্বে ছন্দে' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, ভারত যেভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করেছে, তার প্রতিদান কি তাঁরা দিতে পেরেছেন? এমনকি বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মনেও তিনি এই নিয়ে কোন কৃতজ্ঞতার বোধ তৈরি হতে দেখেননি।[১৬]

শান্তিনিকেতন নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্মৃতিকথা রচিত হয়েছে। এই সমস্ত স্মৃতিকথায় রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন নিয়ে একটা রোমান্টিক ভাবনা কাজ করেছে কোন কোন সময়। তবে সন্‌জীদা খাতুন তাঁর স্মৃতিকথায় শান্তিনিকেতনের বাস্তব রূপকেই তুলে ধরেছেন। অপ্রিয় সত্য উচ্চারণ করতেও ভয় পাননি। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর যে অনুরাগ সেটিও কোন দিন অন্ধ ভক্তির পর্যায়ে যায়নি। আত্মজীবনীর এক জায়গায় তিনি লিখেছেন যে শান্তিনিকেতনে অনেকে রবীন্দ্রনাথকে 'গুরুদেব' বলে সম্বোধন করত কিন্তু তিনি কোন দিন এই নামে তাঁকে ডাকেননি। আসলে তাঁর মনে হত এই ডাকটি ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ভাবনার সঙ্গে যুক্ত কিন্তু তিনি যখন বিশ্বভারতীতে ভর্তি হন ততদিনে আশ্রমের সেই আগের পরিবেশ আর ছিল না। ফলে এই সম্বোধনের প্রয়োজনীয়তাও তিনি অনুভব করেননি।[১৭]

আত্মজীবনী 'সহজ কঠিন দ্বন্দ্বে ছন্দে'-র অনেকটা অংশ জুড়ে শান্তিনিকেতনের অনেক মানুষদের স্মৃতিচারণ করেছেন সন্‌জীদা খাতুন। প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী নীলিমা সেন এমন একজন। তাঁকে সবাই

বাচ্চুদি বলেই ডাকত। ১৯৭১ সালে তিনি যখন শরণার্থী অবস্থায় সন্তানদের নিয়ে শান্তিনিকেতনে আসেন তখন নীলিমা সেন তাঁকে অনেক সাহায্য করেছিলেন। এছাড়া শিল্পী রামকিঙ্কর বেজের সঙ্গেও তাঁর দেখা হয়েছিল। সরাসরি আলাপ না থাকলেও তাঁর কথা গানের সূত্রে আগে থেকেই জানতেন রামকিঙ্কর।[১৮] ১৯৭৫-এর পর অনিল চন্দ ও রানী চন্দের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তাঁর। তাঁদের বাড়িতে প্রচুর ফলের গাছ ছিল। ওঁদের বাড়িতে বেড়াতে গেলেই কিছু না কিছু ফল প্রাপ্তি হত সন্‌জীদার। ক্ষিতিমোহন সেনের ভাইপো সত্যেন সেনের সঙ্গেও তাঁর খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। তাঁদের পরিবারের সঙ্গে জড়িত বেশ কিছু স্মৃতিও লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি। ক্ষিতিমোহন সেনের সঙ্গেও তাঁর দেখা হয়েছিল কিন্তু তিনি তখন পুরোপুরো শয্যাশায়ী। নন্দলাল বসুর সঙ্গেও অল্প সময়ের জন্য সাক্ষাৎ হয়েছিল তাঁর। এছাড়া অমিতা ঠাকুর ও অমিয়া ঠাকুরের কথাও কিছুটা লিখেছেন তিনি। অমিয়া ঠাকুরকে দেখে তাঁর মনে হয়েছিল "আন্তবিস্মৃত ভাবলোকের মানুষ।"[১৯] ২০০১ সালে রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপির বিবর্তন নিয়ে কাজ করতে আবার শান্তিনিকেতনে আসেন সন্‌জীদা খাতুন। সেই সময় মূলত রবীন্দ্র ভবন থেকে জরুরি নথিপত্র অনুসন্ধানের কাজ করছিলেন তিনি। তখন রবীন্দ্র ভবনের পরিচালক ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক স্বপন মজুমদার। বিভিন্ন কারণে রবীন্দ্র ভবন কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সহযোগিতার অভাব বোধ করেছিলেন সন্‌জীদা খাতুন। সেই কারণে কাজ পুরোপুরি সমাপ্ত না করেই তিনি কলকাতা চলে যান এবং বাকি কাজ সেখান থেকে সমাপ্ত করেন।[২০] এই তিক্ত অভিজ্ঞতার পর তাঁর শান্তিনিকেতন যাওয়া এক রকম ভাবে বন্ধই হয়ে গিয়েছিল।

ভালোমন্দে মেশানো সন্‌জীদা খাতুনের শান্তিনিকেতনে কাটানো দিনগুলি সার্থকতা অর্জন করে যখন বিশ্বভারতীর তরফে তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মান দেশিকোত্তম অর্পণ করা হয়। বাংলাদেশের সকলেই খুব আনন্দিত হন তাঁর এই প্রাপ্তিতে। ছায়ানটের সদস্যদের মধ্যে কে কে তাঁর সঙ্গে যাবেন সেই নিয়ে সাড়া পড়ে যায়। ৩০ জনের একটি দল তাঁর সঙ্গে শান্তিনিকেতন যায় এই উপলক্ষে। শান্তিনিকেতনের মানুষেরাও সন্‌জীদা খাতুনের এই প্রাপ্তিতে খুব খুশি হয়েছিলেন। আসলে তিনি যতটা বাংলাদেশের, ততটাই তো শান্তিনিকেতনেরও। ফলে শান্তিনিকেতনের মানুষদেরও তাঁর উপর সেই অধিকারবোধ ছিল। আত্মজীবনী 'সহজ কঠিন দ্বন্দ্বে ছন্দে'-তে তাই তিনি লিখেছেন- "আমার উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র শান্তিনিকেতনে যা পেলাম তার কোনও তুলনা নেই। জীবনে এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কিছুই হতে পারে না।"[২১]

তথ্যসূত্র:

১। খাতুন, সন্‌জীদা। শান্তিনিকেতনের দিনগুলি। প্রথমা প্রকাশন, প্রথম সংস্করণ অক্টোবর ২০১৯, দ্বিতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ১৪।
২। খাতুন, সন্‌জীদা। সহজ কঠিন দ্বন্দ্বে ছন্দে। নবযুগ প্রকাশনী, ২০১৩, পৃ. ৪৭।
৩। তদেব।
৪। খাতুন, সন্‌জীদা। শান্তিনিকেতনের দিনগুলি। প্রথমা প্রকাশন, প্রথম সংস্করণ অক্টোবর ২০১৯, দ্বিতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ৫০।
৫। তদেব, পৃ. ১৮।
৬। তদেব, পৃ. ২৬।
৭। ৬. তদেব, পৃ ২২।
৮। খাতুন, সন্‌জীদা। সহজ কঠিন দ্বন্দ্বে ছন্দে। নবযুগ প্রকাশনী, ২০১৩, পৃ. ১০০।

৯। খাতুন, সন্‌জীদা। শান্তিনিকেতনের দিনগুলি। প্রথমা প্রকাশন, প্রথম সংস্করণ অক্টোবর ২০১৯, দ্বিতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ৪৬।

১০। তদেব, পৃ. ৪৭।

১১। তদেব, পৃ. ৪৮।

১২। তদেব, পৃ. ৯২।

১৩। তদেব, পৃ. ৯৩।

১৪। তদেব।

১৫। তদেব, পৃ. ৯৫।

১৬।খাতুন, সন্‌জীদা। সহজ কঠিন দ্বন্দ্বে ছন্দে। নবযুগ প্রকাশনী, ২০১৩, পৃ. ৯৫।

১৭। তদেব, পৃ. ১৩৫।

১৮। তদেব, পৃ. ১৪৯

১৯। তদেব, পৃ. ২০২।

২০। তদেব, পৃ. ১৬৭-১৬৮।

২১। তদেব, পৃ. ৩৬৭।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। খাতুন, সন্‌জীদা। 'সহজ কঠিন দ্বন্দ্বে ছন্দে'। নবযুগ প্রকাশনী, ২০১৩।

২। খাতুন, সন্‌জীদা। 'শান্তিনিকেতনের দিনগুলি'। প্রথমা প্রকাশন, প্রথম সংস্করণ অক্টোবর ২০১৯, দ্বিতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০২০।

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1921-1927
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.416

আবুল বাশারের ‘তেলেগ দাসরি’: লোকায়ত মরমীবাদ, প্রাচ্য পুরাণ ও মানবিক আধ্যাত্মিকতার তাত্ত্বিক অনুসন্ধান

নাসিরুদ্দিন হোসেন, *গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.03.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This paper attempts a close theoretical analysis of the spiritual, psychological, and sociological dimensions of Teleg Dasari by Abul Bashar, one of the most original voices in contemporary Bengali fiction. The central objective of the study is to explore how the author, through the framework of folk tradition, critically examines the moral decay of urban life and the self-centeredness of the middle class within a mystical and humane context.

At the core of the discussion lies the psychological transformation of the protagonist Surajit and the symbolic significance of his daughter Tinki’s dream, which invokes the timeless mystical philosophy of Abou Ben Adhem by Leigh Hunt. The analysis demonstrates that Abul Bashar transcends the artificial boundaries of institutional religion and establishes selfless love for humanity as the sole criterion of true spirituality.

Drawing upon Eastern mythology, particularly the tradition of the South Indian Dasari—a community of wandering mystic ascetics known for their renunciation—the author relocates this ethos within the harsh and unforgiving winter of Kolkata. Here, winter emerges not merely as a season but as a metaphor for mechanical existence, emotional numbness, and social indifference in modern civilization.

The paper further examines how the presence of humanitarian figures such as Mother Teresa and the Sufi concept of khidmat-e-khalq (service to humanity) are integrated into a coherent philosophical framework. Ultimately, the study argues that true liberation lies in shedding the comfort of individual luxury and embracing collective human responsibility.

This confluence of folk mysticism, Eastern mythology, and humanistic spirituality elevates Teleg Dasari beyond a mere short story, positioning it as a profound spiritual manifesto for twenty-first-century urban life. The narrative reminds us that the most sacred place of worship is not the temple or mosque, but the suffering heart of humanity.

Keywords: Abul Bashar’s Fiction, Teleg Dasari, Eastern Mythology, Folk Mysticism,Abou Ben Adhem, Humanistic Spirituality,Winter as Metaphor, Social Responsibility

আবুল বাশারের ফিকশন বাংলা সাহিত্যের ধারায় এক স্বতন্ত্র ও বৈপ্লবিক ঘরানার জন্ম দিয়েছে যেখানে মাটির গভীর থেকে উঠে আসা লৌকিকতা আর উচ্চমার্গের আধ্যাত্মিকতা এক অনিবার্য বিন্দুতে মিলিত হয়। তাঁর

রচনায় সবসময়ই দেখা যায় সমাজের প্রান্তিক ও ব্রাত্য মানুষের যাপিত জীবনের ভেতরে লুকিয়ে থাকা অলৌকিক প্রশান্তি বা দহনের এক জীবন্ত চালচিত্র। ১৯৮৯ সালে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'তেলেগ দাসরি' গল্পেও বাশার সাহেব এই চিরকালীন বৈশিষ্ট্যকে এক নতুন তাত্ত্বিক মাত্রায় উন্নীত করেছেন। তিনি যখন কোনো আখ্যান নির্মাণ করেন, তখন কেবল চরিত্রগুলোর বাহ্যিক কর্মকাণ্ড বা সংলাপের ওপর আলোকপাত করেন না, বরং তাদের অবচেতন মনের গভীর অলিগলি খনন করেন যা অনেক সময় পাঠককে এক ধরণের অস্তিত্ববাদী সংকটের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়। তাঁর ফিকশনে আধুনিক নাগরিক জীবনের যান্ত্রিকতা, স্বার্থপরতা আর কৃত্রিমতার বিপরীতে আদিম সারল্য ও মরমী চেতনার এক নিরন্তর সংঘাত ফুটে ওঠে। গল্পে সুরজিতের মতো এক মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনের মধ্য দিয়ে লেখক আসলে সমকালীন সমাজের সেই সংকীর্ণতাকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে তুলে ধরেছেন যা আমাদের চারপাশের মানুষের দুঃখ-বেদনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। বাশার সাহেবের ফিকশন কেবল গল্প বলা নয়, এটি আসলে এক ধরণের সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান যেখানে মানুষের আদিম আবেগগুলো ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক প্রলেপ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে এবং এক বিশ্বজনীন সত্যের সন্ধান দেয়। তিনি দেখিয়েছেন যে, একজন লেখক হিসেবে তাঁর দায়বদ্ধতা কেবল সমাজের উপরিভাগের সচ্ছলতার বর্ণনায় নয়, বরং সেই সব মানুষের কথা বলায় যারা ইতিহাসের পাতায় ব্রাত্য হয়ে থাকে কিন্তু যাদের হৃদয়ে বাস করে জগতের গভীরতম আধ্যাত্মিক সত্য। আবুল বাশারের রচনায় ব্যবহৃত ভাষা, প্রতীক ও অলঙ্কার পাঠককে সরাসরি এক আদিম অনুভবের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়, যা এই গল্পটিকে কেবল একটি ফিকশন হিসেবে নয়, বরং একটি তাত্ত্বিক দস্তাবেজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

'তেলেগ দাসরি' শব্দবন্ধটি এই গল্পের প্রাণভোমরা এবং এটি একটি গভীর ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক শেকড় থেকে উৎসারিত যা গল্পটিকে সাধারণ আখ্যানের সীমা ছাড়িয়ে এক বিশেষ উচ্চতা দান করেছে। মূলত তেলেগ দাসরি (Telega Dasari) নামে পরিচিত একটি ভক্তিমূলক ও সামাজিক সম্প্রদায় প্রধানত দক্ষিণ ভারতের তেলুগুভাষী অঞ্চলে গড়ে ওঠে এবং ঐতিহাসিকভাবে বৈষ্ণব ধর্মীয় সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। দাসরি শব্দটির মূল অর্থ ভগবানের দাস বা সেবক, যা বৈষ্ণব ভক্তি ধারায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পরিচয়। এই সম্প্রদায়ের মানুষ নিজেদেরকে ভগবান বিষ্ণুর ভক্ত ও সেবক হিসেবে মনে করেন এবং ঐতিহ্যগতভাবে তারা ভজন-কীর্তন, পুরাণপাঠ, ধর্মীয় উপদেশ এবং মন্দিরসেবার সঙ্গে যুক্ত ছিল। দক্ষিণ ভারতের গ্রামাঞ্চলে দাসরিরা অনেক সময় ঘুরে ঘুরে ভক্তিমূলক গান গাইত, পুরাণের গল্প বলত এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা জাগিয়ে তুলত। তেলেগ দাসরি নামটির তেলেগ বা তেলেগা অংশটি তেলুগুভাষী জনগোষ্ঠীর পরিচয় নির্দেশ করে, ফলে এই সম্প্রদায় মূলত তেলুগু সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত। ঐতিহাসিকভাবে এদের বসবাসের প্রধান অঞ্চল ছিল বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানা। গল্পে তেলেগ দাসরিদের সম্পর্কে সুরজিতের বক্তব্য- "অন্ধ্রের এক দলিত ছোটো জাত এরা। তেলেগু একটা গল্পে এদের কথা পড়েছি আমি। এরা গান করে। রাজারাজড়ার শৌর্যবীর্যের গাঁথা ঢোল বাজিয়ে গায়।"[১] তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের কিছু অংশ পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলেও চলে আসে এবং আজ কিছু পরিবার পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িষ্যা এলাকায়ও বসবাস করে। গল্পে সুরজিতের বক্তব্যে তাদের কলকাতায় (পশ্চিমবঙ্গ) আসবার বিষয়টি স্পষ্ট হয়,"এরা কলকাতায় এল কী করে তাই ভাবছি।"[২] ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তেলেগ দাসরিরা মূলত ভগবান বিষ্ণু এবং তাঁর অবতার ভেঙ্কটেশ্বর-এর ভক্ত হিসেবে পরিচিত এবং দক্ষিণ ভারতের তিরুপতি অঞ্চলে ভেঙ্কটেশ্বর ভক্তির বিস্তারের সঙ্গে তাদের ঐতিহাসিক সম্পর্কের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচ্য ধর্মীয় সাহিত্যে সরাসরি "তেলেগ দাসরি" নামটি খুব বেশি উল্লেখ না থাকলেও দাস বা ভগবানের সেবক ভক্তের ধারণা বিভিন্ন পুরাণে আলোচিত হয়েছে। বিশেষ করে ভাগবত-এ ভক্তকে ভগবানের দাস হিসেবে বর্ণনা করা

হয়েছে এবং ভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরপ্রেম অর্জনের কথা বলা হয়েছে। একইভাবে বিষ্ণু পুরাণ-এ ভগবান বিষ্ণুর ভক্তদের ধর্মীয় কর্তব্য, কীর্তন, স্মরণ এবং সেবার মাধ্যমে ভক্তি প্রকাশের আলোচনা রয়েছে, যা দাসরি সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যের সঙ্গে মিল খুঁজে দেয়। সামাজিক-নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় দাসরি সম্প্রদায়ের উল্লেখ আরও স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় কিছু আধুনিক গ্রন্থে। উদাহরণস্বরূপ এডগার থার্স্টনের 'Castes and Tribes of Southern India' গ্রন্থে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের বর্ণনার মধ্যে 'দাসরি' সম্প্রদায়ের পেশা ও ধর্মীয় ভূমিকার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও এম এ শেরিং এর 'The Tribes and Castes of the Madras Presidency' গ্রন্থেও উক্ত সম্প্রদায়ের সামাজিক পরিচয় ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। এইসব উৎস থেকে বোঝা যায় যে তেলেগ দাসরিরা কেবল একটি সামাজিক গোষ্ঠী নয়, বরং তারা দক্ষিণ ভারতের বৈষ্ণব ভক্তি সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারক। তাদের ঐতিহ্যের মূল ভিত্তি হলো ভক্তি, সেবা ও ধর্মীয় সংগীতের মাধ্যমে ঈশ্বরপ্রেম প্রচার করা, যা বহু শতাব্দী ধরে দক্ষিণ ভারতীয় সমাজে একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ভূমিকা পালন করে এসেছে। আবুল বাশার এই বিশেষ লোকায়ত ঐতিহ্যকে কলকাতার যান্ত্রিক ও ইট-পাথরের প্রেক্ষাপটে এক বিশাল রূপক হিসেবে স্থাপন করেছেন যা একাধারে বিস্ময়কর ও তাত্ত্বিক। গল্পে সুরজিৎ যখন তার মধ্যবিত্ত জীবনের নিরাপদ ও আরামদায়ক বেষ্টনী ভেঙে মধ্যরাতে হাড়কাঁপানো শীতে রাস্তার মানুষের পাশে দাঁড়ানোর সংকল্প করে, তখন সে আর সাধারণ গৃহস্থ থাকে না, বরং সে আসলে সেই ভ্রাম্যমাণ মরমী সাধকদের আধুনিক এক উত্তরসূরি হয়ে ওঠে। "সুরজিৎ বলে- বন্দনা আমার বর্ষাতিটা দাও। একবার দেখি, বউটা কি করছে!"[৩] তাত্ত্বিকভাবে, এই সত্তায় উপনীত হওয়া মানে হলো নিজের ক্ষুদ্র আমিত্ব বা 'ইগো'কে বিসর্জন দিয়ে জগতের সামগ্রিক দুঃখের একনিষ্ঠ অংশীদার হওয়া। গল্পের নামকরণে এই লোকায়ত সাধকদের অনুষঙ্গ ব্যবহার করে লেখক আমাদের এই সত্যটিই মনে করিয়ে দেন যে, প্রকৃত সাধনা কোনো মন্দিরে বা মঠে আবদ্ধ নয়, বরং তা রাজপথের ধুলোয় সাধারণ মানুষের সেবায় নিহিত। এই সাধকেরা যেমন কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের অনুশাসন বা গোঁড়ামি মানতেন না, বরং প্রেম ও দয়াকেই শ্রেষ্ঠ মনে করতেন। সবক্ষেত্রেই টিংকি, কখনো সুরজিৎ আবার কখনো বন্দনার কর্মকাণ্ডেও সেই একই বিশ্বজনীন মরমী সুর ধ্বনিত হয়েছে। বাশার সাহেব অত্যন্ত নিপুণভাবে এই গ্রামীণ ও আদিম লোকায়ত উপাদানকে আধুনিক শহরের কংক্রিট জীবনের নৈতিক সংকটের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন, যা পাঠককে এক ধরণের সাংস্কৃতিক নস্টালজিয়া ও তীব্র নৈতিক প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়।

প্রাচ্য পুরাণ এই আখ্যানের পরতে পরতে এমনভাবে মিশে আছে যে একে বিচ্ছিন্ন করে দেখা অসম্ভব এবং এটি গল্পের কাহিনীকে এক অনন্য গাম্ভীর্যতা দান করেছে। প্রাচ্য দর্শনে বিশেষ করে ভারতবর্ষীয় পুরাণসমূহ এবং লোকগাথায় দেবতা ও মানুষের যে সম্পর্ক বর্ণিত হয়েছে, তা অনেক সময় পারস্পরিক দয়া, ত্যাগ এবং নৈতিক পরীক্ষার ভিত্তিতে রচিত। অনেক পৌরাণিক কাহিনীতে আমরা দেখি যে, দেবতারা বিভিন্ন ছদ্মবেশে মানুষের দ্বারে আসেন তাদের কর্মফল ও হৃদয়ের ঔদার্য পরীক্ষা করতে। 'তেলেগ দাসরি' গল্পে টিংকির স্বপ্নে আসা সেই দেবদূতটি আসলে সেই প্রাচ্য পুরাণের অলৌকিক বার্তাবাহক যারা মানুষকে তাদের প্রকৃত স্বরূপ মনে করিয়ে দিতে পৃথিবীতে আগমন করে।– "টিংকি ডাবরের ঝিলিক দেখে অবাক হল। এমনই আলোয় ঝলমল করছিল রাতের দেবদূত।"[৪] প্রাচ্য পুরাণে দান বা ত্যাগকে কেবল পুণ্য অর্জনের মাধ্যম হিসেবে দেখা হয় না, বরং একে দেখা হয় মহাজাগতিক ভারসাম্য রক্ষার একটি আবশ্যিক পথ হিসেবে। সুরজিতের স্ত্রী বন্দনা যখন সুরজিতের উপর রাগ করে তার ঘরের বহুমূল্য ও উষ্ণ লেপটি শীতে মেঝেয় শুয়ে কাঁপতে থাকা এক ভামিনীর গায়ে ছুঁড়ে দেয়, তখন সেই দৃশ্যটি কোনো প্রাচীন পৌরাণিক ত্যাগের মাহাত্ম্যের চেয়ে কম মহিমান্বিত মনে হয় না। লেখক এখানে আধুনিক সময়ের মানুষকে পুরাণের

সেই আদিম সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন যে, অন্যের কষ্ট লাঘব না করে নিজের ব্যক্তিগত মুক্তি বা শান্তি কখনোই সম্ভব নয়। প্রাচ্য পুরাণের এই নিগূঢ় রহস্যটি লেখক অত্যন্ত সমকালীন ভঙ্গিতে সুরজিৎ ও মেয়ে টিংকির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। বাশার সাহেব এখানে পুরাণকে কেবল অতীত হিসেবে ব্যবহার করেননি, বরং একে এক জীবন্ত শক্তিরূপে উপস্থাপন করেছেন যা মানুষের বিবেকের রুদ্ধ দ্বার খুলে দিতে সক্ষম। এই পৌরাণিক চেতনা সুরজিতের যাত্রাটিকে এক ধরণের পুণ্যস্নানে রূপান্তর করে, যেখানে সে তার যাবতীয় স্বার্থপরতা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে ফেলে।

লোকায়ত মরমীবাদ আবুল বাশারের এই রচনার মূল দার্শনিক ভিত্তি যা শাস্ত্রীয় ধর্মের কঠোরতা, আচারসর্বস্বতা ও কৃত্রিম বিভাজনকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে এক সহজ প্রেমের কথা বলে। মরমীবাদ বা মিস্টিকজম সবসময়ই মানুষের হৃদয়ের সাথে পরম সত্তার সরাসরি ও ব্যক্তিগত সংযোগের কথা বলে, আর লোকায়ত মরমীবাদ সেই সংযোগকে খুঁজে পায় সাধারণ শ্রমজীবী, আর্ত ও রিক্ত মানুষের সেবার মধ্য দিয়ে। "শ্রীরামকৃশষ্ণ মানুষের বেদনা অনুভব করেছেন তাঁর বিশ্বপ্রসারী হৃদয়ের ব্যাকুলতায়। তাঁর বাণী বেদনার বাণী, জাগ্রত চৈতন্যেরও বাণী।"[৫] 'তেলেগ দাসরি' গল্পে আমরা দেখি মেয়ে টিংকি কোনো বিশেষ মন্ত্র বা তসবিহ হাতে নিয়ে উপাসনা করছে না, বরং তার প্রকৃত উপাসনা হলো শীতের রাতে অসহায় মানুষের হাহাকার নিজের বুকের গভীরে উপলব্ধি করা।– "টিংকি হঠাৎ ককিয়ে উঠল- ওরা কি করে বাঁচবে বাবা।"[৬] প্রথমত তাদের সাথে রূঢ় আচরণ করলেও পরন্তু তাদের প্রতি তার সহানুভূতি জেগে ওঠে এবং মেয়ের কথায় কান না দিয়ে "সুরজিৎ যেন মৃদু চমকে সহসা লেপসুদ্ধ উঠে বসে কোনো কথায় শোনেনি এমন ধারা সহজ করে অন্য বিস্ময়ে প্রকাশ করল- এই রে! বৃষ্টি এল বোধ হয়। তা কী করে হয়? ঠান্ডা, এত ঠান্ডা, তারপর বৃষ্টি! বাঁচবে না। সিওর, মারা পড়বে।"[৭] লোকায়ত মরমীবাদে বিশ্বাস করা হয় যে, প্রতিটি প্রাণের ভেতর সেই পরম সত্তা বা ঈশ্বর বিরাজমান, তাই আর্তের সেবা করা মানেই হলো ঈশ্বরের প্রকৃত সেবা করা। সুরজিৎ এবং তার মেয়ে টিংকির মনে পরহিতৈষণার এক অনিশ্চিত যাত্রা, তা আসলে এক ধরণের সুফিবাদী বা বৈষ্ণব সহজিয়া দর্শনেরই আধুনিক নাগরিক সংস্করণ। গল্পে পরোপকারের বন্দনার আপত্তি থাকলেও টিংকি প্রতিবাদী হয়ে ওঠে- "- তুমিই বা কী বোঝ মা। এই ঠান্ডায় ওরা কোথায় যাবে? মা নুষ যে পিশাচ নয় তা বুঝি।"[৮] লেখক এখানে স্পষ্ট দেখিয়েছেন যে, শাস্ত্রীয় নিয়ম মেনে উপাসনা করার চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও ফলপ্রসূ হলো মানুষের চোখের জল মোছানো এবং বিপদে পাশে দাঁড়ানো। এই মরমীবাদ কোনো তাত্ত্বিক আলোচনার বিষয় নয়, এটি একটি সক্রিয় মানবিক অংশগ্রহণ। লোকায়ত মরমীবাদের এই নির্যাসটি গল্পের প্রতিটি সংলাপে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সুরজিতের এবং সবক্ষেত্রেই তার মেয়ের তীব্র মানসিক দহনের মধ্যে এমনভাবে প্রতিফলিত হয়েছে যে, তা পাঠককেও এক ধরণের আত্মশুদ্ধির পথে নিয়ে যায়। এটি প্রমাণ করে যে, ধর্ম যখন মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে গিয়ে কেবল আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত হয়, তখন লোকায়ত মরমীবাদই তাকে আবার মাটির মানুষের কাছে ফিরিয়ে আনে।

'আবু বিন আদম' কবিতার উল্লেখ এই গল্পের কাহিনী বিন্যাসে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ মোড় হিসেবে কাজ করেছে যা গল্পের দার্শনিক উচ্চতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। লে হান্টের এই কবিতাটি বিশ্বসাহিত্যে মানবতার এক অমোঘ দলিল হিসেবে স্বীকৃত যেখানে কবি দেখিয়েছেন যে, ঈশ্বরকে ভালোবাসা আর ঈশ্বরসৃষ্ট মানুষকে ভালোবাসা আসলে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। টিংকি যখন এই কবিতাটি পাঠ করে, তখন সে আসলে এক অবিনশ্বর আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসাকে তার বাবা সুরজিতের সামনে এনে দাঁড় করায়।–

"বাবা তুমি কি ভালো মানুষ নও?"[৯] আবু বিন আদমের সেই বিখ্যাত ও বিনীত প্রার্থনা— "Write me as one that loves his fellow men"[১০] — সুরজিতের জীবনের মূলমন্ত্রে এবং তার অস্তিত্বের সংকটে পরিণত হয়। গল্পের এক পর্যায়ে সুরজিৎ নিদারুণভাবে বুঝতে পারে যে, দেবদূতের কলমে লেখা তালিকায় নাম না থাকার অর্থ হলো সে তার চারপাশের অভুক্ত ও শীতার্ত মানুষের প্রতি উদাসীন থেকে গেছে। এই কবিতাটি এখানে কেবল একটি সাহিত্যিক অনুষঙ্গ নয়, এটি সুরজিতের আমূল পরিবর্তনের প্রধান অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। প্রাচ্য সুফিবাদে যেমন বলা হয় যে মানুষের হৃদয়েই আরশ-এ-আজম বা স্রষ্টার সিংহাসন, আবু বিন আদমের এই দর্শনটি সুরজিতকে সেই ধ্রুব সত্যের খুব কাছে নিয়ে যায়। লেখক অত্যন্ত সুনিপুণভাবে কবিতার পংক্তিগুলোকে সুরজিতের ব্যক্তিগত নিঃসঙ্গতা, যান্ত্রিক জীবন এবং সামাজিক অপরাধবোধের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন।

মানবিক আধ্যাত্মিকতা এই গল্পের সেই কেন্দ্রীয় ও শক্তিশালী বিন্দু যা ধর্মকে অলৌকিকতার কুয়াশা থেকে বের করে এনে লোকায়ত সেবায় ও মানুষের প্রতি মমতায় প্রতিষ্ঠিত করে। প্রথাগত আধ্যাত্মিকতা অনেক সময় মানুষকে ইহজগত থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবল পরলোকের পুরস্কারের চিন্তায় মগ্ন রাখে, কিন্তু আবুল বাশার এখানে যে আধ্যাত্মিকতার প্রস্তাব করেছেন তা সরাসরি জীবন্ত মানুষের দুঃখ-দুর্দশার সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত।– "মানুষকে ভালোবেসেছি যে ভগবানকে ডাকতে ভুলে গেছি।"[১১] সুরজিতের পা পরম যত্নে জড়িয়ে ধরে ভামিনী যখন উষ্ণতা পেতে চায়, তখন তার সেই স্পর্শ কোনো সাধারণ শারীরিক সংস্পর্শ থাকে না, তা হয়ে ওঠে এক ঐশ্বরিক করুণা ও স্বর্গীয় ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। ভামিনী বলে- "বাবুর পা দু'খানি কী গরম গো! বলেই ভামিনী খাটের তলার দেবতার মতো ফর্সা পা দু'হাতে চেপে ধরে।"[১২] মানবিক আধ্যাত্মিকতার মূল কথা হলো, মানুষের ভেতরে যে সৃজনশীল, দয়ালু ও সহমর্মী সত্তা ঈশ্বরপ্রদত্ত হিসেবে আছে তাকে জাগ্রত করা। ভামিনী এখানে সুরজিতের মানবিক আত্মাকে জাগিয়ে তুলেছেন লেখক এই গল্পে সপ্রমাণ দেখিয়েছেন যে, একজন মানুষ তখনই আধ্যাত্মিকভাবে পূর্ণতা পায় যখন সে অন্যের অভাবকে নিজের অভাব বলে মনে করতে শেখে। সুরজিতের এই যে দহন, এই যে শীতের রাতে নিরাপদ ঘর থেকে বের হওয়ার জন্য এক ধরণের ব্যাকুলতা—এগুলো সবই মানবিক আধ্যাত্মিকতার উজ্জ্বল লক্ষণ। এটি কোনো বিশেষ ধর্মীয় লেবাস পরে বা তিলক কেটে হয় না, এটি হয় এক বিশুদ্ধ ও নিঃস্বার্থ সহমর্মিতার বোধ থেকে। আবুল বাশার এই গল্পে প্রমাণ করেছেন যে, আধুনিক পৃথিবীতে যেখানে প্রযুক্তির চাপে মানুষ যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছে, সেখানে মানবিক আধ্যাত্মিকতাই পারে মানুষকে তার আদিম, শ্রেষ্ঠ ও দয়ালু সত্তায় পুনরায় ফিরিয়ে নিতে।

শীতের রূপক এই গল্পে এক প্রলয়ঙ্কারী ও বিচারকের মতো শক্তিরূপে ব্যবহৃত হয়েছে যা মানুষের অস্তিত্বের নগ্নতাকে এবং সমাজের বিভেদকে চরমভাবে প্রকাশ করে দেয়। লেখক যখন 'পৃথিবীর আদিমতম শীতের রাত্রি...'[১৩] শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেন, তখন তিনি কেবল এক ঋতুর পরিবর্তনের কথা বলেন না, তিনি বলেন সেই অনাদ্যিকালের মানবিক বঞ্চনার ইতিহাস যা আজও মানুষকে হাড়কাঁপানো শীতে ফুটপাতে আশ্রয়হীন হয়ে শুতে বাধ্য করে। এই শীত আসলে মানুষের হৃদয়ে জমে থাকা স্বার্থপরতা ও উদাসীনতার এক বিশাল রূপক, যা আমাদের চারপাশের মানুষের প্রতি সংবেদনশীলতাকে নষ্ট করে দেয়। শীত এখানে এক ধরণের নৈতিক বিচারকের ভূমিকা পালন করে যা সুরজিতের মতো মানুষকে তাদের বিবেক জাগ্রত করতে বাধ্য করে। সুরজিতের ঘরে থাকা সেই দামী ও ভারী লেপটি হলো সেই সামাজিক বিভাজনের রূপক যা ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে এক অভেদ্য ও অদৃশ্য দেয়াল তুলে রাখে। শীতের প্রকোপ বাইরে যত বাড়তে থাকে, সুরজিতের ভেতরের অপরাধবোধ ও নৈতিক দহনও তত তীব্র হতে থাকে। এই শীতই শেষ পর্যন্ত

সুরজিতকে বাধ্য করে তার ঘরের নিরাপদ উষ্ণতা ও বিলাসিতা ছেড়ে এক অনিশ্চিত ও কঠিন রাস্তায় নামতে। বাশার সাহেবের বর্ণনায় শীত কেবল এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়, এটি একটি আধ্যাত্মিক অগ্নিপরীক্ষা যেখানে মানুষের মনুষ্যত্ব যাচাই করা হয়। গল্পের শেষে যখন সুরজিৎ ও তার সঙ্গীরা ফুটপাতের মানুষদের অবস্থান জানবার জন্য নিচে নেমে আসে, তখন শীতের সেই ভয়াবহ অন্ধকার যেন এক অলৌকিক মানবিক উষ্ণতা ও ভালোবাসার কাছে নতি স্বীকার করে।

সামাজিক দায়বদ্ধতা এই লেখনীর শেষ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ যা গল্পের কাহিনীকে একটি ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে এক মহৎ সামাজিক লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছে। সুরজিৎ কেবল একজন আধ্যাত্মিক সাধক বা স্বপ্নবিলাসী নয়, সে মূলত একজন সামাজিক জীব এবং তার এই নৈতিক জাগরণ আসলে সমাজের প্রতি তার দীর্ঘদিনের ঋণের এক বিলম্বিত স্বীকৃতি। আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজ যখন কেবল নিজের সুখের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ থেকে চারপাশের দারিদ্র্য ও বঞ্চনাকে সুকৌশলে অস্বীকার করে, তখন সমাজ হিসেবে আমাদের অস্তিত্ব এক গভীর সংকটের মুখে পড়ে। আবুল বাশার এই গল্পের অসাধারণ বুননের মাধ্যমে আমাদের সেই চিরন্তন দায়বদ্ধতার কথাই নতুন করে মনে করিয়ে দিয়েছেন। সুরজিতের এই মধ্যরাতের ফুটপাত অভিযান কোনো ব্যক্তিগত শখের বা করুণার বিষয় নয়, এটি তার টিকে থাকার জন্য এক আধ্যাত্মিক ও সামাজিক দায়। সে গভীরভাবে বুঝতে পারে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রতিবেশী অনাহারে বা শীতে বিনা চিকিৎসায় কষ্ট পাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার নিজের প্রার্থনা, উপাসনা বা ব্যক্তিগত সুখ সম্পূর্ণ অর্থহীন ও মেকি। সামাজিক দায়বদ্ধতার এই প্রখর বোধটিই 'আবু বিন আদম' কবিতার আদলে শেষ পর্যন্ত সুরজিতের নাম দেবদূতের সেই পবিত্র তালিকায় লেখাতে বাধ্য করে। লেখক এখানে দেখিয়েছেন যে, প্রকৃত মুক্তি কখনোই ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা বিচ্ছিন্ন হতে পারে না, মুক্তিকে হতে হবে সামষ্টিক ও সর্বজনীন। যখন তারা সবাই মিলে নিজেদের বিলাসিতা বিসর্জন দিয়ে ফুটপাতের মানুষের পাশে দাঁড়ায়, তখন এক নতুন ধরণের সামাজিক ভ্রাতৃত্বের জন্ম হয় যা যে কোনো প্রথাগত রাজনীতির চেয়েও বেশি শক্তিশালী। এই দায়বদ্ধতাই হলো সেই সঞ্জীবনী শক্তি যা একজন সাধারণ মানুষকে মহৎ ও ত্যাগের সোপানে উন্নীত করে এবং সমাজকে এক নতুন আলোর দিশা দেখায়।

আবুল বাশারের 'তেলেগ দাসরি' আখ্যানটি সমকালীন বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে কেবল একটি সফল সাহিত্যকর্ম নয়, বরং এটি বিজাতীয় ও যান্ত্রিক নাগরিক জীবনের জাঁতাকলে পিষ্ট আধুনিক মানুষের জন্য এক আধ্যাত্মিক ইশতেহার। এই গল্পের পরতে পরতে লেখক যে মানবিক দর্শনের বীজ বপন করেছেন, তা আমাদের প্রথাগত ধর্মচিন্তার সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে এক বিশ্বজনীন দয়া ও ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছে। সুরজিতের মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তর এবং তার মধ্যরাতের কঠিন অভিযান প্রমাণ করে যে, প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা কোনো নির্জন গুহায় বা শাস্ত্রীয় তর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তার প্রকৃত বাসভূমি হলো মানুষের আর্তনাদ আর হাহাকারের মাঝখানে। লেখক এখানে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে দেখিয়েছেন যে, যখন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম মানুষের চোখের জল মুছতে ব্যর্থ হয়, তখন লোকায়ত মরমীবাদ এবং প্রাচ্য পুরাণের সেই মানবিক নির্যাসই হয়ে ওঠে আমাদের প্রধান অবলম্বন। শীতের সেই ভয়াবহ অন্ধকার রাতটি আসলে আমাদের প্রত্যেকের ভেতরের স্বার্থপরতার প্রতীক, আর সুরজিতের ত্যাগ সেই অন্ধকার ভেদ করে আসা প্রথম ভোরের আলো। প্রবন্ধের এই পর্যায়ে এসে এটি স্পষ্ট যে, আবুল বাশার তাঁর ফিকশনের মাধ্যমে এক নতুন ধরণের 'ভক্তি আন্দোলনের' প্রস্তাবনা করেছেন। এই ভক্তি কোনো জড় মূর্তির প্রতি নয়, বরং রক্ত-মাংসের জীবন্ত মানুষের প্রতি। তিনি প্রাচ্য পুরাণের 'দাসরি' সত্তাকে আধুনিক মহানগরের প্রেক্ষাপটে স্থাপন

করে এটিই বোঝাতে চেয়েছেন যে, মনুষ্যত্বের সাধনা কোনো কালেই পুরনো হয় না। টিংকির সারল্য আর লে হান্টের 'আবু বিন আদম' কবিতার সেই চিরন্তন আবেদন যান্ত্রিক জীবনকে যেভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে, তা প্রতিটি সংবেদনশীল পাঠকের জন্য এক বড় ধরণের নৈতিক ধাক্কা। এই গল্পটি আমাদের এই রূঢ় বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করায় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সমাজের এক বড় অংশ ফুটপাতে শীতে কাঁপছে বা অনাহারে দিন কাটাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ব্যক্তিগত বিলাসিতা ও অর্জিত পুণ্য আসলে এক ধরণের আধ্যাত্মিক দেউলিয়াপনা ছাড়া আর কিছুই নয়। লেখকের এই কঠোর কিন্তু সত্য ইশতেহারটিই এই গল্পের চরম সার্থকতা। সাহিত্য যখন জীবনের রূঢ় বাস্তবতাকে আধ্যাত্মিক সত্যের সাথে মিলিয়ে দেয়, তখনই তা কালোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে এবং 'তেলেগ দাসরি' নিঃসন্দেহে সেই বিরল সম্মানের দাবিদার।

তথ্যসূত্র:

ক। বাশার, আবুল। শ্রেষ্ঠ গল্প। দে'জ পাবলিশিং। পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ ফেব্রুয়ারী ২০২৩ (ফাল্গুন ১৪২৯), কলকাতা, পৃ. ১৮০।

১। তদেব, পৃ. ১৯৩।

২। তদেব, পৃ. ১৯৩।

৩। তদেব, পৃ. ১৯৭।

৪। তদেব, পৃ. ১৮৫।

৫। ত্যাগিবরানন্দ, স্বামী। সুফীসাধনা ও মরমীয়া সুফী সাধক-সাধিকা। গিরিজা লাইব্রেরী, প্রকাশকাল ২০২০, ২২/সি কলেজ রো কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ১১১।

৬। তদেব, পৃ. ১৯৪।

৭। তদেব, পৃ. ১৯৬।

৮। তদেব, পৃ. ১৯৩।

৯। তদেব, পৃ. ১৮২।

১০। হান্ট, লে। 'Abou Ben Adhem'। https://www.poemhunter.com/poem/abou-ben-adhem/। প্রবেশের তারিখঃ ২০ শে মার্চ ২০২৬।

১১। তদেব, পৃ. ১৮৬।

১২। তদেব, পৃ. ১৮৩।

১৩। তদেব, পৃ. ১৮০।

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1928-1938
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.417

বাংলা সাহিত্যে বাহা উৎসব ও আদিবাসী জীবনদর্শনে প্রকৃতি চেতনা: একটি সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যতাত্ত্বিক পাঠ

প্রতিমা হেম্ব্রম মান্ডি, *স্বাধীন গবেষক, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 24.03.2026; Accepted: 26.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This research paper analyzes the representation of the Baha or flower festival of the Santhal and other indigenous communities in Bengali literature, along with its inherent sense of nature consciousness. The festival is not merely a folk ritual; rather, it constitutes a fundamental pillar of indigenous worldview where nature and human life are inseparably intertwined. Tribal festivals are not characterized by grandeur but by a deep emotional and spiritual connection. They embody a harmonious relationship between life and culture, and between culture and everyday practices. Through these festivals, communities remember their ancestors and seek to ensure the well-being of both present and future generations.

Tribal festivals can broadly be categorized into three types based on their purpose: first, agrarian festivals; second, those related to the elimination of evil or wrongdoing and associated with hunting practices; and third, those that celebrate natural and mental beauty while welcoming nature and aspiring for renewed life.

According to the Santhal belief system, the world is permeated by Bonga—a spiritual force present in every element of existence, whether visible or invisible, animate or inanimate. This force is limitless and embodies supernatural power. As Bonga has no physical form, there are no temples dedicated to it; instead, it is worshipped through natural elements such as trees and stones, reflecting its omnipresence.

Using an eco-critical framework, this study explores how this festival is represented in the works of Bibhutibhushan Bandyopadhyay, Nalini Bera, Samaresh Basu, Nihar Ranjan Ray, Ganesh Devy, and Mahasweta Devi, where it appears in diverse forms and dimensions.

The central argument of the study is that, in contrast to modern capitalism, indigenous ecological consciousness offers an alternative environmental philosophy rooted in harmony, sustainability, and coexistence with nature.

Keywords: Baha Festival, Bengali Literature, Indigenous Worldview, Nature Consciousness, Eco-criticism

গবেষণার উদ্দেশ্য (Objective):

- ❖ বাংলা সাহিত্যে আদিবাসীর জীবন ও সংস্কৃতির উপস্থাপনার মধ্যে প্রকৃতি চেতনার ভূমিকা বিশ্লেষণ করা।
- ❖ আদিবাসী সমাজে পালিত দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎসব বাহার সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় তাৎপর্য অনুধাবন করা

- ❖ আদিবাসী জীবন দর্শনে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও নির্ভরতার ধারনা বিশ্লেষণ করা।
- ❖ বাংলা সাহিত্য কর্মে এই বাহা উৎসব ও আদিবাসী সংস্কৃতির প্রতিফলন কিভাবে ঘটেছে তা সাহিত্যতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা।
- ❖ আদিবাসী সমাজের উৎসব আচার-অনুষ্ঠান ও বিশ্বাসের মধ্যে কি ভাবে প্রকৃতি-কেন্দ্রিক ভাবনা নিহিত আছে তা সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতে ব্যাখা করা।
- ❖ বাহা উৎসবের মাধ্যমে প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা, সহাবস্থান ও পরিবেশ চেতনার ধারণার প্রকাশ কিভাবে পায় তা অনুধাবন করা।

আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতি মূলত 'টোটোমিক' এবং অরণ্যকেন্দ্রিক। এই বাহা উৎসব ফাল্গুন-চৈত্র মাসে শাল ও মহুয়া ফুলের পরিস্ফুটনের মাধ্যমে নতুন জীবন কে আবাহন করে। আদিবাসী দর্শনে প্রকৃতি কোনো 'জড় সম্পদ' (Resource) নয়, বরং তা তাদের পরম 'জীবন্ত আত্মীয়' (Kinship)। বাংলা সাহিত্যে এ উৎসবের চিত্রায়ন শুধু যে নৃতাত্ত্বিক ভাবে করা হয়েছে তা নয়, বরং মানুষের সাথে প্রকৃতির জৈবিক ও আত্মিক সম্পর্কের এক শৈল্পিক বহিঃ প্রকাশ। এই প্রবন্ধটিতে বাহা উৎসবের মাধ্যমে আদিবাসী জীবন দর্শনের সেই গভীর সত্যটি অন্বেষণ করবে যা সাহিত্যিক ও তাত্ত্বিক কাঠামোয় অনন্য।

আদিবাসী সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎসব 'বাহা' বা ফুল কেবল একটি ঋতুগত উৎসব নয় বরং এটি প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এক গভীর দার্শনিক মাধ্যম। বাংলা সাহিত্যে অরণ্যচারী মানুষের এই জীবন বোধ কিভাবে ধরা দিয়েছে, তা বিশ্লেষণ করায় এই পাঠের উদ্দেশ্য।

বাহা উৎসবের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট :

অর্থ ও সময়: 'বাহা' শব্দের অর্থ ফুল। ফাল্গুন চৈত্র মাসে যখন শাল ও মহুয়া গাছে নতুন ফুল ফোটে, তখন এই উৎসব পালিত হয়।

আচার ও দর্শন: এই উৎসব না হওয়া পর্যন্ত মেয়েরা সারজম বাহা (শাল ফুল), মুরুপ বাহা (পলাশ ফুল), ইচাক বাহা খোঁপায় দিতে পারে না। এমনকি রান্নার কাজে সদ্যজাত কচি নিমপাতা ও ব্যবহার করে না। এই পরবের মধ্য দিয়েই তারা নতুন বছরের ফুল, পাতা, ফল ব্যবহার করতে শুরু করে। বাহা পরব সাধারনত তিন দিন ধরে চলে। পুজোর আগের দিন (উম মাহা) তারা তাদের বাসস্থান ও জাহের থানকে (পবিত্র উপাসনার স্থান) শুদ্ধিকরণ করে। পুজোর দ্বিতীয় দিন (সারদি মাহা) সকালে স্নান সেরে ছেলেরা পবিত্র সাদা ধুতি এবং মেয়েরা লাল পাড় সাদা শাড়ি পরে জাহের স্থানে জমায়েত হয়। নায়কে বাবা (পুরোহিত) প্রকৃতির উদ্দেশ্যে শাল ও মহুল ফুল অর্পণ করেন,তার পর মারাং বুরু, জাহেরএরা এবং মড়েক-তুরুইক বঙ্গার উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়। শেষে আশীর্বাদি ফুল হিসাবে সেই নতুন ফুলকে (শাল ও মহুয়া) নারীরা খোঁপায় আর পুরুষের কানে গুঁজে ধামসা মাদলের তালে খালি পায়ে নাচ গান করে।

পুজোর তৃতীয় দিন (বাসকে মাহা) হোলি বা কৃত্রিম রং ব্যবহার না করে তারা একে অপরকে জল ছিটিয়ে আনন্দ করে। (প্রথমে জল ধাত্রিমাতাকে অর্পণ করে তারপর একে অপরকে দেয়) আদিবাসী বিশ্বাস মতে, প্রকৃতিকে তুষ্ট না করে তার সম্পদ (নতুন ফুল , ফল, পাতা) ভোগ করা অনুচিত। এটি আধুনিক Environment Ethics বা পরিবেশগত নীতি শাস্ত্রের এক প্রাচীন রূপ।

আদিবাসী জীবন দর্শনের প্রকৃতি চেতনা: আদিবাসীদের কাছে প্রকৃতি কোনো জড় বস্তু নয় বরং এক সজীব সত্তা। বাহা উৎসবে জল ছিটানো (বাহা দাঃ) বা শাল ফুল আদান-প্রদান সামাজিক সংহতি ও পুনর্জন্মের প্রতীক। এই জীবন দর্শনে মানুষ প্রকৃতির অধিপতি নয়, বরং তার অংশ- এই সত্যটিই প্রধান।

Literature Review (পূর্বতন গবেষণার পর্যালোচনা): বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির আলোচনায় আদিবাসী সমাজের জীবন দর্শন এবং প্রকৃতি নির্ভর সংস্কৃতির বিষয়টি বিভিন্ন গবেষক ও সাহিত্যিক ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে বিশ্লেষন করেছেন।

নীহাররঞ্জন রায় (১৯৪৯) তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাস: আদিপর্ব' গ্রন্থে বাঙালী সমাজের প্রাচীন সাংস্কৃতিক বিকাশের সঙ্গে আদিবাসী সমাজের গভীর সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে বাংলার বহুলোকাচার, বিশ্বাস এবং প্রকৃতিনির্ভর জীবনধারার উৎস আদিবাসী সংস্কৃতির মধ্যেই নিহিত। অন্যদিকে **মহাশ্বেতা দেবী (১৯৭৭)** তাঁর 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে আদিবাসী সমাজের জীবনসংগ্রাম ও তাদের প্রকৃতি নির্ভর অস্তিত্বকে সাহিত্যিক আঙ্গিকে তুলে ধরেছেন। তাঁর রচনায় বন,পাহাড় ও প্রকৃতি কেবল পরিবেশ হিসেবে নয়,বরং আদিবাসী জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। এর মাধ্যমে লেখিকা প্রকৃতি ও মানুষের পারস্পরিক নির্ভরতার বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন।
গনেশ দেবী (২০০২) তাঁর 'Adivasi Voice and Identity' গ্রন্থে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পরিচয়,ভাষা এবং জীবনদর্শনের আলোচনায় প্রকৃতির ভূমিকার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে, আদিবাসী সমাজের সংস্কৃতি মূলত প্রকৃতিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে এবং তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রকৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ প্রতিফলিত হয়।
বীরেন্দ্রনাথ দত্ত (২০০৮) তাঁর 'আদিবাসী সংস্কৃতি ও সমাজ' গ্রন্থে- আদিবাসী সমাজের বিভিন্ন উৎসব, বিশ্বাস ও সামাজিক প্রথার মধ্যে প্রকৃতির গুরুত্ব বিশ্লেষন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে বাহা উৎসবের মত বিভিন্ন উৎসব প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করে।

বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতি ও আদিবাসী জীবনের নিবিড় সম্পর্কের আলোচনা করতে গেলে **বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের** রচনার গুরুত্ব বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হয়। তাঁর **'আরণ্যক'** উপন্যাসে অরণ্যকে কেন্দ্র করে বসবাসকারী মানুষের জীবনযাপন, তাদের বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান এবং প্রকৃতির সঙ্গে গভীর সম্পর্ক অত্যন্ত সংবেদনশীলভাবে চিত্রিত হয়েছে। এই রচনায় অরণ্যবাসী মানুষের জীবন প্রকৃতির ছন্দের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত বলে প্রতিফলিত হয়েছে। বসন্ত ঋতুতে প্রকৃতির নবজাগরণ এবং ফুল ফোটার সময়কে ঘিরে যে আনন্দ ও উৎসব মুখর পরিবেশ তৈরি হয়, তা আদিবাসী সমাজের বাহা উৎসবের মত প্রকৃতিনির্ভর উৎসবের সাংস্কৃতিক তাৎপর্য বোঝানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত। এখানে প্রকৃতিকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখা হয়েছে এবং মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সহাবস্থানের ধারনা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।
অন্যদিকে **সমরেশ বসুর** সাহিত্যেও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা এবং তাদের সাংস্কৃতিক চর্চার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর রচনায় গ্রামীণ ও উপজাতীয় সমাজের জীবনধারা,বিশ্বাস এবং উৎসব - অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রকৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে বসন্ত ঋতুকে কেন্দ্র করে পালিত উৎসব এবং প্রকৃতির নবজারণের সঙ্গে মানুষের আনন্দ ও সামগ্রিক চেতনাকে তিনি বিভিন্ন রচনায় তুলে ধরেছেন। এই ধরনের সাহিত্যিক উপস্থাপনার মাধ্যমে বোঝা যায় যে আদিবাসী সমাজে বাহা উৎসব কেবল একটি ধর্মীয় আচার নয় বরং প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সম্মান প্রদর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক মাধ্যম।

এছাড়া **রমেশচন্দ্র মুর্মূ (২০১৫)** তাঁর সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি গ্রন্থে - সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের নানাদিক বিশ্লেষন করেছেন। বিশেষ করে বাহা উৎসবের মাধ্যমে প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সহাবস্থানের ধারনা এই সমাজে কিভাবে প্রতিফলিত হয় তা তিনি ব্যাখ্যা করেছেন।

নলিনী বেরার শ্রেষ্ঠ গল্প **(বাসকে দাকা)** গল্পে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর জনপ্রিয় উৎসব বাহা যে নিয়ম নীতি ও নিষ্ঠার সাথে উৎযাপন করা হয়েছে তারই বিশদ আলোচনা রয়েছে।

এই সকল গবেষণা ও সাহিত্যকর্ম থেকে স্পষ্ট হয় যে আদিবাসী সমাজের জীবনদর্শন মূলত প্রকৃতিনির্ভর এবং তাদের উৎসব আচার ও সংস্কৃতির সঙ্গে প্রকৃতির গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। তবে বাংলা সাহিত্যে বাহা উৎসব ও আদিবাসী জীবন দর্শনের মধ্যে প্রকৃতির চেতনার সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য তাত্ত্বিক বিশ্লেষন এখনও তুলনামূলকভাবে কম আলোচিত হয়েছে। এই গবেষণাটি সেই দিকটি বিশ্লেষণের একটি প্রয়াস।

তালিকা - ১

তালিকা আকারে লেখকদের নাম ও বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ

লেখকের নাম ও সাল	**গ্রন্থ/ প্রবন্ধের নাম**	**মূল বিষয়বস্তু**
নীহাররঞ্জন রায় (১৯৪৯)	বাঙালির ইতিহাস: আদিপর্ব	বাংলার প্রাচীন সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে । তাদের প্রকৃতিনির্ভর জীবনধারা ও আচার-অনুষ্ঠান বাঙালি সংস্কৃতির একটি প্রাচীন ভিত্তি তৈরি করেছে ।
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৯)	আরণ্যক	অরণ্য অঞ্চলের মানুষের জীবন, প্রকৃতির সাথে তাদের নিবিড় সম্পর্ক এবং অরণ্য ভিত্তিক জীবন দর্শন অত্যন্ত গভীরভাবে চিন্তিত হয়েছে ।
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২৯)	পথের পাঁচালী	গ্রামীন জীবনের বাস্তবতা, প্রকৃতির সাথে মানুষের দৈনন্দিন সম্পর্ক এবং লোকজ সংস্কৃতির প্রভাব উপন্যাসে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে ।
লেখকের নাম ও সাল	**গ্রন্থ/ প্রবন্ধের নাম**	**মূল বিষয়বস্তু**
সমরেশ বসু (১৯৭৭)	মহাকালের রথের ঘোড়া	গ্রামীণ ও প্রান্তিক সমাজের জীবন সংগ্রাম এবং প্রকৃতি নির্ভর জীবনধারা উপন্যাসের প্রতিফলিত হয়েছে ।
মহাশ্বেতা দেবী (১৯৭৭)	অরণ্যের অধিকার	আদিবাসী সমাজের জীবন সংগ্রাম, বনভূমির সঙ্গে তাদের অস্তিত্বগতভাবে সম্পর্ক এবং সংস্কৃতির পরিচয় সাহিত্যিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে ।
গণেশ দেবী (২০০২)	Aadivasi voice and identity	আদিবাসী সমাজের ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবন দর্শনের সঙ্গে প্রকৃতির গভীর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে ।

বীরেন্দ্রনাথ দত্ত (২০০৮)	আদিবাসী সংস্কৃতি ও সমাজ	আদিবাসী উৎসব, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সামাজিক রীতির মধ্যে প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও নির্ভরতার বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে।
রমেশচন্দ্র মূর্মু (২০১৫)	সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি	সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সামাজিক জীবন, বাহা উৎসবের তাৎপর্য এবং প্রকৃতির সাথে তাদের আধ্যাত্মিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হয়েছে ।
আশুতোষ ভট্টাচার্য (১৯৮২)	বাংলার লোকসংস্কৃতি	বাংলার লোকজ উৎসব আচার ও বিশ্বাসে প্রকৃতি চেতনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উল্লেখ করা হয়েছে ।
ভেরিয়ার এলউইন (১৯৬৪)	The Tribal World of Verrier Elwin	ভারতের বিভিন্ন আদিবাসী সমাজের জীবনধারা, সংস্কৃতি এবং প্রকৃতিনির্ভর বিশ্বাসের বিশদ আলোচনা রয়েছে।

লেখকের নাম ও সাল	**গ্রন্থ/ প্রবন্ধের নাম**	**মূল বিষয়বস্তু**
সত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী (২০০৫)	আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতি	আদিবাসী সমাজের সামাজিক কাঠামো, উৎসব, আচার অনুষ্ঠান এবং প্রকৃতির সঙ্গে তাদের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
নলিনী বেরা (২০০৩)	বাসকে দাকা	সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর জনপ্রিয় উৎসব বাহা যে নিয়ম নীতি ও নিষ্ঠার সাথে উদযাপন করা হয়েছে তারই বিশদ আলোচনা রয়েছে।

RESEARCH GAP (গবেষণার অন্তরাল) :

পূর্ববর্তী অধিকাংশ গবেষণায় আদিবাসী উৎসবকে কেবল নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণার প্রয়োজনীয়তা নিচের অভাবগুলো থেকে স্পষ্ট হয়: বাহা উৎসবটিকে আধুনিক ইকো-ক্রিটিসিজম এবং পরিবেশগত নীতি শাস্ত্রের তাত্ত্বিক কাঠামোয় বিস্তারিত বিশ্লেষণের অভাব।

বিদ্যমান গবেষণায় ভারতীয় আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার দুষ্প্রাপ্যতা দেখা যায়। সাঁওতাল সমাজের ধর্মীয় আচার, উৎসব ও জীবন দর্শন বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণা

থাকলেও সেগুলির অধিকাংশই উৎসবটিকে একটি সামাজিক বা ধর্মীয় অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করেছে। বাংলা সাহিত্যে আদিবাসী জীবনচিত্র নিয়ে যে সমালোচনা মূলক পাঠ বিদ্যমান, সেখানে উৎসব-কেন্দ্রিক সংস্কৃতি চেতনা-বিশেষত বাহা উৎসব -স্বতন্ত্র বিশ্লেষণের বিষয় হয়ে ওঠেনি।

এছাড়াও, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আদিবাসী জীবনকে প্রায়শই দারিদ্র, বঞ্চনা ও সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপন করা হয়েছে; কিন্তু উৎসব, আনন্দ ও সমষ্টিক সংস্কৃতিক অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে পাঠ তুলনামূলকভাবে অনুপস্থিত।

বাহা উৎসব যে বর্তমান বিশ্ব পরিবেশ সচেতনতার একটা বড় অবদান তা সেইভাবে কোন গবেষণায় তুলে ধরা হয়নি। ফলে বাহাউৎসবের মতো একটি প্রকৃতিনির্ভর, পুনর্জীবনমূলক আচার কিভাবে সাহিত্যিক ভাষায় প্রতিফলিত হয়েছে তা উপেক্ষা থেকেছে-সেই বিষয়ে একটি সুসংহত সাহিত্যাত্বিক বিশ্লেষণের অভাব রয়ে গেছে।

উত্তর-উপনিবেশিক ও সাংস্কৃতিক তত্ত্বের আলোকে বাহা উৎসবকে একটি counter-cultural discourse হিসেবে পাঠ করার উদ্যোগ বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষিতে এখনো পর্যাপ্তভাবে বিকশিত হয়নি। এই প্রবন্ধ সেই শূন্যস্থান পূরণের একটি প্রাথমিক প্রয়াস।

মূল ধারার বাঙালি লেখকদের বাহা উৎসবকে কেন্দ্র করে যে পর্যবেক্ষণ ও অনুভূতি তা বাংলা সাহিত্যে কোথাও পূর্ণাঙ্গভাবে আলোচিত হয়নি।

METHODOLOGY (গবেষণা পদ্ধতি):

এই গবেষণায় গুণগত বর্ণনামূলক গবেষণা পদ্ধতি (Qualitative descriptive research method) ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্যের প্রাথমিক উৎস হিসেবে নির্বাচিত উপন্যাস ও কবিতা এবং মাধ্যমিক উৎস হিসেবে বিভিন্ন সমালোচনা গ্রন্থ ও নৃতাত্ত্বিক প্রবন্ধের সাহায্য নেওয়া হয়েছে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের জন্য অভিন্ন লেখক এর উল্লেখযোগ্য লেখা গুলির বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তথ্যগুলি লক্ষ্য অনুযায়ী বিশ্লেষণের মাধ্যমে মূল উদ্দেশ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

ANALYSIS & DISCUSSION (বিশ্লেষণ ও আলোচনা):

বাংলা সাহিত্যে বাহা উৎসব (ফুল উৎসব) সাঁওতাল আদিবাসী জীবনের প্রকৃতির সাথে একাত্মতা, বসন্তের আগমন এবং নবজীবনের উৎসবের একটি সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যতাত্ত্বিক দলিল। শাল-মহুয়া ফুলের মাধ্যমে শুরু হওয়া এই উৎসব প্রকৃতি পূজা এবং মানুষের সাথে প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্কের রূপক হিসেবে সাহিত্যে, বিশেষ করে মহাশ্বেতা দেবীর আদিবাসী-ভিত্তিক লেখায় প্রতিফলিত হয়।

আদিবাসী সমাজের সাংস্কৃতিক জীবন ও জীবনদর্শন প্রকৃতির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। বিশেষ করে সাঁওতাল সমাজে পালিত বাহা উৎসব প্রকৃতির নবজাগরণকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বসন্ত ঋতুতে যখন প্রকৃতিতে নতুন ফুল ও পাতা ফোটে, তখন এই উৎসবের মাধ্যমে মানুষ প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। বিভিন্ন গবেষক ও সাহিত্যিক তাঁদের রচনায় আদিবাসী সমাজের এই প্রকৃতিনির্ভর জীবনচেতনার বিষয়টি ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন।

নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাস : আদিপর্ব' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে বাংলার প্রাচীন সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাঁর মতে, বাংলার বহু লোকাচার, বিশ্বাস ও উৎসবের মধ্যে প্রকৃতিনির্ভর জীবনধারার প্রভাব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বাহা

উৎসবকে কেবল একটি উপজাতীয় উৎসব হিসেবে নয়, বরং প্রকৃতিনির্ভর সাংস্কৃতিক চেতনার একটি ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা হিসেবে দেখা যায়।

বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় প্রকৃতি ও অরণ্যবাসী মানুষের জীবন বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। তাঁর অরণ্যক উপন্যাসে অরণ্যাঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা, তাদের বিশ্বাস এবং প্রকৃতির সঙ্গে গভীর সম্পর্ক অত্যন্ত সংবেদনশীলভাবে চিত্রিত হয়েছে। এই রচনায় অরণ্য কেবল একটি প্রাকৃতিক পরিবেশ নয়; বরং মানুষের জীবন ও অনুভূতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে উপস্থিত। একইভাবে পথের পাঁচালী উপন্যাসেও গ্রামীণ সমাজের মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক এবং লোকজ সংস্কৃতির প্রভাব সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

সমরেশ বসুর সাহিত্যেও গ্রামীণ ও প্রান্তিক মানুষের জীবনচর্চা এবং প্রকৃতিনির্ভর সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলন দেখা যায়। তাঁর মহাকালের রথের ঘোড়া - সামাজিক বাস্তবতার একটি জীবন্ত চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। এই রচনাগুলিতে প্রকৃতি মানুষের জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত এবং তাদের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে প্রতিফলিত হয়েছে।

মহাশ্বেতা দেবীর অরণ্যের অধিকার উপন্যাসে আদিবাসী সমাজের জীবনসংগ্রাম, বনভূমির সঙ্গে তাদের অস্তিত্বগত সম্পর্ক এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় অত্যন্ত শক্তিশালীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে বনভূমি কেবল জীবিকার উৎস নয়; বরং এটি আদিবাসী সমাজের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। এই দৃষ্টিভঙ্গি বাহা উৎসবের মতো প্রকৃতিনির্ভর উৎসবের সাংস্কৃতিক তাৎপর্য বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

অন্যদিকে গণেশ দেবী তাঁর Adivasi Voice and Identity গ্রন্থে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতি এবং জীবনদর্শনের সঙ্গে প্রকৃতির গভীর সম্পর্কের বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, আদিবাসী সমাজের বিভিন্ন উৎসব ও আচার-অনুষ্ঠান প্রকৃতিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে এবং এর মাধ্যমে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করে।

বীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁদের গবেষণায় আদিবাসী ও লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে লোকজ উৎসব, বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রকৃতির প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই উৎসবগুলির মাধ্যমে মানুষ প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং সামাজিক ঐক্যের বন্ধন আরও দৃঢ় হয়।

রমেশচন্দ্র মুর্মু তাঁর সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি গ্রন্থে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে বাহা উৎসবের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, বাহা উৎসব বসন্তের নবজাগরণকে উদযাপন করার পাশাপাশি প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক মাধ্যম।

এছাড়া ভেরিয়ার এলউইন তাঁর গবেষণায় ভারতের বিভিন্ন আদিবাসী সমাজের জীবনধারা, সংস্কৃতি এবং প্রকৃতিনির্ভর বিশ্বাসের বিশদ আলোচনা করেছেন। তাঁর পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে আদিবাসী সমাজের উৎসব ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে প্রকৃতির একটি গভীর আধ্যাত্মিক সম্পর্ক রয়েছে।

এই সমস্ত সাহিত্য ও গবেষণার আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে আদিবাসী সমাজের জীবনদর্শনে প্রকৃতি একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। বাহা উৎসব সেই প্রকৃতিনির্ভর জীবনচেতনার একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক প্রকাশ। বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন লেখকের রচনার মাধ্যমে এই প্রকৃতি চেতনার বহুমাত্রিক রূপ

প্রতিফলিত হয়েছে, যা আদিবাসী সমাজের সাংস্কৃতিক পরিচয় ও জীবনদর্শন বোঝার ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যতাত্ত্বিক পাঠ:

প্রকৃতি ও মানুষের একাত্মতা: বাহা মানে 'ফুল' বা 'কুমারীকন্যা' এই উৎসবের মধ্য দিয়ে আদিবাসীরা প্রকৃতির সাথে মানুষের গভীর সম্পর্ক স্থাপন করে, যেখানে মানুষ নিজেকে প্রকৃতির অংশ হিসেবে গণ্য করে।

বসন্ত ও নবায়নের গান: ফাল্গুন-চৈত্র মাসে যখন শাল গাছে ফুল ফোটে, তখন এই উৎসব হয়। এটি আদিবাসীদের নববর্ষের উৎসব, যা নতুন জীবনের প্রতীক।

সাংস্কৃতিক আচার: বাহা উৎসবে শাল ও মহুয়ার সদ্যজাত নতুন ফুল দেবতার চরণে অর্পণ করার পরই নতুন ফুল-ফল ও পাতা ব্যবহার করা শুরু হয় । এই উৎসবের আগে সাঁওতাল নারীরা ফুল খোঁপায় দেওয়া থেকে বিরত থাকেন।

সাহিত্যে প্রতিফলন: মহাশ্বেতা দেবীর মতো লেখকরা আদিবাসী জীবনে এই উৎসবকে মিথ এবং প্রকৃতির উপাদানের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন । এই উৎসবের মধ্যে দিয়ে আদিবাসী সমাজের আত্মপরিচয়, প্রতিবাদ এবং সংস্কৃতি রক্ষার আকাঙ্ক্ষা ফুটে ওঠে।

বাহা বনাম আধুনিকতা: আধুনিক 'উন্নয়ন' (খনি খনন বা বন উজাড়) বাহা উৎসবের আচারের উপর প্রভাব ফেলছে। আদিবাসী লেখকরা এখন এই উৎসবকে 'Cultural Resistance' বা সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ হিসেবে তুলে ধরেছেন।

আচারতত্ত্ব (Ritual Theory): বাহা উৎসবে ব্যবহৃত 'শাল ফুল' কেবল একটি ফুল নয়, এটি একটি Totem (টোটেম)। আদিবাসী দর্শনে টোটেম মানে হলো মানুষের সাথে প্রকৃতির আত্মীয়তা।

পরিবেশগত ন্যায্যতা (Environmental Justice): আদিবাসী লেখক গ্ল্যাডসন ডুংডুং-এর মতে, বাহা উৎসব প্রমাণ করে যে আদিবাসীরাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 'বনরক্ষক'। তাদের ধর্মতত্ব আসলে একটি 'সংরক্ষণ নীতি'।

রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি: বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসে আদিবাসী জীবনের সারল্য ও প্রকৃতির অতীন্দ্রিয় রূপ ফুটে উঠেছে।

বাস্তববাদী ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি: মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যে (যেমন: 'অরণ্যের অধিকার') বাহা বা সোহরায়ের মতো উৎসবগুলো কেবল সংস্কৃতি নয়, বরং আদিবাসীদের **অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই** এবং জল-জঙ্গল-জমিনের ওপর তাদের অধিকারের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত।

বাহা উৎসব একটি প্রাকৃতিক নীতিশাস্ত্র (Environmental Ethics):

বাহা উৎসবে শাল বা মহুয়া ফুল দেবতার চরণে অর্পণের আগে ব্যবহার না করার যে প্রথা, তা মূলত আধুনিক 'Conservation Law' বা সংরক্ষণ আইনের প্রাচীন রূপ। এটি প্রমাণ করে যে, আদিবাসী জীবনদর্শন 'ভোগবাদী' নয়, বরং 'সহাবস্থানবাদী'।

ইকো-ফেমিনিজম ও বাহা: ইকোফেমিনিজম বা পরিবেশ - নারীবাদ হল রাজনৈতিক ও তাত্ত্বিক এমন একটি আন্দোলন যা নারী - নিপীড়ন এবং প্রকৃতি শোষণের মধ্য ঐতিহাসিক সম্পর্ককে তুলে ধরে। পুরুষতান্ত্রিক

সমাজব্যবস্থা নারীদের ওপর যেভাবে আধিপত্য বিস্তার করে ঠিক একইভাবে প্রাকৃতিক বিশ্বের ওপর ও শোষণ চালায়। ১৯৭৪ সালে ফ্রাঁসোয়া দ্যুবন প্রথম এই শব্দটি ব্যবহার করেন।

বাহা উৎসবে জল ছিটানোর প্রথা এবং নারীদের শাল ফুল মাথায় পরা কেবল সৌন্দর্য নয়, বরং প্রকৃতির প্রজনন ক্ষমতার সাথে নারীর সৃজনশীলতাকে একীভূত করা। ইকোফেমিনিজম কেবল নারীর অধিকারের কথা বলে না সাথে প্রকৃতি সংরক্ষণের মাধ্যমে সমস্ত ধরনের শোষণমুক্ত একটি সমতাপূর্ণ সমাজ গড়ার ডাক দেয়। এক কথায় ইকোফেমিনিজম প্রকৃতি সুরক্ষা এবং নারীদের ক্ষমতায়নকে এক সূত্রে গাঁথে। নির্মলা পুতুলের কবিতায় দেখা যায়, প্রকৃতি ধ্বংস হওয়ার অর্থ হলো আদিবাসী নারীর মর্যাদা ও অস্তিত্বের অবমূল্যায়ন।

তালিকা - ২

বিভিন্ন গ্রন্থে বাহা উৎসব ও প্রকৃতি-ভাবনার বিশ্লেষণ:

লেখকের নাম	**গ্রন্থ/ রচনা**	**মূল বিশ্লেষণ**	**বাহা উৎসব ও প্রকৃতি চেতনার সঙ্গে সম্পর্ক**
নীহাররঞ্জন রায়	বাঙালির ইতিহাস: আদিপর্ব	বাংলা সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন।	আদিবাসী সংস্কৃতির প্রকৃতিনির্ভর উৎসব যেমন বাহা উৎসব বাংলার প্রাচীন সাংস্কৃতিক ধারাকে বোঝাতে সাহায্য করে।
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	আরণ্যক	অরণ্যবাসী মানুষের জীবন, প্রকৃতির সঙ্গে তাদের গভীর সম্পর্ক ও জীবন দর্শন তুলে ধরা হয়েছে।	অরণ্য ও প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে যে জীবনচেতনা দেখা যায় তা উৎসবের প্রকৃতি নির্ভর ভাবনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	পথের পাঁচালী	গ্রামীণ সমাজ ও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের দৈনন্দিন সম্পর্ক চিত্রিত হয়েছে।	প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সহাবস্থানের ধারণা আদিবাসী উৎসব ও জীবন দর্শনের সঙ্গে সম্পর্কিত।
সমরেশ বসু	মহাকালের রথের ঘোড়া	প্রান্তিক মানুষের জীবন সংগ্রাম ও সামাজিক বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে।	গ্রামীণ ও উপজাতীয় সমাজের জীবনধারায় প্রকৃতিনির্ভর সংস্কৃতির উপস্থিতি দেখা যায়।
মহাশ্বেতা দেবী	অরণ্যের অধিকার	আদিবাসী সমাজের জীবনসংগ্রাম ও বনভূমি সংকেত তাদের সম্পর্ক তুলে ধরা হয়েছে।	বনভূমি ও প্রকৃতি আদিবাসী সমাজের সংস্কৃতিক পরিচয়ের অংশ, যা বাহা উৎসবের প্রকৃতি চেতনার সঙ্গে সম্পর্কিত।
গনেশ দেবী	Aadivasi Voice and Identity	আদিবাসী সমাজের ভাষা, সংস্কৃতি ও পরিচয়ের আলোচনা করেছেন।	আদিবাসী উৎসব ও আচার-অনুষ্ঠানে প্রকৃতির কেন্দ্রীয় ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন।

লেখকের নাম	গ্রন্থ/ রচনা	মূল বিশ্লেষণ	বাহা উৎসব ও প্রকৃতি চেতনার সঙ্গে সম্পর্ক
বীরেন্দ্রনাথ দত্ত	আদিবাসী সংস্কৃতি ও সমাজ	আদিবাসী উৎসব, আচার ও বিশ্বাসের বিশ্লেষণ করেছেন।	বাহা উৎসব এর মতো উৎসবের মাধ্যম প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের বিষয়টি বোঝা যায়।
রমেশচন্দ্র মুর্মু	সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি	সাঁওতাল সমাজের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন বিশ্লেষণ করেছেন।	বাহা উৎসব বসন্তের নবজাগরণ ও প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রতীক।
আশুতোষ ভট্টাচার্য	বাংলার লোকসংস্কৃতি	বাংলার লোকজ উৎসব ও আচার অনুষ্ঠানের আলোচনা করেছেন।	লোকসংস্কৃতিতে প্রকৃতির প্রভাব এবং উৎসবের মাধ্যমে তার প্রকাশ দেখা যায়।
ভেরিয়ার এলউইন	The Tribal World off Verrier Elwin	ভারতের বিভিন্ন আদিবাসী সমাজের জীবনধারা ও সংস্কৃতি বিশ্লেষণ করেছেন।	আদিবাসী উৎসব ও ধর্মীয় বিশ্বাসে প্রকৃতির আধ্যাত্মিক গুরুত্ব তুলে ধরেছেন।

LIMITATION (সীমাবদ্ধতা):

১. অনেক আদিবাসী লোককথা অলিখিত থাকায় এবং সাঁওতালি বা কুড়ুখ ভাষার অনেক উপমা বাংলায় হুবহু অনূদিত না হওয়ায় গবেষণায় কিছুটা ভাষাগত সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

২. এই গবেষণায় মূলত পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ড সীমান্তের আদিবাসী জীবনের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

CONCLUSION (উপসংহার):

বাহা উৎসব ও আদিবাসী জীবনদর্শন প্রমাণ করে যে, প্রকৃতিকে রক্ষা করা মানে আসলে নিজেকেই রক্ষা করা। বাংলা সাহিত্য এই উৎসবকে ধারণ করার মাধ্যমে আমাদের সামনে এক 'বিকল্প আধুনিকতার' প্রস্তাব রাখে। জলবায়ু পরিবর্তনের এই সংকটে আদিবাসীদের এই 'প্রকৃতি-কেন্দ্রিক' জীবনদর্শনই হতে পারে আগামীর বিশ্বের বাঁচার পথ।

এই গবেষণার আলোচনায় স্পষ্ট হয় যে আদিবাসী সমাজের জীবনদর্শন প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। তাদের সামাজিক রীতি, ধর্মীয় বিশ্বাস ও উৎসবের মধ্যে প্রকৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও নির্ভরতার ধারণা প্রতিফলিত হয়। সাঁওতাল সমাজে পালিত বাহা উৎসব মূলত বসন্ত ঋতুর আগমনের সঙ্গে যুক্ত এবং এটি প্রকৃতির নবায়ন ও জীবনের পুনর্জাগরণকে উদযাপন করার একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই উৎসবের মাধ্যমে মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক সহাবস্থানের ধারণা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।

বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন লেখকের রচনায় অরণ্য, প্রকৃতি এবং প্রান্তিক মানুষের জীবনযাত্রা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে। বিশেষত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সমরেশ বসুর রচনায় গ্রামীণ ও অরণ্যাঞ্চলের মানুষের জীবন ও প্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্কের যে চিত্র দেখা যায়, তা আদিবাসী

জীবনদর্শনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। এসব সাহিত্যকর্মে প্রকৃতি কেবল পটভূমি নয়; বরং মানুষের জীবন, সংস্কৃতি ও অনুভূতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে উপস্থিত।

অতএব বলা যায় যে বাহা উৎসব আদিবাসী সমাজে প্রকৃতিনির্ভর জীবনচেতনার একটি প্রতিকী প্রকাশ। বাংলা সাহিত্যের আলোচনার মাধ্যমে এই উৎসব ও তার অন্তর্নিহিত প্রকৃতি চেতনার সাংস্কৃতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে আদিবাসী সমাজের জীবনদর্শন সম্পর্কে একটি গভীর উপলব্ধি লাভ করা সম্ভব।

সহায়ক গ্রন্থ :

১। এলউইন, ভেরিয়ার। The Tribal World of Verrier Elwin। Oxford University Press, ১৯৬৪, London।
২। চৌধুরী, সত্যেন্দ্রনাথ। আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতি। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৫ কলকাতা।
৩। দত্ত, বীরেন্দ্রনাথ। আদিবাসী সংস্কৃতি ও সমাজ। প্রগতিশীল প্রকাশনী, ২০০৮, কলকাতা।
৪। দেবী, মহাশ্বেতা। অরণ্যের অধিকার। করুণা প্রকাশনী, ১৯৭৭, কলকাতা।
৫। দেবী, গণেশ। Adivasi Voice and Identity। Orient Blackswan, ২০০২, New Delhi।
৬। বসু, সমরেশ। মহাকালের রথের ঘোড়া। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স।, ১৯৫৫, কলকাতা।
৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। আরণ্যক। মিত্র ও ঘোষ, ১৯২৯, কলকাতা ।
৮। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। পথের পাঁচালী। গুরদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স, ১৯২৯, কলকাতা।
৯। বেরা, নলিনী। শ্রেষ্ঠ গল্প। কলকাতা প্রকাশনী, ২০০৩, কলকাতা ।
১০। ভট্টাচার্য, আশুতোষ। বাংলার লোকসংস্কৃতি। ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৮২, কলকাতা।
১১। মুর্মু, কালোচাঁদ। সাঁওতাল সমাজের উৎসব ও সংস্কৃতি। লোকসংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্র, ২০১০, কলকাতা।
১২। মুর্মু, রমেশচন্দ্র। সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি। লোকসংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্র, ২০১৫, কলকাতা।
১৩। রায়, নীহাররঞ্জন। বাঙালীর ইতিহাস: আদিপর্ব। দে'জ পাবলিশিং, ১৯৪৯, কলকাতা।
১৪। সেন, দীনেশচন্দ্র। বৃহৎ বঙ্গ। বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন, ১৯২০, কলকাতা।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1939-1946
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.418

চন্দ্রাবতীর রামায়ণ: প্রথাগত রামকথার প্রতিস্পর্ধী আখ্যান

আদিত্য চক্রবর্তী, *গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 25.03.2026; Accepted: 28.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Chandrabati's Ramayana, composed in medieval Bengal, stands as a distinctive counter-narrative to the canonical Ramkatha tradition. Departing from the Valmikian framework, this text reorients the epic's thematic and emotional centre from Rama to Sita, thereby transforming a predominantly heroic narrative into a deeply gendered and experiential one. Rather than celebrating divine heroism, Chandrabati presents Rama as a flawed human figure, while foregrounding Sita's suffering, resilience, and inner voice.

Drawing upon folk traditions, oral culture, and regional narrative variants, the text resists Brahmanical orthodoxy and challenges the patriarchal structures embedded within traditional retellings of the epic. The selective narration of events, the absence of elaborate war episodes, and the prominence of female experiences collectively contribute to what may be termed a "counter-current" discourse within the Ramayana tradition.

Furthermore, Chandrabati's portrayal of characters such as Mandodari and Kukua deepens the exploration of women's marginalization, emotional trauma, and social vulnerability in a male-dominated world. The narrative not only reflects personal anguish but also articulates a broader collective feminine consciousness.

Thus, Chandrabati's Ramayana emerges as a significant literary intervention that redefines the moral and ideological contours of the epic. It foregrounds silenced voices, subverts established hierarchies, and offers an alternative, humanized vision of the Ramkatha, making it a crucial precursor to modern feminist reinterpretations.

Keywords: Chandrabati Ramayana, Ramkatha, Counter-narrative, Feminine voice, Sitayan, Patriarchy, Folk tradition, Alternative epic tradition

১

রামকথা প্রাচীন ভারতবর্ষের আদি কাব্যকথা। বেদ-উপনিষদের পরে রচিত হলেও এই স্বীকৃতি রামায়ণ অর্জন করেছে কারণ আদিকবি বাল্মীকিই প্রথম নীরস তত্ত্বালোচনার পন্থা পরিহার পূর্বজ নিটোল আখ্যান গ্রন্থনের মধ্য দিয়ে স্পর্শ করেছন প্রবহমান জীবনসত্যকে। তাই যুগ যুগান্তর অতিক্রম করেও বহমান এই রামকথার ঐতিহ্য, লোকায়ত বিশ্বাস আমাদের 'অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে', কিন্তু চিরপরিচিত পুরাতন হয়েও তাঁর নিত্যনতুন রূপ আমাদের ক্লান্ত করে না। অনেকটা সময় পেরিয়েছে এই কাব্য। শিকারজীবী সভ্যতার অবসানে কীভাবে কৃষিকেন্দ্রিক জীবনচর্চা গড়ে উঠলো অথবা আর্য অনার্যের ক্ষমতাতন্ত্রের দ্বন্দ্বমুখর ইতিহাস বিধৃত এই

আখ্যান রূপান্তরিত হলো কাহিনিমুখ্য ধর্মশাস্ত্রে। বাল্মীকি রচিত 'নরচন্দ্রমা' বিবেচিত হলো পরমারাধ্য পুরাণ পুরুষ বিষ্ণুর অবতার শ্রীরামচন্দ্র রূপে। মধ্যযুগে প্রাদেশিক ভাষায় যখন রামায়ণ অনুবাদের সূচনা হয়, তখন শ্রীরামচন্দ্রের এই দেবমূর্তি আরো খোলতাই হতে থাকে। রাম-মাহাত্ম্য আরো বেশি করে সম্পৃক্ত হতে থাকে ভারতীয় যাপন-বিশ্বাসের সঙ্গে। তার নামকে কেন্দ্র করে আজও চলে ইতিহাসের খনন, রাজনৈতিক সমীকরণের হিসাব নিকেশ। তোলপাড় হয় দেশের বহুত্ববাদী রাজনীতি।

এ কথা অনস্বীকার্য যে হাজার বছর পূর্বের অতীতের মতো আজও রামকথা তাই প্রাসঙ্গিক। কিন্তু রামচন্দ্রের এতো মাহাত্ম্যকথা প্রচারের পরেও আধুনিক সমালোচকের দৃষ্টিতে তাঁর চরিত্র, কার্যাবলীও প্রশ্নাতীত হয়ে থাকেনি। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' থেকে শুরু করে মল্লিকা সেনগুপ্তের 'সীতায়ন' উপন্যাস— সাহিত্যে, ভাবনায় বারবার প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়েছে তাঁর ভূমিকা। দেব মাহাত্ম্যের আবরণ উন্মোচিত করে বারংবার তাঁকে এনে ফেলা হয়েছে দোষগুণ সম্পৃক্ত মানুষ হিসাবে। কিন্তু এ তো আধুনিক জীবনবোধ, দর্শনের কথা। কিন্তু যে সময় ছিল দেবমাহাত্ম্য কীর্তনই ছিল কাব্য, দিকে দিকে রামায়ণ এর অনুবাদ তাঁকে ভগবৎ মহিমায় বৃত হয়ে সুউচ্চ বেদীতে প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে, চলছে ভাগবত, মহাভারতেরও অনুবাদ, চৈতন্য প্রভাবে যখন বৈষ্ণবধর্মকে অবলম্বন করে রচিত হচ্ছে একের পর এক গীত, মঙ্গলকাব্যের রচয়িতারা মনসার পরে আরো নতুন নতুন দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারে মগ্ন, সেই সময়ে মৈমনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জের পাতুয়ারি গ্রামের এক শিবমন্দিরে বসে নীরবে এক নারীর হাতে জন্ম নিচ্ছে এক নতুন রামকথা। যে রামকথার উৎস দৈব আজ্ঞায় নয়, জীবনের আদেশে। যার প্রতিটি উচ্চারণে মিশে যায় সুদীর্ঘকালের নারীর অবজ্ঞা, যন্ত্রণার দুঃসহ ইতিহাস। এইভাবেই সেই ভাবাবেগ আপ্লুত সময়েই সৃষ্টি হলো "রামায়ণী কথার প্রতিস্রোতী এক ভিন্ন বয়ান"[১] যা প্রচলিত রাম গুণকীর্তনের ঐতিহ্যকে নস্যাৎ করে প্রতিষ্ঠা করে রামকথার এক প্রতিস্পর্ধী স্বর। পুরুষ শাসিত সমাজে পুরুষের কলমে লেখা পুরুষ পৃথিবীর ন্যারেটিভে চাপা পড়া নারীর বেদনাবিধুর কণ্ঠস্বরকে প্রতিষ্ঠা করবার দায় নিলেন যিনি, তিনি হলেন বঙ্গের প্রথম মহিলা কবি চন্দ্রাবতী।

২

বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি চন্দ্রাবতীকে বাঙালি পাঠক সমাজের কাছে প্রথম পরিচয় ঘটান বিখ্যাত গবেষক, সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে। চন্দ্রাবতী সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন–

> "বনে অনেক সময় এমন ফুল ফুটে, রাজোদ্যানেও তাহার তুলনা মিলেনা, সে বনফুলের সৌন্দর্য্য কেহ উপলব্ধি করিতে, কিম্বা সে সৌরভ কেহই ভোগও করিতে পারে না, বনের ফুল বনে ফুটে বনেই শুকায়। চন্দ্রাবতী এইরূপ একটি বনফুল, ময়মনসিংহের নিবিড় অরণ্যে, এক সময় এই সুরভি কুসুম ফুটিয়াছিল।"[২] ('সৌরভ' পত্রিকা, ফাল্গুন ১৩২০ বঙ্গাব্দ)

চন্দ্রাবতী রাজ অনুগ্রহ পাননি। তাঁর রচিত রামায়ণের কোনো লিখিত পুথি মেলেনি। সেই জন্যই এই লেখিকা পণ্ডিত সমাজের গোচরে এসেছেন অনেক পরে। কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে এই চন্দ্রাবতীকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে মৈমনসিংহের কিশোরগঞ্জ এলাকার প্রত্যন্ত গ্রামের সাধারণ মানুষ জীবিত রেখেছে। "চন্দ্রাবতী সেই প্রান্তিক মানুষগুলোর প্রাণের কবি"[৩]। শুধু রামায়ণ নয়, 'মলুয়া', 'দস্যু কেনারামের পালা', অসংখ্য গান, মেয়েদের ব্রতর ছড়া এই সব কিছুকেই সযত্নে তারা মুখ থেকে মুখে সংরক্ষিত করে রেখেছেন। কবি নয়ানচাঁদ প্রণীত 'চন্দ্রাবতী পালা' নামে তাঁর জীবন আধারিত এক করুণ রসাত্মক গীতিকা চন্দ্রাবতীকে কিংবদন্তী করে তুলেছে। কবি নয়ান চাঁদ রচিত এই পালা পাঠে জানা যায়, চন্দ্রাবতী বাল্যকালে জয়ানন্দ নামে এক ব্রাহ্মণ বালকের সঙ্গে পরিচিত হন; যৌবন সমাগমে সেই পরিচয় প্রেমে পরিণত হয়। উভয় পক্ষের অভিভাবকের সম্মতিক্রমে যেদিন রাত্রে বিবাহের আয়োজন হয়, সেইদিন অপরাহ্নে সংবাদ আসে যে আশমানী নামে একটি কন্যার প্রতি জয়ানন্দ

আসক্ত বলে দেশের কাজী সাহেব উভয়ের সাদী দিয়াছেন, জয়ানন্দ মুসলমান হয়ে 'জয়নাল' নাম গ্রহণ করেছে। এই ঘটনায় চন্দ্রাবতীর মনে যে নিদারুণ আঘাত এসেছিল, তা থেকে সান্ত্বনা দেবার জন্য পিতা বংশীদাস কন্যাকে শিবপূজা ও রামায়ণ রচনা করিতে উপদেশ দেন— শিবপূজা কর আর লেখ রামায়ণে। চন্দ্রাবতী পিতার উপদেশ পালন করেন। এভাবে পিতার আদেশেই হোক বা আপন ভাগ্যের অভিপ্রায়ে, শিবের সাধক চন্দ্রাবতী যেন হৃদয়ের যন্ত্রণাকেই বাণীরূপ দিয়েছেন তাঁর কাব্যে। তাই রাম থেকে তাঁর যন্ত্রণার ভাষা মুখরিত করবার জন্য তিনি বেছে নিয়েছেন আর এক জনম দুঃখিনী চরিত্র সীতাকে। চন্দ্রাবতীর এই রামায়ণ চন্দ্রকুমার দে যখন আজ থেকে একশো বছর আগে সংগ্রহ করেন, তখনো কবি চন্দ্রাবতীর গান, ছড়া, রামায়ণ শোনা যেত সাধারণ মানুষের মুখে মুখে। বিবাহ, অন্নপ্রাশন ও ব্রত উপলক্ষ্যে। বিশেষত সূর্যব্রতর দিনে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত অবধি মহিলারা চন্দ্রাবতীর রামায়ণ সুর করে গাইত।

চন্দ্রাবতীর পিতা বংশীদাস ভট্টাচার্য ওরফে দ্বিজ বংশীদাস ছিলেন ষোড়শ শতকের বিখ্যাত কবি এবং মনসামঙ্গলের রচয়িতা। তিনি শুধু পদ্মাপুরাণ-ই রচনা করেননি, সেই সঙ্গে 'রামগীত', 'চণ্ডী', 'কৃষ্ণগুণার্ণভ' গ্রন্থেরও রচয়িতা। চন্দ্রাবতীর মাতার নাম সুলোচনী দেবী। দ্বিজ বংশীদাস এবং সুলোচনী দেবীর তিন সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠা চন্দ্রাবতী। দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম নেওয়া চন্দ্রাবতী পিতার তত্ত্বাবধানে শিক্ষালাভ করেন। শুধু তাই ই নয়, অত্যন্ত সুন্দরী এই নারী ছিলেন সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত। শোনা যায়, চন্দ্রাবতী ছিলেন পিতার সাহিত্যকর্মেরও এক দক্ষ সহকারী। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন দাবি করেছেন দ্বিজ বংশীদাসের মনসাভাসান বা পদ্মাপুরাণ রচনা করবার সময় পিতার কাব্যের বেশ কিছু দোহা, লাচারী চন্দ্রাবতী রচনা করেছেন। বলাবাহুল্য, তৎকালীন সময়ে সমাজে অবহেলায় বেড়ে ওঠা নারীর চেয়ে চন্দ্রাবতী ছিলেন ব্যতিক্রমী। শিক্ষা তাঁকে বিদুষী করে তুলেছে। যে কারণে প্রেমে প্রতারিত নারী চন্দ্রাবতী আগামী জীবনে বেছে নিয়েছেন সম্পূর্ণ তপস্যীর জীবনকে অভ্যস্ত করার মধ্য দিয়ে। শুরু করেন জীবনের এক নতুন অধ্যায়। আপন হৃদয়ের দর্পণে প্রথাগত রামকথাকে তিনি দেন এক নব রূপ, অভিনব পরিচয়। এভাবেই মধ্যযুগের সাহিত্যের ইতিহাসে অসংখ্য পুরুষ কবির মাঝখানে এক নক্ষত্র রূপে আবির্ভূতা হন চন্দ্রাবতী। আজ কৃত্তিবাস, শঙ্কর দেব, নিত্যানন্দ আচার্য প্রমুখ রচয়িতার সঙ্গে উজ্জ্বলভাবে উপস্থিত এই চন্দ্রাবতী রামায়ণ। যদিও এ রামায়ণ আজ বহুল প্রচারিত নয়। চন্দ্রাবতী রামায়ণের ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে পরিচিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন নবনীতা দেবসেন। আক্ষেপের সঙ্গে তিনি বলেছিলেন–

> "সুন্দরী মলুয়া ও দস্যু কেনারাম যদিও বা বাংলার ছাত্রছাত্রীরা নাড়েচাড়ে, চন্দ্রাবতীর রামায়ণ তারা উল্টেও দেখে না, সাহিত্য সমাজ থেকে তাকে দুদ্দূর করে হটিয়েই দেওয়া হয়েছে যে।"[৪]

আসলে চন্দ্রাবতীর রামায়ণকে দীনেশচন্দ্র সেন, ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো পণ্ডিতবর্গ গুরুত্ব সহকারে দেখে, তাকে প্রকাশ করে বাঙালি পাঠকের কাছে পরিচয় ঘটনোর উদ্যোগ নিলেও ভাষাতত্ত্বের বিচার করে সুকুমার সেনের মতো অনেক পণ্ডিতই খানিক অবহেলায় দূরে ঠেলে দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে নবনীতা দেবসেন বলেন-

> "বছরের পর বছর ধরে আমাদের বাংলা সাহিত্যের হর্তাকর্তা যাঁরা, সেই পণ্ডিত-পুরুষ সুরক্ষীদের দ্বারা একটি দুর্বল মহাকাব্য এবং অসম্পূর্ণ কাজ হিসাবে উপেক্ষিত ও বর্জিত হয়ে এসেছে 'চন্দ্রাবতী রামায়ণ'। একেই আমরা বলছি টেক্সটের কণ্ঠরোধ। রাম-স্তুতি নেই বলে এই রামায়ণকে দীন মনে করা হল। এবং মৌখিক লৌকিক গানের রচনাশৈলীকে ধ্রুপদী কাব্যের রচনাশৈলীর সঙ্গে তুলনা করে একে দুর্বল এবং গুরুত্বহীন সাহিত্যকৃতি বলে খারিজ করে দেওয়া হল।"[৫]

পুরুষ শাসিত এই আধিপত্যকামী সমাজে চন্দ্রাবতী রামায়ণ সবিশেষ পরিচিতি লাভ না করলেও আপন শক্তিতেই তা সম্পূর্ণভাবে তলিয়েও যায়নি। আজ যখন নারীর অর্ধেক আকাশের অধিকার প্রবল স্বরে উচ্চারিত হয়, তখন সেই যুগের দাবিতেই এই চন্দ্রাবতীর লেখা পুনঃসঞ্জীবিত হয়ে ওঠে স্বাভাবিক নিয়মে।

৩

চন্দ্রাবতী রচিত রামায়ণের বিশিষ্টতার অনুসন্ধানে প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার আয়তনের স্বল্পতা। আয়তনের বিচারে এই রামায়ণ বাল্মীকি রামায়ণের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র। চন্দ্রাবতী রামায়ণে কোনো 'কাণ্ড' বিভাজন নেই। রয়েছে তিনটি খণ্ড। প্রথম খণ্ডে ৮টি, দ্বিতীয় খণ্ডে ২টি এবং তৃতীয় খণ্ডে ৯ টি অধ্যায় রয়েছে। কাহিনি বিন্যাসেও তিনি বাল্মীকি থেকে অনেকটাই সরে এসেছেন। বরং তার সঙ্গে মালয়, কাশ্মীর, তিব্বত, জাভা দেশে প্রচলিত কাহিনির সাদৃশ্য রয়েছে। এই প্রসঙ্গে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন–

> "মৈমনসিংহের ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব কতকটা আধুনিক। তৎপূর্ব্বে এই দেশে বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের নানারূপ কাহিনী ও প্রবাদ দেশময় প্রচলিত ছিল। জনসাধারণ এই সকল উপাখ্যান জানিত এবং চন্দ্রাবতী সংস্কৃত কাব্যের অনুরোধে জনসাধারণকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। এই জন্যই তিনি তাহাদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনীগুলির স্থান দিয়াছেন এবং এই জন্যই আর্য্য সমাজের বহির্ভূত প্রদেশসমূহে রামায়ণের যে বিচিত্র উপাখ্যানমালা প্রচলিত ছিল তাহাদের সহিত চন্দ্রাবতীর বিবরণের এইরূপ আশ্চর্য্য সাদৃশ্য।"[৬]

চন্দ্রাবতী রামায়ণে বাল্মীকি রামায়ণের মতো কাহিনিগত বৈচিত্র্য, জটিলতা, বিস্তৃতি পাওয়া যায় না। এই কাহিনি আসলে সরল, সুন্দর, সুমিষ্ট পালাগান। তার ভাষার বিন্যাসেও তাই নেই মহাকাব্যিক গাম্ভীর্য। এখানে মুখ্যত রামায়ণের সেই অংশটুকুই আলোকিত হয়েছে যেখানে সীতার প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ উপস্থিতি রয়েছে। তাঁর রামায়ণে অনায়াসে বাদ গিয়েছে রামের বীরগাথা, যুদ্ধের বর্ণনা, রামের দীক্ষা। নামমাত্র উল্লেখ আছে হরধনুভঙ্গ, অভিষেক, বনবাস, স্বর্ণমৃগ, সেতু নির্মাণ, ইন্দ্রজিৎ ও রাবণ বধের। রাম নয়, চন্দ্রাবতীর আখ্যানবস্তুর কেন্দ্র যেন এখানে সীতা। নবনীতা দেবসেন তাই এই ভিন্ন ঘরানার রামায়ণকে তাই 'সীতায়ণ' বলে উল্লেখ করতে চেয়েছেন। তিনটি খণ্ডের প্রথম খণ্ডের নাম 'জন্মলীলা'। বাকি দুই খণ্ডের নামকরণ করা নেই। আবার অধ্যায়গুলির কোনো কোনোটির কাহিনিভিত্তিক নামকরণ হয়েছে, কোনোটির হয়নি। সম্ভবত এই নামকরণ সম্পাদকেরই করা। আমরা এখানে এই তিন খণ্ডের উনিশটি অধ্যায়ের নামকরণ বা মূল বিষয়টুকু একটি সারণীতে উল্লেখ করবো, যার মাধ্যমে এই রামায়ণের কাহিনি বৃত্তটি সহজে বোঝা যাবে।

- প্রথম খণ্ড (জন্মলীলা):
- প্রথম অধ্যায়: লঙ্কার বর্ণনা।
- দ্বিতীয় অধ্যায়: রাবণের স্বর্গজয়।
- তৃতীয় অধ্যায়: রাবণ কর্তৃক মর্ত্য ও পাতাল বিজয়।
- চতুর্থ অধ্যায়: সীতার জন্মের পূর্ব সূচনা এবং মন্দোদরীর গর্ভসঞ্চার ও ডিম্বপ্রসব।
- পঞ্চম অধ্যায়: মাধব জালিয়া ও সতা জাল্যানী। ষষ্ঠ অধ্যায়: ডিম্ব নিয়ে জনক মহিষীর কাছে সতার গমন।
- সপ্তম অধ্যায়: রামের জন্মের পূর্ব সূচনা।
- অষ্টম অধ্যায়: রামের জন্ম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুদ্রের জন্ম এবং কুকুয়ার জন্ম।

চন্দ্রাবতী রামায়ণের দ্বিতীয় খণ্ডের আলাদা কোনো নামকরণ করা হয়নি। এই খণ্ডে সীতার কাহিনী প্রাধান্য লাভ করেছে। এই খণ্ডে কবি জনক দুহিতা সীতার মুখে তাঁর কাহিনী বর্ণনা করিয়েছেন। এই খণ্ড মোট দুটি অধ্যায়ে বিভক্ত:

প্রথম অধ্যায়: বনবাস পূর্ববর্তী জীবনের কাহিনী।

দ্বিতীয় অধ্যায়: বনবাসের ঘটনায় পরিপূর্ণ। যাকে নামকরণ করা হয়েছে 'সীতার বারোমাসি'।

এই রামায়ণের তৃতীয় খণ্ডটিও দ্বিতীয় খণ্ডের মতো নামকরণ বিহীন।মোট নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত:

- প্রথম অধ্যায়: সীতার বনবাসের পূর্ব সূচনা।
- দ্বিতীয় অধ্যায়: সীতার বিরুদ্ধে কুকুয়ার চক্রান্ত। তৃতীয় অধ্যায়: রামচন্দ্রের কাছে সীতার বিরুদ্ধে কুকুয়ার মিথ্যা অভিযোগ দায়ের।
- চতুর্থ অধ্যায়: রামচন্দ্রের সীতাকে পুনর্বার বনবাসে পাঠাবার সিদ্ধান্ত।
- পঞ্চম অধ্যায়: সীতার বনবাস।
- ষষ্ঠ অধ্যায়: সীতাকে বাল্মীকি মুনির আশ্রয়দান ও লব-কুশের জন্ম।
- সপ্তম অধ্যায়: সীতার সঙ্গে হনুমানের সাক্ষাৎ। অষ্টম অধ্যায়: রামচন্দ্রের সঙ্গে হনুমানের সাক্ষাৎ। নবম অধ্যায়: সীতার অগ্নিপরীক্ষা ও পাতাল প্রবেশ।

এই কাহিনিবিন্যাস দেখলেই অনুমান করা যায় যে চন্দ্রাবতীর রামায়ণ বাল্মীকি রামায়ণের চেয়ে কতটা স্বতন্ত্র।

প্রথম খণ্ডের বর্ণনায় যে তিনটি অভিনবত্ব সবচেয়ে বেশি দৃষ্টিগোচর হয়, তা হলো রামের জন্মবৃত্তান্তের আগে সীতার জন্মবৃত্তান্তের বর্ণনা, দ্বিতীয়ত সীতা মন্দোদরীর শরীরজাত কন্যা, যাকে সে ডিম্বরূপে প্রসব করেছেন কিন্তু তার জন্মের সঙ্গে রাবণের কোনো প্রত্যক্ষত সংযোগ নেই। তৃতীয়ত, বাল্মীকি রামায়ণের শান্তা চরিত্রের পরিবর্তে রামের অনুজা রূপে কুকুয়া চরিত্রের আগমন। এই চরিত্রটিও কাশ্মীরি, জাভা, কম্বোজ, মালয় দেশের রামায়ণের অনুসারী। কুকুয়া এক আত্মকেন্দ্রিক, পরনিন্দা পরচর্চাকারী, কুটিল স্বভাবের নারী। মনে করা হয় চন্দ্রাবতীর প্রেমিক জয়ানন্দ যে মুসলমান নারীর সঙ্গে বিবাহ করেছিল সেই চরিত্রের সঙ্গে এই কুকুয়ার সাদৃশ্য আছে।

চন্দ্রাবতী রামায়ণের দ্বিতীয় খণ্ডটি সংক্ষিপ্ত অথচ গুরুত্বপূর্ণ। এখানে সীতা একমাত্র বক্তা। সীতার বাচনে প্রকাশিত হয়েছে তার শৈশব-কৈশোর-যৌবনের অভিজ্ঞতার ডালি। সীতার ছোটবেলা থেকে বিবাহ, বিবাহোত্তর জীবন সবটাই বর্ণিত হয়েছে এই স্থানে। একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে রামায়ণের 'বালকাণ্ড'কে চন্দ্রাবতী জায়গা দিয়েছেন 'জন্মলীলা'য়। অন্যদিকে তৃতীয় খণ্ডে এসেছে রামায়ণের 'উত্তরকাণ্ড'এর ঘটনাসমূহ। তাই এই দ্বিতীয় কাণ্ডে সীতার বয়ানে তিনি অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে আসলে বাকি পাঁচটি খণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহকেই মৃদুভাবে স্পর্শ করে গেছেন। সম্পূর্ণ কাহিনিই বিবৃত হয়েছে করুণ রসের মধুর ঝঙ্কারে। এখানে আরো একটি কথা উল্লেখযোগ্য, মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' এর চতুর্থ পর্বে সরমার কাছে সীতা পঞ্চবটী বনের যে বর্ণনা দিয়েছিলেন, সেইরকম বর্ণনাই এখানে পাওয়া যায়। 'সীতার বারোমাসি' অংশে এই সরমা চরিত্রটিকে আমরা পাই। এ থেকে দীনেশচন্দ্র সেন অনুমান করেন যে–

> "আমার বিশ্বাস মাইকেল মৈমনসিংহের কবির রামায়ণটি কোনো স্থানে শুনিয়া মহিলা-কবির দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন।"[৭]

তৃতীয় খণ্ডের সূচনা হয়েছে এমন এক ঘটনা দিয়ে যা কোনো রামায়ণেই উল্লেখ নেই। তা হলো রাম সীতার পাশাখেলা। এক রোমান্টিক ঘন পরিবেশ তৈরি হয়েছে এখানে। সীতা কর্তৃক রাবণের ছবি অঙ্কন, কুকুয়ার ক্রূরতা, রামের অবিবেচক কাজ এবং সীতার সকরুণ পরিণতির প্রসঙ্গ উঠে এসেছে এ অংশে।

চন্দ্রাবতী রামায়ণের চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে প্রথমেই যা উল্লেখযোগ্য, তা হলো রামচন্দ্রের যে 'নরচন্দ্রমা', 'পতিতপাবন' অবতার রূপ, চন্দ্রাবতী তাকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। জন্মলীলায় রামকে 'নারায়ণ' বলে উল্লেখ করলেও রামচন্দ্র সমগ্র আখ্যানে একজন দোষে গুণে পরিপূর্ণ, দেবমহিমাবিহীন, রক্তমাংসে নির্মিত এক অতি সাধারণ মানুষ। এখানে রামের বীরত্ব নেই, সে কোনো কোনো স্থলে ভীরু, অবিবেচক। স্বামী, রাজা, যোদ্ধা কোনো ভূমিকাতেই তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ নন। কুকুয়ার প্ররোচনায় সীতাকে অযোধ্যা থেকে বের করে দিলে সমগ্র রাজ্যটিই লক্ষ্মীছাড়া হয়ে যায়। আবার এই অবস্থায় অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রয়োজনে সীতাকে রাজ্যের মঙ্গলের জন্য বন থেকে ফিরিয়ে এনেও নিষ্ঠুর মানুষের মতো দুই সন্তানের সামনে মা কে পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থা করেন। তাই রামের মতো স্বামী পেয়ে সীতা আক্ষেপের স্বরে ব্যক্ত করে নিজের যন্ত্রণার কথা–

"জনম দুঃখিনী সীতা গো, দুঃখে কাটে কাল।
রামের মত পতি পাইয়্যা গো, মোর দুঃখের কপাল।।"[৮]

সীতার মতোই আর এক করুণ, দুঃখিনী নারী এখানে মন্দোদরী। তাঁর স্বামী রাবণ এখানে অত্যাচারী, অহংকারী, দুর্বিনীত। ব্রহ্মার বরে প্রাপ্ত অপরিসীম শক্তিকে সে ব্যবহার করে পরপীড়নের কাজে। শক্তির দম্ভে যেমন সে দেবতা, মুনিদের হেনস্তা করেন তেমনই সে পরনারী লোলুপ। দুঃখে কষ্টে নারীত্বের অপমানের যন্ত্রণায় সে বিষ ভেবে পান করলেন রাবণ কর্তৃক আনা মুনিরক্ত 'কালজর'। মৃত্যুর পরিবর্তে রাণী হলেন অন্তঃসত্ত্বা। দশমাস দশ দিন বাদে সে প্রসব করলেন একটি ডিম্ব। জ্যোতিষের গণণায় দেখা গেল—-

"এহি ডিম্বে এক কন্যা গো রাজা আইজ লভিল জনম।
এহি কন্যা হইব গো রাজা স্বর্ণলঙ্কা ধ্বংসের কারণ।।"[৯]

অতএব, এ ডিম্বকে নষ্ট করাই ছিল একমাত্র বিধেয়। কিন্তু অসহায় মা মন্দোদরীর আর্তি–

"যদি নাই সে রাখো ডিম্ব গো, তবে সাগরে ভাসাও।"[১০]

মূল রামায়ণের বহির্ভূত এই কাহিনি নির্মাণের মধ্য দিয়ে মন্দোদরী চরিত্রের অসহায়ত্ব প্রদর্শনের মাধ্যমে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর অবস্থাকে চিহ্নিত করেছেন। আবাল্য প্রেমিক জয়ানন্দের কামুকতা, ব্যভিচারিতা চন্দ্রাবতীকে যেভাবে বেদনার্ত করেছিল, মন্দোদরী চরিত্রের মধ্যে যেন তার প্রভাব বিদ্যমান। বিশ্বাসহীনতাই তো দাম্পত্য সম্পর্কের বিনষ্টির আসল সূতিকাগার, রামের মতো রাবণ চরিত্র-ও তাই সুস্থ দাম্পত্যের সহায়ক হয়নি।

চন্দ্রাবতীর আখ্যানে চরিত্র বিশ্লেষণে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র এবং নষ্ট দাম্পত্যের পরিচয় পাই, তা হলো অযোধ্যার রাজকুমারী, কৈকেয়ীর সন্তান কুকুয়া। ভাগ্যদোষে সে কুৎসিত, কুরূপা। স্বভাবে মুখরা। কর্মদোষে তারও সংসার সুখ মেলেনি। সে ঔষধ খাইয়ে স্বামীকে পাগল করেছে। রাম-সীতা সম্পর্কের মধ্যে সন্দেহ, অবিশ্বাস স্থাপন, সীতার চরিত্রহননের কু প্রচেষ্টা এসবই সম্পাদিত হয়েছে কুকুয়ার দ্বারা। এই চরিত্র নির্মাণে চন্দ্রাবতীর জয়ানন্দের সঙ্গে বিচ্ছেদের মূলে যে মুসলমান নারীর কথা জনশ্রুতি, তার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। কারণ 'চন্দ্রাবতী' পালায় অনুতাপের অনলে দগ্ধ জনায়ন্দ যখন মোহান্ধতা থেকে মুক্ত হয়ে চন্দ্রাবতীর কাছে ফিরে আসবার আকুতি জানায়, সেখানেও তিনি তার সেই ক্রূর, মুখরা এবং স্বার্থান্বেষী চরিত্রের কথা উল্লেখ করে। সেই নারী অবশ্য সুরূপা হলেও কুকুয়ার কুশ্রী রূপ হয়তো তার স্বভাবকেই চিহ্নিত করে। শুধু তাই-ই নয়, কুৎসিত রূপের কারণে সেই নারীও আমাদের প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় সমাদৃতা হয় না। সেই বঞ্চনাই তার মনকে এমনভাবে বিষিয়ে কুৎসিত করে তুলেছে। যে কারণে যখন সীতার জন্য সাজানো কাঠে আগুন জ্বালাতে গিয়ে কুকুয়ার কেশ পুড়ে যায়, তখন–

"কুকুয়ার কান্দন দেইখ্যা গো সীতা ঠাকুরাণী।

হস্ত বুলাইয়া কুকুয়ার গো শীতল করিল জ্বলুনি।।"[১১]

নারী বলেই হয়তো সীতা কুকুয়াকে, যে কিনা তার জীবন বিপর্যয়ের প্রধান কারণ, তাকেও এইভাবে যাওয়ার আগে শীতল করে দিয়ে যায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় তার অবস্থানকে অনুভব করেই। আসলে চন্দ্রাবতীর রামায়ণের সবচেয়ে বড় চমৎকারিত্ব এখানেই যে তা ততোটা মূলের অনুসারী নয়, যতোটা না জীবন-সম্ভূত রচনা।

এতগুলি নষ্ট, অসুস্থ সম্পর্কেও মাঝেও চন্দ্রাবতী নির্মাণ করেছেন এক সার্থক দাম্পত্য জীবন চিত্রও। তারা হলো মিথিলার দুই অখ্যাত জেলে-জেলেনী মাধব আর সতা। দারিদ্র্য ক্লিষ্ট জীবনে অর্থাভাব হলেও প্রেম, ভালোবাসা, বিশ্বাস, আন্তরিকতা প্রভৃতি মানবিকগুণের কোনো অভাব তাদের গৃহে ছিল না। চন্দ্রাবতী তার রামায়ণে এই স্বকল্পিত দাম্পত্যের চিত্রণে দেখিয়েছেন বিপুল বিত্তের সমারোহ থেকে দূরেও পারস্পরিক বিশ্বাস, আনুগত্য এবং অকপট ভালোবাসায় জীবনের সার্থকতাকে খুঁজে পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই চন্দ্রাবতী রামায়ণে এই সীতা নামকরণও হয়েছে, সতার নাম অনুসারে। মাধব-সতার দাম্পত্যের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে চন্দ্রাবতীর জীবনদর্শন—

"সতী নারীর সাধু পতি গো যদি থাকে ঘরে।
খাওনের পিন্ধনের দুঃখ গো নাই সে অন্তরে।।"[১২]

এইভাবেই এই আখ্যান রাজকীয় আতিশয্যের চেয়ে পল্লীগ্রামস্থ দারিদ্র্য পীড়িত কিন্তু সুখী দাম্পত্যকেই অধিকতর শ্রেয় এবং আদর্শস্থানীয়ভাবে নির্মাণ করে তার রচনার উপভোক্তা অর্থাৎ মৈমনসিংহ জেলার সাধারণ মানুষের কাছে বার্তা দিয়েছেন।

৪

'চন্দ্রাবতী' রামায়ণকে আন্তর্জাতিক মহলে পরিচিত করবার দুর্দমনীয় সংগ্রাম করেছিলেন আধুনিক বাংলার বিখ্যাত সাহিত্যিক নবনীতা দেবসেন। ভারত এবং ভারতের বাইরে দেশে দেশে সেমিনারে, বক্তৃতায় তিনি চন্দ্রাবতী রামায়ণের সঙ্গে অধিকতর পাঠকের পরিচিতি ঘটানোয় সচেষ্ট থাকেন। ১৯৯১ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে তিনি চন্দ্রাবতী রামায়ণ নিয়ে বক্তৃতা দেন। চন্দ্রাবতী রামায়ণের ইংরেজি অনুবাদও তিনি রচনা করেন যা 'Zubaan' নামে দিল্লির মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত হয়।[১৩] নবনীতা দেবসেন চন্দ্রাবতী রামায়ণকে 'সীতায়ণ' বলে প্রায়ই আখ্যায়িত করতেন। এ অবধি রচনায় যেটুকু পরিচিতি পাঠকবৃন্দ চন্দ্রাবতী রামায়ণ সম্পর্কে পেয়েছেন, তাতে বোধকরি নিঃসংশয়ে এই অভিধাকে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু যে সময়ে নারীচেতনাবাদী ভাবনা সূতিকাগারেও প্রবিষ্ট করেনি, যে সমাজব্যবস্থায় তাদের অবস্থান নিতান্তই প্রান্তিক, সেখানে নানাভাবে এই চন্দ্রাবতী রামায়ণ নারীকেন্দ্রিকতায় অভিনবত্ব লাভ করেছে। যেন চন্দ্রাবতী রামায়ণ আধুনিক নারীচেতনাবাদেরই পূর্বপাঠ।

প্রথমত, এ কাব্যের রচয়িতা নারী। বিবাহ, ব্রত ইত্যাদি অনুষ্ঠানে এ রচনা গীত হতো। তার গায়কী, শ্রোতাও মুখ্যত নারী। অর্থাৎ স্রষ্টা, উপভোক্তা সবই মহিলা। এবং এভাবেই এক মহিলা দ্বারা সৃষ্টি হওয়া আখ্যান বহু শতাব্দী ধরে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সঞ্জীবিত থেকেছে মহিলাদের যত্নশীল চর্চার মধ্যবর্তিতায়।

দ্বিতীয়ত, নামে রামকথা হলেও এই কাব্যে রামের জন্মকথার আগে উপস্থাপিত হয়েছে সীতার জন্মকথাই। শুধু তাই-ই নয়, মূল রামায়ণের সেই সকল প্রসঙ্গই এই ক্ষুদ্রাকৃতির অভিনব রামায়ণে স্থান পেয়েছে যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সীতার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

তৃতীয়ত, চন্দ্রাবতী রামায়ণ অনুসারে সীতা মুনিরক্তে বীজীভূত স্ত্রীযোনিজ সন্তান। সীতা কেবল মন্দোদরীর শরীরজাত সন্তান, তার জন্মের ক্ষেত্রে রাবণের সঙ্গে প্রত্যক্ষত কোনো যোগ নেই। আবার মন্দোদরী জন্ম দিলেও ডিম্বরূপী সীতা মাধবপত্নী সতার দ্বারা প্রতিপালিত। আবার এরপরে ঘটনাপরম্পরায় জনকমহিষীর পরিচর্যায় সীতার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা। অর্থাৎ সীতার জননী মন্দোদরী, ধাত্রী সতা ও পালয়িত্রী জনকমহিষী। সীতার জন্ম থেকে বেড়ে ওঠা প্রায় পুরুষ সম্পর্করহিত।

চতুর্থত, চন্দ্রাবতীর রামায়ণে রাম-রাবণের যুদ্ধ নেই, আর্য অনার্যের দ্বন্দ্বময় ইতিহাস নেই। রাম থেকে যদি চন্দ্রাবতীর আখ্যানের প্রেক্ষণবিন্দু সীতায় প্রতিস্থাপিত হয়, তাহলে রাবণের বদলে এসেছে কুকুয়া। আসলে কুকুয়াকে এখানে দেখানো হয়েছে অশুভ নারীশক্তির প্রতীক হিসাবে। চন্দ্রাবতী এখানে যেন দেখিয়েছেন যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে কেবল পুরুষরাই নয়, আত্মকেন্দ্রিক ক্রূর মানসিকতার নারীরাও নারীর জীবনকে বিপর্যস্ত করতে পারে। এখানে কুকুয়া হলো সেই নারী, যা পুরুষতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী।

পঞ্চমত, সীতার জন্ম প্রসঙ্গে রাবণের গণৎকারের গণনা ছিল— "এহি কন্যা হইব গো রাজা স্বর্ণলঙ্কা ধ্বংসের কারণ।।"[১৪] অর্থাৎ দুর্বিনীত, অহংকারী, নারীলোলুপ রাজার ধ্বংসের মূল কারণ যে সীতা-ই, তা সর্বাগ্রে ঘোষিত।

সর্বোপরি, চন্দ্রাবতী রচিত আখ্যান শুধু মহিলা রচিত নারীকেন্দ্রিক আখ্যানই নয়, তা হয়ে উঠেছে এক স্বাধীনতার আখ্যান, মুক্তির আখ্যান। চন্দ্রাবতীর এই রচনা দেবমাহাত্ম্য কীর্তনের উদ্দেশে তো রচিত হয়নি-ই বরং তা প্রবল পরাক্রমে নস্যাৎ করেছে দেবভক্তিবাদকে। এখানেই চন্দ্রাবতী রামায়ণের প্রধান শক্তি। নবনীতা দেবসেন এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন– চন্দ্রাবতী ব্রাহ্মণদের রামায়ণকে চুপ করিয়ে দিয়েছেন। তাঁর রামায়ণে রামের অবতারত্ব ক্রমশ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়েছে, অনুচ্চারিত থেকেছে তার দেবত্ব, যুদ্ধ দক্ষতা, বীরত্বের প্রসঙ্গ। মধ্যযুগীয় আখ্যানে দৈবমাহাত্ম্যের পথকে পরিহার করে যে জীবন মানবিক আখ্যান চন্দ্রাবতী রচনা করেছেন এখানেই তার অভিনবত্ব এবং প্রাসঙ্গিকতা।

তথ্যসূত্র:

১। নস্কর, সনৎকুমার। 'চন্দ্রাবতী রামায়ণ: 'সীতায়ন'' না 'নারী-মহাকাব্য'? প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য: পরিপ্রশ্ন ও পুনর্বিবেচনা। দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ১১৮।
২। দে, চন্দ্রকুমার। 'মহিলা কবি চন্দ্রাবতী।' চন্দ্রাবতীর রামায়ণ ও প্রাসঙ্গিক পাঠ। বরকত, হিমেল (সম্পা.), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১২ পৃ. ৮২।
৩। ঘোষ, লিপিকা (সম্পা.)। কবি চন্দ্রাবতীর রামায়ণ। কেতাব-এ, কলকাতা, ২০২৫, পৃ. ১৫।
৪। দেবসেন, নবনীতা। চন্দ্র-মল্লিকা। দেশ, বর্ষ ৬৪, সংখ্যা ৬, পৃ. ৯০।
৫। দেবসেন, নবনীতা। তদেব, পৃ. ৯৬।
৬। সেন, দীনেশচন্দ্র। 'চন্দ্রাবতীর রামায়ণ।' পূর্ববঙ্গ গীতিকা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩২, পৃ. ৫২৪–৫২৫।
৭। তদেব, পৃ. ৫২৬।
৮। ঘোষ, লিপিকা (সম্পা.)। 'কবি চন্দ্রাবতীর রামায়ণ'। প্রাগুক্ত। পৃ. ১০৪।
৯। তদেব, পৃ. ৫৫।
১০। তদেব, পৃ. ৫৫।
১১। তদেব, পৃ. ১১৯।
১২। তদেব, পৃ. ৫৮।
১৩। তদেব, পৃ. ৩৩।
১৪। তদেব, পৃ. ৫৫।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1947-1953
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.419

রামমোহন: নারী ক্ষমতায়নের পথিকৃত

ড. ব্রততী চক্রবর্তী, *সহকারী অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ, টুরকু হাঁসদা লপসা হেমরম মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.03.2026; Accepted: 30.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The process of restoring the social status of a group of people who are deprived, humiliated, and neglected in society in various ways, by increasing their skills, potential, and strength is what is called empowerment in sociology. In our country, women have been neglected and deprived in various ways since ancient times. Re-establishing their rights and social respect is known as 'women empowerment'. To establish equality in men and women, the government has taken many steps at present. But if we look back at the history of our country, we will see that the process of women empowerment started in subjugated India. Raja Rammohan Roy, one of the social reformers of India, ignored the adverse social and religious conditions of that time and stood by the side of women. He fought to protect their rights. Just as he restored women's right to life by abolishing sati, he also promoted the importance of women in the public mind by speaking out against child marriage, caste system, etc. He tried to make the people of India realize that women are not objects, but living beings. He also thought about the economic empowerment of women. That is why he brought the issue of women's rights in their father's and husband's property before the British government. He tried to implement all the things that are beyond the imagination of today's modern people in those adverse times. In fact, he is a modern hero of all times.

Keywords: Women Empowerment, Rammohan Roy, Sati Culture, Child Marriage, Social Awareness.

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।"[১]

কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অর্জুনকে তার প্রিয়সখা শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন যে তিনি যুগে যুগে অধর্ম ও অধর্মীদের বিনাশের জন্য এবং সজ্জনদের ত্রাতা হয়ে ধর্মপ্রতিষ্ঠার জন্য বারে বারে ফিরে আসবেন। ভগবান এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন কিনা তা ব্যক্তির বিশ্বাসভেদে বিতর্কের বিষয়। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য, যে যুগে যুগে কিছু মহামানবের আবির্ভাব ঘটেছে, যাঁরা তাঁদের কর্মের মাধ্যমে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন এবং

বিপন্ন মানুষের রক্ষকরূপে বিরাজ করেছেন। তাঁরাই আর্তদের ত্রাতা হয়ে দুষ্টদের অনাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। এমনই একজন যুগপুরুষ হলেন রাজা রামমোহন রায়, যাঁর অসীম প্রজ্ঞা হিন্দুধর্মের প্রকৃতস্বরূপ বিশ্বদরবারে উপস্থাপন করেছে এবং তৎকৃত বিভিন্ন সমাজসংস্কার নির্যাতিত জনগণকে মুক্তির পথ দেখিয়েছে। কোম্পানীর ঔপনিবেশিক শাসনের ভারে যখন ভারতবাসী নিষ্পেষিত, দেশ যখন অন্ধ কুসংস্কারে আছন্ন, অন্ধবিশ্বাস ও ধর্মান্ধতার কারণে জাতির জীবনধারা যখন রুদ্ধ, রক্ষণশীলতার উগ্র বেড়াজালে সমাজ যখন পদে পদে শৃঙ্খলিত, সেই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে দেশবাসীর কাণ্ডারী হয়ে আবির্ভূত হন রাজা রামমোহন রায়। সময়টা ছিল ১৭৭২ সাল (মতান্তরে ১৭৭৪)[২]। সেই বছরের ২২ শে মে হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার রাধানগর গ্রামে রমাকান্ত রায় ও তারিনীদেবীর বা ফুলঠাকুরাণীর সন্তানরূপে ভারতের এই প্রথম আধুনিক পুরুষের জন্ম হয়। তাঁদের কৌলিক উপাধি ছিল 'বন্দ্যোপাধ্যায়'। প্রপিতামহ শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারের থেকে কাজের দক্ষতার কারণে 'রায়-রায়ান' উপাধি লাভ করেন। প্রচণ্ড মেধাবী রামমোহন খুব অল্পবয়সেই বিভিন্ন ভাষায় ব্যুৎপন্ন হন ও সেই ভাষায় রচিত সাহিত্যের তুলনামূলক অধ্যয়ন তাঁর চিন্তাজগতে নবজাগরণ ঘটায়। তাঁর নবজাগরিত মনন ও বিচারক্ষমতা অন্ধকারাচ্ছন্ন সেই ভারতবর্ষকে নতুন দিগন্তের সন্ধান দেয়। কোম্পানীর শাসনাধীন সেই পরাধীন ভারত সর্বকালের মুক্তমনা এই যুগনায়কের হাত ধরে 'আধুনিক' হতে শিখেছিল। দেশবাসীর দুর্দশা তাঁকে এতটাই ব্যাকুল করেছিল যে তিনি মানুষের মঙ্গলার্থে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। নিজের পরিবার, সমাজ কোনকিছুই তাঁর কর্মযজ্ঞকে রুদ্ধ করতে সক্ষম হয়নি। কখনও কোনও অবলা নারীকে চিরাচরিত বর্বর প্রথা থেকে মুক্ত করে, কখনও ধর্মান্ধদের সামনে ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরে, শিক্ষার পথকে উন্মুক্ত করে তিনি প্রকৃত অর্থেই 'ত্রাতা'র রূপে ভারতবাসীর পাশে দাঁড়িয়েছেন। রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় নানান একপেশে প্রথা, গতানুগতিক আচার-আচরণ, নিয়ম-কানুনের গ্রন্থিতে আবদ্ধ অসহায় মানুষকে তিনি আশার আলো দেখিয়েছিলেন, অক্ষমকে দিয়েছিলেন ক্ষমতালাভের পথের সন্ধান। সমাজের সমস্ত পিছিয়ে পরা, দুর্বল মানুষের মধ্যে এই ক্ষমতায়ন ঘটেছিল। বর্তমান নিবন্ধে তৎকালীন সমাজে সর্বাধিক নির্যাতিত, অবহেলিত নারীজাতির ক্ষমতায়ন বা স্বশক্তিকরণের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

'ক্ষমতায়ন' শব্দটি সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম চর্চিত বিষয়। ক্ষমতায়ন হল এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে কোনও ব্যক্তি, সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী তাদের সামাজিক পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য নিজেদের শক্তি, দক্ষতা ও সম্ভাবনা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হয়।[৩] সমাজে বৈষম্য ও বঞ্চনার স্বীকার হওয়া মানুষ ক্ষমতায়নের মাধ্যমে একদিকে যেমন নিজের জীবনকে নিজে নিয়ন্ত্রনের ক্ষমতা অর্জন করে, তেমনি সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তগ্রহণের যোগ্যতাও অর্জন করে। এই 'ক্ষমতায়ন' শব্দের সাথে যখন 'নারী' শব্দটি যুক্ত হয়ে যায়, তখন বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে সামাজিকদের কাছে। কারণ, সমাজে প্রচলিত রীতি-নীতি, পিতৃতন্ত্র, ধর্মীয় বিধান ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার নারীরাই বেশিমাত্রাতে হয়ে থাকে। নারী ক্ষমতায়নের প্রসঙ্গে তাই বলা হয়েছে—

> "Women empowerment may be defined as a process by which the powerless gain greater control over the circumstances of their lives."[৪]

ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তিবৃদ্ধি এক সুস্থ স্বাভাবিক প্রগতিশীল সমাজের জন্য একান্ত কাম্য। বর্তমানে সরকার নারী ক্ষমতায়ন বা নারী সশক্তিকরণের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করছেন, যেমন— বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও প্রকল্প, স্বয়ংসিদ্ধা প্রকল্প, জননী সুরক্ষা যোজনা, কন্যাশ্রী প্রকল্প, সুকন্যা প্রকল্প ইত্যাদি অসংখ্য প্রকল্প। এগুলির মাধ্যমে বর্তমান যুগে বহুনারী উপকৃত হচ্ছে ও সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এতো হল বর্তমান প্রেক্ষাপট।

বর্তমানযুগের প্রেক্ষিতে নারীর অধিকার ও তাদের ক্ষমতায়ন বা স্বশক্তিকরণের ধারণা ও পদ্ধতি ভিন্ন। কিন্তু ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে নারীর অধিকারের ধারণা ও তাদের ক্ষমতায়নের পদ্ধতি সহজসাধ্য বিষয় ছিলনা। তবে ভারতের ইতিহাসে বর্ণিত নারী আন্দোলনের বহুপূর্বে নারীর অধিকারগুলিকে সুনিশ্চিত করার লড়াই শুরু হয়েছিল সেই পরাধীন ভারতেই, রামমোহন রায়ের তত্ত্বাবধানে। সেই অধিকার ছিল বেঁচে থাকার অধিকার, নিজের জীবনের সিদ্ধান্তগ্রহণের অধিকার এবং জীবনধারণের অধিকার।

বর্তমান সময়ের নিরীখে 'নারী ক্ষমতায়ন' কথাটি বহুশ্রুত ও বহুচর্চিত একটি বিষয়। এখন যে কোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই সুস্থ সমাজের রচনায় নারীর ভূমিকা ও তন্নিমিত্ত তার ক্ষমতায়নের গুরুত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম। কিন্তু আজ থেকে আড়াইশ বছর আগে ভারতের যে সামাজিক পটভূমি, তার প্রেক্ষিতে নারী ক্ষমতায়নের চিন্তা ও তার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্যিই বিস্ময়কর। কোনও মানুষ কতটা আধুনিক হলে এহেন দূরদর্শিতা দেখাতে পারেন। রামমোহন বুঝেছিলেন যে সেই মুহূর্তে পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচন ভারতবাসীর পক্ষে সম্ভব নয়। স্বাধীনতা লাভের আগে তার জন্য অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। মাটির তৈরী কলসি যখন কাঁচা থাকে তখন যেমন তা জলধারণের উপযোগী হয়না, তেমনি কোন অধিকার ভোগের জন্য ব্যক্তির আধার শক্ত হওয়া প্রয়োজন, যাতে গৃহীত আধিকার ধারণ করে রাখতে পারে। তা যদি না হয় তাহলে স্বাধীনতা পেলেও তার সুফল দেশবাসী পাবে না। এই বাস্তবসত্য অনুধাবন করে তিনি তাই প্রথমে সমাজকে কুসংস্কার, ধর্মীয় ভ্রান্তধারণা, অশিক্ষা ইত্যাদি থেকে মুক্ত করার পথ বেছে নেন। রামমোহন যেন সেই কাজেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সমাজে সবচেয়ে অবহেলিত নির্যাতিত নারীদের সমতা দানের জন্য, তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য সর্বোপরি প্রাণরক্ষার জন্য তিনি এগিয়ে এসেছিলেন।

নারী ক্ষমতায়নের অন্যতম উদ্দেশ্য হল নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত নিজে নেওয়ার যোগ্যতা প্রদান। কিন্তু সেই সময় নারী বেঁচে থাকবে, না মৃত্যুবরণ করবে, সেই সিদ্ধান্তও তার নিজের নেওয়ার অধিকার ছিল না। তৎকালীন সমাজে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নামে এক বর্বর প্রথা প্রচলিত ছিল, তার নাম 'সতীদাহ'। সদ্য পতিহারা একটি বালিকা বা মহিলাকে স্বামীর পারলৌকিক মঙ্গলার্থে স্বামীর মৃতদেহের সাথে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হত। সদ্য পতিবিয়োগের দুঃখে দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য অবস্থায় মৃত স্বামীর সাথে সহমৃতা হতেন। স্বামীর সঙ্গে মৃত্যুকে বরণ করার জন্য সে 'সতী' আখ্যা পেত। অনেকক্ষেত্রে পারিপার্শিক অবস্থা বিচারের ক্ষমতা বা বয়স কোনটিই হতনা সেই মেয়েটির। এইভাবে শাস্ত্রের আদেশের অজুহাত দেখিয়ে কতশত নারীর থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে তাদের বেঁচে থাকার অধিকার। রামমোহন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এই নৃশংস প্রথার উচ্ছেদ তিনি করবেন।[৫] যদিও তার আগেও 'সতীদাহ' এর যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, এই নিয়ম বন্ধের জন্য আবেদনও হয়েছে, কিন্তু কোনমতেই তার উচ্ছেদ সম্ভব হয়নি। শাস্ত্রাচারের মোড়ক এটিকে আগলে রেখেছিল। রামমোহন সেই শাস্ত্রের বিধানের দ্বারাই প্রমাণ করেছিলেন যে এটি অমানবিক ও শাস্ত্রসম্মত নয়। শাস্ত্রজ্ঞদের মতে, যদি কোন রমণী তার স্বামীর মৃত্যর পর স্বামীর পারলৌকিক মঙ্গলার্থে স্বেচ্ছায় সহমরণে যেতে চান তাহলে তিনি তা করতে পারেন, যদি সেই রমণী অপ্রাপ্তবয়স্কা, অন্তঃস্বত্তা, ঋতুমতী না হন। ১৮০৫ সালে গভর্ণর জেনারেল নিজামত আদালতের পণ্ডিতদের কাছে সহমরণের শাস্ত্রীয় যৌক্তিকতা জানতে চাইলে পণ্ডিত ঘনশ্যাম শর্মা শাস্ত্রোক্ত 'সহমরণ' ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই মতই উঠে আসে।[৬] সুতরাং শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে সহমরণ সম্পূর্ণরূপে ঐচ্ছিক। কোনও রকমের জোর করা, মাদকের আশ্রয় নেওয়া সেখানে অভিপ্রেত নয়। কিন্তু বাস্তবচিত্র ছিল এর বিপরীত। সম্পত্তির ভাগ যাতে না দিতে হয় এবং ভরণপোষনের ব্যায় যাতে বইতে না হয়, সেই কারণে মৃতব্যক্তির স্ত্রীকে জোর করে, অধিকাংশ সময়ে মাদকের প্রয়োগ করে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হত। যদি সে কোনক্রমে জলন্ত চিতা থেকে পালিয়ে যেত, তাকে পুনরায় ধরে এনে আগুনে বসিয়ে দেওয়া

হত। অথবা প্রথমেই তার হাত-পা বেঁধে মৃতব্যক্তির সাথে শুয়িয়ে দেওয়া হত। অনেকক্ষেত্রে যদি সেই নারীটি কোনোক্রমে মরণের হাত থেকে নিস্তার পেয়েও যেত কোন সজ্জনের সহায়তায়, সমাজে তার কোন স্থান হতোনা। উপরন্তু তার প্রাণসংহারের পুনঃপুন প্রচেষ্টা করা হত। যাতে পরবর্তীতে কেউ সমাজের এই নিয়ম লঙ্ঘন করার সাহস না পায়, তাই ধর্মগুরুদের এই প্রচেষ্টা। এহেন বর্বর প্রথার অবলুপ্তির জন্য রামমোহন সচেষ্ট হন। তিনি ইংরেজ সরকারের কাছে এই প্রথা রদ করার আবেদন জানান এবং নিজের মতের সপক্ষে জনমত গড়ে তোলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে শুধুমাত্র আইনপ্রণয়ন করলেই এই দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা প্রথার অবলুপ্তি সম্ভব নয়। এর জন্য মানুষকে আগে সচেতন করতে হবে। যে শাস্ত্রের দোহায় দিয়ে ক্ষমতালোভী একশ্রেণীর মানুষ সকলকে বিপথে পরিচালিত করছে, সেই শাস্ত্রের প্রকৃত বার্তা তিনি মানুষের সামনে তুলে ধরেছিলেন। ১৮১৮ সালে তিনি 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক নিবর্তকের সম্বাদ' নামে পুস্তিকা রচনার মাধ্যমে সহমরণ যে একটি ধর্মবিরুদ্ধ প্রক্রিয়া সেটি জনমানসে যুক্তিসহ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বলেন, যদি সহমরণ শাস্ত্রমতে অবশ্যকর্তব্য হত, তাহলে তা না করলে কি প্রত্যবায় হত তার বিধান শাস্ত্রে থাকত।[৭] সেটি না থাকায় সহমরণের অবশ্যকর্তব্যতা শাস্ত্রনির্দিষ্ট নয়। এছাড়া যেকোন কাম্যকর্ম শাস্ত্রে নিন্দিত। সহমরণও কাম্যকর্ম হওয়ায় তাও নিন্দনীয় হওয়া উচিত। আর সর্বোপরি শাস্ত্রে উল্লিখিত সহমরণ সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে আচরণীয়। এই যুক্তি দিয়ে তিনি জনগণকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে শাস্ত্রাচার বা ধর্মাচারের নামে যে অমানবিক প্রথা চলে আসছে তার গতিরোধ করা প্রয়োজন। বিভিন্ন পুস্তিকা প্রকাশের মাধ্যমে তিনি জনমত গড়ে তোলেন এবং ৩০০ জনের স্বাক্ষর সহ সতীদাহ রদের আবেদনপত্র ব্রিটিশ সরকারের কাছে জমা করেন। তাঁর এই নিরলস প্রচেষ্টা এবং ব্রিটিশ সরকারের সদিচ্ছা ও আনুকূল্যে অবশেষে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক 'সপ্তদশ বিধি' নামে আইন পাশ করে সতীদাহ প্রথা রদ করেন। ভারতবর্ষ 'সতীদাহ' রূপ কলঙ্ক থেকে মুক্তির পথের সন্ধান লাভ করে।

রামমোহন রায় কেবলমাত্র নারীজাতিকে বাঁচার অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তাই নয়, সুস্থ জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক, আর্থিক ও বৌদ্ধিক সংস্কারের দিকগুলিকেও গুরুত্ব দিয়ে নারীজাতির শক্তিবৃদ্ধিতে সহায়তা করেছিলেন। সমাজে নারী ও পুরুষ সমান মর্যাদার অধিকারী- এই মত তিনি পোষণ করতেন। তিনি তাঁর 'Brief Remarks Regarding Modern Encroachments on the Ancient Rights of Female' গ্রন্থে এই সম-মর্যাদার বক্তব্য তুলে ধরেছেন।[৮] সমাজে প্রচলিত যে সমস্ত প্রথা নারীদের অবস্থার উন্নতি ও অগ্রগতির অন্তরায় সেই সকল নিয়মের বিরুদ্ধেই তিনি সোচ্চার হয়েছিলেন। যেমন— বাল্যবিবাহ। ভারতীয় হিন্দু সমাজে তখন ১০ বা ১১ বছর বয়সের বা তার থেকেও কমবয়সের কন্যাসন্তানকে পাত্রস্থ করার রীতি ছিল। না হলে পিতা সমাজে নিগৃহিত হতেন। এর ফলে সেই কন্যার না হতো লেখাপড়া, না তৈরী হতো ভালোমন্দ জ্ঞান। ফলে তার জীবনের সকল সিদ্ধান্ত নিত তার পরিবারের সর্ববেত্তা পুরুষেরা। ফলস্বরূপ সে হতো নির্যাতিতা। রামমোহন এই দৃশ্যতে ব্যথিত হয়েছিলেন এবং বাল্যবিবাহ বন্ধের জন্য সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। এর পাশাপাশি সমাজের আর এক প্রথার বিরুদ্ধেও তিনি প্রতিবাদ করেন, সেটি হল 'কৌলিন্য প্রথা'। সমাজের উচ্চবর্ণের পুরুষেরা নিজেদের 'কুলীন' বলে পরিচয় দিতেন এবং বহু বিবাহ করতেন। বংশ মর্যাদা রক্ষার খাতিরে কন্যার পিতা কুলীনের সাথে কন্যার বিবাহ দিতেন, সে তার বয়স পিতার বয়সের বেশিই হোক না কেন। বহুপত্নীর স্বামী তাদের কোন দায়িত্বই বহন করত না। রামমোহন এই প্রথা বন্ধের জন্যও সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর সেই প্রচেষ্টা পরবর্তীতে আইনে পরিণত হয়। ১৮৭২ সালে 'ভারতীয় বিবাহ বিষয় আইন' বা 'National Marriage Act 1872' পাশ হয়। নিজেদের আত্মমর্যাদা ফিরে পাওয়ার দিকে নারীরা একধাপ এগিয়ে যায়।

রামমোহন 'বিধবা বিবাহ' এর সমর্থনেও আন্দোলন গড়ে তোলেন। স্বামীবিয়োগের পর বিধবার মর্মান্তিক পরিণতি বা দুঃসহ কৃচ্ছসাধনমূলক জীবনযাপন থেকে মুক্তির জন্য তাদের পুনরায় বিবাহের রীতি প্রচলনে উদ্যগী হয়েছিলেন তিনি। অধিকাংশক্ষেত্রে অতি অল্পবয়সেই নারীরা স্বামীহারা হতেন এবং তাদের জীবনে নেমে আসত বৈধব্য যন্ত্রণা ও সমাজের কঠোর বিধিনিষেধের পরোয়ানা। তাই তিনি বিধবাদের পুনর্বিবাহের বিষয়ে সোচ্চার হন। প্রথমেই জনসাধারণের মধ্যে এই মতের সমর্থন পাওয়া যাবে না- এই বিষয়টি অনুধাবন করে তিনি প্রথমে ব্রাহ্মসমাজের সদস্যদের মধ্যে বিধবা বিবাহ ঘটিয়েছিলন। পরবর্তীতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ সালে 'বিধবা বিবাহের আইন' পাশ হয়। যে কোনও সংস্কারমূলক আন্দোলন একটি নির্দিষ্ট তারিখের সীমায় বা কোন একজন ব্যক্তির একার উদ্যোগে ফলপ্রসু হয় না। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা কোনও প্রথার অবলুপ্তির জন্য প্রথম পদক্ষেপটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা পরবর্তীতে দৃষ্টান্তরূপে মনোবলবৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। বিধবা বিবাহের অবলুপ্তির ক্ষেত্রে সেই পদক্ষেপ ছিল রামমোহনের।

নারী-পুরুষের অসাম্যের আর একটি নিদর্শন কন্যা সন্তানের হত্যা। সুদূর অতীতকাল থেকেই মানবসমাজের কাছে পুত্রসন্তান বহু আকাঙ্ক্ষিত। যদিও ঋগ্বেদীয় যুগে পুত্রের আকাঙ্ক্ষা থাকলেও কন্যাসন্তান উপেক্ষিত ছিল না। কিন্তু পরবর্তীতে সামাজিক অবস্থার অবক্ষয়ের সাথে সাথে পুত্রের আকাঙ্ক্ষা বারতে থাকে। 'পুতাৎ ত্রায়তে ইতি পুত্রঃ' অর্থাৎ পুতনামক নরক থেকে পিতামাতাকে ত্রাণ করে বলেই তার নাম পুত্র। তাই পিতামাতার কাছে পুত্রসন্তান কাঙ্ক্ষিত ও কন্যাসন্তান উপেক্ষিত। কন্যাসন্তান থেকে অব্যহতি পাওয়ার জন্য প্রাচীন ভারতে হিন্দু সমাজে কন্যা সন্তানকে গঙ্গাসাগরে বিসর্জনের কুপ্রথা চালু ছিল। কন্যা সন্তানের বিবাহ সংক্রান্ত ব্যয়ভার থেকে অব্যহতি পাওয়ায় ছিল এই প্রথার মূল কারণ। এছাড়াও কন্যা বিধবা হলে তার দায়ভারও পিতামাতার চিন্তার কারণ ছিল। এই অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে রামমোহন জনমত গড়ে তুলেছিলেন। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন নিষিদ্ধ ঘোষনা করেন। রাজা রামমোহন রায়ের উদ্যোগে ও ব্রিটিশ সরকারের কঠোরতায় ভারতের বহু কন্যা এই নির্মম প্রথা থেকে নিষ্কৃতি পায়।

সমাজে মহিলাদের অবস্থার উন্নতির জন্য প্রচলিত কুপ্রথাগুলির বিরুদ্ধে রামমোহন যে শুধু সোচ্চার হয়েছিলেন তা নয়, মহিলাদের সামাজিক অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য তাদের অর্থনৈতিক অধিকারের দিকটিও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। কারণ নারী যদি অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন না হয় তাহলে সে পরনির্ভর থেকে যাবে এবং তার সমস্ত সিদ্ধান্ত তার পরিবারের পুরুষ সদস্যরাই গ্রহণ করবেন। তাই নারীদের অর্থনৈতিক অধিকারদানের জন্য তিনি সম্পত্তিতে মহিলাদের অধিকার স্থাপনের জন্য আন্দোলন করেছিলেন। প্রচলিত নিয়মানুযায়ী হিন্দু সমাজে স্বামী মারা গেলে তার সম্পত্তিতে স্ত্রীর কোনও অধিকার ছিল না। ফলস্বরূপ তার নিজের সমস্ত প্রয়োজনের জন্য স্বামীর আত্মীয়দের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হতো। রামমোহন এই নিয়মের বিরুদ্ধেও কলম ধরেছিলেন। ১৮২২ সালে তিনি 'Brief Remarks Regarding Modern Encroachments on the Ancient Rights of Female'[৯] গ্রন্থে প্রতিপন্ন করেছিলেন যে প্রাচীন ভারতে সম্পত্তিতে মহিলাদের অধিকার থাকত। স্বামী মারা যাবার পর তার সম্পত্তিতে বিধবা স্ত্রীর ভাগ থাকত। সন্তান থাক বা না থাক সে স্বামীর সম্পত্তির অংশীদার হতো। এমনকি প্রতিটি মেয়েরই তার পিতার সম্পত্তিতে অধিকার থাকত। রামমোহন ব্রিটিশ সরকারের কাছে মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আইন প্রণয়নের আবেদন করেছিলেন, যার দ্বারা মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার দিকটি স্পষ্ট হয়। এই অবিরাম প্রচেষ্টার ফল হিসাবে ১৮৭২ সালে 'Special Marriage Act' পাশ হয়, যেখানে বিবাহবিচ্ছেদের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত হয় এবং সম্পত্তিতে মহিলাদের অধিকারটি নিশ্চিত হয়। এছাড়াও ১৮৭৪ এর 'The Married women's Property Act' এ স্ত্রীর সম্পত্তিক্রয়ের অধিকার ও স্ত্রীধনের উপর অধিকার সুনিশ্চিত হয়। নারী ক্ষমতায়ন বা স্বশক্তিকরণের ক্ষেত্রে

অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা রামমোহন সেই কালেই অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর অবিরাম নিরলস প্রচেষ্টা ফলপ্রসু হয়েছে পরবর্তীতে প্রবর্তিত আইনসমূহের মাধ্যমে।

নারী ক্ষমতায়নের অন্যতম উপায় হল শিক্ষার প্রসার। নিজের অধিকার, সমাজে সম্মানজনক অবস্থান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এই সমস্তকিছুই অধরা থেকে যায় শিক্ষার অভাবে। নারীশিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে রামমোহন রায়ের নাম পৃথকভাবে কোনও আন্দোলনে যুক্ত না থাকলেও তৎকালীন সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তন ও পরিবর্ধনে তাঁর যে অবদান তা নারী-পুরুষ উভয়ের বৌদ্ধিক ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু তা ইংরেজ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করার জন্য বা সরকারী কর্মচারী জোগান দেওয়ার জন্য নয়। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে ভারতীয়দের যুক্তিবাদী মানসিকতার বিকাশ হবে। তিনি বুঝেছিলেন বিজ্ঞানই মানুষকে উদারচেতা ক্রতে পারে, মানুষের মনে যুক্তি করার ক্ষমতা তৈরী করতে পারে। আর সেই যুক্তিবাদী মন নিয়েই অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার কাটিয়ে উঠা সম্ভব। তাই তিনি লর্ড আমহার্স্টকে একলক্ষ টাকা পাশ্চাত্যশিক্ষার জন্য ব্যয়ের অনুরোধ করেন। ১৮১৬ সালে তিনি শুড়িপাড়ায় একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮২২ সালে তার নাম দেওয়া হয় অ্যাংলো হিন্দু স্কুল। পরে এর নাম হয় ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি। তিনি তাঁর সম্বাদ কৌমুদী পত্রিকায় নারীদের শিক্ষালাভের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। নারীশিক্ষার প্রসার ও তার মাধ্যমে নারীর সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কেবলমাত্র নারীদের উদ্যোগী করাই যথেষ্ট নয়- এই সত্যটি তিনি অনুধাবন করেছিলেন। তাই তাঁর লেখনীর মাধ্যমে তিনি সমাজের সকলকে নারীশিক্ষার বিষয়ে আগ্রহী করতে চেয়েছিলেন। কারণ পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর ভালো-মন্দ সমস্তই পরিবারের পুরুষের সিদ্ধান্তের উপরেই নির্ভরশীল ছিল। পরবর্তিতে ব্রাহ্মসমাজের স্থাপন এবং সেখানে মদিলাদের অংশগ্রহণের ফলে মহিলাদের শিক্ষাগ্রহণের বিষয়টিতে স্বয়ং মহিলারা উদ্যোগী হলে নারীশিক্ষার বিষয়টি ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

রামমোহন রায় সেই সুদূর অতীতে নারী ক্ষমতায়নের যে বীজ বপন করেছিলেন, সেই বীজ ক্রমশ অঙ্কুরিত হয়ে, বহু হিতৈষী সমাজসংস্কারকদের অবদানে পল্লবিত হয়ে আজ মহীরুহে পরিণত। বর্তমানে আমরা নারীমুক্তির কথা বলছি, নারীর বিভিন্ন অধিকার সংরক্ষণের কথা বলছি, চাইছি নারী-পুরুষের সাম্য, পড়ছি মানবী বিদ্যা, কিন্তু এই সকলই অধরা থেকে যেত যদি রামমোহন রায়ের মত মহাত্মারা পথের সন্ধান না দিতেন। তাঁর মতো মহামানব যদি না থাকতেন তাহলে আজকের নারী বর্তমান সামাজিক সুযোগসুবিধা থেকে তো বঞ্চিত হতো, তার সাথে তার কী অধিকার, সেসম্বন্ধেও ধারণাহীন রয়েই যেত। রামমোহনের সমস্ত সিদ্ধান্ত, তাঁর সমস্ত পদক্ষেপ, তাঁর দূরদর্শিতা, আধুনিকতার পরিচায়ক। 'অধুনা ভব' অর্থাৎ যা এই ক্ষণে বিদ্যমান তাই আধুনিক। সুতরাং আধুনিক শব্দটি কালের প্রেক্ষিতে পরিবর্তনশীল। ২০০০ সালে যা আধুনিক ছিল তা আজকে আর আধুনিক নয়। আবার আজকে যা আধুনিক বলছি, তা ২০৫০ সালে আধুনিক থাকবে না। কিন্তু রামমোহন রায়ের ক্ষেত্রে 'আধুনিক' শব্দটি সর্বদা প্রযোজ্য। কারণ তাঁর চিন্তা, ধ্যান-ধারণা, বিচারক্ষমতা ছিল আধুনিক, যুগোপযোগী। তিনি শাস্ত্রের অপব্যাখ্যাবন্ধ করার জন্য শাস্ত্রকেই ব্যাবহার করেছিলেন। পুরাতন সমস্ত শাস্ত্র, সমস্ত মত, কেবলমাত্র পুরাতন বলেই ত্যাজ্য- এই মতের সমর্থক তিনি ছিলেন না। বরং বিচারের দ্বারা বর্জনীয় বিষয় ত্যাগ করে যুক্তিসম্মত সঠিক সিদ্ধান্তকে তিনি গ্রহণ করেছেন, যা একজন প্রকৃত আধুনিক ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। তিনি প্রাচ্যের সারতত্ত্বকে গ্রহণ করে, পাশ্চাত্যের প্রগতিশীলতার সাথে সমন্বয় ঘটিয়ে ভারতবর্ষের ঘুম ভাঙিয়েছিলেন, ঘটেছিল ভারতের তথা বাংলার নবজাগরণ। সেই ভারতপথিকের দেখানো পথ ধরেই অন্যান্য মহাত্মারা এই দেশ ও জাতিকে গৌরবান্বিত করেছে বার বার। সেই চিন্তনের, যুক্তিশীলতার পথ যদি এখনও অনুসৃত হয়, তাহলে উচ্চস্বরে দাবী করায় যায়—

বল বল বল সবে, শত বীণা বেনু রবে।
ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।

তথ্যসূত্র:

১। শ্রীবদ্ভগবদ্গীতা। ৪র্থ অধ্যায়, শ্লোক ৭-৮। শ্রীগীতা, শ্রীজগদীশ চন্দ্র ঘোষ, পৃষ্ঠা. ১৩৭-১৩৮।

২। রামমোহন রায়ের জন্মসাল প্রসঙ্গে শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'রামমোহন রায়' শীর্ষক গ্রন্থে ১৭৭৪ সালের উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে জন ডিগবীর উক্তি অনুযায়ি ১৮১৭ সালে রামমোহনের বয়স ছিল ৪৩ বছর। ডিগবীর সাথে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৮০০ সালে, যখন তাঁর বয়স ২৭। ১৭৭৪ সালে রামমোহনের জন্ম হলেই এই বয়স সম্ভব।– দ্রষ্টব্য 'রামমোহন রায়', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃষ্ঠা ১২।

৩। Asia and Pacific Centre for Women and Development ক্ষমতায়নের ব্যাখ্যায় বলেছে— "Empowerment is a process by which the conditions for self-determination of a particular people or group can be created".

৪। দ্রষ্টব্য Batliwala, S. (1994). The Meaning of Women's Empowerment: New Concepts from Action. In *Population Policies Reconsidered: Health, Empowerment, and Rights* (pp. 127–138).

৫। বলা হয় তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা জগন্মোহনের পত্নীকে এই বর্বর প্রথা থেকে রক্ষা করতে পারেন নি। তখনই তিনি এই প্রথা রদ করানোর অঙ্গীকার গ্রহণ করেন।

৬। দ্রষ্টব্য মহাত্মা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, পৃষ্ঠা ৩২৪-৩২৬।

৭। রায়, রাজা রামমোহন। *সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক নিবর্তকের সম্বাদ*। ১৮১৮।

৮। Roy, R. R. (1822). *Brief remarks regarding modern encroachments on the ancient rights of females*. Calcutta.

৯। Roy, R. R. (1822). *Brief remarks regarding modern encroachments on the ancient rights of females*. Calcutta.

গ্রন্থপঞ্জি:

১। ঘোষ, অজিত কুমার (সম্পা)। রামমোহন রচনাবলী। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৩।

২। গঙ্গোপাধ্যায়, প্রভাতচন্দ্র। রামমোহন প্রসঙ্গ। কলকাতা, ১৩৫২।

৩। ঘোষ, মুরারি। অনন্য রামমোহন অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ ও যুগনায়ক। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৯।

৪। ঘোষ, শ্রীজগদীশ চন্দ্র। শ্রীগীতা। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, কলকাতা, ২০১৫।

৫। চট্টোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এবং ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার উপদেশ ও মতামত। ইন্ডিয়ান্ প্রেস লিমিটেড্, এলাহাবাদ, ১৯২৮।

৬। চট্টোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। কলকাতা, ব্রহ্মাব্দ ৬০।

৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ। রামমোহন রায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৪৯।

৮। বিশ্বাস, দিলীপকুমার। রামমোহন সমীক্ষা। সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৩৭৩।

৯। মাইতি, প্রভাতাংশু। ভারত ইতিহাস পরিক্রমা (১৫২৬ খ্রীঃ-১৯১৪ খ্রীঃ)। শ্রীধর পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৫।

১০। মুখোপাধ্যায়, জীবন। ভারতের ইতিহাস (১৫২৬-১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ)। শ্রীধর পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১২।

১১। রহমান, মাহবুবুর। বাংলার ইতিহাস (১৭৫৭ খ্রি থেকে ১৯৪৭ খ্রি পর্যন্ত)। বুকস্ ফেয়ার, ঢাকা, ২০১৮।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1954-1962
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.420

শ্রী রামকৃষ্ণের বহুত্ববাদী ধর্মদর্শন: যত মত তত পথ নীতির সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা

চণ্ডী চরণ লেট, *গবেষক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 24.03.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This paper analyzes a fundamental concept of Ramakrishna Paramahamsa's religious philosophy— "As many faiths, so many paths" —and examines its philosophical significance and contemporary relevance. In the present global context, where debates surrounding religious polarization, cultural conflict, and the so-called "Clash of Civilizations" are intensifying, Ramakrishna's notion of experiential religious pluralism offers an important philosophical framework for fostering world peace and interreligious harmony.

A distinctive feature of Ramakrishna's philosophy is that he did not merely advocate theoretical religious unity; rather, he personally practiced diverse spiritual traditions to realize this truth. By engaging in various paths such as Shakta sadhana, Advaita Vedanta, Islam, and Christianity, he arrived at the realization that different religious traditions ultimately lead to the same ultimate reality or God. This experiential insight serves as a powerful philosophical counterpoint to religious exclusivism and sectarian narrowness.

Through textual analysis and philosophical interpretation, this study demonstrates that Ramakrishna's idea of "As many faiths, so many paths" goes beyond mere tolerance and establishes a foundation for active acceptance and mutual respect among different religious traditions. By emphasizing the underlying unity within religious diversity, his thought contributes significantly to contemporary discussions on religious pluralism, global ethics, and interfaith dialogue.

Thus, in an increasingly interconnected yet ideologically divided world, Ramakrishna's perspective provides a meaningful spiritual and philosophical basis for peaceful coexistence, tolerance, and mutual respect.

Keywords: Ramakrishna Paramahamsa, Religious Pluralism, Universality, Global Ethics, Interfaith Dialogue

ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় সাধক শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসের (১৮৩৬–১৮৮৬) বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণের যুগে এক গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে আবির্ভূত হন। বাংলার নবজাগরণের সময় সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নতুন চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হতে শুরু করে। এই সময়ে একদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব এবং অন্যদিকে ভারতীয় ঐতিহ্যের পুনর্মূল্যায়নের প্রয়াস সমাজে গভীর আলোচনার জন্ম দেয়। এই পরিবর্তনশীল ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে শ্রী রামকৃষ্ণের জীবন, সাধনা ও ধর্মদর্শন আধ্যাত্মিকতার এক স্বতন্ত্র ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করে।

প্রথাগত ধর্মতাত্ত্বিকদের মতো তিনি কেবল শাস্ত্রনির্ভর তত্ত্ব বা দার্শনিক বিতর্কের মাধ্যমে ধর্মের ব্যাখ্যা দেননি; বরং তাঁর ধর্মদর্শনের মূল ভিত্তি ছিল প্রত্যক্ষ আধ্যাত্মিক উপলব্ধি। গভীর সাধনা, ভক্তি ও ধ্যানের মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন ধর্মীয় পথ অনুসরণ করে পরম সত্য উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন। শক্তসাধনা, অদ্বৈত বেদান্ত, ইসলাম এবং খ্রিস্টধর্মসহ বিভিন্ন আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মধ্য দিয়ে তিনি উপলব্ধি করেন যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় পথের লক্ষ্য এক এবং সেই লক্ষ্য হলো একই পরম সত্য বা ঈশ্বরের উপলব্ধি। তাঁর বিখ্যাত উক্তি যত মত তত পথ এই অভিজ্ঞতালব্ধ উপলব্ধিরই সারসংক্ষেপ।

এই নীতির মাধ্যমে শ্রী রামকৃষ্ণ বোঝাতে চেয়েছিলেন যে বিভিন্ন ধর্মের মতবাদ, আচার-পদ্ধতি এবং সাংস্কৃতিক প্রকাশ ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু তাদের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও আধ্যাত্মিক সত্য একই। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মীয় বৈচিত্র্যের মধ্যকার মৌলিক ঐক্যকে গুরুত্ব দেয় এবং ধর্মীয় সংকীর্ণতা, অসহিষ্ণুতা ও একচেটিয়া মনোভাবের বিরুদ্ধে এক গভীর মানবিক ও আধ্যাত্মিক বার্তা প্রদান করে।

বর্তমান বিশ্বে ধর্মীয় মেরুকরণ, সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব এবং পরিচয়ভিত্তিক সংঘাত ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে শ্রী রামকৃষ্ণের ধর্মদর্শন কেবল ঐতিহাসিক বা আধ্যাত্মিক গুরুত্বের বিষয় নয়; বরং এটি সমকালীন সমাজে আন্তঃধর্মীয় বোঝাপড়া, সহনশীলতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তাই তাঁর যত মত তত পথ ধারণা আজও ধর্মীয় বহুত্ববাদ, বৈশ্বিক নৈতিকতা এবং আন্তঃধর্মীয় সংলাপের আলোচনায় বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

তাত্ত্বিক কাঠামো: অভিজ্ঞতাভিত্তিক বহুত্ববাদ:

শ্রী রামকৃষ্ণের ধর্মদর্শন এমন এক দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রতিষ্ঠিত, যাকে আধুনিক গবেষকরা অভিজ্ঞতাভিত্তিক বহুত্ববাদ (Experiential Pluralism) বলে অভিহিত করেছেন। এই ধারণার মূল বক্তব্য হলো— ধর্মীয় সত্যকে কেবল তাত্ত্বিক আলোচনা, দার্শনিক বিতর্ক বা শাস্ত্রনির্ভর ব্যাখ্যার মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়; বরং তা প্রত্যক্ষ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়। অর্থাৎ ধর্মের প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য বোঝার জন্য ব্যক্তিগত সাধনা, অভিজ্ঞতা এবং আত্মিক উপলব্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রী রামকৃষ্ণ তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্য দিয়ে এই অভিজ্ঞতাভিত্তিক উপলব্ধির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তিনি বিভিন্ন ধর্মীয় সাধনা অনুশীলন করে উপলব্ধি করেছিলেন যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় পথ শেষ পর্যন্ত একই পরম সত্য বা ঈশ্বরের দিকে পরিচালিত হয়। শক্তসাধনা, বৈষ্ণব ভক্তি, অদ্বৈত বেদান্ত, ইসলাম এবং খ্রিস্টধর্মের সাধনা অনুসরণ করে তিনি এই অভিজ্ঞতায় উপনীত হন যে ধর্মীয় পথ ভিন্ন হলেও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির চূড়ান্ত লক্ষ্য এক ও অভিন্ন।

তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনা ও উপলব্ধির বহু বিবরণ পাওয়া যায় রামকৃষ্ণ কথামৃত, যেখানে তাঁর উপদেশ, আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা এবং ধর্ম সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি সংরক্ষিত হয়েছে। এই গ্রন্থে তাঁর কথোপকথন, উপমা ও শিক্ষার মাধ্যমে তাঁর ধর্মদর্শনের মূল ভাবনা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

এই ধারণাকে ব্যাখ্যা করতে শ্রী রামকৃষ্ণ একটি সুপরিচিত উপমা ব্যবহার করেছিলেন— জলের উপমা। তিনি বলেছিলেন, একই পদার্থকে কোথাও জল, কোথাও পানি এবং কোথাও অ্যাকুয়া বলা হয়; কিন্তু নাম ভিন্ন হলেও পদার্থ একই থাকে। ঠিক তেমনি বিভিন্ন ধর্ম ঈশ্বর বা পরম সত্যকে ভিন্ন নামে অভিহিত করলেও তাদের মৌলিক সত্য এক ও অভিন্ন।

এই উপমার মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে ধর্মীয় বৈচিত্র্য প্রকৃতপক্ষে সত্যের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত প্রকাশ মাত্র। ফলে ধর্মীয় পার্থক্যকে বিরোধ বা সংঘাতের কারণ হিসেবে দেখার পরিবর্তে তা

মানবজাতির আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানের বহুমাত্রিক প্রকাশ হিসেবে বোঝা উচিত। এই দৃষ্টিভঙ্গিই শ্রী রামকৃষ্ণের অভিজ্ঞতাভিত্তিক বহুত্ববাদের মূল ভিত্তি এবং সমকালীন আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক কাঠামো হিসেবে বিবেচিত হয়।

বৈচিত্র্যের স্বীকৃতি:

শ্রী রামকৃষ্ণের ধর্মদর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো ধর্মীয় বৈচিত্র্যের স্বীকৃতি। তিনি কোনো একক সর্বজনীন ধর্ম প্রতিষ্ঠার কথা বলেননি, যা সমস্ত ধর্মীয় পার্থক্যকে বিলুপ্ত করে একটি অভিন্ন কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসবে। বরং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন— তিনি মনে করতেন যে মানবসমাজের আধ্যাত্মিক অনুসন্ধান স্বাভাবিকভাবেই বহুমাত্রিক এবং সেই বহুমাত্রিকতার মধ্যেই ধর্মীয় সত্যের বিভিন্ন প্রকাশ বিদ্যমান। তাই তিনি প্রত্যেক ধর্মীয় পথকে পরম সত্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার একটি বৈধ ও কার্যকর উপায় হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

শ্রী রামকৃষ্ণ এই মতবাদ কেবল তাত্ত্বিকভাবে উপস্থাপন করেননি; বরং তিনি নিজের আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্য দিয়েই এর সত্যতা উপলব্ধি করেছিলেন। শক্তসাধনা, বৈষ্ণব ভক্তি এবং অদ্বৈত বেদান্তের সাধনার পাশাপাশি তিনি ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের আধ্যাত্মিক অনুশীলনও গ্রহণ করেছিলেন। এই বিভিন্ন সাধনা-পদ্ধতির মাধ্যমে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে বিভিন্ন ধর্মীয় পথ ভিন্ন আচার, রীতি ও দর্শনের মাধ্যমে পরিচালিত হলেও তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য একই—ঈশ্বর বা পরম সত্যের উপলব্ধি।

এই অভিজ্ঞতা থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে ধর্মীয় বৈচিত্র্য কোনো বিভাজনের কারণ নয়; বরং তা মানবজাতির আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানের স্বাভাবিক ও সমৃদ্ধ প্রকাশ। তাঁর এই উপলব্ধি ধর্মীয় একচেটিয়াবাদ বা কোনো একটি ধর্মের একচ্ছত্র শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। একই সঙ্গে এটি ধর্মীয় বহুত্ববাদের একটি শক্তিশালী দার্শনিক ভিত্তি প্রদান করে, যেখানে বিভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্য পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বী নয়; বরং ভিন্ন ভিন্ন পথের মাধ্যমে একই আধ্যাত্মিক সত্যের দিকে অগ্রসর হয়।

এই দৃষ্টিভঙ্গি সমকালীন বিশ্বে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ বর্তমান যুগে বহুধর্মীয় ও বহুসাংস্কৃতিক সমাজে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, বোঝাপড়া এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য ধর্মীয় বৈচিত্র্যের এই ইতিবাচক স্বীকৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রী রামকৃষ্ণের এই ভাবনা ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ এবং মানবিক ঐক্যের ধারণাকে আরও সুদৃঢ় করতে সহায়তা করে।

সহনশীলতা থেকে গ্রহণযোগ্যতার দিকে

সাধারণভাবে সহনশীলতা (tolerance) বলতে বোঝায় অন্যের বিশ্বাস, মতামত বা ধর্মীয় চর্চাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেনে নেওয়া বা সহ্য করা। অর্থাৎ এখানে এক ধরনের দূরত্ব বজায় থাকে—ব্যক্তি নিজের বিশ্বাসকে শ্রেষ্ঠ মনে করলেও অন্যের বিশ্বাসকে সংঘাত এড়ানোর জন্য সহ্য করে। কিন্তু শ্রী রামকৃষ্ণের দৃষ্টিভঙ্গি এই ধারণার তুলনায় অনেক বেশি গভীর ও ইতিবাচক। তিনি কেবল সহনশীলতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেননি; বরং বিভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্যের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক সত্যকে স্বীকার করে পারস্পরিক গ্রহণযোগ্যতা (acceptance) ও সম্মানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

শ্রী রামকৃষ্ণের মতে, প্রতিটি ধর্মীয় ঐতিহ্যের মধ্যেই ঈশ্বরের উপস্থিতি এবং সত্যের প্রকাশ বিদ্যমান। তাই কোনো একটি ধর্মকে একমাত্র সত্য বলে ঘোষণা করার পরিবর্তে তিনি বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে নিহিত অভিন্ন আধ্যাত্মিক লক্ষ্যকে উপলব্ধি করার উপর জোর দেন। তাঁর এই উপলব্ধি ছিল কেবল তাত্ত্বিক নয়; বরং তাঁর

ব্যক্তিগত সাধনা ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ফল। তিনি বিভিন্ন ধর্মীয় সাধনা-পদ্ধতি অনুসরণ করে উপলব্ধি করেছিলেন যে নানা পথ অনুসরণ করলেও মানুষের চূড়ান্ত গন্তব্য একই—পরম সত্য বা ঈশ্বরের উপলব্ধি। এই দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে শ্রী রামকৃষ্ণ ধর্মীয় সম্পর্কের একটি নতুন ধারণা উপস্থাপন করেন, যেখানে সহনশীলতা থেকে এগিয়ে এসে পারস্পরিক গ্রহণযোগ্যতা, শ্রদ্ধা এবং সংলাপের ভিত্তিতে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি আন্তঃধর্মীয় বোঝাপড়াকে গভীরতর করে এবং সমাজে সহাবস্থান ও সম্প্রীতির পরিবেশ সৃষ্টি করতে সহায়তা করে।

সমকালীন বিশ্বে যখন ধর্মীয় পরিচয় প্রায়ই রাজনৈতিক ও সামাজিক সংঘাতের উৎস হয়ে ওঠে, তখন শ্রী রামকৃষ্ণের এই অভিজ্ঞতাভিত্তিক বহুত্ববাদ ধর্মীয় সহাবস্থান ও বৈশ্বিক নৈতিকতার আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। তাঁর দর্শন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে ধর্মীয় বৈচিত্র্য কোনো বিভেদের কারণ নয়; বরং তা মানবজাতির আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানের বহুমাত্রিক ও সমৃদ্ধ প্রকাশ। এই উপলব্ধি মানবসমাজে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহযোগিতা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে সহায়ক হতে পারে।

সমকালীন বৈশ্বিক প্রাসঙ্গিকতা:

২১শ শতাব্দীতে বিশ্বরাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির কাঠামো ক্রমশ জটিল ও বহুমাত্রিক হয়ে উঠেছে। বিশ্বায়নের ফলে বিভিন্ন ধর্ম, সংস্কৃতি ও জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগ যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি অনেক ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব, পরিচয়ভিত্তিক রাজনীতি এবং ধর্মীয় উগ্রবাদের প্রবণতাও স্পষ্টভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য থেকে দক্ষিণ এশিয়া, এমনকি পাশ্চাত্য সমাজেও ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয়কে কেন্দ্র করে সংঘাত ও বিভাজনের নানা উদাহরণ দেখা যায়। এর ফলে বিশ্বসমাজে সহিষ্ণুতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রশ্নটি আজ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

এই প্রেক্ষাপটে শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসের ধর্মদর্শন সমকালীন বিশ্বে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। তাঁর দর্শনের কেন্দ্রীয় ধারণা ছিল ধর্মীয় বহুত্ববাদ এবং আধ্যাত্মিক সার্বজনীনতা। তিনি বিশ্বাস করতেন যে সত্যের অনুসন্ধানে বিভিন্ন ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন পথ অনুসরণ করলেও তাদের অন্তর্নিহিত লক্ষ্য একই— পরম সত্য বা ঈশ্বরের উপলব্ধি। তাঁর সুপরিচিত উক্তি যত মত তত পথ এই বহুত্ববাদী ধর্মদৃষ্টিভঙ্গিরই সারসংক্ষেপ। এই নীতির মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছিলেন যে ধর্মীয় বৈচিত্র্য কোনো সংঘাতের কারণ নয়; বরং তা মানবসমাজের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির একটি স্বাভাবিক দিক।

শ্রী রামকৃষ্ণের ধর্মদর্শনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো তাঁর প্রত্যক্ষ সাধনার অভিজ্ঞতা। তিনি কেবল তাত্ত্বিকভাবে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার কথা বলেননি; বরং নিজে হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন সাধনা-পদ্ধতির পাশাপাশি ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্মের আধ্যাত্মিক অনুশীলনও অনুসরণ করেছিলেন এবং এই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে সকল ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্য এক ও অভিন্ন। এই দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মীয় সংলাপ ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করে।

সমকালীন বিশ্বে যেখানে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও পরিচয়ভিত্তিক সংঘাত ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেখানে শ্রী রামকৃষ্ণের এই সার্বজনীন ধর্মদর্শন আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তাঁর শিক্ষা মানবসমাজকে মনে করিয়ে দেয় যে ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য মানুষের নৈতিক উন্নতি, প্রেম, সহমর্মিতা এবং মানবসেবার চর্চা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর দর্শন কেবল আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশেও গভীর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম।

সমকালীন বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসের বহুত্ববাদী ধর্মদর্শন ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের এক গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক ভিত্তি প্রদান করে। বর্তমান বিশ্বে যখন বিভাজন ও সংঘাতের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন তাঁর এই মানবতাবাদী ও সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বসমাজে ঐক্য, সহমর্মিতা এবং শান্তির আদর্শ প্রতিষ্ঠায় বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

১. সংঘাত নিরসন:

বর্তমান বিশ্বে বহু সংঘাতের পেছনে ধর্মীয় একচ্ছত্র আধিপত্য— অর্থাৎ শুধুমাত্র আমার ধর্মই সত্য এই ধরনের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি—একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে কাজ করে। এই মনোভাব প্রায়ই অন্য ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি অসহিষ্ণুতা সৃষ্টি করে এবং সমাজে বিভাজন ও সংঘাতকে উসকে দেয়। ফলে বহুধর্মীয় ও বহুসাংস্কৃতিক সমাজে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহাবস্থান এবং সংলাপের পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এই প্রেক্ষাপটে শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁর জীবন ও সাধনার মাধ্যমে ধর্মীয় একাধিপত্যের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং ধর্মীয় বহুত্ববাদের একটি উদার দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেন। তিনি কেবল তাত্ত্বিকভাবে এই মত প্রকাশ করেননি; বরং নিজের আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ধর্মীয় পথের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। শক্তসাধনা, বৈষ্ণব ভক্তি এবং অদ্বৈত বেদান্তের সাধনার পাশাপাশি তিনি ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের আধ্যাত্মিক অনুশীলনও অনুসরণ করেন। এই বিভিন্ন সাধনার মাধ্যমে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে ভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্য ভিন্ন আচার-অনুশীলন ও দর্শন অনুসরণ করলেও তাদের অন্তর্নিহিত লক্ষ্য একই— ঈশ্বর বা পরম সত্যের উপলব্ধি।

এই অভিজ্ঞতালব্ধ উপলব্ধির ভিত্তিতেই তিনি ধর্মীয় বহুত্ববাদ এবং পারস্পরিক সহিষ্ণুতার এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা প্রদান করেন। তাঁর বিখ্যাত নীতি যত মত তত পথ ধর্মীয় বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের ধারণাকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে এবং মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতার বোধ জাগ্রত করতে সহায়তা করে।

সমকালীন বিশ্বে যখন ধর্মীয় উগ্রবাদ, অসহিষ্ণুতা এবং পরিচয়ভিত্তিক সংঘাত ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন শ্রী রামকৃষ্ণের এই অভিজ্ঞতানির্ভর ধর্মদর্শন একটি গুরুত্বপূর্ণ মানবিক ও দার্শনিক বার্তা প্রদান করে। তাঁর শিক্ষা মনে করিয়ে দেয় যে ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিভাজন সৃষ্টি করা নয়; বরং মানুষের মধ্যে প্রেম, সহমর্মিতা ও ঐক্যের বোধ গড়ে তোলা। ফলে তাঁর ভাবধারা আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, সামাজিক সম্প্রীতি এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সমকালীন বিশ্বে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলে বিবেচিত হতে পারে।

২. বৈশ্বিক নৈতিকতা ও মানবাধিকার:

শ্রী রামকৃষ্ণের ধর্মদর্শনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো মানুষের প্রতি গভীর সহমর্মিতা এবং সেবার আদর্শ। তাঁর আধ্যাত্মিক ভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল মানবপ্রেম ও মানবসেবার ধারণা। তাঁর বিখ্যাত বাণী শিব জ্ঞানে জীব সেবা মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতিকে স্বীকার করার এক গভীর দার্শনিক শিক্ষা প্রদান করে। এই ধারণা অনুসারে প্রতিটি মানুষই ঈশ্বরের এক প্রকাশ; তাই মানুষের প্রতি সহমর্মিতা, করুণা ও সেবা প্রদর্শন করা আসলে ঈশ্বরেরই সেবা করার সমতুল্য।

এই দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মকে কেবল আচার-অনুষ্ঠান বা ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে না; বরং মানবকল্যাণ ও সামাজিক দায়িত্ববোধের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত করে। এর ফলে ধর্মীয় চেতনা মানুষের দৈনন্দিন জীবন, সমাজসেবা এবং নৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়। এই আদর্শ মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহমর্মিতা এবং সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

আধুনিক বিশ্বে মানবতাবাদ, মানবাধিকার এবং সামাজিক ন্যায়বোধের যে ধারণাগুলি ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, শ্রী রামকৃষ্ণের এই মানবকেন্দ্রিক ধর্মদর্শন তার সঙ্গে গভীরভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মানুষের মর্যাদা, সমতা এবং কল্যাণের প্রতি যে গুরুত্ব আধুনিক মানবিক দর্শনে দেওয়া হয়, তাঁর "শিব জ্ঞানে জীব সেবা" নীতিও সেই একই মূল্যবোধকে আধ্যাত্মিক ভিত্তি প্রদান করে।

পরবর্তীকালে তাঁর প্রধান শিষ্য স্বামী বীবেকানন্দ এই আদর্শকে আরও বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা ও প্রচার করেন। তিনি মানবসেবা ও সমাজকল্যাণকে আধ্যাত্মিক সাধনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই ভাবনাকে আন্তর্জাতিক পরিসরে তুলে ধরেন। তাঁর উদ্যোগেই রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল আধ্যাত্মিক সাধনার পাশাপাশি শিক্ষা, চিকিৎসা ও সামাজিক সেবামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে মানবকল্যাণ সাধন করা।

এইভাবে শ্রী রামকৃষ্ণের মানবপ্রেম ও সেবামূলক আদর্শ ধর্মকে এক নতুন সামাজিক ও মানবিক মাত্রা প্রদান করে। সমকালীন বিশ্বে যেখানে দারিদ্র্য, বৈষম্য ও মানবিক সংকট এখনও বিদ্যমান, সেখানে তাঁর এই শিক্ষা মানুষের মধ্যে সহমর্মিতা, দায়িত্ববোধ এবং মানবকল্যাণের প্রতি সক্রিয় অংশগ্রহণের অনুপ্রেরণা জাগাতে সক্ষম।

৩. মানসিক সাম্য ও অন্তর্দৈহিক শান্তি:

আধুনিক ভোগবাদী ও প্রতিযোগিতামূলক সমাজে মানুষের জীবনে মানসিক চাপ, উদ্বেগ এবং আত্মিক শূন্যতার অনুভূতি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রযুক্তিগত উন্নতি ও ভৌত সাফল্যের আকাঙ্ক্ষা মানুষের জীবনকে গতিশীল করলেও অনেক ক্ষেত্রে তা অন্তর্দৈহিক শান্তি ও মানসিক স্থিতির ঘাটতি সৃষ্টি করছে। এই পরিস্থিতিতে শ্রী রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক শিক্ষা মানুষের আত্মিক বিকাশ এবং অন্তরের প্রশান্তি লাভের একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ নির্দেশ করে।

শ্রী রামকৃষ্ণ মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনে অনুরাগ (Anuraga) বা পরম সত্যের প্রতি গভীর আকাঙ্ক্ষা এবং ঈশ্বরভক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁর মতে, সত্যের প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ, নিষ্ঠা এবং ভক্তিমূলক সাধনা মানুষের মনকে ধীরে ধীরে পরিশুদ্ধ করে। এর মাধ্যমে ব্যক্তি অহংকার, লোভ, দ্বন্দ্ব এবং সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হয় এবং তার মধ্যে শান্তি, সহমর্মিতা ও নৈতিকতার বিকাশ ঘটে। এই আধ্যাত্মিক অনুশীলন কেবল ব্যক্তিগত মুক্তি বা ঈশ্বরলাভের পথই নয়; বরং তা মানুষের চরিত্রগঠন ও মানসিক পরিশীলনের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এছাড়াও তাঁর শিক্ষা মানবসমাজকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিভেদ সৃষ্টি করা নয়, বরং মানুষের মধ্যে ভালোবাসা, সহমর্মিতা এবং ঐক্যের বোধ জাগ্রত করা। ধর্ম যদি মানুষের মধ্যে বৈরিতা ও সংঘাতের পরিবর্তে সহমর্মিতা, শ্রদ্ধা ও সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করে, তবে তা সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হতে পারে।

অতএব সমকালীন বিশ্বে যখন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিভাজন অনেক সময় সামাজিক অস্থিরতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তখন শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসের ধর্মদর্শন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ এবং বৈশ্বিক মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করে। তাঁর আধ্যাত্মিক ও মানবতাবাদী ভাবধারা আজও বিশ্বমানবতার সামনে সহিষ্ণুতা, সম্প্রীতি এবং অন্তর্দৈহিক শান্তির এক অর্থবহ পথ উন্মোচন করে।

সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ: আত্মার বিজ্ঞান:

শ্রী রামকৃষ্ণ ধর্মদর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো তাঁর আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানের পদ্ধতি, যা অনেক গবেষকের মতে এক ধরনের আত্মার বিজ্ঞান (Science of Spirit) হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তিনি ধর্মীয় সত্যকে কেবল বিশ্বাস বা তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং তা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের মাধ্যমে যাচাই করার চেষ্টা করেছিলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর চিন্তাকে একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক ও অনুসন্ধানমূলক চরিত্র প্রদান করে।

শ্রী রামকৃষ্ণ বিভিন্ন ধর্মীয় পথকে এক ধরনের আধ্যাত্মিক অনুমান (spiritual hypothesis) হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই অনুমানকে সত্য বলে প্রমাণ করার জন্য তিনি কঠোর সাধনা (সাধনা বা Sadhana) অনুশীলন করেন। শক্তসাধনা, বৈষ্ণব ভক্তি, অদ্বৈত বেদান্ত, ইসলাম এবং খ্রিস্টধর্ম— এই বিভিন্ন আধ্যাত্মিক পথ অনুসরণ করে তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেন যে বিভিন্ন ধর্মীয় সাধনার লক্ষ্য ও চূড়ান্ত উপলব্ধি মূলত একই। তাঁর এই সাধনা ও উপলব্ধির বিবরণ বিস্তারিতভাবে পাওয়া যায় শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত, যেখানে তাঁর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা, উপমা এবং ধর্মসম্পর্কিত বক্তব্য লিপিবদ্ধ রয়েছে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানকে এক ধরনের অভিজ্ঞতামূলক পরীক্ষণ হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়। তিনি কেবল তত্ত্বের উপর নির্ভর করেননি; বরং প্রত্যেক ধর্মীয় পথকে নিজে অনুশীলন করে তার ফলাফল উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর উপসংহার ছিল যে বিভিন্ন ধর্মীয় পথ অনুসরণ করেও মানুষ একই ঈশ্বরচেতনায় (God-consciousness) পৌঁছাতে পারে। এই উপলব্ধি ধর্মীয় একচেটিয়াবাদ বা সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী যুক্তি প্রদান করে।

এছাড়া তাঁর এই পদ্ধতি আধুনিক যুক্তিবাদী মননের কাছেও আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। আধুনিক যুগে মানুষ কেবল ধর্মীয় মতবাদ বা প্রথার উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করতে চায় না; বরং তারা যুক্তি, অভিজ্ঞতা এবং প্রমাণের উপর গুরুত্ব দেয়। শ্রী রামকৃষ্ণের ধর্মদর্শন এই প্রয়োজনের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধন তৈরি করে, কারণ তিনি দেখিয়েছিলেন যে আধ্যাত্মিক সত্যকে কেবল বিশ্বাসের মাধ্যমে নয়, বরং ব্যক্তিগত সাধনা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উপলব্ধি করা সম্ভব।

পরবর্তীকালে তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ এই ধারণাকে আরও বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং ধর্মকে আত্মার বিজ্ঞান হিসেবে উপস্থাপন করেন। তাঁর মতে, যেমন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান পরীক্ষণ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সত্যকে যাচাই করে, তেমনি আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমেও ঈশ্বর বা পরম সত্যের উপলব্ধি সম্ভব। এই দৃষ্টিভঙ্গি ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি না করে বরং তাদের মধ্যে একটি সমন্বিত সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা করে।

এইভাবে শ্রী রামকৃষ্ণের ধর্মদর্শন কেবল একটি আধ্যাত্মিক মতবাদ নয়; বরং এটি এমন একটি অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতি যা মানুষের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেয় এবং ধর্মীয় সত্যকে উপলব্ধি করার জন্য ব্যক্তিগত সাধনা ও আত্মিক অনুসন্ধানের উপর জোর দেয়। ফলে তাঁর এই চিন্তাধারা আধুনিক বিশ্বে ধর্ম, যুক্তি এবং আধ্যাত্মিকতার মধ্যে একটি সৃজনশীল সংলাপের পথ উন্মুক্ত করে।

উপসংহার:

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায় যে শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসের ধর্মদর্শনের কেন্দ্রীয় নীতি যত মত তত পথ কেবল একটি আধ্যাত্মিক উক্তি নয়; বরং এটি ধর্মীয় বহুত্ববাদ, মানবিক সহাবস্থান এবং সার্বজনীন সত্যের ধারণাকে সুসংহতভাবে ব্যাখ্যা করা এক গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক সাধনা

ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দেখিয়েছিলেন যে বিভিন্ন ধর্মীয় পরম্পরা, আচার ও মতবাদে বাহ্যিক পার্থক্য থাকলেও তাদের অন্তর্নিহিত লক্ষ্য এক এবং সেই লক্ষ্য হলো একই পরম সত্য বা ঈশ্বরচেতনার উপলব্ধি। এই উপলব্ধির মধ্য দিয়ে তিনি ধর্মীয় সংকীর্ণতা, একচেটিয়াবাদ এবং অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে এক গভীর মানবিক ও আধ্যাত্মিক প্রতিস্বর উত্থাপন করেন।

সমকালীন বিশ্বে ধর্মীয় পরিচয় ও মতাদর্শগত বিভাজন অনেক সময় সামাজিক অস্থিরতা ও সংঘাতের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রেক্ষাপটে শ্রী রামকৃষ্ণের বহুত্ববাদী ধর্মদর্শন বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। তাঁর শিক্ষা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিভেদ সৃষ্টি করা নয়; বরং মানুষের মধ্যে ভালোবাসা, সহমর্মিতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলা। যত মত তত পথ নীতি ধর্মীয় বৈচিত্র্যকে অস্বীকার না করে বরং তাকে স্বীকৃতি দিয়ে বিভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্যের মধ্যে সংলাপ, সহনশীলতা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের একটি দৃঢ় ভিত্তি নির্মাণ করে।

এছাড়াও শ্রী রামকৃষ্ণের ধর্মদর্শন আধুনিক যুগে বৈশ্বিক নৈতিকতা (global ethics), মানবাধিকারচেতনা এবং আন্তঃধর্মীয় সংলাপের আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক ভিত্তি প্রদান করে। তাঁর শিক্ষায় প্রতিফলিত মানবিকতা ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থা গঠনের পথ নির্দেশ করে, যেখানে ভিন্নতা সত্ত্বেও ঐক্যের চেতনা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটি সামগ্রিক মানবিক মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করে।

পরিশেষে বলা যায় শ্রী রামকৃষ্ণের বহুত্ববাদী ধর্মদর্শন কেবল ঊনবিংশ শতাব্দীর আধ্যাত্মিক চিন্তার একটি ঐতিহাসিক নিদর্শন নয়; বরং এটি সমকালীন বৈশ্বিক সমাজে শান্তি, সম্প্রীতি এবং মানবিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক দিকনির্দেশনা। তাঁর "যত মত তত পথ" নীতি আজও বিশ্বমানবতার জন্য এক আলোকবর্তিকার মতো কাজ করে, যা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে সত্যের পথে বৈচিত্র্য থাকতে পারে, কিন্তু সেই বৈচিত্র্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে এক গভীর ও সার্বজনীন ঐক্য।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ। (২০০৯)। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (৫ খণ্ড)। কলকাতা: কথামৃত ভবন।
২. স্বামী সারদানন্দ। (২০০৮)। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ (অখণ্ড সংস্করণ)। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়।
৩. বিবেকানন্দ, স্বা. (১৯৬৩). স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (১-১০ খণ্ড). উদ্বোধন কার্যালয়।
৪. দে, বিশ্বনাথ (সম্পাদিত)। (১৩৭০)। শ্রীরামকৃষ্ণ-স্মৃতি। কলকাতা: সাহিত্যম্।
৫. সেন, অ. কু. (২০১৭). শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি. উদ্বোধন কার্যালয়।
৬. রামকৃষ্ণ মিশন ব্রহ্মানন্দ কলেজ অব এডুকেশন, রহড়া। (২০২২)। কল্যাণ (বিশেষ সংখ্যা ৫৮)। রহড়া: রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম।
৭. ভূতেশানন্দ, স্বামী। (২০০৩)। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রসঙ্গ (প্রথম ভাগ)। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়।
৮. Amiya P. Sen। (2001)। Three Essays on Sri Ramakrishna and His Times। New Delhi: Oxford University Press।
৯. Sil, N. P. (1993). Vivekananda's Ramakrishna: An untold story of mythmaking and propaganda. Numen, 40(1), 38–62. https://www.jstor.org/stable/3270397
১০. Sumit Sarkar. (1990–1991). Ramakrishna and the Calcutta of his times. India International Centre Quarterly, 17(3/4), 99–121. https://www.jstor.org/stable/23002455

১১. Leo Schneiderman. (1969). Ramakrishna: Personality and social factors in the growth of a religious movement. Journal for the Scientific Study of Religion, 8(1), 60–71. https://doi.org/10.2307/1385254

১২. ঘোষ, অশোক কুমার। (১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩)। ঠাকুর রামকৃষ্ণ। BanglaLive.

১৩. https://banglalive.com/thakur-ramkrishna/

১৪. Vireshananda, S. (2023, January 1). Ramakrishna Mission in the 21st century. Advaita Ashrama. https://advaitaashrama.org/ramakrishna-mission-in-the-21st-century/

১৫. Drishtibhongi. (n.d.). Relevance of Shri Ramakrishna Paramahansa in today's world. https://drishtibhongi.in/relevance-of-shri-ramakrishna-paramahansa-in-todays-world/

১৬. রক্ষিত, সৌমেন। (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০)। সর্বধর্ম সমন্বয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ। Anandabazar Patrika।

১৭. https://www.anandabazar.com/editorial/ramakrishna-made-a-synthesis-of-all-religion-1.1113958

১৮. Das, D. (2025). Ramakrishna's teachings on the nature of reality. The Academic, 3(2), 1038. https://theacademic.in/wp-content/uploads/2025/03/97.pdf

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1963-1969
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.421

পরিবেশ নীতিবিদ্যা ও গভীর বাস্তুবাদ: প্রকৃতির অন্তর্নিহিত মূল্যের এক দার্শনিক পর্যালোচনা

রীনা পাল, *স্বাধীন গবেষক, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 25.03.2026; Accepted: 30.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Environmental Ethics has emerged as an important philosophical branch, which extends human moral responsibility not only to the human-centered sphere but also to the entire world. Deep Ecology, pioneered by Arne Naess, places particular importance on the concept of the intrinsic value of nature. Deep ecology holds that nature is valuable not only for its usefulness to humans, but also for its own existence. This view challenges the conventional anthropocentric view and emphasizes the biocentric and ecocentric perspectives. This paper will analyze the core tenets of deep ecology in the light of environmental ethics and explore its philosophical basis for establishing the intrinsic value of nature. Deep ecology opposes anthropocentrism and argues for biocentrism and ecocentrism. It calls for humans to unite with nature through the concepts of biospherical egalitarianism and self-realization. According to this view, moral responsibility towards nature is not only to protect human interests, but also to respect the existence and development of all living things. This paper will analyze the basic theories of deep ecology in the light of environmental ethics and review its philosophical foundations and relevance in establishing the intrinsic value of nature.

Keywords: Environment, Deep Ecology, Anthropocentrism, Intrinsic Value, Non-human Beings, Self-realization

পরিবেশ নীতিশাস্ত্রের আলোচনায় কেবল মানুষ বা প্রাণবান সত্তাই নয়, জড়-জগত, প্রজাতি ও বাস্তুব্যবস্থারও নৈতিক মূল্য স্বীকার করা হয়। যেখানে মানুষ, প্রাণী, উদ্ভিদ ইত্যাদির পারস্পরিক সম্পর্ক এবং পরিবেশের জৈব ও অজৈব উপাদানসমূহের মধ্যে সেই সুনিয়ন্ত্রিত মিথস্ক্রিয়ার সম্পর্ক আছে, তাকেই বাস্তুবিজ্ঞান বলে। এই বাস্তু বিজ্ঞানের সাথে সঙ্গতি রেখে পরিবেশ চিন্তার জগতে যেসব সমগ্রতাবাদী নীতিতত্ত্ব বা পরিবেশ দর্শনের উদ্ভব হয়েছে, তাকেই বাস্তুকেন্দ্রিকতাবাদ বলে। এই বাস্তুতন্ত্রে, প্রত্যেক সত্ত্বাই এক মিথোজীবিতার সম্পর্কে একে অন্যের ওপর নির্ভর করে বেঁচে আছে। এই পারস্পরিক ভারসাম্যের ওপরেই এই পরিবেশের সুস্থিতি নির্ভর করে। আমরা যদি শুধুমাত্র কোনো একটি প্রাণীর দুঃখ-যন্ত্রণা নিয়ে ভাবতে থাকি, তাহলে এই প্রকৃতির সংরক্ষণ সাধন সম্ভব হবে না। অল্‌ডো লিওপোল্ডের মতে, নীতিতত্ত্বের সম্প্রসারণ আসলে বাস্তুতাত্ত্বিক বিবর্তনের একটি ধারা। বাস্তুর দিক থেকে নীতিশাস্ত্র হল অস্তিত্বের সংগ্রামে স্বাধীন আচরণের

ওপর এক বিশেষ ধরনের নিয়ন্ত্রণ। আমরা যাকে নীতিশাস্ত্র বলি, তার উৎস পরস্পর নির্ভর ব্যক্তিসমূহ বা গোষ্ঠীগুলির পরস্পরের সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে আসে। বাস্তবাদীরা একেই মিথোজীবিতা বলেন।

পরিবেশ নীতিবিদ্যা হল দর্শনের এমন একটি শাখা, যা মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে নৈতিক সম্পর্কের প্রকৃতি ও সীমা নির্ধারণের চেষ্টা করে। এটি মূলত প্রশ্ন তোলে— মানুষের নৈতিক দায়িত্ব কি কেবল মানুষের প্রতিই সীমাবদ্ধ, নাকি তা সমগ্র জীবজগত ও প্রকৃতির প্রতিও প্রসারিত? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই পরিবেশ নীতিবিদ্যার উদ্ভব এবং বিকাশ ঘটে। পরিবেশ নীতিবিদ্যা বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত হয়ে ওঠে, যেমন— মানবকেন্দ্রিকতাবাদ, প্রাণকেন্দ্রিকতাবাদ, এবং বাস্তুকেন্দ্রিকতাবাদ। মানবকেন্দ্রিকতাবাদ মানুষকে নৈতিকতার কেন্দ্রস্থলে রাখে, যেখানে প্রাণকেন্দ্রিকতাবাদ সমস্ত জীবের সমান নৈতিক মর্যাদা স্বীকার করে। অন্যদিকে, বাস্তুকেন্দ্রিকতাবাদ জীব ও অজীব উভয় উপাদানসহ সমগ্র বাস্তুতন্ত্রকে নৈতিক বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত করে। লিওপোল্ডের মতে, নীতিশাস্ত্রের যে বিবর্তন হয়েছে, তাতে ব্যক্তি আসলে পরস্পর নির্ভর অংশ নিয়ে তৈরী একটি সম্প্রদায়ের সদস্য। তার এই ভূমিনীতিতত্ত্বে ভূমির সকল সদস্যকে একই সম্প্রদায়ের সদস্য হিসাবে বিচার করে। এখানে ভূমি বলতে তিনি কেবল পৃথিবী গ্রহের স্থলভাগের উপরিভাগকে বোঝাননি। সমগ্র বিশ্ব, যেমন- মৃত্তিকা, জল, গাছপালা, প্রাণীকুল সকলকেই বুঝিয়েছেন। আমরা এতোদিন গাছপালা, প্রাণীকুলের প্রতি আমাদের কোনো দায়বদ্ধতা দেখাইনি। ভূমিনীতিবিদ্যা অনুসারে, এইসব বিষয়কে কেবলমাত্র প্রয়োজনের সামগ্রী হিসাবে দেখার বিরোধিতা করে এবং এদের অবিরাম অস্তিত্বের অধিকারের কথা বলেন। লিওপোল্ডের মতে, "In short, a land ethic changes the role of Homo sapiens from conqueror of the land-community to plain member and citizen of it. It implies respect for his fellow-members, and also respect for the community as such."[1]

এই নীতিতত্ত্বে মানুষকে প্রাণমন্ডলের সমান মর্যাদাসম্পন্ন সদস্য হিসাবে বিচার করা হয়। বাস্তুতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা অনুসারে, যে ঘটনাগুলিকে মানুষের ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেগুলি হল মানুষের সাথে ভূমির পারস্পরিক মিথোজীবিতার সম্পর্ক। এখানে বলা হয়, যদি ঐ উপত্যকায় গাছপালা, জলবায়ু-আবহাওয়া অন্যরকম হত, তাহলে প্রকৃতি অন্যরকম হতে পারত। লিওপোল্ডের মতেও ভূমির শক্তিশৃঙ্খল, পরম্পরা গতিকে পরিচালিত করে। তাঁর মতে, ভূমি নীতিতত্ত্বকে বুঝতে হলে ভূমিকে বায়োটিক মেকানিজম হিসাবে ভাবতে হবে। ভূমিকে কেবল মৃত্তিকারূপে জড় বস্তু হিসাবে না দেখে, তাকে প্রাণমণ্ডলের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে দেখতে হবে। বাস্তুবিদ্যায়, ভূমির যে চিত্রটি সাধারণভাবে ব্যবহার করা হয় তাহল প্রাণমন্ডলের পিরামিড - এই পিরামিডকেই তিনি ভূমি- প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যা মূলত মানবকেন্দ্রিক, কিন্তু পরিবেশ-নীতিবিদ্যা সেইরকমভাবে মানবকেন্দ্রিক নয়। আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যাকে মানবকেন্দ্রিক বলার কারণ হল- এই নীতিবিদ্যায় কেবল মানুষেরই একমাত্র স্বগতঃ মূল্য আছে। পরিবেশ নীতিবিদ্যা এখানে এই বিচারধারা থেকে আলাদা। মানবহীন প্রকৃতি-পরিবেশেরও স্বগতমূল্য আছে বলে মনে করা হয়। এখানেই আমাদের প্রশ্ন ওঠে যে, প্রাকৃতিক পরিবেশের কতটা অংশকে স্বতঃমূল্যবান বলতে পারবো এবং তা কিসের জন্য? একদল পরিবেশবাদী নীতিদার্শনিক বলেন যে, প্রকৃতিতে স্বগতমূল্য আরোপ করার ক্ষেত্রে একমাত্র মাপকাঠি হল- বোধসম্পন্নতা। বোধসম্পন্নতা, বলতে এখানে সুখ-দুঃখবোধের সক্ষমতাকে বোঝানো হয়েছে। এখানে বলা যায়, মানুষ ছাড়া জীবমন্ডলের একমাত্র পশুরাই হল

[1]Aldo Leopold,A Sand County Almanac And Sketches Here And There (Oxford University Press,1949), Page: 204.

স্বতঃ মূল্যের অধিকারী। আবার, অন্য একদল পরিবেশবাদী বোধসম্পন্নতাকে স্বগতমূল্য আরোপের মাপকাঠি হিসাবে ধরতে স্বীকার করেন না। এদের মতে, বৃদ্ধি, বিস্তার, সম্প্রসারণ এগুলো হল কোনো কিছুর স্বগতমূল্য থাকার প্রমাণ। যা কিছুর বৃদ্ধি হয়, পরিবর্ধিত হয়, সম্প্রসারিত হয়, বিকশিত হয় তাই এরা স্বতঃমূল্যবান বলে মনে করেন। তাই বিশ্বের প্রতিটি প্রজাতির অধিকারভেদ স্বীকার করতে হবে। আমরা যাকে পরিবেশ বিজ্ঞানের ভাষায় বাস্তুতন্ত্র বলি, যেমন- জল, মাটি, বাতাস, গাছপালা, পশুপাখি পরিবেশচক্রকেও নৈতিক অধিকার দিতে হবে। এই বাস্তুতন্ত্রে প্রত্যেক সত্ত্বাই এক মিথোজীবিতার সম্পর্কে একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। মানুষের ক্রিয়াকর্মের জন্যই এই ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। পরিবেশ নীতিবিদ্যার আলোকে গভীর বাস্তবাদ কিভাবে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত মূল্য প্রতিষ্ঠা করে?

গভীর বাস্তবাদ কেবল পরিবেশ রক্ষার জন্য ব্যবহারিক পদক্ষেপের উপর জোর দেয় না, বরং মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের মৌলিক পরিবর্তনের আহ্বান জানায়। সুতরাং, পরিবেশ নীতিবিদ্যার বিকাশ একটি ধারাবাহিক দার্শনিক বিবর্তনের ফল, যা মানুষকেন্দ্রিক চিন্তাধারা থেকে সরে এসে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত মূল্য ও সামগ্রিক বাস্তুতন্ত্রের প্রতি নৈতিক দায়িত্বকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে। গভীর বাস্তবাদ পরিবেশ নীতিবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক ধারা, যা মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ককে একেবারে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করে। এর প্রবর্তক আর্ণে নেস ১৯৭০-এর দশকে এই তত্ত্বটি উপস্থাপন করেন। তিনি অগভীর বাস্তবাদ ও গভীর বাস্তবাদ এর মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরে দেখান যে, অগভীর বাস্তবাদ কেবলমাত্র পরিবেশ সংরক্ষণকে মানুষের স্বার্থে সীমাবদ্ধ রাখে, কিন্তু গভীর বাস্তবাদ প্রকৃতির নিজস্ব মূল্য ও মর্যাদাকে স্বীকৃতি দেয়। গভীর বাস্তবাদ জীববৈচিত্র্যের গুরুত্বের উপর জোর দেয়। বিভিন্ন প্রজাতি, বাস্তুতন্ত্র এবং প্রাকৃতিক উপাদানের বৈচিত্র্য শুধু পরিবেশগত ভারসাম্যের জন্যই নয়, বরং নিজস্ব মূল্য বহন করে। এই বৈচিত্র্য ধ্বংস করা মানে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত মূল্যকে অস্বীকার করা।

নরওয়ের অস্‌লো বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক আর্ণে নেস্ তাঁর প্রবন্ধ 'The shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement'- এর মাধ্যমে বাস্তুতত্ত্বের গবেষনায় পরিবর্তনশীল প্রকৃতির ধারণা সামনে আনেন। এই পরিবর্তনশীল প্রকৃতির ধারণার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সমকালীন পরিবেশ দর্শনে সে তত্ত্বটিকে আমরা জানতে পারি, তাকেই গভীর বাস্তুতত্ত্ব বলে। এই গভীর বাস্তবাদের মূল প্রবক্তা হলেন- আর্ণে নেস্। গভীর বাস্তবাদের মূলত দুটি লক্ষ্য, একটি হল জীবমণ্ডলগত সমতাবাদের ধারণাকে উৎসাহিত করা এবং নীতিভাবনায় মানবকেন্দ্রিকতাবাদকে তৈরী করা। একটি বাস্তুতন্ত্রে পারস্পরিক নির্ভরতার যে ছবি আমরা দেখতে পাই, যে সত্তাকুলের ধারণা পাই, তাকে বিশ্লেষন করলে আমরা বুঝতে পারব, এই জগত মানুষ-প্রাণী-গাছপালা-পাহাড়-পর্বত-নদী ইত্যাদি সব কিছুর ভারসাম্যের ওপর নির্ভর করে। পরিবেশ নীতিবিদ্যার দিক থেকে একটি প্রশ্ন হল- ব্যক্তি-অঙ্গতন্ত্র এবং প্রজাতিতন্ত্রের মত বাস্তুতন্ত্র-এরও নিজস্ব একটি আদর্শমুখী পরিচয় আছে কিনা? নেস্-এর কাছে গভীর বাস্তবাদ শুধুমাত্র একটি নীতিতত্ত্ব নয়, এটি তাঁর কাছে একটি সচেতনমূলক আন্দোলন। এই বাস্তুকেন্দ্রিক সমতাবাদ ও পারস্পরিকতার অধিবিদ্যার উপর গভীর বাস্তবাদ দাড়িয়ে আছে। এই প্রবন্ধে অধ্যাপক নেস্ গভীর বাস্তবাদকে, অগভীর বাস্তবাদ থেকে আলাদা করেন। সমকালীন পরিবেশকে ধ্বংস করা, পরিবেশ দূষন দেশের মানুষজনকে কিভাবে প্রভাবিত করছে এবং তার থেকে মুক্তির উপায় কি?

গভীর বাস্তবাদ বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে মানুষ- এই পরিবেশভাবনাকে বর্জন করে পারস্পরিক সম্বন্ধমূলক সামগ্রিকতার ধারনাকে গ্রহন করে। গভীর বাস্তবাদ অনুসারে, এই প্রকৃতির প্রতিটি ব্যক্তিসত্তার স্বগতমূল্য রয়েছে এবং তারা একে অপরের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের সম্বন্ধে সম্পর্কিত। এই সম্পর্কটি একটি জটিল জালের

মতো। এই সমগ্রতাবাদী বিশ্বে প্রচলিত প্রজাতিবাদী মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে অসার প্রতিপন্ন করে। একই সাথে প্রকৃতিকে কেবল মানুষের প্রয়োজনের সামগ্রী হিসাবে বিচার করার বিরোধিতা করে। জীবকূলের প্রতিটি সদস্যের নিজের মতো করে বেড়ে ওঠার অধিকার আছে- এই সত্যকে গভীর বাস্তবাদ মান্যতা দেয়। এই সমতাবাদের সমর্থনে গভীর বাস্তবাদের বক্তব্য হল, মূল্যের স্রষ্টা কেবল মানুষ নয়। প্রতিটি সত্তা স্বগতভাবে মূল্যবান। এখানে কেউ ছোটো, কেউ বড় নয়, কেউ রাজা, কেউ প্রজা নয়- সকলেই সমান। যদিও এই সমতাবাদী নীতি বাস্তবে মেনে চলা কঠিন, তাই নেস্, নীতিগতভাবে 'biospherical egalitarianism, in principle'[2]- এর কথা বলেছেন। তিনি স্বীকার করেন যে, কিছু ক্ষেত্রে প্রাণী হত্যা ইত্যাদি অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে কিন্তু আমাদের সামান্য প্রয়োজনে প্রাণীর স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকার অধিকারকে কেড়ে নেওয়া যাবে না। আর্ণে নেসের এই গভীর বাস্তবাদ বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, বিশেষ করে আট ও নয়ের দশকে পরিবেশ চিন্তার জগতে ব্যাপক সাড়া দিয়েছে। অনেক চিন্তাবিদ এই গভীর বাস্তবাদের পরিবেশবাদকে সমর্থন করেন। নেস্ গভীর বাস্তবাদের কোনো সংজ্ঞা না দিয়ে একগুচ্ছ পরিবেশনীতির প্রস্তাব আলোচনা করেছেন। তিনি মোট আটটি নীতির কথা আলোচনা করেছেন। এই নীতিগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল-

ক) এই পৃথিবীতে মানব ও অমানব প্রাণীর নিজস্ব মূল্য আছে যাকে আমরা স্বগতমূল্য বলি। এই মূল্য সকল মানুষের জন্য অ-মানব প্রকৃতির ব্যবহার-নিরপেক্ষ।

খ) বহু প্রাণের প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য এইসব মূল্যের উপলব্ধিতে সহায়ক হয়। শুধু তাই নয়, এগুলি স্বগতভাবেও মূল্যবান।

গ) মৌলিক প্রয়োজন ছাড়া এই প্রাচুর্য্য তথা বৈচিত্র্যকে নষ্ট করার কোনো অধিকার মানুষের নেই।

ঘ) মানুষের জনসংখ্যা বড় মাপের হ্রাসের সঙ্গে জীবনের গুণগত মানোন্নয়ন সঙ্গতিপূর্ণ। অ-মানব প্রাণীর স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্যও তা প্রয়োজন।

ঙ) মনুষ্যেতর জগতের উপর মানুষের হস্তক্ষেপ বর্তমানে বেড়ে গেছে এবং এই পরিস্থিতি আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে।

চ) সাধারণ কর্মনীতিকে তাই অবশ্যই বদলাতে হবে। এই বদল আমাদের অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত এবং মতাদর্শগত মৌলিক চিন্তাকাঠামোয় পরিবর্তন আনবে।

ছ) মতাদর্শগত পরিবর্তন স্বগতমূল্যবান জীবনের গুণগত মানকে অনুধাবন করতে সাহায্য করবে এবং তা তথাকথিত ভোগের পরিমাণের ভাষায় জীবনের উচ্চমানের ধারণাকে পাল্টে দেবে।

জ) যারা উপরের এই নীতিগুচ্ছকে স্বীকার করেন, তাদের উপর একটা নৈতিক দায় বর্তায় যে তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আবশ্যিক পরিবর্তনগুলি বাস্তবায়নের চেষ্টা করবে।

গভীর ও অ-গভীর বাস্তবাদ: আর্নে নেস্ গভীর ও অ-গভীর বাস্তবাদের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করেছেন। নীতিবিদ্যার এই ভাষ্য মানুষের সঙ্গে ভূমি এবং অমানবপ্রাণী ও উদ্ভিদের সম্পর্কের ওপরে আলোকপাত করে। ১৯৪৯ সালে অল্ডো লিওপোল্ড তাঁর 'The Land Ethic'- প্রবন্ধে ভূমি নীতিবিদ্যা কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন। তাকেই ভুমি নীতিবিদ্যার জনক বলা হয়। তারপর আর্ণে নেস্ ১৯৭৬ সালে একটি প্রবন্ধে গভীর ও অ-গভীর বাস্তবিদ্যার মধ্যে পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করেন। বাস্তুসংস্থানকে যারা অ-গভীর অর্থে গ্রহন করেন,

[2] Arne Naess,The Shallow and the Deep,Long-Range Ecology Movement.A Summary(University of Oslo,1972), Page:95.

তাঁরা নৈতিকভাবে মানবকেন্দ্রিকতাবাদকে সমর্থন করেন এবং মানুষের স্বার্থ চিন্তা করেই বলেন যে, নিঃস্বাস নেবার জন্য বায়ু, পিপাসা নিবারনের জন্য জল যদি দুষিত হয়, তাহলে মানুষের ক্ষতিসাধন হবে।

অপরদিকে, গভীর বাস্তবাদীরা জীবমন্ডলের স্বার্থেই প্রকৃতিকে সংরক্ষণ করতে আগ্রহী। জীবমন্ডলের এই অখণ্ডতা মানুষের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবে কিনা সে ব্যাপারে তাদের কোনো চিন্তা নেই। জীবিত ব্যক্তিসত্তার উপর জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা গুরুত্ব আরোপ করে, সেখানে বাস্তবাদীরা পরিবেশের মধ্যে প্রজাতি এবং সামগ্রিকভাবে জীবমণ্ডলকেও যুক্ত করতে চান। পল্ টেলরের মতে, অমানব প্রাণীদের শ্রদ্ধা করার সাথে সাথে আমাদের উচিত অন্যান্য আরোও সকল প্রাণের জীবনের নৈতিক মূল্য প্রদান করা।

গভীর ও অগভীর বাস্তবাদের মধ্যে যে পার্থক্য তা বাস্তবে আমাদের বিভিন্নধরনের অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক কর্মনীতি সম্পর্কে এক গভীর প্রশ্ন আমাদের মনে জাগিয়ে তোলে। মানবকেন্দ্রিক ভাবনাকে বর্জন করার কথা এই গভীর বাস্তবাদ বলেন। শুধু তাই নয়, মানুষের যুক্তিতর্ক প্রয়োজনীয় সামাজিক জীবনকে পরিবর্তনের উদ্যোগকে দুর্বল করে দেয়। প্রকৃত বাস্তবাদী দার্শনিকরা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে পরিবেশ রক্ষার জন্য সবকিছুকে বিচার করে পরিবেশের নীতিগুলিকে প্রয়োগ করে। গভীর বাস্তবাদে সামাজিক এবং রাজনৈতিক চিন্তার কথা বলে, কিন্তু তারপরেও এর কিছু গভীর দার্শনিক সত্তা আছে। এই আন্দোলনের সাথে যারা যুক্ত তাদের কেউ খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে, কেউ বা বৌদ্ধদর্শনের মধ্যে এই বাস্তুতাত্ত্বিক নিয়ম-নীতিগুলির সন্ধান করেছেন। নেসের এই বহুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি গভীর বাস্তবাদী আন্দোলনের বিকাশে সাহায্য করেছে।

নেসের Ecosophy-T

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের অনুভব ও ঐতিহ্যের মধ্য থেকে নিজের বাস্তুদর্শনকে খুঁজে পেয়ে থাকেন। দার্শনিক আর্ণে নেসের মতে, প্রকৃতির সাথে মানুষের গভীর আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক সংযোগের একটি ব্যক্তিগত দর্শন হল- এই Ecosophy-T. এটি গভীর বাস্তবাদের আন্দোলনের মূল ভিত্তি। যা প্রকৃতিকে কেবল মানুষের ব্যবহারের বস্তু হিসাবে না দেখে, প্রকৃতিতে সকল জীবের সমানভাবে বাঁচার অধিকার আছে এবং প্রকৃতি আত্ম-উপলব্ধির ওপর বেশি জোর দেয়। এর মূল কথা হল, বাস্তুতাত্ত্বিক আত্মোপলব্ধি, যা গভীর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। এর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য নিম্নে আলোচনা করা হল

i) আত্ম-উপলব্ধি: নেস বিশ্বাস করতেন যে, মানুষ যখন প্রকৃতির অংশ হিসাবে নিজেকে বুঝতে পারে, তখন পরিবেশের যত্ন নেওয়া তার কাছে একটি স্বাভাবিক আচরনের মতো হয়ে ওঠে।
ii) জৈবমন্ডলীর সমতাবাদ: সব জীবের, তা সে মানুষ হোক বা অনুজীব, বেঁচে থাকার, এবং বিকশিত হওয়ার সমান অধিকার রয়েছে।
iii) সাধারন জীবনযাপন: এটি ভোগবাদ কমিয়ে পরিবেশের উপযোগী এবং সরল জীবনযাপন করার পরামর্শ দেয়।
iv) ব্যক্তিগত দর্শন: এটি ব্যক্তিবিশেষে আলাদা আলাদা মতামত স্থাপন করে, নেসের মতে, প্রত্যেকেরই নিজস্ব ইকোসফি তৈরী করা উচিত।

তবে নেসের মতে, এই Ecosophy-T- এর চরম আদর্শকে আমরা একটি সূত্রে স্থাপন করতে পারি এবং সেটি হল- আত্মোপলব্ধি। এই কথাটিকে নেস সংকীর্ণ অহমের ব্যক্তিগত অর্থে বোঝাননি। ভারতীয় দর্শনে যে পরমাত্মা- জীবাত্মার ধারনা আছে, নেস তারই উল্লেখ করে পরমাত্মার উপলব্ধির কথা বলেছেন। নেস্ তাঁর গভীর বাস্তুদর্শনের কেন্দ্রবিন্দুরূপে প্রকাশ করেছেন এই আত্মোপলব্ধিকে। এই আত্মোপলব্ধির দ্বারা শুধুমাত্র আমাদের আত্মীয় বা পরিবার-পরিজনের সাথে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ অনুভব করাই যথেষ্ট নয়, এই বাস্তুতন্ত্রে

সে সমস্ত অমানবপ্রাণী, নদী, পাহাড়, জঙ্গল ইত্যাদি রয়েছে তাদের সকলের সাথে আমরা এক অভিন্নতার সম্বন্ধে যুক্ত। এই প্রকৃতিমুখী আত্মাই প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল।

মানুষ নিজেকে কেবল একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসাবে না দেখে বরং প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে উপলব্ধি করে। আর্ণে নেসের মতে, এই আত্মোপলব্ধি এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে মানুষ তার সীমাবদ্ধ ব্যক্তিসত্তা অতিক্রম করে প্রকৃতির সাথে একাত্মতা উপলব্ধি করে। এই উপলব্ধিই গভীর বাস্তুতন্ত্রের প্রতি প্রকৃতির স্বগতমূল্য প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি। প্রকৃতির ক্ষতি করা মানে নিজের ক্ষতি করা- এই নৈতিক উপলব্ধি স্বতঃসিদ্ধ হয়ে ওঠে, এই দৃষ্টিভঙ্গি মানবকেন্দ্রিকতাবাদকে প্রত্যাখ্যান করে। প্রকৃতিকে কেবল উপযোগিতার ভিত্তিতে নয় বরং নিজস্ব অস্তিত্বের কারনেই, মূল্যবান হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। সুতরাং, এই আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে এই গভীর বাস্তবাদ এমন এক নৈতিক কাঠামো নির্মান করে, যেখানে পরিবেশ সংরক্ষণ কোনো বাহ্যিক কর্তব্য নয় বরং আত্মোপলব্ধির একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।

অনুসিদ্ধান্ত: গভীর বাস্তবাদ মানবকেন্দ্রিকতাবাদের বিরোধিতা করে এবং প্রাণকেন্দ্রিকতাবাদ ও বাস্তুকেন্দ্রিকতাবাদের পক্ষে যুক্তি দেয়। এটি জীবের সমানাধিকার এবং আত্মোপলবদ্ধি ধারণার মাধ্যমে মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হতে আহ্বান জানায়। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, প্রকৃতির প্রতি নৈতিক দায়িত্ব শুধুমাত্র মানুষের স্বার্থ রক্ষার জন্য নয়, বরং সমস্ত জীবের অস্তিত্ব ও বিকাশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। নেস্ তাঁর গভীর বাস্তবাদের আলোচনায় নিজস্ব Ecosophy কে প্রতিষ্ঠা করেছেন উদার এবং সমগ্রতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে। এই গভীর বাস্তবাদ বর্তমান পরিবেশ সঙ্কট সম্পর্কে আমাদের চিরাচরিত সমাজব্যবস্থার কোন সংস্করণ নয়, গভীরভাবে পুনর্বিন্যাসের নির্দেশ দেয়। তাঁর এই আদর্শই এই জগতে মানব এবং অমানব সকল প্রাণীর জীবনযাপনের চাবিকাঠি। বর্তমান সময়ে মানব এবং অমানব প্রাণীদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব একটি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষ এই জগতের অন্যান্য প্রজাতির মতই একটি প্রজাতিমাত্র। এই আত্মোপলব্ধিই মানুষকে সঠিক দিকদর্শন করাতে পারে। মানুষ যদি বুঝতে পারে যে, এই প্রাণীরা তাদের শত্রু নয় বরং তারা একে অন্যের সাথে অভিন্ন, তাদের মধ্যে একজনের ক্ষতি হলে তার প্রভাব অন্যের ওপরেও পড়বে, তাহলে এই পারস্পরিক লড়াই, হিংসা, ক্ষতি করার প্রবণতা ইত্যাদির বিনাশপ্রাপ্ত হবে। মনুষ্য জনসংখ্যার কারণেই অমানব প্রাণীরা আজ বিপন্ন। তিনি অমানব প্রাণীদের নৈতিক বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত করতে গিয়ে মানুষের মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করেননি।

মানুষের কিছু মৌলিক চাহিদার জন্য কখনো কখনো প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন হতে পারে। তথাপি আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এই জগতে মানব এবং অমানব সকল সত্তাই একে অপরের সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে যুক্ত। সেখানে কোন একটি প্রজাতির ক্ষতি হলে তা সকল প্রজাতিকেই কোন না কোন ভাবে প্রভাবিত করবে। সুতরাং, বাস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবেশের বৈচিত্র্য এবং ভারসাম্য রক্ষা করার একমাত্র উপায়। নেস্ এমন একটি মতাদর্শের কথা বলেন, যেখানে জগতের এই সকল উপাদানের মধ্যে কোন উচ্চ নিচ স্তরভেদ নেই, সকলেই সমান। ব্যক্তিগত আত্মানুসন্ধান নয় বরং আত্মোপলব্ধি এবং জগতে মানব ও অমানব সমস্ত প্রাণীর সাথে একাত্মতাই হল আদর্শ নীতিদর্শন। আমাদেরকে এই সমগ্র জগতের বাস্তুতন্ত্র যেমন- গাছপালা, নদী, উপত্যকা, পাহাড়-পর্বতের সাথে অভিন্ন হতে হবে।

সহায়ক গ্রন্থ:

1. Leopold, A. (1949). *A Sand Country Almanc and Sketches Here and There*. New York: Oxford University Press.
2. Taylor, P. W. (1981). The Ethics of Respect for Nature.
3. white, L. (1967). The Historical Roots of our Ecological Crisis. In Science 155:
4. Frey, R. G. (1987). Moral standing, The value of Lives, and Speciesism.
5. Naess, A. (1989). Ecology, community and lifestyle (1st ed.). Cambridge University Press.
6. Naess, A. (1986). The Deep Ecological Movement: Some Philosophical Aspects, In Philosophy Inquiry.
7. Naess, A. (1972). The shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement. A summary. University of Oslo.
8. Pal. S.K. (2021). Falito Niti sastra (1st Part). Levant Books, India.
9. Routley, R. (1973). Is there a need for a new, an Environmental Ethic?. Bulgaria: Sofia Press.
10. Leopold, A. (1949). The Land Ethic from A sand County Almanac.
11. Chakraborty, N.N. (2021). Paribesh o Nitibidya (2nd ed.). west Bengal state Book board.
12. Chakraborty, Somnath. (2020). Kothay karme ethics. Progressive publishers, Kolkata.
13. Sarkar, Swapna. (2022). Nitibidya: falito poribesh o adhinitibidya. Mitram, Kolkata.

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1970-1978
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.422

জাতীয় অর্থনীতিতে ইপিজেড- এর অবদান: চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

মেহজাবীন ইলাহী, *সিনিয়র অফিসার ও গবেষক, ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ এক্সিলেন্স, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ*

Received: 23.02.2026; Accepted: 19.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Export Processing Zones (EPZs) are contributing greatly to the economy of Bangladesh, including earning foreign exchange. The objectives of this study are to review the history and historical context of EPZs in Bangladesh, to assess the contribution of EPZs to the national economy, to analyze the challenges of EPZs, and to discuss the opportunities of EPZs. This study has been carried out according to the qualitative research method, where information and data have been collected from secondary and open sources. The findings of the study suggest that it was observed that the first EPZ of Bangladesh was in South Halishahar of Chattogram in 1983 AD; the 2nd EPZ was in Savar, Dhaka EPZ in 1993 AD; Comilla EPZ was in Cumilla city in 2000 AD; Ishwardi EPZ was in Pabna in 2001 AD; and Uttara EPZ was in Nilphamari (Shangalshi) in Rangpur in the same year. The Mongla EPZ was established in 1998 at the Mongla port area in Bagerhat (1998); the Adamjee EPZ at Siddhirganj in Narayanganj in 2006; and the Karnaphuli EPZ was formed in the same year at North Patenga, Chattogram. There are 451 industrial establishments in the eight EPZs that were established in Bangladesh, of which 149 are garment factories. A total of US$ 81.04 million has been invested in eight EPZs in the last three months (July-September, 2020). On the other hand, employment opportunities have been created for 6,536 Bangladeshi citizens. Sometimes, foreign investors often face problems related to EPZ investment in terms of long-time delay, complexity of required documents, corruption, etc. In fiscal year 2021-2022, EPZ is making a great contribution to sustaining the country's investment, export earnings, and employment generation. The government needs to take more initiatives and amend policies to acquire trust from domestic and foreign investors. It will accelerate economic growth and earn foreign currency for Bangladesh.

Keywords: Export Processing Zones (EPZs), Bangladesh Economy, Foreign Direct Investment (FDI), Export Earnings and Employment, Industrial Development and Policy Challenges

যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নাজুক পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে মূলধনের প্রসার, শিল্পায়ন ইত্যাদি বিষয়গুলো বাংলাদেশের জন্য খুবই দরকার ছিল। আশির দশকে বিশ্বব্যাংকের তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যাকনামারা বাংলাদেশে পরিদর্শনে এসে ইপিজেড (রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল) এর ধারণাটি এ অঞ্চলে ছড়িয়ে দেন। এ ধারণাটি পরবর্তীতে শিল্পনীতি যেমন ইপিজেড আইন ১৯৮০ প্রণয়নে ভূমিকা রাখে। ফলত , বাংলাদেশে ক্রমান্বয়ে ইপিজেড বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে (Fakir et al, 2013)। ইপিজেড এর উদ্ভাবনের ফলে বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পেতে থাকে।

বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (Special Economic Zones-SEZs) স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশে বিনিয়োগ ও প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ (Foreign Direct Investment-FDI) বাড়ানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বাংলাদেশে বিশেষ করে রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে ইপিজেডের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। উৎপাদন খাতে এফডিআইয়ের একটি বড় অংশ ইপিজেড খাতে ব্যবহৃত হচ্ছে। যদিও বাংলাদেশ ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেপজা) অধীনে ইপিজেডগুলির বিকাশ ও রক্ষণাবেক্ষণে সফল হয়েছে। অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে স্পিলওভার তৈরিতে ইপিজেড মডেলের সীমাবদ্ধতাগুলি শীঘ্রই স্পষ্ট হয়ে উঠছে (আলম এবং চৌধুরী, ২০১৬)।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও গত কোভিড-১৯ সময়কালেও ইপিজেড থেকে তুলনামূলক আয়ের ধারাবাহিকতা বজায় ছিল। বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত আটটি ইপিজেড এ ৪৫১ টি শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে যার মধ্যে পোশাক কারখানা রয়েছে মোট ১৪৯টি। পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির পাশাপাশি এখন ইপিজেড চিকিৎসা শিল্পের সরঞ্জাম, মোবাইল যন্ত্রাংশ ও ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম ইত্যাদি তৈরি করছে (হোসাইন, ২০২২)। বাংলাদেশে ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে নিম্নোক্ত দেশ যেমন, পশ্চিম ইউরোপের দেশ যেমন ডেনমার্ক, ফ্রান্স, জার্মানী, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে এবং যুক্তরাজ্যে ২৪৫.৯০ মিলিয়ন ইউএস ডলার বিনিয়োগ করেছে। একই সময়ে কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, মিশর, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, চীন, হংকং, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালেয়শিয়া, নেপাল, পাকিস্তান, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, শ্রীলঙ্কা, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, ভানুয়াতু, এডিবি, আইএফসি এবং অন্যান্য দেশ ও প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে বিনিয়োগ করেছে (Kafi et al, 2007) । বর্তমানে বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হার ক্রমান্বয়ে বাড়ছে।

ব্যক্তিখাত বা শিল্প বাজার অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে ধাবিত করে। জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে লক্ষ্য করে প্রণীত হলেও এখানে বৃহৎ শিল্প ও সেবাখাতের জন্য আলাদা নির্দেশনা রয়েছে। এ শিল্পনীতিতে গতিশীল শিল্পায়ন ও টেকসই বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে পৃথক বিনিয়োগ প্রণোদনা নিশ্চিত হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং রপ্তানী বৃদ্ধিতে অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন ২০১০ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে (জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬, ২০১৬)।

বিশ্বের বিভিন্ন নামকরণা প্রতিষ্ঠান ও বিখ্যাত ব্র্যান্ড ও দেশ বাংলাদেশে উৎপাদিত ইপিজেড পণ্য আমদানী করে থাকে। যেমন যুক্তরাজ্যের ফিলিপ-মরিস, হাই-টেক, এমিলি, ফ্রি স্পিরিল, এডি বাউয়ার, ঈগল, রিলেহ ও মাদার কেয়ার ইত্যাদি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের পণ্য ক্রয় করে। এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র, সুইডেন, ও জার্মানি ইত্যাদি রাষ্ট্রের নামকরা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের পণ্য ক্রয় করে (রায়হান, ২০২২)। এ গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ যথাক্রমে- বাংলাদেশে ইপিজেড-এর ইতিহাস ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করা, জাতীয় অর্থনীতিতে ইপিজেড- এর অবদান মূল্যায়ন করা, ইপিজেড- এর চ্যালেঞ্জসমূহ বিশ্লেষণ করা এবং ইপিজেড-এর সম্ভাবনাসমূহ আলোচনা করা। এ গবেষণা কর্মটি অর্থনীতিবিদ, বিনিয়োগকারী, উন্নয়নকর্মী, গবেষক, বিশ্লেষক, আইনপ্রণেতা, এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জাতীয় অর্থনীতিতে ইপিজেড- এর অবদান, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা সম্পর্কে জানতে সহায়তা করবে।

পূর্ববর্তী গবেষণা গ্রন্থের পর্যালোচনা (Literature Reviews):

রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড) নিয়ে দেশী ও বহির্বিশ্বে বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড), শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ইত্যাদি নিয়ে গুণগত ও সংখ্যাতাত্ত্বিক গবেষণা পদ্ধতির মাধ্যমে নানান গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইপিজেড নিয়ে গবেষণাকর্ম পরিলক্ষিত হয়েছে।

Alam, এবং Murad, (2014) এ তারা মালেয়শিয়া এবং বাংলাদেশের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল নিয়ে একটি তুলনামূলক গবেষণাপত্র সম্পাদন করেছেন। এ গবেষণায় তুলে ধরা হয়েছে বাংলাদেশে সর্বনিম্ন মজুরি কম হওয়া সত্ত্বেও সন্তোষজনকভাবে বৈদেশিক সরাসরি বিনিয়োগ এবং রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল বাড়াতে পারেনি।

বাংলাদেশে বৈদেশিক সরাসরি বিনিয়োগ এর সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে একটি গবেষণাকর্ম সম্পাদন করা হয়েছে। এ গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ যথাক্রমে বাংলাদেশে এফডিআই-এর গুরুত্ব অধ্যয়ন করা, বাংলাদেশে এফডিআই আকর্ষণকারী প্রধান

নীতিগুলির রূপরেখা তৈরি করা, সার্ক দেশগুলির তুলনায় বাংলাদেশে এফডিআই প্রবাহের অবস্থা পরিমাপ করা, এফআইডি এর প্রবাহ এবং বহিঃপ্রবাহের তুলনা করা, বাংলাদেশে এফডিআই-এর প্রধান সম্ভাবনা ও সমস্যা চিহ্নিত করা; এবং বাংলাদেশে এফডিআই সংক্রান্ত কিছু পরিমিত পরামর্শ প্রদান করা (Rayhan, 2009)।

A N M Asaduzzaman Fakir, Mohammad Shahin Miah এবং Md. Shakawat Hossain (২০১৩) বাংলাদেশে ইপিজেড- এর ভূমিকা এবং রপ্তানী বহুমূখীকরণ বিষয় নিয়ে গবেষণাপত্র সম্পন্ন করেছেন। তাঁদের এ গবেষণার উদ্দেশ্য হলো যথা, প্রতিষ্ঠিত আটটি ইপিজেডগুলিতে অভ্যন্তরীণ ও বিদেশী বিনিয়োগের প্রবণতা পর্যবেক্ষণ করা, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সূচক ব্যবহার করে এই অঞ্চলগুলির রপ্তানি কর্মক্ষমতা বিশ্লেষণ করা এবং ইপিজেডগুলিতে রপ্তানি কর্মক্ষমতা এবং বিনিয়োগের নির্ধারকগুলি পরীক্ষা করা। এ গবেষণাটি মিশ্র গবেষণা পদ্ধতি অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে যেখানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎস থেকে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

M. A. Rashid Sarkar (২০০৫) বাংলাদেশের শিল্পায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ এবং সম্ভাবনাসমূহ নিয়ে একটি গবেষণাপত্র সম্পাদন করেছেন। এ গবেষণা প্রবন্ধে তিনি শিল্পায়নের ইতিহাস, বাংলাদেশের শিল্পায়নের প্রয়োজনীয়তা এবং শিল্পায়ন নীতি ইত্যাদি বিষয় তিনি তুলে ধরেছেন। Azam Khan এবং Munira Sultana (২০১৩) রপ্তানীতে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রভাব নিয়ে গবেষণাকর্ম সম্পাদন করেছেন যেখানে তারা বাংলাদেশের বিষয়টি তুলে ধরেছেন। এ গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশের রপ্তানীতে বিদেশী সরাসরি বিনিয়োগ প্রভাব চিহ্নিত করা, রপ্তানি ও সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগের সম্পর্কে মূল্যায়ন করা। তারা এ গবেষণাটি অপ্রধান উৎস থেকে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করেছের।

Sabiha Binta Hasan এবং Md. Kawser Ali (২০১৯) বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে ইপিজেড-এর ভূমিকা সম্পর্কিত একটি গবেষণাপত্র বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁদের গবেষণার উদ্দেশ্য যথাক্রমে বিনিয়োগ, রপ্তানী এবং কর্মসংস্থানে ইপিজেড এর কার্যক্ষমতা পর্যালোচনা করা, দেশে ইপিজেড এর ভূমিকা পরীক্ষা করা এবং বাংলাদেশে ইপিজেড এর চ্যালেঞ্জসমূহ বিশ্লেষণ করা।

বিনিয়োগের জন্য বিভিন্ন দেশে নানা ধরনের অর্থনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা যায়। যেমন পঞ্চাশের দশকে আয়ারল্যান্ডে, পরবর্তীতে এশিয়া ও আফ্রিকায় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা পরিলক্ষিত হয়েছে (বণিক বার্তা, ২০২২)। পূর্ববর্তী গবেষণা গ্রন্থের পর্যালোচনায় এটা বিশ্লেষণ করা যায় যে, বর্তমান গবেষণাটি উপর্যুক্ত গবেষণার চেয়ে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র যেখানে জাতীয় অর্থনীতিতে ইপিজেড- এর অবদান তুলে ধরার পাশাপাশি রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড) এর চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

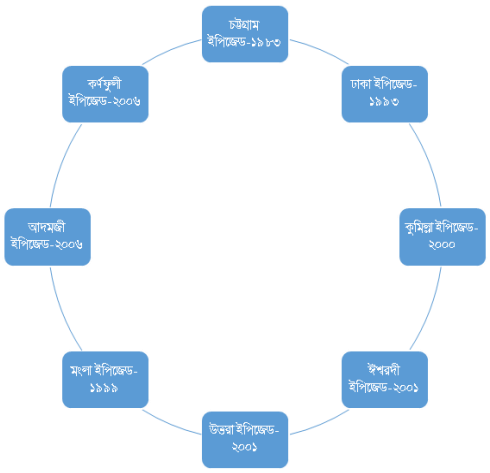
গবেষণা পদ্ধতিঃ

এ গবেষণাটি গুণগত পদ্ধতি (Qualitative Research Methodology) অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে। এ পদ্ধতি সম্পন্নকল্পে অপ্রধান উৎস (Secondary Sources) থেকে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। মূলত অপেন সোর্স থেকে এ গবেষণার উদ্দেশ্য অনুসারে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এখানে মাধ্যমিক উৎস বলতে প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধ, সংশ্লিষ্ট জার্নাল, পত্রিকায় প্রকাশিত আর্টিকেল, সরকারী ও বেসরকারী ওয়েবসাইট, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেপজা) এর প্রকাশনা ও ওয়েবসাইট, ইন্টারনেটে প্রকাশিত তথ্য ও উপাত্ত, সরকারী পরিসংখ্যান, বই, ও ম্যাগাজিন ইত্যাদি মাধ্যম থেকে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করে তা বিশ্লেষণ করে অত্র গবেষণায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

গবেষণার ফলাফল ও পর্যালোচনাঃ

বাংলাদেশে ইপিজেড- এর ইতিহাস ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং শিল্পায়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যদিও ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দের বেপজা আইন এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে। এই আইনের ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়েছে (Fakir et al, 2013)। বাংলাদেশে রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে কর্মরত জনবলের অধিকার ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদী আইনের দৃষ্টিতে দেখার জন্য The Export Processing Zones (EPZ) Labour Act 2019 (the Act) প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইনটি মালিক এবং কারখানায় কর্মরত জনবলের জন্য প্রযোজ্য। এ আইনটি মূলত সংশ্লিষ্ট মহলের মধ্যে যোগাযোগ (নেটওয়ার্ক), সুষ্ঠু কাজের পরিবেশ, ব্যবসার সম্প্রসারণ, নারীদের মাতৃত্বকালীন ও প্রয়োজনীয় ছুটি ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা রয়েছে (Rifat, 2024) ।



চিত্র ০১: বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত ইপিজেডসমূহ (Fakir et al, 2013; Hasan & Ali, 2019)।

ইপিজেড আইন প্রণীত হওয়ার পর বাংলাদেশে ইপিজেড প্রতিষ্ঠা দ্রুতগতিতে প্রসারিত হয়। বাংলাদেশের প্রথম ইপিজেড চট্টগ্রামের দক্ষিণ হালিশহের ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা হয়। চট্টগ্রাম ইপিজেড অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার সাভারে দ্বিতীয়তম ঢাকা ইপিজেড প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে কুমিল্লা শহরে ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে কুমিল্লা ইপিজেড স্থাপন করা হয়। ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে পাবনার ঈশ্বরদীতে ইপিজেড উদ্বোধন করা হয়। একই বছরে (২০০১) রংপুরের নীলফামারীতে উত্তরা ইপিজেড প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে বাগেরহাটের মংলাতে 'মংলা ইপিজেড' প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তী ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দে নারায়নগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে আদমজী ইপিজেড স্থাপন করা হয়। একই বছর (২০০৬) চট্টগ্রামে ২য় ইপিজেড কর্ণফুলী ইপিজেড চালু করা হয় (Fakir et al, 2013; Hasan & Ali, 2019)। বাংলাদেশের বিভিন্ন বিভাগীয় শহর এবং জেলায় ইপিজেড প্রতিষ্ঠা অর্থনীতিতে এক ধরনের গতি এসেছে।

জাতীয় অর্থনীতিতে ইপিজেড- এর অবদান মূল্যায়ন

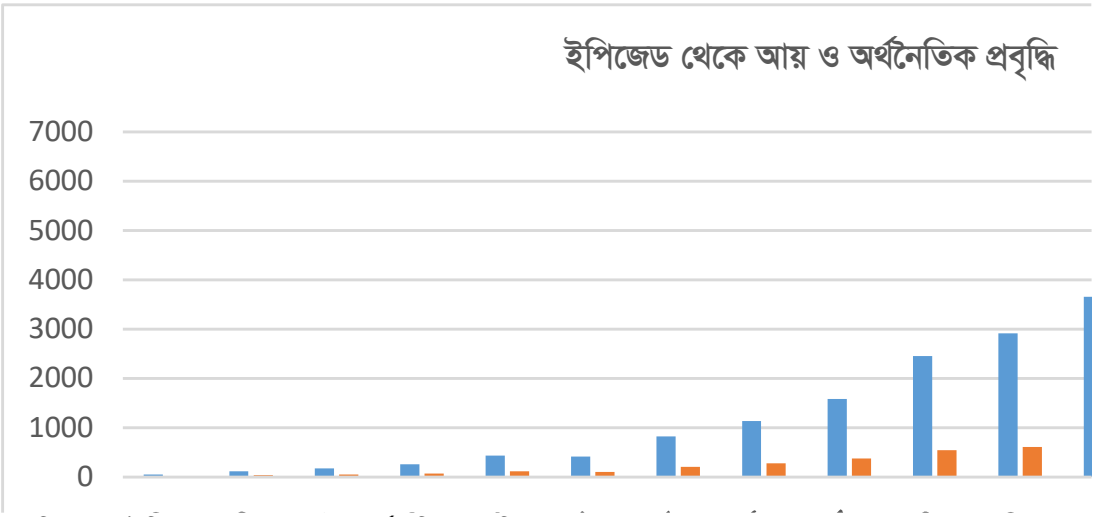
রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল মূলত বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণ ও রপ্তানী বাড়ানোর জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে (Rifat, 2024) ।

ক্রমিকনং	ইপিজেড অঞ্চলের নাম	অপারেশনের সংখ্যা	বিনিয়োগ (মিলিয়ন-ইউএসডলার	জনবলের সংখ্যা (স্থানীয়)	জনবলের সংখ্যা (বিদেশী/বহিরাগত)
০১.	মোট: টাইপ-এ	৩৬৩	৩৭০৭	৩১৩১০৪	১৯৯০
০২.	চট্টগ্রাম	৯৬	১১২৪	৯৪০৩৮	২৬০
০৩.	ঢাকা	৮৯	১২৪৯	৭৪৯৬৯	৫২২
০৪.	মংলা	৩৩	৫৫	৩৬৯৭	৩২
০৫.	ঈশ্বরদী	১৭	৬৪	৬২১৭	৬৩
০৬.	কুমিল্লা	৪৫	২৪৫	২৪৩১৪	১৯৮
০৭.	উত্তরা	১৫	১৬৩	২২৭১২	৩৮১
০৮.	আদমজী	৩৫	৩১০	২৭৮০৬	১৬০
০৯.	কর্ণফুলী	৩৩	৪৯৭	৫৯৩৫১	৩৭৪
১০.	মোট: টাইপ-বি	৯৩	৪৮১	৪৭০৯৭	১৩১
১১.	চট্টগ্রাম	২৪	১২৪	২০০৮৮	২৮
১২.	ঢাকা	১৮	৪২	৩২৩	২১
১৩.	মংলা	৯	৩	৪৮	০

১৪.	ঈশ্বরদী	৫	২৯	৫৪৪	০
১৫.	কুমিল্লা	১৫	১১০	৪৭৬৮	৩৩
১৬.	উত্তরা	১	০	০	০
১৭.	আদমজী	১৬	১৩৬	১৬৫৩৪	৪৯
১৮.	কর্ণফুলী	৫	৩৮	১৮৮৪	০
১৯.	মোট: টাইপ- সি	২১৯	১১০২	১০১২৫৯	৯৩
২০.	চট্টগ্রাম	৬০	৫২৪	৬১৭৪৯	৩১
২১.	ঢাকা	৩৩	২৩৪	৭৯৪১	২১
২২.	মংলা	১৮	২৭	৪৭০	২
২৩.	ঈশ্বরদী	২২	৬০	৫৯১২	১৫
২৪.	কুমিল্লা	২৪	৩১	২৫৬৭	৩
২৫.	উত্তরা	২২	৪১	৩৯০৮	৪
২৬.	আদমজী	২৪	১০৮	১০৫৮৩	১৪
২৭.	কর্ণফুলী	১৬	৭৭	৮১২৯	৩
২৮.	সর্বমোট (গ্রান্ড টোটাল)	৬৭৫	৫২৯০	৪৬১৪৬০	২২১৪

টেবিল ০১: ইপিজেড- এর জনবল ও অন্যান্য কার্যক্রমের পরিধি (Bangladesh Bank, 2019; BEPZA, n.d)।

বাংলাদেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি বিশেষ করে শিল্পায়ন স্থাপন ইত্যাদি বিষয়াবলী ত্বরান্বিত করার জন্য ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দ থেকেই এ দেশে রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মূলত দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করণে বিভিন্ন উদ্যোগ ও কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। ফলে ১৯৮৩-৮৪ খ্রিষ্টাব্দের দিকে চট্টগ্রাম রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। পরবর্তীতে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মোট আটটি সরকারী ইপিজেড প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। উপর্যুক্ত টেবিলে ১০০% বিদেশী বিনিয়োগকারীদের সম্পৃক্ততাকে লক্ষ্য করে এ সকল ইপিজেডকে টাইপ-এ নির্ধারণ করা হয়েছে। আবার বাংলাদেশ ও বিদেশী বিনিয়োগকারী যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলকে বি-টাইপ আখ্যায়িত করা হয়েছে। অন্য দিকে শুধু বাংলাদেশী নাগরিকদের অর্থায়নে পরিচালিত ইপিজেডকে সি-টাইপ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে (Bangladesh Bank, 2019; BEPZA, n.d)।



চিত্র ০২: ইপিজেড থেকে আয় ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (Bangladesh Bank, 2019; BEPZA, n.d)।

ইপিজেড প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৮৮-৮৯ থেকে ২০১৯-২০ অর্থ বছর মূল্যায়ন করলে এটা স্পষ্ট হয় যে এ সময় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অভ্যন্তরীন বাজারে ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ১৯৮৮-৮৯ অর্থবছরে তা ছিল ৫০.৮ (কোটি- টাকায়) এবং যার ইউএস ডলারে মূল্য ছিল ১৬ মিলিয়ন। ১৯৮৯ -৯০ অর্থবছরে তা ছিল ১১১.০ (কোটি- টাকায়) এবং যার ইউএস ডলারে ছিল ১৬ মিলিয়ন। ১৯৮৮-৮৯ থেকে ২০১৯-২০ অর্থ বছর মোট আয় ছিল ৪১৯০৫.১ কোটি টাকা এবং একই সময়ে যার ডলার মূল্য ছিল ৪৯৪৪ মিলিয়ন ডলার (Bangladesh Bank, 2019; BEPZA, n.d)। গত তিন মাসে (জুলাই- সেপ্টেম্বর, ২০২০) আটটি ইপিজেড এ মোট ৮১.০৪ মিলিয়ন ইউএস ডলার বিনিয়োগ করা হয়েছে। অন্যদিকে ৬,৫৩৬ জন বাংলাদেশী নাগরিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও ২০২০-২১ অর্থবছরের ১ম কোয়াটারে রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের পণ্যেও মূল্য ছিল ১৫৭৯.৬১ মিলিয়ন ইউএস ডলার (BEPZA, n.d)। কোভিড-১৯ এর সময়কালেও প্রায় সাড়ে তিন কোটি ডলারের নতুন বিনিয়োগ এসেছে (বণিক বার্তা, ২০২২)। ২০২১ অর্থবছরে ৬.৬৩ বিলিয়ন ডলার আয় করা হয়েছে। অন্যদিকে ২০২২ এ মোট রপ্তানী আয় জিডিপির ১৬.৬৫% ছিল (হোসাইন, ২০২২)।

ইপিজেড- এর চ্যালেঞ্জসমূহ বিশ্লেষণ:

বাংলাদেশের কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতি ক্রমান্বয়ে শিল্পায়ন ভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় রূপান্তরিত হচ্ছে। ১৯৮০ দশকে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের যাত্রা স্বপ্ন পরিমাণে শুরু হয়। ১৯৯০ দশকে তা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। ১৯৭৭-২০১০ খ্রি. সময়ে মোট এফডিআই এর পরিমাণ ছিল ৮৯২৭.৯ মিলিয়ন এবং যার মধ্যে ২০০৬ -২০১০ খ্রি. সময়কালে তার পরিমাণ ছিল ৪১৫৮.৬৩ মিলিয়ন ডলার। মূলত এ বৈদেশিক সরাসরি বিনিয়োগ দুটো ক্ষেত্রে যেমন রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল এবং নন-ইপিজেড অঞ্চলে বিনিয়োগ করা হয়েছে। নন-ইপিজেড অঞ্চলে বিনিয়োগ করা হলেও সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। যেমন ২০১১ খ্রিষ্টাব্দের অগাস্ট পর্যন্ত ইপিজেড এ ৫৩.১৮ মিলিয়ন (ইউএস) বিনিয়োগ হয়েছে এবং ১৭৮২ (এক হাজার সাতশ বিরাশি) জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। এ সকল এফডিআই দেশের বিভিন্ন কাজে ব্যয় হয় এবং জিডিপিতে অবদান রাখছে। এ সকল বৈদেশিক সরাসরি বিনিয়োগ মূলত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। যদিও এফডিআই-এর কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে যা পরোক্ষভাবে ইপিজেড এ প্রভাব বিস্তার করে। এফডিআই এর চ্যালেঞ্জসমূহ যথাক্রমে আর্থ-সামাজিক অচলাবস্থা ও অবকাঠামোগত সমস্যা, দক্ষ জনশক্তির অভাব, এনার্জি সরাবরাহের সমস্যা, দুর্নীতি, প্রশাসনিক জটিলতা, অস্বচ্ছতা, বিভিন্ন নীতি ও আইনের অবাস্তবায়ন, সরকারের নীতি দ্রুত পরিবর্তন ও ট্রেড ইউনিয়নের অসম প্রতিযোগিতা ইত্যাদি (Khan and Sultana, 2013)।

বিদেশী বিনিয়োগকারীরা অনেক সময় দীর্ঘ সময় ক্ষেপণ, প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের জটিলতা, দুর্নীতি ইত্যাদি বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে ইপিজেড সংশ্লিষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হন। যদিও এ সমস্যা সমাধানে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় উপর্যুক্ত সমস্যা সমাধানে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। অন্যদিকে পর্যাপ্ত স্থান না থাকায় অনেকে বিনিয়োগে আগ্রহী নয় (বণিক বার্তা, ২০২২)। অন্যদিকে অর্থনৈতিক উন্নতি ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য শিল্পায়ন একটি দেশের অন্যতম চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করছে। বাংলাদেশে শিল্পায়নের বিবিধ চ্যালেঞ্জ রয়েছে (Sarker, 2005)।

তথ্যপ্রযুক্তি ইপিজেড এ মানানসই করে মোকাবেলা করা এখন অন্যতম চ্যালেঞ্জিং বিষয়। যেমন বেপজা এর নির্বাহী চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল আবুল কালাম মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান বলেন- কর্মসংস্থানের পাশাপাশি অটোমেশনেও গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। ফলে প্রযুক্তি এলে আমাদের মানুষ তা রপ্ত করতে পারবে এবং ভবিষ্যতে বহির্বিশ্বে দক্ষ কর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে। অন্যদিকে এখন এআইয়ের (আর্টিফিশিয়েল ইন্টিলিজ্যান্স) যুগ। বায়ররা শুধু পণ্যেও মানই নয়, আধুনিক প্রযুক্তি, এআই ও ডিজিটাল প্লাটফর্ম ব্যবহার করেছেন কিনা, সে সম্পর্কে দেখভাল করেন। সেজন্য আমরা প্যারাডাইম শিফট করছি (বণিক বার্তা, ২০২৫)।

আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ইপিজেড এর উন্নতি এবং বিনিয়োগকারীদের এ দেশে বিনিয়োগ করতে অনেক বেগ পেতে হচ্ছে। যেমন, শিল্পপতিদের মধ্যে একটি সাধারণ উদ্বেগ হল বেপজার আমলাতান্ত্রিক কাঠামো। অনেক ক্ষেত্রে, অনুমতি এবং লাইসেন্স পেতে কয়েক মাস সময় লেগে যায়, যেখানে প্রতিবেশী ভারতের মতো দেশে কয়েক দিনের মধ্যে অনুরূপ নথিগুলি সুরক্ষিত করা যায়। অন্যদিকে যেখানে লাল ফিতা (Red Tape) বা আমলতান্ত্রিক জটিলতা আছে, সেখানে প্রায়ই দুর্নীতি হয়। ঘুষ ও অনৈতিক চর্চার অভিযোগও উঠে এসেছে। এই ধরনের সমস্যা সম্ভাব্য বিদেশী বিনিয়োগকারীদের কাছে ভুল সংকেত পাঠাতে পারে, যারা বাংলাদেশে কার্যক্রম স্থাপন করতে আগ্রহী (Syed Tashfin Chowdhury, 2025)।

ইপিজেড-এর সম্ভাবনাসমূহ আলোচনা:

ইপিজেড এর মাধ্যমে বিদেশে রপ্তানীর পরিমাণ বেড়েছে। একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, ৯৬ বিলিয়ন ডলারের ইপিজেড পণ্য গত চার দশকে রপ্তানি করা হয়েছে। এছাড়াও দেশি ও বিদেশী উদ্যোক্তার ইপিজেড এ বিনিয়োগ করার প্রতিযোগিতা তুলনামূলকভাবে বেড়েছে। দেশের বেকারত্ব দূরীকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ইপিজেড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে (বণিক বার্তা, ২০২২)।

বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট ইপিজেড-এ ৩৩৩ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। প্রায় ১১০ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ নেট মিটারিং পদ্ধতিতে গত ৭ বছরে যুক্ত হয়েছে যার ৫৫% ভাগ বাণিজ্যিক ভবনের মাধ্যমে এসেছে। মূলত ৫৫.৬% ভাগ শিল্প উৎপাদনে কার্বন ডাই অক্সাইড নেট মিটারিংয়ের মাধ্যমে নিঃসরণ কমেছে। নেট মিটারিংয়ের সুবিধা দেওয়া হলে রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে মাত্র ৩০ ভাগ এলাকা থেকে প্রায় ৩৩ মেগাওয়াট নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব (প্রতিদিনের বাংলাদেশ, ২০২৪)।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে ইপিজেড দেশের বিনিয়োগে ধারাবাহিকতা, রপ্তানী আয়, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদিতে ব্যাপক অবদান রাখছে। ২০২২ অর্থবছরে ৬৪,১৬০ জন বাংলাদেশের নাগরিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে বেকারত্বের সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। অদূর ভবিষ্যতে ইপিজেড এ তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে (হোসাইন, ২০২২)।

ইপিজেড এর কারণে আয় বেড়েছে। যেমন বেপজা এর নির্বাহী চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল আবুল কালাম মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান বলেন- 'বেপজার জোনগুলোতে বিনিয়োগ ৭.০৮ বিলিয়ন ডলার, যার মধ্যে এফডিআই ৫ বিলিয়ন ডলারের বেশি। অর্থাৎ- দেশের মোট এফডিআইয়ের ছয় ভাগের এক ভাগ এসেছে মাত্র ০.০০১% জমিতে। ইপিজেড এর প্রতি একর জমি থেকে বছরে গড়ে সাড়ে ১০ কোটি টাকা আমাদের অর্থনীতিতে যোগ হয়, এটা বেপজার অনেক বড় একটি অবদান (বণিক বার্তা, ২০২৫)।

উপসংহার:

১৯৮০ দশকের শুরু হওয়া ইপিজেড এর ধারণা ও নানান অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত ইপিজেড বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত সরকারী আটটি ইপিজেড বৈদেশিক সরাসরি বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে উদ্যোক্তা, মালিক, এবং বিনিয়োগকারীকে নানানভাবে উৎসাহিত করছে। ইপিজেড এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, বৈদেশিক সরাসরি বিনিয়োগ বৃদ্ধি, শিল্পায়ন সচল ও চালু করা ও টেকসই বিনিয়োগ ইত্যাদি সুচারুরূপে পরিচালনা করার জন্য সরকারী বিভিন্ন ধরনের আইন ও নীতি প্রণয়ন করেছে যার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তা মেনে চলতে বাধ্য।

বাংলাদেশে ইপিজেড প্রতিষ্ঠা ও বৈদেশিক সরাসরি বিনিয়োগ মূলত দেশের অর্থনৈতিক গতি ও প্রকৃতি সচল রেখেছে। যেমন ১৯৮৮-৮৯ থেকে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে জিডিপিতে মোট আয় ছিল ৪১৯০৫.১ কোটি টাকা এবং একই সময়ে যার ডলার মূল্য ছিল ৪৯৪৪ মিলিয়ন ডলার। ইপিজেড যেমন দেশের জন্য আয় ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে তেমনি বিনিয়োগকারীরা অনেক সময় এ দেশে বিনিয়োগ করতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছেন। এ জাতীয় বিষয়াবলী সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আরো সোচ্চার হলে এ দেশে বিনিয়োগ আরো বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশে মজুরী কম হওয়া সত্ত্বেও যে পরিমাণ বিনিয়োগ ও উৎপাদন হওয়া উচিত তা বাড়াতে সংশ্লিষ্ট মহলকে আরো উদ্যোগ নিতে হবে। তাহলে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা যাবে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য ইপিজেড এর চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে টেকসই পদক্ষেপ নিতে হবে।

তথ্যসূত্র:

১. আলম, খ. এবং চৌধুরী, ত. ফ. (ফেব্রুয়ারি ২৫, ২০১৬). A catalyst for investments: Prospects
   a. and challenges. *The financial express*. The *Financial Express.* Retrieved on April 12, 2023 from https://thefinancialexpress.com.bd/views/analysis/a-catalyst-for-investments-prospects-and-challenges

২. জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬. (২০১৬). জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬. *শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ,* Retrieved on June
   a. 03, 2024 from https://bangladesh.gov.bd/sites/default/files/files/bangladesh.gov.bd/policy/d3d43078_64ad_4102_94cb_23722058dfdd/68.%20%E0%A6%9C%E0

৩. প্রতিদিনের বাংলাদেশ. (২০২৪). ইপিজেডে ৩৩৩ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব, *প্রতিদিনের বাংলাদেশ,*
   a. Retrieved on June 03, 2024 from https://protidinerbangladesh.com/national/99853/%E0%A6%87%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E

৪. বণিক বার্তা. (অক্টোবর ১৪, ২০২২). সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় থাকুক, *বণিক বার্তা,* Retrieved on
   a. June 03, 2024 from https://bonikbarta.net/home/news_description/316713/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%

৫. বণিক বার্তা. (আগস্ট ১২, ২০২৫). ৪৫ বছরে বেপজা : ইপিজেড, স্বাধীনতার পর দেশের সবচেয়ে সফল উদ্যোগ, *বণিক*
   ধ. *বার্তা,*https://www.bonikbarta.com/magazine/bepza/GuNEAwBUTsAdJnoU?fbclid=IwY2xjawMgpcFleHRuA2FlbQIxMQABHvB0soh8nyV_dzhDr7BPRvrFbzYO1kEpcPx2HcGAHN3K6a9YzTebrAmnTuu0_aem_h1Aq0ZLfCuF0GbRoq_k2eQ

৬. হোসাইন, সাদ্দাম. (২০২২). ইপিজেড রপ্তানী আয়ে রেকর্ড, *dhakatribunev,* Retrieved on June 03,
   a. 2024 from https://bangla.dhakatribune.com/economy/59469/%E0%A6%8

৭. রায়হান, জহির. (২০২২). বিনিয়োগ, রপ্তানি ও কর্মসংস্থানে ইপিজেডের রেকর্ড প্রবৃদ্ধি, *The Business*
   a. *Standard,* Retrieved on June 03, 2024 from https://www.tbsnews.net/bangla/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF/news-details-111610

৮. Alam, Md. M., Molla, R. I., & Murad, Md. W. (2014). MALAYSIA'S
   a. PROACTIVE ECONOMIC ZONE REGIME AS A MODEL TO EMULATE FOR SUCCESS OF BANGLADESH ECONOMIC ZONE SCHEME. *The Journal of Developing Areas*, *48*(2), 399–407. http://www.jstor.org/stable/23723982

৯. Bangladesh Bank. (n.d.). Export of Export Processing Zones (EPZ), *Bangladesh*
   a. Bank, Central Bank of Bangladesh, https://www.bb.org.bd/en/index.php/econdata/epzexp

১০. BEPZA. (n.d.). Financial Growth, *Bangladesh Export Processing Zone*
   a. *Authority,*https://www.bepza.gov.bd/content/financial-growth

১১. Chowdhury, S. T. (August 17, 2025. BEPZA at 45: achievements, obstacles, and future.*THE*

ধ. *FINANCIAL EXPRESS*. https://thefinancialexpress.com.bd/views/reviews/bepza-at-45-achievements-obstacles-and-future

১২. Fakir, A N M Asaduzzaman & Miah, Muhammad & Hossain, Md. (2013). Export
a. Diversification and Role of Export Processing Zones (EPZ) in Bangladesh. ASA University Review. Vol. 7. 89-105. 10.6084/m9.figshare.4128873.

১৩. Hasan, S. B., & Ali, M. K. (2019). The Role of Export Processing Zones on
a. Bangladesh National Economy. *Global Scientific Journal*, 7(7), 452-467.

১৪. Khan, A., & Sultana, M. (2013). Impact of Foreign Direct Investment on the
a. Exports: Bangladesh Perspective. *Jagannath University Journal of Business Studies*, *3*(2), 55-68.

১৫. Kafi, M. A., Mainuddain, M., & Islam, M. M. (2007). Foreign direct investment in
a. Bangladesh: Problems and prospects. *Journal of Nepalese Business Studies*, *4*(1), 47-61.

১৬. Rifat, Adnan. (2024). An overview of EPZ Labour Act 2019 and detailed
a. comparison between Bangladesh Labour Act 2006 and EPZ Labour Act 2019.Link:https://www.researchgate.net/publication/377075891_An_overview_of_EPZ_Labour_Act_2019_and_detailed_comparison_between_Bangladesh_Labour_Act_2006_and_EPZ_Labour_Act_2019

১৭. Rayhan, M. A. (2009). Foreign direct investment in Bangladesh: Problems and
a. prospects. *ASA University Review*, *3*(2), 101-113.

১৮. Sarker, M. A. R. (2005). Prospects and challenges of industrialization in
a. Bangladesh. *Bangladesh Economic Association, Dhaka*.

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1979-1994
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.423

গণতন্ত্র, গণমাধ্যম ও সুশাসনের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ: বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে একটি পর্যালোচনা

মো. হাবিবুর রহমান, *রিসার্চ ফেলো, ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ এক্সিলেন্স, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ*
মেহজাবীন ইলাহী, *সিনিয়র অফিসার ও গবেষক, ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ এক্সিলেন্স, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ*
মোঃ কামাল উদ্দিন, *প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, আতাকরা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, বাংলাদেশ*
লুবনা আক্তার, *সহকারী অধ্যাপক, জেন্ডার ও ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ*

Received: 25.03.2026; Accepted: 28.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

There exists a triangular interrelationship among democracy, mass media, and good governance. When any one of these components is negatively affected, imbalance emerges within the system, ultimately impacting the overall stability and development of a country. The nature and quality of democracy, media, and governance significantly shape a country's democratic character. This study aims to analyze the interrelationship between democracy, mass media, and good governance, and to examine various global indicators related to these fields. The findings suggest that democracy plays a crucial role in establishing a non-discriminatory society and ensuring good governance. People's participation in the democratic process and the accountability of elected representatives facilitate the advancement of good governance within democratic systems. However, the core principles of democracy are increasingly challenged. Declining positions of many states in global democracy indices, fluctuations in democratic performance, and the persistent negative impact of military intervention in governance demonstrate significant setbacks. The study further identifies growing hostility toward mass media, increased government pressure on media institutions to serve political agendas, and rising threats to democratic institutions. Despite the growth in the number of democratic institutions worldwide, concerns remain regarding media freedom and political interference. The findings emphasize that a pluralistic media environment enhances transparency and balance of power. Furthermore, effective decentralization of authority is essential in multicultural societies, along with political consensus to ensure integration and democratic stability.

Keywords: Democracy and Governance, Mass Media and Political Communication, Good Governance, Media Freedom and Political Interference, Democratic Stability and Participation

বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের শোচনীয় অবস্থা বিরাজ করার কারণে কিছু রাষ্ট্রে অগণতান্ত্রিক আচরণ, নাগরিক সমাজ মৌলিক ও মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে, একটি রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নাজুক পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। The Economist Intelligence Unit-এর মতে, ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে গণতন্ত্র সূচক প্রতিবেদনে গণতন্ত্রের বিভিন্ন নেতিবাচক দিক তুলে ধরা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী একাধিক গণতান্ত্রিক স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে পরিপূর্ণ গণতন্ত্রের সুবিধাভোগী রাষ্ট্রের তালিকায় মাত্র ১৯টি রাষ্ট্রের নাম রয়েছে। অন্যদিকে অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিযুক্ত গণতান্ত্রিক দেশের তালিকায় নাম রয়েছে মাত্র ৫৭টি দেশের (EIU, 2017; Harris, 2018) । যদিও সংবাদপত্র সমাজ ও রাষ্ট্রের দর্পন হিসেবে বিবেচিত তবুও রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক সংবাদপত্রকে ইদানিং জনগণের শত্রু হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। Reporters Without Borders কর্তৃক প্রকাশিত বৈশ্বিক গণমাধ্যম স্বাধীনতা (World Press Freedom) সূচক-২০১৮ খ্রিষ্টাব্দের প্রতিবেদনে ১৮০ টির মধ্যে কিছু রাষ্ট্রে গণমাধ্যমের প্রতি বৈরিতা পোষণ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সত্য তথ্য প্রকাশে হুমকি প্রদর্শন ইত্যাদি কারণে গণমাধ্যমের প্রতি হুমকি ও চ্যালেঞ্জ বেড়েই চলছে। ফলশ্রুতিতে আইনের শাসন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা বিঘ্নিত হচ্ছে (RSF, 2018)।

নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠান গণতন্ত্রের অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে অন্তর্ভূক্ত। গণতন্ত্রায়ন ও নির্বাচন প্রক্রিয়া একই সূত্রে গাঁথা একটি মালা স্বরূপ। এ নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করে। নির্বাচনে জনসমষ্টির ইচ্ছা রাষ্ট্রে ও সমাজে প্রতিফলিত হওয়ার কারণে নির্বাচনকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মৌলিক উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয় (শরীফ, ২০১৬)। অন্যদিকে কখনো কখনো অর্থই তথ্য পাওয়ার প্রধান অনুঘট হিসেবে কাজ করে। মাঝে মাঝে অর্থই তথ্য পাওয়ার প্রধান অনুঘট হিসেবে কাজ করে থাকে (Williams et al.,1994)। গণমাধ্যম সরকারি কার্যক্রমে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটা অনেক দিন যাবৎ এক প্রকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে গণমাধ্যম সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (Besley & Prat, 2006)।

মুক্ত, স্বাধীন এবং বহুমাত্রিক মিডিয়া গণতান্ত্রিক শাসনের মৌলিক বিষয় হিসেবে বিবেচিত। গণমাধ্যম সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার, অযোগ্যতা বা দুর্নীতির উপর নজরদারির মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ ওয়াচ-ডগ (watch-dog) হিসেবে ভূমিকা পালন করে, এমন কিছু তথ্যের অ্যাক্সেস প্রদান করে যা নাগরিকদের সচেতন পছন্দ করতে সক্ষম করে এবং বিতর্কের জন্য সর্বজনীন স্থান উন্মুক্ত করে (দারিদ্র্য এবং বর্জন সংক্রান্ত বিষয়গুলি সহ)। এটি সামাজিক সমস্যাগুলিও প্রকাশ করে, সচেতনতা বাড়ায় এবং রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়ার জন্য চাপ তৈরি করে (DFID, 2008)। সতুরাং গণমাধ্যম একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে Atlantic Charter -এ কথা বলার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে (UN, 1947)। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র মানব নিরাপত্তার উন্নতির পাশাপাশি আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় শান্তি উন্নত করে। স্বল্প মিডিয়া স্বাধীনতা এবং সংকুচিত গণতন্ত্রের ফলে একটি বিশ্বকে আরও সংঘাত, নিরাপত্তার অবনতি এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন বাড়িয়ে দেয় (Marina Nord, Martin Lundstedt, and Staffan I Lindberg, 2024)।

বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের গণতন্ত্রের স্বরূপ এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে। যেমন বাংলাদেশ গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু করলেও বিভিন্ন সময় গণতান্ত্রিক হোঁচট খাচ্ছে। ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দে শেষের দিকে ড. মুহাম্মদ ইউনূস যখন বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব নেন, তখন তিনি একটি জাতীয় পুনর্জন্মের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ছাত্র-নেতৃত্বাধীন বিক্ষোভ ও গণঅভ্যুত্থানের কারণে শেখ হাসিনা (সাবেক প্রধানমন্ত্রী) এবং তার দল আওয়ামী লীগকে পতনের পর ক্ষুদ্রঋণের অগ্রগামী ও নোবেল বিজয়ীকে দেশের অন্তর্বর্তীকালীন নেতা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। গত ১৫ বছর তিনি (শেখ হাসিনা) ক্রমবর্ধমান স্বৈরাচারের সাথে ১৭০ মিলিয়নের দেশ পরিচালনা করেছিলেন, এর প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন এবং এর মজুদ হ্রাস করেছিলেন। বাংলাদেশে এবং তার বাইরে গণতন্ত্রের বিজয় হিসেবে তার পতন উদযাপন করা হয়। আগামী বছরটি (২০২৬) হবে দেশের ভবিষ্যৎ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ (Vishnu Padmanabhan, 2025)।

গবেষণালব্দ ফলাফল পৃথিবীব্যাপী গণতন্ত্র বিষয়ক গবেষক, গণতান্ত্রিক সরকার, গণতন্ত্র কর্মী, জনপ্রতিনিধি, ভোটার, গণমাধ্যমকর্মী, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কর্মী, উন্নয়ন ও সুশাসন কর্মী, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট গবেষকদের গণতন্ত্র, গণমাধ্যম ও সুশাসনের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক সম্পর্কে পর্যালোচনা

এবং এতদবিষয়ক বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অবস্থা জানা ও সে সম্পর্কে করণীয় বিষয় সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে। এ প্রবন্ধে মূলত গণতন্ত্র, গণমাধ্যম ও সুশাসনের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক সমন্ধে তুলনামূলক একটি বিশ্লেষণ তুলে ধরার পাশাপাশি এ গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য হল গণতন্ত্র, গণমাধ্যম ও সুশাসন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন সূচকে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট নিয়ে পর্যালোচনাসহ বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতিঃ

গবেষণাটি মূলত সাহিত্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঐতিহাসিক বিবরণ (Historical Description) ও গুণগত পদ্ধতিকে (Qualitative Method) অনুসরণ করে সম্পন্ন করা হয়েছে। যেহেতু গণতন্ত্র ৫ম শতাব্দিতে উদ্ভব হয়ে এখনো পযর্ন্ত তুলনামূলকভাবে একটি গ্রহণযোগ্য শাসন ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। পরবতী সময়ে গণমাধ্যমে উদ্ভব ও নব্বইয়ের দশকে সুশাসন প্রত্যয়টির আবির্ভাবের কারণে ঐতিহাসিক বিবরণ পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। এ গবেষণায় আলোচ্য গবেষণাকর্মটি দ্বিতীয় স্তরের তথ্য (Secondary Source) ভিত্তিক সম্পন্ন করা হয়েছে। অত্র গবেষণাং তথ্য সংযোজনের ক্ষেত্রে গবেষণার প্রাসঙ্গিকতা ও নিরপেক্ষতার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এ গবেষণা সম্পাদনের জন্য মাধ্যমিক উৎসের মধ্যে দেশি বিদেশি পুস্তক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রসিদ্ধ জার্নাল, সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, সমসাময়িক প্রবন্ধ এবং বিভিন্ন গবেষণা কর্ম থেকে অত্র গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে মিল রেখে তথ্য সংযোজন করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী গবেষণা গ্রন্থের পর্যালোচনা (Literature Reviews)

গণতন্ত্র, গণমাধ্যম ও সুশাসন বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে বহু গবেষক অনেক গবেষণাকর্ম সম্পাদনা করেছেন। এ সকল গবেষণায় বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে বিবিধ উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে নানা তত্ত্বের আলোকে সম্পাদনা করা হয়েছে। তাছাড়া এ সকল গবেষণাকর্মে বিভিন্ন রাষ্ট্রে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও গণমাধ্যমের বর্তমান অবস্থা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

গণতান্ত্রিক ও অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা

Timothy Besley এবং Andrea Prat (2006) বইয়ে দখলকৃত হাতে হাতকড়া এবং গণমাধ্যমের উপর নিয়ন্ত্রণ এবং সরকারের জবাবদিহিতা সম্পর্কে তাঁরা একটি গবেষণাকর্ম সম্পাদনা করেছেন। রাশিয়ার গণমাধ্যমের স্বাধীনতার নিশ্চয়তার বিধান থাকলেও অনেকাংশে তা অনুপস্থিত। রাশিয়ার ফেডারেশনের সংবিধানের ২৯.৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে পাশাপাশি সেন্সরশীপ আরোপ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চয়তা অধরাই থেকে যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ রাশিয়ার ঘটনাকে উল্লেখ করা যায়। পুরাতন প্রচলিত প্রতিরক্ষামূলক বিভিন্ন আইনগত বিধান থাকা সত্ত্বেও রাশিয়ার গণমাধ্যম অধিক পরিমাণে বর্তমানে সেন্সরশীপ আরোপসহ বিভিন্নভাবে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। বর্তমানে সকল জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমগুলো রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত কোম্পানি কর্তৃক মালিকানা দখল হয়ে আছে। অধিকাংশ জাতীয় পত্রিকা নির্দিষ্ট ধনবান ব্যক্তির মাধ্যমে পরিচালিত হয় যা স্বাভাবিকভাবে রাজনৈতিক চাপের জন্য খুব একটা কার্যকর নয়। Freedom House-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে আনুষ্ঠানিক সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক প্রভাব সম্পর্কিত এ দুইটি বিষয়ের অমিল দেখা যায় যথা থাইল্যান্ড থেকে ইতালি এবং ভারত থেকে মেক্সিকোতে তা ভিন্ন অবস্থা পরিলক্ষিত হয়।

প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণমাধ্যমের প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি

Robert P. Snow (1987) তার বইতে প্রিন্ট মিডিয়াকে (সংবাদপত্র) দৈনন্দিন প্রতিষ্ঠান হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ প্রবন্ধে তিনি Newspaper, The Daily Institution শীর্ষক ২য় অনুচ্ছেদে সংবাদপত্রের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে এটাকে সমাজের একটি ছোট প্রতিষ্ঠান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়াও এ পুস্তকে তিনি সংবাদপত্রের ব্যাকরণগত দিক, শব্দভান্ডার, বাক্য গঠন, গণমাধ্যমের প্রভাব সম্পর্কেও আলোপাত করেছেন। Timothy Besley & Andrea Prat (2006) গণমাধ্যমের দখল এবং সরকারের জবাবদিহিতা নিয়ে একটি গবেষণাকর্ম সম্পাদন করেছেন। এ গবেষণা প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য ছিল তত্ত্বীয় দৃষ্টিকোন থেকে কিভাবে এবং কখন সরকার গণমাধ্যমকে

শাসন করে এবং এর উপর রাজনৈতিক ফলাফলে কি প্রভাব পড়ে সে সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। এ গবেষণা প্রবন্ধে তাঁরা মিডিয়া Capture এবং সরকারের জবাবদিহিতা নিয়ে বিভিন্ন সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। এ প্রবন্ধের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হল গণমাধ্যম প্রভাবের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিষয়াবলী দেখা।

গণমাধ্যমে অর্থের ভূমিকা

Williams et al., (1994) তাঁদের পুস্তকে গণমাধ্যম ও গণতন্ত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করেছেন। এ বইয়ে তাঁরা দেখিয়েছেন যে অর্থ কখনো কখনো তথ্য পাওয়ার মূখ্য ভূমিকা পালন করার পাশাপাশি এ স্তরে তারা ইলেকট্রনিক যুগে সংবাদপত্রের অবস্থা ও ডিজিটাল যুগে গণমাধ্যমের ভূমিকা, গণমাধ্যমের পরিধি, ইলেকট্রনিক সংবাদপত্রের উৎপত্তি এবং সংবাদপত্র ব্যবসার প্রতি হুমকি প্রদর্শন ইত্যাদি বিষয়াবলী নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

গণমাধ্যম ও গণতন্ত্রের উত্থান-পতন

Asian Media Information and Communication Centre (2000) কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকে এশিয়ায় গণমাধ্যম ও গণতন্ত্র নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ প্রবন্ধে অত্র অঞ্চলে কিছু রাষ্ট্রে গণমাধ্যম ও গণতন্ত্রের বিস্তার হওয়াতে কিছুটা ইতিবাচক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে। কিন্তু সাংবাদিকতার যে পেশাদারিত্ব ও নৈতিক গুণাবলি প্রয়োজন তা ঘাটতি থাকাতে উদ্বেগের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এমনও অনেক রাষ্ট্র রয়েছে যেখানে গণমাধ্যমকে কণ্ঠরোধসহ বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থায় খুবই শোচনীয় অবস্থার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। কেননা কিছু দেশে গণমাধ্যমকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকার বা সরকারি প্রতিষ্ঠান গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি সেন্সারশীপ-এর গঠনপ্রণালী ও বিধিনিষেধ আরোপসহ এবং সার্বিক কাঠামো আশাব্যঞ্জক নয়। এমাজ উদ্দীন আহমদ (১৯৯৩) তার পুস্তকের দক্ষিণ এশিয়ার গণতন্ত্র শীর্ষক পরিচ্ছেদে গণতন্ত্রের পরিচিতি আলোচনায় সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা ও আইনের শাসনকে গণতন্ত্রের অন্যতম দিক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের সাথে অধুনা বিশ্বে স্বাধীনতা লাভের পর যে সকল রাষ্ট্র গণতন্ত্র গ্রহণ করেছে, সে সকল দেশের গণতন্ত্রের স্বরূপ তিনি বর্ণনা করেছেন। এতে তিনি এশিয়ার কয়েকটি এবং বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি রাষ্ট্রের গণতন্ত্রের উত্থান-পতন সম্পর্কে বর্ণনার পাশাপাশি সংকট উত্তরণে করণীয় দিক বর্ণনা করেছেন।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের সম্পর্ক

Adel M. Abdellatif (2003) সুশাসন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে একটি গবেষণা প্রবন্ধ সম্পাদন করেছেন। গণতন্ত্র, সুশাসন নিয়ে বিদ্যমান বিভিন্ন ধরনের প্রবন্ধ ও গবেষণাকর্ম গণতন্ত্র এবং শাসনের উচ্চ ও নিম্ন মান নিয়ে গণতন্ত্রের মান নিয়ে নানা ধরনের যুক্তি তর্ক উপস্থাপন করা হয়েছে। তিনি তার প্রবন্ধে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাজনৈতিক, বেসামরিক, ও নাগরিক অধিকার এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনত, অন্যান্য বিষয় ভাল মানের শাসন পেতে সম্পর্কিত নাও হতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের আদলে অগণতান্ত্রিক আচরণ, কুশাসন চালু থাকতে পারে।

পূর্ববর্তী গবেষণা গ্রন্থের পর্যালোচনায় গণতন্ত্র, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, এবং সুশাসনের নানান দিক আলোচিত হয়েছে। এখানে যে সকল বিষয় আলোচিত হয়েছে, তা বর্তমান গবেষণা থেকে একটু ভিন্ন। তবে অত্র গবেষণায় গণতন্ত্র, গণমাধ্যম ও সুশাসনের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ পূর্বক বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে একটি পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

তাত্ত্বিক কাঠামো

গণতন্ত্র

Democracy বা গণতন্ত্র শব্দটি আক্ষরিকভাবে জনগণের শাসনকে বুঝায়। গণতন্ত্র শব্দটি গ্রিক 'Demokratia' শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। যা সম্মিলিতভাবে Demos (people) বা জনগণ এবং Kratos (rule) বা শাসন ক্ষমতাকে বুঝায়। ৫ম শতাব্দিতে উদ্ভূত হওয়া এ প্রত্যয়টি এমন একটি রাজনৈতিক পদ্ধতিকে বুঝায় যা সে সময়ের গ্রিক নগর রাষ্ট্রে বিশেষভাবে এথেন্সে জনপদে বিদ্যমান ছিল (Dahl, 2018)। গণতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল, Democracy। ১৬ শতকে ইংরেজিতে এ শব্দটির প্রথম ব্যবহার হয়। ফরাসি Democratie শব্দ থেকে ইংরেজি Democracy শব্দ

থেকে এসেছে (শরীফ, ২০১৬)। আলোচ্য গবেষণায় গণতন্ত্র বলতে সকল রাজনৈতিক দলের মধ্যে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এবং জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভোট দানের মাধ্যমে যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচিত করার প্রক্রিয়ার নামকেই গণতন্ত্র নামে অবিহিত করা হয়েছে। এ ছাড়াও এ প্রবন্ধে গণতন্ত্রের আলোচনায় এমন গণতন্ত্রকে বুঝানো হয়েছে যেখানে সকল রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে উপযুক্ত জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করার পাশাপাশি রাজনৈতিক ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, আইনের সুশাসন ও সুশাসনের উপস্থিতি ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে।

গণমাধ্যম

সাধারণত গণমাধ্যম বলতে এমন কতগুলো যোগাযোগের মাধ্যমকে বুঝায় যার মধ্যে অন্যতম হল পত্রিকা, বেতার, টেলিভিশন এবং ইন্টারনেট। গণমাধ্যম জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নিদিষ্ট কিছু বিষয় ও ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে জনমত গঠনে সাধারণত সহায়তা করে থাকে (Davison, 2017)। সমসাময়িক গণমাধ্যমের বিভিন্ন রূপের মধ্যে সংবাদপত্র, সাময়িকি বা ম্যাগাজিন, টেলিভিশন, এবং বেতারকে সাধারণত বুঝানো হয়ে থাকে (Williams et al., 1994)।

আলোচ্য গবেষণায় গণমাধ্যম বলতে শধুমাত্র সংবাদপত্র, সাময়িকি বা ম্যাগাজিন, টেলিভিশন ও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ফেসবুক (Facebook), টুইটার (Twitter) ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম এ আলোচনায় অন্তর্ভূক্ত করার কারণ হল-বর্তমানে এ মাধ্যম গণমাধ্যমের বিকল্প হিসেবে কখনো কখনো ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ ছাড়াও এ গবেষণায় একটি রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় গণতন্ত্র ও সুশাসনের স্বরূপ উন্মোচনে গণমাধ্যম কর্তৃক যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

শাসন ও সুশাসন

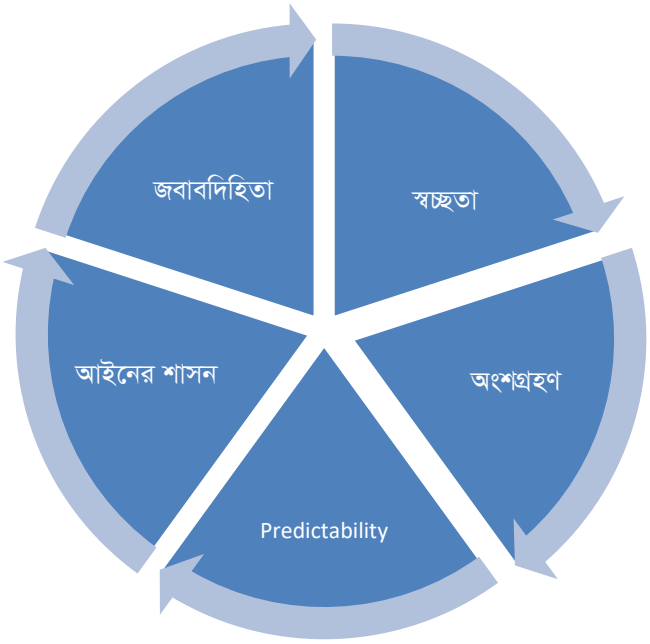
শাসন

বর্তমান সময়ে আইন প্রণেতা, আন্তর্জাতিক দাতাগণ, বিশেষ করে গবেষকদের নিকট শাসন প্রত্যয়টি ব্যাপকভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। শাসন এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত তৈরি করা হয় এবং ঐ সকল সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন হয়। শাসন শব্দটি বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে বিভিন্ন অর্থ বুঝায়। নাগরিকদের অন্যতম প্রত্যাশা হল যথাযথ কর্তৃপক্ষ থেকে সুশাসনের নিশ্চয়তা দেয়া। দুঃশাসন বলতে আইনের অপশাসন, অতিরিক্ত শাসন ও নিয়ম-কানুনের আড়ম্বর, প্রাকৃতিক সম্পদের অসম বণ্টন ইত্যাদি বিষয়কে অন্তর্ভূক্ত করা (Rahman, 2014)।

সুশাসন

বিশ্বব্যাংকের মতে, সুশাসনের মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠানের একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বিদ্যমান থাকা, যার মাধ্যমে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা, কার্যকারিতা এবং অর্থনৈতিক সক্ষমতা থাকবে পাশাপাশি জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতার সাথে তথ্যের আদান-প্রদানের অবাধ সুযোগ এবং উন্নয়নের জন্য আইনগত ভিত্তি যেখানে ন্যায় বিচার, মানবাধিকার ও স্বাধীনতা সমন্বিত থাকবে (ECOSOC, 2006)।

সুশাসন নিয়ে বিভিন্ন সংজ্ঞা ও পর্যবেক্ষণ রয়েছে। মানবাধিকার কাউন্সিল এর মতে সুশাসনের যে মূল বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে, তার মধ্যে যথাক্রমে- স্বচ্ছতা, দায়িত্ব, জবাবদিহিতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা (জনগণের প্রয়োজনে) এবং অংশগ্রহণ (OHCHR,1996-2026)। এ গবেষণা প্রবন্ধে একটি রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ এবং আইন বিভাগে কেউ বৈষম্যের শিকার না হয়ে নিরপেক্ষ ও সুবিচার পেয়ে থাকে এমন ধরনের সুশাসনকে বুঝানো হয়েছে। আইনের শাসন ও সার্বিক কর্মকান্ডে ভাল শাসনের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় এমন ব্যবস্থাকে বুঝানো হয়েছে।



চিত্র ০১: সুশাসনের উপাদান (সূত্র, Rahman, 2014)।

সুশাসন শাসনের এমন একটি গুণ যার মাধ্যমে এমন কিছু বিষয়াবলি যেমন একটি রাষ্ট্রের সার্বিক কর্মকান্ডে জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, কার্যকর, ক্ষমতায়ন, অংশগ্রহণ, টেকসই, নিরপেক্ষতা, এবং ন্যায়বিচার ইত্যাদি বিষয়কে অন্তর্ভূক্ত করে। শাসন পূর্বসংকেত (Predictability) বলতে আইন এবং নীতির স্বচ্ছতা এবং নিরবিচ্ছিন্নভাবে সমাজে প্রয়োগ হওয়ার পাশাপাশি এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্র এবং এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠানগুলো আইনের কাছে বাধ্য থাকবে (Rahman, 2014)।

আলোচ্য গবেষণায় সুশাসন বলতে একটি দেশের মধ্যে বিচারবিভাগ, শাসনবিভাগ ও আইন বিভাগসহ সমগ্র দেশের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা এবং আইনের শাসনের উপস্থিতি ও কার্যকারিতাকে ইত্যাদি বিষয়াবলীকে অন্তর্ভূক্ত করে।

গণতন্ত্র, গণমাধ্যম ও সুশাসন: আন্তঃসম্পর্ক

কোন কোন গবেষক গণতন্ত্র এবং সুশাসনের সুনিবিড় সম্পর্ক হিসেবে উল্লেখ করেছেন (Abdellatif, 2003)। আলোচ্য গবেষণায় গণতন্ত্র, গণমাধ্যম ও সুশাসন: আন্তঃসম্পর্ক বলতে একটি রাষ্ট্রে বা সমাজে গণতন্ত্র ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চয়তার মাধ্যমে যে সুশাসন পরিলক্ষিত হয় তাকে বুঝানো হয়েছে।

গণতন্ত্র, গণমাধ্যম ও সুশাসন: আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ

বৈষম্যহীন সমাজ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গণতন্ত্র

গণতন্ত্র, গণমাধ্যম ও সুশাসন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটি বাধাগ্রস্ত হলে অন্যটির উপর প্রভাব পড়ে থাকে। কখনো কখনো একটি প্রক্রিয়া সঠিকভাবে কাজ না করলে তা সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য বহু নেতিবাচব ফলাফল বয়ে আনে। গণতন্ত্র হল এমন একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া যে ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের পছন্দীয় সরকারের ধারাবাহিক পরিবর্তনের রীতিসিদ্ধ সাংবিধানিক সুযোগ, অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের ব্যবস্থা, একাধিক রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতি, সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা এবং সর্বোপরি স্বাধীন বিচার বিভাগ বিদ্যমান থাকাকে বুঝায়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণত আইন হল সার্বজনীন। আইনের প্রতি সকল জনগণের আনুগত্য প্রকাশ হল গণতন্ত্রের অন্যতম অঙ্গিকার। পাশ্চাত্যে মূলত দু'টি কারণে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এক পরিপূর্ণ ব্যবস্থা হিসেবে রূপান্তরিত হয়েছে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তিভূমি

হিসেবে যে সামাজিক বলয় গড়ে উঠেছে তা মোটামোটিভাবে সমতল ও মসৃণ। অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা সমাজে ও রাষ্ট্রে এমনভাবে সুবিন্যস্ত যা প্রত্যেক শ্রেণি ও সম্প্রদায়ের মানুষের সবধরনের প্রযোজন মেটাতে পারে। মূলত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এক বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে উঠে। ফলশ্রুতিতে সমাজ ও রাষ্ট্রে সুশাসনের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় (আহমদ, ১৯৯৩)।

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থা ও জনপ্রতিনিধিদের দায়বদ্ধতা

প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্র সুশাসনের জন্য কঠোরভাবে আবশ্যকীয় বিষয় নয় যেমনিভাবে দুঃশাসন আনুষ্ঠানিক গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামোতেও সম্পূর্ণরূপে সম্ভব। এ ছাড়াও গণতান্ত্রিক পন্থায় মুক্ত, স্বচ্ছ এবং প্রতিযোগিতাপূর্ণ নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে খারাপ ও দুর্নীতি পরায়ন রাজনৈতিক নেতাকে বাদ দিয়ে যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচিত করার সুযোগ করে দেয়। ফলশ্রুতিতে, জনসাধারণের চাহিদা পূরণ করার জন্য কার্যকরভাবে শাসন উপহার দিতে সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক নেতাদের উৎসাহিত করে। এ ছাড়াও গণতন্ত্র নাগরিকদেরকে অনির্বাচনী উপায়ে তথা সংঘ, আন্দোলন, সরকারি কর্মকর্তাদের গণমাধ্যমের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ এবং বিভিন্ন ধরনের নীতি তৈরিতে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়। অধিকন্তু, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ জোরালোভাবে বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনার সম্পর্কিত উদ্যোগ (অধিকভাবে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক উপায় এবং বাধ্যবাধকতা তৈরিকৃত জনমত) প্রণয়নে সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা ও যৌক্তিকতা নির্ণয়ে এ সম্পর্কিত বিবিধ সিদ্ধান্ত তৈরির পূর্বে নির্বাচনী এলাকাগুলোতে ব্যাপকভাবে গণসংযোগ ও পরামর্শগ্রহণ করতে হয়। এ ধরনের অংশগ্রহণ এবং বিতর্ক জনগণকে নীতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে ও নিজের মধ্যে দৃঢ় প্রত্যয় ও আইন মানার মানসিকতা জাগ্রত হয়। ফলশ্রুতিতে, এ সকল নীতিসমূহ (আইন-কানুন) অধিক টেকসই এবং সরকারকে অধিক বৈধতা প্রদানের সুযোগ করে দেয়। এ সকল এবং অন্যান্য কারণে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলো ব্যাপকভাবে গণতন্ত্র এবং সুশাসনকে উৎসাহিত করছে (Abdellatif, 2003)।

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সুশাসনের পথ সুগম

USAID-এর প্রতি প্রতিবেদনে Foreign Aid in the National Interest-এ গণতন্ত্র এবং সুশাসনকে পারস্পারিক শক্তিশালী প্রত্যয় হিসেবে দেখানো হয়েছে। যখন এগুলো একত্রে উন্নীত করা হয় তখন জনসাধারণের জন্য ধন-সম্পদের সঠিক ব্যবহার করার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়। এ ছাড়াও নিম্নলিখিত বিষয়াবলী, কার্যক্রম অর্জন ও বাস্তবায়নে সহায়তা করে। যেমন, সরকারি প্রতিষ্ঠান তাদের কর্মপরিধি অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা, সামাজিক মতাঐক্য সহায়তা এবং সরকারের বিভিন্ন পদ্ধতি স্থায়ীকরণ, বিভিন্ন দ্বন্দ্ব শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিরসন এবং টেকসই সরকার ঝুঁকি কম থাকার কারণে দেশে বিনিয়োগ মসৃণভাবে পরিচালিত হয়। পাশাপাশি আইনের শাসন, সরকারের বৈধতা এবং স্বচ্ছতার কারণে নিম্ন খরচের কারণে লেনদেন হয় (Abdellatif, 2003)।

গণতন্ত্র দুর্নীতিপরায়ন শাসকদের জন্য অভিশাপ

গণতন্ত্র, সুশাসনের মধ্যে এক সুনিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। প্রথমত গণতন্ত্রের মাধ্যমে জনগণ শান্তিপূর্ণভাবে, নিয়মিত অনপযুক্ত, অকার্যকর এবং দুর্নীতি পরায়ন সরকারি প্রশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য অনুমতি প্রদান করে যার মাধ্যমে জনসাধারণ কার্যকর, সফলজনক শাসন পেতে সহায়তা প্রদান করে। ফলশ্রুতিতে, এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী শাসনের মান বাড়ার পাশাপাশি জনগণের মধ্যে সুশাসন পাওয়ার প্রত্যাশা বেড়ে যায়। অপরপক্ষে, স্বৈরশাসনের মাধ্যমে উদ্দেশ্যহীনভাবে যদিও ভাল মানের শাসন বা সুশাসন পাওয়া যায় কিন্তু যদি শাসক তা না করে তাহলে শাসকগোষ্ঠী এ প্রক্রিয়ায় শুধুমাত্র জোরারোপ করে ক্ষমতার পালাবদল করতে হয় যা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের তুলনায় কখনো কখনো অনেক বছর বা দশকও লেগে যায়। স্বৈরশাসকদের শাসনকালে দুঃশাসনের বিভিন্ন নীতি চলমান থাকার সর্বোচ্চ সম্ভাবনা থেকে যায় (Abdellatif, 2003)।

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় স্বৈরশাসনের উপস্থিতি

আবার অনেক সংখ্যক লেখক উল্লেখ করেছেন যে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের অধীনে বিভিন্ন প্রকারের ব্যক্তি কিংবা দলের (Interest Groups) ক্ষমতার প্রতি আগ্রহ ও পাওয়ার জন্য প্ররোচনা (Lobbying) এবং বিবিধ কারণে নীতি প্রণয়নে অচলাবস্থার সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিজস্ব স্বার্থ রক্ষার কারণে গুরুত্বপূর্ণ নীতি প্রণয়নে বাঁধা হয়ে দাড়ায়। এ ছাড়াও ভিন্ন পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। যেমন, রাজনৈতিক এবং বেসামরিক অধিকারের

উপর বিধি নিষেধ আরোপ করার ফলশ্রুতিতে গত ৩০ বছর যাবৎ সিঙ্গাপুরের যে প্রবৃদ্ধি উল্লেখজনক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় সেখানে উদ্বেগ পরিলক্ষিত হয়েছে। নিম্ন স্তরে (Grassroots), অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নির্বাচনী গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এ বিষয়টি বিরাটভাবে পার্থক্য প্রদর্শিত হয়। প্রকৃতপক্ষে নির্বাচনী ভোটে আর্থিকভাবে সামর্থ্যবান ব্যক্তি বা দলকে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় প্রভাবিত করতে সহায়তা প্রদান করে। ল্যাটিন আমেরিকার অবস্থার পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে পিরো গ্লিজেস (Piero Gleijeses) এ উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন। বাইর থেকে যদিও তা গণতন্ত্র পোশাকে আবৃত তথাপিও ভেতরে তা স্বৈরশাসক পদ্ধতির আভাস পাওয়া যায় (Abdellatif, 2003)। এছাড়াও উন্নত এবং উন্নয়নশীল বিশ্বে গণতন্ত্রের খোলসে স্বৈরতন্ত্রের উদ্ভব লক্ষ্য করা যায়। নির্বাচনী প্রক্রিয়া প্রশ্নবিদ্ধ, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস এবং অবাধ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত না করে কোনমতে ক্ষমতার পালাবদল হয়, যা ফ্যাসিজম, স্বৈরাচার এবং নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের চিত্র ফুটে ওঠে।

গণতন্ত্র, গণমাধ্যম ও সুশাসনের বর্তমান চিত্রঃ বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সমস্যা সমাধান ও আলোচনার দ্বার উন্মোচন

ECOSOC (২০০৬) এর প্রকাশিত প্রদত্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে যে, Thomas G. Weiss-এর মতে বৈশ্বিক সুশাসন হল সম্মিলিত প্রচেষ্টার এমন মাধ্যম যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন সমস্যাগুলো চিহ্নিতকরণ, উপলব্দি এবং সমাধানের চেষ্টা করা হয়ে থাকে এবং যা কখনো কখনো কোন একক রাষ্ট্রের সমাধানের বা আয়ত্বের বাইরে চলে যেতে পারে। তিনি এর মাধ্যমে জটিল আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বিবিধ পন্থা, সম্পর্ক এবং বাজার, নাগরিক এবং সংস্থাসমূহের মধ্যে বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে অন্তর্ভূক্ত করে। এ ছাড়াও আন্তঃ ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ যা যাদের পারস্পারিক সম্পর্কের মাধ্যমে বৈশ্বিক পরিকল্পনা স্পষ্ট ভাষায় রূপদানে সক্ষম করার পাশাপাশি অধিকার ও বিভিন্ন বাধ্যবাধকতার বিষয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন ধরনের মতভেদ ও বিবাদ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হয়। ফলশ্রুতিতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায় (ECOSOC, 2006)।

দরিদ্রতা দূরীকরণে গণতান্ত্রিক সরকার ও সুশাসনের ভূমিকা

দরিদ্রতা দূরীকরণে সুশাসনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সৃষ্টিকর্তার কৃপার কাছে সমাজের কিছু মানুষ তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সমর্পণ করে দিয়েছে যেহেতু নির্দিষ্ট সরকার তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করছে না। দারিদ্র্য অধ্যুষিত উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের লোকজন অনুশোচনা ও বিলাপ করা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। বিশেষ করে দারিদ্র্য জনগোষ্ঠী সামাজিক, আইনগত এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অনেক উন্নত সম্প্রদায় মনে করে দরিদ্রতা দূর করার জন্য সুশাসন অত্যন্ত অত্যাবশ্যক। যদিও উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে সুশাসন এখনও গভীরভাবে সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সকল ধরনের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল পত্র (Poverty Reduction Strategy Paper) সুশাসনের জন্য বিবেচনা করা হয়েছে। এ সকল কৌশলপত্রগুলো একটি দেশের দারিদ্র্য বিমোচনের স্তম্ভ হিসেবে কাজ করেছে। উদাহরণস্বরূপ আলবেনিয়ার সরকার দারিদ্র্য বিমোচন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য এ সকল বিষয়াবলীকে মৌলিক ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করে বিভিন্ন ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠন করার প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছে। অধিকাংশ সরকার তাদের দেশের বিভিন্ন বিষয় পুনর্গঠন করার জন্য সুশাসনকে উপস্থাপন করে। কারণ গিনি'র (Guinea) দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল পত্র দাবি করেছে যে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য সুশাসন হল একটি প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত (Grindle, 2002)।

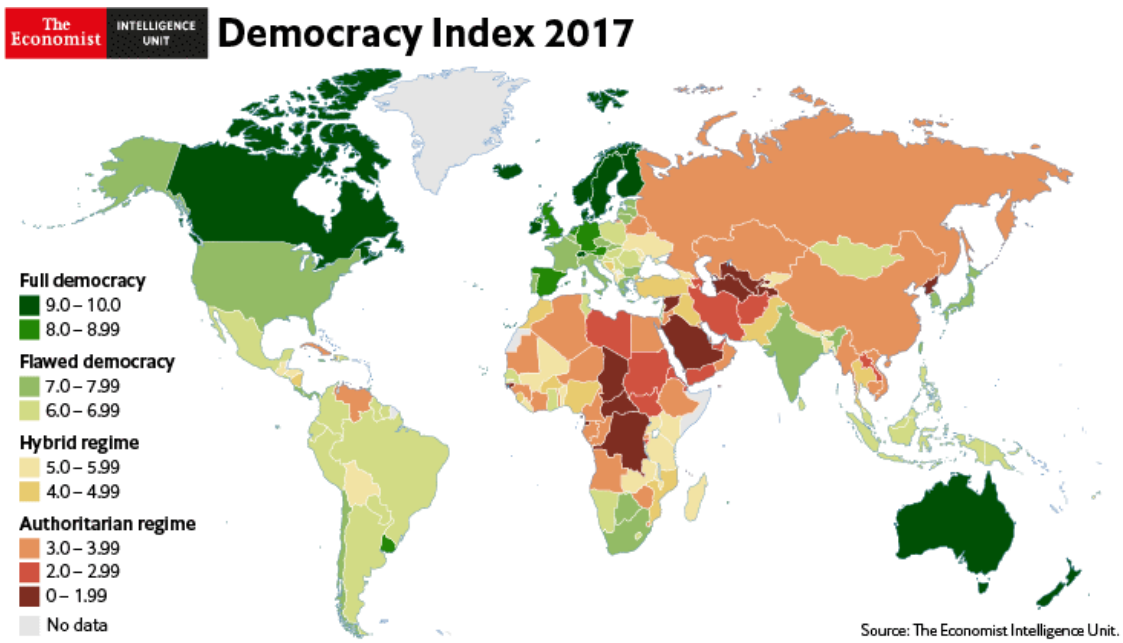
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের মৌলিক উদ্দেশ্য ব্যাহত

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বলতে সাধারণত গতানুগতিক ধারণাকে বুঝানো হয়ে থাকে যা প্রেস ও ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমের স্বাধীনতা তথা বেতার, টেলিভিশন এবং ইন্টারনেটের স্বাধীনতাকে বুঝায়। একটি গণতান্ত্রিক সমাজের জন্য গণমাধ্যমের স্বাধীনতা থাকা অত্যন্ত আব্যশক। জনসাধারণ রাষ্ট্র ও সমাজের অনেক বিষয়াবলী গণমাধ্যমের সহযোগিতা ছাড়া জানতে পারে না। জনসাধারণের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়াবলীর আলোচনা ও মতামতের বহিঃপ্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হল গণমাধ্যম। সত্য উদঘাটন ও প্রকাশ করা, জনসাধারণকে বিভিন্ন বিষয়াবলী সম্পর্কে অবহিতকরণ এবং সরকারের বিভিন্ন কর্মকান্ডের তদারকি ও পর্যবেক্ষক হিসেবে গণমাধ্যম কাজ করে থাকে। গণতন্ত্রের মৌলিক নির্দেশনাবলী গণমাধ্যমের মাধ্যমে প্রকাশের সুযোগ থাকে। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা প্রদানের মাধ্যমে সরকারকে

অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ ও কঠোর নিয়ম-নীতি প্রণয়ন করা থেকে বিরত রাখে (Eagan, 2013)। ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত গণমাধ্যম সূচকে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের নেতিবাচক চিত্র ফুঁটে উঠেছে। যা বৈশ্বিক গণতন্ত্রের জন্য খুবই নেতিবাচক দিক (EIU, 2017)।

গণতান্ত্রিক সূচকে পশ্চাৎপদ চিত্র ও গণমাধ্যমের উপর খড়গহস্ত

সাম্প্রতিক বছরগুলোর মধ্যে যেমন ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত গণতান্ত্রিক সূচকে বৈশ্বিক গণতন্ত্র সবচেয়ে খারাপ অবস্থা বিরাজ করছে। ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল এককভাবে গড়ে গণতান্ত্রিক সূচকে উন্নতি লাভ করতে পারেনি। বরঞ্চ বিভিন্ন রাষ্ট্রে নির্বাচন ব্যবস্থাকে জোর করে প্রভাবিত ও জনগণকে বিভাজন করা হয়েছে। এ ছাড়াও রাষ্ট্র ও অ-রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গণমাধ্যমের উপর হরেক রকমের হুমকি সৃষ্টি করেছে। ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে গণতন্ত্র সূচকে সবচেয়ে ভাল অবস্থানে যে পাঁচটি দেশ রয়েছে তার মধ্যে যথাক্রমে নরওয়ে, আইসল্যান্ড, সুইডেন, নিউজিল্যান্ড এবং ডেনমার্ক এবং সবচেয়ে নিম্নের সারিতে আছে যথাক্রমে গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক কঙ্গো, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, চাঁদ, সিরিয়া এবং উত্তর কোরিয়া। The Economist Intelligence Unit (প্রতিষ্ঠা ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ) পাঁচটি ক্ষেত্র তথা নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং বহুত্ববাদ বা বহু লোকের অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া, বেসামরিক নাগরিকদের স্বাধীনতা, সরকারের শাসন প্রক্রিয়া; রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রত্যয়গুলোকে মানদন্ড ধরে এ প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে। ৬০টি নির্দেশনাকে কেন্দ্র করে ১৬৫টি স্বাধীন রাষ্ট্র ও ২টি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে গণতান্ত্রিক শাসন প্রক্রিয়াকে ৪টি ভাগে যথা পরিপূর্ণ গণতন্ত্র (Full Democracy), ত্রুটিযুক্ত গণতন্ত্র (Flawed Democracy), উচ্চফলনশীল শাসনক্ষমতা (Hybrid Regime) এবং স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ক্ষমতা (Authoritarian Regime) বিভাজন করা হয়েছে (EIU, 2017)।



চিত্র-২ : বৈশ্বিক গণতান্ত্রিক সূচক-২০১৭ (EIU, 2017; the daily Star, 2018)।

গণতান্ত্রিক সূচকে উত্থান পতনের চিত্র

পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক (Full Democracy) রাষ্ট্রের তালিকায় ১৯টি, ত্রুটিযুক্ত গণতান্ত্রিক (Flawed Democracy) রাষ্ট্রের তালিকায় ৫৭টি, উচ্চফলনশীল শাসনক্ষমতা (Hybrid Regime) রাষ্ট্রের তালিকায় ৩৯টি এবং স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ক্ষমতা (Authoritarian Regime) রাষ্ট্রের তালিকায় ৫২টি দেশের নাম রয়েছে। ২০১০-১১ খ্রিষ্টাব্দের অর্থনৈতিক সংকটের পর থেকে বৈশ্বিক গণতান্ত্রিক সূচকে সবচেয়ে বেশি ধ্বস নেমেছে পাশাপাশি মত প্রকাশের

স্বাধীনতায় বিশেষভাবে উদ্বেগ বাড়িয়ে দিয়েছে। যদিও বিশ্বের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বাস করে কিন্তু এ সকল রাষ্ট্রের মধ্যে মাত্র ৪.৫% পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক অবয়বে বাস করে। যুক্তরাষ্ট্র পরিপূর্ণ গণতন্ত্র থেকে ত্রুটিযুক্ত গণতান্ত্রিক (Flawed Democracy) রাষ্ট্রে পদচ্যুত হওয়ার কারণে ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দের ৮.৯% হারের তুলনায় বর্তমানে তা হ্রাস পেয়েছে। অন্যান্য পাশ্চাত্য রাষ্ট্রের মধ্যে ফ্রান্স এবং ইতালিও এ মানদন্ডে পড়েছে (Harris, 2018)।

বর্তমানে গণতন্ত্রের চিত্র আশাব্যঞ্জকের তুলনায় হতাশাজনক রূপ বেশি। ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দে রেকর্ড নির্বাচনের বছর থাকা সত্ত্বেও-যখন বিশ্ব জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি ভোটে গিয়েছিল-EIU-এর গণতন্ত্র সূচক আরেকটি গণতান্ত্রিক পতন রেকর্ড করেছে। গড় স্কোর ৫.১৭-এ নেমে এসেছে, ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দে সূচক শুরু হওয়ার পর থেকে এটি সর্বনিম্ন, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে ৫.২৩ থেকে নেমে এসেছে। বিশ্বের জনসংখ্যার মাত্র ৪৫% একটি গণতন্ত্রে বাস করে, ৩৯% কর্তৃত্ববাদী শাসনের অধীনে এবং ১৫% "হাইব্রিড শাসনে (hybrid regimes)" যা নির্বাচনী গণতন্ত্রকে কর্তৃত্ববাদী প্রবণতার সাথে একত্রিত করে। গণতন্ত্র সূচক ২০২৪ দেশ, আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক পর্যায়ে রাজনৈতিক প্রবণতাগুলির একটি বিশদ বিশ্লেষণ প্রদান করে। বিস্তৃত তথ্যের উপর বিশ্লেষণ করলে, এটি পরীক্ষা করে যে গণতান্ত্রিক মডেলগুলির প্রতি ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ কীভাবে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের নতুন ফর্মের চাহিদাকে চালিত করছে এবং শাসন, নীতিনির্ধারণ এবং বৃহত্তর পরিচালন পরিবেশকে প্রভাবিত করছে (EIU, 2024)।

তিনটি বিষয় সম্ভবত ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দে এবং তার পরেও বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতার উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে। প্রথমত, সেনেগাল এবং শ্রীলঙ্কার মতো যে দেশে গত বছর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা নির্বাচন থেকে নতুন নেতারা আবির্ভূত হয়েছে, অথবা বাংলাদেশের মতো স্বৈরাচারী শাসনের পতনের পর ক্ষমতা গ্রহণ করেছে, তারা গণতন্ত্রের জন্য উজ্জ্বল স্থান হিসেবে প্রমাণিত হতে পারে। কিন্তু অনেক কিছু নির্ভর করবে কিভাবে এই সরকারগুলো সংস্কারের দিকে অগ্রসর হয় এবং তারা নিশ্চিত করে যে ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং আইনের শাসন এই প্রক্রিয়ায় সুরক্ষিত ও প্রসারিত হয় কিনা। দ্বিতীয়ত, স্লোভাকিয়া এবং মেক্সিকো সহ গণতন্ত্রের একটি ছোট কিন্তু ক্রমবর্ধমান গোষ্ঠীর মধ্যে, নির্বাচিত নেতারা এমন প্রতিষ্ঠানগুলিকে দুর্বল করার চেষ্টা করছেন যেগুলি তাদের ক্ষমতা যেমন মিডিয়া, দুর্নীতিবিরোধী সংস্থা এবং বিচার ব্যবস্থার উপর চেক করার জন্য কাজ করে (freedomhouse, 2025)।

গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক সংকট এবং উত্তরণ

এশিয়ায় গণতান্ত্রিক সংকটের ফলশ্রুতিতে কিছু রাষ্ট্রে বিভিন্ন সমস্যার উত্তরণ ও সুশাসনের প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এশিয়া এবং বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রই স্বাধীনতা লাভের পর রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশের শাসন ব্যবস্থা শুরু করে। কিন্তু গণতন্ত্রের এ পথ পরিক্রমা বিভিন্ন কারণে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। উদাহরণস্বরূপ নিম্নলিখিত রাষ্ট্রগুলোর বিভিন্ন উদ্দেশ্যমূলক আইন ও অধ্যাদেশ প্রণয়নের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে নির্বাসিত করে। আবার কখনো কখনো গণতন্ত্রের অবয়বে গণতন্ত্রের ভিন্ন নেতিবাচক চিত্র পরিলক্ষিত হয়। ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে নেপালের রাজা মহেন্দ্র গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম বাতিল করেন। পাকিস্তানে ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে গণতন্ত্রকে উপেক্ষা করে সামরিক শাসন প্রচলন করা হয়। বার্মা তথা মিয়ানমারে ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে সামরিক সরকার গণতান্ত্রিক সরকারের ধারাবাহিকতা বাধাগ্রস্ত করে সামরিক শাসন জারি করে। ভারতের মত বৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মিসেস ইন্দিরা গান্ধি ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে ব্যক্তিগত ফায়দা হাসিল করার জন্য জরুরি অবস্থা জারির মাধ্যমে গণতন্ত্রের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করা হয়। শ্রীলঙ্কাতেও বিভিন্ন সময় জরুরি অবস্থা জারি করার মাধ্যমে গণতন্ত্রের মর্যাদা বিনষ্ট করা হয়। ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ইন্দোনেশিয়াও গণতন্ত্র ভুলে অগণতান্ত্রিক পন্থা অনুসরণ করেছিল। ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে কাম্পুচিয়ায় গণতন্ত্র হোঁচট খায়। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে ফিলিপাইনে সামরিক একনায়কতন্ত্র শুর হয় (আহমদ, ১৯৯৩)। গণতান্ত্রিক পথ পরিক্রমা শুরু হওয়ার পর বিভিন্ন সময়ে তা বাধাগ্রস্ত হয়। বর্তমান সময়ে যদিও এ সকল রাষ্ট্রগুলোতে পুনরায় গণতন্ত্র চালু হয়েছে তারপরেও সাম্প্রতিক প্রকাশিত গণতন্ত্রের সূচক-২০১৭ অনুযায়ী এ সকল দেশগুলোর গণতান্ত্রিক সূচকে উত্থান-পতন পরিলক্ষিত হয়েছে (EIU, 2017)।

গণতান্ত্রিক শাসন প্রক্রিয়ায় সামরিক হস্তক্ষেপ

বিশ্বের কিছু উন্নয়নশীল ও তুলনামূলকভাবে নুতন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হলেও মাঝে মাঝে উচ্চাভিলাসি সামরিক ব্যক্তি ও সেনাপ্রধান গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হস্তক্ষেপ শাসন ক্ষমতা

দখল করে। ফলশ্রুতিতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও সুশাসনের নাজুক পরিস্থিতি ও নাগরিক সমাজ বৈষম্যের শিকার হয়। উদাহরণস্বরূপ মিয়ানমার, থাইল্যান্ড ও মিশরসহ বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রে এ অবস্থার চিত্র মাঝে মাঝে পরিলক্ষিত হয়েছে। যদিও বার্মা বা মিয়ানমার ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম বারের মত সামরিক শাসন শুরু হয় তথাপিও সরাসরি সামরিক শাসন জারি হয় ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে। যেখানে গণতান্ত্রিক সরকারকে জোর করে উৎখাত করা হয়েছে (Devi, 2014)। এ ছাড়াও সাম্প্রতিক সময়ে থাইল্যান্ড ও মিশরে সুপরিকল্পিত উপায়ে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে গণতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাত করে সামরিক অবয়বে শাসন কার্য পরিচালিত হচ্ছে।

প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংবাদপত্র, সমাজে গণমাধ্যমের প্রভাব ও তথ্য প্রকাশে গণমাধ্যম নিষিদ্ধকরণ

সমাজের একটি ছোট প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংবাদপত্র সমাজে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে থাকে। লোকজন সাধারণত পত্রিকা দিনের একটা নির্দিষ্ট সময়, পছন্দনীয় বিভাগ পড়ে থাকে। আর এ ঘটনা ঘটে থাকে সাধারণত খাবারের সময়, পাবলিক যানবাহনে কোথায়ও ঘুরা-ফেরা এবং টেলিভিশন দেখার সময় পত্রিকা পড়ার কাজটা সেরে ফেলে থাকে। যদিও যারা এভাবে পত্রিকা পড়ে তাদের মধ্যে পত্রিকা পড়ার চেয়ে অন্য বিষয়ের চিন্তা মাথার মধ্যে ঘোরপাক খায়। তারা মনোযোগ সহকারে পত্রিকা পড়ে না। এটা সাধারণত লোক দেখানো ছাড়া আর কিছুই নয়। আবার অনেকেই পত্রিকাকে তথ্য-উপাত্তের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে গণ্য করে থাকে। আইনগত ভিত্তি এবং তথ্যের অবাধ সরবরাহের কারণে পত্রিকা মানুষের উপর প্রভাব ফেলার এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে (Snow, 1987)। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো বিভিন্ন সময় সত্য তথ্য প্রকাশে সরকারের রোষানলে পড়ে। কোন তথ্য যদি সরকারের বিরুদ্ধে চলে যায় সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সরকার ঐ সকল গণমাধ্যমকে তার দেশে নিষিদ্ধ করে দেয়। কারণ শাসকগোষ্ঠী জানে যে, এ গণমাধ্যমের প্রকাশিত প্রতিবেদন মানুষের উপর বিরাট প্রভাব ফেলে থাকে। উদাহরণস্বরূপ দীর্ঘ আট বছর পর জিম্বাবুয়ে সরকার আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম বিবিসি (BBC) এবং সিএনএন (CNN) এর উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে (Plunkett & Holmwood 2009)।

গণতান্ত্রিক শাসন উত্থানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভূমিকা

গণতান্ত্রিক শাসন উত্থানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভূমিকা উল্লেখজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় আরব স্প্রিং (আরবের গণজোয়ার) এর মাধ্যমে যে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তা গণতান্ত্রিক অভিযাত্রার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। যদিও ইতোমধ্যে সামরিক হস্তক্ষেপ কারণে গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় বিভিন্নভাবে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। আরবের গণজাগরনের ফলে তিউনেশিয়া, মিশর ও মরোক্কতে বিভিন্ন ধরনের সংঘর্ষ ও অহিংস পন্থার মাধ্যমেও আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে। এ ছাড়া ও লেখক এ ছাড়াও অত্র প্রবন্ধে প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতি গুরুত্বরোপ করা হয়েছে (Moghadam, 2013)। মানুষের মৌলিক অধিকার, মানবাধিকার, আইনের শাসন, সামাজিক ন্যায় বিচার, সুশাসন ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা না পেলে প্রচলিত যোগাযোগের মাধ্যম ব্যবহার না করে অন্য পন্থায় তাদের আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে যায়। আরবের গণজাগরণ মধ্যপ্রাচ্য থেকে শুরু করে উত্তর আফ্রিকা মহাদেশ তথা মিশর থেকে তিউনেশিয়া, বাহরাইন, ও লিবিয়ায় সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম টুইটার এবং ফেসবুক ব্যবহার করে রাষ্ট্রীয় নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে সচেতন জনগণ আন্দোলন সংগ্রাম পরিচালনা করেছে। তিউনেশিয়ার মোহাম্মদ বুয়াজিজের আত্মাহুতি মূহুর্তের মধ্যে সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে এবং জনগণ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন পরিচালনা করে। এ যোগাযোগ মাধ্যমের সাহায্যে অনায়াসে আন্দোলনস্থ স্থান থেকে আপডেট দেয়ার ব্যবস্থা থাকায় এ আন্দোলন তড়িৎ গতিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। বর্তমানে এ ব্যবস্থা টুইটার এবং ফেসবুক বিপ্লব নামে অভিহিত হয়ে আছে। যদিও অনেক আন্দোলনকারী উইকিক্স (WikiLeaks) বিভিন্ন কার্যক্রম দেখে উৎসাহিত হয়েছে। এ সকল যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার ও আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে তিউনেশিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট বেন আলির পতন, মিশরের সাবেক প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের পতন ত্বরান্বিত হয়ে সেখানে পরবর্তী সময়ে নির্বাচনের পথ সুগম হয় (Beaumont, 2011)। বর্তমান সময়ে যোগাযোগ মাধ্যম বিশেষ করে ফেসবুক, এক্স হ্যান্ডেল (টুইটার), ইউটিউব, অন্যান্য মাধ্যমের কারণে গণতন্ত্র এবং শাসনব্যবস্থার উত্থান পতন ঘটছে।

গণমাধ্যমের প্রতি বিদ্বেষপোষণ বেড়ে যাওয়ায় গণতন্ত্রের প্রতি হুমকি

২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে Reporters Without Borders কর্তৃক প্রকাশিত বৈশ্বিক গণমাধ্যম স্বাধীনতা (World Press Freedom) সূচকে ১৮০ টি রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে বহুত্ববাদের স্তর (The level of Pluralism), গণমাধ্যম স্বাধীনতা, নিজস্ব সংবাদপত্রের প্রতি সেন্সরশীপ আরোপের মাধ্যমে বাধা ও নেতিবাচক পরিবেশ (the environment and self-censorship), আইনগত দৃষ্টিভঙ্গি, স্বচ্ছতা, সংবাদ ও তথ্যের প্রকাশনার অবকাঠামোগত বিভিন্ন বিষয়ের মান ইত্যাদিকে সামনে রেখে সংস্থাটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে সাংবাদিকতার প্রতি যে বিদ্বেষ বেড়েছে তার বাস্তবতা খুঁজে পাওয়া যায়। গণমাধ্যমের প্রতি শত্রুতা পোষণ, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে উন্মুক্তভাবে হুমকি ও দোষারোপ উত্থাপন এবং স্বৈরশাসকদের বিভিন্ন নীতিসহ বিভিন্ন বিষয়াবলীর মাধ্যমে গণতন্ত্রের প্রতি হুমকি সৃষ্টি হচ্ছে। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত অনেক জনপ্রতিনিধি গণমাধ্যমকে গণতন্ত্রের সহায়ক শক্তি ও অংশ মেনে নিতে নারাজ পাশাপাশি তারা প্রকাশ্যে গণমাধ্যমের প্রতি অনীহা প্রকাশ করছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গণমাধ্যমকে জনগণের শত্রু হিসেবে উল্লেখ করেছেন যা সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের (রাশিয়া) জোসেফ স্ট্যালিনের ব্যবহৃত প্রত্যয়টির কথা স্মরণ করে দেয় (RSF, 2018)। এ ছাড়াও বিশ্বব্যাপী গণমাধ্যম স্বাধীনতা (World Press Freedom) সূচক-২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম সারির ৫টি দেশের মধ্যে যথাক্রমে নরওয়ে, সুইডেন, নেদারল্যান্ডস, ফিনল্যান্ড এবং সুইজারল্যান্ড স্থান দখল করে নিয়েছে। অন্যদিকে ১৮০ টি দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরে ১৭৬তম থেকে ১৮০তম স্থানে রয়েছে যথাক্রমে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন, সিরিয়া, তুর্কমেনিস্তান, ইরিত্রিয়া এবং উত্তর কোরিয়া (RSF, 2018)। যদিও নিম্নের সারির রাষ্ট্রগুলো অধিকাংশই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নয়। এ সকল রাষ্ট্রগুলোতে স্বৈরতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র বিদ্যমান রয়েছে। অন্যদিকে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রের নিকট গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দেশ এবং অঞ্চলভেদে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

ব্যক্তিস্বার্থ ও সরকারের এজেন্ডা বাস্তবায়নে গণমাধ্যমের প্রতি সরকারের চাপ

প্রতিটি গণমাধ্যমের দুইটি সম্ভাব্য লাভের (Benefit) নির্গমন পথের উৎস পরিলক্ষিত হয় যথা, বাণিজ্যিক লাভ (Benefit) এবং সরকারের সাথে দ্বন্দ্বের ফলে লাভ (Benefit)। পরবর্তী কারণ দর্শকদের কেন্দ্র করে পরিলক্ষিত হয়। এ উপকরণকে লক্ষ্য করে বিক্রি, চাঁদা বা বিজ্ঞাপন, এবং নির্দিষ্ট বিষয় বিবেচনার উপর নির্ভর করে। যদি গণমাধ্যম মজাদার ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশেন করে তখন অনায়াসে র্দশক বা পাঠক বৃদ্ধি পেতে থাকে। সরকারের সাথে দ্বন্দ্বের ফলে যে লাভ হয় তার মধ্যে সরাসরি টাকা প্রদান (ঘুষ), যেমন উদাহরণস্বরূপ পেরুতে আলবার্তো ফুজিমারো (Alberto Fujimori) সরকারের সময় এ বিষয়টি সাধারণভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। এ ধরনের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত অথবা আইনগত হস্তক্ষেপ গণমাধ্যম মালিকদের প্রচুরভাবে উপকার করে। ইতালিতে এ ধরনের ঘটনা অস্তিত্ব পাওয়া যায় যেখানে গণমাধ্যম পরোক্ষভাবে সরকারের নীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ইতালিতে সবচেয়ে প্রভাবশালী ও পরিচিতি পত্রিকার ৩টির মধ্যে ২টি FIAT Group কর্তৃক প্রভাবিত হয়েছে যেখানে তারা এশিয়া থেকে গাড়ি আমদানি করার উপর বিধিনিষেধের মতো Benefit-এর সম্মুখীন হওয়া, নূতন গাড়ি কেনার ক্ষেত্রে আর্থিক প্রণোদনা (Subsidy) দেওয়া, অথবা সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণ বিনিয়োগ করা। এ ছাড়াও ভারতের গণমাধ্যম প্রভাবিত করার উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হয় (Besley & Prat, 2006)। বর্তমানে ভারতে গণতন্ত্র এবং গণমাধ্যমও নানা সংকট মোকাবেলা করে সামনে অগ্রসর হচ্ছে। বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার ও ভারতীয় জনতা পার্টি এর বিরুদ্ধে কংগ্রেস এবং বিরোধী দলগুলো সংসদ এবং রাজপথে আন্দোলন সংগ্রাম পরিচালনা করছে।

বহু গণমাধ্যম ক্ষমতার ভারসাম্য ও স্বচ্ছতা বিধানে সহায়ক

বহু গণমাধ্যমের উপস্থিতি থাকার মাধ্যমে শাসকের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার মাধ্যমে কার্যকরী সুফল পরিলক্ষিত হয়। একটি রাষ্ট্রে অধিক সংখ্যক গণমাধ্যম বিদ্যমান থাকার কারণে সরকারের পক্ষে তা বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা শাসন করা কঠিন হয়ে পড়ে। গণমাধ্যমের একক মালিকানার মাধ্যমে সরকারের প্রভাব হ্রাস হয়। যত বেশি পরিমাণ গণমাধ্যম শিল্পের খরচ বাড়বে এবং সরকারের মাঝে লেনদেনের পরিমাণ বাড়বে তত বেশি পরিমাণভাবে এ শিল্পের উপর চাপ কমবে। গণমাধ্যম সাধারণত রাজনৈতিক ফলাফলের উপর প্রভাব ফেলে থাকে (Besley & Prat, 2006)। তবে গণমাধ্যম কর্পোরেট ইন্টারেস্ট রক্ষা করার কারণে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না। গণমাধ্যমের মালিকানা

অনেকক্ষেত্রে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে। যেমন যুক্তরাজ্যের গার্ডিয়ান (https://www.theguardian.com/international) পত্রিকা যেভাবে কাজ করতে পারে বিশ্বের অন্যান্য গণমাধ্যমে সেভাবে কাজ করতে পারে না। এ পত্রিকাটি Independent Journalism এর বিশ্বব্যাপী কাজ করে। বিশ্বের পাঠকগণ (readers) এ পত্রিকাকে অর্থায়ন করে। পত্রিকাটি পরিচালনার জন্য এককালীন, মাসিক এবং বাৎসরিক অর্থায়ন করা যায়। এ পত্রিকাটি কোন বিলিনিয়ার কিংবা শেয়ারহোল্ডার দ্বারা পরিচালিত হয়। সতুরাং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গণমাধ্যম যদি কর্পোরেট স্বার্থ উপেক্ষা না করতে পারে এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট জার্নালিজম মেনে চলতে না পারে তাহলে গণমাধ্যম নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারবে না। বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ায় তার ব্যতিক্রম নয়।

বহুসংস্কৃতি বিদ্যমান সমাজে (Multi-cultural Society) ক্ষমতার সুষ্ঠু বিকেন্দ্রীকরণ

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতার বন্টন ও সুষ্ঠু হস্তান্তর (Democratic Power-Sharing) এবং বহুবাধি সাংস্কৃতিক সমাজে সাধারণত শান্তি বিরাজমান করে থাকে। অন্যদিকে যে কোন ধরনের সংঘর্ষ দূর হলেই সেখানে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে। সুইজারল্যান্ডে রাজনৈতিক ক্ষমতার সুষ্ঠু বন্টনের কারণে ক্যান্টনের (Cantons) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা (Federation) সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। যদিও সেখানে ৪টি ভাষায় কথা বলা এবং জনসাধারণ ২টি ধর্ম অনুসরণ, ইতিহাস ও আয়তনের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একত্রীকরণ সম্ভব হয়েছে। পরবর্তীতে সুইসদেও একটি যৌথ পরিচয় তৈরি করা এবং ইউরোপে যুদ্ধ চলাকালিন সময়ে তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষা করছে এবং কিছু ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক শ্রেণি সংগ্রাম অতিক্রম করতে সহায়তা করেছে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে Power-Sharing পদ্ধতি বহু সাংস্কৃতিক এবং বিভাজিত সমাজে গণতন্ত্র হল সবচেয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হওয়ার কারণে সুইজারল্যান্ড বিভিন্ন ভাষা গ্রহণ করা সত্ত্বেও এ রাষ্ট্রটি একটি সমজাতীয় সমাজে (Homogenous Society) রূপান্তরিত হয়েছে। এটা বিদ্যমান থাকার পাশাপাশি আরো অধিকার, স্বাধীনতা ও সমাজে সকলের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য Consensus Democracy প্রয়োজন (Linder, 1998)।

রাজনৈতিক Integration-এর জন্য Consensus Democracy প্রতিষ্ঠা

রাজনৈতিক মিলের জন্য Consensus Democracy প্রতিষ্ঠা করা অতিব দরকার। আধুনিক বিশ্বে Consensus Democracy মডেল রাজনৈতিক মতৈক্যের (Integration) জন্য অতি প্রত্যাশিত একটি বিষয়। আজকের বিশ্বে প্রায় ১৮০টির মতো স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বহুসংস্কৃতির সমাজ (Multi-cultural Society)। অধিকন্তু শিল্পায়ন এবং বাজার নির্ভর অর্থনীতি পরিচালনার ফলে বিশ্বব্যাপী পণ্য, সেবা, এবং মূলধনের অবাধ প্রবাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু এ সকল বিষয়াবলি বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে বৈপরীত্য ও দ্বন্দ্ব দেখা দিচ্ছে, যা এক সময় একদম বিচ্ছিন্ন ছিল। বিরাট সংখ্যক শরণার্থী তৃতীয় বিশ্বের মধ্যে বা তৃতীয় বিশ্ব থেকে শিল্পোন্নত দেশে স্থানান্তরিত হচ্ছে এবং নূতন করে সংখ্যালঘিষ্ঠ সমস্যা সৃষ্টি করছে। যদি নূতন বিশ্ব ব্যবস্থায় উদারিকরণ (Liberalization) এবং মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীর কাছে অর্থ না পৌছে তাহলে তারা যেখানে অর্থ আছে সেখানে চলে যাবে। সে জন্য বহুসংস্কৃতির (Multi-cultural) সহাবস্থান শান্তির জন্য এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উদাহরণস্বরূপ যুক্তরাষ্ট্র, উত্তর আয়ারল্যান্ড, কানাডা, আফ্রিকা দূর এবং মধ্যপ্রাচ্যে এ কেন্দ্রিক সমস্যা পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে, এ প্রেক্ষাপটে আরো ভাল রাজনৈতিক মতৈক্য (Political Integration) স্থাপন করা অতীব গুরুত্বর্পর্ণ বিষয় (Linder, 1998)। এ ক্ষেত্রে Power-Sharing পদ্ধতি, রাজনৈতিক মতৈক্য প্রতিষ্ঠায় Consensus Democracy অত্যন্ত প্রয়োজন।

সংকটকালীন মূহুর্তে সরকার কর্তৃক গণমাধ্যমের প্রতি বিধিনিষেধ

সংবাদমাধ্যমে যুদ্ধ চলাকালিন প্রোপাগান্ডা (Propaganda) প্রচারিত হয়ে থাকে। জরুরি অবস্থা জারিপূর্ণ জনসাধারণকে একত্রিকরণ করতে গণমাধ্যম এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। অপপ্রচার (Propaganda) এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে সাংবিধানিক এবং অসাংবিধানিক পদ্ধতির সরকারের মাঝে বিভাজন পরিলক্ষিত হয় এবং এ সকল ক্ষেত্রে সরকারের কাজের পরিধি ও কার্যপ্রণালি যুদ্ধের সময় আরো কলঙ্কজনক (Blur) অধ্যায় দৃশ্যমান হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় গণতান্ত্রিক সরকারগুলো তাদের নিজ দেশের বৃহৎ পরিমাণে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রোপাগান্ডা (Propaganda) প্রকাশে বাধ্যকরণ, সংবাদ মাধ্যমের প্রতি সেন্সরশীপ আরোপ এবং পাশাপাশি সকল প্রকার গণমাধ্যমের প্রতি সব ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ যুক্তরাষ্ট্রে জনসাধারণের মধ্যে

কোরিয়া ও ভিয়েতনাম যুদ্ধ নিয়ে এক প্রকার বির্তক সৃষ্টি হয়েছে এবং ফ্রান্সেও তেমনিভাবে এ সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্যদিকে আলজেরিয়া যুদ্ধের সময়ও। সুয়েজ (খাল) যুদ্ধের সময় এ বিষয়টি প্রতিধ্বনিত হয়েছে যথাক্রমে ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডে। সকল সরকারই যুদ্ধের সময় সেন্সরশীপকে গণমাধ্যমের প্রতি খড়গহস্ত করার উপায় হিসেবে আশ্রয় গ্রহণ করে। আলজেরিয়া যুদ্ধের সময় কিছু সংবাদের প্রতি সত্য প্রকাশের জন্য সংবাদপত্র বাজেয়াপ্ত, অত্যাচার ও সেন্সরশীপ আরোপ করা হয়েছে (Friedrich, 1974)। সেন্সরশীপ দুভাবে আরোপ হতে পারে। যেমন অনেক সময় সেল্ফ সেন্সরশীপ এবং রাষ্ট্রীয় সেন্সরশীপ আরোপিত হতে পারে। গণমাধ্যম জনস্বার্থ উপেক্ষা করে অনেক সময় সেল্ফ সেন্সরশীপ আরোপ করে সত্য উন্মোচন থেকে নিবৃত থাকে। আর রাষ্ট্র যখন স্বৈরাচার কিংবা একনায়কতন্ত্রের দিকে ধাবিত হয় তখন রাষ্ট্রীয় সেন্সরশীপ আরোপ করে সত্য প্রকাশে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

উপসংহার

স্বৈরতান্ত্রিক ও একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রের তুলনায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো তুলনামূলকভাবে এগিয়ে রয়েছে। যদিও এটা নিয়ে পাচ্য ও পাশ্চাত্যে অনেক বির্তক ও সমালোচনা রয়েছে। গণতন্ত্র এবং শাসনব্যবস্থা নিয়ে অনেক তাত্ত্বিক এখনও কোন সমীকরণে পৌঁছতে পারেননি। গণতন্ত্র ও গণমাধ্যম স্বাধীনতা সূচকে সর্বম্নি স্তরে উত্তর কোরিয়ার নাম রয়েছে। অন্যদিকে সিরিয়া অবস্থা এ দুই সূচকে আশাব্যঞ্জক নয়। যদিও এ রাষ্ট্রগুলোর অধিকাংশই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মাপকাঠির মধ্যে পড়ে না। আলোচ্য গবেষণার ফলাফলে এটা পরিলক্ষিত হয়েছে যে, কিছু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং ব্যক্তিস্বার্থ ও ক্ষমতা কুক্ষীগত রাখাসহ বিবিধ কারণে গণমাধ্যমের প্রতি বৈরিতা পোষণ ও সেন্সরশিপ আরোপসহ বিভিন্ন আইন ও নিয়মনীতি প্রণয়নের মাধ্যমে গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করছে। ফলশ্রুতিতে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রে সুশাসন ও আইনের শাসন, গণতান্ত্রিক পরিবেশের অবক্ষয় পরিলক্ষিত হচ্ছে। আলোচ্য গবেষণায় গণতন্ত্র, গণমাধ্যম ও সুশাসনের আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণে সম্পর্কিত আলোচনায় গবেষণার ফলাফল যথাক্রমে বৈষম্যহীন সমাজ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গণতন্ত্রের রূপ, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থার বিধান ও জনপ্রতিনিধিদের দায়বদ্ধতা নিশ্চয়তা, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সুশাসনের পথ সুগম, গণতন্ত্র দুর্নীতিপরায়ন শাসকদের জন্য অভিশাপ স্বরূপ, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় স্বৈরশাসনের উপস্থিতি ইত্যাদি বিষয় এ গবেষণায় প্রতিফলিত হয়েছে।

গণতন্ত্র, গণমাধ্যম ও সুশাসনের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনায় নিম্নলিখিত বিষয়াবলি যেমন বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সমস্যা সমাধান ও আলোচনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। এছাড়াও দরিদ্রতা দূরীকরণে গণতান্ত্রিক সরকার ও সুশাসনের ভূমিকা অত্যাবশ্যক বিষয় হিসেবে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের মৌলিক উদ্দেশ্য ব্যাহত, গণতান্ত্রিক সূচকে বিভিন্ন রাষ্ট্রে পশ্চাৎপদ চিত্র ও গণমাধ্যমের উপর খড়গহস্ত দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক সূচকে উত্থান পতনের বর্তমান চিত্র, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সাংবিধানিক সংকট এবং উত্তরণ, প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংবাদপত্র, সমাজে গণমাধ্যমের প্রভাব ও তথ্য প্রকাশের জন্য গণমাধ্যম নিষিদ্ধকরণ, গণতান্ত্রিক শাসন উত্থানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভূমিকা, গণমাধ্যমের প্রতি বিদ্বেষপোষণ বেড়ে যাওয়ায় গণতন্ত্রের প্রতি হুমকি বৃদ্ধি, গণতান্ত্রিক শাসন প্রক্রিয়ায় সামরিক হস্তক্ষেপ, ব্যক্তিস্বার্থ ও সরকারের এজেন্ডা বাস্তবায়নে গণমাধ্যমের প্রতি সরকারের চাপ প্রয়োগ, অধিক সংখ্যক গণমাধ্যম ক্ষমতার ভারসাম্য ও স্বচ্ছতা বিধানে সহায়ক, বহুসংস্কৃতি বিদ্যমান সমাজে (Multi-cultural Society) ক্ষমতার সুষ্ঠু বিকেন্দ্রীকরণ, রাজনৈতিক Integration-এর জন্য Consensus Democracy প্রতিষ্ঠা, সংকটকালীন মূহুর্তে সরকার কর্তৃক গণমাধ্যমের প্রতি বিধিনিষেধ আরোপ করা ইত্যাদি বিষয় এ গবেষণা কর্মের ফলাফলে উঠে এসেছে।

গ্রন্থপঞ্জিঃ

১. শরীফ, আ. (২০১৬, এপ্রিল-জুন). নির্বাচন ও গণতন্ত্র: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ, *সমাজ নিরীক্ষণ, ১৩৭, ৫১-৭২*

২. আহমদ, এ.উ. (১৯৯৩, ফেব্রুয়ারি). বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট, প্রকাশক শেখ মোঃ ইসমাইল হোসেন, হিমেল প্রিন্টার্স,
   - ঢাকা-১২০৯, ৪৬-৫৩

3. AMIC. (2000). *Media and Democracy in Asia.* Singapore: Asian Media Information and Communication Centre. Retrieved June 07, 2018
4. Abdellatif, A. M. (2013). *Good Governace and its relationship to Democracy & Economic Development* . Ministry of Justice, Republic of Korea. Retrieved June 12, 2018
5. Besley, T. & Prat, A. (2006, June). Handcuffs for the Grabbing Hand? Media Capture and Government Accountability . *The American Economic Review, 96(3)*. Retrieved June 12, 2018, from http://about.jstor.org/terms
6. Beaumont, P. (2011, February 25). The truth about Twitter, Facebook and the uprisings in the Arab world. *The Guardian Newspaper*. Retrieved July 07, 2018, from https://www.theguardian.com/world/2011/feb/25/twitter-facebook-uprisings-arab-libya
7. Castberg, F. (1960). *Freedom of Speech in the West: A comparative study of public law in France, the United States, and Germany.* Norway: Oslo University Press and George Allen & Unwin Ltd.
8. Davison, W. P. (2017, March 17). Public opinion. *Encyclopædia Britannica*. Re**tr**ieved June 08, 2018, from https://www.britannica.com/topic/public-opinion/The-mass-media
9. DFID, 2008, 'Media and Good Governance', A DFID Practice Paper, UK Department for International Development, London
10. Devi, K. S. (2014). Myanmar under the Military Rule 1962-1988. *International Research Journal of Social Sciences, 3*(10), 2319-3565. Retrieved July 08, 2018, from http://www.isca.in/IJSS/Archive/v3/i10/8.ISCA-IRJSS-2014-173.pdf
11. Dahl, R. A. (2018, May 25). Democracy. *Encyclopædia Britannica* . Retrieved June 08, 2018, from https://www.britannica.com/topic/democracy
12. Daily Star. (2018, February 01). EIU Democracy Index: Bangladesh slips to 92th position.
    - Retrieved June 09, 2018, from https://www.thedailystar.net/frontpage/eiu-democracy-index-bangladesh-slips-92th-position-1528165
13. Eagan, J. L. (2013, August 02). Media freedom. *ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA*. Retrieved June 09, 2018, from https://www.britannica.com/topic/media-freedom
14. ECOSOC. (2006). *Definition of basic concepts and terminologies in governance and public administration.* UN. United Nations Economic and Social Council. Retrieved June 09, 2018, from http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan022332.pdf
15. EIU. (2017). *Democracy Index 2017.* The Economist Intelligence Unit. Retrieved June 09, 2018, from http://www.eiu.com/topic/democracy-index
16. EIU. (2024). EIU report, Democracy Index 2024, ECONOMIST INTELLIGENCE , https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2024/
17. Freedomhouse. (2025). FREEDOM IN THE WORLD 2025, The Uphill Battle to Safeguard Rights, Phumelele Mncina, Junior Fellow for West, Central, and Southern Africa Nodari Tsaava, Junior Fellow for Eurasia Rachel Simroth, Junior Fellow for North and East Africa
18. Friedrich, C. J. (1974). *Constitutional Democracy: Theory and Practice in Europe and America* (Vol. Fourth Edition). Oxford & Ibn Publishing & Mohan Prim Lani.
19. Grindle, M.S. (2002, November). Good Enough Governance:Poverty Reduction and Reform in Developing Countries. (H. U. Kennedy School of Government, Ed.) Retrieved June 09, 2018, from https://pdfs.semanticscholar.org/eb88/4e69c181a0d10959cf534c1b1470f1e5a5ec.pdf
20. Harris, B. (2018, February 02). These are world's most democratic countries, according to the Economist. *World Economic Forum*. Retrieved June 09, 2018, from https://www.weforum.org/agenda/2018/02/nordic-countries-top-democratic-rankings-2017/

21. Linder, W. (1998). *Swiss Democracy possible solution to conflict in Multi-cultural societies* (Vol. Second). Great Britain & USA: Macmillan Press Ltd and St. Martin's Press Inc.
22. Moghadam, V. M. (2013). What is democracy? Promises and perils of the Arab Spring. *Current Sociology Monograph, 61*(4), 393-408. Retrieved May 06, 2018, from sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav
23. Nord M., Lundstedt, M. and I Lindberg, S. (JULY 2024). MEDIA FREEDOM, DEMOCRACY, AND SECURITY, This report is part of the OSCE project "No Security Without Media Freedom: Teresa Ribeiro, OSCE Representative on Freedom of the Media
24. OHCHR. (1996-2026). About good governance: OHCHR and good governance, *UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER* , https://www.ohchr.org/en/good-governance/about-good-governance
25. Plunkett, J. & Holmwood, L. (2009, July 29). Zimbabwe lifts reporting ban on BBC and CNN after eight years. *The Guardian Newspaper*. Retrieved July 07, 2018, from https://www.theguardian.com/world/2009/jul/29/zimbabwe-bbc-cnn
26. Padmanabhan, V. (Nov 12th 2025). Will Bangladesh's revolution bear fruit?. *The Economist,* https://www.economist.com/the-world-ahead/2025/11/12/will-bangladeshs-revolution-bear-fruit
27. RSF. (2018). *RSF Index 2018: Hatred of journalism threatens democracies.* Reporters Without Borders. Retrieved June 10, 2018, from https://rsf.org/en/rsf-index-2018-hatred-journalism-threatens-democracies
28. Rahman, M. M. (2014). *Good Governance and Corruption in Bangladesh.* Dhaka, Bangladesh : A H Developemnt Publishing House.
29. Snow, R. P. (1987). *Creating Media Culture* (Vol. 149). US: Sage Publications and Sage Library of Social Research.
30. UN. (1947). Yearbook of the United Nations 1946-47. *United Nations Organization Website*. Retrieved July 05, 2018, from https://www.unmultimedia.org/searchers/yearbook/page.jsp?volume=1946-47&page=1 & https://unchronicle.un.org/article/atlantic-charter-revitalizing-spirit-founding-united-nations-over-seventy-years-past
31. Williams, F. & Pavlik, J.V. (1994). *The people's right to know: Media, Democracy and the Information Highway.* United States of America, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1995-2004
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.424

শিলচরের নর্মাল স্কুলের রামায়ণ পুথি সংগ্রহ একটি পর্যবেক্ষণ

মানচিত্র পাল, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়, হোজাই, অসম, ভারত*

Received: 09.03.2026; Accepted: 13.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract:

What is a manuscript? Until the invention of the printing press, all works were written by hand. And these handwritten works are called manuscripts. Just as the history of writing manuscripts is very old, so is the system of preserving manuscripts. There are various manuscript collections in different parts of the country to preserve manuscripts. For example, the Normal School, a teacher training institute in Silchar, the headquarters of the Barak Valley, has a system of preserving manuscripts. Many manuscripts on the subject of nuns have been preserved in this institution at different times. The manuscripts were collected from different parts of South Assam before independence. At that time, Srihatta was part of Assam. The languages of the manuscripts were Sanskrit and Bengali. The manuscripts are on Ramayana, Mahabharata and Gita etc. There are a total of 78 manuscripts on Ramayana in this collection. The poets of the manuscripts are Krttivasa Ojha, Bhavanidasa, Adbhut Acarya, Gangadasa Sen, Dvija Durgadasa, Dvija Gangaram and Manohar Sen. But this is an unknown topic to many. This important topic will be presented in the article under discussion.

Keywords: Manuscript, Normal School, Poet, Ramayana, Repositor, Silchar.

'পাণ্ডুলিপি' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ Manuscript। Manuscript হল: A handwritten or typed text submitted for awaiting printing and publication অর্থাৎ হাতে লেখা যে-কোনো রচনার খসড়াকেই বলা যেতে পারে Manuscript বা পাণ্ডুলিপি। মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের আগ পর্যন্ত সমস্ত রচনাই হাতে লেখা হত। আর এই হাতে লেখা রচনাই হল পুথি। পুথি শব্দটি এসেছে বিবর্তিত হয়ে সং.পুস্তিকা>প্রা.পুত্থিয়া, পুত্থিআ>বা.পুঁথি, পুথি।[১] ভারতবর্ষে পুথি লেখার ইতিহাস বহু পুরোনো। আর পুথিকে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থাও বহু প্রাচীন। পুথিকে সংরক্ষণ করার জন্যে আছে পুথি সংগ্রহশালা। বরাক উপত্যকার সদর শহর শিলচরস্থিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নর্মাল স্কুলে (১৯০৬) পুথি সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। এই প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সময় নানা বিষয়ক একাধিক পুথি সংরক্ষণ করা হয়েছে। পুথিগুলি সংগ্রহ করা হয়েছিল স্বাধীনতার আগে দক্ষিণ অসম থেকে। তখন শ্রীহট্ট অসমের অন্তর্গত ছিল। এ বিষয়ে সুরমা-বরাক উপত্যকার বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ ও পুথিবিশারদ অমলেন্দু ভট্টাচার্য লিখেছেন:

> "The manuscripts kept in the repository of Silchar Normal School were collected from the South Assam region in the pre-independence period when Srihatta was the part of Assam. ..."[২]

পুথিগুলি কেবলমাত্র যৌথভাবে নয়, ব্যক্তিগত উদ্যোগেও সংগ্রহ করে রাখা হয়েছিল। পদ্মনাথ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন:

> "বোধহয় ১৯০৮ ইং সনে গ্রীষ্মাবকাশে শিলচর গিয়াছিলাম—হিড়িম্ব (বা হেড়ম্ব) রাজগণের সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয় অনুসন্ধান করাই ঐ যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল। তখন জানিতে পারি যে নর্ম্মাল স্কুলে কতকগুলি হস্তলিখিত পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে, ঐগুলি ইন্সপেক্টর প্রমোদ বাবুর যত্নেই নানা স্থান হইতে আনীত হইয়াছিল।"[৩]

পরবর্তীকালে সংগৃহীত পুথিগুলি থেকে কিছু সংখ্যক পুথি প্রবন্ধাকারে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছিল। এ বিষয়ে বলা হয়েছে:

> "Silchar Normal School Teachers did some academic work on the collected manuscripts. As many as seven articles written by them were published in different magazines."[৪]

দক্ষিণ অসমে প্রাপ্ত পুথিগুলির ভাষা ছিল সংস্কৃত ও বাংলা। পুথিগুলি রামায়ণ, মহাভারত ও গীতা প্রভৃতি বিষয়ক। এর মধ্যে শিলচরের নর্মাল স্কুলে রামায়ণ বিষয়ক মোট ৭৮টি পুথি রয়েছে। পুথিগুলির কবি হলেন কৃত্তিবাস ওঝা, ভবানীদাস, অদ্ভুত আচার্য, গঙ্গাদাস সেন, দ্বিজ দুর্গাদাস, দ্বিজ গঙ্গারাম ও মনোহর সেন প্রমুখ। নিম্নে রামায়ণ বিষয়ক পুথিগুলির বিশ্লেষণসহ কবিদের পরিচয় সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হল:

কৃত্তিবাস ওঝা: বাংলা ভাষায় 'রামায়ণ'-এর সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং শ্রেষ্ঠ অনুবাদক হলেন কৃত্তিবাস ওঝা। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে জানা যায় যে, কবির পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা পূর্ববঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি ফুলিয়া গ্রামে বসবাস করেন। উল্লেখযোগ্য যে, কৃত্তিবাস ওঝা ছিলেন প্রাক্-চৈতন্যযুগের কবি। তবে তাঁর জন্মসাল নিয়ে মতান্তর আছে। মনে হয় তিনি চতুর্দশ শতাব্দীর শেষের দিকে জন্মগ্রহণ করেন।[৫] কৃত্তিবাসের কাব্যের আকর্ষণ কেবলমাত্র একটি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সমগ্র বাঙালি সমাজে তাঁর কাব্যের বিপুল সমাদর ছিল। এর কারণ সম্পর্কে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন—

> "...আধুনিক যুগেও বহুপঠিত গ্রন্থের মধ্যে কৃত্তিবাসি রামায়ণই সর্বপ্রধান। বাঙালির ধ্যানধারণা ও জীবনাদর্শের প্রতিটি পর্ব এই মহাগ্রন্থের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং কৃত্তিবাসের রামায়ণ শুধু কাব্য-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত নয়, বাঙালির প্রাণের সঙ্গে এ কাব্যের অচ্ছেদ্য বন্ধন স্থাপিত হয়েছে।"[৬]

আর এই কারণেই হয়ত বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চল বরাক উপত্যকায়ও তাঁর কাব্যের প্রবল জনপ্রিয়তা লক্ষ করা যায়। তবে আমাদের মনে হয় বরাক উপত্যকায় তাঁর পুথির জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে কাজ করেছে তৎকালীন বরাক উপত্যকার ভৌগোলিক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের সঙ্গে গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ। শিলচরের নর্মাল স্কুলে এই পর্যন্ত রামায়ণের যতগুলি পুথি সংরক্ষিত রয়েছে তার মধ্যে কৃত্তিবাসের নামেই সবচেয়ে বেশি পুথি আছে। তাঁর নামে মোট ৩৫টি পুথি

রয়েছে। পুথিগুলি বাংলা ভাষায় লেখা। অধিকাংশ পুথির সময়কাল ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। অর্থাৎ উনিশ শতক। শিলচরের নর্মাল স্কুলে সংরক্ষিত রামায়ণ বিষয়ক তৃতীয় পুথিটির নাম 'অযোধ্যা কাণ্ড'। পুথিটি শুরু হয়েছে গণেশ বন্দনা দিয়ে—

"নম গণসায়ে নম। অথ অর্জদ্যাকাণ্ড পুস্থক।..."[৭]

পুথিটিতে বেশ কয়েকটি ভণিতার পরিচয় পাওয়া যায়। যেখানে কৃত্তিবাসের প্রসঙ্গ রয়েছে। উল্লেখযোগ্য একটি ভণিতা হল—

"কবি কির্ত্তিবাসে বলে শ্রীরামের পদতলে
এক চির্ত্তে সুন সর্ব্বজন।
পুর্ণ বিদ্ধে পাপ ক্ষেয় সমনের নাহিক ভয়ে
এড়াইব ভবের বন্দন।।"[৮]

ভবানীদাস: বরাক উপত্যকায় কৃত্তিবাসের পরেই আর যাঁর নামে রামায়ণের পুথি সবচেয়ে বেশি পরিমাণে পাওয়া গেছে তিনি হলেন ভবানীদাস। ভবানীদাসের নামে প্রাপ্ত পুথির সংখ্যা ১৯টি। তাঁর পরিচয় সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য জানা যায় না। তবে দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড-তে ভবানীদাস সম্পর্কে বলা হয়েছে—

"নবদ্বীপ বন্দম অতি বড় ধন্য।
যাহাতে উৎপত্তি হৈল ঠাকুর চৈতন্য।।
গঙ্গার সমীপে আছে বদরিকাশ্রম।
তাহাতে বসতি করে ভবানীদাস নাম।।
বামনদেব পিতা যশোদা জননী।
সপুত্রে বন্দম যবে সর্ব্বলোক জানি।।"[৯]

এছাড়া শিলচরের নর্মাল স্কুলে সংরক্ষিত 'স্বর্গারোহণ' পুথিতে ভবানীদাস সম্পর্কে উল্লেখ করা আছে—

"...গঙ্গার সমিপে বন্দু সুতগাম নাম।।
তাহাতে বসতি আছে ভবানিদাস নাম।
কতক দিবস ছিল বটহয় গ্রাম।।
জনক জাদবানন্দ জসদা জননি।
সপুত্র বান্ধবে বৈসে সর্ব্বলুকে জানি।।..."[১০]

উক্ত দু'টি উক্তিতে ভবানীদাসের মাতার নাম যশোদা থাকলেও পিতার নাম দুরকম রয়েছে— বামনদেব ও জাদবানন্দ। প্রশ্ন জাগে বামনদেব ও জাদবানন্দ কি একই ব্যক্তি, না আলাদা; না লিপিকরদের-গায়েনদের নিজস্ব সংযোজনের ফলে এই ভ্রান্তি। বিষয়টি গবেষণা সাপেক্ষ।

অদ্ভুত আচার্য: সপ্তদশ শতাব্দীর রামায়ণের উল্লেখযোগ্য কবি হলেন অদ্ভুত আচার্য। তাঁর প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ আচার্য। পিতা শ্রীনিবাস আচার্য, মা মেনকা। কবিরা ছিলেন চার ভাই। ভাইদের মধ্যে কবি ছিলেন কনিষ্ঠ। তাঁর পুত্র ছিল তিনজন—জয়ানন্দ, বিজয়ানন্দ ও শিবানন্দ। অনেকে বলেন তিনি উত্তরবঙ্গের কবি ছিলেন।

তবে সুকুমার সেনের মতে জানা যায়, তাঁর বাস ছিল অবিভক্ত বাংলার পাবনা জেলার বড়বাড়ি গ্রামে।[১১] তাঁর রচিত পুথির ভণিতায় নিত্যানন্দ নামের পরিবর্তে অদ্ভুত আচার্য নাম আছে। তাঁর এই নাম সম্পর্কে অনেকেই নিজের মতো করে নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন সুকুমার সেন বলেছেন—

> "...বোধ করি কবিত্বশক্তি ও সুগায়কতা গুণের জন্য নিত্যানন্দ আচার্য (অথবা "বড়ু" নিত্যানন্দ) "অদ্ভুত- আচার্য" নাম পাইয়াছিলেন।..."[১২]

দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে কবির সম্পর্কে জানিয়েছেন:

> "নিত্যানন্দ নামক এক ব্রাহ্মণ 'অদ্ভুতাচার্য্য' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত রামায়ণ অনুবাদ করিয়াছিলেন, এই রামায়ণখানিও এক সময়ে বিশেষরূপ আদৃত হইয়াছিল,—ইহার প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।...তিনি নিজে লেখা পড়া জানিতেন না, শুধু দৈবশক্তিবলে রামায়ণের অনুবাদ করিয়াছিলেন—এই জন্য তাঁহার উপাধি হইয়াছিল অদ্ভুতাচার্য্য।..."[১৩]

রসিকচন্দ্র বসু-র সংগৃহীত পুথিতে কবির বিষয়ে জানা যায়—

"...সোনা রাজ্যে নাম ছিল বড়বাড়ী গ্রাম।
শুভক্ষণে হইল যে নিত্যানন্দ নাম।।
মহাপুরুষ তবে জন্মিল সংসারে।
যত যত সৎকর্ম্ম তার পৃথিবী ভিতরে।।
দেবগণে মুনিগণে কর্ম্ম শুভাচার।
অদ্ভুতনাম হইল বিদিত সংসার।।
মাঘ মাসে শুক্ল পক্ষে ত্রয়োদশী তিথি।
ব্রাহ্মণবেশে পরিচয় দিলেন রঘুপতি।।
প্রভুর কৃপা হইল রচিতে রামায়ণ।
অদ্ভুত হৈল নাম সেই সে কারণ।।..."[১৪]

উক্ত উদ্ধৃতিগুলির থেকে জানা গেল যে, অদ্ভুত আচার্য উচ্চশিক্ষিত না হয়েও গায়েন ও অলৌকিক কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন। অদ্ভুত আচার্যের নামে শিলচরের নর্মাল স্কুলের পুথি সংগ্রহালয়ে রামায়ণ সম্পর্কিত ৬টি পুথি সংরক্ষিত আছে। ৬টি পুথিরই ভাষা বাংলা। ৬টি পুথির মধ্যে ২টি পুথির নাম জানা যায় না। বাকি চারটি পুথির নাম হল আদ্যকাণ্ড, সুন্দরাকাণ্ড, সুন্দরাকাণ্ড, কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ। পুথিগুলির মধ্যে একটি পুথির লিপিকরের নাম ও সময়ের উল্লেখ আছে—শ্রীকাশীনাথ দাস, ১২১৯ বঙ্গাব্দ (১৮১২খ্রিস্টাব্দ)। লক্ষণীয় যে, ভণিতায় কবির নামের বানানে ভিন্নতা রয়েছে। যেমন, অদভূত আচার্য্য, অদভূত আচার্জ্য, অদভূত আচার্য প্রভৃতি। এর থেকে বোঝা যায় যে সেকালের লিপিকরেরা পুথির বানানের ক্ষেত্রে পুরোপুরি সচেতন ছিলেন না। কিংবা এমনও হতে পারে তাঁদের কাছে পুথি লেখার সুনির্দিষ্ট বানানবিধির অভাব ছিল। প্রথম পুথিটির শুরুতে আছে গণেশ বন্দনা—

"নম গনেশায় নম।
অথো আর্দ্যকাণ্ড পুস্তক লিক্ষিতে।
অজোদ্ধাতে দসরথে চিন্তে মনে মন।..."[১৫]

শেষ হয়েছে—

"রাবনে বোলে ভাই সুনহ বচন।
মর কর্ম্মদুষে তোমা নিদ্রায়ে অচেতন।।..."[১৬]

ভণিতায় বলা হয়েছে—

"কুম্ভকর্ণ সয় তথা ভাই দরসন।
অদভুত আচার্জ্জের কবি মধোর রচন।।"[১৭]

গঙ্গাদাস সেন: গঙ্গাদাস সেন সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর পদ্মাপুরাণ ও মহাভারতের মতো রামায়ণের পূর্ববঙ্গের কবি ছিলেন। সুকুমার সেনও বলেছেন তিনি পূর্ববঙ্গের লোক ছিলেন। যেমন—

> "গঙ্গাধর সেনের লেখা আদি ও অশ্বমেধ পর্বের পুথি পাওয়া গিয়াছে। ইনি পূর্ববঙ্গের লোক।..."[১৮]

গঙ্গাদাস সেন রামায়ণের মতো পদ্মাপুরাণ ও মহাভারত প্রভৃতির পুথি রচনাতেও নিজ প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন। দীনেশচন্দ্র সেন ও সুকুমার সেনের মতে জানা যায়, তাঁর পিতামহ ছিলেন কুলপতি এবং পিতা ষষ্ঠীবর। দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন—

> "কবি গঙ্গাদাস সেন প্রায় প্রত্যেক পত্রেই পিতা ও পিতামহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন—
> "পিতামহ কুলপতি পিতা ষষ্ঠীবর। যার যশঃ ঘোষে লোকে পৃথিবী ভিতর।।"[১৯]

তিনি আরও জানিয়েছেন গঙ্গাদাস সেনের পিতা ষষ্ঠীবর ছিলেন শ্রীহট্টের লোক। এর সমর্থন মেলে রজনীমোহন চক্রবর্তীর সম্পাদিত জানকীনাথের মনসামঙ্গলে—

"শ্রীহট্টের দত্তগ্রাম হয় ষষ্ঠীবর ধাম..."[২০]

গঙ্গাদাস সেনের নামে শিলচরের নর্মাল স্কুলে পাঁচটি পুথি পাওয়া যায়। পুথিগুলির ভাষা বাংলা। লিপিকর শ্রীহরকিশোর দাস, শ্রীলালচান্দ দাস। একটি পুথির সময় কাল উল্লেখ আছে—১২৭৭ বঙ্গাব্দ (১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ)। ৬৬ সংখ্যক পুথির পুষ্পিকায় লিপিকর শ্রীহরকিশোর দাস সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> "ইতি সন ১২৭৭ সন তারিখ ২৮ কাত্তিক শ্রীহরকিসোর দাস সাকিন খারুয়া মুকোন্দ তপেরন ভাওয়াল জিলে ময়মনসিংহ থানে গফরগায়।..."[২১]

অর্থাৎ এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে কবির মতো লিপকরও ছিলেন পূর্ববঙ্গের লোক।

কুমুদানন্দ দত্ত: কুমুদানন্দ দত্ত সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য আমাদের কাছে নেই। তবে সুকুমার সেন জানিয়েছেন—

"...রাম-অশ্বমেধ পালার কবি কুমুদানন্দ দত্ত সম্ভবত ভারত-পাঁচালী রচয়িতা কুমুদ দত্ত।..."[২২]

এক্ষেত্রে বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি গবেষক অমলেন্দু ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন:

> "Kumud Datta and Kumudananda Datta are perhaps the names of one and the same individual. He wrote both Ramayana and Mahabharata in 18th century. He was a resident of Srihattta region."[২৩]

উক্ত মন্তব্য দু'টি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, কুমুদানন্দ দত্ত ও কুমুদ দত্ত বোধহয় একই ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন শ্রীহট্টের লোক। সুধীর সেন রচিত 'বাংলা সাহিত্যে আসামের বাঙ্গালীদের অবদান' গ্রন্থে কুমুদানন্দ দত্ত-কে সম্ভবত কাছাড়ের কবি বলে অভিহিত করা হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তিনি রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর নামে বরাক উপত্যকায় রামায়ণ সম্পর্কিত তিনটি পুথি পাওয়া যায়। তিনটি পুথির মধ্যে দু'টি পুথিতে কবির সঙ্গে কৃত্তিবাস ওঝা ও ভবানীদাসের নামোল্লেখ আছে। পুথিগুলি বাংলা ভাষায় লেখা। প্রথম পুথিটির নাম 'শ্রীশ্রী রঘুনাথের অশ্বমেধ'। সময়কাল ১৭৬৮ শকাব্দ (১২৫৩ বঙ্গাব্দ, ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দ)। পুথিটির লিপিকর শ্রী প্রজাপতি দেবশর্ম্মণ। পুথিটির পুষ্পিকায় আছে—

> "...সাক্ষরানিতি শ্রী প্রজাপতি দেবশর্ম্মণ সকাব্দা ১৭৬৮ সাল মাহে ১৩ ভাদ্রস্য। বেলা চতুর্দ্দস দণ্ড গতে। কুজস্যবারে সমাপ্ত স্বায়ং গ্রন্থমিতি। সাং প্রগনে বিক্রমপুর মৌজে বিহাড়া। দাতব্যে সাং প্রগনে বরাকপার মৌজে তারাপুর। সন ১২৫৩ বাং মাহে ১৩ ভাদ্র। শ্রীদুর্গা।"[২৪]

দ্বিতীয় পুথিটির নাম 'শ্রীরামের স্বর্গারোহন'। বাংলা ভাষায় লেখা। শুরু হয়েছে গণেশ বন্দনা দিয়ে। যেমন—

> "নম গনেসায় নম।
> মৎক্রিতং নম নরচৌব নরত্তমং।"[২৫]

ভণিতায় আছে—

> "ভাএ২ দরসন না হইব আর।
> দর্ত্ত কুমোদ বোলে না কান্দিয় আর।।"[২৬]

তৃতীয় পুথিটিও বাংলা ভাষায় লেখা। পুথিটির নাম অজ্ঞাত। ভণিতায় আছে—

> "কি করিমু কি বলিব জামু কুন স্থানে।
> দর্ত্ত কুমুদে বোলে শ্রীরামের চরনে।।"[২৭]

এতে পরিষ্কার জানা যাচ্ছে যে, কবি শ্রীহট্টের লোক ছিলেন।

দ্বিজ গঙ্গারাম: দ্বিজ গঙ্গারামও ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রীহট্টের কবি। এ প্রসঙ্গে অমলেন্দু ভট্টাচার্য বলেছেন—

> "Dvija Gangaram of 18th century was a poet of Srihattta-Cachar region. ..."[২৮]

বরাক উপত্যকায় দ্বিজ গঙ্গারামের নামে একটি পুথি উদ্ধার হয়েছে। পুথিটির নাম 'মহীরাবণের যুদ্ধ'। লিপিকর শ্রীবিনোদরাম দেব। সময়কাল ১২৩৫ বঙ্গাব্দ (১৮২৮)। পুথি থেকে জানা যায় যে, লিপিকর শ্রীবিনোদরাম দেব শ্রীভূমি জেলার শ্রীগৌরি গ্রামের লোক ছিলেন। যেমন:

> "হিন দাস বিনদে বলে এই সাদ করি।
> অন্তকালে রাম নাম জপিআ জেন মরি।।
> অবধান করি আমি সভা চরনে।
> বসতি নিবাস স্থান করিব বাক্ষানে।।
> শ্রীহট্যের পুর্ব্বে রার্জ্য চাপঘাট নাম।
> তাহার মৈদ্ধেতে আছে শ্রীগৌরি নামে গ্রাম।।
> নিবাস উর্ত্তরে হএ সীদ্ধেস্বর নদি।
> তাহার ফলের কিছু নাহিক অবদি।।..."[২৯]

দ্বিজ দুর্গাদাস ও মনোহর সেন: দ্বিজ দুর্গাদাস ও মনোহর সেন সম্পর্কে সামান্য পরিচয় জানা যায় যে, তাঁরা সম্ভবত শ্রীহট্ট-কাছাড়ের লোক ছিলেন। তাঁদের বিষয়ে অধ্যাপক অমলেন্দু ভট্টাচার্য উল্লেখ করেছেন:

> "Ramayana authors Dvija Durgadasa,...Manohar Sen were, in all probability, inhabitant of Srihattta-Cachar region."[৩০]

দ্বিজ দুর্গাদাসের নামে বরাক উপত্যকায় রামায়ণকেন্দ্রিক একটি পুথি পাওয়া যায়। পুথিটি হাতে তৈরি কাগজে বাংলা ভাষায় লেখা। পুষ্পিকা থেকে জানা যায় পুথিটির সময়কাল ১২৩৬ বঙ্গাব্দ (১৮২৯ খ্রিস্টাব্দ)। পুথিটি শুরু হয়েছে গণেশ বন্দনা দিয়ে:

"নম গনেশায় নম। অথো বিরবাহুর জৌদ্দ পোস্তক লিখতে।..."[৩১]

পুথিটির ভণিতায় বলা হয়েছে দুর্গাদাসের পিতা ছিলেন দ্বিজ দেবানন্দ। যেমন:

"দ্বিজ দেবানন্দ সোত দুর্গাদাসে কয়।
বানর দোর্গতি ধোম্রলোচনে করয়।।"[৩২]

উল্লিখিত কবি দু'জনের মধ্যে মনোহর সেনের 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' পুথি অন্যান্য কবিদের সঙ্গে সিলেটে পাওয়া গেছে বলে সুকুমার সেন জানিয়েছেন। এ বিষয়ে সুকুমার সেন বলেছেন:

> "সিলেট অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে,—গঙ্গারামের 'গোপালচরিত', রামদাসের 'শ্রীকৃষ্ণচরিত',...মনোহর সেনের 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'..."[৩৩]

শিলচরের নর্মাল স্কুলে মনোহর সেনের একটি পুথি আছে। পুথিটির নাম 'রামায়ণ'। পুথিটির শুরুতে আছে:

"কবি শ্রনন্দন সেন শ্রীরাম তনয়।
মধু সেন সুত হিন মনহ...।।"[৩৪]

ভণিতায় আছে:

"মধুসুদন সেন তনয় হিনমতি।
মনোহরে বলে ত্রান কর রঘুপতি।।"[৩৫]

এর থেকে জানা যাচ্ছে যে, মনোহর সেনের পিতা সম্ভবত মধুসুদন সেন ছিলেন। আমাদের মনে হয়, উল্লিখিত কবিদের রামায়ণ সম্পর্কিত পুথি রচনার আগে থেকেই বরাক উপত্যকায় রামায়ণের আখ্যান প্রচলিত ছিল। লোকসমাজের প্রায় সকলেই কমবেশি রামায়ণের কাহিনি জানতেন। প্রশ্ন জগে, কীভাবে এতদঞ্চলের লোকসমাজ রামায়ণের কাহিনির প্রতি অবগত ছিলেন। এই বিষয়ে বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ অমলেন্দু ভট্টাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জানতে পারি যে, বরাক উপত্যকার বিভিন্ন দেবালয়ে-আখড়ায় রামায়ণের আখ্যান বহু আগে থেকেই পালাগানের শৈলীতে নিরক্ষর লোকেদের সামনে পরিবেশন করা হত। শ্রোতাদের মধ্যে অধিকাংশই থাকতেন প্রাপ্তবয়স্ক নারী। তাঁদের কাছে রামায়ণের আখ্যান পরম আদরের বিষয় ছিল। কারণ তাঁরা যেন রামায়ণের মধ্য দিয়ে নিজেদের পারিবারিক জীবনের ছবি খুঁজে পেতেন। যেমন, রামের মতো স্বামী, লক্ষ্মণের মতো দেবর, সীতার মতো সতী নারী, কৌশল্যার মতো শাশুড়ি প্রভৃতি। এর পরিচয় আজও মেলে এতদঞ্চলের লোকসাহিত্যে। যেমন, বিয়ের গানে শোনা যায়:

"... তোমার সীতার ভাগ্যের ফলে অযধ্যা নগর মিলে।
আরো মিলে দশরথ শ্বশুর।
তোমার সীতার ভাগ্যের ফলে রামচন্দ্র পতি মিলে।

আরো মিলে কৌশল্যা শাশুড়ি।
তোমার সীতার ভাগ্যের ফলে তিনজন শাশুড়ি মিলে।
আরো মিলে ভরত শত্রুঘ্ন।..."[৩৬]

বিয়ের গানের মতো সাবিত্রী ব্রতেও উল্লেখ আছে:

"রামের সনে সীতা দেবী ছিলেন কাননে।।
জ্যৈষ্ঠ মাসে সাবিত্রী পূজা করে সর্বজনে।।
কাননে থাকিয়া সীতায় ভাবেন মনে মনে।
অরণ্যে সাবিত্রী পূজা করেন কেমনে।।"[৩৭]

পাশাপাশি ছোট ছোট মেয়েদের দ্বারা অনুষ্ঠিত মাঘমণ্ডল ব্রতের ছড়ায় শোনা যায়:

"রাম যেমন পতি পাই
লক্ষ্মণ যেমন দেওর পাই।"[৩৮]

এতদঞ্চলের প্রবাদেও আছে:

"ভূতের মুখে রামনাম।"[৩৯]

এরকম অনুসন্ধান করলে এতদঞ্চলের লোকসাহিত্যের অন্যান্য উপকরণগুলিতেও কমবেশি রামায়ণের প্রসঙ্গ পাওয়া যাবে।

উপরোক্ত আলচনার মধ্য দিয়ে এটা অন্তত বলা যেতে পারে যে, রামায়ণের প্রতি আকর্ষণ ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের লোকেদের মতো বরাক উপত্যকার লোকেদের কাছেও সমানভাবে জনপ্রিয় ছিল। এখনো আছে। এর প্রমাণ দেয় শিলচরের নর্মাল স্কুলে সংরক্ষিত করে রাখা পুথিগুলি। তবে এটা ঠিক যে আজও সংরক্ষণের অভাবে এই অঞ্চলের নানা প্রান্তে রামায়ণ বিষয়ক ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ক বহু পুথি ছড়িয়েছিটিয়ে রয়েছে। পুথিগুলি সংরক্ষণ করা গেলে অনেক গুরত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে বলে আমাদের মনে হয়।

তথ্যসূত্র:

১। Bhattacharjee, Amalendu। Study Materials। One Week Basic Level National Workshop on Manuscriptology & Palaeography। Organised Jointly by Dept. of Bengali & Dept. of Manipuri In Collaboration with IQAC, RTU, Hojai, Assam, Dt. 18. 03. 2025-24.03. 2025, p. 1।
২। Bhattacharjee, Amalendu। A Descriptive Catalogue of the Manuscripts of South Assam The Collections of The Normal School, Silchar, Vol-1। Eastern Publishers, Guwahati, First Published in 2022, p. xxxviii।
৩। তদেব, পৃ. Xiv।
৪। তদেব, পৃ. Xviii।
৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. অসিতকুমার। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত। মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, নতুন সংস্করণ ২০০৬-০৭, পৃ. ৩৭।
৬। তদেব, পৃ. ৩৬।

৭। Bhattacharjee, Amalendu। A Descriptive Catalogue of the Manuscripts of South Assam The Collections of The Normal School, Silchar, Vol-1। Eastern Publishers, Guwahati, First Published in 2022, p. 4।

৮। তদেব, পৃ. ৫।

৯। সেন, দীনেশচন্দ্র। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দ্বিতীয় খণ্ড। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, নবম সংস্করণ, আগষ্ট, ১৯৮৬, পৃ. ৫১২।

১০। Bhattacharjee, Amalendu। A Descriptive Catalogue of the Manuscripts of South Assam The Collections of The Normal School, Silchar, Vol-1। Eastern Publishers, Guwahati, First Published in 2022, p. 99।

১১। সেন, সুকুমার। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড। আনন্দ, কলকাতা, দশম মুদ্রণ আশ্বিন ১৪১৮, পৃ. ১০৫।

১২। তদেব, পৃ. ১০৪।

১৩। সেন, দীনেশচন্দ্র। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দ্বিতীয় খণ্ড। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, নবম সংস্করণ, আগষ্ট, ১৯৮৬, পৃ. ৫১২-৫১৩।

১৪। তদেব, পৃ. ৫১২।

১৫। Bhattacharjee Amalendu। A Descriptive Catalogue of the Manuscripts of South Assam The Collections of The Normal School, Silchar, Vol-1। Eastern Publishers, Guwahati, First Published in 2022, p. 1।

১৬। তদেব, পৃ. 2।

১৭। তদেব, পৃ. 2।

১৮। সেন, সুকুমার। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড। আনন্দ, কলকাতা, দশম মুদ্রণ আশ্বিন ১৪১৮, পৃ. ৩৬৭।

১৯। সেন, দীনেশচন্দ্র। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দ্বিতীয় খণ্ড। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, নবম সংস্করণ, আগষ্ট, ১৯৮৬, পৃ. ৫০৯।

২০। সেন, সুকুমার। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড। আনন্দ, কলকাতা, দশম মুদ্রণ আশ্বিন ১৪১৮, পৃ. ২৪৫।

২১। Bhattacharjee Amalendu। A Descriptive Catalogue of the Manuscripts of South Assam The Collections of The Normal School, Silchar, Vol-1। Eastern Publishers, Guwahati, First Published in 2022, পৃ. ১২৭।

২২। সেন, সুকুমার। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড। আনন্দ, কলকাতা, দশম মুদ্রণ আশ্বিন ১৪১৮, পৃ. ৩৬২।

২৩। Bhattacharjee, Amalendu। A Descriptive Catalogue of the Manuscripts of South Assam The Collections of The Normal School, Silchar, Vol-1। Eastern Publishers, Guwahati, First Published in 2022, p. xi।

২৪। তদেব, পৃ. 81।

২৫। তদেব, পৃ. ৯৭।

২৬। তদেব, পৃ. ৯৮।
২৭। তদেব, পৃ. ১৩০।
২৮। তদেব, পৃ. Xi।
২৯। তদেব, পৃ. ৫৪।
৩০। তদেব, পৃ. Xi।
৩১। তদেব, পৃ. ৪৩।
৩২। তদেব, পৃ. ৪৩।
৩৩। সেন, সুকুমার। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড। আনন্দ, কলকাতা, দশম মুদ্রণ আশ্বিন ১৪১৮, পৃ. ৩১১-৩১২।
৩৪। Bhattacharjee, Amalendu। A Descriptive Catalogue of the Manuscripts of South Assam The Collections of The Normal School, Silchar, Vol-1। Eastern Publishers, Guwahati, First Published in 2022, p. ১১৩।
৩৫। তদেব, পৃ. ১১৩।
৩৬। পাল, মানচিত্র। করিমগঞ্জ জেলার বাঙালি হিন্দুর বিয়ের গীত। স্রোত প্রকাশনা, কুমারঘাট, ঊনকোটি, ত্রিপুরা, এপ্রিল ২০১৮, পৃ. ৩৭।
৩৭। পাল, মানচিত্র, সংগ্রহ ও সম্পাদনা। করিমগঞ্জ জেলার লোকসাহিত্য। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ২২৯।
৩৮। সাক্ষাৎকার, ভট্টাচার্য, অমলেন্দু। প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গুরুচরণ কলেজ, শিলচর, তারিখ ২২/০৬/২০২৫, সময় রাত ৯টা।
৩৯। পাল, মানচিত্র, সংগ্রহ ও সম্পাদনা। করিমগঞ্জ জেলার লোকসাহিত্য। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১ জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ২২৯।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 2005-2012
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.425

নারীমুক্তি আন্দোলন: ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর সমাজসংস্কারক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে (১৮০১-১৯০০)

ড. অন্তরা চৌধুরী, *সহকারী অধ্যাপিকা, নেতাজী শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.03.2026; Accepted: 21.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Since 1914, March 8th has been recognized as International Women's Day, commemorating the movement of working-class women in New York in 1910. However, while this pertains to the international sphere, what was the nature of this women's emancipation movement within India—specifically in Bengal? To understand this, we must examine the nineteenth century. The nineteenth century marked a pivotal turning point in Bengali society and literature. During the eighteenth century, the British, having initially arrived with their wares for trade, gradually consolidated their political authority. Following the Battle of Plassey (1757) and subsequently the Battle of Buxar (1764), the British embarked on their administrative journey by securing the rights to collect revenue from Bengal, Bihar, and Odissa. Yet, at that juncture, the light of Western civilization had not yet begun to cast its influence upon Indian civilization. In the early nineteenth century, for the sake of administrative convenience—specifically to cultivate a class of indigenous clerks—a select group of Indians gained access to Western education. When this new generation of Western-educated youth analyzed their own society through a lens free of traditional prejudices, they were deeply distressed by the deplorable condition of Indian women. They realized that societal progress could only be achieved if the advancement of the larger segment of society—namely, its women—was made possible. Consequently, the emancipation of women became the central pillar of the social reform movements spearheaded by these newly educated youths. Although they encountered numerous obstacles on this path, they never faltered; and thus, under their leadership, a powerful wave of women's emancipation swept across the entire nineteenth century.

Keywords: Women, Liberation, Society, Literature, Education, Rituals, Boundaries, Reformation, Freedom

ঊনিশ শতকে নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রেক্ষাপট কী কারণে সৃষ্টি হল সেটি প্রথমে দেখে নেওয়া যাক্। হিন্দু ভাবধারায় অর্ধনারীশ্বরের চির প্রতিষ্ঠা রয়েছে। অর্ধনারীশ্বরের পরিকল্পনাতেই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে নারী পুরুষ একে অপরের পরিপূরক এবং তাদের সম্মিলনেই সম্পূর্ণতা সম্ভব। কিন্তু এই ভাবধারা ভারতের জলবায়ুতে থাকলেও এখানে নারীরাই সর্বাধিক অবদমিত হয়েছে। এই অবদমনের মধ্যেও প্রাচীনযুগে তাদের

শিক্ষা তথা সংস্কৃতিক কাজে হস্তক্ষেপ করার স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু এই পরিস্থিতির পরিবর্তন হল। মুসলিম আক্রমণের (১২০১-০৩খ্রীঃ) পর বাংলার জনজীবনের বিপুল পরিবর্তন ঘটল। হিন্দুরা বিধ্বংসী মুসলিমদের হাত থেকে নিজেদের সম্পদরূপী নারী প্রজাতিকে রক্ষা করার জন্য রক্ষণশীলতার পরিমাণ বৃদ্ধি করল। ফলে নারীদের যেটুকু স্বাধীনতা ছিল তা বিলুপ্ত হল। সেনযুগে (১০ম-১২শ খ্রীষ্টাব্দ) যে কৌলীন্য প্রথা প্রতিষ্ঠিত ছিল তা মধ্যযুগে আরো চরম দুর্দশায় পর্যবসিত হল। সে যুগের বারোমাস্যাগুলিতে বাঙালী রমণীদের বারোমাসের দুঃখের চিত্র আমাদের সম্মুখে খুব স্পষ্ট রূপে প্রকাশিত হয়। তারপর এল যুগ পরিবর্তনের আরেক নতুন অধ্যায় ইংরেজদের হাত ধরে। পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে সমাজের চিত্র পরিবর্তিত হল, আর এই পরিবর্তন ঘটল নারীর অবস্থার উন্নতিকরণের মাধ্যমে। সমাজ সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে যে যে বিষয়গুলি আমরা প্রত্যক্ষ করি, তার বেশীরভাগই নারী মুক্তি আন্দোলন-

(১) সতীদাহ প্রথা রদ করা
(২) বিধবা বিবাহ প্রচলন করা
(৩) স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন করা
(৪) বহুবিবাহ রদ করা
(৫) বাল্যবিবাহ রদ করা

প্রথমে আলোচনা করা যাক্ সতীদাহ প্রথা প্রসঙ্গে। পতির মৃত্যুর পর স্বামীর চিতায় স্ত্রীর সহমৃতা হওয়ার ভয়ঙ্কর প্রথার নাম সহমরণ বা সতীদাহ প্রথা। রামায়ণ, মহাভারত থেকে শুরু করে বহু অর্বাচীন পুরাণে সতীদাহ প্রথার সমর্থন করা হয়েছে। ধর্মের নামে মেয়েদের পুড়িয়ে মেরে ফেলার ইতিহাস শুধু ভারতেই নয় ইউরোপ থেকে শুরু করে বিশ্বের সর্বত্রই কম বেশী ছিল। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সেগুলি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু ভারতে তা আধুনিক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কলকাতা শহর তখন ভারতের রাজধানী। পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার শুরু হয়ে গেছে। সেই কলকাতা শহরেই সরকারী হিসেব অনুযায়ী সতীদাহের সংখ্যা ছিল–

স্থান	১৮১৫	১৮১৬	১৮১৭	১৮১৮	মোট সংখ্যা
কলিকাতা	২৫৩	২৮৯	৪৪২	৫৪৪	১৫২৮

(বাগল: পৃ. ২৭)

এই রকম পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে রাজা রামমোহন এই ভয়ঙ্কর প্রথাকে রদ করার চেষ্টা শুরু করলেন। তবে অমানবিক এই প্রথাকে রদের চেষ্টা এর পূর্বেও অনেকে করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সম্রাট আকবর (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রীঃ)। তিনি এক শ্রেণীল কর্মচারীও নিয়োগ করেছিলেন– "In every city and district vigilant and truthful inspectors were appointed to distinguish between voluntary and forced 'sati' and the prevent the latter" [Fazal: P-42] এছাড়া আরো কিছু মোগল সম্রাট থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে ডিরোজিও এবং তার অনুগামীরা এই প্রথা বন্ধ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু রামমোহন এবং তাকে সমর্থনকারী তৎকালীন গভর্নর জেনারেল এই প্রথাটিকে স্বমূলে ধ্বংস করতে পেরেছিলেন। ১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর আইন করে এই প্রথাটি বন্ধ করার কথা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এর বিরুদ্ধেও প্রতিবাদের ঝড় তোলেন

> "...রাজা রাধাকানত দেব, 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকার সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'ধর্মসভা'র পক্ষের বারো জন সদস্য– গোপী মোহনদেব, মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, নীলমণি দেব, গোকুল নাথ মল্লিক, ভবানী চরণ মিত্র, রামগোপাল মল্লিক, নিমাই চাঁদ শিরোমণি, হরনাথ তর্কভূষণ প্রভৃতি ব্যক্তি" (সিংহ: ২০০০: পৃ. ১৪৯)।

এই সমস্ত বাধাবিপত্তির মধ্যেও রামমোহন রায় কখনও পিছিয়ে আসেননি। তিনি সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে শুধু ভারতে নয় সুদূর ইংল্যান্ডেও বিপুল জনমত তৈরী করেন। তাই অচিরেই এই প্রথাটি বিলুপ্ত হল।

এতক্ষণ আমরা সতীদাহ প্রথাকে ঘিরে ইতিহাসের দিকটি জানলাম, কিন্তু বাস্তবিক মেয়েরা এই বিষয়টিকে কীভাবে দেখতো তার পরিচয় আমরা বিভিন্ন সাহিত্য নিদর্শনে পাই। সতীদাহ প্রথাকে এতদিন টিকিয়ে রাখার পেছনে কারণ ছিল- বিধবা রমণীকে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। এছাড়াও বিধবা রমণীর ভরণপোষণের দায়িত্ব নেওয়া অন্যদের পক্ষে অসম্ভব তাই তাদের পুড়িয়ে মারা হতো। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর প্রথা চালিয়ে যাওয়ার পেছনে শুধু সুবিধাবাদী পুরুষরাই ইন্ধন জোগায়নি মেয়েদের মধ্যে কিছু অংশেরও এই প্রথার প্রতি সমর্থন ছিল।

প্রথমত, রমণীকুল চিরসাথী স্বামীর বিরহে আত্মবিসর্জন করতেন সতীদাহ প্রথার মাধ্যমে। প্রেমের এই শাশ্বত বাণীর জয়গানই যেন এক অর্থে এই প্রথাটি বহন করে। তাই মধুসূদন দত্ত রচিত 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে প্রমীলার মেঘনাদের চিতায় আরোহনের দৃশতে শুধু করুণাই প্রকাশিত হয়, সতীদাহের ভয়ঙ্করতা কোথায় যেন হারিয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত, ভারতে সতী, সাবিত্রীর মহান আদর্শ বর্তমান। নিজেকে সেই সম্মানের পদে উন্নীত করার আকাঙ্খা মেয়েদের মধ্যে সঞ্চারিত করা হতো। ব্যক্তিগত জীবনের চির অপমানের অবসান ঘটাতে চাইতো, মৃত্যু পরবর্তী সম্মানের আশায়। যেমন- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'মৃণালিনী' উপন্যাসের মনোরমা সকলের নিষেধ উপেক্ষা করে সহমৃতা হয়েছেন।

তৃতীয়ত, সহমরণে বিশ্বাসী হিন্দু রমণীদের কাছে এটি মহান ব্রত। তারা রমনীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার দৃশ্যটিকে দেবী দর্শনের মতোই মহান মনে করত। ক্ষমতার যে স্তরে শোষিতরা নিজেদের অজান্তে শোষকের অনুরূপ আচরণ করে তাকে আন্তোনিও গ্রামশি 'হেজিমনি' বলেছেন। তৎকালীন মেয়েরা হেজিমনি অবস্থার শিকার ছিল। এই অবস্থার উল্লেযোগ্য উদাহরণ রয়েছে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'বেণু ও বীণা' কাব্যগ্রন্থে 'সহমরণ' নামক কবিতায়, যে কবিতায় বৃদ্ধ স্বামীর চিতায় আরোহণকারিণী রমণীর যন্ত্রণায় আর্তনাদকে ঢাকার আয়োজনের উল্লেখ আছে–

"... ভাঙ্গল সুখের হাট;
খয়ের রাশি ছড়িয়ে পথে
চলল নিয়ে শবের সাথে,
যেখায় শ্মশান ঘাট।
... বাজল শতেক শাঁখ;
লোকের ভিড়ে ভরেছে ঘাট –
ধোঁয়ায় চিতার আধ ভিজা কাট,
উঠল গর্জে ঢাক।"

সতীদাহ প্রথা যেকোন সমাজের কলঙ্ক স্বরূপ। সমাজের এই দগ্‌দগে ক্ষতটি নিবারণ করার চেষ্টায় যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রণী হলেন রামমোহন রায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রথম সাফল্য হিসেবেও এটিকে ধরা যেতে পারে।

বিধবাবিবাহ আন্দোলনের পুরোধা পুরুষ ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। প্রচীনযুগে বিধবা বিবাহের প্রচলন থাকলেও তা মধ্যযুগে অবলুপ্ত হয়ে যায়, বিশেষত কুলীনকুলের রমণীদের ক্ষেত্রে। এছাড়াও কৌলীন্য প্রথার

কারণে কোন কোন পুরষ শতাধিক নারীকে বিবাহ করতো এবং সেই স্বামীটির মৃত্যু ঘটলে তাদের সকলকে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হতো। আর এই বিধবাদের মধ্যে বেশীর ভাগেরই শৈশব অবস্থা কাটেনি। হিন্দু নারীদের এই অসীম দুঃখের অবস্থকে দূরীভূত করার জন্য বিদ্যাসাগর সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহের সপক্ষে জনমতের পাশাপাশি শাস্ত্রীয় যুক্তিও তুলে ধরলেন –

"গতে মৃত প্রবৃজিতে ক্লীবে চ পতিতে পাতৌ।
পঞ্চ স্বাপৎসু নারীণাং পতবণ্যে বিধয়তে।।" (পরাশর সংহিতা: চতুর্থ অধ্যায়)

অর্থাৎ পাঁচটি ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের পুনর্বিবাহ শাস্ত্রবিহিত, তা হল– স্বাশী অনুদ্দেশ হলে, মারা গেলে, ক্লীব বলে গণ্য হলে, সংসার ধর্ম ত্যাগ করলে কিংবা পতিত হলে।

বিদ্যাসাগরের এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে বিস্তর ঝড় উঠেছিল। ব্রজসুন্দর মত্রি (১৮২০-৭৫), কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮২), শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪০-১৯২৫), দুর্গামোহন দাস (১৮৪১-৯৭), শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) প্রমুখ ব্যক্তিদের বিধবাবিবাহ সমর্থন করার জন্য নানা লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়। বিদ্যাসাগরের জীবনীকার বলেছেন বিধবাবিবাহ আন্দোলনের ফলে 'হিন্দু গৃহে সত্যই একটা বিস্ময় বিভীষিকার সৃস্টি হল।' (সরকার: ১৯২২: পৃ. ২৯৬) তাই এর প্রতিক্রিয়া বিকট আকার ধারণ করল। যারা বিধবাবিবাহের সমর্থন করলেন তাদের নানাভাবে ব্যঙ্গ বিদ্রুপের মাধ্যমে জর্জরিত করা হত। তবে এত কিছু বাধাবিপত্তি পেরিয়ে ১৮৫৬-র জুলাই মাসে বিধবাবিবাহের আইনটি স্বীকৃতি পায়। কিন্তু এত কিছুর পরেও বিধবাবিবাহ সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করেনি। এমনকি এই পরিস্থিতির পরিবর্তন একবিংশ শতাব্দীতেও সর্বত্র ঘটতে পারেনি। তবে তৎকালীন ভয়ঙ্করতার মাত্রাটি বর্তমানে অনেকটাই প্রশমিত হয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে কিছু শিক্ষিত সম্প্রদায় ছাড়া বিধবাবিবাহের সমর্থন করতে কেউ সাহস পায়নি। এর কারণ বিশেষত সমাজের রক্ষণশীলদের ভয়ে, তাই বহু মানুষ বিধবা কন্যার দ্বিতীয় বিবাহের কথা ভাবলেও তা বাস্তবায়িত করতে পারেননি। রমণীকুল এ বিষয়টিকে কীরূপে দেখতো সেটার একটা পরিচয় পাওয়া যায় 'নীলদর্পন' নাটকের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে –

"আদুরী। সেই সাগর নাড়ের বিয়ে দেয়, ছ্যা– নাকি দুটো দল হয়েছে। মুই আজাদের দলে।"
(মিত্র: ২০০৫: পৃ. ৮১)

আদুরী নিম্নশ্রেণীর মেয়ে। তার বক্তব্য অনুযায়ী বোঝা যাচ্ছে নিম্নশ্রেণীর মানুষদের মধ্যেও বিদ্যাসাগর সমালোচিত হয়েছেন। বিধবাবিবাহের সমর্থনে বাংলার রঙ্গমঞ্চে বহু নাটক অভিনীত হয়েছে। কিন্তু সর্বাধিক মঞ্চ সাফল্য লাভ করে বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে লেখা নাটকগুলি। প্রসঙ্গত, বঙ্গিমচন্দ্রের এ বিষয়ে অবস্থানটি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে বিধবাবিবাহ তৎকালীন সমাজের লোকাচার বিরুদ্ধ, তাই এটিকে স্বীকৃতি দেওয়ার সময় আসেনি। এমনকি তিনি 'বিষবৃক্ষ' এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাস দুটিতে এমন বিধবা রমণীর প্রেম দেখালেন যেখানে তারা অন্যের সুখের সংসার ভাঙার মূল কারণ। তাই কুন্দনন্দিনীকে আত্মহত্যা করে এবং রোহিনীকে গোবিন্দলাল হত্যা করে সমাজের স্থিতাবস্থা বজায় রেখেছে। তাদের মৃত্যুতে উপন্যাসে করুনরস সঞ্চারিত হলেও তাতে বিধবা বিবাহের সমর্থন দেখা যায় না। বরং তারা প্রবৃত্তিগত তাড়নাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল বলেই তাদের মৃত্যু হয়েছে। স্বভাবতই বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সমর্থক হিসেবে এই উপন্যাস দুটিকে বলা যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর আর একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল তৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৪৭-১৯১৯)। 'কঙ্কাবতী', এটিতে বিধবাবিবাহ সাধারণ শ্রমিক শ্রেণীর কাছেও কতটা ঘৃণ্য সেটি তুলে ধরা হয়। এখানে আরেকটি বিষয় দেখ যায় যে 'তনু রায়' স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বিধবা বিবাহকে সমর্থন করেছিল। তৎকালে বহু

যুবক অর্থের লোভে বিধবা বিবাহ করতেন। বিধবাকে বিবাহ দানের উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগর নিজের অর্থ ব্যয় করেছিলেন।

যাইহোক, বিধবা বিবাহ প্রচলিত করার জন্য বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত চেষ্টা এবং সে বিষয়ের সাফল্য– এ সবই বাংলা তথা ভারতের কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষের বহু রমণীর কাছে এটি আশীর্বাদ স্বরূপ ছিল।

ভারতের সমাজে জগদ্দল পাথরের মতো বসে আছে কৌলীন্য প্রথা। কৌলীন্য প্রথারই ফল বহুবিবাহ এবং বাল্যবিবাহ। বল্লাল সেনের প্রচলিত কৌলীন্য প্রথায় কুলীন পুরুষ একাধিক রমণীকে বিবাহ করত। কন্যার পিতারাও এই বিবাহ দিতে দ্বিধা করতো না। কারণ এটি না করলে সমাজ তাকে একঘরে করে দেবে। আর এই প্রথার অব্যবহিত ফল হল বাল্যবিবাহ।

বিদ্যাসাগর গ্রামে গ্রামে ঘুরে কুলীন ব্রাহ্মণদের বিবাহের সংখ্যার যে চিত্র ধরে ছিলেন তা সত্যই বিস্ময়কর। বহুবিবাহ রদ করার জন্য তিনি আইন প্রণয়ণের চেষ্টা করেন এবং তৎকালীন সরকারকে তাঁর মতের পক্ষে নিয়ে আসতে সফল হন। তৎকালীন লেফটেনান্ট গভর্নরের পত্র থেকে এই মতের সপক্ষে যুক্তি পাওা যায়,

> "I have taken a deep interest in the question since it was first seriously agitated by our late lamented friend Vidyasagar for enactment there upon saw the Maharaj of petitions on the subject had been presented to the legislative council. Sir John Grant promised very shortly to introduce a Bill for the abolition of Hindu Polygamy." (মিত্র: ১৯৬৯: পৃ. ৩৪০)

বহুবিবাহের খারাপ দিক নিয়ে সকলেই সমালোচনা করেছেন। কিন্তু বিশিষ্ট জনেরা এটিকে আইন করে বন্ধ করতে চাইলেন না। তাঁদের মত ছিল সমাজ পরিবর্তনের স্বাভাবিক গতির সঙ্গে এটিও অবলুপ্ত হয়ে যাবে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারই একে অবলুপ্ত করবে। এছাড়াও সিপাহী বিদ্রোহের পর সরকার পক্ষও ভারতবাসীকে কোনভাবে ক্রুদ্ধ করতে চায়নি। ফলত আইন করে বহুবিবাহ রদ করা সম্ভব হয়নি। তবে শুধু ঊনবিংশ শতাব্দী কেন মধ্যযুরে সাহিত্যেও বহুবিবাহের সমালোচনা করা হয়েছে। স্বপত্নীদের সহবাসে নারীদের মর্মান্তিক বেদনার কথা কবিতা, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ সর্বত্র বর্ণিত হয়েছে। ঊনবিংশ শতকের বিখ্যাত নাটক 'কুলীন কুলসর্বস্ব' বহুবিবাহকে সমালোচনা করে লেখা। ঊনিশ শতকের সাহিত্যের প্রসঙ্গ আসলে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথা। তাঁর একাধিক উপন্যাসে বহুবিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন– বিষবৃক্ষ, দেবী চৌধুরাণী, কপালকুন্ডলা, সীতারাম এই সমস্ত উপন্যাসে বহুবিবাহ এবং তার ফলে নারীদের মানসিক অবসাদের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকক্ষেত্রে তিনি বহুবিবাহের সমালোচনা থেকে বিরত থেকেছেন। মেযন– 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে সাগর ও প্রফুল্লর মধ্যে সখ্যতা দেখিয়েছেন। এক্ষেত্রে কোন ক্ষোভ জমা হয়নি। আসলে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তৎকালীন সমাজের নারীদের জীবনের বাস্তবিক রূপ তুলে ধরেছিলেন। যেখানে কোন স্ত্রীর কাছে স্বামীর পুনর্বার বিবাহ যেন এক স্বাভাবিক নিয়ম। সমাজের শোষিতরা নিজেদের দুরবস্থার কারণগুলি বুঝতে পারে না। এর পেছনে একটি বড় কারণ অশিক্ষা।

কৌলীন্য প্রথার আরেকটি ভয়াবহ দিক বাল্যবিবাহ। বাল্যবিবাহ হল নারীকুলের আরেকটি অসহায় প্রথা। বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় ১৮৬০ সালে একটি আইন প্রণয়ন করা হয়, যাতে হিন্দু বিবাহে নারীদের সর্বনিম্ন বয়স ১০ বছর ধার্য করা হয়। ১৮৯১ সালে মেয়েদের বিবাহের জন্য সর্বনিম্ন বয়স ১২ বছর স্থির করা হয়। কেশবচন্দ্র সেন, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিরা বাল্যবিবাহ আইন করে বন্ধ করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ

করেছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ মণীষীরা মনে করতেন এই প্রথাও কালের নিয়মে বন্ধ হয়ে যাবে। আইন করে এটিকে হঠাৎ বন্ধ করা অসম্ভব। শিবনাথ শাস্ত্রীর 'নয়নতারা' উপন্যাসে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হয়েছে, স্বর্ণকুমারী দেবীর 'স্নেহলতা' উপন্যাসেও বাল্যবিবাহের খারাপ দিকটি তুলে ধরা হয়। তবে এটা ঠিক যে বাল্যবিবাহের প্রবণতা ধীরে ধীরে কমে আসছিল কারণ আধুনিক পুরুষ সমাজ নিজেদের জন্য শিক্ষিত স্ত্রী চাইছিল। ফলে বালিকা বধূদের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে। বর্তমানে ভারত সরকারের নিয়ম অনুসারে নারীদের ১৮ বছরের নীচে বিবাহ করাকে দন্ডনীয় অপরাধ হিসাবে ধার্য করা হয়েছে। কিন্তু তবুও এখনও বাল্যবিবাহ ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলে খুব অল্প পরিমাণে হলেও বিদ্যমান। আসলে নারীকে বরাবরই পুরুষ জাতি নিজেদের সম্পদ বলে মনে করেছে। এই সম্পদের উপর অধিকার তারা যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি করতে চেয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্ত্রী শিক্ষা আন্দোলনটি সবদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ পূর্বোল্লিখিত আন্দোলনগুলির সার্থকতা তখনই সম্ভব যখন নারীরা নিজের মূল্য নিজেরাই উপলব্ধি করবে, শিক্ষা ছাড়া যা কোনভাবেই সম্ভব নয়। প্রাচীন ভারতে নারী শিক্ষার কোন বাধা ছিল না। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজ যতই তার ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে থাকল ততই নারীর উপর নিজেদের অধিকারকে কুক্ষিগত করতে চাইল। অশিক্ষার অন্ধকারেই এই অবস্থার সৃষ্টি হযেছে। আধুনিকতার ছোঁয়ায় এই অবস্থার পরিবর্তন হতে লাগল। অন্যান্য নারী মুক্তি আন্দোলনের মতো এই আন্দোলনেও পুরোধা পুরুষ ছিলেন বিদ্যাসাগর। তবে এর পথও দুর্গম ছিল। ১৮৪৭ সালে কালীকৃষ্ণ মিত্র ও নবীনকৃষ্ণ মিত্রের উদ্যোগে বারাসাতে প্রথম মেয়েদের স্কুল শুরু হয়, তবে এর ফলে তাঁদের যা লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। এরপর ১৮৪৯ সালের ৭ই মে ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন, ১৮৬২ সালে এর নাম হয় বেথুন স্কুল। বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে গ্রামে গঞ্জে একাধিক মেয়েদের বিদ্যালয় নির্মিত হয়। আবার উঠল বিরোধিতার ঝড়। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখরা দাবী করলেন স্ত্রীশিক্ষার ফল মারাত্মক। এর দ্বারা নারী জাতির বিস্তর ক্ষতির সম্ভবনা আছে এমনকি তাদের স্বাস্থ্যের এতটাই ক্ষতি হয় যে তারা সন্তান ধারণে অক্ষম হয়ে যায়। এই সমস্ত কারণে স্ত্রী শিক্ষার স্কুলগুলিতে ছাত্রী সংখ্যা কমতে থাকলো। তবে এ অবস্থারও পরিবর্তন ঘটল। বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

> "... দিনকতক ধূম পড়িল, স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার সংস্কার কর, স্ত্রীশিক্ষা দাও। বিধবার বিবাহ দাও। বহু বিবাহ নিবারণ কর, ... যে রীতিগুলির চলন আপাতত অসম্ভব, সেগুলি চলিত হইল না; স্ত্রী শিক্ষা সম্ভব এজন্য তারা এক প্রকার প্রচলিত হইয়া উঠিতেছে।" (চট্টোপাধ্যায়: ১৩৪৬: পৃ. ৪১)

মোটামুটিভাবে স্ত্রীশিক্ষার একটা ক্ষীণধারা বাংলার আবহাওয়ায় শিক্ষিত যুবকদের প্রচেষ্টায় শুরু হয়ে যায়। বেথুন নবশিক্ষিতা বালিকাদের মধ্যে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়েছিলেন। ১৮৫০ সালের ২৯শে মার্চ বেথুন ডালহৌসিকে একটি চিঠিতে জানাচ্ছেন, "The eagerness of children to learn and their docility and quickness correspond fully with what we have seen of the Bengali boys and in judgment of their intelligent teachers for surpass what is found among European girls of the same age." এবার আসা যাক্ মেয়েদের স্কুলগুলিতে কি পড়ানো হতো এ প্রসঙ্গে। নারী শিক্ষার প্রাথমিক উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ হল আশুনিক শিক্ষিত পুরুষদের উপযুক্ত করে স্ত্রী জাতিকে গঠন করা। এই কারণে কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত 'মেট্রোপলিটন ফিমেল স্কুল', রন্ধন শিক্ষা পর্যন্ত পাঠক্রমের অংশ হিসেবে রাখা হয়েছিল। আসলে প্রকৃতিগত দিক দিয়ে বা শারীরিক গঠনের দিক থেকে মানুষ দু'প্রকার– নারী ও পুরুষ। এটি তাদের লিঙ্গগত পরিচয়। কিন্তু সমাজও নারী ও পুরুষের জন্য কিছু আলাদা নিয়ম নির্ধারণ করে রেখেছে। এই সামাজিক

লিঙ্গগত পরিচয় তাদের বজায় রাখতে হয়। অর্থাৎ মেয়েরা ছেলেদের মতো আচরণ করলে কিংবা বিপরীত পরিস্থিতি ঘটলে তা সমাজের কাছে দৃষ্টিকটু হয়ে ওঠে। (গুহ: কলকাতা– ৯) স্ত্রীশিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে তা পাঠক্রমে করা হল সামাজিক স্ত্রীলিঙ্গের পরিকাঠামো বজায় রেখে। তাই ১৮৭৮ সালে প্রবেশিক্ষা পরীক্ষায় পাশ করলে কাদম্বিনী ও চন্দ্রমুখী দেবীর আই.এ. পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করতে হয়। আর চিকিৎসা বিজ্ঞান জানার অধিকার যেন শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য তৈরী হয়েছে। সেই কারণেই মেয়েদের মেডিক্যাল কলেজে পড়ার অধিকার ছিল না। কাদম্বিনী দেবীকে মেডিক্যাল সায়েন্স পড়তে বহু বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কারণ পুরষদের মতো মেয়েরা চাকরী করতে যাবে না। স্বাধীনতার পূর্ব লগ্ন পর্যন্ত মোটামুটি এই ধারণাই বদ্ধমূল ছিল। দেশ বিভাগের পর যখন প্রত্যেকটি গৃহে অর্থের অভাব দেখা দিল তখনই নারীরা ব্যাপক হারে চাকরি ক্ষেত্রে নামতে পেরেছিল– "Lastly the partition of India has dealt a severe blow to the family life of several to India leaving behind their sources of income in land and properties" (Introduction : 1958; P-1) এই অবস্থায় পূর্ববঙ্গের মহিলারা যারা এ বঙ্গে উদ্‌বাস্তু হয়ে এসেছিল তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই অর্থ উপার্জনের দিকে ঝুঁকে ছিল।

সবশেষে বলা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীতেই নারীমুক্তি আন্দোলনের সূত্রপাত ও বিস্তার সম্ভব হয়েছিল। নারীমুক্তি অন্দোলনের প্রধান কারণ অবশ্যই সমাজের উন্নতি সাধন, কিন্তু এর পাশাপাশি ড: রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় আরো একটি কারণের কথা বলেছেন, "ব্যক্তিগত জীবনেও অনেকে নারীর ত্যাগ তিতিক্ষা, সহনশীলতা, স্নেহবাৎসল্য, সেবাপরায়ণতা ইত্যাদি সদ্‌গুণের সান্নিধ্যে এসে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিবশত সম্ভবত এ কাজে হাত দিয়েছিলেন যা একেবারে অস্বীকার করা যায়না।" (বন্দ্যোপাধ্যায়: ১৯৯৯: পৃ. ১০) আসলে পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে, "সামাজিক কু-প্রথাগুলিকে দূরীভূত করার জন্য অভূতপূর্ব আলোড়ন জেগে উঠেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে।" (সিংহ: ২০০০: পৃ. ১৩৯) তবে সর্বোপরি এটা বলতে দ্বিধা নেই যে ঊনিশ শতকে যে নারীমুক্তি আন্দোলনের বাতাবরণ তৈরী হয়েছিল তা সর্বস্তরের নারীদের কাছে পৌঁছাতে অনেকটাই ব্যর্থ হয়েছিল। সেই ব্যর্থতার বোঝা আজও আমরা বহন করে চলেছি। তাই একবিংশ শতাব্দীতেও নারীমুক্তি যথার্থরূপে হয়নি। এই ব্যর্থতার পেছনে যতটা পুরুষ জাতি দায়ী ঠিক ততটাই নারী জাতি। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন,

> "দেশের বক্ষে মেয়েদের স্থান বটে, সেই বক্ষে তাহারা মূঢ়তার যে জগদ্দল পাথর চাপাইয়া রাখিয়াছে, সেটাকে সুদ্ধ দেশকে টানিয়া তুলিতে পারিবে কি? তুমি বলিবে সেটার কারণ অশিক্ষা। শুধু অশিক্ষা নয়, অতিমাত্রায়ায় হৃদয়ালুত।..." (ঠাকুর: ১৪১১: পৃ. ৪৯)

গ্রন্থ পঞ্জিকা:

বাংলা বই:

১। গুহ, লতিকা (ভাষান্তর), স্ত্রীলিঙ্গ (দ্য সেকেন্ড সেক্স) প্রথম খন্ড। সিমন দ্য বোভোয়ার, দীপাণ, কলকাতা -৯।

২। চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, প্রাচীনা এবং নবীনা। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র (সম্পাদক), ১৩৪৬, দি ন্যাশনাল লিটরেচার কোম্পানী, ৫, ডালহৌসি স্কোয়ার, পৃ. ৪১।

৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১৪১১, পঞ্চভূত। বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ, কলকাতা, পৃ.-৪৯।

৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, রণজিৎ, ১৯৯৯, ঊনিশ শতকে নারীমুক্তি আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য (১৮৫০-১৯০০)। পুস্তক বিপনি, কলকাতা-৯, পৃ. ১০।

৫। বাগল, যোগেশচন্দ্র, বাংলার স্ত্রীশিক্ষা। বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ, পৃ.-২৭।

৬। মিত্র, ইন্দ্র, ১৯৬৯, করুণাসাগর বিদ্যাসাগর। কলকাতা, পৃ. ৮১।

৭। মিত্র, দীনবন্ধু, দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য (সম্পাদিক), ২০০৫, দেব পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ. ৩৪০ ।

৮। সরকার, বিহারীলাল, ১৯২২, বিদ্যাসাগর চতুর্থ সংস্করণ। কলকাতা, পৃ. ২৯৬ ।

৯। সিংহ, মঞ্জুশ্রী, ২০০০, ঊনবিংশ শতাব্দীর সহিত্য ও সংস্কৃতিতে বঙ্গ মহিলা। গ্রন্থ সম্পুট, কলকাতা– ৯, পৃ. ১৩৯।

ইংরাজী বই:

১। Abul Fazal, Ain-i-akbari, vol-III, p. 42.

২। Introduction, unemployment, among woman in West Bengal, Directorate of National employment service, West Bengal, 1958, ch- 1.

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 2013-2021
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.426

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময় ও সমাজ

দীপঙ্কর সরকার, *গবেষক, রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচি, ঝাড়খণ্ড, ভারত*

Received: 20.03.2026; Accepted: 30.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract:

Narayan Gangopadhyay's literary career began with poetry. And in this poem he advanced on the path of this establishment as a short story writer. However, Narayan Gangopadhyay painted a picture of the life of that apocalyptic period in short stories that can't be told in poetry. Because he was born into the horrors of the First world war and the madness of the Russian Revolution, and when he grew up, it was the madness of the second world war. A strong protest against World war, smuggling, black market, starvation, poverty, exploitation and oppression became inevitable for the humanitarian Narayan Gangopadhyay. So Narayan Gangopadhyay look short story as a tool. A time collision may shape a writer's vision of life. Time may give the material to the writer. Then the responsible and humane literary person became the artist of the age. In term of content, Narayan Gangopadhyay has selected stories and characters from various contexts and categories. Age artist wrote stories in the context of war, riots and faminers. Thus by seltering these he finally attains an eternal being. Regardless of time, the country has accepted the people of different classes of society such as strongmen, hoarder, black marketeer, tea garden coolie, state owner, priest, educated, santali woman, geo-tourist, historian Rai Bahadur etc. He had no choice any class. He chose characters from all walks of life. His presentation style was amazing introduction. Narayan Gangopadhyay excels at creation multi-dimensional characters. That is why his character does not end in time, but is etemal.

Key words: First world war, madness, russian revolution, smuggling, black market, starvation, various contexts and categories, multi-dimensional characters.

প্রকৃতপক্ষে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় উত্তর-কল্লোল পর্বের একজন বিশিষ্ট ছোটগল্পকার। কল্লোল-কালিকলম পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্যগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল সেই অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র কিংবা শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের অনুসারী ছিলেন না নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। বরং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা, কালোবাজারি, মজুতদারি, চোরাকারবারি, নারীর অবমাননা এবং অবক্ষয়িত মানবিক

আবেদন, বিপন্নতার আবহে বাংলা কথাসাহিত্যে নতুন রক্ত প্রবাহের সৃষ্টি করলেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ, সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মনোজ বসু প্রমুকেরা। এছাড়াও এ সময়ের অন্যান্য কথাকারদের মধ্যে ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নন্দী, সুশীল রায়, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, বিমল মিত্র, গৌরকিশোর ঘোষ, আশাপূর্ণা দেবী, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, অমরেন্দ্র ঘোষ, সমরেশ বসু, ননী ভৌমিক, সুশীল জানা, শান্তি রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাণতোষ ঘটক, সৌমেন চন্দ, বারীন্দ্রনাথ দাশ, স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপদ চৌধুরী, মিহির আচার্য প্রমুখ। এইসব ছোটগল্পকারের লেখার বিষয়-রীতির অভিনবত্বে, প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের স্রোতধারায় ছোটগল্পের নতুন জগৎ গড়ে উঠল।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তথা এই সময়ের লেখকদের সাহিত্য বিকাশের কালটি ছিল আলো-বাতাসহীন মহাকাল। এই সময়ের কয়েকটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা লেখকের সৃজনশীল হৃদয়কে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। ঘটনাগুলি হল-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫), ১৯৪১ এ কলকাতায় জাপান-বোমা নিক্ষেপ, ১৯৪২ এর আগস্ট বিপ্লব ও মেদিনীপুরের বিধ্বংসী বন্যা, ১৯৪৩ অর্থাৎ ৫০ এর মন্বন্তর, ১৯৪৬ এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং তেভাগা আন্দোলন, ১৯৪৭ এর দেশভাগ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব যেভাবে কল্লোল-কালি কলমের লেখায় প্রভাব পড়েছিল, পরবর্তী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ প্রভাবেও বদলালো না সমাজ, মানবজীবন। স্বাভাবিকভাবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর সমকালীন ছোটগল্পকারদের লেখাতেও তার প্রভাব মুক্ত রইল না। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং সমকালীন আরও পাঁচজন ছোট গল্পকার যথা সুবোধ ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নবেন্দু ভূষণ ঘোষ এবং সন্তোষকুমার ঘোষের আলোচনা প্রসঙ্গে সমালোচনায় বলেছেন –

> "যুদ্ধে তান্ডব, মূল্যবোধের ভাঙন, অহিংস-সহিংস আন্দোলনের চড়াই-উতরাই সাম্যবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী-বিরোধী গণ আন্দোলন, মন্বন্তর, আগস্ট আন্দোলন- সমস্ত মিলেমিশে এক রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রকৃতি এরা অনুভব করেছিলেন নিজের নিজের ক্ষমতা মতো।"[১]

১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে কলকাতায় ভয়ংকর দাঙ্গা শুরু হয়। কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, বরিশাল, পাবনাতে দাঙ্গা বাঁধে। কলকাতার দাঙ্গায় বহু মানুষ নিহত ও আহত হয়। স্টেটম্যান পত্রিকা এই হত্যাকাণ্ডকে- The Great calcutta killing আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই এইসব ছোটগল্পকারদের লেখায় উঠে গেল যুদ্ধের ভয়াবহতা, কালোবাজারি, চোরাকারবারির জ্বলন্ত ছবি। বস্ত্র সংকট, খাদ্য সংকট, বিপন্ন সাধারণ মানুষের অসহায়তার ছবি ফুটে উঠলো ছোটগল্পে। যুব সমাজের বেকারত্বের নগ্ন ছবি যেমন অঙ্কিত হল, তেমনি চিত্রিত হল মধ্যবিত্ত মানুষের স্বার্থপরতা, শঠতা, নারীর অবমাননা, নৈতিক অধঃপতনের কাহিনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে একদল সুযোগ সন্ধানী দালাল গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। তারা ছিল সামরিক বাহিনীতে রসদ সরবরাহ করে হঠাৎ বড়লোক হওয়ার ধান্দাবাজ শ্রেণিভুক্ত। কৃত্রিম খাদ্য সংকট তৈরি করে সমাজকে বিপর্যস্থ করে তুললো তারা। ফলে ১৩৫০ এ দুর্ভিক্ষ অনিবার্য হয়ে উঠল। গ্রামের মানুষ অভাবের তাড়নায় পা বাড়ালো শহরের পথে। 'নবান্ন' নাটকে তার নিদারুণ ছায়াপাত ঘটেছে। ১৩৫১ এর সেরা গল্প এর সম্পাদনার 'প্রারম্ভে' সম্পাদক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যুদ্ধবিধ্বস্ত, মন্বন্তর পীড়িত বাংলার যে ছবি এঁকেছেন তার উল্লেখে স্পষ্ট হবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পগুলিতে। দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর ও যুদ্ধের আবহে চোরাকারবারি, কালোবাজারি, মজুতদারির জ্বলন্ত নিদর্শন 'নক্রচরিত' গল্পটি। গল্পটি 'শারদীয়া যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

গল্পের অন্যতম চরিত্র নিশিকান্ত কর্মকার বৈষ্ণব অবতার আবরণে থাকা পাকা শয়তান। পাশবিক সত্তা তার অন্যতম লক্ষ্য। তাই চোখ দুটো শকুনের মতো মনে হয়। কপালে এলোমেলো সরীস রেখা। একদিকে

সে মদনের কাছ থেকে জলের দরে চোরাই সোনা কেনে। অন্যদিকে বৈষ্ণবীয় তিলক এঁটে হাড়ির মেয়ে কষ্টবালাকে সেবাদাসী বানিয়ে নাম রাখে তার বিশাখা। এখানেও আবরণ। কষ্টবালার উপর রাধাভাব জাগিয়ে হয়ে যায় বিশাখা। নিজে গত যৌবন হলেও নিজের সেবাদাসীকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করে ইব্রাহিম দারোগাকে বশ করেছে নিশিকান্ত। এই ইব্রাহিমই নিশিকান্তকে 'ঘোড়েল', 'ভুঁড়ো কুমির' বলেছে। 'নক্র' অর্থে কুমির। নিশিকান্ত যুদ্ধের পটভূমিকায় কালোবাজারি, মজুতদারি, চোরাকারবারের প্রতিনিধিত্ব করেছে। আর নিশিকান্তের কর্ম বৃত্তান্ত নক্রচরিতেরই প্রকৃতরূপ।

নিশিকান্তের গোলাঘরে আটশো মন চাল মজুত আছে, অথচ দুর্ভিক্ষে খাদ্যের অভাবে মতিপাল মারা গেছে। অভাবের তাড়নায় গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে মতি পালের বউ। অপঘাতের মৃত্যুর জন্য নিশিকান্ত দায়ী করেছে দৈবকে। নিশিকান্ত শুধুমাত্র চাল ব্যবসায়ী নয়, সে প্রেসিডেন্টও। তবুও সে অমানবিকতার চূড়ান্ত। তার গোলা ঘরে রাখা চালের কিছু বর্ষার জল পেয়ে পচে দুর্গন্ধ ছড়িয়েছে। তবুও বিপদে কাউকে সে এক ছটাক চাল দেয়নি। যুদ্ধের আবহে নিশিকান্তদের নিশংস আচরণকে গলির গরুর দেহকে ঘিরে থাকা কুকুর ও শকুনের ঘৃণিত লড়াইয়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন লেখক।

শিকার ধরার জন্য কুমিরের কপটতা কিংবা তার মায়া কান্নার সঙ্গে নিশিকান্তের বৈষ্ণবীয় আচরণ এক হয়ে গেছে। আপাতভাবে গোটা দেহ তার কদম্বকেশের মত অষ্ট-সাত্ত্বিকভাবে রোমাঞ্চিত। আর ভেতরে ভেতরে চোরাকারবার ও মজুদদারিতে সে এক নম্বর। তাই যে নিশিকান্তের রাতের অন্ধকারে চাঁদ হিসেবে জগৎকে আলো দেখানোর কথা গল্পে শেষ পর্যন্ত সে নিশি হয়ে গেছে। অর্থাৎ শুধুমাত্র অন্ধকারের প্রতীক হয়ে উঠেছে সে।

'নক্রচরিত'-এর নিশিকান্ত কর্মকার যে গোত্রের 'দুঃশাসন' গল্পের দেবীদাসও অনেকটা তাই। 'দুঃশাসন' আশ্বিন, ১৩৫২, প্রকাশক-বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা। উৎসর্গ-সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়, বন্ধুরেষু। গল্পের সংখ্যা মোট ৯টি। এই গল্প গ্রন্থটিও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলীর দ্বিতীয় খন্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'নক্রচরিত'-এ আছে খাদ্য সংকট আর 'দুঃশাসন' গল্পে বস্ত্র সংকট। মহাভারতের অনুষঙ্গে গল্পের বস্ত্র সংকটকেই প্রতিকায়িত করে।

ছোট গায়ের ছোট বন্দরের বড় ব্যবসায়ী দেবীদাস। প্রকৃতপক্ষে কাপড়ের আড়তদার। খুচরো, পাইকারি সব ধরনের কারবারে সে সিদ্ধহস্ত। যুদ্ধের বাজারে সভ্যতার সংকট-অন্ন ও বস্ত্রের হাহাকার। ইজ্জত রক্ষার জন্য বস্ত্রের সন্ধানে এসে গল্পের প্রথমেই এক ভদ্রলোক হাউ হাউ করে কেঁদেছে দেবী দাসের সামনে। দেবী দাসের পাথরের মন তাতে গলেনি। দেবী দাস যুদ্ধ কিম্বা আকালের জন্য ভগবানের দোহায় দিয়েছে। অথচ এইসব আড়তদারেরা ভয়ে, পুলিশকে সহজেই ৫০ টাকা চাঁদা দেয়। এই গল্পে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা-

এক: গৌড়দাস চরিত্র। দেবী দাস সম্পর্কে তার কাকা। এখনো গৌর ঠিকমতো ব্যবসায়ী হয়ে উঠতে পারেনি। তাই তার মধ্যে বিবেক রয়ে গেছে। পুলিশ পঞ্চাশ টাকা ঘুষ নিয়ে গেলে কাকা দেবীদাস, গৌরকে রেগে বলেছে পুলিশ রক্তচোষে বলেই থানার রং লাল। কথাটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে গৌরদাসের চোখে ভেসে ওঠেছিল দেবীদাসের সাদা বাড়ির ছবি, সেইসঙ্গে হাড়ের ছবি। অর্থাৎ দেবীদাসও যে মানুষকে শোষণ করে তার ইঙ্গিত ছিল সেই ভাবনায়।

দুই: থানার দারোগা শচীকান্তের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হয়েছে 'দুঃশাসনের রক্তপাত'। প্রতীকী ঘটনায় গল্পে তৈরি হয়েছে নাটকীয় দ্বন্দ্ব। একদিকে বস্ত্র সংকট অন্যদিকে সেই সংকটময় সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে দুঃশাসন দ্বারা দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ।

তিন: যাত্রাপালা শেষ হতে হতে ভোর হয়ে গেছে। অন্যদিকে রাতেই একটি শিশুকে শিয়ালে খেয়েছে। দেবীদাস যাত্রা শুনে ফেরার পথে জুতো আনতে মুচিপাড়ায় লক্ষ্মণের কাছে যায়। একটি ষোল বছরের মেয়ে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে জল নামছিল। মেয়েটির –

> "কোনোখানে একফালি কাপড় নেই-কাপড় পরবার উপায়ও নেই। যুগের দুঃশাসন নির্লজ্জ পাশব হাতে বস্ত্রহরণ করেছে তার, তার সমস্ত লজ্জা, সমস্ত নিষ্ঠুর উপহাসে মেলে দিয়েছে লোলুপ পৃথিবীর সামনে।"[২]

জাগ্রত বিবেকের মত শুধু গৌরদাসের মনে হয়েছে, যে দুঃশাসন বাংলাকে বিবস্ত্র করল তাকে কি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে অথবা প্রাণ দিতে হবে কুরুক্ষেত্রে ? কেননা প্রতিশোধ, প্রতিরোধের শাণিত প্রস্তুতি লক্ষ্য করেছে গৌর দাস। যা বেরিয়ে আসছিল মাঠে কাজ করা একদল লোকের ধারালো হেঁসোগুলো থেকে। আরোপিত সত্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে লেখক গল্পে শোষিতের জয় দেখাননি, বরং সমকালের বাস্তব চিত্রই এঁকেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের হেঁসোর শাণিত ঝলকানিতে ফুটে ওঠা সাধারণ প্রতিরোধের ইঙ্গিত গল্পটিকে মহিমান্বিত করেছে।

যুদ্ধের আবহে নির্মিত আরও একটি ছোটগল্প 'ডিম'। নদীর ওপারে বড় জংশনটার গায়ে মিলিটারি কলোনির পাশে অনাবাদি জমিতে তাবু খাটানো হয়েছে সেনাবাহিনীর যুদ্ধ লেগেছে। আহারের জন্য তাই প্রতিদিন ৫০০ ডিম চাই। অথচ মন্বন্তরের আঁচে পেটের দায়ে সাধারণ মানুষ হাঁস মুরগি বেঁচে দিয়েছে। শুধু সেনাবাহিনীর জন্য নয়, ক্রিস মাসে কেক বানানোর জন্যও চাই ডিম। অথচ ডিমের আকাল। সাধারণ মানুষ যেখানে খেতে পায় না, সেখানে ক্রিস মাসে কেক খাওয়ার প্রসঙ্গ বড্ড বেমানান মনে হয়। আর এই ডিম সরবরাহের জন্য মেজর সাহেব দায়িত্ব দিয়েছেন ঠিকাদার প্যারীলালকে। আর এই ডিম সংগ্রহকে কেন্দ্র করেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় একটি অমানবিক বৈষম্যের ছবি এঁকেছেন গল্পে।

সাহেবদের অনুগত ঠিকাদার প্যারীলারের দু'পায়ে মোজা, লেদারের জুতো, দু'হাতে পুরু দস্তানা। কানে, গলায় বাঁধা আছে মাফলার। তার ওপর সে গায়ে শতচ্ছিন্ন ধোকড়া। ঠান্ডায় তার শরীরের অঙ্গগুলো অসাড় হয়ে আসছে। এই রজনীকেই প্যারীলাল তিনজন ডিম সংগ্রহ করার কথা বলে।

রজনীর পুত্রবধূ সারদা। তার বছর আটেকের ছেলেটা ম্যালেরিয়ায় ভুগে মৃতপ্রায়। পিলেটা বড়, অপুষ্টিতে শরীর প্যাঁকাটির মতো শীর্ণ। গায়ে ছেঁড়া চট। পথ্যের বদলে ছেলেটি মাটির মালসা থেকে থাবায় থাবায় মুখে পড়ছে শুকনো ভাত। এদের জীবন যেন পশুর থেকেও অধম। তাই ছেলেটির হাতকে থাবা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন লেখক। সারদার বাচ্চা মেয়েটির দেহও কঙ্কালসার। রজনীর ছেলে নিবারণ শহরে রিক্সা টানতে গেছে। দু'মাস তার কোন খবর নেই। দশ আনা কমিশনের আশায় রজনী অবশেষে চল্লিশটি ডিম সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছে। আর এরপরেই শুরু হয়েছে কাহিনির নাটকীয় দ্বন্দ্ব।

ম্যালেরিয়া জীর্ণ ছেলেটি ডিম খাবার আবদার করে। সারদা ছেলেকে বোঝায়-গরিবের ডিম খেতে নেই। রজনী নাতিকে ধমক দিয়ে বলে, ডিম খেলে তাকে রজনী খুন করে ফেলবে। অবশেষে রজনী সেই প্রচেষ্টাই

করে। ছেলেটার গলায় একটা নির্মম থাবা বসিয়ে টিপে ধরে। রজনীর কঠিন খাবার আটকে পড়ে ছেলেটি যখন মরছে তখন নিরুপায় সারদা শাবলের ঘা বসিয়ে দেয় রজনীর মাথায়। পাশেই জল ছিল গনগনে আগুন। ছেলেটি নিঃসাড় ছিল, রজনী ও আগুনের সজ্জায় মাথা রেখে নিঃসাড় হল। পোড়া মানুষের একটা বিশ্রী গন্ধ নাকে এল। অন্যদিকে ঠিকাদার দালাল প্যারীলাল দূর থেকে দেখল সমস্ত গ্রামটা জ্বলছে, শীতে যেন আগুন পোয়াচ্ছে গ্রামটি। এই প্যারীলালের চিরকাল আগুন জ্বালিয়ে তার থেকে নিজেকে দূরে রেখে উল্লাস করেছে।

হিন্দু-মুসলমান সংঘাতের মধ্য দিয়েই 'ইজ্জত' (প্রথম প্রকাশ 'শারদীয়া যুগান্তর' ১৩৫৪) গল্পটি অগ্রসর হয়েছে। প্রবাল দ্বীপের মত গ্রামে হিন্দু-মুসলমানের বহুকাল যাবৎ সহাবস্থান গ্রামের মধ্যে ফাঁকা মাঠের ভিতরের একদিকে ফকিরের সমাধি। তার অনতিদূরে ডাকাতে-কালীর স্থান। এই ফকিরের ইতিহাসের সঙ্গে জুড়ে গেছে আরো এক প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ডাকাতে-কালীর ইতিহাস। এত বড় মাঠের মধ্যে বহুকাল ধরে বাস করে এসেছে ফকির আর ডাকাতে-কালী। বিরোধ বাঁধেনি কোনদিনই। কিন্তু এক মৌলবী এসে 'ওয়াজ' করার পরেই মুসলমানদের পক্ষ থেকে 'ধলা মন্তাই', হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধি জগন্নাথ সরকারকে জানিয়ে গেল- এরপর থেকে হিন্দুরা ডাকাতে-কালীর থানে পুজো করতে পারবে না। ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে হিন্দুরা চরম অপমানিত হয়ে পুজো করার বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিল। শুরু হলো লড়াই। একদিকে কালী মাঈকি জয়, অন্যদিকে আল্লাহ আকবর।

মুসলমান সমাজের আসল মাথা কিন্তু হাবিব মিঞা। সৌখিন মানুষটির মোট বিবির সংখ্যা বারো। এখনো যে চারজন বিবি বর্তমান তার মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ লাল বিবি হাবিব মিঞার সবচেয়ে আদরের। হাবিব মিঞা জোতদার, চাষের সময়ে জমিতে তার বারোখানা নাঙল নামে। তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার আর ফুড কমিটির সভাপতিও।

হিন্দু-মুসলমান লড়াইয়ে হাবিব মিঞা হিন্দু ধর্মের প্রধান জগন্নাথ সরকারকে হত্যা করার জন্য ধলা মন্তাইকে পরোচিত করে। জগন্নাথের অবর্তমানে যাতে হাবিব মিঞা তার দেড় বিঘা জমি সহজেই হস্তগত করতে পারে। সাম্প্রদায়িক আবহে গল্পটি অগ্রসর হলেও এটি শেষ পর্যন্ত বস্ত্র সংকটের নিদারুণ নির্মমতার গল্প হয়ে উঠেছে।

জগন্নাথ সরকারকে হত্যা করার শালা পরামর্শ করার পর ধলা মন্তাই হাবিব মিঞার কাছে নিজের স্ত্রীর লজ্জা নিবারণের জন্য দু একটি কাপড় ভিক্ষা চেয়েছে। কিন্তু পাষাণ-হৃদয় হাবিব বত্রিশ টাকা জোড়া কাপড় মন্তাইকে বিলিয়ে দিতে নারাজ। তাই সে মন্তাইকে বলেছে, তার কাছে এক ফালি কানিজ পড়ে নেই। ব্যর্থ মনে ফিরে আসার সময় অন্ধকারে চরম শত্রু জগন্নাথের সঙ্গে মন্তাইয়ের ধাক্কা লেগেছে। জানা গেছে, জগন্নাথও তার স্ত্রীর লজ্জা নিবারণের জন্য দুই একখানা কাপড়ের প্রত্যাশায় হাবিব মিঞার কাছে যাচ্ছে। মন্তাইও একই সমস্যার কথা জগন্নাথকে জানায়। মন্তাইয়ের কাছ সব শুনে জগন্নাথও বুঝতে পারে হাবিব মিঞার কাছে কাপড় চেয়ে কোনো লাভ হবে না।

এরপরের ঘটনা চরম নাটকীয়। হাবিব মিঞার ছোট বিবি লাল বিবি হঠাৎ ভেদবমিতে মারা যায়। তাকে কবরস্থ করার রাতেই হাবিব মিঞার কাছে খবর আসে, দু'জন লোক কাফনের কাপড় চুরি করতে কবর থেকে মাটি তুলছে। দলবল নিয়ে হাবিব মিঞা ওই দুইজন লোকের মুখে টর্চ জ্বালতেই হতবাক হয়ে যায় সকলেই। দু'জনের একজন হল ধলা মন্তাই, অন্যজন জগন্নাথ সরকার। হিন্দু-মুসলমানের বিপদজনক

সাম্প্রদায়িক লড়াইয়ের মধ্যে না গিয়ে গল্প শেষ হয়েছে বস্ত্রসংকট--সমাধানের চরম বিস্ময়কর মরিয়া প্রচেষ্টায়। বস্ত্র সংকটের ভয়াবহতায় ধর্ম সংকট ও পরাজয় স্বীকার করেছে। তাই গল্পের শেষে প্রশ্নটি ব্যঞ্জনাবাহী-

"ফকির আর কালীর ভেতরে এত সহজে মিটমাট হয়ে গেল কেমন করে?"[৩]

গল্পটিতে হাবিব মিঞা, ধলা মন্তাই শেষ পর্যন্ত কোন মুসলমান সমাজের কিংবা জগন্নাথ সরকারও হিন্দু সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেনি। সমাজের যে দুটি ধারা স্পষ্ট হয়েছে এখানে সেই দুটি হল-

এক: হাবিব মিঞা শোষকশ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে শ্রেণি শত্রু হিসাবে নিজেকে চিহ্নিত করেছে।
দুই: সাধারণ শোষিত, বঞ্চিত মানুষ হিসাবে ধলা মন্তাই এবং জগন্নাথের সংকট একই প্রকার।

ধর্মের সুড়সুড়ি দিয়ে হাবিব মিঞার চিরকাল নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি লাভ করতে চায়। বস্ত্র সংকটে মানুষ কতটা অসহায়, কাফন চুরি করার ঘটনা থেকে পাঠক তার সহজেই অনুমান করে নিতে পারেন।

'কবর' গল্পটি 'বর্ষাশেষ' পত্রিকায়, অগ্রহায়ণ, ১৩৫১ বঙ্গাব্দে প্রকাশ পায়। আলোচ্য গল্পে হতদরিদ্র ঘরে জন্মানো, অন্যের ঘরে ঝি-গিরি করা মায়ের সন্তান শা-নওয়াজই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র। যুদ্ধের সময় শুধুমাত্র বাসের কন্ট্রাক্ট পেয়ে হঠাৎ বড়লোক হওয়া এই চরিত্রটি পাঁচ গুণ বেশি দামে গাড়ি কিনে গল্পকথককে সঙ্গী করে তার আদি বাসভূমির গ্রামের দিকে ছুটে চলেছে। শোষক, অত্যাচারী, উচ্চকোটিতে বসবাসকারীর যা যা মানসিকতা তাই রপ্ত করেছে সে। জীবনে পোড় খাওয় শা-নওয়াজ যুদ্ধের সময় নানান অমানবিক সুবিধা গ্রহণ করেছিল। অকপট স্বীকারোক্তিতে সে জানিয়েছে, রাশি রাশি মিথ্যা কথা বলে ব্যবসায় সে লাল হয়ে গেছে। শুধু লোক নয়, দেশকেও ঠকিয়েছে সে। পঞ্চাশ লাখ মরা মানুষের রক্ত মাখানো টাকায় সে গাড়ি কিনেছে।, বাড়ি কিনেছে। কলকাতায় মরা মাড়িয়ে রাস্তা পেরিয়েছে সে। কঙ্কালসার মানুষগুলি একটু ফ্যানের আশায় কেঁদেছে। তাদের খাবার না দিয়ে সে কুকুরকে খাবার দিয়েছে। মানুষগুলো খাবার চেয়ে পেয়েছে চাবুকের আঘাত।

যে গ্রামে শা-নওয়াজ বড় হয়েছে, সেই গ্রামে যুদ্ধের করুন পরিণতিতে বিধ্বস্ত। তার পূর্বকার মালিক অর্থাৎ মোড়লের বাড়ি ধ্বংস হয়ে গেছে। মাটির বাড়িগুলো মাটিতে মিশে যাওয়ার উপক্রম। গ্রামের রাস্তায় মোটর গাড়ি এগোচ্ছে না, আটকে যাচ্ছে। কেননা রাস্তাঘাট জুড়ে মানুষকে কবর দেওয়া হয়েছে। এইভাবে সমগ্র গল্প জুড়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত পরিস্থিতির আবহ ফুঁটে উঠেছে।

মন্বন্তর, দুর্ভিক্ষ কিংবা কৃত্রিম খাদ্য সংকটের নির্মম চিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'কালোজল'-এ। গল্পটি শারদীয় আনন্দবাজারে, ১৩৫১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। কর্মহীন বেকার যুবক তারাপদ শ্বশুরবাড়ি থেকে অভিমান করে চলে যাবার পাঁচ বছর অতিক্রান্ত। অর্থনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত তারাপদ শ্বশুরবাড়িতে ফিরছে জানকী কেমন আছে-এতদিন পর দেখা হবার অপার উচ্ছ্বাস। কিন্তু বদলে গেছে গ্রাম। কীর্তন কিংবা রয়ানি গানের সুরে উত্তাল গ্রামগুলি নিরব। যারা বেঁচে আছে তারা মানুষ নয়, অবয়বহীন ছায়ামাত্র। তারাপদর শ্বশুর জানকি চক্রবর্তী কালেরায় মারা গেছে। স্ত্রী অরুণা অভাবের তাড়নায় আত্মহত্যা করেছে। তারাপদকে নৌকায় নিয়ে এসেছিল শীতল। শীতল প্রকৃতপক্ষে এই দুর্ভিক্ষ, খাদ্য সংকট, চালের চোরাচালানকে প্রত্যক্ষ করেছে। গ্রাম জীবনের ধ্বংসের ছবি ধরা পড়েছে তার দৃষ্টিতে।

লেখক এই শীতলকে কেন্দ্র করে তারাপদর সংসার জীবনের করুন কাহিনি থেকে ঘটনা প্রবাহকে নিয়ে চলেছেন মথুরা দাসের চাল চোরাচালনের নৃশংস লোভের ঘূর্ণবাতে। মথুরা দাসদের লোভের তাড়নায় ধ্বংস হয়েছে গ্রাম। এই দেশ দুর্ভিক্ষে গ্রামগুলো যত শ্মশান হয়েছে, মথুরা দাসদের কড়ির পাহাড় হয়েছে ততো উঁচু। নৌকার মাঝি নিরুপায়। মনে মনে সে ভেবেছে-এটা অন্যায় তবুও নৌকায় করে মথুরা দাসের চুরি করা চাল বয়ে নিয়ে গেছে সে। যাবার পথে টর্চের আলো জ্বলে উঠলে পুলিশের প্রশ্নের উত্তরের শীতল মিথ্যা বলেছে, নৌকায় মালপত্র নয়, সোয়ারি আছে। ভেদবমি করছে সোয়ারি। তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আসলে মনে মনে শীতল, মথুরা দাসের ভেদবমি কামনা করেছে।

গল্পে মথুরা পুলিশের হাতে ধরা পড়েনি। লেখক তা করতেও চাননি। তিনি সমকালীন বাস্তবতার চিত্রই আঁকতে চেয়েছেন। বরং প্রতিকী ইঙ্গিতে লেখক এইসব অমানবিক ঘটনাগুলি বিরুদ্ধাচরণের মাধ্যম হিসেবে প্রকৃতিকে জীবন্ত করে তুলেছেন। তাই আড়িয়ল খাঁ নদীর জল সাদা থেকে কালো হয়ে গেছে। নিঃশব্দে দংশন করা সাপের ক্ষিপ্র গতিতে নিজের বিষাক্ত বিবরে লুকানোর সঙ্গে তুলনীয় হয়ে উঠেছে কালোজলের বয়ে চলা।

এরপর আসে 'পুষ্করা' (দেশ, প্রথম প্রকাশ ৭-ই মাঘ ১৩৫৯) গল্পের প্রসঙ্গ। মহামারিতে গাঁয়ের পর গাঁ উজার। কলেরার মড়কে দশ খানা গ্রামে চলেছে মৃত্যুর মিছিল। তাই তিথি না মেনেই অসহায় গ্রামবাসী শুক্লাচতুর্দশীতে শ্মশানকালী পুজোর আয়োজন করেছে। একদিকে মড়ক, অন্যদিকে দুর্ভিক্ষ-

> "মৃত্যু যেন চারদিক থেকে কালো কালো হাত বাড়িয়ে মানুষকে তেড়ে আসছে -একেবারে সমস্ত গ্রাম না করে তার খিদে আর মিটবে না। না খেয়ে মরেছে, খেয়ে কলেরা হয়ে মরেছে। পুষ্করার বাকি আছে কোথায়।"[৪]

পৈশাচিক বীভৎসতার আবহে অনুষ্ঠিত হচ্ছে শ্মশানকালীর আরাধনা। তর্করত্ন হলেন প্রধান পুরোহিত। দেবী খুবই জাগ্রত। দেবীর কৃপায় নিশ্চয় থেমে যাবে মড়ক, দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা। দেবীর সামনে সাজানো হয়েছে শিবাভোগ শেয়াল এসে সেই ভোগ গ্রহণ করলে তবেই অভীষ্ট সিদ্ধ লাভ হবে। এটাই জাগ্রতা দেবীর নিয়ম।

অনেক প্রতীক্ষার পর পেট্রোম্যাক্সের আলো নিভে গেলে তর্করত্নের সাধনা সফল হয়েছে। স্বয়ং দেবী এসেছেন। তর্করত্ন রোমাঞ্চিত দেহে দেখেছেন -শিবাভোগের সামনে দুটো আগুনের মতো চোখ জ্বলছে আর সেই যাচ্ছে ঝাঁকড়া চুলের কালো রঙের অর্ধনগ্ন নারীমূর্তি। তবে কি স্বয়ং দেবীই এলেন প্রসাদ গ্রহণ করতে? ভোরের আগেই সমস্ত গ্রামে রটে গেল, শ্মশান কালী নিজে এসে ভোগ গ্রহণ করেছেন।

পূজো শেষে ট্রেন ধরার জন্য তর্করত্ন গরুর গাড়িতে করে স্টেশনের দিকে যাত্রা করেছেন। গাড়ির অর্ধেক ভরেছে দানে আর দক্ষিণায়। যুদ্ধের সময়ে কিছু মানুষের হাতে এত বেশি টাকা যে, তর্করত্ন তিনশোর পরিবর্তে দক্ষিনা পেয়ে যায় পাঁচশো। যাবার পথে গাড়োয়ানের চোখ পড়েছে-ডোম পাড়ার পাগলিটা রাস্তায় পড়ে কাতরাচ্ছে। মৃত্যু আসন্ন। পাগলীটার তিন ছেলে, স্বামী না খেতে পেয়ে মারা গেছে। পাগলিটাকে দেখে তর্করত্নের মনে ধন্দ জেগেছে। লেখকের বর্ণনায়-

> "কিন্তু একটা জিনিস তার্করত্ন বুঝতে পারেননি। তাঁর শ্মশান কালী এসেছিল ওই ডোম পাড়ায় পাগলিটার রূপ ধরেই-আর এখনও পথের ধুলোয় পড়ে সে মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করছে--

> কালীর মত জীব মেলে হাঁপাচ্ছে এক ফোঁটা জলের জন্য। দীর্ঘদিনের বুভুক্ষার পরে দেব ভোগ্য শিবাভোগ সে সহ্য করতে পারেনি।"[৫]

পাগলিটা নিজের জীবনের বিনিময়ে তর্কাত্বের দেবী মাহাত্ম্যকে রক্ষা করেছে। চিরকাল গরিবেরাই আত্মবিসর্জন দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে উচ্চকোটিকে। গল্পটি আমাদের লালন করা ধর্মের অলৌকিকতাকে চপেটাঘাত করে কোথাও যেন বিবেককে জাগ্রত করার চেষ্টা করে।

যুদ্ধ, মন্বন্তর, মড়ক, দুর্ভিক্ষের প্রভাব শুধু মানুষ কিংবা প্রাণীর উপর পড়েছে তা নয়, প্রকৃতির উপরেও এর নির্মম প্রভাব এর ছবি একেছেন লেখক। বিশেষ করে প্রভাব পড়েছে নদীর উপর। নদী সাদা জল কালো হয়ে গেছে। নদীর স্রোত সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে বহমান। দু'একটি গল্পে নদীর জল ও তার প্রভাব যুদ্ধের ভয়াবহতার রূপে প্রতীকায়িত হয়ে উঠেছে। কিন্তু বিশেষভাবে প্রভাব পড়েছে –

১। নারীর সম্মানকে ভুলণ্ঠিত করে, তাকে পণ্য করে নরোত্তমেরা যেন মেঘনার জলকে কালো করে দিয়েছে।
২। দুর্ভিক্ষে আর মড়কে সন্ধ্যায় নদীর 'গলানো রূপোর' মতো জল কালো ও পিঙ্গলে মিশে যেন হিংস্রতার রূপ নিয়েছে।
৩। গল্পের প্রারম্ভে আড়িয়াল খাঁর জলের রং ছিল সাদা। তারপর নদীর উপর দিয়ে বয়ে গেছে কতশত মরা মানুষ। তারপর শীতল মাঝি, মথুরা দাসের চোরাকারবারির চাল নিয়ে যে খালের মধ্যে দিয়ে চলেছে তার বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন-

> "রাত্রি অন্ধকারে খালের সংকীর্ণ প্রচ্ছন্ন পথে কালো জল কলকল করে বয়ে চলেছে, যেন একটা সাপ নিঃশব্দে দংশন করে ক্ষীপ্র গতিতে লুকোতে চলেছে নিজের বিষাক্ত বিবরে।"[৬]

এই সময়কার গল্পগুলিতে মধ্যস্বত্বভোগী একশ্রেণীর দালাল কিংবা অসাধু ব্যবসায়ী, যারা অমানবিক, মূল্যবোধহীন-তাদের দেখা মেলে। 'বিতংস' গল্পের সুন্দরলাল, 'নক্রচরিত'-এর নিশিকান্ত কর্মকার, 'তীর্থযাত্রা'-র নরোত্তম, 'দুঃশাসন' গল্পের দেবী দাস, 'ডিম' গল্পের প্যারীলাল, 'কালোজল' এর মথুরা দাস কিংবা 'তৃণ' গল্পের পাইকার এ জাতীয় চরিত্র। এদেরই লোভ এবং স্বার্থপরতার মাশুল গুনতে হয়েছে সাধারণ মানুষকে। যদিও এদের নগ্নরূপ চিত্রিত করে লেখক এদের ঘৃণিত স্বভাব বৈশিষ্ট্যের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ নিক্ষেপ করেছেন। সমান্তরালে সাধারণ মানুষের প্রতি লেখকের মমত্ববোধ ও সহানুভূতির স্পর্শ অনুভব করতে পারে পাঠক। তাই যুগশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পর্কে জগদীশ ভট্টাচার্য যথার্থ বলেছেন-

> "মহাযুদ্ধ আর মন্বন্তরের পটভূমিতে তাঁর বিকাশ।.... সেদিন সর্বগ্রাসী যুদ্ধের তাণ্ডবে ভেঙে পড়েছে জীবনের খেলাঘর। ভারতের বুকে সাম্রাজ্যবাদের নাভিশ্বাস উঠেছে; সঙ্গে সঙ্গে শবলুব্ধ গৃধ্রদের উচ্চস্বর বীভৎস চিৎকারে মুখরিত হয়ে উঠেছে আকাশ-বাতাস; একদিকে যুদ্ধের জুয়া খেলায় কাগজি-মুদ্রার ছিনিমিনি, অন্যদিকে চোরাকারবার আর কালোবাজারের নারকীয় অনাচারে পর্যুদস্ত দিন যাত্রা,... জীবনরুদ্রের উপাসক যুবশিল্পীর সৃষ্টিতেও জনচিত্তের এই সঙ্ঘবদ্ধ ক্রোধই রৌদ্ররসে রূপান্তরিত হয়েছে।"[৭]

তথ্যসূত্র:

১। দে, শিপ্রা। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প। শৈলী প্রকাশনী। প্রথম প্রকাশ ১২ই জুলাই ১৯৯৬। কলকাতা। পৃ. ১৬৬।

২। গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ। গল্প সমগ্র। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা.লি। প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৪১৬। কলকাতা। পৃ. ৭৩২।

৩। তদেব, পৃ. ৫৭০।

৪। তদেব, পৃ. ৭৪৩।

৫। তদেব, পৃ. ৭৪৬।

৬। তদেব, পৃ. ৭৪০।

৭। ভট্টাচার্য, জগদীশ। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। *আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী*। ভারবি। প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪০০, জানুয়ারি ১৯৯৪। কলকাতা। পৃ. ১৫৪।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 2022-2033
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.427

সেলিনা হোসেনের ‘নীল ময়ূরের যৌবন’ উপন্যাসের ডোম্বি: প্রেমে, প্রতিবাদে ও প্রতিরোধে

সুকন্যা পাঁজা, *গবেষিকা, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.03.2026; Accepted: 21.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Since the very dawn of civilization, the role of women in society has been of paramount importance. Yet, society has not been willing to accord them recognition with ease. Nevertheless, women have never faltered in their struggle to claim their rightful entitlements. Dombi—a character in Selina Hossain's novel 'Nil Moyurer Joubon' (The Youth of the Blue Peacock), set against the backdrop of the 10th to 12th centuries—stands as just such an indomitable figure. Although the novel features an array of female characters, Dombi remains truly extraordinary in terms of her personality, her capacity for love, and her spirit of resistance. Her spirited persona continues to evoke a sense of awe even among the women of the twenty-first century.

Keywords: Women's Autonomy, 10th–12th Centuries, Charyapada, Kanha, Mallari, Dombi, Boat, Hunting, Subalterns, Brahmanism

পুরুষের চোখে বা সমাজের চোখে নারীর অবস্থান যাই হোক না কেন আবহমানকাল থেকেই নারী স্বাধীনতাকামী ও যথেষ্ট সক্রিয়। তার সক্রিয়তা যেমন ন্যায়ের নির্মাণের সাথে ও শুভর প্রতিষ্ঠার সাথে যুক্ত,তেমনই নিজের বা সমাজের সাথে ঘটা যেকোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধেও নারী বারেবারে রুখে দাঁড়িয়েছে। আবার সে অন্যায় যদি তার কোনো প্রিয়তম ব্যক্তির সাথে হয়, সেখানে নারীর মূর্তি আরও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। হিন্দুপুরাণে সতীকে স্বামীর অপমানের প্রতিবাদে দেহত্যাগ করতে দেখা গেছে। প্রিয় মানুষের দেওয়া আঘাতও তার কাছে অসহনীয়।তাইতো ‘রামায়ণ’-এর সীতা প্রিয়তমের থেকে অসতীর অপবাদ সহ্য করতে না পেরে পাতাল প্রবেশ করেছেন।অন্যদিকে ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ নিজের দেশকে রক্ষা করতে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসের পাতায় পাতায় নারীর প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের একাধিক কাহিনী আজকের নারীকেও সকল বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে আপন লক্ষ্য জয় করার অনুপ্রেরণা যোগায়। নজরুল ইসলাম ‘নারী’ কবিতায় বলেছেন,

> “বিশ্বের যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর
> অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।”[১]

নজরুল ইসলামের এই উক্তিতেই নারী সম্পর্কিত ‘Second Sex’ তত্ত্বটি নস্যাৎ হয়ে যায়। আসলে ‘নারীবাদ’ বা ‘feminism’ শব্দটি বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে প্রচলিত হলেও নারী কিন্তু আবহমান কাল ধরেই বৃহৎ সংসারের সাথে নিজেকে যুক্ত করতে তৎপর। ফরাসি বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার দাবির সাথে ফরাসি

মহিলারা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিষয়টিকে যুক্ত করে তাকে একটি সার্বিক রূপদান করেন ও সারা বিশ্বের সামনে তুলে ধরেন। এটিই নারীবাদী আন্দোলনের প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এরপর ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার দাস প্রথার বিরুদ্ধে নারীসমাজের আন্দোলন বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর প্রবেশকে চিহ্নিত করে। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে দীর্ঘ আন্দোলনের পর নিউজিল্যান্ডের মহিলারা ভোটদানের অধিকারী হন। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে ডেনমার্কের কোপেনহাগেনে কমিউনিস্ট নেত্রী ক্লারা জেটকিনের নেতৃত্বে বিশ্বজুড়ে নারীদের একত্র করার প্রয়াস শুরু হয় ও তারই ফলশ্রুতি রূপে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ৮ মার্চ প্রথম আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়। এই নারী দিবস পালন বা নারীর ভোটাধিকার প্রাপ্তি নারীর সত্যিকারের ঠিক কতটা উন্নতি করেছিল সেই বিষয়ে প্রশ্ন ওঠে, যখন ১৯২৯ সালে ভার্জিনিয়া উলফ 'A Room of One's Own' গ্রন্থে 'নারী কি?'- এই প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন যে,সমাজে পুরুষদের প্রধান বলে বিবেচনা করা হয়। আর নারীরা হলো 'অন্য নির্ভর'।

ভারতবর্ষের ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে দ্রাবিড় জাতি বা মোঙ্গলীয় জাতির সভ্যতা ছিল মাতৃতান্ত্রিক। ঋগ্ -বৈদিক যুগে নারী-পুরুষ সবাই বেদ অধ্যায়নের সুযোগ পেতো। উপনিষদের যুগেও নারীর অধিকার রক্ষিত ছিল। সেই সময়কার যে ছত্রিশ জন ঋষির নাম পাওয়া যায়,তাঁরা প্রত্যেকেই মায়ের নামে পরিচিত ছিলেন। যেমন- গৌতমীপুত্র, কৌশিকীপুত্র, ভার্গবীপুত্র । তবে 'মনুসংহিতা' ও 'মহাভারত'-এর 'অনুশাসন পর্ব'-এ নারীকে পুরুষের অধীনস্থ করার প্রয়াস দেখা গেছে। বৌদ্ধযুগেও যে নারীর স্বাধীনতা মোটামুটি বজায় ছিল তার প্রমাণ 'মৈত্রেয় জাতক' এর বিশাখা ও তার মা সুমনা। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বিশেষ করে তুর্কি আক্রমণের সময় থেকে নারীর স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়। এরপর ইংরেজ

১

শাসনকালে ভারতবর্ষে নারীর অবস্থার ধীরেধীরে উন্নতি হতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীতে রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর সমাজসংস্কারে ব্রতী হন। তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সতীদাহ প্রথা,কৌলিন্য প্রথার বিলোপ ঘটে। বিধবাবিবাহের পক্ষে জনমত গড়ে উঠতে থাকে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বেথুন সাহেব নারীশিক্ষার প্রসারে মনোযোগ দেন। - এতো গেল ইতিহাসের কথা। কিন্তু বাংলা সাহিত্য প্রথম থেকেই নারীর সার্বিক স্বাধীনতার পক্ষপাতী। পাশ্চাত্যে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে কিছু নারীবাদী প্রবন্ধ রচিত হলেও নারীর স্বাধীনতার কথা প্রথম স্পষ্টভাবে এসেছিল ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে মেরী ওলস্টোন ক্রাফটের 'A Vindication of the Rights of Women' গ্রন্থে। বাংলা সাহিত্যের সূচনালগ্নে পাশ্চাত্যের 'নারীবাদ' বা 'feminism' হয়তো স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়নি, কিন্তু সচেতনভাবেই হোক বা অসচেতনভাবে, বাংলা সাহিত্যে নারীর দাবিদাওয়া চিরকালই গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন 'চর্যাপদ'-এ নারীরা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী ও জীবনসঙ্গী নির্বাচনে স্বাধীন। তারা পুরুষ যোগীর সাধন-সঙ্গিনী বা যোগিনী হিসেবে কায়সাধনায়, তন্ত্রসাধনায় অংশগ্রহণ করত। তবে 'চর্যাপদ'-এর সময় বহু অসতী ও বহুগামী নারীরও উল্লেখ পাওয়া যায়,-

"কাহ্নে গাইতু কামচণ্ডালী।
ডোংবিত আগলি ণাহি ছিণালী।।"[২]

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ কিন্তু নারীর বন্দী দশার চিত্র দেখা গেছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর রাধার বাল্যবিবাহ হয়েছিল। সুন্দরী রাধাকে তার শাশুড়ি মা প্রথমে দুধ-দইয়ের পসরা নিয়ে বাজারে যেতে অনুমতি দেননি। কিন্তু সমাজের চাপে পড়ে তাকে হাটে যাওয়ার অনুমতি দিতে হয়। সেক্ষেত্রে বড়াইকে রাধার প্রহরায় নিযুক্ত করা হয়। রাধাও সামাজিক ও পারিবারিক নিয়ম মেনে সতীত্বের সংস্কারবশতই হোক বা স্বামীপ্রেমের কারণেই হোক 'তাম্বুল

খন্ড'-এ কৃষ্ণের দেওয়া কর্পূর- তাম্বুল পদদলিত করেছে। কিন্তু পরবর্তীতে কৃষ্ণপ্রেমে সমস্ত সামাজিক চোখরাঙানি রাধার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে। সেজন্য তাকে কম সামাজিক লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়নি,

> "সমাজের বিধিবিধানের শৃঙ্খলার নিগড় যা নারীজীবনকে শৃঙ্খলিত করে রেখেছিল অক্টোপাসের মতো, তারই চাপে পড়ে রাধা নাম্নী একটি বালা যে কিনা সেকালের নারীধর্মের সামাজিক প্রতিরূপ, লাঞ্ছিতা, অপমানিতা হয়ে বুকফাটা আর্তনাদ ব্যক্ত করেছে চিরকাল, চোখের জলে মধ্যযুগের মাটিকে সিক্ত করেছে।"[৩]

পরবর্তী সময়ে মঙ্গলকাব্যের যুগে প্রতিবাদী নারী বলতে মনসা দেবীর কথা প্রথমে মনে আসে। দেবীত্বে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য তাঁর সংগ্রাম তাঁকে মর্ত্যমানবীতে পরিণত করেছে। 'মনসামঙ্গল'-এ বেহুলা তার স্বামী লখিন্দরের জীবন ফিরে পেতে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছে।তার স্বামীপ্রেমই তাকে পথের বাধা ও পরপুরুষের প্রলোভনকে জয় করার শক্তি জুগিয়েছিল । কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চন্ডীমঙ্গল' রচিত হয়েছিল ষোড়শ শতাব্দীতে। সেই সময় সতীনের সাথে ঘর করা ছিল খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।দেবী চণ্ডী সুন্দরী রমণীর ছদ্মবেশে ফুল্লরার বাড়িতে এসে উপস্থিত হলে ফুল্লরা ভেবেছে কালকেতু এই সুন্দরী রমণীকে বিবাহ করেছে। কিন্তু ফুল্লরা কালকেতুর জীবনে একেশ্বরী হয়েই থাকতে চায়। তাই সে সেই রমণীকে গৃহছাড়া করার মতলবে নিজেদের দুঃখের বারোমাস্যা অতিরঞ্জিত করে শুনিয়েছে। যেখানে ধনপতিপত্নী লহনা পাঁচতোলা সোনা ও পাটশাড়ি পেয়ে ধনপতিকে দ্বিতীয় বিবাহের সম্মতি দিয়েছে, সেখানে ফুল্লরার এহেন আচরণ বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের কানাড়া বীর্যবতী তেজস্বিনী যুবতী ও লখাই বীরমাতা। রঞ্জার পুত্রবধূ কলিঙ্গা যুদ্ধবিদ্যায় ও বীরাঙ্গনাসুলভ আচরণে বীর লাউসেনের যোগ্য পত্নী। সেকালের পুরুষশাসিত সমাজে যেখানে নারীর মন্ত্র উচ্চারণে কোন অধিকার ছিল না সেখানে 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে আমুলা ও শামুলা নামক নারী পুরোহিতের সন্ধান পাওয়া গেছে। 'অন্নদামঙ্গল'-এর 'বিদ্যাসুন্দর' খণ্ডে 'নারীগণের পতিনিন্দা' অংশ মধ্যযুগের সাহিত্যে এক বিরল নিদর্শন। এই অংশে স্বামীকে নিয়ে নিজেদের অতৃপ্তির কথা নারীরা স্পষ্টভাবে বিবৃত করেছে-

> "এক রামা বলে শুন মোর দুখ।
> আমারে মিলিল পতি কালা কালা মুখ।।
> সাধ করি শিখিলাম কাব্যরস যত।
> কালার কপালে পড়ি সব হৈল হত।।"[৪]

এই কাব্যের বিদ্যা স্বেচ্ছায় অধিক বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত ছিল। বিদ্যা ও সুন্দরের সম্ভোগ কেবল পুরুষের নারীভোগ নয়, তা নারী ও পুরুষের মিলিত যৌনাচার। আরাকান রাজসভার কবি সৈয়দ আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্যে পদ্মাবতীর বীরত্ব ও সতীত্ব তাকে অগ্নিস্নানে নির্ভীক করে তুলেছে। 'লোরচন্দ্রানী ও সতীময়না' তে চন্দ্রানী নপুংসক স্বামীকে ত্যাগ করে প্রেমাস্পদ লোরকে বরণ করেছে। 'ময়মনসিংহ গীতিকা'-র মহুয়া, মলুয়ারা শত প্রলোভনেও সতীত্ব হারায়নি। প্রিয়তমের প্রেমে তারা অসাধ্যসাধনে ব্রতী। শুধু প্রেমের প্রসঙ্গেই নয়,গ্রামকে রক্ষার্থে কমলার আত্মত্যাগ সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকাটিকে চিহ্নিত করে। উনিশ শতকের সমাজসংস্কারের ছায়া এসে পড়েছিল সমসাময়িক সাহিত্যেও। মুধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা কাব্য'-এ শোনা গেছে নারীমুক্তির বলিষ্ঠ সুর। সেখানে বৃহস্পতিপত্নী তারা সামাজিকতার উর্ধ্বে উঠে পতির শিষ্যের সাথে সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছে। শকুন্তলা, সূর্পণখা, দ্রৌপদী, রুক্মিণী, কেকয়ীরা নিজেদের মনের প্রেম, বিরহ বা অভিযোগের কথা দ্বিধাহীনভাবে প্রেমাস্পদকে জানিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের কুন্দনন্দিনী, হীরা, রোহিণী বা 'চতুরঙ্গ'-এর দামিনী সমাজের চাপিয়ে দেওয়া বৈধব্যযন্ত্রণা মেনে নেয়নি। এমনকি তারা নতুন করে পুরুষের ভালোবাসা পাবার স্বপ্ন দেখেছে।

'রাজসিংহ'র জেব-উন্নিসা ও চঞ্চলকুমারী প্রেমের স্পর্ধায় ঔরঙ্গজেবকে পর্যন্ত তুচ্ছজ্ঞান করেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও হৈমন্তী, নিরুপমার পাশাপাশি অংকন করেছেন মৃণালিনী-চারুলতাকে। কবি 'মহুয়া' কাব্যের 'সবলা' কবিতায় নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি তুলেছেন। 'বিদায় অভিশাপ' এর দেবযানী উপযাচিকা হয়ে কচের কাছে নিজের প্রণয়ের কথা ব্যক্ত করেছে। 'চন্ডালিকা' নৃত্যনাট্যের চন্ডালকন্যা চন্ডালিকার কাছেও প্রেমের প্রশ্নে সমাজের চোখরাঙানি তৃণবৎ হয়ে গেছে। এই সময়পর্বেই রচিত বেগম রোকেয়ার 'সুলতানা'স ড্রিম' ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম ফেমিনিস্ট ইউটোপিয়ান গ্রন্থ।

মধ্যযুগের সাহিত্যে নারীর প্রতিবাদের তেমন কোনো সুযোগ ছিল না, তবু তারা প্রতিবাদের ভাষা হারায়নি। এইসময়পর্বে চন্দ্রাবতী ছাড়া আর কোনো মহিলা সাহিত্যিকের নাম পাওয়া যায়নি। কিন্তু আধুনিক সাহিত্যের ধারায় বিশ শতকের শেষ পর্যায়ে থেকে মহিলা সাহিত্যিকরাই মহিলাদের কথা শুনিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে জ্যোতির্ময়ী দেবী, কামিনী দেবী, সরলা দেবী চৌধুরানী, নিরুপমা দেবী আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী, বাণী বসু, সুচিত্রা ভট্টাচার্যের মতো একাধিক লেখিকার নাম করা যায়। শুধু নারী নয়, নারী-পুরুষ উভয়েরই লেখনীতে সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলি প্রেমে-প্রতিবাদে-প্রতিরোধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্রৌপদী (মহাশ্বেতা দেবী); সত্যবতী, সুবর্ণলতা (আশাপূর্ণা দেবী); সুজাতা, মাধবীলতা (সমরেশ মজুমদার); রূপমঞ্জরী (নারায়ণ সান্যাল); মিতিন মাসি (সুচিত্রা ভট্টাচার্য); ময়নার মা (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)-এর মত মহিলারা সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে প্রতিবাদ -প্রতিরোধের প্রসঙ্গে পুরুষের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। কপিলা (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়) বা দয়িতারা (সুচিত্রা ভট্টাচার্য) প্রেমের টানে সামাজিক বাধা নিষেধকে পদদলিত করেছে। আবার প্রিয়তমের আঘাত নারীকে যে কতটা ভয়ানক করে তুলতে পারে তার প্রমাণ রয়েছে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'কাচের দেওয়াল', 'নীলঘূর্ণি', 'সহেলি'র র মতো একাধিক উপন্যাসে। ঋগ্বেদের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত চলে আসা নারীলাঞ্ছনার বিরুদ্ধে নিজের কবিতায় প্রতিবাদী আওয়াজ তুলেছেন মল্লিকা সেনগুপ্ত। মন্দাক্রান্তা সেনের 'নারী', 'অফার'-এর মতো কবিতায় রয়েছে নারী জাগরণের বার্তা। কবিতা সিংহের 'স্মরণীয়াসু', 'না', 'পৃথিবী দেখে না', 'অপমানের জন্য ফিরে আসি'-র মতো একাধিক কবিতায় নারীজীবনের ব্যথাগুলি ভাষ্য পেয়েছে। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে মধুসূদন দত্ত শর্মিষ্ঠা চরিত্রের মাধ্যমে নারীর স্বাধীনচিন্তার যে পরিসর তৈরি করে গিয়েছিলেন পরবর্তীকালে বাংলা নাটকের ধারায় জনা (গিরিশচন্দ্র ঘোষ), অহল্যা (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়), অপরাজিতা (নীতিশ সেন), অলকানন্দা (মনোজ মিত্র), দ্রৌপদী (শাঁওলি মিত্র)-র মতো চরিত্রগুলি সেই পরিসরকে আরো বিস্তৃত করেছে। বাংলা কথাসাহিত্যের প্রসঙ্গে বাংলাদেশের লেখিকা সেলিনা হোসেনের রচনাতেও নারীমুক্তির কথা বারেবারে চলে এসেছে। তাঁর বিশেষ লক্ষ্য ছিল উত্তর-ঔপনিবেশিক কালে নারী-পুরুষের সম্পর্কের চরিত্র প্রসঙ্গে। তাঁর রচনায় রয়েছে নারী জীবনের বহুমাত্রিক পাঠ। একটি সাক্ষাৎকারে নারীমুক্তির প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "সামাজিক মূল্যবোধের প্রেক্ষাপটে নারীর মর্যাদার আসন দৃঢ় করার জন্য আমি হাজার হাজার রোকেয়ার কথা বলেছিলাম।"[৫] তাঁর 'নীল ময়ূরের যৌবন' উপন্যাসের মূল উপজীব্য নিম্নবর্গের আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই। কিন্তু এই উপন্যাসে তিনি চর্যাপদের যুগের বিচিত্রধর্মী নারী চরিত্রের সাথে পাঠকের পরিচয় করিয়েছেন। সেই চরিত্রের ভিড়ে ডোম্বি চরিত্রটি প্রেমে-প্রতিরোধে- প্রতিবাদে পৃথকভাবে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

'নীল ময়ূরের যৌবন' উপন্যাসে কাহ্নর স্ত্রী হল শবরী। শবরী কাহ্নর ঘরের মানুষ হলেও মনের মানুষ হয়ে উঠতে পারেনি। শবরী কাহ্নর গৃহিণী।কিন্তু ডোম্বি তার বিপদে পরামর্শদাত্রী ও প্রিয় সখী। শবরী কাহ্নের উদ্দেশ্যে নিজেকে যত্ন করে সাজায়-

> "...পছন্দ মতো সাজতে পারলেই শবরী নিজেকে সবচেয়ে সুখী মনে করে। পুবদিকের বেড়া থেকে গুঞ্জার মালা নিয়ে গলায় ঝুলিয়ে দেয়। হাতে কেয়ূর। কটিদেশে মেখলা, পায়ে মল

শবরীর বিশেষ সখ। ঘুরেফিরে নিজেকে দেখে। সারাদিন চন্দন লেপে রাখার দরুন মুখটা এখন আশ্চর্য পেলব, গালে হাত ঘষে নিজেই অবাক হয় ও।"[৬]

কাহ্নপাদ রাজদরবারে কাজ করতে গেলে সে কাহ্নর জন্য বিরহ অনুভব করে, কিন্তু কাহ্ন কেন 'অনেক সম্মানের' এই কাজ ছেড়ে দিতে চায় তার মানে সে খুঁজে পায় না। শবরী কাহ্নকে কেবল তার গৃহস্থালির প্রেমময়,রোজগেরে কর্তারূপেই ভাবতে চায়। কাহ্নর মনকে যখন 'সবাই রাজা' হওয়ার চিন্তা বিহ্বল করে, তখন শবরী হাঁড়িয়ার নেশায় কাহ্নকে শান্ত করতে চায়। কিন্তু কাহ্নর সাম্যবাদী চিন্তাধারার নাগাল সে ধরতে পারে না। শবরীর কাছে ভালোবাসা মানে সুন্দর করে সেজেগুজে কাহ্নর চোখে রমণীয় হয়ে ওঠা, আর সুন্দর করে রান্না করে স্বামীর রসনা পরিতৃপ্ত করা। শুধু স্বামীকে খাইয়েই সে তৃপ্ত নয়,কাহ্নর এঁটো পাতে খেয়ে পতিসেবার পুণ্য ষোলোআনাই লাভ করতে চায় সে। কাহ্নের পল্লীতে শবরীর মতই আর এক পতিপ্রাণা নারী হলো ধনশ্রীর স্ত্রী ভৈরবী। সচ্ছল গৃহস্থ কামোদ তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলেও ভৈরবীর বাবা তা চাননি। ভৈরবীর নিজের কোনো ইচ্ছা-অনিচ্ছা ছিল না। ভৈরবীর স্বামী ভৈরবীকে যথেষ্ট ভালবাসলেও তার দায়দায়িত্ব জ্ঞান বড্ড কম। অভাবের সংসারে অর্থোপার্জনের কথা না ভেবে সে দাবার নেশাতে মশগুল থাকে। বাড়ির অভুক্ত শিশু বা আগত অতিথির কথা তার মনেই থাকে না। কিন্তু ভৈরবী এ বিষয়ে অভিযোগহীন,

"একদিকে অভাব আর অন্যদিকে স্বামীর খামখেয়ালি, এ দুইয়ের মধ্যে অনবরত যুদ্ধ করতে হয় ওকে। ও একেই ভাগ্য বলে মেনে নিয়েছে, আক্ষেপ নেই, প্রতিবাদ নেই। ভীষণ মনখারাপ হলে নিজের মধ্যে গুমরে মরে। নিজেকে পীড়ন করেই ও আনন্দ নিংড়ায়।"[৭]

নিজের মানসম্মান খুইয়ে কামোদের থেকে চালডাল এনে সংসারের চাহিদাকে ঠেকা দেয় সে। কিন্তু কামোদের বউ তপতী সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের মানুষ। সংসারের অভাব তার বরদাস্ত হয় না। তার দাবিদাওয়া পূরণে সামান্যতম ত্রুটি হলে সে স্বামীকে গালাগাল পর্যন্ত দেয়।

দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর 'চর্যাপদ'-এর প্রেক্ষিতে রচিত এই উপন্যাসে দেখা গেছে যে, তথাকথিত নিম্নবর্ণের সমাজে বাইরের জগতের সাথে মেয়েদের মেলামেশায় কোনো বাধা ছিল না। পুরুষের সাথে তারা সমানতালে আর্থিক উপার্জনে অংশগ্রহণ করত। এই উপন্যাসের দেবকী তেমনই একজন নারী। সে মদ চোলাই করে, খদ্দেরদের আপ্যায়ন করে এবং কড়িরও হিসাব রাখে। লোকী-গুণী, সুলেখা বা ভৈরবীর মত মেয়েরা দেবকীর মত অর্থোপার্জন না করলেও তাদের ছাড়া সংসার অচল। শাকপাতা-গুগলি-শামুক কুড়িয়ে, চাঙারি বুনে তারা সংসারকে ঠেলে নিয়ে চলে। নদীর ঘাটে খেয়া পারাবার করে ডোম্বি। আপাদমস্তক প্রাণশক্তিতে ভরপুর সে। ডোম্বি স্বামী পরিত্যক্তা। তার স্বামী তার চোখের সামনে অন্য মেয়ে নিয়ে সংসার করে। কিন্তু 'চরৈবেতি'-র ধারণায় বিশ্বাসী ডোম্বিকে এই বিচ্ছেদ ভাঙতে পারেনি, বরঞ্চ তাকে সামনে এগিয়ে চলার জেদ যুগিয়েছে। সে সুপটু ব্যবসায়ী। পারের কড়ির ব্যাপারে সে অত্যন্ত কড়া। কিন্তু কাহ্ন তার বিনা কড়ির খদ্দের।তাকে পার না করালে নাকি ডোম্বির 'খ্যাপ সাঁইত' হয় না। 'ডোম্বি' নামটি তার সামাজিক পরিচয়বাহী। কিন্তু কাহ্নর কাছে সে 'ডোম্বি' নয়, সে রাগিণীর মতোই প্রিয় এক নারী -'মল্লারী'। কাহ্নও তার কাছে বড় সাধের 'কানাই'। ব্যাৎসায়ন তাঁর 'কামসূত্র'-এ নরনারীর জীবনকে সুখময় করা নির্দেশ রূপে যে চৌষট্টিটি কলার কথা বলেছিলেন , কাহ্নর স্ত্রী সেই চৌষট্টি কলার মধ্যে সৌন্দর্যকলা ও রন্ধনকলায় বিশারদ। কবি কাহ্নর চোখে এই সৌন্দর্য সাধনা যেন প্রার্থনার মত। কাহ্নর সেই প্রার্থনায় শবরী এক মন্দির। কিন্তু ডোম্বি যেন চৌষট্টিকলার অধিকারিণী,-

"'তোমাকে ভালো লাগার অনেক গুণ আছে।'
'সত্যি?'
'হ্যাঁ গো,সত্যি।'

'কী গুণ বলো দেখি?'

'সে মেলা, কয়টা বলব?'

'যে কয়টা মনে আসে তাই বলো?'

'যেমন গাইতে পারো,নাচতে পারো, নৌকা বাইতে পারো, ভালোবাসতে পারো এবং কবির মনে শক্তি যোগাতে পারো।' "[৮]

–'কবির মনে শক্তি যোগাতে' পারার প্রসঙ্গেই শবরীর থেকে ডোম্বি আলাদা হয়ে গেছে কবি কাহ্নর চোখে।

কাহ্ন রাজবাড়িতে পাখা টানে। সেখানে তার জাতের অন্য মানুষের প্রবেশাধিকার পর্যন্ত নেই।রাজার গাড়িকে কাদা থেকে তুলে দিয়ে রাজাকে বিপদ থেকে রক্ষা করার বিনিময়ে সে এ কাজ পেয়েছে। সেখানে 'ব্রাহ্মণদের নাক সিঁটকানো ভাব' তাকে প্রতিমুহূর্তে চাবুকের মতো আঘাত করে। নীলরক্তের কাঁটাকুটো চেটে আত্মগ্লানিতে ডুবে যেতে থাকে সে। কিন্তু তার এই যন্ত্রণা শবরী উপলব্ধি করতে পারে না। অন্যদিকে কাহ্নর মনের এতোটুকু আঁধারও মল্লারীর চোখ এড়ায় না,-

"'মাঝে মাঝে তুমি কি যেন ভাবো।'

'কই না তো? তুমি বেশি দেখতে পাও।'

'আমাকে ফাঁকি দিও না। তোমার মুখ দেখলে আমি সব টের পাই।'"[৯]

৪

যে অসম্মান অপমানের কালি কাহ্নর মনে আঁধার জমিয়ে তুলেছে তা মুছে দেবার প্রয়াসে সে নিজের প্রাণকেও তুচ্ছ জ্ঞান করে। দেশাখ এই পল্লীর নেতা। নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে নিতে সে রাজার সাথে লড়াইয়ে প্রস্তুত। কিন্তু ডোম্বিকে সেও ভয় পায়। ডোম্বির ব্যক্তিত্বই এই ভয়ের উৎস। তার কথা বলার সাবলীলতা, আত্মবিশ্বাসী মূর্তি কাহ্নর মনেও সম্ভ্রম জাগায়। শিকারে যাওয়ার সময় দেশাখ ও তার দলবল ডোম্বিকে পারের কড়ি দিতে চায়নি। কিন্তু ডোম্বি তার ন্যায্য দাবিতে অটল। তখন নিরুপায় আক্রোশে কামোদ ও দেশাখের মতন বীরপুরুষেরা নিচুস্বরে ডোম্বিকে গালাগাল দেয়। কারণ,তাদের কথা ডোম্বির কানে গেলে বইঠার ঘায়ে মাথা দু -ফাঁক হয়ে যাবে। নদীতে বড় মাছ দেখে পুরুষদের জিভ দিয়ে যখন লালা ঝরেছে তখন ডোম্বিই একমাত্র নিজেদের যন্ত্রণা ও বঞ্চনার কথা তুলে ধরেছে- "'কিন্তু ওই মাছ তো আমাদের কপালে জুটবে না। ও তো আগে রাজার হেঁসেলে যাবে।'"[১০] ডোম্বির এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি তার প্রতিবাদী মানসিকতারই পরিচয় দেয়।

ডোম্বির মনে সর্বদাই এক প্রতিশোধের আগুন জ্বলে। সে প্রতিশোধ উচ্চবর্ণের শোষণের বিরুদ্ধে নাকি তার জীবনের অসম্পূর্ণ বাসনাজাত- তা স্পষ্ট নয়। তবে ডোম্বি যেখানে অন্যায় দেখে সেখানেই গর্জন করে ওঠে। উৎসব প্রাঙ্গণে শবরীর সাথে কাহ্নকে দেখে ডোম্বির কাছে উৎসবের রং ফিকে হয়ে যায়। সে বুঝতে পারে যে, কাহ্ন তাকে ভালবাসলেও শবরী তার স্ত্রী, সমাজের চোখে তার দাবি অনেক উপরে। সামাজিক এই সম্মান সে কোনোদিনই পাবে না।তখন তার মনে হয় যে,বহু গুণে গুণবতী হয়েও তার জীবনে লোকসানের পাল্লাই ভারী। আর বিপুল লোকসানের বোঝা তাকে বেপরোয়া, জীবনের প্রতি মমত্বহীন করে দিয়েছে। সে চায় জীবনের বিনিময়ে হলেও সব অসাম্য, সব অন্যায়ের বিনাশ ঘটাতে।

রাজা বুদ্ধমিত্রের কাছে রাজসভায় নিজেদের ভাষায় রচিত নিজের গান গাওয়ার অনুমতি আদায় করে কাহ্ন। এই অনুমতি পেয়ে কাহ্ন আনন্দে দিগবিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিল। কিন্তু মল্লারীর মধ্যে প্রথম থেকেই এই বিষয়ে একটা সন্দেহ জাগে। সে জানে উচ্চসমাজের কাছে তাদের ছোট জাতের যেমন কোন অধিকার নেই, তেমনি তাদের ভাষা ও কৃষ্টিরও কোনো সম্মান নেই। কিন্তু এই ঘটনায় শবরী পতিনিষ্ঠ পত্নীর মতোই

স্বামীর সুখে সুখী হয়েছে। স্বামী সারারাত জেগে গীত রচনা করলে সেও সারারাত কাহ্নর পাশে জেগে বসে থেকেছে। কিন্তু নিজের ভাষাকে যোগ্য সম্মান দিতে পারবে কিনা- এই আশাআশঙ্কায় দোদুল্যমান কাহ্নর দুশ্চিন্তার যথার্থ কারণ সে অনুধাবন করতে পারেনি। বরঞ্চ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত কাহ্নর শবরীর প্রতি অমনোযোগ বা ভালোভাবে না খাওয়া-দাওয়া তাকে ব্যথিত করেছে। কিন্তু সেই ব্যথার উৎস নির্ণয়ের ক্ষমতা বা মানসিকতা কোনোটাই তার নেই। এইখানেই মল্লারী আর পাঁচটা নারীর থেকে স্বতন্ত্র। এরপর মল্লারীর আশঙ্কাই সত্যি হয়। কাহ্ন রাজবাড়িতে মাতৃভাষায় রচিত গীত পাঠ করতে ব্যর্থ হয়। অপমানিত কাহ্ন তার অপমানের জ্বালা জুড়াতে দেবকীর মদিরায় বেহুঁশ হতে চায়। কিন্তু তার অন্তরের জ্বালা জুড়াতে দেবকী বা তার বানানো মদ ব্যর্থ। কারণ, এই জ্বালার উৎস যেখানে সেখানে প্রলেপ দেবার ক্ষমতা কারোরই নেই-না শবরীর, না মদিরার। সেই ক্ষমতা আছে কেবল মল্লারীর। তাই কাহ্ন নিজের অজান্তেই পৌঁছে গেছে মল্লারীর দুয়ারে। কাহ্ন জানে দেবকীর মদ যে নেশা তৈরি করতে পারেনা,তা পারে মল্লারীর প্রতিবাদী মন। মল্লারীর প্রতিবাদী সত্তাই কাহ্নর আহত মনের একমাত্র মলম।

কাহ্ন রাজসভায় অপমানিত হয়ে বিনা প্রতিবাদেই ফিরে এসেছিল। নিজের এই অবস্থার জন্য তার মনে গ্লানি তৈরি হলেও তার এই অবস্থার জন্য দায়ী দেবলভদ্র ও তার অনুচরবৃন্দের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ সে করতে পারেনি। কিন্তু প্রতিবাদী মল্লারী তার মনে প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়ে তুলেছিল। নিজের ভাগ্যকে ভবিতব্য বলে মেনে নেওয়া কাহ্নকে সে প্রতিবাদের পাঠ শিখিয়েছে-

"'মল্লারী দেবল ভদ্র আজ আমাকে ভীষণ অপমান করেছে।'

'কেন? গীত পড়োনি?' মল্লারীর দু- চোখের পাতায় ঝিলিক।

'আমি ছোটলোক, মুখের ভাষায় গীত লিখি, সব ছুঁচোর কেত্তন। দেবল ভদ্র আমাকে দরবার থেকে বের করে দিয়েছে।'

'তুমি কি করলে?' মল্লারীর এর কণ্ঠে চাপা ক্রোধ।

'কিছু করিনি।'

মল্লারী তেড়ে ওঠে, 'কিছু করলে না? মাথা ফাটিয়ে দিতে পারলে না?'

'তাহলে কি আমাকে কি আস্ত রাখত?'

৫

'না রাখলে মরতে, আমরা সবাই জানতাম তুমি মুখের ভাষার জন্য মরেছ। কুকুরের মত লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যদি আসবে তবে গেলে কেন ওখানে?'

'মল্লারী?'

মল্লারী সমান তোড়ে বলে, 'পারো কেবল অবাক হতে, আমি যা বলি মনের কথা বলি, একটুও ফাঁকি নেই। যাকে তুমি প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসো তার জন্য মরতে পারো না?' "[১১]

কাহ্নকে সে পরামর্শ দিয়েছে- "'মনকে পুড়িয়ে কষ্ট দিয়ে লাভ কী? পারলে দেবল ভদ্রের বাড়িটা পুড়িয়ে দাও।'"[১২] মল্লারীর এই কথাগুলি কাহ্নর সমস্ত সত্তায় প্রতিবাদের আগুন জ্বেলে দেয়। ডোম্বির এই উক্তি যেমন নিজের মাতৃস্বরূপা ভাষার জন্য কাহ্নকে আত্মোৎসর্গের প্রেরণা দেয়, তেমনি ডোম্বিও যে তার প্রিয় মানুষ কাহ্নর অপমানের জবাব দিতে নিজের জীবন বাজি রাখতে পারে, তারও ইঙ্গিত দিয়ে যায়। সে কাহ্নর মাথায় হাত রেখে কাহ্নর অপমানের প্রতিশোধ নেবার শপথ নেয়।

ডোম্বি আজন্ম প্রতিবাদিনী। তার পরিহাসেও মিশে রয়েছে প্রতিবাদ । ঘাটের শুল্ক আদায়কারীকে সে মজা করে 'তরপতি' বলে ডাকে। উচ্চবর্ণের মানুষদের গায়ে কোনো নীচজাতির লোকের ছায়া পড়লে বিষম পাপ হয় এবং সেই নীচবর্ণের মানুষটিকে শাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণরা কোন নিম্নবর্ণের নারীর সাথে ব্যভিচার করলে তার বেলা কোন দোষ হয় না। তরপতি ডোম্বিকে কর চাইলে তরপতিকে ব্যঙ্গ করে ডোম্বি তাই বলে,- "'আপনার কড়ি আমার কাছে এলেই এ কর শোধ হবে.....'"[১৩] কিন্তু রাজপুরুষদের সাথে ডোম্বির দৈহিক সম্পর্ক কেবল কড়ির গন্ডিতেই আবদ্ধ। কানু আছে তার সমগ্র সত্তা জুড়ে। উচ্চবর্ণের এঁটো ডোম্বিকে শুদ্ধ স্নান করায় যে নদীর স্রোত,ডোম্বির কাছে কানু সেই নদীর থেকেও আপন, "'নদী তুই আমার সব- মা, বাবা, বন্ধু, কেবল তুই আমার কানু হতে পারিস না।'"[১৪] সরকার যখন ঘোষণা করেছে, উচ্চবর্গের পুরুষের নিম্নবর্গের নারীগমন আইনসিদ্ধ,তখন সকলে অসন্তুষ্ট হয়েছে। ডোম্বির গায়েও তখন বিছুটির জ্বালা ধরেছে। উচ্চবর্ণের লোকেদের উদ্দেশ্যে সে চিৎকার করে বলেছে, "'বেশ হল,খদ্দের বাড়ল আমার, রোজগারও বাড়বে। দেশের রাজা আমাদের ভারি দয়ালু। গরিবের দিকে দৃষ্টি আছে।'"[১৫] বেড়াল তপস্বীদের এই ছুঁৎমার্গকে সে ঘৃণার চোখে দেখে। অরণীবাবুকে পার করতে গিয়ে অরণীবাবুর গায়ে ইচ্ছা করে জল ছিটিয়ে দেয় সে। দেশাখদের মতো সংগঠকের প্রতিবাদের পাশাপাশি ডোম্বির এই ধরনের মজার মধ্যেও কম প্রতিশোধস্পৃহা লুকিয়ে নেই।

ডোম্বির 'বামুন' সঙ্গ নিয়ে কাহ্ন কোনো প্রশ্ন না করে না। কিন্তু এ বিষয়ে ডোম্বি যেন কাহ্নর প্রতি এক অদৃশ্য দায়বদ্ধতা অনুভব করে। সে কাহ্নকে বলে- "'তুমি রাগ কোরো না কানু। বামুনগুলোকে সবদিন ঢুকতে দেই না। যেদিন কড়ি থাকে না, উপোস করতে হয় সেদিনই কেবল দেই।তুমি রাগ করেছ কানু?'"[১৬] কাহ্ন এই সমস্যার সমাধান খোঁজে ভালোবাসার পন্থায়-

> "'আমার যদি অনেক কড়ি থাকতো মল্লারী!'
> 'তাহলে বুঝি পথে পথে ছিটিয়ে বেড়াতে?'
> 'না পথে নয়। ভালোবাসা বাঁচাতাম।'"[১৭]

এই ছোট্ট কথোপকথনেই তাদের আত্মিক ভালোবাসা ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কাছে তাদের নিরুপায়তার প্রসঙ্গ স্পষ্ট হয়ে যায়।

সমস্ত পল্লীই রাজা ও তার অনুচরবর্গের হাতে অত্যাচারিত। কিন্তু রাজবাড়ির সুখরাত্রিব্রতের দই ও সরষে দিয়ে রাঁধা মাংসের প্রতি তাদের বড় আকর্ষণ। তবে কাহ্নর কাছে ওইদিনের আকর্ষণ ডোম্বির নাচ। ডোম্বির নাচ তার মনে এতটাই আনন্দ দেয় যে, সে বেড়া থেকে পাখির পালকের কলমটা নামিয়ে নিয়ে লিখে ফেলে,-

> "ভব নির্বাণে পড়হ-মাদলা
> মন বপন বেণি করণ্ডকশালা।।
> জঅ জঅ দুন্দুহি-সাদ উছলিআঁ
> কাহ্ন ডোম্বি-বিবাহে চলিআ।।"[১৮]

কাহ্নর এই পদরচনা ডোম্বিকে কেন্দ্র করে কাহ্নর মনের সুপ্ত বাসনারই কাব্যিক রূপ। জবার দেশে বিরল গোলাপ মল্লারী যেমন জোগাড় করেছে কানুর জন্য,তেমনই কানুও তার জন্য তৈরি করেছে শিল্পীর সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার-গান। কাহ্ন তার গানের যথার্থ সুর খুঁজে পায় ডোম্বির কণ্ঠে। শবরীর প্রতি স্বামী হিসেবে সে যথেষ্ট দায়িত্বশীল ও প্রেমময় হলেও সেই প্রেম কেবল সংসারেই আবদ্ধ।

৬

আর ভাবের জগতে কাহ্নর রাণী কেবল মল্লারী। রাজার ভোজে কাহ্ন যায়নি দেখে ডোম্বি আনন্দিত হয়েছে এবং সে নিজেও যায়নি। যে রাজদরবার তার কানুকে অপমান করেছে, সেখানে খাবার কথা ভেবে তার বমন

উদ্রেক হয়। ডোম্বি কোনো পুঁথি পড়েনি বা কাহ্নর মত সে কবিও নয় -দেশাখের মত সে যুদ্ধবিদ্যায় পারঙ্গমও নয়। তবু এ কথা ঠিক যে, স্বৈরাচারীর বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান কেবল যুদ্ধে হয় না। তার জন্য দরকার গণচেতনা। সেই গণচেতনার আলোকে ডোম্বি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আলোকিত। ধর্মতঃ শবরী কাহ্নর অর্ধাঙ্গিনী। কিন্তু কাহ্নর শরীরে যে অপমানের শলাকা বিদ্ধ হয়ে রয়েছে তা শবরীর চেতনায় ধরা পড়ে না। তাই কাহ্নর চাকরি ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত সে সহজে মেনে নিতে পারেনি। নিশ্চিত ভাতের আশ্রয় থেকে বিচ্যুত হতে আর পাঁচটা নারীর মতোই সে ভয় পায়। যে ভাতের ও পুরুষের আশ্রয়ের খোঁজে সুলেখা ভুসুকুর স্মৃতি ভুলে সুদামের ঘরে গিয়ে উঠেছিল সেই ভাতের ভয় ছিল ডোম্বিরও। পরে ধনশ্রী ও ভৈরবীর প্রতি অবিচারের কথা ভেবে শবরী মনে করে যে, অত্যাচারী রাজার চাকরি ছেড়ে কাহ্ন ঠিকই করেছে। কিন্তু ততক্ষণে ডোম্বি কাহ্নর মনে যে প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল সেখানে শবরীর এই মানসিকতার পরিবর্তনের আর কোনো প্রয়োজন কাহ্নর কাছে ছিল না।

কাহ্ন ছোটজাতের মানুষ। রাজদরবারে প্রবেশ করা তার পক্ষে যেমন কঠিন,বের হওয়াও তেমনি প্রভুর অনুমতিসাপেক্ষ। তার ওপর আবার কাহ্ন ব্রাহ্মণ প্রভুদের বিদ্ধ করে গীত রচনা শুরু করেছিল-

"নগর বাহিরেরেঁ ডোম্বি তোহোরি কুঁড়িআ।
ছোই ছোই যাইসি ব্রাহ্ম নাড়িআঃ"[১৯]

তার এই গানে নিম্নবর্গের মানুষ উচ্চবর্গের প্রতি প্রতিবাদ জানানোর ভাষা খুঁজে পায়। জোয়ান ছেলেরা পথে-ঘাটে হাততালি দিয়ে এই গীত গাইতে থাকে। শবরীও এই গানে নিজের জাতির প্রতি হওয়া লাঞ্ছনার যোগ্য প্রত্যুত্তর শুনতে পায়। রাজার লোক এই গীত রচনার অপরাধে কাহ্নকে আটক করে। এমন পরিস্থিতিতেও কাহ্ন ভয় পায় না। বরঞ্চ কাহ্ন গণঅভ্যুত্থানের ডাক দিয়ে বলে- "ভয় পাই না দেশাখ। এক কানু গেলে কী হবে, তোরা তো আছিস।"[২০] এই ঘটনার অভিঘাতে শবরী আকুল কান্নায় ভেঙে পড়লেও ডোম্বির চোখের জল প্রতিশোধের আগুনে শুকিয়ে গিয়েছিল। এই প্রতিবাদী মনোভাব থেকেই কাহ্ন নিজের জীবন রক্ষার সুযোগের বিনিময়েও রাজার প্রশস্তি লিখতে অস্বীকার করে। যে কাহ্ন রাজসভায় গীত পরিবেশন করতে না পেরে মাথা নিচু করে বেরিয়ে এসেছিল এই কাহ্ন সেই কাহ্নর থেকে অনেক আলাদা। এই কাহ্নর কারিগর হলো ডোম্বি। অন্যদিকে কাহ্নর এই পরিণতি ডোম্বিকেও বেপরোয়া করে তোলে। ব্রাহ্মণ মন্ত্রী দেবলভদ্রের ভাগ্না দেহের লোভে শবরীর কাছে এলে শবরী তার বুকে ছুরি বসিয়ে দেয়। অসমসাহসী এই কাজের মাধ্যমে মাধ্যমে সে যেমন নিজের প্রেমাস্পদের প্রতি হওয়া অন্যায়ের প্রতিশোধ নেয়,তেমনি নিম্নবর্ণের প্রতিটি মানুষ তথা নারীর হয়েও প্রতিশোধ নেয়। সে জানে এই কাজের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু সমাজের জন্য, প্রেমের জন্য মরতে তার ভয় নেই। কেবল আক্ষেপ- শেষবারের মতো কানুর সাথে দেখা হলো না। তার মৃত্যুর সাথে সাথে তার প্রতিবাদের বাণীও যাতে মরে না যায় সেইজন্য আকুলস্বরে সে দেশাখকে বলেছে- "দেশাখ আমার কথা তোর মনে থাকবে ?"[২১]

'নীল ময়ূরের যৌবন' -উপন্যাসে যৌবনে দশম-একাদশ শতাব্দীর সময়কার এক নিম্নবর্গের পল্লীর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। তাদের জীবনচর্যা, বঞ্চনা, তাদের রাজা তথা উচ্চবর্গের মানসিকতা ও তাদের প্রতিবাদই এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য। তবে এই উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলি আদি ও মধ্যযুগের মধ্যযুগের অন্যান্য কাব্যের নারী চরিত্রের তুলনায় কিছুটা স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখে। মূল 'চর্যাপদ' পাঠ করলেও দেখা যাবে, সেই সমাজের মেয়েরা অবরোধবাসিনী ছিল না। এই উপন্যাসের নারীরাও অবরোধবাসিনী নয়, বরঞ্চ তারা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী। বিবাহিত বা অবিবাহিত- উভয় প্রকার নারীই জীবনসঙ্গী নির্বাচনে যথেষ্ট স্বাধীন ছিল। সুলেখা যখন সুদামের সাথে নতুন সংসার পেতেছে তখন তেমন কোন প্রশ্ন ওঠেনি। উৎসবের রাত্রিতে নারী-পুরুষের

নিজেদের ইচ্ছামত জুড়ি নির্বাচন এই স্বাধীনতারই পরিচয়বাহী। তবে এখানে একটি প্রশ্ন চিহ্ন রয়ে যায় । প্রবন্ধের শুরুতেও দেখানো হয়েছে যে, নারী দিবস পালন বা নারীর ভোটাধিকার অর্জনই নারীর সামাজিক সম্মানের প্রসঙ্গে শেষ কথা নয়। তাহলে বিংশ শতাব্দীতেও নারীকে 'second sex' বলা হত না বা একবিংশ শতাব্দীতে ধর্ষণ, বধূহত্যা, marital rape-র ঘটনা ঘটত না। 'নীল ময়ূরের যৌবন' উপন্যাসের মেয়েদের সম্পর্কেও ঠিক একই কথা বলা যায় । সমাজে ডোম্বি যতই স্বাধীনচেতা হোক না কেন উচ্চবর্ণের দ্বারা নিগৃহীত হতে সে বাধ্য ছিল। একটি সুখী সংসারের আশায় ভৈরবী যতই মুখ মুখ বুঝে ধনশ্রীর সব দায়িত্বজ্ঞানহীনতা মেনে নিক না কেন, যমজ সন্তান জন্ম দেওয়ার কারণে অযৌক্তিকভাবে ব্যভিচারিতার হাস্যকর অভিযোগ এনে তাদের সংসার ভেঙে দেওয়া হয়। বিশাখের বোন

৭

লোকী ও গুণী ধান জমি থেকে সামান্য শাক-গুগলি তুলতে গিয়ে রাজার পেয়াদা নিখিলের লালসার শিকার হয়। উচ্চবর্ণের নারীরাও এর ব্যতিক্রম নন। রাণী রাজসভার সকলের কাছে সম্মান পান। বহুমূল্য বস্ত্র-অলংকারে তিনি সজ্জিত। কিন্তু নারী হিসেবে তিনি চরম অপমানিত-

> "উৎসবের শুধু প্রথম পর্বের জন্য চন্দ্রলেখা, দ্বিতীয় পর্বে তার কোন অধিকার নেই। যখন নর্তকীর নূপুরনিকবণে চঞ্চল হয়ে উঠবে বুদ্ধমিত্রের সমস্ত শরীর তখন চন্দ্রলেখার জন্য দরবারের দরজা বন্ধ, তার স্থান অন্দরমহলে। সে অবস্থান প্রতিবাদহীন, চন্দ্রলেখা নিজেও তা জানে এবং জেনেও তা সহ্য করে।"[২২]

দরিদ্র ধনশ্রীর মতো সরকারের কর আদায়কারী কর্মচারী অরণীকেও শালার ভাস্তের কন্যার নামে মিথ্যা কলঙ্কের কারণে সে স্ত্রীকে ত্যাগ করতে হয়েছে।

এই উপন্যাসে নিম্নবর্ণ ও উচ্চবর্ণের একাধিক নারীর প্রসঙ্গ এসেছে। নিম্নবর্ণের ভৈরবী, লোকী-গুণীরা জাতির বা নিজেদের অবস্থার প্রতিবাদ করেনি। এমনকি দেশের রাণীও নারীত্বের অপমান সহ্য করে নিয়েছেন নীরবে। তাই বলা যেতে পারে, নারীর এই বঞ্চনার জন্য নারীদের সর্বংসহা মনোভাবই অনেকাংশে দায়ী। কিন্তু ডোম্বি একজন সহায়সম্বলহীনা, আত্মীয়পরিজনহীনা মেয়ে হয়েও সমস্ত জাতির হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে। সুলেখার দাম্পত্যে সাময়িক ছেদ পড়লে সুলেখা নতুন ঘর খুঁজে নিয়েছে। কিন্তু বিবাহবিচ্ছিন্না ডোম্বি আর বিবাহ করতে চায় না। সে নিজের মতো করে সে বাঁচতে চায়। সে প্রাণপণে করে বিশ্বাস করতে চায় যে, বিচ্ছেদ তার জীবনের কণামাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। প্রাণশক্তিতে ভরপুর ডোম্বি আবার নতুন করে বাঁচতে চায়। বাড়ির পাশে চাঁচর বেড়া তোলে, কার্পাস লাগায়, হরিণের মাংস খায়, মাছ ধরে- সর্বোপরি যে কাহ্নকে সে কোনদিনই সামাজিকভাবে পাবে না, সেই কাহ্নকে সে প্রত্যাশাহীনভাবে ভালোবাসে।

কাহ্নর সমাজের প্রতিটি মানুষই ছিল উচ্চবর্ণের হাতে নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, অপমানিত। তারা সেই অপমানকে ভবিতব্য বলেই মেনে নিয়েছিল। তবে নিমাইয়ের মত সকলেই যে শাসকের ভয়ে স্বজাতিকে চুপচাপ শাসকের পদলেহন করতে পরামর্শ দিত, এমন নয়। প্রত্যেকেরই বুকের মধ্যে চাপা অসন্তোষ ছিল। কিন্তু উপন্যাসের প্রথম থেকেই ডোম্বি ও দেশাখ চরিত্রদুটি প্রতিবাদে মুখর। দেশাখ রাজদ্রোহের মাধ্যমে এক সাম্যবাদী রাজ্যের জন্ম দেওয়ার স্বপ্ন দেখতো। তার সেই মানসিকতা সে তার প্রেমিকা বিশাখার মধ্যেও সঞ্চালিত করতে পেরেছিল। দেশাখের মতো ডোম্বিও ছিল আজন্ম প্রতিবাদিনী। আর্থিক স্বাবলম্বী, স্বাধীনচেতা, স্বয়ংসম্পূর্ণা এই নারী ছিল নির্ভীক। স্বজাতি বা উচ্চবর্গ- কারোরই অন্যায় সে সহ্য করেনি। যখন তার প্রাণের কানুকে সে অত্যাচারিত হতে দেখেছে, তখনই তার প্রতিবাদ প্রতিশোধে পরিণত হয়েছে। প্রতিশোধস্পৃহায় মৃত্যু পর্যন্ত তার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে। আর তখনই পাটনী, নৃত্যগীত পটীয়সী,প্রেমিকা ডোম্বি প্রতিবাদে, প্রতিরোধে হয়ে

উঠেছে এক জলন্ত অগ্নিশিখা। যে অগ্নিশিখা নিজে ছাই হয়ে গিয়েও প্রতিবাদের ভাষা যুগিয়ে দিয়েছে প্রতিটি ভীত,সন্ত্রস্ত জনতার মুখে।

তথ্যসূত্র:

১) ইসলাম, নজরুল। নজরুল রচনাবলী (দ্বিতীয় খন্ড)। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৭, পৃ. ৮৯।
২) দাশ, নির্মল। চর্যাগীতি পরিক্রমা। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, ১৯৯৭, পৃ. ১৬২।
৩) মুখোপাধ্যায়, সুতপা। বৈষ্ণব জীবনী সাহিত্যে নারীসমাজ। কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স,১৪০৩। পৃ. ২৬।
৪) বন্দোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা)। ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী (দ্বিতীয়ভাগ)। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ। পৃ. ১২২।
৫) সাক্ষাৎকার, বইয়ের দেশ। কলকাতা: এবিপি প্রাইভেট লিমিটেড, এপ্রিল-জুন ২০২২। পৃ. ৯৭।
৬) হোসেন, সেলিনা। নীল ময়ূরের যৌবন। কলকাতা: নয়া উদ্যোগ, ২০০৯। পৃ. ১।
৭) তদেব, পৃ. ২০।
৮) তদেব, পৃ. ১৩।
৯) তদেব, পৃ. ১৪।
১০) তদেব, পৃ. ২৬।
১১) তদেব, পৃ. ৫১-৫২।
১২) তদেব, পৃ. ১০৫।
১৩) তদেব, পৃ. ৫৬।
১৪) তদেব, পৃ. ৬০।
১৫) তদেব, পৃ. ৬০।
১৬) তদেব, পৃ. ৮৫।
১৭) তদেব, পৃ. ৮৬।
১৮) তদেব, পৃ. ৯৫-৯৬।
১৯) তদেব, পৃ. ১৩১।
২০) তদেব, পৃ. ১৩১।
২১) তদেব, পৃ. ১৩৭।
২২) তদেব, পৃ. ৪২।

গ্রন্থপঞ্জি:

আকর গ্রন্থ:

১) হোসেন, সেলিনা। নীল ময়ূরের যৌবন। কলকাতা: নয়া উদ্যোগ, ২০০৯।

সহায়ক গ্রন্থ:

১) Beauviour, Simon de. The Second Sex. Vintage Classic, 1949
২) ইসলাম, নজরুল। নজরুল রচনাবলী (দ্বিতীয় খন্ড)। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৭।
৩) দাশ, নির্মল। চর্যাগীতি পরিক্রমা। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, ১৯৯৭।

৪) বন্দোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা)। ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী (দ্বিতীয়ভাগ)। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ।

৫) বসু, বাণী। মৈত্রেয় জাতক। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭৪।

৬) বসু, রাজশ্রী ও বাসবী চক্রবর্তী। প্রসঙ্গ মানবীবিদ্যা। কলকাতা: উর্বী প্রকাশন, ২০১৪।

৭) ভট্টাচার্য, আশুতোষ।বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস। কলকাতা: এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০২।

৮) ভট্টাচার্য, তপোধীর। নারী চেতনাবাদ মননে ও সাহিত্যে। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০৭।

৯) ভট্টাচার্য, সুকুমারী। প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ। কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ২০০৬।

১০) মুখোপাধ্যায়, সুতপা। বৈষ্ণব জীবনী সাহিত্যে নারীসমাজ।কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৪০৩।

১১) সেন, সুকুমার।প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৩।

১২) সেনগুপ্ত, মল্লিকা। স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৪।

সহায়ক পাত্রিকা:

১) সাক্ষাৎকার, বইয়ের দেশ। কলকাতা: এবিপি প্রাইভেট লিমিটেড, এপ্রিল-জুন ২০২২।

নির্দেশনা:

প্রবন্ধ পাঠানোর জন্য প্রথমে ওয়েবসাইটে (https://uttarsuri.com/uttarsuri) অথবা উপরে দেওয়া Submit your Article এ ক্লিক করলেও হবে) লেখক হিসেবে নিবন্ধন (Registration) করতে হবে। নিবন্ধন করার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে (Automatic) আপনি লেখা জমা দেওয়ার জন্য পোর্টালে প্রবেশ (Login) করতে পারবেন, প্রবেশ করার পর লেখকের নিজস্ব ড্যাশবোর্ডের বামদিকে Articles এ চাপ দিলে Add New আসবে, তাতে ক্লিক করে প্রবন্ধ জমা করতে হবে। প্রবন্ধ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য আপনি ইমেইল/পাসওয়ার্ড দিয়ে প্রবেশ করলে পেয়ে যাবেন এবং উত্তরসূরি থেকেও স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইমেইলে আপনাকে জানিয়ে দেওয়া হবে।

গবেষণাপত্র রচনায় অনুসৃতব্য পদ্ধতি:

১. শিরোনাম (Title): শিরোনাম যথাযথ এবং স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।
৩. সারসংক্ষেপ (Abstract): ইংরেজিতে ৩০০ শব্দের মধ্যে।
৪. সূচক শব্দ (Keywords): ন্যূনতম ৫টি।
৫. মূল আলোচনা: গবেষণাপত্রে ন্যূনতম ২৫০০ শব্দ থাকতে হবে। শব্দ সংখ্যা ২৫০০ এর কম হলে তা রিভিউ করা হবে না।
৬. তথ্যসূত্র (Reference): লেখকের পদবি, লেখকের নাম। গ্রন্থের নাম। প্রকাশনীর নাম, প্রকাশকাল, প্রকাশস্থান, পৃষ্ঠাঙ্ক।
৭. গ্রন্থ ও পত্রিকাপঞ্জি (Bibliography): পৃষ্ঠাঙ্ক ব্যতিরেকে উল্লেখিত পদ্ধতি।

গবেষণাপত্র প্রেরণের নিয়মাবলী:

১. প্রবন্ধ হতে হবে সুচিন্তিত, মৌলিক ও গবেষণাধর্মী। প্রবন্ধে Plagiarism-এর মত ঘটনা ঘটলে তার দায় সম্পূর্ণভাবে লেখকের। পত্রিকা কোনোভাবেই দায়ী থাকবে না। প্রবন্ধ AI ব্যবহার করে লেখা হলে ছাপানোর জন্য গ্রহণযোগ্য হবে না।
২. অভ্র কীবোর্ডে, যে কোনো ফন্টে টাইপ করে লেখা পাঠাতে পারেন (জার্নালে বেনসেন ১৩ ফন্ট ব্যবহার করা হয়)। ইংরেজির ক্ষেত্রে Times New Roman 12 ফন্ট ব্যবহার করতে হবে।
৩. বাক্যে ব্যবহৃত যতিচিহ্নের (দাড়ি, কমা, সেমিকোলন, প্রশ্নচিহ্ন, বিস্ময়সূচক চিহ্ন ইত্যাদি) আগে কখনোই স্পেস দেওয়া যাবে না। পরে একটি স্পেস দিতে হবে।
৪. গল্প, কবিতা, উপন্যাস, গল্পগ্রন্থ, প্রবন্ধ গ্রন্থ ইত্যাদির নাম 'Single Quote' এর মধ্যে রাখতে হবে।
৫. গদ্য, পদ্য বা যে কোনো টেক্সটের উদ্ধৃতি "Double Quote" এর মধ্যে রাখতে হবে।
৬. উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি দেওয়া বাধ্যতামূলক।
৭. আকাদেমি বানান অভিধান (পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি) অনুসরণ করে ভালোভাবে প্রুফ দেখে লেখা পাঠাতে হবে। আকাদেমি বানান অভিধান এর বিকল্প হিসেবে ব্যবহারিক বাংলা বানান অভিধান, পবিত্র সরকার দ্রষ্টব্য।
৮. সম্পাদকগণ প্রয়োজনে সংশোধন বা সামান্য পরিবর্তন করতে পারেন, যদি তিনি তা প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মনে করেন।

তথ্যসূত্র যে ভাবে লিখতে হবে:

বই এর ক্ষেত্রে:

১. সেলিম, মুস্তাফা। বাহান্ন তাসের পর। সোনিক অর্কেস্ট্রা, ১৯৭৮, ধর্মনগর, পৃ. ৩।
২. একই গ্রন্থ পর পর হলে লিখতে হবে, তদেব, পৃ. ৫।
৩. দে, তমালশেখর। সেলিম মুস্তাফার কবিতা-জগৎ: সাক্ষাৎকার এবং। নীহারিকা পাবলিশার্স, ২০২২, কথামুখ, পৃ. ৬।
৪. দাশ বিশ্বাস, পীযূষকান্তি, সম্পাদনা। ছবি, পাখি সব করে রব, সংখ্যা ১২৫, মার্চ ২০২৪, পৃ. ৮।

সাহিত্যপত্র:

১. দাস বিশ্বাস, পীযুষকান্তি, সম্পাদনা। পাখি সব করে রব, দশম বর্ষ, সংখ্যা ১২০, অক্টোবর ২০২৩, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা।

৪. নাথ, ঋষিকেশ, সম্পাদনা। শব্দনীল, সংখ্যা ২৫, একুশে মার্চ ২০২৩, পয়েন্টস ইউনিট, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা।

পত্রিকা:

১. দাস বিশ্বাস, পীযুষকান্তি, সম্পাদনা। পাখি সব করে রব, দশম বর্ষ, সংখ্যা ১২০, অক্টোবর ২০২৩, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা।

২. ——, সম্পাদনা। পাখি সব করে রব, সংখ্যা ১১৪, এপ্রিল ২০২৩, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা। (একই পত্রিকার ক্ষেত্রে)

ওয়েবসাইট:

ভট্টাচার্য, ড. তমালশেখর। "নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্পে পশুপ্রেম।" আত্মদীপ, www.atmadeep.in/nirbachito-bangla-chotogolpe-poshuprem.html। প্রবেশের তারিখ: ১৮ জুন ২০২৫।

ফুটনোট:

১ ড. তমালশেখর ভট্টাচার্য, "নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্পে পশুপ্রেম," আত্মদীপ www.atmadeep.in/nirbachito-bangla-chotogolpe-poshuprem.html, প্রবেশের তারিখ: ১৮ জুন ২০২৫।

২ মুস্তাফা সেলিম, বাহান্ন তাসের পর, সোনিক অর্কেস্ট্রা, ধর্মনগর, ১৯৭৮, পৃ. ৩।

Plagiarism:

Authors are urged to avoid plagiarism. Any detected instances of plagiarism will be the sole responsibility of the authors.

Review Process

- All the manuscript will be preliminary examined by the Editor-in-Chief and then forwarded to the Reviewers & other Editors of the Journal.
- The papers shall only be published after recommendation of the Reviewers & Associate Editors.
- Information regarding the selection or rejection of articles/papers will be only through Email.
- The journal shall publish the article/papers only after completion of the formalities mentioned in selection letter.
- The journal will also not take the responsibility of returning the rejected articles.

At every stage preceding publication, the editors of the journal shall have the right to make corrections (if needed) in articles/papers to suit the requirement of the journal.

N.B.: Papers will be accepted only when accompanied with abstract (to be written in English only). Submission of papers without abstract (in English) or mere submission of an abstract without the paper would lead to non-acceptance of the same.

Publication Ethics

Publication ethics are the principles and guidelines that govern the conduct of authors, reviewers, editors, and publishers in scholarly publishing. Ensuring ethical practices is crucial for maintaining the integrity and credibility of academic research. Here are some key aspects of publication ethics of our journal:

- **Authorship:** All authors should have made significant contributions to the research and agree to be listed as authors. Misrepresentation of authorship, such as ghost authorship or gift authorship, should be avoided.
- **Originality and Plagiarism:** Authors should ensure that their work is original and properly cited. Plagiarism, including self-plagiarism, is unethical and undermines the integrity of scholarly publishing.

- **Data Integrity:** Authors are responsible for the accuracy and integrity of their research data. Fabrication, falsification, and manipulation of data are serious ethical violations.
- **Conflict of Interest:** Authors should disclose any potential conflicts of interest that could influence their research or its interpretation. These may include financial interests, affiliations, or personal relationships that could bias the work.
- **Peer Review:** Peer review plays a critical role in ensuring the quality and validity of published research. Reviewers should conduct their evaluations objectively and provide constructive feedback.
- **Editorial Independence:** Editors should make decisions based on the merits of the research and without influence from commercial interests, personal biases, or other undue pressures.
- **Publication Ethics Policies:** Journals should have clear and accessible policies on publication ethics, including instructions for authors, ethical guidelines for reviewers and editors, and procedures for handling ethical issues or misconduct.
- **Responsibility of Publishers:** Publishers have a responsibility to support and enforce ethical standards in scholarly publishing. This includes providing resources for editors and reviewers, promoting transparency, and addressing allegations of misconduct.

Publication Charge

The authors should note that there is no submission fee; however, there is a reasonable publication fee for each accepted article to meet the cost of manuscript handling, typesetting, office cum admin expenses, web-hosting charges, up-loading charges, internet expenses, website update and maintenance, electronic archiving and other recurring expenses. The publication fee is obligatory for publication.

- **Indian Authors:** The publication fee for single author per accepted paper is Rs. 1200.00 and Rs. 1500.00 for multiple authors.
- **Foreign Authors:** The publication fee of the accepted paper is $25 for single authored paper and $30 for multiple authored papers
- **Print copy:** Print Copy of the issue can be supplied on payment of Rs. 800.00 per copy. Annual subscription for the print copy is Rs. 3000.00 per Volume (inclusive of postal charges within India) Single print copy can be supplied outside India on payment of 25$ (inclusive international shipping charge) per copy.

ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
Volume-II, Issue-IV, March, 2026
Website: https://www.atmadeep.in/
Email: editor@atmadeep.in

NOVEL INSIGHTS

A Peer-Reviewed Quarterly Multidisciplinary Research Journal
ISSN: 3048-6572 (O) 3049-1991 (P)
Website: https://www.novelinsights.in
Published by: **UTTARSURI**

CALL FOR BOOK CHAPTERS

Date of Publication: 31 July 2026 Submission Deadline: 15 June 2026

Scholars, researchers, and academicians are invited to submit original and unpublished book chapters for inclusion in the following edited volumes. Interdisciplinary and innovative research contributions are highly encouraged.

Proposed Edited Volumes:

- ***Transforming Northeast: Mapping Policy, Progress, and the Path to Prosperity***
- *ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরা ও বাংলা শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি*
- *পাঠ পাঠান্তরে উত্তর-পূর্ব ভারতের নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্প*

Detailed Guidelines & Submission:
https://www.uttarsuri.com/book_chapter_publication.php

From Idea to Publication
Publish Your Book with Uttarsuri Publication
(Academic | Peer-Reviewed | ISBN Assigned)

OPEN ACCESS

UTTAR SURI
Inheriting the spirit, inspiring the future

Uttarsuri | ISO 9001:2015 Certified Publisher
Website: **https://www.uttarsuri.com**
+919101232388
admin@uttarsuri.com

ISSN24541508

₹800